

# চুলে তাই শুরু করব কি করব তা'র দোতামোতায় পড়েছেন?

টু-টোনের ওপর ডানটা  
নির্ভরতায় ছেড়ে দিল!

অন্য আশি তো দোতামায়  
হুলস্থলে।

মাথার চুলে করেটা সাদা কিলিং দেখা'লে,  
মাসেই মোকের নজরে পড়ে যাবে।  
আলসিক ভবন লোকজনের মধ্যে অবাঞ্ছিত  
বোম্ব করবে।

মনে-মনে ভবন আপনি চাইবেন, এ  
সাদা-সাদা চুলগুলিকে সুকিঁচ ফেলি।  
কিন্তু, মাঝামাঝি উল্লসে হবে— তাই  
করা কি নিরাপদ? হুলটা আর সাদা  
থাকবে? চুল শেষ পছন্দ উজ্জ্বল-মুগ্ধ  
কিন্তু হয়ে যাবে না তো? তাই করার কথা  
দুশকণ্ডে কেউ বলবে না কো?

ই-টোনের তত্ত্ব: অত চিত্ত-  
ভীষণ! কেন? চোখ মুগ্ধ তাই  
শুরু করে দিল।

ই-টোন—আমেরিকায় প্রচলিত মেসীন  
কার্টারের বিশেষ কর্তৃত্ব এই তাই,  
আপনার চুল-কে নিরাপদ উপায়ে, আলতো  
পড়বে বীজ-সাদা রঙ এনে দেবে।  
এই পদ্ধতি সহজ নিয়ম পড়-পড় মায়ন:—  
ডাইটা ভেতলপায়ে ভাল ভাবে মোমাম;  
সবাতরক হুতাম। পরে মিন; চুল আলো-  
আলো ভাব করে মিন; এবার ভাল ঘিরে  
ভেতল-পায়ে সাদা চুলে তাই লাগান; অতক  
মিনিট অপেক্ষা করুন; বাস, এবার ঘুরে মিন।

আন্তরিক এ হুলস্থলীক ভবন

(কম)-চোখা জাখা?

আন্তর, এতটা আশঙ্কিত?

দেখছেন কো, এ সাদা-সাদা কিলিং চুলগুলো  
না থাকলে, আপনাকে কত অস্বস্তি,  
সুখী দেখাবে। ই-টোন মাথার চুলে হালকা  
কাখে মিলে ঘিরে চুলের স্বাভাবিক রঙটি  
চমকতর সুকিঁচ ফোলে। আর এই রঙ  
সত্যাহর পর সত্যাহর একই রঙে হয় না।  
আপনার চুল থাকেও যেমন কোরল-রিকম,  
ভেতনই সুকিঁচ। অতক তাইরে চুল  
যেমন রঙ-রঙ তাই করা হয়ে হয়, এতে  
তার নাম-পদও সেই—একবারে সহজাত  
শুধর থাকবে।

আর ভালোবাসা বা অত, এ কিলিং  
সাদা চুলগুলো পাতপাতি ভাবে  
মোপাট করে দিল।

মাথার সাদা চুল দেখা মিলেই ই-টোন  
লাগান। আর পরে, চুল থাকলে, এ  
সাদার কিলিং দেখা মিলে অত-অত 'চাঁদ  
আপ' করে দেবেন। সত্যিসত্যি এ হাল  
একমাত্র তাই, বা আপনার চুলের অতাই  
লাগালে।



পতীর তরে তাই করার চমকতার ওপরে সবাই ই-টোন  
করানোরই অনুরোধ পন্ন। স্বকরের বেলায় তাই।



যখন চঃসহ গরম  
আপনার শক্তি নিঃশেষ  
করে দেয়....



তখন দিন

**গ্লুকন-ডি<sup>®</sup>**

আপনার  
আস্তিত্ব  
স্বাস্থ্যের  
বন্ধন

বাড়তি শক্তির জন্যে—  
যখনই আপনার দরকার।

অসহ্য গরম আপনাকে কতটা ক্লান্ত করে দিতে পারে, অন্য  
কিছুতেই তা পারে না। আর সেই গরমে, পরিভ্রমে আপনার  
সারা শক্তি বেমি নিঃশেষ করে দেয়। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই  
আপনার চাই ঠাণ্ডা, ভরতাল। করা গ্লুকন-ডি। এটি আপনাকে  
বাড়তি শক্তি বোগাবে—ঠিক যখনই আপনার দরকার।

গ্লুকন-ডি হ'ল গ্লুকোজ-ডি'র নতুন নাম, যার ওপর  
৩০ বছর ধরে লক—কোটি ক্রেতার অগাধ বিশ্বাস। যেকোনো  
পানীয়ের সঙ্গেই মিশিয়ে খান—কলের রস, চুখ, চা, কফি,  
জল—বা শুধু এমন-ই। আর দেখুন, কত তাড়াতাড়ি এটি  
আপনাকে চমকুনে ঢাক করে।

গ্লুকন-ডি সারা পরিবারেরই অপরিহার্য।  
এটি দিয়েই শক্তি বোগানোর কলে, ওয়া নতুন  
উদ্যমে কাজে বা খেলার বেতে ওঠে। গ্লুকন-ডি—  
সেই একই পরিচিত সবুজ প্যাকে পাবেন।



MTB-GL-4591-BN

যখনই তৈরী আসল গ্লুকোজ পাউডার,  
যা ভিটামিন-ডি ও ক্যালসিয়াম ফসফেটের গুণে ভরপুর।

## ॥ আমাদের প্রকাশিত কিশোর ও শিশু সাহিত্য ॥

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর		রামী বেদান্তানন্দ		সুখলতা রায়	
হাট্টাপানে রামায়ণ	১০.০০	শ্রীসারদাদেবীর জীবনকথা	৬.০০	নানান দেশের রূপকথা	৬.০০
গজেন্দ্রকুমার মিত্র		নীহাররঞ্জন গুপ্ত		গল্প আর গল্প	১২.৫০
ছেলেদের আরব্য উপন্যাস	১০.০০	কিশোর সাহিত্য সমগ্র (১ম)	১৫.০০	কিশোর গ্রন্থাবলী	১০.০০
এ টেল অব টু সিটিজ	৪.৫০	দ্বিতীয় (২য়)	১৬.০০	সোনার ময়ূর	৩.০০
নীতিকথামালা	০.৬২	তৃতীয় (৩য়)	১৪.০০	সুমধনাথ ঘোষ	
নীতিমঞ্জরী	৮৭	তারানন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়		ছোটদের বিশ্বসাহিত্য	২.৫০
বিদেশী গল্প সংকলন (১ম)	১০.০০	কিশোর গ্রন্থাবলী	১০.০০	সুইস ফ্যামিলী রবিনসন	৩.৫০
" (২য়)	৭.০০	লীলা মজুমদার		ডেভিড কপারফিল্ড	৪.৫০
শিশু রামায়ণ	১.০০	নেপোর বই	৮.০০	কিশোর গ্রন্থাবলী	১০.০০
শিশু মহাত্মারত	১.০০	সীতা দেবী		সুমধনাথ ঘোষের	
দেশবিদেশের লেখাপড়া	১.০০	নিরেট গুরুর কাহিনী		কিশোরোপযোগী প্রের্ত রচনা	
গান্ধী জীবনী	১.৫০	ও অন্যান্য গল্প	৬.০০	কিশোর অমনিবাস	১০.

১২ বই মাত্র ৪.৫০ টাকায়

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের  
সেই বিখ্যাত রূপকথার বই

# ঠাকুরঘার কুঁড়ি

বড় টাইপে  
ছাপা সমস্ত  
ছবি সহ

প্রকাশিত হয়েছে

পেপার ব্যাক সংস্করণ সাড়ে চার টাকা

পুস্তকবিক্রেতা-বন্ধুদের শতকরা ১০ টাকার (১০%) বেশী  
কমিশন দেওয়া সম্ভব হবে না।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

॥ কিশোর পাঠোপযোগী সমগ্র গ্রন্থের সংকলন ॥

## কিশোরসাহিত্য-সমগ্র

১ম খণ্ড : ১৫, ২য় খণ্ড : ১৬, ৩য় খণ্ড : ১৪,

৪র্থ খণ্ডের মূল্য : —

প্রথম খণ্ড : রাজকুমার, লালচিটি, নিশীথরাজের তীরন্দাজ  
অশরীরী আতঙ্ক করে দেয়া মরেছে

দ্বিতীয় খণ্ড : শংকর (প্রথম ভাগ) কালোভ্রমর, বিশ্বর তীর  
বিশ্বায়ের ইন্দ্রজাল লাল মিশান বাদশা  
প্রণাম জানাই (১ম) প্রণাম জানাই (২য়)

তৃতীয় খণ্ড : শংকর (দ্বিতীয় ভাগ) রক্তহীরা  
বক্সসজ চোর কাটা

চতুর্থ খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

॥ প্রকাশিত হল ॥

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের



# দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্র

দ্বিতীয় বা শেষ খণ্ড ২৫-

যাঁরা এই রচনাবলীর প্রথম খণ্ড সংগ্রহ  
করেছেন তাঁরা এখনই যোগাযোগ করুন।



দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য : —

দাদামশায়ের ধলে	ঠাকুরদার কুঁড়ি
আশীর্বাদ ও আশীর্বাণী	কথকা কুঁড়ি
কিশোরদের মন	প্রথম কথা
আমার দেশ	গ্রাম্য-গীতি
চারণ ও হারু	ক্যাকারু (গল্প)
উৎপল ও রবি	খোকাবুকের খেলা

চিঠিপত্র

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

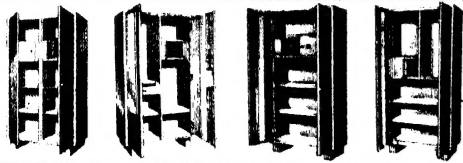
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ / ৩৪-৮৭৯১  
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ / ৩৪-৩৪৯২

বিয়ের যে উপহার জ্যেতায় বাবার উজাড় করা ভালবাসা



## চন্দ্র স্টীল আলমারি বাবার বিশাল হৃদয়ের মতই প্রশস্ত

আপনার চন্দ্র ডীলারের দোকানে দামুগ সব  
আলমারী যথা: হোমেকার, টুইনলক, ইউনিভার্সাল,  
ইউনিহোম, ইউনিস্টার, সিলেক্টা, ব্যাণ্ডাম প্রভৃতি  
দেখবার জন্যে নিশ্চয়ই চলে আসুন। লকার,  
ড্রয়ার, শেলফ, আয়না, হ্যাংগিং-রড, টাই বার  
এইরকম ড্রজনের বেশী সরঞ্জামের সাথে, এই  
আলমারি আপনার মনপছন্দ ঐ রকম সুলভ  
আকর্ষণীয় রঙে পাবেন।



চন্দ্র মেটাল প্রোডাক্টস

প্রাইভেট লিমিটেড

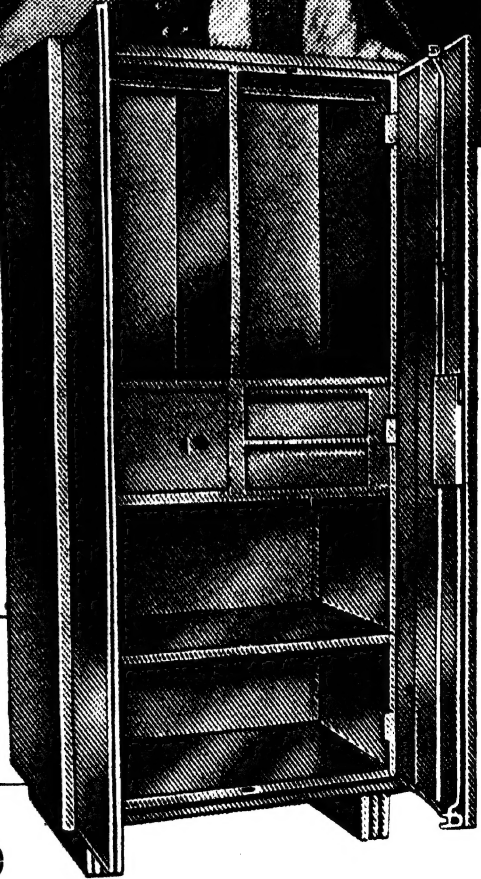
গোরগুরা রোড, বড়োদ্রা, ৩৯০ ০১৬, গুজরাত

উৎকৃষ্ট স্টীল ফার্নিচার আর  
নিরাপত্তার সামগ্রী



যাতে জ্যেতায় আপনার বিচক্ষণতার পরিচয় !

সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে ডীলার রয়েছে। প্রতিনিধিহীন অঞ্চল থেকে ডীলার চাওয়া হচ্ছে।



everest/78/CMP/417 Bn

# মনম-মনম, সমালো, নিউট্রিলা চাংক্স-এর

## কতো অশেষ গুণ জানেন?

ভরপে কিনিভি : আগে থেকেই  
রান্না করে রাখার ছবিতে  
বাঁধাই করা সরেস জাতের সত্যানীম থেকে  
বানানো নিউট্রিলা চাংক্স একেবারে  
রেডিয়েট প্যাকে পাবেন, যা হাল ও  
পুষ্টিতে ভরপুর। চাংক্স শুধু  
২০ মিনিটের মত দুক-জলে ডিকিরে  
রাখুন (মিষ্টি বাবারের গন্ধে দুক-কল  
ব্যবহার করবেন না)। এবার জল নিজে  
মিল এবং আবার বুয়ে সাক করে জল  
সম্পূর্ণ নিজে মিল। এবার যে বাবার  
গাঁবেজেন, তাকে মিশিয়ে রান্না পুষ্টিওর,  
আরে। সুখকোচক করে তুলুন। খোসা  
হাকানো, কাটাছুটি করার কোনো  
কামেলাই নেই।

সেরাজাতের প্রোটিনে ভরা  
সরস-পাচ্য নিউট্রিলা ২০০ গ্রামের  
প্যাকে কতো প্রোটিন গুল থাকে জানেন ?  
২০টা ভিটামিন বা ১ কেজি হালস বা ১/২  
লিটার দুধের সমান প্রোটিন গুল। আপনাদের  
পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য পক্ষে, এর  
চেরে স্বাস্থ্যকর ও সাজসজ্জা উপায়, আর  
কিছু আরো কি ?

খরচে এতো সাজসজ্জা  
যে মনে হয়  
নিখরচার পান্নি  
২০০ গ্রাম নিউট্রিলা চাংক্স জলে ডিকিরে  
নিজে মিলে রাখার পর পরিমাণে কতো  
গাঁড়াক জানেন ?  
...১ কেজি। কতো।  
সাজসজ্জা তুলুন তো।  
এবার অত্যন্ত প্রোটিন  
সমৃদ্ধ থাকবে সতে  
নিউট্রিলা খরচের  
তুলনা করে দেখুন তো, কখাটা তুল  
বলেছি কি-না... খরচ, যেন নিখরচার।  
আবার আপনাদের সসারের কতো মতটা  
হালস দরকার, তার অর্ধেক কিনে, এবার  
নিউট্রিলা যোগান। দেখবেন পরিমাণেও  
একই পাজেন আর স্বাস্থ্যও চরৎকার।

১০০'রও বেশী রকমারি  
সুস্বাদু ভিল  
মিরাশি, ওয়েটার, চাইনীল,  
আমিষ... আপনাদের বাসনে-বাহার  
যত রকমের রান্নার ইচ্ছে আছে, তার  
সবকিছুই এভাবে বানাতে পারেন। আর  
দেখবেন, আপনাদের স্বাস্থ্য কতো  
চরৎকার বেতে হয়েচে... কারণ নিউট্রিলা  
চাংক্স যে যেমন সরস-সরস, তেমন-ই  
রসালো, আর অত্যন্ত স্বাদু বাবারের সতে  
কোন চরৎকার  
মিলে যায়।

২৫০ গ্রাম  
এবং  
১০০ গ্রামের  
প্যাকে পাওয়া  
যায়।

১০০% মিরামি  
**নিউট্রিলা** সমা জাহার  
সুস্বাদু করা... সহজাত গুণে জাহা!



রুচি প্রাইভেট লিমিটেডের  
এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন।



## হুইচটি টিপুন আর...

আরো বেশী  
কাপড় বেচুন



কম্পটাল্যাক্স-এর ঝলমলে আলো  
কাপড়ের সুন্দর ডিজাইনগুলিকে  
এমন দর্শনীয় করে তোলে যে  
খরিদাররা না কিনে পারেন না।

আরো বেশী  
গয়নাপত্র বেচুন



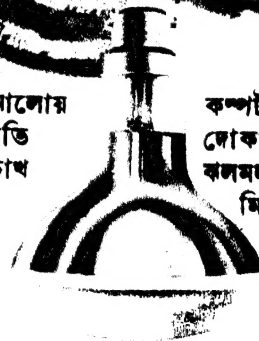
কম্পটাল্যাক্স-এর উজ্জ্বল আলোর  
সোনার এমন ঝলমলে ছাতি  
বেরায় যে খরিদাররা চোখ  
ফেরাতে পারেন না।

আরো বেশী  
জিনিসপত্র বেচুন



কম্পটাল্যাক্স-এর উজ্জ্বল আলোর  
নোকামের জিনিসপত্র এমন  
ঝলমল করে যে খরিদারের  
মিছিল লেগে যায়।

কম্পটাল্যাক্স এক স্বয়ং-সম্পূর্ণ আলোর উৎস। এটি লাগাতে  
কোনো শেড বা বিশেষ ফিটিংস-এর দরকার হয় না। বাস,  
এটিকে লাগিয়ে হুইচটি টিপুন আর যদিকে চান, সেইদিকেই  
উজ্জ্বল আলো ঝলমলান।



MTB-PEI-6784



# কম্পটাল্যাক্স

বহুপযোগী অ্যাকসেসরি লাইট।

**ফিলিপস**

পাইকো ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড

প্রকাশিত হয়েছে  
বিমল কর-এর  
অধিষ্ঠান্য ঘটনাক্রম উপন্যাস  
**অলৌকিক**  
দাম ১০.০০

অধিষ্ঠান্য, ভবু, অবাস্তব  
বলা হবে না, এমনই এক  
ঘটনাবহুল পটভূমিতে  
বিমল কর-এর এই নতুন  
রোমাঞ্চকর উপন্যাস। আমরা  
অনেকেই পড়েছি বিদেশী  
সেই অশ্রুত  
কল্পতাবনা লোকটির কথা,  
যে কিনা শব্দ চোখের দৃষ্টি  
দিয়ে থাকলে দিতে পারে  
কীটা, চামচ কিংবা ছুরি।  
মানুষের এই ধরনের নানান  
অস্বাভাবিক মানসিক ও  
শারীরিক শক্তি নিয়ে দীর্ঘকাল  
ধরে গবেষণা করছেন  
যে-ভুললোক তিনি নিজেও  
ধেনে কিছুটা অস্বাভাবিক  
কল্পতার অধিকারী। নইলে  
সিনেমার সিনেট তাকে দেখে  
মৃত বলে ভুল হবে কেন  
বরদার? অথচ সিনেমা ভাঙার  
পর সেই লোকটিকেই আবার  
জগজ্ঞান্যত অবস্থার চোখের  
সামনে দেখে বরদা অবাক।  
অমূল্যলোকের নাম সিকেশ্বর।  
ভট্ট, মার্জিত, বুদ্ধিমান  
মানুষ। ডেলিকটলা বা  
ভয়ঙ্কর নন। দুমকার কাছে  
একটা রিসার্চ সেন্টার  
খুলেছেন মানুষের  
অলৌকিক কল্পতা নিয়ে  
গবেষণা করার জন্য।



আলাপ হবার পর বরদাকে  
সেখানে টেনে নিয়ে গেলেন  
সিকেশ্বর। নানা ধরনের  
অধিষ্ঠান্য শক্তির মানব  
সেই গবেষণাকেন্দ্রে, এ-ছাড়াও  
রয়েছে এমন একজন, যাকে  
হুবহু বরদার মতোই দেখতে।  
এই বিচার পরিকল্পে বরদা  
শেষ পর্যন্ত রক্ত-হিম-করা  
যে-অভিজ্ঞতার মর্যাদা  
হল, তাই নিয়েই এই দুর্লভ  
স্বাদের উপন্যাসটি লিখেছেন  
বিমল কর। প্রথম থেকে  
শেষ পর্যন্ত তীব্র উৎকর্ষা-  
উত্তেজনা ভরা। প্রচ্ছদ ও ছবি :

তৃতীয় মূল প্রকাশিত হয়েছে  
শ্রীপাত্তের  
তিন কন্যার কাহিনী  
**দেবদাসী** দাম ১০.০০



বিবকন্যা বাদি উপকথার  
নায়িকা, সতী আর দেবদাসী  
ভাবে এই সৈনিকের কথা।  
ইতিহাসের পাতার-পাতার  
তাদের নিয়ে নানা গৌরবময়  
উপাখ্যান। কিন্তু সত্যি কি  
এই ইতিবৃত্ত গৌরবের? প্রাণ  
তুলেছেন লেখক। এবং  
সে-প্রশ্নের উত্তর স্থান  
করতে গিয়ে উন্মাদন  
করছেন অনেক জটিল রহস্য,  
অনেক অজানা তথ্য।  
যেমন, আমরা কি জানতাম  
যে, সতীসাহ প্রাচীর-শব্দ  
ভারতে নয়-প্রাচীন পুঁথিবার  
সর্বত্রই কম-বেশি চল ছিল?  
একই রকম ভাবে, বিশ্বের  
প্রায় সর্বত্র নানা রূপে  
দেবদাসির ছিল বারাজনাগরে,  
তিন নামে ছড়িয়ে ছিল  
দেবদাসী-প্রথা? জানতাম কি  
যে, রুরোপ আমাদের কাছ  
থেকেই একলা এক রহস্যময়  
রাতে ঘরে তুলে নিয়েছিল  
ভারতলব্ধা বিবকন্যাকে?  
বিবকন্যার আপন অস্তিত্বের  
মতোই কোতুলোপীপক  
তার সেই পশ্চিম-অভিসারের  
কাহিনী।  
শ্রীপাত্ত সেই সব কাহিনীই  
দানিয়েছেন। বহু তথ্য ঘেঁটে,  
পুঁথি হাতড়ে ইতিহাসের  
পৃষ্ঠা খুঁজে বিশ্লেষণে  
নির্মম, সত্যে অটল, অথচ  
উপন্যাসের মতোই স্বাধ,  
এবং সুবর্ণতা এই কাহিনী।  
এই লেখকের আরেকটি গ্রন্থ

নীহাররঞ্জন গুপ্তের  
জন্মশতাব্দী রহস্য-উপন্যাস  
**কন্তুরীগন্ধ** দাম ৭.০০

পার্থসারথি চক্রবর্তীর  
কৌতুহল মেটানো কিশোর  
গ্রন্থ  
**চিকিৎসাবিজ্ঞানের  
আজব কথা**  
দাম ৫.০০

বিজ্ঞানভিত্তিক কিশোরগল্প  
বাংলা বইয়ের অভাব মেটাতেই  
কলম ধরেছেন পার্থসারথি  
চক্রবর্তী। গল্পের মতো  
স্বাদ, তাঁর রচনা, আবার একই  
সঙ্গে শিক্ষাপ্রদও বটে।  
বহু কৌতুহল-মেটানো তথ্য  
সমৃদ্ধ 'চিকিৎসা বিজ্ঞানের  
আজব কথা'।

**রাজনৈতিক বই**

ডঃ শিশিরকুমার বসু ও  
বীরেন্দ্রনাথ সিংহ-এর  
**Netaji :  
A Pictorial  
Biography**  
দাম ৫০.০০

নৃত্যচন্দ্র বসু  
তরুণের স্বপ্ন  
দাম ১০.০০

**সমগ্র রচনাবলী  
(১ম খণ্ড)**  
দাম ৩৫.০০

মৈত্রী দেবীর  
**অচেনা চীন**  
দাম ১৫.০০

প্রকাশিত হয়েছে  
নারায়ণ  
গঙ্গোপাধ্যায়ের  
বহু-প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থ  
**সমগ্র  
কিশোরসাহিত্য**  
দ্বিতীয় খণ্ড

সংকর্ষণ রায়ের  
বিজ্ঞানভিত্তিক রহস্যোপন্যাস  
**গভীর গহন**  
দাম ৭.০০

বাংলা ভাষার বিজ্ঞানভিত্তিক  
উপন্যাস কম দেখা হয়,  
এ-কথা সত্য। কিন্তু প্রথম



প্রেশার রহস্য উপন্যাসও কি  
বেশি ঘেরায়? সংকর্ষণ রায়  
একাধারে দুটি অভাবটী  
পূরণ করলেন। প্রখ্যাত  
ভূবিজ্ঞানী এই লেখকের  
'গভীর গহন' কৌতুহল-  
রোমাঞ্চে-উত্তেজনার ভরা  
দারুণ স্বাদ, এক রহস্য-  
উপন্যাস, অথচ সম্পূর্ণভাবেই  
বিজ্ঞানভিত্তিক এই কাহিনী।

বিমল মিত্রের  
অনুপ্রাণিত-করা উপন্যাস  
**দাশরথির  
বাহাহুরি** দাম ৮.০০



কাহিনী-বন্দার ঘণ্টা দিয়ে  
পাঠককে কীভাবে উন্মাদ ও  
কৌতুহলী করে তুলতে  
হয়, বিমল মিত্র জানেন।  
ছোটদের জন্য লেখা তাঁর  
নতুন উপন্যাস 'দাশরথির  
বাহাহুরি'তে বরল-নির্বিশেষে  
সমস্ত প্রেশার পাঠকেই  
তিনি কাছে টেনে নিতে  
পেরেছেন। লেখক হিসেবে  
এখানে তাঁরও আসল  
বাহাদুরি। নিতান্ত মামুলী  
উপন্যাস নয়, যড়োরা এই  
কাহিনী পড়ে হবেন রোমাঞ্চিত,  
আর ছোটরা হবে অনুপ্রাণিত।



আমল পাথরদাস ট্রাইভেট নিউজ  
৪৫ বেনিগানোলা রোড কলকাতা ৯

প্রকাশিত হয়েছে  
শৈলেন ঘোষের  
এ-মুগের রূপকথা  
**জাহ্নব দেশে**  
**জগন্নাথ** দাম ৮.০০

এক মল্লত বীর, বৃকভরা  
সাহস, মৃতিভরা তাঁর শৌর্য  
শত্রুকে তিনি যুদ্ধে দেন  
হারিয়ে, নিরীহ মানুষকে  
বাঁচান নিজের প্রাণ  
তুলে করে। সেই বীরেরই  
হলে জগন্নাথ। ছোট হলে  
হবে কী, সেও বেশ সাহসী,  
মাথাভরা বুদ্ধি, বৃকভরা  
ভালবাসা। আর তাই তো,  
কোরা নামের রাস্তার ফুলট  
জগন্নাথকে ছাড়তেই চায়  
না। জগন্নাথ চলছে, কোরা  
চলছে। যাচ্ছে তো বাজেই।  
কিন্তু কোথায় চলছে  
জগন্নাথ?



চলছে বাবাকে খুঁজতে।  
একদল লুটেরা ছুরি করে  
এনেছিল জগন্নাথকে।  
সেখান থেকে পাগিয়ে জগা  
ফিরে চলছে বাবার খোঁজে  
সেই খোঁজার পথেই  
জগন্নাথ গিয়ে পড়ল এক  
জাদুর দেশে। সেখানে থা  
বাবার আর ভালবাসা  
মামা, দাদার মতো পাণ্ডা  
কৌটোবন্দী, এক মরু-রকু  
রঙের দ্বন্দ্বতা, সোনার  
হৃদয়, বেড়াল হয়ে যাওয়া  
মানুষ, গর্জন দেতা—  
আরও কত কী! সে এক  
অশ্রুত অভিজ্ঞতা। এরা  
করল, আর জগন্নাথ কী  
করল, তাই নিয়েই এই দ  
জাদুকরী রূপকথা—  
'জাদুর দেশে জগন্নাথ'।  
শৈলেন ঘোষের লেখককে  
তাজা কলমে ছোটদের জ  
দারুণ আকর্ষণীয় উপহা  
রন-মাতানো বিস্তার্ত ছবি  
আর রঙীন ছোট এঁকে  
আরেক দিল্পী-জাদুকর-  
দেবদাস দেব।

## সূচীপত্র

রেল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা । সম্পাদকীয় । ৭	শিখ-কে প্র' । প্রথম প্রচেষ্টা । ১৯
চরপরেখা তব । কৃষ্ণ বন্দু । ১৩	সামাজিক কণ । শেখর মুখোপাধ্যায় । ১৭
সেই সময় । সুদীপ গঙ্গোপাধ্যায় । ২১	সাহিত্য । ২৬
বিজ্ঞান । সমরজিৎ কর । ২৯	বিশিষ্ট । সত্যেন্দ্রকুমার ঘোষ । ৩০
দিনব্যাপন । তুলসী মুখোপাধ্যায় । ৩৫	উপবাস শেষে । কৃষ্ণ বন্দু । ৩৫
অরণ্যদেব । ৩৬	দক্ষিণপশ্চিমের পথে । মানসী দলগুপ্ত । ৩৯
বাতাবরণ । সোমনাথ ভট্টাচার্য । ৪৫	মানবজাতি । শীর্ষেশ্বর মুখোপাধ্যায় । ৫৫
ফটুবলে হলুদ ও লাল কার্ড নিয়ে সমস্যা । ৫৮	মুহুর্ত । ৬৪
বাল্মীকির রামায়ণ । অমোঘা কোথার । ৬৫	সীতারাম বেহানী । ৬৫
অলোচনা : শিল্পসংস্কৃতি । ৭৫	প্রজ্ঞা : সত্যেন্দ্র ঘোষাল
প্রজ্ঞাশিল্পী পরিচিতি শেষ পর্টার	

## আগামী সংখ্যা থেকে নতুন উপন্যাস

বন্দেমাতরম শব্দটি বার রক্তে গোলা দিত সেই অনিমেধ লরীর বলেটির দাগ নিয়ে ধীরে ধীরে রাজনীতির প্রবাহে গা ভাসাল। সে এখন সধা বাক। তখন দেশের নেতারা নিজের আধার গোছাতে বালু, নৈতিক বোধগুলো নিজের তুলে রাখা হয়েছে। সারাটা দেশ এখন মেরু-উত্তরীণ তখন কিছু, তরুণ হয়ে উঠল অজান্তে। নিজের পানে দাঁড়ানোর সময়ই সমস্ত দেশ হাতাল হয়ে গেল।

একটু একটু করে জমে ওঠা বৃক্কের বারংগে আগুন লাগার মুহুর্তে অনিমেধ আকিকার করে চারপাশে নিলিঙ্গতার বর্ষাধার। লাগত, লাগত এবং ভীষণ রোমাঞ্চিক এই বৃক্কের বোঝন ভেসে যায়।

সমরেশ মজুমদারের নতুন উপন্যাস 'কালবেলায় কাহিনী' আর এক আত্মনুসংগতের বা বাস্তব হাফির সমগ্রের প্রতি প্রসঙ্গের আঙুল তুলেছে।

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ

আবলম্বাকার প্রতিকা লিমিটেড-এর পক্ষে  
বাণিজ্যিকায় কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং  
কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং  
আবলম্বাকার প্রতিকা লিমিটেড পি ২৪৮  
পি আই টি হোড কলকাতা ৭০০ ০০৪  
থেকে মুদ্রিত।

মাম দেউ টাক।

মাম দেউ টাক।

মাম দেউ টাক।

## রেল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

ভারতীয় রেলের জন্ম হয়েছিল গত শতাব্দীর মাঝামাঝি, ১৮৫০ সালে। তারপর সেরা শ' বছরেরও বেশি কেটে গেল। এই সেরা শ' বছরে ভারতীয় রেলের খ্যাতি কিছু কম জোটেনি। বলা হয়, এশিয়ার মধ্যে ভারতীয় রেল-ব্যবস্থাই দীর্ঘতম এবং পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ। বর্তমানে প্রায় একষটি হাজার কিলোমিটার রেলপথ দেশের মধ্যে ছড়ানো। নিত্য ট্রেন চলে এগারো হাজারের মতন। ব্রিটিশ আমলে রেলের বতটা উন্নতি ঘটেছিল, পরিকল্পিত রেলপথ উন্নয়নের কাজ হাতে নেবার পর, ১৯৫১ সাল থেকে, তার চেয়ে বেশি বই কম ঘটেনি। কিন্তু এই উন্নতি রেলপথ প্রসার এবং অন্যান্য ব্যাপারে ঘটলেও প্রশাসন ও যাত্রীদের সুবিধে অসুবিধের ব্যাপারে বিশেষ ঘটেছে বলে মনে হয় না। বরং তার অবনতি ঘটেছে বলেই অনেক মনে করেন।

ভারতের মতন বিশাল দেশে যোগাযোগ-ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ করে তোলা নিশ্চয় কঠিন। তবু একথা বোধ হয় ঠিক যে, রেল ব্যবস্থাই এদিক থেকে সবচেয়ে সুবিধাজনক। অন্যান্য ব্যবস্থা বলতে বা বোঝার—বেমেন বাস-লরিতে বা নদীপথে যোগাযোগ—তার সুবিধে আমাদের দেশে কম। কাজেই প্রধানত রেলের প্রতি ভরসা করে এই ব্যবস্থা গড়ে তোলা ছাড়া উপায় নেই।

দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে প্রয়োজন। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার তাগিদও নানা কারণে বেড়ে চলেছে। শুমারি বাতী চলাচলের কথা ধরলেই চলেবে না, মালপত্র চলাচলের কথাও ধরতে হবে। যদি সবরকম প্রয়োজনকে একত্রে ধরা হয়—তাহলে দেখা যাবে, আমাদের বা প্রয়োজন রেল তার কিছুটা পূরণ করছে নিশ্চয়, কিন্তু মোটামুটি আট আনাও নয়। এর জন্য কোনো হিসেবের প্রয়োজন নেই, যে-কোনো ট্রেনবাতীই আজ বৃষ্টিতে পারেন, কাছেই হোক অথবা দূরে—কোথাও যেতে হলে কী দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়। এর কারণ মাত্র একটি—প্রয়োজনের তুলনায় ব্যবস্থা কম।

গত তিরিশ বছরে ভারতীয় রেলের প্রসার বতটা ঘটুক, এখনও দেশের বহু অঞ্চলেই রেল-যোগাযোগ নেই। আবার কোনো কোনো এলাকার সপ্তা রেল-যোগাযোগ নামমাত্র। অর্থাৎ কোনো রকমে সংযোগ রক্ষা করা আছে। পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাক। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র রেল ব্যবস্থা নেই, এমন কি যেখানে রেল-যোগাযোগ একান্তই প্রয়োজন সেখানেও না। এদিক থেকে উত্তরবঙ্গ উদাহরণ হতে পারে। উত্তরবঙ্গের কতটুকু রেলপথে আসা-যাওয়া সম্ভব! আবার কোথাও কোথাও এমনও দেখা যায়, ব্রিটিশ আমলে বতটুকু রেলপথ তৈরি হয়েছিল ঠিক ততটুকুই এখনও থেকে গিয়েছে।

রেল কতৃপক্ষ স্বীকার করেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রেলপথ খোলার দাবি তাদের কানে পৌঁছয়, কিন্তু দাবি পূরণের সামর্থ্য তাদের নেই। তারও মধ্যে বতটা পারেন করতে চান।

একথা মনে রাখা দরকার, রেলের আয় আজ তিরিশ বছরে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ১৯৫০-৫১ সালে যেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কাছ থেকে রেলের আয় ছিল চুরাশি কোটি টাকার কিছু ওপরে, সেখানে ৭৬-৭৭ সালে তার আয় দাঁড়িয়েছিল ৪৫৬ কোটি টাকা। মালপত্র বহনের থেকেও রেলের আয় ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এ-সব সত্ত্বেও যদি রেল আরও দ্রুতগতিতে কাজ করতে না চান তবে সেটা দেশের মানুষের পক্ষে মন্দভাগ্য ছাড়া আর কি হতে পারে?

রেলের প্রসার ঘটেছে—আরও ঘটবে একথা মনে করা গেলেও এমন মনে করার কারণ নেই যে রেলের প্রশাসন দুর্ভাগ্য। বরং জনসাধারণ নিজের অজান্তে থেকে জানেন, রেলের প্রশাসন ক্রমাগতই শিথিল ও বিশৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। আজকাল কোনো গাড়িই প্রায় সময়মত চলে না, দুর্ভাগ্যের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, রেল প্রমণ যে খুব নিরাপদ থাকছে তাও নয়। উপরন্তু বিনি টিকিটে রেল-প্রমণ একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের নিত্য বা ভরসা—তার প্রশাসন কেন এমন বিশৃঙ্খল হবে আমরা বুঝি না। প্রসঙ্গত একটা কথা বলতে হয়, কয়েক বছর আগে রেলের এক কতৃপক্ষ মন্তব্য করেছিলেন, কলকাতা বোম্বাইয়ের মতন বড় বড় শহরে যেসব সুব্যবসায়ী ট্রেন চলাচল করে সেগুলি আর যাত্রীদের চাপ সহ্য করতে পারছে না। অসহ্য হয়ে উঠেছে এই চাপ। কথ্যটা, কোনো সন্দেহ নেই, সত্য। কিন্তু রেল কতৃপক্ষ তার জন্যে নতুন কোনো ব্যবস্থা কি করেছে? কলকাতার কথাই যদি ধরা যায়, সর্ব্বদাই স্বীকার করবেন, লোকাল ট্রেন-গুলি যেভাবে ও যে-অবস্থায় চলে তা বর্ণনাতীত। যাত্রীদের নিত্যই নানা দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়।

প্রসঙ্গত বলা দরকার ভারতীয় রেল স্টেশনের রক্ষাব্যবস্থাপনও প্রশংসা করার মতন নয়। বিশেষ করে অধিকাংশ স্টেশনেই যাত্রীদের বিরামাগার নেই। বড় বড় স্টেশনের বৃদ্ধি অধিকার সামনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটাও এক চরম দুর্ভোগ। রেল যে-হায়ে অর্থ-উপার্জন করে, সেই অন্য-পায়ে তার দুর্ভাগ্যের দিক

মেঘ

সাহিত্য সংখ্যা

॥ ১৩৮৮ ॥



এ বছরের সাহিত্য সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত এমন একতরফ চিঠি প্রকাশিত হচ্ছে সাহিত্যপাঠকের কাছে যার আকর্ষণ অপরিমিত। এই চিঠিগুলি কবি লিখেছিলেন তাঁর কবিতার একান্ত ভক্ত-পাঠক ও ব্যাখ্যাকার অজিতকুমার চক্রবর্তীকে। 'রবীন্দ্রনাথ' এবং 'কাব্যপরিচয়' নামক দুটি বইয়ের জন্য অজিতকুমার বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় আর উজ্জল হয়ে আছেন। শান্তি-

মিকেভান হিলালকে তিনি শিক্ষক রূপে একলা যোগদান করেন। কবি তাঁকে বলেছেন 'আদর্শ শিক্ষক'। এবারের অসামান্য চিঠিগুলির মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে ইংলণ্ডের বিগতকালের বিশেষ সমাজের ছবি। অজিতকুমারের পারিবারিক জীবনের সমস্ত সম্পর্কে কবির আগ্রহ, উৎসাহ, গুণ-পরামর্শ ইত্যাদি। এ-ছাড়া ইংলণ্ডে থাকাকালীন কবির জীবনের নানা ঘটনা, মামাখিদি সাহিত্যিক কর্মব্যস্ততার স্মৃতি।

১৩৭৬ সালের সাহিত্য সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা অজিতকুমার চক্রবর্তীর পত্রাবলী। সেগুলির সংকলক ছিলেন পুলিনবিহারী সেন। এবারের চিঠিপত্র সংকলন করেছেন এবং পত্র-পত্রিচিঠি দিয়েছেন পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

আধুনিক মানুষের জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞান ও তত্ত্বের জড়িয়ে আছে। বিজ্ঞান-সচেতনতাও একান্ত প্রয়োজন আধুনিক মানুষের জীবনে এবং সমাজে। এ-বছর সাহিত্য সংখ্যাটিকে একটি মূল্যবান বিজ্ঞান-সংখ্যা হিসাবে প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিশিষ্ট বাঙালী বিজ্ঞান-সাধকদের কাছে তাঁদের সমকালীন চিন্তার এবং ভাবনার প্রতিফলন আছে এমন কিছু রচনার জন্য দেশ পত্রিকার তরফ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

এ বছরের সাহিত্য সংখ্যায় সেইসব খ্যাতিমান বিজ্ঞানীদেরই ভাবনার ফসল সংগ্রহ করার কাজ চলছে। যদিও বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনা তবু লেখাগুলি সুলিখিত এবং সুখপাঠ্য, কিন্তু দুর্বোধ্য নয়। যাঁরা এবারের সংখ্যায় আমন্ত্রিত তাঁরা যথাক্রমে :

বাসন্তীদুলাল নাগচৌধুরী  
সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়  
সুস্মিত গঙ্গোপাধ্যায় শশাঙ্ক  
ভট্টাচার্য অসীম চট্টোপাধ্যায়  
শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়  
অনাদিনাথ দাঁ যত্নাজয়প্রসাদ

ওহ প্রসাদকুমার দাস  
সুধেন্দুধিকার করমহাপাত্র  
জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য  
মৃণালকুমার দাস ও  
শ্রীকুমার দাস কর্তৃক বসু  
ভারতমোহন দাস  
জগদীশ মন্তল দেবরত  
হলোপাধ্যায় মিশীথরজম কর  
এবং আরও অনেকে।  
এ-ছাড়াও এই সংখ্যায় সমরজিৎ  
কর লিখবেন একটি সম্পূর্ণ  
মতুম ধরনের বিজ্ঞানমিত্তর  
কল্পকাহিনী।

এক বছরের বাংলা বইমেলা  
একটি সুনির্বাচিত গ্রন্থতালিকা  
এই সংখ্যার আরও একটি  
বাড়তি আকর্ষণ।

আগাগোড়া অফসেটে ছাপা।  
বিজ্ঞানীদের প্রতিকৃতি সহ  
তাঁদের রচনার সঙ্গে নাতিদীর্ঘ  
পরিচিতি। ২৫শে বৈশাখেই এই  
সংখ্যাটি প্রকাশিত হবে।  
দাম—দশ টাকা।

প্রস্তুত : সংখ্যাটি নিখিঁয়ে পাবার  
জনা পূর্বাঙ্কেই সাক্ষ্য লেনন কল্টোলায়ক  
জানিয়ে রাখুন।





# ‘বি’-কে ‘প্র’

॥ তের ॥  
[ ৩৩ ]

বাগিনজ

পোস্টমার্ক ২৪ ১৯২২

বিবি,

এখানে গরম দিনের পর দিন বেরকম বেড়ে চলেছে তাতে আশা করা যাচ্ছে যে বাঙলা অংশের পাজাব হয়ে উঠবে। এখন বেলা দশটা, এর মধ্যেই রন্ধনের এতটা চড়েছে যে বাইরে বাওয়া ত দুপুরের কথা, ঘরের ভিতরই টিকে থাকা কঠিন হয়ে উঠেছে। Englishman আশা দিয়েছিল যে ৪৮ ঘণ্টার ভিতর গরম কমে যাবে—এখন দেখা যাচ্ছে খবরের কাগজের আর সব কথার মত এ কথাটাও মিথ্যা। ভার্গাস পরীক্ষার কাগজ খতম করেছে, নইলে এই দারুন গ্রীষ্মে কাগজ দেখতে হলে মাথা একেবারেই খারাপ হয়ে যেত। এমনই যে মাথা খুব ভাল আছে তা নয়। সবসময়ের জন্যে লিখিলে কেন জানো। আর লিখতে বসলে মাথার ভিতর থেকে সেই জিনিস বেরবে যার দ্বারা শব্দ সাহিত্যের খন্দর বোনা যায়, কেননা—মাথা এখন চরকার মত ঘুরছে। এর ভিতর অবশ্য একটু অত্যাতি আছে—কিন্তু আলোকায়কের মত সেটা দোষের নয়, গুণের। যদি বলতুম যে কলের চরকার মত ঘুরছে তা হলে সেটা আলোকায়ক হিসেবেও অমার্জনীয় হত। কলের চরকা এক সেকেন্ডে ১৮০ বার পাক খায়—সুতরাং ও উপমাটি লাগালে প্রকারান্তরে স্বীকার করা হয় যে আমার মাথার সবগুলো শব্দ টিলে হয়ে গেছে। তা যে হলান তার প্রমাণ ঐ শব্দের দোহাই দিয়ে আমার মোটরের একটা ফাঁড়া কাটিয়ে নিয়েছি। মেজলা বামড়া ব্যার জন্য আমার গাড়ী চেরোইজেন—দুগুণ ডাক ও তার যোগে। তার উত্তর গেল এই যে আমার গাড়ীর শব্দ টিলে। এখন প্রকাশ তার রথ নিয়ে বামড়া যাচ্ছে।

আমার কলজ এই হয়ে বন্ধ হবে। তোমরা যদি তার মধ্যে এসো ত আমিও সঙ্গে স্মারজিলি হাই। এবার ইন্টারের বারো দিন ছুটি আছে—তাই পারলে আগনের কাছ থেকে পারিবারে। বরফের কাছে হাই। তবে তুমি র’টিতে থাকলে সেখানেই বাব, বলিচ সম্ভবত র’টির তাত কলকাতার চাইতে বেশি। আমি Salamander এর কলধর নই। এইটেই হয়েছে এদেশে জন্মবার মন্স্কিল। সে বাই হোক, গরমে বোধ হয় লেখকের হাতের খিল খুলে গিয়েছে। বোলপুর থেকে আমিও লিখছে যে আমার হালের চিঠি সব লিখিত। এর পর চিঠি লেখা বন্ধ করতে হবে, শেষটা কি Madam de Sevigne হয়ে উঠবে? এরকম হচ্ছে কেন জানো? কাজের কথা কিছ, বলবার নেই—তাই দেশার বারো কথা বকাই—আর বারো কথা গুঁথিয়ে বললেই তা কাবা হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে আমার একটা বড়তা করবার ইচ্ছে আছে। কোথায় সে প্রবন্ধটি পড়ব তাই ঠিক করতে পারছি নে। তিনটি জায়গা আছে যেখানে এ বড়তা চলাবে—প্রথম শাণ্ডিনাকেন, ২য় Theosophical Hall, ৩য় Art Society। এখন মন্স্কিল হয়েছে এই যে এর একটিকে ছেড়ে আর একটিকে ধরতে পারিনে। ধর যদি Art Societyতে বড়তা করি তা হলে সে বড়তা না শব্দে theosophistsরা মনে করতে পারে যে “মায়াব মানজি-গানি” আমার ভুলে বেশি বাজে বকতে পারে। অপর পক্ষে যদি Theosophi- cal Hallয়ে বড়তা করি তা হলে আর্টিস্টরা মনে করতে পারে যে “জাউলিন-ড্রাম-রিশ” এ বিষয়ে আমার চাইতে প্রেস্ত। আমার ইচ্ছে এই দুটি পাখীকেই এক বাগে ধারি—নইলে আমার আর মান থাকে না। ভাল কথা,

যে শব্দটিকে জন্মেছে রানিগানের ঘরে আর যিনি করেছে ক্যানিক—সে রানিগান ক্যানিক লিখি না হয়ে পারছি ও ক্যানিক রানিগান হল কেন? দেখতে পাছ বড় বড় লম্বা নিয়ে এখন মাথা ঘোরাইছি। আর লম্বাটা একটু, কলি পেরোই তাই কাগজের উপর কলম খোঁড়োই করছে। তবে এখন তার রান টানা দরকার। আজ থেকে যদিও চিঠির রান্দুল তবল দিতে হবে। আর বেশি কাগজ এমত করলে ভরদন্দুপ টিকিও খরচ করতে হবে।

এইমাত্র তোমার চিঠি এল। এখানে তোমার বাবার থাকার কোনই অসুবিধে হবে না। কালই ত লিখোঁছ যে সুন্দরামা হরত রলপাইদাঁড়ি বাবে। যেটা স্মারজিলি। সুন্দর বলছে—সেও বহুকাল কলকাতা থেকে বেরমান, তারও একটা change বিশেষ দরকার—সুতরাং ধর নিতে পারো সেও আমিও সঙ্গে স্মারজিলি বাবে। স্মারজিলিও একটা Change বিশেষ দরকার, শব্দ দরকার সেই তোমার আর আমার। কাজেই বেরকম কথাবার্তা শুনাই—অবশ্য কানায়বোর—জাও মনে হচ্ছে ইন্টারের ছুটিতে বাড়ী এক রকম খালি হয়ে যাবে। ও বাড়ীতে মিলনী ও যা থাকবে, কেননা তাঁদের কোনও Change এর দরকার নেই, আর এ বাড়ীতে তুমি আর আমি, আর বুন্দ, একসঙ্গে দু বাড়ীতেই থাকবে। এখন বুন্দে ত। তোমার চিঠির শেষ খবরটা শুনলে অবাক হয়েছি বললেও মিথ্যা কথা বলা হয়, আর হইলে বললেও মিথ্যা কথা বলা হয়। অবশ্য বেরকম দাঁড়াচ্ছে তাতে এইমাত্র বলা যায় যে, তোমার “আত্মীয়স্বজনদের সব হয়, অর্থাৎ বিয়ে না হইতে সম্ভাব্য বাওয়াও হয়।” যাক ও কথা। র’টি দেখছি অল্পেবে রানিগান হয়ে উঠল। আমার জানত রান্ধাং সিংহ এক সুন্দরোই আছে, রান্ধাং রার আছে অবশ্য ব্যারেন্সের সঙ্গে—রান্ধাংহাউতে। কিন্তু রংপুরেও যে ও জান আছে তা জানতুম না। বলিহারের হালরানীর সঙ্গে আমাঘের অনেক রকম সম্পর্ক আছে। প্রথমত, ওর বাবা চৌধুরী রাজা সুন্দারের মাসভূতা তাই—তারপর মেরেটি শ্রীনাথ দাদার ছোট বোনের বোনাকি। এ বিয়ের প্রথম ঘটকালি আমিই করি। সেরের চোখ কটা বলে বলিহারের তরফ থেকে প্রথম আপত্তি। তারপর আমি ব্যারেন্সের মাথা ঐ কটা চোখের অনেক নজর দেখিয়ে সে আপত্তি কাটিয়ে নেই। অবশ্য এ ক্ষেত্রে “হুগো”র খুঁত রংপোর কাটে।

তোমাদের ওখানে বেরকম সরগরম এখানেও তাই—শব্দ তার “সর” বাদ দিয়ে। নিতান্ত কাজে বাধা না হলে আঙ্গুল আর কেউ ধর থেকে বেরর না। আমি কাল সবে প্রথম—৪৪টা বেরই ল কলসে বাবার জন্য। আজ বাড়ীতেই থাকব। তবে যদি দেখি যে সম্ভা লাভটা পশ্চৎ কেউ এলো না তা হলে একবার বেরিয়ে পড়ব। আর কেউ যে এ গরমে এত দু’র আসবে, সে বিষয়েও আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। কালীবাং, আজ তিন দিন থেকে দুপুরে আসছে না, সুতরাং সমস্ত দিনটা একেবারে মিলল অবশ্য থাকতে হয়। তবে বই আছে, তাই নিয়ে সময় কাটিয়ে দিই। এখানকার ঐক্য সব ভাল। সকালে সেকলুম এ পাড়ার চৌধুরীদের সব ছেলেরা পুস্তকখারে হটোপাটি করছে—সুন্দা থেকে সুন্দা করে পুন্দ পশ্চৎ সবাই ছিল—তারপর এখন সব চুপচাপ। লিখতে লিখতে সেখা কত বড় চিঠি লিখে ফেললাম। এর পর তরসা হয়েছে প্রবন্ধও লিখতে পারব। কাল থেকে সবসময়ের জন্য লেখা সুন্দা করব—এলা বেলা খেলা প্রকৃতি পতকন্যায় করব। আমি ভাল আছি—এই লম্বা চিঠিই তার প্রমাণ। ইতি

তোমার বাবু।

Srimatee  
Indira Debi  
C/o S. N. Tagore Esqr  
Morabadi Basuli

[ ৩৪ ]

৩

বাগিনজ

৬ ১৯২২

বিবি,

কাল সকালে যে চিঠি লিখোঁছ আর বিকেলে যা পেরোছি, সে দুটি ভিতর একটি বিশেষ মিল আছে। ইকনমিকস যে জীবনের গোড়ার কথা এ আদারও মত, দেখছি তোমারও মত। তবে যে লোক এতে এত আপত্তি করে তার কারণ—মানুষে প্রায়ই জুলে যায় যে এ সভ্যতা মানবজীবনের একটা নষ্ট সভ্য। সব জিনিসেরই গোড়া যে তার নীচে থাকে সে ত সবাই জানে। এই নীচের সভ্যর উপরেই অবশ্য সব উপরের সভ্য প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তাই বলে উপরের জিনিসকে বাদ দিলে মানবজীবনের কোনই সাধকতা থাকে না—মানুষ পশুর সামিল হইত। বীরা ইকনমিকসকে অবশ্যকার করে morality প্রচার করেন, আর বীরা morality অবশ্যকার করে ইকনমিকস প্রচার করেন, এরা দুজনে যে বয়স প্রাজা Beneditto Croce এ সভ্য

পরিষ্কার করে বাকিরে দিয়েছে। যার Spiritualism যে যার materialism-এর সদর পিঠে—আজকালকার বাণনিকদের কাছে সেটা ধরা পড়েছে। আজকালকার দর্শনশাস্ত্র এই দুইকেই এক কোঠার ফেলে, একটিকে বলে utilitarianism, আর একটিকে বলে Theological utilitarianism। এমন কথা শ্রীমন্তাগবতেও আছে। যাক, এ সব তত্ত্ব বিচার করার কোনই আবশ্যক নেই। কেননা পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকের স্বার্থ ও পরার্থ জ্ঞান দুই আছে, তা বাঁধ না থাকত তা হলে সমাজ ঠিকে থাকা দুরে থাক—কখন জন্মাতোই পারত না। আমরা সবাই যদি শ্বেতাশ্বর চোর কিশ্বা “দিগম্বর” সাধু হতুম তা হলে সমাজের অবস্থা কি হত ছেঁবে দেখ। সত্য কথা এই যে শ্বেতাশ্বর হলেই চোর হতে হয় না, আর সাধু হতে হলেই দিগম্বর হতে হয় না। মানবের কাজ চলছে আশ্বার ঐ দুই শক্তির মিলনে ও সংঘর্ষে, শূদ্র কথার হুপে ঐ দুইকে আলাদা করে নিয়ে আমরা হয় ইকনমিকসের পেটের ভিতর থেকে morals বার করি নয় morals-এর মূখের ভিতর থেকে morals বার করি। এ যুগে দেখতে পাওয়া যায় যে ইউরোপে বারা মানবের মত মানব তম্মা প্রায়ই morals-এর উপর এক হাত নিতে ছাড়ে না। এর কারণ নয় যে তারা morals-এর বিরোধী, এর কারণ এই যে অধিকাংশ লোকের মূখে ও নাম হচ্ছে ভুতের মূখে রাম নাম। থেকে থেকে morality প্রচার করে তখন তারা এই বলে যে—“তোমরা সকলে ভাল হও ও আমার ভাল হোক”। বড়তা করার ক্রমসত পেলে আমি ছাড়ি নে—তাই এক পাতা ধরে বকলুম।

আমার কিন্তু রূম প্রধান সমস্যা হয়েছে ইকনমিকস সমস্যা। অবস্থা যা তা আগেই জানিয়েছি। নতুন বাড়ী করার দেখছি অনেক লেটা আছে। কাল চাষা পরগনার কালেকটর সাহেব বাহাদুরের কাছ থেকে এক তোমার ও আমার নামে এক জমদারী সমন এসে উপস্থিত। আমরা যদি ১৮ই এপ্রিলের পূর্বে পূর্বে মালিকের নাম বদলে আমাদের নামে এই জমিতে না রেজিস্টারি করিয়ে নিই তা হলে আমাদের জরিমানা হবে। নামজারি করতে অবশ্য আমরা সম্পূর্ণ রাজী। সুরেন একটা জমিতে তার নিজের নামজারি করে নেয়নি বলে তাকে চারু হাজাররা কি ভোগটাই ভুগিয়েছিল তা ত জানো! তবে অত তড়িৎবাড়ী নামজারি করার মাস্কল হয়েছে এই যে দরখাস্ত ও ওকালতনামার তোমাতেও সই করতে হবে। দেখি কত দূর কি হয়ে ওঠে। ছুটি যদি

সকাল সকাল ফিরে এসো ত কোন কথাই নেই—নইলে অনেক ভ্রমবর্টি ভিতর পড়ে যেতে হবে।

এইমাত্র টেলিফোন খবর নিলুম, সুরেনরা ফিরে এসেছে। সুরেন ননীকে বলেছে যে সে আর বিকেলে হয় আমার এখানে আসবে, নয় আমাকে টোল-ফোন করবে। তোমার কালকের চিঠি পড়ে আমার মনে হচ্ছে যে ছুটি বা বলেছে তাই ঠিক। তোমার বাবাকে এখানে নিয়ে এলে তাঁর সমস্ত কৃৎকি অবশ্য আমাদেরই নিতে হবে। আমার ত স্বভাব জানই, আশীশবন্দনের কারও বিপদের কথা শুনলে প্রথমেই মনে হয়... আমরা বা পারি তার জন্য ত করি। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরে দেখা যায় যে তার জন্য সব করার শক্তি আমাদের নেই। মিস্টার ঠাকুরের সুরেনের কাছে থাকাই ভাল। বিশেষত আমাদের বর্তমান আর্থিক অবস্থার। তা ছাড়া চিকিৎসা সম্বন্ধেও আমার মতের সঙ্গে সুরেনদের মতের মিল হয় না। “বারোকেমি”, “আনকেমি”, প্রভৃতির রহস্য আমার কাছে অধ্যাবাধ রহস্যই রয়ে গেছে। ছেলে-বেলা থেকেই আমার মন জ্ঞানব্রাহ্মের অশ্বকার গলিখচিত্রে যেতে নারাজ। একটা মাতাল একটা চোরগলিতে ঢুকে শেবটা বন্ধন দেখলে যে সে আর এগুতে পারে না তখন মনের দৃষ্টি বদলিল যে “বাবা গলি, তুমি ও নিরুই হরে গেলে?” শেবটা ঐ কথার আর না পুনরাবৃত্তি করতে হয় এই ভয়েই আমি জ্ঞানের রাজপথ ছাড়তে চাইনে। সে পথের প্রধান গৃশ এই যে শূদ্র হুগের লোকের গারে পায় তা গড়ে উঠেছে—উপরন্তু সেখানে আকাশের আলো হাওয়া অবাধভাবে চলাফেরা করছে। ছেলেবেলার কুকুনগরে একটি মূলসলমান আমাকে বলেছিল যে সে পৃথিবীর সবরকম অসাধাসাধন করতে পারে—একমাত্র “বৃত্তরূকি তেলসামের” সাহায্যে। তাই শূনে অব্যব আমার ধারণা হয়েছে যে “তেলসাম” মাত্রই “বৃত্তরূকি”। তেলসাম বোধ হয় talisman—আর “বৃত্তরূকি” মানে জ্ঞানী।

এইমাত্র বৌ টেলিফোন করলে। সুরেন কবে বাবে তার আসতে ঠিক নেই। সম্ভবত চার পাঁচ দিন পরে। এঁদের দেখছি ছোট্টাটো জিনিষ নিয়ে বাসন্ত হওয়া যেমন স্বাভাবিক—বড় জিনিষ নিয়ে বাসন্ত না হওয়াটাও তেমন স্বাভাবিক। সে বাই হোক, ফলে দাঁড়াল এই যে তোমার ঘরে ফেরাটা আরও পিছিয়ে গেল আর সেই সঙ্গে আমার Solitary Confinement-এর মোয়াদও বেড়ে গেল। সুরেন বিকেলে এখানে আর আসছে না। তারা তোমার বাবার খবর কিছ দিন পারিনি, তাই জানবার জন্য আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিল। বন্ধন কানে কানে কথা হয়ে গেল তখন চোখে চোখে দেখা করবার আর কোনও প্রয়োজন নেই। বোঁরা সব ভাল আছে, শূদ্র শোকা ও মিহিরের জ্বর এখনও আছে। একেই বলে change। হাওয়া বদলালে এক দিকে যেমন অসুস্থ শরীর সুস্থ হয়—অপর দিকে তেমন সুস্থ শরীর অসুস্থ হয়। ছেলেদের গাছপাড়া কখনো লক্ষ করে দেখেছ—তারা নিত্য তার ঠাই বদলার। এ অভ্যাস এখন দেখছি বড় হলেও অনেকের যায় না।

এখন এখানকার দুটো একটা খবর দেওয়া যাক। কিরণশঙ্কর কাল বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তার মূগে-বসন্তের দাগ এখনও মিলিয়ে যায়নি। তার মূখে শূনলুম আমি চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে জেলে দেখা করতে বাঞ্ছার চিন্তা ভারি খসি হয়েছে আর কিরণের কাছে দৃষ্টি করে বলেছে যে আমি ছাড়া তার অপর কোনও বন্ধু তার মোটেই খেঁজ নেয়নি। আর একটা মজার কথা শুনলুম। চিন্তা নাকি বলেছে যে আমার এক brain ছাড়া আর কিছ নেই।—আর সে brainও নাকি monstrously developed—এতে দৃষ্টি করবার কিছ নেই। কিরণ বললে যে সে জেলে পরিচয় পেয়েছে যে আমার উপর চিন্তার নাকি বহুত respect আছে। যদিচ আমাদের মজনের মতের মিল হয় না। আমি কিরণকে meet করার জন্য আসতে শনিবারে সবুজদলকে আসতে বলব। কিরণ গান শুনতে চায়। এখন দু দিনে গাইয়ে জোগাড় করি কোথেকে। শেবটা নিজেই তম্বুরা নিয়ে বচ-বাচ। কলকাতার গরম গরমতর হচ্ছে। থার্মোমিটার এখন এক শর নীচে কথাই কয় না। তার উপরও পাঁচ ছয় সাত হাঁকে। কালীবাড় কাল দিনে আমার কাছেই ছিল। দিবা ঠান্ডা হয়ে থাকে, কোনও উপাত্ত করেনি। পরে গল্প শোনে, ঘুমোয় আর বিকেল পচটায় বাড়ী ফিরে যায়। বাদবাকী স মেমন চলে, তেমন চলছে—খালি দিন চলছে না একমাত্র এই পরলোকের সৌন্দর্য একটা মাসিক পাঠকার দেখলুম “গৃহিণী গৃহমুখ্যতঃ”—এখন বৃদ্ধা আমি গৃহস্থ হয়েও কেন গৃহহীন। ইতি

বা

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী  
C/o S. N. Tagore Esqr  
Morebadi  
Ranohi

[৫৬]

পোস্ট বাক্স ৭৪১১১

যাক ওসব কথা। কালীবাড়কে আমি পড়াছি আর গল্প শোনাই

## অচাৰ্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্র সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ

১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুনীতিকুমারের মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিভীপ ও শ্যামদেশ (থাই ল্যান্ড) ভ্রমণের অধুৰ কাহিনী। বহু চিত্রে শোভিত দাম : ৪৮-০০

## অবনীন্দ্র রচনাবলী

১ম ২০-০০ ২য় ২২-৫০ (কিশোর) ৩য় ২৮-০০ (কিশোর)

৪র্থ ১৭-০০ ৫ম (যুগ্ম)

বিনয় ঘোষের

## পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

১ম ৪০-০০ ২য় ৪০-০০ ৩য় ৩৫-০০ (৪র্থ শেষ খণ্ড) প্রস্ততির পথে

## বাংলার বিদ্বৎসমাজ ১৫-০০

সৈয়দ মুজাফ্ফা সিরাজ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সত্যিনাথ ভাস্করী

## নির্জনগঙ্গা নীলাম্বরীয়া জাগরী

নতুন উপন্যাস ১৫-০০ নতুন মূল্য ১৫-০০ ১৩শ মূল্য ১০-০০

তারানাথর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

আরোগ্য নিকেতন কাশীনাথ পণ্ডিত মশাই

১১শ মূল্য ১৮-০০

৭-৫০

৪-৫০

শ্রদ্ধাংশ ভবন ১১ ১৫ বক্সি চাটাজী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

সে এগার্নিক নেহাড ভালমানুষ হয়েছিল, কোনও গোলমাল করে না আর সমস্ত দিনই আমার কাছে থাকে। English Fairy Tales টা দেখছি নেহাড খেলা বই। Maurice Maeterlinck বলেছে যে এগার্নার রূপকথার ভিতর moral-sense নেই একমাত্র বৌদ্ধগল্প ছাড়া। কথাতা আমাদের শ্রুতে বড়ই খারাপ লাগুক, কথাতা কিন্তু সত্য। Grimms-এর গল্পের সঙ্গে এদেশের গল্পের তুলনা করলেই দুইয়ের moral তফাতটা ধরা পড়ে। এখন দেখছি English Fairy Tales moral হিসেবে খুব উচ্চ, দুইয়ের গল্প নয়, তারপর যথেষ্ট brutal। সেই গাথা, টেবিল ও লাঠির গল্পটা মনে করে দেখো না কেন! টম যখন বাড়ী ফিরে এল তখন সে প্রথম কাজ করলে, গ'রের মেয়েগুলোকে বিয়ে করবে বলে ডেকে এনে তার লাঠি দিয়ে বেয়ার প্রহার দিলে। মেয়েগুলোর কি অপরাধ যে এই শাস্তি হল তা ত বুঝতে পারলুম না। তারপর মার খেয়ে মেয়েগুলো যখন ঘটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল তখন Tom তাদের আঁচল থেকে টাকাকড়ি সব চুরি করে নিয়ে যে মেয়েটাকে বিয়ে করবে তাকে দিলে। এর বীরঘটাই বা কোথায় আর মনুষ্যঘটাই বা কোথায়। তা ছাড়া প্রায় প্রতি গল্পেই দেখছি রাকসার শব্দ ছোট ছোট ধরে রেখে থাকছে আর নাক ডাকিয়ে দ্বন্দ্বচ্ছে। এর বাইরে দেখছি ইংরেজদের আর কল্পনা খেলো না। কাল Mally Whupple-এর গল্প পড়ে কালীবাড়কে শোনাচ্ছিলুম। সে একটা অশ্লীল প্রস্থান করেছিল।

মারির বাপ-মা ছিল গরিব আর তাদের ছেলেমেয়ে ছিল চের। শেষটা খেতে না দিতে পেরে তারা ছোট তিনটিকে জঙ্গলে ফেলে এল। এই পর্ব্বস্ত শ্রুতে কালীবাড় জিজ্ঞেস করলে বড়দের বনে না দিয়ে ছোটদের দিলে কেন? আমি তার উত্তর করতে পারলুম না। শেষটা কালীপ্রসাদ বললে যে বাপ-মারা বৃষ্টি ছোটদের চাইতে বড় ছেলেমেয়েদের বেশ ভালবাসে। আমি বললুম, না, সকলকেই সমান ভালবাসে। এর পর সে অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকলে—বেশ স্পষ্ট মূর্খড়ে গেল। আমি তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে অন্য কথা পাড়লুম। কিন্তু দেখলুম গল্পের ঐ কথাতা তার মনে লেগেছে। ছোট ছেলের মনে একটা কথা অনেকক্ষণ থাকে না—তাই পরে এটা সে ভুলে গেল।

আমি এই গল্প ক্লাবে কাঁজলুম, তাতে মগেন মিত্র বললে, দেখছে ছোট ছেলে instinctively কেমন সত্যটা ধরে। আমি বললুম, তুমি বাপের মত কথা কহে—মা হলে এমন কথা বলতে না। তাতে সে চুপ করে গেল। ভাল কথা—ও গল্পের ঐ তিনটিই ছিল মেয়ে—এই কথা শ্রুতে কালীবাড় নিশ্চিন্ত হল। বাকলে যে বাপ-মার ভালবাসা তার জন্য ঠিক মনুষ্য আছে। সুতরাং তা রাঁচি যাবার কথা কিছ: বলে না। আজ সকালে আমার এখানে আসবার কথা ছিল তাও ত এল না—টেলিফোনও করলে না। সুতরাং তোমাদের কলকাতা আসা কবে ঘটবে জানিনে। ইস্টারের ছুটি ১২ই সূর্য হবো।

শুনিছ সুহৃদ সঞ্জীব ও বেটো দাদার সঙ্গে পুরি যাবে। তাদের change-এর দরকার। আমি কোথাও বাব না। না ম্যারজালিং, না চট্টগ্রাম। তুমি যদি ইতিমধ্যে না ফেরো ত অগত্যা রাঁচিই যেতে হবে—তবে সে change-য়ে আমার শরীর যে খুব চাণা হবে এমন আশা করিনে। Hot fomentation-য়ে আমার কোনও উপকার হয় না। তবে এই ছুটিতে এখানে একা বসে থাকার যে খুব সুখের হবে তা নয়। এরা সব চলে গেলে ও বাড়ীতে থাকবেন মা আর নলিনী- আর এ বাড়ীতে একা আমি। বাঙ্গালার বাক বলে “আকস্মিকস্থৈর্য” পড়া, আমার ইচ্ছে তাই। দেখা বাক সুতরেনরা কলকাতা থেকে নড়েন কিনা, তারপর যা হয় তা ঠিক করব।

আজ আমার কলেজ আছে। দুপুরে পড়া তয়ের করতে হবে। এখন বেলা কটা জানিনে—কেননা ঘরে ঘড়ি নেই—তবে রোদ্দ দেখে যদি অনুমান করতে হয় ত বলব—সাড়ে এগারটা। বোধ হয় দিন অন্তপ্রবৃত্ত হয়নি। এখানকার খুঁটিনাটি কথা যে লিখিনে, তার কারণ সে সব কথা Pleasant হবে না। দিবারাট একটা অভাব-অভিযোগের atmosphere-য়ে থাকটা আমার nerve-এর পক্ষে ভাল নয়। দাদা কি করলেন, আমি কি বললে, কে কোথায় চললে—এইসব নিয়েই অধ্যাপক আমাদের দৈনিক জীবন—কিন্তু প্রতি কথা, প্রতি ঘটনা যদি অপ্রীতিকর হয় তা হলে টেকা মুশকল। জাগিয়া ভগবান আমাকে অন্য interest দিচ্ছেলেন, তবেই এইসব কুপ্রভার ভিতরও নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারি—আর তা পারি বলেই ওসবকে উপেক্ষা করতে পারি। আমরা এক দল আছি—যারা মানুষ মানুষের spirit spirit করেই আশ্বস্ত হই—কিন্তু spirit জিনিষটো মানুষের ভিতর এতই চাপা পড়ে থাকে যে তার সোহাই শেওরা আর চলে না—অথচ ও সোহাই না দিলেও এই জড়-বিশ্বের আচার দাঁড়বার স্থান থাকে না। আমি হতাশ হয়ে Shelly পড়ছি। Adonais যদি কবিতার চরমে না উঠে থাকে ত আমি জানিনে আর কোন কবিতা তার উপরে উঠবে। Hellas পড়ছি—তার lyric-গুলোর তুলনা বোধ হয় কোন জগতেই নেই। Shelly পড়তে হলে মনের তার বিশেষ সুরে বসেছে হয়—জা যে না পারে তার পক্ষে ওসব শব্দাঙ্কুর দায়। আরম্ভ

করেছিলুম শিক্ষা দিয়ে, শেষ করলুম সাহিত্যে, কেননা দেখছি—এক সাহিত্য ছাড়া আর কিছ:তেই শিক্ষা নেই—অপর পক্ষে বার শিক্ষা নেই তার কাছে সাহিত্যও নেই। আজ এই ভক্।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী  
C/o S. N. Tagore Esq.  
Morabadi  
Ranchi

## পত্র পরিচিত

পত্রলেখ ০৩ ॥

Madam de Sevigne : Marie de Rabutin-Chantal

(১৬২৬—১৬) ফরাসী পত্রলেখিকা। সম্ভ্রান্তবংশীরা মহিলার আচার কথনের কাছে লেখা ১৫০০ খানির মতো চিঠিতে ফরাসী সমাজ ও পারিবারিক জীবনের উৎকৃষ্ট ধারাবিবরণীর মতো ছবি পাওয়া যায়। কিন্তু চিঠিগুলি লিখনশৈলীর দিক থেকে বিশেষ উচ্চ মানের নয়।

অমি : দুঃসংসার চৌধুরীর কলিষ্ঠ পুত্র অমিরনাথ। স্বনামধন্য ব্যারিস্টার। উদ্যোগচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা প্রমীলা দেবীকে বিবাহ করেন।

তোমার বাবা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুহৃদ : সুহৃদনাথ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা।

সুহৃদ : সুহৃদনাথ চৌধুরী, দুঃসংসার চৌধুরীর কলিষ্ঠ পুত্র। কলিকতা থেকে ডাক্তারি পাস করে আসেন। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাদুশ্কে ভরসার হিসাবে যোগ দেন। বিবাহ করেন মহাবীর জ্যোতিপুত্র স্বর্ণেশ্বরনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্ণেশ্বরনাথের কন্যা নলিনী দেবীকে।

সঞ্জীব : সুহৃদনাথ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

নলিনী : স্বর্ণেশ্বরনাথ ঠাকুরের কন্যা। সুহৃদনাথ চৌধুরীর স্ত্রী।

মা : জ্ঞানদানাদিনী দেবী।

বাবু : পূর্ণিমা ঠাকুর। সুহৃদনাথ চৌধুরীর কন্যা। সুবীরেশ্বরনাথ ঠাকুরের পত্নী।

কালীবাড় : প্রমথ চৌধুরীর প্রাত্য কুমারনাথ চৌধুরীর পুত্র কালীপ্রসাদ চৌধুরী। ইনি প্রমথ চৌধুরীর পুত্রপ্রতিম স্নেহভাজন ছিলেন। ১৯৪১ সালে ১৭ জুন বিমানবন্দ্রে নিহত হন। কালীপ্রসাদের বরস যখন আড়াই বছর তখন “ছোটো কালীবাড়” শিরোনামে প্রমথ চৌধুরী একটি Triolet রচনা করেন :

“লোক বলে অঁকা ছেলে ছোটো কালীবাড়,

আঁচ বরস তার আড়াই বছর।

কোঁচা ধরে চলে যাবে, সেজে ফলবাড়,

লোক বলে বঁকা ছেলে ছোটো কালীবাড়।

দিনমান বকে বার, হয় নাকো কাড়,

সুরে গায় তলে নাচে, হাসে চরাচর।

লোক বলে পাকা ছেলে ছোটো কালীবাড়,

বঁচি বরস তার আড়াই বছর।”

১৮ জুন ১৯১৮

বাঁগলজ

পত্রলেখ ০৪ ॥

Benedetto Croce : (১৮৬৬—১৯৫২) ইতালীর দল নিক। চার খণ্ডের দর্শনশাস্ত্রের La Filosofia dello spirito গ্রন্থে তার মানবতাবাদী চিন্তাধারার প্রকাশ।

খোকা : সুবীরেশ্বরনাথ ঠাকুর

মহিহর : মহিহরেশ্বরনাথ ঠাকুর

কিরণ : কিরণশংকর রায়

চিত্তরঞ্জন : চিত্তরঞ্জন দাস

পদলেখ ০৫ ॥ কালীবাড় : সুবীরেশ্বরনাথ চৌধুরীর কলিষ্ঠ পুত্র। প্রমথ চৌধুরী তার গল্প সংগ্রহে গ্রন্থ কালীপ্রসাদ চৌধুরীকে উপেক্ষা করে লেখেন :

“তোমার বরস যখন আড়াই বছর, তখন

তোমার নামে এই Trioletটি লিখি—”

আর আজ ?

শ্রীমতী হি বিবর : শচাম্। তথ্যশি কিং করায়।

স্বভাবনা বেরং কাম, সুহৃদ বা শ্রেণং বা কবেদ্যমপক্ষ

পুত্রশোকহৃদভূজো জাতোহামি।”

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১

তোমার ন-কাকা  
প্রমথ চৌধুরী

বেটো : রাজীব চৌধুরী। সুহৃদ চৌধুরীর কলিষ্ঠ পুত্র।  
Adonais, Hellas : শেলার লেখিত দুই কবিতা। গ্রীক পুরাণের চরিত্র অকল্যুস লিখিত। Adonais (১৮২১) এলোজিতে শেলী বলেন যে, কবিদের কাব্যের কঠোর সমালোচনার জন্যই তার অকল্যুস হয়েছিল। Hellas কাব্যদ্বয় (১৮২২) গ্রীকের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্তঃপ্রাণ লিখিত।  
(জানামী লেখার সমাপ্ত)

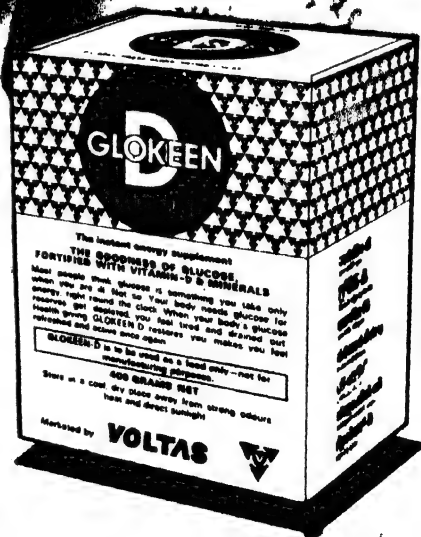
গ্লোকীন-ডি  
শক্তির মাত্র

মুখখানি তেই বিদ্যমান!

গ্লোকীন-ডি প্রত্যেকের উপযোগী দ্রুত বলদায়ক ও শক্তির  
পরিপূরক। এটি ক্লান্তি কাটায়, কর্মশক্তি বাড়ায়।  
গ্লোকীন-ডি গ্লুকোজের সমস্ত সংগুণে বিভূষিত। তার সঙ্গে সঙ্গে  
এটি অধিক ক্যালসিয়াম, ফসফেটস্ ও ভিটামিন-ডি  
সমৃদ্ধ—আর তার মানেই হ'ল প্রতিটি সময়ে, প্রতিটি ক্ষণে  
স্মৃতি আর শক্তি!

গ্লোকীন-ডি-কে, প্রতিদিনের অভ্যাস ক'রে তুলুন।

**গ্লোকীন-ডি**  
দ্রুত শক্তিদায়ক গ্লুকোজ-ডি



ULKA-GD-19 BEN



নেতাজীর শিবিরবাসী জাপান সরকারের সম্মুখে ১৯৪০ সালের নভেম্বরে স্বস্তর পূর্ব এশিয়া সম্মেলন নিম্নলিখিত প্রধান ঘটনা। বিশেষভাবে এই কনফারেন্স-এ বেগে বেগার জন্মই তো উনি জাপানে এলেন। এর গুরুত্ব সম্পর্কে উনি খুবই সচেতন ছিলেন। এই আলোচনা স্টেক থেকেই হয়ত একদিন নতুন এশিয়া ক্রম নেবে—এইরকম একটা স্বপ্ন এঁদের মনে ছিল। হারাল্ডার কাছে শুনছি টোকিওর পরে নেতাজী আর জন এশীয় নেতারাও কতকোঁতে রাজ্যবিরতি করেছিলেন। সে সময় ওঁদের এক পুরোপুরি জাপানী কারদার সরাইখানার তোলা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ওঁরা জাপানী আচার-কনবাসের সঙ্গে পরিচিত হবেন।

এই জাপানী সরাইখানার মালিক কুরানারি তার ভিতরদের খাতার সব নেতাদের দিগে বাণী লিখিয়ে নিয়েছিলেন। বাকীর প্রধানমন্ত্রী বা ম একটু নটকীয়ভাবে লিখে দেন—One blood, one voice, one leader। নেতাজী কিন্তু ইতিহাসের পারিপ্ৰেক্ষিতে বা খুবই বাস্তবসম্মত কথা তাই লেখেন। উনি লিখলেন—

“The world is in the throes of a revolutionary change. Now is the golden opportunity for the peoples of Asia to build a new Asia.”

হারাল্ডা বলেন সরাইখানার মালিক খুব গর্ব করত যে এইসব বিশিষ্ট কবিতা তার অতিথি হয়ে-ছিলেন।

পরবর্তীকালে আমরা বাংলা সম্মেলনে ‘পশ্চাৎ-এশীয়’-এর কথা শুনলাম। এই গ্রেটার ইন্ট এশিয়া কনফারেন্স যে বহু বিবর্তিত প্রচার করেছিল তাতেও কিন্তু আমরা পশ্চাৎ-এশীয় দেখা পাই। যে প’চ’টি নীতি গৃহীত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল—

(১) এশিয়ার দেশগুলি পারস্পরিক সহ-যোগিতার ভিত্তিতে সকল দেশের সমৃদ্ধি ও শান্তির জন্য কাজ করবে।

(২) এই সব দেশ পঞ্চাশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করবে না।

(৩) নিজস্ব ঐতিহ্য অক্ষর রেখেও এরা এশিয়ার সমগ্র সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধির জন্য কাজ করবে।

(৪) এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতি ব্রাহ্মণত্ব করার জন্য এই সব দেশ চর্চনিত সহযোগিতা ও আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে কাজ করবে।

(৫) পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে এশিয়ার দেশগুলি অবশ্যই যোগাযোগ রূপেও সাংস্কৃতিক বিনিময় করবে। পৃথিবীর কে বাও হাতে রাখি ও বণ্টনিত না থাকে তার জন্যও এর সচেতন হবে।

নেতাজী বলছিলেন আমরা একটা নতুন ধরনের সম্মেলনে মিলিত হয়েছি। কারণ সাধারণত বিভিন্ন দেশ মিলিত হয় কখন? একটা বড় যুদ্ধের শেষে বিজিত দেশগুলি মিলিত হয় যুদ্ধে জিতে নেওয়া ধনসম্পত্তি ভাগবটোরার করার উদ্দেশ্যে। এই এশীয় সম্মেলনের চারিত্র্য কিন্তু একেবারে আলাদা।

যে কথা বলছিলাম, এশিয়া সম্মেলন নিশ্চয় নেতাজীর সফরের প্রধান ঘটনা। কিন্তু তার চার-পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছোটখাটো আরো কত বিচিত্র, টুকরো কাহিনী। যত বিভিন্ন মানুষজনের সঙ্গে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছিল ততই নেতাজীর সেই সব দিনগুলির অনেক অজানা দিক আমাদের কাছে ধীরে ধীরে স্পষ্টতর হয়ে ক্রমে উঠছিল। যেমন ধরা যাক শিবসাগর পরিবারের সঙ্গে নেতাজীর অন্তরঙ্গতার কথা।

সেবার যে সব এশীয় নেতারা ফ্রান্সেওতে আড়া হন তাদের এক জায়গার বা একটা বাড়ি হোটেলের না রেখে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রাখা হয়েছিল। বিশিষ্ট সব জাপানী পরিবার এক একজন বিশেষ নেতাকে তাদের পরিবারের অতিথি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে জাপানের পারিবারিক জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় পায় সবুগে এঁদের হয়েছিল।

## চরণরেখা তব

### কুমণ বসু



এই জাপানী পরিবারের সঙ্গে থাকার কাগজটা কিন্তু খুবই বিশেষ ঘটনা। কারণ স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে জাপানীরা সহজে কোন বিদেশীকে নিজের পরিবারের মধ্যে গ্রহণ করে না। এর খুবই বহুবেশল জাতি, বিশেষী বস্তুকে খুবই ঘোষণা করে, খাওয়ায়ে দাওয়ায়ে কিন্তু সহজে বাড়িতে নেবে না। যেদিন কোন বিদেশীকে এর বাড়িতে নিয়ে নিজেদের সঙ্গে খেতে বসাবে সেদিন বস্তুতে গবে এরা সাকে একবারে আপন করে গ্রহণ করবে। তাই এশীয় নেতাদের জাপানী পরিবারে রাখার এই কবচখার মধ্যে রয়েছে একেবারে আত্মতরিকতার পরিচয়।

শিবসাগর পরিবারের অতিথি হয়েছিলেন নেতাজী। শিবসাগর জাপানের খুব অভিজাত পরিবার। মিঃ শিবসাগর সে সময় জাপানের রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর। জাপানের অর্থনীতিতে শিবসাগর পরিবারের ব্যবসায় বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

একদিন ইন্টারন্যাশনাল হাউসের লাইব্রেরীতে গল্প করছি সকল সময়ে—হুয়াং শায়ে আছেন, ইয়োকাবাৰি আছেন, হাচিমা পরিবারের অনেকে এসেছেন—গমন সময় এক জাপানী ভ্রমালোক এসে ঢুকলেন। দেখি তিনি আমাদের সিক্রেট এগিয়ে আসছেন। ইয়োকাবাৰি উঠে গিয়ে ওঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন।

তোমাদের সঙ্গে জালাপ করিয়ে দিই টাই মিঃ শিবসাগর—দুনি প্রথমে চমকে গিয়েছিলেন। এর তো কয়েক বেশী মনে হচ্ছে না। অবশ্য জাপানীদের ব্রস বোকা বেশ মশকিল। তবুও নেতাজী যদি এর অতিথি হয়ে থাকেন—। ইয়োকাবাৰি তখন বুঝিয়ে দিলেন ইনি শিবসাগর জুনিয়র। এর বধা শাকুরো কো শিবসাগর ছিলেন রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর। এঁদের বাড়িতেই নেতাজী অতিথি হন। শিবসাগর জুনিয়র তখন ছেলে-

মানুষ। ওঁর ঠাকুরাণী ছিলেন জাপানী কিনাসের বাপের প্রতিপত্তিপালী। এমন কি এক সময় জাপানের কোন একটি কারেন্সি বেটে ওঁর মুখের ছাপ জাপান প্রস্তাবও উঠেছিল। আর শাকুরো শিবসাগর যুদ্ধের পর জাপানী ক্যান্টনমেন্ট অধ্যক্ষ ছিলেন কিছুদিন।

স্টুট শিবসাগর বেশ হাসিখানি, মিশুকো। আমদের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল।

খাঃ, নেতাজীর কথা মনে নেই? কী বৈ বলো! সেটা তো আমাদের পরিবারের একটি স্মরণীয় ঘটনা—উনি বললেন।

একটু হঠাৎ করেই জানতে পেরা গেল আজাদ হিন্দ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান নেতাজী কত কোস উঠবেন আমাদের বাড়ি। বেশ সময় সাধ রপ পড়ে গেল। আমাদের পরিবারে থাকলেও উনি তো রাষ্ট্রীয় অতিথি। একটুও যেন ছুটি না হয় আরোজেন। কার্পেট খুঁটি, সোফা অনেক নতুন ফর্নিচার এল। আমার বাবা মা তাদের শোবার ঘর দেখে দিলেন অতিথির জন্য। সেই ঘর শুবের করে সাজিয়ে গাড়িয়ে নেওয়া হল। আমরা ছোটরা খুব উত্তেজিত। সারা বাড়িতেই নানারকম ওলট পালট হল। আমরা বরস বছর যেলা হয়ে।

যেখতে দেখতে সেই বিশেষ দিন এসে পড়ল। নেতাজী এসে পৌঁছলেন। বাড়ির কতা, গিন্নী ছেলেমেয়ে পরিচারক-পরিচারিকার দল, এ ময় সিকিউরিটি গার্ড—এর লোকজন পরস্পর সকলের হৃদয় তিনি নিমেষে জর কর দিলেন। যেন কোন হৃদয়ে মোহিত করে ফেললেন সকলকে। আমার তো বোলা বছর, তার পর আমার পরের বোন। আর একটি ছোট বোন ছিল। সে এমনতে অপরিচিত লোকের কাছে সহজে খেতে চাইত না। কিন্তু নেতাজী বতর্দান রইলেন নেতাজীর কেলের কাছে এসে থাকত সম্প্রদ। নেতাজী গাড়িতে করে বাইরে যাবেন, সেও গাড়িতে চড়ে সঙ্গে যাবে বলেন ধরত।

আমি একটু অবাক হয়ে ফললাম, মিঃ শিবসাগর, আপনি তো চমৎকার ইংরেজি বলেন। জাপানীদের মধ্যে এত করকরে ইংরেজি বলা সহজে শুনতে পওয়া যায় না। বরং জানেন তারাও ঠেকে ঠেকে অর অস্পষ্ট উচ্চারণ বলেন।

উনি বললেন, ইংরাজি তো প্রথম কলতে শিখি হাতেখড়ি। আজ্ঞা, কেমন আছেন মিঃ হাসান?

মিঃ হাসান! তিনি কে? ওহো, আদন হাসানের কথা বলছেন উনি, একটু পরে বস্তুতে পারলাম।

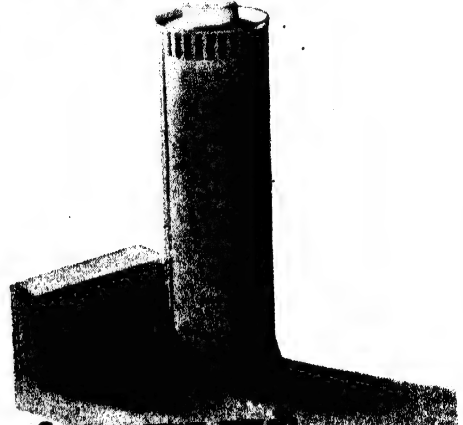


লোকের শিবসাগর পরিবারে অতিথি হলেন নেতাজী



গ্যাভেণ্ডারের সৌরভ । যেমনি সূজা, তেমনি  
 স্বতন্ত্র । যে-সব সৌরভ সর্বকালের সেরা  
 বলে পথা, তারই একটি ।  
 গ্যাভেণ্ডারও আছে বিবিধ রকমের । তার  
 মধ্যে সূজাতম মেটি, সেটি জন্মায় সৌরভের  
 শীতস্থান জ্বালে । নান্য তার লাইল্যাক  
 গ্যাভেণ্ডার । স্পর্শ-পাশে কুম্ভাসাগরের সজল  
 বাতাসের আমেজ । জ্বাল হলেই যে অভিজাত কুটি  
 আর প্রাণোন্মূসের কথা মনে আসে, তারই সার মেন  
 এই গ্যাভেণ্ডার ।  
 ফরাসী গ্যাভেণ্ডারের নির্যাস দিয়েই তৈরী এসেছে  
 সর্বশ্রেষ্ঠ রসায়ন সামগ্রী — গ্যাভেণ্ডার ডিউ ।  
 জ্বালও এই গ্যাভেণ্ডার জ্বালে জ্বাল খেকে, আর  
 দরাজ হাতে সেই সুরভি ঢেলে তৈরী হয়  
 গ্যাভেণ্ডার ডিউ সাবান আর ট্যালক ।  
 নিজেকে আবৃত করুন গ্যাভেণ্ডার  
 ডিউ-এর সৌরভে । বিশ্বের সেরা  
 সৌরভের মাঝাজালে ।

ফরাসী সুরভির  
 অভিজাত স্পর্শ



গ্যাভেণ্ডার-ডিউ সাবান আর ট্যালক — ভারতের বিলাস রসায়ন সামগ্রী  
 কালকেদিকোর সামগ্রী, সেরা জিনিষের সমন্বয়সম্পন্ন জমা

শিঃ হাসান তো নেতাজীর সেক্রেটারী। উনিও নেতাজীর সঙ্গে আশাশের বাড়িতে ছিলেন। উনি প্রথম ইংরেজি শেখলেন, পরে অবশ্য আমি চর্চা রেখেছি। শিঃ হাসানের সঙ্গে আমার খুব জব্ব হয়েছিল। ঐর সঙ্গে সঙ্গে খরতম সব জায়গায়। তখন আমি ইস্কুলের পড়া শেষ করেছি। মিলিটারি একাডেমিতে ভর্তি হব তার তোড় জাড় চলছে। আমি নেভিতে ট্রেনিং নেব অনেক দিন থেকে মন স্থির করে রেখেছি। কিন্তু শিঃ হাসান সব গোলমাল করে দিলেন। উনি বললেন, তুমি ইনক্যান্ডিডে ট্রেনিং নাও। আমার ওপর ঐর খুব প্রভাব তখন। উনি নিয়ে তো জার্মানিতে আমিও ট্রেনিং নিয়েছেন। এমন যোগ্যতায় যে আমি বৃষ্টি মেলায় এবং নেভিতে না গিরে আমি ট্রেনিং-এ ভর্তি হলাম।

শিবসাগর বাড়ির এই দিনগুলোতে নেতাজী স্বাভাবিকভাবেই খুব ব্যস্ত থাকতেন। কন-ফারেন্স-এর কাজ ছাড়াও আরে অনেক কাজ থাকত। হিন্দি পড়ে সেই বিশাল সমকেশ ভাষণ দিলেন। রেডিও শ্রুতি করলেন, সাংবাদিক বৈঠক ডাকলেন। শিবসাগর: ছেলেদেরা দেখত ঐর ব্যস্ত আনাগোনা।

সম্মেলনের দিকে কোন-ন-কোন রিসেপশন, ডিনার এসব লেগেই থাকত। অবশ্যই পানাহার করা এর একমাত্র উপশ্রম ছিল না। গুরুত্বপূর্ণ ডিপ্লো-মেটিক আলোচনা এই সব ডিনার টেবিলে হত। কনফারেন্স প্রতিনিধিদের সঙ্গে ছাড়াও জাপানের পরের ষ্ট্রী সপ্তর, এয়ারফোর্স, নেভির অফিসারবৃন্দ এদের সঙ্গে নেতাজীর এই ধরনের আলোচনা অসাধারণ। রিসেপশন, ডিনার, বৈঠক ইত্যাদি হতোই। নেতাজীর সব সময় চিন্তা ছিল কীভাবে আজার হিন্দু সরকার বা আজাদ হিন্দু ফোর্সের জন্য সব রকম সুযোগ সুবিধা অঙ্গার করে নেওয়া যায়। জাপানী অফিসাররা বলতেন নেতাজী বেশ ভাল 'বারগেন' করতে পরতেন। সে সময় উনি আজাদ হিন্দু ফোর্স ক'রে বাড়িয়ে জেতার কথা ভাব-ছিলেন। জাপান বলছে, ভিতর হাজারের বেশী সৈন্যকে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া ওদের পক্ষে কষ্টকর। নেতাজী বলতেন, না, পঞ্চাশ হাজার রেলগাড়ার আমি তে থাকব, তা ছাড়া সিভিলিয়ানদের মধ্যে থেকে কুড়ি হাজার থাকবে ডলারিটার সাহায্যে। দাব্যের আশ্রয়ের কথা, আই এন এর 'এক্স-পানিশন' বা বড় করা নিয়ে যখন আলোচনা করতেন তখন উনি নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর কথাও তুলতেন। আমরা তো জিন আজাদ হিন্দু ফোর্সের এয়ারফোর্স বা নেভি ছিল না। কিন্তু করতে যে হবে সে নিয়ে তখন নেতাজী গুরুত্বপূর্ণ দোশোদিয়ান করছিলেন। এই সব ডিপ্লো-মেটিক ডিনার ও রিসেপশন তাই ছিল নিত্যন্ত জরুরী।

ইতিমধ্যেই নেতাজী টেকিওর মিলিটারি একাডেমিতে শিক্ষাগোষ্ঠ করত পাঠিয়ে দিয়েছেন গছাই করা কিছ হেলে। ডাকের মধ্যে দলজন এয়ারফোর্স ট্রেনিং-এ আছে। পরবর্তীকালে আমিও ট্রেনিং-এ। এই সব ছেলেরা নেতাজীর প্রাণাধিক প্রিয়। জাপানী ডকুমেন্ট বলাছে, নেতাজী ছিলেন ওদের কাছে 'লাইক এ মাদার' মায়ের মত।

নানা কক্ষে ফাঁকি ফাঁকি অনেক দেখা করতে আসতেন নেতাজীর সঙ্গে। কত লোক আসতেন কত রকম উপহার। শিবসাগর বাড়িতে উপহার স্তূপ হতে লাগল। নানা রকম উপহারের মধ্যে একটি ছিল তরবার। এক দিকে নাম খোদাই করা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, অন্য দিকে কঠোর বাস্তব শেখা শব্দেই বহন করে, শিষ্টের পালন করে। এই ধ্যানলো জাপানী ভাষায় লেখা 'হায়া কেন্দো'। হাতে লেখা জাপানের বিশিষ্ট সামরিক নেতা ইতিমধ্যেই তেরমায়ার। জাপান-ভারত বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে তোরা যা এই তরবারি আনুষ্ঠানিক-ভাবে উপহার দিয়েছিলেন। ফকুওকার দুই কারু-শিল্পী এই তরবারি বানিয়েছিলেন। শুনিয়েই সব গাইতে ডল তরবারি নাকি বানান হয় কুতূহলকে।



ডিপ্লোমেটিক ডিনারে ভাষণ দিচ্ছেন নেতাজী (টেকিও ১৯৪৫)

দুই শিল্পীর নামও লেখা আছে। আরো লেখা আছে ফকুওকার শিচিহেই টসানো এটি দিলেন। যোদ্ধার তরবারকে জাপানী বিশেষ সম্মানের চোখে দেখে।

দেখতে দেখতে নেতাজীর বিদায়ের দিন এসে পড়ল। শিবসাগর পার্শ্ববর্তী সকলকে ডেকে নেতাজী বিদায় চাইলেন। ঐর বা কিছু উপহার-সামগ্রী বিশেষ করে এই তরবারি নেতাজী বললেন শিবসাগর পার্শ্ববর্তী কাছেই থাকবে। নেতাজী বললেন, আমি আবার আসব। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে আমি আবার তোমাদের কাছে আসব, তখন আমি এই সব গ্রন্থ করতে পারব। ততদিন এ সব তোমাদের কাছেই থাকবে। শিবসাগর বাড়ির সকলে নেতাজীকে বিদায় জানাতে গিয়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। উনি ওদের একান্ত আপনজন হয়ে পড়ে-ছিলেন। যাবার আগের দিন নেতাজী নিজের একটি ছবিতে সই করে বাড়ির রাস্তাকে কাউকে দিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু উনি কাকে ফেলে কাকে দেবেন। ছোট শিবসাগর গলপ করলেন ওদের বাড়ির রাইনী, বেরারা, মালি, যে যেখানে আছে সবাই চার ঐর একটা ছবি। সিকিউরিটি গার্ডদের লাইন পড়ে গেল, তাদেরও একই দাবি। অনেক ভি আই পিকে তো ওরা দেখানো করেছ কিন্তু এ রকম চমৎকার মানব ওর আর দেখানি। শিবসাগর মনে আছে আরো অনেক ছবি আনাতে হলো আর চল আসার আগের রাতে জাপানি জাহাজে অনেক রত পর্যন্ত বসে নেতাজী কেবলই ছবিতে সই করে চললেন।

দেশ স্বাধীন হলে আবার আসব বলেছিলেন নেতাজী। তখন নিয়ে যাবেন তরবারি ও অন্যান্য উপহার। সে সুযোগ তো আর হল না। এদিকে জাপানের পরাজয়ের পর সারা দেশ একটা বিপর্যয়ের ছায়া নেমে এল, শিবসাগর পার্শ্ববর্তী বাদ গেলেন না। কে কে খার ছিটকে পড়ল, কোথায় চলে গেল নেতাজীর ফেলে থাকা সব জিনিস।

প্রায় কুড়ি বছর পর একদিন এক জাপানী হঠাৎ দেখতে পেলেন টেকিওর এক কিউরিওর দোকানে এক তরবার। তার গারে লেখা জাপানী ভাষায়-হিজ একসেলেনসি সুভাষচন্দ্র বোস। তখন তিনি জাপানের ওয়ার ডেটোরন বা যুদ্ধ-ফেরত অফিসরদের খবর দিলেন। খবর পেয়ে এসে হাজির হলেন প্রবীণ জাপানী অফিসাররা। যোদ্ধার তরবার ওদের কাছে পরম প্রাণ্যর জিনিস। একে তো হলো-ফেরা কড়া ধার ন। অফিসাররা নিজেরা পরামর্শ করে দোকান থেকে প্রথমে সেই তরবারি সংগ্রহ করলেন। ঐরা অনেকেই এই তরবারি কথা

জানতেন। অনেক সময় কেবলেন গেল কোথায় সেটা। তরবারি উদ্ধার করার পর ঐরা জাপানে ভারতের তখনকার রাষ্ট্রদূত কম্প্রসিন তরবারি সঙ্গে যোগাযোগ করেন ও বুঝাবাসের মাধ্যমে নেতাজী রিসার্চ স্ট্রেকে খবর দেন।

এর পর জেনারেল কজিয়ারা টেকিও থেকে কলকাতা নিয়ে এলেন সেই তরবারি। নেতাজী ভবনে তরবারি অনুষ্ঠান নামে এক অতৃতপূর্ণ উৎসব হল। কয়েক হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিলেন সেদিন। তখনকার মুখ্যমন্ত্রী, গভর্নর, বেঙ্গাল এয়ার কমান্ডার সকলের উপস্থিতিতে জেনারেল কজিয়ারা ফিরিয়ে দিলেন নেতাজীর তরবারি। মিলিটারি ব্যানডে এক দিকে তখন মাটিং টিউন বাজছিল অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথের গান 'বাঁধ ভেঙে মাও, বাঁধ ভেঙে দাও' গাইছিল ছেলেদের দল। কিশোর কাল পরে দিল্লীর লাল কোয়ার্টারের রাষ্ট্রপতি আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মান জানিয়েছিলেন এই তরবারিকে।

টেকিও থেকে সেবার নেতাজী কিন্তু সোজা সিঙ্গাপুরে ফিরে যাননি। উনি চীন স্করে গেলেন। এলিটা সন্মেলনের সময় চীনের প্রধানমন্ত্রী নেতাজীর সঙ্গে আলাপ করে বিশেষভাবে মনুষ হন। নানকিং সরকারের পক্ষ থেকে উনি নেতাজীকে চীনে আমন্ত্রণ জানান। ঐর নিজের বল থেকে উনি প্রচার-বন্দীকে আগে থাকতে নানকিং পাঠিয়ে দিলেন। কারণ, নেতাজীর অজ্ঞানতার প্রস্তুতি প্রয়োজন।

নেতাজীর এই চীন স্কর নানা কারণে বিশেষ কোতূহলজনক। কলকাতার থাকার সময় ১৯০১-এ উনি একসঙ্গে চীন যাবার অয়োজন করেছিলেন কিন্তু যেতে পারেননি। ব্রিটিশ সরকার ঐকে চীন যাবার অনুমতি দিতে অস্বীকৃত হন। অর্থাৎ তার অল্প দিন আগেই পণ্ডিত নেহরু বন্ধন চীনে গেলেন তখন কোন আশাও কতপক্ষে ওঁজেননি।

সে সময় কলকাতার চীনের কমসল জেনারেল ছিলেন মিঃ হুয়াং। উনি বলেন, নেতাজী ঐকে একদিন ফেনে এলগিন রোডের কাঁড়িতে ডেকে পঠান। দুজনে কিছুতে কথা হয়। নেতাজী বলেন, ব্রিটিশ সরকার ঐকে যে-কোন মুহুর্তে জারেরপ্ত করে জেলে পুড়ে দেবে। উনি থরা পড়তে চান না। যদি উনি চীনে বেড়াতে গিয়ে সেখানে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন তবে চীনের চর্যাক সরকার তা দেনে কি? মিঃ হুয়াং বলেন, যদি সুভাষচন্দ্র বেড়াতে যেতে চান তবে এখন নামেরে অভ্যর্থনা করা হবে এ বিষয়ে উনি নিশ্চিত। তবে

পালিটিকাল অস্ত্রসমূহ জমিষ্ঠ। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে চুক্তি সরকারের যে স্বাক্ষর করে তাতে এটা সম্ভব হবে অস্ত্রও মনে হয় না।

এদিকে সত্যযুদ্ধের চীন মাল্লার খোলাখুলি অনুমতি দেয়নি। বাংলা সরকারের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু দিল্লী থেকে ইন্সট্রাকশনস প্রদত্ত বক্তৃতা শুধু আপত্তি জ্ঞানলেন। ওর মতে সত্যযুদ্ধে জাতিসংঘ সাহায্য চাইবে। চীন বাবার নাম করে পথে বন্ধন থাকবে থাকবে দেখানোই হল। স্বাক্ষর হওয়া সম্ভব। তার চাইতে একে দেখাই রাখা। প্রয়োজনমত ডিক্লেস অথ ইন্ডিক্স আর্টিক করা যাবে।

আর একজন সোটে দিলেন, কেবলমত তা হলো বলে। ওকে না বলে দিক। অবশ্য, অমরদের এই সিদ্ধান্তের খুবই সন্দেহজনক হবে, কারণ সেহরুকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

হোম ডিপার্টমেন্টের লেফটারি এর ওপর সোটে দিলেন—আমার মনে হয় জাতিসংঘ নয়, ও রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান, তা হলে ওর লোকট কনসালিডেশন কমিটির বন্দুকা খুঁচা হবে। এই সময় ঐ স্বাক্ষর একজন বিপ্লবজনক শিল্পবীকে সেখানে এশিয়ার হেডে দেওয়া খুব ভাল হবে। ইতিমধ্যেই থাক, সরকার পড়লেই 'নেট' করা যাবে। এই প্রসঙ্গে উনি মন্তব্য করছেন—নেহরু আর হাই সোব থাক, সত্যযুদ্ধ বোমের চাইতে একেবারে অন্য ধরনের মানব। আমার মনে হয় না ওকে যেতে দেওয়া হয়েছিল বলে অন্যজনকেও দিতে হবে এমন কোন কথা আছে। তা ছাড়া নেহরু যখন গিয়েছিলেন তার চাইতে পরিস্থিতি এখন একেবারে পালটে গেছে।

চুক্তি সরকারের কাছে তাই আর নেতাজীর মাওয়া হয়নি। এখন জি পরিস্থিতিতে নানীক সরকারের আমন্ত্রণে এলেন। খুবই সার্ব অজ্ঞান পেলেন উনি। ওকে রাখা হল রাষ্ট্রীয় অতিথি-



মিতল, তেরমার দেওয়া তরবার হাতে নেতাজী

পালার। ওদের জাতীয় এলিমেন্টাল বিশেষ অভিযোজন তাক হল। উনি আই এন এর দুইটি জমায়েত। ওকে ওদের মিলিটারি একাডেমিতে গিয়ে পাওয়া হল। আমর-আপারদের জবাবে নেতাজী কিম্বীত জিয়ার দিলেন। সেখানে জাতিসংঘ রপ্তা ওয়েলম্যান, জাপানী সেনাপতি হাতা লকলেই উপস্থিত ছিলেন।

চুক্তি সরকারের উদ্দেশ্যে নেতাজী পর পর দুটি বোমার-বক্তৃতা করেছিলেন। প্রথমটি খুবই বন্দু-পুল। উনি বাবার নাম ইরান-সেনের প্রতি ওর গভীর প্রশংসা করা উল্লেখ করলেন। এ কথাও মনে করিয়ে দিলেন যে উনি বন্দু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি তখন উনিই চীনে একটি মোড়কল মিশন পরিচালিতেন। উনি জাতিসংঘের মনে, এশিয়ার কৃষকরা লব্ধের কথা চিন্তা করে চীন-জাপান যোগাযোগ হওয়া সরকার ও চীনের নিজেদের অনেক দূর করা প্রয়োজন। সনে ইরান-সেনের স্বপ্ন সফল করতে হলে চাই এশিয়ার মন্ত্রী, এশিয়ার ঐক্য।

বিত্তীয় বোমার-বক্তৃতা সুর একটু জি। ভারত-বর্মী সীমান্তে চীনা সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে এতে নেতাজী বিরক্ত ও দুঃখিত। এইভাবে ব্রিটিশদের সাহায্য করলে কোন জাতীয়তাবাদী বা দেশপ্রেমিক ভারতবাসী চিয়ার কাইসেরকে ক্ষমা করতে পারবে না।

নানীক থেকে নেতাজী সাংহাই গেলেন। সেখানে অনেক ভারতীয়ের বসতি। তারপর এলেন হানিন। প্রেসিডেন্ট জোন্সে লরেনের সঙ্গে আবার দেখা হল। সিঙ্গাপুরে ফিরে এসেই আবার উনি বেরিয়ে পড়লেন। এবার জাকর্তা, সুমাত্রা ও বোর্নিও। পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি কোনার উনি পৌঁছে দিলেন ভারতবর্ষের মুক্তিযোদ্ধাদের বাতী আর পূর্ব এশিয়ার হস্ত প্রবাসী ভারতীয় একে মনে প্রাণে গ্রহণ করল তাদের নেতাজী রূপে। (জমল)

দাঁতের ডাক্তাররা বলেনঃ

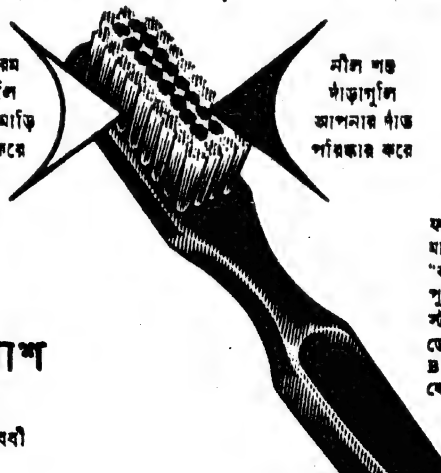
নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করুন আর মাড়ি মালিশ করুন, তাহলে মাড়ির গোলমাল আর দাঁতের ক্ষয় রোধ করতে পারবেন।

**ফরহ্যাগ ডবল অ্যাকশন টুথব্রাশ ব্যবহার করুন**

যা আপনার দাঁত পরিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে মাড়ি মালিশ করার জন্যে বিশেষভাবে তৈরী

সাধা মরম  
দাঁড়াগুলি  
আপনার মাড়ি  
মালিশ করে

নীল শক্ত  
দাঁড়াগুলি  
আপনার দাঁত  
পরিষ্কার করে



ফরহ্যাগ দিয়ে দাঁত ব্রাশ আর মাড়ি মালিশ করতে লিখুন। **বিজ্ঞানমূল্যে**  
“আপনার দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্য” স্বাস্থ্যে রক্ষণ  
পাণ্ডিত্য করে। ডাক্তারের বাবদ ২৫ পরসার  
সম্পূর্ণ সমস্ত লিখুন, এই টিকানায় : ফরহ্যাগ  
ডবল অ্যাকশন টুথব্রাশ, ডিপার্টমেন্ট নং  
BB-219, পোস্ট বাক্স ১১৪৬০, বয়ে ৪০০ ০২০  
যে ডাক্তার চান জানাবেন।

**ফরহ্যাগ টুথব্রাশ**

পরিবারের প্রত্যেকের জন্যে

অ্যাডাপ্ট (মাড়িমা ও সফ্ট) • জুনিয়ার • বোবী



# সামাজিক ঋণ

## শেখর মুখোপাধ্যায়

কবীরাম বল্লাহসেন, বুঠি কনক আরে যে, না পদায়ে জরোগে। তুমি ভুক্তি হইছিলে হাত চৌ করে, এখন এই ধরবার থেকে বিহার দেবে, হাত কবে খালি। সঙ্গে কিছই হবে না।

ভুলসীমারের বেড়া 'রয়েত হুরে কুম আরে, ওর জগ নে হ'সা থা। যারসা জীন জীও কুলসী, হ তুম হসতে হুরে জারো, অওর দুনিয়া রোরে।' লম্বা হুতে তুমি কল্লন করছিলে আর লুনে পৃথিবী ঠাছিল হোসে। এমন কল্ল কর কেন তুমি হানতে সতে নেবে বিদার আর কিলকলগ ওঠে কেদে।

কিবকানদের সতক বাণী, 'পরার্থে' বচাই বচা। যি শূহ; সেই ম'হত গুলিভেই বেচে আছে বন্ধ-রার্থে' বচছে। কেবলমাত্র নিজের জন্য বেঁচে থাকে শূহেলা জীবন।

কিবকানদের অহান, ঢেলা হাই কল্ল মানবমাজে, লো বাহিরিয়া জগতের মাঝে, থেকে না অলস রানে, থেকে না মগন স্বপনে।

এরা সকলে পরার্থে বাঁচার কথাই বলছেন। যোশ, কল্ল হও। প্রতিক্ষেপ ঋণমুক্ত হও। বাবার শী বাজার আগে কুরো তামাম ঋণশোধ।

আমরা সকলেই ঋণী। ধনী ঋণী নির্ধনের কাছে। ধনিক ঋণী অশিক্ষিতের নিকট। শহর ঋণী গ্রামের কাছে। শোষণকারী ঋণী শোষিতের নিকট। ধনিক শাসনালী ঋণী ভূতীয় বিশ্বের কাছে। জীন কত বেশী দকা-দীকা-ধনসম্পত্তি-পদমর্যাদা-সুযোগ পেয়েছেন, তিন তত বেশী ঋণী অশিক্ষিত-নিরক্ষ-বঞ্চিত মানুষের নিকট।

কি ভাবে ঋণগ্রস্ত? এর স্বরূপ কি? বাধ্য কি? কোম্পে নিম্নরূপ।

দেশের সরকার প্রতি বছর যে পরিমাণ রাজস্ব নগণের নিকট থেকে বিবিধ করের মাধ্যমে সংগ্রহ করেন, তার ঋণ দুই শতাংশ আসে আরকর থেকে। সুমানিক ২৮ শতাংশ আসে নানাবিধ অর্থদানী-তানীতে শুল্কের ইত্যাদির দ্বারা, আর বহুংশ ঋণ শতাংশই আদায় হয় অসংখ্য 'পর্যাক' করের দ্বারা।

এই সকল পর্যাক কর সব সময় দশমানে নর। কর কর, শিল্পবস্ত্র প্রভৃতির প্রতি পদক্ষেপ কর, জ্বালি এর বিভিন্ন রূপ। ধনী-নিধন সকল ব্যক্তিকেই এই সকল পর্যাক কর সমর্থনায়নই দিতে হয়, প্রতিটি ক্ষুদ্রকাল, বা উপভোগের সময়। দুই-একটি ক্ষেত্রে হয়তো বিবরটি স্পষ্ট হবে।

এক কাপ চায়ের দাম, ধরা মাক, রিশ পরসা। লুখো চা-পাতা, চিনি, দুধ, ইত্যাদি বস্তুগুলির দামিলাত মূল্য কিন্তু মাত্র আট পরসা, আর পরোক্ষ হু লাকিরে আছে বাইশ পরসা। এই করগুলি দশমানে। চা-বাগিচায় চা প্রস্তুত হচ্ছে সেখানে কর। রিকং বাজার চা-পাতা ভরা হচ্ছে, প্রাইভেটের উপর কর। লরীতে চোপে শহরে আসছে টোলার ও ডিক্লেসের কর। ইত্যাদি ইত্যাদি। একইভাবে চিনি, দুধ, লুসিনের ওপর। এই সব অদৃশ্য করের সম্মিলিত ফল হল এই বাইশ পরসা।

একটি দেশলাই-এর বাতের দাম ১৮ বা ২০ পরসা। ম'থা কিন্তু লুকোনো আছে ১০ পরসা পর্যাক। নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি বস্তুতে, ঋণী-নিধন কেই কর করতে হয়, এরূপ বহুল পরিমাণ কর হয়।

এবং যেহেতু ভারতের সত্তর কোটি জনসংখ্যার প্রায় তালই দারিদ্র্যসীমার নীচে (জাভার বহুভাগই দারিদ্র্য থেকে অনেক নীচের অবস্থায় গড়ছে), এই সত্তর কোটি গরীব দেশবাসীর প্রদত্ত পর্যাক করের দাম, যুটীমের ধনী বা মধ্যবিত্ত লোকদের ক্ষেত্রে এবং পর্যাক করের যেট পরিমাণের থেকে অনেক অনেক বেশী। আরকর জাতভার কখন আসে? আসলেও সেরা রাজস্বের দাম দুই শতাংশ দাম সংগ্রহীত হয়। পক্ষণ কোটি নিরক্ষ, হতশিক্ষা অশিক্ষিত (রাবীন ও লুহুরে বাঁচত)



শোষণকারী ঋণী শোষিতের কাছে

মান কের নিকট থেকে পর্যাক করের মাধ্যমে আদায়ীকৃত প্রকৃত পরিমাণ অর্ধেই বস্তুত দেশের সরকারের খরচ চলে। পক্ষাব্যক্তি পরিবক্ষণদালীর হয় বৃশাশ্রম। কিন্তু হুশারক্ষে মাঝমে অতি নগণা অংশই গরীব মানবজনের কাছে কিয়ে আসে।

দেশনাই পর্যাক করের হার বিখ্য হল ও দুত মূল্যবানীতির ফলে এই হতশিক্ষারাই হন আরো কঠোরভাবে আশ্রিতপ্রান্ত। চরম দৃশ্যশাস্ত।

এই পশ্চাতিতে ধনীর নিকট থেকে অর্থ ও সম্পদ সংগ্রহ করে দরিদ্রদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে তিক্ত বিশরীত কার্য।

এটা পেল শূহুয়ায় রাজস্ব সংগ্রহের দিকটা। এখনও সরকারী ব্যয়ের হিসাব অসোচিত হয় নি, যে কবার স্পষ্টীকরণ হাড়া সামাজিক ঋণের বাধ্যা থেকে হবে অসম্পূর্ণ।

এই রাজস্বের একটি বৃহৎ অংশ ব্যয়িত হয় পক্ষাব্যক্তি যোজনা বাজে, যুক্তী সাধারণ উন্নয়ন প্রচেষ্টার ও শাসনবস্ত্র চালু রাখার। এই সক্ষম-বোজন ও সামান্য উন্নয়নের কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে আকাশপক্ষী বাই দৈনন্দিন-সকল বৃহৎ শিল্পায়োগের জন্য প্রয়োজনীয় ইনফ্রাস্ট্রাকচার, কঠোরো, শাক, কারিগরী ও গবেষণা কেন্দ্র, কিস্তিবিদ্যালয় ইত্যাদি ইত্যাদি গড়ে তোলা হয়।

কিন্তু এ সবের দ্বারা ভারতের অর্ধশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত গরীব মানবেরা কত না উপকৃত হন, তার থেকে শত শত গুণ বেশী লাভবান হন মূল্যমের ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়, ব্যবসারী ও স্বয়ংসেবায়ীরা। তৈলাভর্যাই হন আরো চিকন। শিক্ষিতরা সুযোগ পান আরো শিক্ষিত, আরো দক্ষ এবং আরো উপার্জনশীল হতে। ব্যবসারীরা সুযোগ পান দেশের গরীব অধিবাসীদের টাকার গড়ে তোলা ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সাহায্যে আরো মূল্যবান পাহাড়ের চোড়ের বসতে। আর অর্ধশিক্ষিত ও দরিদ্ররা? তাঁর দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে হন আরো দরিদ্রতর, আরো ক্ষান, আরো বিপুল; হুক ভারবাহী পশু, গত হোন হয় আরো করুণ, বোবা, মৃত মাছের চোখের মত; ভেজা ভেজা কেঁচুরগত চোখের মধ্যে জীবনের কিস্তি সম্পদ আর ধ্বনিত হতে চার না। জনপেতে কসে কালো আকাশের দিকে দৃষ্টি বাড়িয়ে তাদের শূহুয়ায় নীরব অক্ষয়।

এখানে যোজনা কার্যক্রম, বা উন্নয়ন প্রচেষ্টা, বা শিল্পায়োগের জন্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ কঠোরো গড়ে তোলার বিরুদ্ধে কোন-রূপ সোচ্চার মতবা করা হচ্ছে না। শূহু এইটুকু সত্য। উল্লেখ্যচিত হচ্ছে যে বর্তমান ব্যবসার এই বাহ্যিক শিল্পায়োগ, কিস্তিবিদ্যালয়, কারিগরী সংস্থা, মানববহনের উন্নতি এবং সক্ষম উন্নয়ন-প্রচেষ্টাটির যেভাবে উপযোগ ও ব্যবহার চলে আসছে তাতে দেশের জনগণের সুবৃহৎ অংশ, দরিদ্র মানবেরা, (যাদের অর্থ ম'থাত এই সকল গড়ে তোলা হয়) তারা পড়ে থাকছে সেই প্রগাঢ় ভিত্তিরেই, বৈশরীতো ম'থিমের স'বিধাতোলাইরাই কলক'রমই সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। দেশের অশিক্ষিতের অংশ কখন ক্রমপ্রদারমাণ কমতা, সুবিধা ও কলক'রমের মনে মনে তখন সমাজের সিত-তালটাই প্রক্ষিপ্ত হচ্ছে গভীরতর হতশার বত্রে।

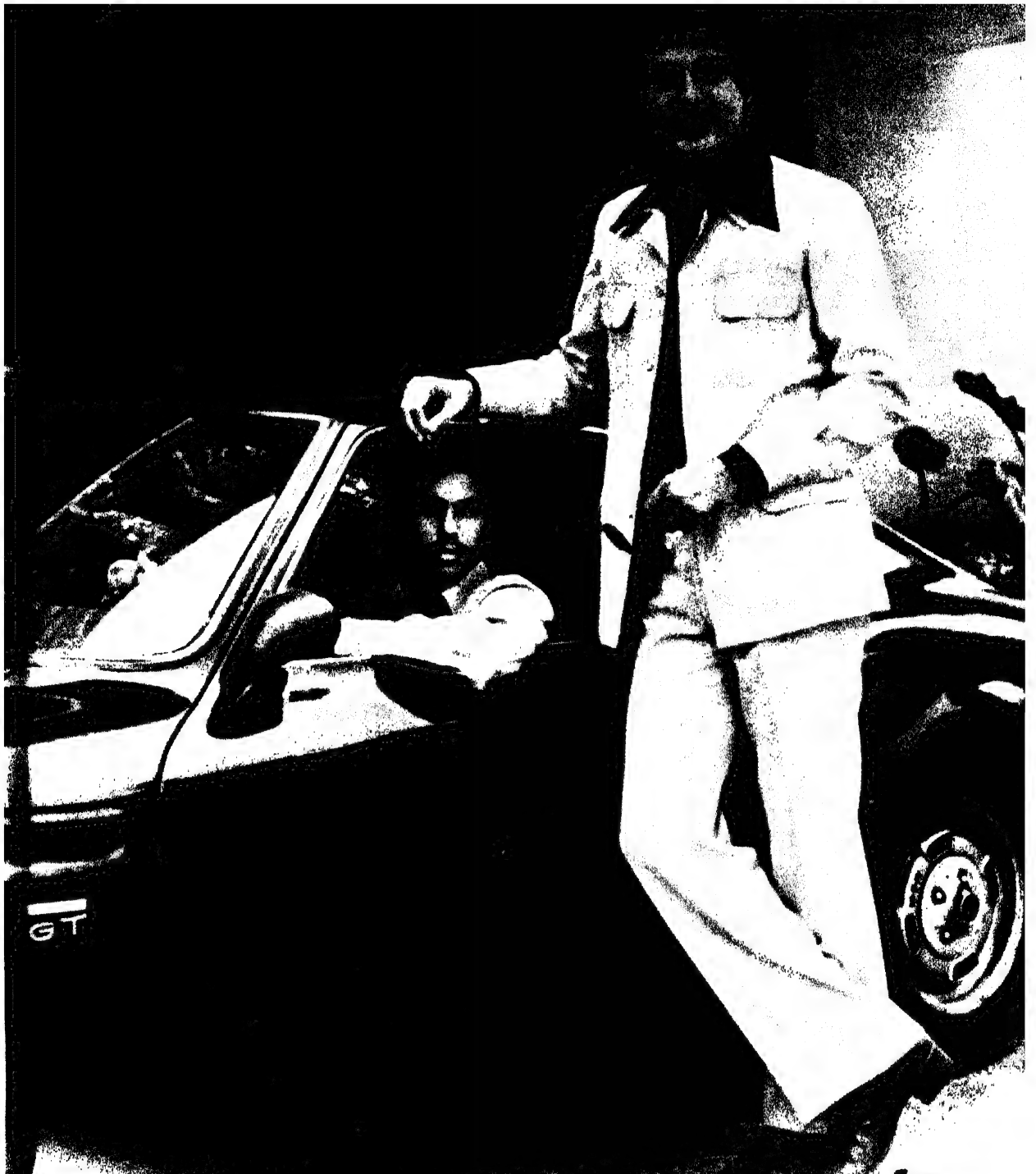
এই ত্রিমক পরিণতির সামান্য করেকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া থাক।

জলসেচের জন্য বৃহৎ বৃহৎ বহুমাত্রী প্রকল্প ও বিশাল বিশাল বাঁধ গড়ে তোলারক সুকুমি বলতে হবে। কিন্তু তরুত প্রণামত কারা লাভবান হচ্ছে। সেটাই বিচার। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে ১৯৭২-৭০ সালের এক অর্থনৈতিক সমীক্ষার দেখা গেছে যে জাভা-নাঙ্গাল প্রকল্পের সেকুল উপভোগ করত পারছে বিশেষত বড় ভূমধ্যকারী ও বড় কৃষকরা, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষীরা শূহুই অসহায় চোখে তাদের ক্ষেতের পাশ দ্বারে করে যাওয়া বিপুল জলরাশিক নিগমসে দেখছে। সেচ জলকর দেবার সামান্য অর্থ-সমর্থনাদিকুও সেই ভরে। সেই জলসেচের উপযোগে এখন বড় চাষীরা সুপ্রচুর ফসল তুলছে লুসানে, বাজারে বাড়ছে লুসার দাম, আর সরকারের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে শুল্কের দাম বাড়ানোর, তখন জলসেচের অভাবে

MAPP-GR-81-127 BEN



ভারতে প্রথম স্টার্টিং  
গোয়ালিয়র বাতালো...



হাল-ফ্যাশনের চমকপ্রদ স্যুটিং  
তাই তো আতালো!

GWALIOR  
SUITING 

30



# সেই সময়

## সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৭৭ ॥

ইন্দিরামপুরের প্রাক্তন কুঠীবাড়ির পাশেই নির্মিত হয়েছে নতুন এক ইয়ারং। পুরোনো কুঠীবাড়ির ধ্বংসস্তূপে এখনো বিদ্যমান। প্রকৃতির যা নিয়ম, ধ্বংসস্তূপের ওপরেও আবার প্রাণের সান্নিধ্যের হর, সেখানে জন্মে গেছে অনেক গাছ-পালা।

সৌন্দর্য অঙ্গাঙ্গী নির্দেশ করে ভুলপাথর ফলো, এ ঘাথেন, এ ছিল আসল কুঠীবাড়ি, নীলকর সাহেবগো পুরনোরা এক রাইতে আসুন নাগ ইয়া দিছিল। বউ-ভাগবাল-মাইরা লটখা আমি সেই রাইতেই নিরাশ্রয়। তাক-খাওয়া ইন্দুরের মতন আমি প্রাণের ভরে সকলজিহ্বের লইয় পলাইছি।

নবীনকুমার সৌন্দর্য চেয়ে চাপ করে দাঁড়িয়ে হইলো।

ভুলপাথর পুরনোর ফলো, আপনি যেখানে খাড়া ইয়া আছে, ঠিক এখানেই একদিন আপনার মজা গল্পানারাম সিংহ অকস্মাৎ একদিন আইসে খাড়াইয়াছিলেন। মূখ ভরাতি দাঁড়-গোথের প্রশাল। আমি তেনারে চেনেবা কান্নে আমি ঠাওর ট-চলাম বুকি এ আর এক জাল প্রতুপপ্ত। পরে বরসুন্দর ডাক ইয়া কোঁর করাইতেই তেনার আসল চাপ বইয় হইল....

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, নীলকর সাহেবরা এখন প্রজন্মের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করে?

ভুলপাথর বললো, কহ, সব আপনার খইলা কহ। আগে মূখ-হাত খেল, ক্রিয়া করেন। পিচ-লেন কর যে আমার প্রাক্তনীর রাজার হাত নাটক করেন, যদি আজ্ঞা হয় তবে আইজ আমার ঘরেই আপনের আচারাদির ব্যবস্থা করি।

নবীলকে কবরা থেকে নেমে বেল ঘানিকটা হাতে আসতে হয় এই কুঠীবাড়িতে। ভুলপাথর লালিক বাস্কা করতে চেয়েছিল, কিন্তু নবীন-কুমার তাকে নিরস্ত করে পদক্ষেপে এসেছে। প্রাণের কোনো প্রজন্মই তাকে চেনে না। অনেক তার দীর্ঘত মনতক দিবাকরিতর দিকে বিশ্বাসভরা আসে চেয়ে থেকেছে। কিন্তু জমিদার তেবে সন্দেহ মনে কুণ্ডিতে পড়েছিল।

ভুলপাথর তাকে নিয়ে এলো মতন গবে। তার মধ্য একটি ককের শরের তালো খুলে ভুলপাথর ফলো, এই ঘাথেন, ববস্বর কোনো হুটি রাখি নাই। এ-ফরের খাট-আলমারি, ভেলেক বালিশ কিছানা সবই মতন। জমিদারবাড়ির কেউ যদি কোনোদিন আসেন সেই লইয়া সব ইয়া রাখি। কিন্তু গত নর ববস্বরের হুবা কেউ আসে নাই।

নবীনকুমার কিছটা বিস্তারিত হয়ে গেছে, ভুলপাথরের ইখর বঁকা শরের কথার সে ববস্বই উত্তর করে পাছে ন। এই বিষয়টি নিয়ে সে আসল তিনের কোনো চিন্তাট করেনি। বাসো ও উড়িকার বিশিষ্ট কতলে ভাবের জমিদারি আছে, সে এই কথাটি মনে জানে, সেই জমিদারি পরিচালনা বিষয়ে তান কোনো জ্ঞান নেই। প্রায় কৈশোর বরস থেকেই সে নিজস্ব নানান পরিকল্পনার মত থেকেছে। আলমি প্রয়োজন হলো সে তলর করেই খাড়াইত। এন্টেটর তহবিল থেকে সে চাহিদ মতন পর্বীর অর্থ না পেলে এক একবার বিক্রয় করবে কলকাতার এক একটি সম্পত্তি। বিবর-ভবাকির জব গল্পানোরপের ওপরে। অবশ্য একা গল্পানার মণই বা কতদিকে সামলাতে পাবে। কিন্তু সে কথা নবীনকুমার এতদিন ভাবেনি।

নতুন ভূজ অবিলম্বে ককটি ঝড়-পৌছ করে দেবার পর নবীনকুমার সে-কক্ষ প্রবেশ করলো। সেটি আরওনে লেল বড় আসবাবগুলি রুচিসমত, কোনো জমিদারের সুমারক ব্যবসারের অনুশ্রম নয়। গ্রীষ্মে টানা পাথর ব্যবস্থা আছে। পালক রক্তাও রয়েছে একটি আর একটা। ভুলপাথরের অনুরোধে নবীনকুমার সেটিতে বসলো।

ভুলপাথর ভূমিতে আসন ঘটান কবে আবার সেটি বিদ্যুপ ও কৌতুক মিশ্রিত সুরে বললো, আমি আপনাদের জমিদারি রাস কইরা লইছি কটে, কিন্তু আমারা একেবারে নিমকহারাজ কইতে পারবেন না। তাইলে আর জমিদারের লইয়া এমন বর সামাইয়া রাখি কান? এই করে কিন্তু আইজ পর্যন্ত কেউ শোয় নাই। আপনার কোষ্ঠপ্রভা বন্দ গল্পানাব্যব সিংহে কল্যে অস্তত একবার আসবেন এমন আশা কইরাছিলাম। তিনি আইলে নিজেও খুব বৃশী হইতেন। ট্রিনি প্রজাগো পক্ষ লইয়া নীলকর সাহেবগো বিবরুখ অবর লড়াই দিছিলেন, এবর আইলে তিনি স্বয়ং সেট লড়াইয়ের ফলাফল মনটিকে লাগতে পারতেন।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে। কলকাতা?

এবে মাকগ্রেগার সাহেবের নাম শোনলে বাহে-গরতে একঘাটে জল খাটতো, এমনকি আমাগো বাকের মইকও গড়গড়াইতো, সেই মাকগ্রেগার সাহেব অস্বস্ততা করছে। ডিন্ট্রি ম্যাকিনস্ট্রেটের লেডার সাথে তর যেন কী সব চাইছিল। বাউক সে কথা। সে কেউ পাইতে তার পাপের লাগিত। তারপর একদিন নীলকুঠীতেও আগুন লাগে। সাহেবরা সব পিঠাঠান দিছে, এহনে আর নীলকুঠী নাই। আমাগো কুঠী বরা পুড়াইয়া দিছিল, তারা নিজেরাও নিস্তার পর নাই। এখন আর এই এলাকার জমিতে নীলচাষ হয় না অবার সোনার ধান ফলে।

—সেই আমিও বৃশী হলাম যে আমার দাখা যে করণের জন্য প্রাণের বুকি নিরেছিলেন, তা সার্থক হয়েছে।

—কিন্তু তিনিও লহরে শিরা অইনাগো মতন কল জমিদার হইলেন। অর গ্রামে আইলেন না।

—আমার দাখা অনেক রকম কাজ নিয়ে লস্ক। না আসতে পরা তব পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কলকাতা থেকে আমাদের এন্টেটর আব কোনো কেউ কখনো আসেনি কলতে চান? জ হতেই পারে না।

—আইছে, আইছে। গোড়ার গোড়ার প্রভাক কহরেই একবার দুইবার অমলা-গোমস্তারা আইছে। আমি তাগো হ'কাইরা দিছি। এ দিবাকরই তো

কেন এদিকে আইলে ভূর দাখা কাটাইরা দিম।

—আমাদের প্রতিনিথকে কেন আপনি হ'কিয়ে দিচ্ছেন, তা জহতে পারি কি?

—নিস্তার জানতে পারেন? দিছি আমার বৃশী। শোনে, শোনে, অমন উজ্জ্বল হন কান। পলট কমা শোনার কতাল আপনাতো নাই। তাই মখা কহর হইরা যায়। শোনে, আমি বাই হই শিরাল, তাইলে অ পনগো এ অমলা-গোমস্তারা হইলো, কুমার, অর্থাৎ আপনারা বরস কন কুমার। পরের যবে পোশুরি করতে গ্যালেও আমারা তব খাটেতে হয়। আর অরা আইলো লুটের বখরা চাষ। অগের হাতে আমি টকা দিম, কান। জমিদার আইলেও না হয় দিয়া বড়াইয়া দিতাম, অগো হাতে টকা দিল সে টকা আপনগো এন্টেটর তবিলে কমা পড়বে কইতে চান? খেদনোনি না। অস্তত তিন ভাগের দুই ভাগ অরা নিজেরা হজম করবে। তাই আমি ঠিক করলাম অগো দিম, কান, পরাপুরি আমি নিজেই বই। আমারও পরিপাক শক্তি কম নয়। দিখা হজম হইরা যায়।

—অর্থাৎ যে-কোনো কোঁপলে জমিদারকে ঠকানোই আপনার মূল উদ্দেশ্য।

—তাইলে ছোটবাঁহ, এই কথার স্কয়ার দান তো। নীলকরের অ্যাচারে আমি বখন বউ-খাওয়া, মাইরা লইয়া নিরস্তর হইছিলাম, তখন জমিদার আমারা দেখাছিলেন? জমিদার একরও কি চিন্তা করছিলেন যে আমি কোথার থাকু কী বাহ? আমি মরলো না বচলাম, হার কেউ খেঁজ নিহ? এই যে কী সান্নাতিয়ক আকাইল গাল, শোনের প্রভাকটি করে করে হাফার তখন প্রজাগো একটুও কি লাইখা করছে জমিদার? সে সব বাই না করে, তবও আমি জমিদারের গোমস্তা আইলেই তার পা খোঁচেরে কল দিয়া খাতির করম আর তার হাত টকার খাল তুলিয়া দিম?

—অনা সব জমিদাররা মহলে নিরমিত আসে বলতে চান?

—যারা আসে না, তাগো জমিদারি আইজ না হউক কাইল লাটে ওঠবে। আপনার শিতালাহ নিরমিত অ সতেন, আপনার পিতাভ্রুও বৈকেন আসছেন বেশ করকবার। তারপর আপনার মোস্ত-প্রাভারে পাঠ ইতেন। তাইরপর যেই আসা বন্দ হইল, আপনগো জমিদারির লগাও কল-লুকনা নদীর মতন হইল। আর বেশী দিন নাই—

—আমরা বাই এ জমিদারির অংশ খিঁচ করে দিতে চাই?

—তা পারবেন। কিন্তু দিম পাইবেন না? এই কৈপরা জমিদারি কেনবে কেডা?

—আপনিই কোঁপরা করে রেকচেন, বোকা বাহে।

—বোকা অত সজ্ঞ না, ছোটবাঁহ। আগে গেরমের অবস্থা ভালো কইরা নিজের চইকে লারখন, তারপর বোকেলেন।

—জমিদারির অবস্থা যে খোঁপ হরে বাহে, সে কতা আপনি আমাদের চিঠি লিকেত জান ননি কো।

—আমার বিপদের সময় অস্তত সাতখান পর পাঠাইছিলাম আপনগো কহে, একখানেরও কোনো জবাব পাই নাই। মানলাম, অ পনের কৈষ্ঠপ্রভা তখন মেল খাটেত আইলেন কিন্তু আপনও তখন নিভান্ত অকোষ লালকটি তো না, আপনার কুড়ি-একুইশ কলর বরস, কিন্তু অ পনে তখন একটুও নম্র দ্যান নাই। আপনে তখন মহাভারত রচনার মতন মনত কহে বাস্ত আইলেন। আপনে নমইক শক্তি আমি প্রাক্তন না হইলে আপনার পর হাত দিয়া প্রণাম করতাম। কিন্তু আপনে জমিদার হিসাবে অপদার। আপনে বিধবা কিবহের জন্য লক্ষ টকা কর করছেন লুইছি, কিন্তু আপনে আমার গ্রাম-গলার অনাহারী মানুসগো জইনো এক মট্রা অজও কান নাই।

—আমি বিধবা কিবা প্রচলনের জন্য অর্থ



## একক সাহিত্য

ড. ক্ষেত্র গুপ্ত

বহুমুখতার উপন্যাস শিল্পীতি

বাংলা সাহিত্যে কর্মের  
আলোচনার প্রথম বই। ২৫.০০

নাট্যকার মধুসূদন ২০.০০

মধুসূদনের নাটকগুলির দীর্ঘ ও  
তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা।

ড. অরুণ কুমার সিকদার

রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য

এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাট্যের রূপান্তরের  
বিচিত্র কাহিনী এবং তার  
নিপুণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ১২.৫০

ড. সুধীর করণ

লোকায়ত রবীন্দ্রনাথ ১১.০০

লোকজীবন ভিত্তিক রবীন্দ্রসাহিত্যের  
মনোভ আলোচনা।

## কিশোর সাহিত্য

ওজ দেশের যাদুকর ৮.০০

—লিম্যান ফ্রাঙ্ক বম

(অনুবাদক—জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী)

হেট্টি-টোটি ৬.৫০

—আলেকসান্দার বেলিয়ায়েভ

(অনুবাদক—ননী ভৌমিক)

হাসির মজার ভূতের গল্প

—ফ্রান্সোয়াস ৬.০০

(রূপান্তর—জ্যোৎস্না গুপ্ত)

সাতসমুদ্রে সিদ্ধবাদ ৫.০০

—(আরব্য রজনী থেকে)

(রূপান্তর—পূষণ গুপ্ত)

বেনহর ও ৬.৫০

লান্ট ডেজ অফ পম্পিয়াই

(একত্রে) (রূপান্তর—কুমারেশ ঘোষ)

পিনোসিয়ো ৬.৫০

—কারলো কলমোদি

(অনুবাদক—জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী)

বিচিত্র রূপকথা ৬.০০

—অসকার ওয়াইল্ড

(অনুবাদক—শৈলজাণন্য মিত্র)

প্রান্তিলয় ২০/১৫

পটুয়াটোলা (লেব. কলিকাতা-২)

আমাদের কার্য করছেন। কিন্তু এখানে সে আপনাদের  
অধিবেশনের ফলে ধীরে ধীরে কত গেরস্ত বাড়ির বড়  
অকালে বিধবা হইল, সে খবর রাখেন নাই।



নবীনকুমারকে নিরন্তর অবশ্যই গুন হয়ে  
যেতে দেখে ভুলপাথর উঠে দাঁড়িয়ে কণ্ঠস্বর বললে  
বললো, আরে বাবু রাহু! আরি শব্দে এককই করতে  
আহি আপনাদের খাওন-বাড়নের কোনো বকল্য হইল  
না এখনও... আপনাদের বিদ্রোহ করেন, ছোটখাট, আমি  
একটু ভিতরের বাই—।

তিনি চিন্তিত ভুলপাথরের কৃতীবাড়িতে কাটিয়ে  
ছিল নবীনকুমার। লোকটির সঙ্গে দু'বেলাই তার  
কথা কাটাকাটি হয়। ভুলপাথর ইয়েজিতে নিরন্তর  
হলেও বাংলা ও সংস্কৃতে যেকোনো পড়াশুনো করেছে,  
এই পরগনার বাইরের জন্য সম্পর্কেও খবরাখবর  
রাখে। সত্যিকার বা খোঁসারদের বললে সম্পর্কবাদের  
সে বর বরই পাল্প করে। কিন্তু এই লোকটির কথা-  
বাতী সে পরোয়াশের সহ্যও করতে পারছে না, আবার  
অগ্রাহ্য করতেও পারছে না।

একদিন প্রত্যেককালে নবীনকুমারের সিন্ধা জন্ম  
হলো একটি গান শুনতে। অতি সুস্বাদু সুর, গানের  
কথামূল্যও সুমধুর। নবীনকুমার ঘুম-জাগৃত চক্রে  
উঠে এসে দেখলো বাইরের প্রশাশে দাঁড়িয়ে একজন  
বৈষ্ণব গায়ক পূর্ণাঙ্গীত বাজিয়ে গান গাইছে, আর  
সাধনে একটি জলচৌকিতে বসে মৃদুভাবে শুনছে  
ভুলপাথর।

নবীনকুমারকে দেখে ভুলপাথর লম্বাশ্বতে উঠে  
এসে জিজ্ঞেস করলো, আপনার নিয়মি ব্যাখ্যাত হইল  
নাকি ছোটখাট?

নবীনকুমার বললো, না। জটিলতরপাই, এ  
গরকটিতে এদিক ভাবুন তো, গানটি ভালো করে  
শুন।

গরকটি নবীনকুমারের পরিচর আসে খেঁচেই  
শুনতে থাকে নিশ্চয়। করে এসে সে ভূমিতে মস্তক  
ঠেকিয়ে প্রণাম জানিয়ে বললো, দজব, হজব।  
আপনার পিতার নাম গান শুনইনি? তিনি গান  
বড় ভালো বাসতেন।

নবীনকুমার বললো, এ গানটি আর একবার  
গান তো। কতগুলো সব বসন্তে পারিনি।

গরকটি আমার শব্দে করলো:  
হৃদয়স্থানে বাস, হৃদয় কর কলহাপাতি।  
ওহে ভক্তগণ! আমার ভক্তি হবে রাধা সতী।।  
হৃদয়-কামনা আমারি, হবে কলমে গোপনারী,  
নেহ হবে নন্দেরশূরী, নন্দে হবে মাঃ মনোমতী।।  
আমার ধর ধর জনার্মন। পাপ-জর পেবধন  
কাম্যি হয় কঃসরে ধুলে কর সম্প্রতি।।  
বাজারে কুশা-বন্দী, জন-বন্দকে বশ করি,  
তিষ্ঠ হৃদয়গোষ্ঠে, পরাও ইষ্ট, এই দিনতি...  
নবীনকুমার বহুবারে তারিক করে বললো, বাঃ,  
বাঃ! বড় বাংলা বাঁসলী! এমন সুন্দর রূপক-গান  
কখনো শুনিনি। এ গান কে রচতে? এতো  
রামপ্রসাদেরও নয়, তিনি কলীভক্ত, আর এ গান  
কৈশবের।

গরকটি বললো, আরে, এ গান-বাস, রায়  
মশাইয়ের।

নবীনকুমার সন্নিহিত বললো, বাস, রায়?  
ভুলপাথর বললো, সে কি ছোটখাট, আপনি  
বাস, রায়ের নাম শোনেন নাই? বর্ধমান-কটেয়ার  
বাস, রায়ের গান বাংলায় কে না শোনছে? আমারা  
এই দিকে অশ্রমবাসের গাওনা করতে আইসাই তো  
তিনি দেহরক্ষ্য করছেন। সে বোধকরি সেই  
সেপাই ধুঁকেব বসবে।

নবীনকুমার বললো, বাস, রায়ের নাম কেন

ইতরামতে ভরা। ভাব হৃদয় দিক্ত এমন গান  
বেইয়েতে, বিশ্বাস হয় না।

ভুলপাথর বললো, এ ভেদে কল্য, পক্ষই পল  
সেটে। ভাকইত রাকইত আল্পীক হয়। এ গান  
বাস, রায়ের। একটি কল্যাপির পণ্ডিত্যও পল  
রাকইত সম্মান দিছে পল্য পল্যইত। আইসাই  
এইজা শুনই; কল্য ভেদ, কল্য? সেতাই, সেইজা গান  
তো, বোব কারো করলো, না—।

নিজাই আবার বলল:  
বোব কারো করলো, বা  
আমি লম্বাশ্বত বলিলে ভুলে বারি প্যাম।  
কল্যাপি হলো কোন্সত মল্যপ  
পল্যকর মাক কাটিলাই পল  
সে কল্য পল্যপল, কল্যপল কল  
কলমসোরাম

আমার কী হবে ভাবিনি  
নিশ্চয় ভাবিনি  
বিদ্যপ করাই লম্বাশ্বত...

নিজাইয়ের গান মস্তকবে ধারিয়ে দিয়ে  
ভুলপাথর জিজ্ঞেস করলো, এ গান অলগ শুনছেন  
কল্যো ছোটখাট? কল্য তো, কল্য?

নবীনকুমার বললো, এটি শ্যামালপণ্ডিত, অতি  
উচ্চস্পন্দ। এ গান নিশ্চয়ই রামপ্রসাদ কিংবা  
কল্যাপির।

ভুলপাথর বললো, হইল না। এই গানও এ  
গান, রায়েরই। একই রানব এই শ্যামালপণ্ডিত আর  
আগের বৈষ্ণব গান ল্যখছে।

—আমরা ডাকে অলপী পণ্ডিত্যকার হিসেবেই  
জানি। এই দুটি গানে তো একটাও নোরা কত  
নেই।

—জহলেই বোঝেন আপনাদের কত কিছু, ভুল  
জানেন গুরে বইস। শোনেন তত একটা গলপ কথা  
এই গানে ঐ যে একখান কথা আছে না, কল্যাপি  
হল কোন্সত মল্যপ—এ কোন্সত লম্বাশ্বত তিক অল  
বাস, রায় মশার জানতেন না। তিনি ভাবছিলেন  
কোন্সত মানে কোদাল, তাই ত্রে কোন্সত দিরা কল্য  
খড়াইছেন। কিন্তু আপনাদের সন্দেহ অতি উচ্চ  
জানেন, আপনাদের জানা অছে নিশ্চয়ই যে কোন্সত  
মানে হইল ধনুক। শব্দে ধনুক, তীরও না, সুতরা  
কোন্সত দিরা কল্য কাটা বর না, বাস, রায় কল্য  
ভুলই করছেন। এই রইনা এক টোলের পণ্ডিত  
জাতররা বাস, রায় মশাইয়ের উপহাস করছিল  
ল্যখাপণ্ডা তেমন শেখেন নাই বস, রায়, একা  
মাক্টা কথার ভুল হইতে পারেই, কিন্তু এমন গ  
বাস্তবতে পারে করজন? টোলের ছয়গের টে  
মল্যকার কথা শুনিনা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায়  
রাম শিরোমণি হাজগলরে বইক্য কইছিলেন, দা  
বায় বখন ল্যখছেন, তখন ওতা হইলো; আর  
প্রয়োগ। আর খিক কোন্সতের অর্থ ধনুকও হ  
কোদালও হবে।

নবীনকুমার বললো, আঃ বেড়ে গলপটি যে  
দল, রায়ের যে এসব দিকে এত লক্ষ্যন হরোছিল,  
আমি জানতুম না। তবে ঐ গলপ শোনার চেষ্টা  
শোনা ভালো। আরও গান গাইতে বলুন ওকে।

আরও তিন চরখান গান শুনতে উত্তরে  
মৃদু ভয়ে নবীনকুমার এক সময় বললো, একে অ  
কল্যাপির নিয়ে বাবো। এমন চমককার এর সুরে  
কণ্ঠস্বর, শহরে গেলে এর কোল্য সম্মান হবে।  
গান শুনতে বাস, রায় সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তি  
ভুল ভুলবে।

ভুলপাথর বললো, ওকে আপনি কল্য  
নিরা থাকেন?

—হ্যাঁ। আমি কখন কল্যবো, ও আমার সুর  
বাবে।

—বাস! অতি উচ্চ প্রস্তাব। নিজাই  
কল্যাপি খুঁজিয়া গেল। কী রে, নেতাই, ছোট  
সময় কল্যাপির ব্যক্তি?

নিজাইচ'ন গান ব্যক্তির হাত কোন্স

বাঁড়ির আছে। লোকটির বরন অস্তত যাঁট হবে।  
কেন্দ্রিয়ল জন্তক, মন্থখানি শুব লর। তার  
জাতিজতে কেনন কেন একটা শালিক পাখির ডান  
আছে। গারে একটি নামাকলী।  
ভুলপথের প্রদন শুনেন সলো সলো সে  
সম্ভাতিস, তক যাঁট নাড়লো। তারপর বললো, তেমন  
নিতাইচ কি আমার হবে?

ভুলপথের বললো, তুই হে টবাবর নেকনজরে  
পট্টা মেহন, তোর আর চিন্তা কি? আইজ বাইতে  
কইলে আইজই বাবি?  
নিতাইচ বললো, নিশ্চয়। আমার তো  
পিছতল নাই। কোনো দিন র্যালগাড়িতে উঠি নাই,  
কু শব একবার র্যালগাড়িতে বাই। আর কইলকাতার  
গিরা একদিন বরক বাম। বরকর কথা অনেক  
দুনি, কেসোকলে চইকে বোঁখ নাই, জীবনে যদি  
এই সাধটা মেটে।

ভুলপথের হালতে হালতে বললো, দাখলেন,  
হাখলেন হোটেলদা। ও এক কথার রাছি। একেবারে  
এক পারে বজা। এই নেতাই বোল্টমরে আমি  
হজকাল ইশক বেখতে আছি, কেনোকলে এই দুই  
জনখান পেরামের হারবার বার নাই। আর আইজ  
র পনার কথা দুইন্যা অমদেই কইলকাতার বাইতে  
ঠার।

নবীনকুমার বললো, আমি কলকাতার নিরে  
গিরে ওর গান সবাইকে শোনানো। এমন সুকন্ঠের  
কাঁকারী হয়ে শব্দ শুন, গিরে পড়ে থাকবে কেন?  
ভুলপথের এবার বিচিত্র হাখখাল করে সললো,  
সরাম থিকা সব ভালো ভালো জিনিস যদি আপনেকা  
ব্বরে লইয়া বান তাইলে আমরা কী লইয়া  
লুম? শহর থিকা কিছু ভালো জিনিস ছিটে-  
কটা গ্রামে পাঠাইতে পারেন না?

নবীনকুমার বললো, এটাই এ বঙ্গের রীতি।  
দুটচাখলশাই, সুযোগ পেলে সব গুণী জামীরা  
হলে বাবেই। কারণ শহরে টাকা আছে। টাকাই  
তা বহ।

হ। টাকা যে কতকড় বহ, তা আমি জানি।  
কিন্তু হোটেলদা, শহরের সেই টাকার খোলাস দেব  
কে? এইসব পেরামের টকাই শহরে বার না?  
গ্রাহই হইল গিরা দেখ, এই দেখ সব রক্ত বার শহর  
নহের হসিঙ্গক। কি, তুল কইতাই? তবে,  
আপনেকাও এই কথাটা ভোলবেন না যে হানুখের  
জ্বালপট্টা বকে দেখেই মইবোই, হসিঙ্গক না। গ্রাহই  
হাখলেন প্রাণ।

নবীনকুমার নিজে গায় থেকে শালটি খুলে  
নিতাইচকে শিরোপা দিল। তারপর তার পুপী-  
বহটি নিরে পরীক্ষা করতে লাগলো মনোযোগ  
দিয়ে।



সেইদিন থেকেই নবীনকুমার নিতাইচাদের কাছ  
থেকে সপাতি শিক্ষা নিতে শুরু করলো। তার  
নিজের কন্ঠও বেশ শুর আছে, গান তুলতে পারে  
সহজে। এই শিক্ষকলটি সম্পর্কে তার মনের মধ্যে  
একটা ভুল রয়ে গেছে অনেক দিন থেকেই। হাখি  
হুখজোর সলো সে হালুকচদের আখড়ার বেত  
প্রধানত নৃত্য-গীতের আকর্ষণেই। মনে মনে সে  
সম্ভবশ্য নিরে ফেললো, এবার কিরে গিরে সে  
কাঁড়িতে নিরামিত গান বাজনার আলস বলাবে।  
গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে আরও ভালো ভালো গায়কের  
সন্ধান পেলে সে তাদেরও নিরে ববে শহরে।

দিন দুয়েক পরে সে ভুলপথেরের পেড়া-  
পিড়িতে একপ্রকার বাখা হরেই গ্রাম পরিদর্শনে  
বেরলো। এবার অবশ্য পদব্রজে নর, পালাকিতে।  
সলো দুলালচন্দর এবং অন্য কয়েকজন সহচরও  
রইলো। ঘোরা হলো প্রায় চার-পাঁচটি গ্রাম। হাখো

হাখো পালকি নাখির নবীনকুমারকে কিল্লা দেওয়া  
হর, সেই আলসের প্রামের কিছু মানবজনের সলোও  
বোখা হর। অধিকাংশই রুপ, শীর্ণ চেহারা। নবীন-  
কুমার কিল্লর বোখ করে। এমন নীচকর সাহেবদের  
অভ্যচার আর সেই, তব, গ্রামের মনুষ্যদের এ দশা  
কেন?

এক স্থানে সম্ভবত আগে থেকেই কোনো  
বাখলো করা ছিল। নবীনকুমার একটি বড় আয়-  
চালসমেত কাছারি বাড়িতে এসে পেঠিহালো  
হাখলো।

ভুলপথের জানলো যে এখানেই নবীনকুমার  
আহার সেরে কয়েক ঘণ্টা জিররে দেখে। তবে তার  
আগে স্থানীর প্রজাদের একবার সন্ধ্যা দিলে ভালো  
হর।

নবীনকুমার কাছারি থেকে আটচালার প্রান্তে  
এসে কাঁড়িতেই দেখতে পেল, সেখানে জমায়েত হয়েছ  
প্রায় হাজার খালক মানব। ভুলপথের তাদের উদ্দেশ্য  
সবু বালোর বললো, শুন, প্রজামগ। জাহরদের  
পরব শব্দ জমিবার শ্রীল হর নবীনকুমার সিংহ  
হাখলর তোমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত। কথাসিঁতরে  
কাপতে থাকার তিনি এতদিন আমাদিগের এ  
অঞ্চলে আসিতে পারেন নাই। তোমরা ইহার অরুজ  
সাবু গলানায়াল নিহ মহালয়ের পরিচর এককলে  
জানিরাছ। তিনি তোমাদের মঙ্গলের জন্য নিজের  
রক্তপাত পর্যন্ত করিয়াছিলেন, কল্যায়নের অশকারে  
দুঃসহ ক্রেশের সহিত দিন কাটাইয়াছেন। ইনি  
তাহারই সুখোদা প্রাত্য, আমাদের পূজনীয়,  
মহানুভব ইন্ডর রামকমল সিংহের পুত্র। এতকাল  
পরে তিনি এতমতলে আসিয়া, তোমাদের অবস্থা  
স্বাক্ষে দেখিয়া এবং পর পর দুই বৎসরের আকালের  
কথা নিবেচনা করিয়া, তিনি দয়াপূর্বক তোমাদের  
এই দুই বৎসরের খরচনা মকুব করিয়া দিলেন।

প্রজারা প্রথমে একবারে নীরব থেকে হুল

বোম্বাইয়ের সেন্টার হোটেলের 'শিরণ' বিউটি পার্শার-এর  
নামকরা চেয়ার ডিজাইনার মিসা ডি সুজা বলেন :

“নানান রকমারি চুলের যত্ন নিতে  
কি শ্যাম্পু লাগাবো তা’ আমায় আর চিন্তা  
করতেই হয় না। প্রত্যেক গ্রাহীকার  
বিভিন্ন ধরনের চুলের সঠিক যত্ন নিতে  
গ্রীম-এর নানান রকমারি শ্যাম্পু তৈরী।”



গ্রীম-এর সব শ্যাম্পুই তার বিশেষ উপাদানগুলি আর ভরপুর  
ফেনার ভোরে চুলকে পুরোপুরি বাগে আনে। আপনার  
চুল পরিষ্কার করে গ্রীম তাকে অনেকরূপ মিষ্টি ফরাসী  
সুগন্ধে ভরিয়ে রাখে। আর—বরচও কম।

গ্রীম	গ্রীম	গ্রীম
রেগুলার	এগ	টনিক
সব রকমের	কমডোরি চুলে	মাথার ঘুস্কি
চুল-কে পরিষ্কার	প্রোটিন হুগিরে	চুলকানি দূর
করে। পরিপুষ্ট	তাকে পরিপুষ্ট,	ক'রে চুলের
করে। বাগে	বাছো উজ্জল	সব সমস্যাও
এনে রেশমের	আর ঘন ক'রে	দূর করে।
মতো নরম	ভোলে।	
করে তোলে।		



এখন  
সুবিধাজনক  
৩০ মি.মি. মিশিতেও  
পাওয়া যাবে

**গ্রীম**  
শ্যাম্পু  
মিষ্টি ফেনার ভ্রাসররা  
সুসারিষ করন

Gaiffey Manners & Co. Ltd.

G 51A

সত্যটি স্থানগত করে চিৎকার-চীৎকারে চিত্তকে একেবারে কেটে পড়লো।

ভুলপাথর নবীনকুমারের দিকে চেয়ে বললো, হুজুর, এখন আপনি ঘোষণাটি একবার নিজের মূখে উচ্চারণ করুন।

নবীনকুমারের কাছে ঘোষণাটি যেমনই অপ্রত্যাশিত, তেমনই অদ্ভুত। সে কড়া গলার বললো, এই প্রহসনের মনে কী? এখনকার আদার-তাহসিল আপনি করেন, আমি নামেই শুধু জমিদার। আপনি নিজের মূখে স্বীকার করতেন যে এখন থেকে একটা আদলাও আমরা পাই না। তবে আর আমরা এ খিনা মকুব করা না-করার কী আসে যায়?

ভুলপাথর বললো, ছোটবাবু, আমি আপনাকে টাকা কড়ি দেই বা না সেই সেটা ভেবে কথা। সেটা আমার-আপনাকেই স্বাধীন। আমি জানি এই লোকালয়ের এখন খাজনা দেওয়ার কামত নেই। আমি হুজুরে খাজনার কইন্দে অঙ্গা উপর চাপ দিলাম না, কিন্তু খাজনা না দিরা জমিদারকে ঠেকাইলে অঙ্গা মনের মতো একটা পানের জাহ হক। অঙ্গা ভাবে, খাজনা না দিলে জমি পরম্পর হার না। সুতরাং, আপনাকে জমিদার হইরা যদি নিজের মূখে খাজনা মকুব করিরা দানি অঙ্গা স্বান্তি পায়।

দু' হাত তুলে প্রজন্মের উপেক্ষা করে ভুলপাথর আবার বললো, এই চুপ! চুপ! ছোটবাবু, কথা কখনে তোরা মন দিরা শোন।

সকল খেমে যেতে নবীনকুমার বললো তোমাদের খাজনা মকুব।

ভুলপাথর বললো, দুই বৎসরের জন্য।

নবীনকুমার বললো, না। চিরকালের জন্য। আজ থেকে আমার এলাকার সব জমি নিষ্পত্ত হতে গেল।

নবীনকুমার এইটুকু বলে খেমে যেতেই এমন কোলাহল শব্দ হতে গেল যে কান পূজা দুশ্চর। কানুর কোনো কথা বোঝা যায় না। পজারা অনেক আশ্চর্য লাগে গেছে। জমিদার আছে, অথচ জমির খাজনা লাগবে না, এ অবার কেমন কথা! করকজন লোক অতশত না বুকেও ছুটে এলো নবীনকুমারের পায়ের পড়ে প্রশংসা জানাবার জন্য। অবশ্য এমন দাঁড়ালো যে নিরাপত্তার জন্য নবীনকুমারের পক্ষে আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। ভুলপাথর নবীন-কুমারকে টেনে নিয়ে এলো কাছাকাছির মধ্যে।

এবার নবীনকুমারের মূখে শব্দ, হাসার রেখা। ভুলপাথরকে চোখে স্থির দৃষ্টি রেখে সে কৌতুকরূপে সুরে বললো কেমন জন্ম করলুম আপনাকে?

ভুলপাথর বিমূঢ় ভাবে বললো, এ আপনাকে কী কটিলেন ছোটবাবু? চিরকালের জন্য খাজনা মকুব? তাও কখনো হয় না কি? এ তো পোলোপানগো মতন কথা।

নবীনকুমার বললো, আপনি জেবেচিলেন, আপনি নিয়ে চিরকাল আমাদের জমিদারির দোজগার হজম করবেন! সে পথ মেরে দিলাম কি না?

ভুলপাথর বললো কিন্তু সরকারের ফর তো আপনাকে বৎসর বৎসর টাকাসে জমা দিতে হইবে ঠিকই—যদি কেবো আর না থাকে, তাইলে...

—সে দেখা যাবেখন।

নবীনকুমারের ঘোষণার বিরাট এক বিস্ফোত ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো। ইব্রাহিমপুরে পরগনার অনেকগুলি গ্রাম, সেইসব গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে আর কার খাজনা মকুব হলো, কার হলো না তা বে খাই গেল না। যে-সব প্রজা সেদিন উপস্থিত ছিল জমিদারের সামনে, শব্দে তারাই কি এই সুখের খেল? এর মধ্যে আবার কিছু এলাকা ছিল নীলকরের কাছে ইজারা দেওয়া, সহরেরা চলে হাবার পর চাষারিা আপনমনে চাষ করে চলেছে বটে কিন্তু জমি ইজারা মত হচ্ছে কি না তাই বা কে জানে!

নবীনকুমারের পক্ষে আর ইব্রাহিমপুরের কুঠী-খাড়িতে টেকাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। দলে দলে লোক মেরে অসছে। তারা প্রত্যেকে নিজের জমির খাজনা বিষয়ে জমিদারের মূখ থেকে আশ্বাসবাণী

শুনতে চায়। সে এক অসম্ভব হাঁপার, নবীনকুমারের সন্মানহার করারও সময় নেই, কারণ এই সব অবাধে মান-হুগলি এক কথা বারবার বুকের খসলেও বোকে না। গ্রামে-গঞ্জে ঢাক পিড়ির জমিদারের বাতা জানাবার জন্য বোকে পাঠানো হলো। কুঠীখাড়ি ছেড়ে নবীনকুমার আশ্রয় নিল বরগার সেখানেও তার সঙ্গী রইলো ভুলপাথর।

বজরা ভেসে চললো কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য ছাড়াই দিনে মাত্র একবার কোনো জনাবিল স্থানে থামে। ভুলপাথরদের কাছে প্রায় সবংশ সে-গ্রামের জীবন বারার বুটিনটি বিষয় শোনে। এ বারার প্রান্তে সে উপস্থিত হইলো প্রকৃতি প্রেম, এখন তার অগ্রহ ক্রান্তত মানুষ সম্পর্কে। ইতিমধ্যেই নবীনকুমার সিঁচ্ছাত নিরুদ্বেষে বো ইব্রাহিমপুর থেকে নবাবীপ পর্যন্ত একটানা পাক সড়ক সে নিজকরে নির্মাণ করে বেবে। পথের বেগাবোগের অন্তরে গ্রামা পথা মার যায়।

একদিন যথার্থে নবীর বীক্ষণ ভীতের একটি গ্রামে বহু লোকের বিপন্ন হাহাকার শোনা গেল। মানুষজন ঘর বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে। নবীনকুমার সেদিকে বজরা ভেঙেতে থলতেই ভুলপাথর নিষেধ করলো। এ পথের সন্মুখের জমিদারের এলাকা।

ভুলপাথর বললো, আপনার পক্ষে ওখানে পরীক্ষণ করা যেতেই উচিত হয় না। ঐ কখনে আর এক লাহেমের জমিদার। ওনর নারের পচিখানা হাতি লাইরা গেরামে আসে। যে-সব দৃষ্ট প্রজা খাজনা দেয় না, তাগো বাড়ি হাতির পায়ের গড়ায় গড়াইরা যায়। সেইজনাই সুখচরের জমিদারের বাড়িতে সব সময় টকা কবর কবর করে। সেই টাকার বাবুরা কইলকাতার বাজিরা নাচার আর পাররা উড়ায়। মাল্লরও বানাইছে দুই ডিন খান!

একটু হেসে ভুলপাথর জিজ্ঞেস করে, ছোটবাবু, আপনাকে কইলকাতার মাল্লর লানন নাই?

নবীনকুমার সে প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ না করে অনমনস্ক ভাবে বলে, সরকারের চোকে আমরা এখনো ইব্রাহিমপুরের জমিদার। আপনি আমাদের নারের। এখন থেকে আপনি নিরামিত মাল মাইনে পাবেন। আপনার ওপর অনেক কাজের ফর দেবো। প্রতি দুখানা গা অঙ্গর ইক্ষুল বানতে হবে, আকলের বচরে বিনা সূত্রে চাবিরের বীজ দান আর খোরাকি খান দিতে হবে। আর...

ভুলপাথর বললো, কইলকাতার ফিরা গালেই সব ভুলিয়া যাবেন জানি। কিংবা, বিধু মৃদুইজা এখনো বঁচিয়া আছেন না? তিনিই সব ছুরাইরা মিলেন।

নবীনকুমারের স্বরায় হাল ভেঙে পড়ির মেরামতির জন্য এক স্থানে থামতে হলো। টানা প্রায় পঁচ দিন বজরার বস থেকে হাত পরেরও খিল করে গেছে। নবীনকুমার নেমে একটু খোরাকি করতে চায়। স্থানটি ইব্রাহিমপুরে সদর থেকে অনেক দূরে, সম্ভবত নবীনকুমারের আগমনবাটা এতদূর এসে পৌঁছায় নি।

ডিনকুড়ি আর ধানকুড়ি নামে পাশাপাশি দুটি গ্রাম। গত কাল এক পশলা বন্টি হয়ে গেছে বলে গাছপালা আরও শস্যী সবজি। কাতাস খুব সুখপ্রদ। দুলাল ও ভুলপাথর সমাজিকভাবে নবীনকুমার হটতে হটতে চলে এলো অনেকখানি। তাদের পশ্চাতে ছোট একটি কৌতুহলী লেলর ডিডু জমেছে। সেদিকে যন না দিয়ে নবীনকুমার সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলতে বলাতে চলেছে।

একটি ভাল গছের নিচে বহুকাল আগে অশ্বিনস্ব এক কুটিরকে ঘিরে আগাছার এক জগল জমে গেছে। সেখান দিয়ে যেতে যেতে অকস্মাৎ মনুষ্য কণ্ঠের হুড় হুড় শব্দ শব্দে নবীনকুমার থমকে দাঁড়ালো।

সেই জগল ভেদ করে বেরিয়ে এলো একজন অনেকটা মনুষ্যাকৃতি হলেও সে মানুষ না বনপ্রজা তা-সহজে লেখা যায় না। তার পরশে কোনো সন্দিগ

কর নেই, কেবলটি গছের ভাল তার কোমরের নবীনকুমার সঙ্গে বঁধা। বুক মূখে হাটি মাথা। অত্যন্ত পচিশ-তিনিশ বছর সে কোনো কোমরকের সংস্পর্শে যায় নি। লোকটি এগিয়ে এসে এই বলটি দিকে দিগের সোয়ে ডাকিয়ে রইলো।

গ্রামবাসীদের কয়েকজন বলে উঠলো, সাধবান বাবুরা, ওর কাছে যাবেন না।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলেন, কে এই লোকটি? গ্রামবাসীরা জানালো যে, এই লোকটি ন্য ডিলেচন দাস। এক সময় কয়েক বৎসরের খাঁন বাকি পড়ার জমিদারের লোক-লক্ষ্যর এসে ওর বাড়ি পড়িয়ে দেয়। সব কিছ এখনো সেই অবস্থাতে আছে।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, এখনে কাকে জমিদার?

ভুলপাথর তাকাতাকি বলে উঠলো যে, এটা ইব্রাহিমপুরের মতোই বটে, কিন্তু এই খিনা তা আমলে নয়। এ ঘটনার কথা সে জানে। ভুলপাথর নারের কাছে গত বিশ বৎসর। তার আশেখা নারের উপবনারপের নয় শুনলে এখনো খনে ডরে কাশে। প্রজন্মের ঘর বাড়িতে জমি সংঘো করা ছিল তার পথের ভীড়া।

নবীনকুমার বললো, এতকাল ধরে এই ব্যাি সেই অবস্থায় আছে। আপনার আমলেও আপনি কিছ, সুবন্দোবস্ত করেন নি?

ভুলপাথর জানালো যে, চেষ্টা করলেও করবা উপায় নেই। ও কারকে কছে যেহতে দেয় না।

গ্রামবাসীরা আরও তথ্য জানলো যে, নারেরে অতচারে লোকটি শতী-পূত্র-কনাকে নিয়ে লে ছেড়ে চলে য়। অনেক দিন ওর কোনো সংবাদ ছিল না, ওর ভিটে এই পোড়া অবস্থাতেই ছিল। তার পর বেশ কিছু বছর পর ও একা ফিরে আসে বো উম্ম হ হয়ে। নিজের ভিটেটুকু শব্দে চেনে। আ কোনো মানুষ চেনে না।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, ও এই ভিটের মাি কামড়ে কড়ে যায়। আর কোনো খাদ্য ওকে কে গ্রহণ করতে দেখনি কখনো। এমন কি, অন্য কে কিছ খাদ্য হুড়ে দিলেও ও তা স্পর্শ করে না শব্দে মাটি খেয়েই ও বেঁচে আছে।

এই সময় ডিলেচন দাস ধীর স্বরে বললে বাবু, একটু জল পাবেন, চিড়ে ডিজারে খাবো! নবীনকুমার বললো এ তো লোকটি জ চাইছে, চিড়ে চাইছে!

গ্রামবাসীরা চোঁচরে বলে উঠলো, না, শুনবেন না, ওটা ওর কথা। কিন্তু নবীনকুমার সব অগ্রাহ করে দু' এক পা এগিয়ে গিয়ে বলতে হ্যাঁ, তোমাকে চিড়ে দোবো, অন্য খাদ্য দোে তোমার চিকিৎসা করানো ি হবে আমায় সঙ্গো?

ডিলেচন দাস সঙ্গে সঙ্গে প্রায় কাছের ম এক লাফ দিয়ে স্বীকৃতির পড়লো নবীনকুমার ওপরে। কেউ কিছ বোঝবার আগেই দেখা ে নবীনকুমার ভুলপাথর, আর ডিলেচন তার বক্ষ কামড়ে ধরেছে।

সকলে মিলে হুড়োহুড়ি করে যখন ডিলে দাসকে টেনে তোলা হলো, তখন দেখা গেল মূখে নবীনকুমারের শোশকের একটি টুকরো স এক খালো মাসে।

তার প্রচুর এই দশা করেছে দেখে দুলাল ে অধীর হয়ে তৎক্ষণাং লোকটির চুলের মূঠি ফেলে দিল মাটিতে এবং তারপর তার হাত ে সমনে ঢালাতে লাগলো। অনারও যোগ দিল সঙ্গে। অশ্লবদের মধ্যেই উল্লাস ডিলেচন দুলালের প্রহারে খনে হয়ে গেল।

ভুলপাথরকে ভেঙে শাহিদ নবীনকুমার, সজালাল। তার কতস্থান নিচে ভলকে ভলব বেরিয়ে আসছে।

# মোরারজী মিলন্স



## সাহিত্য

### এক হিন্দু মৌলবীর আত্মকথা :

গিরিশ সেন

আজকের পাঠকের কাছে গিরিশচন্দ্র সেন হয়তো সম্পূর্ণ অপরিচিত। তার আত্মজীবন-এর নামই যা কে শুনবে একলে! অথচ এই নামটি ভুলে যাবার মতন নয়। গিরিশচন্দ্র সেন আরবী, পারসিক, উর্দু, সংস্কৃত ও বাংলায় সমানভাবে পারদর্শী ছিলেন—এ কথা বললে তার পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়; কিন্তু মানসিকভাবে চেনা যায় না। মূল আরবী কোরান শিরকের বাংলা ভাষার প্রথম অনুবাদক গিরিশচন্দ্র। আবার বিগত শতকে তিনিই কয়েকটি অসাধারণ জীবনী উপহার দিয়েছিলেন বাংলা ভাষায়। আজকের পাঠকের কাছে তাঁর কোন বই সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে তাকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার অপেক্ষা রয়েছে। সেই পরিচয়ের উদ্দেশ্যে তাঁর অধুনা অল্প গ্রন্থ থেকে বেছে নিয়েছি—আত্মজীবন-গ্রন্থটিকে। পরিশুদ্ধ সংজ্ঞা ভাষায় সম্পূর্ণ গ্রন্থটি লিখিত। ব্যতিক্রম শব্দ, গ্রন্থের নামকরণ আর নামপত্রে একটি সংস্কৃত শ্লোকের প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা থেকে—সেই একবারই ১৯১০ সালের ২২ নবেম্বর (ইসলাহী ১৩৩০) ছাপিয়েছিলেন গুপ্ত মধ্যরাত্রি আড়া কোং। নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য ১ টাকা মাত্র।

সং জীবনী সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র সেন অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। মৃত ব্যক্তির জীবনচরিত রচনা করতে গিয়ে জীবনীকার জীবন সম্বন্ধীয় প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে অনেক সত্যকে প্রচ্ছন্ন করেন কিংবা অনেক অসত্য সত্যরূপে ব্যক্ত হয়। আবার কখনও বা অযোগ্য লোককে কম্পনাঙ্কল স্বর্ণে তোলেন, আবার একজন সুযোগ্য লোককে রসাতলে পাঠান। নিজের জীবনকে সত্যত প্রত্যেকে নিজে যেরূপ জ্ঞানেন এবং যথার্থ বলতে পারেন, অপর লোক কখনও সে রূপ জানতে পারেন না। সত্যায়, ঠিক বলতে ও লিখতে পারেন না। আর ঠিক উল্লিখিত কারণগুলির জন্যই গিরিশ সেন তাঁর আত্মজীবনী লিখতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। জীবনের ত্রাণিকালে সত্তর বছরের অভিজ্ঞতা দিয়ে সুখ-দুঃখ, ধর্ম-অধর্ম, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আলোক-অন্ধকারাবির আলপনা অঙ্কলেন লেখক।

বিশ্বব্রহ্মের গ্রন্থ এটি। আত্মজীবনী রচনা বাংলা সাহিত্যে অভিনব নয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরুর করে রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী সব গ্রন্থ নেতারাও তাঁদের আত্মজীবন কথা লিখে রেখে গেছেন। অতীতেরও লিখেছেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, নবীচন্দ্র সেন, কৃষ্ণকুমার মিত্র—এই ধরনের আত্মজীবনীগুলিতে কোন ক্ষেত্রে তাঁদের অন্তর্জীবনের ছায়া পড়েছে, কোথাও বা শিল্পের তাগিদে শিল্প সৃষ্টি হয়েছে। আবার কোথাও বা প্রকৃত উচ্চাঙ্গের উনিশ শতকের জীবিত দলিল হয়ে উঠেছে গিরিশচন্দ্র সেনের 'আত্মজীবনী' ঐতিহ্যের পরে। পাঠ্যে বইটির স্বভাব মূল্য ধরা পড়ে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি তথ্য জ্ঞান দয়াকর। যেমন গিরিশ সেন গ্রন্থ লিখেন। কেশবচন্দ্র সেনের প্রবর্তিত নববিধান ধর্মের আদর্শ অনুসৃত ভঙ্গ প্রচারক তিনি। কেশবচন্দ্র সেনের সর্বধর্ম সম্বন্ধী দর্শনে গিরিশচন্দ্র সেন ইসলাম ধর্ম ও শাস্ত্র আলোচনার গুরু, দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

গিরিশ সেন কিশোর বয়সেই ইংরেজী ভাষা করে পারসিক ভাষা শিখতে শুরুর করেছিলেন। কৃষ্ণ রায়ের কাছে লেখক তওরাফি জাহাঙ্গীর, মাদনোজ্জওয়াহের, মহম্মদনামা, বহরনামা, সেকাফনামা, যোজ্ঞাতে ইয়ার মহম্মদ মোল্লান ইত্যাদি গ্রন্থের অধ্যয়ন করেন। পরে অবশ্য ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লখনৌ নগরিতে এই ভাষা অধ্যয়নের পূর্ণ সুযোগ পান। তিনি ইসলাম সাহিত্যের চর্চা করেছিলেন বলে বাঙালির কাছে তিনি মৌলবী গিরিশ নামে প্রসিদ্ধ। ধর্মসাধন নীতি পদ্ধত্বের সমালোচনার শ্রীমতী আর এস হোসেন

তাকে 'মোসলমান রান্স' বলে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন খৃষ্টিয় বিশ্বদর্শী। ইংরেজী কিংবা ইসলামী কোন প্রভাবই তাঁর ব্যক্তি জীবনের স্পর্শ করেনি। 'আমি একজন সভ্যজগতের বাহ্যিক লোক। আমি কখনও ইংরেজী জ্ঞাতা পারদর্শ্য করি নাই কোনরূপে বিলাতী পোশাক পরি নাই। পরে আমি বিশেষভাবে মুসলমান শাস্ত্রের আলোচনা করিরাছি, মোসলমান সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে সম্বন্ধ হইয়াছি, কিন্তু মোসলমানদিগের ন্যায় জীবনে কখনও মাদ্রাসা ধারণ করি নাই, ইজার চাপকান পরি নাই, এবং মস্তকে টুপি ধারণ করি নাই, ভক্ত হই নাই। নববিশ্বব্রহ্মের নারিকের ট্যাংকোতে একদিন মাত্র আমি মৌলবী সাজিয়াছিলাম, তখন কয়েকজনের জন্য ক্রীম মাদ্রাসা ধারণ এবং মৌলবীর পোশাক, টুপি ও ইজার চাপকান পরিয়াছিলাম।' আর একবার পরেই ছিলেন হায়দ্রাবাদে। সেরোজিনী নাইডুর মা, ডঃ অরোরাবায় চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী হায়দ্রাবাদে মোসলমানদের এক সভায় উদ্বৃত্ততা দিতে বাওয়ার আগে টুপি, ইজার ও চাপকান পরবার অনুরোধ করেন। বাস, এই পর্বত আর কোনদিনও মুসলমানী পরিচ্ছন্ন তিনি পরেন নি। তিনি বিয়ারাশ বহুর বয়স থেকে নিয়মিতভাবে নিত্যভরে আরবা ব্যাকরণ ও পারস্য দেওয়ান হাফেজের চর্চা করেছিলেন। কিন্তু কোরানের অনুবাদ কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হইলেও কিছু মোসলমানেরা ভুল হয়েছিলেন—'আমাদের পবিত্র ধর্ম-গ্রন্থের অনুবাদ একজন কাকের করিয়াছে, তাহাকে পাইলে তাহার শিরচ্ছেদন করিব।' এমন ভীতিও তাকে দেখান হয়েছিল। ডা হাড়া, হাকিম গ্রন্থটি ভুল করতে



গিরিশও তিনি অপদ্রব্য হয়েছিলেন। মোসলমান ইজ্জত দূর থেকে কোথায়না প্রদান করেছিলেন মাত্র, তাঁকে স্পর্শ করতে দেননি। এক মুসলমান দস্তুরীকে দিয়ে তিনি গ্রন্থটি কিনে আনেন, আর একজন মোসলমান রান্স তাকে কোরান খরিদ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর অন্তর্জীবিত কোরান ও হাদিস অধ্যাত আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে বাঙালী মুসলমান সমাজ গ্রহণ করেছেন। এবং অনেক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত মৌলবী তাকে কৃতজ্ঞতা জানান—'আমরা বিশ্বাস ও জাতিতে মোসলমান আপনি নিরবধাভাবে জনহিত সাধনের জন্য যে, এতাদৃশ চেষ্টা ও কষ্ট সহকারে আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরানের গভীর অর্থ প্রচারে সাধারণের উপকার সাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন এ জন্য আমাদের অত্যন্ত ও আন্তরিক বহু কৃতজ্ঞতা আপনার প্রতি দেয়।' আত্মজীবনের পাতায় মৌলবী গিরিশ সম্প্রতি বিবরণী লিখছেন গিরিশ সেনকে রহস্যাবৃত করতে সাহায্য করে।

নব বিধান সমাজে অনেক ভক্তের আত্মচরিতের বেলায় যেমনটি ঘটেছিল—গিরিশ সেনের 'আত্মজীবন' গ্রন্থটিও এতকাল পরেই 'বৈজ্ঞানিক ব্যাপার' বলে পুরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আত্মজীবনী উনিশ শতকের অনেক ঘটনার সাক্ষী। রাজনারায়ণ বসুর সেকাল ও একালা কিংবা শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' ও 'রামতনু জাহাঙ্গীর' ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ-এর বহুই বহুবিধ ঘটনার ঠাসা এই গ্রন্থ। শাস্ত্রী মহাই-এর লেখায় যেমন তৎকালীন কলকাতার সমাজ জীবন্ত,

গিরিশ সেনের আত্মজীবন পূর্ব বঙ্গের সমাজ চাকা ও মৈয়নসিংহকে কেন্দ্র করে যে সামাজিক ও সাম্প্রতিক বিষয় ঘটেছিল তারই কিবন্ত ছবি ফুটে উঠেছে।

দেওয়ান বংশের ছেলে শিখারাম রামমোহন রায়ের পৌত্র গ্রামজীবনে ছিলেন সেফা হিন্দু পৌত্রলোক। বড়ো/ডেবো বহরের সময় কুলদ্রবের কাছে শিব মন্দির গ্রহণ করেছিলেন। জাতিভেদ প্রথম ছিল পূর্ববঙ্গে প্রবল। সেই সংস্কার নিয়ে বালক গিরিশ বিশ্বাস করতেন মোসলমানের ছায়া মড়ালে অপরিচিত হতে হয়। 'তখন জাতিভেদের বড় অসীমার্থী ছিল, এখন মোসলমানের রাগিণীও যেন হিন্দুর চলে, তখন শাস্ত্র চাকরে রাগিণীও বাওয়া হইত না। পূর্ববঙ্গে রান্স পাক সুলভ ছিল না, এখনও নয়।' নয়/দশ বছরের ছেলে আহরে বসছে এক শাস্ত্রজ্ঞাত শ্রীলোকের অধীনাশী পাশ কাটিয়ে যাবার সময় বালকের গায়ে লাগে বলে তার আহর করা আর হল না। কে জানত এতেন বালক উত্তরকালে মুসলমানী ধর্ম ও সাহিত্য আলোচনা করে 'মৌলবী' হবেন।

পূর্ববঙ্গের গ্রামাঙ্গীতে কবিব্রাহ্মের দলের মত সখী সংঘার গানের দল ছিল। শিবদল সিনে এট দলের নেতৃত্ব করতেন। শিব সিনেতর সখী সংঘার দলটি ঢাকা ও মৈয়নসিংহে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করছিল। ঢাকার লি ইংরেজি স্কুল পেরোয়ার স্কুল। মৈয়নসিংহে শহরে ছিল একটি সংস্কৃত পাঠশালা। প্রধান শিক্ষক ছিলেন ভগবানচন্দ্র বসু, আর পাঠ্যভিত্তিক তত্ত্বেরের কাছ থেকে এ সংস্কৃত পাঠশালার গিরিশ সেন সংস্কৃত ভাষার পাঠ গ্রহণ করেন। শিক্ষা ও শিক্ষার্থী, উভয়ের গুণে অঙ্গদ্বিনের মধ্যেই গিরিশ সেন সংস্কৃত কবিতা রচনার সক্ষম হন। এ ছাড়া, গিরিশ সেনই বোধ হয় একমাত্র যিনি 'বানীতা বিনোদী' কবিতা পুস্তকে পদ্যবধে নারী শিক্ষার বিধান দিয়েছিলেন। পটনো গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে কিংবা পরে কলকাতার ভারতপ্রসে শিক্ষারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করে তিনি স্ত্রী শিক্ষার অনেক প্রসার ঘটিয়েছিলেন।

আজকের সমাজে দুর্নীতির কল্যা ছায়া আমরা সর্বত্র দেখি কিন্তু বিগত শতাব্দীতে সমাজনীতির মানটি কোন ছিল? আমাদের কৌতুক হল যেভাবে আত্মজীবনের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। 'আমি বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদির কিছু কিছু আলোচনা করিয়া নর্মাল প্রোগ্রামে প্রবেশের পরীক্ষা দান করি। আমি গণিত জ্ঞানিতাম না, কোন সহস্রাব্দী গণিতের পরীক্ষার উত্তরণ হওয়ার পক্ষে আমার সহায়তা করিয়াছিলেন। তখন এরূপ কার্য অনীতিৎ অনার্য বিনা বড় বোধ ছিল না, অনেককই এরূপ অনীতির পথ অবলম্বন করিতে দেখা গিয়াছে। গিরিশচন্দ্র সেন মদ্রাসী কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বাড়িতে থেবে পারস্য ভাষার চর্চা করেন। তখন তাঁর চোখে পড়ে 'কৃষ্ণ রায় মাদ্যারী ছিলেন, প্রত্যহ মদ্যপান করিতেন ভ্রম পরিবারের একটি বিধবা নারী সীতার গৃহে স্থিতি করিয়া তাঁর কাছে দুই বেলা রান্না দিত, এবং তাঁহা সেবা শূন্যে করিত। সেই অশোভনতার সন্মুখি তাঁহা অপরিচিত যোগে ছিল। তাঁর আমার পক্ষে বসির মদ্যপান করিতেন, মদ্য না খাইলে বন্ধুর স্বর্গাত হই না, ভাল শিক্ষা হয় না—এরূপ বিনায়া কখন ক' আমাকে সুযোগে প্রবৃত্তিমান করিয়াছেন। ইন্দুর ধন্যবাদ, আমি তাঁহার আশীর্বাদে ওস্তাদজীর টে উপদেশ গ্রহণ করিয়া কারণ স্পর্শ করি নাই।' এ সময়েও চাকুরীস্থলে বজ্রনপোষণ নীতি চলত। জে স্কুলের চতুর্থ প্রোগ্রাম হার সেই স্কুলেরই পক্ষে পদে চাকুরি পেয়েছিলেন, কারণ যথাক্রমে নিম্নের নিম্ন গ্রন্থ। এই চাকুরিই পূর্ববর্তিকে পাইয়ে দেবার ও আমলাতান্ত্রিক কৌশল অবলম্বন করণটিকে স্বর্ণে গিঁ দেনও দুর্নীতি হ্রাস করেন নি। লেখক আত্মজীবী ক্রম, নীচ ঘটনাবলীরও সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে ব করে গেছেন—মেমন পৌত্রলোকী করেছেন।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রজনাথ কেশবচন্দ্র সেন ধর্ম প্রচার উদ্দেশ্যে মদ্রাস বঙ্গ হন। সঙ্গে ছি টেলোকানাথ সান্যাল, অরোনাথ গুপ্ত, দী



মজুমদার, ডাকনাথ সূত্র, রতন সিং, বঙ্গচন্দ্র মল্লিক প্রমুখের সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন। এই প্রচারবার্ষিকীতে গিরিশ সেনও একজন বারী ছিলেন। এই প্রচার সূত্রের সিংহ দেশ ও বঙ্গদেশকে এই দক্ষিণে মাদ্রাজ পর্যন্ত হয়েছিল—তার পূর্ণ বিবরণ এবং কোথায় কোথায় কিভাবে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করা হয়েছিল—কোথাও সংকীর্ণনের সাহায্যে কোথাও উদ্ভূত, কোথাও হিন্দী ভাষার বক্তৃতার দ্বারা তার পূর্ণ মনোজ্ঞ বিবরণ তিনি দিয়েছেন। পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম প্রচারকেরা খুব নিঃসহীত হয়েছিলেন। কোনও গৃহস্থের বাড়িতে তাদের আতিথ্য দেওয়া হয়নি। ঢাকার নবাবিধান সমাজের উপাচার্য ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের (যাঁকে সবাই পূর্ববঙ্গের কেশব সেন বলতেন) নেতৃত্বে বরিশাল অঞ্চলে ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে জয় সিংহের খালে পথ হারিয়ে সারারাতব্যাপী কতকগুলি তরুণ ব্রাহ্ম যাকের যে ভীতিকর অভিজ্ঞতা, কিংবা বনগ্রাম থেকে যশোহরে প্রচার বাতা ইত্যাদি বর্ণনার বেন ইতিহাসের এক রোমাঞ্চকর আশ্বাস পাওয়া যায়।

প্রমণবলাসীনের জন্যও কিছু কৌতুহল উদ্গীর্ণক বিবরণ রেখে গেছেন তিনি। কেশবচন্দ্র সেন স্বদেশ্যধর্মিতার জন্য যখন সপরিবারে গাজীপুরে গিয়েছিলেন সেই সপ্তাহ গিরিশ সেনও ছিলেন। “তখন দেলদার নগর হইতে গাজীপুরে গমনের ব্রাহ্ম লাইন হয় নাই। জম্মানিয়া স্টেশন হইতে বাতিকাশিককে উঠের গাড়ি বা ডাকবোশে ১৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে হইত। আমরা রাতিতে জম্মানিয়াতে পৌঁছিয়া ছিলাম। পরিদর্শন প্রান্তে আচার্য ডাকগাড়িতে আরোহণ করিয়া বাতা করিলেন, আমরা সকলে একখানা ছিটের উঠের গাড়িতে চড়িয়া বাতা করিয়াছিলাম।” গাজীপুরেই ব্রাহ্মানন্দ ও তাঁর সব সঙ্গীরা দর্শন করলেন হিন্দু, বৌদ্ধ, পণ্ডিত, সৌম্য প্রভৃতি। তাঁহার মধ্য বসে উজ্জ্বল পৌরোহিত্য, সৌম্য প্রভৃতি ছিল তিনি বিনয়ের অবতার ছিলেন, আচার্যকে উপস্থিত দেখিয়া

বিশ্রামের জন্যে প্রণাম করিলেন। এই প্রকারে সম্রাসীর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ হয়েছিল। স্বামী অভ্যেসানন্দও অলৌকিক বোলশাউরীসম্পন্ন এই পূর্ববঙ্গ মহাপুরুষকে গাজীপুরে দর্শন করেছিলেন। ঈশ্বর প্রসঙ্গে আলাপ আলোচনাও হয়েছিল। এরা সকলে প্রায় কাছাকাছি সময়ে এসেছিলেন গাজীপুরে। স্বামী অভ্যেসানন্দের ‘আমার জীবনকথার’ ও গিরিশ সেনের ‘আজীবন’-এ পণ্ডিত বাবার মহত্ব বোঝাবার জন্যে তাদের প্রতি বাবার সাহায্য করেছেন। সেই একই গল্পটি উভয়ের গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ১৮৭০ খৃস্টাব্দেও বাঙালীরা দেবাদুর্ন, মুর্শাবারী, হরিশ্চন্দ্রে ভ্রমণে যেতেন। কিন্তু সেতে হত বিভিন্ন ব্রাহ্ম—স্ট্রেন, এজালাড়িতে, গোবানে, অম্বারোহণে কিংবা কখনও বা পদপ্রক্ষেপে। গিরিশ সেন ৪২ মাইল পথ তা ব্রাহ্ম পথ দিয়ে একা গাড়িতে চড়ে দেবাদুর্নে পৌঁছেছিলেন। রাক্ষসপুর থেকে ৭ মাইল পথ অম্বারোহণে অতিক্রম করে মুর্শাবারীতে পৌঁছান। আর দেবাদুর্নে থেকে ৩৫ মাইল নির্ভয় অরণ্যের পথ পদপ্রক্ষেপে অতিক্রম করে হরিশ্চন্দ্রে আসেন। আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন তিনি একা গাড়িতে ভ্রমণ করেন। সীতাকুণ্ড, বিষ্ণুর ও কুতুব তিনি গিরেছিলেন গরুর গাড়িতে চড়ে।

পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম আন্দোলন ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, ঢাকার বিভিন্ন জেলার ব্রাহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্ম যুবকদের মধ্যে মতানৈক্য ও বিরোধ, কুচবিহার বিবাহের প্রতিবাদে পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মসমাজে ভাঙন, সকল বিশ্বাসের বিবর্তন প্রতিবেদন এই গ্রন্থটি। কলকাতার ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজে কুচবিহার বিবাহের ফলাফল যে জঘন্য দলদলিলের সৃষ্টি করেছিল তার বর্ণনা শিবনাথ শাস্ত্রী দিয়েছেন। পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম সমাজে এই বিবাহের ফলাফলস্বরূপ বিবাদ ও একই জাতীয় দলদলিলের চিত্র উদ্ঘাটিত করেছেন গিরিশ সেন।

গ্রন্থটি প্রকাশের কাল ছিল ১৯০৬। পূর্ব বছর বঙ্গভঙ্গের বছর। বাংলার ইতিহাসের এক চরমকাল।

সিদ্ধান্ত প্রচেষ্টার ইংরেজের এই কু-ইচ্ছা নিবারণ হল। কিন্তু গিরিশ সেন পোশাকে, আচারে, আহারে সম্পূর্ণ স্বদেশী হয়েও এই ব্যাপারে বিদেশী ইংরেজকে সমর্থন করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন তা স্কুলের জল্পবয়সী ছেলের বোঝাবে উদ্ভিজিত করেছিল আর ছাত্রের নিয়মাবলি অগ্রাহ্য করে সারা দেশময় যে উৎপাত শুরু করেছিল—সেটাই তার অপরিহার্য কারণ ছিল। লেখক রাজনৈতিক আন্দোলন-বিষয়ে মনস্তত্ত্ব করতে গিয়ে ইংরেজ জাতি ও লর্ড ক্যানিংকে সমর্থন করেছেন ও উচ্চ ভাষায় তা তিনি জানাতে সম্মত বোধ করেননি।

বহুবিধ তথ্যের ভ্রাম্যাত বর্ণনার গ্রন্থটিতে অতিরিক্ত বোকোর তার চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। গিরিশ সেন বাংলা সাহিত্যের শ্রুতী অনুবাদক কিংবা জীবনীকার নন, তিনি সাহিত্যিক। প্রতিটি ঘটনাই বর্ণনার সহজ মাধ্যমে রসবস্ত্র হয়েছে। তার ঘর্ষণমান জীবনের দুটি দুর্ঘটনার ছবি সকল বঙ্গের সকল পাঠককুল উপভোগ করবেন। একটি তার স্ত্রী ব্রাহ্মসমাজের মৃত্যু, অপরটি তাঁর মায়ের মৃত্যু। মৃত্যু মানুষের জীবনে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, করুণ সত্য। কোন বিচিত্র ঘটনা মাত্র নয়। জীবনকে নিয়ে, পারিপার্শ্বিককে নিয়ে পরিকল্পনা করে মৃত্যু কত সহজ, সুন্দর ও প্রেমসিদ্ধ হয়ে ওঠে, ভরস্করও কেমন শ্যাম সন্মান হয়ে ওঠে গিরিশ সেনের লেখার তাই আমি পেরোছি। সমগ্রভাবে এই বইটি পড়ে আমি উপন্যাসের স্বাদ পাই। বিচিত্র গতিময় একটি জীবন, সমাজ, ধর্ম, জাতি, পরিবার, দেশ ও দেশের মানুষের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে নতন করে সৃষ্টি করে চলেছে নিজেকে। পটভূমি উনিশ শতক নবজ লেখক নিজেকে। হৃদয় আলোকে উদ্ভাসিত এক গভীরতর সত্যানুভূতি সমগ্র গ্রন্থখানি সংগৃহীত করেছে।

করা বঙ্গ



দেখুন...  
সবচেয়ে সাদা  
করার জন্য

**রানীপাল®**

কাপড় শেষবার ধোবার আগে জলে একটু রানীপাল মেশান আর এবার দেখুন কাপড়ের অকথকে সাদা! রানীপালের সাদা!  
সাদা কাপড় সে যাই হোক না কেন সূতা, সিল্ক, টাইল ও রেগেড - রানীপাল ব্যবহারে অকথকে হয়ে উঠবেই।

নিয়মিত রানীপাল লাগান...  
আর সাদা কাকে বলে দেখুন ও দেখান



সূতার কাপড়ের জন্য রানীপাল®  
সিল্ক ও রেগেড কাপড়ের জন্য  
রানীপাল® - এস

Ship SG-2A 78 Ben

শিঙারী কুমকুম টিপ

লানব্যময়ী রূপে রমণীয় টিপটি গরুন।



মোহিনী রূপটি ফোঁস আখির  
হিন্দোলো...  
মনোলে...  
পরে...  
শিঙার...  
বানানো...  
লালান...  
মন...  
রাত...  
শিঙার...  
রূপ... সাজ।

শিঙারী

মনো...  
কুমকুম টিপ  
ভারতীয় সৌন্দর্যের  
সুন্দরতম সাজ।



বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার : ১৯৮০

রসায়নে

রসায়নে উল্লেখযোগ্য গবেষণার জন্য যে তিন বিজ্ঞানীকে ১৯৮০ সালের নোবেল পুরস্কারে বৃত্ত করা হয়েছে তাঁদের অন্যতম হলেন পল বার্গ। পুরস্কার-অর্থের অর্ধেক পেয়েছেন তিনি। অর্ধাংশ অংশ সমান দুই ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওরালটার গিলবার্ট এবং ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টেফান ল্যাংগারের মধ্যে।

গীতিন এমন একটি বাগার নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত যা কাছেই পরিণত হয় নি। নোবেল পুরস্কারের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর পল বার্গ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন জনৈক বিশেষজ্ঞ।

নোবেল কমিটির সন্তোষ, পল বার্গের গবেষণা-বিষয়ক প্রকল্প নিয়ে গোড়ার প্রচুর ঝড় হয়ে গেছে, সম্ভবত নেই। কিন্তু যে অশঙ্কার উপর ভিত্তি করে এই ঝড়, সেটা কিছুটা বাড়বাড়ি বলেই মনে হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিন প্রযুক্তি কিভাবে গবেষণার সুপারে বিভিন্ন বিধি-নিবন্ধ রচনার তার অবদান অনস্বীকার্য। যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটা। একথা বিবেচনা করেই পুরস্কারের অর্থের সমানমূল্য অধ্যাপক পল বার্গকে অর্পণ করা হয়েছে।

জীবজগতের বংশগতির ধারক এবং বাহক এক ধরনের জটিল রাসায়নিক যৌগ—যার নাম ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অসিড বা সংক্ষেপে ডি এন এ—বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে ১৯৬০এর দশকেই নিখর নিশ্চয় হয়েছিলেন। ওই একই সময়ে আবিষ্কৃত হল ডি এন এ-র গঠন বৈচিত্রের ছক। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, ডাইরসই হোক অথবা অতিদার নীল তিমি—তাদের সবার ডি এন এরই মূল উপাদান একই। কীভাবে সেই সব উপাদান পরস্পরবিন্যাসও এবং এক এক বিন্যাসে তাদের সংখ্যা কত তারই উপর নির্ভর করে কোন প্রাণী ডাইরাস হিসেবে বিরাজ করবে, কিংবা রূপ পরিগ্রহ করবে তিমি, পাখি বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং মানুষের অবশ্যই।

প্রশ্ন উঠল কোন প্রাণী এবং উদ্ভিদের পরিপূর্ণ রূপ এবং শারীরবৃত্তীয় কাজ-কর্ম যদি তার ডি এন এ বা জিনের উপর নির্ভর করে, তা হলে সেই গিড ডি এন এ বা জিনের রাসায়নিক গঠনের কিছুটা হেরফের ঘটিলে অনেক কিছুই তো করা যায়। যেমন ধরুন, খাল-সমস্যা। পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে। প্রয়োজন আরও অধিক পরিমাণ খাদ্য। উৎপাদন বাড়িতে হবে গম, ধান ইত্যাদি। এ সব করতে গেলে দরকার প্রচুর নাইট্রোজেনযুক্ত সার। অতিরিক্ত সার তৈরি করতে খরচ বাড়ছে। অতএব যদি এমন করা যায়, ডি এন এ-র হেরফের ঘটিলে তৈরি করা হয় এমন প্রজাতির গম অথবা ধানের বীজ, যারা উদ্ভিদে পরিণত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন নিজেসরি সরাসরি বাতাস থেকে সংগ্রহ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে নাইট্রোজেন সারের আর প্রয়োজনই হবে না। কিংবা ধরুন, ডায়াবেটিস রোগ। শরীরে ইনসুলিন নামে এক ধরনের হরমোনের অভাব ঘটলে এই রোগ হয়। এমনও তো হতে পারে, বিশেষ কোন ব্যাকটেরিয়ার তিস্যও হেরফের ঘটিলে এমন প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া হরত তৈরি করা গেল খাবার এবং বাতাসের বাতাস মূল্যবান এই হরমোনটির উৎপাদনে সাহায্য করতে পারে। হরত এই একই পদ্ধতিতে কানসার নিরাময়ও সম্ভব।

১৯৬০ এবং ১৯৭০ দশকের গোড়ার এই ধরনের চিন্তাভাবনার উপর নির্ভর করেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একক এবং সম্মিলিত উদ্যোগে গড়ে উঠল এক ধরনের জৈবিক পদ্ধতি। যার নাম রাখা হল 'রিফর্ম-বিন্যান্স' ডি এন এ 'জিন প্রাইসিং' 'জিন গ্রাফটিং'।



ওরালটার গিলবার্ট



পল বার্গ



স্টেফান ল্যাংগার

জিনস'। 'রিফর্ম-বিন্যান্স' ডি এন এ বা পুনর্গঠনযুক্ত ডি এন এ বলতে বোঝায় দুটি পৃথক প্রজাতি থেকে সংগৃহীত জিনের পরস্পরিক মিলন। এ ধরনের পরীক্ষা চালাতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা কিছু কিছু সামগ্রীও আবিষ্কার করলেন। আবিষ্কৃত হল দুই প্রেশার 'এনআইএ' বা জৈবিক অন্যতম। 'লাইগেল' এবং 'নিউক্লিয়ার'। নিজেদের আশ্বর্যকর জনো প্রাকৃতিক নিয়মেই এই এনআইএগুলি ব্যাকটেরিয়ার দেহে উপস্থাপিত হয়। লাইগেল ব্যাকটেরিয়ার ডি এন এ-র মেরামতি করে। আর নিউক্লিয়ারের কাজ অজ্ঞাত-কুলশীল কোন ডি এন এ ব্যাকটেরিয়ার সান্নিধ্যে এসে তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ধ্বংস করা। অর্থাৎ সাধারণভাবে কাপারটা মাড়ান, লাইগেল কেন অটা, যার কাজ জোড়াতালি দেওয়া, এবং নিউ-ক্লিয়ার হল কাচি শব্দকে ধ্বংস করার দায়িত্ব বার উপর ন্যস্ত।

কিন্তু কীভাবে জিনে কেটে দুই প্রজাতির দুটি জিনকে আটা দিয়ে জড়িয়ে না হয় নতুন একটি জিন তৈরি করা গেল, কিন্তু সেই সংগে অরও একটি সমস্যাও জন্ম নিয়েছে। এবার দরকার সেই জিনকে কোন ব্যাকটেরিয়ার কোষের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া, যেখানে গিয়ে সেই জিন প্রজননের মাধ্যমে একাধিক অনুরূপ জিন তৈরি করতে পারে। ব্যাকটেরিয়ার এই নতুন জিন বহন করবে কে? অবশেষে সেই পরি-বাহকও আবিষ্কৃত হল। যাদের বলা হয় 'প্লাসমিড'। কোন কোন ব্যাকটেরিয়ার কোষে কিছু কিছু অতিরিক্ত ডি এন এ থাকে। অতিরিক্ত সেই ডি এন এ-র ছোট ছোট আণবিক মত কলরকেই বলা হয় 'প্লাস-মিড'। এই প্লাসমিডস সহজেই ক্রোমোসোম থেকে পৃথক করা যায়। এর ফলে পুনর্গঠনযুক্ত ডি এন এ নিয়ে পরীক্ষা চালানোর জন্যে বা বা দরকার সবই পাওয়া গেল। পাওয়া গেল 'আটা' জিন কাটার 'কাচি' এবং সংযোজিত জিনকে করণানার, পী ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে পরিবহণ করার মাধ্যমে 'প্লাসমিড'। ব্যাকটেরিয়ার বলতে এখন বুঝাত 'এককোষীয় কোষ' বা সংক্ষেপে ই. কোলির কথাই ধরা হলে। বিশেষ ধরনের এই ব্যাকটেরিয়ার আয়তনের পৌষ্টিক নালী বা অস্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যেও পাওয়া যায় এই ব্যাকটেরিয়ার। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, প্লাসমিডসে থাকে খুব কম সংখ্যক জিন। কোন ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করার পর তার তাদের জিন ওই ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোসোমে প্রোথিত করতে পারে। আবার ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোসোমের সঙ্গে নিজের জিনের বিনিময়ও করতে পারে। কোন ব্যাকটেরিয়ার হরত প্লাসমিড ডি এন এ প্রবেশ করান হল। সেখানে ঘটল তার বংশ বিস্তার। বংশ বিস্তারের পর তাদের সংগ্রহ করে তাদের সঙ্গে সংযুক্ত ডি এন এ-র কে পরিচিত, কে পরিচিত নয়, তাও কল দেওয়া যায়। যদি দেখা যায়, প্লাসমিড ডি এন এ-র বংশধরের মধ্যে কোন অজ্ঞাত পরিচর ডি এন এ রয়েছে, বুঝতে হলে, সেই ডি এন এ ই কোলি নয়, অন্য কোন জিন থেকে এসেছে। এইভাবে অজ্ঞাত পরিচর ডি এন এ সনাক্ত করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে জানা যেতে পারে তাদের জৈবিক ধর্ম।

সেটা ১৯৭১। অধ্যাপক পল বার্গ তখন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের একটি পরীক্ষা চালানোর ব্যাপারে পরিকল্পনা করছেন। তার লক্ষ্য তখন প্রাণী ক্যানসার-ডাইরাস নিয়ে গবেষণা করা। উল্লেখ্য, বিজ্ঞানীরা অনেক আগেই কিছু কিছু ডাই-রাসের সম্ভাবন পেয়েছিলেন। গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই সব ডাইরাস ই দূর, ময়ূগা, প্রকৃতি প্রাণীর দেহে ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে। মানুষের দেহে ক্যানসার ঘটান মত কোন ডাই-রাসের সম্ভাবন পাওয়া না গেলেও দেখা গেল, ঐ সব ই দূরাস মনুষ্যোক্ত প্রাণীর দেহে ক্যানসারের সঞ্জন ঘটায় এবং কখনও কখনও প্রাণীকান্সারের মধ্যে কালচার করা মানুষের দেহ-কলা ক্যানসারের মত প্রতিক্রিয়া ঘটায়। এতে করে কিছু কিছু মনে করলেন, মানুষের ক্যানসার রোগেরও হরত কারণ

## বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলী ও রচনাসংগ্রহ মানিক গ্রন্থাবলী

সাহিত্যে সমাজ জীবনের নবমূল্যায়নে মানিক আশুপাধ্যায় অগ্রতিষ্ঠান। তাঁর সমগ্র রচনা ১৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তথ্যসঙ্গীত প্রতিখণ্ডের মূল্য ২৫/-

### বনফুল রচনাবলী

বনফুল ডঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের অসামান্য সাহিত্য-জীবদান। এ-সার ১৪ খণ্ডে প্রকাশিত। বাংলাসাহিত্যে বিচিত্র এবং অমূল্য জীবদানের জন্য রবীন্দ্রনাথের পরেই বনফুলের স্থান অনস্বীকার্য। প্রতিখণ্ডের বর্তমান মূল্য ২৫/-

### বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ

এ-কালের অগ্রণী কবি, কথা-সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার হিসেবে তাঁর সাহিত্য পথপ্রদর্শক। এ পর্যন্ত ৮ খণ্ডে প্রকাশিত। ৭ম ও ৮ম খণ্ড ৩০/-, অন্যান্য প্রতিখণ্ড ২৫/-

### অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

কবি, কথা-সাহিত্যিক ও অসামান্য জীবনীকার অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ৯ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ৮ম ৩০/-, ৯ম (কিশোর সাহিত্য) ১৬/- ও অন্যান্য প্রতিখণ্ড ২৫/-

### প্রেমেন্দ্র মিত্র রচনাবলী

কবি, কথা-সাহিত্যিক, শিশু ও কিশোর সাহিত্যিক হিসেবে তিনি অগ্রণী, এ-কথা সর্বজন স্বীকৃত। ২ খণ্ডে প্রকাশিত। প্রতিখণ্ড ২৫/-

### নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী

কথা-সাহিত্যের ভিতর দিয়ে মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, অভিযোজনা তাঁর মধুর ও জনবদ্য লেখনীতে প্রদীপ্ত। একজন যুগজর সাহিত্যিক। ২ খণ্ডে প্রকাশিত। প্রতিখণ্ড ২৫/-

### জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী

আধুনিক বাংলা গল্প ও উপন্যাসের নিঃসন্দেহে প্রথম পূজারী। নিতুতে অসামান্য সাহিত্যিক কি হতে পারে তাঁর নিদর্শন। ১ম খণ্ডে প্রকাশিত। মূল্য ২৫/-

শি. র.—বাঁরা প্রতি সাহিত্যিকের প্রকাশিত সকল খণ্ড একসঙ্গে ক্রয় করবেন তাঁদের ২০% কমিশন দেওয়া হবে। মঞ্চস্থলের প্রচলিত প্রতিখণ্ডের নির্ধারিত মূল্য পাঠালে ডাক মাওল আমরা বহন করে রেঃ মুক পোস্টেই বই পাঠানো হবে। ক্রয়বর্তমান কাগজের মূল্য এবং মূল্য ও অন্যান্য খরচ হ্রাসের জন্য গ্রন্থাবলীর ভবিষ্যৎ মূল্যবৃদ্ধি অবশ্যজারী। আপনাদের ইচ্ছিত খণ্ডগুলি একত্রে সংগ্রহ করুন।

প্রিন্সালস প্রাইভেট লিমিটেড  
১১৫, বক্স চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

## প্রথম পলি শেষ পাথর

অরুণ মিত্র

বহু কবি বহু ভাবে কাব্যচর্চা করেন। কেউ সরবে, কেউ নীরবে। কেউ আত্মঘোষণায় নিজেকে তুলে ধরেন দলের সামনে। আবার কেউ নিজেকে জানাতে সঙ্কুচিত হয়ে যান আত্মমগ্নতায়। কবি অরুণ মিত্র শেষোক্ত ধর্মের কবি। কী আশ্চর্য সুন্দর কবিতা তিনি লেখেন অথচ যেন নিজেকে আড়াল করে রাখতে চান সমস্ত প্রশংসা ও স্বত্তির সামনে থেকে। কবিতা যেন তার নিজের সঙ্গী শুধু। প্রথম পলি শেষ পাথর তার অতি সাম্প্রতিকতম লেখার অনন্য সংকলন। পরিণত জীবন জিজ্ঞাসায় উপস্থিত রহস্যময়তার অপূর্ব এক স্বাদ। যা ইদানীং-এর কাব্য জগতে দুর্লভ।

দাম ৬.০০

### জিগসী মেয়ে

মণীন্দ্র রায়

মণীন্দ্র রায়ের সর্বাধুনিক কাব্যগ্রন্থ। এই ছোট সংকলনে তিনি নিজেকে তুলে ধরেছেন বিরূপ এক ব্যক্তিতে। আসলে এই ব্যক্তি তার হৃদ-কলমের স্বচ্ছতার ও মায়াময়তার প্রসাদগুণ। ব্যক্তিনায় শব্দচয়নে ও প্রতীকী রচনায় তিনি যে অনবদ্য স্বাভাবিকতাকে হাজির করেছেন তা গ্রন্থখানির প্রতিটি কবিতা পড়লেই ধরা পড়ে। রুমশঃ উপলব্ধির মহৎ এক উত্তরণের সজ্জিকণে ধ্রুপদে গেছেন শ্রী রায়, যা পাঠককে বিম্বিত ও মুগ্ধ করবে নিঃসন্দেহে।

দাম ৫.০০

অস্বাভাব্য কবিতার বই

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ভালোবেসে ধুলোয় নেমেছি ৪.০০

প্রণবন্দ দাশগুপ্ত

মানুষের দিকে ৫.০০

কবিরাজ ইসলাম

বিকল্প বাতাস ৫.০০

রাম বসু

সময়ের কাছে সমুদ্রের কাছে ৬.০০

দাউদ হায়দার

আগুন মঞ্চ দেশে একা ৫.০০

অমিতাভ দাশগুপ্ত

হৃদ্যার অধিক খেলা ৫.০০

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

উড়ন্ত নামাবলী ৫.০০

সুরজিৎ ঘোষ

নিষ্ঠুর কাঁচ ৫.০০

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

ভিন্মন স্বতি-চিহ্ন ৫.০০



করুণা প্রকাশনী

১৮এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯, ফোন: ৩৪-৬২৬৮

কোন না কোন ভাইরাস।

এক ধরনের টিউমার ভাইরাস নিয়েই পরীক্ষার পরিচালনা করেন বাগ'। ভাইরাসটির নাম 'সিমিয়ান ভাইরাস-৪০' বা সংক্ষেপে এস ডি-৪০ ভাইরাস। বিজ্ঞানীরা এই ভাইরাসটি প্রথম বনরের দেহে আবিষ্কার করেন। অত্যন্ত ক্ষুদ্র এই ভাইরাসে থাকে তিনটি ময় জিন। অক্ষুত কাগির এই, বিজ্ঞানীরা দেখলেন, এই ভাইরাস বানরের দেহে টিউমার সৃষ্টি না করলেও, ইদুর বা অন্যান্য প্রাণীর দেহে এদের ইনজেকশনের সাহায্যে টুকিরে দিলে শেবেল প্রাণীরা ক্যানসারে আক্রান্ত হয়।

সুগ' ঠিক করলেন, একটি প্রাসমিডের সঙ্গে তিনি 'এস ডি-৪০' ভাইরাসের তিনটি জিন প্রথমে জুড়ে দেবেন, তারপর সেই প্রাসমিডটিকে ঢুকিয়ে দেবেন ই কোলির দেহে। ধর নিলেন, অস্পষ্টভাবে মনে পড়েছিল তিনি পৃথক করে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখবেন ওদের মধ্যে কোন জিনটি ক্যানসার সৃষ্টির মতো কাজ করে এবং কেন করে।

পরীক্ষার বাধা পড়ল। ১৯৭১ সালের কোন এক দিনে যখন তিনি খুবই ব্যস্ত, এমন সময় তার কনের কাছে থেকে উঠল টেলিফোন। সুস্থের নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থ কোল্ড স্প্রিং হারবার ল্যাবরেটরি থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে টেলিফোনে শোনা গেল বিশিষ্ট জিন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রবার্ট পোলাকের কণ্ঠস্বর। তিনি জানালেন, 'অধ্যাপক সুগ', খবর পেলাম আপনি ই কোলির মধ্যে প্রাসমিডের সাহায্যে 'এস ডি-৪০' ভাইরাসের জিন ঢুকিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করার আয়োজন করছেন। এ বছরে আমি খুবই চিন্তিত। আমার আশংকা, এ ধরনের পরীক্ষা চালাতে গিয়ে এমনও হতে পারে 'এস ডি-৪০'এর টিউমার সৃষ্টিকারী জিন হয়ত ই কোলির জিনের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে বিশেষ প্রকারের ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি হল। সেই ব্যাকটেরিয়া একবার যদি



জিন হলে

মহেশ্বনাগরের বাইরে ছাড়া পর, তারা এবং তাদের বংশধর ব্যাপকভাবে মানুষের শরীরে ক্যানসার সংক্রমণ সহায়তা করতে পারে। হয়ত আমার এই আশংকা সত্যপ্রসারিত। তবু হয় একটি কারণ। ই কোলি এমন এক প্রাণীর ব্যাকটেরিয়া যারা জৈবিক বিলুপ্তির মাধ্যমে মানুষের দেহে আগ্রস নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। জিন ধরনের ব্যাকটেরিয়া শরীরে সংক্রামিত হলে শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তাদের সাবাত্ত করে। কিন্তু ই কোলির ক্ষেত্রে তার সম্ভাবনা কম। অতএব টিউমার জিনবাহী ই কোলি সম্পর্কে আমাদের সতর্কতা হওয়া উচিত। তাই আমার অনুরোধ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে বতর্কণ না সবই নিশ্চিত হচ্ছেন, আপনাদের

এই পরীক্ষা আগনি বন্ধ রাখেন।

শুরু হল বিতর্কের কড়। বাগ' দেখলেন, পোলক বা আশংকা করছেন, তেমন কোন জটনা তখনও পর্যন্ত ঘটেনি। তবে তঁর আশংকা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ফলে, তিনি তাঁর পরীক্ষার কাজ আপাতত বন্ধ রাখলেন।

এরপর 'রিকমিনাস্ট ডি এন এ' নিয়ে একাধিক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। এ ধরনের আলোচনাসভার বিশিষ্টতম উদ্যোগের মধ্যে ছিলেন বাগ' এবং ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডঃ মাক্সিম লিগোর। তৈরী হল ন্যাশনাল ইনসটিটিউটস অফ হেলথ কমিটি (এন আই এইচ)। কমিটির চেয়ারম্যান নিৰ্বাচিত হলেন পল বাগ'। এর পর ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কালিফোর্নিয়ার স্যানসিয়ার কনফারেন্স সেন্টারে বসল 'রিকমিনাস্ট ডি এন এ' অধু উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে মার্কিন হুজরাষ্ট্র, ইউ কে, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, সোভিয়েত দেশ এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রায় দেড়শ জন বিশেষজ্ঞ অংশ গ্রহণ করে। সম্মেলনে বড়ো ভূমিকা ছিল অনাতম। 'রিকমিনাস্ট ডি এন এ' সংক্রান্ত গবেষণার কী কী ধরনের নিরাপত্তা নেওয়া দরকার সম্মেলনে তা স্থির হয়। বলা বাহুল্য, মানুষের নিরাপত্তার কথা ভেবে কোন গবেষণা শুরু হওয়ার আগে এমন ধরনের উদ্বেগ পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম।

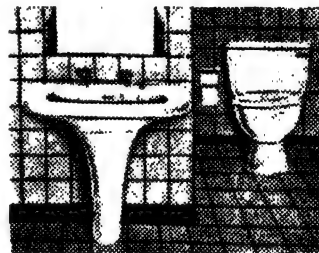
ওরালটর গিলবট এবং রেডারিক সাংগারের কৃতিত্ব 'রিকমিনাস্ট ডি এন এ' সংক্রান্ত পরীক্ষার ব্যাপারে তাঁরা আশঙ্কর করেছেন অনেক নতুন পদ্ধতি। ওরা একপ্রকার প্রোটিন অণু আবিষ্কার করেছেন, বাগের বলা হয় 'কেমিক্যাল রিপ্রেসর'। জিনের জোড়াতালি দেওয়ার কাপারে এদের ভূমিকা অন্ততম। গিলবার্ট এবং তাঁর এক সতীর্থ আলানি মার্সালম এক ধরনের রাসায়নিক বোঁগ আবিষ্কার করেছেন। এই বোঁগগুলির সাহায্যে 'ডি এন এ'

মর্মরের  
অপরূপ শোভা...

... স্যানিটারীওয়ার-এর উচ্চল সৌন্দর্য-  
খোডিয়ান

এসিড ইত্যাদির ক্ষয় হারানি প্রতিটি ভাবনায় হারিয়ে  
যাবে যেমনই বইর পাতায় খোলাই করে। তিনি ইতিহাসিক  
বটমাকলীকে প্রাণিত করছেন

খোডিয়ান ও তার ভাস্কর্যজাতক হারানি গিরকলার  
এক অতিবহু রূপে প্রকাশ করেছে। অনেক পৃথকায় বিজ্ঞতা  
খোডিয়ান ভাস্কর্যজাতক হারানি পোস্ত-এর সহযোগিতায়  
এমনে প্রকৃত হুত আর খিদি ভিলাইন, টাইল ও মরে পাকলা  
যায়। এতে আই এন আই মার্ক আছে।



Khodiyar  
**খোডিয়ান**

খোডিয়ান পানি ও মল নিষ্কাশন সিস্টেম

গিহোরা, গুজরাত ৩৬৩৩৩৩

সোনালী ও সাদা পলিশ করা একমাত্র নিরক্ষর ও নীচের পলিশ করা সিস্টেম



national 737 A BM.



ସଦୃଶ



କ୍ରିଡବରୀଜ୍ ଜାଣି ଯୋଡ଼...  
ମାୟକ୍ ମଜାକ୍ ସିଫି ଡେକ୍!



କରାଜା ଗାନ୍ଧୀ ଶିକ୍ଷାକ୍ରମ -  
କେବଳ ଏହି ଆଉ ଆମର ଚକ୍ରାନ୍ତ!

অপূর্ণ বিভিন্ন অংশকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। স্যাংগার আবিষ্কার করেছেন এক ধরনের 'এনজাইম'। এই এনজাইম জিনের অনুকৃতি তৈরীর বাপারে সাহায্য করে। এই পদ্ধতির সাহায্যে তিনি বাক্টেরিয়াকে 'ইনস্ট্রাক্টর' নামে এক ধরনের রাসায়নিক মৌল উৎপাদনে সক্ষম করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। 'ইনস্ট্রাক্টর' ভাইরাসের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে।

জিন প্রযুক্তিবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ এবং অর্থবহু করে গড়ে তোলার বাপারে বাস, গিলবার্ট এবং স্যাংগারের অবদান এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

### চিকিৎসা বিজ্ঞানে

প্রায়শই অনেকে মন্তব্য করে থাকেন, বৌল-গবেষণা থাক, প্রারোগিক গবেষণার উপর বরং বেশি মন দিন। কারণ প্রারোগিক গবেষণাগুলি ফল সরাসরি মানুষের উপকারে লাগে। কথাটা যে আংশিক সত্য, ১৯৮০ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে বঁরা নোবেল পুরস্কার পেলে, তাদের অবদান সেটাই প্রমাণ করেছে। তাঁদের গবেষণার বিষয় 'ইম্যুনোলজি' বা রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক বিজ্ঞান। বিভিন্ন রোগের নিরাময় এবং প্রতিরোধের বাপারে তাঁদের আবিষ্কার এক নতুন পদক্ষেপ।

পুরস্কার পেয়েছেন সিম্মলিডভাকে তিন জন। বাবুজ কেনেসেরাফ, জর্জ স্নেল এবং জিন স্নেল।

বেনেসেরাফের কর্মস্থল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। জন্মস্থান ডেনভারের কলরাডো। শিক্ষা প্রথম দিক পরি শহরে। পরে মার্কিন দেশে এসে প্রকৃতি নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং অক্সফোর্ড চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণা শুরুর করেন ভার্জিনিয়ার মেডিকেল কলেজে। ১৯৬০ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।

পরবর্তীকালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণার জন্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ করেছেন। এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুল, পারির রোসা হাসপাতাল, নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুল, ওয়াশিংটনের নিকটস্থ ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অব হেলথ এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৭০ সাল থেকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাথলজ বিভাগে তিনি চেয়ারম্যান। সম্প্রতি তিনি বসুন্টের সার্জন ফারবার কানসার ইনসটিটিউটের সভাপতি হয়েছেন।

স্নেল-এর জন্ম ম্যাসাচুসেটসের হ্যাভারহিল শহরে। শিক্ষা ডার্টমাউথ কলেজে। ১৯৬০ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ ডি। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'জেনেটিক্স'। ১৯৬৬ সালে তিনি বার হার্ভারের জ্যাকসন ল্যাবরেটোরিতে যোগ দেন এবং শেষ পর্যন্ত তিন বছর আগে ওই প্রতিষ্ঠান থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স-এর সদস্যরূপে মনোনীত হন। ১৯৭৮ সালে মনোনীত হন ফ্রেন্সের অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের সদস্য। এর আগে উল্লেখযোগ্য গবেষণার জন্যে চেকোস্লোভাক অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস তাকে 'গ্রেগর মেনডেল' পদক দিয়ে সম্মানিত করেন। যে কাজের জন্যে তিনি নোবেল পুরস্কার পেলে, তার স্মৃতি ১৯৬২ সালে।

"খুবই মৌলিক গবেষণা" সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেছেন স্নেল। "বাপার" যে খুব হতাশ করেই ঘটেছে, সে কথা বলব না। বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘদিন।...এক প্রাণীর দেহে অপর প্রাণীর বস্তু অথবা কোন প্রতাপ প্রতিস্থাপন করতে গিয়ে আমরা দেখলাম, প্রতিস্থাপনের পর সেই বস্তু অথবা প্রতাপ কখনও গৃহীত হচ্ছে, কখনও পরিভাষা হচ্ছে। আমরা জানতাম এই গ্রহণ এবং স্বল্পের কাজটি চালিয়ে থাকে 'জিন'। 'জিন'ই স্থির করে একের পক্ষে অপরের বস্তু বা প্রতাপ কখন গ্রহণীয় অথবা বর্জনীয় হবে। কীভাবে সেটা ঘটে সেই রহস্য উন্মোচনের জন্যে আমরা গবেষণার হাত দিলাম।"



জর্জ বেনেসেরাফ

এই গবেষণা চালাতে গিয়ে স্নেল তাঁর গবেষণাগারে লিভন প্রজাতির ইন্দুর তৈরি করেন এবং তাদের নিয়ে পরীক্ষা চালান। এই পরীক্ষা বৃক এবং প্রতাপের প্রতিস্থাপনের বাপারে 'জিনের' প্রত্যক্ষ ভূমিকা সম্পর্কে প্রচুর নাকচীর তথ্য যেগাতে সমর্থ হয়েছে। পরে দলে প্রমাণ করেন, ইন্দুরের অনুরূপ জিন মানুষের দেহেও রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে একটি নতুন কথাও শুনিয়েছেন স্নেল: 'হিস্টোকেমপ্যাটিবিলিটি কমপ্লেক্স'। জীব-



জর্জ স্নেল

দেহে এক শ্রেণীর রাসায়নিক বৌল অত্যন্ত সঙ্কট এদের বলা হয় 'জ্যান্টোজেন'। এরা যুক্ত প্রজাতি শ্রেণীর বৌল। প্রতিটি জীবকেই 'জ্যান্টোজেন' থাকে। তবে তাদের গঠন এবং বৈশিষ্ট্য ভেদে ভেদে বিভিন্ন হয়। বৃক অথবা প্রতাপের প্রতি স্থাপন সম্ভব, কি সম্ভব নয়, এই জ্যান্টোজেনই ঐ স্থির করে। যে সব জ্যান্টোজেন এ ধরনের কাজে সক্ষম তারা তাদের বলা হয় 'হিস্টোকেমপ্যাটিবিলিটি জ্যান্টোজেন'। আর যে সব জিন এই জ্যান্টোজেনের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে তাদের বলা হয় 'হিস্টোকেমপ্যাটিবিলিটি জিন'। স্নেল দেখিয়েছেন অল্প-প্রতাপের প্রতিস্থাপনই হচ্ছে নয়, শরীরে কাজকর্ম কোন ভাইরাস, বাক্টেরিয়া অথবা কোরাস্তু প্রবেশ করলে এই সব জিনই তাদের প্রতিরোধ করে রোগের হাত থেকে প্রাণীকে রক্ষা করে।

বেনেসেরাফ প্রমাণ করেছেন, কোন বস্তু ভাইরাস প্রজাতির আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষা ক্ষমতা তার বংশগত সূত্রে পাওয়া নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। গিনিগোয়ে দেহে নিজের তৈরী এক ধরনের সংশ্লিষিত বস্তু ঢুকিয়ে দিয়ে এই সত্যো তিনি উপনীত হন।

বেনেসেরাফ এক ধরনের জিন আবিষ্কার করেছেন। এই জিন শরীরের বাইরে থেকে আগত রোগসৃষ্টিকারী ভাইরাস বা বস্তুকে প্রতিলিখ করতে পারে। তিনি দেখিয়েছেন, এই রোগপ্রতিরোধী জিন প্রাণী জন্ম নিমন্ত্রণ দেহের মধ্যেই বংশগত সূত্রে লাভ করে। তিনি দেখিয়েছেন, কোন আক্রমণকারী ভাইরাস, বাক্টেরিয়া এবং অন্যের দেহের প্রতিস্থাপনযোগ্য অল্প-প্রতাপ কোন প্রাণীর দেহে সংশ্লিষিত হয়, তখন ওই জিন বস্তু ধরনের কাজ করে থাকে। প্রথমত তারা তৈরি করে এক ধরনের বস্তু। এই বস্তুটি আক্রমণকারী ভাইরাস, বাক্টেরিয়া এবং প্রতিস্থাপিত প্রতাপের কোষ-তলার সেলস সারফেসে। অঙ্গুরণে পরিণত হয়। এ নৈমিত্ত্য কেটে ওই কোষগুলি চিহ্নিত করে দেওয়া। পরিষ্কার করে বোঝান যায় দেহের নিজস্ব কোষ থেকে তারা পৃথক। এটা করা হয়, যাতে করে রক্তের স্রোত কণার এখের চিনে নিতে পারে। এর পর ওই জিন বিভিন্ন ধরনের খেত কণার (লিম্ফোসাইটস) মধ্যে বসতি পাঠিয়ে কীভাবে ওই সব আক্রমণকারীকে সাবধ করতে হবে তা জানিয়ে দেয়। "এই কাজ মানবিক নীরোগ করে তুলতে সাহায্য করবে।" বেনেসেরাফের মন্তব্য।

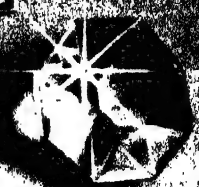
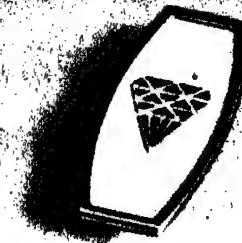
দলে তাঁর গবেষণার স্নেলের কোষকলার প্রতিস্থাপন পদ্ধতিটিই কাজে লাগিয়েছেন। পরীক্ষারত ইন্দুরের কোষ তিনি মানুষের কোষ-কলার প্রতিস্থাপন করতে সমর্থ হন। এবং সেটা করতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন কোষের চিহ্নিতকরণের কাজটিও করেন। তিনি দেখিয়েছেন রক্তের যেমন 'এ', 'বি', 'ও' প্রজাতি শ্রেণীবিভাগ আছে, প্রাণীর কোষকলারও রয়েছে তেমনি শ্রেণীবিভাগ। ইংরেজিতে বলে বলা হয় 'টিস্যু টাইপিং'। একজনের রক্ত অপরের শরীরে দেওয়ার সময় দেখে নিতে হয় উভয় রক্তের মধ্যে মিল আছে কি না। আরো শরীরে 'এ' শ্রেণীর রক্ত থাকলে তাকে 'এ' শ্রেণীর রক্তই দিতে হয় 'বি' শ্রেণীর রক্ত সে গ্রহণ করতে পারে না। ঠিক তেমনি কোন প্রাণীর প্রতাপ প্রতিস্থাপন করার আগে দেখা দরকার, সেই প্রতাপের কোষকলা কোন শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। যদি দাতা এবং গ্রহীতার কোষকলা একই শ্রেণীভুক্ত হয় একমত সে ক্ষেত্রেই প্রতিস্থাপনের পর বর্জনের সম্ভাবনা থাকে না। এই আবিষ্কার একের কিডনি প্রজাতি প্রতাপ অপরের দেহে প্রতিস্থাপনের কাজে সহায়্য করবে।

নোবেল পুরস্কারের সংবাদ ঘোষিত হওয়ার পর দলে মন্তব্য করেছেন, "আমরা তিনজনেই পরস্পরের নিকটতম বন্ধু। স্নেল এবং বেনেসেরাফের গবেষণাগারে গিয়ে বহুব্যয় আমি কাজ করেছি। অবশ্য ঊনাত্তম বছর পরীতে আমার গবেষণাগারে এসে কাজ করেছেন। আমরা একই পথের পাখি।"

সমরজিৎ কর

এই চিহ্নই স্বাক্ষর পাশে

G E M



G E M

**GEM**

রেফ্রিজারেটর

রেফ্রিজারেটরের গায়ে জেমের চিহ্ন  
মানিয়ে সেরা জিনিষের প্রতিশ্রুতি।

প্রতিটি জেম রেফ্রিজারেটরের পেছনে  
আছে ব্যাপক অভিজ্ঞতার ফসল, একাত্ত  
চেউ ও উত্থানের কারিগরী এবং তার  
ওপরে সারাদেশ জুড়ে হুড়ানো বিক্রীর  
পর অক্লান্ত সেবার ব্যবস্থা। এ সবার  
জন্মই জেম রেফ্রিজারেটর অতুলনীর।

জেম রেফ্রিজারেটরের কম্প্রেশর চের  
মজবুত এবং এর বিকল হওয়ার হার  
পৃথিবীতে সবচেয়ে কম। এ বিশেষভাবে  
তৈরী বলে ২৭% কম বিদ্যুতী খরচে ক্রান্ত  
ঠাণ্ডা করে। ফলে ভেতরের তাপমাত্রা সব-  
চেয়ে কম হওয়ার চের বেশী বরফ তৈরী  
করে। এর ফ্রিজারে অনেক বেশী জিনিষ-  
পত্র রাখা যায়। এর ফ্রিস্পারে বাজার  
বেশী সৌজন্যে ভাব বজার রাখার জন্য  
লাকসজী কল বেরীনিম তালা থাকে।  
এ বিহীন ব্যাপক ওঠানামা সহ্য করতে  
পারে এবং বছরের পর বছর কম খরচে  
বিস্তৃত ও স্বাস্থ্যসাহী কাল করে যায়।  
এর স্বয়ংক্রিয় বরফ গলানোর ব্যবস্থা  
ভেতরের খাবারদাবার না গলিয়ে শুধু  
জমা বরফই গলায়।

জেম রেফ্রিজারেটর সব পরিবারের  
মাগেই পাওয়া যায়। যেমন, ২৮৬, ১৬৫  
(স্বয়ংক্রিয় বরফ গলানোর বন্দোবস্তযুক্ত),  
১৩৫, ৯০ এবং ৬৫ লিটার মাপের।



জেম ডিপ ফ্রিজার ৪২৫, ২৭৫ এবং ৮৫  
লিটার মাপে পাওয়া যায়। পুরো  
রেফ্রিজারেটরের জন্য এক বছর এবং  
সিল করা অংশের জন্য পাঁচ বছর।

অতএব, রেফ্রিজারেটর কিনতে হলে,  
জেমের এই চিহ্নের, ওপরই নির্ভর  
করুন। আপনি ঠকবেন না।

জেম রেফ্রিজারেটর—চিরকালের  
জনা শুধু আপনাবই!



**GEM**  
INDIA LTD.

রেজিঃ ও হেড অফিসঃ  
২/৯০ কনট সার্কাস, নিউ দিল্লী-১১০০০১  
দিল্লী, বরেন, কলকাতা, মাঝাজ,  
আমেরাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, ভূপাল,  
ঝোকারো টীল সিটি, চণ্ডীগড়, কোচিন,  
কটক, ধাকবাদ, জবপুর এবং লাক্কো  
ক্যানকাল : পরজাবু (হিমাচল প্রদেশ)

Model-2505 BEN

## বেশি বাঁচলে

সন্তোষকুমার ঘোষ

পদ্য গদ্য পদ্য

চেনা ছবি, আপনা-আপনি বেন ক্রেমে এঁটে  
যায়। পালঙ্ক বিস্তারিত, বিমর্ষ হৃদয় কথোচিত  
আর তার রোগা রোগা লিকলিকে ধোঁয়া।  
ফুল ফুল, মত্প মত্প, দিররে, পারেও।  
চাপা কামা, কামা নয় বাঁধ-ভাঙা চুল  
ঢাক-ঢাক গুড়গুড় চাদরটা সংবৃত, সম্পূর্ণ  
ছেঁরে। তুলসীপাতার চোখ  
নির্নিমেষ চরে। শোকার্ত অঙ্গুষ্ঠ, তবে  
অতিশয় ভদ্র আর কথোচিত হৃদয়।  
দরজা ঠেলি, সরে আসি, একদম  
রিফ্লেক্স-বশত।  
মৃত্যু। চিনি। হিম, শব্দ। কত না দেখলাম।  
এই চিত্র-পরিচিত ?  
মনে মনে চট করে লিখে ফেলি “সেখতে হয় :  
বেশি বাঁচলে ঢের মরা। নিরুপমা।”

✱

আসবে ভেবেছিলাম, বলেও ছিল আসবে,  
ফিরবে। আসেনি তো! এল না।  
অবশ্য নিঃশব্দ বে জেগে আছি, সেটাই তার ফেরা  
বলে অহরহ নিজেকে বদি না জপাই, বদি না।

চিঠি ? পাই। লা-জবাব, বেবাক হজম।  
লিখিও। উত্তর মেলে না। মরা ?  
কত কতভাবে, কত দিন অনেক দেখলাম।

✱

কলিং বেল বাজে। কিংবা কপাটে  
টকটক, টকটক, লোভশিঙা বখন।  
সাদা - উহু, আর না। চোখ হাত চেপে কান,  
বিছানায় সটান। সিঁড়িতে তরতর,  
এল, না গেল ? নাকি নেমে যেতে কেতে  
ক্ৰমাগত আসতেই থাকল ?  
জানি না, যেমন আছি তেমনটি থাকি,  
এবার কানেও দুটি-হাত। পাথর, নিখর।  
থাকতে হয়, এই নিরম  
নিত্য-কৃত্য এই।  
এই চিত্রটার পরিচিতি ?—লিখে নিন, বলে দিচ্ছি  
“ঢের বাঁচলে ঢের মরা। মারতেই হয়।”

## দিনযাপন

তুলসী মদ্যোপাখ্যায়

জন্মের ঘরে কেটে যায়-সারাদিন  
খুব কিছু মাপের লোককে কুর্নিশ করতে হয়  
খুব উঁচু করে  
হাতের মতো  
দুপাচটা খুনের ইচ্ছে মা-মরা ছেলের মতো কর্দে।

সন্ধ্যার নিবু নিবু সূর্য বখন ডুবে যেতে থাকে  
আমি জেগে উঠি হৃদয়দড় করে  
দশ হাজার রমণীর প্রাকৃতিক দৃশ্যে মজে বাই  
অতঃপর ঝাপ মারি কারুণ-সাগরে  
খুঁতু কফ, বমির স্বর্গে আবছা ছায়ার মতো  
বলোর মারাবী আকাশ, কৈশোর-আকৃতি  
এবং জীবনে প্রথম প্রেম হাঃ হাঃ প্রথম প্রতিমা  
নিদারুণ কৃতিতে বেরারাকে ডেকে বলি—  
ওহে দঃখহরণ, আর একটা কাইল।

## উপবাস শেষে

কৃকা বসু

এই চোখ তার তুমল নিয়ে জেগেছিল খুব দীর্ঘ উপবাসে,  
সংসারের ভাঙাচোরা, লোকাল ঘ্রেনের পথে রোজ এক মৃৎ,  
চেনা স্থাপত্যের কাছে করে গিরে মরা চোখ, বেন মৃত  
মাছের কংকাল, জেগেছিল, তার কোনো কিন্ময় ছিল না;  
আজ দীর্ঘ উপবাস শেষে সে জেগেছে এই পাহাড়তলির দেশে,  
চারিদিকে অজস্র ফুলের মধ্যে দূর বনমালির সীমানার  
এই বনবিভ্রামের বাড়ী,—এইখানে কৃৎস্নের ভোজ,  
আজন্ম তুমার দাহে পড়ে গেছে তার অস্থিচর্মসার,  
এই নীল শূদ্রাঘর দেশে সে পেয়েছে তার খাদ্য।  
এই গম্বখন সকাল বেলায়, অলস মাছির শব্দে,  
কাঠপোকায় চিপ চিপ ডাকে, কান বিভ্রামের অবকাশে  
সংগীতের আর এক নাম জেনেছে নীরবতা !  
চোখ তার খাদ্য পেল। কান তার নিজস্ব বিভ্রাম,  
দেহ শূদ্র, পড়ে আছে এই ঘন কীরের মতন রোদে  
সারাবেলা, শীত নামে বিদেশী রঙিন অতিথি কত এসে  
এই বনবাংলোর চারিপাশে নির্বিড় জেগেছে;  
আমি এই বিদেশী ঋতুর কাছে  
ঠান্ডা হাত উক করে নেব বলে  
তার সখোর মতন রোদে করুণের সমেত মেলেছি।

# অরণ্যদেব







আমরা সবাই জানি...  
আমাদের মতো লোকের মতই কাজ করা

আমরা



আমাদের সৃষ্টি

# আপনিই দেখুন, দেতা ব্যাঙ্কে আপনার জমা টাকা কেমন ত্বরিতরিয়ে বেড়ে ওঠে...



## সমৃদ্ধি

### জমা যোজনা

আপনার জমানো টাকা  
ত্বরিতরিয়ে আশ্চর্য গতিতে  
বেড়ে উঠার মূল কারণ হ'ল  
আপনার আসল মূলধনের  
সাথে সাথে অঙ্কিত সুদও  
সুদ আর করছে... সুদের  
ওপর সুদ, তত্ব সুদ।  
১২ থেকে ১২০ মাসের  
মেয়াদে ১০০ টাকার মূল্য  
সংখ্যার অর্থ লয়ী করুন।

### ক্রম-পঞ্জিত জমা যোজনা

আপনার আয়ের মাসিক  
রকম সঞ্চয়কে ভবিষ্যতের  
মোটরকম থেকে টাকা  
পরিণত করুন। সঞ্চয়ের অর্থ  
আপনার পছন্দমত মূল্য  
সংখ্যা বেছে নিনঃ  
৫ টাকা থেকে ৫০০ টাকা।  
মেয়াদকালও পুনিমত্ত বাছুনঃ  
১২ থেকে ১২০ মাস।

### মেয়াদী জমা আমানত

সুখের সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার  
কক্ষে আপনি এই টাকা  
নিরাপদে সরিয়ে রাখতে  
পারেন। আপনার টাকা  
দীর্ঘ মেয়াদকালের কক্ষে  
জমা করে বেশী হারে সুদ  
আয় করতে থাকুন।

### ক্যাশ পার্টিকিফেট

এক নিরাপদ জমারূপে যা  
আপনা-আপনি বেড়ে উঠে।  
এই পার্টিকিফেট এইসব মূল্য  
সংখ্যার পাওয়া যায়ঃ  
২৫ টাকা, ১০০ টাকা,  
১০০০ টাকা, ১০,০০০ টাকা,  
৫০,০০০ টাকা ও  
১,০০,০০০ টাকা।



## দেতা ব্যাঙ্ক

(একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাঙ্ক)

সেন্ট্রাল অফিসঃ হেকার টাওয়ার্স ই,  
কাক পার্কেড, বম্বে ৪০০ ০০৫

আরও বিশদ বিবরণের কক্ষে আপনার  
নিকটতম দেতা ব্যাঙ্কের শাখার চলে আসুন।

জনগণের উন্নতি ও সমৃদ্ধির সেবায় সম্মিলিত

দাক্ষণপুবাচলের পথে মানসা দাশগুপ্ত

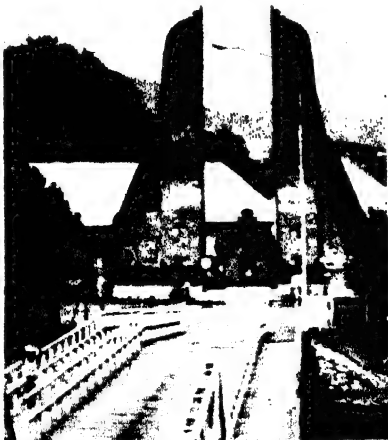
ইন্দোনেসিয়ার জমি হুয়েই তখন বোরোবুদর, প্রাচীনান কি পিডরে শ্রেষ্ঠে পুরুষ ছাত্রোচ্চৈঃ ন: কয়ে জাকাতার বাণ শিরে গিয়েছে কয়েকজন লোক, তখনই মনে হইল যখন হুয়েই পড়বে সে হুয়েই গিয়েছে কোথ' অর্থাৎ 'জাকাতার' সূৰ্য'. অত্যা যেরে কথা উঠে পড়ে সেখানে গিয়ে থাকিলে মার্চ'পল'পনে একট' বাবা পড়া অসম্ভব নয়। তবে, বাউট একবারে সেই এখন দিন যেমন কই মার জাকাত'র তেমন আবার সত্যাদেশমনি করকরবার একরকম অবিরাম বর্ষাধারতও হবে অসম্ভব নয় ওয়েশ' মাদেফনে। ওয়া দিগ্গম রথে জিনের ভিতরে একবার না একবার লিখা যেনেবে জাকাতার'র জনকি, যেরে বর্ষ'কয়েল সম্মো থেকে জাকাতার'র বাউট করলেও আনানর সনে নির বাইরে 'মর' বায়ান্ন কনো বম্বাশরকর। 'এই বাকারে বৈ কোকোর, যবে কি' করে?' এরকম ভেতোরক প্রম্নে সে 'শির বিনীত উত্তর দেবে. 'একট' মর'র কর' যবে'।' অর্থাৎ যবে দেখে কেউ করিলে ভয়- এই সারকথা যথ প্রকৃত কট্ট লিখ থাকে তা সে অমরও এই জাকাতালিঙ্গীপদমূর্ত্যের প্রভবেশবিদ্য। জনকি, সত্যাদেশ বে বোলকার যেরে গারে লাগ প' থেকে এসেছে সেও অনিষ্ট। মরত বোলকার'র ভিতরেই দেখেনে জাকাত'র মাম'লিঙ্গম বোলজিলেন 'ভগ্নে সেপ্টেম্বরে মর'র রাখে বোলজিলে। এর পর বাউট নাকলে তো আর মার' না।' কালভারের হিসেবত মূল্যনির হুয়ান বা বোলকার লগ ওদেশে অজের থেকে এতিলে। জাকাতের যে পব'ন্ত হজারের দৈকট। কিন্তু এত মর'ও সূৰ্য' এমিকও হলেল ন ওমিষ্টও 'হলে না।' অমরকর তেমন প্রভাহ একই সময়ে টক করে উঠে পড়' কস করে অদ্বা' হয় মাত হারি। প্রভাহ য: গোহালির বর্ষ'কট্ট নেই, দিন বড হয় ওয়া ছোট্টে যবে যাওয়ার কোনো হের ফর নেই বর'র জুড়ে। মর'র কখনো গায় না কেউ ওখানে। আম দর ইতুপ'জোর মতো ঘরোয়া ভ্রাতের কথা 'হুয়েই' দিন ম. ওবে যে প্রাচীন হিন্দু মেরুদণ্ডের নানা রূপ প্রকাশিত ১৩তম ছাত্রের গিরিলাভ তার ভিতরে সত্যাদেশবাহী মর'ের সাকিন হলেল না। সূৰ্য' দিনমণি, কিন্তু জুখনো সর্ব'পাশপুয় হিসেবে ওয়ের অপভ্রান্তজন হলে'হলেল এমন প্রমাণ নেই। ত'ই বলে সূৰ্য'র মর'কা কি একট'ও কম? মোটেই না। যাম-সাহ'সেতে জিক হাওয়া শুরোতে আছে তো ও সূৰ্য'. আর, প হাড়ী শুলে ঠাণ্ডার সঙ্গ দিতে? জাকাতার কখনো নাক না দেখা দিলে কি হবে ইন্দোনেসিয়ার জনে ঠাণ্ডা ককে বলে। জাকাতার'র কাছাকাছিই একট, উচ্চ, পুরুষ-শীতাত' মর, কিন্তু মনোহর। আরও ঠাণ্ডাতই আছে পাহাড় চমৎকার লগ জাকাতা যমন মালার সন্ন্যাসান। কিসকল সন্ন্যাসিনী সূৰ্য'বদন দেখা প্রের টাইগার ছিল সূৰ্য'দর দেখার মতো পূৰ্ব'পিত্ত বিকশিত। যদিও সাধারণ-ভাষা সন্ন্যাসিনী শরতে কিন্তুত আহারের কোড়াই চনালের কথা কেমন করে মন পড়ে মর'. মার্জিলিয়ারের কথা ঠিক তেমন ক'র সন পড় না। কিংবা ভ্রতর আমদের দেশের তুলনা ঠিক ঠিক হাটেই না। জাকাতার সনে ঠাণ্ডা, প হাড়ী জলগায়ার সনে কোন এক বিশিষ্ট মর'র আছে। সে কি তার মানিকজান্নর জন্যে? সে কি তার আচার' অরগাস'ময়ের জন্যে? ঠিক ক'র বানা কর বলা

এক বায়র বারোদিন ধরে ঐ পুণ্য পুণ্য একটা  
 ঘাসে করে ঘুরে আনামা লাভা হেড়ো বেকির আসব  
 যাবে এসেছি। একটাইটা চালকের হাতে গড়ি। মিঃ  
 হো নামে হামানব এক তরুণী ছিলেন বটায়  
 বন্দা দাশনিক ও পথ-পরিচরক। এই তরুণীটির  
 হাতেই বটায় ভিঙের অধিকাংশই ছিলেন চীনা-  
 ইন্দোনেসিয়ান। আমদের চলন্ত গৃহস্থালির রকম  
 এবং ব্যাবহার ছিলো এক স্বত্বাভিজ্ঞা লাভনী বকত  
 চাক্রে মিঃ মিষ্ট কয়ে ভাকুডন, 'বাস' মিঃ। এই  
 চাকরতার আহুতিই করে নতুন হিসেবে চালু হয়ে  
 সকলের মধ্যে। চলন্ত চলন্ত আমরা আসো যাবো

অজানা ভাষার কথা হলে সিদ্ধিহীন, চরিত্র ব্যক্তি  
পলার পলার গান কিংবা বাস্তবিক কনের মতো হলে  
হতে কলসে অভ্যর্থন কলসের দ্বারা আপল হতে  
হতে চালিয়ে এককর মিষ্টক চেয়ারের বিকল  
বেলা। এইসব ব্যাপারে মিষ্টক বক্তব্য কত  
অজানা নাল মিষ্ট। কলস নন পাইব  
—এই যে ব্যক্তি কলস মাও কলস মাও, হুজুজি  
হে। আর এ কলসি—আপল চালিয়ে চালিয়ে  
বেলা—বাস্তবিক নন বক্তব্য থাকে মিষ্টদের হতে  
আপনারের কত হতে 'নাল মিষ্ট'। জামাইের হতে  
চালিয়েদের ভাষা হতে চলতে কী করে এ প্রশ্ন  
করেনে অনেক কথা।

এ যে কথা আছে : 'যদি হয় মজল' । মজল  
হল কেবল তেঁতুলপাতার মজল কলত পারে তাই  
মজ, ভাষা বলে কখনও হয়।

তাই বলে কি আর একটিও অব্যবহিত হরনি  
প্রবন্ধ প্রবন্ধ ? হঠাৎ বই কা। পবিত্রস্বপ্নের প্রকাশ  
প্রকৃত তো বোকা বারনি যে চলা শুরুর মধ্যে কিছু  
বাহার ইন্দোনিশিয়াতে সব কাব্যনি চলে। সব  
দশ এগারো সত্ত্ব হ তখন কটিসরিই প্রাকৃতিক বাসনা  
ইন্দোনিশিয়ার সঙ্কল মানা। কখনো তো  
যেবে যার হটেই হ্রত বাল গলে বসিও না। কামল  
ইন্দোরসি কটি। সর্বাঙ্গই ইন্দোরী অধিকার।  
বিতসনা। তাতে কি আর সঙ্কল শব্দ সঙ্কলান  
হবে ? এই যেমন, সব বাহী কিল সেমরাই নাম  
সম্বর কেট করুজিতে গেই রাতিবাস শর হোটে।  
রায়ের জামের পরে সকলে কখন উঠত হয়ে কখন  
বাহার ব্রাহ্ম হলে শুর। এ সবই বাহী শিশির  
শিশির প্রকৃত বলে বাসনা মনে। নিদ্রা হরা  
সহজ নয়। কিকি নামে সহজই যে-জেনেটির মধ্যে  
দুশশিই ইন্দোরী শব্দ যোগার তাড়াতাড়ি এগারে  
কেনে অধ্যাপককে বলে গেল "হাক পাঠ কাইতে  
ঠাইর হতে হলে কিন্তু।"—মানে তকামা এ তো  
অতি আনন্দের কথা। ঐ গরম মতকে সহজে পঠিত  
কি আর সকল ! উঠাবা তে আরই। কুল ভেচে  
গেল বাহী ভের হ্রত হ্রতের চেম আদাই। আনলে সহজ  
নিদ্রা দিইলো যাকে ইন্দোরিতে বলস হাক পাঠ  
ফের। রওনাই সকল পঠিত। বাহা ইন্দোনিশিয়ার  
সেমেগা লিমা [অর্থ পঠি] মানে হলে স'ফ চার  
এসো সহজে পঠি নয়। কিকির বহুতে দিগে  
জোমাল হরনি যে হাকপাঠ কাইকি কিন্তু সাড়ে পঠি।  
তা তো বোকা গেল কিন্তু হেড়াইকি হ্রতশকল  
হলা না বোকা এয়ে রেয়েও চেম বোশি হ্রতশকল  
হরহুল বোনিশিয়ার কবি পাহড়ে, এ বাহামার  
কেনা। [এখানে বলে রাখা বরকত বোনা] কিসে  
কাখির 'ব' হচ্ছে হরর হ্রত বালগাতে আধা  
পেটকাটা 'ব' এবং অন্য 'ব'তে জিহ্বা রাধি বাধা



भावा एवम मयिज्जानी

অক্ষরমালা থেকে নীরবে হৃদয়কেন্দ্র পাঠ এইসব হৃদ  
উদ্ভাসিত করি।) যোগোন্মাদিত পৌষকালের  
আগেই এই প্রত্যাহার হঠাৎই হেরে, বিদ্যমান  
জগৎ পর্যাণ্ডিত্যে আর রাষ্ট্রের স্বেচ্ছা এল যোগো  
যোগী শব্দের হৃদয়কেন্দ্রিত্যে। জগৎই রাষ্ট্রিকলীন  
জিয়ার। আর করতলবর্তীর জিয়ার তবু সেইইই  
অকলস সিম্পের জন হাত-পা ছেলে ছেলে, দুঃখের  
কে কোনও। কিন্তু করে লক্ষ কল্যাণ ঠেক রাখতে  
পারানো তাই ব্যর্থতার করে মিলিয়ে দেবার। এই  
হেট প্রত্যাহার হৃদ পড়ন মটোলা কারি পাছোরে  
সাহসেছেন। ওইখানে মিলে পৌষকালের আরম্ভ কথা  
ছিলো। সুকর্মের জন্মস্থান ত্রিভাবের হৃদয়ত্ব মারবে।  
পূর্ব পূর্বে ভুলনা দেখে স্বজ্ঞ হয়ে ওঠেন ওঠি  
কিন্তু কেন্দ্রের আলস সে-প্রবর্ণনী না সহজেই  
হৃদয়েন হৃদ-প্রবর্ণনী পরে। কামের কামের হৃদ  
কামের কথা। তা ত্রিভাব দেখে কি সোজার  
হৃদয় কেন্দ্র মিলে স্বজ্ঞতা-বাহিনীরা না কেন্দ্রটিও  
স্বজ্ঞ হলে, মিলে ত্রিভাবের কেন্দ্র মিলে যোগো।  
ত্রিভাবের হৃদয়ত্ব মিলে এলাই দেখানো কিহট  
হলে না। তাহার ঠাঁওহলেম অস্বপ্নকলীন হলে কে  
অস্বপ্না ওঠে। তরঙ্গের পাহাড়ে পথ বের খলি  
ওঠি বাহি মিলে ওঠো। হিট হেয়েনা এক মিলি  
হৃদয়ত্ব বাহিনীর ওঠানর করে সন্ধ্যাকে হাসোছেন  
আর হৃদয় বাহি, ওঠানর করে অর্থ সন্তোষ কয়েন।

সম্ভাষণ। সোমবারে চলছি দুটিমধ্যে যেতে  
সেবার দিনে জনবাসিনা পূর্ব হবে। জীবনযিক  
পাথে মনের মতো বর কিলে কনা।  
বিরাহিতের পূর্ব নদু। দুটিমধ্যে কনা  
নিরে হাস হাসি চলছে। দুটিমধ্যে  
প্রাণিক মত হুজু দী এক পুরুষ  
ঢালাও পূর্ব পূর্ব ঘোরে এই দে-  
রকিত মোটেলিটে। এখন সেবার দিতে চাও  
তো প্রদানী বসে এইখানে। রাষ্ট্র সম্ভাষণ-এর  
দশক দেউল রুশ আর হলদে সম্ভাষণ। পঁচাত্তর  
বর্ষ।

‘সেঙ্গারা’ কী, বোঝাতে মিষ্টা ভিন্নিমি খেতে লাগলেন। আমায়ের ভাবিল অভিযানে সেখেল চলে যান লেখা। বুকতে বুকতে তার শেখা সেলে বকলাম সেঙ্গারা গ্রাম সালা বালায় থাকে কলো। পলে দেয়া। কিন্তু ‘মোটেল’ বলতে কী বোঝার? সেখানে কী করে হতে পারে মোটেলের হতা। হেথায় বিহারখানের আমদানী বাইতে হয়। সেখানে স্থানিক এক পুরকের পাশক ঢালাবিভনার সবুখা ঠিক সেখেনতে? এই ‘মোটেল’ এক পুখুখাস নিয়ে অকপক ময়শ উত্তেজিত হয়ে ইংরাজিতে হিটিকে বলতে লাগলেন ‘আমায়ের দুখনের গ্রাম, চিট হুইতের মাজন, সাবান সবুই তো একটি করে একই স্টুটকস এবং একটি ভঁয়ের ঝালতে মিরে এসে।’ আমায়ের কুনক দুই ছর থাকতে হবে অগম বললেন না কেন?’ মিষ্টা ‘করণ’ বুকতে পায়ের না ডিঁনি কী বলন, আর বিই শাকুল হয়ে কী বলছেন তা ডিঁনি ব্যেকন না। পল্লুর বিপদটি মাঝে বরে হেতে থাকে। এই মাঝখানে চেপে পাহাড়ী বিন্দি নামলো। বাসের সব মরজা চলল। লখ। বইরে দক্ষিণ দ্রুড়ে অক্ষার কলম করছে। সবাই যে বাস নীচকত বর করে গারে হুড়ে বসে। আমায়ার নীচের জন্য তখন টাইর হার খেয়েইনি নাগো। কে জানত জাকার্তার বাইরে এমন ঠাণ্ডা হবে। জাকার্তাতে তেজী বুলে কিছু, নেই। তবু, গরম জামা কোথেকে চলে দেখে হেঁসে। এখন পায়ের হাতুয়ার বিরহা সম্বল দুটি ওজনদার চাদর কঁথকাল থেকে বের করে দেয়া সেন। নবাববাহিত দুটি জুটি গয়ে-গয়ে খেয়ে বসছে। আমায়ের ওকর উকতা সন্ধান আর মানয় না। মিষ্টা কী বলছেন? আমায়ার দুখনে যে দার ছটা চেপে ধরে বসে রইলাম। বলতেই হবে, সর্জা কয়ে লাগার মতো জিনিস অমরা স্পেন প্রদী।

গম্ভীৰ্য্য শৈথিল্যে অবস্থা দেখা গেল ছাত্তার  
বিকল্প বহুত্বা ওখানে মজ্জা। আতিথ্য প্রসারক  
হাতা নর। ঐ পাহাড়ের গিরি গারে বসে বসে



ডিয়েং স্ট্রোটের বিনা (ভীম) মন্দির

দোকান তার ছোট ছোট ছেলেকে দিয়ে পশরা হিসেবে এই উদ্ভিদ ছাতার সাহায্য বিক্রি করে যাঠীদের কাছে। নাথ্যা বিনিময় মূল্যে যে কোনো যাঠী ছাতার তলে মাথা বচাতে পারে তবে আমাদের দলে যত যাঠী ছিলো সে তুলনায় ছাতার সংখ্যা মনে হলো কম। ভাবলাম আমরা তো ছাতার বিক্রে বিস্তারন, চটপট এগিয়ে উঠে গিয়ে কেথাও মাথা বচিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে পাঠাতে পারি ছাতা কারো হাতে যাঠীদের সাহায্যে। আমাদের সে দম্ভিক জাবনা শব্দে এঁ পাছাড়ের জগো দেবতা নিশ্চয় মঞ্চে টিপে হাসছিলেন। সিঁড়ির পরে সিঁড়ি বেয়ে উঠি, স্ট্রোভের মতো জল ঝরছে, পথ আর ফুরেয় না। উঠছি তো উঠছি ক্রম বেগ কমে আসে আমাদের চলার কিন্তু বন্দির বেগ কম না। পিছল পিছড়ে পথ দুর্গম মনে হয়।

এর ভিতরেই বোকা গেল রাতিবাস নিয়ে যে জাবনা ছিলো মনে তার অনেকটাই কথা। নিরুদ্বেষ বেশ পরিবর্তনর প্রশ্নই নেই কোনো কেননা সটকেস

রয়ে গেছে আমাদের বাসর ঘোলের ভিতরেই পছাড়ের নীচের ধাপে যেখানে বাস থেমেছে সেইখানে। এই দুর্ভাগ্য এত পথ বেয়ে কে আনবে মালপত্র এক রাতেই জন্য? কেনই বা আনবে? অন্য সকলে এত জামাকাপড় কিনেছে সেলোয়, সে সব পলিখিন বাগ করে গছে তাদের সঙ্গে নিরাপদ, শাতলা কাগজে মুড়ে রাখা নানা পরিষে বগলের তলে চাপে নিয়ে ওঠে আসছে তারা, জানতে বাগ? সেন্সায়াঙের সময় পেরিয়ে যাবনি তো?

অধ্যাপক তখনো জানতে উৎসুক 'মোটেল' শাখারটা কী? অপ্রত্যাশিত শীত, অপ্রত্যাশিত বর্ষা! এরা মানবিক বেসমসাময়িকের হৃদয়ঙ্গর আমার ভাষা চমৎকার গািলয়ে গিয়াছিল। রাতির আবাসে পেশীচ ঢালাও সারিবদ্ধ চৌকির ওপরে চাটাই পাভা দেখে বললাম 'ধর্মশালা টাইপ অফ থিং, বকুলে?' নিজের শকজটায় নিজেরই হাসি পেয়ে যাওয়ার দৃষ্টিতে মন খুলে হাসলাম বাট কিন্তু ভাষাজ্ঞানের অভাব যে খানিকটা ভিজে কাপড় পাল্টানোর



জাকার্ডার বাজার (পানার জামা)

বকখাটকুও সঙ্গে রাখিনি এই খেল ভাঙে পরো চলে গেল তা নয়। আর শীত! মাঠের মতো তা-হা করা ঘর। ধর্মরক্ষার্থে তারই একসারির চাটাইয়ে সমস্ত নারী এবং অন্য সারির চাটাইয়ে সমস্ত পুরুষের পরস্পরের মিকে পাছের তেলো দেখিয়ে শয়ে থাকতে হবে। মিইং ব্যাকুলভাবে পুনরায় কী যেন বলতে চাইলেন। এতক্ষণ পরে তার সাহায্যার্থে বলের ভিতরে মডেলের যে দুজন মেয়ে ছিলো তাদের ভিতরে ইংরেজিনদীশ দেবীশ্রী এগিয়ে এসে সরল মার্কিন ইংরেজিতে জানতে চাইল, জোমরা কি আগে বাতের খবার খেতে যাব না আগে প্রার্থনা করতে যাবে? খেতে যাবো বাইরে আবার? এই বস্তুতে অধ্যাপক ভারিভাবে বললেন, 'অম্মা পজাপাঠ করি না বকুলন? তবে দেবমন্ডানে আবার আমাদেব খেতে নেই কিনা টিক তই আজ রাতিবাসলো অস্তত আমরা সন্ধ্যা-সন্ধ্যা উপবাসই করবো ছেবেবাঁ।'—দেবীশ্রী তার বড়ো বড়ো চোখ আরো গোল করে ফেলে ফিরে গেল।

সকলে অবশ্য কাপি পাহাড়ের বৃপ দেখেছি। বস্তুি ধোয়া পথ সকলের আলোতে এক উজ্জ্বল আমলুপ জানাচ্ছে যেন। আরো অনেকখানি উঠে গলে জংগো মন্দির। এটি জাভানী বৌদ্ধ মন্দির। মন্দিরের মাধ্যম টিশলে রয়েছে। মনে হয় আগে এটি ছিলো শিব মন্দির। বর্তমান অবয়ব আঠারোশ একাত্তরে তৈরী। এইবকম লেখা রয়েছে বাইরে। সকলে সেন্সায়াং হতে বিলম্বে মন্দিরের দরজা তাই খুলে বম্ব। চাবপাশে স্থানীয় দর্শনার্থী এবং পাশ্চাত্য বস আছে এদিকে ওদিকে। অতটা উচ্চতে ওঠার আগেই মাঝামাঝি এক খণ্ডে চক্করের মতো এক ভিত্তি একটি মুসলিম প্রার্থনাস্থান বিদ্যমান। এটির গায়েও লেখা বহু ধর্মকথা। পার্থন ব কথা। এপেরে মন্দিরের পিছনে এবং পাশে ধাপে ধাপে বহু স্নানাগার। বকনার বহমান জলে এবং জমে ওঠা তীর্থজলে স্নান করলে পুণ্য হয়। পাশ্চাত্য ভেঁকে বলে গেল, স্নানাগারের ভিতরে উচ্চ জল পাওয়াও সম্ভব। রাতের বন্দির শেষে সন্ধ্যার সেই রোদে শীত আর ছিল না একটু। কিন্তু কাপড় জামা বম্ব রয়েছে বাসর গহ্বরে। স্নানের ভাবনাক আমল না দিয়ে কণে ছেড়ে সেলাম মাল্য মন্ত্রকে। ততক্ষণে ভুল গেছে ভাষার গোলের লগা। ভুল গেছে রাতের স্মৃতিস্মেতে ঠান্ডা আর চাটাইয়ের কথা। দেবীশ্রীর কাছে জানা হয়েছে কী করে বলে টেলিফোনস-এ চাকরির স্মৃতি সে সিংগাপুরে গিয়ে যত্ন করে ইংরেজি শিখে এসেছে। এদের তে উচিত ছিলো এভাবে কাউকে শিখিয়ে আনা আন্তর্জাতিক পর্যটনের বাস চালানো। ইংরেজি বলবে না কেন?—দেবীশ্রী বলেছে। উত্তর আমব হেসেছি।

মতদিনে সারাঙ্গানের পাহাড় চড়ায় উঠেছি এতদিনে শব্দ দেবীশ্রী নয়, আরো অনেকের সঙ্গে দুটি একটি কথা—এবার চেয়েও বেশি হাসি ও গানে,—বন্ধু হয়ে গেছে। সূর্যোদয় দেখবো বলেই বিশেষ করে উচ্চ চড়ায় 'লা' আবেশ গিয়ে থাকা। একটানা বাসে বাসে হা থেকে বালিশপীপ, বালিশপীপ থেকে ফিরে এভাবে এসে এই ক্রান্ত তীর্থযাত্রীর দল যেন সূর্যের প্রসাদের আশাতেই থামলো সারাঙ্গানে। পরবর্তে মাতাহারি চক্ষু বজের রইলেন। কুয়াশা ঢেকে রইল পাহাড়, হ্রদ, পথ। এ অবস্থায় লোক কী করে? অরে কসে কসে এটা সেটা খাশর থর না? এরা কিন্তু সব দলে দলে বেরিয়ে পড়লে সাহসের ভরসায় অম্বারাহণে আমাদের কী ডাক ডাকি সঙ্গে যাবার জন্যে! মিইং তো একাই এক ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এ কুয়াশার মাঝখানে। তিনি নাকি বায়বার এসে এসে এই পাহাড় পথ এমন ভালো কেনেন আর ঘোড়া চালাতেও এত দক্ষ হয়ে গেছেন যে, যেক্ষ কুয়াশা কিছুতেই তার জাবনা নেই। ফিরলেন অবশ্য সে-ই গাড়িতে চেপে। সকলে মিলে তখন নিয়ে এসেছে তাকে। কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে ঘোড়া যেক্ষে দিচ্ছিল মিইংকে কী ভাণা যে পাহাড় গাড়ি পড়ে যাবনি বেচারী। অরো ভাগ্য যে ঐ ধন কুয়াশা পদীর ফাঁক দিয়েও কিক দেখতে পেয়ে গেছে

মিঃ পড়ে কাড়রাজেন। পারে, হাতে, মুখে নানা বর্ষন ছ'দন দিয়ে জাতি রবাব শূইরে দিয়ে গেলেন তাঁকে। কিন্তু মিঃ কি শুরে থাকার মতো মহিলা? মাতাহারি স্ব' কুশনার ভয়ে না উঠলে না-ও উঠতে পারে কিন্তু মিঃ উঠবেনই। ওষুধ আর জলীয় পথের বল নিয়েই। স্ব'কেও দেখা গেল ভরদুপুরে মিঃমিঃ দিয়ে বেরোচ্ছে। তখন সবাই যে বর গামছা পেতে দিতে লাগলো হোটেল লাবুর বাওয়ার। না, স্ব'কে বসতে দেখার উদ্দেশ্যে নয়, বর-বার তোরালে গামছা শুকিয়ে নিতে। এ পাহাড়ের ওপরেও তো হাওয়া তেমন শুকনা নয় যে স্ব'বিশ্বীন হাওয়ারতে মেল দিলে হাওয়ার ভিজে তোয়ালে শুকাবে। তাই স্ব' দেখলেই অপায়ন। সারাংশানের এই পাহাড়ে শীত ছেড়ে নীচে রামতে নামতে জাকাতার এসে দি়ের দাঁড়ালে মনে হয় যেন ভিনদেশের হাওয়া লাগছে গিয়ে। গরমেট গরম কি এমনি গরমেট আর এর গরম হয়? বাপি রে!

তবু, জাকাতা হচ্ছে জাকাতা। এ যে বেড়ানোর পথে পথে যদিউন জেক কোর্দার হয়ে জাভার কতো গ্রামে গল্প দেখা গেল বাড়ির গিয়ে। বাড়িতে ঢোকান প্রধান দায়েরের এপাশে ওপাশে গেছে তেলা কিংবা একে লেখা 1945, তারপরেই 17 কোথাও বা তাকে উল্টে দিয়ে ভোরগের এদিকে 17, ওদিকে 71 রোমাই করা, সেউ উনিশশো পয়তাল্লিশ খৃষ্টিয়ান্দর মতোরাই অগস্ট কেউ ভোলেনি তো। সেই স্বাধীনতা ঘোষণার শপথের প্রকাশ আর প্রমাণস্বরূপ নতুন করে গড় উঠেছে, ভরে উঠেছে জাকাতা। নতুন বিশাল ওড়া রাণপথ যে কোনো একটির মাড়ে দাঁড়ালে মনে হবে প্রায়সর অতি আধুনিক এ কোন নতুন দেশে এলাম। যেন সে বাস্তব স্বচ্ছ গড়ন তেমনি সে সব পথে যানবাহনের দ্রুত চলান। এক পলকে সবুর সহিবে না কোনো গাড়ির। সব জেনারেলদের নামে নাম-পাঠানা প্রশস্ত বাস্তব গাড়ির চালকদের মোজা মিলটারি; চেচামেচি নেই। আজ চক্কর পলক হ'ল কর বোয়ি বাওয়ার প্রচণ্ড তড়া, দেখলে আলোর বাধানিবন্ধ না যেন রাস্তা পার হওয়ার কলকাতাই ভাবনা মন থেকে পালাবে আপনা-আপনিই।

রাস্তার নিয়মের ফঁদ কেবল পথচারীর জন্য নয়, গাড়ির চালকের জন্যও বটে। একবার যদি এ নিয়ম পথে ফুল গিলতে ঢকে পড়েছে কোনো চালক বাস, উদ্ভিল্প পথে ফেরার জন্য তার আর এদিক-ওদিক ব'হার কোনো প্রবনই নেই। তাকে চলতেই হবে সোজা নাক বরাবর এ ডল গলে ধরেই যতক্ষণ না কোথাও বাক নেওয়ার বিধিসম্মত অনুমতিচিহ্ন চোখে পড়ে। দেখতে লাগে কি? দেখা যাচ্ছে? চলো, চলো, এগিয়ে চলো। হয়েছে আজ অর ফেরা!—এমনিভাবে বিদঘুটে নিয়মানান স্ব'কি নিয়ও যে শয়ে শয়ে ব্যক্তিগত নানা ছ'দের গাড়ি সারাদিন জাকাতার পথে পথে ছোটে তার কারণ ইন্দোনেশিয়ানদের রয়েছে হেলের জোর। এটি এক অমোজা জোর। ওপেক-আসরে বাসে পড়তে যে-দেশ পেরেছে আজকের দিনে তাকে আর প্রায় কে? ওখানে সব মানবজনের তাই তেল পুড়িয়ে চলার দিকে ঝেঁক। গোটা একটা গাড়ি যদি না হলো তো মোটর-পাইকই সহ। জাকাতাতে তো বটেই যোগজাকাতাতেও আজকের ঘণ্টা আর ছ'টির ঘণ্টা যেই বাজে, প্রত্যহ মোটরবাইকের এক চলন্ত মেলা দেখা যায়। আর যখন সপ্তাহ শেষের ছ'টি? সবাই তখন ছ'টে-বাছাকাছি সব সুন্দর সুন্দর জায়গায় যাব যাব গাড়ি নিয়ে। গাড়ি যর নেহাত নেই সে গিয ধরবে রেলগাড়ি। জাকাতার ভিতর দি়েই যুর ঘুরে গেছে স্কোয়ারের ট্রেনের মতো এদের নিজস্ব মাপের রেলগাড়ি অর রেলপথ। শহরের এদিকে ওদিকে স্টেশন আছে একখানি ১২ কিংবা একটি ছাউনি, তাতেই যথেষ্ট। সেইসব স্টেশন ভরে দাঁড়িয়ে থাকে স্কুলের ছেলেমেয়ে, পসারা বা পারার মতো সাধারণ যাত্রীরা। ট্রেন আসি-আসি হলেই পথের ওপরে গড়নি দরজা সড়াক করে, সেটে গিয়ে রেললাইন আর সড়কপথের মাঝখানে স'ধা সর্দি কর দেয়, ট্রেন চলে যাওয়া মাত্র



মুর্গা বিক্রি হচ্ছে

তড়াক করে সরে গিয়ে পথ খুলে যায়। দীর্ঘ শ্রুতীক্ষায় এদিকে ওদিকে পারিষদ যানবাহনের কম্পান দশা দৈনন্দিন দেখা যায় না জাকাতায়। হয়ত শহরের আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা এখনো কম বলে। সেইজন্যই হয়ত বাসস্থাপনার গৃহ এখনো কম করছে। সহজ তো নয় জাকাতার বাসস্থাপনা। জাকাতা এমন মসৎ একটা জায়গা যেন হয় যেন একটা গোটা প্রদেশকে শহরের ভিতরে পুরে ফেলা হয়েছে। সমস্ত অঙ্গলেই সমান শহুরেমানার ছাপ পড়েছে তা নয়, কিন্তু নাগরিকতার বিস্তার ঘটনের চেষ্টা চলছে দ্রুত। যত না রাস্তা তত আলো আর প্রতিটি পাড়ায় মস্তায নতুন নতুন বাজার। এসব বাজারের ভিতরে অনেকগুলি ভিড কম্পেই চয় না তেমনি আবার কতগুলি দারুণ রাজস্বজ্ঞা নিয়ে শনা প্রহর গধেনে। এতে কিন্তু দোকানপাটের বিকির্কান বালিকা-বালকদের তাপ-উত্তপ নেই একটুও। হাসি হাসি মুখে তারা নিজের নিজের সচানো দোকান নিয়ে মেতে আছে। ক্ষেটবা

গান বাজারে শোনছে, কেউ গল্প-গজব করছে নিজেদের মনে। ক্রোতা দেখলেই এগিয়ে আসিত তৈরী, কিন্তু খন্দর হাঁদ কিছ, না কিনে কেবল দেখে দেখে চলে যায় একজনও পিছু ডেকে বলবে না "এই যে দিদি/মসীমা, দেখুন না, ভালো শাড়ির ফলস, কিংবা ভালো জিনিস আছে।" না ও-রকম হ'কডাকে অনভাস্ত ও দেশে এ নম্ব সুন্দর মানব-গাল। হবে ভিতরে বাজারেও তাই ঠেলাঠেলি চলে কিন্তু চেঁচামেচি নয়। একটুও নয়। এমন কি বাসের কণ্ডাকটর যখন জানান দেবার জন্যে শড়া তুলে ডাকে "পলরা" এমন লাজকে শোনি ষ সে মবর যে উৎকর্ষ হয়ে না থাকলে শ্রুতে তুল হয়ে যেতে পারে। একই লাইনের এক বাস থেকে অন্য বাসে মহকুমীকে হেঁকে কথা বল: কিংবা খেপিয়ে হাসা। এই তো পার হয়ে গেলাম কি ব ওস্তাদ, চালা চালা। মাত্র একদিন শ্রুতে পেরেছি প্রায় এক বছর ধরে জাকাতার পথে পথে বাসে ঘোরাঘুরি করে। যে এ বকম খেপ ছিল সে কণ্ডাকটরটি



সারাগানের পাহাড় চড়ার লাক, বিরামদান



এই প্রথম ।

# সোনার

সিওন ঘি

প্রাচীন বাঙ্গালী ঐতিহ্যে  
নতুন পরশ আনে



বৌভাতে, প্রীতিভোজে রান্নার স্বাদগন্ধে সবার মন জুয় করে

বৌভাত—বাঙ্গালী ঐতিহ্যের এক  
বিরাট ব্যাপার । এবার চাই সবার  
সেবা জিহ্বায় । সোনার ঘি-ই  
আপনার রান্নায় এনে দিতে পারে  
সেই স্নেহজড়িত স্বাদ । সোনার  
একটি ঘি-ই হয় সম্পূর্ণ ঘি—যা যে  
কোন প্রীতিভোজে আর উৎসবে  
এবং দৈনন্দিন ব্যবহারে  
তা এলেই নয় ।



সোনার ঘি-টি ঘি

- অপূর্ণ স্বাদ, অল্পময় সুগন্ধ
- গুণমান সবসময় একই বকম,  
হাতে না চুঁয়ে যেখানে স্বাদ্যকর  
পদ্ধতিতে তৈরি
- স্বাদ্যকর পদ্ধতিতে প্যাক করা  
যাতে ঘি-টির ঘি-এর গুণ  
অক্ষয় থাকে
- ২০০ গ্রাম ও ৪০০ গ্রামের  
সিলবন্ড টিনে পাবেন

সোনার—ঘরে তৈরী ঘি-য়ের সব গুণবৈশিষ্ট্য ভরা—সব বেলায়—প্রত্যেক দিন ।

নিম্নেরই অধিকতর সুসজ্জার লোক কেন না, মনুষ্যই, সুসজ্জারিলা এসব কাপড়ে জাতানদের ঠিক উঠে। জাতানদের বুক কটে তবু, যখন কোটে না, তখনকার ঘাব ধারে না সমস্যানরা। ইদানীং অনলা জাতানরাও একটু, একটু করে পায়ে দাঁড়ে। দক্ষিণদেশের বলা বার নতরান প্রাণীদের যে সাধন পরিবর্তিত ছিলো জাতার জামা, তপ্পিত, ডায়ে—এই সেদিন পর্যন্ত, তা রনে চেহারা পাতে ফেলছে। তবু জাতার মানবজনের নিহু গলায় এবং নরম কথার ভঙ্গিতে চেনা যায় তাদের সেই পুরোনো সমস্যার আদর্শ।

এই প্রাচীন ভ্যাতজ্ঞানের প্রভাবে আজও এখানকার খেপে খিঁসে কিবা চাকরের আকর্ষণ হতে খিঁকির দক্ক। দিয়ে, সামান্যমান নয়। সময়ে চমককার দরজা রয়েছে সেইখান কসই রয়েছে দরজার কয়েই বৈঠকের আরম্ভ কেরার বাড়ির তুলনা। প্রকৃত। কিন্তু এরা সে ঘরের এক ঘর পেরিয়ে পিঠান দিক দিয়ে এসে জানান দেবে নিজেদের আশঙ্ক। জাবানা কেন, হুড়া দরজা হচ্ছে বড়োবড়োবড়ো জেনে। অতঃপর এইসব মানবগুলির পরনের পোশাক এখন হতে গেছে পাকিস্তানী। চমককার আধুনিক চাঁদের স্মার্ট সমস্ত ছুর এসে একেবারে হুটু, সেড়ে যখন ছানি নামে দলীলি আপনাকে পানীর তল এগিয়ে যের, আপনায় একটু অস্বাভাবিক হতে পারে বই কি। পূর্ব-পশ্চিমের সংস্কৃতির মিলন আরম্ভের সেনে ঠিক এমন চেহারা সেরনি তো। এ হুটুগাড়ি ব্যাপারটা যেনে ততখানিই চমক লগে হতখানি লগে সহায়ক-সহায়িকার স্বাক্ষরবিহারী সাম-সজ্জার চুলচীড়ের বাহরে, সুসজ্জা সোফা ক্রীমার নির্বাণ বর্ষহরে। হতে পারে এসব অহর জাকজার বৈশিষ্ট্য, যবে সম্ভব তা-ই। কিন্তু নতুন যে ফেরওয়াজ কিবা কেওলা আসে এবং দিন কয়েকলে নিজের নিজের পুরা এবং বাড়ি নিয়ে সরে বার শহরের পথ ছেঁকে, তাদের দারিদ্র্যও তো মীলন করে না সেই সব মানবগুলিকে—এ কথা কম কথা নয়। এরা একভাবে বঁচতে দিচ্ছে হতে এবং সময়ে গরীব থাকলেও গরীবের না হুটুকেন, তবে প্রভা চোখে বিস্মিত করে না। সকল থেকে সন্দ। ঘরে ভিতরেও এরা জানে সেহকে হুটুকেন, রাখ-সহজ মিলে। গরু, পশু, প্রাণীদের অঙ্গপদে যেনে রাখা সজ্জার ছোট একটু সূত তো এটা বা অপ্রকাশ্য, প্রতিকাল, বিপদ সেই সব কিছুইই আচ্ছাদ করে ফের সেই সূত কোনো এক সময়ে ইন্দোনেসিয়ায় জাতানরা আরম্ভ করেছিল একদা সে সূতা তাদের হাত থেকে দুয়ে এলিয়ে যায় নি। পশ্চিমী মন্ত্রকে বাহ সজ্জা যখন সমস্ত অভিজ্ঞতাকেই রানান করে বলতে শিখিয়েছে, হলে হলে, দেখির দেখির বলা এবং নিরাস্ত করা তাদের করোয় না। দক্ষিণ-পূর্ব মন্ত্রকে এ মানবগুলি তেমনি নিজেই হাসতে আর চুপ করে থাকতে। এ কেবল ছুরের ভিতরে সন্ধান সগো মাপা হাসি, মূঢ়, বাক্যলগ্ন কিবা, ব্যাক-চীন সমস্তের স্থাপার নর, বেশ গোলমেলে টোলা-টোলাতেও এরাই মনোভা রক্ত ভাঙের। এ রকম একটু দৃষ্টান্ত নিতা দেখা যেত কিংবাগালগত সলেশন ডাকঘরের সময়ে। প্রয়োজনের তুলনার ওখানে জকখর তো বেশি নেই কয়েই কিংবাগালগত সলেশন হলেও ওখানে পড়ানু-লোক জেতা হরে যেত। কিন্নর করে পরব-উল্লম্বের দিন এসে তো ল্যেত বই-বই। অত লোক জমে সেহে হলে যে সাব সেহে ডাক ঠিকিট কিনার মনে একের পিঠনে অনন্য দাঁড়নে তেমন রীতি নেই ওখানে। আপনি যদি কলকাতার লাইন লাইনের অভ্যাসে ও রকম দাঁড়তে সলেন তো দেখবেন আপনায় এ কীরকম পাখ বেহে, ও কীরকম ওপর দিয়ে নানা রকমের হাত এবং মূঢ়, টেলে টেলে আনছে, পরমা গলে বাছে যবে মূঢ় জনেরামসহ ঠিক কেরাভিত্তে ও কলকাতা স্টেশন। গিটিটার ঠিকিট ঠিক আছে? দেখবেন, ডাক কলকাতা দিক হাসি হাসি মূঢ় কেন না পারছে দিক দিক বাছে ধীরে সূত্রে। এই যে গাভাখি, পিঠনে থেকে উঠিয়ে আসা, এ নকি



খালিহাদের বেনাকি (বৈশাখী) মন্দিরের ভিতর

চলছে যবে খোপেখোপে। দক্ক সে যিহে এক যে বাছে মূ, তকেরই ডাব কেন ব্যাপারটা বেশ জ্ঞান। কেনো রানু-যে নেই। এইসব কথি গলাগলির ভিতরে তখন আপনিও গলতে হুটে কককন গতস্তর নেই। এ রকম ভরা। সমস্ত বাহরে একেবারে হালছাড়া। কী হবে রীতি-নীতির কথা ভাবি? অতঃপর কতো রকম রীতি-নীতি যে কালেশ্বরে দাঁল দল্লরকেনে জাতির ভুলেয়ে ওয়েশে ওয়াই, সেও এক আশ্চর্য কাকত। তাত্তও সাধারণ মানবের কেনো তাপ-উত্তাপ টের পেরা যায় না। কোরকও এক পা লম্বতে হলে একদো রকম হুটে-কুৎ যেনে-সেজ রানি বোলক করে আনতে হবে? ঠিক অহে, তাই হবে।

এই যে আপাত শান্ত স্বাভাবিক এর পিঠনে ঠিক কী অহে জেব ইন্দোনেসিয়ার বইয়ের সন্ধান মানবজন একটুখানি অস্বাভাবিক বোঝ করেন : 'যে তজ এরা কিন্তু দেখবেন কেউ আপনার বখা' কহে হলে না। কখনো না।' কিবা 'কখনো মন খেলেন না এরা। বছরের পর বছর আপনি এদের সন্ধ্যা ফের উঠন, বসন, কাক কলন, হাসন, দেখবেন এরা যেমন হুর তেমনি হুর একটা আড়াল থাকছেই।'

এই রকম অল্প কথ মনুষ্য—বাঙালী-অবাঙালী ভাষাতীর অজান্তর অস্বাভাবিক করে। সমস্ত কলকাতায়ে এরাই অস্বাভাবিক মানব চৌনি, রাষ্ট্রপতির কাক দেখেন ওয়েশে। হুরে হুরেই নর। দেশ হুটে কাক ভরা। স্থানীয় সংস্কৃতির আন্তরিক উৎসাহ এবং সহযোগিতা ছাড়া তার কাক এগিয়ে নিহে যোগ্য পথ নেই। সেই সমস্ত পূর্ব-বেগীরা সকলেই হাসিমুখ, অতিশয় ভাব কিন্তু চৌনি কিহুতেই হুটেতে পায়ন না কাক লিহের এদের ধারণা কেমন। তাদের অস্বাভাবিক মত কী? এই প্রশ্নগুলি দাঁড়াবে, কাক জেব? চৌনি অস্বাভাবিক, এর চেয়ে সোমসুজ বাই ঠোরা বলতে, এগুলো চাই না কিবা, ওইগুলো চাই, তা হলে লম্বতে কঠিন হতে সে সব কথা, হরত বা উত্তরজনা রমতো সজ্জা। কিন্তু কোকও হো এগোলে কলকাতা, কিহু তো ধরা বেত? এ যে সন্ডাই নর হাসি দিয়ে ঢাক-মত অমত সবই। দিনের পর দিন জড়ে শূন্য, সৌন্দর্যলগ্ন, মূঢ়াঙ্গল হর এতে মত আন্তরিক আগন্তুক কলকাতার। এই একই মূঢ়াঙ্গল কি কোনো জাতনী অনুভব করেন না কখনো?

আমার কেমন দেখে-দেখে মনে হয়েছে যে এম উত্তর হবে : হ্যাঁ, সম্ভবত করেন। কিন্তু সে অনুভূতি তো সূতের নয়, আর বা সূতের নয় তাকে কিভাবে খোলাখালি তিতে হর অথবা প্রকাশ করে বলতে হয় তা বোঝ হয় ঠিকমত দেখার সুযোগ জ্ঞান ভাঙের সময়ে। তাই হুর না প্রস্তর দিয়ে অর পেহেই যে-সমাজে সকলের চলবার কথা, সেখানেই এলে সেই অভিজ্ঞতা বার নাম ইংরেজীতে 'গানি অস্বাভাবিক'। নরম হাসির রেখা ছাড়া আর কোনো রেখা, বাহের মত এতে তোলায় কথা ভাবা

যার না তারা খেপে হুটাত্তজান শূনা হরে হুটাত্ত, কিশাস করত ইচ্ছে করে না। অতঃপর হর তার প্রায় এই বাক্যকথ। একে শূন্য ইংরেজী তার র কিবা ইংরেজীভাষী পরিজ্ঞাকের বিকৃত কলপনা বলে কীরকম দেখা যাবে না। 'আমু' একের নিম্নে মল্ল এদেরই অভিজ্ঞতার। এরা পেরেছে 'মেডাম', 'বানি আমু' তারই স্পষ্টতার মাঠ। জেবে দেখলে এতে আশ্চর্য হওয়ার তেমন কিছু নেইও। বলা যায়, এটাই প্রত্যাশিত। কীবা বাগ, রাগা বাগ, চেচানো বাগ —এত রকম চিরকাল কি সকলে স্টুতে পারে? কখন আর একেবারে সর না তখন স্বভাবিক প্রকাশের পথ না থাকলে অস্বাভাবিক মিলনিক জ্ঞানশূনা অহেতের বোকা টেকরন কে? ররীয়া মনুষ্যের সেই চেহারা ধরা পড়ে বানি আনাকে।

এই রকম উল্লেখ জোয়ের চেহারা ওখানে এক-দিনও ঘোঁরা। এর কাছাকাছি একটুখানি দূশা মেহেছিলাম সলেশন-রানুস্তার। কিন্তু সেট সূত্রে এ-ও দেখেছিলাম মায়মুখা মানবটিকে অস্বাভাবিক বলে টেকবার জন্য দাঁড়িয়ে গেছে তাদের। সাধারণ মেওয়ার বরন কত ধীরাম্বর, তাদের মূঢ় কথা কত সন্দ। যে-অস্বাভাবিক আশ্চর্যের সেনের মানব অহেই হু-হুয়ার দল্ল বলে যাবে সেখানে সকলের মূঢ়ে জাকজার কুটিটার বেশি লক্ষ পোনে লো না। মন্দির বাহরের বেনাকি (বৈশাখী) মন্দিরের কুটা সলেশন কুটা কিন্তু তেমনি আবার ওদের ততটা নেই। আশ্চর্যের সেনের সল্লা এ তফাতও বনিকটা মন্দিরে পড়ে। কিশাস করে বসের ভিত্তি। একজন দাঁড়িয়ে গাথা স্বেচ্ছাচকি নিজে নিজে যাওয়ার সময়ে আসনিটি কেউ দিয়ে কেতে চন, তিনি কেনো রকম 'এই কে 'আপনি বসুন' এ ধরনের কলকাতার ভিতরে না গিয়ে বিনা সন্ধ্যাক্তে সজ্জারাম সহযোগিতা স্পষ্ট করে এর মনোযোগ অকর্ষণ করতে পারেন। এ'আপনার বরল কিবা স্টা-পূর্বব ছেদ নিয়ে কোনো রকম বিবর্ত ভাব দেখা যায় না। যবে 'সহজেই যে কারো সহ' অথবা পূর্বে স্পষ্ট করে একজন সহযোগী নিহের আননিটি দেখির দিয়ে হলে। এতে কেউ 'মল্ল' ওঠে না কিবা হু-হুচক বলে না। বসতে দিত চাওয়া ছাড়াও এরাই কথা বলে ওটার 'প্রয়োজনেও ওরা এটুকুই জেনে মনোযোগ অকর্ষণ করে। আমার এ অভিজ্ঞতা একদিন হলো একটু বিচি-ভাষায়। বর্তমান আমি মনে মনে দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতার পানে তাকিয়ে ততদিন আমার মনে যিরে 'কিরে আশ্চর্য এই অভিজ্ঞতা।

বসে উঠেই দেখেছিলাম এই ছাত্র দুটি লক্ষ করছে আমাকে। ওদেরই কাছাকাছি আসন পেরে কল যাওয়ার দৃষ্টতে পোয়া ওরা নিহেদের মল্ল কী কলকাতা করছে। একটা ছেলে 'বলছে অন্য জনকে যে, আমি নিম্নেরই বাংলাদেশের মেয়ে। অন্য জন যবে হু-হু মন্দির কিছু একটা প্রতিবাদ করছে। সম্ভবত সে কলকাতা খোঁটা দিয়ে থাকবে 'তুমি সব জানো গোহের কিছু' বলে। এর পরেই যে মেলেটির নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল যে আমি বাঙালী সে একটু, কুৎ 'পড়ে আমার হাতে টোকা ছিলো : 'একটু, মনুষ্য, আপনি বাংলাদেশের, তাই না?'

এখন এ প্রশ্নের কী উত্তর? এ তবু ছাত্রটি একেবারেই ঠিক করছে অত ঠিক তো না। জেব কি এর উত্তর হবে 'হ্যাঁ' এবং 'না'? কিন্তু সে উত্তর ব্যক্তির কল বার কী করে? কম কথা বেশি কথা, কোন কথা প্রকাশ করে বলা যায় এই খিঁসখিঁস ছাত্রটির সহজ প্রকাশের কথা? উত্তর? যেমন করে যতবার সাজাই নানা ভাষা, প্রশ্নটি যিরে 'কিরে অস্বত থাকে। সামান্য ঐ কেরকটি লক্ষ কী কঠিন ধাঁধা'মতো সোনার। —আমি কি বাংলাদেশের? আমি কি বাংলাদেশের নই?

আমার নামার 'হায়র এসে গিরেছিল। আমার ইচ্ছে হেরেছিল হেলেকিট জিজ্ঞাসা করি : কী করে সে অনুভব করলো। আমার বাঙালীরা। সে সব কিছুই না করে আমি কলকাতাকে ছাত্র দুটির দিকে চেয়ে হাসলাম।' বললাম, 'আমি ভারত থেকে আসছি।'

**খাওয়াভরা রসনা!... এক সেশনে খেতে খাবার  
খাওয়া যায় না! আর খাবার খাওয়াতে যা রসনা  
এর জে ফেরাশের দামের একেবারে জায়গা নেই।**



রসনা-র প্রতিটি প্যাক থেকে পুরো ২ সোভাল সরব্ব তৈরী হয়—তার থেকে ৩২টি  
সোভাল করে কেবল—ফেরাশের দামের জটিল করে! রসনা—তে জল মেশান অথবা সোডা  
মিশিয়ে ফেরাশিত করে তুলুন—তারপর খেতে আনুন... শুধু মজা, মজা, আর মজাদার!  
রসনা তৈরী করা কত সহজ!

রসনা-তে শুধু জল আর আর চিনি মেশান— নিজে খাওয়ার আর অপরকে  
খাওয়ানোর জন্যে রসনা তৈরী। নানান অভিজাতীয় খাবারসমূহ রসনা-র মধ্যে থেকে যে  
কোনো একটি বেছে নিন। বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ বাঙ্গালী কোলা-তে শুধুমাত্র সোডা মেশাবেন।

**রসনা** প্রাণভরে খান, প্রাণভরে খাওয়ান।  
সবকিছুতেই সেরে ফেরে।



# বাতাবরণ সোমনাথ ভট্টাচার্য

জন্মগাটা সত্যিই খুব ভাল লাগছিল। নিবিড় কাউন্স, প্রব... প্রব...  
বহু, পীর মত সমুদ্রের বড় বালুচর, বসবাসের স্বাচ্ছন্দ্য—সব মিলিয়ে কোভ  
উত্তরের কোনো কারণই ছিল না। নতুন জায়গার আসার প্রথম উত্তেজনা কেউ  
হাবার পর ছেলেমেয়ের উৎসাহ যে কিম্বা এসেছে খানিক, বিকাশ বৃদ্ধিতে  
পারছিল। সেটা এখানকার নিজ নতুন জেনো। বোয়ার নিজের কোনো পছন্দ-  
অপছন্দ নেই। বসবাসের মোটামুটি ব্যবস্থা, বিশেষ করে পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা এবং  
নিরাপত্তার দিকটা বেশ শক্তপাঠ বকে নিতে পারলেই স্বামী এবং ছেলেমেয়ের  
পছন্দ—তারও পছন্দ। ছেলেমেয়ের এক্ষেত্রে কাটাবার জেনো বিকাশ সামনের  
ফকা রাস্তার গাড়ি চালাবো শেখাতে শুরু করে দিয়েছিল। মিলি, মোটামুটি  
গাড়ি চালাতে জানে। বিকাশ ওর হাতে স্টিয়ারিং ছেড়ে পালে শুরু সতর্ক হয়ে  
বসে থাকে। জরের বসেস এগারো। দাঁদির দেখাবোধ সে নাহেড়। প্রার কেলে  
বসিয়ে মাঝে মাঝে তার হাতে স্টিয়ারিং দিতে হয়। পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়নি। মিলি,  
জর এই নতুন খেলার বেশ মেতে উঠেছে। বিকাশ বৃদ্ধি, সামনের শনিবার  
পর্যন্ত দিবা কাটাবে দেওয়া যাবে। কলকাতার ফিরে রবিবারটা বিশ্রাম। সোমবার  
থেকে আবার কাঁধে জোয়াল।

টরিস্ট লজ্জটা সুন্দর। অন্য রকম। কঠোর বাড়ি। আসবেসটারের চারচালা  
ছাদ। মোটা মোটা খুঁটির ওপর মাটি থেকে প্রার চার ফুট উচুতে তিনটে ছবিছানার  
ছাদ। চার ধার দিয়ে একেবেঁক চওড়া বারান্দা। সবুজ রঙ। একটু দূরে জলের  
ট্যাংক। নীচে পাশের ঘর। এখনও বিদ্যুৎ এসে পৌঁছানি এখনো। জেনারেটর  
চারদিয়ে ট্যাংক জল তোলা এবং রাস্তে লজ্জ আলোর ব্যবস্থা। সব কিছুতেই একটা  
সাময়িক ব্যবস্থার ছাপ। লজ্জের সামনে, রাস্তার ওধারে ডানদিক চেপে অনেকখানি  
জায়গা সাফ-সুতরো, মাটি ফেলে সমান করে রাখা। বছর কয়েক আগে, পূর্বতন  
স্বাধীন নতুন টরিস্টলজ্জের শিলান্যাস করে গেছেন। মোটাল রোড, পেছনে থেকে  
এসে টরিস্ট লজ্জ বেড় দিয়ে আবার প্রধান রাস্তার গিয়ে মিছেছে। সামনে, রাস্তার  
ওপারে বালিয়াড়ির ওপর ঘন কাউবন। তারপর সমুদ্র—আদিগত।

দিনটাও মিটে। কাল গভীর রাত আশিখনের আকাশ ভেঙে হঠাৎ স্বরবর  
বাঁঠি। রাতের মধ্যেই বালি সব জল শুষে নিয়েছে। রোদের তেজ গিয়ে বিধ্বং  
না। বাতাস বইছে সতেজ। পড়বনে হাওয়ার সন সন।

বিকাশের পুত্র লাগছিল, অথ... এ সব ছেড়ে আজই তাদের চলে যেতে হবে।  
আজ বখবর। শনিবার এখনও অনেক দূরে। ছেলেমেয়ের এখনও জানান  
হয়নি। রেবা এবং সে, দুজনে ঠিক করে রেখেছে, দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর  
জানানো হবে ওদের। বলা হবে, বিকাশের একটা জরুরী কাজের কথা মনে পড়ে  
গেছে। আজই ফিরে যেতে হবে। খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে চারটে  
নাগাদ বোরের পড়বে। নটা নাগাদ বাড়ি। সেকত হোটেলে এখন জানানো হবে  
না। তিনটের সময় যখন ওদের লোক বিকেলের চা দিতে আসবে, তখন তাকে  
ক্যান্টিনের বা বিল হয়েছ, আনতে বলা হবে। টরিস্ট লজ্জ নিয়ে ভাবনা নেই।  
শনিবার পর্যন্ত তাদের বুকিং। পরসকাল মোটোনোই আছে। বেরুবার ঘণ্টাখানেক  
আগে জানিয়ে দিলেই হবে, তারা ঘব ছেড়ে দিচ্ছে। জন্মগাটা আর কালো লসকে  
না। বোর করছে।

সুখ এবং বিকাশ অত্যন্ত গোপনে প্রার রণকেশল ঠিক করার মত করে সমস্ত  
পরিকল্পনা করেছিল। প্রচ্ছন্ন কারণ একিই, তাদের নিরাপত্তা বিধি। তারা  
এখানে থাকার স্বাভাবিক মনে করতে পারছে না। তাদের মনে হচ্ছে, ব্যক্তিগত  
বা তাদের সমগ্র পরিবারের ওপর যে কোনো দিক থেকে হামলা আসতে পারে।  
লজ্জের সামনে বিকাশের মার্ক ফোর আমবাসেডার চার পায়ের দাঁড়িয়ে বোলে  
গা সেকছে। খোলা আকাশের তলার কাল রাতের বাঁঠি, সমুদ্র-হাওয়ার কাপটা  
সবটাই ওপর দিয়ে গেছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই বিকাশ গাড়িতে উঠে  
বসেছিল। ভেতরে ভেতরে বেশ নান্দাস। আজই কলকাতার ফেরার ঠিক। সব  
ঠিক আছে তো? বিপদের সময় অনেক মূল্যহীন আশংকাই তো মনে হয়।  
আ্যকসেলাক্রেটারের ওপর পায়ের চাপ, দু' আঙুলের মধ্যে পাবি। দ বোরের বেশ  
তিনবার চেষ্টা করতে হল না। সমস্ত শরীর ক'পিয়ে জেলে উঠল।

বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে ভাবছিল বিকাশ। প্রু কেকালো, আজকের  
ককে সিগারেটের মধ্যে অনেকখানি ছাই জমে। দুটি কাউবনের ওপর, আকাশের  
দিকে। হাইওয়ে পর্যন্ত প্রার একশ কিলোমিটার রাস্তা নিয়েই ভাবনা। সর,  
রাস্তা। যদিও বেশ দিন আগে তৈরি নয় কিন্তু এর মধ্যেই অনেক জন্মগার বসে  
গেছে। পিচ উঠে খোয়া, ইটের পরত বোরের পড়ছে। রাস্তা সারানোর তোড়জোড়  
লছে। আসার সময় রাস্তার ধারে অনেক জন্মগার ইটের থাক, খোয়ার চৌ-বন্দী,  
গির-বরলার, খোয়ার পিচ হোশানোর মৌশন পড়ে রয়েছে দেখেছে। হাইওয়েতে  
হাস্তাটা মেশার আগে বেশ চওড়া প্যানের একটা ব্রিজ। নীচ, বাল। রিজের ওপর  
থেকে হাইওয়ে দেখা যায়। ভাবনা হাঁজল, গাড়ি বেশ আশে চালাতে হবে। এট  
হাস্তাতক পেরতেই সময় খেয়ে যাবে। আসার সময় দিনের আলো ছিল। ববাব  
হাস্তাটা বেশ খুঁটির দেখে এসেছে বিকাশ। হাইওয়েতে উঠে পড়তে পারলে আ  
সরি লাগবে না বাড়ি পৌঁছতে।

শ্রান সেরে চলে লম্বা করে চিবনী টানতে টানতে রেবা বারান্দার  
বোরের এল, 'হাইওয়ে পর্যন্ত যেতেই বেশ সময় লাগবে, না গো?'

খুঁটা আড়াই তিন তো কটেই—বা রাস্তা, বিকাশ জবাব দিল ঠিকমতই।  
কিন্তু ভাবছিল অন্য কথা...রেবা কি করে বৃদ্ধিতে পারে? তার চিন্তা ঠিক এট



মুহুর্তে কোন খাত দিয়ে বইছে, অবলম্বিত হাশি করে কি করে? অনেকটা চিন্তা-পতন পোহের ব্যাপার। এটা কি গভীর অতীতের বছরের হাস্যপাতনবোধের নির্বাহের নীতি ফল? যা হবারক, সুখপ্রাপ্ত, পরম নিষ্ঠুরবোধ। বিকাশ ভাবল, সেও কি পারে না? পারে না রেবাক পড়তে? রেবার মত অনারাস এবং তীব্রভাবে না হলেও, —পারে। অনেকটাই পারে। থাকেটে ধরতে ধরতে কোন শাড়ী রেবার নশব কাড়বে, আগে থেকেই আঁচ করতে পারে। বধূপত্রীদের মধ্যে কার প্রসঙ্গ বা প্রশংসা রেবার কাছে না-করাই সব স্বাক্ষরভাবে সমীচীন, সে-করণে বলে দিতে পারে। এমনকি, ছেলেনের বড় হয়ে বাবার পরও দুবার নাসিং হোম করে এসে, কদাচিৎ নীল চাঁদের দিনে রেবার সম্মতিতে মিলনেচ্ছা—বিকাল অনারাসে পড়ে ফেলাতে পারে।

‘কি ব্যাপার বল তো’, বিকাশ জিজ্ঞেস করল, ‘সকাল থেকে আজ দেখছি না ওদের।’ চলে গেল না কি?’

‘হ্যাঁ যাচ্ছে—’, রেবা তেতো গলার বলল, ‘ওই তো বসে রয়েছে।’

‘মুহুর্তে বিকাশ সম্ভাল হয়ে উঠল, ‘কোথায়?’

‘রেবা হিম্মিন থেকে ঝুরা চুল বার করতে করতে বলল, ‘কলভার্টের ওপর।’ আমি পেছনের বারান্দার কাপড় শূকতে দিতে গেলিলাম। ডায়াডায়া করে তাকাল।’

‘মিলি, জর...ওরা কোথায়?’

‘বিকাল উদ্বেগ নিয়ে সেরা হয়ে বসে এমিক-ওমিক খ-জল।’

‘গান শুনছে। একটু আগেই তো পৈ-রেকডার আর একটা গ্রাউন্ডসিট নিয়ে আউটবল ঢুকল দুজনে।—কাজেই আছে কোথাও।’

‘বিকাল শানার চোটা করল। আউটবল বেশ হাওয়া। হাওয়ার মধ্যে দিয়ে শুনতে পেল।—আউটবল শুরে শুরে ডাই-বোনে মেহৌদি হাসানের গলল শুনছে। উদ্বেগ কটল।’

রেবার পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকল বিকাশ। পেছনের বারান্দার বেয়ুতে বসছিল। ধমকে গেল। ঘরের ভেতর থেকে জানা দিয়ে দেখল। রেবা ঠিকই দেখেছে। কালভার্টের ওপরে বসে আছে দুজনে। এমিকই ফিরে রয়েছে। ভাল করে দেখার জন্য বিকাশ টেবিলের ওপর থেকে জরের দুব্বাশী তুলে নিল। কোকাস আড-জান্ট করল। বিকাশ ঘরের ভেতর অন্ধকার। ওরা দেখতে পাবে না। দুব্বাশীর দেতর দিয়ে ওরা এখন বিকাশের মুখোমুখি। দুজনের পরনেই প্রিন্টেড জাম্পিং, স্যান্ডা গেজি। লম্বা লম্বা চুল হাওয়ার বেসামাল। গলর প্রার শেষ পর্যন্ত নেমে আসা জুলুফ। খুলে পড়া গেল। হাতে স্টিলের বালার রোড ঠিকরোকে। বেশ লম্বা শরীর দুজনেরই। এক সময় হরডো ডালই চেহারা ছিল। শরীরের ওপর অবিরাম অত্যাচার, অমিতাচারের জন্য এখন রক্ত, তোরোড়ে। দুজনেরই স্থানান্তরী দৃষ্টি বারবারই ট্রান্সলেক্সের এই ঘরটি, সংলগ্ন বারান্দার ওপর ঘুরে ঘুরে থাকে।

‘বিকাল বুকতে পারল না। এই মুহুর্তে ওদের খর দৃষ্টি কাকে খুঁজছে বোঝা? মিলি—? মিলির নবীন উদ্ভিদ বোনার? না, তাকে—? আলোতে প্রধানত যার সাক্ষ্য ওদের দু বছর জেলের ঘানি ঘোরাতে হরেছিল?’

বছর পট্টিক আয়ের জন্য।

কল্যাণীর টি বি হাসপাতালে একটা টেডার ছিল। লাখ দশক টাকার কাজ। দুর্গাপুর উন্নয়ন প্রকল্পে তখন সব মিলিয়ে প্রায় ত্রিশ লাখ টাকার কাজ চলছে বিকাশের। বেশ ধনবৎ অবস্থা। তাব, কল্যাণীর কাজটার ওপর বিকাশ কুঁকোঁছিল অন্য কারণে। আগেই, কল্যাণীর এ ব্লক চার্লস ফট রাস্তার ধারে, হুঁ কঠোর কর্মর প্রট কন্যা ছিল। ভেবেছিল, কল্যাণী হাতাতে পারলে, সিমেন্ট, হুঁ কঠোর হবে না। স্বর্ভূত-পড়তি মাল দিয়ে দিবা একটা বাড়ি কঁসতে পারবে। রিটার্ডাড লাইফে সেটাল কালকটোর হাইবাইজ ব্রাউ থেকে মাকে মাকে কল্যাণীতে এসে কর্তন বসবাস করে এক্সপেরিয়েন্স কাটিয়ে যাবে। পাকা একটা বসোবসত হয়ে রইল।

টেডারটা অবশ্য বিকাশ পায়নি। অনেক বিলো রেট পড়েছে। তার নীচে আরও চারজন। সফল টেডারার মডান কনসট্রাকশনের, হিরহর হোড়। বিকাশের পূর্ব-পরিচিত। হোড় ছাড়ল না। আরও কয়েকজনকে সঙ্গী করে নিজের বাড়িতে বাড়ি নিয়ে তুলল। একটা পাটি মতন হল। কিছু পান এবং ভোজন। বিকাশের তাড়া ছিল। কলকাতা ফিরতে হবে। নিজের গাড়ি নেই। সারাট করতে গ্যারেজে। টেনে ফিরবে। পেটে বোতল দুয়েক হিমশীতল ডরুক হজমের আমেজ। মাঝে মাঝে সফল উদগার। কল্যাণীর প্রশস্ত ফঁকা রাস্তার মজারীমের সাম্যকালীন বাতাসের হা-হা। টেনন পর্যন্ত হেটেই যাবে শিমর করে বিকাশ পা চালান। এ ব্লকের কাছাকাছি এসে মনে বড় মারা জম্মাল।—কতদিন আগে জমিটা কিনেছে। দুয়েকশে বোড়িং-এ রাখা ছেলের মত জমিটা। উদ্যম আকাশের তলার পড়ে পড়ে রোলজল থাকে। শেখবার এসে দেখে গেছে, তাও দু বছর হল। দু বছর কাছে একবার বাহুর মতো অপত্য দেখে দেখে। সেখানে বোঝে হয়ে এসেছে। জমির কাছে বাবার আগেই দু পাশ থেকে দুজনে এসে বন্ধুর মত কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়াল।

শুভভাবে বসিছে, যা আছে বার করন। কামেলা করলে বাড়ি দেবো।’

যা দেখবার বিকাশ তার মধ্যে দেখে নিরেছিল। বালাপরা হাতে কককক তোরা। একটা উপার আসছিল। কন্টে চাপল। বিনা বাধ্যবতার পকেট থেকে পার্স বার করে দিল, সিকো রিস্টওরাল।

‘আমিটা খুলুন।’

এইখানে এসে বিকাশ একটু ইতস্তত করেছিল। সোনার জন্যে নয়, পাখটার জন্যে।—রক্তমুখী নীলা। শনি নীচশ বল জ্যোতিষীর পরামর্শে ধারণ করেছিল। কাজ ছিল অসামান্য।

‘চলুন ডাডাভাউন, স্বর বেশ কর্কশ।’

সিন্ধুর জ্যোতিষীর দিল।

সম্ভার অন্ধকার মাঠের মধ্যে মিলিয়ে গেল ওরা।

টেননে এসে শুনল, বোলা দুটো নামার মেহৌদি কাছ ডাউন লাইনে মালগাড়ি পা হড়কেছে। ডাউন লাইন বন্ধ। মালগাড়ি ডোলার কাজ শুর। গাড়ি হাতাতে এখনও শতী ভিনেক। প্রাটকথে বেশ ভিড়। দুপুরের ডাউন ব লোকাল প্রাটকথ জুড়ে দাঁড়িয়ে। একটা ফঁকা কামরা দেখে বিকাশ উঠে বসে আউটবল জন্যে কন্টে হাঁকল। বিশেষভাবে পাখটার কথা মনে পড়ে। রিন পার্স—এ শতবাহনক টাকার কথা প্রায় কুলেই গেছিল। কিন্তু পাখটা। অন্য ন নীলা দিক কাজ না যায়। দারুণ সুচী করেছিল।

হিম্মিন মডন এসেছিল। হাতে হাত পড়তে ধড়মড় করে উঠে বসল।

‘আরে, আপনি এখানে? আর আমি তিনবার আপনাকে এখান দিয়ে গেছি—’ মডান কনস্ট্রাকশনের হোড়, ‘আপনার নাকি ছিনতাই হয়েছে?’

‘বিকাল অবাক, ‘আপনি জানলেন কি করে?’

‘আরে রশাই, খানার ওসি ফোন করেছিলেন। আপনার নাম করে টি করলেন—চিনি নাকি। মাস্তান দুটো ধরা পড়েছে। ওদের কাছ থেকে ও জিনিসপত্র পাওয়া গেছে।’ মনিবালস আপনার ভিজিটিং কার্ড থেকে ও প্রক্সেন জেনে বাড়স অব টি সেম ফোদার হিসাবে আমার বাড়িতে ফোন পেয়ে একটা চান্স নিলাম—বদি আপনাকে টেননে ধরতে পারি। চলুন এ ছেলে দুটোকে আইডেণ্টিফাই করবেন, জিনিসপত্র দ্বৈধ লিফট করে দেবেন। গাড়ি রয়েছে।’

‘বিকাল উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। রক্তমুখী নীলা—লিভিং স্টোন।

তা নইলে এমন কেউ কখনো শুনেনি যে, ছিনতাই ধরা পড়েছে এখা পুলিশের হাতে? পুলিশই খবর করে খুঁজেপেতে তাকে টেননে শেখে ধরার ব্যবস্থা করেছে। আর, ছেনের সোলমাল তিকি আছে, এই সময়। এ তার তো সেরালদার পৌছে ধরার কথা...আউটবল একবার হাতে নেবার বিকাশ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।—এ তার পাখর। একমাত্র তারই। তার। এই বিশেষ পাখরটা স্মৃতি করে টপ করে আকাশ থেকে পৃথিবীর বৃক দিগন্তে জন্মাইটি।

গাড়িতে যেতে যেতে খানিকটা হোড়ের মুখে আর খানিকটা খানার ও মুখে শুনছিল বিকাশ। বেশ কিছুদিন ধরে জাল পেতে রেখেছিল প অনেক দিন ধরেই অভিব্যাস আসছিল ছেলে দুটোর নামে। ‘সারাদিন মোটরস দ্বাবে বেড়ায়। এ অঞ্চলে নতুন মুখ দেখলে ভর দেখিয়ে ছিনতাই।’ মেরেরের সামনে জ্বালানি অচরখ। মনের দোকানে ঘরে মদ ঘোরা জন্য ও ওরগান রেকিং। এমনকি, কল্যাণীর মাঠে ঘাস কাটতে আসা যেসুড়ে ও মুখ চোপে পাশের ফঁকা বাড়িতে টেনে তোলার কানাবোবা পর্যন্ত। প্রভা লোকের ছেলে দুজনেই। একজনের বাবার কঁড়াপাড়ার মোটর গ্যারেজ, পাম্প, আউটবাল লার এবং বাস। ছেলেটাও আই টি আই থেকে পাশ করে নে আর একজনের বাবা তো নামকরা ডাক্তার এ অঞ্চলে। ফ্যামেলিতে দুজন ম্যাটি নিজেও গ্র্যাজুয়েট ছেলেটা। পুলিশ সব জেনেও চুপচাপ ছিল। এখন এম এল এ মিনিমিস্ট লেভেল থেকে চাপ দেওয়াচ্ছেন।

‘আপনি কি মনে করেন এরা অভাব থেকে এ সব করছে?’ এ সি ও কড়া ধাতের, ‘আসলে এরা যে ঠিক কি করবে বৃক উঠতে পারছে না। এক মেট খুঁজছে...।’

বিকাল আমতা আমতা করে পুথিপত্রা বিদ্যে জাহির করার মত কবে গেল। নিউ জেনারেশন, জেনারেশন গ্যাপ...

এ সব বৃকটিক না মশাই, ও সি যেন বিকাশকে ধমকে উঠলে বাড়ি ডিগ্রির কেস—। হাতপায়ের জয়েন্টগুলো খলে দাও। সারা জীবন পরে চারের দোকানে বসে খবরের কালজ পড়ে যাবে।—তেননে এদের...।

লক-আপ থেকে এনে দাঁড় করাল দুজনের।

বিকাল শিউরে উঠল। ইতিমধ্যে পুলিশ বানিরে শেখছে। সারা মশ কালসিটের দল। একজনের শার্ট ছিড়ে ফালাফালা। খামড়ি পিটে দাগড দাগ।

বাড়িতে রেবার কাছে ব্যাপারটা চোপে ধরার চোটা করেছিল বিকাশ খাবার টেবিলে ধরা পড়ে গেল। অবাক হয়ে রেবা জিজ্ঞেস করল, ‘তোমার বলতেই হল।’

রেবা ধমক-ধামক শুর, করে দিল, ‘কি দরকার ছিল অজানা জায়গার সময় যাওয়ার? বদি ছুরিটুকি মারত? ও অলঙ্কণে জমি আমি কেতে দে তারণর কয়েকবার রাসাঘট কেট পর্বন্ত দৌড়খাপ। সরকারী সনাক্তকরণ। যথেষ্ট কোয়ার দেওয়া। একমাত্র সফল, রক্তমুখী নীলার পত শনিবার দ্বৈধ কাল্যাণীরে মনিবের সোফাতে, শাখাচারে অনামিকার ধর স্নানের পোশাক পরে মাথার টুপি বসিতে বসিতে মিলি বাথরুম থেকে এল, ‘চল বাপি।’

‘চল।’

সামনের বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে রেবা উল বনছে। সমুদ্রের নে স্নান করলে ওর শরীর জ্বালা কর। এখানে এসে একদিনও সমুদ্রের ডোবার নি। বারান্দা থেকে গলা তুলে বলল, ‘চিট পরে নাক। ব্যাি উঠেছে।’

জয় আগেই নেমে গেছিল। ওদের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে অি উঠেছিল। পরনে লাল রঙের শট সু। খালি গা। বিকাশের পেছনে পে বারান্দার বেরিয়ে এল। রেবা বেশ খুঁটিয়ে মেরেকে দেখল। মিলির গাে ছেলেমেয়ে



ভালভাষি করে বাবা এবং মায় চোখের আল পেরেছে। মিলি পেরেছে মায় পায়ের রক্ত, আর বাবার লম্বা শরীরের কঠিনতা—কঠাকঠা চোখমুখ। পনেরো বছর বয়স। অন্যরকম দু' বছর বাড়িয়ে কথা বার। জয়ের রকম এগারো। মরলা রক্ত। মায় রক্ত বড় বড় চোখ।

বেশি বাগিচাখানি করব না। উঠে আসবে তড়াতাড়ি।

ই—সু, নীচ থেকে মিলি মায় দিকে তাকাল, পাশা বড় বড় চান করব আল।

দু' বড়ী, দু' বড়ী জর একটা পাতালমুখ বাড়িগাছের ডাল মাথার ওপর তুলে নাচতে নাচতে মকে রাসতে লাগল।

না—রেবা কড়া ধমক দিল।

বিকাল মাথার ডালতে সুস্বাদু তেল ধাবড়তে ধাবড়তে ব্যাপারটা উপভোগ করছিল। রেবার ঠোঁট কমে গেল, আঁখি তো সজেই বাঁজি। তুমি অত ইরে করছ কেন?

সকলে বখন অরোপাছে রাস্তা ভিঁসিরে কাটকন ঢুকছে, পেছন থেকে রেবা ফল, একটা নকর রেবা। আমি এখানটা খেঁচাই।

টীখাভটপর্শ কক। বিকাশের সঙ্গে চোখে চোখে কথাও হয়ে গেল। বিকাশ বুলল, রেবা বলছে, স্নান করতে গিয়ে বিকাশ বাঁশ বেঁচে ছেলে দুটো স্নান করছে, কেন ছেলেমেয়ের একমুখ কাছাকাছি থাকে। রেবা এখিকটর নকর রাখছে, ইতিমধ্যে স্নান করতে যা গেলে, ছেলে দুটোর গর্তবিবরণ ওপর।

কি—এ বিশেষ লোকজন নেই। জনা করক রয়েছে, সবাই স্নানীয়। জেলেরে ছেলেরা জলে হুটোপাটি করছে। দু'রে কটা নৌকা। ডিন চারজন মাটিতে পাটা জাল মেসামত করছে বাড়ি গুঁজে। সতর্ক দৃষ্টি চারিদিকে বুলল বিকাশ। সমুদ্রের তীর বা পাড়ের কাউন। গতকাল বেখনে বসে ওদের গজার করক চানতে দেখেছে।—বেশতে শোন না। আল বেশ ডেউ। হাওয়া কিছেরে বাপটা দিয়ে। বিকাশ হাওয়ার ভেতর দিয়ে গলা তুলে সাবধান করল, বেশি দূরে বেও না।

দুজনে ভতকর কেমের জলে নেমে যুগ্মবুদ্ধি দাঁড়িয়ে, চাত ধরাধরি করে ডেউয়ের তালে তালে জাপান শব্দ করছে।

বিকাল বানিকর স্নানটান করে ডেউহুই তীরে এসে বসেছে। এভাবে বসে থাকতে দু' বাত লাগছিল বিকাশের। মাঝে মাঝে এক-একটা টেউ সামনে ছড়নো পায়ের ওপর দিয়ে প্রায় গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে ওপরে উঠে বাজছে। আবার নামার সময় হুড়হুড় করে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। হাতের আঁচল, পোড়ালী নোড়ের মত বালিতে গিয়ে বিকাশ সামলানছে নিজেকে। তাড়া ফিল ছেলেমেয়েরের, আর নয়। ওঠো এবার।

আর পাঁচ মিনিট বাঁশ।

এর আগে অগতঃ বার দু'রেক পাঁচ মিনিট করে সময় দিয়েছে বিকাশ। বানিকর অপেক্ষা করে নিচ্ছে পাড়ে উঠে দাঁড়ান, উঠে পড়। মা রাস করবে। ওরা উঠে এল। মিলির ভেতরালে দিয়ে জর হাত-পা মুছেছে। মিলি মাথার টীখা খুলে কেলছে। এক ঢাল রেশমের মত চুল বাড়ি কাত করে বুলিয়ে আঁচল চাটিলে বাড়ছে। বিকাশ হঠাৎ দেখল, মিলি অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছে। জয়ের কাছ থেকে ভেতরালে ছিনিয়ে নিয়ে শরীর ঢাকছে। মাথার মধ্যে কোথায় একটা ত্রিক শব্দ হল। পাড়ের দিকে তাকাল বিকাশ।—পাড়ের ওপর রাস্তা আঁকে দাঁড়িয়ে ওরা দাঁড়। নিনি দেব, নিলক্ষ দৃষ্টিতে সোজা তাকিয়ে রয়েছে এদিকে। একটা ধমকমে সময়। বিকাশ সহজ হবার চেষ্টা করে বলল, চল চল, রেশমেরে দাঁড়িয়ে থাকে না।

আগে বিকাশ। পেছনে মিলি। ডান হাত দিয়ে জরকে গায়ের সঙ্গে প্রায় লেপটে নিয়েছে। মাথা নীচু। সারা মুখে রক্ত এসে জমেছে। ওরা একইভাবে দাঁড়িয়ে। রাস্তা ছেড়ে দাঁড়বার বলতাতা নেই কোনো। বখন মায় হাত করক দু'রেকের মাথা এসে পড়েছে একজন বলল, 'এই, রাস্তা ছেড়ে দাঁড়া না লালা। তোরা বাশের রাস্তা পেরেচিস। পারালিক বাবে কি করে?' সামান্য সরে বেন অনুগ্রহ করে জালা গা ছেড়ে দিল। কেমনা রকমে প্রায় গলে বোরেরে বাবার মত জালা। পারের ডালার বালির মত সমস্ত রক্ত তেতে উঠেছে, টের পেলে বিকাশ। দু'পাশে দজন জামের মত দাঁড়িয়ে। সে কেমনা মুহুর্তে হাত বাড়িয়ে হাত টেনে ধরতে পারে। বিকাশ নিশ্চয় ফীকটুকু দিয়ে মাথা নীচু করে বোরেরে গেল। পেছনে পেছনে গায়ের সঙ্গে লেপটে মিলি আর জর।

এর ঘোঁই চান হয়ে গেল আল—?

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বিকাশ শুনতে গেল কথটা। ইঙ্গিত বৃদ্ধত ঘেরি হল না, মিলির উল্লেখে বলা।

ডাঙতে কি—একজন বাজার-চালু, গনের সর নকল করে গেয়ে উঠল, 'বেবা হবে কাউনেন ড্যা...এ্যা...এ্যা...'

কানটান গরম হয়ে উঠেছে। বিকাশ জানে, তার দিক থেকে সামান্যতম প্রতিবাদ, ওরা বড়ের মত স্বীপরে পড়বে তার ওপর। জয় দিগির হাত থেকে ছাড়া শেরে চলতে চলতে বারবার পেছন ফিরে দৃষ্টিতে দেখছে। বিকাশ নিশ্চল আঁচলো বালির ওপর লাগি মারার ভঙ্গিতে চলতে চলতে ধমক দিল, কি দেখছ কি? এগিয়ে যেতে পারছ না?

রেবা টোঁবলে খাবার সাজিয়ে বসে। সৈকত হোটেল থেকে যে ছেলেটা খাবার নিয়ে আসে, বাসলাপ নিয়ে খাবার জেনে বারান্দায় অপেক্ষা করছে। রাস্তাবালা ভালই হোটেলটার। বড়ো নিয়েছে বিকাশের কামোলের দৃষ্টি, পছন্দ। জেরেছে, পরদায় ব্যাপারটা কেননা সমস্যা নেই। আল নোনা এবং মিঠে জলের মাছের পদই দিয়েছে তিন রকম। বেশ তৃপ্তি করে খেতে খেতে জানলা দিয়ে বিকাশ দেখল,

ছেলে দুটো স্নান সেরে সৈকত হোটেল ফিরে বাজছে। দু'জনের দৃষ্টিই সটান এখয়ের দিকে।

'প্কাউনল', বিকাশ মায়ের কাঁটা বুঝতে চুপতে হিঁসিস করে উঠল, চাবকে শিঠের চামড়া তুলে দিতে হয়।

রেবা জানলার দিকে শিখন ফিরে বসেছে। ফিরে তাকাল না। মাথা নীচু করে মুখে প্রাস তুলতে গিয়ে থামল। সেই অবস্থাতেই ত্রু তুলে বিকাশের চোখে চোখ রাখল। মিলি, একবার জানলার বাইরে তাকিয়ে খাবারের প্লেটে দাঁড়ি নামাল। জর, বিকাশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কার চামড়া বাঁশ?'

তারপর বিকাশের দৃষ্টি ভুলসরণ করে চোরা ছেড়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে রাস্তা বেঁচে বলল, 'কেন বাঁশ?'

গুঁরি খাও ডো—। ক'ব'ক' করতে হবে না', রেবা ধমক লাগাল, 'আর একটা মাহ নাও।'

গত দিনবার বিকাশ কখন সপরিবারে এখানে এসে পৌঁছিল, তখন রাজকীর বাড়িখের সুব রস্তার অরোহণ সারা আকাশভেঁতে। আকাশে ছিটেফোটা মেঘ ছিল। শেষ শরতের আকাশে থাকে যেমন। হাওয়া নেই। নিশ্চতঃ কাউন। নিখর প্রশান্তি চারিদিকে।

এর জিজ্ঞেস করেছিল, 'সমুদ্রটা কোন দিকে বাঁশ?'

ফান—টা—স—টিক', চরিত্রিক মুখ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে মিলির গলা বড়ো এল।

রেবা হেসে উঠেছিল। 'কালই তো বলবে কলকাতা ফিরে চলো। জন্মশাটা কি নিজন?'

কি রে মিলি? টুরিস্ট লজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ক'র মুখে মিলির দিকে তাকিয়ে বিকাশ, কলোছিল, 'পাতিদিন ক্ষমতে পারাবি তো?'

কর লাইক—

বিকাল, রেবা দু'জনেই হেসে উঠেছিল।

টুরিস্টলজের ম্যানেজার বিকাশের দিকে মোটা খাতা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'একোবারে সত্যাপনের বৃষ্টি নিয়ে এসেছেন?'

কেন বলুন তো', বিকাশ লিখতে লিখতে বলল, 'কিহ' ভরটর আরে নাকি কথা?'

না...না, তা নয়। খুব নিজন তো? ভাল লাগবে? এখন তো সিঁধন নয়। আপনাদায়ী দু'খু থাকছেন লজের। গার্ড থাকে রয়। ক্রেস্ট ডিপার্টমেন্টের কেরকজনও রয়ে বারান্দায় শোয়।—আমিও থাকি।

টুরিস্টলজের সব কিছই ভাল লাগল সকলের। ধপধপে সাদা বিছানার চাদর থেকে চমৎকার কাচের সেলাসটা পর্যন্ত। বাথরুম দেখে এসে রেবা তাইনাল মত জানাল, 'চলবে'।

অসুবিধা দুটো।—গ্যারজ নেই। মার' ফারকে আকাশের তলার কঠতে হবে। আর, টুরিস্টলজে খাবার ব্যবস্থা নেই। খাবারের ব্যবস্থা এখানকার একমাত্র স্থায়ী হোটেল—সৈকত। সিঁধন টাইমে অনেক হোটেল গিয়ে ওঠে। মাটির বেওয়াল, খড়ের চাল। আলকাতরা মাথানো ক্ষমতা-জানলা। সার সার চৌকি, নড়তে চলেতে বাজনা বাজছে। এখন সব বন্ধ। মালিকরা মাঠে চাষের কাজ করছে। লজের ম্যানেজার জানালেন, অসুবিধা নেই। সৈকত হোটেল মোটামুটি সবই পাওয়া যাবে। কলসে, খাবার-খাবার সবই ওরা লজ পৌঁছে দিয়ে যাবে।

সপরিবারে বেড়াতে বেড়াতে সৈকত হোটেল দেখে এল বিকাশ। বতটা খারাপ হবে ভেবেছিল, তার থেকে বহুসখ ভাল। হোটেলের মালিক অমারিহ। বিকাশ রেবার সঙ্গে আলোচনা করে নিল, ট্রেককাট আর প্রেরজনমত চা কোড জ্বিকস্ পাঠিয়ে দিলেই চলবে। সকাল এবং রাতের খাবার হোটেল এসেই ঘরে যাবে। এইটুকু তো পথ। কালডাটের ওখারেই টুরিস্টলজ। বানিকটা হাটা-হাটি হবে।

ফেরার পথে রেবা বলল, 'দেখবে, সব ঘর বন্ধ। একজনও বেড়ার নেই।'

শুনলে না, এখন অফ-সিঁধন', বিকাশ বলল, 'ভালই হল। সকলের পরো সেবাযাই তুমি একলা ভোগ করবে।'

পরদিন দুপুরে বাইরে আশ্বিনের চড়া রোদ। বেশ বানিকর বিছানায় দু'মবার বাচ্' চেষ্টা করে বিকাশ উঠে পড়ল। আলোর মধ্যে তার ঘুম হয় না। টুরিস্টলজের জানলার কাঁচের শাঁশ। পর্দা নেই। ওপাশের বাটে রেবা ঘুমচ্ছে। সিঁগারেট ধরিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখল, মিলি বেড়ের চোরে পা তুলে বসে সিনেমার পটিকা পড়ছে। ওদিকের বারান্দা থেকে জ্বিকের ধরাবিবরণী ভেসে আসছে।

মিলি উঠে গেল। চোরেরে জুত করে বসে বিকাশ পটিকটা তুলে নিল। পাটা উলটে দেখতে লাগল। চমকা নেই। পড়তে অসুবিধা হচ্ছে। বাইরে দুপুরে স্নান হয়ে এসেছে।

ওদিকের বারান্দায় রেলিংয়ের ওপর পা বুলিয়ে বসে মিলি উদাস চোখে কাউনের ওপরের আকাশের দিকে তাকিয়ে।

বিকাল উঠে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল, 'এখনে ভাল লাগছে না,—না রে?'

মিলি চমকে উঠল, 'কেন বাঁশ?'

এই লোকজন নেই। নিজন...।

না না, তা কেন।—ভোরের ভাল লাগছে তো?'

বিকাল বুলল, মিলি নিজেকে লুকেছে। জর, বাবসার জন্যে তারের ব্যবধক কি পরিপ্রম করত হয়। নাওয়া-খাওয়ার ঠিক নেই। কলকাতার বাইরে পৌঁছেছি। একটা ছুটির দিন পর্যন্ত নেই। সুবোল পেরে কটা দিন নিরিবিলিতে বিশ্রাম

# বেশীর ভাগ মহিলারা আজকাল ল্যাক্‌মে ভ্যারিশিং ক্রীম মাখছেন কেন জ্বায়েত তো ?



# Lakmé

## ৫ টি কারণেঃ

- এতে মুস্তোর মত সাদা জো থাকায় রঙ অনেক ফর্সা দেখে।
- এতে ময়েস্‌চারাইজার থাকে। ত্বক সম্পূর্ণ তাজা থাকে।
- এর প্রলেপ, বাতাস আর ধুলোময়লা থেকে আপনার ত্বক রক্ষা করে।
- ব্রণ আর দাগ হতে দেয় না।
- তৈরী করে ল্যাক্‌মে—আপন বিশ্বস্ত সৌন্দর্য-প্রসাধন নির্মা



# ল্যাক্‌মে ল্যাভেণ্ডার মেখে সুরভিত থাকুন প্রতি পলে



# Lakmé

মনমাতানো ফরাসী সুরভি মাখ  
ল্যাক্‌মে ল্যাভেণ্ডার টাল্ক—অ  
অঙ্গে জড়িয়ে থাকে সা-রা-দি-ন  
আপনার দিন শুরু করুন ল্যাক্  
ল্যাভেণ্ডার টাল্ক মেখে—কখন  
কার মন মাতে কে বলতে পা



নিতে এসেছে। আসলে, বিকাশের যদি ভাল লাসে মিলি নিজের ভাল-সামান্যক দিয়ে সহ্য করতে প্রস্তুত—করতে হবে।

‘আমারও ভাল লাগছে’, জর ধারাবাহ্য নিতে দিতে লাগল। পাশে এসে দাঁড়াল, আমি টেটে এলেই এমনি করে লাফিয়ে উঠল।

বিকাল ভাবল, আর কি চাই। আর কি চাই লাইকে। হয়ে সমঝনী ন্দী। মুঠুটে ছেলেরা। তারা, তার বুকের জন্যে নিজের সুখ বিলম্বিত দিতে পারে জানারসে। দ্বারিণিং বিজনেস। চারটে ব্যাংকে আকটিউ। লকারে গহনা ইত্যাদির সঙ্গে বড়, সার্টিফিকেট, বেশ কিছু ভাল শেরার। সেন্সিটল কলকাতার হাইব্রাইড দ্রুত বাড়িতে তিন কামরার ফ্ল্যাট আউটলার। বিকাশের স্মরণস্পর্শ পৃথিবী। আর কি চাওয়ার থাকতে পারে।

ঠিক এই সময়, লজের শেখন থেকে বড়ের বেগে ছুটে আসা মোটরসাইকেলের গজন শুনছিল বিকাশ। মোড় নিয়ে যখন টুরিস্টলজের কাছে এসেছে তখন শব্দে লজের কঠোর বিপ্লব কেপে উঠল। জানালার কাছে শাশিতে বনকন শব্দ বজল। ঝাউকনে ঢোকায় রাস্তার সামনেই চোখে পড়ার মত সাইনবোর্ড—কোনো প্রকার ধানবাহন ঢোকায় ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা। মোটরসাইকেল নোটিশ বোর্ডের সামনে থামল। ইনজিন চালু রয়েছে। নতুন বুলেট। আররাহী দুজন। পরনে উপবাসী পোশাক। —পাশে আয়কল বট, জ্যাকেট, চোখে স্পার্পা চশমা থেকে হেলমেট পর লত। পেশনের জনের পরনে কালো জ্যাকেট, হলুদ হেলমেট। যে চালাচ্ছে তার টকটকে লাল জ্যাকেট, সাদা হেলমেট। নোটিশ পড়া হল। বিকাশ, মিলি, জর সকলে ব্যারাদার ঝড়িয়ে দেখছে। ম্যানেজার, কোনো টুরিস্ট এসেছে ভেবে নিজের অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন। বিকাশ যখনই কৌতুহল নিয়ে অপেক্ষা করছিল, ওরা কি করে খোঁজের জন্যে। নোটিশ বোর্ডটিকে দারুণ তাজিলা দেখিয়ে মোটরসাইকেল আবার গজন করে উঠল। মোড় নিয়ে ঝাউকনে ঢুকল। বিকাশ ভাবল, এই এক অশুভ প্রবণতা এসেছে ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে। আইন ভঙার মধ্যেই যেন উল্লাস। —সমস্ত সুখ, সমস্ত আনন্দের সারাংশের লুকিয়ে আছে।

‘ওরা যে ভেতরে ঢুকলো—?’ বিকাশ বেশ ক্ষোভ নিয়েই ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করল।

‘একটু দাঁড়িয়ে থাকুন’, ম্যানেজার ট্রেটে রহস্যময় হাসি এনে বললেন, ‘মজা দেখতে পাবেন।’

জর এসে গা ঘেঁষে দাঁড়াল, কি মজা হবে বাপি? ঝাউকনে পলিস লুকিয়ে আছে? —হরষে ওদের?’

বিকালও বকে উঠতে পারছে না। এটুকু বুকেছে, মোটরসাইকেলের শব্দ জন্য রকম শোনাচ্ছে। অনেকটা গোষ্ঠার মত। তারপর, শব্দ একবারেই থেমে গেল। আবার ঝাউকনে হাওয়ার শব্দ। বিকাশ বুঝল এবার। —নিজেকে রক্ষার ব্যবস্থা প্রকৃতি নিকেই করে রেখেছে। বাতির দাঁত ওদের মোটরসাইকেলের ঢাকা কামড়ে ধরেছে। ওদের তাচ্ছিল্যের এমন সমুচিত শাস্তি পেতে দেখে বশ্টিত বোধ করল বিকাশ।

একটু পরেই ঝাউকন থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। মোটরসাইকেলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে ঠেলতে ঠেলতে। মাথার হেলমেট, চোখের চশমা—সব খোলা। পিচের রাস্তার ওপর মোটরসাইকেল তুলে দাঁড় করিয়ে দু’ হাতের কাপটার পোশাকের বালি ঝাড়তে লাগল। মধ্যে অপ্রাণী ভাব। বিকাশ স্পষ্ট দেখতে পেল ওদের এবার। হুঁ কুচকে উঠল—চোনো মনে হচ্ছে!

‘বাবু—বা, কি শব্দ—’, রেবা এসে পাশে দাঁড়াল। বিকাশের মূখের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, ‘চেনা নাকি?’

‘চেনা লাগছে। ঠিক হরষে পারছি না।’ বিকাশ অনামনস্কের মত বলল।

‘তা দিও বলা’, আসলোয় ভাষাতে রেবা চোয়ালে গিয়ে বসল।

কি একটা বলছে বা কারেছে ওরা—মিলি বেশ শব্দ করে হেসে উঠল।

ওরা এসিকে তাকাল। বিকাশ দেখল, নিম্পলক চোখে দেখছে তাদের। খুঁটিয়ে দেখছে। বিকাশ বুকেতে পারছিল না, কারে দেখছে ওরা। মিলিকে, তাকে না তাদের সকলকে? মিলি অনাসিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। বিকাশের আবারও মনে হল, খুব চেনা মুখ। অথচ, মনে পড়ছে না।

পরাজয়ের লক্ষ্য এড়াবার জন্যেই—যেন ওরা হঠাৎ খুব তৎপর হয়ে উঠল। হিন্দী সিনেমার হিরোর মত লাফিয়ে মোটরসাইকেলের সিতে উঠে বসল। এক স্টোকেই নতুন বুলেট ভরাট গলায় হেসে উঠল। আয়কলসেয়ারের মোড়ের হাসি অটুটিয়া হয়ে চারিদিক কাঁপিয়ে তুলল। মোটরসাইকেল গতি নিল। জয়ের চোখে মন্বত। মিলি বেধ হর ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের দিকে তাকিয়েছিল। পেশনের জন পেশনে তাকিয়ে মোটরসাইকেলের শব্দের ওপর গলা তুলে গান গেয়ে উঠল, মড় মড়কে না দেখে, মড় মড় কে...

বিকাল দাঁতে দাঁত চাপল, রাসকল।

‘বিকাল আর রেবা বেশ স্মরণভাবে বিচ-এ হাট্টছিল। ভাইবোনে অনেকটা এগিয়ে। তখন ভটী। সমুদ্রের জল অনেক নেমে গেছে। সমুদ্রা হয়ে এল প্রায়। রেবা তার দ্রিষ্টা পঠনের অংশবাস্য দক্ষতার নাজর রাখল আবারও, কি দো? ছেলে দ্রুতকে চিনে উঠতে পারলে?’

হাট্টে হাট্টে বিকাশ সামান্য হাসল, ‘মনে হচ্ছে পেরেছি।’

‘তা হলে আর অত দৃষ্টিভার কি আছে।’

বিকাল ভাবল, বলবে রেবাকে? ছেলে দুটোর পরিচর জানিয়ে দেবে? ঠিক হবে ব্যাপারটা। রেবা ভুল শ্রোয় হবে বা না তা? বিকাশ এখনও নিঃশব্দ নয়। তুল হতে পারে। আরও কাছ থেকে দেখা দরকার। সাত-পাচি ভাবে ভাবে কল ফেলল।

রেবা থকে দাঁড়াল। দু’ চোখে ভর মেঘনো বিশ্বয় নিয়ে বলল, ‘বাবু—’

না হওয়ারই বা কি আছে? বিকাশ বলল, ‘ওরাও হরষে আমদের মত বেড়াতে এসেছে। দেখা হয়ে বাওয়াটা একটা কৌনিসিডেন্স।’

রেবা গম্ভীর হয়ে উঠেছে হঠাৎ। চিন্তাশ্রিতভাবে বলল, ‘কোথার উঠেছে বল তো?’

‘বিকাল ভেবে বলল, ‘লজের বন্ধন ওঠান তখন সৈকত হোটেলে। আর জরগা কোথায়?’

‘ও বাবা—’, রেবা বলল, ‘তা হলে রাগে ওখনে খেতে বাব না। লজের খাবার পাঠিয়ে দিতে হলো।’

‘হু—’। ভোমার কি মাথা খারাপ হল নাকি? ওরা ওদের মত রয়েছে—আমরা আমদের মত। মিতে গেল।’ বিকাশ রেবাকে অভয় দিতে চাইল, ‘তা ছাড়া, এখনও আমি সিওর নই। ব্যবসার মনে করছি, তারা নাও হতে পারে।’

পাঞ্জাবির পকেটে দু’ হাত দিয়ে বিকাশ হাট্টছিল অভ্যাসমত। অনুভব করল, রেবা সজোরে তার বাহু অঙ্কড়ে ধরল। বিকাশ রেবার মুখের দিকে তাকিয়ে দৃষ্ট অনুসরণ করে সামনে তাকাল।

ছেলে দটো। কি ধরে এসিকেই হেঁটে আসছে।

এখন কিছু ভালো মরে বারানি হবে, চিনতে অসুবিধা হবে। একটা আলংকার বুকের ভেতরটা গুরগুর করে উঠল। —মিলি, জর অনেকটা এগিয়ে গেছে। ওদের প্রায় সামনেই। দেখল মিলি হঠাৎ জরকে নিয়ে খানিকটা জলের দিকে নেমে গেল। বকের ভেতর থেকে বুকচাপা প্রবাস বোরিয়ে এল বিকাশের।

ওরা এসিকেই এগিয়ে আসছে।, প্রতি পদক্ষেপে নিকটতর হচ্ছে। রেবা বিকাশের কাছে ঘেঁবে এল। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেছে। ঠিক সামনে এসে ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। শরীর হঠাৎ শব্দ হয়ে উঠেছে, স্নায়ু টানটান বিকাশ টের পেল।

‘আচ্ছা আছে’, একজন সটান বিকাশের চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল।

দৃষ্টিবান্ধি ভাষা।

বিকাল নিঃশব্দে পকেট থেকে লাইটার বার করে দিল। একজন সিগারেট ধরাচ্ছে। আর একজন শ্বির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে। বিকাশ অনুভব করল, তারও যেন চিনে নিতে চাইছে।

‘লাট্ট, মাল তো—’, যে সিগারেট ধরাচ্ছিল, লাইটারটা করেবার জ্বেল।

হাট্টের-ফিরিয়ে দেখে ফেরত দিল। সলগার দিকে তাকিয়ে বলল, চলবে—। কি দেখাচ্ছিল শালা? সাইফে জেটেলমান দেখানি?’

ওরা চলে গেল।

রেবা খানককণ বদে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, ‘চিনতে পারলে?’

বিকাল কথা বলল না। ঝাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

‘চিনতাইকরা ছেলে দুটো?’

বিকাল আবারও ঝাড় নাড়ল।

খানককণ নিঃশব্দে পথ হাট্ট। ঝাউকনের ভেতর দিয়ে লজের বাবার রাস্তার মোড় প্রায় এসে গেছে। ছেলেমেয়ের ওদের জন্যে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। রেবা বলল, ‘ছেলে দুটো তোমার তো নাও চিনতে পারে?’

‘সন্দেহনা কম’ বিকাশ মনের বোকা হালকা করার জন্য হেসে বলল, ‘এই পঠ বছরে আমার হোয়ারায় একটা পরিবর্তন হরানি হবে, চিনতে অসুবিধা হবে।

ভুড়িভাড়া আর তুল পাসার ব্যাপারটা যদি না ধরা যায়।’

তারপর গত দু’ দিনে বিকাশ এবং রেবার স্নায়ু ওপর চাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ওরাও যেন ক্রমশই বে-পরোয়া হয়ে উঠেছে। যখন-তখন মোটরসাইকেলের বিপট গজন তুলে টুরিস্টলজটিকে ভেঙে দিয়ে যোরা। ঠিক বিকাশেরা যখন সমুদ্রে স্নানে যাবে, তখনই ওদেরও স্নানের স্মরণ হয়। রাস্তার, বিচ-এ বেড়াবার সময় নানা মন্বত। বেশির ভাগই মিলিকে উদ্দেশ্য করে। অনেক সময় বিকাশকে তাচ্ছিল্য করে। রেবা, জরও বাদ নেই। সৈকত হোটলে খেতে যাওয়া বন্ধ করবার পর যেন ব্যাপারটা আরও বেড়েছে। ছেলেমেয়েদের সামনে উপেক্ষা দেখিয়ে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করে বিকাশ—রেবা। বিকাশ জানে, ভেতরের ব্যাপার না জানলেও মিলি বেশ অস্বস্তি অনুভব করছে। বাবা, মার উৎকণ্টা বুকেতে পারছে।

জয়ের হাজার প্রশ্ন, ওরা এটা বলল কেন? ও রকম করছে কেন? ওটা কি খারাপ কথা?

বিকাল, রেবা একসঙ্গে আলোচনা করে দেখেছে বেশ কয়েকবার। —কেন এ ধরনের আচরণ করছে ওরা? উদ্দেশ্য কি? বিকাশের ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়? বিকাশ ভাবে, প্রতিশোধের প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে? ভোমরা পলিসের হাতে ধরা পড়েছে, মার খেয়েছে, জেল খেটেছে, ভোমাদেরই কৃতকর্মের জন্যে।

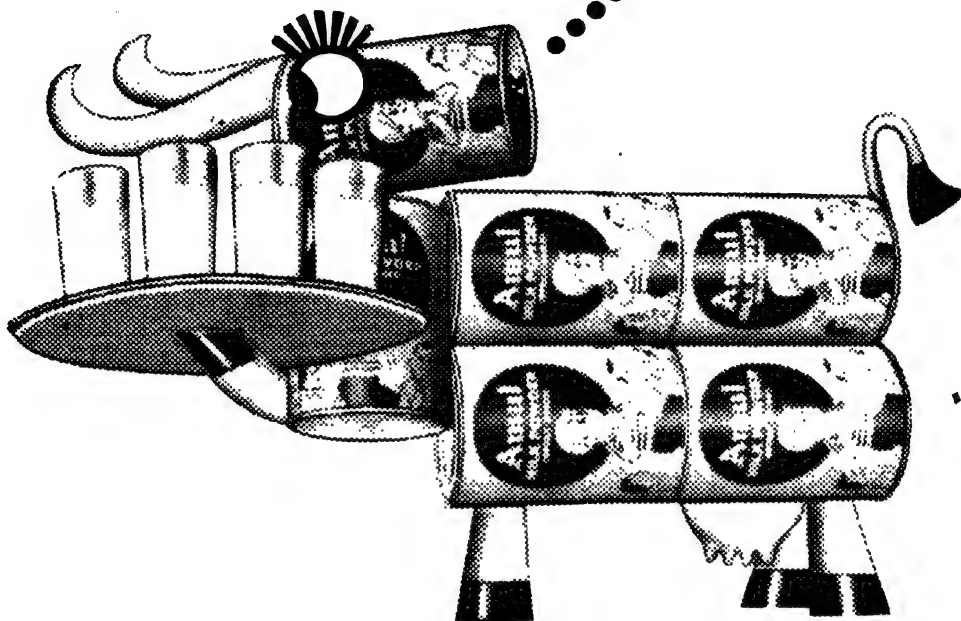
চিনতাই না-করলে বিকাশ কিছু সাক্ষী বা সনাক্তকরণের দায়িত্ব নিত না। আইন বাইভুত কাজ করেছে, আইন মোতাবেক ভোমাদের শাস্তি হয়েছে। এখন বিকাশের ভূমিকা কি? তারপর ভেবেছে, কি ধরনের প্রতিশোধ ওরা নিতে পারে। তাকে শারীরিক ভাবে আক্রমণ? মিলিকে ঝড়িয়ে কোনো গড়গোলা পাকিয়ে তোলা? বা, রেবাকে নিয়ে? নাকি, এখনে বসবাসের বিনগ্লে স্নায়ুচাপ এবং উৎকণ্টার নর্য কতোই ওদের প্রতিশোধ স্পৃহা সীমাবদ্ধ।

জরকে যদি ওরা কিছু করে?’ রেবার গলা কেঁপে উঠেছিল।

‘ইয়ারিক’ নাকি।’ বিকাশ গলায় জোর আনার চেষ্টা করে বলছিল, ‘জললের রাজত্বে আছি নাকি? আইন নেই?’

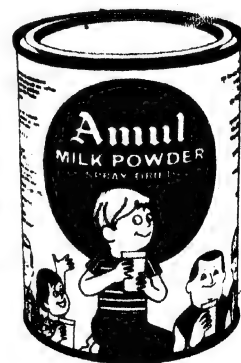
‘কিছু হয়ে যাবার পর আইন নিয়ে কি ধূয়ে বাব! খুব বেড়ানা হয়েছে, কলকাতা ফিরে চল।’

# আমূল মিল্ক- আপনার পরিবারের জন্যে



একটি ৬ লিটার পরিমাণের গেলাসে বড় চামচের উঁচু উঁচু ২৫ চামচ আমূল মিল্ক পাউডার ঢালুন। তারপর অল্প গরম জলে গুলে মসৃণ লেই-এর মত তৈরী করে নাড়াতে থাকুন। এরপর গেলাসটিতে কানায় কানায় গরম জল ভরে আরও নাড়াতে থাকুন। এই নিন—খাওয়ার জন্যে দুধ তৈরী! এটি চা, কফির জন্যে আর দই আর পুডিং ইত্যাদির জন্যে উপযোগী। আর তৈরী করাও এত সহজ যে কৃতজ্ঞ বোধ করবেন। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ—এ একেবারে গ্যারান্টি!

**আমূল  
মিল্ক পাউডার**  
ঘরে সবসময়ে দুধের ভাণ্ডার



বিতরণ : গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড, আনন্দ।

পুলিসের সাহায্যের কথাও ভেবেছে বিকাশ। মাইল দুইরক দুই একটা ছোট ন পলিস কাটিয়ে আছে। ডবের খবর দেবে?—কি লাভ। পুলিস নিশ্চয় কাপের পরিবারকে রক্ষা করবার জন্য সশস্ত্র রক্ষী পাঠাবে না। এসে সরাসরি লেফটেনেন্ট হাডক্কা পরিচয় নিয়ে যাবে না। খুব জোর, গুণের গতিবিকারের একটা নজর রাখবে কি একবার এসে শালিরে টাঙ্গিরে যাবে। তারপর—। মিল চলে গেলে হয় ওরা ভয় পাবে। নয়তো আরও বেপারোরা, উদ্ভার হয়ে যাবে। ওদের মত চোট খাওয়া দলীলার শিবিরে রাস্তাটাই ধরবে বলে বিকাশের ধারণা। হোটেল থেকে তাকে ওরা বধ করাত ইতিমধ্যে ওরা হুগে নিয়ন্ত্রণ পরিবারে বিকাশ ভীত, সন্দেহ। ডব, রেবার কথামত এখান থেকে চলে যায় ব্যাপারটা বিকাশ যেন নিতে পারছিল না মন থেকে। ভরে পালানোর মত ডার ব্যাপারটা—পেরিয়ে লালাছিল।

কিন্তু গতকাল সন্ধ্যার সমস্ত আবহাওয়া চরমে উঠল। গতকাল বিকেল থেকে ওরা প্রায় আঠার মত পেছনে লেগে রইল। বিকাশের মন হল, বেশ বেশপ্রস্তুত অস্ত্রা দুজনেরই। অস্ত্রাণী মন্যভাব। কুর্সিত অস্ত্রাণী। কি—এ বেড়তে বেড়তে পেছনে থেকে ছোটছোট মাটির টুকরা গারের পড়ল। বেগুনেই বায়—সাদালা দুইয় বজার রেখে—ওরা সখানাই। বেগুনো লেজুবি রেখে বিকাশেরা লজের আগাত নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে এল। সৈকত হোটেল থেকে চা এল। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। জেনারেলটোরে কি গণ্ডগোল রয়েছে। মায়েরকার দেখানে। অস্ত্রাণী সেই লজের। সন্ধ্যার ডার অধিকার নেমে আসছে। চরার জুড়ে নিখর শান্তি।

ওরা কাউন থেকে বেরিয়ে এল। সদস্ত পা ফেলে উঠে এল ব্যাঙ্গদার শূণ্ডিতে। ওদের এদিকে আসতে দেখে রেবা ছেলেমেয়েকে ঘরে পাঠিয়ে দিল। শ করে পা ফেলে বিকাশের চারদিকে ব্যাঙ্গদার ঘরে বেড়তে লাগল ওরা। রেবা, ইকাশ বেডের সোয়ারে কাঠের মত বসে। নিঃশব্দে ভীষণ কিছু একটা ঘটনা চির জনো বেন অপেক্ষা করছে।

‘গবরমেট শালা ঘাম জিনিস বানিয়েছে তো।’  
লজের গাড় ব্যাঙ্গদার দাঁড়িয়েছিল। ওরা গ্রাহ্য করল না।  
‘আমার চার নম্বর পাগলাটিকে এখানে এনে শালা রাত কাটিয়ে যেতে হবে।’  
খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ওরা প্রায় নিঃশব্দে বসে থাকা বিকাশের গা-হুয়ে মেল গেল।

রাতে খাবার টেবিলে জর জিজ্ঞেস করল, ‘আচ্ছা বাপি—? ওরা এখানে পাগলাই রে এসে কি করবে?’

ওরা চলে যাবার পর থেকে রেবা বিকাশের সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। মের কথা শেষ হতেই কামা চাপতে চাপতে টেবিল ছেড়ে উঠে গেল। জর নাক। তারপর হাওয়া গরম ভেবে খাওয়ার মন দিল। মিলি মাথা নীচু করে লট টোক রুয়ে। বিকাশেরও উঠে যেতে ইচ্ছে করছিল। অত্যন্ত নাটকীয় র যাবে ভেবে উঠল না।

ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়ছে। নাইট গার্ড, ঠকঠক করে রাস্তার লাঠি মতে ঠকতে পাহারা দিচ্ছে। ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের কয়েজন শ্রমিক আশা-তক চার মাইল দিয়ে ঘুমছে ওদিকের ব্যাঙ্গদার। বিকাশ পাগলারি থাকেরে বার পানের চেয়ারটার এসে বসল, ‘চলে যাওয়াই থাক। কাল বিলটিল দিয়ে ত বাল—।’

রেবা খুব ক্লান্তভাবে বিকাশের কঁধে মাথা রাখল। পেছনে ছড়ান হাত তুলে বার মাথার রাখতে লজের অন্তব করল জেরোরা রুমীর মত উত্তপ্ত।

বেরুতে প্রায় পাঁচটা হয়ে গেল।

তিনটে নাগাদ বিলটিল মিটিয়ে তৈরি হয়েছিল বিকাশ। রেবারও সোচ্ছাছ হ। ছেলেমেয়েদের যে-রকম ঠিক করে রাখা হয়েছিল—বলা হল। বিকাশ য়, মিলি বিশ্বাস করেনি। ছেলেমেয়েদের কুর্সিত, অভব্য আর-লই বে এখান কে চলে যাবার কারণ—বুঝে নিচ্ছে। আকাশে দুপুর থেকে মেঘ। চারটে পাগ গলে নামতে শুরু করল। মাথার ওপর কমকমে বৃষ্টি নিয়ে বেরোনো দাশ, রেবা কেউই পছন্দ করছিল না। আশ্চর্যটা বাদে বৃষ্টি থামল। আকাশ রমুছে আরনার মত। গাড়িতে ওটার সময় ডাইবোনে প্রবল খগড়া। জর, যেন বিকাশের পাশে বসবে, এবং একাই। এ—ব্যাপারে নির্দিষ্ট সঙ্গে তার কোনো কোনো সৌহ। মিলিরও জেহ—আসার সময় ও সামনে বসে এসেছে। এবার র টার। জর কেদে জিতে গেল। রেবার হমক খেয়ে মিলি গজগজ করতে তে মার পাশে গিয়ে বসল পেছনের সিটে।

প্রথম কুড়ি কিলোমিটার রাস্তা খুবই ধারাপ। খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে হল। পনেরো থেকে কুড়ি কিলোমিটারের ওপর গতি তেজী বাজিল না। নকদর পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে, তারপর আর হয়নি। আকাশে মেঘ জমে কুলে রছে। বেশ অধিকার মতন। বিকাশ হেড-লাইটের আলো রাস্তার ওপর লে রাস্তা দেখে গাড়ি চালাচ্ছে। গ্রাম মাঝে মাঝে। রাস্তার লোকজন কম। টা গরর গাড়িকে পাশ দিয়ে রাস্তার উঠে বিকাশের মনে হল, দুই রাস্তার খানে কিছু যেন দেখল। হেড-লাইটের আলো সামনে কেলে কয়ে আসতে লে, তিনটে বোতল রাস্তার তিক মাঝখানে থাড়া করে দাঁড় করানো দেখে ল, খালি বিকাশেরে বোতল। অনেকটা জিকেরের পিচ-এর ওপর উইকেটের দায় সাজান। এখানে রাস্তার মাঝখানে কে বিকাশের বোতল সাজিয়ে রাখল—খাটুক ভাবতে ভাবতে নিশ্চয়ই হুগে বিকাশ—হঠাৎ মোটর সাইকেলের চড়া

শব্দ। তার অগোচর জেহ শুনে গেল।—ওরা! রাস্তার ওপর রাখা পানের ড্রামের পাশে লুকিয়ে অপেক্ষা করছিল—হেড-লাইটের আলো কেলে বিকাশকে অন্ধ করে দিতে চাইছে।

রেবা চীৎকার করে উঠল। মিলি, চীৎকার করে উঠল। বিকাশ কোনরকমে অ্যাকসেলারেটরের ওপর চাপ কামি, স্ট্রিয়ারিং চেপে টলমাটল গাড়ি তিক করল। ওরা পেছনে।

ওদের এভাবে দেখতে পেরে বিকাশ প্রথমে বেশ বিমূঢ় হয়ে গেলিছ। সামনের আরনার দেখল, ওদের জলন্ত হেড-লাইট বেশ পেছনে। এ-ধরনের রাস্তার বে-গতিতে গাড়ি চালান উচিত, বিকাশ এখন তার থেকে বেশি জেরে গাড়ি চালাচ্ছে। হাতের মটের স্ট্রিয়ারিং ধরে রাখা বেশ অসুবিধাজনক হয়ে উঠেছে।

‘ওরা কি করে জানলো বল ভো বে, আমরা আজই চলে যাছি?’ রেবা জিজ্ঞেস করল।

‘কি জানি। বন্ধুতে পাচ্ছি না।’

‘জানো বাপি, ওরা বোধহয় সৈকত হোটেলের বরটাকে জিজ্ঞেস করে জেনেছে।’ মিলি বলে উঠল, ‘আমরা সব বিল পেয়েই করে দিলাম। বর্শাশ মিলাম।’

এখন আর সোপান রাখা কথা। এতদিন চেপে থেকে মিলি আনোচনার মৌল দিল। জর কথা বলছে না। হুয়ে হুয়ে সকলের হুয়ের দিকে তাকিয়ে বেন কথা গিলছে।

কি হুয়ে এসেছে বিকাশ। আরনার পেছনে কোনো হেড-লাইটের প্রতিভাবি নেই। বিকাশ আরনার চোখ রাখছে। মিলিও হুয়ে দেখছে কখনো কখনো। জর হুটফুট করছে। সিটের ওপর হাট। সোড়ে উঠে বসে ফিরে পেছনে তাকায়। রেবা হমক দিল, ‘আ কি হুটফুট করছে?’ তিক করে বসতে পারছো না?’

ঘুমত একটা গাম পেরিয়ে গেল। রাস্তা একটু ভাল হয়েছে। বিকাশ আরনার একটা আলোর বিন্দু দেখতে গেল। ওদের কিছু জানাল না। গতি বাড়তে সাহস হল না। স্ট্রিয়ারিং বেশ কপিতে।

‘বাপি—, ওরা আসছে,’ মিলি উচু গলায় বলে উঠল।

জর মার নিঃশব্দে কুলে সিটের ওপর হাটসোড়ে উঠে বসে পেছনে তাকাল। রেবাও সোচ্ছা হরে বসল।

আলোর গাড়ির ভেতর ভেসে গেল। মটরসাইকেলের গজর্ন। হর্ষ দিচ্ছে। বিকাশ গাড়ি তিক রাস্তার মাঝখানে রেখে এগুচ্ছে।

‘ওদের রাস্তা দিচ্ছে না কেন?’ রেবা অসহিষ্ণু, বিরক্ত ভাবে বলল।

বিকাল বর্গাকের চেপে এল। গতি কমাল। ওরা কড়ের মত পাশ দি়রে বোরয়ে গেল।

সামনে ওরা এখন। ওদের টেল-লাইম্পের আলো বিকাশের সামনে নড়েচড়ে সলেছে। মাকফেরের জোরাল আলোর সামনে ওরা। লাল জ্যাকেট, সাদা হেলমেট, পেছনে বসে। ওরা মটরসাইকেলের গতি কামিরে এনেছে। চলেছে রাস্তার তিক মাঝ বরাবর। পথ আটকে। কুড়ি কিলোমিটার গতিতে বিকাশ গাড়ি চালাচ্ছে। রেবা, মিলি হেলান বেড়ে সোজা হয়ে বসেছে। দৃষ্টি সমনে, রাস্তায়। কুড়ি থেকে পনেরো। পনেরো থেকে দশ কিলোমিটারে গতি নামিরে এনেছে ওরা। বিকাশকে বাধ্য করছে গতি কমতে। বিকাশ জেনে, হর্ষ দেওয়া কথা। ওরা পথ দেখে না। মটরসাইকেল, মাকফেরের হেড-লাইটের মিলিত আলোর সামনের রাস্তা দিনের মত পরিষ্কার।

‘হর্ষ দাও—। এরকম করে গেলে তো রাস্তাভোর হয়ে যাবে।’

বিকাল অনিচ্ছাসত্ত্বেও হর্ষ দিল। সাদা হেলমেট পেছন ফিরে অঙ্গলীল ভঙ্গি করে দাঁক দেখিয়ে হাসল। বিকাশ অপমানিত ক্ষুব্ধ ম্বরে বলল, দেখলে তো—। ওরা রাস্তা ছাড়বে না।

সামনে একজন সাইকেল চালিয়ে আসছে। আলোর এমনিতেই চোখ লীথিরে গেছে। ওরা মোটর সাইকেল নিয়ে এমনিভাবে সাইকেলের দিক ধরে গেল, যেন থাকা মারবে। আরোহী পড়িমড়ি সাইকেল থেকে নেমে সাইকেল কেলে রাস্তার ধারে বাবলায়ছের আড়ালে সরে কাঁড়াল। হা...হা...করে হাসল দুজনে। বিকাশের জোয়াল শব্দ হয়ে উঠল।

ওরা হঠাৎ গতি বাড়াল। হুহু করে বোরিয়ে গেল। টেললাইম্পের আলো ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল অঙ্গদারে। রেবার দিক থেকে শ্বাস্তির প্রশংস ফেলার শব্দ শনতে গেল বিকাশ। মিলি হেলান দিয়ে বসেছে ফের। জর পা কলিরে বসল। রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বিকাশ সিলারেরট ধরাল।

আকাশ তারায় ভরা। দু পাশে ধান ক্ষেত। রাস্তার পাশে নয়নঝুলি জলে টেটবুর। মাঝে মাঝে কাশফুলের ওপর আলো পড়ে, সাদা ফুল রূপোর মত স্বকণক করে উঠেছে। বিকাশ ভাল গতিতেই চালাচ্ছে এখন।

‘আমাদের ফাই-ফরমাম্ খাটোতো যে ছেলেটা—’ রেবা বলল, ‘তাকে বর্শাশ দিরেছো তো? আচ্ছা, ছেলেটাকে জেরের একটা জামা দেব বলছিলাম। তাড়া-হুড়োয় কুলে যাঁছি।’

‘মিলি উঠে দাঁড়িয়ে সামনের সিটে বসুক দেখে বলল, ‘খা. ভাই ঘুমিরে পড়ছে।’

‘জর—,’ রেবা ডাকল, ‘বর্শাশ না। হুমুড়ি খেয়ে পড়বে। বা রাস্তা—।’  
না—,’ জর ঘুমন্ত গলায় অর্ধশব্দে জবাব দিল।

সামনে টিমিটিম করে একটা আলো জ্বলছে। মোকান একটা। রাস্তার ধারে বেমন হোটেলের মোকান থাকে। কাছে আসতে বিকাশ দেখল, মোটরসাইকেল থামিরে ওরা দাঁড়িয়ে। সিটে বসে, ডাকে দেখিরেই বেন মঞ্চে ওপর বিরারের বোতল উপুড় করে ধরল। চালকের সামনে এবার কামো জ্যাকেট, হলদু



# ছোটদের আশ্চর্য পত্রিকা



## কিশোরজ্ঞানবিজ্ঞান বৈশাখ থেকে বেরোচ্ছে

আশ্চর্য বিজ্ঞানসংকলন 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' প্রকাশিত হয়েছিল পূজোর সময়। আর প্রকাশের সাতদিনের মধ্যেই সব কপি শেষ। পাঠকরা খুশী। খুশী আমরাও। এখন দাবী উঠেছে 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানকে নিয়মিত মাসিক পত্র রূপান্তরিত করায়। এ দাবী শুধু ছাত্র-ছাত্রীদেরই নয়, বিজ্ঞানপিপাসু সব পাঠকেরই। দৈনিক পত্র-পত্রিকাতো একই অভিমত প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান আর বছরে একবার নয় এবার থেকে প্রতি মাসেই সেরা বিজ্ঞানলিখিয়েদের রচনার পুষ্টি হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হবে। শুধু বিজ্ঞান লিখিয়েই নয়, ছোটদের যারা ভীষণ প্রিয় তাঁদের সব মনকাড়া লেখাও কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে থাকবে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যারা বিশেষজ্ঞ, বিদ্যালয়ের অতিষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের ও অধ্যাপকগণের লেখাও কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠবে। এ ছাড়া বিদ্যালয়পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরও নির্বাচিত লেখা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিয়মিত প্রকাশিত হবে। সবমিলিয়ে আমাদের বিশ্বাস, কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান হয়ে উঠবে জ্ঞান ও আনন্দের এক আশ্চর্য সমীকরণ।

শৈল্যা প্রকাশন বিভাগ

৮/১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩

যেদর দিকে তাকাতে মনে হল, ওরা যেন বিহুপের হাসি হাসল।

মিলি বলল, 'ওরা চলে যাবনি মা—'।

ভোমার দেখতে হবে না। লোক আছে দেখেই।'

বাস্তার কাজ হচ্ছে। সরানোর সঙ্গে সঙ্গে চওড়াও করা হচ্ছে। মাঝে মাঝে কখন বোড। জরকে জাগিয়ে রাখা যাবে না। বিকাশ বা হাতে জ্বরের গোটা পা কুলিয়ে দিল। একটা খড় বোকাই গরুর গাড়ি আসছে। আলো পড়ে গরুর চোখ কাচপোকার মত জ্বলজ্বল করছে। বিকাশ হেড-লাইটের আলো রাস্তার ফেলল। গাড়ির ভেতর আলোর বন্যা। আরনার আলো ঠিকরোমে মোটরসাইকেলের গছন। হর্ণের শব্দ। আরনার চোখ রেখে বিকাশ বা পাশে গাি সরিয়ে রাস্তা ছেড়ে দিল।

গাড়ির ভেতর থেকে আলো সরে গেল। বিকাশের ডানপাশে আলোর বনা সেই ভাবেই রয়েছে। ছাড়িয়ে যাচ্ছে না। কনের পাশে মোটরসাইকেলের বিরক্তিশব্দ।

মা—আ—আ, মিলির আত। চীৎকার ভেসে এল 'ওবা জানলার পাতে বাপি...বাপি...?'

'কচ তুলে দে মিলি, কচ তুলে দে—' রেবা চীৎকার করে উঠল।

'আমি পারব না। পারব না।'

আরনার বিকাশ দেখল মিলি ব্যাকরেস্টে সিটিয়ে বসে। সামনে হাত দা জড়ো করা। রেবা, মিলির কোলের ওপর দিয়ে হুমাড়ি খেয়ে পড়ে কাচ তুলে জ্বরের খম ভেঙ্গে গেছে। বড় বড় চোখে অবাক দৃষ্টি। সামনে-পেছনের দু চাকা রাস্তার একেবারে ধারে। এই অবস্থায় ব্রেক করলে বিকাশের মনে হ গাড়ি সামলাতে পারবে না। গাড়ি থামবে? এই সুযোগে ওরা যদি খাঁপ পড়ে? এখানে, চীৎকার করে গলার রক্ত তুললেও কেউ শুনতে পাবে? বিকাশের হাত-পা কঁপছে। ঘামের ফোটা গাড়ির খুঁতনির তলার কুলছে। বিকাশে মনে হল, হাইওয়ে আর কতদূর? আলো, গাড়ির মিছিল, লোকজন?

ওরা পেছনে গেল। গাড়ির ভেতর আলো মরে এসেছে। সবলেই চু জর, খম ভেঙ্গে সামনে তাক করে। রাস্তার ধারে অনেকখানি জায়গা জড়ে এব হাটতলা পেরিয়ে গেল। দু-পাশে মুখ খুঁড়ে পড়ে থাকা গরুর গাড়ির সাি দটো কুকুর ডাকতে ডাকতে তড়া কবল কিছু দূব। সামনের রাস্তা না সারান। চওড়া। মসৃণ। বিকাশ গতি বাড়াল।...ওরা আবার এগিয়ে আসে আরনার আলো পড়ল। হর্ণ মিছে ওরা। বিকাশ চোয়াল শব্দ করল। তোলপাড়।

হর্ণের তীক্ষ্ণ শব্দ।

মার্কফোর, একা সমস্ত রাস্তা জড়ে চলেছে এবার। স্ট্রিয়ারিং ঘুরিয়ে বিব এখন সমস্ত রাস্তাতার দখলদার। ডানপাশ, বাঁদিক দুদিকই মনেমেখে অত উন্মাদিত হয়ে উঠছে। ওরা বেরিয়ে যাবার ফাঁক খুঁজছে। গাড়ির তলার রাস্তা খোয়া ছিটকে লানার শব্দ। স্পিডোমিটারে কাটা প্রায় শ্বির রেখেছে বিক আলসে আসতে রাস্তা চড়াই-এ উঠছে। কিছুদূরে রিজ। রিজ উঠলে হাই দেখা যায়। ঘনের মাঠ, জলভর্তি নরনজলি ক্রমশ নীচে পড়ছে। ওরা আঁপ হর্ণ বাজাচ্ছে সমানে।

'কি করছে কি ভূমি? অতো জোর গাড়ি চালাচ্ছে কেন,' রেবা বিকাশ কাঁধ খামচে ধরল পেছন থেকে, 'ওদের যেতে দিচ্ছে না কেন?'

'বাঁপি-ই,' মিলি ডাকল, 'ওদের রাস্তা ছেড়ে দাও।'

জর বড় বড় চোখে বিকাশকে দেখছে।

দু-পাশে খালি পিচের ড্রাম। খোয়ার স্টাল। বিকাশ সামান্য গতি কম ওরা অনেকখানি এগিয়ে এল। মার্কফোর থেকে মোটরসাইকেলের দুহু আসছে—সুস্তর ফুট। পশ্চাৎ ফুট। স্ট্রিয়ারিং শব্দ হাতে চেপে বিকাশ শরী দমস্ত শক্তি পায়ে চেলে ব্রেক টিপল।

মোটাল রোডের ওপর চারটে চাকার আতনাদের রেল ালয়ে যাবার আ খালি ড্রাম ছিটকে পড়ার শব্দ। হুড়মুড় করে খোয়া বাওয়ার শব্দ। সে লাইটের তীর আলো নীচে ধানক্ষেতের ওপর এলোখাবাড়ি চাবকের মত প পড়তে মিলিয়ে গেল।

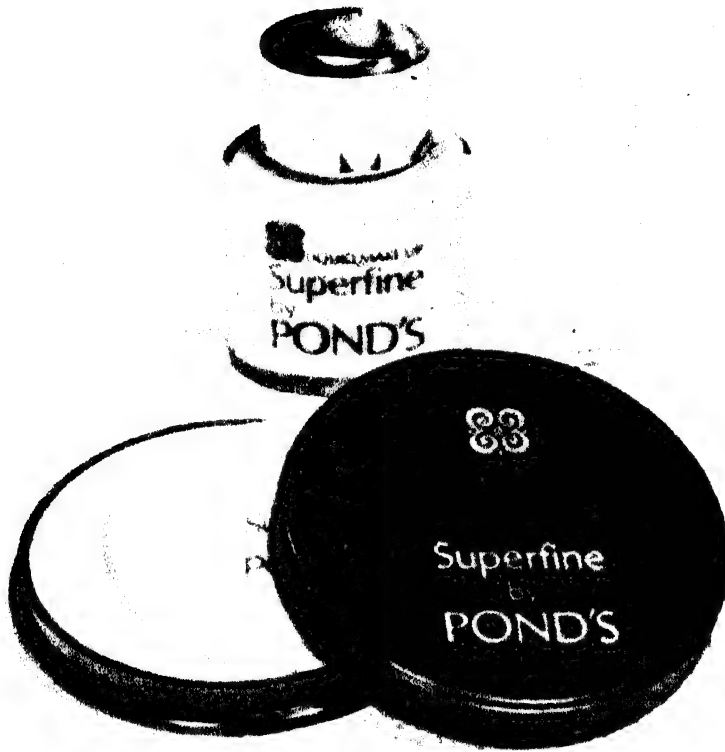
'এ কি করলে গো ভূমি,' রেবার খামচে ধরা হাতের মুঠি শিখিল হয়ে গেল বিকাশের কঁধের ওপর থেকে। মিলির গলার উচ্চকিত কন্নার আও জানলা থেকে দুটি সরিয়ে এনে জর বিকাশের দিকে রাখল, 'বাঁপি?' 'ওদের মেরে ফেললে?'

প্রশস্ত হাইওয়ের ওপর দিয়ে মসৃণ গতিতে বিকাশ গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চলে সামনে-পেছনে গাড়ির সারি। মহকুমা শহরের রাস্তার গাড়ি যাচ্ছে। দু- দোকান। নিরনের উন্মাদ। বাজারের মানুকের ভিড়। আম্মিলিকায়ের একটা সিনেমা হল পেরিয়ে গেল। মাথার ওপর আরনার বিকাশ রেবাকে দে হেলান দিয়ে বসে রেবা। একটা হাত কনুই ভেঙ্গে চোখের ওপর আড়া রাখা। মিলি, বাইরে তাক করে। হাতের মুঠোর সান্না র মাল মুখের সামনে রয়েছে। মাঝে মাঝে জোরের শরীর ঝকিয়ে খবাস টানছে। জর, দরজা। জড়সড়। দুটি দোজা সামনে।

মুখকের প্রত্যাপ্ত অ্যাম্বুলেন্সের মত চলছিল মার্কফোর। ভেতরে, নিা বন্দগার আত নাশ করছিল রক্তাঙ্গ সম্পর্কগুলি।

হবি : সুব্রত পল্লবপাথর

বাঃ!  
দেখাচ্ছে কি  
দা-ক-ণ!



পণ্ডস-এর তৈরী

নতুন!

সুপারফাইন

কমপ্যাক্ট ও লিকুইড  
মেক-আপ

রূপ-চর্চার এক নতুন পন্থা।  
নানান মনমাতানো শেড ও মনোরম  
সৌরভে।

প্রাথমিক অবস্থায়  
**অর্শের**  
জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে আরাধ্য  
পেতে বিশ্বস্ত  
**হ্যাডেন্সা**  
মলম



ব্যবহার করুন-  
অপ্পোপচার তা  
করলেও চলে !

13651R BEN

অবাহিত লোমের সমস্যাকে  
গোড়া থেকে দূর করুন

- এতে শুধু নিরাপদ জৈব উপাদান আছে। এমন কোনো ক্ষতিকর রসায়ন নেই যাতে ত্বক্ জ্বালা জ্বালা করে অথবা চুলকায়।
- ত্বক কর্কশ হবার বা কেটে যাবারও কোনো ভয় নেই।
- সঙ্গে সঙ্গে, এবং অতি সহজে লোমকে গোড়া থেকে দূর করে।



বিউটি  
সলুনের  
নির্ভরযোগ্য

নতুন  
মাই ফেয়ার লেডী

কোল্ড ওয়াস্ক হেয়ার রিমুভার

MY  
FAIR  
LADY

SA/MLC 928/8

বাজার ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড।  
বোম্বাই, কোলকাতা, মাদ্রাস, দিল্লী

কস্মেটিক্সএর ডেবী।

**জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ**

১ম খণ্ড ১৫/-, ২য় ১২/-, সর্বসাধারণকে ১৫% ছাড়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

**অগু**

পথের পাঁচালী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়  
অপরাজিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়  
কাজল তারালাস বন্দ্যোপাধ্যায়

এই তিন মহাগ্রন্থ একত্রে ৩৫/- টাকা।

২০% ছাড় দিলে ২৮/- টাকার।

মনোজ বসুর বিখ্যাত উপন্যাস

ডি এইচ লরেন্স

**জলজঙ্ঘল** ১৬, **শ্রেষ্ঠ গল্প** ১৪.

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

**প্রাগৈতিহাসিক** ১২/-

বিশ্ব বসু সম্পাদিত

**জ্ঞান বিজ্ঞানের  
হাজার জিজ্ঞাসা** ২০/-

জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অসংখ্য জিজ্ঞাসার  
উত্তর মিলবে এই গ্রন্থে।

অরুণাচল সম্পাদিত

**বিশ্ববিখ্যাত সায়েন্স ফিকশন** ২০/-  
**ভৌতিক অমনিবাস** ১৪, **দশরহস্য** ১৬

নারায়ণ সান্যালের

**ভারতীয় ভাস্কর্যে মিতুন** ২৫  
**তিমি তিমিঞ্জিল** ১২, **দণ্ডক শবরী** ১৬

মনোজ বসুর

**সেই গ্রাম সেইসব মানুষ** ১৬  
চীন দেখে এলাম ২৫ বন কেটে বসত ২৮ নিশিকুটুম

বীক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

**দেশবিদেশের ভৌতিক কাহিনী** ১৬  
**দেশবিদেশের অলৌকিক কাহিনী**  
**স্পাই অমনিবাস** ১০/-

মেসার্স পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৪ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলি-৭৩



(পটভূমি)

একটি আন্তর্জাতিক এয়ারওয়ের জমাবো জেট বিমান হওয়ার শ' ডিনেক বাহী মায়া সেছেন, খবরটা বিশাল করে বেরোলো কালকে। রোডওতে সকাল দুপুর রাত্রি বারবার ঘোষণা করা হল। বোম্বাই থেকে ছেড়ে ইউরোপ যওয়ার পথে ভারত মহাসাগরের ওপর হতভাগ্য বিমানটি ভেঙে পড়ে। ততো বড় ভাঙারতীর বাতী ছিলেন। নিহতদের নামের তালিকা এখনো পাওয়া যায়নি।

সকাল খবরের কাগজটা সামনের বারান্দার ছাড়ে দিয়ে বার কাগজওয়ালা। অনেক বেলা পর্যন্ত সেটা ওইভাবেই পড়ে থাকে। শব্দ, অফিসে বাওয়ার আগে ব্রেকফাস্টের সময় কখনো কখনো খুব আনমনে কালকে একটু চোখ বুলিয়ে নেন বোস সাহেব।

আজ বোস সাহেব তার আশেপাশে জিম ডাঙতে ভাবতে খবরের কাগজটা চাইল।

জিমের থলথলে কুসুমটা হঠাৎ পিছলে টেবিলের ওপর পড়ে ফেটে গেল। গাঢ় হলুদ কাথ গড়িয়ে পড়ল দুখসাধা টোরনের পায়ের ওপর। বোস তা ততটা খোলা কল না। আপনমনে বলল, ষ্টেঞ্জ!

মিল্লীপা বাথরুম। বোস কাগজটা সন্তর্পণে ভাঁজ করে টেবিলের এক কোণে সরিয়ে রাখল। দীপনাথ তত সময়ের ফ্রাইটে উঠেছে তা তার জানা নেই। তবে সময়টা প্রায় মিলে যাবে।

বোস টোস্টের প্লেটটা সরিয়ে রাখল। জিমের কুসুমটার খাঙলানো চেহারার দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর উঠে ঘরে গিয়ে ট্রাইকাস পরে নিল। খুব অস্বস্তি একটা ভাবলেন অসুখটা টের পাবে নিশের ভিতরে। একদা লোকটা ছিল ননএনটিভি। তারপর হি বিকেম এ স্টেড। দেন এ রাইজাল। বাট অলওয়েজ এ স্টেড।

নিশ্বাস ঘরে একটা ইঞ্জিনের বেস বোস একটা সিগারেট ধরাল। বহুকাল সিগারেট খায় না। ডাক্তারের পরামর্শে ছাড়তে হয়েছে। পুরোনো কেনা প্যাকেট-গুলা সাজিয়ে রেখেছে টেবিলে। এখন খেল। কারণ, ডাক্তারের হুকুম মানার স্বঘোষিত ব্রিটিশ আর নেই। হুজুর পরজা তো হাজারো ক্ষি দিয়ে খোলা। মৃত্যু হলে হাজারো দায়ী।

বোস লক্ষ করল, তার হাত ক'পড়ে। সিগারেটটাকে আঙুলের ক'কে ধরে রাখা যাচ্ছে না। টেবিলে ঠিকমত তুলতে পারছে না। কিন্তু সিগারেটটার খুব প্রয়োজন এখন তার। বুকে একটা বাধা টের পাচ্ছে সে। না, মানসিক ঝটকা নয়। সম্পূর্ণ শারীরিক।

বোস উঠল। কাফিনেট খুলে ব্রান্ডির বোতল বের করে ঘোলাসে ঢেলে নিল অনেকটা। স্টোভ। স্টোভ। ইউ হ্যাভ টু বি স্টোভ। রিভিভ করতে করতে গপ

করে খেয়ে নিল। প্রায় খালি পেটে গিয়ে তার পাচন নাড়ি লাগিয়ে দিল ব্রান্ডি।

বোস আবার ইঞ্জিনের বেস। আসলে থেকে আশ-খাওয়া সিগারেট তুলে নেন এবং ব্রান্ডিটা ধীরে ধীরে শেষ করে। কাগজটা হরতো ঠিক হল না। তবে আপাতত হাতের কাগজটা কমল। বুকের বাথটা না কমলেও বেড়েও গেল না আর।

মিল্লীপা বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘরে গেল। বোস উঠে আবার বড় মশের ব্রান্ডি নিয়ে এসে বসে। অসুখ আসতে সময় নিয়ে সেটা শেষ করে। কতক্ষণ লাগল তা বুঝতে পারেন না। সময়ের বোধ খানিকটা গুলিয়ে গেছে। তবে বুঝতে পারছে, অফিসে বেরোতে আর দেরি করা উচিত হবে না।

ধীরে ধীরে বোস একসময়ে ওঠে। প্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখে। তারপর রুমাল মুখটা ভাল করে মুছে বেরিয়ে আসে।

অন্যত্রাসের দরুন এক অসময়ের খাওয়ার দরুন মাখটা টলছে। শরীর নির্মম করছে।

ডাইনিং হল-এ মিল্লীপা এসে ব্রেকফাস্ট করছে। পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর দেখাচ্ছে থাকে। বোস মিল্লীপার দিকে চেয়ে আবার সময়ের হিসেব গুলিয়ে ফেলে। দেওয়ালে ঘুর রেখে দাঁড়িয়েই থাকে গাড়লের মতো।

একটু বসে মিল্লীপা হঠাৎ তাকে দেখতে পায়। চমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, এ কি বন্ধু? শরীর খারাপ লাগছে নাকি?

বলতে বলতেই প্রায় উড়ে কান্নে আসে মিল্লীপা, কী হয়েছে? শ্ল্যাক করলে নাকি?

বোস সামান্য শ্বলিত শ্বরে বলে, শরীরটা ভাল লাগছে না।

তবে শুরুর থাক। আমি ডাক্তারকে রিং করি।

না। তুমি কিছু নয়। কোয়ার্টার পারফরম্যান্স এ ব্যাড নিউজ ফর আস। কালজটা দেখ।

কিসের নিউজ? বলতে বলতে মিল্লীপা গিরে কাগজটা তুলে নেন। কিন্তু কোন খবরের কথা বোস বলছে তা বুঝতে না পেরে হু হু করে শ্বাসতে থাকে। বোস বলে, লীড, সো হু দি লীড নিউজ। স্টেন স্ট্রাস।

মিল্লীপা দেখে এবং পড়ে। এবং তারপর বুঝতে পারে। হঠাৎ সে অসুখ অসুখ চেয়ারে বসে। মূখ্য কিসের বেসের দিকে চেয়ে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করে, এই মেনে কি দীপনাথবাবু ছিলেন?

আই আম নট সিওর। তবে সময়টা খুব কাছাকাছি।

এই এয়ারওয়েজেই উনি বাঁজলেন?

বোধ হয়।

মিল্লীপার চোখে দৃষ্টি খুব শূন্য হয়ে যায়। বোসের দিকে চেয়ে থাকে শূন্য। কথা বলে না।

বোসের দিকে চেয়ে থাকে শূন্য। মিল্লীপা বলে মনে হয় বোসের। ভেরী হিউম্যান, ভেরী সফট।

অলমোস্ট টাচবল। ইভন লাভবল।

বোস দেওয়ারলের ভর তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে গিরে বাইরের দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে। আজ অনেক কাল নিয়ে বাস্তু থাকতে হবে। মেক ইওরসেলফ ব্রিজ। গুডার বারনডেড। সেট টার্মড। সেট স্ট্রাক্স।

এনিথিং বাট ব্রান্ডি।

গাড়িতে বসে আবার সিগারেট ধরাল বোস। আরে! দীপনাথ খুব পাহাড় ভালবাসত না? টল মাইটেনস! হাইটস! চুক চুক। হি লাইমহড হাই দিস টাইম। দি কল ওয়াল অলসেস স্টেট।

বোস চোখ বুজে থাকে। ভিতরে ভিতরে কী বেন দিকি দিকি পড়ে যাচ্ছে। বড় জ্বালা।



বিত্তীয়তার খবরটা পড়ে কাগজটা সরিয়ে রাখে মিল্লীপা। তারপর উঠে দড়ায়। তার পা টলছে না, বুকে কাঁপছে না। কিন্তু বুকের বড় শূন্য। মনে হচ্ছে আর এক পাও হেটে বাওয়ার কোনো মানে হয় না। শোওয়ার ঘরের আলমারি থেকে সে তার মশ

চপ্পল গুলির বেরিয়ে পড়ে।

অফিস টাইমে রাস্তার টাকসি পাওয়া মুশকিল। তবে ভালাসে পাশের স্ট্রাটের বড়ো মাস্টার ডব্লোক তার গাড়ি বের করছিলেন।

মিল্লীপা সোজা তার কাছে গিয়ে বলে, একটা লিকুট দেবেন?

প্ল্যাডলি। কন্সব?

কতক্ষণ না একটা ফাঁকা টাকসি পাওয়া যায়।

উঠে পড়ুন।

টিফিনাখানার কাছাকাছি ফাঁকা টাকসি গেল মিল্লীপা। রতনপুর শেইছে দেখল, হাতখড়িতে ময় সোরা কলটা। কি করে পেয়েছিলেন, এই সময়ের মধ্যে কী কী কন্যা ঘটেছে, কোন দৃশ্য চোখে পড়ছে তা তার কিছুই মনে পড়ল না। রিকশার বেস সে স্কাডাবিক হওয়ার চেষ্টা করল খুব। পারল না। বার বার আনমনা হয়ে যাচ্ছে সে। খুব পাহাড়ের কথা বলত দীপনাথ, সময়ের কথা নয়। তাই কি দীপনাথকে পেরে হিরে সমগ্র তাকে টেনে নামাল অথি জলের গভীরতায়? হাতে আর তার পাহাড় ওঠার সাধ না জায়?

রিকশাওয়ালা জিজ্ঞেস করল, ফটক দিয়ে ঢুকতে হবে নির্দিষ্ট?

না, ছেড়ে দাও। বলে পরসা দিয়ে নেমে গেল মিল্লীপা।

চান্সে বাড়ির সবই স্কাডাবিক আছে। নতুন দেওলা বাড়ির ছায়ার একটা মোড়ার হিসেবের খাতা দেখতে দেখতে এক কাপ চা খাচ্ছিল তৃষা। মিল্লীপা দেখে খুব অবাক আর খুশি হয়ে বলল, আরে এসো! কর্তাদিন পর!

কিছু বলতে হল না, নতুন একটা ছোকরা চাকর কাছাকাছি কোথাও হুকুনের অপেক্ষার ছিল, সে সেড়ে আর একটা মোড়ো নিয়ে এল।

গরমে জেতপড়ে এসেছে। চা খাবে?

মিল্লীপা মাথা নেড়ে বলে, না।

আমার নতুন বাড়ি দেখ। কেমন হয়েছে?

চমৎকার।

আমার নিজের দেওয়া ডিকাইনে ঠেরি। দেখতে যেমনই হোক, থাকতে ভারী আরাম। সদিন এসে আমার কাছে থাকবে? সাহেব বরজিকও সদিন এনো, জারগার অভাব নেই। আমার অভাব কথা বলবার মত লোকের।

তুমি এক আত্মা চুল পেকেছে, লক্ষ করল মিল্লীপা। চেহারাটা একটু ভারভাগিক। বরসের ছাপ নয়। তবে অভিজ্ঞতার একটা পকতা এসেছে মনে। কিন্তু বা খুঁজছে মিল্লীপা তা নেই। উৎস নেই, শোক নেই।

চায়ের কথা বলতে হল না তুমি, বস্তাচালিতের মত এসে গেল।

মিল্লীপার সত্যাকারের কেননা নেদা নেই। মাকে মাকে শব্দ করে সিগারেট বা মদও খেয়েছে সে। কিন্তু কোনটাই তাকে বেঁচে রাখেনি। চাও নয়। কিন্তু এখন এক কাপ গরম চা পেরে তার খুব ভাল লাগল। তার আসে এক প্লাস জল চেয়ে খেল সে। তলানী পর্যন্ত চা শেষ করল। তারপর বলল, দীপনাথবাবু! কেন এয়ারওয়েজে গেলেন তা কি জানা আছে আপনার?

এয়ারওয়েজ! ও বাবা, সে সব কি আমাকে বলে গেছে নাকি। এই তো গতকাল রাতের গাড়িতে গেল। বললেও মনে রাখতে পারতাম না। কেন বলো তো?

কখনো বলেননি?

আমাকে বলেনি। তবে আমার ছেলে ওসব খবর রাখে। বড় কাকা তার প্রাণ।

সম্মল কোথায়?

পরীক্ষার পর ক্রিসের বাড়ি এলাহাবাদ বেড়াতে গেছে। হুমি কী নিয়ে এত ভাবছ বলো তো? অমন দেখাচ্ছে কেন?

বলবে কিনা তা বারেক ভেবে নিল মিল্লীপা। কিন্তু ভেবে লাভ নেই। সে না বললেও জানতে পারবে তৃষা। কিন্তু তৃষা শান্ত মনে, জেজ্ঞ পড়বে না। হরতো



## বসন্ত

বরণ করিত ঐ চরণ কমল  
 জমারের শুভন, কোকিলের কুঁজন  
 রাঙ রাঙ রঞ্জিত নব ফুলদল  
 লয়ে ফুল মালিকা, চলে অভিসারিকা  
 ঘোবন উচ্ছল রুদি শতদল !



প্রতি স্বপ্ন বঙ—  
 অ্যাপকোলাইট  
 সুপারঅ্যাক্রিলিক  
 ইমালশান



এন্টিয়ান  
 পেন্টস





ক্যালসিয়ামের অভাব হলে হাড় দুর্বল হয় ও সহজে ভাঙে!

**ক্যালসিয়াম-স্যাণ্ডোজ**

**হাড়ের কাঠামো মজবুত করে!**

দরীর হাড় আমরা দেখতে পাই না। অথচ বাতালের পরিপূর্ণ ভাবে থেকে ওঠার জন্য তাদের গুরুত্ব খুবই বেশী। ক্যালসিয়াম হাড় ও দাঁতের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় উপাদান। দরীর ক্যালসিয়াম কম হলেই হাড় দুর্বল হয় ও সহজে ভেঙে যায়। দাঁতের গোড়া আলুপা হয় এবং দাঁতে গর্ত দেখা দেয়।

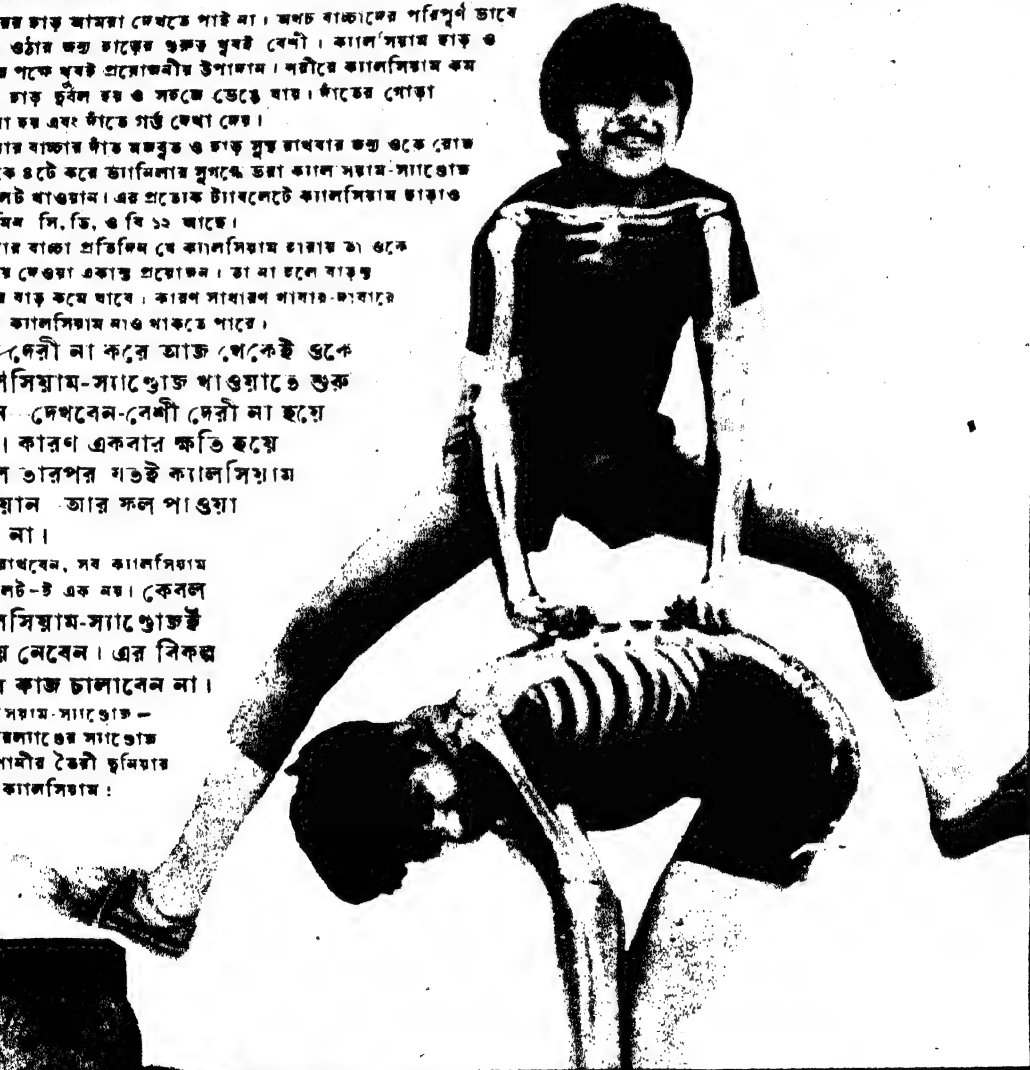
আপনার বাতাল দাঁত মজবুত ও হাড় সুস্থ রাখবার জন্য ওকে রোজ ৩ থেকে ৪ টি করে ক্যালসিয়াম স্যাণ্ডোজ ড্রাগ ক্যালসিয়াম-স্যাণ্ডোজ ট্যাবলেট খাওয়ান। এর প্রত্যেক ট্যাবলেটে ক্যালসিয়াম ডায়া ও ভিটামিন সি, ডি, ও বি ১২ আছে।

আপনার বাতাল প্রতিদিন যে ক্যালসিয়াম চায় তা ওকে ফিরিয়ে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে বাতাল বাতাল হাড় কমে যাবে। কারণ সাধারণ গাধা-জাঘারে যথেষ্ট ক্যালসিয়াম নাও থাকতে পারে।

আর দেরী না করে আজ থেকেই ওকে ক্যালসিয়াম-স্যাণ্ডোজ খাওয়াতে শুরু করুন। দেখবেন-বেশী দেরী না হয়ে যাব। কারণ একবার ক্ষতি হয়ে গেলে তারপর যতই ক্যালসিয়াম খাওয়ান আর ফল পাওয়া যাবে না।

মনে রাখবেন, সব ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট-ই এক নয়। কেবল ক্যালসিয়াম-স্যাণ্ডোজই চেয়ে নেবেন। এর নিকট দিয়ে কাজ চালাবেন না।

ক্যালসিয়াম-স্যাণ্ডোজ - সুইজারল্যান্ডের স্যাণ্ডোজ কোম্পানীর তৈরী ক্যালসিয়াম সেবা ক্যালসিয়াম।



**ক্যালসিয়াম-স্যাণ্ডোজ®**

**শক্ত মৌত ও সুস্থ  
প্রবল হাড়ের জন্ম**



কম্বু? টাকে বলের কলসী নীচে তো? বাবির  
বলার?

ভোর বা অকস্মাৎ দেখছি, বাবিরে বললে কি পরে  
জানার মতক হয়নি।

দুজনে পাশাপাশি বিছানায় বসে। মনিষীপা এক  
গভীর এক লম্বা মাথা হেঁট করে থাকে। কি করে  
মুখ তুলবে তা বুঝতে পারে না।

তুমা আরো করে বলে, লম্বার কিছ নেই। আমার  
কথা তো ভেটক কখনো বলিনি। আমিও ভোর সতাই  
পালী। একজনের ঘর ভরি, মদ আর একজনের কাছে।  
ভোর আর একজন তবু বেঁচে বসে আছে। আমার  
জন কেবল শূন্য।

সে কে?

ভোকে বলছি আর কি? তা মনে ভোর অত  
দরকার কি রে? তুই কখনো লিপ্যরি কখনো করেছিস?  
প্রশ্ন এক হুত পাশে বাঙালির অবাক মনিষীপা  
বলে, না তো।

রাসা কিছ জানিল, না বিবি সেজে ঘুরে কোল  
বাঁলে?

একটু, একটু জানি।

হাই জানিল। লিপ্যরি কেমন করে রীতে জানিল  
না তো।

নামই শুনিনি।

আজ কেনে দেখে? যদি ভাল লাগে তবে শিখরে  
দেখো। কত রকম রেখে বাঙালি।

নতুন বাড়ির একটি মসোয়র কচ ঢাকা বায়লার  
মন্ত বাঙালির টোকেল দুজনে খেতে বসল। তুমা বলল,  
এই মন্ত বাড়িতে আমি একা থাকি, জানিন?

একজন একা?

আমার একজন খাস দাসী আছে, বন্দু। সে থাকে।  
তুই থাকতে পারবি একা? ভুতের ভয়ে মরে যাবি।

আমার ভুতের ভয় নেই।

কেন নেই রে?

কিভাবেই করি না।

ঘর বোকা। ভুতের ভয়টা একটা ভারী মজার  
জিনিস। ওটা না থাকলে জীবনটা আনন্দই হয়ে যায়।  
আমারও ভুতের ভয় নেই। কিন্তু মরক মাকে চোকা করে  
একটু, আদর্শ, ভর ভৈরি করি।

তোমার সেই কথারীত বললে না কিন্তু। সেই আর  
একজনের কথা। খুব চোপে বসেছ।

না।

বলো না।

তুমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বলতে শূন্য  
কলো ফুরাবে না। আমাদের জামল ছিল অসংকম।  
তখন আমরা ছিলার সব পরচরণের নামক নারিকার  
মতো। প্রেম মনেই বুক-ভাঙা কত। ভোরের আমল  
তো সেরকম নয়। এখন তো শূনি জেলে মেরেরা গিঁবা  
খোলামেলা করে, শোনা বসা হয়, আমার হাসিমুখে  
হাফাছাড়ি হয়ে চলে যায়।

অনিচ্ছা তাই।

তবে তুই হঠাৎ কী বলে দীপ্ত ওপর হুমকি  
খেয়ে পড়লি?

পড়িনি তো। মনিষীপা হাসল। রেসে মেল না।  
মারব বাপড়। মেরেমানুষের চোখে কিছ, এড়ান  
না।

উই আর ক্রেডল।

লিপ্যরি কেমন থাকিস?

মার্ভেলাস। কিন্তু কতটা কি করে কেটেছো  
কলো তো। ঠিক স্প্রিং-এর মতো।

লিপ্যরি আসল কারিকুরিই তো? ওখানে।  
কটাকটাই আসল। খুব খার্টনি।

কত খাটতে বাও কেন? সময় নষ্ট। রাসা হবে  
গ্রেম জাপ্ত কুইক।

আমি তো ভোরের জেট-বুসের মান্দে নই।  
আর সব কিছুই কি রেন জাপ্ত কুইক কলো বা?।  
কারিকুরি না থাকলে গোটা জীবনটাই হয়ে মিল-  
হাল।

জোমকে আমারে কিছ শেখানোর নেই।

আজ রে, মারো। আমার খুব ইচ্ছে করে  
আজকালকার মেরেদের কাছে শ্বাসী বস করার  
কলো মন্তরটা শিখে নিই।

কেন, ভোরের শ্বাসী তোমার বস নয়?  
একটুও না।

মরিক বসে রাখার চেষ্টা করোনি?  
অরিন আবার।

মনিষীপা মাথা নেড়ে বলে, কিভাবে করি না।  
তোমার শ্বাসীটি তো ভারী ভালমানুষ।

জাপ্ত এ ভৈরি হ্যাংডাম পারল। কোয়ট  
আডোরবল। তোমার আর একজন কি আরো  
হ্যাংডাম?

ভেটক বলখ কেন?

সে মারা গেছে মরিক?

হ্যাঁ। কিন্তু মরেও কি আর মরেছে? তুত  
হয়ে থাকে চোপে আছে। এ জন্মে আর কোনো  
ওকা-বিসরি লাগে নেই যে, তাকে ডাকার।

সে তোমার বসে ছিল?

না। বরং আমিই তার বসে ছিলাম। সে  
মেরেদের খুব ভাল শোখ মানতে পারত। ভোর  
আর একজনের মতো মিনিমেন নয়।

আমার আর একজন কেউ নেই।  
সেই জে চোখখোটা লামালি কেন? তা রূপে:

সব জানি।

তুই এত বাংলা শ্ল্যাং কলো কেন? জু।  
হুড়ি। আর একজন।

যদি থাকি যে। তবে এসব শব্দেবোও জানে।  
জানে, কিন্তু কথার কথার ইটন করে না।

তুই ভীষণ গোঁরো।  
গোঁরো হই আর বাই হই, তাকে একটা কথা  
বলছি। আর গিরে বরং সোপে শূনি।

হ্যাঁ।

হ্যাঁ নয়। এই বরং থেকে যদি পারের তলায়  
মাটি জালায়া হতে থাকে তবে বেশী বরং সম্পর্কের  
বিবর্তা গাড়ির যাবে। আমার অকস্মাৎ দেখাছিল না?

তোমার আমার কী অকস্মাৎ? বেশ তো আছো।  
কী দেখে বেশ আমি বুঝলি? এই মারি,  
সম্পর্ক, টাকা? জানিল, বরং পাড়া দিই নি বলে  
তাজ এই সবোবের কেউ আমাকে আপন জানে না?

আমার ঘর তো আমাকে ডিভোর্স করার জন্য  
হুমকি দিয়ে আছে।

কেন, খুব কট কট করে কথা শোনাশ মরিক?  
না না। কথাই হয় না প্রায়।

সেও তাহলে ভোরই দেখে। নিস্তরই বর ভোর  
পছন্দে নয়।

কত মানি সেন্ডিক, সোলকিন, জ্যাম্বিশাল।  
সে যেমনই হোক হাফাছাড়ি হয়ে গেলে কিন্তু  
একজন ভুবজলে পড়বি। বা পেরেছিল সেটাকেই  
ঠিকঠাক করে সে। পুতুখ মানুষ হচ্ছে একবার  
কোম-জালা মরবেখ। হাত করা লজ কাল নয়।

তার ওপর ভোর তো হুড়ি জিনিসপত্তর খরাস  
নয়। হুড়িরও আদর্শ। আজ কিরে গিরে একটু  
সাজগেজ করে থাকবি। বর এলে একটু, ঢালাটাল  
করিল।

কী যে সব বাক্য বরং কথা কলো না।  
শুনতে খারাপ। কিন্তু বা বলছি সব নিস্তর  
জীবন থেকে।

আমি যে বরং সোপে শূনি তা জানলে কি করে?  
কেউ বলছে?

ভোর মূখ ফেলেই তো বোকা বার।  
কী আরে বুঝে?

ভোর মূখ চোপে আই-বাই করছে।  
হ্যাঁ। ইয়ারকি মেরো না।

মাইরি বলছি। ভেতরে আই-বাই না থাকলে তুই  
আর একজনের দিকে চলে পড়তি না।

মনিষীপা খুব অভিমানে বলে, সেটাও বুঝি  
সেকস?

তোমার কি কলো?

তুমা একটু, শ্বাস হয়ে মাথা নেড়ে বলে, না রে।  
আমার একটু, অন্য রকম। ইয়ারকিতে কী বলে মেনে।  
ডিভিড না কী। আমি হুজি তাই।

মরিক?

মরিক, আমাকে দেখলে কোন মরিকসী মনে হয় তা  
জানলে নই রে।

মরিকসী কেন বলছ? বট ইট লুক সেকানি  
এসক।

তুমা একটু, হেসে বলে, তাই তো বলছিলাম,  
বাইরে থেকে বাক্য বা মনে হয় সে মরতো তা নয়  
জানলে।

দীপনাখবাবুর সঙ্গে তুমি আমাকে জড়িয়ে তাকাল  
কিই ইংলিশ করলে কিন্তু।

মরি মরি। কী বললাম, কী বুঝলি। বললাম  
সেকস স্যাটিসফাকশন না থাকলে মাথার নানান  
পাশলারি আসে। ভোরও মরতো তাই।

আমি পামল।

না, ভেটক নিরে পারি না। সব কথা অমন ধরিয়ে  
কেন?

তোমার কথাগুলো তা হলে খুবই বরং মরক নয়?  
তুমা হেসে ফেলে। বলে, এইটুকু করে খাস মরিক  
রেন? এই খোরাক হলে বাঁচবি কি করে? আর  
ছিলাম হওয়ার মরক নেই, এবার একটু, গায়ে পড়বে  
হয়ে ওঠ।

ইস, কী যে সব গোরো শ্ল্যাং বলছ না।  
দীপ্ত খুব চাইতে ভোর ভাল হোক। কিন্তু কিসে  
ভাল হইব তা বুঝতে পারত না। দীপ্ত হই আর আমি  
ভেটক বলে দিছি। শ্বাসটিকে হাতছাড়া করিস না।

একটাকে বাই জাচলে বাঁচতে না পারিল তবে বোকা  
মেল, আর কাউকেও পারবি না।

এমনভাবে বলছ কেন তুমি আমার বরং চেনো।  
চিনি না। তবে জানি পুতুখের খুব কথা করতে  
ভালবাসে। আর পছন্দ করে বড়ের তোমারোনা।

তবে নিস্তরকে বস মানতে পারছ না কেন?  
তুমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেড়ে বলে, কত সেরী করে  
কলোই রে। বরং তো কখনো উঠানে বার না। এখন  
আমার আর ওর মধ্যে অনেক নতুন সময় কোা দিয়েছে।  
হেলে মেরে আশ্বিনাল ভর ফেরা। কত সেরী হয়ে  
গেছে।

আর সেই আর একজনের কথা বললে না?

তুমা মাথা নেড়ে বলল, না। সে আমাদের মাথা  
না। আমি তাকে সোপনে হুসের রেখেছি। কাউকে  
জানতে দিই না। কেমন জানিল? যেমন ভলবাল। ভরক  
ভালবেসেও অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা খর। অসুবিধে  
হয় না।

গোরো স্ট্যানডার্ড সেটাও কিন্তু পাম।  
জানি। রামরও কি পাম ছিল না? চল আউই।

হাত শূকিরে কড়কড়ে হয়ে এল। এরপর একটু, হুসিরে  
সে।

মনিষীপা উঠল। বেসিনে মূখ হুতে হুতে বলল,  
আজ আর থাকব না দিবি। তবে মরক মনে আসব।

থাকবি না কেন?

দুপুরের ঘরে থাকতে আমার ভাল লাগে না।  
এই রকম রেনে বুঝি? রেনে মাথার করে হুসির  
কলো শূকিরে গোলিল।

এক দুকলো কলো না। তোমার জামার বাক  
খিলার কলো তাই।

তুমা মূখ চোপে মনিষীপার দিকে চেয়ে একটু  
হাসল। বলল, তুই বড় মরা জানিল।

তাব মনে?

কী জানি হাই। তবে কেবল ডাকতে ইচ্ছে করছে,  
তুই আমার আর একটা মেরে।

মেরিল। বলে একটু অপ্রস্তুত হাসি হেসে  
মনিষীপা বলে, তুমি সত্যিই গোরো। মেরে আমার  
কি? উই আর ক্রেডল।

চুপ কর মূখপাড়ি। ভোর ইয়ারকি-বলা মূখ আমি

# আমূল চীজ-খাসা চীজ!



**কাটলেট এমনই  
মজাদার  
খেতেই থাকবেন  
বার-বার।**

## নিরামিষ চীজ কাটলেট

(১০ টা কাটলেট বানাতে)

৩ টে বড় আলু—সেদ্ধ করা ও খোসা ছাড়িয়ে  
চটকানো; ১০০ গ্রাম করে গাজর, কুলকপি  
ও বাঁধাকপি—ছোট-ছোট করে কাটা।

১০০ গ্রাম মটরশুঁটির ধানা

১০০ গ্রাম আমূল চীজ—ফেটানো

১ ছোট চামচ মুন

১/২ ছোট চামচ পাকা লঙ্কার গুঁড়া

৩ ছোট চামচ ধনে গুঁড়া

১ ছোট চামচ গরম মসলা

১ ছোট চামচ জিরে

১ ছোট চামচ সরষে

২ টো কাঁচা লঙ্কা—কুচনো

১ গাছি তাজা ধনে পাতা—কুচনো

১/২ থানা পাতিলেবুর রস

ভাজবার জন্তে বনস্পতি

একটা ভারী পাতনে ২ বড় চামচ বনস্পতি  
গরম করুন। তাতে জিরে ও সরষে ফেলে

সাঁতলান। এবার বাকি মসলা ঢেলে, ক্রমেক  
সেকো নাড়ুন। ক্রম তাতে কাটা সজী,

মটরশুঁটি ও আলু চামচ মুন মিশ্র। পরিমাণ

মত এমন জল ঢালুন, যাতে সবকিছু ভাল

পাক হয়। তারপর আঁচ থেকে নামিয়ে

ফেটানো চীজ মেশান। সজী ও চীজের এই

মিশ্রণটি এবার একধারে সরিয়ে রাখুন।

চটকানো আলুতে এবার বাকি মুন, পাতিলেবুর

রস, কুচনো ধনে পাতা ও কাঁচা লঙ্কা মেশান।

আলুর এই মিশ্রণটিকে এবার পাতিলেবুর

আকারে গোল-গোল পাকিয়ে ফেলুন। এবার

হাতের তালুতে প্রত্যেকটি গোলাকে পুরির

সাইকে চেপটে নিন। এবার এক-একটি পুরির

ওপর সজী ও চীজের মিশ্রণ ভরে, তার ওপর

আরেকটি পুরি রেখে, দু'টো পুরির চারধার ভাল

করে মুড়ে বন্ধ করে দিন। এবার লেডো  
বিস্কুটের গুঁড়োয় মাখিয়ে কাটলেটের মাগে করে

নিন। তাওয়াতে অল্প বনস্পতি ঢেলে এমন

করে ভাজুন, যাতে কাটলেটের দু-শিটই লাল ও

মুচমুচে হয়। এবার, চটনি বা টমাটো সসের

সঙ্গে গরম-গরম খেতে দিন।

**আমূল চীজ ওলা ছোট পুরির  
স্যাণ্ডউইচ**

(মোটামুটি ২০ টির মত স্যাণ্ডউইচ বানাতে)

১০০ গ্রাম আটা

১ ছোট চামচ বনস্পতি বা আমূল বা সাগর মাখন

৪ বড় চামচ পাতলা ক্রীম বা দুধের সর

৩ টি আমূল চীজ 'চীপলেট'—ফেটানো

১ টি ছোট পেঁয়াজ—কুচনো

২ টি কাঁচা লঙ্কা—কুচনো

ভাজার জন্তে বনস্পতি বা ঘি

আমূল চীজের মিশ্রণ

ফেটানো চীজ আরও চটকান। ক্রীম ঢালুন ও

ভাল ভাবে নেড়ে মিশ্রণ তৈরী করে নিন।

পেঁয়াজ ও কুচনো লঙ্কা মেশান।

ছোট পুরি বানানো

আটাতে বনস্পতি মিশিয়ে মেখে নিন।

এবার অল্প জল ঢেলে এমন ভাবে ঠাহুন, যাতে

সহজে বেলা যায়। এবার ঠাসা আটাটিকে দু'টো

গোল তাল পাকিয়ে দু'টো বড় কটির আকারে

বেলে নিন। এবার কোনো স্কোয়াশ বা ঐ

ধরনের বোতলের ঢাকনা চেপে ছোট-ছোট

পুরির মত কাটুন। তারপর সুঁট গরম

বনস্পতি বা ঘিয়ে ভাজুন। দু'টি করে

পুরির মাঝখানে আমূল চীজ মিশ্রণ ভরে,

স্যাণ্ডউইচ বানান। বাস, এবার

গরম-গরম খেতে দিন।

## চীজ ওলা মুড়ির খাবার

(২ জনের মত বানাতে)

২ কাপ মুড়ি

৫০ গ্রাম ফেটানো আমূল চীজ

১ বড় চামচ আমূল বা সাগর মাখন

১/২ ছোট চামচ মুন

১/২ ছোট চামচ পাকা লঙ্কার গুঁড়া

মাখন গালিয়ে নিয়ে, তাতে মুড়ি ঢালুন এবং

এপিঠ-ওপিঠ করে ভালভাবে নেড়ে নিন।

এবার আঁচ থেকে নামিয়ে ওতে ফেটানো চীজ,

মুন ও লঙ্কার গুঁড়া মেশান। বাস, এবার হাতে

গরম খেতে দিন।

আমূল চীজ এমন খাসা চীজ যে যাতে বানানো  
সব খাবার-দাবারই চমৎকার হুজু ও পুষ্টিকর  
হয়ে যায়। এতে সহজ-পাচ্য ২০% প্রোটিন  
ও যথেষ্ট ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন এর গুণ  
রয়েছে। আর তাছাড়া—এটা খেতেও দারুণ  
মজাদার!

## আমূল চীজ

**সব খাবারই আমোদ খাসা  
বানানোর চীজ!**



ASPIAC-BEN/7/2-81



বিজী-বাবুদ্বার : গুজরাত কো-অপারেটিভ মিড মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড,  
আনন্স ০৮৮ ০০১, গুজরাত।

লক্ষ্য করলেও ভয় হচ্ছে কিরে বাঙার পর আমিও  
মাকে মাকে ওসব বলে কেলব দাঁক।

না বম্বোলেও সামান্য সময় একটু শব্দে এপাল  
ওপাল করতে হল মণিলাপকে, ভয়ানক হুকুমে। তারপর  
বাইরে রিকসার হন বাকল। তুবা এসে ডাকল, ওঠ  
হুড়ি, রিকসা এসে গেছে। প্রতি রাতিবারে চলে আলবি  
বরকে নিরে। মনে থাকবে?  
থাকবে।



ট্রেনে জানাশার ধরে বসে মোটা দিলটার কথা  
ভাবতে ভাবতে মাকে মাকে মণিলাপা গম্ভীর হাঙ্কল,  
আপনমনে হেসে উঠছিল। মনে থাকবে না আবার!  
খুব থাকবে। আঙ্ক ফিরে গিরে কী করবে মণিলাপা?  
সজিই বনুর সঙ্গে শোবে? ভাবতেই আবার হাসি  
পাচ্ছিল তার। খুব অবাক হবে বন্দু। খুব বোকা  
হবে বাবে। তুবা কি সত্যিই স্টিজিড? না গুলে মারল?  
সে নিকে ফিজিড নয় ঠিকই, কিন্তু খুব সেকসিও  
নয়। হুমার মতো বসে সেও কি স্টিজিড হয়ে বাবে?  
বনুর সঙ্গে কত কাল সম্পক নেই, তবু তো সে  
শরীরের জন্য পালল হয় না? জুং, বুড়িটা একদম  
বাজে একটা একসপ্যানেশন দিল। দীপনাথকে জড়িয়ে

ওঠে। পৃথিবীর সুন্দর যা কিছু তা সব খুব ভাল  
লাগতে থাকে। বসতে ইচ্ছে করে। এই কি প্রেম? যে  
প্রেম সে আসে কখনো টের পায়নি?

বুড়িটাকে কিবাস হরনি মণিলাপার। তবু বাড়ি  
ফিরে এসে সে আঙ্ক সেজে রইল। চমৎকার একটা  
কড় কড় কালো কলকার পাড়ওলা ছাইরতা ভাঁড়ের লাড়ি  
পরল। হুখে সামান্য পাড়িয়ার। কপালে মশত কুমকুমের  
টিপ। সামান্য রান্ধা করল টেটি। একটু সুসুখী শ্রেণ  
করল গারে।

সন্দের অনেক পর বোস ফিরল। চলাচল মাতাল।  
টলছে, হেঁচকি তুলছে, নাল গড়ছে কখ করে। মুখ  
লাল, চোখ লাল, চুল উড়াখড়ো। ঘরে ঢুকেই ফ্যান-  
ক্যালে গলার বলল, হি ইজ ডেড।

মণিলাপা বিরত হরোছিল। তবু গিরে ধরল  
বোসকে। সোফার বসিরে পাখাটা চালিয়ে দিলে এল।  
তারপর মুখোমুখি বসে বলল, তুমি খবর নিয়েছো?  
নিইনি মানে? খবর তো কাগজেই ছিল।

বাট ইউ ওয়ার নট সিওর।  
আই অ্যাম সিওর। হি ইজ ডেড লাইক এ লগ।  
আমি খবর নিয়েছি। হি ইজ নট ডেড।  
কে? কার কথা বলছ? দীপনাথবাবু কাল লন্ডন থেকে তাঁর দামাকে  
ট্রাকে কল করেছিলেন।

বোস কিম হয়ে বসে গরর মতো ভাবহীন চোখে  
চেরে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর খুব অবাক হয়ে বলে,  
তা হলে হু ইজ ডেড? সামওয়ান মাস্ট হ্যাভ ডায়েড।  
দীপনাথ নয়।

বাট সামওয়ান মাস্ট বি ডেড। কে বোলা তো?  
তুমি শোবে চলো বন্দু।  
শোবে? এখন কি শোওয়ার সময়? অতগুলো

আলবাস দেছে। ওপেন দি ফল্ট পেজ অফ দি  
নিউসপেপার। ওপেন ইউ।

চৌচিও না।  
কেন চেঁচাব না? আই হ্যাভ লস্ট মাই ব্রাদার।  
কেন চেঁচাব না?

মণিলাপা দু হাতে কান ঢাকা দেয়।  
বোস উঠে আসে করছে। হাটু সেড়ে মণিলাপার  
সামনে বসে দু হাতে ডাকে কাঁছনি গিরে বলে,  
সামওয়ান মাস্ট বি ডেড। মাস্ট বি ডেড। হু ইজ হি?  
আমি জানি না বন্দু।

জানো না? স্ট্রেঞ্জ। কল বেকুবের মতো মণিলাপার  
দিকে চেয়ে থাকে বোস। তার চোখ দিয়ে টস টস করে  
জল গড়ির পড়তে থাকে। ফিস ফিস করে সে বলে,  
জানো না। তারা মরে গেছে। সে মরে গেছে। জানো  
না? সত্যিই জানো না?

দীপা দু হাত বাড়িয়ে এই স্বার্থপর, উচ্চাকাঙ্ক্ষা-  
সম্পন্ন, প্রতিভামানীল একজিকিউটিভের মাথাটা ধরে  
থাকে। তার ক্ষেমা আসে না আঙ্ক। শোক মনুষ্যকে  
তো শুষ্টই করে। কিন্তু এ লোকটার কিসের শোক  
তা সে বুঝতে পারে না।

বোস স্প্লিড গলার জিজ্ঞেস করে, সত্যিই জানো  
না?

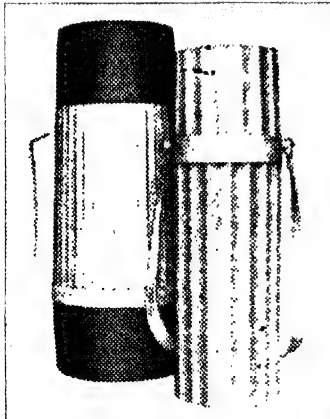
মণিলাপা হঠাৎ মাথা নেড়ে বলে, জানি বন্দু।  
হু ইজ ডেড? বোলা।  
ব্রাদার। ফ্রেন্ডস।

দ্যাটস এ গুড গাল। কেন কামছো না তবে?  
কে বলে কাঁছনি না বন্দু। বলতে বলতে এক রাল  
চোখের জল কোথেকে এলো। নল্লের এল বান। টেটি  
কোঁপে গেল ঘরঘর করে। স্প্লিড গলার মণিলাপা  
বলল, এই তো কাঁছনি।

লম্বাশ

# হ্যামার মাস্টার

## প্রতিটি উপলক্ষে



প্রতিটি প্রয়োজনের উপযুক্ত  
নানান, বস্ত্র, তক্ষা ও আকারের  
পাওয়া যায়।



ডালো ফ্রাঙ্ক চাইলেই  
পাবেন  
হ্যামার মাস্টার

HVG-980 BEN



କେନ୍ଦ୍ରୀୟ  
କାଉନ୍ସିଲ



ଭାରତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ  
ଭାରତୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ  
ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପଂଚଜ୍ୟ





“আমি হলুম  
সবচেয়ে রসালো,  
ঝাঁঝালো আদা...”

প্রিয়ারই  
স্বাদে স্বাদ  
মেলানো।”

“প্রিয়ার জুড়া নিষাচিত হতে গেলে প্রত্যেক আদার  
আমার মত পুষ্ট আর ভাল জাতের হওয়া ছাড়া  
গতি নেই।

ভবেই পাওয়া যাবে বাছাই করা উপকরণের সাহায্য।

যেমন কিনা, সবচেয়ে ভাল মসলাপাতি...

অথবা একদম ঝাঁটি তেল...

তারপর সবকিছু জারানো, মজানো হবে অন্ধ্রপ্রদেশের  
বিখ্যাত ঐতিহ্য অশ্বযায়ী বিশেষ পদ্ধতিতে...

স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরী, আকর্ষক নিশিতে ভরা

সে এক অতীব লোভনীয় ব্যাপার...

একি? জিভে ভল এসে গেল যে! তবে এখানেই থামি?”

দুই সাইজে (৩০০ গ্রাম

এবং ৬৫০ গ্রাম) প্যাকেট—

রন্ধনপুঙ্ক অথবা রন্ধন ছাড়া।

• আম • মেবু • পোংগুরা • আদা • টমেটো

**প্রিয়া ফুডস**  
প্রাইভেট লিমিটেড

বাড়ারে হাউসিং :

হার্ণবর্নী মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড,  
ইস্টার্ন কম্পাউন্ড, হাজরাবাদ ৬০০ ০০৪



জিভে ভল আসা আচর-**প্রিয়া**

# ফুটবলে হলুদ ও লাল কার্ড নিয়ে সমস্যা

হলুদ এবং লাল—দুটি রঙ সব ক্ষেত্রে দৃষ্টি-সূচক নয়। ফুটবলারদের কাছে তো এখন মোটেই নয়। হলুদ ন্যায়ের লক্ষণ, লাল ভয়ের। ফুটবল খেলার লাল ও হলুদ কার্ডের ব্যবহার চালু হবার পর থেকে খেলোয়াড়দের মধ্যেও দারুণ ভীতির সঞ্চার হয়েছে। সকলেই জানেন খেলার সময় খেলোয়াড়কে হলুদ কার্ড দেখানোর অর্থ তাকে সতর্ক করে দেওয়া। লাল কার্ড দেখানো মানে খেলার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা। অর্থাৎ মাচিং অভ্যর্থন দিলে মার্চ থেকে বের করে দেওয়া।

ফুটবল খেলায় অশোভন আচরণ, নিরমবাহিত ফাউল বা অন্য কোনো অপরাধের জন্য খেলোয়াড়কে হলুদ কার্ড দেখানো এবং হলুদ কার্ড দেখা খেলোয়াড়ের পরের মাচে সাপেন্ডে থাকার ব্যাপার নিয়ে সম্প্রতি স্পোর্টস সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। নির্দিষ্ট ভারত ফুটবল ফেডারেশন ইচ্ছা করেই এ সমস্যা ডেকে এনেছেন। এখন পরিমার্জিত সামাল দিতে নিজেরা কোন নিয়মিত খেলোয়াড়ের তেমন বিপদে ফেলছেন। আবার শান্তিপূর্ণ খেলোয়াড়দের খেলানো নিয়ে ক্রাফ ও অনুবিধার পড়ে মামলা করার দুর্ভাগ্য কিছুই।

ঘটনাবাহিত খিড়িয়ে দেখা যাক। কলকাতার ফুটবল লীগের খেলা চলার সময় মজিরের সাপেন্ডেনকে কেন্দ্র করে প্রথম এই সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে ইস্টবেঙ্গল ক্রাফ। ফেডারেশন কাপের খেলার মজিরকে একবার হলুদ কার্ড দেখানো হয়েছিল। পরে লীগের একটি মাচেও তাকে হলুদ কার্ড দেখানো হয়। ফলে মজির পরের মাচাটি খেলার অধিকার হারায়। ইস্টবেঙ্গল ক্রাফ যদিও একটি মাচে মজিরকে বিনের রাখে কিন্তু আইনের ব্যাখ্যা চেষ্টা চিঠি দেয় আই এক একে। তাই বাকি ছিল ফেডারেশন কাপের খেলা এবং কালকাটা ফুটবল লীগ দুটি পৃথক প্রতিযোগিতা। সুতরাং দুটি প্রতিযোগিতার একবার করে কোনো খেলোয়াড়কে হলুদ কার্ড দেখানো হলে সেই খেলোয়াড় একটি মাচের জন্য সাপেন্ডে থাকতে পারে না। ফুটবল ফেডারেশনের আইন তুলে আই এক এ জানায়, অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সাকুলার অনুযায়ী ভারত যে কোনো রিজিস্টার্ড প্রতিযোগিতার কোনো খেলোয়াড়কে দু'বার হলুদ কার্ড দেখানো হলে একটি মাচের জন্য সে সাপেন্ডে থাকবে। ব্যাপারটি তখন ধমা চাপা পড়ে যায়। কিন্তু প্রস্তুতি আবার ওঠে বোম্বাইয়ের রোডার্স কাপের খেলার সময়। ইস্টবেঙ্গল ক্রাফের নটপার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বোম্বাই ফেডারেশন কাপে এবং ডি সি এম টুর্নামেন্টে হলুদ কার্ড দেখেছিল সেখানেও ক্রাফের প্রথম মাচে বসে থাকে। অর্থাৎ সাপেন্ডে হওয়ার জন্য ওই মাচে খেলতে পারে না। তারপর এরিয়ান ক্রাফের সপ্তে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার দিন মতি সিংকে অবৈধভাবে জেরায়ে ফাউল করার অপরাধে মনোরঞ্জনকে আবার হলুদ কার্ড দেখানো হয়। সাকুলার অনুযায়ী এবার দুটি মাচে মনোরঞ্জনকে সাপেন্ডে থাকার কথা। ইস্টবেঙ্গল ক্রাফের পরের মাচা ছিল মোহনবাগানের সপ্তে। গুরুত্বপূর্ণ সেমিফাইনাল খেলা। তাই ইস্টবেঙ্গল ক্রাফ জানাল মনোরঞ্জনকে তারা মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলাই। তাকে যদি খেলতে দেওয়া না হয় কিংবা খেলোয়াড় অন্য দলকে স্ট্রাইক করা হয়ে তবে কোর্ট-জারি করবে। পশ্চিম ভারত ফুটবল আসোসিয়েশনের সপ্তম কাছ এবং নির্ধারিত ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কে জিয়ার্ডিন পড়লেন মহামুশিকলে। নতুন করে সাকুলারের ব্যাখ্যা খোঁজা হল। তাতে দেখা গেল সাকুলারের কোনো স্পেসিফিকেশন নেই। দুটি মাচে হলুদ কার্ড দেখলে একটি মাচে বসে থাকতে হবে। ভূতীয়ার হলুদ কার্ড দেখলে বসে থাকে না। দুটি মাচে। এক



দিকে ইস্টবেঙ্গল ক্রাফের হুমকি, অপর দিকে নিজের ফেডারেশনের পরিষ্কার সাকুলার। জনাব জিয়ার্ডিন সাহেব তখন ফেডারেশন দিলেন মনোরঞ্জন যে ফেডারেশন কাপে এবং ডি সি এম টুর্নামেন্টে খেলার সময় হলুদ কার্ড দেখেছিল তার কোনো রিপোর্ট তাঁদের কাছে নেই। সংবাদপত্রের রিপোর্ট তাঁদের কাছে গ্রাহ্য নয়। সুতরাং, মোহনবাগানের বিরুদ্ধে মনোরঞ্জন খেলার ব্যাপারে কোনো বাজা নেই। সেই ক্ষেত্রে অনুযায়ী মনোরঞ্জন খেলল। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল জয়ী হল এবং শেষ পর্যন্ত মহম্মদান স্পোর্টিং ক্রাফের সপ্তে হুমুভাবে জয়ী হল রোডার্স কাপের ফাইনালে। মনোরঞ্জন দুটি মাচে বসে থাকলেও ইস্টবেঙ্গল হরতো রোডার্স কাপে হুমুজয়ী হতে পারত। মনোরঞ্জনকে খেলার অধিকার দেওয়া হয়েছে বলেও আমি এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছি না। এই জন্যই আলোচনা করছি যে, ফেডারেশন অগ্রগণ্য না ভেবে শান্ত সম্পর্কে যে সাকুলার দিয়েছেন সেই সাকুলার বিভিন্ন আসোসিয়েশনকে এবং খেলোয়াড়দের দ্বীতিমত হুমকি দেচ্ছে।

হলুদ কার্ড এবং লাল কার্ড দেখানোর ব্যাপারটি আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন (ফিফা) যেনে নেবার ফলে একরকম আইন পরিণত হয়েছে যদিও ফুটবল খেলার আইনের ধারায় এখনো মূঢ় হরান। শুধু ফিফার স্বীকৃতিতেই কীভাবে অপরাধী খেলোয়াড়কে কার্ড দেখতে হবে তার চিহ্ন আইন-বইয়ে দেওয়া আছে। সুতরাং কার্ড দেখানো এখন আইনের অঙ্গ হতে দাঁড়িয়েছে। মূঢ় খেলোয়াড়কে সতর্ক না করে কেন কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করার প্রথা চালু হয়েছে এর আগে বেশ পরিষ্কার সে বিষয়ে আলোচনা করছি। এখন প্রশ্ন দাঁড়িয়ে কার্ড দেখা খেলোয়াড়ের সাপেন্ডের বিধি কি একটি দেশের একাধিক প্রতিযোগিতার প্রযোজ্য?

আমি হত দূর জানি, একাধিক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই শান্তির বিধান আছে। টুর্নামেন্ট টুর্নামেন্টে কাম কবার্টিও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট সম্পর্কে বলা হয়েছে। অর্থাৎ দুটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার একজন খেলোয়াড় যদি একবার করে হলুদ কার্ড দেখে তবে একটি আন্তর্জাতিক মাচ সে ক্ষেত্রে পারবে না। তারপর আবার হলুদ কার্ড দেখলে তাকে বসে থাকতে হবে দুটি আন্তর্জাতিক মাচ। ফিফার এই ক্ষেত্রেই আমাদের ফেডারেশন ধরার প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সাকুলার দিলে বসে থাকে।

ইচ্ছা করলে ধরার। প্রতিযোগিতার অবশ্যই এই বিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। কিন্তু তার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থাও নিশ্চিত থাকার প্রয়োজন। আমাদের দেশে এখন প্রচুর ধরার প্রতিযোগিতা।

সব ভারতীয় নক-আউট বড় প্রতিযোগিতাদুলি ছাড়াও প্রচুর মকারি প্রতিযোগিতা আছে। প্রতি রাজ্যে আছে লীগের খেলা। এই সব খেলায় কে কারে হলুদ কার্ড লাল কার্ড দেখাচ্ছে, কে কতবার কার্ড দেখতে তার হিসাব কে রাখে? সমস্ত প্রতিযোগিতার রিপোর্ট ফেডারেশনের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা আছে? ফেডারেশন থেকেও কি ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রতি রাজ্যে রিপোর্ট পাঠানোর? সে সব ব্যবস্থা না করে শান্তির ফেডারেশন করা অর্থহীন। ধরার প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে আমি একটি দেশের সমস্ত প্রতিযোগিতার কথাই বলছি। অন্যান্য দেশে এই ব্যবস্থা যদি চালু থাকেও আমাদের এই বিরাট দেশে চলু রাখার অনেক অসুবিধা আছে। আন্তর্জাতিক খেলার রেকর্ড রাখা হয় নিশ্চিতভাবে। প্রতি প্রতিযোগিতার রিপোর্ট ফিফার কাছে পাঠাতে হয়। প্রতি মাসে বুলেটিন মারফত ফিফা সেই সব রিপোর্ট প্রকাশ করে এবং পাঠিয়ে দেয় সদস্য দেশগুলির কাছে। তাই আন্তর্জাতিক একাধিক প্রতিযোগিতার ব্যাপারে শান্তির ব্যবস্থা কার্যকরী হয়ে থাকে। কোনো দেশ যদি সেই ব্যবস্থা চালু করতে চায় তবে তার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থাও প্রয়োজন। তা না করে শুধু ফিফার মতোরা অনুযায়ী শান্তি বিধানের সাকুলার প্রচার করে—আমার মনে হয়—নির্ধারিত ভারত ফুটবল ফেডারেশন একটা বড় ভুল করে বসে আছে।

আগেই লিখেছি, হলুদ ও লাল রঙ এখন ফুটবলারদের কাছে ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একাধিক নামী খেলোয়াড় আমায় কয়েক অভিযোগ করেছেন, সবসময় তাদের ক্ষেত্রে একটা মানসিক চাপের মধ্যে। ভয় থাকে তুচ্ছ কারণে কখন কখন রেকর্ড পকেট থেকে হলুদ কার্ড বের করে দেখিয়ে দেবেন। একবার ক দুইবার হলুদ কার্ড দেখা খেলোয়াড় কিছুতেই তার স্বাভাবিক খেলা ক্ষেত্রে পারবে না।

অন্য দিকে অনেক রেকর্ডারীও তুচ্ছ কারণে অনেক সময় হলুদ কার্ড দেখিয়ে বসেন। দিল্লিতে কুরান্ড কাপের খেলাতে দেখেছি দিল্লির রেকর্ডারী বাজাজ এক রকম বিনা কারণেই মোহনবাগানের প্রসন্ন বানার্জীকে হলুদ কার্ড দেখালেন। পরে বোধ হয় নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন বলে রিপোর্ট করেন। আরও কয়েকটি ক্ষেত্রেও দেখেছি দিল্লির কারণে যেখানে লাল কার্ড দেখানো প্রয়োজন সেখানে হলুদ কার্ডও বের করলেন না। তুচ্ছ কারণে বের করে বসলেন। কই হোক, এই কার্ডের ব্যবহার সম্পর্কে নির্ধারিত ভারত ফুটবল ফেডারেশনের নতুনভাবে সাকুলার জারি করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। দরকার হলে ফিফার কাছে থেকে নির্দেশ দিয়ে।

মুকুল

# বাল্মীকির রামায়ণ ।

## অযোধ্যা কোথায় ?

### সীতারাম বেহানী

রামের জন্মস্থান পণ্ডিত অযোধ্যা নগরী উত্তরপ্রদেশের উদয়গিরী নামক শহরের নিকট অবস্থিত। এজন্য থেকে বাল্মীকী একজন 'মিলাদখানি', লখনৌ একজন 'জাটাল' ও এলাহাবাদ একজন 'বায়' ভিলোমিটার দূরে। রামের এই পূণ্য জন্মস্থানকে রাম হলেন জনমানবিক বিশ্বের সত্য অথবা স্বভাবতই অযোধ্যা হিসেবেই একটি দার্শনিক প্রাচীন জাতির তীর্থক্ষেত্র। রামায়ণ হলেন ভারতবর্ষের প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণের দু'খা নামক, যে মহাকাব্যের সঙ্গে গ্রীকদের প্রাচীন গ্রন্থ ইলিডাড ও ওডিসির কিছুটা তুলনা করা যেতে পারে। রামায়ণ ভারতীয় মানবের কল্যাণ, নীতি-তত্ত্ব, নীতি ও সভ্যতার উপর বিশেষভাবে যোগ্যপাত করেছে। এতে তৎকালীন সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্ক ও মানবের মূল্যবোধের চমৎকার প্রতিফলন হয়েছে। রামায়ণ-কাহিনী বোধ করি আজও প্রচুর কোথায়ও উৎকৃষ্টতম গ্রন্থ। পৃথিবীর বিভিন্ন মানুষ সম্প্রদায় বর্ণ নিবিশেষে আজ থেকে দু' হাজারেরও বেশী বছর আগে রচিত মহাকাব্য বাল্মীকির রামায়ণের ভাষাধারার বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত ও সঞ্চারিত এই গ্রন্থ পৃথিবীর বহু দেশে আজ বিশেষভাবে সমাদৃত ও জনপ্রিয়। এ-সম্প্রদায় অলোচনার পরে জানছি। রামায়ণের রচয়িতা কবি বাল্মীকিকে আধুনিক কালের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'কবিকুল-পতি' বলে আখ্যাত করেছেন।

অযোধ্যা ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ ঈশ্বরবংশীয় রাজ্যকে বহুকাল ধরে রাজধানী ছিল। ভারতীয় ইতিহাসে মহারাজ ঈশ্বর ছিলেন তখনকার প্রথম রাজা এবং পরবর্তীকালে রামচন্দ্র এখানকার রাজা হয়েছেন। কোশলার সূর্যবংশের উৎপত্তি এই স্থানেই। সূর্যবংশীয় রাজাদের শ্রীরামচন্দ্র সহ এটাই ছিল রাজধানী। এখান থেকেই রাজা হরিশ্চন্দ্র মরণ হারাণ করেন। আধুনিক হিন্দী কবি মৈথিলীদরশ গুপ্ত 'সংস্কৃত' নামে মহাকাব্য রচনা করেন এই তীর্থক্ষেত্র নিয়ে। বাল্মীকি রামায়ণের বালকচন্দ্র ঈশ্বরবংশের রাজধানী অযোধ্যার সুন্দর বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে, অযোধ্যার স্থাপনা হর মানবের মনু স্মার (অযোধ্যা নাম নগরী ভদ্রা সিন্ধোবিশ্রুতা। মনুনা মানবোপেন্ত রা পূরী নিমিতা স্মরণঃ)। আবার অযোধ্যা বহু অনুসারে অযোধ্যা নগরীর স্থাপনা হর দেবতাদের দ্বারা। এ-সম্প্রদায় সময়ের বহুকাল বহু এই শহর জীর্ণ ও ভগ্নবশী প্রাপ্ত হলে উজ্জয়িনীর মহারাজা বিজয়াদিত্য এখানে সর্বাধিক সংস্কার করে প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানগুলিতে রাজমহল, সুরোবর, দেবমন্দির ইত্যাদি নতুনভাবে তৈরি করেন ও অযোধ্যার নতুন রূপাঙ্গন করেন যা আজও তার পূর্ণাঙ্গত্ব বহন করছে। আবার 'রামায়ণকালীন সংস্কৃতি' বইতে উল্লেখ আছে যে, রামের আবির্ভাবের বহুকাল আগেই এখানে প্রচুর সম্রাট ও শ্রীকৃষ্ণ হয়েছিল। তখন এখানে পূর্ণাঙ্গাঙ্গী সুর্য নগরী তৈরি করা যোজন লক্ষ্য ও দুই যোজন চওড়া 'শ্রীমতী মহাপুরী' নামে বিশাল এক নগরীকর্তৃক ছিল। শহরের আশেপাশে এর চতুর্দিকে ছিল অগাধ জল ভরা বিরাট পরিভা। শহরের একদিকে বিশাল তোরণমুখ দরবার বিরাট লক্ষ্য ও মহাবল্লভ কপট ছিল। শহরের নিজস্ব সেনানী, হাতী ঘোড়া ও বৃষ্ণের নানা সজ্জা-সরঞ্জাম থাকত অশ্বাগারে। আর নগরের সুন্দর বিস্তৃত রাস্তাঘাটের দু' ধারে ছিল সুন্দর অট্টালিকা ও বাহারি সৌকর্যপট। তখনকার রাস্তা ও গুলিকে বলা হত 'রাস্তা' এবং রাজপ্রাসাদে যাওয়ার পথকে বলা হত 'রামমার্গ'। শহরের সমস্ত রাস্তাঘাট প্রতিজন পরিচালার করে লোকসংখ্যা কহা হত ও নানা বর্ণে সূর্য্যবংশে তুল হুড়ানর বিধি ছিল। রাস্তা বৃক্ষসমূহে প্রসিদ্ধ জলািলের শহর অলৌকিক বাহ্যারও বাধ্যতা ছিল।

এই অযোধ্যাকে কেন্দ্র করে আজ নানা ধরনের প্রশ্ন উঠেছে। ঐতিহাসিকদের এ-নির্দেশ তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই। এ-হাড়া মহাভারতের মত রামায়ণকে কেন্দ্র করেও গড় করে লোক ধরে নানা বাত-বিবাদ চলছে। অনেকের মতে রামায়ণের প্রতিটি ঘটনাই আকস্মিকভাবে সত্যি এই-এ-রা রামায়ণের জন্মকাল পরেই আজ থেকে প্রায় এক লক্ষ বছর আগে। এদের মতে রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য রচিত হয়েছে মূল ঘটনার বহু পরে। পরবর্তীকালে এই মহাকাব্যে কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয়েছে যা। উদাহরণস্বরূপ এ-রা বলেন, মূল মহাভারত মতে এটা হাজার আটশ' শোলাক ছিল। কিন্তু অনেকের মহাভারতের রয়েছে প্রায় এক লক্ষ শোলাক। এই পরিপ্রেক্ষিতেই তথা বাল্মীকি রামায়ণের সাত কণ্ডের মধ্যে প্রথম ও শেষের কাণ্ডটি পরে সংযোজিত হয়ে থাকতে পারে। আবার অন্য একটি মতবাদ হল, রামায়ণের ঘটনা আগে কোন ঘটনাই না। এহল মনোভা এক বিরাট কাহিনী। ততএব এই মহাকাব্য নিয়ে বহুস্ত তুল বোধ্যাদিকর অবশ্যক আছে, সন্দেহ নেই। আবার অযোধ্যা নিয়েও নানা তুল বোধ্যাদিকর চলছে বহুকাল ধরে। অনেকের মতে অনেকের অযোধ্যা মেটেই তেতার রামের অযোধ্যা নয়। তা ছিল অন্য কোথাও। আবার অনেকের ধারণা অনেকের অযোধ্যাই হল রামের আসল অযোধ্যা। ততএব এ-নির্দেশ সাধারণ মানবমনে নানা প্রশ্ন উত্থিতকৃত হারবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আবার বিশেষে যে-সম্প্রদায় জারগার রাম ও রামায়ণের করার আছে সেখানকার মতে রামের অযোধ্যা তাদের দেশেই কোথাও ছিল। বাইল্যান্ডের রাজধানী বার্লিনের কাছে শ্রীঅমৃত্যু বসে ত একটা জারসাই আছে। এটা হল বাইল্যান্ডের পুরনো নামধানী। দশকালের রাজধানী অযোধ্যা অনুসারেই কে এই নামকরণ হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। বাই হোক, দুই কবেক আগে সিমলার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ



ভিক্টোরিয়া পর্কে তুলসীদেবের মন্দির স্থিতি

এত ভালসদ স্টাডিজ এবং অক্সফোর্ডালিকল সারভে অফ ইন্ডিয়া দ্বারা একটি প্রজেক্টের নাম অক্সফোর্ডালিক অফ রামায়ণ সাইটস-এর বোধ উদ্দেশ্যে একটি প্রজেক্টবিশেষের জল বিভিন্ন স্থানে খননকার চালিয়ে আমাদের অনেক সন্দেহের নিরসন করেছেন ও কিছু নতুন তথ্যের হিঙ্গল দিতে পেরেছেন। তবিলকতে এই সংস্কার নতুন খননকার চালিয়ে আরও নানা স্থান দিতে পারবেন হল আসা করছেন। আপাতত খোঁজাখুঁজি করে বিভিন্ন সূত্র ধরে এই দলের বক্তব্য হল, রামের জন্মস্থান অনেকের অযোধ্যাতেই এবং এই অযোধ্যাই নির্ণিতভাবে ছিল রাজা কলম্বের রাজধানী। ততএব রামায়ণে বর্ণিত ঘটনারও সভ্যতা রয়েছে বাই ও কবির লেখনীতে এই মহাকাব্যকে অলঙ্করণ করতে কিছু কিছু অঙ্গের কাপ্যাসিক সহযোগিতা রয়েছে মাত্র। অধ্যাপক রামবাসী লালর দেহু এই খননকারের পরিপ্রেক্ষিতে তার অভিমত হল রামায়ণে জন্ম দু' হাজার আটশ' বছর আগে। অথবা অযোধ্যার পণ্ডিত ও সাহস্যত্বের মতে রামায়ণের ঘটনা দু' হাজার আটশ' বছর আগে। সেটা এ-রা চেতা, স্থাপন ও কলম্বের বরস হিসেবানুযায়ী দাবি করেন। আবার অনেকের মতে রামের আবির্ভাব দু' লক্ষ বছর আগে। কিছু প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে, রামায়ণের আবির্ভাব দু' হাজার বছর পূর্বে। তাই রামায়ণ কবে রচিত হয়, তা সঠিকভাবে আজও নির্ণিত হয়নি। তবে বাই হোক না কেন, দু' হাজার বছরের কম তা কিছুতেই নয়। এই দীর্ঘ সময়ে অজস্র পরিবর্তন ঘটেছে পৃথিবীর বৃক্কে। নানা সভ্যতা ও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। কত কিছুই না ভেঙেছে, কতই না গড়া হয়েছে। ভারতবর্ষের উপর বহু বিদেশী প্রভাব পড়েছে এই দীর্ঘ সময়ে। কিন্তু একটি কথা স্মরণ হতে রয়েছে। তা হল, রামায়ণের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা কিন্তু কোন দিনই এতটুকু হ্রাস পাননি।

বাই হোক, রামায়ণের উল্ল স্থানে খননকার পাঁচালিত হর অযোধ্যার কিছু স্থান, এলাহাবাদে তরশ্বাক জায়গা, চিতকট, নন্দীগ্রাম ও শ্রীলঙ্কেশ্বরে। অযোধ্যার প্রায় সতেইটি স্থানে খোঁজাখুঁজি চালান হয়। প্রাপ্ত সামগ্রী দেখে প্রমাণিত হয় যে, তৎকালে অযোধ্যাবাসীরা লোহার ব্যবহার জানতেন। বিখ্যাত সিংহ সভ্যতাকেও লোহার প্রয়োগ ছিল বলে কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত মেলেনি। তাই প্রত্নতাত্ত্বিকরা একথা খণ্ডন করেছেন যে, রামায়ণ কয়েক লক্ষ বছর আগে রচিত হয়েছিল কারণ সারা বিশ্বে লৌহপ্রচলন পনেরো শ' খ্রীষ্টপূর্বের আগে ছিল বল কোথাও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অন্যান্য প্রাপ্ত জিনিসপত্র দেখে মনে হয় তখনকার অযোধ্যার নগরীরা নানা বর্ণের সুন্দর সুসজ্জা বস্ত্র ব্যবহার করতেন। সত্যিইতে রাজ্য কথা হল, খনন কারের মাধ্যমে অন্যান্য স্থানগুলি থেকেও প্রায় একই ধরনের সামগ্রী পাওয়া গিয়েছে। তাই মনে হয়, অযোধ্যা ও পারিপার্শ্বিক স্থানগুলির ঘটনা বা সভ্যতা একই সময়ের। শ্রীলঙ্কেশ্বরে খনন কার চালিয়ে গম্বার ধরে লক্ষ মিটারের মত উঁচু একটি সুন্দর টিউব স্থান পাওয়া যায়। এই স্থানেই সম্ভবত শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে বনবাস ব্যস্তর প্রাচীর নিবাসভারের আতিথেয় রাজসংগন করেন। পরদিন নিবাসভার এঁদের গম্বা নকী পার করে দিলে

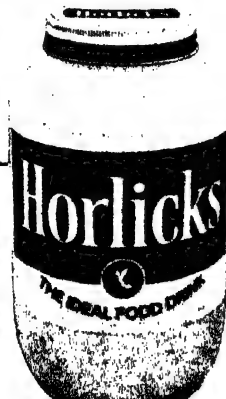


বেশীর ভাগ মায়েদের চিন্তা  
বাচ্চাদের খাবারে যথেষ্ট পুষ্টি হ'ল কিনা।  
কিন্তু স্বচিন্তা নিশ্চিত।



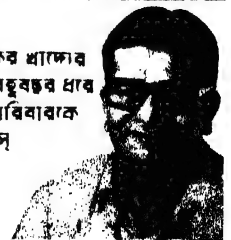
উনি বলেন : “আমি ওদের প্রতিদিন হরলিক্স  
খাওয়াই। ডাক্তারগুরু বলার পর মোকদ্দম হরলিক্স  
ওদের দৈনন্দিন অধ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আমি জানি  
হরলিক্স ওদের দৃষ্টি-স্বপ্ন রাখতে সাহায্য করে।

আপনি আপনার ছেলেমেয়েদের  
নিয়মিত হরলিক্স খাওয়ান ভো?”



**মহান  
শক্তিদাতা**

“পুষ্টির একটি মূল উৎস হ'ল হরলিক্স। পুষ্টির খাদ্যের  
অপূর্ণ সংমিশ্রণ। তবু হরলিক্সের উৎকৃষ্ট বহুবছর ধার  
বিশ্বাস। তাই। দিনের পর দিন আপনার পরিবারকে  
সুস্থ, সবল আর সক্রিয় রাখতে আমি হরলিক্স  
খোঁজ পরামর্শ দিই।”





অবশেষে তাঁদের নীতা-রাম-লক্ষ্মণের স্নেহসাধনের দ্বিত্ব  
সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চৌধুরিটি জাহাজ করে কলকাতা থেকে প্রায় পঞ্চাশ  
হাজার মজুরকে শতাধীন ভাঙতা নিয়ে ও লোড দেখিয়ে ওয়েশ নিয়ে যাওয়া  
হয়। ব্যায়র আগে তাদের কথা হয়েছিল যে ভারতের দুই নিকটেই গ্রীষ্ম ঋতু  
তাদের নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে তারা যেতে কামাবে যখন তাদের কাজ করে জর্  
উপার্জন করতে পারবে। গ্রীষ্মের প্রান্ত বিশেষ হলতা থাকবার দরুন সেমি সেই  
মজুরের হল কোন আশুতি না জানিয়েই অনেক আশা নিয়ে এক অভ্যাস অচেনা  
স্থানের উপদেশ পাড়ি জমান। এরা সমুদ্রপথে সাড়ে তিন মাস পর সূর্যনাম  
পৌছান। কিন্তু পরে প্রবল অসুখ ও কুঠা ঠাণ্ডা হাওয়া হলে এরা দেশে ফিরে আসতে  
পারেননি। আজ এদের অনেকই ওয়েশ বংশধরানুভবে বাসিন্দা। সূর্যনাম  
নাশিও এখন হর গ্রীষ্ম বা সূর্যনাম থেকে নেওয়া।

বাইয়াল্যেভের আদর্শধারা নামক স্থানটির কথা আগেই বলাই। এখানে বিরাট এক মন্দিরে রামচন্দ্রের মূর্তি আছে ও বহু বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা প্রচল প্রথাগত পূজিত হয়। মন্দিরে এক বিশাল শিলা এই আদর্শধারা আয়াদের অস্বাভাবিক মনে করির বেরে। কাইদের, রামায়ণের নাম হ'ল 'রামাকরেন' এবং রামাকরনের কাহিনীও আমদের রামায়ণের মতই। ব্যাবেক পরপরগত বাই নাচ ও গ্রামীণ নৃত্য গোলাকালীন লক্ষ করাই, এদের শৌর্য ভঙ্গি নাচই নামাকর লড়াইকে কেন্দ্র করে। আবার কিছু নাচ সংস্কৃত পৌরাণিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে রচিত। অনেক নাচ আবার রামায়ণের নানা অঙ্গের ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রস্তুত করা হয়। ওদের এক ধরনের নাচের নাম 'শা-কোকা' অর্থাৎ নৃত্যনাট্য। এটি বিশেষ করে রামাকরনকে ভিত্তি করে মধ্যে উপস্থাপিত করা হয়। বাই রামালীও আম্রকাল ব্যবসায়িক দিক দিয়ে সফল ও জনপ্রিয় আছে। পর্বতকের মন মাতাতে অবশ্য- কিছুটা প্রভাব আমদানী করা হয়েছে। আমাদের দেশেও কথকালি নাচের রামায়ণের কাহিনীর উদ্ভাব অনেকখানি। এদেশের আরও নানা গীতিভাণ্ডা, নৃত্যভাণ্ডা, ছান্না-নৃত্য গ্রামীণ নৃত্য রামায়ণের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত হয়। এ-ছাড়া আরও অনেক দ্রব্য তাদের রামায়ণ মত উপস্থাপিত করে নানা হোয়ার মাধ্যমে। ব্যাবেকের বহু মন্দিরের দেওয়ালে পুরো রামায়ণ কাহিনী খোঁদিত ও চিত্রিত হৈছে আমদের অভিজ্ঞত হয়েছে। আরও লক্ষণীয় বিষয় হল বহু শতাব্দী থেকেই বাইয়াল্যেভের রাজ্যের বিশেষতম 'রামা' বলে উপাধি দিয়ে থাকেন। সে-প্রথা আছে ও চলিত। সে-দ্রব্য বিক্রয় করা হয় গ্রীষ্মের দ্বিতীয় দ্বিতীয় অর্ধেক আমদান করছিলেন বা পরবর্তী করলে মাড়-জাপাইহে সন্ধ্যা দ্বারা জাতীয় অস্তিত্ব হয়। বাসনের 'মুসকরেন রামায়ণের' নাম হয় 'হালাক ফলাম' ও ফোম অর্থাৎ মালকোনিয়ার রামায়ণ হিকারের সৌন্দর্যমা বলে পরিচিত। মালকোনিয়ার অবশ্যই ইসমাইল হইসেনের মতে মালকোনিয়ার প্রথম উল্লেখ্যক প্রভাবকাল হুইং হাকার আরবী কাঁটার পদ্ধতি রচিত হয়। এই পদ্ধতির অনেকগুলিতেই রামায়ণের বর্ণনা আছে। প্রসঙ্গাত উল্লেখ্য, মালকোনিয়ার প্রথম রামায়ণের পটচিত্র পাণ্ডুলিপি রয়েছে। ইন্দোনেসিয়ার মত দেশে বোধোদয় নব্বই শতাব্দী মুসলমান সেখানে রামায়ণের পরিচিত প্রায়শঃ কাছাকাছি রয়েছে এবং এ-দেশে হিন্দুদের এই মহাকাব্য সংগ্রহ রাখা হয়েছে। বাসি এবং বাহ ও 'সুপু' জাতীয় রামায়ণ প্রথম ও জনপ্রিয়তার দিক'। এমনকি মুসলিম মত লোক প্রচল ভিন্নভাষাসক্রেও প্রকাশ্যে প্রথম আন্তর্জাতিক রামায়ণ উল্লেখ ১৯৬২ সালে ইন্দো-নেসিয়ার মধ্যে জাতীয় অস্তিত্ব বহুর প্রামাণ্যবলন করতে অনুমতি দেন। এই প্রথম এখন রামায়ণ উল্লেখ বিরাট এক মন্দিরে শহর হয়। প্রামাণ্যবলনের এই মন্দিরে পাশের মন্দির দেখাই করা রামায়ণের গল্পের প্রবুর বিষয়ক আছে। আমাদের দেশেও ভাটাবায়ম উপলব্ধি করে রামায়ণের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে ভাটাবায়মের একা' মন্দির বহুর রামায়ণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অতীত ভাটাবায়ম' বহু মন্দিরেই মন্দিরও প্রভাব রয়েছে। এ-ছাড়া ইন্দোনেসিয়ার মত দেশে করকীট বাসনীয়ক মন্দিরও রয়েছে। রামায়ণের বিশেষত্ব হল 'মুসকরেন' কথকালি, জনপ্রিয়তা ও তার প্রকাশ্যে সফল ও সন্তোষজনক জমাই মুসক' দেখিও এই রামায়ণ উল্লেখ উপস্থাপিত



## হাই পাওয়ার সার্ফ ধোয় সবচেয়ে সাদা করে...

এমন, যা নজরে পড়ে!

আপনার ছেলে যদি জামাকাপড় ময়লা করায়  
চ্যাম্পিয়ন হয়, তাহ'লে সেই ময়লার সঙ্গে লড়াই  
করার আগেও ত' দরকার আর এক চ্যাম্পিয়নেরই—  
হাই পাওয়ার সার্ফ।

হাই পাওয়ার সার্ফের শক্তিশালী ফরমুলায় আছে  
বেশী পরিষ্কার করার ক্ষমতা, যা কাপড়ের ধুলো  
ময়লার প্রতিটি কণা তুলে বের ক'রে ফেলে।  
সত্বিকারের ময়লা জামাকাপড়ও ক'রে তোলে  
ধবধবে সাদা!

হাই পাওয়ার সার্ফ আপনার পুরো পরিবারের  
জামাকাপড়কে দেয় এক বাড়তি গুস্তা আর  
উজ্জলতা। তাই তো বেশীর ভাগ মায়েরা কাপড়  
ধোয়ার আগে অথ পাউডারের চেয়ে, সার্ফই  
বেশী ব্যবহার করেন।



বেশীর ভাগ মায়েরা কাপড় ধোয়ার জন্যে অন্য পাউডারের চেয়ে সার্ফই বেশী ব্যবহার করেন।

করতে পারেন নি। কবীর হু' ধরনের রামায়ণের সন্ধান মেলে। এর একটি অনুবাদ পাওসের রামায়ণের সংস্কৃত হয়েছে। বহু দশক আগে অন্য অনুবাদের সন্ধান মেলে ফিলিপিন-এর থারানাউ নামক এক প্রেসার উপজাতির হতে। এই সোভীয়ার সোভেটরা পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্ম প্রসারিত করে। তাই এই রামায়ণ কাহিনীতে ঐশ্বরিক ধর্মের অনেক আভাস ও স্পন্দ মেলে।

কোন সন্দেহ নেই, দেশে ও বিদেশে বর্তমানকালে রামায়ণ সম্পর্কীয় গবেষণার সাহিত্য ক্ষেত্রে বর্ধিত হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তুলসীদাস রচিত রামচরিত মানসের প'চ' বহু পূর্ব হওয়ার জরতী উপসেবের একটি আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান হিসাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সাহিত্য একাডেমির সম্মিলিত উদ্যোগে রামায়ণে ঐতিহ্য সম্পর্কে আহুত একটি আলোচনাসভার এশিয়ার বিভিন্ন দেশের চারজন বিশিষ্ট পণ্ডিতকে অংশগ্রহণ করেন। ভৌগোলিক পরিধিরে যে বিশাল অঞ্চলের দেশটি অংশে এশীর সেই সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিনিধিও এই আলোচনার যোগদান করেন। এশিয়াতে রামায়ণ ঐতিহ্য এশীরদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে একটি ব্যস্ত ও জ্বলন্ত সত্য। তাই বলা যেতে পারে এ-হেন আলোচনাসভা রামায়ণ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আগ্রহসম্বলিত একটি সাধু উদ্যোগ। রামায়ণের উপর এই ধরনের সম্মিলিত আলোচনা এর আগে আর কোনদিন হয়েছিল অল্পতপক্ষে আমার জানা নেই। মোট বিশিষ্ট বক্তার মধ্যে এই আলোচনার প্রসঙ্গ ছিল রামায়ণের সাহিত্য ঘটিত এ আদর্শ বিজ্ঞক আলোচনা, দেশান্তরিক প্রকারান্তর ও বৈচিত্র্য এবং ন্যটক ভাবান্তরকরণ।

এই আলোচনাসভার মগোলীয়রা অধ্যাপক ডায়ামিন্ডসন-এর মতে 'জিওরাকার' (আমাদের রাজ্য দশরথের নামান্তরকরণ) কাহিনী মগোলীয়রা বহু শতাব্দী আগেই তিব্বত ও চীনা বৈদেশিকদের মাধ্যমে পেয়েছিলেন। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিজ্ঞানের প্রধান ডঃ মিনোহা হারায় মতে জাপানে দু' জনের রামায়ণ আছে। এই দু'টিরই ভিত্তি বাস্মাটিক মূল রামায়ণের উপর। এর মধ্যে একটি শ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত। অন্যটি পরবর্তীকালে ডঃ গোদাকুমারার মতে খ্রীলংকার রামায়ণ রোসল শতাব্দীতে কুমারদাসার সংস্কৃত প্রকাশিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ 'জানকীহরণ' রচিত হওয়ার পর প্রসার লাভ করে ও জনপ্রিয় হতে থাকে। এই রামায়ণের সঙ্গেও বাস্মাটিক মহাকাব্যের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আছে। মোট কথা, কিছু কিছু অমিল থাকা সত্ত্বেও বাস্মাটিক মূল রামায়ণের প্রভাব সর্বক্ষেত্রে অনুভব করা যায়। ভারতবর্ষেও অবশ্য বাস্মাটিক রামায়ণ ছাড়াও অন্য আরও কিছু রামায়ণের সন্ধান মেলে। এর মধ্যে একটি ওড়ীয়া ভাষার অনূদিত রামায়ণ আবিষ্কৃত হয়েছে। ওড়ীয়া ভাষার বিচিত্র রামায়ণও প্রসিদ্ধ। অন্তিম শতাব্দীতে তিব্বতি একটি ন্যটক দেখেন যার নাম 'উত্তর রামচরিত'। এতে রামের পরবর্তী-কালের ক্তনবলীও বিবৃত হয়েছে ও এই প্রথমে লেখক শেষকালে রাম ও সীতার মিলন ঘটিয়েছেন। এ ছাড়া তামিল ভাষার নবম শতাব্দীর কবনের রামায়ণ, পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলায় কৃত্তবাসের রামায়ণ, ষোড়শ শতাব্দীর তেলুগু ভাষার রঙ্গনাথের রামায়ণ, মালয়ালমে তুনচানের রামায়ণ, মারাঠীতে একনাথের রামায়ণ এবং ওই একই শতাব্দীতে উত্তর ভারতে হিন্দী তুলসীদাসের রামচরিত মানস পরিচিত। এর মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষ হল তুলসীদাস রচিত রামচরিত মানস।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভটি 'রাবণবধ' নামে ও সমসাময়িককালে কুমারদাস 'জানকী-হরণ' নামে মহাকাব্য রচনা করেন। এগুলি বাস্মাটিক রামায়ণকে ভিত্তি করেই লিখিত হয়। আধুনিককালে মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' ত আমাদের সবারই অতি পরিচিত। কবি কালিদাসের রচনায়ও রামায়ণের প্রভাব বিদ্যমান। তাঁর 'মেঘনদ' কাব্যে যক্ষকে নিবাসনে পাঠান হলে যক্ষ তার বাতী পত্রীর কাছে পোষে দিতে মেঘের কাছে বিলাপ করেছে। 'বহুদেবে' কালিদাস শব্দ রামের কাহিনীই বলেন নি, তাঁর পূর্বগুরু ও বংশধরের কথাও উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালেও বহু কবিই বাস্মাটিক পদ্যক অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাঁরা কাব্যকাহিনীও কেউ পৌছতে সমর্থ হননি। তাঁর সেই মৌলিক ও সজ্জ্বলতার কারণেই মধ্য আসে নি। কেবলমাত্র কালিদাসই হয়ত বা কিছুটা বাস্মাটিক কাব্যকাহিনী গিয়েছেন। তাই বলা চলে, বাস্মাটিক কাহিনী কালিদাস যতদূর শেক সর্গায়ণের কাছে কিছুটা উত্থান। যাই হোক, শ্বাদশ শতাব্দীর সংস্কৃত লেখা ভূমি-বিদ রামায়ণের কথা অনেকেরই জানা। একটি অতি প্রাচীন রামায়ণের পাণ্ডুলিপি কিছুকাল আগে চিত্রকটে আবিষ্কৃত হয়। এটি চারপ' বছরেরও অধিক পুরনো বলে প্রতীত হয়। এর মধ্যে রয়েছে সংক্ষিপ্ত আকারে রামায়ণের বহু সর্গ। উৎসর্গের জাতীয় গ্রন্থাগারে আজও বহু প্রাচীন এক রামায়ণের প্যারুলিপি সংরক্ষিত। ভারতের আরও নানা স্থানে বহিঃ ও বিহিঃ রামায়ণের সন্ধান মেলে। উচিত সংরক্ষণের অভাবে এ-সমস্ত গ্রন্থ বহু জায়গাতেই আজ ধ্বংসের মুখে ঝাঁপে রয়েছে। মজার কথা হল, রামায়ণের তার নিজের দেশ ভারতে বর্ত না প্রচার ও প্রসার তার চাইতে বিদেশেই আজ রামায়ণের গুরু ও জনপ্রিয়তা ভ্রমবর্ষমান।

রামায়ণ কাহিনী এশীয় দেশগুলিতে বহিঃ ও পূর্ব প্রাধান্যহকারে স্বীকৃত ও সমাদৃত কিন্তু রামায়ণের কাহিনীতে স্থান বিশেষে নানা অমিল দেখা যায়। আবার বহু পরিবর্তনও বেশ চিত্রাকর্ষক ও লক্ষ করবার মত। বিশেষ করে বিশেষের রামায়ণের অমিল পূর্ব বেশী। তবে একটি কথা ঠিক যে, দেশ-বিশেষে সর্বত্রই রামায়ণের কাহিনী বাস্মাটিক মূল রামায়ণ থেকে পূর্ব বেশী পৃথক হবার। ভারতবর্ষেও রামায়ণে কাহিনীর কোন কোন স্থানে পরিবর্তন ঘটিয়ে চরিত্রগুলিও বিভিন্নভাবে অঙ্কিত হয়েছে। থাঙ্গুরহো ও মধ্য ভারতের বহু প্রাচীন মন্দিরে রামায়ণ কাহিনীর চিত্রায়িত সর্গের সন্ধান মেলে।

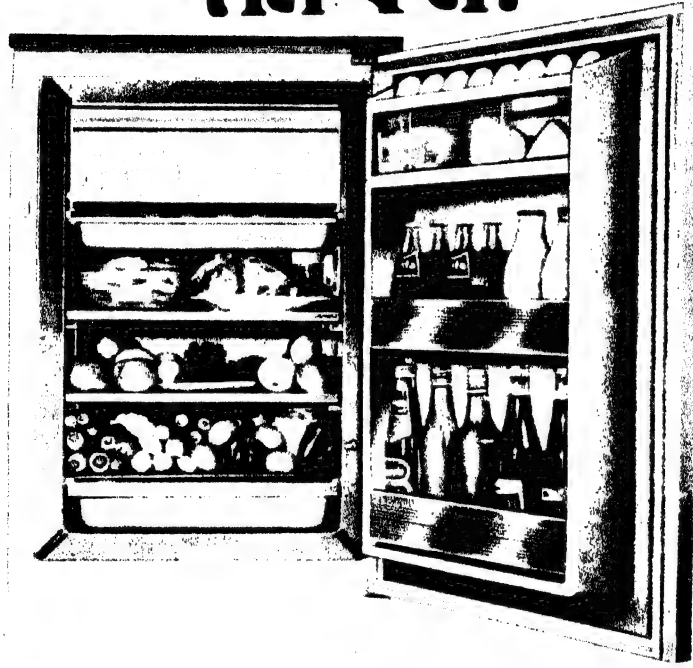


কনক ভবন—যেখানে সীতা অবসর নিবাসন করতেন

সমোজ, দক্ষিণ ভারতে রামের চাইতে রাবণকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। রাবণকে সেখানে অনেক বেশী শক্তিশালী ও আকর্ষণীয় চরিত্র বলে গণ্য করা হয়েছে। রাবণের মৃত্যুও রামের হাতে দেখান হতনি। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বহু স্থানেও রাবণ চরিত্রকে বিশেষ গুরুত্ব ও প্রাধা দেখান হয়েছে। এদের এখানেও রাবণের মৃত্যু দেখান হতনি। এদের বিশাল মঞ্চ রাবণের মৃত্যু ঘটালে দুঃখ ও দুর্বিপাকে পড়তে হবে। লাওসের রামায়ণ বিশেষভাবে দশরথ ও রাম এই দু'টি চরিত্র নিয়ে বহুলাভাবে প্রসিদ্ধ। কথ্যে রামায়ণের পরিচিতি বিশেষ করে সেই সেনার হারিণ ও সজীবনী গুরুত্ব সন্তোষ ব্যাপার নিয়ে। এখানকার রামায়ণের বহু জায়গার সীতাকে রাবণের কন্যা বলে দেখানো হয়েছে। এবং নিবাসনে তার শান্তি পাওয়ার পরই রাবণ সীতাকে বাড়ি ফিরিয়ে নেবার জন্য হরণ করেছেন। আবার সীতার মাতা হলেন মগোদারী। এখানকার রামায়ণের আর এক ব্যাখ্যানে মগোদারকে রাজা দশরথের পত্নীরূপে দেখানো হয়েছে। অন্য আর এক কাহিনী মতে কলহর তর পত্নী মগোদারকে রাবণের হাতে দান করেছিলেন। তাই রামায়ণ অনুসারে রাবণ হনুমানকে লক্ষা অভিযুক্ত উড়ে আসতে দেখে তাঁর কন্যার সাহায্যে হনুমানকে বাধা প্রদান করেন। সেই কন্যা হনুমানকে মোহজালে আবদ্ধ করে বিয়ে করেন ও পরে তাঁদের সন্তান হয়। তাই রামালীলার মারীচব, বালিবধ, রাবণ-জটায়ু, মৃগ, সীতার অশ্বিনপরাীকা, পূর্ণিবাটিকার হনুমানের সীতাদর্শন, সীতাহরণ, রাম-লক্ষ্মণ-সীতা চরিত্র সবই আছে। রাম-লক্ষ্মণ আমাদের স্বভাৱ ও চরিত্রের তত্ব। পূর্ণিবাটিকার দৃশ্যে কিছু কিছু রূপান্তর করা হয়েছে বটে, তবে রাম-রাবণের যুদ্ধ আমদের মতই। থাইরা রাবণকে বলে 'তোতালান' বা 'তোতাকর্ত'। লক্ষ্মণ মনে হয়, দশকণ্ঠ থেকে গহীত। বহু বহু জায়গার নামকরণ হয়েছে রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে। আমদের একটি শহর মূল্যে-এর নাম কোনকালেক ছিল রামপুরা। আবার আমদের টাংগীয়া নাম এক সময় পরিচিত ছিল রামাবতী নামে। এখানে রামালীলকে বলা হয় 'ধম পাও'। রাবণের নাম 'মুস্তাগি'। এই লক্ষ সন্দেহ ভারতীয় দশগ্রন্থ বা শব্দের রূপান্তর। আমদের রামায়ণগানের লক্ষ্য শক্তিশাল বাণে ঘরেল হলে হনুমান সজীবনী বৃটি বিশালকায়ী আনতে ছোটো হিমালয়ের গর্ভময়ান পর্বতে। কিন্তু বর্মার মতে, হনুমান এই বৃটি আনতে যান আপার বর্মার মাউন্ট পোপাতে। একটি মালবী বর্ণনায় রামের স্ত্রী অজনা গর্ভবতী হলে হনুমানের জন্ম হয়। তাই হনুমান হলেন রামচন্দ্রের পুত্র। ইন্দোনেশিয়ায় সীতা হলেন সীতা। রাবণ দশমুখ নামেই পরিচিত। কিন্তু লক্ষ্য নাম হল 'আলেশ্বা'। এদের রামায়ণ মতে রাবণ সামুদ্রিক সীতা হরণ করেননি, করেছেন বরষের ভারে নামক বৃদ্ধ সেকো। এই সীতাহরণের রচিটি ছিল ভীষণ কটিকাসম্পন্ন। অতএব সীতা ধরাপরত্ব হয়ে ঘরের দক্ষা বলে বৃদ্ধকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়ার পরই রাবণ তার আসল রূপধারণ করেন ও সীতাহরণের বিপত্তি ঘটে। এ ছাড়া, আরও নানা রকম কাহিনী খ্রীলংকার সাহিত্য ও ঐতিহ্যসারে রাবণকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। এ দেশের পরমশিব আইয়ার-এর মতানুযায়ী লক্ষা মধ্যপ্রদেশের কোন এক স্থানে অবস্থিত। ১৯৪০ সালে সে স্থানেওও তিনি মনোমুগ্ধিতভাবে নিরপেক্ষ করে দেন। জাভা ও বালির নৃত্যে হনুমানের রক্ত বহবৎ ফল। এমনকি তাঁর বংশধরও শব্দে। এ ছাড়া, হনুমানের লক্ষ্যম্প, লক্ষ্যের উদ্যানে বৃদ্ধ বৃদ্ধে দাপদাপি ও বৃদ্ধ উপাটন, রাবণের অনুচরদের আছাড় ও নানা দাপটের দৃশ্য থাকে এ সমস্ত মণ্ড অভিনয়ে। তাই এখানকার মণ্ড পূর্ব মজ্জ্বল করে তৈরি হয় যেন হনুমানের দাপটে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে যায়। তবে একটা জিনিস সবাইই ক্ষেত্রে মোটামুটি এক। সবাই রামচন্দ্রের নিবাসনকে মেনে নিয়েছেন। আর চরিত্র হিসাবে সব চাইতে জটিলত, প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হল হনুমান তারপর রাবণ ও অতঃপর রামচন্দ্র।

যাই হোক না কেন, ভারতীয় জনতা ও জাতির বহুতর অংশের দৃষ্ণে রামায়ণ

# আজ অন্যান্য রেফ্রিজারেটরের চেয়ে আপনার আস্থাভাজন গোদরেজের দাম কম!



গোদরেজ রেফ্রিজারেটরের অসাধারণ গুণাবলীর ফিরিস্তি একবার দেখুন:— প্রথমতঃ, এর ভেতরের ওয়াল এনামেলওলা মজবুত স্টীলের; দ্বিতীয়তঃ, ভোপেন্টের বেশী ওঠা-নামার ধকল সহ্য করার ক্ষমতা; তৃতীয়তঃ, ল্যামিনেটেড টপ ও মজবুত স্ট্যান্ড; আর সবার বড় বিক্রীর পর সুনিপুণ সেবার অতুলনীয় ব্যবস্থা—এই সর্ব-গুণাবিশিষ্ট জিনিসটি আপনি পাচ্ছেন, অন্যান্য অধিকাংশ রেফ্রিজারেটরের চেয়ে কম দামে—যার জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য আমাদের অধিক উৎপাদন ক্ষমতার।  
এই চমৎকার সুযোগ আমরা যতদিন সম্ভব আপনাদের দিয়ে যাব।

সুতরাং, আজই আপনার আশপাশের গোদরেজ শোরুমের বা ডীলারের কাছে চলে আসুন, 'আর শুধুকে যাচাই করুন, কথাগুলো বর্ণে-বর্ণে সত্যি কি-না! সত্যিকার দিয়েই মজবুত ভাবে বানানোর ফলে এটি বহু বছর, চমৎকার কাজ দেয়—আর সেই কারণেই পরস্পর ফেলে সেয়া জিনিসটি কেনার মানেনই হ'ল—গোদরেজ রেফ্রিজারেটর।

**Godrej**

সওদার এমন মওকায় এখনই কিনে ফেলুন!

অমলিনভবে আশ্রিত হয়ে রয়েছে। রামায়ণ নেহাউই একটি এপিক কাব্য নয়, রামায়ণ হল শাস্ত্র ও সার্বজনীন একটি গ্রন্থ। রামায়ণের করক স্বল্প বছরের প্রতিভা ও মর্যাদা নিঃসন্দেহে এই সভা প্রমাণ করে যে, রামায়ণ মানবিক প্রীতি ও সম্যকতার এক তুলনামূলক রচনাভাবের জগত ও নবোন্মত প্রেরণামূলক। রামায়ণ নিয়ে কবিরা প্রেম, প্রশংসা, বিরহ, কর্ম বোলা বন্ধুত্ব ভালবাসা প্রীতি আদর্শ কমা পিতৃভক্তি ও প্রত্যাশাবল্লভের সুন্দর আলোক নান্যভাবে বিচিত্রিত করেছেন। রামায়ণ তাদের লেখনীতে রম ও অনুপ্রেরণা জ্বলিয়েছে। এ ছাড়া, পুত্রের কতবা, স্ত্রীর ভাল, বন্ধুপ্রীতি, উচ্চ ও নীচের নিকট, নিঃস্বার্থ কর্ম রক্ষার কতবা ও নিষ্ঠা—এ সবই রামায়ণে আছে। এ সমস্তই আমাদের মনে গভীরভাবে প্রবেশ করে বিবেকে আন্দোলিত করে।

জনজীবনের আনন্দ, প্রেরণা, শাস্ত ও সাধনার আদর্শও এই রামায়ণ হইকাব্য। সাহস যোগ্যবারও এক বিরাট পাঠ আছে এই গ্রন্থে। আমদের জৈনগিন হীনের বহুক্ষেত্রেই রামায়ণ হল পথপ্রদর্শক। জাতীয় প্রতিভারও বিরাট এক স্মল হল রামায়ণ বা ভারতীয় আচার সঙ্গ ওতপ্রোতভাবে দেখে রয়েছে। রামায়ণের মাধ্যমে জৈন ও বৌদ্ধরা অহিংস নীতি প্রচার করেছেন। নেপাল রামায়ণের মাধ্যমে প্রচার হয়েছে নিরুপদ্রব জ্ঞাননীতি। পান্ডাবের গুরু গোবিন্দ সং রামচন্দ্রকে এক বিরাট বোঝা বলে আখ্যাত করেছেন। তুলসী রামায়ণের উপর বিভিন্ন ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে ভারতীয় কামিল কুলক-এব কল্প প্রাণসেনার। এই রম্যভাবে বইটির নাম হল "রামকথাটা উপভব ও বিকাশ"। এ দেশে প্রতিদিন রাত্রি কোটি হিন্দু রামায়ণ পাঠ করেন। অবশ্য সংস্কৃতে পাঠকের সংখ্যা মূল্যবোধের। নরক আবার তর্জমা করে পড়িয়ে নেন। অনেক মন্দির বা সংস্কে পড়িয়ে দেন। মানসিককাল হলেও তারা প্রকণে যেম পড়তে মেন না। বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনাকালে তাদের অনেকেই কেঁদে বুক ভাসান। তবুও রামায়ণ প্রতিবারই নতুন রে জ্বলনের গভীর প্রবেশ করে। বহু ঐকির রামায়ণ থেকে প্রেরণা পেরেছেন। ঐকির চিত্রে রামায়ণ কাহিনীর ছড়াছড়ি। বিহারের মধুবনী, ওড়িশার পট, হারোলের পাটনা ও রামায়ণী চিত্রে রামায়ণের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। ছাড়া, জাম্বুদ্বীপেও রামায়ণের সন্মের শেষ নেই। সেনা, রপো, রোজ জাতীয় গীত, মাটি ও কাঠের দ্বারা রামায়ণের বহু চিত্র ও কাহিনী প্রত্নতত্ত্বের নমিত্রয়। বহু মন্দিরের চড়াও রামায়ণের অনেক দৃশ্য মনে করিয়ে দেয়। এ তো সেনা রাম-রামায়ণ-বান্দ্য-প্রাচীন অবেধ্যার আলোচনা। এবারের চমক অবেধ্যার আলোচনার আসি। অবেধ্যার ভৌমোলিক পরিচয় লেখার চড়াতেই গিয়েছি।

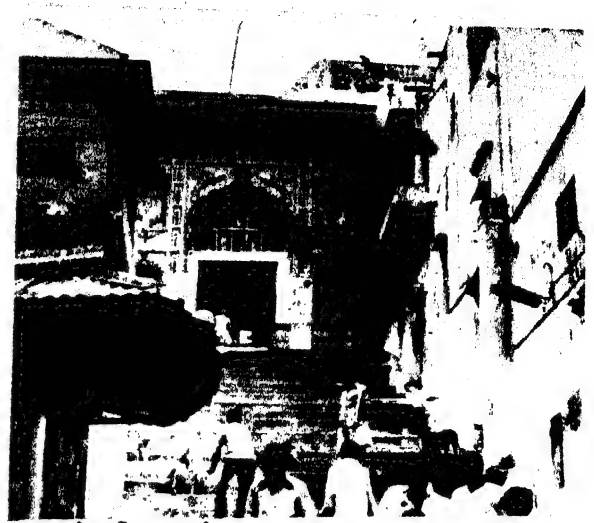
পূরায় মতে অবেধ্যা সপ্তমহাপুরীর মধ্যে সর্বোত্তম। অবেধ্যার অবেধ্যার কেন্দ্রবর্তী বলে উল্লেখ করা হয়েছে (অভ্যুতাকা নবস্বারা দেবানা পুরয়োধ্যা)। অবেধ্যা ও পাণ্ডববর্তী অঙ্গুল মিলিয়ে এ স্থান অবধারী বলেও পরিচিত। অবধারীর পরিচিত হল ছিন্নানবই কামাইল। আবার অবেধ্যা স্মল দ্বার ফলেও পরিচিত কারণ এখান থেকেই রাম তর প্রজ্ঞকে স্মল করে স্বপ্নে আরাধন করেন। স্কন্দপুরাণে অবেধ্যার প্রশস্ত প্রশংসা করা হয়েছে। অবেধ্যার সর্বম নদীর তীরে এসে অজ্ঞপ্ত ভক্ত পূজার্ত কর পরম ভূক্ত লাভ করেন। এই পূজার্তলাভে স্মান করলে শাস্ত্র মতে প্রাণী পূজার্তের বহুলা ও পাণ্ডব জ্ঞালায়স্মল থেকে মূল্য পায়। তা ছাড়া, এই নদী শাস্ত্রানুসারে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালকে পরিচয় করে।

হিন্দুদের বিশ্বাসে অবেধ্যা হল, ভগবান বিষ্ণুর মন্দির। এ ছাড়া, স্বপ্নায়মে অবন্তিকান্দবী হল, বিষ্ণুর পদস্মল, শিবকামি ও বিষ্ণুকামি দুই জংঘা, দ্বারকা নাভি, হরিদ্বার দ্বার, মথুরা কণ্ঠ ও বাল্যদশী নানিক।

প্রমথান ও তীর্থযাত্রীদের বিরাট আকর্ষণস্থল হল এই অবেধ্যা। ঐ বছর ধরে এখানে অজ্ঞপ্ত লোকের আগমননা থাকে। তবে অবেধ্যা বাগ্যাব সত্যহিতে রমণীর সময় হল সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত। এর পর প্রচণ্ড গ্রীষ্মে প্রমথানদের সংখ্যা খুবই কমে যায়। অবেধ্যার নামবার সঙ্গে সঙ্গে স্টেশন থেকেই বিরাট বিরাট বাতা হাতে পাণ্ডারা ঘিরে ধরে। বাতা খুঁজে চটপট তারা তীর্থ-যাত্রী পূর্বপূর্বদের নামধার নিমেষেই বের করে স্মে দ্বার মায়কমে প্রাণ্ডারা তীর্থ বিরক্তির কারণও হয়ে দাঁড়ায়। এখানকার ভাষা মজ্জাত হিন্দী ও মৈথিল। এ তীর্থ প্রচুর ধর্মশালা ও মন্দিরেও থাকবার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানকার লোকদের আভ্যুতত্ত্ব, বন্ধুত্ব ও সরল ব্যবহারের জন্য যে কোন প্রমথানই মৃগ্য হবেন। বাল্যদশা প্রায় সবাই নিরামিলাশ। আর এখানকার জলে জানি না কি ক্ষমতা আছে, প্রচণ্ড ক্রিদে বড়ি পায় ও কিছুদিন এখানে থাকলে শরীরের ওজন বেশ বেড়ে যায়।

অবেধ্যাতে মন্দিরের সংখ্যা প্রায় আট হাজারের মত। তাই এই শহরকে মন্দির নগরীও বলা চলে। সব মন্দিরই সেই কলভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত এবং এর পর করক ঘণ্টা বিরতির পর বিকেল থেকে অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে। সারাক্ষণই মন্দিরগুলো দর্শনার্থীর ভিড়ে গমগম করতে থাকে। সকাল সন্ধ্যায় পূজার ঘণ্টাধ্বনিত ও ফুলের গন্ধে যে কোন পূজার্থীর হৃদয় অন্য জগতে পৌঁছে যায়।

অবেধ্যার সারা বছর ধরে উৎসবেরও শেষ নেই। প্রতি মাসেই কিছু-না-কিছু উৎসব ও স্থানকে মাতারে রাখে। তাই একে উৎসব নগরী বলেও অভিহিত হবে না। রামায়ণের পূর্বে এখানে দক্ষিণমলে কোন উৎসব অনুষ্ঠিত হত না কারণ এই সময় সেবতারা নিদ্রায় থাকেন বলে বিশ্বাস করা হত। উৎসব ও পূজাপার্বণ সবই অনুষ্ঠিত হত উত্তরমলে কারণ একমাত্র এই সময়েই সেবতারা জাগ্রত থাকেন। বর্তমানে এখানে দশেরা উৎসব খুবই ধুমধামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। সেখার পনেরো দিন আগে থেকে নানা জগায়ার নট ও নচের মাধ্যমে রামলীলা উপাখ্যাত



হনুমানচীতে শ্রীহনুমান মন্দির-এর প্রবেশদ্বার

হয়। সঙ্গে সঙ্গে বহু জগায়ার রামায়ণ পাঠও হয় খুব ঘটা করে। কন্যাসের কাছ রামায়ণ রামলীলা উৎসবের জন্য প্রসিদ্ধ। নবরাত্রে রামলীলার শেষ দিনে বাণ, কুম্ভকর্ণ ও মেঘনাদের প্রতিকৃতি তৈরি করা হয়। এর পর রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও হনুমানরূপী কিছু চরিত্র সেই প্রতিকৃতিতে আর ছড়িয়ে পড়ে। কুম্ভকর্ণালিকার ভরা থাকে প্রচুর দাহা পদার্থ ও পটকা। অতঃপর সর্বস্তরের সমর প্রদ্রবাজ ও পটকা ফাটিলে কুম্ভকর্ণালিকা জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। ভারতবর্ষের নানা প্রান্তেও এই উৎসব প্রচুর উজ্জ্বল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। এর পর অনেকে সেই ছাই সংগ্রহ করে শরীরে ধারণ করেন। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী এই ছাই ধারণ কবলে নাকি কোন দুষ্টপ্রভাব পড়তে পারে না। এত উজ্জ্বল মাধ্যমে রাবণের মত চরিত্রকে যোগ্য বৃশ করে এত নির্দয়ভাবে বধ করা হয় বলে আমারও ভীষণ কষ্ট হয়। প্রচলিত একটি মতনুযায়ী রাম রাবণকে বধ করতে বা রাবণের বিরুদ্ধে শক্তি সপ্তরের জন্য দুর্গার সহস্রা পাখনা করতে পুজো করেন বলেই এই দেশেরা উৎসব। অথচ মজার কথা, এই পুজোতে রাম রাবণকে আমন্ত্রণ জানান পৌরোহিত্য করতে। অকৃতোভর রাবণ এই পুজার বাঁধনমতভাবে পৌরোহিত্যও করেন বান্দ্যক রামায়ণ মতে। এতে তার চরিত্রের উজ্জ্বলতা ও বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে বহু গুণ বেড়ে গিয়েছে। অন্য আর এক মতে, দেশেরা উৎসব পালিত হয় রম্যদুর্-এর পূর্ব মহিষাসুর-এর বিরুদ্ধে দুর্গার বিজয়ের দরুন। এ বিশ্বাস বানন, বরহ ও স্বরূপপুরাণ অনুসারে—যার বিবর্তিত রূপ রয়েছে মাকড়ের পুরাণে। দেশের পাঁচমাগলে প্রথমটি ও পর্বাতলে দ্বিতীয়টির প্রচার, প্রসার ও মান্যতা বেশী।

দেশের পর পরই ভরত মিলারের উৎসব। এই দিনেই রাম ও ভরতের মিলন হয়েছিল। দেশের বহু প্রান্তে এই দিনটিকে পারিবারিক মিলনের দিন বলে গণ্য করা হয়। এর পর সপ্তাহ তিনেক বরহই দেওয়ালী উৎসব। সব চাইতে জনপ্রিয় প্রবাদ হল, রামের সঙ্গে চৌদ্দ বৎসর বনবাসের পর ও রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসবার পর অযোধ্যাবাসীরা শহরে প্রদীপ জ্বালিয়ে শ্রীরামচন্দ্র ও সঙ্গীদের স্বাগত জানান। এ ছাড়া, সারও নানা প্রবাদ আছে দেওয়ালী উৎসব ঘিরে। তবে উল্লিখিত ঘটনাই সব চাইতে জনপ্রিয়। অবেধ্যা এই দিন প্রদীপের সন্দেশ স্বপ্ননগরীর রূপ নেয়। প্রচুর পটকা ফাটিলেও উজ্জ্বল প্রকাশ করা হয়। দ্বিতীয় বিত্তর ও পরম্পরে অভিনন্দন জানিয়ে এ উৎসবের সমাপ্তি হয়। এ ছাড়া দেশের সবটাই এই উৎসব খুব জীক্জমক সহকারে উদ্‌যাপিত হয়।

ঠের মাসে আসে রামনবমী মেলা। এদিন হল রামচন্দ্রের জন্মদিন। নানা নটকের মাধ্যমে ও দশ দিন ধরে নিরম মতে রামায়ণ পাঠ করে এই উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে বিরাট মেলা হয় অজোধ্যাতে। সে মেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মায় বিশেষ থেকে জড় হন। মন্দিরগুলি নবরূপে সাজানো হয়। মন্দিরে দোলনচত্রে একটি নারকেল রাখা হয়। তারপর পুরোহিত দুপুরে রামের কন্ম ঘোষণা করেন। এই সময়েই রামের কন্ম হয় বলে কল্পে উল্লেখ আছে। এই উৎসবে অজ্ঞপ্ত লোক সর্বম নদীতে স্নান করেন। পূজার্তলা সর্বমর উৎসবিত নাকি ভগবান বিষ্ণুর প্রেমাপ্র থেকে। তাই এর স্মার এক নাম নেটকা। বাই হোক, অনেক পুরাতন ও মেরেরা সর্বম নদীতে মাথার চুল দান করেন। এ ছাড়া, কায়িক মাসে পরতালিল কিলোমিটার পায় হেটে অজ্ঞপ্ত লোক অবধারের প্রিয়মা করেন। প্রচুর গ্রাম ও সারা রাত্তা হয়ে পেরারা, আমকটাল ও আমলকির বাগানের মধ্য দিয়ে হটতে খুব ভাল লাগে। অবেধ্যার আমলকি ও পেয়ারা খুব প্রসিদ্ধ। এই পরিক্রমার রাস্তায় মলে সর্বমর কিনারে বমরাজের মন্দির। এই স্থানে সর্বমতে স্নান করে বমরাজের মন্দিরে পুজো করলে নাকি সেই প্রাণীর হৃদয়কে কিছুতেই হমের দুঃখেরা ধারণকাজ আসতে পারে না। অতএব এই ভব থেকে অস্ততপক্ষে আমি নিশ্চিত।

অবেধ্যা হোঁচাতেও রঙীন রূপ নেয়। তা ছাড়া মহাশিবরাত্রিও এখানে খুব



যখন বাচ্চারা প্রাণ-প্রাচুর্যে চনমন করে



তখন ওদের ঐ চকলতায় মন যায় ভরে!

মলটোভা খাওয়া বাচ্চারা  
বাড়তি জীবনীশক্তির উজ্জ্বলতায়  
এমন উপহাস করে যে, দুধ থেকে  
এক লজ্জাই বলা যায়, ওরা  
'মলটোভা বাচ্চা' কল'। যা কিছুই  
করুক না কেন, জীবনের সব  
কোড়ই, ওরা সমান আগ।

আর মলটোভা খাওয়া কত  
মজাদার—আর সুধু মজাদারই  
নয়, সেইসকল অত্যন্ত পুষ্টিক্রমও  
এটি প্রোটিন, ভিটামিন আর  
এলিজ পদার্থ এতই তরুণ যে,  
আপনার বাচ্চা শরীর  
সঠিকভাবে তরুণীয় বাড় ওঠ  
স্বাস্থ্য অলম্বন করে। মলটোভা  
বাচ্চা মলটোভা এমন এক বাড়তি  
প্রাণ-প্রাচুর্য আন যে, ওকল ঐ  
চনমনে উজ্জ্বলতায়, সম্ভাব্য  
জনা আপনায় লুক গর্ভি ভায় ওঠ।



ভিটামিন তরুণ

**মলটোভা**

প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা শক্তি ও স্মৃতি  
আপনার সম্ভাব্য গর্ভি প্রতিমূর্তি!



**JiL** জনপ্রিয় ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

ASPI/2000-01-02

৬ বছরের মধ্যে তারা রাত কাঁড়স করে উৎসব পূর্ণ করে। আর বিরাট জাতিগত সঙ্গ উৎসবগত হয় কাঁড়স করে হুন্সনগর জমিদার ও নরসিং নারীরা। এ ছাড়াও আরও হাজার একটা উৎসব কি আর আর সেগেই আছে অথবা।

আজই হলো, হানসনগর স্থানে গ্রাম্যদের পর অথবা উজ্জয় গর সেলে রামের পর লব ও কুল এখানে নতুন করে বসতি স্থাপন করেন। গ্রাম্যে এখানে সাগেশ্বরনাথ মহাদেব মন্দিরের স্থাপনা হয়। পরবর্তীকালে অথবা অথবা আবার ধীরে ধীরে বসতিপাল হতে যায়। ইতিমধ্যে মতে তারা বিজয়াদিত্য দেশ পবর্তনে বোনের সন্তান তীরে শিবির করেন ও এখানকার কিছু বিশেষ দেখে লাম্বুলগড়ের কাছে লাম্বুল পড়েন, এটাই সেই পবিত্র অবস্থায়। অতঃপর তাঁরা নানা সন্তানের কাছে হাত দিয়ে এই শহরে নতুনভাবে প্রাণলভ্য করেন। অনেকের মতে নরসিংনাথ মন্দিরের সূত্র ধরেই তিনি এই পবিত্র স্থানের মন্দির পান। বাই হোক নরসিংনাথ মন্দির অথবা মন্দির মন্দির মন্দির মন্দির। চমকায় শিবালিগ স্থাপিত হলেই মন্দিরের মন্দির। প্রতি সোমবার ও শিবের বিবলে ওলবের দিনে এখানে অল্প লোকের ভিড় হয়। শিবের মাথার জল ঢালতে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। এখানে লকলে ও লম্বায় আরাতি দেখান হয়। এই মন্দিরের পাশেই রয়েছে কালেশ্বর মন্দির। একটি মাত্র কাল পাথরে চাঁদ তাই ও নীতার মন্দির দেখতে অপূর্ণ লগে। মৌলি বালাই বাঘ শ্রাব্য রামের জন্মভূমি আশ্রিত হওয়ার পর নাকি এই মন্দির পূজারীরা রামের জন্মভূমি থেকে তুলে এসে এই মন্দিরে স্থাপনা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মন্দির হতে অথবা ও অথবা রাজা-বাল্লাই বাঘ বহুবার আক্রান্ত হয়ে মূলপ্রস্তর হয়েছে।

কালেশ্বর মন্দির থেকে সন্তান কিনারে কিনারে কিছু দূর হেটে গেলেই লক্ষণকলা। এর পাশেই লক্ষণকলাই মন্দির লক্ষণের পাঁচ ভূত উদ্ভূত ভবা মন্দির। এই মন্দিরটির নামসেই একটি কুণ্ডে পাওয়া গিয়েছিল। কথিত আছে, এখানে থেকেই লক্ষণ রামের জন্মদে শেখলগের রূপ ধরে পরমাধম হয়ে আসেন। এখানে সন্তান জন্মদে প্রদীপ জ্বালিয়ে সন্তান আরাতি হয়। সেখানে অপূর্ণ। এখানে থেকে শেখ কিম্বদন্তি হয়ে জনক জন্ম বা লক্ষণ মন্দির। শিবালি এলাকা দিয়ে এ মন্দির তীরে কলা ও ওড়না-মন্দির। এটাকে রামের জন্মভূমি বা নীতার মন্দির বলা হয়। এখানে সীতা জন্মের বিশেষ করে। এখানে মূর পাথরে সীতা ও রামের মন্দির প্রচুর লোকের অলংকার। মন্দির গারে হলোয়ান অনেক পাথর ও লাম্বুল রয়েছে। মন্দিরের স্তম্ভ সোমের মোড়া। মূখ্য মন্দির সামনে লক্ষণ কুণ্ড হতে সা গ্রীর বাসনা আছে। মাঝে এই মন্দির সোমসোমার পরিমাণ ও অন্যান্য হিসেবমিত্রের জন্মদে কোতাহলী হওয়ার বেশ একপ্রস্থ কালেশ্বর পূজারীরা। থাকে সোমসোম কলা। জনক জন্ম থেকে কিম্বদন্তি হয়েই রাম জন্মভূমি। এটা তীর্থযাত্রীদের পক্ষে বিরাট এক পবিত্র স্থান। ইতিমধ্যে মতে কথিত আছে, ১৩২৮ সালে বাঘ এখানে মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরি করেন। এই কালভূমির পাশেই নাকি একটি পুকুর ছিল। সেই পুকুরে স্নান করলে বড় দুঃখরাগা ব্যাধি দূরে যেত। তাই মৌলি রাক্ষস এই স্থানের প্রতি আকর্ষিত হয়ে বাঘ মসজিদ তৈরি করেছিলেন। এখনও এই স্থান হিম্ম ও মসজিদদের মধ্যে বিরোধপ্রসূত। এই মামলা নিষ্পত্তির জন্য এখনও অথবা মসজিদ ভেঙে মসজিদ তৈরি আসল। এই পূজা ভূমি উৎসবের জন্য ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৮১ সালে থেকে এর পাশেই ছোট একটি পুকুরের অঞ্চল কাঁড়স চলছে। এই কাঁড়সের হোতা রাম জন্মভূমি সেবা সমিতির পরিচালক বাবা রামলক্ষণ শরণ। প্রায় প্রতি জন কীর্তনীরা পালা করে এখানে সন্মানে কীর্তন চালাচ্ছে। উল্লেখ্য বাঘ কীর্তন এই স্থান না পুরোপুরি মতে হবে কীর্তন চলতেই থাকবে। এর জন্য মাসে প্রায় ৩০০ হাজার টাকা মত। এই পুরো টাকাই তোলা হয় পূজার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া দানের মাধ্যম। দিনের এই সার্বজনীন মন্দির স্থান থেকে কিছুটা দূরে মস্তাক্ষেপ মন্দির। টিন বিতীকরণের পত্র ও অথবা প্রহরী। এই মন্দিরের পাশেই সন্তসাগর তীর্থ। রামাভিষেকের সময় এখানে সাত সমুদ্রের জল সঞ্চিত হয়।

অথবা বোধ করি সবাইতে মূখ্য মন্দির হল হুম্মানগড়ী। গড়ের মত উচ্চ জায়গায় এই মন্দির। এখানে হুম্মানের মন্দির অল্প ফুলে ঢাকা থাকে। ফটটি সিঁড়ি ধরে মূখ্য মন্দিরে প্রবেশের পথ। মন্দিরের চারিদিকে বড় সাধু ও ভক্তরা সর্বদা ধ্যানধারণা করছেন। এই ঠাকুরকে খুবই জাগ্রত ঠাকুর বলে মানা করা হয়। বড় তীর্থযাত্রী নানা মনস্কামনা নিয়েও এ-মন্দিরে পূজা দিতে আসেন। শনি ও মঙ্গলবার বিশেষভাবে ভক্তের ভিড় হয়। লাক্ষের প্রসাদের প্রচলনই বেশী। রামায়ণ মতে হুম্মান মিষ্ঠি-বিশেষ করে লাক্ষ খুব পছন্দ করেন। পূজায় মতে শ্রীরামচন্দ্র স্থানে বাওরার আগে হুম্মানের হাতে অথবা শামনভার তুলে খেলে। তাই কালেশ্বর অথবা প্রধান ও মূখ্য দেবতা হলেন হুম্মান বা অথবা মন্দির মতে বজর গল্লী। হুম্মানগড়ীর কিম্বদন্তি দক্ষিণ সমুদ্রবর্তী ও অঙ্গারিটলা। এখানে মস্তাক্ষেপ ও অঙ্গদের মন্দির আছে। এ-ছাড়া রাজমন্দির দক্ষিণপ্রান্তে তুলসীচোরা। এখানেই নাকি সোমসোমী তুলসীসার রামচরিত মাল রচনা শুরু করেন। এ-ছাড়া ত্রাতারমের মন্দির, সীতারসেই, বশিষ্ঠকুণ্ড, বিশ্বাক্ষেপ, শ্রীরামকট, মণিগুপ্ত, সর্ষকুণ্ড, মূর্ধাকুণ্ড, নিম্নাকুণ্ড, মনোরমা তীর্থ উল্লেখযোগ্য। এর প্রতিটিই আলাদা আলাদা ইতিহাস রয়েছে। অথবা থেকে কিছু দূরে নন্দীগ্রাম যেখানে ভক্ত রামের চোলে বহুর বনবাসভার তপস্বীর জীবনগান করেন ও শত্রুঘ্নকে রাক্ষস পরিচালনা করতে সাহায্য করেন। এখানে ভক্তের মন্দির, ভরতকুণ্ড, শিলাচময়নকুণ্ড ও পরাকুণ্ড উল্লেখ্য। অথবা কেন্দ্রস্থলেই রয়েছে অথবা মনোরম প্রাচীন রাজপ্রাসাদ বিশাল এলাকা জুড়ে। রাজপ্রাসাদ চত্বর সুন্দর শিবের মন্দির।



মন্দিরটি আশ্রিত রাজ্যের সন্তান তীরে ভক্তসম

ভিত্তিরীয়া পাক। পাকের মাধ্যমে শেখপাথরে তীরে তুলসীসার আকর্ষণ বা বেকার প্রমাণার্থীরা মন্দির আকর্ষণ করে। অথবা ১৩৮১, বিজয়াদিত্য হুন্সন, মন্দির, পূজারী, চত্বর, ও পূজারী নামে লাভটি ধীরে ধীরে মন্দির করে। এর মধ্যে শেখের সন্তান হতে গুরুত্বপূর্ণ। এই মন্দিরের পাশেই পূজারী ঘাট। অতঃপর শিবালি, এই ঘাটে সন্তান লগতে প্রচুর দিনে রামচন্দ্র প্রমাণমেল লক্ষ্য আয়োজন করেন।

একটি যোড়গাড়ি অথবা স্থানীয় ভাষায় একা করে প্রতীক স্থানস্থানীয় ঘোড়াটাই বেকার প্রমাণার্থীরা পকে সবাইতে সন্তানজনক। অথবা এখানে শিবালি ও অথবা সেই। অথবা বিরাট এক আকর্ষণ হতে পারত যদি এ-মন্দির দিনে সেলে সন্তানরূপে প্রচার করা হত। আশ্চর্যের কথা সেলের বেশীরা ভাল ট্রান্সিট হুন্সনহেই অথবা সন্তান কোন সন্তানজনক খবর মেলে না। তা ছাড়া বেশীরা ভাল ট্রান্সিট ঘাটে অথবা কোন উল্লেখই সেই। অনেক ট্রান্সিট ফেলের ত এমন হাতকাষ দেখি যেন এরা অথবা নামই সেলেন। এটা খুবই দৃষ্টান্ত। উত্তরপ্রদেশ সরকার অন্যান্য আকর্ষণ কেন্দ্রগুলির মতখানি প্রচার করেন অথবা ব্যাপারে ভাড়া এত নিম্ন হলে এটা আবার কিছুতেই মাঝার আসে না। কেন্দ্রীয় সরকারও এ ব্যাপারে নিষেধ করে। হিন্দুকে এত বড় মূখ্য তীর্থস্থানে ঘণ্টালা ও থাকবার জায়গা খুবই অপ্রচুর। তা ছাড়া খাওয়া-দাওয়ার জন্য খুব ভাল হোটেল বা রেস্টোরাঁ নেই এই শহরে। শহরের বাতাস আকর্ষণ ও শহরটির খুবই সৈন্য। বড় মন্দির যুগ যুগ ধরে জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়েছে। এখন কোন মেরামত বা সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয় বলে মনে হয় না।

ভব ও প্রতীক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিকদের পক্ষে অথবা হল এক আকর্ষণীয় স্থান। শহরের লোহালাজুড় ও ইট পাথরের জীবন থেকে কিছুটা সময় এখানে কটালে বেকার প্রমাণার্থীরা খুব ভাল লাগবে। এখানে এসে এক নতুন জীবনের স্থান মিলবে। শহরের অতীত দেখা যাবে প্রচুর চত্বরজীবন ও ভালা-গণ্যকারী। গারে তাদের চন্দনে লেখা রামনাম। ছোট ছোট বাড়ির বিরাট টিকি মাথায় দোড়কাপ করতে দেখে স্তম্ভের লাগে। সন্তান কিনারে গড়িয়ে দেখা যাবে কাক কাক মত ও কচ্ছপ। জ্বারা ছড়ালে ত সব সিঁড়ি পবিত্র উঠে আসে। এসব লচর প্রাণীদের ধরা একসম বারণ। তবুও চিপসারে এদের ধরে বাটরে চালান করা হয় বলে আগের তুলনায় সংখ্যা বিলীম্বান। এখানকার পিতল ও তামার মন্দির প্রসিদ্ধ। পূজার আরও বহুবিধ সমগ্রীও প্রচুর দেখা যাবে সোকার সোকার। এ-সময় কয়েক নিরাক্ত লোকেরা বংশধরপরায় এ ব্যবসারে লিপ্ত। এ ছাড়া পাথরে খোদাই করা মন্দির ও মন্দিরগুলির জন্য অথবা প্রসিদ্ধ। অথবা স্টেগনে নামবার পর থেকেই বা সবাইতে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে তা হল এখানকার বিশাল বানর বাহিনী। যেন হয় শ্রীরামচন্দ্র স্বর্ণের সওয়ার সময় তাঁর লক্ষার সেনাবাহিনী এখানেই ছেড়ে যান। এদের জয়ে শহরের সব সোকার জাল দিগে ঘেরা। প্রায় সব মন্দিরের চড়া ও শহরের সব বাতাসতুলসী ব'কানো। সবই এদের বদরমোর ফল। এদের বৃষ্টিও প্রচুর। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে এদের বিরোধ খুবই সীমিত। কিন্তু প্রমাণার্থীদের এদের থেকে একটু সতর্ক হয়ে লোকেরা করতে হয়। কারণ খাবার জিনিসপত্র লাঠি করা এদের খুব পিয় কাম। তবে এটা খুবই পরি-তাপের বিষয় যে, দেশ-বিদেশে নানা পরীক্ষা-রীকার জন্য অথবা আকর্ষণ এট বানর বাহিনীও ভ্রমাস্ত কমে থাকে।

বাই হোক, অথবা থেকে বিচারকালে আপনি অথবা থেকে আসবেন, কিন্তু অথবা সহজে আপনাকে ছাড়বে না। যাদের এক কেগে অথবা মন্দির আপনকে মাঝে মাঝেই নাড়া দেবে। আর কবি ও শহরের রূপনার 'বন্যাসকী' সুদূর আউর অবধী নাম' আপনার শহরে জীবনেও অজান্তে আপনকে আনমনা করতে থাকবে।

এক নতুন রান্না শিখে—

# সুস্বাদু খাবার পরিমাণে বাড়িয়ে ফেলুন আর পুষ্টিগুণে ভরপুরও করুন!

রান্নায় মিলমেকার মেশান— প্রত্যেকটি সুস্বাদু খাবার পরিমাণে  
বেড়ে যাবে আর প্রোটিনের পুষ্টিগুণে ভরপুর হবে। অথচ, এতে  
নাড়তি খরচও নেই!



মিলমেকার দিয়ে রান্না খাবার পাতে পাতে পরিবেশন করুন।

রান্না করা-ও বেশ সহজ



● অল্প গরম  
নুনজলে...  
২০ মিনিট  
ভিজতে দিন...



● জল ছোঁকে ফেলে  
মিলমেকার-কে  
ঝরঝরে  
করুন...



● এবার সুস্বাদু  
রান্নার সঙ্গে  
মিশিয়ে  
রাখুন...



মিলমেকার মিশিয়ে  
রান্না করুন।

## মিলমেকার

এটি সহ্য প্রোটিনের পুষ্টিগুণে ভরপুর

উৎপাদক: আইসোর স্ন্যাক ফুডস লিমিটেড, ১২, প্র্যাটফর্ম রোড, বাঙ্গালোর ৫৬০০২৩

এখন এক  
রঙ-বেরঙের  
নতুন প্যাকে—  
রান্না-প্রণালীর চমৎকার  
পুস্তিকা আছে।



# ঘামাচির চুলকানি আর জ্বালাযন্ত্রণা ভুলে যান!

**নাইসিল**  
ব্যবহার করুন!  
সবচেয়ে দ্রুত  
আরামদায়ক ঘামাচি  
নাশক পাউডার



২টি  
প্যাকে—  
'২' আর  
'স্যাণ্ডেল উড'

**নাইসিল আনুত  
ঘামাচি ভুলত  
ট্যালকম পাউডারের  
চেয়ে কম দামে!**

বিশেষ ওষুধ মেশানো  
নাইসিল ঘামাচি প্রতিরোধ  
করে প্রতি ধাপে।

১. অতিরিক্ত ঘাম হওয়া  
নিবারণ করে।

২. ঘাম শুষে নেয়।

৩. দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী জীবাণু  
নষ্ট করে।

৪. ত্বকে স্নিগ্ধতা এনে দেয়।





# আপনি জ্বালাদী থেকেই প্রতিবছর ২৭৬ টাকা বাঁচাতে পারেন শুধু একটি হকিস প্রেসার কুকারের সাহায্যে!

## আপনার হকিস প্রথম বছরেই তার কেনা দাম উসূল করে দেবে।

আপনার হকিস প্রথম বছরেই তার কেনা দাম উসূল করে দেবে।

আপনার কেরোসিন সমস্যার সমাধান করুন

কেরোসিন তো আজকাল পাওয়াই যায় না, তার ওপর আবার দামও প্রচণ্ড। তাই রান্নার জন্যে কি করে সবচেয়ে কম কেরোসিন খরচ করা যায় তা দেখা উচিত। আর সে সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছে আজকের আধুনিক বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে তুলনামূলক রান্নার পরীক্ষার প্রমাণিত হয়েছে যে সাধারণভাবে রান্নার চেয়ে হকিস প্রেসার কুকারে রান্না করলে গড়ে ৫০% কম কেরোসিন খরচ হয়। কারণ সাধারণভাবে রান্নার চেয়ে হকিলে রান্নাতে অর্ধেক সময় নেয়, তা সে আপনি গ্যাস, করলা, কাঠ বা ইলেকট্রিক যে কোনো জ্বালানী ব্যবহার করুন।

### সর্বোত্তম বিনিয়োগ

হকিস ব্যবহার করলে একটি সাধারণ পরিবার প্রতিদিন আধ লিটারের মত কেরোসিন বাঁচাতে পারেন। আপনার হকিস, শুধুমাত্র জ্বালানী দিয়েই তার কেনা দাম প্রথম বছরেই উসূল করে দেবে। তাই আপনার এই আগামী-দিনের সর্বকণের সন্ধার জন্যে আপনার টাকার সর্বোত্তম বিনিয়োগ করুন— আজই।

আপনি যদি আগে কখনও প্রেসার কুকার ব্যবহার না করে থাকেন তাহলেও ব্যবহারের না। কারণ প্রত্যেক হকিলের সঙ্গে ১২৭টি পরীক্ষিত রন্ধন প্রণালী সমেত একটি ক'রে সহজ, সচিহ্ন নির্দেশ পুস্তক দেওয়া হয়। এই বইটি ১২টি বিভিন্ন ভারতীয় ডাবার পাওয়া যায়।



দেখাশোনা করার খরচ বাঁচায় হকিলের বক্সটি সব চেয়ে কম। হকিল-এর গ্যাসকেট আর সেকাটি ভালভ সাধারণ প্রেসার কুকারের চেয়ে টেকে বেশী।

হকিলের বিশেষ ডিজাইনের জন্যে এটি দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত। কারণ এর ঢাকনা পাশের দিক থেকে না খুলে নীচের দিকে অর্থাৎ পাত্রে ডেউর দিকে খোলে আর বাষ্পের চাপ সম্পূর্ণ নিরাপদ মাত্রায় নেমে না গেলে ভুলবশতঃও ঢাকা খোলা যায় না। সেকাটি ভালভ হ্যাণ্ডেল বারের নীচে থাকায় যখন এটি কাজ করে তখন বাষ্প নিরাপদভাবে নীচের দিকে বেরিয়ে যায়।

### অবৈতনিক সেবা

হকিল-এ বছরের জন্যে লিখিত গ্যারান্টি দেওয়া হয়। ঐ সময়, গ্যারান্টির আওতার পড়ে এমন সমস্ত অংশ বিনাপরসার বদলে দেওয়া হয়। হকিল-এর সার্ভিস সবসময়ই বিনাপরসার পাওয়া যায়। ভারতের ১১৫টি শহরে ফ্র্যান্সিসে তালিম পাওয়া মেকানিকরা রয়েছেন। তাঁদের কাছ থেকে চটপট যোগ্যতাপূর্ণ সার্ভিস পাওয়া যায়।

# হকিস

বিশ্বখ্যাত হকিস প্রেসার কুকার

বছরের পর বছর ধরে দেয় আশ্বাস সেবার।

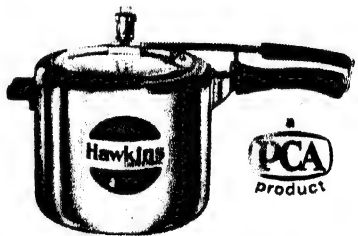
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্য রক্ষায় টাকা খাটান আপনি হয়ত জানেন না যে আপনার পরিবারের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যেও হকিলে টাকা খাটান উচিত, কারণ এতে সাধারণভাবে রান্নার চেয়ে অনেক বেশী স্বাস্থ্যকর খাবার রান্না করা যায়।

সেটাল ফুড এণ্ড টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর গবেষণার জন্যে গেছে যে প্রেসারে রান্না করলে কয়েকটি পুষ্টিগুণ পদার্থ বিশেষতঃ ভিটামিন আর প্রোটিন খাবারে ভালোমত বজায় থাকে। আর বিজ্ঞানসম্মত করার জন্যে যে উদ্ভাপের প্রয়োজন হয় হকিল-এ সেই ১২২° সেলসিয়াস উদ্ভাপে রান্না হয় বলে এতে রান্না করা খাবার আরও বেশী স্বাস্থ্যসম্মত হয়।

আজকের দিনে একটি হকিল প্রেসার কুকার ছাড়া রান্নার কাজ কর্ম করা সত্যিই শক্ত। তাই আপনার কাছাকাছি কোনো বিশ্বাসযোগ্য বিক্রেতার কাছ থেকে একটি হকিল কিনে ফেলুন অথবা এর নির্মাতাদের কাছে লিখুন :

প্রেসার কুকারস অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্স লিমিটেড,

পো: ব: ১৫৪২, বোম্বাই-৪০০ ০০১



① হকিল ও হকিল ইউনিভার্সাল হ'ল রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

② রেজিস্টার্ড ব্যবহারকারী প্রেসার কুকারস অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্স লিমিটেড-এর ১৯৮০-র কপিরাইট,

৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

# ধন মন যৌবন



গোচপদে এক টুকরো আকাশের প্রতিবিম্বের মত  
এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের এক আশ্চর্য দর্পণ । ২২০০

কণা বসু মিশ্র  
আকাশের চাবি ১০৫



দে'জ পারজিশিং ১০ বর্ষিক চ্যাটার্জ স্ট্রাট,  
কলিকাতা ৭০০০৭০, ফোন : ৩৪-৫০৩৫

সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের  
শ্রীমতী (১৯৪৩) এবং শ্রীমতী জগদীশ  
প্রসাদ (১৯৪৪)। ১৯৪৮, ৪৯,  
৫০—বর্তমান নিম্নে একক প্রদর্শনী।  
১৯৫১ সরকারী চারুকলা মহা-  
বিদ্যালয়ের চিত্রকলা প্রধান অধ্যাপক  
হিসাবে যোগদান। ১৯৫৪-৫৫ সালে  
স্বদেশে স্থগল উত্তর শিক্ষালয়।  
১৯৫৫, ৫৬ একক প্রদর্শনী, সিঙ্গি,  
কলকাতা ভ্রমণের অন্তিম পথে ভারতের  
অন্য প্রদেশগুলি হ্রসবে জেরুলালের  
শরণ গ্রহণের বিরতি তৈরিচিৎ অকলেন  
(১৯৫৭)। ১৯৬১-৬৫ সালে ৩টি  
কলকাতার দুটি একক প্রদর্শনী। আগত-  
এবার প্রদর্শনী টোকিও, বাসিলা,  
বাংকক, হংকং-এ হল। প্রথম পুরস্কার  
গেলেন সত্যেন (১৯৬৫)। জাপানে  
ইন্টারন্যাশনাল আসোসিয়েশন অব  
প্লাস্টিক আর্টস টোকিওতে তাঁর একক  
প্রদর্শনী কলকাতা। তিনি নির্মমিত হয়ে  
গেলেন (১৯৬৬)। সেই সময় দ্বিতীয়  
মল কলেন। ১৯৬৮-৭১ সিঙ্গি-  
কলকাতার দুটি প্রদর্শনী। ১৯৬৯-এ  
সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের  
উপাধ্যক্ষ হলেন। ১৯৭০ অবধি হিসাবে  
নিযুক্ত হলেন। ভারত সরকার একক  
প্রদর্শনী হিসাবে ২০তম ওয়াশিংটন আর্ট  
কনফারেন্সে যোগদান করতেন গেলেন এম-  
সত্যেন (১৯৭৫)। সরকারী চারুকলা

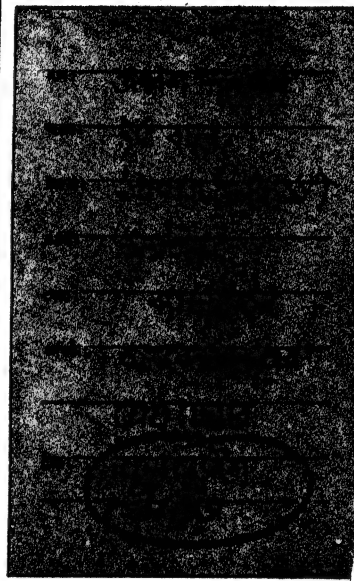
সেইদিন যোথালোর জেদে ওয়ারস  
কালোলের হুতুর হওয়ায় কামোদুলোরে  
জিহা মেথপালারক মহা হিচিলে গুল  
গুনে হয়ে কুলাতে চাইছেন। অলপ  
হায়ে জিহা হায়ে আকছেন। দেখেবো  
হায়ে ডাই ডাই লুবে সেকের আক  
হেজিন লাক্ত ভেবে। গেরুর কুলির টা  
টোদের যে এখানের সপে  
হেবেরে কাকের লপকাক তা  
গুহত গী লসালারি হত ভাগ  
হে  
এসেবো। লবহরবাসী (পান  
হিচিলে) মহা জিহা প্রকৃতক দেখেব  
সিপেবো, ওয়ারসকোথের হারিসক  
লপেব হসেব ডাক। হায়ে  
ওপিলারক কহেতব হের  
আকাক হেব হেরাসী। ১৯৭৮



সালে অকা চিত্রমঞ্জার নাম "খানমশ  
নিসলা"—সেবতাক্ত; হিমালয়ের ছবি  
তিন এর উপস্থান, বিস্তার, পাহাড়ে  
পশর আবহাওয়ার কারুক, য়ে  
তুষার থেকে ঝড়ের পবন্ত ধরবে  
চেয়েছেন। এক্ষেত্রে জ্বালা। নিঃশব্দতা  
প্রতিদর্শন করে। ঐর চোখে চো  
রেখে গৃহস্থ, পারসৎকো। শব্দে মন  
হয়েছে হৃদয় অতীতের মিত করছেন  
প্রকৃতির জোয় দর্শনীয় মেজাজটা ধর  
পর্বে। এখন সম্ভারভীর বাজারে গি  
চলছে না ভেবে দূরন্ত কখনোরাই  
মত তুল চালাতে হবে তাকে।

“ধানধান প্রকৃতি” চিত্রশালা  
অন্যতম তৈলচিত্র (৪৪"×৩৬")  
দিশালতীন নীলের মধ্যে চুকা  
আচ্ছাদিত পর্দা। মাখবনের সাহেব  
রুমশামলায় মত বর্ণের কবর নিয়ে দৃ  
দিক দিয়ে পাহা তী নদী। রংএর কা  
কুরি। বুনোটে মরি মরি মরি রং  
সাধারণিক নানা মায়েলার মান্দু  
তার স্পেনের কাছে ধরে তেলের  
সভেনে ঘোবলের ক্ষেত্রে তাই ঘটে  
কিন্তু একেবারে ডিন। শামার  
পশ্চাদপসর জল্লাভাজে জনই। ত  
প্রভা বড়ন রাজভাতিত।

যে সুইশ দিয়ে দাড়ি বাতায়  
তাকে মোকাবিলায় কে হারায়!



নতুন সুইশ স্টেনলেস—বিজ্ঞানের এই  
কেন্দ্রীয় উদ্ভাবন নিম্নলিখিত  
আবশ্যিকতার কারণে মনোহর  
কামোতে পরিণত হয়েছে।  
কিছু পাতার দ্বারা আবৃত  
হওয়া এবং এর কঠোর  
পৃষ্ঠের পৃষ্ঠের দ্বারা এটি  
একটি দৃষ্টিগোচর  
কামোতে পরিণত হয়েছে।

নতুন

NEW  
**Swish**  
STAINLESS

পরিবেশনায়:  জরুরি বস্তু ইন্ডিয়া লিমিটেড

Vision/BB/813/8en





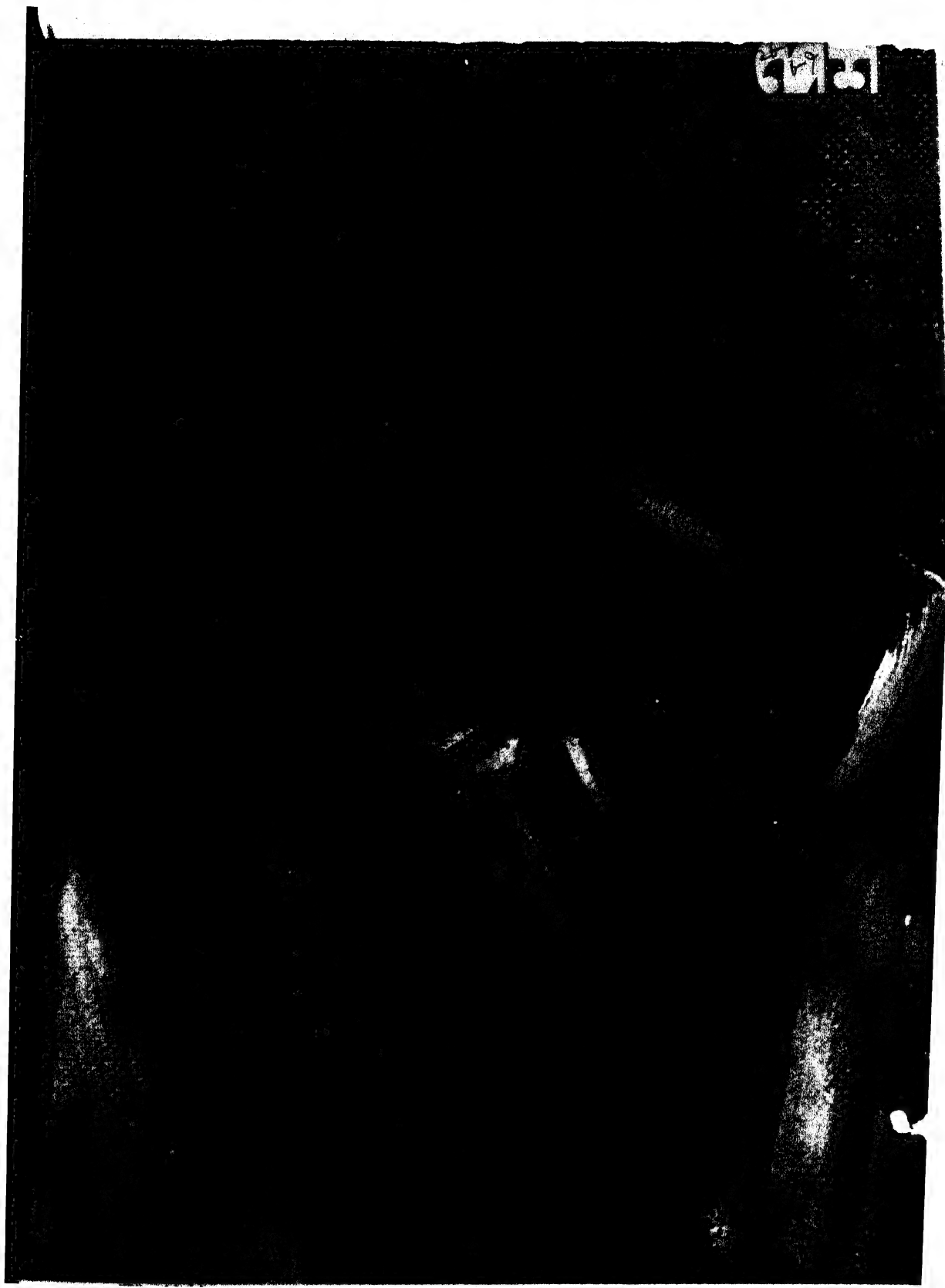
এক নতুন ফ্যাশনের ছন্দ-রাজ-দৃষ্ট ও স্বচ্ছন্দ

প্যারাগন টেক্সটাইল মিলস প্রাঃ লিমিটেড, বক্শ-৪০০ ০১০,

প্যারাগন



ELPAR



# ঘামাচির ঢুলকানি আর জ্বালা-যন্ত্রণা ডুলে যান!



**টাইসিল**  
ব্যবহার করুন!  
সবচেয়ে দ্রুত  
আরামদায়ক ঘামাচি-  
তাশক পাউডার



২ বকরের  
পায়ে পাওয়া  
যায়—'মু' আর  
'তাপেল উত'।

**টাইসিল আনুত**  
**ঘামাচি ডুলুত**  
**মাত্র টি.৬.৬৭প্.**

\* সর্বাধিক খুচরো দাম।  
হালির কর আলাদা।

একমাত্র ঘামাচি মল্লার পাউডারই  
ঢুলকানি আর জ্বালায় অস্বস্তি  
থেকে আপনাকে সবচেয়ে দ্রুত  
আরাম দেয়।

বিশেষ গুরু মেম্বারো টাইসিল  
ঘামাচি প্রতিক্রিয়া করে  
প্রতি রাতে।

১. অভিরিক্ত বাম হওয়া  
নিবারণ করে।

২. বাম শুবে দেয়।

৩. দুর্দশ পটিকারী লীবাণু  
মই করে।

৪. দকে জ্বরতা এসে দেয়।





চা-কফিতে  
ঢালুন...



কুটিতে  
মাখিয়ে নিন...



ফলের উপর  
ছড়িয়ে দিন...

টিন খুললেই  
খাসা  
গন্ধে-স্বাদে  
ঠাসা

সুস্বাদু ও  
সুস্বাদু



স্বাদেই  
তফাৎ বুঝাবেন

আচম্যাকুমার

সেনগুপ্ত

পরমপুরুষ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

(১ম/২য়/৩য়/৪র্থ) ৫০

অখণ্ড অমিয়

শ্রীগোবিন্দ

(১ম/২য়/৩য়) ৪৫

কবি শ্রীরামকৃষ্ণ

ভাগবতী তনু

রবীন্দ্রনাথ

ভূমাপুরুষ

শ্রীঅরবিন্দ

ভক্ত বিনোয়নন্দ

মৃগমদ

চল চল কাঁচা

অথরা মাধুরী

অবধূত

অবিমুক্ত ক্ষেত্রে ৪৫০

উদ্ধারণপুরের ঘাট

বহুব্রীহি ৫৫০

কলিতীর্থ কালিঘাট ৫৫০

মরুতীর্থ হিংলাজ ৮

ঐ (পেপার ব্যাক) ৬.০০

তারাদাস

বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্ত্বির আলো ৫

অনন্তর ৫

কল্লসপথ ৮.৫০

তরুণকুমার

ভাড়াড়ী

কাগজের নৌকা ১০

সজ্জাদীপের শিখা ৫

নিমাই ভট্টাচার্য

ভাগ্যৎ ফলতি

সবত্র ৬

নাচনী ৭

নরেন্দ্রনাথ

মিত্র

মিত্ররাগ ৪

যাত্রাপথ ৪.৫০

প্রফুল্ল রায়

তটিনী তরঙ্গে ৬

মহাশ্বেতা দেবী

আঁধার মানিক ১২৥

বায়েজ্জোপের বাস ৬

বাণী রায়

জনারগো একমুখ ১২

অর্গানের দিন ২

লীলা মজুমদার

আর কোনোধানে ১০

ফেব্রুয়ারী ২

সুধীরঞ্জন

মুখোপাধ্যায়

মজুরাণী ৫.৫০

কাঞ্চনময়ী ৬

দূরের মিছিল ৫

হরিনারায়ণ

চট্টোপাধ্যায়

উপকূল ৩

স্বর্গচাঁপার দিন ৩

ছলনার জাল ৩

চন্দনবাউ ৫.৫০

দিনান্তে

নিশান্তে ১৫.০০

প্রশান্ত চৌধুরী

টুকরো কাঁচের ছবি ৯

কান পেতে শুনি ৫

ঘন্টাফট ৪

আলোকের বন্দরে ৪৥

শিশু ও কিশোর সাহিত্য

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাত্রাপানে রামায়ণ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

ছেলেদের আরব্য উপন্যাস

এ টেল অব টু সিটিজ

নৌতিকথামালা

বিদেশী গল্প সংকলন (১ম)

.. (২য়)

শিশু রামায়ণ

শিশু মহাভারত

দেশবিদেশের লেখাপড়া

গাঙ্গী জীবনী

তারাকঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কিশোর গ্রন্থাবলী

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

ঠাকুরদার ঝুলি

সুখনাথ ঘোষ

ছোটদের বিশ্বসাহিত্য

সুইস ফ্যামিলী রবিনসন

ডেভিড কপারফিল্ড

কিশোর গ্রন্থাবলী

সীতা দেবী ও শান্তা দেবী

হিন্দুস্থানী উপকথা ১০.০০

লীলা মজুমদার

নেপোল বই ৮.০০

সীতা দেবী

নিরুপেণ্ড গুরু কাহিনী

ও অন্যান্য গল্প ৬

সুখলতা রাও

নানান দেশের রূপকথা ৬

গল্প আর গল্প ১২.৫০

কিশোর গ্রন্থাবলী ১০.০০

সোনার ময়ূর ৩.০০

স্বামী বেদান্তানন্দ

শ্রীসারদাদেবীর

জীবনকথা ৬.০০

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

কিশোর

সাহিত্য সমগ্র (১ম) ১২.৫০

কিশোর

সাহিত্য সমগ্র (২য়) ১২.৫০

যামিনীকান্ত সোম

শ্রীনেহরু ২.০০

প্রবন্ধ, সমালোচনা, স্মৃতিকথা, জীবনী

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

ধর্ম ও সমাজ ১৬.০০

ধর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ৭.০০

সুখরঞ্জন রায়

রবীন্দ্র কথাবোঝার শিক্ষাসূত্র ১৭.০০

বিশ্বপতি চৌধুরী

কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ৫.৫০

প্রবোধচন্দ্র সেন

ইচ্ছামন্ত্রের দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ ৭.০০

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা কাব্য ১৫.০০

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ৬.০০

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

গগনেন্দ্রনাথ ৬.৫০

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

ফিরে ফিরে তাই ১৬.০০

নলিনীকান্ত সরকার

দাদাঠাকুর ১২.০০

অধ্যক্ষ অহিভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত

Student's

TRILINGUAL DICTIONARY

ইংরাজী • বাংলা • হিন্দী

ট্রিশ টাকা



মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১০, শ্যামচরণ দে স্ট্রীট-৭০/৮৬/১, মহালা গান্ধী রোড-১

॥ প্রকাশিত হল ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী

॥ দাম কুড়ি টাকা ॥



## চিঠিপত্র

### রবীন্দ্রসংগীত কি লাইট মিউজিক ?

শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য ১২ই এপ্রিল  
দেখ পাঠকর প্রকাশিত তব চিঠিতে  
(রবীন্দ্রসংগীত কি লাইট মিউ-  
জিক ?) আকাশবাণীর এডিটরে  
রবীন্দ্রসংগীতকে 'লাইট মিউজিক'  
হিসেবে গণ্য করা হর বলে প্রতিবাদ  
জানিয়েছেন এবং রবীন্দ্রসংগীতকে  
বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য  
'প্রত্যক্ষ আলোকালন' ও 'অনমত গঠনের'  
ডাক দিয়েছেন। শ্রদ্ধা তাই নয়,  
লোকাল অডিশন কমিটির সদস্য  
হিসেবে রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি  
আকাশবাণীর মনোভাবের বিরুদ্ধে  
প্রতিবাদ জানিয়ে উক্ত কমিটি থেকে  
পদত্যাগ করার উদ্দেশ্যে যে চিঠিটি  
তিনি লিখেছিলেন, সেই চিঠির  
অংশবিশেষও তিনি উদ্ধৃত করেছেন।  
তা থেকে আমরা জানতে পারছি যে  
শ্রীভট্টাচার্য মনে করেন, আকাশবাণী  
কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে  
স্বল্পসংকল্পভাবে আধুনিক গানের  
সঙ্গে একসঙ্গে বাজিয়ে চলেছেন।  
শ্রীভট্টাচার্যের বক্তব্য প্রদর্শনযোগ্য।

#### রবীন্দ্রসংগীত কি লঘুসংগীত ?

—এ প্রশ্ন অত্যন্ত সঙ্গত। কারণ,  
'লঘুসংগীত' বললেই যে ধরনের  
সংগীতের কথা আমাদের মনে আসে,  
সে ধরনের সংগীত রবীন্দ্রনাথ কমই  
সৃষ্টি করেছেন। আমি জানি এটুকু  
সংশয় জনেই রবীন্দ্রসংগীতের  
অনেক অনুরাগী ও আমাদের দেশের  
রবীন্দ্র-প্রীতিহর ধারক-বাহক কুপিত  
চলবে। কারণ, জন্মবার্ষিকী আমরা  
রবীন্দ্রনাথের নাম শুনলেই দশহাত  
কিছির এসে কুশল কবিতা  
লিখি। বিশেষত রবীন্দ্রসংগীতের  
শিল্পীদের এ নিরামৃত প্রোডাক্টের  
বিশ্ব ভাগের মনেই এই ধারণা বদ্ধ-  
মূল হয়ে গেছে যে রবীন্দ্রসংগীত  
মানেই এক মহা গহ্বরের বাপার, যা  
যাবতীয় বিচার-বিশ্লেষণের উদ্ধার।  
কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের স্থান বাংলার  
সংগীতজীবনে যে কোথায়, সেই  
সংগীতের প্রচুটির সঙ্গে আমাদের  
সম্পর্ক যে কতো নির্বিড় একথা আমি  
আমরা রক্তমাংসের মানুষ্যের মতো  
ভাবতে ও বুদ্ধিতে লিখতাম তা হলে  
ভয়মিত্ত প্রস্থার দূরে গিয়ে  
কুশল না করে তাকে সজ্ঞান-স্বা-  
জ্ঞানে এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরতাম।  
এবং তা হলেই আমরা টের পেতাম যে,  
যে কোনো সংগীতপ্রচুর কাজে গৃহস্থের  
পাশাপাশি লঘুও থাকে, গভীর  
ভাবনার পাশাপাশি আঞ্চলিক  
আলস্যের বা মজার লহর থাকে।  
সংগীত এমনই এক শিল্পমাধ্যম যা  
সমস্তের চেউরে অবগতনের  
আনন্দও দেয়, নিস্তরঙ্গা দীর্ঘিতে  
পরম নিশ্চিন্তে গা ভোবানোর সু-  
দের আবার পাখড়ের কোনো ফটল  
থেকে নেচে-আসা কবীর মলে পা  
ভেজানোর তাক্ষণিক মজাও দেয়।  
'এ মোহে আবরণ খোলো' কে গো

কিহালো-র গৃহস্থের পাশাপাশি  
হা রে রে রে রে আমার ছেঁড় দেয়  
দেয়ে-র অপেক্ষাকৃত লঘু সৃষ্টি  
করার হক ও মনোবাহ রবীন্দ্রনাথ  
নাথেন বলেই তিনি রবীন্দ্রনাথ।  
এবং পৃথিবীর সকল সার্থক সংগীত-  
প্রচুর কাজ বিশ্লেষণ করলে আমরা  
দেখতে পাই যে তাঁদের গৃহস্থের  
কাজগুলোর মতো তাঁদের লঘুস্তার  
কাজগুলোও লঘুস্তার হিসেবে  
সার্থক।

রবীন্দ্রনাথের সব গানকে লঘু  
সংগীতের পর্যায়ে ফেলা দেওয়ার  
প্রচুরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর  
সময় যেমন এসেছে, তেমন  
এসেছে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ধরনের  
গানগুলোকে সাংগীতিক বিশ্লে-  
ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়-  
ভুক্ত করা যার কিনা তা নিয়ে  
ভাবার সময়। কারণ অমূলক  
রবীন্দ্রসংগীত ভালো গান বলে  
কিছুই বলা হয় না। কারণ  
গানকাঠি এবং স্বাভাবিক সাংগীতিক  
প্রবণতার গণে তার কাছে রবীন্দ্র-  
নাথের প্রাথমিক গান লউল্লাপের  
গানের চেয়ে বেশী ভালো আসে।  
এমন গানকে বা গানিকা ধর কমই  
আজকে যিনি রবীন্দ্রনাথের সব ধরনের  
গান গানের ক্ষেত্রের মনে সামগ্রিক  
পরিভ্রমণ সৃষ্টি করতে পারেন। এই  
বিষয় ভাবার সময় সংস্কার ও  
বিশ্বস্ততার সংকীর্ণতা ছেড়ে বৈচিত্র্য  
এবং নিরূপক বিচার-বিশ্লেষণের  
পরশ নিতে হবে আমাদের।

#### শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্যের চিঠিতে

তার পরভাগপত্রের উদ্ধৃতি পড়ে যে-  
কোনো সঙ্গীত পাঠকের মনে হবে যে,  
রবীন্দ্রসংগীতকে লঘু সংগীত বলায়  
তিনি সগত কারণটি বিজ্ঞপ্ত হলেও  
'আধুনিক' গানকে তিনি লিখা লঘু  
সংগীত বলে স্বীকার করেন। এবং  
রবীন্দ্রসংগীতকে আকাশবাণীর কর্তৃ-  
পক্ষ আধুনিক গানের সমগোষ্ঠীর মনে  
করেন বলে তাঁর বিবৃতি। এখানে  
আমরা প্রশ্ন: "আধুনিক" গান বলতে  
তাঁনি কোন ধরনের গানের কথা  
বলছেন? রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে  
আমরা আধুনিক সাহিত্য বলে মনে  
করি। রবীন্দ্রনাথের গানও কি  
আধুনিক গান নয়? গত এক শো  
বছর ধরে বাংলা আধুনিক গানের যে  
ধারা চলে আসছে, রবীন্দ্রনাথ কি তার  
উৎস নেই? আর "আধুনিক গানের"  
প্রতি এমন কড়া কেন? আজকের  
দিনে সংগীত প্রায় সামগ্রিকভাবে  
ভোগ্যপণ্যে পরিণত হবার জন্য এবং  
তার ওপর ব্যবসায়িক স্বার্থ চাপ  
সৃষ্টি করার জন্য প্রামোহনিক কন্যারী,  
আকাশবাণী ও চলচ্চিত্রের শিল্পিত হলে  
কাপড়ের নতুন নতুন ছিটের মতো  
যে সব গান তৈরি হচ্ছে ও বাজারে  
বিক্রী হচ্ছে তাদের মূল্যায়নের মাপ-  
কাঠিতে যদি "আধুনিক বাংলা গান"  
নামে এক শিল্পশব্দকে মাপা হয়,  
তা হলে উত্তীর্ণ অসংখ্য গানের প্রতি  
আকার করা হয় না কি? "আধুনিক  
বাংলা গান" তো এক বিরাট বাপার।  
আকাশবাণীর হয়ে ওকালতি না  
করেও বলা যায় যে "আধুনিক বাংলা

## উপন্যাস গল্প রম্যরচনায় বিশ্ববাণীর বিচিত্র সম্ভার

সমরেশ বসু-র

গল্পসংগ্রহ (৩য়) ২৫.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর

কয়েকটি ভিন্ন স্বাদের গল্প নিয়ে প্রকাশিত হলো

প্রতিশোধের  
একদিক ১০.

সুজিতকুমার সেনগুপ্ত

ভিন্ন স্বাদের রম্যগ্রন্থ

জ্যোতির্ময় রবি ও কালো মেঘের দল ১০

প্রথম দেখা ১০.০০

শ্রীবাসব-এর

সেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস

নাজমা বেগম ১০.

এক মুঠো মাটি ৬ গুলবানু ১২.

গোমতী গঙ্গা ১৪. দেওয়ানবাড়ি ১৫.

আনন্দীকল্যাণ ৫. রাহু ও কেতু ৮.

আকাশ মন্দাকিনী ৪. ছুয়ে পক্ষ ৬.

কত বিনোদিনী ৬. একই আকাশ

বহু প্রশংসিত উপন্যাস

বাঁধন ছেঁড়া দাগ

নব কলেবরে প্রকাশিত হলো। দাম ১২.০০

বিশ্ববাণী প্রকাশনী

৭২/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড II কলকাতা ৯

# আমাদের প্রকাশিত উপন্যাস গল্প ও অন্যান্য পুস্তক

অমরদাশের রায়  
বাংলা দেশে ১২, সাতকাহন ১০,  
যুবনাথ  
মাক্সাতার বাবার আমল ১২,  
বনফল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়  
তুমি ৫, অন্যান্য জীবন ৫,  
সমরেশ বসু  
বান্দা ৬, পাতক ৪, ঝিলে নগর ৭,  
বন্ধ দুয়ার ৪, পুতুলের প্রাণ ৮,  
নবনীতা দেব সেন  
করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে ১০,  
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় দেবেশ দাশ  
বুদবুদ ১০, রাজ্যোয়ারা ১৪,  
মহাশ্বেতা দেবী  
নৈশ্বর্তে মেঘ ২০, রূপরাখা ৫,  
ধানের শীষে শিশির ১০, হাজার চুরাশীর মা ৮,  
অরণ্যের অধিকার ১৫, অগ্নিগর্ভ ১৪,  
লায়লী আসমানের আয়না ১৫,  
চোদ্দিমুণ্ডা ও তার তীর ১৬,  
কবি বন্দ্যোপাধ্যায় গাঙ্গুর জীবন ও মৃত্যু ১২,  
শক্তিপদ রাজগুরু  
বন্যা এলো ১২, অন্তরঙ্গ ৭,  
নারায়ণ সান্যাল  
সত্যকাম ১২, মহাকালের মন্দির ১০,  
আমি রাসবিহারীকে দেখেছি ২০, গ্রামের বাড়ি ৬,  
নিগুণানন্দ  
দণ্ডিত আসামী ৬, এই মহতের জন্য ১৬,  
শেখর সেনগুপ্ত নজরুল ইসলাম  
নগ্ন তাপস ৬, ভক্তিগীতি মাধুরী ১০,  
বিমল মিত্র  
আমার প্রিয় ১০, মধোখানে নদী ৮,  
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়  
চন্দ্রকিরণ ৫, মা বাবা-ভাই বোন ১২,  
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়  
নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে (১ম) ২০, (২য়) ১৫,  
দৃঃস্বপ্ন ৭, শেষ দৃশ্য ১৪, বলিদান ১০,  
অরুণ মিত্র অজিত হাজরা  
শিকড় যদি চেনা যায় ১৪, ওরা চারজন ১০,  
প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র সৈয়দ মুস্তফা সিরাত  
জব চার্নকের বিবি ১৪, তৃণভূমি ২০,



করুণা প্রকাশনী  
১৮ এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯, ফোন : ৩৪-৬২ ৬৮

কি লাইট মিউজিক?" এই প্রশ্নটো  
যে চাটখান লিখেছেন, সে ব্যাপারে  
আমার কিছু বলার আছে। মৌড়  
কল্প পক্ষ রবীন্দ্রসঙ্গীতকে 'লাইট  
মিউজিক' আখ্যা দিয়েছেন। এই  
'লাইট মিউজিক' কথাটা আচর্য  
ক্ষেত্রের কারণ হতে পারে। তবে  
রবীন্দ্রসঙ্গীত যে কালোরাঙ গান নয়  
সেটা আমরা সকলেই মেনে নিতে  
পারি। মূলত রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যই  
ছিল প্রাচীন কালোরাঙ গানকে  
(সুত্র, পুরাবৃত্ত) সহজ করে  
অর্থাৎ 'লাইট' করে কথার গভীরতা  
দিয়ে সকলের মনে পৌঁছে দেওয়া।  
যার ফলে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে শব্দ  
সঙ্গীত না বলে সাহিত্য-সঙ্গীতও  
বলা যেতে পারে। এখন কালোরাঙ  
গানের পাশাপাশি রবীন্দ্রসঙ্গীতকে  
বিচার করতে হলে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে  
স্বাভাবিকভাবেই 'লাইট মিউজিক'  
আখ্যা দেওয়া যায়। এতে অন্যের  
কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না।  
অনুবাবু ১৯৭৯ সালের  
জানুয়ারী মাস থেকে কলকাতা  
আকাশবাণীর অডিওন বোর্ডের  
রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্যতম বিচারক  
অর্থ ১৯৭৯ সাল থেকে এমন অনেক  
শিল্পীর রবীন্দ্রসঙ্গীত বেতারে  
প্রচারিত হয়েছে (এর আগে যে  
হয়নি তা বলছি না) যা প্রচারিত  
হবার অযোগ্য। সেখানে রবীন্দ্র-  
সঙ্গীত আর রবীন্দ্রসঙ্গীত থাকে নি।  
অর্থ সেইসব শিল্পীরা অনুবাবুর  
বিচারে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাহলে  
অবাক লাগে যে? অরুণবাবু বেতার  
কল্প পক্ষের 'লাইট মিউজিক' আখ্যার  
প্রতিবাদে বিচারকের পদ ছেড়ে দেবার  
আবেদন করেছেন, তিনি একবারও  
ডাবেননি যে তার অডিওন বোর্ডের  
বিচারে শিথিলতা রবীন্দ্রসঙ্গীতকে  
কত বেশী 'লাইট' করে দিচ্ছে। আসল  
ব্যাপারেই অনুবাবুর কোন প্রতিবাদ  
নেই। সবশেষে অরুণবাবু লিখেছেন  
প্রত্যক্ষ আন্দোলন ও জনমত গঠন  
করতে—“যদিও না রবীন্দ্রসঙ্গীতকে  
বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা যায়  
ততদিন।” আমি মনে করি রবীন্দ্র-  
সঙ্গীত বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিতই।  
এ ব্যাপারে কারো সন্দেহ থাকতে  
পারে কি?

বনপাণিয়া চৌধুরী  
কলকাতা-৪৭

১১/৩/৮৮

গত ১২ই এপ্রিল ১৯৮০  
তারিখে দেশ পত্রিকার চিঠিপত্র  
বিভাগে শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য আকাশ-  
বাণীতে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে 'লাইট  
মিউজিক' বৃত্ত থেকে বিশেষ মর্যাদায়  
সুত্রে উন্নীত করার জন্য যে প্রত্যক্ষ  
আন্দোলন এবং জনমত গঠন করা  
আহ্বান জানিয়েছেন তাকে স্বাগত  
জানাই। তবে নীতি এবং আদর্শ  
বিচারে এই দাবীর যথার্থতা থাকলেও  
মণ্ডে সম্মানমল্লোর বিনিময়ে সঙ্গীত  
পরিবেশন করে জনপ্রিয় হবার প্রচেষ্টা  
ছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রভাবশাল  
প্রথম সারির শিল্পীদের অন্য কো  
বিষয়ে সময় দেবার মতো যথেষ্ট সম  
আছে কিনা সে বিষয়ে বিতর্ক

১২

১২ই এপ্রিল ১৯৮০ সংখ্যার  
দেশ অরুণ ভট্টাচার্য "রবীন্দ্রসঙ্গীত

প্রবাল আছে। জা. হাফা রবান্দ-  
সঙ্গীতকে 'বিশেষ মর্যাদার' প্রতিষ্ঠিত  
করার আন্দোলনে সামিল হবার সঙ্গে  
সঙ্গে এটাও বিচার করে দেখা উচিত  
যে আকাশবাণীতে সচরাচর যে মানের  
রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন হয়ে থাকে তা  
'বিশেষ মর্যাদার' যোগ্য কিনা।  
রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, রাজ্যসনে  
বসলেই রাজা হয় না। বর্তমানে  
আকাশবাণীতে যে সব নবীন ও প্রবীণ  
শিল্পীরা নিয়মিত রবীন্দ্রসঙ্গীত  
পরিবেশন করেন, আদর্শ রবীন্দ্রসঙ্গীত  
পরিবেশনের বিচারে তাদের কখন  
'বিশেষ মর্যাদার' প্রতিষ্ঠিত হবার  
যোগ্যতা বিচার সাপেক্ষ। ক্রান্ত কণ্ঠ,  
অস্পষ্ট ও সান্দ্রনাসিক উচ্চারণ,  
অসংযত ছন্দ, কপিট ও স্থানান্তরিত  
স্বরকল্পণ, সীমায়িত স্বর-বিন্দুত্ব,  
ইচ্ছাচাহীন গানের গভড়া, বিচ্যুত  
স্বরলিপি প্রভৃতি এক বা একাধিক  
নিদনীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে যখন কয়েক  
জন শিল্পীকে আকাশবাণীতে নিয়মিত  
রবীন্দ্রসঙ্গীত করতে দেখি তখন মনে  
প্রশ্ন জাগে এটা কি রবীন্দ্রসঙ্গীতের  
প্রচার মাধ্যম না শিল্পীদের প্রচার  
মাধ্যম? প্রত্যেক অরুণবাবু তো কিছু-  
দিন অভিশন বোর্ডের সদস্য ছিলেন,  
অরুণবাবু কি মনে করেন এই অভিশন  
দেওয়ার পদ্ধতিটা সম্পূর্ণ টুটিহীন?  
তা না হলে আকাশবাণীতে প্রায়  
নিশ্চয়মানের রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা যায়  
কেন? রবীন্দ্রসঙ্গীতকে 'বিশেষ  
মর্যাদার' প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনের  
অগে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অভিশন  
সম্প্রতি টুটিমুক্ত করার জন্য  
আন্দোলন করার প্রয়োজন আছে, ন  
হলে গোড়া কেটে শূন্য আগতেই জল  
দেওয়া হবে। শূন্য মাঠ অভিশন-  
পদ্ধতির পরিশোধন করলেই হবে না,  
যে সব শিল্পীর পরিবেশনে  
রবীন্দ্রসঙ্গীতের 'বিশেষ মর্যাদার'  
পরিচয় পাওয়া যায় না তাদের অবসর  
গ্রহণ করতে বাধ্য করা উচিত। কারণ  
শিল্পের চেয়ে শিল্পী কখন বড় হতে  
পারে না।

বু বৈশ্বাস  
কলকাতা-২৯

সংগীত ও ভাবনা

৮ই মার্চের দেশে গ্রীস্মম্ন  
চট্টোপাধ্যায়ের 'সংগীত ও ভাবনা'  
শীর্ষক রচনাটি পড়লাম। ভারতীয়  
সমগ্র সংগীতের ক্ষেত্রে ভাবনা-  
চর্চার দৈন্য সম্পর্কে বিমতের  
কোনো অবকাশই নেই। এতএব  
আমাদের এই অর্ধশতাব্দীত  
সংগীতে চট্টোপাধ্যায়ের অভিনব  
নিশ্চিতরূপ সময়োচিত এবং সাধু-  
সাধ্য। কিন্তু এই প্রসঙ্গে চট্টো-  
পাধ্যায়ের মতামতের সঙ্গে একটি  
মাসপাখিকা অনুভব করছি।

তার মতে সংগীতের টেকনিক  
শিল্পিগণ সম্বন্ধে অজ্ঞতা (সংগীতের  
আকাংক্ষা না জানা) ব্যাপক  
সংগীত-আলোচনার অনুপস্থিতির  
ফলে দারুণ হওয়া উচিত নয়। এই  
শিষ্টাঙ্গ থেকে তার ধারণা  
সংগীতের 'ফর্মাল জ্ঞান-বিজ্ঞান'  
ল-মান'প্রাপ্ত গান-বাজনা নিয়ে

অচীর আলোচনা করণ, তাতে দেশের  
সংগীত-সংস্কৃতির বিকাশই ঘটেবে  
এবং ভারতীয় সংগীত ক্রমশ একটি  
মননশীল বা ইনটেলেকচুয়াল আর্ট  
হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। কিন্তু  
আমি বলব সিনেমা সাহিত্য অথবা  
জিকের মতো সংগীতের পরি-  
প্রেক্ষিতেও যথার্থ, সৃজনশীল আলো-  
চনার জন্য একটা ন্যূনতম টেকনিকাল  
জ্ঞান অপরিহার্য। নচেৎ এসব  
অন্যায়-সম্ভব আলোচনা নিম্নক চা-  
কম্বির আসরে সময়-ত্যাগের  
আজ্ঞাতেই পর্যবসিত হবে। বহুত  
গান-বাজনার ক্ষেত্রেও ঐ ধরনের আসর  
আজ্ঞা এবং লঘু চিন্তার খুব একটা  
অভাব আছে বলে মনে হয় না।  
আবার অন্যদিকে সংগীতের প্রাথমিক  
কলাকৌশলও অজ্ঞ, অথচ সন্মত  
'ইনটেলেকচুয়াল' কারু কারুর  
আমাদের সংগীত (বিশেষত রাগ-  
সংগীত) সম্পর্কে আপাতগভীর  
(এবং প্রায়শ উদ্ভাসিক) আলোচনা  
ইদানিং পড়েছি বা শুনছি যেগুলি  
যে-কোনো প্রকৃত সংগীতবেত্তার পক্ষে  
একান্ত বিরক্তি ও বেদনার কারণ। ঐ  
ধরনের ভুলো অসংস্কৃত বা ভুলো  
ভেতাবী সংগীত সমালোচনা মৌলিক  
কলা-প্রগতির সহায়ক হতে পারে না।  
অতএব, সংগীতশিল্পী, সংগীতজ্ঞ  
স্রোতা এবং বিদগ্ধ সংগীত-  
সমালোচকরা এগিয়ে আসুন, পদ-  
পরিচা, আলোচনাচক্র, বহুলা  
ইত্যাদির মাধ্যমে সংগীতের (In-  
depth) ও উচ্চমানের সংগীত-  
আলোচনার প্রসার হোক, এবং ভারতীয়  
সংগীতের ব্যাকরণ, সূত্রা ও নন্দন-  
তত্ত্ব, ইতিহাস ও অপরিমিত  
সম্ভাবনা নিয়ে মনোচর্চা চলুক, তথা  
সাধারণের মধ্যে সংগীত-জিজ্ঞাসার  
প্রেরণা জাগুক। কিন্তু যারা গান-  
বাজনার অ আ ক খ না জেনে  
ভারতীয় সংগীতের ভাবনামূল্য বা  
বস্তুবিচারে লিপ্ত হতে চান তাদের  
উৎসাহ যোগালে তার ফল হতে  
বিপরীত হবে। তা ছাড়া বেশ  
খানিকটা গান-বাজনা শোনার আগে  
সংগীতের তত্ত্বালোচনা করতে না  
চওয়াইই সমীচীন এবং সাংস্কৃতিক  
দিক থেকে নিয়মিত।

ডঃ গৌতমকুমার সরকার

বর্ধমান

সরোজিনী নাইডু

৮ই মার্চ ১৯৮০ তারিখের  
সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় গ্রীষ্ম  
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের 'শান্তি-  
নিকেতন সরোজিনী নাইডু' প্রবন্ধে  
লেখক গ্রীষ্মী নাইডুর চারতর  
মধুরতম দিকটির চমৎকার আভাস  
দিয়েছেন। তার জীবনের সুবিস্তৃত  
পটভূমিকায় কাব্য ও রাজনীতি যথা-  
সময়ে প্রাধান্য লাভ করলেও জাতীয়  
জীবনের সর্বক্ষেত্রে ছিল তার অব্যব  
স্বিকার এবং স্বাচ্ছন্দ্য বিচরণ।

মনে পড়ে, ১৯২৪ সালের মে  
মাসে নারায়ণগঞ্জ অনর্ধশত টাকা  
জেলা ছাত্র সম্মেলনের কথা। অভ্যর্থনা  
সমিতির সভাপতি, স্থানীয় জামদার  
কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সুদর্শন,

## নবপত্রের বই

দক্ষিণেশ্বরে

শ্রীরামকৃষ্ণ

জীবনী ও উক্তি

\* দক্ষিণেশ্বর মন্দির

প্রতিষ্ঠায় রাণী রাসমণি

\* শ্রীরামকৃষ্ণদেবের

যোগদান

\* তার পুণ্য বিবরণ

ভক্তজনের সমাবেশে

তার সহজ সরল উক্তি

\* গুরু-বন্দনা গীতি

দাম : ১২২

মহাশ্বেতা দেবীর

নতুন

মুগল উপন্যাস

মূর্তি

মহাশ্বেতা দেবী বর্তমান

কালের সর্বাধিক আলোচিত

লেখিকা। মূর্তি নিঃসন্দেহে

তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ

উপন্যাস। 'অনাটী

'মোছনপুরের রূপকথা'

উপন্যাস দুটিকে এক

কথায় আঁকের ধান্য।

সমাজের দর্পণ বলা চলে।

৯৮ টাকা

ডঃ সুরেশচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায়ের

প্রাচীন ভারতের

অপরাজিত ও

যৌন বিজ্ঞান

প্রাচীন ভারতের

অপরাজিত ও যৌন

বিজ্ঞান বিষয়ে বিশদ

আলোচনা। দাম : ১৬০

\*

রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপ্ত কাব্যগ্রন্থ অরুণ মিত্রের

শুধু রাতের শব্দ নয় ৬

নবপত্র প্রকাশন

৮ পটুয়াটোলা মেন, কলি-৯



বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

পিণ্ডার হিমালয়ে ৮

শ্রীমতী ভক্তি বিশ্বাস

অপরিচিত

প্রতিবেশী ভুটান ১৫

নেপাল হিমালয়ে ১২

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

কে কোথায় যায় ৭

ভূতের বেগার ৮

ডাক বাংলার

ডায়েরী ১৫

সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ

ঘটনা যখন

রহস্যজনক ১২

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

মানগানু উপত্যকার

বেড়াল ৭

প্রসন্ন বসু

অন্যদিক ৭

নারায়ণ দত্ত

জনকোম্পানীর

বাঙালী কর্মচারী ২০

গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়

ভারতের নৃত্যকলা ১০

**একমাত্র  
কমপ্লাট -ই  
হল প্রভেডের  
দরকারী ২৩ টি  
একান্ত প্রয়োজনীয়  
খাদ্যগুণে  
ডরপুর সম্বূর্ণ  
আহার!**

কমলাস পাওয়া যায়—গেল আর  
চকলেট, এলাচ-জাকরানের মুখরোটক  
আদগছেও এবং স্ট্রবেরীর এক নতুন  
আদগছে—যা বাচ্চারা দারুণ ভালোবাসে!



## अभ्युपगमः

CASGC-38-234 BEN

কালের মূল সত্যসত্য দুজনকে  
গোপনীয়। যিনি বশন, শত্রু ধর্মের  
বিশুদ্ধ অকলঙ্কিত  
কার্যে তার ইংরাজী ভাষণ শুনিয়ে  
আমরা ছয়গণ সত্যসত্য হইয়া  
গেলার। বিশ্বব্রহ্মের যে তখনও বাক  
ছিল বাক নাই। বুদ্ধিলাস তখন যখন  
প্রধান অর্থাৎ গ্রীষ্মতী নাই তু তার  
ভাষণ আরম্ভ করিলেন। বাংলা ভাষায়  
প্রথম মনোমুগ্ধ তার কাব্য-প্রতিভা  
প্রসঙ্গে বাংলার প্যাপরা বুলবুলের  
প্রতি তার মমতার কথা উল্লেখ করা  
হইয়াছিল। তখন মহাশয়ের আলো-  
চক্ষুর স্নেহের শরীরা দেশে প্রবল  
চন্দ্রমাদনা সৃষ্টি করিয়াছে। গ্রীষ্মতী  
নাই তু তরুণ সমাজকে অলস ভাব-  
প্রবণতা পরিভাষণ করিয়া দেশসেবার  
আত্মনিরোগ করিতে উদ্যত আহ্বান  
দানাইলেন। আজও তার ভাষণের দুই  
প্রকটি কথা মনে পড়ে— 'the days  
of Papias and Bulbuls are  
one by' এবং 'why, in  
his land of Chaitanya, are  
all a-Chaitanyas?'

তর মৃগালবাহুর স্বচ্ছন্দ-সঙ্গলনে  
এবং সুধাকুণ্ডের উদাত্ত মৃচ্ছনায়  
গামরা কুরক সহস্র প্রোতা সম্মোহিত  
হইয়া গেলার। সে মোহ বহুদিন  
ঘেষত কাটে নাই; সে মুচ্ছমা বহু-  
দিন পর্যন্ত কানে বাজিয়াছে; আজও  
গর ঘেষ আছে।

গ্রীষ্ম হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়  
শান্তিনিকেতনের যে সমাবর্তন উৎ-  
সবের সরস প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন,  
ঐ সম্ভার উপস্থিত থাকিয়া গ্রীষ্মতী  
নাই এবং গ্রীষ্ম রাজগোপালাচার্যীর  
সাত্ত্বিক কলহ প্রবণ করিবার সোভাগ্য  
ইয়াছিল। প্রবন্ধ লেখক অতি  
নিপুণভাবে তার বিবরণ দিয়াছেন।

হু একটি রসাত্মক কথা যেন তার  
বিবরণ হইতে বাদ পড়িয়াছে মনে হয়।  
গ্রীষ্মতী নাই তু যখন রাজাজীকে কেবলই  
ভীক্ষু কৌতুক বাণে বিশ্ব করিতে-  
ছিলেন তখন স্চুতর রাজাজী কটাক্ষে  
হাসিয়া বলিলেন—আপনাদের আচায়ে  
এ ব্যাপারে বিশেষ অবাকার আছে,  
কারণ আমরা উভয়ে অতীতে অনেক  
ফুটকের সহচরী।

(We were co-conspirators in  
many an evil thing in the  
past.) সভাপ্রাপণে হাসির ক্রল বহিয়া  
গেল।

গ্রীষ্মতী নাই তুর মহান ব্যক্তিত্বের  
আর একটি দিকের আভাস বস্তুগত  
অভিজ্ঞতা হইতে দিতে শিখা হইলেও  
অতিশয় কুঠার সহিত উল্লেখ  
করিবো। গ্রীষ্মতী নাই তু ঐ উৎসবের  
শেষে শান্তিনিকেতন তাগ করিয়া  
যাইতেছেন। আমি বোলপুর স্টেশনে  
তার নিরাপত্তা ব্যবস্থার তদারকিতে  
বাস্ত। টেন ছাড়ার ঘণ্টা হইয়া গেলেও  
টেন ছাড়িতেছে না। এমন সময় তার  
মিলিটারী সেক্রেটারী (যতদূর মনে  
পড়ে বীরভূমিবাসী) লেঃ কর্নেল  
ডাঃ চাটাজী) হুটিয়া আসিয়া  
আমাকে পাকড়াও করিয়া গবর্নরের  
গাড়ির সম্মুখে উপস্থিত করাইয়া  
বলিলেন—'আসামী হাজির'। গ্রীষ্মতী  
নাই তু স্মিত হাস্য প্রাটফর্মের

পক্ষে ম.দ. করামাংকত বসবাস  
জানাইলেন। কর্নেল চাটাজীর  
সম্মুখে টেন ছাড়িয়া দিল। বহুকে,  
সোনিয়া মাধবী অভিজ্ঞত হইয়া চলত  
টেনের কৌচি চাইয়া বহিলাম। সে  
চির যেন আজও চোখে ভাসে।  
অমল্যারতন সমাজদার  
কলকাতা-৩৪

রংগামণ্ডে বস্কিম  
দেশ পথিকা ২২শে মার্চ ১৯৮০  
সংখ্যায় গ্রীষ্মমণ্ডলন ভট্টাচার্যের লেখা  
'বঙ্গরংগামণ্ডে বস্কিম' প্রসঙ্গে কিছু  
ভুল তথ্য পরিবেশিত হওয়ার জন্য  
কলকাতার নদীয়া হইতে গ্রীষ্মদ হাজার  
দেই ভুলগুণি সংশোধনের জন্য বাহা  
লিখিয়াছেন সেই লেখার মধ্যেও ভুল  
তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে। গ্রীষ্মদ  
লিখিয়াছেন, "পরবর্তীকালের প্রকৃত  
নট শিশিরকুমার বোধ করি বাংলা  
বঙ্গালয়ের ব্যতিক্রম পুরুষ। তিনি  
বস্কিম-উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রযোজনা  
ক অভিনয়ের প্রেরণা বোধ করেননি।  
সম্ভবত একবার তিনি চন্দ্রশেখর  
চন্দ্রশেখর চরিত্রে রূপ দেন। সংগে  
প্রতাপরূপে ছিলেন দুর্গাদাস।" এই  
দুটি তথ্যই ভুল।

আমি নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের  
সহিত অভিনেতা হিসাবে একদিনের  
কুড়ি বৎসর যুক্ত ছিলাম। তার জীবনের  
শেষ অভিনয়ের দিনটিতে পর্যন্ত তার  
পাশে ছিলাম। তিনি নাট্যমন্ডিরে  
"অমর দত্ত কতক নাট্যকারের গ্রন্থিত  
গ্রন্থ" (কলকাতার উইল) ১৯২৭  
সালে অভিনয় করিয়াছিলেন। তার  
ভূমিকা ছিল গোবিন্দলাল। তারপর  
১৯৫৫ সালে গ্রীষ্মদ মণ্ডে হাস্য-  
কৌতুক অভিনেতা "রঞ্জিত" নাম একদিন  
মাত্র সম্মিলিত অভিনয়ের ব্যবস্থা  
করেন চন্দ্রশেখর। বহু অনুরোধ  
উপরোধ করিতে শিশিরকুমার গঙ্গালিস  
(লরেন্স ফস্টার)-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ  
হন। চন্দ্রশেখর ভূমিকায় নয়। সংগে  
প্রতাপরূপে ছিলেন ছবি বিনোদ-  
"দুর্গাদাস" নন।  
গণেশ শর্মা  
কলকাতা-২

এভারেস্ট অভিযান  
১৯শে এপ্রিল দেশ-এ প্রাণেশ-  
কার মালোয়ী ও আর্যভনের এভারেস্ট  
অভিযান সম্বন্ধে প্রবন্ধ থেক  
চিত্রাকর্ষক। তবে এতে একটি  
তথ্যগত ভুল আছে বলে মনে  
হয়। কাপ আল ডেনমান এভা-  
রেস্ট অভিযানে মারা যায় নি, বরং  
ঐ অভিযান থেকে ফিরে এসে Alone to  
Everest বইটি লেখেন এবং ঐ অভি-  
যানে তার সঙ্গী ছিলেন বিখ্যাত  
তোরনিক্স নরগো। সম্ভবত প্রচলিত  
মার্স উইলসন অথবা কে বি লারসেনের  
কথা বলতে গিয়ে ডেনমানের নাম  
উল্লেখ করেছেন। উপরন্তু দুই অভি-  
যাত্রী পৃথকভাবে নয় কলের  
পথে উঠছিলেন এবং সেখানেই তারা  
নিখোজ হন।  
শিশিরকুমার রায়  
শান্তিনিকেতন।

## হীরেন্দ্রনাথ দত্ত রচনাবলী

বাদ্যবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা পণ্ডিত 'হীরেন্দ্রনাথ দত্ত  
ফ্রাউডেশন' দার্শনিকগ্রন্থের হীরেন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষা-  
কল্পে তাঁর সমগ্র রচনাবলী সংকলন ও সম্পাদন করে  
কলেকটি স্বত্তে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন।

● 'প্রথমর্থ' ও 'রাসলীলা' এই দুটি গ্রন্থ নিয়ে রচনাবলীর  
প্রথম খণ্ডটি ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা, ৪৬৮ পৃষ্ঠা, মূল্য বত্রিশ টাকা।

● 'বেদান্ত ও বিজ্ঞান' এবং 'জগদগুরুর আবির্ভাব'  
দ্বিতীয় খণ্ডে সমিবিষ্ট। শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

পরিবেশক  
সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড  
কলিকাতা-৯

জিজ্ঞাসা দাশগুপ্ত এণ্ড কোং  
১এ কলেজ রো কলকাতা-৯ ৫৪/৩ কলেজ স্ট্রীট  
এবং ১৩৩এ রাসবিহারি এডেন্স কলকাতা-৭৩  
কলকাতা-২৯

ভয় ছড়ানো এই শহরের  
ভয় তাড়ানো ছড়ায় ভরা

সুরল দে-র

ভয়তাড়ুয়া ৩.৫০

ছবি এঁকেছেন : শৈল চক্রবর্তী  
২৫ জন ক্ষুদ্রে শিল্পীর আঁকা ছবির সঙ্গে ছড়া  
লিখেছেন

গীতা দত্ত

ছবির মেলা ছড়ার খেলা ৩.৫০

সবার কাছেই এ এক লোভনীয় উপহার। আধুনিক ছড়া  
সংগ্রহের ব্যাপারে এ রকম সার্বভৌমিক প্রচেষ্টা ইতিপূর্বে  
হয়নি। আগাগোড়া ছুই রঙে ছাপা। —দেশ

শৈলশেখর মিত্র সম্পাদিত

ছবি ছড়ার দেশে ৬.০০

এমিগ্রা পাবলিশিং কোং বঙ্গবন্ধু স্ট্রীট সার্কেট  
কলকাতা-৭০০০০৭



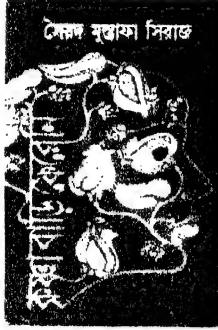
**বিমল কর-এর**  
দম-ফাটা হাসির নাটক  
**ঘুঘু** দাম ৬.০০

বিমল কর-এর সাহিত্য-জীবনের শুরুর বেলা পৌঁছান নাট্যরচনা দিয়েই—এ-খবর ক'জন রাখেন জানা নেই, কিন্তু বারী তাঁর পূর্ণাঙ্গ 'কলকৃত্তী সংলাপ' কিংবা একাক্ষর 'ঘাতক' পড়েছেন তাঁরা নিশ্চিত জানেন যে, নাটকের যাবতীর চাহিদা মিটিয়েও তাঁর নাটক কীভাবে হয়ে ওঠে বিশুদ্ধ সাহিত্য-কর্ম, গল্প উপন্যাসের মতোই তাঁর নাটক আলাদাভাবে কতটা সম্ভব।  
যেমন এই নতুন নাটক 'ঘুঘু'। কোতুলকে কীভাবে তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত টানটান করে ধরে রেখেছেন, সংলাপকে করে তুলেছেন জীবন্ত, চরিত্রগুলিকে করে তুলেছেন সবল এবং স্বতন্ত্র, কীভাবে সজ্ঞারিত করেছেন তাঁর এক গভীরবেগ—ভাবলে বিস্ময় জাগে। তার থেকেও বড়ো আকর্ষণ, 'ঘুঘু' নাটকে রয়েছে এক দমফাটা হাসির কাহিনী। এর গড়নে হাসি, বিন্যাসে হাসি, ঘটনায় হাসি, সংলাপে হাসি, চরিত্রে হাসি, হাসি রয়েছে সস্পেন্সও।



বলা বাহুল্য, এ হাসির চরিত্র আলাদা। কোথাও ন্যাকামি নেই, নেই ভাঁড়ামি কিংবা স্থূলতা। স্বাভাবিক ভাব, বর্ণনায় এক কাহিনীর ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এই নাটক। প্রবল প্রত্যাশিত এক জন্মাবধি কীভাবে ঘায়েল করল সামান্য এক ভাড়াটে—তাই নিয়ে লেখা এই নাটক শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে যায় দারুণ জমজমাট হাসির তোড়ে।

**সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের**  
দৃশ্য উপন্যাস  
**কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি** দাম ১২.০০



কী নগর, কী গ্রাম—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের লেখনীতে একইরকম জীবন্ত। জটিল নাগরিক মানসিকতার ব্যুৎ থেকে শুরুর করে গ্রামীণ ও প্রকৃতির করতলে ধৃত আদিম মানসিকতার প্রাথমিক সীমা পর্যন্ত প্রসারিত তাঁর অবলম্বন। সাম্প্রতিক সময়ের বাল্যব যৌবন সমস্যার ব্যাধি, মানব বন্দী, নিপুণ শলা-চিকিৎসকের মতো সেইসব সমস্যাকে বিশ্লেষণ করে দেখান তিনি।  
'কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি' উপন্যাসেও তাঁর এই দক্ষতার পরিচয়। আপাতনির্ভর, উদাসীন, সন্ন্যাসীর মতো অন্তর্মুগ মানব তরুণ স্কুলশিক্ষক ননী। তার আদরের বোন কৃষ্ণা বাড়ি ফিরল না, ফিরবে না কোনোদিন। সময়ের পাপ তাকে গ্রাস করে নিল এবং এই ভয়ঙ্কর শোকারহ চৈতন্য জর্জরিত হতে-হতে ননীর কাছে মানুষের জীবনটাই হয়ে উঠল অর্থহীন। কিন্তু ধ্বংস ও বেদনায় ক্ষতবিক্ষত ননী চরম মুহুর্তে আবিষ্কার করল, তবু, কিছু থেকে যায়। তবু, কিছু আছে। তা হল প্রেম। সেই প্রেমই মানুষকে বাঁচায়। মধ্যরাত্রে দৃশ্য উপন্যাসের সুর যেন এই রচনা। পাঠককে একটি আশোষ প্রত্যয়ে উত্তীর্ণ করে দেন সিরাজ তাঁর এই শিল্পনিপুণ উপন্যাসে।

**সৌকীর্ণ মিত্রের**  
খ্যাতি অখ্যাতির  
নেপথ্যে দাম ৪০.০০  
দ্বিতীয়  
প্রস্তাবনা-সম্প্রদায়  
রবীন্দ্রসাহিত্যে  
ধর্মচেতনা দাম ৮.০০

শান্তিনিকেতন সোমেন্দ্র  
রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা  
দাম ১৬.০০  
রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ  
শিক্ষাদর্শে সঙ্গীত ও  
নৃত্য দাম ৫.০০  
শোপালাদাস  
চট্টোপাধ্যায়ের  
রবীন্দ্রনাথকে বেকথা  
বলা হইল না দাম ৬.০০

**শক্তি**  
চট্টোপাধ্যায়ের  
চিরময় কাব্যগ্রন্থ  
**ছিন্ন বিচ্ছিন্ন**  
দাম ৩.০০

অসংখ্য স্মরণীয় ছোট কাব্যতা লিখেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় বিগত কয়েক বছরে। 'ছিন্ন বিচ্ছিন্ন' সেইসব কাব্যতার একত্র-সংকলন। চিরময় কবিতার এই বইতে অজস্র ছবি এঁকেছেন পূর্ণেন্দ্র পট্টা,



**শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে**  
**কৃষ্ণক এর**  
মজাদার বই  
**শব্দ নিয়ে খেলা**



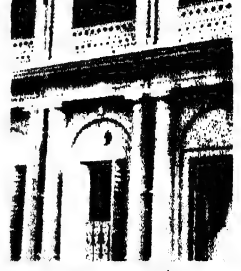
আনন্দ পাবলিশার্স ট্রাস্টেড লিমিটেড  
৪০ বেনিয়ারটোলা লেন কলকাতা ৯  
ফোন ৩৪ ৪৬৩৬

**বহু-প্রতীকিত গ্রন্থ**  
রবিশঙ্করের আত্মজীবনী  
**রাগ-অনুরাগ**  
দাম ৫০.০০  
রাগ-অনুরাগ রবিশঙ্করের আত্মজীবনী, এবং তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু। অকপট ভাষায়, সাবলীল ছন্দে এত বড় একজন গুণী মানুষ প্রাণপশাণী যে-আত্মনিবেদন রেখেছেন তার তুলনা হয়ত কেবল রবিশঙ্করেরই মরমিরা সোতারবাদন।  
'রাগ-অনুরাগ'-এ রবিশঙ্করের পরিবার-পরিজনের কথা আছে। স্ত্রী অন্নপূর্ণার প্রসঙ্গে সংস্কারোক্তি আছে। তাঁর গুরু, ওস্তাদ আলীউদ্দিন খাঁ সাহেব, গুরুভাই ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ, সমসাময়িক



মহান সেতারশিল্পী ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ, অমর গুণী ওস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ ওস্তাদ আমীর খাঁ, ওস্তাদ গোলাম আলি খাঁ, সিদ্ধেশ্বরী দেবী, বেগম আখতার প্রায় সবাইই কথা আছে। অত্যন্ত সরস, মনোরমভাবে, পুস্তকানুপুস্তক ডিটেলে সমেত। পড়তে, পড়তে পাঠকের সামনে একটা আশ্চর্য যুগের ছবি ফুটে ওঠে। গোটা দেড় বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন শহরে এবং লন্ডনে বসে লেখা 'রাগ-অনুরাগ'। বহুদিনের, বহু ঘণ্টার টেন-রেকর্ডারে বিভিন্ন মেজাজে, বিচিত্র পরিবেশে, কখনো আবেগে-উচ্ছ্বাসে, কখনো চিন্তার প্রাথর্বে যে-সব কথা বলেছেন রবিশঙ্কর, তারই নিচোলা, সং-অনুলিখন এই গ্রন্থে। এক জীবন্ত রবিশঙ্করকে স্পর্শ করা যায় তাই এই বইতে। মনে হয় যেন, রক্তমাংসের রবিশঙ্কর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেছেন। শব্দ, বাংলা কেন, কোন ভারতীয় ভাষাতেই এমন সং ও মহৎ আত্মকথন বেশি প্রকাশিত হয়নি।

**চিত্রা দেব-এর**  
উপন্যাসপ্রতিম রচনা  
**ঠাকুরবাড়ির**  
অন্দরমহল দাম ২০.০০



যখন বেহারারা ঘেরাটোপ ঢাকা পালকি করে বনেদি বাড়ির মেয়েবোদের নিয়ে গঙ্গায় ডুবিয়ে আনত, সেই সময়েই জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ির এক বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে ঘোড়ার চড়ে ময়দানে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলেন। আর রক্তগণীল সমাজ তাই দেখে ছি-ছি করে উঠেছিল লম্ফায়, থিকারে। বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে নারীজাগরণের অধ্যায়টিও পরম কৌতুহলকর। আর সেই জাগরণে ঠাকুরবাড়ির অন্দর-মহলের দান সবচেয়ে বেশি। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে, অভিনয়ে, সঙ্গীতে, বেশভূষায়, রচিত্রে, শিল্প-চর্চায় এই বাড়ির মহিলাদের ভূমিকা যেমন চমকপ্রদ, তেমনই গৌরবোজ্জ্বল। কিশোর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রতিভার বিকাশে, শিল্প-সঙ্গীতে-অভিনয়কলার অনুশীলনে তাঁর দিদি-বৌদিদিদের কল-কণ্ঠ প্রেক্ষা যে কতখানি, তার নেপথ্য-ব্যস্ততা অনেকেই অজানা। অতীত পরিণত বয়সেও সঙ্গীতে-অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ বারবার ডেকেছেন বাড়ির মেয়েদের। সেজন্যও ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপরিচারা স্মরণীয়। এমনই কয়েকজন স্নানামথন্য ও কয়েকজন অনাস্থ্য পরিচয় উপস্থাপিত করে চিত্রা দেব শব্দ ঠাকুরবাড়ির নারীদেরই নয়, বাংলার নারীজাগরণের একটি ছিন্ন-স্মৃতি নতুন করে গাঁথলেন। এমন অশ্লীল, চোখ ভোলানো বিবরণ আগে লেখা হয়নি। প্রজন্মে, পুস্তকানিতে দুর্ধর্ষ ছবি। সেই সঙ্গে আলাদা ভাবে ঠাকুরবাড়ির বংশলতিকা এই-বইয়ের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ।

## সূচীপত্র

চিঠিপত্র	১০
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও সংস্কৃতি	১
কল্যাণ	১০
মেলাবেন তিনি মেলাবেন	১১
কলকাতা (নব পুষ্টি)	১৫
হিমালয় ফিরে আসা	১৭
সেই সময়	২৫
স্মৃতি সত্যই স্মরণ (শ্রীমতী পর্ব)	২৯
৮০ ওলিম্পিক	৩০
মেঘ	৩০
মোহটো	৩১
সন্ধ্যার সিংহাসনে	৩১
হবি আঁক, ছিঁড়ে ফালে	৩২
চট্টোপাধ্যায়	৩২
বিচ্ছেদ	৩২
অরুণ	৩৩
মানবজীবন	৩৩
উনিশ শতকের বাংলা লিঙ্গ-পত্রিকা	৩৩
ফটোচার্জ	৩৩
বিজ্ঞান	৩৩
বিশ্বনাথের বালাজীবনের অজ্ঞাত	৩৩
তথ্য	৩৩
সাহিত্য	৩৩
পত্রিকা	৩৩
ফেডারেশন	৩৩
রাখাল	৩৩
আলোচনা	৩৩
প্রবন্ধ	৩৩
প্রবন্ধ	৩৩

## পরবর্তী আকর্ষণ

অশোক রক্তের প্রকৃষ্ণ  
রামচন্দ্র  
অশোক দাসের প্রকৃষ্ণ  
কই, বাঙালী ও কইলাড়া  
গীতা কিশোরের স্মৃতিচিহ্ন  
পরমাশ্রয়ী দিলীপকুমার  
অশোক দাসের প্রবন্ধ  
আই আক ও তার সমস্যা  
অমান্য রক্তের গল্প  
রাখাল কসর ইচ্ছাপূর্ণা  
আশিস ঘোষের গল্প ওদের সঙ্গে আমি

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ

মানসবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে  
বিশিষ্টা রায় কর্তৃক ৬ প্রকল্প সরকারী স্ট্রীট  
কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং  
খানদা অফিসে প্রিন্ট করা লিমিটেড পি ০৮  
সি আই টি (২০৮ কলকাতা) ৭০০ ০০৮ থেকে  
মুদ্রিত।  
দাম এক টাকা।

বিমান মাসিক : এপ্রিল : ১০ পয়সা  
পুঁথিকলের অজাগা হানে ২০ পয়সা

## পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও সংস্কৃতি

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার আপাতত নানা দিক থেকে বিবর্তিত, হয়ত বিপর্যস্ত। কিন্তু আলস্য তাঁদের হাতে নেই। অস্তিত্ব তথা ও সংস্কৃতি দপ্তরের কাজকর্মে তেমন কথাই বলে। সম্প্রতি এই দপ্তরের মন্ত্রী একটি বিল আনার চেষ্টা করেছিলেন, যে-বিল গ্রহণ করা হলে পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার সরাসরি সরকারের হাতে পড়ত। বিলটি প্রথম দফায় গ্রহণ করা হয়নি, অনুমান করা যাচ্ছে দ্বিতীয় দফায় হয়ে যেতে পারে। ওই দপ্তরের মন্ত্রী বলেছেন, এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সদরে, রবীন্দ্রনাথের নামে যে-সব সदन ও মণ্ড সরকারী অর্থানুকূল্যে তৈরী হয়েছে, ১৯৬১ সাল—অর্থাৎ রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর সময় থেকে, সেগুলির পরিচালনা ভার সরকার নিজের হাতে নিয়ে নিতে চান এইমাত্র, এছাড়া সরকারের অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।

তথ্যমন্ত্রী যে-বিলটি এনেছিলেন কতকগুলি কারণে তা গ্রহণ করা যায়নি। অবশ্য যেসব খুঁটিনাটি ব্যাপারের জন্যে তা প্রথমদিন গৃহীত হয়নি, অনুমান করা যাচ্ছে, দ্বিতীয় দিনে গৃহীত হয়ে যাবে, বিরোধীদের আপত্তি সত্ত্বেও।

বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকে সব ব্যাপারেই টুটি ও বেনিয়ম কাজকর্ম দেখতে পাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন আগে যেখানে যত সরকারী, বেসরকারী পরিচালনা ব্যবস্থা ছিল তা গলদে ভরা। স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁরা এই গলদ দেখেছেন, দেখেছেন অন্যত্রও। কাজেই সরকারী সাহায্যে যেসব সংস্থা রবীন্দ্রনাথের নামে গড়ে উঠেছে তার মধ্যে যে টুটি থাকবে না—এমন তো হতেই পারে না। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিতে এই বিল আনার সঙ্গত কারণ রয়েছে। অতঃপর, আশা করা যায়, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রবীন্দ্রসদন ও মণ্ড সরকারী তত্ত্বাবধানে অতি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হবে, যেমন আরও কোনো কোনো সংস্থা হচ্ছে।

সবচেয়ে মজার কথা হল, এই বিলটির সাধু উদ্দেশ্য বোঝাতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন এর দ্বারা সংস্কৃতির উন্নতি করা যাবে, অর্থাৎ যে বঙ্গ সংস্কৃতি এখন ক্ষয়িষ্ণু ও মূর্খতার অধঃপতন রোধ করা যাবে। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে এই জেহাদ অবশ্য বামফ্রন্ট সরকারের নৈতিক কর্তব্য বলেই বিবেচিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির কতটা অধঃপতন ঘটেছে তার আলোচনা এখানে অবান্তর। প্রশ্ন হল, সরকারী পরিচালনা কি কোনো অধঃপতনই রোধ করতে পারে? তা যদি পারত, তা হলে না হয় বলা যেত, ব্যবস্থারটি উত্তম। দপ্তরের বিষয়, সরকারী পরিচালনায় কী ঘটে তা সাধারণের অবদিত নয়।

বিরোধীদের কেউ কেউ এই বিলটি আনার পিছনে সরকারী উদ্দেশ্য অনুমান করেছেন। এদের আশঙ্কা, বামফ্রন্ট সরকার এইভাবে একে একে অনেক কিছুই নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে নেবেন, তার মধ্যে লাইব্রেরীও থাকবে, থাকবে গ্রাম বাংলার অন্যান্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এই আশঙ্কা একেবারে অসংলগ্ন এমন আশ্বাসবাণী যদিও তথ্যমন্ত্রী দিয়েছেন, তবু বিরোধীরা আশ্বস্ত হননি। বলা বাহুল্য, হবার কথাও নয়। কেননা দেখা গিয়েছে, সে শিক্ষার ক্ষেত্রেই হোক অথবা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও পরিচালনা সরকারী পরিচালনার অপেক্ষা সবসময় নিকৃষ্ট হয় না; বরং সরকারী পরিচালনায় দক্ষতাহীন। বেশী করেই চোখে পড়ে। তা ছাড়া ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চেষ্টায় মানুষ কিছু গড়ে তুলুক, তার পরিচালনা করুক—এটাও তো সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং আত্মবিকাশের পরিচয় হতে পারে, সমস্ত বিষয়ে সরকারের নাক গলাবার প্রয়োজন কি? যেখানে গাফিলতি চোখে পড়বে, কিংবা মনে হবে পরিচালনায় টুটি ঘটেছে সরকার সেখানে নজর দিতে পারেন। সব কিছু টুটিপূর্ণ, সবাই অযোগ্য—একমাত্র সরকারই যোগ্য এবং ন্যায়পরায়ণ এমন মনে করার কী কারণ থাকতে পারে? একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, সরকারী অর্থানুকূল্যে পাঠাগারের জন্যে বই কেনার যে ব্যবস্থা রয়েছে, সরকার সেখানে একটি লিখিত পুস্তক-তালিকা দিয়ে দেন, অর্থাৎ ওই বইগুলি কেনার জন্যে সুপারিশ করেন। সেই তালিকায় যে সমস্ত বই স্থান পায় তার সবই কি উৎকৃষ্ট? নাকি সরকার প্রকারণতর তাঁদের মনোনীতদের বাজারে কাটিয়ে দিতে চান? সরকারই যে সর্ববোধ্য এমন অভিমান না থাকাই ভাল।

বামফ্রন্ট সরকারের অনেক প্রচেষ্টাই প্রশংসার যোগ্য। যেমন, বাংলা সিনেমার উন্নতির জন্যে অর্থ সাহায্য। বাঙালী লেখকদের গ্রন্থ প্রকাশের জন্যেও সরকার অর্থ সাহায্য করার কথা ভাবছেন। কোনো সন্দেহ নেই, এই উদ্দেশ্যগুলি প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু এ-কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে, সরকার যেখানেই অর্থ সাহায্য করবেন সেখানে তাঁদের পক্ষ থেকে পাশ্চাত্য কিছু প্রত্যাশা থাকতে পারে। এই প্রত্যাশা কী? সম্ভবত তা অনুমান করা চলে। যে-বিলটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করতে চলেছেন তার মধ্যেও প্রচ্ছন্ন সরকারী উদ্দেশ্য না থাকলেই ভাল, তবে আশঙ্কা একেবারেই অকারণ এমন মনে করার কারণ নেই।



# মেনাবেন, তান মেনাবেন

নিকসনের চীনসফর সূচী পাকা করবার জন্য কিসিজার যখন হঠাৎ একদিন পিকিং-এ ভেসে উঠেছিলেন তখন সারা পৃথিবী তার আকস্মিকতায় বিস্মিত হয়েছিল। কিসিজার ভূব দিয়েছিলেন আমাদের পাশের ইসলামাবাদে সেই সুবাদে একাধিক পাকিস্তানী নায়ক দাবি করেছিলেন, এই অভিযুক্ত মিলনের কৃতিত্ব তার। অল্প খান এই দাবি করেছিলেন, করেছিলেন ইয়াহিয়া খান আর জুলফিকর আলি ভুট্টো। তারও বেশ কয়েক বছর আগে ভুট্টো প্রতিবেদককে বলেছিলেন, ভারত সরকার যদি চান তাহলে তিনি চীন-ভারত সীমান্তবিরোধে মধ্যস্থতা করতে পারেন। যেন আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তি এত সহজ—একজন মুন্সিফ, কলে-দেওয়ার লোক পাকড়াতে পারলেই হল। একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের পিছনে থাকে অনেক অনেক দিনের প্রচেষ্টা। অস্ট্রিয়ার নিরপেক্ষতা আজ সর্বজনস্বীকৃত, পূর্ব-পশ্চিম বন্ধুত্ব তাকে স্পর্শ করে না। অস্ট্রিয়া নিরপেক্ষ থাকবে, এই শর্তে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর চার মিশ্রাষ্ট্র অমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েট ইউনিয়ন অস্ট্রিয়া চাড়াতে অস্ট্রিয়াকে স্বাধীনতা দিতে রাজী হয়েছিল। দখল-করা কোন দেশ সোভিয়েট ইউনিয়নের ছেড়ে যাওয়ার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নেই। নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে অস্ট্রিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়ার এই প্রস্তাব সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে প্রথম করেছিলেন জওহরলাল নেহরু। সে-প্রস্তাব বৃট্টাভে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। একক চেম্টার বা একবারের চেম্টার কোন দু-রাই আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের নিজের যদিও বা থাকে তাহলে তা অতি বিরল।



মাও-সে-তুং

এমন আর কয়টি অজানা নেই, নিকসনের চীন সফরে যে-সমঝোতার প্রকাশ সূচনা তার পিছনে ছিল দীর্ঘ, অনলস প্রচেষ্টা। কিসিজারের সফর যা নিয়ে এত হইচই হয়েছিল, সে তো ওসত্যের শেষ রাঙের মার মার। ১৯৫৩ সালে কেরিয়া যুদ্ধ-বিরতির পর থেকে চীন-মার্কিন গোপন আলোচনার সূতপাত, বিভিন্ন স্তরে এই আলোচনা চলে প্রায় দশ বছর, আলোচনার ক্ষেত্র বদলেছে আলোচনাকারীরাও বদলেছেন, কিন্তু আলোচনা কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। একমাত্র আয়মাসাডের স্তরেই বৈঠক হয়েছিল ১৩০টি একথা বললে ভুল হবে না ওই সময়ের আও বৈঠক, অত আলোচনা আমেরিকা কোন অর্কামিউনিষ্ট দেশের অর্থাৎ তার মিত্র দেশের সঙ্গেও করেন। এসবই হয়েছিল গোপন। এই আলোচনার আংশিক বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু অনেক কিছু এখনও অজানা, ক্রিস-ফায়ড ইনফরমেশন। নিকসন সফরের আকস্মিকতার মূলে এই গোপনীয়তা। ক্রমশ, বিহীন সোভিয়েট পন্থীরা অবশ্য বলেছিলেন, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, মাও সে-তুং তো ইয়োনানের যুগ থেকে আমেরিকার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে এসেছেন। এ বিষয়ে তার প্রধান সহযোগী এডগার সেনা।

কিসিজারের চীন সফরের আগে চীন-মার্কিন মিত্রতা সম্পর্কিত সব জল্পনা যেমন অব্যাহত মনে হত সোভিয়েট-চীন মিত্রতার সম্ভাবনাকেও আও ততখানি অবাস্তব মনে হতে পারে। সরকারীভাবে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ অর্থাৎ সোভিয়েট ইউনিয়ন এখনও চীনের এক মন্দর শত্রু। চীন-মার্কিন বনিষ্ঠতা এখনও চীনের রণকৌশল। চীন এখনও এই মাও তুং বিবাস করে যে, বর্তমান কালের সবচেয়ে বড় বিবাহ সাম্রাজ্যবাদ ও মার্কসমী দেশ-গুলির মধ্যে। এই বিবাহে চীনের সমর্থন স্বভা-বতই মার্কসমী, সোভিয়েট দেশগুলির পক্ষে, নীতি-গতভাবে চীন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। কিন্তু সাম্রাজ্য-কদের অসন্তোষ আছে। এবং এই অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে এক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আর এক সাম্রাজ্যবাদের কাঁচ, কমা পরিচয় কমিউ-

নিস্ট রণকৌশল। সোভিয়েট ইউনিয়নে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সূচনা ক্রমশের কালে, পঞ্চদশের দশকের শেষার্ধ্বে। সোভিয়েট কমিউনিজমের প্রথম ডেকাল দেন ক্রমশ, তিনিই প্রবর্তন করেন সেই কমিউনিজমের যার নাম দিয়েছিলেন মাও সেতুং 'গুলাশ কমিউনিজম'। অথচ পঞ্চদশের দশকে ও ষাটের দশকের প্রথম কয়েক বছরে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চীনের মিত্রতা বজায় ছিল। তারপর এল মহান সর্বহারা সাম্প্রতিক বিপ্লবের কাল। সে-কালে চীন হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সমান বিরোধী। সাম্প্রতিক বিপ্লবের অবসান ও ১৯৭২ সালে নিকসনের চীন সফরের পর চীনা কৌশলের আর একবার পরিবর্তন হল। সত্তরের দশকে সোভিয়েট ইউনিয়ন ঘোষিত হল চীনের ও তৃতীয় বিশ্বের প্রধান শত্রু হিসাবে; আশির দশকে যে আবার কৌশলের পরিবর্তন হবে না সে কথা জোর করে কে বলবে?

অবশ্য, শত্রু এ বিষয়ে নয় সব বিষয়েই অনেকখানি নির্ভর করে, চীনে কমতা কোন গোষ্ঠীর করায়ত্ত হতে তার উপর। চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে কমতা দখলের গোষ্ঠী লড়াই এখনও চলছে, আরও কিছুদিন চলবে। এই লড়াই মাও-এর মৃত্যুর পর শত্রু হয়েছে মনে করলে ভুল হবে। মাও যখন সত্তরে পদাধিষ্ঠ করলেন, অর্থাৎ ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকেই এই লড়াইয়ের সূতপাত। সাম্প্রতিক বিপ্লবও এই লড়াইয়ের অঙ্গ। যদিও লিউ শাও-চিং ব্রুজোয়া সদর দপ্তরের বিরুদ্ধে কামান দাগার আহতান জানিয়ে মাও স্বয়ং বড় হরকের পোস্তার লিখেছিলেন, তবু সেই ১৯৬৬ সালেই পন্থী চিনাং-চিং-কে তিনি জানিয়েছিলেন, বাধ্যবাধিত তার পছন্দ হচ্ছে না, লিন শিয়াও ত্তর নাম নিচ্ছেন, অথচ লিন শিয়াও-এর সঙ্গে তার মতপার্থক্য রয়েছে। তিনি বলেছিলেন, দেশে ও মলে দক্ষিপপন্থীদের বোল আনা কমতাচ্যুত করা সম্ভব হবে না, কাজেই তার উদ্দেশ্য তাইয়ের আংশিক কমতাচ্যুত করা। সেজন্য তিনি এমন কিছু বলতে চান না যাতে বামপন্থীদের ক্রটি হয় ও দক্ষিপ-পন্থীদের সুবিধা হয়। তার মৃত্যুর পর দক্ষিপ-পন্থীদের কমতা দখলের সম্ভাবনাকে মাও উড়িয়ে দেননি। তিনি মনে করতেন, দক্ষিপপন্থীরা তার নাম নিয়ে কিছুদিন কমতাসীন থাকতে সক্ষম

হবেন। কিন্তু বামপন্থীরা তার অন্য উদ্ঘতি ও নির্দেশ অনুসারে নিজেদের সংগঠিত করবেন ও দক্ষিপপন্থীদের কমতাচ্যুত করতে পারবেন।

এট চিঠি লেখার সময় মাও নিচের বৃক্কে প্যারেনি, ঠিক দশ বছর পরে তার মৃত্যুর করক-মালের মধ্যে এই চিনাং-চিং-এর কী হাল হবে, তিনি এবং তার তিন সঙ্গী, বীরা নিজেদের প্রকৃত মাওবাদী বলে দাবি করতেন, রাষ্ট্রবিরোধিতার জন্য গ্রেফতার হবেন। এখন শোনা যাচ্ছে, তাঁদের বিনা বিচারে আটক থাকার কল শেষ হতে চলছে। পার্টি থেকে নিশ্চাস্ত নেওয়ার হয়েছে, শীঘ্রই আদালতে তাঁদের বিচার হবে, এবং এও শিখর হয়ে গেছে যে চিনাং-চিং-এর শাস্তি হবে মার্কসমী কমতাচ্যুত। মাও বৃক্কে প্যারেনি, যে-সাহেব-স্মৃতির সহযোগিতার তিনি সাম্প্রতিক বিপ্লব শত্রু করেছিলেন সেই গোষ্ঠীর চার নেতা অভিযুক্ত চার মস্তান হিসাবে চিহ্নিত হবেন এবং যে-ভেৎ শিয়াও-পিয়ংকে তিনি দুবার কমতাচ্যুত করে-ছিলেন সেই ভেৎ রাজনীতির কেন্দ্রে তৃতীয়বার আবির্ভাবের পর পন্থীদের ঘোষণা করবেন, 'শামি-বামরা যদি তোমাকে ধনতপন্থী বলে তাহলে ধরে নেবে তুমি ভালো কাজ করছ।' মাও-এর মৃত্যুর পর দক্ষিপপন্থী, মধ্যপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে অনেক গোষ্ঠী বদল হয়েছে, কিন্তু কমতাবাদীদের জন্য গোষ্ঠীলড়াইয়ের অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে তার ভবিষ্যৎসীমা বার্ষ হয়নি।

তার জীবনের শেষ দুই দশকে মাও এই বিষয়ে এতই চিন্তিত ছিলেন যে স্বভাবই তাঁর নেতৃত্বের উত্তরাধিকারী হিসাবে গণ্য হতে পারেন এমন কাউকে তিনি বরদাস্ত করতে পারেননি। একথা জনস্বীকৃত যে চীনা বিপ্লবের নেতৃত্ব তার নিজস্ব, এবং এই নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা ও তাকে রক্ষা করবার জন্য তাঁকে অজ্ঞানি সংগ্রাম করতে হয়েছিল। শূন্যে, শূন্যে চীনে স্তালিন ভাঙির প্রাবল্য তেমন নেই, এবং মাও যে ব্রুজোছিলেন, স্তালিনের সত্তর শতাব্দী জাল, ভাঙির শতাংশ ধারণা তার উদ্দেশ্য প্রমিত লি প্রচারমূলক। মাও-এর উদ্যোগিত স্তালিন প্রাণির মূলে ছিল স্তালিনোভের সোভিয়েট নেতৃত্বের প্রতি বিবেচনা। মস্কোর নির্দেশ মেনে নেওয়ার সপক্ষে যারা ছিলেন তারা যদি নেতৃত্বের স্বত্ব মাওকে পরাস্ত করতে পারতেন তাহলে চীনের বিপ্লব সংঘটিত হতে পারত কিনা সন্দেহ। মাও যে একবারে কোনদিন পরাস্ত হননি তা নয়। তিনি নেতৃত্ব থেকে অপসারিত হয়েছেন, কিন্তু সামরিক-ভাবে। বিপ্লবের শেষ পর্যায়ে তার নেতৃত্ব ছিল একক ও অবিসংবাদিত। এক সে কারণে পুরো-পূরি মস্কোর নির্দেশের পরিপন্থী। এমন কি, বিপ্লবের চরম মুহূর্তে যখন গণমাতী ফৌজের বিজয় অভিযান অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলছে তখনও স্তালিনের পরামর্শ ছিল কুরামিনটাং-এর সঙ্গে, চিনাং কাই-সেকের সঙ্গে সমঝোতার। স্তালিন যদিও স্বীকার করতেন, চীনা বিপ্লবের গতিভ্রষ্টতা বাইরের কারণ পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় তাহলেও তিনি ক্রমশে প্যারেনি, চীনের বিপ্লব, মাও সে-তুংয়ের বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তার নির্দেশ অমুদা করার মধ্য পিঠে। তাই সেই বিপ্লবের বিজয়ী বীর যখন অগ্রজ বিপ্লবীর সঙ্গে দেখা করতে মস্কো পৌলন-চীনের বাইরে মাও সে-তুংয়ের সেই প্রথম পদাধিষ্ঠ-তখন স্তালিন তাঁকে দশদিন বসিয়ে রেখেছিলেন।

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টিতে দুই লাইনের লড়াই প্রকৃতপক্ষে মাওপন্থা ও সোভিয়েটপন্থীর লড়াই। চীনা পার্টির একাধক কংগ্রেসে হুয়া কুংজো ফেৎ রাজনীতিক রিপোর্ট পেশ করেন তাতে কী হয়েছিল যে পাং অব ফো-শেং (জাং-ইয়াং) ব্রুজো চীনা কমিউনিষ্ট পার্টিতে দুই লাইনের একাধকতম বৃহৎ লড়াই। উদ্যোগিত চার-ইয়ার

জীবদ্দশায় এই লড়াই সংঘটিত হইয়াছিল দশবার, এবং দ্বার প্রান্তবায়ই পরাজিত গোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত চিরিত হইয়াছিল মনোপক্ষীয় হিসাবে। এই মনোপক্ষীয়দের মধ্যে কেবল মাও-এর প্রতিদ্বন্দ্বী-রাই ছিলেন না তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামী। লং মারতে তাঁর সহযোগীও ছিলেন। লিউ শাও-চি ও লিন পিয়াও-এর বিপক্ষীয়তা সকলেরই জানা। কিন্তু চু এন লাই ও চু তে-ওর মধ্যে প্রথম সারির নেতা হইয়া জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মাও-এর একনিষ্ঠ সহকর্মী বলে পরিচিত ছিলেন তাঁরাও সমরবিধানে মাওপন্থার বিরোধিতা করেছেন। সোভিয়েট লাইনকে সমর্থন জানিয়েছেন।

কান্নেই মাও-এর পক্ষে তাঁর অবতরনে দেশ, দল ও বিপ্লবের কী অবস্থা হবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা স্বাভাবিক ছিল। তিনি জানতেন, তাঁর জতো অন্য কোন নেতার মাপসই হবে না। জেনেপনেনে তিনি দুজন তাঁর তুলনায় ছোটখাটের নেতাকে দ্বার তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেছিলেন। কিন্তু তিনি দুজনের উপরই ক্রমে ক্রমে হন এবং দুজনেই কেবল পদচ্যুত হন না, চরম অসম্মানের মধ্যে তাঁদের মৃত্যুও ঘটে। লিউ-শাও-চি যখন চীনের প্রেসি-ডেন্ট মনোনীত হইলেন এবং কমিউনিস্ট পার্টিতে তাঁর স্থান মাও-এর পরেই নির্দিষ্ট হল তখন সকলেই ধরে নিয়েছিলেন মাও-এর পরে দেশ ও দলের নেতৃত্ব তাঁর উপরেই বর্তাবে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবে এত তেজস্বী শেখ পর্যন্ত এই লিউকে হঠানোর জন্য। লিউ শাও-চি হঠাৎ হঠাৎ দল থেকে বিতাড়িত হলেন, তাঁর মৃত্যু ঘটল বন্দীশায়া। দলের দুই নম্বর হিসাবে লিউ-এর স্থান স্থানটি নিয়োজিতেন লিন পিয়াও। ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসে যে লিন পিয়াও মাও-এর উত্তরাধিকারী হিসাবে সরকারী স্বীকৃতি পান এবং মাওবাদে তাঁর নিষেধাজ্ঞা

১৯৭১ সালে মাওকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন এবং সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার সোভিয়েট ইউনিয়নে পালাদোর সময় এক বিমান দুর্ঘটনার মারা যান। লিন পিয়াও-এর মৃত্যুর পর মাও আরও পাঁচ বছর বেঁচে ছিলেন, কিন্তু আর কাউকে তিনি উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন বলে জানা যায়নি।

অবশ্য চু এন-লাইয়ের মৃত্যুর পর হুয়া কুয়ো ফেংকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করার তাঁর সম্মতি ছিল। ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হুয়ায় নাম যখন অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ঘোষিত হয় তখন কেউ ভাবতে পারেননি যে, তিনদিনের মধ্যে তিনি কেবল পাকপাকি প্রধানমন্ত্রীর পদ নর মাও-এর শূন্য পদটিও অধিকার করবেন। সরকারীভাবে এত কমতা ইতিপূর্বে কোন নেতার করায়ত্ত হয়নি। হুয়া কুয়ো-ফেং এই তিনটি চীনা অক্ষরের ইংরেজী অর্থ 'স্পায়ার হেড অব দি রিভলিউনারী ক্রিডম'। চীন রিভলিউশন ক্রিডম হলেও হতে পারে কিন্তু হুয়া তাঁর বর্ণাফলক হবেন এমন কোন লক্ষণ তাঁর জীবনের প্রথম পঞ্চাশ বছরে দেখা যায়নি। বস্তুত, হুয়ায় সব চেয়ে বড় ঘোষ্যতা ছিল, তিনি অসাধারণ নন, তিনি অতি সাধারণ তিনি বিতর্কিত দক্ষিণ বা বামপন্থী নন, তিনি মধ্যপন্থী, তিনি বিপ্লবের নেতা ও প্রবীণ রাজনীতিক নন, আবার তেং সিয়াও-পিং যে সব নেতাদের হঠাৎ উত্থানের প্রতি কটাক্ষ করে 'হেলিকপটার' নেতা বলে কানা করেন তাদের মতো নবীনও নন। তিনি মধ্যবর্গী, মধ্যপন্থী ১৯৭০ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির দলম কংগ্রেসে তিনি পলিটবুরোর সদস্য মনোনীত হন এবং ১৯৭৫ সালে হন জন-নিরাপত্তা, আমাদের পরিচিত ভাষায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কাং শেং-এর মৃত্যুর পর নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা বিভাগের উপর হুয়ায় কতটুকু পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্যাং অব ফোর-কে গ্রেপ্তার করে পিকিং শহরের সেরা

এই বাহিনী কাং শেং-এর নিজস্ব কতখানি ছিল, এবং ধরে নেওয়া যেতে পারে কাং-এর ম না হলে হুয়ায় পক্ষে এই ইউনিটের সাহায্যে অব ফোর-কে ধরা সম্ভব হত না।

হুয়া অবশ্য বরাবরের মাও ভক্ত। খানিকটা সেন্সা ও খানিকটা তাঁর নিবিত্ত রাজনীতির জন্য সম্ভবত মাও তাঁর অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন কিন্তু হুয়ায় পরবর্তী পদোন্নতি সবই মাও-লেখ্য তথাকথিত একটি চিরকুটের জোরে। মৃত্যু পাঁচ মাস আগে, তেং সিয়াও-পিংয়ের শ্বশুরীয় পুত্রের অধাবাহিত পরে মাও নিজের হাতে হুয়া একটি সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। চীনা ভাষায় 'হুয়া অক্ষরের (কারেকটার) ইংরেজী উচ্চা-উচ্চাই, ইন চারজ, আই হ্যাভ নাথিং টু ওয়ারি। 'হুয়া যখন কত-বে তখন আমার ভাবনার কিছু নেই হস্তাক্ষর যে মাও-এর তাতে কোন সমস্যা নে এবং এই হোয়াংলি ভরা সার্টিফিকেটটি যে তিনি হুয়াকে দিয়েছিলেন সে বিষয়েও চীনা বিশেষজ্ঞ সন্দেহ প্রকাশের কোন কারণ দেখেন না। সংলগ্ন কিছু তা ওই সার্টিফিকেটের প্রকৃত অর্থ ও প্রয়োগ করে নিয়ে। মাও কী বলতে চেয়েছিলেন? তিনি বলতে চেয়েছিলেন সারা চীন দেশের কতটুকু হুয়া হাতে থাকলে তিনি নিশ্চিত? অথবা কে একটি বিশেষ প্রকল্পের ভার হুয়ায় হাতে না হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। -আমেরিকার একজন চী বিশেষজ্ঞ রহস্য করে বলেছেন পিরানডেলোর বিখ্যাত নাটক 'সিক্স কারেকটারস ইন সার্চ অব আ অর্থ' এর অনুকরণে চীনের এই বিতর্কিত ন বেওয়া যায়—সিক্স কারেকটারস ইন সার্চ অব মীনগ।

## আপনার চুল কি পাতলা, বেতিয়ে পড়া ? আপনার চুলকে ঘন ও দোলদোলাতো করে তুলুন...



## প্রাচীন-সমৃদ্ধ হেলো এগ শ্যাম্পুর সাহায্যে

পুষ্টির অভাবে আপনার চুল পাতলা হয়ে যায়-বেতিয়ে পড়ে-  
দোলদোলাতো অবটি আর  
থাকে না।

পাচু স্পোরী রাঙের হোলা এগ  
শ্যাম্পুর প্রাচীন-সমৃদ্ধ পুষ্টির  
ফরমুলা আপনার চুল পুষ্টি

জোগায়, আপনার চুল আয়ত্ব  
আনে। ফলে চুল দেখায় ঘন ও  
দোলদোলাতো। হোলা এগ  
শ্যাম্পুর ঘন ফেনা আপনার  
চুলের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে মিশে  
গিয়ে আপনার চুলকে সজীব  
ও তুলমালে করে তোলে।

ঘন ও দোলদোলাতো চুলের জন্যে  
আজই হেলো এগ শ্যাম্পু কিনুন



মাও-এর শৃঙ্খলার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। এই সার্টিফিকেটটিই আর ফেরেনি, চিয়াং চিং ও তার ভিন্ন সঙ্গীর প্রতি মাও-এর বিশ্বাস সম্পর্কে অনেক তথ্যও প্রকাশ করেছেন। 'গ্যাং অব ফোর' এই জাফাটিও নাকি মাও-এরই সার্টিফিকেট। তিনি 'হো-লি-কপটার' নেতা ওয়াং হুং-ওয়েনকে বলেছিলেন—স্টপ কার্যসিঁই অন উইথ ইওর গ্যাং অব ফোর, চিয়াং চিংকে বলেছিলেন, জোনট ইউ টার্ন ইনটু এ স্মল ক্লাকসন অব ফোর। ১৯৭৫ সালে পলিটব্যুরোর একটি সভায় চার ইয়ারকে তিনটি কাজ করতে ও তিনটি কাজ না করতে উপদেশ দিয়েছিলেন, সেনাবাহিনীই হচ্ছে মাও-এর বিশ্বাস—শিঁ ডুক ও য়ি ডেনিস'। মাও বলেছিলেন, মারকসিজম-লেনিনিজম মেনে চলে। সংশোধনবাদ মেনে না। একাবশ্য হ'ও। বিপ্লব সার্টিফিকেট কায়ো না। খোলাখুলি চল, স্বয়ংক্রিয় ও মল্যদর্শন করো না। এই প্রসঙ্গেই নাকি মাও চিয়াং চিং ও তার ভিন্ন সঙ্গীদের বলেছিলেন, ডোনট ফাংশন আজ ও গ্যাং অব ফোর। স্টপ ভুইং দ্যাট এনি মোর।'

মাও-এর মৃত্যুর কয়-বোশ একমাস পরে পলিটব্যুরোর একটি সভায় হয়। এই সব তথ্য শেখ করেন। চিয়াং চিং শেখ করলেন বিপরীত তথ্য। দাবি করলেন তারাই মাও-এর মনোনীত উত্তরাধিকারী। কার সার্টিফিকেট খাটি, কার সার্টিফিকেট মোকী তাই নিয়ে পলিটব্যুরো বিশ্ববিভক্ত হল। শেষ পর্যন্ত হয়। জিজ্ঞাসেন পলিটব্যুরোতে সেনাবাহিনীর প্রতিনিধির সমর্থনে। সেইদিন রাত্রেই চার ইয়ার প্রস্তাব হলেন, পিকিং শহরেই তাদের আটক রাখা হল। মাও-এর আশীর্বাদমন্ত্র হয়। মাও-এর নির্দেশ ইউনাইটেড ডোনট স্টপট আওড়াতে আওড়াতে পারাটিক দু'ভাগ করে ফেললেন। মধ্যাপন্থী হিসাবে তিনি সকলকে একসঙ্গে রাখতে পারলেন না, বা রাখলেন না। এমন কি মাও-এর সহযোগী হিসাবে পরিচিত বামপন্থীদের সংগেও তিনি থাকলেন না। তিনি বেছে নিলেন মাও-এর সঙ্গে যাদের চিরকালের বিবাদ ও মতভেদ তাদের। কেন হয়। এত সহজে, এত তাড়াতাড়ি দক্ষিণে হেললেন বলা শব্দ। হয়ত সেইদিনে পলিটব্যুরো আলোচনায় তিনি বসতে পেরেছিলেন, বামপন্থীদের ছত্রভঙ্গ না করলে মাও-এর সার্টিফিকেট সত্ত্বেও তিনি বেশদিন ক্ষমতার থাকতে পারতেন না। এখন স্পষ্ট যে মাও হুয়াচ্যাংর ঠিক বোঝেন নি, তাঁর বলা উচিত ছিল, উইথ ইয়, ইন চারজ, আই আমি ওয়ারিড।

সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিরা কেন হুয়াং সংগে স্বার্থে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে গেলেন তা বোঝা শক্ত নয়। বিপ্লবের আগে যাই হোক, বিপ্লবের পরে আর চীনের সেনাবাহিনী কমিউনিস্ট পার্টির সার্বভৌমত্ব, পার্টি কনস্ট্রাকশন ইলি গান' মাও-এর এই তত্ত্ব মানে। রাজী হ'চ্ছিল না। মাও কেবল বিপ্লবের ভাবীক ছিলেন না, তিনি সামরিক তত্ত্ব-বিশারদও ছিলেন। এ বিষয়ে তার গুরু, ছিলেন সানজু, আজ থেকে প্রায় দু'হাজার তিনশ বছর আগে লেখা বই বই 'দি আর্ট অব ওয়ার' এখনও সমরশাস্ত্রের উপর প্রমাণ বই বলে স্বীকৃত। গেরিলা রণনীতি ও কৌশল সম্পর্কে মূল কথাগুলি সানজু লিখে গিয়েছিলেন। মাও যেন সেগুলি গ্রহণ করে-ছিলেন, ভেতনি গ্রহণ করেছিলেন সানজুর আর একটি তত্ত্ব, যুদ্ধে ভেতবার জন্য সব চেয়ে প্রয়োজনীয় নীতি ও আদর্শ—একান্তনতা। পশ্চিমী রণনীতি বোঝেন বলে, সেনাবাহিনী পেটে ভর দিয়ে হাট, মাও সেখানে মনে করতেন সেনাবাহিনী হাটে আগুনে ভর করে। মাও-এর সামরিক তত্ত্ব রাজনীতি ও সশস্ত্র সংগ্রাম অপাঙ্গাভাবে জড়িত। গেরিলা যুদ্ধের সফলতা নির্ভর করে ব্যাপক জনসাধারণের সমর্থনের উপর, তাই মাও-এর সেনাবাহিনীর উপর নির্দেশ ছিল জনতার সংগে পূর্ণ মিশ্রতার সম্পর্ক স্থাপনের। মাও-এর তিনটি নিয়ম ও আটটি মন্তব্যের উপেক্ষা ছিল সেনাবাহিনী ও জনসাধারণের এই একাধ

জলে থাকে গেরিলা তেমন থাকবে জনগণের মধ্যে। এই সধারণ লোক হতে সেনাবাহিনীর প্রতি বিরূপ না হ'ল তার জন্য এমন সব খুঁটিয়াই নির্দেশ দিয়েছিলেন বা মাও-এর মতো নেতার পক্ষেই সম্ভব। যেমন যুদ্ধ থেকে উঠে নিজে বিছানা গুটিয়ে রাখবে, মেয়েদের সামনে স্নান করবে না, গিঁথা পরেয়ানা না থাকলে কারও দেহতলসানি করবে না। এ সব নির্দেশের মূল্য কী তা চীন বিপ্লবের সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায়।

সেনাবাহিনীর উপর পার্টির কতখানি সেনা-নায়কদের উপর পলিটব্যুরো কর্মসূচির কতখানি সামরিক বাহিনীর অনেক নেতাই মেনে নিতে পারেননি। এই অসন্তোষ আরও বাড়ল যখন বিপ্লবের পর মাও বললেন, গমমুখি ফোর্স শৃঙ্খলাভীর প্রতিভার নিযুক্ত থাকবে না, উপপাদন বাড়ানোতেও সাহায্য করবে। কোন দেশের সামরিক বাহিনীই অসামরিক দায়িত্ব পালনে ইচ্ছুক নয়, চীনেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। কোরিয়া যুদ্ধের পর চীনা সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণের তার যখন সোভিয়েট বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শদাতাদের ওপর ন্যাত হ'ল তখন তারা মুহূর্তকোষের আদি চারিত্র সংগঠনে প্রবৃত্ত হলেন, তারা অফিসার ও সাধারণ সৈন্যের বেতনের বৈষম্য অনেক বাড়িয়ে দিলেন, পোশাকে পার্থক্য আনলেন, উপপাদনের কাজে সেনাবাহিনীকে লগানোর বিরোধিতা করলেন। সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের এই সব প্রত্যাবে চীনের তখনকার প্রতিরক্ষামন্ত্রী পেং তে-হুয়াংয়ের পূর্ণ সমর্থন ছিল। মুহূর্তকোষের এই চারিত্র পরিবর্তন মাও-এর পছন্দ হয়নি। তার ইয়ারের অন্যতম চ্যাং চুন-চিয়াও এই সময় পিপলস ডেভেলপেট একটি প্রবন্ধে বলেন, সেনাবাহিনীতে বেতন প্রথা বৃদ্ধোয়া প্রত্যাখ্যানের পরিচায়ক আর বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সব কিছু সরবরাহের যে ব্যবস্থা আগে চালু ছিল তা বৈশ্ববিক। সেনানায়করা বিনা কারণে চার ইয়ারের' উৎখাতে হয়। কুরো-ফেংকে সাহায্য করেন নি। যোক্ষম আঘাত অবশ্য মাও হেনেছিলেন। সেনাবাহিনীর নতুন প্রবণতা, সৈন্যনাযকদের ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী পেং-এর বিরোধিতা উপেক্ষা করে তিনি বললেন, 'গ্রেট লীপ ফরওয়ার্ড' আন্দোলনকে সফল করার জন্য সেনাবাহিনীকে উপপাদনের কাজে লাগতে হবে। তারপর নির্দেশ এল, অফিসারদের কায়িক পরিশ্রম করতে হবে। ১৯৫৯ সালের এক হিসাবে দেখা যায়, একশ ঘর জনেরেল সহ দেড় লক্ষ অফিসারকে সাধারণ সৈন্যের কাজ করতে হয়েছিল, তারা ভাড় দিয়েছেন, রাখা করেছেন, ময়লা পরিষ্কার করেছেন। পেং-তে-হুয়াং তাঁর বিরোধিতা গোপন রাখেননি, তিনি গ্রেট লীপ ফরওয়ার্ড আন্দোলন, কমিউন বাকশ্য ও সেনা-বাহিনীর আধুনিকীকরণে হস্তক্ষেপের সমান নিন্দা করেন। ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বার্ষিক অধিবেশনে মাও তাঁর সমালোচনা করলেন পেং ও তার চীফ অব স্টাফ হুয়াং চো-চংকে। পেং পদচ্যুত হলেন, নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী হলেন লিন পিয়াও, নতুন চীফ অব স্টাফ লো জুই-চিং। সেনাবাহিনীর উপর পার্টির কতখানি আবার প্রতিষ্ঠিত হল। অল্পদিনের মধ্যেই লিন পিয়াও ঘোষণা করলেন, সেনাবাহিনীতে আধুনিকীকরণের প্রবক্তারা তাদের ভুল বুদ্ধিতে পেরেছেন, তারা স্বীকার করেছেন, সেনাবাহিনীতে মানবিক উপপাদনের স্থান সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সমরোপকরণ ও যুদ্ধশাস্ত্রের স্থান তার পরে। তিনি কালেন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সেনাবাহিনীর পক্ষে ভীষণ প্রয়োজনীয়। মানসিক আটম বোমা (সিপিএচএল আটম বম্ব) অর্থাৎ আদর্শগত সচেতনতা ও সাহস বাস্তব আটম বোমার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ও প্রয়োজনীয়। তিনি ঘোষণা করলেন, অস্ত্র ও মানবের মধ্যে মানবের স্থান, অন্য কাজ ও রাজনৈতিক কাজের মধ্যে রাজনৈতিক কাজের রাজনৈতিক কাজের

দিকের ও কেতাবী চিন্তা ও গতিশীল চিন্তার মধ্যে গতিশীল চিন্তার স্থান, প্রথমে, লিন পিয়াও-এর এই অনুশাসন চারটি প্রথম' নামে খ্যাত। 'দি হিউমান ফ্যাকটর ফারসট', 'পলিটিক্যাল ওয়ারক ফারসট', আইডিওলজিক্যাল ওয়ারক ফারসট, আনড ডাইনামিক থট ফারসট।

মাও-এর প্রতি লিন পিয়াও-এর আনগত্য অনেক দিনের। যদিও তিনি চীন-সোভিয়েট মৈত্রী সংঘের সমাপতি ছিলেন, এবং বিপ্লবের পরও এক-নাগাড়ে প্রায় চার বছর স্বাস্থ্যসাধারের জন্য মস্কোতে ছিলেন তবু, মাওবাদের তার বিশ্বাস অটল ছিল ধরে নেওয়া যেতে পারে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবে তিনিই সেনাবাহিনীকে সামিল করেছিলেন, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তিনিই ছিলেন এক নম্বর নেতা। এই নিবন্ধের শুরুরেই উল্লেখ করা হয়েছে, মাওবাদের লিন পিয়াও-এর আস্থা সম্পর্কে বয়স। মাও-এর সম্মেদ ছিল। তা সত্ত্বেও নবম কংগ্রেসে লিন মাও-এর উত্তরাধিকারী ঘোষিত হ'ল। লিন-এর বিরোধে ও মৃত্যুর কারণ এখনও রহস্যাবৃত। তবে এ বিষয়ে সকলেই একমত, সোভিয়েট ইউনিয়ন পালানোর সময় তিনি বিমান দুর্ঘটনার মারা যান। কাজেই এ অনুমান স্বাভাবিক, তিনিও সেনাবাহিনীর উপর পার্টির তদারকিতে বিব্রত হয়ে সোভিয়েট পন্থার আধুনিকীকরণের দিকে ঝুঁকছিলেন। লিন পিয়াও-এর পতনের পর পার্টি কতখানি অমানি করবার মতো কোন সামরিক নেতা থাকলেন না। চিয়াং চিং ও তাঁর ভিন্ন সঙ্গী গোড়া মাওবাদী হিসাবে পার্টির সার্বভৌম ও সার্বিক কতখানি শিফাস করতেন। তাই হয়। যখন চার ইয়ারের সংগে ক্ষমতার লড়াই-এ প্রবৃত্ত হলেন তখন সামরিক নেতরা হুয়াংকে সমর্থন করলেন। এই সমর্থনের উদ্দেশ্য ছিল মাওবাদকে খর্ব করা যাতে সেনাবাহিনীর উপর পার্টির খবরদারি বন্ধ হয় ও সোভিয়েট পন্থাভিতে গণফৌজকে একটি আধুনিক বাহিনীতে পরিণত করা যায়।

১৯৭৭ সালে অবশ্য হুয়াং মাওবাদকে অস্বীকার করবার সাহস হয়নি। তিনি মাও-এর নাম নিয়ে খাটি মাওবাদীদের আঘাত করলেন, একাবশ্য কংগ্রেসে ঘোষণা করলেন লিউ শাও-চি ও লিন পিয়াও-এর মতোই চার ইয়ার চেয়েছিলেন ধনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ তাদের মাওভাদি আড়ালেও ছিল সোভিয়েটপ্রতিষ্ঠা। অবশ্য যখন ঘোষিত হয়েছিল যে মাও-এর রচনাবলীর নতুন সংস্করণ প্রকাশ করা হবে এবং এই সংস্করণের প্রধান সম্পাদক হবেন স্বয়ং হুয়াং কুরো-ফেং তখনই সম্মেদ করবার কারণ ঘটেছিল যে মাওবাদের সংশোধনের উদ্যোগ হচ্ছে, মাও-এর মৃত্যুর পর মাওবাদের মৃত্যু ঘটতে চলেছে।

মধ্যাপন্থী হিসাবে যখন তাঁর সেনাবাহিনীর আশ্রয়প্রাপ্ত সেনাবাহিনীর মধ্যাপন্থী অংশের সমর্থন মিলল। পার্টির বামবিরোধী দক্ষিণ ও মধ্যাপন্থীরাও তাঁর সঙ্গে রইলেন। বামপন্থী, গোড়া মাওবাদী সকলেই যে তাঁর বিরুদ্ধে গেলেন তাও নয়। পিকিং-এর মেয়র উইং বা মাও-এর দেহরক্ষী ওয়াং জুং-সিং হুয়াংকে সমর্থন করলেন। একাবশ্য কংগ্রেসে দু'জনেই পলিটব্যুরোর সদস্য মনোনীত হ'ল। ওয়াং জুং-সিং তার উপর হ'ল পার্টির চারজন জাইস-প্রেসিডেন্সের অন্যতম ও একই সঙ্গে পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল। পিকিং-এর যে নিরাপত্তাবাহিনী ১৩৪১ ইউনিটের সাহায্যে হুয়াং চিয়াং চিং ও তাঁর সঙ্গীদের গ্রেপ্তার করেছিলেন সেই ১৩৪১ ইউনিটের তারও হুয়াং ওয়াং জুং-সিংকে দিয়েছিলেন। এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির সেনায় পলিটব্যুরোর যে চারজন সদস্যের পার্টি ও সরকারি সব পদ থেকে 'পদত্যাগপত্র' গৃহীত হ'ল তাদের মধ্যে এই দু'জন আছেন। অন্য দু'জন হলেন চি তেং-কুয়েই ও চেন সি-লিয়েন। চি বামপন্থী বটেই পরিচিত, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় তিনি নেতৃত্ব অর্জন করেন, তবে চেন আগে পরি-



দীপঙ্কর সেনের

# যুরোপীয় সঙ্গীতের কাহিনী

মুদ্রা দশ টাকা।

সম্পর্কে কিছু অভিমত—

বইটি তোমার কথাসাহিত্যের মতনই মন  
টানেন...অন্য কাজ ছেড়ে বইটি শেষ করেছি  
নৈলে অন্য কাজে মন দেওয়া শক্ত হত—  
—দিলীপকুমার রায়

এ ধরনের বাংলায় লেখা সার্থক প্রচেষ্টা  
চোখে পড়ে নি এর আগে—জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ  
...যাঁরা পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু জানতে  
চান তাঁদের জন্য বইটি ভালো।

—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

চিন্তাশীলতার স্বাভাবিক রচনারীতি সুরকার-  
দের জীবনরহস্য বুঝতে সাহায্য করবে।  
—নারায়ণ চৌধুরী

প্রছে বাস, হাওেল, হাইডেন, মোটসার্ট,  
বেটোভেন, স্ট্রাবট, মেনডেলসন, সুমান,  
শোপ্যা, ডাঙানার, ব্রামস এবং চাইকভস্কির  
জীবনকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া  
ওপেরার রূপান্তর এবং শিল্পীদের কথাও বলা  
হয়েছে— শান্তনু (সেখ)।

এ ধরনের বই বাংলাভাষায় সম্ভবত এই  
প্রথম —হুগান্ডর

এই গ্রন্থে ভাষা ব্যবহারে গ্রীসেন মুসৌসীয়ানার  
পরিচয় দিয়েছেন —চতুঃকোণ

বইটি থেকে অনেক কিছু জানতে পারবেন  
সঙ্গীত উৎসাহী ব্যক্তিরা —অজুত

এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ  
২ বক্সিম চ্যাণ্ডীজী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

চিত্র ছিলেন সন্ন্যাসী। চ. এন-লাইয়ের অনুবাদ।  
হলে।

সাময়িক বাহিনী ও কলের একাংশের সমর্থন  
সত্ত্বেও হুয়া নিশ্চিত হতে পারলেন না। নিজের  
নেতৃত্বের দ্বিত শক্ত করার জন্য তিনি চাইলেন  
পারটি ও গভর্নমেন্ট ব্যুরোক্রাসীর সমর্থন। পারটি  
আরমিও ব্যুরোক্রাসী-চীনের নয়া শাসনব্যবস্থার এই  
তিন স্তরের আনুগত্য মাও পেয়েছিলেন। হুয়া  
চাইলেন শ্রিতীর মাও হতে। তাই তিনি থেকে  
আনলেন ব্যুরোক্রাসীর অবিসংবাদী নেতা তেং  
সিয়াও-পিংকে যাকে মাও স্বয়ং হুয়ার ধনতন্ত্র-  
পন্থী ও মাওবাদবিরোধী এই অভিযোগে পদচ্যুত  
করেছিলেন। অবশ্য লিউ শাও-চিও মতো তেং  
কোনদিন পারটির সাধারণ সদস্য পদ হারাননি।  
মাও-এর গ্রেট লীস ফরোয়ার্ড অমোলনের অন্যতম  
উদ্দেশ্য যেমন ছিল সেনাবাহিনী থেকে সোভিয়েট  
প্রভাব দূর করা, তেমনই তার সাম্প্রতিক বিপ্লবের  
অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ব্যুরোক্রাসীকে সোভিয়েট প্রভাব  
মুক্ত করা, ব্যুরোক্রাসী যাতে এক নতুন শাসক-  
শ্রেণীতে পরিণত না হয়—যা সোভিয়েট ইউনিয়নে  
হয়েছে বলে তিনি মনে করতেন—তার জন্য তাকে  
এক বিষম নাড়া দেওয়া। সাম্প্রতিক বিপ্লবের পর  
ব্যুরোক্রাসী আবার নিজেকে সংগঠিত করতে শুরূ  
করে চ. এন-লাইয়ের নেতৃত্বে। এ কাজে সাহায্য  
করবার জন্য চ. এন-লাই তেং সিয়াও-পিংকে তার  
প্রথম রাজনৈতিক নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে  
আনেন। চ. এন-লাইয়ের পর মাও হতেও শ্রিতীর  
নির্বাসন দ্রুত ঘন। মাওয়ের মৃত্যুর পর তেংকে  
আবার ফিরিয়ে আনলেন হুয়া। তেং হুয়ার চেয়ে  
অনেক দক্ষ ও বয়সে অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও  
অনেক বেশী কমতি। তেং নিশ্চয়ই ডোলের্নিন যে  
তার শ্রিতীরবার পতনের সময় বাঁচা তাকে ধনতন্ত্র-  
পন্থী, ক্যাপিটালিস্ট রোডার বলে দিকার দিয়ে-  
ছিলেন তাইদের মধ্যে হুয়াও ছিলেন। বামপন্থীদের  
অন্তর্বিরোধের সুযোগ নিয়ে বামশক্তিকে ধ্বং করার  
উদ্দেশ্যে তেং হুয়াকে সমর্থন করেছিলেন। সেই  
উদ্দেশ্যে সফল হওয়ার পর হুয়া আর তার কাছে  
অপ্রয়োজনীয়। লক্ষ্যণীয় যে শ্রিতীর পুনর্বাসনের  
পর তেং যে চারটি আধুনিকীকরণের স্লোগান তুলে-  
ছিলেন, তার মধ্যে সেনাবাহিনীরও স্থান ছিল।  
সেনাবাহিনীর মধ্যক্যাপলিস্টদের সমর্থন তিনি সহজেই  
পেরেছেন, চ. এন-লাইয়ের জীবিতকালেই ব্যুরো-  
ক্রাসী তার কন্ডার হতেছিল। ফেব্রুয়ারী মাসে  
পারটির কমিটি সভাবে বামপন্থীদের  
বরখাস্ত করে তেং-অনুগত্যের তাঁদের স্বলজাতিবৃত্ত  
করল তাতে মনে হবে পারটিতেও আজ তেং-এর  
প্রতিপন্থী কেউ নেই। শোনা যাচ্ছে, এই বছরের  
শেষে চীনা কমিউনিস্ট পারটির অকাল কংগ্রেস  
হবে। এই কংগ্রেসেই সম্ভবত তেং ও হুয়ার চূড়ান্ত  
শক্তিপরীক্ষা হয়ে যাবে। এ বিষয়ে এখন আর কোনও  
সন্দেহ নেই যে পচি বছর আগে যিনি চীনের নয়া  
শ্রিতীর জন্মদাতা বলে বিখ্যাত হয়েছিলেন সেই তেং  
সিয়াও-পিং এখন চীনের এক নম্বর নেতা।

যদিও তেং-এর সাম্প্রতিক পরিচিতি চ. এন-  
লাইয়ের সমর্থক ও বাস্তববাদী বলে, প্রকৃতপক্ষে  
তার নেতা লিউ শাও-চি। লিউ শাও-চি-কে তিনি  
মরণোত্তর পুনর্বাসন করেই সঙ্গীত হননি, তিনি যোগ্য  
করেছেন নেতা হিসাবে লিউ-এর স্থান শ্রিতীর—  
মাও-এর ঠিক পরে ও চ. এন-এর উপরে। যদিও  
সাম্প্রতিক বিপ্লবের সময় লিউ সংশোধনবাদী ও  
চীনের হুশান্ত বলে নিশ্চিত। হয়েছিলেন তা হলেও  
তাকে ঠিক গোড়া সোভিয়েটপন্থী ও মাওবাদ-  
বিরোধী বলা চলে না। তবে একথাও ঠিক যে তিনি  
মাও-এর উগ্র সোভিয়েট বিরোধিতার সার দেননি,  
সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে যত্নভাবে আমেরিকার  
বিরুদ্ধে ডিরেডনামকে সাহায্য করার প্রস্তাব তিনি  
দিয়েছিলেন। চীনা কমিউনিস্ট পারটির আর একজন  
প্রথম সারির নেতা যাকে তেং বরণগণের পুনর্বাসিত  
করেছেন তিনি লি-সান। লি-সানের

হুয়া লাইয়ের প্রতি আনুগত্য সম্পর্কে সোভিয়েত  
কোন অবকাশ নেই। তিনি ধর্মীত মধ্যপন্থী।  
তেং মিলে কোনদিন সোভিয়েটপন্থী বলে  
পরিচিত ছিলেন না। পারটির আভ্যন্তরিক লড়াইর  
মাওকে নিজের লাইন প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে ব্যর জন  
নেতাকে পরাস্ত করতে হয়েছিল তাঁদের মধ্যে লিউ  
শাও-চি, লিন পিয়াও, লি সি-সান, ওয়াং সিং  
আছেন কিন্তু তেং নেই। তা সত্ত্বেও তেং মাও-  
বিরোধী। মাও-এর সমর্থক হওয়ার বিশেষ কোন  
কারণও তার নেই। মাওয়ের সক্রিয় বিরোধিতা  
সত্ত্বেও তিনি আজ চীনের এক নম্বর নেতা।  
তার আধুনিকীকরণ কর্মসূচী মাওবাদের  
বিরোধী। আভ্যন্তরিক নীতিতে তিনি মাওবাদের  
কখন করেন কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তিনি  
একজন মাও প্রবর্তিত নীতি মেনে চলেছেন। এই  
ধৈর্যবীরা ভৌম দিন চলা সম্ভব নয়। বত মানের উগ্র  
সোভিয়েট বিরোধিতা তা আধুনিকীকরণ কর্ম-  
সূচীকেই বাহত করবে। সোভিয়েট ও চীনের বিরোধে  
উস্কানি দিতে আমেরিকা ও পশ্চিমী শক্তিগুলোর  
হাতই আগ্রহ থাকুক না কেন, তারা কোন দিনই একটি  
সমাজতান্ত্রিক দেশকে সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক  
থেকে সত্যিকারের শক্তিশালী, স্বাধীন হতে সাহায্য  
করবে না। এক সোভিয়েট ইউনিয়নে রক্ষা নেই, তারা  
চীনের কখনই সুগ্রীষ দ্বন্দ্বের বানাবে না। আমেরিকা  
ও পশ্চিম জার্মানী তো স্পষ্টই জানিয়েছে চীনের  
তারা আধুনিক অস্ত্র বিক্রয় করবে না, রিটেন ও ট্রান্স  
করতে পারে। তবে তাদের কী ক্ষমতা যে চীনের তারা  
সোভিয়েট ইউনিয়নের সমকক্ষ সামরিক শক্তি হিসাবে  
গড়ে ওঠার সাহায্য করবে? তার উপর আছে বৈশ্বিক  
মন্ত্রণার প্রশ্ন যা চীনের অপরিহার্য নয়। এসব ছাড়াও  
আছে সমাজ ব্যাপ্তার প্রশ্ন। মাওবাদেরীরা কেউই  
সমাজতান্ত্রিকবোধী, সংসদীয় গণতন্ত্র অনুসরণী নন।  
কীরা ভেবেছিলেন সোভিয়েট বিরোধিতা ও আমেরিকা-  
প্রীতির বেশ কয়েক নেতারা তেংকে বেশ পশ্চিমী  
গণতন্ত্রের অধা অনুপ্রবেশ বাধ্য দেবেন না তাঁরা  
আজ আশাহত, খুঁড়োক্রাসী ওয়াশিংটন অটো  
কম্ব হারে গেছে। স্বয়ং তেং যোগ্য করেছেন "চার  
মহৎ-এর কোনও প্রয়োজন নেই। এই চার মহৎ হচ্ছে  
বাক স্বাধীনতা, আলেচনার স্বাধীনতা, জমায়েতে  
স্বাধীনতা আর প্রাচীরপত্ত লেখকের স্বাধীনতা।  
সংকীর্ন থেকে এই চার মহৎকে ছেটে দেওয়া হয়েছে।  
চীনের কতমান সামাজিক ব্যাপ্তা আজার রাখার  
জন্য, চীনের আধুনিকীকরণ কর্মসূচী সফল করা  
জন্য চীনের নেতাদের সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে  
একটি সমঝোতার আসতে হবে। যে-কারণে মাওয়ের  
অনুসরণ করে চীনা সোভিয়েট ইউনিয়নের সমকক্ষ  
হওয়ার আশা করতে পারত মাও-উ-চীনে সেই নিষ্ঠা  
ও কিস্বসেরও অভাব রয়েছে। চীনা নেতার যদি  
মাওবাদ থেকে সরে আসেন তা হলে তাঁদের সঙ্গে  
আলোচনার বসতে ও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক  
করতে সোভিয়েট ইউনিয়নেরও আগ্রহ থাকবে না।  
চৈনিকের যদি থাকে তার উত্তরাধিকারী থাকবে না।  
চীনের কতমান অস্বাভাবিক এই দিক পরিত্যাগের  
প্রস্তুতিপর্ব। সত্যিই যদি এই সমঝোতা হয় তা হলে  
তার ফল হবে সুদূরপ্রসারী। আমেরিকা ও অন্য  
অনেকের আপেল গাড়ি ওলটাতে, আবার আমাদের  
দেশের পক্ষে তা হস্ত হতে মশলকর। চীনা নেতাদের  
থেকে থেকে সোভিয়েট-বিরোধী হস্তার-যদিও  
কিছদিন হল কবে এসেছে—শনে মনে হতে পারে এই  
সমঝোতার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তুললে চলবে  
আ চীনা কনব্রীতির আদি পাত, সান জর্-এর প্রায় আড়াই  
হাজার বছর আগের শিক্ষা—আপনাদের ইন্ট, স্টাইক  
ওয়েস্ট; পুর্বে শ্বের তোলা, পশ্চিমে আঘাত হানো।  
প্রকৃত সোভিয়েট বিরোধিতা গোপন সোভিয়েট  
প্ররীতির চাকনা হতে পারে।

# কণ্টকলিত অতুলা ঘোষ (নব পর্বত)

॥ ২৪ ॥

সংবাদপত্রে যা পড়লাম তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না; কিন্তু নাম-ধাম দিয়ে বা বেরিয়েছে তা সত্য এবং এই সত্য ঘটনা গভীর উদ্বেগ ও চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। আসামের ঘটনায় সকল দায়িত্বশীল মানুষই উদ্বেগিত। বোঝা যায়, ঘটনা জটিল হয়েছে তৎকালীন তদারক স সরকার ও রাজ্য সরকারের দায়িত্বহীনতার জন্য এবং ঘটনার জট ছাড়াতে কিছু দিন সময় লাগবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের যে খবর বেরিয়েছে, তাতে সত্যিই স্তম্ভিত হতে গেছে। এই বাম ফ্রন্ট সরকার এখন অনেক সংখ্যাধিক্য নিয়ে এসে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করে, তখন তাকে স্বাগত জানিয়েছিলাম। এবং সত্যিই মনে মনে চেয়েছিলাম যে, স্বাধীন সরকার এখানে পাঁচ বছর বিরাজ করুক। তখন অবশ্য বাম ফ্রন্ট সরকার মানে যে মন্ত্রীরা কিছুই নন, বাম ফ্রন্ট দলই যে সব এটা বোঝা যায়নি। মন্ত্রিসভার কোন মর্মান্দা বা দায়িত্ব যে নেই, এত পরিস্কারভাবে এর আগে কখনও প্রকাশিত হয়নি। বিষয়টা অতি সাধারণ এবং প্রশাসনিক। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং মেডিকেল কলেজে ঢোকবার আগে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে কাগজে বেরিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী,—যাঁর এ বিষয়ে কথা বলার পূর্ণ অধিকার আছে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী,—যাঁর এ বিষয়ে দায়িত্ব অপরিসীম,—আর মুখ্যমন্ত্রী,—যাঁর দায়িত্ব সর্বাধিক,—এইসব কলেজে এন্ট্রান্স পরীক্ষা নিয়ে মত দিয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাও হয়েছে। এই প্রশ্নে বাম ফ্রন্ট দল দল হিসাবে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছে এবং বাম ফ্রন্ট দলের চেয়ারম্যান অতি কঠিন ভাষায় তাঁর মত প্রকাশ করেছেন যে, এই তিনজন মন্ত্রীর ফ্রন্টের নির্দেশের বাইরে যাবার কোন অধিকার নেই। গণতান্ত্রিক দেশে এ অবস্থা বোঝা খুব শক্ত। দল হিসাবে ফ্রন্টের নিশ্চয়ই পরামর্শ দেবার অধিকার আছে। বাজেট এখন হবে, বিলিফের ব্যবস্থা কিভাবে হবে, খরার সাহায্য কিভাবে করা উচিত—সাধারণভাবে এসব বিষয়ের পরামর্শ দেবার অধিকার দলের দলের দলেই আছে। রাজ্যের বিভিন্ন উন্নতিকল্পে পরামর্শ দেবার অধিকার আছে, জমির বিলিবাংলা এবং জমিতে যারা চাষ করে তাদের সম্বন্ধেও পরামর্শ দেবার অধিকার আছে। সাধারণভাবে নীতি প্রকাশ করাই দলের কাজ। কিন্তু দল যদি প্রশাসনিক খুঁটিনাটি নিয়ে নির্দেশ দিতে থাকে, তা হলে তাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলা একটা বড় রকমের পরিহাস।

ছোটখাট অনেক ব্যাপার নিয়ে আমরা শুনছি এর আগে—যেমন, স্কুল ইন্সপেকশনের সময়ে অধিকার নেই এমন লোকও দলের পক্ষ থেকে ইন্সপেকশনে গেছে। মাঝে মধ্যে একান্ত প্রশাসনিক কাজেও দলের হস্তক্ষেপের কথা শোনা যায়। এরকম সাধারণ

টুটি-বিটুটির কথা সব দলের সম্বন্ধেই মাঝে মাঝে শোনা যায়। কিন্তু স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী যেখানে একদম প্রশাসনিক ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন, সেখানে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে হচ্ছে যে, 'যা হবার হয়ে গেছে, ভবিষ্যতে আর হবে না'—এ কি কোন গণতান্ত্রিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কথা? এইভাবে যদি এখানে শাসনতন্ত্র চলে, তবে স্বৈরাচারের সঙ্গে তার তফাত কি? বাম ফ্রন্ট নাকি তাঁর দলকে গণতান্ত্রিক বলেন এবং ইন্দিরা ও তাঁর দল নাকি স্বৈরাচারী। অতীতের কথা ছেড়ে দিই।



কারণ, পূর্বনো কাসুদ্দি ঘটলে সব দলেরই অনেক গুপ্ত কথা বের হয়ে পড়বে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কেন স্বৈরাচারী এবং বাম ফ্রন্ট সরকার কেন গণতান্ত্রিক তা বিশ্লেষণ করার সময় এসেছে। যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর দায়িত্ব এবং অধিকার অনুযায়ী কাজ করলে দলের কাছে গুটিবন্ধী করার করতে হয়, সে রাজ্যে আর যাই থাক, গণতন্ত্র আছে—এ কথা বলা চলবে না। আইনসভায় নির্বাচিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে দলের প্রতি আনুগত্য ভুলে যেতে হবে—এ কথা কেউ বলতে না। কিন্তু যদি



তিনি মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ নিলেন, সেদিন থেকেই তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। কেবলমাত্র দলের মুখ্যমন্ত্রী নন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রশাসনিক কাজ করবার জন্য আরও কয়েকজন মন্ত্রী অছেন। দলের নির্দেশ তাঁরা মনে রাখতে পারেন, কিন্তু তাঁরা তো সারা পশ্চিম বাংলায়ই

মন্ত্রী। বঙ্গীয় সাহায্য বৎসর দেওয়া হয়ে, তাই কেবল দলীয় পরিবারদেরই দেওয়া হবে? আমি বিশ্বাস করি না বর্তমান মন্ত্রিসভার কোন মন্ত্রী বা সমর্থিতভাবে সব মন্ত্রী উচ্চৈশ্বরে এ কথা ঘোষণা করবেন। কারণ, মন্ত্রী হবার পর দলের সঙ্গে তাঁদের যে সম্পর্ক তা একেবারে নিজস্ব। মন্ত্রী তাঁরা সমগ্র রাজ্যের অধিবাসীর, যারা তাঁদের ভোট দিয়েছে তাদেরও, যারা ভোট দেয়নি তাদেরও। খরা, কন্যার যেমন সমগ্র অধিবাসী তাঁদের কাছে সমান, তেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সব বিষয়েই তাঁরা সব অধিবাসীদের কাছেই দায়িত্বশীল। প্রশাসনিক পদ্ধতির মাধ্যমেই এইসব দায়িত্ব পালন করা হয়। এখানে দলীয় নির্দেশ আসার কোন স্থান নেই। যখন দলীয় নির্দেশে প্রশাসন পরিচালিত হবে, তখন তাকে আর গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বলা চলবে না। কেবলমাত্র ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর দল স্বৈরতন্ত্রী এবং নিজেরা গণতন্ত্রী—এ কথা বললেই গণতান্ত্রিক নীতিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

যেখানে গণতান্ত্রিক সংবিধান অনুযায়ী প্রশাসন পরিচালিত হচ্ছে, সেখানে ব্যক্তিগত নির্দেশ বা দলগত নির্দেশ—দুইই অন্যায়, অনুচিত ও অবাস্তব।

ভাবেও আশ্চর্য লাগে যে, একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দৃষ্টি প্রকাশ করেছেন। তা হলে কি মন্ত্রীদের প্রশাসনিক নিত্যনৈমিত্তিক কাজগুলি দলের অঙ্গুলিহেলনে চলেবে? যেমন সরকারী কর্মচারীদের উপর দলীয় প্রভাব থাকা অনুচিত, ঠিক সেইরকম মন্ত্রীদের প্রশাসনিক কাজের দৈনন্দিন খুঁটিনাটির উপর দলীয় নির্দেশ থাকা অনুচিত। দলের বৈঠকে তাঁরা ঝাইচ্ছা নীতি নির্ধারণ করতে পারেন, কিন্তু সরকারের প্রাত্যহিক কাজ বা নীতি নির্ধারণে দল যদি হস্তক্ষেপ করে, তবে তাকেই স্বৈরতন্ত্র বলে। একান্ত বিশ্বাসের বিষয়, যে বাম ফ্রন্ট দল এন্ট্রান্স পরীক্ষা নিয়ে এত উদ্বেগিত, কিন্তু পরীক্ষা যারা দিতে বসবে, তারা বিদ্যুৎ পায়ে কিনা তা নিয়ে তাঁদের কোন উদ্বেগ নেই। তা হলে কি দল রাজ্যের কোন ব্যাপার নিয়ে কোন উদ্বেগ অনুভব করেন না? পরীক্ষার ফল সময়ে বেরুক বা না-বেরুক, তা দিয়ে দলের কোন উদ্বেগ নেই। পরীক্ষার সময়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে না পাবার জন্য তাঁদের কোন উদ্বেগ নেই। যেনে রাহাজানি নিয়েও তাঁদের কোন উদ্বেগ নেই। ইমপ্রুভেমেন্ট ট্রান্স্ট, সরকার, এল আই সি প্রভৃতি অনেকেই হাজার হাজার চারতলা ফ্ল্যাট তৈরি করেছেন। সবচেয়েই পাম্পে জল ওঠার কথা। কিন্তু বিদ্যুৎ নেই—পাম্প অচল, নিজেদের জল ভুলতে হয়। এর জন্য ফ্রন্টের কোন মাথাব্যাথা নেই। কলকাতার বহু বড় রাস্তা জঞ্জালে প্রায় স্বাতন্ত্র্যভের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। তাঁর জন্য ফ্রন্টের কোন চিন্তা নেই। এরকম ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যায়, যার জন্য ফ্রন্টের মাথা-ব্যথা হওয়া উচিত; কারণ, তাঁদের দলীয়

নির্বাচিত হয়েছেন, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁরা উদাসীন। তা হলে কি ধরে নিতে হবে যে, পশ্চিমবঙ্গের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য যে সব মন্ত্রী আছেন তাঁরা দলের হাতে ক্রীড়নক মাত্র? আমাদের সংবিধানে তো এরকম কোন নীতি বিধিবদ্ধ করা নেই। সংবিধানের নীতি বারী অমান্য করেন, তাঁরাই তো স্বৈরাচারী। যে রাজ্যের মধ্যমন্ত্রী নিজের সহযোগীদের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দলের কাছে ভৎসিত হন, তাঁদের কি গণতান্ত্রিক আখ্যা পাওয়া সাজে? তাঁরা যখন শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর দলকে স্বৈরতন্ত্র্যী বলেন, তখন সেটা যেমন অসংগত, তেমনি অশোভন হয়। দলের এ ক্ষমতা আছে মধ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলার, কিন্তু বর্তমানে তিনি মধ্যমন্ত্রী আছেন, ততদিন তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার দলের নেই। এই পাথক্য বারী বোঝেন না, তাঁরাই স্বৈরতন্ত্রের ধারক ও বাহক।

বর্তমানে ভারতবর্ষে যেভাবে দল ভাঙা-ভাঙ্গা ও দলে দলে মিতালি হচ্ছে, তাতে নীতির কথা না তোলাই ভাল। কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গে তো সে অবস্থা নয়। এখানে বাম ফ্রন্ট দলভুক্তদের তো দল ভাঙাভাঙ্গার প্রশ্নই নেই, আর মিতালি তো সর্বাধিক। কিন্তু এদের কাজের পেছনে যদি এই মনোভাব ফুটে বেরোয়, বা প্রচ্ছন্ন ডিক্টেটরশিপের অনুরূপ, তা হলে কি এটাই প্রমাণ হয় না যে, পশ্চিম-

বঙ্গের বাম ফ্রন্ট দল বাকি আমরা ডিক্টেটরশিপ বলি সেই পথে হাবার চেষ্টা করছেন! বড় বড় বিষয় সম্পর্কে দল নীতি নির্দেশক হতে পারে, কিন্তু মনে রাখতে হবে সেটা পরামর্শ মাত্র। নীতিকে কার্বে রূপ দেবার সম্পূর্ণ অধিকার মন্ত্রীদের এবং সেটা প্রশাসনবস্তুর মাধ্যমে। হতে পারে কোথাও ভুল হয়, বা কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো দলীয় নির্দেশ অনুযায়ী হয় না, তার সামাধান তো ক্রোধের স্ফারা হতে পারে না। আলোচনার পথ তো খোলাই থাকে! যেখানে মধ্যমন্ত্রীকে অবধি ভয় পতে হয় দলের কাছে, তা হলে তিনি প্রশাসনিক কাজ কিভাবে স্বাধীনত করবেন? এটা মনে রাখতে হবে যে, দল যখনই প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করবে, তখনই যে কেবল মন্ত্রীদের মর্যাদা নষ্ট হবে, তা নয়—কর্মক্ষমতাও অনেক কমে যাবে। জনসাধারণ কৈফিয়ত চাইবে মধ্যমন্ত্রীর কাছে, দলের কাছে নয়। সেই মধ্যমন্ত্রীকে যদি হেয় করা হয়, তা হলে তাঁর পক্ষে প্রশাসনিক কাজ-কর্ম চালানো তো অসম্ভব! দলের মধ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, কিন্তু বর্তমানে তিনি মধ্যমন্ত্রী আছেন তিনি সারা পশ্চিম বাংলার মধ্যমন্ত্রী, দলের নন। দলের এই মনোভাবকেই স্বৈরতন্ত্র বলে। এই প্রসঙ্গে একটা পুরাতন কাহিনী মনে পড়ছে।

বোধহয় সালটা ১৯৪৯। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় তখন আমেরিকায়। ভারত-বর্ষের প্রধানমন্ত্রী এবং কংগ্রেস দলের দলপতি জওহরলাল ডাঃ রায়ের অবর্তমানে কলকাতায়

এসেছিলেন। তাঁর কিছু অভিযোগ মনে সঙ্গে সঙ্গে তদন্তের নির্দেশ দিয়ে বান। এ স্বর আমেরিকার ডাঃ রায়ের কাছে পৌঁছয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় ফিরে এলেন। তিনি কলকাতায় আসার পরই দিল্লি থেকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক কলা ভেকটরাও তাঁকে দিল্লি যেতে অনুরোধ জানালেন। ডাঃ রায়ের উত্তর গেল যে, ওয়ারাকিং কমিটির মিটিং ডাকা হোক, তিনি যাবেন। দিল্লিতে ওয়ারাকিং কমিটির মিটিং। জওহরলাল আছেন, বল্লভভাই আছেন, আর আরও সব স্বনামধন্য নেতারাও আছেন। ডাঃ রায় একটি ছোট বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার বিষয়—তিনি রাজ্যের মধ্যমন্ত্রী। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর রাজ্যে কোন তদন্তের আদেশ দেবার কি অধিকার দলপতি জওহরলালের আছে? জওহরলাল তাঁকে পদত্যাগ করতে বলতে পারেন, তিনি অবনত মস্তকে মেনে নেবেন। কিন্তু তিনি বর্তমানে রাজ্যের মধ্যমন্ত্রী আছেন, ততদিন প্রশাসনিক সব নির্দেশ তাঁর মারফত পাঠাতে হবে। এরই নাম গণতান্ত্রিক অধিকার। অবশ্য জওহরলাল তদন্তের আদেশ প্রত্যাহার করে নেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে স্বাদের হাতে শাসন ক্ষমতা আছে, তাঁদের এটি মনে রাখা উচিত, তাঁরা দলীয় সদস্য হিসাবে দলের কাছে দায়ী, কিন্তু মন্ত্রী হিসাবে দায়ী রাজ্যের কাছে। মধ্যমন্ত্রীর অমর্যাদার প্রশাসনবন্দ কখনও সচল হতে পারে না।

কঠো : অলক সিং

## মাড়ির গোলমালের প্রথম লক্ষণ?



### প্লেগ (Plaque)

হল জীবাণুর এক অদৃশ্য পর্দা যা আপনার দাঁত আর মাড়িতে সবসময়ই চড়িয়ে থাকে। অবহেলা করলে, প্রেক্ষ মস্তমলে পরিণত হয়।

### দস্তমল

দাঁতের গোড়ার জমে, ফলে মাড়ি জ্বালা করে আর ফুলে ওঠে। পরে মাড়ি আর হাড় ক্ষয়ে গিয়ে দাঁত পড়ে যেতে পারে।

মাড়ি থেকে রক্ত পড়া গ্রাস দিয়ে দাঁত সাফ করবার সময় দুর্বল আর ফোলাফোঁসা মাড়ি থেকে রক্ত পড়তে পারে। এতে বাধা না পেলেও গুরুতর সমস্যা দেখা দিতে পারে।

## দাঁতের ডাক্তারের তৈরী ফরহ্যান্স টুথপেস্ট দিয়ে আগবার মাড়ির যত্ন নিব

### ডাঃ ফরহ্যান্সের অধিষ্ঠীয় ফরহ্যান্স

ডাঃ ফরহ্যান্সের শক্তিশালী অ্যান্টিজেন্ট ক্রিয়ায় ফরহ্যান্স আপনার মাড়ির ওপরের ভাগ মজবুত করে তোলে, ফলে আপনি মাড়ির গোলমাল রোধ করতে পারেন।

### দাঁতের ডাক্তাররা বলেন

মাড়ির গোলমাল হলে এমনিতে সূক্ষ্ম দাঁতও পড়ে যেতে পারে। রোজ রাতে আর সকালে দাঁত গ্রাস আর মাড়ি মালিশ করুন, ফরহ্যান্স টুথপেস্ট আর ফরহ্যান্স ডবল আকশন টুথব্রাশ দিয়ে।



মাড়ি  
থারাপ  
তো স্বাস্থ্যও  
থারাপ



কিন্তু! "আপনার দাঁত ও মাড়ির যত্ন"

বর্তমান পান্ডিত্য। অনুগ্রহ করে ২৫ পরসার ডাকটিকিট সমেত এই টিকানায় লিখুনঃ ফরহ্যান্স ডেন্টাল আউটফিটার্স বারো, পোস্ট বাগ নং ১১৫৬০, ডিপার্টমেন্ট P 128-215, বক্স ৫০০০২০।

যে ভাষায় চান জানাবেন।

ফরহ্যান্স  
দাঁতের ডাক্তারের  
তৈরী টুথপেস্ট





## হিমাদ্রির ফিরে আসা সমীর মুখোপাধ্যায়

সকাল সকাল গুয়ায় হিমাদ্রির চান করা অভ্যাস। আজ তার খবর তাত্ত্বিক। সেইজন্যে বেশ একটা হাড়াতড়ি পা চাটিয়ে চলেছে। খালি গয়ে তেল চর্চা করে মাথা, কাঁধে তোমলে, মুখে ফেনযুক্ত গাশ, তার এখন অন্য রকম চেহারা। সেই সম্ভা ছটার এনগেজমেন্ট প্লটার 'খারটারে' তার অক্সা এখন অনেক দেরি। তবু হাতে কোন জরুরী কাজ থাকলে, কাজটা যতো দেরিতেই থাক, হিমাদ্রির স্বভাব, ও সমস্ত মন সেই এনগেজমেন্টের দিকে একাগ্র রাখে। প্রত্যেকটা মিনিট তখন সে হিসেব করে খরচ করে। সব সময়, এমন কি খেতে খেতে কিংবা পথচলতে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেও, এমন কি অর গের নদী খতার সঙ্গে যার নাম অতি নশেবক তা। মনে ক'কাল মন্থিত হয়ে গেছে। স্পষ্টতর, গায়ের কোন প্রসঙ্গে এলো হিমাদ্রি তখনো তার ইন্দ্রিয়কে সচেতন রাখে। তখনো এনগেজমেন্টের সময় একটুও ভোলে না। কিন্তু মজা এই, কখনো ঠিকমত সে কোনদিন কথা রাখতে পারে না, যতো তুচ্ছ আর যতো অহংকারী এনগেজমেন্টই হোক কোথাও না কোথাও একটা শব্দ থেকে যায়ই। আর একটুও নিরাশ বা বিষন্ন না হয়ে 'হিমাদ্রি পরকর্তী' এনগেজমেন্টের বাগ্যটাক আবার সিরঙ্গন হয়ে ওঠে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে এটা অনাগালের মত কিছুতেই 'ফলা' হতে দেবে না। যেমন আজ, আজ সম্ভা ছটার প্লটার 'খারটারে' যাবার প্রোগ্রাম বাত চেপে না যায় তার জন্যে সে অনেক আগে থেকে মনে এই ভোরবেলা থেকেই প্রস্তুত, যদিও হাসাকর, অর্থহীন এবং কিছুতেই 'ফেলা' হবার নম্র, তবুও সে এক রকম ছটো ছটো গলি দিয়ে, পেছন দিক থেকে সাইকেলে করে এসে দলভ তার সঙ্গে যেতে যেতে কলে, 'করে, চান ক তে চললি।' আ খেলে যা। দাঁতগুলো সব বার করে ফেললে। দেখছে চান করতেই যাচ্ছে তবু 'চান করতে চললি, এক নম্বরের একটি...। কিন্তু মেজাজ খারাপ করলো না 'হিমাদ্রি, সে জনে এ সময় মেজাজ ঠিক রাখতে হয়, তারপর এনগেজমেন্ট ঠিক ঠিক রাখার প তখন সে মেজাজকে কলবে, আর শালা, কতো খারাপ হাব হ'। তখন সে মেজাজের বাপ মা তুলে মেজাজকে ওসকাবে। কিন্তু তার আগে.....

মেয়েটার কাল থেকে জ্বর। আমার ডাক্তারীতে কুলোছে না। দেখে একবার ডাঃ চৌধুরীকে। তাকে পেতে গেলো তো তার অনেক লটা। ভোর পাঁচটার

এসে। লাইন লাগাও। লিস্টে নম লেখাও। উনি আবা: ব্যেরটার কেল দেখে না। এ শালা মহা হে'পা। উনি ছাড়া শহরে একটা ভালো ডাক্তার নেই। বাকি সব তো হাড়ড়ে হাফ ডাক্তার। কি যে করি—

এই সেরেছে। আজ আমার এনগেজমেন্ট, আজই আমার এসব শোনানে কেন? পাছে অমাক বলে কসে তুমি ভাই ও'দকে তো যাকো, ডাক্তার চৌধুরীর ডিসপেনসারীতে গিয়ে লিস্টে আমা। মেয়ের নামটা যদি ঢ'করে দাও তো খুঁচ ভালো হয়। খুঁচ যে ভালো হয় আমি তা জানি রাসার। কিন্তু আমারও যে খুব খারাপ হয় তা কি তুমি জানো? আজ আমার মপ করে রাজা। হ'দও একটা বিশেষ কাজে ডাঃ চৌধুরীর ডিসপেনসারীর কল্যাণার্থে একবার যাবে কিন্তু লিস্টে নাম দিতে গেলে অনেকটা সময় কথা বলে যাবে, আমি আজ পারছি না। মনে মনে কথাগুলি আউড়ে নিয়ে, একটু শক্তি সঞ্চা করে নিয়ে হিমাদ্রি দুল'ডকে বললে, 'এদিকে তে মর মেয়ে অস'খ। ওদিকে আমার বাড়ীতেও কিপল।' কবার আবার হাটের অবস্থাটা কাল থেকে চোখে মুখে নিখুঁতভাবে হিমাদ্রি উল্লেখ্যতা ফুটিয়ে তুলল।

আ বোকবার বাটা দলভ ঠিকই বকলো। মনে মনে নিশ্চয়ই কলে, শালা একখানি ঝাল। মেয়ের অস'খের কথা বলে ছ'কিনা অম'নি বাপের অস'খের কথা এনে মুখে কথ করে দিলো। ঢের ঢের বস্তা দেখেছে কিন্তু এমন একখানি হাতের ...

কি টি কলেজের কল্যাণার্থে এসে গেছে হিমাদ্রি, এইবার ঢাল: পড় বেলে গলায় নামকে, আগদটা ভবু যায় না, আজ তার জরুরী একটা এনগেজমেন্ট, না গেলেই নয়, অথচ সকাল না হতেই মাথো এইসব বক্কা। 'তা হলে—

একটু বিশ্বাস হেসে দলভ সাইকেলের প্যাডেল ঘোরালো। 'হ্যাঁ। বাবার হাটটার দিকে একটু নজর রেখো। কখন কি হয় কলা তো যায় না।' বলে হুশ করে কোঁরয়ে গেল। দেখলে? বাবার সময় কেমন অল'খ সে কথা টি ছেড়ে গেল। আর মথের ওই হাসিটা। উঃ, হাড়'পাশি অ'দলে হয়। কিন্তু এনগেজমেন্টের কথাটা আবার মনে পড়ে গেল হিমাদ্রির। না সে কিছ'তেই এখন মেজাজ খারাপ করবে না। মনটা তাজা রাখা, সজীব রাখা এখন খুব জরুরী। কিছ'তেই মেজাজকে খানখান্দে হিমাদ্রি এখন পড়তে দিতে রাজী



না কথা। প্রভাতে ঘাটোনা অজ্ঞ আর ঠিক হবে না। সত্তর হিমালয় মূখ  
কছে শূনে গেল প্রভার অভিযোগ। একবার ঠিক বলতেও শোলে। পূর্বদিকে কিছু  
সামলে নিলো। আজ না তরু এবেশজামেট। এটা সে ডালে কেমন করে  
পটার—এ বজ্রনী। নাটক দেখা ছাটার। তাকে ঠিক কটার কটার ছাটার হঠাৎ  
হঠাৎ না হলে ইচ্ছেভের একমেষ। এবেগজামেট ব্রেক করাই তার বে  
কিছু। কথা দিয়ে কথা রাখা তার ফেন কুণ্ডলতে নেই। লিচু আজ এ সমীর  
এবেগজামেট ও ছিড়েই ফেল করবে না। ঠিক চারদিন আগে মোদালিম  
কাজের অফিস জটনটেক ও বরুতে বসে দিয়েছিলো। এই কাজেরা লিচু  
সম্প্রতি জাপ সাপার নিয়ে থাকে। ছোটখাটো কাগজ। বেশী হাঁক-ডাক নেই  
তবু, চলছে বন্দ নানা কেকা-কাহিনী ছাঁপের। কিতাবে যে মালিক-কাম  
সম্পাদক ভুললোক ঢেকো আলাবাবর সঙ্গে যোগাযোগ হাট্টিলো সে আজ  
বার হিমালয়র মনে নেই। উনি ওর কাজে হিমালয়র পক্ষ—আখট—খিচে  
লায়। লেখা আর কি, এই দু-একটা হিন্দী বাংলা সিনমা, তা ছাড়া আরকাল  
বন্ধা-ট্যাটা লোকের খব বই হয়েছে না, সেই সব সম্পর্কে বা কীভাবে কখনো ভালো  
কাজে ইয়েস্টর বই সম্পর্কে দু-চার ছত্র লেখা। সেই কবে কোন্ কালে ডালোর  
এই এ পাশ করছে। তারপর থেকে তো লেখাবার সঙ্গে সম্পর্ক অসম্ভব,  
এই চোদ্দ-পনেরো বছর ধরে তো খালি লেজার আর কইলের ছানি ঘুরেযোনা।  
অথবা আজ থেকে অতো বছর আগে চোটা চলতো না। তখন এটুকু গ্যে  
নভরে খেটে পয়সাক বৈভরণী পার হতে হত। এটুকু—আখট, পড়তেও হত  
পারীকার বৈভর্যে ছাঁর পিঁচো, মাস্টারকে তড়কে দিয়ে পর পণ্ডা খেতো না।  
অবলাবাবুই এর্কান ভরসা দেন, কেন পারবেন না মশাই? আমার কাগজ কি  
বাখানার কাগজ নাকি। এটা তো একটা, অ্যো সো, কি কাগজ নাই বললার নিয়ে  
ছক—এ কাগরে লেখা তো হোলেই যেকো পারে। লিচেনা, বহা খিচোরের  
ফি—পাস পাবেন। দয়া করে এটুকু দেখে আসবেন। এ কাজের আপনিই উপহার  
বাড়ি। অফিসে আসেন এই পর্যন্ত। কাজ দেখে বই তো অফিস থাকবে?  
অফিসে আসা মনে হতে—এর-ওর নামে ঢুচলি খাওয়া, পটিং—কাজ, হুক ফু  
করে সিনারট টানা আর অফিসের টেলিফোনে অন্য অফিসের লাকেরের সঙ্গে  
পিরীত করার। আপনি পারবেন মশাই। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ যে লাইনখানি  
অবলাবান আগে পেতে দিয়ে গেছেন, দেখবেন সেই লাইন ধরে আপনায়  
ডাকলে, টি ইনভিট্যাটা ভেল ভেসে করে টিকিই হাওয়া-ব্যাংকল করছে।  
পক্ষভালান বছর পর্যন্ত চলবে ঠিক হচ্ছে খেলে। তারপর অথবা ককেজিক

জিজ্ঞাসার কথা হবে আপনার ইমজিনকে। তা আপনার পূর্বজালিশ অনুসারে জে এখানে বেশ দৌঁরে। চালিয়ে যান। আমার কাগজেই হাতেখড়ি হোক।

প্রতি ভরনতে হিমায়িত একটু-আখটু লেখা আরম্ভ করলেন। দু-চার বছর ধারণার পর হিমায়িত দেখলো, আরে, এতো মন নয়। দু-চার টাকা হচ্ছেও, ওই আর কি বারে-টোরে সোলাসের খরচ আর সব চেয়ে বড় কথা। এটা একটা খোলা জানালা, এই লেখাটা। এই খোলা জানালাটা আছে বললেই হিমায়িত এক রকম বেঁচে গেছে, বস্তুবাহ্যবোধের তো খোলে। তারা বসলেই বৃষ্টির বার। বৃষ্টি শব্দই হয়েই গেছে তা নয়। ছেলের হাস্যর এডুকশন আর মেরের বিয়ে নিয়ে চুল পাকিয়ে ফেলোছে অকালে, বড়ো বড়ো ভাব, কথাবাড়াগুলো পূর্বসূত বড়োতে মাকী, চোখে পাগলের দৃষ্টি। অল্পের শ্রী কত। বলে, তোমারি যে পনেরো বছর বিয়ে হয়েছে তা কে বলবে। বরেন্সের ছাপ পড়ছে তিক্ত। সে আর বাবে কোথায়। কিন্তু তবু এখানে বেশ ছেলেমানুষ আছে। ছেলেমানুষ আছে এখনো? সত্যি? বাঃ, কাজ মিথো বলছে। কিন্তু যদি ছেলেমানুষ একটা, তার মধ্যে থাকেই তার মূলে কিছু হিমায়িত বেশ জানে এই খোলা জানালাটা, ওই একটু লেখা খোলা, তাঁর মজার খেলা যে, যেটাকে হিমায়িতের প্রভা বলে, 'রি-ফোর্স' অশ্লীলতা আর ওয়ানফোর্স' ভাড়াটি, সব মিলিয়ে ভড়াক, পাবলিকক ভড়াক, তা সে যাই হোক হিমায়িত কিন্তু বেঁচে গেছে, ওই জানলাখানিই। তাকে ব'চিয়ে দিয়েছে। আজ থেকে চারদিন আগে অশ্লীল থেকে বেরিয়ে লালবাজারের দিকে একটু 'রেইং' বেরিয়েছিলো। বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে জ্বলন্তাইল বিল্ডিংয়ের কাছে এসে ভিড় বসল। এসেই মনে হল হিমায়িত লিফটে করে একবার চান্দলার বাই না, 'মোনা'লিসা' অফিসে। অমূল্যাবাদ; কেন্দ্র আছে একটু খোঁজ। অনেকদিন ওদিকে তো মাড়াইনি। স্রী' লিফট আর ততোধিক স্রী' লিফটমানকে দেখে হিমায়িত দুঃখ হল। নালা, বলা যার না, যদি লিফট উঠতে উঠতে মাঝখান পূর্বসূত এসে ছিড়ে পড়ে। তা হলেই তো 'ফেলো'। দরকার নেই বাবা। ভাঙে সিঁড়ি। এখনো তো হাটের অলুখ ধর নি। হলে দেখা যাবে। সিঁড়ির পর সিঁড়ি, এ স্বপ্নের সিঁড়ি নাকি বে, ফুরোর আর না, ফুরোর আর না, হিমায়িত সিঁড়ি ভেঙেই চলেছে, তারপর লক্ষ্য একটা আছে অশ্লীলতার করিডর, দু পাশে পায়ের খোপের মত নানাভাজের অফিস, উঃ, কি দুঃশব্দ, ইউরিন্যাল, মানুষের এই সব জিনিস যদি এককালের বস হয়ে যেতো, ঈশ্বরের এই সৃষ্টির ব্যাপারটার খুব একটা উল্লাস করার কিছু নেই, এখনে অনেক কিছুই আছে যাতে ভুললোক সম্বন্ধে খুব একটা উঃ, ধারণা থাকে না, উঃ বাপরে বাপ, অল্পপ্রাপনের ভাত উঠে আসছে, নরক নরক একখানা, আবার একটা ছোট করিডর অরপর লোহার একটা বড় দেয়ল, তারপর একটা ছোট মত ঘেরা জায়গা, সেখানে রাশি রাশি পটিকার বাসিন্দা, বাসিন্দা পেরিয়ে ক'রের জোড়া-জানাল ঠেসেতেই হিমায়িত চোখ দেখে অমূল্যাবাদের অসম্মান দাঁতে এসে আটকে গেল।

বে কথা অমূল্যাবাদ, সকলকেই বলেন, বলে বলে অভ্যস্ত করেছেন তাই বললেন হিমায়িতকে দেখানোর।

এই যে হিমায়িতাবাদ, আপনারকেই বুঝিয়েছিলাম।

হিমায়িতের মুখে এসে গিয়েছিলো, বরেন্সের মাইরি প্রাপ, সেটা আঁত কষ্টে মন করলো। 'আপনার তো খুব উকির দরকার।'

কি অশ্লীল। কি করে জানলো। ব্যাটা নিশ্চয়ই গণকর। তিক্ত ধরেছে তো।

হিমায়িত ভাবলেন এই প্রথম অমূল্যাবাদের দিকে সপ্রসঙ্গে দৃষ্টিতে তাকালো।

এতোদিন হিমায়িত জানতো লোকটা এই বামারে ভালোই কামাই করছে বটে কিন্তু আসলে একটা পত্নী, এখন কিন্তু কথটা উঠেছে করে নিতে হচ্ছে না, এতোদিন যা ভেবেছি, অমূল্যাবাদ তা নয়, বর্ণিসংস্থ আছে, না হলে হিমায়িতের টাকার দরকার আর সব সময়েই দরকার এই খুবই জরুরী কথটা অমূল্যাবাদ কি করে চেনে পেল। হিমায়িত অমূল্যাবাদের পায়ে পড়বে? 'আইরি' অমূল্য। তুই একটা জিনিস।' বলে অমূল্যাবাদের গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। দুই ভাই আবার হয় নাকি? করেন অনেক বড়। অবশ্য করন আজকাল আর 'কান' বাধা নয়। আজকাল তো শূনি ওসব কেউ মানে না, অনেক হাটুর বরসায় ছেলো যো হিমায়িত দেখেছে প্রবীণ কাছিরে কাঁধে হাত রেখে নাম ধরে কথা বলছে। প্রবীণ ব্যাটিটিও ইয়াং সাজার ব্যাটিকে সেসব ফন্টিনিস্টও বেশ আলাও করছেন। তা করুন। হিমায়িত ওসব পারবে না। ওই মনে হওয়া পর্যন্ত এর দৌড়।

'আপনি এক কাজ করুন না। এখনো তো দৌঁর আছে। আজ সোমবার। তিক চারদিন পর 'স্টোর'এ 'রজনী' হচ্ছে। এ জি বেঙ্গল অফিস কম'রা ওটা করছে। আপনি ছটার সময় গিয়ে নাটকটা দেখে এসে তারপর দিন অফিসে যখন আসবেন তখন ফেরার পথে লেখাটা জমা দিয়ে বারেন এখনো ব্যাপারটা বুঝলেন?'

হ্যাঁ। তা আমি খুব পুরী।

'পারেন না। লেই কবে এসেছিলেন। তারপর মাঝখানে আপনার কোন পাতা নেই। আপনার কথার কোন তিক থাকে না।' বলে অমূল্যাবাদ হিমায়িত দিকে স্থির চোখে তাকালেন।

আঁ, এও জেনে গেছে। বস্তুরা এমনকি প্রভা এমনকি অজোড়কু ছেলে বাকো—সেও বলে 'যা বা ভূমি কথা দিয়ে কথা রাখো না। হাড়ি কিনে দেবে বলাইলো, দলখানা আঁক করলো। দলখানা করলাম। ভূমি হাড়ি দিলে না। তোমার কথার কোন—'

এখন অমূল্যাবাদও সেই কথা রিপট করছেন।

এক আধবার হঠাৎ কথার খেলাপ হয়েছে, তাতেই অতো বড় একটা নিশ্চিন্ত নিয়ে ফেললেন?'

এক আধবার? অন্তত বারো তেরো বার তো বটেই। আপনাকে নিয়ে মৃদুকিল জে এই। বললেন বাবো নিশ্চয়ই বাবো, কত'ও নিয়ে নিলেন সঙ্গে তারপর কোন গাল'ফ্রেডকে দিয়ে দিলেন। আপনার তো এ সব মেলাই তারপর তাদের মূখ থেকে শব্দে ভাষা মিথো কথা ভাষা সত্যি বলে চালিয়ে দিলেন। এই অভ্যাসটা ভালো নয়।

ব্যাটা কি করে জানলো? হিমায়িত আহাশ্মক বনে গেল। আজ অমূল্যাবাদ, যা বলছে তাই নিশ্চয় লেগে থাকে। সত্যি এ রকম সে দু-চারবার করেছে। তবে ওটা তিক নয়, তার কোন গাল'ফ্রেড টেনে নেই। অরুণের শ্রী কত। কলকাতার আসে দাঁকপীতে গান শিখতে। ওকেই বার কতক কত' দিয়েছে।

'আপনাকে নিয়ে অসুবিধে তো ওই। আপনার কথার—'

বলে অমূল্যাবাদ বাক অশ্লীলতা রাখলেন। ব্যাটিটা ভরাট করবার জন্যে বার কতক চুলহানি মাথাটা নেড়ে ফেললেন। হিমায়িত গেট কাটটা চেয়ে নিলো। তারপর ও'র চোখের দিকে পূর্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটা কথালো গলার বলল, 'এবার ফেল হবে না।'

না হলেই ভালো।

অমূল্যাবাদ হিমায়িত দিকে আর অকাবে না। টৌকলের ওপর পাতা প্রকাশ্য ব্রিট পেপারটার ওপর পেন দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে একাধি মনোবেগে রেয়েমানুষের প্রসিদ্ধ অঙ্গপতঙ্গালি অঁকতে লাগলেন। হিমায়িত হাঁক ছেড়ে বাঁচলো। এ অফিসের সবাই জানে। ওই রেয়েমানুষের শরীরের বিভিন্ন পার্টস আঁক মানেই হচ্ছে সম্মতির লক্ষণ, উনি অনুমোদন করলেন।

.....আজ সেই পুত্রবার, আজ সন্ধ্যার 'স্টোর'-এ 'রজনী'। যদিও অনেক অনেক দৌঁর তবু সাবধানের মার নেই। তা ছাড়া অমূল্যাবাদ, যে রকম ধরেই গিয়েছেন... অতএব একবারও অন্তত যেন কথার তিক থাকে। বেশ একটা, সকাল সকাল মানে ওই ধরা ব্যক্তি এগারোটা পাঁচের বায়েল্ড লোকাল ধরে হিমায়িত হাওড়া যাবে, সেখান থেকে এসপ্যান্ডেড, এসপ্যান্ডেড থেকে লালবাজারের কাছে 'মোনা'লিসা' অফিসে, আগেভাগে গিয়ে অমূল্যাবাদকে চেহারাটা একবার দেখতেই হবে, উল্লসনা কলা বিফোর টাইমেই এসে গোর্জ মশাই, আর এনি এনি অর্গানি। থিয়েটার দেখতেই এলাম। না হলে কোলকাতা ট্যাঙ্কেতে সাধ করে কে আর আসে এই গরমে। আজ তো আমার অফিস বস, ফাউন্ডেশন ডে। মাড়োয়ারীরা এ সব খুব মানে। দেবদ্বিক্ষে ভক্তি আর হচ্ছেও তার ফল ভগবান ছাপ্পর ফড়কে চিঙ্কেন। দেবদ্বিক্ষে মনে করে ফাউন্ডেশন দিনও মানে আর তার জনোই আমার একটা নীট হুটি পাওয়া, যেন নীট একটা বোতল মেরে দেওয়া, হা—হা—হা।

এই বোতল 'টোতল' নিয়েও হিমায়িত বেশ একটা নিজস্ব ধরন আছে। না, সে হালেকালে ধর্মতলা বা পাক' স্ট্রীটের কোন করে হানা দিলেও ওসব বহুকাল ও ছেড়ে দিয়েছে। ওখানে মেলাই ভাড় সত্যিকারের মাতাল একটাও যায় না, অথচ মাতালমোরে ভালার অশ্লীলতা, মাতালমো আর ভাতলমো, রাবিশ। তার চেয়ে হিমায়িতকুমার সোনাছেলেটি হয়ে শূঁড়ির দোকান থেকে (হুগলীতে কলা থেকে খুব ভালোভাবেই একটা জিনিস টেঁজে হয়।) মালটি কললমোবা কবে, লগে মচচে মাছভাজা, হ্যাঁ, একা কইক, দোকা আর এই কেয়েসে—, বাই হোক সে সব নিরু সোজা কোন গ্রামের ধারে, জেলম মঠের মধ্যে, গাছপালা। ছারাক মধ্যে মাখাটি কাং করে আর গোটা দুরারীত শীতকালের জমকালো জোড়ো। ফেলে রজন হিমায়িত (তখন রজা হাড়া আর কি।) লে এক এক টুকরো মাছ ভাজা দাঁতে কটিকে আর মনে বোতল মূখ দিয়ে চুক চুক করে টেনে থাকে, আহা ভাবা যার না, মৃদুকিল মৃদুকিল।

.....তা পান হিমায়িত শেষ করে উঠছে, কাকোকে একবার ব্রাড শুলে দিয়ে আসতে হবে, এখন থেকে শব্দ হল হুগলীভাড়ার পালা, নিশ্চয় ফেলার সময় পাওয়া যায় না, খালি একটার পর একটা কাজ মনে বায়েল্ড টেনে মনে একটা পায়েজার টেনে ইন করত না করতেই আর একটা পায়েজার টেনে নিয়ে আসে যাবার জন্যে পড়ি কি হারি হরে তৈরী হওয়া। এই সব সময় মনে হয়, ভালোরে তোর সোনার। তেজ কাঁথার আগুন। সকলের মূলে তো ওই কথাই, লেভ, মেয়েমানুষের পাশে দুঃশব্দ মেয়ে। লোভ, আর তার ফলেই তো হঠাৎ অশ্লীলতা আর কতট, তিক কিন। মেয়েমানুষ পৃথিবীতে যদি না থাকতো তবে তো তাকে নিয়ে শোবার লোভও থাকতো না, না ইশ্বক। নামক ভুললোককে এমন অনেক কাপার আছে যার জন্যে তিক প্রশংসা করা যায় না।

সোন, কাকারের বাছে তো; ওই লগে দ, কেঁজি চাল এনে।

আজও হিমায়িত লক্ষ করলো প্রভা কাকারের কথা, চালের কথা বললে বটে কিন্তু বলি দুটো হাতে দিয়ে গেল না। প্রভা কোন কাজ পুরোটা করতে পারে না, ব্যাটিটা সে হিমায়িতের জন্য রেখে দেবে। কথা না ব্যাটিকে হিমায়িত হুক থেকে থল নিয়ে বলল, 'পরশা?'

হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই ড্রেসিং টৌকলের সামনে আছে। কোন্ পরশা ঘেরো না। পোন আছে। পোনো যে থাকে, আছে হিমায়িত তা জানে। সে পরশা মারবে কি, তারই পরশা। সে পরশা মারবে। কিন্তু এই সোজা কথটা প্রভাকে যেকোনো বুঝা। হাড়ীতে যে কিছু কাজ করে তোকে আগাধি বিকাশ, ও চুরি করতেই পারে না, আর হঠাৎ অসুস্থিতি কাণ্ড নাকি এককো হিমায়িত করতে পারে। তারই পরশা সে মারবে, উল্লস হঠাৎ চিন্তা। কাকো সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। 'কাকো, আমি দেখছি, ভূমি কতো পরশা নাও।' বলে ফিক ফিক

ক' হালদে। মনে হয় হিম্মতির, ককের গালে ঠাস ঠাস করে ঢুক মরে। ও ও কিন্তু তাই চার। চকু খেয়ে এমন কান্ড জড়ো সেবে যে ইন্দুর কাষর চৌহান পর করে সেবে। চকু ওইই দুখিধ কেকর। তারপরেই ও সোজা চলে যাবে গুলি নিয়ে মাঠে, সেখানে গিরে 'কুল' আর 'পাই', কাল রঙ্গ, কান্টের গারে—এই-কন করবে।

হিন্ট তিনেকের মধ্যে ঠেরি হয়ে বাকের সাইকেলে। রড বসিয়ে গুলি পার হলে কাকের কাছে এসে পড়েছে হিম্মতি, বাক বাবা, বাম দিগে জুড় হাড়লো। আজ আর কালকের মত কোরাপরেটের সামনে কেরোসিনের লাইন নেই।

কাল জোরে হিম্মতি যখন গল্পার চান করতে থাকে, হঠাৎ দেখে অতো ভোটে কোরাপরেটের সামনে প্রায় দুশো ডিনলো হোটেল ইট আর টিন আর কোডল পাড়া, তারও পেছনে এ পাড়া ও পাড়ার বেশ কিছু ছেলে। কি আপার আতো ভোরে না, ডানলপ থেকে বারা দীকট ডিউটি করে ফেরে রাত দুটোর সময় তারা কাড়িতে এসে বলে, 'ওরে নৌড়ে। এই মাইন দেখে এলাম কোরাপরেটের সামনে তোরের একটা গাড়ি। দের করলে লাইন জাম্প হয়ে যাবে। বা, যা, অনেক দুয়োহিস। এখন লাইন মারগা জ, লাইন। দেড়ো। বলে টেলে তুলে দিয়েছে ছেলগুলোকে। ওদেরই মুখ থেকে শোনে তাড়াতাড়ি করে আসতে গিরে ওদের একজন নাকি কেরোসিন তেল নেকর জনে আসত একটা মটির কুজো নিয়ে চলে এসেছে। না, আজ আর সে কথাই নেই। কোরাপরেট এখন ফারার জ্রপ করে ডেড ইজিন হয়ে গেছে। না, কপাল ভালো, একটা বজাট ফেস করতে হল না। কিন্তু ওই যা, তুলে ধরে দিয়েছে হিম্মতি। বাজার করতে এসে দুধের বোতলটা রেজই আসে লগে, আজ ককের তাকি কিনা, এগারোটা পিচের গাড়ি ধরতেই হবে, অতএব কপালগুস্তে বকে। যেতল আনতে তুলে গেছে।

ওরিকের হরিণঘাটার দূখ আসার দিন আজ মিলক বার-এ। এর মধ্যেই লাইন পড়ে গেছে। বহবা, বাহবা। দেবোটা ডিউটকল চলেছে। খালি লাইন আর লাইন। গোটা দেশ জড়ে এসব হচ্ছে কি? মনুষ্যকে খালি বসন্ত রাখার বাসনা! খাল পাগল করে দেবার মতলব? মনুষ্য কে একটু রসে। কথা বলবে, তেমন চোখের দিকে তাকিয়ে একটু রস থাকবে, তার আর উপার রাখলো না। হারমজাদার, হা, দেশ চালাচ্ছে, সরকার চালাচ্ছে খাল 'পুকা' আর 'পুকার' খাল আওলাক, খাল আওলাক, খাল পুরের কথি বন্দুক রেখে—

যা, এক হল। শুলের সামনে হিম্মতি এসেছে আর ভুস ভুস করে। সাইকেলের চাকার পাশপ বেয়ে গেলে কব জন্ম হয়েছে দেখে বাকো খুব খুশি। ড্যাম প্ল্যাড দাক বলে। খিল খিল করে শরতানের হাসি হেসে বলল, 'যেমন আমরা সাইকেল নাও না আর বাক মোটা কা' হিম্মতি ডান হাতটা তুলেছিলো মারবার জনো। বাকো হাসতে হাসতে ছুটে পালালো। কি আ করবে ও, ও সাইকেলটা হটিতে হটিতে মনের বোকানের সামনে নিয়ে এলো। মন মাথা নীচু করে বাট দিচ্ছিলো। মুখ না তুলেই ওর নিজস্ব লাগোয়েজ আরম্ভ করলো।

এই সাত সকালে এই সব আরম্ভ করলেন তো! অনেকবার অপনোদে বলি লিক টিক হলে একটু বেলায় আসবেন। এসব ভাির কজারের কাজ। এখন শালা খাল টায়ার খোলো, ডিউব খোলো। তারপর সলটুইন মারো। খাল খোলো আর মারো। ওই দেখুন, কলতে না বলতে ওই আর একজন, উই, কলতে হকে না, খুব দ্বীকটি, তোমারও লিক। বাস, আমার আজ আ। করে খেতে হবে না। অম টেলো।

মদনের কথা শুনে হিম্মতির হাফটিশ জুড়ে গেল। কিন্তু কোন উপায় তো নেই। ও সাইকেলটা টেলে টেলে ওর সামনে এনে দাঁড় করলো যতে নিভাত হরণ করেও মন যদি একবার নজর দেয়। মনও ও জহুরির চোখ দিঃ একবার তাকিয়ে বলল, 'এ, এ তো মেরে এনেছেন। এর আর আছে কি। কারোটা পাঁজিয়ে এখন আমার কাছে নিয়ে আসতে হয়।' অনেকটা ডাকার চোখ বীর মত। গাভারবাবুর কাছে গেলোম। উনি একটু পেট টিপে অন্দান বদনে বললেন, 'এ, করছেন কি। এখন আসতে হয়। এতো লেজ করে এনেছেন। গরুরে তো কিছ নেই। শরীদটা তো মশাই রেখে। হাক্সে বানিয়ে ফেলেছেন।' চা মদন কিসে কমতি যায়। সাইকেলের লাইনে মদন আমায়ের গাকর চৌবয়ী। হিম্মতি হন হন করে বাজারের দিকে গেল। খুব লম্পটভাবে না হা, আবছাভাবে তার খেলা সে খার করে দিগেছেন, হিম্মতি যেন পরিষ্কার লুতে পারলো। কোন সন্দেহ নেই, আপারকটম-টটা যতে রাখতে না পারত তাব মনে চোমটা এখন থেকে আরম্ভ হয়েছে। নইলে কাল রাতে হিম্মতি যখন বাড়ি এলো রাত দশটার (প্রভা বল রা চরে)। তখন সাইকেলের দুটো চাকার পাশ টাইট ছিল। আর আজ সকালে, কোথাও জার্মান, রাস্তা পরিষ্কা পিচের, পান খস নেই, একটু আগে রাস্তার ঝটি পড়েছে, শুল পেটের সামনে বলা নেই ওরা নেই আর্ন ভুস করে পাশ চলে গেল। এসব জার্মান এমনি। কোন উদ্দেশ্য নই? কোন চম্ভাত ন? অথবা এখানে অনেক দেরি। সেই সখে ছোটো এতো গাড়াটাড়ি জটক করাটা ঠিক নয়, কিন্তু সাইকেলটা এতো তাড়াতাড়ি লিক না লেই তো পারতো। লিক হািস হািস এগারোটা পিচের ডাউন ট্রেনে ওঠার পু তিস। তাও তো হতে পারতো। কিন্তু তা হলো না। একি এমনি এমনি।

অন্য আকিছটা সর্বাধে আছে। বাজার থেকে ফিরলেই অন্য অন্য দিন কো বলে, ওয়া। একি এনেছো গো? তোমার মত শ' টকে কোন আর মোচা। যাও ও, ফেরে গিরে এসো গে বাও। অথবা ঠিক যেটি আনবে সেটি বাজারের খলি ব

দুখ লড়ায়ে হিম্মতি বলা চেষ্টা করবে, কিন্তু আল, বেগুন, উইজ টাফি—কিন্তু প্রভা, ওসবে কানই দেবে না। তেমন কানই তার নষ্ট। সে 'পটল'কে লেগে থাকবে।

আল, বেগুন, উইজ, টাফি এগুলো পটল নয়। মও দিক কোরো না। পটল নিয়ে এসো।

'পটল কি না আনলেই নয়?'  
না। পটল না আনলে পোস্তর পিণ্ডি আমি কি দিগে চটকোবা।  
ওরে বাপরে। এর পর আর কি করে অকিবাস করে হিম্মতি যে যদি এ পট না আনে তা হলে প্রভা হিম্মতির পিণ্ডিই চটকে দেবে। হ্যাঁ, সে প্রতিভা প্রভ কিলকশ আছে, কোন সন্দেহ নেই।

না আজ আর এ দশটি ফি। আসছে না। সে গড়ে বাজি। কা সন্ধ্যার সময় হাফ বাজার হিম্মতি সেয়ে রেখেছে। বাজার থেকে ফেরার প রেল বাজারে নেমে মাল গন্ত করছে। কেবল মাছটা আজ সকালের জন্যে রে দিয়েছে। মাছের খলটা হাতে হিম্মতি তাড়াতাড়ি বাজারের দিকে বেতে লাগলে বাসতার দক্ষ 'দিক থেকে চুচুড়গামী' চার নম্ব। কালটা হন বাজার বজাতে আসছে। কালটার উত্তর মুখ থেকে এসে হারিণঘাটার দূখে। পাড়িটাও প্র বড়ের কাছে এসে হন বজাচ্ছে। মাখানো ঢকে গেছে কেরোখানি রিক্সা রিক্সা ভান। আর সংকীর্ণ, খোয়া ওটা পিচের রাস্তাটিকে দ দিক থেকে সঁড়া আক্রমণ করেছে যতো জোর কোপারীরা। এখানে ঝাঁক, ওখানে খালি কেউ আর পেম্বা-বসুন-আদা, কেউ আপেল-কলা-আমুর সাজিয়ে বেশ জম্পল এক বসে গেছে। এরই ফাঁকে ফাঁকে মাছের চার চারটি আড়ত। একটা কঠা, একটা কোশ, বোঁগির ওপর একটা হাতখাল। বেশ হয়ে গেল এক এব গমুট। একটা কোশ, বোঁগির ওপর একটা হাতখাল। বেশ হয়ে গেল এক এব আড়ত সেখানে অনারত (অনবরত) মাছ খড়কো কেনা হো হাচ্ছে। ফলে হো রাস্তা জগে আছে সেটুকুও জল থই থই করে নাচছে। জল কাশা মাড়িয়ে 'হমা বাজবে চকলো। বাজারে ভেতর এককরে সামনে টিনের চাল নিয়ে ঘেরা জল নিকর।' বটি পেতে, মাছের গরুর দাপকাঠি হিঁদিয়ে কস গেছে, তাদের এ পালে মাছ রাখার তালা কোলোনে প্রকাণ্ড প্যাংক বাজ, অল পাশ ভিজে নে আর খরবে। কোথাই ছোট চুপড়ি। ওরা খন্দেজের দেখেই এক একটা মাছ ঘা করে কেটে ফেলেছে। কেটে ফেলা। পর তার থেকে রক্ত নিয়ে আর আর হেসব ম ট কয়ে টুকরো করে কাটা আছে তাদের গায়ে বহু ছিটিয়ে দিচ্ছে। বটিতে ও লে আছে রক্তের দাগ। প্রথম হিম্মতির গোষ্ঠী নিকর দিকে নজর পড়লো। গো হেসে 'আসন বাব' বলে আপায়ন করলো। হিম্মতির মনে হল প্রভর মত গোষ্ঠী ঠিক কোর এই লোকটা, বাজারে যতো লোক মছ কিনতে আস তার ম সবেচক বোকা। এর গলা সবচেখ সবজ কাটা যায়। এমনকি বোকার হাত লোক নিজেই গলটা কাড়িয়ে দেয় কাটবার সাক্ষর জনো।

ও আসন বাব' আর কিছই নয় হিম্মতি যেন পক্ষট শুনলো, আসন ন গলা কাটবন তো? ওই তো রক্তের বটি। এমন কাসজাল কাটবে যে টেটটি পনে না। এই মাছ কেনা নিয়েই প্রভা কমপক্ষ দ দবার রোজ গণে গণে তাে বাজারে পাঠার। আজ হিম্মতি ওর সখে ছোটর এনিগজমেন্টের কথা ভাবে গো থেকেই কো সতক হয়ে গেল। কেননা একটা আগেই ও টের পেয়েছে, এক খোলা, খাঁ গোপনে হলেও, শরে হায়ে গেছে।

সাইকেল লিকের কথাটা হিম্মতি তুলতে পারছিলো না। যাই হোক, যাে সময় আর বাজার ভাবে নট না হয় সেই জনো ও তাড়াতাড়ি পোস্তর কাছে গি বলল, 'দাখো পোস্ত। একটা কথা বলছি। কেরবার চেষ্টা কর। থমকো চোে না।'

'এই ব্যাখো! পোস্ত হেসেই সারা, আপনি হচ্ছেন বাব। তার উপর আপ হকেন খন্দের। খন্দে, মানে নক্ষু।' খন্দেরের কতার দাগ বে কতখ সে জ নি'কারি ব্যাটাই লায়, বখলেন কিনা।'

'না, না। কাপাকটা আগে শোন। তোমরা জো ংকজরও খন্দেজের গ চোপাও।'

গোষ্ঠী মূখটা হাঁ হয়ে গেল। সাতসকালে লোকটা বলে কি ব্যাখো।

আবার কি ধরনের কথাবার্তা!  
'তোমরা ওজনে মারো, দামে মারো, মাছে মারো, ঠিক কিনা।' অনাধিন কর তা কর। আজ তাই তুমি মেছে নাও, তিনটের মধ্যে কোন দুটোতে দু লম্বার মারবে। একবার তিন তিনটেই মেে। না? ঠিক আছে।'

গোষ্ঠী হাঁ হাঁ করে বলতে গেল। কিন্তু হিম্মতি আজ মরীয়া। তাকে স সক্ষপ করতেই হবে। সে আজ কিছইই দু দুধর বাজার আসবে না। হাত তুলে বলল, 'আমার বলা এখনো শেষ হয়নি। তুমি যখন আমার শত টে রাকী তখন আমার একটা অনরোধ ংখো। তুমি ওজনে মারো, দামেও মাে কিন্তু মাছে মেরো না। আজ যেন অনাধিনের মত পড়া মাছ নিয়ে বাড়ি যে না হয়।' বল আমার কথাটা বেশ ভালো করে বুকেছো তা। গোষ্ঠী মুখ হাঁ করে বলল, 'এ সব কথা কি বলছেন গো বাব। মাইরি, এই বটি আর ' হায়ে লছি, আবার কিরে—'

যাক, যাক। ও সব কিরে ফিরে যাক। আমি তো তোমার কাছে সারেন ওর'ছ, তার ওপর—'

'ওসব সালপাড়ার মালপড়া। গুলি মারুন। আপনি এই মাছ নিয়ে বা এককরে চমচ মাছ, খেয়ে বলবেন যে পোস্ত মিছে হলনি।' তা' বাব' কত টে পিচেন?'

পড়িয়ে মাল শিল্পে আবার মনোহর হিমালয় নর, কড় জোর কাটা ফেলন হওয়া কি জড়াই শো নিয়ে আর তবু পড়িটা লোকের সামনে বৈশিষ্ট্য কলহে পেরে, তাকে টাইট খাওয়াচ্ছে। আর লোকগুলোও বাইরে তেমন। অপরের মেন্দ্রা দেখতে পেল আর কিছু চান না। কতকাল লোকাল ফেল হর হোক, কিন পরনের এই একজরটা মেন পড়ে। হর, একটি ফোটাও ফেল বাক না যায়। হিমালয় কলতেও পা ছে না যেন, পা ছে অতটা নেন না। আবার নেন কে কলতর সে জোরও নেই। যাটা নিকর, সেও কিন তাকে মছের মত কুটেই।

কিন্তু হিমালয়ও কম নয় না। সেও বে গোষ্ঠ। ককাজটার বোকা বনে গিরে দল দলটা করকরে নোট ওকে দিয়ে দেবে সে বালা ও নর।

ও কল ধীর শিল্প হরে বলল, 'কতোটা মাহ নি, তা তো তুমি জানো। রোজ বা নি তাই দেবে।' ঊহ, ওখান থেকে নর, কাকরই ল্যাঙ্কের দিক থেকে মল গছাবর তাল তোমার। তা তো আজ হচ্ছে না। মাকখান থেকে কাটো। মাকখান থেকে।

হিমালয় মালাটা ধলিতে ঢুকিয়ে মদনের সাইকেলের দোকানে এসে ডাকলো, 'মদন!'

মদন দোকান থেকে বেরিয়ে এলো হাতে হাতুড়ি নিয়ে, ঐষ হয় সাইকেলের টাল ফাল সারাইলো, বললে, 'একটু ধরে আসুন। কাক-টাক্সগুলো সেয়ে নিন না। ততক্ষণ আপনার সাইকেল রেডি হয়ে যাবে।'

দেখেছো কান্ড। এখনো সারারানি। না, নির্ঘাত এগারোটা প'চ ফেল করিয়ে ছাড়বে। অবশ্য এখানে অনেক ধরে। এখন কটা? হাতে ঘড়ি রাখার অভ্যাস হিমালয় নেই। পনেরো বছর আগে একটা ছুল করে ফেললে, এখন আর শোষণবার উপায় নেই। প্রত্যেক হিমালয় দিয়ে করে তখন ও কমা নিলি ছিলো। একটা ভালো কিছু করবার জন্যে টগবগ করে ছুটতো। মাঝার তখন ওই এক 'কারা' ঢকটিছলো, পণ নোব না, ঘড়ি, আর্টিং, সাইকেল কিছুই নোব না। ওই কারারই সম্বন্ধলটি করলো। তা না হলে প্রভার বাবা তো সবই দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন হিমালয় ক'চাখগা কমানিট, হেকে বসলো, কোন কিছু নোব না। ঘড়ি নেওয়াও তো কিছু নেওয়া হল। তাই বা নোব কেন? আপনার মেয়েকে কোরা শাড়ি পরিয়ে পাঠিয়ে দিন। তাহলেই হবে।—বাগরে, কি ভরানক আদর্শ'বাণী। কি একখানা 'পুকার'। যখন দু'নিয়ার মরদুর এক হো।' এ সব 'কারা' না ঢকলে তো ঘড়ির টাইম জানবার জন্যে আর লোকের কাঁধর দিকে তাকাতে হয় না। পাল দিয়ে পাড়ার রামরতন ভুজাওয়ালার ফের নিয়ে থাকে শ্বক্লে, ঊহ টিফিন টাইম, তাই বোধ হয়। হিমালয় হাত কাঁকা কিন্তু ভুজাওয়ালার হাতে ঘড়ি, ও লন্ডার মাথা খেয়ে জিগেস করলো, 'হারে রামরতন, কতো ভোর ঘড়িতে?' রামরতন ভুজাওয়ালার ডানলপের অপসক্রে মত ক বজ উঠে ঘড়ি দেখে গম্ভীরসে বলল, 'আপনা। কতো দরকার?' বাটা, ছুটিস তো এ ইস্কুল। বোর্চস তো 'টিচ' কারেট আর তে'ফুলের গোলা, তার আবার সাজের কি ঘটা। জামা প্যাণ্টেরই বা কি বাহ্যর। কিনেছিস তো রিডাকসানের মাল, তার আবার ফুটানি কতো? পরকেট গম্ব-রু'মাল, হাতে ঘড়ি, বাটা 'সব'হার। এখন 'সব'লোটা হয়েছে। এদের নিয়েই না এক সময় হিমালয় খিডাং খিডাং বোলে কতো মাসলে তাল ভুলেছিল।

'আটাটা হবে?'

'হা। অটটা কেজ প'চ মিলান।'

না। বোঝা অবশ্য খুব একটা হরানি। অঘটন না ঘটলে এগারোটা পাঠের লোকাল না ধরার কিছু নেই, তবু হিমালয় মদনকে ফের জিগেস করলো, 'ঠিক কতোখান লাগবে, মদন?' হাতে তেলমা'ল লাগিয়ে মদন যেন কপাড়ার জন্যে ঠিকঠিক ছিলো। পাড়ার ছেলে তাই স্নেহও কোণী। বললে প্রায় মূখ 'খিচিরে, আমি কি আপনা। হুকুমের চাকর ঐ মছের কথা খসাতে না খসাতেই করে দিতে হবে? মদন, মদন। মদন কি কলতর। এ যে দেখছি ওঠ ছুড়ি তোর কিয়ে করে ছাড়লেন?'

মাথো কান্ড। বোক ঠালা। কোন কথা থেকে কোন কথা। ও বেন পায়ে পা দিয়ে বগড়া করতে চায়। মদনের কথার জবাব হিমালয় ঠোঁটের আগার এসেছিলো, বললেই কলতে পারতো, 'মদনকুমার, নেহাতই আমি তাই। তাই ছালাটা আমার ওপর বাড়লে।' কিন্তু হাত ঘাঁড় কোন স্টাটাসজমা লোক, যে যদি হুকুম করতো দেখতাম তা হুকুমের চাকর হতে কিম্ব। তার বাচ্ মাটিতে পড়বার আগেই মদনকুমার, সেই বাচ্ তুমি চেটে নিত।' কিন্তু হিমালয় আজ কোন প্রেরানার ফাঁসে পা দেবে না। যে যতো ইচ্ছে বাক্যে কথা বলুক, হিমালয় পিঠে কেঁষেছে কুলো, কলনে দিয়েছে কুলো। কেননা ও ইতিমধ্যেই টের পেয়ে গেছে গোপন খেলা। চোরা-মার যে শুর, হয়ে গেছে তা ও বুঝে ফেলেনো। ও অভদ্র কথা না খাড়িয়ে বাড়ি-মখো হাল। আজ মনে হচ্ছে প্রভা মাহ নিয়ে মছব ছুড়তে পারবে না। গোষ্ঠ নিকরকে তো বোঝানো হল, মারে। অনেক রাত্তা মাদো না আমাকে, মেয়ে বড়লোক হও, কেবল আজ মেহেরবানি করে মছে মেরে না। কিন্তু হিমালয় বেশ একটু চিন্তিত হল। প্রিট পক্ষপক্ষে ও বেন অনড়ব করত লাগলো এক অদৃশ শক্তি তাকে এখন সোজাস'জি না ঠকিয়ে, একটু, বোরোপ'ষ, একটু, চোখ ইশারার কাত করে দিতে চায় বেন। মাছটা প্রভা ডালো মনে নিয়ে কিনা দেবে হরতো যখন হিমালয় ব্যাকুল এক সেইজনা সম্ভবক জখখালো পাঠের রাঙবে (না হলে তো গোষ্ঠে নিকর মত প্রভা তাকে আঁকবটিতে কুটেবা)। ঠিক তখনই, প্রভা হরজে মছের রাশতাই মড়ালো না, হিমালয় বাড়তে গিয়ে দেখলো প্রভা জানলার আরু'র জন্যে প'চ টাক্সে, (পেরনে কাঁড়তে তেমন

চোখলো পুর ম কেটে নেই বলই বোঝার আর টাক্সোয় এতো ধুম!) এক কারে, পাও তো হাতুড়িটা।' প্রভা তার প্রকমত এককমই বল, কেনন ও কখনও কোন কাজ পুরোটা নিজে ক তে পরে না, আখখানি হিমালয় জন্যে স্নেহ দেবেই, অন্যরসেই নীচ হয়ে খাটের তলা থেকে হাতুড়িটা নিতে পারে, তবু পুরোটা কাজ অভ্যাস নেই বল বা ক'কুর জনে অভার করবে। আহা, তা' ক ক। কল হিমালয় অভ্যাস। কিন্তু হিমালয় হাতুড়িটা এগিয়ে দিতেই হরতো প্রভা কোজাভায়ে বল বসলো, 'বাও জে চকর বাজ।' থেকে চারটে মূখ খোলা পেরক নিয়ে এসো তো। এদিকে তাকাও, ওদিকে আবার হা করে কি দেখো। ও জে একটা বাচ্ছা মেরে।' প্রভাকে কমা খুব রিস্ক, নারীর তুল এ জীবনে হারওয়ার নর। স তরাং মূখটা প্রভার দিকে খুঁরিয়ে বেশ সামলে সূমলে হিমালয় বলবে, 'বাচ্ছা বলই তো দেখছি। বড় হলো—'

'আ থাক।' বাচ্ছা আর ঘাড় মেরে নিয়ে গবেষণার তোমার বতো আনন্দ আমার ততো নর। বাও, চকর খজার থেকে—'

ভক্ত মানে আখখটার মেরে প্রভা হিমালয়কে ফেল দেবে। চকবজার অবশ্য তেমন দুরে নয়। কিন্তু আজকাল কোন জিনিসটা পাওয়া যাবে আর কোনটা পাওয়া যাবে না, কমা খুব মূখশিলা। কোনটা যে কখন আটট অফ মারকেট হরে যায়, কিছুই বোঝা যায় না। সবচেই লোডলোড। তা ছাড়া ইলেক্ট্রন পিসটনের মত নর-ক ছোটোছোটো তো আছেই। তেল যদি বা দোকানে পাওয়া গেল, দেখা গেল এক কোঁজ আ দু কোঁজ। টিন দোকানে নেই, তার জন্যে ছোটো লালা চুচড়ের। চিনি নিখোঁজ, চিনিতে লোডলোড এখনো। কিন্তু কে একটা উড়া বকর মিলে, ব্যাংকলে চিনির পাহাড় পাওয়া সক্ষে। ছোটোর রেস শুর হয়ে গেল। এই কেরে লাইকটা একম হল হয়ে গেল। কায় যে সরকার চালায়, কি খেয়ে ঝ টেনে যে সরকার চালায়, কেনই বা চালায় কোথা অ'শকল।

হা, হা। খালি পুকা, খালি পুকার। খালি আওরাজ আর ভড়কি, এইভাবে পাবলিকের কাখে কন্ড রেখে কতোদিন আর..

...বাড়ির পিছ। দিকের ঘরে ঢুকতেই হিমালয় দেখলো চণ্ডা সিমেন্টের স্কোরকের ওপর একটা কুরুর মরে পড়ে আছে। যখন ও বাজাে গিরেছিলো তখন সন্ধ্যারজা দিয়ে গিরেছিলো, পেছনের দরজা দিলো তো নর, তাই চোখে পড়েনি, এখন কোথ ঠালা। এগারোটা পাঠের গাড়ি ধরবে ধরবে ক'রে নাচাইলো হিমালয়-ভুজা। এবা কুরুর নিয়ে নাকানিহানি খাও। সম্ভবক অনেক কিছুই ভেবেছিলো হিমালয়, কিন্তু সে কি কুরুরের কথাও ভেবে ফেঁপেছিলো? একম অবশ্য বক ঘটনা শ'খ শ'খই ঘটলো? এর পেছনে কোন উদ্দেশ্য হেই? কোন দৃঢ় সংকল্প নেই? যাতে সে এগারোটা পিঠের গাড়ি ধরতে কিছুতেই না পারে তার জন্যে এটা কি একটা মরাজা চেঁচা নর? সবই হতে পারে কিন্তু হতে পারে আর হওয়া এক জিনিস নর। হিমালয় হাতে এখনো প্রচুর সময়। সম্ভো ছটা, সে কি সোজা সময়? এগারোটা প'চ যদি কুরুরের কারণে ফেলই হয় তব সম্ভো ছটার আপপেটমেণ্ট রক্ষা করার জন্যে মাকখান অনেক গাড়ি ধরবে। এতো কাকডাবর কি হল? হিমালয় নাইলনের ধলি হাতে ওপরে গেল। না, প্রভা মাহ সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলো না। সে তখন বাড়ির অটটা কোমর পাক দিয়ে খুঁরিয়ে তল্লর হয়ে বলকাটি দিয়ে সিনা-এর কুল বাড়ছে। বেঘর প্রভা কুরুরের কাশারটা জানে না। ও ওশ। মিকে মূখ কপেই বল, 'গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি'র শাখা এসেছিলো। ও যে গো, মার ওপরে তোমার একসময় ক'ক দুর্বলতা ছিল।' হিমালয় শব্দটা-প্রসঙ্গ কেন সচেতনভাবে এ'করে গেল, কাল, 'গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি'। সেটা আবার কেডা? ওহো ব'কোই। তা' তোমার তো মেরে নেই।

প্রভা কিছু বাক্তে না পেয়ে বলল, 'মেয়ে হেই তো কি হয়েছে?'

'মেয়ে আসের থাকে তা' মহিলা সমিতি করে। করলে আখেরে কাজ হয়।'

'আখের?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। মহিলা সমিতিতে থাকলে মেয়ে পাক্তর জুটেই অসুবিধে হয় না। তখন ক্যাডার পস্তর পাওয়া যায়।'

'মাগো।' মূখখানকে বতোটা সম্ভব কুছিত করে প্রভা বলল, 'বাটা মাজে ওইসব কাডার পাস্তরদের। যদি আমার মেয়ে থাকতো তাকে বা' কি খাই মেয়ে কোমডাম তব, ক্যাডারকে পাক্তর করতাম না। মাগো। কি সব এক একজনের ছাঁর। কতো সব... চোরাল চ'কে গেছে, কতর বাড়ি বেঁচিয়ে গেছে, চোখ ঢুকে গেছে কতালে, তার ওপর আবার উপল দস্তর কাকুর চিবুকে এক চিলতে উড়ন্ত মাড়ি, মাগো।'

সে বাচ্ছ। কিছুতেই তো খোঁজ রাখো না। বাড়ির পেছনের দরজার একটা কুরুর, অনেককম মরে পড়ে আছে। হারামজাদা কুরুরটা আর মদনর কায়র ক'কো শোল না। মরবি তো মর আমারি সন্ধ্যার সামনে। এসব জেনেশুনে শব্দটা নর?'

'ওমা, কুরুর। পা ধরোছো? জামাকাপড় ছেড়েছো?' প্রভা কুলকাটি দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে এককরে হা হা করে উঠলো।

বাও। মূখা এক করে। পা খাও। পা খাও। বেশ রুড়ে 'পেড়।

ওমা, আসে কলকে তো। এতোখানি প'চ মাড়িরে এলো? 'ছ হি।' কাকুর হুখে প'চ হতে হতে হিমালয় কাল, কুরুর রইলো পড়ে, তোমার খালি প'চ মেওর। কেন একখানি কাজ পেয়ে গেলো। এখন মরা কুরুরকে নিয়ে আমি কি করি?'

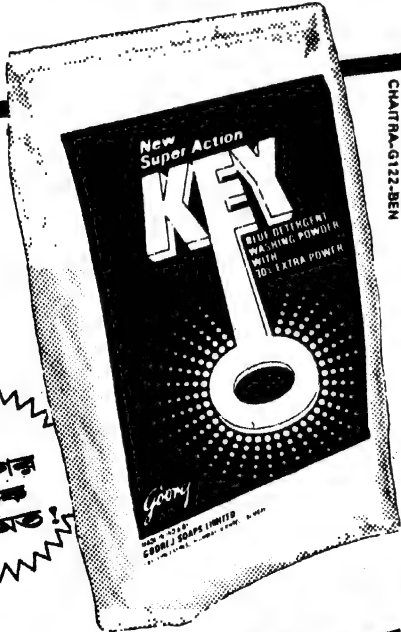


# ১/টাকা ছাড়

১ কিলোগ্রাম পলি প্যাকে

## কা লু ডিটারজেন্ট পাউডার

পরিষ্কার করার অতিরিক্ত  
ক্ষমতা অথচ অন্যান্য দামী  
ডিটারজেন্টের তুলনায়  
৩০% দামে কম।



CHARTRA-G122-BEN

শিশুসিদ্ধ  
সুপার  
সীমিত!

গোদরজে  
—এর উপপাদন

এক আবার করবে? এর ভাব করবে না গিরে মোগল! সাক্ষর মোকন থেকে সফল হ'ল কাতার হাউস কিনে নিয়ে এসে। গিরে এসে কুকুটার মত ঠাণ্ডে বেঁচে টানতে টানতে ডায় ডায় করে জমড়ে ফেলে দিয়ে এসে।' মল প্রভার হুপে অর্জন চাপ দিয়ে কি হাসি। রমেশ হুপে উঠে কিছু একটা জাবার জন্য হুপের উঠলো হিমালি, কাল না কিছ, বুধ সময় আর মোহা নট করে কি লাভ? এগারোটা পিচ তো ধরতেই পারবে না, সে কেন বোঝাই বহলে, এখন বাকেরটা পরভালিশও হাউস করতে না পারবে তবু তো সফল দিয়েই ফেলো। ও আর এক মুহূর্ত নট না করে দীক্ষিত পুরক এসে পড়লো। পুরক সোল হাতার নীচে এরকম সময় কাস্তিদা বসে থাকে, কাস্তিদা হচ্ছে মিউনিসিপালিটির জামিন, আর ওকে খিরে উচ্চড়ে। মত কিছ মেঝেরানী আর হাউসরানী; হু' একটা ডায়গড়ে নিয়ে অধর গাড়ি টাউন্ড বি-টি কলেজের দার ফেসে দাঁড়িয়ে থাকে। গাড়োরানী এই সময় চাপ, পাড় বেয়ে নেমে এসে হাউসরানী পিডমের ডেরার বসে একটা শূ'খা নেলা টেনে। কিছু কাল গুপে কাজ সব ভেঁা ভেঁা। সেল কোথায় কাস্তিদা আর তার লোকজন? এ তো হচ্ছে। হিমালি বাফলো, এক আর চোরা-মার নর, এবার বেশ স্পষ্ট একটা কাছা মেলেও তা হু'তে পরে, এবার একেবারে সোলাসুজি তাকে কেলে দেবার চেষ্টা কিছ ভেঁই হিমালি রাতে অ্যাপারটমেন্টটা রাখতে না পারে তার জন্যে শূ'ব জোরালো না হলেও স্পষ্ট একটা ধাক্কা। না হলে কোথা থেকে ছুটে গেলে একটা মরা কুকুর, আর জুটাই তো জোট তারই হাড়ির দরজার, তাও সদর দরজার মরে পড়ে থাকলে সকলেই হিমালি। নর পড়তো আর এতোক্ষণে একটা কবখা ঠিক হয়েই যেতো। এখন কি করবে হিমালি? শেষ পরিস্থিতি কি প্রভার কথাই কলে হু'কে? সে কি বাবে মোগল সাক্ষর মোকনে কাতার হাউস কিনতে? সে কি হাউস গিরে কুকুটার মরা ঠাণ্ডে বেঁচে তাকে টানতে টানতে—

হ্যাঁ। শূ'ব ওটাই করাই ঠিক, ওই মনোফরাসের কাজটা। হিমালি কম্পনা। চক বেতে পেলে, পাড়ার হোকরাগা হু'বে আশুল পরে সিটি দিকে, পললতর-বনা মাপাশের হাড়ির গরাদ-সেওরা জানলা কটামট খুলে বাছে, সেখানে নানা কলসের মেলে, তারা কেন তাদের আলাদা দেবতা উত্তমকুমারকে নিরীক্ষণ করছে এমন উচ্চ কোঠা হলে। সপো হিমালির দিকে তাকিয়ে আর হিমালি নির্ভরকর মনে, হাটে কিছ চেপে, কুকুরের মরা ঠাণ্ডে কাতার হাড়িটি কবে বেঁচে মনোফরাসের মত টানতে টানতে ভাগাড়ের দিকে আছে। অহো, এর চেয়ে সখক অক্সা আর কি হতে পারে? কিছু কাস্তিদা বেপায়া হয়ে পেল ন'ক? ওর আর একটা আশ্তানা আছে না? কি, কুরের ধারিত কিস ওখনকা। খালি জাপানীসের ও চরার। অহা, কতোরকমের রানী আছে নলসে। মেয়েদের অনেকই রানী। মেয়েদের সে সুবিধে নেই। মেঘবনের যে কাজ করে সেও রানী, মেঘরানী। এইভাবেই চাকরানী, গোরানী সবাই এক একজন রানী। তা টিও একটা রানী, প্রভারানী। হু, এসব সাহিত্যচর্চা কি এখন ভালো লাগে? হাটতে হাটতে হিমালি চাচের কাছে বিন্দু রায়ের হাড়ির দীক্ষা কাছে এসে গেল। কাস্তিদা এইখানেও খানিকটা সময় কাটিয়ে যায়। হিমালি লনবেই বিন্দু রায়ের কটকের সঙ্গে কাস্তিদার নাকি কিসকম বেন লটর-পটর আছে। থাকলে যাক লটরপটর। কাস্তিদা হাউস বিন্দু রায়ের হাড়ির হাউস কাটে জবে কার কি।

অহে, ওই জে, মেঘ না চাইতেই জল। কাস্তিদা স্বর দেবতার মত দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ধরে। হিমালি ওর অসুবিধের কথা কমা তখনই শেষ করেন, গেলে থেকে গাঁক গাঁক করে চাকরার কলটা আসছে রাস্তাঘাট খুলে ওড়াতে ওড়াতে ওড়াতে, কাস্তিদা হাক হুপে পরেটো আসাধ করে নিয়ে কাল, আজ জে আমি যাচায়। কিছই করতে পারছ না। আমার মেয়েকে নিছাটির হিউর-পড়া থেকে বেঁচে আসছে। তা। জোপাঙ্ক কতক, তাহাড়া তেই হিউরকে তো জানিন—

নিজের কটকেই জানি না তো কাস্তির বউকে। হিম হ'র, কাস্তির বউকে চকও ফাঁকি, অহানি বউ'ব হকো সেল। কাঃ করল। এরকম যখন ভাবছে হিমালি, তার নম্বর অসটা সামনে এসে গেল হু'ডমু'ড করে, কাস্তিদা প্রার চলন্ত কলটির কটকেতে পা দিয়ে বেশ চোঁচির কল, আজ আর কোন উপায় নেই না। আজ আর তুই মরা অসলা। কাল বা হর—

জি, মাল একখানি। বয়েলটা হিমালির হাঁক বহুর দশক করে যেতো তাহলে এ কবার উত্তর একখানি হিমালি রুতা থেকে আশুলা তুলে কাস্তিদাকে কেড়ে দিত। 'শুই এখন মল আগলা—ইয়ারারিক আর টাইম পেলে না। আর খেলে না। ঠিক আছে, এখন কল জড়াসে নড়ে—ওই মেয়ে দেখাই আর ওই জে কপ, সিঁড়িপে মাকা' ততে আধর জেড ব্রাক বেশ পাকা জ, কাদা দিয়ে খবলেও উঠবে না, ওই তো মেয়ে, কবার কলে হাড়ি। বাছা হাড়ি, মন্দর বাছা মনা। কাস্তিদার মেয়ে জে কাস্তিদারী হাড়া আর কি হবে। মেহাটির মিত্র পড়ার লোকেরা এক শেট খেরে লবগের কুচি নটে অটকে পা জল করে দেওয়ার ভাগাতে কবে, পেরে জলাবো। তার মানে খুই খুই লক্ষ্যকো। খিরে গড়ে বাসি। অহা, বেশ হলছে জে সে। যিরে গড়ে কাল, কখানি- রিপট ক লো হিমালি। কিন্তু তা না হয় হল। এখন মল কুকুরের কি হবে? মেঘবনক ডাড়ির মোকনের সলসে, কাস্তার ওপর খেঁড়ে বনা জমগহনক পরেয়া সেল। সব হু'বে রাসপহন অকপটে খুঁজা। করলা বাব থেকে দেখায় তার খব হিউরক



५७

কিন্তু, হিম্মত মনে মনে কাল, তখন আর করে তোমাকে একটা ছিন্ন ভিনে দেব। তুমি হলে তোমার আর একটা ধরন। তা হোক, তোমাকে সুখী করার জন্যে আমি পারি না কি। সব পারি প্রভাবলী, সব। মন উনার আর প্রসন্ন থাকলে কত কি কিছু দেওয়া যায়। পালসা তো আর লগে না। স্টেটিং মনে উইটনার থাকলে প্রভাবক বৃদ্ধি করতে মনে মনে হিম্মত অনেক প্রতিভা-তি দিয়ে কেলে। অনেক কোঁক খেতে গেলে অবশ্য হিম্মতির সে সব কক্ষ একদম মনে থাকে না।

কিন্তু একা। ক্রম আসছে না কেন? কতাকাল সে ঘাড়িয়ে আছে? কটা বাজে? পথচারী একজনকে ও জিগেস করলো। সাড়ে পচিশটা? সেকেন্স। এতোকাল হয়ে গেল তবু ক্রম আসছে না কেন? হিম্মতির ভীষণ ব্যাধি গেল। ও দরম। করে থামতে লাগলো। একজন ক্রম কর্মচারী গুমটির দিকে বাজে। তাকে ও জিগেস করলো। মোকটা কাল, লাইন এখন জাম্প। একটা গাড়ি জিক্সে এসে লাইনের ওপর পড়ে আছে। অপারি অনাকিছ ধরন। অনাকিছ, ধবছে? এমন ত পিক আওয়ার। অনাকিছ ধরন কি সম্ভব? হিম্মতির ব্যকের ভেতরটা গুরুত্ব। করে উঠলো। জেনলো? খেলাটা কেমন খেলল। যেখানে ছাড়ি মারলে একটা স্ট্রোকেরই কাজ হয়। সেকেন্সেই ছাড়িটা আমলে কিম্ব করছে। তার এনগেজমেন্টটা কি তাহলে নষ্ট হয়? কি এখন করবে হিম্মতি? সে তো স্টেটার হুটি কর্ত্তন সকাল থেকে। কিন্তু পদে পদে একটা নর একটা কথা, ছোটখাটো অথবা প্রকা, কখনো কিনা নোটিশে, কখনো নোটিশ দিয়ে, কখনো সংগেপনে কখনো খোলাখুলি, তাকে মারিতে কলে দেবার জন্যে মরীয়া আক্রমণ চালাচ্ছে। সে খবর সতর্ক ছিলো গোড়া থেকেই। তাই প্রথম বা দ্বিতীয় চোটে তাকে কান্না করতে পেরে। কিন্তু যেই একট, অসতর্ক হয়েছে ঠিক তখনই সেই কান্না কিরাত তাকে একটুও সচেতন হবার সুযোগ না দিয়ে বিম্বাধা তীরে সূতীক। ফলা তার। শরীরের রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিলো। কিন্তু তবুও হাতে আছে এখানে আশ্বস্তা সময়। সে কি এই আশ্বস্তা সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কটিয়ে দেবে? একবার শেষ চেষ্টা করবে না? একবার দেখবে না? ভেতর থেকে তাঁর একটা কাননা যেন তাকে মন্থনলে লোক-কোথাই একটা লোভ বসের দিক ঠেলে দিলো। হিম্মতি পড়ি কি মরি হয়ে বসে উঠে পড়লো। বসের লোকগুলো এই অবস্থার বা করে অথবা খবর খানিকটা উপদেশ দেবার ছলে গালগল্প করা, তাই করে নিলো আল মিটরে। খানিকটা বাবার প, ল্যান-ব্রাডের কাছাকাছি এসে কিছু আসটা ধরকে দাঁড়ালো। ওমিক থেকে রাস্তা জুড়ে মিছিল আসছে গগনভেদী চীৎকার করতে করতে। সন্ধাননাগ। এ মিছিল তো অন্তত মিনিট বিশেকের আগে পথ ছাড়ছে না। আর এখন থেকে 'স্টার' মিনিট পনের পথ। তাহলে? হিম্মতি আর চিন্তা করতে পরছে না। মিনিট কুড়ি সময় পথ হয়ে গেছে। হর একটা ছিটা না হয় হটোর কাছাকাছি। এখনো যদি চেষ্টা করে তাহলে সময় ছুটা নাগাদ ও 'স্টার'-এ ঢুকতে পারে। না হয় মিনিট পনেরো পেরিয়ে ঢুকবে। তাতে এমন কিছু মহাভারত অশ্রুধ হব না। হিম্মতি আর ভাবতে পারলো না। ও কল করে নেমে পড়লো। তারপ, কোলকাতার কে কাকে চেনে, না হয় ডাবলেই লোকটার মাথা খারাপ, ও রাস্তার নেমেই চৌ চৌ দৌড় লাগলো। কিন্তু বেশ ক' মিনিট ছোটর পর ওর চটির শ্রীপাটা ফস করে ছিড়ে গেল। দেখলে? জুতোর আঙুলটা একবার দেখলো? পায়ের তলায় কতো সেও এই একই ফড়ফড়? না হলে আগে থেকে একটা ওয়ার্মিং দিতে পা তো। মাইরী, মাইরী, কি একখানা কপাল করে ও আল ওর এনগেজমেন্ট বন্ধ করতে বোঁ হয়ে ছেলো? ভীষণ রোশ ও ওর ছোড়া চিট জুতোর হাতে নিলো, তারপর ওর শরীরে বতোখানি দাঁড়ি হোক, সমস্ত একটাও করে ও প্রাপন্থন ছুটে লাগলো পাগলের মত। ফোকাই খোক এনগেজমেন্টটা তাকে রানতেই হবে। হিম্মতি ছুটেছে দিশিধিক জানাশুনো হয়ে, কোনদিকে দৃকপাত করার টাইম নেই, পারে লাগছে, সে রকম ছোটর অস্ত্রাস অনেকদিনই নেই, বুকটা খড়াস খড়াস করছে, তবু ছুটে ছুটে ছুটে, হিম্মতি ছুটেছে, তার হাতে ছোড়া চিট, চোখে পাগলের দৃষ্টি, সে ছুটেছে বন বন করে কিন্তু কিছু একটা মনে গড়ব লাগছে, তার যেন কিরকম সপেহ লাগলো, সে কি কাউকে জিগেস করবে? কিন্তু জিগেস ক লেও তো থামতে হবে একটু। তাতে আখ মিনিটও সময় যদি চলে যায়? একে তো সপেহট দোর হয়ে গেছে, তাতে এই আখ মিনিটে। অজস্র। না, না। কমা বার না। হিম্মতি আর রি-ডল স্পীডে ছুটে লাগলো, কিন্তু মনের মধ্যে কান্নাটা এবার দারপ জোরে খচ খচ করে উঠলো, হিম্মতির কেমন যেন আবার মনে হল, সে কি ভুল পথে ছুটেছে? হঠাৎ সে থেমে পড়লো। ব্যকের ভেতরটা অজানা আশংকার গর গর করে উঠলো। উহু, হিম্মতির স্টার পার হয়ে ফার্মিন, ও স্টারটির দিকেই আসেনি। স্টার জোকে এতোকাল ঠিক তার বিপরীত দিক সে ছুটে গেছে। পাশেই একটা পার্নারিফির দোকান। দোকানের ঘাড়তে হিম্মতি দেখলো এমন সাড়ে ছটা বেজে গেছে। সে স্পর্শই বুঝলো তা। প্রতিপক্ষ তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ দৃষ্টিশালী। লুধু দৃষ্টিশালী নর সে রিসকও বটে। আর ছোটখাটো বাধা তার সামনে এগিরে কিরছে বস সে সহজেই টপকে যেতে পারে। এটা যে তার চলনা, চতুঃ রমণীর মত তা সে বুঝতে দেবী। এইভাবে 'ফার্ম' তীর বয়েছে, প্রলোভন দৌঁছেছে, একের পর এক কথা বা। একের পর এক বাধা অবিভ্রম করার লোভ। তারপর ঠিক কে মূহুর্ত সে বুঝেছে তাকে

কিন্দরীত দিকে, আর যখন সে কোরে তখন আ। তার কির এসে মন্থন করে স্টার সেবার সপ্ত উন্নয় শেষ হয়ে গেছে। তাহলে? হিম্মতি, তুমি এখন কি করবে? গভীর প্রান্ততে, বিশেষ হত্যালাগ হিম্মতি নিজেই এক প্রশ্ন করলো। এক দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো। বাড়িই ফেরা যাক বরং। কিন্তু ফেরাও কি সহজ হবে?

সম্মা হয়েছে অনেক। গাড়ি অন্ধকার ছাড়িয়ে পড়েছে কোলকাতার আকাশে আকাশে। রাস্তার আলো কখন জ্বলে গেছে। বাড়িই ফেরা যাক বরং। আ, কি গভীর রাত্রি। পা দুটো যেন কিশোরের মনে মনে বাজে। ঐ তো একটা আলোকিত, ধাবমান ডবল ডেকার কিন্তু কি সাংঘাতিক ভাড়। উঠবে কেমন করে? ঠিক আছে, লাইটপোস্টের সামনে হিম্মতি আর একটা লাইটপোস্টের মত দাঁড়িয়ে থাকে। তার তো এখন তেমন আর কাজ রইলো না। আর তার কেন তাড়া নেই। তার সকল কাজ এখন শেষ হয়ে গেছে। আর তার কোন এনগেজমেন্ট নেই। এখন সে অনতকাল লাইটপোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করে পারে। কিন্তু আশ্চর্য, মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়েছে কি দাঁড়ানি একটা ভাড় থেকেই ডবল ডেকারের পর ঠিক তার পেছনেটা, স্মাজিক কিন কে জানে, সেটা হার খালি, অন্তত ওটা যায়। হিম্মতি দৃষ্টি অকস্মে উঠে গেল। আশ্চর্যের কিন্তু এখানেই শেষ নয়। দু-তিনটে মটপ পার হবার পর একজন বেগ সপ্রতিভ এবং নিঃসন্দেহে সূক্ষ্মরী মহিলা তাকে অবাক করে দিয়ে বখর হয়ে বলালেন, এইবার আমি নেমে বাবো। আপনি বসে পড়ুন। জরদাহলা নেমে গেলেন এবং আশাতীত সৌভাগ্য হিম্মতি কসতেও পেল। কে জানে কেন, ও খুব মনে মনে হাসতে লাগলো। রাস্তার কোথাও বাসটকে থামতে হল না। অশ্রুত ব্যাঘার, কোথাও কোন জাম নেই, একবারে ক.রকুরে, মসৃণ এই বাটা। ছাইওয়ের ওপর দিয়ে গিয়ে হাওড়া ব্রিজে নামতেই গরুর লাগলো তারি মিতে, তারি সুন্দর হাওয়া, শরীর মন একবারে জুড়িয়ে গেল। হিম্মতি হাওড়া স্টেশনে এসে বৃষ্টিং অফিসের কাছে এসে দেখলো, যেমন অন্যান্য হয়, আজ তার চেয়েও প্রকাণ্ড লাইন। এই লাইনে দাঁড়িয়ে তাকে টিকিট হতে? ভাবতেই আবার সেই আগেকার বিরক্তি, ক্রোধ যেন ফিরে এলো, একটা মায়-মারি, কটাফাটি অসম্ভব একটা গালমন্দ করার জন্যে তার শরীরটা যেন হঠাৎ আবার তেমনি হয়ে উঠলো। কিন্তু সেসব কিছই করতে হল না। তাকে বঁচিয়ে দিলো একটি লোক। দেবতার মত তার সামনে আবির্ভূত হয়ে সে বলল, 'টিকিট নেনে ব্যাণ্ডেলের?' ভাল করে দেখে নিন। টিকিটটা কেনেই না। আমি ভেবেছিলাম ব্যাণ্ডেল হবে। নানা কারণেই আজ আর হাওয়া হবে না। হিম্মতি কিছু এতো কাল সত্ত্বেও মোটেও টিকিটটা দেখে নিলো না। কেননা সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গেছে, সূতরাং টিকিট দেখাটা হিম্মতি বাহল্য বিবেচনা করলো। ও খুব বুঝেছে, এ টিকিট কেনেই না হুজুই যার না। নুধ, তাই নর তার ফেরার বেলা পথে তার জন্যে আরো এক বিস্ময়, আরো এক আনন্দ অপেক্ষা করাছিলো। দু-নম্বর স্প্যাটফর্ম পা দিয়ে গার্ডের গাড়ি ভটিম্ব করে খানিকটা হিম্মতি এগিরে গেছে এমন সময় তাকে ভীষণ বৃষ্টি করে নিজে মেরালি গলার উজ্জল ভাণ্ডাতে কে যেন তাকে বড় গভীর করে ডাকলো, 'হিম্মতিদা, হিম্মতিদা।

হিম্মতি হাঁস মুখে তার কাছে এগিরে গেল।

কাতা, তুমি?

কবে, কি যোগাযোগ। মনে মনে তোমাকে কতো খুঁজি। আজ ভালো-মিনেই তোমার সঙ্গ পেলাম।

ভালো দিন?

হ্যাঁ। আজই রেডিওতে গানে চান্স পেলাম। ভালো দিন না?

সুন্দর দিন।

এমন ভালো দিনে এই ভালো খবরটা একজন খুব ভালো। কাউকে জানাতে ইচ্ছে করে।

সে তো ঠিক।

হিম্মতিদা, তুমি ঠাট্টা করছো। ঋণ গলায় অনুযোগ আর আবদার নিয়ে কাল, অরুণ কলছিলো তোমার হিম্মতির খবর কি? কতোদিন আর্মিন তোমার কাছে। হিম্মতিদা, তুমি কি বলবে কেন তুমি আমার কাছে আর আসো না। অরুণ তো কোন আপত্তি করে না, তাছাড়া তার আপত্তিই বা শুনছে কে?

একবার কি জবাব দেবে হিম্মতি? যে গোটা দিনটা একটা আগে সে কাটিয়ে এলো এখন সেই দিনটা একখানা খোলা বই-এর মতন তার সামনে পড়ে আছে। তার অবশ্য আর কোন বিন্দা নেই, কি সে করবে আর কি সে করবে না। তবু এই বিশেষ দিনটির চমক এর অসামান্য কুহক এখনো তাকে আকর্ষ করে রেখেছে। হিম্মতি তাই এক ঘোরেই মধ্যে জবাব দিলো, যদিও এ জবাব অস্পষ্ট, যদিও এ জবাব যেন নিজের কাছে নিজের, তথ্যটি হিম্মতি যেন অপরকে বলছে, এমন ভাণ্ডাতে বলল, 'কাতা, তুমিও আর কোথাও কখনো যেও না। গিরে কিছ হয় না। বা'র ফেরে। ফিরে এসো।

কাতা হতবৃদ্ধির মত তার দিকে তাকিয়ে থাকলো। ও কিছই বুঝতে পারলো না। ওর চোখে দুজনের রহস্যের মত কিছু যেন ফুটে উঠলো। হিম্মতি যেন কলিকাতা কোলাজে তেমনভাবে তার পিঠে হাত কোলাতে কোলাতে আনন মনে হেসে উঠলো। তার আর ইচ্ছে হল না আরকের এই অশ্রুত দিনটার কথা সে খতকে জানার। কি হবে জানিয়ে? একদিন সবাই জানতে পারে। কেন এই হাওয়া, কেনই বা ফেরা, ফিরে আসো। কেউ আসা, কেউ পরে। বরং এখন



# সেই সময়

## সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

৪৪৬

কুসুমকুমারীর পিতার প্রায়ই নানা উপলক্ষে শব্দ ধুমধাম হয়। এ গৃহে সুখ ও সমৃদ্ধি বেন পরম্পরের হাত ধরে আছে।

কুসুমকুমারীর পিতারা পচি ভাই, তারা সকলেই একান্ত বর্তী। তাদের পুত্র কন্যার সংখ্যাও বর্তমানে সব মিলিয়ে সাতাশ, কুসুমকুমারীর নিজের সহোদর সহোদরার সংখ্যাই নয়। সুতরাং এতবড় পরিবারের একেবারে এক কপে কিংবা কুসুমকুমারীর হারয়ে হাবার কথা ছিল। কিন্তু তা হলো না। বিধবা বলেই কুসুমকুমারীকে ঠেলে দেওয়া হলো না ঠাকুরঘরে। তার পিতা-মাতা ভালো করে খেজ খবর না নিয়েই যে এক উম্মাদের সঙ্গে তার বিবাহ দিয়ে ছলন, সেই ছুলের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তারা কুসুমকুমারীর প্রতি আদরের কণা বইয়ে দিলেন। তার জন্য নিখরাত হলো এ গৃহের একটি সুসজ্জিত কক্ষ, দুটি দাসী নিযুক্ত করা হলো তার সেবার জন্য।

কুসুমকুমারীর পিতা কুন্নাথ বাবের সঙ্গে ত্রিশরায় রাজ পরিবারের কিছু বাবসায়িক সম্পর্ক আছে। কিছু দলের মধ্যেই কুন্নাথকে কাব্যপল্লবক ত্রিশরায় যেতে হলো, তিনি কুসুমকুমারীকে সংগে নিয়ে গেলেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারের যথার্থ বিধবার পক্ষ দেশ ভ্রমণ প্রায় অকল্পনীয় ব্যাপার। কিন্তু কুন্নাথ নিছক আচারবশ মানুষ নন, তিনি তেজস্বী পুরুষ, নিজের বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করেন, পতননের কথা অগ্রাহ্য করার সাহস রাখেন। বংশ জীবন ছেড়ে কিছুর বাইরে ধরে এলে শোকসন্তপ্তা কন্যাটির যে স্বথেষ্ট উপকার হবে, সে কথা ভেবেই তিনি কুসুমকুমারীকে নিয়ে গেলেন ত্রিশরায়।

কুসুমকুমারীর অকল্পনীয় সন্তোষ ছিল, কিন্তু শোক ছিল না। যেসময়টা সঙ্গে ভর কোনো দিন একটিও স্বাভাবিক ব্যাক্য বিনয়ন হলো না, ছদ্ম বিনয়ন তো দুয়ের কথা, থাকে দেখে সে শব্দ ভরই পেয়েছে, তার মৃত্যুতে আবার শোক কী? শব্দ বকের ওপ। সবকণ বেন পাগড়ার চোপ থাকে।

ত্রিশরায় পড়ে পাছাড় ও অরণ্যার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে আস্তে আস্তে তার হৃদয় উন্মোচিত হয়।

শব্দ শব্দ করে দৃষ্টি ছেলে বেতে দেখল একই সঙ্গে সে বিস্মিত ও জীর্ণিত হয়ে ওঠে। এই ভাবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে কঠ চালাল ব্যাক্য, বা ভাবি স্থানিক ব্যাপার তো। মধ্যে মধ্যে চোখে পড়ত দিশুর কখন দৃষ্টমিত্তরা দৃষ্টি নিয়ে ছুটে যাওয়া শব্দর স্তব্ধ বন-খরগোশ। কুসুমকুমারীর ইচ্ছে হয় ছুটে গিয়ে ওদের ধরতে।

হঠাৎদৃষ্টির সঙ্গে প্রথম দিলে চলেই ত্রিশরায় রাজবাহিনীর কেরকজন সৈনিক। সুতরাং বিপদের কোনো ভয় নেই। কুন্নাথ বাবের এসে কন্যার আবার ব্যাপারও বিশেষ কতকটি করেন নি, জলপুক। বাইরে দিয়ে হাবার সময় কুসুমকুমারীর পালাকির দৃষ্টি পাশ খোলা থাকে। কখনো ইচ্ছে হলে সে তার পরম্পরিকাকে সঙ্গে নিয়ে বনের মধ্যে হেটেও আসতে পারে।

ত্রিশরায় ধর্মনার নামে এক স্থানে এক সারি-বেলা ওদের তানু পড়তে। কাছেই একটি জলাশয়ের ওপরে খানিকটা জলা। পূর্ণিমার স্রুত, আকাশ ধরে যাচ্ছে জোৎস্নার। কুসুমকুমারী সেই জলাশয়ের ধারে এসে বসেছে। এক একবার সে জল দেখছে, এক একবার দেখছে আকাশ। আজ চন্দ্রকিরণের এত জোর যে পাতলা মেঘ ভেদ করেও দেখা যায় পূর্ণ চাঁদ। মেঘগুলি শব্দ শব্দ করে ছুটেছে, অথবা এক এক সময় কুসুমকুমারীর ত্রম হা হা মেঘগুলিই বৃষ্টি থেমে আছে আর চাঁদ ছুটেছে অমন করে।

হঠাৎ অদূরে চক্ চক্ শব্দ হতেই কুসুমকুমারী চমকে তাকালো। তার পর সে বেন নিজের চক্কেই বিবাস করতে পারলো না। সেই সরোবরে জলপান করতে এসেছে দুটি চিত্রল হাব। কুসুমকুমারী এর আগে কখনো জীবিত হাব দেখে নি। সমস্ত ছন্দটিকে দৃষ্টি চক্ এনে সে দেখতে লাগলো হাব দুটিকে এক তাকে সাহায্য করার জন্যই বেন সেই সময় মেঘ সরে গিয়ে বেশী করে আলো পড়লো সেখানে। হাব দুটি এত কাছাকাছি আনুষের উপস্থিতি হের পাশ নি আসে, একটি, পরে সজাগ হতেই তারা এক সংগে লাফের উঠলো। তাদের সেই ছন্দময় লাফ এবং সমস্ত শরীরে ঢেউ খেলিয়ে ছুটে যাওয়ার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বইলো কুসুমকুমারী, তার সব শরীরে রোমাঞ্চ হলো। পৃথিবীটা এত সুন্দর।

সেইখানে আকস্মিক হতেই বসে ছিল কুসুমকুমারী, একটু পরেই একসঙ্গে অনেক মানুষের চিৎকারে সজাগ হলো সে। রক্তের দল হাব দুটিকে দেখতে পেরেছে, ওদের বধ করার জন্য তারা পিছ হাওয়া করেছে। কুসুমকুমারী তৎক্ষণাৎ উঠে কাড়লো। তার পিতাকে বলে সে ওদের নিষেধ করতে। এমন সিন্ধ, সুখাময় রাতেও কি মানুষের মনে হিংসার কথা মনে আসে। কুসুমকুমারী মনে পড়ে গেল শকুন্তলার গল্পের কথা। এই স্থানটিকে বেন তপেবন, এখানে জীব হত্যা নিষেধ। তারপর তার মনে হলো, এমন জ্যোৎস্নার রাতে, সমস্ত পৃথিবীটাই তপেবন তোহাও কার মনে এখন হিংসা থাকে উচিত নয়।

কুসুমকুমারী এগিয়ে যেতে লাগলো তাকিয়ে দিকে। লোকগুলি হাব দুটিকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পায়নি শব্দ সে নিশ্চিত হলো। আবার ফিরে এলো সেই জলাশয়ের কাছে। জলের ওপর ভাসছে চাঁদ, আকাশেও চাঁদ, এই দুই চাঁদ দেখতে দেখতে মশন হয়ে রইলো সে, বেন তার শরীরের প্রতিটি রেশে স্থানান্তরিত হচ্ছে। তার ততেরা বছরের জীবনে এমন আনন্দ সে বেন আর কখনো পায় নি।

তবু, চক্ চক্ এত সুন্দরের মধ্যে কস থেকেও কুসুমকুমারীর এক সময় মনে হলো, চিত্রল হাব দুটি কেন সে দেখলো? শকুন্তলার গল্পটা না মনে পড়লেই ভালো হতো এ সময়। সে কিছতেই দমন করতে পারলো না একটি দীর্ঘশ্বাস। শকুন্তলা তার মতন বিধবা ছিল না!

ত্রিশরায় থেকে প্রায় তিন মাস পরে কুসুমকুমারী

উঠেছে।

এই পরিকল্পনের প্রেরণা কেউ প্রকাশ্যে মন-মেয়মানবের চর্চা করে না। গোপনে কার কোনো দিক আভ্যাস্যত করে, তা কে জানে, কিন্তু বাড়িতে ও সবার কোনো স্থান নেই। কুসুমকুমারীর পিতা কুন্নাথ অকল্পনীয় প্রকৃতিই সর্কার পুরুষ, তার থেকে আছে ধৃশপতি সপ্নাতের প্রতি। এ গৃহের কলকণের শব্দ-কলমে পড়া বাধ্যতামূলক। হাবকর পারা ও বাড়ি ওড়ানোর নিষেধ অনন্দ মত থাকে। বোল-নগেরকরো ব্যাটা ও পলাপান হয়। এবার তারা নিজেরই নাটক করবে। নিষেধক, অভিনেতা, গায়ক-বাদক প্রায় সকলেই এ বাড়ির ছেলে। বাড়ির মেয়েদের অংশ গ্রহণ করার কোনো প্রত্নই ওঠে না, তবে নাট-মহলে মহড়ার সময় মেয়েদের উপস্থিত থাকার কোনো দোষ নেই। নাটকের নাম বিক্রমোবশী। জ্যোতিষিকার সিংহবাড়িতে নবীনকুমার সিংহের এই নাটকের অভিনয় দেখে বাগবাজারের ছেলেরা মগ্ন হয়েছিল, তাই তারা সেই নাটকই মগ্নত্ব করতে চেয়েছে। কুসুমকুমারী আগাগোড়া বসে বসে মহড়া দেখে, এক একবার সে তার মনে, ছোড়না, ফুলদানের বিক্রি কিছু নির্দেশও দেয়।

একদিন দুর্গামণি একটি পত্র পাঠালো তাকে।

স্বাম্যার পরম স্নেহের ধন কুসুম সোন, আজ ছয় মাস হইল তোর দর্শন করে নাই। দিবারাত্তর ২ মনে পড়ে তব ফল কুসুমিত মৃৎখানি। ঐ নীল নলনামি দৃষ্টি কী কীরকম বদমা আমার সঙ্গে ২ ফেরে। তুই এই পাপের গৃহে আর কোনোদিন পদস্পর্শ করিবি না জানি কেনই বা করিবি, তোর উপহার হইয়া গিয়াছে। আমি হতভাগিনী আর কোথায় বাইবে এই পাপ পুরুষেরই পিচিয়া ম। বৈ আর কোনো গতি নাই। শ্রীমান সত্যপ্রসাদ মধ্যে ২ তোমার কথা বলে। চোচারি বড় মুক্কাইয়া পড়িয়াছে, উহার বোধহয় এম্মান হইতে বাস উঠিল। উহার মাতা কিংহের জন্য পড়িপাড়ি করিতেছেন সে পাশ না দিয়া বিবাহ করিতে চাহে না। আর খেলা ভ্রমে না।

ওরে কুসুম, তুই বড় বাচা বর্চিয়া গিয়াছিস। ব্যাকস পাগোল স্বামীর সহিত স্য জীবন জুলিয় পড়িয়া মরার চাহিতে স্বাধীন বৈধবা শতশ্রে ডালো। স্বাধীন বৈধবা এমন কথা সত্যপ্রসাদ একবার তোর সম্পর্কে কিলকিছিল, আমার বড় মনে ধিরমাছে। আহা! আমি যদি এমন স্বাধীন বৈধবা পহিতাম। তুই বিধবা জারি কেন আমার মতন তোর রূপে তো তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকে নাই-ব্রহ্মবরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জলকলি। সুতরাং করিলাম। তোর কাচা বয়স, তোর পুন্নার বিবাহ হইবে, হইবেই হইবে, এমন হার বংশ সেই যে বৃন্দাবন গঙ্গোষ্মী ঠাকুর একবার গান শুনাইয়াছিলেন ঢল ঢল কাচা অণের লাবণ্য তুই কেন সেই। কলি কি কুসুম, আমি যদি পুরুষ মানুষ হইতাম তবে বলপূর্বক তোরে হরণ করি লইয়া কইতাম কেনে দূর দেশে। আমা! এই জীবনটা বিবাহ গেল, ভূমি ভাগবতী হও, কোনো রূপবান গুরুবন পুরুষ তোমারে গ্রহণ করিয়া ধন্য হউন। সত্যপ্রসাদ এই পত্র পাঠ করিবার জন্য আকৃতি করিতেছে তাহাকে দেখাইবে না সুতরাং আর লিখিব না। আর অধিক কী। ইতি আ তোমার খড়ী ঠাকুরানী দুর্গামণি।

পর্যায়ন অশ্রুত দশবার পাঠ করিয়া কুসুমকুমারী। পড়তে পড়তে সে হাসলো কাঁদলো, তার পর সেখানি কুটিলি করে ছিড়ে সে উড়িয়ে দিল বাতাসে। এই পত্র অন্য কেউ দেখে যেখানে কতখানি লজ্জার ব্যাপার হবে। দুর্গামণির মাথের কোনো বাধন নেই। আবার বিবাহ? বিঃ।

কুসুমকুমারী অবশ্য জানে না যে তার পুনর্বিবাহ নিয়ে ইতিমধ্যেই খানিকটা গল্পন শব্দ হয়ে গেছে। কুসুমকুমারীর চোখভ্রাতা নপেন্দ্রনাথের দুটি শিশু-পুত্রের গৃহশিক্ষক বদ্পতি গাঙ্গুলী, তার সংগে নপেন্দ্রনাথের মাঝে মধ্যে দেশ ও সমাজ বিষয়ে

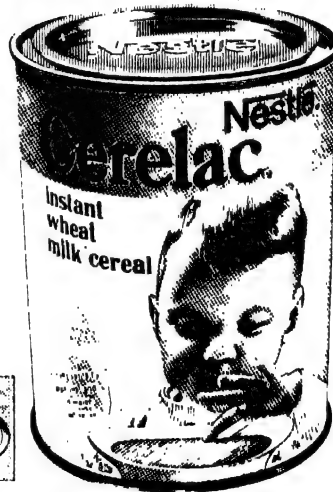
আপনার বাচ্চাকে দেখুন

SAA FSL/C/1043 BN



# সেরেলাক-এর সাহায্যে

বাচ্চাদের জন্য গুটিগুণে  
ভরপুর সিরিয়েল ফুড।  
দুধ, চিনি... আর  
আদর ভালবাসায় ভরপুর।



এটি বানানো কত সহজ  
শুধু এটি জলের সাথে মিশিয়ে নিন।



সেরেলাক—  
ফোটান জলে ডালুন



মিশিয়ে খেলে নিন



এবার খেতে দিন

- আপনার বাচ্চা বয়স কি  
৪ মাস হয়ে গেছে? তাহলে  
এখন ওর সবচেয়ে বড় কাজের  
জগা দরকার সঠিক মাত্রায় সুস্থ  
জানা শেখার শক্তি আনার।  
সেরেলাক শিশুদের জগা  
পুষ্টিতে ভরপুর শস্য আহার  
দান। শস্য, খালাইদার ছুঁস আর  
চিনির এক সুস্বাদু মিশ্রণ, যা  
আপনার বাচ্চার বাচ্চের জগা  
পুষ্টিকরীয় সবরকম  
পুষ্টিতে যোগায়।
- সঠিক সুস্থমাত্রায় ফ্যাট আর  
কার্বোহাইড্রেট থাকার দরুন  
আপনার বাচ্চা চলতে পারে।
  - যথেষ্ট পরিমাণে পোটাম  
থাকার দরুন আপনার বাচ্চা  
বাহুতে পারে।
  - অতিরিক্ত পরিমাণে  
ভিটামিন ও আয়রন থাকার  
দরুন আপনার বাচ্চা  
খেলতে পারে।



সত্যর সন্ধ্যা এক কিরানাপুরের ঢালা। নৃপেন্দ্রনাথ এ বদ্বপতি প্রেরণার অন্তর্গত নৃপেন্দ্রনাথের বিবাহের সময় কিছু আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। কুমুম-কুমারী এ বাড়িতে বিবাহ হয়ে যির আসার কিছুদিন পর বদ্বপতি একদিন নৃপেন্দ্রনাথকে বললেন, আপনি বিবাহ বিবাহের সমর্থক, আপনি আপনার এই ভগ্নীর আবার বিবাহ দি না কেন? প্রত্যাব শ্রুত নৃপেন্দ্রনাথ আমতা আমতা করতে লাগলেন। তৎক্ষণাৎ সার দিতেও পারেন না আবার গৃহীণককে কাছে প্রাচীনপন্থী সম্মতেও চান না। তিনি বললেন, আমার অমত না থাকলেও আমার বাবা এ পরিষদের কত, তার সম্মতি বিনা তো কিছ হতে পারে না। বদ্বপতি তখন বললেন, আপনার বাবার কাছে এ প্রস্তাব পেশ করন তবে। শ্রুত আপনার কথা রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের একজন সূত্র। আপনি জানেন নিশ্চয় যে রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল বোম প্রমুখ বিবাহ বিবাহে কাছে মহোৎসব?

আজ্ঞা বোধি বলে নৃপেন্দ্রনাথ তখনকার মতন এড়িয়ে যান। রামতনু লাহিড়ী কখনো এরকম কথা বলতে নৃপেন্দ্রনাথের সাহস হয় না। কুমুনাথ যদি রাজি হন তো তখন এমন সুপ্রসঙ্গের জন্য প রকে সন্দেহ-সন্দাবণ করবেন, আর যদি রাজি না হন তো অর্মান একেবারে ভোঁতে অশ্লীলতা।

নাছোড়বান্দা বদ্বপতি কিছুদিন অন্তর অন্তরই বিফলতা মনে করিরে দেয়া নৃপেন্দ্রনাথকে। নৃপেন্দ্রনাথ এখন গৃহীণকটিকে দূর থেকে দেখলেই সোজা একেবারে শঙ্কন ঘরে ঢকে ম্লান মুখে বলে বলে থাকেন। তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ দুই ভাইকে একটু কাকিয়ে দেখেছেন নৃপেন্দ্রনাথ। সেই ভাই দুটির কোনো আপত্তি নেই কুমুমকুমারীর পুনর্বিবাহে, কিন্তু তারাও কেউ কুমুনাথের কাছে গিরে এই প্রসঙ্গ তোলার সাহস পায় না।

কুমুনাথ বাচাই করার সাহস কখন তারের পেশ, তখন কনা একটা পন্থা গ্রহণ করে যেতে পারেন। রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে গিরে যদি অনুরোধ ক বাবা, তিনি কুমুনাথকে কুমুমকুমারীর পুনর্বিবাহের কথা বলেন। কুমুনাথ রাজি না হলেও রামতনু লাহিড়ীর মতন মানা বন্ধুর ওপর তো রাগ করতে পারবেন না। সেই অনুযায়ী রামতনু লাহিড়ীর বোধি নেওয়া হলো। কিন্তু দুইয়ের কিছ লাহিড়ী মহাশয় এখন কুমুনাথের। তার কলকাতার আসা পশ্চত অপেক্ষা করা হাড়া গতি নেই।

কুমুমকুমারীর কুলদামা হেমেন্দ্রনাথ সাজিয়ে উর্বশী। সে বোটারি দু পা চাটলেই লাড়ী বলে যায়। তা দেখে নটমন্ডের সিঁড়িতে বসা বাড়ির মেয়েরা একেবারে হেসে গড়িয়ে পড়ে। সন্ধ্যা ঠেকারোত্তীর্ণ হেমেন্দ্রনাথ রাগ করে বলে, দ্বিধা থাকলে আমি পারি ক্ষমতা না। মহড়ার সময় ওকে। বাকা চলবে না।

তখন মেয়েরা কলকল করে ওঠে। কুমুমকুমারীর সেজদারি বলেন, ওরে হেমু, আসল খাটরের দিনে আটো করর সময় ভোর যদি লাড়ী বলে লাগ, তখন ডালা হবে?

কুমুমকুমারী বলে, অ সেজদারি, হেমু, বলতে, উর্বশী মালকোঁচা মেরে লাড়ী পরবে।

এক হাতে তলোয়ার ধরা পুরুষরা পশ্চত হেসে ওঠে!

নাট্য নির্দেশক পিলভুতো দামা নৃপেন্দ্রনাথ গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে বলে, জ্যাঁই, কী হচ্ছে! এটা ছাফলাদোর জারগা? ইন্দু, লক্ষী, কুসী, কেমী! তোরা এবার ভাগ্ এখেন থেকে!

সেজদারি ইন্দুমতী বলেন, তো। খাটরের সম্মা লোক হাসলে আমাদের বাড়ির নাম কল্যাপ হবে না?

যাও, যাও, তোমাদের আর বিপ্লবপন কর্তে হবে না। এখনি ইদিকে বড়োদামা এসে পড়লে দেকাবে মজা।

—ওমা, ওমা, নন্দু ওর লাড়িতে বেট বেঁচে থাক। অ নন্দু, সখীরা বেট বেঁচে এস্টেজ নামবে নাকি রে? হি-হি-হি মেয়েদের রগারস অবল অকস্মাৎ ছেমে গেল। এই সময় সেখেন এসে পড়লো ম্লান নাট্যকার নবীনকুমার সিংহ। ঠিক পরের গৃহেই তার বন্ধুরা-লয়। এ বাড়ির বৃকরা তাকে অনুরোধ জানিয়েছিল একবার এসে মহড়া দেখে কেতে এবং কিছ, পরামর্শ দিতে।

সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে এ বাড়ি। কিছুটা আত্মীয়তা আছে, সেই হিসেবে নবীনকুমার এ বাড়ির দুইয়ের মতন। তাকে দেখে মহিলারা মেমটা দিলে মূখ ফেনালো, কেউ কেউ আড়ালে সরে গেল, কয়েকজন একই জায়গার বসে রইলো, তাবের সঙ্গে নবীন-কুমারের। রসকতার সম্পর্ক।

কোঁচানে দুটি ও নীল মঞ্চলের কৌনরন পরা নবীনকুমার চব্বির মাকখানে গম্ভীর মুখে দাঁড়ালো, তার হাতে একটি মূপের বখানো ছড়ি। তার চেয়েও বেশী কয়েলী বৃকদের উদ্দেশ করে ডারিতী গলায় সে বললো, তা কেমন হচ্ছে টুকে শুন। সুরেন্দ্রনাথ, বাঁধ পুরুষা সেজেছেন?

কুমুমকুমারী সিঁড়ির আলন ছেড়ে উঠে অকস্ম-মুখে চলে গেল অন্তর মহলে। বাবার সময় নবীন-কুমারের সামনে দিলে আসতে হলো তাকে। সে মূখ ফুললো না একবারও। এই নবীনকুমারের কাঁধের সময় সে একবার দেখতে গিরেছিল, তখন নবীনকুমার একটিও কথা বলেন তার সঙ্গে। সে কথা তার মনে আছে। নবীনকুমার এবারও অবল খান কাপড় পরে

একমাত্র গাছগাছড়ার ভেষজগুণ দাঁতকে ক্ষয় থেকে বাঁচাতে পারে



10L/NTN/48

ক্যালকাটা কেমিক্যাল এর তৈরি

একমাত্র **নিম**

টুথপেস্টেই আছে নিমগাছের  
যাবতীয় ভেষজ ও  
ঔষধীয় গুণ

দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্যরক্ষায়  
অদ্বিতীয় টুথপেস্ট—নিম



সরোজিনী একটা এ বাড়িতে। সকলের  
আগেই বাক্যের সেরে একবারে শেষ কালে সে  
কলো। কুসুমকুমারীর কাছে। সরোজিনী এর আগেও  
কুসুমকুমারীর সঙ্গে যে করে গেছে করকবার।  
কিন্তু সে পিয়ালো আসে, এ বাড়িতেও একবার বসে  
বাসে। আজ এসে সরোজিনী কুসুমকুমারীর হাত  
খুঁজিয়ে ধরে কলো, অ কুসুমকুমারী, তুমি একবার  
আমাদের বাড়িতে চলা। এখন চলা।

কুসুমকুমারী কলো, কেন রে, তোমার বাড়িতে  
বসে কেন?

সরোজিনী তারে টেনে তোলার চেষ্টা করে  
বললো, চলা না। একবারটি চলা। আমার আত্ম-  
পুত্র তোমার সঙ্গে কথা কইতে চেরেচেন।

—কী বলি। কী পর।

আত্মপুত্র। আমি সব সময় অন্যদের কাছে  
আমার বর, আমার বর বলি তো, তাই উনি বলেচেন,  
বর বর কলো কেন? বর তো শুধু কিসের দিন হয়।  
তোমাকে কি এখন আমি আমার কনে, আমার কনে  
বলবো? তুমি আমার আত্মপুত্র বলবে।

কুসুমকুমারী হেসে বললো, ও, আত্মপুত্র। বর-  
কলে আত্মপুত্র। এ যে কেননা বাবা বাবা শোনায়।

—কী করি বলো দিদি। ওনার যে খেলনা। কত  
রকম খেলনা যে ওর হয়।

—তা তোর বরের সঙ্গে আমি কী কথা কইবো।

—একবার চলাই না। তুমি যে কেবা হয়েচো,  
সে কথা তো উনি জানতেনই না, আমি কাল রাতে  
বেলার ক্ষম। তা শুন উনি বললেন, আবা, কোন  
মেরেটি গো? সেই বার নলো আমাকে পুতুলের বে  
হয়েছিল? তাকে একবার ডাকো না?

—সরো, তুমি যেমন পাগল, তোর কলও তেমন  
পাগল। সেই পুতুল খেলা, সে সব কবে কার কথা।

—আমরা তোমার পর? আবার বাড়ি তোমার  
হলো সে পরের বাড়ি?

সরোজিনীর স্বভাবটি এখনো ছেলোমানুষীতে  
ভরা। কুসুমকুমারীর চেরে সে বরসেও কিছুটা ছোট।  
একটু অমনোমত কথা শুনলেই সে আত্মমনে গুণ্ড  
কোলায়। তা সরোজিনীর অভিমানের কারণ আছে।  
দুই পরিবারের প্রাসাদ একবারেই সংলগ্ন কলো যায়,  
এ ছাদে ও ছাদে কথা হয়, অন্যর মহলের পিছন দিকে  
দুই বাড়িরই বাগান এবং ঝিল। এ বাড়ি ও বাড়ির  
সেরো সব সময়ে বাতাসের করে।

তবু কুসুমকুমারীর বেতে লক্ষ্য করে।  
সরোজিনীও কিছুতেই ছাড়বে না। শেষ পর্যন্ত  
কুসুমকুমারী গেল তার মারের কাছে অনুরোধ চাইতে।  
তার মা পুণ্যপ্রভা বললেন, ওমা, তুমি বোসেদের  
বাড়ি যাবি, তাতে আবার কথা কী। তিনি সরো-  
জিনীর চিবুক ছুঁয়ে অনেক আদর করলেন।

নবীনকুমার পালঙ্কে শয়নো একখানি কই পাড়ছিল,  
সরোজিনী ঘরে ঢুকে বললো, এই যে, কাকে এনিচি,  
দেখুন।

নবীনকুমার দেখলো, একগলা ঘোমটা টান এক  
খান পরা মণিচাঁদ্রী ঝুং পাশ ফিরে দাঁড়ানো। মৃশখানা  
দেখবার কোনো উপায় নেই।

নবীনকুমার বললো, এট যে মিতেনী, আমার  
চিনতে পারো?

কুসুমকুমারী কোনো উত্তর দিল না।

নবীনকুমার বললো, সরোজ, তোমার মিতেনী কি  
অমন উল্টো দিকে ফিরে থাকবে?

সরোজিনী বললো, আপনি ভুলে গ্যাচেন, ও  
আমার মিতেনী কেন হবে। কুসুমকুমারী তো ছেল

নবীনকুমার বললো, তা না হয় হলো। উনি কি  
আমার সঙ্গে কথা কইলেন না?

সরোজিনী বললো, ও কুসুমকুমারী, তুমি আত  
লক্ষ্য পাচ্চো কেন গো? তুমি তো আগে আমার  
বরের... অ্যাঁই। বাড়ি... আমার আত্মপুত্রের সঙ্গে  
কথা কইতে।

কুসুমকুমারী ফিসফিস করে কী যেন কলো  
তাকে।

সরোজিনী বললো, তুমি ওরকম কলো না তো।  
বিধবা হলে বাকি কথা কইতেও নেই। শান্তি মানা  
কি চন্দনালয়ের পিসেমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলেন না।

নবীনকুমার হাত জোড় করে হৃদয়কোণে কলো,  
হে দেবী, একবার আমার দর্শন দান করে ধনা করুন।  
আপনি কি জানেন না, বিধবা কুলতী তার দেবর  
বিদ্রোহের সঙ্গে কথা কইতেন।

সরোজিনী জোর করে স্মরণে দিল কুসুমকুমারীর  
মুখের ঘোমটা। তবু সে এমিকে তাকাতে না। আবার  
মৃশখানা জোর করে শ্রমীর দিকে ফিরিয়ে দিল  
সরোজিনী। কুসুমকুমারীর চক্ষু দুটি বোঁজ। তার  
ওষ্ঠের কাম্পিত হচ্ছিল লক্ষ্য।

কুসুমকুমারীকে দেখে চমকে উঠলো নবীনকুমার।  
ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা পার হয়ে এসেছে বলে এই  
মেরেটের মৃশখানি সে ভুলেই গিয়েছিল। এখন মনে  
পড়লো। আশ্চর্যে কণ্ঠে সে কলো, তুমি... তুমি সেই  
কনজোবন্দী।

এবার নীল রঙের চক্ষু দুটি মেলে কুসুমকুমারী  
তাকালো নবীনকুমারের দিকে। (ক্রমশঃ)

যেমন খাঁচা তেমনই ফল...  
এও খাঁচা নারকেল তেল দুদ্বার ফিল্টার  
করা বলে এতে নারকেলের সহজাত গুণাগুণ  
ও মিক্সি গন্ধ পুরোপুরি আছে।



রোদে শুকানো বাছাই  
করা নারকেল থেকে এও  
খাঁচা নারকেল তেল তৈরি  
করা হয়। দুদ্বার ফিল্টার  
করা। ফটিক স্বচ্ছ আর  
নারকেলের সহজাত মিষ্টি  
স্বগন্ধে ভরা তেল।

এও খাঁচা নারকেল তেল—  
বছরের পর বছর ধরে  
বিশ্বব্যাপার নির্ভরযোগ্য।



বাছাই-সম্পূর্ণ উপায়  
সঙ্গে তরুা উর ৫টি সারক  
পাতা যায়। আর যেতাল  
২টি সারক।

আইসিএফ মিলস  
বম্বে • আন্ধ্রপ্রদেশ  
কলকাতা • বাঙ্গালোর  
নরসিংদী • পাটনা

খায়াটো কিছু খুব ভালো দিচ্ছেলো। ঘোঁরা-ওঠা চমৎকার স্বাদের দুগুণ, উৎকর্ষত্ব বাসে, গরম গরম রোল রুটি, ফ্রেন্স ফ্রেন্সে মাংস রোল ভরাতি মালাড, এক ধরনের মিন্টি-সবই উপাদেয়। সেই সঙ্গে ওরাইনের স্বাদও অতুলনীয় এবং দামও তুলনামূলক। দু'বাক্যে। ফরাসিদের এই পানীয়টি আমার মতো অরসিকের জিহবেও সন্তোষ সঞ্চার করে।

হোটেলের কিরতে ফিরতে অনেক বেলা হলো। একটু শুরুর নিচ্ছিলাম হাত-পা ছাড়িয়ে, দরজার টোকা। চারটে বেজে তিরিশ মিনিট, চা নিয়ে এসেছে একটি মেয়ে। সকালে বিকলে চায়ের ব্যপ্তি আছে এখানে। সঙ্গে সূক্ষ্ম কার করা বেতের ডালার রুটি কেক বিস্কুট। ফলও আছে। কলা আর আঙ্গুর। কেবল এই ডালাগায়েলো সুন্দর। রুটি, রোল ইত্যাদি এরকম ডালাতেই দেয় খেঁচাই। হোটেলের ডালাতেই দিচ্ছেলো।

চা পেয়ে বৃন্দেব খুব খুশী। তোজা বস্তু সব অবশ্য অস্পষ্টই রইলো, কিন্তু পট-ভরাতি চায়ের একবিদ্যুৎ ফেলা গেল না।

চা শেষ হতে হতেই নিচে থেকে ফোন এলো কোনো অতিথি এসেছেন দেখা করতে। অনুমান করছিলাম কে হতে পারে। কিন্তু নেমে এসে বলল সেলাম তিন নিভাতিই এক অচেনা ব্যক্তি। খুবকই বলা যায়, খুব সূক্ষ্ম সকল সন্তোষ। হারিসমুখে উঠে দাঁড়ালো। পরিচয় হলো। নাম দিলীপ মালাকার, বেশ কিছুকাল যাবৎ এ দেশেরই বাসিন্দা। বলাই বাহুল্য বাংলাভাষা শুনলে আমি পরম আনন্দিত। ভাবার জন্যই না, ভয়েলোকটিও চমৎকার। বিশেষ থেকেও দেশের খবরাখবর রাখেন। সাহিত্য বিষয়ে কোডহল এবং অনুভূতি দুই-ই যথেষ্ট, ওয়ারিকবহুলও খুব।

অনেকক্ষণ রইলেন, অনেক ধরনের কথাবার্তার মধ্যে দোকানবাছারের কথাও উঠে পড়লো। আমি আমার একটি গোপন লক্ষ্য সসংশোধিত নিবেশন করলাম। শুনলে বৃন্দেব ততো প্রায় হার হার করে উঠলেন, 'কী কাণ্ড, সোনার টোকা কেনার বৃন্দেব তোমাকে কে দিল?'

বস্তুতেই দিচ্ছেলো একজন। আমার আমেরিকার বন্ধু শালি' ছাই। আমার হাতের চুড়ি, গলার হার, কানের ফুল-সবই যে সোনার এ নিয়ে সে বিশ্ময় প্রকাশ করে বসেছিলো, 'ভারতবর্ষের মেয়েরা এখনো খাঁটি সোনা ছাড়া অলঙ্কার ব্যবহার করে না দেখে আমাদের বড়ো অবাক লাগে। সারা আমেরিকা চলে ফেলসেও তুমি চোশপ কারেটের উপরে সোনা পাবে না। সেটাই এখানে যথেষ্ট। সেই গরমাই বলতে গেলে কোনো মেয়ে পরে না। পরলে বেশ গৌরবের সঙ্গে বলে। অথচ তোমারা কতো সহজই এসব নিয়ে ঘোরো-ফেরো ব্যবহার করো। খাঁটি সোনা কেন, খাঁটি রূপাও আমরা চোখে দেখি না এখন। যা রূপোর বাসন বলে বিক্রি হয় সবই স্পোট করা। তারই বা কী দাম। কেনার লোক কোথায়?'

আমিও অবাক হয়ে বসেছিলাম 'এতো বড়লোকের দেশ, আর বলছো কেনার লোক কোথায়?'

'আসলে কি জানো, এভাবে ঘরে ঘরে সোনা হোড় করে রাখাটা কোনো কাজের কথা নয়। সোনা থাকবে দেশের নৈর্বিকার চড়ে হয়ে। কার তোষা-খানায় কতো সোনা জমা আছে সেটাই হবে তার দেশের ধনদৌলতের মাপকাঠি। ঐ জন্য চোশপের উপরে কখনো এনকারেজ করে না। নাই-ই, তার উপরে গরনা।'

কথার সত্যতা আমি অবশ্য যাচাই করার অবকাশ পেয়েছিলাম। আমার ছোটো কন্যা যখন ঐ দেশেই বিবাহিত হয়েছিলো, আমরা তার দু'মাসের মধ্যেই সেখানে গিয়ে সেই বিবাহ উপলক্ষে তাদের কিছু উপহার দিতে চেয়ে ছিলাম: বই, টাইপ-রাইটার, রেকর্ড, কাপড়চোপড় ইত্যাদির সঙ্গে কিছু সোনাও দিতে চেয়েছিলাম। আমরা কথটা অবশ্য গৌরবে বহুবচন হলো, কেননা সোনা দেবার ব্যাপারটা বৃন্দেবের চিন্তায় কোথাও ছিলো না। ওটা একা আমার ইচ্ছে।

মেয়েকে নিয়েই আমি সব জুয়েলারী দোকানে ঘুরে বোড়োঝাই, ঐ চোশপ কাপের ছাড়া কোথাও কিছু পাইনি।

'সোনা এখন কোথায় সস্তা জানো? ফ্রান্সে।' শালি'ই সংবাদটি পরিবেশন করেছিলো। বলেছিলো, 'আমি যদি সেখানে যাই, বেশ কয়েকটা সোনার টোকা কিনবো ভেবেছি।'

'সোনার টোকা?'

'জানো তো ডলারের কী সমাদর এখন সারা জগতে! ডলার দিয়ে কিনলে সস্তাও পাবে।'

'সত্যি! আমরা তো কয়েক মাসের মধ্যেই ফ্রান্সে যাবো। বল তো কোথায় কিনতে পাওয়া যায় সোনার টোকা?'

'কিনবে?'

'হ্যাঁ।'

'কিনো রান্না, কিনো। তুমি কিনলে আমি খুশী হবো।'

শালি' আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে একটা সোনার টোকা উপহার দিতে। যদি তিনি, যদি ওখানে তোমার ঘরের এমন কাজকে পাই যার হাত দিয়ে সেটা পাতানো যায়, আমি নিশ্চয়ই পারিবে দেবো।'

'এ আমার লক্ষ্যসোনা, দিও, তাই কি? হাসতে হাসতে খুব পিঠ চাপড়ে দিচ্ছেলো।

কিন্তু ঠাট্টা নয়, আমি সত্যিই ভেবেছিলাম। অবশ্য তুলে যেতেও বেরি হয় নি। নানা প্রসঙ্গে ঘন পড়ে গেছে।

দিলীপ মালাকার বললেন, সোনার টোকা কোথায় পাওয়া যায় আমি কিছু জানি না। তবে খাঁটি সোনার দোকানে যেতে চান তো নিজে যেতে পারি। হয় তো সেখানেই পাওয়া যেতে পারে। সোনার টোকা নিয়ে আসনি দেখে যেতে পারবেন কিনা সম্ভব।'

আমি বললাম, নন্দনা হিসেবে একটা-দুটো নিলেও কি আপত্তি করবে?'

ঠিক আছে, কখন যেতে চান বলুন, আমি দোকান নিয়ে যাবো আপনাকে। এসব ওখানেই পাওয়া যাবে।'

যথাসম্ভব ভাড়াভাড়ি দিনকণ ঠিক করে গিয়েছিলাম দিলীপ মালাকারের সঙ্গে সোনার দোকানে। কক্ষকে শো-কেসে চোখ ঠিকরেনো সেটিয়ের গরনা দেখে মোহিতও হয়েছিলাম, সেখান ঘন স্থির করে দামও জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারপর সেই দামটি কানে যেতে বিশ্বাসপুষ্টের মতো চমকে উঠেছিলাম। সোনার দাম নয়, মজার দাম। সে যে কী ভয়ানক বলা যায় না। সোনার চেয়ে তার হার অনেক বেশী। বৃন্দেব পরলাম কেন মেরো! আর সোনার গরনা পরে না। কস্টউম জুয়েলারী অনেক ভালো। অবশ্য তারও কম দাম নয়।

হত্যা হৃদয়ে বোঁজের এলাম শোখন থেকে। সোনার টোকা অধরেও দিলীপ মালাকার খবর নিয়েছিলেন ওদের কাছ থেকে। ব্যাংকের মধ্যস্থতার পাওয়া যায়, কিন্তু তার হাশিয়াও অনেক, দামও তেমন। সূতরাং ফরাসী দেশে সোনা সস্তা এই প্রচলনটা আর আমার বিক্রে খাটলো না। শেষ পর্যন্ত একটি ক্রেপ-ব্যান্ডেজ কিনে ঘরে ফিরলাম।

ব্যান্ডেজটি বৃন্দেবের জন্য। পারের ব্যাখাটা জমেই বেশ বেড়ে উঠেছিলো। প্রায় চলতেই পারছিলেন না। ভাবলাম ব্যান্ডেজটা দিয়ে টাইট করে বেঁধে রাখলে চলতেও পারা হবে, ব্যাখাটাও কমবে। আমার কাছে ফরাসী পরমা ছিলো না, দামটো দিলীপ মালাকারই দিলেন। রসদ দাম নয়। আমি অদরবাহি সেজন্য কৃতজ্ঞ আছি তার কাছে, কেননা ঐ ব্যান্ডেজ বেঁধে বৃন্দেব আরামও পেয়েছিলেন, নিরামরও হয়েছিলেন। অবশ্য প্রায় এক মাসের উপর রাখতে হয়েছিলো সেই বান্ধন।

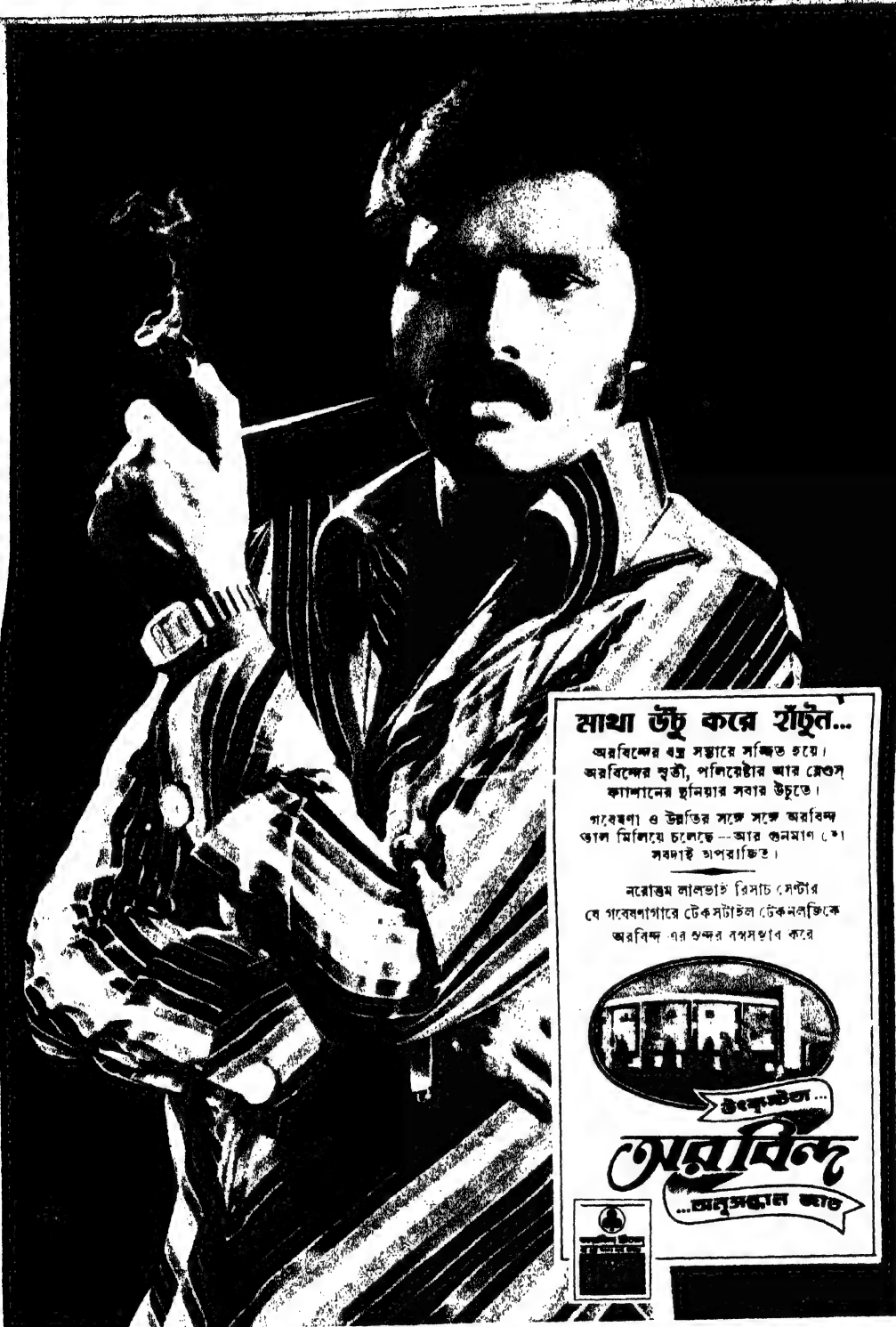
পরের দিন এক পাঞ্জাবীসম্পন্ন এলেন। এঁদের সঙ্গেও নতুন পরিচয় ঘটলো। শ্রী এবং শ্রীমতী ডিভা, তাঁরাও ওখানে বেশ কিছু দিন আছেন। ডিভা চাকরিসূত্রে এসেছেন, আরো কিছু দিন থাকবেন। এই দু'জন মানুষের সঙ্গে আমরা শেষ পর্যন্ত অনেকটাই বান্ধন হয়ে পড়েছিলাম। যে কদিন পার্টিয়ে ছিলাম, প্রায় প্রত্যহই কোনো না কোনো সময় বেছে নিয়ে তাঁরা আসতেন। সপ্ত দিনে, বন্ধুতা দিয়ে, পরিপ্রায় দিয়ে সমস্ত কাজেই আমাদের সহায় হতেন। কতো মাইল দূরে গারগেট অর্পিয়ে যেতে হবে বৃন্দেবের, সেখানেও মিল্টার ডিভা তাঁর সাহায্যে আগ্রণী।

বিশেষ কতো সহজেই কতো মানুষ কেমন আশন হয়ে ওঠে। পরে আর তার স্মৃতি ছাড়া কিছুই থাকে না। তাঁরা যে এখন কে কোথায়, কিছই জানি না। আর কখনো দেখে হয়নি তাঁদের সঙ্গে। অথচ আশা করেছিলাম। মনে হয়েছিলো এঁরা তো বিদেশী নয়, ভারতীয়। নিশ্চয়ই মাড্রুজিতে কখনো না কখনো আবার মিলিত হতে পারবো। হইনি।

আর থাকে প্রায় সকল সময়কার সঙ্গী, সকল কাজের বান্ধনাতা এবং সকল বিষয়ে একাত সচিব বলে জেনেছিলাম, সেই অপরূপ সুন্দর ফরাসী যুবক ইভান কাটস-তাকেও বা আর দেখলাম কই। অথচ তার সঙ্গে দেখা হওয়া প্রায় অসম্ভবত ছিলো। কর্মসূত্রে ইভানের পরের বছরই ভারতে আসা স্থির ছিলো। সেই কর্মসূত্রে সঙ্গে বৃন্দেবের জড়িত ছিলেন। বৃন্দেবের সম্পাদনার একটি আন্তর্জাতিক বার করবার পরিকল্পনা ছিলো কোনো প্রকাশকের, ইভান তার মধ্যস্থত। সেই কারণেই ভারতে আসা নিশ্চিত ছিলো। শেষ পর্যন্ত পরামর্শেই যত্ন সম্পন্ন হলো।

প্যারিসে থাকাকালীন এই ইভান আমার সব ইচ্ছে নির্বিশেষে পূরণ করতো। কিছু কিনতে চাওয়া, দেখতে চাওয়া, অকাল শখ-সব কিছুর জন্যই ইভান হাজির। ঐ ঐতিহাসিক শহরের আনাচেককান্ডে পথে-প্রান্তরে যেতো কিছু, প্রমত্তা সত্ব সবেরই প্রদর্শন সঙ্গী ইভান কাটস।

যেদিন আমাদের লুভারে নিয়ে গেল, ঘন-প্রাণে অনুভব করেছিলাম এই ধরনের শিক্তি মার্জিত সুসজ্জা একটি কথুর গাইডেন্স না পেলে অনেক কিছু থেকেই আমরা বঞ্চিত হতাম। কোনো মানুষের পক্ষেই এই সব মহান কীর্তি দেখা মাত্রই উপলব্ধি করা সম্ভাবনার পরপরে। 'দেখোঁ' বলার জন্য হাওয়া আর উপভোগ করার জন্য হাওয়া-দুটোতে কোনো মিল নেই। বিশাল চিত্রশালাটিতে ঢুকেই তার ধূম লম্বা করাইডোরটির এ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ঐ প্রান্তে তাঁর দাঁড়িমতো বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। এই অলৌকিক জগতের প্রত্যক্ষ অনুভূতি



## মাথা উঁচু করে শ্যুট...

অরবিন্দের বস্ত্র সজ্জার সম্বন্ধে হয়ে।  
অরবিন্দের সূতী, পলিরেটোর আর রেগুস  
কালানের ছানিয়ার সবার উচুতে।

গবেষণা ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ  
ভাল মিলিয়ে চলেছে—আর ক্রমশঃ  
সবদাই অপূর্য্যাক্ত।

নরেন্দ্র লালভাট রিসার্চ সেন্টার  
যে গবেষণাগারে টেকসটাইল টেকনিককে  
অরবিন্দ এর অঙ্গর বপুসংগ করে



# অরবিন্দ

...অনুসন্ধান জাত



রিটেল বিক্রেতা : কলিকাতা : গঙ্গাধিন গুপ্তা, ০২ নিউ মার্কেট • সুনিট, এফ-২৯/০৮ নিউ মার্কেট • রীচী : মধুকুজ, মেন বাজার, বেগুসরাই • পাটনা : চন্দ্রলাল  
দুর্গাপ্রসাদ, বীকীপুর • সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভস • অগ্রা : আরোরা টেকসটাইল ট্রোড কর্পোরেশন, ৪২/১৬৪ বিলেচপুর, খোড়কুজ রোড • কানপুর : গনেশপ্রসাদ  
হীরালাল, ৪৯/২৬ জেনারেল গজ • কলিকাতা : গিরধরীলাল রামনারায়ন, পি/১০ নিউ হাওরা ব্রীজ, এ্যাপ্রোচ রোড। আসাম : জরতী টেকসটাইলস, অলোক ডবন,  
এস আর সি বী রোড, শোহাটি • ওরিসা : আগরওয়াল টেকসটাইল এজেন্ট, জৌনালিয়াপাট, কটক।

পারিবারিক না। অধিকন্তু বহুই সময় কখনও একই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।  
ইতান বললো, 'প্রথম দিন এসে আমায় ঠিক এই অভিজ্ঞতাই হয়েছিলো।  
এখন বলতে পারো এখনে আসি একটা বেড়া। কিছু করার না থাকলেই চলে  
আসি, মন খারাপ হলেই চলে আসি, ফুটিত হলেও চলে আসি। এখন আমি  
জানি কীভাবে শূন্য করতে হয় আর কীভাবে লারা করতে হয়। কিন্তু দু'দিন  
জানতে হবে।'

'তাই আসবো।'

শূন্য হলো প্রথম দিনের পরিচয়। ঘরে ঘরে বেশ সুস্থিরভাবেই দেখা  
হতে লাগলো সব। সব শোনা হতে লাগলো। মাঝখানে আমাদের কোনো  
বিভ্রামসম্বল বসিয়ে ইতান গিয়ে বাইরে থেকে স্যান্ডউইচ কিনে নিয়ে এসে  
বললো, 'যেহেতুটা সময় পারো থেকে যাও খাবার জন্য বেরুবার দরকার নেই।'

শেষ পর্যন্ত মোনালিসার বহুপ্রত্ন ছবিটির কাছে এসে দাঁড়ালাম। হঠাৎ  
আমার তোফা জল এসে গেল। চিত্রকরের শিল্পনৈপুণ্যের জন্য নয়, আমি যে  
সীতাই এই পৃথিবীবিশ্বায় আসল ছবিটির কাছে এসে দাঁড়াতে পেরেছি এই  
সুখের গৌরবই আমাকে সজল করে তুললো। তা নইলে আসল ছবিটি দেখে খুব  
অবাক লাগে না। এই রহস্যময় হাসিমাখা মুখখানা দিয়ে কালেন্ডারও ছাপা হয়  
আমাদের দেশে। কতো প্রস্তুত দেখেছি তার ঠিক নেই। হুবহু প্রতিভূতি। কিন্তু  
তার নকল। নকল আর আসলের দৃষ্টিগত ভেদাভেদের প্রশ্ন নয়, মনোগত  
উপলব্ধিই মানুষের অধঃগকে সজ্ঞালিত করে।

শাত্ কাথিঙ্কলেও ইতানের সঙ্গেই গিরেইলাম আমরা। কোন দিন  
কখন কী করবো, কোথায় বাবো, কী দেখবো—সব লিস্ট করাই ছিলো। ওখানে  
সুখদেবের সর্বন কিংবদন্তীলারে বহুতা দেওয়া ছাড়া আর বিশেষ কোনো কাজের  
বাধ্যবাধকতা না থাকার সময় অটল ছিলো। তার উপরে ফরাসী সরকার গাড়ি-  
খানা দেওয়ার ভোয়াকেরার সুবিধেও হয়েছিলো খুব। প্রকৃতির আশ্বাসও  
তখন অতি মনোরম। বলা যায়, একান্তই বসন্তকাল, ঠিক আমাদের ফলসনে  
মাসের মতো। প্যারিসের চওড়া চওড়া রাস্তা এবং বাড়ি-ঘর কোথাও আকাশকে  
আড়াল করে না। ঘোঁরা নেই, খাঁজ নেই, গগনচুম্বী বাসগহের ভিড় নেই, মনে  
হয় সবটাই মুক্তির হাওয়া অব্যাহত। এ অবস্থায় ঘুরে বেড়ানোর মতো সুখ  
আর কোথায়।

প্যারিস থেকে শাত্ কাথিঙ্কলের দূরত্ব খুবই কম। গাড়িতে মাঠে দেক  
ঘণ্টার রাস্তা। প্রাতরাশ সেরেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। ভাবা ছিলো এই দেবালয়টি  
দেখে ভালপাইতে চতুর্দশ লাইন্সের ক্যান্ট্রি হাউসটিও দেখতে যাবো।

শাত্ কাথিঙ্কলে গিয়ে যখন পৌঁছলাম, সকালের রোদ তখনো তাপহীন।  
বাইরে বাগানে গাছের ফলক আলোছায়ার খেলা। খিলনের গায়ে গায়ে সব  
সাদুসস্তর মূর্তি, বীশুর জীবনগাথা। সেই সব মূর্তিও সূর্যের নরম রোদের  
স্পর্শে উজ্জ্বল কোমল, চোখ-ধাখনে নয়। চোখ ধাখনো চড়ার দিকে তাকিয়ে।  
দৃষ্টি চলে না এতেই উচ্চ। সেই উচ্চতে তাকাতে হলে ঘাড় বাধা করে  
সূর্যের স্পর্শে চোখচোখি হয়ে যায়। আর সেই স্পর্শে শ্বেতপাথরের কারুকার্য-  
খচিত কোনারকের স্মৃতিস্মরণের কথাও মনে পড়ে যায়।

বাইরে দাঁড়িয়েই অনেককণ কেটে গেল। সম্মুখে প্রাচীন গম্ভীর দেবালয়টি  
ঈশ্বরের মহিমার উপস্থিত। পরিব্রতার প্রতীক। মন আপনই অবনত হয়।  
সহসা সারা মাঠ ভরে যেন সহস্র ফুল ফটে উঠলো। সাদা সাদা কুন্দ ফুল।  
দুটি বাস ভরতি গলা থেকে পা পর্যন্ত স্ত্রীল তোলো ধবধবে নিস্কলস্ক শূন্য  
পোশাকে বালিকারা নামলো এসে সেখানে। সেই সব সূর্যের বালিকাদের নিয়ে,  
তাদের পোশাক নিয়ে উদ্ভাসিত আকাশের দিগন্তব্যাপী আলো নিয়ে স্মৃতির  
পাদদেশে একটি পরম স্বর্গীয় দৃশ্যের অবতারণা হলো। আমার মূখ্য স্তম্ভিত  
দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে। ইতান বললো, 'এরা আজ বরপটাইসড হতে  
এসেছে। দেখছো না কাথিঙ্কলের ভিতরে পরোহিতরা কেমন দাঁড়িয়ে আছেন  
শান্তভাবে? আমার তখন থেকেই মনে হচ্ছিলো সম্ভবত কোনো বিশেষ  
আয়োজন আছে।'

বালিকারা নিরমিত লয়ে সারিকণ্ডভাবে উঠতে লাগলো সিঁড়ি বেয়ে।  
সাদা ডেই। পরিচালনাকারিণীরা নিরস্ত্রত করছেন তাদের, পুরনে সন্ন্যাসিনীদের  
পোশাক। চক্রে উঠে আবক আনত হলেন, ক্রস কাটলেন, মন্দিরে ঢুকে প্রণত  
হয়ে মন্দির তলার দাঁড়ালেন। পরোহিতরা গ্রন্থ করলেন তাঁদের, আরোহণে-  
অনুষ্ঠানে ব্যাপ্ত হয়ে পড়লেন।

কোথাও কোনো গোলমাল নেই চাকলা নেই, বিশৃঙ্খলা নেই। উত্থান-  
পতন, ক্রিয়াকর্ম, মনোচ্চারণ—সবই সূরে বাধা।

কিছুক্ষণ এই অনুষ্ঠান দেখে, সমস্ত দেবালয়টি প্রদক্ষিণ করে বট্টাটান  
স্বী-পূরুষ যেখানে পাঠীর কাছে তাদের অকণ্ট স্বীকৃতির প্রাণ পাপপালন  
করে সেখানে এসে উপস্থিত হলাম। এই দেবালয়ের এটিও একটি স্তুতবাস্থল।  
এখন বোঝ হয় কার্যকরী নয় ইতান তাই করলো। ঘরের গ্রীহীনতাও সেই  
সাক্ষীই দাঁড়িলো। বড়ো একটা লম্বাচওড়া ঢাকা বারান্দার মতো জায়গা। টানা  
দেয়ালের গা খোঁষে খোপ পাছো কাটা। একটি খোপ পাছোদের অবস্থানের জন্য,  
পাশের খোপে তাপিত তব্ধিত চিত নাথ হে' বলে পাশিদের দন্ডায়মান

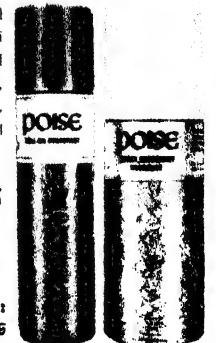


স্ত্রী সারাদিন  
রাখুন

পয়েজ ডিওড্যাট আপনার সারিধাকে  
ক'রে তোলে আনন্দদায়ক—সবসময়।  
প্রানের পর এটি ব্যবহার করুন আর শরীরের  
ঘামের দুর্গন্ধ থেকে মুক্তি পান—একটি মনোরম  
তরতাজা ভাব অহুত্ব করবেন।

পয়েজ রোল-অন অথবা

স্ট্র-এর কোমল তাজা দুর্গন্ধ  
আপনাকে হরষিত ক'রে  
রাখবে বহুক্ষণ! ডুটাই,  
নতুন, আকর্ষণীয়,  
কাঁচের কণ্টোরে।



পয়েজ  
রোল-অন আর  
স্ট্র ডিওড্যাট

বিপণনঃ  
র্যালীস হাউস লিমিটেড

U-PD-15 BEN

মাতাকে বুকের  
দুধ খাওয়াতে  
চলান যা P

জিভকে সোমী  
জন্মানর কোন  
ক্ষতন নেই।



পূপ-সী বাচ্চাকে  
তার একান্ত প্রয়োজনীয়  
সহজ স্বচ্ছ  
আরাম এনে দেবে।

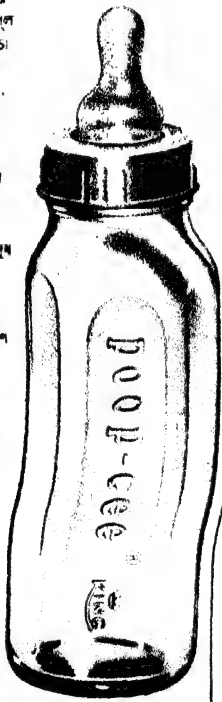
আপনি হয়তো বাচ্চার মা ঘাঁকে  
চাকরি-বাকরি করতে হয় অথবা আপনি  
হয়তো আপনার কিগার ঠিক রাখা  
সম্পর্কে বিশেষ সচেতন। হয়তো  
এইসব কারণে বাচ্চাকে বুকের দুধ  
খাওয়ানোর ব্যাপারে আপনি মন  
থেকে ঠিকমত সাড়া পান না।

এতে চিন্তার কোন কারণ নেই। এর একটি দৃষ্ট  
সহজ সুলভ উপায় আছে— তা হল পূপ-সী।  
এটি ঠিক আপনার মতই বাচ্চার পুরোপুরি যত  
করবে পূপ-সীতে লালানো রয়েছে এমন নিশুল  
বা মায়ের বুকের মত কোমল আর যেটি বাচ্চা  
দুধ সহজে চুষতে পারে। আর এই পূপ-সী  
ফাঁড়িৎ বাতলাটি এমন বিশেষ ডিজাইনে গড়া।  
যে বাচ্চা সম্মুখে সমানভাবে দুধ টানতে পারে  
এবং যার মধুন বাচ্চাকে কোনও কষ্টই করতে  
হয় না। এই বাতলে দুধ খেতে খেতে  
বাচ্চা কখনো হাঁপরে ওঠে না, যার ফলে তার  
মেজাজও বিগড়েন না।

সুতরাং বাচ্চাকে পূপ-সী-ফাঁড়ির সাহায্যে দুধ  
খাওয়ান। মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার মতই  
এটিতে দুধ খেয়ে বাচ্চা যে সুস্থভাবে বেড়ে  
উঠবে, সেখানে আপনি সুনিশ্চিত থাকতে  
পারেন। আর এর চেয়ে অলঙ্কার সাক্ষা-প্রমাণ  
আপনার আর কিই বা থাকতে পারে।

**পূপ-সী®**

তারতের সবচেয়ে বেশী  
বিক্রী কীডার ও ব্রিঞ্জ



INNOVATION/BLD/B/17

একাত্তরো জানীলা, একটি ছোটো কুকুদপারি বড়ো। পাঁচলা জাল লাগানো  
আছে। নিজের খোপে বসে পুরোহিত এই কোকরটি দিয়ে অনুভবের স্বাক্ষরিত  
প্রদান করেন। কিন্তু যে বলে তার মূখ দেখতে পান না।

পাপমোচনের কতো সহজ উপায়ই না বার করে ফেলেছে বুদ্ধিমান  
মানবেরা। সারা বিশ্বময়ই এ সব বুদ্ধিতে এ সব মানব দারুণ দক্ষ। কেউ গণ্যার  
ডব দিচ্ছে, কেউ ঝুপবরের প্রতিভা হিসেবে পুরোহিতদের কাছে বলে বুক  
হালকা করছে। দেখা যাচ্ছে অপরাধবোধের ভাব বড়ো কম গুরু নয়। আপন  
কারাগারেই মানব আপনি বন্দী।

ক্যাথলিক থেকে আর জানাই প্রাসাদে 'মৃত' বুদ্ধদের রাজী হাচ্ছিলেন  
না। বললেন, 'দূর, ও সব রাজবাড়ি দেখে মিছিমিছি সময় নষ্ট। আজ  
বোদলোরারের সমাধিতেই চলা। মন কতো অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে।'

তা যাযো। কিন্তু রাজসানী রাজপুরী পুনলেও আমার মনে হাজার  
বছরের অতীত ভিড় করে আসে, ইতিহাসের গঞ্জে আমি উতলা হয়ে উঠি।  
আমার কম্পনা আকাশে পাখা মেলে। বোদলোরাব, জেলেন, মালার্মে, ফ্রোদেল,  
রায়বী, সোলাজোরা, সেজন, মাতীস, রুসো মাদিলরানী রশা—এইসব  
পুণ্যাবাদের নামের পাশে পাশে সেই সব দুঃস্বাচারী বিলাসী একাধারে মচ ও  
ক্রোশ, নিদ্রা ও মরালদ, মাতা ও কপল, গুরুদ্বাহী ও মূর্খ, তাগানী ও ভোলা  
রাজনাথগণও আমাকে কম আকর্ষণ করে না। চতুর্দশ লুইয়ের এই প্রাসাদটি  
দেখার ইচ্ছে আমার প্রবল ছিলো। কিন্তু বুদ্ধদের আনিজ্ঞা প্রবল হওয়াতে  
নিরস্ত হতে হলো।

অপ্রত্যাশিতভাবে ইতান বসে উঠলো, ঢলো, ঢলো, ডালসাই বুদ্ধের  
আসি। কতোকণ আর লাগবে। তারপর ওখানে গেলোই হবে।

সবাইই দেখেছি ভাষাটা গৌণ, জপাটাই মূখ্য। ইতান ঠিক ধরতে পেরেছে  
আমাদের কথোপকথন। বললো, 'ডালসাই শহরটির সমস্তটাই জুড়েই এই  
প্রাসাদ আর উদ্যান। দেখার আশোনা নয়, আর দেখলেই বুদ্ধের গারবে সত্যি  
সত্যিই কী একখানা ভল্ড। স্বাধীনতা হিসেবে যদি ধরো, সেটাও একটা কীর্তি।  
বিলাসিতার বাহুলা ককে বলে তারও একটি উৎকর্ষ নন্দনা।'

অতএব গাড়ি বুরলো ডালসাইয়ের দিকে। যথেষ্ট দূর। যথেষ্ট সময়  
লেনেছিলো। পথে ইতান আমাদের একটা গ্রামও দেখালো। বাকি বলে গম্ভীর।  
একটা ক্ষেতের ধার দিয়ে চলতে চলতে বললো, 'দাখো।'

এই মাঠের মধ্যে দেখার কী আছে ভক্তের ভক্তের দৃশ্যটা চেয়ে পড়লো।  
বলদের খ্যালা নয়, মানবে টানা হাল-শাঙল। মানব হাল-জাংগাল টানতে—এ  
দৃশ্য ফলাসী দেলের নির্বিড় গ্রামেও আমরা কম্পনা করিনি। একটু চমকেই  
গিরেছিলাম। অশ্লিষ্ট কৃষক সমাজ মধ্যে টোনার মতো টুপি খুলে তাকালো  
আমাদের দিকে। হাসি ছুড়ে দিল। আবার মন দিল কাছে।

মুদ্র, হেসে ইতান বললো, 'এইবার একটু চা খাওয়া বাক, কী বলা?'

এই প্রান্তরে কোথায় সে চা খাওয়ারবে কে জানে। আমরা চারদিকে  
দেখছিলাম। গাড়ি এসে একটি বাগারির বেড়া ঘেরা কাননের দরবারে থামলো।  
সেই কাননে কোনো দামী ফল বা দামী লতা ছিলো না। তবু অনেকটা জমি  
ভরাট বাজে ফুলের বর্জিন ফোরায়া। পেরিরে ছোটো একটি কুটির, সামনে  
মাওয়ার মতো প্রশস্ত বাসিন্দা। সেই বারান্দার মস্ত মস্ত দুটি গাছের ছায়া।  
চার-পাশি সমান বরষা শিশু, ফুলের কাননের শ্রেষ্ঠ ফুলের চেহারা নিয়ে খেলা  
করাছিলো। সব খামিরে হাঁ করে চেয়ে রইলো আমার দিকে। একটি শিশু, পাখির  
গলায় কী যেন বললো আমাকে। ইতান মোড়ারীর কল করে বাকি  
শিশুটি জিজ্ঞেস করছে, 'তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ?'

আমার গাড়ি রঙের সিলেক্স লম্বা অরেনা পোশাক দেখছি সবলকে  
হতভম্ব করে।

দরবার সামনে এসে ইতান গৃহস্থামীর নাম ধরে কলো, বোকা গেল  
চেনে। স্বামী এবং স্ত্রী দুজনেই বেরিয়ে এলেন। শ্রদ্ধা কালে আরো একটি  
শিশু। ইতানকে দেখে দারুণ বন্দী। হেসে হেসে কী সব বলছে। আমাদের  
দিকে তাকিয়েও হাসতে লাগলো। মাথা নেড়ে বলতে লাগলো, 'হুবে বন্দী  
হয়েছে এইরকম অতিথি দেখে। এখানেও ইতান মোড়ারী।

কোল থেকে বাচ্চা নামিয়ে ছুটে ছুটে মোটা গিন্নী মোটা বুনোটির মোড়া  
এনে দিল বসতে। কতটা মোটা, সে ভিড়ের দিকে চলে গেল। দেখতে পেলাম  
মাটির উঠোন পেরিয়ে ও-পাশে রজাঘরে ঢুকলো। একটু পরেই ফিরে ওলো  
আবার। ভতোক্ষণে বাচ্চার এসে ফিরে দাঁড়িয়েছে। দু'বছর পেড় বছরের  
জোড়াখড়ি ছটি বাচ্চা তাদের। ছটিরই পাখরের মতো স্বাস্থ্য। আর মা-বাবার  
তো কথাই নেই।

বাবা ফিরে আসতে মা গিরে রজাঘরে ঢুকলো। কিন্তু মনের মধ্যে কালো  
কফি এসে গেল মগে করে, সপো ঘরে তৈরী বিস্কুট।

অতিথি পেরে কতো যে আমার করতে লাগলো। আমরাও সেই মাটির  
ঘরের মাটির মাওয়ার বসে সেই আয়ের সপো কালো কফি আর ঘরে তৈরী  
বিস্কুটের আশ্রয় গ্রহণ করতে করতে স্বাস্থ্য অনুভব করতে লাগলাম।  
গিন্নী আমার শাড়ী ছুঁতে দেখেছিলো, জিজ্ঞেস করাছিলো খোঁপার সব চুলই  
আমার নিজের অথবা নকল। আমি খোঁপা খুলে তার কৌতুহল নিবারণ  
করলাম। লম্বা চুলের বহর দেখে প্রায় সাপ দেখার মতোই গোল গোল চেয়ে  
অজকে উঠলো।



# ৮০ ওলিম্পিকের আগে রুশ দেশ

১৮

আরমেন বললেন, সকালে দেখেছেন সোভিয়েটের খেলাধুলার সেরা সম্প্রদায়। কিকালে দেখেন ছোটদের একটি স্কুল। বকালে ঠান্ডাটা আরও জেঁকে বসেছে। আঝাওয়ার প্যাডাসেও নাকি জানানো হয়েছে সন্ধ্যার দিকে ঠান্ডা বেশী হবে। বড় ঠান্ডাই হোক, ভরা কিসের। আমরা তো বাইরে বেরোচ্ছি না। দু-তিন মিনিটের জন্য না বাইরে থাকি।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করছিলাম গাড়ির ভিতর হিটারের কাছে বসে। এবার জল হলো। স্কুলের ধরে কাছে গাড়ি বাবে না। দুটি রাস্তাই করছে ঢেকে আছে। কক্ষের উপর দিয়ে বাওয়ার। চেষ্টা ক'লম। কিস্ট উপার নেই। যেখান দিয়েই বাই, ঢাকা ঢকে যাচ্ছে নরম করকের ভিতরে, গাড়ি এগোতে পারছে না। আমাদের মত অনেকেই তাই গাড়ি দূরে রেখে হাটছেন।

গাড়ি থেকে নামব কি নামব না ভাবছি। আরমেন

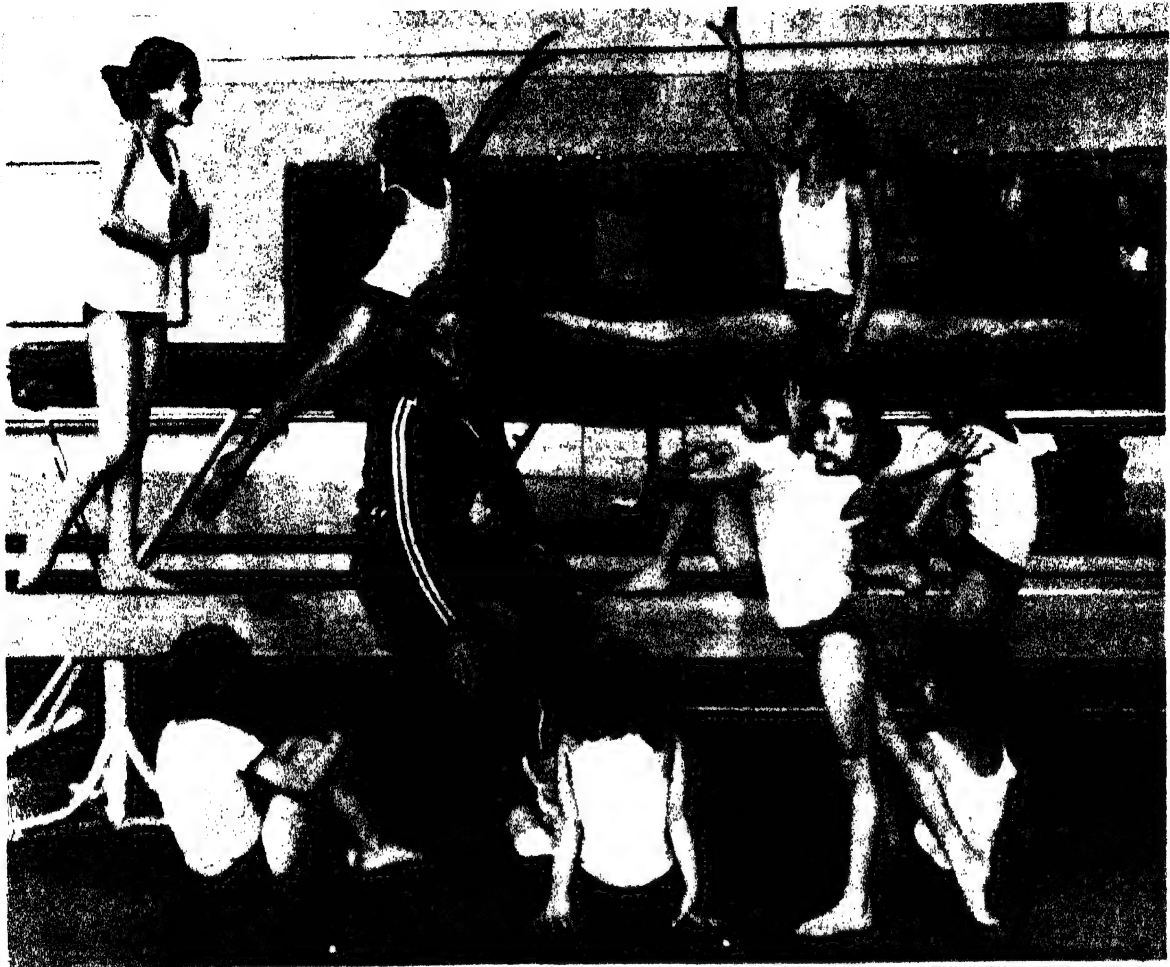
বললেন, ওরা সবাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। সরকারী প্রোগ্রাম। না গেলে ক'মনে করবেন। আমার সামনে অনেকগুলো মাথ ভেসে উঠল। সব কিছু ভাল করে দেখে এস—হলেছিলেন সাগরমর ঘোষ। রত নন্দী আর মকুল দত্ত বলেন, আসার সময়, পুথোগ মানবের জীবনে ক'মই আসে। মনে পড়ছিল ফিল্মে 'বিশ্ব মন্ত্রণালয়' অফিসারদের কথা, আপান গোটা ভারতের প্রতিনিধি।

নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। পুরো জটোই করছে ঢবে গেল। আরমেনের সুবিধা ছিল, ও'র জটো হাট, অর্থাৎ অনেকটা গাম্বটের মত। করছে আমার জটো ঢবে গেলো মোজার ভিতরে বরফ ঢোকে। মিনিট পাঁচেক হেঁটে স্কলে ঢুকলাম। ও'র টিং হলে অনেকই বসে। ওরা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করছেন। ওরা কারার বাবা, কারা, মা। ক্লাস শেষে ছেলে-ময়ে নিয়ে যাবেন। আরমেনের কথাগুলো বেশী কান না

দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—ও'প, ওভার কোট কোথায় খুঁজতে হবে? হলের ডান 'ডক' কেটেই ওগালি রাখার ঘরটি মিলল। ওখানে গিয়েই তড়াতাড়ি জটো খুললাম। বা আশংকা করে ছলাম। সোল ভেন্ড করে উলেন মোজা ভেঙে গেছে তুমারে। ঠান্ডার আঙলগুলো জ্বালাড়। আরমেন ইতস্তত না করে হিটারে। সন্ধ্যা নিয়ে বললেন। কিন্তু মোজা, জটো তড়াতাড়ি ব'কোর কি? আঙলগুলো গরম পেয়ে একটা সজীব চল।

ঠান্ডা থেকে সাবধান।' কথাগুলো আমার মনে পড়ল। দীর্ঘকাল আগে কলকাতা থেকে এক সাহিত্যিক এখানে এসে হঠাৎ ঠান্ডা জল মধ্যে দিয়ে নাকি দাঁত-গলা খাইয়েছিলেন। আরমেন আমার হাকচাব লক্ষ্য করছেন। ডরোঁয় পাতা খলে 'কিছ', লিখতে গিয়ে ল'দেই পেগেটের কয়েকটি কথা চোখে পড়ল। 'কারি জন ইওর স্টাডি উইথআউট রেস্ট, উইথআউট রেস্ট।' আমাদের উপস্থিতির সবটুকু স্কুলের অংশ





জিমনার্স্টিকস স্কুলে উঁচু বিহু ছিদের উপরে দেহেরা অনুশীলন করছে। কেউ কেউ কোচ আনা ফিল্ডের উপর দৃশ্য

রানজকত করেছেন আমার সঙ্গে সপেই। তাঁর ব্যস্ত চক্ৰ না দেখে বোঝা নিলেন—আমরা কি করছি। আরকেন জানালেন, ঢেংকার অনুশীলনী কোয়ার্টার। খালি পার প্রবণতা অনুশীলন। রানজকত আমাকে কীভাবে সাহায্য করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। হঠাৎর সামনে জুতো, মোজা রেখে অবশেষে খালি পায়েই টকলাম। এখনও কাঠের সো, তার উপর জোটা কাপেট। সুতরাং ডেজা জুতো মোজার চাইতে খালি পায়ে জরনক আরাম। অথচের বরাট চমৎকার সাজানো। এ ঘর টিও ওলিম্পিকঘর। ছোট্ট অলম্বারিতে উল্লসন ধরেক ছোট্ট সাইজের ডাল-কুছান—মিমা। পাশেই টিউ। বেলে একধরো সান্না কাগজপত্র, ফাইল। এসব রেখেছেন প্রয়োজনে আমাদের খোঁজা। জনক।

এটি স্পোর্টস স্কুল হলেও এখানে জিমনার্স্টিকস ছাড়া অন্য কিছু দেখানো হয় না। এটিই স্কুলের প্রাচীনতম স্পোর্টস স্কুল। স্থাপিত ১৯৩৩। অত্যন্ত রানজকত জিমনার্স্টিকস বিশেষজ্ঞ নিয়ন্ত্রণে। ব্যঙ্গ পদ্ধতিগত। যথা। কথাবতীর মনে হল এই স্কুল ও এর ছেলেরেরা ওর প্রণ। বিশেষ জিমনার্স্টিকসের অ আ থেকে চম্পক পূর্ণিত তাঁর নকলপণে। মস্কো আমার করেক দিন আগে বিশ্ব জিমনার্স্টিকস লেব হয়। তাকে সোভিয়েটের ফল খবর ভাল হয়নি। আর রোমানিয়ার সেই কিল্লর বালিকা নব্বির কেমনেইচ জাহত থাকে সন্তুও চমৎকার ফল দেখার। নব্বিরর কথা তুলতেই বললেন, ওর কুনো হয় না। জানালেন সে চিকিৎসার জন্য রাশিয়ার এসেছিল। ওর হাতের

তালতে ফোড় বন্ধ ভেগাছে। অর গলার কালেন, অক্সিয়ার কোচ কিস্তু আমায়র দেশেরই।

ওই বছার মাঝে রানজকত আমাদের জিমনার্স্টিকস প্রসঙ্গে এসল। নেতাজী স্টেডিয়ামে কেমন জিমনার্স্টিকস হাঙ্গ। তিন রা জ। প্লাব জিমনার্স্টিকসে জাল কেন? অন্য রানজকত চাইতে এখানে কি সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি? ইত্যাদি।

রানজকতকে পবিত্র মনে হ'ল—তিনি এমন একটি ফোব সঙ্গে স্ট্রীলিও হাক বার সিরে আজকাল খেলাধুলার কথা ভাবই যার না। বললাম। আমরাও জাহ'ই সব ফোবর আগে বাড়ি জিমনার্স্টিকসে হাঙ্গ-মেরোসর গুপ্ত কর যার। অধ্যাক কালেন না শুন জিমনার্স্টিকস নাক। রকর আকর্ষণেও। আকর্ষণিকস হল কিং অর স্পোর্টস, অর জিমনার্স্টিকস কুইন অর স্পোর্টস। এই দুই খেলার ম্যারা যাহের শীর্ষ তৈরী, তারা অন বে-কোনো ফোবর গেল প্রথমই সাক্ষা পেয়ে যাবে।

বললেন, খেলাধুলার উন্নত বে-কোনো দেশে যল, বে-কোনো স্কলেই জিমনার্স্টিকস জ। আকর্ষণিকস সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন।

সাত বছর আগের যে-কোনো ছেলেরের এই স্কুলে ভর্তি হতে পার। কারও মাইনে লাগে না। সবারই স্কুলে তো খেলার ব্যবস্থা আছে। দেখলে যার ভাল কলা করে খেলার, অ কালের শেষ মনে হয় বিশেষ ট্রেনিং প্রকল্পের তাকেই স্পোর্টস স্কুল পরানো হয়। কিস্তু লেখাপড়া যার রেখে নর। খেলার জন্য লেখাপড়া ছাড়াই দেখা

দিলে চিঠি চলে যার বাড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়ার দিকে বেশি নজর দেওয়া হয়। অর্থাৎ একটির বদল দিরে আরেকটি ক'হতেই নর। জেলসেল স্কুল ছাটির পরে এই ছোট ছোট ছেলেরের চলে আসে স্পোর্টস স্কুলে বিশেষ ট্রেনিং নিতে। নিয়মিত প্রভর্শন দুই থেকে চার ঘণ্টা এখানকার ক্লাস।

ক্লাসগলি দেখার আগে অধ্যাক কালেক্টর, আসে এই স্কুল। ব'জর রকম কলা দেখানো গার। ১৯৬৮ থেকে হচ্ছে শুন জিমনার্স্টিকস। সাত থেকে বা। অক্সিয়ার ছেলেরেরা অন্য এই ধরনের স্পোর্টস স্কুলে ফস্কোতে ওঠে। তবে একই স্কুলে আগের মত নানারকম খেলা খেলানোর ব্যবস্থা নেই। বিভিন্ন খেলার পৃথক পৃথক স্কুল। এতে প্রাথমিক সূক্ষ্মা ফোন আছে, তেমনি বেশি ট্রেনিং-এও অনেক সুবিধা হচ্ছে। তবে ছেলেরেরের এরই ভিত্তি যে ৫৪টি স্কুল প্রয়োজনে খেলার বেল কর।

আমি ভব'ছলাম কলকাতা। কথা। ক'সিরর অন-শীলন কেন্দ্রে পশ্চিমকলা জজা ভীড়া পরিষদ যে রকমকার ব্যবস্থা করেছেন এন আই এস কোচ রেখে লেখানো আধ উল্লসন ছেলেরেরও যার না। বেঙ্গল টেক্সট ট্রেনিং সন্থা ভারতে প্রথম টেক্সট ট্রেনিং স্কুল করেন করেক বছর আগে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে। ভারতের অন্তর সেরি বি টি টি এ বাবা হকে বন্ধ কু পিরেছেন। আর এখানে? একক কিল্লীত চিত্র। আমরা প'ই জিম সপ্তাহের কোচ—যার কোনো মাইনে হয় না। আর এখানে প'চ বছর হয়ে নিরব জল ট্রেনিং নিয়ে এই

শুনের হোস্টেলের নাম 'জিমনাসিয়াম'। এখানেই জিমনাসিয়ামের স্টাফের, শুলে বা কলেজে। তবে তার জন্য ভাল ফল দেখাতে হয় এই খেলার শুলে কেন। জিমনাসিয়ামের শুলেও। অলমারির যোগে মিশারালিক দেখার অবকাশ কলেন। প্রতি সপ্তাহেই এই শুলে জিমনাসিয়ামের কলিটিন হার নিজেদের চাফ। প্রতি মাসে জিমনাসিয়াম সপ্তাহে একবার বা দু'বার হয় ইন্টার শুলে কলিটিন; এগুলি তার প্রাইজ।

অধ্যক্ষকে চক্কর দান হাফিল শুলের ছাত্রছাত্রীদের কাপড়টিতে। বারো বারের অনুমোদন করেছিলেন। চলন জিমনাসিয়ামের শুলে আসি। এত মাঝে যোগা দাঁড়িয়েছে। জড়োও অনেকটা। হলে প্রবেশের আগে দেখাশুন জেলেমেয়েদের পোশাক বদলান পৃথক পৃথক অংশে রাখা। স্নানের জায়গা, টয়লেট ইত্যাদি। অধ্যক্ষমান দা। ছাত্রদের দেখে কলন। এত মাঝে মাঝেই অভিভাবগ নিয়ে আসেন আমার কাছে—জেলেমেয়েরা ত্যাগাড়ি বাড়ি ফিরতে চান না কলে। বলেন, আমরা অফিস কাছারি করে ক্লান্ত, কতকগুলি অপেক্ষা করব। বাড়ির কাজও তো কিছু কিছু আছে।

আসলে এমন পরবেশ এলে কাজ বাড়ি কি তে ইচ্ছে করে? জেলেমেয়ে পৃথক হলে ঢুকে দেখি আলোর কলমল হল। জিমনাসিয়ামের কী সব সরঞ্জাম। সন্ধ্যা ভারত খুঁজলে কোথাও মিলবে না। আমাদের সবার উপরে যে পাতিয়লা, সেখানকার জিমনাসিয়ামের সরঞ্জাম ইত্যাদি অপেক্ষা এই ছোট্ট শুলে জড়োত দলদল উত্তর পলিয়ে। ডিডটা শব্দ হওয়ার দরকার—একবার এরা খুব কিংবা। আর সেই মত কাজ করছেন

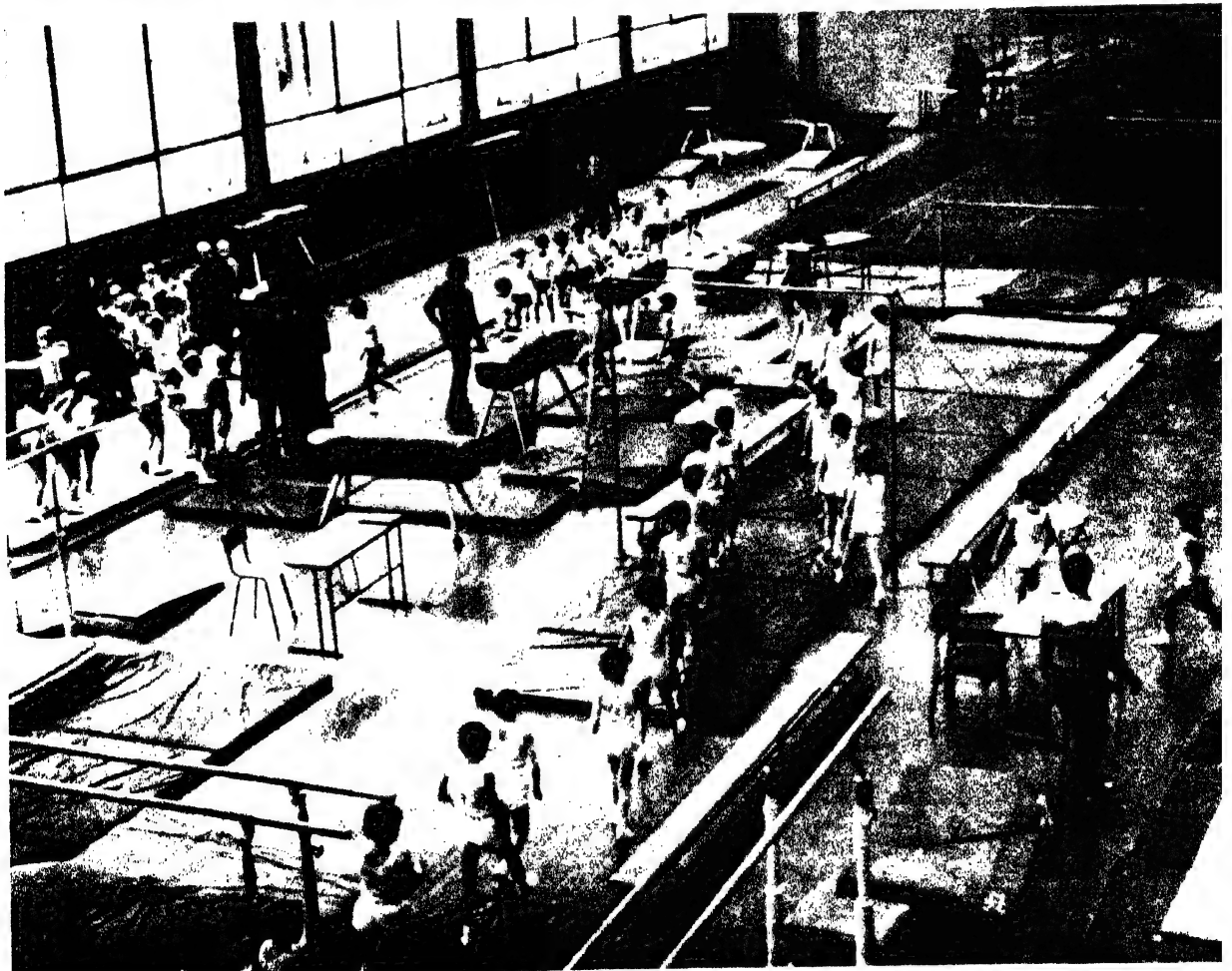
মেয়েলি শাশা এই জেলেমেয়ে, তেমন চোখ বাধার সরঞ্জাম। এক-একটি ইন্ডেন্টের সরঞ্জাম হাফ উল্লস করে। প্রতিটি ইন্ডেন্টের জন্য চার-পাঁচ জন করে কোচ। প্রতিটি ইন্ডেন্টে আবার একজন করে ডিক কোচ। প্রতিটি জেলেই কী সিঁরাস। জায়ে-ডাল রেকর্ডের কাছিকে আফসোস পাওয়া যায় না। প্রতিটি জায়গা নিখুঁত না হলে কেউ অনুশীলন ত্যাগ করে না। হুয়াইজটাল বার-এ কেউ কেউ উঠেছে? অন্যরা তখন পায়লালা বার নিয়ে হস্ত। সেখানে ডিক? চলে গেল পমেলড হরলে। তা না হলে হরতো ফোর এয়ারলাইজে। একদম উত্তর প্রান্তে খেন গালিচা বিছিয়ে দেওয়া। বিকট জায়গা জড়ো ফোর এয়ার সাইজের মাটি। ওখানে পুরো বোরাল জড়ো আননা। চমৎকার বাজনার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ফোর এয়ারলাইজ করছিল। মাঝে মাঝে ওই ইন্ডেন্টের অনুশীলন কথ থাকলেও চমৎকার সর ফেসে কেড়াইলা সারা হলে। সেই সূরের সঙ্গে সব মিলিয়ে খেন একটা মোহমর পি বেশ।

খেন হল অধ্যক্ষের দরলতা আছে পনের হলে—কোথানে মেয়েলি অনুশীলন করছে। উনি গর করে কলন। প্রেসিডেন্ট নিকসনের স্টা এখানেও এসেছিলেন। এসেছিলেন জড়ানোর রান্নাও। অধ্যক্ষের দরলতার কারণও অনেক। মেয়েদের এই হলে তখন ফোর নানা রকম তাপমা দেখাছিলেন মহিলা কোচ। আর একজন পলননে বজাছেন। জেলেদের দেখে এতকল মশ্ব ছিলার। এয়ার ডল মশ্ব মেয়েদের দেখে। এদেরও কল সাড ফকে এগারো। মেয়ে নয় এরা। করং

আছে মনে হল না। মানুকের দেহ এত নমনীয় হতে পারে?

এখানেও একই রকম দলোবল। একই ইন্ডেন্টে একাধিক সরঞ্জাম। ফোর এয়ারলাইজে এই শুলের মেয়েদের এমন কলম; তা হলে ন্যাসনল চ্যাম্পিয়ন বা ওলিম্পিক স্পর্ক-বজালা কলম। আর। বারি বাড়ি থাকত, আমাদের দেপে জেলেমেয়েদের জন্য তুলে নিতাম। তুলে নিতাম টেপ পলননের সড়িতও।

করং আটকে। একটি মেয়ে ভর্তিই হলে অন্য শীলন করছিল। সাদা পেরশাক। স্টাটিং পরেই গিরে কনসেন্টে করে দেখে লরু করছে। কি সিরিাস। আ। বছর বরসেই এই রকম? ও এরা জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ওর বরসের গ্রপে। যাকলম, নাসিয়ার মত ১৪ বছর এও যদি ধরতির আনে বিশ্ব জ ওলিম্পিক জিম নাসিটকসে অবাধ হকর কি আছে। সারা সোড়রো ইউনিকন হরলে এমন ক্ষুদে নাসিয়ার লরে লরে মিলবে লনলাম ভর্তিই হরসের একটি কৌশল নিখুঁত হক্কে না তাই বরো বরো সে ওটি চেষ্টা করছে। নিখুঁত করল আমাদের উপস্থিতিতেই। তখন ওই-ই বাসতে পেরে ছিল। ২৭তম বারে নিখুঁত হলে কোচ ওর পিঠ চাপিয়ে দিলেন। অধ্যক্ষ নিখুঁত ডাকতেই সে আমাদের কানে এস। ওর জিমনাসিয়ামের জড়ো হাত সেরে দেখ ছিলম। দেখছিলাম কিসের তৈরী। কলনের কোথ হা ছোট্টদের পুরো হাত দেওয়া গহিত কাপার। ফুটকা মেরেই পা সঁরকে নিল। খেন ওই খবর অন্যর কল



জেলেদের হলে জিমনাসিয়ামের বিভিন্ন উচ্চতার সরঞ্জাম—রিং, পায়লালা বার, পমেলড হর। শেষ প্রান্তে ফোর এয়ারলাইজের জায়গা



কিশর চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু আনাতনি করণ্ড

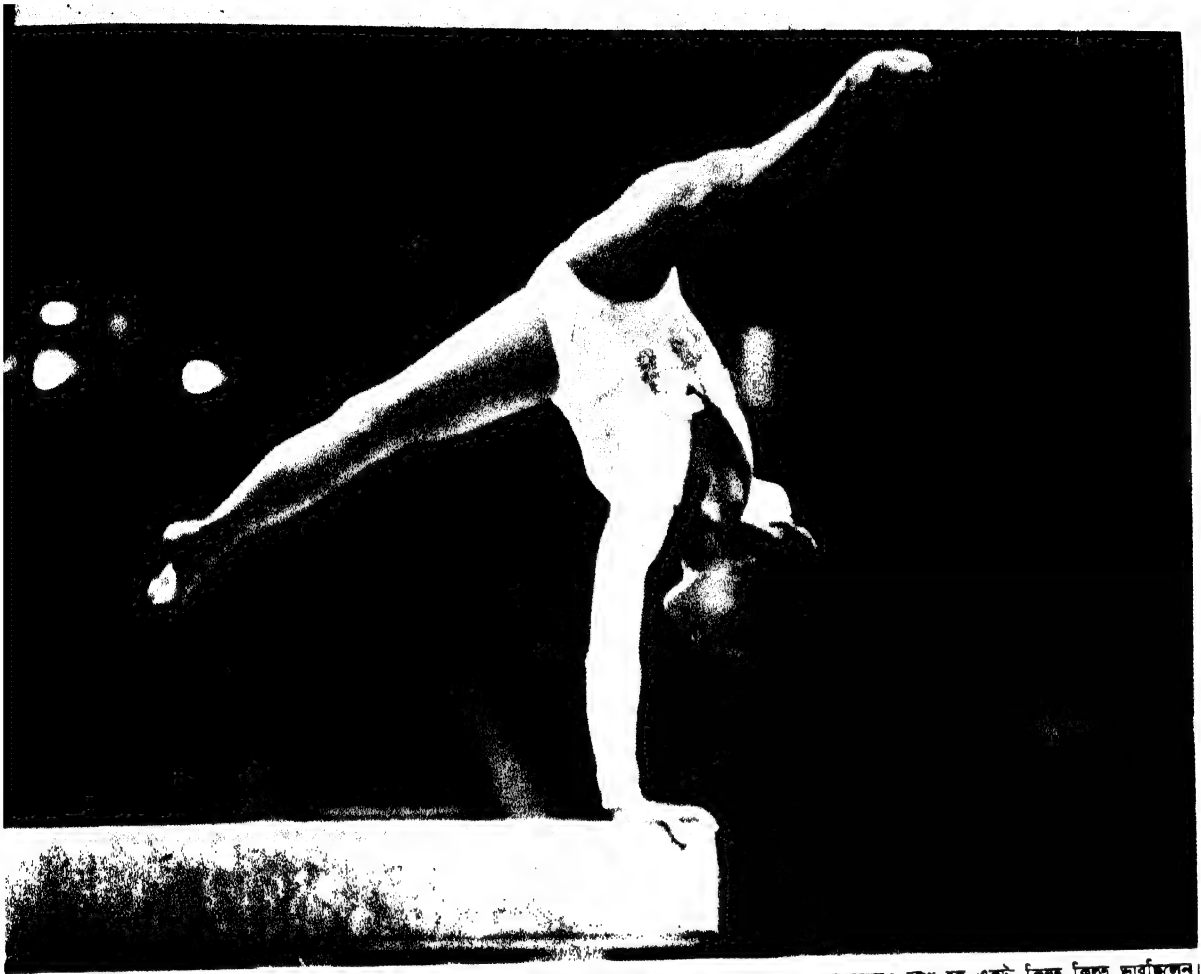
ফেলছে। অথচ শুধু বোঝালে, আমি কেন হাত দিতে চাই। তারপর ও কাছে এল অত্যন্ত সজোরে নিয়ে। অকস্মিক বললাম, ও'ক একটা সার্ভেনির দিতে চাই। দিলাম আমাদের কয়েকটি মন্ত্র। সে তো কিছতেই নেবে না। অথচ বললে, সে হাত বাড়াল, 'পারিসবা বলে ছুটে গেল কব্জীর কাছ দেখাতে। অন মেয়েরা তখন আমার দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু কিছ, চেয়ে নেওরা এদের ভয়ভার বাইরে। নিজেকে ছোট মনে হচ্ছিল—এদের সকলকে কিছ দিতে পারলাম না।

মেরেসের হলে আটটি কিছু বিভিন্ন উক্তার। কেন? বললাম একটু পরে। বিভিন্ন বরসের, বিভিন্ন উক্তার। মেরেস পঞ্চক পঞ্চক কিমে অনুশীলন করছে। আন ইভন বারও বিভিন্ন উক্তার। জিম-ন্যাস্টিকসে পড়ে যওয়ার সম্ভাবনা নানা ইভেন্টে। তাই বিভিন্ন ইভেন্ট করতে গেলে বেশ সাহস চাই। দক্ষিণ প্রান্তে দেখি দাঁট ফোমের ছোট পুকুর। টকরো টকরো ফোমে পুকুর দুটি ভর্তি করা। কোচরা একদম নভিল মেরেসের হাতে তুলে ওখানে ছুড়ে ফেলছেন। ও। ফোমের উপর পড়ে লিপ্রাং-এক মত লাফিয়ে উঠছে। ছেলেরদের ওখানে বিভিন্ন উক্তার হরাইজ-টাল বার ও প্যারালাল বার দেখছি, মেরেসের এখানে দেখছি তেমন বিভিন্ন মাপের আন ইভেন বার। মেরেসের এখানে চারটি স্ট্যান্ডার্ড আন চারটি নিচু বার। আন ইভেন বার চারটি। দাঁট হস।

এই জিমন্যাস্টিকস স্কুলে মোট ছাত্রছাত্রী ৩০০। দেয়াল ঘেঁষে ছোট একফালি বিভ্রামের জালগা ওদের। আমরা যেতেই এই পড়ুলগুলি উঠে দাঁড়াল। ইতস্তত করছে—কোথায় আমাদের কসতে দ্বেবে। সবচেয়ে অবশিষ্ট বোধ করছিলাম ওখানকা কোচরা। অথচ



অস্কেয়ার ইয়ং পাইওনিয়ার স্কুলে ছোটবেলা দাবা স্কুলে চলে নিজা অনুশীলন



লেনিন স্টেডিয়ামের জিমন্যাস্টিকস হলে বিম ব্যালালস দেখাচ্ছেন নাতালিয়া আপোশানিকোভা



ক্যালিফোর্নিয়ার কিং চ্যাম্পিয়ন ইরিনা বেরুদিনা

বান্ধকভও বেধ হয় একটু কিন্তু কিন্তু ভাবছিলাম। আরমেন ও আমি ছোট জামাটকুত য়সলাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অথাক বোকাতে লাগলেন সব। বললেন, শুল, জাতীয় শুল, এক গ্র প ও ওদের বয়সী জাতীয় প্রতিযোগিতায় আমার শুলের অনেকই অংশ নচ্ছে। এখন ডিসেম্বর, এদের কয়েক জনের বা পরবর্তমান্যাস তাতে মনে হয় সিনিয়র জাতীয় দলে মশ্কা ওলিম্পিকসে। ট্রায়ালের জন্য আসতে পারে। হয়তো নির্বাচিত হবে দ-একজন। কিন্তু আমার লক্ষ্য ১৯৮৪। সারা দেশের নানা শুলে অংশে জিমনাস্ট রয়েছে। কম্প টলন ভীষণ। তবে আমার কিবাস ১৯৮৪-র আগে এই শুলের আধ ভজন ছেলেমেয়ে থাকবে সিনিয়র জাতীয় দলে।

কথা ছিল আধ ঘণ্টা + আধ ঘণ্টা = এক ঘণ্টা থাকবে। কিন্তু চাক ঘণ্টা কেটে গেল। 'প্রতিযোগিতা নয়, অনুশীলনে এতক্ষণ কাটলে চলবে কেনে।' আরমেনের কথা জবাব দেব কিন ভাবছিলাম। অথাক মশাই চাই ছিলেন—আমি আ ১০ থাকি, আরও দৌঁধ, আরও জেনে নিই। তা ছাড়া শুলেই ও'কে বলেছিলাম বিনা শিকার, 'আমরা খেলাধলার পিছরে, আমাকে জানান, কেবান যতে এ গরর খেতে পারি, কেন কলকাতার ফিট। খেলারোড় জাইবোনদের বলতে পারি, কেবানতে পারি সোভিয়েটের ছেলেমেয়েরা এগিরে কেন, বেন আমাদের জীড়া কতদেয় জানানতে পারি। সোভিয়েটের এগিরে যাওয়ার মা জকট। কেবার। আরমেনের কথা জবাব দিলাম অথাককে। এক ঘণ্টার জামগার আপনি চার ঘণ্টা সময় দলেন। যদি চারদিন ল'হু এই জিমন্যাস্টিকস শুলে থাকার অন মতি বেন, আমি থেকে যাবো। বড় ইচ্ছে ছিল এই





পাশেই হল—এ এই লম্বের পা টিক এলি রাখতে হয়—বোকার্কেস কোর্ট

পাতুল ছেলেমেয়েদের সারা দিনটা স্টাডি করার ওসে। সকালে ছয় ভাঙা থেকে রাতে শতে বাঁওর অবধি জান্নার ইচ্ছে ছিল। জানতে চাই ওদের স্বপ্ন মাসের, জানতে চাই জেনারেল স্কুল ওদের লেখ-পড়ার ধরনটা। জানতে চাই ওদের মানসিকতা, ওরা কি খার ইত্যাদি সব। জানতে চাই আপনাকে, আপনায়। পরস্পর ও মেরে কোচসেও।

আমেন সব কথা রূপ ভাষার অধ্যাক্ষকে বন্ধ করে বলা পর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি তা হলে খেলাধুলার রানীর (জিমনার্স্টিকস) প্রেম পড়ে গেছেন।

স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নই—এমন একটি স্কুল পেলে আমার হৃদয়, ২৪ পরগনা, ওয়েলিংটন, চেতলা বা পাঞ্জাব হিপারার জিমনার্স্টিক ছেলেমেয়ে ১০ খাওয়ার ছয় ভুলে বাঁবে।

স্বপ্নে দেখা জিমনার্স্টিকস বা স্পোর্টস স্কুলও বোধ হয় এমন হয় না। জিমনার্স্টিকস হলের বইরে ওয়েস্টেই হলে তখন 'ভিড বোডু' বা মা-দের। প্রত্যেকে অপেক্ষা করছেন ছেলেমেয়ের জন্য। কারুর কারুর ছুটি হয়েছে। জিমনার্স্টিকসের পোশাক বদল করে দ্রুত সাধারণ পোশাক পরছে নিজেরাই। কারুর সাহায্য দরকার নেই। কিটকাগে সব গুছিয়ে আছে। সশেণ আরও একটি ব্যাগ। তাতে স্কুলের বই খাতা। ওই নিয়ে কেউ ছুটে মায়ের বুক ঝাঁপিয়ে পড়ছে, কেউ বা বাবার আদর নিয়ে। ওরা কেউ দিক্‌নে আইসক্রিম, কেউবা চকলেট। খাওয়া শেষে কোচকে অভিবাদন জানিয়ে বাড়ি বাচ্ছে। আমাদের স্কুল ছুটি

হলে যেমন হইচই, ধূসর আর তেমন নয়। সবই হচ্ছে নিশাচর, সব কিছুর মধ্যে একটা ডিসিলিন, অথচ প্রাণের স্পর্শ সবই। সব কিছুর মধ্যে অদ্ভুত নিষ্ঠা, অদ্ভুত ভালোবাসা। স্কুলের পড়া শেষে খেলার স্কুলে আসতে হবে, পরম আগ্রহে অনুশীলন করতে হবে, আকা। বাড়ি যেতে হবে। কোনো কিছুর মধ্যে ফিকি নেই। বড়রাও কখনও বলেন না—এটা কেবল সেটা করো। একটা জাতিকে কড় হতে গেলে, একটা জাতিকে উঠতে হলে ছোটবেলা থেকেই এরকম বোধ হয় ট্রেনিং দরকার। সোভিয়েটের প্রতিটি মন বই সম্ভবত এমনিভাবে ট্রেনিং পেয়েছিলেন তাদের কালো ও কৈশোরে।

স্কুলে রেওরাজ আছে ডি আই পি-রা ভিজিট করতে এলে ভিজিটর খাতার মতক লিখতে হয়। আমি তো এমন কেউ নই। বললাম, বা লেখার বা কলাম দেলে ফিরে লিখব। লিখব আমাদের ছোটদের পরিচয় আনন্দমেলার। এখানে আসার আগে নীচে পূর্ণাধ চক্রবর্তীও বলেছিলেন, আনন্দমেলার জন্যে কিছু ছোট্টরলস আসিস।

অধ্যক্ষ নাছোড়বান্দা। লিখতেই হবে খাতার কিছু। বাৎসারতেই লিখলাম করেকটি লাইন। তা ইংরাজিতে বোকালাম আরমেনকে। প্রথম তিনটি লাইন আমার স্থান সাধক। অধ্যক্ষ শুনে বললেন, পরে কখনও সোভিয়েটে এলে অকলাই এখানে আসবেন। উনি একগাঙ্গা ছ'ব মিলেন ওর স্কুলের। সকলিই স্কুলের ছেলেমেয়েদের ট্রেনিং-এর। বললেন, এগুলি আমাদের নীচকালের বন্ধু ভারতের ছোট ডাই-

বোনদের জন্য। ছবি দেখে ওরা প্রেরণা পেলে, উপকৃত হলে—আমরা খুশি হবে।

দেওয়ার মত তেমন কিছুই ছিল না আমার কাছে। কিছু মাত্রা দিলাম সাংবাদিক হিসাবে কলাম, স্কুল লাইব্রেরির মিউজিয়ামে রেখে দিলাম।

আর দেরী করার উপক নেই। বাক্তই রক্তনা হয়ে হবে লেনিনগ্রাদের দিকে। অধ্যক্ষ কলের প্রধান কর্তব্য পর লত পোছে মিলেন।

বাঁয়ে তখন অধ্যক্ষের ডেস্কের। বৃষ্টির মত তুষার পড়ছে। স্কুলে ঢোকার সময় দেখেছিলাম অনেক জাঙ্গা বরফহীন। কিন্তু এই চার ঘণ্টার বেশ ক'ব কারা সন্ধ্যা পোছা তুলো দিবে সব ঢেকে দিয়ে গেছেন। গায়ে যেমন থান ক্ষেতে। মধ্যে সন্ধ্যা জাঙ থাকে, এখানেও কক্ষের মধ্যে কেনোরকমে দুটি প ফেলার মত সন্ধ্যা রান্ধা। সেই রান্ধা ধরে আমি সন্তর্পণে হাটতে লাগলাম। গাড়ির হালি মিলন কে কিছুক্ষণ হাটার পরে। বরফে ফেঁপেও হতে পারে আশঙ্কার ড্রাইভার একটু পরিষ্কার জাঙ্গায় লিখে গেছিলেন।

ঠান্ডার আমি একটুতেই কাবু হয়ে পড়ছিলাম কিন্তু ওই ছেলেমেয়েরা দেখে দ্রুত হেঁটে চলছে দ্রুত জ্রম বা বাস রান্ধার দিকে, কিংবা মেট্রো ধরতে ওদের মধ্যে একটুও ক্রান্তি নেই, কি কি নেই আসলে জন্ম থেকেই ওরা এইভাবে তৈরী। মনে হচ্ছিল লড়াই করে বাঁচতে হবে কথা ক'টি এসেপে মানুসেরই বলা মানস, আমাদের দেশের মানুসের জা হয়তো নয়।

(জন্ম)

## ছাঁব আকে, ছিঁড়ে ফ্যালে

### শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বহুবাহু হারিয়েছে ব'লে আজ কেউ  
লাকটিকে খেঁজে না আর, সুতো ছাড়তে থাকে।  
যতো দূর যেতে চায়, থাক, বেঁচে থাক।  
অমৃত্যু মাথার 'পরে মৃকুট দিয়েছে—  
অনেকেই চেনে তাকে, অনেকে চেনে না।  
বাঁধে কিছু, বাঁধে কিছু কোনো কোনো লোক,  
কিছুই লাগে-না-ভালো এমন অসুখে  
লাকটি উজ্জ্বল আজ, বেঁচে-বর্তে আছে  
কোনো মতে। বেঁচে থাক, দৃষ্টি হয়ে থাক।  
কল্কু, কী যে দৃষ্টি তার নিজেই জানে না,  
লাকটি কবি, ছাঁব আকে, ছিঁড়ে ফেলে দেয়!

## কাছেদূরে

### বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

খুব দূরে নয়,  
একটি গাছতলার ছায়া প'ড়ে আছে।  
খুব কাছেও নয়,  
একেকটি মানুষের রোদ-মাথার অমন হাটাচলা  
আর হা-পিতোশ করা  
আর নিজ-নিজ দূরে গলদঘর্ম-হওয়া।

কী এসে যায় বললে—  
মানুষ-নামক একটি বিন্দু ফুটে ওঠে মাঠে;  
যে-মাঠ একটি নিশ্বাস শূন্য;  
দীর্ঘ, আর সর্বাঙ্কু থেকেই অনেক দূরে।

কাছের বলতে—এই চারদিকের ধূম ডাঙা বড়ো,  
অনেক বড়ো।  
তার প্রকাণ্ড হাত-পা আর নখের সম্মুখে  
স্ব-নৈবেদ্য,  
যে তার খোড়োচালসম্মত  
নিখিলে—  
পাঠায় ধোঁয়াটে গন্ধ।  
হৃদয়ে থাকে চোখ আর চোখের ভিতরকার  
পুরনো চিহ্নগুলি।

### কাছেদূরে

ওই চিহ্নের সুতোয়,  
হাই-তোলা শেষ ক'রে, এই সব—  
মানুষ হয়েছ মানুষের মতোমুখি।  
এখন কার কতো শতধার দৃষ্টি  
পাথর হয়ে গলাবে,  
তার বড়ো গলায় বলুক মাইক্রোস্কোপ।  
আর বলুক সেই গাছতলাটি,  
যখানে মানুষ নেই, আছে শূন্য ছায়া।

## মোহটোহ

### প্রশবকুমার মুনোপাধ্যায়

নতুন দৃষ্টিতে পুরনো ছন্দে ধরতে বাওরাটাই যে ভাল  
সেটা টের পেলাম এখন  
ততক্ষণে সেটা দৃষ্টির ছিল।

এক নম্বর ছিল, দৃষ্টি পাওরাটাই।

দৃষ্টি পাওরাটাই কিছুটা পুরনো অভ্যাস।  
অনেকটা সাবেকী ছন্দে কীরে মাথার মতোই  
অসতর্ক, মোহময় একটা ব্যাপার।

অথচ এমনই বরেন্স যে, অসতর্ক হলে চলে না।  
প্রশ্নই ওঠে না, মোহকে প্রশ্ন দেবার।  
পারলে বরং পাশে একটা 'টোহ' লাগিয়ে  
আরও সপ্রতিভ সাজার চেষ্টা করা উচিত।

হাতে নেওয়া উচিত একটা লাঠি,  
বেশ করেকবার সজোরে সেটাকে মাটিতে ঠুকে,  
হারমোনিয়াম বেলা করার কারদার  
হাত নাড়তে-নাড়তে বলা উচিত—

ও-সব দৃষ্টি-দৃষ্টি আমার আসেটাসে না হে,  
মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে-সম্পর্কে  
ভালোবাসাটোলাবাসার  
বিশ্বাসটিবাস নেই আমার

দেখা উচিত  
কাদের অলীক পৃষ্ঠটাই বেন ছাড়িয়ে পড়ে তখন  
বেন বোরিয়ে না পড়ে  
ভেতরের চেহারাটা।

## বিচ্ছেদ

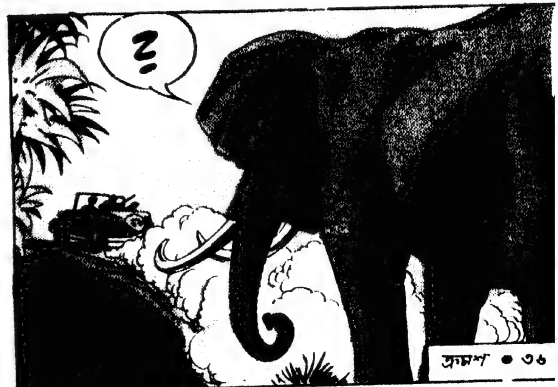
### আলোক সরকার

সম্মে হবার ঠিক আগে আবার দেখতে পেলুম  
এক দৌড়ে পালিয়ে গেল  
সবুজ একটা বিদ্যুৎ—হাঁক দিয়ে বললুম  
গল্প করবে না? বসবে না এসে পালাপাশি?

একদিন খুব গল্প হতো। ঠিক কবে মনেই পড়ে না  
একটা ঝর্না ছিল, হিজলগাছ।  
অনেক অনেক দিন আগে। এখন দেখা হলেই পালিয়ে যায়।  
আমি কিছুই বুঝতে পারি না! তার সঙ্গে ঝগড়া হলো কখন?

আমার আর ভেমন কান্না আসে না। ভাব ক'রে নিতেই তো চেয়েছিলাম।  
কৃত স্পষ্ট সব মনে পড়ে  
ধূম থেকে জেগে উঠছে অঁধার এদিক ওদিক কথা বলছে জোনাকি।  
চিকচিক করছে রূপোলী জল পাতা নৌকোর মতো ভাসছে।

আসলে গল্প ফুরিয়ে গেছে আমার নাকি তার গল্পই ফুরিয়ে গেছে সব!  
গল্প ফুরিয়ে গেলেই তো একা একা।  
সে কি ভুলে গেছে গজমোতির মালা? আর আমার মনেই পড়ে না  
বাঁশবনের ভিতর দিকের অন্ধকার। একা মানুষকে কে আর ভালোবাসবে!  
৩৯





# মানবজমিন

শ্রীধেনু মুখোপাধ্যায়

(উপশ্লোক)

ঝোপড়ার দরজার দীপনাথ উকি দেতেই মণিদীপা মুখ তুলে চাইল। একটু হেসে হাঁপাতে নিতাইকে সোঁতের কলল, হি ইজ এ কমালট ফ্রাড।

সো আমি আই আন্ড সো ইউ অল আর। এখন চলুন তো, কউদি আপনাকে ভীষণ খুঁজছেন। দীপনাথ কথা কলতে বলতেই ঝোপড়ার ভেতরকার চিমসে কটু বদখত একটা গাধা পোরে নাক কুঁচকে বলে, এই কিফট গাধের মধ্যে বসে আছেন কি করে?

মণিদীপা উঠে আসছিল। বাইরে এসে মিষ্টি হেসে বলল, আমি এক সময়ে কলকাতার বস্ততে বসতেতো সোশ্যাল ওয়ার্ক করেছি। নোয়া, বদগাধ, আবার অভাব, পভার্ট বঁদ সহ্য করতে পারেন তবে দেখবেন লোকগুলো খরাপ নয়। দে আর অল লাইক ইউ আন্ড হি।

অভিজ্ঞতাবলে দীপনাথ জানে, কথটা সত্য নয়। তবে সে তাকে না গল্পে বলল। আপনি অনেক কিছু পারেন দেখছি। আমি খাপা নিতাইয়ের ঝোপড়ায় এরা আগেও বার করেছ হানি দিয়েছে। ভিতরে ঢুকতেই গা ঘননিষন করছে।

মণিদীপা দীপনাথের পাশাপাশি হাটতে হাটতে বলে, বোড়ার একটা কউ ছিল, আপনি জানেন?

কে না জানে? বউ পালানোতেই তো। নতাই পরগল চল।

হাসছেন? লোকটা যে বউকে অতটা ভালবাসত তার জন্য কউ হয় না আপনার?

হয়। আই আমি অলওয়েজ উইথ দা হাজব্যান্ডস। জানি। ব্যাখ্যা করতে হবে না।

এতক্ষণ পা লয়ে পা লয়ে আর কি কি করলেন? ঐ বাঃ। বলে থমকে দাঁড়ায় মণিদীপা। আমার টেপ রেকর্ডারটা পড়ছে জগলের মধ্যে।

কী সর্বনাশ! টেপ রেকর্ডারও সঙ্গে এনেছেন নাকি?

আনবো না তো কি? কলকাতায় বসে মোমাঁছির শব্দ শুনবে বলে...দাঁড়ন দেখে আসি—

কল মণিদীপা কুজবানর দিকে প্রায় নোড়তে থাকে। গিছনে দীপনাথ।

খাস জগলের ওপর কাসেট শেষ হওয়া টেপেরকর্ডারটা পড়ছি ছিল। ঝিপকারের ওপর পা খ মোরো ফেল গেছে। মণিদীপা রি-উইন্ড করে একটু।

শুনল শব্দটা? মধু গোমড়া কউ। বলল, একদম ডাল সাউন্ড আসেন।

দীপনাথ হেসে বলে, টেপ রেকর্ডারটা যে চুরি হয়ে যায় ন সোই ভগা বলে জানবেন।

আপনার সঙ্গে আমার তফাৎ কোথায় জানেন?

কোথায়?

কেশী জরুরী হল মোমাঁছির শব্দ, পাখর ডাক। আপনাকে কাছে তার চেয়ে চেয়ে বেশী দামী জিনিস এই যন্ত্রটা। আপনি এত আশ্চর্য রোমাণ্টিক কেন চলুন তো।

তার মনে আমি আপনার চেয়ে অনেক বেশী গম্ভীরবদী।

আমি যে গম্ভীরবাদীদেরই সবসময়ে পছন্দ করি তা কিন্তু নয়।

তা জানি। সেই জন্যই বোধহয় আপনি আমাকে কৌনিকনই পছন্দ করেন না।

মণিদীপা মধু একটু, হাসল। তারপর বলল, আপনি বাস্তববাদী একথা কিন্তু আমি স্বীকার করিনি। আপন রোমাণ্টিকও নন তা বলে।

তাহলে আমি কি?

আপনি ভীষণ হাদিগ্রাম।

দীপনাথ হাসল হটে, কিন্তু এই খুঁকি চেহারায় এচোড়ে পাকা মেয়েটাকে একটা গট্টা মারবার জন্য তার হাত একটু নিস্পৃগও করাছিল। হাসজগলে মধু ছারায় দুজন মধোমুখি হট্টা গেড়ে বসে। মধু নীচু করে মণিদীপা কাসেটটা ফ্রাড থেকে খুলে আনল।

নিজের ভানিটি কাগ থেকে আ। একটা নতুন দামী কাসেট বের করে ভরল টেপ রেকর্ডারে।

আবার টেপ করবেন নাকি?

আসেরটা যে ভাল হল না। এই কাসেটটা দিয়ে দেখি। যন্ত্রটা গাছের ডালে কললে বোধহয় ভাল হয়, তাই না? ঐ নীচু মোচাকটার কাছাকাছি টেপ রেকর্ডারটাকে একটু সেট করে দেখেন?

আমাকে গাছে উঠতে বললেন?

গাছে ওঠেননি কোন নন?

কিন্তু। তবে সে ছেলবেলার। এই বড়োঝরসে পড়ে গিয়ে মল্লা ভাঙল আপনি দারী।

আপনি হাদিগ্রাম হলেও পড় খওয়ার লোক নন। কারিয়ারের গার্হাটতে তো দাঁকি তরতরিয়ে উঠে যাচ্ছেন। আর এ তো সামান্য গাছ।

মধু শুনো কউ দীপনাথ বলে, দীপনার যত খরাপ কি কেবল আমি?

আপনি ভীষণ খারাপ। এখন জুতো খুলুন তো।

নীচু গাছ উঠতে কোনো অসুবিধে হবে না।

উঠ ছ বাবা। কারিয়ারারপট হওয়াও যে কী কটের তা যদি বুঝতেন। জুতো খুলতে খুলতে দীপনাথ বলে, কলকে তেল দিতে হয়, কসর খুঁকি তেল দিতে হয়। আর তেল দেওয়ার ছিঁকটো দেখুক লেকে। বসের। ছিঁকটোয় কউ মোমাঁছির গান টেপ করছে বলে এই বারবেলার মধ্যবসে গাছেও উঠতে হচ্ছে।

কারিয়ারা রুট দুর্কমের আছে। হাদিগ্রাম আর বৃক্ষমান। বৃক্ষমানদের শটতে হয় না, কিন্তু হাদিগ্রামদের খাটা ছাড়া তো উপায় নেই।

দীপনাথ জুতো খুলে গাছে উঠল। খুঁকি সহজ গাছ। নীচুতেই অজন্ত ডালপালা। দুটো ডাল ডিঙিরে একটু উপরে উঠতেই মণিদীপা বলল, কাঃ, বেশ পায়েন তো। কিন্তু আরো ওপরে উঠে গেলে আমি টেপ রেকর্ডারটা দেখা কি করে? নাগাল পাবো না যে।

এইবেলা এটা ধরুন। বলে হাতে টেপ রেকর্ডারটা উঠু করে তুলে কল মণিদীপা।

খুঁকি ফল টেপ রেকর্ডারটা নিতে হাত বাড়াল দীপনাথ তখনই সল্বেহবতিকরপ্ত একটা মোমাঁছির খেরে এল কোথেকে। বা চোখের কোলে তার ঝুঁকি হল হটে করে বাফল, টের প্রায় দীপনাথ। কিন্তু এ সময়ে নড়ল বা অসামান্য হলে দামী যন্ত্রটা পড়ে যেতে পট্টে। তাই সে একটুও লজ্জা করল না। নীরবে টেপ রেকর্ডার তুলে নিল।

মোচাকটা খুব ওপরে নয়। আর দুটো ডাল উঠতেই সে প্রায় হাতের নাগালে পেরে গেল মোমাঁছিতে কিং-বিড করা চাবটকে। বা চোখের কোল মধুতে ফলে উঠেছে। তীব্র জ্বালা। কিন্তু দীপনাথ শব্দ করল

জানেন। কিন্তু ঢাকনা দেওয়ার মতো কিছু নেই হাতের কাছে।

একটা ঘন পাতার চাপ ভেদ করে মাথা তুলতে না তুলতেই তার চুলের মধ্যে জেট স্পেনের মতো দুটো মোমাঁছি এসে ঢুকল অঃ একটা হল দিল কলসের নীচে, বাড়ু। প্রতিটি হলই ইলক টুক গকের মতো। দীপনাথ শব্দ হকো রইল। নড়ল আবার কামড়াবে। খুব ধীরে ধীরে চোখ ঘিরে ঘিরে সে টেপ রেকর্ডারটা ঝোলানোর অকলংক খুঁকি দেখল। পেরেও গেল হাতের কাছে। একটা ভারবৎকম ডাল ফেরার আছে কাণ্ড থেকে। সে হাতলটা গিলিয়ে দিল গাছেই ডালে। তারপর সাবধানে ঢুক ডং ঢালু করে দিল। টেপ ঘুরছে কিনা তাও দেখে নিল ডল করে। এখন মোমাঁছির শব্দ খুব খালা। অশা করা হয় রেকর্ডিং জালই হবে।

সবকসমে আবার নেমে আসে দীপনাথ। ভাগ ফর প্যাস্টের পকেট একটা স্পেনচলমা ছিল। কালো চমখা পরতে তার ভাল লাগে না। সর্বাঙ্গ মেঘলা দেখে ডাক্তার। তার রোগের কথা ভোঁর সঙ্গে এনেছিল। এতক্ষণ পরনি। গাছ থেকে নেমেই সে মণিদীপার দিকে পিছন ফিরে চলমাটা পরে নিল।

মণিদীপা গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে। একটা ধন্যবাদ না, কোনো কথাও না।

দীপনাথ হাতটা কেড়ে নিয়ে হাসি মুখে বলল, চলুন। বউ দ বসে আছে।

মণিদীপার দ্রু কৌচিকানো, নতমুখ। শব্দ, কলল, হঃ।

দীপনাথের বা চোখ ক্রমে আরো ফুলে উঠেছে, চশমার ফ্রেমের তলা দিয়েও সেটা দেখতে পাওয়ার কথা। কিন্তু মণিদীপা তাকাচ্ছে না তার দিকে। মধু, পায়ে চটিছে আগে আগে, ভিতর বাড়ির দিকে। দীপনাথের কাছে মাথার আরো সোটা তিনকে জারগা ফলে উঠেছে।

পাগল-পাগল জ্বালা। তবু সে পিছন থেকে হাসিমুখে বলল, মাদাম এই কুজকনটা খুঁকি ফের করলেন কি ভাবে?

মণিদীপা জবাব দিল না।

দীপনাথ অধাক হল না। মণিদীপা একটু মূর্খ।

কখন ভাল থাকে বা কখন খারাপ থাকে তার তো কোনো ঠিক নেই। তাই সে আর কথা বলে উত্তর করল না। জ্বালাভরা চুলকানি সামাল দিতে একবার চলমাটা তুলে হলের জারগাটা কলার সে। নক্স জারগাটা তা ভেঁড়েফেড়ে আরো ফুলে উঠতে থাকে।

চলমাটা আর রাখাই যাচ্ছে না। তবু সেই জ্বালাভরা জারগা ওপর চলমাটা জোর করে বসিয়ে রাখল সে।

মোম ঘর হলে, তার চোখে বেশী কিছু ছাড়া নন। মানস এর চেয়ে ঢের বেশী যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে।

প্রীতম করেন? মধুবা পণ্ড ঐ প্রীতম তাকে জীবনে অনেক বেশী প্রেরণ দেয়। চাপা করে তোলে।

ঘরে পৌঁছতে পৌঁছতেই শরীরের জ্বালা বন্দপ প্রায় তুলেই গেল দীপনাথ।

কউদি, এই যে ঘরে এনেছি। উনি মোমাঁছির টেপ রেকর্ডিং করাছিলেন, খাপা নিতাইয়ের ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন।

তুয়া তার ঘরের টেবিলে খাবার সাজাচ্ছিল। লিচি, জিমের ডালনা, মিষ্টি আরো কী কী ফল। ফিরে না তাকিয়েই বলল, খুব ভাল। এ জারগা ফাফের কাছে ভাল লাগে আমি তাদের খুব পছন্দ করি।

মণিদীপা তুমার কাছ বরাবর এগিয়ে গিয়ে মধুস্বরে জিজ্ঞেস করল, মোমাঁছি কামড়ালে কি লাগতে হয় জানেন?

তুবা চট করে মধু তুলে বলে, তোমাকে কামড়িয়ে নাকি?

না। মণিদীপা হাঁপাতে দীপনাথকে দেখিয়ে দিয়ে বলে ওঠক। দেখুন চোখ কেমন ফুলে আছে।

কুয়া দীপনাথের দিকে ঘেঁরে দেখল। তার মধ্যে কোনো অশ্রু ফটল না। শব্দ, কলল, মধু। বলে

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে  
 প্রথম দফায় ১৫ জনকে বন্দি করে। তারপর  
 দ্বিতীয় দফায় ১৫ জনকে বন্দি করে।

তাদের জ্ঞানগাথলোতে আঙুল দিয়ে মধু ঘাষে  
 দিতে দিতে প্রায় কানে কানে তৃষা জিজ্ঞেস করে, কী  
 করে কামড়াল?

গাপনে জিজ্ঞেস করার মতো কাপার নয়। তবু  
দীপনাথও মদস্বরে বলল, গাছে উঠতে হল যে।

কেন ?

টেপ রেকর্ডার বোলাজে।

ভবাকে বেশী বলতে হয় না। প্রকর বান্ধবলে সে  
সব বুঝে নেয়। বলল, বসের বউ, তার ওপর আবার  
প্রেমও পাড়েছে, এটুকু জ্বালা যথেষ্ট কিছ নয়।

তামাকে একদিন এমন গাটো দেবো না।

মণিকীপা বিছানার দ্বারে কসে একটা মাগাজিনের  
পাতা ওলটানো। কিছ, দেখছে না, শব্দ চোখটা সরিয়ে  
রাখছে মাত্র।

দীপনাথ বলল, টেপ রেকর্ডারটা আমার নামাতে হবে কিছুক্ষণ বাদে। কিন্তু সেটা আর আমার কথ্যা নয়।

কুস্মা বলল, কন্সমোটায় যাওয়ার দরকার কি ছিল ?  
বাডি ভর্তি কলেজের লোক রয়েছে, যে কেউ ওঠে, কয়  
আসতে পারত। তোমাকে ভাবত হবে না, আমি লোক  
পাঠিয়ে নাহিয়ে আনাবোখন।

মধু লাগানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্বালায়ত্তণা অনেক কম গেল। শর্দূ ফোলাটা রইল। কিছু ক্ষণ থাকবে। সে জিজ্ঞাস করে, মেজলা খেয়েছে বউদি?

না অথোরে ঘ.মোছে ।

ସମୋତେ ନାও । କିନ୍ତୁ ସମୋସେ ତତ ଡେନଶନ କେଟେ  
ଥାଏ ।

তবে হাসল, কোমা মারল আমাকে আর টেনেশন  
হল তোমার মেজদার। এসব পরামর্শকে নিয়ে চলা যে  
কণী মশকিল।

কথা মনে হেসে চাপা গলায় বলে, এখানকার  
লাকেরও সেই কথা বলে। আহা, আমার কী  
গেঁড়বের কাশার!

তাই আমাদের গৌরব।

যাঃ। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও ভো। যেরেয়া  
যগনিপাও সঙ্গো গল্প করবে বলে বসে আছে। কেউ  
খেলতে পারবে না যারিনি।

খাওয়ার সময়েও দীপনাথ লক করল মণিপ্রোণ।  
তাঁর দিকে তাকাচ্ছে না, কথা বলছে না। দীপনাথ

ঘটল না। দিশকে খেয়ে নিজ দুজন বোস সাহেব  
 নিষ্ঠা থেকে আমেদবার গোছেন। তবে ফিরকে ঠিক  
 নেই। মংশীপা বেজ অফিসে ফোন করে দীপনাথকে  
 হুদাফিল, তবে রতনপুরে যাচ্ছেন বলুন। আমার যে  
 বলকাতার পাগল-পাগল লাগছে। দীপনাথ ঠিক  
 করোডল, এবার বোস সাহেবের অনুমতি ছাড়া  
 অংশীপা কোথাও নিয়ে যাবে না। যেস সাহেব  
 বংশী প্রায়ই অফিসে ট্রাক করে তার সঙ্গে কা-  
 বার্তা বলেছে। কিন্তু কোনোরকমে দীপনাথ কথটা  
 তুলতে পারেনি সংকোচের বশে। কিন্তু মংশীপা  
 তড়ায় পক্ষাধীন সে কালের কথা হয়ে বাতায়র পর  
 যে সাহেবকে স্ব-বিনীতভাবে বলল, মিসেস জেস  
 একট রতনপুরে যেতে চাইছে।

**কোথায়?**

রতনপুর। কাছেই। সেখানে আমার মেজদার  
বাড়ি।

ଉଃ, ଅକ୍ଷ କେମି । ଯାକି ନା, କେ ଆଟକାଟେ ନ  
ଆସନ୍ତା, କେମି ଆସନ୍ତା

বোস সাহেব খুব হাসল। বলল, আজ পূর্ণিমা  
কচী কাগারে দীপা আমার পারমিশান নিয়েছে তা  
তো আমি জানি।

উনি না নিলেও আমাকে ভো নিতেই চক।  
আপনার পারমিশ্যন ছাড়া আমি ওকে কোথাও নিয়ে  
যেতে পারি না।

अभिज्ञानाश्वमेध की कविता

ধীরে ধীরে তখন হাঙ্গামা হল, ওড়াসে হল।  
আমি সেটাকে পুরা মশান বলে ধরেছি পারি না মিস্টার  
বাব।

কোন সাহেব মেজাজ খারাপ করতে পারত। কিন্তু কোম্পানির বিজনেল খুব ভাল হওয়ার বোনের মেজাজ শরীক ছিল। খুব উদার গলার কল, প্রবীণত্বও দীপ্য একাই বহু জায়গার কাছে। এ ছাড়া আপনায় যতো একজন চমৎকার গাইডের সঙ্গে হবে। থাক না।

আমরা সকলে বা মূল রে গিরে সম্মেলনই করে  
আসব।

ওঃ আমি ভেবেছিলাম স্বর্ষি উইক এন্ড কাটতে।  
তাহলে তো পারমিত্রানোর দরকারই ছিল না চাটটার।  
আপনি এত বেশী সংস্কার মেনে চলেন কেন বলুন  
তো। আজ্ঞা উদ্দেশ্যিক মশাই আপনি। মনে  
দীপাও হাসবে।

আসার সময় হাওড়া স্টেশনে যাত্রীরা বসেছিল,  
আমার বন্ধু ভাল লাগে তাহলে আমি রক্তপথে বসিন  
থেকে বেতে পারি কিন্তু।

স্বাক্ষর। কিন্তু আপনার ক্রাফ্ট পাহারা দেবে কে; পাহারা দেওয়ার কিছু নেই। আমরা কার্ভিট আছি। আজ রান-কে বিশ্বাস করতে ভালবাসি। আপনার বর্চনতা থাকলে আপনি গিরে পাহারা দিবে পারেন।

এখানে মগদীপার কেমন লাগছে কিংবা সে থাকে।  
কিনা তা জিজ্ঞাস্য করতে ইচ্ছে হলেও মূখের তা-  
দেখে সাহস পেল না দীপনাথ। খেয়ে উঠে সে  
দীপনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেল। মজা আর মক  
এসে ধরে নিয়ে গেল মগদীপাকে।

দেখা হতেই দীননাথ বলেন, তোমরা কেউ বুলদ  
খবার নাও না। সে কেমন আছে, বুউয়ার কী হল কেউ  
আমাকে বলে না।

বিবেকানন্দ ও  
সমকালীন  
ভারতবর্ষ



## শঙ্করী প্রসাদ বসু-র

বহু প্রতীক্ষিত

চতুর্থ  
খণ্ড

মূল্য : ২৫.০০

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ : সম্পর্কের রূপ নিয়ে শিক্ষিত বাঙালী চঞ্চল। বাদ প্রতিবাদের অন্ত নেই। এ-বিষয়ে দুম্পায়া তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণাত্মক দীর্ঘ রচনা, যা স্বতন্ত্র গ্রন্থতুল্য। নিবেদিতার পক্ষে রবীন্দ্রসংবাদ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও সরলাদেবীর বিবেকানন্দ বিষয়ে প্রবন্ধ, মহর্ষি সন্নিধানে স্বামীজী, ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর আলোচনা। এছাড়াও অঙ্গুল প্রসঙ্গ।

প্রথম খণ্ড : (তৃতীয় মুদ্রণ) ২০.০০ দ্বিতীয় খণ্ড : (দ্বিতীয়  
মুদ্রণ) ২৫.০০ তৃতীয় খণ্ড : (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ৩০.০০

- ব্রিটিশ শাসনকে স্বামীজী শয়তানী শাসন মনে করতেন।
- শ্বেগ দুর্ভিক্ষ—র্যাণ্ড ও আয়ার্স্ট ইত্যাদি, শহীদ চাপেকর দ্ব্যতুগণ, তিলকের শাস্তি।
- ঐতিহাসিকদের সশ্রদ্ধ কৌতূহলের বিষয়, দেশবিদেশে অগণ্য শাখা বিস্তারী নামকরুষ্ক আন্দোলন।
- বিবেকানন্দের সেবা আন্দোলনের সর্বভারতীয় প্রতি-  
ক্রিয়া : অসাধারণ মানব প্রেমিকদের আগ্রহ জীবনচিহ্ন।
- নব বোধ ও নব বৈষ্ণব আন্দোলনের কাহিনী।
- সমকালীন দুঃসাপা চিত্র ও কাউন্সেল



ভালো সোনারখণ্ডে ভাঙে সপোন দেখা করে শব্দ সোনারখণ্ডে।

লক্ষ্য পেরে বলে, বুঝি কলম খেঁচেছে।

ভাইয়ের খবর নেওড়াইত কাজ।

আপনি একটা চিঠি দিলেও তো পারেন।

চিঠি মশককে দিয়ে বার দুই লেখালাম। আজ-কাল ডাকের পিঠনয় ঠিকমতো চিঠি দেয় না। কেবলই পারনি, তাই জরুরিও ফেরনি।

আচ্ছা, আমি এবার গিরে খেঁচি নেবো।

নিও। বোলা, এখানে আমার ভাল লাগছে না।

কেন বাবা? এ জায়গা তো খুব ভাল।

ভাল আর কি? প্রীনাথ খবরও নেয় না। তার কী সব খরাপ অবস্থা হয়েছে শুন। আমাদের বংশে এসব তো ছিল না। তার ওপর কাল রাতে নাকি ডাকাত পড়েছিল—এ ভয়ানক গুলিগোলেব জায়গা।

শীত পড়লে কলকাতার বাতেন। এখন কিছুদিন ধরুন।

তুমি বিয়ে করলে আমার একটা আশ্তানা হত। তিন ছেলের কাছে হুর্গেকের থাকতে পারতাম। বিলুও খোঁজ করে না। প্রীতম আছে কেমন?

ভাল। ফিল্ম তো চাকরি করে।

শুনোই। প্রীতম ভাল হয়ে গিরে থাকলে এককর কেন আসে। তার মতো তো তুলতে হুর্গেক।

আসবে। এখানে আপনার আর কোনো অসুবিধে আছে?

এ আমার জন্মের জায়গা নয়। কেমন সবাই অচেনা অপরিচিত ঠেকছে। নিজের জায়গা বলে মনে হয় না।

দীপনাথের সপোন আর বেশীকণ কথা বলল না দীপনাথ। মানিকগঞ্জ থেকে একটা একল টাকার নোট কেন করে হাতে দিয়ে বলল, ইচ্ছেমতো খরচ করবেন।

বড় ক'র বরং কখনও হাতে বসত।

না, আপনি রাখুন। কাউকে কিছু দিতে ইচ্ছে হলে দেবেন।

দীপনাথ মানিকগঞ্জ হুপ করে থেকে বলেন, এই কিবচনটুকু অন্য ছেলেকের যদি থাকত!

দীপনাথ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। ডাকনামের গিরে কলার কাছে খবর নিয়ে জানল, কিছুকণ আগে ডাক্তার এসে প্রীনাথকে দেখে গেছে। আবার বোধহয় ঘুমের ইনজেকশন দিয়েছে। অথচোরে যমোচ্ছে প্রীনাথ।

দীপনাথ প্রীনাথের সম্বর খপ্পনটোর ভিতরে গিরে অনেককণ বসে রইল। শরৎকাল আসতে না আসতেই প্রীনাথের কায়নে দিল্লি এসে গেছে। অন্যকরে মাটিতে করে পড়া অজর শিউল বাসি হচ্ছে। একটা মশলমশ গাছে কোশে পশু ফুটেছে। মৌমাছিরা গজান তুলে উড়ছে। বউদি কি জানে প্রীনাথের নিজের হাতে তৈরি করা ফুল থেকেই মৌমাছি কুজবনে গিরে চাক বঁধে, আর সেই মখই টলটল করছে তার পাখরের বাড়িতে? কথটা বউদিকে বললে কেমন হবে? ভেবে আপনমনেই মাথা নাড়ল দীপনাথ, লাভ নেই। কোনো কোনো স্বামী স্বী বোধহয় তাদের সম্পর্কর বিচ্ছেদই বেশী উপভোগ করে। মশর কথা তাকি কানে নেবে না।

কোলে ঢলে পড়ল গাছগাছালির আড়ালে। চিকড় মিকড়ি রোদ খেলছে বাগান জুড়ে।

দীপনাথ উঠে ভিতর বাড়িতে অগে।

বউদি, এবার কেতে হয়।

একশি কি? আর একটু, থাকো। তোমার সঙ্গে কথাই তো হল না।

সবল বসের কউ, ফিরতে রাত হওগু ঠিক নয়। দীপ, তুমি ককে বুঝবে যে, আমি কত একা?

নিশল্প হয়। তোমারও কল বউদি, মহীরদীয়া চিরকাল একা। তাদের সপোন হওগুর মতো যোগ্যতা কলনের থাকে কলা?

আমি মহীরদী? অবাক করলে দীপ,।

কেন, লোকে বলে না?

তোমার মতো চাটকার তো সবাই নয়। মহীরদী বলে আমাকে লোকে মারতে চাইবে কেন বলে! কেনই বা আমার আপনজন স্বজ্ঞারে হাটে আমার কলক রুটেরে কোড়াবে?

লোকের কথা দিয়ে কী হবে বউদি। আমি যা মনে করি তা তো পাশ্বে কেলব না।

তুবা একটু হাসল। মথের বিষমতা তাতে কাটল না। খুব গম্ভীর গলায় বলল, কোনোদিন ভনে আর না শুনি তোমার মথ যে, আমি খারাপ, আমি ভাল নই।

দনকে না কউদি।

তোমার কাছে বেন আমি চিরকাল ভাল থাকি। থাকবে। যে ছেলে দুটো কাল বোমা মেরেছিল তারা মল পড়েছে?

না। তবে নাম জানা গেছে। দুজনেই তাড়তে গড়ে। কাছাকাছি মাথগল থেকে।

কাল তাদের পাঠিয়েছিল? তোমার কাউকে সন্দেহ হয়?

কি করে বলব? তাকে হয়তো একদিন এইভাবে আমার মরণ হবে দীপ,। তখন খুব কম লোকই কদবে আমার জন্য। আর কেউ না কলক, তুমি একটু কেসো। কামা এমনতে না এলে নিজেকে চিমটি কেটে। (হাস্য)

## বিমল করের

এই সময়ের সময়বয়সী উপন্যাস

সাহিত্য। যাদের কাছে অবসর বিনোদনের সামগ্রী মাত্র নয়, বিমল করের নতুন বই প্রকাশের খবর তাদের কাছে একটা বিশেষ সংবাদ।

“সংশয়” তাঁর সর্বাধুনিক উপন্যাস যা সব অর্থে আকর্কের এবং আগামী-কালের। “সংশয়”-এর পাত্র-পাত্রী, পরিবেশ, ঘটনা, যন্ত্রণা বর্তমান কালের। যে কালে শুধু এই ব্যাপারটাই নিশ্চিত যে, সব কিছু অনিশ্চিত। নিজেকে বেনদায়, কামনায়, আকাঙ্ক্ষায়, দুর্বলতায় বিহ্বল, বিপন্ন এবং সংশয়া-কুল। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এই সময়ের এই পৃথিবীর ক্রেশিত নর-নারীর জিজ্ঞাসা, অসহায়তা ও সংশয়ের শৈল্পিককণ বিমল করের নতুন উপন্যাস “সংশয়”।

লেখকের অন্য বই

## প্রতীক্ষার প্রতীক্ষা শেষ হবে কবে?

“যেয়ে মনের বাড়িরে কুবা কি ‘তবিস্যাতের’ বাগানে ফুল ফোটার আবার অপেক্ষার পরীক্ষা দিতে দিতে রাত হয়ে পড়ে না? সে কুবা দিলে মিনে তিলে তিলে ডাকেই কল করে আলো না?”

জানপাঠ বিজ্ঞানী মাশ্ব এক উপন্যাস লিগেছেন। সচনশীল এক দম্পতি ও দুটি কুমার ও কুমারীমনের যজ্ঞ নীলাধরম ভাবানুভূতির প্রকাশ অনন্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সঙ্গ প্রকাশিত উপন্যাসে।

আশাপূর্ণা দেবীর

## প্রতীক্ষার বাগান

লেখকার অন্য বই

২২.০০

## সংশয় :... বাছাই গল্প ২০.০০

চিরজীব সেন-এর

## গাশাগাশি ৮, আবার বারমুড়া ট্রাঙ্কল ১০, প্রেয়সী ও শ্রেয়সী ১০

● মডল বুক হাউস ৥ ৭৮/১ মহাশা গাঙ্গী রোড ৥ কলকাতা-৯। ফোন : ৪৪-৮৭৪৭

## মনে রাখবেন

মায়ের দুধ সবচেয়ে উত্তম

প্রকৃতির এই মহান দানের কোনো বিকল্প নেই। সেইজন্য যত দিন পর্যন্ত সম্ভব আপনার বাচ্চাকে নিজের দুধ খাওয়ান। তবে যদি আপনার বুকের দুধ যথেষ্ট না হয়, তা হলে ওকে আমূলপ্রেস খাওয়াতে শুরু করুন।

শুরু থেকেই আমূলপ্রেস দিন সবচেয়ে জনপ্রিয় দুধ-আহার আমূলপ্রেস'র নিজস্ব বিশেষত্ব-সমূহ :

- পুরোমাত্রায় সুখম
- ভিটামিনে ভরপুর
- সহজে হজম হয়
- সহজে গুলে মিশে যায়



## আমূলপ্রেস বিকাশের শূভারম্ভ করে আর বালআমূল সেই বিকাশকে পরিপূর্ণ করে

### বাচ্চার ৩ মাস বয়সে

বালআমূলও খাওয়ান —

অত্যন্ত পুষ্টিকর, দুধ-মিশ্রিত শস্যাহার

৩ মাস বয়স থেকে বাচ্চা এত তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে, যে, ৬ মাস বয়সে ওর জন্ম-সময়ের ওজন দু'গুণ হয়ে যায় আর ৩ বছর বয়স পর্যন্ত ওর মস্তিষ্কের বিকাশ হয় ৮০% ভাগ। এই কারণে তখন ওর জন্যে শুধু দুধই যথেষ্ট নয়। ওর প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সম্বলিত সুখম মাত্রার আহারের প্রয়োজন। যা একমাত্র বালআমূলেই ঠিকমত পাওয়া যায়।

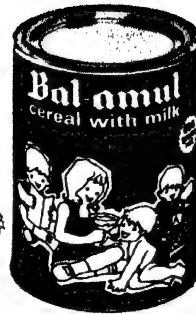
বালআমূল—আমাদের দেশের শিশুদের জন্য এক বিশেষ অবদান

বালআমূল সেণ্ট্রাল ফুড টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহায়তায় বিশেষ ধরনে তৈরী করা হয়েছে। আর এটি ভেল্লোরের ব্রিটিশিয়ান মেডিক্যাল কলেজে বিশেষভাবে পরীক্ষিত।

বালআমূল—বেশী পুষ্টি-মূল্য

- অন্যান্য ব্র্যান্ডের শস্য-আহারের ও শক্ত-আহারের তুলনায় অন্ততঃ ২৫% বেশী প্রোটিন
- বেশী ক্যালসিয়াম, ভিটামিন 'এ' এবং 'সি'
- স্নেহ-পদার্থ, আয়রন ও ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্সে বেশী সমৃদ্ধ
- আগে থেকে দুধে রাসা করা, সুপাচ্য ও সুস্বাদু
- অন্যান্য আহার—যেমন, ডাল, পিষে নেওয়া ফল ও পুডিং প্রভৃতির সঙ্গে সহজে মিশে যায়।

বালআমূলে আপনার দ্বিগুণ দাম উত্তল হয়



ASP-AB-5/79

বিলাজুলেট! বিশ্বদ বিবরণ সম্বলিত 'আমূল বেবি বুক' ইংরাজী, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় এবং 'বালআমূল স্নোথ রেকর্ড বুকলেট' শিশু ইংরাজীতে পাবেন। আপনার পুরো নাম ঠিকানা লিখে ১ টাকার ডাকটিকিটের সঙ্গে এই ঠিকানায় লিখুন। শোভা বাগ নম্বর : ১০১২৪, বক্স ৪০০ ০০১



বিক্রী-বাবুদায় :  
গুজরাত কোঅপারেটিভ মিড  
মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড, আনন্দ।

প্রচার উপায় উদ্ভাবনা ও বিভিন্ন অনু-  
ষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্প্রতি আন্তর্জাতিক শিশু-  
বৎসব হলে। বছরটিতে সরকার এবং সমাজের  
বিশেষ দৃষ্টি ছিল শিশুদের ওপর। শিশু-রাই  
দেশের ও জাতির ভবিষ্যৎ কথাটা চিন্তাসভা হলেও  
গত বছরটিতেই যেন কথাটির সত্যতা বিশেষ করে  
উপলব্ধি করতে পেরেছি। এই উপলক্ষে নানা  
রং-এর বৈচিত্র্যপূর্ণ ছবিতে পরিপূর্ণ বই প্রকাশিত  
হয়েছে। বিশেষ শতাঙ্কীতে আমাদের দেশে শিশুদের  
জানো পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছে অনেক। এক্ষেত্রে  
বাংলা শিশু পত্রিকার কথাই বলছি। সন্দেশ,  
শিশু, মৌচাক, শিশু, সাধী, খোকাখুঁ, আনন্দমোহা,  
পল্লীরাঙ্গা, বাংলাশিশু, রামধন, শক্তভায়া, মাসপল্লা  
ইত্যাদি নামকরা পত্রিকা ছাড়াও আরো অনেক  
পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। যদিও সবকটিই যে  
দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে এমন নয়। বিশেষ শতকের মত  
উর্নাবংশ শতকেও শিশুদের জন্য পত্র-পত্রিকা  
প্রকাশিত হয়েছিল, যার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়।  
এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় উনিশ শতকে শিশু এবং  
বালকদের জন্য রচিত প্রধান কয়েকটি খোকাখুঁ  
দেখার সুযোগ হয়েছে। সাময়িক পত্রিকা সম্পর্কে  
আলোচনা করা হয়েছে।

শিশু-সাহিত্য গড়ে ওঠার পেছনে সাময়িক-  
পত্রের দান অপরিহার্য। প্রকৃতপক্ষে সাময়িক পত্রের  
মাধ্যমেই শিশু-সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত। ১৮১৮  
খ্রীষ্টাব্দে গ্রীসামপুরের মিশনারিদের চেষ্টায় এবং  
জন ব্রাক্ মার্সম্যানের সম্পাদনায় বাংলা ভাষার  
প্রথম সাময়িকপত্র 'দিগদর্শন' প্রকাশিত হয়।  
পত্রিকাটির আখ্যাপত্রে 'যুবলোকের শিক্ষার্থে'  
সংগৃহীত নানা উপদেশ এবং 'বালকদের শিক্ষার্থে'  
সংগৃহীত নানা উপদেশ' দুই রকমের পাঠ্যই লক্ষ  
করা যায়। এতে বিভিন্ন দেশের বিবরণ, ব্যক্তির  
বিবরণ, জীবনকথ, জ্যোতিষ ও বিজ্ঞান বিষয়ক  
আলোচনা প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটি যে তখনকার  
দিনে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তার প্রমাণ  
পত্রিকাটির বিভিন্ন ভাষায় এবং একাধিক সংস্করণের  
প্রকাশ। কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির কার্য-  
বিবরণী থেকে জানা যায় যে 'দিগদর্শন' সে বছরের  
স্কুলপাঠের উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় উক্ত  
সোসাইটি পত্রিকাটির বহু খণ্ড ক্রয় করেছিল।

শিশু-গ্রন্থপঞ্জী সংকলয়িতা গ্রীমতী বাণী বসু তার  
বাংলা শিশু-সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জীর (১০৭২) ভূমিকাত্তে  
১৮১৮ সালের পর ১৮৭৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত  
ছোটদের উপযোগী কোন পত্রিকার সম্ভাবনা পাননি  
বলেছেন। এবং সেখানে শিশুদের জন্য অন্য কোন  
পত্রিকা না থাকায় রাজেশ্বরলাল মিত্র সম্পাদিত  
'বিবিধার্থ' সংগ্রহ' (১৮৫১), 'রহস্য সান্দর্ভ'  
(১৮৬০) এবং 'জ্যোতিষবিগ্ণান' (১৮৬১) ও  
পত্রিকা তিনটিতে শিশুদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি পৃষ্ঠা  
ধাকত বলে শিশু গ্রন্থপঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।  
কিন্তু এ সময়ের মধ্যে আরো দুটি পত্রিকার সম্ভাবনা  
আমরা পাইছি। পত্রিকা দুটি 'উপদেশক' (১৮৪৭),  
পত্রাশ্রয়ী' (১৮৬০)। প্রথমটিতে বড়দের বিষয়ের  
সঙ্গে ছোটদের জন্যও একটি বিভাগ ছিল। কিন্তু  
দ্বিতীয়টি শিশু-মাত্র শিশু এবং বালকদের জন্যই  
রচিত হয়েছিল।

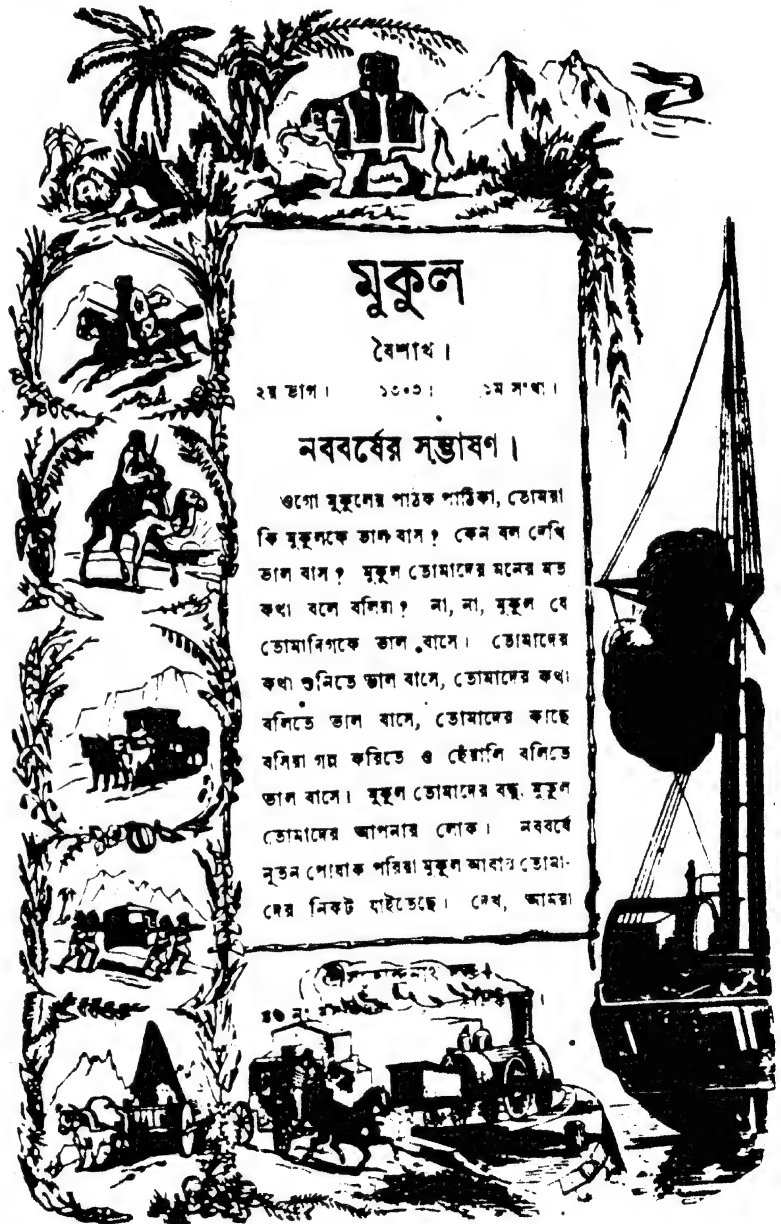
'দিগদর্শন'ের পর বালকদের জন্য ১৮২২  
খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'পদ্মাবলী'র উল্লেখ করা যেতে  
পারে। যদিও কেহ কেহ 'পদ্মাবলী'কে সাময়িক পত্র  
না বলে পুস্তক বলেছেন। তবে প্রতি মাসে  
প্রকাশিত হবার জন্যে 'পদ্মাবলী'র নাম সাময়িক  
পত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। পত্রিকাটির  
প্রত্যেক সংখ্যার একটি করে জন্তুর বিবরণ এবং  
প্রথম পৃষ্ঠার সেই জন্তুর কাঠখোদাই চিত্র থাকত।  
এর প্রথম পর্বের পাঠ্য লসন কঙ্ক সংগৃহীত।  
বর্ণনামূলক করেন ডবলিউ এইচ প্যারিস। পত্রিকা-

টির দ্বিতীয় পর্বের পরিচালনা করতেন হিন্দু  
কলেজের দ্বিতীয় ক্লাসের মিত্র। 'পদ্মাবলী'র প্রথম  
দু' সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর স্কুলের ছাত্রদের  
পরিচিতিতে পুস্তক হিসেবে গ্রন্থাগার চলে বিবেচনা  
করে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটি এই  
দু' সংখ্যা একত্রে পদ্মাবলী নামে পুস্তকাকারে  
প্রকাশ করেছিলেন।

এর পর ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে  
কলকাতা মিট্রের পরিচালনায় মাসিক 'আনন্দমোহা'  
পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি প্রধানত বালক-  
বালিকাদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল।  
এতে নীতিতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান বিষয়ক  
রচনা এবং জীবব্রহ্মের বিবরণ প্রকাশিত হচ্ছিল।

তবে অধিকাংশ প্রকল্পই ছিল উপদেশমূলক। কোথাও  
এই উপদেশ সম্পর্কিত ছন্দে পরিবর্তিত হয়েছে।  
আবার কোথাও প্রবন্ধের শেষে নীতিতত্ত্ব প্রকাশ  
পেয়েছে। স্কুলের মেথোদী ছাত্রদের মধ্যে বিতর্কনের  
জন্য স্কুল বুক সোসাইটি পত্রিকাটির বেশ কয়েক  
খণ্ড ক্রয় করেছিলেন। 'আনন্দমোহা'কে দেশীয় এবং  
বাহ্যলী পরিচালিত প্রথম শিশু-পত্রিকা বলা  
যেতে পারে।

'আনন্দমোহা'র পর দীর্ঘ কয়েক বছর বাংলায়  
একান্তভাবে শিশুদের জন্য কোন পত্রিকা রচিত  
নয়নি। তবে কয়েকটি পত্রিকার বড়দের বিষয়ের  
সঙ্গে ছোটদের জন্যও কয়েকটি নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা  
বরাদ্দ ছিল। এক্ষেত্রে জে ওয়েলিংঘার সম্পাদিত



মুকুল পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠা

## লিও টলস্টয় :

### জীবন ও সাহিত্য

নিখরপ্রসূত রূপ কথাসাহিত্যিক লিও টলস্টয়ের জীবন ও সাহিত্যকৃতির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। টলস্টয়ের জীবন ছিল অতিশয় অল্পবয়স্ক মণ্ডিত, দাম্পত্য জীবনে না ছিল সুখ, না ছিল শান্তি। লেখক এই প্রচণ্ড টলস্টয়ের সেই অশান্ত বিজড়িত অস্ত্রজীবনের স্বরূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন গভীর শৈল্পিক অনুভবের সঙ্গে। সেই সঙ্গে আছে টলস্টয়ের সমগ্র শিল্পকৃতির যতদূর সম্ভব পূর্ণাঙ্গত আলোচনা। বাংলা ভাষায় টলস্টয় সংক্রান্ত পূর্ণাবয়ব নই এই প্রথম প্রকাশিত হলো।

সিদ্ধার্থ ঘোষ

বিজ্ঞান নির্ভর অভিযানের কাহিনী

### গ্যাবনে বিস্ফোরণ

পশ্চিম আফ্রিকার গ্যাবনে কে ফাটল পারমাণবিক বোমা? আমেরিকার? রাশিয়ার? চীনের? এরই উত্তর ঘোষণা করতে ও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ রূপান্তরিত, এক দুরন্ত নৈজান্ত্রিক অভিযান। হেলিকপ্টারে গমন আদিম অরণ্য পাড়ি।

নারায়ণ চৌধুরী

### সাহিত্য ভাবনা

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ

### মাতৃভাষা ও সাহিত্য

ডঃ অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য

### ইয়োরাগে ভারতীয়

### বিপ্লবের সাধনা

অনন্য চট্টোপাধ্যায়

### জীবন শিল্পী সুকান্ত

অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল

### শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা

### জ্যাক লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ গল্প

অনুবাদ : রমা ভট্টাচার্য/সিদ্ধার্থ ঘোষ

দক্ষিণারজন বসু

### খেয়ালী কবি সৈনিক

ছোটদের নজরুল

বালক কবি, সৈনিক কবি, বিদ্রোহী কবি, বন্দীকবি এবং পীতৃকবি এই পাঁচটি অধ্যায়ে কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য ও জীবন ধারা সম্পর্কে ছোটদের উপযোগী প্রসাধারণ গ্রন্থ।

Anna Louise Strong

Stalin Era Rs. 10.00  
Rs. 15.00

Sefali Nundy

Bengali For Foreigners Rs. 6/-

পপুলার লাইব্রেরী

১৯৫১/৫২, বিধান সরণি, কলি-৩

(১৮৬০) এবং জ্যোতিষবিদ্যে (১৮৬১) উল্লেখ করা থেকে পারে।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ব্যাপটিস্ট মিশন স্কুল থেকে রেজালেন্ট স্নে ওয়েলসারের সম্পাদিত 'উপদেশক' 'The Instructor' নামক খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কিত মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এতে খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে শিশুস্বাধিকার নিবন্ধন বিভাগে পাঠশালাতে প্রকৃত মনোবোধ্য রাখবার বিষয় শিশুর প্রাধিকার, অশ্লিষ্ট, হাড়, হৃদয়নি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। শিশুরা যাকে পাঠশালাতে পুরোপুরি মনোবোধ্য দিয়ে পড়ানো করে তার জন্য উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে—

“তোমরা কি মনে কর ওয়ে শিশুস্বাধিকার, বিদ্যালয়ে করে থাকে বাবা আগমন।  
যে স্কুলে পাঠ কর প্রভুত জ্ঞান।  
অবস্থা বৃদ্ধিতে হবে তাহার আভাস।  
নতুন ভাষাতে অল্প জ্ঞান হওয়া ভার।  
বয়সি আশ্রয় তাহা কর বারবার।  
পড়িবা যে পাঠ বহু স্পষ্ট আর ধীরে।  
যেন অর্থ হয় তোমার অন্তরে।”

বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকাটি সম্পর্কে সম্পাদকের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে পত্রিকা প্রচারের অনান্দ উপদেশের মধ্যে বালক-বালিকারা ভীড়া-ভুলে পত্রিকা পাঠ করে যাতে আপন আপন জ্ঞানের বিস্তার করে এটাও ছিল সম্পাদকের অন্যতম লক্ষ্য। প্রথম সম্মেলনও তেমনি ভেটিমের জন্যে করেকটি পত্রিকা বরাদ্দ ছিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কোলকাতা ট্রাকট সোসাইটির প্রচেষ্টায় জ্যোতিষ-বিদ্যা মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। বালক-বালিকা এবং স্ত্রীস্বাধিকার এককালীন আমোদ ও নীতিশিক্ষা প্রদানই ছিল পত্রিকাটির উদ্দেশ্য। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ওয়াশে ডাব্রিখের সংবাদ প্রকাশের পাঠে জানা যায় যে ঐ বছরের ২৬শে এপ্রিল প্রিয়মথ বসু, ওয়েলসারের চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনার 'বিদ্যাবন্দন' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটিতে নীতি ইতিহাস, কবিতা এবং বালকদের পাঠোপযোগী বিষয় থাকত। বিদ্যাবন্দনের বিবেচক হল যে এটি উনিশশে শতাব্দীর পঞ্চদশ শতকের প্রথম দুই দশকের পরিচালিত পত্রিকা। এর পূর্বে শিশু এবং কিশোরদের জন্যে বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশিত হলেও কোনটিই কেবলমাত্র বালকদের উদ্যমে প্রকাশিত হয়নি।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে খ্রীষ্টান ভার্গবীয়ার এককালীন সোসাইটির কল্যাণী ভাষা কল্লুক সভাপ্রবীণ নামক শিশুপাঠ্য খ্রীষ্টীয় মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। প্রবাসত শিশু এবং বালক-বালিকাদের মধ্যে জ্ঞানবিকাশের উদ্দেশ্যে সহজ ভাষায় এবং স্বল্পমূল্যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটির ইংরেজী নাম ছিল 'The Lamp of Youth'। ভূমিকা অংশ থেকে পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা যায়—“যে প্রিয় বালক-বালিকাস্থ, তোমাদের নিমিত্তই এই পত্রিকা প্রস্তুত হইতেছে। তাহা অল্প মূল্যে বিক্রীত হইবে। সুতরাং তোমরা দারিদ্র হইলেও অনায়াসে এই পত্রিকা ক্রয় করিতে পারিবা এবং তোমরা যেন বৃদ্ধিতে পার এই জন্যে সরল ভাষা প্রয়োগ করিব ও মনোমুগ্ধ পাঠে ইহা পরিপূর্ণিত থাকিবে। ইহাতে সুন্দর ২ গল্প লিখা থাকিবে।..... আর যে সকল বৃদ্ধত আত্ম পরিত্রা উত্তমরূপে বৃদ্ধিতে পার নাই, অর্থাৎ বাপ্পির পোত, বৈদ্যক বস্তু.....সকলি লিখিবা।”

প্রধানত বালক-বালিকাদের উদ্দেশ্যে রচিত পত্রিকাটিতে বিভিন্ন বিষয়ে—যেমন, পশুপাখী, জীবজন্তু, বিজ্ঞান, নীতিশিক্ষা, ইংরেজী প্রবাদবাক্য, জীবনচরিত খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ে বিভিন্ন

হৃদয়ক ভাষায় বৃদ্ধত জাতীয় রচনাও প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকা সংখ্যা ছিল ১৬। পত্রিকাটি শিক্ষা প্রদর্শনী, সুবন্দরী ও সুস্বাদুরূপে বালকদের মনোমুগ্ধ করে রাখি ছিল সম্পাদকের উদ্দেশ্য। এতে বিভিন্ন বিষয় চিত্রিত আলোচিত হয়েছে পর্যবেক্ষণকেই প্রথম শিল্প পত্রিকা বলা থেকে পারে। মার্চের তালিকা থেকে পত্রিকা ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে বলা জানা যায়।

পত্রাপ্রবীণের দ্বিতীয় সত্তরো বছর ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা সেনের সম্পাদনার বাংলায় প্রথম শিশু পত্রিকা 'বালকবন্ধু' (১৮৭৮) প্রকাশ ল করে। এটিই প্রথম বালক পাঠ্য পত্রিকা পত্রিকা সংখ্যা ৮। আনন্দবোধের সঙ্গে শিশুদের জ্ঞানার্জনের আগ্রহ বা পছন্দ জাগিয়ে তোলা প্রায় : শিশুসাহিত্যিকদেরই লক্ষ্য। কাজেই জ্ঞান বিজ্ঞা : বিভিন্ন বিষয় যাতে শিশুরা মনের মতো করে গ্রহণ করতে পারে তার প্রতি সম্পাদকের সজাগ দৃষ্টি ছিল। কলে শিশুদের মনোমুগ্ধতার জন্যে পত্রিকাটিকে ছড়া ও ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছিল। এ নানারকমের কবিতা, গল্প, ছড়া, উপদেশ, হেঁচকা নীতিমূলক সংকলিত শ্লোক ও তার বাংলা অর্থের মাধ্যমে গাঢ়তর স্তর ইত্যাদি বিভিন্ন বি প্রকাশিত হয়েছিল। বালকবন্ধুর বিশেষ হলো এতেই প্রথম দেশ-বিদেশের সংবাদ (২০ সং থেকে) এবং বালকদের নিজেদের লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। 'বালকবন্ধু'কেই প্রথম 'আদর্শ' শিশু পত্রিকা বলা যেতে পারে যার বৈশিষ্ট্যগুলো আনন্দসূত হয়ে আসছে।

বালকবন্ধুর পর ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে প্রমদাচরণ সেনের সম্পাদ প্রকাশিত হলো 'সখা'। পত্রিকাটি সম্পর্কে সম্পাদক বক্তব্য—“এতদিন পরে 'সখা' প্রকাশিত হইতে চলে এইরূপ পত্রিকা আদ্যাদেশে দেশে নাই বলি আমরা এই পত্রিকাদ্বারা প্রকাশ করিবার করিয়াছিলাম। আমাদের হৃদয়ভাষা দেশে বহু বালিকাদের জ্ঞানের ও চরিত্রের উন্নতির জন্যে অলোক চিন্তা করেন না, অথবা করিবার অবসর না, এই জন্যই 'সখা'র জন্ম হইল। সখা শিশু মাতার উপদেশ এবং শিক্ষকের শিক্ষা দুইই : কাঁচের। যাহাতে বালক-বালিকারা বাস্তবিক হইতে পারেন, এজন্যে সখার লেখক ও লেখিকা প্রাণপনে চেষ্টা করিবেন।” পত্রিকাটিতে কবিতা, জীবনী, জীবনজ্ঞানের বিবরণ, আখ্যান ও নীতিমূলক এবং স্বাভাবিকসম্পর্কিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইবে। 'সখা'তে বালিকাদের জন্য করেকটি নি পত্রিকা ছিল, তাতে বিভিন্ন ধরনের রামায়ণ, পিথার তৈরী করার নিয়ম, পোশাক পরিচ্ছদ বালিকাদের প্রথম গল্প লক্ষ্য নতুন ইত্যাদি রচনাদি প্রকাশিত হইবে। উপদেশিকাশর বিপিনচন্দ্র পাল, হেমচন্দ্র দেবী, বিপিনচন্দ্র সেন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছিলেন নিয়মিত লেখক। এতেই বিপিনচন্দ্র শিশুদের জন্য রচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ 'সুখার কারাকাস' প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটি চতুর্থ এবং পত্রিকা সংখ্যা ১৬। 'সখা' আপন বৈশিষ্ট্যের বিশিষ্ট বালিকাদের দ্বারা প্রকাশিত হইবে। 'সখা' সম্পর্কে সাহিত্যসম্রাট কবি লিখেছেন—‘সখা পত্রিকায় সকল পড়ি নাই, বড়দের পত্রিকায় তাহাতে বিশেষ প্রাণ করিয়াছি। সখা প্রধানত বালক-বালিকাদের হৃদে, কিন্তু এ সখার সাহায্য অনেক পত্রিকার পক্ষেও অনবলম্বনীয় নহে : বালিকাদের এমন সম্পর্ক অতি দুল্লভ। এই জন্যে অতি সরল, বিবরণবস্তুপূর্ণ জ্ঞানগত মার্জিত। এই সখার সঙ্গে তরুণ বালক সখীয়া করা উচিত। সখার জন্যে যাহার শিশু বালক-বালিকা আছে সেই আপনার নিকট

কথা সম্পাদক উল্লিখিত করে চলমান বঙ্গ লিখে-  
জিহলন—

"I have looked through the first volume of the Sakha with very great pleasure. As a periodical for the instruction and amusement of children it is an excellent publication".

পত্রিকাটি যে তখনকার দিনে বিশেষ সময়ের লাভ করেছিল তার প্রমাণ শিবতীর সংস্করণের প্রকাশে।

এর পর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জাননানন্দিনী দেবীর সম্পাদনার ঠিকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত হয় 'বালক'। এটিই সাহিত্য সম্পাদিত প্রথম শিশু পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সরলাদেবী, জাননানন্দিনী প্রমুখ ঠিকুর পরিবারের লেখক গোষ্ঠী ছাড়াও শ্রীশচন্দ্র বসু, মদনমোহন, শতীলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ভুবনমোহন মিত্র, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শরৎচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ লেখক ছিলেন। এতে কবিতা, গল্প, নাটক এবং ভ্রমণ, পরীক্ষা, বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ রচিত 'হে'রালী' নাটকটি 'বালকে'ই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। শিশুসাহিত্যে এই প্রথম নাটকের আবির্ভাব। 'বালক' সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-স্মৃতিতে লিখেছেন—'ছবি ও গান এবং কাড়ি ও কোমল এর মাঝখানে বালক নামক একখানি মাসিক-পত্র এক বৎসরের ওপরে মতো ফসল ফলাইয়া লীলা সম্বরণ করিল। বালকের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ ব্যতিরিক্ত বাক্যের জন্য স্বেচ্ছাবোধিতকুরাণীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা ছিল সুখীন্দ্র, বসন্ত প্রভৃতি আখ্যায়িকার বাক্যের বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু

জানিয়া তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন।"

'বালকের' দু-এক সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার জনৈক রাজনায়ক বসুকে দেখতে দেওয়ার বান। দেওয়ার থেকে কোলকাতা ফিরবার পথে গাড়ির ভিড়ে তাঁর চোখে ঘুম আসছিল না। কাজেই তিনি বালকের জন্যে একটা গল্প লেখার কথা ভাবছিলেন। এরই মধ্যে তাঁর চোখে ঘুম এসে পড়ে এবং তিনি স্বপ্নে দেখেন। এই স্বপ্নলব্ধ কাহিনীর সঙ্গে টিপসার রাজা যোগবিশ্বমণিকার পরাবৃত্তকে মিলিয়ে রাজর্ষি রচিত হয় এবং মাসে মাসে 'বালক' প্রকাশিত হতে থাকে। পরে ১৯১০ সালে রাজর্ষি বই আকারে প্রকাশিত হয়।

'বালকের' প্রথম সংখ্যার জাননানন্দিনী দেবী রচিত 'বারাম' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটির বিরোধিতা করে জনৈক সংখ্যার 'লাঠির উপর লাঠি' লিখলে জাননানন্দিনী দেবী তাঁর সম্পাদককে নিষেধান কৌতুক করে লিখছিলেন—'লাঠির পরে লাঠির লেখক আমার লাঠি হারাইয়া আমাকেই বিলম্ব শিক্ষা দিয়াছেন।" অবশেষে সম্পাদক হিসেবে তাঁর বক্তব্য "তোমাদের এই সকল কথা বলিবার তোমাদের অনুরোধ করিবার সুযোগ পাইব বলিয়া এই 'বালক' পত্র প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি—তোমাদের মংগলই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য।" এক বছর প্রকাশিত হবার পর ১৯১২ সালের চৈত্র মাসে 'বালকের' প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকাটি তখন থেকে 'ভারতী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু কাগজরূপে 'ভারতী ও বালক' নামে প্রকাশিত হতে থাকে।

'বালকের' পর ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ভুবনমোহন রায়ের সম্পাদনার প্রকাশিত হয় 'সাধী'। বালক বালিকাদের সর্বাঙ্গীন শিক্ষাদানই ছিল সাধীর মূল উদ্দেশ্য। এতে কবিতা, গল্প, অদর্শ জীবনচরিত, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের কথা প্রকাশিত হতো। সাধীর প্রথম সংখ্যার বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক যোগেশচন্দ্র সরকার লিখেন—'সাধীর গ্রাহক হতে আহ্বান জানিয়ে লিখাছিলেন—

"কোথায় আছ তাইটি আমার কোথায় আছ বোন,

আয় ছুটে আয় শোনের

এসে সাধীর আবাহন।

উপদেশো নয় যে ভাই,

হাতে নাইকো ছাড়ি

নাইকো তাহার উচ্চ ধমক

দস্তের কড়মড়ি।"

নিম্নক আনন্দ ও কৌতুকের ওপরই শিশু মনের কোক। কাজেই উপদেশ ও ছাড়ির ব্যাপারটি না থাকায় সাধীর এই আহ্বান শিশুদের কাছে নিশ্চয়ই মাদরে গৃহযোগ্য হয়েছিল।

'সাধীর' সম্পাদক প্রমদাচরণের মৃত্যুর পর সখা ও সাধী যুক্ত হয় এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ভুবনমোহন রায়ের সম্পাদনার পত্রিকাটি 'সখা ও সাধী' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। এতে বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হলো 'মুকুল'। সম্পাদক ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পাদকের বক্তব্য—'জ্ঞানের মুকুল, প্রেমের মুকুল, সকল ভাল বিষয়েরই মুকুল আছে। এই পত্রিকা যাহাদের জন্য তাহারাও মুকুল, মানব মুকুল।...মানব মুকুলদিগকে ফুটিবার পক্ষে সাহায্য করাই মুকুলের উদ্দেশ্য।" 'মুকুলের' নববর্ষে আরো বলেছেন—'শিশুদের পরিচর্যা করা বড় কঠিন কাজ। মুকুল শিশুদের সংগী হইতে চার, হাসি ও খেলার মধ্যে তাহাদিগকে দু'একটি ভাল কথা শুনাইতে চেষ্টা করে। তাই মুকুল পাইয়া, তাহার একগল হাসিলেই মুকুল চরিতার্থ।" এতে কবিতা, গল্প, ছড়া, অঙ্ক শেখার পদ্ধতি, বিজ্ঞান ও রাসায়নিক

১ নং সত্যপদ্য। ২ খণ্ড

## THE LAMP OF TRUTH.

No. 1. JANUARY, 1861.

14123 016.



CALCUTTA:

BENGAL BRANCH OF THE CHRISTIAN VERBACT-  
LAE EDUCATION SOCIETY FOR INDIA.

1861.

সত্যপদ্য পত্রিকা আবার পর। ব্রিটিশ প্রদেশের লক্ষ্যের প্রমাণিক গ্রাহক শ.র সৌজন্য প্রাপ্ত




বাঙলার মহানবী আমল তখন শের ইংরেজ কোম্পানীর আমল তখন শুরু। শাসনের মুষ্টি সবে কড়া হচ্ছে। চারিদিকে বনবাদাড়। পথ চলাতে পথিকের ভয়। শেরশেহর চোখে ঘুম নেই। কখন বৃষ্টি হানা দেয় ডাকাত! সত্যিকথা বলতে কি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত শান্তিতে বাস করা দূরে থাক, পথ চলাচলও নিরাপদ ছিল না। আর আশ্চর্যের বিষয় সেই সময়ে বাঙলা দেশের অনেক ইতিহাস প্রসিদ্ধ জমিদাররাই ছিলেন ডাকাত।

বঙ্কিম চন্দ্রের কথায় বলা যায়—‘আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে অনেক জমিদারই দস্যু ছিলেন। ডারউইন বলেন, মানবজাতি বানর দিগের প্রপৌত্র। এ কথায় যদি কেহ রাগ করিয়া না থাকেন তবে পূর্বপুরুষগণের এই অখ্যাতি শুনিয়া বোধ হয় কোন জমিদার আমাদের উপরে রাগ করিবেন না।’

সেই সময়েই সাহস ডাকাতের অভিব্যক্তি। মহিশের নামে শুধু পূর্ব বাঙলাই নয়, গোটা বাঙলা দেশেই রাস ও আতঙ্কের স্থিতি হয়েছিল। দুর্ধম মতিমের ক্রিয়াকলাপও বিচিত্র। বীরকে, সাহসিকতায়, চাতুরীতে সাহস ডাকাতের জুড়ি নেই। কখনও ফেরিওলা সেজে ঘোরাফেরা করে, কখনও আবার মাঝি সেজে ইংরেজ পুলিশ অফিসারকেই নদী পার করে দেয়। কিন্তু মহিশকে কেউ ধরতে পারে না। তার পায়ে যেন বিদ্যুতের গতি।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত অনেক দালন-পত্র সরকারী গেজেটিয়ার ও কিংবদন্তী ঘোঁটে ‘কৈশোরক’ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে ‘মহিম ডাকাত’ লিখে হৈছে ফেলে দিয়েছিলেন। ছোট বড় সবাই তখন গোপ্তাসে গিলেছিল। লেখক নিজেই কুমিয়ায় বলেছেন—‘মহিম ডাকাত উপন্যাসখানি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর নাম কিছু কিছু পরিবর্তন করিলেও ইংরেজ সরকারের অধীন গোয়েন্দা কানীকাস্ত চক্রবর্তীর নাম পরিবর্তন করি নাই।’ সেই বই আনবেকল



যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের

**মহিম ডাকাত**

১০৮

**বাঙলার ডাকাত**

১—৪ প্রত্যখণ্ড

শৈব্যা চ/সি, স্ট্রামিটারগ দে স্ট্রীট



#### ‘বালক বন্দু’ পত্রিকার প্রাক্কৃত পৃষ্ঠা

প্রবন্ধ, নানা দেশের এবং জন্তুর বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৬। এমন সমস্ত চমৎকার ছবি দিয়ে পত্রিকাটিকে আকর্ষণীয় করা হয়েছিল যার মধ্যে বিংশ শতকের শেষার্ধের ছবির অনায়াসে তুলনা করা চলে। এখনকার মতো মকুলে ছবি দিয়ে সেই ছবির পরিপ্রেক্ষিতে গল্প কবিতা লেখার আহ্বান থাকতো এবং তার জন্য পুরস্কারও ঘোষণা করা হতো। মকুলের চতুর্থ বর্ষের আখ্যাত সংখ্যায় এই ধরনের ছবির ওপর কবিতা লিখে পুরস্কার পেয়েছিলেন বিমলী বারীন্দকুমার ঘোষ। বিপিনচন্দ্র পাল, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রকিশোর বারসৌধ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র বসু, অতুলপ্রসাদ সেন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রামেশ্বর-সুন্দর দ্বিবেন্দ্রী, প্রমথ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ মকুলের লেখক ছিলেন। একালের বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকারের ‘মজার মকুল’ কবিতাটি মকুলের পাতাতেই প্রকাশিত হয়েছিল—

‘ধক যে আছে মজার দেশ  
সব রকমে ভালো,  
রাতিরেতে বেজায় রোদ  
দিনে চাঁদের আলো।’

কবিতাটির সঙ্গে শিশুর বুলিফোটার সঙ্গে সংগেই যেন পরিচয় ঘটে। আট বছরের ছোট্ট শিশু, মকুমার রায়ের প্রথম কন্যা ‘দাদী’ কবিতাটি মকুলেই (২য় বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা) প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এতে ব্রাহ্মকান্য গণেশপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, রামতনু লাহিড়ী, প্লাডম্পটন, জর্জ ম্যাকার লর্ড এলগিন প্রভৃতি দেশী বিদেশী বিখ্যাত মনীষীদের জীবনী চিত্রসহ প্রকাশিত হয়েছিল।

শিশুদের স্বাভাবিক কৃতিত্বগুলোকে বিকাশিত করে তোলা এবং ভালো কিছু শেখানো অর্থাৎ নীতি উপদেশ শিক্ষা দেওয়া সব শিশু পত্রিকারই উদ্দেশ্য। তাই মকুলে সবরকমের মজাদার গল্প, ছড়া, কবিতা, ধাঁধা, ছাড়াও কোন কোন রচনার মধ্যে প্রচ্ছদভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। উপেন্দ্রকিশোর তাঁর ‘স্যাডো’ নামক সচিত্র প্রবন্ধটির শেষে বালকদের স্যাডোর নামক বসন্তালা হবার জন্য উপদেশ দিয়ে বলেছেন—‘প্রাথনা কর। ভেজরা স্যাডোর নাম বসন্তালা হও, আর স্যাডোর চাইতে সেই বলের অধিকতর সম্ভাব্যতার কর।’

১৯০৭ বঙ্গাব্দ থেকে মকুলে বালক-জনো একটি বিশেষ পৃষ্ঠা প্রকাশিত হয়েছিল বালকদের জন্যে সহজ সেলাই, সহজ রান্না, ধরনের খেলার নিয়ম ও হারমোনিয়ামের সহজ লিপি থাকতো।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে রাে গুপ্তের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে ‘অঞ্জলি’ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্পাদক লিখেছেন—‘এইখানি শিক্ষা বিষয়ক ম পত্রিকা, বালক বালিকাগণকে সুশিক্ষিত ইহার প্রাপ্য। এই শিক্ষাদান কার্যে পিতামাতা ও অভিভাবকগণকে বিশেষতঃ শিক্ষক ও ছাত্র সাহায্য করা ইহার উদ্দেশ্য।’ পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬। এতে শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় বর্ণনামূলক, ইতিহাস, এটলাস শিক্ষা সম্ভাব্যতার ইত্যাদি বিষয় ছাড়াও সমসাময়িক সম্পর্কিত সংবাদও থাকতো এতে। ১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাঠ্য তা প্রকাশিত হয়েছিল। কবে কোন পরীক্ষা গৃহীত তারও সংবাদ থাকতো।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে শ্রু সোসাইটির প্রতিপত্তিক জনো রাখা দিয়ে যে সাহিত্যের সূচনা তা ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে পুস্তক এবং সাময়িক পত্রের মাধ্যমে বিকাশ করে। বিংশ শতকে এই শিশুসাহিত্য তথ্য সাপ্তাহের দ্বারা নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধতর হয়েছে। শতকের শিশুমনও হয়ে উঠেছে অধিক স্মৃতিশীল। তাদের মনে আঁকা নানা প্রশ্ন—শিশুদের এই জ্ঞানভাণ্ডার অনুসন্ধানের যোগ্যেতে বিংশ শতকের শিশু সাহিত্যিকরাও সচেতন। ফলে পত্রিকাও বৈচিত্র্যসম্পন্নতর সমৃদ্ধ উঠেছে। তবে বিংশ শতকের শিশুপত্রিকার সমৃদ্ধির পেছনে ঊনবিংশ শতকের শিশু সাপ্তাহের দান অনস্বীকার্য।

গ্রন্থাবলী—

- (১) যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—শতাব্দীর শিশুসাহিত্য ১৯৫৮।
- (২) বাণী বসু—বাংলা শিশুসাহিত্য গ্রন্থ ১৯৭২।
- (৩) যোগেন্দ্রনাথ বসু—পাঠ্য—বাংলা সাপ্তাহ—২য় খণ্ড ১৯৬৯।

## স্থানিক জ্যোতির্বিজ্ঞান কেন্দ্র কলকাতায়

২৩ এপ্রিল ভারতের প্রথম স্থানিক জ্যোতির্বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্বোধন হলো কলকাতায়। উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট আবহাওয়া-বিজ্ঞানী এবং ভারত সরকারের আবহাওয়া দপ্তরের ডায়রেক্টর জেনারেল ডঃ পি কে দাস। এই উদ্বোধন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা এবং তার প্রাচ্যগিক ক্ষেত্রে যে সম্প্রসারিত করতে সাহায্য করবে, বলাই বাহুল্য।

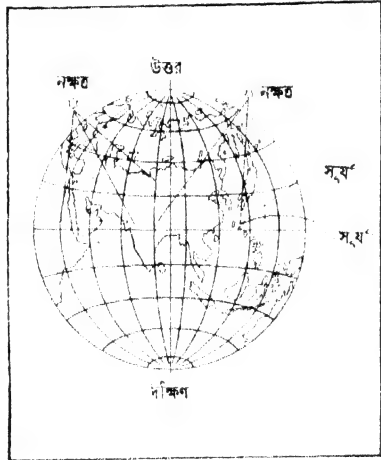
প্রতিষ্ঠানটির ইংরাজী নাম দেওয়া হয়েছে 'পার্সনাল অ্যাস্ট্রোনমি সেন্টার'। বাংলা পরিভাষা করলে যা দাঁড়ায় স্থানিক জ্যোতির্বিজ্ঞান কেন্দ্র। কেন্দ্রটির মূল লক্ষ্য হবে আধুনিক পদ্ধতিতে সূর্য, চন্দ্র, বিভিন্ন গ্রহ এবং নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয়। বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে দেখলে আকাশের সঠিক কোন কোন অঞ্চলে তাদের দেখা হবে তার সঠিক বিবরণ নির্ধারণ করে পৃথক হিসেবে প্রকাশ করা। এই বিবরণের মধ্যে সূর্যগ্রহণ, ধূমকপতুর আবির্ভাব এবং তার সঞ্চারপথ, বৃষ্টি, শূন্য প্রভৃতি গ্রহের স্থানিক অবস্থান—এমন অনেক কিছুই থাকবে। এই সব তথ্য জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার যেমন সাহায্য করবে, সেই সংগে নানা রকম বৈজ্ঞানিক ব্যাপারেও সাহায্য করবে যথেষ্ট। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নৌ-চালনা এবং বিমান-চালনা।

বিমান-চালনার কথাই ধরা যাক। ইদানীং অবশ্য ভূপৃষ্ঠে অবস্থানরত বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে যেতার সংকেত পাঠিয়ে অথবা রেডারের সাহায্যে বৈমানিকরা তাঁদের গন্তব্য পথটি স্থির করে নেন। বোয়িং-৭৪৭-এর মত আধুনিক বিমানে আবার থাকে যন্ত্রগণক বা কম্পিউটার। স্থানীয়ভাবে এই যন্ত্রগণক নিজেই বিমানকে তার নিজস্ব গতিপথে চালনা করে। কিন্তু কখনও কখনও এমন অবস্থাও দাঁড়ায় যখন যন্ত্রগণক হয়ত ঠিক মত কাজ করলো না। অথবা রেডার বা ভূপৃষ্ঠে অবস্থানরত নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রের সংগে যেতার সংযোগকারী ব্যবস্থা বিকল হয়ে গেল। এমন অবস্থায় বৈমানিককে তার অবস্থান জানার জন্যে নির্ভর করতে হয় জ্যোতির্মন্ডলের উপর। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ বা বিশেষ বিশেষ নক্ষত্রের অবস্থান জানতে হয় তখন। বিশেষ কোন নক্ষত্র, গ্রহ, সূর্য অথবা চন্দ্রের অবস্থান জেনে নিয়ে তাকে বুদ্ধি দিয়ে চললে, কোন দিকে যাবে। অথবা যদি অবতরণ করার প্রয়োজন হয়, তিক কোন দিকে গেলে কাছাকাছি বিমান বন্দরে পৌঁছনো যাবে এ সব সম্পর্কে নানান তথ্য। এই তথ্যাবলী জানার ব্যাপারে সাহায্য করে স্থানিক জ্যোতির্বিজ্ঞান।

যেমন ধরুন, কলকাতায় যখন রাত আটটা, ওই সময় বছরের কোন নির্দিষ্ট দিনে একটি আন্তর্জাতিক বিমান লন্ডনের পথে বাতাস করলো। চন্দনী রাত। পশ্চিম আকাশ। আটটার সময় কলকাতার বিমান বন্দর থেকে দেখা গেল, চাঁদ আকাশের একটি বিশেষ জায়গায় অবস্থান করছে। ওই সময় পাটনার আকাশে চাঁদের অবস্থান হবে ভিন্নরকম। কলকাতা থেকে যাত্রা করার কিছুক্ষণ পর বিমানটি যদি পাটনার উপর দিয়ে উড়ে যায়, তখন সেখানকার আকাশে চাঁদের অবস্থান হবে অন্যরকম। ধরা যাক ওই সময় পাটনার আকাশ কালো মেঘে ছেঁয়ে রয়েছে। জেট পেন। অতএব উড়ে যেতে উপর দিয়ে। মেঘের আরেকপাশে দরুন বিমান বন্দরের আলোক সংকেত দেখা বৈমানিকের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ওটিকে কয়েক দরুন বিমান বন্দরের যেতার-সংকেত স্পষ্ট

পাচ্ছেন না। এমন অবস্থায় ইজনে গোলরোস দেখা দিল। পাটনা বিমান বন্দরে তাঁর নামা দরকার। কিন্তু কী করে বৈমানিক বুঝবেন কোথায় বিমান বন্দর? তখন একমাত্র অবলম্বন চাঁদ, কোন গ্রহ অথবা নক্ষত্র। বৈমানিক তাঁর চাঁদ দেখে বুঝে নেবেন, ঠিক ওই সময় চাঁদ বা নির্দিষ্ট গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান কোথায়। সেই অবস্থান জানা থাকলে তিনি বুঝতে পারবেন, ঠিক কোন ভৌগোলিক অঞ্চল দিয়ে তিনি উড়ে চলেছেন। চাঁদ বা গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান দেখে পাটনা বিমান বন্দরের অবস্থানও তিনি বুঝে উঠতে পারবেন। এবং সেই মত নির্বিশেষে নামের আন্তে পারবেন তাঁর বিমান পাটনা বিমান বন্দরে।

শুধু বিমানই নয়, প্রতিদিন বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের আকাশে সূর্য, চন্দ্র এবং বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র কখন কোথায় অবস্থান করছে সে সব জানা গেলে জাহাজেরাও জানতে পারেন সাগর এবং মহাসাগরের কোথায় তাঁরা অবস্থান করছেন। বলা যাক, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান যত সূক্ষ্মভাবে জানা যাবে বিমান এবং জাহাজের অবস্থান জানাও তত নিখুঁত হবে। জানা যায় জোয়ার-ভাটার সময় এবং সেই জোয়ার-ভাটা কোন জায়গায় কতক্ষণ চলবে তার হিসেব। জানা যায় বিভিন্ন অঞ্চলে সূর্য এবং চন্দ্রের উদয়-অস্তের সময়। কোথাও গরমের সময় হয়ত ফুটবল খেলা হবে। ওই সময় সেখানে সূর্যের আলো কোন বরাবর বেশি বা প্রত্যকভাবে পড়বে জানা যায়। এগ তথ্য স্টেডিয়ামের পরিচালনা করতে সাহায্য করে।



রকেট উৎক্ষেপণ এবং মহাকাশযানের সঞ্চারপথ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান জানা দরকার। আমরা যখন পথ চালা, তখন আমাদের চোখের সামনে থাকে নানা রকম নিশানা। দিনের দিকে সূর্যের অবস্থান দেখে বুঝতে পারি কোন দিকটা উত্তর, দক্ষিণই বা কোন দিকে। অথবা পথের পাশে আছে ঘরবাড়ি, আলোক স্তম্ভ অথবা গাছ-পালা। এদের নিশানা ধরে আমরা গন্তব্য পথকে চিনে নিই। কিন্তু রকেট এবং মহাকাশযানের কথা ভাবুন। পৃথিবী উদ্ভাষণে ওঠার পর কীভাবে তারা গন্তব্য পথ ধরে এগিয়ে যাবে?

এক্ষেত্রেও স্থানিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভূমিকা অনিবার্য। রকেট বা মহাকাশযান থেকে যান্ত্রিক চোখ মহাকাশে উৎক্ষেপণের পর পৃথিবী থেকে সংকেত পাঠিয়ে চলমান রকেট এবং মহাকাশযানকে এমনভাবে পাল ফিরিয়ে দেওয়া হয় যাতে সেই যান্ত্রিক চোখালি মহাকাশে নির্দিষ্ট কয়েকটি (কম করে তিনটি) নক্ষত্র এবং গ্রহের দিকে চেয়ে সঞ্চারপথ ধরে এগিয়ে যায়। ওই নক্ষত্র এবং গ্রহই তখন নিশানা হিসেবে কাজ করে। নক্ষত্র অথবা গ্রহের পারস্পরিক অবস্থান যদি নিখুঁতভাবে জানা থাকে



এন সি লাহিড়ী। অধ্যাপক সেনমান সাহার দ্বিতীয় পরিচালনা। এন সি লাহিড়ী প্রায় এক বছর হিসেবে সেই পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল এক্সপেরিমেন্টাল এবং নটিক্যাল এক্সপেরিমেন্টের উপর তাঁর দীর্ঘ এবং অনলস উদ্যম পরিচালনা অ্যাস্ট্রোনমি সেন্টার স্থাপনে সাহায্য করেছে।

তা হলে রকেট বা মহাকাশযান নির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করা যায়।

বছরের বিভিন্ন সময়ে সূর্য, চন্দ্র এবং বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র আকাশে কখন কোথায় অবস্থান করে এমন তথ্য আবহাওয়াবিজ্ঞানীদের কাছেও মূল্যবান। পৃথিবীর বুকে ঋতুর পরিবর্তন হয়। এক এক ঋতুতে অঞ্চল বিশেষে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানও পালটায়। প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁদের দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের সাহায্যে এটা যে সত্যি, তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা জানতেন, আকাশের কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে কোন নির্দিষ্ট নক্ষত্র যখন দেখা যায়, পৃথিবীর বুকে তখন আসে বর্ষা। আকাশের নির্দিষ্ট অঞ্চলে অপর কোন নির্দিষ্ট গ্রহ বা নক্ষত্র দেখা দিলে আসে শীত। এর অর্থ এই নয়, বিশেষ বিশেষ নক্ষত্র আকাশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে থেকে পৃথিবীর বুকে ঋতুর পরিবর্তন ঘটায়। ব্যাপারটা আসলে সময়ের মত। যে যে সময়ে তাঁরা বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে আবির্ভূত হয়, ওই ওই সময় আগমন ঘটে এক-একটি ঋতুর। অতএব আকাশে নক্ষত্রাবলীর অবস্থান যদি সূক্ষ্মভাবে জানা যায়, কোন সময়ে কী ধরনের আবহাওয়া হবে সে সম্পর্কে অনুমান করা যেতে পারে (পরিবেশ দূষণের দরুন কিছু কিছু ব্যতিক্রম অবশ্য ঘটে)।

এ ছাড়া আরও একটি বিষয়ের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। সামাজিক এবং ধর্মীয় জিহ্মা-কলাপের জন্যেও মানুষ সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রের উপর নির্ভর করে। তারা আকাশে কখন, কোথায় এবং কী পর্যায় অবস্থান করছে তার উপর নির্ভর করে তৈরী হয় পাজিকা। পাজিকায় দিন ক্ষণ, তিথি প্রভৃতি উল্লিখিত হয়। মংশিকল এই, ধর্মীয় এবং প্রথাগত ভিন্নতার দরুন এইসব তিথি এবং দিনক্ষণ গণনার ব্যাপারে দেশ এবং সম্প্রদায় বিশেষে নানা রকম পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। এক সময় আমাদের দেশেও ছিল নানা রকম পাজিকা। এখনও আছে। এইসব পাজিকার মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করা দরকার। ওক্ষেত্রেও স্থানিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভূমিকা অনস্বীকার্য।



নাম অ্যাগিপটোপিথেকাস। দাঁতালো এই বানর জাতীর প্রাণী আজ থেকে প্রায় তিন কোটি বছর আগে পৃথিবীর বুকে বিরাজ করত। সম্প্রতি মিশরের কাছাকাছি সাহারা মরুভূমির একটি অঞ্চলে ওই প্রাণীর চোয়ালের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। সেই জীবাশ্মের উপর নির্ভর করে নর্থ ক্যারোলিনার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা ওই প্রাণীর একটি পৃথিবীর ছবি

এঁকেছেন। ছবিটি উপরে দেখান হলো। নিচে বাঁ দিকে পুরুষ বানরের দাঁত। ডান দিকে স্ত্রী বানরের দাঁত। পুরুষের দাঁত মেরেছে। চেয়ে যড়। পুরুষ এবং স্ত্রীদের দাঁতের এই পার্থক্য দেখে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন, ওই প্রাণীদের পুরুষ ই হরত শত হাত থেকে নিজেদের সমাজকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়োজিত। এবং বানর জাতীর ওই প্রাণী মানবের পূর্বপুরুষ।

শেষে ক্যাপারটি নিয়ে এ দেশে যারা গভীর-ভাবে চিন্তা করেন এবং পজিকা সংশোধনের জন্য পুরোহিত হিসেবে কাজ করেছেন বা করেছেন, অধ্যাপক মেশনার সাহা তদ্বের মধ্যে অন্যতম। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস এবং নৃত্য সম্পর্কে অধ্যাপক সহস্র অপরিণামী প্রমাণ ছিল। তিনি দেখেছিলেন, এদেশে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সময় নির্ধারণ একটা বড় রকমের সমস্যা। কারণ, এক এক সময়ে এবং অঞ্চল বিশেষে একাধিক পজিকার চল ছিল। তাদের সাল তারিখ এক-এক ক্ষেত্রে এক-এক রকম। অধ্যাপক সাহা চেয়েছিলেন, এদেশে এমন একটি পজিকা তৈরি হোক যার সাহায্যে প্রাচীন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাবতীর ঘটনার সন-তারিখ সেই অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে।

অধ্যাপক সাহার উদ্যোগে ভারত সরকার ১৯৪৬ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক পজিকা বা অ্যাস্ট্রো-নমিক্যাল অ্যালম্যানাক এবং নৌ-পজিকা বা নটিক্যাল অ্যালম্যানাক তৈরি করার জন্য একটি কমিটি তৈরি করেন। উদ্দেশ্য, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যোতির্পদার্থ-বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার সাহায্য করা। পরে ১৯৫২ সালে তৈরি হলো ক্যালেন্ডার রিফর্ম কমিটি বা পজিকা পুনর্গঠন কমিটি। এই কমিটির সভাপতি হন অধ্যাপক সাহা স্বয়ং। এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছিলেন স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। কারণ তিনিও বুকেছিলেন, দেশে এমন একটি পজিকা থাকা সরকার বা জাতি বর্ষ নির্বিশেষে ধর্মীয় এবং সামাজিক প্রয়োজনে কার্যকর হয়।

ভারি উদ্যোগে তৈরি হলো নতুন জাতীয় পজিকা: ১৯৫৪-৫৫ ইংরাজী বছর থেকে। শুরুর

হলো শকাব্দ গণনা। ওই বছরকে ধরা হলো ১৮৭৬ শকাব্দ। ধরা হলো চৈত্র, অশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘ এবং ফাল্গুন—এরা প্রত্যেকটি হবে ৩০ দিনের মাস। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় শ্রাবণ এবং ভাদ্রের প্রত্যেকটি মাস ৩১ দিনের হবে। সূর্য বর্ষদিন মহাবিবব অতিভ্রম করবে তার পরিধি থেকে শুরুর হবে নতুন বছর। ইংরাজী সাল ধরলে এই দ্বিমিটি হবে ২০ মার্চ। এছাড়া এই কমিটি ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে জাতীয় পজিকা এবং নৌ-পজিকা প্রকাশের কথাও অনুমোদন করেন।

প্রথমে এই প্রকাশনার কাজ শুরুর হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ নিউ-ক্লিনার ফিজিক্স-এ। এ কাজে অধ্যাপক সাহার প্রধান সহকারী হিসেবে এগিয়ে এলেন স্বর্গত এন সি লাহিড়ী। ক্যালেন্ডার রিফর্ম কমিটির সদস্য এবং সেক্রেটারি হিসেবে তিনি যোগ দেন। পরে এই কমিটি ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের একটি শাখা হিসেবে কাজ করতে শুরুর করে। এন সি লাহিড়ী এই শাখার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১৯৫৮ সালের পজিকা এবং নৌ-পজিকা প্রকাশিত হলো। তারপর থেকে দপ্তর আগে পর্যন্ত এন সি লাহিড়ী বিনম্রভাবে এ কাজে লিপ্ত ছিলেন। ১৯৭০ সালে সরকারী চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর এ কাজের ভার নিলেন প্রীতিলোক বন্দ্যোপাধ্যায়। পজিনালাল জালরোনামি সেটেরের এখন তিনি ডিরেক্টর। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৭৬ সালে ডঃ রাজা রামানুজ কমিটি তৈরি হয়। এই কমিটি স্থানিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিম্নলিখিত আলেন : এই শাখার

একটি পছন্দ পজিকা হিসেবে কাজ করা উচিত। সেই নিম্নলিখিত একন কাজে পরিণত হলো।

পজিকা এবং নৌ-পজিকা তৈরির ব্যাপারে সারা পৃথিবীতে কাজ করছে মোট লাখটি দেশ। ভারত, যুক্তরাজ্য (ইউকে), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত দেশ, জাপান, স্পেন এবং জাপান। জাপান ছাড়া সারা এশিয়ার ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে তার নিজস্ব ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে পজিকা তৈরির কাজ হচ্ছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক এবং নৌ-পজিকা। এই পজিকার উপর বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, ইরান ইরাক, সৌদি আরব, তাইল্যান্ড, বাম্বী, পাকিস্তান এবং আফ্রিকার কয়েকটি দেশ সহ এবং আরও কয়েকটি দেশের আবহাওয়া দপ্তর নির্ভর করে। এ ছাড়া আমাদের দেশের যে যে সংস্থা এই পজিকার সাহায্য নিয়ে থাকে তাদের মধ্যে আছে ভারতীয় সামরিক বিমান বাহর, ভারতীয় সুরার বিভাগ, ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক মানমন্দির, জনসাধারণের জন্যে যারা পজিকা তৈরি করেন তারা, জাতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট এয়ার লাইনস, এয়ার ইনডিয়া, কেম্পার এবং রাজ্য সরকার, পবটন দপ্তর, রেল, পোস্ট এবং টেলিগ্রাফের মাইক্রোওয়েভ বিভাগ প্রভৃতি।

এই প্রতিষ্ঠান ভারতের বিভিন্ন শহরের মানসি আকাশ-চিত্রও তৈরি করে থাকেন। এই আকাশ-চিত্র ওই শহরের আকাশে সূর্য, চন্দ্র, বিভিন্ন গ্রহ এবং উল্লেখযোগ্য নক্ষত্রাবলীর অবস্থান দেখানো হয়ে থাকে।



পজিনালাল অ্যাস্ট্রোনামি সেটের উদ্দেশ্যে করে গিয়ে ভারতের আবহাওয়া দপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ পি কে দাস বলেন, গত পঁচিশ বছর ধরে আমরা যে পজিকা প্রকাশ করেছি তার তথ্য বলার জন্যে প্রায় পুরোপুরিই আমাদের নির্ভর করেই হয়েছে ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের তথ্যের উপর আমাদের দেশে এখন কমপিউটারের সূচ্যোগ এসেছে এবার দেখতে হবে এ কতদূর আমরা যেন আত্মনির্ভর হতে পারি। কোন কারণে বিদেশী তথ্যবলীর অভাৱ ঘটলে আমাদের কাজ বাতে না যাবা পার, সে দেখা সরকার।

ডঃ দাস বলেন, 'গাণিতিক মডেল দাঁড় করিয়ে বহু ক্ষেত্রে আমরা স্থানিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয় সিদ্ধান্ত নিই। ওই সব সিদ্ধান্ত নিরীক্ষিত পজিকা নিরীক্ষার মাধ্যমে যাতে প্রমাণিত হয়, তার ব্যবস্থা আমাদের করা সরকার।' এর জন্যে যেসব আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং কমপিউটার সরকার ডঃ দাস সেট পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করবেন বলেও প্রতিজ্ঞা দেন।

'কিন্তু যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন', দাস বলেন, 'এ ধরনের উদ্দেশ্য অর্জন করতে গেলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের সমবেত সহযোগিতা সরকার। তাই একটি বড় রকম উত্তরণ ঘটা সম্ভব এই সহযোগিতা শুরুর আগেই কল্পে হলে চল না। এর জন্য সরকার প্রত্যক্ষভাবে মেলায়েশা এ মহামতি বিনিয়োগ। অ্যাস্ট্রোনামিক, ওয়ার্কশপ বিজ্ঞান গবেষণাসারের বিশেষজ্ঞদের মাঝে যা অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে এই কাজটি করা যেতে পারে।

উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলো সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানিক অধ্যাপক অজিতকুমার সাহা। অধ্যাপক সাহা বকে পজিকা এবং নৌ-পজিকা তৈরির ব্যাপারে বিদ্যে তথ্যবলীর উপর নির্ভর না করে আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে।

এই কেন্দ্র বিমানচালকদের জন্যে বিম্বা পজিকা তৈরির কাজেও সম্প্রতি হাত দিয়েছে বিমান চলার সময় প্রতি দশ মিনিট অন্তর যাত্রাপা আকাশে কখন কোথায় সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র অবস্থান করবে এই পজিকার তা দেখান হবে। সমরাজিৎ কর


প্রশান্তকুমার পাল

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন শিশু-বয়সে তাঁর  
স্বপ্নাংশোনার জন্য যে চাকর নিযুক্ত ছিল, তার নাম  
দেখ। 'জীবনস্মৃতি'তে তার একটি নিবন্ধ 'বর্ণনা' ও  
পাওয়া যায়—গোলাবর্ণ মোহোরী বালক যাহার লম্বা  
চুল, খলুনা গোলাবর্ণ তাহার বাড়ি [জৈলবেলার  
বর্ণনায় তার বাড়ি যশোর]। এই চাকরটিই রবীন্দ্র-  
নাথকে গণ্ডিকপদ্মে আকৃষ্ট করে রাখত। এমন কথা  
আমরা তাঁর কাহ্ন থেকেই জানি। কিন্তু হিসের  
জাতীয় এই-চাকরটির প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ১০  
দ্রাবণ ১৯৭৬ [২৭ জুন ১৮৮৯ খ্রঃ] তারিখে  
গণ্ডিকপদ্ম ও অরণেশ্বরবাবুর চাকর রূপে, সেই  
সময় পোয়েন্দ্র ও রবীন্দ্রবাবুর চাকর ঈশ্বর দাস।  
অবশ্য একথা হেনে কাহ্ন সঙ্গত হবে না যে চাকরের  
পরিচিতি সর্বদা এইরকম বিশেষ বিশেষ যাবুন  
সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকত। হিসাব-খাতার দেখা যায়  
কিভাবেই বর্ণনা হয়েছে এক বাবুর দাঁড়ই থেকে  
অন্য বাবুর ঘায়েই, কিন্তু শাস্ত্র দাসকে কখনোই  
রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে বড় দেখা যায় না,  
যেমন করেকটি ক্ষেত্রে তাঁর কপালের বেতন শ্রমের  
মারফৎ জমা হওয়া জাড়া। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তাকে  
'তোতী কত' বলে অভিহিত করতেন, কিন্তু শ্রম  
থেকে যায় আট বছরসের ভেলেকা সীতাহররের তর

[illegible]

‘প্রাণবান্ধবী’, ‘হৃদয়েবেলা’ প্রভৃতি স্মৃতি-  
কথামূলক রচনার পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির  
কাগজের ডায়েরি মৈনাব্দার কথ্য রবীন্দ্রাবর  
ব্যবহার ব্যুৎপত্তি লিখছেন। কিন্তু নিম্ন হিসাবের  
কার্যবাঁহের সাক্ষ্য ভিন্ন ধরনের। সেখানে দেখা যায়,  
১৪ শেখ ১২৭১ [ ৩ জানুয়ারি ১৮৫৬ ] রাবিবান্ধ-  
বাবুর ইজের ১৯টা বাক্সে অন্তর্ভুক্ত যেমন কেনা  
ইজের তেওঁনি ১৪ অগ্রহায়ণ [ ১৪ নভেম্বর ১৮৫৪ ]  
রাবিবান্ধাবাবুর ১২টি ইজের তৈয়ারি করতে তিন  
টাকা পরোয়া আনাও কর্তৃক করা হয়েছে। আবার ৮  
শেখ ১২৭২ [ ১৯ এপ্রিল ১৮৫৬ ] রাবিবান্ধাবা-  
বুর ১৯টা -বাতে দু' টাকা দশ আনা বায় হলেও  
১৮ টের ১২৭১ [ ৩০ মার্চ ১৮৫৬ ] রাবিবান্ধাবা-  
বাবুর ১৯টা পরিমাণ -বাতে খরচে পরিমাণ পঁচ  
টাকা লাড়ে পঁচ আনা। জামা এবং পাটের কাপড়ের  
গুণাগত মান ও সেগুলিতে পকেট ছিল কি না সে-  
সম্পর্কে আমাদের পক্ষে কিছু বলা সম্ভব না হলেও  
একই সংকেত ইজের ও পরিধানের মাধ্যমে পার্থক্য  
ঝাঁকিয়ে দেয় আটপোরে ও পেশাবী দ্বংসকর্ম  
জাহাজপোষে আরোজন তাঁর জন্য ছিল এবং যখন  
পরিমাপশেষ ছিল। সন্ধ্যাবেশী পাঠকে তারিখ-  
পুলিও লক্ষ্য করতে বলি; এত কম সময়ের  
ব্যবধানে এক বেশী সংখ্যক জামাপ্যান্টের আয়োজন  
কি! এতই ব্যবস্থাসীল ছিল যে এখনকার ছেলের  
চলক তাহার তালিকা ধরিলে সম্মানহানির আশঙ্কা  
আছে? তা হ্যাঁ ১৯ টের ১২৭২ [ ২ এপ্রিল  
১৮৫৬ ] কমিজ তৈয়ারির জন্য নয়নবন্ধ কাপড়  
কেনা হয়েছে; বাক্সে আনা পিত্ত রাবিবান্ধাবাবুর  
১ কোড়া বিনিমায় [ জুতো ] পরিতও করা হয়েছে  
১৪ আহায়ণ [ ১৮ নভেম্বর ১৮৫৪ ] তারিখে।  
পাটকের বিস্তারিত জন্মে কেবল ১২৭১ ও ১২৭২  
বাক্সদের বাড়ি থেকে উপরোক্ত হিসাবগুলি  
সংকলন করে দেওয়া হল। কিন্তু পরবর্তী সময়ের  
ব্যত্যাঙ্গুলি সাক্ষ্যও ভিন্নরূপ নহে। শ্রী আলফ্রেড  
লাগে—এবং সে কথা রাবিবান্ধাবাবুর বলেছেন—তাঁদের  
জন্ম শতবর্ষের কোনো আয়োজন নেই দেখে।

কীবাস্বতন্ত্র আর একটি বস্তুবোধও—  
বরষা মসের কোঁঠ। পায় হইবার পূর্বে কোনোদিন  
কোনো কারণই যোজা পুরি নাই। [অনেক সময়  
দেগোঁজিল পায়ের মোকো উঠত—ছেলেকোনা]  
—কিরোণিত। করে এই কামবৎহেলি। ২৪ পৌষ  
১২৭১ [৬ জানুয়ারি ১৮৬৫] তারিখের হিসাবে  
স্পষ্ট লেখা আছে—বোলা গিন্নি/বিক্রান্দাধর্মক/৮  
৩ ডজন, ৮ দাম পেগেছে লাড়ে তিন টকা। সেই যুগের  
বন্দ্যাসারের কথা। স্মরণে রাখিল অনুমানিক কথা হার  
সেগুজির গণপত মানও খুব ধরাপ ছিল না, যে-  
যুগে বড়োবাবু বিষ্ণুপুস্তকের জন্যও বড়ো ছোড়া  
হাতি কেনা হয় হার নটকায়। রবীন্দ্রনাথের বরষা  
এই সময়ের তিন বরষা লাড় হান। এই খেতে পর্যন্ত



যে বাচ্চারা পরে তাদের চেয়েও  
দুর্দান্ত কাপড়!

বাচ্চার ইউনিফর্ম তৈরীর সময়  
প্রত্যেক মায়েরই মনে পড়ে বিগ্নীর  
কথা! তা তো পড়বেই! এক শতাব্দীরও  
বেশী হয়ে গেল বিগ্নী তৈরী করে  
চলেছে— দুর্দান্ত মজবুত কাপড়— ড্রিল,  
কেসমেন্ট, লংক্লথ, সেলুলার শাটিং।  
প্রত্যেকটিই তাঁর বাচ্চার মতই দুর্দান্ত!  
মাঝে মাঝে তার চেয়েও দুর্দান্ত!

 **বিগ্নী**

ইউনিফর্ম তৈরীর কাপড়



বঃ সোণালিচন্দ্র বঙ্গোপাধ্যায়  
 গবর্নমেন্ট পাবনা  
 [ বঃ ] সত্যেন্দ্রনাথ বসু  
 সোমেশ্বর বাবু ও রামচন্দ্র বাবু  
 তিনাকান্দার ইন্সুলের  
 অধ্যক্ষ মহাশয়  
 ● বিল-৪১'

[ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত গোবিন্দচন্দ্র কলোপাধ্যায় ছিলেন গবর্নেন্ট পাঠশালা বা নর্মাল স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, যিনি রবীন্দ্রনাথকে 'উচ্চ অঙ্গের সুনীতি সম্বন্ধে' কবিতা লিখে আনতে অগ্রদূত করছিলেন। ]

—এই হিসাব থেকে অনুমান করা যায়, সেক্টম্বর বনসে গুজোর ছুটির পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষকাত্মনে কলিকাতা রৌঁচ একাডেমী-পর্ব সমাপ্ত হইবে। বাকী ছুটির শেষে হবার পর গবেষক সাহিত্যজালা বা কলিকাতা নমাল স্কুল-পর্ব আরম্ভ হইবে। ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু কালিকাতা আস বা নভেম্বর ১৯৬৫ থেকে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন চার বছর ৮ মাস মাত্র।

উপরে প্রসন্ন তথা থেকে দেখা যায়, রবীন্দ্র-  
নাথের প্রথম শিক্ষাক্ষেত্র হিসেবে গৌরীয়েটাল  
সেমিনারী'র এতদিন পর্যন্ত যে গৌরব লাভ করে  
সেইদিকে এখন থেকে সে গৌরবের অধিকারী হবে  
'কলিকাতা স্ট্রোং একাডেমি', যার তৎকালীন ঠিকানা  
ছিল ১৩নং কন'ওয়ালিশ স্ট্রীট এবং বর্তমানে  
স্কুলটি ১৩নং ডাঃ নরায়ণ রায় সরণি। [সিমলা  
স্ট্রীট] ঠিকানায় জার্মানী বাজারে ঠিক পনেরো  
অক্টোবর। স্কুল পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে এই  
টুকু অনুমান করতে পারি যে, ছেটে ছেটে  
শিশুদের পক্ষে জোড়াসাঁকো থেকে কন'ওয়ালিশ  
স্ট্রীটে দ্রুত সম্ভবত খুবই বেশি মনে কর  
হয়েছিল, যেখানে নর্মাল স্কুল ছিল প্রায় বাড়ি  
পাশেই, বাঁও বাড়ারাতের জন্য 'ইকুল গাড়ী'  
বন্ধোবর্ত ছিল, যার '৪০ ইম্পারিং মোমেন্ট'  
জন্য তিন টাকার খরচ করা হয়েছে ৪ পোষ ১২৭৬  
[১ জানুয়ারি ১৮৮১] তারিখ।

প্রসঙ্গত, কলিকাতা ট্রোনিং একাডেমির ইতিহাস একটু অনুসন্ধান করা যেতে পারে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ২২রা জুন ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, মাধবচন্দ্র ঘাড়া [ধর?] পতিতপাবন সেন, গণেশচন্দ্র সেন, যাদবচন্দ্র পালিত এবং বৈষ্ণবচন্দ্র গুপ্ত একত্রে অত্রা প্রসিদ্ধ ধনী শ্যামাচরণ মল্লিকের সহযোগতায় 'ক্যালকাটা ট্রোনিং স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয়রূপে প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান বিদ্যালয়ের কলেজের পশ্চিম তখন বিখ্যাত ধনী শঙ্কর ঘোষের একটি বড় বাড়ি যথায় চক্রবর্তী বাড়ি ছিল। বার্ডিউটর তৎকালীন 'স্কুল' পরে নাম পরিবর্তন করে, 'ক্যালকাটা ট্রোনিং স্কুল' নাম হার। কবি হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এই স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস থেকে স্কুলটিতে শিশু বিভাগ খোলা হয়, বেতন ধার্য হয় মাসিক এক টাকা। এই বছরের মধ্যে ডিসেম্বর মাসে বিদ্যালয়সংক্রান্ত সভাপতি, ঠাকুরদাস চক্রবর্তীকে সম্পাদক, মাধবচন্দ্র ঘাড়া কে কোষাধ্যক্ষ এবং পূর্বতন সভাপতির সঙ্গে রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি কয়েকজন নতুন সভ্য নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। কিছুদিন পরে একটি অপ্রতীকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে কমিটির সদস্যদের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হলে ঠাকুরদাস চক্রবর্তী পদত্যাগ করে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা ট্রোনিং একাডেমি' নামে একটি প্রতিভাবন্তী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অল্পদিন পরে মাধবচন্দ্র ঘাড়াও তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। ট্রোনিং স্কুল নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'য়েস্টেরিয়ান স্কুল' নাম গ্রহণ করে। [তৎকালীন বিদ্যালয়ের কলেজ শতবর্ষ

স্বাধীনতা গ্ৰন্থ-এর অন্তর্ভুক্ত শ্রীলঙ্কেশ্বর প্রদান নিয়োগী  
লিখিত মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশনের ইতিহাস/  
আদিপর্ব প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত।]

ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমীর প্রতিষ্ঠার তিন  
বছর পরে রবীন্দ্রনাথ এই বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণীতে  
ভর্তি হন। কয়েক মাসের মধ্যেই এই স্কুলে তাঁর  
ছাত্রজীবনের পরিসরমণ্ডি ঘটেলেও, অন্যভাবে ঠাকুর  
পরিবারের সঙ্গে স্কুলটির যোগাযোগ অক্ষর ছিল।  
জ্যোত্স্নাকো ঠাকুরবাড়ির আনন্দকল্যাণ ও নবগোপাল  
মিত্রের প্রবর্তনায় প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মেলা বা জাতীয়  
মেলায় সঙ্গী সফলভাবে জাতীয় সভা বা নাগরিক  
সোসাইটির বহু অধিবেশন এই ক্যালকাটা ট্রেনিং  
একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখানে  
বিকল্পেস্ত্রন, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি অনেক ভাষণ  
প্রদান করেছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই  
অনুষ্ঠানগুলির প্রত্যেক কোনো যোগ ছিল না।

নর্মাল স্কুল বা গবর্নমেন্ট পাঠশালা-পর্বই  
রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনের দীর্ঘতম পর্ব। এখানে  
তিনি কার্তিক ১২৭২ [নভেম্বর ১৮৫৫] থেকে  
মাঘ ১২৭৮ [ফেব্রুয়ারি ১৮৭১] পর্যন্ত পড়েছিলেন  
অর্থাৎ দশবছরেরও বেশি। চার বছর ছাত্র্যে বয়স  
কেবল দুই বছর নমাস বয়স পর্যন্ত। নর্মাল স্কুল  
প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্সপেক্টর বিদ্যালয়গরের তত্ত্বাবধানে ১৭  
জুলাই ১৮৫৫ তারিখে। এর উদ্দেশ্য ছিল বাংলা  
স্কুলের জন্য শিক্ষক-শিক্ষণের আয়োজন করা।  
প্রথমে সংস্কৃত কলেজের একাংশই স্কুলটি বসত।  
পরে এটি উঠে আসে জ্যোত্স্নাকোতে চিংপুর রোডের  
উপর শ্যামলাল মল্লিকের বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ  
স্কুলটির একটি বর্ণনা দিয়েছেন 'জ্যোত্স্নাকো'র মাঝে  
গ্রন্থে- 'নর্মাল স্কুলের বাড়িটিও ছিল ক্ষুদ্র  
বহুময়। প্রকাণ্ড রাজবাড়ি; তাতে কত অলিগলি,  
অসিঁদাসিঁদ, এখানে ঘর, ওখানে খিলে দেওয়া  
বাগান। মোটা মোটা খাম; তারই গায়ে দিনের  
আলো পড়ে চকচক করত।'

নর্মাল স্কুলেও রবীন্দ্রনাথ শিশুশ্রেণীতেই  
ভর্তি হয়েছিলেন মাসিক বেতন ছিল বারো আনা।  
১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে বেতন বেড়ে  
হয় মাসিক এক টাকা। স্কুলের পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে  
স্পষ্ট ধারণা কাশীবাঁহ থেকে করা সম্ভব হয় না,  
বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কেবল 'পুস্তক খরিদ' দিরো-  
নামায় খরচ দেখানো হয়েছে। তবে ২০ শ্রাবণ  
১২৭৬ [৬ আগস্ট ১৮৫৯] মেসোমেন্ট ও রবীন্দ্র-  
বাবুর ফস্ট বুক অফ রিডিং [প্যারীচক্ৰ সরকার-  
প্রণীত] রূপ ও বাঁধাই করা হয় আট আনা দু'পয়সা  
খরচে, ৩ পৌষ [১৭ ডিসেম্বর ১৮৫৯] 'পঞ্চা-  
বীয়া [অক্ষরময়্যার প্রণীত] ৩ খান ও ওরানস  
এরিথমেটিক একসেট' এবং ১১ মাঘ [৩১ জানুয়ারি  
১৮৭০] 'বালকদিগের গ্রামার তিনখানা ও নিউবোথ  
[নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক গোপালচন্দ্র  
কন্দোপাধ্যায়-প্রণীত] তিনখানা' কেনা হয়- পাঠ্য-  
পুস্তক সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ এর বেশি পাওয়া যায়  
না।

গৃহশিক্ষক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'নর্মাল  
স্কুলের একটি শিক্ষক শ্রীযুক্ত নীলকমল ঘোষাল  
মহাশয়'-এর উল্লেখ কাশীবাঁহতে প্রথম পাওয়া  
যায় ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৭০ [২১ নভেম্বর ১৮৫৬]  
তারিখে- 'বালকদিগের বাল্যকাল (বালকদিগের  
পড়িত)।' ক কার্তিক মাহার বেতন শোধ/বিঃ  
এক ডাউটার ১০ টাকা। এর থেকে বোঝা  
যায়, ১২৭০ বঙ্গাব্দে কার্তিক মাস থেকে  
তিনি পড়াতে শুরু করেন এবং মাঘ ১২৭৮-এ তখন  
আকস্মিকভাবে রবীন্দ্রনাথের কালোশ্রমী জীবনে  
তখন নর্মাল স্কুল পর্বের সমাপ্তি ঘটে, তখন পর্যন্ত  
তিনি এই কর্মে নিমগ্ন ছিলেন। এমনকি তার পরও  
বঙ্গদেশের ও অরুণোদ্যানে গৃহশিক্ষক হিসেবে  
তিনি কাজ করেছেন। শ্রাবণ ১২৭৫ থেকে তাঁর বেতন  
দুই পেয়ে দাঁড়ায় মাসিক বারো টাকা।

নিম্নরূপ হন ২০ ফাল্গুন ১২৭৬ [৬ মার্চ ১৮৬৯]  
তারিখে: ১২ শ্রাবণ ১২৭৬ তারিখেও হিসাবে দেখা  
যায়- 'ক অধোরন্য চট্টোপাধ্যায়/ই- ২০ ফাল্গুন না  
৩০ চৈত্র/১৮৮০ রোডের ১০ টাকা হিঃ বারো টাকা  
মাসে কল আন বেতন পেয়েছেন। মাসিক কল টাকা  
কেতন মাঘ ১২৭৭ থেকে বেড়ে হয় পনেরো টাকা।  
বৌদ্ধনাথ জীবনস্মৃতি, ছেলেকেলা ও 'জ্ঞানসম্মত  
কথা' গ্রন্থে এই শিক্ষকটিকে অমর করে রাখলেও  
আর-একজন শিক্ষক তার স্মৃতিতে উপস্থিত থেকে  
পড়ছেন। কাশীবাঁহতে ২২ আশ্বিন ১২৭৫ [৭  
অক্টোবর ১৮৬৮] তারিখে হিসাবে দেখা যায়- 'পা  
মাল্যদাস দত্ত/জলকদিগের খরচ ইয়োজি পড়াইবার  
মাস্টার/দ-৩ উহার প্রাণব জাদ দুই মাহার/বেতন শোধ  
৬ টাকা হিঃ-বিঃ এক বিলি গঃ খোদ/রোজ ১২  
টাকা' অর্থাৎ এই রাখাল দত্তের কাছেই প্রায় ১২৭৫  
থেকে রবীন্দ্রনাথের ইয়োজি শিক্ষার সূচনা হয়েছিল।  
এর কার্যকাল অথবা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি; ১২ শ্রাবণ  
১২৮৬-এর হিসাবে দেখে- 'রাখালদাস দত্ত/ক-  
পৌষ মাঘ ও ফাল্গুন মাহার দুই রোজ ২/২ রোজ  
মাসিক ৬ টাকা হিসাবে বারো টাকা হ আনা তিন  
পাই বেতন শোধ করা হয়েছে অর্থাৎ ২ ফাল্গুন  
১২৭৫ তারিখে যে কোনো কাশীবাঁহে হোক তিনি কল-  
চ্যুত হন এবং এর ঠিক একশ দিন পরে এই কাজের  
দায়িত্ব নেন উক্ত অধোরন্য।

অধোরন্যবৎ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,  
'এই মেডিকেল কলেজের ছাত্রমহাশয়ের স্বেচ্ছা এমন  
অন্যায়রূপে ভালো ছিল যে, তাঁহার তিন ছাত্রের একাংশ  
মনের কামনা সত্ত্বেও একদিনও তাঁহাকে কামাই করিত  
হয় নাই। কেবল একবার ফল মেডিকেল কলেজের  
ফিরাংশ ছাত্রদের সঙ্গে বাঙালি ছাত্রদের লড়াই  
হইয়াছিল, সেই সময় শত্রু দল চৌকি ছুঁড়িয়া  
তাহার মাথা ভাঙিয়া ছিল। ঘটনাটি শোচনীয় কিন্তু  
সে-সময়টাকে মাস্টার মহাশয়ের ভাঙা কপালকে  
আমাদেরই কপালের দোষ বলিয়া গণ্য করিত পারি  
নাই, এবং তাহার আরোগ্যলাভকে অনাবশ্যক দ্রুত  
বলিয়া বোধ হইয়াছিল।' ঘটনাটি ঘটেছিল ৭ শ্রাবণ  
১২৮০ সাহাবার [২১ জুলাই ১৮৭৩] তারিখে,  
১৮০ সোমপ্রকাশ, ১৫ খণ্ড ৩৭ সংখ্যা, ১৪ শ্রাবণ;  
বেঙ্গালী ১২ খণ্ড ৩০ সংখ্যা, ২৬ জুলাই। রবীন্দ্রনাথ  
তখন বেঙ্গাল একাডেমির ছাত্র। কিন্তু কাশীবাঁহ  
আমাদের জ্ঞানিয়ে দেয়, তথ্য আলও একবার পানয়ে  
নি অধোরন্যের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়াছিলেন  
১২৭৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে, কারণ ৩ আষাঢ় ১২৭৭  
[১৬ জুন ১৮৭০] তারিখের হিসাবে দেখা যায়-  
'অধোর চট্টোপাধ্যায়/মাস্টার ১৫ দিন কামাই/বাসে/  
১৫ দিনের বেতন শোধ-৫ টাকা; অথবা কি কারণে  
ছাত্রদের 'একান্ত মনের কামনা' সফল হয়েছিল  
সে-বিষয়ে কাশীবাঁহ সম্পূর্ণ নীরব।

কাশীবাঁহ থেকে আরও কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে  
অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ধারণা করা যেতে পারে। 'নান্য বিদ্যার  
আয়োজন' অধ্যায় রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন,  
স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলেই ড্রয়িং এবং জিমনা-  
স্টিকের মাস্টার আমাদিগকে লইয়া পড়িতেন।' ৯  
আশ্বিন ১২৭৬ [২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৬৯] তারিখের  
হিসাবে দেখা যায়- '৪ ছেলোবাংদিগের জিমনাস্টিক  
শিক্ষার কস্ট তৈলমারি বার' ঘটনো হইয়াছে তিন টাকা  
দু'আনা দু'পয়সা। ১২ অগ্রহায়ণ [২৬ নভেম্বর]-এর  
হিসাব-দ-বালকদিগের জিমনাস্টিক শিক্ষার জন্য  
মাস্টারের বেতন আশ্বিন কার্তিক দুই মাসের দোষ  
দিবার জন্য দেওয়া হইল-১২ টাকা। শিক্ষকের নাম  
এখানে না পেলেও বোঝা যায় ১২৭৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন  
মাস থেকে তাঁদের জিমনাস্টিক শিক্ষা বা 'ফ্রিষ্টার ডাডার  
উপর খণ্ডাধনকে ধরে শরীরটিকে উলটপালট' [ছেলে-  
বেলা] করা শুরু। শাশুরের ঘরে অন্তত অগ্রহায়ণ  
মাস থেকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন, সে-কথা আমরা  
জানতে পারি ১১ ভাদ্র ১২৭৭ [৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭০]  
তারিখের হিসাবে থেকে- 'কায়মচরণ ঘোষ/ব-বালক-  
দিগের জিমনাস্টিক/শিক্ষার জন্য উহার বেতন-ই-

মাহার শোষ-৫৪ টাকা। [তিনি সেই সময়ে একজন  
নামকরা ব্যায়ামশীল হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। বঙ্গোপ-  
সেন্স বাগল ছিল, মেলায় ইতিবৃত্ত গ্রন্থ লিখেছেন,  
মেলায় আরম্ভ করিয়া শাশুরের ঘরে নামক এক বাঁহ  
কুস্তি-করার আদির জন্য প্রতি বারই পদক পেরেকার  
পান। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে মেলার তথ্যলব্ধি ছোটলাট সর্  
উদারময়্যার শরীর-চর্চার উৎসর্ঘের জন্য মেলায় পদক  
হইতে তাঁহাকে একটি পদক প্রদান করিয়াছিলেন।]  
কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কথিত উক্ত গ্রন্থে শিক্ষকের কোনো  
সম্ভান আমরা কাশীবাঁহতে পাই নি, যদিও তাঁর মে-  
দাদা বীরেন্দ্রনাথকে ড্রয়িং শিক্ষা সেবার জন্য পেনসিয়ল  
ও কগজ রূপ এবং জনৈক ডবানীচরণ সেনকে শিক্ষক  
নিয়োগ করার সংবাদ আমরা এ থেকে লাভ করি।

১৬ পৌষ ১২৭৮ [৩০ ডিসেম্বর ১৮৭১]  
তারিখের একটি হিসাবে দেখা যায়, 'ছেলোবাংদিগের  
ড্রয়িং শিক্ষার জন্য/হাড খরিদ' করতে খরচ হয়েছে  
৪টাকা দু'আনা। এসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন  
'ক্যামেল মেডিকেল স্কুলের একটি ছাত্রের কাছে কোনে  
এক সময়ে আশ্বিনবিদ্যা শিক্ষিতে আরম্ভ করিলাম। তা-  
দিয়া জ্যোত্স্নাকো একটি নরককাল কিনিয়া আনিয়া আমাদে  
ইস্কুলখালে লটকাইয়া দেওয়া হইল।' এই আশ্বিনে  
'ক'কাল' গল্পে সাহিত্যরস লাভ করেছে। কিন্তু  
কলটিতে একটু, দুটি আছে। ক্যামেল মেডিকেল  
স্কুল স্থাপিত হয় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে  
অথচ উৎসবের সংবাদ থেকে জানতে পারি আশ্বিন  
শিকা ১৮৭১-৭২ খৃষ্টাব্দের ব্যাপার। সুতরাং একে  
'ছেলেবেলা'র কলনা-মেডিকেল কলেজের এক ছা-  
কস আছেন মানসের হাড় চেনাবার কিদা দেখাবা  
জেনা-অধিকতর নির্ভরযোগ্য। কিন্তু এই ছাত্রটি  
কাশীবাঁহতে সমাজ করা যায় নি।

উপরোক্ত সমস্ত বিবরণই রবীন্দ্রনাথের নর্মাল  
স্কুল-পর্বের অন্তর্ভুক্ত। এই পর্ব কি কারণে আকস্মিক  
ভাবে সমাপ্ত হয়েছিল জীবনস্মৃতিতে প্রদত্ত ত  
কৌতকাবহ বর্ণনা আমাদের পরিচিত। কাশীবাঁহর তা-  
বিশ্লেষণ করে আমাদের ধারণা, ঘটনাটি ঘটেছে  
১২৭৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি [১৮৭  
খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারির শেষে]। ২৭ মাঘ (৮ ফেব্রু-  
য়ারি) তারিখের হিসাবে দেখা যায়- 'ছেলোবাংদিগের  
বিদ্যালয়ের ফেব্রুয়ারি মাহার/ফি শোধ'-রবীন্দ্রনাথ  
সোমেন্দ্রনাথ সভাপ্রসাদ ও ম্পিগেন্দ্রনাথের এক টা-  
কা-র ও অরুণোদ্যানের বারো আনা নিয়ে মোট ৮  
টাকা বারো আনা খরচ করা হয়েছে, কিন্তু ৩০ ফাল্গু-  
ন ১২৭৮ মার্চ, শুধু, 'পঞ্চপদ অরুণোদ্যাবদিগের  
বিদ্যালয়ের মার্চ মাহার/ফি শোধ' বাবদে খরচ এক টা-  
কা বারো আনা-রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ তিনজনকে বো-  
উল্লেখ নেই। এই বছর ফাল্গুন মাসের প্রথম দি-  
মর্ষি হিমালয়-ড্রাম শেষে কলকাতায় ফিরে আসে  
আর এটি কিছুদিন আগে ঠাকুরবাড়িই আশি  
সাহায্য কিশোরীচাঁদ মিত্র-জি'র শ্রম কলকাতায় ঠাকুর  
ইয়োজি জীবনী প্রকাশিত হয়। তার পরেই ২ বৈশা-  
খ ১২৭৯ [শনিবার ১০ এপ্রিল ১৮৭২] তারিখে কা-  
বাহার হিসাব-পরিচালক হিসাবে-১৫/৭০ Be-  
gal Academy দ-সোম রবী ও সভাপ্রসাদ/বারো  
মার্চ মাহার/ফি শোধ/বিঃ ০ বিল-৫ হিঃ/পত্র ইন্ড-  
বাস-১৫' রবীন্দ্রনাথের স্কুল-জীবনের নতুন  
শুরু হয়। যদিও মার্চ মাসের বেতন দেওয়া হয়ে  
তবে মনে হয় এপ্রিল মাস থেকেই তারা বেশ  
একটোমতো বেতে আরম্ভ করেছিলেন। লক্ষণ  
তাঁদের কোনো ভীতি ছিল না, ইয়োজি  
রূপ কোনো নিয়ম ছিল না। কিন্তু একই তারি-  
খের একটি হিসাবে দেখা যায়- '৬ ডিকম্বর সা  
Bengal Academy দ-উহার জন্মতিথি উপল-  
ছেলোবাং মহাশয়ের [জ্যোতির্বিজ্ঞান] অনুমতি  
সবসম্পন্ন দেওয়া যায়/পত্র ইন্ড-বাস-৬'। ভ-  
নি-উত্তর দা পরিষদ নিতে নতুন-রবীন্দ্র  
স্কুলের অধিক সম্পর্কে জীবনস্মৃতিতে যে ব-  
দিয়েছেন এই হিসাবটি উল্লেখ করেই সত্যিভাবে

## সাহিত্য

### ‘বসন্তক’ : উনিবিংশ শতাব্দীর বাংলাপত্রিকা

তখন বরন কম, সবেমাত্র স্কুল ছেড়ে কলেজে ভর্তি হরোই, অপরিণত, ভাগ্যবশে সামান্য একটা চাকরি পেয়ে গিরোইলাম বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে। যে টোঁকল আমাকে বসতে দেওয়া হয়েছিল ঠিক তার পাশেই স্তম্ভীকৃত ছিল উনিশ শতকের বহু বিখ্যাত সাময়িকপত্র। যেমন, ভারতী, বঙ্গবর্মান, বিবিধার্থ সংগ্রহ, সমাচার দর্শন ইত্যাদি। হঠাৎ করেই অত পত্রিকা পেয়ে বাঁশ খনে ভোর কানার মতন অবস্থা। মুড়মুড় পাতা, খুব সাবধানে ওলটতে হয়। এই স্তম্ভ খেঁকেই খুঁজে পেয়েছিলাম ‘বসন্তক’-কে। বসন্তক বাংলা ভাষার বাংলা পত্রিকা। ইংরেজী ‘পাণ্ডা’ পত্রিকার মতন। পাণ্ডা ছোড়া সব কাঠ-ন-রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা কিছুরই বাণ ধার্মিক বিশ্ববিস্তার।

বসন্তকের সঙ্গে খনিষ্ঠ পরিচয় ঘটল বাংলা মুদ্রণের দশ বছরের সময়। অবশ্য ইতিমধ্যেই জেনে নিরুইছি বসন্তকের অনেক ইতিহাস। ‘বসন্তক’ পত্রিকা মানে সোঁদনের কলকাতার সমাজ চিত্র : পাল্লিক ফিটন, মেম-সার্জনের হাত ধরাধরি চলন, ভাগ্যপাশ, যশ-পানরত বাবু ইত্যাদি। পত্রিকার মলাটের কথাই ধরা থাকে—তিলক কাটা মাথার পাগাড়ি বঁধা টিকিওরালো পেটেমোটা বামন বসে আছে খালি গায়ে, একহাতে মোটা পৈতলের গোলা ধরে, অন্য হাতে পট্টা, মুখে বাকী হাসি। বামনের বাঁ-দিকে কাক ডাকছে কা-কা। বামনের অনেক পিছনে যেন আকাশের গায়ে ছাড়া ছাড়া ভাবে লেখা রয়েছে ‘বসন্তক’। এটা শূন্যের জলটে। শেষ মলাটেও ওই একই বামন ঠিক যেন মাচের ভাঁপামার দাঁড়িয়ে আছে। সামনে সবশেষ তরুণী অভিমানে মুখ ফিঁড়িয়ে বসে। তলার লেখা ‘শ্রীমতী হরোই’ হয়ে থাকে কম লো প্রিয়।’ মলাটের পরিচয় থেকে বৃদ্ধিতে অসুবিধা হয় না বসন্তক কি চরিত্রের পত্রিকা। চরিত্র সম্পর্কে আরও পরিচয় হওয়া যায় প্রতি সংখ্যার আরম্ভ-পত্রের শিরোভুক্তির সঙ্গত সন্দেহকর্তি দেখে—নবপরিণত রোগিণী স্বামী, হাস্যাতিক বহু, মদ বিলাসিতা-চর, চন্দ্রানন্দ মৌর্য। গণিতের ফণি বন্ধু মৃত্ত বংশ দিব্যেশ প্রমত্ত দীন হীন, কালকূটকভংগ।

‘বসন্তক’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮০ সালের বসন্ত পঞ্চমীর পর। চলছিল দু বছর। প্রকাশের তারিখ, সম্পাদকের নাম ও সূচীপত্র কিছুই ছিল না। তবে বসন্তক নিজেই বলেছে, ‘প্রতি ইংরাজি মাসের শেষে প্রকাশিত হইবে।’

বিবিধার্থ সংগ্রহকে আমরা পেরেছি পরিচয় জাপা প্রথম সচিত্র পত্রিকা হিসেবে। বঙ্গবর্মান সাময়িক পত্রের ইতিহাসে রুচিশীল সাহিত্য পত্রিকা। জ্ঞানানুভূত, সাধারণী ও মধ্যস্থ তখন বিভক্তের বিশ্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে বিলাতী ‘পাণ্ডা’ পত্রিকার অনুকরণে সবেমাত্র জন্ম নিয়েছে ‘হরোইলা ভাড়’। ১৮৮০ সালে ডেক্সা স্কেচ বুক ভারত-খবর প্রথম প্রকাশিত বাংলা-পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করলো জন ওয়ালারেন সন্ডার্স-এর পরিচালনায়। পর পর বাংলায় প্রকাশিত হতে শুরু হল, রহস্য সন্ডার্স (১৮৮৬), বিন্দুখক (১৮৯০), রসতরঙ্গ (১৮৯৮) হরোইলা ভাড় (১৮৯৪) প্রভৃতি রূপ-বাংলায় পত্রিকা। উল্লিখিত পত্রিকাগুলির মধ্যে কেবল মাত্র হরোইলা ভাড় বাস্তবায়িত সহ প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক হরোইলা ভাড়ের ঠিক পরেই রূপকরে আবিস্কার হল বসন্তকের। রেখা ও লেখার ঠিক যেন চক্রেবোলা ভাড়ের কার্যকর কপি। এদের মধ্যে কেবল মাত্র বসন্তকই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা সচিত্র বাঙ্গালিক মাসিক পত্রিকা।

সমসাময়িক কালের দর্শন বসন্তক। বিশেষ করে জ্ঞানকাজে মিউজিনিপালিটির কার্যকলাপ



#### প্রাণনাথ দত্ত

সম্পর্কে নানাবিধ সংবাদ বাগ্যাকারে যেভাবে পরিবেশিত হত এমন অল্প অন্ত হলনি, হবে না। ইংরাজ অপশাসনে জরাজীর্ণ সমাজ ব্যবস্থা এবং তখনকার অসামাজিক কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনাও করেই বসন্তক। ইংরেজের বামাধরা বিশিষ্ট বাঙালী সমাজকে বসন্তক তার বাগ্যচিত্র ও লেখার কলাঘাত অভিযন্ত করে তুলেছিল। যে প্রজন্ম শক্তি বসন্তককে পরিচালিত করত তিনি হলেন প্রাণনাথ দত্ত। ছাট-খোলায় মন্তব্যের সন্তান। রাজেশ্বরলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকার তার সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত। ১৮৭২ সালে প্রাণনাথ ‘হরোইলা সন্ডার্স’ পত্রিকার সম্পাদক হন। বেশ দিন বাঁচির রাখতে পারেননি তিনি পত্রিকাটিকে। সেই যেমনার ফসল তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত সচিব, বন্দারাল থেকে প্রকাশিত বসন্তক। অবশ্য পত্রিকাটি প্রকাশের পূর্বে তিনি হাটিকোটের অনুবাদকের পদে নিযুক্তি হন। ইংরেজের দালাল করাকে সম্মান-হানিকর মনে করে ওই পদ প্রত্যাখ্যান করেন। দু বছর প্রকাশিত বসন্তক প্রাণনাথ নিজের নাম কোথাও ব্যবহার করেননি। তাঁর জমাদার হরি সিং-এর নামেই বসন্তকের কাজকর্ম চলত। প্রতি সংখ্যার জন্য মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল আট আনা।

আমরা যে পেটেমোটা বামন ও সূর্যবলা ভবনার কথা বলছি এঁরা হলেন বসন্তক ঠাকুর ও তাঁর ভৃত্যের পক্ষেই নদী বাসিন্দা। বসন্তক ঠাকুর তাঁর ভৃত্য করে বসন্তক সম্পর্কে পরামর্শ চেয়ে এক ছাত্রগার বলেছেন, ‘প্রিয়। ভাল কথাটা মনে করে দেখো। সহজেই আমাকে বিলাতী পত্রিকার অনুকরণ করা যায়, তাতে আমার বিলাতী চাল চলবে অনুকরণপ্রিয় বাঙালীদের কাছে কোঁপের তুলি এই ভয়েই তক্তা করে দেখছি যদি দেশীয় ভারপ্রস্ত-বাঙালীও খালি মুখে হাসাতেও একবার হাসি বার করতে পারি। তা, প্রিয়। তুমি দু-চারটা পরামর্শ দেও।’ কল্যাণিতা স্মিত হেসে পরামর্শ দিলেন—‘হো হো করে উদ্ভাসী না করে দেশের রাষ্ট্র নীতির নকল দেখানো, কোন বিশেষ কথার অপরাধ দেখিয়েই চাক্ষুষ করে না, লোকের গুণ কথায় কণপাত করা না, সেটা উল্লোকেদের কার্য নয়, যে সকল বিষয়ে সাধারণের সম্বন্ধ আছে, তাহাই তোমার আলোচ্য হবে যদি সাধারণ বিষয়ের আলোচনার কোন বিশেষ লোকের নিন্দা বা কটু উক্তি করিও না, তাহা হইলে সকলেই রুষ্ট হইবেন ও ধনা করিবেন।’

বসন্তক বাসিন্দাকার কথার তর্পণাত না করে প্রথম সংখ্যার ‘৬০০,০০০ মিউজিনিপাল ডোজবাসি’ কাঠুনে কুপাস পাঠকে কালোরেঙে এঁকেছিলেন। সাধারণী পত্রিকার কোভের সঙ্গে এর প্রতিবাদ করে লেখা হয়—‘মিউজিনিপাল বামার বাজীতে বাজীকরের দাম পাঁচেক কুপার জাষ্টিশকে ও-রূপে স্থাপিত আকারে স্থাপিত করা ভাল হয় নাই।’

বসন্তকের প্রধান চিত্রাঙ্গণী ছিলেন প্রাণনাথ নিজের। এছাড়া গিরীশচন্দ্রের দত্ত ও গোপালচন্দ্র দত্ত মতের মতের ছবি আঁকতেন। কাঠুনেগুলি ছিল অত্যন্ত লেখাঘাত এবং শিল্পগুরুদেবদেবতার দ্বারা ভ্রম পত্রিক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সহজেই। অনেক পত্রিকের পত্রের উত্তরে বসন্তকে প্রকাশিত ছবির মাথা বড় কেন সে সম্পর্কে লেখা হয়—‘...পত্র-প্রেরক মাথা বড় দেখে চট্টেবন না এর একটু, কারণ আছে। যেমন গ্রীষ্মকুমার সময় সাধারণ লোকে বলে থাকে ‘শ্রী বাঙালী না থাকতো এদেশে তবে তিল গজা গুড় শ্রুটি কড়াই কোথায় যেতে পেত?’ সেই রকম আমরাও বলি ‘যদি হেঁড়ে মাথা ছেড়ে দিলে ছবি লিখতে যাই তবে বশুরে কৈ মাছের মত চিনতে কিসে ভাই।’ কলাঘাতের মত উদ্ভৃতি ছিল বসন্তকের রচনারীতি। প্রমাণো এবং নিন্দা দুই জটিল বসন্তকের কপালে। যেমন মহাদেব বিরূপ হয়ে লিখেছিলেন—বসন্তক রাজ্য সন্তান হইয়া ইতরের মনোরঞ্জে প্রবৃত্ত হইলেন দেখিরা আরোপ হয়। বিশেষ আমরা বসন্তকের রূপলাকাক্ষী, বসন্তক এ রূপে ইতরের উপাসনা না



হাইকোর্টে নতুন আদালত

করিয়া বালস্ভিত্তা স্থলপাদের সেবা করুন, জীবিকা-নির্বাহ না হয় মহতের উপাসনা করুন, তাহাতে না হয় উৎকর্ষে প্রাণভাগ করুন।' বসন্তভক্ত সহ্য করা যায়। তার উৎকর্ষ লেখনি থেকে কেউ বেহাই পারনি। ব্যবস্থা সহকারে পটিকাটি দেখলে বোঝা যায় তখনকার সমাজব্যবস্থার কোনো চিহ্নটি বসন্তভক্ত চোখে এড়াননি। তার তাঁকা দৃষ্টির নমুনা নিম্নলিখিত উৎকর্ষ থেকে জানা যায়।

১। বঙ্গীর কবিরাজের আসন হাইকেল মধুসূদন দত্তের মরণে শূন্য হওয়ার্তে আধুনিক বিধাতা বঙ্গদর্শন তাহাতে যেমনসুখে অভিব্যক্ত করেছেন।

২। রায় দীনবন্ধু মিত্রের পরলোকগমনে দুই-চারজন ধামাধরা বিষামোদী তার নাটকগুলিকে পোড়াবার লয়েকে বোলে বেড়াচ্ছেন ও বঙ্গ-রশ্মি হস্তিপথাননের নাটকাদিনেরে রায়গে হয়েচে।

৩। নতুন ফৌজদারী আইন শুল্ক ম্যাজিস্ট্রেট-গণ চতুর্ভুজ হয়ে 'হা মা কা' (হাতে রাখা কাটা) হুকুম জারী করেছে।

৪। অনাবৃষ্টি বলত অঙ্কুশ হওয়ার্তে গরীব প্রজাদের পক্ষে ১৮৮০ সাল চৌকর শাল কাঠের কার্য করিয়াছে ও কতকগুলি কনস্ট্রাক্টরের পক্ষে কাম্বারী শালের ঘোড়া হয়েছে।

৫। ইংরেজ ও আর্মান্টগণের সহিত সংগ্রামে কাটা ও বসন্তভক্তের মধ্যে কাহার শক্তি অধিক তাহা অপ্রমাণিত হয়েছে।

৬। অশ্লীলতা নিবারণী সভার সংস্থাপন হয়ে অপর গণ্ডিত শগোল চড়াই পাখী প্রভৃতি বোমাবী ভরণ নিবৃত্ত হয়েছে।

৭। বখা বখ সকলের পুত্রোপাদনার্থ হিন্দু ধর্মাস্ত্রের নানা ভোগে প্রতিপালিত পবিত্র স্মৃতিব্যবস্থার রাজা মাধবচন্দ্র গিরি নামক তারকেশ্বরের মোহনভক্ত বিনাপরম্পদে পুরাতন বদমাঈস বোলে তিন কলসের জনা কারারুদ্ধ ও ছানিটানার হুকুম হইয়াছে ও তাঁর বাবা তারকেশ্বর রাজা মুখ ইংরেজ দেখে ভয়ে চুপ করে আছেন। ইত্যাদি।

সামাজিক, রাজনৈতিক উভয় বিবরণ অবলম্বনে বসন্তভক্ত নির্যমিত কণ্ঠ রচনা ও চিত্র প্রকাশ হত।



এ পিপ শো

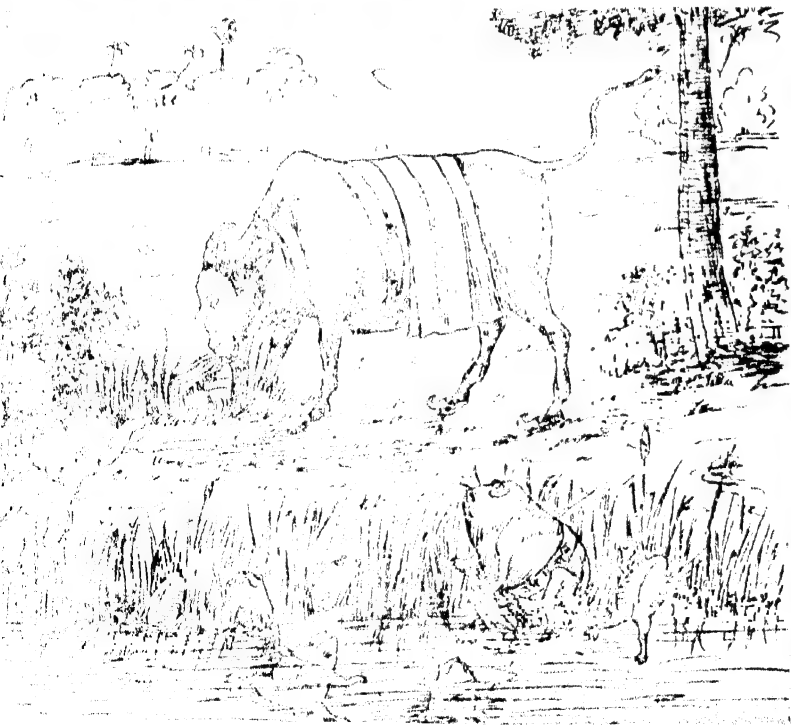
একবার কৃষ্ণদাস পাল সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করে- ছিলেন- 'হী হে, তোমাদের ঘোরাতে বড় কালি ছিল সবই কি আমার গায়েরতে ছেলেচ।'—জিজ্ঞাসা করবার কারণ হল, কৃষ্ণদাস তখন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সভার সম্পাদক, অনেক সময় দেখা যেত কৃষ্ণদাস প্রজা-সাধারণের পক্ষ গ্রহণ না করে গবর্নমেন্টের পক্ষ সমর্থন করতেন। বসন্তভক্ত কৃষ্ণদাস পালকে নিয়ে একাধিক কার্টুন প্রকাশ করে। একটি ছবিতে দেখা যায় কৃষ্ণদাস সার রিচার্ড স্টেম্পলের পালিত কুকুর। কৃষ্ণদাস এই নামের সঙ্গে সংগতি রেখেই হয় তো তার দেহকে কাল করে অঁক হত। তবে কৃষ্ণদাসকে চিনতে অসুবিধ হয় না—আড়াআড়িভাবে কৃষ্ণিত

চাবরখানি সর্বদা তাঁর কাঁধে থাকতো। বিজ্ঞান চিত্রে কৃষ্ণদাসকে বিভিন্ন ভূমিকার দেখা যায়। যেন হয় দু বছর বসন্তভক্ত সব চেয়ে বেশি লাঞ্চিত হয়েছেন কৃষ্ণদাস। জানা যায় কৃষ্ণদাসের সঙ্গে প্রাণনাথের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল।

বসন্তভক্তের আক্রমণের মূল লক্ষ ছিল তখনকার সমাজব্যবস্থা। তবে সরাসরি, আত্মসম্মতি হয়েচে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি, রাজসমাজ এবং অশ্লীলতা নিবারণী সভা। বাঙ্গা রচনা ও চিত্রে সার স্টেম্পল্ট হগ, কৃষ্ণদাস পাল, রিচার্ড কোচ, বিক্ষম-চন্দ্র ও বিদ্যালোগার প্রমুখ কাঁছা আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠিয়েছিলেন। মিঃ হগকে দেখান হয়েছে বরহা অবতাররূপে। কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ার-ম্যান মিঃ হগ (বরহা)-এর দৃষ্টি দাঁতের উপর কল-কাতার উন্নতির চিত্র ভুলে থরা হয়েছে, বখা-গ্রাম-থরেন, ফ্রেনেল, বাজার ও টাঙ্গি। কলকাতা কর্পোরেশনকে নিয়ে একটি চমৎকার কার্টুন 'ফ্রেনেল হওয়ার্তে হাতার নতুন বাজার।' এই কার্টুনে দেখান হয়েছে, একটি ঘোড়ার গাড়ি ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে চলেছে, রাস্তা কাঁধাঝলে পরিপূর্ণ, ঘোড়ার পায়ের কামাঝল ছিটকে পথিকের গায়ে লাগতে। এদিকে শ্রমিকরা ভেঙে বৃষ্টি করছে এ সবথার পথিক বৃষ্টির মতো মাথা না বাঁচলে কাঁচা দিয়ে কামাঝল আটকাচ্ছেন।

হাইকোর্টের নতুন আসবাব কার্টুনে সার রিচার্ড কোচ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হলে, বসন্তভক্ত তখনকার বিচার-ব্যবস্থার সুস্থের প্রতিজ্ঞাব ভুলে ধরেছে এই কণ্ঠাচন্দ্রে। একটি চার-পায়া কৌচের বাদি দৃষ্টি পান্না ভেঙে যায় তা হলে ভোক্তার যেমন অবস্থা হয় তেমনি ইংরেজ শাসনভাবের বিচার ব্যবস্থাও মুখ খুঁড়ে পড়েছিল। এই কার্টুনে ডেবাল্লান ইংরেজ রাজত্বের বিচার প্রহসনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বসন্তভক্তের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গচিত্র হল 'দ্য বুল অ্যান্ড দ্য ক্লপ', হাটের মাঝে হাড়ি ভাঙা এবং এ পিপ শো। তবে ভোট জিকা, অশ্লীলতা নিবারণী সভা, ৬০০.০০০ মিউনিসিপেল জোন্সবাজি বাজে সাড় লাক ২ ইত্যাদি কার্টুনগুলিও ছিল উল্লেখ্য।

দ্য বুল অ্যান্ড দ্য ক্লপ কার্টুনে বিদ্যালোগারকে হাড়ি এবং বিক্ষমচন্দ্রকে (বঙ্গদর্শন) বাজা এভাবে অঁকা হয়। এই কার্টুনিট প্রকাশের কারণ হিসেবে জানা যায় যে ১৮৮০ সালের আক্য মাসে কলদর্শনে বিক্ষমচন্দ্র বড় বিবাহ প্রবন্ধ





না এতদ্বিধকর বিচার—শ্রীমতীর পুস্তক—এর জটিল সমালোচনা করেন। এই সমালোচনা তখন বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। জনগণে বিপ্লবাত্মক ভাবের বর্ধিত করেছিল বশ্বকরের এই সমালোচনা। পরবর্তীকালে বশ্বকরচন্দ্র স্বয়ং উত্তরকালে তাঁর প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণের সময় সমালোচনার আপত্তিকর অংশ বিশেষ বহন করেছিলেন। বঙ্গবিশ্বের সমালোচনার সে সময়, মধ্যস্থ, হালিসহর পত্রিকা মূখর হয়ে ওঠে।

কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ভারত-আশ্রমের একটি লক্ষ্যজনক কটনকে কেন্দ্র করে ছাটের মাঝে হাড়ি ভাঙা কণ্ঠচড়াটি ছাপা হয়। শিখনাথ নামদার আশ্রমচারিত থেকে জানা যায় হরনাথ বসু, সুপরিবারে ভারত আশ্রমে বসবাস করতেন। তাঁর আর অশুভা করে বেশি ফলে দেবদায়ার হয়ে পড়েন। আশ্রমের অশুভ বার বার ভাগ্যদায়ী দ্বিগুণ পাওয়া আশ্রম করত পারেননি। অসত্য হরনাথ বসু, শ্রী-পত্রকে মূখ্যর-বাড়িতে পঠিতার কবিতা করেন। পলী বিনোদিনী একদিন আশ্রম ভাগের সময় আশ্রমের অশুভের আদেশে চাকরেরা তাঁর গাড়ি আটক করে। পাওনা টাকা না দিয়ে তাঁকে আশ্রম ছেড়ে যেতে দেওয়া হবে না। বিনোদিনী নিজেকে অসমানিত বোধ করলেন এবং নিজের গা থেকে গরনা খুলে দেন। তারপর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনার হরনাথ বসু, উত্তেজিত হয়ে ব্রাহ্ম-বিরোধী পত্রিকার বিনোদিনীর নাম সহ ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করেন। এই সময়েই অন্যান্য পত্রিকাদ্বারা ব্রাহ্ম সমাজ তথা কেশবচন্দ্রকে নাস্তানিহাদ করে তোলে। কেশবচন্দ্র সাহিত্যিক সমাজের বিরুদ্ধে মামলা করেন। পরে অবশ্য এই মামলা আপোসে নিষ্পত্তি হয়। এই ঘটনার ভারত আশ্রমের ভিতরের ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়।

প্রিন্স অব ওয়েলস (সপ্তম এডওয়ার্ড) ১৮৭৫ সালের ডেইশ ডিসেম্বর কলকাতার এলে তাঁকে কল-কাতাবাসী বিপুল সম্বর্ধনা জানায়। এই সময় জুবানীশুরের মূখ্যজী পরিবারের মেরেরা বাড়ির বাইরে বকুলতলার এসে প্রিন্সকে-মালা চন্দনে চর্চিত



#### কলকাতার ঘটনা

করেন। এই ঘটনার তখনকার সব কাগজ মূখ্যজী পরিবারের সমালোচনার মেতে উঠেছিল। বসন্তকণ বাদ বারনি।

অশ্লীলতা নিবারণী সভাকে বাগ্য করে একাধিক বাগ্যচিত্র, বাগ্য কবিতা ও রচনা বসন্তক প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৭৩ সালে Society for the suppression of Public obscenity in India স্থাপিত হয়। কেশবচন্দ্র সেন কালীচরণ বঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তি এর উৎসাহী সভ্য ছিলেন। বাংলার অনেক বিখ্যাত

কাব্য ও গদ্য গ্রন্থকে অশ্লীল বলে বহন করার পক্ষে জনমত গঠন করাই অশ্লীলতা নিবারণী সভার অন্যতম কাজ। এই সভাকে বাগ্য করে বসন্তক প্রকাশিত কাটুন, ছানাল, বানর, গাধা, এমনকি শিব-কালীকেও বন্দাবত করা হয়েছে। ছাঁবর নীচে লেখা—অশ্লীলতা নিবারণী সভার একজন সভ্যের বাটীর কালী। কলকাতার অশ্লীলতা নিবারণী সভা হওয়াতে কি কি পরিণতি ঘটবে!

আর একটি ব্যাপারে ততো ডিক্কার ঘটনাটিও চমৎকার। স্যার রিচার্ড টেম্পলের শাসনকালে নতুন নতুন মিউনিসিপাল বিলে কলকাতাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এই প্রসঙ্গে কাটুন সহ হেমচন্দ্রের বাগ্য কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কবিতার কিছু অংশ উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে —

সেলাম টেম্পল চাচ্ছা আচ্ছা মজা নিল,  
ডোজ দিয়ে ভোটঃ খুলে মিউনিসিপাল  
বিলে ॥

ফাক্ট বলি, সহর জুড়ে তারা আড়ম্বর,  
আকট জারি হবে নতুন পরল্য সেপ্টেম্বর ॥  
ইত্যাদি।

উনিবংশ শতাব্দীর এই দুঃপ্রাপ্য বাগ্য-পত্রিকার যে সব বাগ্য রচনা ও চিত্র প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সে সময়ের উপযোগী করেই লেখা ও অঁকা। কিন্তু সেই কাটুন, সেই রচনা আশ্রমের সমাজের অন্যও প্রযোজ্য। কেন্দ্র হওয়াতে ভারত নতুন ব্যবহার এখনকার কলকাতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যবহার করা যায়। একশ বছর পূর্বে আমরা যে ভিতরে ছিলাম আজও সেই ভিতরে। নিত্যক সাংবাদিকতার দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে বসন্তককে। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার চোখরাঙানি সর্বোপরি বাটীর রক্ত চক্কে উপেক্ষা করে বসন্তক তার নীতিতে ছিল অবিচল। কিন্তু দু বছরেই বসন্তকের মৃত্যু ঘটলে, এই স্বল্পায়ু জীবনে বসন্তক যেন বাংলা সাময়িক জগতকে একটি হাসি-খাঁশি দামাল ছেলের মত মাতিয়ে রেখেছিল। এই মরণশীল সাময়িক জগতে বসন্তক নিজের গৌরবে ভাস্বর হয়ে আছে। পত্রিকাটির বর্তমান অবস্থা যা তাকে রক্ষা করবে না পারলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রশংসার একবার চোখের দেখাও দেখতে পাবে না।

সুনীল দাস



পরের ঘনে খোঁকার নাট



# সপন

## শিশুদের জন্য মিল্ক ফুড



### শিশুদের সহজ রুচিসম্মত আহার

কারণ, আপনার  
শিশুর প্রয়োজনীয় সব  
কিছু সপন-এ রয়েছে।

নাড়ন্ত শিশুর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মাসগুলিতে যে সুস্বাদু  
পুষ্তিকর আহারের প্রয়োজন, আপনার শিশুকে  
দেবার জন্য অত্যাবশ্যক সব উপাদান, সপন মিল্ক  
ফুড-এ রয়েছে।



উচ্চমানের প্রোটিন—শরীরের সুঠোঁড় বাড়  
ও সর্বাঙ্গিক বিকাশের জন্য।  
মায়োসিনেমায়েড ও ৮ অত্যাবশ্যক ভিটামিন—  
শরীরের সুস্থ তত্ত্বের জন্য।  
অম্লরূপ—লোহিত রক্তকণিকা তৈরীর জন্য।  
ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস—হাড় ও দাঁত শক্ত  
রাখার জন্য।  
কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট—অধিক জীবনশক্তি ও  
সমন্বীলতার জন্য।  
স্ট্রো ড্রাইভেড—সহজে পাচকরণ ও হজমের জন্য।

ডালমিয়া ডেইরী ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, বানা সিউরার বাইপাস রোড, ভরতপুর, রাজস্থান

# ফেডারেশন কাপের খেলা আতঙ্ক জাগিয়ে রাখল

গত ১৬ এপ্রিল ইডেনে ফেডারেশন কাপের উদ্বোধন দিনের খেলার শেষে দর্শকদের হাতে হাতে মশাল দেখে যারা জেঁকেছিলেন ওটা অহিন্দে আনন্দ সন্ধ্যার অঙ্গ তাদের ভুল ভাঙতে দোর হয়নি। আসল প্রথম দিনেই জ্বল উঠেছিল বিশ্ববীর জাগুন।

যে খেলাটিকে কেন্দ্র করে গ্যালারিতে গ্যালারিতে ধরনের কাগজের মশাল জ্বালানো হয়েছিল সে খেলাটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল কলকাতার মহম্মেদান স্পোর্টিং এবং গোয়ার ডানকো স্পোর্টিং ক্লাব। ডানকো অবশ্যই উন্নত ধরনের ফুটবলে এবং গতির চমকে দর্শকদের কিছ্র আনন্দ দিয়ে মহম্মেদান স্পোর্টিং ক্লাবের কাছ থেকে একটি পরেট ছিঁড়িয়ে নিরেছিল। খেলাটি শেষ হয়েছিল ২-২ গোলে এক সবাই জানেন শেষ মুহুর্তে একটি গোল করে মহম্মেদান স্পোর্টিং সৈদন হার বাঁচিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, যে মহম্মেদান স্পোর্টিং ঢাককোল পিটিয়ে এবার যথেষ্ট শক্তিশালী করে দল গড়েছে প্রথম খেলায় তাদের ভাবমূর্তিও একটু স্থান হয়ে গিয়েছিল।

গোয়ার একটি দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্টার খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া কলকাতার একটি দলের প্রত্যাশা পূরণের বাধা ফুটবল-বহর কলকাতার সজারাই কারণ হওয়া উচিত। কিন্তু উল্টে দেখা গেল তারা মাঠে আনন্দের জোয়ার। বুকে নিতে কষ্ট হয় ন ওই আনন্দ বিস্ফোরণেই বাহ্যিকপ্রকাশ।

ঘরের ছেলোদের বিরুদ্ধে বাইরের খেলোয়াড়-দের জড়ী-দক্ষতার প্রশংসা জানানোর ব্যাপারে কলকাতার দর্শকদের অবশ্যই সন্মান আছে। কিন্তু সৈদন সত্যিই কি গোয়ার খেলোয়াড়দের গণপন্যার প্রারম্ভের জন্য মশাল জ্বলিয়েছিল? নাকি রাজ্যের দল মহম্মেদান স্পোর্টিংকে কিছ্রা হেনস্থার জন্য? যদি খেলাধুলি বলি, মহম্মেদান স্পোর্টিং ওই মাঠ জুড়ে না পারার মুখ্যত সেই ক্লাবের সমর্থকরাই আনন্দ প্রকাশ করেছেন যে ক্লাবের নামী সাতজন খেলোয়াড়কে মহম্মেদান স্পোর্টিং এবার দলে টেনে নিয়ে নিয়েছে তা হলে আমার ধারণাকে কি কেউ বলবেন?

এই বিশ্ববীর এবং পারস্পরিক রেবারেই এবারের ফেডারেশন কাপের খেলায় কুণিসংভাবে ফুটে উঠেছে। মশা সব খেলার নয়, কলকাতার তিন প্রধানের পারস্পরিক খেলায়। মহম্মেদান স্পোর্টিং এবং মোহনবাগান ক্লাবের খিভীয় দফার সৌমফাইনালে মাঠে ও মাঠের বাইরে কম করে আহত হয়েছে পঞ্চাশ ন। ময়দানের বিস্তীর্ণ এলাকার এবং রাজপথে প্যামা ছাড়িয়ে পড়ে। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের স্টানাল খেলায় আহতের সংখ্যা একশোর উপর। ডেনেও যেমন, ইডেনে মাঠের বাইরেও তেমন ছোরা-রি, কুর, ব্রেড ইট, বোমা লাঠি লাথির যথেষ্ট বিহার হয়েছে। আর ফাইনাল খেলাটি যা হয়েছে তাকে ফুটবল খেলা না বলে হাতুড়ি মারামারির ক'বড় লড়াই বলা যেতে পারে। মোহনবাগানের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের রেবারেই প্রায় জন্মলন্ডনকে। অর্ন্তাতের কিছ্র, কিছ্র খেলায় অশ্লাই হলীনতার বাধ ভেঙেছে, সমর্থকদের মধ্যেও মারা-রি হয়েছে কিন্তু মাঠে নেমে দুই দলের খেলোয়াড়-এমন এক বিস্তীভাবে ফাউল কর খেলতে আগে থেকে বলে মনে পড়ছে না। গুরুত্বপূর্ণ সনো ফুটবল মাঠে রেফারীর এমন দৃবল পরি-লনাও আগে দেখিনি। বাস্তবহীন পরিচালনার দৃষ্টি কুন্জির সৃষ্টি করে গেছেন বোম্বাইয়ের রেফারী পি কুটিনহো।

ফাইনাল খেলাটির মধ্যে কী না ঘটেছে? প্রথম ল মিনিটেই মধ্যে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা গোল বার ফাউল করেছে। আর পরো দুই মিনিটে জো হয়েছে আকছান বে-আইনী

খেলা। ইস্টবেঙ্গলের খাবাজ দক্ষতা ক্রয়ার ভঙ্গিতে মোহনবাগানের গৌতম সরকারের মূখ করে নাড়া দিতেই গৌতম তার মুখে এক চাপড় বসিয়ে দেন। একটি ফাউলের পর ইস্টবেঙ্গলের তপন দাসকে চড় কবার মোহনবাগানের শামল ঘোষ। একটি মটলার মধ্যে রেফারী কুটিনহোকে একটি লাথি মারে ইস্টবেঙ্গলের জামসেদ নাসির। মোহনবাগানের শ্যামল থাশা রেফারী কুটিনহোর উপর লাফিয়ে পড়ে তার গলা টিপে ধরতে উদাত হয়। আর রেফারীর প্রায় প্রতিটি সিদ্ধান্তে চ্যালেঞ্জ জানাতে থাকে দুই দলের খেলোয়াড়। বেন ফুটবল খেলা নয়, অগ্নিগর্ভ কিস্তফার অবস্থার মধ্যে হাজিরিতি লাথিলাথি।

আমরা জানি, মাঠে রেফারীর সীমাহীন কর্তৃত্ব। আইন প্রয়োগ করা এবং উদ্ভত ও দুর্বিনীত খেলোয়াড়দের গহিত আচরণ তাদের শাস্তি দেওয়ার সমস্ত অধিকার রেফারীর হাতে ন্যস্ত। কিন্তু স্মার, দৌর্বল্যে অশ্রান্ত হয়ে এবং বাস্তব বিসর্জন দিয়ে রেফারী কী করেছিলেন? রমের দোষ শামের ঘাড়ে এবং শামের দোষ রমের ঘাড়ে চাপিয়ে প্রতিনিবৃত্ত বাঁধি বজাঙ্কলেন এবং মধ্যে মধ্যে হলদে কার্ড দেখিয়ে খেলোয়াড়দের সতর্ক করছিলেন। খেলোয়াড়রা বকে গিরেছিল মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। কেনো খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দেবার মতো মনোবল রেফারীর নেই। তাই লাগামহীন গালা-গালি এক যথেষ্ট ফাউল করা থেকে কখনো বিরত হয়নি। খেলাটিও পরিণত হয়েছে কদর্য ধরনের রেবারেই ও হানাহানির খেলায়। মাঠের বাইরে রক্ত ঝরেছে বহু দর্শক সমর্থকের দেহ থেকে।

আর যে ঘটনাটি অনেককেই পীড়া দিয়েছে তা হচ্ছে মাঠে ঢুকে পড়া একটি ছেলের উপর বাঁধ-বাম্বাক ভঙ্গিতে সূত্র ভাঙাঘেরে স-বুট লাথি কখনো। এমন লাথি বাটে ছেলেরিতি খেলা দেখার শখ চিরজীবনের মত শেষ হয়ে যেতে পারত।

ক্রাবপ্রীতি এবং ক্লাব-বিশ্বের নামের মোহে মাতাল অব্যবপ্রবণ যে সব ছেলে বাঁধপাজার

খাবাজের দেখানো মতো ঢুকে পড়ে। প্রগ খেলোয়াড়-দের গলার মালা পরিবে গুরু, গুরু করে তাদের আচরণ অত্যন্ত নিম্নদরী। বোধ ও বিবেচনামার্গ নিরশলে রাখার ক্ষমতা নেই বলেই তারা অব্যব ও উচ্ছাসপ্রবণ হয়ে ওঠে। ফাইনাল খেলার দিন যে ছেলেটি ইস্টবেঙ্গল ক্লাব গোল করার পর মালা নিয়ে মাঠে ঢুকে পড়েছিল, পলিসের চোখ ফাঁকি দিয়ে, ধরে নেওয়া যেতে পারে সে ছেলেটি ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাবের অর্বাচীন সমর্থক। তার অগভর্তগ বা মূখনিপ্ত শেলবথাকো সূত্রের দৈর্ঘ্যে বঁধ ভেঙে যাওয়াও অব্যাবাদিক নয়। কিন্তু সূত্রের মনে রাখা উচিত ছিল, সে সূত্র ভাঙাচাষ-মোহনবাগানের প্রাচীন অধিনায়ক এবং ভারতের বশস্বী ফুটবলার। আর খেলাটি চপলমতির অব্যবপ্রবণ এক ক্লাব সমর্থক।

লহর গজব রট্টেছিল সূত্রের লাথির ঘারে ছেলেটি পরে মারা গেছে। ভাগিস গজবটা গজবই —না না মুখের রটনা। কিন্তু সত্যিই যদি ছেলেটি মারা যেত সূত্রভেদে সারা জীবন অনুভূতাপে দম্ব হতে হত। কলকাতার বোঝাও চাপত। এমনিতেই যে কলকাতায় হটে হয়েছে সেটাও উপেক্ষার নয়।

খেলে আনন্দ পাওয়া এবং অপরকে আনন্দ দেওয়া খেলোয়াড়ের মূল লক্ষ্য। তার সঙ্গে এখন যোগ হয়েছে স্বার্থ সন্ধান এবং দুর্জি-রোজগারের প্রশ্ন। তবু সঙ্গাচার, নিয়মনিষ্ঠা খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব প্রভৃতি খেলোয়াড়দের গণ্যাবলী বলেই স্বীকৃত। সেই খেলোয়াড়রাই যদি মাঠে নেমে অশালীন আচরণ করে তবে সমাজের উপরও তার প্রভাব পড়ে। খেলোয়াড়দের আচরণই দর্শক সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনার খোরাক জোগায়। ফেডারেশন কাপের খেলায় যে ঘটনাগুলি ঘটে গেছে এ সব ঘটনা কলকাতার লীগ ও শীড়ের খেলাতেও ঘটতে পারে। তাই শূভবাধি সম্পন্ন মানবের ছেবে দেখার প্রয়োজন আছে ফুটবল সমাজীবনকে কী দিকে? অবক্যের পথ প্রশস্ত করছে কিনা?

গুরুদায়র এসে পড়েছে ক্লাব কর্মকর্তা এবং ফুটবল প্রশাসনের উপরেও। দুর্বিনীত এবং আইনভগাকারী খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে তঁরা যদি



ফাইনালের দিন মারাত্মক ও দুর্ভাগ্য



ভারতবর্ষের সঙ্গে

আমার দেখা হয়েছে

নানা ভাবে। কখনো ধানক্ষেতে আলপথে  
গোচাটায়, খালপাড়, বৈকুণ্ঠপুরে  
তত্ত্বসাধকের হাবির আগনের আলোয়।  
আবার কখনো সদা পুত্রহীন শরণ চাষী  
কেরাচিন কিনতে বেরিয়ে ছেলে-পড়া  
ধানের শীষ যখন দেখছিল তখন।  
এই সব নিয়ে গত দুই দশকে আমি যেসব  
গল্প লিখেছি তার বাছাই  
সুদৃশ্য, সুসহজ আয়োজন

শ্যামল

গঙ্গোপাধ্যায়ের

গল্প সংগ্রহ-১

পঁচিশ টাকা

সবার জগে

নতুন

উপন্যাস

চন্দ্রেন্দ্রের

জংশন

বারো টাকা

আসলে মে-স্টেশনের নাম হতে পারতো  
জীবন জংশন কেননা চন্দ্রেন্দ্রের  
মানুষজন চাঁদা তুলেছিল—তাদেরই গায়ে  
বজ্রেরকৈ ডাঙ্গা মাসে ভালো করে নেবে বলে  
বজ্রের ওরফে বজরা ওয়াগন ব্রেকার।  
সে তের নম্বর ডাকাতিতে যায়নি—তবু  
ধরা পড়লো। কারণ এর আগে তার  
নামে যে বারোটা ডাকাতির মামলা চালা।  
বজরা খানা লকআপে এই জীবন  
জংশনের টিকিট পেয়ে গেল।

প্রচুর স্বাক্ষরিত প্রথম ২০০ কপি  
২০% কমে পাওয়া যাবে  
সব বইয়ের দোকানেই পাওয়া যায়

অনুরাগ

গুণু বইয়ের দোকান নয়—আরও কিছু  
৫৭সি কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

কলকাতার ফুটবল শৃঙ্খলা বজায় রাখা কণ্টক  
হয়ে উঠবে। শহরের শান্তি-শৃঙ্খলাও বিঘ্নিত  
হবার সম্ভাবনা।

ফেডারেশন কাপের খেলার পর্য্যালোচনায় বলব  
দুই তিনটি খেলা বাদে সামগ্রিকভাবে উন্নতিশীল  
খেলার এই আসর ভাল কর্মনি। না জমার একটি  
প্রধান কারণ বাইরের সব দলকে দুটি করে ম্যাচ  
খেলাতে হয়েছে দুপুর দুটো বা আড়াইটে থেকে  
প্রচণ্ড গ্রীষ্মতাপের মধ্যে। এত গরমের মধ্যে নব্বই  
মিনিট খেলাতে খেলোয়াড়রা হিমসিম খেয়ে উঠেছে।  
বৌশর জাগ খেলোয়াড়ই যোগ্যতা অনুযায়ী  
দলভার পরিচয় দিতে পারেনি।

কলকাতার তিন প্রধান দল মোহনবাগান,  
ইস্টবঙ্গল এবং মহম্মদান স্পোর্টিং বাইরের দল-  
গুলির বিরুদ্ধে পর্যায় প্রাধান্য নিয়ে খেলে জিতে  
মোলেও রক্ষণ ও আক্রমণের মধ্যে সমন্বয় গড়ে  
সে খেলা দেখতে পারেনি। যে খেলা দেখার জন্য তিনটি  
ক্রাবের অর্গণিত সমর্থক উদ্ভূত হয়ে ছিল। উন্নত  
ধরনের ফুটবলের পক্ষে ইডেনের মাঠও অনুকূল  
নয়। জলেভেরা ইডেনে ফুটবল প্রায় অচল। প্রমাণ  
হয়ে গেলে রোডে জাতা এডেনেও ফুটবল খেলা  
সম্ভব। মাঠের মাটি ছিল এতে কঠিন যে দৌড়তে  
গিয়ে অনেকেরই পায়ের কা উরর পেশীতে টান  
ধরেছে। প্রতি দলের দুই-তিনজন করে খেলোয়াড়  
আহত হয়েছে। দুই দলের দুজন নামী খেলোয়াড়  
পেরেছে বড় ধরনের চোট। জে সি টি দলের ইন্দ্রার  
সিঙ্ঘের হাত ডেঙোছে, মহম্মদান স্পোর্টিংয়ের  
সুরাজ সেনগুপ্ত হাট মাচড়ে যাবার পর কার্টিলেজ  
অপারেশন করতে হয়েছে।

ইডেনে খেলার বস্খা না করেও উপায় ছিল  
না। কারণ কলকাতায় এই প্রথম ফেডারেশন কাপের  
খেলা হল। ভারতের প্রথম সারির খেলাটি দলের  
খেলা দেখতে আগ্রহী ছিল প্রচুর দর্শক। তাদের  
মনাই ইডেনে খেলার ব্যবস্থা করতে হয় এবং  
প্রতিদিন দুটি করে ম্যাচের বস্খা রাখতে হয়  
তিন সপ্তাহ সময়-সীমার মধ্যে প্রতিযোগিতা শেষ  
করার জন্য। তার ফলেই প্রথম খেলাটি হয় গ্রীষ্মের  
দাবদাহের মধ্যে। শ্বিতীয়টি হয় সূর্যভেজ কিছুটা  
শ্রীমিত হবার পর। গ্রীষ্মতাপ শব্দ খেলোয়াড়দেরই  
কাহিল করানি দর্শকদেরও প্রচুর গায়ের ঘাম  
ঝরিয়েছে। সর্দিগর্মির শিকার হয়ে প্রতিদিন  
ইডেনের মিনি হাসপাতালে চিকিৎসিত হয়েছে  
পনেরো কুড়ি জন করে দর্শক। ফুটবল খেলা  
বাঙালীর কত প্রিয় এটা তারই প্রমাণ। প্রিয় কল  
প্রচণ্ড গ্রীষ্মতাপ উপেক্ষা করে মাঠে গিয়েছে।  
টিকিট বিক্রি হয়েছে প্রায় একট্রিশ লাখ টাকার।  
কলকাতার ফুটবল ইতিহাসে এটা এক রেকর্ড।

এই ফেডারেশন কাপের খেলা তো আরও  
তিনবার হয়েছে। সাতাত্তরে এণ্টিকলামে বসেছিল  
প্রথম আসর। লাভ নাকি কিছুই হয়নি। পরের বছর  
কোরেন্সটোরে উদ্যোক্তার সমান লাভের ম্খ  
দেখিয়েছিলেন। গড় কড়র গোহাটির প্রতিযোগিতার  
হুজুকে বড় রকমের লোকসান। ফেডারেশন কাপ যে  
ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা কলকাতাতেই তার  
প্রমাণ মিলল। কিন্তু আগেই লিখিছি, কলকাতার  
তিনটি ক্রাবের রেবারেবির ফসলই সে খেলা কল-  
কাতার আশাশ্রয়ী মরসুমের জন্য ফুটবল অনুরাগীদের  
মনে আড়ম্ব জাগিয়ে রাখল।

ফুটবলের টেকনিক ট্যাকটিকস সম্পর্কে অনেক  
কথাই শোনা যায়। পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং গবেষণারও  
অন্ত নেই। গোয়ার ডেমপো স্পোর্টস ক্রাবের  
ইংলিশ কোচ কা বটল্যান্ডও কিছু নতুন কথা  
শুনিয়ে গেছেন ফেডারেশন কাপের খেলার সম্বন্ধে।  
তবু হতে ভারতীয়দের খেলার ঝক এখন সেকলে  
হয়ে গেছে। নতুনভাবে বিনাস শুর, হয়নি।  
বটল্যান্ড সহব তিন বছর ধরে ডেমপোর প্রশিক্ষণ  
আছেন। তার শিক্ষাগুলে ডেমপো ভারতীয় ফুটবলে

একটি খেলাতেও জিতে পেরেছে?

টেকনিক ট্যাকটিকসই বলুন আর মেথ  
কান, অবশ্যই তার প্রয়োজনীয়তা আছে। শিখ  
গুণও অনস্বীকার্য। কিন্তু ফুটবল খেলোয়া  
আসিল গ্যস ট্যালেন্ট, স্কিল সিপড, স্ট্যাটিনা  
লুটিং এবিলিটি।

ডেমপো, ভাসকো, টাটা মফংলাল, আই  
আই, হ্যাল, জে সি টি, পাঞ্জাব পুলিশ কত দলে  
তো খেলা দেখলাম। জমির উপর বল টে  
বেওয়া নেওয়া করে আক্রমণ রচনার সুন্দর ছ  
জোছে পড়েছে। কিন্তু সারা মাঠ ভাঙিয়ে খেলা  
গোলের মধ্যে গুটিয়ে এসে খেলার মধ্যে অ  
পার্বক আছে। মাঠের গতিম্খ যখন ছোট  
আসে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার দুর্গম হয়ে ওঠে তখন  
তখন খেলোয়াড়দের বাড়তি গতি শিকলের জাদু  
লুটিং ক্রমতাই দলকে জয়ের পথ দেখায়। মহম্ম  
স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে ভাসকো স্পোর্টস ক্র  
ফরোয়াড়রা ছাড়া খেলার কোনো ক্রাবের খেচ  
শেষ মধ্যে গতিস চমক দেখাতে পারেনি। কলব  
তিন প্রধানের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ কে দুই নম্বর  
কে তৃতীয় তারও সঠিক চর্চিস মেলেনি।  
ফাইনালে মহম্মদান স্পোর্টিং টাই-ব্রেকারে পে  
কিকে হেরেছে মোহনবাগানের কাছে। লিগ  
প্রশান্ত বানার্জি এবং সুরাজ সেনগুপ্ত দলে থ  
মহম্মদান স্পোর্টিংক টাই-ব্রেকারে যেতে হত কি  
সম্পর্ক প্রশ্ন উঠতে পারে। মোহনবাগান ও  
বঙ্গাল ক্রাবের ফাইনাল খেলা। তো নব্বই টি  
১-১ গোলে অসমাপ্ত রইল। অতিরিক্ত  
মিনিট খেলার বস্খা থাকলেও আমার নি  
ধার্মা গোলমালের জনাই রেফারীর পক্ষে  
খেলানো সম্ভব হয়নি। ফলে দুই দলকে ফেড  
কাপের যুগ্ম জয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। এট  
রকমের গোজামিল। কারণ অতিরিক্ত যে পনের  
খেলার কথা ছিল সে পনের মিনিট খেলা না  
অর্থ খেলাটি অসমাপ্ত। এই অসমাপ্ত খেলা  
পুরো সময় খেলানোই আইনস বিধান।

যাই হোক এবার নিয়ে মোহনবাগান  
ফেডারেশন কাপে খেলে তিনবারই ফাইনালে  
ছিল। তার মধ্যে দুবার হল যুগ্মজয়ী। ইস্ট  
ক্রাবও দুবার যুগ্মজয়ী হল দুবার খেলে।  
বঙ্গাল প্রথমবার ও তৃতীয়বার খেলেনি।  
বাগানও খেলেনি তৃতীয়বারের প্রতিযোগিতার  
ব্যক্তিগত ণ্ডাভূমিকায় বাইরের  
খেলোয়াড়ই নম্বর কেউচ। তাদের কথা  
গেলে আলোচনা দীর্ঘ হয় যাবে। কে  
খেলোয়াড়দের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে ভাল  
মহম্মদান স্পোর্টিংয়ের আধিনায়ক ও লি  
অমলরাজ এবং ইস্টবঙ্গাল স্টপার সমর ড  
প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ পোপার ডের পুরস্কার  
সময়ের পক্ষে সেট। পাওয়ার সম্ভাবনা  
মোহনবাগানের স্টপার সুরত ভট্টাচার্য ও  
হয়ে উঠেছে দুটি মাঠে। মহম্মদান  
(শ্বিতীয় দফার সেমিফাইনাল) ও ইস্ট  
কিরেছে। দুই লিঙ্কমান গৌরম ও প্রস  
মাঠে স্বকীয় দীর্ঘপ্রভে ফুটে উঠেছে, কো  
বাধা থেকেছে মাঝারিমানের মধ্যে। অক  
অমলরাজের টাই-ব্রেকার পেনাল্টি কিক অট  
সেমিফাইনালে মোহনবাগানের জয়ের নায়ক  
শিবাজী বানার্জী। যে আগে আরও তিনবার  
বাগানকে তিন প্রতিযোগিতার ফাইনালে  
পেনাল্টি কিক আটকে দিয়ে।

কাইয়ের যে তিনজন এ বছর কলকাতা  
তাদের মধ্যে দুই ইরানী মজিদ বাসকর ও  
নাসিরী ইস্টবঙ্গালের অত্যন্ত মূল্যবান  
মোহনবাগানের স্টাইকার স্প্রাসিস ডিসজা  
প্রমাণ দিতে পারেন বেশ মাঠে বাইরে কস

মুকুলা

আলোকচিত্র : নীল

## আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **বই**

সূরের আগুন। সম্মা সেন। মেজ পাবলিশিং। ৩১১১১ মহাশ্মা গাম্খী বোড। কলকাতা-৯। ১৬ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের গান যাদের প্রাণে সূরের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে এমন একুশজন ব্যক্তির ইন্টার-ডু ভিত্তিক পারস্পরিক ও বহুভাষী প্রস্তুত বইয়ে আছে। আরো আটশ জনের নামের তালিকা দিয়ে সম্মা সেন জানিয়েছেন এই বইয়ের পরবর্তী খণ্ড প্রস্তুতমান। আপাতত আলোচ্য বইয়ে আমরা যে একুশজনকে পাই তাদের বই পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া যায়। এক, রবীন্দ্র-সংগীতের যশস্বী শিক্ষক, দুই, রবীন্দ্রসংগীতের প্রবীণ ও নবীন শিল্পী। শিক্ষকদের মধ্যে অনেকে অনাদিকুমার, শৈলজারঞ্জন, শূভ গুহঠাকুরতা, নীহারিকন্দ, সেন ইত্যাদি। শিল্পীদের মধ্যে আছে অমিয়া ঠাকুর, সত্যী দেবী, সাহানা দেবী থেকে শূর, করে পঞ্চজ মল্লিক, কানন সেন, শান্তিদের হরে অর্থাৎ সেন, শূভ গুহ (সম্মা সেন লিখেছেন, গুহঠাকুরতা) পর্যন্ত। কার্ত্তী কুমার সাহা উল্লেখ নেই বলে কালক্রমিকভাবে এই তালিকা আমাদের কাছে পৌঁছায়নি।

লেখক রবীন্দ্রনাথ অনুসারে জানা যায় 'আজ থেকে (অর্থাৎ ১৯৭৯ সালের নভেম্বর) প্রায় পচিশ বছর আগে পরিকল্পিত ধারাবাহিকভাবে লেখাগুলি বেঁচেছিল। অর্থাৎ রচনাগুলির মূল রূপ ও বক্তব্য সাময়িকপত্রের সীমাবদ্ধতায় নিষ্পন্ন হয়েছিল। প্রত্যাচারের প্রকাশের সময় রচনাগুলির বাহ্যিক পরিমার্জন ঘটেনি। অতিকথন ও পুনরাবৃত্তিদোষ ছাড়াও ছোটখাট ভুল অনেক আছে যা মর্মভেদী। যেমন, শান্তিনিকেতনের প্রখ্যাত সংগীত শিক্ষক সম্পর্কে তিন বাক্য উদ্ধারণ ও বানান (ভি ভি ওয়ারেল ওয়ার, বি ভি ওয়ারেল ওয়ার বি বি ওয়ারেল) সহজেই এক বাক্য তথা সঠিক কথা যেত। প্রখ্যাত রবীন্দ্রনাথের বিদেশী পলিডট আনন্ড বাক্য সম্মা সেনের কলমে হয়েছেন মিঃ বার্ক। শোচনীয় ভুল। আসলে গ্রন্থাকারে রচনাগুলি সন্নিবিষ্ট করার সময় লেখিকা খুব মনোযোগ দেননি। ফলে, বইটি হয়েছে ছাড়া-ছাড়া, কেন্দ্রীয় ভাবনাবিহীন এবং খানিকটা লম্বা মেজাজের। 'একবার আমার চোখে ইনফেকশন লেগে চোখ দুটি প্রায় হারাবার অবস্থা হয়েছিল। সেই সময় একদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম।' বাধা দিয়ে সত্যী দেবীর মেয়ে রমা গুহঠাকুরতা বলেন, 'এ সব স্বপ্ন-টপ্পন কথা থাক মা, গানের কথা বল। বাবা তোমার গান শুনলে তোমার বিয়ে করতে চাইলেন—সম্মা এই সব কথাতেই ইনটারেস্টেড।' 'যে কোন সত্যিকার লেখক এই সংলাপ উদ্ধার রাখেন। সম্মা সেন

আশাবিত্ত ভেলেই হত সব কিছুই পরিবেশন করেছেন। তার বলে বাদ থাকতো সূনির্দিষ্ট প্রশ্ন ও দিল্পী-দের নির্ভরযোগ্য বারো-ডাটা ওবে লেখিকার প্রচলিত প্রবন্ধগুলোর পক্ষে তত্ত্বাবধায়ক হত।

এত কথা বলতে হল এই জন্য যে, সম্মা সেন এই রচনাগুলি লিখতে প্রচুর অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার পরিচয় রেখেছেন এবং এই কৌশল প্রবর্তন খণ্ড প্রকাশের জন্য চেষ্টা করেছেন। বহু বিচিত্র ও অজানা রচনাগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে বা রবীন্দ্রসংগীত রসিকদের পক্ষে আকর্ষণীয়। যেমন সাহানা দেবীর কবিতাতে জানা যায় তিনি বৈদেশ-নায়কের কাছ থেকে একদিনে চ্যাপটি গান শিখেছিলেন টেলিফোনে।

বইটির পাঠযোগ্যতার আরেকটি কারণ, রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষকদের মূল্যবান মতামত ও বিশ্লেষণ এবং জ্যোতি দিল্লীপীর স্মৃতিস্মরণীয় মৌলিকতা।

দেবীর চিত্রকর্ম

হৃদয়ালার দেশে। অম্বদাশঙ্কর রায়। শৈল্যা পুস্তকালয়, কলকাতা ৭০। মাম পচি টাকা।

এখানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছড়াকার অম্বদাশঙ্কর রায়ের বিভিন্ন ছড়ার বই থেকে কেছ নেওয়া ছড়ার সংকলন এটি। সৌন্দর্য থেকে এই সংকলনটি ছোটদের কাছে খুবই আদরের জিনিস। তবে অম্বদাশঙ্করের ছড়া শব্দ, শিল্পের জেনে নয়, বালক-বালিকা এবং কিশোরদেরও উপভোগ্য। বড়দের কাছেও কিছু কম উপভোগ্য নয়। ছোটদের লেখা অম্বদাশঙ্করের চারটি ছড়ার বই আছে। তাদের নাম রক্তা যানের ঠেং, ডালিম গাছে মৌ, আতা গাছে তোতা এবং হে রে বাবুই হে। আরো একটি বই প্রকাশের অপেক্ষায় : রক্তা মাথায় চিরুনি। প্রত্যেকটি বই থেকে দশটি করে ছড়া বেছে নিয়ে মোট পঞ্চাশটি ছড়ার এই চর্যনিকা হৃদয়ালার দেশে। ছোটদের কাছে খুবই প্রিয় হবে। ছড়াগুলি সবই যে প্রোত্বেষের আধার নিয়ে এই সংকলনে এসেছে তা নয়। বৈচিত্র্যের দিকে তাকিয়েই লেখক এই ছড়াগুলি নির্বাচিত করেছেন। কবিতা, গান, কালাভ, লিমেরিক আছে। কিছু ছড়ায় নাটকের মতো সংলাপও আছে।

ছোটদের নিজস্ব খেলবার প্রাধান্য ভগবানকে জানিয়ে সংকলনটি শব্দ, বয়স্ক মানুষ আজকের পৃথিবীতে যেমন ভগবানের কাছে অভয়-বীর চায়, সেই অভয়-বীর চাইতে হয় না বাদ শিশু। ছোটবেলা থেকেই ভয়ের সংকার-মুক্ত হয়ে বড়তে পারে। তাই শিশু, বয়স্ক প্রাধান্য করে একমুখে ভগবানকে বলাহে : জগৎ অর্থে ভয়ের মেলা/ভয় লাগে যে সারা বেলা/কেনম করে করব খেলা/ভয় ভেঙে দাও, প্রভু। তখন এই বিপন্ন সংসারে বয়স্ক মানুষের প্রাধান্য যেন একই সঙ্গে সুর মিলিয়ে বোঝায় আসে। তাই শিশুর পক্ষে নিষ্ঠার হওয়া যেমন

বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণের একমাত্র পুস্তক

**চলচ্চিত্র নির্মাণ ও**

**পরিচালনা** ১০০

বীকেশ্বর শোশ

দে বুক স্টোর

১৩ বক্সিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলি : ৭৩

প্রকাশিত হয়েছে

**বহুরূপী**

সংকলন ৫৩

বাংলাদেশ-থিয়েটার সংখ্যা

দাম পাঁচ টাকা

বহুরূপী

৭ লোয়ার-রেজ

কলিকাতা ১৭

**মালিনী**

মেয়েদের পত্রিকা কিন্তু মেয়েদী নয়। লিগেটেন- অমিত্য চৌধুরী, সম্ভ্রাম- কুমার ঘোষ, কবিতা সিংহ, দৌরী আইয়ুব, সুনীল গাম্খী, হামদি বে, শঙ্খ ঘোষ, রাধানাথ গুপ্ত ও আরো অনেক। রাসা থেকে শুরু করে আইন আদালত পর্যন্ত—কি না আছে এতে।

সম্পাদক মারী সিদ্ধান্ত

দাম : ১-৫০

যোগাযোগ করুন

৮ জেনিন সরণী। কলকাতা-২৩

গোড়াই থেকে আট বছর পরে সার হুচ্ছে বাঙালীদের একমাত্র বাংলা কাগজ বোড়াই বিচিত্রা (প্রমাসিক, প্রাক্ত চাঁদা : সড়াক ১৫ টাকা)। আমরা চাই প্রাক্ত, প্রেনীলজ বিজ্ঞাপন, প্রবন্ধ, গল্প, অন্যান্য রচনা। লেখার কপি রেখে পাঠাবেন।

যোগাযোগের ঠিকানা :  
Bombai Bichitra, C/o Bichitra Cultural Association, 2 Pradeep, World Hills, Bombay 400 018

পি. এল. ডাঙারি'র  
**টপ সিক্রেট ও অন্যান্য গল্প ও**  
**পাগলা কুত্তা ও কুটনৈতিক** ৭০  
রেমার্ক-এর

লিসবনে এক রাত ১২-৫০

সোলম্বিন্ডিসন-এর

**প্রাণন বৃত্ত** ১০০

ডাঙারিয়ার্স পাবলিকেশন্স

১০১ ক. কে. রোড, কলকাতা ৮৯

'সংসারে তুমি, আমি, হুথ, হুথ সবই সত্য হুথের প্রকাশ, গ্রহণ করতে পারার মধ্যেই রয়েছে তার সার্থকতা।'

**স্বাধীনতা**

আরও গুণ

ব্রজী প্রকাশনী, ৪২/১, এ.পি.  
সি. রোড, কলি-২, ৩৬-২৫৮১

হতাশা, হুচিন্ডা, নৈরাশ্য ও অশান্তি  
কাটিয়ে উঠতে হল

**“সুখী জীবন”**

বইটি পড়ুন।

বৈদিকী ডাকে ৪টা ৭০ পঃ

(ভি. পি. ডে পাঠানো হয় না)

পি. কে. গোহাঙ্গী

১৩৫ হাড্ডা রোড, কলকাতা ২৩

জন্ম শতবর্ষে প্রচার্য  
**গল্প সন্তার**

(প্রেমচন্দ)

বাংলা অনুবাদ : শীলা চৌধুরী

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি পড়ুন

(পুস্তক বিক্রয় ও পাঠানদের জন্য

বিশেষ কমিশন) মূল্য ৫-০০

যুব প্রকাশনী

১০৬, বিধান সরণী, কলি-৬

**পত্রযোগে**

**মিতালি**

নর-নারী নিবিশেষে বাংলাভাষায় পত্রমেয়ী স্থাপনে যারা ইচ্ছুক, বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন। মঞ্জুরী দেবী, প্রচার সম্পাদিকা, বিশ্ব মিতালি সম্ম, উত্তরপাড়া (৭১২২৫৮) হুগলী পঃ বঃ।

ডাঃ তারকচন্দ্র ঘোষ  
প্রণাত

গীত-মঞ্জরী ১ম খণ্ড ৭-০০

(স্বরলিপি সমেত)

গীত-মঞ্জরী ২ম খণ্ড ৬-০০

গীত-মঞ্জরী ৩ম খণ্ড ১২-৫০

ডি. এম. লাইব্রেরি

৪২, বিধান সরণী, কলি-৬

# যুগল মিলন



## ভারতের একমাত্র শারীরিক দুর্গন্ধনাশক সাবান ও ট্যালক

দু'ভাবে দুর্গন্ধ প্রতিরোধের জন্য একেবারে সঠিক  
যুগল মিলন... সিঙ্হল সাবান মেখে পরিষ্কার মন...  
আর তারপর সুগন্ধ পাউডার মাখা...  
যার ফলে আপনি ঝরঝরে তাজা  
বোধ করবেন।

**গোদরেড - এর নিবেদন - সিঙ্হল**





তার প্রাথমিক প্রয়োজন, তেমনই সব রসের মানবেরই কাছে তা মৌলিক প্রয়োজন। শিশুর প্রাথমিক মানবেরই প্রাথমিক। ছোটদের হৃদয় এইরকম রসের মতো জড়িয়ে স্নেহ অমর্যাদার মনোবাসেই। সেই বিখ্যাত ছড়াটি :  
 তেলের শিশি ভাঙল বলে— এই  
 প্রদেশে সকলেরই মনে আসবে।  
 এটিকেও সংকলনে রাখা হয়েছে। কিংবা  
 সেই কেশনগরের মশার বৃন্দবাস্তব-  
 বাণী সমান কুশলভার কাহিনী।  
 ছোটরা শব্দ বিচিত্র যুদ্ধে মশার  
 চুম্বিকা এবং অশার কামড় মিলিয়ে  
 চাপড়ে বাতীবাস্ত মানবটিকে নিয়ে  
 সাহসিক করে। কিন্তু গুরুজনকে  
 বোঝা খুঁজে দেয় পঞ্চম বাহিনী কিংবা  
 একই জনবৃন্দ করি/এ হতে ও  
 তেত, কিংবা জানকীর, পলাশের  
 রুমি এবং জাপানি আক্রমণের রেকর্ড-  
 রশমি বড়দেরই উপভোগের মতোকে  
 পশু করে। যাই হোক, এই মাত্রাতনের  
 পদের সম্বন্ধে সব সময়েই খেঁচ  
 যার, কিন্তু সেই পার্বতী-কাবতী-না  
 মেঘতীর বেঙালটার জন্যে একই সঙ্গে  
 দ্বিভাষা ও উগ্র কৌতুহল, বেঙালের  
 ইমারত ভ্রমণ, আশ্রম ছেঁদের দোলায়  
 মজার বাঘ শিকারের কাহিনী, পশু  
 রাজের স্বর্গ ছেঁড়ে হাস-খাওয়ার গল্প,  
 দুশোমন দাম্পত্য-এর পোড়া কপ-এর  
 গল্প কিংবা 'কিসসা কঠিকড়ালীর'  
 কবী বাতির ব্যারিকড করে কেউ-  
 যাবুর অকথা সমুদ্রস্রোতের মতো পেতে  
 গেলে ছোট-বড় সকলকেই হটমাল-এ  
 পলে হেনো হয়ে ঘুরতে হবে। তবেই  
 তা আসল মজা। আর মজার মজার  
 ছবি দিয়ে ভাস্কর্য্যগলোকে ফুটিয়ে  
 তালার জন্যে প্রকাশকের চেষ্টাকেও  
 গরিফ করতে হবে।

শিল্পকলায় সজীবতার

আলোচনা শিল্প সংস্কৃত চিত্রকলা

দ্রষ্ট আদমের মতো আত্নান্দ  
 ট্রেনের কম বয়সী শিল্পীদের গড়  
 তিন বছর ঘন ঘন প্রদর্শনী করতে  
 লাগা যাচ্ছে। প্রায় নিঃসন্দেহ হয়ে কলা



অপদ সুরকারের অঙ্কন

যার বে নিজের এক অন্তের কাছ,  
 নিজের থেকে বেশি অন্তের কাছে, প্রমাণ  
 করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে অনেক কাজ  
 করেন ডায়রী। অথচ এটা খেল কবিত্বের  
 না প্রচুর প্রসঙ্গ "সুতিকা কবিত্বের"  
 (কাম্যাক্ষিপ্ৰকাশ) সম্প্রদায় যাচ্ছে।  
 সত্যময় হবল হবল। রবীন্দ্রনাথ বা

যেক্টর মতো শাস্যামল সকলে নন।  
 ভাস্কর সুরকার প্রদর্শনীতে একর  
 অনেকালি সাদা কালো অঙ্কন ছিল  
 (২১-২৭ জানুয়ারী আকাদেমী অব  
 ফাইন আর্টস)। মূলত ভাস্কর তিন  
 এবং গড় কিছুকাল প্রতি চার-ছ মাসে  
 প্রদর্শনী করতেন। তার ভাস্কর্যে প্রচুর  
 শব্দলিঙ্গ দেখে গেছে কবিও আর্ট পুরো  
 ওঠান।  
 এখানে প্রদর্শনীতে বহু সাদা কালো  
 অঙ্কন ছিল। তবে সব ছবিগুলোই যেট  
 দশটা ছকের রকমের বলা যেতে পারে।  
 অধিকাংশ কাজেই পুনরাবৃত্তি। ত.পসের  
 অঙ্কন মানুষ বা ঠিক ক মানুষ  
 পাশাপাশি রাখা এক অটপাশে বঁধা।  
 পরস্পর সংস্পর্শে উভরই বিশদ এবং  
 বিচারগত। পরিবেশটা ফেন অবিরকী  
 এক মতচ্ছন্ন। কিছু কাল হলো প্রমা-  
 সিন্থ কালতবকে সামান্য ফিকৃত করে পট  
 ছাঙ্কির ক। শব্দ হয়েছে। এক সফল  
 ডাল, মাকস আনন্ট, যেনে মাত্রাটের  
 সেলো এদেশে সদ্যবাস্তক ছবি একেছেন,  
 অঁকছেন। তেমনি আঙ্ককাল মিলে থেকে  
 আর্শিল গোক এবং রস ওভারল্যাপ  
 পশুত শিল্পীদের ভারতীয় শাস্যামল  
 আসর জমতে চাইছেন। সঙ্গরগত নল,  
 নলবক (পাইপ বেন্ড), নাড়ুড়ি  
 চকড়ির মতো করে মানুষ মেয়েমানুষ  
 জড়-জানারকো সুপারিশিত হয়ে পড়ে  
 চাঁড়ির হয়। মান পারের থেকে এই  
 পারায় সঙ্গরগত। অলাক ভৌমক,  
 আদিতা কলা থেকে রোশাকনে ভাস্কর  
 সুরকার এদেশে এই পশ্চিমী খার  
 ভাষাথি হতে চাইছেন।  
 তাপস খুব মোটা আর সরু রেখার  
 কাটকুট, কার কার রেখার কারকু  
 এক হারাকির দিয়ে পটে ধড়কোর  
 জাল পেতেছেন। মোটামুটি মাঝ বরাবর  
 অবরকট রেখাছেন। এই টটাফাটা  
 মানুষ, জন্তু, অ্যামবাসদৃশ হার যন্ত্রের  
 সঙ্গে দুমড়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি  
 জয়গালো সাদা। মধ্যস্থানে বস্তু বা  
 জীবের সমাবেশ। কিন্তু প্রথমে  
 নির্মিতির কোন সমস্যা এতে নেই। কারণ  
 মাঝ থেকে অব্যবহিক সুরের পলে  
 বেলে রচনাকে জমাবার চেষ্টা করেননি।  
 ফলে রচনার ছকটার মধ্যে একঘেরেই  
 এসেছে। দ্বিতীয়ত যে কোন ছবি মূলত  
 মাঝা এবং সরলরেখা। সম্মতি এক বস্তু  
 রেখার আমদানি হলে সেক্ষেত্রে সামঞ্জস্য  
 আনবার জন্য অন্য বস্তুকে রেখা এনে  
 ভারসাম্য আনতে হয়। রঙীন হোক বা  
 এক রঙাই হোক ছবি এক অক্ষর রাখা  
 দড় খেলা মতো শব্দই, তিন খোলা  
 দুটি রেখা সংযোগে কোণ তৈরি করে-  
 ছেন সেখান তরসাম জাখার জন্য অন্ত  
 অনরূপ কিছু করেনি। ফলে খেঁচ  
 তৈরী হয়েছে। এই সামঞ্জস্য না রাখার  
 জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে ছবির রচনার  
 আভ্যন্তরীণ ক্ষতি হয়েছে। কৃত্রিমত তার  
 ছবি। আকেন আমাদার নাসদচতনর  
 কাছ লাগা বরং অবচেতনের গহন  
 গহীর দিকে হাত বাড়িয়ে দেন তিনি।  
 অথচ তাপস সুরকারের কাছের প্রতি  
 নিষ্ঠা এক প্রেম আছে। ডব্লু বর  
 মালমার্ট দম্পত্য কল হাত গটিকে  
 বসে না থেকে রেখাচিত্র অঁকতে খার  
 করে দেন। পরে প। প্রদর্শনী কর  
 রাতারাতি নাম করার শর্ত না করে তার

"আডভেচার বই-এরই বিক্রি সবসময় ওপরে"  
 বই-মেলা প্রসঙ্গে বলেছেন দেশ (১২ এপ্রিল ১৯৮০)

৮০ র বই মেলায় বিশ্বোদগম ঘটিয়েছে প্রবীর ঘোষ সম্পাদিত

## অ্যাডভেচার

বিশ্ব কাঁপানো ১২টি দুর্ধর্ষ দুঃসাহসিক সত্যি ঘটনা লিখেছেন ১২জন  
 প্রখ্যাত সাংবাদিক; বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ঘটনার তথ্য  
 সংগ্রহ করে। ছাপা হয়েছে বহু দৃষ্টান্ত ছবি। ভারতীয় সাহিত্যে  
 এই ধরনের প্রয়াস এই প্রথম। ছোট-বড় সকলের দারুণ ভাল-  
 লাগার মতো বই। মূল্য টাকা।

## আগাথা ক্রিস্টির আয়না জায়ে

অনুবাদ : অরুণ বাগচী

অসাধারণ রহস্য উপন্যাসের অনবদ্য অনুবাদ যা দেবে মূল  
 উপন্যাসের অনুপম স্বাদ। চোখ টাকা।

## আগাথা ক্রিস্টির শেষ দৃশ্য

অনুবাদ : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আগাথা ক্রিস্টির শ্রেষ্ঠতম রহস্য উপন্যাসের অসাধারণ অনুবাদ,  
 যা পড়ে পাবেন মূল উপন্যাস পড়ার আনন্দ। মূল্য টাকা।

বইয়ের পুরো দাম পাঠালে রেজিস্ট্রি খরচ বহন করা হয়।

প্রান্তিক প্রকাশনী ॥ ৯৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-৭

জানতপন্থী, বহুভাষাবিদ  
 পণ্ডিত অমলাচরণ বিশ্বাক্ষয়ের [ সত্য প্রকাশিত ]

## বাঙলার প্রথম ২০'০০

বাঙলার প্রথম : বাঙলা ব্যাকরণ / বাঙলা অভিধান / ইউ-  
 রোপীয়দের ছাপা বাঙলা গ্রন্থ / ইংরেজী ও বাঙলা সম্বন্ধপত্র /  
 সচিত্র পুস্তক/ছাপার ব্যাকরণ / মৃত্যুযন্ত্র / কাশীরম্যাসের মহাভারত /  
 রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতি বিষয়ে জানতে হলে অপরিহার্য এই মূল্যবান আকর  
 গ্রন্থটি। বিশ্বাক্ষর মহাশয়ের গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনার সংকলন।  
 অমলাচরণের জীবনকথা ও সাহিত্যকীর্তি সম্বন্ধে আলোচনাসহ  
 গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন প্রখ্যাত গবেষক ডঃ অতুল সূর।

চিত্ররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের [ সত্য প্রকাশিত ]

## দুইয়ের বই ৩০'০০

বিশ্বের বিরাট এক গ্রন্থজগৎ একটি গ্রন্থে প্রতিফলিত। এমন  
 বিচিত্র এবং সাধক সংকলন বাংলায় আর কখনো হয়নি।

প্রখ্যাত গবেষক ডঃ অতুল সূরের [ সত্য প্রকাশিত ]

## বাঙলা ও বাঙালী

বাঙালীর ধর্মীয় চেতনা, বাঙালীর সভ্যতার ইতিহাস, বাঙালীর  
 লৌকিক জীবন, ব্যবসারী-বাঙালীর ঐতিহ্য ইত্যাদি নিয়ে বাঙালী  
 জাতির দর্পণ এই গবেষণা গ্রন্থ। ২০'০০

শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষের [ সত্য প্রকাশিত ]

## সাহিত্যিক কোতুকী

বিদ্যাসাগর / মাইকেল / বাঁকমচন্দ্র / রবীন্দ্রনাথ / অক্ষয়চন্দ্র সুরকার/  
 নবীনচন্দ্র সেন / রজনীকান্ত সেন / বিশ্বরত্ন গুপ্ত / শরৎচন্দ্র চট্টো-  
 পায়ের প্রমুখ সাহিত্যিকদের জীবনের কৌতুককর ঘটনা। ১২'০০

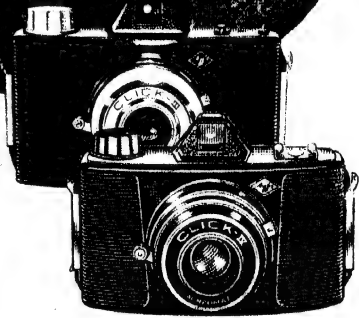
সাহিত্যালোক ৩২/৭ বিভূষণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রতিটি মুহূর্তই  
প্রাণী জীবনে ভরা  
সঙ্গে যদি থাকে  
আগফা-গেভার্ট  
ক্যামেরা!



পিকনিক, পার্টি, জন্মদিন, ছুটিতে ভ্রমণ, সবেই আনন্দঘন মুহূর্তগুলি আগফা-ক্লিক ক্যামেরায় ধরে রাখুন। এত কম দামে এত অপার আনন্দ, আপনি কম্পনা করতেও পারবেন না। এই আনন্দদায়ক সুবিধেজনক 'ক্লিক' সর্বদা সঙ্গে রাখুন। আপনার নিকটতম আগফা-গেভার্ট ডীলারের কাছে এখনই চলে আসুন।

পরিবেশক :  
আগফা-গেভার্ট ইণ্ডিয়া লিমিটেড,  
রেজিস্টার্ড অফিস :  
মার্চেন্ট চেম্বার,  
৩১, নিউ মেরিন লাইন্স,  
বম্বে ৪০০ ০২০



লেখামাত্রই ছবি তোলা যায়



ক্লিক III আর ক্লিক IV

Ⓢ ফোটোগ্রাফ সম্বন্ধীয় ব্যবসায়ী উৎপাদনের প্রজ্ঞাপকর্তা আগফা-গেভার্ট, অ্যানটওয়ার্প/লিভারকুসেন এর রেজিস্টার্ড।

SIMOE/AG/6/79 BEN

এক কন্যা আর নির্মিত লক্ষ্যে  
অপেক্ষা করে থাকা।  
লক্ষ্য পূরণ

মালোচনা, শিল্প সংক্রান্ত চলাচল

## জি টি রোড

১৯৭১-র ফিল্ম ফেষ্টিভালে  
দাঁড়িয়ে “কনভার্স” নামের একটি  
মার্কিনী ছবি দেখে ডেবোইলাম, এই  
বিষয় নিয়ে কোনো দিন না কোনো দিন  
একটি ভারতীয় চলচ্চিত্র তৈরি হবে,  
সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক কাঠামোতে এবং  
সম্ভবত হিন্দি ভাষাতে। সে-ছবিটির  
বিষয়বস্তু ছিলো আমেরিকান হাই-  
ওয়েতে ট্রাক ড্রাইভারদের জীবন এবং  
শেষ পর্যন্ত একস্প্লন্সরশনের  
বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে দাড়াবার  
সংকল্প। ভালো লেগেছিলো কনভার্স  
ছবিটির আগাগোড়া রুক্ষতা, এবং  
কেন্দ্রীয় চরিত্রটির বলিষ্ঠ অভিনয়।  
আমেরিকান হাইওয়েও হয়ে উঠেছিলো  
একটি অন্যতম চরিত্র। এবং ছবিটিকে  
পশ্চিৎ জুগিয়েছিলো ফটোগ্রাফ এবং  
ট্রিটমেন্ট-এর বাস্তবধর্মিতা। জি টি  
রোড ছবিটির কাহিনীতে এবং চিত্র-  
নাট্যে এই বাস্তববোধের অভাবই  
সবচেয়ে বেশী ছবিটি বিষয়ে বিমূর্খ  
করে তোলে আমাদের।



রুম্মিক রায়

কলকাতা-বাণীগঞ্জ রুটে ট্রাক-  
ড্রাইভার যোগীন্দর সিং হঠাৎ একদিন  
সোহাগীর দেখা পায় জি টি রোডে।  
প্রাতিদিনের পথই এই ট্রাক ড্রাইভার-  
এর প্রেমিকা হতে পারতো। এবং  
হাইওয়ে ড্রাইভিং-এর বিবিধ সমস্যা  
এবং অভিজ্ঞতা থাকতে পারতো  
ছবিটির সবটুকু জুড়ে। যদি তাই  
থতো, তা হলে জি টি রোড  
নিঃসন্দেহে অশ্রুত বিষয়ের বিচারে  
একবারে বন্ধকে নতুন বলে গহীত  
হতো। কিন্তু বাংলা ছবির ফরমুলা  
থেকে অত সহজে মুক্তি কোথায়?  
সুতরাং জি টি রোডের ওপর ছাপিয়ে  
উঠলো সোহাগী। এবং চিরন্তন  
ফরমুলাকে অদ্যো একটু জোরদার  
করার জন্যে সোহাগীকে হতে হলো

সমস্যা নিঃসন্দেহে যোগীন্দরের  
একর সমস্যা। সে ট্রাকড্রাইভার না  
হলেও এই সমস্যা তার জীবনে আসতে  
পারতো। এবং এর পর কাহিনী বতাই  
এগুতে থাকে ততোই আমরা ছবিটির  
চূড়ান্ত সম্ভাবনা থেকে সরে যেতে  
থাকি। ক্রমশই আমরা বুঝতে পারি  
হাইওয়েতে ট্রাকড্রাইভিং-এর মধ্যে  
মূল বিষয়ের কোনো গভীর সংযোগ  
নেই। এবং ফলে ছবিটি ধীরে ধীরে  
হাইওয়ের গতি হারিয়ে ফেলে  
কন্ট্রোলভাবে মগ্ন হয়ে ওঠে।  
ফরমুলায় চাপে কাহিনী বিন্যাসও  
আড়ম্বল হয়ে যায়। এবং যোগীন্দর  
একটি শিশু সন্তানও জুড়িয়ে পায়  
জি টি রোড থেকে। এই পর্ব থেকে  
শুরু হয় জি টি রোডের রূপকথা।  
যোগীন্দর বারবানতা সোহাগী ও  
জুড়িয়ে পাওয়া সম্ভাবনাকে নিয়ে  
সংসার পতিত। এতেও বিশেষ কোনো  
সমস্যা দেখা যায় না, বতর্কণ না  
যোগীন্দর তার পুত্রের অন্নপ্রাশনের  
আয়োজন করে। পুনরুর্ভাস-এর  
প্রয়োচনায় যোগীন্দরকে অন্যান্য ট্রাক-  
ড্রাইভাররা একঘরে করে। পরে আবার  
যোগীন্দরের চাকরি গেলে এই সব  
ট্রাকড্রাইভাররা তাদের তুল বৃত্তে  
পেরে যোগীন্দরকে মদত দেয়। অর্থাৎ  
ছবিটি তার মূল কেন্দ্র থেকে সরে এসে  
একটি বানিয়ে-তোলা টেনশনকে মূল  
উপজীব্য করে নেয়। এবং ছবিটির  
শেষ পর্যায়ের বস্তাবটি তাই বিশ্বাস  
হয়ে উঠতে পারে না। ছবি এডিটিং  
আরো ছিমছাম হলে হতো ছবিটির  
গতি আর একটু বাড়তো। এ ছবিতে  
ভজন গানের কোনো প্রয়োজনই ছিলো  
না। এবং হাইওয়েতে ট্রাকড্রাইভিং-এর  
মতো একটি দুর্ভাগ্য বিষয় নিয়ে ছবি  
এরতে সাহস না পেয়ে পরিচালক কেন  
ক্রমশ একটি একঘেরে গল্পের মধ্যে  
সরে গেলেন বৃত্তে পারলাম না।  
ট্রাকড্রাইভার-এর ভূমিকায় শ্যামল  
ঘোষাল এবং সোহাগীর ভূমিকায়  
রুম্মিক রায় যথাবান অভিনয় করেছেন।  
রজন বন্দ্যোপাধ্যায়

## শাওন কো আনে দো

ঠেকো অভিজ্ঞতা শেষ পর্যন্ত  
টিকে থাকতে পারে না—এই কথা  
তুলে ধরার জন্যে এক গ্রাম্য গায়ককে  
নায়ক করা হয়েছে। সাধারণ হিন্দী  
ছবির প্যাটার্নে পরিকল্পিত এই  
কাহিনীতে (কৌজিতা: গ্রাহ হাম্মে  
রোজা) দেখা যায় রিজমোহন (অন্নি  
গোভিল) সহজাত সুকণ্ঠ গায়ক।  
জমিদার কন্যা চন্দ্রমুখী (জিন্সা  
ওরাহব) লখনৌতে বিদ্যাজন দেখে না  
বছর পরে গ্রামে ফিরে বাল্যবান্দ  
রিজমোহনের গান শনেই তার প্রেমে  
মারজ। চন্দ্রমুখী রিজমোহনকে গানের  
মারজকে ক্ষেত্রোড়া শ্রীতির স্বপ্ন  
দেখায়। অসিত রিজমোহন চন্দ্রমুখীর  
পিতার (অম্বিক পুরি) কাছে ওদের  
বিবাহের প্রস্তাব করলো। মামলার দায়  
অনন জমিদারী তথা অর্থমর্যাদা বেতে  
কলকাতা চন্দ্রমুখীর পিতা কেশব  
আজিজতোর কথা শিনের রিজমোহনকে  
প্রত্যাখ্যান করলো। সহপাঠিনী লখনৌ-

স্বাক্ষরিতা প্রকাশনীর গবেষণামূলক উপন্যাস বেকুল  
রুণু বাগচীর

## আহত তরঙ্গ

ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতে ব্যবহৃত শব্দের সাহায্যে মস্তিষ্কের জটিল  
অপারেশন। শব্দ তরঙ্গের এক নতুন দিক। আগামী দিনের  
চিকিৎসা শাস্ত্রে নবতম সংযোজন, যা এখন আর উপমা  
সামান্য কিছন নেই। তাকে ভাষা আর বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে  
সমৃদ্ধ করেছেন বেশ কিছু সঙ্গীতজ্ঞ চিকিৎসক আর শিল্পী।

একে তাই সম্পূর্ণ গবেষণামূলক উপন্যাস বলাই জেয়।

### প্রাপ্তিস্থান :

গান্ধী মেমোরিয়াল কমিটি

৫২বি, চৌরঙ্গী রোড

কলিকাতা-২০

দেবু বুক ষ্টোর

১৩, বঙ্গিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রিট

কলিকাতা-৭৩

দত্ত চৌধুরী এণ্ড সন্স

এম/টি ৭২এ, কলেজস্ট্রিট মার্কেট

কলিকাতা-৭

শরৎ বুক হাউস

শ্রীমাতারন মে ষ্ট্রিট

কলিকাতা-৭৩

সর্বোত্তম বুক ষ্টল

হাওড়া ষ্টেশন

তু'থও ৪৫ টাকার বই ২৫ টাকায় সংগ্রহ করুন

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও অধ্যাপক রুদ্র সম্পাদিত

## শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ

## গোয়েন্দা কাহিনী

শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কাহিনী

শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ রোমাঞ্চকর গল্প

শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ হাসির গল্প

প্রধান উপদেষ্টা ও ভূমিকা—প্রমথ নাথ বিনী

প্রধান সম্পাদক—তুষার কান্তি পাণ্ডে এম. এ. (ডবল)

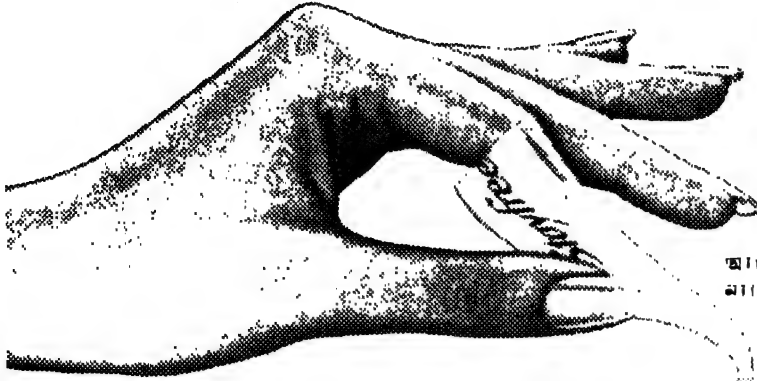
গত দুই শতকের শ্রেষ্ঠ লেখকদের শ্রেষ্ঠ গল্পের সামগ্রিক সংকলন।  
বিদ্যাসাগর হতে আজিকার সজীব চণ্ডীপাখ্যায় পন্থ হাতির গল্পের  
সুত্রহণ সচিৎ ও শোভন গ্রন্থ। স্বাভাবিক বাস্তবিক চিত্রনাট্যের  
অসংখ্য উজ্জ্বল ছবি সহ ২৫শে বৈশাখ প্রকাশিত হয়েছে। দাম্য  
কাগজে সচিৎ জাকেটে মোড়া।

আজই গ্রাহক হোন। আগামী দুই সপ্তাহ সীমিত সংখ্যক গ্রাহক  
করা হবে। গ্রন্থ প্রতি ১০ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন। ডাকেও  
করা হবে।

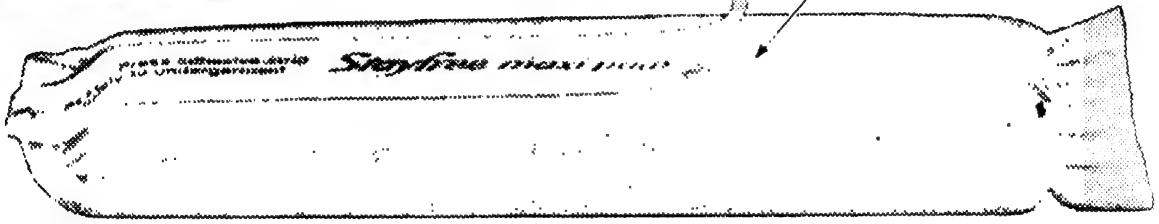
প্রচ্ছদে ১১ চবি কমেজ রো, কলিকাতা-৩

# তরুণ স্ট্রীফ্রি বেল্টবিহীন ত্যাগকৃত!

OBM 1638 R-B



আপনি যদি স্ট্রীফ্রি আপনাদের আটসাঁট প্যাঙ্কিটে  
ন্যাপকিনকে জায়গামত দৃঢ়ভাবে ধরে রাখেন।



ফাঁস তেঁয়ে, বেল্ট তেঁয়ে, পিন বা দড়ির অঙ্কিত ত্যাগকৃত তেঁয়ে।  
রত্নাতি তির্কস্মাট রত্ন চাত রত্নাতিয়ে রত্নত,  
রত্নাতি সূর্যস্নাত অত্যাঙ্গত রত্নাতিয়ে গাত্তত।

আপনি যদি এমন মহিলা হন, যিনি  
জীবনের প্রতিটি দিনের আনন্দ উপভোগ  
করতে চান তাহলে আপনার সঙ্গে  
পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি একটি অসাধারণ  
জিনিষের: স্ট্রীফ্রি বেল্টবিহীন  
স্যানিটারী ন্যাপকিন।

যতখানি নির্ঝঞ্ঝাট হতে চান  
ততখানিই হবেন

ফাঁস বা বেল্ট, পিন বা দড়ির অঙ্কিত  
পোয়াবার দিন আর নেই।  
ন্যাপকিন সঠিক জায়গায় রাখার জন্যে  
স্ট্রীফ্রিতে তার নিজস্ব একটি অ্যাডেসিভ  
স্ট্রীপ আছে। আপনারা শুধু আপনার  
আটসাঁট প্যাঙ্কির ভেতরে ওটি আটকে  
নিতে হবে। আর তারপর দেখুন যতক্ষণ  
না আপনি নিজে ওটি সরাজেন কেমন  
থাপেথাপে সুরক্ষিতভাবে আটকে থাকে!

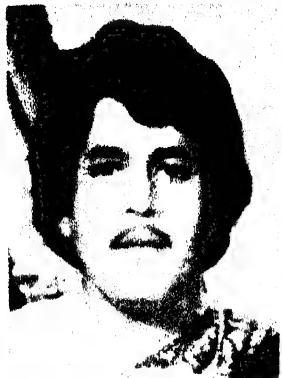


স্ট্রীফ্রি ন্যাপকিন ব্যবহার করে  
আপনি যেমন শুলী পোশাক পরেন-যা শুলী  
করুন ওটি তার যথাস্থানে চলেবে।

যতখানি স্বরক্ষার অয়োজন  
ততখানিই পাবেন

নিশ্চিতভাবে আপনার প্রয়োজনীয়  
সুরক্ষা দেওয়ার জন্যেই স্ট্রীফ্রি  
বিশেষভাবে ডিজাইন করা। অসিক  
শেষ কমতায়ুত ভেতরের স্তর  
ভেতরের আর্দ্রতা শুষে নেয়, আর  
ন্যাপকিনের তলা ও ধার ঘিরে যে  
ও-মুখী প্রাক্টিকের শীল্ড তা দাগ লাগা  
নিবারণ করে। আজই এক প্যাকেট  
কিনুন আর আবিষ্কার করুন বেল্টবিহীন  
স্বাধীনতা। একবার ব্যবহার করলে  
আর কখনও ফাঁস বা বেল্ট, পিন বা  
দড়ির অঙ্কিতে যেতে চাইবেন না।

বাঙ্গালী কবিজগৎ (সাহিত্য জগৎ) সর্বদা বোণাবোণ করে চলেছে। জনসাধারণের গায়ক রিক্সমোহনে কখনো এই সুরেই রিক্সমোহন আকর্ষণীয় গাইবার সযোগ পায়। সর্বদা রিক্সমোহন বিভিন্ন ওপদাদের কাছে উচ্চাঙ্গ সম্প্রদায়ের চর্চায় বৃত্ত হয়। রিক্সমোহন তার জীবিত এক প্রভুত অর্থ লাভ করে এর পর ছাত্রসংগে জড়িয়ে পড়ে রিক্সমোহনের জামাতা রূপে করণ করার জাগ্রত হিসেবে।



জনিত গৌড়াল

কাহিনীর বিন্যাস পরিচালক কনক মিশ্র মৌলিক কোন শিল্পচর্চার পাকড়া দিতে পারেন নি কোন সচেতন। এবং রিক্সমোহন ও চন্দ্রমখীর অসা-আকর্ষণ ও মানসিক সংঘাত কল্পিত করে করে স্বপ্নের দৃশ্য উপস্থাপন চিত্রের ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত পাকড়। অথবা একটা স্বীকার করতে হবে যে পরিচালক আর যাই হোক ছবিখানি পিতৃস্বপ্ন রাখতে পেরেছেন। সচেতন হা ছিল ছবির ক্ষেত্রে চোখে পড় না। এ ছাড়া ছবিখানির বিশেষ সম্পদ রাজ-কমলার সর্বস্বজনীনতা যেসুহাস, বংশপাল সিং, আনন্দকুমার ও সলকুয়া পণ্ডিতের গাওয়া গানগুলি। পক্ষ এক চুঁকি তালের গানবাজার রাসাশ্রিত এ-ছবি সঙ্গীত গানগলি দশকদের অবশ্যই ভাল লাগবে। ভাল লাগবে অতীত গৌড়াল জাতি ওয়াহকের অভিনয়। রামচন্দ্রের কামোজা দৃষ্টিকে তৃপ্ত করার মত দশা পরিবেশনেও সক্ষম হয়েছে।

পক্ষক দত্ত

প্রাচীন/শিল্প সংগ্রহ সংগীত

ডোভার লেন সংগীত সম্মেলন

এ বছর ডোভার লেন সংগীত সম্মেলনের (সিংহী পাবলিশ, জানুয়ারি ২৪-২৬) তিন প্রধান শিল্পী ছিলেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর, নিখিল বাম্ভা-পাথায় ও আমজাদ আলী খাঁ। এরা তিনে পণ্ডিত যমরাজ, হরিপ্রসাদ চৌধুরী, অশীষ খাঁ, পরভিন সুলতানা ও সমরেশ চৌধুরী। দ্বিতীয় ও শেষ অনুষ্ঠান ছিল রাতিবাণী।

পণ্ডিত রবিশঙ্কর প্রথম বাঁটা-বাণী অনুষ্ঠানের শেষ শিল্পী ছিলেন এবং রাত তিনটে বেজে দশ মিনিট নাগাদ তাঁর প্রথম নিবন্ধন সুরচিত

করেন। নিজস্ব চেষ্টা প্রথমিক খণ্ড স্বরের মাধ্যমে তিনি রাগটির একটি সরল ও সুপরিচিত পরিভাষা করে জোড় ধরেন তের মিনিট পর। জোড়টি প্রথমধর্মের চেয়ে দ্বিতীয়ধর্মই শুনতে ভাল হয়েছিল এবং জোড়ের শেষে খালা বাজানো হয়নি। একটি রাগে দু'শক তালে নিবন্ধ গৎকারি শুরুর হয় তেহাই দিয়ে শেষ হওয়া দুইন ছন্দের কাজ দিয়ে এবং তবলা-বাদক জাকির হুসেন এগুলির দক্ষ জবাব দেন। এরপর শোনা যায় কিছু, চৌগাণী লয়কারি ও চতুসর তেহাই। অসাধারণ শিল্পবোধপূর্ণ লম্বা সাধ-সংগত দিয়ে গৎকারি শেষ হয়—মুই শিল্পী এরকম বোঝাপড়ার সংগে বাজাচ্ছিলেন যে মনে হচ্ছিল যেন পাশ্চাত্য সংগীতের 'স্কেয়ার' পড়া বাজনা।

তারপর শোনা যায় ভাটিয়ার রাগে বিলম্বিত তিনতাল ও দ্রুত একতাল গৎকারি। বিলম্বিত গানের প্রথমার্ধে শিল্পীর চরিত্রগত বাংলা লোকসঙ্গীতের স্বাদ মেলাতো। বিস্তারের কাজ (দ্যাদ ট কিং) ভাটিয়ারের কোন কঠোরগত পরি-বর্তন না করেই আনা হয়। এবং সুরের ভরপুর ছন্দের কাজ ছিল। দ্বিতীয়ধর্ম ছিল দক্ষ বোল-অঙ্গের তান-তোড়া। দ্রুত গতে ছিল একটি প্রবীর বোল-পংগ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ খালার কাজ। মিশ্র ভৈরবীতে আওচার এবং জমজমাট দ্রুত ও অতি দ্রুত গৎকারি দিয়ে রবিশঙ্কর বৈঠক শেষ করেন সকল সাতটা নাগায়।

এই রাতের অনুষ্ঠান শুরুর হয় আলী আকবর খাঁর জেষ্ঠ পুত্র আশীষ খাঁর সরাসরি বাদন দিয়ে। ইনি বাজান বাগেরী রাগে আলাপ ও জোড় এবং ক্রিষ্ণেটি রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত তিনতাল গৎ। এর বাজনা অনেক দিন পরে শুনলাম এবং সব দিক থেকেই খানিকটা উন্নতি দেখলাম। ভাল লেগেছে বিশেষ করে ছন্দের কাজ তেহাই-এর কাজ সাধ-সংগত এবং বিস্তার অংশে সরোদের আওয়াজ। ভাল লাগলি ক্রিষ্ণেটিতে রাগেরী গ ম র গ (এক সময়গায় গ ম র গ ব স গ ম) প্রয়োগ, বোল-অঙ্গের কাজে ক'লতা, কিছু কিছু তানে বেসুর পদার্থ ও একবার অতিভার সপ্তকর ও উপরে যাওয়ার বাধা প্রচেষ্টা (খাল বা চর্মাচ্ছাদনের উপর আঙুল লাগিয়ে)। জাকির হুসেনের তবলা-সংগত অনবদ্য হয়েছিল। তাঁর শিল্পবোধপূর্ণ কায়দা বোলা জবাব, সাধ সংগত এবং খালার ছন্দ-ম-ফক প্রকা ও সন অনযয়ী বয়ব আওয়াজ —ম-গ ও স এই তিনটি ধর তিনি বয়্যে থেকে পরিষ্কারভাবে বাস করে ছিলেন—প্রমাণ করে মিল না তিন তবল বয়সই একজন প্রথম স্তরের সংগতকার।

এরপর শোনা যায় তবল গায়ক সমরেশ চৌধুরীস দ্বাবাদী কনডা। রাগে বিলম্বিত কুমলা দ্রুত তিনতাল ও দ্রুত একতাল খেয়াল। আমীর খাঁ ও বড়ে গলাম আলীর গায়নশৈলী

উৎসব উদ্‌যাপন অনুষ্ঠিত

অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলীন-এর

## বেয়ার আইল্যান্ড

প্রকাশিত হল হেডলী চেজ-এর চেয়েও দুরন্ত সাসসেন্স থ্রিলার

বাবু মুখোপাধ্যায় অনুদিত রিচার্ড ডেমিং-এর

## কীট বিদ্ধ গোলাপ

বাংলায় এ যাবৎ অপ্রকাশিত কাহিনী

ফুল ডেমিং-এর

## আমাজনের উজানে

(Eight Hundred Leagues on the Amazon)

অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলীন-এর

লাস্ট ফ্রন্টিয়ার

জয়ন্ত দত্ত

ড্রাগনের মুখে ক্রস লী ৭, সানি গাভাসকার ১১

## বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রেমের উপন্যাস

১ম খণ্ড প্রকাশিত হল। মোট আট খণ্ডে প্রকাশিতব্য।

প্রতি খণ্ডের মূল্য : ২৫/- গ্রাহক মূল্য : ২০/-

মুদ্রার কল্যাণ ৯৭ শীতলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৫

জ্ঞানপীঠ বিজয়িনী—

## আশাপূর্ণা দেবীর রচনা সম্ভার

(খণ্ডে খণ্ডে বাহির হইতেছে)

প্রথম—২০.০০ দ্বিতীয়—২০.০০ তৃতীয়—২২.০০

চতুর্থ—২৫.০০ পঞ্চম—২৮.০০ ষষ্ঠ খণ্ড (যন্ত্রস্থ)

প্রকাশিত ৫টি খণ্ডে—প্রথম প্রতিষ্ঠিত, সুবর্ণলতা ছাড়াও অনেকগুলি বড়, ছোট উপন্যাস এবং বড় ও ছোট গল্প আছে।

বীরভঙ্গ-এর ভাণ্ডার বন কাঁদছে—৯.০০

[ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণে এটি একটি রোমাটিক উপন্যাস, মহুরাকীর তীরবর্তী ভাণ্ডারবন এই কাহিনীর উৎসসূত্র।]

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়-এর

স্বরূপ মণ্ডলের সব কথা—২০.০০

অখ্যাত ঔপন্যাসিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র-এর

বড়, ছোট এবং মাঝারি—১২.০০

(বৃহৎ অমনিবাস)

মফস্বল ও কলিকাতার সম্ভার পুস্তকালয়ে, দিল্লীতে ইন্টার পাবলিশার্স ও ডিস্ট্রিবিউটার্স, গোলমার্কেটে পাওয়া যায়।

জি. ভরদ্বাজ অ্যান্ড কোং ; ২২/এ কলেজ রো, কলিকাতা-২



ত্বকের অধিক সমস্ত পরিচর্যা...  
অধিক স্বাস্থ্যোজ্জ্বলতার জন্যে—  
নিকো ঔষধিযুক্ত সাবান



নিকো মেডিকেটেড সাবান রাখুন।  
রোজ আপনার ত্বকের যে সমস্ত  
পরিচর্যা করকার— তা পাবেন  
নিকোর কাছে। কারণ নিকো হল  
ঔষধিযুক্ত সাবান। যে কোনো  
সাধারণ সাবানের চেয়ে এটি আপনার  
ত্বকের অনেক বেশী বড় মের। নিকোর  
মোলায়েম ফেনা। আপনার ত্বক থেকে  
সমস্ত ময়লা পরিষ্কার করে ত্বকে  
কবে তোলেন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল—  
যেখান একদম তরতাজা।

**NEKO®**

আসল  
ঔষধিযুক্ত সাবান

পার্ক ডেভিস  
এর একটি উৎপাদন



® — Regd. Trade Mark — Regd. Users — Parke Davis (India) Limited, Sakinaka, Bombay 400072.

JAISONS PD 180 BEN

শিল্পের এক সীলিকা ঢঙে শিল্পী নব্বের  
মুঠে, বিস্তার কলনের। চিত্র সরসর,  
রক সম্পদ সঙ্গর উদ্য ও আকার  
নিগলি উদ্ভাষণের চরিত্রিক।

যেখানে বেশিব ভাগ গায়ক  
বিশেষ করে ককেজন গায়িকা)  
চিত্রের সঙ্গকের হৃৎপি অর্ধেক পায়  
জা কবে কেবল হাততালি পাওয়ার  
নাই কয়েকবার লগনি, সেখানে এই  
শিল্পীর কাছে তার সঙ্গকের পদম ও  
চিত্রের হৃৎপি তিন সঙ্গকবাপী তানেব  
য়মিত ও স্বাভাবিক অংশ।  
শিল্পীর তুণে উঠছিল দ্রুত তিন-  
ল খেলালিতে। দ্রুত একতাল  
য়েলটিতে পাতাভার আত্মদ্রুত  
মন্ত্রম ও নজাকৎ-সলামৎ দ্রুত  
পদ তানই ছিল বেশি। স্বগীয়  
সত্যদ আমীর খাঁ জীবনের শেষে যে  
গতি রচনা করেছিলেন কিন্তু নাম-  
রণের সময় পাননি (স গ জ প গ)  
যে যেটিকে আজকাল আমীরখানি  
না হয় সেই রাগে একটি খেলায়  
য়ে শিল্পী ওর অসর শেষ করেন।  
এপর ছিল বানী কারনার নাচ।



শিল্পকর

সম্মেলনের প্রথম সঞ্চায় ছিল  
খিল বন্দোপাধ্যায়ের সতার বাদন  
এং সুখা পান্ডের নৃত্য। নিখিল  
বন্দোপাধ্যায় শামকরণ রাগে আলাপ,  
গড় ও কালা বাজিয়ে তার বৈঠক  
বু করেন। নারায়ণের মত সঙ্গকে  
নিট দুয়েক কলাগ অংশের কাজ ও  
বতের উপযুক্ত বহরার করে রাগের  
ব্রহ্মগতিক শৃঙ্খল সঙ্গ-এর উত্তরগ  
কে কড়াব পুঙ্খ কবতে হয় তা  
খিয় দায় শিল্পী খাদের তরে নেমে  
লেন। খাদের তরে শোনা গেল  
জ প, নি ধ প অংশের বিদম্ব ও  
লপ্যবোধপূর্ণ বিশ্লেষণ। নারায়  
রে পূর্বোক্তের বিশ্লেষণের কাজকে  
লভ করে তুলেছিল। অনঙ্গমায়ী  
প্রগতি এবং অন্তরায় হাওয়ার  
গে ছিল কিছু অশিষ্ট ন-গ  
গতিবদ্ধ কাজ। দীঘ বেশের  
মজ্ঞে ও লম্বা মীড়ে ভরপুর ছিল  
জাপটি।

কুড় মিনিট আলাপের পর  
শিল্পী ধরলেন মধ্যায় জড় এবং

শ্রোতার লাড়, হসক ও হুচের ফলক  
ছুটলে ঘন মীড়-লগেট সমৃদ্ধ  
স্বরপ্রগতির পটভূমিকা থেকে। এরপর  
ওস্তাদী কায়দর বহু গান্ধারহীম  
নকশা বাজানোর পর ন-প সমৃদ্ধ।  
মাধ্যমে গান্ধারটি লাগিয়ে প্রোতার মনে  
একই স্নেহ তৃপ্তি ও বিম্বয় জাগানো  
হয়েছিল। আর বহু স্বরসংগতির মধ্যে  
কি অশিষ্ট শিল্পবোধ : প ন জ প  
প ন গ। একজন শিল্পীর কথা বার  
বার মনে পড়ছিল—স্বগীয় ওস্তাদ  
আমীর খাঁ। এঁর গানে এরকম  
জিনিস পাওয়া যেত।

দ্রুত জোড়ের অতি সুপরি-  
কম্পিত গমক, লাড় ও বোল-অংশের  
তানেও ছিল এই ধরনের স্বর-  
সংগতির প্রয়োগ এবং শেষের উল্টা  
কালার কাজে ছিল অসাধারণ বোল  
ও ছন্দ-বৈচিত্র্য।

বিলম্বিত তিনতাল গংটি ছিল  
খোয়াল অংশের শৃঙ্খল কলাপ অর্থাৎ  
যাতে নিষাদ ও তাঁর মধ্যমের বহু-  
প্রয়োগ হয়। তবে যদিও সাধারণত এই  
ধরনের শৃঙ্খল কলাগকে খোয়ালঅংশীয়  
বলা হয় কিছু দ্রুতদের জায়গা বিশেষে  
নিষাদ ও মধ্যমের উপর যথেষ্ট জোর  
দেখা যায়। যেমন তানসেনের 'আনান্দ  
ত্রিপুরসন্দরী' মাতা' (স্বগীয়  
বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী এটি তাঁর  
'রাগসংগীত' নামক পুস্তকে প্রকাশ  
করেছেন) গানটির আভোগে দুই  
জায়গায় নিষাদকে পুরো (ঢিমে)  
একমাত্র ধরে রাখা হয়েছে। কাজেই  
নিখিল বন্দোপাধ্যায়ের নিষাদের  
বাহ্যবাহকে খোয়ালঅংশীয় বলাও বোধ  
হয় ঠিক নয়।

যা হোক শিল্পী অপেক্ষাকৃত  
প্রবল নিষাদস্বর কাজে নিষাদ-মধ্যম  
বিত্তিত কাজে যেমন গ প র এবং মীড়,  
কন বা কনতনের মাধ্যমে এই দুই  
স্বরশালকৃত কাজের এমন এক সমাবেশ  
ঘটালেন বিশ্লেষণের কাজে যে তাঁর  
গায়কপাণ্ডিত্য একটি অসাধারণ  
সম্পূর্ণতা তো এলই একটি নিজস্ব  
বিশিষ্ট ফর্টা উঠলো। গমক ও ছন্দ-  
পূর্ণ তোড়া অতি নিপুণভাবে বনে  
দেওয়া হয়েছিল বিশ্লেষণের কাজের  
মাধ্যমে। বহু ছন্দের কাজে ছন্দপূর্ণ তান,  
জোড় অংশের কাজে তেহাই ও তান-  
তেহাই সবার প্রয়োগ হয়েছিল অতি  
শিল্প সমৃদ্ধ এবং ফলোপাদক।  
জাকির হোসেনের তরঙ্গসংগত ছিল  
সংযমী এবং সমকালীন। ছোট করে  
বাজান দ্রুত তিনতাল গংকারিতে  
তানের লজ্জাও ভাল হয়েছিল।

তানের শাশর অবগ সম্পূর্ণ-  
ভাব খললে আমান আলীর লাগি  
লগন' গানটির ঢঙে রচিত হুসন্ধান  
বাগে দ্রুত তিনতাল গং বাজানার  
সময়। সপট মীড়খিড় ও গায়কী  
অংশের (মীড়ের কায়দায় টেনে  
বজানো) তানগালির যেমন ছিল  
কাঠামোগত উৎসাহতা তেমন ছিল  
পরিবেশনশৈলী। দ-একটি তান  
বজানত গিয়ে শিল্পীর হাত ফসকে  
গিয়েছিল বলে মনে পড়ত তবে এ  
সকল বাজনা যিনি বাজান তাঁর দ্বার  
সকল চান্দার হাত ফসকলেও কিছু  
খাম আসে না। বিলম্বিত অতিদ্রুত



## রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী সম্পদ

## কালকূট রচনা সমগ্র

প্রথম থেকে পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

প্রতি খণ্ডের মূল্য : ত্রিশ টাকা

মৌসুমী প্রকাশনী/১৭ কলেজ রো/কলকাতা-৯

বদরুদ্দীন উমর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ ৮০০

উনিশ শতকের আর্থ-সামাজিক পরিবেষ্টনীতে তৎকালীন  
বাঙলাদেশের প্রগতিশীল চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি  
ঈশ্বরচন্দ্রের সাফল্য ও ব্যর্থতার মার্কসবাদী মূল্যায়ন

লেখকের আর একটি বহু-বিত্তিকৃত বই

চিরস্থায়ী বন্ধোবন্ধে বাঙলাদেশের কৃষক ১০০০

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

ভোলগা থেকে গঙ্গা ১ম পর্ব : ২০০০  
২য় পর্ব : ৭০০

বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ কিম্বদেবে

দ্বিতীয় মুদ্রণ ১০০০

১০০০

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ইয়াসিনের কলকাতা ৫০০

মাদুরী ভাসায় লেখা কিশোরদের মন-মাতানে উপন্যাস

রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ ১২০০

সুভাষ সেন

VIEWS ON CINEMA 25.00

চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩

অনুবাদ সাহিত্যে এক ভাসাধারণ প্রকাশনা

একটি আশ্চর্য ট্রিলজী

# ক্রাইম গ্যাসন স্পাই

সম্পাদনা ও ভাষান্তর : শ্রীযুক্ত সেন

এতে আছে :- শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রহস্য লেখক জেমস হেডলী চেজের আকর্ষণ প্যাকড ক্রাইম থ্রীলার রঙ্গনভীর মৃত্যু রহস্য, বরগীয়া সাহিত্যিক সমরসেট মামের একমাত্র স্পাই কাহিনী অপারেশন সিক্রেট সার্ভিস ও মন রহস্যের সমরগীয়া রূপকার আলবার্তো মোরা-ভিয়ার দুরন্ত প্রেমের উপন্যাস শকুন সূখ। মনোরম প্রচ্ছদ শোভিত। দাম : ২৪ টাকা।

আঙতোষ মুখোপাধ্যায়	৥	মডেল	৭
নরেন্দ্রনাথ মিত্র	৥	পালঙ্ক	৮
কুশান বন্দ্যোপাধ্যায়	৥	ডালিং ডেন	১০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৥	চোখের বাহিরে	৫
নীহাররঞ্জন গুপ্ত	৥	সুভদ্রা হরণ	৬
প্রেমেন্দ্র মিত্র	৥	দ্বিতীয় জীবন	৭
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	৥	নবীন যৌবন	৬
আশা দেবী	৥	নির্জন দুপুর	৫
রমেন দাশ	৥	নজরুলের প্রেম	৮
তারাপ্রণব ব্রজচারী	৥	সেকি এলো ফিরে	৮
বাসুদেব বসু	৥	ডয়াল অরণ্যটা হতবাক	১২
চিরঞ্জীব ও শ্রীপাথ	৥	ফুটবলের আলবাম	৮
দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়	৥	জ্যোৎস্নায় অরণ্যে একা	
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	৥	নীলশূন্য	১০
জহর মুখোপাধ্যায়	৥	মেঘের কোলে রোদ	৫
বেদুইন	৥	বাংলায় এখায় জল ওখায় পানি	১৫
টোডরমল	৥	ভূমিরাজস্ব ও জরীপ	১৫
জরাসন্ধ	৥	নদীর এপার কহে	৮
নিশাচর	৥	সেই চোখ	৬
অবনী সাহা	৥	ক্ষেত্রজ	৬
চিরঞ্জীব সেন	৥	নাইটহুক	১০
ফ্রিজ লিবারের ভৌতিক এডগারএ্যালান পোর			
আদিম অভিশাপ ৪, ছায়া প্রতিমা ৪,			
আর্থার কোনান ডয়েলের ডেভিড সেলজ্যারের			
প্রেত পিশাচ ৪, শেষের সেদিন ৪			

প্রতিস্থান : সাহিত্য মন্দির, ৫৭/সি কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩

জ্যোতি প্রকাশন \* ২এ নবীন কুণ্ডলেন \* কলি-৯

ছিল বৈচিত্র্য।

বিরতির পর শ্রাবণ ঋতু মধ্যমাসে গায়ের মিতে আঁওকার ও মজার ভরণের রূপক তালে গৎ এবং আভোগি কানড়া রাগে উচ্চাঙ্গের তান-তোড়া ও ঝালা সমৃদ্ধ দ্রুত তিনতাল গৎ। স্রোতালের অনুরোধে মিশ্র ভৈরবীতে আওচার ও দায়রা গৎ বাজিয়ে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বৈঠক শেষ করেন রাত সাড়ে বারোটোর পর। কালাপর্বে জাকির হুসেন আশ্চর্য শিল্পবোধ ও দক্ষতার (যে বিশ্বর আগেও আলচনা করা হয়েছে) পরিচয় দিয়েছিলেন।

সরোদ শিল্পী আমজাদ আলী খাঁ ছিলেন স্বিতীয় এবং শেষ রাতি-বাপশী আসরের শেষ শিল্পী। তিনি প্রথমে বজিয়ে ছিলেন রামকোল রাগে আলোপ জোড়ি ঝালা ও তিনটি গৎ। বজা করে বাজানো আলোপটির (সাতাল মিনিট) প্রথম কয়েক মুহূর্তে নিষাদের উপর বেশি জোর দিয়ে ফেলা ছাড়া শিল্পীর রাগ রূপারগে কোন খুঁত ছিল না। যৈবৎ ও গান্ধারের প্রাতি চমৎকারভাবে লেগেছিল সব সময় গ্রন্থস্বর শ্রুত মধ্যমের উপর সব সময় যথার্থ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁর মধ্য ও কোমল নিষাদের প্রয়োগ ছিল সঠিক ও শিল্পবোধপূর্ণ। এই রাগের কয়েকটি পদ একটি চরিত্রগত সঙ্গিন আছে। আমজাদ আলী এই জিনিসটিও সঙ্গরভাবে কৃতিত্ব দিয়েছেন।

জোড়ের প্রথমার্ধে লাপট-গমকের পৈচান পথ থেকে কয়েকটি মীড় বড় সম্বরভাবে বেবিয়ে আসছিল। শ্রাবণীয়ার উচ্চাঙ্গের লড়িও দ্রুত গমকব কান ছিল। শেষের বোল-অগের ঝালা ও উল্টো ঝালা জম-জমাত হয়েছিল।

যাহেতু সর ও ছন্দের দিক থেকে রাগটিতে যা কিছু করা সম্ভব তা আলোপ ও জোড়েই হয়ে গিয়েছিল। তাই আমজাদ আলী তাঁর সংক্ষিপ্ত বিলম্বিত তিনতাল গংকারিতে জোর দিয়েছিলেন তনকারির উপর। কাজেই গংকারি মহুতর জনেও একঘেয়ে হয়নি—রামকোলির ক্ষেত্রে যে-কোন শিল্পীর পক্ষেই এটি একটি বিরূপ কৃতিত্ব। বোল-অগের তান, গমকতান এবং একহারা তান প্রত্যেকটিই উচ্চাঙ্গের হইছিল।

দ্রুত তিনতাল বংশধরটি উন সঙ্গ লাগি খেলাল গানটির ঢঙে রচিত হয়েছিল (ওস্তাদ ফৈয়াজ খান রেকর্ড) এই গানটিকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে) এবং শিল্পী যথাক্রমে ভালো দুনি তান, বোল-অগের কাজ এবং সাধ-সংগত পারবেশন করেন। শেষের লপাৎ সখের কাজট, দুঃখের বিষয়, সমে না পড়ে খাঁপাতে (নয় মাতার) পড়েছিল। লয়ের ক্ষেত্রে শিল্পীর এটিই বৈধ হয় প্রথম পদমূলন।

আত দ্রুত তিনতাল গংটি ছিল শিল্পীর পিতামহ ওস্তাদ নান্নে খাঁর রচনা এবং এতে ভাল বোলকারি ও ঝালা শোনা যায়। মাইকেফোনের গলদ



আমজাদ

সঙ্গেও কুমার বসু তাঁর নিজস্ব ও তবলা সংগত করেন—তাঁর বা কিশোর মহারাজ ও শাস্ত্রাপ্রসাদের ভাল জিনিস এবং খাশ বেন আগুন ছিল।

আমজাদ আলীর স্বিতীয় নি ছিল ডুপাল-টোড়ী রাগে কি আওচার ও দুই গৎ। আতা সরেলা হয়েছিল এবং ঝাপতাল গ প্রথমার্ধে একটি নিম্প্রাণ হ স্বিতীয়ার্ধে আনন্দদায়ক তানকারি বোল-অগের ছন্দের কাজ ছিল। একতাল গংকারিতে শিল্পী উচ্চা তান-তোড়া ও ঝালা বাজিয়ে ছি স্বরচিত 'ভাটিয়ালি' বাজিয়ে নি সম্মেলনের যবনিকা টেনে দেন। অংশে রাগমালা চঙে বৈরাগী ভৈরবীর কাজ ও বাজান হয়।



সরোদ শিল্পী

শেষ রাতের অন্য তিন ছিলেন পণ্ডিত যসরাজ হরি চৌরাসিয়া ও পরভিন মূল যসরাজ ছিলেন আসরের প্রথম এবং তাঁর বেহাগ-রাগে খেলাল মঙ্গল মড়িক ও সরগ বিস্তারের কাজ, ছন্দোময় সরগ গমক তানকারি ছিল। হুসেন আলী আদানায় দুটি রচনা গেয়ে তাঁর বৈঠক শেষ করেন।



শিল্পী বসন্তরঞ্জন

বংশীবাদক চৌরাসিমার কর্ণাটক রাগ হেমশতীতে আওচার, জোড় ও রূপকতাল গথ বেশ সুপারকম্পিত ও আনন্দদায়ক হয়েছিল। জোড়টিতে তার উল্লসকারী বোল-অঙ্গের কাজ ফোটানোর আশ্চর্য ক্ষমতা লুক করল। দেশরাগে আওচারটি একটু একধারে এবং নাটকীয় লেগেছে। এই রাগে মধ্য-মৃত তিনতাল ও অতিমৃত তিনতাল গংগলিও বিশেষ ভাল হয় নি। তিনি প্রায়ই প ম র স ন প দ ব্যবহার করে সারং-এর ভাব এনে ফেলছিলেন। কয়েকবার তালক কামোদের র প ম গ র গ স ন প দও শোনা গিয়েছিল। এই টুটিগুলি তান ও বিস্তার দুইই ছিল। অতি মৃত

র প ম গ-প-স র-এ রকম হুগে বেশ রাগের গতে থাকে বিশ্বকর।

পরভিন্দ সুলতানার বৈঠকের প্রথম অংশ (বাগেট্টী রাগি খেরাল) বানিবাবু কারণে শুনতে পারিনি। শ্রিতীর অপ্শব কৌশল-কানাড়া রাগে খেরালে বিস্তারের কাজ প্রাথমিক প্রণয়ি বাল মনে হ'য়েছে এবং তানে প্রায়ই সরু কম লেগেছে। একটি গজল চ'ত্তর ঠ'হনী গোক তিনি শেষে 'ভাবানী ময়ানী' ভৈববী সাদরটি গজল, তখন ও রাগমালার চকু গাইলেন। নীলাক্ষ গজ

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি নাটক

### পড়ার খেলা : খেলার পড়া

অক্ষিতী একর ছোটদের নিয়ে আসরে এলেন। নিমেষক আসিত চট্টো-পাখ্যায়ক কুতব তান বয়েলটাকে ক'মরে এনে শিশুদের সাথে মিশে ছেতে পেরেছেন। রবীন্দ্র সদনে সৌন্দর্য শিশুরা নিজদের খেলায় ব'শীত মেরে উঠে-ছিল। কিশলয়ের তিন ট ভাগের তিনটি আখ্যান অকল্পনে তিন ট ছোট নৃত্যনাট্যে রূপ ও সুর দিয়েছেন জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। কয়েক দিন আগেই হয়ত প'চকে শল্লপীয়া পরীক্ষা দিয়েছে। তারা কি তখন ভেবেছে পড়ার মধ্যে এত মজা ছিল, মজার সঙ্গে এত খেলা ছিল?

সাময়ান্য নৃত্যনাট্যে চলচ্চিত্রের



মত বর-বউ-এর আসা, সত্যর আসার ক্ষুদ্র পাল্যকরের বে বিদম্ব ভাবনা ছিল, শিশুশিল্পীরা সেটা সহজ করে নেয় অবলীলয়। কড়ার কবুতে গেলে নানা রকম আগেকের কথা ভাবা হত—কারিগরি হত, কিন্তু শিশুরা যেন আর ভাই খানিকটা খেলেন। এই ভাব নিয়ে অভিনয় করতে আসার সহজে জমে গেল। গরব ম'টর সার্কাসের দৃশ্য কত সহজে হ'য়েছে তুলে গেল—হ'য়েছে। কড়ার মত অনায়াসে। তুলনার ব'ড়ারি কোটো' কম

নাম করাছ না, তবে কড়া প্রাপশা সেন ও রেলমী দত্তকে মঝে মঝে সজীব পুড়ুল মনে হাচ্ছিল। তার সঙ্কলর মন কেড়ে নিয়েছে। আর ব'ড়ারি কোটো' তমল পতিতু'ড তো পাকা অভিনেতা। গরনের সুর ব'ব জমটি। জটিলেশ্বর মুখো-পাধ্যায়ও শিশুদের মত করে গান বাঁধতে পেরেছেন। তবে হইচই-এর সমস্ত গান-গুলো কত জমটি, দুঃখের গানগুলি তত গভীরভাবে শিশুদের মনে দাগ ফেলে না। অথচ জটিলেশ্বর মুখো-পাধ্যায় স্বয়ং বড়দের গান লেখেন বা সুর করেন তখন দুঃখের কথা এত গভীর থেকে বেরিয়ে আসে যার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী। তুলনার বড়দের জন্য লেখা আনন্দের গান কম এবং ক্ষণস্থায়ী। হয়ত তিনি সেই গভীর বেদনার শিশুদের সংজ্ঞামত হতে দিতে চান না। শিশু যবর কল্যায় ভাব্য।

গানের শিল্পীদের মধ্যে চমকিত করেছে ভাস্কর্যী মুখোপাধ্যায়। ঘাটা। আসরে "এ বাতন সহ ন" গানটি নাটকীয়তার দিক দিয়ে অনবদ্য। অর্থাৎ সীতা ব'ক চাপড়ে কান'ছ, শিশু কল'করা হেসে ল'টোশ টি দিচ্ছে—দুই তরফেই সম্পূর্ণ সিরিয়াস। দীনেশ চন্দর অ'ক' স'জনে শিশুদের জন্যে আলাদাভাবে কিছু ভাবা হয়নি। এই প্রশ্ন সকালে একমুঠা বিজ্ঞানীর হেতু ছিল সডিউড রেকর্ডিং। দেবদীপ দাসব'দ



HBB-BAB-80

## আমলা তেল

- একটি আদর্শ সেরার টুনিক
- মাথার মাঝে মাঝরে দুঃ-ওড়া বন্ধ করতে সাহায্য করবে
- মাথা ঠান্ডা রাখে
- চুলের স্বাস্থ্য বজায় রাখে
- চুলে আনে সতেজ কনিকতা ও সজীবতা
- দিগ্ধি সুখমে ভরিয়ে তোলে মন
- আপনাকে দেখে প্রকৃতক মন কারো মনোর চোখ-জুড়ানো সৌন্দর্য



সর্বপ্রকার ব্যবস্থা সমন্বিত ওটি আধুনিক কারখানার **উৎপাদিত** ৬০০গ্রাম ও বোনা আদর্শবীণী উষধ তৈরি করেছে।



**উৎপাদিত** আদর্শবীণী উষধ মিথিটে ১-৩৩৩ সেন, কলিকাতা-৬ কলিকাতা ও দারিদ্র ও বীণী মাপসু ও এলাকা



## পুরনো কলকাতার কথাচিত্র

পূর্ণেন্দু পত্নী



কলকাতা নিয়ে আমাদের সাহিত্যে অনেক মূল্যবান রচনা আছে। কিন্তু আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কলকাতার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। আজ থেকে ২৪ বছর আগে পূর্ণেন্দু পত্নী যখন সমুদ্রগুপ্ত হৃদয়নামে 'শহর কলকাতার আদিপর্ব' বইটি লিখেছিলেন, তখন তার দ্রুত সংস্করণগুলো প্রমাণ করেছিল একই সঙ্গে পাঠক সমাজের স্বীকৃতি এবং বইটির গুরুত্ব। তার এই সাম্প্রতিক বইটি আরও অনেক বেশী পরিপ্রেক্ষার ফসল এবং আরো অনেক বেশী তথ্যপূর্ণ। ইতিহাসের মত গুরুগম্ভীর বিষয়ও যে তার কলমের ছোঁয়ায় কবিতার মত সুললিত এবং সুখপাঠ্য হয়ে উঠবে, সেটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। পত্নী গীজরা ভারতের মাটিতে পা দিচ্ছে থেকে শুরু হয়ে, পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভের প্রথম স্বদেশ যাত্রায় বইটির আখ্যানভাগ শেষ। মাঝখানে রয়েছে ভারতবর্ষ আর বাংলাদেশের তোলপাড় রাজনীতি, রাজপুরুষদের উত্থান-পতনের প্রবল লড়াই আর সেই সঙ্গে অথবা তারই ফাঁকে ফাঁকে জঙ্গল ফুঁড়ে কলকাতা নামের একটা শহরের জেগে ওঠার পৃথানুপৃথক বিবরণ। প্রত্যেক বাঙালী পরিবারে এই বই হয়ে উঠবে একটা স্থায়ী সম্পদ। ৪৩২পাতার বই। ১৭টি আর্ট প্লেট। দাম মাত্র ৩০ টাকা।



দে'জ পাবলিশিং c/o দে বুক স্টোর

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

ফোন : ৩৮-২০৩৫

## প্রবন্ধ শিল্পী পারাভাত

রথীন মৈত্র (১৯১০-)

অবনীন্দ্রনাথের মেত্রে নবা ভরতীর কলমে পাশাপাশি তৈলচিত্র আঁকা হচ্ছিল। স্বদেশিকতার জন্যই অনেকে যদিও সেটা সুনজরে দেখেন নি। লক্ষী হেসে, 'হেমন মজুমদার, জতুল বসু থেকে প্রহ্লাদ কর্মকার, শক্তিধর এবং নৈশিক শিল্পী। যামিনী রায় এই দলে ছিলেন। এলেন তিনি ইম্প্রেশনিষ্ট এবং ফন্ডাবাদীর জগতে এবং লোকায়নের পাখে। রিশের দৃশ্যকে অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলালের ছবি লৌকিক হল। কিন্তু যামিনী রায়ের ছবিতে বর্ণের মৃতি এবং রূপারোপের নতুন ইঙ্গিত এল। শেরগিল, রামকৃষ্ণকর এবং বিনোদবিহারী ভিক্টর গভীরতা বসুলেন।

বেছে উঠল যুদ্ধের তর্ক। বিশ্ব শতকী আধুনিক ঐতিহ্য চেতনা যেমন কলকাতার বাংলা সাহিত্যকে তেমনি শিল্পকলার 'ক্যালকাটা গ্রুপকে' আলাড়িত করেছিল। যুদ্ধ এবং দার্ভিক, ইডুয়ার্ডসন, ব্রাক আউট, বেল্যা এবং দালাল, সৈনিক সহসা মধ্যবিস্তার নিরাপত্তাবেধের দুগের মরজা ছেগে দিল। বেদনা আতঙ্ক নতুন চেতনার জন্ম দিল। নতুন রূপবন্ধ এবং রচনারীতির পরোক্ষ হল। শূভো ঠাকুর, নীরদ মজুমদার, গোপাল ঘোষ, অবনীন্দ্রনাথ, প্রদেব দাশগুপ্ত, প্রাণকৃষ্ণ পাল, পরিতোষ সেন এলেন। এবং রথীন মৈত্রও। এরা বর্তমানকাল এবং ইম্প্রেশনইজম থেকে পরবর্তী সকল শিল্প আন্দোলনের ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকার দাবী করলেন। আশা এবং নৈরাশ্যের প্রতিজ্ঞায় এদের ছবি হল ভীরু, তির্যক এবং নাগরিক। যদিও সব সময় সাধক নয়। পরবর্তীকালে দল ভাগলো এবং অধিকাংশ নিষ্ক্রিয় হলেন।

রথীন মৈত্র এই দলের অন্যতম নায়ক। বঙ্গকাল (১৯৫২ থেকে অব্যাবধি) তিনি আকাদেমী অব ফাইন আর্টসের যুগ্ম সম্পাদক গোপাল ঘোষের সঙ্গে। যদিও আকাদেমীর প্রশাসন প্রশিক্ষণ জড়ালেন এবং সাংবাদিকতার দৃষ্টি ছবি ত্রম্ব জপকা শুরুর করলেন। এখন এদের মধ্যে সক্রিয় নীরদ মজুমদার, পরিতোষ সেন এবং প্রদেব দাশগুপ্ত।

রথীন মৈত্রের জন্ম পাবনার বিদ্যুৎ জমিদার বাগে। সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা চলছে বাড়িতে। দাদা জ্যোতিষ্মদনাথ এবং নিজের তিনি এরাই উত্তরসূরী। তার নিজের আগ্রহ ছিল ছবিতে। এলেন কলকাতায়। 'ভক্তি' হলেন গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ১৯৩২-৩৮। '৪২ কলকাতা গ্রুপের প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। দলীয় প্রদর্শনী নিয়ে অনাহ যান। লালিতকলা আকাদেমীর প্রতিষ্ঠার আগে ভরত সরকার, আকাদেমী অব ফাইন আর্টস এবং বোম্বে আর্ট সোসাইটির বোধ ভাবে সমকালীন ভারতীয় চিত্রকলার প্রদর্শনী ঘরকিন দেশে যান। তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে যান

রথীন মৈত্র আর্ট স্কুলের রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁকে জিজ্ঞাসে। নতুন ইরকো না ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রি জন্য দ্রুত বড় মডেল করেন। তখনই মেত্রে বঙ্গদেশের জন্য প্রজ্ঞানবিশ্ব ইয়ারকি অনুদিত ভগবদগীতার জন্য প্রকৃত জাপকেন রথীন, ভূমিকা লেদে জলভাস হাকসলি। সেই অধে ইউরোপ প্রমথ। সোনালী, সিঁদু এবং ফিকে নীলে আঁকা রথাদী-বিষয় অর্জুন এবং প্রাক্ক কক শিল্পীকে সুমাম দিরেছিল।



রথীন মৈত্রের ছবি একসং বোধা ও বিদ্যেধের দৃষ্টিতে পড়ে ছিল। 'ক্যালকাটা গ্রুপের' আমে তার ছবি পালটে যায় দ্রুত। নিস থেকে এলেন শ্রমিক এবং গ্রামগরে মানবের জগতে। নিলেন পট থেে রূপারোপের ধরন, সরলীকরণ। এ উল্লেে রাতায় বলয়ের রঙ। এ সময় প্রাণকৃষ্ণ এবং রথীনের আঁক মানবজনের পা গুড়ির মতো হ মোটে। এল ঘনকলীবাী। সমুদ্রে উ কুলে নলিয়া। স্থাপত্যের মতো হলে পট শ্বিমাটিক। আবার জলু জানোয় পাখির জগৎ। ঘোপের মধ্যে শিকার বহু-পী গিরগি ট। শব ভোত শকুন। বনা কুকুর। যামিনী রায় কাছাকাছি রথীনের জগৎ। রক্ত নগ মনস্কতার এক আতঙ্ক নৈরাশ্য ডি অস্বচ্ছ জলজন্তু এবং তৈলটি মাধামটাও ভিন্ন। দংশার সম রথীনের চাঁদের মতো বাকা সৌমি কান্তি মুসলমানের 'নামাজ' পড় দশা সাম্প্রতিক সম্প্রীতির উলা আহ্বান।

'দে'জ' (২২"x৩০" তৈর চিত্র) ছবিটা শ্বিমাটিক। পটের মাঝ মাঝে একটি যুদ্ধ। তার মূ নৈরাশ্যের ছাপ। পুরো ছবির অং বিশেষ প্রক্সে দেখানো হয়েছে নীলে, ধূসরে, খয়েরী হলুদে বিধ ছবি। যুদ্ধের মধ্যে গলায় ঈ সবুজ, কানে, গালে লালের ছাপ বিষাদের রূপ। বেকার কি বিজ্ঞা।

রথীন মৈত্রের ছবির জগৎ ছিল নানারকম বিস্তার এবং বিকলে সম্ভাবনা। রূপবন্ধ এবং রচনা সম্বধে পরীক। বৈমন্ধ্য। উকতা। কি প্রথম ঘোবন এবং উত্তরাধিকার দে প্রতিপ্রতি তিন কম কাজ করার দ রক্ত করেননি।



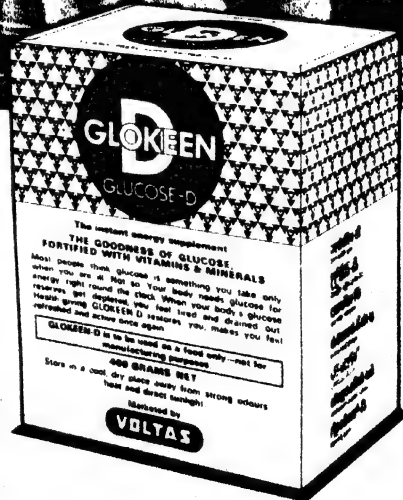
# গ্লোকীন-ডি শক্তির ম্যান

মুখখানিতেই বিদ্যমান

গ্লোকীন-ডি প্রত্যেকের উপযোগী দ্রুত বলদায়ক ও শক্তির  
পরিপূরক। এটি ক্লান্তি কাটায়, কর্মশক্তি বাড়ায়।  
গ্লোকীন-ডি গ্লুকোজের সমস্ত সংস্করণে বিভূষিত। তার সঙ্গে সঙ্গে  
এটি অধিক ক্যালসিয়াম, ফসফেটস ও ভিটামিন-ডি  
সমৃদ্ধ—আর তার মানেই হ'ল প্রতিটি সময়ে, প্রতিটি ক্ষণে  
শ্রুতি আর শক্তি!  
গ্লোকীন-ডি-কে, প্রতিদিনের অভ্যাস ক'রে তুলুন।

## গ্লোকীন-ডি

দ্রুত শক্তিদায়ক নতুন গ্লুকোজ-ডি

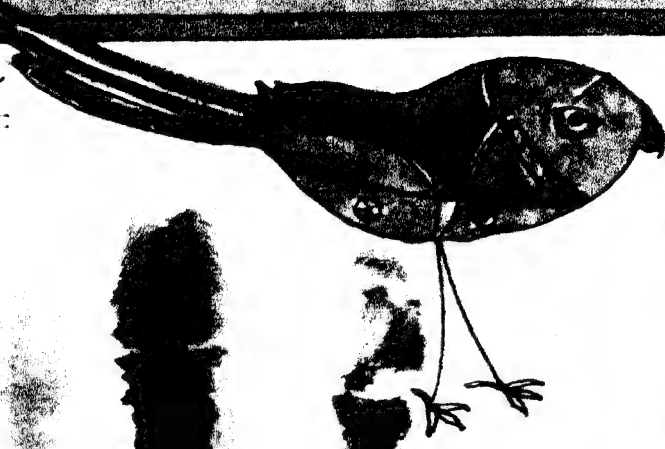


ULKA-GD-21-BEN

કિરણ્મય તાલે જાય મુલકિત લે



୨୬୭୭  
୬୦, ୬୮,



ସମସ୍ତ ୨୫ (୨୫୪୪) ମଧ୍ୟ

କିରୀଟ ଚନ୍ଦ୍ରାଧିପତି

# "আমার পরিবারের জন্যে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবর্ধক পানীয়ই চাই!"

একমাত্র  
**কমপ্লাট-ই**  
হল প্রত্যেকের  
দরকারী ২৩ টি  
একান্ত প্রয়োজনীয়  
খাদ্যগুণে  
ভরপুর সম্পূর্ণ  
আহার!

একমাত্র কমপ্লাটেই আছে  
স্বাস্থ্য ও শক্তির জগ্গে  
বিজ্ঞানসম্মতভাবে নির্ধারিত  
অনুপাতে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট,  
খনিজ পদার্থ, ভিটামিন ও অগ্ন্যাশ্ব  
একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ যা  
প্রত্যেকের... প্রতিদিন দরকার!

মনে রাখবেন, সম্পূর্ণ পুষ্টির জগ্গে  
ডাক্তাররাই বেশী করে কমপ্লাট  
খেতে বলেন।

কমপ্লাট পাওয়া যায়—প্লেমন আর  
চকলেট, এলাচ-আফরনের মুখরোচক  
আদর্শগন্ধেও এবং স্ট্রবেরীর এক নতুন  
আদর্শগন্ধে—যা বাচ্চারা দারুণ ভালোবাসে!



স্বপ্ন দেখার  
প্রয়োজন নেই।

**কমপ্লাট**

সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবর্ধক পানীয়

CASGC-31-234 BEN

# নিশ্চিতভাবে টেকসই

বিনীর  
সূতী কাপড়  
স্বভাবতই ...

আপনার বাড়ির সবার জন্যে সূতী  
কাপড় কেনার সময়ে আপনি নিশ্চয়ই  
টেকসই, সরেস আর নির্ভরযোগ্য  
জিনিসটিই খোঁজেন।  
বিনীর সূতী কাপড় কিনলে এই  
তিনটি গুণই পাওয়া যায়।  
বিনীর সূতী কাপড়ের শক্ত  
সূতো সহজে  
ছেঁড়ে না — বছরদিন চলে।  
তাছাড়া এখন ফ্যাশনেরও  
হোয়া লেগেছে।  
বিনীর সূতী কাপড় কিনলে  
আপনি নিশ্চিত।

  
**বিনী**

CAS/BC34 A /80/BEN





— প্রকাশিত হ'ল —

বিখ্যাত ভ্রমণ-মহাশিল্পী

অবধূত-এর

# ভ্রমণ-কাহিনী-সমগ্র

'মরুতীর্থ হিংলাজ', 'হিংলাজের পরে', 'দুর্গম পন্থা' এবং  
'নীলকণ্ঠ হিমালয়'—এই চারখানি বইয়ের একত্র সংকলন

'মরুতীর্থ হিংলাজ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা লেখককে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সারির লেখক বলে চিহ্নিত করে। গুণমুগ্ধ পাঠকদের অনুরোধে লেখক পরে আরও তিনখানি ভ্রমণ-কাহিনী রচনা করেন। সেগুলিও যথেষ্ট সমাদর ও স্বীকৃতি লাভ করে। বর্তমান মুদ্রণ-সংকটের দিনে এগুলি সব সময় ছাপা থাকে না বলে পাঠকরা প্রায়ই অন্বয়োগ করেন। এই অসুবিধা দূর করার জন্যই সেই চারখানি গ্রন্থ—'মরুতীর্থ হিংলাজ', 'হিংলাজের পরে', 'নীলকণ্ঠ হিমালয়', ও 'দুর্গম পন্থা' একত্রে ভ্রমণ-কাহিনী-সমগ্র রূপে প্রকাশিত হ'ল। দ্বিগুণ টাকা

লেখকের  
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই  
অবিমুক্ত ক্ষেত্রে ৪-৫০  
উদ্ধারণপুরের ঘাট ১২  
কলিতীর্থ কালিঘাট ৫-৫০  
মরুতীর্থ হিংলাজ ১৫  
ঐ (পে: ব্যা) ৬  
বহুব্রীহি ৫-৫০

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

গজেন্দ্র মিত্রের

গল্প-গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় পর্যায়

কথা কল্পনা

কাহিনী

দ্বিতীয় খণ্ড



পে পা র-ব্যা ক-এ  
বিখ্যাত উপন্যাসের  
সংযোজন।

সুমথনাথ ঘোষের

বাক্যশ্রোত

নয় টাকা

— নতুন মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে —

তারানন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

কীর্তিহাটের কড়চা

১ম খণ্ড-৩৫.  
২য় খণ্ড-৩৫.

তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ

প্রথম খণ্ড

২০.

সমরেশ মজুমদারের

আশাপূর্ণা দেবীর

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উত্তরাধিকার

প্রথম প্রতিশ্রুতি

অপরাজিত

ত্রিশ টাকা

বত্রিশ টাকা

সাতো বারো টাকা

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী

১ম খণ্ড-২৫. ৬ষ্ঠ খণ্ড-২৫. ৭ম খণ্ড-২৫.

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

স্বামী রামানন্দ ভারতীর

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

পাঞ্চজল্য

হিমারণ্য

কলকাতার কাছেই

বত্রিশ টাকা

আট টাকা

(পেপার ব্যাক) নয় টাকা

নটকের তার জাতিস্মরণ ও মৃতের আবির্ভাব

বিমল মিত্রের

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী

২০.

হীরা চুনি পান্না

১২.

আসামী হাজির

৫৫.



## নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো—৩০.

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ / ৩৪-৮৭৯১  
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ / ৩৪-৩৪৯২

## চিঠিপত্র

একচরিত্র নং হেরারফিল্ডস  
অকসফোর্ড

আন্তর্জাতিক ব্যাতিসংগর লেখক  
শ্রীনিবাস সি জৈধরী পরিচরপণের  
অনেক রচনা না। তার আরবিন  
ইয়েরী সাধনার ফলশ্রুতি পাঠ্য  
গণ্যে তার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি ও বহু-  
বিধ আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত।  
পুনর্বার তার ইয়েরী রচনালী  
জনা নোবেল প্রাইজ পাওয়ারও  
সম্ভাবনা আছে। বাঙ্গালীর  
অপটিকারী ও সঙ্গীতচিন্তা সত্ত্ব  
আরো অকুণ্ঠ প্রাধিকার জানাই  
এই অর্থাতির জ্ঞানবন্ধ লক্ষ্য  
লাভ করেন। তবে শ্রীসংগরন যো  
দাঁতদারের শ্রীচৌধুরীকে সমর্থন করে  
দাঁত চিত্রের সিংহাস্তগাল মানতে  
পারলাম না। ডঃ আসিফ বসু, মজিবক  
তিনি যেভাবে অস্ত্রমণ করেছেন  
তাতে তিনি নিজেকে ও নিজের বিবর-  
বস্তুকে দর্শন করে ফেলছেন।  
আশাসবন্ধতা ও চমকপ্রদ তত্ত্ব সরবরাহ  
করে অনেক ভালোনা যার না।

শ্রীনিবাস সি জৈধরীর প্রতি গ্রন্থা  
রেক্ষেও কেনো কোনো বিবর তার  
লগ্নে একমত নাও হওয়া বেতে  
পারে।

শ্রীসংগর শ্রীর সিংহাস্তে এসেছেন  
বে বাঙালীর 'ল্যান্ডস্কেপপ্রীতি'

হেরারফিল্ডস থেকে এসেছে।  
এই সিংহাস্ত যেনে নেওরা যার না।  
জরতীর সাহিত্যে, বিশেষত বাংলা  
সাহিত্যে, নিমগ্নভেদনা বস্তুটি  
ইয়পোর্টেড নয়। চন্দ্রদাস, বিদ্যা-  
পতি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকতার অস্তর-  
স্পর্শ কবিতার নিমগ্নভরতা একটা  
স্বতন্ত্র 'ল্যান্ডস্কেপ' ব্যাপার। সংস্কৃত কবি  
জরনব ও কালিদাসের ভিতর  
শ্রীচৌধুরীর ভাবার ল্যান্ডস্কেপ  
প্রীতি দেখা যায়। হালের বাংলা  
সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীনিবাস  
দাসের কবিতার ভিতর এই ল্যান্ডস্কেপ  
প্রীতি সুন্দর রূপ নিয়েছে। তবে এটা  
সবটাই সচেতন-পাঠ্য সাহিত্য-  
চর্চার ফলে নয়। মেঘমন্দর  
গামিলমম্বর নদীমাতৃক গ্রামবাংলা  
বিহীন, স্বভাঃ উপসারিত কবি সত্ত্বকে  
মর্মস্পর্শ কবিতার উদ্ভব করেছে।  
বর্তমান বাংলার 'সাইড' প্রকৃতিপাগল  
পথের পাচালীর লেখক শ্রীবিহুজ  
বল্লোপাধ্যায়কে ফরাসী সাহিত্যিক  
'প্লামার' এর সঙ্গে তুলনা করলেও  
তার উপন্যাসে গ্রাম বাংলার ঘাটির  
গন্ধ পাওয়া যায়। তার স্মৃতি গাহ-  
গাহড়া খোপখাড়, পশুপাখী সবই  
বাংলার ঘাটির কাছাকাছি। বাংলার  
ল্যান্ডস্কেপ প্রীতির উল্ল সন্ধ্যা  
পাঠ্যসাহিত্যের আনতে কানোচে বুর  
না বেড়িয়ে নিজের দেশের প্রসঙ্গ  
আপনার এই খোজকে সীমাবদ্ধ  
নাথাই বৃদ্ধিমানের কাজ।

সে রকম বাংলা গানেও অসুস্থ-

১৭ শ খণ্ড প্রকাশিত হলো

এই দুর্লভ গ্রন্থের গ্রাহক হউন।

মহামহোপাধ্যায়-মহাকবি-ভারতচাৰ্য্য

হরিন্দাস সিংহাস্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য-এর

## মহাভারতম্

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণবৈপায়ন বেদব্যাস-এর

মূল শ্লোক

দর্শনাচার্য্য শ্রীমদ্রীলকণ্ঠের

টীকা

টীকা, পাঠান্তর, প্রতি পর্বের কৃমিকা, ভারত-বৃদ্ধের  
কালনির্ণয়, বৃহৎ সূচীপত্র এবং গড়ে বঙ্গাভূষা  
রয়াল সাইজের এই শোভন সংস্করণ রেরিয়ে বাঁধাই ও  
প্রচ্ছদে শোনার জলে নাম লেখা।  
বীরা অগ্রিম ২৫.০০ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হবেন, তাঁরা  
প্রতি খণ্ড ২৭.০০ টাকায় পাবেন। কলকাতার বাইরের  
গ্রাহকদের বই পাঠাবার রেক্সিসি ডাক খরচ আলাদা।  
আনুমানিক ৪০ খণ্ডে প্রকাশিত হবে।

৫ম খণ্ড প্রকাশিত হলো

গদ্যশচন্দ্র চক্রবর্তী-র

## বাংলার সাধক

তান্ত্রিক, যোগী, বৈষ্ণব প্রকৃতি বিভিন্নপন্থী  
সাধকদের জীবনী। বিভিন্ন উল্লী চরিত্রগুলি  
একত্র সন্নিবেশিত হওয়ায় পাঠকদের কাছে  
বৈচিত্র্যময় মনে হবে না। ১০.০০

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও লক্ষপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক

ডঃ জয়গুরু গোদ্বামী-র

গবেষণালব্ধ আকরগ্রন্থ

## চারণকবি মুকুন্দদাস

(রচনা সম্ভার সহ)

বিশ্ববাণী প্রকাশনী

৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড II কলকাতা ৯

## হীরেন্দ্রনাথ দত্ত রচনাবলী

মাদ্রাসপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত 'হীরেন্দ্রনাথ দত্ত  
জাতিভেদন' দার্শনিকগ্রন্থের হীরেন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষা-  
করে তাঁর সমগ্র রচনাবলী সংকলন ও সম্পাদন করে  
করেনকটি খণ্ডে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন।

০ 'গ্রেমখর্ষ' ও 'রাসলীলা' এই দুটি গ্রন্থ নিয়ে রচনাবলীর  
প্রথম খণ্ডটি ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা, ৪৬৮ পৃষ্ঠা, মূল্য বহিন টাকা।

০ 'বেদান্ত ও বিজ্ঞান' এবং 'জগদ্বন্ধুর আবির্ভাব'  
দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট। শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

পরিবেশক

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৯

জিআস

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং

১৯ কলেজ রো কলকাতা-৯

৫৪/৩ কলেজ স্ট্রীট

এবং ১৩৩এ রাসবিহারি এডেন্স

কলকাতা-৭৩

কলকাতা-২৯

# ব্রিটিশ রাজরোষে অভিযুক্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস চণ্ডীচরণ সেনের মহারাজ নন্দকুমার

১৭৭৫ খৃস্টাব্দের ৫ই আগস্ট। ঐ তারিখেই একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রায় সত্তর বছর বয়সে আইনের ছলে মহারাজ নন্দকুমারকে ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। ঐতিহাসিক হেনরি বেডারিজ এই ঘটনাকে 'জুডিসিয়াল মার্ডার' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল বর্তমান রেস কোর্সের কাছে—কুলিবাজারের মোড়ে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ থেকে আশি বছর আগে চণ্ডীচরণ সেন রচনা করেছিলেন এই বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস। তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার সহ্য করতে পারেন নি অসাধারণ এই গ্রন্থটিকে—তাই প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে রাজরোষে দণ্ডিত। অথচ বাঙালী পাঠকসমাজ উপেক্ষা করেছিলেন এই রাজরোষ—মুদ্রণের পর মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল 'মহারাজ নন্দকুমার'।

## তদানীন্তন সমালোচনার কিয়দংশ

'চণ্ডীবাবু এ পুস্তক প্রণয়ন করিয়া স্বদেশপ্রেমের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট শারীরিক পরিশ্রম, বহুল অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। কেবল তাহা নহে, এজন্য তাঁহাকে গবর্নমেন্টের চাকুরীর মমতা পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ইহা কয়জন লোক পারে? দেশের কয়জন এ প্রকার চাকুরীরূপ স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে পারে? চণ্ডীবাবু এ সম্বন্ধে বাঙালীর আদর্শ। গবর্নমেন্টের বেতনভোগী কর্মচারী থাকিয়াও অশ্লানচিত্তে ইংরেজ কলঙ্ক চিহ্নিত করিয়া স্বদেশী ভ্রাতাদিগকে সজীব করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। চণ্ডীবাবু ধন্য এবং তাঁহার লেখনীও ধন্য।' (নব্যভারত, কাতিক সংখ্যা, ১২২৩)

এই মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থটি বাঙালী পাঠকসমাজের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে আজ আমরাও ধন্য!  
৮০ বছর পরে প্রকাশিত হল ॥ ৩০ ॥

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র

সিরাজদ্দৌলা

নবপত্র প্রকাশন

৮ পটুয়াটোলা লেন, কলি-৯



সম্প্রতি জনতার সম্মুখীন ব্রিটিশরাজের মন হরত অতুলপ্রসাদের রাতা (?) সম্মুখিতের ভিতর তেমন কিছুই থাকে পান না। তবে সাধারণ বাঙালীর কান ও মন ব্রিটিশরাজের মতন অত উচ্চ গ্রামে উঠতে পারেনি। এবং তাদের নাক সিটকানোর মনোবৃত্তিও নেই।

পরিশেষে ব্রিটিশরাজের আশ্রয়ে নাতনীর মাখন না পাওয়ার জন্য আলাপ-চারী বিলাসী দাদর সক্রমণ খেদোন্ত সত্যই আমাদের ফরাসী সম্রাজ্ঞী মারি আন্তোয়ানের—এর প্রসিদ্ধ নিষ্ঠুর উত্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। ব্রিটিশরাজের এই খেদোন্ত জীবন সংগ্রাম জর্জর সমস্যাসংকুল বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে বড়ই anachronistic বলে মনে হয়। বাংলাদেশের বাবা-মায়েরা সন্তানদের দুঃখটো অঙ্গসংস্থানের সঙ্গীত হারিয়ে দিচ্ছে। চোখের জল ফেলারও ফরসৎ পান না।

পরিশেষে ব্রিটিশরাজের অভিজাত বংশাবতংস শিশু নাতির অশ্রুতিপূর্ণ-বৃন্দ দাদর টাউনস্কে উন্মোচন করে শিশু মরণের অভ্যাস। আমাদের কাছে অকল্পনীয়। বর্তমানে আমাদের ঘরের ছেলে-মেয়েরা রামনাম কা তরিনাম করে না। তবে এ রাতার অবাঞ্ছিত উৎসবেরও কখনও পরিচয় দেয় না।

দেবলকুমার চক্রবর্তী  
কলকাতা-৪৫

১২ই এপ্রিল তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় ব্রিটিশরাজ চক্রবর্তী মহাপ্রমের লেখা 'ললিত বড়ুজোর ফোরা' শীর্ষক রচনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং কৌতূহলোদ্দীপক। ললিত বড়ুজো মহাপ্রমের মধ্যে নদীরা জেলার নিম্নলিখিত শব্দ হালারসের যে ফলা-ধারাটি বহমান ছিল, লেখক সুন্দরভাবে তা তুলে ধরেছেন।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি তথ্য সম্পর্কিত স্মৃতিস্বপ্ন কথা বলি। ললিতবাবু, বড়ুজো হাইস্কুলের ছাত্র ছিলেন এবং এই বিদ্যালয় থেকেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার ব্যক্তি পান বলেই আমার জানা আছে। কটকুলি গ্রাম, যেখানে ললিতবাবুর জন্ম, তারই পশ্চিমবর্তী গ্রাম বড়ুজো এবং তৎকালে ঐ অঞ্চলে ঐ একটিমাত্রই বিদ্যালয় থাকায় আশপাশের সকল ছাত্রই সেখানে পড়তে যেতেন, কলকাতার কলেজিয়েট স্কুল অবধি হাবার সুযোগ তেমন হত না।

কটকুলি গ্রামের লোকদের অন্তরে আত্মশ্রুতি রসিকতার অন্তঃসলিলা ধারা বিশেষ লক্ষণীয়। ললিতবাবুও তো সেই গ্রামেরই লোক। একবার তাঁর প্রমের পরি-কল্পনার সব স্বেচ্ছাবৃত্ত পাকা করে জেনারেল পোস্ট অফিসের সেভিস একাউন্ট রাখা টাকা তুলতে গিয়ে মহা ফাসাদে পড়েছিলেন। তার সহী নাকি মিলেছে না। ঘাই হোক ওভার-

"আডভেঞ্চার বই-এরই বিক্রি সবার ওপরে।"

বই-মেলা প্রসঙ্গে বলেছেন দেশ (১২ এপ্রিল ১৯৮০)

৮০ র বই মেলায় বিস্ময়জনক ঘটিয়েছে প্রবীর ঘোষ সম্পাদিত

## আডভেঞ্চার

বিশ্ব কাপানো ১২টি দুর্ধ্ব দুঃসাহসিক সত্য ঘটনা লিখেছেন ১২জন প্রখ্যাত সাংবাদিক, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করে। ভাপা হয়েছে বহু দুপ্পাপ ছবি। ভারতীয় ঐতিহ্যে। এই ধরনের প্রয়াস এই প্রথম। ছোট-বড় সকলের দৃষ্টিতে ভাল-লাগার মতো বই। মূল্য টাকা।

## আগাথা ক্রিস্টির আয়না জায়ে

অনুবাদ : অনুরাগ বাগচী

অসাধারণ রহস্য উপন্যাসের অনুবাদ। অনুবাদ যা দেবে মূল উপন্যাসের অনুপম স্বাদ। চোখ টাকা।

## আগাথা ক্রিস্টির শেষ দৃশ্য

অনুবাদ : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আগাথা ক্রিস্টির শ্রেষ্ঠতম রহস্য উপন্যাসের অসাধারণ অনুবাদ, যা পড়ে পাবেন মূল উপন্যাস পড়ার আনন্দ। মূল্য টাকা।

বইয়ের পুরো দাম পাঠালে রেজিস্ট্রি খরচ বহন করা হয়।

প্রান্তিক প্রকাশনী ॥ ৯৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-৭

এলো ভাষা বাড় থেকে। কিন্তু তখন  
যে ললিত বাড়জো কে তার সাক্ষা  
দেবে? রি পি ও-র ভেতরে কখনও  
বহু লোকের মধ্যে কেউ কি তাঁর হয়  
নেই? অনেক বোঝানো শোনানোর পর  
যখন টাকা তোলার অনুরোধ মিলল,  
তখন তিনি সেই একাউন্টের সমস্ত  
টাকা তুলে নিয়ে লিখছেন—

‘আমি এই কলিকাতা জেনারেল  
পোস্ট-অফিসের পূর্বদিকের বারান্দার  
লিফটের ডোরিণ কোটি দেবতার নামে  
শপথ করছি যে আমার যাবতীয়  
সম্পত্তি অর্থাৎ আমার পূর্বপুরুষের যে  
বেতের পাটের আঁছে তাহার মধ্যে  
রাখিয়া মাটিতে পড়িয়া রাখিব—  
চোরের লর পরোপকার হইবে—তথ্যটি  
পোস্টট্রান্সমিট আর্ কখনও টাকা রাখিব  
না।’

ভারতীয় ডাক কৃতাক কি আঁছে  
ললিতাবাবু এই রসিকতা মাঝনো  
সত্য কথাটি শরৎচন্দ্রদত্ত তত্ত্ব  
বিত্তিকার ন্যায় অঙ্গনিবরণে গলধঃকরণ  
করিতে থাকিবেন।

শরৎচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়  
মুড়াগায়া, নদীয়া।

১২২

৪৭ খণ্ড ২৪ সংখ্যা (১২  
এপ্রিল ১৯৮০) দেশে সাহিত্য  
পর্ষায় প্রকাশিত ‘ললিত বড়জোর  
ফোরার’ শীর্ষক আমার লেখা নিবন্ধে  
মুদ্রণখরচ একটি তথ্যগত অসংগততা

শিখরদত্ত পরিচর পূর্বে ছাপা হয়েছে  
মেমোরিগলিটন কলেজ থেকে বিএ  
পরীক্ষার ইংরাজি অনার্সে প্রথম স্থান  
পান। এই তথ্য অসংগত ও ভুল।  
বস্তুতপক্ষে তখন ডবল অনার্স ব্যবস্থা  
চালু ছিল। তিনি ১৮৮৭ সালে উক্ত  
কলেজ থেকে ইংরাজি অনার্সে প্রথম  
শ্রেণীতে অন্তিম স্থান এবং সংস্কৃত  
অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান  
লাভ করেন।

১৯২৯ সালের ২৯ নভেম্বর  
তার মৃত্যুর পরে অমৃতবাজার পত্রিকার  
ললিতকুমার সম্পর্কে যে বিশেষ রচনা  
কোরার সেখানে তাকে ইশান স্কলারও  
বলা হয়েছে। অবশ্য অন্য কোথাও এ  
তথ্যের সমর্থন পাইনি। ১৮৮৮  
সালে তিনি এমএ পরীক্ষার প্রথম  
শ্রেণীতে প্রথম হন প্রেসিডেন্সী  
কলেজের ছাত্র হিসাবে।

সুধীর চক্রবর্তী

কলকাতা

বিজ্ঞান প্রসঙ্গে

গত ১২ই এপ্রিল ১৯৮০ খ্রি  
পত্রিকার প্রকাশিত প্রিন্সেরাজের  
মহাশয়ের বিজ্ঞান প্রসঙ্গে লেখাটি  
নিঃসন্দেহে বহুই তথ্যগত, কিন্তু  
তার লেখক একটি ভুল সম্পর্কে আমি  
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

লেখক হল নবাব প্যারাগ্রাফ-  
এর শেখরেশ (পৃষ্ঠা-৩২) লিখে-

সারা বিশ্বে যে বই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল,  
প্রথম প্রকাশের পর মাত্র তের মাসে যে বইটির  
আঠারোটি সংস্করণ হয়েছিল, এবং যে বইটি  
পড়ে ইংল্যান্ডের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন  
চার্চিল বলেছিলেন; যে, বইটি পড়তে শুরু করে  
শেষ না করা অবধি তিনি ঘরের বাতি নেভাতে  
পারেন নি; মার্থা ম্যাককেনা-র সেই বিস্ময়কর  
আত্মজীবনী ‘আই ওয়াজ এ স্পাই’ অবলম্বনে  
এই গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে।

# স্পাই মেয়ে মার্থা

মূল্য ১৫.০০

অনুবাদ

শ্রীহিন্দুভূষণ দাস

পরিবেশক

গ্রন্থ নিকেতন

১৮এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

ইশানচন্দ্র ঘোষ অনুদিত

## জাতক

৫ম থেকে ৫ম মণ্ড ৩০.০০ ডট মণ্ড ৪০.০০

ভারতীয় সাহিত্যে যতগুলি আকর গ্রন্থ আছে জাতক তার  
মধ্যে অন্যতম। পরলোকগত ইশানচন্দ্র ঘোষ এই গ্রন্থ  
বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে এক অসামান্য সাহিত্য-  
কীর্তি স্থাপন করেছেন, যা তুলনায়হিত। জাতক গ্রন্থে  
ওধু বৃক্সদেবের পূর্ব জন্মান্তর কাহিনীই আছে তা নয়—  
এর গল্পগুলির মধ্যে আশ্চর্যভাবে রামায়ণ মহাভারত  
প্রভৃতির বহু গল্প সমিবেশিত হয়ে গেছে। গ্রন্থটি বহুদিন  
মুদ্রিত ছিল না। বাঙালী প্রায় জাতকের কথা ভুলতে  
বসেছিল। আমরা সেই গ্রন্থটি ছুটি খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত করে  
নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করি।

আমাদের প্রকাশিত প্রবন্ধ-সাহিত্য

ড. প্রণবরঞ্জন ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য ২০.

বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য (৩য় সং) ৪০.

ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস ২০.

ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য

নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা (২য় মুঃ) ৩৫.

ড. সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-কাব্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথ ২৫.

ড. অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

নাট্যকার মধুসূদন ও কৃষ্ণকুমারী ১০.

প্রমথনাথ বিশী

মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ ১৬.

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরাতন বাংলা নাটক সংকলন ২৫.

ড. রামবহাল তেওয়ারী

আধুনিক বাংলা ও হিন্দি ছন্দের

তুলনাত্মক আলোচনা ১৮.

সুভদ্রা অধিকারী ॥ ভারতীয় নৃত্যকলা ৮.

ড. পারুল ঘোষ

বাংলার বৈষ্ণবধর্ম : সাহিত্যে ও দর্শনে ১৫.

সুত্রতকুমার দিম্ভা

গীতার শিক্ষা ও ভারতের আধ্যাত্মিকতা ১৮.

নির্মল ঘোষ

চীনা সাহিত্যের ইতিহাস ১৬.

নকশালবাড়ি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য ২০.

সুনীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত ॥ বিশ্বকবির কৌতুক ৮.



করুণা প্রকাশনী

১৮এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯, ফোন : ৩৪-৬২৬৮

কবির ৮২তম জন্মদিনের সম্মানার্থে ২৭ জুন পর্যন্ত নামমাত্র মূল্যে নজরুল সাহিত্য ও সংগীতের ব্যাপক প্রচার অভিযান:

## ৩০- কমে কিনুন নজরুল রচনা-সম্ভার

দুই সহস্রাধিক পৃষ্ঠার সম্ভার সঙ্গল রচনা তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ।  
মূল্য ১০০। ২৭ জুন পর্যন্ত একত্রে টাকা ত্রয়া দিলে মাত্র ৬০।  
এখন সবে সঙ্গে ১ম ও ২য় খণ্ড পাবেন। অক্টোবরে ৩য় খণ্ড  
নেবার সময় কোন টাকা দিতে হবে না। ইতিমধ্যে যারা ৭০  
গ্রাহক হয়েছেন ৬০ এর অবশিষ্ট টাকা ত্রয়া দিলে তাঁদেরও  
অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না। এ বই এমুলে আর কোমদিন  
দেওয়া যাবে না। এই শতাব্দীর মহান গ্রন্থ।

## বিদ্রোহী-বিচিত্রা

সম্পাদনা : আবদুল আজীজ আল-আমান

কবি নজরুলের সকল শ্রেষ্ঠ কৃষ্টির এক অসাধারণ অভিযাত্রা সংকলন। এই সংকলনে কবির শ্রেষ্ঠ সংগীত কবিতা ছোট গল্প প্রবন্ধ নাটক অভিযাত্রা চিত্রিত মুখবন্ধ অটোগ্রাফ আশীর্বাদ শিষ্ট-সাহিত্য বিদ্রোহী-বাণী ইত্যাদি স্থান লাভ করেছে। এ ছাড়াও কবি-জীবনী, পুস্তক-তালিকা, ৪০টি ছবিসিপি, আট রঙের ছবি মূল্যবান ছবি। এই একটি যাত্রা গ্রন্থে নজরুলের সমগ্র কৃষ্টির সৌরভ বর্তমান। উচ্চমানের উপহার উপযোগী সুসজ্জিত বাক্সে বইটি সেওয়া হচ্ছে। মূল্য ৯০। সাধারণ ৮৭, ব্যবসায়ীগণ ৮৬।

## উপনিষদ

অখণ্ড সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। মূল্য ৩০। যারা গ্রাহক হন  
নি ঠাণ্ডা ২৭ জুন পর্যন্ত গ্রন্থটি নামমাত্র মূল্য ২৫ পাবেন।  
পৃষ্ঠা ২০২০। এ বই এমুলে আর কোন দিন পাবেন না।

বেস ৫ খণ্ড ৯০, জাপবত ২৫, গীতা ২২, গীতারহস্য ২৫।

নজরুল-বিষয়ক গ্রন্থে ২০% ও ২৫% কমিশন

নজরুল-পরিচরমা ২০। ধর্মকেতুর নজরুল ৪।

মুগ্ধপ্রভা নজরুল ১০। আমার বন্ধু নজরুল ১০।

কবি নজরুল ৪। আমার শিল্পী জীবনের কথা ১০।

রাণাজবা ১০। স্বরলিপির সম্পূর্ণ সূচীপত্র ৫০

হরফ প্রকাশনী ৥ দুরাল্পনী : ৩৪-৫৫৮০

এ/১২৬ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট। কলকাতা-৭

হেন বসন্তের স্থিতিশীল তার জয়ের  
কপালসমূহ পাতক একে তার  
ব্যাসার্ধের ব্যাসার্ধ পাতক, অর্থাৎ  
ব্যাপারটা বড়োই এই তার বত  
বাতবে; স্থিতিশীলও তত বাড়বে।  
এবং তার ব্যাসার্ধ বত কমবে, স্থিতি-  
শীলও সেই অনুপাতে কমবে।" এখন  
আমরা জানি একটি বস্তু অন্য একটি  
বস্তুর লিখে universe variation  
এ থাকলে, স্থিতির বস্তুর মান কমলে  
প্রথম বস্তুর মান বাড়বে; আবার  
স্থিতির বস্তুর মান বাড়লে প্রথম বস্তুর  
মান কমবে। সুতরাং একেই বলে;  
উল্লিখিত লাইনের শেষোক্তি হইবে—  
জর বত বাড়বে; স্থিতিশীলও তত  
বাড়বে। এবং তার ব্যাসার্ধ বত কমবে  
স্থিতিশীলও সেই অনুপাতে বাড়বে।  
বিমল দাশ  
প্রিয়মতঙ্গ

৥২৥

গত ৮ই মার্চ ১৯৮০ দেশ-  
এর বিজ্ঞান বিভাগে সম্মিলিত কর  
লিখিত 'ক্যানসার বিষয়ক' আলোচনার  
কিছু তথ্যগত তুল রয়েছে। বেহালার  
ঠাকুরপুকুরে মহাত্মা গান্ধী রোডে যে  
'ক্যানসার সেন্টার' আড়ৎ ওয়েল-  
ফেয়ার হোম' গড়ে উঠেছে সেটিতে  
আজ পর্যন্ত কোম সরকারী সাহায্য  
আসে নি। ঐ হোমের সম্পাদক  
ডাঃ সরোজ গুপ্তের (উনি দাশগুপ্ত  
নন) উত্তর উল্লিখিতই এই তুলটি  
রয়েছে। ঐ হোম সম্পূর্ণরূপে জন-  
সাধারণের দানই গড়ে উঠেছে এমন

কি শুল্কের বাজারের টীফেনের পলস  
জমানে 'দান' পর্যন্ত রয়েছে কিছু  
সরকারী সাহায্য একটি পরলাও পাওয়া  
যায় নি। আমি ঐ হোমের আজীবন  
সম্মান (পরিচালন কর্মীটির) হিসাবে  
বলতে পারি ডাঃ গুপ্ত কখনই এমন  
তুল তথ্য সরবরাহ করতে পারেন না  
কেননা ঐ হোমের সম্পাদক হিসাবে  
তঁর ওপর বরোহ বিরাট দায়িত্ব।  
অন্য করি ঐ তুলটি সন্দেহিত হবে।  
মণিকা বসু, কলকাতা-৬০

## চণ্ডী বরাহদন্তিকা

২৬শে এপ্রিল সংখ্যের জন্ম  
দানের 'চণ্ডী বরাহদন্তিকা' শীর্ষক  
প্রবন্ধটি পড়লাম। এর সম্প্রদায় এক  
কথা বলার আছে। লেখক বলেছেন  
জহরা মন্দিরের আলোপালে কোনও  
বসতি নেই। একথা ঠিক নয়।  
মন্দিরের ডানদিকে একটি বড় পুকুর  
আছে। এই পুকুরের পাড়ে কয়েকখর  
কলিত আছে। এরপর পুকুরের পাড়  
থেকে দক্ষিণ পশ্চিমদিকে কয়েকখর  
গজ গেলে জনবসতি লক্ষ করা যায়।  
আর এক কারণে বলছেন, জলাশয়ের  
মধ্যে জহরার মন্দির। কিন্তু জলাশয়  
কি করে কলি বার? মন্দিরের সামনে  
খোলাখোলা মাঠ, পিছনে আমের ক্ষেত,  
মন্দির বে খোলাটিতে অবস্থিত সেখান  
থেকে সন্তত দুটি বটগাছ, দু-একটা  
কোমার লহ আমের কয়েকটি মায়-না-  
জানি গাছ আছে, অথচ মন্দির প্রাঙ্গণ  
এবং আলপাল প্রিয়মতঙ্গ। এহেন

## হিন্দুস্তানের জনজীবন ও জীবন-চর্চা

কেন. এম. আশরাফ দাশ ৩৫০০০

গ্রন্থটি নতুন করে কোনও পরিচয়ালিপির অপেক্ষা রাখে  
না। যে-মুগে রাজারাজড়া ও মুজাফিরের ইতিহাসই  
ছিল শুধু ইতিহাস রচনার উপাদান, সে-মুগে  
ডাঃ আশরাফই প্রথম কাব্যনৈতিক, অর্থনৈতিক ও  
সামাজিক শক্তিকল্পের কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে  
ইতিহাস রচনার ও গবেষণার এক নতুন দিগন্ত  
উন্মোচন করেছেন।

## মোঘল-রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা

এন. এ. সিদ্দিকী দাশ ২৫০০০

মোঘল প্রশাসনের ভিত্তি ছিল কৃষি-ব্যবস্থার সূচু  
পরিচালনা। পরম্পর বিরোধী স্বাধিকারের সমন্বয় সাধন  
করে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা সময়ে-সময়ে কত-  
ভাবে যেরূপ নিয়েছে, ডাঃ সিদ্দিকী তার সামগ্রিক চিত্র  
সহ বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ সুন্দররূপে করেছেন। ইতিহাসের  
হারা ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের কাছে বইটি অবশ্য পাঠ্য।

পার্সি পাবলিশার্স

২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬



অবশ্যকে ভগ্নল মোটেই ক্যা হবে না।  
জহর মন্দির নিয়ে আরো বৃদ্ধক চড়া  
অলোচনা করা যাক। মন্দির আরের  
কোট থেকে জহরতলা মোটামুটি  
ভিন্ন মাইলের কিছু বেশী। এই  
স্থানটি মন্দির আরের দক্ষিণ-পূর্ব  
দিকে অবস্থিত। এই ভিন্ন মাইল  
রাস্তায় যেক এক মাইলের মধ্যে রাস্তা  
পাকা, বাকীটা রাস্তা কঁচা। যথেষ্ট  
বালি মেশানো রাস্তায় ইট-কুচি মেশানো  
রয়েছে। কলে বসিতে ক্যা হয় না।  
এর উপর দিয়ে মেলার ধ্বনি সকল  
থেকে দিকল অর্ধি- ঘোড়ার গাড়ি,  
বিক্রী, টাঙ্গি বাতীর নিয়ে ছুটেছে।  
কেউবা হেঁটে চলেছে মন্দিরের দিকে।  
অনেকে ভোর ভোর শৌছে বার মন্দির  
প্রাপ্তবে, সকল থেকে দুপুর অর্ধি  
বেশ ভিড় লক করা হয়। এই পূজা  
উপলক্ষেই মেলা বসে ছোটখাট। এই  
মন্দিরে শব্দ হিন্দুয়ই পড়ে বেন না।  
অনেক মূলমানও আরের কাছে রানত  
করেন। মনসিক শব্দে আসেন,  
আরেক মন্দিরে পূজাও দিয়ে বান।  
লেখক এক জাহাঙ্গীর জহর মন্দির  
ছাড়াও গোড়েশ্বরী এবং ম্বারবাসিনীর  
কথা উল্লেখ করেছেন। এই তিনটি  
মন্দির ছাড়াও গোড়ের মধ্যে আরো  
একটি মন্দির ছিল। এর নাম ছিল  
পাতালচণ্ডী। এটি নাকি বর্তমান মন্দির  
ঘাটের কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত  
ছিল। এই চারটি মন্দির মধ্যে একমাত্র  
জহর মন্দির কতমান। জহর মন্দিরের  
সম্প্রদায় অস্ততপক্ষে দ্বার হয়ে।  
একবার হয়েছিল ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে

খ্রীষ্টাব্দে আরেকবার হয় ১০৪৪  
খ্রীষ্টাব্দে। এটিই শেষ সংস্কার।  
বাতীরের থাকার জন্য মন্দিরের দুপাশে  
দুটি টিনের ছাউনির কথা এবং নল  
কুপের কথা লেখক উল্লেখ করেছেন,  
কিন্তু বাতীর আরে রাস্তাঝে প্রবেশ  
কনা এই ধরনের খোলামেলা টিনের  
ছাউনি মোটেই নিরাপদ নয়। যদি এই  
দুটি ছাউনিকে ঘিরে ঘিরে বরজা  
জানালা বসিয়ে দেওয়া হয় তাহলে  
বাতীরের পক্ষে ঝাকা নিরাপদ হবে,  
মন্দিরের কাছাকাছি দ্বার একটি কি  
দুটি টিউবওয়েল আছে, এই দুটি  
টিউবওয়েল দিয়ে কি এতদন্ত বাতীরের  
পানীর জলের চাহিদা মেটানো যায়।  
কতৃপক্ষ যদি থাকার সাথে পরনি  
জলের ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে  
দূর-দূরান্তের মতাসিমালা আরো বেশী  
হবে।  
অসিতবরণ মন্ডল  
মালদহ  
প্রম সংশোধন  
গত ৩মে ১৯৮০ সংখ্যার দেশ  
পত্রিকার প্রকাশিত 'সহচর' গল্পের  
লেখকের নাম : অশোককুমার সেনগুপ্ত।  
ভুলবশত অশোককুমার সেনগুপ্ত ছাড়া  
ইওয়ার আমরা দৃষ্টিভত।  
\*  
১৯ এপ্রিল সংখ্যার 'ওলিম্পিকের  
আগে রুশ দেশে' রচনাটির একবিংশতম  
লাইনে ব্যারোমিটারের বদলে থার্মো-  
মিটার পড়তে হবে। ভুলক্রমে ব্যারো-  
মিটার লেখা হয়ে গেছে। —লেখক

কবির ৮২তম জন্মদিনের সন্মানার্থে ২৭ জুন পর্যন্ত  
নামমাত্র মূল্য নজরুল সাহিত্য ও গীতির প্রচার অভিযান:

## শ্রেষ্ঠ নজরুল স্বরলিপি: ৩ খণ্ড

[সাধারণের ২০% ও ব্যবসায়ীদের ২৫% ছাড়]

নজরুলের সকল শ্রেষ্ঠ ও প্রচলিত হিট গানের স্বরলিপি ৩ খণ্ডে  
প্রকাশিত হয়। ৩য় খণ্ডটি সদা প্রকাশিত। এই তিনটি খণ্ড কিনলে  
সাধারণতঃ অন্য খণ্ড কেনার প্রয়োজন নেই। প্রতি খণ্ড ১৫৯

## নজরুল-স্বরলিপি

[সাধারণের ২৫% ও ব্যবসায়ীদের ৩০% ছাড়]

যাঁরা নজরুলের প্রতিটি গানের স্বরলিপি চান তাঁরা নজরুল-স্বরলিপি  
সংগ্রহ করুন। আজ পর্যন্ত ৮ খণ্ড প্রকাশিত। প্রতিখণ্ডে ১০০  
গানের স্বরলিপি। প্রতিখণ্ড ১৫৯।

## গীটারে শ্রেষ্ঠ নজরুল-স্বরলিপি

[সাধারণের ২০% ও ব্যবসায়ীদের ২৫% ছাড়]

নজরুলের কয়েকটি অতিবিখ্যাত গানের গীটার উপযোগী স্বরলিপি  
গ্রন্থ। গীটার বাজানোর প্রাথমিক শিক্ষা-পদ্ধতি ও চিত্রের সাহায্যে  
বিশদ ভাবে আলোচিত। স্বরলিপি : সমীরকুমার নাথ। মূল্য ১০৯

## নজরুল-গীতি

একখণ্ডে নজরুলের ২১১১ গানের ঐতিহাসিক ও অজিতা  
সংকলন। কবি-জীবনী, ভূমিকা, রেকর্ড-তালিকা, ৪ আর্ট প্রেট,  
১৬ ছবিলিপি। মূল্য ৩০৯। সাধারণ ২৬৯ ব্যবসায়ীগণ ২৫৯

## অগাধ্য স্বরলিপি গ্রন্থ :

রজনীকান্ত স্বরলিপি ২ খণ্ড (প্রতি খণ্ডে ১০০ গান)  
প্রতিখণ্ড ২০. লোকগীতি ১ম ৬. ২য় ২০. বিজেক্ত  
৩ খণ্ড প্রতিটি ৬. প্রণব ৩ খণ্ড প্রতিটি ৬. সলিল ১ খণ্ড  
১০. দেশবন্দনা ৬। স্বরলিপির সম্পূর্ণ সূচীপত্র ৫০ পৃষ্ঠা

হরফ প্রকাশনী ৥ এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কল-৭

প্রকাশিত হল

জেমস্ হেডলী চেস্-এর

নীল বেশা

১৯০০

জেমস্ হেডলী চেস্-এর অন্যান্য

রক্তাক্ত সৈকতে আর্ত আধার

১৪-০০

১১-০০

নিয়তি দুর্বার আহত বিষ্ময়

১৪-০০

১০-০০

মত মূল্য ১২, নিশিসঞ্জিনী ১০, বিপন্ন নায়ক ১৫,  
ডেনিসে যুদ্ধার হাওয়া ১০, মহানের নামে পদ্মকল ১২,  
উর্বশীর যুদ্ধা ১০, যুদ্ধা অভিসার ১০, বিহঙ্গ পিজরে ৬,  
নিশিসঞ্জিনী ১০, আলোর আলো ১০, যুদ্ধা তিমির ১২,  
বিহঙ্গ নিষাদ ১২

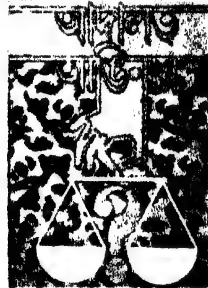
রু-বেল পাবলিশার্স (৪৬-৭৫১৪)

১২৩, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড / কলকাতা-২৬

প্রাতিস্থান : দেবু স্টোর ৥ ডি. এম. ৥ মাধব দাস

# বিধান নিংহের বিচার অপরাধ কাহিনী আদালত আজিনার দাম ৭.০০

নে-জীবন উপন্যাসের থেকেও  
বৈচিত্র্যময়, সেই জীবন  
থেকেই অপরাধ কাহিনী  
যেদের বিচার কাহিনী হলে  
এসেছেন সাংবাদিক বিধান  
নিংহে। এই আটটি মেয়ের  
জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে  
নৃশংসভাবে। খুন করা  
হয়েছে তাদের। খুন করেছে  
স্বামী অথবা প্রেমিক,  
নিভাতাই কাছের কিছ  
মানুষ। বাইরের দল-পন্থা  
নয়।  
জিউকটকট গল্প-উপন্যাসের  
বেশানে শেষ, জীবনের  
সত্য ঘটনার সোনারই শরৎ।  
গল্পের দুঃস্বপ্নের গোয়েন্দা  
অবিশ্বাস্য কার্যদার খুনকে  
ধরলেন, গল্পের নটগোত্র  
সোনারই মৃত্যু। কিন্তু  
জীবনের কেষ্টে খুনকে  
ধরার পরই অপরাধ প্রমাণের  
দায়িত্ব এসে পড়ে। পুলিশের  
শ্রোতাদের খুনের কিনারা হয়  
না, হয় আদালতের বিচারে।  
বিধান নিংহে তাই হুটে  
গিয়েছেন আদালত আজিনার।



রহস্যময় খুনের নিষ্পত্তি  
হাতড়েছেন, বাস্তব  
জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দৌড়েছেন  
উকিলের বাড়ি, কখনো  
বিচারকের কাছে, কখনো  
সাক্ষীর ডেরায়, কখনো  
আমারী সম্মানে। তারপর  
সাজিয়েছেন এই  
কাহিনীগুলি। কীভাবে  
খুন সংঘটিত হল, কীভাবে  
ধরা পড়ল খুনি, কীভাবে  
রায় দিলেন আদালত—  
প্রতিটি পর্বের বিস্তৃত,  
পেশান্দুঃস্বপ্ন বর্ণনার  
কখনো চমক, হয়ে ওঠে অদ্ভুত  
সজল, কখনো হাস্য  
আরম্ভ, কখনো উৎকণ্ঠার  
উৎসব, কখনো সমবেদনার  
আজ্ঞা। এমন হৃদয়স্পর্শী

# শিবকালী তট্টাচারের রবীন্দ্র পুস্তকালয়-প্রাপ্ত ভারতীয় ভেষজবিষয়ক গ্রন্থ চিরঞ্জীব বনোবধি

চার খণ্ডে প্রকাশিত।  
প্রতি খণ্ড ২৫.০০  
ভারতীয় বনোবধি সমগ্রের  
সাড়ে তিন হাজার বছরের  
সমীক্ষা তুলে ধরা হয়েছে  
এই গ্রন্থের খণ্ডে-খণ্ডে।  
ওষধিগাছের পরিবার, গণ ও  
প্রজাতির পরিচয়, বোটানিক্যাল  
নাম, প্রকারভেদ, প্রয়োগবিধি  
ছাড়াও প্রত্যেকটির  
রাসায়নিক উপাদান,  
তিথিভেদে বিভিন্ন খাদ্যের  
নিষিক্ততার বৈজ্ঞানিক কারণ  
এবং কোন রোগে কী পথা-  
তার তালিকা এতে উল্লিখিত।



মানুষের শারীরিক গঠন  
সেহে তার প্রকৃতি বিচার  
ও সজ্ঞাবা রোগ নির্ধারণ  
সম্পর্কে আলোচনা যেমন  
শ্রিতীয় খণ্ডের আকর্ষণ,  
তেমনিই তৃতীয় খণ্ডের  
অমূল্য সংযোজন হল 'নিদেন  
হাঁকা' নিয়ে বিস্তারিত ও  
প্রাঞ্জল আলোচনা। সদ্য-  
প্রকাশিত চতুর্থ খণ্ডের  
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, কিছ  
মারক রোগ সম্পর্কে  
আলোকপাত। সব রোগেই  
মৃত্যু অবশ্যম্ভাব্য নয়,  
আবার এমন রোগও হয় যা  
মারক হয়েই আত্মপ্রকাশ  
করে। এই খণ্ডে তারই  
দিগদর্শন। বাবহারিক  
প্রয়োজনের দিক থেকে প্রতিটি  
খণ্ডই স্বতন্ত্রভাবে মূল্যবান  
ও অপরিহার্য।

এই বইটির চারটি খণ্ড  
একত্রে ডাকযোগে যারা  
নিতে আগ্রহী, তারা ১০০  
টাকা পাঠালে ডাকমাসুল  
ছাড়াই চার খণ্ড বই পাবেন।



আদ্য পাবনাগঙ্গা গ্রাউন্ড রিমিট  
৫৫ বেনিমারোলা জেন কলকাতা ৯

# বিভিন্ন মূল্য প্রকাশিত হল রাধারানী দেবীর অপরিহার্য আলোচনামূলক শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প দাম ১৫.০০



বহু বাস্তবতার সমাহারে  
মানুষ শরৎচন্দ্রের জীবনের  
সৈন্যদল চেহারাটি কেমন  
ছিল তা যেমন জানা যায় এই  
গ্রন্থে, তেমনিই স্পষ্ট হয় তার  
সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্য-  
সৃষ্টির মূল প্রেরণার  
কথাও। খোদ শরৎচন্দ্রের  
কাছ থেকে জানা  
বহু জরুরী, অজ্ঞাতপূর্ব,  
চাঞ্চল্যকর তথ্যে ভরা এই  
বই শরৎচন্দ্রকে নতুন করে  
জানাতে আর চেনাবে।

# বিভিন্ন মূল্য প্রকাশিত হল জয়প্রকাশ নারায়ণের জরুরী অবস্থায় লেখা সিনলিপি কারাবাসের কাহিনী দাম ৫.০০

জরুরী অবস্থায় বেল  
কয়েকমাস জেলে আটক  
ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ।  
সেই সময়ে রচিত এই  
সিনলিপি। সমকালীন  
ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ  
মনীষীর চিন্তাধারা,  
মেজাজ এবং নৈতিক  
চেতনাবোধ যেমন এতে



প্রতিফলিত তেমনিই  
জনআন্দোলন, সামগ্রিক  
বিশ্বব প্রকৃতি সম্পর্কে  
তার ধ্যানধারণারও এক

# সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার গোয়েন্দা ফেলুদা—এই নামটির সঙ্গে পরিচয় খুব বৌশাগসের নয়। দারুই দল-বান্দো বয়স। এক আণ্টি-দুরি রহস্য জেল করতে বাংলা সাহিত্যে নতুন এক গোয়েন্দাকে আমদানি করলেন সত্যজিৎ রায়। সেই গোয়েন্দার নাম ফেলুদা, ওরফে প্রদোষ মিত্তির। তিন এলেন, থেকে গেলেন। বাদশাহী আণ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটনের পর একের-পর- এক কত-না রহস্যের জট খললেন ফেলুদা, কত-না নতুন নতুন পটভূমিতে। সপ্ত তোপসে।

ইতিমধ্যে আরেকজন এসে  
জুটেছেন ফেলুদা আর  
তোপসের নিত্য সহচর  
হয়ে। তার নাম জটীচর।  
জটীচর এসে জুটে বাওরার  
রহস্যের সঙ্গে কৌতুকের  
এক ঘোহন মিশ্রণ ঘটেছে।



অসম্ভবসী এই তিনজনের  
নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার  
গল্প শুনতে শুনতে একেবারে  
উদ্‌গ্ধ হয়ে থাকেন  
সব-বয়সী পাঠকবৃন্দ।



বাদশাহী আণ্টি ৬.০০  
গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৬.০০  
সোনার কেল্লা ৬.০০ বাজ-  
রহস্য ৬.০০ কৈলাসে  
কেশেকারী ৬.০০ রয়েল  
বেগল রহস্য ৫.০০ জর  
বাবা ফেলুদা ৬.০০  
ফেলুদা এন্ড কোং ১০.০০



বাসুদেব ওহর  
নতুন উপন্যাস  
বিস্তার

# প্রকাশিত হল কৃতক-এর মজাদার বই শক নিয়ে খেলা দাম ১০.০০

অনেকে মনে করেন, বাংলা  
বানান সবকমই হয়।  
সব রকম দাঁত লাও হয়, অনেক  
রকম সিঁপিত হয়।



রবীন্দ্রনাথই নাকি করে  
দিয়েছেন এইসব। তারপর  
থেকেই বাংলা বানান নাকি  
সোজা হয়ে গেছে খুব।  
যেমন হচ্ছে লিখলেই চলে।  
আবার অনেক ভাবেন যে,  
বাংলা বানান খুব খটমট  
ব্যাপার। এমনক-সব নিয়মে  
বাঁধা যা জানতে গেলে  
পাণ্ডিত হতে হয়। গুণ বিধান,  
ষড় বিধান, প্রত্যয়—এসব  
নিয়মে বাঁধা ফোটানোই  
কঠিন, জানা তো দূরের  
কথা।

কৃতক তার এই বইতে প্রমাণ  
করলেন, এই দুই ধারণার  
কোনটিই সর্বাংশে সত্য  
নয়। বাংলা বানান সহজই  
যে শেখা যায়, শব্দের  
গঠনে যে দারুণ রকমের মজা  
লুকনো রয়েছে, খেলাচ্ছলেই  
যে জানা যায় শব্দকর্মের  
নিয়মকানুন— যা জানাবার  
জন্যই গল্পের মতো সরস  
পালকের মতো হালকা  
এই বচনা। এমন মজাদার  
খেলা খেলা লেখা বড়ো একটা  
চোখেই পড়ে না। শব্দ,  
ছোটরা নয়, ছোটরাও সমান  
আগ্রহ নিয়ে পড়বেন এই  
বই, এ-কথা নিঃসংশয়ে  
বলা যায়।

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে  
বুদ্ধদেব ওহর  
নতুন উপন্যাস  
বিস্তার

**ਸੁਚੀਪਤ**

চিঠিপত্র : ৩  
 পুথ্যকলিত গ্রন্থমালা : সম্পাদকীয় : ৯  
 কাগজীক : ১০  
 সংগীত প্রাণেশ্বর তুলসী হারিবাঈ : বসন্ত  
 পোতমার : ১১  
 কলকলিত (নবমহার) : অতুল্য যোষ : ১২  
 নন্দন ইন্দার : প্রতিক্রিয়া বন্দ : ১৩  
 রাজল বন্দর ইন্দ্রপুত্র : রম্যনাথ রায় : ১৪  
 সেই নন্দন : সুদীপ গণেশোপাধ্যায় : ১৫  
 জীবিত্যাক ও তার নন্দনা : অরুণ দাস : ১৬  
 ১০ ওলিম্পিক্সে আগের  
 মদন দেশ : চিরঞ্জীব : ১৭  
 মানসময়িন : খর্ষিক, মূল্যবোধোপাধ্যায় : ১৮  
 বিজ্ঞান : সমরসিংহ রায় : ১৯  
 বই, বাঙালী, বইপাঠ : অশোক দাস : ২০  
 পদ্মাবতী হিলিপুত্রমার : গীতা বন্দ্যাস : ২১  
 কাছাকাছি থেকে : অতি মূল্যবোধোপাধ্যায় : ২২  
 তিথ্যার : মল্ল মূল্যবোধোপাধ্যায় : ২৩  
 উৎকর্ষ বিবাহ : উৎকর্ষ সিংহ : ২৪  
 দেখা দেখো : মেরোপাস বন্দ : ২৫  
 অন্নদেব : ২৬  
 এশীয় টেলি টেলিফোন চীনায়ের  
 অন্নদেব : মূল্য : ২৭  
 আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি : ২৮  
 প্রচ্ছদ : কলিকতা শাহিন  
 প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি শেষ পদ্মার

## পরবর্তী আকর্ষণ

শংকরলাল ভট্টাচার্যের নিবন্ধ  
কান্ ফিল্ম ফোর্সিডাল : ১৯৮০  
শতাব্দী ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ  
নৃপবতী বড়োদারী ও নগতীর্থ পাওরাসড়  
গৌতম গুপ্তের প্রবন্ধ  
হাল্লিন : কলোনী ও কলঙ্ক  
সমর মিশ্রের গল্প  
সেই আলো

সম্মানক ৪ সাগরময় ঘোষ  
 মহাপ্রবাহার পত্রিকা লিমেটেড-এর পক্ষে  
 বাংলাদেশে বার্ষিক ৬ অনুন্নত সরকার স্ট্রীট  
 কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এম  
 বারাক অফসেট প্রাইভেট লিমেটেড শি ৭০৮  
 সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০০৪ থেকে  
 মুদ্রিত।  
 দাম এক টাকা।  
 বিমাল মণ্ডল : এপ্রিল ১৭ পরমা  
 পূর্বাঞ্চলীয় অধ্যাপক হোলে ২০ পরমা

পুরাকীৰ্তি গ্রন্থমালা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ বেশ কয়েক বছর আগে একটি গ্রন্থমালা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনাটির মোটামুটি উদ্দেশ্য ছিল, এই রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলা এবং কলকাতার যাবতীয় 'পুরাকীর্তি'র ও 'পুরাবস্তু'র বিশদ বিবরণ সংকলন করে এক একটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্রাকার পুস্তক প্রকাশ। রমেশচন্দ্র মজুমদার মশাই মনে করতেন, এই পরিকল্পনা সরকারী অর্থে হলেও তা প্রয়োজনীয়, 'জনশিক্ষা ও কীর্তিমূলক'। লোকশিক্ষামূলক এই গ্রন্থমালা প্রকাশ শূন্য হইয়াছিল ভালভাবেই, বীরভূম, বাঁকুড়া, কোচবিহার, নদীয়া, হাওড়া—এই পাঁচটি মাত্র জেলার পুরাকীর্তি বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশের পর অকস্মাৎ এ-বিষয়ে ছেদ পড়ে। ১৯৭২ সালে বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি প্রকাশের পর ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত—অতপ সময়ে পাঁচটি গ্রন্থ ছাপা হয়নি। তারপর গত চার বছর আর কোনো গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়নি। হবে যে তারও কোনো ইশতিজ নেই।

এই গ্রন্থমালা প্রকাশ স্বাধীনতার কারণ কী? সরকারের অর্থাভাব? নাকি অন্য কিছু? অর্থাভাব যে নয় তা বোঝা যায় কয়েকটি কারণে। যেমন, উক্ত গ্রন্থমালা প্রকাশের উপশেষ নিয়েই পূন্যাত্তর ডিরোজভৌর একটি উপদেশটা কমিটি এবং সম্পাদকীয় বোর্ড গঠন করে দেখেছেন। গত এক বছরে এই কমিটি কমপক্ষে দশবার বৈঠক করতে বসেছেন। কিন্তু বসাই সার, কাজের কাজ কিছুই এগোয়নি, মতান্তর মনান্তর ধ্বংস হয়েচে। এইমাত্র, পুস্তক প্রকাশ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে চাননি।

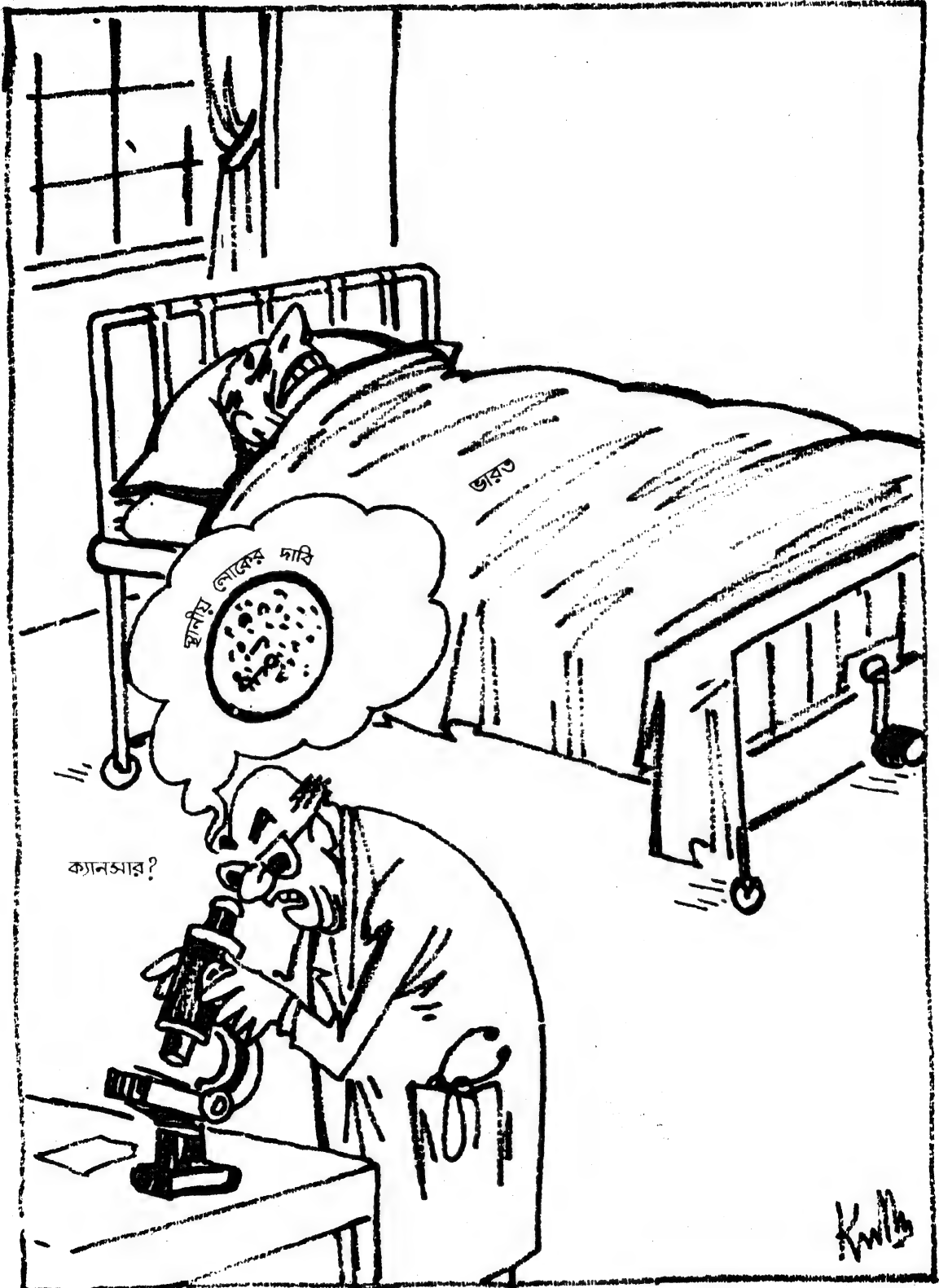
মতান্তরের কারণ কি? কমিটির সভাদের কি গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য নিয়ে মতভেদ আছে? নাকি এক একজন এক এক রকম চাইছেন, অথবা যোগ্য সম্পাদক খুঁজে পাচ্ছেন না? শোনা যাচ্ছে, কেউ কেউ নাকি বলেছেন, কমিটি নাথেকে কমিটি—তার কাজ করার কোনো ক্ষমতাই নেই, কমিটির বেশার ভাগ নির্দেশই পুরাতন বিভাগ মানতে রাজী নয়। কেউ বা জানিয়েছেন, কমিটির সিদ্ধান্তগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে অস্পষ্ট করে রাখা হয়েছে। কেউ বা বলেই পারছেন না, একই কাজ করার জন্যে একাধিক ব্যক্তিকে কিভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। এইসব গণ্ডগোলের ফল হয়েছে এই যে, কেউ কেউ কমিটি থেকে ইস্তফা দিয়েছেন, কেউ বা ইস্তফা দিয়েও আবার ফিরে আসছেন কমিটিতে। মোটামুটি এখন যা অবস্থা, তাতে কমিটি আছে কিন্তু কাজ করার কোনো চেষ্টাই নেই।

প্রকাশিত পুরাকীর্তি গ্রন্থমালার সম্পাদনা ও উপস্থাপনা নিয়েও নানা মহলে প্রশ্ন আছে। কেউ কেউ মনে করেন, গ্রন্থগুলি যেমন হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি, কারুর বা ধারণা, এই জাতীয় গ্রন্থ বেশী পাণ্ডিত্যপূর্ণ, গবেষণা জাতীয় জটিল পুস্তক করার কোনো কারণ নেই, বরং গ্রন্থগুলিকে মোটামুটি শিষ্টচরমণের জেলাগুলির সাংস্কৃতিক পরিচয় হিসেবে পরিবেশন করাই সম্ভব। এই ধরনের মতাবলম্ব অবশ্যই রয়েছে।

পূরাকীর্তি গ্রন্থমালা কেমন করে রচিত হবে তা কমিটির সভা এবং সম্পাদক বোর্ডের বিবেচ্য। তবে এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ যে, নানা মূর্খির নানা মত যদি শুনতে হয় তবে পূরাকীর্তি গ্রন্থমালা আর রচিত হবে না। বলা বাহুল্য, পূরাকীর্তি গ্রন্থমালার এমন কোনো উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয় যা নিতান্তই পণ্ডিতদের প্রয়োজনে লাগবে। এই গ্রন্থমালার আংশিক উদ্দেশ্য অবশ্যই জনপ্রিয়তা। সৈদিক থেকে পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থগুলি জনসম্মাদ লাভ করেছিল। সরকারী দপ্তরখানার লাট হয়ে পড়ে থাকে নি। কোনো কোনো গ্রন্থমালা পূরাকীর্তিরও প্রয়োজন হয়েছে। কাজেই এ রকম মনে করার কোনো কারণ নেই যে, গ্রন্থগুলির প্রকাশ অসমর্থক হয়েছিল।

পুরাতত্ত্ব বিভাগ যে ঠিক কি কারণে গ্রন্থমালা প্রকাশ স্বর্ণগিত রাখছেন তা জানি না। পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই কিছু কিছু গবেষক রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্থানীয়ভাবে, কেউ বা অধ্যবসায়ী, পারদর্শী। এদের সাহায্যে কেন যে পুরাকীর্তি গ্রন্থমালার মতন সংকলিত অথচ সর্বজনস্বার্থে গ্রন্থ রচিত হবে না—তা আমরা ব্যস্ত হই অক্ষম।

আমাদের সব সং প্রচেষ্টাই নানাবিধে বানাল হয়, কিংবা করা হয়। একদা যিনি চার বছরে পাঁচটি গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনিও ১৯৭৬ সালে দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি নিয়ে বলেছিলেন, রাজনীতি ও ব্যক্তিগতার্থের অদৃষ্টবশেষের জন্য তিনি পদত্যাগ করছেন। আসলে সবে মিলি করি কাজ—আমাদের জন্যে নয়। প্রতি পদেই আপত্তি, বাধা, মতাত্তর। আর এই মতাত্তরও যে সব সময় ব্যক্তিগ্রাহী তাও নয়। অনেক সময় ব্যক্তিগত রেবারেখিও কাজ করে। সাধারণ এবং তুচ্ছ কারণে পুরস্কারীরা গ্রন্থমালার প্রকাশ যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় পরাতত্ত্ব বিভাগের মর্মান্দা তাতে বাড়বে না। বরং এই বিভাগ এমন চেষ্টাই করুন যাতে উক্ত গ্রন্থমালা প্রকাশ করা সম্ভব হয়। কর্মিট যখন তারা গঠনই করেছেন তখন কর্মচারী মতভেদ থাকলেও কর্মিটির সুপারিশ গ্রহণ না করারই বা কি কারণ থাকতে পারে? আজ চার বছরে আলোচ্য গ্রন্থমালার একটি গ্রন্থও প্রকাশ করা গেল না—এটা কোনো কৃতিত্বের কথা নয়।



# সংগীতপ্রাঙ্গণের তুলসা হারাবাহ বসন্ত সোতদার

পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর বড় ছেলে জরুত সেদিন হঠাৎ বলল, “বসন্ত, যে মাসের শেষের দিকে আসছে তো পুনরায়?”

“কেন? তোমার বাগের বিশেষ মেহেতু?”  
“সে তো আছেই”, হারাবাহ-এর জন্য বড় অনুষ্ঠান হচ্ছে।

“হারাবাহ-এর জন্য? কেন?”

“তুমি জানো না? তিনি ৭১ বছর বয়সে পুরো করছেন। ২৯শে মে তার ৭৬তম জন্মদিন।

“দাঁড়াও, আমি টেলিফোন করি” হঠাৎ গেলুম ফোনের দিকে।

“আরে মজেকা, চম্পুতাই এখন হাসপাতালে! চিন্তা করো না, ছোট একটা অপারেশন। আজ লম্বায় ফিরে আসবেন।”—জরুত।

তবুও ফোন করি। চম্পুতাই-এর (হারাবাহ-এর ডাক নাম) বোমা বলালেন, “তাই এখন ভালো আছেন। আগামীকাল সকালে আসুন।”

হারাবাহ ৭৫? তাঁর অপারেশন? কত বছর দেখতে এসেছি তাকে। আমার জন্মের আগে থেকে গান করছেন।

হারাবাহ: সংগীতপ্রাঙ্গণের তুলসী। বুবা বয়েস থেকে ষাট বছর পার করেও হারাবাহ-এর চেহারা প্রায় কোনো বদল ঘটেনি।

তুলসীর মতনই শ্যামল বর্ণ, কানে মস্তুরের দুল ও হাতে টুটি, গলার মস্তুরের মালা, সেই মস্তুরে দাঁড়ি নেওয়া জবপর্ণ চোখ, সাদাসিধে যে কোনো রং-এর শাড়ি। মস্তুরে প্রবেশ করার সময় কোনো অস্বাভাবিক আত্মনিবেশ নেই। তানপুরা নিয়ে তুলসী বৈঠকতলা। স্রোতাসের প্রণাম, তাতে না আঁত নড়া না বাঁশিকতা। গায়নের সময় বাঁ হাতের তর্জনি ও মধ্যমা জড়িয়ে সুর দেখানোর আদত। কারেক মাত করার বেশ নেই, না তান-পালটার ফালতু সর্কিশ না তানের বাজি ফাটানো। সম্প্রতিয়াদের দিকে কখনও চোখ রাখার দেখা যেন না। স্ত্রী স্বভাবের অসম্পত্তি কোনো হাবভাব নেই। থাকত শব্দ, একটি মোহমহী, স্নেহহাস, শীতল স্বর এবং আদরে আদরে লয়।

গায়নের তাঁর বাড়িতে যেতেই আমি উত্তেজিত হয়ে বললুম, “অভিনন্দন চম্পুতাই, শতবার, সমস্তবার অভিনন্দন। আমার একারই নয়, দেশ পরিবার সমস্ত পাঠকদের তরফ থেকে আপনায় ৭৬তম জন্মদিনের জন্য হারদিক অভিনন্দন!” শতভাবের বললেন, “জন্মদিনের তারিখ ২৯শে মে, তুমি হাসখানেক আগেই অভিনন্দন জানাতে এসেছো?”

আমি বললুম, “মৌখিক শুভেচ্ছা আজ জানাচ্ছি তবু সেটা প্রকাশিত হবে যে মাসের শেষে সন্ধ্যাবেলা। কান্নেই...”

“ও যা, তুমি আমার জীবনী লিখতে এসেছো কী?”

“না না”, আমি এবার প্রথমেই চম্পুতাইকে জামা করে দেখি। শরীর একটু দুর্বল, গলার সুর কণী। তবু চেহারা শাফির ভাব আগের মতনই। “আপনার ইংরেজিও নিতে আসিনি, আজ আপনার ৭৫ বছরের বৈভবশালী জীবন। সেই অভ্যুত্থার কোন কোন ঘটনা আরও আপনার স্মৃতিপটে জাগ্রত হয়ে আছে? সেগুলো শব্দ বলুন। কানপুরে ডাঃ মিস্ত্রিরদের বাড়িতে সমানে আট দিন নিজের সংগীত জীবনের অনেক বাহ্যারবার কিস্সাগুলি আপনি আমদের শুনিয়েছিলেন। সেরকম নয়। শব্দ আই ঘটনগুলি যে আপনি কখনও ভুলতে পারেননি, পারবেন না। ২৯শে মে পুনরায় আপনার জন্য বড় অনুষ্ঠান হবে। বালগম্ভব রংগমঞ্চে ফলমালার শরীর প্রায় আচ্ছাদিত অবস্থায় আপনি সংগীত গণিজনদের মধ্যে বসে থাকবেন তখন জীবনের কোন কোন প্রসঙ্গ আপনার চোখের সামনে ছবির মতন

আলবে? আস্তে আস্তে বলুন। আমি কোনো প্রশ্ন করব না।

রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে বর্ষাকাল নিয়ে যেমন বর্ণনা আছে অবিকল সেই রকম সুরের বর্ণার কথাটা শব্দ করলেন হারাবাহ।

“বসন্ত, বাল্যকালের দিকে যখন তাঁকির দেখি সবার আগে মনে পড়ে আমার বাবার মস্তুর মতন মিলিত গলা। সেই স্বরলহরী আজও কানে গুলুন করছে। বাবা রাতদিন রোজক করতেন। আমাকে অথবা আমার দুজন বোনকে কখনও দেখান নি তিনি। তাঁর ধারণা গনি-বিনা মেয়েদের জন্য নয়। থাকিও হয়, নিজের মেয়েদের জন্য একদম যারগ। বাড়িতে আমার মূখ থেকে তিনি সকাঁড়কে গোহর-জাম ও মলকাজনের গামের নকল শুনতেন, হাত-তালি ও শাবলকী নিতেন কিন্তু শোনার নাম নেই। আমরা তিনজন বোন গানের টানে বাবুল আর বাবা তাঁতি করে ছিলেন হুজুরপাথরা কন্যাশালায়।

[স্বগত]

মরহুম উস্তাদ আবদুল করীম খাঁ সাহেবের পিচ্চন ছেলেমেয়ে। বড় ছেলে সুরেশবাবু, মানে (জন্ম ১৯০২) তারপর হারাবাহ জন্ম (১৯০৫)। নবজাবের অসীম লালিত এবং মহাশা ভ্রম থেকেই নিয়ে এসেছেন হারাবাহ। কল্যাণীতি না করে তিনি এই পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি হলেন। মৃতজাত মনে করে মাস’ তাকে কাপড় বেঁধে একদিকে রেখে দেয়। হঠাৎ একজন ডাক্তারবাথ, দেখি দেখি বলে সেই পুটুলিটা খুলে দেবে। তারপর তড়াহ ডো। নবজাত মেয়ে বেঁচে আছে শব্দে খাঁ সাহেব খুব খুশী। চম্পুচাপ জন্মেছিলেন তিনি এবং সঙ্গীত-মহল থেকে রসজ স্রোতাসের বড় পবিত্র চম্পুচাপ পৌঁছেছিলেন।

খাঁ সাহেব মেয়েদের গান শিকার বিরুদ্ধে ছিলেন বটে, হারাবাহ-এর গান ও কীর্তি শব্দে পরে নিজের তুল শাখার যেন।

হারাবাহ: এবার পর মনে পড়ে সাদার গান। তিনিই আমার প্রথম গুরু। ১২ বছর বয়স থেকে ওঁর কাছে শিখতে শব্দ করছি। ১৫ বছর বয়সে আলদিয়া খাঁর শিবা লক্ষ্মীবাই আখও-এর গান শানে অবাচ অভ্যুত্থ হয়ে গেছি। লক্ষ্মী বাই-ই



তখন আমার আদর্শ। তাঁর মতন গয়ন শেখার জামা প্রজ্ঞালিত হয়। তারপর রাতদিন নিরামিত রোজক। দাদা শেখাতেন, মা ঔষোহ দিতেন। মা নিজে বাবার শিষ্য, খুব ভালো গায়িকা। আবার উচ্চাকাঙ্ক্ষী। ছেলেমেয়েদের শিখাি করার জন্য কত খেটেছেন। আজ সবার কথা মনে পড়ে। দাদা যে অকালে মারা যান।

[স্বগত]

হারাবাহ-এর মায়ের নাম তারাবাই। দাদা সুরেশবাবু, মানে পদবী লাগতেম। অসধারণ গায়ক। ঠুংরীর বাদ্য। হুজুর বাবার মতন গায়ন কিন্তু কি দুর্ভাগ্য দেখুন, বড় মেহেতিলে জমাতে পারতেন না। হারাবাহি ছাড়া মিলিত তর্জী ও প্রজা অল্পে এ দুজন গায়িকা সুরেশবাবুরই প্রধান শিষ্য। পণ্ডিত ভীমসেন এবং বসন্তরাও দেখলপেও সুরেশবাবুর কাছে থেকেই, শিখিয়েছিলেন বটে কিন্তু তাঁর গায়কীর নজাকত তাঁর সঙ্গেই গেল। তাঁর মৃত্যু বটে ১৯৫০ সালে।

হারাবাহি: তারপর ১৯২২ না ২৩ সাল, ঠিক মনে নেই। তোমার ইন্দোর শহরের দোল দেখতে গিয়েছিলেন মায়ের সঙ্গে। বড় অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে উস্তাদ ওরাহি খাঁ এসেছিলেন। তিনি আমার বাবার ভাস্পে, আমার শিষ্যত্বেরা ভাই। লায়-করা গায়ক এক সর্বশ্রেষ্ঠ গান-শিকক। মা জিগোস করলেন, “আমার মেয়েকে দেখাবেন কি?” তিনি বললেন, “আগে গান শুন, পরে ঠিক করবো।” আমি খুব রোখা, লাজুক মেয়ে। তানপুরার আকারের মধ্যে হারিয়ে বাবার মতন দেখাবিঁ। মা ও মায়েরা ঔপাধ ছিলেন, দাদা হারমোনিয়াম নিয়ে সঙ্গত করতে বললেন। কি গেরেছি আজ মনে নেই আমার। কিন্তু গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাক বললেন, “মামী, আমিই দেখাবো মেহেতিলে। আর কারুর কাছে পঠিয়েন না।” শেষে ফিরে এসে নাক্তা বন্ধনের অনুষ্ঠান হয়।

[স্বগত]

ওরাহি খাঁ সমানে পঁচ বছর শেখালেন। মূহ হস্তে, মূহ কণ্ঠে বিনা দিলেন। আবার বাড়িতে রোজক করিয়ে নিতেন মা ও দাদা। হারাবাহি-এর দাদা স্বভাঃকৃত এক বামবেশালী প্রতিভার শিল্পী। আজ এক গাইবেন, আগামীকাল আর কখনো। পরে হারাবাহি মোহরজানের কাছে ঠুংরী, বালগম্ভবের কাছে নাট্য সংগীত এবং ওম্বাকব্রার কাছেও কিছুটা শিখলেন। কিন্তু তাঁর গায়নে ওরাহি খাঁরই ছাপ। ওরাহি খাঁ সাহেবের জ্ঞান খুব গভীর তবু, আসর জমানোর জন্য গলাটা খুব একটা অনুকূল ছিল না। তাঁর তিনজন শিষ্য তিনটি নগরে। বসন্তে হারাবাহি, শিঞ্জিতে মুল্লিবাই এবং লখনউ শহরে আব্বতরীবাই। খুরে বেড়াতে তিনটি জারগার। আমার খাঁ সাহেব নাক্তা বন্ধননি তাঁর, তবু আমার খাঁর বিলম্পত গায়কীর গুরু ওরাহি খাঁই।

পণ্ডিত ভীমসেন ওরাহি খাঁ সম্পর্কে একটি কথা জানালেন। ভেবেছিলেন, যখন বড় গুলাম আলির জীবনী লিখব তখন সে কথাটি দেব কিন্তু এখন সেই লোভ আর সম্বরণ করতে পারছি না।

পণ্ডিতজী জানালেন, বড় গোলাম আলি একবার ওরাহি খাঁর কাছে শেখার অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি না করে দিলেন। একজন শিষ্য জিগোস করল, “উস্তাদজী বড় গোলাম এমন মহান গায়ক শিষ্য হতে চাইছেন তাতে আপনারও তো সৌরব। আপনি কেন প্রত্যাখ্যান করলেন?” তখন ওরাহি খাঁ সাহেব ঠান্ডা গলার জবাব দিলেন, “বড় গোলামের গলার পাহাড়ি মউমাহিরা মধু সগ্রেহ করে রেখেছেন। খুব মিষ্টি এবং তৈরী গায়ক। তাঁর গায়নে শব্দ এক আখটা মোহ আছে। আমার কাছে শিখলে সেটাও সরে যাবে। কিন্তু তারপর আর



রেশমী কোমল, উজ্জ্বল কেশভার। সানসিক শ্যাম্পুই  
নয়—আপনার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় প্রসাধনী। কারণ,  
একমাত্র সানসিক শ্যাম্পুর যত্নই আপনাকে দিতে পারে  
সেরা সৌন্দর্য, আর সৌন্দর্য সাধনে তৃপ্ত এক অভিনব  
অন্তর্ভূতি।

আর এখন, 'নতুন-রূপের' সানসিক শ্যাম্পুতে পাবেন  
আরো কিছু : প্রাকৃতিক উপাদান—যা চুলের জন্যে  
উপকারী বলে আপনার জানা আছে।

যতই সাজগোজ করুন না কেন, সানসিক ব্যবহার  
করলে তবেই আপনার রূপ সত্যিসত্যি ফুটে উঠবে।  
এখনই ব্যবহার করতে শুরু করুন।

# সান সিক\*

মেয়েদের একান্ত প্রয়োজনীয় প্রসাধনী



'নতুন-রূপের' সানসিকের ডাঙারে পাবেন প্রত্যেক ব্রকমের চুলের  
উপযুক্ত রকমারি শ্যাম্পু।  
সাজগোজ চলবে জানা আছে। তেলা চলেবে জানা নেই।

সমস্ত গায়ক কুলা হয়ে যাবে, তার কি? প্রোভাতারা আর কাউকে শুনবেই না।

**হীরাবাই :** ১৯২০ সালের আর একটি ঘটনা, মেটা, জানো, চাইলেও ভুলতে পারব না। উত্তাধ-জীর কাছে সব শিখতে শব্দ করেছিলাম তবুও তিনি ইমারত দেন। খিদের ইজাজত জানব? খিদেরটোয় গান করার আর মা পুনার আর্থিকরণ খিদেরটোয় আমার প্রথম জলসা করান। কি সব কথা! তখন কেশববাই মোগবাইরা বরসে আমার চেয়ে বড় হলেও কখনও আসর করেননি। মেয়েরের গান শুনতে বাওয়াও বহন বরস গান গাইবে কে? তখন শব্দ, তমশার তব্বেরকরা খিদেরটোয় নাচ করতেন। নাচের সঙ্গে হালকাহালকা গান। সেই সময়ে আমি তিন ঘণ্টার উত্তাধ সঙ্গীতের মেহেফল করলুম। বারা এসেছিলেন, ভরে ভরে, খেমে গিরে গান শুনছিলেন। গানের চেয়ে দরজার দিকে তাঁদের কান। দ্বারশিষ্ট হবার আশঙ্কা ছিল। আমি ভরে ধরবার কাঁপছিলুম। হারওয়ানিরায়ে দাদা এবং তব্বার ছিলেন বলবন্তরাও রুড়ীকর। টিকট ছিল আট আনা থেকে তিন টাকা। ভাগিস, কোনো হাস্যময়। কিন্তু পুনা বশের নামকরা গায়করা খুব রেসে গেলেন। 'এই স্বভাবত মেরে উল্লঙ্গ সগণী আট অনার এই বিকি করে ডিল'—তাদের ক্ষোভ। তিকিই জমল জলসা। গানের জন্য ডাক আসতে শব্দ হল। বেশি করে বিয়ের বাড়িতে ঘরোয়া আসর। ৩৫ টাকা পেয়েছি। ১০ টাকা সগণীতাদের। ২৫ আমার। মনে পড়ছে তার আসকের কথা : বাড়িতে কেউ বড় লোক এলে গাইতুম। তারা বেশি হয়ে রূপের মেডেল দিতেন—তখন সেই মেডেলের নাম বাড়তে মাত্র একটাকা। সেই ক্ষুর মেডেলের জন্য আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা, গেয়ে থাকতুম। মেডেল পেলে বের স্বর্গের ছাত্তাকে সম্পর্ক করছি এমন আনন্দ। আর হঠাৎ মাত্র আঠারো বছর বরসে আমি একটা আসরে ২৫ টাকা পেতে লাগলুম। অমনিও খুশি!

[স্বগত]

আর্থিক খিদেরটোর জলসা ভারতীয় উত্তাধ সগণীত জগতে রটিমতন বিকল ঘটিয়ে এনেছে। কুলীন বাড়ির মেরে মঞ্চে বসে গান করছে?—অবলম্বন, লাহোল দিলা কুওয়াত, নির্বিশ্ব। এটা হীরাবাই-এর সবচেয়ে বড় অবদান! এজন্য তার কাছে ভারতীয় শব্দটির সগণীত এক সমস্ত মহিলা শিল্পীরা চিরকাল উপকৃত। কয়েক বছর হীরাবাইকে খুব অপমানিত অবস্থায় আসর করতে হল। বিশেষত ছোট শহরে। তিনি একটি ডিজ গাইতেন, হঠাৎ প্রোভাতের মধ্যে থেকে শিস্ আসবে, সন্তা গানের ফারমাইল হচ্ছে, 'বাড়ির গান না' এরকম বিকার। তাঁর চারি নিরে কানাহাওয়া। তবু হীরাবাই নিভরে বসে বৈঠক জমাতেন। অভুলানীর তাঁর মনের জোর। হীরাবাই-এর আগের হাজার পচিশ বছরের ভারতীয় গেমসগণীতের ইতিহাসে কোনো মহিলা গায়কের নাম পর্যন্ত নেই। আজ সেই ইতিহাসে হীরাবাই-এর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়েছে।

আর যখনই মহিলা গায়কদের আসর শুন, মেয়েরের রোজক করতে দেখি, ওদের জানাতে ব্যাকুল হয়ে উঠি, 'জানো তোমাদের গুরু যে কেউ হোক, গল্পনের স্বাধীনতা দিয়েছেন হীরাবাই। তাঁর অদৃশ্য আঙ্গুল ধরেই তোমরা মঞ্চে উঠেছ।'

**হীরাবাই :** পরের বছরই, মানে ১৯২৪-এ নাগপুরে অনুষ্ঠান হয়। আজও সেই মেহফিলের প্রত্যেকটি মুহূর্ত মনে পড়ে। একটি মেরে হিল্লুখানী সগণীত গাইবে? নাগপুরবাসীদের জন্য যেন পৃথিবীর অন্ধম চমককার। কলকটের খিদেরটোয় একেবারে ফল। পরমা উপরে বার। আমার দুর্বল গঠন দেখে লোকেরা চিৎকার করে, 'এ গঠনবদ্ধ মেরে গাইতে পারবে কি?' আমি ভরে ব্যাকুল। গান শব্দ কর এবং জমজাই অস্তরা জর সনে আসতেই

হতেই পর পর ১৩টি অনুষ্ঠান ঠিক হয়। নাগপুর আরও আমাকে সেইরকম ভাসোবাসে।

[স্বগত]

হীরাবাই সনে আসার যে কথা বললেন সেটা শুনই তাঁর গায়কীর হীরের টুকরোগুলি আমার স্মৃতিতে চমকে উঠল। মুরুলী মেনে ডোলা স্বরকাজ এবং জমজাই অস্তরার পর সর্পিগতিতে বিলম্বিত হিয়ার করা তাঁর বিশেষত্ব। তবু তাঁর স্বরজালের মোহিনী থাকত শব্দ একটা মুরে—উপরের বড়ল। তাঁর আঁচ বড়ল লাললেই সমস্ত কোলাহল, কথাবার্তা, গুনগুন শেষ। কত কি ঘটে গেছে গত ৫০ বছরের মধ্যে। মহাছন্দ, আর্থিক, সশোধন, পুস্পলীত, ফ্যাশানে নানান বদল, হরেক রকমের হুচি-পালট। তবু হীরাবাইর অনাধিত্য তার বড়দের স্বাভাবিকতা সেই রকম টাটকা, রুচিকর। হীরাবাইর সমস্ত গায়কীর গঠন বোলনার মতন। প্রোভাতা প্রায় ৫৫ বছর পর্যন্ত সেই বোলনার বসে কুলেছে, খসেছে। কখনও বোলনার দাঁড়ি ছিঁড়ে বারান, খোঁচা। ৫৫ বছর! এত দীর্ঘকাল কোনো গায়ক বা গায়িকা গেয়েছে মনে হয় না। যদি গেয়েছে, হীরাবাই বড় আসর করেছেন তত নিচুই করেনি। সভা-সম্মিলনী, আকাশবাণী এবং বহুরা, আবার ৫ বছর নাটকের নায়িকা হিসেবে হীরাবাই হাজার হাজার অনুষ্ঠান করেছেন। গানের সময় হীরাবাইর ডাবজল্লী দেখে মনে হত তিনি প্রত্যেকটি মুর দেখে পরিকার দেখছেন। সত্যিই হচ্ছেন তিনি সেই বরদান তিনি দাদা ও বাবা থেকে পেয়েছেন। আর হীরাবাই যে স্বরশব্দ ছেঁবেন সেগুলো মধ্য-মুদারী সমস্ত কবিদের পদ্যের মতন প্রসাদিক পবিত্র। তিনি সাধু,সুভদ্র গায়কীর প্রবক্তা। কাজেই যদিও তিনি নুতন রাগ রচনা করেন নি, চিজ-বল্লিশ বইয়ে নি, তিনি তাঁর সময়ের সবচেয়ে লোকপ্রিয় গায়িকা। অভিজাত উত্তাধ সগণীতে রস জাগাবার অভিনাৱী প্রোভাতের জন্য প্রথম পাঠ হচ্ছে হীরাবাইর গায়কী। প্রকৃতির শীতল জলের মতনই প্রবাহিত গানশিল্পী।

হীরাবাই : তোমাদের কলকাতার কতবার যে গেছি কিন্তু মনে পড়ে ১৯৪০-এর আসর। কোনো নাহারবাড় ডেকে ছিলেন। কে এল সহগল সেজেটোরা। আমার আগে রোয়ানখারা বেগম গাইতে বসে। গানের শেষে সে 'জমুনাকে তাঁর' গায়। সেটা ডেবরী মনে তার গানের সঙ্গে অনুষ্ঠান শেষ। আরোজকরা চিন্তিত, এবার আমার কি হবে? আমি বসে মাদুরবিহাণ এবং হোরী খেলা মোসে নন্দলালা গাই। প্রোভাতের প্রচণ্ড হাততালি। ১২টি স্বর্ণপদক পেলাম। সহগল মঞ্চে উঠে যারা পদক দিয়েছিলেন তাঁদের নাম পড়ে শোনান।

[স্বগত]

কলকাতার হীরাবাই প্রথম গান ভূগেনবাবুর অল বেগল কনফারেন্স-এ ১৯৩৭ সালে। সেই লালক কলকালিকে হাত ধরে মঞ্চে নিয়ে এলেন সুরেন্দ্রী কেশববাই। তিনি প্রোভাতের জানান, 'হীরাবাইর পলকভঙ্গের শরীর মুরের গুরুত্ব বহন করতে কত সমর্থ সেটা আপনাদের দেখানোর জন্য আমি নিয়ে ওকে নিয়ে এসেছি। শুনুন।' আর প্রোভাতা হীরাবাইর স্বরপ্রোভে জসতে লাগলেন।

হীরাবাই : আর শব্দ একটি ঘটনা। অবিস্মরণীয়। ১৯৪৪ সালের বকেতে বার্ষিক নাট সম্মেলনে 'সোভিট নাটক করা ঠিক হল। সম্মেলনের সভাপতি বালগম্বর্ষ ছিলেন এজন্যই। কিন্তু তিনি সুভদ্রার ভূমিকা করতে কিছতেই রাজী হননি। বললেন, বরেন হার গেছে, স্ত্রী-ভূমিকা আমাকে আর মানার না। তোমরা যদি চাও অজুনের ভূমিকা করতে পারি। তখন সীমিতর সদস্যরা সুভদ্রার ভূমিকা জন্য আমাকে অনুরোধ

অস্বীকার করে। রায়-এ টিকিট বিক্রি হয়, এক লক্ষ টিকার চেয়ে বেশী টিকিট সেল। আমাদের মুরনের প্রত্যেকটি গানকে এনকোর দিচ্ছে প্রোভাতা। রাত চল্লিশ শব্দ হয় নাটক এবং শেষ হয় সকাল ৬টা।

[স্বগত]

বালগম্বর্ষ পরম প্রতিভালব্ধ শিল্পী। মহারাষ্ট্রের বালগম্বর্ষ তিন ব্যক্তির প্রীতি প্রধান দুর্বলতা—যোশা পিবাজী সন্ত কবি জ্ঞানেশ্বর এবং গায়ক বালগম্বর্ষ। তাঁর নাম শ্রীনারায়ণাও রাজাইয়া।

ছোট নারায়ণের নাম শুনলে লোকজানা টিলক নাম দিলেন বালগম্বর্ষ। তিনি রাজাটি সগণীত নাটকে স্ত্রী-ভূমিকা করতেন। তাঁর মূপ, পাগড় পরা ও খোঁপার ধরন তখনকার মহিলাদের ক্যাপান হত। মেরো বালগম্বর্ষের গোষ্ঠাক্ষরে অনুকরণ করতেন, পুরবরা ব্যক্তির রজাধরের বাসন বিক্রি করে তাঁর নাটক দেখতেন। আলাদিয়া ধী, আবদুল করীম, ফৈয়াজ ধী, ওয়াবেছাধা যে কোনো নাম নিন, বালগম্বর্ষের গায়নের চাইয়া। মরহুম তবলা-নওয়াজ উম্মাথ অহমেদজান থিরাকুরা বেই বালগম্বর্ষের গান শুনলেন তাঁর সঙ্গত করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। অনেক বছর থিরাকুরাধায়ে গম্বর্ষ নাটক কোম্পানির সঙ্গে মুরে বেগুন হতেন। শব্দ বালগম্বর্ষের সঙ্গে সঙ্গত অন্য গায়ক-অভিনেতা-দের জন্য অন্য তরঙ্গিল।

বালগম্বর্ষ গানের আসর করেন নি কিন্তু নাট্যসংগঠিত সমস্ত রাগগুলি পরিপূর্ণ ও পরিষ্কারভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। হীরাবাইর আসর এবং কোম্পানির নাটক একই শহরে বহন হতো, নাটক শেষ হতেই বালগম্বর্ষ হীরাবাইর মেহফিলে পৌঁছে যেতেন। তিনি বলতেন, 'আমার গানগুলি সহী সহী গায় শব্দ হীরাবাই।'

এমন আমাদের হীরাবাই বড়োদেবর। বড় মিষ্টি গায়ন তত মিষ্টি স্বভাব। সগণীতমহলের সব চেয়ে নিরহংকারী জ্ঞাতাশব্দ। ভারতের একমাত্র শিল্পী যার বিবরে অন্য সমস্ত শিল্পীরা ভালো বলেন।

"শব্দ শিল্পীরাই কেন, জনসাধারণও বারা চম্পুতাইর সম্পর্কে একবারও এসেছেন শব্দ জলো মত প্রকাশ করেন। জানালেন মুরেশবাবুর শিবা এবং পণ্ডিত ভীমসেন মোশারী স্ত্রী বললেন। একবার প্রভা অরে ও আমি চম্পুতাইর সঙ্গে আবদুল করীম ধী সাহেবের শ্রুতিভাতির জন্য মীরজ গিরোহিলাম। কত যে খেঁজাল রাখলেন আমদের। আমি গান করতেমতে ওটার আগে জোর করে আমার হাতে খিঁজের সোনার চুড়ি পরিয়ে দিলেন। আমারই কেন, লতার খেঁজাল রাখেন। মুরেশবাবু অকালে মারা যান। তাঁর ৪-৫ মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা, কিরে সব কিছুর ব্যবস্থা করেছেন। বড়ো গরিব গায়কদের মনা সরকারী অনুদান যোগাড় করেন, নবাবিকাধী'দের উপার্জক যেন। আজ ৭৬ বছর বরসেও সেই উল্লাহ, লোককল্যাণে বের প্রদত্ত।"

ওটার সময় আমি প্রথমবারই জিগ্যাস করলুম, চম্পুতাই এখন ভারতীয় সগণীতের অল্কা কী? তিনি বললেন, "অধার ভাই, আমি তো সব আঁচই আঁচ করছি। আজকের যুবকবরী আসলে বেশী সতেজ ও বুদ্ধিমান। কিছু খুব চকল। আমি কি বলি এদের জানো? আমি অল্কা মনে মনে বলি, যেহে, গানবান্দার জন্য হরতা সমর না দিতে পারো তোমরা। জীবনটা কাষ্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে। জন্মভাবে ভালো বাবহার তো করো কমস কম।" এদের গল্পর মত খন নেই তার চেয়ে বেশি শব্দ এদের নাকের ভগার চমকে ওঠে। কি কবি যার, বলা? "

আমি আর কি বলতে পারি। তাঁর ৭৫তম জন্মদিনের জন্য তিনি যে সন্ধ্যাবহারের সম্মেল দিলেবন সেটা শিল্পী এবং সাধনজনের কাছে

# জীবনে ছোট-খাটো মুখের মূল্যও অনেক...



শিশুর চোখে আনন্দের ঝিলিক দেখা কিংবা বাড়ির সবাইকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার আনন্দ বড় কম নয়, ছোট হলেও জীবনে এই মুহূর্তগুলির মূল্য অপরিণীম। আজ আপনার বয়স অল্প, সঞ্চয় করার মতো কিছু পরস্যাও আপনার হাতে আছে—আজই কানাডা ব্যাঙ্কে একটি নিরন্তর ডিপোজিট খুলে ফেলুন। অল্প কিছু টাকা—তা সে হত কমই হোক না কেন—নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে কিংবা কিছু টাকা একসঙ্গে জমা রাখলে এ থেকে সারা জীবন আপনার বেশ কিছু বাড়তি আয় হতে পারে। কানাডা ব্যাঙ্ক প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে টাকা দিতে শুরু করবে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—সারা জীবন ধরেই এই টাকা আপনি পেয়ে যাবেন। বিলাসিতা, সুখ—এমন কি অবসর জীবনের শান্তি, সব কিছুই হবে আপনার করায়ত্ত। এই কুবেরের ভান্ডার শেষ হবে না কোনদিনও। অথচ আপনার মূলধন অক্ষরই থেকে যাবে, প্রয়োজনে তাও কাজ লাগতে পারবেন।

যেসব অল্পবয়সী মানুষ জীবনের পুরো আনন্দ উত্তল করে নিতে চান, কানাডা ব্যাঙ্কের দূরদর্শী নিরন্তর ডিপোজিট তাদেরই জন্যে।

বিশদ বিবরণের জন্যে কানাডা ব্যাঙ্কের নিকটবর্তী শাখায় চলে আসুন। আমাদের অন্যান্য আরও বিশেষ পরিকল্পনার মধ্যে আছে : কামধেনু, বিদ্যানিধি এবং বালকেম।

## নিরন্তর ডিপোজিট

## কানাডা ব্যাংক

(একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক)

সারা দেশে এই  
ব্যাঙ্কের ১২০০-রও  
বেশি শাখা আছে।



১১০০

৭৭ সালে ভারতীয় রাজনীতির রূপমণ্ডে যে জনতা পার্টির আবির্ভাব হয়েছিল, যার পুরোখা ছিলেন জগদ্রকাশ, তাদের পরের কার্যক্রমে ধীরে ধীরে এটাই প্রকাশ হয়ে পড়েছিল যে, তাদের কাছে ভারতবর্ষের শাসনকার্য ছিল গোপ, ইন্দিরা গান্ধী ও কংগ্রেসকে হঠানোই ছিল মূল লক্ষ্য। নির্বাচনে যে কাজ হাসিল হবার পরই তখন থেকেই সব যেন এলোমেলো হয়ে যেতে লাগল। কিছু দিন দরবে কাজ চলল বটে, কিন্তু দলকে দীর্ঘস্থায়ী করার কোন প্রচেষ্টা শূন্য থেকেই দেখতে পাওয়া যায়নি। জনতা দল বিভিন্ন রাজ্যে শাখা ও গড়ল—কিন্তু সেটা নগে মাত্র। দলীয় নির্বাচন ক্রমাগতই পেছিয়ে গেল এবং কোন দিনই হল না। মন্দিরে যারা আসীন হলেন, তাঁদের মধ্যে যোগ্য লোকও অনেক ছিলেন, কিন্তু রেষারেষিও ছিল। প্রথমে তা প্রকট হয়নি, পরে প্রকাশ পেল। শূন্য থেকেই নির্বাচনকে এঁরা এড়িয়ে চলেছেন। প্রধানমন্ত্রী হলেন মনোহর-সেখামেও নির্বাচন এড়ানো হল। তারপর কি পাল্লিমন্টারী শাখা, কি সংগঠন শাখা—কোথাও নির্বাচনের উপর জোর দেওয়া হল না। বাইরে থেকে কেন্দ্রে খুব শক্তিশালী মনে হলেও সত্যিকারের কোন শক্তি ছিল না। যে ক'টি দল নিজেদের অস্তিত্ব লোপ করে দিয়ে একত্রিত হয়ে নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী ও কংগ্রেসকে হারিয়েছিল, শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর দেখা গেল ভিতরে ভিতরে দলগুলি আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করছে। দলে যে শূন্য শাসনকার্যই অবহেলিত হল তা নয়; জনতা দল নামক দলটির অস্তিত্ব লোপ পাবার সম্ভাবনাও উদ্ভূত হয়ে উঠল। সেইজন্য ভাষণে যখন শূন্য হল, সাধারণের কাছে তা অপ্রত্যাশিত হলেও দলীয় নেতারা খুব একটা বিচলিত হয়ে-ছিলেন বলে মনে হয় না। যে ক'টি দল একত্রিত হয়েছিল—লোক দল, জনসম্ম, সংগঠন কংগ্রেস, সোস্যালিস্ট পার্টি, এবং শেষে যুক্ত হয়েছিল সি এফ ডি বলে এক পার্টি, যার এই যুক্ত হবার জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল, আগে কোন অস্তিত্ব ছিল না। চন্দ্রশেখর হলেন দলের সভাপতি—সেও মনোহর। যে দল ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, সে দলের সভাপতির যে মর্ষাদা পাওয়া উচিত, প্রশাসনে যারা ছিলেন, তারা কোন দিনই তাঁকে সে মর্ষাদা দেননি। সমস্ত নজরটাই ছিল প্রশাসনিক দায়িত্বে যারা আছেন তাঁদের মর্ষাদা বশ্বির জন্য। দলের মর্ষাদা বা দলের শক্তি বশ্বির জন্য কোন চেষ্টাই তারা করেননি।

প্রথম থেকেই লোক দলের গাভড়পাণী ভাল ছিল না। প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে তো দ্বন্দ্ব ছিলই, তারপর মন্ত্রিসভায় কে দ' নম্বর এবং কে তিন নম্বর হবেন, তাই নিয়ে চরণ সিং এবং জগজীবন



জগজীবন জনতা দলের সভাপতি শপথ নিচ্ছেন।

রামের মধ্যে দ্বন্দ্ব। সোস্যালিস্ট পার্টির যারা তাঁদের একাংশের খুঁতখুঁতানি লেগেই ছিল। আর সভা সভাই কান্ট্রিডজ-মধু লিমায়ের পক্ষে যাদের বরাবর তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিপাল্পন্য বলে এসেছেন তাঁদের মন থেকে মেনে দেওয়াও শক্ত ছিল। আর নতুন সৃষ্টি সি এফ ডি—তাঁদের মধ্যে মতান্তর মনান্তরে পরিণত হয়েছিল। সংগঠন কংগ্রেসের দু'একজন যারা প্রথমেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের বাদ দিলে সামগ্রিকভাবে সংগঠন কংগ্রেস ও জনসম্মারী শব্দখলা মেনে নিতে চেষ্টা করতেন। এর মধ্যেও গোলামাল ছিল। সংগঠন কংগ্রেসের নেতা মোরারজীভাই প্রধানমন্ত্রী হয়ে চড়চড় করে এত উপরে উঠে গিয়েছিলেন যে, সংগঠন সম্বন্ধে তাঁর নিষ্পত্তি হতা ঔদাসীন্যে পরিণত হয়েছিল। আর কংগ্রেস থেকে যারা এসেছিলেন—চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্ত, রামধন প্রভৃতি—এঁরা খানিকটা নিজেদের জনতা দলের বলেই মনে করতেন। সোস্যালিস্ট পার্টিরও এক দল—যেমন, সুব্রহ্মমোহন, মধু দম্ভবত—এঁরাও খানিকটা খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তারই মধ্যে এমন একটা বিপ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, দল আর কোনরকমেই টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। চরণ সিং এবং রাজনারায়ণ প্রভৃতি ঠিকই করে রেখেছিলেন যে, চরণ সিং প্রধানমন্ত্রী হবেন—না হওয়ায় তারা ক্ষুব্ধ। তাই প্রথম থেকেই তারা চেষ্টা করতে লাগলেন জনতা দলের মধ্যে ভাঙান এবং বাইরে যাদের সঙ্গে সম্ভব মিতালাি করে লোক দলের প্রধান চরণ সিং বাতে প্রধানমন্ত্রী হন। যে সজয় গান্ধী সম্বন্ধে বিভিন্ন কটাক্ষে রাজনারায়ণ খ্যাতি (?) লাভ করেছিলেন সেই সজয় গান্ধীর সঙ্গে মিতালাি করার জন্য তিনি উঠেপড়ে লাগলেন। ইন্দিরা কংগ্রেস বিরোধী দলও সৃষ্টি হল। তারা কোন সুযোগের অপব্যবহার করল না। তারা চরণ সিংকে সমর্থন করল এবং চরণ সিং জনতা (এস) নামে দল গঠন করে সেই দলের প্রধান হিসাবে হলেন প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতি ও তাঁর পরামর্শদাতারা অনর্থক তাড়া-হুড়ো করে চরণ সিং ও তাঁর সমর্থকদের

মন্ত্রিসভা গঠন করতে বললেন; যেন তাঁরা দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছিলেন যে, তাতেই দেশের মঙ্গল হবে। ইন্দিরা কংগ্রেস তৈরীই ছিলেন—তারা জনতা (এস)-এর পক্ষ থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলেন। রাজনৈতিক দল হিসাবে ইন্দিরা কংগ্রেস যা করেছিল, তার বিরুদ্ধে কারো কিছু বলার নেই। মনে রাখতে হবে, বর্তমানে পৃথিবীতে যে রাজনীতি চলছে, তা ম্যাকিনাভেলী ও চান্দকার অনুসরণে। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ই এই মতেই পলিটিক্যাল সায়েন্স-এর শিক্ষা দেয়। কাজে-কাজেই এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করবার অবকাশ নেই। জনতা দলে যারা অবলম্বিত ছিলেন, তারা ক্ষেপে উঠলেন। এমন কি, তাঁরা রাষ্ট্রপতিকে ইমপিচ করার ভয়ও দেখালেন। আর, দলের দলপতি হলেন জগজীবন রাম। অনেকে ভাবলেন এখানেই ব্যর্থ শেষ, কিন্তু সেটা ভুল। জনতা দলের কোথাও কোথাও একটু সুনাম হয়েছিল, কিন্তু তদারকী সরকারের পাঁচ মাসের রাজত্ব প্রমাণ করে দিল যে, ইন্দিরা গান্ধী এবং তার দলকে সরানোর ভারতবর্ষের বিরাট সর্বনাশ সাধিত হচ্ছে। লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনে জনসাধারণ প্রমাণ করে দিল যে, ভারতবর্ষে জনতা দল বলে এসেছিল, তার অস্তিত্ব রাখবার কোন প্রয়োজন নেই। নির্বাচনে দেখা গেল জনতা দল ভেঙ্গে যেসব দল সৃষ্টি হয়েছিল, তারা সকলের সঙ্গেই মিতালাি করতে প্রস্তুত। জনতা দলের বাইরে যেসব দল ছিল তাদেরও তাই অবস্থা। একমাত্র বাতীক্স ইন্দিরা কংগ্রেস দল। নির্বাচনেও তাই প্রমাণিত হল যে, শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর দল ভারতবর্ষকে জানেন এবং ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষের প্রাধিকার এবং আশা-ভাজন। নির্বাচনের আগেই সি এফ ডি গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা বহুগুণা তত্ত্ব সঙ্গীদের নিয়ে দল গঠকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। নির্বাচনের পরে ছবিটা আরও পরিষ্কার হল। চরণ সিং-এর বিনির্ভান হাত, বিনির্ভান অসংখ্য আচরণের অন্য খ্যাতি (?) লাভ করেছিলেন, এমন কি, শপথ গ্রহণের দিন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির মুখে প্যাঁড়া

## লীলা মজুমদার রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ২৫, দ্বিতীয় খণ্ড ২৫,  
(তৃতীয় খণ্ড যন্ত্রণ)

লীলা মজুমদার

তিনি যখন শিশুদের জন্ম লেখেন

তখন তাঁর কলম প্রত্যেক

অক্ষরে অক্ষরে তাদের জন্ম

অমায়্যাসে ইন্দ্রজাল রচনা

করে।...আলম্বাজার পত্রিকা

লেখিকার আরও বই :

গুপীর গুপ্তখাতা ৫, বহুরূপী ৫,

ভূতের গল্প ৬, মণিমালা ৫,

এই যা দেখা ৫,

সব সেরা গল্প ৫, নাকুগামা ৪,

লীলা মজুমদার ভাস্কর

## হাস্য অ্যাপ্তারসন

## রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ২৫, দ্বিতীয় খণ্ড ২০,

হাস্য অ্যাপ্তারসনের

অমায়্য বই :

ছোটো টুকুর কথা ৫, ছোটো

জলকন্য়ার কথা ৫, তুষার-

রানীর কথা ৫, সব সেরা

গল্প ৪৫০

লীলা মজুমদার সম্পাদিত

## উপেন্দ্রকিশোর

## সমগ্র রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ৩৫, দ্বিতীয় খণ্ড ৩০,

উপেন্দ্রকিশোরের অমায়্য বই :

ছেলেদের রামায়ণ ৪,

টুনটুনির বই ৫, ছেলেদের

মহাভারত ১০, গুপী গাইন

বাঘা বাইন ৫, গল্পমালা ৫,

## অবন ঠাকুরের

## ছোটদের সত্তার ২৫

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

এ/১৫২ কলকাতা-৭

হাস্যকর করে তুলেছিলেন, সেই রাজনারায়ণ ও চরণ সিং-এর মধ্যে বিভেদ ঘটে গেল। সেখানেই শেষ নয়। জনতা দল থাকে নেতা করে সারা ভারতবর্ষে নির্বাচন পরিচালনা করল, তিনি আছি কি নেই করতে করতে গিলে খোপদান করলেন কংগ্রেস (ইউ) দলে। কংগ্রেস-ইউ দল অবশ্য যে-কোন সময়েই ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে ভিড়ে যেতে রাজী, কিন্তু ইন্দিরা কংগ্রেস বোধ হয় এখনও তাদের স্পৃহা বলে ভাবে না। সি এফ ডি-র আর এক মাতঙ্গর বহুদূগা তো নির্বাচনের আগেই সি এফ ডি ত্যাগ করেছিলেন। এটিকে আবার জনতা দলের কিছু কিছু নেতার হঠাৎ দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল। তদ্বা আবিষ্কার করলেন যে, প্রাক্তন জনসম্মতিরা এখনও জনসম্মতিই আছেন—তাদের সঙ্গে একত্রে ওঠা-বসা করা যায় না। তাদের জনতা দলের মধ্যে উপস্থিতি দলকে কলুষিত করছে। '৭৭-এর নির্বাচনের সময় মনে হয়নি, মণ্ডিসভা গঠনের সময় মনে হয়নি যে, রাতারাতি রক্ত বদলানো যাবে না—তাতে সময় লাগে। যখন জনতা দল বিপর্যস্ত, তখন তো বাইরে কোন কাজ করবার নেই, তাই স্বাধীন বিপর্যস্ততার সঙ্গে কাজ করে এসেছেন, তদরই দল থেকে বেরিয়ে যাবার পথ পরিষ্কার করে দেওয়া হল এবং জানিয়ে দেওয়া হল যে, না গেলে গলাধাক্কা দেওয়া হবে। বাস। প্রাক্তন জনসম্মতিরা বেরিয়ে গেলেন এবং সঙ্গে করে জনতা দলের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাকেও নিয়ে গেলেন। ভারতীয় জনতা দল তৈরী হল। অর্থাৎ ১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনকে উপলক্ষ করে জনতা দল নামক যে দলটির সৃষ্টি হয়েছিল, তার সামান্য আশ্চর্য থাকলেও আড়াই বছরের মধ্যে তার যে অবস্থা হল, সে যে ইতিহাস রচনা করল, তা বহু দিন ভারতবর্ষের রাজনীতির ছাতদের অনেক শিক্ষা দেবে। প্রমাণ হল যে, আগুপিছ বিবেচনা না করে যে-কোন কাজই করতে বাওয়া হয়, তা হয় ব্যর্থতার পর্য্যবসিত।

জনতা দলের সৃষ্টিকর্তা বললেও চলে—জরপ্রকাশ, যিনি গান্ধীভক্ত এবং আমরা বইক সকলেই প্রাণ্ডা করি, তাঁর শরীর ছিল রোগদীর্ণ এবং মনের উপরেও রোগ প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। তিনি সমস্যা সমাধানের সহজ পথ নিলেন। জনতা দল কতগুলি পরম্পরাবিরাধী দলের সমষ্টি, এ কথা তিনি ভুলে গেলেন এবং তাড়াতাড়ি কার্ণাটক জেলা মনোনীত প্রধানমন্ত্রী নবগঠিত জনতা দলের উপরে চাপিয়ে দিলেন। তাঁর শরীর ভেঙ্গে গেছে, সময় কম। সেজন্য এই পরম সত্য বিস্মৃত হয়েছিলেন যে, সন্তান কাজ হাসিল করা যায় না। পরম্পরাবিরাধী শক্তি বন্ধন একীভূত হয়, কেবলমাত্র অপর একটি দলকে পরাজিত করবার জন্য—তখন কাজ হাসিল হয়ে গেলে সে দল আর টিকতে পারে না। কারণ, তাদের পেছনে কোন আদর্শ বা নীতি নেই। নীতি বা আদর্শ অনেকের কাছেই বাক্যে কথা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু জরপ্রকাশের কাছে তো তা ছিল না। কিন্তু তাঁর ছিল বাস্তবতা। তাই তিনি এই

কেন্দ্র করে দল সৃষ্টিত হয়। হয় নীতি ও আদর্শ, অথবা এমন ব্যক্তির বহু প্রতি প্রাণ্ডা আছে, অথবা সর্বোচ্চ শাসনক্ষমতা থেকে অস্থিরতা দূর করবার জন্য আগ্রহ। জনতা দল নির্বাচনে কংগ্রেসকে হারাবার পর এই তিনটির একটিও তাদের মধ্যে ছিল না। যেমনি কংগ্রেস দল হেরে গেল, অমনি তারা আর একত্রে থাকার কারণ খুঁজে পেল না। কংগ্রেস দলকে হঠানোর তীব্র ইচ্ছার সহযোগী দলগুলির বেসব ছোটখাট খুঁত চাপা পড়ে গেলি, কংগ্রেস দলের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সহযোগী দলগুলির সেইসব বাস্তব এবং অবাস্তব খুঁতগুলি প্রকট হয়ে উঠল। কারণ অতি সুস্পষ্ট। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রোশ এদের বড় প্রবল হয়েছে, ভারতবর্ষের ছাঁচ এসেই সামনে থেকে তত স্থান হয়ে গেছে। কংগ্রেস দলের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডিসের মনদ চোখের সামনে ফুটে উঠল এবং সেখানে কিতাবে কার্যে হওয়া যায়, তারই জন্য চেঁচা হতে লাগল নিরন্তর। এরা যে শত্রু কংগ্রেস দলকে হঠানোর জন্য যাননি, জরপ্রকাশের কথামত ভারতবর্ষে একটা শত্রু গণতান্ত্রিক প্রশাসনের জন্য গিরেছিলেন, তখন আর সে কথা কারো মনে ছিল না। প্রশাসনে কে থাকবেন এবং কত দিন থাকবেন সেটাই একমাত্র চিন্তা। কেন প্রশাসনে এসেছেন, সে কথা সকলেই ভুলে গিয়েছিলেন। '৭৭-এর নির্বাচনের চের আগে থাকতেই জরপ্রকাশ বন্ধু আসাছিলেন যে, তৎকালীন প্রশাসন যার দুনীতিপরায়া—এর অবসান চাই। নির্বাচনের পর জনতা দলের কারো সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকলে জনতা দলের সব নেতারা প্রশাসক হবার জন্য ছুটে যেতেন না; ভারতবর্ষকে একটা শত্রু, দুনীতিমূলক প্রশাসন দেবার জন্য সকলেই দলকে শক্তিশালী করবার চেষ্টা করতেন। এরা মনে করেছিলেন যে, এরা নিজেদের শক্তিতে নির্বাচনে জরলাভ করেছেন। সেটা যে ভুল, সে কথা একবারও মনে হয়নি। নির্বাচনের আগে এদের কথা এবং আচরণে ভারতবাসীর মন একেবারে উবেল হয়ে উঠেছিল। তারা আশা করেছিল যে, গান্ধীভক্ত জরপ্রকাশ নারায়ণ যে দল সৃষ্টি করেছেন—তার কাজে ও প্রশাসনে অন্তত খামিকটা আদর্শের ছাপ থাকবে। নির্বাচনের পর যখন দেখল যে, স্বাধীন এসেছেন তাঁরা স্পারিহ চান না। আগের দিনে 'বারবারিক ইনভেসন'গুলো যেমন হত, স্পারিহের জন্য নয়, যে দেশে 'ইনভেসন' হত তার সমৃদ্ধির জন্য নয়, লুটপাটের জন্য, জনতা দলও সেইরকম কেবলমাত্র কমতার অধিকারী হতে চান বলে কমতার এদৌছিল, সে কমতার দেশের সমৃদ্ধি বা দেশের স্থিতিশীলতার কোন আভাস ছিল না। বা অবশ্যাস্তাবী, তাই ঘটল। অনেক হলেন, জনতা দলের বিপর্যস্ত হয়ে। কিন্তু বিপর্যস্ত কেন? তদ্বা তো আর কিছু চারদিক। ভারত-ইতিহাসের এক অধ্যায় সৃষ্টি হল—যে অধ্যায় সৃষ্টি না হলে ভারতবর্ষের কোন কতি হত না এবং ইতিহাসও কলুষিত হত না।



# নজরুল ইসলাম প্রাণভা বসু

খাঁক ঢাকা শহরে, কয়েক তখন তেরো, এই সময়ে একবার বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ এবং সাহিত্যিক দিলীপকুমার রায় এসেন লেখনে। উঠেন তার কক্ষ বৈজ্ঞানিক সজ্জাযুক্ত বসুর বাড়ি রমনায়। ঢাকা গান পাগল দেশ। গায়কেরও অভাব নেই, সমকণারেরও অভাব নেই। সেই সময়ে সারা বাংলা যে তিনটি নামের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছিলো তার একজন এই সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপকুমার রায়, আর একজন রাজনীতিবিদ সত্যচন্দ্র বসু, অন্যজন কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

দিলীপকুমার রায়কে নিয়ে যেতে উঠলো শহর। নানা জায়গার তার গানের আসর বসতে লাগলো, আমায়ও ডাক পড়তে লাগলো ঘন ঘন। কেহেহু আমার কিছু গানের রেকর্ড বেরিয়ে গেছে ততোদিনে, দিলীপকুমার আমায় নামটা জানতেন, রেকর্ডও শুনতেন, সহজেই তার সঙ্গে আমার গুরুদ্বিধার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল। তিনিই আমাকে নজরুলের গানে হাতেখড়ি মিলেন। এবং সেই গান শুনেন শ্রোতার পাগলের মতো মোহিত হতে লাগলো। নজরুল ইসলামের গানের বাবু, সকল স্বকল্পবস্তুর ছবিরে তো বটেই, প্রাক্তন বাস্তবের হারতশ্রীভেদে বর্ণিত হোয়ে যা দিল। নজরুল ইসলাম শব্দ গানের অভিনববোধে জনাই বা কল্পাঙ্কার হিসেবেই বিখ্যাত নর, তিনি এক স্বগাণ্ডকারী বিদ্রোহী নেতাও, তার কবিতা পরাধীন ভারতের প্রতিটি বাস্তবী ছন্দকে স্বাধীনতার পুঙ্খানুপুঙ্খ করে প্রক্ষালিত করে। মলে মলে ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে আসে সেই কবিতার ডাকে। একটি উপকার মতো মানব। সেই মানব বিগের আমাকে দীক্ষিত করে কিছুকাল বাবে দিলীপকুমার চলে গেলেন। তার চলে যাওয়া আমার উচ্চল নিরানুরাগকে অনেকখানিই নিম্প্রভ করে দিয়েছিলো।

কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই কোনো এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ির দরজার এসে একটি খোড়ার

গাড়ি থামলো। ঢাকতে খোড়ার গাড়ি করে কেউ আসা মানেনি পরিবার নিয়ে বেড়াতে আসা। নইলে ঢাকার পুরষেরা সকলেই পন্যতিক অথবা সাইকেল আরোহী। মহিলা হলেই গাড়ির প্রশ্ন। মক্কাবন্দ শহরের সব সন্ধ্যাই বড়ো বিরস। সেই বিরস সন্ধ্যায় বিরস যুগে আমি আমাদের পোতলা বাড়ির রাস্তার ধারের কোলানো বারান্দায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছিলাম। দূরে দূরে টিমটিমে গ্যাসের আলোর পথও বিরস। তারই মধ্যে একটি গাড়ি খেমে কোনো অভিধার আগমন ঘোষণা করে আমাকে বর্ণিত শব্দী করলো। আমি খেঁড় নিচে এলাম।

মা বললেন, 'মুঠুটিস কেন? কী ব্যাপার?' তেমনি খেঁড়ই শিড়ি নামতে নামতে বললাম, 'কারা যেন খোড়ার গাড়ি করে বেড়াতে এলো আমাদের বাড়ি।'

তা একটি আসা নিয়ে বা, পুন্যর মাকে (আমাদের পরিচারিকা) ডেকে বল লঠনটা দিতে।'

পুন্যর মাকে ডাকতে হলো না, একতলার আসতে সে নিজে খেকেই লঠনটা হাতে দিল। আমি সেটা টেকিলে রেখে দরজা খুলে বিলাম। খুলে দিয়েই দেখলাম বাস্তবীর তুলনার অভিনব স্বপ্ন এবং সূত্রী এক বাস্তব দাঁড়িয়ে আছেন দরজার। একে আমি বারান্দা খেকেই নামতে দেখেছিলাম। একমুখে হেসে আমাকে প্রায় ঠেলেই ঢুকে এলেন ঘরে। আমি হকচাকিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি আমার মূখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'এই তো, এই তো আমি। তুমিই রানু, ঠিক তো? তুমিই মণ্টর হাটী।' মণ্ট, দিলীপকুমার রায়ের ডাকনাম।

আমার বুকটা ধক করে কেপে উঠলো, মনে মনে বললাম, 'তবে কি ইনিই তিনি?'

আমি নজরুল ইসলামকে কখনো দেখিনি, কখনো তার চেহারার কোনো বর্ণনাও শুনিনি, তবু স্বাচ্ছন্দ্যভাবেই মনে হলো এর নামট

নজরুল ইসলাম। 'বড়ো বড়ো গলার হাসলেন।

নজরুল ইসলামের কয়েক তখন তিরিশ-বিশ বছর। তারও কিছু, বেশী কিনা আমি জানি না। জীবন তার চোখে মুখে সমস্ত শরীরে নদীর স্রোতের মতো বহমান এবং বেগবান। সেই বহসে তাকে বরাবর দেখেছেন শব্দ, তাঁদেরই কোনো। বাবে কী দৃকুলসারী আনন্দধারা দিয়ে গড়া তাঁর চরিত্র। আমার মতো একটি নগণ্য সদা কিশোরীর জীবনে এই বিরাট বাড়ির উপস্থিতি সোনিম যে প্রচণ্ড স্বপ্ন এবং সন্ধান এনে দিয়েছিলো তার কোনো তুলনা নেই।

তিনিই যে নজরুল ইসলাম সেটা যে দেখে মায়ই বুঝেছিলো তার সবটাই আমার ইন্টাইলেন, তা নয়। মিন দুই আগে জননব শব্দেই তিনি ঢাকা এসেছেন। ছাত্ররা নাকি ডেকে পড়ছে তার দরজায়। কেবলমাত্র গানেই নয়, ঢাকার মানব বিশেষত ছাত্রছাত্রীরা রাজনীতিতেও প্রকল উল্লাস। এই বাস্তবী নানা কারণেই তাই নানা মানুষের কাছে এক কম্পনার নায়ক। বস্তুতই এমন একজন নায়ক কোনো দেশে কোনো কালেই অবিরল নয়। মস্ত বড়ো কবিতা টানা কালো চোখ, এলোমেলো ঘন চুলের বাধার, তীক্ষ্ণ নাসিকা, ধব তামার মতো রং, লাক্য, নজর সরল আদ্যাত্তিক বাহ্যিক, উপায় হাসি, উচ্চল-প্রবণতা—সবটা মিলিয়ে একটি ব্যক্তির বটে। আর তার হলোর লুটির পড়া সেদরসা চার।

ঢাকা আমার গল্পটাও ঠিক তার চরিত্র উপযোগীই ছিলো। কুটিল খেলা খেতে গির-ছিলেন গড়ের মাঠে, ইন্টেকপল আর মোহনবাগান নিয়ে তুমুল তর্ক করতে করতে কোনো কখনো পাজার পড়ে নিরালস্য স্টেনে এসে হাজির। দেখলেন ঢাকা মেইল হাঁড়ের আছে। হঠাৎ মনে হলো একবার গিরে বেড়িয়ে এলে কেমন হয়? এই তো মণ্ট, কেমন শুরে এলো। মনে হওয়া আর টিকট কাটা। বাস, উঠে কালেন।

আমি বিহবলতা কাটিয়ে দেখলাম না এসে দাঁড়িয়েছেন, বাবাও নেমে এসেছেন ছাদ থেকে, নজরুল ইসলামই নিজে বলে আপ্যায়ন করছেন তাঁদের, আসুন, আসুন আপনাদের কথা আমি সব শুনছি মণ্টর কাছে। এসে খেতে বলছি সেই পাখির গলা ঘেরোটর কাছে গিরে বাও আমাদের, কেবল এমিক ভাবি নিয়ে বার আর ডিক করে। তাই আজ ঠিকানা খেঁজে নিজেই চলে এলাম।'

এই মানবের আগমনে আমার বা-বা-বাও কম বিহবল হননি। তাতে কি? নজরুল তো একাই একলো। মণ্টের মধ্যে সকলের সব মনোভবের-মুখে হালিতে গান্ধেত পান্ডেত কম্পনে করে তুললেন আসি। কদার বর থেকে উঠে এলার দোতলায়। নজরুল ইসলামের স্মৃতি মনেই হতে ছাত্রমনিরম, বাটা-তরা পান, আর ঘন ঘন চা। সেই হারমোনিয়ম মেমে এলো বাস্তব থেকে বাটাভরা পানও এলো, চা-ও এলো পট ভরিত। তারপর গান, গান আর গান। আমাকে দিরেও গাওরাজেন, নিজেও গাইছেন, সপ্পে সপ্পে অনন্য হারি। মাকে মাকে চোঁচরে উঠছেন, 'দে গরুর গা দুইরে।' আমি গানে টান দিলেই বলা উঠছেন 'জতালন জতালন।'

তার নিচের গলা ভাঙা-ভাঙা, কিন্তু কী যিষ্ট, কী স্মরণীয়। সোনিই লেখনো শব্দ, হয়ে গেল। উঠলেন রাত দশটার। চলে যাবার পরেও অনেককাল একটা তদন্ত আনন্দের সজ্জা হাওরার করে থাকলো বাড়ী।

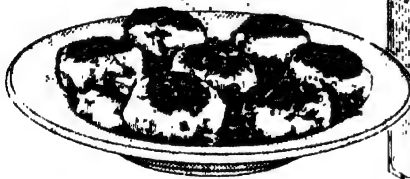


এমন খাঁটি, তাজা, সুস্বাদু মশলা  
আর হয়নি!

**ভোলীটা**

এই মশম, এমন  
তিলগুণ সীলকরা প্যাকে...  
যা হাওয়া ও আর্দ্রতা  
চুকতে না দিয়ে মশলা  
প্রয়োথরি তাজা রাখে

পলিথেনস্টার, পলিথিন আর  
অ্যালুমিনিয়ামের তিনটি পরত  
দিয়ে তৈরী ভোলীটার অসাধারণ  
খালি মশলার স্বাভাবিক স্বাদবলক  
আর বিশেষ সবকারী তেল বজায়  
রাখে। তাছাড়া ভোলীটা মশলায়  
কেবল বাড়াই করা উৎকৃষ্ট  
উপাদানই ব্যবহার করা হয়।  
এক আপনার সুবিধের জন্যে তা  
খুঁচা করা হয়। খাঁটি আর  
তাজা হওয়ার ফলে ভোলীটা মশলা  
অল্প ব্যবহার করলেই হজম  
আসুন। খাঁটি, তাজা, সুস্বাদু ভোলীটা মশলা  
দিয়ে রান্না করে বাড়ীর সবাইকে  
অবাক কর দিন।



**ভোলীটা** ঝুঁড়া  
মশলা

-ঘরে কোটা মশলার মতই খাঁটি, তাজা আর সুস্বাদু!

লক্ষা • তলুদ • মনে • জিনে • গোলমলিড

**অরুণ!**



আচার

—আম ও মিক্সড,  
এমন লোভনীয় আচার...  
যেন দিদিমার তৈরী।



পরের দিন সকালেই আবার খেঁচি চলে এসেছেন। আমি সব মদ্য থেকে উঠে হাই তুলতে তুলতে মদ্য ধরে এলাম। মা আমাবের চা দিচ্ছেন, এই সময়ে কড়া নাড়া। আমরা তো অবাক।

প্রভু হালি, এলে পড়লাম, বকুল ? বেলা  
 বাড়তে দিলে কি আর উপায় আছে ? সব ছেলেরা  
 ঠিক ভিড় করবে, ধরে নিয়ে যাবে কোথাও। এখান  
 থেকে ফিরে গিয়ে কাল রাত্তিরে একটা গান লিখেছি,  
 একদুটি শিশুরে দিতে হবে। বাবে, নাও, শীগগির  
 যা গেয়ে নাও। আবার কুল হয়ে যাবে।’

চারের আসরে তিনিও বসে গেলেন। সকালটাই উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তারপর আবার হাস্যমোহিনীরা পান্নের বাড়ী আর গান। আশ্বার কোন কলে আত্ম ভিত্তিলা বতী এ কোন সোনার গিন্নি, আশ্বার ভাটীর তরী আবার কেন উজান খেতে চায়। এই গানটি লিখেছেন রতি। দেখা গেল তখনো তার বয়স বা নয়রোপ সম্পূর্ণ হয়নি, আমাকে দেখাতে দেখাতে বেরলো ঠিক করে নিলেন। পকেট থেকে কলম বাকীটা, কাটাকুটি কাগজ বেরলো গলা থেকে শুর বেরলো, গানে সম্পূর্ণতা এসে।

দিন তিনেক বাদে আর একটি গান তৈরী হলো, 'এতো জল ও কাজল চোখে পাবাণী আনলে বলা কে।'

যখন গানে বসতেন অকিঞ্চান্ত চা খেতেন বলে  
আমার মা মাঝে মাঝেই অপ্রত্যাশিতভাবে এক কাপ  
চা এনে দিতেন হাতে, আহা—আটখানা ছরে  
উঠতেন, ‘নাহ্, মার মতো দেখে হর না—’ সেদিন  
গেয়ে উঠলেন, ‘ওতো চা ঐ পেয়ালার এমন করে  
আনলে বলে কে’

এইটুকু থেকেই পরের দিন এ গান রচিত  
হয়ে এলো। 'শেখো, শেখো, শীগগির শিখো  
নাও।'

এরফিলেন মাঠই কয়েক দিনের জন্য। রইলেন প্রায় হাস পেয়ে। উঠছেন বর্ষমান হাউসে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনের বাড়ি। সেখানে থেকে রোগ আসবেন খোঁজার গাড়ি করে। দূর তো কম নয়, কোথায় রমনা আর কোথায় পানগঞ্জ। যদি গাড়ি না মিলতো তাহলে হেঁটে। গান শুনগান করতে করতেই হাঁটতেন। বলতেন, কখন পথ ফুরিয়ে গেলে বুকভেঙে পারলাম না।

তখনো আমরা হিন্দু-মুসলমানের দাণ্ডায়  
চেহারা দেখতে অভ্যস্ত হইনি। স্বদেশী আন্দোলন  
ধর্মার হরে উঠেছে, জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকটি  
ভারতবাসী বংশধরিকর হয়েছে ইংরেজ বিতাড়নে  
জারদ করছে বিটিল সাহায্য। ইংরেজরা রাস্তা  
থলেছে কোন রপ্তান সর্বনাশের বিষ ঢোকায়ে, ভেঙে  
দেবে এই একতায় বাঁধ। নেতারা তখনই অন্তর্যমান  
করছিলেন শেষ পর্বত ধর্মের ধরো তুলে আশীর্বাদ  
অনগণের মধ্যে এরা না একটা বিশেষের বাঁধ ছাড়িয়ে  
দেয়।

নজরুল ইসলাম সগৰ্ভনে সৰ্বথ কল্পতা কৰিছেন  
এই বিৰুদ্ধে। উদাস গলায় প্ৰাণের সমস্ত আবেগ  
ঢেলে ধল উঠছেন হিন্দু না ওয়া মুসলিম এ  
জিজ্ঞাসে কোনজন? কাণ্ডারী! কল্যা ডুবিয়ে  
মানুষ সন্তান মোর মার।

আমরা ভারতবাসী, এই আমাদের পরিচয়।  
ভারতভূমি আমাদের মাতা, আমরা তার সন্তান।  
এর মধ্যে কে হিন্দু কে পাশী? কে শিখ বা জৈন?  
কে মুসলমান—এই চেতনা নিষ্শেষর। বা নিছক  
মাথা ঘামাবে তা শব্দ, পরাধীনতার লক্ষ্যমোচন।  
ভারতপরেই গানের গলপে দেশে উদ্বেগ হে,  
‘দুর্দশ গিরি, কাল্যায় রহু, হৃদয় পারাবার হে,  
লক্ষিতে হবে রাত্রি নিশাচর স্বাভাৱী হৃদয়িয়ার হে,  
হৃদয়ক মোরে ওঠে’ আমরা লজ্জা আমরা বল, আমরা  
ভালকরে আমাদের পায়ের তলার মূর্ছে’ তুফান উদ্বেগ  
বিমান ঝড় বায়ল, আমরা হারদশ।

নজরুল যদ্যে গিয়েছেন, জেল খেটেছেন,  
জেলের নিঃসঙ্গা কুঠরির অন্ধকারে নির্বাসিত

হয়েছেন, অনশন করেছেন, খন্দরই তাঁর একমাত্র  
আবরণ, মাথায় গেরদুয়া রঙের গাম্ভীর্যটুপি, গায়ে  
গেরদুয়া চাদর—কী একটা ব্যক্তিত্ব! ভাবা যায় না।

উনি ঢাকা থেকে ফিরে আসা মাস আট-নশ বাসে  
আমাকেও কলকাতা আসতে হল। গ্রামোফোন  
কোম্পানীর সঙ্গে বছরে ছ'বার রেকর্ড করবা এই  
কর্তে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলুম। এসেই দেখা হলো। ওর  
সঙ্গে। ওর সঙ্গে আমার আবার তখন কঠিন। উনি  
কলকাতা, 'আমার গানই রেকর্ড করো' আমি নিজের  
তাই শ্রবণ করে এসিলাম। আমার মা-বাকরও সেটাই  
ইচ্ছে। কোম্পানীর কতকো বেল ঠেকাই আমার  
ইনোয়ার হিসেবে নিযুক্ত করা হলো। আমার ধারণা,  
গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে সেই প্রথম সর্বোপ  
নজরুল ইসলামের। যদি বা তার আগে কোনো  
যোগাযোগ হয়েও থাকে, এতটা ঘনিষ্ঠ অতন্ত ছিল  
না সেটা জানি।

জানি। একসঙ্গে দশানা রেকর্ড হলো, এ-শিট ও-শিট চারখনা গান। সেই সময় আমি চুচুড়ার আমার পিসিমার বাড়িতে ছিলাম। আমার পিসেমশাই ইসলামকার কলেজিয়েট স্কুলের আসিস্টেন্ট হেডমাস্টার। অধি বাবার পর নজরুল ইসলাম কলকাতা

श्रीश्री- साधु साध  
श्रीश्री- साधु साध

ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାମଲା ମୋଡ଼ା ମୋଡ଼ା-  
ସରକାରୀ ଯାକ ମାମଲା-  
ମୋଡ଼ା ମୋଡ଼ା ମୋଡ଼ା ମୋଡ଼ା

(५) प्रकृति (साहस) अपन-  
 शक्ति (शक्ति) विनिमि-  
 शक्ति (शक्ति) विनिमि-

જાલદી પ્રવેશિ શ્રી ।  
સુધિ આનંદપદ સર્વ પ્રભ પ્રભ  
ગણાયિત આરબ-

१५ मूल प्रमाण प्रमाणित ७७-  
 मनी जरा प्रमाण।  
 १६ मूल प्रमाण प्रमाणित ७७-  
 मनी जरा प्रमाण।

[illegible]

প্রতিভা কোবীর উদ্দেশে লেখা কবিতা

বলডেন, 'থাক, থাক, খান্নাই হই বাই হই'; ভোমার  
মতো কালীক্ক ভো নই।' হাত বাড়িয়ে বলডেন,  
'মমলাও তো রং।' একদিন হাসতে হাসতে নজরুল  
ঘললেন, অ'ড়ান, কলোয় যে কভো গল্প দেখাখি।

রাত জেগে কীর্তন লিখলেন একটি।  
 কেনে প্রাণ ওঠে কর্ণিয়া, কর্ণিয়া গো  
 বতো ভুলি ভুলি করি, ততো আকড়িয়া ধরি  
 ততো ধরি সাধিয়া সাধিয়া গো।

উভে যায় নাকাল নাখিল সো।  
 পায়ের সে রূপ ভোলা কি যায়  
 নিখিল খামল কর শোভায়  
 আকাশে সাগরে বন কান্ডারে  
 'নভার পাতায় সে রূপ ভার।'

সুখসাথে যে কালো ছাড়া আর কিছুই নেই  
সুখ, তারই আকৃতি শবাব গলার :

আমি বহুর রূপের দ্বারা বহু<sup>ক</sup> বার  
 আকাশ আরসি নীল গো  
 বহু কুবন প্লাবিত কালার ভাবিত  
 কালো সাগর মিলিল গো—  
 আমি তাইই আমি

চাকারনী হয়ে দিলে ডুকে নই তারই লাগি  
 অতে রকির কারণে শরণ মাগি  
 তারই লাগি  
 কীমে ফলগদনে গদনগদন ফলপ্রসরা

কনহারীশ্বর চোখে তালি কাজল পরা  
তাকে কেমনে জুলিবে—!

হৃদি ফুল হয়ে ফাঁটি ভরসাথে  
সে যে পাতা পালক হয়ে ধরে থাকে  
হৃদি একাকিনী চলি কনতলে

সে যে ছাড়া হয়ে পিছে পিছে চলে  
 বাকি একা ঘরে মোর দীপ জ্বলিছে  
 আসে অধীরের রূপে কমলালী  
 তারে কেমনে ছািব।'

আতি থেকে হয়তো সব ঠিকঠাকভাবে ফুলে দিয়ে  
পারলাম না। তাকে সব কিছুর অর্থই এই যে, চিত্রকলা  
কালোকে ভোলার কেন্দ্রে উপায়ই রাসুনীম প্রভু  
বাদি একা করে মোর দাঁপ জ্বালি, আসে আবার  
রূপে বনজালী—এই লাইনটা গাইতে গাইতে নিজে

গানে নিজেই মোহিত। দেখেছে, কী কান্ড। ক  
সুন্দর। আসে আজকের রূপে কনমালী। ভাব  
পার? কিন্তু আসে, সত্যিই আসে। তারপরে  
চেঁচামোঁচ, জ্ঞান, কোথায়, এসে এসে। কসে

এই পরেই পেরে বসলো কীতনে। পর পর হা  
 রাত্রে বসে পুস্তকনি কীতনি লিখলেন। তারপরে আ  
 কানু কিনে গীত নেই।

নালিনীকান্ত সরকার (এখন বহাদুর পশ্চিমবঙ্গী  
আগ্রহপ্রবর্তক) ছিলেন ঐর প্রাণের যথ। নালিনী  
কমতে পাগল। ঐর সৃষ্টি অবিলম্বে আমারও দা  
হাসনে ফিরি।

হলেন তিনি। হুঁকি থেকে কলকাতা এসে  
বাড়িতেই উঠতাম। দাদা ভেে দাদাই, কখনো কো  
সংকেতের প্রশ্ন রাখতে মেনে না। সে বাড়িতে সকলের  
অকাধ গতিবিধি।  
যেমন নজরুল ইসলাম একাই এক শো, তে

নলিনীদাস কাড়িই আমাদের সকলের কাড়ি। সেখানে বসে  
এককর গানের আসর বসলো, সে সকলেই হোক, সমস্ত  
হাপুরেই হোক আর বিকেলেই হোক, সমস্ত জাতি  
থাকবে না কেনো। গুরুচন্দ্র পণ্ডিত, যিনি দ্বারক  
নামে জিহাযে একটী ছাত্রাভিষেক তার মধ্যে তাঁর নাম

সেই উপবীতধারী ধীত আর চাদর সজ্জা আচ্ছাদিত  
মানবটিও হঠাৎ হঠাৎ এসে উপস্থিত হতেন সেখানে  
বাস। আর দেখতে হবে না।

গা ধাইরে। চিৎকার চেচামেচি, হইছান, গান, জগদ  
নাওয়া—মহা উল্লাস। কঠিনও তেমন—গাঙ্গে পান  
মখে হাসি, এক বিশ্ণু, বিরহিত নেই। একেবারে  
অসংলগ্ন। চুড়চুড় থেকে ফোঁসী দিন না এলেই সন্ধ্যা

সাহিত্যিক ভাষার নালিনীদার চিঠি কেতা, প্লান  
 লীপ্সির চলে এসো, নইলে কিন্তু তোমাকে গীতা  
 মাসী বলে রীটরে দেব। গীতা হচ্ছে নালিনীদার কন্যা  
 এই নসিফাটা করতে উনি খব ডালোবসতেন।

সেই সময়ে নবাবুল ইসলাম আর নলিনীকী আমায় একদিন রোডেরে আরপাস নিয়ে এলেন। রোডেরে তখন সরকারী প্রতিষ্ঠান ছিলো না, অভিনব ইত্যাদির কোনো নিদর্শন ছিলো না, যেহেতু দূর যুগে নূরুল ইসলামই ছিলো নবাবুল ইসলাম। সেই সময় থেকেই

মজুমদারই ছিলেন কণ্ঠস্বর। তাঁর অনুরোধেই তাঁ-  
নির গিরায়েছিলেন আমাকে। নজরুলের গানকে হিউ-  
দেয়ার উৎকৃষ্ট মাধ্যম ছিলেন দিলীপকুমার রায়, কিং-  
তিনি তখন সম্মানসূচী হলে প্রীতরবিগ্ধের অগ্র

[illegible]

नमोऽस्तु नित्यं हृदयं त्वं गानं नित्यं गितानिष्टमन

হলো আমাদের। নানারংগজে গিয়ে পৌঁছিয়ে ট্রেনে মাত্রই কয়েক স্টেশানের দূরত্ব ঢাকা শহর। সেই ট্রেনের কাষায় উঠে বসবার পরে হঠাৎ দোঁধি উঠল। তার মনে আছেন আমাদের মতোমুখি আসনে। তার মনে উঠল আসছেন সেই নিমন্ত্ণে। চমকে গিয়ে বললাম 'আপনি'।

উনি মদ্য হানো বললেন, 'এইরকমই হয়।'  
আমি ঋণিতে আস্থিত। নিশ্চয়ই অবৈতনিকভাবে  
অনেক কিছু বলছিলাম। পরে বাবলাম উনি কিছুই  
শর্নাঙ্কলেন না। কিন্তু মৃৎখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন  
একসম্প্রতি। কথার মাধ্যমতাই বললেন, 'জান রান,  
আমি শ্রীঅর্জবলকে দেখছি।'

আমি বললাম, 'সে কি! আপনিও দিলীপনার  
মতো পণ্ডিতেরা চলে যাবেন শেষে?'  
উনি একটু একটু মাথা নেড়ে কালেন, 'না, না,  
আমি পণ্ডিতেরা হইনি, আমি তো তাকে ঘরে বসেই  
কেঁদেছি।'  
'ঘরে বসে?'

এর নামই শক্তিসাধনা, এই সাধনার জোরে আমি  
কালীদর্শনও করছি, কথা বলছি তবু সশোণ।  
আমি চুপ করলাম।  
তিন বুকের দিকে তাকালেন, 'এই যে, তুমিও  
আছ।' এই বলে তোমার কি মনে হয়?  
জিজ্ঞেস করে জবাবের প্রতীক্ষা না করে আবার

আমার দিকে ফিরলেন, 'জানো তো, বুলবুল মারা গেছে!'

বুলবুল ঠর প্রথম সন্তান। খবরটা আমি কল-কাতাতেই জেনেছি। এও জেনেছিলাম এই মৃত্যু ঠেকে নিম্ন আঘাত করেছে। এখানেও আমার বলার কিছু ছিলো না। কিন্তু ঠরও যে এতোকাল আদে দেখা

হওয়াতে আর কিছু বলার আছে তা-ও মনে হলো না। যেন চ্যেনেন না এরকমভাবে উদাস দৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে থাকলেন। আমার খুব মন খারাপ হয়ে গেল।

ট্রেন নির্দিষ্ট স্টেশনে এসে পৌঁছনো পর্যন্ত আর একটা কথাও বললেন না।

এ শেষ দেখা। কৃষ্ণদেব ব্যাডি এসে বলে-  
ছিলেন, 'উনি ঠিক প্রকৃতিস্ব নেই। মাঝে মাঝে  
স্বাভাবিক হলেও মানুষটাই বদলে গেছেন। ব্যাঙে  
পাবেন না ?'

বছর কয়েক বাদে যখন জানলাম সত্যিই উনি  
ততোদিনে প্রায় সম্পূর্ণ অপর্যায় হয়ে গেছেন,  
তখনো সেরকমই কান্না পেয়ে গেল। কিন্তু আমি  
কখনো তাকে দেখতে গাইনি। দিকানা তখন দূর

কখনো ভাঙে দেহ-ভাঙা বাহিনী। চিকানী ভবন ভাঙে  
স্থায়ী, অতদিনে এ স্বভাববাবল মানুষটিকে গৃহ-  
বন্দী হতে বাধ্য করেছে ব্যাধি। কিন্তু তিনি  
কোথার? তাকে তো আর বন্দী করতে পারেনি।  
কোথায় তিনি এখনো বন্দী?

একবার শুনলাম খুব দরবন্দার পড়েছেন।  
একটি মুসলমান ছেলে এসে বললো, প্রাণীলা  
ইসলামের ইচ্ছে আপনি কিছ: টিকিট কিস্তী করে

‘কিসের টিকিট?’  
‘একটা ভায়াইটি পাসপোর্টের আয়োজন’

এ কথার পরে বলাই বাহুল্য প্রাণপাত করে ঘরে ঘরে অনেক টাকাই আমি তাকে তুলে দিয়েছিলাম। পারফরমেন্সও হয়েছিলো। তাতে নেট সেলও হয়েছিলো অনেক। কিন্তু টাকাটা প্রমীলা

তারপরে গড়িয়ে গড়িয়ে আরো কতো বছর  
কেটে গেল, ঊন কখন তালিয়ে গেলেন বিশ্ব্যতির

অশ্রুধারা। ধর্মের কবরে মননে সর্বদাই যখন তিনি  
হারাছায়ায় আসে তখনই একদিন রেডিক্লো ঘেঁষে  
কল্পলো, তিনি মারা গেছেন।  
আশ্চর্য। মারা তো তিনি কতকাল আগেই

গিয়েছেন, এতদিন পরে এই সংবাদ। তারা  
গেলেন। তবু এ সংবাদে আমার কেবল কাঁচা  
পেরেই গেল না, কেঁদে ফেলে বললাম, 'ঊন তারা  
গেলেন। তারা গেলেন।'

কাল্পনিক শ্রমিকরা প্রমাণ করিল যে ঘরে নাই।  
আমলে আমরা কিছুই ছুঁলি না, ফুলেতে পাবি না,



## রাখাল বসুর ইচ্ছাপূরণ

রমানাথ রায়

আসুন, আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি রাখাল কসু, এক এ বি টি। বয়স চল্লিশ, রঙ মরলা, রোগা চেহারা, কপালে কাটা মাগ, উকতা পুঁচি ফুট দু, ইতি, ওজন সাতচল্লিশ কিলো সাতশো গ্রাম। পেশা : শিক্ষকতা। ডি এ ধরে তার মাইনে বর্তমানে সাতশে পঁচাত্তর টাকা। তবে মাসে মাসে ডি এ বাক্স দুশো কুড়ি টাকা পান না। তিন চার মাস অন্তর হটাৎ হটাৎ একসঙ্গে টাকাটা পেরে যান। এ ছাড়া বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে পড়ুর মাসে মাসে কখনো পান তিনশো, কখনো পান চল্লিশো। রাখাল কসু থাকেন মধ্যযুগে লেনের সাইটিকাল নব্বু বাড়ির দোতলার। ছোট ছোট ডিনটে ঘর এবং একটি কমন অথরুম নিয়ে তিনি কবাস করেন। এর জন্যে তাকে মাসে মাসে দুশে পঁচিশ টাকা ভাড়া গুণতে হয়। ঘরে থাকে তার বিধবা মা, অবিবাহিতা বোন, স্ত্রী এবং দুটি ছেলে। তাঁ : কিবা মা চোখে ভাল দেখতে পান না, হাঁপানিতে ভোগেন। বোন রোজ বিকেল বহু পরনে একটা হারমনিয়ম নিয়ে বসে, রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়, মনে মনে স্বপ্ন দেখে, সিনেমার গল্পের মত একদিন এক সুদর্শন ধনী ছবক এসে তার গলায় মালা পরিয়ে তাকে এখান থেকে এক কিংবাল অটালিকার উপহার করে নিয়ে যাবে। স্ত্রী সবার চালায় এক পেটের ব্যাঘ্র ভোগেন। পরসার অভাবে আজ পর্যন্ত ভাল ভাড়া। দেখতে পারছেন বলে পেটের ব্যাঘ্র করণ অজ্ঞাত থেকে গেছে। তবে চিকিৎসা বধ হয়নি। সম্প্রতি আলোপ্যাথি ছেড়ে হোমিওপ্যাথির আশ্রয় নিয়েছেন। আর ছেলে দুটি এখনো নবাবলক। অকলা নাবালক হলেও তারা সিনেমায় লাইন দিতে শিখেছে, সিগারেট টানতে শিখেছে।

এ হেন রাখাল কসু পক্ষে সবার চালাবো দিন দিন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। মাসের কুড়ি পঁচিশ তারিখ আসতে না আসতে অলৌকিক উপায়ে তাঁর হাত খালি হয়ে থাকে। একটা পরশাও থাকে না। ফল থাকে থাকে তিনি মার ওপর, বোনের ওপর, স্ত্রীর ওপর, ছেলের ওপর রেগে যান। মাঝে মাঝে অকারণে বাঁশ্চক্য ও রবীন্দ্রনাথের ওপর রেগে যান। মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ওপর রেগে যান। মাঝে মাঝে গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের ওপর রেগে যান। তাকে, এই সব মহামানবের বা শেষ পর্যন্ত করল কি। শৃংখলা জীবন ধরে কথা, কথা আর কথা বলে গেল। তার মত মানুষের বেড়ে থাকবার কোন সুবাদ্য করে যেতে পারল না। তিনি জীবন জীবিত ছোট ছোট অল্প আঁচড়িত জোরা তার ছোট ছোট মতমান জীবন

দিকদিক তিন গুণে মাইনে পায়। তার দক্ষিণ কলকাতার স্ট্রাট নিয়ে থাকে। তাদের ঘরে টি ভি থাকে, ফ্রিজ থাকে। তারা চোরা টেলিভি ডাভ খায়। তারা কুকুর পোষে, তাদের ছেলেরা ইথরজিমে কথা বলে। মাসের শেষে তাদের হাত কোনদিন খালি হয় না। মাসের ত্রিশ তারিখও তারা নিজের ভিতর থেকে সংখ্যাবোলা বিজ্ঞানের বোতল করে করে।

এক এক সময় রাখাল কসুর মাথার রঙ উঠে আসে, খুন চেপে বার। চার-পাশের প্রতিটি মানুষকে খুন করতে ইচ্ছে হয়। অথচ মর্শ্বকল এই যে খুন করতে চাইলেই খুন করা যায় না। খুন করা অত সহজ নয়। অন্তত রাখাল কসু মত মানুষের পক্ষে ত নয়ই। তবে তার হয়ে যদি কেউ খুন করে দেয় তা হলে ব্যাপারটা মন্দ হয় না। আর সেটা নিয়েই বর্তমানে চিন্তিত হয়ে পড়ছেন রাখাল কসু। তিনি যদি এখন একটা খুনী জোতার করতে পারেন তা হলে তার পক্ষে কাজটা অনেক সহজ হয়ে আসে। তিনি তা হলে সকলকে এক হাত দেখে দিতে পারেন। অর্থকন্ডের জন্মলা কি ভরাক তা সকলকে বুঝিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, খুনী কোথায় পাওয়া যায়? খুনীদের যদি সত্যি সত্যি যেমন কোন আশতানা থাকত যেখানে গেলে তাদের পাওয়া যাবে তা হলে সমস্যাটা এত যোজাযো হয়ে উঠত না। তিনি সোজাসজি সেখানে চলে যেতেন, দিয়ে একটা খুনী বাছাই করে নিয়ে আসতেন। দুঃখের কথা, এরকম কোন আশতানা তার জানা নেই। তবে 'খুনী চাই' বলে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া। কথা তিনি ছেঁবেছিলেন। কিন্তু কোন কাগজ এই ধরনের বিজ্ঞাপন প্রকাশে সম্মত হবে না কেনে তিনি আর ও পথে পা বাড়াননি। পা বাড়ালেও খুনী সংগ্রহের আশ্রয় তিনি একেবারে কিস্তি দেননি। তিনি তাকে তাকে আছেন। কোথাও একটা খুনীর সম্ভাব পেলেনি তাকে পাওয়াও করেনি।

রাখাল কসু একটা জিনিস ছেঁবে এক এক সময় খুব বিন্দিত হন। প্রতিদিন মানুষ খুন হয়, প্রতিদিন তার খবর কাগজে ছাপা হয়। অথচ কে খুনী তা সচরাচর জানা যায় না। সংবাদে। শেষে সব সময় প্রায় এক ভাষাতেই লেখা হয় : এখানে খুনী ধরা পড়ল। তবে পুলিশ লন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। রাখাল কসুর কাছে ব্যাপারটা খুব সম্ভবজনক ঠেকে। তার মনে হয়, এসব খবর আসলে মিথ্যা, বনানো। এসব খবর আসলে সেই সব পাঠকের কথা ভেবেই তৈরি করা হয় যা। এর নিমিত্ত পাঠক। তারা সকলে কাগজ খুলেই আইন-আদালত পড়ে নর, তারা খবরের খবর পড়ে। কাগজে খবর খবর না গেলে তাদের সারাদিন মাথা কামিয়ে করে, গা বাঁমি বাঁমি করে। খবরের খবর তাদের শরীরে ভিতরমুন্ডে কাজ করে। আমি জানি, রাখাল কসুর এই মত অনেক গ্রাহ্য করেন না, হেসে উড়িয়ে দেবেন। কিন্তু একটা প্রশ্ন আমি তাদের করতে চাই। তারা কখন আজ পর্যন্ত কটা খুনী কিনা রাইয়েছে? কখন খুনী ধরা পড়েছে? মাসের ধরে পড়ছে তারাও আবার প্রমাণভাবে শেষ পর্যন্ত কেবলমাত্র খালি পেয়ে গেছে। এটা কি করে সম্ভব? খুন হচ্ছে অথচ খুনী ধরা পড়ছে না? আর খুন ত সব সমাজেই প্রচুর অধিকার। কোন নিষেধ জারি হয় না। আজকাল ত খুন প্রকাশ্য দিব্যা-লোকেই হয়ে থাকে। সে সব ক্ষেত্রেও ত খুনী ধরা পড়ে না। রাখাল কসুর কাছে এটাই একটা রহস্য হয়ে আছে।

যদি হোক, রাখাল কসু বর্তমানে আর্থিক কারণে খুব মানুষের ওপর জ্বাধ হয়ে আছেন। অথচ তাদের বিরুদ্ধে কিছু করার ক্ষমতা তার নেই। নইলে তার মধ্যে দিন বেড়ে থাকে। একটা খুনী ভাড়া করতে না পারলে তার কোথ আশ্রয় পাওয়া হবে না। অথচ খুনী পরিচালনা করার তিনি কিছুতেই একটা খুনীর সম্ভাব পাচ্ছেন না।

কিন্তু একদিন একটা ঘটনা ঘটে গেল। ঘটনাটা ঘটল রাখাল কসুরই চোখের সামনে। সেদিন বিকেল পাঁচটার সময় তিনি ছাত্র পড়ুরে স্কুল সেনে স্ট্রীট ধরে বাড়ি ফিরছিলেন। স্কুল সেনে স্ট্রীটে সারাদিনই মানুষ উপচে পড়ছে। কোন সময় সে রাস্তা ফাঁকা থাকে না। আর বিকেল হলো ত কথাই নেই। রাখাল কসু এই ভিডের ভিতর দিয়ে হাটছিলেন। হাটতে হাটতে থমকে দাঁড়ালেন। দেখলেন, একটা ছেলে একটা লোককে পিস্তল দিয়ে গুলি করল। গুলি করে ছেলোটো পিস্তল পকেটে পুরে কানাই ধর লেনের ভিতর। ঢুক গেল। তাকে কেউ ধরল না। লোকটা গুলি ছোঁতে রাস্তার লাইটের পড়ল। সবাই তার দিকে ছুটে গেল, তাকে ধরে ধরল। রাখাল কসুও গেলেন। কিন্তু লোকটাকে বন্ধনো গেল না। হাসপাতালে পৌঁছবার আগেই লোকটা মারা গেল। রাখাল কসু বাড়ি ফিরে এলেন। এক ভিত্তে। ভিতরে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে রইলেন। কারণ, জানেন তিনি এই প্রথম একজন খুনীকে প্রত্যক্ষ করলেন। এক লক্ষ করলেন যে খুনী ধরা পড়ল না। খুনী খুব নিশ্চল হাত দেলাতে মেলাতে চলে গেল। সেসে রাখাল কসু, তাকে চিনে রাখলেন। শৃংখলা তার মনে হল ছেলোটাকে তিনি আগে কোথাও দেখেছেন। ছেলোটো তার মনে চেন। একবার মনে পড়েছে। জলে ভাবলেন ছেলোটো তার ছাত্র হলেও হতে পারে।

দুর্দিন পরে এই ছেলোটোর সঙ্গে রাখাল কসু হটাৎ দেখা হয়ে গেল। ছেলোটো হত্যার পাড়া লেনের মাঝে দাঁড়িয়ে কথকদের সঙ্গে গল্প করছিল। রাখাল কসু ছেলোটাকে দেখেই চিনতে পারলেন। চিনতে পেরে তার সঙ্গে তাঁর কথা কয়েত ইচ্ছে হল। কিন্তু ছেলোটো অনেকে। সঙ্গ ছিল বলে সে সাহস তাঁর হল না। তিনি ছেলোটাকে দেখতে দেখতে তার পাশ দিয়ে চলে গেলেন।

আর একদিন সকাল বেলায় একটা চমৎকার সুযোগ এসে গেল। ছেলোটো পাড়ার মোড়ের ঘোষ কোঁকিয়ে বসে চা খাচ্ছিল, ছেলোটো একা বসে ছিল। তার আশপাশে কেউ ছিল না। রাখাল কসু, তাকে দেখেই লোকদের ভিতর ঢুকলেন।



**“ঈগল গার্ডসী সম্বন্ধে আর কি বলা যায়?”**



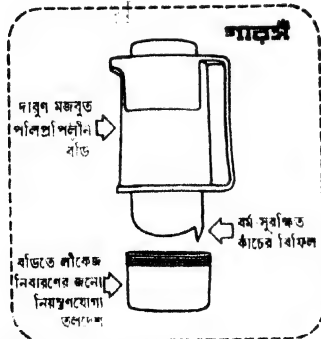
**“সর্বদা আপনার সেনারত...”**

সকাল, দুপুর, রাত্তির।



**“নয়ল করা সহজ...”**

খুলে বাইরে বন্দী...উত্তাপ ভেতরে  
বন্দী ২৪ ঘণ্টা।



**“অমমম...হম্নেই তো,  
ঈগল ড্যান্ডিয়াস ফ্রান্স মো।”**



**ঈগলের পক্ষতলে...১২৩ টি মডেল রয়েছে।**



আমাদের লাইসেন্স আছে

ছেলেটার সামনে এসে বসলেন। ছেলেটা তাকে দেখেই বলে উঠল, স্যার, আপনি। রাখাল কন্স নিশ্চিন্ত হলেন। ছেলেটা তা হলে তাঁ। ছাত্র। অঙ্ক, দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই। তাই তিনি ছেলেটাকে কথার জবাবে হেসে কালেন, চা খেতে এলাম।

ছেলেটা সপোং সপোং রাখাল কন্স হঠাৎ বেরারকে ডেকে চা দিতে বলল। কোয়া চা দিয়ে গেল। চা খেতে খেতে রাখাল কন্স জানতে চাইলেন, তোমার নামটা কি যেন...

- কালু।
- তুমি এখন কি করছ?
- বাবসা।
- কিসের?
- মানুষ খনো।

কথাটা শুনেই রাখাল কন্স হকচকিয়ে গেলেন। কালু, বে খুনী তা তিনি জানেন। জানলেও কেউ বে নিজের মুখে এই কথাটা খোলাখুলি বলতে পারে তা তাঁর ধারণা ছিল না। তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিরকম পাও?

- আগে স্যার কজার ভাল ছিল। এখন দিন দিন বাজার খারাপ হয়ে যাচ্ছে।
- তার মানে?
- দুচার বছর আগে একটা মানুষ খুন করতে পারলে পাঁচশের টাকা পাওয়া যেত। এখন সে জারজারা দুশো তিনশো করে পাই।
- এরকম হল কেন?
- এ লাইনে এখন স্যার প্রচুর ছেলে চলে এসেছে। এখন ছোট কম্পিউটার। রাখাল কন্স একটু খেমে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ভয় করে না?
- কিসের ভয়?
- খরা পড়ার।
- খরা পড়বে কেন? আমা। ত লাইসেন্স আছে।
- রাখাল কন্স বিস্মিত হলেন, লাইসেন্স।
- সহ। বাবসা করতে গেলে লাইসেন্স লাগবে না? রাখাল কন্স এত দিনে কখনো পারলেন খুন করে খুনীরা কেন ধরা পড়ে না। সব খুনীরই তা হলে লাইসেন্স আছে।
- রাখাল কন্স চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। তিনি তাঁর ও কালু। চায়ের দাম মিটিয়ে উঠে পড়লেন।
- কালু, বলল, আপনার যদি কোনদিন সরকার পড়ে কলকেন স্যার।
- নিচুর কলব।
- কনসেশন দেব স্যার, কথা দিচ্ছি।

রাখাল কন্স মোকান থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু কালুর শেষ কথাটা মাথার মধ্যে পাক খেতে লাগল। কনসেশন কেন স্যার। কথ দিচ্ছি। কিন্তু কাকে খুন করবেন তিনি? এতদিন তিনি খুনীর সাফল্য পাননি। এখন শ্রেয়ছেন। এখন মন স্থির করতে হবে। তিনি দিনের পর দিন ধরে এ নিয়ে ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে তিনি শেষ পর্যন্ত প্রেমোং, লালকেই খুন করবেন বলে ঠিক করলেন।

এখন পাঠকদের অকণ্ঠের জন্যে প্রেমোং, লালকে এক চামশের এত লোক থাকতে তাঁর ওপর রাখাল কন্স এত ক্রোধের কারণ কি তা ক্যা হয়কার। রাখাল কন্স যে স্কুলে চাকরি করেন সেই স্কুলের সহ-প্রধান শিক্ষক প্রেমোং, লাল। তিন বছর আগে প্রেমোং, লাল অবশ্য সহ-শিক্ষকই ছিলেন। কিন্তু তৎকালীন সহ-প্রধান শিক্ষক জীকন ভট্টাচার্য—এর অবসর গ্রহণের পর প্রেমোং, লাল সহ-শিক্ষক থেকে সহ-প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হন। এই পদের জন্যে রাখাল কন্সও প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু তাঁর পদোন্নতি না হওয়ার পিছনে স্কুলের প্রধান শিক্ষক কিরণ দে মহাশয়ের যে হাত ছিল তা ক্যা যায় না। কারণ, রাখাল কন্স সপোং তাঁর দীর্ঘ কাল ধরে একটা সুক্কু মনোমালিন্য চালালে। একে এই সুখে প্রেমোং, লালের সপোং তাঁর একটা গেরপন আঁতাত পড়ে উঠেছিল। তাই তিনি সহ-প্রধান

শিক্ষকের পদের খাঁপারে যেমন ছিলেন রাখাল কন্স। বরুণে, তেমন ছিল প্রেমোং, লালের পক্ষে। বস্তুত, তিনিই স্কুলের সম্পাদকের কাছে প্রেমোং, লাল হয়ে ওকালতি করেছিলেন। এসব কথা রাখাল কন্স জেনেছেন তাঁর এক হৈতব ক'মিটি সেশনের কাছ থেকে। ক'মিটির সেই সেশনটিই তাঁকে আরো বলছেন যে সম্প্রদায় মহাশয় নাকি তাঁর প্রতি একটু সহানুভূতিশীল ছিলেন। বাই হোক সেসব অতীত দিনের কথা ভেবে যা। লাভ নেই। কারণ, রাখাল কন্স আর সহ প্রধান শিক্ষকের পদের জন্যে লালোচিত নন। এখন তিনি সহ-শিক্ষক থেকে একবারে প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হতে চান। আগামী মাসের সাত তারিখ প্রধান শিক্ষক কিরণ দে মহাশয়ের অবসর গ্রহণ করছেন। সেই মতোই পদের জন্যে তিনি প্রার্থী হকেন। তাঁর সে বোগভাও আছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও বাধা সেই প্রেমোং, লাল। প্রধান শিক্ষক হওয়া। যোগ্যতা রাখাল কন্সর যেমন আছে, প্রেমোং, লালেরও তেমন আছে। শব্দ আছে নাকি, প্রেমোং, লালের দাবি অনেক বেশি প্রেমোং, লাল যোগ্যতার সপোং সহ-প্রধান শিক্ষকের পদে তিন বছর ধরে অবস্থান করছেন। অর্থাৎ প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করার পক্ষে তিনি রাখাল কন্স চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে আছেন। তবে কাইরে থেকে যদি প্রধান শিক্ষক আনা হয় তা হতে এসব প্রতিদ্বন্দ্বিতার মানেই হয় না। কিন্তু সম্প্রদায় মহাশয় শিক্ষকের আশঙ্কা দিয়েছেন। এই স্কুলের শিক্ষকদের ভিতর থেকে প্রধান শিক্ষক নির্বাচন করা হবে তাঁর এই আশঙ্কাস বরুণে কলকই পরিদর্শিত আসতে আসতে জটিল থেকে জটিল হয়ে উঠবে।

এমতাবস্থায় প্রকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমোং, লালকে ধরাধাম থেকে সারিয়ে দিয়ে পরলেই রাখাল কন্স নিশ্চিন্ত। আর এ ব্যাপারে কালুই তাঁর একমাত্র ভরসা মনে মনে রাখাল কন্স মন দেবেতে থাকেন। প্রেমোং, লাল মৃত। তিনি প্রধান শিক্ষকের সিংহাসনে আসীন হয়েছেন। তাঁর আর্থিক সম্বলতা এসেছে। তাঁর সম্মান বাস্তু শ্রেয়ছে। কল তিনি মধ্যস্থত লেন থেকে সন্ত লেকে চলে গেছেন মায় হাঁপানি ভাল হয় পেছে। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। স্ত্রীর পেটে কথা সেয়ে গেছে। ছেলেরা পড়াশুনার মন ফিরছে। সংসারে তাঁর আর কোন সমস্যাই নেই। তিনি প্রতিদিন মিনি বাসে করে স্কুলে হাটারত করেন। ছাত্র। তাঁর সামনে মাথা নিন্দু করে কথা বলে। অভ্যাককর তাঁকে সমীহ করেন। শিক্ষকরা হেঁ হেঁ করে। রাখাল কন্স কথাটা কালুক কালেন বলে ঠিক করলেন। কালু, যা নের নেছে। কালু অবশ্য বোঁশ নেবে না। কালু নিজের মুখেই বলেছে, কনসেশন দেব স্যার, কথা দিচ্ছি। এখন দেখা যাক কত কনসেশন দেবে। এ নিয়ে তিনি কালুকে সপোং দ। কথাকথি করবেন না। ক'মিটি খারাপ দেখছে।

কালুর সপোং রাখাল কন্সর মাঝে মধ্যে দেখা হতে লাগল। কখনো পাড়ার

ডঃ পঞ্চানন ঘোষালের প্রখ্যাত উপন্যাস

## রক্তনদীর ধারা

নতুন মুদ্রণ  
১২-৫০

পাশলা হত্যা। কাহিনী অবলম্বনে লেখা জাহ্নবী উপন্যাস। হত্যা-কারী শোকার ফাঁসি হয়েছিল, ঘটনা পরস্পরা পাঠককে রক্তস্রাসে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সংকর-৩৪

যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ মানচিত্র

২৭শ মুদ্রণ ১০-০০

২৮শ মুদ্রণ ১০-০০

এক দুই তিন পাত্রপাত্রী সার্থক জন্ম

৮-০০

৮-০০

৯-০০

দিলীপকুমার রায়ের

প্রেম অভয় শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

মহোপন্যাস ১৫-০০

১৫-০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নারায়ণ পরোপাধ্যায়ের সৈয়দ মুজতবা আলীর দুর্গরহস্য সেই সকালে শ্রেষ্ঠগল্প

১-০০

৮-০০

নির্মল গুপ্ত-৪

মুণ্ডারি কবিতাগুলি রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম

৫-০০

৫-০০

॥ বাক-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড ॥

৩৩, কলকাতা রো, কলকাতা-১

প্রকাশিত হল

আনন্দধারা - হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ২০.

সমবেশ বস্তু

জীবন যখন একটাই • ২০.

কবিতা সিংহ

কবি ছিলাম পিঙ্গাচেন্দ্র ২.

— ০ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে ০ —

ক্যান্সার • ডাঃ অমিয়কুমার হাটি

অজানা দেয় লাভাক.

শতদল ভট্টাচার্য

ডঃ ঘোষাল গ্রন্থাবলী.

চবিত্র.

ঐফুল রায়

এ ছাড়া

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

পর স্ত্রী

ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে

চিত্তরঞ্জন মাইতি

সুভিত্তকুমার সেনগুপ্ত

পরমা ২০

রক্তমাখা গুপ্তধন ৬.

আনন্দধারা মুখোপাধ্যায়

শিল্পাখণ্ডে কথা ১৬

সুবোধ চক্রবর্তী

একটি নাটক নিয়ে ৯.

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

যশ অপযশ ছাড়িয়ে ১০.

অগ্রিম ছাড়া V. P.-তে বই পাঠানো সম্ভব নয়।



৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

যোড়ে, কখনো চাকর দোকানে, কখনো ট্রেনে-কেনে। দেখা হলেই রাখাল বস, মাথোঁস এনে কথা বলতে লাগলেন। নানাজানো তাকে ভুলে কলতে লাগলেন। যেমন, চরের দোকানে দেখা হলে তাকে চা খাওয়ার লেন। ট্রেনে-কেনে দেখা হলে টিকিটটা কেটে দিলেন। কিন্তু আসল কথাটা পাড়ব পাড়ব করেও পাড়তে পারলেন না। কারণ, প্রমাণে, বাস লম্বা হলেও প্রতিদিন তার সঙ্গে তার দেখা হয়, কথা হয় গল্প-গজব হয়, হাসি-ঠাট্টা হয়। যতই মাঝে রাখাল বস, তাই নাড়িও বান। প্রমাণে, রাশে। স্বাধীন সঙ্গে, বাবা মার সঙ্গে, ছেলে মেয়ের সঙ্গে তার ভাল পরিচয় আছে। প্রমাণে, মাস মাসা গেলেন তার সঙ্গে তখনই তখনই হয়ে থাকে। এটাই রাখাল কসুর মনে দিবারাত্রি কাটায় যত খুশি করতে লাগল। তিনি কেবল ভাবতে লাগলেন, কি করা যায়। একবার ভাবলেন প্রমাণে, কপের প্রাণের কিন্নরে যদি তার জীবন সাধক হয়ে ওঠে তা হলে কী কি। আবার কখনো ভাবলেন, তার নিজের জীবনকে সাধক করতে গিয়ে একটা সংসারকে অন্যায়ের মধ্যে টেনে দেওয়া কি ঠিক।



প্রমাণেশ্বর, আমাকে পাঠালেন

এই হাট ও নাল টানপেরেডেনে রাখাল কসুর দিন কাটতে লাগল। কোন স্থির স্থির আসতে পারলেন না। অথচ এর মধ্যে পর পর কটা ঘটনা ঘটে গেল : প্রধান শিক্ষক কিরণ দে মহাশয় অকসর গ্রহণ করেছেন, কাগজে প্রধান শিক্ষকের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, রাখাল বস, একটা দরখাস্ত করেছেন এক টাকের ইন্টারভিউতে ডাকা হয়েছে। সামনের রবিবার সকাল নটার ইন্টারভিউ। দেখতে দেখতে বৃহস্পতিবার গেল, শনিবার গেল। রাখাল বস, তবুও মন স্থির করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত শনিবারও গেল। রাখাল বস, বৃহতে পারলেন তার কিছু, করার নেই। তিনি তাই রবিবার সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠলেন। নটার ইন্টারভিউ। তিনি তাড়াতাড়ি বাজার করে, টিফিন করে, দাড়ি কামিয়ে আটটার মধ্যে তৈরী হয়ে নিলেন এখনো এক ঘণ্টা দের আছে। স্কুল বোর্ড দূরে ন্যা, হেটে গেলেন আশ ঘণ্টা লাগে। রাখাল বস, হেটেই যাবেন বলে ঠিক করলেন। তবে যাব। আগে একটা সিগারেট ধরানোর কথা তার মনে হল। তিনি খালি গারে চেয়ারে বসে আরাম করে একটা সিগারেট ধরালেন। তখন ঘরের মধ্যে কেউ ছিল না। তিনি একা। আর ঠিক সেই সময় কালু এসে ঘরে ঢুকল। রাখাল কস, কালুকে দেখে চমকে উঠলেন, তুমি!

কালু, হাসতে হাসতে কল, এলাম স্যার।

—কি আপস?

—প্রমাণেশ্বর, আমাকে পাঠালেন।

—কেন?

—আপনাকে...

কালু, কথাটা শেষ না করে, পকেট থেকে পিস্তল বের করল। রাখাল কস, বিস্মিত হয়ে বসে রইলেন। তার মুখে কির একটা কথা ফেরল না।

আপনারা বারি পাঠক হিসেবে বস্তুমান, তাঁরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন গল্পটা এবার শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এই গল্পের দু, রকম উপসংহার হতে পারে। পাঠকের, কাছে আমার কিনীত নিবেদন তাঁরা এই দু, রকম উপসংহারের যে কোন একটা অথবা ইচ্ছে করলে দুটোই গ্রহণ করতে পারেন।

কালু রাখাল বসুর বুক লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। রাখাল কস, চিৎকার করে বকে হাত দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। কালু, নিশ্চিন্ত মনে পিস্তল পকেটে পরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অথবা

কালু, রাখাল বসুর বুক লক্ষ্য করে টিগার টানল। কিন্তু গুলি ফেরল না। কালু, কিছু বুঝতে না পেরে আবার টিগার টানল। এবারেও কোন গুলি ফেরল না। তারপর আরও কয়েক আর কালু, চেষ্টা করল। তবুও গুলি ফেরল না। কালু, তখন হত্যা হয়ে পিস্তল পকেটে পরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাখাল বস, স্বাভাবিক নিশ্বাস ফেল তাড়াতাড়ি জামা-প্যান্ট পরে নিলেন। নিরে এক মহত পড়লেন না। হন হন করে ইন্টারভিউ করতে উঠলেন।



# সেই সময়

## সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৪৬ ॥

—তোমার কুসুমারিয়ার আমি আবার বিয়ে দেবে।  
মুনে আঁতকে উঠলো সন্ন্যাসিনী। তার পিঠ  
কেঁচুটি যে একটি, ক্যাপাসে ধরনের তা সে অনেক  
দিন আগেই কেনে গেছে। নিত্য নতুন বস্ত্র তার  
মস্তকে ভর করে। কিন্তু এ আবার কী উদ্ভট কথা।  
হুই চকু প্রায় কপালে তুলে সন্ন্যাসিনী কালো,  
আপনি কুসুমারিয়ার যে দেখেন? আর্পনি শোয়াব  
দেখেন? ওর কে হয়ে গাচ সেই কবে, তাপস  
বেঁধা হলো, আর্পনি ফেকলেন না সিন্দকে, মাতার  
সিঁদুর নেই, হাতে নেলেন নেই, কপাল পুড়িয়ে  
বগের বাড়ি এয়েছে—  
—বিষয় কলই তো ওর বিয়ে দোবো আবার!  
—কিবার যে? সে তো ছোট-লোক, জমাত-  
কুলাতন মাথা হর, আট ঘাট করে হাড়া। আর  
সম্পর্ক? ও কি জল-কুশে কথা! আর্পনের কি  
পরকালেরও ভর নেই?  
—ঠিক এই কতটাই কিস্যাসার মহাই বলছিলেন।  
আমরা এ বছরে যে কটা বনসী ঘর গিঁটিচ, আমবা  
মুখে মুখে কিস্যাসার মহাইয়ের কিবা-কিহ কর্মে  
সার গিঁটিচ, কেউ কেউ অর্থ সাহায্যও করিচ, কিন্তু  
নিজদের বাড়িতে কেউ বিধবা-বিয়ে চাল করিনি।  
উনি বৌদিকে কতটা বদলেন, লম্বার আমার মাথা  
ন্ধি হয়ে গেল। উনি তো হক, কতাই বললেন।  
আমারিদের বড় প্রগতি সব বর্ধ জিকের ভগ্নার, কাজে  
নয়। কিন্তু কী করবো বলা, আমার বাড়িতে তো  
বিধবা কেউ নেই যে তার বিয়ে দেবে। তুমি যদি  
কিবা হলে, কত দটাগোটা করে তোমার বিয়ে দিতুম  
আবার।  
সন্ন্যাসিনী শ্রমীর পায়ের কাছে বসে পড়ে  
কলসীভূত কণ্ঠে কালো, আমার মাতার দিকি,  
আর্পনি এসব কথা কলকেন না, এই বেকুন, আমার  
হকের হযো কেন্দ্রন ভোগ সাগার মতন গুড়ম গুড়ম  
শব্দ হক?

নবীনকুমার হাসতে হাসতে কালো, তুমি বিধবা  
হলে জামি মরে যেতুম, এই তো। তা এতবড় একটা  
মহৎ কিস্যাসার জন আম মস্তেও রাজি আছি। দেশের  
কাছে মস্তেও সূখ।  
এর পর সন্ন্যাসিনী ওগো আমার কী হক পে,

হলে ছুকে উঠলো। নবীনকুমার তার হাত ধরে টেনে  
তুলে কালো, জববে বলিচা আন কাকে হলে। আরে  
জামি কি সতিই মস্তে বাড়ি নাকি? এ হলো সে  
কড়ার কথা। সেই জনই তো কলচি, তোমার কুসুম-  
ারিয়ার বিয়ে দোবো। সরোজ শব্দ অশকারই হয়ে  
গালো, এত বই কলচ-পত্তর এসেছি, কিছুই পড়ে না।  
পড়লে জানতে আজকাল ভাষারও কিয়ার বিয়ে হয়।  
আট বছর কায়েত কী বলচো, প্রোটির কুলনি ভাষারও  
কিবা মেয়ে বিয়ে করেন। তোমার কুসুমারিয়ার পত্নী  
হিসেবে খবই ভালো।  
অন্তঃস্বাক্ষর করে সন্ন্যাসিনী কালো, আর্পনি  
কুসুমারিয়ার কে দেখেন, এ কেনমন্তে কথা?  
কুসুমারিয়ার কি আণনার আঁড়ির মেয়ে? তার লম-  
দাবার রয়েচেন না, ওয়ার এই কথা মনে লাঠি নিয়ে  
আপনকে তড়া করবে।  
—কেন? ওর কি নিবোধ? আঁড়িতে এমন খাল  
একটি বিধবা পত্নী থাকতেও ওরা কিস্যাসার জনাইকে  
খালী কন্তে চাইবেন না?  
—কিস্যাসার না কে খালী হবে বলে ওগোবা এমন  
পাপ কাজ কন্তে বাবেন? খটা মারি এমন খালী  
হওয়ার হক?  
—এই হলো মেরমানের স্থিতি। নিজের ভালো  
নিজের কেবো না। তোমার কুসুমারিয়ার সারস্বতী  
বিধবা হয়ে কন্ট পরবে, তাতে তুমি খালী?  
—কিবা হয়েছে, ...যার বেমন ভাগ্য, ভাগ্য  
থাকলে হক না?  
—জামি ভাগ্য পসেট দেখো। কলই কথা কলো  
কুসুমারিয়ার সপো। ওর বিরতে আমি জল-বিশ  
হাজার টাকা খরচা কন্তেও রাজি আছি।  
পর দিনই কথা কলা হলো না কলা, কিন্তু  
কিরটা নবীনকুমারের মনে রয় গেল। সে এখন কিহ  
হাসত। মহাভারত অবধের কাজ নিপুণভাবে চলাছে  
প্রায় অষ্টপ্রহর হয়ে। এতদিন কেউ সঠিক বিশ্রামই  
করতে পারেনি যে নবীনকুমারের মতন এক কিল-  
কলীর অস্থির স্বভাবের বৃক সমগ্র মহাভারতের  
জন বহরের মতন কিল্লা কাজ হাতে নিজে সতিই  
তাতে মন দিয়ে লেগে থাকবে। কিন্তু এখন আর  
কিলকাসের উপার নেই। কাজ অগ্রসর হচ্ছে আঁড়ি  
হলে, ইতিমধ্যে প্রথম পর্ব সম্পূর্ণ হয়ে মস্তিত হয়েও  
বেরিয়েছে। দ্বিতীয় পর্বও যলুম্ব।  
অন্যদের প্রথম পর্ব পাঠ করেও সকলে বিশ্রিত।  
আট মল জন সন্তোষজনক মূর্ণ-ভক্তির দিকে নবীনকুমার  
অন্যদের কাজ করছে। এ বছর সকলেই জানে, কিন্তু  
এমন গম্ভীরপূর্ণ অর্থ সুনীলতা, সরস বাংলা লেখা  
তো কোনো পণ্ডিতের কর্ম নয়। এতে বিশেষ একজন  
কায়র হাত আছে, এক সেই একজন নবীনকুমার  
স্বরং। সেই রক্তর ভাষা আশোপাস্ত পরিমার্জন  
করে।  
নিজের আঁড়িতে স্থান সন্তুলান হচ্ছে না হলে  
মুদ্র এ কাজের জন্য নবীনকুমার কলহানদের একটি  
প্রশস্ত উপান বাটী লর করছে, এক তার নাম নিজে  
পালকভারত। পণ্ডিতর সবই সেখানেই স্থায়ী  
হয়েছেন। আর একটি বাড়ি কিনে সেখানে স্থাপিত  
হয়েছে মন্ত্যক। প্রাতিদিন জোড়ানকো থেকে জুড়ি-  
পাড়ি হাঁকয়ে নবীনকুমার তার কলহানদের। পরে  
কলহানদের তার কলহানদের পড়ে। এক একদিন বহর-  
নদের অধিক জাতি পশ্চত কাজ চললে সেকিলা আ  
নবীনকুমার নিজের বাড়িতে ফেরে না, মন্ত্যর আঁড়িতেই  
জাতি বাপন করে। সন্ন্যাসিনীও সেখানেই আছে।  
কাজের কলার বেন পেরে কলহে নবীনকুমারকে।  
এতবড় একটা কাজ তো রয়েছেই, তার ওপরেও সে  
নিজেকে 'বিকিরণ' সংগ্রহ-এর মতন উভমানের  
পরিচায় সম্পানন ডার। লম্বাশ্রিতা মিত পলভার  
করার কলভাবানবাক সমিতির এই পরিচাটির  
অস্তিত্বই বিশ্র হরে উঠেছিল, তখন নবীনকুমার  
নিজের মন্ত্যে এই কাজে লেগে। মানাব এবং পণ্ডিত-  
প্রবর মন্ত্যশ্রুতাল মিতের পরিচয় কুঁড় বদর হয়েলো  
এক বৃক শিবিধাৎ সংগ্রহ-এর মতন পরিচায়  
সম্পদক। অবশ্য জনবাক এবং লেখক হিসেবে

সম্পদক তার বোধগত হাতকলহে পলভার ভক্ত্যে  
প্রমাণ করেছে।  
তবে এতেও কলচ নর সে। প্রাতিদিন সন্তোষ-  
অন্যর ও গুড়ম গম্ভীর লম্বাশ্রিতা মন্ত্যে  
এক এক সময় তার কল কলপালা হয়ে যায়। তার  
চাট্টে একটা লম্বা, আমোদ প্রিয় দিক আছে। এক  
লম্বায়ে অনেককল সে উভাপন চিত্তা-ভাবন চালিয়ে  
কেতে পারে না। মাঝে মাঝে তার চিত্ত যিয়েনের  
পরকার। মলক চাঁদের আখড়ার সে আর যায় না।  
হরিল মন্ত্যের সপোও দেখা হয় না, কল-অন্যর  
সপোপে কলপাপন করার মতনও তার অবল নেই।  
সেই জনই সে বহরনদের মহাভারত চাট্টার মাঝে মাঝে  
হটাং উঠে চলে যায়, সেখানে নিজস্ব একটি কল  
আছে, তাতে প্রকল করে মন্ত্যর মন্ত্য করে দেয়। সেই  
কলের একটি সেকাল জুড়ে রয়েছে একটি কলজিয়ার  
আলনা। নবীনকুমার আননার সামনে দাঁড়িয়ে নাচতে  
শুর করে। লাফার, ডিগবাজি যায়। এই তার কিলেনন।  
একা একা সেই কলের মন্ত্যে সে কলো শ্রীকল মাঝে,  
কখনো শ্রী মাথিকা, কখনো সে ভীম, আবার সে নিজেই  
বক হকস। আননার সামনে বকে সেবা যায়, তাকে  
সে জিহ্না প্রশর্শন করে, নানা লম্বা জাতি কাট।  
একট পের সে কল আবার বেশ-অস ঠিকতা করে  
চাঁদ চারটি দির সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে গম্ভীর  
ভাবে, তখন তাকে দেখে কে বকবে যে এই মানবটই  
একট আগে কতরকম ছেলোম করছিল।  
সন্তোষ ঘোষা, সন্তোষ সমাস সমাধিত গরগম্ভীর  
লাকাগলি মাথা থেকে তাড়াবাদ জন সে আরও একটা  
উপার অকলন করছে। নিজের গোপন কলটিতে সে  
একটি ছোট খাতায় বা খালী লিখে যায়। কিল-  
দন আগেই চড়ক গেছে, সেই উল্লেখ কলকাতা পতর তেমন  
মেতে উঠেছিল তার একটা কিলর লেখে সে, কিন্তু  
লেখকর সময় সতর্ক থাকে, পাঠককে সে সন্তোষ  
কথা বাবার করবে না।  
আপন কলোলে এই ভাবে সে লিখে যায়, 'শ্রীদিক  
হলে জোড়া, হাড়ি ও কাড়র মন্ত্যে পলক উঠির  
সতো গলার দিরে নিজ নিজ বীরভের মহত্ত্ব সন্ত-  
স্বরণ বাণ ও দশ লাঠি হাতে করে প্রত্যেক মন্ত্যর  
নোকনে, কলোলে ও লোকের উঠানে চাকর সপ্ততে  
কেতে জাড়াছে। চাটার চাকর টোরেতে চামর, পাশর  
পালক, ঘণ্টা ও মন্ত্যর বেঁধে পাড়ার পাড়ার চাক  
বা করে সমাসী সংগ্রহ করে; গুড়ম মহাপলো পাঠালা  
কল হয়ে গিরেছে—ছেলোর...চাকর পেচোনে পেচোনে  
সতে সতে জাড়াছে...'।  
ঠিক কেন তার মন্ত্যের ভাষা সেই রকম লেখা।  
এই সপো মহাভারতের বিশেষ ভাষা এক এই জন  
বর্চলি গবা লিখে চলেছে একই লোক। এই নতুন  
ধরনের লেখা লিখতে লিখতে লেখ লেখা পেরে লেন  
নবীনকুমার। চড়ক পর্বনের পর লিখলো কল-  
ইয়ার পুঁজা বিহর। জমে ছোট খাতাটি ভাটি হরে  
বাওর নবীনকুমারের মনে হলো, এই লেখাশ্রি  
হাণিরে প্রকাশ করলে কেনন হবে? তাই নিজস্ব  
হাণথান হরয়েছে। কিন্তু গ্রন্থকারের নাম কী থাকবে?  
তার নিজের নাম দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। মহাভারতের  
অন্যবাক হিসেবে যে পরিচিত, তার কলম দিকে এই  
লেখা বেরিয়েছে কেউ কিলক করবে? এ লেখা পড়লে  
যদি সকাই 'হি হি করে? না, নাম সেলগ চলতেই পারে  
না। মলকচাঁদের নামটা দিরে দিলে হয় না? মলক-  
চাঁদ কাকপাকীর মতন হয়ে হয়ে লহর কলকাতার লর  
সংলগ সংগ্রহ করে। কাকপাকী না পাটা? হতোম  
পাটার নকশা নাম দিলে কেনন হয়?  
মাঝে মাঝেই মনে পড়ে কুসুমকুমারী কথা। এ  
নীল লম্বা কালিকাটির গুড় চোখের পণ্ডি বেন নবীন-  
কুমারের মনে গেঁথে গেছে। ওর কথা মনে এলেই  
নবীনকুমার মাথা কলার, বেন সে-ই কুসুমকুমারীর  
অভিভাক, কুসুমকুমারীর জীবনের সন্তোষ করে  
দেবার পাশ্র্য তারই। একটা কিল; করতেই হবে ধবে  
শীর, কুসুমকুমারীর পিতার সপো কথা কলা হলেই  
উঠে নু। তিন কলকাতায় নেই।  
একদিন দেবসুন্দর ঠাকুরের বাড়িতে গেল নবীন-

# মিষ্টি-সুস্বাদু মিল্কমেড এখন সুবিধাজনক প্যাকে



২০০ গ্রাম  
প্যাক

অপূর্ব মিষ্টি স্বাদে ভরা  
খাঁটি কনডেনসড মিল্ক।  
এখন সুবিধাজনক ২০০ গ্রামের  
প্যাকে পাবেন।  
যেমন সরস, তেমনি সুস্বাদু—  
অথচ খরচ কম,  
ব্যবহারেও সুবিধা।

## মিল্কমেড

স্বাদেই ভরসা বুনবেন





সময়ে, শত সহস্র মানুষ অনাচার সম্বন্ধে, তা নিয়ে কিছু আলোড়ন হচ্ছে সংবাদপত্রগুলিতে। সেই উপলক্ষে দেবেন্দ্রনাথ রায়সাহসর উদ্যোগে একটি সভা ডেকেছেন। রাষ্ট্রধর্ম গ্রন্থের বিদ্যুৎ বসন সেই নবীনকুমারের, কিন্তু ইদানিং সে প্রায়ই ও'কের সভায় যায়। দেবেন্দ্রনাথের কথা শুনে তার ভালো লাগে, এমন সুমিষ্ট বাংলা সে অন্য কারুর মতো শোনেনি। সভায় বেসিঁপলে সব দেকেন্দ্রনাথ এ দেশের সমস্ত সমস্ত প্রান্তের ভ্রমাবহ দুর্ভিক্ষের চিত্র কণী করলেন অম্পর্শী ভাষায়। দেবেন্দ্রনাথ নিজে এ সব দেশ ঘুরে এসেছেন, তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। পাহাড়ী জাতির লোকের বড় সরল হয়, দেকেন্দ্রনাথ ভাষায় তাদের দর্শনের চিত্র যেন চক্কর সম্বন্ধে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। দেবেন্দ্রনাথ যেই বললেন, যে দেশ-বাসীর বিপদে আমরা যদি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত না করি তবে কি আমাদের মন্তব্য কর হবে না, অমন নবীনকুমার আর থাকতে পারলো না, উঠে এগিয়ে গেল দেবেন্দ্রনাথের দিকে। তার গায়ে যে একটি ছাল রয়েছে, যার মতো অন্তত দুই সহস্র মৃত্যু, সেটি বলে দেকেন্দ্রনাথের পরপ্রান্তে রয়েছে সে কিশীতভাবে বললো, এই আমার সামান্য দান। পরে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করলে?

ওখনট সভাস্থলের অল্প সকলেই নিজেদের অপরাধীর, সোনার বৈতাম ও গাড় চৌন সম্মিলিত বাড়ি বলে নিয়ে দিতে লাগলেন। আশ্চর্যের বিকর এই সময়ও নবীনকুমারের মনে পড়ে গেল কুমুমকুমারীর কথা। কোথাও কোনো মানুষের দুঃখের কথা শুনলেই তার কুমুমকুমারীর কথা মনে আসে। না, এ অপারূপাঙ্কি স্থানিকার্টিক কিছুতেই সারলক্ষ্যবিন কষ্ট পেতে দেওয়া হবে না। শীঘ্রই কুমুমকুমারীর জন্য একটি পত্র জোগাড় করতে হবে। নবীনকুমার তার পরিচিত অকৃতদার কিংবা

কুমুমকুমারীর পিতার অভিমত গ্রহণ করে এমন কিছু করণী নর, একজন উপস্থিত কিংবা-ববাহেজ, পারের সম্মান করাই এক প্রধান করণী।

দেকেন্দ্রনাথের পাশে তাঁরই পুর বসে আছে, একজনের নাম দিকেন্দ্রনাথ। অন্য জন জ্যোতির্বিদ। দেকেন্দ্রনাথের সম্মান-ভাষণ হবে ভালো, এর মধ্যেই তার প্রলোভনটি পুর-কন্যা জন্মেছে। জ্যোতির্বিদ বেশ ছোট, কিন্তু দিকেন্দ্রনাথের মতো হয় নবীনকুমারেরই সমবয়সী হবে। নবীনকুমার একবার ভালো, দেকেন্দ্রনাথের কাছে প্রস্তাব দিলে হয় না যে তাঁর এক পত্র এ কুমুমকুমারীকে কিংবা করুক। দেকেন্দ্রনাথ নবা পক্ষী, উহার মনক কাঁচ, তিনি নিশ্চয়ই এতে আপত্তি জানাতে পারবেন না। অসামান্য রূপ-লাক্যবতী কুমুমকুমারী তাঁকুর বাড়ি বসে হাকার অনুপস্থিত নয়। কিন্তু একটি পরেই তার জ্ঞেয় হলো এ রকম প্রস্তাব করা যার না। দেকেন্দ্রনাথেরা রাষ্ট্রধর্ম, কুমুমকুমারীরা কারলক্ষ্য। পিরিলির অমনই হোক আর রাষ্ট্রধর্মই হোন, এ'র এখানে কিংবা-বাপের জাতি-বৈদ ঘোষণাতে পারেননি।

কয়েক দিনের মধ্যেই অবলা নবীনকুমার অন্য এক ব্যাপারে মেতে উঠলো, আর মনে ছিলো না কুমুমকুমারীর কথা।

এক প্রত্যক্ষলে যদি থেকে বের বাত ম'খ নবীনকুমারকে ধরলো গুপদায়করণ। সে ফালো, ছোটকু, কর্ণিক থেকেই তাকে খ'জিচ, তোর আর দেখাই পাই না। মহাভারতের অনবদ্যটি কু স'রেল করিচি স'রে। আমার আরও খানকতক বই কিংবা? নবীনকুমার কললো, তোমার কত খ'দী খই নও না, দাখারনি। দ'লালকে কলো, আনিরে দেবে। আমি তো মহাভারত থেকেই নর, তিন হাজার কপি জাপি'রটি, সব বিলিয়ে দোকে, যে যে চাইবে, মহাভারত নিয়ে আমি বসসা কতে নারিনি।

কম্বলের দেকালম' ভাগা ভো'কা অমনাক'ব' ললো। এমন স্বচ্ছন্দ অন'বাদ, যেন মনে হয় নতুন জনা।

—দাদামনি, তুমি তো হারিশ ম'জের ওখানে গভার্যাত করো, ওকে বই দিও এক কাপি।

—তুই আমার যে বইখানা দিইচিলি সেটা আমার এক কথা জোর করে নিয়ে নিলো। কিছুতেই ছাড়ল না। তার কল সে তার লেখা নতুন একটা বই তোকে পড়তে দিবেচ, তুই পড়ে কেক'ব?

—কে তোমার বখ?

—য'হ, আমার সহপাঠী ছেল, এখন তো বেশ ক'খান খই লিখেচে, বেশ নামও হরচে, তুই নর খ'নিসনি? মাইকেল মধ'সু'কন দত্ত—

নবীনকুমার হাত বাড়িয়ে বইখানি নিয়ে জড়ি' গাড়িতে উঠে পড়লো। এখান থেকে ক'হানগর যেতে অনেক সময় লাগে, তার মধ্যে বইখানি পড়ে ফেলবে। মধ'সু'কন দত্তর নাম সে শ'নেছে ক'টে, পাইকপাড়ার রাজাদের ব'ধা নাটকার! নবীনকুমার নিজে বাড়ির মধ্যে থিয়েটারের প্রচলনের পর অনেকেই তার অনুকরণ করছে। পাইকপাড়ার রাজক'র ক'হ, অর্থ ব'য়ের আড়'কর করে। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে এক ধনী তার চেয়ে একটা বেশী কোনো ধনীকে ঠিক পছন্দ করতে পড়তে না। সেই অনুসারী পাইকপাড়ার রাজাদের সম্পর্কে নবীনকুমারের মনে একটা বিরগণ ভাব আছে। স্বভাবতই তাদের কাঁধ নাটকার সম্পর্কেও সে প্রবল নয়।

বইখানি অক'র নাটক নয়, কাব্য। 'মেঘনাদ ক'ব' খ'হ, নরটি থেকেই নবীনকুমারের মনে একটা চিন্তা তরল খেলে গেল। মহাভারত নয়, রামায়ণের কাহিনী। রামায়ণেরও কোনো কিংবা গদ্যো ব'খান'ক'দ নেই। মহাভারত শেষ ক'রেই রামায়ণ অনু'ক'দে হাত দিতে হবে তো?

তারপর প্রথম পাতা উল্টে সে পড়তে শ'রু' করলো।

প্রকাশিত হ'ল : শশধর দত্তের আলোড়নকারী গ্রন্থ  
**মোহন অমনিবাস** (২য় খণ্ড) ২৫.  
শৈলেশ দের নিব্রনী কাহিনী  
ইতিহাস মনে রাখেনি ১০, অগ্নিযুগ ২৫.  
নটরাজনের মনমাতা উপন্যাস  
প্রমীলা মহল ১০, প্রেম অভিসারে ১২.  
আব্দুল জব্বারের সাড়া জাগানো উপন্যাস  
অলৌকিক প্রেমকথা ২০, রাতপাখির ডাক ১২.  
মৃণাল ওহঠাকুরতার নতুন উপন্যাস  
পুফ্ রীডার ১২, ভাগ্যে ভার্যা (২য় সং) ১০.  
অধৈর্য দত্তের ॥ শিকারের জার্নাল (২য় সং) ৮.  
অমলেন্দু ঘোষের ॥ মার্কসবাদই শেষ কথা নয় ৮.  
চিরঞ্জীবের ॥ খেলার মাঠে মেয়েরা ৭.  
অবনী সাহার ভ্রমণ কথা ॥ টালা থেকে তামিলনাড়ু ৮.  
চিরঞ্জীব সেনের গুপ্তচর কাহিনী ॥ সিক্রেট সিগন্যাল ১০.  
শৈলেশ দের উপন্যাস ॥ প্রজাপতি মন ১০.  
সুভাষ সিংহের নতুন উপন্যাস ॥ বৈরী হাওয়া ৫.  
দেবযানীর বলিষ্ঠ উপন্যাস ॥ আবীরের রঙে ১০.  
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ॥ সোনার পিতল মূর্তি ৭.  
মণীন্দ্রনাথ দাসের ॥ স্বর্ণ ও গণিরত্নের কথা ৫.  
পূর্ণ প্রকাশন ৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯, ৩৪-৯৫৯২

সার আর্থার কোনান ডয়েলের  
শালক হোমস্ সিরিজ  
পূর্ণ অনবাদে এইমাত্র প্রকাশিত হল  
**এ স্টাডি ইন স্কার্লেট** ৭.৫০  
**দি সাইন অব্ ফোর** ৭.৫০  
দি অ্যাডভেঞ্চার অব্ শালক হোমস্ ১৫.০০  
এই তিনটি বই একত্রে  
**শালক হোমস্ সমগ্র** (প্রথম খণ্ড) ২০.০০  
এর পরে ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছে  
**মোমোয়্যাস অব্ শালক হোমস্** ১৪.০০  
**দি রিটার্ন অব্ শালক হোমস্** ১৬.০০  
এই দুটি বই একত্রে  
**শালক হোমস্ সমগ্র** (দ্বিতীয় খণ্ড) ২০.০০  
এইভাবে পর-পর শালক হোমস্ সিরিজের বাকি চারটি বইও—  
যথা 'দি হাউস অব্ দি বান্ধারিভিলস', 'দি ড্যান অব্ ফিয়ার',  
'হিজ লাস্ট বাট' আর 'দি কেস-বুক অব্ শালক হোমস্' প্রকাশিত  
হবে এবং যথাক্রমে দুটি করে বই নিয়ে হবে—  
**শালক হোমস্ সমগ্র** (তৃতীয় খণ্ড) ২০.০০  
**শালক হোমস্ সমগ্র** (চতুর্থ খণ্ড) ২০.০০  
পূজার আগে সেট সম্পন্ন হবে। পুরো সেট একসঙ্গে ৭৫.০০  
অড্যদয় প্রকাশ-মন্দির ॥ ৬, বঙ্গিম চাটুজে স্ট্রীট, কলকাতা-১৩

সেই বেলো মধুসূদন অকালে; কহ হে দেবী! অমৃত-  
ভাষিণী... নবীনকুমারের ভূর উজ্জ্বলিত হলো। এই-  
ভাবে আরম্ভ, এরকম মাঝখান থেকে? শব্দ থেকেই  
এক বীর চর্যামণির পতন? এ বৈ নাটকের মতন।  
এরকম কাকা নবীনকুমার কখনে পড়েন।

অন্যান্য হতেমের নকশা লেখার মাল-মশলা  
সংগ্রহের জন্য সে পথের দু পাশ দেখতে দেখতে  
যায়। আজ আর অন্য কোনো দিকে তার আর  
খোয়াইলই রইলো না। এ কী অবস্থাসা! রকমের  
কবিতা? কবিতা সম্পর্কে নবীনকুমারের মনে  
এমনভেই একটা বিশ্বাসের ভাব আছে। সে অনেক  
কষ্টের করে দেখেছে, কিন্তু কবিতা তার হাতে ঠিক  
আসে না। গদ্য রচনা বিষয়ে তার আত্মবিশ্বাস  
লক্ষ্য পেছে, কিন্তু কবিতা জিনিসটা কেমন যেন  
হয়ও হয়ে ওঠে না। এরকম কবিতা নবীনকুমারের  
কখনো পড়েন। এমন কৃৎকারের শব্দ, এমন উজ্জ-  
ভাব, লাইনের শেষে মিল নেই অথচ প্রতিটি  
লাইনই দৃঢ় সর্বস্ব।

...শুনিয়েছে বীণা-ধ্বনি দাসী  
পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে  
সরস মধুর মাসে, কিন্তু নাহি শুন  
হেন মধুমাখা কথা কহু এ জগতে।  
দুলালচন্দ্র দাঁড়িয়ে থাকে জড়ি গাড়ির  
পিছনে। ললিত গাড়ি থেকেই নেমে দৌড়ে দরজার  
কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, কী বলছেন, ছোটবাবু?  
নবীনকুমার কখন আপনমনে উচ্চস্বরে পাঠ  
করতে শব্দ করেছে। এমন কবিতা মনে মনে পড়া  
যায় না। হাতের ইশারায় দুলালিকে যে যা বলে সে  
পাঠে নিমগ্ন হয়ে রইলো। ধ্যানিক পরে আবার সে  
মধু বাড়িয়ে কোচোয়ানের উদ্দেশ্যে বললো, এই  
ঘোরা, ঘোরা, লিঙ্গার গাড়ি ধারিয়ে নে। দুলাল  
আবার নেমে এসে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে,  
ছোটবাবু?

নবীনকুমার এমন ঘোরের মধ্যে আছে যেন  
দুলালকে চিনতেই পারলো না প্রথমে। তার দৃষ্টি  
মলে বললো, কে? কে বিরক্ত করে এখন?  
পরক্ষণেই আবার সে বললো, ও, দুলাল, আমি  
আজ কাজে যাবো না, আজ বাড়ি ফিরবো, গাড়ি  
ঘোরাতে বল, তুমি দৌড়ে বরানগরে চলে যা—পশ্চিম  
মহাশয়ের খপর দিগে যা—।

সারাদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে নবীনকুমার  
মেঘনাধবধ কাবা পাঠ করলো। এমন নেশা সে  
অনেকদিন পারেন। তারপর চারদিন ধরে নবীন-  
কুমারের মধ্যে শব্দ ঐ কাবোর কথা। যাকে পায়  
তাকে ডেকে ডেকে শোনায়। এই ফিরিশণি কবি  
সম্পর্কেও তার মনে দারুণ কৌতূহল জেগেছে।  
ছোটভাই-এর এতখানি উৎসাহের আতিশয্য দেখে  
গণ্যনারায়ণ বললো, তুমি মধুর সংগে পরিচয় কতে  
চাস? ডেকে আনবোখন একদিন তাকে আমাদের  
বাড়িতে।

কিন্তু মধুসূদনকে এত সাধারণভাবে ডাকা হলো  
না এ-বাড়িতে। এর মধ্যে একদিন বিখ্যাত অধ্যাপক  
রিচার্ডসনের বিশায় অভ্যর্থনা হয়ে গেল। আগেকার  
হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডি এ রিচার্ডসন ব্যস্ত  
হয়েছেন, চিরকালের মতন তিনি ভারত ছেড়ে চলে  
যাচ্ছেন ইংল্যান্ডে। মধুসূদন, গৌর গণ্যনারায়ণ,  
জুদব প্রমুখ ছিল রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র, তারা  
ওকে টানলে হলে সম্বর্ধনা জানানো এবং তারাই

তারা গণ্যনারায়ণের ফেরার আহ্বান তাকে  
দিল। সেই সভাতে উপস্থিত রইলো নবীনকুমার।  
সভা শেষে বাইরে বেরিয়ে এসেই সে বললো,  
আমরা প্রধান প্রধান সম্ভবদের বিদায়ের প্রাক্কালে  
রিসেপশান দি, আমরা অসাব্যধ আমাদের দেশীর  
কোনো ব্যক্তিকে তা মিয়াটি?

যদুপতি গাঙ্গুলি বললো, এটা তুমি ঠিকই  
বলচো, নবীন! আমাদের দেশে সত্যিকারের বড়  
মানুষদের পেচোনেও আমরা খেঁচি পাকাই, গুণের  
সমসির করি না। নইলে হলো, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে  
পাবলিক রিসেপশান দেওয়া উচিত ছিল না কি?  
তুমি একটা ব্যবস্থা করো না।

নবীনকুমার একটুক্ষণ ভেবে বললো, উনি কি  
এ সব ভোয়াটা করেন? কে বলতে যাবে ওকে।  
যদি উনি ধমকে উঠেন? আমি বলি কী, যে নতুন  
জ্যোতিষের উদয় হয়েছে আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে,  
তাকেই প্রথমে সম্বর্ধনা জানানো যাক। আগেকার  
দিনে রাজা-বাদশারা কবিদের শিরোপা দিতেন। এখন  
রাজা থাকেন বিভূতে। আমাদেরই সে দায়িত্ব লওয়া  
কর্তব্য।

নবীনকুমার পারের উল্লস জল গড়াতে দেয়  
না। পরের সপ্তাহেই ব্যবস্থা হলো সম্বর্ধনার। এই  
সম্বর্ধনা দেওয়া হবে সিংহবাড়ির বিদ্যোৎসাহিনী  
সভার পক্ষ থেকে। কার্ড ছাপিয়ে বিতরণ করা  
হলো শহরের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে।  
কাপারটি সঁতাই অভিনব, কলকাতা শহরের পত্তনের  
পর এ পর্যন্ত কোনো কবিও এমনভাবে প্রকাশ্য  
অভিনন্দন জানানো হয়নি। শব্দ, মানপত্র নয়,  
কবিকে একটি উপহারও দেওয়া হবে। উপহারের  
চলটি নবীনকুমারই ঠিক করলো। সরা-প্রমিক  
কবিকে দেওয়া হবে একটি দৌপা নির্মিত পানপাত্র।

গণ্যনারায়ণ গিয়ে সম্মতি নিয়ে এসেছিল  
মধুসূদনের। নির্দিষ্ট দিনে মধুসূদন সবেগে  
তৈরি, সংগে যাবে গৌরদাস এবং একজন মাইনেকরা  
পশ্চিম। গৌরদাসের অনুরোধেও মধুসূদন দেশীর  
পোশাক পরিধান করতে রাজি হলেন না। কিন্তু  
যাবার আগে মনের জোর আনার জন্য মধুসূদন  
গ্যান্ডির বোতল খুলে খেই গলার ঢালতে বাবেন,  
তখন গৌরদাস চেষ্টা করলেন তার হাত। অনন্য  
করে বললেন, শ্রী মধু, অন্তত আজ থাক।  
ওখানে পচিজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসবেন, তোর শব্দ  
থেকে কিছু শুনতে চাইবেন—

বোতলটি নামিয়ে রেখে মধুসূদন বললেন,  
থাক, আজ আর নিজের পরসার কেন খাই। ওরা  
নিশ্চয়ই সার্ব করবে? বড় মানবের বাড়ির ব্যাপার,  
আশা করি ওরা বেশ কৌশলটিই দেখে।

গৌরদাস বললেন, মনে হয় না। যতদূর জানি,  
ও-বাড়িতে স্ক্রাক্স-এর চল নেই।

—কী বলি? সভা খুলেচে, ইংলিশ কায়দার  
রিসেপশান দিচ্ছে, আর ওয়াইন সার্ব করবে না?  
বিদ্যোৎসাহিনী সভা তো শুনচি আসলে মধো-  
সাহিনী সভা!

—তুমি ভুল শুনচিস মধু!  
—ভবে আর বাই কেন? হোয়াই বসায়।  
মিচিমিচি গণ্ডাখানেক লোকের বকবকানি শুনতে  
যাই কেন?  
—তুমি কী বলচিস, এত বড় সম্মান! চল,

প্রাঙ্গণ, কাপারটা সেয়ে এসে বাড়ি ফিরে তুমি যত  
শুশী ডিক করিস।

ঘোড়ারগাড়ি মাঝরাস্তা পর্বত আনার পর  
আবার ছটকটিয়ে উঠলেন মধুসূদন। গৌরকে  
তিরস্কার করে বললেন, তুমি কী কল্লি বল তো?  
আমার গলা শব্দে আসচে। ওরা কি ডারাস তৈরি  
করে তার ওপর আমার বসাবে? ওরে বাপ রে বাপ!

গৌরদাস বললেন, বেশীক্ষণ লাগবে না। তোর  
লেকচারটা শেষ হলোই তুমি বাড়ি চলে আসবি।

—হোয়াট? লেকচার? কে দেবে লেকচার?  
তোর মাতা খায়াস?

—বাঃ, ওদের সম্বর্ধনার উত্তরে তোকে দ-  
চার কথা বলতে হবে না? সেটাই তো ভগ্নতা!

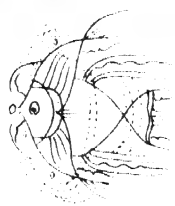
—তোরা আমার ঘরে ফেলতে চাস। আমি  
দেখো বেগালিতে লেকচার? শুনই আমার নারা  
গা কপচে। ওরে বাপ রে বাপ, আমি যাবো না,  
আমি পালাবো—

পশ্চিমতট হো হো করে হেসে উঠলেন।  
মধুসূদন চক্ গরম করে তার দিকে ফিরে বললেন,  
তুমি হাসচো কেন, পশ্চিম? ভাবচো, আমি প্রহসন  
কচ্চি? আমি বেগালিতে লেকচার দেবো? নেভার।  
পশ্চিমতট বললেন, বলেন কি মশাই, হাসবো  
না? বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি বিনি, তিনি বাংলা  
বক্তৃতা করতে ভয়ে কপিছেন, এতে হাসি পাবে  
না?

এবার গৌরদাসও হেসে উঠলেন সশব্দে।  
অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে কিন্তু মধুসূদনের  
সব কিছুই বেশ পছন্দ হতে লাগলো। বিদ্যোৎসাহী  
সভার সভ্যদের উৎসাহ-উদ্দীপন শব্দই অস্বাভাবিক।  
বিশিষ্ট ভগ্নমন্ডলী উৎসাহের সংগে চোরে আছেন  
তার দিকে। আবেগকম্পিত কণ্ঠে নবীনকুমার পাঠ  
করলেন মানপত্র। সেই আবেগের স্পর্শ লাগলো  
মধুসূদনের কণ্ঠে, উত্তর দেবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে  
বিশিষ্ট ভগ্নমন্ডলী বলতে লাগলেন তিনি।  
অবশ্য একটুখানি বজার পরই তার হাঁটু, স্বয়ং কম্পিত  
হতে লাগলো। হঠাৎ একটুখানি থেমে তিনি বললেন,  
আমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণতাবিহীন... কৃতজ্ঞতা  
প্রকাশে নিতান্ত অক্ষম... তারপরই বসে  
পড়লেন। তাতেই বিপুল হর্ষধ্বনি ও করতালধ্বনি  
হলো। এরপর অভিনেতা কেশব গাঙ্গুলি পাঠ  
করলেন মেঘনাধবধের নির্বাচিত অংশ। মধুসূদন  
বেশ নির্বিকারিত শব্দে লাগলেন তার আর বাড়ি  
ফেরার তাকা দেখা গেল না।

ফেরার পথে ঘোড়ারগাড়িতেও গৌরদাসের  
সংগে মধুসূদন আলোচনা করতে লাগলেন সভ্যটির  
সাধকতা সম্পর্কে। নবীনকুমারকে বেশ পছন্দ  
হয়েছে মধুসূদনের। ঐ অল্পবয়সী ছোটটি  
শহরের সমস্ত খ্যাতিমান ব্যক্তিগণই তার পেরেছে  
এই সভার, এটা কম কথা নয়। গৌরদাস বললেন,  
গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র হরিশ মধুজোকেই  
দেখলুম না। তিনি বোধ হয় অন্য কর্মে ব্যস্ত—।

মধুসূদন ললট কুণ্ডিত করে বললেন, আর  
একজনকে দেকিনি। অথচ দেকবো বলে একসপেকট  
করিচিলুম। তোমাদের ঐ বিদ্যাসাগর। তিনি এলেন  
না কেন? তার বৃষ্টি খুব অহংকার! ইচ্ছা ইউ মিট  
হিম, ওকে বলে দিও, ঐ সব অহংকারী পশ্চিমতটদের  
মাইকেল এম এস ডাট গ্রাহ্য করে না। (ক্লমশ)



# আই ব্যাংক ও তার সমস্যা

ভোরের আলো তখনও ছুটে ওঠেনি। চোরগাী এলাকার মেয়েটি সিনেমার সামনের ফুটপাথে দু'একজন ভিখারী দাঁড়িয়ে। খোল বছরের চেতন লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যায় বাসস্টপের দিকে। এটা ওর কলেজ জীবনের দ্বিতীয় দিন। হঠাৎ ঘাড় খরিয়েই বাসটিকে দেখতে পেয়ে ছুটেতে শুরুর করে চেতন। পা ফসকে পড়ে যায় ও মাটিতে। ঘোড়লা বাসের বিশাল চাকাটা ওর শরীর দুমড়ে বেরিয়ে যায় নির্বিচারে। রক্তমাখা নিষ্পাপ দেহটা পড়ে থাকে সদাস্নাত পিচের রাস্তায়। প্রাণচঞ্চল কলকাতার ধুম ভাঙছে তখন সবে।

ঠিক গেসেবনের বাসের জানালা থেকে চেতনের বন্ধু মিউরে ওঠে ওর নিখর নিষ্পন্ন দেহটিকে দেখে। ছুটে নেমে আসে। রাতের শেষ প্রহরের পেটলিং পুলিশ জানানি থমকে দাঁড়ায় চেতনের কাছে।



করনিয়া গ্রাফটিং করে ইনি আবার ফিরে পেতে পারেন পৃথিবীর আলো।

এস এস কে এম হাসপাতালের এমারজেন্সিতে যখন ডাক্তাররা চেতনকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন, তখন খবর পৌঁছে গেছে উত্তর কলকাতার লেখাী পত্রিকাল। রামনীকলাল একমাত্র ছেলের মৃত্যুর দিকে তারিকের চোখের জল ফেলেন না এতটুকু। ঠাণ্ডা মাথায় ঠাণ্ড বড় ভাইকে ডেকে বললেন, দেরি করো না। ফোন করা একটুনি আই ব্যাংককে।

কলকাতা মেডিকেল কলেজ আই ব্যাংক থেকে এলেন ডাক্তার। মুছে ছিলেন চেতনের চোখের চার-পাশটা স্পিরিট দিয়ে। মিনিট দশেকের মধ্যে চোখ দুটো তুলে রাখা হল আলোদাতবে ছোট ছোট দুটো ক্লাসকে। বরফের মধ্যে। চেতনের চোখের পাতা দুটো এমনভাবে কালো সিল্ক দিয়ে সেলাই করা হলো যেন মনে হাচ্ছিল ও চিরনিদ্রায় মগ্ন। ছিল না কোথাও এতটুকু বিকৃতি।

ওদিকে মেডিকেল কলেজ অপারেশন থিয়েটারে শুরুর হয়ে গেছে কর্মবাস্তবতা। ছোটো ছোট করছেন নারসরা কেরাটোমাসটি সেট রোড করতে। ডিপ ক্রীজে রাখা হল ক্লাসক দুটি। ১৯৭১-র ২৫শে সেপ্টেম্বর চেতনের দেহ যখন মহাপ্রস্থানের পথে যমশানের দিকে তখন কলকাতারই বকে তারই বরগাী দুটি অন্ধ ছেলে মেয়ে ফিরে পেল তাদের দৃষ্টিশক্তি। চেতনের চোখের স্বচ্ছ করনিয়া দুটো তুলে ডাক্তাররা লাগিয়ে দিলেন তা' ওই অন্ধ দুজনের চোখে।

সার্থক চেতনের জন্ম। মরেও চেতন অমর। কিন্তু এ দৃষ্টান্ত বিরল। ভারতবর্ষে যেখানে ৯৫ লক্ষ অন্ধ লোকের মধ্যে প্রায় কুড়ি লক্ষ লোক করনিয়ার অস্বচ্ছতার ভুগছেন (অর্থাৎ এরা সকলেই করনিয়া গ্রাফটিং অপারেশনের কল্যাণে ফিরে পেতে পারেন আবার পৃথিবীর আলো) সেখানে আই ব্যাংকগুলির ডিপ ক্রীজগুলো প্রায়শই ফাঁকা পড়ে

থাকে। অথচ দেশের নানান প্রান্তে শহরে গাঁয়ে গড়ে মানুষ মারা যাচ্ছেন প্রতিদিন অসংখ্য। কলকাতা মেডিকেল কলেজের পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, গতবছর এখানে করনিয়া গ্রাফটিং হয়েছে ৪০টি। ১৯৮৮ সালে আই ব্যাংকে জমা পড়ে মাত্র দুটি চোখ এবং শুরুরতে '৮৫ সালে একটিও নয়। বদিও পনের বছরের মাঝখানে সংখ্যাটা হ্রাস বর্ধিত, তবুও প্রয়োজনের তুলনায় তা বহুলাংশে।

অশিক্ষিত বা বীরা একদম গায়ের লোক তাঁদের কথা ছেড়েই দিলাম, এমনকি শিক্ষিতরা যারা জানেন আলো পেয়েছেন তারা চোখদান সম্পর্কে অবহিত থেকেও নীরব। কিন্তু কেন এই অবস্থা? কুসংস্কার? প্রিয়জনের প্রতি অশ্ব আবেগসম্মত ভালোবাসা? অজ্ঞতা? অথবা প্রচারের অভাব? করিগটা খাঁতের দেখার আগে আসুন দেখা যাক আই ব্যাংক কাকে বলে: কিই বা তার উদ্দেশ্য। আর সেই সঙ্গে জানা



যাক করনিয়া গ্রাফটিং অপারেশনই বা কি।

চোখের সামনে প্রায় হুভাগের একভাগ রক্তমাখা জুড়ে যে স্বচ্ছ কাঁচের মত অংশটি রয়েছে তার নাম করনিয়া। আলোকরাশি এই করনিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রতিসৃত হয়ে থাকে। যার চোখের মধ্যে ছোট ছোট লেন্স বা মাইগ্রে। তারপর এই আলো এসে কেন্দ্রীভূত হয় একদম চোখের ভিতরে সংবেদনশীল রোঁটিনায়। রোঁটিনা থেকে নাভ'ভন্দুর মাধ্যমে বাত' পৌঁছে যায় সোজা মস্তিষ্কে। মাথার ঠিক পিছনে। এর নীট ফল: আমরা দেখতে পাই। চোখের এইসব নানান মিডিয়া বা মাধ্যম যদি স্বচ্ছ থাকে আর সেই সঙ্গে নাভ'ভন্দুর সঠিকভাবে বাত'বহন করে নিয়ে যায় তবেই আমাদের দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক থাকে আর এর ফেরফের মানেই হল স্বাধীন দৃষ্টি বা অন্ধত্ব।

আমাদের দেশে অন্ধদের প্রায় শতকরা কুড়ি ভাগ হল অস্বচ্ছ করনিয়াজনিত। করনিয়া অস্বচ্ছ থাকায় আলোকরাশি বাধা পায়, প্রবেশ করতে পারে না ভিতরে। কেন এই করনিয়া স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলে? চোখে আঘাত, অপদৃষ্টিজনিত কেরাটে-ম্যালোমিয়া, ট্রাকোমা, স্মল পক্স বা বসন্ত-এই সমস্ত নানান কারণে সাধা হয়ে যেতে পারে করনিয়া। মনে করুন ধান কাটছেন কেউ ক্ষেতে। হঠাৎ চোখে এসে ঠিকরে পড়ল ধারালো ধানের শিখ। অথবা করখানায় কাজ করতে গিয়ে দু'এক ফোঁটা আঁশিড বা ওই জাতীয় কোন তরল এসে ছিটকে পড়ল চোখে। বা দেওয়ালিতে পটুকা ফটাতে গিয়ে আঁশের ফুলকি এসে ঢুকল চোখে। এ ধরনের আঘাত করনিয়া সাদা হয়ে যেতে সময় লাগে না বেশিদিন। আর বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার দূষণে শিশুদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আঘাতজনিত অন্ধত্বের সংখ্যাও বেড়েছে ভীষণভাবে।

অভাব। এর ফলে করনিয়ার যে পারবর্তন হয় তাকে পরিভাষায় বলে কেরাটোম্যালোমিয়া। এটা সবচেয়ে বেশি হয় পাঁচ বছরের নীচে শিশুদের। এদের অনেকেই পেটের রোগ বা গ্যাসট্রোএন্টেরাইটিসে ভোগে। আর এটা প্রায়ই দেখা যায় কোন ব্যক্তার জারিয়ায় হলে মারেরা তাকে বালির জল, পাণ্ডা। দুধ বা নরম ভাত ওই জাতীয় কিছু খাবার জোর করে খাওয়ান। এটা চোখের পক্ষে মারাত্মক। দু'একদিন চোখ বুজে থাকে ব্যক্তি আর এর পরেই মারেরা যখন ব্যক্তার চোখ খোলাবার চেষ্টা করেন, তখন ইতিমধ্যে চোখের করনিয়া হয়ে গেছে সাদা। দেখা দিয়েছে অপদৃষ্টিজনিত রোগের ছাপ।

এছাড়া অস্বচ্ছ করনিয়ার অন্য দুটি কারণ হল ট্রাকোমা ও বসন্তরোগ। ট্রাকোমা দেখা দেয় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। ভীষণ ছোয়তে। বিশেষ করে চোখের জল। এক ধরনের মাছি এটা ছড়তে সাহায্য করে। বর্তমানে পৃথিবীর ৫০ কোটি লোক এ রোগে অক্রান্ত, আর এর দরুন অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন কুড়ি লাখ। ওয়ারলড হেলথ অর্গানাইজেশন অবশ্য সাবী করেছেন, স্মল পক্স মুছে গেছে পৃথিবী থেকে। তবে আমাদের দেশে অন্ধদের এক বিরাট অংশ বসন্তের শিকার হয়ে আজও দিন গুনছেন অন্ধকারে।

করনিয়া গ্রাফটিং বা সংস্থাপন নতুন নয়। এর ইতিহাস অনেক পুরোনো। অস্বচ্ছ করনিয়াকে পালটে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনার পথিকল্পনা প্রথম মাথায় আসে জাপানের দা কুইংসিও। ১৮৭১ সালে। তাঁর বললেন, সাধা করনিয়াটিকে কেটে একটা কাঁচের ডিস্ক সূতো দিয়ে চোখের সামনে জুড়ে দিলে কেমন হয়? আর এই সঙ্গে কুইংসিও এও বললেন, অপারেশনের জন্য বেছে নেওয়া হোক একটা পরিষ্কার স্পন্দর শচিশত্ৰ দিন। রোগীকে লম্বালম্বি শোয়ানো হোক একটা টেবিলে। (তখনকার দিনে চোখের অপারেশন করা হত রোগীদের বসিয়ে।) আর অপারেশনের পর আটদিন টানটান শাইয়ে রাখা হোক রোগীকে যাতে কিনা ক'চের ডিস্কটা মাটিতে পড়ে না যার মাঝাক্ষরে। কিন্তু কুইংসিও এ প্রচেষ্টা সফল হরনি।

১৮৭৭ সালে ডাবলিনে প্রকাশিত একটি বইয়ে সামুয়েল বিয়ার জানালেন, যখন তিনি মিশরে বন্দী ছিলেন তখন একটি পোষা হরিণের চোখে করনিয়া পাটে তিনি সফল হয়েছেন। এর ঠিক পরের বছর রিচার্ড কিসাম হুম্বাসের একটি শুরুরের চোখ থেকে স্বচ্ছ করনিয়া তুলে লাগিয়ে দিলেন একজন অন্ধ আইরিশম্যানের চোখে। জম্মলোকের নাম জেমস ডান। নতুন গ্রাফটের মধ্যে দিয়ে জেমস দেখাছিলেন ভালোই। কিন্তু এটি টিকোঁছিল মাত্র একমাস। গ্রাফটি সাদা হয়ে যায় পরে। এরপর ভন হিপপেল, যুক্স সবাই করনিয়া গ্রাফটিং নিয়ে পরীক্ষা চালান ব্যাপকভাবে।

তবে কোন মানুষের দেহ থেকে করনিয়া তুলে অন্য কোন মানুষের চোখে সংস্থাপনে যিনি প্রথম সফল হলেন তিনি হলেন জারম (Zimm)। ১৯০৫ সালের ওলমউটের একটি ছোট শহরে এট ঐতিহাসিক অপারেশন হয়। আর এতে চোখ দান করোঁছিল একটি ছোট ছেলে।

এরপর পৃথিবীর নানান প্রান্তে গবেষণা শুরুর করলেন বিজ্ঞানীরা। ভারতে লালেন কিভাবে মৃতদেহের চোখ তুলে সংরক্ষণ করা যায় যাতে কিনা ঠিক প্রয়োজনের সময় সারজন সেই চোখের করনিয়া তুলে কোন অন্ধলোকের চোখে গ্রাফট করতে পারবেন। এলো আই ব্যাংকের পরিকল্পনা। আই ব্যাংক প্রথম চালু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। ১৯৪৫ সালে। নিউ ইয়র্ক শহরে। শুরুর করলেন পান্টন। এমনভাবে গড়ে উঠল একের পর এক বর্জিত দেশের আই কোংগ্রেস। ভারতবর্ষে আগন্তত প্রায় ৫০টি আই ব্যাংক রয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিম বাংলার দুটি। কলকাতা মেডিকেল কলেজ আই ব্যাংক ও নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে অতুলবজ্র আই ব্যাংক।

# রবীন্দ্র সংগীতের নতুন রেকর্ড

চিরপরিচিত শ্রেষ্ঠ  
শিল্পীদের পরিবেশনায়  
এবারের রবীন্দ্র সঙ্গীতের  
প্রতিটি রেকর্ডই হয়ে  
উঠেছে অসামান্য ও  
অতি উপভোগ্য। এই  
রেকর্ডগুলি এখন  
এইচ এম ডি ডিলারের  
দোকানে পাওয়া  
যাচ্ছে। আজই সময়  
করে চলে আসুন।

## ই পি

সংঘমিত্রা ওঙ্ক

S/7EPE 3298 (Stereo)

এ ভারতের রাশো নিতা

হৃদয়-নন্দনবনে

খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি

ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো

জর্জ সেন

S/7EPE 3297 (Stereo)

পদপ্রান্তে রাখা' সেবক

হার মানালে গো

ওগো সুন্দর, একদা কী জমি

বিজয়া চৌধুরী

S/7EPE 3299 (Stereo)

তুমি এবার আমায় লহো হে নাথ

আঁখিজল মুছাইলে, ভননী

তিমিরময় মিবিড় নিশা

আধেক ঘুমে নয়ন চুমে

## এল পি ৪৫

সাগর সেন

S/45 NLP 2025 (Stereo)

জীবনে আমার যত আনন্দ

আজি নাহি নাহি নিদ্রা

তোমার ছায়ে কেন আসি

ওই বালুয়ার ব্যঙ্গরে

আমি কী গান গাব যে

আমায় থাকতে দে-না

ওই কে আমায় ফিরে ডাকে

তারে দেখাতে পারি নে কেন

চিন্ময় চ্যাটার্জি

S 45 NLP 2027 (Stereo)

কাজে ছিলে দূরে গেলে

নিশী না পোহাতে জীবন-প্রদীপ

কে দিল আবার আঘাত

অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে

আমার খেলা যখন ছিল

পাঠখানা যায় যদি যাক

আমার সুরে লাগে তোমার হাসি

সেই তো আমি চাই

হিজেন মুখার্জি

S 45 NLP 2026 (Stereo)

চিরবন্ধ, চিরমিষ্টর

ওই আসন তুলে মাটির 'পরে

যিনি সকল কাজের কাজী

তুমি কেমন করে গান কর

কোন সে ঝড়ের ডুল

এ পারে মুখর হল কেঁকা ওই

ওই জানালার কাছে

চৈতন্যবনে মম চিত্তবনে

রজত নন্দী ও দিলীপ রায়

S/45 NLP 2028 (Stereo)

গীটার ও বেহালায়

রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর

সংগচ্ছন্দঃ—(প্রচলিত)—রজত নন্দী

(গীটার) ও দিলীপ রায় (বেহালা)

আমার সকল রসের ধারা—

রজত নন্দী (গীটার)

তোমার হলো ওঙ্ক, আমার হল

সারা—দিলীপ রায় (বেহালা)

না চাছিলে যারে পাওয়া যায়—

রজত নন্দী (গীটার)

ডেকে না আমারে ডেকে না—

দিলীপ রায় (বেহালা)

যেপে আমার মনে হলো—

রজত নন্দী (গীটার)

মনে হবে কি না হবে আমারে—

দিলীপ রায় (বেহালা)

হে নৃতন, দেখা দিক আর-বার—

রজত নন্দী (গীটার) ও

দিলীপ রায় (বেহালা)

## সপার স্টেডেন

সুমিত্রা সেন

S/SLDE 116 (Stereo)

মেঘ বলেছে 'যাব যাব'

তুমি যত ভার দিয়েছ

মধুর মধুর ধ্বনি বাজে

অনেক দিনের মনের মানুষ

সখী, ওই ব্যুধি বাঁশি বাজে

আজি ঝড়ের রাতে

## এল পি

হেমন্ত মুখার্জি

"সুদূরের পিয়াসী"

S/33ESX 4266 (Stereo)

বাদল-দিনের প্রথম

মনে হলো যেন পরিয়ে এলেম

গোধূলিগগনে

দিয়ে গেলে বসন্তের এই গানখানি

চিনিলে না আমারে কি

আমি তোমার সঙ্গে

এমনি ক'রেই যায় যদি দিন

আমি চকল হে

দিনগুলি যোর সোনার খাঁচায়

তোমার আমার এই বিরহের

লহো লহো, তুলি লও হে

সজ্জা হল, গো, ও মা

কপিকা বন্যোপাধ্যায়

"কণ্ঠে নিলেম গান"

ECSD 2607 (Stereo)

মরি মৌ মরি, আমার বাঁশিতে

রোদনভরা এ বসন্ত

আমি সকল নিয়ে বসে আছি  
মাটির বৃকের মাঝে  
বনে যদি ফুটল কুসুম  
ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল  
ও যে মানে না মানা

দিনশেষের রাঙা মুকুল  
আমার শেষ পারানির কড়ি  
বড়ো বিস্ময় লাগে  
বাদল-মেঘে মাদল বাজে  
না গো এই-যে ধূলা আমার  
আমি মারের সাগর পাড়ি দেব  
দূরে কোথায় দূরে দে

আশা ভৌসলে  
"বড় আশা ক'রে এসেছি গো"  
ECSD 2606 (Stereo)  
জগতে আনন্দযুক্ত আমার  
তোমারি ঝনাতলার নিজনে  
আমার বেলা যে যায়  
চক্রে আমার তুফা ওগো  
এসো শ্যামলসুন্দর  
বড় আশা করে এসেছি গো

সহে না যাতনা  
তুমি কোন কাননের ফুল  
সপে আমার মনে হল  
আমার মন মানে না  
কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন  
ডেকে না আমারে, ডেকে না

সুচিতা মিত্র  
"নতন প্রাণ লাও"  
ECSD 2604 (Stereo)  
নতন প্রাণ লাও, প্রাণসখা  
যেথায় থাকে সবার অধম  
নমি, নমি চরণে  
আমার আঁধার ভালো  
জাগিত হবে রে  
কে গো অন্তরতর সে  
না রে, না রে, হবে না তো  
আমার যাবার এলাতে

বুড়ির বাঁশি বাজল যে ওই  
আজ তুলেব বনের করতালি  
মম মন-উপবনে  
তোমার নাম জ্ঞানি নে  
রও লাগলে বনে বনে কে  
আমায় দোষী করো  
গোপনপ্রাণে একলা মানুষ  
ওরে ভাই, মিথো ভেবো না

প্রতি রবিবার  
রাত ৯ টা ৪৫ মিনিটে  
কলকাতা বিবিধ ভারতী কেন্দ্রে  
'এইচ-এম-ডি সঙ্গীতজলি'  
অনুষ্ঠান গুনুন।



হিজ মাস্টার্স ভয়েস  
উচ্চল ডবিস্বাতের প্রতিশ্রুতি

প্রথমটি শূন্য হ'ল ১৯৬৫ সালে ৩ বিশ্ববিদ্যুতি  
১৯৭৫-এ

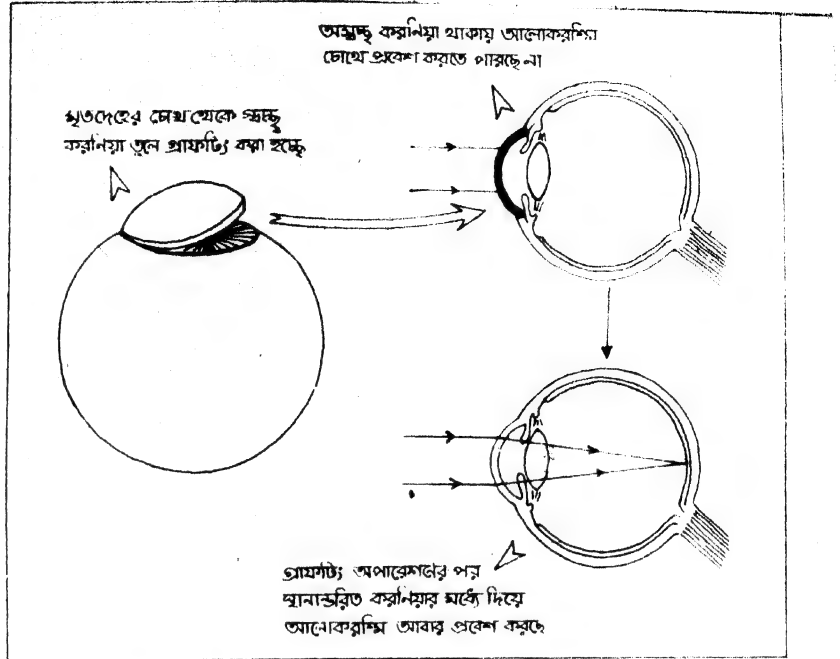
একটা কথা। বাটের দশকে সাক্ষ্য আফরিকার  
ক্রিয়াকর্মী বাল্লভেন্ডে বন্দন প্রথম হুমবন্দ  
সম্মানন করেন কোন এক ছদ্মরোগীর ব্যকে,  
তখন তারা বিশ্বের আলোড়ন উঠলেও উৎসাহে ভীতি  
পড়ে কর্মকর্তাদের মধ্যেই। কেননা রোগীরা কেউ  
বঁচলেন না বেশিদিন। মৃতদেহের হুমবন্দ নতুন  
শরীরে প্রবেশ করায়ই গ্রাহকের স্বাভাবিক প্রতিরোধ  
শক্তি বা ইমিউনিটির ফলে তা পরিভ্রান্ত হতে থাকল।  
যাকে বিজ্ঞানীরা বলেন 'রিজেকশন'। এই  
রিজেকশনের সমস্যাটা আজকের বিজ্ঞানীদের ভাবের  
তুলেছে খুব বেশিভাবে, ঠিক এমনভাবে ভাবের  
তুলেছে অপ্রতিরোধ্য ক্যান্সার রোগের সমস্যা। তবে  
তুলনামূলকভাবে করিনিয়া গ্রাফটিং সোজা। রিজেক-  
শনের সমস্যা অনেক কম। এর কারণ হল করিনিয়া  
শরীরের এমন একটি অংশ যেখানে রক্তনালীরা এসে  
পৌঁছাননি। ফলে শরীরের প্রতিরোধকারী কোষগুলির  
কাছে করিনিয়ার স্থান মূল্যহীন। এটা খুব আশার কথা।

ঠিক এই জন্যই আই ব্যাংকগুলি ব্যাপকভাবে  
গড়ে উঠেছিল। এদের কাজ হল মৃতদেহের চোখ  
নগ্নে করা, তার সংরক্ষণ আর উপযুক্ত অধ্যয়নীদের  
সেই চোখ দান। মনে করুন আপনি স্বচ্ছতার চোখ  
দিতে চান। সোজা খবর দিন আই ব্যাংককে। নাম  
রেজিস্ট্রী করান ওখানে। ঠোঁট আপনাকে দেবেন  
একটা পকেট কার্ড যা আপনি আপনার কাছে রাখুন  
সবসময়। কার্ডের একপাশে লেখা : দয়া করে  
মৃত্যুর পর ফোন করুন আই ব্যাংককে। আর হ্যাঁ,  
এ সম্পর্কে জানিয়ে রাখুন আপনার কাছের  
লোকদেরও। যদি আপনার আত্মীয়রা মৃত্যুর দু'খতীর  
মধ্যে আই ব্যাংককে খবর পাঠান তবে আই ব্যাংকের  
ডাক্তার এসে মিনিট মশেকের ছোট অপারেশন করে  
চোখ দুটি তুলে নিয়ে যাবেন। যে কেউ করণিরা  
দিতে চান। অবশ্য স্বচ্ছ থাকে চাই সেই করণিরা।  
চোখগুলি রাখা হবে ডিপ ফ্রীজে ঠান্ডার মধ্যে।  
আর হাসপাতালে যে সমস্ত অর্থ রোগীরা ভর্তি  
হয়ে অপেক্ষা করছেন অপারেশনের জন্যে, তাদের  
দুঃখের চোখে এক এক করে গ্রাফট করা হবে  
করিনিয়া দুটো।

এ বছরের গত এপ্রিল মাস পর্যন্ত কলকাতা  
মেডিকেল কলেজ আই ব্যাংক এমনি পকেট কার্ড  
করিয়েছেন ১৬৬৬ জন। ঠোঁট সবাই চক্ষুসানের  
অপারেশন করেছেন। ওঁদেরই একজন হলেন আর পি  
লাথানী। বয়স ৬৬। ব্যাক ব্রাশ করা সাধা চুল।  
চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা। থাকেন কিছু লম্বা  
স্ট্রীট এলাকার এক ছোট ছাউনে একলা। রিটারার  
করে এখন বেকার ভরেনার আর পরম্পর সম্পর্ক  
নানান ইয়ের পাড়ায় ভুবে থাকে। হঠাৎ চোখদানের  
কথা ভাবলেন কিভাবে, প্রশ্ন রেখেছিল। কলকাতা,  
স্টেটসম্যানের 'পারসনাল কলাম'-এ জাকোটা পুঁজি  
আর ইকোনা কোটিং-এর বিজ্ঞাপনের ফাঁকে একদিন  
দেখলাম আই ব্যাংকের কথা। ভাবলাম আচ্ছা ত'  
অবিশ্বাস্য। যদি মৃত্যুর পর এ দেহ কারো কাছে  
লাগে মশ কি?

এজন্যে সব পাকাপাকি করে রেখেছেন লাথানী।  
জ্বরার খুলে 'কম থেকে বের করে দেখালেন টাইপ  
করা চিঠি যাতে বড় বড় করে লেখা আছে মৃত্যুর পর  
আই ব্যাংককে ফোন করা ছাড়া আরও অনেক  
একান্ত কথা। 'আমার প্রাণকাসের স্নানপের প্রবেশ  
নিষেধ: ইত্যাদি। এর ধূটো কপিও পাঠিয়ে দিয়েছেন  
উনি ছেলে আর মেয়ের কাছে।

এমনি অপারেশন করেছেন বিখ্যাত এক ফার্মের  
মুদ্রারী রিসেলার্সিস্ট অজলি মুখার্জি। দুই ছেলের  
মা। বয়স চল্লিশ। উনি অবশ্য আই ব্যাংক সম্বন্ধে  
প্রথম জেনেছিলেন টাইম' মাগাজিনের পাতা  
উল্টোতে উল্টোতে। তারপর অনেকটা নিজের  
উৎসাহেই ফোঁড় নিয়ে ফার্স্ট করিয়েছেন। অজলি  
হয়ত আজ কলকাতা চোখ দান করবেন, কিন্তু মৃত্যুর  
সময় ছেলে এতে আপত্তি করবে না ত? মাথা নেড়ে



#### করিনিয়া গ্রাফটিং অপারেশন

উত্তর দিকের ছোট ছেলে একেবারেই নয়।

ফাদার জন একেবারেই বললেন, চোখ দান  
করা মানবসেবার এক বড় সুযোগ। কলকাতার  
বাসিন্দা উনি। পরিষ্কার বাংলা বললেন। বেলজিয়াম  
ওঁরা আছেন বৈতে। ওখানকার মেডিকেল  
কলেজকে ওঁর পুরো শরীরটাই দান করেছেন।  
মৃত্যুর পর ব্যক্তিদের জন্য। একেবারেই জানাছেন,  
ওঁদের প্রাণের পাথ ফাদার জুলিয়েন হেনরী মৃত্যুর  
সময় চোখ দান করে গেছেন। তালতলার বাঙালী  
শ্রীমতীরা ওঁকে গুরু বলে মানতেন। হেনরী  
ওঁদের অনুপ্রাণিত করেছেন।

কিন্তু হুড়ি লাখ অর্থ রোগীর তুলনায়  
উপসাহী দাতার সংখ্যা নেহাতই কম। কেন সকলে  
এগিয়ে আসছেন না চক্ষুসানের এমন মহান কাজে?  
কথা হচ্ছিল কলকাতার রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ  
অপথ্যালমোলজির ডিরেক্টর ডাঃ আই এস রায়ের  
সঙ্গে। ওঁর কথায়, কুসংস্কার এখনও মানুষের মনে  
বাসা বেঁধে আছে প্রবলভাবে। অনেকের মনে করেন  
মৃত্যুর সময় চোখ অপসারণ করলে হৃদয় পরজন্মে  
অর্থ হয়ে রক্ষাভুক্ত হবে। কিন্তু সত্যিই কি তাই?  
তাহলে প্রতিদিন ত' কত লোক মায়া বাচ্ছেন বাঁদের  
একটাও দাঁত নেই কিংবা নেই কোন টনসিল?

ডাঃ রায়ের মতে, আমাদের নেতারা ত' এ  
ব্যাপারে দুঃশীল রাখতে পারেন। কোন কিম্বদন্তি বা  
নব্বী খেলোয়াড় বা সাহিত্যিক যদি চোখ দান করলে  
করে নিচুর আরও অনেকে এগিয়ে আসবেন। আর  
সবচেয়ে এ বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন  
ধর্মীয় গুরুরা। কলকাতার বাঁরা এ পর্যন্ত চোখদান  
করেছেন তাঁদের বেশির ভাগই হলেন জৈন কিংবা  
পারস্যী। ওঁদের ধর্মীয় নেতারা শিবদের প্রতীকিত  
করতে পেরেছেন খুব বেশি করে।

ধর্মীয় নেতারা এ সম্বন্ধে কি ভাবছেন?  
কলকাতার বিশপ রোভারেন্ড জোসেফ অম্বানন্দকে  
প্রশ্ন করলে তারও বললেন, যদি বাঁদু, কৃষ্ণবিশ্ব হয়ে  
তাঁর নিজের শরীর উদ্বলন করতে পারেন, তবে  
আমরা কেন পারব না সামান্য চোখ দিতে? মৃত্যুর  
পরও যদি আমাদের শরীর কাছে লাগে তবে তা ত'  
সোভাগ্যের কথা।

তবে একটা কথা। অনেক প্রশ্ন তুলছেন, যদি

এমন একটা আইন পাশ করানো যায় যাতে আই  
ব্যাংকের ডাক্তাররা যে কোন মৃতদেহ থেকে চোখ  
সংগ্রহ করতে পারবেন। এর জন্যে শৃঙ্খমায় মৃত-  
বাহির অনুমোদন পেলেই চলবে। প্রয়োজন হবে  
না কোন আত্মীয়স্বজনের পরামর্শ। কেননা এরকম  
অনেক ঘটনা ঘটেছে যেখানে মৃত ব্যক্তি ইচ্ছে প্রকাশ  
করা সত্ত্বেও তাঁর নিকটজনরা মৃত্যুবর্তিত বা  
কুসংস্কারের জরে চোখ সংগ্রহে বাধা দিয়েছেন  
সমীচীনভাবে।

রোভারেন্ড জোসেফের এতে ঘোরতর আপত্তি।  
বললেন, জোর করে আইন করে কিছু করা সম্ভব  
নয়। এতে ফল হবে উল্টো। ব্যাক্তি অশান্তি।  
একমত ভারত সেবায়ম সংঘের স্বামী বিকাশানন্দও।  
ওঁর মতে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে চোখদানের ইচ্ছে না  
থাকলে কখনই আইন করে চোখ নেওয়া উচিত নয়।  
হিন্দুধর্মে চোখদানে কোন বিধিনিষেধ নেই। বরং  
গীতার কাছে—সন্ন্যাসিতের বরং ত্যাগো বিনাশে  
নির্যাত সত্যি।' বংকাজের জন্য ত্যাগ করাও ভালো,  
কেননা এ শরীর ত' নিশ্চিত নষ্ট হবেই। এই কারণেই  
আমাদের মনিষ্যবিশেষ মধ্যে 'জলসমাধি' প্রচলিত  
ছিল। মৃত্যুর পর জলের নীচে সমাধি দেওয়া হত।  
মহেশ্বর ও অন্যান্য প্রাণীরা তাঁদের শরীর খেয়ে নিত  
আপ্তে আপ্তে।

পারস্যীদের মধ্যে অনেকটা এইরকমই শেষকৃত্য  
প্রচলিত আছে। উচ্চ টাওয়ারের মাথার মৃতদেহকে  
জালের উপর শূঁয়ে রাখা হয়। শূন্যজাতীয় পাখিরা  
এসে তখন সেই দেহ খুঁটে খুঁটে খেয়ে যায়।  
নীচে পড়ে যায় দেহের হাড়গুলো। এর পিছনে হয়ত  
এই বিশ্বাস কাজ করছে যে মৃত্যুর পরেও যদি এই  
দেহ কারো গুরুজনে আসে তা সে যে কোন প্রাণী  
হোক না কেন তবে, তাতে পুণ্যই হয়। যদি হিন্দু বা  
শ্রীমতী ধর্ম ধর্মগতভাবে কোন বাধা না থাকে  
তবে তা এই দুই ধর্মের নেতারা এগিয়ে আসতে  
পারেন লোকের মনের অর্থ কুসংস্কার দূর করতে।  
আরো অনেকে চক্ষু দানে উৎসাহিত করতে।

তবে বোরতর আপত্তি এসেছে মুসলিম ধর্ম  
থেকে। প্রথমে অনেকটা অবাকই হয়েছিলেন মহম্মদ  
সাক্ষি করণিরা গ্রাফটিং-এর কথা শুনেন। উনি  
কলকাতার নাখোদা মসজিদের ইমাম। বললেন, জে



বুঝে নেই।' বৈ অম্ব হয়ে গেছে তার তার ত' নেনে, জন্ম, আমরা নই। বৈ অম্ব ভাকে ড' পাপের প্রারম্ভ করতই হবে। পবির কোরণে লেখা আছে মৃত বা জীবিত কাউকেই আঘাত করা পাপ।

ভাগ্যবান বাঁকুড়ার কোটালপুন্দের অনিল বাবো। দীর্ঘ কইশ বছর অম্বকার জগতে কাটরে ও আবার ফিরে এসেছে আলোর জগতে। মাত্র ঐক বছর বয়সে রক্ত আমোশার ভুগে অনিল অম্ব হয়ে যায়। ওর মূল্যজীবন কেটেছে নরেন্দ্রপুরে। পড়া-শুনো শিখেছে ব্রহ্মিল সিস্টেমে। এখন বহুল-প্রচারিত এক প্রসাধনী দ্রব্যের কারখানার প্যাকিং-এর কাজ করে। কিছু দিন হল ওর ডানচোখে করনিমা গ্রাফটিং হয়েছে।

অনিলের কাছে এ সেন নবজন্ম। 'এতদিন বা শুনিয়ে তা মিলেছে নিছক নিজের ধোঁকে'। অনিলের অনেক আশা পৃথিবীটাকে ও আবার দেখতে পাবে। ফিরে পাবে স্বাভাবিক জীবন।

এমনিভাবে ফিরে পেতে চায় পৃথিবীর আলো আরো লাখ লাখ অম্ব মানুষ। গরীব দেশে ভিক্ষের পথ নিয়েছে ওরা অনেকেরই। দেখতে পাবেন ওদেরকে মসজিদে, মন্দিরে সবুজ। এটা একটা দেশের পক্ষে ম্যানপাওয়ার বা কর্মশক্তির বিরাট অপচয়। অর্থ-নৈতিক ক্ষতি।

আই ব্যাংকে চোখ কেন জমা পড়ছে না? আগেই বলেছি আইন করে চোখসংগ্রহ সম্ভব নয়। বড়জোর এমন একটা কিছু করা যেতে পারে যাতে করে হাসপাতালে বেওয়ারিশ কোন মৃতদেহ-মৃত্যুর দুঃখটর মধ্যেও যার কোন দাবীদার নেই—তার থেকে চোখ নেওয়া সম্ভব হয়। বর্তমান করনিমাল গ্রাফটিং আর্ট (১৯৬৫) অনুসারে, যদি কোন ব্যক্তি লিখিতভাবে বা মৃত্যুর সময়ে সূচনা বা তারও বেশী সাক্ষীর উপস্থিতিতে মৌখিকভাবে মৃত্যুর পর তার চোখ চিকিৎসার প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য ইচ্ছে প্রকাশ করে থাকেন, তবে 'আইনগতভাবে' ওই প্রকার অধিকারী যিনি তিনি চোখ সংগ্রহের ব্যাপারে অনুমোদন করতে পারেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মৃতদেহের ইচ্ছে থাকে শুধুও লাখ সাধনের আত্মীয়রা। ওরা যদি কেউ খবর না দেন আই ব্যাংকে, তবে কিছই উপায় থাকছে না ডাক্তারদের।

আর প্রয়োজনের তুলনায় আই ব্যাংকের সংখ্যাও নগণ্য। ধরুন বর্ধমানে কোন সঙ্ঘের বাড়ি তার চোখদুটি হান করতে চান। খবরও পাঠানো হল আই ব্যাংকে; কিন্তু এটা কিছুতেই সম্ভব নয় কলকাতা থেকে গাড়ি ছুটেই বর্ধমানে। কেননা মৃত্যুর দুঃখটর মধ্যে চাই চোখদুটি। অনেক প্রত্যন্ত রেখেছেন রোনালা আই ব্যাংক তাঁর হোক। জেলায় জেলায় একটি করে। এতে সংগ্রহের ভাড়াতে জমা পড়বে অনেক বেশি চোখ। যত বেশি আই ব্যাংক হবে আর কর্মীসংখ্যা বাড়বে, তত জোরদার হবে এই সংগ্রহ। তবে সমস্ত আই ব্যাংকগুলি ধাকা উচিত একটা কেন্দ্রীয় সংস্থার তত্ত্বাবধানে। এতে কাজ এগোবে অনেক সুনির্দিষ্টভাবে। কানাডার এমনি-ভাবে গড়ে উঠেছে সারা দেশ জুড়ে কানাডীয়ান আই ব্যাংক। প্রতিটি প্রতিবেশে একটি করে।

এছাড়া চাই দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা। খবর পাওজন্যের কত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা' বল না ট্রেস্ট্রী হোক (বিশেষে স্কেনেও) চোখ সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকা চাই। কানাডার টরন্টো এলাকার যোগাযোগ ব্যাংকটি অভিনব। টরন্টো কিরক্যালয়ের অপর্যায়মোজি ফোরমের প্রথম বার্ষিক ছাত্রের টিনা তিন মাস আই ব্যাংকের কাজে নিযুক্ত থাকেন। তাঁর প্রতিটি ছাত্র বয়সের বয়স ফেলো স্ট্রিডও চালিত 'শেল কল' সিস্টেম আর 'ইন্টারকমিউনিকেশন সিস্টেম'। এই কলসে থাকে চোখ ডোলায় নগদন বস্তুপাত। পকেট কল-এ খবর পেয়েই ওরা ছুটে যান চোখ সংগ্রহে। আর ফিরে এসে তা জমা দেন আই ব্যাংকে। আবার নতুন একটি ক্লাপ

মের সাহায্যে ওরা প্রতীক্ষা করেন পরবর্তী কল-এর জন্য।

পশ্চিম বাংলার বে দুটি আই ব্যাংক আছে তাদের নিজস্ব কোন আম্ববলেনস নেই। তাই কলকাতার ভবি কেউ চোখ দিতে চান সেটাও সময়ে সময়ে দুঃখ হয়ে পড়ে। প্রথমত কলকাতার শোরগোলে খবর দিতে দেরি হয়। তারপর তা আছে কলকাতার টেলিফোন ক্রিডাট। আর টেলিফোনেও বা যদি পেলেন, পেতে দেরি হয় হাসপাতালের আম্ববলেনস। সারা হাসপাতালে গাড়ী চলছে হরত দুটো। ব্যাকসুলি ভাঙা নরত মেরামতে। এমনও তা হতে পারে ঠিক ঐ সময়ে আম্ববলেনস দুটো ছুটেছে কোন মরণাপন্ন কতি বা প্রসূতি মাকে হাসপাতালে আনতে। তাই গ্রীনলেশোর্ট চোখসংগ্রহের ব্যাপারে একটা কড় সমস্যা। তবে সবচেয়ে বেশি বেটা প্রয়োজন তা হল লোকের মনে গেড়ে বসা কুসংস্কারগুলো উপড়ে ফেলা। দুঃ কল্পত হবে অজ্ঞতা। চাই প্রচার। এ' ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা সবাই এগিয়ে আসুক।



ডল্লচোখে অজ্ঞানতার পর এই তরুণটি দেখেছে আবার পৃথিবীকে নতুন করে।

এগিয়ে আসুক বর্ধমেনডারা। যথেষ্ট আপত্তি না জনলেও ওরা কিন্তু কেউ কোন সুনির্দিষ্ট প্রচারের কর্মসূচী নেননি। দুঃখের কথা সরকারের ভূমিকাও এখানে সামান্য। যদি গ্যারান্টি প্যারি-এর কতী করে করে লস্ট হিন্দীসনের কীক কীক কখন পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে, তবে সেরা প্রচার করা যাবে না চোখদানের কথা?

এটা ত' ঠিক, লাল হিউজের চিহ্ন দেখে আজকাল বরুকে নিতে করো অসুবিধে হয় না ওটা কি বা কিসের প্রতীক। সরকার পরিবর্তন পরিকল্পনা প্রচারের জন্য হাতটা ব্যাড়া করেন তার একশ ভাগের একভাগও যদি চোখসংগ্রহের প্রচারে কম করেন, তবে সফল হওয়া ছাড়ে অনেকটা।

সম্প্রতি কলকাতার ইন্টারন্যাশনাল আই ব্যাংকের সূচনা হয়ে গেল আনুষ্ঠানিকভাবে। এটা খুব আশার কাজ বেসরকারীভাবে এমন একটি প্রচেষ্টা পরে হয়েছে। গত ৩০শে এপ্রিল এক আলম-সম্মান গ্রান্ড হোটেলের বলরুমে ডানসের আম্ববাসাদার আপ্পে রস প্রদীপ জ্বালিয়ে এর উদ্বোধন করলেন।

সংগত ভাষায় সভাপতিত্ব অলোকজুমার সরকার

কলেন। বিশেষ দেহের কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হান করাকে এক বিরাট সমাজসেবা হিসেবে গণ্য করা হয়। আম্বদের দেশে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার চোখদানে আইও এক বিরাট প্রতিবন্ধক। তার আশা, ইন্টারন্যাশনাল আই ব্যাংক এই কুসংস্কার দূরীকরণে সফল হবে।

প্রধান অতিথি রাজাপাল, হিউজ নায়রথ সিং কলেন, এককালে কলকাতা ভারতবর্ষের রেনেসাঁসের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। চোখদানের ব্যাপারে এমন এক শব্দ প্রচেষ্টার কলকাতা যে নেতৃত্ব দিচ্ছে এটা খুব আনন্দের কথা।

তবে এই আই ব্যাংক গড়ে তোলার পিছনে উদ্ভাস্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন যে মানুসিটি তিনি হলেন মনোরঞ্জন মজুমদার। প্রীলংকা থেকে ঘুরে এসেছেন তিনি গত এপ্রিলের গোড়ায়। কলম্বোর ড হাউসন সিলভার গড়ে তোলা পৃথিবীবিখ্যাত আই ব্যাংকটি ঠিকে মংখ করছে। দেখেছেন কি করে একটি মৃতের তার মাজাজীবন উন্মোচন করেছেন অম্ব জনের সেকর। সারা প্রীলংকার সিলভা একটি কিংবদন্তী। ওখানকার প্রতিটি মানুষের মনে সিলভা এটু কিস্কাস জাগতে পেরেছেন যে মৃত্যুর পর চোখ মানে পুণ্য হয়, মহানির্বাণ লাভ হয়।

প্রতি বছর এই কলম্বো থেকে প্রায় হাজার ব্যারো চোখ পৃথিবীর নানা প্রান্তে পাঠানো হয় ঠান্ডা প্যাকিং-এ। এর জন্যে কোন অর্থ দাবী করেন না সিলভা। মনোরঞ্জনবাবু জানালেন, তাঁর এই সংস্থা পুরোদমে প্রচার চালিয়ে যাবে চোখদানের ব্যাপারে। এর কর্মীরা করে করে গিরে ইচ্ছুক চোখদাতাদের নাম সংগ্রহ করেন। মৃত্যুর পর চোখসংগ্রহে ছুটে থাকেন এমাই করে করে। প্রয়োজন অনুযায়ী এই আই ব্যাংক নানা হাসপাতালে চোখ পাঠিয়ে চাইসা মেটবেন। তবে এটা ঠিক এই ব্যাংক রাতের সরকারী দুটি আই ব্যাংকের সঙ্গে কোন প্রতিযোগিতার নামেই না। চোখদানের ব্যাপক অভিজ্ঞতা এঁরু সবাই হলেন একে অন্যের পরিপূরক। ইতিমধ্যে অনেক সাড়া এসেছে। ইন্ডিয়া টোবাকো কোম্পানীর এ এন হাসকার ডাঃ মুরলী সেনগুপ্ত ও ডাঃ রণবীর মুখার্জি এই সংস্থার সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। অভিনন্দনযোগ্য এই অভিজ্ঞান।

এমনি করে গড়ে উঠুক আরো আই ব্যাংক সারা দেশে। আমেরিকার পঞ্চাশ বছরের সেরদার ছিল অল্প কয়েকটি আই ব্যাংক। এগুলি সবই ছিল কিং-বিক্রয়ালগুলির সঙ্গে বৃদ্ধ। তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ল প্রচার। গড়ে উঠল অসংখ্য আই ব্যাংক। সবচেয়ে বড় কথা, এদের সবগুলি কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল কলেজের সঙ্গে বৃদ্ধ নয়। অনেকগুলিই বেসরকারী এক সাধারণ মানুষ দ্বারা পরিচালিত। তবে বর্তমান না আমরা দেশের মানবকে উদ্বেষ করতে পারছি, দুঃ কল্পত পারছি মনের অধিকার ততদিন আই ব্যাংকের ডীপ ট্রিঙ্গলটি পড়ে থাকবে বাহ্যি।

নাথোদা মসজিদ থেকে আমরা বন্ধন বেরিয়ে আসিহুদার তখন দুঃখের গড়ের বিকল। সারাজ পড়া চলেছে ভিভরে। দরজার গোড়ায় বসে অলকুশীন। জ্বাল কুড়িত কোঠার। মাঝার টপ। লাল গামছা পেতে জিক্ত করছে সূর করে গোরে। দূরচোখ ওর পথ। আলকুশীনের চোখের করনিমা দুটো সাদা হয়ে গেছে একেবারে বন্ধন ওর বয়স ছিল পঁচ। করনিমা গ্রাফটি করে ফিরে পেতে পারে ও আবার ওর দুর্ভাগ্য। সূচ্য স্বাভাবিকভাবে আর মশটা দুর্ভাগ্য লোকের মত তারও কচবার ইচ্ছে হয়। কিন্তু হরত এমন করেই সারাজীবন ওর থেকে জাবে অম্বকাষর। কেনন 'ঐশ্ব্যে অম্ব কনরা উপর-ওরাম।' আজাই ওকে পাঠিয়েছেন অম্ব করে। আর ইচ্ছা করেই সারাজীবন কুড়ি লাখ অম্ব লোক আলকুশীনের মত জামকে মেনে নিয়ে ফিন গুনেছেন অম্বকারে।

তবে ওঁদের আলো দেখতে পারি আপনি আঁসি লোক, তাই না?

# '৮০ ওলিম্পিকের আগে রুশ দেশ চরঞ্জবি

৯১০

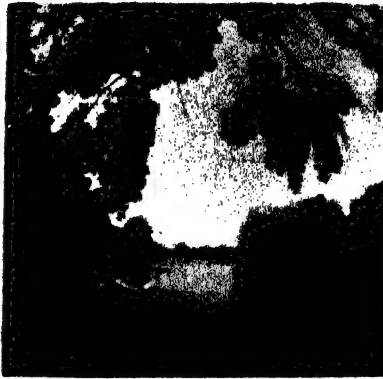
ধারণা ছিল এসব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে না। এই আমাদের কাছে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন—পশ্চিম বাংলার বেকার কত, কলকাতার রাস্তার কত মানুষ রাত কাটায়, কত ভিক্ষুক আছে কলকাতায়। বিব্রত বোধ করব না কি? শূন্য-ছিলাম, সোভিয়েত দেশে অনেক কিছুই সাজানো। অনেক কিছুই 'অভিনয়'-এর মত, ভিতরের কথা জানা খুবই দুশ্কর। হয়তো এসব ঠিক, কিংবা ঠিক নয়। তবে আমি তো কিছু সাধারণ তথ্য জানতে চাই। আরমেন শিবধা না করে একে একে প্রশ্নের জবাব নয়, আলোচনা শুরু করলেন। বিনীতভাবেই বললাম, আপনার দেশ সম্পর্কে আমাদের কত যে অনসম্মতিসা.....

বেকার আর ভিক্ষুকের কথা উঠতেই জানলেন, "শুধু আমার কথাই বিশ্বাস না করে, এখানে আপনার পরিচিত ভারতীয়দের কাছে খোঁজ নেন। তা হলে আরও জানতে পারবেন। সমাজ-তন্ত্রে বেকার থাকতেই পারে না। লেনিন বলে-ছিলেন প্রতিটি মানুষকে কাজ দিতে হবে, বাঁচা মত খাদ্য দিতে হবে। আমাদের সরকার বিপ্লবের পর থেকেই এজেন্দা প্রয়াস চালিয়েছে। বড় বড় রাস্তায় হোডিং-এ দেখেছেনও লেনিনের ওই কথাগুলি রয়েছে তাঁর নানা বাণীর সংগে। তা ছাড়া বেকার থাকবে কোনমতেই না। এতবড় দেশে আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় জনসংখ্যা বেশ কম। প্রতিটি মানুষকে শিক্ষণে পরিমার্ণে কাজ করতে হয়। চাকির বয়স হলে তাই কলেজ বা অনুরূপ সংস্থায় শিক্ষানবীশ কাল শেষ হতে না হতেই আপয়েন্টমেন্ট লেটার চলে যায়। বেকার থাকার কোনো সুযোগই নেই। শিল্প খেতেই চলেছে, কলকারখানাও। কাজের সুযোগও উন্নয়নের বশি পক্ষে। প্রতিদিন আমরা কাজের লোক খুঁজে বেরাচ্ছি। পরেখা তো নয়ই, কোনো বাড়িতে সমর্থ মেয়েরাও বসে নেই। শূন্য তাই নয়—কাজের লোকের অভাব বলেই পরেখদের মত মেয়েরাও কদিন পরিশ্রমের কাজে নিযুক্ত। সব দেশের মত আমাদের এখানেও নির্দিষ্ট বয়স অবসর নিতে হয়। তারপর ঠোরা পেনসন পান। কিন্তু কাজের লোকের অভাব বলেই সমর্থরা। ইচ্ছা করলে অবসরের পরও কাজ পান। কাজ দেওয়া হয় আর্থিক সমস্যার বা পুরো সময়ের।"

আরমেন হেসে বললেন, "দুই বন্ধু দেশ ভ্রমণ ও সোভিয়েট ইউনিয়নেই জনসংখ্যার সমস্যা। তবে ব্যাপারটা একদম বিপরীত। আপনার দেশ জন-সংখ্যা বেশ। আমাদের জনসংখ্যা কম। জনসংখ্যা কমজনিত সমস্যা নিয়ে সরকারের চিন্তাও খুব। কদিন আগে খবরের কাগজে দেখছিলাম সোভিয়েট মানবের গড় আয় বেড়েছে বলে অবসরের বয়সীমা পাঁচ বছর বাড়ানোর চিন্তা করা হচ্ছে। চিন্তার কারণ আরও। হিসাব করে দেখা গেছে আগামী দশ বছরে প্রায় পাঁচ কোটি লোক অবসর নেন চাকরি থেকে। এতে দারুণ সমস্যা দেখা দিতে পারে কলকারখানা, শিল্প ও অন্যান্য সব কিছুতেই। সরকার এদিকটাও ভাবছেন।" আরমেন বললেন, "যেখানে কাজের তুলনায় জনসংখ্যা খুব কম সেখানে ভিক্ষুক থাকতে পারে?"

রাশিয়ায় আমি শহর ও শহরতলীতে ঘুরে-ছিলাম। জানি না, একেবারে গণ্ডগ্রামের অবস্থা কেমন। শহর ও শহরতলীতে ভিক্ষুক বা ছোঁড়া জামা-কাপড় বা ওই ধরনের পোশাক পরে কাউকে খোঁষাঘুরি করতে দেখিনি। অলিতে-গলিতে ঘুরে, চাকুরে বা ছাত্র ভারতীয়দের কাছে জিজ্ঞাসা কর্তেও ভিক্ষুক বা বেকারের সম্ভান পাই নি।

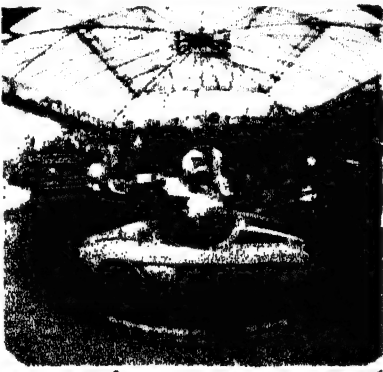
আরমেনের কাছে শুনলাম, অধিকাংশ দম্পতীরই একটি সন্তান, শতকরা দুইটি দম্পতীর দুটি সন্তান, তিনটি সন্তান আছে—এমন দম্পতী



গোর্কি রিক্রেশন পার্কে ছুটির দিনে নৌবাহার



গোর্কি রিক্রেশন পার্কের আর একটি দৃশ্য



ছোটদের জন্য বিশ্বের বৃহত্তম 'অলালো' খেলার ক্ষেত্র



পার্কের ভিতর থেকে কলম্বর খিরকীর

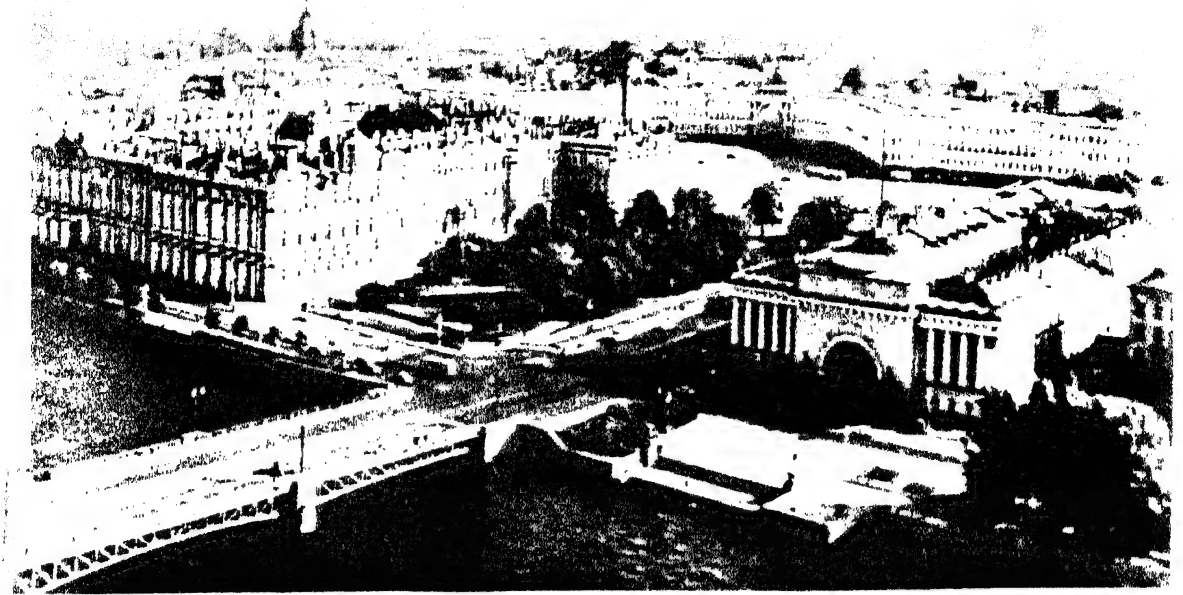
একশয়ে হয়তো তিনটি বা চারটি কিংবা তারও কম।

খোলাখালি জানতে চাইলাম, সম্ভান-সম্পত্তি কমে কারণ কী? সকলেই কি ফ্যামিলি প্ল্যানিং করেন? না, অন্য কোনো ব্যাপার? পচাও শীতও কি অন্যতম হেতু? শেষের প্রশ্ন সম্পর্কে আরমেনের বক্তব্য—হয়তো তাই। তবে অন্য বক্তব্যটি রাখলেন সেটি শূন্য কিছুটা অবাক করে দেয়। আরমেন নিজের প্রসঙ্গে এলেন, "আমরা একটি মেয়ে বয়স সাত। কিন্তু ওর জনোও কম সমস্যায় পড়তে হয়নি। ওর জন্মের আগে সমস্যায় পড়লাম স্ট্রীকে নিয়ে। স্ট্রী ও আমি থাকি মস্কো, একটি ফ্ল্যাটে। তৃতীয় বাড়ি কেউ নেই। পঞ্চম মেয়ের জন্মের ছ' মাস আগে স্ট্রী তো কাজের জকে। তার উপর হাসপাতালে পাঠাবার আগে তে কত সমস্যা। অফিস কামাই করে আমাদেরই দেখা শোনা করতে হত। আমাদের এখানে তো চাকর বাকের রেওয়াজ নেই। বাবা হয়ে সরকারকে জানালাম। আমার মা থাকেন অনেক দূরে টাঞ্জিয়ায়। তাঁর পক্ষে মস্কোয় এসে বেশদিন থাকাও সম্ভব নয়। সরকারকে বলতেই মস্কোয় আমার শাশুড়ির ফ্ল্যাটে কাছাকাছি একটি ফ্ল্যাট দিলেন আমাদের। শাশুড়িই দু'বেলা দেখে যেতেন তাঁর মেয়েকে। আরও সমস্যা মেয়ে হওয়ার পর। শাশুড়ির প্রয়োজনটা আরও বাড়ল। আরও ছ' মাস স্ট্রী কাজে (শিক্ষিকা) যেতে পারলেন না। অর্থাৎ এক বছর কাজ বন্ধ। মেয়ের জন্মের ছ' মাস পরেও নিশ্চিন্তে স্ট্রী শুলে যেতে পারেন না। তবুও আমার না হয় শাশুড়ি আছেন, ওঁদের কাছাকাছি ফ্ল্যাটে দেখোঁচলাম। অন্যদের ক'জন এমন সুযোগ পান? একথা ঠিক—আমার মেয়ে বড় হয়ে নিশ্চয়ই রাষ্ট্রকে সাহায্য করবে। কিন্তু স্ট্রী ৬+৬=১২ মাস রাষ্ট্রের কোনো কাজে লাগলেন না মেয়ের জন্য। নিশ্চিন্তে ছিলাম না আমরা দু'জন বতর্দিন ওর বোঝার বয়স হয়নি। এখন তো প্রতিদিন মেয়েকে শুলে পেপীছে দিয়ে আমি অফিসে আসি। কিন্তু তাও অনেকদিন সম্ভব হয় না। স্ট্রীকে কণ্ঠে পড়তে হয় কিংবা ওর দিমাঝকা। এই কদিন আপনার সংগে থাকায় মেয়ের ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারছি না।"

অপ্রাসঙ্গিক হলেও আবিও একটি প্রশ্ন করে বসলাম। আরমেন বিবাহানীতিস্ত জবাব দিলেন, "সমাজতন্ত্রে পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ সোভিয়েট দেশে এর চিহ্ন পাবেন না।" কলকাতায় ও দিল্লিতে কয়েকজন কমিউনিস্ট বন্ধু বলেছিলেন, "রাশিয়ায় পতিতা নেই তবে বামধর্মী পেতে পারেন।" আরমেন ওই শূন্য বললেন, "এখানকার প্রতিটি মেয়ে ও পরেখ ওয়েল বিহেভুড অনেক সময় এর সুযোগ নিয়ে বিদেশীদের কেউ কেউ মেয়েদের নানাক্রম প্রস্তাব দেন। হোটলে হয়তো অতিরিক্ত মদ্যপান করে কেউ কেউ মেয়ে কর্মীদের উপর চড়াও হয়েছেন, কিন্তু পরে বুঝেছেন কাজটা ঠিক করেন নি। তা ছাড়া মেয়েরা দেহ-বাবসায়ে যাবে কেন? চাকরি পত্রকেরই রয়েছে, আরও কম নয়। সরকারীভাবে তো পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ।"

চার, ডাকতি বা ওই ধরনের কার্যকলাপ সম্পর্কে অন্য কয়েকজনের সংগে আরমেন মোটামুটি একমত। কালেভদ্রে বা বছরে এক-আধটি ঘটনা ঘটে না এমন নয়। তবে তার জন্য কষ্টের শাস্তি যেমন আছে, তেমন খাতিয়ে দেখা হয় চাঁদ, ডাকতির কারণটা কি? মূলটা ধরে উৎপাটিত করার দিকে সরকার নজর দেয়।

রাজনীতি সম্পর্কে আমার ধারণা খুবই কম, বরং বলব একদম নেই। তবে কয়েকটি সংবাদ প্রদান এলা। যেমন সোভিয়েট ইউনিয়নের নাগরিক গ্রাহেই কি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য? আরমেন বললেন, না। জনসংখ্যার দিক থেকে



লেনিনগ্রাদ : স্টো নদীর তীরে উইন্টার প্যালেস ও প্যালেস স্পোরস

ইতালীর চাউতে আমরা অনেক বেশী। কিন্তু ইতালীতে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যসংখ্যা আমাদের দ্বিগুণ। স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ বা অধিকার আছে কি-না চিন্তাসা ক্লাব উইন জানালেন, নিশ্চয়ই এ অধিকার প্রত্যেকেই ভোগ করেন। তবে তার মধ্যে ডিসপ্লিন রয়েছে। যথেষ্ট মন্তব্য করার অধিকার কারও নেই। পার্টি কমী বা নেতাদের মাধ্যমে আমরা সব বক্তব্য পেশ করি। এমন কোনো মন্তব্য বা হাত প্রকাশ করা হয় না যাতে মতাবোধ নষ্ট হয়, বা যাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। বললেন, আমাদের ফুটবলের কথা তো শুনেননি— বেশ কিছুদিন ধরে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তেমন যুক্তত পাচ্ছি না দেখে কাগজে তার সমালোচনা হল। পার্টি এবং সরকারের ভয়ঙ্কর থেকে অনুসন্ধান হল; তারপর তখনকার ফুটবল কভারদের হাত থেকে ক্ষমতা নিয়ে কলেকসভ লেভ ইরাসিনের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য সব কাজে একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা থাকে। কার্যকাল বা মেয়াদ শেবে দেখা হয় সেই কাজ ঠিক হল কিনা—না হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বললেন, সরকারী কাজের সমালোচনা আমরা করি, কিন্তু সেই সমালোচনা কখনও দেশের জনগণের স্বার্থ-বিরোধী হয় না, স্বার্থবিরোধী হয় না। আমরা সব সময় মনে করি ব্যক্তি স্বার্থ অপেক্ষে রাষ্ট্র স্বার্থ অনেক বড়। অন্যদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য এখানেই।

তদ-এর এক ঐক্যবোধিক সংবাদদাতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আপনার কি গণভন্ডে লিবারী নন? কলচ্ছিলান্স আপনাদের একজন—ভন্ডে নাগরিক অধিকার ক্ষুর হয়। উইন আমাদের আহত করতে চান নি। এবাবে শুন বলছিলেন, যে দেশে যে 'ভন্ডে' থাকুক—তার ভালবাস্য দুটি দিকই থাকে। তবে সেই 'ভন্ডে'র ব্যবহার প্রয়োগ হতে পারে বা প্রয়োগের সবটাই নিষিদ্ধ করে সেই দেশের নাগরিকদের উপর। জনসাধারণ যদি যথেষ্ট সচেতন না হন, ভোটপ্রয়োগ কাচুপি হয় তা হলে কোনো 'ভন্ডে' সফল হতে পারে না।

উঠেছিল। বললাম, কলকাতায় দেওয়ালে দেওয়ালে তার ছবি তার বাসী রয়েছে। আমাদের ওখানকার কমিউনিস্ট পার্টি শুঁকে খুব প্রশংসা করে। আরমেন বললেন, আমরা তো তাঁকে অশ্রদ্ধা করি না।

এবার অন্য প্রশ্নে—এলাম—কিছু আপনাদের সমর্থন পায় না কেন? ইম্পেরিয়ালিস্ট গেম বলেই কি?

—না। আমাদের পুরো দেশটাই খেলা অন্ত প্রাণ। কিন্তু অত সময় দেব কেনম করে! সারাদিন ঘরে খেলা—আমরা ভাবতই পারি না। কাজের সময় নষ্ট করে কোনো খেলাকে আমরা সমর্থন করি না। সারা বছর ধরে আমাদের দেশে খেলাধুলা কিন্তু সাধারণত অফিসটাইমে কোনো খেলাই হয় না। কলকারখানা, অফিসকাছারি, কুর্সি খামরের কাজ কথ রেখে খেলাধুলার উপোহ দেওয়া না। উপাদান বন্ড রেখে খেলাধুলা চলবে এটা কি করে সম্ভব?

টেন দ্রুত চলছে লেনিনগ্রাদের দিকে। জানালার পর্দা তুলে কাচের ভিতর দিয়ে বাইরে তাকাছি। বিদ্যুৎ আলো মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে কোনো স্টেশন বা শহর এলাকা এলে। মাঝে মাঝে গ্রাম ধরনের লোকসল্লাও দেখলেন আরমেন। গ্রামাঞ্চলের কৃষিকাজ চলে সই কলেকটিভ কামের মাধ্যমে। গ্রামাঞ্চলে পুরনো বাড়িও চোখে পড়ল। তবে তার ধারাই এখন গড়ে উঠে আধুনিক হাউসিং এস্টেট। সরকার গ্রাম বা যক্ষ্মলের অধিবাসীদের জন্যও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছেন। আরমেনের মজিলাং সিমলা প্রভৃতি অঞ্চলে যেমন শীতে আগুনের তাওয়া বা ওই ধরনের কিছু আছে ধর গরম রাখার জন্য। ডেরনি এসেছেও কাঁচ বা তরল জ্বালিয়ে গরম করার ব্যবস্থা রয়েছে আজও। তবে এখন সবটাই বিদ্যুৎ-হিটর বসানো হচ্ছে—শহর-গ্রামের ভেতরা তুলে দেওয়া হচ্ছে।

মাঝে মাঝে স্টেশন দেখছি। দেখছি এই শীতে, এই যক্ষ্মাওও লোকজন ছুটিয়ে নেই। নানা কাজে এরা ব্যস্ত। বরফ সরানোর কাজ হয়তো প্রধান। কিন্তু মালগাড়ির ওয়াশন থেকে মাল বালাস বা বোকাইও চলছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে এদের এই

বরফের মরুভূমি সাহাবোরিয়াতেও এরা চাষ করছে। শিল্প গড়ে তুলছে। আর আমাদের মতোসানার বাংলায় একটা বৃষ্টি না হলে চাষ বন্ড, খাদ্যভাব। বেশী বৃষ্টি হলে বন্যা—তা নিয়ন্ত্রণ আজও করতে পারি না। ফরত্ভা পরিকল্পনার পবেও গণ্ডা শক্তিরে যায়। পলি পড়ে পড়ে কলকাতা বন্দর প্রায় অচল। এরা চাষ করে হোক, অন্য দেশ থেকে আমদানী করে হোক খাদ্যশস্য শীতের পাঁচ-ছয় মাসের জন্য প্রতি বছর গ্যামজাত করে রাখে।

এদের সঙ্গে তুলনা করে নিজেতে বড় ছোট মনে হচ্ছিল। আমাদের মুখামন্ডী জ্যোতি বস, হুমকি দিয়েও কমীদের ঠিক সময়ে অফিসে আনাতে পারেন না। বেশ কয়েক বছর আগের কথা, কখনকার মন্ডী ও এস টুই সি নেতা সুবোধ বানার্জি একদিন সাংবাদিকদের কাছে অরেক্ষণ কব বলেছিলেন, বেতন কমিশন মাইনে বাড়ালেন মনে কি কাজ বাড়বে ছেবেছেন? বাস! বন্ধা করে অফিসে আসেন তাই বেতন বাড়ুক কাজ বেশী করার জন্য হয়তো দু-চারটি বেতন কমিশন চাই। তিন্সম্মান স্ট্রাভাডের সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় না, সত্য চকবর্তী ঠিক মনে নেই। সুবোধবাসুর করার জের টেনে বলেছিলেন—তাতেও কি কাজ করার মানসিকতা আসবে?

ভাবছিলাম কলকাতা কর্পোরেশনের কথা। পাকগলোর রোলি উঠাও। ছেলেমেয়েদের খেলার সরঞ্জাম আজ আর সকালে বিকালে চোখে পড় না। অথচ ১০ বছর আগেও সকালে বিকালে খেলারি হয়ে পড় যেত কাঁচকাচাদের মধ্যে। আজ কিন্তু ওসবের জন্য বাজেট বেছেছে কমী বেছেছে। কিন্তু সরকারের পাজ নেই। মালী বা ওই ধরনের কমীও দেশে বার না। মনে পড়ে? কয়েক বছর আগেও প্রতিদান সকালে বিকালে হোস্ পাইপের জলে সারা কলকাতা হয়ে কেলা হত। আজ ওসবের জন্য বরাদ্দ বেছেছে কমী সংখ্যাও। কিন্তু ১০ বছর আগের তুলনায় আজ কটি রসতা ম্মান করে সকালে ও বিকালে? কিংবদন্তি না কথ্য নীক বলেছেন, গত কয়েক বছরে কলকাতার পানিয়ে ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু কোনোরকম ইমপার্ট

হচ্ছে পড়ছে না। এর ভীতের মতন একটা অস্বাভাবিক মিল তাল হত। জানি না কেন এসব লিখছি। শূন্য সোভিয়েট আর জার্মানি, আমেরিকা জাপান, ইংল্যান্ড স্কটল্যান্ড আর হবে আমরা ধীন শূন্য জাতির ক্ষেত্রে নয়, মানসিক নিক ক্ষেত্রে ধীনতার এবং হীন। আর হবে গীতা রামায়ণ আমদের কিছুই শিখা দেয়নি। আর হবে রামকৃষ্ণ রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, শ্যামলী, নেতাজী, জওহরলালের উত্তরাধিকারী আমরা নই।

রাত প্রায় একটা আরম্ভের ঘড়িতে। আরম্ভের সময় প্রায় নয়ট ডিনটা। শূন্য শূন্য কলকাতার অফিসের কথা মনে পড়ল। বিরামতা, ভূপালনা, সোমনাথনা বা অক্ষরবাবুরা অনেক আগেই বাড়ি চলে গেলেন। আজ রাত্রে চিক সাব কে আছেন—শুধুমাত্র বাবু না ভগ্নমাত্র বাবু না শিশিরনা? উত্তরও পেরে ছেড়ে শূন্য পড়েছেন টেলিগ্রাফারের কাছে। আর আরম্ভের স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টে নাইটে পম্পেনবাথ বা বিক্রেতাবাদ? কিন্তুই নাক ডাকছে এতক্ষণে। আরম্ভের লাইট নিষিদ্ধ তাকা দিলেন, চোখ বুজলেন। সকল লেনিনগ্রাডে শৌছে জ্বালা পড়েন না।

লেপ ঘড়ি দিচ্ছে ঘুর এল। কিন্তু কলকাতার অভ্যাসটা পুর হইনি। ছটা না বাজতেই ঘুরে জড়ল। অর্থাৎ প্রায় আড়াই ঘণ্টার মধ্যে জেমে যেলাম। বাইরে তখনও অন্ধকার। স্থানীয় সময় অনুযায়ী তো রাত পোহাতে অনেক দেরী। কেবল শূন্যই কঠোর ব্যক্তি সমস্তটা। আরম্ভের একটু লেট রাইজার, তবুও ঠাণ্ডা হাড়ির ছটার একটু আগে উঠে পড়লেন। আরম্ভের বঙ্গলেন, হাড়ির দিকে

আঁকিরে, তাকাতাকি জমা-পার্ট পুর মিনি। শিট মিনিটের মধ্যেই শৌছে যাবো বোঝানোর। হাড়ির স্পিডও কমে গেছে। আরম্ভের বোঝানোর লেপের ও বাইরের ওয়াড় বুলে ভাঁজ করলাম, লেপ হাড়ির ভাষে উপর বাঁশ পাখলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—এগুলো কি বোঝানোর হবে?

—অবশ্যই, ঠাণ্ডা উত্তর। এখনই প্রতিটি কম্পার্টমেন্টে ডিসাইনিং করা হবে।

ছটা হই কিবা তিন মিনিটে গাড়ি থামল লেনিনগ্রাড স্টেশনে। পূর্বেই ঘোরে হস্টেল থেকে আরম্ভের এক মিনিট আগের ট্রেনটি। বয়সীরা এখনও নামছেন। আরম্ভের বললেন, বাইরে শূন্য নামুন। ট্রান্সি স্ট্যাণ্ডে প্রচণ্ড ভিড়। ভিড় করা পূর্ণত কিন্তুই দাঁড়তে হবে। বাইরে ট্রাক্স অর্গানি কন্ট পাবেন। বাকস-পেটরা নিয়ে পা টিপে টিপে হাটতে লাগলাম। এখনও 'ক্যাটকট' শব্দ করক। প্রতি মুহূর্তে পা হড়কে বাওয়ার আশঙ্কা। এসোছি হঠাৎ দেখি ট্রেনের সামনে আরটেনশন হয়ে একমল লোক ছবি তুলছেন। কাছে ছেত বুকলাম উত্তর কোরিডার সেই ডেলিমেটরা। স্টেশনে থিঞ্জ থেকে বাইরে সঙ্গ এসেছিলেন। হস্টেলের কাজ শেষে ওরা লেনিনগ্রাডে এলেন।

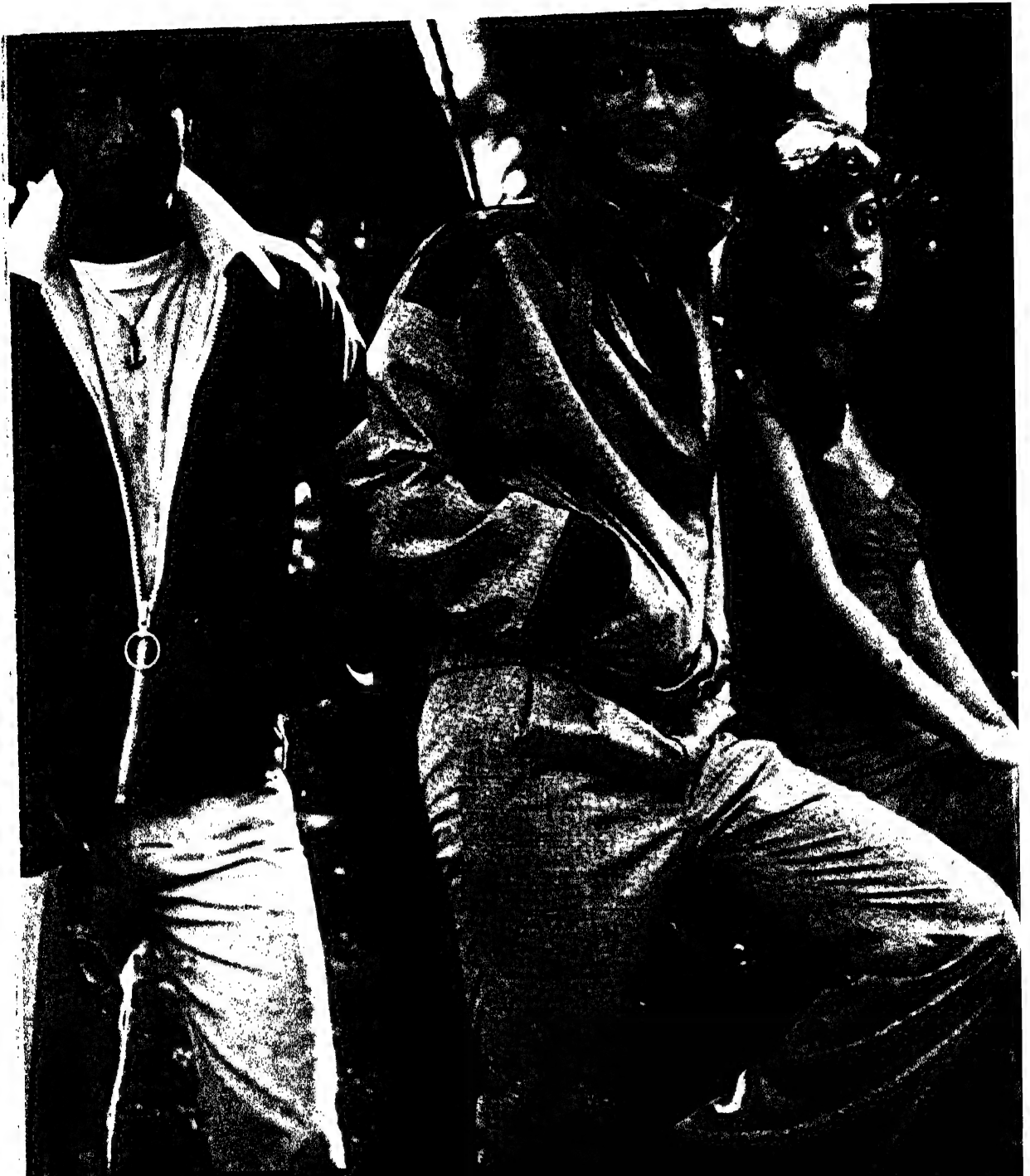
টাকসি স্ট্যাণ্ডে আমাদের ছেত হল না। এক জম্বলোক তার আগেই আরম্ভের কাছে এসে কিস কিস করে কি সব বললেন। আরম্ভেরও আমাকে স্থিরে করে দিলেন—টাকসির জন্য কিছু দিতে হবে না। তবে সামান্য হাটতে হবে। গাড়ি রেডি আছে। তা হলে এখনও কি হাওড়া বা শিলালক্ষের রত বাকা পথে টাকসি পাওয়া যায়? আরম্ভের মেলে

উত্তরনা করলেন,—না ঠিক তা নয়। আর 'কলকাতা' কথা ওর ভিটটি অক। কিন্তুের ওখানে স্টেশন ওর দেরী হয়ে যাবে। তার জন্য অনুমতি চাই মনিফেস্ট ডিপার্টমেন্টের। ঊনি সারা রাত ভিটটিতে ছিলেন। অনুমতি মিলবে না। গ্রীষ্মে একটা ট্রিশ হলে গাড়ির আর হবে। আর সরকারের। খালি গাড়ি মেলে তো তা হবে না। তাই টাকসিটি আজট লক্ষ না ওয়েতে আছে। কলকাতার স্টাটী স্টেশন ও ওভারটাইমের প্রশ্ন আসবে না সেরে হবে। হা মিনিট হাটী মানে তো এই শরীর সাক্ষর বাওনা! কিন্তু বিরতি বা অক্ষমতা জানিয়ে থাকে। কেনই বা জানাবো। শীতের জন্য কন্ট নিশ্চয়ই হাটিল। আরও কন্ট ২০-২৫ কিলো ওজনের স্টেটকেশন জন্য। তাও ভাল হস্টেলের কিছু খালি হয়েছিল। এদের কাছে এসব ওজন কিছুই নয়। আমাদের কুশি, চাকর ইত্যাদি ব্যবহার করে আমরা বাবু হয়ে গেছি।

লেনিনগ্রাড প্রাচীন শহর। সোভিয়েটের প্রথম রাজধানী। বিপ্লবের পর এটাই ছিল সারা দেশের প্রধান কর্মকেন্দ্র। লেনিনগ্রাডের আগের নাম সেন্ট পিটার্সবার্গ। লেনিনগ্রাডের আগের নাম সেন্ট পিটার্সবার্গ। তারপর নাম বদলে হয় পেট্রোগ্রাড এবং মেহেতু লেনিনের জীবনের বহুমুখিতা কন্ট এখনো তাই তার নামে পুরে হল লেনিনগ্রাড। জল্লের বিপ্লবের শূন্যও এখানে। হুশ ইতিহাস ও সংস্কৃতির পৌরষের অধ্যায় এই কন্ট্রোল, প্রসাদ ও নদীনালায় শহরের সঙ্গ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। শূন্য কলকাতা ইতিহাস বইয়ে পড়া সেই পিটার বা সেন্টের পড়া সত্যের



লেনিনগ্রাডের শহরতলে কন্ট রাস্তা দেখানি আর্জিভিট করায় দিনে



বিশ্ব স্টিকারি স্থলজর-এর আকর্ষণীয় বসনা।

**ওয়াড্রীল**

ওয়াড্রীল স্ম্যটিংস—সর্বোত্তম—এবার এশিয়াতে, একসঙ্গে  
সবচেয়ে বেশী লাগানো 'স্থলজর' মেশিনে বোনা।  
সারা দুনিয়ায়, অটোমেটিক শাটলনেস বোনার মেশিনে তৈরী  
এ হল এক অসাধারণ জিনিস।





પ્રવિષ્ઠ કક્ષન ઇન્દિયાતેવ એક નવૂન ધામ્યલેવ સજે !

**સુલજોન**

વિભાગ નામ અમુક દ્વારે ટેમ્પલવારેજડ્ ટેમ્પલવારેજડ્

નવે

સાથે

বসে আর কতটুকু লোক করা যায়। এখনও লেনিন-গ্রাডের ঘুম ঘোষ হয় পুরোপুরি ভাঙ্গেনি। গ্রাঙ্গলেও শহরের জন্য ওজা বোধ হয় করার মতোই আনন্দ। তা ছাড়া ছুটির দিন। বেরোনের তাক্সা নেই তেমন। মস্কোর মত এখানেও বন্ধ আর ফাঁক। তবে প্রতিটি বাড়িই দেখার মত। মস্কোর ফাঁক ফাঁকা ভাঙা ভাঙা রয়েছে নতুন এলাকাগুলো। কিন্তু লেনিনগ্রাড পুরনো শহর। সব কিছুই সেরকমে। সবচেয়ে উচ্চ বাড়িগুলো হয় বা সাভ ভলার বেলী নয়। মস্কোর মত স্কাইস্কাপার নেই। এখানকার বাড়িগুলিকে কিসের সঙ্গে তুলনা করব? অনেকটা রাইচাস বিল্ডিং, কিলকাতার জি পি-ও বা মনিখাবাদের নবাববাড়ির কাছাকাছি। কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরির পুরনো বাড়ি বা গ্র্যান্ড হোটেলের সঙ্গেও কিছুটা তুলনা করা যেতে পারে।

ট্যাক্সি মত এগিয়ে চলেছে। ইটাং টেলিফোন বেজে উঠল। আরমেন জানালেন, ওর কনস্টান জিঙ্কাসা করছে এখন গ্যাড়্টি কোয়ার, ডিউটি টাইম প্রায় শেষ হয়েছে। তিনি কি আর কাজ করবেন? না—গ্যাড়্টি গ্যারাজ করবেন। ক্রাইভরের উত্তর : মিনিট পঁচেনার মধ্যে আমার ট্রিপ শেষ হবে। এখন আমি এ পি এন-এর কন্ট্রোলপেডেট ও একজন ইন্ডিয়ান জনারালস্টকে নিয়ে হোটেল ইউরোপায় বাচ্ছি।

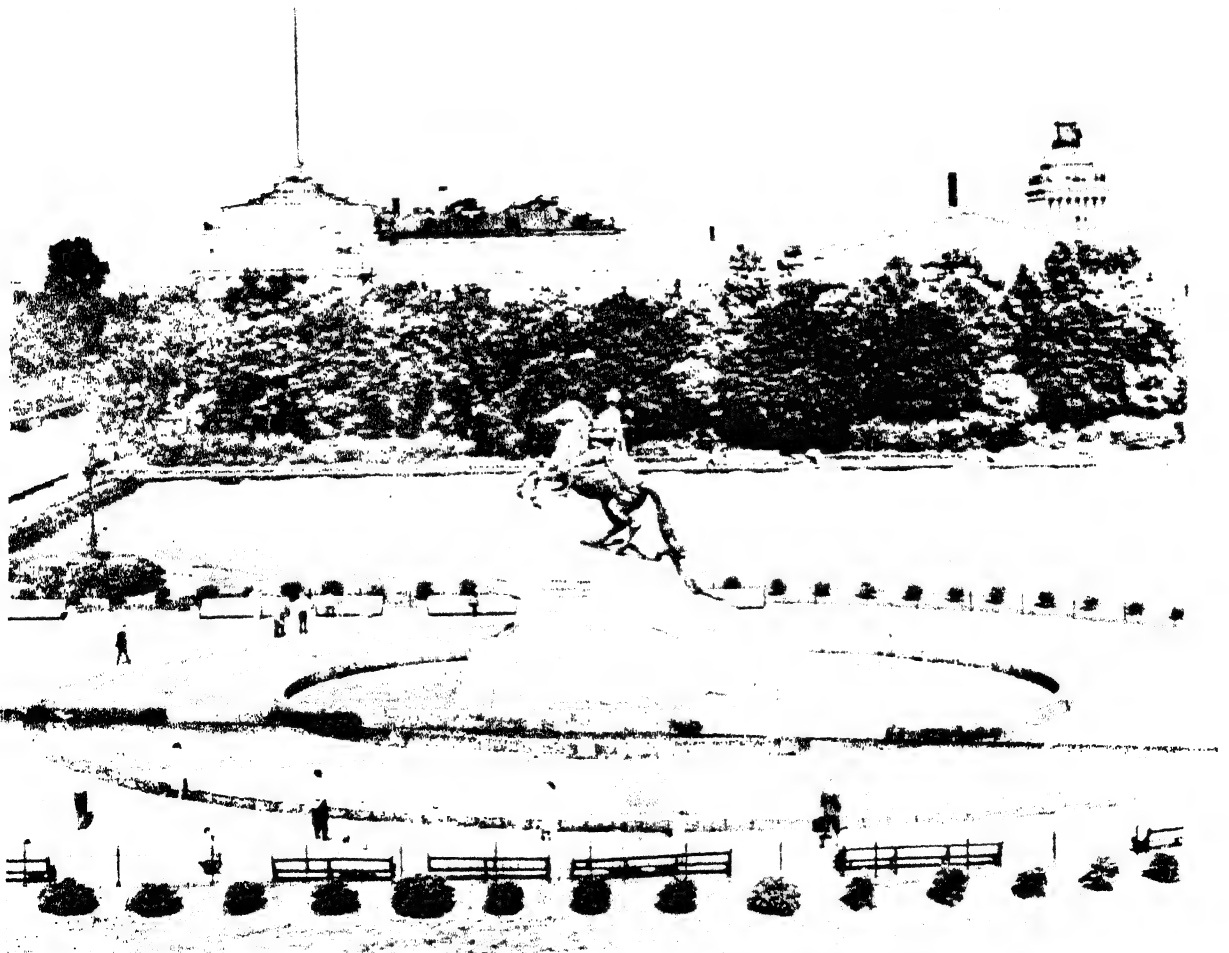
কেল স্টেশন থেকে পনের মিনিটের মধ্যে শহরের

বেরে চক-ক ১০০ পার-হলার। নেতা নবা লেনিনগ্রাডের বুক ছিরে বেরিয়েছে। কিন্তু নবীত জল নেই। সব জল জমে বজর। নবীর তীরে প্রসাদের পর প্রাসাদ আঁতরায় করে, অলংকা পার্ক, মনুসেন্ট ডাইনে ব'রে জেথ আমরা ধামলাম হোটেল ইউরোপার সাহনে। সারিকথভাবে দেখানে দাঁড়িয়ে ইনট্রিস্টের বড় বড় বাল ও কিছু ট্যাক্সি। এখানেও মস্কোর মত, পিঙ্কি হোটেলের মত নিম্নম। ফর্ম গুরু পাসপোর্ট জমা দেওয়া ইত্যাদি অবশ্য হোটেলের প্রবেশ মুখেই রয়েছে। বা দিকে ইনট্রিস্টের অফিস। হোটেলের রুমে বাওয়ার আগে খোঁজ নিলাম সকালে কোথাও বেড়াতে বাওয়া যায় কিনা। মস্কোর মত লেনিনগ্রাডেও এসবের দায়িত্ব মেয়েদের। ইনট্রিস্ট, পাসপোর্ট রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি সবই মেয়েরা করছেন। ম্যানি একচেতা ধবরের ক্যাডের কিরস্ক, স্যুভোর্নিরের মোকান হোটেলের ডিভারকার—সবই মেয়ে পরিচালিত। ইনট্রিস্টের ওরা কৌতুহলের সঙ্গে আরমেনের কাছে আমার পরিচয় জেনে নিলেন। এখানে একটি সুবিধা হল—এরা প্রত্যেকেই কাজ চালাবার মত, বোকার মত ইংরাজী জানেন। প্রথম পরিচয়েরই স্যুভোর্নির হিসাব কিছু ব্যাজ পেয়ে গেলাম। কেন জানি না, একটা ধারণা ছিল রুশ বা স্যোভিয়েট মেয়েরা যেটা সেটা বা গান্ধা গোম্বা চেয়ারার হন। হোটেল ইউরোপার ইনট্রিস্ট অফিসে এসে ধারণাটা তুল প্রমাণিত হল। ওদের হেড বা চিফ ছাড়া ব্যাক সকলেই মোহার।

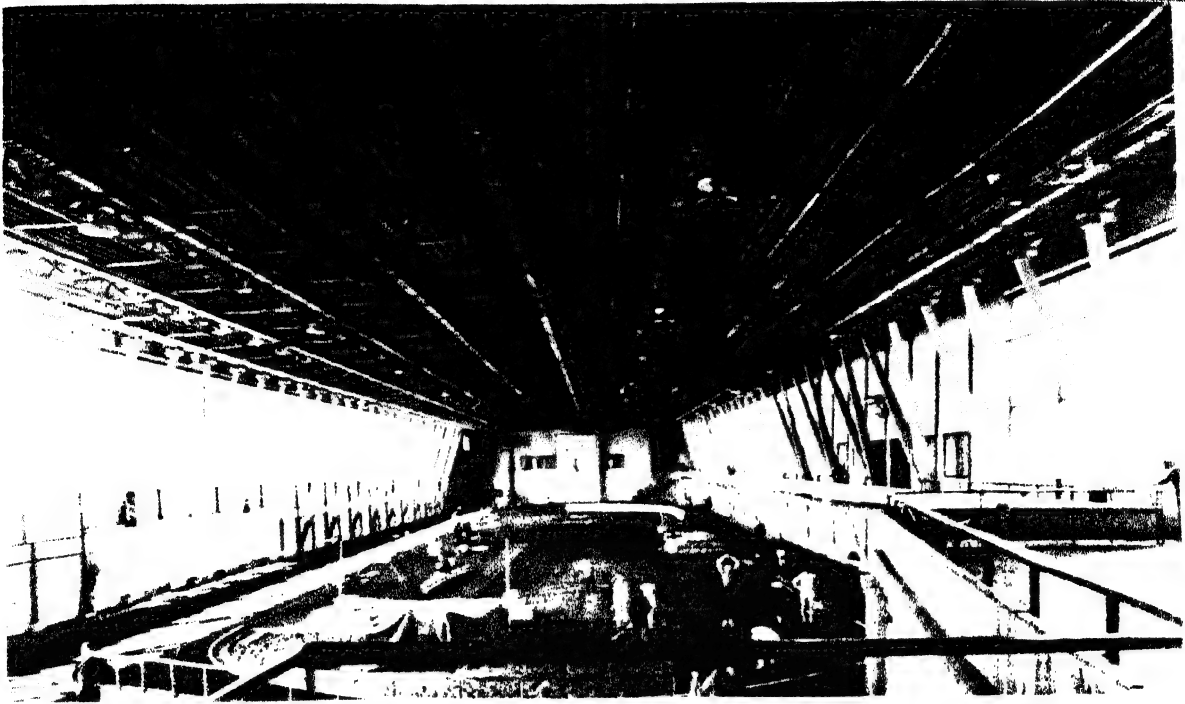
হোটেলের এক কেশ সুন্দরী। ট্যুরিজম-এর জন্য বেশ হয় সুন্দরী চাই। মস্কোর মতের জর চোকা নবীর। একেই এসে এই কদিনে একটা জিনিস লোক করছিলাম—তা হল ট্যুরিজম ব্যবসা। মোভিজেটে ইউনিয়ন আদ আর লোই কবানিকা নয়। তাহলে পর্যটনকে এরা এমনভাবে উপস্থাপিত করতেন না। প্রতিবছর এমন লোক লোক ভ্রমণ-বিলাসী আনছেন সারা দুনিয়া থেকে। সামান্য অভিজ্ঞতা বলছে—এই পর্যটন ব্যবসারে একেই বোধ হয় লেনিনগ্রাড শহর সবদা উপরে।

এখানে এসে চি এল রয়ের কেরকটি কথাও প্রয়োগ করা যায়। 'স্বপ্ন দিয়ার তৈরী' আর কেন 'স্মৃতি দিয়ে ঘেরা'। কে জানে কত কবির কবিতার ও গানে লেনিনগ্রাড উজ্জারিত। কে জানে কত শিল্পীর তুলিতে এই সেন্ট পিটার্সবার্গ মহানীর।

এই সকালে ইনট্রিস্টের দুটি প্রোগ্রাম আছে। একটি চার ঘণ্টার, আর একটি আড়াই ঘণ্টার। প্রথমটিতে দু'বের ঐতিহাসিক জায়গাগুলো দেখা হবে, দ্বিতীয়টিতে নাম লেখালে শহর শহরের ভিতরের প্রক্টরা স্থানে বাওয়া হবে। আরমেন বললেন, যে কোনো একটি বেছে নিন। দু'টির ভালো মধ্য সব বাখ্যা করলেন। এর মধ্যে আমাদের স্পোর্টস প্রোগ্রাম রয়েছে। লেনিনগ্রাডের পথঘাট, মোকান দেখার ইচ্ছা। কলকাতার ভেসপ্যাচ পাঠানো, ভায়েরি লেখা, চিঠি লেখা কত কি! শহর দেখার প্রোগ্রামে 'ইরেস' জার্নির উপরে উঠলাম বাস পেটরা



১৯৮০ সালে একটি বিখ্যাত দ্য সেন্ট-এর নির্মাণ কাজের সময় ছবি তোলা হয়। এখানে কোরবাস তার এই বাড়িরই কলকাতা প্রতীক



স্বাধীনতার প্রধান জল সোনারা। এটি লেনিনগ্রেডে অ্যাথলেটিকসের সব ইভেন্টের ইভেন্টের স্টেডিয়াম। হলের ভিতরে ৪০০ মিটার পেরের টাটান গ্রাকও রয়েছে।

নিয়। ২০ মিনিটের মধ্যে নেমে আসবেন। বাস রেডি থাকবে। বলা হল।

মস্কোয় একলা ভাল লাগেনি। ভেবেছিলাম, এখানে আরমেন আমার বন্ধু মতো হবেন। কিন্তু তা হল না। দুজনের আলাদা আলাদা ঘর। এও প্রায় কাছাকাছি নয়। শূণ্য, তাই নয়, হুতলার এট হোটেল ইউরোপায় তখন একটি রুমই খালি ছিল। সেটি আমাকে দেওয়া হল। আরমেন আপাতত হুতলায় আমার ৩১০ নম্বর ঘরে ঠিক বাগটি রাখলেন। তারপর দুজনে হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়লাম। হোটেল ইউরোপার বয়স কম নয়। ১৯৭২-এ সে শতবর্ষ পূর্তি উৎসব করেছে। কত ঘটনার সাক্ষী সে। রুশ বিপ্লবও দেখেছে, দেখেছে এর আগের শাসকদেরও। হোটেলের এই বাড়িও ১৯৭১-তে ১০৭ বছর পূর্ণ করেছে। পুরনো আমলের বাড়ি হলেও এর কোথায় কীট লিফট, কোথায় কীট সিঁড়ি-অতুলনের পক্ষে খুঁজে পাওয়া বাঁওরত সমস্যা। আরমেন কব্জার এখানে এলেও সমস্যা পড়ছিলেন। পিঙ্কি হোটেলের মত এখানেও পুরনো আমলের আলোর সাজ রয়েছে। আধুনিক হোটেলগুলির মত আধুনিকতম বন্দোবস্ত থাকলেও মজেসজা কিন্তু প্রাচীন ইউরোপের ভাবধারায়। এখানেও ভি আই পিরের জন্য সংরক্ষিত সুটে স্থান হল এই প্রতিবেদকের। একই নিয়ম-বাইরে বাওয়ার সময় বেধন, তেমনি বাইরের থেকে এসে সকলের আগে ক্রোর ক্রাকের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

আরমেনের ভাড়া নেমে সেলাম নাচে। সময় অর্ধে দেখে রেককাস্টের জন্য গেলাম ইন্টারিস্টের কাছাকাছি রেস্টোরাঁয়। এই হোটেল একাধিক রেস্টোরাঁ রয়েছে। আরমেন বললেন, লেট আস টাই জানিবার সিঁড়ি। এই রেস্টোরাঁয় বাওয়া আমার পক্ষে লোকসানের। বায়া ভোজনবিলাসী তাদের খুব উপযোগী। পেটচুজির ব্যাপার। বতখুশি খান, দাম বেশী দিতে হয় না। ব্রেকফাস্ট ১ রুবল ২০ কোপেক। কত আইটেম, হিসাব করাই মুশকিল। কলকাতায় আমাদের অফিসের ক্যানটিনে গিয়ে সত্যকর্ণী শরদিন্দু মাঝে মাঝে বাঁদানাখাবকে বিপদে

ফেল। আহ! শরদিন্দু যদি এখানে আসতে পারত! ছি দুই ধরনের বুটি তো আছে, রয়েছে ছি সুইট ওফ্রটার সর্বস্ত। আর এই পেটচুজির খাওয়ায় সসেজ, স্যালাড, ভেজিটেবল তিন চার রকমের, চিকেন, পোক, চিড়ি, চাঁদা ও চেলা মাছ ধরনের দুইরকম মাছ, কেক প্যাস্ট্রি হাফ ডজন। গুণে দেখি মোট ২১টি আইটেম। এছাড়া আপেল বা আনারসের জুস এবং চা বা কফি। কুপন কিনে স্ট্রেট নিচে নিজের পছন্দমত খাবার তুলুন। লম্বার কিছু নেই। সবাই নিচ্ছেন। দেখা কি শূণ্য শরদিন্দুর? খাওয়ার মাঝে আরমেন ইনটারিস্টে গিয়ে থবর নিলেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বাস ছাড়বে।



সময় হয়েছে জনরত শরদিন্দুর কবি বাসকর্তার দৃষ্টি

আসল ব্যাপারটা একটু, অন্য ধরনের। কলকাতায় মিনিবাসগুলো ভিটার আগে পর্যন্ত যেমন শাট নিয়ে থাকে, প্রাণ্ডি মুহুর্তে ছাড়ানি ভাবটা দেখার তেমন অনেকটা। প্যাসেঞ্জার কুল হলেই এদের টারিস্ট বাসটি ছাড়ে। আমরা বাসে গিয়ে বসতেও দুটি সিট খালি ছিল। এলেন দুজন। দম্পতী। বেশ বয়স্ক। এই হোটেলেরই উঠেছেন। এসেছেন রোম থেকে।

কলকাতার যেমন টেস্টের সময় ক্রিকেটারদের নিতে ডিলান্ন বাস দেখি এই টারিস্ট বাসও অনেকটা তেমন। তবে লম্বায় একটা বেশী। প্রচণ্ড ঠান্ডা প্রত্যেকটি জানালা বন্ধ। মোটা গ্লাসে ঢাকা। কুললেই হুহু করে ঠান্ডা হাওয়া ঢুকবে। জাইভারের পিছনে ঘোষকা। সামনের দরজার ধারে ডানদিকে প্রথম সিটে আরমেন ও আমি পাশাপাশি। ঘোষকা উঠে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ওভারকোট খুলে রাখলেন। কুলসেন কার-এর টুপি এবং গ্লাভসও। ইনিও মোহারা চেতাবার। কুর্সী তো হবেনই। কিন্তু এমন সোনালী চুল এই প্রথম চোখে পড়ল। মেয়েদের বা পুরুষদের চুল আর দেখছিই বা কোথায়। সকলেরই মাথায় টুপি তো। একটা বিষয়ে এদের তারিফ করতেই হয়। এরা পোশাক পরে আর রক্তির জন্য। এমন পোশাক পরে না বার মাথামে সেক্সকে প্রকাশ করা বার। অতঃপর মেয়েদের কোনো পোশাকই কিছু সেক্সে নয়। ঘোষকা বা গাইড নিজের নাম বললেন। লক্ষ করালিয়ার ঠিক হাত, মুখ, অলংকার ইত্যাদি। দুহাতেই নকালো লম্বা লম্বা, গাঢ় লাল নেলপালিশ লাগিয়েছেন। ওর সঙ্গে ম্যাটিং লিপস্টিক। মিন্ট কণ্ঠস্বর। চমককার ইংরাজি বলেন। বলছিলেন রুশী, ফ্রেন্স ও লাতিন। বাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জানালেন :

The rare beauty of this northern city, stretching along the banks of the Neva River under the inclement Baltic skies, has been sung by poets and perpetuated by painters; it is famous for its "white nights", arrow-straight avenues, shady parks, innumerable bridges and canals.

(ক্রমশ)

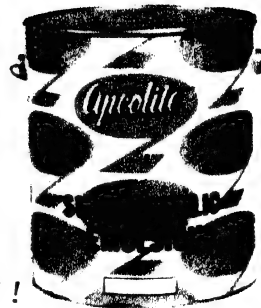
ঋতুরঙ



Adroit-2068 BEN

## গীত

সূর্য যেমন সূর্যাস্থীর টানে  
তুমিও তেমনি টানা মোরে তব পানে  
দিবসরজনী বিরহ দহন ছালা  
তবু আছ মোর অন্তরে তুমি আলা  
জানি একদিন শুনি হৃদয়ের বাণী  
সব ভালে তুমি বুক নেবে মোরে টানি !



প্রতি ঋতুরঙ—  
অ্যাপাকোলাইট  
সুপারঅ্যাক্রিলিক  
ইমালশান



এনিম্যান  
পেন্টস



১১ এপ্রিল ১১

প্রীতম জিজ্ঞেস করে, তুই কেথেকে শিখলি এ সব?

শতম লজ্জা পার, শিখিছি, শিখিছি। দেখ না তোমাকে ভাল করে তুলবই।

তোমার মনের জোর আছে। আমার নেই। জোর-টোর নয়, আসলে তোমার ইচ্ছে নেই। তুমি কি কিস্তি করে না, যার মনে যত পাঁচ-ঘেঁচ, যত কুটিলতা জটিলতা তার তত ব্যারাম? থামোনা কারো ব্যারাম হয় না। রোগের প্রথম অঙ্গুর গজার মনে। তারপর তা শরীরে ছুটে বোয়।

মলান হেসে প্রীতম বলে, আমার মনে বোধ হয় অনেক পাঁচ-ঘেঁচ, অনেক জটিলতা কুটিলতা! মাথা নেড়ে শতম বলে, তা নয়। তবে তোমার একটা রোগ রোগ বাতিল ছিল দাদা। শরীর নিয়ে তুমি বড় বেশী ভেবেছো।

তা ভেবেছি। তোমার কথাটা ভাবতে ইচ্ছে করানি যে, এই শরীর মানসকে দেওয়া হয়েছে কাজ করার জন্য। বাসিয়ে রাখার জন্য নয়। যত শরীর শরীর করবে তত আজ চলকুনি কাল পচিড়া, পরশু আর একটা না একটা কিছু এসে ধরবেই।

শরীরকে ভুলে যেতে বলছিল? একদম। গতর পুষে রাখার জন্য তো নয়। মনের ওপর শরীরের সব ভালমন্দ। মনটাকে তাজা রাখা, শরীর উজ্জ্বল হবে। আর বসে বসে মরণের চিন্তা করো, শরীরে তার ছায়া পড়ে যাবে। শরীরকে কখনো বিশ্রাম দিও না। খাটো, কেবল খাটিয়ে যাও।

প্রীতম হেসে বলে, বিশ্রাম নেবো না? নেবে। কেন নেবে না? তবে শরীরের বিশ্রাম কেনম জানো?

কেন? তুমি তো অ্যাকাউন্ট্যান্ট। রোজ হিসেবনিকের করতে করতে যখন ক্লান্তি আসে তখন যদি হঠাৎ একটা টেবিল টেনিস খেল বা কবিতা লেখো, কি একটা বাগান করলে, সেইটাই বিশ্রাম। রোজকার অভ্যস্ত কাজ ছেড়ে অন্য কাজ করলে শরীর বিশ্রাম পায়।

হুমোবো না? হুমোবে। দিনে রাতে চার ঘন্টা। বলিস কি? ডাক্তাররা যে আট ঘণ্টার কথা বলে।

বলে তো কি? শরীরের জন্য চার ঘন্টা ছুটি যথেষ্ট। দেখ না কুলি-লাইনের পশ্চিমারা সারা দিন মাল বস, অসুখের মতো খাটে। আবার কত রাত

অবধি জেগে রাইয়া হো' গান গায়। আবার হোর-হাতে কাজে বেরিয়ে পড়ে। কখনটা ছুঁমোর বলা তো। তারা বেঁচে নেই? তোমার আমার চের টের ভালভাবে বেঁচে আছে। ঐ যে চার ঘন্টা ছুঁমোর সে-ছুঁম গভীর, নিশাট, গায়ের ওপর দিয়ে মোর হোটে গেলেও টের পাবে না তা জানো?

জানি। ভুল বললাম? প্রীতম মাথা নেড়ে বলে, না। তবে এত সব ভাল করে কখনো লক্ষ করিনি।

এখন শোকে করো। শরীর নিয়ে ভেবো না। রোজ সকালেই এ রকম কিছু উজ্জীবক কথাবার্তা বলে শতম তার মোটরসাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যায়। দুধের গ্লাস হাতে আসে যা। শরীর নিয়ে কখনো কিছু বলে না। কথাবার্তা অনেকটা করে গেছে। দুধের মধ্যে অনেকটা সর তুলে নিয়ে অহস। পাশে বসে চামচ দিয়ে ছুটে ছুটে সরটাকে দুধের মধ্যে মেশাতে থাকে। এতে নাকি বেশী পোষ্টাই।

কিস্তি এ সবই অনভ্যস্ত অস্বাভাবিক লাগে প্রীতমের কাছে। বিলুর সপ্ন থেকে থেকে ঐ এক রকম অভ্যাস তৈরী হয়ে গেছে। বিলু, কোনোদিন তার দিকে বিশেষ নজর দেননি, মনোযোগী হয়নি। তবে মনকে সরিয়ে রেখে হৃদয়মহীন কত'বা করে গেছে। আর তাইতই অভ্যস্ত হয়ে গেছে প্রীতম। এখন তার প্রতি কেউ বেশী মনোযোগ দিলে, তাকে কেউ বেশী ভালবাসলে ভারী অস্বস্তি বোধ করে সে। মাকে মাকে বাড়ির লোকের অতি আগ্রহের অভ্যাসের সে বিরক্ত হয়। রেগেও যায়। মা বরাবরই তাকে খুব ভাল বোঝে। তার মুখে দেখেই মনের ভাব এঁটে নিতে পারে। তাই প্রীতমের জন্য আছা টিহু, সব চেয়ে কম করেছে মা।

সর খুঁটে দুখটা খায়ে নীরবে মা একটা তেল-পড়ার বোতল নিয়ে এসে হাতে পারে মালিশ করে দেয়। প্রথম প্রথম বিক্রির লাগত, মাঝে মাঝে চাইত না প্রীতম। আজকাল হাল ছেড়ে দিয়েছে। তার অসুখের প্রথম দিকে অহসের এক কলিগ গেরিগণ বোস হাবড়ার এক ফকিরের কাছ থেকে বার দুই মস্তশুত তেল এনে দিয়েছিলেন মালিশের জন্য। সে তেল আবার আগাগোড়া হাতে করে বয়ে আনতে হত কোথাও রাখার নিয়ম ছিল না। গোরিগণাবাবু, ভাড়ির টেনে যেমে চুপসে কন্ট করে সে তেল আনতেন। বিলুকে পই পই করে ব্যাকরে দিতেন, কি করে মালিশ করাত হবে। বিলু সে তেল রেখে দিত। কখনো মালিশ করনি। একদিন প্রীতম বলেছিল, গোরিগণাবাবু কন্ট করে তেলটা আনলেন, ফেলে রাখবে?

ও সব বৃত্তান্ত কি দিয়ে কী হবে? তেলপড়ার অসুখ সকলে এত লোক ডাক্তারদের কাছ যেত না। খুবই যুক্তিপূর্ণ জবাব। অবশ্য প্রীতম নিজেও তেলপড়ার গণে বিশ্বাসী নয়। কিস্তি তার মন বলত, আমি যদি তোমার প্রিয়জনই হয়ে থাকি তবে আমার এই কঠিন অসুখের সময় তুমি লজিক মেনে চলতে পারো কি কর? মানস যাকে ভালবাসে তার একটা কিছু হলোই সে পাগল হনো হয়ে যায়। তখন যুক্তি থাকে না। বিবাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন থাকে না, সে তখন ডাক্তার বাদা, তাবজি তাগা মাধুলি জলপড়া মাথাখোঁড়া ধর্না দেওয়া সব করে করে বেড়ায়। ভাতের কাজ না হোক উষ্মণ আর ভালবাসার একটা মমতামাট প্রকাশ তো ঘটে। বিলুর ঠান্ডা মৃদুশ্রী আর ক্ষুরধার বৃষ্টি তার সামনে কচুকাটা হয়ে গেল প্রীতম। কিন্তু বিলু জানে না, সংসারে সব লড়াই জিততে নেই।

তেলের প্রথম শিশিটা কৌতূহলভরে নাড়া-চাড়া করতে গিয়ে ডেঙ ফেলেছিল লাবু। গোরিগণাবাবু, খবর পেয়ে আবার তেল এনে ছিলেন। দ্বিতীয় শিশিটা আবার তাকে ভোলা রইল। মাস দুই পরে একদিন শিশিটা নজরে পড়ার গোরিগণাবাবু প্রীতমকে একান্তে বললেন, আজকালকার ওয়াইফরা

কেনম বলুন তো মশাই? এদের কাছে স্বামী কি কোনো ফ্যাক্টরই নয়? আমি বলে, গোলাম আপনাকে, যদি বাচত চান তা হলে নিজের মায়ের কাছে চলে যান।

এখন মা পায়ের গোড় থেকে উরু পর্যন্ত টান টান করে তারী এবং দু'গুণ্ড তেলটা মালিশ করে দিচ্ছে। মুখে কথা নেই। মা জানে, প্রীতমের মেজাজ এখান এসে ভাল থাকছে না। এখানে মন বলতে সময় নেবে। এ জীবনে তো তার বহুকাল অভ্যাস নেই।

নিষ্ঠুর হোক, শীতল হোক তবু, বিলুর প্রতি এক চোখভরা তীব্র আকর্ষণ আজও আছে প্রীতমের। শব্দ আছে নয়, এখানে আসার পর তা আবার উড়ি ছেড়েছে। সব বাঁবি-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে এসেছিল, তবু মন থেকে বিসর্জন দেওয়া গেল না। তেমনি বকে ঢেউ ধরে লাবুর কথা মনে হলে। সারাদিন ভবানীপুরের সেই ঘরটার ছবি চোখে ভাসে। নাকে আসে লাবুর গায়ের গন্ধ। বিলুর স্পর্শ টের পায় যেন শরীরে।

প্রীতম ডাকল, মা।

শতমকে বলা, আবার আমার কলকাতার দিঁয়ে আসুক।

ভাল হ, বাঁবি। আমার এখানে খুব ভাল লাগছে। কিস্তি কলকাতার থাকলে ঘরে বসেও আমি কিছু কাছ-টাগ পাই, রোজগার করতে পারি।

মা কথাটার কোনো জবাব দিল না, কিস্তি আপন মনে বলতে লাগল, বউ-ময়ের জন্য মন তো কেনম করবেই। কিস্তি সেখানকার যা অবস্থা শুন —কে কাকে দেখে।

প্রীতমের এ সব কথাও ভাল লাগে না। চোখ ফিরিয়ে সে জানালার বাইরে কলকে ফুলের গাছটার দিকে চেরে থাকে। ঘন সবুজ পতায় ভোঁপ ফেলেছে জানালাটাকে। তার ওপাশে শরতের নীল আকাশ জড়ে অক্ষরস্ত রোয়।

প্রীতম চুপ করে থাকে। তেল মালিশ করা শেষ হলে মা আবার নিঃশব্দেই চলে যায়।

বাড়ির লোক এ-ঘরে কমই আসে। প্রীতমের বিরক্তি ও বদমেজাজ সবাই লক্ষ করেছে। এমনতেও প্রীতমকে সবাই বরাবর একটু সমঝে চলে। বাবা একসময়ই ঘরে ঢেকে না। মেজো বোনটার সঙ্গে তাব ছিল খুব এক সময়ে। সে মাকে মাঝে আসে, গল্প করে বসে বসে। কিস্তি অস্লেই ক্লান্তি আসে প্রীতমের। তার কেবল ভবানীপুরের বাসার কথা ভাবতে ইচ্ছে করে, চুপচাপ শূন্য থেকে।

লিলুকে একটা পেন্সে সংবাদ দিয়েছিল প্রীতম। তারপর বিলুর ভিন-চারখানা চিঠি এসেছে। প্রীতম জবাব দেননি। মেজো বোন ছবি এসে বহুবীর বলেছে, বউদিকে চিঠি দেবে, দাদা? দিলে বলা, লিখে নিচ্ছি।

প্রীতম মাথা নেড়ে বলেছে, তোরাই দে। আমার ইচ্ছে করছে না।

নিজে চিঠি না লিখলেও বিলুর চিঠির জন্য উৎকণ্ঠা থাকে সব সময়ে। আজকাল বিলু বাবাকে বা শতমকে বা ছবিবেই চিঠি দেয়। বেশ ঘনঘন দেয়। প্রীতমের সব ধরনের খুঁটিয়ে জ্ঞাতে চায়। ওরা কী জবাব দেয় তা জানে না প্রীতম। জিজ্ঞেস করে না। কিস্তি বিলুর চিঠি যখন আসে তখন বক্তা কেঁপে ওঠে উত্তেজনার, আবেগে।

লিলুর প্রতি নিজের এই অম্ম ভালবাসা দেখে অথাক মানে প্রীতম। ঐ ঠান্ডা, নিরন্তর যুক্তিবাদী নিষ্ঠুর মহিলাকে এতকাল ধরে কি করে ভালবাসছে সে?

নিজেই প্রশ্ন করে প্রীতম, ও যে অরুণের সপ্ন...তোমার ফেরা করে না, প্রীতম?

নিজেই জবাব দেয়, করে তো! শিউর উঠি, কেঁপে উঠি ফোয়ারা লজ্জায়। তবু, অম্ম অবাধা এক মমতা কেন যে মনের মধ্যে টলটল করে।



# “আরাধনা”



স্বর্গীয় পরিবেশের শ্রুতিপূর্ণ পদ্মা...

## KVIC ধূপকাঠি

নানান মধুর সৌরভে পা ওড়া যায়।

- অম্বর ডিলাক্স ● ভক্তি ● আরাধনা
- সমর্পণ ● শ্রমিষ্ঠা ● প্রার্থনা
- এছাড়া KVIC র অন্যান্য ধূপের ডালি— সপ্তাহের বিভিন্ন দিনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সৌরভে ভরা নানান ধূপের অপরূপ স্যাক।
- আর ইয়া, কে ডি আই সি'র নিজস্ব সৃষ্টি বিশেষ ধরনের ধূপ, যার উগায় বাতাস পাতার দলুন আপনা থেকেই জলে— অঙ্গুর আর উর্বসী।

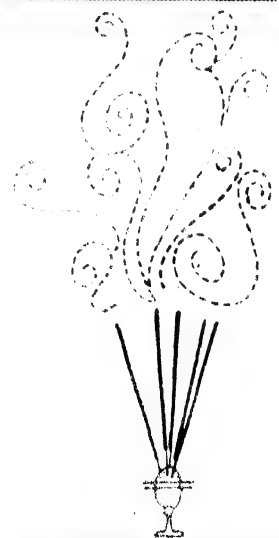


ডায়েরিটোরিট অফ মার্কেটিং (ম্যাচ ডিভিসন),

খাদি ও প্রামোজোগ কমিশন,

কোম প্রামোজোগ কেন্দ্র, শিম্পালী, বোরিভলী (পশ্চিম), বম্বে-৪০০ ০২২

টেলিফোন: ১১-৪২২৩, গ্রাম: MATCHDEZIN. ফোন: ৬৬৭৭২৬.



3 BROTHERS/KA, 1880 Beng

নিজেকে বিধির ফেল, প্রীতম। অব্যাহত রাখা  
দশকে। কখনো কখনো কারো না, নয়ম হারা  
নাহো।

বিধির গৌরব। জলজিহ্বা। টানটান রাখছি  
নিজেকে। তবু স্পঞ্জের মতো যেমন লুকোনো  
নিংড়োলেই বেরিয়ে আসে। এই ভালবাসাও তেমনি।  
অবিশ্বাসী শ্রীকে ভালবাসা কি ঠিক, প্রীতম?  
শোনো শোনো। আমার লাভ যদি শত  
প্রণয়ও করে তবু কি আমি তাকে না ভালবেসে  
পারি? বলা! যাই করুক তবু মনে হবে, ও যে  
আমার লাভ! আমার ছোট লাভ! বিলুর প্রতি  
আমার ভালবাসাও অবিকল সেরকম। যাই করুক,  
যমনিই হোক ও যে বিলু।

তোমার বিলু?

হতাশার মাথা নেড়ে প্রীতম বলে, তা বলছি  
না। বিলু কার তা কি করে বলব? কিন্তু মন!  
মনকে কি করে মেরে ফেলা যায় বলা তো। বিলুকে  
আমি এক ফোটাও কখনো করিনি জানো? তবু,  
বিলুকে মন থেকে তাড়াবোই বা কি করে, যার না  
হয়!

কিন্তু মড় জঘনা যে তার পাপ!

মানুষ কখনো পাপ থেকে মুক্তি পায় না, না?  
কিছুতেই শূন্য হয় না? মৃত্ত হয় না?  
উত্তোজিত প্রীতম কাত হয়ে দু হাতে ডর দিয়ে  
উঠ বসে বিছানায়। সারা গায়ে ঘন তেলের প্রলেপ।  
পায়জামাটা তেলে ভিজ্ঞে সপসপ করছে। গায়ের  
বুকখালা শাটটা নিংড়োলে বোধ হয় এক-পো  
তেল বোরায়ে।

রাগের গলার প্রীতম ডাকে, মা! মা!

ছবি দৌড় আসে। পরনে ইস্কুলের খয়েরি  
পাড় শাড়ি, চুল অঁচড়ানো, মুখে পাউডার। বলল,  
কি দাদা?

দেখ তো, কি বিচ্ছিন্ন তেল মাথায় গেছে।  
শাটটা মুছিয়ে দেওয়ার কেউ নেই।

আমি দিচ্ছি, দাঁড়াও।

মা গেছে কালীবাড়ি।

থাক সে, তুই ইস্কুলে যা।

কিছু হবে না, মুছে দিচ্ছি দাঁড়াও। বলে  
দাঁড়ে গিয়ে একটা গামছা আনে ছবি।

লজা পেয়ে প্রীতম হাত বাড়িয়ে গামছাটা  
নিরে বলে, তুই যা, আমি পারব।

ছবি সিঁদাডরে দাঁড়িয়ে থাকে একটু। আর  
গাপচারি করতে সাহস পায় না। দাদা হয় তো  
রগে যাবে। বস রেগে যায়।

আসছি তা হলে, দাদা। বলে ছবি চলে যায়।  
গামছাটা পায়ের কাছে মেঝের ফেলে দিয়ে চুপ  
করে বসে থাকে প্রীতম। বৃকের মধ্যে এক অক্ষম  
রাগের মাথা খোঁড়াখুঁড়ি। অভিমানের বান ভাসিয়ে  
নিজেকে তাকে।

গাড়োয়ান যেমনভাবে তার দৃষ্ট অবাধা গরকে  
সমিলায়, চাবুক মারে, পঁচনের গড়ো দেয়, ঠিক  
তেমনিভাবে নিজেকে লক্ষ করে প্রীতম বলে, র  
রা! শত হও। শত হও। তুমি কখনো এ রকম ছিলে  
না। তুমি এ রকম নও। মনে করো, পৃথিবীতে

তোমার কেউ নেই। ইউ আর এ লোন ব্যন্ডাভ।

কিন্তু এই মনের খেলা। বেশীকণ খেলতে  
পারে না প্রীতম। বড় ক্লান্তি আসে, হতাশা ধৈর্য-  
হীনতা আসে।

দুপুরের শতম খেতে আসে। একবার টীক  
মারে ঘরে।

দাদা।

আয়।

ঘুমোওনি?

না।

বড় বেশী রেন্টলেস দেখছি তোমাকে।

না, না ভাল আছি।

ভালই তো আছো। তবে কেন থাকে কলেছো,  
কলকাতা যায়ে!

জাব্বিলায়, চোটা করলে হয় তো এখনো  
অডিটের কাজ করতে পারি ঘরে বসে। সময়ও কাটবে,  
কিছু টাকাও আসবে।

করবে? তা তার জন্য কলকাতা কেন,  
এখানেই কাজ দেবে।

দিবি? দে না!

শতম দুপুরেই একগালা কাগজপত্র সমেত  
গোটা ভিনেক ফাইল প্রীতমের চৌকির পাশে একটা  
টেবিল এনে রেখে গেল। সপ্তা রেখে গেল একটা  
টেপ-রেকর্ডার আর অনেকগুলো গানের ক্যাসেট।  
বলল, হিসেব করতে করতে টার্ড লাগলে একটু  
গান শুনো। তুমি তো একটু আধটু গাইতেও  
পারতে। গাও না কেন?

দূর, বরং হিসেব করলেই ভাল থাকবে।

যা খশি করো। শব্দ মরার কথা জেবো না।

প্রীতম অনাবিল হেসে বলে, আচ্ছা তুই যা  
তো।

শিলিগুড়িতে বেশ শীত পড়ে গেছে এই  
শরতের শুরতেই। দুপুরেরও গায়ের একটা কিছ  
দিত হয়। পায়ের জানালাটা দিয়ে রোষ আসে।

প্রীতম নিজের দপ্তর খানিকক্ষণ ফাইলের  
কাগজপত্র দেখল। ছক কেটে অনেকগুলো এনট্রি  
করল। আস্তে আস্তে আক্যাউন্ট্যান্সিস পুরোনো  
নেশা খুব পেয়ে বসল তাকে। বিলু হলে বাধ্য  
দিত। এখানে বাধ্য দেওয়ার কেউ নেই। দরজা  
ভেঙেনো। একটানা অনেকক্ষণ কাজ করে পেল সে।  
শতমের ব্যবসার কাগজপত্র থেকে সে জানতে পারল,  
বন্ধের কম করেও শতম গ্রিশ থেকে চাবিশ হাজার  
টাকা রোজগার করে। জেনে ভারী খুশি হল সে।

বিকেলের দিকে ক্লান্তি এল। চোখ বুজে  
শুরে বিশ্রাম নিতে গিয়ে হঠাৎ শতমের সেই কথাটা  
মনে পড়ল, অভ্যস্ত কাজ ছেড়ে অন্য কাজ করলে  
মানুষের বিশ্রাম হয়। জেবে একটু অবিশ্বাসের  
হাসি হাসল সে। তবু একসপেরিমেন্ট করতে  
উঠেও বসল সে।

গান গাইবে? গাইত এক সময়। অল্পস্বল্প।  
কতকাল যায় না! ভুলে গেছে কথা, সুর।

বালিশে ঠেস দিয়ে চোখ বুজে নীচ ফেলে  
সে গুনগুন করল কিছুক্ষণ। অনেক বিস্ময়িত আর

অনভ্যাসের শিলিগুড়ি পড়েছে গলার। তবু কিছুক্ষণ  
চেষ্টার পর সে মোটামুটি সুরের ওপর রেখে গাইতে  
লাগল, সোলাও সোলাও সোলাও আমার হৃদয়।  
আচ্ছা! ক্লান্ততা ধীরে ধীরে কেটে গেল।

শতম অনেক রাতে এসে হানা দিল ঘরে।  
বলল, দেখি কী করলে সারাদিন!

কাগজপত্র উল্টেপাল্টে দেখে বলল, বা! এ  
খু অনেকটা হিসেব করে ফেলেছো। বলে খানিক  
চুপ থেকে শতম বলে, তোমাকে খাটাচ্ছি জানলে  
বউদি আমাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু না খাটলে  
যে হবে না। মানুষ নিজের ক্ষমতা টের পেলে বৃকত  
সে কতখানি। খাটতে খাটতে শরীর যখন ভোগে  
পড়ে, হাত-পা চলতে চায় না, তখনো ইচ্ছে করলে  
জোর করে মানুষ ক্যাটিং লেয়ার পেরিয়ে যেতে  
পারে। তখন দেখা যায় ক্লান্তি কেড়ে সে আবার  
বিশ্রাম কাজ করছে।

ভোর আঁড়ি আমিই করে দিতে পারবো।

ওঁও। তুমি থাকতে আমি অন্যের কাছে  
খামোকা যাবো কেন?

আগের রিটানের রেকর্ডটা দেখলাম। সব  
কিছুই রিটানে দেখান কেন? অনেকগুলো এনট্রি  
না দেখালেও চলত।

আমি কিছুই লুকোই না।

প্রীতম মাথা নমুল, বৃকছে। শতম আর  
পটজনের মতো তো নয়। সামান্য একটু অহংকার  
বৃকের পালে এসে লাগে।

শতম বিছানায় বসে বলে, রোজ রাতে  
খাওয়ার পর আমি মা ছবি মরম রূপম পট্টক  
মিলে আডা দিই। তা জানো?

না তো! টের পাই না।

তোমাকে কেউ ভরে আডায় ডাকে না।

প্রীতমের অবশ্য এই পারিবারিক আডা ভাল  
লাগার কথা নয়। একা ঘরে বসে ভবানীপুরের  
বাসার স্থায়ী অঁকড়ে গুমরে গুমরে উঠতেই সে  
বোধ হয় আনন্দ পায় বেশী। তবু ভগ্নভাবে সে  
বলল, ভয়ের কি? ডাকলেই পারতিস!

ডাকব না। থাকে থাকে সবাই মিলে তোমার  
ঘরেই চলে আসবে।

কেন তো।

আজ গান গেরেছিলে! ছবি বলছিল, দাদার  
গলার এখনো কী সুর!

যেত!

বউদির একটা চিঠি এসেছে আজ। দেখেছো?

না তো, কেউ দেয়নি আমাকে।

তোমাকে লেখা নয়। বাবাকে লেখা।

কি লিখেছে?

বউদি নভেমবরের আগে আসতে পারবে না।  
ডিসেম্বরও হতে পারে।

ও।

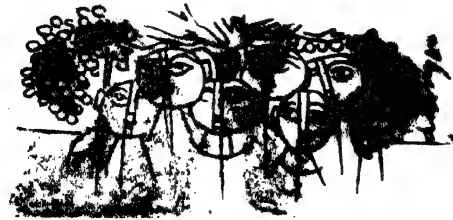
এ মাসেই আসার কথা ছিল।

আর কোনো খবর নেই, না?

না।

প্রীতম বসে ছিল। আস্তে আস্তে শুরে  
চাখ বৃকল।

(তমস)

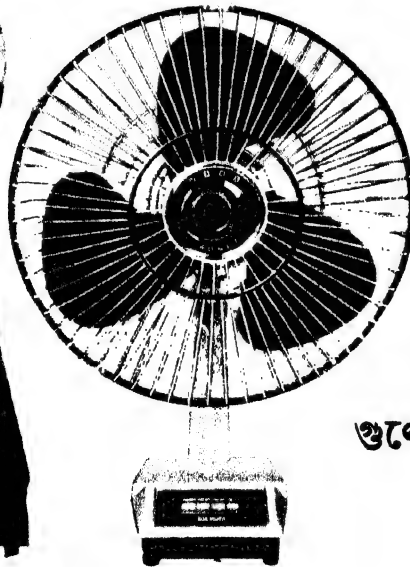


# উষা

শোভন সুন্দর কারিগরী  
পরিপূর্ণ গড়ন

বৈশিষ্ট্য :

- মেসিনে ওয়াইণ্ড করা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মোটর দ্বারা পরিচালিত বলে এই পাখা বহুদিন নিঃশব্দে ও নির্ঝঞ্ঝাটে চলে।
- হাওয়া খেলানোর উপযোগী সূক্ষ্ম গড়নের বেড আরও বেশী বাতাস সঞ্চালিত করে।
- বিভিন্ন ধরনের ও নানারঙের চোখজুড়ানো মডেল
- ২৫০০ এরও বেশী ডীলার সার্ভিস কেন্দ্র।
- ৬০টিরও বেশী দেশে রপ্তানী করা হয়।



উষা

গুণের মহান ঐতিহ্য

## বিজ্ঞান

ধূলি বাড় বাড়ছে

মে মাসের গোড়ায় বর্ষিত এবং গৌরিখপুর জেলার উপর দিয়ে প্রচণ্ড ধূলি ঝড় বয়ে গেল। এই ঝড়ের গতি ছিল ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার। প্রাথমিক সংবাদে জানা গেছে, এই ধূলি ঝড়ের মধ্যে পড়ে ছয়জন প্রাণ হারিয়েছে। যারা গেছে প্রায় একশ'র মত গবাদি পশু। সাম্প্রতিককালে এমন প্রলম্বকর ধূলি ঝড় আর কখনও দেখা যায় নি।

জলৈক ভূতভোগী প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণঃ সকাল থেকেই আবহাওয়াটা মেঘন বেনে অথমে ছিল। গন্ত কয়েকদিন ধরে চলছিল প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ। খরায় পুকুর ডোবা খুঁটতে। জলের জন্য চারিদিক হিঁকার। আকাশে মেঘ নেই। কয়েকদিন ধরে বিবেকের দিকে আকাশের রঙ যেমন মনে তামাতে মনে হচ্ছিল। অবশেষে সেদিন—বিজল শুন, হওয়ার মধ্যে সঙ্গে মনে হল চারিদিক-অন্ধ ফোলাটে হয়ে আসছে। পরক্ষণেই অন্ধকারে ছেড়ে গেল চারিদিক। প্রথমে মুন্সুবাতাস। তারপর ঝড়। দিগন্ত বিভ্রান্ত ঘরের উপর দিয়ে বাক্স স্খাব বাড়িয়ে প্রচণ্ড সেই ঝড় হুটলে। গ্রান কুল গ্রাবের পর গ্রাম। আমার চোখের সামনে ছুটে যাচ্ছিল একমল গরা। ঝড়ের দাপটে তাদের মধ্যে একটি ছিটকে পড়ে গেল। তারপর হওয়ায় যেমন কাঙ্ক্ষ ওড়ে, ঠিক সেই বকম ঝড়ের ধাক্কা; তার দেখটি উড়ে চলল শক্ত মাটির উপর দিয়ে। চোখে আমি তখন অন্ধকার দেখছি। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, ধূলিকমা আমার দু চোখ জ্বালা করছে। হঠাৎ মত ধূলিকলা এসে বিধেছে আমার চোখে। অন্ধর ভেতর ধূলিকণা, গলায় গিয়ে বিধছে। কানতে শব্দ করেছি আমি। মাথার চুলে শব্দ মাটি আর ঘাটি। শ্বাস বন্ধ হওয়ার মত অবস্থা। মাথের মাথা দিয়ে যাচ্ছিল। ঝড়ের ধাক্কা ইঠক মুখ থবড়ে পড়ে গেলো। আর ওই ভাবেই পড়ে রইলাম বেশ কিছুক্ষণ। অবশেষে ঝড় কমলো। ভয়ে আমার শরীর তখনও কাঁপছে। পরে মনে হয়েছে, আমি ঝড়ের ধাক্কা পড়ে সিঁপিছলাম বলেই বেঁচে গেছি। নইলে দম বন্ধ হয়ে হকাত মারা যেতো।

বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, বাস্তব এবং গোয়েন্দাধর্ম জেলার এই ধূলি ঝড় একটা বড় রকমের বিপদ-সংকেত। ধূলি ঝড় এদেশে এখন কোনও নতুন ঘটনা নয়। গরমের সময় রাত-সন্ধ্যার খর মরু, হুঁমি এলাকায় প্রায়শই ধূলি ঝড় ওঠে। উত্তর ভারতেও কোন কোন অঞ্চলে প্রচণ্ড ধূলি ঝড় হয়ে থাকে। কিন্তু গত দুই দশকে ধূলি ঝড়ের বিস্ফূর্তি বেড়েছে। উত্তরপ্রদেশ, পাজ্জাব, হারিয়ানা, বিহার, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশের ব্যাপক এলাকায় এখন মরু, হুঁমির মত অবস্থা। এইসব অঞ্চলে একটু বাতাস উঠলেই ধূলা উড়তে থাকে। বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার পরিমাণও বেড়েছে অনেক। রাজস্থানের খর মরু, হুঁমি এলাকায় দৈনিক ৩০০ টনের মত ধূলিকণা বাতাসের তোড়ে স্থান থেকে স্থানান্তরিত হয়ে পরিবাহিত হচ্ছে। ধূলি ঝড় মধ্যপ্রদেশের কটন সপেহে নেই। কিন্তু ইন্দানী মানসেবো অসুদর্শিতার দরুনও ধূলি ঝড় ব্যপক।



নানা কারণে বাতাসে ধূলিকণা জমতে পারে।  
এদের মধ্যে সবচেয়ে নাকিঁসি হওয়া আশেন্নাগিরি  
বিশেষ্য। পৃথিবীর বৃহৎ ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য  
আশেন্নাগিরি। বড় বড় এক-একটি আশেন্নাগিরিতে  
স্বল্প বিশেষ্য ঘটে, তার গহ্বর থেকে তখন বেরিয়ে  
আসে প্রচুর ভষ্মকণ। বিশেষ্য প্রচণ্ড ধাক্কা  
ডাক্কা উৎসর্গ করে শ্রোতৃবিশেষ্য পর্যন্ত উঠে যায়  
সেখানে নিম্নতর বেষ্ট বাতাস বয়ে গেছে, সেই বাতাস  
আশেন্নাগিরির ভষ্মকণা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়।  
এই ভষ্মকণা অথবা ধূলি কখনও কখনও মাসের

মলে ব্যাভাসে ভেসে থাকে এমনও দেখা গেছে।' বৈশ্বনাথ ধরুন, জাফা এবং সুমারের অন্তর্ভুক্তি রক্ষাকর্তারায় বিবেচনার। ২৬ আগস্ট, ১৮৮০ পর্যন্ত রক্ষাকর্তারাকে সবাই দেখোঁছিল একটি স্থানিগের মত। স্থানিগটি ২৬০০ ফুট উচ্চ একটি পাহাড়ের মত সমুদ্রের বৃক্ক মাথা উপর করে দাঁড়িয়েছিল কতকাল, কেউ তার ববর রহস্য জানে। অনেকেই বহুতোমার পরে, সেয়ে স্থানসালে ছিল একটি স্তম্ভে অবস্থানগারি। ২৬ আগস্ট প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটলো রক্ষাকর্তারায়। বিস্ফোরণের ধরুন স্থানিগটির একটি অংশ অদৃশ্য হয়ে গেল। তার গহ্বর থেকে ভস্মকণা ছড়িয়ে পড়লো উদ্ভাসিকালে। এই ভস্মকণা পৃথিবীর বৃক্ক অধঃস্থিত হতে সমর গোঁড়োছিল প্রায় দুই বছর। অবহাওয়া বিজ্ঞানীরা মনে করেন, উদ্ভাসিকালে আভ্যন্তরীণ দ্বালকণ জ্বার ধরুন পৃথিবীর অহাওয়া কখনও কখনও অস্বাভাবিক রকম চাউদ হয়ে থাকে।

বাভাসে দ্বিলিঙ্গা হুইয়ে 'দেওয়ার ব্যাপারে  
মানুষের ভূমিকাও কম নয়। জনসংখ্যা বাড়ছে। অজ্ঞান  
মানুষের মধ্যে গ্রাস যোগোনার জন্যে তাই চেষ্টা জারি।  
বনজ গুল কেটে ফেলা হচ্ছে। কেটে ফেলার পর গছের  
গুড়ি এবং লজপাতা বা কিছু পড়ে থাকে তাতে  
আমুন ধিয়ে দেওয়া হয়। সেই আমুনে গুড়ি এবং  
লজপাতা পড়ে ছাই হয়। আমুনে জারি উপায়ের  
বতাস গরম হয়ে গরমচলন পদ্ধতিতে সেই ছাই  
উর্ধ্বাংশে চালান করে। এ ছাড়া গাশালা  
ফেলার বদলে বিকৃত অঙ্গুলের মাটি শাকিয়ে যায়।  
প্রকার রোঁদে কেটে সূঁচ করে দ্বিলিঙ্গা। সেই  
দ্বিলিঙ্গা বাভাসে গরু দিয়ে চরাঁদিয়ে হুইয়ে পড়ে  
এবং মাঝে মাঝে সূঁচ করে দ্বিলিঙ্গ।

বহাদিন ধরেই ধূলি কড় নিয়ে পশ্চিমবীর বহু  
দেশে গবেষণা চলছে। গবেষণা দেখেছেন এই  
কড়ে মানব এবং গাবাদ পশুর মত্না হাড়াও অৰ্ধ-  
নৌতিক স্মৃতিও বড় কম নয়। ধূলি কড়  
নানা রকম যোগের জীবাদু হুড়ায়। এই সব জীবাদু,  
মানব, পশুপাখি এবং উদ্ভিদসমূহ কতি করে।  
বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাক্ষ-  
পশ্চিম অঞ্চলের মানব এক ধরনের জরের জুগে  
থাকে। রোগটির নাম 'ফ্যালি ফিভার'। এই রোগের  
দ্বারা কোন এক ধরনের পরজীবী জীবাদু,—কেক-  
কিডাইইউডেস ইমাইসি। ধূলি কড়ে এই জীবাদু  
কিন্তুত অঙ্গলে ছিড়িয়ে পড়ে কখনও কখনও মহা-  
মারী সৃষ্টি করে। আর এক ধরনের জীবাদু আছে,  
যার নাম 'ট্রিপটোকাস নীওফরমানস'। ঈষ্ট কোষের  
পরে এই জীবাদু মানবের রক্তের স্রাবের  
ফসফাস এবং দেহের আক্রমণ করে। যার ফলশ্রুতি  
স্নায়বিক রোগ, শ্বাসকষ্ট এবং চর্মরোগ। এই  
ধরনের জীবাদুও হুড়ায় ধূলি কড়। নানা রকম  
উদ্ভিদ রোগের জীবাদুও

ধূলিকড়ের উৎপত্তি সম্পর্কে একাধিক তত্ত্বের কথা বলা হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তত্ত্বটি সেক্ষেপে এই রকম : প্রথম যোদে ধূলিখসারিত কোন জাগা হয়ত শব্দে সাধে। এমন সময় মাথার উপর এসে জমলে এক ফালি কষার মেঘ। সেই মেঘ থেকে বাঁচি। বাঁচির সন্ধ্যা জল নেমে আসার সময় মাথাপে বাগ্ন হইতে উড়ে যেতে পারে। অথবা তার কিছু অংশ মাটির উপরও পড়ে পারে। এই জেলের স্পন্দন আশাপাশের বাতাস থেকে সৈশান-কার বাতাস শীতল হয়। শীতল হওয়ায় বাতাস বার বেড়ে। আশাপাশের উষ্ণ বাতাসের চেয়ে শীতল এই বাতাস ভারী হওয়ায় দ্রুত সবেগে মাটির দিকে ধোঁয়ে আসে। তাগীর মর্দনে আঘাত করে প্রচণ্ডত হয় এবং সামনের দিকে এগিয়ে যায়। মাটি বঁধি শুকনো এবং ধূলিখসারিত থাকে, বাতাসের ধারায় সেই ধূলি ইতস্তত হড়িড়ে পড়ত। শীতল এই বাতাস বেগ কতটা হতে হৌতে নিবর্ত করে মাটি থেকে বৈধ কতটা উচুতে রয়ছে তার উপর। উক্ত বৈধ

হলে কাভাসের বেগ বাড়বে।

আবহাওরবিজ্ঞানীদের বক্তব্য, মরুভূমি অঞ্চলে খনিজ খাদ্য এইভাবেই হয়ে থাকে।

আরবী ভাষার ধূলি কড়কে বলা হয় 'হাব্ব'।  
হাব্বের প্রকোপ সবচেয়ে বেশী দেখা যায় সমুদ্রাশে।  
বারতুর অঙ্গুলে এই কড় কখনও কখনও বছরে চিখল।  
বারও হতে দেখা গেছে। সাধারণত জা থেকে  
আটোবর মাসের মধ্যেই হয়। জুন এবং জুলাই  
মাসেই অবশ্য তার প্রকোপ সবচেয়ে বেশী। এই দুই  
মাসে হাব্বের দরুন খারতুমের কোন কোন জারগার  
ব্যরো থেকে পেশর ফুট উঠে ধূলি সত্তর জমতে  
দেখা যায়।

হাটবরের গড় বেগ ঘণ্টার প্রায় ৫০ কিলো-  
মিটার। কখনও কখনও এই বেগ ৮০ কিলো-  
মিটারও হতে থাকে। হাটবরের আগমনের সঙ্গে  
সঙ্গে বাতাসের আর্দ্রতা বেড়ে যায়। তাপমাত্রা কমে।  
করেক ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের  
মতও কমতে দেখা যায়।

হাঙ্গেরি আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে প্রায় অশুষ্ক হয়ে যায়। কখনও খুব কালের জিনিসও দেখা যায় না। গড়ে আধ কিলোমিটারের বেশি দূরত্বের কোন বৃষ্টিই আর দাঁটিগোচর হয় না। হুলি কড়ের পর প্রায় বজ্রবিদ্যুৎ এবং বর্ষণ। বর্ষ হলো ষষ্ঠ দই-এর মধ্যেই চারিদিকটা পরিষ্কার হয়ে যায়। বর্ষণ না হলে কড়ের পর ব্যতাস হুলিকণা ভাসতে থাকে। কয়েক দিনেও ব্যতাসের ঘোলাটে ভাঙটা কাটে না।

কিমানার। মহাকাশযান থেকে সারা পৃথিবীর  
চাঁব ভুলছেন। পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে  
ভাল ঝড়ের প্রকোপ সবচেয়ে বেশী, এই চাঁব দেখে  
ভাল হিমস ও পাওয়া গেছে। জানা গেছে, পৃথিবীর  
মধ্যে সাহারার দক্ষিণ অঞ্চলেই সব চেয়ে বেশী  
ধূলি গুড় অধাবিত এলাকা। মারটানিকা এবং  
নিজার অঞ্চলের ২৫০০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এবং  
৬০০ কিলোমিটার প্রস্থ ঝুড়ু বাতাসের দতরে  
শব্দ ধ্বনো আন ধ্বনো। ভূমধ্য সাগরের দক্ষিণ-পা-  
শ্চল, সুমানেব উত্তরপর্ব, আরবের উপবীণ এলাকা,  
ভল-যা নদীর নিম্নাঞ্চল, ককসাসের উত্তরে, টাকলা  
মাকান, গোবি এবং অরসলের বিস্তৃত অঞ্চল,  
আরিয়জানা—এই সব অঞ্চল ধূলি ঝড়ের স্বগ-  
রাষ্টা। ভারতের ধর মরুভূমিও এর মধ্যে পড়ে। ধর  
ক্লেয় এগিয়ে বাচ্ছে পঞ্জাব, হিরিয়ানা এবং উত্তর-  
প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলের দিকে। ধর দাঁড়ির  
দিকেও ধাবা বাড়িয়েছে।

পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মানুষের  
অস্বাভাবিকতার দরুন পরিবেশের বহু অঙ্গুলের অবস্থা  
এখন প্রায় মরুভূমির মত। বাসস্থান, কলকাত্তান  
এবং শস্য উৎপাদনের জন্য বন কেটে গড় কয়েক  
বছরে প্রচুর জমি বের করা হয়েছে। জ্ঞানানির জনো  
নির্মূল করা হয়েছে প্রচুর বন। এর ফলে  
আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। এক সময় বরষা অঙ্গুল  
বর্ষার সময় হতে, সেসব অঙ্গুল এখন জ্বাং ধুংছে।  
জ্বাংলর অভাবে মাটি ধুংকিয়ে গিয়ে শুষ্কো ধুংলি-  
কণায় পরিণত হচ্ছে। হঠাৎ প্রবল বর্ষণ হলে সেই  
ধুংলি জলে পরিবাহিত হয়ে গিয়ে পুঙ্খ নশীনালাং।  
এতে করে নদীনালা মজে ধাচ্ছে। এ জাড়া ওই ধুংলি  
বাতাসেও ছড়িয়ে গিয়ে আবহাওয়ার পরিবর্তন  
খাচ্ছে। মাঝে মাঝে উঠছে ধুংলি জড়। তাদের বজ্জা  
ধুংলি জড় ছোড়া করতে গেলে দেশে বনভূমি বাড়াতে  
হবে। এ জাড়া চাষের জমিও এমনভাবে বরংকল  
করতে হবে, যাড়া করে সেই জমির থেকে বেশি  
পরিমাণ ধুংলিকলা বাতাসে না ছড়িয়ে পড়ে।

সমরজিৎ কর

# যুগল মিলন



## ভারতের একমাত্র শারীরিক দুর্গন্ধনাশক সাবান ও ট্যালক

দু'ভাবে দুর্গন্ধ প্রতিরোধের জন্য একেবারে সঠিক  
যুগল মিলন... সিন্থল সাবান মেখে পরিষ্কার হান...  
আর তারপর সুগন্ধ পাউডার মাখা...  
যার ফলে আপনি ঝরঝরে তাজা  
বোধ করবেন।

গোদরেড্ -এর নিবেদন-সিন্থল





# বই, বাঙালী ও বইপাড়া অশোক দাস

বাঙালী পুস্তক-প্রেমিক। সব সমস্ত পুস্তক ও নানা নাকি সেই সাক্ষা দেখে। কখনো যদি আর্থিক ও তা হর ভবে আশার কথা। অবশ্য সৈমার বিনোদন আশার কথাই হলে। গত তিন বছরে লোক দর্শক সংখ্যার হিসাব (অবাঙালী দর্শক সৈম) যথাক্রমে : প্রায় দু'লক্ষ, তিন লক্ষ, এক লক্ষ ; এই সময়ে বই বিক্রির পরিমাণ যথাক্রমে : প্রায় এক লাখ টাকা, দু'লাখ টাকা এবং এক লাখ টাকা। বাহ্যিক চিত্রটি কল্পনাক্রমে কল্পনাক্রমে হলেও আসল চিত্রটি পরিষ্কার হচ্ছে না। মেলানি বন লোকভাষা হচ্ছে তখন মনে প্রাণে জাগা স্বাভাবিক য মেলার এই ভয়-বিকার থেকে এই অন্ধকার, অন্ধকার অধিবাসীর কি উপকার হচ্ছে? প্রত্নটি গোমান গাছের আরও স্পষ্ট আরও নির্দিষ্ট করে লোকে যথেষ্ট : বাংলা বইয়ের পঠিকের বৃদ্ধি ক উন্নতি হচ্ছে? প্রকাশনার ক্ষেত্রে বাংলা বইয়ের প্রগতি আশী হলে কি? বাঙালীরা কত টাকার বই কেনেন? তার লতকরা দশ ডাগ বইও কি কালের কনকন? এ সবের উত্তর পরিসংখ্যান দিতে পারবো:

বইপাড়ার লোকদের অভিজ্ঞতা বলে যে অবস্থা যাবনতির দিকে। প্রকাশিত বইয়ের বৈচিত্র্য বিন দন করে আসছে। অন্য দিকে বাংলা এই এগারো শর পরিখি আর ছড়িয়ে পড়ল না। অস্তত এজন্য পারেনি। বাস্তবত্ব হিসেবে বৈব বই এগারো শর বেশী ভাগা হয়, বইপাড়ার ভাষার তা নাকি 'সাড়া' জগলানো বই। বহিও শিক্ষার প্রসার ভববৎমান। কখনো বই কেনে না অর্থাৎ বাংলা বই কেনে না; না কেনে তা হচ্ছে 'অর্থনৈতিক' অর্থনৈতিক বই অর্থনৈতিক ইংরেজী। বাংলা বইয়ের প্রকাশকও তাই বাক্তিগত পুস্তক-কর্তার উপর ভরসা রাখতে পারেন না; তাঁরা অল্প নমানে চেয়ে থাকেন সমাধার প্রাধিকারগলির দিকে। আপাতত বর্তমান সময়ের কথা মূলত্ববী রেখে গোড়ার কথার আসা থাক।

পাশ্চাত্য জগতের সম্পর্কে আসার ফলে আমরা যা কিছু, পেরোই মন্থনবল্য তার অন্যতম। এই মন্থনবল্যের আনুকূল্যে কালক্রমে পেলাম গ্রন্থ-ব্রাহ্মি। অগ্রে ছিল পৃথি যা কিনা প্রত্যক্ষভাবে বারি দীর্ঘচাটী করতেন তাকর সগ্রহে লিখাপরম্পরির বিরাজ করত। মুদ্রিত পুস্তকত্বের আবির্ভাবের ফলে সাধারণ ব্যক্তির পক্ষেও তা যোগাড় করা অসম্ভবত লজ্জ হত। পৃথিবীর অমলে যা ছিল দু'লক্ষ বস্ত্র, মন্থনবল্য তা সাধারণের পক্ষে করলো সচলত্ব। এটা মন্থনবল্যের জালীবাঁদ। কিন্তু এর অভিশাপ?

“গ্রন্থ মানুষের বন্ধু”। এটা আত্মবাক্য। বিদ্যাসর-সত্রে 'রচনা' লেখা অভ্যাসের কল্যাণে তাই কেনে এসেছিল এবং কালে সেই ধারণা কিভাবে লিখিয়েছে। আমাদের দেশে মন্থনবল্য তথা মুদ্রিত পুস্তকাদি মুদ্রিতের (অনুদ্রষ্টব্য) ব্যক্তির সুবিধা ঘটলেও। আপামর জনসাধারণের পক্ষে নামূলী বিদ্যা আহরণের ক্ষেত্রেও তা এক বিরাট অসুভাব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কখনো অজ্ঞানবী শোনেলেও তা রত্ব বাস্তব। জ্ঞানের চর্চা যুগে যুগে দেশে দেশে কল্পে গভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল (কি এখনও আছে)। আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু সেই জ্ঞানচর্চার ফল পূর্বে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষও ভোগ করত। যোগাযোগ-ব্যবস্থা আদির শ্রদ্ধা লগ্নেও মনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে এমন কিছু ব্যবস্থা ছিল, যার জন্য বর্তমান কালের 'কম্যুনিকেশন গ্যাপ'-এর সমস্যা তখন দেখা দেয়নি। সে যুগে আমাদের দেশের চণ্ডীমন্ডপ (বা পড়শী বাজা ওড়িশার ভাগবতটীপা) কেবল গ্রাম্য দলবালির আখড়া বা পরিনন্দ পরচর্চার পাঠস্থান ছিল বলে জানতে হত। সেখানে সর্ব স্তরের মানুষ

আলোচনা হত। এই আলোচনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ আর বই হক অশিক্ষিত থাকত না। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে চণ্ডীমন্ডপ মানুষকে পরামর্শদাতা সাহায্য করত।

কোম্পানী আমলের পেশের দিকে সাবাস্ত হলে যে অভ্যাসের কল্যাণে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে কেবলমাত্র শ্রমবাহুল্য নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করা হবে এবং সেখান থেকে ছেলেরা শিক্ষিত হয়ে মলে মলে গ্রামে গলে ছাড়িয়ে, পড়ে মাড়ভাষার মাধ্যমে গ্রাম বাংলায় অধিবাসীদের আধুনিক শিক্ষার শিক্ষিত করবে। এর শ্রদ্ধা একদিন দেখা যাবে যে জ্ঞানের বন্যার সারা বাংলা টাইটুস করছে। এই তত্ত্বকে 'জা' হল 'জ্ঞানওজ্ঞান' ছিলোশন খিওরি। পুর্বে সুদূর পরিকল্পনা। কিন্তু পরবর্তী ইতিহাস বলে যে উদ্দেশ্য হয়ে শিক্ষিত মানব জ্ঞানের 'আলোচনা' বর্তিকা' নিয়ে গ্রাম বাংলার ছুটে মাননি (এখনে রান্নারায়ণ বসুর মত দু-চারজন ব্যক্তির ব্যতিক্রমের কথা আসতে না)। ফলে 'ফিল্ডওজ্ঞান'-এর বদলে তা 'স্ট্যান্ডেশন' হয়ে শহুরেই সীমাবদ্ধ হইল। 'কম্যুনিকেশন গ্যাপ'-এর যোগে তখন থেকেই লুপ্ত। কবীর বলতেন, 'বহুতা পানী নিমলা, বধা গাংখা হের'। জল হয়ে না গিয়ে এক জায়গায় বধ হরে থাকলে তা পড়ে দৃষ্টিতে হয়। জলের জপর নাম জীবন। সত্যি কথা। তা বলে অই পুণ্ডিগম্ভয় পটা জল নয়, যা কিনা মানুষের প্রাণ সংশয়ের কারণ হতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই কথা। নতুন ব্যবস্থার শিক্ষা সর্বত্র বিস্তার লাভ না করে তা গহরেই গণ্ডীভূত হয়ে থাকল। সময়ের উপকারের বদলে তা সমাজকে করল কলুষিত, পরিবেশ করল দূষিত।

অতীতে গ্রাম বাংলার প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল জীবনমুখী। গ্রাম্য পাঠশালায় শেখান হত বর্ণ-পরিচয়, হাতের লেখা, পত্র-লিখন, শব্দভর, অঙ্ক-মানসিক। আর অন্যান্য বিষয়ে মুখে মুখে পড়ান হত। এই শিক্ষা-ব্যবস্থার সর্দার পোড়ার এক বিশিষ্ট স্থান ছিল। মুদ্রিত বইয়ের ফেন কাপারটি ছিল না আর তা থাকারও কথা নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য : পাত্রী উইলিয়াম আডাম তার প্রথম রিপোর্টে (১৮০৬) উল্লেখ করেন যে তৎকালীন বাংলা-বিহারে তত্বে জনসংখ্যা ছিল চার কোটির মত; এবং এই চার কোটির জন্য পাঠশালা ও মন্ডর ছিল এক লক্ষ। অর্থাৎ চার লক্ষ মানুষ পিছ-একটি পাঠশালা। নতুন ব্যবস্থায় স্পষ্ট হল যে অই পাঠশালা-গুরুশালী-সর্দার পোড়ো'র স্থান অচল-তা কালোপযোগী নয়। অথচ এই 'সর্দার পোড়ো' ব্যবস্থার উপযোগিতা উপলব্ধি করে বিবেচনা লাগত তা নিজের দেশে চালু করে 'মানিটারিয়াল সিস্টেম' নাম দিয়ে। থাক সে অন্য প্রশ্ন। মোশা ব্যাপারটা হাড়াল যে, পুরনো শিক্ষা-ব্যবস্থা ব্যতিক্রম হল অর্থ পুস্তক নিভর নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে প্রচলন করা হল না। শহুরে আর গ্রাম বাংলার মধ্যে এক অদৃশ্য কুটরেখা টানা হল। রাতারাতি সৃষ্টি হল, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানবের। মন্থনবল্যের আমলে আমাদের সমাজের এই হল নিট লাভ। আর শহুরে মানুষ শিক্ষিত' চল অর্থ তার জ্ঞানের শূন্যে জাগল না বিন্দুমাত্র। শিক্ষা অর্জন চাকুরী-লাভের পূর্ব শর্ত' হিসেবে গণ্য হল। তাই শহুরে বাঙালী শোলদীর্ঘ থেকে লালদীর্ঘিতে প্যাঁড় জমিরে' শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক ছেঁদ করতে লাগল। আজও সেই ঐতিহ্য অব্যাহত। বাঙালীর কাছে বই কেনা, পড়ানো করা অর্থের অপচয়, সময়ের অপব্যবহার-পশ্চাত্তম মাত্র। বাংলা বইয়ের সঙ্কট আর অই নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থা একই সঙ্গে ব্যাধী শূন্য করেছে, ভার্য অশাণ্ডিভাবে পরস্পর পরস্পরকে আঁড়িয়ে ধরেছে। এই শিক্ষা-ব্যবস্থা সময়ে সময়ে

বর্তমান, এবং বাংলা বইয়ের সঙ্কটও।

মুদ্রিত পুস্তক তথা নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের সমাজের ক্ষতি করেছে। এটা ঘটনা, এটা বাস্তব সত্য। তবে যে ব্যবস্থা আমাদের সমাজে এসেছে তা থাকবেই। পুরনো শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। পাও ফিরে সে অল্পা লও এ নগর' বলে আক্ষেপ করে লাভ নেই। তবে আমাদের দেশে আমাদের সমাজেও যাতে বই প্রকৃতপক্ষে বন্ধুর স্থান গ্রহণ করে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। বই হতে সর্ব সর্ব স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে যায় তাই হওয়া উচিত লক্ষ্য। প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নব আবিষ্কৃত টেপ রেকর্ডার, রেডিও, টেলিভিশন হরত একদিন মুদ্রিত পুস্তকত্বের প্রয়োজন অনেকাংশে মেটাবে, তবে বইয়ের স্থান সে কখনই গ্রহণ করতে পারবে না। মানব সভ্যতা বর্তমান থাকবে, বইয়ের প্রয়োজনও থেকে যাবে। তাই আমাদের কাছে বই, আরও বই, অনেক অনেক বই। বীধা-ধরা স্কুল-কলেজী শিক্ষা শেষ হবার পরও জ্ঞান-পিপাসা তৃপ্ত হওয়া উচিত নয়। তাই এর পরবর্তী স্তরে মানুষের জ্ঞানচর্চা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হয় বিভিন্ন ধরনের বইয়ের-বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য। অন্যথায় যে বিদ্যা মানুষ অর্জন করেছে, তাও যাবে সে ফুলে। আবার, আমাদের দেশে নিরক্ষরের সাক্ষর করার উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাদের জন্যও চাই বিশেষ ধরনের বইয়ের। নতুন তাসের অ-আ-ক-খ শেখানোটাই হবে সত্যিকারের পশ্চাত্তম। জাতীয় অপচয়। অর্থাৎ আমাদের বইয়ের প্রয়োজন প্রচুর।

আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া থাক। প্রকাশকদের আক্ষেপ আমরা শুনছি। এবার, বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে কি বলেন দেখা যাক। ক্ষেত্রবর্ধী আভিযোগ যে এর জন্য প্রকাশকদের লাভ সম্পূর্ণ দারী। প্রকাশকরা বাংলা বইয়ের দাম তুলন ব্যতিক্রম বর্তমানে যা করছেন তাতে বাঙালী মধ্যবিত্তদের কাছে বই এখন আকাশকুসুম। উদাহরণ হিসেবে তাঁরা বলেন যে, এই করক বছর আগেও যে 'সংগীতার দাম ছিল দশ টাকা, এখন তার দাম হয়েছে ছাশ টাকা-মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে লতকরা তিনশ' যাট ভাগ। ঠিক একইভাবে অন্যসব বাংলা বইয়ের দাম কম-বেশ একই হারে বেড়েছে। সেজন্য মধ্যবিত্ত বাঙালী ব্যক্তিগত সগ্রহের জন্য বই কেনা এক রকম বন্ধ করছে।

বাংলা বইয়ের হঠাৎ এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ কি? প্রকাশকদের বহুবা এই মূল্যবৃদ্ধি কেবল বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য সব ভাষার ক্ষেত্রেও ঘটেছে। মূল্যের হাস-বৃদ্ধি প্রকাশকদের মজির উপর নির্ভরশীল নয়। বই প্রকাশনের আনুষঙ্গিক সব কিছুই দাম তিন-চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বইয়েরও দাম বেড়েছে, যদিও সেই অনুপাতে বইয়ের দাম তিনা বাড়ানো। কার্য' হিসেবে তাঁরা বলেন যে এখন তবুও যাও বা কিছু বিক্রি হচ্ছে, বইয়ের দাম সেই হারে বাড়ালে বই বিক্রি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে।

সে যুগে কালি-কলম-মন হলেই পুঁথি রচনা চলত। ব্যাপারটির ওখানেই সাপা হত। বর্তমান যুগে, বলতে গেলে ব্যাপারটির শূন্য ওখান থেকেই। মূলত প্রয়োজন তিনটি : কাগজ চাই; তাকে ছাপানো হবে; এবং বন্ধন পূর্বের পর ডেকেই তা ভোগ্য পণ্য হবে-সমাজের প্রয়োজন মেটাবে। এখনে কাগজই হল বিরাট প্রতিবন্ধক।

বেশ কিছুদিন ধরে পৃথিবীব্যাপী একটা আশঙ্কায় কথা শোনা যাচ্ছে যে কাগজের দৃষ্টান্ত আগত্যপ্রায়। উন্নয়নশীল এবং অনন্য প্রযুক্তিগত শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থের প্রয়োজন বাড়ছে অতি দ্রুত গতিতে। কিন্তু সেই তুলনায় কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভবপর নয়। কাগজ উৎপাদনের প্রধান উপকরণ বনজ এবং কৃত্রিম সম্পদ;

ইউরোপে বৈশ্ব সমরযুদ্ধের। ফলে চাহিদার তুলনায় কাগজের যোগান প্রচণ্ডভাবে কমে যাচ্ছে : এর ফলে কাগজের দ্রুততর অবশ্যাব্যাহী। এটা আশ্চর্য্যের। গত কয়েক বছর হল আমাদের দেশেও কাগজের লক্ষ্যত দেখা দিয়েছে—কাগজের জন্য হাজারকি পরিচ্ছে। এ বেন কাগজবিশাখীর পূর্বে চৈতালী হাণ্ডি। বন প্রকৃত দ্রুততর দেখা দেবে তখন কি হবে ?

অবস্থা শোচনীয়। কিন্তু বসন্ত পরিমিত কি তাই বলে? বর্তমানে কাগজের মিলগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা বা ভাঙে এই অভাব এখনই থেকে দেওয়ার কথা নয়। বর্তমানে আমাদের দেশে কাগজের চাহিদা প্রায় সাড়ে এগারো লক্ষ টন। সেখানে কাগজ উৎপাদন হয় মূল লক্ষ টনের মতো। অর্থাৎ মাত্র দেড়েক টনের মতো কাগজের অভাব থেকে যাচ্ছে। অবস্থা সরকারী হিসাব মতে এই অভাবের পরিমাণ মাকি আরও কম।

কাগজের বর্তমান অবস্থার জন্য মিল কৃত-পক্ষ ও সরকার—উভয় পক্ষ পরস্পরকে দোষারোপ করছে। মিলগুলির বহুবা দেশে কাগজ প্রস্তুতকারী যন্ত্রপাতি বন্ধ পুরনো। বর্তমান চাহিদার সঙ্গো তাল হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধি করা এই মাধ্যমে আমাদের যন্ত্রপাতির সাম্যাতীতি। অথচ সরকার বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানির ব্যাপারে ভীষণ কড়াপাকড় করে। আমাদের দেশে এই ধরনের যন্ত্রপাতি যা তৈরী হয় তা সঠিক ধরনের নয়। এরপর বিদ্যুৎ। শক্তির জন্য এই শিল্পে বিদ্যুতের একান্ত প্রয়োজন কিন্তু তার যোগান অব্যাহত রাখতে সরকার অপরূপ। অন্যদিকে কাঁচা মিল ও করল। আনার জন্য রেল ওয়াগন তিকমত পাওয়া যায় না। এই পরিস্থিতিতে মূল্য উৎপাদন আশা করা বাতুলতা মাত্র। মিল মালিকদের আভ্যন্তরীণ দুরীকরণের উপেক্ষা সরকার প্রতিষ্ঠান করতে চের বেশ কিছুদিন আগে এক প্রস্তাব তামের দিরাছিল। তাকে একটাটা শর্ত ছিল : মিলকে তামের উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু সরকারের এই প্রস্তাবে মিলের কোন প্রতিষ্ঠা দেখা যায়নি।

করক বছরে কাগজের দর কি অব্যাব্যাহতভাবে বেড়ে চলেছে তা নিচের তালিকা থেকে দেখা হবে প্রতিক্রিয়া কাগজের দাম—

১৯৬৮	১-৬০ টাকা
১৯৭০	২-০৬ "
১৯৭৪	৩-৬২ "
১৯৭৮	৪-৬০ "

বর্তমানে সরকার আদ, প্রয়োজন মেটানোর জন্য কিছুক থেকে (ইন্সপেকশন ও বাংলদেশ) কাগজ এনেছে এবং তা নিজ তত্ত্বাবধানে বায়ারে বিক্রি করছে আট টাকা কোঁজ করে। অর্থাৎ ১৯৬৮-৮ তুলনায় কাগজের মূল্যের বৃদ্ধি হয়েছে পাঁচ গুণ।

ফলে বায়ারে অন্য কাগজের দাম আরও উচ্চমুখী।

বর্তমানে ভারতে আটটি বৃহৎ বাবলারী প্রতিষ্ঠান তামের কৃত-পাদানী সত্তেরটি মিলের মাধ্যমে শতকরা প্রায় পঁচাত্তর থেকে আশী ভাগ কাগজের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। পক্ষান্তরে, আড়াই শ ডিসট্রিক্টটির বায়ারের প্রায় শতকরা ষাট ভাগ কাগজ বিক্রি বঙ্গদেশে করে থাকে। কোনো দার এইসব ডিসট্রিক্টটির মধ্যে মিলের কোনো-যোগ্য পারিবারিক সত্তে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ প্দেরকের জন্য কাগজের সরবরাহে যে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হবে তা বলাই বাহুল্য। আরও একটি মজার ব্যাপার আছে। কাগজ উৎপাদন হয় একটি বা মৌরিক টন হিসেবে এবং তা বিক্রিও হয় ঐভাবে কিন্তু কাগজের ব্যবহার হয় মিম হিসাবে। অর্থাৎ কোন একটি বই ছাপতে বত রিমের প্রয়োজন হয় তা কাগজ কত পাতলা বা মোটা তাতে রিমের সাধারণ দ্রা-বর্ণিত খটে না। কাগজ কত পাতলা বা মোটা তা প্রকাশ করে রীজ এস এম' দিয়ে—জি এস এম অর্থে 'গ্রাম পার স্কোয়ার মিটার'। এখনে একটি

টনে ৬০ জি এস এম কাগজ পরওয়া বার ৬৫ রিমের মত, সে ক্ষেত্রে এর থেকে সমান পাতলা কাগজ ৫৬ জি এস এম পাওয়া যাবে এক টনে প্রায় ৭০ রিমের মত। আলোচনার সুবিধার জন্য ধরা যাক, কোন একটি বই ছাপানোর জন্য ৯১০ রিম কাগজের প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে ৫৬ জি এস এম কাগজ হলে ১৩ টন কাগজের প্রয়োজন হয় কিন্তু ৬০ জি এস এম হলে কাগজের প্রয়োজন হবে ১৪ টনের মত, অর্থাৎ এক টন বা এক হাজার কোজ কাগজ বেশী দরকার হবে। অন্য কথায় কাগজের দর পাঁচ গুণ বাড়িয়ে তার সমতুল্য নয়, হিসেবের মাধ্যমেই এক হাজার কোজ কাগজ বেশী কিনতে কাজ করে আরও আট-ন হাজার টাকা বেশী দাম আদায় করে। অন্য পক্ষে, আরেক বোঝান ৫৬ জি এস এম কাগজ (ধরা যাক) মূল হাজার টন (অর্থাৎ ৭,০০,০০০ রিম) তৈরী করতে; এখন সেখানে ৬০ জি এস এম কাগজ হয়তো সাড়ে মূল হাজার টন (অর্থাৎ ৬,৮২,৫০০ রিম) কাগজ তৈরী করছে। এতে সরকারকে বোঝানো সম্ভব হচ্ছে যে, তাদের কাগজ উৎপাদনের পরিমাণ পঁচিশ টন বেড়ে গেছে। কেখানে বাস্তব চিত্র হচ্ছে : আগে সেখানে ৭,০০,০০০ রিম কাগজ পাওয়া যেত, এখন সেখানে ৬,৮২,৫০০ রিম কাগজ পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ স্বাক্ষরযোগ্য কাগজের পরিমাণ ১৭,৫০০ রিম কমে গেছে। কিন্তু এই কারুপিস সরকার কেন ধরতে পারে না তা ব্যোংম্য নয়।

গ্রন্থ উৎপাদনের জন্য কাগজের দর প্রয়োজন হয় ছাপানোর। ছাপানোর বরত গত দশ বছরে তিন গুণেরও বেশী বেড়েছে। এক্ষেত্রে আনুমানিক জিনিসের দাম বৃদ্ধি ছাড়াও লোডলোডিং এক অন্যতর কারণ। এর দাম কিস্তাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা নিচের তালিকার চোখ বুলোলে দেখা যাবে (হাজার কপি ডবল ডিমাই এক ফর্ম ছাপানোর খরচ) :—

১৯৬৯	৫৫ থেকে ৬০ টাকা
১৯৭২	৬৫ " ৭৫ টাকা
১৯৭৬	৭৫ " ৮৫ টাকা
১৯৭৮	৯০ " ১০০ টাকা
১৯৭৯	১৫০ " ১৭০ টাকা
১৯৮০	প্রায় ২০০ টাকা

কাগজ ও ছাপানোর খরচ ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে বহা বর্ধাই, রক, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির খরচ অনুচ্ছপ-ভাবে বৃদ্ধি করছে। এই পরিস্থিতিতে বইয়ের দাম স্থিতিশীল থাকার কোন উপায় নেই বলে প্রকাশকর জানানোল।

বাংলা প্রকাশন শিল্পের ঐতিহ্য বহুদিনের। ঐতিহ্যের কথা বাক দিলে বাংলা বই প্রকাশনের কলিগত উল্লেখের ক্ষেত্রে ক্রিয়ালব্ধ হইছেন আদি পুরুষ। ব্রিটিশ বঙ্গে বঙ্গালী প্রকাশকদের প্রচেষ্টায় এই অঞ্চল ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অগ্রগত ছিল—ভারতীয় প্রকাশন-ব্যবসার কেন্দ্রবিন্দু ছিল কলকাতা। স্বাধীনতা উত্তর যুগে কিন্তু চিত্র কালে গেছে; কল-কাতকে অনেক ক্ষিমে কেনে দিলি-বোম্বাই এগিয়ে গেছে। অবনিক পূর্বাভিকার করণ-কৌশল প্রয়োগের ফলে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে প্রকাশন-শিল্প প্রায় বৃহৎ শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। দিলি-বোম্বাইও সৌদিক জনকর্মান অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু দ্রুতের বিক্রি, কাগজ বাই প্রকাশনার ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্প তো দুরূহান, তা ক্রম শিল্প বলে লক্ষ্য হবার দাবি করতে পারে না। বিশ্বাসযোগ্য আমলের মত তা কুটরিবিশল্ল পর্বারেই রর গেছে। কুটরিবিশল্ল নাবলক্দের সম্ভা না পর হতে পারলে দ্যাস প্রোডাকশন সম্ভব নয় আর দ্যাস প্রোডাকশন না করতে পরল বইয়ের দাম কথিয়ে তা সাধারণের কাগলের মধ্যে আদ্য থাকে না।

এখানে আসে মূলধনের কথা। সাধারণত মধ্যবিত্ত বঙ্গালী এই ব্যাকারে লিখত এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের কলারিক যোগ্যতা প্রমাণিত নয়। এই সব কারণে মূলধনের অপ্ৰতুসতার সমাধান হচ্ছে না। এই শিল্পের উপায় বহিও প্রায় লক্ষাধিক লোক পরজক

সরকার এই শিল্পের জন্য কিছ করা প্রয়োজন বোধ করে না। কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করতে আগ্রহী তবুও কিছ করা হচ্ছে না। প্রকাশন শিল্পে মূলধনের সমস্যা কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নয়, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও একই সমস্যা কাজ করছে। কয়েক বছর আগে ভারতীয় প্রকাশকরা ভারতের শিক্ষা মন্ত্রকের কাছে আবেদন করে, কেন অন্যান্য শিল্পের মত ভারতীয় প্রকাশকরাও মূলধনের কাগারে ব্যান্ড, এল আই সি, ইনডাসট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন প্রভৃতির কা থেকে সহযোগিতা পায়। শোনা যায়, ন্যিক শিক্ষা মন্ত্রক এই বক্তার বোধিতা স্বীকার করে নিয়ে শিল্প মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরন্তক প্রকাশনকে শিল্প বলে ঘোষণা করবার ব্যাপারে অনেক দূর এগিয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ব্যান্ড প্রচুড় উল্লিখিত সরকারী সংস্থাগুলি কেবলমাত্র সরকারীভাবে স্বীকৃত শিল্পাঙ্গিকে ছল দিয়ে থাকে। প্রকাশনকে শিল্প হিসাবে ঘোষণা করবার মাধ্যমে আইন মন্ত্রক যোরতর আপত্তি জানায়। ফাল, প্রকাশন ব্যাপারে শিল্প হিসাবে ঘোষণাটা হবে নাকি রীতিমত সংস্থান-বিরোধী। একে শিল্প হিসাবে গণ্য করলে, তাকে অন্যান্য শিল্পের দ্যার কতকগুলি বিধিবিধির আওতার আনতে হবে এবং সরকারী বঙ্গালার অধীন করতে হবে; কিন্তু সরকার তা পারে না। কক স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা ইত্যাদির নামে মূলধন যন্ত্রের স্বাধীনতা সংস্থান-স্বীকৃত ব্যাপার। সে ক্ষেত্রে সেরসকারী পরন্তক প্রকাশন অবশ্যকক শিল্প হিসাবে ঘোষণা করলে তা হবে মূলধনের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ। সুতরাং, ব্যাপারটির ঐক্যনেই হবে। তবে অন্যভাবে সাহায্য করার অবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার নিচ্ছে। সতরাং, আপাতত ঐক্যের দাম কয়ার কোন আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে না।

বাংলা কইরেন কোন এই সুকট? কেন বঙ্গালী (বাংলা) কই কেনে না? হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধি এর কারণ : না, বঙ্গালীর জীবনে বইয়ের কোন প্রয়োজনোত্তর ব অভাববোধ দেখা দেয় 'ন? নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস : সলো পাজা দিয়ে কইও বঙ্গালীর জীবনে এক পর্বতে স্থান লাভ করবে, এতটা ভাবা যায় না। কিন্তু আশুপসের কাগর এই যে, অধ্যাপকর ভিত্তিতে নিত্যপ্রয়োজনীয়, প্রয়োজনীয় তো বটেই এমনকি অনেক শৌখিন কড়কও পরে তার স্থান নির্দিষ্ট স্বাধীনতা-পূর্ব বগে যে বঙ্গালী টাইলের লর্ট ২ লক রুখলো পাজাটিতে অভ্যস্ত ছিল এখন তারই জগে দেখা যাচ্ছে অনেক শৌখিন তন্তুল পোলক; এ ক্ষে মূল্য কোন বখার সৃষ্টি করছে না। দান অজনা : খেলাধলোয় ক্ষেতর ও তার হাত দরজ—এখান গানবজ : চো : কখোলাচোটা কথা হচ্ছে না। কোথাকরকো বালো টাপ আলহ বা জাজ : প : এসেছে, বঙ্গল হুইটিং থেকে পড়ছে। বইটিই কোন দিই জানে খেলাতে, তার টিকিটের জন্য কলোকাটারী দরে আশ্রিত নেই। সেই বঙ্গালীর মধ্যে কখন আসে শোনা যায় যে, লত কয়েক বছরে কইরেন দ্যম এ বেড়ে গেছে বলে সে আর অন্য কলিগত সত্তেই জন্য বই কিনতে পারল—তখন তা কল ওজর হতে মনে হয়। এটা তার কই না কনোর হল মাত্র, কা সে (বাংলা) কই কখনই কেনে না—আগেও কিনত : এখনও কেনে না। সতিই হাঃ মূল্য বৃদ্ধির ল বঙ্গালীর কতমানে কই কলো বধ হলে বা কমে গি থাকে (অর্থাৎ আগে সে কিনত), তা হলে আ প্রকাশকর যে ক্ষেত্রে এগরো শ করে বই ছাপিয়ে এখন তার আরও অনেক কম সংখক বই ছাপিয়ে ঘটন বনন তা নয় তখন বঙ্গালী হালকিল কই যে বন করছে—এ হুইটিং মনে দেওয়া যাচ্ছে না। কই কেনারটাই বঙ্গালীর ঐতিহ্য। অজক কই কনোর স্কাপ প্রতীহা কোজ আমাদের মতোই নয়, পশ্চিমবঙ্গে—এ প্রকট না হলেও—জড়তা কেন আছে। ইংলণ্ডের কিঞ্চ প্রকাশন-সংস্থা জন্ম' আলেন জাড আমটাই অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্যার স্ট্যানলী আনউইন ৭ স্মৃতি কথার এ কারণে থেকেলবাসদের সম্ব

ক্রমানংক	কাল	বিশেষ	তারিখ	তরফদার
প্রশ্নাবলী	২-৪০	০-০৯	১৭-৪৬	৪-১১
সমাজবিদ্যা	৪-২৪	৪-৪১	০৯-১২	১২-১৫
সর্গহিত	৪০	৬৭-৬৮	২০-২৫	৫৪-০০

৪৩ বছরের প্রকাশিত কবিতার যে বিশেষ কবিতা  
 সেগুলি রয়েছে তাক মধ্যে কীভাবে, কীভাবে ইত্যাদি  
 সম্বন্ধে কিছু কবিতা আছে। বসিও, শ্রদ্ধাসহ হওয়া  
 কবিতা কবিতা সেখানে যে সমাজগত হওয়া হয়েছে  
 তার সবই প্রায় কবিতা বিবরণ এক কবিতার মধ্যে

প্রসঙ্গক্রমে এক ট কথা এসে পড়ে। কিছু কিছু সংস্থা পুরনো নাম করা কই নতুন করে বার করে নেবে। বিশেষত গ্রাম্যস্বাক্ষর জাতীয় বই। এগুলির মধ্যে কিছু বই ভালই বিক্রি হচ্ছে অথবা কয়েক হাজার করে। এই খবর কিছু প্রয়োগ হয় না যে বাড়ালী কখনো বইয়ের জন্য। এদের বেশির ভাগই কোন

সাবানাকদের নান্দ্র কল্যাণ উত্তর বৈষ্ণবরাও প্রবৃত্তি আশ্বস দিয়ে কল্যাণে নেবে তেল ভাল মূল্যের ছাড়দেবে এই অবলম্বনা যুক্তে কতিপয় হতে না হয় তার জন্য যোধ কতৃপক্ষ ভীষণ সতর্ক। তাতে সাংঘাতিক যখন তাকে পালাত প্রদান করেন, 'ভাল মূল্য মানে'—'বারাণ মূল্য আছে নাকি?' 'তা হলে তাহলে অসম্মান মূল্য কল্পে নাকি?' ইত্যাদি। ভদ্রলোক মহা কাঁপকে পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি জ্ঞাপারট বোধহয় ঠিকই বলছিলেন। ভাল মূল্য জ্ঞাতে তিনি বেধয় বলতে চেয়েছিলেন, ইহকালে 'মান মূল্য এক সমসারী মূল্যগুলার কথা। এখানে তবু, কিছু কিছু পড়াশুনা হয়। বাকি মূল্যগুলি লোক-দেখানো বা লোক-উত্থানের জন্য। তাই আর আর পড়ুয়া ও পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা বাড়ছে—প্রতি শিকার প্রায়শ বিস্ময়া হচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে বনটীবা মূল্য থেকে যায় বের হচ্ছে তাদের প্রায় সবাই জড় ভরত আর তথাকথিত 'জালা' মূল্য থেকে যায় আসছে তার প্রায় সবাই হচ্ছে কেরিয়ার সফল। এই দৃষ্টান্তে কারোবাই বাৎসা কীরেয় প্রয়োজন হবার কথা নয়। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার জাপাতদ্রুত সবই আছে স্বাচ্ছন্দ্য তা ফলপ্রসূ হচ্ছে না। বরীক্ষাগুলি হলছেন, 'প্রদীপে জলন্ত তেল ঢালিতে পায়িলেও দীপ জ্বলে না এবং সলিতা পকাইবার নৈশকোয় সূক্ষ্ম হয়রা উঠিলেও দীপ জ্বলে না। যেমন করিয়াই হউক, আগুন ধরাইতে হইবে।' (পঞ্চর সপ্তম) আমাদের দেশে তেল-এই একটি আশ্রয়। একটি তেল উল্লেখ্য।

ପ୍ରକାଶନା ସମ୍ବଳମ୍ବତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନାଦିନା ଜନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ  
ସମ୍ବଳମ୍ବତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମେ ।



# পরমাত্মীয় দিলীপকুমার গীতা বিশ্বাস

মোটবেলার তার কথা কতো যে শুনেনি! আমার রাগাঢ়াকাবাধার (স্বৈচ্ছান্দ্রবন্দ্য) পরম বন্ধু, আমার বাবা ও মামা ('পরচন্দ্র বন্দ্য' ও 'বিভাবতী বন্দ্য') বিশেষ স্নেহভাজন—দিলীপকুমার রায়। আমরা যখন বড় ছাত্র, তখন তিনি সমগ্র ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত আশ্রমে চলে গেলেন। তাই তাকে দেখবার ও তার গান শোনার সুযোগ এল অনেক পরে।

কবি ও নাট্যকার 'শিবজেন্দ্রলাল রায়ের' পুত্র দিলীপকুমার রায়। আমার মা-র কাছে শুনেনি, রাজপুত্রের মত চেহারা, শৌখিন মানুষ্য দিলীপকুমার রায়ের কথা। গরদের ধূতি-চাদর পরনে, চোখে রিমলেন্স চশমা। গায়ের চামর পালের কাছে লাটুরে পড়ছে। যেমন অপরূপ রূপ তেমন অপরূপ গান। তখন তিনি তাঁর যাবার স্বদেশী-সঙ্গীত, কবি নজরুল ইসলামের ও অভুলপ্রসাদের গান—এইসবই বেশী গাইতেন। মা বলেছিলেন, একবার এলগিন রোডের বাড়িতে গানের জলসা হলো, গাইলেন 'কবি নজরুল ইসলাম ও দিলীপকুমার রায়। অন্যান্য গানের সঙ্গে তারা দুজনে মিলে "বাঁগচাঁর বলবালি তুই ফুলশাখতে দিস নে আলি দোল" এই গানটি গেয়ে আসর মাতিয়ে দিলেন। তখন তার মাত একখানি রেকর্ড ছিল "রাগাঢ়াকাবাধা কে দিল তোর পারে মঠো মঠো"। লোকে বলত "দিলীপকুমার রায় অফ 'রাগাঢ়াকাবাধা' ফেম"। আমরা শ্রদ্ধা বারবার করে তার ঐ রেকর্ডটি শুনতাম।

ইতিমধ্যে তার আর একখানি রেকর্ড

বেরিয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গ থেকে রেকর্ডিং করিরে আনি হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানী থেকে। গান দুটি হলো, "চমকে ভিঁসির ঘির বিজলী" ও "মল্লল আমার মন-প্রমত্তা কালীপদ নীলকমল"। বহু দিন পরে ১৯৩৭ সালে তিনি অল্প দিনের জন্য কলকাতার এলেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে। সেই সময়ে তাকে দেখবার ও জানবার সুযোগ হলো। আমরা দেখলাম মেরুনা বসনধারী সখিক দিলীপকুমার রায়কে। শিশুর মত স্বচ্ছ মন, অক্লান্ত স্নেহ সকলের জন্য। হাসিতে আমোদে আনন্দের লহরী তুলে দিলেন। উভয় পার্শ্বের বাড়িতে মাঝে মাঝেই তাঁর গানের জলসা হতো। এক-একটি গান করতেন এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা ধরে। সমস্ত শ্রোতা স্তম্ভ হয়ে শুনত তাঁর অনুরূপ গলা ও গায়কী। এই সময়ে তিনি তাঁর স্বদেশী-সঙ্গীত খুব বেশী গাইতেন না। তখন তাঁর মন আত্মকৃত জগতে চলে গিয়েছে। ভজন, বাউল ও কীর্তনগায়ের গানগুলিই তিনি গাইতে ভালবাসতেন। কবি নিশিকান্তের অনেক গানে তিনি সুর দিয়েছিলেন। যখন তিনি প্রাণ চলে উদাস্ত কণ্ঠে গান গাইতেন, মনে হতো তিনি এই পার্থক্য জগতের অনেক উর্ধ্বে। তাঁর এই পরশকীর্তির ছোঁয়া লেগে শ্রোতাদের মন ও অনারকম হয়ে যেত। মনে আছে তাঁর গান "অজল আমার মনপ্রমত্তা কালীপদ নীলকমল", "জলবার মল্ল দিলে মোরে", "সেই বন্দাবনের লীলা অভিরাম" ইত্যাদি। দিলীপবাবু গান গেয়েই চলেছেন, বাবা, রাগাঢ়াকাবাধা ও অন্য সকলে মন্তমুখের মত বসে

আছেন। গান যখন শেষ হলো, তখন দেখলাম দুই ভাইয়ের চোখে জল। দিলীপবাবুকে তাঁরা সাদরে আলিঙ্গন করলেন। এইসব গানের আসরে অনেক জানা-পাণী বাড়ি, বহু প্রসিদ্ধ গায়ক-গায়িকা উপস্থিত থাকতেন। "শতীন বেব বমন", "ভাস্মদেব চট্টোপাধ্যায়", "পাহাড়ী সন্ন্যাস প্রমথ" লিপিকায়ে দিলীপবাবুর গানের শব্দ দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। দিলীপবাবু গান শেষ করবার পর দেখেছি তাঁরা সঙ্গত্রে মাথা নত করেছেন তাঁর স্বর্ণীর সঙ্গীতজলার প্রতি প্রণাম জানিয়ে।

সে সময়ে দিলীপবাবু কলকাতার এলেন থাকতেন তাঁর মামা 'খগেন্দ্রনাথ মল্ল'মহারের বাড়িতে রোডের বাড়িতে। উভয় পার্শ্বের বাড়িতে মাঝে মাঝে এসে থাকতেন তিনতলার ঘরে। ঘরের সামনেই প্রস্তুত ছাদ। ভোরে উঠে গুনগুন করে গান করে ছাদ পারটার করতেন। বলতেন, আমাদের বাড়ির মত এত সুন্দর ছাদ তিনি দেখেননি। দিলীপবাবুর কাছে এ কথা শুনলে অনেক ছাদ ফেটে চাইতেন। বাবা অবাক হয়ে কেতেন। বলতেন, ছাদ তো সবাইয়ের বাড়িতেই থাকে। এর মধ্যে দেখবার মত কি আছে? এই ছাদে দিলীপবাবু গান গেয়ে শোনালেন মহাত্মা গান্ধীকে। গান্ধীজী তখন (১৯৩৮ সাল) আমাদের বাড়িতে রয়েছেন। দিলীপবাবুও তখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছেন। সন্ধ্যার ছাদে মহাত্মাজীর প্রার্থনা-সভা হতো। সেই সময়ে ভজন ইত্যাদি গানও তিনি শুনতে জল-বালতেন। দিলীপবাবু করক দিন সন্ধ্যার তাকে গান শোনালেন উমা বন্দ্য (হাসি) সহ। দিলীপবাবুর গান শুনলে মহাত্মাজী মোহিত হলেন। উমার গান শুনলে মহাত্মাজী তাকে "নাইটিংগেল" বলে অভিহিত করলেন।

আর একদিনের কথা। দিলীপবাবু কটা দিন উভয় পার্শ্বের কাটাচ্ছেন। একদিন মহাত্মাজীকে নিমন্ত্রিত হলেন তাঁর দুজন কন্যা—শাহিহ সুরাবাদি (বাসোম্বরী প্রফেসর) ও "তুলসীচন্দ্র গোস্বামী। সঙ্গে অবশ্যই ছিলেন আমার রাগাঢ়াকাবাধা, স্রীসুভাচন্দ্র বন্দ্য। এই চতুর্মল্লনের দৃশ্য কেন এত মনে আছে জানি না। সারা দিন ঘরে তাঁদের চলল নানা রকম আলোচনা। সব কথা বোকবার বিদ্যাবৃদ্ধি বা বরস তখন হয়নি। তবে বকেছিলাম এরা সকলেই আলাদা ও উচ্চ ধরনের মানুষ্য।

দিলীপবাবুর সঙ্গে তাঁর মামার বাড়িতে প্রায়ই যেতাম। তাঁর মামাভো ও মাসভূতা বোনেদের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তাঁর মামা ও মামামার কাছে অনেক নৈহ পেরেছি। দিলীপকুমার যে তাঁদের কতো আদরের তা বেশ বুঝতে পারতাম। আমাদের বাড়িতে নিজে এসে আমাকে নিয়ে যেতেন খিয়েটার রোডে। গান করতে করতে সারা রাত্তা হুটুতেন। খিয়েটার রোডে তাঁর বোনেদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে গান শিখতাম। সে কি আনন্দের দিনগুলি! এ ছাড়া দিলীপবাবুর সঙ্গে তাঁর গানের জলসার অনেক জায়গায় গেছি। আর গেছি তাঁর বোন মারা দেবীর বাড়িতে। মারা দেবীর বিয়ে হয় 'সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের' ছেলে 'শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের' সঙ্গে। 'সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের' ব্যারাকপুরের বাড়িতে তাঁরা থাকতেন। গাংগার ঘরে তাঁর সুন্দর বাড়ি। 'শিবজেন্দ্রলাল রায়ের' একমাত্র পুত্র দিলীপকুমার রায় ও একমাত্র কন্যা মারা দেবী। তাঁরা অল্প বয়সে মাতৃহারা হন। 'শিবজেন্দ্রলাল মাতৃবৎ স্নেহে পুত্র-কন্যাকে পালন করেছিলেন। তাঁর কবিতা 'শ্রুত লিঙ্গ' দিলীপবাবুকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

কলকাতা-জীবনে সুভাষচন্দ্র ও দিলীপকুমারের প্রথম আলাপ। কৈশোরের বন্ধুত্ব দিলীপকুমার ও সুভাষচন্দ্র জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্লান্ত রেখেছিলেন। যদিও তাঁদের মত ও পথের অনেক পার্থক্য ছিল। দিলীপকুমার ছিলেন সন্ন্যাসী, সুভাষচন্দ্র সৈনিক। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ভালবাসার





শুরে সারা রাত গল্প করে কাটিয়ে দিয়েছেন দেখেছি। এইসব দেখে আমাদের প্রশংসা ঠাকুরা (‘বাসন্তী দেবী’) শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন পাছে না দিলীপ স্ভাষকে সন্ন্যাসের পথে টেনে নিয়ে যায়। একদিন বললেন ‘দেখ স্ভাষ, তুই দিলীপের সঙ্গে বেশী মিশবি না। ওর মত তুইও কবে আশ্রমে চলে যাবি সেই ভয় করে।’ শূনে রাগাকাকাবাবুর কি হাসি। স্ভাষচন্দ্রের অন্য লক্ষ্য অন্য পথ—‘বৈরাগ্যসাধনে মজি সে আমার নয়।’ তবুও মায়ের মন রানতে চায় না।

দিলীপবাবুর বিরাট পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা দেশের ছেলেমেয়েদের কল্যাণে লাগুক—এই ছিল স্ভাষের কাম্য। বারবার তিনি বলতেন দিলীপ, দেশকে তোমার অনেক দেবার আছে, তুমি কিছু দিয়ে যাও। দেশ কতোখানি তা গ্রহণ করেছে জানি না।

দিলীপবাবুর কাছে কন্যাসম স্নেহ পেয়ে ধনা হয়েছি কিন্তু তিনি ‘দাদা’ বলে পরিচিত হতে ভালবাসতেন। রাগাকাকাবাবু বলেছিলেন, ‘আজ্ঞা দিলীপ, তুমি গীতার দাদা হলে কি করে? তুমি তো আমার বন্ধু, আর আমি গীতার কাকা। অতএব তুমি গীতার কাকা হও।’ দিলীপবাবু বলে উঠলেন, ‘না, না, ও-সব কাকা-টাকা আমার ভাল লাগে না—বুড়ো হয়ে যাবে যে। আমি গীতার দাদাই হব।’

পরে তিনি পশ্চিমবঙ্গের অরবিন্দ আশ্রম ছেড়ে পুনেতে চলে যান। মাঝে অনেক দিন কলকাতার তিনি আসেননি। আমিও বাটরে বাটরে ঘুরেছি, তাঁর সঙ্গে সংযোগের সুযোগ ঘটেনি। ১৯৬৪ সালে আমরা নেতাজী রিসার্চ বুরোয় উদ্যোগে দিল্লীতে নেতাজীর আলোচ্য প্রদর্শনীতে অয়োজন করি। এই প্রদর্শনীতে চিত্রে নেতাজীর জীবন-আলেখ্য দেখে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণ, উপ-

রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেন ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী চমৎকৃত হয়েছিলেন। আমাদের কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ডঃ সি ডি দেশমুখ, সম্পাদিকা শ্রীমতী কল্যাণী ভট্টাচার্য এবং অন্যতম সদস্য শ্রী সি সি দেশাই, শ্রীহরিবন্ধু কাম্য প্রমুখরা। শ্রী সি সি দেশাই রাগাকাকাবাবু ও দিলীপবাবুর সঙ্গে বিলাতে একসঙ্গে ছিলেন এবং তাঁদের বিশেষ বন্ধু ও ভক্ত। দিলীপবাবুকে চিঠি লেখা হলো তিনি যদি প্রদর্শনীর সময়ে দিল্লীতে আসেন ও স্ভাষ সন্মুখে আমাদের কিছু বলেন। দিলীপবাবু সানন্দে রাজী হলেন ও আমাদের আমন্ত্রণে পুনে থেকে দিল্লীতে এলেন। সম্প্রীত ও কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি দিল্লীর প্রাণে আলোড়ন ফুলে দিলেন। দিল্লীবাসীরা তাঁর গান শোনবার সুযোগ আগে বেশী পাননি। অল ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যান্ড ড্রামাটিক সোসাইটি হলে লোক ধরে না। দিলীপবাবু নানা ভাষাবিদ ছিলেন এবং অনেক বিদেশী সুরও তিনি আমাদের বাংলা গানে আরোপ করেছিলেন। সেদিন তিনি গাইলেন তাঁর বাবার (শিবজেন্দ্রলাল রায়) ‘যেদিন সুনীল জলাধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ’ গানটি। পরে শোনালেন এ গানের হিন্দী, জার্মান, স্প্যানিশ ও ইংরাজী ভাষার অনুবাদ গেয়ে। আরো দুটি স্মরণিত স্মরণীয় গান তিনি শোনালেন। প্রথমটি স্ভাষচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে লেখা। তার কয়েকটি লাইন এখানে উদ্ধৃত করছি :

You sang the Gita's song of songs :  
"Up! quell the shadows' tyranny!"  
And so our Lord of Dawn booned you  
with the crown of immortality.  
You chanted the Gita's deathless hymn,  
"Wage war we must to do His will,  
And charge the embattled alien hordes  
and dying to night, His Morn reveal;  
We'll cross the seven seas, ride the storm

and rule the waves—may bless us God:  
We'll stake our all for the All—in all,  
redeem our Motherland with  
our blood."

চীন-ভারত যুদ্ধের পরিস্থিতিতে আমাদের সেনাবাহিনীকে উদ্দেশ্য করে তাঁর রচিত গানও তিনি সেদিন আমাদের শোনালেন। তাঁর সঙ্গে সন্মো করলেন তাঁর আজীবন বন্ধু স্ভাষের স্মৃতিচারণ। তাঁর সঙ্গে শেষবারের মত দেখা হয়েছিল ১৯৭০ সালে কলকাতার শ্রীমলিন সেনের বাড়িতে। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন আমার অটোগ্রাফ বইটি, যাতে তিনি ১৯৩৭ সালে নিশ্চলিখিত কবিতাটি লিখে দিয়েছিলেন। নিজের লেখা কবিতাটি একবার পড়লেন, তারপর তাঁর নীচে সই করে দিলেন।

“গীতা,

স্নেহ তোমার রইবে মনে যখন যাব দূরে,  
শুধু তোমার কামিত স্ভাষ স্মৃতির মধুরে।

তোমার তরে ভাই করি প্রার্থনা

হোক তোমার এই জীবন আরাধনা,

সুরাজের সুরেই মেলাও এই স্ভাষের সুর  
তা হলে সব নিগড় হবে আনন্দ নৃপরে।”

—দিলীপদা

তাঁর নীচে আবার তাঁর স্বাক্ষর ২৭/১/৭৬ তারিখে।

ইন্দিরা দেবীকে বললেন, ‘জানো ইন্দিরা, গীতাকে কতো যে কোলে করেছি। আমার কোলে উঠতে ও খুব ভালবাসত।’ আমি বললাম, ‘আপনি যদি অনুমতি দেন, আজও আমি আপনার কোলে বসতে পারি।’ শূনে তাঁর সেই প্রাণখোলা হাসি হাসলেন।

কানে কিছুটা শ্রবণ কম শুনতেন। চেতের দুটিও শ্রবণ হয়ে এসেছিল। কিন্তু সেই মন, সেই প্রাণ, সেই মন-ভোলানো হাসি ছিল আগের মতই। এই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ।

একমাত্র গাছগাছড়ার ভেষজগুণ দাঁতকে ক্ষয় থেকে বাঁচাতে পারে



LDL/NTN/48

একমাত্র **নিম**

টুথপেস্টেই আছে নিমগাছের  
যাবতীয় ভেষজ ও  
ঔষধীয় গুণ

ক্যালকাটা কেমিক্যাল এর তৈরি

দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্যরক্ষায়  
অদ্বিতীয় টুথপেস্ট—নিম

## কাছাকাছি থেকে

### মৃত মৃত্যুপাখ্যায়

'কাছাকাছি থেকে তুমি, বেশি দূরে কোথাও যেনো না'  
সতর্ক ধর্মির মতো মার কথা আজো মনে পড়ে  
আমি তো চাইনি যেতে চেনা জল চেনা রোদ থেকে

কুয়াশার ঝেরাটোপে

গাছের একটি পাতা, খুব চেনা পাতা  
খসে যেতে দুঃখ পাই  
পাতাটা কুড়িয়ে এনে ফিসফিস বলি  
মা'র কথা কেন শুনলে না  
সদর দরোজা খুলে কেন তুমি

ফেরিঅলা বাতাসের ডাকে ছুটে গেলে?

এইসব বলি, তবু বেড়ে যায় আমার বিরহ  
বেতস লতার মতো জন্ম থেকে দূরে যাই  
ক্লমশঃ বিচ্ছেদ বাড়ে  
দূরত্ব বেড়ে চলে কৈশোরের যৌবনে থেকে  
সূচীমুখ কামা নিনে ডালোবাসা যায়  
পড়ন্ত রোদের মতো আমার সময়  
তবু, যাই, যেতে হয় দূরে  
আরো আলো আরো তাপ উৎসবের দিকে  
চেনা জল চেনা রোদ ছেড়ে এই যাওয়া  
প্রতিদিন অগস্ত্যের মতো।

মনে পড়ে মার কথা।  
'কাছাকাছি থেকে তুমি, বেশি দূরে কোথাও যেনো না।'

## ভিত্তি

### চন্দন মৃত্যুপাখ্যায়

চারটে দেওয়াল সরে গেছে খুব দূরে  
ছাদ উঠে গেছে অনেক শূন্যে, ফাঁকা  
ঘর ব'লে আর কিছু নেই পৃথিবীতে  
শীতের বাতাস সব দিকে ব'য়ে গেলো।

রাত একটায় দ' পা বাড়িয়েছ তুমি  
এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে খুব ধীরে  
তোমাকে ভীষণ শাস্বত মনে হ'লো  
শীতের বাতাস সব দিকে ব'য়ে যায়।

কোনো মানে নেই তবু তুমি উদাত  
পৃথিবী ভাঙছে গ'ড়ো গ'ড়ো ওই পায়ে  
তোমার মৃত্যুর রেখা আমি দেখব না  
শীতের বাতাস সবদিকে ব'য়ে থাক।

## উৎকীর্ণ বিষাদ

### উজ্জ্বল সিংহ

শোকস্তম্ভ রাহি ঘিরে হে মেঘোৎকীর্ণ শিলারারশি  
এসো নম্র পৃথিবীতে এসো, ভাঙে গান, অবনত স্বপ্নের সম্ভার  
হৃদয় সর্পের কীড়া শব্দ হলো এইবার অবাধ্য শয্যায়  
তড়িৎ প্রবাহ কেটে ফুটেছে নিঃপ্রাণ তারা অধার আকাশ  
এই রাত আত্মঘাতী হবে।

গোপন প্রবাহ থেকে দূরে প্রবল পাহাড়ে  
পাথরমল্লগা ফেটে উড়ে যায় মর্মজ্বালা মানুষের সফল গোলাপ  
ওগো ব্যর্থ শাদা শিলা, নবীন ঘরের ছাদে বেজে ওঠো নিপুণ মঞ্জীর  
সজোর পবনে বহো বিধুর প্রাবণ, কাঁপো শস্য  
ক্ষেতের কল্পোলে চন্দ্রাচার উড়ে যাক পতঙ্গধ্বংসের ধ্বনি হয়ে।

প্রান্তর ভাসিয়ে ওড়ে বিজয়পতাকা ওড়ে ছেঁড়া পায়জামা  
তীরন্দাজ শতাব্দীর হাত ভাঙে রস ভাঙে স্মৃতির ফলক  
ভৌগোলিক চতুঃসীমা ছুঁয়ে হে কুটিল হাওয়ার গীটার  
গেয়ে ওঠো সেমেটারি গান।  
মলিন কার্পাসে মাগো লেগে আছে সন্তানের কিছ্র ভুল নারীপ্রেম।

## দেখা যেতো

### দেবশিশু বসু

আসলে আমাকে নয়, ফিরিয়েছো এক মূর্তি হাওয়া  
হাওয়ার ভেতরে ছিলো করজা ফুলের দ্বার

আরো কত কী যে  
আমিও জানি না,

জীবনযাপনে মিশে ঝেরকম পাগল পাগল ছিলো দিন  
যেভাবে এলেন মেঘ মাননীয় অতিথির মতো,

লব্ধভার, খুঁজে বেড়ালেন—

ছেঁড়া ছেঁড়া এইসব দৃশ্য মনে আছে ;

অথচ যখন বৃষ্টি সহস্র আঙুলে আঁকিবুঁকি  
খেলছিলো জংলা কাঁথায়

মনে হ'লো বৃষ্টি আমন্ত্রণ—

না-হ'লে কি পাওয়া যেতো এক জীবনের ভুল, অমন সহজে  
একদিনে,

এবং তোমাকে নয়

দেখা যেতো তোমার আলোয়!

# অরণ্যদেব

ধান্দালো ছোড়ার উশর দিয়ে  
হাই জালদা!



এবারে বর্ণা-নিষ্কম!  
প্রতিযোগীরা এম্মো!



অরণ্যের তালিমদিকে  
সুদু বর্ণা ছুঁতেনেই হয় না.....



...চাটিতে শড়বার আগে ছুটে গিয়ে বর্ণাটা ধরে ফেলতে হয়!



জুয়া আকর্ষণি বেয়ে নামছে.....



তাহাতাতি নাম  
জুয়া!



ছেলেটাকে এবারে খতম  
বন্দে দিনেই তো হয়!

পাড়ি থেকে নামিয়ে  
দিনেই লাটা চুকে যায়!



না, সাক্ষী  
স্বাক্ষর না!



ওয়াবার-কাবা

# এশীয় টেবল টেনিসে চীনাদের জয়জয়কার

চীনা নামগুলি আমাদের পক্ষে মনে রাখা একটু শক্ত। এবং নাম থেকে বোঝাও শক্ত কে পুরুষ, কে মেয়ে। যেমন— লি জি-হাও, জাই সাইকে, গুরো উয়ে-হুয়া, কাই জেন-হুয়া ইত্যাদি লিখাং জা। জাইং, টং লিং; কী বাও-জিয়াং, লিউ ইয়াং প্রভৃতি। আন্তর্জাতিক টেবল টেনিসে ক্রীড়া দক্ষতার জন্যই চীনাদের চিনে রাখতে হয়, জেনে রাখতে হয় কে পুরুষ কে মেয়ে।

ইজেন নেভালী ইনডোর স্টেডিয়ামে মে মাসের ১০ থেকে ১৮ তারিখ পর্যন্ত যে পঞ্চম এশিয়ান টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ হয়ে গেল সেটা প্রতিযোগিতার দলগত ও ব্যক্তিগত ইভেন্টের খেলা দেখে চীনের মেয়ে পুরুষদের আমরা ভাল করেই চিনে রেখেছি যেমন চিনেজিলাম ৭৫ সালে ওই ইনডোর স্টেডিয়ামেই কিংব টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে চীনের শি য়েন-টিং লিখাং কো-লিয়াং, লি চেন-শি, স, সাও-ফা, চ্যাং লি কে শিন-আই হু উলান প্রভৃতিতে।

কিন্তু অকপটে স্বীকার করছি, চীনের কোন পুরুষ বা কোন মেয়ে টেবল টেনিসে সবচেয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে যেমন সঠিক হারিস পাইনি, যেমন এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপেও প্রকাশ হমানি পাবেন। বিভাগের চ্যাম্পিয়ন লি জি-হাও এক মেয়ে বিভাগের চ্যাম্পিয়ন কী বাও-জিয়াং সবচেয়ে ভাল। টেবল টেনিসের উন্নত কলাশৈলীতে সবাইকেই প্রায় সমানক কল মনে হয়েছে। টপস্পিন, লুপডাউন, স্ম্যাশ, ড্রপশট, চপ-এর রকমফের এবং সার্ভিসে কেউ বাকি কারো চেয়ে কম নয়। অবশ্যই মারের পরিমার্জনে ইতর বিশেষ আছে। যেদিন যে সময়ে যে খেলোয়াড়ের হাত ভাল খেলছে সেই জিতে গেছে। পুরুষ বিভাগের সেমিফাইনালে সকলে দেখলাম লিম্বের দুই নম্বর খেলোয়াড় এবং প্রতিযোগিতার এক নম্বর বাছাই গুরো উয়ে-হুয়াকে প্রায় নাস্তানাবুদ করে স্ট্রেট গেমে জিতল ১৮ বছরের তরুণ জাই সাইকে। আবার সন্ধ্যায় ফাইনালে দেখলাম ওই সাইকেরই খেলা খুলল না লি জি-হাওয়ের কাছে। কিছুটা সহজেই হারে গেল।

এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে আর ফোর্ট দেখলাম তা হচ্ছে চীন, জাপান, উত্তর কোরিয়া, হংকং প্রভৃতি দেশের খেলোয়াড়দের পেনহাঙ্গ প্রিপের বৈশিষ্ট্য আর বজায় থাকছে না। পেনহাঙ্গ প্রিপে খেলতে সমান লেপগোর পরিচয় দিচ্ছে। এই চ্যাম্পিয়নশিপে মাসগুলিগ মাসের জন্যে কট খেলোয়াড় খেলোয়াড় গ্রীপে। বিশিষ্ট নামগুলি চ্যাম্পিয়ন লি জি-হাও (চীন), হুয়াং লিয়াং (চীন-বিশ্বের ১৭ নম্বর), টং লিং (চীন-বিশ্বের ৪ নম্বর মেয়ে), হুকেও গোতো (জাপান-বিশ্বের ১৬ নম্বর), কেনেচ ইকোদা (জাপান-মেয়ে), কাই ওয়াদা (জাপান-মেয়ে) লি স, স্ক (উত্তর কোরিয়া-বিশ্বের ২ নম্বর মেয়ে), হং গেল স, উত্তর কোরিয়া) প্রভৃতি।

বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠছে এবার সার্ভিসেও। খুব উচ্চতর বল ডুলে ব্যাটের আঘাতে ছোঁয়ার স্পিনের বিষ মিশিয়ে আমরা প্রথম সার্ভিস করতে দেখছিলাম চীনের স, সাও-ফাকে ৭৫-এর বিষ চ্যাম্পিয়নশিপে। স, সাও-ফা প্রচুর পয়েন্ট নিরর্থক সার্ভিস থেকে। এবার দেখলাম অন্যেরই ওই আর্ট দক্ষ। এমন কি ভারতীয়রাও। তার প্রায় কুড়ি-বাইশ ফুট উপরে বল ডুলে ওই সার্ভিসে সবচেয়ে বাহাদুরি দেখিয়েছে উত্তর কোরিয়ার এক নম্বর পুরুষ খেলোয়াড় জো ইয়ং হো। প্রতিযোগিতার ছিল পঁচিশ নম্বর বাছাই।



লি জি-হাও



লি জি-হাও

স, সাও-ফা ও হুকেওদের দলগত ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হও ছাড়াও ব্যক্তিগত ইভেন্টেও এটি খেতাবের মাধ্যমে শেরক হ চীন। যদি বলক ও বলিকা বিভাগে ত্রয়ো খেলোয়াড়ের দলগত খেলায় হরতো পুরুষদের ১৬টি খেতাবই খেত চীনাদের হাতে। তবে জো চীতে বেশ কয়েকজন নম্বর মেয়ে-পুরুষ খেলোয়াড় কলকাতা খেলতে আসেন। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের স, সাও-ফার একটি দল সফর করছিল ইউরোপে, আর এক দল অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে।

বিশিষ্ট খেলোয়াড় উত্তর কোরিয়ায় নিয়ে চীন যে ফ করল এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে তা নতুন রেকর্ড হ রইল। এর আগে কোনো খেলোয়াড় ৭টি খেত পায়নি। ৭৮ সালে কুয়ালালামপুর চ্যাম্পিয়নশিপে চীন পেরেছিল চারটি খেতাব।

এশিয়ান টেবল টেনিস ইউনিয়নের সপ্তদশ এটি ছিল পঞ্চম চ্যাম্পিয়নশিপ। এর আগে ১১৬ সালে ভারতে আর একবার এশিয়ান টেবল টেনিস আসর বাস। সেবার পঞ্চম প্রতিযোগিতা হয় যোম্বাই, এশিয়ান টেবল টেনিস ফেডারেশনের অধীন নবগঠিত এশিয়ান টেবল টেনিস ইউনিয়নের প্রথম চ্যাম্পিয়নশিপ হয় ৭২ সালে পিকিং, শ্বিভ প্রভিযোগিতা হয় ৭৪ সালে ইয়েকোহামা, তৃতীয় প্রতিযোগিতা ৭৬ সালে কোরিয়ার শিং ইয়ং এর চতুর্থ প্রতিযোগিতা হয় ৭৮-এ কুয়ালালামপুরে।

কুয়ালালামপুরের ভারতের পুরুষ দল পেরোয়া বর্ষ স্থান মেয়ে দল চতুর্থ স্থান। এবার কলকাতা তিক উঠে ফল হয়েছে। পুরুষরা দুই ধাপ উপরে উঠে চতুর্থ হয়েছে। মেয়েরা নেমে গেছে দুই ধাপ বারিগত প্রতিযোগিতায়। ভারতীয়দের ভূমিকা মোটে উজ্জ্বল নয়। পুরুষ মেয়েদের মধ্যে কেউ আদর্শ খেলাতে পারেনি। শূন্য বলক বিভাগে মহারাজ প্রভৃতি খেলে সূচক খেলোয়াড় ফাইনাল খেলে স্কলস হয়েছে আর বলিকা বিভাগের সেমিফাইনাল খেলতে আসা মেয়ে একটি মেয়ে, নিরতি স্কল।

ব্যাকহ্যান্ড ও ফোরহ্যান্ড মারের চটক বোঁধে সূচক খেলোয়াড় সেমিফাইনালে হারিয়েছিল জাপানের বলক প্রতিভাদের অগ্রগণ্য কোর্নিচ ইকোদাকে। কিন্তু ফাইনালে হংকংয়ের ল কান টুয়েন বিজয়ে ফুটে উঠতে পারেনি সম্ভবত অভিজ্ঞতার অভাবে এবং স্মার, চাপে। খেলোয়াড়ের কিন্তু ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। গত বছরই জাতীয় জুনিয়র হয়েছে। উল্লেখ্য এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে কোনো ইভেন্টে ফাইনাল খেলায় খেলোয়াড় সূচক ভারতের শ্বিতীয়। এর আগে ইয়েকোহামার চ্যাম্পিয়নশিপে বলক বিভাগে ফাইনালে খেলোয়াড় ভারতের অরুণ কুমার।

দলগত প্রতিযোগিতায় চন্দ্রশেখর, মর্নিজত দুয়া মর্নিজত সিং ও কমলেশ মেটকে নিয়ে গড়া ভারত দল ৭টি খেলার মধ্যে জেতে তিনটি খেলোয়াড় হারে চারটি দেশের কাছে। চীনের কাছে ০-৫ খেলার, জাপানের কাছে ২-৫ খেলার, মালয়েশিয়ার কাছে ৪-৫ খেলার এবং উত্তর কোরিয়ার কাছে একই ফলে। জেতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৫-১, ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে ৫-৪ এবং থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫-০ খেলার। টেনিস টেনিসে উত্তর কোরিয়ার স্থান অনেক উপরে। তাদের সঙ্গে খেলার ভারতের ৪-৫ ফল প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু মালয়েশিয়ার কাছে পরাজয় অপ্রত্যাশিত ছিল।

উল্লেখ্য, পুরুষদের দলগত প্রতিযোগিতার ফল মায়োসা হয় ১টি সি গলস খেলোয়াড়। প্রতি দেশের পক্ষে খেলে তিনজন করে খেলোয়াড় প্রথম এবং পাঁচ জনকে দ্বিতীয়। মালয়েশিয়া দলগত প্রতিযোগিতার মায়োসা হয় চারটি সি গলস এবং একটি ডাবলস খেলার ফলে। ভারতের মেয়ে দলে খেলেছে লিখনি কলকার্ণি, ইন্দু, পূর্ণি, মোনালিসা কল্যা, কল্যাণী সীতরাম ও সিন্ধা মেটা।

ভারতের মেয়ে দল হয়েছে ৫টি দেশের কাছে,

কেন্দ্রে পূর্ব অস্ট্রেলিয়া (০-০) ও জাপানের (০-১) বিরুদ্ধে। চীন, উত্তর কোরিয়া ও জাপানের বিরুদ্ধে ভারতের মেরু একটি খেলাতেও জিতে পেরেন। পূর্ব হংকং ও ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকে একটি করে ম্যাচ পায়, যদিও দুই দেশের কয়েকই হয়ে ১-০ ফলে।

ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার ভারতের রমেশবাবু, কল্লেশ মেটা, এমন কি মনীষিত দুজনে এবং মনীষিত সিং প্রাথমিক ধাপ পার হয়ে মূল খেলার যোগ্যতা পাননি। মূল ১৬ জনের মধ্যে এসেছিল পূর্ব জাতীয় চ্যাম্পিয়ন চন্দ্রশেখর এবং অরুণকুমার। দুজনের কেউই ৮ জনের মধ্যে যেতে পারেননি। চন্দ্রশেখর হারে চীনের সি জি-হাওয়ের কাছে, অরুণকুমার জাপানের শিগের, ফুকের কাছে। দুজনেই অতি সহজে এবং শ্রেষ্ঠ গেমের মেয়েদের মধ্যে মূল খেলার অধিকার অর্জন করতে পারেননি ইন্দু, পূর্ণী, যোনালিসা বড়ুয়া ও ফলাবতী নীতলায়। নীন্দনী কুলকর্ণী, কাম্বীরা প্যাটেল ও সিন্থা মেটা হারে প্রথম রাউন্ডে। সুতরাং কোরীয় কোচের প্রশিক্ষণ টেবল টেনিসে ভারত অনেক উন্নতি করেছে বলে যে প্রচার চালানো হচ্ছে খেলার ফলের সঙ্গে তার সম্পর্কিত কোথায়? তবে নিসন্দেহে ভারতের খেলোয়াড়দের লড়তে হয়েছে পৃথিবীর বহু নামী খেলোয়াড়দের সঙ্গে। যদিও এটা ছিল এশীয় চ্যাম্পিয়নশিপ, তবে চীন এবং জাপানই তো টেবল টেনিসে পৃথিবীর এক নম্বর ও দুই নম্বর দেশ। উত্তর কোরিয়াও দারুণ শক্তিশালী। তবে জাপান এবং কোরিয়ার খেলোয়াড়রা এবার বহুলাংশে স্তিমিত ছিল। ৭৮-এ ফুজিলালমপুর্ চ্যাম্পিয়নশিপে উত্তর কোরিয়া পূর্বের ও মেরে বিভাগে দলগত রানার্স হওয়া ছাড়াও তিনটি পেরেছিল জুড়িসাত খেতাব। এবার একটি খেতাবও পাননি। জাপানের পূর্ব বালিক বিভাগে চ্যাম্পিয়নশিপ। দু-বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন কোরিয়ার সেই অসাধারণ মেয়ে পাক ইয়ং সুনের জুড়িসাত অনেক স্থান। দলগত ও ব্যক্তিগত খেলা

খালারে তিনটি খেলার হার স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু কিং চ্যাম্পিয়নশিপের রানার্স এবং এই প্রতিযোগিতার এক নম্বর বাছাই লি সাং সুক মূল প্রতিযোগিতার খেলতে পারেননি প্রাথমিক ধাপে হেরে গিয়ে।

জাপানের হিসেবে গোটে বহু খেলোয়াড় অসাধারণ সংগ্রামী শক্তির পরিচয় দিয়েছে। অসাধারণ ডিফেন্স। অকিঞ্চন্যভাবে কল ফেরৎ পাঠার যে বল তোলা অসম্ভব বলে মনে হয়। কিন্তু ডিফেন্সের তুলনায় আটাক দুর্বল। নিজের কতিপয় রত পরেই পায় তার চেয়ে অনেক বেশি পরেই পায় প্রতিদ্বন্দ্বী খুলে, ফকে নেগেটিভ পরেই বলে। কিন্তু নেগেটিভ পরেই ম্যাচ জেতা যায় না যদি প্রতিদ্বন্দ্বী সতর্ক থাকে। জাপানীরা যেখানে কোরিয়ান ও ব্যাকহারড যারের কনায় টেবিলের উপরে তখন ভুলেই যেতে উড়ের ভেসে আশ্রয়কার চেষ্টা করেছে। চীনাদের নীতি আটকেই বেস্ট ডিফেন্স।

চীনের অরুণকুমারের কথা আগেই লিখেছি। অন্যান্য দেশের খেলোয়াড়দের তুলনায় তারা যে কত পোস্ত তার প্রমাণ, পূর্ব বিভাগের ৭টি দেশের বিরুদ্ধে তারা একটিও ম্যাচ হারেনি। সব খেলাতেই জয় ৫-০ ফলে। মেরে বিভাগে পূর্ব উত্তর কোরিয়ার কাছে একটি ম্যাচ হার ছাড়া ৬টি দেশের বিরুদ্ধে জয় ০-০ ফলে। উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে ০-১ ম্যাচে। পূর্বের মেরে ব্যক্তিগত লিপিসে ৮ জন সেমিফাইনালিস্টের মধ্যে ৭ জনই ছিল চীনের।

আগেই লিখেছি, চীনাদের নৈপুণ্যগত পার্থক্য বড় হয়ে ফুটে ওঠেনি। চোপের দৃষ্টি, হাতের মার, পারের ছন্দ, টেবল ড্রাফট-সবই যেন সমান তারে বাধা। তবে এটা বসতে অসুবিধা হয়নি যে, বিশ্ব-প্রতিযোগিতার রানার্স পুরো উইরে হুমার প্রতিভার এখন ভাটার টান এবং বা-হাতি, তরুণ জাই সাইকের মধ্যে স্কর্ সম্প্রদায়। ইলজো তার জন্য বিশ্ব খেতাব অঙ্গণা করছে।

এশিয়ার ২৩টি দেশের খেলোয়াড় ও জৌহরীসের নিয়ে সমুদ্রভাবে এই প্রতিযোগিতা পরিচালনা ছিল বেঙ্গল টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সাহায্যে এক কড় চ্যালেঞ্জ। এই জন্যই চ্যালেঞ্জ বলাই যে, হাতে সময় দুইই কম ছিল এবং দায়িত্ব ছিল দম্ভ বড়। কিন্তু বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের সংগঠনার কলকাতা বেনম সুন্দাম পেয়েছিল তখনই সুন্দাম পেয়েছে পঞ্চম এশিয়া টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার এবং অভ্যর্থনা ও আতিথেয় ক্রিয়াদের সন্মুখিত্ব বিধান।

নীচে ফাইনাল খেলার বিজয়ী ও রানার্সের নাম দেওয়া হল।

**পুরুষের লিপিসে-বিজয়ী** সি জি-হাও (চীন), রানার্স-জাই সাইকে (চীন)। **মেয়েদের লিপিসে-বিজয়ী** কী বাও-জিয়াং (চীন), রানার্স-লিউ ইয়ং (চীন); **পূর্ব-মেরে ডাবলস-বিজয়ী** জাই সাইকে ও পুরো উইরে-হুয়া (চীন), রানার্স-সি জি-হাও ও কী জেন-হুয়া (চীন); **মেয়েদের ডাবলস-বিজয়ী** লিউ ইয়ং ও জ্যাং জাইং (চীন), রানার্স-পাক ইয়ং ওক ও জং গিল সুন (উত্তর কোরিয়া); **লিউ ডাবলস-বিজয়ী** সাইকে ও জ্যাং ডাইং (চীন), রানার্স-গারো-উইং-হুয়া ও লিউ ইয়ং (চীন)। **কলম্বের লিপিসে-বিজয়ী** ল কাম টুং (হংকং), রানার্স-সুতর ঘোরপাড় (ভারত)। **বালিকদের সিংগলস-বিজয়ী** হু-মিকো ওকাযোটো (জাপান), রানার্স-মিকা হোসিনো (জাপান)।

**দলগত স্থান (পূর্ব-১)** ১। চীন, ২। জাপান, ৩। উত্তর কোরিয়া, ৪। ভারত, ৫। ইন্দোনেশিয়া, ৬। অস্ট্রেলিয়া (মেরে) ১। চীন, ২। উত্তর কোরিয়া, ৩। জাপান, ৪। হংকং, ৫। ইন্দোনেশিয়া, ৬। ভারত।

মুকুণ



## বেদনামা আমলা তেল

- একটি আদর্শ মেয়ের টনিক
- মাথার ঘামে মাথাকে  
● তুল-ওঠা যন্ত্র করতে  
● সাহায্য করবে
- মাথা ঠাণ্ডা রাখে
- চুলের হাওয়া বজায় রাখে
- চুলে অনেক সতেজ  
● ক্রিয়াকলাপ ও সজীবতা
- ঘিঙি সুন্দার  
● তরির তরির মন
- আপনাকে মেরে প্রকৃত  
● মন করিয়ে দেবে  
● চোখ-মুখানো সৌন্দর্য



সর্বস্বকার সাহায্য  
সম্মিলিত ৫টি আধুনিক  
কারখানায় **উৎপাদিত**  
৬০০টিরও বেশী  
আন্তর্জাতিক ঔষধ  
তৈরী করছে।



**উৎপাদক**  
আধুনিক ভবন সিটিউ  
১, ৩শত রাস, কলিকাতা-৬  
কলিকতা ● পানী ● খানী  
বাপুত ● এলাহাবাদ

BBB-BAB-80-



## আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **বই**

পুরনো কলকাতার কথা। পূর্ণেশ্বর পট্টা। বৈজ্ঞানিক পাবনা। কলকাতা। দ্বিতীয় ৪০-৫০।

পুরনো কলকাতা সম্পর্কে কোতুলক অথবা জানার আগ্রহ পূর্ণ হাওয়াবদলের নর, সাধারণ মানবেরও অপরিণীত। ভারতের আর দশটা শহরের মতো প্রতিনিয়তের দাবী-দার নয় কলকাতা; এর অর্থকাল নিত্যতাই ধরাছোঁয়া নাগালের মধ্যে। তবু সত্যতত্ত্বকে চাপকের নোঙর ফেলা থেকে শূন্য করে পরবর্তী একশো বছরেরও কম সময়ের মধ্যে কলকাতার গারে ক্রুট উঠলো জাঁক-জমকের চিহ্ন-কলকাতা হয়ে উঠলো Colonial city par excellence-এ প্রতিলিপি। এ অঞ্চলে ইংরেজ কোম্পানীর প্রাধান্য লাভের গুরুত্ব ও ফলাফল নিয়ে ঐতিহাসিক যত্নে

পূর্ণেশ্বর পট্টা

পুরনো কলকাতার কথা



পরিবেশ চলেছে। আরো চলেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে-কলকাতার দাবী অন্য কারণে। সত্যতত্ত্ব, কলকাতা, গোবিন্দপুর অধ্যায় (এ সম্পর্কে মতভেদের অবকাশ রয়েছে) পত্রটির নিয়ে শহরের আদি চেহারা থেকে শুরুর করে কিভাবে এই শহরটি উন্নীত হল প্রাসাদপত্রীর স্তরে, কি ধরনের লোক ছিল এ অঞ্চলের আদিম বাসিন্দা, কি ছিল তাদের উপ-জীবিকা, নতুন বস্ত্রধারী নানা ধর্মের উদ্ভব। সমাজ-জীবনে তার প্রাতিম্বা, ভিত্তিগত বাসিন্দাদের ভিত্তি, এখানকার দশা সমাজের রূপরেখা, ইংরেজ তথা পাশ্চাত্য সম্পর্কের প্রভা। অর্থ-নীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন, নতুন গাঁয়ের ওটা শহরের দাপ্তরিক, অফিস কাছারি, গির্জা, হাসপাতাল, দোকান, ধনী বাসিন্দা নতুন ধনী, তাদের জালজাল, বাক-সমাজ-এসব সম্পর্কে মানবের জ্ঞান আরও বৃদ্ধি পাবে।

সাধারণ মানুষের এই আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রন্থকার কথার পর কথা দিয়ে দেখিয়েছেন পুরনো কলকাতার কথাটির মতো। বইখানি অত্যন্ত সুখপাঠ্য। কলকাতা ভাষা

ভাষার মধ্যে স্পষ্ট কথাটি। তবু বড়ই জরাজীর্ণ হোক না কেন, বইখানি পরিবেশন করতে গ্রন্থকার যে প্রকাশ-ভঙ্গিটি বেছে নিয়েছেন তা পরোক্ষভাবে কোতুলক করার মধ্যে পাঠকের বিনা জ্ঞানে পৌঁছে দেয় শেষ পাতার শেষ পঙ্ক্তিতে। গ্রন্থের একে শেষ অধ্যায়ের ব্যবধান চান্দ্রো পট্টা। এক একটি অধ্যায় যেন কথা দিয়ে সাজানো এক একটি ছবি। পট্টা অতি সুশোভন মতোই লেখার আকর্ষণ।

পূর্ণেশ্বর পট্টা যেন রেখেছেন যে আরম্ভেরও আরম্ভ আছে। তার কলকাতার আরম্ভ তিনি শুরুর করেন নি-কালীকৈর কিংবা জোব চারুক দিয়ে। শহরের বাসিন্দাদের পরিচয় তিনি শুরুর করেছেন বইখানির ৭৩ পৃষ্ঠায়। তার আগে তিনি লিপিকথ করেছেন পাশ্চাত্যের লিপিকথের আনা-গোনা বিস্তৃত কাছিনী। গ্রন্থকার তার বক্তব্য শুরুর শহর কলকাতার উত্থান এবং প্রসারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন। যে পটভূমিকার ওপরই কলকাতা ইংরেজ কোম্পানীর প্রধান কর্মক্ষেত্রে পরিণত লাভ করেছিল গ্রন্থকার তা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। মোগল-মহিমার তখন শ্মশান-শায়া, মুর্শিদাবাদ খরি সেন্তেবে বাংলার নবাবদের প্রার-স্বাধীন মর-পতির কর্মভালাভ ইংরেজ ও অন্যান্য পাশ্চাত্য বণিকদের মধ্যে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা, বাংলা নবাব বনাম ইংরেজ সওদাগর মুর্শিদাবাদের মসনদ নিয়ে হানাহানি, সরফরাজ খাঁ, আলিয়ার, আফগান বিদ্রোহ, কলী আত্মহন সিরারের সপ্তে ইংরেজ কোম্পানীর প্রকাশ ও গোপন নজিরগীর শেষ পরিণতি, পলাশীর যুদ্ধ-বিস্তার ও বিচার এই পটভূমিকার পূর্ণেশ্বর পট্টা আলোচনা করেছেন কলকাতার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ইতিহাস। সমাপ্তি টেনেছেন ক্লাইভের আমলের কলকাতার বর্ণনা দিয়ে। গ্রন্থকার আশঙ্কিত করেছেন-ক্লাইভ পরবর্তী আঠার শতকের সেবারের এবং উল্লিখ শতকের কলকাতার কথাটির আখ্যা পাবো পরবর্তী পৃষ্ঠা।

পূর্ণেশ্বর পট্টা সুসঙ্গত, সাহিত্যিক ভগ্নের একটি সুপ্রতি-স্থিত নাম। সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে তার কৃতিত্ব এ প্রসঙ্গে অব্যাহত থাকতে পারে। কলকাতার যে ইতি-হাস তিনি বর্তমান গ্রন্থের মাধ্যমে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন ইতি-হাস-অসংলগ্নভাবে কাছে তা স্পষ্টে গৃহীত হবে। নিম্নক ইতিহাসের গবেষক অবশ্যই তার গ্রন্থের পঙ্ক্তিতে কলকাতার ইতিহাসের বিজ্ঞ দিক দিয়ে আলোচনা করবেন এবং ঐতিহাসিক মতে তার ব্যবহার মূল্যায়নও হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে একটি দিক দিয়ে গবেষণা-মূলক পুস্তক অথবা এই সম্পর্কে ব্যাখ্যা বা আলোচনা তাদের সংখ্যার ভুলার সংখ্যার গুরুত্ব কতকগুলো দিকের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী পাঠকের মধ্যে স্বেচ্ছাবৃত্তি অনেক বেশী। এই শোভা প্রেরিত পাঠ্যপত্র মানুষের

**৩০০০** বই  
নিঃশেষিত  
হয়ে  
নতুন সংস্করণ বেরুলো  
**এক ব্যাগি শংকর**

একটা ডাউন উপন্যাস, একটা উপন্যাসোপম কাহিনী ও একটা বিরাট গল্প। এতো কম নামে এমন সুন্দরভাবে এর আসে কখনও প্রকাশিত হয় নি। মর থেকে নতুন পর্বত ভাঙির সমার জমো আশ্চর্য উপহার মাত্র ৭৫। ব্যাগি হ্যাঁ কিছুতেই মেয়েন না। ডি পি ১০

ষট্টি দিন দ্রুতপ্রাপ্য থাকার পর জাবার পাওয়া যাবে

**স্বর্ণ মর্ত পাতাল** ডি পি ১৬

৬৮০ পাতার মর সংস্করণের প্রতি লাইন অক্ষত রেখেও এই বিশাল বইয়ের নাম মাত্র ১২৫। পুস্তক বিক্রেতার ও যোগাযোগ করুন। স্টক সীমিত

সামান্য কিছু কমি পাওয়া যাবে

**শংকর**

এর আকর্ষিত

রজত জয়ন্তী সংস্করণ



৩৬ টিকর  
উপন্যাস  
মাত্র  
১২৫  
ডি পি ১০

বাংলার বোলদের  
এবং তাঁদের আশ্রয়ভঙ্গদের  
অব্যর্থপাঠ্য

নতুন উপন্যাস সুখণ সুখণ ৪০, ডি পি ১৪	কলকাতার আরো রজনী সন্ধ্যা ও সূর্যাস্ত ৪০, ডি পি ১৪
শংকর-এর সব বই সে বুক টোয়ে পাওয়া যায় : জম অরফ ৮, মেখানে বেয়েন ১০, চৌরসী ১২৫০ আশা আকাশ ৮, রত্নাবলী ১২৫, মনোপাল ৮	
মোজ পাশবিশিষ্ট c/o সে বুক টোয় ১০ বাল্লম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭০ ফোন : ৩৪-৫০০৫	

অদ্বীশ বর্ধন সম্পাদিত

# বিশ্ব বিখ্যাত ২০ সায়েন্স ফিক্সন

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিন বিখ্যাত কিশোর উপন্যাস

## কিশোর অমনিবাস ১৫

চাঁদের পাহাড়  
মরুর উল্লাহ বাজে  
হীরা মানিক জ্বলে

সর্বসাধারণকে ২০% ছাড়।

তাপস গঙ্গোপাধ্যায়/পিনাকী চট্টোপাধ্যায়

## বনে বনে ২২

সুন্দরবন পালামৌ  
আর গুরুমারার জঙ্গল

সেইসঙ্গে ভারতবর্ষের দশটি বাঘ প্রকল্পের বিশদ বিবরণ।

তারানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

## হাসুলীবাঁকের উপকথা ২৫

## শ্রেষ্ঠ গল্প ১২, ধাত্রী দেবতা ২০

মনোজ বসুর অগ্নিযন্ত্রের পটভূমিকার তিনটি উপন্যাস

## সংগ্রাম ১৫

ভুলি নাই  
বাঁশের কেরা ২০% ছাড়  
সৈনিক

স্বামী দিব্যানন্দ

পরলোক প্রেতভক্ত ১০, তত্ত্ব রহস্য ১০

সাধুসন্তের জীবনে অলৌকিক রহস্য ১ম ২২, ২য় ২০

বীর চট্টোপাধ্যায়

## দেশ বিদেশের অলৌকিক কাহিনী

## দেশবিদেশের ভৌতিক কাহিনী

মৃণাল সেনের

## চার্লি চ্যাপলিন ২২

## জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ

১ম ১২, ২য় ১২, সর্বসাধারণকে ১৫% ছাড়।

অদ্বীশ বর্ধনের রহস্য উপন্যাস বনমাসুখের হাড় ৭,  
লোহার কোট ১২, প্রেত পাহাড়ের সরোবর ৬

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইং লিঃ ১৪ বহিম চট্টোপাধ্যায় কলি-৭০

নইটি পট্টক স্বাক্ষরের কাছে ভুলে  
থাকেন। এটি নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহের  
উপর। কিন্তু ইতিহাসকে সর্বজন-  
গ্রাহ্য করে ভোলায় দায়িত্ব অপরিহার্য।  
পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সরকারী অথবা  
সংসদগরি নাথিল। কিংবা বিদেশীদেশে  
লেশা গ্রন্থকাহিনী অথবা ভারতীয়  
জাতীয় পশ্চিমপত্র থেকেই তার লেখার  
উপকরণ সংগ্রহ করেন। এদেশীয়  
পত্রাতন সাহিত্য, ছড়া, প্রবাদ এ সব  
উপকরণকেও যথাযথ স্বীকৃতি দিয়ে-  
ছেন। এটিও উপসাহস্র ব্যতিক্রম।  
এছাড়া গ্রন্থকার বলেছেন 'কলকাতা  
বিশ্বের নানা মূর্খের নানা মত'। যেটা-  
খটি সমস্ত মতকে সামনে রেখেই গল্প  
বলায় মত করে ইতিহাস কলি ব.  
পটে চেয়েছি। এটিও বইটির গুরুত্ব  
বিশ্বের সহায়ক হবে। কিন্তু সহায়ক  
গ্রন্থ তালিকার যে ক'টি নাম সংযো-  
জিত হয়েছে তার মধ্যে দাঁটি একটি  
নামের অনুরোধ পণ্ডিত্যমূলক বলে মনে  
হয়, যেমন—A. K. Ray—A short  
History of Calcutta, Part I.  
Census of India, vol VII, Cal-  
cutta. Town and Suburbs, S.  
N. Mukherjee—Calcutta My-  
tho and History  
তাছাড়া সমসাময়িক ইংরেজ ও অন্যান্য  
বিদেশী লেখক Memoris and  
Journals ইত্যাদি। এছাড়া  
বহুটির নানা জায়গায় মূল ইংরেজী  
থেকে যে সব উদ্ধৃত ছাপা হয়েছে  
তার মধ্যে রয়েছে বিস্তারিত মূল্যের  
প্রমাণ। রাতমত পাড়াদায়ক। বহ-

১৬টির প্রাতিশ্রুতি রয়েছে—ছাপাশ্রম-  
কার অল্প অল্প কয়েক ডারবে  
আকা তার নিম্নলিখিত থাকলে পাঠক  
খুশি হবেন। জোব চাপক (বই-এর  
ভাষায় অব চাপক) পারিয়ে যে ছাপার  
প্রাতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার প্রমা-  
নিকতা সম্পর্কে যোরতর সন্দেহ  
রহেছে। এছাড়া বই-এর মূল বক্তব্য  
এমন কয়েকটি উক্তি স্থানান্তরিত  
করেছে যার গ্রন্থাবলিগত সন্দেহ-  
প্রশ্ন ওঠে যেমন ১১ পৃষ্ঠার চাকরসা  
বিদ্যার আদ জনক, মধ্যমপত্র ইউ-  
রোপের অর্থকার (১১ পৃষ্ঠা), কাল-  
কটের রাজা আমোদন (পৃষ্ঠা ১০),  
রাজা সন্তম হেনরী ও ভারত রাজের  
আকাশ (পৃষ্ঠা ২৭), চাপকের  
মৃত্যুকাল (পৃষ্ঠা ৬৬), কলকাতার  
প্রথম আমোদন (পৃষ্ঠা ১০৬),  
১৭১৭ সালের কর্মকর্তার পটিক  
তারিখ জানা নেই (পৃষ্ঠা ১০৬), আর  
তিনটে গ্রাম ছাড়া আরও ৩৮ গ্রামের  
জায়গারী লাভ (পৃষ্ঠা ৬৬)।

এছাড়া কয়েকটি ক্ষেত্রে ঘটনার সন  
তারিখ বিভ্রান্তিকর—যেমন, ভাস্কে  
জা গামার কালিকটে অবতরণ, তার  
মৃত্যুর তারিখ (পৃষ্ঠা ১৬), নতুন ইন্ট  
ইন্ডিয়া কোম্পানীর আবির্ভাব (পৃষ্ঠা  
৭৬), কবজলব খারি বাঙ্গার দেও-  
য়ানি লাভ (পৃষ্ঠা ৭৯), গিরজার  
যক্ষ ও সরস্বতীকে মৃত্যু (পৃষ্ঠা  
১৬৬), আলিবাড়ি খারি মৃত্যু (পৃষ্ঠা  
২০৬) ইত্যাদি। পরবর্তী সংস্করণে

সদা প্রকাশিত

<b>THE AGRARIAN SYSTEM OF BENGAL</b> Vol. I : 1582-1793 by A. C. BANERJEE-Analytical survey of government-Zamindar-ryot relations from Akbar to Cornwallis		Rs. 85.00
<b>CHINA'S HUNDRED WEEDS :</b> An Anti-Rightist Campaign in China (1957-58) by N. N. DAS		65.00
<b>THE CHINESE GOVERNMENT AND POLITICS</b> by S. BANERJEE S. B. 20.00, H. B. 35.00		
<b>DEMAND FOR ELECTRICITY</b> by NIRMALA BANERJEE (Monograph of Cen- re for Studies in Social Sciences, Calcutta)		35.00
<b>THE LEAGUE OF NATIONS :</b> Failure of An Experiment in Internationalism by N. BHUINYA		35.00
<b>METAMORPHIC ROCK SEQUENCES OF THE EASTERN HIMALAYA</b> edited by P. K. VERMA		100.00
<b>THE PARAMOUNT POWER AND THE PRINCELY STATES OF INDIA : 1858-1881</b> by A. K. NEOGY		70.00
<b>POLITICAL DEVELOPMENT IN CHILE :</b> From Democratic Socialism to Dictatorship by NADER ENTESSAR		45.00
<b>UNITED NATIONS : Problems &amp; Prospects</b> by N. BHUINYA S. B. 20.00, H. B. 35.00		
<b>WESTERN POLITICAL THOUGHT :</b> From Plato to Marx by AMAL KUMAR MUKHOPADHYAY		50.00

K P BAGCHI & COMPANY

286 B. B. Ganguli Street, Calcutta-700012  
B. O.-I/1698 Chittaranjan Park, N. Delhi-110019

গ্রন্থকার এ বিষয়ে অবহিত হলে তার বইখানি কলকাতা 'সম্পর্ক' সাধারণের কাছে একটি অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ-রূপে নিশ্চিহ্ন গৃহীত হবে। নিশ্চিহ্নকল্প হার

### আমোদন: শিল্প সংক্রান্ত চিত্রকলা

অঙ্গু চৌধুরীর উল্লেখ্য এটিং কিম্বদন্তি-র প্রথম-প্রকাশনী, গ্রীষ্মকী অঙ্গু চৌধুরীর প্রাকিকের প্রকাশনী হয়ে গেলে বিজ্ঞান আকা-জৌর মূল্যবোধে। গ্রীষ্মকী চৌধুরীর প্রার প্রতিটি কাজই আমাকে মুগ্ধ করেছে। প্রাকিক বা এটিং-এর কাজে প্রবর্তন এবং আশ্চর্যকোমলার বিশেষ একটা ভূমিকা আছে, অঙ্গু চৌধুরী বা নহেই কল্পনা করেছেন। শব্দ, ভাষা, প্রাতিটি কাজেই গ্রীষ্মকী চৌধুরীর বিশিষ্ট দিল্পীকায়িত্ব এবং দৃষ্টিভঙ্গী আভাসিত হয়েছে। উপলব্ধি, তার এটিং-এ তিনি বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস বেতবে অবস্থার করেছেন তা-ও নিলক্ষ্যে লক্ষ্যবসী।

প্রবাহিত রেখা, নেকরবন্ট, এক বৃত্তাকার—এই তিনটি সূত্রকেই তিনি কাজে লাগিয়েছেন তার এটিং-এ—তখনও প্রথমটির ওপর জোর পড়েছে। তখনও যা শিল্পীর ও কৃত্রিমতার ওপর। ফোমেন্ট, ওরটার লি'লজ—কাজটিতে প্রবাহিত রেখাশাখী তলার অবস্থাকার মূল্যবোধ ফলে গিয়ে মিলিত হয়েছে, এক নির্বিক্স বেনাশী রূপে প্রতিটি উপলব্ধি হয়ে আছে। বহু মনন। ঐশ্বর্য প্রকাশ-এ রেখাকীর্তি আভা-নমায়িত ওপর দিয়ে বেন কার্হিপ্রোল প্রবাহিত হয়েছে—এখানেও বেনাশী এবং আভা-লাল রূ-কে তিনি কল্পনায় পট-ভূমিকায় সঙ্গো সমান পাতিতভাবে আভাসিত করতে পেরেছেন। একটি কথা কলা বার 'অন দ চ্যুটিজান কাজটি সম্পর্কে'—এখানেও দিল্পের রূমোমো-চিত সীমায় সঙ্গো সর্বত্র রঙের স্ফুটনকর বাক্যের আভাসিত সঙ্গর।

কোলে কোলো কাজে গ্রীষ্মকী চৌধুরী ঠিক জীবন (মানবের, মানবপালার, প্রকৃতির) অন্তর্ভুক্ত করে এক রূপভাসকে ধরেতে চেয়েছেন (এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন)—বেন 'এক্সট্রাটিক', 'আমোদিত দ্য কাক', 'আমোদিত দ্য কাক', 'কালিকের', 'শোখ ডাক', 'সোস', 'বাক' প্রমুখ কল্পনালিতে। 'এক্সট্রাটিক' নামটির উদ্ভাবকে গ্রীষ্মকী চৌধুরী



অঙ্গু চৌধুরী

কল্পিত দৃশ্য রেখার এক কল্পনায় রঙে আভাসিত করেছেন; প্রোথ ডাকে তিনি একটি গহ্বরে পুঁজুর আকারে চাক-পথে বিভিন্ন বৃত্তাকার এবং চিকড়-বাক্যের শিখরিত শরীর কটির অর্ধবৃত্তাকার করেছেন একটি কল্পনামূলক টেক্সচার; অন্যান্য উল্লিখিত কাল-গুলিতেও মোটামুটি একই ধরনের চিত্র-রূপ প্রভাবিত হয়েছে।

আমাদের দিক থেকে গ্রীষ্মকী চৌধুরীর এটিং-এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো যে কোলে কোলে কাজে তিনি পুরো ক্যাটিকে দুটি কি তিনটি আকারে জেতে করেছেন—তারে অব-একটি আরও আত্মীয় হয়েছে তার কাজে। এই ধরনের কল্পনামূলক মনো-স্বত্বের উল্লেখযোগ্য হলো 'জিভেইকেট পেন্স' এক দ্যাক আভ হোলো কাজ দুটি।

গ্রীষ্মকী অঙ্গু চৌধুরীর কোনো আমার আভাসনকই হয়নি।

### কলা-ভারতীর চিত্রপ্রদর্শনী

'কলা-ভারতী' এবং 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি' অক ওক্লেরটাল অফ দ্য উনাইটেড স্ট্রীংস অব কানাডা এবং তার হাউজ এর চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হলো বিজ্ঞান আকা-জৌর দ্বারা। মূল্যবোধিত দানের দ্বি (প্রার সবই কলার, ওরাল-পার্থীতে আঁকা) দেখতে দেখতে মনে হলো যে তিনি অবশ্যই প্রবাহিত চিত্র-রূপটিই অনুসরণ করেছেন—প্রার সমস্ত দ্বিই 'বেঙ্গল মূল্যবোধিত' মূল্যবোধিত। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে দ্বিইগুলো দেখতে আদৌ কলাপ লাগে না; অধিকাংশ দ্বিই নরমরঙ্গন, স্পন্দ এবং সুস্বাদিত। মূল্যবোধিত দানের দ্বি দেখে আরো একটি সূত্র মনে হলো আমার—বেঙ্গল 'মূল্য' প্রভাবিত দ্বি শব্দে আশ্চর্যের দিক থেকেই পেলবকামল রোমান্টিক নর, বিবর-বস্তু দিক থেকেও দ্বি। অর্থাৎ, ওরাল-পার্থীতে আঁকা দ্বিইতে যে পেলবতার ও নমনীয়তা থাকে তা দ্বিই বিবরবস্তুর সঙ্গো সবতোভাবে সমানপাতিত। এই প্রার-লব্ধ রোমান্টিকতার প্রতি আমাদের কোথার বেন একটা দোপন সমর্থন আছে। সমর্থন কিংবা সহনীয়তা।

সুসমজ, কোরেন্ট, 'আমোদিত বৈব' প্রভৃতি দ্বিইতে প্রার-নন্দ রমণী শরীর শব্দই রোমান্টিকভাবে আভাসিত হয়েছে। শব্দ তাই নর. রমণী-শরীরকে এমনভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে যে তার প্রার পূর্ণ করতে ইচ্ছে হয়। অথচ সমস্ত দ্বিইই বর্ণিল বাতাবরণে এমন এক ধরনের কমনীয়তা উপস্থাপিত যে বিবরবস্তুকে কখনোই অশ্লীল বলে মনে হয় না। রকেন্স তাঁর নারী-প্রভৃতি আঁকার পরে তাকে আলিঙ্গন করতে চাইতেন, মেনোরা চাইতেন তারই আঁকা নন্দিকদের দেহ ধারণ করতে। কলা বাহুল্য হলে বা মেনোরা'র মনো কোনো দিক থেকেই মূল্যবোধিত তুলনীয় নন, আগেই লিখি যে তার চিত্রশৈলীতে রঙের মূল্য থেকে

# আগাথা ক্রিষ্টির

আঁখি তারায় রক্ত ১৬

মৃত্যুর চোখ হিম ১৪

নিহত ভ্রমর ১৪

একটি আশ্চর্য জিজ্ঞাসী

# ক্রাইম গ্যাসন আই

চিরঞ্জীব সেন-এর একটি নতুন ধরনের থ্রিলার

নাইটহক ১০

ইজরেলের ওপর দিয়ে প্রচলিত কৃত্রিম চলেছে, সারা ইজরেল ছুড়ে লারুপ কর্মতৎপরতা আর উত্তেজনা, কি হত, কি হত, তামাম আরব দুনিয়া এখার মুখি দুটি টিপে ধরবে, সিন যেত আর সি আই এ দুজনেই সক্রিয় কিন্তু দুই বনে কে কলকটি মাড়াবে ? নাইটহক ? কোনো থ্রিলার রাষ্ট্র নাকি সেই নরনতোনো সুন্দরী ?

# বিদেশী ভৌতিক অমানিবাস ২০

সম্পাদনা ও ভাষান্তর—পৃথিবী সেন

এতে আছে—শার্লক হোমসের স্রষ্টা স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের একমাত্র ভৌতিক উপন্যাস, বিখে আলোড়ন সৃষ্টিকারী হরর ফ্রিম 'দি ওয়েন' অবলম্বনে ডেভিড সেলজ্যারের উদ্ভাবন কাহিনী, শিহরিত রহস্যের জনপ্রিয় লেখক ফ্রিজ লিব্রের আদিম প্রতিহিংসার উপন্যাস ও ভৌতিক সাহিত্যের বরলীয় লেখক এডগার অ্যালান পোর চারটি মন রহস্যের নিখাদ কাহিনী। অবিকৃত অনুবাদে মূল কাহিনীর রস আশ্বাদ করা যাবে।

# জেমস হেডলী চেজ

এ কফিন ফ্রম হংকং ১৮

সোনালী মাছেরা নিরুদ্দেশ ১৫

সঞ্জিনি স্মেরিনী ১৪

গ্রাহিহান সাহিত্য মন্ডির ৥ ৫৭-সি, কলেজ স্ট্রীট, কলি-৭৩

জ্যোতি প্রকাশন \* ২এ নবীন কুণ্ডলেন \* কালি-৯

কল্পিত, ভদ্‌ ভরি নারীদাঁতে  
এখন এক ধরনের ইন্দ্রিয়ের আত্মন  
জন্মে যা অমরত্বের নিশ্চয়তাকে দাঁত  
জড়ায় করে।

বিরাট ক্যানডাসে আঁকা 'প্লাস্ট  
স্পার'—এ বীন্দু দাঁত এবং ভরি  
শিখরবৎ ও ভারতীয় রীতিতে আঁকা  
হয়েছে—মানবের হাত-পা রাখার  
উপায়ে, বর্নকবহারে, সব কিছুতেই।  
ছবিটি সুন্দর। 'রিদুয়া' ছবিতে  
বৃক্কেলে আঁকা একটি বৃক্কের  
ছবি এমনভাবে আঁকা হয়েছে যে,  
নরনারীর আলগাধারের হলে প্রকৃতির  
অন্তঃস্থলের সঙ্গে এক হয়ে গেছে।  
সেখানে শব্দ প্রকৃতির ছবি একেছেন  
হৃদয়কান্তিত। সেখানেও প্রকৃতির  
অন্তঃস্থল মাছবৎকৈ তিনি সুন্দর-  
ভাবে প্রকাশ করেছেন—যেমন 'গোপ্তেন  
ইয়েলো'। হাউসিং হরাইজন,  
'ফিশিং' প্রকৃতি ছবিতে। একটি  
ছবিতে গাছগাছালির শরীরে তিনি  
এমন উদ্ভেল সোনালি-হলুদ রং  
ব্যবহার করেছেন যে পুরো ছবিটিই  
দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। 'গোপ্তা'  
ছবিতে তেলরঙের ওপর স্প্যাটুলার  
দুট ব্যবহারে তিনি রঙের 'বর্ণি'  
নির্মাণ করে প্রমাণ করেছেন যে,  
তেলরঙের ব্যবহারেও তিনি সিম-  
হস্ত। আগেই লিখছি যে ভরি প্রায়  
প্রতিটি ছবিই নরনরজন—শব্দ-  
উল্লেখে এক এগনি ছবি দুটি  
ছাড়া। দুটি ছবিতেই কৃত্রিমতা প্রায়  
পেরেছে, বর্ণব্যবহারও শব্দল।  
'শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথ' ছবিতে শরৎচন্দ্রের



নন্দন : হৃদয়কান্তিত

আবশ্যমগ্ণর এই দুটি চারের  
কৈশোরলীলাকে শব্দ সাধকভাবে  
আত্মলত করেছেন হৃদয়কান্তিত।  
'সেলফ-পোর্ট্রেট' ছবিতে রেখা ও  
রং শব্দ সংবেদনকে ব্যবহৃত হয়েছে।  
সুন্দর।

হৃদয়কান্তিতের ছবিছবিরা একই  
রীতিতে চিত্রণ করেছেন এবং তা-ই  
বোধ হয় স্বাভাবিক। আমার কাছে  
কিছুখোঁজা মনে হয়েছে তাপস

বড়দার 'হৃদয়কান্তিত', তাপস বিশ্বাসের  
'পিসিসি', জলার্দন চন্দ্রবীর  
'শ্রীং', কল দত্তর ল্যান্ডস্কেপ,  
কাজী আনিব্বের 'গ্রাফিক', স্বামী  
বোবের 'হৃদয়কান্তিত', দীপ্তি শেখের  
'দুখা' সুশ্রীভাসিনের 'স্টাডি' এবং  
'ল্যান্ডস্কেপ'।

কিন্তু কালি আনিব্ব এবং তাপস  
বড়দার ছবি করে কালি জন্মে অন্য  
কোরে সবে আরোহিত প্রদর্শনীতে  
সেবেছিলাম মনে হয়।

চন্দ্রনাথ দত্ত-র 'প্লাস্টারের  
ডান্ডা' অভ্যন্তর অনুরোধবাস্য।  
প্রদেব্দু দাসগুপ্ত

## অন্যোক্তা: শিল্প সংক্রান্ত চলচ্চিত্র

### গৃহপ্রবেশ

গৃহ হল মন। মনের ব্যর্থ  
দুরার উন্মোচিত কর অনুরে প্রবেশ  
করার একটি হৃদয়লপনী কাহিনী  
'গৃহপ্রবেশ'। চরিত্র বলতে তিনি—অমর,  
(সঞ্জীবকুমার) মানসী (শর্মিষ্ঠা ঠাকুর)  
ও স্বপ্না (সারিকা)। বর্জি এবং  
বিনম্র হই হটেগোলে জরে থাকি  
জ্যাটব্যাঁড় বাসিন্দা অমর ও মানসীর  
অভিলাষ নিজেদের একটি স্বতন্ত্র  
গৃহের। একই মানসী কৃষ্ণাধন ব্যারী  
তিল তিল কর অর্থ সঞ্চয় করে বার।  
সাধ আহ্লাদ বিসর্জিত জীবন মানসী  
নিজস্ব গৃহের ধ্যানে সারাক্ষণ মগ্ন  
থাকে। গৃহচিহ্নের নিম্নে মানসী  
জন্মে স্বামী অমরের আর্তিনবপ থেকে  
হয়ে সরে বেতে থাকে। অমরের

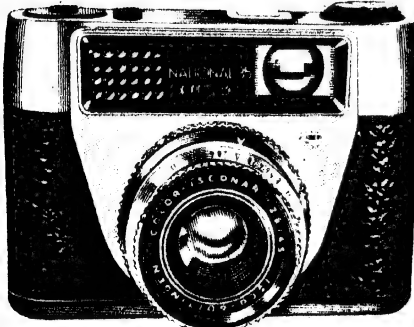
মনে হয় মানসী বেন জর থেকে হুয়ে  
সরে বহছে। এমনি পরিমিতত অমরের  
দাঁত আনিব্ব করল আঁকনের টাইপিক  
স্থানা। স্বপ্নাকে নিজেই অমর নতুন করে  
মলোর পাতার শ্বিল্পকল্প—আর  
তখনই অমর মানসীর হৃদয়কে  
প্রকাশের দুরার খোলা পেল।

পরিচালক বাসু ভট্টাচার্য নিজেই  
পরিচালিত এই কাহিনীর কথা কতন  
সেই। বহুত শব্দকে ছেড়ে অন্য নারী  
প্রতি আস্ত স্বামী—এমন কাহিনী নিয়ে  
একাধিক ছবি ইতিপূর্বেই 'বেধা  
গিরেছে। কিন্তু পাখ্যকা হচ্ছে বিন্যাসের  
ক্ষেত্রে। অমর ও মানসীর সদা বিবাহিত  
জীবন; ওদের আশা আকাঙ্ক্ষা; নিজস্ব  
গৃহের স্বপ্নে মানসীর মগ্নতুল থাকা;  
অমরের জীবনে স্বপ্নার অবিভাব;  
বিরাল থেকে স্বপ্নার প্রতি অমরের  
অনুরাগ এবং মানসীকে ত্যাগ করার  
কল্পনা; অমরের মানসিক স্বপ্ন;  
অমরকে শব্দী দেখার জন্য স্বপ্নাক  
অভ্যর্থনার মানসীর গৃহ ও অঙ্গসজ্জার  
পিন্ধনে অমরের মানসীকে নতুন করে  
চেনা—অমর-মানসী ও স্বপ্নার চিত্র ও  
চলন-চলনকে নাট্যবৈভবে সূচীলত করে  
উপস্থাপনে পরিচালকের কল্পতবান্দগ  
শিল্পবোধের পরিচর পাওয়া যায়।  
স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্কে ধীরে ধীরে  
কিছুই চিত্র বার এবং পরিশেষে  
নিজেদের কুল বহুকে আবার উত্তরের  
অন্তরণে হয়ে ওঠার একটি অনূপম  
কাহিনী 'গৃহপ্রবেশ'। স্বপ্নার  
অভ্যর্থনার মার চার-বটীর মধ্যে অমর  
ভোল সম্পূর্ণ পালটে দেওয়ার মত

## আপনার তোলা ছবিতে আনুন পেশাদারী হাতের পদশ

# NATIONAL-35

Sprinty BC ক্যামেরা এখন অবিশ্বাস্য  
কম দামে পাওয়া যাচ্ছে



NATIONAL-35 Sprinty BC  
সখের ফটোগ্রাফির জন্য একটি পেশাদারী ক্যামেরা

- হিমছায়, সুন্দর, সুদৃশ্য ডিজাইন।
- সর্বাধুনিক হাই-ইমপ্যাক্ট এ.বি.এস প্রাস্টিক বডি। দারুণ মজবুত। হালকা ওজন। ব্যবহার করা সহজ।
- উচ্চ শক্তিসম্পন্ন f/2.8 লেন্স ও অধিকতর ডেপথ অফ ফোকাস। স্বকম্বল নিখুঁত ছবি তোলা যায়।
- হাই-স্পীড শাটার ও প্রভলতি আজট্রা-সফট রিজি। ন্যাশনাল কুইক-লোডিং (Q.L.) পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয় ভাবে ফিল্ম ডরা যায়।
- ক্র্যাপে ছবি তোলার জন্য সিনক্রোনাইজ করা। যেকোনও

জায়গায়, যেকোনও সময় ছবি তোলা যায়।  
এছাড়া পাবেন এই সব অতিরিক্ত সুযোগসুবিধেঃ  
ক্যামেরা কার্টেজ ও ফ্ল্যাটে লেন্স।  
র্যাপিড প্রোগ্রামড সিঙ্গেল রিঃ অপারেশন।  
অ্যাপারচার-স্পীড কন্ট্রোল।  
এক্সপোজার সেটিং-এর জন্য স্ট্রেসার  
সিঙ্গেল। সঙ্গে লাগানো (built-in)  
এক্সপোজার মিটার। ব্রাইট-লাইন  
ফাইন্ডার। র্যাপিড ওয়াইডিং লিডার।  
ডেপথ অফ ফিল্ড ইন্ডিকেটর।  
স্বয়ংক্রিয় এক্সপোজার কাউন্টার।  
বিশদ ভাবে জানতে হলে আপনার  
নিকটবর্তী ডিলারের কাছে আসুন।



পশ্চিম আমাণীর সহযোগিতায় তৈরী কর্তৃক  
ন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেন্টস লিঃ

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা) আলমবুদ, কলিকাতা-৭০০ ০৩২  
পশ্চিমবঙ্গে আমলের সেলস অফিস।  
কে. পার্থসর্য হাউস, ৪৭, বি. ডিমেলো রোড  
বোম্বাই-৪০০ ০০৯ কোমঃ ৩২-৬২২১ গ্রামঃ "YANTRA"



শ্রীমতী ঠাকুর

অস্বাভাবিক ব্যাপারও পরিচালন সৌকর্যে প্রতীতিতে গ্রহণ হয়ে ওঠে। জীবননাট্যের আঁত পান্নাচিত এবং আপাতদৃষ্টিতে নগণ্য ঘটনাও কামেরায় সাধারণ দর্শকচোখকে অভিভূত করে তোলে। পথের পথিকের পেঁচা দেওয়ার অসাধারণ বিন্যাস দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। পরিচালক অভিনয় সিন্ধুতে কৃত্রিম দেখিয়েছেন কামেরায় বঙ্কিম অদীপ চ্যাণ্ডন এবং শ্রীমতী ঠাকুর। অর্থবহ সংলাপ রচনারও গুলজার চরিত্র ও ঘটনার মেজাজ পরিষ্কার করে দেখিয়েছেন। সঞ্জীব-কুমার, শ্রীমতী ঠাকুর বা সায়িক-প্রধান ভূমিকাগুলির চরিত্রগুলি আয়াসলব্ধ অভিনয়ের ছাপ পাওয়া যায় না। তাদের অভিনয় চরিত্রগুলিকে বাস্তব রূপ দিয়েছে।

#### স্বয়ংস্বর

পত্রের জন্য পাত্রী পছন্দ হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যাশিত হল শিল্পপতি গ্রীয়ার লাগে। কারণ পাত্রী মৌসুমীর পিতার একমাত্র সন্তান ছিল বলে। পিতার এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে রম্যাম্মার তালে মাচ করে বোঁরয়ে পড়ল দুই ভাই-সঞ্জীবকুমার ও শশি কাম্পুর। সঞ্জীবকুমার সাজলো গহবৃত্ত। আর শশি কাম্পুর রামনগরের রাজকুমার। বেগমজ পার্বতীকুমার গড়ে তোলা নান্দ্য ঘটনার মধ্যে দুই ভাই-ভাইয়ের উদ্দেশ্যে সফল হল। সঞ্জীবকুমার জয় করল বিদ্যা সিন্ধুকে। বিদ্যা আসলে মৌসুমীর বৈমাত্রেয় বড় বোন হলেও ওকে এই গহের দাসী রূপে দেখানো হয়েছে। কারণ ওই চরিত্রই ভূত-বেশী সঞ্জীবকুমারের

সঙ্গে জয় মিলন ঘটাবে স্বয়ং। তেজনি মৌসুমী ধনী ও উগ্র আর্থনিক। বড়ো রাজপুত্রের প্রতি জয় আকর্ষণ স্বাভাবিক বলে প্রতিপন্ন করানো যায়। বংশ মর্যাদা নিয়ে আত্মসম্মতি অথবা টেকের না; পাঁচই পরীর একমাত্র গতি; এক জীককে ঠিক মতো জানতে হলে দুঃখ-কষ্টের তাপে নিজেকে শব্দ করে নিতে হয়-এমত বস্তুর কাহিনীর আশ্রয় প্রাপ্ত। কিন্তু ওই বস্তুরাশ্রয়কে মৃত করে তোলে যে সব ঘটনার অপ্রত্যাশিত করেছেন পরিচালক পি সবাশিত রাও। তা দর্শক সমক্ষে একটা নট্রামের প্রদর্শনের চেয়ে বিশেষ কিছু দিতে সক্ষম হয়নি। চরিত্রগুলির অসংযত আচরণ এবং প্রকাশ-বোঁষা সংলাপ হাসির উদ্দেশ্যে অবশ্যই চটকদার। রাজেশ্বর রোশনের সংগঠিত পরিচালনা ঘটনার চরিত্র ফাঁটের তোলার সত্যক হয়েছে। চরিত্রগুলির মধ্যে বিদ্যা সিন্ধু ও গ্রীয়ার লাগাই বা কিছুটা স্বাভাবিক—তাই ওদের অভিনয়ও ভাল লাগে।

#### সবুত

অর্থই যত অনর্থের কারণ। এই আন্তরিক বলে বলে নাটকের গুরু ধনরাজ একের পর এক প্রতিশ্রুতিকে ধরা থেকে সরিয়ে ফেলতে থাকে। খুনের তদারকিতে নিয়োজিত হয় ইনসপেকটর সাহানী (নবীন নিশ্চল)। শেষ পর্যন্ত নিহত শিল্পপতি ধর্মদাসের কন্যা আশা ও ক্রিশের (বিদ্যা সিন্ধু ও কাজল করণ) অভিভাবকস্থানীয় অজিত রায় (ওম শিবপুরী) যখন আসল খুনী রূপে ছবিতে সারাসত হল তার আগেই দর্শকদের কাছে রহস্য ফস হয়ে গিয়েছে। কাহিনী রচয়িতা জে কে আহুজা কিভাবে ঘটনা সাজিয়েছিলেন জানি না। কিন্তু পরিচালক তুলসী রামসে ও শ্যাম রামসে যেভাবে ঘটনা বিন্যাস করেছেন তাতে বোকা গেল রহস্য-রোমাঞ্চ জমিয়ে তোলার দক্ষতা তাদের নেই। কিবা বলা যায়, রহস্য-রোমাঞ্চ নাম করে বাজার-চলতি ফরমালায় সেক্স ও ভাইম-এর অনুশাসন তারা দৃশ্যবাহীর উপস্থাপনই পরিচালকবরের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সৌন্দর্য থেকেও তারা অসাধারণ কিছু পরিবেশনে সক্ষম হয়েছেন।

ছবির নাম 'সবুত' অর্থাৎ প্রমাণ। কিন্তু দেখা গেল একটার পর একটা খুন হতে থাকল এবং ইনসপেকটর সাহানীও খুনী সম্পর্কে যে সব প্রমাণ হাতে পাচ্ছেন তাতে খুনী কে তা জানতে কোন ধরম থাকে না। সত্যরাজ সাসপেন্সটাও পরিচালক জমিয়ে তুলতে পারেননি। ইনসপেকটর সাহানী চরিত্রে নবীন

প্রকাশিত হল

## কালকূট-এর

চঞ্চল্যকর নতুন উপন্যাস



## মন-ভাসির টানে

কালকূট-এর

কয়েকটি বিশিষ্ট উপন্যাস

নির্জন সৈকতে ১০০

মিটে নাই তৃষ্ণা ৮০

হারিয়ে সেই মানুষে ৫০

আরব সাগরের জল লোনা ১০০

সমস্ত বইয়ের তালিকার জগু লিখুন

দে'জ পাবলিশিং, C/O দে বুক স্টোর

১০ বাক্স চাটুজো স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩ ফোন : ৩৪-৫০৩৫







## হাই পাওয়ার সার্ফ ধোয় সবচেয়ে সাদা করে...

এমন, যা নজরে পড়ে!

আপনার হেলে যদি জামাকাপড় ময়লা করায় চ্যাম্পিয়ন হয়, তাহ'লে সেই ময়লার সঙ্গে লড়াই করার জেহাও ত' দরকার আর এক চ্যাম্পিয়নেরই— হাই পাওয়ার সার্ফ।

হাই পাওয়ার সার্ফের শক্তিশালী ফরমুলায় আছে বেশী পরিষ্কার করার ক্ষমতা, যা কাপড়ের ধুলো ময়লার প্রতিটি কণা তুলে বের ক'রে ফেলে। সত্যিকারের ময়লা জামাকাপড়ও ক'রে তোলে ধবধবে সাদা।

হাই পাওয়ার সার্ফ আপনার পুরো পরিবারের জামাকাপড়কে দেয় এক বাড়তি শুভ্রতা আর উজ্জলতা। তাই তো বেশীর ভাগ মায়েরা কাপড় ধোয়ার জেহাও অথ পাউডারের চেয়ে, সার্ফই বেশী ব্যবহার করেন।



বেশীর ভাগ মায়েরা কাপড় ধোয়ার জন্যে অন্য পাউডারের চেয়ে সার্ফই বেশী ব্যবহার করেন।

রায় অপহরণ করে। কিন্তু তাকে আজত  
বন্দির রেখাঙ্কন কেন তারই হাতে  
নিজের হৃদয় থেকে আনতে। যদিও  
সংগীতহীন এবং পরিমিত রাস রাহিত  
দৃশ্যবিন্যাস। শব্দ থেকেই বাস্তবীয়  
কিছু উদ্ভূত মনে হয়।  
পঙ্কজ দত্ত

আলোচনা: শিল্প সংগীত

## মহাজাতি সদনে আমজাদ আলী খাঁ

গুস্তাফ কেরামতজাদ খাঁ মিউজিক  
সারকেল সরোব বানক গুস্তাফ আমজাদ  
আলী খাঁর এক বৈঠকের আরোহণ  
করে ছিল মহাজাতি সদনে গত ১৭৭  
মাঠ। অনুষ্ঠানের আরম্ভে রাইচাঁদ  
বড়ল ও জানপ্রকাশ ঘোষ স্বগীয়  
গুস্তাফ কেরামতজাদের বিবরে ভাব্য বেন।  
আমজাদ আলী বাননা শব্দ করায়  
আগে বলেন যে এ ভবন্য সারকের  
সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বিশেষ ধরনের।  
তিনি যখন কলকাতা শ্বরে প্রথম  
বাননা (সহায়ণ সম্প্রীত সন্ধান, ১৯৬৮) তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা  
হয়েছিল তিনি কার তবলা সঙ্গত চান।  
তিনি অবিলম্বে স্বগীয় কেরামত খাঁর  
নাম করেছিলেন, কারণ এঁর বাননার  
তার এক কণ্ঠস্বর অসঙ্গি ছিল।

মিশ্র কাকিতে আঙুর ও একটি  
হোলি চক্রে রচিত চাঁচর ভাল গং  
হাটের আমজাদ আলী তাঁর বৈঠক  
শুরু করেন। জামি এই প্রথম কোন  
মিল্লাকে টুয়েন্টি চক্রে বাননা দিয়ে  
বৈঠক শুরু করতে শুনলাম। আঙুরট  
পরিষ্কার এবং ধূনিমাখা জমা ছিল  
এক গর্ভাঙ্কিত ছিল প্রাকৃতিক বিস্তারের  
কাজ।

এরপরে শোনা গেল বৈঠকের মূল  
নিবেদন শ্রী রাগে অল্লাপ, জোড়, কালা  
ও তিনটি গং। অল্লাপটি একটি চক্রে  
প্রকৃতির হঠোঁল এবং এটির মীড়  
আগের বাহার ও বৃক্ষদীপ্ত স্বববাজনা  
সুখপ্রাণা হলেও শ্রী রাগের গম্ভীর  
মোজা সম্পর্কভাবে ফুটে ওঠেন।  
স্বরগত রূপরাগ অবশ্য কোথাও বিকৃত  
হয়নি। জোড় এক কালার বিষয় এই  
অন্তবাই খাটে। প্রথম গর্ভাঙ্কিত ছিল  
এক এবং তাতে বেশ ভাল ভেসে অল্লাপ  
কাজ ও উচ্চারণের তান-জোড়া  
বাজনো হয়েছিল। পরের গর্ভাঙ্কিত ছিল  
দুই চক্রে নিবন্ধ এবং এতে ছিল  
চমককার ধূনি গমক তান, ঘোড় তান  
আটমায়ার সওয়াল-জবাব ও সাধ-  
স গাত। কেরামত পুত্র সবিব খাঁ  
নিপুণজ্ঞ ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে ভবলা  
সংগত করেছিলেন। শেষের অতি দ্রুত  
গতের ক্রিপণ্ডিত কালার সঙ্গে তাঁর  
ক্রোড় বেশ খুলেছিল।

বিরাড়ির পর আমজাদ আলী তিলক  
কামোদ রাগে একটি বিলম্বিত ভিত্তাল  
গং করেন এবং বিলম্বের কাজে রাগের  
আলোকচান দক্ষতা ও দিল্লুবাবের  
সঙ্গে কুটির তোলেন। বি ভ্রম  
সংজকের শ্বরের মিশ্রণ এবং আলোকিক  
তানের প্রয়োগ ভাল হয়েছিল। তবে  
শিল্পী বড়ো আকর্ষণকভাবে গর্ভাঙ্কিত শেষ  
করে নন বা অসঙ্গি কল্যাণে একটি  
দ্রুত ভিত্তাল গং করেন। এই রাগটিতে



আমাদের মন কসতে না বসতেই তিনি  
হঠাৎ রাগে রাগে একটি দ্রুত ভিত্তাল  
গং শুরু করেন। এটি নিয়ে সামান্য  
কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে তিনি কামোদ  
রাগে দ্রুতি গং বানান। এই গং দ্রুতি  
তুলনায় বেশকিছু বানানো হয় এবং  
শিল্পী এগুলাতে কিছু উচ্চারণের তান  
জোড়া শোনান।

এবার সবিব খাঁর অনুরোধে  
কণ্ঠক রাগ হেমাবতীতে আঙুর ও  
একটি রূপক তালে নিবন্ধ গং বানান  
আমজাদ আলী। সরোলা ও সুপারি-  
কলিত কিতার ও একছন্দা তানের  
কাজগালিতে বেশ একটি বিলম্ব  
কণ্ঠক রস ছিল। এই রস সাধারণত  
হিন্দুস্থানী মিল্লাদের হাতে ফেটে না  
—তারা কণ্ঠক রাসগালিকে হিন্দু-  
স্থানী নিয়ম-কানুনে বেধে একটি ভিন্ন  
চরিত্রের আয়তন করে ফেলেন।  
স্বরচিত ভাটিয়ালী বাকিরে আমজাদ  
আলী তাঁর বৈঠক শেষ করেন।  
বিলম্ব দ্রুত

## উত্তরপাড়া সংগীত চক্র

চল্লিশ বছর ধরে অক্লান্ত উদ্যমে  
অসামি অধ্যাপক এবং আন্তরিক অনু-  
রাগ শহরতলীর একটি বিশেষ অন্তরে  
ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের অনুশীলন  
এবং সম্প্রসারণ কাণ্ডে থেকে উত্তর-  
পাড়া সংগীত চক্র সৃষ্টির অক্লান্ত  
সাধবান লাভ করেছেন। প্রশংসা এবং  
সাধবাদের তাঁদের প্রয়াস আশঙ্কিত  
হয়নি বরং অধিকতর পণ্যবান হ'চ্ছে।  
বছরে এক ট করে সংগীত সম্মেলনের  
আয়োজন করেই ক্রান্ত করণ তৈরি।  
উত্তরপাড়া সংগীত ভবন প্রতিষ্ঠা করে  
লব্ধতলীর উৎসুক শিক্ষার্থীর দিক-  
লাভের সুযোগ করে দিয়েছেন। এঁদের  
চমোমতি সম্প্রদায় নতুন করে নামসংগ  
হলায় এবারের বার্ষিক সংগীত  
সম্মেলনে। জরতুক পাবলিক লাইব্রেরীর  
মাঠে সারারাতের আসরে ব্যবস্থাপনায়  
পরিপাটার অভাব ছিল না। নামী এবং  
স্বল্পনামী উভয় পণ্ডিতই শিল্পী  
অনুষ্ঠিত হয়েছিলেন। এতে রসাতল  
তো ছুটেই নি। পরন্তু দু-একটি  
সমাপ্যাত প্রভুভার ঠিকান পাওয়া  
গেছে।

## ১৩দশখণ্ড প্রকাশিত হলো

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

পোয়েন্দা কাহিনীর প্রত্নাবলী



## কিরীটী অমনিবাস ২২

যে কোন খণ্ড যে কোন সময় কিনতে পারা যায়। কোন  
খণ্ডের সহিত অন্য খণ্ডের লিঙ্ক নেই। প্রতি খণ্ডই স্বয়ং সম্পূর্ণ।



জানসীথ পুরস্কার ভূষিতা

বিমল করের

আশাপূর্ণা দেবীর

এক অভিনব প্রস্থ

অবিনশ্বর ১০

তিন চরিত্র ৭

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

নতুন এক জনবল্য হৃদিত

## গদাবলী কীর্তন ১২

বাংলায় প্রথম খাজুরাহো ভ্রমণ কাহিনী

শঙ্কু মহারাজের

## রূপতীর্থ খাজুরাহো ১২-০০

সদ্য প্রকাশিত - উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

## বৈষ্ণোদেবী ও

## অন্যান্য কাহিনী ১৪-০০

কাজী নজরুল ইসলামের ওপর ২৩ জন লেখকের

বিশিষ্ট রচনা ও আলোচনার

## নজরুল সঙ্গ ও প্রসঙ্গ ১০-০০

নারায়ণ সান্যালের - এক অভিনব প্রস্থ

## 'আনন্দ'-স্বরূপিণী ৭-৫০

জ্যোতিষাচার্য ভূগুজাতকের

## ভাগ্যালিপি ৯

## হাত দেখতে শিখুন ৭

(হস্তরেখা বিচার ছবিসহ)



অমর সাহিত্য প্রকাশন

৭ টেমার লেন, কলিকাতা-৯ (কলেজ স্ট্রীট জংশন)

ত্বকের অধিক সমস্ত পরিচর্যা...  
অধিক স্বাস্থ্যোজ্জ্বলতার জন্যে—  
নিকো ঔষধিযুক্ত সাবান



নিকো মেডিকেটেড সাবান রাখুন।  
রোজ আপনার ত্বকের যে সমস্ত  
পরিচর্যা করুন— তা পারেন  
নিকোর কাছে। কারণ নিকো হল  
ঔষধিযুক্ত সাবান। যে কোনো  
সাধারণ সাবানের চেয়ে এটি আপনার  
ত্বকের অনেক বেশী বড় দেয়। নিকোর  
মোলারেন ফেনা আপনার ত্বক থেকে  
সমস্ত ময়লা পরিষ্কার করে ত্বকে  
করে তোলে স্বকমক স্বাস্থ্যোজ্জ্বল—  
যেবার একদম তরতাজা।

**NEKO®**

আসল  
ঔষধিযুক্ত সাবান

পার্ক ডেভিস

—এই একটি উৎপাদন



® — Regd. Trade Mark — Regd. Users — Parke Davis (India) Limited, Baki Naka, Bombay 400 072.

JAISON'S PD 186 BEN

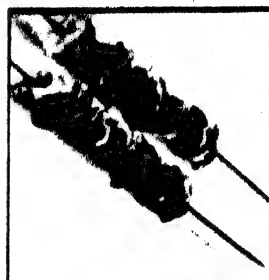


শ্রদ্ধা কল্যাণী বা

সংগীত জগতের হায়দারীয়া স্ববর্ণ  
র শাস্ত্রীর সংগীত পরিবেশন করে  
নৃত্যদের মাদ্রাসাটি করলেন। এরপর  
ইলেন লক্ষ্মীশংকর। রংগ যোগেশ্বরী।  
যে বন্দিত করে খেরালটিক তিনি  
খিল অথবা ক্রান্তকর করে তোলে।  
পরিবার সংকীর্ণ রেখে রংগ  
নবত করার কোশল তিনি জানেন।  
যত চুম্বিতর কারণে কোথাও জাড়া  
করা প্রয়োজন ঘটে। তার  
রালের বিশেষভাবে আদরপন্ন। অংশ  
স্তার। সরের কাজে অংশটি খবই  
নামম হয়ে ওঠে। লক্ষ্মীশংকরের  
নাও মিটি। তবে তামকতবে সাধ-  
লিতা বা বৈচিত্র্যের অভাব আর

সরগমের স্ববর্ণতা পরিবেশনার জাতি-  
সাম্য অজ্ঞান রাখতে পারেনি। কণ্ঠস্বর  
এবং আবেগময়তার গলেন ছিল পিতা  
উন্নতিটির কথাও অবশ্যই কোন খাম  
ছিল না। তার বোলবানানোর সহজ  
পরিপাটী মনোমুগ্ধকর। সরবারী  
কানাকা আর তার কেশী আকিত ধীরে  
দুটি উজ্জ্বল ও তিন ভাবময় প্রসঙ্গ  
একটি পরিবেশ গড়ে তোলেন।  
স্ববর্ণতার সুরারোপিত সেতের  
বাংলা রাগপ্রবাস পালটিও তার  
কণ্ঠে সার্থক রূপ নেয়। তবলার  
গোবিন্দ বসু এবং হারমোনিয়মে  
সোহনলাল দাসের সঙ্গত—অন্যভাবে  
টিকে আদ্যন্ত স্পষ্টিত রাখে। অসামান্য  
অবিশ্বাস্যর সামাই-দাসের গেলেম  
বিস্মিতা খ। প্রাকৃতিক আই স্বাধীনতা  
অন্যদের সচেতা হল মারবেহায়ে।  
তারপর আরও দুটি বড় রাগ, সরবারী  
আর মালকোষ। উত্তরপথে কাজরী আব  
উত্তরবর্তীতে ধম। প্রতিটি রাগ রূপায়ণের  
আলাদা আলাদা বিশেষণের প্রয়োজন  
হয় না। কারণ স্বরটির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি  
সাধারণ লক্ষণ হিসাবে প্রতিটি প্রকরণেই  
উপস্থিত ছিল। লক্ষ্যগতি পাখির মতো  
সরের উচ্চ-নিচ স্তরে সহজ চলাচল।  
গাছ গাছ স্বর একই করে মাসা হাণে  
তাদের প্রাথমিক, তাদের গতি ও বাকের  
আকস্মিক রূপ, সর পরিবর্তন লক্ষণীয়  
প্রতিভার অনন্যসাধারণ বারংবার স্মরণ  
করিয়ে দিচ্ছে। আর আশ্চর্য কলা-  
কৃতির তলে তলে কি গভীর রাগভেদনা  
ও মাতরমিক কল্পনা। সরোদিনা সরেন  
বর বরলে তরল। তবে আশী অপটু

লিওনার্ড  
জাডম  
সাথে  
কাফার  
কাফারো-ডে



লিওনার্ড  
ঠাণ্ডা সাথে  
মশলা মুখ  
মামুয়াই-ডে



লিওনার্ড  
হাসিখুশী  
সাথে  
গেসীকে  
গোয়া-ডে



লিওনার্ড হেজিলায়েটের মতো সুস্বাদু লক্ষ লক্ষ পরিবারে নির্ভরযোগ্য কাজ বিজে। লিওনার্ড  
বাহ্যবাহ্যিকভাবে সবে তাঁদের লিওনার্ড সবে কোলো আলোচনা করতে গেলে, তাঁর জুড়ি আর  
একই হায়েন। বাস্তবিক, পরিবারের মত সবচেয়ে ৩০ বছরে এক চেহে বেশী কিই বা বলতে পারি।



**Leonard**

১৮৮১ সাল থেকে সারা দুনিয়ার বিখ্যাসপার

Another quality product from

★ BLUE STAR

Leaders in refrigeration

যে • নিউ দিল্লী • কলকাতা • মাদ্রাস • আমেরিকা • বড়োকা • পুনে • টম্বোর • কানপুর • চম্পক  
জামশেদপুর • বোম্বাই • ম্যাঙ্গলোর • কোচিন • ত্রিবাঙ্গারী • সেওজাবাব • বিদ্যাপাণ্ডব • বিজয়ভাড়া

S/BS/174G/80

১৩৮৭র ব্রীলি পুত্রস্মার প্রাপ্ত গ্রন্থ

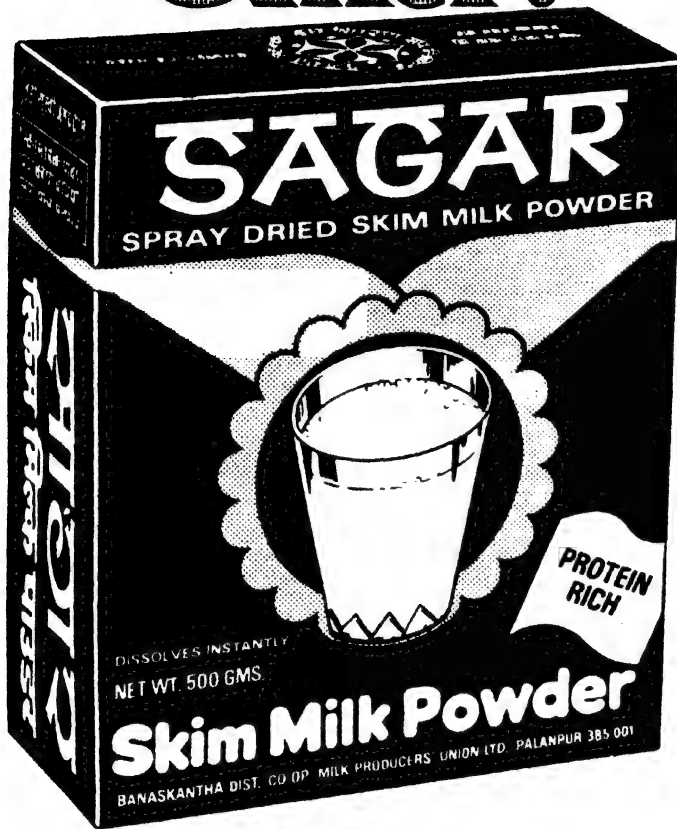
ডঃ তারকমোহন দাসের



১০০ টি সাদা কালো ও রঙিন ছবি। দাম-২৮

জোনাকি পাবলিকেশন্স

# কফি, চা আর আমি!



## সাগর স্কিম মিল্ক পাউডার

বিশেষভাবে  
তৈরী দ্রুত  
কায়ক সেকেন্ডের  
মাধ্যম  
মিলে যায়!

সাগর স্কিম মিল্ক এমন বিশেষভাবে তৈরী যে, এটি নিম্নমাত্রার মাধ্যম ভাল স্কিম মিল্ক পাউডার মিলে যায়। এই বিশেষভাবে তৈরী দুধ প্রোটিন-সমৃদ্ধ এবং এতে স্নেহ-পদার্থের পরিমাণ খুবই সামান্য। যারা দুধ খেতে ভালবাসেন অথচ ওজন বাড়াতে চান না, এবং অতিথি আপ্যায়নের জন্য গৃহিণীদের পক্ষে এটি এক দারুণ সুখবর।

জলে সাগর মিল্ক পাউডার মিশিয়ে কায়ক সেকেন্ডে বাতুন, বাস, দুধ একদম তৈরী। চা, কফি, মিল্ক ড্রিং, পুডিং এবং মিঠাই যা খুশি এই দুধ দিয়ে বানান। ৫৫ লিটার পরিমাণ দুধের সমতুল এই দুধ সুবিধাজনক ৫০০ গ্রামের প্যাকে পাওয়া যায়, যার দাম মাত্র ১০ টাক। (কর আলাদা), অথচ যা থেকে আপনি সবসময়েই বাঁচি দুধ পোত পারেন।

মাত্র আপনাদের দ্বিগুণের আমূল মাখন, আমূলপ্পা, আমূল চীক, আমূল চকলেট, মালআমূল, ও মিউটামূল, ডাফ্রাই নিবেদন।

ASP-SMP-2-79





নন। বরং তাঁন যে কল্যাণের আকাজক্ষা  
সত্তর করে নিজের হৃদয়গর্ভে অশ্রু  
রূপে সংলগ্ন করে নিঃসৃত তার প্রথম  
শব্দ। যেমন আগে আগে গল  
হি রাগের বহুভেদে আপ্যোয় তাঁন  
‘তুমি সত্যক’ নন। এখানে তাঁর মিনা  
কি তোড়ী কি তৈরবী কি সিন্দু  
তৈরবীর মূখ্যায় এর ব্যতিক্রম  
প্রকাশ। তাঁর পরিবেশনার মডিফ  
প্রকাশ, তানসিটি, জোড়ের কাজ এবং  
হৃদয়চর্চনা অকুণ্ঠ প্রকাশের যোগ্য।  
তবলায় সাবলীল সঙ্গত করেন অরুণ  
যোহাল। মালিকার্নস মনসরের সপোও  
সম্প্রদায়ের দ্বারা মনসরের সপোও  
তবলায় ও বিভাস রাগে দৃষ্টি খেলায়  
গাইলেন। তাঁর গান প্রোফুলসারগির্বি-  
সেবে সকলের কাছেই লম্বা হতে ন।  
পারে। তবে সংগীতবোধমায়াই যে পরি-  
কৃত হবেন সে কথা হল। বাদ্য, কারন,  
তাঁর গানে শ্রুতির শ্রুততার পূর্ণ  
প্রকাশ হটে। অবশ্যই তা নীচ  
পাণ্ডিত্যের প্রকাশ নয়—ব্যাকরণের সানস  
যেমনও মালিকার্নস সংগীতের রন-  
সত্তরে পারদর্শী। তাঁর দৃষ্টি খেলায়ই  
স্বাধীনতা। তান, বোলতান, এবং হৃদয়-  
কাজে এর মিলন প্রমাণ বারবার  
মিলেছে। যোগী মত বা তবলায় তাঁর  
প্রকাশ শিল্পী তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করে-  
ছিলেন। সিন্দুর তবলায় হারমোনিয়ম  
বাদ্য মাদাম টোলপুর্নী কণ্ঠশিল্পী-ও  
কিছুকালের জন্যেই করেন। সারা-  
রাতের আসরে উদ্যোক্তারা সাতের অনু-  
ষ্ঠানও বাদ দেননি। শেষে কথক মাও  
সেখান লাইফটী সিন্দুর। তাঁদের  
অনুষ্ঠান আহাতির না হলেও মিলন-  
নয়।  
অন্যদিক দৃষ্টান্তস্বরূপ



পাণ্ডিত্যের ও হৃদয়চর্চনার

নানা কারণে তাই এই দুই শিল্পীর  
অনুষ্ঠান সমন্বয় করে উঠবে এমন  
প্রত্যক্ষ নিয়মে পৌঁছানোর অনুষ্ঠানে  
উপস্থিত হিলাম। কিন্তু প্রথম শিল্পী  
হেমন্ত মুনোপাধ্যায় তাঁর গানে সেট  
প্রত্যক্ষা পূর্ণ করেন নি।

প্রথমত এবং প্রথমত কণ্ঠ  
বিপর্নীর কারণে তাঁর গানগুলি পূর্ণ  
মহাভার বিকসিত হয়ে উঠল না। প্রথম  
গান থেকেই তাঁর কণ্ঠ অস্বাভাবিক ছিল  
না, ক্রমাগতই এলো তিনি বিস্তৃত বোধ  
করতেন আর সত্যিকার সে কারণেই গান  
পরিচয়নে মনোনিবেশ অক্ষম থাকে  
ন। গানগুলি প্রায় বাস্তবিক পদ্ধতিতে  
তাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত হতে দেখা গেল,  
এমন কৈ সেদিনে তাঁর কণ্ঠে বহুভেদে  
গানগুলির সুরম্যতাও অলস ছিল না।  
‘তোমার আমার এই’ গানটির একবার  
সেবার কাজে তাকে লও হঠাৎ তাঁর  
দৃষ্টির কালে সুরাভরে একটি বৈচিত্র্য  
আছে কিন্তু হেমন্তবাবু এই হঠাৎ  
গাইলেন একবারই। এই গানের অন্তরে  
লক্ষ্যই কখনো উদ্বীর্ণ হলে ‘অন্তরে  
কখনো বা অন্তরে’। ‘আমি তোমার  
লগ্নে বৈদ্যবীর আমার প্রাণ গানটি  
লগ্নীর অংশের সুরও তাঁর দৃষ্টিতে  
উল্লেখ ছিল না। এই তালিকা দীর্ঘ  
একটি অসম্ভব নয়। বিখ্যাত হঠাৎ  
কারণ হেমন্তবাবু করে এই বর্ষের  
চুটি অনুষ্ঠান। সার্বভৌম ‘আমি  
আমার এসব’, ‘বৈদ্যবীর লগ্নীতীরে  
অথবা ‘পা দো দে’ মিলে কথার  
মতো করেও তাঁর গান বাস্তবিক পৌঁছ  
তাকে তেমন প্রস্তুত ছিল বলে হয়।  
সিঁরিয়ার স্বাধীন করতে হয়ে  
শিল্পীরাই পাণ্ডিত্যের বোধ অনুভূতিকে  
সমন্বয় করে তুললেন। প্রথম এই  
শিল্পী আজও কী জগদারা স্যাক্সোফোন  
একটি ট্রামের গানগুলিকে তাঁর কণ্ঠে  
মুদ্র করে তুললেন তা যেমন অবশ্যই  
তেমন চমৎকারীজনক। মতকণ্ঠে গান  
গাওয়ার গানের শৈল্পিক সৌন্দর্যের  
মান হয় এ কক বীরা মনে করেন  
তাঁদের কাছে প্রত্যক্ষের অপসারণ  
নিয়ম আসার বসেছিলেন তিনি। মত  
কণ্ঠে প্রথম গানে ‘আলেকজান্ডার এই কলম-  
ধারার বন্ধন পেয়ে উঠলেন তখন যে  
অন্যদিকের রসপূর্ণকণ্ঠের দৃষ্টি হল  
তাকে অবিস্মরণীয় কালেও অনুভূত  
করা হবে না। তিনি একদিনেই কখন  
‘দিলে পরের’, ‘আলো জমা। আলো  
আমার হিয়ার মাঝে’, ‘কো হুগে বাকি  
আমার’, ‘কখন এসেছিলো’, ‘সক দিবি  
কো’, ‘না বলে বার পাছে সে’, ‘কলমে  
তুমি মাঝে’, ‘দুঃখের বজ্র অলস  
জ্বলনে’, ‘অধির এল কল’, ‘এখন  
আমার সমর হল’-এর পর অস্বাভাবিক-  
প্রভা ও চণ্ডালিকার কিছ্র অংশ

**রবীন্দ্রসংগীতের সমন্বয়  
আসর**

কল্যাণনাথের গানের ক্ষেত্রে ‘বঙ্গালী  
লগ্নীতীরে বসে’র অনুষ্ঠান তারা  
হই এ’র মতো লগ্নীতীরে রবীন্দ্রসংগীতের  
‘ক’ পূর্ণ সিঁরিয়ার রবীন্দ্রসংগীতের  
সমন্বয় আসর-এ উপস্থিত থাকলে  
‘বঙ্গালী’ লগ্নীতীরে বসে’র ‘সম্প্রদায়’  
বিষয় পোষণ করতে হয়।

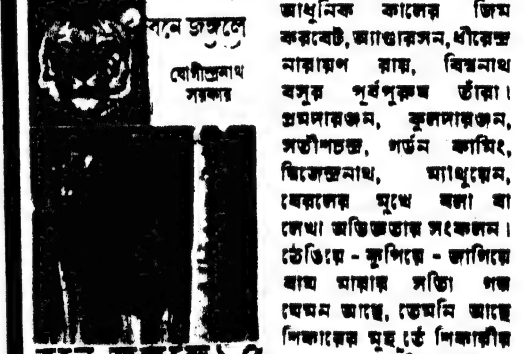
এদিনের আসরে পূজনীয় শ্রী শিল্পী  
হিলাম-পাণ্ডিত্যের যোগ এবং হেমন্ত  
মুনোপাধ্যায়। পাণ্ডিত্যের যোগ অজস্র  
সবী ট্রাম-মিলনসময়ের সাফল্যে শিল্প-  
ধর্মী তাগের গায়কী কণ্ঠে ধারণ করে  
আজ একটি প্রতিষ্ঠান বিশেষ। দীর্ঘ  
সময় ও আভিজাত্য এই গান আনবার-  
তাকে আজ এক অলস দৃষ্টি হুগে  
তাঁর কণ্ঠে বিকসিত। আর হরগোপম  
কণ্ঠে অধিকারী হেমন্ত মুনোপাধ্যায়  
রবীন্দ্রসংগীত-অগ্রে দীর্ঘদিনের একটি  
কর্মপ্রম নয়। শিল্পী হিসাবে এই  
কল্যাণের মূল সম্পদ তাঁর কণ্ঠলাবণ্য।  
এর সঙ্গে যুক্ত হলেই গায়ন-ভাণ্ডার  
পরজন্ম হয়। আরো দৃষ্টি বিকসিত তাঁর  
শৈল্পীতার কথা একেবারে সাক্ষ্য উল্লেখ  
যোগ্য। প্রথমটি : গান নির্বাচনে কণ্ঠের  
উপযোগিতা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা,  
শিল্পীত্ব : সুরের শ্রুততা রক্ষার সর্ব  
প্রয়াস। তাঁর গায়কী নিঃসন্দেহে  
পাকবদ্ধ। মালিকার্নস-এ কালের অগ্র-

**পশুপাখি বন জঙ্গলের**  
শিশুবর্ষে পুণীত পরিকল্পনার ৪৩ তম প্রহর

পশুপাখি ও জন্তু-জানোয়ারের পরিচয়সূচক  
গল্প এখনকার ছেলেমেয়েদের পাঠ্য—বিজ্ঞানের অপরিহার্য  
বিষয় হিসেবেই। জন্তু-জানোয়ারের ওপর মানুষের  
কৌতুহল চিরকালের। কিন্তু এখন তা বৈজ্ঞানিক  
পরিবেশকেই ব্যাপার। এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলস্বরূপ  
প্রমাণ যোগাযোগের অধুনা-বিশুদ্ধ কিন্তু অবিস্মরণীয়  
দুখানি বই ‘পশুপাখি’ ও ‘বনে জঙ্গলে’।

**অবিস্মরণীয় কিশোর ক্যাসিক  
আবার প্রকাশিত হলো!**

‘বনে জঙ্গলে’ বইটি হলো বৈজ্ঞানিকভাবে সংকলিত কিন্তু  
বিখ্যাত বাঙালী ও সাহেব শিকারীর রোমাঞ্চকর  
অভিজ্ঞতার বর্ণনার সচিত্র উজ্জ্বল প্রত্যক্ষ বিবরণ।



**বনে জঙ্গলে**

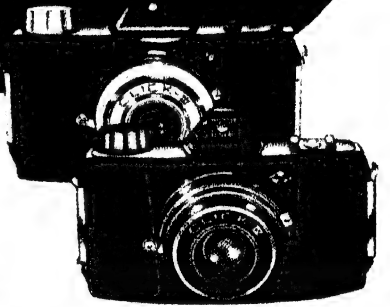
‘পশুপাখি’ ও ‘বনে জঙ্গলে’ এই দুখানি ক্যাসিক বই সে  
আমলে বাস্তবিক প্রতিটি ছাত্রের চোখে অক্ষতভাবে রেখে  
আজকের যুগের ছেলেমেয়েদের জন্যে পরিবেশন করা  
হলো। আজকের যুগের ছেলেমেয়েরা এই চিরকালের  
জীবজন্তুর পরিচয় ও গল্প পড়ে যেমন মুগ্ধ হবে, তেমনই  
ছেলে-মেয়েদের ছাপ-মায়েরা তাঁদের খেল-আলাপে  
রোমাঞ্চকর সত্যিকার ও ফিকার পাবে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের  
**হাতি চোর ৩০০**  
**বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের**  
**অপু কাহিনী**  
অপুর ছেলেবেলা ॥ ৬, ছোটদের অপরাধিত ॥ ৬,  
তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ॥ ছোটদের কাজল ॥ ৬,  
**নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের**  
**টেনিডা কাহিনী**  
চারমুখি ॥ ৫, টেনিদার অভিযান ॥ ১০,  
আউ বাংলাদেশ রহস্য (৩য় মঃ) ॥ ৫,  
শৈব্যা ॥ ৮/৯ সি স্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩



পিকনিক, পার্টি, জন্মদিন, ছুটিতে ভ্রমণ,  
সবেরই আনন্দঘন মুহূর্তগুলি আগফা-  
ক্লিক ক্যামেরায় ধরে রাখুন। এত কম  
দামে এত অপার আনন্দ, আপনি  
কল্পনা করতেও পারবেন না।  
এই আনন্দদায়ক সুবিধেজনক 'ক্লিক'  
সর্বদা সঙ্গে রাখুন। আপনার নিকটতম  
আগফা-গেভার্ট ডীলারের কাছে  
এখনই চলে আসুন।

পরিবেশক :  
আগফা-গেভার্ট ইন্ডিয়া লিমিটেড,  
রেজিস্টার্ড অফিস :  
মার্চেন্ট চেম্বার,  
৪১, নিউ মেরিন লাইন্স,  
বম্বে ৪০০ ০২০



লেখামাত্রই ছবি তোলা যায়



**ক্লিক III আর ক্লিক IV**

⊗ ফোটোগ্রাফ সম্বন্ধীয় যাবতীয় উৎপাদনের প্রস্তুতকর্তা আগফা-গেভার্ট, অ্যানটওয়ার্প/লিভারকুসেন এর ট্রেডমার্ক।

SIMOE/AG/8/79 BEN





প্রাগচাঞ্চল্যে ভরপুর  
নেস্কাফে



বিশ্বের সর্বাধিক  
বিক্রীত কফি

শতকরা ১০০ ভাগ খাঁটি কফি থেকে তৈরী  
একমাত্র ইনস্ট্যান্ট কফি



হেমন্ত মূখোপাধ্যায়র সংবর্ধনা জন্মদিনের  
বহরত বিবরণসহ।

দেবরত কিস্কসের হাতে। বস্তুত, এই  
সংবর্ধনাসভার মূখ্য উপোক্ত হেমন্ত  
মূখোপাধ্যায়, "কিশ্কস" সম্প্রদায়  
আয়োজনে নির্বেদিত হল সভাটি গত  
১১ মার্চ সন্ধ্যায়, রবীন্দ্রসদনে। কিশ্ক  
বর্ধনাবেশেব পক্ষ থেকে যে এই  
আয়োজন নয়, সে-কথা মূখ্য বলে  
দিলেন হেমন্ত মূখোপাধ্যায়, জনপ্রেম  
পদ্ম, উল্লেখ ছিল—“বঙ্গবাসীর পক্ষে  
হেমন্ত মূখোপাধ্যায়।”

বুই তৎপরপূর্ণ এই অনুষ্ঠান।  
খতানতই প্রয়োজনীয় ও জরুরী কাজ  
সম্পন্ন করলেন হেমন্ত মূখোপাধ্যায়,  
সমন্বয় নেই। সত্যজিৎ রায় এই  
অনুষ্ঠান সম্পর্কে যেমন লিখেছেন—  
“সম্প্রদায়ের সম্পর্কে এখনও নানান  
নাশিল পুঙ্খানুপুঙ্খ হয়ে আছে : আশা  
করি আজকের এই অনুষ্ঠান তাঁর মন  
থেকে সব অভিযোগ অভিমান দূর  
করে সাহায্য করবে” সে-কথা অরও  
অনেকের মনের কথা। আনুষ্ঠানিক  
এই সংবর্ধনার মূল্য সেদিক থেকে  
অপরিসর।

সেই মূল্যের কথা ভেবেই বোধহয়  
প্রেক্ষাগৃহে সেদিন তল ধারণের ভয়না  
ছিল না। মধ্যে ভেঙে পড়ছিল সব-  
সত্তরের গুণিজনদের সমাবেশ। চিত্র-  
পরিচালকরা, প্রবীণ-নবীন সঙ্গীত-  
শিল্পীরা, আবৃত্তিকারেরা, চেনা-  
অচেনা আরও বহু জন ভিড় করে-  
ছিলেন মধ্যে উইংসের দুই ধারে, এ-  
কোণে ও-কোণে সবত্র। পুষ্পস্তবক  
উপহার দিলেন অমিয়া ঠাকুর, কনক  
বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, শ্বিজেস  
জিয়ারী, সন্তোষ সেনগুপ্ত, শ্রুত  
গুপ্তাচার্য, নীহারবিন্দু সেন, সাগর  
সেন, তপন সিংহ, তরুণ জঙ্ঘমদার  
অজয় কণ, অরবিন্দ মূখোপাধ্যায়  
প্রমুখ।

সন্তোষ সেনগুপ্ত দেবরত  
কিস্কসের বিশাল জনপ্রিয়তার কথা  
বললেন তাঁর ভাষণে। নীহারবিন্দু  
সেন তাঁকে “গীতজ্ঞত” অভিধায়  
আখ্যাত করে তিনিটি প্রার্থনা জানালেন  
—রোগমুখি, সূর্যের অবসাহত গতি  
এবং শতকরের আয়। তরুণ জঙ্ঘম-  
দারের ভাষণে কুটে উঠল কিশ্ক  
কল্যাণ। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যাকরণের  
চারণে পাহারা তুলে যারা জঙ্ঘ

অবাক্য হ করতে হবে—আবেগজড়নে  
কণ্ঠে বললেন তরুণ জঙ্ঘমদার।

পল্লব গেরুয়া বসন, এক মূখ  
মাড়িত ঢাকা মূখ, যেন আরেক  
দেবরত বিশ্বাস সেদিন মধ্যে আসীন।  
কিশ্ক সংবর্ধনার প্রস্তাবে কথা দূর,  
কণ্ঠেই গমগমে গলার, নিজস্ব পুঙ্খ-  
বঙ্গীয় টানে ভরা উচ্চারণে চেনা গেল  
তাঁকে। জনগণের মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত  
ছড়িয়ে দেবার কাপারে মূখনের কণ্ঠই  
যে আসল রূপ, কালেন তিনি। প্রথম  
জন পুষ্পস্তবকার বক্তৃতা, কিস্কস-  
হেমন্ত মূখোপাধ্যায়। প্রথম জনকে  
প্রশ্না জ্ঞানের নিজের কণ্ঠ থেকে  
মালাটি হেমন্ত মূখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে  
পারিয়ে দিলেন দেবরত বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব ছিল  
গান। হেমন্ত মূখোপাধ্যায় শোনালেন  
প্রথমে। নির্বাচন এলোকেলো, কিশ্ক  
পরিবেশকে লাভ্যায় তাঁর নিবেদন।  
কিশ্কস থেকে আমার ডাক্তার, প্রাণগণে  
মোর এবং এমন দিনে তবুে বলা যায়  
সৌন্দর্য অসম্মান্য পরিবেশ সৃষ্টি  
করে ছল। কিশ্ক “আছে মূখ আছে  
মূখ্য” গানটিকে সেদিন কেন বাহুল্য  
তিনি, বোঝা গেল না।

দেবরত বিশ্বাস ভাষণ যে-কথা  
কলননি, তাই বললেন গলে সেদিন।  
প্রেক্ষাগৃহের আলো জ্বালিয়ে দেবার  
নৈশ দিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর  
আলোকিত প্রত্যাশার সামনে তিনি  
চারজন গায়ন তুলে ধরলেন তাঁর  
গোপনকৃত উত্তরণগুলি। প্রথম গান  
“এ-মিহাং আমার নাহি সাজে।”  
সংবর্ধনার উত্তর হয়ে এল যেন।  
দ্বিতীয় গান—“আমার কণ্ঠ হতে  
গান কে নিলা” নাশিল নয়, বেদনা হয়ে  
খাঁ পড়ল। তৃতীয়ত, “গান আমার বার  
ভেসে যায়” তে ক্রমশ স্পষ্টতর হল  
সেই বেদনা। “চল নে ফিরে চল নে,  
তো আমার কিয়ার” স্বগতোক্তির মতো  
শোনালো, এবং বলাবাহুল্য, সেই  
উজ্জ্বলিত যে-অভিমান, যে-হৃদয়া, যে  
আকৃতি তা সেই সন্ধ্যায় সমস্ত  
শ্রোতার আঁখিকেই বেদনায় ছলছল  
করে দিয়েছিল। এবং সেই বেদনাবিশ্ব  
শ্রোতৃমণ্ডলীকে আরও অঙ্গুল করে  
শেষ গান মুনিত হল তাঁর কণ্ঠে  
তীব্রতর বেদনায় ভরা জিজ্ঞাসা হয়ে  
“যেদিন সকল মূখল গেল করে, আমার  
ভাকলে কেন গো এখন করে।” “হাতে  
আমার শূন্য জলা”, “রিজ কহ এই  
তো আমার” এই কলিঙ্গুলি গাইবার  
লময় হাত উঠে এসেছিল তাঁর, একথা  
সত্য, কিশ্ক তাঁর সেদিনের কণ্ঠ,  
গহনভাষা, সন্ধ্যাহক উচ্চারণ বারবার  
মনে করিয়ে দিচ্ছিল যে তাঁর অনু-  
ভবটি এখনো শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে  
লজা হয়ে ওঠেনি। তাঁরও কোনো  
অধিকার নেই শ্রোতৃমণ্ডলীকে এভাবে  
বক্তৃত করে রাখার। সব শেষে সেদিন  
হেমন্ত মূখোপাধ্যায় ও দেবরত  
বিশ্বাস একত্রে পরিবেশন করলেন  
“ক্লান্তি আমার”। বাংলায় ও  
ইংরেজীতে। বাংলার হেমন্ত মূখো-  
পাধ্যায়, ইংরেজীতে—দেবরত বিশ্বাস।  
প্রথম মূখোপাধ্যায়

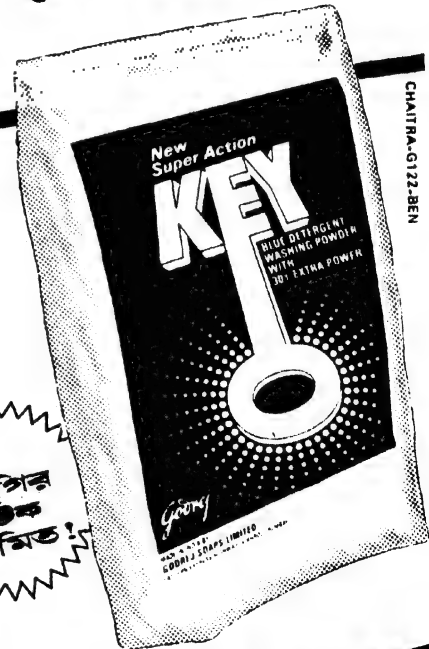
# ১/-টাকা ছাড়

## ১ কিলোগ্রাম পলি প্যাকে

# কী

ব্লু ডিটারজেন্ট  
পাউডার

পরিষ্কার করার অতিরিক্ত  
ক্ষমতা অথচ অন্যান্য নামী  
ডিটারজেন্টের তুলনায়  
৩০% দামে কম।



শিশুগণের  
সুস্থতা  
সীমিত!

গোদরেজ  
—এর উপপাদন

CHAITRA-G122-BEN



নিউরশীল টেকসই  
ও আধুনিক  
বলেই এর সমাদর



ভালো ছাত্র জন্য  
একটি বেশী খরচ  
করাও মার্থক

কে.সি.পালের  
ছাত্র



অতি আধুনিক  
ও বাজারের সেরা জিনিস  
দিয়ে তৈরী। ছাত্র  
কাপড়গুলিও ওয়াটার-প্রুফ

কে.সি.পাল এণ্ড সন্স  
কলিকাতা-৭০০০০৭

## ব্রহ্মদ শিল্পী পরিচিতি

কার্তিকচন্দ্র পাইন  
(১৯০১-)

শিল্পী-সমাজে তিনি দ্রুত কার্তিক পাইন। তাঁর কলকাতার পুরনো বাসিন্দা। উত্তর কলকাতার বসবাস-বন্দক পারিকেরে এইভাবে তাঁর জন্ম। ছোট ভাই কলচর দত্ত কলকাতা। এই ব্যক্তি গবেষণায় আর স্নায়বিক ব্যক্তিও আসেন। সেই ব্যক্তি হলে গবেষণ। তাঁর জন্মভাই। তিনিও নারী শিল্পী। বস্তুত একই প্রকারে একই বংশে ভিন্নতর ব্যক্তিত্বের শিল্পী কল কল করা হয়।

প্রথমে "পাইন হস্তকর" (জানু ১২" x ৬") ছবিটি বই প্রকাশনা করে। হস্তের ছাপ এতকেন্দ্র নামে মুদ্রা করে। ওপরে টিয়ার-পাইন। সমস্ত ছবির সাক্ষ্যেই মনেই জীবন সৌন্দর্য্য পাশ। একট হালি। আসলে তাঁর সত্যিকার শিল্পী সত্যের সোনার হস্তকর দেখেন। তাঁকে নিয়ে মজা করান ইচ্ছা হয়। শোকে ভারতীয়ের জাগরণী হুগো-বাগ করেন। এই ছবির পরিমিত ছকটু কলকাতা। অন্যকাল কিছু সেই। পরে হাতের চাকি-পাশে কালির দ্রুত আঁড় টেনেছেন। সামান্য আরোহণ কিছু সামান্য করছেন।

কার্তিক সরকারী চাকরি করতেন। মহাশয়গণের স্নায়ুত: কলকাতা সর্গ-ভারতীর প্রথম-নীতে অংশগ্রহণ করতেন। আকাশবাণী অব কলিমা আর্টস পুরস্কার ১৯৬৬, '৬৯, '৭০, '৭৬। যথাক্রমে কলকাতা পরিষদ পুরস্কার ১৯৭০, '৭৪। একক প্রদর্শনী করেছেন একাধিক কলকাতায়। দিল্লির আইফেন্স আয়োজিত হুগোবন্দী প্রদর্শনী (১৯৬১)। লালিতকলার একক প্রদর্শনী '১৯৬৮ এবং জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারী বোম্বেই (১৯৬৮)। কলকাতা সোসাইটি অব কলেক্টরদের আর্টস্টেট সদস্য ছিলেন। বর্তমানে ওরেন্ট কেবল আর্টিস্ট কেবলকেন্দ্র। সম্প্রতি জাপানের ফুকুচি আর্ট মিউজিয়ামে "এশিয়ান শিল্পকলার এক শত বর্ষের (১৮৬১ - ১৯৬১)" প্রদর্শনীতে ভারতীয় বিভাগে রবি বর্মার ছেলে কার্তিক পাইন এক শ জনের কাজ ছিল। সমবয়সীদের মধ্যে ছিলেন এ শহর থেকে যথেষ্ট উচ্চাচার, শরীরী স্নায়ু-চেষ্টারী, অজিত চক্রবর্তী। এদের কাজ ১৯৬৯-তে ন্যাশনাল গ্যালারী সংগ্রহ করেন। দুটি মুরাল করেছেন একটি হোম পার্শ্বসিটি ডিপার্টমেন্ট পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের জন্য। অপরটি ভারত সরকারের তথ্য এবং জনসংযোগ বিভাগের জন্য। ন্যাশনাল গ্যালারী অব মডার্ন আর্ট বিজ্ঞান আকাশবাণী প্রকৃতি স্থানে তাঁর কাজ আছে। আড়াই বছর ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে অধ্যাপনা করেছেন।

কার্তিকের হাতে নানারকমের কাজ  
এক শত বর্ষের শিল্পী পরিচিতি

বিশেষত সেখান থেকে তাঁর নাম বা চিত্রকলা সেখান কল আছে। তাঁর প্রথমত কল কলকাতা বসবাস হুগোবন্দী তেলো পড়ে পড়েন চক্কর। এম হলে কলকাতার সৌন্দর্য্য জীবন হারা করেন। হুগোবন্দী তার প্রতিফলন



ছোট। অন্যদিকে ইউরোপীয় তৈলচিত্রের প্রাচুর্য্য আকর্ষণ। এই উত্তর কার্তিক সংগ্রহে তৈল নিম্নম্ন শৈলী। উত্তর কলকাতার গলি, লোকচারা, শ্রী আচার, পূজা পাঠের জগৎ একই উপ-নৈবদিক সংকীর্ণ, সব মিলিয়ে শহর কলকাতার মানবিক এক মানবিকতার প্রতিফলন আছে তাঁর কাজে। কার্তিক কলকাতা-এর কাজে সমান দক্ষ। সেখানেও তাঁর কল-রেখার সমান কলাকৌশলতা। কলকাতার কাজের সৌন্দর্য্য মনে লেগে থাকে।

কার্তিকের মত কিছু শিল্পী কল-কাতার অছেন বারী নিম্নম্ন রেখার করেন। রচনা করেন। অথচ লোকের উল্লাহ বা পুণ্ড্রপাশকতার অভাব, অর্থের অভাব এক গৃহস্থের উপস্থাপন করার লোক না থাকার, এরা অগতির চিত্রই থেকে যান। একজন ততীর প্রাণীর কবি অ গল্পকার কলকাতা। যে সমান পান, একজন প্রথম সত্যিকার শিল্পী তা পান না। অথচ শিল্পীরা কলকাতা। ভাল কল গাছের উল্লাহ মাটি নিম্নতে হয়। কল দিতে হয়। গত বছরে ১৮৬১-১৯৬১ পর্যন্ত এশিয়ার শিল্পকলার প্রদর্শনীতে কলকাতা জাপানীরা থাকে নির্বাচন করেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিদপ্তরে পর ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের কবি বিভাগ থেকে তাঁর চাকরি যায়। এই দেশ।

কার্তিকের বারী চেনেন, তাঁর অকাই সাক্ষ্য দেখেন ছোট্টো টাইনানী করে কি-ভাবে তাঁর শিল্পকলা চলিয়ে গেছেন। কখনো স্নায়ু বা পুণ্ড্র তৈল চিত্রচিত্র হাট্টু উড়ে বারন। কল তিনি কাজ করে গেছেন। পরনে ছবি পেছনেই কাজ করেছেন। তাঁর কলকাতা-প্রবণ জগৎ। নিম্নম্ন পাইন হাত ধরে হাট্টু। বাহ হয় মানব। মানব হয় জন্তু। বাহকর কার্তিক পাইন।

# ঘামাচির চুলকানি আর জ্বালা-স্বন্দ্রনা ডুলে যান!



**টাইসিল**  
ব্যবহার করুন!  
সবচেয়ে দ্রুত  
আরামদায়ক ঘামাচি-  
তাশক পাউডার



২ রকমের  
পায়ে পাওয়া  
যায় - 'মু' আর  
'স্ট্রাপল উড'।

**টাইসিল আত্ন**  
**ঘামাচি ডুলন**  
**মাত্র টা.৬.৬৩প\***

\* সর্বাঙ্গিক খুচরো দাম।  
স্থানীয় কর আলাদা।

একমাত্র ঘামাচি মারার পাউডারই  
চুলকানি আর জ্বালার অস্বস্তি  
থেকে আপনাকে সবচেয়ে দ্রুত  
আরাম দেয়।

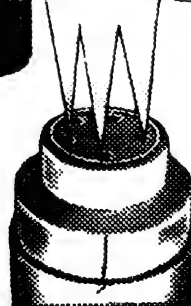
বিশেষ গুণে কোনো নাইসিল  
ঘামাচি প্রতিরোধ করে  
প্রতি থাকে।

১. অতিরিক্ত ঘাম হওয়া।

২. ঘাম শুষে নেয়।

৩. প্রবল লসিকারী ঝাঁপাণু  
নষ্ট করে।

৪. যাকে স্নিকতা এনে দেয়।



সাথের পুতুল টুটুট  
ঘুঙুর বাজছে রতনঘাত  
তথ রাঙ্গাতোতে

টিপস  
অ্যান্ড  
টোজ



TIPS  
AND  
TOES

নিশ্চয় নখরজ্যোতি

এ হ'ল আপনার মত হাসি  
লাসো ভরা যুবতীদের হৃদয় নখ  
রাঙ্গানোর জগৎ—ককমকে  
মনোলোভা রঙ। যে রঙ আপনার  
নখে একবার লাগালে বহুক্ষণ  
পর্যন্ত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ  
করতে থাকে।  
নানান হৃদয় হৃদয় রঙ যা  
আপনার ব্যক্তিত্ব ফোটায়,

নখকে সাজায়, মনকে রাঙ্গায়।  
নানান মনোলোভা রঙ যেমন,  
চকলেট ব্রাউন, ডাফি পিংক,  
স্ট্রবেরী ক্রীম, ককি ব্লাউড  
আর আরো গুণাপ।  
টিপস অ্যান্ড টোজ নেল লাস্টার  
রিমুভার ও পাওয়া যায়।  
যেকোনও বড় দোকানে খোঁজ  
করলেই পাবেন।



# ঘামাচির চুলকানি আর জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলে যান!



**টাইসিল**  
ব্যবহার করুন!  
সবচেয়ে দ্রুত  
আরামদায়ক ঘামাচি-  
নাশক পাউডার

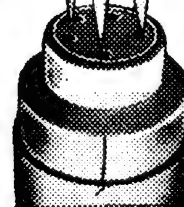


২ বকরের  
পাকে পাওয়া  
যায় - 'মু' আর  
'তাইসিল ইউ'।

**টাইসিল আনুত**  
**ঘামাচি ভুলত**  
**মাত্র টা.৬.৬৩প.**

\* সর্বাধিক খুচরো দাম।  
স্বাধীন কর আলো।

- একমাত্র ঘামাচি নাশক পাউডারই  
চুলকানি আর জ্বালার অস্বস্তি  
থেকে আপনাকে সবচেয়ে দ্রুত  
আরাম দেয়।  
বিশেষ গুরুত্ব বেশানো টাইসিল  
ঘামাচি প্রতিরোধ করে  
প্রতি রাতে।
১. অভিরিক্ত বায়ু হওয়া  
নিম্নরূপ করে।
  ২. বায়ু শুষ্ক হয়ে যায়।
  ৩. দুর্গন্ধ বহিকারী জীবাণু  
নাষ্ট করে।
  ৪. স্বপ্নে স্নিগ্ধতা এসে যায়।





# মিল্কমেড তৈরী দুধের সেরা-গন্ধে স্বাদে উরা



## দু লিটার সুস্বাদু দুধ-চিনি সমেত।

স্বাদে ভরা দুধ তৈরীর তিনটি সহজ পর্যায়।

দু লিটার অতি সুস্বাদু দুধ  
আপনার সারা দিনের দুধের  
চাহিদা মেটায়। মিল্কমেড  
সুগিষ্ট বলে আপনার চিনির  
ধরচ বাঁচায়। আজকের চড়া  
দামের দিনে সত্যিই পয়সার  
সঞ্চয়।

১। মিল্কমেড ৪০০ গ্রামের  
টিন খুলুন।



২। ২ লিটার জগে ঢালুন।



৩। তারপর মিল্কমেডের টিনে পাঁচবার  
জল ভরে তাতে ঢালুন আর গুলে  
নিں। এবার সুস্বাদু সুগিষ্ট ২  
লিটার দুধ আপনার জত তৈরী।



**মিল্কমেড**  
স্বল্পদামে সুস্বাদু ও চমৎকার

# বিভূতি মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

সপ্তম খণ্ড  
পঁচিশ টাকা

প্রকাশিত হয়েছে

বিভূতিভূষণ  
বন্দ্যোপাধ্যায়ের



প্রথম খণ্ড : ১৯৯টি গল্প ৪০,  
দ্বিতীয় খণ্ড : ১৯২ টি গল্প ৪৫,

অবধূত-এর



'মরুতীর্থ হিংলাজ', 'হিংলাজের পরে'  
'দুর্গম পন্থা' এবং 'নীলকণ্ঠ হিমালয়'  
এই চারখানি বইয়ের একত্র সংকলন  
ত্রিশ টাকা

তৃতীয় খণ্ড  
ত্রিশ টাকা

— সঙ্গ প্রকাশিত —

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সুমথনাথ ঘোষের  
কথা কল্পনা কাহিনী বাঁকাত্রোত  
দ্বিতীয় খণ্ড : কুড়ি টাকা (পেন্সার ব্যাক) নয় টাকা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের  
সোনার হরিণ নেই ৫০

সুজিত কুমার সেনগুপ্তের সোনালি দিনের পাখিরা ১২



নীহাররঞ্জন গুপ্তের  
কিশোর পাঠোপযোগী সমগ্র গ্রন্থের সংকলন  
কিশোরসাহিত্য-সমগ্র  
তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে  
৩য়: - ১৪.০০

কিশোরদের জন্যে লিখিত লেখকের সমগ্র রচনাগুলি  
তিন বা চার খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিখণ্ড  
আনুমানিক ৩০০-৩৫০ পৃষ্ঠা, প্রাস্টিক জ্যাকেটে  
মোড়া, ছোটদের উপহার দেবার মত। এখনই সংগ্রহ  
করুন।  
মূল্য-১ম খণ্ড সাড়ে বারো টাকা  
২য় খণ্ড সাড়ে বারো টাকা

মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১০, স্বাধাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ ৩৪-৮৭১১

# নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী

প্রকাশিত হয়েছে



দেখুন...

সবচেয়ে সাদা করার জন্যে **রানীপাল**



কাপড় শেষবার ধোবার আগে জলে একটু রানীপাল মেশান আর এবার দেখুন  
কাপড়ের ঝকঝকে সাদা ! রানীপালের সাদা ! সাদা কাপড় সে যাই হোক না কেন  
সূতী, সিন্থেটিক আর ব্রেণ্ডেড-রানীপাল ব্যবহারে ঝকঝকে হয়ে উঠবেই।  
নিয়মিত রানীপাল লাগান...আর লাফা কাকে বলে দেখুন ও দেখান  
সূতীর কাপড়ের জন্য রানীপাল®  
সিন্থেটিক ও ব্রেণ্ডেড কাপড়ের জন্য রানীপাল®-এস

দলের প্রাচ্য প্রাচ্য ও আন্তর্জাতিক  
বলেই বাম দলের নির্দেশ দেবে নৈমিত্তিক  
প্রাচ্যের দিকে।  
শ্রীলেখা মুখোপাধ্যায়  
হাফা, ২৪-পরগনা

## ম্যালোরীর মৃতদেহ

দেশ পরিচালক প্রকাশিত প্রদেশ  
চলচ্চিত্র "এডভেঞ্চার থেকে ম্যালোরীর  
মৃতদেহ আকর্ষণ" লেখাটি পড়তে ভাল  
লাগল। ১৯২৪ সালের এডভেঞ্চার  
অভিনয়ের ঘটনাবলী সম্পর্কে তিনি  
সার লালিস ইন্ডিয়ানকে এর  
একটি অংশ মাউন্ট এডভেঞ্চার থেকে  
সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু তাঁর  
কয়েকটি তথ্যগত ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি  
আকর্ষণ না করে পারছি না।

শ্রীচক্রবর্তী লিখেছেন যে, "১৯৪২  
সালে রাশিয়ান এক অভিযাত্রী দলও  
এডভেঞ্চার শিখর আরোহণের প্রচেষ্টা  
করেছিলেন শোনা যায়...তাদের মোট  
সাতজন রশী পর্বতারোহী প্রাণ  
হারিয়েছিলেন। কিন্তু এপ্রিল, ১৯৫৪  
সালে প্রকাশিত হিমালয়ান ক্রাফট  
লোটার নং ৮এ বলা হয়েছে যে,  
অভিনয়টি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫২  
সালের অক্টোবর মাসে। অভিযাত্রী মোট  
ছয়জন সদস্য ২৭০০০ ফুট পৌঁছে  
আর ফিরে আসেননি। এই প্রসঙ্গে  
স্মরণ করা যেতে পারে যে, দ্বিতীয়  
বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে কোন এডভেঞ্চার  
অভিযান সংগঠিত হতে পারে নি।

১৯৪৭ সালে অল ডেনম্যান যে  
এক অভিযান চালিয়েছিলেন, তার  
সঙ্গে দশ জন শেরপার অন্যতম ছিলেন  
শ্রীতেনজিং নোরগে। অভিযানটি বিফল  
হওয়ায় তারা সকলেই ফিরে আসেন।  
অভিযানটি যদিও অননুমোদিত ছিল,  
কিন্তু এ অভিযানে কোন দুর্ঘটনা ঘটে  
নি। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে  
ডেনম্যান আবার এসেছিলেন, কিন্তু  
এবারও অননুমোদন না থাকায় তেনজিং  
যেতে রাজী হননি। ডেনম্যান ফিরে  
হান। রামসে উলমানের দ্বারা অনু-  
লিখিত তেনজিং-এর আত্মজীবনীতে  
এই অভিযানের কিতাবিত বিবরণ  
পাওয়া যায়।

ম্যালোরীর ক্যামেরায় তোলা  
exposed film যদি থেকেও থাকে,  
ছাপার বছর পরেও ফিল্মটি অক্ষত  
থাকা কি সম্ভব? যদিও এর ফলাফল  
জানতে বেশী দেরি হবার কথা নয়,  
কিন্তু আমরা জানি যে, তুষারভরের  
প্রমাণ থেকেও বারো অর্ডার (Mois-  
ture) এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আর  
এই আশ্রয়ই ফিল্মের ক্ষতি করে সব  
চেয়ে বেশী।

প্রমথ নাথ সেন

কলকাতা-২৬

## রবীন্দ্রসংগীত

দেশ পরিচালক প্রকাশিত শ্রীসম্মান  
চরিত্রাখ্যায় রবীন্দ্রসংগীত কি লাইট  
মিউজিক বিষয়ক চারটি কয়েকটি দৃষ্টান্ত  
সম্পর্কে কিছু কথা বলার মনে করি।  
প্রোতা এবং শিল্পীর ভূমিকা এবং  
কত কত সমস্যা রবীন্দ্রনাথ নিয়েই বলে  
গিয়েছেন। প্রোতা এবং শিল্পীর সম্পর্কে

কত কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ১৮৬৭-১৮৭৭  
একটি চিত্রিত। "তাই বহন আমার  
গান করে, বলেই বলেই হয় আমার গান  
রচনা সাধক হয়েছে। সে গানে স্বতন্ত্র  
আমি আছি ততখানি কন্যে আছে।  
এই মিলনের দ্বারা যে পুণ্যতা ঘটে  
সেটার জন্যে রচয়িতার সাহস প্রতীক্ষা  
আছে।" (শ্রীশ্রী রবীন্দ্র সেন সম্পাদিত  
"রবীন্দ্রনাথ", দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২০৪)।  
সংক্ষেপে সব রকম বিচার-বিবেচনা  
উপর রেখে প্রচার প্রতি নিঃসৃত এবং  
নিঃসৃত আত্মসম্মান করতে না পারলে  
গান গাওয়া অর্থক্য গান শোনা কোনটাই  
সাধক হয় না।

শ্রীচক্রবর্তী লিখেছেন যে, "রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ধরনের  
গানগুলোকে সাংগীতিক বিশ্লেষণের  
মাধ্যমে বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা যায়  
কিনা।" রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ক কোনো  
কোনো গ্রন্থে গানগুলিকে ঋগ্বেদাঙ্গ,  
উপাঙ্গ, কীটনাঙ্গ, কাউলাঙ্গ প্রভৃতি  
পাঠ্যে ভাগ করা হয়েছে, তবে লঘু-  
অলঘু বলে কোনো শ্রেণী-কিনাসেব  
কথা শোনা যায়নি। রবীন্দ্রনাথের গান  
কথা-অর্থ, সুর-প্রধান নকি এ কথা  
রবীন্দ্রনাথ নিজেই বার বার বলে গেছেন  
এবং এই কারণেই সুর-কিয়ারে ভিত্তিতে  
না করে গীতকিতার গানগুলিকে  
কথা-কিতার ভিত্তিতেই পর্বত ভাগ  
করেছেন। তাঁর গানগুলির ভিত্তিতে  
কোনো শ্রেণী-কিনাসের আবশ্যকতা  
বোধ করলে নিশ্চয় তিনি তা লিখে  
যেতেন। কিন্তু যতদূর মনে হয়, এমন  
কথা তিনি কোথাও লেখেননি। সুতরাং,  
গীতকিতার পদ্ধতি-কিনাসের পর তাঁর  
গানগুলির নতুন কোনো শ্রেণী-কিনাসেব  
আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কিনা  
সেইটাই ভেবে দেখা দরকার সবার  
আগে।

শ্রীচক্রবর্তী লিখেছেন,  
"রবীন্দ্রনাথের গান কি আধুনিক গান  
নকি? গত একশ বছর ধরে বাংলা  
আধুনিক গানের যে খাজা চলে আসছে  
রবীন্দ্রনাথ তার উৎস নৈই?" বাস্তবিক  
এ এক অশুভ প্রশ্ন। কিসের উৎসে  
কি নৈই? "আমি কেবল তোমার দাসী,  
কেমন করে আনব মনে তোমার  
ভালবাসা?" রবীন্দ্রনাথের এই গানটি যদি  
আধুনিক হয়, তাহলে গোপালকৃষ্ণ মল্লিক  
অগুনত জড়িয়ে দিগন্ত করল। গণ  
এ "বিশ্বদী" গানটার আধুনিক হতে  
যা কি? এইভাবে উৎসের উৎস, তস্যা  
উৎস খুঁজলে তো চাবুপীতকেও  
আধুনিক গান বলা যায়। আধুনিক  
গান—একসঙ্গে এই দুটো শব্দকে প্রচলন  
কত দিনের? তাঁরই দৃষ্টান্ত প্রথম  
দিকে "আধুনিক গান" নাম দিয়ে কোনো  
গানের কথা শোনা যেতে না। হত কেনই  
হোক না কেন, এই আধুনিক গানের  
বয়স প্রায় থেকে ৫০ বছরের মধ্যেই  
ধরেতে হয়। বাংলা গানের বিশিষ্ট ধারার  
অবলম্বিত এই আধুনিক গানের প্রকৃত  
উৎস বললে খুব অস্বস্তিক কিছু বলা  
হবে বল মনে হয় না। জয়দেব থেকে  
নন্দরল পর্বত বাংলা গানের যে  
ধারা, তাতে দেখা যায়, এই  
সব গানের রচয়িতা এবং সুরকার  
একই ব্যক্তি। স্বতন্ত্র অংশই  
কিছু আছে, কিন্তু তা বই সামান্য।

# বাংলাদেশের আমি

মহেশচন্দ্র পাল সংকলিত

বাংলা হরফে মূল, বাংলা হরফে যশোদার পূর্ণাঙ্গ টীকা,  
মূল ও টীকার বঙ্গানুবাদ। সম্পাদনা: স্ত্রীবিবানা রায়।  
৫০ টাকা ॥

## কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস

তারাকর বন্দোপাধ্যায় অপরাধিতা	২০'০০
আশাপূর্ণা দেবী	১০'০০
প্রেমেশ্বর মিত্র	৭'০০
মহাশ্বেতা দেবী	৬'০০
বিমল কর	১২'০০
সুভাষ মুখোপাধ্যায়	৭'০০
কৃষ্ণা দত্ত	১৮'০০
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	১২'০০
অতীন বন্দোপাধ্যায়	৭'০০
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়	২০'০০
শৈবাল মিত্র	১২'০০

## ভক্তিমূলক-রচনা

গোস্থামী তুলসীদাস	১০'০০
সম্পাদনা ও ভাষান্তর-জ্যোতিভূষণ চাকী	৩০'০০
৩ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড	৩০'০০
সনৎকুমার গুপ্ত সম্পাদিতঃ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ	১২'০০

## দ্রষ্টব্য-কাহিনী

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়	৮'০০
শ্রীমতী ভক্তি বিশ্বাস	১২'০০

# আমি

মূল্য : ৩০ টাকা

গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়

# আমি তেজির অন্তর্গত অঙ্গীতম

ডগতরাম তলোয়ার

২০

নবপত্র প্রকাশন

৮, পটুয়াটোলা লেন, কলি-৯



**পাণদেব** **সাজেদ্রকুমার মিত্র**  
**সধুমঙ্গ** ১০.০০  
 দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হ'ল

**শ্রেয়সী ও শ্রেয়সী** ১০.০০

কবি বলেছেন নারীর দুই রূপ—বর্ষা ও বসন্ত। এক জন নর-সহচরী অপরজন মর্মসজিনী। যে বসন্ত—সে শুধু যুগযুগান্তর ধরে বিশ্বের শ্রেয়সী। পুরুষ এই রূপে মুগ্ধ হয়েছ, উদ্ভ্রান্ত হয়েছ, ভ্রান্তি রূপিনীর সাধন করেছ সর্বত্র পণ করে, সর্ব নিমিত্তির পথে। অথচ কল্যাণী রূপ তার সামনেই আছে চিরদিন—তার জীবনের পূর্ণতা নিয়ে, সার্থকতা নিয়ে। সে রূপ তাকে দেখাতে হয় অনেক সময় জীবনের মূল্যে, সমস্ত চক্কোর বিনিময়ে। সর্বনাশের স্থশানে বসে চিনেতে সে বর-শাস্ত্রী, তপ্তরূপিনী, জীবনসজিনীকে।

**শক্তিপদ রাজগুরু**  
**তিল থেকে তাল** ১২.০০

কুম্ভ একটি লাউ, তাকে কেন্দ্র করে লাউগড় বীরপুর লাইট রেলওয়ের ইতিহাসে, ওখানকার মানুষের জীবনে একটি বিচিত্র অধ্যায় রচিত হয়েছিল। সামান্য ঘটনা—বিচিত্র পটভূমিকা আর জাপত চক্কিরের সমাবেশে অফুরন্ত হাস্যরসের স্পর্শে অসামান্য সাহিত্য কৃতিত্ব পরিণত নোভুন বাদের একটি উপন্যাস।

**বিমল করের**  
**সংশয়** ১০.০০

সাহিত্য যাদের কাছে অসঙ্গর যিনোদনের সামগ্রী মাত্র নয়, বিমল করের নতুন বই প্রকাশের খবর তাদের কাছে একটা বিশেষ সংবাদ।

**আশাপূর্ণা দেবী**  
**প্রতীক্ষার বাগান** ১২.০০

“মেয়ে মনের মাতৃহের জুধা কি ‘উষিষ্যতের’ বাগানে ফুল ফোটার আশায় অপেক্ষায় পরীক্ষা দিতে দিতে রাত হয়ে পড়ে না? সে জুধা দিনে দিনে তিলে তিলে তাকেই ক্ষয় করে আনে না?”

মণ্ডল বুক হাউস  
 ৭৮/১ মহাশা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। ফোন: ৩৪-৮৭৪৭

নজরুলের পর কেবলই পরোক্ষরূপে আধুনিক গানের বঙ্গ। এখন পালি লেখেন একজন আর নয় কেউ আর একজন। ব্যতিক্রম সেই কালেই হয়।

**কমলাকান্ত বসু**  
**হাওয়া**

**গ্রাফিক আর্ট : লেখকের প্রত্যুত্তর**

১৭ই মে সংখ্যার সলাং করের টাট পড়ে লক্ষ্য লয়াম। ছাপাই ছাপকে আদ্য পিছে চির এবং ভাস্কর্যের লম্বা গুঁড়ো দিই না। সলাং কর-সহ অমের কণ্ঠে কিছ্র নিছক ছাপাই শিগ্প। এ-রূপেরে কুখ্য। আমার ব'জি এই-রকম—কণ্ঠ লিপ্সী সময় পেলে এ কাজ করেছেন এবং প্রেস্ত চিরকর ও ভাস্কর্য-বের ছাপাই ছাপি সলাংকরে রসোভা। এ কথা আমার ক'বর আগে ন'দে ইয়ক' মডন আর্ট গারলারীর প্রেরিত প্রদর্শনী দেখেই আমার নতুন ক'ব' ব'কেছ। পিকাসো, মাতিস, রাখ আদ্যদের পাশে দাঁড়ায় কমজা ছিলা অ' হেটেরে নান্দনিক বিচারে। এ দৃঢ় বিশ্বাস ছাপাই চরাল্পদীর লাক্ষত করে।

হেঁদের ডিকালিটি পম্বতির মূল আকর্ষণতা অবশ্যই। ভারতবর্ষ থেকে বত হয়ে আমি তার স্টুডিওতে প্রথম কক্ষ দেখেন জনগুরুল ক'ব'। এই লক্ষ্যতিন নতুন প্রবৃত্তির উন্নতির পোচান ক'ব' রেভী এবং কারকোমিতর

বাস আছে। এ কক্ষর লেখকর প্রাচলি স্বীকৃত। সলাং কর লেখক্য নিজেই বলেছেন।

সলাং কর আমার ক'ব' স্বীকার করেছেন—ইন্ডলিও পম্বতির ক'ব' খিরে প্রুই না জেনেও কিছ্র বলেমেরে ইক'ব' দিক'ব' বেলো খেলে বাস আদ্যিতের মতে খাতুর পা'তা অর্থাৎনর ল'ব' করে। প্রাপলগত তিনি বলেছেন, খাতুর পাতে আদ্যিত অর্থাৎ বটর মা—এত ব'ব অ'ব'ভাবন কি করে কলেদ? ভীর প্রাক'ব' দিকের কাজগুলো মনে পড়ল না? সেগুলো তিনি কালক'ব' হয়েন নতুন দিকক থাকতে করে-ছিলেদ? তততে মূলত আদ্যিতের অর্থাৎপটিলনী বেলো মাহাভা কি ছিল না? ল্যভবী কেলেলেতে ১৯৬৪-র প্রদর্শনী।

প'ত ১২-১৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতার এনোয়ালেদ লক্ষ্যতের ময়েল কলেজ অব আর্টের ছাপাই ছাপি বিজ্ঞানের প্রধান, অধ্যাপক আলিষ্টার গ্রাণ্ট। তিনি আমার বলেছেন হেঁদের ইক' এ ডিকালিটা'। বললাম, আপনার উদ্ভ'ত ক'ব'তে পারি? অবশ্যই। প'খিবীর প্রেস্ত ডিকের অক্ষররা প্রেস্ত ছাপা-ক'ব'। ভুরোর, গোইলা, পিকাসো ছাডিস। বে শ'ব'ই ছাপাই শিগ্পী, সে খ'ব'ই সীমারিত। ফেরল ক'ব'রে ছাপাই ছাপির প্রত্যেক ছরকে টি-ভাস্কর' করে কেতে বাধ্য করি।

আলিষ্টার গ্রাণ্ট ক'ব'ব' সলাং কর। কলকাতকন বলায় ময়েল কলেজ। বিক'টি'র গ'ব'ব' ম'ব'রাং খিবেচ। শিগ

**প্রকাশিত হল**  
**রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত প্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তীর**  
**বিষ্ণু পুরাণ**

ভারতীয় পুরাণগুলি গুরুত্বপূর্ণ। আখ্যান-উপাখ্যানের এক অক্ষরও ভাঙার। তার মধ্যে আবার বিষ্ণু পুরাণ গুরুত্বপূর্ণ খনি মলাও চলে। খ্যাননামা লেখক নৃত্যনকালের পঠিকালের উপযোগী ওখার অখণ্ড প্রাচীন পুরাণের গল্পের রস অক্ষর রেখে বিষ্ণু পুরাণ এই বইতে গদ্য সারানুবাদে উপস্থিত করেছেন মনোজ ভট্টাচার্য। ১৪

**এই লেখকের অন্যান্য বই**  
**রম্যগি বীক্ষ্য**

রম্যগিদের জন্য এই সিরিজের ৬ পর্বত ২০টি পর্ব প্রকাশিত হয়েছে।  
**সুন্দর নেহারি** **রূপমতীর দেপে**  
**চোখের আলোয় দেখেছিলেন**  
**প্রকাশিত হতে চলেছে**  
**সুবোধ বাবুর লেখা একখানি অনবদ্য গল্প সংকলন**  
**গল্প শুধু গল্প**

এ. সুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড  
 ২ বক্ষিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩

কলকাতাই কেন্দ্র করে এক নিশ্চয়সে  
হেটোর এবং বহুল শিল্পী চিত্রকরের  
কর উত্থাপন করলেন? আলিসের ফ্রেস  
এক জিটিল অটোপারের আয়ার সঙ্গে  
নিজা সিরিষিত করে জানা নিশ্চয়সিক-  
নের পরিচয় হয়। তাঁদের জন্য কোন  
জিজ্ঞাসা করেছি। তাঁরা হেটোরের নাম  
কেউ পোনেলনি। আলিসের গ্রাউ  
কলসেন, হেটোরের কাজের মাকিন  
হলসে। ইটেরপে তিনি অপরিচিত।  
এক কী পরীক্ষিত। তাঁর কাজে  
নান্দনিক কোন গুণ নেই।

স্বপ্নরথনা সেমরথ হোড় কলা-  
কলকাতা অধ্যাপক। তাঁর এটির অমায়  
বাহুল্য লাগে। তাই বলে কিছু কোন  
দিন তাঁর সাধারণ ওপর সাদা কাগজে  
আমার উপর স্বপ্নরথনা কাজ মনে  
হয়নি। এটিই এক ইন্টা-পলওর তফাত  
আছে। আমার মনে আছে অরণ কল,  
পারী থেকে ফিরে আসার পর  
কলকাতার ইন্টা-পলওর গুরু হয়। তাই  
তাকে ভাবিচ্ছিল বলে। এ ফিরে  
সোসাইটি অব কন্ট্রোপোরারী আর্টিস্টের  
স্বপ্ন সম্পর্ক প্রথমবারের মতো উদ্ভূত  
করে। স্বপ্নের কেস, অটে প্রেসেট  
আমি আসোসিয়েটে প্রকটের অব  
গ্রাফিক আর্টস জাউ...সিটি ইউনভার-  
সিটি অব ন্যু ইয়র্ক। অরণ ইজ এ  
ফটো-ভার মেশুর অব সোসাইটি অব  
কন্ট্রোপোরারী আর্টিস্টস। হি ওয়াস  
ওরান অব দ্য আলিসের টি, বি টেন্ড  
জাউ হেটোরস আর্টিস্টসের। ইট ইজ  
ফ্রম অরণ দ্যট শ্যামল দত্ত রায়, সনক  
কর, টেলেন মফ...হ্যাড ফেরার ফল্ট  
লেনস ইন মালটি লেয়ার এটাং উইথ  
ডিকরেন্সিসমাল ডিসকো-সিটি মেথড অব  
কমর আপালিকেনস উইথ রে-লারস  
অব ডিকরেন্স সুরাল মেলে-বলিটি, দ্যট  
এক-একল ওরান টি, গোট মাল-ট  
কলার প্রিন্ট ফ্রম এ সিগেল মেট্রিকস।  
ইট ইজ ফ্রম হিম এগেন দট দে  
লারসেট দ্য টেকনিকস অব লিফট গ্রাউণ্ড  
অয়স্ট একোরাটি-ট-এফকটেড অন  
এটাং স্লেটস ফর টেকসচারাল  
এফকটস অ্যান্ড ফোনাল ডে-রয়েসস।  
অন. হজ জিওরন ফ্রম পারী অরণ টক  
আপ দ্য রেসপনসিবি লট অফ  
ম্যানেজিং দ্য গ্রাফিক অট ওয়াস শপ  
অফ দ্য সোসাইটি অব কন্ট্রোপোরারী  
আর্টিস্টস... দ্য সোসাইটিস ফান্ড  
এটিং প্রেস (গারজেনসড উইথ এ গ্রাউ  
ফ্রম লালিতকলা আকাদেমী ইন ১৯৬২)  
দ্যট দ্য মেমবরাল ফুড হেলড এ শো  
অব দেয়ার প্রিন্ট ইন ১৯৬৭। (লালিত  
কলা কন্ট্রোপোরারী-২১)।

সত্যায়, কলকাতার ই-টা-পলওর  
ভগ্নাঙ্ক অরণ কল, সেমরথ হোড়  
নন। হেটোরের ধরনা বলল এটা চট  
কেন? পরবর্তী অমিত্যভ বন্দ্যোপাধ্যায়  
প্রশ্নে বন্ধ সোসাইটির সদস্য হয়ে  
ইন্টা-পলও করলেন, পরোকে তখন  
জানত কি আর্ট-পারের অকরহন  
করেননি?

সেমনথ হোড়ী বানান করে তৈরি  
হল শাস্ত্রনিকরহন। তিন দিগ্গজ অট  
কলেজ হোড় কেন ১৯৬৭। কলাভবনে  
আসেন ১৯৬৮। তাঁর ধার অ-হেটোরী।  
কিন্তু চৌধুরী সত্যায় সেমনথ  
হোড়ের এটিং নকশে প্রভা মত অমার

জ হাড়, সোজাধ মারুল এবং  
ভাস্কর্যে সুন্দর কাজ করেছেন। এদলি  
পারেন বলে এবং অন্ধ জোরাল বলেই  
তাঁর হাঙ্গাই হাঁহ তল।

সদাপ সরকার

শিশিরকুমার ও  
বাংকমের নাটক

১৬ জানুয়ারী '৮০ তারিখে ফেল  
পাটকা: প্রীজ-এস-মেন ভট্টাচার লেখত  
করণপল মন্তে বাংকম নামক নিবন্ধে  
বে তথ্যাবি তিনি বিবৃত করেছিলেন  
তাতে কিছু প্রশ্ন থাকার ২২ মার্চ  
'৮০ বেশ পাটকার চিঠিপত্র বিজ্ঞপ  
সেইসব প্রশ্নের সম্বোধনকরে প্রীজ  
হাজরা বা জানিয়েছেন, তাও যে প্রশ্ন-  
বাহুত নয়, এই আপত্তি জানিয়ে যে  
আসের ১০ তারিখের সংখ্যাত প্রীজপেশ  
নাম। পরোকে করছেন।

কিন্তু দুইবার বিবর, অপরের ভুল  
ভাঙতে গেলবাবু, নিজেই ভুলের  
কাটা লাড়িয়ে গিয়েছেন।

শিশিরকুমার ভাড়া চন্দ্রশেখর  
অভিনয়ের পাঁচ বছর আগে বাঁকম-  
চন্দ্র কলকাতার উইল-এর নটোপ  
প্রমর নামে মন্তব্য করেন এবং মন্তব্য  
নয়কর চারটে অভিনয় করেন  
২৫-১-১৯২৭ ও ১-১-১৯২৮ তারিখে  
নটোপদের বড়দিন উপলক্ষে। আরো-  
কিত নাট্যপটের দ্বিতীয় প্রশ্ন-নটে  
মার্চ সাড়ে চারটে। হর জে এ তথ্য  
নীরবকর জানা ছিল না। কুল-  
সংলোচক গেলবাবুও জা অজানা  
ছিল।

গণেশব-উল্লিখিত চন্দ্রশেখর  
অভিনয়ের ২০ বছর আগে ১৯০২ সালে  
প্রীজপেশ-এর পূর্বতন নাট্যমঞ্চ নাট্য  
নিকতনে তৎকালীন নিবন্ধিত  
শালারকুমার সার্মারকরবে, সেখানে  
হোড়শী, চন্দ্রশেখর, প্রফর প্রভৃতি  
নাটক অভিনয় করেন, তাঁর  
মন্তব্যিত বংশোদ্ভূত 'ভাড়াটে কেন্ট'  
হিসেবে। এবং একবারের এক বিশেষ  
নাট্য-নটানে চন্দ্রশেখরের ভূমিকার  
মণ্ড বস্তর করেন এক সঙ্গে নাট্য  
নিকতনের স্মেটীফুল মনোবাস  
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতাপ চন্দ্র অভিনয়  
করেন। প্রমাণ প্রয়োজনে গেলবাবু  
নাট্যশালার নাট সম্পর্কিত নথিপত্র দেখে  
নিতে পারেন।

প্রীজপেশ নাম জানিয়েছেন-নাট্যা-  
চ' শিশিরকুমার সহিত অভিনয়।  
হিসেবে একাধিকবার কুড়ি বছর বয়স  
হিলাম। তাঁর অভিনয়ের শেষ অভিনয়ের  
সিনটিতে পরন্ত তাঁর পাল হিলাম।  
—কিন্তু গেলবাবুর এই উক্তিও মন্তব্য  
নাম। তিনি প্রীজপেশে নিয়োজিত হয়ে-  
ছিলেন 'মাল' নাটক মন্তব্য হওয়ার  
সময় ১৯৪২ সালের শেষার্ধ্বে।

সত্যায় হিসাব মত কুড়ি বছর নয়,  
১০ বছর করেও থাকে-১৯৬৬ সালের  
২মার্চ জানুয়ারী পর্যন্ত। প্রাচ ৭  
কালের তফাত। দীর্ঘ সময় বাবৎ সঙ্গে  
না পাশে থাকলেই কি সব কিছ জানা  
হয়?

সুললিতমোহন গোস্বামী  
কলকাতা-৩০  
এ-বিভাগের জাতি প্রমাণ পর প্রমাণ সম্ভব

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

## পরবর্তী আকর্ষণ ১০:০০

সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

দাগী ১:০০ গুরু ৮:০০

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

## শংকর নর্মদা ১৬:০০

## হেলেন ট্রয়ের হেলেন ১০:০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বনফুল

ঝংকার ১০:০০ নবীন দত্ত ৮:০০

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

## বেঞ্চ অ্যাণ্ড বার ১২:০০

## পূর্বাভাস ১২:০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

## সুর নৃত্যের উর্বশী ১০:০০

বাসুদেব বসু

## নদীর নাম মহানদী ১০:০০

শক্তিপদ রাজগুরু জরাসন্ধ

## নিঃসঙ্গ যৌবন ৭:০০ ভুল ৬:০০

রজন সেন

## একদিন অনেকরাত ৫:০০

## অমিয়সাগর ৬:০০

নারায়ণ চক্রবর্তীর রহস্য উপন্যাস

## সোনার হরিণ ১০:০০

রবার্ট লুই স্টিভেনসন

## সুইসাইড ক্লাব ৮:০০

নিশাচর প্রীপারাবত

## প্রেমপ্রতিহিংসা সেফ ল্যাণ্ডিং ৬:০০ ১০:০০

তারানাথর বন্দ্যোপাধ্যায়

## শতাব্দীর মৃত্যু (তিন খণ্ড)

প্রথম ২০:০০ দ্বিতীয় ২৫:০০ তৃতীয় ২০:০০

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

## ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাস ১০:০০

## ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাস ১০:০০

## রিংয়ের রাজা আলী ১০:০০

মণ্ডল বৃক হাউস

৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। ফোন: ৩৪-৮৭৪৭

০০.৮  
ইন্ডিয়ান ক্যাণ্ডিডেট  
২০:০০  
১২:০০  
১০:০০  
৮:০০  
৬:০০  
৫:০০  
৪:০০  
৩:০০  
২:০০  
১:০০  
০:০০

প্রকাশিত হল

## সুনির্মল বসুর

গল্পের মতো জীবনীগ্রন্থ

## বঙ্কিমচন্দ্র নাম ৪.০০

সব জীবনই ঘটনাবহুল, কিন্তু সব ঘটনা গল্পের মতো স্বাভাবিক হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনই যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনই কৌতূহলকর। তাঁর শৈশবজীবন থেকে শুরু করে কর্মজীবন, সাহিত্য রচনার আরম্ভ থেকে পরিণতিপর্যন্ত—নামান রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্তে ঠাসা। এমন-কি তাঁর বাবার জীবনেও অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল একবার। আরো বহু বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের বাবা বাগচীপুরে মৃত্যু হয়, কিন্তু চিত্র থেকে পুনর্জীবন লাভ করে তিনি ব্যাঙ ফিরে আসেন এক সম্যাসীর আশীর্বাদে। পরে সেই সম্যাসীর কাছ থেকেই মল্ল গ্রহণ করেন বাগচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের বালাজীবন, ছাত্রজীবন, কর্মজীবন এবং সাহিত্যজীবনেও বহু ঘটনার সমষ্টি। বহু, সরস গল্প, বহু কিংবদন্তী তাঁকে ঘিরে। সুনির্মল বসু, তেমনই



কিছু গল্প তুলে নিয়েছেন এবং বর্ণনার সত্যের গেঁথে তাঁর করেছেন একটি আশ্চর্য মাল্য। সেই মাল্যই এই জীবনীগ্রন্থ। এক পূর্ণাঙ্গ মানবের জীবন-কাহিনী কত কৌতূহলকর করে যে বলা যায় তারই এক অবনবা দৃষ্টান্ত যেন এই বই। মৃত্যু ছোটরা তাঁর লক্ষ্য, কিন্তু বড়োরাও এক নিঃশ্বাস শেষ করবেন এই জীবনটার—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

লেখকের আরেকটি গ্রন্থ

ছন্দের টুটো ৮.০০

পুরস্কৃত গ্রন্থ

## রেবন্ত গোস্বামীর

জীবনধর্মী কিশোর-উপন্যাস

## অরুণমিত্রদের কথা

নাম ৪.০০

অরুণ আর মিত্র, ছোট দুটো জাইবোন, এবং তাদের বন্ধনা মা—এই তিনজনের জীবন-সংগ্রামের এক কল্পন জীবন্ত আলোখ। 'অরুণ মিত্রদের কথা'।

শিশুসাহিত্য-পরিষদ-এর পক্ষ থেকে ১৩৮৬-৮৭ সালের জন্য এই বইটির লেখক রেবন্ত গোস্বামীকে দেওয়া হয়েছে স্মৃতি পদক।



প্রতি বছর প্রেস কিশোরগ্রন্থের লেখককে দেওয়া হয় এই পুরস্কার। বইটির প্রকাশক-রূপে লেখকের এই সম্মানে আনন্দাণ্ড গৌরবান্বিত।

০৭টি মূলত দুঃপ্রাপ্য ছবি এবং ঠাকুরবাড়ির অমূল্য একটি বংশলতিকা যে-বইকে করে তুলেছে অপরিহার্য এবং অমূল্য।

## চিত্রা দেব-এর

উপন্যাসপ্রতিম রচনা

## ঠাকুরবাড়ির

## অন্দরমহল নাম ১০.০০

গল্প অনানন্দী ও অনামধন্যাকে নিয়ে লেখা অন্তরঙ্গ এই আলোচনাগ্রন্থটি উপন্যাসের মতোই স্বাভাবিক। সেই সঙ্গে ০৭টি মূলত দুঃপ্রাপ্য ছবি, পূর্ণাঙ্গ প্রচ্ছদ এবং পৃষ্ঠাশিলা। সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ঠাকুরবাড়ির মাত্র তিনটি আখ্যায়িকার পরিকল্পনা পরিকল্পনা সংলাপ



একটি বংশলতিকা আনন্দাণ্ডে দেওয়া হচ্ছে

\*\*\*\*\*

## আমাদের অভিনন্দন

\*\*\*\*\*



কলো-কালিকায়-এর যুগে আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম পুরোছাপের মার আবির্ভাব, পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল যাবৎ মার স্বাধীনতা লেখনী বাংলা সাহিত্যকে নানাভাবে পুষ্ট করে এসেছে, সেই প্রবোধকুমার সান্যাল এ-লঙ্কার পেনে প্রফুল্লকুমার স্মৃতি পুরস্কার।

তার এই সম্মানে আমাদের সন্ত্রস্ত অভিনন্দন।

আনন্দ পাথরগার্স থেকে প্রকাশিত প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাস।

পিরামিডনাম ৮.০০ জনম জনম তম (নিঃশেষিত)

\*\*\*\*\*



কবিগুরু সর্বদা দিয়ে রচিত গুরুগুরের যিনি প্রধানতম, প্রধানতম শিষ্যদের যিনি অন্যতম, লোক সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ে গুরুগুর করে যিনি সঙ্গীতকে উত্তীর্ণ করেছেন সাহিত্যের আনন্দ-লোকে, যার কণ্ঠ-শরীর-বোলে-মাননে রবীন্দ্র প্রাতিহেয় ও রবীন্দ্রচর্চার অনন্য পরিচয়, সেই শান্তিদেব ঘোষ এ-বছর পেনে সুরেশচন্দ্র মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার।

তার এই সম্মানে আমাদের সন্ত্রস্ত অভিনন্দন।

আনন্দ পাথরগার্স থেকে প্রকাশিত শান্তিদেব ঘোষের গ্রন্থ।

রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা ১৬.০০ রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদর্শে সংগীত ও নৃত্য ৫.০০



নীরেন্দ্রনাথ

## চক্রবর্তীর

আকাশমি-পদ্যসংগ্রহ

কবিতা-গ্রন্থ

## উল্লস রাজা নাম ৬.০০

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা পড়লেই বোঝা যায়, তিনি এই রূপে সমাজের ব্যাখ্যা এই রূপে দিবসের ভাষাকার। তাঁর কবিতা যেন সন্ধানী আলোর মতো, দেশ ও কালের মানা গোপন বস্তুগকে বা নিমেঘে উদ্ঘাটিত করে। সর্বকালের যোগ-সম্পর্কে আত্মশাশল হয়েও তিনি সমকালের সঙ্গী, ঐতিহ্যের সঙ্গে বৃত্ত থেকেও তিনি প্রতি



মুহুর্তেই 'আবার নতুন কলমে'র দীপ্তিমান। তাঁর বেশব বিখ্যাত কবিতার পংক্তি—'কলমে'র চিলের কামা', 'অকাল-সন্ধ্যা', 'জোড়া খন', 'কবিতা-৭০', 'হ্যালো লম্বা', 'গোলাপ-বাটা' ইত্যাদি—আজ পাঠকের মধ্যে-মুখে ফেরে তারই সংকলন এই গ্রন্থ—'উল্লস রাজা'।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ : আজ সকলে (কাব্য গ্রন্থ) ৬.০০ পিতৃপুত্র (উপন্যাস) ৭.০০ সাদা বাঘ (ছোটদের ছড়া) ১০.০০

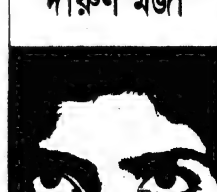
শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

## পার্থসারথি

## চক্রবর্তীর

## বুদ্ধি নিয়ে

## দারুণ মজা



প্রকাশিত হল

## জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

জাদুকরী গল্পগুচ্ছ

## আজ কোথায়

যাবেন নাম ১২.০০

কেউ তাকে বলেন সুন্দরের কারিগর, কেউ তাকে জীবন শিল্পের জাদুকর, কেউ জানেন তাকে গল্পের কারিগরী রূপে, কেউ তাঁর রচনার খুঁজে পান প্রগতিশীলতা, কেউ পান মারিডিটি, কেউ তাকে মনে করেন আশ্চর্য, কেউ তাঁর লেখার দেখেন উত্তরণের ইঙ্গিত—বাংলা সাহিত্যে বহু বিতর্কিত তব, বহুবাণীত লেখক তিনি, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। কিন্তু সবাই তাঁকে একটি ক্ষেত্রে স্বমিহ্ম সাক্ষ্যকার অবশ্যই হিসেবে মেনে নিয়েছেন, সেই সাক্ষ্যটি হল ছোট গল্পের। লেখানে তিনি অবধারিত, অপরিহার্য, অনন্য। তিনি নিজেও একলা জানতেন, গল্প হল এক-এক খণ্ড ইট যে-ইটের সমাহারে গড়ে ওঠে উপন্যাসের ইমারত। সেই ইমারতে থাকে সিরুগেশনের দোজা-জানাল, ঘটনার সিঁড়ি ও বায়লা, পটাইলের পলেন্ডার, ভাষার রঙ।



সেই ই-টগুলি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নির্মাণ করেন এক নির্মিত নিজস্বতায়। প্রকৃতি এবং নারী, শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ, কিছু ভালো লোক আর মল্ল লোক, নির্মিত-নির্ধারিত নিরুদ্দেশ্য দিন যাপন, প্রবর্তি এবং আবেগ, কিছু আলো এবং অন্ধকার তাঁর গল্পের উপজীব্য। তবু লেখার গণে তাঁর রচিত জগতের এবং আমাদের পরিচিত জগতের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তৃতীয় একটি আয়তন। সেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সাম্প্রতিক কালে রচিত এক গল্প গল্পের সংকলন

## সূচীপত্র

চিঠিপত্র । ৩	চিপ্পুরায় গণহত্যা । সম্পাদকীয় । ৯
পরমা পাপ । সুধাংশু ঘোষ । ১১	মানবজীবন । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় । ১৭
বিজ্ঞান । নবরত্ন কল । ২১	১৮০ ওলিম্পিকের আগে হুশ
দেশ । জিজীব । ২৩	কার্যক্রমে সমগ্র-পক্ষ । রাসা দাস । ২৯
অস্বাভাবিক । ৩২	স্বাভাবিক সত্যই সত্যের । প্রতিভা বন্দ্যোপাধ্যায় । ৩৩
কর্তৃকল্পিত । অজুলা ঘোষ । ৩৭	কেন? আস। কেন? বাও । দাসেন্দু দাস । ৩৯
টেনিসের ব্যক্তিগত । রবীন্দ্র আদ্যক । ৩৯	পাখি চাই । রূপা বসু, বন্দ্যোপাধ্যায় । ৩৯
পাতা । শোভন মহাপাত্র । ৩৯	সেই সময় । সুন্দরী গঙ্গোপাধ্যায় । ৩৯
কটকটের গোলমালে জড়িত কী	বলবে । মৃদুলা । ৪৫
আলোচনা । শিল্পসংস্কৃতি । ৪৭	প্রবন্ধ : যতীম দাস
প্রবন্ধ : যতীম দাস	প্রবন্ধ : যতীম দাস

## পরবর্তী আকর্ষণ

অমিতসেন ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ  
রোডোপলিটো টাকুওয়াড় ও বস্তুকর্ম  
তরুণ দত্তের প্রবন্ধ  
স্বাধীনতা স্বাধীনতার  
রতন ভট্টাচার্যের গল্প  
বড়ির জন্ম

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ  
খাম্বাংগার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে  
পালালিতা দাস কর্তৃক ৬ এপ্রিল সরকারী স্ট্রীট  
কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং  
আদ্যক অফসেট প্রাইন্টিং লিমিটেড লি ২৪৮  
লি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০০৮ থেকে  
মুদ্রিত।

দাম এক টাকা  
নিম্নলিখিত : ত্রিপুরা ১০ পরমা

## ত্রিপুরায় গণহত্যা

ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল এখন আর শৃঙ্খলিত, অগ্নিগর্ভ নয়, অগ্নিময়। এই আগুন প্রথম জ্বলানো হয়েছে আসামে। বিদেশী বিতাড়নের ধুরো তুলে যে অরাজকতা ও নরহত্যার আবহাওয়া গড়ে তোলা হয়েছিল তারই চরম পরিণতি দেখা গেল ত্রিপুরায়। ত্রিপুরায় যা ঘটতে তাকে গণহত্যা বলা কোনো ক্রমই অস্বাভাবিক বা আতশয়াস্পন্ন নয়। সাড়ে তিনশোর মতন মানুষ—যার মধ্যে নারী ও শিশুরও অভাব নেই, আজ মৃত। দেড় লক্ষ অসহায় নরনারী গৃহহীন, আশ্রয়প্রার্থী। হাজার হাজার ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। মৃত, আহত, গৃহহীনের এই সংখ্যাই যে স্বার্থ? তাও নয়, ত্রিপুরার দুই দশকের খবর এখনও অজানা; কেউ বলতে পারে না—সব খবর জানার পর মৃত ও আহতের সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।

ত্রিপুরায় এই গণহত্যা কেন? এক কথায় 'বিদেশী বিতাড়ন' আন্দোলন। কিন্তু তাই কি! নানা তরফের নানান ব্যান আছে, রাজ্য সরকার যেভাবে নিজের মন্থরকার চেষ্টা করবেন, কেন্দ্র সরকার নিশ্চয় তা করবেন না। সি পি এম এই নারকীয় ঘটনা ঘটায় যে হুঁজি ও ব্যাখ্যা দেখাবেন, ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতারা নিশ্চয় তা দেখাবেন না। কিংবা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মন্থরপাত্ররাও নিজাদের মনোমত ব্যাখ্যাকেই একমাত্র সত্য বলে প্রচার করবেন। এতে বাস্তবিক কি আসে যায়? যারা মৃত, আহত, নিহাতিত, গৃহহীন তাদের পক্ষে সমস্ত ব্যাখ্যাই মূল্যহীন। সত্য এই যে, এদের জীবন ও ধনমান রক্ষা করার জন্যে কেউ ছিল না।

ত্রিপুরায় সি পি এম সরকার যে খুবই কর্মক্ষম এ-কথা তাদের দলীয় লোকেরাই বলেছেন, গণহত্যার পরও। এমন কি এ কথাও বলা হয়েছে, ত্রিপুরার বর্তমান সরকার উপজাতিদের স্বার্থ ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্যে অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন, উপজাতি সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যেও তারা সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই সব কারণেই না 'টাইবাংলা এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল'-এর নিবর্তনের আয়োজন। এ-ছাড়াও অনেক কিছুই তারা উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্যে করেছেন বলে দাবী করতে পারেন। এত কিছু করার পরও কেন যে এই গণহত্যা কে বলবে? কেন তবে ত্রিপুরা উপজাতি বৃহৎসমিতির বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলন?

এ-কথা বোধ হয় অস্বীকার করা যাবে না, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনিপেন চক্রবর্তী এবং তাঁর সরকার গোড়ায় কিছু গলদ করে ফেলেছেন। গলদ ছোটখাট নয়, বড় রকমের। উপজাতি সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্যে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি শৃঙ্খলিত উপজাতিদের জন্যে? নাকি সেই সঙ্গে নিজাদের গোষ্ঠী স্বার্থরক্ষারও প্রস্ন ছিল? যদি তা না থাকত তবে শ্রীচক্রবর্তীর সরকার এবং তাঁর দলকে এমনভাবে বিস্তৃত ও বিপন্ন করা কেন? অন্য কী হুঁজি থাকতে পারে উপজাতি বৃহৎসমিতির তাও আমাদের কাছে রহস্য। এ-রকম শোনা যায়, অবশ্যই বিরোধীদের মধ্যে যে, উপজাতিদের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কিছু বড় রকমের ভুলচুক করে ফেলেছিলেন। আজ সেই ভুলের মাশুল বড় বেশী ক্রেই গুনতে হচ্ছে।

ত্রিপুরায় সাম্প্রতিক অরাজক অবস্থার জন্যে অনেক কিছুকেই কম বেশী দায়ী করা হচ্ছে, যার মধ্যে বিদেশী হস্তক্ষেপের কথাও শোনা যায়। কী ধরনের বিদেশী হস্তক্ষেপ তা অবশ্য জানা যায় না, তবে ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থান এমনই যে বিদেশী রাষ্ট্র থেকে বিরোধীদের অনুপ্রবেশ একেবারে অসম্ভব নয়। তবে বাইরের হস্তক্ষেপে এত বড় ঘটনা সাতারানি ঘটায় সম্ভাবনা কম। ত্রিপুরা সরকার যদি সময়ে সজাগ থাকতেন তা হলে এই অনুপ্রবেশই বা কেমন করে ঘটে? তারা কোনো সময়েই যে সজাগ ছিলেন তাও মনে হয় না, কেননা গণহত্যা শুরুর হবার পরও সরকার দ্রুত কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেননি। সরকারের অসিত্ত্ব যে আছে তাও প্রথম চার পাঁচ দিন বোঝা যায়নি।

ত্রিপুরায় আজ যে-ঘটনা ঘটেছে তাকে সাময়িক বললে ভুল হবে। ভুল করা হবে—যদি মনে করা হয়, এটা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ! ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল জুড়ে যে বিচ্ছিন্নতাবাদের বিষ কাজ করে যাচ্ছে তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা, মেঘালয়—সবটাই এই মানসিকতা কাজ করে যাচ্ছে। কেন? বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপের চেয়েও বড় কথা অস্ত্রশক্তির সঞ্চার, অজ্ঞান দৃষ্টি। রাজনৈতিক মুনাকা লোটার জন্যে নেতা এবং দলীয় শক্তিগুণ নির্বোধের মতন এমন কাজ করছেন যাতে দেশের সংহতি নিতাই বিপন্ন হচ্ছে। সবচেয়ে দুঃখের কথা, 'বিদেশী বিতাড়ন'—এই ধুরা তোলার পিছনে যে সর্বনাশ ওত পেতে আছে তা কি এদের অজানা? গোটা দেশ জুড়ে যদি 'বিদেশী বিতাড়ন' যজ্ঞ চলে তবে উত্তর-পূর্ব ভারত যে নিরাপদে থাকবেন তাও তো নয়। আগুন হাত দিলে হাত পোড়ে না এমন মানুষ নেই। কাজেই আন্দোলনকারীরা নিশ্চয় জানবেন, যে আগুন নিয়ে আজ তারা খেলা শুরুর করেছে

# “হারকিউলিস অ্যাসেমব্লিং এত সহজ বলেই তো খদ্দেরদের খুশি রাখতে পারি।”



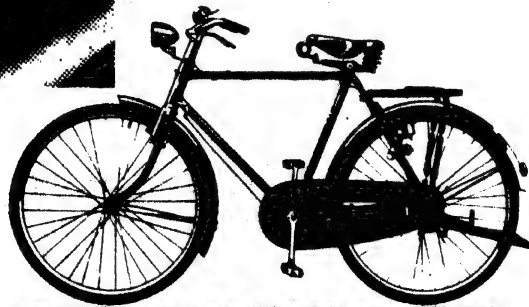
শ্রী এন আর মুথুস্বামী  
সাইকেল মেকানিক, সালেম, তামিলনাড়ু

“একটি সাইকেল অ্যাসেমব্লিং করা সহজ কাজ নয়। তাই আমি হারকিউলিস-নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করি। এর প্রতিটি পার্ট সহজে লাগানো যায় বলে এই সাইকেল অ্যাসেমব্লিং করা মোটেই ব্যামেলার কাজ নয়। সত্যি কথা বলতে কি এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে আমি এটির অ্যাসেমব্লিং করতে পারি (অনেক সাইকেলই আছে প্রায় দু’ ঘণ্টা সময় লেগে যায়)। এতে শুধু সময়ই বাঁচে না, ক্রেতাদের অভিযোগ থেকেও এটি আমায় বাঁচায়।”

অধিকাংশ সাইকেল মেকানিকদের হারকিউলিস সম্পর্কে প্রশংসার পিছনে সত্যিই যথেষ্ট যুক্তি আছে। হারকিউলিস: বহন ক্ষমতা ও গুণমানের কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা কাঁচামাল থেকে শুরু করে

প্রতিটি হারকিউলিসের উপরই ৬৭টি ডিম ডিম রকমের পরীক্ষা করা হয়। প্রতিটি ব্যাচের একটি করে হারকিউলিস নিয়ে এক সপ্তাহ ধরে অবিরাম চালিয়ে পরীক্ষা করা হয় যাকে বলে ‘টরচার’ টেস্ট। রিম, টায়ার, টিউব শুধু ডানলপ থেকেই নেওয়া হয় (T) সাইকেল কেবলমাত্র সেরা জিনিসই কেনে)।

আপনার হারকিউলিস: সহজে চলার জন্য এতে আছে বিশেষ ধরনের বল বেয়ারিং পুরো দুইসারি হাই-ক্রোম স্টীল-বল থাকায় চাকা সহজে ঘোরে ও আরামে চলে — এমনকি ভারী বোঝা থাকলেও। হারকিউলিসের বডি হাই-বেকড এনামেল আর পুরু ক্রোমিয়াম প্লেটিং-এর তৈরি, ফলে বছরের পর বছর হারকিউলিস থাকে সুন্দর ও ঝকঝকে।



**হারকিউলিস**



আমি কলকাতার ব্যাপার পূর্বম জ্ঞানেই, চন্দ্রনাথ ঠাকুর জমাজে একটা বিশেষ  
কারণে। চন্দ্রনাথ কোথেকে, পাতার পর পাতা লেখে। আগে ব্যাপার জেনে পাতার  
কোডে হাশি মি। এখন নিকট করেই, নিজের ঠাকুর একখানা মোটা বই হাশিও,  
সেই বই হাশি হলে নিকট সবাই হতে আসবে চন্দ্রনাথের গলায় হাশি পড়বে নিজে।  
চন্দ্রনাথ লেখে আর প্রায়ের মধ্যে করে করে লোকজনদের মধ্যে গল্প করবে। হাশি,  
ক'লকাতা



# উত্তরে মেরু দক্ষিণে বন

কমল দাশ

তেলে জলে রোদে মানুষ যে দেশের লোক সেই দেশের বাঙালী লেখিকা চলেছেন “পৃথিবীর বরফের মুকুটের দেশে। ভাবতেই গাটা শিরশির করে ওঠে।” মিডনাইট গানের আলোয় ল্যাপল্যাণ্ডে বঙ্গা হরিণে টানা স্নেজের পথে বঙ্গ-নারীর এই প্রথম পদক্ষেপ। হানস অ্যান্ডারসনের শিশু স্বপ্নে বিড়োর ছোট্ট কমলি কমলে পরিণত হয়ে চরণ ফেলছেন ফিনল্যান্ডের তুষার পথে, জার্মানীর অতুলন শিল্পজগতে, বনভূমিতে। এবং মনোভূমিতেও। দুজোড়া বিস্ময় মাথানো চোখ দিয়ে তিনি দেখেছেন এক অতেনা জগৎকে। তাঁর সেই তিল তিল সঞ্চিত বিস্ময় আর অজানা মানুষের মন নেনে ধরেছেন অপূর্ব লেখনীতে। সেইসঙ্গে নিজের দেশ ও মানুষকেও যাচাই করছেন। হ্যামলেটের মধ্যে আবিষ্কার করে নিতে চাইছেন চিরন্তন বাঙালীকে। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে বাংলা সাহিত্যের আবিষ্কার ইনি। “বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতেই বলছি বাংলা সাহিত্যে একটি দুর্লভ নাম কমল দাশ...”

—অন্নদাশংকর রায়

১২২

গণেশ লালওয়ানীর  
**বর্ধমান-মহাবীর**  
[ মহাবীরের জীবন চরিত ] ১২০০

জীবনীকার শঙ্করনাথ রায়ের  
**ভারতের সাধিকা**

২ খণ্ড প্রকাশিত। প্রতিখণ্ড ১৪০০



**করুণা প্রকাশনী**

১৮এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯, ফোন: ৩৪-৬২৬৮

সব সময় চন্দনবর কইস একটা ছোলা, একমুখ দাড়ি। একদিন পলক বলাহিল, আর্পিন দাড়ি রক্তের পলসা বচিতে।

চন্দনবা হেসে কাল, না রে, তা ঠিক নয়। আমি রোজ রোজ দাড়ি কামতে বসে কাজে সময় নষ্ট করছে চাই না।

চন্দনবা এখন এসেছে এই আড়াই বছর। এর মধ্যে একবারই পলকের হাতে একটা পাতলা পটকা দিয়ে বলাহিল, আলার একটা লেখা আছে, পড়।

পলন খুঁজে বের করে কাল, এটা তো পদ্য। পদ্যের আমি কী বকি? গল্প হলে পড়তাম।

চন্দনবা ঠোট দিয়ে হাসি চেপে কাল, পদ্য নাকি রে, কবিতা।

—ও বুটো তো একই জিনিস।

—এক জিনিস নয় রে, আলাদা। তুই বকবি না। এই লম্বাটা লম্বা কবিতার লিটল মার্গাজিন।

—সেটা আবার কী?

—তুই বকবি না।

পলন সত্যি বোঝে নি। ওই কথাটা সেদিনই প্রথম শনেছিল।

আরো একদিন চন্দনবা ভূবু কুচকে বলাহিল, তোদের এই গ্রামটা পলন, একেকেরে খাচ্ছতাই। আমাদের পূর্ব বাঙালার গ্রাম মোটেই এরকম নয়। সেখানে লিটারারি মিক্স অ্যান্ড হার্নি করে বেত।

—লিটারারি মানে?

—ওসব ছাড়। তোদের এখনে বিকলবেলার গ্রামের মানব পুরুষপাঙ্কর যোকানে বশির মচার কল কড় আন্দোলন মতন কোর্নি চিবায়। ছোট ছোট নীলাচ গেলাসে চা খায়। চরে মড়াপাড়া গম্ব। শাওলার জন্য পাকুরের জল প্রায় দেখাই যায় না। কেউ হাত বাড়িয়ে এক গোছা শাওলা ভেলে না। পূর্ব বাঙালার বিকল কোলার গ্রামের মানব খস চিড়মড়ি, নারকেল কোরা, নাড়, সন্তোষা—

—আপনি তো জন্মেছেন কলকাতার। সেখান থেকে এই গ্রাম এসেছেন। আপনার জন্মের কত আগে দেশ ভাগ হয়েছে। পূর্ব বাঙালার গ্রাম আর্পিন দেখলেন কবে?

—নিজের দেখি নি, স্বাকাকার মধ্যে তো শনেছি।

মাস্টার তিনজনের কিপটোম ছাড়া আরো একটা জিনিস পলনের খরাপ লাগে। ওদের মধ্যে কোনো লামা নেই। গ্রামের অন্য পটটা লোকের মতোই মাঝে মাঝে তাই বলে, পলনের সামনেই বলে। পলন গত বছর ফেল করে ক্লাসে আসা কথ করার পর তাকে তো আর ছাড় ডাকে না। চন্দনবা বকি দক্ষিণ মতন নোয়া কথা না কলোও তার জিন্সের ডগার শালা কথাটা বলছে। যখন-তখন টপ করে খস পড়ে। সামান্য কামেলা হলেই কলব, এই শালার ইসকুলে মানব বা কল করে।

তবু সন্তোষ ইসকুলে মাঝে পলনের ইংরেজীর মাস্টার চন্দন ভট্টাচার্যকেই পছন্দ। তার সঙ্গেই গলাগলি, বন্ধর মতন। চন্দন ছাড়া ইসকুলের গাটের পাশের ইউকলিপটাস গাছটাকে পলনের ভালো লাগে। তার ছোটবেলার পশাপাশি দুটো গাছ ছিল। গাছ দুটোও তখন ছোট। একটা ভেঙে পড়েছিল ঝড়ে, বাকীটা একা বেড়ে উঠেছে। ইউক্যালিপটাসের পাতার গন্ধ কড় পছন্দ পলনের।

চন্দনবা চায়, পলন পড়াশুনোটা চালিয়ে বক। তার মারও তাই হচ্ছে। অথচ সে এখন বেশ বকতে পারছে, তার ওসব হবে না। পাস করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। বকস বেড়ে যাচ্ছে। ইসকুলে এখন তার কাসী হেল বোধ হয় একটাও নেই। লাইব্রেরি থেকে চন্দনবা তাকে একখানা কই পড়তে দিয়েছিল। নাম আম আর্টিন ভেপ। এই কইটাই পড়তে পড়তে একটা ছেলেকে চোখের জল মছতে দেখেছিল। বইটা পড়ে দর্গার জন পলনের কল হয়েছিল। তারও তো একটা দিদি আছে। নাম পার্বতী। পার্বতী মনেও তো দর্গা। অথচ শোয় করে কল মনে পড়ল, দিদি কতবার তাকে খিমাচ প্রায় রক্ত বের করে দিয়েছে। পর সাতক অগে সেই দিদিরও কিয়ে হয়ে গেছে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে পলনের খেরাল হল, গল দুটো ছাড়া এখন বাড়িতে কেউ নেই। গরুর কথা ভাবতেই সদামকে মনে পড়ল, দা উজন গরুর মালিক সদাম, মস্ত খাটল, কাঁড়কাঁড় ছানা পঠায় শব্দ। এই মাস সদামকে দেখে এল ইসকুলের গেটের সামনের চায়ের দোকানে, কল কল চামচ দিয়ে নোড় বোড় ডিম ভাজা খেছে। সকালেই দা এক গেলাস চোলাই পেট পড়ে ছ নোড়। আতা কড়া করে ভাজা, প্রায় পোড়ানো ডিম খাচ্ছে কেন? সদামের মাঝ দেখলে পলনের মন কিবয়ে যায়। তার বাপ সদামের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিল। কাগজে কিছ, লেখা নেই, তবে সাক্ষী আছে। সেই ধার শোধ হয় নি।

বই মোড় নিতেই সামনে পাড়ার মস্ত এজমালি ডোবটা। এতক্ষণ গাছ-গাছালির আড়ালে ছিল। ডোবার পাড়ার একটা বক্সা মেয়ের সঙ্গে জলের মধ্যে ঝুঁকে পড়ে বোধ হয় গগল খাচ্ছে খশী। পলন থামল। শাওলা-পানির চকা জলের ওপর ভাসছে, ঠোট ভোজছে একগুনা নানা রঙের হাঁস, তাদের এবং পাড়ার অন্যদের। ভালপাতা আর কলস বনেলতার ফাঁক দিয়ে কলি ফলার মতন যৌব এসে পড়ে ছ শাওলা-চাকা জলে। খশী এখনো তাকে দেখতে পায় নি, জলের ওপর ঝুঁকে আছে। খশীর গলা, বকর খানিক উদম, ময়লা জল ঢলকে উঠে দেখেনে কাপড় ভিজিয়ে দিয়েছে, কটাশ চুলের ভেঁজেও চিকচিক করছে ছোট-ওম: জলের কন্দু।

পলনের শিরকাড়া বেয়ে সরিসরেনি নামাছিল। রোঙ্গর তেমন কড়া হয় নি, তবু ঘাম ফুটছিল চর্নিচন করে। বরেন বাড়ছে, আজকাল স্পষ্ট বকতে পারে,

কেল হুইল দিকে তাকায়। হাত ছাড়িয়ে নিজে বলে, বাই, কাল-কাল পড়ে আছে।  
বুদীর গারে ইউক্যালিপটাসের শরতীর গন্ধ আছে কিনা জানবীর জল হর  
পবনকে। মনোবের গার কি এমন গন্ধ হয়?

ঠাটা নিম্ন দৃশ্যবলার হুইল টাটা ডাক নকল করে পবন ডাকল হুইল।  
বুদী সোজা হয়ে হুইল দাঁড়ালে পবন গলা চড়িয়ে বলল, তোরা গুণগল কল।  
ওগা, ওগা।

বুদী জলপ হাসল।—আমিও বাই না, আমার মাও খায় না। আমার টাটা  
জার বাবা খায়।

বুদী সোজা হয়ে দাঁড়ালে দেখা গেল, ভেজা শাড়ি সার জপে সেটে গেছে।  
ভোজার পাড়ে এমন খেম খেম গিরে এখন বুদীর দিকে চেয়ে থাকা কেমন পুষ-পাপ  
মনে হল পবনের। জেনে-দেনে আজও তো কোনো পাপ করে নি, বাইও ইলনীং  
এক-এক সময় পাপ তাকে আচমকা টান দেয়, হুইতে পারে।

পবন জানে, বুদী ঠাকুমা জুরে ভূঁইল। জর থেকে উঠে বুদী বোধ হয়  
দুর্গলির কোল মাওসার কারনা ধরেছে। ভোজার পাড়ে আর দাঁড়াল না পবন।

কড়ির উঠানে পা দিয়ে বুকতে পারল, মা ফেরে নি। এতো তড়াতাড়ি  
কিরকের কথাও নর। চার পিঠা বাঁড়তে দ্বাং বোয়ান দিতে মা হাঁসের ডির আর  
লাকপাতা নিয়ে বন্ধারে গেছে। মাকে তো দূর থেকে দেখে এসেছে কঁজারে বলে  
আছে, সামনে ডিম, কলমিলতা, হিঙেশাক, নিমপাতা। কতবার মাকে ফলছে  
গ্রামের মনদে লাকপাতা কিনে খাবে না। মা তার কথার কান দেয় না। জল ফেরে,  
কথান থেকে ওই সব বোলাড় করে আনে। হরতা কেনেও দুর্ভাজন, দুর্ভয়ের  
মতন হলের অগাধ পল্লা।

হালপলো জেবার, গরু দুটো জাককা চিহ্নিত কিমোছে। কিম ধরে আছে  
খালি আড়ো। কিসাছের মাথার জোপের কলকাছে। সবলতা গাড়ির কাছে  
দুশ্বরের দিকে। পবন পেটে খিদের মোচড় টের গেল। কঁবদাড় লুটেপুটে সব  
খেরেছে। খরই বা কী পারে? তখন নীলচে পাকী এমন টুস্টেলে পাকা আম  
কোথার পেরেছিল?

থেরে গিরে হাড়িভুড়ি হাতড়াল। কাইরে রেন্ড চড়ে গেলেও জেরে মধ্যে খালি  
হাড়ির ভিতরের অখকারটা ঠান্ডা ঠান্ডা। একটা হাড়িতে শকুনো কুল। মিন্টর  
থেকে টক কেশী। পোকাও খরছে। দুশ্বরের আগে টক ভালো লাগে না। তবে  
পবন এক মূঠো শকুনো কুল ভুলে নিল।

একদিন চন্দনবাকে বলাছিল, আপনি তো পলতার পর পাতা লেখেন, এই  
গ্রাম থেকে মালমশলা বোলাড় করেও লেখেন। আমাকে নিরু লেখেন একআধটু?

—তুই আঁছিস আমার লেখার।

—আমার বে খিদে পার, মাকে মাকে দারশ খিদে পার। খিদের দীতমবে চেপে  
ছুরিছুরি। এই নিয়ে লেখা যায়?

চন্দনমা একটু ক্ষেবে উত্তর দিয়েছিল, কেবল খিদের কথা লিখলে কেউ পড়  
না রে। হারা বেলী আর তাদের কিছ থেকে তাদের উলাত হাত নিয়ে লিখলে কেউ  
কেউ পড়ে। কিন্তু আমি তো শব্দে লড়াই নিয়ে লিখি না। আরো অনেক কিছ।  
যেমন ওই মেয়েটা, বুদী, হার সপেগে তার একটু ইয়ে আছে, ওই মেয়েটাও অসবে  
আমার লেখার। কী সব নিয়ে লিখিছ, তোকে বোঝাতে পারব না, তুই বুঝি না।  
বেলী বেলার ভাত খেয়ে পবন বইখাতা নিয়ে বসল। বরের মাটির মেঝের  
ওপরে অখর বাড়তি মাট লাগিয়ে যে জায়গা খানিক উঁচু করা তার ওপরে আম-  
কাঠের তক্তা সাজিয়ে আধমশলা কঁচনা পাতা। সেই বিধানের রাস্তায় পবন হুমোর।  
মা শোর কাছেই মাটির মেঝের। বেলার খেরে পবন অনেককণ খঁখাতা নাড়াচাড়া  
করল। মন বসাতে না পেয়ে বিছানার বালিশের পক্ষে খঁখাতা রেখে শব্দেও রইল  
খানিক। হত দিন যাচ্ছে পলট হুইতে পারছে, পাস কুইতে পারবে না, কী খেটে  
লাভ নেই।

বিকেলের দিকে রোদ নরম হলে ছাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। বাড়ি থেকে দাঁক-  
মখে দশ মিনিট হটলে নদী। নদীর পাড়ে পবনের অপের মাছ ধরার নৌকোখান  
টেনে ফুলে রাখা হয়েছে। দ হাত করে লম্বা বাঁশের খুঁটির প্যালা দির নৌকোটা  
কাত করে রাখা হয়েছে। নৌকার খেলের মধ্যে কাড়ি কাতাসে উড় এসে জমেতে  
শুকনো পাতাপুতি, সর ডাল, বাস, খড়; নদীর পড়ের এই জায়গাটা মনে হয়,  
পবনের একার ইজারা নেওয়া। বুদী ছাড়া আর কেউ তেমন আসে না এখানে।

কাত করা নৌকোর গারে টেনে থরে পবন বাড়িয়ে রইল নদীর দিকে তাকিয়ে।  
রোদ আরো নরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নদীর জলের স্তর বকলোছে। নৌকোর  
ওপরের গল ইয়ের ওপরে একটা কাঠেভালি। বেরিকে পুরেপরি মধ ফেরতে  
মাটিতে লাগিয়ে পড়ে কোথায় উঠাও হয়ে গেল। পবন দেখছিল, তার অপের  
মতুদ পর লম-এগারে মাসে রোদ-বড়লে নৌকোখান ফুটোফাটা হয়ে গেছে।  
জলার নদীতে ভাসতে হলে প্রচুর মেরামতি দরকার। তার জন্য কাঠ চাই, কাঁথার  
চাই। নদীর দূরের বিকির দিকে চোখ ফিরিয়ে পবন ভাবছিল, আমি জলের  
বাড়া। আমাকে জলে নামতে হবে। ডাকার আমি কিছ, করতে পারব না।

মর জোপের পাতলা ছায়া ছড়িয়েছে বাড়িছের সারি। রোদ বাড়ছে কতাসের।  
বাড়িরে চিন পাতার সনল জোরালো হচ্ছে। বুদী আজ আসবে না। এলে  
এর মধ্যে এসে কেত। পবন নৌকোর গারে দূর হাত কুলিয়ে নদীর পাড় বরাবর  
হাঁটতে শুরুর করল। চওড়া সড়কে এসে উঠল খানিক পরে। সড়কটা রেল সেতুর  
থেকে এদিকে এসে ঘুরে গেছে। সেতুর এখান থেকে খেঁদে মাইল। সড়কে চীঠে  
পবন দেখতে পেল, যেখান থেকে নলখাড়া আর হোপল্যান্ড শুর সেখানে সড়কের



নীহাররজন গুপ্তর  
গোয়েন্দা কাহিনীর সংকলন



# কিরীট অমনিবাস

কোন খণ্ডের সহিত অন্য খণ্ডের লিঙ্ক নেই।

প্রতি খণ্ডই স্বয়ং সম্পূর্ণ।

এ যাবৎ প্রকাশিত খণ্ডগুলি

১ম খণ্ড	কিরীটীর আবির্ভাব রহস্যভেদী চরী	২০.০০
	বৌরানীর বিল হাড়ের পাশ।	
২য় "	হলদ শরতান ডাইনীর বাঁশী ড্রাগন	২০.০০
	যোমের আলো বসন্ত রজনী কালোপাখি	
৩য় "	বিষকুট মৃত্যুবাণ রাত্রি যখন গভীর হয়	২০.০০
	আলোকলতা	
৪র্থ "	তাতল সৈকতে বনমরালী সূতভারহণ	২০.০০
	বিদ্যুৎবহি	২০.০০
৫ম "	মন পবন অদৃশ্য শব্দ প্রজাপতির রং	
৬ষ্ঠ "	মৃগতৃকা পুষ্পধনু মিথুন লগ্ন	১৫.০০
	চারের অন্ধ আদিমরিপু	১৫.০০
৭ম "	কৃষ্ণাকাবেরী রুতিবিলাপ মদনভঙ্গম	
৮ম "	রিপুসংহার নালপাল সেতারের সুর	১৫.০০
	ওরা তিনজন ছোরা	
৯ম "	কালোহাত ছায়াকুহেলী পদ্মিনী	১৫.০০
	মৃত্যুবিষ	১৫.০০
১০ম "	ঘুম নেই কলঙ্ককথা হীরচূনিপালা	
১১ম "	অহলায়াম হীরকানুরায় ঘুমভাঙ্গার রাত	১৫.০০
	নীলকুণ্ঠি	
১২শ "	সদিল রক্তলোভী নিশাচর নিরাল প্রহর	১৫.০০
	বল্লি সিংহাসন রক্ত মজিল	
১৩শ "	আলোকে আঁধারে নলরনটী উর্বশী সজ্জা	১৫.০০

লেখকের সর্বশেষ নতুন উপন্যাস

পদাবলী কীর্তন ১২

— শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ কাহিনী —

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

বৈষ্ণোদেবী ও অশ্বাশ্ব কাহিনী ১৪.০০

কুয়ারী গিরিপথে ১০.০০

ত্রিলোকনাথের পথে ৬.০০

শঙ্ক মহারাজের রূপতীর্থ খাজুরাহো ১২.০০



অমর সাহিত্য প্রকাশন

৭ টেমার লেন, কলিকাতা-৯ (কলেজ স্ট্রীট অংশন)

প্রকুর রায় চর্চিত্র আপোন নান ২৮'০০ ৯'০০	সত্যপ্রিয়ান সেমন্ত বুর্গার্ড জুজিনিও ২২'০০ গাঞ্চা বিবীদিভা ৬'০০
হেমন্ত বুধোপাধ্যায় আনন্দধারা ২০'০০	চিত্তরঞ্জন মাইতি মরুনা ২০'০০
ডাঃ অধিরূপার হাটি ব্যান্ডার ২৪'০০	দুর্ভিহীন নকুল রাজা ৭'০০ ইনি কে? ২২'০০
কবিতা সিংহ ব্রীদি ট্রিল শিশাচর ২'০০	অমিতাভ চৌধুরী প্রান্তর প্রবনা ২০'০০
জামল গলোপাধ্যায় মরুস্তি ২০'০০ অলীকবারু ৭'০০	শরদীন্দ্র চন্দ প্রাণবান্ডা ও দাম্পত্য- জীবন গ্রন্থ প্রভাব ২২'০০
সমরেন বসু জীবন যখন একটাই ২০'০০	সংকর্ষণ রায় বৃত্ত প্রবাল ২০'০০
তারানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাপ্রভা ২২'০০	আশুতোষ বুধোপাধ্যায় শিশাচর শ্রেষ্ঠা ২৫'০০
অবোধ চক্রবর্তী একটি ব্রীচিক নিয়ু ২'০০	মীহাররঞ্জন গুপ্ত নক্ষত্রের রাতি ২'০০
তবেশ দত্ত মরুস্তি ২০'০০ স্বামী নিগমানন্দ	সৈরল মুক্তকা সিরাজের অশ্রুচিহ্নের রূপ ২২'২২



৬৮, কালিঙ্গ স্ট্রীট  
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

একটি রাত জেগে আছে। কোন্‌ জেগে চকিতের দামেবকর।  
শিকারি করে। আলম হতভম্ব পাখি শিকার। মলমল জ্বালা হোলাস্রোতের  
জলের পানি আছে। তবে শিকারিদের মলমল জ্বালা হোলাস্রোতের কোন্‌ দূর  
জোরেতে পড়ে না। নারিকেল পোকাকারক। ভিতরে অনেকটা গেলি জল। সেখানে  
জল, জলকানার পর জল হতে।

করে গিরে পদম সেকল, গাড়ির মধ্যে কেউ নেই। সড়কের পাশে এঁকটার  
দু'কল লম্বা মাটি, বালির ঘন স্তূপ। এঁক-এঁক জাল পদ। গাড়ি থেকে  
পদে-হুঁড় হাত তুলতে যোগাড়ের জালদে কালচে লাল হস্তের অভাস।  
এ'গরে যোগের ফাঁক দিয়ে উণীক দিতে প্রথমেই চোখে পড়ল, একটি নরম নিচোল  
পা, হাট পশত অলবৃত্ত। চমকে উঠে দু'হুঁড়ের ভাবাবেগে জাল, খসে লগা হো?  
বলি জোরে ফাঁদে এসেছে, গাড়ি লম্বা বালির জমিতে পাড়া কালচে লাল মোটা  
জলের ওপর মাখন রঙের আঁড় পদ নরকে আসতে পদকের জন্য পদকে জল  
খাঁচা লাগল। তখনই অকস্মিত পা গাড়িরে গেল, হাড়েরে গেল আবার। পদম  
সেকল, একজন নর, দু'জন, চারজন ওপর পদাচ্ছে, হেঁচক খাচ্ছে লাল পদা-  
গজাবি আর লম্বা গাড়ি ওলট-পলট। চাপা অন্ধ লুপেরা হালির মতন হেঁচক-  
হেঁচক শব্দের গমক কানে এসে যা মিল। ডাঙাটে আর লুপ করল লুপে লুপের  
আঙুল দু'কল পিঠের মাংসে গেঁথে বাচ্ছে। চট করে দু'খিঁচিরে দিতে পাল  
না, বরং পদকের গাড়িলা জেগে উঠে হল। লিখিত লুপ থেকে কটা ফল ছিঁড়ে  
আলমার মতন চোখ ছিঁড়ে আলমার লম্বা দেখতে পেল, কালচে লাল চারের ওপর  
একটা কলক, খাবারের টাকার, জলের পর, উজ্জ্বল হুঁড়ানো পদে, কাত কামা  
একটা বোতল, কিলোর অথবা মদের। এঁকটার ফেল-বাওরা এরকম বোতল পদ  
আগেও দেখতে।

চলল একটা গল্প বলাইল একদিন, লিখিত ফল খাওয়ার গল্প। জোগের  
আঙুলের ওই লুপটা লুপের দেখে সেই ফল খাওয়ার পাপ করল না তো পদ?  
ই'হুঁ করে তো দেখতে যারি। বদল কোপের পদে এঁগিরে গিরে হল তখন কেউ  
নি কী আছে ওখানে। চোখের সামনে লুপালটা তুলে ধরলে বালি অন্ধ নর জাল  
কী কালচে পারে? পাপ হয় নি, কোনো পাপ করে নি পদল, অন্ধ হুঁতে  
পারিলা গল্প তাকে টানে, টানতে।

সরে এল। সড়ক ধরে কিছু, দু'হুঁটে বীর নেমে গেল বাড়ির দিকে। অন্ধ  
জর চলল ওখানে যা যা না। আসলে নরীর পাড়ে ফিরে বাবর লসনা হ'ল।  
খাক, আকা নরীর পাড়ে গিরে কাজ নেই।

মাস্তুর ঘরে শব্দে ঘুম নেই। মাঝ রাতের খবর পদ লুপারপত রাখে না,  
হুমোর। আজ ঘুম আসছে না। চোখে কেমন তাপ, কপল ঘাম ভেজা, হুঁও।  
পিঠের তলার তলগলে অসমান। তোলাকটা এতো পাতলা আগে কখনো টের  
পায় নি। হ' হাত দু'নে মেকো মা ঘুমিরে। ঘরে অন্ধকার গাঢ় নর। ফাঁকফোকর  
দিয়ে চুইক আসছে জোখন।

ঘেমন হর, মাঝ রাত ঘুম না হলে শেষ জাঁকিরে দিকে ঘুম আসে। শেষ  
রাত জানলা দিয়ে তাড়া কাডাস এলো পদম ঘুমিরে পড়ল। ঘুমিরেও অশ্রুতার  
ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন, খুঁচিক জাঁকিরে স্বপ্ন। এমন স্বপ্ন যা নিজেদের কাছেও লুপকেতে  
পারলে কাটা যায়। অন্য দিন ভোরে ঘুম ভাঙে না। মা ভোরের কাজগুলো সেরে  
এসে তাকে ডেকে দেয়। অন্ধ স্বপ্নের খাঁকি নতে ঘুম ভাঙল ভোরকোয়ার। তাকিয়ে  
দেখল, মার কিলানি গোটায়ে। নিজেই কিলানির উঠে বসে পা গাড়িরে হাটর ওপর  
খুঁচানি রাখল। মা দরজাটা ভেঁজয়ে রেখে গেছে। ঘরে ভোরকোয়ার পরে আলো  
আসে নি। কোলের দিকে রেজারের অন্ধকার। নিজেই মাঝর মধ্যে কিলিকির  
লোয়ার জাব।

সারা দিন ঘোরেই মধ্যে কাটল। সামান্য মা কাজ তা করে গেল নিরমদায়িক।  
গর, বুটোকে কাবনা মিল, কাজার করে দিরে এল মাস্টার ডিমস্রম। দু'সকে  
কোন্‌ বেলার ভাত খাওয়ার পর মা গলা না ঘরে একটা কথা কল। মার গলার  
কখনো তাঁর অভিব্যক্তি নেই। মা বলল, খাকার থেকে তোর। 'ব' দু'সামের লপে  
দেখা। দু'সাম টাকা শোধ করতে না পারলে একটা গরু দিরে দিতে কলছে। জামি  
বলছি—এবার একটা বকনা-খাকার হোক, তারপর মা হার একটা গরু দিরে দেয়।  
কলে জলে উঠেই তাড়া হয়ে গেল পদ। ঘোর কাটল না।

দিকল মেম আসতে বাড়ি থেকে কোঁরো জাঁকিরে। জাল বড় উলটো-  
পালটা হাওরা। কোন্‌ জাঁকিরে দি'ল। মাগল, কোপলল জাঁকিরে কাকার এসে  
দু'খ থেকে দেখতে পেল, নরীর পাড়ে কাত কল কেঁতোর গারে তেন দিরে খুঁচী  
কল জেগে পা হাড়িরে। মাথার ওপর দিরে এক কাক পাখি উড়ে গেল মলমলতা-  
হোলাস্রোতের দিকে। কী পাখি চিনতে চেষ্টা করল না।

করে গিরে লক করল, খুঁচিক দু'খ গাড়ির। তাকে আসতে দেখেই নিশ্চয়ই,  
তবু, এঁককে ডাকাছে না। পাশের বসে পড়ে পদম বলল, কিছ, ডাকাছিন? জামাকে  
কে দেখে দিল গাড়িরে ফেল?

খুঁচী চট করে কোঁরো উত্তর দিল না। খাঁকি হুপ থেকে কল, পদ-পাড়ার  
দু'সাম খসে জলতা। চোখ দু'খ, হুঁচক কেমন কলে থাকে। এখন এঁককে আলিহ,  
ওইভাবে ডাকাছিল। জামি চলে আলিহ, পেছন থেকে কালকবেল গলার জাল,  
দু'খ। দুই হেলের আপ, কলজাত, কোঁরো।

একদিনে দু'খর দু'সামের লমে অভিব্যক্তি। মার মতন পদা নর খুঁচির।  
খুঁচীর গলার চুইক কল। অন্য দিন হলে হাড়ী অলমকর হত। অন্ধ লুপের  
হুঁ কটাশে চোখ কলানো দু'খ মন থেকে খাঁকি করে দিতে চাইল, খাঁকির করে  
দিতে পাল্ল। কাল শেষ দিকল থেকে পদম কোঁরো হ'ল।

বুধ নিঃকর আরে, সরু একটা জাল ভাঙে হুটুট করে। কান্না কঁকর হুতব  
জলেরের নৌকো সড় দেখাচ্ছে। বেশ দূর, দেখতে পুতুলঘরের মতন। জলে  
আজ ঢেউ। হুড়ানো মেঘ আকাশে। মেঘের ঢাঙাগড়ো এক সপ্তাহ জ্বলি থাচ্ছে  
কড়বুড়ি আসবে না? চার পাঁচ দিন কড়বুড়ি হয় নি। বিকেল ছড়িয়ে না গেলেও  
হারা নাথাকে বন হয়ে। কড়ো স্বতসে থাপামি বাড়ছে বাড়িগড়ায়। বুধীর অঁচল  
উড়ে উড়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে পল্লবের গল-গলার। এতো কাছে কসলে বুধীর গর  
থেকে কে গম্বুী পায় তা কোনো পাতায় গন্ধ নর, জলের—গম্বুীর জলের গন্ধ।

পকন একটা হাত রাখল বুধীর কাঁধে। বায় পাবার আগেই আসে কাছে সরিয়ে  
এনে বুধের ওপর বুধ নারীরে কঁকর প্রথম জলগম্বুী আসলে আলতো করে  
হাত কসল। ছটকে দূ হাত তফাতে চলে গেল বুধী। পকন একপাশে একটু  
কাত হয়ে পড়ল। খট করে কনাইয়ের হাড় লাগল নৌকোর কানায়। তখন নৌকোর  
খোলার ভিতরের শুকনো পাতাপাতের মধ্যে কসখস। কিলকিল করে একটা মাটি  
রঙ সাপ নৌকোর কান থেকে মাটিতে নেমে একবেকে চলে বাচ্ছে, চলে বাচ্ছে—  
পকন চোখ ধারালো করে দেখল—না, ওই সাপের বিব নেই। দুকের মাটির জিহব  
আড়ালে চলে গেল সাপটা।

কনাইয়ের কাছে জালা করছিল। চোখ নামিয়ে দেখল, এক জারগর একটু  
রক্তের আভাস। সাপটা বায়র আর আলতো করে হাত হুইয়ে যার নি তো, নাকি  
নৌকোর ভাঙা কাঠের ঘন্টানি? সাপটা দাঁত হুইয়ে থাকলো বা হবে, সারতে  
চাইবে না তাড়াতাড়ি।

বুধী প্রার খাঁপরে পড়ে কনইয়ের কাছে আসলো চুবে চুবে রক্ত বেশ করে  
আলল। ভারী মজা লাগল পকনের। —তোর গারে যদি কি ঢেকে?

কটিলে কল কঁকর বুধী কনব দিল, দেখাছল না কতবার বুধু কোলাহ।  
বুধীর গলে চুলা এসে পড়ছে, যেখানে পকন দাঁত কসিয়েছিল। সেদিকে  
ডাকিয়ে ডাকল, আজ আমার পাপ হল না তো? চন্দনলার সেই গম্বুী মনে  
পড়ছিল আবার। সেই গম্বুীও একটা সাপ ছিল।

লম্ব লম্ব ডাল কুড়িয়ে এনে পকন কাত করা নৌকোর মধ্যে থেকে টেনেঠেলে  
শুকনের পাতা, সরু ডাল, বাস, খড় সরিয়ে দিল, জোর স্বতসে উড়িয়ে দিল।  
সাকসুধ হয়ে গেল খোলার ভিতরটা। না, আর সাপ নেই, সাপের ডিম নেই,  
খোল নেই।

কড়বুড়ি এল না। সাঁইসাঁই বাতাসে মেঘ উড়ে বাচ্ছে। বুধীর কাঁধ হাত  
রোখে পকন কল, তাকে একটা কথা বলি বুধী। রোজ রোজ চন্দনঘর কাছে  
গিয়ে লাভ নেই। আমি পাস করতে পারব না। বুধী, আমি জেলের বান্ধা। আমি  
মা ধরব, দনভর, স্নাতভর। নৌকোটা আবার ভাসতে হবে। কয়েকখান তলা  
চাই। কারিগর আমার চেনা। মা এখন অশ্ব কিছু মিলে নৌকো মেয়ামত করে  
দেবে। বাকীটা আমি পুর শোধ করব। আমার সপে আর বুধী।

—কে, থার?

—আর না একটু, আমার সপে।

কনীর পাড় থেকে সরে এসে যেখানে বাগান-ঝোপঝাড় শূন্য সেখানে একটা  
অশ্বুত আসগাছ। মাটির তিন হাত ওপরে উঠে গাছটা সমান দূ ভাগ হয়ে গেছে।  
ডালপল্লা বেশী নেই, আমও হয় না। খানিক দূর থেকে দেখলে পকনের মনে  
হয়, একটা কালি হাড়িকাঠি। সেই গাছের তলার এসে পকন কল, তুই একমুনে  
দাঁড়া বুধী। আমি একটু বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি।

মোড়ো বাড়ি এসে মাকে কোথাও দেখতে পেল না। মাকে বলবারই বা কী  
আছে? ওই গরু কোনো কাজে লাগে না। আগে দূ-বলটা ডাল টক পান-  
বালিশের মতন লম্বা লম্বা আম হত, তাই গাছটার নাম কলশে। অশ্বকাল একটাও  
আম ধরে না। মা অকপা কঠোরেরে কাছে গাছটা কেলে টাকা পেতে পারে।  
পকন কুড়লটা নিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে দেখল, তাদের হাঁসগুলো জোবা  
থেকে কসছে।

আবার মৌড়ে গরুতলায় এসে পকন হাঁসটিছিল। তবু মোটেই দেরি না করে  
গরুটার সমান দূ ভাগের একদিকে কুড়ল মাগল। চেরাই করল কয়েকখান তলা  
পাওয়া ধাবে।

বুধী কল, এই দেখকোয় গাছ কাটবি?

কুড়লের ঘরের দলে বুধীর কথা চাপা পড় গেল। পকন শুনলেও অশ্বক  
দিল না। এক-আধটু পাখির ডাক ছাড়া চারদিক চুপচাপ। কুড়লের ঘরের দল  
বাড়ি অর্ধ পৌছে যেতে পারে। মার কানে গেলে এদিকে চলে আসবে। তখন  
সব বোঝতে হবে মাকে। নৌকো মেয়ামতের মতলব মার ভালো লাগবে?

জল্ললের তল দির অশ্বকার গড়ি মেয়ে এঁগিয়ে আসছে। ভৌতিক হাল  
হুড়ছে আশপাশের গরুগাছালি। ফকির বরু ফাকাশে আলো। দিনের আলো  
তো কড়ু, চল উঠছে বোঝ হয়। পকনের হাত অকল হয়ে আসছিল। কতবার  
কুড়ল মেয়েছে হিসেব নেই। গাছটা সরু নর, কাটে সমর লাগবে। পকন কলল।  
থামতে স্পষ্ট বুকেতে পরল, সারা গারে বায়, স্নানিত।

বুধী কল, আজ আর না।

—কেন?

—সম্পো হল যে। রাত গাছ কাটে নেই। এখন বাড়ি য়।

বাড়ির কথার এতোকশে পকন টের গেল, পেটে খিদে মোড়। একটু বাড়ি  
গিরে কী পাবে? হাঁড়ের বোদলে হাত ডেরলে কেবল ঠান্ডা ঠান্ডা অশ্বকার  
মটোর বজা মার।

গাছটা আশাআশি কাটা হয়েছে। অশ্ব থাক। কাল সকালে দেখা ধাবে। পকন



## পুপ-জী® কিনুন

বাচ্চাকে তার একান্ত প্রয়োজনীয়  
সহজ স্বচ্ছন্দ আরাম এনে দেবে।

খাপনি হয়তো বাচ্চাকে বুকের দুধ  
খাওয়াতে চান কিন্তু শারীরিক কারণে  
তা খাওয়ানো হয়তো সম্ভব হচ্ছে না।

উপহার কোনও কারণই নেই। পুপ-জী কীভাবে  
ওপর ভরসা করুন। দেখুন সেটি ঠিক আপনার মতই  
বাকার পুরোপুরি স্বত করবে। এর নিশ্চয়টি মায়ের

বুকের মতই কোমল বা বাকার দুধ সহজে চুষতে  
পারে। আর এই পুপ-জী কীভাবে বোতলটি এমন  
নির্দেশ ডিজাইনে গড়া, যে বাকার মতলব সমানভাবে  
দুধ টানতে পারে এবং আর দ্রুত বাকাকে কোনও  
কষ্টই করতে হয়না। এই বোতলে দুধ খেতে খেতে  
বাকার কখনো হাঁপরে ওঠে না, আর কল তার  
মেজাজ ও বিগড়ায় না।

বাকাকে পুপ-জী কীভাবে সহজে দুধ খাওয়ায়।  
দেখুন বাকার মাটির সতৃষ্ণ-কাল তার পুরোপুরি  
স্বত নেওয়া হচ্ছে।

আর বাচ্চাদান বাড়র বাকার মেঘে আপনায়  
আনন্দ ও লভ পুপ খেতে ধাবে, কারণ খাপনি ওকল  
করাইছেন পুপ-জীর ওপর।



## পুপ-জী®

ভারতের সবচেয়ে বেশী  
বিক্রীর কীডার ও বিপ্ল



ਅਨੁਮਾਪਿਤ : ੨੭੬. ਕੇਸਰਵਰਤਨ ਜੇਮ ਨੰਬੀਓ / ਕਲਿ-੨



আমি কোনো ব্যাপারেই এন্ট্রান্ট নই।  
এন্ট্রান্ট বলেই তো আন্টিস্ট্যান্ট জানে-  
জরের পেয়েই অরহন।

গোল্ডট আমি পেরেছি তেল দিয়ে। আপনি  
তো জানেন।  
ব্যাপারটা সিরিয়াস। আমি একটা সোফান  
দিচ্ছি।

সোফান? কিসের সোফান?  
পান খিঁড়ির।  
ও, তা হলে আমি ভাল আড্ডাইল দিতে  
পারব।  
তা হলে পরশু? আফটার অফিস  
আওয়ার?  
হ্যাঁ। বোস সাহেবের গাড়িতেই চলে যাবো  
আপনাদের স্ট্রাট।

শুনুন। আপনাকে কিন্তু আমার পার্টনার  
হতে হবে।  
কিরকম পার্টনার?  
পার্টনার আবার কিরকম চর? ক্যাপিটাল  
ইনভেস্টমেন্ট ফিক্সিটি ফিক্সিটি। অর্থাৎ আপনি পান  
সাক্ষরন আর আমি বিড়ি বাখব?

শপ ম্যানেজমেন্ট আমার, আউটডোর  
আপনার।  
আর কিছু?  
আর কি?  
ধরুন লাভটা আপনার, লোকসানটা আমার।  
ফের ইয়ার্কি?  
না, তাবছিন্ন রাজনীতি কি এককম ছেড়ে  
দিলেন?  
ছাড়ব কেন? এটাও এক ধরনের লাভ।  
অপ্রশ্নের বিরুদ্ধে।

আপনি ক্যাপিটাল পেলেন কোথেকে?  
এখনো পাই নি। কি করে পাওয়া যায় তা  
আপনাকেই জিজ্ঞেস করব। শুনোই আজকাল ব্যাংক  
ব্যবসার জন্য লোন দেয়। সত্যি?  
দেয়।  
আমার সামান্য কিছু সোনা আছে। বেচে  
দিচ্ছি।

সর্বনাশ।  
সর্বনাশ কেন?  
সোনা বেচলে আর কিনতে পারবেন না  
কখনো। সোনা বেচতে নেই।  
ওসব প্রিমিটিভনেস আমার নেই। সোনা  
আমার কোনো কাজে লাগে না।

ইতিমধ্যেই কি কিছু বেচে দিয়েছেন?  
শুধু হারটা।  
কতটা সোনা ছিল?  
সড়ে তিন ভরি।  
দীপনাথ চুকচুক করে একটা আফসোসের  
শব্দ করে বলল, নিচেরট করে আমি আপনি ঠেকেছেন।  
আজকাল সোনার দর জানেন?  
না তো।  
কত দিয়েছে আপনাকে।  
তিন হাজারের মতো। সোনার পান বাদ দিল  
বে।

ওরা সব সময়ই পান বাদ দেয়। কিন্তু কথা  
তো তা নয়। ওর ওপরে যারগেন করতে হয়।  
আপনি নিশ্চই তা করেননি!

আমি লোককে বিশ্বাস করি। বলল  
মহিদীপা, কিন্তু গলার স্বরে তের ফুটল না। বরং  
করুন সোনালা।

দীপনাথ হাসল, আমি গিয়ে পৌঁছানোর  
অসম্ভব কষ্টকে সোনা বিক্রি করবো না। খুব  
ঠেক যাবেন। তা ছাড়া বোস সাহেবের আড্ডাইল  
নিলেন না কেন?

!!! সত্য প্রকাশিত হ'ল !!!

একালের সর্বজনপ্রিয়  
প্রথম সাহিত্যিক

বৈতালিক-এর [এক সঙ্গে]

মণিমহেশ

ত্রিলোকনাথ ১০

...দুর্গম হিমালয়ের দুই প্রান্তে দুই  
মহাতীর্থ মণিমহেশ এবং ত্রিলোকনাথ।  
চম্বা থেকে ইরাবতীর তীরে তীরে  
খাড়া মুখ। তারপর বুড়ালের তীরে তীরে  
ভারমোর...হাডসার...খান্হো...  
অবশেষে মণিমহেশ...কৈলাস...চম্বা  
কৈলাস। এবার মানালী হয়ে রোটাং  
পেরিয়ে লাহুল স্পিতি। চম্বাভাগার তীরে  
তীরে কোক্সার কেলতের পাশ দিয়ে  
খিরোট হয়ে উদয়পুর, অবশেষে মহাতীর্থ  
ত্রিলোকনাথ।

বৈতালিকের রচনা সম্ভার  
প্রথম সাহিত্যে সর্বকালের রেকর্ড।  
প্রতিবছর দুটি মুদ্রণ।

হিমগিরি তীর্থপথে ১০

[পশ্চিমবঙ্গ : কেশরনাথ, মন্মহেশ্বর,  
তুঙ্গনাথ, বৃন্দনাথ, কপেশ্বর]

রূপবতী তমসা ১০

[তমসার তীরে তীরে গাড়োয়ালের  
জীবন আলোখা]

তুষারতীর্থ অমরনাথ

গুহাতীর্থ বৈষ্ণবদেবী ১০

বর্ণালী বালুচরে ৭

[সর্বকালের দূরন্ত প্রেমের কাহিনী]

সম্রাতি প্রকাশিত করেকটি  
বিশ্ববিস্তৃত বই

জেমস্ হেডলী চেজ-এর

কফিন ফ্রম হংকং ১৮

সোনালী মাছেরা নিরুদ্দেশ ১৫

সঞ্জিনি স্বৈরিনী ১৪

আগাথা ক্রিস্টির অমর সৃষ্টি

আঁখি তারায় রক্ত ১৬

মৃত্যুর চোখ হিম ১৪

নিহত ভ্রমর ১৪

জ্যোতি প্রকাশন

২৫, নবীন কুণ্ড লেন, কলিকাতা-২

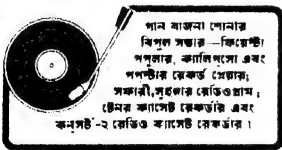
প্রাতিস্থান : সাহিত্য মন্দির

৫৭/সি, কলকাতা-৭০০০৭৩



## এইচ এম ভি ফিয়েস্টা পপুলার ভারতের সবচেয়ে বেশী বিক্রীত রেকর্ড প্লেয়ার

ফিয়েস্টা পপুলার বাজারে চালু করার সময়ে আমাদের আশা ছিল যে এতে আমরা অনেক বেশী শ্রোতাদের কাছে সংগীতের আনন্দধারা পৌঁছে দিতে পারবো। এইভাবে আমরা ফিয়েস্টা পপুলারে সেই সব বৈশিষ্ট্যের সংযোজন করেছিলাম যা সংগীত প্রেমিক মাঝেই একটি ছিমছাম এবং মজবুত সেটে আশা করেন। তার প্রথম প্রমাণ হলো এর সুলভ দাম,



এসি অথবা ব্যাটারী মডেল  
উভয়েরই। শুধু এই নয়, এতে  
আছে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত  
ফ্রিকোয়েন্সি  
রেইনজ-এর  
আম্বাশ-  
ফায়ার এবং  
চাকনায়  
লাগানো  
চমৎকার  
মানানসই স্পীকার যেক্টিকে আপনি  
যেখানে খুশি রেখে গান-বাজনা  
শুনতে পারেন। ধ্বনির গভীরতা  
ইচ্ছেমত ভারী অথবা হালকা করার  
জন্য আছে একটি টোন-কন্ট্রোল।  
আর আছে সব রকম রেকর্ড বাজাবার  
জন্য ৩-স্পীডের টানটেবল।  
এসবের উদ্দেশ্য একটি—যাতে

ফিয়েস্টা পপুলারের মাধ্যমে অনেক  
বেশী লোক গান-বাজনা শোনার  
আনন্দ পান।  
আনন্দের বিষয় এই যে আমাদের  
প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে অনেক আগেই  
ফিয়েস্টা পপুলার ভারতের  
সবচেয়ে বেশী বিক্রীত রেকর্ড  
প্লেয়ারে পরিণত হয়েছে।  
আজ সারা ভারতে ৩,০০,০০০  
ফিয়েস্টা পরিবার আছে। আপনি  
নিশ্চিত জানবেন—ঠিক এই নৃহীত  
কোথাও না কোথাও এইচ এম ভি  
ফিয়েস্টা নিশ্চয়ই বাজছে।

সর্বাধিক অনুমোদিত  
বিক্রয় মূল্য  
**৬৯৪ টাকা**  
উৎসাহিত শুক সমেত  
স্থানীয় কর অন্তর্ভুক্ত



**হিজ মাস্টার্স ভায়স**  
উচ্চল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি

এইচ এম ভি 'হলিডে কন্সট্রাক্ট'-এ যোগ দিন। হংকং, সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক  
রোমাঞ্চকারী সফর! সীমিত মেয়াদী সুযোগ। বিশ্বদ বিস্মরণের জন্য আজই এইচ এম ভি  
ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ও জানলে দাগ করবে।  
 কান কলাই টাচিত।  
 সেইজন্যই এক্সপার্ট ওপিনিয়ন চেরেছিলাম।  
 এ সময়ে আপনি নর্থ বেঙ্গলে গিয়ে বসে বইলেন  
 কেন কলুন তো।

আমাকে খেট খেতে হয়, অনেক হুকুম  
 চলেতে হয়। আমি কি জানতাম আমি নর্থ বেঙ্গলে  
 এলেই আপনি সেনা বোচবেন।

সোনা আমি সব বিক্রি করব। তবে এবার  
 আপনার রুতে।

আমি ও গণিষ নিতে পারব না।  
 তা হলে আমার হাত-খরচ চলেবে কিসে?  
 কেন, বোস সাহেব হাত-খরচও বন্ধ করেছেন  
 না কি?

ঠিক তা নয়। যা দেয় তাতে চলে না। টের  
 থেকে ফিরে এসেই ফিনান্সিয়াল কার্যক্রেতাঁর  
 করছে।

মতদর জানি, আপনি চারশো টাকা পান।  
 বিশ্মিত মগিঙ্গীপা বলে আপনি জানেন? কি  
 করে? ও কি আপনাকে বলেছে?

দীপনাথ গতমত ধরে বুলে, ঠিক ওভাবে  
 বলেন নি। একবার কী একটা কথা প্রসঙ্গে হঠাৎ  
 ইনফরমেন্টা বেরিয়ে আসে।

কুট সন্দেহে চোখ ছোটো করে মগিঙ্গীপা  
 বলে, ও।

চারশো টাকা কিন্তু কম নয় মিসেস বোস।  
 কম কলাই না। কিন্তু আমি জনতে চাই  
 আমার স্বাধীনতা নেই কেন? আজকাল বঙ্গ বাবুচির  
 মাইনে পুশত বোল সাহেব দেয়, আগে আমার হাত  
 দিয়ে দেওয়ারো হত। জরুজি আকাজিস্টে টাকা  
 নেই। গাড়ি গ্যাকজে তালো কথা। কিন্তু আপনাকে  
 বলে কি হবে? আপনি পুরোমানুষ, সবসময়ে  
 পুরোমানুষই পক্ষ নেবেন। আই নো ইউ জল।

আপনিও তো অবলা নারী নন মিসেস বোস।  
 চারশো টাকার নিশ্চয়শ্রুতি একটা পরিবারের চলে  
 যায়। আর আপনার তো ওটা শব্দ হাত-খরচ।  
 খাওয়া থাকা বা পোশাক ওর বাইরে।

হ্যাট হু ইউ নো সো মাচ? বোস সাহেব কি  
 এসবও বলেছে?

নন তবে টেলিফোনে আর এসব প্রসঙ্গ না  
 কলাই ভাল।

দেন টক অ্যাকস্ট ওয়েদার।  
 এখানে ভীষণ ঠান্ডা। আজ গ্যারটকে গিয়ে  
 জমে গিয়েছিলাম।

মগিঙ্গীপা রাগ করে বলল, ব্রিসভার রেখে  
 দিচ্ছি কিন্তু।

আরে, রেগে গেলেন বোঁ ওয়েদারের কথা  
 আপনিই কললেন তো।

রাগ হওয়ার কথা নয় বুঝি? এদেশ কলেই  
 মেয়েদের এত সহজে বেকারদার ফেলা যায়। সভা  
 দেল হলো—

মেশটাকে সভা করে তুলুন না। কে আটকাচ্ছে?  
 আপনরাই আটকাবেন, কেবলো প্রবেশ করলে  
 বাঘের ইটারেন্ট হামপরিড হয়।

আমি তো আপনার পাঠনর। আপনি প্রবেশ  
 করলে আমারও প্রবেশ।

এখনো পাঠনর হননি।  
 হাঁচ্ছি তো। পরশু দিন।

আপনাকে পাঠনর কবব কি-না তা দুবার  
 জাবতে হবে।

কোনো মেয়েকে পাঠনর করতে চান? সময়ে  
 না।

তার মানে?

মেয়েতে মেয়েতে কো-অপারেশন হয় না।  
 পরেবে মেয়েতেও তো হচ্ছে না।  
 পরশু বঙ্গ আপনি আমার একটা ইন্টারভিউ  
 দিন।

ইন্টারভিউ শুধুবার নিরোজি। কাওরাজ।  
 সেলফ কন্সট্রাক্ট।

জরুজি?  
 নরতো কে? অলস ভীত অনস্মার্ট।  
 তবু আমাকেই পাঠনর করতে চেরেছিলেন  
 একটু আগে।

এখন চাইছি না। আপনি আমসক রাগিয়ে  
 দিচ্ছেন।

আপনি না রেগে কখন থাকেন বলুন তো।  
 বখনই দেখা হয় তখনই দেখি রেগে আছেন।

আমি যোটেই রাগী নই।  
 আপনার বাক্য যদি জমে যায় তা হলে কি  
 হবে মগিঙ্গীপা?

নামটা মনে পড়েছে তা হলে?  
 পড়েছে। কিন্তু প্রশ্নের জবাবটা?

আমার বাবসা জমবেই।  
 কিন্তু তারপর?

তারপর আমার কি? ইউ উইল প্রো বিগার।  
 আমি একটা চেনই অফ লপসের কথা ভাবছি।

সে না হয় হল। কিন্তু আপনার সামসারিক বা  
 লম্পজজীবনের কী হবে?

তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?  
 আমি জানতে চাই আপনি সংসার ছাড়া  
 প্রেলোগ হিসেবে এসব বাবসা-টাকসার কথা  
 জাবতেন কি-না।

আমি তো সংসার ছাড়া হয়েই আছি।  
 মেস্টেরের মতো থাকি খাই।

তবু তো একটু হলেও আছেন।  
 সেটুকু বাস গেলেও কারো ক্ষতি হবে না।

কিন্তু হলে অনেক বেশী কাজ করতে পারতাম।  
 আমাদের ডিভোজটা আপনার জন্যই হল না।

কিন্তু তাতে লাভ কি হল বলুন তো।  
 লাভ-ক্ষতির হিসেব এখনো শেষ হয়নি।

সময় হলেই ব্যালানস শীট পেয়ে যাবেন।  
 বোস সাহেব উতিলকে একটা ডিজিটেল  
 দিরেছিল শুনছি। আপনার পরামর্শে নোটিশটা  
 সার্ভ করেনি। কিন্তু এটা ব্যালার বাঁধ।

দেখা বাক।  
 আমি কারো করণের পাঠী হয়ে থাকা পছন্দ  
 করি না। সবসময়ের মনে হয় বোস ইচ্ছে করলেই  
 আমাকে ডিভোজ করতে পারে দয়া করে তবতে না।  
 একদম আউট সাইডারের মতো এই থাকটা কি  
 হবে সম্মানজনক?

ধৈর্য ধরুন।  
 ধৈর্য ধরি তার কারণ অন্য। বোসেব চ্যাক  
 জেতে বেরোলে আমার কলকাতার আর থাকার মতো  
 জায়গা নেই। শব্দ সেইজন্যই—

জানি মগিঙ্গীপা।  
 আপনি জানেন বলেই বোধ হয় ডিভোজটা  
 আটকেছেন। কিন্তু ও ডিভোজ না করলেও আমি  
 যামলা আনব। তখন ঠেকাতে পারবেন না।

তারপর কি হবে মগিঙ্গীপা?  
 কিন্তু তার আগে বলুন, আপনি ডিভ  
 মিনিটের টাইম লিমিট কতক্ষণ আগে পাব হলেচেন?

অনেকক্ষণ। কিন্তু আমি একচেয়ে থেকে কথা  
 বলছি। এ জায়গা আমার চেনা। এমন কি পরস্যাও  
 লাগে না।

ও। হ্যাঁ, তারপর কি হবে মিসেস  
 করছিলেন। জেনে কি হবে? আমি ডিভোজ  
 করলেও তো কেউ মালা হাতে কস থাকবে না।



প্রকাশিত হয়েছে

ডঃ নিতাই বসুর

নতুন বই

অনন্য

রবীন্দ্রনাথ ২৫.০০

প্রেম ও বৈরিতা, খ্যাতি ও ঈর্ষা, শ্রদ্ধা ও  
 বিভ্রম, সংসার ও সংগ্রামের বাস্তব  
 জালা-জ্বালা তথ্যের একত্র বিশুল সমাবেশ

এই লেখকের অন্যান্য বই :

মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সমাজজিজ্ঞাসা ২৫.০০

“মানিক সাহিত্যের অভ্যন্তরে প্রবেশের  
 পক্ষে উচ্চল আলোকবর্তিকাবিশেষ...

তথ্যবহুল-চিন্তাসমৃদ্ধ”—যুগান্তর।  
 “উল্লেখযোগ্য সংযোজন”—সন্দর্ভ।

শরৎচন্দ্র :

জীবন ও সাহিত্য

“সমালোচক সাহস ও সত্যতার পরিচয়  
 দিচ্ছেন...গতিশীল ভাষা।”—সুখ-  
 পাঠ।”—বঙ্গ। উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

...যথার্থ এক সন্ধানী আলো।”—অমৃত।  
 মুক্তিযুদ্ধ, তথ্যভিত্তিক...শরৎ শতবর্ষে এই  
 গ্রন্থটি হল আমাদের অগ্নির স্বীকৃতি।”—  
 যুগান্তর। ২য় মুদ্রণ। ১৫.০০

তারাকঙ্করের

শিল্পিমানস

“বিলেখনধর্মী আলোচনা”—অমৃত।  
 “অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য।”—যুগান্তর

“সংযত বাকভঙ্গি, বিলেখনী ক্ষমতা”—  
 আমলবাগার। ১৫.০০

দে বুক স্টোর

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলি : ৭৩

আন্তর্জাতিকভাবে উচ্চ ইংরাজ তরুণ  
কক্স ক্যান্সারের মোকাবিলায়  
শ্রমের মাটি ভিজিয়ে ছিলেন বৃক্কের রক্ত  
চলে। তাঁরই অসিঃসমরণী রচনা :

## র্যালফ ফক্স নভেল গ্র্যান্ড দ্য পিপল

বজানুবাদ : সর্বাঙ্গিক সেন/সিদ্ধার্থ ঘোষ  
উপন্যাসের উচ্চ বিকাশ ও বৃত্তান্ত সমাজের  
অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তার সজ্ঞা এবং সমাজ-  
তাত্ত্বিক সমাজ উপন্যাসের নতুন সম্ভাবনা  
সহজ অন্তর্ভুক্তি আলোচনা।

## নারায়ণ চৌধুরী লিও টলস্টয় :

জীবন ও সাহিত্য ১০,  
সিদ্ধার্থ ঘোষ  
বিজ্ঞান নির্ভর অভিযানের কাহিনী

## গ্যাবনে বিস্ফোরণ ৮, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ

## মাতৃভাষা ও সাহিত্য ১০, অমুন্য চট্টোপাধ্যায়

## জীবন শিল্পী মুকুত ১২, সংগ্রামী কবি সূর্য্য ভট্টাচার্য্য

এবং কবিসভা সম্পর্কে প্রাপ্ত মারনা করা  
উপযোগী অপরিসীম একখানি গ্রন্থ।

## ডঃ অমিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইয়োরাগে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা ১০,

নারায়ণ চৌধুরীর নতুন প্রবন্ধ গ্রন্থ

## সাহিত্য ভাবনা ১০, দক্ষিণারঞ্জন বসু

## খেলানী কবি সৈনিক ১০, বালক কবি, সৈনিক কবি, বিপ্লবী কবি,

বন্দীকবি এবং গীতিকবি এই পাঁচটি অধ্যায়ে  
কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য ও জীবন মারা  
সম্পর্কে ছোট্টদের উপযোগী অসাধারণ গ্রন্থ।

## লেনিনের প্রিয় লেখক জ্যাক লগনের শ্রেষ্ঠ গল্প ১০.০০

অনুবাদ : রমা ভট্টাচার্য্য সিদ্ধার্থ ঘোষ  
গল্পগুলি পূর্বে সংগ্রামের বাঁচার দুনিবার  
আকাঙ্ক্ষার। উদগ্র জীবনতত্ত্ব। মারা  
পড়বেন তাঁদের কাছে ছোট গল্পের মানুষী  
পরিচয়ের মারনা একেবারেই বদলে যাবে।

Anna Louise Strong Rs. 10.00  
Stalin Era Rs. 15.00  
Sefali Nundy

Bengali For Foreigners Rs. 6/-  
পশুপার লাইব্রেরী  
১৯৫/১৮, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

এদেশের কাওরাত পুত্রবধা ডিম্বোন্মী যেরেদেব  
জর পায়।

ঠিক তাই মণিবাণী।

কিন্তু আমি তো আর বির করতে যাচ্ছি  
না। কয়েকই ও প্রস্ন ওঠে না। আমি চাই কাজ।

অনেক কাজ আছে তবু থাকব।

কাজ চাই? সেজন্য মোকল কেন? আপনায়  
বিশ্বাস কি শেষ হয়ে গেছে মণিবাণী?

মণিবাণী হা- কেঁচকর কেন শেষ হবে?

যে লোকটা বিশ্বাসীর জড়ের গেরত হুকে দেয়  
সেও বিশ্বাসী। আপনি রিভোলিউশন অফ দি

প্রোলতারিয়েত কাকে বলে তাই জানেন না।

আপনি বোধহয় বিশ্বাসীদের মনই গুণ্ডি  
দিয়ে পান সময়ে, আর আমি বিশ্বাসী রাস্তার  
বিড়ি লাল বুড়োর বেঁচে মেঝে?

কেন যে আপনি এত অশিক্ষিত।

মণিবাণী মা-মহালানো হাসি হাসছিল।

মণিবাণীর ওপর সে কখনো সত্যিকারের রাগ  
করেনি। আর করল। হাসির মাধ্যমে রেখে দিল  
কেনটা।

কেন সহ্যে ফিরল নটা নাগদ। আজহাল  
সব সময়েই বাসায় ঢোকে গম্ভীর মুখে, ডু-  
কেচকানো। মণিবাণী ভাত ভয় পায় না বা

গুণ্ডিও দেয় না। লোকটাকে তার বোকা হয়ে  
গেছে। এও জানে তারা দুজনে কেউ নিজেকে

বলাবে না। যদি না বলারি তবে মিলও হবে না  
কেনোদিন।

তবে আজ মণিবাণী আঘবটা বাধে হানা  
মিল বেগের ঘরে। ততক্ষণে বোস গরম কাপড়ের

ফ্রিঃ গাউন পরে এক কাপ ভালো কফি শেষ  
করেছে। বাইফোকাল চশমা চোখে কিছ, কাগজপত্র

দেখছিল লেখাপড়ার টেবিলের কাছে বসে।

মণিবাণী সাজিয়ে গুণ্ডিয়ে কথা বলার  
পটী নয়। ছর ঢেকেই বলল, বুন, তোমার সঙ্গে

আমার জরুরী কথা আছে।

বোস কাগজ সারিয়ে একটু অবাক চোখে  
মণিবাণীকে দেখে নিয়ে বিরক্ত গলায় বলে আই

নো। তোমার কথা মনেই টাকা। আমার পক্ষে  
কিছ, করা সম্ভব নয়।

অপমানটা খুব কাছাকাছি হয়ে মণিবাণীর  
সর্বাপেক্ষা অগ্নির পড়ল কট, কিন্তু তবু সে আজ

মাথা ঠান্ডা রাখতে পারল। আর একটা চানস ওকে  
দেবে সে।

মণিবাণী মাথা নেড়ে বলে, টাকার কথা  
তোলাটা নিশ্চয়ই ঘরঘর নয়।

ঘরের হত খর খরশেট টাকা তুমি না পেতে।  
আমি খরশেট পাই না। তার চেয়েও কড় কথা,

টাকার ব্যাপারে আমার কোনো স্বাধীনতা নেই।

স্বাধীনতা মেঝে এমন শব্দ ছিল না।

তা হলে আমাকে কট সাজিয়ে রেখেছো কেন?  
চলে যাও। দরজা সবসময়েই খোলা।

আমি কেতেই চাই। কিন্তু যাওয়ার জন্যও  
আমার কিছ, খোক টাকার দরকার। আমাকেও

কিচতে হবে তো।

সেটা কেটেই ঠিক হবে।

তুমি কি ডিম্বোন্মী সন্টে আনছ?

না। পারলিগিটি আমি অপছন্দ করি। তবে

তুমি মমলা করতে পারো। আমি লড়ব না।

আমি কেন মমলা করতে, বাবা? তোমার

আমার মিল নেই, ছাড়াছাড়ি দরকার, সেটা কি  
কাছারি মুখ দিয়ে বলতে হবে? কাছা রিতে গিয়ে

তো আমার বির করিনি।

তা হলে আপসে সেপারেশন চাও?

জাই।

আর সেজন্যই টাকাটা তোমাকে দিতে হবে।

তাও নয়। তুমি মনি বলে অন্য রকম অর্থ

করছ। চলে ফওয়ার প্রি কন্ডিশন হিসাবে আমি  
টাকাটা চাইনি। আই ওয়াস-টু-টাট সামর্থ্য

ইমিডিয়েট। পরে আমি ব্যাংকের লোন পেরে  
কিনলাম। সেজন্যই টাকা তখন পাঠি করে দেবো।

তুমি কী স্টাট করতে যাচ্ছে আগে সেটা  
আমার জানা দরকার।

এখনো ঠিক করতে পারিনি। আই ওয়াস-টু-টাট,  
ওপেন এ শপ।

শপ? মণিবাণী নাকি?

তোমার হালচার বেশী দূর ওঠে না, তাই যা  
খুশি ভিজিট পারায়।

জরুরের মেরো কি মোকলদারী করে?

কখনো নুনিং।

করে এবং খুব তাড়, ঘরের মেয়ে ইউও  
করে। আমার বন্ধু অজু কত বড় টোলারি করেছে।

ওর বর তোমার চেয়ে অনেক উচ্চ শোপেট কাজ  
করে।

অজু? সেটা কে?

ইউ নো হার ওয়েল। ন্যাকামি কারো না।

বোস নিজেই নাকটাকে দু, আঙুলে চেপে  
ধরে একটু ভাবল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, আই

নো। বোধহয় বাসগজে ওর একটা ফ্যানের  
মোকল আছে, আন্ড শী ইজ এ ভাটমোট।

তোমার আসেসমেন্ট তোমার নিজস্ব। তবে  
আমিও ওরকম কিছ, করতে চাই।

আমি তোমাকে টাকা দিয়ে বিশ্বাস করতে  
পারি না। অজু যা পেরেছে তুমি তা না পরতেও

পারো।

তবু তুমি তোমার টাকা ফেরত পাবে। আমি  
ধার হিসেবে কাগজপত্র সেই করে টাকা নেবো।

ইউন আই আম রিডি টু পে ইন্টারেস্ট।

বোস হাসল, খুবই শেয়ালমুখো হাসি, যা  
আললে হাসি নয়। বলল, তুমি চলে গেলেও তো

আমার লাল হবে না। আইনত আমি বিবাহিতই  
থেকে যাচ্ছি।

তুমি কি আবার বির করতে চাও বুন?

চাইলে দোষ কি?

আর একটা মেয়ের সর্বনাশ হইব। ঠিক আছে  
আমি মিউচুয়াল করে নিতে রাজি। কেন ভো ইন

ক্যামেরাও করা যায়।

যায়। তবে আমার ইচ্ছে কেনটা তুমি ফাইল  
করো।

তবে টাকা দেবে?

জবে দেব।

মণিবাণী অভ্যন্ত গভীর বুক-খালি-করা  
দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, স্টাটিজ শিলিগুড়ি থেকে

ফোন করছিল।

কবে আসছে।

আল। তবে কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে  
না।

জানি। তুমি যাও।

আর একটা কথা বুন, স্টাটিজ আমার  
টাকার অসুবিধের কথা সবই জা- তুমি যে

আমাকে রেশনে রেখেছো তা ও কখন কি করে?  
তুমি কলছো?

আমি। বলে যেন একটু অবাক হয় বোস।

তারপর সত্যিকারের একটু হাসে, ইন ফ্যাক্ট  
তোমাকে টাকার ব্যাপারে কনসোল করার কথা ওই

আমাকে প্রথম বলে। হি ইজ এ বিয়াল ফ্রেন্ড।  
ব্যাকপার্টিস থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

দীপবাণী?

অবাক হওয়ার কিছ, নেই। তুমি যখন আমাকে  
ফরাসি বানানের মহান রত নিয়েছিলে তখন আমার

অবস্থা পাপালের মতো। অত টাকা আর করেও  
কিছই থাকে না। দীপনাথ ঠিক সেই সময়ে

উনটারফরয়ার করে। আই আম প্রোটেক্ট টু টিম।

মণিবাণী হাত মটো করে রগে কাঁপতে  
কাঁপতে অম্বের মতো, আচ্ছ, মাথায় নিজের ঘরে

ফিরে এল।

তার কথা আসে না সহজে। আজ এল।  
আললে কান্না নয়। অসহায় দুঃখ রাগ তার

ভিতরটাকে বিদীর্ণ করে দিল বুক। বাসগজে মুখ  
চেপে ধরে নিজের কবাসেরা করতে করতে হাত পা

ছুড়ে কঁপতে লাগল মণিবাণী। (কম্প)



## গঙ্গা এবং কাবেরীর সংযুক্তি কতটা বাস্তব সম্ভব

উত্তরে গঙ্গা। দক্ষিণে কাবেরী। খাল কেটে ভারতের এই দুই নদীর মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্যে বেশ কিছুকাল ধরেই মাথা ঘামাচ্ছে আমাদের প্রযুক্তিবিদরা। এ ধরনের পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য তিনটি। এক, গঙ্গা এবং তার মাথা নদীগুলির উৎস জলপ্রবাহ প্রায় প্রতি বছরেই স্খালন সৃষ্টি করে। সেই স্খালন জটিলভাবে থেকে সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয় বিস্তার। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, গঙ্গার উৎস জল কাবেরী এবং তার শাখানদীগুলির দিকে ঝালপথে সরিয়ে নিলে এ ধরনের বিপত্তিকে ঠেঁকে সরিয়ে রাখা যাবে। দুই, এই খাল উত্তর এক দক্ষিণ ভারতের মধ্যে সরাসরি জলপথ স্থাপন করতে সাহায্য করবে। এতে করে পরিষ্কৃত সমস্যার সরাহা হবে অনেকটা। ত্রি, জলপথ স্থাপন করে ডিজেলের উপর চাপ পড়বে কম। তিন, গঙ্গার উপত্যকা দক্ষিণ দেশের বিস্তৃত অঞ্চল জলপথে প্রায় সব সময় খরাগ্রস্ত অবস্থায় থাকে। জলের অভাবে ওই সব এলাকায় সেচের জন্যে এখনও পল্লত নিষ্ঠুর-যোদ্ধা কোন কাকপাই গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। বিশেষভাবে মনে করেন, গঙ্গা-কাবেরীর সংযোগকারী ওই খাল এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। ওই খালের জল নালা কেটে হাজার হাজার একর জমির মাটি সিক্ত করে তুলে সেখানে সবজির জোয়ার আনা তখন আর অসম্ভব হবে না।

‘এ ধরনের উদ্যোগে খরচ প্রচুর’ বলেছেন জনৈক সৌভাগ্যবান বিশেষজ্ঞ। খাল, জলাধার, কেম্পন এক তার সঙ্গে আছে ব্যাকার-উপযোগী পড়ো জমির উদ্ধার। এ সব কাজ পরিচালনা করতে করা গেলে পরে ওই খরচ অবশ্য পারিয়ে নেওয়া যাবে। সেচ এবং শক্তি ছাড়াও আভ্যন্তরীণ জল-পরিষ্কৃত, মাছ চাষ, এমন কি আঞ্চলিক আবহাওয়ারও উন্নতি ঘটানো যেতে পারে।

দেশে উপলব্ধ সেচ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে সম্প্রতি ভারত সরকারের সঙ্গে সৌভাগ্যবান দেশের সরকারটি চুক্তি হয়েছে। এদের মধ্যে তিনটি চুক্তি থাকবে। প্রথম চুক্তি বঙ্গালি তৈরি করবেন বিজ্ঞানগণ। দ্বিতীয় চুক্তি যে ব্যাকার খাল তৈরি হবে, বিজ্ঞানগণও ঘটানো হবে ঠিক সেই কারণে। ইংরেজিতে থাকে কলা হবে ডাইরেক্টরাল রিসার্চ। এতে করে খাল তৈরি হওয়া খালগুলি তৈরি করা যাবে। তিনটি চুক্তি ভারত-সৌভাগ্যবান বঙ্গ উদ্যোগে গড়ে তোলা হবে একটি কারখানা। এই কারখানা তৈরি করা হবে কলকাতার আবহাওয়া। খালের পাড় এবং তল এই অঞ্চল দিয়ে দেকে দেওয়া হবে। ফেনটি করা হয় বয়সটির নকশা তৈরি করে। এতে করে কলকাতার জল চৌকান রাখা যায়। কলকাতা খালে প্রবাহিত জলের বেশ অংশ মাটি ফেনে গুলে নেয়, এ ধরনের খাল সেটা হবে না। কলকাতার চারি চৌকির যে কারখানাটি তৈরি হবে সেটি উপায়ক হবে বাকের দুই লক্ষ ঘন মিটার চার। তৃতীয় চুক্তি, যে সব অঞ্চলের জলের পাহাড়ী নয়, সেখানে পাথর এবং মাটির মিশ্রণে উচ্চ কীট তৈরি করে, এক দরকার হলে কলকাতা দিয়ে তৈরি হবে কলকাতা জলপথ।

গঙ্গা-কাবেরী ছাড়াও গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সংযোগের কথাও ভাবছেন ভারতীয় প্রযুক্তি বিজ্ঞানীরা। পারস্পরিক দুটি নদীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন এ দেশে এমন কোন নতুন ঘটনাও নয়। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার ভারত বঙ্গ আকর্ষণ ছিল, ওই সময় কলিঙ্গ, চেনায়ে উত্তরাংশ এবং কলিঙ্গ-মৌর্যের কিনাশের মধ্যে খাল কেটে পরস্পরের বিস্তৃত এলাকায় সেত্রে বাধ্য করা হয়। আধুনিকতার পরও এ ধরনের বেশ কয়েকটি প্রকল্প এ দেশে কাজেই বাস্তবায়িত করা হয়েছে। এই সব প্রকল্পের মধ্যে আছে পেরিয়ার প্রকল্প, রায়চান খাল প্রকল্প, পরমবিজয়-আলিয়ার প্রকল্প, গুরু গাঁও



বিজ্ঞানীরা নদীগুলির সংযোগ

খাল প্রকল্প, জিন খাল, শতদ্রু-বিপাশার সংযোগ প্রকল্প।

ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ অঞ্চল বিশেষ স্বতন্ত্র। কোথাও অতি বর্ষণ, কোথাও বৃষ্টির দেখা পড়ার ভার। কোথাও জলের প্রচুর, কোথাও এক কোটা জলের জন্যে হা পিড়ো। নদী অবকাঠামো-গুলির মধ্যে উপলব্ধ সংযোগ স্থাপন করা গেলে এ সব সমস্যা হ্রাস পড়বে। অতিবৃষ্টি-অঞ্চলের জল অন্যত্র-অঞ্চলে কটন করে শবের উপশাসন বাড়ানো থেকে পল্লপালন, কলকারখানার সম্প্রদায় এমন অনেক কিছুই করা তখন সম্ভব হতে পারে।

তবে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে গেলে নিষ্ঠুরতার প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। বিশেষ করে গঙ্গা-কাবেরীর ক্ষেত্রে তা বটেই। প্রকৃতির নিজস্ব কারিগরির মধ্যে যে স্থিতিস্থাপকতার পরিচয় পাই, তাকে পরোক্ষরূপে আরও করা না গেলে এ ধরনের উদ্যোগ অনেক সময় কম্পনকে কারণে হয়। জল-কিন্তু উপলব্ধের জন্যে তৈরি হয়েছে কলকাতা এবং কলকাতার। বিজ্ঞানীরা দেখছেন, ওই সব বর্ষণ এবং জলাধার-অবস্থিত অঞ্চল এখন কখনও কখনও বৃষ্টি-কলকাতা হচ্ছে। গঙ্গা এক কাবেরীর মধ্যে পড়ে রয়েছে বিস্তৃত জলাধার। তাই কোথাও নরম মাটির স্তর, কোথাও পাহাড়-পর্বত হাড়ের পাথর অঞ্চল। অতএব প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, গঙ্গার জলের বেশ কিছু অংশ দক্ষিণে প্রবাহিত করতে দিয়ে আঞ্চলিক আবহাওয়ার উপর চাপ পড়বে না তো? উত্তর নদীর জলকল-কলতার পরিবর্তন ঘটবে না তো? ভূতাত্ত্বিক পরিবেশ বিপর্যস্ত হবে না তো? অঞ্চল এক বর্ষণ সম্পন্ন উপলব্ধ তার প্রত্যেক কতটা বড় হতে পারে? উত্তর নদীর অস্তিত্বটি অঞ্চলে আছে প্রচুর নদী এবং তার মাথা প্রশাখা। ওই ধরনের উদ্যোগে সেগুলি হতে কতগুলি নদী হবে, সে দিকটাও দেখতে হবে। সেটা দেখতে গেলে চাই নিষ্ঠুরতার অভিজ্ঞতা। এত জন্যে চাই অগাধ গবেষণার প্রস্তুতি। এই গবেষণার ভিত্তি, জল-প্রবাহ বিজ্ঞান আবহাওয়া এক পরিবেশ-বিজ্ঞান—এমন অনেক বিষয়ই অস্তিত্ব হওয়া প্রয়োজন। পরীক্ষালব্ধ কলাকলের উপর নির্ভর করে তবেই এমন কিছাট একটি প্রকল্পে হাত দেওয়া উচিত।

প্রসঙ্গত জানও একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সারা দেশ জুড়ে রয়েছে অসংখ্য নদী নলা। উপলব্ধ সংযোগের অভাবে তাদের অনেকই মাঝটা হারিয়েছে। অনেক নদী শুকিয়ে গেছে। উদ্যোগী হলে এই সব নদী-নলার সংকর করে সেচ এক নৌ পল্লবকে বক্ষা করা যায়। এ ধরনের নদীর একটি পেশী পরিবেশের নেওয়া দরকার। দরকার সেগুলির সংকরের কাপারে রুটিন দক্ষিণ গবেষণা। ওই

গবেষণার উপর নির্ভর করে কম খরচ এবং কম কলকাতা হ্রাস ওই সব নদী-নলা সেচ এবং পানীর জল সরবরাহের কাজে লাগান যেতে পারে। তা না করে গঙ্গা-কাবেরীর মধ্যে খালকাটা—এর প্রযুক্তিগত দিক এক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কেউ নিশ্চিন্তের নন—তখন সোনার হারিয়ে পোহান ছোট কতটা স্বস্তিসঙ্গত হবে সেটা দেখে দেখা দরকার।

### জাজোবা

জাতিয় নম সাইমনডারিয়ার চারনেস (লিঙ্গ)। জাতিলক নম কোথাও পিচ্ছকট। কোথাও গের্টনেট। তবে অনেকের কাছেই জাজোবা নামেই পরিচিত। জাজোবা এক ধরনের গাছজাতীয় গাছ। চির সবুজ। উচ্চতর করে কট মর। আরাইজানা, ক্যালিফোর্নিয়া এক মেক্সিকোর কোন কোন অঞ্চলে এই গাছ ব্যাপকভাবে জন্মে থাকে। ভারত সরকারের বিজ্ঞান এবং কারিগরী দপ্তর কিছুদিন আগে মাকিন দেশ থেকে দুই কিলো-গ্রামের মত বীজ নিয়ে এসেছিলেন এ দেশে। ওই বীজ থেকে এ দেশে জাজোবা গাছের চাষ করা যায় কি না, সেটা দেখার জন্যে দক্ষিণ পড়লো যোগেশের লেগুন জ্যারিত জোন রিসার্চ ইনসটিটিউট, এবং লখনৌ-এর ল্যান্ডল কোটনিক রিসার্চ ইনসটিটিউট উপর। গবেষণার দৃষ্টির বিজ্ঞানীর সকলের সঙ্গে বীজ থেকে চাষ তৈরি করলেন। গবেষণা এ দেশের জল-বায়ুতে রাস্তা টিপার লাক্সন পূর্ণ তল লাক্সন পল্লিকা-বীজিকা চলানেন তরল। সবলও হলেন। এ দেশেও হাতে জাজোবা ব্যাপক চাষ করা যায় সম্প্রতি ভারত উদ্যোগে হাত দিয়েছেন ভারত সরকারের বিজ্ঞান এবং কারিগরী দপ্তর। এ ব্যাপারে দেশের বিজ্ঞান গবেষণার এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ে একটি প্রকল্পও রচনা করেছেন তারা। আপাতত রাজস্থান, গুজরাত, মহারাষ্ট্র এক উত্তরপ্রদেশ এই গাছটি ব্যাপকভাবে চাষ করা যায় কি না সেটাও খতর দেখা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞের কথা, এই গাছ প্রচুর-বর্ষণ অঞ্চলে চাষ করা যেতে পারে। যে সব জমিতে সু-বর আলো পড়ে কম অথবা মাঝারি চাষাস লাভজনক নয়, অথবা করা যায় না, সেখানেও জাজোবা চাষ করা যায়। লবণাক্ত অথবা অতিরিক্ত কাদা আছে এমন জমিতে এ কাজে লাগানো যেতে পারে। সেচেরও তখন প্রয়োজন হবে না। বরং মাটি সংরক্ষণ সাহায্য করে জাজোবা।

এমন আদর করে জাজোবা গাছ চাষের কারণ কি? এর উত্তর : জাজোবার নানা অংশের নানা গুণ। জাজোবার বীজ ডেলের পরিমাণ পল্লব দ্রুতত। রাসায়নিক গঠনের দিক দিয়ে এই ডেল পল্লব ত্রিয়ার ডেলের সঙ্গে তুলনা করা চলে। স্পাস তি মর ডেল অত্যন্ত মূল্যবান। উচ্চ মানের মোটরগাড়ির ডেলে

কিন্তু তেলই ছিলো যে স্পার্ম-তেল। বস্ত্রপরিষ্কার  
জলের পিছল রাখার ব্যাপারে স্পার্ম তেল যেন তুলনা-  
হীন। তার প্রধান কারণ, অতি কম তাপমাত্রা এক  
চাথে এই তেলের গুণাগুণ নষ্ট হয় না। তা ছাড়া  
বস্ত্রের নিশ্চল থাকলেও এই তেল তার গায়ে লেগে  
থাকতে পারে, চুইয়ে বা গড়িয়ে পড়় যায় না।  
কিশোরবয়সে সেখেনে, জাজোবা তেলেও এই সব গুণই  
আছে। অতএব 'লিট্রিক্যান্ট' বা পিচ্ছিলকারী তেল  
হিসেবে দেশে এই তেলের চাহিদা যথেষ্ট। জাজোবার  
বীজ থেকে তরল-মোমও পাওয়া যায়। এই মোম  
প্রাচীন সামগ্রী, ফোন শ্যাম্পু, সাবান, মোমের ত প্রভৃতি  
তৈয়ারি ব্যাপারেও কাজে লাগানো যায়। হ্যাঁ, জাজোবার  
পাতাও যথেষ্ট মূল্যবান। সবুজ সার হিসেবে যথেষ্ট  
কমর। ঠিক মত চাষ করলে একর প্রতি জাজোবা  
বীজের উৎপাদন ০.৭৫ মেট্রিক টনের মত হতে পারে।  
এই তেলের আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদাও যথেষ্ট।  
দাম কিলোগ্রাম প্রতি ২৪০ টাকার মত। তেল এবং  
সবুজ সার ছাড়াও জাজোবার কাঠ জ্বালানি হিসেবে  
ব্যবহার করা যেতে পারে। কিজান এক কাকিয়ারী  
দস্তর মনে করেন, জাজোবার চাব সাধারণ লসাদি  
চাষের মতই লাভজনক। গ্রামীণ কম সংস্থান এবং  
অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাজোবার চাব যথেষ্ট কাজ করে হবে  
বলেই তাদের বিশ্বাস।

### সাপ-ঘর

"কী, সাপ দেখে ভয় করে? ভয় পাবেন না।  
সাপ নিরীহ প্রাণী। সাপ অথবা কাউকে ধ্বংস করে  
না। এই আমাকেই দেখুন না।" বলেই একটি জ্যাক  
লাউডগা সাপ হাতে তুলে নিল কলকাতার পা  
মাটিনের-এর তরুণ ছাত্র আশু, বাও। সাপটির  
গায়ে হাত বেলাতে লাগলো সে। কখনও গালের  
উপর কখনও বা কঁধে তার মৃদুটি বেলাতে লাগলো।  
তার সামনে তখন রমণ্যবাসী জনতা। শিশু, বালক-  
বালিকা এক বড়সের ভীড়।

আশু, বললো, সাপ দেখে সব শুষেই ভয় পান  
আপনারা। লাউডগা সাপে কি নেই। কড় রোগী সাপ।  
বিশ্ব কল্লই কামড়ায়। এই দেখুন না, কেমন কামড়ে  
সিঁরেছে আমার হাত।

সম্প্রতি কলকাতার বিজ্ঞান ইন্ডাস্ট্রিয়াল আন্ড  
টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম দুটি সাপ-ঘর তৈরি  
করেছেন। ঘর বলতে কিছুটা গভীর গর্ত। গর্তের  
মধ্যে জলের বাক্স আছে। সেখানে গাছপালা, নড়ি  
পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেশ।  
আর সেই পরিবেশে কাল তাকাত চলে যিরে বেড়াচ্ছে  
জরেক জাতের সাপ। লাউডগা, গোখরা, বোরা,  
লম্বাচুড় প্রভৃতি। গোসাপও আছে। সাপ ঘর দেখার  
জন্যে মিউজিয়ামে এখন প্রচুর ভীড়।

মিউজিয়ামের কিউরেটর সন্নর বাগচী বললেন,  
ভারতে সাপের কামড়ে যারা মারা যান দেখা গেছে  
বৌশর ভাগ ক্ষেত্রে বোড়া সাপেই তাদের কেটেছে।  
লম্বাচুড় বিষত সাপ। মারাত্মক এর বিকল্প। তবে  
চট করে কাটকে আত্মরক্ষা করে না।

আশু, একটি বোড়া সাপ হাতে নিয়ে তাকে  
গাগিরে তার দাঁত দিয়ে বিষের ফোঁসারা দেখালো।  
সবাই দেখল বোড়ার বাকী দাঁতের ডগা থেকে বিষ  
পড়ল।

সন্নরবাগী বললেন, আমাদের কারিগরি সংগঠ-  
নালার এয়ার থেকে কিছু কিছু জ্যাক প্রাণী  
রাখার ব্যবস্থা করেছি আমরা। সাপ-ঘর তৈরি  
হয়েছে। কিছু কিছু মাছও রাখা হয়েছে। ছোট  
পুকুর তৈরি করে মাছ এবং জলচর জীব রাখার  
ব্যবস্থা হচ্ছে। স্কুলের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এসে  
এখানে। আমাদের আশা, প্রাকৃতিক পরিবেশের  
সঙ্গে জীবজগতের সম্পর্ক কতটা সে সম্পর্কে সঠিক  
ধারণা বোঝানোর ব্যাপারে এই উদ্যোগ তাদের যথেষ্ট  
সাহায্য করবে।

প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক বৌশর ভাগ  
ক্ষেত্রেই আমরা ছাত্রছাত্রীদের শিখরে থাকি স্কুলের

চার দেওয়ালে রয়েছে। সেটা পরিষ্কার করা। সেই  
পরিষ্কার করার অভিজ্ঞতার সুশাস্ত্রীয়ত কগার  
ব্যাপার বিজ্ঞান মিউজিয়ামের এই প্রচেষ্টা  
অভিনন্দনীয়।

### বিজ্ঞান পত্রিকা

জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারের আশার বহর  
চার আগে বিজ্ঞান বিচিত্রা নাম দিয়ে আগরতলার  
কয়েক জন স্বাক্ষর একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের  
আয়োজন করেছিলেন। আনন্দের কথা, তাঁদের সে  
উদ্যোগ এখন সার্থক। ঊষা গ্রাহক পেয়েছেন এক  
হাজারের মত। গ্রাহক বাড়ছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে  
পত্রিকার বৈচিত্র্যও। বিশেষ করে আইনস্টাইন  
সংখ্যাটি। আইনস্টাইনের বাস্তবগত জীবন থেকে  
বৈজ্ঞানিক কর্ম-বজ্রের এমন স্নায়ু এবং নিউক্লিয়ার  
লেখা খুব কমই চোখে পড়ে। কলকাতার পদ-  
পত্রিকাতেও দেখেন। ভৌত এক জীবনবিজ্ঞান  
নির লেখাগুলির মধ্যে প্রচুর মৌলিক রসোহ।  
বৈজ্ঞানিক সলিটন, বৈজ্ঞানিক উদ্যোগ, বিজ্ঞানের  
যে সব কথা জানলে সখ্যকর মানব উপকৃত  
হতে পারে, ছাত্রদের স্কুলের গভীর বইয়ের  
পঠন অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি-সুপারিকম্পিতভাবে তার  
চেতনা করা হয়েছে এই পত্রিকার। আরও  
প্রশংসনীয় পত্রিকার লেখক-তালিকার দ্বারা  
আছেন অনেকের পাঠক-পাঠিকার কাছে হস্ত  
সম্প্রদিত নন, কিন্তু লেখার মনসিমানার তঁরা  
অনবদ। বাংলাভাষার প্রকাশিত এ ধরনের পত্রিকা  
খুব কমই চোখে পড়ে। মাত্র চার বছরে একটি  
বিজ্ঞান পত্রিকাকে এমন দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলার  
দক্ষতা কিরল ঘটনা সন্দেহ নেই। পত্রিকার  
সম্পাদক দেবীন্দ্র দামকে এই কৃতিত্বের জন্যে  
ধন্যবাদ। তিকানা : বিজ্ঞান বিচিত্রা। পোঃ বোগোদ-  
নগর। আগরতলা, রিপূরা।

সমার্পিত কর



একদিন আমার সোনারগণি  
হাস্ত বড় ডাক্তার হবে!

জন্মসময়ের সেই দিনের কাজ  
আজও শুরু করুন।  
স্টেট ব্যাঙ্ক আমাদের  
কাছে আজও চলে আসুন।

এটা তো স্বাভাবিকই যে প্রত্যেক বাপ-মায়ী  
আমাদের সন্তানের উজ্জল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন।  
কিন্তু তাঁরা জানেন না যে সময় সম্পনার পাখর  
ডানা মেলে কোথা দিয়ে উড়় যায়। বিচ্ছিন্ন  
দুরদলিতা, দিকমত পারিকম্পনার অভাবে আমাদের  
কত স্বপ্ন বাস্তব-রূপ নিতে পারে না।  
স্টেট ব্যাঙ্কের আমরা প্রত্যেক প্রতীতি পরকে  
সার্থক করে তোলার জন্যে নানান মানসসিই যোজন।  
রচনা করে রেখেছি। আমাদের ইটন-ডেন্টমেন্ট প্রান  
(পুনঃনিয়োগ যোজনা), কোয়ারি ডিপোজিট জীম  
(কম-পুঞ্জিত জমা যোজনা), স্টেভিং অ্যাকাউন্ট  
(সত্তর খাতা), টার্ম ডিপোজিট (মোদারী জমা),  
জনতা ডিপোজিট (জনতা জমা), হাটনরস অ্যাকাউন্ট  
নাওয়ালকম্পের জন্য সত্তর খাতা। এবং পেরোনিয়াল  
পেনশন প্রান (সোহা জীবন-ব্যাপী পেনশন যোজনা)  
প্রভৃতি থেকে আপনার পছন্দসিইটি বাছাই করে  
স্বয়ং সার্থক করে তুলুন।

সকলের জন্যে

**স্টেট ব্যাঙ্ক**  
ভারতের বৃহত্তম ব্যাঙ্ক

# '৮০ ওলিম্পিকের আগে রুশ দেশ চিরঞ্জীব

১১ ১৪ ১১

এক তুয়ারবান্দি, তার সঙ্গে সমুদ্রের কোড়া  
হাওয়া। গায়ে কাঁটার মত শোথের বাজিল যেন।  
ক্যান্টনসও হাত আড়ম্ব হরে আসছে। দেখে পকেটে  
পুঁথিলায় হাত দুখানা। কিন্তু মুখে বচাই  
কেমনে। আর জ্বরের তলা দিয়েও ঠান্ডা উঠেছে।  
আজ আবার মস্কোর জিমনাস্টিকস স্কুলে যাওয়ার  
মত অবস্থা না হয়। তবে আজ বোরোবার আগে  
ভবল মোজা পরে বেরিয়েছি এই যা রক্ষা। গ্রীষ্মের  
আজ্ঞনকে অনেকই দেখেছেন, দেখবেন ওলিম্পিকের  
সময়ে। নীল বাস্টিকে শাখা পড়ে তুলে নোকা  
জাসতে দেখিছি ফিল্মে। কিন্তু শীতের ডাল্লিন  
দেখার সৌভাগ্য কখনের হয়? কষ্ট হচ্ছে ঠিকই,  
কিন্তু বরফ ঘেরা ইয়ট ক্লাব, নিভনি ইয়ট ক্লাব মিন-  
দুশরে। অদূরে জাহাজগুলিও নিশ্চল—এমন  
ডাল্লিনকে সচরাচর দেখা যায় না। ঈশ্বরকে অশেষ  
ধন্যবাদ জানিয়ে, সোভিয়েট সরকারকে কৃতজ্ঞতা  
জানিয়ে ফিরলাম শহরের দিকে। আবার সেই বরফের  
চড়াই উৎরাই। আবার সেই ত্রেন, তারের বেড়া  
অভিজ্ঞ। কিন্তু ফিল্মব কিসে। হোটেল ভিদ্-র  
দুখের কম নয়। একটিও টাক্সি নেই। শহরের এই  
প্রান্তে বাস চলাচলও খুব কম। কিছুক্ষণ দাড়িলাম  
বাসস্ট্যান্ডে। আপ ডাউন কোনোদিকেই কিছু নেই।  
আমাদের মত আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে। লিওনার্দো  
কথায় আস্তে আস্তে এগোতে লাগলাম। সামনেই  
আর একটি মোড় আছে ওখানে যদি কিছু মেলে।

হাঙ্গার পা দটো অবশ হয়ে আসছে। ক্রিষ্টিবের  
বাঁধিতে আরও খরাপ লাগছে। ঠাণ্ডা এখবরের  
আবহাওয়ার অভ্যস্ত। জনমানব শূন্য বরফের রাস্তা,  
বরফের গাছ, বরফের বাঁধের মাঝে লিওনার্দোর  
কণ্ঠে হঠাৎ বাংলায় রবীন্দ্রসংগীত সব ভ্রান্তি, সব  
অবসন্নতাকে দূরে ঠেলে দিল। নিখুঁত ওয়ার্ডিং,  
সুরও কাছাকাছি। মস্কো বা লেনিনগ্রাডে ব্যাপারটা  
হলে অবাক হওয়ার ছিল না। বাক্সালী চাকুরে ছাড়াও  
হায় আসছেন কিছু। উপরন্তু করেন ল্যাংগোরেজ  
ডিপার্টমেন্টে এসেশী অনেকই আপনার আমার মতই  
বহলা বলেন, লেখেন, গান করেন।

হঠাৎ কটি টাক্সির হাঙ্গিশ মিলল। অনারও  
হুটুটিলেন। কিন্তু লিওনার্দোকে হারানো অসম্ভব  
ছিল। ঢলে এলাম হোটলে। স্নান সেরে আবার  
বেরোন। লিওনার্দো স্পেশাল লাঞ্চ খাওয়ারে নিয়ে  
যাবেন। সবচেয়ে সস্তা অথচ এমন ভাল লাঞ্চ নাকি  
ডাল্লিনের কোথাও পাওয়া যায় না। জিজ্ঞাসা করলাম  
—এ কেমন ব্যাপার। সারা দেশে নাকি সব জিনিসের  
একই কোয়ালিটি এবং একই রকম দাম? জানি না  
কোথায় যাচ্ছি। লিওনার্দো মাঝে মাঝে দুটি হাঙ্গিশ  
শব্দ ব্যবহার করছেন—‘খাবড়াও মাং’। এক রাস্তার  
মেয়েদে দৌঁধ প্রায় লখনেক লোকের কিউ। মেয়ে  
পুরুষ সকলেই দাঁড়িয়ে। কলকাতার মত  
স্ন্যাক বার এখনেও আছে। লাঞ্চ টাইমে এরা দ্রুত  
শস্তার লাঞ্চ প্যাকেট দেন। ইচ্ছে হল দাঁড়াই। কিন্তু

ওরা দুজন তাঁর আপতি জানালেন। তবে কি  
সকলের জ্ঞান নয়? লিওনার্দো বললেন, প্রভেদকে  
লাঞ্চ প্যাকেট পেতে পারেন। আঙুল তুলে বললেন,  
ওই যে ওই দেখুন উনি এখানকার মিউনিসিপ্যালিটির  
চিফ অফিসার। তবে আপতি শব্দ আপনার ক্ষেত্রে  
অভিধ আপনি। আলজি করি কেমনে। নাছোড়বান্দা  
দেখে কিউরে দাঁড়িয়ে তিনজনে একটি প্যাকেট  
নিলাম। আচ্ছ। মনে হবে মস্কো বা লেনিনগ্রাডের  
কোনো বড় হোটেল থেকে রান্না করে এই স্ন্যাক  
বরের সন্ধ্যাই দেওয়া হয়েছে। হুটুতে হুটুতেই ওটি  
শেষ হল। এবার ট্রায়ে উঠলাম। নামলাম রেল  
স্টেশনের কাছে। লিওনার্দো যে কেমন পরিচিত  
সকলের আবার বোকা গেল। রেল ক্যান্টনে প্রচণ্ড  
ভিড় হয় লাঞ্চ টাইমে। ডিনজনের বসার টেবিলে  
টেবল খালি নেই। কোথাও একজনের রায়গা আছে,  
কোথাও বা দুজনের। কিন্তু ম্যানেজারকে বলে ম্যানেজ  
করে ফেললেন। মস্কোর, লেনিনগ্রাডে তবুও মানিয়ে  
নিরোঁছলাম, কিন্তু লিওনার্দোর পাল্লায় পড়ে কীসব  
যে পেলাম জানি না। সারাক্ষণ বমি চেপে, দম বন্ধ  
করে গল্পধঃকরণ করছি। কেবল চিকেন কারি আর  
আইসক্রিমের সময় ঠাণ্ডা আমার মধ্যে একটু হালি  
দেখোঁছলেন। কিন্তু যাই খাই না কেন শরীর খারাপ  
করে না। গলা অবধি খেয়ে কি হুটু যায়?   
লিওনার্দো বললেন, হুটু শরীর গরম থাকবে,  
ব্যায়াম হবে। তাছাড়া না হুটু শহর চিনবেন



মস্কোর একটি মেট্রো স্টেশনে যাত্রীরা নেমেছেন।

কেমন করে। গাড়ি ছোড়ার চক্রে কি মানুষ চেনা যায়? কত ক্ষমতার কোন গলি দিয়ে যে নিয়ে গেলেন বেলা দুপুর। ওর সঙ্গে বোরসে বুকলাম শহরটা কত পুরনো। কলকাতার বড় বাজারের মত গলি, বিভিন্ন এলাকা সরেছে নানা ভাষায়। কত পুরনো এলাকা। বেগুনের নতিভঙ্গি উঠেছে, লেগুনি না জেতে পারছেন না। পুরনো এলাকা-গুলির রাস্তা এত ছোট যে দুটি গাড়ি মুখোমুখি এলে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। গলিখুঁজি দিয়ে আসতে আসতে আরও একটি অভিজ্ঞতা হল। একটি দোকানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে হঠাৎ এক জম্মাইলা অজান হয়ে পড়ে গেলেন। দু'তিনজন তাকে ধরার পর তেলার চেষ্টা করলেন। লিওনার্ডে বললেন, সবভবত মৌকি হয়েছে। কিন্তু এখনই এটা হাসপাতালে পাঠানো দরকার বা ডাক্তার ডাকা উচিত। কথা না শেষ হতেই অক্সফোর্ড হাউসের। মনুষ্যের মধ্যে একে নিয়ে গেল। কলকাতার দরকল এলে সকলে রাস্তা ছেড়ে দেন, এখানে অ্যাম্বুলেন্সেরও তেমনি গুরুত্ব।

লিওনার্ডের একটি বোমা বারের চোখে পড়ল। ওর খুব শখ ভোলভো গাড়ির। ওলিম্পিকের জন্য নানা ঘরের লটারি বোরসেই আধঘণ্টা পরে গারে ভাঙ দের হয়। ওর প্রথম পুরস্কার গই গাড়ি। লটারির টিকিট কিনে আধঘণ্টা পরে স্টেট কাউন্টার গিয়ে উনি দেখেন গাড়ি পেলেন কিনা। শ্রিতীয়বার কপাল ঠকলেন—আঃ, সামান্যর জন্য পেলেন না। তিনটি টিকিট আগে কাটলেই গাড়ি পেতাম। আমাদের সঙ্গেই হোটেল চলেছেন। আজ এবং আগামীকাল ওর জিউটি আমাদের সঙ্গেই। কিন্তু হোটেল গিয়ে বিপদে ফেললেন ওর সঙ্গে আরও কয়েকজন স্থানীয় সাংবাদিক। মস্কোর কথা দিয়ে এসেছিল লেনিনগ্রাদ, তাল্লিন সফর শেষে ভারতীয় শেলার ডিনেনস্ট্রেশন হবে। এখানে এড়াতে গেল না। হোটেল ভিডু-র ১২ তলার পাট্টা কেটে পরে কবাড়ি কিছুটা বোঝাতে পারলেও খোঁজা কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না। কবাড়ির ব্যাপারে অবশ্য লিওনার্ডে অনেকটা সাহায্য করলেন। বাংলাদেশে তিনি কবাড়ি দেখেছেন বিভিন্ন ভাষায়।

কলকাতায় খবর পাঠবার ব্যাপারটা আরম্ভে আজ লিওনার্ডের উপর ছেড়ে দিলেন। আসলে তাল্লিনে আগে কয়েকবার এলেও আরম্ভে খুব ওয়াইল্ডহাল নন। তাড়াহাড়ি ডেসপ্যাঁচতেরী করে তিনজনই বোরসে পড়লাম। প্রথমে এখানকার ক্রি পি ও-তে। সেখানে কোনো হুইল মিলল না। ওরা জানালেন, সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসে যান। যা হবার ওখানেই হবে। সেখানেও গিয়ে শুরুরতে নিরাশ হতে হল। ওরা জানালেন, হাওয়াতে টেলিগ্রাফ পাঠাতে হলে মিনিমাম অনুমতি চাই। লিওনার্ডে জাতও দমলেন না। ১১ টি ও-র ডিরেক্টরের অফিস থেকে ফোন মন্তব্যই করলেন। তিনি অনুমতি দিলেনও মৌখিকভাবে কিন্তু পরে জানা গেল আগস্টে বাস্তবিক রেগেটার সময় ইংরাজি টেলিগ্রাফ চালু ছিল। কিন্তু এখন বন্ধ। ওলিম্পিকের এক মাস আগে জুনে আবার ইংরাজি টেলিগ্রাফ পাওয়া যাবে। ডিরেক্টর চা, বিস্কুট খাইয়ে খুশী করে বললেন, নেস্ট টাইম আসুন বিমুখ করব না।

হোটেল ফিরে ফ্রান্স সেরে ডারের লেখা, তারপর ডিনার। ডিনারের জন্য আরম্ভে সারা হোটেল চরে ফেললেন। অন্তত মোটামুটিক রেস্তোরাঁ আর বার আছে ভিডু-তে। ঘেলেছে দুটি নাইট ক্লাব। গোটা তিনেক রেস্তোরাঁ খাওয়া থাকে রাত তিনটে অবধি। কয়েকবার ওটা নামা করলাম। সবশেষে গেলাম ২২ তলার উপরের রেস্তোরাঁ। এখানে নাচ-গানের কামেলা নেই, ভিক্টরিও কম। ইংরাজিতেও মেন্ডে পেলাম। ট্যাক্সিদের কোয়ার সুবিধার জন্য রুশ, ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, প্যানিশ ও লাতিন মেন্ডে পেলাম। জাম্বুজ হতে হয় খাবারের নামে। মস্কোর পিকন, লেনিনগ্রাদের ইন্টারন্যাশনাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি পার্ক নেই।

আমাদের কলকাতা, বিলি, বোম্বাই, মাদ্রাসের মাসের কলকাতার কথা নাহা বললাম। কলকাতার যে গোটাটাকে বড় হোটেল আরে তার একটির সঙ্গে আরেকটির কোয়ালিটি ও ঘাসের মিল পাওয়া যায়? তাইবা কেন, একই ওখ সাবান, টুথপেস্ট, পাউডার কলকাতার বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন দাম। রাঙা রাঙা তো কত বৈকিক্য। দাম অবশ্য হাণ্ডা থাকে একটাই। কিন্তু প্লাস একটাই লোকাল ট্যাক্সে আপনার আমার পকেট কাটা যায়। মনে হয় দশজন ইন্দিরা গান্ধী বা কুর্জিন ম্যোভ বসুও এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারবেন না।

গতকাল লক্ষ করিনি। আজ রিসেপশন কাউন্টারে দেখি নানা ঘরের পতাকা ওখানে। গুলাম—মোট ১৪টি ঘরের জাতীয় পতাকা। অন্তর্গত আমাদের তিনরঙা জাতীয় পতাকা। এশিয়ার আর কোনো দেশের পতাকা নেই। বড় ভাল লাগল, মনে মনে বর্ষা বোধ করছিলাম। লিওনার্ডে কণা করে বললেন, ওরা বুঝছে একজন ইন্ডিয়ান এখানে আছে, তাই হুজুতে টাকিয়েছেন।

রেকমন্ডের পর আর প্রথম অ্যাপারেশনমেন্ট ডাল্লিন ওলিম্পিক কমিটির ডেসপ্যাঁচ প্রেস চিফ গানার পল-এর সঙ্গে। পল-এর বয়স ৩৫। দারুন চটপটে লোক। ছিপছিপে চেহারা। বড় বলেই মনে হয় না। নিজের বিভাগের কলকাতা সম্পর্কে জানতে বেশ আগ্রহী। বাস্টিক রেগেটার ২৭টি ঘরের ৪৬৬ জন প্রতিযোগী এসেছিলেন। ওই সময়েই প্রেস সেন্টারের কাজকর্ম পরীক্ষা হয়ে গেছে। ওলিম্পিক নিয়ে ওরা তাই খুব ভাবছেন না। পল-এর ধারণা এবরের ওলিম্পিক রেগেটার রেকর্ডসংখ্যক দেশ ও প্রতিযোগী আসবেন। অন্তত ৫০টি দেশ আসবে। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, কোনো ওলিম্পিকেই রেগেটা প্রেস সেন্টার আমাদের মত এত ভাল হয়নি। থকট ইন দ্য হিস্টরি অফ ওলিম্পিক গেমস।

হিসাব করে জানালেন, রেগেটার খেলোয়াড় ও কর্মকর্তা আসবেন ৬০০, সাংবাদিক ৩০০, আই ও সি ও অন্যান্য মোট ৫০০ এবং ট্যাক্সি ১০ হাজার। সর্বকছর জন্য ডিসেম্বরের আগে ফ্রেন্স রিহারসাল হয়ে গেছে। রেগেটার জন্য টিভি ও রেডিও স্টার্ট বিশেষ ব্যবস্থা করছে। এখান থেকেও সরাসরি টিভি রিলে করা হবে কিংবদন্ত। প্রেস সেন্টার থেকে খবরও যাবে মস্কোর মতই। বাস্তবিক বিচে আলদা কমপ্লেক্স হয়েছে, হয়েছে নতুন সুপার মার্কেট, নতুন রাস্তা, দুটি ব্রিজ, একাধিক ডিসপার্টমেন্টাল স্টোর, হোটেল, পোস্ট অফিস ইত্যাদি।

ওলিম্পিক শেষে আফগানিস্তানার স্পোর্টস-ম্যানদের হাতে সর্বকছর সম্পন্ন করা হবে।

আমাদের কথার মাঝে একটি টেলিফোন এল। টেলিফোন রেখে পল জানালেন, স্থানীয় রেডিওর দুই প্রতিনিধি আসছেন, তারা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। ইয়াটিং নিয়ে আরও আলোচনা হল। ইয়াটিং কীভাবে জনপ্রিয় হচ্ছে ক্রমশ। এই ক্লাবে সুযোগ সুবিধা বাড়ানো হলো যে তা সদস্য সংখ্যা তুলনায় খুশেট নয়। বোম্বাইয়ে ইয়াটিং কেমন চলছে জানতে চাইলেন।

বিপদে পড়লাম রেডিওর ওরা আসার। শুরুরতেই প্রচলিত ধ্যানদায়ক অশোককুমার কেমন খেলছেন। ওরা ভারতীয় হকি দলের নামও জানলেন। তারা মস্কো ওলিম্পিকে খেলবেন। তাতেও অশোক-কুমার রয়েছেন। ব্যাপারটা নিয়ে আমতা আমতা করা ছাড়া উপায় ছিল না। কেননা ডিসেম্বরে তো ঠিকই ছিল না ভারত চ্যাম্পিয়ন পর্বে খেলতে পারবে কিনা। জবাখিলাস কান্না এই তালিকা পঠিলেন। অনেকটা রায় না হতেই রামারমণের মত। জিলাসা করলেন, আর কোন ইজেক্ট কভরজ অংক নেবেন ইত্যাদি। এরপর এঁরাও এলেন আমাদের লোকসভার নির্বাচন প্রসঙ্গে। এঁদের যেতে চালাবার খেলার রিপোর্টার বলে। কিন্তু বেসভাষা ওরা আমাদের মাড়ী নম্রা জানেন। স্পোর্টস রিপোর্টার-এর আসে কোন্ কানগের কতদিন অন্য রিপোর্টার করতাই ইত্যাদি। আরও কয়েকটি প্রশ্ন

জবাব করে দিল। পশ্চিমবঙ্গে বামজন্ট কেমন করবে নির্বাচনে। আপনি তো প্রেসে এশিয়ার থাকেন, ওখানে কেমন হবে? শুরুরতে প্রশ্নটা বন্ধি। তারপর ব্যাখ্যা করার বুকলাম—আমাদের যাবৎপরে কমিউনিস্ট সমর্থক বেশী। কমিউনিস্ট মানে প্রেসে।

রেডিও ইন্টারভিউ শেষে বোরসে পড়লাম আর একটি অ্যাপারেশনমেন্ট রক্ষা করতে। ইনি মাটি মার্ক—ডাল্লিন ওলিম্পিক কমিটির আর এক প্রধান। মাটি মার্কের এই অফিসেই ১৯৭৬-এ ওলিম্পিক রেগেটার কাজ শুরুর হয়ে। তাকে নিয়ে তখন কর্মী ছিলেন ষাট জন। তারপর ৮ ও ১১। ১৯৭৯-র ৯ জানুয়ারি কর্মীর সংখ্যা বেড়ে হয় ১০০। এখন প্রায় ২০০। এরা সকলেই ফুল টাইম ওয়ার্কার। কিছু একবারে নতুন চাকুরে। বাকিরা অন্য চাকরি ছেড়ে ওলিম্পিকের কাজে এসেছেন। সরকার পর্যক ওলিম্পিক অ্যাঙ্ক অনুযায়ী চাকরি দিয়েছেন ওলিম্পিক দফতরে। ওলিম্পিকের সময় কর্মী লাগবে অন্তত ১ হাজার। ওলিম্পিকের পরে কিন্তু এরা বেকার হবেন না। বিভিন্ন অফিসে নিয়োগ করা হবে যোগ্যতা ও কার্যধারা অনুযায়ী।

মাটি জানানেন, রেগেটার প্রতিযোগীরা উনিশ জুলাইয়ের আগে এখানে আসবেন। কিন্তু মস্কোর লেনিন স্টেডিয়ামে ১১ তারিখে উদ্বোধন অনুষ্ঠানের মাঠ পাশে সকলকে অংশ নিতে হবে, তাই ওইদিন সকালেই প্রেসে সকল প্রতিযোগীকে মস্কো নিয়ে যাওয়া হবে। পরদিন ওরা তাল্লিনে ফিরে আসবেন। এ সব ব্যাপার, খরচ উদ্ভাটনাদে। তাল্লিনে প্রতিযোগিতা আরম্ভ ২০ তারিখ বিকালে।

মাটি-র কাছে জিজ্ঞাসার তেমন কিছু ছিল না। প্রতিযোগিতার নৌকালি সম্পর্কে জানালেন, এই প্রথম প্রত্যেক প্রতিযোগীকে নৌকা ও আনুষঙ্গিক সব সরঞ্জাম সরবরাহ করবে উদ্যোক্তারা। অর্থাৎ কোনো ওলিম্পিকে এ নজীর নেই। তবে প্রতিযোগীরা ইচ্ছা করলে নৌকা নিয়েও আসতে পারেন।

কালকের মত আজও লাগু খেতে চলছি বেলা কানিটনে। লাগুর পর আজ একটা ডেডলাইন, কয়েকটি ক্ষমতা দেখতে হবে। লেনিনগ্রাদের মত এখানেও খরচা সফর। শুরুরতে গেলাম ১৮৬৯ মাল যেখানে প্রথম এফগানিস্তান সংগীত সম্মেলন হয়েছিল। ৭০০ শিল্পী সেই উৎসবে অংশ নেন। তার ১০০ বছর পরে ১৯৬৯ মাল শতবার্ষিকী সংগীত সম্মেলনে অংশ নেন তিরিশ হাজার শিল্পী। শ্রোতা ছিলেন ২ লক্ষ। বিরাট খোনা মাঠ। একাধিক মঞ্চে মত করা, ছোট একটি টাওয়ারও বসছে। সংগীত সম্মেলনের সময় ওলিম্পিকের মত ওই টাওয়ারে মশলি জ্বালিয়ে রাখা হয়। পিটার দ্য স্ট্রেট স্পার্পিত কাউন্সিল পাক্স এসে নিরান আর্ট মিউজিয়মে আপনাকে যেতেই হা—প্রাচীন এস্টা-নিম্নাক জানতে হলে যেতে হবে ওপেন এয়ার মিউজিয়াম অফ রোকা আল মারে-তে। অভুলনীর পাইন গারের বন পেরিয়ে পিরিজা সমুদ্রসৈকত। গ্রীষ্মে সারা পৃথিবী থেকে অসংখ্য মানুষ আসেন এই বাসুমল বিচে রোমের উপভোগ করতে। আমাদের দীর্ঘা, পুরীকে এর সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়। পুরীর সঙ্গে একটাই মিল পাবেন। পুরীর অদূরে দেখা যায় প্রতি সকালে অসংখ্য দীর্ঘা মাছ ধরতে চলছেন, পিরিজা সারাদিন ধরে দেখবেন ধরে ধরে নৌকা চলছে ট্যাক্সিদের নিয়ে সমুদ্রের উপভোগ করতে।

বেড়ানো সেরে চলে এলাম বাক্স জিমনার্সি-হাউস। কলকাতায় সারা বছরের জন্য চালু বাক্স রিং বলতে বাক্স ওয়েলিংটনের এস ও পি সি। কিন্তু এখানকার কলসেরের জন্য বাক্স জিমনার্সিমা দেখলে মাথা হয়ে যায়। লিওনার্ডের আগ্রহে ওখানে গেলাম। ওর এগার বছরের ছেলে এই রিপাবলিকের আন্তর্জাতিক চ্যাম্পিয়ন। তাছাড়া এই জিমনার্সিমাটি স্কুল ছাত্রদের জন্যই নিষিদ্ধ। হলের মধ্যে আটটি



রিং। এমিক ওমিক ওয়েট ট্রেনিং-এর মতো বলসম্পন্ন।  
 হুই প্রাকটিক্স চলছে আসামা হুইট সিং-এ। সব  
 খিলিরে হুই চই ব্যাপার। সন সময়ের জন্য ডাক্তার  
 রক্তেরন দুজন-আখাত কলসে পিঁকসের জন্য।  
 প্রতিটি ছেলের জন্য প্রতিদিনের পৃথক পৃথক চার্ট,  
 আলানি আলানি খাবা ভাঙ্গিকও।

৯৬ খিলিট এখানে কাটিয়ে দূত চলার  
 ডায়েরি-এ পি এন হেডকোয়ার্টারে। তখন অমিক  
 হুইট হারে গেছে। লিওনার্দোই লরকা বলেছেন।  
 খবর পেয়ে এসেন এ পি এন-এর বুয়ে চিক  
 কল হেলেমে। এসেন এসের আরও দুজন সংবাদ-  
 দাতা। মোট ছজনকে নিয়ে টি পলিট। লিওনার্দোই  
 চা কানির পরিকল্পনা করলেন। সুবিধা হল  
 আরমেনের। এ পি এন মস্কোর সঙ্গে এখান থেকে  
 হুটলাইন রয়েছে। উনি জানলেন কাল ভোরেই  
 আমরা মস্কো পৌঁছাইছি। জেনে নিলেন কোয়ার কি  
 প্রোগ্রাম রয়েছে। একটি সূক্ষ্ম দিলেন। আমাকে  
 লক্ষ্য করে বললেন, সেরিভরেট সরকার আপনার  
 মস্কো প্রমাণ দুদিন কাড়িয়ে দিয়েছেন। আরমেন  
 যখন কোন কলসেন, তখনই লিওনার্দোর একটি  
 ফোন এল তার বাড়ি থেকে। ওর ঘরে জিজ্ঞাসা  
 করছে, ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অফেন্স কোয়ার। ওর  
 শুলের শিককারা বুজছেন। লিওনার্দোর ঘরে  
 আজ ওর শুলের উসেবে শাড়ি-ব্রাউজ আর অজমার  
 দেওয়া। বৈশেষ চুড়ি ও হেরারক্লিপ পরে গিয়েছিল।  
 শিককারা চুড়ি আর হেরারক্লিপ কিনতে চান।  
 অনুরোধ কলকাতায় ফিরে যেন কিছ পঠাই।

বিশেষে আমাদের র-সিলেক্টর কদর হবে। কয়েকটি  
 দেশে সোনার অলঙ্কার বেশ আদৃত। কিন্তু কমরামী  
 হ্যাণ্ডিক্রাফটসেরও জেদ হয় খুব চাইয়া রয়েছে।  
 অন্যতম সোঁতেরেট দেশে এসে তাই মনে হল।

এ পি এন অফিস থেকে সোজা হেডটেল। সংগে  
 এসেন লিওনার্দো। দূত হুইগলোর ক্যাপসান করে  
 দিলেন। ধন্যবাদ জানিয়ে ডাক্তারকত ঘনে ঢল  
 গেলেন। আমরাও দূত গাড়িতে নিলাম। রাতের  
 ট্রেনেই মস্কো রওদ হতে হবে। ইন্টারনেট গিরে  
 পান্সপোট সংগ্রহ, সেইসাথে করে ট্যাঙ্ক ধরলাম।  
 বড় ব্যাগ লাগাভল হই চই করা মানুটি লিওনার্দোর  
 জন্য। অমন সন্দী থাকলে সব সময় সজীব থাকা  
 বর। দুদিনের জন্য তারিফে এসে এই শহরটিকেও  
 ভালোবেসে ফেলছিলাম। জানি না আর কোনোদিন  
 এখানে আসার সৌভাগ্য হবে কিনা। নই বা এলাম,  
 কয়েকটি কথা কেনোদিন ফুলব না-

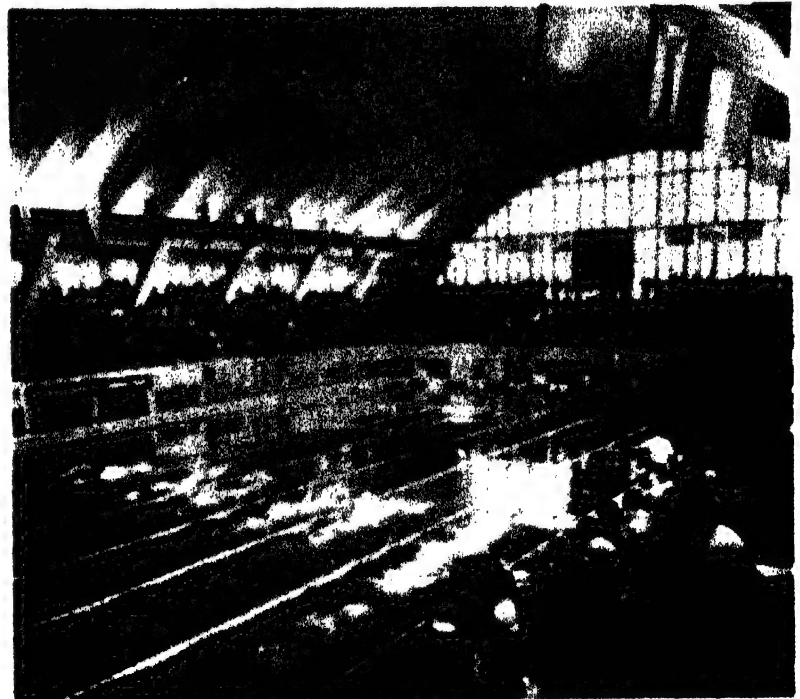
‘তাল্লিন ইজ এ ব্রেলিওর জন্ম দ্য সি। তাল্লিন  
 ইজ এ পোরোটিফল কলেকশন অফ টাইল্ড বুকস।  
 তাল্লিন ইজ এ ম্যাডিক কিংডম অফ হোরাইট  
 নাইটস।’

তাল্লিন রেল স্টেশনে একটি অভিজ্ঞতা হল।  
 ১৮০ বুকেরা কলে ডলার পাওয়া যায় ৬৪টি।  
 কিন্তু ডলারের কল এখানে সম্ভবত বেশ। আরমেন  
 গেছেন রাতের জন্য কিছু স্ম্যাকল আনতে। হুইট  
 মেয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন ভাঙ্গা ইংরাজিতে-  
 আমি বিদেশী কিনা। বিদেশী, জরতীর শব্দে ওরা  
 ঢলে গেলেন। এরপর আর দুজন এসে জিজ্ঞাসা  
 করলেন আমার কাছে ডলার আছে কিনা। না, ডলার  
 কোয়ার পাৰ। আমি আপনার পেন্সিট। এবার আর  
 একজন বললেন, ওলিম্পিক করেন দেখিয়ে, ডলার  
 দিলে এই করেন দিতে পারি। খুব কাছে এসে  
 গোপনে ওরা এসব করছিলেন। ঠিক চোরপাতিতে  
 যেমন কানে কানে এসে বলে-বিদেশী সেট, কলাম  
 আছে নেবেন নাকি? তবে চোরপাতি এদের সঙ্গে  
 বোধ হয় কিছুটা পার্থক্য আছে। কয়েকটি আমাদের  
 দশ পয়সা, পঁচিশ পয়সা ও পঞ্চাশ পয়সা দিলাম।  
 লজ্জা পেয়ে কিনা জানি না ওরা দিলেন একটি  
 ওলিম্পিক করেন।

ট্রেনে অজ্ঞাত দুই সিন্টের কুপ পেয়ে গেলাম।  
 আরমেন বললেন, বেশী রাত করার দরকার নেই।  
 ডায়েরি লিখে-বুঝিয়ে পড়ুন। লকসে মস্কো  
 পৌঁছাব। হোটেল কাওয়ার আগেই হর তো আমাদের  
 প্রোগ্রাম পড়ে হবে।



সেরেদের বৈশেষ চুড়ি ব্যান্ড বসলের হুইট



সব দুইদিন খুব ট্রেনিং চাল



কর একই ভিলেজের। বর্তমানেই ভাড়াভাড়ি করে একটি উল্লার। স্নান হাড়া সব কিছুই টেনে সরিয়েছে। টেনে থেকে নেমে একটিও সন্মর থাকবে না—কিন্তুই আরম্ভের। ভাড়াভাড়ি ওঠার হুন্ দেলের কলকল শব্দ আর লুপোয় হল। জাহাওরা বেশ কলকল, কলকলার পদ। তুলে দিলে বের্কাই। কলকল বের্কাই এক প্রস পল্লব কিলোমিটার। কিলো কল কলই টেনেই মল্লব শূন্য হার গেছে। কলকলকলার ইতি ওখানে। শূন্যের আগে অনেক কলকল কলকলার ছিল। কিন্তু আশান থেকে কলকলকলার হুন্ সরানো হচ্ছে এখন—পরিবেশ বাতে শূন্যই না হয়। এখান থেকে সান্টিস্টের বিল্ডিং করে গিয়ে। ওদের ভবন এগুলো এক একটি ভিল্ডিং। এক বা দুই কিলোমিটার গেলে আবার এ রকম একটি ভিল্ডিং। সেখানে বাজার, স্কুল, হাসপাতাল সবই আছে।

মস্কোর শৌখিনের সময় নটা দশ মিনিটে। আরম্ভের তো এখন স্নেনও সন্মর মত ছাড়ে না বা শৌখিন না। এখানে কিছু টেনেও অমনটি হয় না। ঠিক নটা দশ মিনিটে মস্কা স্টেশনে টেনে থামল। প্রাটফরমের গারেই গাড়ি বার্ডিরছিল আমদের জন্য। স্টেশন থেকে সোজা চললাম পুস্কিন স্টেশনগারে এ পি এন অফিসে। আরম্ভের বললেন, কিছু স্রষ্টিকাগ অছে আপনার। এই কদিন রেডিও, টিভি-র আর তো বেশ ছিলাম। তা হাড়া বাতারাও, বাওরা সবই এদের। খরচ বলতে নিজের জন্য কিছু কিনলে। আর এ পি এন-এর একটি লেখার জন্য সাড়ে তেতাল্লিশ রুবল পেলাম। পেলাম একটি ওলিম্পিক করুন—একটি রুবল। তবে টাকা পরলার ব্যাপারে আমদের অফিসের মহীমবাহর সঙ্গে এখানকার এ পি এন-এর মহিলা ক্যাশিয়ারের তুলনা করা যায়। আমার মথটা দেখে, ভারতীয় কিনা (হিন্দি কথা শুনেন) পরীক্ষা করে তবে রুবল-গুলি দিলেন।

এবার আমদের লন্ডনকালীন সোভিয়েট ভ্রমা বিশ্বের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক খেলার পত্রিকার জাকিন। এর আরম্ভ 'প্রভা' জাকিন দেখেছি। দেখেছি ঠিক ইউনিয়নের পত্রিকা তুস-এর জাকিন। 'মস্কো সপ্তক' সংক্ষেপে জানাই—একটি রাস্তার ঘেরে ওর বিরাট বাড়ি। ওখানে কিছুদিন ধরে ট্রাফিক জাব হাছিল। দুশ-তিনশ মিটার জায়গা চাই জাম করতে। তবে তার জন্য বাড়িটি ভাঙতে হবে। এঞ্জিনিয়াররা বললেন তুস-এর বাড়ি ভাঙতে হবে। স্বপতিরা জানালেন, ভেঙে রাস্তার জন্য তিনশ মিটার জায়গা দিবে এবং মতুন বাড়ি করতে ছমাস লাগবে। তুস কত পক্ষ বললেন, তা হতে পারে না। অতদিন কাগজ বন্ধ রাখা অসম্ভব। কাগজ হবে বেশী হলে এক সত্তাহ বন্ধ থাকতে পারে। এঞ্জিনিয়াররা এরপর বললেন, তাই-ই হবে। তুস-এর বাড়ি ভাঙা হয়নি। তিনদিন ধরে বাড়িটিকে তিনশ মিটার ধরে সরিয়ে নেওয়া হয়। ওই তিন দিন অবশ্য কাগজ বের হয়নি। বরফের ভেতরে কাটকে ঢকতেও দেখা হয়নি। তিনদিন টোল-ভিনানে সারা দেশকে দেখানো হয় কিভাবে তুস-এর বাড়িটি আস্তে আস্তে সরে গিয়ে ট্রাফিকের জন্য জায়গা করে দিচ্ছে।

হারণা ছিল, এদেশে খবরের কাগজ বলতে ওই প্রভা আর ইজ্জতস্তরা। আর কোনো পট-পত্রিকা এদের নেই। এই কদিনেই সে তুল ভেলো গেছে। কত দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক আর মাসিক পত্রিকা অছে কে জানে।

প্রভা বোরোর ভোরবেলা। ছয় পৃষ্ঠার কাগজ। একটি লাইনও বিজ্ঞাপন থাক না। দাম তিন কোপেক। প্রচার সংখ্যা এক কোটি দশ লক্ষ। 'ইজ্জতস্তরা' বিকালে ফেরার। প্রচার সংখ্যা এক কোটি দশ লক্ষ। ছয় পৃষ্ঠা। দাম তিন কোপেক। সাকুলেশন সব চেয়ে বেশী তুস-এর। চার পৃষ্ঠার কাগজ। দাম দুই কোপেক। বিভিন্ন প্রতিদিন এক

কোটি কুড়ি লক্ষ। সবগুলিই আর্থনিকতর ফোটে অকসেসেই হাণা। অনেকেরই জানা প্রভা আর ইজ্জতস্তরার একটি পাঠির মতপন্থ, অন্যটি লরকারী মতপন্থ। আর তুস তো ঠিক ইউনিয়নের কাগজ। কিছু জামত ব্যাপার পাঠির লরকার ও ঠিক ইউনিয়নের কাগজেও খেলার গরুঘটা কোনো অংশ কম নয়। মাথো যতক মনে হবে এগুলি বড়ি খেলার পত্রিকা। চেষ্টা জিকটে বা কুটিলের বড় খেলা থাকলে জামরা আনন্দবাজারের যা কার, ঠিক ডেবনি জামরা। ওলিম্পিকের খবর তো গভ চার বছর ধরেই প্রতিদিন বড় বড় করে দিবে চলছে। রেজল সামান্যত আঠার ভাগ জুড়ে খেলার খবর থাকে।

এই সব কাগজ এখন এই করছে খেলার পত্রিকা তা হলে কেন? খেলার দৈনিক সোভেৎস্ক স্পোর্ট-এর দফতর পেছের মাথা শূন্য হিগল। আমার মত সাধারণ একজন রিপোর্টারের জন্য ওদের আগ্রহ দেখে অবাক হলাম। এডিটর ইন চিফ নিকোলাই কিসলেভ সন্মাল থেকেই তার ইন্টারন্যাশনাল জেক্সের ভারত কিশ্ববজকে নিয়ে অপেক্ষা করছেন। বলা বাহুল্য। তিনি বছর পশ্চিমের এক ডরশী। চমককার ইংরাজি জানেন। আমাদের দেশের খেলা-বলা তার নখদপণে।

কিসলেভ-এর কাছে তাঁর কাগজ সম্পর্কে নানা তথ্য জানলাম। ১৯২৪ সালের জুলাই-র সোভেৎস্ক স্পোর্ট প্রথম বের হয় তখন ছিল সাপ্তাহিক। রোটারিতে হাণা হত। হ্যাণ্ড টাইপে কম্পোজ হত। এখন সোভিয়েটের ওটিটি শহর থেকে একই বছরের এই পত্রিকাটি বের হয় প্রতিদিন সন্মালে। আরম্ভের আনন্দবাজারের সাইজ। তবে মার্স চার পৃষ্ঠা। একটিও বিজ্ঞাপন থাকে না। দাম দুই কোপেক। গড় সাকুলেশন পঞ্চাশ লক্ষ চাকলশ হাজার। সব রকম খেলার খবর থাকে দেশ-বিদেশ-পর। বের হয় বিভিন্ন শহর থেকে এদেশের বিভিন্ন রিপাবলিকের (অর্থাৎ স্থানীয়) ভাষায়। মস্কো থেকেই চৌদ্দটি শহরে প্রেরণা যায়। পশ্চিমটি শহরে যায় ফোটা ট্রান্সমিশনে। নরটি শহরে যায় রাট-স্নেনে। মস্কোর 'হড কোয়াটার' ফোটাগার সহ সাংবাদিক দেড়শ জন। এবং এদের মধ্যে মেরের সংখ্যা প্রায় অর্ধেক। এডিটর-ইন-চিফ কিসলেভের ঘরে বিরাট কনফারেন্স টেবলে কথা হাছিল। এক কোণার তাঁর টেবলে ছোট একটি বক্সের দিকে ঘন ঘন তাকাছিলাম। পরে জানলাম ডেবিশটি শহরের ব্যুরো চিফদের সঙ্গে যোগাযোগের যন্ত্র ওটি। এক থেকে ডেবিশ নম্বর রুছে। নব টিপই উনি কানেকশন শেষে যান। তারপর প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলেন। ডাসকন্ড, ব্রাডকাস্টক প্রভৃতি শহরের ব্যুরো চিফদের থেকে তাঁদের সঙ্গে আলোপও করিয়ে দিলেন। ভাবছিলাম নাইট জিও টিভিও আমরা কারার রিসোড, লালবাজার কন্স্টো পেতেই কেনম গলদবন্দ্য হই।

বিজ্ঞাপন হাড়াই আপনাদের কাগজ চলে? লোকসান হয় না? —না, লোকসান হবে কেন? চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রাটকে ডেকে হিসাব নিয়ে বললাম, প্রতি বছর আমাদের লাভ আট মিলিয়ন রুবল। কিসলেভ গর্ব করে বললেন, পৃথিবীতে এত সস্তায় আর কোনো হাড়া দৈনিক পাঠন না।

বিজ্ঞাপন নেন না। না—পান না? বললেন, মস্কোর কাগজে বিজ্ঞাপন থাকে। কেন না প্রচার সংখ্যা এত নয়। তবে কোনো বড় কাগজেই বিজ্ঞাপন থাকে না। প্রথমত তাদের বেশ লাভ হয়। শ্বিতরিত আমদের সমাজবাবস্থার বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটিকে তেমন উল্লেখ দেওয়া হয় না। উদাহরণ দিলেন—বরুন, আপনাদের দেশে চারটি কোম্পানী ধরে মাথার জন্য চার রকমের সাবান বের করল। প্রত্যেকেই বিজ্ঞাপন দিল 'আমারটাই সবার সেরা। সেরা বা সবার সেরা তো একটিই হয়। চারটি হতে পারে? অর্থাৎ জনসাধারণকে ওরা চাটছেন।



চীফ সাংবাদিকদের অন্তর্ভুক্তিক সভালগ্নে—ওরাই সোভেৎস্ক স্পোর্ট-এর প্রথম সম্পাদক নিকোলাই কিসলেভ।

আমাদের জো সবই স্বাভাবিক, একমুখে এই ধরনের প্রস্তাবনা দেই। তবে, কেবলমাত্র নতুন জিনিস বেরিয়ে আসিয়ে নেওয়া হয় তার নাম, যথাযথ ইত্যাদি। যার বৈশিষ্ট্য পূর্ণ, জিনিস জেগে উঠেছে।

এদের ধরনের কাগজের কয় দান হওয়ার আর একটি কারণ সত্যের নিষ্ঠা। আমরা আমবাণি করি অনেক দান। এরা কিছুকালের ভিত্তি নিষ্ঠা প্রতি ব্যবহার করে জো করেই স্বাভাবিক করে প্রচার। প্রতি টন সোভিয়েট নিষ্ঠা প্রচারণার দান এখন একশ সত্তর হওয়া। ওদের বেশির অংশে একশ সত্তর টাকা। ভারতীয় হাজার হিসাব করলে এক টনের দান পড়ে ৮ হাজার টাকার টাকা। অভাববীর।

চৌদ্দশটি প্রধান শহর থেকে এই কাগজটি বের হলেও বিভিন্ন শহরে একাধিক খেলার সাপ্তাহিক, পাকিস্তানি খেলার সাপ্তাহিক জারি। স্থানীয় সাধারণ পাকিস্তানি খেলার খবরের পূর্ণ সন্ধানিক। দ্বারা একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সাবস্ক্রিপশন লক্ষ্যিক। খেলাধুলার যে প্রতিটি পর-পত্রিকা রয়েছে তারা দেশে, তার আচারটি বের হয় বিভিন্ন রিপাবলিক থেকে। খেলাধুলার নিয়ে প্রতি বছর যে সব এই বের হয় তার প্রচার সংখ্যা প্রায় এক কোটি। এর থেকে দেখে বার জনসাধারণ খেলাধুলার কত আগ্রহী। পাকিস্তানি সোভিয়েট স্পোর্ট কত পক্ষ প্রতি সভায় দুটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। একটি দ্বারা নিয়ে, অন্যটি কুটিল ও হাক সম্পর্ক। কিছুকালের খেলাধুলার সন্তোষ একটি পাকিস্তানি পত্রিকাও বের হয় এই দিকের থেকে।

স্পোর্ট অ্যান্ড ফিজিক্যাল কালচার নামে আর একটি পত্রিকার সাবস্ক্রিপশন প্রায় পঁচ লক্ষ। আলাদা পত্রিকা আছে আফগানিস্তানের এবং স্পোর্টস সারেসেরও।

আপনাদের দেশে খেলাধুলার উন্নয়নে পর-পত্রিকাদ্বারা কি কি করে? একে একে বললে, কিসেলেভ : প্রাচুর্য প্রতি বছর কশি শ্রেণীর আগ্রহজন করে সারা দেশ জুড়ে। হাজার হাজার প্রতিযোগী এতে অংশ নেন। আইস হকির একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা করে ইজর্ভেস্টার। গ্রিম্যানস্টকস ও ফিলার স্কোটিং এর প্রতিযোগিতা হয় মস্কো নিউজ-এর পৃষ্ঠপোষকতায়। আন্তর্জাতিক একটি সাধারণ আগ্রহজন প্রতি বছর কসমোল-লস্কোয়া প্রাচুর্য। এয়ার স্কোটিং প্রতিযোগিতার হেলিকপ্টার ছিল সাউথমিলি হাজার। এরা সকলেই সাত থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের। বারো ভাল করে—তারপর পায়নো হয় স্পোর্টস স্কুলে উত্তর র্যোঁন এর জন্য। মস্কোর যে সাপ্তাহিক রিক অফ, তা কিশোর কলা হচ্ছে। কম বয়সীদের এই প্রতিযোগিতাটি করে সোভিয়েট স্পোর্ট। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল স্কোটিং এর উন্নতি করা। কিন্তু সারা দেশ থেকে এত ছেলেমেয়ে আসা শুরু, করেছে যে মূল অবস্থা হয়েছিল যে পরপর পঁচটি রিববারে এমন অবস্থা হয়েছিল যে পরপর পঁচটি রিববারে টুন, ট্রান্স করতে হয়েছে। হয়েছে কোল্লাইকাই টুন, স্পোর্ট প্রতিযোগিতা হয় মস্কোয়। প্রতিযোগীদের বাড়ার দ্বারা খাবার ব্যবস্থা সবই করে এই পত্রিকা। কিন্তু ক্রমশ প্রতিযোগিতার আকার বাড়ছে, তাই পত্রিকা কত-পক্ষ জনসাধারণের মজবুত করেছে কীভাবে বৃদ্ধাকারজনিক সমস্যার সমাধান করা যায়। সোভিয়েট স্পোর্ট-এ গ্রাম-এর উপর নিয়মিত একটি কলম বের হয়। গ্রামকে হৃদয়ের রক্তচাপের দ্বারা বলা হয় এরা আবিষ্কার করেন। প্রতি বছর যে মাসের প্রথম রিববারে সারা দেশে পৌঁছ দিবস উদ্‌যাপিত হয় এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। যারাবলি এবং পূর্ণসাধারণ নাম প্রচারের পৌঁছের আয়োজন করেন।

ইন্টারন্যাশনাল ডেস্কের রিপোর্টার তরুণীটি জিজ্ঞাসা করলেন, ভারতের পত্রিকাদ্বারা, তার অবদান কেমন খেলার জন্য। বজালার, ভারতে খেলার জন্য

# Советский Спорт

2

СОВЕТСКИЙ СПОРТ

СРЕДНЕГО ПОСЛА

СРЕДНЕГО ПОСЛА

СРЕДНЕГО ПОСЛА

ТРАДИЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТСКИЙ СПОРТ

## ШУНЯТ СНЕЖНЫЕ ТАРУСЫ

В этот раз мы расскажем о том, как в Советском Союзе организовано зимнее катание на коньках. В последние годы в нашей стране наблюдается огромный интерес к этому виду спорта. В городах и селах строятся ледовые катки, на которых люди наслаждаются катанием в зимние месяцы. Это не только увлекательное занятие, но и отличное средство для укрепления здоровья и физической подготовки. В нашей стране есть много талантливых конькобежцев, которые участвуют в международных соревнованиях и приносят нашей стране высокие достижения. Мы гордимся ими и надеемся, что в будущем они достигнут еще больших успехов.

## А ПОЛЯНЕ

В этой статье мы расскажем о том, как в Советском Союзе организовано лыжное катание. Лыжи — это популярный вид спорта, который способствует развитию выносливости и силы. В нашей стране есть много талантливых лыжников, которые участвуют в международных соревнованиях и приносят нашей стране высокие достижения. Мы гордимся ими и надеемся, что в будущем они достигнут еще больших успехов.

## КОМАНДНЫМ СПОРТОМ

В этой статье мы расскажем о том, как в Советском Союзе организовано командное катание на коньках. Командное катание — это увлекательный вид спорта, который требует слаженной работы и высокой скорости. В нашей стране есть много талантливых командных конькобежцев, которые участвуют в международных соревнованиях и приносят нашей стране высокие достижения. Мы гордимся ими и надеемся, что в будущем они достигнут еще больших успехов.



Киселевский сформировал команду для участия в международных соревнованиях.

Повторяю, что в нашей стране есть много талантливых конькобежцев, которые участвуют в международных соревнованиях и приносят нашей стране высокие достижения. Мы гордимся ими и надеемся, что в будущем они достигнут еще больших успехов.

Аналогично, в нашей стране есть много талантливых лыжников, которые участвуют в международных соревнованиях и приносят нашей стране высокие достижения. Мы гордимся ими и надеемся, что в будущем они достигнут еще больших успехов.

Вот так, шаг за шагом, мы развиваем наш спорт. Мы создаем условия для тренировок, привлекаем талантливых спортсменов, организуем соревнования. И в результате мы получаем отличные результаты. Мы гордимся нашими спортсменами и надеемся, что в будущем они достигнут еще больших успехов.

Киселевский сформировал команду для участия в международных соревнованиях.

Повторяю, что в нашей стране есть много талантливых конькобежцев, которые участвуют в международных соревнованиях и приносят нашей стране высокие достижения. Мы гордимся ими и надеемся, что в будущем они достигнут еще больших успехов.

Аналогично, в нашей стране есть много талантливых лыжников, которые участвуют в международных соревнованиях и приносят нашей стране высокие достижения. Мы гордимся ими и надеемся, что в будущем они достигнут еще больших успехов.

Вот так, шаг за шагом, мы развиваем наш спорт. Мы создаем условия для тренировок, привлекаем талантливых спортсменов, организуем соревнования. И в результате мы получаем отличные результаты. Мы гордимся нашими спортсменами и надеемся, что в будущем они достигнут еще больших успехов.

Вот так, шаг за шагом, мы развиваем наш спорт. Мы создаем условия для тренировок, привлекаем талантливых спортсменов, организуем соревнования. И в результате мы получаем отличные результаты. Мы гордимся нашими спортсменами и надеемся, что в будущем они достигнут еще больших успехов.

তমসো মা জ্যোতির্গময়

অভিজাত  
হাল ফ্যাশনের  
টুডায়

জাল গ্রেস  
ফ্যাব্রিকস

নিবেদন করছেন

১৪

SUN GRACE  
FABRICS

জাল  
ফ্যাব্রিকস  
অভিজাত  
জাল গ্রেস



ক্যাথড্রালে সমুদ্র-  
পক্ষী রানা দাস

[illegible]

“ঐ ভো! এসে পড়েছে।” সম্ভবত তরুণ-  
বাবুরই স্বকৃত-সম্ভাষে আদ্যেবের প্রতীক্ষার ফলে  
পড়ল। কিরকল তখন চারটে এলিশন হবে, সেন্ট-  
জা রূপার মেগে দীর্ঘকাল এগ সাহেবে আদ্যেবের  
প্রাথমিক নজর কাড়লেন। পরনে লালরঙের সিল্কেন  
ট্রাউজার, সাদা জামার ওপর কালো রঙের কোট,  
মাথার টাঁপি। তার হাতের ছড়ি ঘোরানো আঙ্গুলের  
সঙ্গে সেই মুহূর্তে আরো কোন অন্যক কুইস-  
ওয়ারে বিস্তারিত পছন্নার তেমনি তাকাল। অনুসরণ-  
কারেবের সঙ্গে নিয়ে অভিব্যব আঙ্গুলক বায়া দুর-  
করলেন কোলিঙ্ক্যাল রেজেন্ট নিক। তার এই  
আবির্ভাব ক্যাথলিকান ব্যাপ্ত নারিকবের দৃষ্টি-  
গোচরে এনে বেবাবর রক তার শবে বেবে উঠল  
কিউলার। সেখের উল সেন্ট পলস ক্যাথলিক্যাল চার্চের  
চুড়ো, সেখের তখন রজিব মন্তে সম্মিত ত  
গুড়াবাক দাড়িয়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টি  
কারির কিন্তু বিকোপে গলার কোলানো ভ্রমে নক  
তলে সন্তস্ত অভিব্যক্তিতে আভাসিত এগ মূবতী  
বোরেবর এলো আকাজেব থেকে। সব মিলিয়ে  
মুহূর্তের মধ্যেই চোখটানো কান্ড। থরক বাওরা  
গাড়ির আরোহীরা নেমে পড়েছেন রাস্তায়। রান্না-  
হাটের বায়লস মুটপারের জুতো পালিশগাররা  
হাতের বহুশ গিরেছে ঘোমে, মূবতী বাবটিও  
হতবাক। অনন্য আরোজনে অভিব্যব গলার সম্মিত  
মুটিংমান বিশ্বর অনুসরণ করে অপ্রস্তুত নকবের  
ভিড় ডাকবে ক্যাথলিক্যাল চার্চের উদ্যানে ঢুক  
পড়েছে।

বিশ্বকরের পরিলক্ষিত তখনো নয়। বরং  
কৌতূহলকে উপেক্ষা করে এমন জন্মোৎসবের সেখানে  
কৌতূহল হল 'ভেতরো' তসুকাকিন' নাট্য সংস্থার  
প্রযোজিত 'আলমবার্গার' মূর্ত অভিনয়। নামের মধ্যেই  
ইংলিশ পাওরা যাকে 'ভেতরো তসুকাকিন' এ  
বিশেষভাবে নাট্য সংস্থা নয়। বরং ইটালীর  
মিলানো থেকে মাত্র কয়েকজন জন এরা উড়ে এসে-  
ছিলেন এদেশের মার্কিটে। কলকাতার পৌরস্ব  
কমিশনার জনা এদেশে আকাজক, রবীন্দ্র সেন বা  
কালোমিকরের খেঁজ নিতে হরিন, কারন ভদ্রনাথ  
তসুকাকিনে তাদের এই পার্বালি ম্যোরে জন্ম হয়  
নয়, হুজাকিনে বিনামূল্যে বাস্তব পরিবেশ ও পরি-  
মিতিকাজ (শুধু উপস্থাপন) বলেই হয়ে করেন, জা  
মার) আকাজক আলোকবস্ত্র ব্যবহার করেন।  
সেই হেতু 'আলমবার্গার' অভিনয় কাকাজ্ঞাল মজের  
দুর্ভাগ্য-পরিচয়-ভিতর-মাকিনেই শুধু নথিবাক রইলো।  
যা, মজের মজের একটা অংশেও কিছুমাত্রের জন্ম  
বিশুদ্ধ হল। আসলে আলোজ্ঞা পারকাকাজ্ঞাল নানা





করতে পারে, তেমনি এর লক্ষ্য লক্ষ্যকে কেনো এক্ষণে জন্মে যেতে না-সেওয়ার। ফলত নাট্য-কাহিনীর প্রতি টান ছাড়াও অংশগ্রহণকারী অভিনেতা অভিনেত্রীদের শারীরিক কসরভঙ্গিমা মার বোকাভাবে আশ্চর্য্যাবৃত হয়ে উপস্থিত বর্ষককেও লচল আগ্রহে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হয়। প্রসঙ্গত, যেটা উল্লেখ করার, তেরায়ো তস্কাবিলের একটি অনুষ্ঠান আলাদাভাবে উপভোগ করতে হলে যে-কোনো লক্ষ্যকেই তার প্রাণীভূতনা মনোমালি দিয়ে এক-যোগে 'দলবন্দ' হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

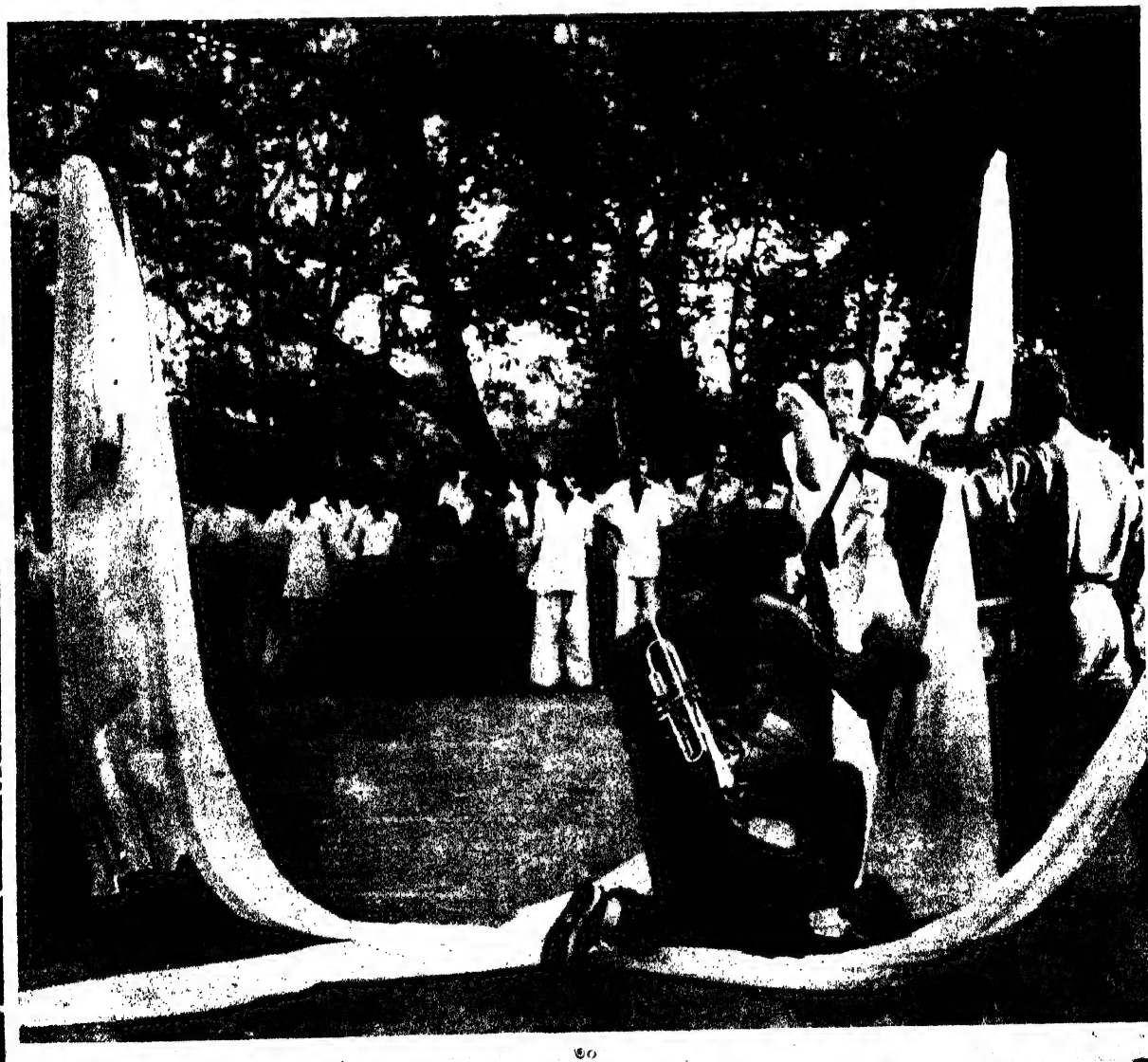
মোলায়েম সাহা হাশালা পরিহিতা হুশোম ও মলপাহীন একজন মহিলা শিল্পীর ভীত সন্ত্রস্ত কুমারী আলবায়ালের (সামুদ্রিক গন্ধ) ভূমিকার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বোম্বলোর ও কোলকাতার অনুপ্রাণিত আলবায়ালের অভিনয়ের সূচনা। পর-হুহুতে রনপার হাফানো চারজন অভিনেতার অত্যন্ত আকর্ষণ প্রতিহত করতে না-পেরে অলহার কুমারী পাণ্ডিটি কথী হয়। অন্য পাশ থেকে তখন আলবায়ালের হুশোম পেরা আরেকজন অভিনেতা রনপার হুহুতে এসে প্রাণত আকর্ষণকারীদের হাত থেকে বসিন্দীক উদ্ধার করেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই অভিনয়ে সাময়িক ছেদ পড়ে। শূন্য হয়ে প্রদর্শনী

হওয়া-সময়ে, শিল্পীরা মনোমালি দিয়ে এক-যোগে হুহু হাফিরে ছিটিয়ে উপস্থিত বর্ষকদের কাছে উঠা করেন। বাটের থাকে কুল। বর্ষকের মনে যেমন সামর্থ্য বা ইচ্ছে পরলোভি দিয়ে এক একটি কুল ফুলে নেন। দাড়া ও প্রহীতার মধ্যে এই লুপ্তে পরস্পরিক সৌমন্দ্যের একটা সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যায়। এই সময় শিল্পীরা একান্ত ও অরলম্বোর খেলার শারীরিক কসরও দেখিয়ে এই ধরনের পর-ফরম্যাসের জন্য উপস্থিত একজন শিল্পীর প্রত্যক্ষসমীচন, শরীর নিরন্তরে দক্ষতা ইত্যাদির কিছু প্রমাণ দিয়ে হঠাৎই আবার নাট্যকাহিনীতে ফিরে আসেন। 'পরবর্তী' পর্বের হুশোমলোভিত কাহিনী দানা বেধে অংশগ্রহণকারী চরিত্রগুলোর প্রেম ও প্রভাবপার। সব শেষে আকর্ষণের প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও হুহুচরিত্রের হাতে একজন আলবায়ালের বন্ধন করণ হুহু হুহু। বিকৃত অঙ্গল থেকে তখন বাতী আলবায়ালের পক্ষ বিস্তার করে তখন প্রকৃষ্টান জীবন ও সন্তোষের জ্ঞান দেয়। একই সঙ্গে বাতিল ও সুন্দর, নির্মম ও মধুর রস সমাশ্বিত 'আলকাটি' অভিনয়ের কাব্যিক পরিসমাপ্তি এখনেই।

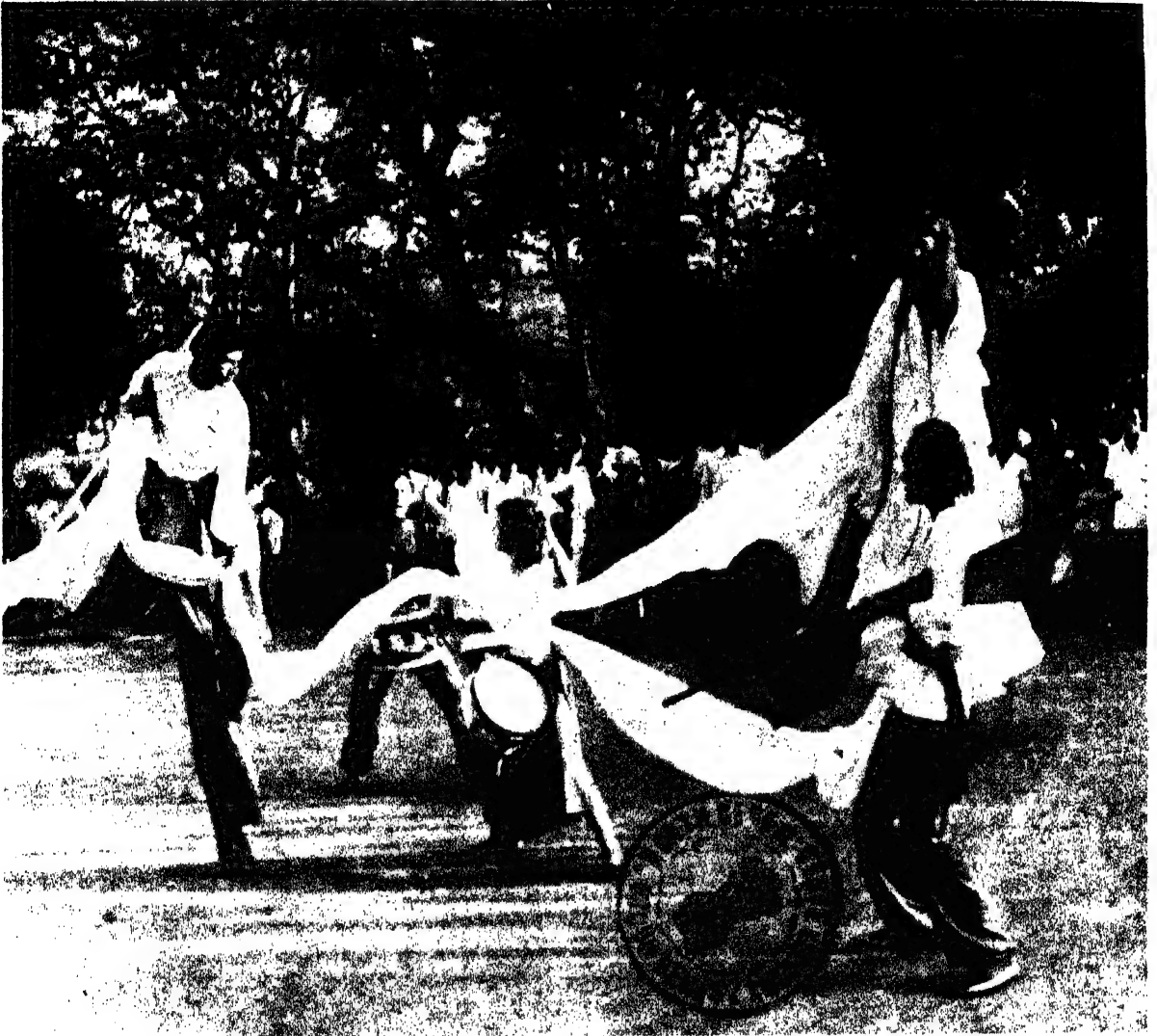
তেরায়ো তস্কাবিলের বর্তমান অভিনয়ালম্বা মল্লপ সমস্তের জন্য হলেও এর প্রতিটি মুহূর্তে চাপা উত্তেজনার ভরা। নিবর্তিত কাহিনীর অভিনয়-

শিল্পীর আলাদা লক্ষ্যের জন্য দলবন্দে অন্য লক্ষ্যকে জাননো হতে বের না। লক্ষ্যীত, লুপ্ত ও লুপ্তের সূচনায় প্রতিটিবার উপস্থাপনার সমস্ত বিষয়টি অতি হুহু স্থাপ্যিত। বার প্রতি একবার আগ্রহ প্রকাশ করলে শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্তের মধ্যে অনুভবন করে যেতে হয়। আলোচ্য পদ্ধতিম্বায়েল বা লক্ষ্য করবার তা হল সৌন্দর্য সন্তোষের অভিনয় শিল্পীকে-কি নারী, কি পুরুষ-জগৎ প্রাণ-শক্তি, প্রকাশে বা সাম্প্রদায়িক কাজনা রচনা করে। প্রতিটি শিল্পীর ক্ষেত্রে বিকল্প বা অঙ্গ সন্তান কখনো হুহু, হুশোমের কখনো বা হাফে জোরালো। অভিনয়কালে একজন শিল্পীর শির-বক্ষ-পাল্ল কটি-পদ ইত্যাদি অঙ্গ সঙ্খ-বাহু-উর, জন্ম ইত্যাদি প্রত্যঙ্গ নেত্র, মূ, গণ্ড, অথবা চিবক ইত্যাদি উপাঙ্গ সব কিছু বাহ্যারে এমনই বাহ্যর যে উপস্থাপনার কোনো রকম কমিউনিকেশন গ্যাপ-এর অবকাশ থাকে না। সে পাওরা হাফ, লাক্ষা, ভজনীতা ও ব্যক্তিগত তেরায়ো তস্কাবিলের প্রতিটি শিল্পী অভিনয়কাল কেবলমাত্র লক্ষ্য নয়, উপলব্ধিত।

পাশ্চিমের পরীক্ষামূলক থিয়েটারের সত্ত্বে তেরায়ো তস্কাবিলের (পেরো নাম, তেরায়ো তস্কাবিলে ডি বাল্যো) ভূমিকা ইতিমধ্যে অত্যন্ত







গুরুত্বপূর্ণ করেছেন বলে জানা গেল। থিয়েটারকে ব্যক্তিগত জীবন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে মানতে এঁরা রাজী নন, বরং সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন দিক ও অবস্থার যে সম্পর্ক তার প্রকাশ হিসেবেই দেখেছেন। থিয়েটারের সঙ্গে এঁরা এঁদের সম্পর্কের রূপ বোঝাতে জল ও মাছের কথা উল্লেখ করেছেন। একজন অভিনয়শিল্পীর নাট্যপ্রবণ অন্তরের পরিণতিতে তেয়াদ্রো তস্কাবিলে তাই যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। এবং প্রতিটি অভিনয়স্থির মধ্যেই বর্তমান ভাষার সূচল অবস্থা। যেভাবে তারা প্রতিটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন তাতে সর্বোচ্চ স্বাভাবিক গতিশীলতার প্রতি লক্ষ্য রাখেন। ফলত, এক একটি খন্ড মুহূর্তের রসভোগ কল্পতে যেমন একজন দর্শকের কোনো রকম অসুবিধে হয় না, তেমন নিবিষ্ট হয়ে গড়লে দীর্ঘকাল ধরেই তিনি সমগ্র অনুষ্ঠানটি থেকে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভ করতে পারেন। এর মূলে আছে এই চেতনা যে দ্রষ্টাও কোনো স্থায়ীভূমিকায় নেই। প্রদর্শনী চলার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও স্থান পরিবর্তন করতে পারেন। প্রথাগত নাট্যানুষ্ঠানগুলোর সঙ্গে এখানেই তেয়াদ্রো তস্কাবিলের প্রয়োগ প্রকল্পের মৌল পার্থক্য। তাই এটা ভাবলে ভুল হবে যে তেয়াদ্রো তস্কাবিলের

অভিনয় দর্শক পরিবেষ্টিত তথাকথিত মৃত-মঞ্চে অভিনয়ের সামিল।

প্রথাবিরোধী এই নাট্যপ্রয়োগ সম্পর্কে তেয়াদ্রো তস্কাবিলে ১৯৭৭ থেকেই অতিমাত্রায় আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সেবার তারা প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে অরগ্যান্ডলে গিয়েও একটি অভিনয় করে আসেন। ১৯৭৯-তে এঁরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের আরো একটি পারফরম্যান্সের ব্যবস্থা করেছিলেন, দম্ভরেভাস্কির চরিত্রের অনুপ্রেরণায় 'সেন্সা' নামের এই প্রদর্শনীটি শহরের কোলাহল থেকে দূরে বাগান দুর্গ, এবং পরেই গিজার ব্যাশ অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত হয়। ইউনেস্কোর সহযোগিতার ১৯৭৭-এ তেয়াদ্রো তস্কাবিলে একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছিলেন, পরিচালনার ছিলেন ইউজেনিও বার্বো, বিশ্ব গ্রুপ ছিয়েটার, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে দুশোরও বেশি তরুণ নাট্যকর্মী এতে অংশ গ্রহণ করেন। একজন অভিনয় শিল্পীর দেহকে কি কি উপায়ে কতভাবে অভিনয়ের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায় তেয়াদ্রো তস্কাবিলের বর্তমান চর্চার মূল লক্ষ্য বোধক। এবং এই চর্চার আজ প্রায় দু বছর ধরে এঁরা ভারতের প্রদর্শনী নৃত্যসমূহকে বিশেষ স্থান দিয়েছেন বলে জানা গেল।

বার পরিচালনার তেয়াদ্রো তস্কাবিলে এদেশে এসেছিলেন তাঁর নাম রেনজো ভেসকোভি। মাত্র তিনশ বছর বয়সে মিলানোর ইউনিভার্সিটি থিয়েটারের রেনজো ভেসকোভি রেনজো ভেসকোভি প্রথান চরিত্রে অভিনয় এবং পরিচালনা দিয়ে তার নাট্যজীবন শুরু করেন। এর পর তিনি ক্রমান্বয়ে মোট কুড়িটি নাটকে (ইউরোপিয়ান থেকে কামাউ) সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে তাঁর নাট্যব্যবস্থার ক্রমোন্নয়ন ঘটান। পরে তিনি ১৯৭০-এ সম্পূর্ণ প্রফেশন্যাল গ্রুপ হিসেবে গঠিত তেয়াদ্রো তস্কাবিলের পরিচালনা গ্রহণ করেন। রেনজো ভেসকোভি পরিচালিত গিয়ে নিজেকে ইউজেনিও বার্বো এবং গ্রেটস্কির ছাত্র বলে উল্লেখ করেন। এ পর্যন্ত ইতালী ছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন নাট্য-উৎসবে তাঁর পরিচালিত ও পরিচালিত নাট্যজীবনের উপস্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি 'অ্যানথ্রপোলজিক্যাল ফাউন্ডেশন অব ক্রায়া লিংকড উরিন অরিয়েন্টাল/ইন্টারন্যাশনাল' এই শিরোনামের একটি রচনা লেখার কাজে হাত দিয়েছেন। তেয়াদ্রো তস্কাবিলে ডি বাগমো এদেশ ঘুরে গেলেন 'ইন্ডিয়ান কন্সট্রাক্টর' ফর কালচারাল রিলেশনস' এর আমন্ত্রণে।

কিটন তেওঁ এয়েহে.....



# স্মৃতি সততই সুখের

প্রতিভা বসু

১৭

শৈশব পাহারা' ছবিটি রেমন্টান্ট হ'ল। বছর বয়সে এঁকেছিলেন। যে সময়ে তাঁর জীবন ছিল কল-কল-পল-পল-সেখানে ভরপুর। একেবারে উপচে পড়ছিল সব। কী নেই? ধন মান যৌন বল ক্ষাতি প্রতিপত্ত প্রেম প্রভা সম্মান—সব কিছুর অধিকারী তিনি। ধনকর্তা শ্রী সান্ধিকার নিরে সমুদ্র বাসপতা জীবন তাঁকে সর্বদাই নিরাপত্তা কাল করবার অবসর যোগিয়েছে। অমতবারে সংগ্রহ করা সংগ্রহশালাটিও কালের অনুকূল পরিকল্পনা তাঁর করে কাজের সাহায্য করেছে—মোট কথা, একজন মানুষ যা চায় সবই ছিল তাঁর করতলগত। কিন্তু এই ছবিটি আবার পর থেকেই ধীরে ধীরে হেমে এল কালো বনকা। হল্যান্ডের প্রধান পুরুষটি আস্তে আস্তে ডুবে গেলেন দুর্ভাগ্যের অতল সমুদ্রে। ছবিটিই শূন্যে নিল সমস্ত ভাঙ্গা। নিরে নিরে গরীয়ান হয়ে অমর্য লগত করল।

তখনকার সময়ে এক-একজন শিল্পীর জীবন যে কী অশ্রুত গল্পকথার মতো ছিল, এ যুগে তা ভাবা যায় না। প্রভা আর ভাগ্যহীনতা যেন একসঙ্গে বাস করত। লেখকগুলোও এর কত প্রমাণ ছড়ানো। কন্ঠের জগদ্বল পথের তৈলে ডুবে আলোর দ্যুতি। ঈশ্বরের করুণা পেলোই মানুষ অকরণ হয়ে ওঠে। নিজস্বের স্বৈরিক ক্রিয়াকে দিয়ে আত্মকাত প্রতিজ্ঞা করে। ঈশ্বরি মানুষের আত্মা বসি। অনেক আত্ম বসি শিক্ষাব্যতীর ঘরশৈল্প প্রস্তুত হলেও এই বাস্তবিত দেখা যাচ্ছে দমর।

যে ছবিটি দেখার জন্য বুদ্ধদেব পাগল হয়ে আছেন, যে ছবি একমাত্র এই মিউজিয়াম ছাড়া অন্যত্র কোথাও নেই, যে ছবি একে রেমন্টান্ট তাঁর দুর্ভাগ্যকে চোখে এঁকেছিলেন সেই 'শৈশব পাহারা' নামের ছবিটিই যে রেমন্টান্টের প্রেত ছবি তা কিন্তু কেউ বলেনি। এর ভিতরে মোকালিসার হাসির মতোই এমন এক অপর রহস্য লুক্কায় আছে যা নিয়ে আশেও পাণ্ডিত্যের তব্বের অবসান হচ্ছে না। যুগ যুগ ধরে মাথা ঘামাচ্ছেন কোথায়। অনেকের মতে, এই ছবিটিই হচ্ছে ইউরোপীয় চিত্রকলার রোমান্টিক ধারার প্রবর্তক।

বিশাল পটে আঁকা হয়েছে এই ছবি। মিউজিয়ামের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হলের মস্ত দেওয়ালেও এর ঠাই হয়নি, ছাঁটতে হয়েছে কিছুটা। ঐতিহাসিক মতে, দলপতি করের শোভাযাত্রার ছবি এটি। তেইজল নগররক্ষী আছে। কলাই বাইলা, তারা আপন আপন প্রতিষ্ঠিত দেখতেই উপস্থিত ছিল, তার কলে যা হলো প্রতিষ্ঠিত তো দূরের কথা, এ ছবিকে অতিপ্রাকৃত বলই আখ্যা দেওয়া যায়। এর মধ্যে এক কিশু বাস্তবতার স্পন্দ নেই। কেবল ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসঠাসি এক দৃষ্টি ভিড়ের দৃষ্টি করেছে তেইশটা কাপসা মুখ, তারা যে মানুষ তাই প্রায় বোকা যায় না। মাঝখানে এক অশ্রুত নারীমূর্তি। যার মুখের পেশিতে কোথাও কোনো ভাব নেই, ভাষা নেই, হচ্ছে অস্বচ্ছ ভালে মন্দ ক্ষণ তুচ্ছ দৃষ্টি কিছুই নেই, অথচ চিত্রকর আলোর উজ্জ্বল এ রোয়টের মুখেই প্রত্যক্ষ লত। এই মূর্তির কোমরে একটা মুরগি ঝলছে, ডান দিকে প্রায় অশ্রুত একটা কুকুর।

এমন এক অসঙ্গত উদ্ভট ছবি কারেরই পক্ষ হলে না। তারা ভুলে কুঁচকুলো, প্রত্যাখ্যান করল একে এই পাগলামিতে কিংবা হল।

শুধু যে তারই ভুল, কুঁচকে প্রত্যাখ্যান করল তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ক্রোড়ারও মুখ ফেরলো। রূপ করে কথ হতে গেল ছবির বিস্ত্র, উপজ্ঞানও খেমে গেল। এইরকম দুঃসময়ে মারা গেলেন শ্রী সান্ধিকার। শোকে উদ্ভ্রান্ত হলেন সন্দেহ নেই, অসহায়ও হলেন। তবু তারই মধ্যে অবিরতই ছবি আঁকন, বেঁচে থাকার উৎস। অন্তর্নিহন মধেও সংগ্রহের নেশাটি কাটাতে পারেন না কাল অভাব আরো দুর্ভাগ্য হয়ে ওঠে। শেষে একেবারে ধামে-দেয়ার তল হয়ে গেলেন।

শ্রীর মৃত্যুর কিছ, কাল পর থেকেই হেন্ড্রিক্সের নামে একটি মেরুর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতোই বাস করছিলেন। শ্রী সান্ধিকার যা কিছু বিষয়-আশয় ছিল, তিনিই তার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন বটে, কিন্তু একটা চুজি ছিল, পুনরায় বিবাহ করলে এ থেকে বাঁচত হবেন। হয়তো সেইজন্যই মেরুটিকে শ্রীর মর্যাদা দিয়েছিলেন ঠিকই। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে নয়। অর্থাৎ হেন্ড্রিক্সের যে তাঁর শ্রী, সেটা আইনসঙ্গতভাবে সিদ্ধ ছিল না।

হেন্ড্রিক্সের যখন সন্তানসম্ভবা কথা উঠলো তখন। সমাজপতির মুখে দাঁড়ালেন নীরবকর হয়ে। স্বামীপত্নী কলেন, হেন্ড্রিক্সেরকে সর্বসমক্ষে স্বীকার করতে হবে সে বোশা, স্বীকার করতই হবে কোরান্ত বোশা রেখেছেন। কোরান্ত প্রতিজ্ঞা করে ছিলেন, কলছিলেন, বিবাহ তো মানুষের তাঁর একটা সম্রা, ঈশ্বরের চোখে বিবাহ হল কিছ, নেই। আমি তাতে বিশ্বাস করি না। শ্রী-পত্নীর পারস্পরিক ভালোবাসাটাই আসল। সৌন্দর্য থেকে আমাদের মিলত জীবন নিজের সত্য। হেন্ড্রিক্সের সর্বদা ভাবই আমার শ্রী, শুধু আমারই শ্রী। কিন্তু এ সব কথাই চিড়ে ফিড়লো না। এই পারস্পরিক প্রায়শ্চিত্ত করতই হবে। পিতারা এই হল শালানো, যদি নিজেকে বোশা হল স্বীকার না করে হেন্ড্রিক্সের তা হলে তার অজ্ঞাত সন্তান অন্ত নরকে পতিত হবে। চার্চের

অনুশাসনে শেষ পর্যন্ত এই অসম্মান মাথা পেতে নিতেই হয়েছিল, হেন্ড্রিক্সের স্বীকার করতই হল সে বোশা। অতএব স্বীকার করার পরে ধর্মিক কলেন, সন্তান অন্ত নরকে থেকে রক্ষা পেলোও তোমার শাস্ত তাতে মিলবে না। তোমাকে ঈশ্বরের কল্যাণাল থেকে আমরা বাঁচত করলাম।

ঈশ্বর কে, কোথায় আছেন, কোথায় থাকেন, তা তো কেউ জানে না। ঈশ্বরের সন্তানরাই প্রতিষ্ঠ হতে প্রতিজ্ঞা করে। এই দুঃসহ অসম্মান ও বৈদ্যমান পতিত জীবনের দুঃখকেও নিঃশব্দে নিঃশব্দভাবে হজম করতে হল রেমন্টান্টকে। তার উপরে জর্জরিত কপের দূরে পাণ্ডাযাত্রা তাঁর সকল সম্পত্তিও একদিন নিলামে চড়ালো। সেই সঙ্গে তাঁর প্রাণকুল সংগ্রহশালাটিও গেল। কেননা, সেটা যেতেই বড় আড়ি ছেড়ে উঠে এলেন ছোট বাড়িতে। ছবি তো বিক্রি হয় না, তাই দিয়েই কোনরকমে ভরণপোষণ করেন শ্রী-পত্নীর। বলা যায়, অতি বৃদ্ধিমতী এরা সংকেন্দ্রশীল হেন্ড্রিক্সেরই কোনরকমে চালিয়ে নেন কট করে এবং সর্বতোভাবে নিজেকে বাঁচত রেখে।

প্রতিভাকে কিন্তু করে দেবার সমস্ত আয়োজনই সম্পূর্ণ করতে পারেনি। দমাজপতিরা, তবু কিন্তু ছবি আঁকা বন্ধ হল না কোরান্তের। তিনি তাঁর কাজে কিংবদন্তিই সংগ্রামী। সম্যাসী যেমন ঈশ্বর ছাড়া জানে না; বড়কল্লা বাই আমুক, সেখানেই তঁর মস্ত, তেমনই কোরান্তও সব কড়কল্লা উঠে উঠে তাঁর ছবিতই তঁর মস্ত হয়ে রইলেন।

বোল কলা পণ্ডে হল হেন্ড্রিক্সের মৃত্যুতে এক পত্র টিউসের মৃত্যুতে। যাদের সহায়তায়, সাহায্যে, মনোবোলে, পরিপ্রয়ে এক ভালোবাসার গড়তায় সব অভাব-অপমান কিছুটা অন্তত তুলে থাকতে পেরেছেন। সব কিছুর পরেও কিছুটা অন্তত শক্তি সংগ্রহ করতে পেরেছেন। তখনো ঈশ্বরের মত অকিল। তবে মৃত্যু তো সকলেরই আছে। মৃত্যু সকলের দরকার গিয়ে দাঁড়ায়। একদিন তাঁরও মৃত্যু হল। সেই তাঁর প্রথম বিগ্রাম ছবি আঁকার কর্ম থেকে।

পশ্চিমাট পড়তে পড়তে আমার মনে হ'ল, মানুষের জীবন শেষ পর্যন্ত অদৃষ্টের সংগ্রহে সাত পাকে বাঁধা। মান বসি যে পার্থিব অর্থে অতি হতভাগ, তাতে আর সন্দেহ কী! চারিদিকে অশ্রুকার, তাই মধ্যে অনন্ত বেধা, অনন্ত উদাম, দৃষ্টি প্রতিভা শূন্য একই লোক অব্যত। মরে তিনি অমর হলেন। কিন্তু জীবন তাকে কী দিল? শূন্যই লাঞ্ছনা। যে দেশকে তিনি গৌরবের মন্তু পরিণে বিশ্বের দলবারে এনে সিংহাসনে কালেন তারা তাঁকে পাক পতে রেখেছিল। এমন কি, প্রোটেস্ট্যান্ট বলে চার্চের ঝাড়ও যা কি অবহেলিত। কথ নেই বাস্তব নেই; আমদান্যের কোন একটি অশ্রুত গরীবি ইহুদিপাড়ার সন্ন্যাসিনী বাসনা। সেই সব, গলিতেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেলেন।

সেই সন্ন্যাসিনী গলির ছোট কুটিরকে এখন কতই না যত্ন রেখেছে। সে তো ভীষণ কের। সারা পৃথিবীর মানুষের পদচলিতে আকীর্ণ। এই তো আমরাও তো এসেছি তারই টানে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে খাল দু পাড়ের রাস্তা। নৌকোর জন্য তীরে এসে দাঁড়ালো। জলের হাওয়া, জলের গন্ধ, সোদলমান নৌকো আমাদের বহু দূরে নিয়ে গেলো। পূর্ববঙ্গের সেই হুঁসিড়া গ্রামে, যেখানে আমি জন্মেছি, যেখানে আমার বাড়ির টান, আমার পিতামহ। বড় সুন্দর গ্রাম। বাড়ির পাড়ের মতো ঘরে-ঘরে জল চলে গেছে এরাড়ির তীর ঘেঁষে, সে-বাড়ির কোল ঘেঁষে। খাল-বিলের দেশ। জলই প্রাণ, জলই সৌন্দর্য, জলই অতি আদরের সামগ্রী।

একটি নৌকো ভাড়া করা হল। একক নৌকো। সাধারণত একক নৌকো বড় কেউ নেয় না। অনেক বেশী ভাড়া পড়ত যায়। তাই বেশির ভাগ লোক শেয়ারেই ওঠে। যে যেখানে যাবে নামের দেয় ঘাটে ঘাটে। আবার কেউ বিহার করলেও ফিরে আসে। চেকেরিচ শেয়ারে না গিয়ে আস্ত নৌকোই ভাড়া নেওয়া হলো। যাবো একটা নির্দম গড়তবা, নির্দম আকাশ পুরল করত; সেসব ক্ষেত্রে অমের সঙ্গে ঠিক সুবিধে হয় না।

নৌকোর গড়ন ঝেঁটের মতো। দেখতে বেশ সুন্দর। ইঞ্জিনও চালান কেউ, কারো দ্বারা নৌকোর নিয়ন্ত্রণই লাড়ি টানে। আমরা সেই হাড়-টানা নৌকোই নিলাম। কো ধীরে ধীরে যওয়া যাবে, কলের শব্দ বৈকালিক শতশ্রুতাও ক্ষুর হবে না, কর্পসইও বিপরীত হবে না।

সাহেব মাঝ দূরত্ব আদরে গ্রহণ করলো আমাদের। নৌকো চলতে লাগলো দূরে দূরে। বানিক দূর এসে বুদ্ধদেব কলেন, 'রেমন্টান্টের বাড়ি চেনে তো?' 'রেমন্টান্ট?'

'আমরা তাঁর বাড়িটা দেখতে চাই।'

সাহেব মাঝ এক চোখ ছোট করে কিছ, কণ ভাবল, ভেবে কলো, 'কেডাবেন না?'

'হ্যাঁ, কেডাবো তো বটেই। বেড়াতে বেড়াতেই তো যাবো। আবার কেডাতে কেডাতেই ফিরবে। পথে যা ডটা দেখতে নামবে।'

'সু তো বেশ দূর! যেতে যেতে সন্দেহ লেগে যাবে।'

# মুখে দিলে গলে যায়, আহারে কি পুষ্টি!

জিতল কে ?

Kwality আইসক্রীম,  
আবার কে ?

আর হবে নাই বা কেন ?

Kwality-র পুষ্টির জবাব নেই।

সেরা উপাদানে তরপুর Kwality  
আইসক্রীমে আছে দুধ, চিনি, মাখন,  
ফল, বাদাম এইসব। মেশানো  
থেকে প্যাকেটে ভরা পর্যন্ত সবটাই  
হয় অটোমেটিক মেশিনে, ফলে  
হাতের ছোঁয়াটুকু পর্যন্ত লাগে না।

Kwality আইসক্রীম সম্পূর্ণভাবে  
পাস্তরাইজড ফলে বীজাণুমুক্ত।

প্রতি চামচে ঘন মোলায়েম ক্রীম,  
প্রতি কামড়ে আছা কী দারুণ  
স্বাদ, কী পুষ্টি!

আইসক্রীম বলতে কোয়ালিটি

  
**Kwality**



‘তা থাক না, কতি কী! বাধা আছে কোনো?’

‘তা তো জানি না!’

‘তবে চলো!’

‘আপনার তা হলে স্পীড বোটে বাওজই উচিত ছিল!’

‘কেন?’

‘কম্প্রস মনে হয়, সম্ভার পরে বাওয়া যাবে না। তা ছাড়া, কুইটার নৌকা যেখান দিয়ে যাবে, সেটা ঠিক ঘাট নয়। স্পীডের নৌকায় ঠিক ঘাটে বার। আর আমি ঠিক সেই কুইটার চিনিও না!’

‘শুনুন এটা মন খারাপ হয়ে গেল! বৃদ্ধদের বললেন, চলো কিরা!’

‘আমি বলছি, আশার সূতা ধরে বললাম, পরে থেকেও কি দেখিয়ে দিতে পারবে না?’

‘তা পরেরে?’

‘তবে তাই চলো!’

‘তাই চললো! কিন্তু বৃদ্ধদের মেজাজ বিগড়ে গেছে, এখন আর কিছুতেই স্বাভাবিক হবেন না। সবটাই মাটি। আম দেহই বোকা ম হয়েছি। জিজ্ঞেস করে আসা উচিত ছিল কখন কেউ হয়, কোন পথে যেত হয়, কোনে গাইড নেওয়া দরকার কিনা। হোটেলের আপিসে জানতে চাইলে সব খবরই পাওয়া যেতো। এই লোকটি বা বলছে তা হতো ঠিক নয়, কেনে না বলই নানান কৌশলত বোঝে। হরতোর রেমন্টের নমাই জানে না। যা একান্তই অসম্ভব নয়।

‘কী আর কর! নিয়ে গেল অনেক দূর। যেতে যেতে আলাপ করলো। নিজের জানও খেড়ে দিল অনেক। সব জাকলাগই আমার সঙ্গে। বৃদ্ধদের তো মেজাজ খারাপ, এখন অনেককণ আর সেই মেজাজেই না।

‘হঠাৎ নৌকা ঘরিরে একটা বোম্বার্ডের ধার ঘেঁষে চলতে চলতে বললো, এই দেখ বাড়ি!’

‘কোর বাড়ি?’

‘এ বার বাড়ি তোমার দেখতে চাও!’

‘হেমন্ট?’

‘হ্যাঁ!’

‘বল তো তিনি কে?’

‘কুইটার থেকে হাত সরিয়ে শূন্য আঁকার ভাণ দেখিয়ে বললো, এই যে হব কাছে মিউজিয়াম!’

‘তা হলে ঠিকই চেনে। উৎসুক হয়ে তাকিয়ে ‘কই, কই, কোথায়’ করতে লাগলাম। ঠিক কোনো নির্দিষ্ট গ্রামের মতো বোপের অধিকার ফাঁকে সীতাই একটা বাড়ির আভাস। খল থেকে বেশ একটু দূরো। চোখের একটু ও বিশদ নয়, কোনো বিশেষ বাক্য আছে বলেও মনে হচ্ছিলো না; এমন কি, অশ্ফল্যে একটা বিশেষ আলো জেলেছে সেখান থেকে বিশেষ স্থানের সংকেত হয়ে দর্শনভীরের দর্শনের হৃদয় দাঁড়িয়ে না।

‘লোকটি কলো, এটা বাড়ির পিছন!’

‘ভূমির মতো সেই পিছনের দিকেই তাকিয়ে থাকলাম।

‘এই বাথ ভ্রমণে বাড়ি ফিরেও মনখারাপ যায় না। কথা ছিল ‘নিউইয়র্ক’ থেকে ডক্টর ডানওয়েডারেন আসবেন সম্ভব। ‘তিনিও আর এলেন কই? আমরা এসে ছ তিন দিন, পরামর্শ করে তারিখ মিলিয়েই এসেছি, হোটেলের ঠিকানাও জানানো আছে, এলে নিচুই থেঁজি কলতন। গুজ্ঞা এলে একসঙ্গে ঘরে-ফিরে কেউলে অনেক বেশী ভালো লাগত। অন্তত এই ধরনের হতাশার সম্মুখীন হবার জন্য অত অর্ধসন্দ হত না।

‘এটা গুর দেশ, উনি এদেশের ন্যাডিনকর চেনেন, অচমকা এসে একা একা কতটুকু জানা যায়। তা-ও এই অধিক ভ্রমণ। উনি এসে কত ভালোভাবে দেখা হত সব, ভালোভাবে জানা যেত দেশটাকে।

‘আমাদের পক্ষে গুদের এই না-অসাটা তখন বেন অরো ভীষণ হতাশার কারণ বলে মনে হতে লাগলো। কী আর কর! আমি চিঠি লখতে কলাম, বৃদ্ধদের বই নিয়ে কলেন।

‘অক্যা এরও প্রয়োজন ছিল। চিঠি লেখা আর বিশ্রাম আর অসরযাপনের উৎকৃষ্ট কথ, কই-এ সকের পাট একেবারে চুকই গেছে কপিদন যাবত। যে কারণেই হোক, হলো যখন তখন ‘কিন্তু একটা অন্তরকম আশ্রয় পাওয়া গেল।

‘পরের দিন সকালেই শূদ্র খবর। ডক্টর ডানওয়েডারেন ও তার স্ত্রী এসে গেলেন। চায়ের পট সাগা করে চানটান সেরে যখন কেমনে কেমনো ডাবাই তখনই ফোন এলো নিচে থেকে।

‘হাত কাঁকাকাঁকা, ভালোবাসাবাসি, পূর্নমর্জনের অকো ইতারির পরে জানা গেল, ডক্টর ওয়েডারেনের হাতে হঠাৎ একটি সিরিহল রোগী এসে পড়ার দু’ দিন পরি হয়ে গেছে। বললেন, ‘সিডি আমি খবর দুর্ভাগ্যত সেকেন্দা। আমার স্ত্রী ধরবারেই বলছিলেন সে কথা। কিন্তু আমরা কোনো উপায় ছিল না। নতুন রোগী হলে হাতে না নিয়ে চলে আসতাম, কিন্তু পুরোনো রোগীকে এড়িয়ে আসা সম্ভবই হল না। বাই হোক, এখন বল আজ আমরা কী করব? আরো তো দু’ কণ আছে।

‘আমি জানলাম, ‘আপনারা যে দেশ পর্বত এসেন তাতেই মনে হচ্ছে সব হচ্ছে পুরল হয়ে গেছে।’

‘এ কথার মিলেন ওয়েডারেন খাঁশির চোটে আমাকে জাঁকুর ধরে চুমু খেতে কললেন, ‘সিডা, শেষ পর্বত যে এসে পৌঁছতে পারলাম এবং দু’ দিনের জন্য হলেও ভোমরের সঙ্গে যে আর একবার দেখা হল তাতে আমার ভীষণ ভালো লাগছে।’

‘বৃদ্ধদের কললেন, ‘এখন তো দলটা, তাড়াতাড়ি লগ খেতে যে-কোনো উপায়ে বেরিয়ে পড়লেই হবে। জানুন, ততক্ষণ এখানে বসে আতা দেওয়া থাক।’

‘ক’র অভ্যাস বেগুণ হল। গল্পে গল্পে চট করেই কখন বেরটা বেজে গেল।

‘এই প্রথম আমার উত্তানের অগানে লাগ খোলায়। প্রথম এই জন, ওখানে বসে খেতে হলে বা দাঘ দিতে হয় তা অকালের পক্ষে সহজ ছিল না। কিন্তু অতিথি আশ্রয়ন জন কখন। তা ছাড়া, বাস্তব অগে একদিন দু’মল্লোর ভোজই থাকে এখানে বসে—একবার মনে মনে ভাবাই ছিল।

‘অক্যা কিল মেটরেনে নিয়ে ওয়েডারেন স্পীডের সঙ্গে আমাদের প্রথ হাতা-হাতি। তাঁরা কললেন, তাঁরা কললেন; আমরা কল, আমরা দেব। তাঁদের কল্যা—সেটা তাঁরাই বেশ, সেখানে আমরা অতিথি, তাঁরা নয়। আমাদের বক্তা—এখন, এই পূর্ন সার্বিকভাবে হলেও আমরাই হোস্ট এবং হস্টেস, সূত্রাং, তাঁরাই অতিথি, আমরা নয়।

‘এই করত করত শেষ পর্বত প্রতিযোগিতার জিতে ওয়েডারেনই বৃদ্ধদেরক এড়িয়ে গুটে গিরে কিল মিটিয়ে এলেন।

‘মিলেন ওয়েডারেন বললেন, ‘এক্স তো কল সেক্সটোর কুইটার দেখে আসতে পারেন নি, আর একবার চোটা করলে হয় না?’

‘ডক্টর ওয়েডারেন কোথায় একটা কোন করলেন, তারপর কিস মধে বললেন, ‘আমি জানতাম, কুইটার নিয়ে কী একটা গোলমাল চলছে, কেউ এখন বলে না দেখেন। বৃদ্ধেই পারছ পনের শতকের বাড়ি, জানে গরীবের বাড়ি, আর কোথায় রাখা আছে না। যে কারণেই হোক, বর্তমানে কোনো লোককেই যেতে দেওয়া হচ্ছে না দেখেন। যদি এমন নৌকাপ্রমথ যেতে চাও, যেতে পার। কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে হিফল পর্বত।’

‘তা হলে চলো, দু’শব্দেই গুটের ঘরিরে নহরটা দেখিয়ে দিই, গাড়ি যখন

## উপসর্গের দিনগুলিতে -

বাড়িতে একটু জামাই ভালমন্স খাবার তো হবেই—পেটের চিড়ায় জামন্স মুহূর্তে শ্লান হতে দেখেন না—মতচ্ছপ গ্যাসোমিন সরে আছে।



গ্যাসোমিন-ভারত হোমিও মেডিসিনের এক অনবদ্য আবিষ্কার  
১৩৯/এ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

বিমল করের

প্রথম ও

শেষ অঙ্ক

মগুচৈতন্যের গভীরতর  
অঙ্ককারের স্বাদে একদা  
বিমল কর তাঁর  
পাঠকদের বিষণ্ণ ও বিপন্ন  
করেছেন। কিন্তু তাঁর  
এই নতুন উপন্যাসের পট-  
ভূমি ও অবলম্বন ক্ষেত্র  
ভিন্ন। থিয়েটারের পরি-  
প্রেক্ষিতে ক্ষয়টি মধ্যবিত্ত  
জীবনের কিছু পুতুল ও  
তাঁদের মানুষ-হৃদয়ের  
দ্বন্দ্বকে তিনি অসামান্য  
কুশলতায় বিশ্লেষণ  
করেছেন।

অথচ তাঁর লেখার ভংগি  
এত সাবলীল, স্বরকারে।  
এত নৈবাস্তিক তাঁর গদ্য।  
ঘর ও বাহিরের, পাঁচিল  
ও প্রান্তরের টানা পোড়নে  
জর্জরিত মানুষের কথা  
এমন করে তাঁর মতো কেউ  
লিখতে পারেন নি।

থিয়েটার-যা শুধু  
অক্লিষ্টকর প্রমোদোপ-  
করণ, তা যখন  
জীবনের জটিল সমস্যা-  
গুলির অন্যতম শুধু  
নয়, বিশিষ্টতম হয়ে ওঠে,  
তখন মানুষের অস্তিত্বে  
ভারসাম্য টাল খোঁচ যায়।

প্রথম ও  
শেষ অঙ্ক

বিমল কর

রেবতী, প্রভা, শশিবালা  
নুটু সেই ভারসাম্যহীন  
ক্ষতবিক্ষত কয়েকটি নর-  
নারী। তাদেরই মঞ্চ ও  
সাজঘরের এই উপাখ্যান  
সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে  
অভিনবত্বের দাবি রাখে।

দাম ৮-০০ টাকা।

## উপন্যাস ও গল্প গ্রন্থ

প্রফুল্ল রায়

অঙ্ককারে ফুলের

গল্প ৮

অতীত বন্দোপাধ্যায়

ধর্মনি প্রতিধ্বনি ১০

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

স্বর্গের পাশের বাড়ি ১০

ক্লান্ত বন্দোপাধ্যায়

খমকে কেন দাঁড়িয়ে ১০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কখনো দিন

কখনো রাত্রি ৭

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

বিলয় না জানি ১০

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমি চলে যাচ্ছি ৭

বিজুতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

জামাই বণ্ডী ১০

প্রবন্ধ ও

আত্মজীবনী

অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়

পুরাতন বাংলা গদ্য

গ্রন্থ সঙ্কলন ৩০

অমিতাভ চৌধুরী

রবিঠাকুরের

পাগলা ফাইল

অজিতকুমার ঘোষ

নাটকের কথা ১৮

অনন্ত সিংহ

কেউ বলে বিপ্লবী

কেউ বলে ডাকাত ২০

মণি বাগচি

জীবনী শতক ২৫

মোহন

প্রকাশন বিভাগ ৮/১ স্যামাচরণ দে স্ট্রাট

পাক্সা দেহে, কই তো জন্মাবে নেই।' মিসেস ওয়েভারেন আমার পিঠে হাত  
ঝুলেন, 'কী বলো?'

আমি সায়েব কলাম, গাড়ি আছে;  
মিসেস ওয়েভারেন কালেন, 'হ্যাঁ, পেট্রোল একটা।'

শ্বশুরের গাড়ি?'

গাড়ি অনেক ঠিকই, তবে আপাতত আমেরিক। আমরা এখানে তিন মাসের  
জন এসেছি, আবার এখনকার এক ভুলোক তিন মাসের জন্য নিউ ইয়র্ক পেয়েছি।

একসঙ্গে হয়েছে। উনি ওখানে গিয়ে আমাদের গাড়ি ব্যবহার করবেন, আমরা  
এখানে ঠিক গাড়ি ব্যবহার করবো।'

শ্বা কেল ভালো তো!'

ডক্টর কালেন, 'তা গাড়ি আমরা পাই বা না পাই, থাক বা না থাক, তাতে  
কী এসে থাকে। এ-সঙ্গে কী ব্যাব নেই? তুমি কী ইচ্ছা করো সেট, বলা, আমরা  
দবাই-ই কেইমতো ছাড়বো।'

ডক্টর ওয়েভারেন বরফ কাঠি, অসম্ভব সঙ্গী, বহুসর ভার কোথও নেই।  
ডাক্টর মনুষ্য, দেহের বর নিতে জানেন, পক্ষাশের উৎসে উঠেও একটা ভারি চায়  
হাননি। খাওলাগাওয়া, ব্যায়াম-সবই নিয়মিত এক পার্শ্বমত। জীবনব্যাপন প্রশালীর  
মধ্যেও হৃদয়পতন নেই। স্বভাবতই একটু গম্ভীর কিন্তু কেতক প্রায়, আতিথি-  
পরায়ণ এক বন্ধুত্বের উদার।

মিসেস ওয়েভারেনও চমৎকার মানুষ। তাঁর সাদাসিধে। স্বামীর চেয়ে মনে  
হয়, বেশ কিছুটা কড়। মেটাসোটা নন্দনকন। কনসের ছাপ পড়েছে, বেশী  
কমলাক' কহতে পারেন না। নিউ ইয়র্কে যেদিন ঐদের বাড়ি নিয়ন্ত্রণ খেতে  
গিয়েছিলুম, ডক্টর ওয়েভারেনই রান্নাঘরায় করাছিলেন। স্বামীর উপর সমস্ত ভার  
পড়ে দিয়ে খুব নির্ভরত হতে পারছিলেন না। আমাকে আপন পরিচয় সহ্যক  
করে নিয়েছিলেন। এম্ব দজনেই মনে করেন আমার কনস খুব অল্প। তিনজন  
বড় কড় ফেলোমেরের মা শুনেন বিজ্ঞেস করেন ভারতবর্ষের রীতি অনুযায়ী বাল্য-  
বিবাহ হয়েছিল কিনা।

এ-সঙ্গে দেখছি অনেকই আমার বয়েস ধরতে পারছে না। আসলে ফেলোবলা  
কেবল হুঁ মাথার জন্য এদের চামড়া অল্প কয়েকটি তেল হাড়িয়ে ফেল খসখস হয়ে  
ওঠে। কচি ডাকটা কমে যায়। তা ছাড়া, মূখে কড় সহজে দাগ পড়ে। তার  
কারণ, হিসেবে আমার একটা বিশ্লেষণ আছে। এম্বা কথা কবার সময়ে স্বামী-পুত্র  
নির্বিশেষে ভীষণ হাতখে নাড়ে। এত পরিপ্রমই দাগ ধরে। চাঁদের মত  
ডাবলেশহানি, বড়ো বড়ো চাঁদের চামড়াও কী মসৃণ! জাপানীয়াও শান্তভাবে  
কথা বলে। তাদের মূখেও যাকে হল রংকল, তা একঝরেই নেই। ভারতীয়রাও  
খুব চকল নহা। তারাও শান্তভাবেই হল চলে সেজন্য তাদের মূখও দাগ পড়ে  
কম। ঐজনাই আমার কনস কেবল না। বোঝে না কলেই স্নেহের ভাবটা প্রবল।

এবার আমি সন্তপণে আমার কোথায় যাবার বাসনা সে কথাটা প্রকাশ করলাম।  
খাওলাগাওয়ার পরে কচি নিয়ে বসেই কথা হচ্ছিল। অপ্রাসংগিকভাবে কলাম,  
পেইশোলিকভাবে একটা বিখ্যে আমন্টারডামের মতো আশ্চর্য শহর পৃথিবীতে  
আর কিছু কোথাও নেই। সেটা দেখলে হয় না?'

ডক্টর ওয়েভারেন বললেন, 'কী বলা তো?'

আপনিই কলন না?'

মিসেস ওয়েভারেন মাথা নাড়লেন, বেশ রহস্য করছো মনে হচ্ছে। জাতোর  
কল কামো নাকি?'

জতো? বী জতো?'

ঐশ্বিন্তি সায়েবনীর হিসেবে কেনে, জানো না? তুমি কেনো নি?'

না তো!'

ফেলোবলা?'

'হ্যাঁ, ফেলোবলা। ছোট ছোট কাঠের জতো তো? আশায়ে, না?'

না, না, আশায়ে নয়। এই আশ বিখ্যত জতো? এখানে কেন বিখ্যত গল্পটা  
আমার শোনা ছিল, এখন মনে নেই। তোমার জানা আছে?'

স্বামীর দিকে তাকালেন না। হাসতে হাসতে বললেন, 'ও, এই আশ্চর্য  
শহরে উৎস সম্মানে যেতে চাও তুমি?'

আমিও হাসলাম। উনি কালেন, দেখ, কেমন ঘরে ফেলোবলা মনো কল্য।  
কলাম, জাপানী মেশিন আছে নাকি পকেটে?'

উনি আমার মাথার টোকা দিয়ে বললেন, 'ইয়ার্কি নহা। সাকখন। আমি  
মন্ডতুবিদ। সব কথা ধরে ফেলবো কিছু। গৃহস্থ হতে হবে।'

বছরেব একবার ঘরে গিরেছিলেন, ফিরে এসে কালেন, 'কী বদপার, কার  
গৃহস্থ হবো?'

'আর কার, তোমারই নিচর। তোমার স্বামী ভাবছেন আমার পকেটে মনের কথা  
ধরার জাপানী মেশিন আছে। ফর পেরে বাচ্ছেন খব। চলো, চলো, কোথায় ঘব  
ঠিক হয়ে গেছে জালগা।'

কোথায়?'

'ফেলোই না! সমস্তের তলা থেকে একবার উপরে ওঠা যায় কিনা দেখে আসি।'  
বক্তার তখনি বকে ফেললেন। আমার এই বাসনা ঠিক তো আর অজান  
ছিল না। পূরণ সম্ভব নয় জেনেই উৎসাহ থাকলেও আর অঙ্গের হবার কথা  
ভাবা হানি।

মিসেস ওয়েভারেন কালেন, 'আমি তো কিছই বকেতে পারছি না।  
আমি বললাম, শুনেন লাকির উলেন, 'চমৎকার আইডিয়া। চলো, চলো,  
আমিও ককেতে খুব উৎসুক।'

# কষ্টকল্পিত অতুল্য ঘোষ

(নব পর্যায়  
১ ৩৪ ১)

বছরটা ঠিক মনে নেই। তবে '৬২ সাল বা তার পরে। ছুরাণ্ড কাপের ফাইনাল খেলা। ডাঃ রাধাকৃষ্ণ তখন রাষ্ট্রপতি। ফাইনালের দিন রাষ্ট্রপতি মাঠে এসেছিলেন। আমি তখন দিল্লীতে ছিলাম। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দু'দলের পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে আমি বললাম, 'এই আমাদের টিম ইন্ট বেংগল—এই আমাদের টিম মোহনবাগান।' রাষ্ট্রপতি একটু হেসে বললেন, 'তুমি বাজে কথা বলছ। দুটো টিমই কি করে তোমার হবে?' তখন একজন রাষ্ট্রপতিকে বুঝিয়ে বললেন যে, অতুল্যবাবু আই এফ এ-র প্রেসিডেন্ট। সব টিম সম্বন্ধে তাই উনি এ কথা বলতে পারেন।

আজকে বোধ হয় আর এ কথা বলা হবে না। কলকাতার রাজনীতির জগতে যা কোলা-হল, তার চেয়ে খেলার জগতে বেশী আবর্ত। সবই বৃদ্ধির অগম্য। আবার ইন্ট বেংগল-মোহনবাগান নিয়ে ঘটি-বাঙালের কথাও শোনা যাচ্ছে। রাস্তায় আসতে আসতে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে যে, চিংড়ি মাছ টাঙানো, কি ইলিশ মাছ টাঙানো। এসব কিসের জন্য? এর সঙ্গে খেলার সম্পর্ক কি? আর খেলার জগতে ঘটি-বাঙাল এ কথা আসে কি করে? ১৯১১ থেকে মোহনবাগান ক্লাবকে যশের শিখরে তুলেছেন, তাদের মধ্যে কতজনের বাড়ি ইন্ট-বেংগলে, তার খবর আছে কি? স্বতন্ত্র মনে হয় ১৯১১য় ছিল সাতজন। আর পরের বর্গে থাকে সমস্ত বিলেতের টিম ভয় করত, যিনি আজম্ব মোহনবাগানের সেবা করে গেছেন, সেই পরম শ্রম্বেয় গোষ্ঠ পালের বাড়ি কোথায়? ইংরাজী কাগজগুলো নাম দিয়েছিল 'চাইনীজ ওয়াল'। গোষ্ঠবাবু বল মারলেন, যে সাহেব বল মারতে এসেছিল, সেও বলের সঙ্গে শুন্যে উঠে গেল—এ গল্পকথা নয়, আমরা দেখছি। ডাঃ সন্ধ্যা দত্ত কোথাকার লোক? চুনি কোথাকার লোক? অবাচ হয়ে ভাবি এসব কথা ওঠে কেন। যারা খেলে বা ক্লাবের মেম্বর, তারা ঘটিও নয়, বাঙালও নয়। তারা সেই ক্লাবের খেলোয়াড় এবং মেম্বর। এইটাই শ্রেষ্ঠ পরিচয়। আর তা ছাড়া আজকাল তো কণাটিক থেকে খেলোয়াড় আসে, পাজাব থেকে খেলোয়াড় আসে, হায়দ্রাবাদ থেকে খেলোয়াড় আসে, আবার ইরান থেকেও খেলোয়াড় আসে। কাজেই এখন ঘটি-বাঙালের স্থান কোথায়? আর হায়দ্রাবাদের যে খেলোয়াড়, সে ঘটি না বাঙাল? আর তা ছাড়া ক্লাব বদলের সময়ে এত নাম বেরায় এবং সেই উপলক্ষে সংবাদপত্রে এত সব কাহিনী প্রচারিত হয় যে, খেলোয়াড়-দের দলের প্রতি আনুগত্য নিয়েও বেশ মনে মনে সন্দেহ হয়। কাহিনীর কতটা গল্প, কতটা গুজব, কতটা সত্য জানি না। তবে এটা ঠিক যে ফুসফুস, গুজগুজ, কানাকর্ষিত টাকার



গোষ্ঠ পাল

লেনদেনের কথাও শোনা যায়। খেলোয়াড়রাই তো ক্লাবের আসল মর্যাদারক্ষক। সেই খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেকেই যখন দল বদলের সময়ে অত্যন্ত উৎসাহে মেতে ওঠে, তখন সেই ক্লাবের বা টীমের মর্যাদা বিশেষ রক্ষিত হয় কি? ঘন ঘন দল-বদলের একটাই মানে হয়—ক্লাবের প্রতি মমত্ববোধের অভাব। রাজনীতিতে দল বদলের যখন হিড়িক পড়ে, তখন সেটা সর্বত্র



খেলার মাঠে বিশৃঙ্খলা

বেশ নিন্দনীয় বলেই অভিহিত হয়। তার থেকেই 'আয়ারাম-গয়ারাম' কথাটির সূত্রপাত। নেতারা যখন দল বদল করেন, তখন তাঁরাও সমালোচনার হাত থেকে অব্যাহতি পান না। অবশ্য রাজনীতিতে দেখা গেছে যে, গোটা দলই অন্য দণ্ডভুক্ত হয়ে গদি রক্ষা করেছে। খেলার মাঠে এখনও সেটা হয়নি। কিন্তু হতেই বা কত দেরি? কলকাতার বেশ নামজাদা একটি ক্লাবের অনেক-গুলি খেলোয়াড় এবার অন্য ক্লাবে গেছেন। এর পর আবার ক্লাবের নিজস্ব মর্যাদার কথা ওঠে কি করে? তিনটি বড় ক্লাবের একটি ক্লাবের নামের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার অন্য জড়িয়ে আছে। কিন্তু সে ক্লাবেরও গদ্য জড়িয়ে কতগুলি খেলোয়াড় খেলছেন? তা হ'ল সাম্প্রদায়িক জিগিরও তোলা আর চাল না। সেদিন অবধি একটি বড় ক্লাবের জনপ্রিয় সভাপতি ছিলেন ভাগ্যকুলের নামজাদা বংশোদ্ভূত। তার আগে তিনি বহু দিন ভাইস প্রেসিডেন্টও ছিলেন। তা হলে কি করে সেই ক্লাবের সম্পর্কে

ঘটি বা বাঙালের বসংবাদের কথা ওঠে? আশ খেলার জগৎ তো সেইজন্যে নয়। কিন্তু আজ এ কথার কোন দাম আছে বলে মনে হচ্ছে না। এখন বেন ট্রীক পাওয়া নিজেই কথা। তা সে স্বত অদল-বদল করেই হোক, বা অন্য যেভাবেই হোক। কাসকে মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায় যে, অমুক শৈল্যারকে অমকের বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছে, তা সে দল বদলে বাধা করার জন্যেই হোক বা দল বদলে বাধা দেবার জন্যেই হোক। এর মধ্যে ক্লাবের মর্যাদা কোথায়? তা হলে মাঠে যেসব গোলাবোণের সৃষ্টি হয়, তার কারণটা কি? এবারের গোলামাল তো খেলার মাঠ থেকে বেরিয়ে ওয়েলিংটনের মোড় অবধি এসে গিয়েছিল। কিসের জন্য এই অশান্তি? এ কি বাস্তবিক? আগে মাঝে মাঝে শোনা যেত বাট যে, বিরুদ্ধ ক্লাবের কতৃপক্ষকে বলে-কয়ে অনুপস্থিত করে বা খারাপ খেলিয়ে কোন কোন ক্লাব জয়লাভ করেছে। সে রটনা খুবই সামান্য ছিল। এখন তো আর রটনা নেই, এসব কথা সকলের মূখে মুখে। প্রশংসার দৃষ্টান্তও এখন বিরল নয়। রেকর্ডার মার খাওয়া, কোচের মার খাওয়া—এসব দৃষ্টান্তও বর্তমানে স্থাপিত হয়েছে। আবার খেলতে গিয়ে না বলে চাল আসা, তার দৃষ্টান্তও আছে। যে ক্লাবের খেলোয়াড় সেই ক্লাবের সমর্থকরাই তাদের প্রহার করেছে—এ দৃষ্টান্তও ছুরি ছুরি। তা হলে আর বাকি রইল কি? তা হলে খেলার নাম করে সম্প্রদায়বাদ সৃষ্টি কেন?

বর্তমানে বড় দৃষ্টি দলের গাশ্ব খেলা আছে শুনলে নাগরিকরা সমস্ত হয়ে ওঠেন। ছেলে-মেয়েরা খেলা দেখতে বাবাই। বাড়ির লোকেরা বাধা দিলেই তাদের বলা হবে যে, ছেলে-মেয়েদের খেলা দেখার উৎসাহে তাঁরা বাধা দিচ্ছেন। কিন্তু অভিভাবকরাও তো নিরুপায়। কোন ছেলেমেয়ে ফিরলই না, কেউ ফিরল রক্তাক্ত দেহে, আবার কেউ ফিরল অর্ধোল্লংঘ অবস্থায়। আর এই যে অবস্থা হয়, তার পেছনে কোন যুক্তি বা কোন সভাভবা কথা থাকে না। যে-কোন ছেলেমেয়ের যে-কোন সময়ে এই অবস্থা হতে পারে। এর নাম খেলা দেখা।

মুখ্যমন্ত্রী মশাই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ। কিন্তু মনে হয় সেটা কেবলমাত্রই বাণী। তা নইলে যেখানে প্রায় এক ডজন স্থানীয় মন্ত্রী, একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন, সেখানে এক ঘণ্টা ধরে নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহৃত হল কি করে? পুলিশকে দোষ দিয়ে লাভ কি? পুলিশ যদি একটু বেশী আগ্রহ দেখায় এবং তাতে যদি কোন দল মনে করে যে, এতে খেলোয়াড়ী মনোভাব দেখানো হচ্ছে না, তা হলে সেই পুলিশকে রক্ষা করার তো কেউ নেই! যখন মন্ত্রীদের চোখের সামনে এইসব ঘটনা ঘটে, সেখানে পুলিশের সাধা কি বিশেষভাবে সজ্জি হবার! বেশ ভাল করে ভেবে দেখলে বুঝতে পারা যাবে যে, খেলার মাদকতা আজকে যতটা, তার চেয়ে ঢের বেশী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার মাদকতা। অভিনব দৃশ্য এবার দেখা গেল। মেম্বর গ্যালারিতেও পুলিশ অগ্নিপায় পড়েছে। তার একটাই মানে হয়। এইসব মেম্বর গ্যালারী,

হয়েছে। পুলিস যে অনর্থক হাস্যামা করেন তা প্রমাণিত হয়েছে কোন বড় ক্লাবের পক্ষ থেকে মেম্বার গ্যালারীতে হাস্যামার কোন প্রতিবাদ দেখা যায়নি। অনেক নিরীহ মেম্বারও আহত হয়েছেন। কিন্তু ক্লাব কর্তৃপক্ষ একেবারে চুপ। তা হলে যদি এ কথা মনে করা হয় যে, এইসব হাস্যামা সৃষ্টির পেছনে ক্লাব-কর্তৃপক্ষের সমর্থন আছে, তা হলে কি খুব ভুল হবে? তা হলে খেলার মাঠে রইল কি? খেলার প্রতি বাদেবের অনুরাগ আছে, তাঁরা কখনও খেলোয়াড়দের বা দর্শকদের আঘাত করতে পারবেন না। ক্লাবের প্রতি যদি অনুরাগ থাকত, তা হলে কখনও এত দল অদল-বদল হত না। খেলার মাঠে একটা গল্প চলিত আছে। দুটো বড় ক্লাব তাদের জার্সি একটা কুকুর এবং একটা গাধার গায়ে পরিয়ে রঙ্গ-তামাশা করেছিলেন। গোষ্ঠ পাল মশাই কাদতে কাদতে বলেছিলেন যে, জার্সির অসম্মান তো ক্লাবের অসম্মান! আর জার্সি তো আজকাল শখের থিয়েটার বা বাতাসলের ডাড়া-করা পোশাকের মত। যে-কেউ যে-কোনদিন যে-কোন জার্সি গায়ে দিতে পারে। কেন বদল করে জানি না, তবে বদল হচ্ছে এটা সত্য এবং এত তাড়াতাড়ি বদল হচ্ছে যে, অনেক সময়ে মনে হয় যে, আসছে বছর হয়তো ঐ খেলোয়াড়ের গায়ে অন্য জার্সি দেখতে পাওয়া যাবে। তা হলে খেলার মাঠে রইল কি? কিছ, অর্থ সংগ্রহ? যদি অর্থ সংগ্রহই হয়, তা হলে

সমগ্র কলকাতার খেলার জগৎকে দূষিত করছে। খেলার মাঠের মধ্যে যে জায়গা সাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ, সে জায়গায় আগে কিছ ক্লাব-কর্তৃপক্ষ এবং খেলোয়াড়দের দেখা যেত। আজকাল তো ডজনে ডজনে, শরে শরে লোক সেখানে বসে আছে। এ'রা কারা? এ'দের জন্য কি কোন আলাদা টিকিট আছে, যাতে তাঁরা ঐ নিষিদ্ধ জায়গাতেও গিয়ে বসতে পারেন? আর পুলিস তো এ'দের দেখতে পায় না! আর সেটাই স্বাভাবিক। কারণ, ক্লাব-কর্তৃপক্ষ যেখানে নিয়ম তুলে করে এ'দের বসতে দিচ্ছেন, সেখানে পুলিস নজর দেবে কেন?

এবারে ফেডারেশন কাপের খেলা নিয়ে কলকাতার খেলার জগৎ এক মর্মান্তিক নিজর সৃষ্টি করেছে। অনেকে নিজেদের মধ্যে প্রতিবাদ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু কেউ মুখর হননি। ভয়ে? ২৫ বৈশাখ বিকালে ফেডারেশন কাপের ফাইনাল খেলা। ঐদিনটি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবাসীর কাছে পরম গৌরবের দিন—বিশ্ব-কবির জন্মদিন। এই রাজ্যে আরও অনেক যেসব প্রস্থেয় ব্যক্তি ছিলেন, তাদের অনেকের সম্বন্ধে আমরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কয়েকজন মৃষ্টিমের প্রগতিশীল(!) ব্যক্তি ছাড়া তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে কোন বাঙালীই পশ্চাৎপদ নয়। তর জন্মদিনের বিকালে কলকাতার দুটি জনপ্রিয়

খেলার জগৎ এক অভিনব কীর্তি (!) স্থাপন করল। সেদিন রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষে ছোট বড় কত অনুষ্ঠান যে বাহত হয়েছে, সে খবর খেলার জগৎ রাখে না। যিনি প্রস্থেয়, শত অব হেলায় তাঁকে শ্রদ্ধার আসন থেকে নামানো য় না। কিন্তু করুণা হয় খেলার জগতের কর্ম কর্তাদের অবস্থা দেখে। তাদের ওদালানী যে বহু লোকের কাছে তাঁদের নিদাহ করেছি, সত্য তারা জানেন না। বিশ্বয় লাগে এই ভেবে, রবীন্দ্রনাথ যে মাটিতে জন্মেছিলেন, এ'রাও সেই মাটিতে জন্মেছেন। ভাষ্যেও অবাক লাগে যে, এই ঘটনা ঘটল কি করে? শোনা যায় যে খেলার মাঠে দিন স্থির করার দায়িত্ব সম্পূর্ণ সরকারের উপর। তাঁরা সকলে রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে তাদের দায়িত্ব সেরেছেন। বাস তাদের ধারণা তাইতাই তাঁদের দায়িত্ব শেষ হয়েছে। সরকার অবশ্য নৈবা'জিক। কিন্তু যত খেলার জগতের কর্তা, তাঁরা ভবিষ্যতের জন যে দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন, তা চট করে মুছে যাবে না। দুঃখ তা নয় যে, কেবলমাত্র খেলার জগতের কর্তৃপক্ষ এই কাজ করেছে; দুঃখ এই যে, খেলার জগতের সঙ্গে যেসব সং ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি জড়িয়ে আছেন, তাঁরাও কি করে এই অপরাধে মক-বখিরের অংশ গ্রহণ করলেন? এই প্রশংসা আর না বাড়ানোই ভাল। খেলার জগতের বহু কেলেঙ্কারির মধ্যে এই ঘটনা বহু দিন অনেকের মনকে পীড়া দেবে।

দাঁতের ডাক্তাররা বলেন:

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করুন আর মাড়ি মালিশ করুন, তাহলে মাড়ির গোলমাল আর দাঁতের ক্ষয় রোধ করতে পারবেন।

**ফরহ্যাঙ্গ ডবল অ্যাকশন টুথব্রাশ ব্যবহার করুন**

যা আপনার দাঁত পরিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে মাড়ি মালিশ করার জন্যে বিশেষভাবে তৈরী

সাদা নরম  
দাঁড়াগুলি  
আপনার মাড়ি  
মালিশ করে

নীল শক্ত  
দাঁড়াগুলি  
আপনার দাঁত  
পরিষ্কার করে

**ফরহ্যাঙ্গ টুথব্রাশ**

পরিবারের প্রত্যেকের জন্যে

আডাল্ট (মিডিয়াম ও সফ্ট) • জুনিয়র • বেবি

ফরহ্যাঙ্গ দিয়ে দাঁত ব্রাশ আর মাড়ি  
মালিশ করতে শিখুন। **বিজ্ঞানমূল্যে**  
"আপনার দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্য" সংকে রঙিন  
পুস্তিকা লেন। ডাকখরচ বাবদ ২৫ পরসার  
স্ট্যাম্প সমেত লিখুন, এই ঠিকানায়: ফরহ্যাঙ্গ  
ডেন্টাল আডভান্সারী বুরো, ডিপার্টমেন্ট নং  
B5-219, পোস্ট বাক্স ১১৪৬০, বম্বে ৪০০ ০২০  
যে চাহার চান জানাবেন।

## কেন আসো, কেন যাও

শান্তনু দাস

নিজেকে উদ্যম ক'রে নারী বা শিশুরা আসে  
পিছুতের কাছে।  
তোমার পায়ের নীচে মাটি দিয়েছিলো—জন্মভূমি।  
মায়ের বুকের মধ্যে ঠোট গুঁজে বড়ো হতে  
ঈশ্বরই শিখিয়ে দায় তবু—  
তোমার প্রতিভা থাকে আরেক শরীরে,  
যাকে তুমি দ্যাখোনি, জানো না, তবু তাকে—  
কখনো শব্দের কাছে, কখনো বা উপবীত  
চেউ হয়ে ভাঙে।

কখন টিপের মতো সূর্য ওঠে ভোরে।  
বুকের জলায় এসে নামে।  
কেউ দ্যাখে, কেউ বা কখনো সেক—আতুর শরীর।  
সূর্য বা আগুন ছাড়া কে এত বিশ্বাসী হ'তে পারে।  
গভীর জলের মতো শান্তি  
গভীর দুঃখের মতো রাত  
গভীর রাতের মতো নীরবতা  
ক্রমশঃই চলে যায় সবস্বহীনতায়।  
পৃথিবী তোমার মতো তৈরী হ'তে শেখেনি কখনো।

নিজের গান্ডীব নিতে ভুল হ'য়ে যায়।  
ভুলে যাই বীজমন্ড।  
চোখের জলের সাথে হাওয়া উড়ে এলে—  
বুক কাঁপে।  
কেন আসো, কেন যাও? ভুবে থাকো দুঃখের শরীরে।  
এত ভিড়ে খুঁজে পাও,  
খুঁজে পাও মধ্যমপান্ডব?  
খুঁজে কি পেয়েছো তুমি অনন্ত আড়ালে?  
আমরা এখনো ডালে মিশে আছি লতায় পাতায়।  
আঠায় রক্ত জমে গেলে মূছে ফেলতে বড় কষ্ট হয়,  
তবু এ সময়—কবি কিংবা শব্দকে মানে না  
শব্দ নতজানু হয়।

পাতা

শোভন মহাপাত্র

ধূলার ভিতরে পাতা, পাতার ভিতরে মরা দেশ  
সবুজ আলপনা আঁকা মৌন প্রকৃতি আর স্বপ্ন-ভুবন;  
তুচ্ছ পাতার জন্য মানুষের এত সাধ, এত স্বপ্ন, মায়া,  
সন্ধ্যায় কাকভোরে ভেসে ওঠে ছোট মানুষের ছায়া!

তার হাতে কিছু নেই, তবু তার পাতা  
ভূগোলের ছবি একে একে বেঁধেছে সে খাতা—  
ধূলার ভিতরে শান্ত সুধাময়, জুল  
নদীতে ভাসান-খেলা, কুয়াশার ফুল?

## টেরেসাকে ব্যক্তিগত

রবীন আদক

একটি করুণ হাত বাড়িয়ে দিয়েছ,  
কি দেব তোমার করতলে?  
আমাদের লব্ধ নখে অল্ধ পাপ  
রক্তে জ্বলে আছে,  
আমাদের হৃৎপিণ্ডের জবাফুলে নীল ডুম্বো মাছি!  
এমন অশ্রুটি  
সময়ের সাচীকৃত মূখের উপর  
শিশির পড়ে না স্বর্গ থেকে,  
সর্বস্ব জুয়ায় বাজি রেখে  
আমরা এখন এক দীর্ঘ মোমবাতির  
দু'পাশে আগুন জ্বলে পোহাই আঁধার,  
তুমি সেই আত্মতুক আলোর তিমিরে  
দু'চোখে জ্বলেছ, সম্মানসিনী,  
ঘৃতদীপ, বর্ণপরিচয়—  
তোমার বুকের মধ্যে দুঃখী শিশুদের বাড়ির,  
কুশাবিধ আতুর ঈশ্বর  
তোমার আঁহিক স্পর্শে আরোগ্যপ্রবণ,  
তুমি দুঃখী সিদ্ধার্থের রক্ত-ডোবা হাঁস  
বুকের প্রসূনে রেখে, ভিখারী জননী,  
একটি করুণ হাত বাড়িয়ে দিয়েছ,  
কি দেব তোমার করতলে?

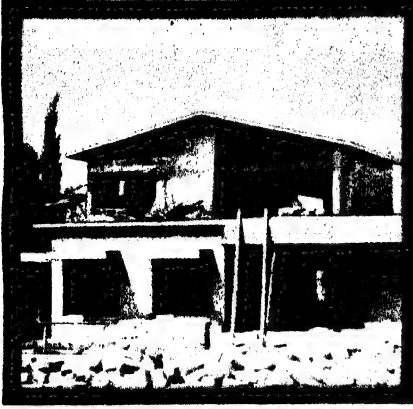
## পাখি চাই

রাণা মজুমদার

কত যে শেখালুম পাখি বল তুই কখনো বল  
তা না সে কেবলি বলে পাখি চাই পাখি চাই পাখি—  
আমার ছিল না কিছু খাটাটাই বা ছিল সম্বল,  
নরম পিচ্ছিল গা, দেখি তার বিস্ফারিত অঁখি;  
উড়াল দিস না পাখি উড়লে যে বাজে নেবে তোকে,  
খুঁটে খা সঞ্চিত দানা তৃপ্তিতে গা না তুই গান—  
অধীর অব্যথা ডানা উড়ে গেলে বলবে কি লোকে;  
পা ধরে সেখানি তবু চোখে জল বুকে অভিমান।

আকাশে ত বস্ক নেই, হা হা শব্দ নেই কোন কণাটা,  
বনজ শস্যের গন্ধ ভেসে আসে প্রসন্ন বাতাসে—  
অলীক সাম্রাজ্যে আছি শরীরে লৌকিক আড়াল,  
সমস্ত দুঃশোর সামনে ক্যামেরার ক্যাচ থাকে আঁটা;

সুবর্ণমন্ডলে পাখি উড়ে যায় অশ্রুত আয়্যাসে  
পীতাম্ব আঁশের বর্ণে লিপ্ত হবে নৃপতি, চন্ডাল।



ভবিষ্যতে কোন  
খরচের পরিকল্পনা  
আছে ? তার জন্যে  
ভাবনা কিসের ?

**ভবিষ্যতে যতই খরচের পরিকল্পনা  
থাকুক না কেন, কথা দিচ্ছি, কানাড়া  
ব্যাংক সেই খরচের অর্ধেক টাকা যোগান দেবে**

সময় থাকতে টাকা জমানো শুরু করলে সবকিছুই  
আপনার সামর্থ্যের মধ্যেই এসে যাবে। ভবিষ্যতের এই সব  
পরিকল্পনা রূপ দেওয়ার জন্য আপনাকে সাহায্য করতে  
কানাড়া ব্যাংকের একটি বিশেষ জমা প্রকল্প রয়েছে।

কি চাই বলুন না—গাড়ি ? ছুটার ? নিজের বাড়ি ?  
না কি ছেলেমেয়ের উচ্চশিক্ষা কিংবা বিয়ের খরচ ? কামধেনু  
জমা প্রকল্পের সাহায্যে আপনি খুব সহজেই আপনার  
টাকা দিগুণ করে নিয়ে সবচেয়ে বেশি লাভ ঘরে তুলতে  
পারেন।

এই প্রকল্পের সবচেয়ে উল্লেখজনক দিক হল যে এতে  
আপনার প্রয়োজনীয় অর্থের একটি সামান্য অংশ জমা দিতে  
হবে। আপনি শুধু জমা টাকার অর্ধেক এবং মাসের  
সংখ্যাটা গুণ করে ফেলুন। বাস, এরপর সুদের উপর  
সুদ জমতে জমতে মাসের পর মাস বেশ মোটা টাকাই  
আসবে। ফলে আপনার জমা টাকা হয়ে দাঁড়াবে  
জিঙলেরও বেশি।

বিশদ বিবরণের জন্য কানাড়া ব্যাংকের নিকটবর্তী শাখায়  
চলে আসুন। আমাদের অন্যান্য আরও বিশেষ প্রকল্পের মধ্যে  
আছে বিদ্যানিধি, নিরন্তর এবং বালকৈম।

**কামধেনু  
ডিপোজিট**

**কানাড়া  
ব্যাংক**



(একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্বাধীন ব্যাংক)  
সারা দেশে এই ব্যাংকের  
১২০০-রও বেশি শাখা আছে





## সেই সময়

### সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৫০ ॥

নিরতি ঠাকুরাণী বড়ই কৌতুক পরায়ণ। প্রকৃতির রাজ্যে যে-সব নিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে, থাকে মধ্যে তার কিছু কিছু ভাঙল করে দিত। ত'র বেশী আশো। প্রকৃতির পাখিরা মৃত্ত অকাশে স্বাধীনভাবে উড়ে যায়, আবার নিরতির পক্ষতলে তাদের মতোই দু'পলটি পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়। নিরতির কৌতুক আজ যে রাজ্য কাল সে ফাঁকর, আবার হাটে-কুড়ানীর পথেও অর্থক রাজ্য সমেত রাজকন্যা পায়। পথের ধ'কা-মুঠে কঠোর পরিগ্রহ করণে পরিবরের জন্য দু'বেলার গ্রাসাচ্ছাদন লাগ্রহ করতে পারে না, জড় ধনীর দু'লাল, যে সারাদিন নিজেই হাতে কুটেই নাড়ায় না, সে নামানিধ অত্যাচার খাশা সন্মতীর সামনে কসে নাক হটা দিয়ে ফল, ওটা খাবো না, ওটা খাবো না। নিরতি জাতি মিন্টুর, এতই মিন্টুর যে মানুষ কে.নোদিন তার হৃদি' পর্বত অলস করে।

সিহে পরিবারের প্রতি নিরতির লেখনজর যেন একটা বেশী। এ বাড়ির গঙ্গানারায়ণকে মিলে তিনি কম খেলা খেলেন নি, আবার আর একবার খেললেন। নীলকর সাহেবরা গঙ্গানারায়ণের নামে যে বিজ্ঞান মামলা মারের করেছিল, অ.সালভের বিচারে গঙ্গানারায়ণ তার সব কটিতেই যে-কসুরে ফলাল পেয়ে গেল। বিচারকদের মধ্যেও তাত দু'-একজনের সত্যি সত্যিই আইনের প্রতি আস্থাচািত থাকে। এমনকি শেষোক্তদের মধ্যেও তেমন বাতিভম আছে। জাতিস পক্ষিকাত' গঙ্গানারায়ণকে সন্মানে মতি দিয়ে মন্তব্য কলেন যে বিস্ময়কর এই বাড়ি নীলকরার জাপানে করেকটি অর্থাতিক ব্যবসায় প্রতিকার বাসনার সাধারণ সিহিই চারদিকের সাহায্য করতে গিয়েছিলেন, তার ফলে ইনি নিজেই অত্যাচারিত হয়েছেন। এই প্রকার বাড়িরে শান্তি দিলে দেশের আইনপুংখতার প্রতি প্রজাদের বিশ্বাস মণ্ড হয়ে যমার আলসকা হয়ে।

এদিকে ইন্ডিগো কমিশন চলছে। গঙ্গানারায়ণের মামলার এরকম মারের অনেক লুপল পাওয়ার সম্ভাবনা, সেই জন্যই দেশী বাড়িরে বারো পরিচালিত সংবাদপত্রগুলিতে ফলাও করে টি বক্তাত হাশা হলো। অতি ঘনিষ্ঠমহল ছাড়া

গঙ্গানারায়ণকে বিশেষ কেউ চিনতো না, সে বিখ্যাত হয়ে পড়লো রাজনীতি। তার কতিকাহিনী মাস-ভাবে অভিজাত হয়ে এবার ছড়িরে পড়লো শহরের লোকের মধ্যে মূখে মূখে। অনেক গঙ্গানারায়ণকে একবার চাকর বোঝার জন্যও সিহেলবনের শ্বরের লাকনে এসে ভিত্ত করে।

গঙ্গানারায়ণ অবশ্য এই ব্যাপারে ব্যতিভান্ত হয়ে উঠলো বুঝই। সে লোকের লাকনে থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, নিজের ককে লুকিয়ে থাকে। এমনকি সে চিন্তা করতে লাগলো যে কল-কাতা ছেড়ে কিছদিনের জন্য অন্য কোথাও হুরে আকবে কি না। ঠিক এই সময় নিরতি দেখী অলসকে গঙ্গানারায়ণের দিকে চেয়ে হাসলেন।

আনু'নিক কালের শিক্ত বাড়িরের মধ্যে বিনি পিরোমি, সেই একু'বার রামগোপাল ঘোষ স্বয়ং একদিন গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে দেখা করে একটি প্রস্তাব মিলেন। না তেবেচিন্তে হুটে করে কোনো কথা বলেন না বলেই রামগোপাল ঘোষের মতামত'র বিশেষ গুরুত্ব আছে। হরিশ মূখুরো রামগোপাল ঘোষের জিহব অনুসৃত, এক সময় হরিশ রাম-গোপালের গৃহের লাখা আন্তর নিরতিত বেতেন। কিন্তু সেখানে পরিমিত মনোপাস হয় ফলে ইদানিং হরিশ আর বড় একটা ধান না, কিন্তু রামগোপালের সঙ্গে তার যোগাযোগ অক্ষুর আছে।

রামগোপাল বললেন, হরিশের কাচ থেকে আপনাদের হস্তাত সব শ্মিতি। ইট আর এ মারকেন। অথচ আপনি এত মডুট, এত সন্মু'ট স্পোকেন, এই আপনিই কল, ক ধরেনে কতকালীন স্তাত হাউত এ প্যান্টেরখালিসের বিরুদ্ধে.... এ যে বিশ্বাসই করা যায় না।

গঙ্গানারায়ণ মন্তক অবনত করে বললেন, হরিশ সব কিছুই বাড়িরে বলেন, কল'ক ধরিচি বটে কিন্তু ফারার করিচি নাও একবার।

রামগোপাল অঙ্গকালের মধ্যেই সরাসরি চল এলেন মূল প্রসঙ্গে। তিনি বললেন, আমার নিজের পক্ষ থেকে এবং আরও অনেক পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি একটি নিবেদন আছে। আপনি বাগবাজারের কলনাথ মারের বিবাহ কন্যা কুসুমকুমারীকে বিবাহ করল কথা যিবেচনা করে দেখুন।

গঙ্গানারায়ণের মাথায় যেন একবারে জাভাল ডেতে পড়লো।

গঙ্গানারায়ণের মতন, কুসুমকুমারীর নামটিও এখন একবারে অপরিচিত'ময়। কলনাথ মারের মতন একজন মালগয়া বাড়ি যে ত'র বিবাহ কন্যার পুনর্বিবাহ দিতে চেয়েলেন এবং সেজন্য পাত খোঁজা-খুঁজি চলছে, এ সবসল কসে কসে বাড়িরে পড়ছে মূহুরে। এখন ঐ বিবাহের ব্যাপারটি আর লুখ-বাগবাজারের কলনাথ মারের পরিবারই জানাখ নেই। বিবাহ বিবাহের সম্বন্ধ'করা এই উপলক্ষে আব র কোমর বেঁধে ওঠে পড়ে লাগলেন, যেমন করেই হোক, এই কল্যায় কিবাহ দিতেই হবে। অদ'নিক গোড়ায় ললও নিশেচন' হয়ে নেই, তারা তেবেচিন্ত, এর মধ্যেই বিবাহ বিবাহেরে ফোক স্তিমিত হয়ে গেছে, আর কিছদিনের মধ্যেই লোকের এই অনাচার সম্পূর্ণ বজল করবে। তার মধ্যে আবার এ কি হামোয়া। কলনাথ মারের মতন ধীর, শিখর ধমপ্রাণ ভক্তি'র কি হঠাৎ বদ্বিশিষ্ট হলো। গোড়ায় লল রাজা রাণীকাত বেবেজি গিরে ধলো, আপনি যেমন করেই হোক এই বিবাহ আটকান।

কলনাথ মারের সঙ্গে শহরের অন্য অনেক ধনী বাড়ির বলা-বাগিচা স্তরে সম্প'ক আছে। তারও এই বিবাহ কল করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে লাগলো সামাজিকারে। কলনাথ নিজ লিখাভেতে অবশ্য এখনো জলজ আছে, তবে তার একটাই শত'। কুসুম-কুমারীর প্রথম বিবাহের সময় তিনি ফুল করেছিলেন, এবার তলু' করে দেখে লুপে পল্লব মতন পায় না পেলো যায় তার হাতে তিনি ত'র এই আদর্শী কন্যাকে ফুলে দেখেন না।

পরে বিদ্ব' পক্ষ'ররা কোনো বক্তব্য করে

কিছ অকস্মাৎ আবার কলনাথ মারের মত পরি-বর্তিত হয়, তাই বিবাহ-বিবাহ-সম্বন্ধ'করা যে শত সম্প'ক এই বিবাহ সম্প'কিত করত। তার। এ সব ব্যাপারে কালহরণ মানই অশ'ত। এ পর্বত কোনো পাতকেই কলনাথ মার মনোনিীত করেন নি। কুসুম-কুমারীকে বরা চক্কেও দেখেনি। কলনাথ মারের পরিবারের মধ্যে যাবের কোনো প্রকার সম্প'ক' নেই এমন শত শত বাড়ি কুসুমকুমারীর জন্য পাত আবেশক তপসর। এদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষের মতন বাড়িও আছেন। বিলাসাগর অবশ্য এ ব্যাপারে কোনো নিস্কম্ব উযোগ' নেননি, তবে কুসুমকুমারীর বিবাহের দিনকণ বর্ষ' হলে তিনি স্বয়ং যে বিবাহ বাসরে উপস্থিত থাকবেন সে কথা জানিয়ে দিয়েলেন।

কলা মার সত্যিই প্রায় শতাধিক বাড়ির মূখপ'র হয়েই এসেছেন রামগোপাল। বিজ্ঞান সম্প্রদান'তে অলোচনার এই জনমতই গড়ে উঠেছে যে গঙ্গা-নারায়ণ সিহেই কুসুমকুমারীর হোগতম পায়। এমন উদার ও মত মান'ব এখন সারা দেশেই দু'ল'ত, তলু'পার সে ধনী ও অভিজাত বহুরের সম্প্রদান, লুটী, স্মাধ্যবল, লুপতিত শরীরের অধিকারী এবং বিশপ'কি। কলনাথ মার কোনো কারণেই গঙ্গা-নারায়ণকে অঙ্গপন করতে পারবেন না।

গঙ্গানারায়ণকে সম্পূর্ণ নীরব দেখে রাম-গোপাল ঘোষ আঁকর বললেন, আমি কল্যাপকের লোক নই, লু'ত'র আমার কাচ থেকে এ প্রস্তাব লুপে ইট যে বী জাতিফারেকা' সাহপ্রাইজত.... কিন্তু আসলে আমরা পাঠপকেরই, আপনাদের কাচ থেকে সন্মতি পেলে মেরে পকের কাচে গিরে কথা পড়বো।

গঙ্গানারায়ণ এবার 'ধীর' কন্ঠে বললেন, আপনি কন্ঠ করে আমাদের বাড়িতে এসেছেন, আমরা কৃতজ্ঞ' হরিচি, আমার ছোট ভাই এখন গৃহে নেই সে আপনাকে খেলেদ খুঁই আশ্রয়ীত হতো, তবে.... দু'বেলের কিছ' এটু'কুই যে আপনাদের নির্বাচন ফুল রেখে, আমার আর বিবাহ করার ইচ্ছে নেই। আমি আর সন্মারী হতে চাই না।

রামগোপাল হেসে বললেন, আপনি বন-জগল ছেড়ে সন্মারের ফিরে এসেচল। সন্মারের থাকলে তো সকলকেই সন্মারী হতে হবে।

—অনেক সন্মারেরই আবার দু'-একজন আলসে'ত ধরনের মান'ব থাকে, হারা লাতে-পাতে বেতে চার না। মিঃ ঘোষ, আমি বাকি জীবনটা খোলাসেলা থাকতে চাই।

—আপনি চাইলেই বা আমমা মোবো কেন? দেশের স্বার্থে', সন্মারের স্বার্থে' আমার চাই আপনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

—দেশের জন্য আপনি আর বা ফোক কতে' বললেন, কিন্তু বিবাহ কতে' বললেন না।

—দেশের জন্য মান'ব প্রাণ পর্বত দেহ, আর আপনি বিবাহের মতন একটা সামান্য কাজ কতে পারবেন না? এই যেমন না, সিন্ধ মিউটিনের সময় দিল্লির বারমুখানা লক্ষ সাধারণের জন্য কজন ইয়েরে কেমল খেজার প্রাণ দিলে—

—মিঃ ঘোষ, আমার গীরে গের'রা হাওরা লেগে গ্যাচে, আমার আর দারা-পু'র-পরিবারে মন বসবে না।

—হাওরা পল'তে আর কতকল। সেফুন না, দেশের হাওরাই এখন উল্টো দিকে বইতে।

আরও কিছুক্ষণ এরকম কথার পিঠে কথা চলল, কিন্তু গঙ্গানারায়ণ বিবাহে সন্মতি দিল না। শেষ পর্বত তাকে আরও একটু বিবেচনা করতে বলে রামগোপাল ঘোষ কিলার মিলেন। কিন্তু জাপারটা দেখাযেই কালত হলো না। এরপর গঙ্গা-নারায়ণের ওপর আত্মক'র আসতে লাগলো নানা দিক দিয়ে। হরিশ মূখুরোর কচকেও এ সবসল পৌঁছে, ডিলিও এতে খুঁ উলসহী। গঙ্গানারায়ণের বন্ধুরা গোঁদাল, রাজনারায়ণ, কুসুম-এমনকি মদ'সুদন পর্বত দেখা'হলেই তাকে ঐ কথা কলন। সকলেই

কিন্তু সে একটা বড় কল-এর জন্য গঙ্গানারায়ণের এই বিশ্বাস কত ঊচিৎ।

রাজনারায়ণ তার স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার উপর ভরসা করে গঙ্গা সেখানে স্বরসের সঙ্গীত কত শুনিয়েছে, তার হলো যে একেলে স্বরসের সঙ্গী। আমরা সবাই মিলে ভেট্টে তাকে কী দিবাচন করিচি এখন তো তার পেচণ্ডাও হলে চলেছে না।

গঙ্গানারায়ণ বললো, আমি কি নমিনেশান পেপার সাবমিট করিচি নম বে তোরা আমার ইলেট করি—

রাজনারায়ণ বললেন, ভ্রমওয়েলেক যখন রাজা করা হলো তখন তিনি কি নমিনেশান পেপার সাবমিট করেছিলেন? সবাই ফেরে সাগে না।

—অর্থাৎ আমার দশাও ভ্রমওয়েলের মতই হবে।

—তা ভাই, বিয়ে করা মানেই তো একমুখ কাঁসী কাঠে চড়া নয়? তুই একবার বিয়ে করেই এত ভর পেয়ে গেলি? এই দ্যাক না, গের, মধু আমি আমরা সবাই তো দুবার করে মাথা ঘাড়িয়েচি, আর ঘের করিস নি, তুই এবার দু'শা বলে কুলে পড়।

—আমাকে এমন অনুরোধ করে আর বিরত করিস নি তোরা।

—তুই কি বিশ্বাস কতে ভর পাচ্ছিস? দ্যাক, বিশ্বাসাসানের আশেপালনের অনেক আগেই আমার শ্বশুরের বিয়ে হয়ে গেছে, নইলে আমি নিশ্চয়ই কোনো বিশ্বাস পারিগ্রহণ করে অস্তত একজন দুঃখিনী বালিকার দুঃখ দূর করতুম। কিন্তু আমি নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আমাব দুই ভরসের বিয়ে দিইচি দুই বিশ্বাসের সঙ্গে। তখন লোকে কত ভর দেখিয়ে-ছেল আমার। আমি খেসিনীপরে বাংলা বাড়িতে থাকি, বলে কিনা রাতের বেলা আমার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবে। আমি ঝুঁকিলা, দিক দোক একবার। বেড়ালের লোকেরা বললো, আমি গ্রামে

সেলে আমার ইট হারবে। আমি একটা ঘোটা লাঠি হাতে নিয়ে গ্রামে বেরুই। ভোর বাঁধ কোলো বিপদ হয়, আমরা সকলে মিলে ভোর পাশে থাকবো।

গঙ্গানারায়ণ মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, না, না, আমি সে কথা বলচি না, সে কথা বলচি না—।

গঙ্গানারায়ণ তর্কবাক্য নর। সকলের কাছেই সে হুজিতে ছেলে বার। কিন্তু তার মন মনে না। অবস্থা এমন হয়েছে যে তার এখন আর কোথাও থাকার উপায় নেই, সব জায়গাতেই ঐ এক কথা। এরা সকলে মিলে গঙ্গানারায়ণের মনের কষ্ট অনেক বহির্বি করে দিল।

এতদিন পর আবার বারবার মনে পড়তে লাগলো বিদ্যুৎবাসিনীর কথা। কুসুমকুমারীকে চক্রে দেখিয়ে গঙ্গানারায়ণ, কিন্তু তার যে বরসের কথা সে শুনিয়ে, সেই কলসেই বিদ্যুৎবাসিনীকে গোপনে চিরভরে প্রেরণ করা হয় কাশীতে। ঊষারের জীভাসিগানী বিদ্যুৎবাসিনীর মত, ঠিক যেন গজনি ভেল মাধ্য প্রতিভার মতের মতন, আর সেই সময়কার সুমধুর দিনগুলি গঙ্গানারায়ণের স্মৃতি পটে কতকগুলি স্থির চিত্রের মতন সোলে। তারপর বারানসীর বিদ্যুৎবাসিনীকে মনে পড়ার মাত্র তার বকের মধ্যে যাতনা শুরু হয়। যেন সবকিছু তলতলে ফেটে ফেটা রক্তপাত হচ্ছে। ঘেঁষের সেই অমোঘ কাল-রাগিতে বজ্রা থেকে নেবে নৌকার ওপর দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎ আঃ আঃ শব্দ করছিল, সে রকম বক ফাটা আতনান মানুকের কণ্ঠ থেকেও বেরোয়। তার আগে বিদ্যুৎবাসিনী নেশাচ্ছিন্ন গলার অস্তত দু'বার বলে-ছিল, আমার কিছুই পাওয়া হলো না রে, গঙ্গা। এমন বিস্তৃত কাভেরোয়াঁ কি গঙ্গানারায়ণ কোনোদিন ভুলতে পারবে? সে প্রশংসন ভুল থাকার চেষ্টা করেছিল, কেন সকলে মিলে তার সেই দুঃসহ স্মৃতিকে আবার উদ্বেক দিতে চায়।

বিদ্যুৎবাসিনীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের কথা গঙ্গানারায়ণ কারকে বলেনি, এই গোপনীয়তার

বিপুল ভার সে সারা জীবন একমুখ বহন করবে। কোথায় যেন বিদ্যুৎবাসিনী? সে কিচর সঁতার জানতো না। নগর কলকাতার বদৌলী পরিবারের পুরোপানা, তাও বাল্যবিশ্বা, তার সন্তরণ শিক্ষার সুযোগ কোথায়? তা ছাড়া বিচিতে তো সে চারমি, ইচ্ছে করে লাক নিরোছল নৌকো থেকে, জলের গভীরে ডালির পেছে, হাঙরে-কুমীরে ঠুকরে খেয়েছে তার দেহ।

একরায়ে বিদ্যুৎবাসিনীকে স্বপ্নে দেখলো গঙ্গানারায়ণ। বারানসীর বিদ্যুৎবাসিনী নর, সেই প্রাণোচ্ছল কিশোরী, যার সঙ্গে একলাখে গঙ্গানারায়ণ পলিতমশাইয়ের কাছে সংস্কৃত পাঠ নিত। স্বপ্নের কিদ্যুৎবাসিনী অস্তমানে কুসুম বাঁকিয়ে বললো, তুই না বলিচিলি আমার মেঘদূত কাব্যখানা পড়াবি? মিথ্যুক! তোর কোনো কতার ঠিক নেই।

স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠে গঙ্গানারায়ণ অনেকদিন পর কাঁপিয়ে ঘুপিয়ে কাঁদলো। অশ্রুকার কক, রাগ নিশাতি, তার এই কল্লার কক আর কেউ জানবে না।

মল্লকচাঁদের আশঙ্কায় হারিশ মল্লকো একাধিন নবীনকুমারকে জিজ্ঞাস করলেন, ডেয়ার দাদা এ বিয়ের ব্যাপারে কিছ, ঠিক কখনে? আবার কচিও করিন যাবৎ আসছেন না।

নবীনকুমার মল্লকচাঁদের আশঙ্কায় আবার নিরাশিত যাওয়া আসা শুরু করেছে। প্রতিদিনই অত্যধিক সুখ পান করে শেষ একসময় ডেতনা হারায়। এখন সে ঠিক যেন হারিশ মল্লকোয়ারই পদাঙ্ক অনুসরণ করছে, সারাদিন হাডারিত অনুবাদ এক অন্যান্য কাজে প্রকৃত পরিগ্রহ করে, তারপর সন্ধ্যা থেকেই এখানে এসে শব্দ করে যদ্যাপান। তবে আগের তুলনায় সে অনেক গম্ভীর, জনা সকলকে চুপ করিয়ে রেখে নিজে একা কল বলায় অজান একেবারেই পরিভাঙ্গ করেছে, মডলারি মল্লকোও সে যোগ দেয় না এক বারনারীকে সম্পর্কে কোনো

# বিদ্যনাথ

## দস্তমজুন (লাল)

### হাসিতে দেয় মুক্তোর আলক

দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য উপাদানে তৈরী **দস্তমজুন** আয়ুর্বেদীয় দাঁতের মাজুন।  
দাঁতকে সুদৃঢ় ও উজ্জ্বল করে। মাড়ির স্বাস্থ্য বজায় রাখে ও মুখকে সুগন্ধি করে।  
কনজিউমার কাউনসিল অফ ইন্ডিয়ায় সমীক্ষায় দেখা গেছে—  
কেবলমাত্র আয়ুর্বেদীয় গাছগাছড়াই দাঁতকে বিভিন্ন দস্তরোগ থেকে রক্ষা করে।  
সুনির্বাচিত ভেষজ থেকে ঐতিহ্য ও আধুনিক পদ্ধতির সমন্বয়ে তৈরী **দস্তমজুন** ঔষধ সারা ভারতে জনপ্রিয়।



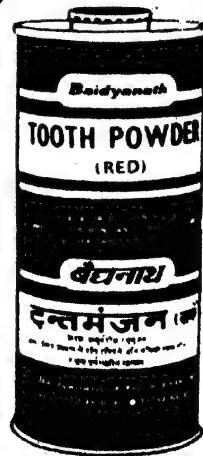
**বীদ্যনাথ**

**আয়ুর্বেদ ডবন লিমিটেড-এর**

একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

১, ৩৩ত নন, কলিকাতা-৬

কলিকাতা • পাটনা • বাদী • নাসপুর • এলাহাবাদ



আজই সেই। নতুনকীরা এসে সে পড়নের কাজে ব্যস্ত  
হয়ে যায়।

হুল্লুভূমির বাবলার অনেক প্রীতিস্বপ্ন হয়েছে  
ইতিমধ্যে। রক্তাশ্রম থেকে সে তার ভাই ও আত্মীয়  
স্বজনদের এই দাদার অবাধারে জড়িয়ে নিয়েছে। বড়-  
ছোটের অন্তরে অনেকগুলি বাড়িও জালিক সে দিয়ে।  
জানাবাড়ির এই আবেগের সে আর প্রতি লক্ষ্যকো  
আপত্তে পারে না, তবে বাবলার সবই ঠিক থাকে।  
মনে হয়, এই আবেগটি সে টীকিত যেনেই শব্দ,  
চরিত্র মনুষ্যের জন্যই। জীবনোদয় এখানে আর  
আসে না, এটা নবীনকুমারের পক্ষে একটা স্বাভাবিক  
বিশয়।

হরিশের প্রেমের উত্তরে নবীনকুমার লক্ষ্যপে  
করেনা, কী জানি।

হরিশ সত্যিকার হয়ে বললেন, আজ এ ঘাটার  
জক জাকট, আই ওয়ার পোয়িং টু, আফ ইট।  
তোমার এ বাল্যের কোনো উল্লাস নেই কেন  
তো? বৈরাগ্য? কদিন ধরেই লজ্জা করছি, ভূমি এ  
সম্পদকে একটাও কথা কও না। সবই এখন এত  
মাতামাতি করছে!

নবীনকুমার বললো, আমি আর কি বলবো?  
—ভূমি তোমার চ্যামাটিকে বোঝাওনি? গণগ-  
নারায়ণ অসম্পদ পর্ব। উই হ্যাভ্ মেসি প্যান্ডাস  
টুগেদার। গণগাতে অসম্পদে দেখো না সম্মানের রহস্য  
থেকে আমরা একটার পর একটা মৃত্যুশেষ লাভ  
করো—আগামী বর্ষ কররের মধ্যে আমি এই ইয়েজ  
ঘাটারের টিট করে ছাড়বো।

—এইকর মৃত্যুশেষ কত গেলে কি মন  
বিরক্তে জড়িয়ে পড়লে, বলে তাকে বাধার সৃষ্টিই  
তো হবার তা।

—না, না, এই বিরোধী করা বিশেষ দরকার।  
এই উদালসি জাতিতে করবার যা মারাত্তর হবে। এক  
একটা মহৎ একজামপল সেট করতে হবে। গণগা-  
নারায়ণ সিংহের মতন মানব যদি বিধবা বিবাহ  
করেন তা হলে আরও কত লোক এর রক্ষা করা  
কতে ভরসা পাবে।

—আমার মনে হয়, এ বিয়ে হবে না।  
—কেন?

—আমার মা বেঁচে রয়েছেন, তিনি হরিশ্বারে  
বাস্তব আর বেথানেই থাকুন। এ খবর ঠিকই তার  
কানে পৌঁছেবে, তিনি ছুঁকরে ছুঁকরে কাঁদবেন। দাদা  
নিশ্চয়ই আমার মনে এরকম দুঃখ দিতে চান না।

হরতের গেলানটা নামিয়ে রেখে হরিশ মনুষ্যের  
মহা উজ্জ্বলভাবে বললেন, ভূমি ভূমি এই কথা  
বললে, নবীন? ভূমি প্রতিটি বিধবা-বিবাহের জন্য  
এক হাজার টাকা দান ঘোষণা করেছিল, সেই তোমার  
মুখে এমন কথা। ভূমি না বিদ্যালগারের চালা! এখনি  
নিজের পরিবারে এই বিয়ে ঢুকতে বলেই অন্য  
লগ্নে গাইতো। জারিন, জারিন, তোমরা সব একটু  
এদিক ওদিক হলেই বাপ-মায়ের সপুত্র হতে  
যাও। মনুষ্যের মারাত্তর জগত, তারপর দাদা পড়লেই  
ভালো মানবের হস্তে মৃত্যুটি করে বলবে, কী করে  
ভাই, যা অনেক করে যত্নে, তাই এই বিরোধী করে

কেনে, হে? আমি যে ফলস্ জালিয়ার জন্য  
সম্পদভর হই, মাকেবের পক্ষে সোমকুমার জড়িয়ে  
পড়ি, সে কি আমার মায়ের মত করে? তোমার  
দাদা যদি এ বিয়ে করতে জন পান, তা হলে তব  
লগ্নে আমার আর কোনো লক্ষ্যই রইবে না। আমি  
আমার হৃদয়ে জালিয়ে রাখো।

এখন, ভবনটার উত্তরে নবীনকুমার একটুও কথা  
বললো না। সে গালিয়ার ওপর কদে ছিল, হরতের  
গেলানটি দেখে করে সে আস্তে আস্তে পুরে পড়ে  
চোখ বুজলো।

হরিশ বললেন, তোমাদের সলনী হাজার  
হাজার হাউল করে রয়েছেন, তবু তোমরা মায়ের  
মোহাই পেতে লটকাছো।

নবীনকুমার মীরের দৃষ্টি হরতের পালা স্যাপল  
করলো দুই চকুর ওপর।

—কী কোনো উত্তর দিতে না যে?

—জামাকে এখন বিবাহ করা না।

—জানি, এখন তোমরা কোনো বাড়ি দেখাতে  
পারো না। তবন হুমিরে পড়ে। খাটি ভারতীয়  
একেই বলে, হে?

নবীনকুমার এবার উপভূত হয়ে গেল। হরিশ  
মুখ জোর অনেক প্রয়োচনাতেও সে আর একটা শব্দও  
উচ্চারণ করলো না।

এর বর্ষ দিনের মধ্যেই বিবাহের দিন ও লগ্ন  
ঠিক হয়ে গেল। নবীনকুমার হাজির সেই ধরনের  
মানব, যে লোকের অনুমোদনের উত্তরে বারবার না  
বলার চেয়ে ইচ্ছার হোক, অনিচ্ছার হোক কোনো  
ক্রমে মনে নিজেই স্বীকৃত হোক করে। সৌভাগ্য  
অন্যতর খাতিরে এবং বন্ধুদের উপরোধে সে বোধ  
হয় বিবও খেতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রে কুমুমকুমারীর  
সঙ্গে বিবের উপমা দেওয়া কোনো ভ্রমেই ঠিক হলো  
না। সেই এক রাতে বিন্দুবাসিনীকে স্বপ্নে দেখার  
পর থেকেই গণানারায়ণের মন একটু একটু পরি-  
বর্তিত হাছিল। তার মনে হলো, বিন্দুবাসিনীর  
বয়সী এক বিধবাকে প্রত্যাহান করার ফলে সে এ  
মর্যেটিকে বিন্দুবাসিনীর মতনই মৃত্যুগোর দিকে  
টেনে দিচ্ছে। এই মর্যেটিকে শরীর সম্মান দিয়ে  
জীবনে প্রতিষ্ঠিতা করলে বিন্দুবাসিনীর আত্মা  
নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ হবে। সেই ইশ্বত দেবার জন্যই  
স্বপ্নে আবিষ্কৃত হাছিল বিন্দুবাসিনী। সুতরাং  
গণানারায়ণ বিবাহে এই ভেবেই সম্মতি দিল যে  
সে যেন অন্য মর্তিতে বিন্দুবাসিনীকেই গ্রহণ  
করবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার, এই বিবাহ উপলক্ষে বিধ-  
শেখর কোমলরূপে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টাই  
করলেন না। লিখে পরিবারে এত বড় একটা কান্ড  
হতে চলেছে, অথচ তাকে বিধ শেখরের মনে পক্ষে  
বিপাক কোনো উপলক্ষই নেই। বহা সময়ে  
গণানারায়ণ বিধ শেখরের অনুমতি নিতে গিয়েছিল,  
তিনি শূন্যে গলার বলছিলেন, ভূমি বিবাহ কতে  
চাইতো... এতে আর আমার বলবার কী আছে। যা  
ভালো বোধে, কর'। এটুকু বলেই পাশ ফিরে

দুঃখী হলেন তিনি। গণানারায়ণ তখন সুখানন্দকে  
জিজ্ঞেস করছিল, জারিন, সব তো শুনিয়েছি, আমি  
যদি এই যে ভাই, তোমরা মৃত্যু হবি? উল্লসত করে  
কোনো ভ্রমে বোধ করে সুখানন্দী উত্তর দিয়েছিল,  
গণানারায়ণ, বৈদ্যসুখ সব মৃত্যুখী মেয়েরা তোমার  
হু হাত ফুলে আশীর্বাদ করেন।

বাগবাজারে কল্যাণ মায়ের প্রাসাদে এই  
বিবাহের দিন সমারোহ হলো। বিশুদ্ধ। আসরে  
উপস্থিত রইলেন গণানারায়ণ বহু ব্যক্তি। নবীনকুমারের  
স্ববশ্য মাওরা হলো না।

বহু-বেশী গণানারায়ণকে কুমুমকুমার দ্বি-  
গাঙ্কিত চাপিয়ে এবং অন্যান্য গাঙ্কিত ও পালঙ্কিত  
করবারাদের চাপিয়েই নবীনকুমার চক্কল হয়ে  
উঠলো। বিকলের এক নিদারুণ দুঃসংবোধ এসেছে,  
জাতিবৃত্ত সে সংবাদ গোপন করে রাখা হয়েছে  
গণানারায়ণের কাছ থেকে। গত রাতি থেকে হরিশ  
মৃত্যুতো অনন্তর রত-বর্ম করছেন। তবু মাথার  
কোনো পিরা ছিড়ে গেছে বোধ হয়, বাটার  
সম্ভাবনা খুবই কম।

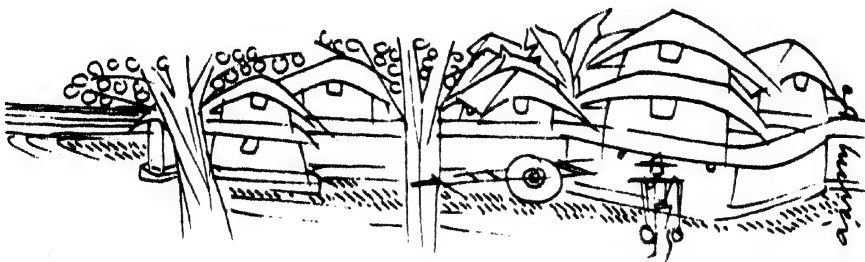
দুঃখ সাহেব চিকিৎসক এবং ডাক্তার  
দুঃগাটর কল্যাণধারকে সঙ্গে নিয়ে নবীনকুমার  
খানিক পরেই উপস্থিত হলো হরিশের বাড়িতে।  
সেখানেও একটি ছোটখাটো ভিড় জমে গেছে।  
গণানারায়ণের বিবাহের নিমন্ত্রণ সেরে রামগোপাল  
বোম প্রমুখ কয়েকজন হুটে এসেছেন এত দূরে  
হরিশকে দেখবার জন্য। তারা বললেন, নবীন-  
কুমারকে এখন একবার বাগবাজারে যেতে, সন্ধ্যাই  
তাকে খেঁজাখুঁজি করছে। গণানারায়ণকে হরিশ ও  
নবীনকুমারের অনুপস্থিতির কারণ সম্পর্ক নানা রূপে  
ফুটো-ভাঙে দেওয়া হয়েছে, এখন নবীনকুমারের  
একবার মাওরা অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু মৃত্যু  
বন্ধুর শয্যাশ্রমে ছেড়ে নবীনকুমার কিভাবেই উঠে  
বেতে রাজি নয়।

রাতি ভোর হবার পর বহু কার্য অসম্পন্ন রেখে,  
বহু মান ককে কাঁদিয়ে শেষ নিশ্বাস ফেললেন হরিশ।  
আগের দিন থেকেই তার বাকরোধ হয়েছিল, মৃত্যুর  
আগে যন্ত্রণাভর একটি কথাও বলে যেতে  
পারলেন না।

হরিশের গৃহের সামনে যে ছোটখাটো একটি  
জটলা ময়োছিল, সেখানে মাঝে মাঝে এসে উঠিক  
দিয়ে হাছিল রাইমোহন। ভেতরে মারিন। মাঝার  
মতন অবস্থাও নয়। তার শোশক লতাছাড়া, বাধা  
লরীর মৃত্যু হয়ে গেছে, চকু দুটি স্তিমিত, ঠিক  
পরের পাগলের মতন ছোঁরা, চোলাই বার না  
আগেকার মানবটিকে। শেষ সংবাদ শোনার পর সে  
বেদুরো জড়িত কণ্ঠে শুকনো রচিত একটা গান  
শুন করে দিল।

নীল বীরের সোনার বাংলা  
করলে রে ভাই হারখার  
অসময়ে হরিশ ঘোলো  
লগ্নে হলো কারাগার  
প্রজার প্রাণ বঁচানো তার....

(জন্ম)



# আপনার বাচ্চাকে দেখুন



## সেরেলাক -এর সাহায্যে

বাচ্চাদের জন্য গুটিগুণে  
ভরপুর সিরিয়েল ফুড।  
দুধ, চিনি... আর  
আদর ভালবাসায় ভরপুর।



এটি বানানো কত সহজ  
শুধু এটি জলের সাথে মিশিয়ে নিন।



সেরেলাক-  
কোটান জলে ডালুন



মিশিয়ে জলে মিন



এবার খেতে দিন

আপনার বাচ্চার বয়স কি  
৪ মাস হয়ে গেছে? তাহলে  
এমন ওর সর্বাঙ্গীন বিকাশের  
জগা দরকার সঠিক মাত্রায় সুস্থ  
মানুষের শক্ত আহা।

সেরেলাক শিশুদের জগা  
পুষ্টিতে ভরপুর শস্য আহা  
দানা, শস্য, মাল্টিগ্রান চুর্ন এবং  
চিনির এক সুস্বাদু মিশ্রণ যা  
আপনার বাচ্চার বাড়কে এক  
পায়েজিনী সবরকম  
পুষ্টিতে যোগায়।

- সঠিক সুস্থমাত্রায় কাটি আর  
কার্বোহাইড্রেট থাকার দরুন  
আপনার বাচ্চা চলতে পারে।
- যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন  
থাকার দরুন আপনার বাচ্চা  
বাড়তে পারে।
- অতিরিক্ত পরিমাণে  
ভিটামিন ও অ্যাম্লিক থাকার  
দরুন আপনার বাচ্চা  
খেলতে পারে।

**NESTLE**

# ফুটবলের গোলমালে সাইন কী বলছে (১)

বছর তিনেক আগে কলকাতার প্রথম ফিউটবল লীগকে দু'ভাগ করে কাশী ও বাসুদেবীতে বিভক্ত করার মাধ্যমে রাধা হারিয়েছিল। বি গ্রুপটা লসিকাশীতেই পরিণত হতে বাধ্য পাল হওয়া প্রস্তাব নুমারী খেলা চালানু হত। কারণ বি গ্রুপের খেলার পক্ষে চ্যাম্পিয়নশিপের কোনো প্রশ্ন ছিল না। একেই অবশ্য দুটি গ্রুপ হল। বাঁও দাঁই গ্রুপের লার ফলের উপর চ্যাম্পিয়নশিপের প্রশ্ন নির্ভর-লি তবু ভিন্ন প্রবাহের মধ্যে একটি গ্রুপে আহবানাদ ও ইন্ট্রোডাকশন এবং একটি গ্রুপে ফেডারেশন স্পোর্টিং থার্ড ক্লাস ও বাস-দেবীতেই অবস্থা দাঁড়াল। কেননা গতবারের লীগ গঠার তৃতীয় দল মহম্মদ স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে -গ্রুপে আর যে বারোটি ক্লাব আছে তার মধ্যে জিকায়ের দাঁড়াল। একটিও নেই। গ্রুপের ই নম্বর ক্লাব এরিয়ানকেও গত বছর সাতটি মাঠে যে স্বীকার করতে হয়েছিল। অপরদিকে বি-গ্রুপের ইই প্রধান মেহনতবাদ ও ইন্ট্রোডাকশন ছিল পলাতান। যেভাবে গ্রুপ ভাগ হয়েছে তাতে বি শের খেলাতেই আকর্ষণ কমে গেছে। গ্রুপের খেলা হয়ে পড়বে একবারে জলো। আর সামগ্রিকভাবে লীগের আকর্ষণ যে ক্লর হবে ন আলোচনা আগের সপ্তাহেই করছি।

সামগ্রিকভাবে লীগ খেলার আকর্ষণ কমে গলেও ফুটবল নিয়ে ক্লাবের নামের সঙ্গে মোহ ছানো দর্শক সমর্থকদের মাতামাতি ও উৎসাহ-শীপনার ভাটা পড়বে বলে মনে হয় না। এবং ফুটবল নিয়ে খেলোয়াড় ও দর্শকদের উজ্জ্বল গাচরণ এবং হ্রদান ও শহরের শান্তি-শৃঙ্খলার বিধি-টায় আশঙ্কাও থাকবে সমানভাবে।

রাইটার্স ব্রিটিশেসে স্বয়ং মুম্বাইর কক্ষে-বাং শের মুখামম্মার উপস্থিতিতে ক্লাব প্রশাসক, গঠন খেলোয়াড় ও ফুটবল অনুষ্ঠানিকদের আলো-না সভার খেলার মাঠের শান্তি শৃঙ্খলা-বজায় রাখার ব্যাপারে প্রচার কথা খরচ হয়েছে।

ফুটবল মাঠের অশান্তি একবারে নিমূল না হলেও তু ধরনের গল্ফগোল অবশ্যই বন্ধ হতে পারে। আর স্পেন্সোয়াল দানা বেঁধে ওঠার সম্ভাবনা অস্বপ্নই বলা-করা যেতে পারে ফুটবল আইনের ধারা-গোষণাধারা যেমন চললে এবং দর্শকদের নয়-খেলোয়াড় ও ক্লাবকর্তৃপক্ষকে আইনের ধারা-কর্তৃপক্ষ গোপনিত্ব করে তুললে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, খেলোয়াড় ও ক্লাব কত-পক্ষ কি আইনের ধারাগুলি জানেন না?

উত্তরে বলব, কেউ কেউ জানেন, অনেকেই জানেন না। ধারা জানেন তাঁরাও আইন মেনে চলেন না।

সবাই জানেন, উত্তরেক ওয়ু সেবন খেলার আইনেই নিষিদ্ধ। আমি যদি অভিযোগ আনি, অতি রোগ উদ্বেজক এবং সেবন ফেডারেশন কাপের হাটিনালে খেলোয়াড়দের উজ্জ্বল আচরণের আশংকিত ভয় ছিল তবে অভিযোগ নিশ্চয়ই প্রমাণ করতে পারব না। কিন্তু সত্যের খাতিরে খেলোয়াড় ও ক্লাব কর্মকর্তারা কি অভিযোগ অস্বীকার করতে পারবেন?

এটা গেল সমস্ত খেলার সাধারণ আইনের কথা। বিশেষভাবে ফুটবল আইনের কথা নয়। ফুটবল আইন গোলমাল নিরসনের জন্য কী বলছে সত্যিই আমি দেখাতে চাই।

ফুটবল আইনের এক নম্বর ধারার খেলোয়াড়-দের প্রতি উপদেশশব্দে বলা হয়েছে:

"Learn the laws thoroughly. Only in this way will you be able to become really good at and get the maximum enjoyment

from the game. If all players had a full understanding of the laws, including the Referees' powers, there would be fewer disputes, which so often lead to the cautioning of players."

[Law one: Advice to Players]

দেশ পরিচালক পাঠকদের কাছে উপরে বর্ণিত বাংলা অনুবাদের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। শব্দ এইটুকুই বলতে চাই, ফুটবলের আইন সত্যিকারেরে অব্যাহত হওয়া প্রত্যেক খেলোয়াড়ের পক্ষে অপরিহার্য। এবং সেটা মেনে চললে খেলোয়াড়দের পক্ষে রেকর্ডার দ্বারা সতর্ক হওয়ারই প্রয়োজন ঘটবে না।

খেলোয়াড়দের অশোভন আচরণের জন্য ক্লাবই যে আসাসিসিয়েশনের কাছে দায়ী হয়ে পড়ে নীতির ক্ষণটুকু থেকেই তা পরিষ্কার।

The Football Association holds every club responsible for the behaviour of its players.

[Law Three: Advice to secretaries]

বিত্তী ধরনের ফউল, হিংস্র আচরণ, গালি-গালাজ করা প্রভৃতি অপরাধের জন্য খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দেবার অধিকার ও ক্ষমতা তো রেকর্ডারী আছেই, অধিকন্তু খেলার আগে, খেলার সময়ে এবং খেলার পরে দৃশ্যমান কারণ দর্শক, কর্মকর্তা ও পরিবর্তী খেলোয়াড়দের অশোভন আচরণ সম্পর্কে রিপোর্ট করার দায়-দায়িত্ব আছে রেকর্ডারী যাতে উপযুক্ত কতৃপক্ষ রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারেন।

রেকর্ডারী যদি তার দায়দায়িত্ব পালন না করেন এবং নিয়মক সংস্থা যদি মনে করেন অসদাচরণের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে তবে রেকর্ডারীই সাসপেন্ড হতে পারেন। নীচের লেখা আইনের ধারা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যাবে। ফুটবল মাঠে রেকর্ডারী সীমাহীন ক্ষমতা। কিন্তু কতদূর অব-হেলার জন্য শব্দ একটি ক্ষেত্রেই তাকে সাসপেন্ড করার বিধান রাখা হয়েছে নিয়মনিষ্ঠা বজায় রাখা ও উজ্জ্বলতা নিরসনের প্রয়োজনে।

The Referee shall report to the appropriate authority misconduct or any mis- demeanour on the part of spectators, officials, players, named substitutes or other persons which take place either on the field of play or in its vicinity at any time prior to, during, or after the match in question so that appropriate action can be taken by the authority concerned.

[Law Five: Board Decisions-4]

The Referee shall not allow any person to enter the field . . . nor shall he allow coaching from the boundary lines.

[Law Five: Board Decisions-12]

A Referee who fails to report misconduct which came under his notice may be suspended, if it is proved to the satisfaction of the Council that the case of misconduct should have been further investigated.

[Law Five: Advice to Referees]

যে ক্লাবের মাঠে খেলা হয় সেই ক্লাবই যে রেকর্ডারী নিরাপত্তা ও ভালমন্দের জন্য দায়ী এবং সুখ্যাত মানুষের মাঠে প্রবেশাধিকার না দেবার আর সদাচরণ করার জন্য প্রাক্কার্ড পোস্টার দেওয়ার দায়িত্বও যে ক্লাবের আইনের মধ্যেই সে বিধান রাখা হয়েছে। আইনের ধারা:

The home club is responsible for the welfare of the Referee and Linesmen, before, during and after the match, and on leaving the ground.

Notoriously bad characters should be refused admission to the ground. Post bills respecting misconduct towards the Referee, threatening immediate expulsion of any spectator go guilty.

[Law Five: Advice to Secretaries]

ফুটবল মাঠের গোলমাল বন্ধ ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আইনে আর কী কী বিধান আছে পরে আলোচনা করা যাবে।

মাকল

ডায়েরী  
গাইড

অমণ সঙ্গী  
১৯৮১। প্রথম ভাগ-৩০

অবন ঠাকুরের  
হোটেল মন্ডর-২৬

লুইস ক্যারল  
রচনাবলী

অনুবাদ: জয়ন্ত চৌধুরী ও  
লীলা মজুমদার।

ছবি: স্যার জন টেনিয়েল ও  
অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথম খণ্ড ২৫, দ্বিতীয় খণ্ড ২৫,

লুইস ক্যারলের রচনা কোনদিন  
পুরানো হবার নয়। সম্পূর্ণভাবে এক  
মলাটের মধ্যে লুইস ক্যারলের সব  
রচনা..... এটা একটা চমৎকার ব্যাপার।  
আনন্দবাজার।  
লেখকের আরও বই:

আজব দেশে অ্যালিসের  
অ্যাডভেঞ্চার ৬-৫০

আগ্নানার ওপারে অ্যালিস ৬-৫০

গ্রিম ভাইদের  
রচনাবলী

অনুবাদ: কামাকীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়  
ছবি: গণেশ পাইন

যদিও মুস জার্মান-তবে আজ বিশ্ব-  
জনীন রূপ পেয়েছে গ্রিমস্ ভাইদের  
উপকথা। এমন ভাষাটি খুঁজে পাওয়া  
ভার যে ভাষায় অনুবাদ হয়নি  
গ্রিমস ফেরারি টেলস। তাঁদের মোট  
২০টি উপকথার সমগ্র সম্ভারের  
একমাত্র বাংলা সংস্করণ।  
প্রথম খণ্ড ২৫, দ্বিতীয় খণ্ড ২০,  
তৃতীয় খণ্ড ২০

লেখকের আরও বই:  
কাঁচের কফিন ৭, বেহালা  
বাজিয়ের গল্প ৫, তুষার কণা ৫

এসিয়া পাবলিশিং  
কোম্পানি

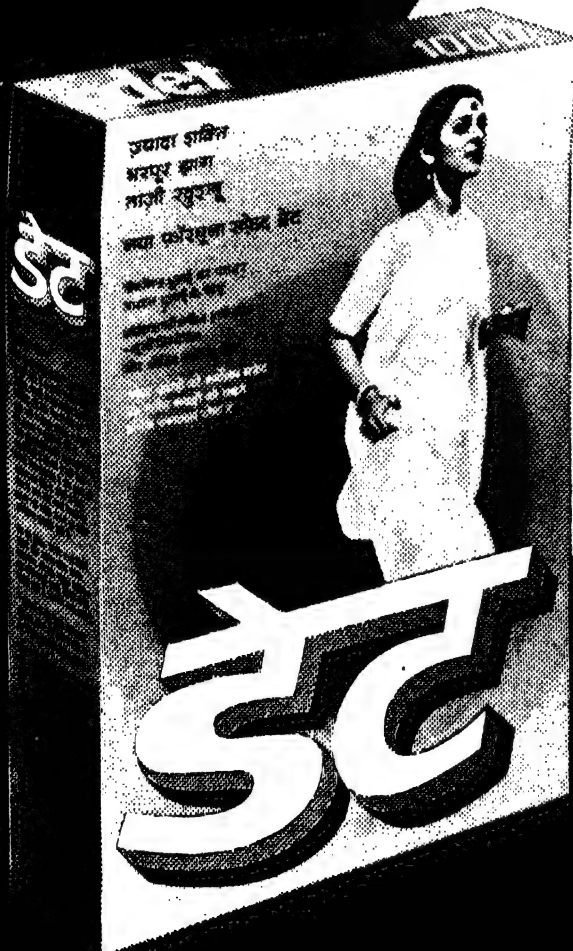
বহুলকৃষ্ণী  
কোম্পানি ৭০০০০৭



# આદા

# ਫਿਟ

# ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার পাউডার



**অতুলনীয় ধোয়ার শক্তি, অফুরন্ত ফেনা,**



কিন্তু শব্দ কিভাবেই হোক, পারলার  
 সূচীপত্রও যদি থাকত।  
 কিন্তু কৃত্রিমতা এ বিষয়ে কেনো সাহায্য  
 করে না। কীটন যারকর হকভাবে পড়ে  
 গেলেন। সেখা যার না। বসি, বিজ্ঞ,  
 সবার জন্ম আর কী সূত্রে তিনি  
 কীটন পরিচালনা করেছেন? আরও  
 অপ্রত্যাশিত ও প্রকাশিত পত্র পরিচালিত  
 থাকারই বা তাৎপৰ্য কী? কোনে  
 কীটনের প্রতি বা কবোয় উত্তর যদি  
 কী থেকে দেয় করবে চাই, তা হলে  
 পত্রের পর পরটা উলটে যেতে হবে,  
 ভালরকম চোখে পড়তেও পারে। কারণ,  
 কীটে কোন সূচীপত্র নেই, তেমনি  
 কেনো নিবেদিকাও নেই।

অন্য এক বস্তুমত্রেয় প্রজ্ঞা, হাস্য,  
 কান্দন শব্দ ভালো। প্রকাশক তার  
 করে মুঠি করেছেন নি।  
 তরুণের পদ

আলোচনা: শিব মহাশয় চিত্রকলা

**বেলা অবেলা কালবেলা**  
 কয়েকটা ব্যাপার এমন জটিল  
 করে, এমন আরো পত্র, কান্দন হীন-  
 ভাবে ঘটে যে তিনি শিল্পকলার  
 আকর্ষণ তিন কিলোমিটার হয়ে দাঁড়িয়ে  
 পড়েন। যেমন আকাশের জ্বলন্ত  
 আটকে জ্বলন্ত ভাবের কিলোমিটার  
 আরো জট বাধিতকৈ সমকালীন  
 পশ্চিম কালের প্রতিনিধনকে প্রকাশ নী  
 ফলে অস্তিত্ব করা হয়। কারণ, সম-  
 কালীন পশ্চিম কালের লক্ষণপ্রতিভা  
 কোন শিল্পী এতে অংশ গ্রহণ করেন

নি—উদ্ভাবিত কর, কীটন সমকালীন  
 পরিভাষা সেন, জমিন উন্নয়, মালিকলাল  
 কল্যাণশালার বা সোমস্বয় হেত, কিন  
 চৌধুরী, গোপাল সান্যাল, সুনীল দাস,  
 গুলেন পাইন, জবীন মন্ডল, কিশোর  
 ভট্টাচার্য, ডানকবে' বিপিন গেরগুদী,  
 লবনী রায়চৌধুরী, অজিত চক্রবর্তী,  
 দেবরত চক্রবর্তী, সুরজিৎ দাস, হাসাই  
 হাতিত ল্যামলা বসুদার, সনথ কর,  
 অমিতাভ কল্যাণশালার প্রমুখ  
 আরো শিল্পীদের নাম দিয়ে  
 এমন কিরত করা আর, বস্তুত  
 কোন কী তরুণের তারকাধর মধ্যে  
 অনেক নেই, অলাক ভট্টাচার্য, কান্দন  
 দালপাশ, কিলবর্গিত মাইতি, সযাশে,  
 বীর্ভুজ, অশোক জ্যোতিষ, তিলক  
 মন্ডল, বর্ষদ্যতির প্রকাশিত নিজেগী  
 এক অন্য অন্দেক। সত্যজ্ঞ, সে অর্ধ  
 সমকালীন কাল ত্রিক লাভতা হবে না।  
 প্রতিনিধনকে না হলেও, এর  
 মধ্যে কয়েকজনের ভাল কাজ ছিল। যেন  
 হয়, আমি একজনকে সন্তুষ্ট করে  
 আঁককার করলাম—ডেলখাউ (জেল  
 পান্টেল) আঁকির এক কবিতার  
 শিল্পীকে—অস্বাভাবিক মনোভাব। এর  
 মধ্যে কানাই একেবারে সন্তুষ্ট করেন।  
 পড়েন চালের মধ্যে কিলকৌ প্রতিক্রমের  
 গানসম্মি শরে থাকা, বাড়িরার নীচে  
 শরে থাকা কুঁড়ুর আর তেলকালি মাখা  
 প্রমিৎ এবং বসন্ত এক লোহার খণ্ড—  
 কলকাতার প্রমজীবীদের একেছেন হাবির  
 জাতিমিত সেনে, যেমন অল্পম তেমনি  
 তিনা উন্নতমসের। জলরঙে দৈবাল  
 যোবের "স্বাভাবিক অতিথদের জন্য

সমকাল—এক হুপারেল কেন হলেও  
 কোথায় কেন বসন্তের চোখের হাস  
 পড়েছে। তার চোখের চোখের হাস  
 রাভাভাভা মঠের মধ্যে প্রমের হু-কার  
 জন্ম এবং মেখে ঢাকা আকর্ষণের হাবির  
 টেনেছে। কারণ, অনুভূমিক এবং স্বাভাবিক  
 যোয়ার জাতিমিত কোয়ার সপ্তো জমের  
 কাজ। বসন্ত কল্যাণশালার টেম্পোরার  
 কাল করেন। হঠক ব্যাপারে কেন  
 একটা মজা আছে। কিন্তু তার কিল-  
 বস্তু শব্দ, গুলগদ ভাব প্রেম—নিজ  
 কড়ির বাসনের বেগতে বা পাকে  
 নির্বিঘ্ন প্রেমিক-প্রেমিকা অকেন—এক  
 হুপারেল এক ভঙ্গি কিছটা কিলোমিটার  
 চিত্রের মধ্যে এক প্রেম 'তিনি কি  
 জমকের জগতে জন্ম করেন? এখানে  
 তিনি বঁচার পাখি বঁচা থেকে চমক  
 করে জন্মহীলাকে হু-কার দশা—  
 সীতার বাবহার মাংসকার—লোভা এক  
 ময়লার কল মনে পড়ে—তব, মন জন্ম  
 না। অন্যদিকে সোমস্বয়র মাল পড়ে-  
 পেরি গণেশ পাইলকে সন্তুষ্ট করেছেন—  
 মালসের হু-কার হুপারেল, রঙ জন্ম  
 এক পরস্পর জন্ম হু-কার গুলগার।  
 অস্বাভাবিক সাজসোজ পুষ্কত। একটা  
 কলকাতার মাল কীটনচরিত্র দিয়ে টোঁকে  
 হলে কথার দশা একেছেন। বরং তব, ও  
 সূচীভাষার হু-কার টেম্পোরার করা  
 হারমোনিয়ামককে একেবারে মন  
 জন্মগে। মনব কল্যাণ প্রমিত। কল  
 কাতের জাতিমিত নের টেম্পোরার কাজ  
 করেছেন এক অন্যত পুষ্কর-টার  
 পুষ্কর সন্তো অমরক এর ইন্দ্রকৌর  
 কল তি সিন-র শকের মধ্যে। হঠক

কেনো। কারণ, ইন্দ্রকৌর কর, শিল্পী  
 কেন কল্যাণশালার শিল্পী হতে থাকে।  
 কল্যাণ হু-কার হু-কার হু-কার। এই  
 প্রজ্ঞা হতে পড়াশব্দলয়। আশ্চর্য  
 মন বা মালিকতা হু-কার নেই।  
 শব্দ নীচ হু-কার বা কিলকৈ একে  
 কল্যাণশালার হু-কার করেছেন একে  
 মন বা তাৎপৰ্য কিলকৈ কল্যাণ  
 কৌ। নিম্নে ভাল লয়র কিলকৈ সে  
 কিলকৈ। কিন্তু হতে হতে নদ্যাকার  
 বালা পেরেছেন, জীবনর তালির মাল  
 আটকায়ে।  
 হাসাই হাতিত এবং হু-কার  
 জা কিলকৈ করছেন। হরেন দাসের হু-কার  
 জন্ম এক শাতিশকতনে মন-তার  
 পড়াশব্দলয় করছেন। এবং তার খাচুর  
 পাতখোদাই (এটি) মনমী যদি  
 অগত্যাভূমির চিত্রকল হু-কার। তেমনি  
 কল্যাণশালার মাল "সাজসোজ" দেব  
 হু-কার প্রার হু-কার, হু-কার পাশাপাশি  
 লায়নে হু-কারে। পুষ্কর একটি  
 জন্ম এবং অন্য টেই জন্মের ওপ  
 গারাকটা। এতে সিংহাসন, মাল, হু-কার  
 হু-কার, হু-কার হু-কার সব আছে, আর  
 হু-কার প্রজ্ঞার কল্যাণ—হু-কার কল্যাণ  
 একই জিনিসের পদমোড়। কিন্তু  
 পের তিনি হু-কার হু-কার তার পরিচয়  
 আছে। হু-কার হু-কার হু-কার কল্যাণ  
 সমান নর এক একবারে মাল রেখা পের  
 টানা হু-কারে। কল্যাণ হাসাই হু-কার  
 জন্ম পুরীকা একাধিক এক হু-কার  
 হু-কার হু-কার তোলা। তব ও বসন্ত, মন  
 লাল সবজ রঙের বেরকম দাঁতি আনে  
 তার তুলনা নেই। তব হু-কার সবেমের

প্রতিটি ফোঁটাই গুণ্টি যোগায়!

কেসো-কার্পিনের প্রতি ফোঁটাই তুলের  
 পুষ্টি যোগায়...তুলকে সজীব রাখে।  
 তাইতো আমি রোজ কেসো-কার্পিন  
 মাখি। আর কেসো-কার্পিনের  
 মনোরম গন্ধের মিষ্টি আমেজ  
 সারাদিন আমায় প্রফুল্ল রাখে।

**কেসো-  
কার্পিন**  
 কেশ তৈল



দে'জ মেডিকেলের তৈরী



০৫২৭৮

অসম্পন্ন করে। প্রতিটিই অসম্পন্ন করে।  
কবিতাকে কবিতা-রূপেই যে অসম্পন্ন  
করে তাকে চেয়েছে সেটা কোন  
প্রশংসার, তেমনই তা যে পরোক্ষ  
নিষেধ নয় এবং পুঙ্খ, সৌন্দর্য, ঠিক।  
তাঁর অধ্যায়ের, নিষ্ঠার আদর্শ  
কবিতা কবিতার সমালোচনা করলাম।

জানকীর দান ছিল। সেটির  
মালী এবার পুনরুজ্জীবিত। তাঁর  
আকাঙ্ক্ষার সাহায্যে কলা তেতো-ওষধ-  
কলার জীর্ণ রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে  
একটিকে করে পড়ে থাকে পুঙ্খ মিল  
সময়। কলা কলার কবিতার মধ্যে  
তখনই যে "কবিতা-রূপ", তাপস  
সরকারের "সেপ" রবীন্দ্রবাবুর "সিঁদুর  
বিহার" জারজাত। এবং কবিতা  
পাইলের "পালিত" (মিঃ রবীন্দ্র হলেও  
অসম্পন্ন) মিল নয়। তবে এক  
হাস্যই হইবে যেহেতু ওপর ভাল ছিল।  
রবীন্দ্র জারজাত প্রতীতিত এক  
উন্নয়ন বহু শিক্ষণীয় পশ্চিম যাত্রার  
লিপিকল্পনা হলে যেমন "সিঁদুর"।  
কলার সরকার

## রূপসী আন্দামান

'আন্দামান আর্টস্ট সার্কেলের'  
রূপসী পদ্মা, নীরল পোশাক এবং  
স্বপ্নের সৌন্দর্য্য তাঁদের হৃদয় প্রসঙ্গী  
করলেম বিজ্ঞান আকর্ষণীয়। রূপসী  
কবিতার আন্দামানে কবিতা—এক  
আন্দামান-নিক-রূপ স্পষ্টপূর্ণের নিষ্কণ  
দেখলেই চিত্র-আঁকিত প্রকৃতির  
কবিতা। আন্দামানের আন্দামান  
সময়, কবিতা-রূপে তঁর মালী, মাল-  
কবিতার আন্দামান, গাছপালা মৃৎপাথর  
স্বপ্নের সৌন্দর্য্য হৃদয় প্রকৃতির কবিতা-  
কবিতা। নীরলের চিত্রমালায় আন্দামান  
কিছু পত্রিকাভাবে উপস্থিত—কিন্তু সে-  
প্রশংসা পরে আসিবে।

স্বপ্নের যে হৃদয়টি আমাকে সম-  
সেই মনুষ্য করে, সেটি হলো ১৬  
মহাব হৃদয়—নীলা-সবুজ কবিতা  
পাথরকে সেকতের ওপর দাঁড়িয়ে  
আছে, পশ্চিমপট নীল-সবুজের হোশ-  
কো আকর্ষণ আকর্ষণ। কবিতা পাথর  
উল্লসিত হৃদয় আছে, এবং কবিতা  
সময়ে ল'রু-সুন্দর একটি পরিষ্কার  
জারজাত রূপ স্বপ্নের আন্দামান  
ক্যান্ডাসে। পুঙ্খ তাই নয়, হৃদয়টিতে  
এমন এক ধরনের নিশ্চিন্ততা আছে। সত  
হয়েছে যা স্বপ্নেরই অবিভক্ত করে  
আমাদের। তবে, অধিকাংশ হৃদয়ই  
স্বপ্নের ইচ্ছা প্রকটভাবে ব্যবহার করেছেন  
তেরাও—এমন হয়, প্রকৃতির ক্যান্ডা-  
তাকে প্রকাশ করতে চেয়েই অতো রং  
লাগিয়েছেন স্বপ্নের, কিন্তু সবই তা  
সফল হয়নি। বিশেষত, ক্যান্ডা রঙকে  
তিনি যেমন সাফল্যে ব্যবহার করতে  
পারেননি। একটি হৃদয় তঁর অবশ্য  
কলার-উল্লসিত একটি রঙিত ব্যবহার  
করেন—নির্ভর, নীল সমুদ্রের  
ওপরে তিনি ছোটো একটি বস্তুর  
ভেতরে নীড়, পাথর, বিন-কর হৃদয়  
একত্রে। অর্থাৎ, সমুদ্রের বাতাস  
অবশ্যই, নিরন্তর বার সেকতাবাসে  
ল'রুতে পড়ে, তাদের তিনি স্বতন্ত্র  
একটি ফর্মের সহায় সমুদ্রের ওপরে  
দোদুল্যমান রেখেছেন। হৃদয়টি সুন্দর।  
যাই হোক, স্বপ্নের হৃদয় দেখে মনে

হয়েম রূপসী রূপসী, নেভার  
নীল-পাথর, হাছ-পালা ও স্বপ্নের  
প্রকৃতির বিশেষ বৈচিত্র্য কবিতা হয়ে  
আছে।

নীল, পশ্চিমের, প্রকৃতির হৃদয়  
প্রকৃতির হৃদয় নি। অর্থাৎ, 'কবিতা'  
কবিতা, হৃদয়মান রূপসীর  
সাহায্যে তিনি আন্দামান কবিতা  
চেয়েছেন আন্দামানের আন্দামান।  
তঁর অর্থাৎ, 'কবিতা' রেন্ডেল ও  
হৃদয়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে  
একবার আন্দামান রমণীর দেহ,  
কখনো বা পুঙ্খ পুঙ্খ ওষধের কখনও  
কখনও, চক্রে গভীর তাঁর হৃদয়ের  
কথা মনে পড়ে যায়। যে আন্দামান  
প্রকৃতির স্বপ্নের হৃদয়কে  
বাস্তবায়ন করে এঁকেছেন, তাকেই  
চেয়েছেন তঁর এনেছেন নীরল—বাস্তব  
ও 'কবিতা' রূপকল্পের সম্মেলনে, কখনও  
বা প্রকৃতির সহায়, কখনও  
আন্দামান-রূপের পার কবিতা বর্ণে।  
তঁর হৃদয় নামসিঁদুর এই হৃদয়-  
জীবনের আলো-র সংকেত—এ-  
হৃদয়, লাইফ ফ্রেন্ড, লাইফ প্রেসেন্স,  
স্টাটমেন্ট ইত্যাদি। নীরল পোশাকের  
প্রায় সব হৃদয় আমের তালো লেগে।  
প্রশংসা দান পুঙ্খ

## আন্দামান: পিতৃ সংগীত

### গান্ধবীর রবীন্দ্রজন্মোৎসব

'গান্ধবী' সংস্কার উদ্যোগে কখন  
হলে ১ থেকে ৭ মে পর্যন্ত সপ্তাহ-  
ব্যাপী রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালিত হ'ল।  
দিল্লি কলকাতার এত বড়ো মাপের  
রবীন্দ্র-জন্মোৎসব এর আগে হয়নি।  
সৌকর্য্যে এই প্রচেষ্টা অভিনন্দন  
যোগ্য। অভিনন্দন এঁদের অসীম  
কার্য্যেও প্রাপ্য। প্রথমত, একটি-কিন্তু  
গানের জলসার পরিণত করতে চালান  
গান্ধবী আসরগুলিকে। এক-এক দিনে  
আসরে এক-একজন শিল্পীকে অনেকটা  
করে সময় দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, শিল্পী  
নির্বাচনে শুধু রুচিরে কাজ করেছেন।  
আশাভূষণ, আপল কিংবা অসহায়তা  
একমুহুর্তে না তা নয়, তবে কমই ছিল।  
চেষ্টা করেছেন, ভেবেছেন, এটাই বড়ো।  
সাফল্যের সর্বোচ্চ যে উদ্যোগের হাতে  
থাকে না, নিতান্ত শিল্পী তা জানে।  
তবুও এটাই ছিল প্রথম বছর।  
অভিজ্ঞতা নিশ্চিত নিশ্চিত করবে  
আমারী হিসেব অনুষ্ঠান-পরিচালনা।

১ মে সকালে ছিল প্রথম আধ-  
কেন। বেদনায় দিয়ে সূচনা। অতঃপর  
মঙ্গলাচরণ। গান্ধবীর পক্ষ থেকে  
সুনির্মিত রায়ের স্বগত ভাবের পর,  
এ-দিন সভাপতি প্রদুলচন্দ্র গুপ্ত  
সংক্ষিপ্ত দু-চার কথার বললেন, উৎসব  
যেন শুধু প্রমোদের খেলা না হয়ে ওঠে,  
রবীন্দ্রবাবুর কঠিন দিকটির সঙ্গেও  
যেন আমরা পরিচিত হবার চেষ্টা করি,  
অনুসরণ করি তাঁর সাংগঠনিক চিন্তা-  
ধারাকে। প্রধান অতিথি মহাশয় সেন দুর্গা  
চন্দ্রকার অভিজ্ঞতার কাহিনীর মধ্যে দিয়ে  
সর্বস্বত্বের মানবের মধ্যে রবীন্দ্র-  
উপস্থিতির ব্যাপকতার কথা তুলে  
থরলেন।



## শ্যামলা দীঘর পশান কোণে

'শ্যামলা-দীঘর পশান কোণে'  
হিজল-তেঁতুল-ভালের মনে  
দাঁড়িয়ে আছে প্রকাশিত জামগাছ।



এই জামগাছকে ঘিরে নানা মিলি হলে এক অপরূপ কাহিনী  
হলেছেন তঁর শিল্পরূপ দানও। কাহিনীর চরিত্র—তিনি হল  
পাখি, কাঠবেড়ালি, পিগিরাং, পোহলা, পেলিকা আর অনেক।  
মানসিক আবেগের প্রাণবন্ত।

প্রতি পৃষ্ঠা প্রীতিপল্লব সত্ত-র আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ওঠে। [৫.০০]

## মজর কবিতা



প্রদীপ কবি প্রীতিপল্লব মজর হাতের এট  
কবিতাগুলি ছিল মজর, আশোরা-ভাষা-এক  
কথা মনে করিয়ে দেয়, বিশেষভাবে আন্তরিক  
উপযোগী।

প্রীতিপল্লব হৃদয়ে ওঠে মজর। [৫.০০]



শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ

৩২এ আচার্য প্রহ্লাদচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯

আকাশবাণীখ্যাত বেলা দে'র

## রূপ সাধনা ১২

### দেশবিদেশের রান্না ১২

পার্ল. এস. বাক নিক কাটার  
শয়তানের চোখে ঘুম নেই অপারেশন কায়রা  
১২ ১২  
গী দা মপাসা কোমান ডয়েল  
তৃষ্ণা যখন আদ্য গ্লোরিয়াফট শার্লক হোমস  
১২ ১২

রবার্ট মাকক্যান

## স্পাই ইন বসফোরাস ১২

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়-অগ্নিগু ৫, বসন্ত বাহার ৮,  
বনফল-মানদন্ত ১০, প্রেতগন্ধ ২২

নীহারজন গুপ্ত

দোলনচাঁপা তারা ওঠার আগে কান্তবিহঙ্গ  
১০ ৬ ৫  
শক্তিপদ রাজকর নীহারজন গুপ্ত শক্তিপদ রাজকর  
প্রতি ঘরে ঘরে প্রজাপতি রঙ ৬, আমি শুধু একা  
১৫ ১২ ১০  
আশাপূর্ণা দেবী-বংশধর ৭, উত্তর পুরুষ ৭

আচার্য কোমান ডয়েল

## এক্সপ্রেস অব সার্লক হোমস ১২

সঙ্ঘা প্রকাশনী ৭০, মহাত্মা গান্ধী রোড ৯ কলিকাতা-৯

সম্ভাব্য ঠিকার ও সহানুভূতিশীলতার  
সম্মেলন করে তার গানের  
অনুষ্ঠান শুরু হল। প্রত্যেক বিলাস  
কাননে এবং শত্রু আগুন বিলাসভায়ে  
কথাচিত্র হৃদয়ময় গানটির যেমন করে  
এই ক্ষেত্রের নিপুণ পরিবেশনে তেমনই  
শ্রুতিতে সন্মেলন করলে 'শ্রুতনামা'  
জেরা শুনিল কি কি এবং মিলিত করে  
শ্রুতি যে সুরের অনুষ্ঠান-এ সহজে  
সঙ্গীত হল প্রাণিত কর্তৃ। কণ্ঠের  
সুখম মিলনে ও শ্রাব্যতার জ্বলার  
বীত এমন সম্মেলন গান শোনার মে  
বিলস অভিজ্ঞতা, এ-কথা অনস্বীকার্য।

এক আশ্রয় প্রথম দিল্পী কণ্ঠ  
গৃহ যে অসম্ভব, ঘোষিত তা আগে-  
জানিয়ে দিলেন। সুরের কথা,  
দিল্পীর পরিবেশনে অসম্ভবতার ছাপ  
তেমন প্রকট ছিল না। শ্রুতি, কণ্ঠ,  
কণ্ঠের আশ্রয় কানটিতে কণ্ঠ গৃহ  
নিজেরই জীবন্ততার করে সৌম্য  
পরহৃত। এ-ছাড়া প্রাণের ধারের মতই  
অবিরল শ্রুতি করে পড়েছিল তব  
তোমার সোনার আলোর, স্বপন বাহি  
জানিলে বা প্রাকরণের ধারের মতো  
গানগুলিতে।

আশোকতরঙ্গ, কল্যাণাখ্যার সৌম্য  
দুর্ভাগ্যে শ্রুতিরেরেছন ঘোর দুঃখে  
জাগিল। বিভাস চিত্রালে নিকম এই  
গানে নিশ্চয়সান ও বশ দিলার জাগরণ  
স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, অনুভূতিসোচর হয়ে  
উঠল তার গারনভাষায়। সৌম্য তার  
অন্য পরিবেশনের মধ্যে নয়ন জেরার  
আশ্রয়দায়ী মাতোয়ারা এবং চারপের  
দুঃখ ভাষাতে শোনানো একবার তোরা



সম্ভাব্য ঠিকার ও সহানুভূতিশীলতার

মা বলিরা ডাক ভালো লেগেছে। কিন্তু  
প্রথর তপন তাপের তপন আর তিনি  
বেতাবে পার হলেন তা অচেনা লাগল  
কানে।

গান ছাড়াও এ-দিনের অন্যতর  
আকর্ষণ ছিল দেকলিঙ্গ কল্যাণাখ্যারের  
সংগত যাত্রার আবহুতি।

শ্রুতির মিলের শ্রুতিতে ছিলেন  
চিরনবীন শান্তিদেব ঘোষ। কখনো কখনো  
কোমল কখনো জীবন্ত কণ্ঠে চকিত  
অভিজ্ঞতার উচ্চারণ তেরটি গানের  
মধ্যে কখনো বিষম, কখনো উদ্ভাসিত,  
কখনো শুল্কিত, কখনো অনুরাগিত

করে তুলছেন তিনি। কলকল ভা  
ছিলই, এ-হৃদয় ছিল সেই সম্ভার  
ভালিতে সুনির্বাচিত আরও বারটি  
গান। এক হাতে বীর কৃপাল এবং অন্য  
হাতে হার তিনিই যেন শ্রুতিদেব ঘোষ  
আত্মক নিরে ফেরেন না কখনো। যা  
আছে সব একেবারে করেন অধিকার।  
এখনও সফলতর লুক করতে হয়,  
দুঃখের বজ্র অনল জ্বলকে গানের  
প্রতিটি বৃত্তাকরকে উপলব্ধির মতো  
সংগে দাঁল করে কী করে নেমে আসে  
সুরের স্বরনাথার, কী ভাবে গিরবে না  
তা জানির না-র টানকে তিনি করে

তোলেন বাধাবিহীন আলস, ব্যক  
চিত্তে বাক বিহার জল-এ কীভাবে  
ওজস্বিতা করেন ব্যক, 'ও জাই কানাই-  
এই কৌতুকময় রসটিকে কীভাবে করেন  
মৃত্যু। অনুরাগ বস্তের খেল এই  
অনুষ্ঠানের আরেক স্বরূপের আনন্দকণী।

অপর্যবেশ গানের প্রথম দিল্পী  
পূর্বা নাম পক্ষম গানে ইক অলানন্দক  
হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তার সঙ্গ  
পরিণত, লক্ষ পরিবেশভাষিতে শ্রাব্য  
শ্রুতি এসো আন। 'মেয়ে করে মারে  
'এই আসন তলের এক গিরে কীরে  
ডাক দৌঁধের গানগুলি অনবদ্য নিবেশন  
হয়ে উঠে হল। পূর্বা নামের গানে  
ইহানী নতুনতর একটি মনো ব্যক  
হয়েছে, বাস্তব ও রূচিবাহক অস্ত  
দিল্লেন তিনি, ফলে গান শ্রুতি  
আওড়ানো হয়ে থাকে না, তাৎপর্যপূর্ণ  
এবং সূক্ষ্ম চেহারা পায়। অপর পক্ষ,  
অর্থাৎ সেন যেন জনপ্রিয়তার সঙ্গে সহজ  
সম্মিলন করতে চাইছেন। স্বর বাস্তব  
কমরে, মোলোনা বৃত্ত করে, তিনি  
এমন একটা ভাষাতে পরিবেশন করেন  
যা তার মতো সিরিঙ্গান স্বরূপ দিল্পীর  
কাছে প্রকাশিত নয়। অন্যান্য সুরেরা  
এবং লালমার অর্থাৎ সেনের কণ্ঠ  
উচ্চারণ স্পষ্ট, সজ্ঞ ও স্বকোমল  
তার স্বরকণ। সেই সঙ্গে নাটকীয়তার  
প্রতি সাম্প্রতিক ও অকারণ শ্রো  
সৌম্যের প্রতিটি গানেই দেখা গেল।  
এ-দিনের আবহুতিতে ছিলেন দৌঁধী  
ঘোষ ও পাখি ঘোষ। শ্রুতি কণ্ঠের  
কোনো নিবেশন ছিল না। কেন যে ছিল  
না।

## আপনার চুল কি পাতলা, বেতিয়ে পড়া ?

আপনার চুলকে ঘন ও  
মোলামোলা করে তুলুন...



## প্রাচীন-সমৃদ্ধ হেলো এগ শ্যাম্পুর সাহায্যে

পুষ্টির অভাবে আপনার চুল পাতলা  
হয়ে যায়-বেতিয়ে পড়ে-  
মোলামোলো করে ভাবটি আর  
থাকে না।

গাঢ় সোনালী রঙের হোলো এগ  
শ্যাম্পুর প্রাচীন-সমৃদ্ধ পুষ্টির  
ফরমুলা আপনার চুলে পুষ্টি  
জোগায়, আপনার চুল আয়ত্ব  
আনে। ফলে চুল দেখায় ঘন ও  
দোলাদোলানো। হেলো এগ  
শ্যাম্পুর ঘন ফেনা আপনার  
চুলের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে মিশে  
গিয়ে আপনার চুলকে সজীব  
ও বলমূল করে তোলে।

ঘন ও মোলামোলো চুলের জন্যে  
আজই হেলো এগ শ্যাম্পু কিনুন





পূর্বী গান

তৃতীয় দিনের আদরের মতনা করলেন গীতা কটক। তাঁর গান শোনা রজন্য অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছে। এ-দিনের পটিচি গানের মধ্যে প্রথম তিনটিতে লক্ষ্যবোধ ছিল প্রবল। শেষ দুটি ছিল তাঁর কণ্ঠের নিরুপম অনুকূল-বিকাশিত—‘কী হৃদয় এবং গতি শো মরি’। কিন্তু পথে চলে যেতে যেতে বা ‘আয়ো আযাত’ কিংবা ‘বে কদিনে ছিল’ গান তিনটিতেও রৌদ্রের গীতা ঘটকের রেশম কোমল কণ্ঠ অনুরাগ মসৃণতার অনন্য হয়ে ধর। পরেও।

লুভপ্রী মনোপাখ্যায় খুবই ভালো গোরেছেন ‘ফিরে ফিরে’ এবং ‘তুমি কোন পথে বে এসে’। কিন্তু তাঁর পক্ষে ‘প্রথম জাগি তব লজি’ বা ‘আপনারে দিয়ে’ গান দুটি ছিল বেশি জারিজী। তাঁর কণ্ঠ সুরেলন, উজ্জ্বল সুন্দর, গায়ন ভাষা স্পষ্টময়, তবু এ-গান দুটিতে ছোট্ট মেরেপের মতো নারী বক্তৃৎসের বেনারসী পরে সাজতে চায়। কোথায় যেন কাক থেকে বার, তবুও কণ্ঠে খোলে না জারি গানের মহিমা।

কলিক। বন্দোপাখ্যায় ছিলেন এ-দিনের প্রবলতম আকর্ষণ। সেদিন প্রথম থেকেই পূর্ব সত্যার পাওর। গিরেছিল তাকে মনে হয়েছে সেইসব সুন্দর সত্যার শেষ কে না পাই-এর শব্দে সত্যার শেষ কে না পাই-এর শব্দে পূর্বের লক্ষ্যটি, কী কর্মসূচির আঁর্জি হয়ে থেকে উঠেছিল ‘কিছুই তো হল না’। বিন-প্রতিশ্রুতিময় হাফাকার তা জ্ঞান বাক্যেই ভরিল। শেষ গানে, ‘কত মনে লগোতে, রজন্য তবু যে খেঁজের থেকে মাজতে হাফাকার সূর্যের অভিজ্ঞতা, তা বাধা সোন বাজল কীম্বদন্তে সেবার অনুভব জন্মানোর। বোকা সেল, তখন ঠিক বসতে হয়, আমার এ গান হতেছে তার লক্ষ্য অলংকার, তখন সে-খা, কোন্ ফিল্ম মনুতে, লজা হয়ে গেছে তার গানের সিল্পীর কাছেও।

এ-কক্ষ এ-দিন গানে ছিলেন বাদী হুও মোরা লক্ষ্যবিকারী। তাঁরা মের মহিমার আলম উজ্জ্বল করেছেন, মের মহিমার নয়।

আজিকে ছিলেন প্রবীণ বোধ। শ্রীমতীময় বাক্য অলংকারে নির্বাচিত কলিক। সিরে তিনি একটি মনোবা-প্রথম মালম দেখেছেন। বিজয়ীল স্মরণীয়। তবে স্মরণীয় দাঁড়।

তৃতীয় দিন সকালে একজন লক্ষ্যবোধে ছিলেন গীতা কটক। আর্থবান গান শোনার লক্ষ্য তিন। প্রজাতন্ত্রী আদরের অনুভব নির্বাচিত হয়েছিল তাঁর গানের মাঝে। তারসংগত ইংল অলংকার ছিল তাঁর কণ্ঠ। শেষ গান ‘আমার গহিহতে যোগো নাতে’ মে-বীর্ষবান লম্বত গানটিকে নিরাসিত করেছে, তা বেশ কোথাও কলি না। তাঁর কণ্ঠের শব্দ, উপহার শব্দ প্রভাতে, পূজন প্রাণ দাত এবং সব আদর্শে জাগো।

এ-দিন সকালে কোমল গান্ধার্য গোষ্ঠীর প্রবেশনার লক্ষ্য হল ল্যাংগেরটির মটকটি। এই মটকটির আলোচনা এই পটিকা এর আগেই হয়ে গেছে। সেদিন ভূমিকালিপিতে সারান। অবলবল ছিল, কিন্তু মল নাটকের আবেগনে কোনো হেরকের ঘটনা। প্রব মনোপাখ্যায়

কটক : সুবীল চট্টোপাধ্যায়

### আলোচনা : পিতৃ সংজ্ঞা রেকর্ড

#### পশ্চিম বৃত্তে চোর

রবিশঙ্কর একবার তাঁর নামের আগে ‘পশ্চিম’ লক্ষ্যটি ব্যবহারে অপসিত জানিয়েছিলেন। কলোই করেছিলেন। কারণ, ‘পশ্চিম’ লক্ষ্যটির মধ্যে একটা গোড়ামি আছে, সৎকারে অস্বস্তি জন্মায় চিত্র আছে। রবিশঙ্কর সম্পূর্ণভাবেই মনোপাখ্যায় মানব—সর্বভোক্তা অর্থাৎ সব জাননা খোলা আছে, সর্বদিকের বাতাস এসে কোলাহুল করে।

সম্প্রতি পলিডোর কোম্পানী থেকে রবিশঙ্কর অপসী সিল্পীদের সহ-কোম্পানীর একটি সাং জোরে ‘রেকর্ড’ প্রকাশ করেছেন। মল দুটি ‘কোতো’ এবং ‘শুকুহাচি’। কোতো মল তেরটি তার। কটকের উপলক্ষ্যে অষ্টম শতকের ‘চীনা’। আর ‘শুকুহাচি’ হল পঞ্চাল সেমি লক্ষ্য বাণেশের বাঁশ। অনেক আগে বৌদ্ধ প্রচারকরা এই বাঁশ বজাতেন। পরবর্তীকালে অন্য মলের সঙ্গে মিলে জীবনের গভীরতা প্রকাশে ‘অপরিহার্য’ হয়ে পড়ে। কোতো’র বখন হাফা হাফা-জবে স্পরণালি বজতে থাকে, তখন অস্বস্তি একটা লৈলিক ‘পালপলস’ তৈরী হতে থাকে। কিশকিকর লাল-পেল লল—বেদনার দ্বারা যেন আকাশ থেকে দেয় হীর পলসকরে। আর ‘শুকুহাচি’-র আওরাল আমায়ের বাঁশ, জারিওনেট; আ লাসাই; কোন কিছুই ললগারীর লর কিছু কাছাকাছি। চিপুদা রুটের অনেকটা আময় আসে। ‘শুকুহাচি’ গভীর থেকে আভিগম্যেরক টেসে আসে এবং অনুভূতিক প্রত্যক করে তেলে ছোলাত পর্কিয়ে।

সাং জোরে-এর প্রথম অংশে এক ‘কোতো’ বাজিয়েছেন সুন্দর মিলনিত। রোয়াল জম্বীর এই মল মনোপাখ্যাকে লক্ষ্যভাবে আবিষ্কার করা যায়—জিহ্না ভৌগোলিক পরিবেশ। মলটির বজনের বরন এবং আওরাল জম্বেরী অচল থাকে কতকিই সুদৃষ্টিক দিয়ে বলে দেখে যে সেটি চিপিতে পর কিনা। ‘আজমায়’ তখনা লহরার (কহারবা) হরত অপসী প্রেরতদের বিশ্মিত করবেন। আর আমায়ের কহর

## নিউরশীল, টেকসই ও আধুনিক বালই এর সমাদর



ভালো ছাত্র (জন্য)  
একটু বেশী খরচ  
করাও মার্থক

## কে.সি.পালের ছাতা



অতি আধুনিক  
ও বাজারের সেরা জিনিস  
দিয়ে তৈরী। ছাতার  
কাপড়গুলিও ওয়াটার-প্রুফ

ক.সি.পাল এণ্ড সন্স  
কলিকাতা-৭০০০০৭

## সংগ্রহ করে রাখার মত দুটি অসাধারণ গ্রন্থ



কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ সেন বহুবিশ্লবের' প্রকাশ করছেন।

বাঁ দিকে প্রকাশক অলোক নাথ বাগচী ও লেখক কিরণেন্দু বাগচী।

ডানদিকে শিক্ষা অধিকর্তা মাননীয় শ্রী এস, সি, দাশগুপ্ত।

### কিরণেন্দু বাগচীর বহুবিশ্লব

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাসে সশস্ত্র আন্দোলনের অধ্যায়টি আত্মদানের রক্তাক্তরে চিরকাল সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। সেই অগ্নিশৃঙ্গের এক অবশ্য উচ্চারিত নাম বিপ্লবী কানাই লাল দত্ত। তাঁর মহান জীবন কাহিনী 'বহুবিশ্লবের' পাতায় পাতায় বর্ণিত হয়েছে লেখক কিরণেন্দু বাগচীর আশ্চর্য শৈল্পিক নিপুণতায়। বহু দুঃপ্রাপ্য ছবিসহ ৫২০ পৃষ্ঠার বর্তমান গ্রন্থটি ভারতের সশস্ত্র আন্দোলনের একটি মূল্যবান দলিল। অরবিন্দ বোমা মামলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সেই ঐতিহাসিক সওয়াল পূর্ণ, সচিত্র বিবরণ বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবেশিত হওয়ায়, আইনবিদ এবং আইনের ছাত্রদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ স্বরূপ। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ সেন বলেন, "বহুবিশ্লবে বিপ্লবের ইতিহাস নোতুন ক'রে লেখা হল এতদিনে।" পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা অধিকর্তা মাননীয় শ্রী এস, সি, দাশগুপ্তের অভিমত, "প্রতিটি স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি এবং সাধারণ পাঠাগারে 'বহুবিশ্লব' অবশ্যই সংগ্রহ করা দরকার।" এছাড়া অগ্নিশৃঙ্গের মহান বিপ্লবী মাননীয় শ্রীগণেশ ঘোষের লেখা গ্রন্থখানির ভূমিকা থেকে স্মরণ করি, "ভারতের মুক্তি সংগ্রামের বহু সংখ্যক অমর শহীদের জীবন আলোকে অন্ধনে লেখকের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়।" বাকবাক্যে ছাপা, সুন্দর বাঁদাই এবং প্রাস্টিক জ্যাকেটে মোড়া বইখানির মূল্য ৩২.০০ টাকা মাত্র। পুস্তক বিক্রেতা এবং গ্রন্থাগারগুলির জন্য বিশেষ ছাড়। সত্তর নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

জিতেন্দ্র মোহন ভৌমিকের

**তত্ত্বকন্যা**

(১ম ও ২য় খণ্ড)

প্রতিখণ্ড ১৮.০০ মাত্র

তত্ত্বসাধনা, জন্মান্তর ও আত্মারহস্য, প্রেত ও পরলোকতত্ত্ব সম্পর্কে আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সহ বর্তমান দুটি খণ্ড একত্রে নিজে ২০", বিশেষ ছাড়।

CEA/80

**তিনখানি বই একসঙ্গে নিলে ভি, পি, খরচ নেই**

আগামী প্রকাশনা  
ডঃকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামীর প্রব্রতীর্থ পরিক্রমা  
ও হরিন্দাস ঘোষের তিন্ন তিন্ন কবিতা

দেবক ভেটাস  
কলেজ স্ট্রীট  
কলিকাতা-৭৩

প্রাপ্তিস্থান

নাথ ব্রাদার্স  
শাখাচরণ দে স্ট্রীট  
কলিকাতা-৭৩

ভি.পি.তে বই পেতে হলে মনিঅর্ডার বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে নীচের ঠিকানায় টাকা পাঠান

দেবকঠ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১২, লাউডন স্ট্রীট মার্কটিং কলিকাতা-৭০০০১৭



সেটা উপরি পাওয়া। শেষ অংশে সম্পদ-  
দশ শতকের একটি সুন্দর 'কোতো' সুর  
চড়াতে পুঙ্খানুপুঙ্খ রবিশঙ্কর নতুনভাবে  
সুর গ্রহণ করছেন। রেকর্ডের শ্রুতি  
অংশে 'নম্র শিবায়' নামে একটি সুন্দর  
কম্পোজিশনে 'শাকুবাচ' শিবরজনী  
রূপটির রস নিখুঁত আদায় করেছেন।  
শিবরজনীর কোমল গাম্ভীর্য 'শাকুবাচ'ত  
তীর থেকে তীরতর হতে থাকে।  
শেষ অংশটি যেন উদ্দাম আরতির পর  
পূর্ণাঙ্গালি দিলেন হোজান ইয়মো-  
য়েতে। কৌশিধনে রাগে রবিশঙ্কর  
বাজিয়েছেন 'নিপুনের উদ্দেশ্য পূজা  
নিবেদন' একটি স্বার্থ সাংস্কৃতিক ভাব  
বিনিময়।

শ্রবণ বা সেতার বা জরতীর যন্ত্রে  
যে মীড়ের কাজ, সে ধরনের গাথনি  
রসে সুর এগিয়ে যায়, জাপানী যন্ত্রে  
সেই সুবর্ণালি এগিয়ে যায় ছাড়া ছাড়া  
কাটা ভাবে। একই সুর ভিন্নদেশে,  
ভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে। পূজা দেয়।  
আমরা মাল্য গাথি, অনেকগুলি পদ্য  
দিয়ে পদ্মাসন রচনা করি—অলংকার,  
চালচিহ্নে আমাদের পূজা নিবেদন।  
জাপানী কবিতা ছোট, একটি দুটি  
ফলের সংস্পর্শে অগঙ্গা গৃহসম্বা  
ফুলবাঁহীন হয়েও অনেক কিছু কলা।  
আসলে সুর আসে জীবন থেকে—  
জীবনীবাচ্যত সুর ধ্যান ভগ্নতে পারে,  
ধানসম্পদ হতে দেয় না।

**বাঁগচাচা বুলবুলি**

অন্য গানের ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছে,  
নব্ব্বলগাতিও ক্ষেত্রে তার বিপরীত  
আভিজাত্য। বিকৃত বংগের শিল্পীরা  
এখনও আধুনিক, সাম্প্রতিক শিল্পীরা  
অনেক সময় অক্ষমতার জন্য সরলীকৃত  
করেছে চান, অথবা অনেকে সক্ষমতাকে  
জাহির করার জন্য অকলংক করেন।

ইনঃসেকার এবারের নব্ব্বলগাতির  
মধ্যে ষাঁড়পুট্ট মিত্রের সংকলনে  
কয়েকটি অমূল্য গান স্থান পেয়েছে।  
ভোজের কিলের জলে বা ফলের  
মলসার নীরব কেন কবি গমন দুটি  
শিল্পীর নামের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।  
ডরকী তাঁতের ধানশ্রী রসের বিখ্যাত  
সুখামালতী বকে গানে অব্যাহত  
কামল রে আরোপে সম্মান ও সকলের

এই অকল্যাণ আরও সত্যকৃত  
নিশ্চরিত রিমক্স বালক নৃপের গানে।  
কোন অকল্যাণ ডান বাহুল্য, কখন ইচ্ছা  
হাতাতে যেন। জাই সপ্তরীত বার  
খালি পক্ষী কুল মেলে/মেলে পানে  
আছে চেরে/করে দেখি জমি করে  
দেখ/মেখলা আকাশ না মেখলা মেখ  
হালিট শব্দ হলে ওঠে (রবিশঙ্করের  
'কুলকলি') তিনিই ভক্তিগীতর মধ্যে  
'মশানে জাগিছে শ্যামা' কাফি-  
সিদ্ধিতে রক্তগোপী খেলে হোরী বা  
পুই কালি মেখে গানলিপিতেও একই  
অনুরস ভাপি। একমাত্র খেলন শেষ  
হল গানটি যেন কিছতেই স্বাভাবিক  
হয়ে উঠি আনতে পারেন না।

টনরকের রেকর্ড-এর অসীম  
ক্ষমতা। তার প্রচুর সুপ্রভা সরকারের  
কণ্ঠকেও অনুরকম করে দিতে পারেন।  
যে অসম্ভব দুপট শিল্পীর আকর্ষণী  
সেই দুপট হঠাৎ বেড়ে যায়—গলা বেখানে  
ধরে এসেছে দৌঁকে সযত্নে ধরে রাখা  
হয়। মাঝে মাঝে স্পন্দন হয়। তার বরস  
বেশী, সুপ্রভা সরকারের না কেকড়  
ইঞ্জিনারিয়ার-এর? এত দুটির মধ্যে  
বরণায় শিল্পী অনাক্ষুণ্ণ থাকেন না।  
—আমার কাচোরা ঠাকুর এলো বা জির  
জাতির আবার এলো কি আদ্য। দুই  
ডাকের গানেই। ভাল লাগেন 'সুমাও  
ঘমাও দে.খত এসো'। এই ধরনের  
গানে তিনি বাজবার আমাদের আগে  
আনমনা করে দিয়েছেন। 'আমার নমনে  
নয়ন গুনটি শকীরতার উল্লেখ।  
অপ্রসিদ্ধ হলেও একটি কথা বলা  
দরকার। এই গানটির সংশ্লিষ্ট দুইনাথের  
'হে মোর দেবতা' গানটির প্রায় ছটে  
ছটে মিল। এরকম অনেক গান দেখান  
যেতে পারে—নব্ব্বল কতভাবে রবীন্দ্র-  
নাথ-অনুপ্রাণিত। সুরের ক্ষেত্রে তিনি  
যেমন চটকার করে পাখা মেলেতে পারেন—  
গান রচনায় কিন্তু তিনি আকাশ-  
ডাকনাকে মত সীমার এনে ফেলেন।  
ফলে অনেক সাধারণ পাঠক বা শ্রোতা  
সহজেই আকৃষ্ট হন। এই প্রসঙ্গ দাঁখ  
আলোচনা-সম্পর্ক।

পুরবী দত্তের লং লেইং এখানেও  
একটি সম্পদ। পুরবী দত্তের কণ্ঠে সব  
ধরনের গান সজীব হয়ে ওঠে। বিশেষত  
তার গায়নশৈলী সর্বোচ্চ আধুনিক।  
জাহা চলাতি আধুনিক বা কিসের  
গানের গুরুত্বপূর্ণ নব্ব্বলগাতিতে তিনি  
জর্নিপ্রসন্ন করেও মরা দিতে পারেন।  
'ওগো সুন্দর' বা 'শিউলিতলার জোর  
কোয়ার দুটি সম্পদ' জির গোত্রের  
গান। কিন্তু স্বার্থ অনুবোধে তিনি দু-  
ধরনের গানে প্রোডাক্ট চমকিত করতে  
পারেন। গজলের নিখোঁজে পিঁড়িতে  
'হাড় হাড় অচল ব'খ' বা বাগেদীতে  
চোখের কোয়ার ডালকাসা গানেও তিনি  
অনল্যা। আবার দুটি 'জিমখমী' গান  
এসো যে সজল ঘন বা 'মনে পড়ে আজ'  
গান দুটির পরিবেশনও বিন্দুসর  
আভিজাত্য। ইসলামী গান এখন প্রচুর  
শোনাই যায় না। পুরবী দত্ত 'এ কোন  
মধ্য শরায় দিলে গানে আবারও  
নব্ব্বলগাতির জোর একটি দিক স্মরণ  
কার্যে যিলেন। অকল্য হই এই ভাবে  
এত নৈশুখা সড়ুও 'কুল করে জীব'  
গানটি রসোত্তীর্ণ হল না কেন?

**মানব মত বই-মানব বিলি কলেক্টর**

চিত্তরঞ্জন মাইতি      হুজিতকুমার সেনগুপ্ত  
পরমা ২০১      রক্তমাখা গুপ্তধন ৬  
প্রফুল্ল রায়  
আপন মনে ২০০      করুণাধারায় এসো ১৫.০০  
স্বপ্ন মিত্র      শান্তিনাথ মুখোপাধ্যায়  
একদা ৬.০০      সংলায় ৮.০০

**বিহঙ্গের গান ২০১**

বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ গায়কগণ উপভোগ্য  
প্রফুল্ল রায়ের

**চ রিত্র ২৮১**

হুমন্ত মুখোপাধ্যায়, আবলকুমার ২০০  
কবিতা সিন্ধু, রাণী টিলা নিশা ২০১  
আমিতাভ চৌধুরী, আভাস গুপ্তা ২০০  
সত্যদেব ভট্টাচার্য  
অজুলা দেশ লাভার

স্বর্গদেবী চন্দ্র  
ভাষাভাষা ও দৃশ্যভূমি জীবন  
যেহেঁতু জীবন ১২

সমবেশ বঙ্গ  
জীবন যখন বৈকুণ্ঠ ২২

৬৮ কলকাতা স্ট্রিট, কলি-৭০

অগ্রিম ছাড়া V. P.-তে বই পাঠানো সম্ভব নয়

বিশাল কান্ড একালের জনপ্রিয়  
 শিল্পী। তিনি নিজস্ব একটি ধরন  
 সৃষ্টি করে নিয়েছেন (বয়সঃ ৩৫।  
 ছোট) লক রকম গান তিনি ধরেন বেশে  
 নেন। এছাড়া কিছু গান রসাতলি  
 হয়ে কিছু সজলিকরণ সব ফেলে সুলভ  
 নেন না। এটি গানের ভূমি গান বেশভাষা  
 গায়কিক গায়ক বলে বিবেচন করা যায়।  
 যাও সেখানে গানে কাজ হলে গায়  
 গায়কগণটি অবহেলা। অজ্ঞের ভূমি  
 অজ্ঞ চিরদিন গানটি রসাতলি, অজ্ঞ  
 একটি ভক্তগণটি খেলাই এ বিশ্ব জগৎ  
 গানে কখনই সেই বিরাট শিল্প আভাসিত  
 হয় না যে প্রকার সৃষ্টি তব পূজনা  
 মেলা/মিলনে প্রভু নিরাসনে বলে গলে  
 হয়ে। 'হৃদয়লাকাতে যেবে কিবা  
 গলেনে সৃষ্টিই কি এর জন্য দারী? 'অ-  
 পূর্ব' সৃষ্টি সহজই, ওকে? 'পাশ  
 হাতে বসি' গানটি ভাল গায়ক হয়ে।  
 কিন্তু গানটি গাইতে হলে সীমায়িত  
 রেজ দিয়ে অস্বাভাবিক পড়তেই হবে।  
 সত্যারিতে খাটে ধীরেন কস। স্বজ্ঞে  
 চলে গেলে। কিন্তু তারসংকে ভবি  
 কণ্টক ক্রিয়মতা অনুভূত হয়।  
 সত্য শিল্পীদের মধ্যে খেঁচা চট্টা-  
 পাঞ্চরো সম্প্রদায় প্রচুর। নানা ধরনের  
 গানেই তিনি পারদর্শী। এ মানেই তাঁর  
 কৃতিত্ব ও ব্যর্থতা। অতুলপ্রসাদ, নজরুল  
 বা আধুনিক সব কক্ষের গানের স্বাভাব্য  
 তাকে আবিষ্কার করতে হবে। মিল্লিপ  
 চক্করটি কিছতেই মঙ্গলপটকে সূক্ষ্ম  
 নন—অন্য ক্ষেত্রেও তিনি স্মৃতিস্তর  
 নন। আর অন্য উদাহরণে জকা কল  
 বা 'বীর স্বপনে' গানের জকাটি স্মৃতি



তিনি স্মৃতিস্তর নন। বাট গানের  
 ক্ষেত্রেই কিন্তু সেই জমি তৈরী ছিল  
 যেখানে আবার করতে জানলে সেনা  
 ফলত। পলিতোর রেকর্ডে রামানজ  
 দাশগুপ্ত চারটি নজরলগ্নাতি পরিকল্পনা  
 করেছেন। উল্লভ কণ্ঠ সম্পর্কেই  
 নিজে গলার গাওয়া (সেটি সত্যারিত  
 হতে না) সবচেয়ে ভাল লাগে 'আজ  
 জালবাসার সাথ জগো, 'পরবশী'  
 প্রিয়তম' যা 'পড়ালে দ্বারের মোক গান  
 হটির পরিবেশন পরিষ্কার কিন্তু 'দাঁড়  
 স্বপনে হাম মন ডবনে' গানটি হরত  
 কিছু অমকুল জালা মেখেই তিনি  
 রেকর্ড করেছিলেন—কিন্তু ফুলমালেক  
 আলোচনা হরত প্রত্যাপার প্রতিফল  
 হতে পারে।

ইন্ডোকা শব্দ যন্ত্রের জীবন্তাশ  
 আর্জিত একটি সংকলন প্রকাশ  
 করেছেন। আজকের আর্জিত যে এত  
 পরিচিত, মিলনেসহে শব্দ মিল তর  
 পরিচয়। নাটকের আইরে তর আর্জিত  
 জলাসা হবার। ইতিমধ্যে আর্জিত  
 স্মৃতিস্তর হয়ে, নাটকীয়তা পরিহার  
 করে। শব্দ যন্ত্রের অলঙ্কার শব্দ  
 বিবেচনা। জগৎপ্রতিমা, ইন্ডোকায়ে  
 সত্যে নাটকীয়তাই এখন কানে লাগে।  
 সুরেলা আর্জিত প্রচাভাষা তিনিই করে  
 ছিলেন—কিন্তু এখন যে হলেই আর্জিত  
 সমাজেই, সেইখানে তাঁকে কই জবাবার  
 মনে হয়; এটাই মনে লাগে। জীবন  
 নেবতা' কবিতা আর্জিত অন্তত একটি  
 পরিবেশ সৃষ্টি করে—না সম্পূর্ণ  
 স্বাভাবিক সত্যারী প্রতিভা—আর্জিত  
 কারের ও একান্ত সত্যার। জনসভার  
 হরত এটি বিজ্ঞান বিবেচিত হবে।  
 রেকর্ড 'কভারটি' জন্ম।  
 ভারতী রেকর্ডে প্রথম মিল্লিপ  
 রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রকাশিত হয়েছে। অসীম  
 ভূতাত্ত্বিক কণ্ঠটি ভয়, তবে টিমো  
 বাহলা অনেক জায়গার বিজ্ঞান  
 ফলে। রেকর্ডে যোগ দেওয়া  
 তোমারি কনাতলার রবীন্দ্রসঙ্গীতের  
 উপস্থিতি কণ্ঠ। তবে গান নিবন্ধনে তাকে  
 সচেতন হতে হবে। যেমন এই গল্পটিতে  
 ধম। সার সারাসাংখ্য। পদাংক  
 অনুরান নন। সৃষ্টি সেনের কণ্ঠ এখনও  
 অনেক পরিমার্জনের অপেক্ষা রাখছে।  
 সঙ্গীত চাকী আধুনিক গানের  
 পরিচিত মিল্লিপ। রবীন্দ্রসঙ্গীতেও তাঁর  
 সম্ভাবনা উজ্জ্বল। তবে এই প্রথম

রেকর্ডে তাঁর স্বাভাবিক স্মৃতিস্তর  
 জকা হরত কিছটা মিল্লিপ মনে হয়েছে।  
 জালা জাকা হার, চমক স্বাভাবিক  
 রেখেও তিনি সঙ্গীত বলতে পারছেন  
 'কণ্ঠে মিল্লিপ গান/একটা হাট্টেই হই  
 জার সেই ভরসার পড়ি।'  
 সত্যারিত শব্দসংকে

আলোচনা: শির সর্গী নৃত্য

### মৈত্রে জগোই

মিল্লিপী স্মৃতিস্তর স্মৃতিস্তর  
 ফলে শব্দ আর্জিত স্মৃতিস্তর স্মৃতিস্তর  
 মিল্লিপ মিল্লিপী চালিতা প্রতিভা  
 উল্লভ জগোই স্মৃতিস্তর স্মৃতিস্তর  
 জন্মলাগি স্মৃতিস্তর শিল্পী  
 উল্লভিত হল। আলোচনা মিল্লিপ  
 জন্মলাগি স্মৃতিস্তর জন্মলাগি  
 মিল্লিপীই অলঙ্কার করেন। এঁদের  
 মিল্লিপ আধুনিক আর্জিত বেশ ক'জন শিল্পী  
 মিল্লিপী ছিল। মিল্লিপী চালিতা  
 পরিচালনার মিল্লিপী নৃত্যচর্চার  
 প্রাথমিক ও পরিপক্ব পর্যায়ে একাধিক  
 মিল্লিপী জন্মে গ্রহণে এঁদের আসরে  
 পরিচয়িত হল কলালীনা, গৌরীনা,  
 লেইমা জগোই পুচ্চেলম, রাস  
 ইত্যাদি বিবর্তিতকি বিভিন্ন নৃত্যসং-  
 গঠন। এছাড়া ছিল বৈজ্ঞানিক জগৎ  
 পেছনের কবিতা অবলম্বনে কস্মীত  
 কুঞ্জে' নামের একটি নৃত্য এবং তাঁর  
 বামকক্ষের কস্মীতের গল্প অলঙ্কারে  
 মিল্লিপী জন্ম। মিল্লিপী একটি হৃত্য-  
 নাটক। নাটকটি মিল্লিপীক হলেও

## টু-টোন-এখনও ভারতের ১তম্বর হেয়ার ডাই।



করণ, টু-টোন এর সাথে এক অতুলনীয়  
 ফলসে যা চুলের পর্দায় প্রবেশ করে...  
 চমকবর মিলিয়ে যায়!

টু-টোনই হল একমাত্র হেয়ার ডাই যা চুলের  
 পর্দায় প্রবেশ করে... যা বিবর্তিত করে।

টু-টোন ভারতের সবচেয়ে বেশী কার্টার হেয়ার ডাই—  
 আর তা হলে আসছে বছরের পর বছর ধরে... এর বিশেষ  
 কর্তৃপক্ষ চুলের প্রতিটি তর ধীরে ধীরে প্রবেশ করে... যা ও  
 নিখুঁতভাবে আপনাদের চুলের ডাই করে। আপনাদের চুলে  
 এনে দেয় সত্যিকারের এক আত্মনিক রূপ... করে তোলে  
 মোজারেম ও চক্কর... রাখে নিজের মতো।

একবার ব্যবহার করেই দেখুন না... আপনি অন্য কোমও  
 হেয়ার ডাই আর পছন্দই করবেন না। কালো ও হাট্টন রঙে  
 পাওয়া যায়। পুরুষদের জন্যে স্পেশাল প্যাক।



**টু-টোন**  
 হেয়ার ডাই



চুলের কলের ব্যাপারে বীরা জগতে সবার অগ্রণী।

everest/80/JKH/48-bn

(অন্যভাবে পড়ার সময়) এর প্রকাশনা-  
পত্রিকার পক্ষে পত্রিকার পক্ষে  
অন্যভাবে। প্রতিটিটির স্বাধীন প্রকাশ  
শিল্পীকর্মের সাক্ষর অংশগ্রহণও  
ভার্য প্রকাশ।

আলোচ্য আসরে অংশগ্রহণকারী  
শিল্পীরা শিল্পীদের নিয়ে কিতোরিত  
আলোচনার কক্ষ অত্যন্ত পুরে নিশ্চয়ই  
পাবে, অংশগ্রহণ বৈ কখনো কখনো তা  
হল, কেন্দ্রে শিল্পীই চান না তাঁর  
শিল্পকীর্তি কল্প সমস্যাগুলি বাকি  
পড়ে থাকে। কিন্তু ভেবে দেখলে  
অন্যভাবে করার উপায় নেই। একজন  
প্রশ্নোত্তরশীলী অনেকাংশেই কালের  
গতিতে বাধা। প্রশ্নোত্তরশীলী কালের  
নৃত্যচারণ একজন শিল্পীর সাক্ষরতা  
নিচেরই কিতোরিত উৎসর্গে কিন্তু সেই  
উৎসর্গের কাগজ বোঝা উত্তরাধিকার।  
কিন্তু কখনোই সংস্কার হল লক্ষ্যও  
সেইটি। তাই কালের আলোচ্য সংস্থা  
সংগঠন শিল্পীকর্মের তত্ত্বকর্ম  
গীতালায় প্রকাশিত আলোচ্য শিল্পী  
প্রকাশনার একজন শিল্পীর ভে  
কিটোরিত শিল্পকীর্তি উৎসর্গে করে  
ভেলে। শিল্পী শিল্পী নিয়েও সাক্ষর  
ধরনের কাল্পনিক-প্রশ্নোত্তর বসন এই  
নগরজীবনে বর্তমান তখন যেই  
জগোই সংস্কার মাধ্যমে দেবদেবী  
চালিহার কিশোর এক নৃত্য ধারার  
সাক্ষরপূর্ণ প্রকাশকর্ম নিসন্দেহে  
অভিনববোধোদয়।

জেনারেল



অন্য কক্ষের ডাই আছে—অর্থাৎ শিল্প  
দল মেথরে জন্ম হাতা, হারেকেন  
সময় আছে। আলো যেমন ডায়াল  
সেই রকমই ধনীভূত বা বিস্তারিত হয়।  
এক কক্ষের পটভূমি হারা সমস্ত রঙ  
হাতে থাকলেও সেটা কার্যসিই হয়ে  
থাকে।

অনির্মিত অভিনয় বা মহলায়  
অনির্মিতভাবে কয়েকজন সঙ্গের  
উদ্যোগে হোটেল খান (কো) অংশগ্রহণ  
প্রবন্ধের পক্ষে। কিন্তু কাল-  
কিশোর পক্ষেই একজন কিশোর  
মিথের 'আত্মত্যাগ' রম্যপ্রকাশ বাক্যের  
নিদে শব্দ কিশোর সাক্ষর দেয়।  
একটি অংশগ্রহণের কথা কিন্তু কুলী  
উৎসাহপনায় আর একজন ডায়াল  
পল্লব করে।

সেক্ষেত্র শিল্পকর্ম

হাট : অজয় দত্তসুত

আলোচ্য শিল্প সংস্থা বিবিধ

তরুণতীরের বার্ষিক সম্মেলন

ছোট মেয়ে টম্পাক। তারও একটা  
সংসার আছে। সেই সংসারের খেলাধুলে  
সে বড়দের সংসারটাকেই অনুকরণ করে।  
টম্পাক সংসারের আছে পুতুল মেয়ে  
পম্পা, আছে খাওয়ার পর নো অংশ  
বিশ্ব ডায়াল ডাকনো। টম্পাক ছোটটি  
থাকলেও তার পুতুল মেয়ে পম্পা এক  
বেলাতেই কোলের শিশু থেকে ডায়ালটি  
হয়ে যায়। মেরেকে কিশোর দেবার চিন্তা  
করতে হয় তাকে। সঙ্গ সঙ্গ অন-  
চিন্তাও অবলা তার থাকে। সমস্যার  
আগেই গুটিয়ে ফেলতে হয় নিজের এই  
খেলার সংসারটিকে। কারণ বাবা তখন  
অফিস থেকে ফিরে আসেন। আর বাবা  
ফিরে এলেই তো বই নিয়ে বসতে হয়  
টম্পাকে। সময় মজ্জাঘরের রচনা  
অনুসরণে কালী রায়ের নিদে শব্দ  
এই সমস্ত ব্যাপসিই চমৎকার অভিনয়  
করে দেখানো ছোট একটি মেয়ে প্রাণী।  
আলোচ্য শিল্পনটিকটি কিশোর সংস্থা  
তরুণতীরের প্রবন্ধন। এই সংস্থার  
কেন্দ্রীয় সম্মেলন সম্প্রতি উদযাপিত  
হল কল্যাণ নগর বেসমেন্টে। তরুণতীর  
নামে কিশোর সংস্থা হলও আলোচ্য  
দিনের অনুষ্ঠানে সেক্ষেত্র শিল্পীদেরই  
প্রাধান্য। সেটা অনুষ্ঠানসূচী এক অংশ-  
গ্রহণ দৃষ্টিক থেকেই। সে বাই হোক।  
সমস্যার সমস্ত পরিচালনা উপস্থিত  
সকল বয়সের দর্শকেই আলোক দান  
করে। সূচনার দেখা গেল সুদীপ্ত, ওরুণতীরের অংশগ্রহণ এক সদস্য  
যে একটি শিল্পমেলা পরিচালনার দায়িত্ব  
নিয়ে মণ্ডে আসে। সদস্যদের ডায়াল  
প্রকাশনায় বিভিন্ন কোষ থেকে কয়েক  
কয় শিল্প মেয়ে উঠে এসে কেউ  
পোনালো গান কেউ বা আবৃত্তি। ছোট

দের অনুষ্ঠানে এই ধরনের শিল্পমেলা,  
কর না হয় থাকবে একজন শিল্পী  
নিচিন্তভাবে অভিনয়বোধো। কারণ  
এটা শিল্পের সাবলিমি হবার পথ খুঁজে  
পায়। অনুষ্ঠানে পরম্পর পরে  
পরিবেশিত হল কিশোর প্রকাশ (স্বদেশ  
ও বিচার পরের নির্বাচিত রবীন্দ্র-  
সংগীত, একমাত্র এতেই সংস্কার কিশোর  
কিশোরের অংশগ্রহণ করেন),  
লোক নৃত্য, কিশোরের টম্পাক আর-  
শোলা চার পাখি হতে ইত্যাদি।  
জালা বাস

আবৃত্তিকর্মের আসর

১৪ মার্চ থিয়েটার সেটারে  
‘আবৃত্তিকর্ম’ মোটর উদ্যোগে আলোচ্য  
হারা হল এক আবৃত্তির আসর। একক  
কণ্ঠ আবৃত্তি হাড়াও তিনটি আবৃত্তি  
হল। সফলক আবৃত্তি ও সফলক  
পাঠ।

পূর্বা যোগে নেহাতই বালা। কিন্তু  
তার গোমস্তার সৈন্যদের সব থেকে  
নিষেধ পারবন্দন, এতে সন্দেহ নেই।  
অজয় জেব, সুদীপ বসু ‘আমি এই’  
কিতোরিত নির্বাচনে বৈ সম্ভ্রান্ত কুলে  
ধরলেন, পরিবেশনে সেই ধরনের  
স্বাভাব্য ছিল না। উদ্যোগেও ভুল  
রয়েছে। ‘গ্যালাম’ নয়, গোলাম। পার্শ্ব  
বসু কণ্ঠে সুর এবং সবলতা রয়েছে,  
রয়েছে অংশ-অনুসরণের দক্ষতা, কিন্তু  
প্রেমের মিত্রের কিতোরিত তার সুরেলা  
ভাষাট মাত্রাতিরিক্ত মনে হয়েছিল।  
মহোদেব চক্রবর্তী এক দেখে  
মুখোপাধায়-এর ভাষা উত্থাপন-এ

হীন, একেবারে। তখন সাক্ষর কিতোরিত  
অংশগ্রহণ মেলায় সঙ্গো ভাল লাগতে  
বাক। রবীন্দ্র সম্মেলনও তাই। পদে  
আছে কলকাতা’র প্রবন্ধবাক্য ভা  
ধরতেই পারলেন না। উদ্যোগেও  
গোলাম, কণ্ঠ-এর রেক আসেন,  
বাক্য ধনিরয়ে বাক্য। প্রদীপ রায়-  
চৌধুরীর গলা উদ্যোগ, কিন্তু আধুনিক  
কিতোরিত সঙ্গো পরিচয় নিকট নয়।  
পদাংশের অন্তর্লীন স্পন্দন ধরত  
পারেননি। শিখা সেনগুপ্ত কুল হাত  
ধেন, মহোদেবের সো বাক্যে কুল  
জায়গার কেটে হস্তাপন ঘটলেন।  
ভাষাটিও আবৃত্তির নয়, পাঠেই।

শিল্পীদের জন্য সংকলন জায় রে  
ভোলা বৈশ্বকোষ লেখা ও অংশগ্রহণ  
দিক থেকে মোটামুটি সাক্ষর। ‘প্রথম  
পাখি’ কালকলক নটরসহীন পরে তার  
চিহ্ন হারিয়েছে। কাল্য নাটকে নাটকও  
বৈ কিতোরিত মেতাই জয়ী, পাঠের  
মন্ত্রমন্ত্র তা ধরা গেল না। সংকলিত  
অনুষ্ঠান ‘কুলাশঙ্কর ভোরে রক্ত  
স্বদেশীকাল-এ বহু-বাক্যের মেরু  
প্রকাশ। এখন ভোলা লেখা। বিশেষত,  
সফলক আবৃত্তির সঙ্গো বৃগঙ্গ একক  
কণ্ঠের আবৃত্তিতে কক্ষ কোথা যায়নি  
ভাল করে। মাইকেল গোলাম ছিল  
সৈন্য। কালকলক ছোট্টে বোধহয় ভেত।  
ভেতর থেকে ঘোষণার বাক্য থাকলে  
ভোলা হত, অথবা পূর্ববর্তীর বাক্য  
পত্রবর্তী নাম বাক্য ভেতন-বেতন দ-  
একবার হল—তা হলও শুন্যতা  
কমানো যেত।

প্রথম মুখোপাধায়

আলোচ্য শিল্প সংস্থা নাটক

কাল বিহঙ্গ

মনোজ মিত্রের একাধিক বসন  
অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে করে, তখন চক্ষু  
পরে উদ্ভাসিত মনোভূতি দীর্ঘ-  
স্বাধীন হলে থাকে, যেমন মনোভূতি চোখে  
জল বা টম্পাক টম্পাক। কিন্তু একাধিক  
বসন বহিরের সংঘাতে ঘটনাবাহিত হয়ে  
আসে তখন ঘটনার ঘনঘটা প্রকাশ্যে  
মাক সূচী করলেও নাট্যপ্রভাব হয়  
কক্ষস্বাধীন। এই কারণেই মনোজ মিত্রের  
অনেক একাধিক পরবর্তীকালে পূর্ণাঙ্গ  
অংশগ্রহণ ধন্য চিত্রিত।

কুমুদী প্রবন্ধিত ‘কালবিহঙ্গ’  
একাধিক ঘটনাবাহিত। ফলে ভক্তদের  
ছলনা যেমন শব্দ রি লক্ষ তার  
নিলাস গীতাঞ্জলি ও সংগ্রামে জরাজড়ের  
হাততালিতে চাপা পড়ে যায়। রম্যপ্রকাশ  
বাগিক নিদে শব্দ। কিন্তু  
অনির্মিত অভিনয়ের জন্য কাল-  
বিহঙ্গ অভিনয় শব্দ কয় সময় সেই  
নিদে শব্দের চিহ্নিত ভোটে পড়ে। যেমন  
ভক্তদের ভূমিকার অভিজ্ঞ নন্দী  
প্রথম থেকে সুন্দর অভিনয় করেন,  
কোথাও অধ্যবাহিত নেই, কিন্তু বোঝা  
আহত হবার পর তান খেই হারয়ে  
ফেলেন। পার্শ্ব গোলামী এক অন্য  
কক্ষের আলোচিত বাচনশীল  
চিহ্নের সঙ্গো মেলেন—এই প্রকাশ  
সবচেয়ে কিতোরিত ডায়ালের ভূমিকার  
সমীক্ষা মধ্যপ্রাচ্য। এদের কুলনায়  
শব্দমেলক মজ্জাঘর অনেক মধ্যপ্রাচ্য।  
রম্যপ্রকাশ বাক্য নিদে শব্দের আলাপ  
দিয়েও নাটকেই অন্যমাত্রা বোঝা করার  
চেতা করেননি। মণ্ড সামগ্রীতে বা যা

প্রকাশিত হল  
রুদ্ধস্বাসে গড়ার মতো বই

# জেমস হেডলী চেজ

## অর্কিড ভিলি

(CONSIDER YOURSELF DEAD)

কিডন্যাপিং... কার্লো প্রান্তী জিনাকে ইলেকট্রিক তারের  
বেড়া, হিংস্র কুকুর আর দুজন দুর্ভাগ্য গার্ডের হেফাজতে  
রেখেছিল। ... একটি ছিনতাইয়ের পরিকল্পনার দাম—  
কুড়ি লক্ষ মিলিয়ন ডলার! পরিণতি—তাপদগ্ন দুপুরে  
ঝাঁকঝাঁক বুলেটের আওয়াজ। ... এই বই শুরু করলে  
শেষ না করে উপায় নেই! দাম : বারো টাকা

মৌসুমী প্রকাশনী/১৬ কলেজ রো/কলকাতা-৯



032-100-7034



## হাই পাওয়ার সার্ফ ধোয় সবচেয়ে সাদা করে... এমন, যা নজরে পড়ে!

আপনার ছেলে যদি জামাকাপড় ময়লা করায়  
চ্যাম্পিয়ন হয়, তাহ'লে সেই ময়লার সঙ্গে লড়াই  
করার জগেও ত' দরকার আর এক চ্যাম্পিয়নেরই—  
হাই পাওয়ার সার্ফ।

হাই পাওয়ার সার্ফের শক্তিশালী ফরমুলায় আছে  
বেশী পরিষ্কার করার ক্ষমতা, যা কাপড়ের মূলো  
ময়লার প্রতিটি কণা তুলে বের ক'রে ফেলে।  
সতীকারের ময়লা জামাকাপড়ও ক'রে তোলে  
ধবধবে সাদা!

হাই পাওয়ার সার্ফ আপনার পুরো পরিবারের  
জামাকাপড়কে দেয় এক বাড়তি গুঁত্রতা আর  
উজ্জলতা। তাই ভো বেশীর ভাগ মায়েরা কাপড়  
ধোয়ার জগে অগ্ন পাউডারের চেয়ে, সার্ফই  
বেশী ব্যবহার করেন।



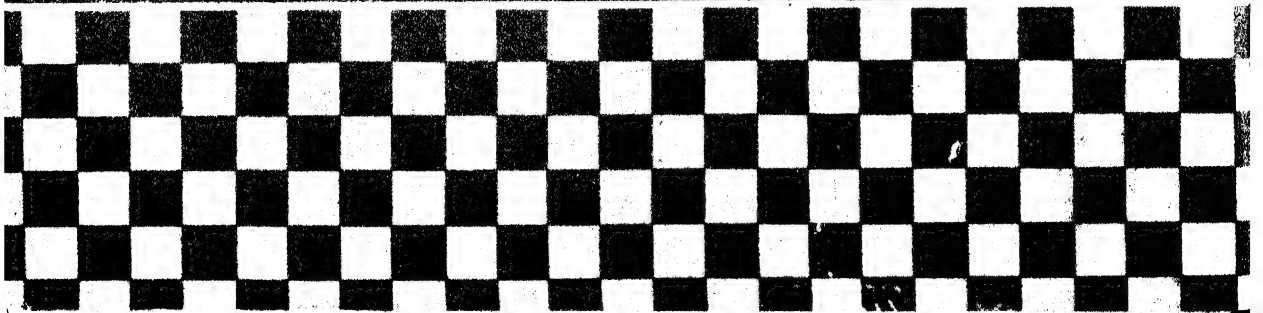
বেশীর ভাগ মায়েরা কাপড় ধোয়ার জগে অন্য পাউডারের চেয়ে সার্ফই বেশী ব্যবহার করেন।

**গলা ব্যথা  
কাশি থেকে রেহাই দেয়...**

ULKA-PP-1/80 BEN

**মুখরোচক স্বাদ, গলার আরাম ।**

**ভে কা সি ল**



Jan 29/7

97-5669

৯৭-৫৬৬৯



**No 10**  
 বাস্কার টেন এন্ড অ্যান্ডারসন



রক্তাব দিগ্বী



দেবদাস দাস



প্রমোদিত মাল



আবদুল আলি খান

**বাস্কার টেন**  
**ফিল্টার**

যে স্নান দিব রাত ঘন ডরায়



পূর্ব ভারতে  
 ফিল্টার সিগারেটের  
 মার্কে এর বিক্রি  
 সবচেয়ে বেশি

Grant-1531

সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর

STATUTORY WARNING CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH



# ইন্ডানা হোল মিল্ক পাউডার

হাতের কাছে এমন খাঁটি দুধ যা দিয়ে মনোমত  
অনেক খাবার তৈরী করা যায়।



পান করুন, শীতল  
পানীয় তৈরী করুন, দই  
জম্যান, অন্য জিনিষের সঙ্গে  
মিশিয়ে খান, মিষ্টি তৈরী করুন

আপনার এলাকায় বিতরক পুষ্টিকর দুধ সহজে পাওয়া না গেলে  
আপনি কি করবেন? আপনার রান্নাঘরের কাজই তো বন্ধ হয়ে যাবে,  
আর বাচ্চারা দুধের তৈরী তাদের প্রিয় খাবার থেকে বঞ্চিত হবে।

এইসব সমস্যার সমাধান—এক টিন ইণ্ডানা হোল মিল্ক পাউডার  
সহজে গুলে ঘন, পুষ্টিকর আর স্বস্বাদু—এই দুধ দিয়ে আপনি  
হরেক রকম মজাদার খাবার তৈরী করতে পারেন। হাতের কাছে  
ইণ্ডানা রাখুন—আপনার পরিবারের সবাই খুশী না হয়ে পারবে না।

## ইন্ডানা

হোল মিল্ক পাউডার

—এমন প্রাচুর্য যাতে সবাই খুশী



— নতুন গ্রন্থ —

নারায়ণ সান্যালের

উলের কাঁটা ১১

রহস্য উপন্যাস

সুমথনাথ ঘোষের

এক নাটক অনেক দৃশ্য ১২-৫০

ও

বাঁকাস্রোত ২

(পেপার ব্যাক)

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

গল্প-গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় পর্যায়

কথা কল্পনা কাহিনী ২০

ও

সুখে থাকার কাল ৩

পকেট বই

সজিত কুমার সেনগুপ্তের

সোনালি দিনের পাখিরা ১২-০০

— নতুন উপগ্রাস —

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

সোনার হরিণ নেই ২৮

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

হাওয়া গাড়ী ২৫

দিব্যেন্দু পালিতের

সাধ-আহ্লাদ ১০

প্রফুল্ল রায়ের

অহঙ্কার ৮

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

পাঞ্চজন্ম ৩২

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের

অমৃত ছিল না ১১

সমরেশ মজুমদারের

উত্তরাধিকার ৩০

বিভূতি মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

সপ্তম খণ্ড

পঁচিশ টাকা

তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

কিশোরসাহিত্য সমগ্র ১৪-০০

— হিমালয় ভ্রমণ সাহিত্য —

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

কৈলাস ও মানস সরোবর ২০, মনিমহেশ ১২, গঙ্গাবতরণ ৮,  
কাবেরী কাহিনী ১০, শেরপাদের দেশে ১৪, হিমালয়ের পথে পথে ১৬,

প্রবোধকুমার সান্যালের

মহাপ্রস্থানের পথে ১০, ঐ (পেপার ব্যাক) ৫,

শঙ্কু মহারাজের

বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা ৮, পঞ্চ প্রয়াগ ১০, গহন গিরি কন্দরে ১০,

তমসার তীরে তীরে ১৮, পঞ্চবটী ৮,

জ্যোতিঃকুমার চৌধুরীর

ধ্যান গম্ভীর এই যে ভূধর ৪-৫০

স্বামী রামানন্দ ভারতীর

হিমারণ্য ৮

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩  
৮৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

অবধূত-এর

ভ্রমণ-কাহিনী-সমগ্র

৥ দ্বিংশ টাকা ॥  
'মুকুতীয়া হিংলাজ', 'হিংলাজের পরে', 'দুর্গাম পস্থা' এবং  
'নীলকণ্ঠ হিমালয়'—এই চারখানি বইয়ের একত্র সংকলন

## চিঠিপত্র

### এশিয়াটিক সোসাইটি

দেশ পরিষদ এশিয়াটিক সোসাইটি সম্পাদকীয় এবং একত্রিত মে সংখ্যাতে প্রকাশিত নির্মল জীবনের চিঠি পড়লাম। কিশকিন্দ্র কিশক প্রাতি-ধান এশিয়াটিক সোসাইটি আজ যময্যপ্রদ, আর্থিক অনটনকে তার এই দুরবস্থার একমাত্র কারণ বললে সত্যের অপমান হবে। এই ধরনের বিপদ প্রাতিধানের আর্থিক অবস্থা খুব কম ক্ষেত্রেই ভালো হয়, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রেই ভালো যেখানে এখনও সগোত্রের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, সেখানে এই সংপ্রচীন ও আমাদের জাতীয় মর্যাদার প্রাতিধানের বিপদ সংখ্যাটি কিছু, সুযোগসম্পন্ন লোকের জীভাতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্মলবাবু চিঠিই বলেছেন এই সোসাইটির কর্মকর্তারা একে ক্রা-কর্মের টাঁড়াসে ভরা সাক্ষী হবে। সমস্ত প্রাতিধানকে নিজেদের ইয়েজ প্রোজেক্ট করবার জন্য ব্যবহার করেন। গত কয়েক বছরের সোসাইটির কাজ-কর্মের টাঁড়াসে ভরা সাক্ষী হবে। দক্ষাতিস্বরূপ গত কয়েক বছর সোসাইটির দুটি সম্মান ফেলোশিপ ও বিভিন্ন পদক-বঁদের দেওয়া হয়েছে। তাঁরা এই বছরগুলিতে যারা সোসাইটির কর্মচার ছিলেন, তাদের দলের লোক, কলংক ও সোসাইটির সম্মানের বিনিময়ে তাদের অনুগ্রহীত করার ক্ষমতাসম্পন্ন।

অনেক ক্ষেত্রে কর্মচারী নিজেরাই সম্মান-মূল্য নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোরা করে নিয়েছেন। এই কর্মকর্তারা খুব-খুবের গুণ এক বশকরও বেশ সোসাইটির পরিচালকমণ্ডলীতে স্থান-তরিয়েতে আছেন এবং নিজেদের দলের বাইরের কাউকে এই মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করেন না। এদের আর্থিক ও লোককল আছে এবং সোসাইটির কিছু সংখ্যক কর্মচারী পরিচালকমণ্ডলীর নির্ধারণের সময় সোসাইটির কাজকর্ম ফেলে রেখে ইলেকশন কর্মীর ভূমিকায় নেমে পড়েন।

এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য চাঁদা বছরে পঞ্চাশ টাকা। সাধারণ সদস্য এই চাঁদার বিনিময়ে কী পান? সত্য কথা বলতে কিছুই নয়। গত কয়েক বছর যাক সোসাইটিতে বই কেনা প্রারম্ভ হয়, সোসাইটি আর্নাল-এর প্রকাশিত আর্নালমিত এবং বছরে চারটি সংখ্যক পরিষদের একটি মাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়। অ-ও অসংখ্য মন্ত্রণামতের ভিত্তি। গত পঁচিশ সাত বছরে এখনও ও কিছুশে মানাবকী বিদ্যার ক্ষেত্রে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য ও বিশিষ্ট বইপত্র বোরিয়েছে তার পঁচিশ শতাংশ বইও এখনকার গ্রন্থাগারে নেই। সোসাইটির সংগ্রহশালায় এখনও বহু মূল্যবান পুঁথিপত্র, পুরা-লেখ, মন্ড্র ইত্যাদি আছে। শোনা যায় তাদের মধ্যে বেশ কিছু নাকি অস্ত-হিত। কাগজেও এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে দু'একটি খবর বেরিয়েছে।

সোসাইটির গ্রন্থাগারের অবস্থা

## প্রকাশিত হয়েছে

### কালকূট-এর

ঘরের কাছে আরশি নগর ১০.০০

নীললোহিত-এর

সতেরো বছর বয়েসে ১০.০০

সাগরময় ঘোষ-এর

হীরের নাকছাবি ১২.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর

কোকিল ও লরিওয়ালা

চাণকা সেন-এর

এখন শুধু পদক্ষেপ

নিমাই ভট্টাচার্য-র

ইমন কল্যাণ ৬.০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়-এর

গল্পসংগ্রহ ২৫.০০

শক্তি চট্টোপাধ্যায়-এর

মস্তের মতন আছি স্থির ৫.০০

(কবিতা)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর

দেখা হলো ভালোবাসা বেদনায়

৫.০০ (কবিতা)

পূর্ণেন্দু পত্রী

হে সময়, অশ্বারোহী হও ৫.০০

(কবিতা)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর

নাজিম হিকমতের আরো কবিতা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়/সুব্রত রুদ্র

তুই প্রেম (কবিতা)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর

কাব্যসংগ্রহ ১৫.০০

বিশ্ববাণী প্রকাশনী

৭২/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড ৥ কলকাতা ৯

## ড: আশুতোষ ভট্টাচার্যের লেখা

প্রবন্ধ সাহিত্য:

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস

দাম ৬০.০০

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস

১ম খণ্ড-৫৫.০০ ২য় খণ্ড-৪৫.০০

রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য ১২.০০

ভ্রমণ সাহিত্য:

সুন্দরী ইন্দোনেশিয়া ১২.০০

অজানা অফ্রেলিয়া ১৫.০০

সঙ্গীত ও নৃত্যকলা:

বঙ্গীয় লোকসংগীত রত্নাকর

বাংলায় লোকসংগীতের একমাত্র কোষগ্রন্থ (এনসাইক্লোপিডিয়া)

৪ খণ্ডে প্রকাশিত প্রতিখণ্ডের দাম ২০.০০

বাংলার লোকনৃত্য ১ম খণ্ড ১৫.০০

এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ

২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩

তারাক্ষর বন্দোপাধ্যায়ের

অপ্রকাশিত উপন্যাস

# অপরাজিতা

তারাক্ষরের গগনদেবতা, কবি, হাস্যলীলাঙ্কের উপকথা, নাগিনী কন্যার কাহিনী প্রভৃতি যুগোত্তীর্ণ রচনার পাশাপাশি 'অপরাজিতা'ও যে আপন বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল হয়ে থাকবে তাতে সন্দেহ নেই।

দাম : কুড়ি টাকা।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

হিরণ্যময় বন্দোপাধ্যায়	: উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ	২৫'০০
গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়	: ভারতের নৃত্যকলা	৩০'০০
ডঃ সরোজচন্দ্র	: প্রাচীন ভারতের অপরাধতত্ত্ব	
বন্দোপাধ্যায়	ও যৌনবিজ্ঞান	১৬'০০
ডঃ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়		
সম্পাদিত	: বাঙালীর ধর্ম ও	
	দর্শনচিন্তা	৩৫'০০
নারায়ণ চন্দ্র	: জন কোম্পানীর	
	বাঙালী কর্মচারী	২০'০০
ভগতরাম তলোয়ার	: আমি নেতাজীর অন্তর্দ্বন্দ্ব	
	সঙ্গী ছিলাম	২০'০০
প্রবন্ধ বসু	: আনন্দিক	৭'০০
মহেশ চৌধুরী	: দেয়াল দিয়ে ঘেরা	১২'০০
মুখু বন্দোপাধ্যায়	: ডাকবাংলার ডায়েরী	১৫'০০

## দুলভ-গ্রন্থ

রেডার্স জেল	: প্রবাদমালা (১ম)	১২'০০
	: প্রবাদমালা (২য়)	১০'০০
	: প্রবাদমালা (৩য়)	১৫'০০
মহেশচন্দ্র পাল সংকলিত	: বাৎসর্য্যের কামসূত্র	৫০'০০
চৌধুরী সেন	: মহা রাজ নন্দকুমার	৩০'০০

## উপন্যাসগুচ্ছ

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	: নির্বাচিত উপন্যাসগুচ্ছ	১৬'০০
অশাপূর্ণা দেবী	: নির্বাচিত উপন্যাসগুচ্ছ	১৬'০০

প্রতিটি বাঙালী পরিবারে অপরিহার্য  
কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও  
কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত

# দ্রব্যগুণ

সম্পাদনা : কবিরাজ ব্রজেনচন্দ্র নাল  
মূল্য : ৩৫ টাকা

নবপত্র প্রকাশন

৮ পটুয়াটোলা লেন, কলি-৯

বুঝি যায়। সাধারণ পাঠকের জন্য নিষিদ্ধ চোরগঙ্গা জম্ম কিস্তি ছাপাকার ভর্তি। বই চাইলে সহজে পাওয়া যায় না। কথ্যচারীদের দেখা পাওনাও সমান শব্দ। এ অভিজ্ঞতা একজন সাধারণ পাঠকের। পরিচালক-মণ্ডলীর সদস্য হলে বা সদস্যের বন্ধু হলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। সাধারণ সদস্য তিনখন্ড বই (দুঃপ্রাপ্য না হলে) বাড়ি নিয়ে যে পারেন, কিন্তু কতব্যতিরিক্ত যে কোন সংখ্যক বই নিয়ে যেতে পারেন, এবং সে সব বই বইই দুঃপ্রাপ্য হক না কেন। সোসাইটির গ্রন্থাগারের বই, বই এই সব প্রিজিলেজড সদস্যদের কাছে থেকে ফেরত আসেন এবং হয়তো আসবেও না। দুঃস্থলত স্বরূপ, কিছুদিন আগে সংস্কৃত কামসূত্র-এর খোঁজ করেছিলাম। পেলাম না। জনৈক গ্রন্থাগারকারী বলেন, এটি সোসাইটির একজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ১৯৫৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বর মিসে রেখেছেন, তাঁকে ফেরত ফেরত দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু এখনও পূর্বসূরী দেয়নি। এবং আরও উল্লেখ্য, কামসূত্র সহ তার কাছে যেটি বই আছে নটি। যেখানে সাধারণ সদস্য তিনখানার বেশি বই পান না, সেখানে এই প্রেসিডেন্ট মহোদয় নখানা বই নিয়ে রেখে দিয়েছেন। এই হলো সোসাইটির কাজকর্মের নমনো প্রশাসনিক দক্ষতা ও গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিচয়।

সোসাইটির গলম ও সদস্যের দুর্ভাগ্য করণ সম্ভব দুটি রাস্তাতে। প্রথম, কোন প্রাক্তন বিচারপতি (তিনি অন্য

প্রদেশের হলে জলের হর)কে দিয়ে সোসাইটির পরিচালন-ব্যবহার ও বর্তমান ও পূর্বতন পরিচালক-মণ্ডলীর কাজকর্মের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করানো।

এক বিচার, এই তদন্তের ফলাফল না বেরোনো পর্বন্ত সরকারী অনুদানের পরিমাণ বাড়ানোর প্রস্তাব মল্লভূমী রাখা।

বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী  
কলকাতা-১২

স্মৃতি সততই সৃষ্টির

শ্রীমতী প্রতিভা বসুর স্মৃতি সততই সৃষ্টির (২৯ মার্চ সংখ্যক) একটি উজ্জ্বল উল্লেখ, জগদ্বন্দ্ব, শ্রীচৈতন্য, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ পঞ্চমহাসম্মেলন-এর কথা ছেড়েই দিলাম, এই সৌন্দর্য্যে শ্রীঅরবিন্দ এক মহাশয় গাথার বৈজ্ঞানিক। কিন্তু আমার ভারতীয় হিন্দুরা, কখনোই তাদের উপর বিশ্বাস আরোপ করেনি। প্রকৃতির বিধান উল্টিয়ে কুমারীর গর্ভপাত বলেও প্রচার করেনি। এমন একটা ভারসাম্যহীন উক্তি কী বলে এরা তথা হিসাবে বিশ্বাস করেন সেটাই আশ্চর্য।

প্রকৃতির বিধান উল্টিয়ে কুমারীর গর্ভপাতের ঘটনা কি হিন্দু-মাস্টার্স লেখিকা হিন্দু লাস্টে কখনোই পান নি? ধর্মশাস্ত্রে উক্ত সকল ঘটনা ধর্মবিশ্বাসই মান্য তথা হিসাবেই গ্রহণ করে, ভারসাম্যহীন উক্তি বলে মনে করে না। কারণ

## প্রকাশিত হল

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

# রবীন্দ্র সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ

১৯২৭ সালে সুনীতিকুমার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মায়ার উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বনিদ্বীপ ও শ্যামদেশে(থাইল্যান্ড) ভ্রমণ করেছিলেন। সেই ভ্রমণ-আখ্যানই এই গ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যের এক অতুলনীয় সম্পদ। বহু চিত্র-সমৃদ্ধ ভূতীয় মূদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে, দাম : ৪০/-

বিনয় ঘোষের

# পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

১ম খণ্ড ৪০-০০ ২য় খণ্ড ৪০-০০ ৩য় খণ্ড ৬০-০০ মূল্য (মুদ্রণ)

বাংলার বিদ্বৎসমাজ পরিদর্শিত ও পরিবর্ধিত সং ১৫-০০

সতীনাথ ভাদুড়ী

তারাক্ষর বন্দোপাধ্যায়ের

জাগরী

আরোগ্য নিকেতন

প্রথম রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত

রবীন্দ্র পুরস্কার ও জাকাদামি

উপন্যাস ১৩শ মূদ্রণ ১০-০০

পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস ১৮-০০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

কাশীনাথ শরৎ-বিচিত্রা গণ্ডিতমশাই

৭-৫০

১৫-০০

৪-৫০

প্রকাশ ভবন ১৫, বকিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

উপায় প্রতিষ্ঠিত। ধর্মবিশ্বাসীরা ধর্মের  
ডক্ট্রিন বিশ্বাস করে, নাস্তিক ধর্মের  
ডক্ট্রিন অনুসন্ধান করে। লেখকের আর  
একটি উক্তি, ভারতীয় সম্মানসে অন্য  
ধর্মের উপর কোন হস্তক্ষেপ নেই, শুধু,  
নিজেকে নিয়ে নিজের বোধ্যতা প্রকাশের  
কৃষ্ণসামর্থ্য, মিশনারীদের কৃষ্ণসামর্থ্যের  
নীতি এরা সম্পূর্ণ বিপরীত। কৃষ্ণ-  
সামর্থ্যের মাধ্যমে নিজের আত্মকে উচ্চতর  
মাগে উন্নতকর কি সব ভারতীয়  
সম্মানসিদ্ধে একমাত্র লক্ষ্য? সম্মানসী  
বিবেচনায় কি মানুষের সেবার  
মাধ্যমে ঈশ্বরের উপলব্ধি করতে  
চলান? যা হেঁয়সা তো আজও  
জীবিত। বরাহোদ্যার মতো। যদিও  
ভারতীয় সংস্কৃতিরলে তিনি আজ  
জরতীর, তবু মনে তিনি কি  
মিশনারী নন? তিনি কি খ্রীষ্ট-  
মতাবলম্বী নন? তিনি কি অন্য ধর্মের  
উপর হস্তক্ষেপ না করেই খ্রীষ্ট  
আদর্শে আত্ম-অসহায় মানবের সেবার  
মাধ্যমে ঈশ্বর উপলব্ধি করছেন না?

লেখিকা যান ডানতে শিবের গীত  
গেয়েছেন। খ্রীষ্ট ধর্ম সম্পর্কে অল্প  
জ্ঞানকে মূলধন নিয়ে সমস্ত খ্রীষ্টান  
জগতের মানুষের বিশ্বাসে আঘাত করা  
মতো খ্রীষ্ট রোমন্টিকের কি আদর্শ  
ছিল জার্মান না।

প্রদীপ্ত মণ্ডল চম্পকহাটী

খরা ও স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান  
ফেল (৩০ সংখ্যক) পরিষ্কার  
অতুল্য ঘোষ মহাশয় “কর্মেতীকপ্ত”  
প্রবন্ধে খরা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে

স্বেচ্ছাসেবী সংস্কারকেও কিছুর না করার  
জন্য দোষারোপ করেছেন। বর্তমান  
সরকার কি করছেন ও কি করবেন তা  
আমার কল্প্য নয়। উনি উদ্দেশ্যবোধ্য  
সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলি বলতে রামকৃষ্ণ  
মিশন, ভারত সেবাপ্রম, মাদ্রাজের  
ব্রিটিশ সোসাইটিকে বোঝাতে চাইছেন।  
কিন্তু উনি কি জানেন না, এ সংস্কার-  
গুলির কোন টাকার গাহ নেই, বা এমন  
প্রচুর অর্থ নেই যে ইচ্ছা করলেই যখন  
যে কোন সেবা কাজ শুরুর করেন। এবার  
ধর্মের বাণীর সংবাদপত্রের তেমন কোন  
ভূমিকা ছিল না। ফলে জনসাধারণও  
অস্বাভাবিক নন, এ জন্য ওদের কাছে  
ব্রিটিশের জন্য দানও আসেনি। তবুও  
রামকৃষ্ণ মিশন পশ্চিমবঙ্গের গ্রাণ্ড  
কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে তাঁদের সাধামত  
টিউবওয়েল বা কূপ খননা করেছেন  
এমন রিপোর্ট তাঁদের বিভিন্ন মাগজিনে  
লেখতে পাঠি, তাম্র বা করেন কংগ্রেসী  
বা রাজসৈনিক নেতাদের মত তা ঢাক  
পিটিয়ে করেন না। সাধামত সেবার ভাণ্ড  
করেন। ক্ষমতার স্বার্থে ওরা যান না  
কলেই এখনও এই মহোত্তর আরামবাগ  
মোরি, গ্রিপার, অস্ত্র প্রভৃতি স্থানে  
লক্ষ লক্ষ টাকা কাজ করে চলেছেন।  
অতুল্যবাবু, কি বলতে চান—ওপরি টাকে  
করে জল নিয়ে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে  
দেবেন, যতই হাজার হাজার গালন  
ডিজল লাগবে। লক্ষ লক্ষ টাকা লাগবে।  
তা কি সরকার ছাড়া কোন স্বেচ্ছা সেবা  
সংস্থার পক্ষে সম্ভব?  
রঞ্জিত রায় কানপুর

তোমাদের চাওয়া আমাদের দেওয়া  
এই দুই নিয়েই

## বোধন

তা চাইবে কী?

কেন! তোমরা—কিশোর বালক শিশুরা—সবাই  
আপন আপন পছন্দ-সই লেখকদের লেখা।  
যাঁর যাঁর গল্প-উপন্যাস ছড়া-ছবি কমিক-কার্টুন  
ম্যাজিক আর খেলা নিয়ে লেখা চাও তাঁদের নাম  
পাঠাও। বাস! আমরা তখন সেই সব লেখক-  
দের কাছে তোমাদের আজি মাফিক হাজির  
হব। বিশ্বাস—ছোটদের আবদার রাখবেন  
তাঁরা। আর তাহলেই—

বোধন হবে ইচ্ছেপূরণ

## পূজাবার্ষিকী

চিঠি পাঠিয়েই গ্রাহক হওয়া যাবে। গ্রাহক হতে কোন  
আগাম টাকা পাঠাতে হবে না।

শঙ্করনাথ রায়ের

রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপ্ত অসামান্য জীবনীগ্রন্থ

### ভারতের সাধক

(১৩শ খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত) প্রতিখণ্ড ১৬.০০

শঙ্করনাথ রায়ের

আর দু খানি মহান জীবনীগ্রন্থ

### ভারতের সাধিকা

(২ খণ্ড প্রকাশিত) প্রতিখণ্ড ১৪.০০

### সাধুসন্তের মহাসঙ্কমে

(৩য় মুদ্রণ)—১৪.০০



করুণা প্রকাশনী

১৮এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯, ফোন: ৩৪-৬২৬৮

## ॥ গ্রাহক করা হইতেছে ॥

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সমগ্র রচনার সংকলন

## শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

(১৩শ সম্ভারে সমাপ্ত)

সমগ্র সম্ভারের মূল্য : ৩২৫ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ২১০ টাকা

প্রথমে ১৫ টাকা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে।  
বাকী ১৩টি কিস্তিতে বই নেবার সময় ১৫ টাকা  
করে দিতে হবে। ডাকে বই নিয়ে প্রতিটি  
বইয়ের জন্য ৩ টাকা করে বেশী লাগবে।

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

১৪, বঙ্কিম চ্যাট্টো স্ট্রীট, কলি-৭৩ ফোন-৩৪-১৭৮২



প্রকাশিত হল

## স্বোষকুমার বাসের পূরের দিকে

ম ৮.০০

স্বপ্ন মানব বারো  
র বয়সের মধ্যে যা শেষে  
কি জীবন তারই  
বঁট চর্চা চলে। ফলে  
স্বপ্ন কিশোরকে যেভাবে  
জু ছেবে নাভালক করে  
খি আমরা, বোধহয় ততটা  
চ সে নয়।

স্বোষকুমার ঘোষই  
স্বভাব সেই লেখক, যিনি  
শেষভাবে শিশুদের  
র-শিশুদের থেকে মুক্তি  
য়েছেন। তাঁর লেখা একটু  
টু, একটু গভীর, একটু  
টিল। তিনি গা ভাসিয়েছেন  
রাচারিত শিশু-সাহিত্যের  
ভিতরল স্রোতে।  
রি রচনা সেই সব  
হলে-মেয়েদের জন্যে, যারা  
ই-প্রথম জীবনের



হাটলতার আশ্বাদ নিতে  
দুঃখ করেছেন। যারা  
কালবেলা থেকে পা  
গাড়িয়েছে দুঃখের দিকে।  
য়সম্মির দারুণ সময়ে  
ঠোং তাদের মনে হতে পারে,  
এই তো সেই কথা,  
যা বস্তুতপক্ষে আমরাও!  
বিশ্বাস্তর বঙ্গের  
বিশিষ্ট গদ্যকার সন্তোষকুমার  
এর আগে শিশুদের জন্যে  
নয় বয়্য করেননি একটুও।  
আকাদেমী পুরস্কার-প্রাপ্ত  
এই লেখক বড়ো বেশি  
গম্ভীর ছিলেন বড়োদের নিয়ে।  
এই প্রথম তাঁর কিশোরদের  
মনস্তত্ত্ব পঞ্চাশনা এবং  
প্রথম বারেরই ওই আশ্চর্য  
নান্দাজের অনেক অদেখা  
কবুতকে তুলে এনে হাজির  
করেছেন তাদের সামনে  
এবার যারা তাঁর রচনার বিষয়।  
ভতরে চমৎকার সব ছবি—  
গন্ধাক্ত দেবদাশ দেব।



## শরাদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বপ্রথম উপন্যাস

### দাদার কীর্তি

দাম ৮.০০

‘দাদার কীর্তি’ শরাদিন্দু  
বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা  
জীবনের সর্বপ্রথম উপন্যাস।  
এই চমৎকার হাসির  
উপন্যাসটি তিনি যখন লেখেন,  
তখন তাঁর বয়স মাত্রই  
যেগো। প্রথমে এই কাহিনীর  
নাম শরাদিন্দু বাবু রেখে-  
ছিলেন, ‘প্রেমের প্রায়শ্চিত্ত’।  
পরে তা পালটে রাখেন,  
‘দাদার কীর্তি’। বিস্ময়কর  
ব্যাপার হল, লেখকের  
জীবৎকালে এই উপন্যাসটি  
কোথাও প্রকাশিত হয় নি।  
অথচ শরাদিন্দু বন্দ্যো-  
পাধ্যায়ের মতো লেখকের  
ক্ষেত্রে জীবনের সর্বপ্রথম  
উপন্যাসের তো বটেই,  
যে কোনো রচনারই  
ঐতিহাসিক গুরুত্ব যে  
অপরিসীম, সে কথা বলা  
বাহুল্য। তাঁর লেখক জীবনের  
ক্রমবিকাশের ধারা ও স্বরূপ  
জানতে গেলে ‘দাদার  
কীর্তি’কে কোনেমাতেই  
উপেক্ষা করা যায় না। আবার  
‘দাদার কীর্তি’ পড়লে বোঝা  
যায় যে, জীবনের প্রথমতম  
রচনা হলেও এ-উপন্যাসের  
প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের  
হাসির উপন্যাসের দীর্ঘ-  
অনুভূত অভাব মেটাতে  
পেরেছে। এর গড়নে হাসি,  
আশ্চর্য হাসি, ভাষায় বর্ণনায়  
অনাবিল আবিমিশ্র হাসি।  
শরাদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের  
পাঠকদের কাছে তাই ‘দাদার  
কীর্তি’ এক অমূল্য সম্পদ  
রূপে গণ্য হবে।  
বইটির আকার যেমন সুন্দর,  
মুদ্রণও তেমনি নয়নহরণ।  
আগাগোড়া দুঃখ ছাপা,  
সোনার জলে কাপড়ে ছাপা  
প্রচ্ছদ, হাফ-লেঙ্গার বাধাই।  
উপহারের পক্ষেও দারুণ

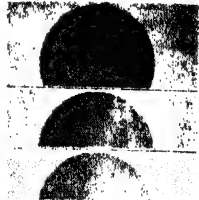
বিভীয়া মুদ্রণ প্রকাশিত হল

## নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সর্বাধুনিক কাব্যগ্রন্থ

### আজ সকালে

দাম ৬.০০

যিনি কেবলই বদলে নেন  
নিজেকে, বিগত তিন  
দশকেরও অধিক কাল ধরে  
বাংলা কবিতায় যার উজ্জ্বল  
উপস্থিতি এক লহমার  
জন্মও অমনস্ক হবার সুযোগ  
দেয়নি, তাঁর প্রতিটি  
কাব্যগ্রন্থই নতুনতর তাৎপর্য  
নিরে হাজির হয় পাঠকের  
কানে। ‘আজ সকালে’



নীরেন্দ্রনাথের সেই রকমই  
তাৎপর্যময় নতুন কাব্যগ্রন্থ।  
কিছু কাল আগে লেখা তাঁর  
যাবতীয় স্মরণীয় কবিতা  
স্থান পেয়েছে এই  
গব্যসংকলনে।  
এই লেখকের অন্য কাব্যগ্রন্থ :  
উলঙ্গ বাজা ৬.০০

ছোটদের দুর্ধর্ষ উপহার

## নীরেন্দ্রনাথ

### চক্রবর্তীর

ছড়ার বই

### সাদা বাঘ

দাম ১০.০০

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কবিতা  
লিখছেন চার দশক ধরে,  
কিন্তু তাঁর ছড়ার বই এই  
প্রথম বেরুল। এই বইয়ের  
দারুণ-দারুণ সব ছড়ার মধ্য  
দিয়ে নীরেন্দ্রনাথ যেন বারবার  
ফিরে গেছেন তাঁর শৈশবে,  
কৈশোরে। পাঠকও খুঁজে  
পাবেন তাঁর নিজের শৈশব ও



কৈশোরে। বইটির পাতায় পাতায়  
বাম বাঁধা ছড়ার সঙ্গে  
তাঁর মিলিয়ে বাঁধা বাঁধা ছবি  
এঁকেছেন আরেক দুর্দান্ত  
শিল্পী—বিমল দাস।



আনন্দ প্রকাশনা প্রাইভেট লিমিটেড

অব্র রায়ের

বৈচিত্র্যময় উপন্যাস

## হৃদয়ের শব্দ

দাম ৭.০০



বিমল কর লিখেছেন—

‘‘আমরা যদি অব্র রায়ের  
সবে-ধন উপন্যাসটির কথা  
স্মরণ করি—‘হৃদয়ের শব্দ’—  
যার পটভূমি বাংলা সাহিত্যে  
একবারে নতুন (অন্তত  
এয়ারফোর্স ফ্লাইং ক্লাবের  
পটভূমি আগে বাংলা সাহিত্যে  
এসেছে বলে আমি জানি  
না) তাহলে বুঝতে  
পারব, লেখক ঠিক শৌখিন  
দর্শক নয়, জীবন-বৈচিত্র্যের।  
তাঁর নিজের কোনো  
দৃষ্টিভঙ্গি জীবন-সম্পর্কে  
জড়িয়ে আছে।’’

### শেখর বসু

তীব্র গভীর উপন্যাস

### অগ্ররকম

দাম ৬.০০



‘‘চারি সম্পর্কে’’ ব্যাজক,  
কমিক, টাইপ ইত্যাদি  
বিশেষণগুলো মানি না।  
আমি নতুন অর্থে  
‘প্রণয়ী’ চরিত্রে বিশ্বাস  
করি।’’ —এ কথা লিখেছেন  
যে-লেখক, তাঁর উপন্যাস  
সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই  
কৌতূহল হয় তীব্রতর।  
‘‘অন্যরকম’’ সর্বাধিক থেকেই  
নতুন স্বাদের অন্যরকম  
উপন্যাস।

প্রকাশিত হল

## গৌরী ধর্মপাল এর

ছোটদের ছড়ার বই

### মোজা যায়

প্রকাশিত হল

## সঞ্জীব

### চট্টোপাধ্যায়ের

নতুন স্বাদের উপন্যাস

### ক্যানসার

দাম ৮.০০

ক্যানসার—এই চারটি অক্ষরের  
মধ্যে যেন লুকনো রয়েছে  
প্রতিকারহীন এক  
সর্বনাশের ইঙ্গিত। এ এমন  
এক ব্যাধি যা শূন্য  
ব্যক্তিমানুষকেই নয়, সমগ্র  
সমাজকেই ভিতর থেকে করছে  
আক্রান্ত। অসহায় আক্রান্তে  
নিষ্ফল প্রতিবাদে নিষ্ঠুর  
নির্যাতনের হাতে আত্মসমর্পণ  
হয়ে পড়েছে অব্যাহারিত।



সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এমনই  
একটি বিষয়বস্তুকে বেছে  
নিয়েছেন তাঁর নতুন  
উপন্যাসে। এ কাহিনীর  
নায়ক শঙ্কর সং, অসচ্ছল,  
মধ্যবিত্ত এক যুবক।  
স্ট্রীর ব্রেন্স্ট ক্যানসারের  
চিকিৎসার জন্যে মরিয়া হয়ে  
ঘরে বেড়াচ্ছিল অর্থের  
সন্ধান। সম্পদ আত্মীয়স্বজন  
থেকে শূন্য করে পুরনো  
বন্ধুবান্ধবদের যেমন  
আবিষ্কার করল সে, তেমনি  
তাঁর অভিজ্ঞতার  
পরিধীতে যত্ন সহ, অনেক  
নতুন মুখ, বহু নতুন  
মূল্যবোধ। কুখ্যাত পল্লীর  
বাসিন্দাদের যেমন,  
তেমনই অভিজ্ঞত ফ্রাটবার্ডির  
লোকদেরও চিনল সে।  
বন্ধু, প্রেম, সত্য, ই,  
নিষ্ঠুরতা, পাশবিকতা,  
প্রতিশোধ—যাবতীয় চলতি  
ধারণাগুলো নতুন আলোয়  
কাঁভাবে প্রতিফলিত হল  
তাঁর চোখের সামনে—  
তাই নিয়েই আদলত উৎকণ্ঠা  
মেগনো এক সঞ্জীব  
কাহিনী রচনা করেছেন  
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

বেতপাথরের টোবল ৭.০০

সোফা-কাম-বেড ১০.০০

পাখরা ৬.০০

## সূচীপত্র

### চিঠিপত্র । ৩

বিচ্ছিন্নতাবাদের মানসিকতা । সম্পাদকীয় । ৭  
বাপটিচ । ৮  
পলিটানার সিংখাল ও গিরিতীর্থ  
হিংলাজ । বস্তুপদ চট্টোপাধ্যায় । ৯  
মাকাল কোজি-এ সর্বোধ ঘোষ । অমর  
মান্যাল । ১০  
দুখট । কেতকীকুশারী ডাইসন । ১৬  
শেষ রাতে । দামলকান্ত দাস । ১৬  
স্বামীর কোথাও যাবার  
ছিল । রতত্তী বিশ্বাস । ১৬  
স্বপ্নের লোকাল টোন । শান্ত রায় । ১৬  
শুকুতলার পতিগৃহে বাসা । সত্যেন্দ্র আচার্য । ১৭  
বিজ্ঞান । সমরজিৎ কর । ২০  
কণ্টকাল্পিত । অজুলা ঘোষ । ২৬  
মানবজমিন । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় । ৩০  
অরণ্যদেব । ৩২  
স্মৃতি সত্যই সুখের । প্রতিভা বসু । ৩৩  
সেই সময় । সুদীপ গঙ্গোপাধ্যায় । ৩৭  
সাহিত্য । ৪১  
মস্কো অলিম্পিকস এবং ভারত  
দল । মুনসুল । ৪৩  
আলোচনা : শিল্পসংস্কৃতি । ৪৫  
প্রচ্ছদ : লতিকাল কাঠ  
প্রচ্ছদাংশী পরিচিতি শেষ পৃষ্ঠায়

## পরবর্তী আকর্ষণ

কল্যাণকুমার দেবের প্রবন্ধ  
গ্রাম ঈশ্বরের সৃষ্টি, সবুজ বিপ্লব মানবের  
মিহির মুখোপাধ্যায়ের গল্প  
গ্রামীণ সংবাদ

## সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে  
বাল্লভীজা রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট  
কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং  
আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ১৮৮  
সি বাই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০০৪ এবং  
জীবনসত্য প্রিন্টিং হাউস ১০ প্রফুল্ল সরকার  
স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত ।  
দাম এক টাকা  
বিমান মাফুল : ১০ পরস  
পূর্বাকলের অন্ত্যস্ত হাউস ২০ পরস

## বিচ্ছিন্নতাবাদের মানসিকতা

সাঁওতাল বিদ্রোহের এক শো পঁচিশ বছর পূর্ণ হল গত ৩০ জুন। ১৮৬৫ সালে দুই  
সাঁওতাল ভ্রাতা সিধু ও কান্দুর নেতৃত্বে এই বিদ্রোহের সূচনা। দীর্ঘ ছ' মাস সময় লেগেছিল  
ব্রিটিশ সরকারের সেই বিদ্রোহ দমন করতে। সিপাহী বিদ্রোহ ঘটেছিল আরও দু' বছর পরে।  
তবু সিপাহী বিদ্রোহ ভারতের ইতিহাসে যে গুরুত্ব পেয়ে আসছে সাঁওতাল বিদ্রোহ ততটা নয়।  
এর কারণ বোধ হয় এই, সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রধানত ছিল আঞ্চলিক, সাঁওতাল পরগণা জুড়ে।  
যদিও সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিচারে এই বিদ্রোহের কারণ নিহিত ছিল অর্থনৈতিক শোষণ  
ও নিপীড়নের মধ্যেই। আজ এক শতাব্দীর বেশী হয়ে গেল সেই কারণগুলি যে নিশ্চিহ্ন  
হয়েছে তাও নয়, তবু নতুন করে কোনো বিদ্রোহ ঘটেনি; সিধু কান্দু ঐতিহাসিক পুরুষ  
হিসেবে থেকে গিয়েছেন। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বিশেষ কোনো ভাগ্য পরিবর্তনও যে ঘটেছে  
আজ এক শো বছরে তাও নয়। কিন্তু কোনো কোনো ঘটনা থেকে আশঙ্কা করার কারণ ঘটেছে,  
শান্ত নিরীহ পরিশ্রমী এই সম্প্রদায় আবার যদি কোনো দিন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তবে আশ্চর্য  
হবার কিছু থাকবে না।

একথা মনে রাখতে হবে, পশ্চিমবঙ্গের গায়ের পাশে আগুন জ্বললেছে। তার আঁচ কম  
নয়। ইতিমধ্যেই আমরা বিব্রত, বিভ্রান্ত। আবার এই সুযোগেই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ঝাড়খণ্ড,  
উত্তরখণ্ডের দাবী উঠেছে, দেওয়াল-লীপ পড়েছে, এবং দাবীদাররা গোপনে নিজেদের শক্তিবান্ধ  
করছে। উত্তরবঙ্গ থেকে উত্তরখণ্ডের দাবী, ঝাড়গ্রাম বীরভূম বাকুড়া পূর্বদিল্লী থেকে দাবী  
ঝাড়খণ্ডের। এটা লক্ষ করার বিষয়, 'সাঁওতাল মাহাতো ভাই ভাই, বাঙালীর রক্ত চাই' এই  
ধরনের লেখাপত্র, কিংবা 'উত্তরখণ্ড আলাদা চাই' প্রচারপত্র বিলি করার মধ্যে বিশেষ অভিসন্ধি  
গোপন রয়েছে। এর পরিণাম ভয়াবহ হতে পারে।

রাজ্য সরকার নিশ্চয় অশঙ্কিত নন। তাঁদের চোখ যে সতর্কভাবে সব কিছু লক্ষ করছে তাতেও  
সন্দেহ নেই। বিশেষ করে সরকার এখন অধীনস্থ পুলিশকে এমনভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন যে,  
সাঁওতাল বিদ্রোহের এক শো পঁচিশতম বার্ষিকীতেও ঝাড়গ্রামের মতন জায়গায় সামান্যমাত্র  
লোক জমায়েত হয়েছিল। অবশ্য সিউড়িতে যে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা সরকার করেছিলেন সেখানে  
হাজার তিরিশ লোক জমেছিল উপজাতি সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্‌যোজন উপলক্ষে। মুখ্যমন্ত্রী  
শ্রীজ্যোতি বসু একা নন, আরও অনেক মন্ত্রীসভা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হয়ত এই সব  
কারণেই ভিড় জমেছিল। মুখ্যমন্ত্রী সেখানে তাঁর ভাষণে বলেছেন, কিছু লোক এই রাজ্যে যে  
বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন সরকার তা বরাদ্দ করবেন না।

মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন তা সম্ভব কথা। পশ্চিমবঙ্গ বলে কেন, দেশের কোনো প্রান্তেই  
কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন কোনো সরকারই সমর্থন করতে পারেন না। কিন্তু কোনো  
কোনো অন্য প্রশ্ন থেকে যায়। ধরে নেওয়া যাক দুমকা জেলার খেজুরিয়া গ্রামের কথা—যেখানে  
সাঁওতাল সম্প্রদায় গত বছরে রাজপুত জোতদারদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। তখন  
বিহার সরকারের পুলিশ-মহল এবং পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ-মহল যুক্তভাবে  
এই আন্দোলন দমন করতে আসলে নেমেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বীরভূমের রামনগর  
গ্রামে এমন কী ঘটেছিল যার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও তাঁদের অনুগতরা জনসভা থামাতে  
চেষ্টাছিলেন! বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে এগুলিকে ধরলে ভুল হবে বোধ হয়।

ঐতিহাসিক সিধু কান্দুর বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে নিশ্চয় কোনো বাধা নেই, বাধা  
নেই সরকার যদি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমন করার জন্যে কঠোর হন, কিন্তু এমন যদি হয়  
সরকার সমস্যাগুলিকে ধামা চাপা দেবার জন্যে কিছু লোক-দেখানো সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য দেখা-  
চ্ছেন তবে তার দ্বারা কিছু হবে না। একথা অস্বীকার করা থাকে না যে, উপজাতি বা  
আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমস্ত অভিযোগই যুক্তিহীন কি অন্যায্য। এই সম্প্রদায়ের যথার্থ কল্যাণও  
নিশ্চয় সরকারের কাম্য হওয়া উচিত।

আমাদের কোনো কোনো ব্যাপারে মিশ্রা থাশা স্বাভাবিক। ইদানীং রাজনীতির যে নগদ-  
বিদায় পল্লা দেখছি তাতে মনে হয়, যে-কোনো সুযোগই গ্রহণ করে পক্ষ বিস্তার রাজনৈতিক  
দলগুলির উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে। এমন কথা জোর করে বলা যায় না, বিচ্ছিন্নতাবাদের ইচ্ছন  
সুযোগ মতন যোগানো হয়নি বা হবে না। ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট কী করতে চেয়েছিলেন—পরিণামে  
কী ঘটেছে—এ-বিবৃতির দরকার নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা বড় ভয়ংকর শিক্ষা।  
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার নিশ্চয় এমন কিছু করবেন না যাতে বিচ্ছিন্নতাবাদের এই ভয়াবহ  
মানসিকতা স্থায়ী হয়—আবার সরকার নিশ্চয় দেখবেন সাঁওতাল ও অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের  
যথার্থ কল্যাণ কেমন করে হতে পারে।



# পালিটানার সিংহাসন ও গারতীয় হিংস্রতা

কাঁথারাজের অন্তর্গত পার্বত্য পালিটানার সিংহাসনই গিরিজা'র হিংস্রতা। সমুদ্রতল থেকে এর উচ্চতা ২৮৭৭ ফুট। হিংস্রতা মহাভায়ে আছে গিরিপালিয়ার মহাশালার সিংহাসনতটস্থিত। সেই সিংহাসনের কথা শুনেই এবারের গুরুতর পরিচরমার অস্বাভাবিক থেকে ভাবলারের ট্রেনে চেপে আমি শিহর জলসনে এসেছি। আমার ট্রেন এক ঘণ্টা লেট ছিল। তাই পালিটানার ফার্স্ট ট্রেন আগেই ছেড়ে গেছে। এর পরের ট্রেন বেলা ১১টার। কি আর করি। বাতীশুন স্টেশনে একা একাই পারচারি করতে লাগলাম। স্টেশনে একটি মাত্র চায়ের দোকান ছাড়া আর কিছু নেই। এক কাপ চায়ের দাম ৬০ পরমা। বাজে চা। তাই খেয়েই পার্বত্য শিহরের অশেপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। চারিদিক পাহাড় ঘেরা। কাছেই একটি নদী আছে। নাম গোডমী। নদীটা একেবেঁকে দূর বনাস্তরালে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। নদীর বাঁধেতে নৈমে অনেককণ চরায় ঘুরলাম। নদীর ওপর রেল পোলে দাঁড়িয়ে নদীর জলে মাছের খেলা দেখলাম। তারপর আবার ফিরে এলাম স্টেশনে। পালিটানার ট্রেন এলে তাড়েরি চেপে বসলাম। সামনে গিরিমে দুটি মাত্র বগি। মধ্যে ইঞ্জিন। এ এক অশ্রুত ধরনের ইঞ্জিন। মোটর মৌসনে চলে। যাই হোক। বনাসমরে ট্রেন ছাড়ল। তারপর ঘোড়ার গাড়ির মতো অসম্ভব রকমের জাঁকনি দিতে দিতে ছুটে চলল পালিটানার দিকে।

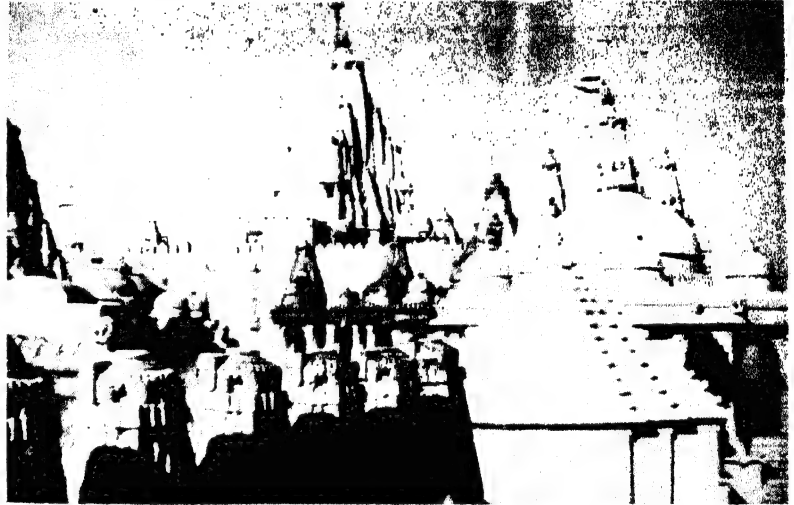
ট্রেন ছাড়ার পর তেত পড়ল দুপাশের মনোরম সৌন্দর্য। চারিদিকে শৃঙ্গ পাহাড় আর পাহাড়। ছোট বড় কত অসংখ্য পাহাড় আর টিলা যে দেখলো তার ইয়ত্তা নেই। শিহরের পর দুটো মাত্র স্টেশন। তারপরই পালিটানা। ট্রেন থেকে নেমে চারদিকের পরিবেশ দেখে ছবিতে গেলাম। এসে দেখা গেল একেবারেই ফাঁকা জায়গা। কোথায় গিরি উঠব তা হলে? ব্যর্থ করে স্টেশন মাস্টারের কাছে গেলাম। তিনি বললেন ভয় পাবার কিছু নেই। স্টেশন অঞ্চলটা ফাঁকা হলেও শহর একটু ভেতরে। থাকারও কোন অসুবিধে হবে না। সরকারি রেন্ট-হাউস, বাংলা সব কিছুই আছে এখানে। আর আছে প্রচুর ধর্মশালা। আমি বললাম, কিন্তু আমি যে শুনেছি এখানকার ধর্মশালায় জৈন ছাড়া কাউকে ন্যাক থাকতে দেয় না। স্টেশনমাস্টার বললেন, ওসব বাজে কথা। এই ভারি হিন্দু ও জৈনে আশ্রয়ের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

স্টেশনের সামনে একটিই মাত্র টাঙ্গা বাতীর প্রতীকার ছিল। আমি চার টাকা ভাড়ায় সেটিকে রক্ষা করে যে কোন একটি ধর্মশালায় নিয়ে যেতে বললাম। টাঙ্গায় চেপে কিছু পথ অসন্তোষ পালিটানার শহর পেলাম। এখানে প্রচুর ধর্মশালা রয়েছে দেখলাম। তবুও টাঙ্গা আমাকে নিয়ে আরো এগিয়ে চলল। একসময় শহর শেষ হল। দুপাশে ফাঁকা মাঠ। কতদূরে কোথায় হাছ তা জানি না। একটু মুন্ডে পড়লাম। আমার মূখের ভাব দেখে টাঙ্গাওলা বলল, ভয় নেই বাবু। আপনি বাতী তো। তাই পালিটানার নতুন শহরে পাহাড়ের কান্ডাকাছ নিয়ে যাচ্ছি। এখানে থাকলে আবার টাঙ্গা ভাড়া করে আপনাকে পাহাড়ে যেতে হবে। বাট হোক। পালিটানার নতুন শহরে যখন ঢুকলাম তখন আলো নন্দিত হয়ে উঠল মন। কি চমৎকার সাজানো গোছানো শহর। মনে হল যেন এক স্বপ্ন-পুরীতে এসে পৌঁছেছি। অথচ এমন যে শহর তাতে কোন গ্রাণ চাক্ষুষ নেই কেন? মনে হচ্ছে কত যমুনস্বতের ছোঁয়ার সব কিছুই যেন স্তম্ভ হয়ে গেছে। পথে লোকজনের চলাফেরা নেই। দোকান পাট বন্ধ। ব্যাপার কি? টাঙ্গাওলাকে রিজেন্স করতে বলল, আর পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। তাই সম্ভব ৬টা পর্যন্ত পালিটানা এইরকমই স্তম্ভ হয়ে

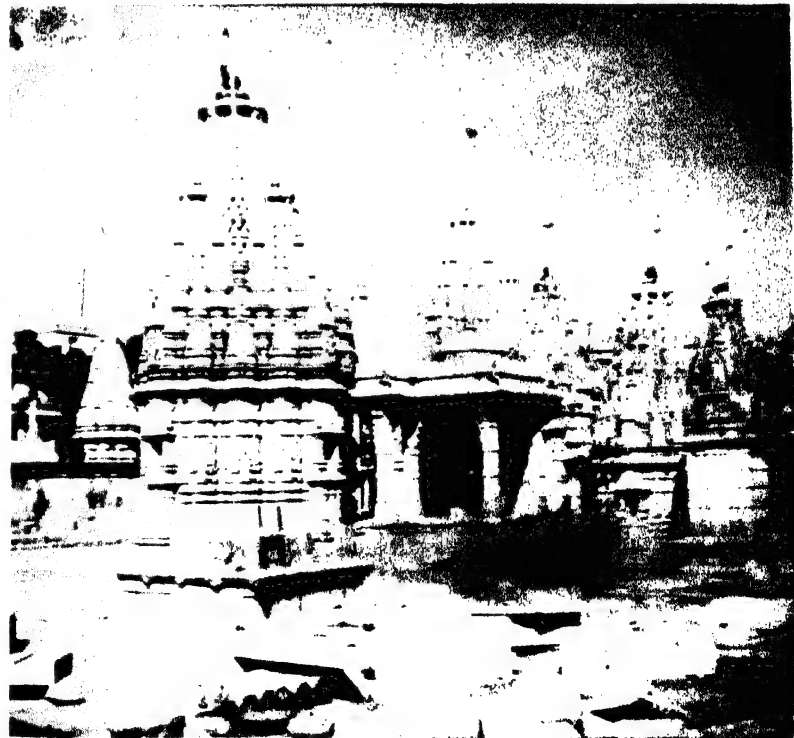
থাকবে। তারপরে অবশ্য স্বাভাবিক হবে সর্বাধিক। কথা বলতে বলতেই পাহাড়ের কান্ডাকাছ একটা সুবৃহৎ জাট বাড়ির সামনে এসে পড়লাম। এটাই ধর্মশালা। নাম বনাপুরা জৈনের তল (ছোবিকল্পের নাম)। এই ধর্মশালার দোতলায় একটা ঘর পেলাম আমি। ঘরে একটি লোহার খাট আছে। লিগোরা বাথরুম। গদি ব্যালিশ সব কিছুই বিনামূল্যে পাওয়া যায়। মোট চারদিন থাকতে দেয়। কোন চার্জ নেই শুধু ডিপোজিট রাখতে হয় দুটি টাকা। বাবার সময় সম্পূর্ণ টাকা ফেরত দেয়। এর

সঙ্গে ইচ্ছা হলে কেউ কেউ সব টাকাটাই লব্ধ এমরো টাকা জালোটির ঘোঁরি নানারূপের সেবা জন্য দেন। আমি এগরো টাকা দিয়েছিলাম।

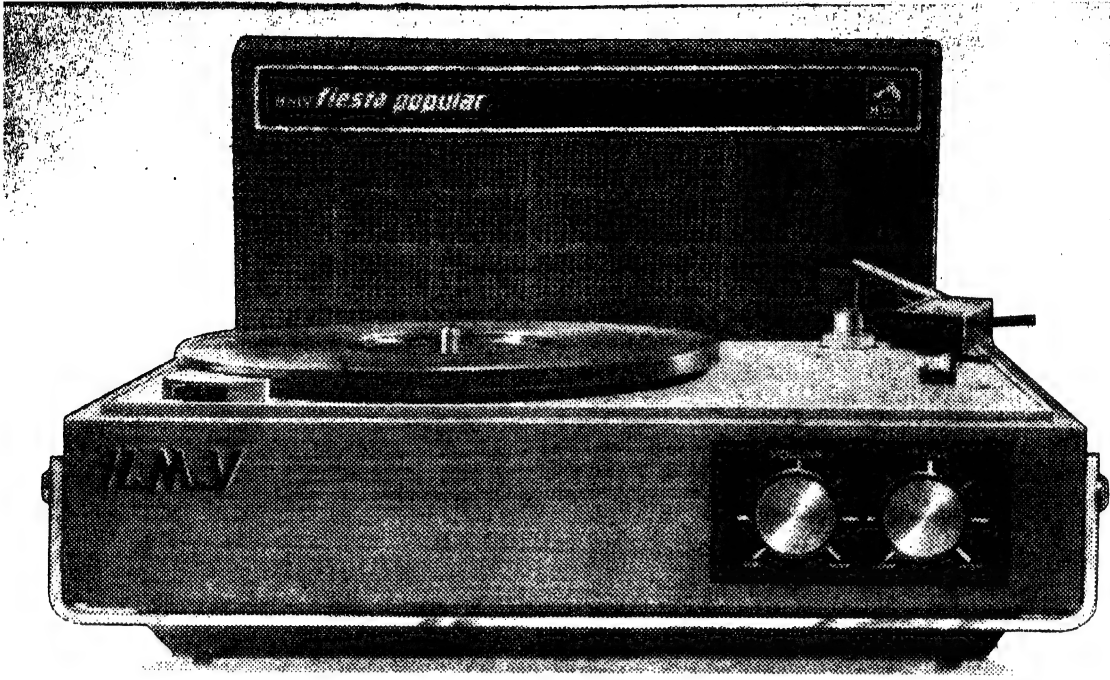
পালিটানার ৭টার পরে সম্ভব হয়। ৬টা পর্যন্ত ধর্মশালায় ক্রিয়াম করে যখন শহর ঘুরতে বেরোল তখন চারিদিক জমজম করছে। রাতের খাওয়াক্ষা করে সকালে পাহাড়ে উঠব তাই কিছু ফ্রিফ্রি ইজারি কলোকাটা করলাম। এখানকার রাব পটীয়া এবং লাক্স অতি সুস্বাদু ও উপাদেয়। একেবারেই নিভেছিল। নামও আকাশ ছোঁরা না



চৌমুখ মন্দির

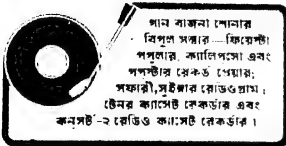


রক্তবরী ও অন্যান্য মন্দির



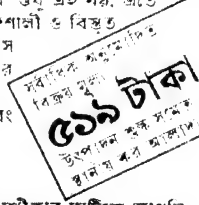
## এইচ এম ভি ফিয়েস্টা পপুলার ভারতের সবচেয়ে বেশী বিক্রীত রেকর্ড প্লেয়ার

ফিয়েস্টা পপুলার বাজারে চালু করার  
সময়ে আমাদের আশা ছিল যে এতে  
আমরা অনেক বেশী শ্রোতাদের  
কাছে সংগীতের আনন্দধারা পৌঁছে  
দিতে পারবো। এইভাবে আমরা  
ফিয়েস্টা পপুলারে সেই সব বৈশিষ্ট্যের  
সংযোজন করেছিলাম যা সংগীত  
প্রেমিক মাত্রই একটি ছিমছাম এবং  
মজবুত সেটে আশা করেন। তার  
প্রথম প্রমাণ হলো এর সুলভ দাম,



এসি অথবা ব্যাটারী মডেল  
উভয়েরই। শুধু এই নয়, এতে  
আছে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত  
ফ্রিকোয়েন্সিস  
রেটিনজ-এর  
আম্প্লি-  
ফায়ার এবং  
টাকনায়া  
লাগানো  
চমৎকার  
মানানসই স্পীকার যেটিকে আপনি  
যেখানে খুশি রেখে গান-বাজনা  
শুনতে পারেন। ধ্বনির পটীততা  
ইচ্ছমত ডারী অথবা হাসনা করার  
জনা আছে একটি টোন-কন্ট্রোল।  
আর আছে সব রকম রেকর্ড বাজাবার  
জনা ও স্পীডের টার্নটেবল।  
এসবের উদ্দেশ্য একটি—যাতে

ফিয়েস্টা পপুলারের মাধ্যমে অনেক  
বেশী লোক গান-বাজনা শোনার  
আনন্দ পান।  
আমাদের বিষয় এই যে আমাদের  
প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে অনেক আগেই  
ফিয়েস্টা পপুলার ভারতের  
সবচেয়ে বেশী বিক্রীত রেকর্ড  
প্লেয়ারে পরিণত হয়েছে।  
আজ সারা ভারতে ৫,০০,০০০  
ফিয়েস্টা পরিবার আছে। আপন  
নিশ্চিত জানবেন—ঠিক এই সুইটে  
কোথাও না কোথাও এইচ এম ভি  
ফিয়েস্টা নিশ্চয়ই বাজছে।



**হিজ মাস্টার্স ভায়স**  
উজ্জল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি

এইচ এম ভি 'হলিডে কন্সট্যান্ট'-এ যোগ দিন। হংকং, সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক  
রোমাকাকারী সফর! সীমিত মেয়াদী সুযোগ। বিশদ বিবরণের জন্য আজই এইচ এম ভি  
উল্লারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।



স্বাক্ষর পাঁচটা ১২ টাকা এবং লাকড় ৮ টাকা বৈধ।  
কেন্দ্রসমূহ করে ধর্মশালায় ফিরে সে রাতের মধ্যে  
পড়লো।

সকালে যখন সূর্য থেকে উঠলো তখন  
গার্মিংক সলসল করছে। ঠান্ডাও রয়েছে বেশ।  
তবু পাহাড়ে ওঠার জন্য গরুর জামা গরুর না  
দিয়ে হেঁটেই রওনা হলো। আমার ধর্মশালাটা  
পাহাড়ের গারে নর। বিনীত দশেক হাটতে হয়।  
জামি হেঁটেই চললাম। প্রশান্ত রাজপথের দুপাশে  
পলিটানার নব নির্মিত প্রাসাদমালা দেখলাম।  
আধুনিক ভিজাইনের কত যে সুবৃহৎ অট্টালিকা  
রয়েছে সেখানে তা গুলে শেষ করা যায় না। মজার  
ব্যাপার এই যে এগুলো সবই ধর্মশালা। ধনী জৈনেরা  
যে কি প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয় করেছেন বা করছেন  
না দেখলে অনুমান করা যাবে না। তাই এখানে এসে  
ধর্মশালায় বাহার দেখব না সিংহচালের পাহাড় দেখব  
তা ভেবে পেলাম না।

এক সময় সিংহচালের পাদদেশে এসে  
পৌঁছলাম। বেশ কয়েকটি অপূর্ণ কারুকার্মশিল্পিত  
জৈন মন্দির রয়েছে এখানে। পাহাড়ের নিচে দুর্বল  
ও বৃন্দ বাটীদের বহন করবার জন্য ডুলি নিয়ে  
ডুলিওয়ালারাও ভিড় করে আছে। রেট খুব বেশি  
নয়। ৩০ থেকে ৪০ টাকা। আর আছে প্রচুর  
দোকানদারি। একেবারে জম জমাট জায়গা।

জামি নিচে অবধা সময় নষ্ট না করে পাহাড়ে  
ওঠা শুরু করলাম। ধাপে ধাপে সিঁড়ি ওপরে উঠে  
গোছে। লোকজনও উঠছে। তবে বেশিরভাগই জৈন।  
মুজন মেমসাহেবও এসেছেন দেখলাম। তাঁরা ডুলি  
করেছেন। এই পাহাড়ে মনসা ও বাবলা ছাড়া  
অন্যান্য গাছশালা বিশেষ নেই। কাজেই গ্রীষ্মকালে  
পথ ছায়াশীতল নয়।

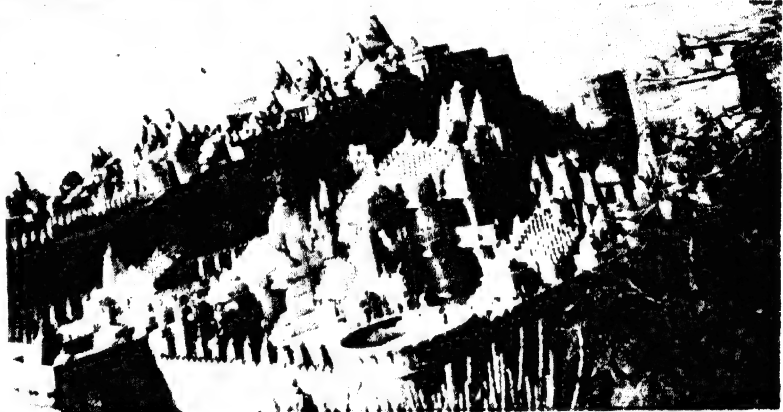
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জৈনদের যেসব তীর্থ  
আছে তার মধ্যে পলিটানার সিংহচালই সর্বাঙ্গী  
প্রসিদ্ধ। এই সিংহচালের একুশটি নাম। তার মধ্যে  
একটি নাম হল শতজয়। পাহাড়ের পিছনদিকে  
শতজয় নামে একটি নদীও আছে। এই পাহাড়  
তীর্থ মায়াছো এমনই মহিমান্বিত যে এই স্থান  
একেবারেই হিংসাবিজ্ঞাত। আগে এই পাহাড়ে বাঘ  
ও হরিণ পাশাপাশি ঘুরত। বাঘের দুধ বাছুর  
খেত। গাড়ীর দুধ বাছে। এখন বাঘও নেই হরিণও  
নেই। দু'একটা মরুত অবশ্য আছে। প্রতি বছর চৈত্র  
পূর্ণিমার সময় এখানে বিরাট মেলা বসে। সে সময়  
ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু জৈন নরনারী  
এখানে এসে থাকেন।

এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক অবস্থান ও জলবায়ুর  
বৈচিত্র্য স্থানটিকে অত্যন্ত রমণীয় করে তুলেছে।  
মুসলমানদের কাছে যেমন মক্কা-মদিনা, হিন্দুর  
যেমন কেদার-বারি, জৈনদেরও তেমন পলিটানার  
সিংহচাল। শান্তি ও অর্থ থাকলে জীবনে একবার  
অন্তত এই পুণ্য তীর্থে এসে এর মন্দির দর্শন ও  
পবিত্রোৎসব জৈনগণ মহাপুণ্য বলে মনে করেন।  
শুধু তাই নয়, জৈনদের বিশ্বাস এই পুণ্যভূমিতে  
মন্দির নির্মাণ করলে মহানির্বাতের পথ সুগম হয়।  
তাই সেই বিশ্বাসের ফলে এই পাহাড়ের শিখরদেশে  
মন্দিরের গ্রাম বসে গেছে।

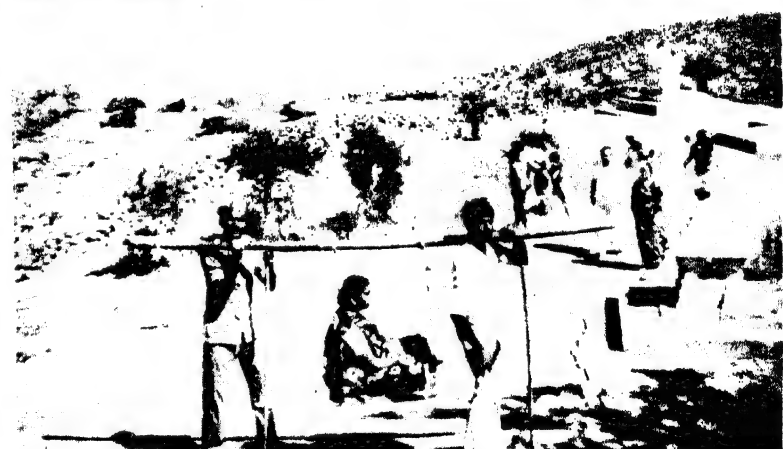
অনেকটা ওঠার পর এক জয়গার বাকীর মধ্যে  
একটু নিরান ও প্রশান্ত স্থান দেখে বসে পড়লাম।  
পাশেই পাহাড়ের গারে পাথরে খোদাই করা একটি  
মন্দির রক্তকম্বু পরিধেয়া এক দেবী মূর্তি রূপে  
দেখলাম। দেবীর সামনে ধূপ জ্বলছে। কিছু ফুল  
ছড়ানো আছে। গুজরাটী ভাষায় লেখাও আছে কি  
ফেন। পড়তে পারলাম না। তবে ভক্তিসহকারে প্রণাম  
করলাম। এমন সময় একজন বিশাল বস্তু কাথিরাবাড়ী  
হাটী লাঠিতে ভর করে ওপরে উঠে আমার পাশে  
ধপাস করে বসলেন। তাকে জিজ্ঞেস করতে হাঁকিতে  
ঠাফতে কললেন তিনি হিংলাজ কি হলো? এই  
তবে হিংলাজ! ভগবতী হিংলাজ মাতার মন্দির।  
একটু পরেই পূজারিণী এলেন। তাকে জিজ্ঞেস  
করতে তিনি হজাজন চাঁ। প্রব-তীর্থব হিংলাজ



অঙ্গুর সিংহচাল



সিংহচাল শিখরে মন্দিরের গ্রাম



হিংলাজের পথ

এখানে গিরিতীর্থে অধিষ্ঠিত। জেবে পেলাম না  
একই দেবীর দুই তীর্থে অধিষ্ঠান কি করে সম্ভব।  
হিংলাজে তো সত্যি রক্তকম্বু পড়েছিল। কিন্তু  
এখানে? পূজারিণী ব্যক্তিই বলেন। তার মধ্যে যা  
শুনলাম তা হল এই—। অতি প্রাচীনকালে করাচীর  
কাছে এক বনে হিংলা নামে এক রাক্ষস বাস করত।  
তার উপরীষে বহু মানব প্রাণ হারাত। এ বন পার  
হয়ে মরুতীর্থে গমনকারী সমস্ত তীর্থযাত্রীকেই  
কিনাশ করে ভক্ষণ করত সে। একবার এ রাক্ষস এক  
সামর্য্যক আক্রমণ করতছিল। সাম-পাশ আস-সীত

হয়ে কাতরকন্ঠে দেবী অম্বিকার স্তব করতে  
লাগলেন। সাধুর স্তবে প্রসন্ন হয়ে দেবী অম্বিকা  
আবির্ভূতা হলেন। এবং ভয়ংকরী মূর্তি ধারণ করে  
কিনাশ করলেন হিংলাকে। মৃত্যুকালে হিংলা  
দেবীর কাছে একটি বর প্রার্থনা করেছিলেন। বলছিলেন,  
তো মা অম্বিক। আজ তোমার হাতে মৃত্যুবরণ করে  
জামি উদ্ধারপ্রাপ্ত হলো। আমার অন্তিম কামনা এই  
যে আজ থেকে যেখানে কোন হিংসা নেই সেই স্থানে  
ভূমি আমার নামে অধিষ্ঠিতা থেকে। দেবী অম্বিকা  
তখন খোঁচট মরুতীর্থ এ অগ্নিসমর পুণ্যভূমি

নারায়ণ সান্যাল

বাস্তু-বিজ্ঞান (Building

Construction in Bengali) ২০.০০

Hand Book of Estimating 15.00

নীহারকান্তি সামন্ত

জল সরবরাহ প্রযুক্তি-

বিদ্যা (Water Supply) ১৬.০০

শুচি প্রযুক্তি বিদ্যা

(Water Purification) ১২.০০

ঋতব্রত সান্যাল

ওভারহেড লাইন

নির্দেশিকা ১৫.০০

পাওয়ার কেবল

সংস্থাপন-পদ্ধতি ১৫.০০

Bengal Electricity

Duty Act & Rules 10.00

Laws Relating to Regis-

tration of Generating

Plant 2.50

Construction Practice

of Overhead Line in India 15.00

Installation Practice

of Power Cables in India 12.50

বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

প্রাথমিক উদ্যান-বিদ্যা ১০.০০

শাক-শব্জি চাষের কথা ১০.০০

ফুলের বাগান ১২.০০

সবিতা মল্লিক

সচিত্র যোগ-ব্যায়াম ১২.৫০

(অসংখ্য ছবিসহ)

যোগ ব্যায়ামের চার্ট

(১ম/২য়)—প্রতিটি ১.৫০

প্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত

শরীর-রক্ষণ ৪.০০

ফনিভূষণ বিশ্বাস

শারীরিক-শিক্ষা

(১ম/২য়)—প্রতিটি ১০.০০

ভারতী বুক স্টল

৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলিকাতা-৯, ফোন-৩৪ ৫১৭৮

সিম্ধাচলে হিংলাজ নামে অধিষ্ঠিতা আছেন।

হিংলাজের মাহাত্ম্য শুনে যখন আরো উচ্চস্থানে ওঠার জন্য বড়না দিচ্ছি তখন আমার পাশে বসে সেই বিশালবপু কাথিয়াবাড়ী যাত্রীটি চোঁচির বলে উঠলেন, হিংলাজ নো হাদো, কদে হাথ মুকী চাখো। অর্থাৎ কিনা হিংলাজের চড়াই বড়ই দুর্গম। এর ওপরে উঠছ যখন কোমরে হাত রেখে ওঠো। তবু কথামতো তাই করলাম। হিংলাজের চড়াই অতিক্রম করে যখন আরো উচ্চস্থানে উঠলাম তখন সিঁদুর রঞ্জিত এক প্রকাণ্ড হনুমান মূর্তি চোখে পড়ল। এখান থেকে দুটি পথ দুদিকে ভাগ হয়ে গেছে। একটি পথ দক্ষিণ দিকে দিয়ে সিম্ধাচলের উত্তর শিখরে গেছে আর একটি পথ বাম দিকের উপত্যকার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ শিখরে উপস্থিত হয়েছে। এই দুই শিখরই সৈধ্য ও প্রস্থে ৩৫০ গজ। আমি প্রথমে উত্তরের সর্বোচ্চ শিখরের দিকে রওনা দিলাম। পথে যেতে যেতে এক মুসলমান পীরের আস্তানা দৃষ্টগোচর হল। এই পীরের নাম অঙ্গারেশ্বর। সাহাবুদ্দিন ঘোরীর রাজত্বকালে মুসলমানরা যখন সিম্ধাচলের পবিত্রতা নষ্ট করবার চেষ্টা করেছিল তখন জিন্দেগ ভগবান আদিনাথের ক্রোধানলে মুসলমান সেনাপতি ভস্মীভূত হন। এই স্থান পার হয়েই উচ্চ শিখরে উঠলাম। এখানে এসে সিম্ধাচলের যে রূপ দেখলাম তা বর্ণনাতীত। কি পবিত্র ও রমণীয় সেই স্থান। ধর্ম বিশ্বাসী জৈনদের ভক্তিঅঙ্গীকৃত পূজ্যভূমি। সুন্দর মন্দিররাজি শোভিত ছেন এক অলকাপুরী। মন্দিরের ভোরগন্ধারে যখন উপস্থিত হলাম তখন সারা মন ভক্তিরসে আশ্লুত হয়ে উঠল। যখন স্থাপত্যের দিকে তাকলাম তখন দুটি চোখে বিম্মিত ও লসিত হয়ে উঠল। এই অসম্ভব কর্মকাণ্ড কি মানুষের স্বারা সম্ভব। একি দেখছি। মন্দিরের পর মন্দির। তারপর মন্দির। আবার মন্দির। এ যে মন্দিরের গ্রাম বসে গেছে। এত মন্দির তো ঘুরে দেখা একদিনে সম্ভব নয়। এখানকার সীমান্ত প্রাচীরে উঠে যখন চারিদিকে তাকলাম তখন সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য এ নিরুপম শান্ত সৌন্দর্যের প্রভাবে আমার সংসারতপ্ত মন ঝঞ্চনিত হয়ে উঠল। আমি বিমূগ্ধ বিস্ময়ে তন্ময় হয়ে সেই বর্ণিতা শিল্পকলার দিকে তাকিয়ে আমার মানব জন্ম ধন্য করলাম।

ভেতরে প্রবেশ করে প্রথমেই দর্শন করলাম দ্রোম্য নামক মন্দির। এই মন্দির এত বিশাল ও উচ্চ যে তা প্রায় ২৫ মাইল দূর থেকেও দেখা যায়। প্রবাদ আছে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময়ে এই মন্দির নির্মিত হই। কিন্তু বর্তমান মন্দির ১৬১৯ সন্বতে যোগাল স্ট্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে আমেদাবাদের প্রসিদ্ধ ধনী শিবসোমজী নির্মাণ করেন। এই মন্দিরে জৈনদের সর্বপ্রথম তীর্থঙ্কর ভগবান আদিনাথের চতুমুখ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এতবড় মূর্তি এখানকার অন্য কোন মন্দিরে নেই। এছাড়া কুমারপলি বিমলালাহ শাস্তিনাথ ও আদিনাথের মূল মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জৈনদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজার মন্দিরও আছে এখানে। আর আছে পৃথক পৃথক নির্মিত নয়টি বড় বড় অশ্রম। এর নাম নওটুক। এইসব আগ্রমে প্রবেশ করার জন্যও কারুকার্যমণ্ডিত এক একটি সুবিশাল সিঁহদ্বার রয়েছে। আর রয়েছে অসংখ্য মন্দিরের সমাগোহ। এখানকার ছোট বড় মোট মন্দিরের সংখ্যা এক হাজারের ওপর। ছোট মন্দিরের সংখ্যা ৮৩৯। এইসব মন্দিরের দেবমূর্তির সংখ্যা হল ১১৪৭৪। এছাড়া জৈন অহংগণের ৮১৬১টি পদচিহ্ন রয়েছে। তবে এই মন্দির নগরীর বেশিরভাগ মন্দিরই খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর। ভারতীয় ভাস্কর্যকলার অপূর্ব নিদর্শন ও জৈন ধর্মীগণের কোটি কোটি অর্থের বিনিয়োগ সত্যই দেখবার মতো।

ওপরের মন্দির ও অশ্রমগুলি দেখে যখন অপর শিখরে ভগবান আদিনাথের মূল মন্দিরে প্রবেশ করলাম তখন দেখলাম কাতারে কাতারে জৈন



আদিনাথ মন্দিরের ভাস্কর্য

গোলাপ ও তুলসী চন্দনের জ্বালা হাতে লাইন দিয়েছে পূজার জন্য। একদিকে মহিলা এবং অপরদিকে পুরুষদের লাইন। এরই মাঝে পূজারীরা লাল শাল ও হলুদ চাদর পরে ঘোরাঘুরি করছেন। মন্দির প্রাঙ্গণে লোহার আটচালায় বহুবর্ণ রঞ্জিত চিপলের চাঁদোয়ার নীচে গান বাজনা হচ্ছে। দুটি রূপোর ছোট ও বড় সিংহাসনও বসানো রয়েছে দেখলাম। ভেতরে ঢুকে দর্শন করলাম আদিনাথকে। কি সুন্দর ও সুবৃহৎ মূর্তি। সর্বভাগ্যী জিন্দেগ ভগবান। কিন্তু ভক্তরা তাকে সর্বভাগ্যী করতে চান না বৃষ্টি তাই নানা রঙের সমস্তর ঘটিয়ে বিপুল রত্নালংকারে সাজিয়েছেন তাঁকে। ভক্তদের স্বাভাবিক আদিনাথের পূজার ঘটা এখানে খুব। তাই দলে দলে জৈন তীর্থযাত্রীরা পূজা দিতে সর্বপ্রথমে এখানেই এসে থাকেন। তারপর শুধু পারেন অর্থাৎ শক্তি ও সামর্থ্য যাদের আছে তারা অন্যান্য মন্দির দর্শন করেন ও চৌমাখ শিখা নেন। আসে এই দুই শিখরের মধ্যস্থলে এক প্রকাণ্ড খড় (খাদ) ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে কোন এক সম্ভ্রান্ত জৈন তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য প্রচুর অর্থব্যয়ে দুই শিখরে মধ্যের খাদ ভরাট করিয়ে দিয়েছেন। কাজেই যাত্রীদের এখন অনেক কষ্টের লাঘব হয়েছে।

এইখানে আদিনাথের মন্দিরে স্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের অনেক জৈন ভিক্ষু শিখা দেখলাম। তাদের বেশিরভাগই হয় কুমারী, নয় বিধবা। প্রত্যেকে সুন্দরী ও রূপবতী। ওরা এই পূণ্যতীর্থে পরিগ্যাতারীপণী দেবীমূর্তির ন্যায় প্রতীয়মান যে আমার মনে হল। তদিয়েই একজনের সঙ্গে আলাপ করে জানলাম শুবু স্বেতাম্বরের নয়, দিগম্বর সম্প্রদায়ের জৈনদেরও অনেক মন্দির এবং ভগবান শাস্তিনাথ তীর্থঙ্করেরও বহু মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এখানে। এখানকার পূজারীরা নাকি অনেক শৈব ধর্মালম্বী। তাই তাঁদের উপাসনার জন্য একা শিব মন্দিরও রয়েছে। এই জন্যই বৃষ্টি সিম্ধাচলে পূজ্যতীর্থ নানা ধর্ম সম্প্রদায়কুলে নরনারীকে সার্বজনীন তীর্থক্ষেত্র হিসেবে পরিণত করেছে।

# মাকাস বোর্ডিং-এ সুবোধ ঘোষ অমর সান্যাল

নীলকণ্ঠবাবু বললেন, সাত নম্বর লোক এল, মাকাস বোর্ডিং-এ গিঁট খুলি থাকে না।

আমার চার নম্বর ঘরে কথাবার্তা হচ্ছিল। বোর্ডিং-এর মাঝেকার নীলকণ্ঠ মিত্র আর চৌধুরী মশায় উপস্থিত ছিলেন। খবর শুনলে চৌধুরী ছুটলেন সাত নম্বরে। বোর্ডিং-এ সিঁড়ির নীচে তখন চার্লস স্টোভান, আমার চার নম্বর থেকে দোকানের ভিতরটা পর্যন্ত দেখা যায়।

ঘিরে এসে মন্তব্য করলেন চৌধুরী মশায়, ভরলোক আপনার মত চা-খের নয়, সকালে এক কাপ বিকেলে না হলেও চলে।

নীলকণ্ঠবাবু বললেন, পদবী ঘোষ। বোধ হয় আমাদের বংশেরই কান্দু, নামটিও বেশ, সুবোধ ঘোষ। বামন আর বদ্রদের নামগুলো বড় বোকাডা-রকমের।

সম্মুখেবোলা ম্যানেজার আবার এলেন। ঘনঘন আসার কারণ আমার মেসেজার্জ দু'মাস বাকী। যথারীতি তগাদার পর বললেন, পুলকেশবাবুর কাছে সব শুনলাম। সুবোধবাবুও আনন্দবাজারের লোক মাকাস বোর্ডিং-এ গিঁট খালির খবর ওনার কাছেই পেয়েছেন।

পুলকেশবাবু বোর্ডিং-এ মাস ছয়েক আছেন, গম্ভীর প্রকৃতির লোক, আমার পাশের ঘরে থাকেন। তাঁর কাছে পরবার করলাম-সুবোধ ঘোষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। 'ফিসিল' গল্পটি তখন পড়ে ফেলেছি-অুখাজীর্ণ প্রস্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ বিশেষ প্রয়োজন। অজানগড় নয়, তিনি আছেন কলা-বাগান বিস্তার গায়ে গায়ে মাকাস বোর্ডিং-এর সাত নম্বর ঘরে।

হাতদূর মনে পড়ে সেদিনটি চৈত-সম্মা। চারদিকে বস্তুর ঘরে ঘরে আগুন জ্বলছে, বাতাসে শেকারটির গন্ধ। বোর্ডিং-এর চর ধোয়ার ঢাকা, বালক দল লেনে গ্যাসের আলো তখনও জ্বলেনি। সাত নম্বর ঘর গেটের পাশেই, অম্বকার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে এক অচেনা মুখ।

পুলকেশবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, অমরবাবু! আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান, আপনার 'ফিসিল' পড়ে মুখ।

অচেনা মুখের মালিক বললেন, আজ সকালেই চৌধুরীমশায় বোর্ডিং-এর বাসিন্দাদের পরিচয় দিয়েছেন। অমরবাবুর কথাও শুনছি। আপনাকে তো মশায় অনেক দূর যেতে হয় মাস্টারি করতে।

এই সময় লম্বা লম্বা পা ফেলে চৌধুরী মশায় এলেন। খালি গা, খালি পি, হাতে একটা বাবর। সাত নম্বরে আলো জ্বললো। সুবোধবাবু, দরজা বন্ধ করে দিলেন।

চৌধুরীমশায় সামান্য সুরে বললেন, খেটে-খেটে এসেছেন, ক্রিয়াম দরকার, খুব আলাপী লোক, আজ সকালেই আমার সঙ্গে বেশ জমেছে।

চৌধুরীমশায়কে আমরা একটু এড়িয়ে চলতাম। বাড়ি বর্ধমানে, ডাকাতি করে চার বছর জেল খেটেছেন। খালসের পর পুলিসের নম্বর-বলী ছিলেন কিছুদিন। তারপর আসল জমালেন মাকাস বোর্ডিং-এ। বাটের কাছাকাছি বসল, দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, মুখমন্ডলে গোঁফের আভিভাষ। লম্বা ধূতি গুটিয়ে পরতেন হাটু পর্যন্ত। বোর্ডিং-এর পরতালিশ জন মেম্বারের হালচাল ও গতিবিধি তাঁর অজানা ছিল না।

চৌধুরীমশায়ের কথা শুকিয়ে শুকিয়ে ফলে গেল। পরদিন কিরতে একটু রাত হয়েছে। তেরে দেখি সাত নম্বর ঘরে আলো জ্বলছে, দরজা বন্ধ। তেতালির ডাইনিং রুম। খেতে বসেছি, হঠাৎ তার ছায়া পড়লো দরজার মুখে। সুবোধ ঘোষ নিঃশব্দে বসলেন আমার পাশে এবং ভোজন-পর্ব শেষও করলেন নিঃশব্দে। আমাদের সামনে একজন বোজার খাচ্ছিলেন, তিনি

এঁচোড়ের তরকারি দিয়েই খালার ভাত শেষ করে আবার ভাত চাইলেন। সুবোধবাবু তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে আসন ছেড়ে উঠলেন। একতলায় নেমে দেখি আমার চার নম্বর ঘরের সামনে সুবোধবাবু দাঁড়িয়ে, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। বললেন, রাড় দেশের লোক ভাত খায় বেশী। এ লেবুস চৌধুরী মশায়ের খাওয়া।

সিঁড়ির নীচে চৌধুরী মশায় খেতে বসেছেন। খালার পিরামিডকৃতি ভাতের স্তূপ কি একটা তরকারি দিয়ে দলা পাচ্ছিল চৌধুরী মশায় টপটিপ গিলছেন।

আমাদের পরিচয় নিকড় হল, কিন্তু অনুভব করতাম একটা পার্থক্য। তিনি সংস্কারমুগ্ধ, আমি সংসারবুগ্ধ। তাঁর উপর সুবোধ ঘোষ কংগ্রেসানুগামী ও একনিষ্ঠ গান্ধীভক্ত। কথাবার্তার মনে হত জগতের জ্ঞান ভান্ডার তাঁর হাতের মুঠোয়।

১৯৪২ সাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মরসুম। গান্ধীজীর ভারত ছাড়ো বাণী আমাদের মাকাস বোর্ডিং-এও উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। নীলকণ্ঠ মিত্রের কাছা আছিলেন লজ করে। তাঁর ভাষণ শোকা আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে জিমের ওমলেট খেতে আরম্ভ করলো-গায়ে জোর করতে হবে। চৌধুরী মশায়ের ধূতি হাটু ছাড়িয়ে দাবনার উঠলো। সুবোধবাবু বললেন সকলের মধ্যেই চেতনা এসেছে। আমি একটু জামানভক্ত ছিলাম।



একদিন হিটলারের প্রশংসা করতেই সুবোধবাবু, রেগে উঠে। তখন আমরা আলস্যরদ খাচ্ছিলাম। একটা আলু আমার হাতে থাকে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন স্কুল ফেরে সোজা গোলাম বর্মণ স্ট্রীটে। সম্ভার অম্বকারে তেলেভাজা খেতে খেতে দুজনে বোর্ডিং-এ ফিরে এলাম।

সুবোধবাবুর গায়ে হাফসার্ট। অকস্মে সাধারণত ধূতি-পাজিাব পরে যেতেন। তেলেভাজার টোঙাটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, পাজিাব কোথাক গেল।

—চুরি গেছে। রাস্তার দিকে জানালা খোলা ছিল, টেনে নিয়েছে।

—পাজিাবিতে সোনার বোতাম ছিল না?

—হ্যাঁ, চলল আমার ঘরে।

একটু পরে সুবোধবাবুর ঘর সরগরম। কয়েক জন লোকমী এসেছেন। সুবোধবাবুকে সকলেই অজানিত করলেন তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'অসিল' গল্পগ্রন্থের জন্য।

সোঁদন রাতে ঘুম নেই। গরমে বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করছি। হঠাৎ দেখি খোলা জানলাপথে একটা বঁশ আমার পাজিাব ঘরে টানটান করছে। লম্বিয়ে উঠে বঁশ ধরেই চিককার। সে চিককার আমার প্রতি-

বেশা পাচ নম্বর ও ছা নম্বরের ঘুম ভাঙলো না। সাত নম্বর থেকে সুবোধবাবু ছুটে এলেন। আঁতরণ বঁশ ধরে ধরধর করে কাঁপছি সুবোধবাবু ছুটে গেলেন বালক দল লেনে বাঁশের মালিকে সম্বোধন।

পরদিন সকালে দুজনে জেফ্রাসীকো ধান্য গেলো। সুবোধবাবুর হাতে সেই বঁশ। মারোগ বললেন, বঁশ রেখে যান, সার্জেন্টদের বলে দে-গিলটার টহল দিতে।

এ সময়টা সুবোধবাবুর ঘরে প্রায়ই জনসমাগ হত। মম্বা সান্যাল, বিজ্ঞান ভট্টাচার্য, অরুণ মিহে স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, সুশীল রায় এবং আরও অনেকে আসতেন। কাছাকাছি বসাকদাঁঘি লেনে থাকতে শিবরাম চক্রবর্তী। তিনি ঘরে বড় একটা ঢুকতে-না, জানলা দিয়ে উঁকি মারতেন। লোকজন এরে চৌধুরী মশায়ের স্কর্টিং বাড়তো। তিনি ঘরে-বাইরে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনতেন ও চা ইত্যাদি সরবরাহ করতেন।

আমি সপ্তাহান্তে প্রায়ই বাড়ি যেতাম। ঘরের চাঁবি থাকতে সুবোধবাবুর কাছে। এক সোমবার দিন দেখি টেবিলটি এক কোণ থেকে আর এক কোণে স্থানান্তরিত। সুবোধবাবু বললেন, স্বর্ণবাবু বঁশবার রাতটা আপনার ঘবে কাটিয়েছেন টেবিলের উপর শুরে, ছোটখাট মানুষ, অসুবিধে হচ্ছিল।

১৯৪২ সাল। 'করণেগে ইয়ে মরেনো' বাণীতে দেশের আকাশ বাতাস মুখ্যরিত। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ক্রাণপ্রচারের অন্তরাল।

সুবোধবাবু একদিন বললেন, কথাবার্তা

সাবধানে বলবেন, বোর্ডিং-এ স্পাই আছে।

আমাদের সমবেদ হল এক চাটুখোর উপর। ভরলোক আমাদের সঙ্গে অযাচিত আলাপ জমাবার চেষ্টা করেন। একদিন সুবোধবাবু একটা খাম আমাদের দিয়ে বললেন, চাটুখোর ঘরে ফেলে দিতে।

খামের ভিতরে কি লেখা ছিল জানি না, কিন্তু তারপর থেকে চাটুখো আনন্দবাজারের লোককে এড়িয়ে চললেন। সম্মুখভাষন আর একজন ছিলেন উনিশ নম্বর ঘর-কেন এক অম্বসর বড়বাবু। বড়বাবু সেজেগেজে সাম্ভাবিহারে যাওয়ার সময়

কানে পোঁছল, তার দোকলার নামতেন সশব্দে চেকুর তুলতে তুলতে। সুবোধবাবুকে আমি বলতাম বড়বাবু, আপনার 'খাখার' গল্পে 'বড়ীমা'র মত। সুবোধবাবুর একটা অব্যক্ত মন্তব্য একতলা থেকে বড়বাবুর কানে পৌঁছল, পরিশ্রমে তিনি খাওয়ার সময়টা পালটে দিলেন।

একদিন সম্ভার অপেই সুবোধবাবুর বোর্ডিং-এ আগমন হল। চা খাওয়ার পর বললেন, কাঁচি আছে? আমার কাছে একটা গোফ-কাঁচি কাঁচি

# SONODYNE



can be played in your home

- ☐ HI-GAIN 12 CHANNEL TUNER
- ☐ FULL SIZE 51 CM PICTURE TUBE
- ☐ TONE CONTROL
- ☐ CORNER TO CORNER BRILLIANCE
- ☐ SUITABLE FOR AG OR PC AREA

Sonodyne Super VU is the latest in TV technology. The high gain circuitry of Super VU with automatic gain control ensures precise reception of near and distant stations without fading or disturbances.



**SONODYNE** TELEVISION CO. PVT. LTD.

Available from  
all leading TV dealers

ছিল, সুবোধবাবু বললেন, ওভেই হবে। আমার দিকে পিছন ফিরে বললেন, পাকাচুল যা আছে কেটে দিন।

—কি ব্যাপার।

—হাওড়া বাব। একটা সভায়। ওরা নিতে আসবে এখানে।

কাচি চালিয়ে সুবোধবাবুর পাকাচুল বিশেষ কাটতে পারলাম না, কাটা চুলই বেশী কেটে ফেললাম।

সুবোধবাবু দুখানা আয়না সামনেসামনি ধরে বললেন, বেশ হয়েছে। ওরা মনে করবে সুবোধবাবুর চুলই ওই প্রকার।

এই সময়টা রাত্রি রাতেই সাইরেন বাজতে। সুবোধবাবু নিজের ঘর ছেড়ে আমার চার নম্বরে, আর তার সাত নম্বরে অন্ত্র নিত সামনের বিস্তার নারী মিঞা, তার চার বিবি আর ছেলেমেয়ের। বিবিরা আপাদমস্তক বোরশায় ঢেকে আভরের গন্ধ ছড়িয়ে বোডিং-এ প্রবেশ করতেন। চৌধুরী মশায়ের এ ব্যাপারটা ভাল লাগতো না। আমাকে একদিন চূর্ণচূর্ণি বললেন, নারী মিঞা এপাড়ার নামকরা গুন্ডা, ওর সঙ্গে মাথামাথি ভাল নয়।

সাইরেন মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাসী হত, সুবোধবাবু নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন, আমি ঘুমজড়ানো চোখে শুনতাম, আর গলি দিয়ে হেঁকে যেত এক বাস্তবাসী উম্মাধ—ডর মং ডর মং।

সুবোধবাবুর পড়াশুনায় পরিধি ছিল সীমিত। সাধারণ কথাও বলতেন অসাধারণভাবে।

এই সময় হেমন্তের এক ধূসর সন্ধ্যায় মক্কাঁস বোডিং-এ আগমন হল এক অচেনা মত্থের। সুবোধবাবুর সঙ্গে তেতলায় উঠলেন।

চৌধুরী মশায় বললেন, আনন্দবাজারের লোক, সকালে এসেছেন। তোরি নম্বরে যান।

অমি ছুটলাম তেতলায়। সুবোধবাবু, পরিচয় করিয়ে দিলেন। সাগরময় যোবা 'দেশ'এর সহ সম্পাদক। আগন্তুককে দেখে আমি একটু চমকিত হলাম, রহস্যময় বিষয়ে আচ্ছন্ন তাঁর মুখশ্রী। যেন বিবাসীরাষ্ট্র, অনেক গোপন দৃশ্য নিহিত।

বছর শেষ হয়ে এল। সেদিন ২৪শে ডিসেম্বর—ক্রীসমাস ইভ। সন্ধ্যা সাতটার সাইরেন বাজলো। সুবোধবাবু বললেন,—আজ কিছ্র একটা হবে। অধি ষষ্ঠার মধ্যেই বোমা পড়ার দুমদাম আওয়াজ। সাগরবাবু, বাইরে। সারা বোডিং জড় হল একতলার বারান্দার নীচে। আলো নিভানো, লোক চেনা বাজছে না। হঠাৎ আমার হাত ধরে কে একজন টানতে টানতে তেতলায় রান্নাঘরে নিয়ে গেল। উনুনের অঁচে ঘরটা লাগ হল আছে।

সুবোধবাবু বললেন,—ধরুন। পরাত থেকে ভাজা মাছ চারখানা আমার হাতে দিলেন। দুজনে খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে মাছ খাচ্ছি, আর নীচের তলায় চৌধুরী মশায়ের উল্লসিত চিকরির কানে আসছে,—ওই পড়লো! আর একটা।

ঘন্টা তিনেক পর অল ক্রিয়ার হল। সুবোধবাবু বললেন, চলুন ভালহোসী স্কোয়ারে। বোমার আওয়াজটা ওদিক থেকেই আসছিল।

চাঁদের আলো ছিল আকাশে, পথখাট অনেকটা নিখুঁত। ভালহোসী স্কোয়ারে পুলিশের গাড়ি হুটোহুটি করছে। স্টেফেন হাউসের সামনে একটা গ্যাসশেট গোড়া ফটে পড়ে আছে। সেন্সিটাল টোল-রাফ অফিসের বড় বাড়িটার গায়ে পিপলনটারের লতাচিহ্ন। হাটতে হাটতে এসম্প্যান্ড গেলো। রাস্তা চলছে না, লাইনের উপর ক্রীসমাস ইভের উৎসব শুরু হয়েছে। সেন্সিটাল অগভাষণ করে নাচের আসর সমিচ্ছে। আমার ভাল লাগলো না, সুবোধবাবু নির্বাকভাবে নাচ উত্তোষণ করতে লাগলেন। ফেরার সময় বললেন, পলকা নাচ।

পর্বনি বোডিং-এ ঘর ঘরে তালা পড়লো। গরুর, চাকর সব উঠাও। ম্যানেজার নীলকন্ঠ দ্বিতীয় স্তরের দিকে ছুটলেন। নেপালী দরোয়ান সুবোধ-

বাবুকে দেখে নিভাত অসহায়ের মত ডুকরে উঠলো।—হাম কেরা করগা।

খাওয়ানাগরায় বিশেষ অসুবিধা হল। চৌধুরী মশার এটােসটা রান্না করে খাওয়াতেন, কিন্তু তখনকার দিনের তুলনায় খরচ বেশী হত। আমরা কুকুরে আহাতিদির ব্যবস্থা করলাম। সব সিম্ব, আর প্রায়ই মাসের 'স্টু'। ছিদ্দিন ভাল লাগলো, তারপর একঘরে। সুবোধবাবু একদিন পথ থেকে কাগজ-কুড়ানো একটি ছেলে ধরে আনলেন। তাকে সাবান দিয়ে ঘষেমেজে পরিষ্কার করা হল। তারপর তাকে বসানো হল রান্নাঘরে। অনেকদিন পর আমরা রান্না ভাত খেলাম। পরদিন সকালে দৌঁধি ছেলেটা পালিয়েছে, আমাদের দেওয়া হুটি-গোঁজ রান্নাঘরের এক কোণে পড়ে।

বছর শেষ হতেই সারা দেশে মড়ক লাগলো। কুকুরে খাওয়ার ক্ষরতও বাড়লো। তা ছাড়া চালভালে কৃৎখা। সুবোধবাবু সেইসব 'গম্ব' একটা একটা বিশেষণে বিভূষিত করলেন। সাগরবাবু, আহাতিদির বাইরে সারতে লাগলেন; আমরা একটা লম্বাখানার অন্ত্র নিলাম। বোডিং-এর কাছে একটা হিন্দি স্কুলে সন্তান খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। চৌধুরী মশার ভাত, ডাল, তরকারি, অবল। পেট ভরে খাও।

নানা অসুবিধার মধ্যেও সুবোধবাবুর লেখনী সচল। 'পরশুরামের কুটার' শেষ করে তিলাজলির খসড়া করলেন। চৌধুরী মশায় বললেন, রাত দুটো আড়াইটে পর্যন্ত ওর ঘরে আলো জ্বলল।

ভাত্রমাস শেষ হয়ে এল। সেদিন অবিরাম বর্ষণ, বোডিং-এর চারদিকে একহুটু জল। সুবোধবাবু ও সাগরবাবু বর্মণ স্ট্রীট থেকে ফিরলেন একসঙ্গে। আমার ঘরে ঢোকা দিয়ে বললেন, তেতলায় আসুন।

সেদিন বর্মণময় সন্ধ্যায় এক অভিনব আঁত-জাড লাভ করলাম। সাগরবাবুর কন্ঠ গীত-বিতানের সঙ্গীত প্রবাহিত হল একের পর এক। সভাসমিতিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনছি, কিন্তু এমনটি নয়। এ যেন গায়কের মুখ প্রাণের অনাহত উচ্ছ্বাস। বোডিং-এ তখন সংখ্যার আমরা ছিলাম ডেরজন। বাকী দশজনের অস্বস্তি আমরা অনুভব করছিলাম তেজানো ধরজার বাইরে বস্তুতজ্ঞা বারান্দায়।

সুবোধবাবু বললেন, সাগর লাভক মানুষ, সভাসমিতিতে গান করতে নারাজ। রসভঙ্গ্য করলেন চৌধুরীমশায়। ওমলেট ও চা এনে বললেন, দাম দিতে হবে না। তাঁর শৃঙ্খল-শোভিত মুখে তৃপ্তির রেখা।

কংগ্রেস সাহিজ সংঘ স্থাপিত হয় এইসময়। সুকৃতি সেন বংশমাতরেন নতুন সূর দিয়েছেন।

তাঁর বাড়িতে প্রায়ই সংঘের অধিবেশন হত। সুবোধবাবু ও সাগরবাবু বিশিষ্ট সভা হিসাবে উপস্থিত থাকতেন, সঙ্গে লেজডরেন্স আমিও থাকতাম। অন্যান্যদের মধ্যে থাকতেন সঞ্জনীকান্ত দাস, সুবল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপ্তি সান্যাল, এবং আরও অনেকে। জাগে নব ভারতের জনতা/একজাতি একপ্রাণ একতা।—গানটি অধিবেশনে গাওয়া হত। সুবোধবাবুও যোগ দিতেন।

সভাসমিতিতে বাওয়া তিনি বড় একটা পছন্দ করতেন না। মাঝে মাঝে আসতেন আমি গাংগুলী, শ্রীরামপুর থেকে। ইনি সরকারী চাকুরে ও সাহিত্যানুগাণী। তখন সরকার থেকে যুঁথের জন্য সাহিত্যিকদের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা চলছে। নামকরা সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকে ভিড়ে গেলেন সরকারী দলে।

অমির গাংগুলী একদিন সুবোধবাবুকে নিয়ে গেলেন ক্যালিকাতা দ্রাবে এক আই সি এস অফিসারের কাছে। বোডিং-এ ফিরতে রাত হল একটা। আমার হ্রম ডাণিগরে বললেন,—অফিসারমশায় 'কল'ফিলির ডাক-এর উজ্জ্বলিত প্রশংসা করে বললেন, গল্পের নায়ক স্ক্রলমাস্টার ফার্সিবিরাধী হলে আরও ভাল হত।

সাগরবাবু আসবার পর থেকে শিবরামবাবু প্রায়ই বোডিং-এ আসতেন। সুবোধবাবু উপস্থিত থাকলে একটু অস্বাভাবিক বোধ করতেন। তিনি থাকতেন বোডিং-এর অতি কাছে বসাকশাধি লেনে। আমাদের বাড়িরদোর পথে প্রায়ই দেখতাম, ব্যালকনিতে চরমরাসা এক বিস্তৃত পুস্তকশা। সুবোধবাবু এদিক ওদিক তাকিয়ে পথ চলতেন; বসাকশাধি লেন সামনে পড়তেই বলতেন, ব্যালকনি দেখুন।

খাওয়ানাগরায় ঘাটীত হলেও আমাদের আভার ঘাটীত ছিল না। অধিবেশন হত আমার চার নম্বরে ঘরে। একদিন কুকুরে শুধু ভাত রান্না হল। চৌধুরীমশায় মাস রান্না করে দিলেন। রাত এগারোটো না বাজতেই চারদিক প্রায় নিখুঁত। গলির মোড়ে একটা হোটেল থেকে তল্লুর রুটি ও লিককাবাবের গম্ব ভেসে আসছে। সুবোধবাবু বস্তু, আমরা নির্বাক দ্রোতা। সভ্যভঙ্গের আগে সাগরবাবু গাইলেন,—কল'ফার্সির দোলদোলানো পৌষ কাগানের পালা। একটিন সিগারেটের শেষ তিনটিতে বখন তিনজন ক' দিলাম, বোডিং-এর বাড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজলো।

১৯৪৪ সাল। বোডিংরায় অনেকে ফিরে এসেছেন। সুবোধবাবু বললেন বড় একঘরে লাগছে।

এক ছুটির দিন আমরা বাসার খোঁজে বেরুলাম। বর্মণ স্ট্রীটের কাছাকাছি হলে ভাল হয়; ভাড়াটে বাড়ির সন্ধ্যানে উত্তর কলকাতার আলিগাধি প্রায় চষে ফেললাম, কিন্তু সুবোধবাবুর মনোমত বাড়ি পাওয়া গেল না।

আর একদিন বেরুলাম দক্ষিণ কলকাতা অভিমানে। কালিঘাট পার্কের কাছে একটা বড় বাড়ি—টু-লেট। কল'ফে নীচে একটা ভাত্রাখানার শোঁজ করতাই ভরলোক হেসে খুন। অনেক কন্ঠ হাসি ধামিয়ে বললেন, টু-লেট আপনাদের জন্য নয়। আমরা ক্লাস্ত হয়ে বসলাম পার্কের একটা গাছের ছায়ায়। শজাবী হোটোলে খেয়ে বোডিং-এ ফিরতে রাত হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত সুবোধবাবুর বাড়ি ঠিক হল, ক'হুলেতে। আনন্দবাজার অফিস থেকে অনেকখানি দূরে। নিকটতম প্রাতিবেশী শুলীয়া রাস্তা ও তারপাশ রাহা। বাসস্টপ থেকে বেশ খানিকটা হাটতে হয়। যাহার দিন ঠিক নেই, শৃদ্ধ পশ্চাতীকৃতি চৌধুরী-মশায় গম্ভীরতর হয়েছেন।

একদিন সকালে সুবোধবাবু ম্যানেজারের ডায়েরি খোঁকাকে ভেঙে ঘরভাড়া মিটিয়ে দিলেন, আর আমাকে বললেন কুকুরটা আপনারই থাকুক। তাঁর জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল বিছানা আর বড় একটা সুটকেস।

বিষায়ের দিন আমি ছিলাম না। সেদিন সকাল থেকেই সুবোধবাবু নাকি মহাব্যস্ত ছিলেন। চৌধুরীমশায় বিছানাপত্র বেঁধেছেরে দ্রোঁড় করলেন। সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্তে ছেলে পড়েছে; একটা খোঁজার গাড়ি প্রকৃত্ত মাক্সিস বোডিং-এর গেটের সামনে। জিনিসপত্র তুলে নির আরোহীসময়ে গাড়ি চললো শীর কদমে মাক্সিস স্কোয়ারের পাশ দিয়ে। সাগরবাবু ঘরে চলে গেলেন। চৌধুরীমশায় দাঁড়িয়ে থাকলেন গেটের বাইরে; তাঁর দৃ চোখ বেয়ে কবরুর করে জল পড়ছে।

সম্ভাব্যে ফিরে দেখি ঘরের মধ্যে পড়ে একটুকুরা কাগজে লেখা চিঠি—  
“অমর বাবু,

আমি চললাম। পাশের ঘরে আমার ছাড়াটি বন্দী আছে; একদিন এসে নিয়ে যাব।

সুবোধ

ইতিমধ্যে আমার কোন চিঠি আসলে আপনার কাছেই রাখবেন। আর সব সজ্ঞাতে হবে।”  
আমার চার নম্বর ঘরের নামকরণ করেন সুবোধবাবু—“পাশের ঘর”।



## তুর্ঘট

### কেতকী কুশারী জাইসন

তোমাকে কোলে ক'রে রাত কাটানো যেতো।  
তা হলো না।

তুমি দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেলে।

এক কক্ষলে শীত মানলো না,  
মাদলের বোল ঘুম পাড়ালো না,  
যে রাতে মশা কামড়ালো

সে রাতেই তোমার ম্যালেরিয়া হলো।

বন্দী গাছগুলো যখন ভোরের কুয়াশা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে

তখনই দরজায় এলো তোমার গ্রেপ্তারের পরোয়ানা,—

সেই কড়ানাড়া আমি এখনও শুনতে পাই।

খিড়কি দুরোর দিয়ে তুমি পালিয়ে গেলে।

খবর পেলাম তুমি দূর দেশে ফেরার হয়েছো।

হাতীর পিঠে চ'ড়ে তোমার ডেরায় আসা যেতো।

তা হলো না।

হাতীটা মদমত্ত হয়ে দাপাদাপি করলো,

বাঁশবন লণ্ডভণ্ড হলো।

চিঠল লুপা সামান্য তুলে ধ'রে

খালি পায়ে ছুটে এলো মেয়েরা।

তাদের জিজ্ঞাসা চোখের তেরছা আলোয়

আমি অপ্রস্তুত হলাম।

## সন্ধের লোকাল ট্রেন

### শান্ত রায়

আর কেউ নয়, শুধু সন্ধের লোকাল ট্রেন টের পায়

উষর ভূমির দীর্ঘশ্বাস ;

এখানে ওপরমুখী চিমনি নেই,

কিছু আগে অবসন্ন উড়াল-পাখির সংক্রামে

আকাশ অধার হয়ে গেছে—

জোনাকি-তরুণ-ব্যাঙ-ডাকপাখিদের শব্দ সাড়া

একটেরে প্ল্যাটফর্মে ট্রেন থামে ধামুয়ান্ন, তারপর

লোকজন নেমে গেলে, স'রে যেতে থাকে...

উল্টোপারে যোপঝাড়, লক্ষের আলোর আবছা খ'ড়েচাল

হঠাৎ সেখান থেকে শিশুর চিংকার শোনা যায় :

ও বাবা, এসেছেল

## আমার কোথাও যাবার ছিল

### ব্রততী বিশ্বাস

আমার কোথাও যাবার ছিল পরবাসের ঘরে  
আমার কোথাও তাড়া ছিল দিনদুয়েকের তরে  
আমার ছিল ছিন্নবাস আমার ছিল ঘুম

পাহাড়তলির দীর্ঘ ছায়া অবসরের ডাক  
ডাক কি ছিল? ছিল কিছ, অন্যতর ফাঁক  
গহীন গাঙে জলের মতো যেই না চূপ করা

ধমকে আছে সময় এখন হাতের শিরার কাছে  
পরবাসের দৃংখ নেই সূখটি জানা আছে  
দৃংখ নিয়ে মাথার ওপর আকাশছায়া হাত  
আমার এখন ঘরে থাকার, ঘরে থাকার সাধ।

## শেষরাতে

### শ্যামলকান্তি দাশ

শেষরাতে তুমুল বৃষ্টি হবে,

অপরাহ্নে আজ আমরা ময়ূর দেখেছি।

দেখেছি জানালা-খোলা মানুষের শূন্য ঘর—

ছাড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নিসর্গের ছিটেফোঁটা

শ্রিয়মাণ বকুল-পারুল,

এলোমেলো ত্রুস্ত চাঁদ ঝুঁকে আছে সেতুর ওপারে।

মানুষ কোথায় গেছে, এ-সময়ে, এরকম অসময়ে?

কোথাও যায়নি।

মানুষ হরিণ তাই রঙিন শস্যের ক্ষেতে বেড়াতে গিয়েছে

মানুষ মানুষ তাই কবিত্বের ছেঁড়াকাঁথা গায়ে দিয়ে

পাহাড়ে ঝুঁটছে

মানুষ ময়ূরপাখি ছেঁড়াখোঁড়া জীবনের ধারে বসে

একা-একা গোথুলি দেখছে।

মানুষ কোথাও গেছে, আমি তার গতিবিধি কিছুই জানি না।

শেষরাতে তুমুল বৃষ্টি হবে

অপরাহ্নে আজ আমরা দুজনেই ময়ূর দেখেছি।



## শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা সত্যেন্দ্র আচার্য

হাত খড়ি দেখে নিয়ে আরো একটু জোরে হাটল সন্দীপ। দ্রুত হাটল সন্দীপ ফুটপাথ ধরে না, রাস্তার নামে। রাস্তা যেন তাকেই টেনে নিয়ে যায়, কোন প্ররোচনা থাকে না। সে হাটতে, একটা নিজস্ব ডাঁড়িতে। পেছন থেকে কেউ ডাকলেও সাড়া নেই। সন্দীপ হাটছে কি ছুটছে ঠিক বোঝা যায় না তখন। যেন সব কিছু সপোন দিয়ে একটা কলের পুতুল এগিয়ে চলেছে। দম-স্বখন ফুরাবে, গতি শ্লথ হবে তখন।

দম ফুরিয়ে গেলে এখন। গতিও শ্লথ হল, বাড়টার মনোমুখি দাঁড়িয়ে। সন্দীপ রুমাল বের করে মুখ মুছল, তারপর শ্লথ পয়ে ঢুক গেল ভেতরে। টেবিলে মুখে রেখে চূপচাপ করেছিল রততী। বই খাতা অগোছালা। সন্দীপ মুহূর্তে অনেক দাঁড়াল পাশে, বাঁকা চোখে টেবিলটা দেখল, তারপর চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। বসে কল, 'কসেই তো আছ, পড়ছ কোথায়?'

দ্রুত, ঠিক হাটলে যেমন ভিন্ন মানুষ সন্দীপ, তেমনি এই টেবিলে। অতত রততীকে পড়াতে বসলেই সন্দীপ ভিন্ন মানুষ। চোখে মুখে গাম্ভীর্যের প্রলেপ, গলার স্বর গাঢ়। পড়বার চোখে না তাকিয়েই সেই গাঢ় গলার কল, 'কী, আর কতক্ষণ বসে থাকবে?'

তবু কোনো উত্তর এল না। টেবিলটি যেন মরুভূমি, এবং এই বিরাট মরুভূমির ওপর দাঁড়িয়ে রততী এখন অসহায়, এমনভাবে তাকাল।

সন্দীপ আরো কঠোর হল। আবার ভারিঙ্গী স্বর আনল গলার। কল, 'আগের জন্মের পাগ না থাকলে, তোমার মত ময়ের কেউ টিউটার হয় না। বকলে?'

উত্তরে কোন উত্তর ছেই। শব্দ, একটা খাতা টেনে নিল রততী। পেয়ার প্রতীতি আর কী! চোখে মুখে কোন ভাবান্তর ঘটল না। কোন পরিবর্তন লক্ষ করা গেল না।

সন্দীপ আবার কঠোর হল। তেমনি প্রবীণতার ভাণ করে কঠোর গলার কল, 'কসেই আছ তো কসেই আছ। কই, কলম নড়ছে না তো?'

রততী তেমনি যালকরাগির ওপর সেটে থাকা ভাঁপতে শব্দ, বাঁকা করে হাসল না।

সন্দীপ হাঁতডাঁত একটু তাকাল। সময় কাটল। পরবার ওপাশে কান রেখে কী যেন লক্ষ করল। করে আরো কঠোর গলার বা বলবে ডাকল, তা কল না। যেন কলা হল না। চোরা বাগিতে পুঁতে বাওয়া রততীর শরীরে এককণ পরে যেন নিকুটিত গেল। এককণ পরে দল্লজ গলার বলল, 'কি, পরবার ওপাশে কি?'

ভেব না তুমি শুলেই পড়ছ এখনো, সন্দীপ ওইটুকু বলে থামল। যেন দম নিল থেমে। তারপর আর একটু গলা চাড়িয়ে কল, 'নেনা আমন যে। পইতের কদম থাকবে কেন কল?'

পেয়ে সোনারাও ডিখ পায় না, সন্ধ্যা সন্ধ্যা তিব্বত মন্তব্য রততীর। একেবারে নাকটুকু হাসিতে কেটে পড়ল রততী। কিন্তু ডিকের সেবার মত আমার

সন্দীপ গাম্ভীর্য বজায় রাখতে সিগারেট ধরাল। টেবিলের ওপর এক রাশ বই। খাতার ওপর পেন্সিল ছাইরে আবার তেমনি চূপচাপ বসে থাকল রততী। সন্দীপ ঘন ঘন সিগারেট টানল। ধোঁয়ার কুণ্ডলী হাতসে ডানসে দ্বিগে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'সময়ের দাম আছে আমার।' ধোঁয়ার কুণ্ডলী টেকিল পার হলে হাওয়ার সীতার কাটেতে কাটেতে কিছ, পরবার ওপাশে, কিছ, জানলা দিয়ে ওপারের হাওয়ার মিশে গেল, সন্দীপ শব্দ, কল, 'আমার একটা সন্ধ্যা আছে।'

রততী ঠোট বোঁকিয়ে তাকাল। পেন্সিল কামড়াল। তারপর খুব মনোযোগ দিয়ে খাতার ওপরে 'শ্রীশ্রী সরস্বতী মাতা সহায়' লিখল সন্দীপ চোখ ঘুরিয়ে পরবার দিকে তাকাল। আর তাকাতই রততী যেন সুযোগ পেল। 'উহু, ওটা পদ্য। পড়ো। কেমন উত্তর লিখছে, কি করছে টিউটার সৈদিকে লক্ষ রাখবে তো? পড়াতে বসে অনমনস্ক হতে নেই।'

যেন ভূমিই পড়াছ আমাকে, এমনভাবে কথা কাছ? সন্দীপ আবার রাগল। তেমনি রাগের ভালা করে কল, 'পড়ছ আর কোথায়, শব্দ, তো মা সরস্বতীর নাম লিখছো তখন থেকে। সন্দীপ রততীর দিকে তাকাল না। কল, 'সেই কখন থেকে কলমের ডগার প্রবর্তী নিয়ে চূপচাপ বসে আছ।' সন্দীপ এবার একটু উঠে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল, তারপর জলন্ত সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে বলল, 'আমাকে তুমি ডোবাতে চাও?'

রততী ভটপেন্টা এককণ পরে হাতে ধরে 'সরস্বতী' মাতার লজ্জাশে গেরটা পাঁচক গোলা-গোলা চিহ্ন দিয়ে সরস্বতী মাতাকে কন্দী করে মাথা দলিয়ে কল, 'ভূমি না বকলে সব কেমন গাঁলিয়ে যায়, স্যার।'

সন্দীপ এখন আর নতুন করে সিগারেট ধরাল না। এই আর এক অভ্যাস সন্দীপের। চিন্তা ডাকার ডুবে থাকলে, পর পর গেরটা তিনেক সিগারেট পোড়ায়। রততী যেন উপদেশ দিচ্ছে এমন গলার বলল, 'আর সিগারেট খাবেন না স্যার, বাওয়া স্মাশ্বেদ্য পক্ষে হানিকর।' বসেই নিরন্তর মনেই যেন বলছে আবার বলল, 'আমি তো আর সিগারেট খাই না, আমার আর মাথাঝা কি?'

সন্দীপ একটা কই টেনে নিল। নিয়ে বইয়ের পাতার চোখ রাখলে রততী বলল, 'কি গো, সন্দীপ বানাচ্ছি।' সুর, ক্লাসের ভেতর যদি এসে কি সময়কে সন্দীপদা বলে ডেকে ফেলি, তা হলে ককবে ভূমি স্যার?'

সন্দীপ কই থেকে মুখ তুলল না। না তুলেই কপট রাসের কড়া সুর আনল গলার, 'আ। কতক্ষণ আর লক্ষ্যক কলো তো?।' বিরাট প্রকাশ করল সন্দীপ, 'বাঁড়ীকেই জিজ্ঞাস্য করো না?'

বেশ, বাবা, বেশ, রততী ভাঁড়খড়ি উত্তর দিল, 'না হয় রেখেই আসছি বাঁড়ী ও ঘরে।' রততী উঠে কাঁড়াল, কিন্তু ধরল করে আবার বসে পড়ল চেরারে। কল বাঁড়ীকে লক্ষ করে শাসন করল, রততী। প্রেম ভাবি তোকে চাবি দিতে ভুলে যাব। কিন্তু ওই যে, ওঘর থেকে— মুখ ভেঁড়িয়ে নিজের নামটা বিকৃত উচ্চারণ

প্রবন্ধ, সমালোচনা ও অগ্ৰাণ্য গবেষণামূলক গ্রন্থ

আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর

পথের শেষ কোথায়

‘দেশ’ পত্রিকায় (১৩৮৩) প্রকাশিত রচনাগুলি ছাড়া আরও বেশ কিছু প্রবন্ধ এ-বইয়ের অন্তর্গত। যা সংশোধিত ও পরিমার্জিত। দাম ১৪৮

৥ লেখকের অন্যান্য বই ৥

আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ . পাশ্চাত্যজনের সখা

[পরিবর্তিত, পরিমার্জিত সংস্করণ] ১২৮ . [পরিবর্তিত সংস্করণ] ১২৮

কিরণশী দে ৥ রবীন্দ্রসংগীত সূচমা ১২৮

বুদ্ধদেব বসু ৥ সাহিত্যচর্চা ১২৮

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত

দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ ৮৮

বাংলার লোক সাহিত্য ৥ প্রবাদ ৥ ২৫৮

গীতকবি শ্রীমধুসূদন ১৫৮

পুর্নালিয়া থেকে প্যারিস ১৫৮

অমিতাভ চৌধুরী’র

সূর্যাস্তের আগে

রবীন্দ্রনাথ ৭০০

পূর্ণেন্দু পত্নী ৥ পুরনো কলকাতার কথাচিত্র ৩০৮

দীপ্তি ত্রিপাঠী ৥ আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় ২০৮

গোপালচন্দ্র রায় ৥ অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র ২৫৮

শম্ভুজ বসু

একটি নক্ষত্র আসে

(জীবনানন্দ দাশ ও তার বইয়ের আলোচনা) ১২৮

সন্ধা ৥ সেন ৥ সুরের আগুন ১৬৮

নির্মালকুমার রায় ৥ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংস্পর্শে ২০৮

সাধনকুমার ভট্টাচার্য

এয়ারস্ট্রেলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব ২২৮

ভূদেব চৌধুরী

বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, প্রথম পর্যায় ৩০৮

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

বাংলা উপন্যাসের

কালান্তর ২৮৮

বেঙ্গল পাবলিশিং c/o বেঙ্গল বুক কোর্স

১৩, বহুম চাটাকি স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩

পরের বাড়িকেই কল্যাণ, দ্বাখ, কাল থেকে ঠিক জুলে থাকে। চাঁদ, লম্বা কিছুর, দেব ন চোকে। সাইরেন বাক্সের আর ওপর থেকে যেই বলুক—৮

সুদীপ হুমাল বের করে লম্বাট একটু ঘেঁষে নিয়ে আবার চোখে লালাল কিন্তু ডাকাল না। রত্নতী অপরূপ থেকে কোন জবাবের প্রত্যাশা না করেই অভিব্যক্তি করল, সময়ের বে অভাব এসে কি সময় তোমার তা আমি জানি। কিনা পল্লভার পড়লে যে আমি, সময়ের দম্ব আমার টিউটোর থাকবে না তো, আমার থাকবে? তার পর জেগে হাত ঢালা দিয়ে সুদীপকে লক করে প্রার কামার গলার বলল, তোমার সময়ের দাম তো আর আমার বখাবেলগ্য দাম দিয়ে কিনতে পারিনি? সুদীপ চুপ। রত্নতী এবার চোখ থেকে হাত নামিয়ে হো হো করে হেসে বলল, ঠিক, কেমন দিলাম বলত সুদীপ স্যার? এবার হাসতে হাসতে হেলথলে বলল, ‘আর চাইতে তুমি আমাকে পরকা অভিব্যক্তি হওয়ার টেনিং দাও, সিনেমার সময়। নারিকা হবার মত চেয়ার আমার নেই, কিন্তু নারিকার ছোটবোন তো হতে পারি? কি গেল এসে কি সময়, পারি না?’

জানি না। সুদীপ নিতান্ত সত্যের গলার কল। প্রথমে তুমি, কোচকলো রত্নতী, পরে সরস্বতী মাতা-র লিপিসিল্পে দৃষ্টি রেখে কল, ভাগ্যক্রমে ধনপতি কোন নারিকার সঙ্গে নারিকার সাথে সহযোগে ইয়ে ইয়ে হলে তব ছোট সালী হতে পারি তো? কি গো স্যার, এসে কি সময় টেনিং-সেনি-এর অভিব্যক্তি আছে হতে? সুদীপ হাসতে গিলেও খেমে গেল। এবারে গলার মধ্য একটু কোমল করে কল, ‘অনেক বকসে, এখন সেখানে’, সুদীপ কইটা বন্ধ করে রেখে দিল। নিয়ে কল, ‘আর না বললে বলো, একশেরবার বলিয়ে লেক। কিন্তু না হলে বোকার জাপ করবে না বলছি।’

জনা কাঁধে চিবুক হুইয়ে তিরিক তরিকের বন্দী সরস্বতীকে নমস্কার করল রত্নতী। তারপর জিব দিয়ে ওপরের টেটটা ভিজিয়ে নিল। কিন্তু লেখার কোন লক্ষণ প্রকাশ পেল না। সুদীপ এখন খাতার ওপর আঁকিবাকি করেই কাটতে ঠিক এবার কল না। কিন্তু উল্লা প্রকাশ পেল না। বলল, ‘নিতান্ত জোয়ার অল্প দাঁদির অনুরোধ, তাই এই দায়। নইলে—’

নইলে? রত্নতী বেন টপ করে কথার লক্ষ নিয়ে হীরের কীরের বার করল উদ্যোগ করল। তারপর প্রশ্ন করে বলল, নইলে, আসতে না, এই তো? সুদীপ হুইউথানেক বিস্তৃত হল। উত্তরের ডাক খুঁজল। না শেরো হেসে ফেলল। তেমনি হেসেই উত্তর দিল, ‘বেন তুমিই আমাকে পড়াতে বলছ। কথার কথার আমার তাই জবাব দিতে হবে।’

টেটটা হুঁচকলো করে লেখার মন দিল রত্নতী। সুদীপ আর কিছু কল না। পড়ের হাওয়া আসছিল ঘরে। পদা সরিয়ে। আজ বেনক অন্য দিনের চাইতে একটু শীতের ভাব হাওয়ায়। হঠাৎ লিখতে লিখতে কলম জামের রত্নতী প্রশ্ন করে কল, ‘তুমি পড়াতে বললে আমার কেমন হাসি পায়। আচ্ছা—’

‘কী?’

‘কল, আর তো কটা দিন। আমি কলজ থেকে বেরিয়ে গেলে তুমি তো জরুরি দিতে পারতে?’

‘আবার?’ সুদীপ আবার ধমক দিল।

‘আচ্ছা, কবে তোমার ছুটি হবে কল, সুদীপসার?’

‘ওহ! সুদীপ আবার কপাল কুচকলো।

‘কানের পাশে চুল পাকবে? একটা শের রা রঙের চিলে ঢালা পাঞ্জাবি পরে অজ্ঞানভূতি, নিসগচেতনা, এই সব কঠিন কঠিন কঠিনের কাখা সেবে?’ এর পর বেন কিছুক্ষণ ধরেই নিজের মনেই হাসল রত্নতী, তারপর রাসিকতা করল, ‘আলোটা আলোর মকত নোট থেকে লেন্সেইং রেকর্ড চালাবে?’

এতকাল পরে সত্যিই হেসে ফেলল সুদীপ। ‘কী তুমি পড়বে, না উঠে দাব ও ধরে?’

‘সেইটাই তো চাও, রত্নতী মন টিপে হাসল। ‘আও?’

পালের ঘরে দাবার জন্যে সুদীপ উঠে দাঁড়ালে রত্নতী হা এর টানল। সুদীপ বেজার মন করে দাঁড়িয়েই থাকল। কল না। রত্নতী হাত না ছেড়েই কল, বেশ বেশ ওই জারগাটা আর একটু বাকিয়ে দাও।

সুদীপ হাত ছাড়িয়ে নিল। নিয়ে গম্ভীর গলার বলল, ‘কোন জারগাটা?’

‘সেই জারগাটা।’

‘কোন জারগাটা?’ সুদীপ লক দটোর ওপর অনেকখানি জোর দিল।

‘সেই যে সেই? বাড়ি মোলাল রত্নতী। সেই যে অভিসারে কাকের রাক্ষরানী, তই জল ঢেলে মাটি পেছল করে তার উপর দিয়ে হাঁটছেন। কলম পথে যেতে হতে পারে কল, সেই যে সেই, কটা পথে তার ওপর দিয়ে হাঁটছেন? কী বেন, কী বেন সেই লাইনলো?’ কলম কামড়াল রত্নতী। ‘ইস! কিছতেই মনে থাকে না।’

নিজের মাথার নিজেই একটা গট্টা মারল, বেন পড়েছে, মনে পড়েছে, রত্নতী বেন অনেক চেষ্টা করে মনে আনতে পেরেছে, চোখে মুখে এমন ভাব এনে কল—

কটক গাটি কমলময় পদতল

মজির চাঁকিই স্বাণি

গদ্যার বাজি জারি কাকি পিছল

লোভীহ অঙ্গলি চাপি।

পদ শেষ করে রত্নতী হাসল। সেবল, সুদীপ তেমনি দাঁড়িয়ে। ওখের দাবার জন্যে বাসত। রত্নতী কল, ‘তা হলে কল স্যার, প্রিয়মিলনের জন্য প্রীরাধিকার এই অনুশীলন বেশ ইম্পোর্টেন্ট, পরীক্ষার আসতে পারে?’

পায়ে ও ধরার দিকে চোখ রেখে ছোট জর উত্তর দিল সুদীপ।



# “পিয়ারলেস টীম” ভারতের জাতীয় সংহতির এক মূর্ত প্রতীক



মোট সম্পদ-  
১০০ কোটি  
টাকার উদ্দেশ্য

পিয়ারলেসের মাধ্যমে সঞ্চয় মানেই  
রাষ্ট্রের কল্যাণে সঞ্চয়



Estd. 1932

■ “পিয়ারলেস টীম” গড়ে উঠেছে  
জাতি ধর্ম নিবিশেষে ভারতের বিভিন্ন  
রাজ্যের সর্বশ্রেণীর মানুষকে নিয়ে।  
বস্তুতঃ, নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও তাদের  
মিলনসূত্র একটাই—সেটা হল  
আপামর জনসাধারণকে স্বল্প সঞ্চয়ে  
উদ্ধৃদ্ধ করে, সংগৃহীত অর্থ সরকারী  
তহবিলে নিয়োজিত করার মহান ব্রত।

■ পিয়ারলেস টীমকে তাদের কাজের  
মাধ্যমে স্বভাবতঃই নানা জাতি, নানা  
ভাষা-ভাষী ও বিবিধ সংস্কৃতির লোকের  
জীবনধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে  
আসতে হয়। সেই অপূর্ব ঘনিষ্ঠতা থেকে  
তারা সহজেই একজাতি-একপ্রাণ হয়ে যায়।

## দি পিয়ারলেস

### জেনারেল ফাইনান্স

গ্র্যান্ড ইন্ডেন্টমেন্ট কোং লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস : পিয়ারলেস ভবন,  
৩, এসপ্লানড ইন্ট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯



তাকি! দৃশ্যটা বাহরে কেমন দাঁকব রেখে বলল, 'আমাদের গল্পটার দাঁকব তাকালে চাঁদটা চোখে পড়ে। না?'

সুদীপ কিছু বলল না। সর্বাশী বলল, 'পাতার ওপর দিয়ে একটু, তাকাতো কি দিকে? কি, সেই?'

চাঁদ সেই? সর্বাশী এবার চাঁদের ওপর হাসি রেখে বলল, 'হিঃ, অত ভেব না। কপালের ওপর ডাকি পড়বে।'

ডাকি না।  
আমি ঘাবড়ি।

কী বোঝ? সুদীপ এবার তাকাল সর্বাশীর চোখে।  
কিন্তু আমি তো আর ভাল হব না।

সুদীপ উত্তর দিল না। তেমন সর্বাশীল চোখে, চলে, শরীরের ওপর বার বার চোখ ঝেঁলালে সর্বাশী বলল, 'আমি জানি, তুমি আমাকে দেখছ, আমার অস্থ চোখ ছুঁটার ওপর এখন তুমি তাকিয়ে আছ। না?'

না, সুদীপ দেখে না তুলে জবাব দিল।  
আছ। আমি ঘাবড়ি।

সুদীপ চোখ বোজাল। বজিয়ে কী যেন ডাবল।  
সর্বাশী আরো কাছে গলায় বলল, 'সেই তুমি ভাবছ।' এরপর সর্বাশীও বেন কী ডাবল। ভেবে বলল, 'আর তো কদিন। রততীর পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আর কি তুমি আসবে?'

সুদীপ চুপ করে থাকলে, সর্বাশী নিজের প্রশ্নের উত্তর যেন নিজাই দিয়ে দিল, বলল, 'কেনই বা আসবে, সেই আর আগের আমি আছি নাকি? সেই আগের সর্বাশী? নিয়াজিক তুমি মানতে না, আমিও না।'

সুদীপ চুপ করে থাকলে সর্বাশী বলল, 'তোমার মনে পড়ে সুদীপ, যেদিন আমরা ইটনিভার্সিটির গাছ ছাড়লাম, ঠিক তার পরের দিন আমরা একটা ট্রেনের জমরায় চেপে সারাদিন ঘুরেছিলাম।'

হ্যাঁ।  
স্টেশনে ট্রেন থামলেই তুমি তাকালি। একটা ভাল নামের স্টেশন পড়লে সেই স্টেশনে নামব আমরা।'

নামটা তুমিই পছন্দ করেছিলে, সুদীপ বলল।  
ঠিক। সর্বাশী উত্তর দিল। একটু ভেবে বলল, 'এমন একটা স্টেশনে নামব যে-স্টেশনের নামে তোমার নামের 'স' আর আমার নামের যে কোন অক্ষর রয়েছে। একটা আক্ষরিক খেলার ছলে আমরা পর পর স্টেশন পর হচ্ছিলাম। তুমি হলেছিলে তেমন স্টেশন না পেলে এই ট্রেনেই ফিরে আসব আবার। কিন্তু ঠিক পরের স্টেশনেই আমার ইচ্ছা পূর্ণ হল।'

আমরা নিয়ে পড়েছিলাম, একটু খেমে সুদীপ বলল।  
দেখে আমরা দু'জনে দু'জনের দেখেছিলাম, চোখ বজল সর্বাশী।

স্টেশন ছেড়ে আমরা উল্কাশহীন হেঁটেছিলাম, সুদীপ যোগ করল।  
আমরা একটা মঠের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলাম, সর্বাশী চোখ খলল এবার, দূরে আকাশ মিশে গেছে, দূর থেকে উড়তে উড়তে এক ঝক পাখি আসছিল।

ঠিক। সুদীপ বলল।  
'তুমি সেই মাঠে তাদের ছায়া খেঁজেছিলে। উত্তর দক্ষিণ, ডাইনে বাঁয়ে ছোটো ছোটো করেছিলে।'

সুদীপ কথা বলল না।  
সর্বাশী বলল, 'তোমার সেই চোখ, উদ্ভূত পাখির ঝাঁক, আকাশের শেষ বিন্দু, আমি চোখ বজালে ঠিক তেমন দেখতে পাই। সর্বাশী চোখ বজাল। আঁচল তুলে বলল, 'কিন্তু মাঠে গিয়েছিলে সুদীপ, সেই অশ্রু বিন্দু, দেখতে দেখতে নিজের চোখ বজিয়ে বলল, 'কেন শীত পড়েছে আজ। গায়ে শালটা জড়িয়ে বসে।' সুদীপ একটু সরে গিয়ে হেঁটে হয়ে গায়ে ওপর শালটা জড়িয়ে দিল। তারপর মথা হেঁটে করে বলল, 'আমি ঘাবড়ি, লজ হল।'

সুদীপ চলে গেলে সর্বাশী চোখ বন্ধ করে ডাবল, কী আশ্চর্য সূতের দিন ছিল ওসক। এক সঙ্গে পড়ত, একই কলেজে। সেই থেকে অলাপ। এই আলাপের সূত্র শেষে এসে দাঁড় করল একটা আশ্চর্য জগতে। অলাপ, গল্প, হাসি আর অভিমানের ভেতরে দিয়ে শেষে শেষ কথায়, এল ওরা। সুদীপ বলেছিল, 'তুমি কথা কিছ?'

সর্বাশী প্রথমে অবাক চেপে তাকিয়েছিল। রক্তের ভেতর কেমন একটা শিহরণ অনুভব করেছিল। তবু বলেছিল, 'কোন যেন উয় হয়। এক এক সময় যেন হয়, তুমি আমি পাশাপাশি হেঁটে চলেছি, কিন্তু দু'জনে অনেক। কেমন ভয় করে। আছ, কেন এমন হয় বলত?'

জানি না। গভীর গলার ওইটুকু ছোটো উত্তর দিয়েছিল সুদীপ। পক্ষপাতি বলেছিল, 'যত সব কাজে বিশেষ মজা তোমার ভিড় করে। যত দেরী করবে, ততই তোমার ভয় বাড়বে। আসলে তুমি আমাকে নাকচ করতে চাইছ।'

আই—  
'আমি জানি, সুদীপ অনযোগ্য এনেছিল গলায়।

জানো না। তারপর সুদীপের চোখে তাকিয়ে বলেছিল, 'আমার চোখের দিক তাকিয়েও তুমি বাকতে পার না? শেখ কথগুলো কেমন অস্পষ্ট, কেমন অনমানসিক হয়ে চোখের ওপর উঠে এসে সুদীপ আরো কাছে সর এসে বলেছিল, 'তা হল চলা মেয়েশ্বরী করে আসি। যাদের আগে বিয়ে হতে দেখে কি। ডবল মজা। অল্পের রসিকতা এনেছিল গলায়, 'কবে আবার কর হাত ধরে ফার ঘর

প্রবন্ধ ও আত্মজীবনী

রবীন্দ্রচন্দ্র আত্মজীবনের পথচক্র

অমিতাভ চৌধুরীর

কবি ও সম্যাসী

কবি রবীন্দ্রনাথ ও সম্যাসী বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত সম্পর্কের নানা তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে সম্ভবত প্রকাশিত গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ নিম্নোক্ত প্রায়। এই আলোচন সৃষ্টিকারী গ্রন্থের সঙ্গে সংযোজিত আরও আটটি প্রবন্ধ নিম্নোক্তেই সর্বশ্রেণীর পাঠকের আগ্রহ ও কৌতূহলের মীমাংসা করবে।

রবীন্দ্রনাথ ও সম্যাসী

পাগলা ফাইল

রবীন্দ্রনাথ ও সম্যাসী

পাগলা ফাইল

পাগলা ফাইল

পাগলা ফাইল

পাগলা ফাইল

প্রবন্ধ ও আত্মজীবনী

রবীন্দ্রচন্দ্র আত্মজীবনের পথচক্র

অমিতাভ চৌধুরীর

কবি ও সম্যাসী

কবি রবীন্দ্রনাথ ও সম্যাসী বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত সম্পর্কের নানা তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে সম্ভবত প্রকাশিত গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ নিম্নোক্ত প্রায়। এই আলোচন সৃষ্টিকারী গ্রন্থের সঙ্গে সংযোজিত আরও আটটি প্রবন্ধ নিম্নোক্তেই সর্বশ্রেণীর পাঠকের আগ্রহ ও কৌতূহলের মীমাংসা করবে।

রবীন্দ্রনাথ ও সম্যাসী

পাগলা ফাইল

রবীন্দ্রনাথ ও সম্যাসী

পাগলা ফাইল

পাগলা ফাইল

পাগলা ফাইল

পাগলা ফাইল

পাগলা ফাইল

পাগলা ফাইল

পাগলা ফাইল

পাগলা ফাইল

পাগলা ফাইল

পাগলা ফাইল

পাগলা ফাইল

পাগলা ফাইল

পাগলা ফাইল

পাগলা ফাইল

পাগলা ফাইল

পাগলা ফাইল

পাগলা ফাইল

পাগলা ফাইল

পাগলা ফাইল

পাগলা ফাইল

পাগলা ফাইল

পাগলা ফাইল

পাগলা ফাইল

পাগলা ফাইল

পাগলা ফাইল

মনোজ বসুর অমিত্যগের পটভূমিকায় তিনটি উপন্যাস

# সংগ্রাম

ভুলি নাই  
বিশের কেন্দ্র  
সৈনিক

২৫-

ভারতীয় বন্দোপাধ্যায়

ধাত্রী দেবতা ১৮-

হাসুলীবাঁকের উপকথা ২৫-

মানিক বন্দোপাধ্যায়

## চারটি উপন্যাস ১৫

ধরাবাঁধা জীবন/চিন্তামণি আদায়ের ইতিহাস/প্রতিবিম্ব

ছবি বন্দোপাধ্যায়ের রামায়ণ বই

ভারতীয় রান্না ৬- চাইনিজ রান্না ৭-

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

মনোজ বসু

কারল চ্যাপেক

শিলালিপি ১৬- নিশিকুটুম্ব ৩৬- চীট ৮-

গুরু বিশ্বাসের উপন্যাস

পিটার হারকোস

মতিন মিয়ার মরিফত ৪- সাইকিক ৭-

অভীশ বর্ধন সম্পাদিত

বিশ্ববিখ্যাত সায়েন্স ফিকশন ২৫-

ফেঙ্ক, আমেরিকা, ইংলিশ এবং রাশিয়ান সাহিত্য থেকে বিশ্ব-  
বিখ্যাত চারটি উপন্যাস ও তিনটি কাহিনীর অনুবাদ নিয়ে এই  
বিশ্ববিখ্যাত সায়েন্স ফিকশন প্রকাশিত হ'ল।

## ভৌতিক অন্ননিবাস

১৪-০০

প্রমোচন্দ্রের অরণীয় রচনা

পঞ্চ পরমেশ্বর ১৪-

আকাশ সেন

প্রথম আবিষ্কার ও

বিজ্ঞানের বিস্ময় ৮-

বিজ্ঞানের মজার খবর ৮-

ভারতীয় বন্দোপাধ্যায়

শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠ গল্প ১৫- শ্রেষ্ঠ গল্প ২৫-

কাবু শী

জুডো শিখুন ৫

ক্যারাটে শিখুন ৫



বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইং লিঃ ১৪ বক্সিং চাট্রফে ফ্লিট। কলি-৭৩

খবো তাই বদ হই?

কি?

‘তুমি আর আমি অনেক দূরে। আলো আর অন্ধকারের মত স্বপ্নান।’

তখনো ভাববো তুমি আছ।’ সুদীপ ঠিক গোছাল করে কথাগুলো কলতে পারছিল না। নিতান্ত দুঃখ আর ক্ষোভে বলেছিল, ‘ভাববো তুমি একদিন ছিলে।’ একটু খেমে সুদীপ আবার বলেছিল, ‘তোমার ভাববো নিয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দেব।’

‘এক এক সময় মনে হয় তুমি খুব দূরে সরে যাছ।’ সর্বাণী ওর আঙুল মটোর তুলে নিয়ে বলেছিল, ‘জানো, বন্ধন একলা বসে জ্বাক করে তখন ভাবিন কত হয়। ভাবিন যেন কামা পায়। আচ্ছা, কেনো এমন হয় কলতে পার?’

‘কিয়ং হলে সব সেরে যাবো।’ টাট্ট করেই সুদীপ।

‘আই—’

‘কি,’ সুদীপ উত্তর দিয়েছে।

‘এক এক সময় অশ্রুত অশ্রুত কল্পনীর আমাকে ঘিরে ধরে।’ সর্বাণী আঙুলে ছেড়ে দিয়ে বলেছিল, ‘জানো হুম তুমি আর আমি জ্বালি মুখোমুখি বসে গল্প করি। কখনো মনে হয়, আমি জ্বালি, তুমি শুনবে। তুমি ককবে, আমি রান্না, অভিজ্ঞান করব। আবার সাহায্য করবে তুমি।’

সর্বাণী নিজে নিজে চমকে উঠল একলা। এসব ভাবতে ভাবতে কোথার যেন ডুবছিল এতক্ষণ। চমক ভেঙে দেখল, ‘রততী দাঁড়িয়ে।’ তেমনি অনুমানে তার উপস্থিতি বুঝে নিয়ে সর্বাণী জ্বাল, ‘কি রে?’

‘রততী ঠিক পাশে বসল না। জানলার আরো কাছে সরে গিয়ে জানলার হেলান দিয়ে বাইরে তাকাল। কলল, ‘পাত কছর এখনি সময় তুই কিন্তু হাসপাতালে ছিল, শিফট।’

‘গলির মোড় পার হইরে একটা রিকশা নিয়েছিল সর্বাণী।’ কথা ছিল, সুদীপের সঙ্গে ম্যারেজ অফিসে গিয়ে ‘বনটিস’ দিয়ে আসবে দুজনে। দিন ঠিক করে আসবে। কাক পর হইরেই যেন ঝড়ের বেগে একটা লরি কোথা থেকে ছুটে এসে ওদের ধাক্কা দিল। ছিটকে পড়ল সর্বাণী। জখম হল রিকশাওয়ালা। সর্বাণী হাসপাতালে থেকে ফিরে এল বাড়িতে। তখনো ঝাপসা দেখতে পেত। আস্তে আস্তে আস্তে তাও মুছে গেলে শব্দ কলত সর্বাণী।

‘সুদীপ একদিন নিশ্চিতে রততীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, ‘আমার চোখ দুটো দান করে এলাম রততী। আই ব্যাচ্ছে।’ তুমি তো জান, সুদীপ বলেছিল, ‘মৃত্যুর পর চোখ গেলে তা দিয়ে ডাক্তাররা কলিয়া গ্রাফটিং করেন।’ এখনি অলখ হইরে যাওয়া অনেক তখন চোখে আবার দেখতে পার। তাই দানপত্র সেই করে এলাম হাসপাতালে।’

‘রততী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল সুদীপের সামনে। সুদীপ বলেছিল, ‘আমার যদি এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়, আমার চোখ দুটোর তোমার দিকি আবার চোখ ফিরে পাবে।’ একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এসেছিল তখন সুদীপের গলা দিয়ে।

‘চোখ তুলে কাইরে তাকিয়েছিল রততী।’ সুদীপ আঙুলের বুর্শে সামনে ঝুঁকি পড়া হইরে একটা তুল শেখনের দিক ঠেলে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ। রততী চোখ তুলতেই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সুদীপ। ‘কি খেল কলতে গিরেও কলতে পারাছিল না। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর বলেছিল, ‘পরিবর্তন আলো আবার নতুন করে দেখবে সর্বাণী।’ সুদীপের গলার স্বর কেমন অস্পষ্ট, কেমন বজ্জে আসছিল। ‘তবু কলল, ‘এই সুদী, চন্দ্র এই আকাশ, নক্ষত্র এই দিনরাত্রি সব আবার নতুন করে চোখের ওপর ভাসবে। শব্দ, আমি তখন থাকব না।’

‘রততী চোখ তুলতে পারাছিল না। সুদীপের চোখচোখ তাকাতে পারাছিল না। সুদীপ আকাশ দেখল।’ কিন্তু আকাশ চোখে পড়ে এখন থেকে। সীমাহীন পরিমণ্ডলে নিনিমে চোখে তাকল সুদীপ। বেশ কিছুক্ষণ চেটে কলতে কি যেন কলতে গিরেও খেমে গেল সুদীপ। গলার স্বর আবার তেমনি ঝুঁকি এল। নিশ্বাস দুততর হইছিল। যেন তা গোপন কলতে গিরে সুদীপ কাঁচি বসল। ‘মৃত্যুর পর আমার চোখ, অলখনের আলো হইক।’

‘রততীও যেন তাকাতে পারাছিল না। সাহস করে চোখ তুলতে পারাছিল না। সুদীপ আরো কিছুক্ষণ অনড় দাঁড়িয়ে থেকে বসল, ‘কাল থেকে আমি আর এ বাড়িতে আসব না রততী। সর্বাণীকে তুমি বল না।’

এবার তাকল রততী। সুদীপ চোখ নামিয়ে কলল, ‘জ্বলেই মনে হয়, সেই দুজনের নামের দুটি অক্ষর নিয়ে গড়া একটা সুন্দর স্টেশনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি।’ শব্দ গাড়িতে চড়ে গলতকে ফিরে যেতে তুলে গৌছ আমার।’ সুদীপ যেন কল নিল, বসল, ‘কি মনে হয় জান, রততী? যেন গোছাল মলান হইরে সন্ধ্যার আলো এসে পড়ল আমাদের চোখে। অলখকারে সব ঢেকে গেল। সে স্টেশনের নাম আরো চোখে পড়ে না। অলখকার, অলখকার।’ এ সব বুঝবে না, রততী।

সেই থেকে এই অভিনয়। এই হলকল। সুদীপকে টেনে আনতে হয় এ বাড়িতে। অভিনয় কলতে হয় রততীকে। তেমনি জানলা হেলান দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল এতক্ষণ। নিজের চোখ দুটো ঝাপসা হইরে এসে, রততী বসল, ‘আর কত অভিনয় করব দিকি?’ গলার স্বর বজ্জে আসছিল রততীর। দেখে হাত চাপ দিয়ে অস্পষ্ট গলার কলল, ‘আমি তো আর পুরষ নই?’

কোন জবাব দিল না সর্বাণী। সেতারে আঙুল ছুইরে শব্দ টং টং আওরজ তুলল।

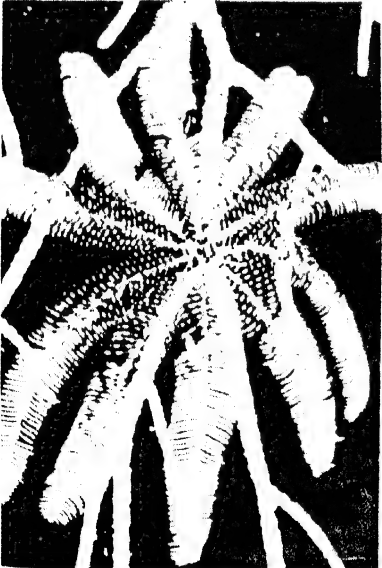
ছবি : সুদীপ সৈন

## বিজ্ঞান

### যে প্রাণী কোটি বছর পরেও এখনও প্রাণবন্ত

কে বলবে, ওরা প্রাণী? ডুবুরীর পোশাক এবং যন্ত্রপাতি নিয়ে কারিবিদ্যান সাগরের প্রায় তিন শ ফুট গভীরে নামার পর আমার মনে হলো, আমি যেন নন্দনকাননের সামনে এসে হাজির হয়েছি। আমার পাদের নিচে অজস্র শাখা-প্রশাখা। তাদের গায়ে বড় বড় অজস্র পালক; ফাঁকে ফাঁকে সমুদ্রের নিচের মাটির উপর দাঁড়িয়ে সরু সরু কান্ড। মাথায় ফুলের মত গুচ্ছ। কী বিচিত্র তাদের চেহারা! যেন অজ্ঞাত কোন শিল্পী বিচিত্র রঙ বুলিয়ে তাদের ধরে ধরে সাজিয়ে তৈরি করেছে স্বর্গীয় কানন। প্রথম অভিজ্ঞতা যাদের তাদের মনে হবে সমুদ্রের নিচে কী সুন্দর এক অরণ্যই না আবিষ্কার করেছেন। হ্যাঁ, অরণ্যই বটে। তবে এ অরণ্য উদ্ভিদের নয়। ওরা এক ধরনের প্রাণী। ওদের মোহিনী রূপ দেখে অনেকেই হয়ত মুগ্ধ হবেন। যেমন হয়েছি আমি। কিন্তু ওদের দেখে থেকে নিঃসৃত বিষ অনেক জলচর প্রাণীর কাছেও বিভাবিকার মত।—বছর কয়েক আগে সবক্ষেপে ওদের সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতার কথা এইভাবেই তুলে ধরেছিলেন জনৈক পুরা-জীববিজ্ঞানী (পেলিও-বাইওলজিস্ট)।

“আজ থেকে পঞ্চাশ কোটি বছর আগে থেকে শুরু করে পরবর্তী সাড়ে সাতাশ কোটি বছর পর্যন্ত গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের মত দেখতে এই সব প্রাণী পৃথিবীর ব্যাপক সমুদ্র-অঞ্চল যেন জমজমাট করে তুলেছিল। বংশবিস্তার করতে করতে এক সময় এদের সংখ্যা দারুণভাবে বেড়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর পর এদের জীবদেহ সমুদ্রের নিচে কোথাও কোথাও গড়ে তুলেছিল প্রায় একশ ফুট পুরু চুন পাথরের স্তর। প্রাচীন সমুদ্রের নিচে শত শত মাইল ছড়িয়ে থাকার পর ওই সব স্তর এখন বহু জায়গায় সমুদ্র তলের উপরেও মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এসেছে। তাদের মধ্যে ওই সব প্রাণীর পঁচ হাজারেরও বেশি প্রজাতির সম্মান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ইংরেজীতে এ সব প্রাণীদের বলা হয় ক্রাইনয়েড। জৈবিক বিবর্তনের বাধা পেরিয়ে সেই পাঁচ হাজার প্রজাতির মধ্যে মাত্র



সমুদ্রের গভীরে এখন ৪০০ বর্ষ প্রজাতির ক্রাইনয়েডের সম্মান দিয়েছেন প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা।



সবুজ ক্রাইনয়েড জলের স্রোতে ভালমান শিকার ধরার জন্যে প্রস্তুত।

দুটি গোষ্ঠী এখনও পর্যন্ত তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। প্রাণিবিজ্ঞানীদের কাছে যাদের পরিচয় সবুজ সমুদ্র-লিলি এবং অবন্ত ফেমার স্টার। এদের বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক কথাই আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু বিবর্তনের প্রতিবন্ধকতাকে অস্বীকার করে সবুজ সমুদ্রলিলি এবং অবন্ত ফেমার স্টার আজও পর্যন্ত কীভাবে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হলো সে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমায়িত। সম্প্রতি এই মন্তব্য করেছেন কিনসিসাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূত্বের অধ্যাপক ডেভিড এল মায়ার এবং হিউস্টনের একসোন প্রোডাকশন রিসার্চ কোম্পানির বিশেষজ্ঞ ডি ব্র্যাডফোর্ড ম্যাককুজা (জুনিয়র)।

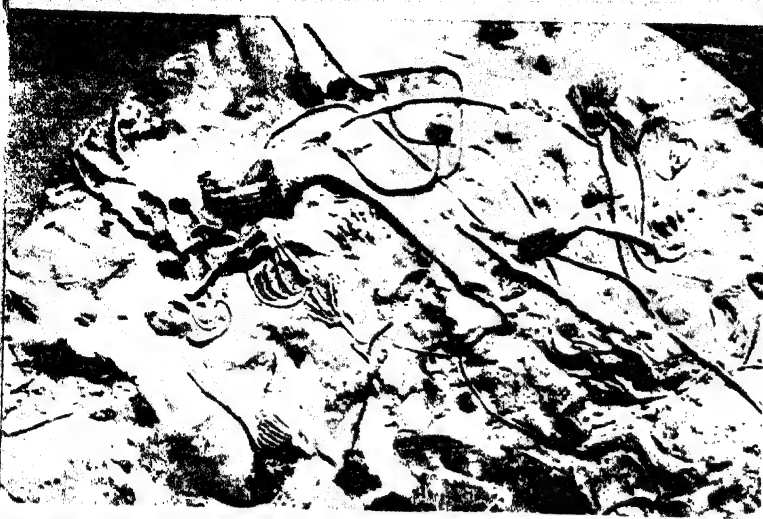
“এক সময় সব বৃক্ষ ক্রাইনয়েডেরই বৃন্ত ছিল। প্রায় কুড়ি কোটি বছর আগে ফেমার স্টার নামক তাদের একটি গোষ্ঠী তাদের দেহের বৃন্ত অংশগুলি হারাতে শুরু করে। পরিবর্তে তাদের বাহুর মত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিতে গড়ে উঠতে থাকে জটিল এক ধরনের পেশী। ফলে দেখা গেল, এক সময় যেখানে সবুজ ক্রাইনয়েডের ছিল ছড়াছড়ি এখন সেখানে সেই প্রাচীনতম পূর্বপুরুষদের সাক্ষ্য বহন করে জীবন্ত জীবদেহের মতো বোঁচ রয়েছে তাদের বেশির ভাগই বৃন্তহীন। আপাতত এ ধরনের প্রায় ৪৮টি প্রজাতির সম্মান পাওয়া গেছে।”

ফেমার স্টারের বাংলা পারিভাষ্য করলে হয়ত

কীভাবে পালক তারা। পৃথিবীর ব্যাপক সমুদ্র-অঞ্চল জুড়ে এদের বাসস্থান। উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর সমুদ্র, কর্কট এবং মকর ক্রান্তি এলাকা। যেখানে জোয়ার-ভাটার সঙ্গম, অথবা মহাসাগর কুড়ি হাজার ফুট গভীরে হাজার হাজার মাইল জুড়ে এরা ছড়িয়ে রয়েছে। তবে রকমারি বর্ষ দেখতে চান তা হলে আপনাকে যেতে হবে প্রবাল স্রষ্টা অধ্যুষিত এলাকার অথবা মহি-সোপানের যে স জায়গায় গভীরতা প্রায় তিন শ ফুটের মত, সেখানে।

তুলনায় সবুজ লিলির স্থান সংখ্যালঘুর মত। এ পর্যন্ত মাত্র চারশটির প্রজাতির সম্মান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তবে তাদের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষদের বহু চার শ এবং গঠনবৈচিত্র্য এখনও পর্যন্ত এদের মধ্যে বজায় রয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তিন শ ফুট গভীরে অল্পেই এদের বাসস্থান। কোন কোন জায়গায় সমুদ্রের প্রায় ছয় শ থেকে আট শ ফুট গভীরেও এদের দেখা যায়। সেখানে পালক তারের সঙ্গে অশুভ্রত এক সহ-অবস্থান করে এদের বেশে থাকতে দেখা গেছে।

সবুজ লিলিরা সমুদ্রের নিচে এখনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, দেখলে মনে হয় সঁজাই ওরা কেন এক একটি গাছ। এদের দেহের প্রধান অঙ্গটি দেখায় কান্ডের মত। সেই কান্ডের নিচে থাকে ধারাব মত প্রত্যঙ্গ। এই প্রত্যঙ্গই ওদের মাটির সঙ্গে আটকে রাখতে সাহায্য করে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ভূত্বের গরমে এইভাবে লেগে থাকার দরুন



খাদ্য কোর্সেই রন্ধন পায়নো জাইনরেডের বৈদ্যসম্মেলন লক্ষ করুন

মৃত্যু লিঙ্গের মধ্যেই কবিরি কেটে থাকতে র। শব্দের মধ্যে পড়লে আশ্রয়কার জন্যে নিরাপদ আরগার আশ্রয় নিতে পারে না। সমুদ্রের জল মাঝে মাঝে যখন বিক্ষুব্ধ হয়, তার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে। জামাইকার কাছাকাছি সমুদ্র-তটের উপরে যে কেউ দেখতে পাবেন হাজার হাজার সর্বস্ত লিঙ্গ এর জন্যেই অসহায়ের ত মৃত্যুবরণ করছে। ওদের সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ার ঠাণ্ডা একটা কারণ।

একিক দিয়ে দেখতে গেলে পালক তারারা নেকটা নিরাপদ। ওদের দেহে আছে বাহুর মত তপ্পা। প্রয়োজনে এই প্রত্যঙ্গর সহায়তায় ওরা তারি কেটে অথবা মাটির উপর হামাগুড়ি দিয়ে রোগের আরগার আশ্রয় নিতে পারে।

প্রবাল, স্পঞ্জ, প্রকৃতি প্রাণীর মত সমুদ্র লিঙ্গ

ওদের খাদ্য বলতে বুঝে খসে প্রাণী। এই সব প্রাণী পাল দিয়ে ভেসে বাওয়ার সময় ওই জাল কাঁধে ধরা পড়ে। তখন ওদের উদরস্থ করতে আর অনুবিধে হয় না। সমুদ্র জিঙ্গ এবং পালক তারা অমেরুদণ্ডী প্রাণী। তবু শিকার ধরার সময় যে তৎপরতা ওদের মধ্যে দেখা যায়, যে অশূন্য কৌশলের ওয়া আশ্রয় নেয়, যাঁরা তা দেখেন নি, তাঁরা কম্পনাও করতে পারবেন না।

অনেক পালক তারা খাবারের সময় স্রোতে গা ভাসিয়ে থাকটা পছন্দ করে। এই সময় তারা খাদ্য-আহরণকারী জালগুলি স্রোতের মধ্যে ধরে রাখে। কতকটা প্রাণী স্রোতের টানে দলে দলে পরিবাহিত হয়ে জালে এসে ধরা পড়লেই নিকেশ। আবার কোন কোন জাইনরেড জলের স্রোত একেবারেই পছন্দ করে না। সমুদ্রের নীচে ভূস্তরে থাকে অজস্র

কোন জাইনরেড জাবার শিকার। একবার স্রোতের দিকেই খাবারের সন্ধানে তারা প্রসারিত করে তাদের বাহু। দিনের দিকে গাটীরে নেয়। অশুভ এই ব্যাপারটি সম্পর্কে প্রথম খবর দিরেছিলেন ম্যাগনাস নামে জনৈক প্রকৃতিবিজ্ঞানী। এ ধরনের কৌশলটা তাঁর চেয়েই প্রাচুর্য ধরা পড়ছিল লোহিত সাগরের কয়েকটি অঞ্চলে। পরবর্তীকালে ক্যারিবিয়ান সাগর, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং ভারত মহাসাগরেও এ ধরনের ঘটনা অনেকেরই চোখে পড়েছে।

কোন কোন জাইনরেডের মধ্যে এই যে শিকার-চারিত্র, এর কারণ কী?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিরে প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা বলেছেন, খাদ্য সংগ্রহই হলত এর কারণ। বিশেষ প্রমাণিত ওই সব জাইনরেড হরত বিশেষ ধরনের খাবারে অভ্যস্ত। খাবার বলতে এখানে স্রাঙ্কটনের কথাই ধরা হচ্ছে। ক্রুর ক্রুর প্রাণী। খাদ্য একবার স্রোতের দিকেই সঞ্চিত হয়। স্রোতের দিকে চলাকোঁরা করে। তাই শিকার হিসেবে ওদের পেতে দেলে ওই সব জাইনরেডের স্রোতের দিকেই সঞ্চিত হতে হয়।

তা না হয় হলো। কিন্তু কোন কোন আরগার আরও একটি অশুভত কাপার লক্ষ করেছেন প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা। ওরা দেখেছেন, কখনও কখনও একই আরগার নুই প্রাণীর জাইনরেড দেখা যায়। কত বৃগ ধরে তারা পালাপাশি এক সন্ধ্যা বাস করে অসহে, সে খবর এখনও অজানা। কিন্তু মজার ব্যাপার এই, ওদের মধ্যে কয়েক প্রাণীর জাইনরেড শিরদাঁড় ধরেই আহার করে। ওদের শিকার ধরার বেন কোন বিরতিই নেই। অজ্ঞ ওদের পলাপাশি বাস করেও আরও কয়েক প্রাণীর জাইনরেড এই শিকার ধরার কাছাকাছি করে একসময় স্রোতের দিকে। দিনের দিকে ওরা নিজদের গাটীরে নেয়। পালাপাশি বাস করা সত্ত্বেও উত্তর প্রাণীর জাইনরেডের এই ভিন্ন আচরণ প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের কাছে আশ্চর্য পর্বত এক বড় রকমের মিজাস।

আরও একটি ব্যাপার। প্রখ্যাত মার্কিন প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিউবার্ট লিমান ব্রাক ১৯১৫ সালে তার একটি গবেষণা পত্রে আরও একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। বলা হয়, অস্ট্রেলিয়ার স্ট্রেট বেরিংয়ার রিফের উত্তরে টোরেস প্রমাণীতে কয়েক প্রাণীর পালক তারা দেখা যায়। বেশির ভাগ মাহ এদের এড়িয়ে চলে। ব্রাকের ধারণা, সম্ভবত ওই সব পালক তারার দেহ থেকে বিষ নিঃসৃত হয়। তাই আতঙ্কিত জনোই মছেরা ওই ধরনের আচরণ করে থাকে। ব্রাকের এই ধারণা যে সত্যিই, পরবর্তী-কালে তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। কিন্তু এমনও দেখা গেছে, কোন কোন মাহ ওই পালক-তারা খেয়ে বেড়তে থাকে। এটাই প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের কাছে একটি বড় রকমের প্রশ্ন।

সম্প্রতি জাইনরেড নিয়ে নানা কম গবেষণা চালাচ্ছেন প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা। ওদের দেহ থেকে নানা রকম রাসায়নিক যৌগ সংগ্রহ করেছেন তারা। এই সব যৌগের মধ্যে অনেকগুলি প্রচণ্ড বিষ। কিন্তু এই সব বিষ কোন কোন কটিন রোগের ক্ষেত্রে অবাধ নিরাময়ক হিসেবে কাজ করে। এছাড়া জৈব-বিবর্তনের কল-কৌশল জানার ব্যাপারেও তাঁরা যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করেছেন জাইনরেডের উপর পরীক্ষা চালিয়ে। তাঁদের বক্তব্য, আর থেকে কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে ছিল অগভীর সমুদ্র। আর সেই সময় জাইনরেডেরও ছিল জরজরকার। পরবর্তীকালে সমুদ্রের বহু আরগা গভীর হয়েছে। জাইনরেডও আঁড়বাকনের মাধ্যমে সেখানে গিরে আশ্রয় নিচ্ছে। নতুন এই পরিবেশে বিলুপ্ত হচ্ছে অনেক। অনেক প্রতি-কল পরিবেশের সঙ্গে নিজদের খাপ খাইয়ে এখনও টিকে রয়েছে। কীভাবে এটা সম্ভব হলো, তার সঠিক কারণ জানা গেলে জীবদের অনেক অজানা রহস্যই হজম আবার জায়েত পাবে।

সমসৃষ্টিও কর

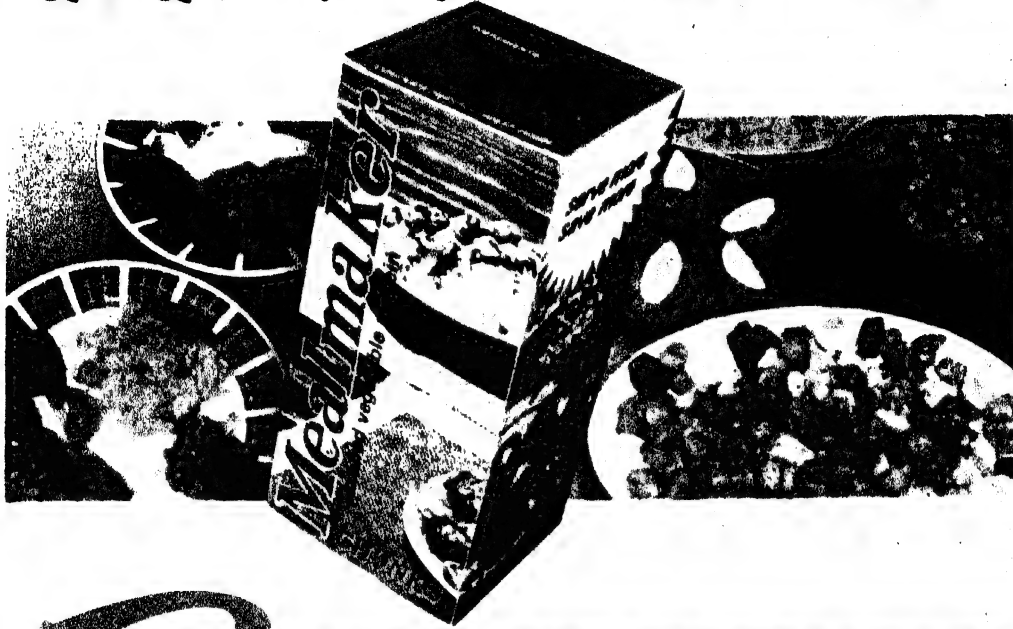


নটলের সঙ্গে দেখের প্রাক্কালে জাইনরেডের দেহে শিকারের আশ্রয় হওয়ার মত প্রত্যঙ্গগুলি কাটুরে রেখেছে অংশ প্রজাতি এই জাইনরেড

ক পালক তারা খাবার সংগ্রহের সময় কোন বাস্তবায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে না। অর্থাৎ খাবারের ত কোন প্রাণীর সন্ধান পেলেই মাহ অথবা অজানা প্রাণী যেমন সেই খাবারের দিকে ছুটে যায়, ছুটে গিয়ে আক্রমণ করে, এরা তা করে না। দারীক ঠিকের ধরন সোটা সম্ভবও নয়। এদের দেহে বড় বড় হাবাভ জায়গা হয়। অজানা দারীক হাবাভ পায়গা।

ফটল। অতিরিক্ত স্রোতের সময় ওই ফটলের মধ্যে তারা আশ্রয় নেয়। অথবা স্বাভাবিক অবস্থায় বলও করে ওই ফটলগুলির মধ্যে। খাবার সংগ্রহের সময় লেপন থেকে বাহুর মত প্রত্যঙ্গগুলি তারা ফটলের কাছেরে হেলে রাখে। সেই বাহুর স্পন্দ থেকে কীং, সেই কীংই ধরা পড়ে শিকার। অজ্ঞও একটি বজার ব্যাপার দেখা যায়। কোন

এক নতুন বাজার শিখে—  
জুস্বাদু বাজার পরিমাণ বাড়িয়ে ফেলুন!



# মিলমেকার

এইসব জুস্বাদু খাবার পরিমাণেও বাড়ায়  
আব গোস্টাইও করে।

মিলমেকার মিশিয়ে রোধে মার্টন ও তরিতরকারির পরিমাণ  
যথেষ্ট বাড়িয়ে ফেলুন ও পাতে পাতে পরিবেশন করুন—  
আর দেখুন, আপনার পরিবারের সকলে ভো. বটেই,  
সেইসঙ্গে নিম্নস্বাস্থ্যও কেমন মহানন্দে সেটি খান।  
আপনার খাবারের স্বাদে চমৎকার মিলে যায়  
মিলমেকার আপনার পছন্দসই জুস্বাদু খাবারের  
সাথে চমৎকার মিলেমিশে যায়।

**প্রোটিনের পুষ্টিগুণে ভরপুর**  
এটি পুষ্টিগুণে ভরপুর... ২৫০ গ্রাম  
মিলমেকারে ০.৯ লিটার দুধ বা  
১ কিলো মার্টন কিংবা ২৪টি ডিমের  
প্রোটিন পুষ্টিগুণ রয়েছে।

**১০০% নিরামিষ**  
মিলমেকার সয়া প্রোটিনের পুষ্টিগুণে  
ভরপুর। এটি পাওয়া যায়  
মোটা টুকরোয় ও দানা দার ধরনে।



## নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য

৪ টাকা ৫০ পয়সা—২৫০ গ্রাম—মোটা টুকরোর প্যাকে (স্থানীয়  
কর অতিরিক্ত) বাজার পর পরিমাণ ১ কিলোরও বেশী হয়।  
৩ টাকা ৭৫ পয়সা—২০০ গ্রাম—  
দানা দারের প্যাকে (স্থানীয় কর অতিরিক্ত)  
বাজার পর পরিমাণ প্রায় ১ কিলো হয়।



অল্প পরম মনজলে...  
১০ মিনিট ভিজতে  
দিন...



জল ঢেঁকে কেগুন...  
এবার শুকান্নে বাজার  
সঙ্গে মিশিয়ে রাখুন।



উৎপাদক:  
মাইসোর স্ন্যাক ফুডস লিমিটেড,  
১৯, প্রাইটফর্ম রোড, বাঙ্গালোর ৫৬০ ০২০



# কণ্টকলিত অতুলা ঘোষ

(নব পর্বত)

১১ ০৭ ১১

আবার বিতর্ক শুরু হয়েছে। এর আগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই রিলিফ সলোন্স ব্যাপারে কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্যের পশ্চিম-বঙ্গ সরকার ঠিকমত হিসাব দেননি, এই অভিযোগ করেছিলেন। এবারে বর্তমান কৃষিমন্ত্রী রাও বীণেশ্বর "পাশের পরিবর্তে কাছ" প্রকল্পে কেন্দ্র থেকে যে অর্থ সাহায্য হয়েছিল, তার ঠিকমত হিসাব পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ করেছেন। বর্তমানে কিছু দিন বন্ধ থাকলেও রাজ্যের অর্থমন্ত্রী শ্রীঅশোক মিত্র বহু মাস ধরে কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্য সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন। এইসব কাণ্ডারটাই জনসাধারণের কাছে গোলেলে ঠেকেছে। ভারতবর্ষের সংবিধান অনুযায়ী দু'পার্শ্বের রিলিফের কাজ একান্তভাবেই রাজ্যের দায়িত্ব। যেখানে ভারতবিভাগের জন্য লোক গৃহহারা বা দুর্গত হয়েছেন, সে রিলিফের দায়িত্ব Concurrent List-এ আছে। Concurrent List-এর ২৭ অনুচ্ছেদ আছে :

27. Relief and rehabilitation of persons displaced from their original place of residence by reason of the setting up of the Dominions of India and Pakistan.

অতএব সাধারণ রিলিফ নিয়ে কেন্দ্রের সাহায্যের কথা সর্ববিশেষ লেনা নেই। কিন্তু বন্যা, মহামারী, খরা, ভূমিকম্প প্রভৃতির সময়ে কেন্দ্র সাহায্য দিয়ে থাকেন এবং প্রচুর সাহায্য। সাধারণভাবেই এই প্রশ্ন মনে জাগে যে, তা হলে বিসংবাদ কেন? প্রকৃতপক্ষে কাজের পরিবর্তে খাদ্য তৈরি রিলিফের কাজে যেমন মানুষকে সাহায্য করা হয়, তেমনই শিশু-মহিলা রিলিফের কাজে যেমন পরনির্ভরতা আসে, তার থেকেও দুঃস্বপ্না মুক্তি পায়। রিলিফ যেমন সমাজজীবনে একান্ত প্রয়োজনীয়, সঙ্গে সঙ্গে তার একটা ব্যাপার দিকও আছে। যে মানুষ রিলিফ নেয়, তার সব সময়ে একটা স্প্যানিবেশ থাকে। ভিক্ষার না হলেও এ বেন নিজেদের অক্ষমতার জন্য অন্য লোকের দয়ায় জীবনধারণ করা ও পরিবার প্রতিপালন করা। এতে স্বাভাবিকভাবেই যারা রিলিফ নেয়, তাদের নিজেদের কাছে তাদের নিজেদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এবং তারা পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু কাজের পরিবর্তে খাদ্য প্রকল্পতে মানুষের মনোবল বাড়ে। সেইজন্যই এই সম্পর্কে দেয় অর্থ সবটাই খরচ করা উচিত এবং দেওয়া উচিত। এই নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই।

এমন অভিযোগ শোনা যাচ্ছে যে, রিলিফের জন্য যে টাকা কেন্দ্র থেকে এসেছে, তার কিছুটা অংশ অন্য খাতে খরচ হয়েছে। এ তো অকল্পনীয় ব্যাপার। কারণ, রিলিফ যে যতটা পাক, কেউ প্রয়োজনমত সবটা পায় না। সেইজন্য সেই খাতে থেকে টাকা কেটে নিয়ে অন্য খাতে সেই টাকা খরচ করা একটা মর্যাদাহীন অপরাধ। মনে রাখতে হবে যে, রিলিফ ব্যাপার পায়, তাদের মধ্যে অধিকাংশই সর্বহারা। বান্ধে ঘর বাড়ি যখন ভেঙে যায়, জমিদার যখন ভেঙ্গে পড়ে, তখন সেই গৃহহস্তের দাঁড়বার জায়গাও থাকে না, ভবিষ্যৎ বকেও কিছু থাকে না। কাজে কাজেই, তাদের জন্য দেওয়া অর্থ অন্য খাতে ছিড়িয়ে খরচ হতে পারে এটা ভাবাই মশাফিল। যদি কেন্দ্রের অভিযোগ সত্য হয় তা হলে এই অভিযোগের কোন উত্তর নেই।

রিলিফের ব্যাপার নিয়ে কোন বারদিসংবাদ একেবারেই শোভনীয় নয়। আর যেখানে রাজা সরকারের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব তাদের উচিত এ বিষয়ে সন্দেহভাজনভাবে কাজ করা। কারণ, তারা ট্রাস্টি। জনসাধারণ মধ্যমশ্রেণীর তহবিলে যে টাকা দিয়েছেন, সেইভাবে অন্যান্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য



করেছেন। একেবারেই রাজ্য সরকার হলেন ট্রাস্টি। ট্রাস্টির হিসাবে গণ্ডগোল করলে আমাদের দেশের জাইন অনুযায়ী তাঁরা দণ্ডনীয়। কিন্তু এখন তো আইনের কথা আসে না, আসে নৈতিক দায়িত্ব পালনের কথা। তার সঙ্গে দাঁড়াদের শৃঙ্খলাও একটা ভূত কথা। সেইজন্যই এই সম্পর্কে বিসংবাদে বৈশিষ্ট্য হতে হয়। বন্যা, খরা মহামারী, ভূ-বৃষ্টি, ভূমিকম্প—এসব তো লেগেই আছে এবং প্রতি বিপদেই রিলিফের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। জনসাধারণ যদি একবার মনে করেন যে, তাদের দেওয়া অর্থ ঠিকভাবে খরচ হচ্ছে না, তা হলে সেটা হবে রাজ্যের পক্ষে এক বিরাট দুর্বিপাক। একটা প্রচলিত কথা আছে যে, শৃঙ্খল সং হলেই চলবে না, জেটকে যাতে সং তাহে সেটাও দেখতে হবে। এ ক্ষেত্রে এই প্রবাদ বিশেষভাবে প্রযোজ্য। রিলিফের হিসাবের সঙ্গে অন্য কোন হিসাব জোড়া যায় না—এ হিসাব একেবারে স্বতন্ত্র। সেইজন্য রিলিফের টাকা অন্য কোন খাতে কিছুতেই খরচ করা যায় না, তা সে যতই প্রয়োজনীয় হোক। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবার নানা দুঃস্থ লোকের পেন্সনের ব্যবস্থা করেছেন। তাতে অনেক খরচ হয়েছে, কিন্তু সেই অনুপাতে আর দুঃস্থ হযনি। কাজটা নিশ্চয়ই ভাল; কিন্তু আর না বাড়িয়ে খরচ বাড়ালে টাকাটা (?) কোথা থেকে আসবে? রিলিফের টাকা যদি এই খাতে যায় হয়ে থাকে, তা হলে সেটা অমাজনীয় অপরাধ। হিসাববিশেষজ্ঞদের মতে; এক খাতের (Head) টাকা অন্য খাতে খরচ করা অপরাধ। কিন্তু রিলিফের টাকা যদি অন্য খাতে গিয়ে থাকে, তা হলে সেটা সাধারণ অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে না। সামগ্রিক আয় ও সামগ্রিক ব্যয়ের হিসাব চরমতো মেলানো যায়, কিন্তু তাকে হিসাব বলে না।

একটা ট্রাস্ট তহবিলে অনায়াসেই করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তো দেখাতেই পারেন যে, কেন্দ্র কোন কোন খাতে রিলিফের জন্য কত টাকা দিয়েছেন এবং সেই টাকা কিভাবে খরচ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারেরও তো জানাতে কোন অসুবিধা নেই যে, রিলিফ ব্যাপারে কোন কোন খাতে কত টাকা দিয়েছেন এবং সে টাকার হিসাব কতটা স্পষ্ট হয়েছে। সবটাই যেন স্বাভাবিক লঘুভাবে হচ্ছে। রিলিফের সাহায্যের উপর বহু লোকের জীবন-মরণ নির্ভর করে; তা নিয়ে তো লঘুভাবে আলোচনা করা যায় না। একটা কথা বুঝতে হবে অসুবিধে হচ্ছে যে এ নিয়ে বিসংবাদের স্থান কোথায়। এ তো কোন কৌশলগত বা নীতিগত ব্যাপার নয়, এ অতি স্বাভাবিক প্রশাসনিক কাজ।

যদি সরকারে আছেন, তারা যে দলভুক্ত সেই দলের নীতি ও আদর্শ প্রচার করার সম্পূর্ণ অধিকার তাদের আছে। কিন্তু রিলিফের ব্যাপারে দলদলীয় লক্ষ্য স্থান নেই, আর আদর্শ প্রচারেরও কোন স্থান নেই। তবে বিসংবাদ কেন? তা হলে কি কেন্দ্রীয় সরকার কোন বিশেষ মনোভাব নিয়ে এইসব সমালোচনা করছেন? তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের লাভ কি? আর কেন্দ্রীয় সরকার খাই করুন, রাজ্য সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য অতি পরিষ্কার। তাদের এই হিসাব দেখাতেই হবে এবং আরও দেখাতে হবে যে, যে খাতে যে টাকা দেওয়া হয়েছে, তার বাইরে কোন খরচ হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার সম্বন্ধে পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের মনোভাব খুব পরিষ্কার নয়। কখনো তারা বলেন যে, কেন্দ্রের সরকারী দল শৈবরাচারী। আবার সেদিন মধ্যমশ্রেণী বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার কতক অহেতুক কোন হস্তক্ষেপের আশঙ্কা নেই। এই যে পরস্পরবিরোধী কথা, এ বন্ধ হবে কবে? যে দল কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করছেন, সেই দল সম্বন্ধে এবং কেন্দ্রীয় সরকার সম্বন্ধে এখানকার সরকারপক্ষীয় দল এবং সরকারের অধিক দায়িত্বশীল মহতী বহু আলোচনা ও অসংশত উক্তি প্রায়ই করে থাকেন। কিন্তু তাদের কোন অপরাধ এখনও প্রমাণ হয়নি। এ কি একটা বিরুদ্ধ আহ্বানও নীতি করে তাকে জীয়ে রাখার জন্য? শোনা যায় যে, পাকিস্তানে এখন কোন বিপদ ঘনিষ্ঠে আসতে, তখন তারা হমাগত ভারতবর্ষের বিপদ বিষোপায় করত, যাতে পাকিস্তানী অধিবাসী নিজেদের ঘরোয়া বিশৃঙ্খলা ভুলে গিয়ে ভারত-বিস্ফোরের দিকে অধিকতর আগ্রহী হয়। ব্যাপারটা মনস্তাত্ত্বিক। অর্থাৎ নিজেদের অক্ষমতা; ঢাকবার জন্য কাঁটকে একটা শত্রু, খাড়া পেরে তার বিষমুখে বিস্ময় প্রচার, যাতে জনসাধারণ বিবেকজর্জর হয়ে দেশের প্রকৃত সমস্যা থেকে মন সরিয়ে নিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এভাবে দেশের লোককে বিভ্রান্ত করার কোন প্রয়োজন নেই। তারা বহু সংখ্যাধিকার নিয়ে সরকারে এসেছেন, ঘরের মধ্যে তাদের এসব বিপত্তি থাকা উচিত নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, তা হলে কেন? এই কেন? উত্তর দেওয়া অত্যন্ত কঠিন।

কিছু কিছু লোক বলেন, পশ্চিমবঙ্গ এখন বঙ্গীয় সরকারে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তারা বহু বছর বিরোধী দলে ছিলেন। বিরোধী দলে থেকে বিরোধিতায় তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বিরোধিতার অভ্যাস তার ছাড়তে পারছেন না। পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীনতার আগের এইসব পরম্পরাবিরোধী মনোভাব দেখতে পাওয়া যায় মাত্র তখন যেমন দৃঢ়তা

আছে, ডের্মিন তিন শান্ত ও শির। শোনা যাচ্ছে, তিনি শান্ত ও শির বলেই তাঁর দলের অনেককেই তাঁর প্রতি বিমূগ্ধ। এমন কি, কোন কোন প্রবীণ নেতা তাঁকে সারিয়ে অন্য কাউকে মুখামম্বী করার কথাও ভাবছেন। এইসব অভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্যই কি কেন্দ্রের প্রতি বিশেষ জাগ্রার জোটা হচ্ছে? সরকারী দলের খনিষ্ঠ মহল এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারেন, এ আলোচনা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এটা ঠিক যে, কেন্দ্রের সঙ্গে অহেতুক বিবাদ বাড়ানো পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ক্ষতিকর হবে এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্য-মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তাঁর দলের কোন কোন অংশের বিরূপাচরণ তাঁর দল এক পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশের কারণ হবে। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চল জ্বলছে। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ জনগণেরা, চুরি-ডাকাতি আছে, কিন্তু প্রাদেশিক উত্তেজনা নেই। এটা পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষের যে-কোন প্রান্তের যে-কোন অধিবাসী এসে পশ্চিম-বঙ্গে বসবাস করছে, বুজি-রোজগারও করছে, কিন্তু তাদের প্রতি কর্তার বিশেষণও নেই, বিরূপাচরণও নেই। প্রাদেশিকতার সর্বনাশা কল্পে সম্বন্ধে পশ্চিম-বঙ্গবাসীরা যেমন সচেতন, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও ডের্মিন সমাগ। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অনেক জারগার কলভা-ভাষীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমবঙ্গবাসীরা তাদের জন্য ক্রুদ্ধ, রাগান্বিত ও দুঃখিত। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত দিয়ে পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের বহু আত্ম নরনারী পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করছে। তাদের দুঃখকষ্টের অবধি নেই। তত লোক গৃহহারা, ক্ষতজন স্বামীহারা, পুত্রহারা, মা-হারা হলেছেন তাঁর কোন সঠিক সংখ্যা এখনও জানা যায় নি। তবে অনেকে যে হয়েছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এইসব ঘর থেকে উৎসাদিত গৃহহারা মানবজাতির



পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা সামরে গ্রহণ করে তাদের স্বাধীনতা ব্যবস্থা করছে। কিন্তু এর জন্য উত্তেজনার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এর জন্য দুঃখ আছে, রাগা আছে, বেদনা আছে; কিন্তু উত্তেজনা নেই। পশ্চিমবঙ্গের অনেক দারিদ্র্যবাহী নাগরিকের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও এ বিষয়ে সচেতন হাতে কোন উত্তেজনা না হয়।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের যা অবস্থা তাতে কারো মধ্যে বিরোধ হলে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতি হবে—কেন্দ্রের সঙ্গে বিরোধ হলে তো হবেই। সেজন্য

সংঘর্ষের একান্ত প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, কেন্দ্রের মধ্যে ব্যবহারের মাঝে মাঝে সংঘর্ষের আভাষ দেখা যাচ্ছে। বিরোধ যে শব্দ অনুচিত তা নয়—কর্তৃত্বও। বেশ তো কেন্দ্র যদি কোন অনায়স করে, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের উপর তার ক্রোধ করার ভার ছেড়ে দেওয়া হোক না; নিজেরা ভগ্নপন্ন হয়ে বিরোধ ছাটার প্রয়োজন কী? কেন্দ্র যে দল সরকার পরিচালনা করছেন, সে দল সত্যিই যদি শৈবরাচারী জন তা হলে সেটা তো প্রকাশ পাবে। শাসনকার্যে আসার পর থেকে কি কি শৈবরাচার ত্যাগ করেছেন, তার দৃষ্টান্ত মাঝে মাঝে দিলেই তো হয়। কেবল-মাত্র 'শৈবরাচারী' ও 'শৈবরাচারী' বলে লাভ কি? ভারতবর্ষের জনসাধারণ তো একবার দাঁতেরেই দিলেই যে, তারা শৈবরাচার ও শৈবরাচার সহ্য করবে না। অতএব এতে ব্যস্ততা কেন? আর অতীত ইতিহাস যদি দেখা যায়, তা হলে কোন দলই যোগ্য ভূলসীপাতা নয়। ভারতবর্ষের বহু প্রতিষ্ঠাবান রাজনৈতিক দলেরই সুবিধানবিরোধী কাজ করার অনেক নমুনা আছে। সেইজন্য অতীতের ধর্ম্য টেনে এনে বর্তমানকে বিপর্যস্ত করে কারোই লাভ হবে না। বর্তমান রাজ্য সরকার তাদেরও বৃক ফুলিরে পোয়া হয়ে দাঁড়িয়ে বিশেষ কিছু করার কৃতিত্ব তাঁরা প্রদান করেন নি। ফলে জল নেই, একটা নোটস দিয়েই দাঁড়িয়ে শেষ। কিন্তু একটা নোটস পেলেই মানুষের প্রাত্যহিক কাজকর্মের জন্য যে জলের ঘরকার, তার অভাব কি পূরণ হবে? এরকম ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যার কথা দিয়ে অকমণ্যতা, অক্ষমতা ও অসহায়তা ফুটে উঠছে। এর প্রত্যেক-টারই কৈফিয়ত নিশ্চয়ই আছে এবং অনেক কৈফিয়ত সংগত বটে। কিন্তু তাতে তো সাধারণের দুঃখ-দুঃশা দূর হবে না—যে দুঃখ দূর করতে এই সরকার প্রতিলুপ্তিকণ। সেইজন্যই বিরোধের মনোভাব পরিচালনা করাই বাঞ্ছনীয়।



**একদিন আমার খোকন সোতা নামকরা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে!**

**কনিষ্ঠদের সেই দিনের কাজ আজই শুরু করুন। স্টেট ব্যাংক আমাদের কাছে আজই চলে আসুন।**

এটা তো বুঝি স্বাভাবিক, যে প্রত্যেক বাপ-মায়ী আশঙ্কায় সন্তানের উজ্জল ভবিষ্যতের কথা ভাবেন। কিন্তু তাঁরা জানেন না, যে সময় কন্যার পাখার জন্য হলে কোথা দিয়ে উড়ে যায়। শিক্ষণ পূর্ণশিক্ষিত ও টেকসই পরিচালনার অভাবে আমাদের কত গরু বাতর বৃশ নিতে পারেন না। স্টেট ব্যাংক আমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি শরকে সার্থক করে তোলার জন্যে নানান যোজনা গ্রহণ করে রেখেছে।

- আমাদের—স্টেটস জ্যাকউট (সস্তা খাতা)।
- কিন্তু ডিপোজিট (ঘরানাী কমা)।
- কোয়ার ডিপোজিট (সম-পূজিত কমা)।
- ইউনিকভেরেট প্রদান (পুণি-নিয়ন্ত্রণ যোজনা)।
- স্টেট-নিয়ন্ত্রণ (সম-পূজিত কমা)।
- কনতা ডিপোজিট (কনতা কমা)।
- এবং রাইনব্রস জ্যাকউট (নোবালকদের জন্য সস্তা খাতা)।
- আরও বিভ্রান্তিকর কমা আমদানি নিবর্তন স্টেট জ্যাকউট আফিসে চলে আসুন।
- ৫,২০০ রত আর্থিক আফিসের ভিতরে বৃহত্তম ব্যাংক।



CHAITRA-SBI-626-BEN



প্রত্যেক নতুন নতুন  
 শৈলীফ্যাশনের জগতে  
 ফণ আনোড়ন!  
 মাদের ৮০ বর্ষেরও  
 ধিক কলার  
 উজ্জ্বল ষ্ট নিত্য  
 র জগতের সাজে  
 প্রস্তুত করব



গ্যাপার্ড



সুবার্ট

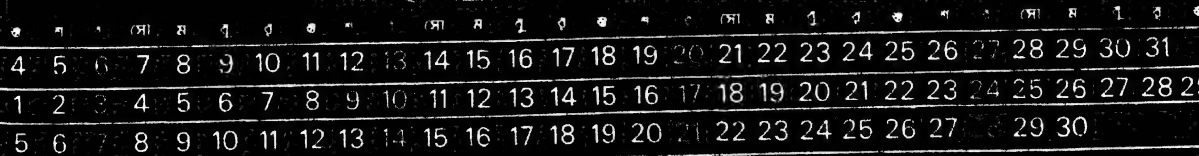


মফতলাল

এই সব চাপলাকার নতুন  
 ফ্যাশন আপনার জগতে তৈরী:  
 সিলেকশন  
 গোল্ড ক্রেফ্ট  
 স্টিস  
 শেরিফ  
 শাটস  
 কটো প্রিন্সেস কবিয়া

	সা	ম
80 জুলাই		1
80 আগস্ট	3	
80 নভেম্বর	1	2

# স্ট্রটবোড্‌ প্রেস



# ফ্যাশনের রাজ্যে নিত্য



# মানবজমিন

## শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

৯ অক্টোবর ৯৯

কুঠে সামস্তর বাড়িটা এখন রোদে হাওয়ার হাসছে। বাড়ির দাঁত নেই সে হাসবে। তবু কেন বেন ঠিক তাই মনে হয় নিজাইয়ের। চলে ক্ষু, মাটির দেয়ালগুলোয় নতুন পলেশতারা, উঠানের দাঁড়তে একটা আঁকটা শাড়ি কাপড় টাঙানো, বড় সুখের চেহারা বাড়িটার। রান্নাঘর থেকে রোজ খেঁচিও ওঠে।

সকালের দিকটার প্রদানই নিতাই এসে বাইরে থেকে হাঁক দেয়, কই গো।

কুঠে সামস্তর বউ এ সময়ে বাড়ি থাকে না। ধানকল যায়। জে তার খোঁজে আসেও না নিতাই। বার খোঁজে আসে সে ভাইবোন সামলে, রান্না চাপিয়ে ভারী ব্যস্ত। তবু একটু হাসিপানা মুখ করে বেরিয়ে এসে বসে, এসে নিতাইনা।

দাদা ডাকটা নিতাই নিজেই শিখিয়েছে। প্রথমটার ককা ডাকতে লেগেছিল। সে ডাকটা নিতাই পছন্দ করেনি।

জীবনটির পেটলা পাশে রেখে নিতাই উঠানে শাঁতের রেদে ঠাণ্ডা মেলে বসে যায়। জটার বা শুকোলেও উকুনের উপপাত কস্ট হয়েছে। খাবলে মাথা চুলকোতে চুলকোতে নিতাই সব খোঁজ-খবর লয়, কী রান্না হচ্ছে? কেমন আছে সবাই? তারপর নিতাই নিজের কথা পেড়ে ফেলে, কালও এসেছিল ন-পাড়া থেকে একদল। বলে মন্ত দাও। কলা মুলেটা চালা চাল ভাল সাহায্য প্রমাণ এনে ফেলছে। আমি বলি কি, মস্ত দেওয়া কি মথের কথা! নিলেই হলো? নিলেই হল? বাও গিয়ে তিন দিন হবিষা করো, মন পবিত্র করো, কালীর থানে পুজো চড়াও, তারপর দেখা যাবে। তা কে শোনে কার কথা! পা দুখানা ঠিক ধরল।

বিনি, অর্থাৎ কুঠে সামস্তর ডাগর মেয়েটি, এ সব কথার অর্থ বোঝে। নিতাই টোপ ফেলছে। ফিক করে হেসে বলে, জটা বড় বিচ্ছিন্ন। ও নিতাইনা, জটা ছাড়া তান্ত্রিক হওয়া যায় না?

নিতাইয়ের মুখ বেজার হয়। জটা ছাড়া তান্ত্রিক হয় কিনা তা সে ভাল জানে না। তবে এটা জানে যে জটা ছাড়া বাবসা হয় না। জটা রক্তাশ্রব রক্তাক্ত বিশলে, রক্ত চক্ষু এ সব না হলে মানুষ ভুড়কাবে কেন? আর না ভুড়কালে মাথাই বা নোয়ড়ে যাবে কেন? তাই সে বলে, তা হয়। তবে কিনা আমার জটার অনেক গুণ। স্বয়ং মা গংগা এই জটার সঙ্গে সর্পিণ্ডে রয়েছে। কভার নিজে গংগাঙ্গল বের

করেছি। তা ছাড়া জটার চুল নিয়ে গিয়ে অনেকে কবচ করে। একগাছা চুল দশ পরস।

বলো কি? বলে হাঁ করে থাকে বিনি। আর জটা ছটিবার কথা মথেরও আনে না।

নিতাই হাতধরনের মতো মাথা নেড়ে বলে, তান্ত্রিকরা যদি পরস চার তবে টাকার বৃষ্টি করে দিতে পারে। তবে কিনা পরসাকড়ির কথা আমরা ভাবি না, এই যা।

আমাকে একদিন টাকার বৃষ্টি দেখাবে। দেখাবেন। তবে পুঁচনের সামনে নয়। ভারী গৃহ্য সাধনার ব্যাপার তো।

মেয়েটার বিস্মিত মুখের দিকে চেয়েই নিতাই টের পায়। জমছে। খেলা জমছে। কিন্তু জমে লাভ কি? বউদিয়ার যদি টের পায় তবে বাড়ি থেকে তাড়াবে। আর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে নিতাইয়ের ঠাই জুঁতে কোথায়? সাতা বটে তার নামেও বউদি দশ বিঘে জমি কিনেছে, কিন্তু সে জমি কোথায় তা নিতাই জানে না, দলিলটাও চোখে ঘেঁষেনি। সে জমির নাগালও সে কোনোদিন পাবে না। তা হলে তার নিজের বসতে রইল কি? বউ নিয়ে উঠবে কোথায়? খাওয়ারবেই বা কোন কাচকলা?

তোমার বউ কেন পালিয়েছিল গো, নিতাইনা? তুমি তো লোক খারাপ নও! মা বলে, নিতাইবাবুর মনটা বড় ভাল।

সেটা আর সে বুকল কই বলো? মড়ার খুলি দেখে ভর পেল কিনা। তল-সাধনার গৃহ্য কথা কি মেয়েরা বোঝে?

বিনি চোখ কপালে তুলে বলে, ওমা! বউ থাকতে তুমি তান্ত্রিক হয়েছিলে নাকি? লোকে তো বলে, বউ পালানোর পর হয়েছো!

নিতাই ধরা পড়েও হাবড়ার না। অজ্ঞান দিলে নাড়ি অঁচড়তে অঁচড়তে বলে, পুরোপুরি ছিলাম না বটে। তবে একটু আঘট, নাড়াচাড়া করতাম।

তোমার সেই বউ খুব সুন্দরী ছিল? ছিল এক রকম। নাকটা চাপা। তা ছাড়া ভালই।

নাক জো আমারও চাপা। তোমার? যাঃ। তোমার বলে টিকোলে, নাক! এই সব আগড়ম্ব আগড়ম্ব বকতে বকতে বেলা চড়ে। নিতাই জানে, কৌশল্য সঙ্গে বিনি খেতে বলবে। সেটা ঠিক হবে না। গরীব মানুষ, একটা বাড়তি লোককে খাওয়াতে এদের যে কত কষ্ট হয়। তা ছাড়া খায়ই বা কি? কচু ঘেঁচু আর পাতা সেখ, একটু লক আর লক্ষা। তাই নিতাই এসে না। উঠে পড়ে।

বিনি খানিকটা এগিয়ে দিয়ে বলে, আবার এসে। তুমি এলে ভারী ভাল লাগে।

একদিন দুপুরে সামস্তর বাড়ি থেকে ফেরার পরে রঘু সাক্ষাৎ ডেকে বলল চা খাবি না কি?

বহুকাল রঘু সাক্ষর সঙ্গে দেখা নেই। একবার খামোখা খুব কামেলায় পড়েছিল। সেই থেকে আর ও-পথ মন্ডার না। তবে কেউ ডাকলে না গিয়েও পারে না নিতাই।

রঘুর নতুন বাড়ির দাওয়ার বসে বলল, খুব টাকার হয়েছে তোমার দেখছি।

রঘুর মৃৎখানায় চেহারা ভাল না। হাসি নেই, গোমরা পানা। একটা বাটিতে আঁশে সোনা জ্বাল দিচ্ছে কাঠ কয়লার আঁকরা। গবেষ কাশি আসে, পেট গুল্মার।

রঘু বাড়িটা নামিয়ে রেখে কছে এসে বসে

বলল, খবর টের সব শুনিয়েছ? কি শুনবে? সন্দেহের চেয়ে চার নিতাই। ও বাড়ির খবর। চাটুজ্ঞানবাড়ির। খবর তো কিছু নেই। শব্দ বড়দিনিয়ার বিয়ে হবে শুনিয়েছি। তা সে এখনও নয়। এলাহা বামে।

ও খবর নয়। শ্রীনাথ চাটুজ্ঞান যে আবার মাইফেলে আছে, সে খবর শুনিয়েছ? ওঃ। সে তো নতুন কিছু নয়।

শ্রীনাথের ছেলোটা তো খুব উঠেছে দেখছি। সন্তলখোকা? সে আবার উঠবে কি? উঠবে কি? বলে মৃৎ জেগার রঘু, আলিসান চেহারা হয়েছে। ডাক্তার টাকাত হবে বড় হলে। ডের্মন হাড় হরিমজালা।

সন্তলখোকা আবার তোমার কি করল? দিক্ত সোদিনই ঠাণ্ডা ভেঙে। নেহাৎ ফেলে মানুষ, তা ছাড়া কাপটাও সামনে রয়েছে। কিছু বলিনি। কিছু সাবধান করে দিল। এর পর বাদরাম করলে পুঁতে ফেলব।

নিতাই হাসে জড়পানি দেখে। মাথা নেড়ে বলে, বাস কস, অত লাফও না। সবাই কি আর নিতাইকাপা? কেড়ে কাশো জে বাপ কাপারটা শুনি আছে।

রঘু রক্ত চোখে চেয়ে বলে, ইঃ, কে আমার সালিশী এলেন। ঠেকে বলতে হবে।

তা খাওয়ারবে বলিয়েছে যে! রঘু উঠে গিয়ে বাড়িটা আবার নেচেচেড়ে দেখে। আলিডটা সাবধানে আন একটা পত্রে চেলে দিয়ে উঠে আসে। বলে, চা চা করে গলা শুকিয়েছিল কেন? বলাই বখন হবে।

জো কথাটা কি? কাউকে বলবি না? কার দিকি কাউতে বলো, কাউই। মা কালীর। মা কালীর দিবা। তার দিবার কোনো নাম নেই। তবু বলছি, শ্রীনাথবাবুকে রামলাখনের ছেলে আমি নিয়ে থেকে নিয়ে বহিনি। তাই নাকি? মাইরি।

নিজ থেকে নাওনি, তবে কি বাবু নিজেই গেল?

তাও নয়। গৃহ্য কথাটা কি? মাসটাক আগে ভটভটিয়া চেপে শ্রীনাথের শালা সরিৎ এগুণ দিয়ে বাড়িল। আমি নারকোল গাছের গোড়ায় নুন দিচ্ছিলাম। দেখে ভটভটিয়া খামিরে নেমে এসে অনেক আগড়ম্ব আগড়ম্ব কথা পাড়ল। ছোকরাকে আমার পছন্দ, তবে মস্তান বলে কথা। খাতির রাখতে হয়। শৈক্সেব বলে ফেলল, জামাইবাবুর অবস্থা তো জানেন। কেমন-তরো পাগল পাগলা ভাব। ডাক্তার কলছে, আগের সব অভ্যাস হঠাৎ ছেড়ে দেওয়ার এরকমটা হয়েছে। তা আবার একটু ফুঁতুর্-তুঁতুঁ করলে সেরে যাবে। চিকিৎসাই একরকম।

জাই কটে। চোখ কপালে তেলে নিতাই। বললে কিন্তু কেউ কেলব, নিতাই। কালীর দিবা করেছি। নিশ্চিন্তে বলো। কথা এটুকুই। বলল, জামাইবাবুকে মাঝে মাঝে ডেকে নিয়ে যাবেন। তবে কেউ বেন টের না পায়। তুমি রান্না হলে? রান্না না হয়ে উপায়? রান্না ঘারে, রান্নাও ঘারে যে।

কউদি যদি জানতে পারে? সে কথাও তুললাম। চোখ টিপে কলল, জামাখের পরামর্শ তো, বেকারি কিছু মনে করবে না। তখনই বহুকাল, চাটুজ্ঞানবাড়ির সন্ন আছে।



অন্ন জেমাতে কিছ, দিল টিল ?  
না, কী দেবে ?  
কিছই না ?  
মতো খাবি কিছ, নিতাই।  
নিতাই হেসে বলল, সাধু সেজো না। কদিন  
আগে একজোটা বালা ভেঙে রতনচুড় করতে ধেরনি  
এটাই তোমাকে ?  
সে কি হবে ?

জান্ন তে কি ? ও বাড়ির গরনা করে  
কলকাতার সাক্ষরার। জোয়ার মতো হাতাতে সোনার  
ধেনকে কে পেঁছে যে ?

হ তাহলে চা পাবি না।  
তাহলে কখনোও গোপিন থাকবে না।  
হা কালার দিদি কাটালি যে।  
তুমিও তো চা খাওমাবে বলে ডেকেছিলে।  
রেখেছো সে কথা ?

চা হবে যে বাপ, কখনো ওভাবে ধরিননি।  
হাল ছাড়া, কথা যেভাবে ধরতে বলবে  
সেভাবেই ধরব।

ধরাধারি কিছ, নেই। শ্রীনাথবাবু এখন আবার  
একটু ফুর্তি করার জন্য আকুপকু। বেচারার জন্য  
কন্টও হয়। কিন্তু এ কলকাতক ছেলেরাও ভর  
পাই। সেদিন রমলাখনের ঘরে ঢুকে লক্ষ্যকান্ড  
করে এসেছে। ওকে একটু বুকিয়ে কলবি যে,  
দোষটা আমার নয়।

দোষটা কার ঘাড়ে চাপান দেবো তাহলে ?  
ডাক্তারের ঘাড়। বলবি ডাক্তার বলেছে।  
ও ছেলে অত সহজে ভুলবার নয়।  
অবে ভাবি ভুলবে কিংস ?

সে ভাব আমার। আমাকে একটা ঘর করার  
জায়গা দেবে ? তোমার তো মেলা জায়গা।  
আধকাটা পেলেও আমার হয়।

দূর শালা! ভাগ।  
আচ্ছা এখন তো চা খাওয়াও। বলে নিতাই  
জুত করে বসে।

\*

সজলের বন্ধুদের বলা আছে। তারা চারিদিকে  
নজর রাখে। পাহারা দেয় সজল নিজেও। ইস্কুল  
থেকে ফিরেই সে আসে ভাবনায় ঢুকে বাবাকে  
সঙ্গে। যখন বিকেলে খেলতে যায় তখন ভাল হয়ে  
বাবাকে পাহারা দেয় স্কাপা নিতাই বা নতুন মাগী।  
সজল সবাইকে বলে রেখেছে, রঘু, সাক্ষরাকে  
কাঁচিপেঁতে ঘোরাঘুরি করতে দেখলেই সেন তাকে  
খবর দেওয়া হয়।

সেখের পর বাড়ির মাস্তারমশাই চলে গেলে সে  
নিজেই বাবার কাছে চলে আসে। শ্রীনাথও তাকে  
দেখলে হাঁসি হয়।

অন্ন। মাস্তারমশাই চলে গেছেন ?  
হ্যাঁ।

বোস, কয়ে এসে বোস। যা শীত।

এক লেশের তলার গায়ে গায়ে বাপ-ব্যাটার  
কসে গুটিসুটি হয়ে। সজল এখন মাথায় মাথায়  
শ্রীনাথের সমান লম্বা। শ্রীনাথের চেয়ে তার স্বাস্থ্য  
ভাল এবং গায়ের জোর অনেক বেশী। খুব হঠাৎ  
কবেই সজলটা এমন ধাঁ বেড়ে উঠল। এই বেড়ে  
ওঠাটাকে খুব উপভোগ করে শ্রীনাথ। সে গাছপালায়  
বেড়ে ওঠা লক্ষ করেছে। এমন সবজি সহজ বাড়ন  
খুব সুন্দর। গাছপালাকে কখনো একটু ছটিকাত  
করতে হয়। তাতে বাড়ি আরো ভাল, কিন্তু মানুষের  
ছটিকাত কীভাবে হবে তা তো সে জানে নী।

সজলেন্দু, বাড়ন্ত শরীরে নিজের শরীরের তাপ  
সত্তার করে দিতে দিতে শ্রীনাথ বলে আজকাল আমি  
কেমনধারা হয়ে গেছি কেন। বোধহয় বৈশাখীন  
বঁচন না। তুই আমাকে দেখিস।

সজল গম্ভীর গলায় বলে, আর কখনো হাওনি  
তো, বাবা ?

রামলাখনের ওখানে ? দূর বোকা।  
আমি কিন্তু চারিদিকে পাহারা রেখেছি।  
পাহারা। বলে অবাক হয় শ্রীনাথ, সে কি রে।  
পাহারা কেন ?

রঘু, সাক্ষরা যদি তোমাকে নিয়ে যায়।  
শ্রীনাথ চুপ করে থাকে। তারপর অনেকক্ষণ  
বাসে আসতে আসতে বলে, রঘুর দোষ কি ? নিমিত্ত  
মাত্র। আমিও তো ভাল নই। নইলে সে ডাকল আর  
আমিও কেন চলে গেলাম।

সজল মদ, কিন্তু দড়ি স্বরে বলে, তুমি খুব  
ভাল বাবা।

দুজনে আর একটু নিকড় হয়ে বসে। শ্রীনাথ  
একটু আবেগের ধরা গলায় বলে ভালই তো ছিলাম  
একসময়ে। তারপর সব গম্ভীর হয়ে গেল। কাঁচা  
পরস, নিশ্চিন্তের জীবন এসব ভাল নয়। তুই  
একটু দুঃখে থাকিস। টানটানিতে থাকিস ভাল  
থাকবি।

সজল হঠাৎ লেপটা গা থেকে সরিয়ে চিতা-  
বাঘের মতো দৃঢ় গিয়ে এক কটকটির পশ্চিমের  
জানালাটা খুলে বলল, কে ?

ভ্রাতা' গলায় কবাব এল, আমি।

সজল তেমনি বাঘের মতো গিয়ে দরজার

হাউকো খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

সজলখোকা, আমি নিতাই।

কি চাও ?

একটা কথা।

চালাকি কোর না। স্পাইগিরি করছিলে ?

চালাকি নয় গো।

কে তোমাকে লাগিয়েছে কথা সোনাম জনা ?  
মাইরি কেউ না।

সজল হঠাৎ বিকট স্বরে চোঁচিয়ে বলে আমার  
বাবার ওপর যে স্পাইং করবে তার টুটি ছিঁড়ে ফেলে  
দেবো।

নিতাই উড়তে গিয়ে বলে, কখনো শোনোই  
না। অভ চেঁচালে যে লোক জুটে যাবে।

সজল অবশ্য কথাটা নিতাইকে উদ্দেশ্য করে  
আর কাউকে শোনাচ্ছিল। কেননা তার ক্রন্দ চোখ  
ভিতরবাড়ির দিকে। চোখটা জিরিয়ে অন্ধকারে  
কালো চামরে মূড়ি দেওয়া নিতাইয়ের দিকে চেয়ে  
বলল, মিথো কথা বলবে না তো।  
না। তোমাকে মিথো বলে কি মার খেয়ে  
মরবে ?

কি কখন ?

রঘু, সাক্ষরার দোষ নেই। তোমার মামা তাকে  
লাগিয়েছিল বাবাকে রামলাখনের আঁচার নিয়ে  
স্বজ্ঞে। আমার নাম কেরেনা কিছু। বলে গেলাম,  
এবার পালাই।

সজল খুব অবাক হল না। কিন্তু একা  
অন্ধকার বাগানদার দাঁড়িয়ে রাগে বিস্ফোষে পাগল  
হয়ে নীতে দাঁত পিষতে লাগল।

ভিতর থেকে শ্রীনাথ জাকস, সজল, আর। কে  
রে ?

জর ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে সজল বলে,  
নিতাই।

আবার বাপ-ব্যাটার কাছ বেঁধাধেঁধি করে  
কসে।

শ্রীনাথ বলে, তুই কি খুব ডাকাবুকা ? দুম্ভু ?  
সজল হাসে। বলে, না। তবে আমাকে সবাই  
ভয় খায়।

তোকে ? তুই তো একটুকানি ছেলে, তোকে  
ভয় খায় কেন ?

কি জানি।

মরাশিট করিস ?

অন্যর দেখলে। তাছাড়া নয়।

শ্রীনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ছোড়ে বলে, ওসব  
করিস না। চারিদিকে শত্রু। কে কবে শোষ নিতে  
খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে তোকেও মেরে ফেলবে।  
আমাকে মা অবধি ভয় পায়। জানেন ?

তোকে ? শ্রীনাথ অবাক, কই তোকে দেখে তো  
ভয়ের কিছ, মনে হয় না।

সজল হাসে, একমাত্র তুমিই আমাকে ভয় পায়  
না। বরং আমিই তোমাকে ভয় পাই, বাবা।

দূর পাগল। আমাকে ভয়ের কি ? কেউ  
আমাকে ভয় পায় না।

আমি পাই। আমি যে তোমাকে ভীক  
ভালবাসি।

(তমস)



# অরণ্যদেব

অরণ্যদেব বাড়ি ফিরছেন.....



এখানে হাত  
ঝাটাব আজ।

শীলা - উয়ির সোনা-বেলাডুটি।



বিয়ের পরে  
তো এখানেই তোমরা  
এসেছিলে।

ইয়া, রাজা।  
এখন মাছ মাড়ব।



পেয়েছি!

তুমিও!

পাশাপাশি! হাতের  
খাওয়াটা ভালই হবে!



মুখাবাকবাক্য, তোমার  
ছেলেটা নাম তো বিটে, তা  
হেয়েব নাম কী হবে?

কো জানে, ডায়ানা  
কী নাম রাখবে!

\* অরণ্যদেবের আর এক নাম।



নাম রাখা হয়নি বলে বোধহয়  
মেয়েটা ঝগদছে।

..... হতেও পারে!

ওঁহা...!

৩/১০

অরণ্যদেবের বংশের ইতিহাস।



দেখি যদি এই ইতিহাস  
চোঁটে কোনও.....

নাম খুঁজে  
পাওয়া যায়।

ওঁহা...!



মনে হচ্ছে,  
নামটা ওর  
শব্দন হচ্ছে!

কী নাম!

# স্মৃতি সততই সুখের

প্রতিভা বসু

২০

হয়্যাডের পরে তখনকার একে পৌছলাম।

পার্লিসের পরে আমদারডাম যেকোন সমীক্ষিত এক অটো-অটো লেগেছিলো, আমদারডামের পরে কোপেনহেগেনে পা দিয়েই তখনই আমার খোলায়মালা হাজারি কিনলাম। যিনিয়ার, জ্যেটো এক লক্ষ্যে একটি নিখুঁত নিটোল স্ক্রলার শহর। তবে এই শহরের সব কিছুর উপর তার আসল বিশেষণ হলো সজ্জাতা। সজ্জাতার ভেদে হচ্ছে। আমদারডামের মতো এও ভালো-খরো শহর। জলের মতোই সব সহজ সরল তরল বেগে প্রবহমান। জীবনধারণ পদ্ধতিতে পাখির মতো এক কিল্ডো জন্মদেব নেই। এক বিন্দু অভাবেরও ছিটেফোটা নেই কোথাও।

তেলতেলে চওড় চওড়া অতি পছন্দীয় রাস্তা দিয়ে বেলায় নান্দিক চেয়ারের সুপেশের বা স্ক্রলারী রাস্তা যেতে কাজে তাদের চালচলন, ধরন, ভঙ্গি, হাস্য-পরিহাস-সবই অস্বাভাবিক। পার্লিসের মতোই অনেক চকর আছে। সেখানে ফুলের মতো ছোলেমেয়েরা খেলা করছে, রোগ পোহাচ্ছে, জন্মকর হয়েছেন কিশোরীরাও। জন্মকরী ছোলেমেয়েরা শ্রেয় করছে, মহিলারা বেতে বেতে পরিচিত হুখ দেখে দাঁড়িয়ে পড়ছেন, আলাপ করছেন; কেউ কেউ রেলিগে টেল দিয়ে আলাপবাক্যও দেখছেন।

আমদারডামের মতো শহুরে জলই নর, ফুলেরও মেলা সেইরকম। বেশ গরম পড়েছে, অকলস নিমেষ নীল, শীতের পরেই জ্বিরে উঠে প্রকৃতি একেবারে রঙের সাগরে ডুবে আছে। গাধাশালা পাতলাতা ঘর সবুজ। জীকত। সজ্জাত। জল ফুলের জে কখনই নেই! জলবায়ের শিল্পের সঙ্গ্য কে আর পারা দিতে পারে? ভরি ভাঙারে যে কতো রু আছে কেউ জানে না। আর প্রমাণটি। জন্মকর। তামাও তাদের পান্থের আদর্শ কার্যকার্য নিয়ে রঙের প্রতিযোগিতায় শামিল হচ্ছে। পান্থী বৃক্ষজাতের বসে নবীন সুরে ডাকছে, উড়ছে, চলে যাচ্ছে। কিন্তু কাকি বেধে বসে আছে পারায়রা। চক্রে চক্রে তাদের ডিঙ। তারাও এক-একজন রঙের কোষের। গল-গলার ফুলেরে আত্মা আত্মা ভাব। মনে হয় লাল লুহরের সফল লোকেরই পোজ পাখি। আমিও বানো হাতে কাজে গিয়ে দাঁড়লাম। কতক বাতুম করে এ ওকে টেস্টেসিস করে কী কালো, তরপার আমাকে ঘিরে কেলে খুঁটে খেতে লাগলো সেই দান। খেয়েই হঠাৎ একযোগে উড়ে যোলে সব। সজ্জাতার সমস্ত পান্থের আপটো ফুলের মতো হাওয়ার শব্দ উঠিত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। আমার মিলল যাবের বিখ্যাত কবিতাটি মনে পড়ে গেলো: উজ্জ্বল এক কাক পরায়, সূর্যের উজ্জ্বল রেখের চকুল পান্থার উড়ছে— নিঃসীম ঘন নীল অন্ধর—

লন্ডনে পা দিয়েই মনে হচ্ছিলো শহরটার মধ্যে বড়ো বেশী গান্ধীজি ছড়ানো, বড়ো বেশী সাকনা আর চূপচাপ, বড়ো বেশী সভা-সভা বয়। আমার এজন্যরকমত পিছরেই সব কেমন ধূসরতার আচ্ছন্ন, পার্লিসে এসেই চটলতার উদ্বেল এক ফুঁতির কল্যা, আমদারডাম বিমর্ষ; এসবের তুলনায় কোপেনহেগেনের চেহারা খুব সুখী-সুখী। ফুঁতেতে আনন্দ বেশী, চটলতা কম। প্রয়োজনে গান্ধীজি, কিন্তু কখনই হুখ থেকে হাসি কিলীন হয়ে থাকে না। আর অস্বাভাবিক হুখের তো কই হুরে। অতীত আত্মনিক। অতীত স্বাধীন। বাস্তবের খল কিল নীল সমস্ত উলান অস্ফা এবং অসংখ্য গিজে নিয়ে এই নগরটি যেন পরিপূর্ণতার প্রত্যাক।

তবু তথা হিসেবে জানা যায় পৃথিবীর মধ্যে এসেছেই নাকি আত্মহত্যা সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। খুঁই অকাক করা কথা। তবে কি অস্বাভাবিক সুখও দুঃখের নামান্তর? একেবারে লাগে? দুঃখের অভাবে সুখের রোমাণ্ড শিথিল হয়ে যায়? চাইলেই পাওয়া যায় বলে চাওগাটাই অর্থহীন?

কিন্তু এখানে আমাদের অভ্যর্থনার নিমিত্ত তিন মাস হাঙ্গে বসলেন, এ নিয়ে কীনা চিন্তা করবার করছেন। তবে কি জানেন, অতিথি স্বাধীনতাও এত ধরনের মতো। সীম্য সব কিছুর মধ্যেই আসা বরকর। সবাপাশি জীবনধারণের সঙ্গ্য কিছটা শৃঙ্খলিত থাকাকও একটু ফুরাকও কম বয়—প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটা ক্রমে আসলে অনেক অশান্তির হাত থেকে অব্যাহতি পড়বে যায়। জীবনধারণের ক্ষেত্রেই এর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। রাগ, শোক, মনঃমারী—এ তো আছেই জীবনে। ঈশ্বরের বিধান বলে তা আমরা মেনেও নেই। আত্মহত্যার কারণ এসব নয়। এই আত্মহত্যার উদ্ভাবনা—সবই ভালোবাসার অভাব। প্রেম এখানে একেবারেই স্বাধীন নয়। মারা-মমতা শব্দটা প্রায় উঠে যাচ্ছে হৃদয়-হৃদয়তাদের মধ্য থেকে। আত্মহত্যা বেশী এ হৃদয়-হৃদয়তায় করে।

কথটা আমার কথা মনে হলো। যদিও জন্মলোকের চেহারাটা বড়োই শাখাল। গাড়ি নেই, মোটা গোধি আছে এক জোড়া, চুল পেটে পারা করে, অচিড়ানে, মনে হয় এক গাধা তেল দিয়ে পরিপাটি করে রেখেছেন। কয়েক চীলশেখার জিনিস-পারি মানব, একটা ছোকা জব নেই। কিন্তু কথাবার্তায় দেখা গেল দুরন্ত এক পরিণত। শূদ্রময় নিজের বেশটুকুই নয়, সারা অগত্যের খবরও

হলো। নর বিধের পড়াশোনা করেন, তার কথা মল্লভেই আছ বেশী।

আমাদের জন্য একা যে হোটেলটি ঠিক করে রেখেছিলেন সেটি যে পথের ধরে অবশিষ্ট ডার নাম এটি সি আডারলন বলেভার। এই এই সি আডারলনই হলেন পৃথিবীর সর্বজনপ্রিয় লেখক হাল্স রিচেল আডারলন। ইয়ের কথনের করে এই নামেই ইনি পরিচিত। আমার সবই ইংরাজীর মাধ্যমে জানি বলে জামরাও তাকে এই নামেই চিনি। হঠাৎ এই সি আডারলন বলেভার নামটা মনে পড়ল। জন্মলোকটি গোড়ার কাকি মজাক হোসে বসলেন, তখন রাস্তার হোটেল ঠিক করিয়ে দেখেন। এই সি আডারলন দেখে বোধ হয় বক্তে পারলেন। আমাদের দেশে ওর ওঠাই নয়।

হুখের লাকিরে উঠে উজ্জ্বলভাবে ওর হাত জড়িয়ে ধরলেন।

শুধু রাস্তাই রেনমপের উপকরণ নয়। মদের জানালা দিয়ে রাইরে তাকালেই দুই তাল বানানো নদীরা মতো চওড়া খাল। খালের উপর ছলছল পুস। পুসের উপর দিয়ে অল্প বানহনব অবিভল গতিবিধি। দাঁড়িয়ে দেখতে পুস জলনে মল্লভলো। কইরে এই হুখ, দাস্তার এই দাস্তার এই দাস্তার পুস জতবি সুখের সঙ্গ্য নেই। হুখেরে জন্মলোকেরে জানালা দিয়ে খাল দেখা যায় এমন জড়িই চোলেছিলেন। সেখানে হরিন, এখানে হলো। আর এ রাস্তার নামটা তো উপরি পড়ল।

হুখ বা রাস্তার হাউও হোটেলের অভ্যন্তরীণ অভ্যন্তর আর্থনিক এবং কল্যাণের ক্ষিত্র। একটি কোয়ার টিপলেই হুটে আসে পরিচরিকা। অভ্যন্তর প্রীতি একটুও অমনোযোগী নয়, কথা শেষ হওগা মানেই চলে যায় না, আরো একটুকু দাঁড়িয়ে থাকে যদি আরো কিছু বলি সেই অপেক্ষায়, প্রসন্ন-জনেই বিধানের চাপকটা টান করে সরে, প্রেরণ টেককটা টেককটা করে সেরে জলের পালটা এগিরে রাস্তা-সেবার জিপ। ভাগ্য লাগে। আর্থনিকবো জন্মকর। শূদ্রনে-শূদ্রনে কঠক-কঠক কঠবস্বনের উপরেও আরো কিছু, পাওয়া যায়।

পৌছলিলাম সকালে। যে পরিমাণ প্রাক্কল নিয়ে এলো, আয়র দুখন তো কোন হার, তেমন তেমন লক্ষন খাইরকও সন্তুষ্ট পেট করে থাকে। পরিচরিকটি ইংরাজি বলতে পারে, তারও খুব দাঁড়ি, কলো, এই হোটেল রায়েপেরে আর কোনো মিন কোমো ভারতীয়কে সে দেখেন। এইরকম লক্ষ্য ফ্রেন পর মেরে সে এই প্রথম দেখলো।

কোপেনহেগেন বন্দরটির আরতন খুঁই হোটেল, প্রাকৃতিক সম্পদও যে প্রচুর, তাও নয়; উপরন্তু প্লাজান্ত প্রতিকলিদের বজা সবগাই আশ্চর্য। কোনো উপনির্কণও নেই, তজ্জি কী করে এমন ধনসম্পত্তির অধিকারী হলো কে জানে।

সংস্কৃতিতেও এক পিছরে নেই। চিত্রশালাটি চমৎকার। এখানেই প্রথম এডভার্টাইসের করকটা মূল ছবি দেখে বুদ্ধের বসলেন, আমার বহু দিনের একটা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো।

এখানকার দর্শনার সব কিছই আমাদের হোটেলের খুব কাছাকাছি। চিত্রশালাটি জে হেটে গেলে পিচ-সাত মিনিটের বেশী একটুও নয়। আর বানিক হটলেই চিভিল পার্ক। আবার তার ওপাঠেই টাউন হল। বানিক দূরে একটি অরলা।

এখানকার সবকিছু আমাদের খুব কাঁক। সব মিলিয়ে দু মিন কি তিন দিন বহুতা আছে বুদ্ধেরে। সেটা কাল থেকে শূদ্র। সূত্রায় ফৌল দিজে পৌছলাম সেদিন কিকলেই ভুললোক আমাদের সেই অরলে ককোতে নিয়ে গেলেন। অরলাটি একাতই অরলা। অনেক দূরত্বেরে জন্মলও ঠিকই আছে সেখানে। গাছের মাথার মাথার জড়িরে সে জন্মল এমন নির্বিড় যে, অস্বস্তিরে পথ চলা যায়। এরকম জন্মল ভারতবর্ষে হলে বাত-ভালকের আশঙ্ক হতো। কিন্তু এখানে কোনো হিংস্র প্রাণী নেই। শূদ্র ইরিন। যেহেতু এদের সবারে ফরাফর মতো অন্য প্রাণী কেউ নেই, কাজেই কখনোভাবে কখনোই করে পরম শূদ্র লাগিতপালিত।

কথাই বাহুল্য, এই ঘন কল্যাণটিও পরম বড়ো লাগিতপালিত। এখানে সব আছে। কিন্তু সবই প্রকৃতির সঙ্গ্য জানকের সহকোণজ জিগিরে প্রভুত। যে টপালে জলের একটি হুখ জন্মলকে জিগিরে বড় বাজে সেটা মনঃবারত। হুকের মধ্যবর্তী জন্মলের মধ্যে রঙিন ফুলের বালনটুকু তাই। বুদ্ধেরে বাসা বেধে যেবা অপরূপ সূন্দর পাখি আমের কাছে কবে ডাকছে, তাদের অনেকই অনেক দেশ থেকে সংগৃহীত। তা হাড়া প্রকৃতির সঙ্গে সাঙ্গ্য এখানে-ওখানে মনঃযানিমিত খানখন্দ গিরিহা প্রভলও অনেক আছে। এই জন্মলে বেড়াবার সুখবাহন মোটর গাড়ি নয়, উল্ল শতকী ফিন। মল্ল এক কালো কুচুতে চকল ও সডেজ কোটা পিডেলের সজ্জাত হুগে হোতা আছে কাছাকাছি সঙ্গ্য। হুটবার জন ঘন ঘন পা নাড়ছে। ভুললোক আমাদের নিয়ে সেই ফিন ডাড়া ককে তাকেই উঠে কলেনা। চোলে লাগলো গাড়ি। হোটার খবর টেকক লনের নিরামিত লয়। জন্মলের লক্ষ্যে সঙ্গে কোথায় একটা সংহতি স্থাপন করে অন্তত সুরেরে সম্মোহন তৈরি করছে। এইজন্যই জেহ হয় ফরম্যানের বলে পল্লবান?

ভিতরে ঢুকে কেবল সবজ, সবজ আর সবজ। চারটের বেলার কইরে

প্রকাশিত হল

**ক্যান্সার**

ডাঃ অমিয়কুমার হাটি



আজকের জীবনে সবচেয়ে ভীতিকর রোগ ক্যান্সার।  
আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর সম্বন্ধে যেটুকু জানা  
গেছে তা পাওয়া যাবে এই বইটিতে। সাধারণ মানুষও  
তার মনের গোপন সন্দেহ নিরূন করিতে পারবেন যদি  
পড়েন

**ডাঃ অমিয়কুমার হাটি-র  
ক্যান্সার** ১৪.০০

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বই

**সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত-র  
ববার্ট ব্রাউনিং** ১২.০০

**আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-এর  
শিলাপটে লেখা** ১৫.০০

**দৃষ্টিহীন-এর**

**নকল রাজা** ৭.০০ **ইনি কে?** ১২.০০  
**চিত্তরঞ্জন মাইতি-র** **সম্বিং মিত্র-র**  
**পরমা** ২০.০০ **একদা** ৬.০০  
**রঞ্জিত গাঙ্গোপাধ্যায়-এর**

**সাজবদল** ৮.০০

সম্পূর্ণ হালিকার জন্য লিখুন।

অগ্রিম ছাড়া V.P. তে বই পাঠানো সম্ভব নয়।

**নিউ বেঙ্গল**

৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৬

সেখানে খর রোগ ছিলা, বপ করে ছায়া নেমে গেল সেখানে। কিন্তু তা হল  
কোথাও কি রোগ নেই? আছে। নইলে রঙিন ফুলের কানন বচিবে, কার ডাশে?  
বাগানে প্রজাপতির মতো প্রেমিকখণ্ডেরাও সব ঘুরে বেড়াচ্ছে। পশেই সমুদ্র  
বয়ে বাজে গভীর গভীরে।

বৃন্দাবনের এক সাহিত্যিক কব্জর বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিলো বিকলে। একটু  
দৌর হলে গেল যেতে। এবং গিয়েই কথাসম্ভব তাত্ত্বিক উঠতে হলো। এখন  
থেকে লাইসিয়ানা হয়ে তবে ঘরে ফেরা।

লাইসিয়ানা এখনকার এক ধনী ব্যক্তির উদ্যান-বাটিকা। এটি তিনি শিল্প-  
সংরক্ষণের জন্য দান করে গেছেন। বাড়িটি এতো সুন্দর! বলা যায় এটিই একটি  
শিল্পকর্মের উৎকৃষ্ট নমুনা। এবং উদ্যান-বাটিকার আকর্ষক সংকরণ। মাইল-  
মাইলব্যাপী মৃগকানন দেখে আসার পরেও সমুদ্রতটে লাইসিয়ানার বাগান  
জোখকে তেমনি কিথরে মগ্ন করে। এক দিকে যেমন সমুদ্র, অন্য তিন দিক  
ঘিরে তেমনি বাগান ও বাগিচা। কব্জর সমারোহে অপরিমিত। কতো জাতের গাছ  
যে আছে তাক ইয়াতা নেই।

সমুদ্রকে সামনে রেখে অনেককাল বসে রইলাম সেখানে। ভরলোক আর এক  
প্রশ্ন চা খাওয়ালেন। মন প্রাণ প্রকল দর্শন—সব জড়িয়ে গেল।

জাপানের মতো দিনেরভরদের সুক্স সৌন্দর্য্যবোধের তীব্রতা এসে থেকেই  
অনুভব করছিলাম। যেমন গৃহসম্মা, তেমনি পুষ্কসম্মা, তেমনি স্থাপত্য। এমন  
সুন্দর জল-যেহা একটা ছোট্ট মিষ্টি শহর সম্ভবত জগতেই বিরল।

বৃন্দাবন বললেন, 'একবারেই আশ্চর্য্যসূচক গল্পের দেশ।' তাকিয়ে  
থাকতে থাকতে মনে হয় একটু বয়স ঐ লাল আর সাদা নৌকোটে লাফিয়ে  
উঠে কথো হিলায়মার, ছটা রক্তহাসি ভাসিয়ে নিয়ে থাকে।

ভালোকে হাসতে হাসতে কালেন, 'এই বনটিকেও সেই বন ভাবতে দেখে  
কী, যেখানে ফুলেরা পল্লবের গল্প বলে, গাছেরা বলে ডাকাতদের গল্প।'

আমি কলাম, 'তা হলে আসুন এই বাড়িটাকেই সেই প্রাসাদ ভাবি যেখানে  
রাজকন্যা এসে কখনো অলিন্দে দাঁড়িয়ে থাকেন, কখনো বারান্দায়। আর, সোনার  
তলোয়ার হাতে পাহারা দেয় রাজপুত্র।'

'যা বলেছেন, তা হলে ছোট্টা জলকন্যাটিকেও এই ফুটফুটে জোয়ালদার  
উঠিয়ে আনা যাক না সামনের সমুদ্রতটে—' কোথা থেকে এক ভরমাইলা এসে  
ফেগ দিলেন, 'আর সেই নাটক-নাটক খেলা পাতুল নিয়ে গলা ছেড়ে নদীতীরে  
দাঁড়িয়ে গান গাওয়া—'

হাসলেন, তারপর কুমার ভণ্ডাতে বললেন, 'অযাচিতভাবে এসে আলাপ  
করলাম বলে কিছ মনে করছেন না তো? অনেককাল থেকেই এই বিদেশী  
অতিথি দৃষ্টনকে দেখছিলাম, কথাবার্তা শুনছিলাম—' আমার দিকে তাকালেন,  
'খুব ইচ্ছে করলো পরিচয় করি, এমন সুন্দর জোয়ালদারাবিত সমুদ্রতীরে লাই-  
সিয়ানার বসে হাসে আশ্চর্য্যসূচক নিয়ে কপনকালে খেলাটি আপনাদের বৈষ্ণব  
সুন্দর জমিয়ে তুলেছেন, ভালোমত ফর্মালিটির অপেক্ষা না রেখে যোগ দিই  
সেই খেলায়। মজা না চেয়ে নিচ্ছি সেজন্য।'

না, না। কী আশ্চর্য্য! খুব ভালো করেছেন। আসুন আসুন, বসুন—  
তিনজনেরই সমবেত অভ্যর্থনা মনোহর হলো বাতাসে। খুশী হলেন তিনি।  
মহিলা সুন্দর দেখতে, অল্প বয়স, মাথার চুল লম্বা এবং সেই চুল দিয়ে টান-  
টান করে খোঁপা বাঁধা।

'আমি ওয়েলস-এর মেয়ে, আমার পাশে বসলেন, যেখান থেকে হাস  
নামের সেই জোখ কব্জর সাধারণ ছেলটি একদিন তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাত্ত্বিক  
কোপেনহেগেনে চলে এসেছিলো কিছ করতে।'

ভরলোক বললেন, 'আপনি কি কোপেনহেগেনে বেড়াতে এসেছেন? নাকি  
এখানেই থাকেন?'

মহিলা বললেন, 'এখানেই থাকি। রক্তাক্ত করি, আমার মত যিস লিন্ডা  
আশ্চর্য্যসূচক, হাসের সঙ্গে একই পদবী।'

বৃন্দাবন হেসে বললেন, 'শুধু পদবীই কি এক?'

এ কথায় মহিলা ভীষণ হাসলেন। বললেন, 'আমি অন্যান্য করছি আপনারা  
ভারতবর্ষের লোক।'

'ঠিকই ধরেছেন।'

'আপনাকে দেখে নয়, কিন্তু একে দেখে। ভারতীয় মেয়ে প্যারিসে আমি  
অনেক দেখেছি, তাই পোশাকটা চেনা। ভারতীয় দশ নে বিশ্বাস করলে কলতে  
হয় হয়তো আমিই সেই লিন্ডা।'

এবার সিম্বলিত হাসি রোলে ইয়োজোপীয় সভ্যতার কিংবদন্তি ধরলো।  
খাম্বার পরে আমাকে স্বীকার করতেই হলো তাদের এই আনন্দময় আমায়  
কোনো অংশ ছিল না যেহেতু রাসকতাতা আমি ঠিক করতে পারিনি।

'ও হো, আচ্ছা তা হলে শুনুন—' খাম্বলেন লিন্ডা, তাকালেন মূখে মূখে,  
বললেন, 'আমার পরিচয়টা ভে জানলেন, কিন্তু আপনারা—'

এর উত্তরে আমরা তিনজনেই তিনজনের নাম-খাম্ব বললাম। দেখা গেল  
ভারতবর্ষের প্রতি লিন্ডা খুব প্রাণবন্ত। রবীন্দ্রনাথের নাম জানেন, কাল যে  
রোজেরতে বৃন্দাবনের বন্ধুতা আছে তাও জানেন। ভারতীয় দর্শন তার প্রিয়  
বিষয়।

'লিন্ডার গল্পটা তা হলে আপনার শ্রীকে বলি, কেমন?' লিন্ডা বৃন্দাবনের  
দিকে তাকালেন।

কৌতূহল হচ্ছে একবার গিয়ে দেখে আসি তাঁর আদি বাড়ি।

আদি বাড়ি? বার বাবা জুতো সেলাই করতেন আর মা বাড়ি বাড়ি ঘরে কাপড় কাচতেন, তার আকার আদি বাড়ি। তারপর তো সেই কুচী বাবা কতজ্ঞ অল্প বয়সে মরেও গেলেন, মা আবার বিয়ে করলেন, আর এই সাধারণ ঘরের সাধারণ হাঙ্গল—ও, গড়—ক্স ফাটলেন, বিশ্বর যে কাকে কী দেন, কার জন্য কী মাজিয়ে রাখেন, শ্বশুর তিনিই জানেন। নইলে দেশ ছেড়ে, গাঁ ছেড়ে পরিচিত পরিজন সব ছেড়ে চলে এসে সেই ছেলে এই হয়। অবাক লাগে না?

তাই তো!

আমি হাসের অশ্রু ভক্ত, হাসের বই পড়তে পড়তে আমার গায়ে কাটা দেয়। আগলি ডাকলিং গল্পটা ডেকে দেখুন, উনি নিজের ছাড়া আর কে? উনি কি জানতেন সেই হিসেব বাচ্চাটা একদিন মরল হয়ে আকাশে উড়বে ঠিক তাইই মতো—যে তিনি আশ্বিনের ডায়েরি একটা অপসার মাত্র? যাবা যাবা জাবার পরে মা-ঠাকুমা কতবার বললেন, হাতের কাজ শেষে, হাতের কাজ শেষে। শুনলেন? শুনলেন না? আশ্রয় নেই, আহার নেই, সন্ধ্যা নেই, কী ভেবে এসে উপস্থিত হলেন এই শহরে। লেখাপড়াও তো জানেন না। সেই থিরটারুয়ালারা ভরতি করে দিলেন স্কুলে। ক্রমে সবচেয়ে চান্দা, আর সবচেয়ে বড়ো ছেলে তিনি। আর সবচেয়ে খারাপ ছাত্রও। ডাকুন।

তাই তো!

দেখতে পর্যন্ত ভালো না—

দেখতে ভালো না? এই বিস্মিত উক্তিটি আমার। আমার চোখে হাস ক্রিশ্চেন আন্ডারসন মানেই সোভাসজি ড্যানি কে। হাস ক্রিশ্চেন আন্ডারসনকে নিয়ে জর্নাগ্রে চলচ্চিত্রটি নিশ্চয়ই অনেকে দেখেছেন। নায়ক ড্যানি কে। আন্ডারসনকে ডাকলিই ড্যানি কে তাঁর রূপসাবল, আনন্দ, কৃতিত্ব এবং অবিরল হাসির ক্ষেত্রীয় নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে যান আমার চোখের সম্মুখে। অভিনয়-প্রতিভার গমে আন্ডারসন আর ড্যানি কে দুই ব্যক্তি থাকেন না, সম্পূর্ণভাবেই একে অন্যের রূপে রূপান্তরিত হয়ে ওঠেন।

ভদ্রমহিলা বললেন, না, দেখতেও ভালো ছিলেন না। তাঁর বালক-বয়সে তাঁর চেহারায়া প্রতিজ্ঞার কিন্তু ছবিও কোনোখানে ফটে ওঠেনি।

আমি বললাম, আন্ডারসনকে জো কখনো দেখিনি দেখিয়েও না, কিন্তু তাঁর চরিত্রে অভিনয় করে যিনি এখানে আমাদের হৃদয়কে মন্তমুগ্ধ করে রেখেছেন তিনি ড্যানি কে। যেন বাদ্য, কণ। গম্ভীর গম্ভীর ছোট আসনে শিশুরা, আর তিনি তাঁর হাতের বড়ো আঙুলের নখে নখে একে ঘাসের পিঠের টাঁপ মাথার দিয়ে শিশু দিতে দিতে পরী নাচাচ্ছেন। শিশুদের মধ্যে সবার স্বর্গ।

না, না, না—মাথা ঝাঁকালেন ভদ্রমহিলা, দেখুন, ওখানেও আমাদের ভীষণ আপত্তি, আমাদের অক্লান্ত প্রতিবাদ। পৃথিবীর সব অনুবাদকই তাঁকে যেন একজন শিশুদের মন-জালালো রূপকথাকার হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন—সেটা ঠিক না, সেটা অন্যায়।

এর জগতের বাস্তব বললেন, আপনার অভিযোগ কিয় পরিমাণে সত্য হলেও সত্য কখনই নয়। আমার শ্রী ছোট বলছেন সেখানে হলিউড হাওয়া। তাঁকে কুচী, সখী, জয়ী, অনন্দে ভরপুর একজন শিশু সাহিত্যিক হিসেবে উপস্থাপিত করে সত্যিই শিশুদের বিমোহিত করে শিশুদের বাৎস্যায়িক সাফল্য অর্জন করেছে; কিন্তু হাস ক্রিশ্চেন আন্ডারসনের লেখার গঢ় অভিজ্ঞতা যদি কেউ নাই বড়ো তা হলে তাঁর ভক্ত পাঠকদের মধ্যে নিশ্চয়ই ডিকেন্স বা হুটম্যানের নাম সর্বপ্রাণে উচ্চারিত হতো না, অক্ষর ওয়াইল্ডের হাস ক্রিশ্চেন আন্ডারসনের অনুকরণে রচিত বাহিনীগলোই ইংরেজী ভাষায় তাঁর শ্রেষ্ঠ বাহিনী বলে বিবেচিত হতো না। হেসে বললেন, আর এই যে আমরা চান্জন এখানে একত্রিত হয়ে তাঁকে সম্মান করছি, আমরাই কি এতো কথা বলতাম? কিন্তু লিভার গম্ভীর মিসেস যেমনকে বলুন এবার। সেটাই চাপা পড়ে থাকছে।

ভদ্রমহিলাটি স্ব স্ব জমাটী এবং আলাপী। আমার হাত নিজের হাতের মতোয় নিয়ে বললেন, জানেন তো, ব্যক্তিগত জীবন তাঁকে তাঁর সাহিত্যিক মশালা ছাড়া আর কোনো মশাদাই দেয়নি। বারেকবারে প্রেমের বাথ হয়ে কতো কন্ট্রি না পেয়েছেন। শেষ প্রেম তাঁর সগায়িকা লিভারের সঙ্গে। এই যে আমি, আমি লিভার আন্ডারসন। হাস সেই লিভার জন্য কী না করেছে! কোথায় কোথায় না থাকেছেন? এমন অভিনবিত প্রবন্ধ জীকল্পভাবেই যিনি তাঁর দেশের সকল মানুষের সকল সমস্যার অধিকার ধনী, সেই মানুষকে তাকিয়েও দেখার লিভার। শেক্সে সেই জেনা নিয়েই স্বাধীন, সন্তানহীন, গৃহহীন, প্রেমহীন এই প্রতিভার এক বধুর গমে মৃত্যু ঘটলো। আমি লিভার তাঁর প্রায়শ্চিত্ত করণা, আমি কখনো তাঁর নাম ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসবো না, কখনো বিবাহ করবো না।

এই গল্প এক এই ঘোষণার পরে কেমন একটা বিরতি নামলো সমস্ত আলোচনাটার মধ্যে। তারপর যা টুকটাক দু-চারটা কথা হলো, নিতান্তই আলাপ। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের হাতের ঘড়িতে চোখ ফেলে যে যার গন্তব্যে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ভদ্রলোক আমাদের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিতে নিতে বললেন, মহিলা স্ব স্ব অন্তর, না? মিস্টক।

বৃদ্ধদের বললেন, এও প্রায় হাস ক্রিশ্চেন আন্ডারসনেরই গল্পের বিষয়।

কণ ফ্যান্টাই বদলে গেল  
কিন্তু ৬০ বছরেও  
চিরন্তন



বেঙ্গল কেমিক্যালের  
ক্যাথারাইডিন  
হেয়ার অয়েল

চুলের যত্নে সবার সেরা  
ঘরে ঘরে সবার চেনা



**দাড়ি কাম্বাতোর পরে  
ত্বকে নির্মল, তাজা ও নরম করতে...**



আপনার ত্বক  
স্বাভাবিক, শুকনো বা  
তৈলাক্ত যে অবস্থাতেই  
থাকুক বা ফেন,  
ইরাসমিক এখন  
এনেছে এমন এক  
শেডিং ক্রীম যা ঠিক আপনার  
ত্বকেরই অনুকূল...এর বিশেষ কর্মূলা।  
আপনার ত্বকে নির্মল, তাজা ও  
নরম করে দেয়। আজই পরীক্ষা করুন—  
ইরাসমিক।

- এন্টিসেপটিক — স্বাভাবিক ত্বকের জন্যে
- ক্রীম-রীচ — শুকনো ত্বকের জন্যে
- লাইফ ক্রিম — তৈলাক্ত ত্বকের জন্যে

**ইরাসমিক হাজির করছে—**

**এমন এক ক্রীম-যা সব প্রকার ত্বকের অনুকূল**



# সেই সময়

## সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

১৫৩

হরিশের মৃত্যু নবীনকুমারের বন্ধু একেবারে তাঁর শেলসম বাজলো। কয়েক দিন প্রায় হতচেতনের মতন গড়়ে রইলো সে। অমন স্বাধীন, অমন তেজস্বী, সব সময় উপায়ে ভরপুর মানবটি চলে গেল অকস্মৎ! আর যে সময় হরিশকে দেশবাসীর সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল, সেই সময়ই সে অস্পষ্ট হলো। কিব-নিষ্কার তার এক আঁকার! আর কী-ই বা কয়েক হরোঁছর হরিশের, মাও সইছিল কসর।

এক সময় শোক সামলে উঠেই হলো নবীন-কুমারকে। হরিশ বড়, কাজ অসমাপ্ত রেখে গেছেন, এখনই সেগুলি জোড়া লাগাবার চেষ্টা না করলে একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে। বিশেষত হিন্দু পেট্রিষ্টের মতন পত্রিকা কথ হতে দেওয়া চলে না কিছুতেই।

হরিশ অর্থ উপার্জন করেছেন প্রচুর, আবার তার ক্ষমতার হাতও ছিল অতি দরাজ, নীল হারনের জন্য তিনি অকুণ্ঠভাবে ব্যয় করেছেন। মৃত্যুর পর দেখা গেল হালকা ভরানপরে একটি ছোট বসন্ত বাড়ি আর হিন্দু পেট্রিষ্টের মদ্রাঘট ছাড়া আর কিছুই রেখে যাননি। তাঁর বিশ্বাস পরী ও মাতার গ্রাসাচ্ছাদন হবে কী করে তারও কোনো ব্যাক্থা নেই।

হরিশের প্রাণ্য শরীত চুক যাকার পর নবীনকুমার একদিন ধীর পদে হিন্দু পেট্রিষ্ট দফতরের সিঁড়ি বয়ে উপরে উঠে এলো। এখানে হরিশ নেই, তার উচ্চ কণ্ঠস্বর, দরাজ হাসা আর শোনা যাবে না, এ যেন কলনাই করা যায় না। নবীনকুমারের শরীর অবল হয়ে আসে। তার মনে হয়, পৃথিবীতে তার আর একজনও বন্ধু নেই।

পত্রিকা দফতরে একটি বাক একলা চুপ করে কিয়ৎ কদমে বস আছে। এই বাকটির নাম শম্ভুচন্দ্র মনোপাধ্যায়। এই বাকটি কিছদিন হরিশের সঙ্গে পত্রিকা সম্পাদনার কাজ করছে। হাতাবাক্য থেকেই অনেক পত্রিকার সঙ্গে বন্ধ হয়েছিল শম্ভুচন্দ্র, এক সময় যে নিজের স্বতন্ত্রভাবে একটি কাগজ বার করতে চেয়েছিল, কিন্তু অর্থের সঙ্গতি নেই। বাকটি ইংরেজী লেখে চমৎকার, ব্যক্তিগত বেশ তীক্ষ্ণ। এবং চমকে সন্দেহপ্রসূতি আছে। দফতরেই শম্ভুচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হয়ে থাকে নবীনকুমারের ভাঙে লেগে যায়। এক কথায় নবীনকুমার তার পত্রিকাপত পত্রিকার

জন্য কিলো দেয় একটি মাত্র দশ। শম্ভুচন্দ্র তখন যথোচিত মনোযোগ দিয়ে পত্রিকা বার করলো, কিন্তু চললো না বেশদিন।

শম্ভুচন্দ্র নবীনকুমারের চেয়ে সামান্য বয়সে বড় হলেও নবীনকুমারকে দেখে সে সম্প্রদে উঠে দাঁড়ালো। দু'জনে পত্রিকার দিকে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত, একটিও কথা কললো না। পরে মানব অন্য পরাজ মানবের সামনে আর কী ভাবার শোক প্রকাশ করবে। নীরবতাই এখানে বাধ্য।

হরিশ নেই বলেই বরখানি কেন নিয়ন্ত্রণ হল মনে হচ্ছে। নবীনকুমার চতুর্দিকে চক্ কললোকে লাগলো। সর্বটাই হরিশের চিহ্ন। ফেওরালের একটি হুকে কলছে এক গালা পৈতে। রামুল সন্তান হরিশ যথোক্ত রামুল হরার পর ঢাক ঢোল পিটিয়ে, লোকজন ডেকে উপস্থিত পরিতাল করেননি বটে, তবে ঐ সুঅযোগাযোগের প্রতি তাঁর বিশেষ সন্ধানকোষও ছিল না। প্রায়ই গা থেকে পৈতে খসে ধুলিরে কাপতেন দেয়ালে, কখনো কখনো গ্যালি প্রফের আড়তন বোঝার জন্য ঐ পৈতে দিয়েই মেপে নিতেন, আবার বাড়ি ফেরার সময় পরে নিতেন গল্লার। শেখান আর পরা হয়নি।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, এ পত্রিকা বন্ধ হয়ে থাকে?

শম্ভুচন্দ্র কললো, আর তো উপায়ান্তর দেখি না! এ ছাপাখানাও বন্ধ করা যাবে না বাকি। নীলকর সাহেবের ঠুর নামে মানবীর মামলা কলিরে রেখেছে, ঠুর মৃত্যু হলেও প্রতিবেশে নোয়ার জন্য সাহেবগা এই ছাপাখানা বন্ধ করে নিতে পারে।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, তা পারে?

শম্ভুচন্দ্র কললো, সাহেবদের পক্ষে অকলাই সম্ভব। এই ছাপাখানাটিও গেলে হরিশের পরিবার একেবারে সর্বস্বান্ত হবে।

নবীনকুমার কয়েক মুহূর্ত মাত্র চিন্তা করলো। তারপর প্রশ্ন করলো, আর কেউ যদি তার আগেই এই ছাপাখানা এক পত্রিকার স্বত্ব কিনে নেয়।

—তা হলে কীভাবে যেতে পারে অকলা।

—এই ছাপাখানার মোট দাম কত হবে বলে আপনাদের মনে হয়?

—করাটি পুরোনো হয়ে গ্যাচে, টাইপালিও বন্ধ বাবহত, তা তবুও হাজার কারোশো টাকা দাম উঠবে নিশ্চয়।

—আপনি হরিশের মা ও স্ত্রীকে দিয়ে বলুন, আমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে এই সময়ের কিলে নিতে চাই।

—কত টাকা বললেন?

—পাঁচ হাজার টাকা। আশা করি সেই টাকার সঙ্গে বই কিংবার সার জীবনের খরচ চলে যাবে।

শম্ভুচন্দ্র খানিকক্ষণ বিমোহিত হয়ে থাকিয়ে রইলো। তারপর অশ্রুত স্বর বললো, আপনি হাজার টাকার জিনিস পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে কিনবেন? এমন অশ্রুত দরবারির কতা কখনো শুনিনি। কলকাতা শহরে বড় মানব অনেকই আছে, কিন্তু আপনাদের মতন সং কাজে ব্যয় করতে জানে কজন? আপনি...

নবীনকুমার হাত তুলে এই সব অবাস্তব কথা বন্ধ করিয়ে দিয়ে বললো, আপনি ব্যাক্থা করেন, আমি কালকের মধ্যেই টাকা দিয়ে সইপত্তর করে সব পত্রিকা করে নিতে চাই। আমি মনে মালিক হলেও এ পত্রিকা চালাতে হবে আপনাকেই।

—আমি চালাবো?

—হ্যাঁ। আপনি একা না পারেন, গিন্নি যোগ্যে ডেকে নিন, কাগজের ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা আছে—আপনাদের সম্পাদনার তার কোন, খরচপত্রের ব্যয় সব আমরা। এ পত্রিকা কিছুতেই কথ হতে দেওয়া হবে না।

যে কথা সেই কাজ। নবীনকুমারের অধাকসারে কয়েকদিনের মধ্যেই হিন্দু পেট্রিষ্ট পত্রিকা আবার চালু হয়ে গেল। সেখানেই নিযুক্ত হলো না নবীন-কুমার। হরিশের স্মৃতি রক্ষার জন্য সে উঠ-পড়ে লাগলো। স্বদেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ হরিশকে

বাকি দেশবাসী ভুলে যায় তবে তার চেয়ে কৃতজ্ঞতা আর কিছু নেই।

কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে নবীনকুমার গঠন করলো হরিশচন্দ্র মেমোরিয়াল কমিটি। হরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থে বার বারসাধা দান করার জন্য আহ্বান জানিয়ে মনোপাধ্যায় ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশ করে বিতরণ করলো সে। এই স্মৃতিভণ্ডারের মাধ্যমেই মিল পাঁচ শত টাকা। কিন্তু দেখা গেল বার্ষিক সাধারণ মনুষ্য অনেকই এক টাকা, দু' টাকা, পাঁচ টাকা পাঠালেও বিশিষ্ট জনী বার্ষিক পাঁচ শত, হাজার টাকা মনের যৌথিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁরা কেউ আসলে কিছুই দিলেন না। নবীনকুমার তখন মেমোরিয়াল কমিটির কাছে এক প্রস্তাব দিল, হরিশের নামে এক স্মৃতি মন্দির নির্মাণ করা যাক, যেখানে প্রবেশ একটি গ্রন্থাগার, উৎসাহী ছাত্রের জন্য ব্যবস্থার সঙ্গে একই পাঠ্যবই পাঠ্যিক হল, যেখানে দেশীয় লোকেরা সভা-সমিতি করতে পারবে। এ বছরে স্থানীয় লোকেরে ব্যবহার উপযোগী একটিও হল নেই। এবং এই স্মৃতি মন্দিরের জন্য নবীনকুমার এখানে ব্যয়ভরণে দুই বিঘা জমি দান করতে প্রস্তুত আছে।

তবু কমিটির সভ্যদের বিশেষ কোনো উপসাহ দেখা গেল না। সকলেই যে-বার স্বার্থ সমল্যতে কল। চাঁদা বা উঠেছে তা অন্য কাজে লাগাবার জন্য একজন এক একরকম পরামর্শ দেয়। কমিটির সম্পদক কল্লাস পালের স্বাক্ষর আগ্রহ ও লোভ হরিশের পত্রিকাটি হস্তগত করার।

বীতশ্রদ্ধ হয়ে নবীনকুমার নিজেকে সত্যি সত্যি সেরা এই সব জাপার থেকে। হরিশের মতন স্বার্থত্যাগী মানবকেও বাকি মৃত্যুর পরেই লোকে এমন অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তা হলে এ দেশে আর সত্যিকারের আদর্শবাদ পুর্ন জন্মাবে কী করে? জীবিতাবস্থায় হরিশকে নিয়ে জ্ঞান মাতামাতি করেছে, বার্ষিক মৃত্যুতে গেয়েছে, এখন তারই কলভাবে খল, হ্যাঁ, হরিশ অনেক বড় বড় কাজে হাত দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু নিজেই অমিত্যাকর করে অকলে প্রাণটি ছেদিয়েছেন।

মেমোরিয়াল কমিটির সভা থেকে একদিন রূগত-ভাবে বেিয়েরে গিয়ে গাড়িতে উঠে নবীনকুমার মনে মনে কলতে লাগলো, কথ, পরকাল বল কিছু আছে কিনা জ্ঞানি জানি না, তুমি কোনো জায়গা থেকে আমার কতা শুনতে পারবে কি না তাও জানি না, তবু আমি বরাঁচ, আর যে-ই তোমার ভুলে থাক, আমি যতকল বেতে থাকবো, আমি তোমার কখনো একদিনের জন্যও কল্মুত হবো না। বন্ধু, এমনভাবে আমার একা ফেলে চলে গ্যালো।

নিজ গৃহে সার দিনের মধ্যে বোধ হয় একদণ্ডও কাটায় না নবীনকুমার। শোক ভুলবার জন্য সে নিজেকে যেন শত কাজেও মগ্ন ভূঁইয়ে দিয়েছে। শব্দে কাজ আর কাজ! সার্বিক বিনোদনের জন্যও সে যায় না কোথাও। হরিশের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গোই মল্লক-চাঁকের আঘাত কথ হয়ে গেছে, নবীনকুমারও আর মধ্য পন্ন করে না। সর্বজন সে লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত।

একেবারে মল্লক ভাষায় সে যে ছোট ছোট নকশা-গুলি লিখছিল, সেগুলি একসঙ্গে গিলিয়ে সে বই আকাজে ছাপিয়ে বার করে দিল নিজের নাম গোপন করে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-সমাজ একেবারে ডাম্ভাব। এ কার রচনা? এমন নিম্ন সভা, কল-বগম্বর সমাজচিত কার হাত দিয়ে বেরলো? টেটর-চাঁকুরের চেয়েও এ লেখার ভাষায় জোর অনেক বেশী। মহাজ্ঞাত অনুবাদের স্বাধীনতার ভাষা বার হাত দিয়ে রেখেছে, সেই কালির পক্ষে যে এমন তীক্ষ্ণ, তীব্র, চমকে লেগে শকলো লেখা সম্ভব, তা কার? সুদূরতম কল্মনাতেও এলো না। একই সঙ্গে নবীনকুমার দিল আবার নতুন নতুন প্রমাণ, আর মহাজ্ঞাতের কাজ তো চলছেই। নীলপর্ণ নাটকখানি প্রকাশ সফলকর নিশ্চিত হবার পর আর কেউ ভয়ে প্রকাশের ভাব নিতে চাইছে না, নবীনকুমার নিজ কায়ে নিজের মতলজ্ঞতা থেকে সেই বই ছাপার বার করে দিল।

পত্রিকাটির প্রতি বারের পাঠক-সমাজের

শিশুর খাবারে বৈচিত্র্য আনুন তাকে দিন  
সেরা চাল থেকে তৈরি এমন খাবার যা সহজে হজম হয়

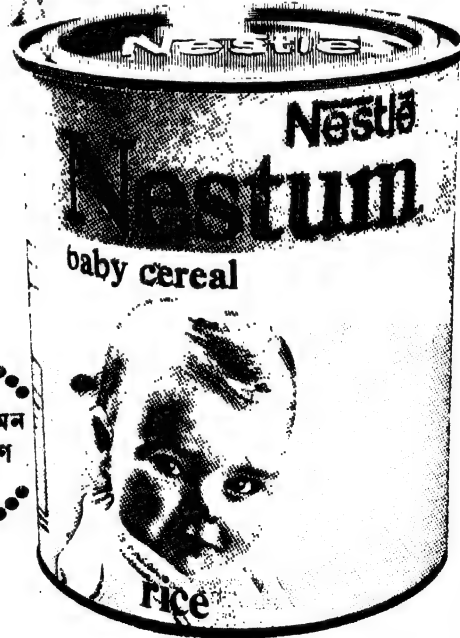


আপনার শিশু ৪ মাসের হলে একে  
কিছু শক্ত খাবার দিতে শুরু করুন।  
হার ওর পক্ষে সবচেয়ে ভালো শক্ত  
খাবার হল নেস্টাম বেরি সিরিয়াল  
সহজেই হজম হয়।  
চাল থেকে তৈরি এই খাবার খুব  
সহজেই হজম হয়ে যায়।

অসম্পাৰণ

প্রথমে ভুষের সঙ্গে মিশিয়ে নেস্টাম  
দিতে শুরু করুন—সেদ্ধ ফল, রাসা  
করা ও মাশড শাকসব্জী ও ডালের  
সঙ্গে মিশিয়ে নেস্টাম দিন।

**নেস্টাম**  
বেরি সিরিয়াল  
রাইস



সহজেই হজম করা যায়



খাদ্য নেস্টামে, নেস্টাম দিন ও  
কৃত্রিম সসম ভূত চালুন চালো করে বেশান  
এসু, ডাল  
খেতে দিন।

১১টি ভিটামিন  
ও আয়রনে  
সমৃদ্ধ

**NESTLE.**

SAAY/FSL/N/1554/BEN

হর আসে, তার স্বামী তার দিকে মনোযোগ দেবারই সময় পর না। রূপের আল দিগে ফেলা একটি বিশেষী লণ্ডন কিসের নবীনকুমার বা বাতাসের কাপটার নিব বার না। সেই লণ্ডন জেলের সে অধিক মাত্র পশ্চিম লোকপন্থর কাজ করে যায়।

সরোজিনী কিছুক্ষণ ধারের কাছে কুণ্ডিতার ভাঁপেই ঘাঁড়িয়ে থাকে। তারপর এক সময় স্বামীকে কাছে এসে আড়ম্বরে বলে, অনেক রাত হলো যে, আপনি একর মতো আসছেন না?

নবীনকুমার যথ্য না ফিরিয়েই বলে, আমার ঘোর হবে, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো তো।

সরোজিনী তবু জিজ্ঞেস করে, আপনার কত ঘোর হবে?

নবীনকুমার পাঠে নিমগ্ন থেকে অনমনস্কভাবে উত্তর দেয়, তার ঠিক নেই।

এক প্রহণ কালকর জিজ্ঞেস করলে নবীনকুমার হঠাৎ অত্যন্ত হতভম্ব হয়ে বলে সরোজিনী আর কিছু বলে না। নিম্নলিখিত আরও একটুকু ঘাঁড়িয়ে থেকে আসতে আসতে ফিরে যায়। তার স্মৃতি রেশমী বস্ত্র পরা, বাহ্যেই ফলের সাজ আর সারা শরীরে চন্দন সৌরভ মাখা সখী বর্ণ হয়। নিজের লবায় ফিরে গিয়ে সে ফাঁপিরে ফাঁপিরে কঁদে। কিছুদিন হলো তার পণ্ডিত দোকানটির কেন এমন পরিবর্তন হলো, সে কিছুতেই বুঝতে পারে না। আগের তো তিন অনেক কাজে ব্যস্ত থাকতেন, কিন্তু হঠাৎ পরন কয়েক সরোজিনীকে কাছে জেকে নরম সোহাগ স্বাক্ষর করতে প্রতিনিয়ম। নিজ নতুন কত না কৌতুক উজ্জ্বল করতে উঠে। কত না খুনসুটি! সেই মানসেই এই ক মাসে এমন বদলে গেলেন।

সরোজিনী এই নিরে তার মা ও দিদিকে কাছে কা কাটি করেছে। সকলেই মনে বিশুদ্ধ হয়। বাড়ির ভাইয়ে রাত কাটার না, বাগানবাড়িতে দীক্ষা পোষে নি, নিজ গৃহে থেকেও পানীর দিকে নজর দেয় না; এ আবার কেন দারি কণ্ড। এমন তো হয় না। হায়ল মনুষ্যের ওর কণ্ড ছিল, তার মনুষ্যে নবীনকুমার মনে আঘাত পেয়েছে ঠিক কথা, কিন্তু সেও তো হয়ে গেল কয়েক মাস। বয়টোহলে কণ্ড, মায় গেলে কোনো পুরুষমানুষ এমন মনমরা হয়ে থাকে? তা ছাড়া, এরকম সময়ে তো সবাই বরের মানসকেই বেশী করে খাঁড়ি ধরে।

সবাই সরোজিনীকে দোষ দেয়। সেই নিশ্চয়ই তার স্বামীকে বল করতে পারছে না। কে নথবা মেরে-মনুষ্য নিজের স্বামীকে সঙ্গে এক গরনকে থেকেও স্বামীকে কাছে পরে না, সে মেরেমানুষের মরগও জালো। দিগন্ত পরমর্শ ক্ষে, ওরে সরো, একদম হাত-আলগ দিল্লি, নাপটে ধর, দরকার হয় পারে পড়াই, একবার মন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে কেঁসেও কল পাবি না।

সরোজিনী সত্যই এক মধ্য রাতে ঘোড় এসে নবীনকুমারের পায়ে ঘাঁড়িয়ে পড়ে।

নবীনকুমার চমকে উঠে বলে, এ কি, এ কি!

সরোজিনী সবশেষে কহ, অলঙ্কার পরে, বলমলে

কোরলী শাড়িতে নবকুমার সরে এসেছে। কিন্তু তার চোখে জল। নবীনকুমারের পায়ে মাখা কুণ্ডিত কুণ্ডিতে সে কলসো, আজ আপনাকে বলতেই হবে, আমি কী দোষ করছি। কেন আমার দোকানেই আপনি হাত নেড়ে বলেন, চলে যাও, চলে যাও। আমি কি বিষ পিষে, আমার আপনার সহ্য হয় না? বলুন তবে, আমি আগুন কাঁপ খেয়ে মরছি।

নবীনকুমার টোঁকলের ওপর হস্ত বদ্ধ একটা কাগজ বিছিয়ে তার ওপর পেন্সিলের দাগ কেটে কী সব হিসেব করছিল। হাতের পেন্সিলটি সরিয়ে রেখে সে সরোজিনীর হৃৎখানি ধরে ওপরে তুললো। তারপর বিরক্তাপা ইং অস্থির কণ্ঠে কলসো, আম, সরোজ, কেন, ছেলেমানুষী করো। দেখতে না জরীম ব্যস্ত রইচি। কাজের সময় এ রকম বিরক্ত করে না।

সরোজিনী চোখের জল মুছে বলে হঠাৎ দাঁত হার বার। তারপর উঠে ঘাঁড়িয়ে কলসো, ঠিক, কাজের সময় কিংব করত নেই। আর আপনাকে কিংব করছি না। তবে আমার বা জিজ্ঞেস করতে বলছেন, রাত জেগে আপনি কী এত কাজ করেন, তা দিনের বেলা সারা বার না? এ রকম রাত জাগলে যে আপনার শরীর নষ্ট হবে। যারা পেটের ভাত জোঁটার জন্য কাজ করে তারও তো এমন দিল্লান্তির খাটে না। ভগ্নমানের কৃপার আমাদের অভাব নেই—

নবীনকুমার শুন্যেই হেসে কলসে, পেটের ভাত জোঁটার জন্য কৌ খাটতে হয় না ঠিকই, কিন্তু দল্ল ভাত জোঁটারে গেলে সময়ের হিসেব করে চলে না। আমি এখন যে কাজে হাত দিচ্ছি, সেটা তোমার কোমলোও বুঝবে না।

সরোজিনী কলসো, তবু কলন একটা, মা জানতে চেরেন।

—আমি বাজো দৈনিক অগচ্চ বার কাট।

—কী?

—এ যে বললুম, তুমি বুঝবে না। সাহেবরা ইংরেজীতে ভোল নাম পেপার খর করে, কখনো দেখেচো? লোকে সকালে জলখাবার খেতে করার আগেই ফেরিওলায়া কাড় কাড় সেই কাগজ ফিরে বার। আমি একর সেই রকম বার কাড়, কলসো ভোল নাম পেপার। তার নাম 'পরিদর্শক'।

এবারও কিছু দল্লপন্ন হলো কিন বোঝা গেল না। সরোজিনী তার স্বামীকে মথের দিকে একদৃষ্টে চেরে রইলো।

কতুত নবীনকুমারের এই নতুনতম উল্লমটি দেখে তার পরিচিত সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেছে। পর-পত্রিকা ব্যাপারে নবীনকুমারের আগ্রহ সেই কৈশোর থেকেই। কোনো পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে থাকে, সে সহ্য করতে পারে না। আর্থিক অনটনে কোনো পত্রিকা উঠে বাবার উপস্থান হলোই নবীনকুমার সেটি কিনে নিব আবার চালু করে দেয়। এমনকি একবার গরবান নামে একটি উল্ল পত্রিকার সম্পাদনার কাজ শরেন নবীনকুমার তৎক্ষণাৎ সেই পত্রিকাট রক্ত করে তার এক

মুসলমান কথক সেটি আবার দিয়ে দেয় চালা জন্য। দেবেদননাথ ঠাকুরের সুবিধায় উত্তরোত্তর পত্রিকাও সে একটি মূদ্রণ কত্র কিনে উপ দিয়েছে। কিন্তু এবারের ব্যাপারটি সব কিছুকে ছাড়ি বার। দুই হাতশ মিলে পরিদর্শক নামে এ উজ্জ্বলপত্রী পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং কয়েক পরেই তাহার সামর্থ্য ও উল্লাহে ভাটা পড়ে। নব কুমার অর্মান সেই পত্রিকার স্বয় কিনে নিয়েছে। এটা সে নিজেরি চালাতে চার দৈনিক পত্রিকা হিসেব জালের অজর দৈনিক পত্রিকা, তাও একুল ক বরেনের ব্যবক তার সম্পাথক। এ যে ইচ্ছা গ মশাইকেও টোকা দেবার চেষ্টা।

পত্রিকাটির প্রকাশ করে থেকে শুরুর হবে ঠিক নেই এখনে, তবে কয়েকদিন পরেই প্রকাশ সেই পত্রিকা সজ্জান্ত হিসেব কিয়ে চলছে। সকলে থাকল, নবীনকুমারের বখন একরর বোঁক চেপে তখনও পত্রিকা সে বর না করে ছাড়বে না। একটা মহাভারত অনুবাদের মতন কিশাল কাজ, অন্যটি দৈনিক পত্রের প্রকাশ।

নবীনকুমার সরোজিনীকে দৈনিক পত্রের ব্যাপার কোমলার চেষ্টা করছিল, মধ্য পথে হঠাৎ সরোজি কলসো, আমি একটা কথা জিজ্ঞাস করবো?

—হ্যাঁ।

—আপনি কুসোমাদিসির বের জন কত ব হলছিলেন, কত আপনার উৎসাহ, সেই কুসোমাদি অম্বাদের এ বাড়িতে কটনন হয়ে এলো, আর আপ জর সঙ্গে একটাও কথা বলেন না কেন?

প্রশ্নটির আকস্মিকতার নবীনকুমার থমকে গে ৬ক; তারকা দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার। নিম্ব ফো লতক হয়ে গেল।

তারপর সে বললো, তোমার কুসোমাদিসির বি হবার দরকার ছেল, কির হয়েছে ...ভালো চরিত্রে আমরা সবাই হলী হরিচি...

—আপনি কুসোমাদিস-বউতানের সঙ্গে একাধি কতা কলেন না...এ বাড়িতে এলো...

—আমি কাজে ব্যস্ত, আমার এখন কারুর সঙ্গে কতা করার সময় নেই। তোমার সঙ্গেও তো ক কইতে পারি না।

—কুসোমাদিস-বউতান সুখোজিলেন, তিন আপনার কী বলে ডাকবেন, ঠাকুরপো না আমার মং মিতেনীর কর?

—ওনার বা শুনী তাই ডাকবেন...আমি কী জানি

—আপনি তালে অজ্ঞও এখন শুরতে থাকেন না আমি বাই?

—হ্যাঁ।

সরোজিনী চলে যাবার পর নবীনকুমার আনিকশ বিকল মূখে গর হয়ে কসে রইলো। তারপর বরক করে কাপতে লাগলো তার শরীর, ঠিক অভ্যাধি জ্বরতন্ত রোগীর মতন। চক্ষুর থেকে নেমে সে ছুঁতে ওপর শুরে পড়লো টানটান হয়ে। তার শরীরে একেবারে অতল থেকে কতর দল্ল বোঁকো আসল লাগলো, আর। আর।

(ক্রমশ)



# মধুশ্রেণীকে ধন্যবাদ!

## তার জন্মেই তো আমি কেমন বীরপুরুষ আর এমন ফুর্তিবাজ!

মায়ের সতর্ক যত্ন আর সজাগ র্নেহ মিশে  
তৈরি হল শিশুদের এই দুধাহার—  
মধুশ্রেণী। সুখম, ডিটামিনে ভরপুর,  
সহজপাচ্য। দুধের যাবতীয় গুণের  
খুঁটিনাটি পরীক্ষার পর অতীৰ স্বাস্থ্যসম্মত  
উপায়ে প্রস্তুত। সুতরাং এতে অবাক  
হবার কিছুই নেই যে আপনার বাচ্চাটি  
মধুশ্রেণী দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে...  
ভালবাসবে শুধু মধুশ্রেণীকেই!



জননীর র্নেহ আর পুষ্টিটির উপাদান মিশ্রিত  
রয়েছে মধুশ্রেণী-র প্রতিটি কৌটোয়।





## জগদীশ গুপ্ত অনিশ্চিত

জগদীশ গুপ্তের সঙ্গে আমার যখন প্রথম দেখা হয় আমি তখন স্কুলের ছাত্র। টিফনের পরলা জমিরেও তখন বই কিনতে পারতাম না। কারণ বাড়ি থেকে টিফনের পরলা পৌঁছাই নেই। লোকের বাড়ি বাড়ি দিয়ে যারা পুস্তক বই-পত্রিকা, শিশু-কোডল খোলা জের কিনে আনে, টালাগজ বাজারের কাছে এ রকম কিছু ফেরিওয়ালার আস্তানা ছিল, এখনও আছে। তাদের কাছ থেকে পুরনো দু-একখানা বই-এর সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার একটা পুরনো শারদীয় সংখ্যা পেরেছিলাম। তার মধ্যে একটা গল্প ছিল। একটি পণ্ডিতের কাছ লেখকের নাম : জগদীশ গুপ্ত। আমাদের স্কুলের বাংলার মাস্টার মহাশয়-এর মতো বা অন্য কারও কাছে এই লেখকের নাম তখনও শুনিনি।

গল্পটি পড়েই মনে হলো, এ ধরনের গল্প আগে পড়িনি জে। কিছুদিন পর আমাদের প্রতি-বেশী দুঃসাদা বন্ধন তাদের ঘরদোর আরমোলামত করার জন্য পুরনো বই, কাগজপত্র গ্রাঙ্ক তখন আবার জগদীশবাণুর সঙ্গে দেখা হলো। মলাট ছেঁড়া একটা বই-এর নাম : 'শাস্ত্রিক কবিরাজের স্ত্রী', লেখক আমার সেই জগদীশ গুপ্ত। এইটি কয়েক দিনের জন্য ধার চাইতে দুঃসাদার স্ত্রী সঙ্গে সন্ধ্যা রাত্রী হলেম আর দুঃসাদা ইতস্তত করে বললেন, পড়ে আবার ফেরত দিন।

বইটা পড়ে ফেরত দেওয়ার সময় আমার এক বন্ধু যেমন সব বই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তেমনি জিজ্ঞেস করল, বইটা যেমন রে?

আমি কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। শাস্ত্রিক কবিরাজের স্ত্রী বইটা ভাল কি ভাল নয় আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না। এ বইটা এ রকম নয় পড়তে মজা লাগে। পড়তে পড়তে মনে করণ রসের সঞ্চার হয় এ রকমও নয়। টের পাচ্ছি, এই গল্পগুলোয় মধ্যে এক ধরনের অজ্ঞান আছে, যা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আমার মধ্যে নেই।

পরবর্তীকালে এ বইটির সোঁজ করিছি। কিন্তু এ সকলনের মাত্র কয়েকটি গল্প নতুন করে পড়ার সুযোগ হয়েছে। বাকি গল্পগুলো জগদীশ গুপ্তের অনেক গল্পের মতোই এখন প্রায় দুঃসাদা।

'শাস্ত্রিক কবিরাজের স্ত্রী'র নতুন করে পড়া গল্পগুলো সম্পর্কে আমার বর্তমান প্রতিভ্রাণভাবে প্রকাশ করে যার, জগদীশ গুপ্তের গল্প মন ভাঙিয়ে দেয় না বরং যেন একেবারে নিঃশব্দ করে যার। জগদীশ গুপ্তের গল্প 'স্পন্দ' করে বা চমকে দেয় বললে যেন ঠিক বলা হয় না, তার গল্প আমাকে যেন বিমুগ্ধ করে রাখে। আমি নিজেও বিমুগ্ধ মনে করি।

কোন লেখক সম্পর্কে বাঙালী পাঠকরা যে ধরনের বিশেষণ ব্যবহার করতে ভালবাসেন, যেমন, ধর্মী, মরমী—এ সমস্ত কোনো বিশেষণ জগদীশ গুপ্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না মনে হয়। এ রকম একজন লেখক যদি তার পুস্তকে আঘাত করে তখন যে জনপ্রিয় হবেন না তদন্তে আর বিস্ময়ের কি আছে?

জনপ্রিয় লেখা সম্পর্কে জগদীশ গুপ্তের ধারণাটা কি রকম? প্রভাত যুগোপাধ্যায়ের গল্প প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন : 'ভাষার গল্পগুলিতে যে শান্ত্রী এবং সরসতা আছে তাহা চিরকাল রসগ্রাহী উপভোগ্য হইয়া থাকবে। ...মস্তক উদ্দেশ্য লইয়া নিজেকে বিশ্বসাহিত্যের সহিত সংশ্লিষ্ট মনে করিয়া কিংবা কেমনে অন্তরগত কি ব্যবহারগত সমস্যা লইয়া তিনি অকুতোভয়ে গল্প লেখেন নাই। মানবের আত্মক অবস্থাটা যাচা চার তাহাই তিনি তার মনের পাশে পুঁজি করিয়া যিহা পটভূমির করিয়াছেন। ...

দুঃসাদা রসের ব্যতিক্রমী সুলভ এবং অস্বাভাবিক জিনিস মনে।'

কিন্তু জগদীশবাণু নিজে কখনও এ রকম 'দুঃসাদা' গল্প লিখতে আগ্রহী হয়েছেন বলে আমার জানা নেই। গল্পে 'শান্ত্রী' বা 'সরসতার' চর্চাও তিনি করেননি। তার গল্পপাঠে তথাকথিত 'মনের পাশে পুঁজি' হয়ে ওঠে না। বরং আমার সব কিছু হারিয়ে যেন সবদিকের বহুখণ্ডিত হই। তার নিজেরই কথায় তিনি লিখেছেন, 'পত্রীর উদ্দেশ্য লইয়া নিজেকে বিশ্বসাহিত্যের সহিত সংশ্লিষ্ট মনে করিয়া কিংবা কোনো অন্তরগত কি ব্যবহারগত সমস্যা লইয়া.....অকুতোভয়ে।'

সেজন্য তার একটি উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি লিখতে পারেন, 'ইহাতে স্টট নাই—আমার বস্তু বাস্তব করিয়াছি মাত্র, গল্প তৈরী আমার উদ্দেশ্য নয়।

উপন্যাসসুলভ গল্পের বস্তুসংস্থান বা পরিপূর্ণি ইহাতে নাই।.....তিনিটি ব্যক্তি এবং এখানে একজনের আনন্দের উদ্ভব এবং লয় দেখান হইয়াছে। ঘটনা পরস্পরের সাহায্যে উহা দেখাইতে হইয়াছে। ঘটনাবলিও পরস্পর বিচ্ছিন্ন। ...

উপন্যাস বা গল্পের সংজ্ঞার অধীন আনিয়া উহাদের বিচার না করিয়া প্রবন্ধ হিসাবেই যদি কেহ ইহাদের বিচার করেন তবে আমি বিস্মিত হইব না।'

অন্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শেষের পরিচয়'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে জগদীশ গুপ্ত কঠোর মন্তব্য করেন : কথালিপি শরৎচন্দ্র তার পাঠকবর্গকে চিনিতেন; তাহাদের কুণ্ড করিতেই তিনি সারসার সৃষ্টি করিয়াছেন। ... গল্পের যখন শুরু তখন সবিতার বয়স 'পরিশিষ্ট-চরিত্র—বলা চলে, সে প্রৌঢ়। রমণী শু আঁত প্রৌঢ়। এই শ্লথ এবং লোল প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার যৌন আকর্ষণের বেগ পাঠকের মনে তেমন তীব্রতা লাগাইতে পারে না—সুতরাং একটি বৃক এবং একটি মূবতী চাই। পাঠককে স্পৃহাভূত রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় সেই বৃক-মূবতী হইতেছে রাখাল আর সরলা।'

শরৎচন্দ্রের শেষের পরিচয় সম্পর্কে এই মন্তব্য পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ এখানে নেই কিন্তু জগদীশ গুপ্ত পাঠকদের 'কুণ্ড' করতে বা 'স্পৃহাভূত' রাখার ব্যাপারে কখনও বন্ধ নেননি। আমরা তা জানি। কোনো প্রকাশক তার একটি উপন্যাস আকারে বাড়িতে আর 'অংশবিশেষ অপেক্ষাকৃত অধিক রসযন' করে তুলতে ছেলেছিল। উত্তরে জগদীশবাণু বলেন, 'যে উপন্যাস যেখানে যখন সমাপ্ত হওয়া প্রয়োজন



কোন কোন কথালিপি লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয় তবে জগদীশ গুপ্তও মনে হয় পাঠকবর্গকে চিনতেন। 'সাহিত্য ক্ষেত্রে চিত্রবর্ণনা অনেক কাছের' তিনি যে 'অনিশ্চিত' তা তিনি নিজে ভাষাচার্য করেছেন। মনে হয় সেজন্যই অল্পকালে অন্তিমানে তিনি 'শাস্ত্রিক কবিরাজের স্ত্রী' গল্প সংকলনটি 'সমান ধর্ম'বোধে উৎসর্গ করেছেন।

'শাস্ত্রিক কবিরাজের স্ত্রী'র গল্পের ভাষা ভাষাতে আমারের চেয়ে পূর্বে লেখক নিলি-স্ততা এক হয়তো কিছুটা নিষ্ঠুরতা। মনে লেখকের গল্প বা উপন্যাস পড়তে গেলে অধীনে মনে হয় তার চরিত্রদের সঙ্গে তিনি যেন একান্ত ভাষার সোকে তিনি বিহীন হন, আনন্দ উদ্ভাস কখনও আবেগে অস্তিত্ব। কিন্তু জগদীশ গুপ্ত যে নিলি-স্ততা একই দৃষ্টি থেকে চরিত্রদের দেখেন 'ভরণ্য হইতে ভরণ্য' গল্পের বস্তু সম্বন্ধে পাঠকদের তিনি অবহিত করেন এইভাবে : 'স্বাধমক কাহিনী বস্তু মনে হইতো, এ-কল্পার সময় রূপের সুভাষা ধমক মনেদের কী আছে?

'তারপরই সে জলের কথাও ভুলিয়া বাইতো ধমকের কথাও ভুলিয়া বাইতো, বহন করিবার মতে বিশূল বন্ধ বস্তু নাই।'

'কিন্তু প্রথমা স্ত্রী গুণবতীর কথা তার সমগ্র ভাবে মনে আছে—যেমন একটি পিড়ার অকুণ্ড বস্তু কথ্য মানবের দৈবাৎ মনে থাকিতে পারে।... মনে থাকিতেই, যে বিবাহের বিবাহ করিলো... মিত্রীরা গিরিজাকে বিবাহ করিয়াও যে প্রথম গুণবতীকে ভুলিলো না.... এবং না-ভুলিতেই একী পুত্র সন্তান গিরিজার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলো।'

জগদীশ গুপ্তের পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে 'নিস্পৃহতা', 'নিলি-স্ততা' নিয়ে হট্টোলের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। অবজোড়িত দৃষ্টিভঙ্গির কথা অতি সাম্প্রতিক কালের আগে বিশেষ উচ্চারণ হয়নি। সেই অবজোড়িত দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিলি-স্ততা জগদীশ গুপ্তের লেখার যে স্বাভাবিকভাবে বর্তমান। মনে রাখতে হবে তিনি কল্যাণ বৃগের অধিকাংশ লেখকের চাইতে ৮-১০ বছরের বড় ছিলেন এবং তার প্রথম গল্প সংকলন 'কিনোদীপী' প্রকাশিত হয় আর থেকে প্রায় তিনপাশ বছর আগে অর্থাৎ কিম্বদন্তি বন্ধক।

একটু আগে জগদীশবাণুর দূর থেকে নিজে চরিত্রদের দেখার কথা বলছি। এমন কি চর্য সবদিকের বর্ণনার সময়ও তিনি যেরকম নিলি-স্ততাভাষে যে ভাষার পরিবর্তে বা ঘটনার বিবরণ যেন তাতে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। 'শাস্ত্রিক কবিরাজের স্ত্রী'র অন্তর্ভুক্ত নয় এক একটি গল্প অব্যাহতভাবে একটি বন্ধা ছেলেদের তার বাবার উপনিষদে কুমারের ধরে নিয়ে যার। গল্পের নাম : 'দিকের শেষে', ছেলের নাম : পটু।

'যখন ওপারের কাছাকাছি পাঠক পুনর্বার দেখা গেলে তখন সে কুন্ডারের মধ্যে, নিচুলা... জনতা হায় হায় করিয়া উঠিলো। পটুর মতো পাতুর হয়েছে উপর সূর্যের শেষ রক্তাশ্মি জ্বলিতে লাগিলো...দূর থেকে জলক নিবেদন করিয়া লইয়া কুন্ডার পুনরায় অব্যাহত হইয়া গেলো।'

জগদীশ গুপ্তের আলোচনা প্রঃ অব্যাপক আলিঙ্গন রাস থাকে ... মন 'সরসাদী শান্তি' মোহিতলাল মজুমদার যে প্রঃ ... মন 'একটা অতিশয় দরহীন ও দুঃখের দৈব-নির্ভরতা

প্রকাশিত হল

# সমরেশ বসুর

সেই বিখ্যাত উপন্যাস

## গঙ্গা

নতুন মুদ্রণ ॥ দাম : ১৫.০০

## মূল্যবোধ গঙ্গাপাধ্যায়ের

প্রথম লেখা উপন্যাস

## যুবক যুবতীরা

নতুন মুদ্রণ ॥ দাম : ১৪.০০

রুদ্ধস্বাসে গড়ার মতো বই

## জমস হেডলী চেজ

## অর্কিড ভিল

দাম : দশটাকা

সমরেশ বসুর  
অন্যান্য বই

শ্রীমতী কাফে	১৬.০০
ভানুমতীর নবরঙ্গ	১৪.০০
বিকালে ভোরের ফুল	৬.০০
নাচঘর	৮.০০
কুন্তী সংবাদ	৮.০০
ছুটির ফাঁদে	৮.০০
রামনাম কেবলম	৮.০০
তিন ভুবনের পারে	৬.০০
ছেঁড়া তমসুক	৬.০০
বিপরীত রঙ্গ	৬.০০

মোসুমী প্রকাশনী

১এ কলেজ রো \* কলকাতা ৯

বহুলা ধনসম্পন্ন ভাঙাঘরে...মানুষ তবুই যেন এক  
অসহায় শিকার—এই লেখকের কথিকালে যত্নপূর্ণ  
এই বেন পটভূমি।

‘শশাঙ্ক কবিরাজের স্টা’র একমুখ গল্পেও  
আমরা দেখব ভয়ঙ্করের যুগোন্মুখি হওয়া, দেখব  
মানুষকে অসহায় শিকার হতে। দেখতে পাব,  
কত কিভাবে ‘কালোর শীমাহীন প্রাচীনত্বের আর  
গ্রীষ্ম’তার সঙ্গে একাকার হইরা বিলীন হইরা  
হাইডেছে...গিরিজা তার স্মৃতিস্মৃতি বর্ণের একটি  
অতি সংকীর্ণ শীমাবন্ধ স্থানের ভিতর ঘুরপাক  
খাইয়েছে.....’

দেখতে পাব ‘অপছন্দ আকল-কুসুম’ গল্পে  
উজ্জ্বল চৌধুরীর ‘অতীত দিনের ভিতর ঘূর্ণিত  
সংজ্ঞা হঠাৎ ধড়ফড়াইয়া মাগিয়া উঠিলো....’

উজ্জ্বল চৌধুরী অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলো;  
নিজের কাছেই সে জানিত চাইলো, তবে কি আমি  
যুগো হইয়াছি?’

‘জগদীশ গুপ্তের গল্পে (এবং উপন্যাসে)  
‘স্বভাবসিদ্ধ ইতর’ আর ‘কোমরবন্ধা শরতাবনে’-  
এর অভাব নেই।

প্রসিদ্ধ দরদের মধ্যে নয়, মমতা ছাড়াই তিনি  
অশ্রুত শক্তির অধীন অভিশপ্ত, নির্বোধ—নানা  
প্রকৃতির মানবের ক্রিয়া, প্রতিজ্ঞা দেখিয়েছেন। তার  
পরি-পার্যায়ের মধ্যে নিষ্ঠুরতা, নিবৃণ্ণতার অভাব  
নেই। তারা উচ্চ-অনুচ্চিত্তের সমস্যার অধীন হয়  
না। অনুশোচনায় অস্থির নয় তারা। এখানে  
মাটিকে মাটি বলেই দেখানো হয়েছে। কোনরকম  
ভাবালুতা প্রশ্রয় পায়নি। এইরকম জগদীশ গুপ্তের  
অর্থ। এই তার সাহিত্যের অন্তর্গত বাস্তবতা।

কিন্তু যতই প্রশ্রয়হীন অনাচারের মতো যুগ  
করে জগদীশবাবু তার চরিত্রের অজ্ঞতা, দুর্বৃত্তা,  
দুর্বলতা, সংকীর্ণতার কথা বলেন না কেন, আমরা  
টের পাই তারা বড় অসহায় এবং পাঠক হিসেবে  
আমরাও কখন অবলম্বনহীন হয়ে পড়ি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে অন্ধকারের  
কথা আছে। কিন্তু তা প্রথম ধৃষ্টতে বেরিয়েছিলেন  
জগদীশ গুপ্ত। তবে এই অন্ধকার, এই বাস্তবতাকে  
মানিকবাবু অন্য এক আদর্শের চশমা পরে দেখে-  
ছিলেন।

জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত  
লিখেছিলেন, ‘সত্যেজ, সজীব লেখক, বৈশিষ্ট্য-  
সম্পন্ন। দুর্দান্ত সাহসে অনেক উদ্ভাসিত গল্প  
লিখিয়েছেন। বয়সে কিছু বড় কিন্তু বোধে সমান  
তন্তুজ্বল।’

তিনি কোনদিন ‘কল্লোলের অফিসে যাননি।  
‘অনেকের কাছেই তিনি অদেখা হয়তো বা অনু-  
পস্থিত...অর্থনৈতিক সাহিত্যের নথিতে তিনি একটা  
বড় রকমের বেগ।’

সাগরময় ঘোষ তার ‘সম্পাদকের বৈঠকে’  
বইটিতে জগদীশ গুপ্ত কি করে লেখক হলেন তার  
একটা মজাদার গল্প বলেছেন।

(জগদীশবাবু) ‘গলার স্বরটা কিংবদন্তি মূর্খ  
করে বললেন—আমার গিন্নীই আমাকে লেখক  
বানিয়ে ছেড়েছেন।’

ব্যাপারটা হলো একদিন রোগে গিয়ে ‘গৃহিণী  
বললেন, বলব আর কি। চোখে দেখতে পাওনা  
রোজ সকালে কুড়োম না করে নিয়ে গিয়ে হাট-  
বাজারটা করলেও দু’পয়সা সাশ্রয় হয়।’

‘আমার মাঝার বন্ধুত্ব।’ এই বাছুর টাকার  
জগদীশবাবুর ঘরে একমুখ নয় না। বোলপূরের  
বাজার তার বাড়ি থেকে মাইলখানেকের পথ। পথে  
হুগো, বাজারে ভিড়ে লেটলোপেট তার ওপর আছে  
এক পয়সা কমাবার জন্য দরদারি কর। তা ছাড়া  
আদালতে বাওয়ার আগে সকালের সমকটাই তার  
নিজস্ব। তবে বাজারে যেতে-হয়। কলে গিন্নীর দু-  
চার পয়সা সাশ্রয় করতে গিয়ে নিজের বাড়ি-  
সিগারেটের পরসার টান। দরদারি কর কন্ডাট এড়াতে  
নিজের পকেটের পরসার টান। পাশের বাড়ির

মোড়ারবাড়ির সঙ্গে বামোয়ালিলা কখন-কখনো  
দরদারি করে সম্প্রতি। প্রজ্ঞা করছেন যুগে-এই  
মোড়ারবাড়ির স্টা বাড়ির চাকরকে বন্ধুত্ব করে  
স্বামীকেই বাজারে পাঠিয়েছেন। অস্বাভাবিক জগদীশ-  
বাবুর স্টার সঙ্গে প্রবাহিত কল্যাণ। তার মতো ভী-  
তরকারি গৃহিণীর আর পছন্দ হয় না। ‘অধিনে  
বখন প্রায় ফেরা ধরিয়ে দেবার উপক্রম, হঠাৎ মাঝার  
একটা যুগ্মি খেলো পেলো। ... একদিন আদালত থেকে  
একগাদা নীলপাশ বাসিন্দা বৈঠকে বাড়ি নিয়ে এলো।’  
স্মৃতি বলা হলো, ‘আদালতের কাজ। বামোয়-  
মোকদ্দমা অনেক জমে গিয়েছে। মাজিস্ট্রেটের কড়া  
হুকুম। তাড়াহাড়ি ঢুকিয়ে দেওয়া চাই।’

গিন্নী জানতেন জগদীশবাবু রাতে চোখে কয়  
দেখেন। অতএব সকালেই এই কাজ করতে হবে।  
বাজার করার হাত থেকে মুক্ত পাওয়া গেল। কিন্তু  
‘রোজ সকলে ষষ্ঠার পর ষষ্ঠা আদালতের নীলপাশ  
বাটা তারও তো মানসিক কষ্টের কথা নয়। শেষে বাবা  
হয়ে লিখতে শুরুর করে দিলাম। রোজ সকালে বসে  
লিখি, গৃহিণী ভাবেন কত। আমার আপসের কাজে  
কী ষাটাই না ষাটছেন।

লিখতে লিখতে একদিন নিজেই আবিস্কার  
করলাম যে একটা ছোটোগল্প লিখে ফেলোছি।  
গিন্নীকে না জানিয়ে গোপনে লেখাটা পঠিয়ে  
দিলাম পঠিকার সম্পাদকের নামে এক তা যথা-  
সময়ে প্রকাশিত হল।’

বালা ভাষার একজন প্রধান লেখকের বাবা  
শুরু হলো। কিন্তু তার প্রথম বই ‘বিনোদিনী’  
পাঠক-ক্রেতাদের কিরকম সন্দেহনা পেয়েছিল?  
‘বিনোদিনী’ ছাপানোর টাকা কোনো এক কানুবা-  
বু দিয়েছিলেন। বইটির কয়েক কপি ‘একে-ওকে’  
দেওয়া হলো। ‘অবশিষ্ট ছাপারখানেক বই আমার  
আর কানুবা-বু ‘বিনোদিনী’ প্যাকি বাজার ভিতর  
রহিয়া গেল; পরে কীটে খাইল।’

জগদীশবাবুর প্রথম বই যে কীটের খাদ্য  
হয়েছিল তাতে আমরা খুব বিস্মিত হই না। মনে  
হয় জগদীশবাবুও হাবনি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের  
একটি লেখা প্রসঙ্গে তার মন্তব্য: ‘তিনি একটি  
জকপট সত্য অতি সুন্দর করিয়া বলিয়েছেন,  
জগদীশবাবু সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণশীল অনেকের  
কাছেই ‘অনুপস্থিত’। ‘অনুপস্থিত’ লক্ষ্যটি আমার  
সঙ্গে পাঠকের যোগাযোগটি চমৎকার নির্বিশেষভাবে  
দেখাওঁয়া দিয়েছে।

পাঠকের কাছে তার অনুপস্থিতির কথা  
জগদীশবাবু জানতেন। তবু ‘বিনোদিনী’র বহুর আট  
পরে প্রকাশিত ‘শশাঙ্ক কবিরাজের স্টার উৎসর্গ-  
পরে সমান ধর্মার কাছে পৌঁছানোর স্বাভাবিক  
কমন বাজ হয়। এই উৎসর্গের প্রায় পরজাগ্রিত বহুর  
পরেও আমরা দেখতে পাচ্ছি পরিস্থিতির বিশেষ  
পরিবর্তন হাবনি। কেউ বলতে পারেন, কানু নিরবধি  
ইত্যাদি। কিন্তু পাঠক সম্পর্কে আমরা অজ্ঞতা  
আমাকে বেশী অশাব্যাসী হতে শেখো।

সুদূর সেনগুপ্ত

## পরমানন্দ সরস্বতী

বিশিষ্ট কবি মণিলালপ্রসিদ্ধ দাম, যিনি একদা  
বৃন্দাবন বন্দু সম্প্রদিত ‘কবিতা’ পত্রিকার মণিলা-  
লপ্রসিদ্ধ নামে কবিতা লিখতেন, সম্প্রতি কবিতা  
৬৫ বয়স বয়সে দেহরক্ষা করেছেন। পরবর্তীকালে  
তিনি সাধক গ্রন্থের প্রবেশ করেন এবং গ্রীষ্ম  
পরমানন্দ সরস্বতী নামে পরিচিত হন। দীর্ঘকাল  
তিনি এই নামেই ‘কবিতা’ লিখেছিলেন। প্রেমেন্দু  
মিত্র এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্যের দ্বারা সম্পাদিত ‘কবিতা’  
এবং নিরমিত ‘কবিতা’ ও ‘নিরমিত’ পত্রিকায় কবিতা  
লিখতে থাকেন। তার সব প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘আকাশ’  
প্রায় চার দশক পূর্বে প্রকাশিত হয়। সেই থেকে  
এ পর্যন্ত তার প্রায় কুড়িটি গ্রন্থ বিভিন্ন সময়  
প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখের মারী  
রাজ ‘দিশমত’ ‘উত্তর বসন্ত’, ‘নিরমিত স্মৃতি’



## লীলা মজুমদার রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ২৫০, দ্বিতীয় খণ্ড ২৫০,  
তৃতীয় খণ্ড ২৫০

লীলা মজুমদার

তিনি যখন শিশুদের জন্য লেখেন  
তখন তাঁর কলম প্রত্যেক  
আকারে অকারে তাদের জন্য  
আনন্দময় ইচ্ছাশক্তি রচনা  
করে। ... আমলবাজার পত্রিকা

লেখিকার আরও বই :

গুপীর গুপ্তখাতা ৫, বহুকণী ৫,

ভূতের গল্প ৬, মণিমালা ৫,

এই যা দেখা ৫,

সব সেরা গল্প ৫, নাকুগামা ৪,

লীলা মজুমদার সম্পাদিত

## হ্যাস অ্যান্ডারসন রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ২৫০, দ্বিতীয় খণ্ড ২৫০

হ্যাস অ্যান্ডারসন

হ্যাস অ্যান্ডারসন

ছোটো টুকোর কথা ৫, ছোটো

জলকলার কথা ৫, তুমার-

হানীর কথা ৫, সব সেরা

গল্প ৪৫০

লীলা মজুমদার সম্পাদিত

## উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ৩৫০, দ্বিতীয় খণ্ড ৩৫০

উপেন্দ্রকিশোরের অন্যান্য বই :

ছেলেদের রামায়ণ ৪,

টুনটুনির বই ৫, ছেলেদের

মহাভারত ১০, গুপী গাইন

বাঘা বাইন ৫, গল্পমালা ৫

অবন ঠাকুরের

ছোটদের সম্ভার ২৫০

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি  
৪/১০০ কলকাতা স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭

তাই! অসম্ভাব্য এক কিউরার আন্তর্জাতিক হকিতে  
কোন স্থানই নেই। জয়, পৃথু, রাশিয়াকে। কারণ,  
স্বদেশে এক প্রি-অলিম্পিক হস্টকার রাশিয়ার কাছেই  
ভারতকে হার স্বীকার করতে হয়েছে। আর ভয়  
আস্ট্রে টাফের খেলায়। মস্কোর হকি খেলা হবে  
আস্ট্রে টাফের, যে টাফ খেলতে ভারতীয়রা অভ্যস্ত  
নয়। তা ছাড়া, আস্ট্রে টাফের দৈহিক সামর্থ্য এবং  
গতিবেগে হার খাবারও আশঙ্কা আছে। অবশ্য ভারতের  
উপর এক ট্যাগেটের উপর জোর দিয়েই ভারতের দল  
গড়া হয়েছে। তাই আশা করা যেতে পারে, তিনটি  
অলিম্পিকের পর ভারত আবার হকি স্বর্ণপদক  
পুনরুদ্ধার করবে।

হকি দলে যারা আছে :

গোলকিপার—বি এস ছেট্রী (বাংলা) ও আলান  
সেরোফন্ড (সার্বিসেস);

ব্যাক—রাজেন্দ্র সিং (রেলওয়েজ), দেবীন্দ্র সিং  
(পাঞ্জাব) ও ডুংডুং (সার্বিসেস);

হাফ ব্যাক—গুরুমল সিং (পাঞ্জাব), রবীন্দ্র সিং  
(উত্তরপ্রদেশ), ডি ডাকবিশ—অধিনায়ক (রেলওয়েজ) ও  
এম এম সোমায় (বোম্বাই);

ফরোয়ার্ড—চরিত্র কুমার (পাঞ্জাব), এম কৌশিক  
(বোম্বাই), অমরজিৎ সিং (ইউনিভার্সিটিস), সুকিন্দার  
সিং সোধি (পাঞ্জাব), মার্ভিন ফার্নান্ডেজ (ইন্ডিয়ান  
এয়ার লাইনস), জাফর ইকবাল (ইন্ডিয়ান এয়ার  
লাইনস), মহম্মদ শাহিদ (উত্তরপ্রদেশ)।

কোচ—বালকরণ সিং।

মেয়েদের হকি

অলিম্পিক মেয়েদের হকি প্রতিযোগিতা হচ্ছে এই  
প্রথম। যেকোনো দেশ গেমস কর্তৃক করার ভারতের  
মেয়ে দলের অংশগ্রহণের সুযোগ ঘটেছে। মেয়েদের  
হকিতেও খেলবে ছয়টি দেশ—সার্বিসেস, ইন্ডিয়ান  
আর্মিলিয়ার, পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, ভারত এবং  
জিম্বাবুয়ে।

মহেন্দ্রাজে বিদেশের মেয়ে হকি দল ভারত সফরে  
এলেও এবং ভারতের মেয়েরা বিদেশে খেলতে গেলেও  
হকিতে ইউরোপীয় মেয়েদের দল ভারতের মেয়েরা  
এখনো পট্টে হয়ে উঠতে পারেনি। কঠিন প্রতিযোগিতা  
জনা যে প্রস্তুতি এবং অনুশীলন ও সাধনার প্রয়োজন  
ভারত অভাবে আছে। ভারতে মেয়েদের হকি খেলা  
এখনো শব্দের পর্য়াই আছে। সুতরাং, ফল সম্পর্কে  
কেউই আশাবাদী নয়। দলে আছেন :

গোলকিপার—মাগ রেটে তসকানো (রেলওয়েজ)

হোতাধিক কগলী বা ব্যাজিয়া জাইদি (উত্তরপ্রদেশ);

ব্যাক—গোপালী ভান্ডারী (রেলওয়েজ), সুধা  
চৌধুরী (উত্তরপ্রদেশ), ও হরপ্রিত গিল (কিব-  
বিদ্যায়);

হাফ ব্যাক—গোপা মু. ডাম্পন (রেলওয়েজ), সুপা  
সাইনি—অধিনায়িকা (পেপসু), জ্যোতা সোনি (রেল-  
ওয়েজ) ও গীতা সারিন (মহারাষ্ট্র);

ফরোয়ার্ড—এলিসা নেলসন, কলকিন্দার ডাটিয়া ও  
সেলমা ডিসিলভা (রেলওয়েজ), নাসলিন মরসওয়ারা  
(মহারাষ্ট্র), প্রেম ময় (উত্তরপ্রদেশ), লোকেন  
ফার্নান্ডেজ (বোম্বাই) ও নিলা শর্মা (পাঞ্জাব)।

কোচ—কর্তার সিং।

আমলোভিতিক :

খেলোয়াড়, বিশেষ করে আখলিটিকসে অগ্রণী  
দেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী ও জাপান  
মস্কো অলিম্পিক কর্তৃক করার ভারতীয় আখলিটিকদের  
পদক সম্ভাবনা কি উজ্জ্বল হয়েছে? মোটেই না।  
কারণ মস্কো অলিম্পিকে দশম স্থানান্তরকারী যে  
মাস ভারতীয় আখলিটিকের ছাড়পত্র পাবার যোগ্যতামান  
তক করা হয়েছিল নির্বাচিত ১০ জন আখলিটিকদের  
মধ্যে একজনও সে যোগ্যতামানে পৌঁছতে পারেনি।  
কেউ কেউ আবার দু বছর আগে ব্যাকেক এশিয়ান  
গেমসে যে ফল করেছিল ঠিকালে তার চেয়েও খারাপ  
ফল করেছে। সুতরাং, সোনা, রূপো ব্রোঞ্জের কথা বাদ  
দিচ্ছি। অর্ন্ত মাত্র দিল্লি গড়া ৮ রকমের পদক অর্ন্তম  
স্থানান্তরকারী পর্যন্ত পাবে—যদি অলিম্পিকে এই  
ব্যবস্থা থাকত তা হলেও ভারতের কোনো আখলিটিকের

পদক পাবার সম্ভাবনা থাকত না। পৃথিবীতে নিজ  
নতুন রেকর্ড হচ্ছে। আখলিটিকদের মান বাড়ছে। যে  
দেশের কোনো প্রতিযোগী দশম স্থানান্তরকারী  
যোগ্যতাম পৌঁছতে পারে না সে দেশের আখলিটিকের  
অলিম্পিকে পাঠানে শূন্য নীতি ও আদর্শের খাতির  
—জরাজনক নয়, অলিম্পিকে অগ্রগৃহণই বড় কথা—  
এই নীতির তাৎপর্য বিন্যাস রেখে।

অবশ্য অলিম্পিকে যেয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন এক  
অনুপ্রেরণা লাভের একটি সাক্ষ্যই হলো আছে। কিন্তু  
অভিজ্ঞতা ও অনুপ্রেরণা তো তাদেরই প্রয়োজন, যা  
বাসে তরণ এবং আগামী দিনের আশা। ভারতের  
আখলিটিক দলে কিন্তু প্রায় বাতিলের সংখ্যাই বেশি।  
স্থানভাবে পরিসংখ্যান দেওয়া গেল না। না হলে  
দেখিয়ে দেওয়া যেত, প্রায় প্রত্যেকেই আগের মানের  
চেয়ে নির্বাচনী ঠিকালে কত খারাপ ফল করেছে।

অত্যন্ত লক্ষ্যের কথা, ৬০ বছর অলিম্পিকের মধ্যে  
থেকেও ৬০ কোটি মানবের দেশ ভারত আখলিটিকসে  
ওলিম্পিক থেকে একটিও পদক আনতে পারেনি। অথচ  
ছোট ছোট দেশের আখলিটিক দল হাত ভরে পদক  
কুড়িয়েছে।

আমলোভিতিক দলে আছে : গ্রীসাম সিং (৮০০  
মিটার দৌড়), হিরিচাঁদ (১০ হাজার মিটার দৌড়),  
বাহাদুর সিং (শট পাট), পি সুভাষানন্দ (২০০  
মিটার দৌড়), সন্ত কুমার (১০০০ মিটার দৌড়),  
গোপাল সাইনি (৫ হাজার মিটার দৌড়), রাজীত সিং  
(২০ কিলোমিটার হাট), শিকানথ সিং (ম্যারথন  
দৌড়)।

(মেরে)—পি টি উবা (১০০ মিটার দৌড়) ও  
গীতা জ্যোতি (৮০০ মিটার দৌড়)।

কোচ—যোগীন্দ্র সিং সাইনি :

অন্যান্য দল

বাস্কেট বল, ব্যাডমিন্টন, জুডো, শ্যাটল  
এক ইকোরেশিয়ানের ভারতের কেউ মস্কো থেকে  
পদক আনতে পারবে এমন সম্ভাবনা নেই। কোনো  
প্রতিযোগী প্রতিযোগীর ছোট আখলিটিক দলে কিংবা  
অন্য কোনো কারণ যদি কেউ একটি পদক পেয়ে যায়  
তবে পৃথক কথা। মূলত একে বাওয়া সেই নীতির  
প্রশ্নে এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজনে।

বাস্কেট বল ভারতের অংশগ্রহণের সুযোগ এসে  
গেছে যোগ্যতা অর্জনকারী এশিয়ান তিনটি দেশ চীন,  
জাপান ও ফিলিপিনস গেমসে ক্যাকট করার।

শ্যাটল রথদীর্ঘ সিং মস্কোতে ট্রোপে পেয়েছিলেন  
২১তম স্থান। ব্যাকেক এশিয়ান গেমসে অবশ্য সোনা  
জিতেছিলেন। কিন্তু এশিয়ান গেমস আর অলিম্পিক  
গেমসের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। হ্যাঁ, বিশ-  
ব্রিটিশ দেশ অলিম্পিক কর্তৃক করা সফল।

কোনো কোনো স্পোর্টসে ভারতের করার প্রতিদ্বন্দ্বি  
করেনে নীচে নাম দেওয়া হল।

বাস্কেটবল দল : পরমজিৎ সিং, হনুমান সিং,  
আজমীর সিং, জড়োয়ার সিং (রাওয়াল), পরমদীপ  
সিং, বলদেব সিং (পাঞ্জাব), জি দলীপ (কণটক),  
দরভজন সিং, ডি পি ইরানী (বিহার), অমরনাথ  
(তামিলনাড়ু), টি এস সাই, রাধেশ্যাম (সার্বিসেস)।

কোচ—ক্যাথেন রাজন।

বর্জি দল : বি এস জাপা (লাইট হাই ওয়েট),  
অমল দাস (হাই ওয়েট) ও জি মনোহরণ (ক্যান্টাম  
ওয়েট);

কোচ—ওমপ্রকাশ।

জারোভোলক দল : ই কর্ণাকরণ ও এম তামিল  
সেলজান।

কুস্তি দল : মহাবীর সিং (৪৮ কিলোগ্রাম গ্রুপ),  
অশোক কুমার (৫২ কিলোগ্রাম গ্রুপ), জগদীন্দ্র সিং  
(৬৮ কিলোগ্রাম গ্রুপ), কর্তার সিং (১০ কিলোগ্রাম  
গ্রুপ) ও রাজেন্দ্র সিং (১০০ কিলোগ্রাম গ্রুপ)।

শ্যাটল দল : কানী সিং ও রথদীর্ঘ সিং।

ইকোরেশিয়ান দলে—পটজন প্রতিযোগী লেখার  
সময় পর্যন্ত নাম জানা যারনি।

মুকুন্দ

## আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি বই

**ভারতের সঙ্গীতগুণী।** দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। এ মুদ্রণের আশু কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। ২ বাক্স চাটাজী প্লেট। কলকাতা-৭০০০৭০। প্রতি খণ্ড ১৬.০০ টাকা।

বাংলা তথা ভারতীয় সঙ্গীতের ধরনটি ইতিহাস রচিত হলেও শিল্পীদের সম্পর্কে বিশদ তথ্য খুব বেশি পাওয়া যায় না। দীর্ঘদিনের ভারতীয় রাগসংগীত ধরনা পরম্পরায় দুঃস্বপ্ন ও পরিণত হয়েছে কণ্ঠ ও যন্ত্রের যুগল মাধ্যমে। তারই শ্রেণীভিত্তিক বিকশিত হয়েছে প্রাদেশিক ভাষা-গানের বাণী ও রূপ। আজ বহুদুর্ভাগ্য মন নিয়ে এই ভাবগ্রাহী শিল্পের বিবর্তনের ইতিহাস উন্মোচন এবং শিল্পীদের জীবনবৃত্তান্ত ও সাধনার ধারাপরিচয় লাভ প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। তা ছাড়া চিরকালের ভারতীয় মন শিল্পীর বস্তুপরিচয়ের চেয়ে উৎসাহী ছিল শিল্পের রসমহাদানে। ফলে পরবর্তী কালে কল্পনাবিলাসী ভারতীয় মন তাঁর করেছে নানা আঙ্গুণী গালগল্প ও অসম্ভাব্য অতিনটিকায় বিবরণ। বাস্তবিকর উইয়ের টিবি, কালিদাসের

গাছের শাখা কতন, ডানসেনের গাছের আগুন জ্বলে ওঠা—এ সবই সংস্কৃত কথাকাহিনীর ঐতিহ্যপূর্ণ নিষ্ঠাজাল ভারতীয় সৃষ্টি।

সুতরাং গ্রেডোতেই স্বাধীন করত হবে দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় যে কঠিন ও আরামসাধ্য কাজে হাত দিয়েছেন তার সম্পূর্ণতা ও সর্বজন-স্বীকৃতি লাভ কঠিনতর। কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থ পর্যায়ে ভারতের অগণন সঙ্গীতগুণীর (গায়ক-গায়িকা ও বাদক) মাধা বিখ্যাতদের তথ্য-নির্ভর জীবনী, সমকালীন সংগীত-ক্ষেত্র তাঁদের স্থান, তাঁদের পূর্বাচর্য ও শিষ্যদের পরিচয় ইত্যাদি সংকলনের সাধু সংকল্প তিনি নিয়েছেন। এইসব শিল্পীদের আত্মপ্রকাশের কাল, দিলীপবাবুর ভাষায় 'আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ' সমগ্র উনিশ শতক এবং বিশ শতকেও বিস্তৃত। এই বিরাট কালপর্বের সীমাহীন পরি-প্রেক্ষিতে আপাতত তিনি দুই খণ্ডে প্রস্তুত করেছেন যোলজন সঙ্গীত-গুণীর জীবন-বিবরণ। সংগে সংযোজন করেছেন তেরোজন গুণীর দুঃপ্রাণা আলোচক। স্মৃতিত উপাদান ছাড়াও শিষ্যপ্রাণীদের স্মৃতিকথা এবং অন্যান্য মৌখিক সূত্রও তিনি অবিরলভাবে ব্যবহার করেছেন জীবনী রচনায়। আলোচ্য দুই খণ্ডে যোলজন গুণীর মধ্যে বেশ কজন খানদানী, আবার কেউ কেউ শিক্ষিত পটু, কেউ বা রূপজীবী। এর

থেকে বোঝা যায় গুণীর বিচারে লেখক শ্রেণীসচেতনতা রাখেন নি। সেটি তাঁর উদারমনস্কতার পরিচয় দেয়। তবে আমাদের প্রশ্ন জাগে, গৃহরতন আর মানদাসদুর্ভাগী কিংবা মৌজুদ্দিন আর মরাদ খাঁ জাতীয় শিল্পীর গুণগত পার্থক্য ও উৎকর্ষের তরতম সম্পর্কে তিনি কতখানি সচেতন? মনে হয় ভারতীয় সঙ্গীতগুণীদের বিবরণ কালানুক্রমিকভাবে সাজালে ইতিহাস, সমাজ ও সঙ্গীতবিবর্তনের ছবি অনেক বেশি স্পষ্ট হত।

এসব কথা উঠছে দুটি কারণে। প্রথমত, লেখক প্রচণ্ড পরিপ্রয় করেছেন এবং তাঁর আন্তরিকতায় কোন খাদ নেই। দ্বিতীয়ত, এই গ্রন্থ ভবিষ্যৎ লেখকের একক প্রয়াস আরও অনেক খণ্ডে প্রকাশিত হয়ে সম্পূর্ণতা পাবে। এই দুই কারণে তাঁর দায়িত্ব এবং তাঁর প্রতি আমাদের আশা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হওয়া দরকার। তথা যাচাইয়ের উৎসাহ তাঁর আছে, নতুন তথ্য খুঁজার বার করবার সদিচ্ছা আছে কিন্তু সেই সঙ্গ আছে এক বিপজ্জনক প্রবণতা। তিনি ঠেকী রমাজনর চং, এমন কি নাটক-ফলকেও খুব বেশিরকম প্রশ্রয় দেন বলেছেন। ফলে তাঁর বিবরণে প্রথমে হিন্দুস্থানী কলাবৎ বাংলা সিনেমার সংলাপের ঢঙে হিন্দী উর্দু মেশানো বাংলা বলেন। যেমন অবাতালী মালকাজান (আগ্রাওয়ালী) অবাতালী ফৈয়াজ খাঁকে বলেন 'খাঁ সাব, আপনি আমায় মেহমান... তাই জিজ্ঞেস করছি, আপ

খামোশ কান্না? আপনার ঠক তকাল আমার কলমে।' ফৈয়াজ বলেন, 'বোফকর রাইজয়। আমার মন খালি হলে আদ অনা কারণে।' এর চেয়েও রোমাণ্টিক দিলীপবাবুর কলমে গায়িকা গুরু-ভামিনীর সামনে ইংরেজ সাহেব হামিল-ডের সংলাপ। পাঠক, যেমন কল্পনা করছেন, ঠিক সেই সাধু ভাষা, বস্তুমেয় লরেন্স ফস্টার থেকে সব সাহেব বে! ভাষায় কথা বলেছে বাংলা সাহিত্যে। হামিলডে বলেন, 'আমি লালকুন্ডার হইতে আসিচৌছি। আপনার নামে রিপোর্ট আছে তাই আসিতে হইল।' দিলীপবাবুকে অনুরোধ, এই গ্রন্থের ভবিষ্যৎ খণ্ডগুলি লেখবার ক্রম একটু সতর্ক হবেন। অতীত কালের মানুষগুলির মুখে শাদা বাংলা ভাষাই মানাবে। অতিক্রিপত উর্দু হিন্দী কিংবা কণ্ঠকলিত সাহেবী বাংলা বজ্রন করা ভাল। সেই সঙ্গে তাঁকে বহুমান হতে হবে অনুচ্ছেদ রচনার নিয়ম সম্পর্কে। একটি করে বাক্যে একটি করে অনুচ্ছেদ রচনা (বিশেষ দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ১) ব্যাকরণ-সম্মত নয়। এ ছাড়াও বজ্রন করতে হবে অবাস্তব বিশেষণ প্রয়োগের (শ্রেষ্ঠ গুণরূপ জাতীয়) দূর্বলতা, জাযাৎ এলায়িত ভঙ্গী এবং অতিকথনের ক্রান্তি।

'ভারতের সঙ্গীতগুণী' নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। জানা, অজানা, অপরজানা, জোলজন সঙ্গীতগুণী সম্পর্কে লেখক যে সিন্ধু বস্তুস্থান করেছেন তা প্রশংসনীয়। বিশেষ করে

বিভূতি রচনাবলী

॥ আবার গ্রাহক করা হচ্ছে ॥

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সমগ্র রচনা

বিভূতি-রচনাবলী

৬ খণ্ডে—সুলভ সংস্করণ

খোলাবাজারে এই রচনাবলীর দাম হবে অন্যান্য ২৪০ টাকা। গ্রাহকরা মাত্র ১৫০ টাকায় পাবেন।

॥ নিয়মাবলী ॥ ৩০ টাকা জমা দিয়ে নাম রেজিস্ট্রী করাতে হবে। প্রতি খণ্ড নেবার সময়ে ২০ ক'রে দিতে হবে। টাকা নগদে বা মনি অর্ডারে নিয়ম ঠিকানায় পাঠাবেন। যারা ডাকে টাকা পাঠাবেন—তাঁদের রসিদ পাঠাবার রেজিস্ট্রী খরচ ৩০ লাগবে।

গ্রাহক করার সময় : প্রতিদিন ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা শনিবার বেলা ২টা

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ / ৩৪-৮৭৯১

৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ / ৩৪ ৩৪২২





স্বামী আখার কোনান ডয়েলের

শালক হোমস্ সিন্ডিক

পূর্বস অনুবাদে এইমাত্র প্রকাশিত হল

**এ স্টাডি ইন স্কার্লেট** ৭.৫০

**দি সাইন অব্ ফোর** ৭.৫০

দি আডভেঞ্চার অব্ শালক হোমস্ ১৫.০০

এই তিনটি বই একত্রে

**শালক হোমস্ সমগ্র** (প্রথম খণ্ড) ২০.০০

**কিশোর অমনিবাস সিরিজ**

উপেন্দ্রকিশোরের কিশোর অমনিবাস ১০ (টুনটুনির বই,

ফুলপরা, গুপি গাইন), হেমেন্দ্রকুমারের কিশোর অম-

নিবাস ১২ (অসম্ভবের দেশে, পদ্মরাগবৃদ্ধ, সত্যিকার

শালক হোমস্), জুল ভার্ন-এর কিশোর অমনিবাস ১ম

১৫ (মিটিটরিয়াস আইল্যান্ড, ফ্রুম দি আর্থ টু দি মুন),

২য় ১৬ (টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড লীগস, এরাউণ্ড দি

ওয়ার্ল্ড, জানি টু দি সেন্টার অব্ দি আর্থ)।

জিম করবেটের কেনেথ অ্যান্ডারসনের

রুদ্রপ্রয়াগের চিতাবাঘ ৮ নটি বাঘ একটা মত্ত শ্রুতি ১০

জাঙ্গল লোর ৮ তাহাওয়ার আলি খানের

আমার ভারত ১০ সুন্দরবনের নরখাদক ৮

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির

৬ বঙ্কিম চার্জো স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

মৌজীশ্বিন ও' লালচাঁদ বড়াল সম্প্রদায়  
জন্মে নতুন তথ্য আমাদের আনন্দিত  
করছে। অমিরনাথ সান্যাল পরিবেশিত  
মৌজীশ্বিন সংগ্রহে তিনটি বইয়ের  
তিনি প্রতিবাদী তথ্য দিয়েছেন। সঙ্গীত-  
রসিকদের পক্ষে তা বিবেচন্যযোগ্য।  
আমাদের দেশে সঙ্গীতের ঐতিহ্য-  
সচেতন বহু মানুষ আছেন। মিল্লীপ-  
কুমার মুখোপাধ্যায়ের বই তাঁদের সংগ্রহে  
'নিচয়ই স্থান করে নেবে। তবে আমাদের  
প্রত্যাশা তাঁর কাছে একটু বড় মাপের।  
জেরাল্ড আন্ডারহাম বা র্যালক হিস্‌লি যেমন  
পাশ্চাত্য সঙ্গীতগণীদের জীর্ণী  
লিপ্যেছেন আমরা সেইরকম সম্প্রদায়  
ও সুস্বপ্নেই কাই চাই। প্রেক্ষিত ডিকশ-  
নারি অব মিউজিক আন্ড মিউজি-  
সিয়ানস' বইটির অত্যন্ত প্রচলন গ্রন্থ  
করলে তো কষ্ট নেই।  
স্বর্গীয় চক্রবর্তী

প্রাচীনতা: শিল্প সংক্রান্ত

**চিত্রকলা**

**ভারতভীর্ষ**

ওপনিবেশিক খোঁয়াড়ী ভাঙ্গা  
যুগে একটা প্রশ্ন বারবারে ওঠে  
শিল্পকলার প্রসঙ্গে, ভারতীয় ছবির  
সংজ্ঞা কি? ভারতবাসীর আঁকা ছবি  
কি ভারতীয়? না তার অন্য  
বিশেষ্য আছে। আজ এত দেরীতে  
হলেও প্রশ্নটা জরুরী। আমার সংগ  
জেনেক মার্কিন মহিলায় পরিচয়  
হয়েছিল। তিনি ভারতীয় চিত্রকলার  
অধ্যাপিকা একটা ছোটখাটো মার্কিন  
কিশোরীমায়ের। কথায় কথায় জানলাম  
তিনি প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে  
মুদ্রাল আমল পর্যন্ত পাঠ্যের  
অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তারপর থেকে  
ভারতীয় শিল্পকলার ওপর বৈদেশিক  
প্রভাব পড়েছে। প্রশ্ন করলাম: কিন্তু  
গাল্পারের ওপর গ্রীক প্রভাব বা মুদ্রাল  
চিত্রকলার ওপর পারসিক এবং  
প্রত্যাচার প্রভাব তো সুবিস্তৃত।  
তের্মনি চীন জাপান এবং দূর-  
প্রাচ্যের ওপর বৌদ্ধ হিন্দু প্রভাব  
পড়েছে। ইউরোপীয় শিল্পকলার  
ওপরও তো মিশর, প্রাচীন মধ্য প্রাচ্য  
থেকে চীন, জাপান, আফ্রিকান শিল্প-  
কলার প্রভাব সামান্য নয়। বস্তুত  
বসবাস করার জন্যই হোক, বা যুদ্ধ  
এবং বাণিজ্য করার জন্য হোক মানুষ  
এক জায়গা থেকে যখন অন্য দেশে  
গেছে, তখন চিন্তাধারা জীবনযাত্রা  
প্রাণী, ধর্ম এবং শিল্পকলা নিয়েই  
গেছে। আগন্তুক এবং বাসিন্দাদের  
পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে  
সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাচীন-  
কালের জন্য এই সত্য যদি মেনে নি,  
তাহলে আধুনিককালের ব্যাপারে  
মানব না কেন? শিল্পকলার অভিব্যক্তি  
কুগোপযোগী এবং প্রাসঙ্গিক  
হচ্ছে কিনা-শুধু এই প্রশ্নটাই তোলা  
যেতে পারে। কালের তাগিদে যদি  
আমাদের শিক্ষাদীক্ষা জীবনযাত্রায়  
আধুনিকীকরণ ঘটে থাকে, সাহিত্যের  
রূপরেখা পালটে গিয়ে থাকে, তাহলে  
শিল্পকলার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটবে না  
কেন? ভারতপ্রেমী এবং শ্রুতিবান্-

**HOW ABOUT SPENDING SOME MONEY ON SAVINGS? FROM THIS MONTH?**

You've been finding it difficult to save.

So why don't you start spending? On savings.

BOB has several savings schemes to suit your specific need.

Walk into the nearest BOB branch today.



**Bharat Overseas Bank Ltd.**

Regd. Office: "Golf House" Mount Road, Madras 600 006.

155-C, Mahatma Gandhi Road, Burma Bazar, Calcutta 700 007 ★ 12-A Camac Street, Calcutta 700 017 ★ No. 208 1A Rash Bahari Avenue, Beliungunge, Calcutta 700 029 ★ 7, Habibullah Estate, Hazratganj, Lucknow 226 001 ★ 72, Bank Road, Gorakhpur 273 001

Your landmark for prompt and efficient service



কি সেহ অধ্যাপক অক্ষয় প্রসন্ন  
দত্তর সেনানী।

মানিকলাল স্কলোপাধ্যায় এবং  
কানীনারায়ণ পাণ্ডেড়ীর সাংগঠনিক  
কাদমী অব ফাইন আর্টসের প্রথম-  
তে শর্তবায়ুগ্রস্তদের উল্লেখ শুনাই  
কি দেখাই আত্মনিকপন্থীদের  
চকানো নাক। আমার মনে হয়  
চীন ঐতিহ্যের কব্জির কেউ যদি  
রেশমী হন, তা হলে সেটা যেনে  
রঙে আমাদের বিশ্বাস কোন কারণ  
কো উচিত নয়। মানিকলাল রেশমী  
গপড়ের ওপর জলরঙ ব্যবহার করেন  
বং উইনসর স্ট্রাটন কোম্পানীর  
বনাতী রঙও ব্যবহার করেন। অন্য-  
রকম তিনি আমাদের সমকালীন গ্রাম  
ওয়ে ভারতীয় নিলগাই অক্টোবর  
গাবিক মাধুর্য মিশিয়ে। তার জগৎ  
ওয়ে দৃষ্টিভঙ্গী প্রাচীন বা মধ্য-  
যুগীয় নয়। অজস্রতা বা মৃদলের  
মানসিকতার সঙ্গো তার মিল নেই।  
রঙ্গকৌশলের মিল তার ছবিকে লুপ্ত  
গায়র সঙ্গো একাধা করে দেয় না।  
মৃত-পাঞ্জাবি পরলেই কেউ যেমন  
প্রাচীনপন্থী হন না। এবারের  
সঙ্গরনীতে মানিকলালর ভাই জীবন-  
রকের "বনমাই" (জাপানী পর্দাভিত্তে  
ফরা বামন গাছ) এবং ছবি ভিত্তর  
সম্ভাব্য দিয়েছে।

মানিকলালর ছবির বুনোটে রচনা  
করা, বিশেষত রেশমের সুতোয়  
নোন এবং জেল্লা কাজে লাগানো,  
তুলির উল্টো পিঠ দিয়ে কাটা রঙকে  
মুখে তুলে নেওয়া—দারুণ একটা মজা  
দেখি হয়েছিল। যদিও আরেকটু  
দারুণ চকচকে ককককে রঙ ব্যবহার  
করলে পারতেন। স্লোন কালচে রঙের  
মিট ইথং মোহগ্রস্ত তিনি। কিন্তু  
তার হাতে কি বাদ্যের ক্রমতা। খড়  
রাঝাই নৌকা, বা তারের তেতর  
বেগের জীবন, একটা কুকুর থেকে  
দিগন্তের মধ্যে উন্মুক্ত বন্ধ নদী, বা  
বজ্রের রস পাড়ার দৃশ্য—তার ছবিতে  
জনপদের মানবজন তাদের আনন্দ  
আহ্লাদ আর দুঃখ নিয়ে এসেছে।  
তার আকাশজোড়া কবিব, দরাজ  
হাওয়ার মতো এসে, আমাদের ঝাঁকড়া  
মনটাকে ভালপালানো, আমল নাড়া  
দিয়ে যায়। আমি বোধ হয় চিরকাল  
মানিকলালর মাটিঘোঁষা ছবির অনুয়াগী  
থেকে যাব।

লক্ষ্মীনারায়ণ পা চো ডাঁ  
মানিকলালর শিষ্যচিহ্নসমূহ। সাধারণ-  
ভাবে মানিকের স্থাপত্যাক্ষর, বিগ্রহ  
এবং ভীষণাচারীদের ছবি একেছেন।  
সমাতনী ভারতবর্ষের একটা স্বাদ  
এসেছে। যদিও তার চিত্রমাণিক পারি-  
পার্শ্বিকতা এবং অদ্ভুত বিদ্যুৎ  
দৃশ্যের অবলম্বিতর জন্য, তার ভারত-  
বর্ষর সঙ্গো ডানিয়েলদের দেখা  
করতবর্ষের মিল তৈরী হয়েছে।  
যদিও এক সূত্রে বিষয় সবকিছু  
নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মানিকের  
জামিতিক মোটামুটি ছবির  
জামিতির সঙ্গো মেলাতে পেরেছেন।  
একটি জায়গায় পাল থেকে দেখা  
দশাবমেধ ঘাট এবং কন্যাকুমারীর  
কৌলিক সূক্ষ্ম সমুদ্রের উচ্ছ্বাস একেছেন  
ভাল।

এসের ছাবর তিনটে প্রদর্শনা  
বেধে কিন্তু মনে হয় এবার স্লোন  
পালটানোর সময় হলো।  
দল্লীপ লরকার

আলোচনা: শির সংস্কৃতি চলচ্চিত্র

ইয়েহ ক্যাসা ইনসাফ  
পরাই একমাত্র কতবা ও ধর্ম কি  
শুধু পিতর আত্মও ইচ্ছাবহ হয়ে  
থাকা?—এই প্রশ্ন নিয়ে রচিত আই ভি  
এস অভ্যাকারীর মূল উপন্যাসে যেটি  
অজস্রনে নিমিত এই ছবি। অকল্পিত  
দিক থেকে এক আবেশিতও সর্বস্তরের  
মানুষের কাছে অনস্বীকার্য। প্রশ্নটির  
উপস্থাপনে যে কাহিনী গঠিত তা  
দুঃস্বপ্নের নিম্নে। প্রথম পুরুষে রাম  
(বিনোদ মেহরা) প্রেম করে বিবাহ করে  
কৃতবিদ্যা গায়িকা মথকে (শাকের  
আজমি)। বোনের বিয়ে দিতে ঋগ্ৰস্ত  
হওয়ার পরই রাম কুপিত হতে থাকে।  
ফলে বিচ্ছেদ। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হল  
পাণ্ডানারায়ণের তাগাদায় উদ্ভাত কিন্তু  
চাকরিস্থল বদল এবং স্ত্রীর সঙ্গো  
বিক্ষেপের সঙ্গোই যেন সে ঋগ্ৰস্ত হয়ে  
গেল।

শিবতীর পূর্ব দেখা যায় যে  
সমস্যার জন্য রাম ও মথুর মধ্যে বিচ্ছেদ  
ঘটে ঠিক একই সমস্যা দেখা মিল  
রামের কন্যা কিরণের (সৌরিকা) বিবাহের  
পর। পার্থক্য হল রাম তার স্ত্রীকে তাগ  
করে চলে যায়, কিন্তু কিরণ পিতার  
দুঃশার দিকটো আসলে নর এনে  
স্বামীকে ছেড়ে থাকতে অনিচ্ছুক। আর  
সেই সূত্রেই রামের বিবেককে জাগ্রত  
তুলে কিরণ পিতার সঙ্গো শৈলগ থেকে  
তার হারানো মায়ের পুনর্মিলন করেন।  
কিন্তু মজার ব্যাপার হল নারী ও  
পুরুষের যে সমানাকার নিয়ে রাম ও  
মথুর মধ্যে বিরোধ—অর্থাৎ স্ত্রীর স্বতন্ত্র  
সত্তা স্বীকার্য—সে প্রশ্ন উবে যায় বন্দন  
কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে মথকে বলতে  
শোনো গেল, "পিতর পদসেবাই স্ত্রীর  
একমাত্র রত"।

অথচ এর আগে পর্যন্ত মথকে  
বেল এক মহারসী নারী রূপেই দেখানো  
হয়েছে। যে নিজে অশেষ ক্রেশ স্বীকার  
করে নিজের ছোট ভাইকেই শূদ্র নর,  
পরিচারিকার অনাথ পুত্র, সুন্দরকেও  
(রাজকিরণ) উচ্চাঙ্গা দিয়ে মনুষ্য করে  
তেলে। মথ কৃতবিদ্যা গায়িকা। সত্যতঃ



শাবানা আজাদ

মাত্র ২০ দিনে দুটি সংকরণ নিঃশেষিত  
তৃতীয় সংকরণ প্রকাশিত হল

বাংলাভাষায় স্রেষ্ঠ সাসপেন্স উপন্যাস

বাংলা সাসপেন্স  
সাহিত্যে  
নতুন ডাইমেনশন

**প্রফুল্ল রায়-এর**

চরিত্র

চরিত্র

দাম ২৮.০০

প্রফুল্ল রায়-এর আরো দুটি বই

**করুণা ধারায় এসো**  
**আপনমনে**

নিউ বেঙ্গল  
৬৮, কলেজ স্ট্রীট ৥ কলকাতা-৭০০০৭৩

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

১৬.০০

সব মিলিয়ে **মানস ভ্রমণ**

আমি Sunny Days-এর বাংলা

১০.

**সুনীল গাভাসকার**

অলাপণী দেবীর ১৫.০০ দিব্যেন্দু পালিতের

পয়সা দিয়ে কেনা প্রণয় চিহ্ন

দেবেন্দ্র গঙ্গীর

টপ্পা চুংরী তিন হাজার দুই

হিমালীপ গঙ্গোপাধ্যায়ের

বাংলার শেষ ডিটেকটিভ

তুষার ঘোষের

**গ্রীস ও রোমের উপকথা** ২৫.০০

সন্তোষকুমার ঘোষের সমস্ত গল্প

প্রথম খণ্ড ২০/- দ্বিতীয় খণ্ড ২৫/-

দেবদাস সিন্ধুজীর

অনুসন্ধান \* সরলিপি \* রুদ্ধস্থ ভার্য্য

১০.০০ ২০.৫০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট

কিন্তু এছাড়াও বিশেষ ছবিও বানাচ্ছে।  
স্বপ্নেতে বোটা মত গান জুড়তে হলে  
কল্পনায় বসে বসে সৃষ্টি করেই স্বপ্নের  
দশা উপস্থাপিত করে আভির্ভাস যান  
পরিবেশিত হওয়ার আর সে-সব  
দশা হলো বা রূপকথায়ই মানতে  
পারে। পরিচালক দলারি নারায়ণ  
রাওয়ের কৃতিত্ব হচ্ছে রাম ও মধুর মান  
সিক বিরোধের ব্যাপারটা (কিছুটা  
শ্রদ্ধা হলো) নটকীয় করে উপস্থাপনে  
সক্ষম হয়েছেন। সে-সব দশা দর্শকের  
মনে রেখাপাত করে মুখ্যত শাবনার  
অভিনয় গলে। বিনোদ মেহরাকেও অন্য  
ছবি করে ভাল লাগবে। ভাল লাগবে  
শোভা সারিকা ও রঞ্জিতের  
অভিনয়ও। শশিকলাও আছেন যথা-  
পূর্বে একটি দৃশ্যের চরিত্রে। কে এস  
মানের কামেরা দৃষ্টিকে তুচ্ছ রাখার  
মত দশা পরিবেশনে সক্ষম হয়েছে।  
সুরযোজনায় এবং গীত রচনায় রবীন্দ্র  
জেন তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।  
দোকানটি সজ্জাও একটি পরিচ্ছন্ন  
ও নটকীয় ঘাট-প্রতিঘাটে সুসংবদ্ধ  
ছবি উপস্থাপনে প্রযোজক ও পরি-  
চালক সক্ষম হয়েছেন।

#### সংগীত

ফিরে দেখা

বহু, বাসনার, বহু, প্রতীকার, কড়  
উত্থাপন সেই দিনগুলো। দেশে তখন  
আকাশ, চারিদিকে স্বপ্নের দিল্লি,

কিন্তু এছাড়াও বিশেষ ছবিও বানাচ্ছে।  
স্বপ্নেতে বোটা মত গান জুড়তে হলে  
কল্পনায় বসে বসে সৃষ্টি করেই স্বপ্নের  
দশা উপস্থাপিত করে আভির্ভাস যান  
পরিবেশিত হওয়ার আর সে-সব  
দশা হলো বা রূপকথায়ই মানতে  
পারে। পরিচালক দলারি নারায়ণ  
রাওয়ের কৃতিত্ব হচ্ছে রাম ও মধুর মান  
সিক বিরোধের ব্যাপারটা (কিছুটা  
শ্রদ্ধা হলো) নটকীয় করে উপস্থাপনে  
সক্ষম হয়েছেন। সে-সব দশা দর্শকের  
মনে রেখাপাত করে মুখ্যত শাবনার  
অভিনয় গলে। বিনোদ মেহরাকেও অন্য  
ছবি করে ভাল লাগবে। ভাল লাগবে  
শোভা সারিকা ও রঞ্জিতের  
অভিনয়ও। শশিকলাও আছেন যথা-  
পূর্বে একটি দৃশ্যের চরিত্রে। কে এস  
মানের কামেরা দৃষ্টিকে তুচ্ছ রাখার  
মত দশা পরিবেশনে সক্ষম হয়েছে।  
সুরযোজনায় এবং গীত রচনায় রবীন্দ্র  
জেন তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।  
দোকানটি সজ্জাও একটি পরিচ্ছন্ন  
ও নটকীয় ঘাট-প্রতিঘাটে সুসংবদ্ধ  
ছবি উপস্থাপনে প্রযোজক ও পরি-  
চালক সক্ষম হয়েছেন।

আপনার চুল কি পাতলা, বেতিয়ে পড়া ?  
আপনার চুলকে ঘন ও  
দোলদোলাতো করে তুলুন...



প্রোটিন-সমৃদ্ধ  
হেলো এগ  
শ্যাম্পুর সাহায্যে

পুষ্টির অভাবে আপনার চুল পাতলা  
হয়ে যায়-বেতিয়ে পড়ে-  
দোলদোলাতো জবাটি আর  
থাকে না।

গাঢ় সোনালী রঙের হেলো এগ  
শ্যাম্পুর প্রোটিন-সমৃদ্ধ পুষ্টির  
ফরমুলা আপনার চুলে পুষ্টি  
জোগায়, আপনার চুল আয়ত্ব  
আনে। ফলে চুল দেখায় ঘন ও  
দোলদোলাতো। হেলো এগ  
শ্যাম্পুর ঘন ফেনা আপনার  
চুলের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে মিশে  
গিয়ে আপনার চুলকে সজীব  
ও স্বলম্বিত করে তোলে।

ঘন ও দোলদোলাতো চুলের জন্যে  
আজই হেলো এগ শ্যাম্পু কিনুন।

করছিল বলে। প্রাচীন শিক্ষা  
প্রাচীন, লোকসভা, ভাষা, কল্প  
প্রবন্ধ গান, সুরের পরিচয়, গীত  
প্রযোজনার নতুন ফর্ম, বাংলা নাট্যের  
নতুন চিন্তা—যে সাম্প্রদায়িক ফল  
নাট্যের এখনও আমাদের গাছিকী-  
তি। নাটক যে কল্পতরুর ধরতাই  
গাওয়া গেল এখনও তার বিস্তার  
কখনও কল্পিত কখনও দ্বন্দ্ব কিংবা  
চোদ্দনে। নির্বাহার কলা যার তখনকার  
গণনাট্যের কর্মী বা সংশ্লিষ্ট শিল্পীরাই  
পুরুষতাকালে নতুন প্রাণ। উদাহরণ  
হিসাবে স্বীকৃত। সম্পূর্ণ তালিকা দিলে  
বা কাজের বিবরণ দিলে মনে হবে এক  
কণ্ঠা শোভাযাত্রা। যে উদ্ভাসিত সময়  
গণনাট্যের কর্মকাল—সেই সময় এখন  
পালটে গেছে। বাংলা রাষ্ট্রতন্ত্র কালের  
জনা পথ নেমেছিলেন, আজ পরিবর্তিত  
পটভূমিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা  
অনেকাংশেই তাঁদের হাতে। ফলে প্রশ্ন  
থেকেই যারা সংগ্রামের পর গঠনমূলক  
কাজে তাঁরা কতটা নিরোক্ত? ঠিক  
এই সময় পুনর্মিল্লার প্রয়োজন ছিল  
অতীত জরুরী, নেতাজী স্মৃতিসম্মানে  
দুই দিনের অনুষ্ঠানে সকাল এক  
একালের গণনাট্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত  
হল। এই সময় ফিরে দেখার সুযোগ  
পেয়ে আমরা রোমাঞ্চিত এক কিম্বদ-  
গম্ভ।

অনেকেই জানেন না ইংরাজের  
সারের জাহাঙ্গির সার রায়-  
শঙ্করের। গানটি এখন অনেকাংশে  
মহাশয়বাহক গানের পরাজয়। গানটি  
গণনাট্য সংঘের। এরকম আরও অনেক  
গান আছে যা দলমত নির্বিশেষে গাওয়া  
হতে থাকে। অনেক কংগ্রেসী জনসভার  
উৎসাহের সঙ্গীত হিসাবে তৎকালীন  
গণনাট্য সংঘের গান শোনা যাচ্ছে।  
সাম্প্রতিক শব্দ এইভাবেই জাতি গোত্রের  
উৎসাহ চলে যায়। বঙ্গবন্ধুসঙ্গীতে  
উল্লেখিত জ্যোতির্বিদ্রোহীদের অনেক  
গান গীতিনাট্য আজও অনেক শিক্ষার্থী  
সমনা মহাবাহার শিখে থাকেন, সলিল  
চৌধুরীর পুরনো গান শেখার জন্য  
অনেক প্রতিষ্ঠিত শিল্পীও আগ্রহী।

বিজয় ভট্টাচার্য, কিরণ রায়, হেমাপা  
বিশ্বাসের অনেক গান আজও গণনাট্য  
শিল্পীদের প্রেরণা। এটা শব্দ কিংবা  
দিনের জন্য স্বাভাবিক অনুরাগ নয়।  
অনেক দিন আগের অভিজ্ঞতা থেকে  
বলছি, গোড়া রাজনৈতিক পরিপ্রভা  
যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ,  
রজনীকান্ত, দিল্লেশ্বরলাল রায় এবং  
কিছু কিছু নজরুল ভাড়া কিছু শাসন  
করত নারায়ণ ছিলেন—তৎকালীন  
আধুনিকতা তো নৈবৈনিক—তাঁরাও কিন্তু  
সমগ্রই সলিল চৌধুরী বা গণনাট্যের  
গান শুনতে বা শিখতে চাইতেন—  
আমাদের ভিন্নতা সত্ত্বেও। কারণ, এ  
নক্সা কথা ও সুরে একটি নতুন প্রবাহ  
পরিবর্তিত পটভূমিতে এখন কিছু  
সমকালীন গণনাট্যের শিল্পকর্ম  
সম্পূর্ণ সাধারণ তত আগ্রহী নন।

এই সম্মেলনে যখন সলিল চৌধুরী  
ও আলোর পথ ধরে গান আমি  
জন্মেছি মা কিংবা 'ও মাদের দেশ-  
বাসার' গানগুলি পঙ্কশব্দ করে-  
ছিলেন তখন যে হাম'নাইজেশন—

তার চিহ্নিত নেই। কারণ এ  
পরিণামালি হঠাৎই করে কলক  
আছে। কলক আলোকনের সঙ্গে বহু  
থেকেও সঙ্গীতের নতুনতর পথের কথা  
তিনি চিন্তা করেছিলেন। প্রতিভার  
কিন্তু সত্ত্বেও এখন সেই চিন্তাই  
অনুপস্থিত। সোজাসুজি গানের মত,  
রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধরনে, 'বিচারপতি  
তোমার বিচার করবে কারা', কিংবা  
সেই মেয়ের মতো সুপ্রসারণ দলভ।  
তোমার বাকের শব্দের চিত্র খসে বা  
ডেউ উঠছে কার টুট্টোর মত গানের  
প্রেরণাও একালের গানে বিরল। পরবর্তী  
কালে সলিল চৌধুরীর ফিল্মের গান  
যা আধুনিক গানে অনেক পুনরাবৃত্তি  
আছে; কিন্তু এই সব গানে পুনরাবৃত্তি  
নেই। কারণটি সঙ্গীত। বাবলীয়ক  
জগতে ফরমুলার চাহিদা থাকে—প্রাণ  
থেকে উৎসারিত গানে নতুন নতুন বাক  
স্বতন্ত্র উৎসারিত। কোন নেশার চাহিদা  
সেখানে সংকল্প হয় না—ফলে কিল্লী  
অকস্মিক থেকে ভাঙা সুরও আমাদের  
মাঝা জাগায়। আর একটি উল্লেখ্য এই  
প্রসঙ্গ দেওয়া যায়। সলিল চৌধুরী  
আমার কিতাব। সুর দিয়ে একটি  
এমন উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন যা  
আমাদের বাংলা গানের সম্পদ—কীভাবে  
ছাড়াও গান হিসাবে আমাদের কাছে  
দীর্ঘস্থায়ী হবে (সে ভাব মনোপাখ্য-  
এর 'অশ্লীলকপের তরুটি জড়ে' গানটি  
এখন অজ্ঞান কেন জানে) সেগুলি  
ছিল প্রাণের তাগিদে। পরবর্তীকালে  
সম্ভবত মাত্র একবারই তিনি মাইকেলের  
কবিতায় সুরারোপ সেই তাগিদ  
অনুভব করেছেন—কমিশিয়াল জগতের  
এমনই মারিচ ময়লা। বিনয় রায়,  
হেমাপা বিশ্বাস, বিজয় ভট্টাচার্য,  
জ্যোতির্বিদ্রোহীদের প্রত্যেকের মধ্যে  
কি প্রাণের তাগিদ ছিল, তার বলে এক  
এসেছে প্রয়োজনের তাগিদ। এই  
প্রয়োজন বঙ্গের প্রয়োজন নয়।  
রাজনৈতিক প্রয়োজন—পন্থাবস্ত সার  
ও কথার শব্দই স্টেটমেন্ট। প্রবীর  
মজুমদার, অনল চট্টোপাধ্যায় বা  
অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় যারা আজও  
কাজ করে চলেছেন—তাঁরা হস্ত পুরুষে  
থাতা খুলে নিজেরই অবাক হয়ে থাকেন  
—একদিন তাঁরা এই কক্ষ ভাঙতেন—  
রাতে হয়তো ভাঙতেন কাল সকল  
থেকে আবার নতুন করে ভাঙতে হবে।  
সকালে টেলিফোন এল—এইচ এম ডি  
পূজা রিলিজে ছয়টি আধুনিক গান  
চাই—তখন চিন্তার মাঠ নলী পাহাড়  
প্রান্তের গুটিয়ে নিয়ে এককাল চন্দ্র  
দুর্গ হাওয়ার, শাড়ির অটল, রক্তবাহারী  
কুলের মধ্যে মাথা ফুটে মরে। গানের  
কাতার পুরনো পাতাগুলি আজও  
লালচে হতে থাকে। ভবৎ কাকসারিক  
স্বপ্নের অনেক নতুন পথ খুলে যায়  
কিন্তু শব্দ ক্ষয়ের জন্য সংবাদ-  
বিজ্ঞাই হতে পারে—গানে নয়।

সুরের কথা ছেড়ে দিয়েও কথার  
মিক থেকে দিলীপ সেনযত্নে যখন  
লেখেন, তুমানে তুমানে উঠেছে  
আওয়াজ সেইব না মোরা সেইব না/  
আজন্ম কাঁধে শোষণের ঢাকা কঁধ না  
এক আরও অনেক শব্দ, ইমেজ তখন  
অকস্মিকভাবে সলিল চৌধুরীর

## ১০০০ প্রথম স্বামী নিগমানন্দ

সকলের ভালো লাগার মতো করে লেখা বইটি গল্প  
উপন্যাসের চেয়েও আকর্ষণীয়  
সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত এর  
রবার্ট ব্রাউনিং

দুর্দীপ্ত স্মরণ কার্তিকী  
শতদল ভট্টাচার্য

রেগিস্ট্রান-রাজস্থান ৯০০

অজানা দেশ তাদাক ২০০



প্রখ্যাত ক্রীড়া-সাংবাদিক, নামকরা খেলোয়াড় এবং  
নামী সাহিত্যিকগণ খেলাকে কেন্দ্র করে ছোট বড় গল্প,  
উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্য রচনা লিখেছেন—

খেলা আর খেলা ৯০০



পুস্তক অধিকার প্রকল্প লিখুন

৬৮, কালিডাস স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০৭৩

## সংগীত-এর বই : শতুনাথ ঘোষের

কথক নাট্যের একটি অনবদ্য গ্রন্থ

- ১। মজলিসী ঠুংরী ৬
- ২। সহজ তানালাপ  
১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে ১৫
- ৩। তবলার ইতিহাস ১৫
- ৪। সংগীতের ইতিহাস  
১ম ও ২য় প্রতিখণ্ড ১২
- ৫। প্রগোত্তরে নজরুলগীতি ১৫
- ৬। নজরুলগীতির নানাদিক ৭
- ৭। প্রগোত্তরে প্রভাকর ও বিশারদ ১২
- ৮। রবীন্দ্রসংগীত (প্রগোত্তরে)  
১ম খণ্ড ১০০, ২য় খণ্ড ১২

পঞ্চকেন্দ্রার, সপ্তবদরী, নন্দনকানন ও হেমকুণ্ডের একটি মিথিটমধুর ভ্রমণকাহিনী : শতুনাথ ঘোষের

হিমগিরির অঙ্গনে

পারিবেশক

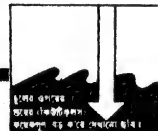
নাথ ব্রাদার্স II ৯, শ্যামচরণ দে স্ট্রীট II কলিকাতা-৭৫

আর একটি গান মনে করিয়ে দেয়, 'ভাঙের ডাঙরে ডাঙ' গানে 'আলোর পথচারী'র অনেক শব্দ, ইমেজ বিকসিতভাবে ছিটান, এরকম একালের অনেক গানের কথা ও সুর তুলে দেখান যায়—একালের শিল্পীরা সেকালের গানকে অভিধান হিসাবে ব্যবহার করেছেন—বংশসামান্য পুঁজি নিয়ে। তাই সলিল চৌধুরীর বাগগীতি বা হেমাক্ষ বিশ্বাসের 'গ্রাউণ্ডব্যাটেন কাবা' কিংবা দ্বিধা রায় মজরী লোকগীতির ধরন—হলধরজী বা হারুন চট্টোপাধ্যায়ের কিম্বদন্তি রূপান্তর সম্ভব হয়নি—চরিত্র কুশারীর 'অরণ শিরের দলাদলি করে' গল্পের মত প্রাঙ্গণশী গানও এই রূপান্তরিত অবস্থায় সৃষ্টি হয় না। স্বল্প সলিল চৌধুরী 'কায় ঘরে প্রদীপ জ্বলনি'র 'কায় কাড়ার দখ জোড়নি'র বহু গানে বহুভাবে ব্যবহার করেছেন—কিন্তু সবার মিলিয়ে গান হয়েছে, কবিতা হয়েছে। এখন সেই শব্দ নিয়েও নতুন ভাবনা হচ্ছে না এটাই তথ্য। একালের শিল্পীদের মধ্যে নরেন মথোপাধ্যায় দরজা গলার অধিকারী—কিন্তু মন, ঘোষের মত প্রণেয় গান গাইবার সুযোগ তিনি পাননি। তাই তখনকার দিনের জিকলে কি এন আর এর ফলবাক মন্ট, ঘোষ সাধ্যায় যেমন গল্পগাথা করতেন, আজও প্রবীণ বলস সেটা করেন; কাল, গান গাইতে তিনি উদ্দীপ্ত হন বুল। নরেন মথোপাধ্যায় কি করুক বছর পরে এই গান নিয়ে ততটা উদ্দীপ্ত হতে পারবেন! তখনকার নৃত্যনাট্যে আজও লক্ষ্য



ড্রামচার্জ, অসিত চট্টোপাধ্যায়, কট, পাল, শক্তি নাগ অনেকের মন জয় করেছিলেন—কিন্তু একালের নৃত্যনাট্য পঞ্চদশ দিন গোনা শব্দই কিংবা নাটক এই স্টেজের মত সম্পূর্ণ দৃশ্যবাহু হয়ে দাঁড়ায়। নাটকের ক্ষেত্রেও চরিত্রের দলকে—আগুন, জবানবন্দী, নবায়, ল্যাংগুয়েজ, হোমিওপ্যাথি, বাস্তবতা, —পল্লবের দলকে দলিল, রহস্য, জ'লিয়াস ফটিক, আজকাল, নীলমণি প্রভৃতি অনেক অরণ্যীয় নাটকের নাম করা যায়। ষাট দশকে কিমলিস, হাদ্রানেক নাটজামাই, অশ্বিনকান্ত, লেনা প্রভৃতি মাত্র কয়েকটি নাটকের নাম মনে আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে রবীন্দ্রনাথ, মার্ক্সম গোবিন্দ, চেম্ভে বহুপরিচিত। পরবর্তী পর্বে এ সব নাটকে কল্লীর অনেকের জীকনটা পরিচয়। অবশ্য এই সময়ে গণনাট্যের

## টু-টোন-এখনও ভারতের ১তম্বর হেয়ার ডাই।



টু-টোন হ'ল একমাত্র হেয়ার ডাই যা চুলের গভীরে প্রবেশ করে... এর দীর্ঘকালী করে।

টু-টোন ভারতের সবচেয়ে বেশী কার্টিজের হেয়ার ডাই—আর তা চলে আসছে বছরের পর বছর ধরে... এর বিশেষ ফর্মুলা চুলের প্রতিটি স্তরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে... সহজ নিষ্ঠুভাবে আপনার চুলের ডাই করে। আপনার চুলে এনে দেয় সত্যিকারের এক স্বাভাবিক রূপ... করে তোলে মোলায়েম ও চকচকে... সাথে নিজেই বেশ! একবার ব্যবহার করেই দেখুন না... আপনি অন্য কোনও হেয়ার ডাই আর পছন্দই করবেন না! কালো ও ব্রাউন রঙে পাওয়া যায়। পুরুষদের জন্যে স্পেশাল প্যাক।



**টু-টোন**  
হেয়ার ডাই



চুলের রঙের ব্যাপারে যাঁরা রূপতে সম্মত অগ্রণী।

evorest/80/JKH/48-bh



সম্প্রতি হঠাৎ করে নটকের কিশক-  
গীত বর্তমানের গ্রন্থ খসড়া-  
নিরাক্ষর ধরন।

একদিন রাগা পথে পথে মিছিল  
শ হয়েছিলেন, গ্রামে গাজ মাঠে  
নিয়ম সাধারণ মানবিক তাপমাত্রা  
অথবা শীতাতঃ রক্তে সম্ভবিত  
ছিলেন, তাঁরা অনেকই সম্মিলিত  
ছিলেন যেমনটা নটক করতে গান  
ত শীতাতঃপন্নালিত নেতাজী  
গার স্টেডিয়েমে। বেভারকেই হোক  
কের উপস্থিতিতে রোমাঞ্চিত হবার  
গাণ থেকে বর্ণিত করেছে—এটা  
থর। একদিন স্বাধীনতা সংগ্রামে  
১৫ই আগস্ট-এ অনেকই মাথায়  
টুপি পরে কংগ্রেসী হয়ে গেলেন  
৮ দিনের জন্য জেল খেটেও  
শিত রাজনৈতিক কর্মীর ভাতা  
র বেতে লাগলেন। আজ পরিবর্তিত  
ভূমিতে অনেকই আই পি টি এ  
বেল দিয়ে কোলোনিয় অহেতুক  
ভরান করেন। কিন্তু শিক্ষা সাহিত্য  
য়ে পারিবারিক ঐতিহ্য থাকলেও  
লীনা নতুন করে অভিনয় করতে হর  
গ জানবার, শেখবার এবং ভাববার।  
লীনা অজ্ঞানের প্রসঙ্গে আসি  
নাটোর প্রথম পর্ব সচিয়া মির,  
লল চৌধুরী গণনাটোর গান রেকর্ড  
কেন। পরকর্তৃক লেহমন্ত মঞ্চে-  
ধারের গায়ের বধু রেকর্ড করার  
য়ের অবস্থা সকলেই জানেন।  
কোলোনিয় স্টেডিয়ের দৃষ্টান্ত কতবার  
ছিলেন গণনাটোর সমর্থক। তাঁরা  
কপর হারাছিলেন সতপন্থ-পরবর্তী-

কালে জনসাধারণ জীবনসংগ্রামে বরণ  
করে নিরক্ষর ছিলেন। এই সাহস এখনকার  
অনেক কত বাস্তবের নৈই এবং সাহস  
থাকলেও এখনকার গল্পগল্পের গান  
জনসাধারণ—সহ সঙ্গীতগুলোই তাকে  
বরণ করে নেবে কিনা সন্দেহ।  
সাধারণের কাছে পৌছানোর যে  
কৌশল সেখানেও আমরা করছি।  
বেশবিশ দলপন্থ

## আলোচনাসহ তিনটি গানের আসর

রবীন্দ্রসদন আয়োজিত রবীন্দ্র  
কল্যাণসেবে 'গানের আসর' ভিন্ন  
'আলোচনাসহ গানের আসর' পূর্বায়  
করকটি অনুষ্ঠান সূচীভূত হয়েছিল।  
এই পর্বের প্রথম অনুষ্ঠান ১২  
মে সম্মুখ্যে মূল গান সহ রূপদী  
রবীন্দ্রসঙ্গীত। প্রযোজনা : সত্যকরবা  
অনুষ্ঠানে তিনটি গুপ্ত, তিনটি ধার্ম্য,  
দুটি খেয়াল ও দুখানি টপ্পা গান সেই  
আদর্শে রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের পাশা-  
পাশি পরিবেশিত হল। সর্বশেষ  
রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে মূলানুগ ও মূল-  
ভিত্তিক, এই দুটি ভাগে গানগুলিকে  
নির্বাচিত করা হয়। সুয়ে, ভাল ও গর  
এবং আধিকাংশ ক্ষেত্রে কন্যার বিবরণসূত্বে  
ও কলি গঠন মূলের অনুসরণে রচিত  
হলেও প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের  
গান সম্মিলন। বস্তুত এই বক্তব্যের  
পরিপ্রেক্ষিতেই অনুষ্ঠানের প্রয়োজন।  
পরিবর্তনা ও পরিবেশনায় তেমন কোন  
নতুন না থাকলেও অনুষ্ঠান সাধক

শ্রী শৈলেন্দ্র নারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী প্রণীত

# গিতরৌ

(মূল্য : ৩২-০০)

এই মহাপ্রভুটির মন্ত্রবাণী—

“ব্রহ্মটা আছেন শুনি

তাঁরে চোখে দেখিনি,

মাতাপিতা নিত্য প্রকট

তাঁদেরই নমি।”

বেদ-উপনিষদের আলোকে ধরার দেবতা মাতাপিতাকে  
ধরেই কি ডাবে জীবনে পূর্ণতা আসে তারই এক  
ছন্দোবদ্ধ ইতিবৃত্ত।

সর্বজনপাঠ্য এই পুস্তক।

একাধারে মাতৃগীতা এবং পিতৃগীতা।

প্রকাশক :

বৈদিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট

২, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩

## মাড়ির গোলমালের প্রথম লক্ষণ ?



**প্লেগ (Plaque)**  
হল জীবাত্মর এক অদৃশ্য  
পদ। যা আপনার দাঁত আর  
মাড়িতে সবসময়ই জড়িয়ে  
থাকে। অবহেলা করলে,  
প্রেক দস্তমলে পরিণত হয়।

**দস্তমল**  
দাঁতের গোড়ায় জমে, ফলে  
মাড়ি জালা করে আর ফুলে  
ওঠে। পরে মাড়ি আর হাড়  
ফাটতে পারে।  
ফলে গিয়ে দাঁত পড়ে  
থেকে পারে।

**মাড়ি থেকে রক্ত পড়া**  
ব্রাহ্ম দিয়ে দাঁত সাক্ষরকার  
সময় দুবল আর ফোলাফোপা  
মাড়ি থেকে রক্ত পড়তে পারে।  
এতে বাধা না পেলেও গুরুতর  
সমস্যা দেখা দিতে পারে।

## দাঁতের অস্ত্রের তৈরী করহ্যাস টুথপেস্ট দিয়ে আপনার মাড়ির যত্ন নিন

**ডাঃ করহ্যাসের অধিভূমি করমুলা**

ডাঃ করহ্যাসের শক্তিশালী অ্যান্টিপ্লেগ ক্রিয়ায়  
করমুলা আপনার মাড়ির ওপরের ভাগ মজবুত করে  
তোলে, ফলে আপনি মাড়ির গোলমাল রোধ করতে  
পারেন।

**দাঁতের ডাক্তাররা বলেন**

মাড়ির গোলমাল হলে এমনকি সুস্থ দাঁতও  
পড়ে যেতে পারে।

রোজ রাতে আর সকালে দাঁত ব্রাশ  
আর মাড়ি মালিশ করুন, করহ্যাস টুথপেস্ট আর  
করহ্যাস ডবল অ্যাকশন টুথব্রাশ দিয়ে।



**মাড়ি  
খারাপ  
তো স্বাস্থ্যও  
খারাপ**



**কিন্তু কি?** “আপনার দাঁত ও মাড়ির যত্ন”

রঙীন পুস্তিকা। অনুগ্রহ করে ২৫ পরসার  
ডাকটীকট সমেত এই প্রিকানার লিখুন।  
করহ্যাস ডেপ্টাল অ্যাডভাইসারী বুরো,  
পোস্ট বাক্স নং ১১৪৬০, ডিপার্টমেন্ট P 128-215,  
বক্স ৪০০ ০২০।  
যে ডাকঘর চান জানাবেন।

**ফরহ্যাঙ্গ**

**দাঁতের ডাক্তারের  
তৈরী টুথপেস্ট**

Read, T.M. Geoffrey Manners & Co Ltd.

**পরিবহিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ বেরুলো**

সি. আর. এ-র অন্যতম পরীক্ষক ও জাতীয় রেকর্ডার

**রবি চক্রবর্তী**

**ফুটবলের রেফারী কুড়ি টাকা**

ফিফার সর্বশেষ আইনের ভিত্তিতে প্রায় দেড়শত চিত্র ও নয়শত প্রস্তোত্তর সহ রেফারী পরীক্ষায় বসার একমাত্র হাতিয়ার যা ইতিপূর্বে বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত হয় নি।

সাংস্কৃতিক প্রকাশিত করেণি বই :

বেদুইন বীর চট্টোপাধ্যায়  
মাঝরাতে সূর্যোদয় ২০, রূপালনের নায়িকা ১৫

পরেশ ভট্টাচার্য কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়  
তবুও রমণী ৭.৫০ মোমের আলোয় দেখা ৮

আন্তর্জাতিক যুগোপাধ্যায়

**সোনার কাঠি রূপোর কাঠি ১০**

(অমরকণ্টক নামে মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে)

জনির্বাচিত পদ ১৬, রাগশর ১০, কুমারী যাত্রা ৬

ভি. পি-তে বই নিতে হলে অবশ্যই অগ্রিম পাঠাতে হবে।

সাহিত্য প্রকাশ, ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

আলোকিততা ও নিষ্ঠা-র আদর্শগত প্রখ্যাত শিক্ষাবিদেব সহযোগিতায় কলকাতা এ কেন্দ্রে বিশেষভাবে স্মার্তব্য। কেন্দ্র এটি কবির কোথাও পরিচালিত হয়নি। দুপলী রবীন্দ্রসংগীত বসতে এর কি হুকেছেন এবং তার যৌক্তিকতাই কি?

মূল গানগুলির মধ্যে দুপলী ও ধামারদুল গেরেছিলেন কলকাতা মিল। তার কণ্ঠে বলিষ্ঠতার সঙ্গে মাধবের স্পর্শে গানগুলি সুখপ্রসূ হয়—বিশেষ উল্লেখ্য, ইমন কল্যাণের সুরে সুর ফাঁকতলে নিকল শব্দের শিখ পিনাকী এবং বেহাগের ধামার 'আজ' রূপ খেলতে হোরা! গান দুটি। এই প্রসঙ্গে কোনো কোনো গানে কীর্তি আলোপের অংশ এ কেন্দ্রে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। পাথোয়ারী-বাদকের লয়বৈক্য তাঁর দু-একটি গানে রসহানি ঘটিয়েছে। সন্ধ্যাক গানের কেন্দ্রেও এই দুটি পরিমার্জিত হয়েছে। মূল খেলাগানগুলি পরিবর্জন করেন উমা দে ও নিমখা সেন। উমা দেব সুরসমৃদ্ধ কণ্ঠে খেলাগানগুলি উপভোগ্য হলেও রবীন্দ্রনাথের 'এ পরবাসে হবে কে' গানটি উচ্চারণ ও গায়কীর দুটিতে প্রাণিত রসসঞ্চারে সমর্থ হয় নি। সাগরীন্দ্রিন খাঁর কণ্ঠে 'মিঞা বে মানলো' এবং 'ও মিয়া কেনেকলেনে' পাজারী টপ্পা দুটি অপরূপ লাক্ষ্মীর পরিবেশন।

অনুষ্ঠানে উল্লেখ্য সঙ্গীতের তুলনায় রবীন্দ্রসংগীতের অংশ ছিল নিম্নতম। স্মৃতিস্ম অংশে কত র

আলোকিততা বাইরে কখনো এক বিদেব করে কীর্তির সুরে যত্নে হুগে 'হায় রাসন পূর্ণ হল গান দুটিতে যে অশ্রু' রসসঞ্চার করলেন তা কিঅসম্ভব। সৌন্দর্যের অনুষ্ঠানে তাঁর শিক্ষণীয়তার পূর্ণ বিকাশ প্রমাণ করে তিনি কেন্দ্র জাতের শিল্পী। তমালিকা ব্রহ্ম দুটি গানের মধ্যে 'দুখ রাতে ছে মল্ল গানটি অধিকতর আকর্ষণীয় হয়। 'দ্বিগিরে মম কে' গানটিতে মাধব মিল সহজেই কবিরে দিলেন তাঁর শিক্ষার ভিত্তি। কত দুর্ভাগ। তুলনায় চন্দন মন্ডো-পাথারের কণ্ঠে অগ্রে নাথ জোহন রাতে' পরিচ্ছন্ন পরিবেশন। শ্রুতেন্দ্র; কিশোরের এক কণ্ঠের গানগুলি আঁত, সাধারণ মানের এমন কল্য ও কল্য কর না। সন্ধ্যাক গানগুলি অনুগ্রহে। দেবদুল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ এই অনুষ্ঠানে বিশেষ কার্যকর মনে হয়েছে।

২৪ মে এই পরিচ্ছন্ন দ্বিতীয় অনুষ্ঠান 'রবি-অনুষ্ঠান'। প্রবেশনা—কংসদেব।

অনুষ্ঠানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পূর্বব। নরীর প্রতি আকর্ষণ উদয় ছিল। বহু নরীর আকর্ষণও ছিল সুপুরুষ রবীন্দ্রনাথের প্রতি। উত্তর পক্ষের কাঁহনী নিরেই এই দুঃসাহসিক অনুষ্ঠান। পরী মঞ্জলী দেবীকে স্বদ দিলে জামর ছরজন ভাগ্যবতী মহিলাকে পাই, যাঁর রক্তে রসে প্রাণিততে জলোদ্যায় কাঁবর জীবন স্পন্দন করে রেখেছিলেন। এই মহিলাকে সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথ অনেক গান ও কবিতা

**বৈদ্যনাথ**  
**দস্তমঞ্জন (লাল)**  
**হাসিতে দেয় মুক্তোর আলক**

দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত ও নিষ্ঠুরযোগ্য উপাদানে তৈরী **বৈদ্যনাথ** আয়ুর্বেদীয় দাঁতের মাজন। দাঁতকে সুদৃঢ় ও উজ্জ্বল করে। মাড়ির স্বাস্থ্য বজায় রাখে ও মুখকে সুগন্ধি করে। কনজিউয়ার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ায় সমীক্ষায় দেখা গেছে— কেবলমাত্র আয়ুর্বেদীয় গাছগাছড়াই দাঁতকে বিভিন্ন দস্তরোগ থেকে রক্ষা করে। সুনির্বাচিত ভেষজ থেকে ঐতিহ্য ও আধুনিক পদ্ধতির সমন্বয়ে তৈরী **বৈদ্যনাথ** ঔষধ সারা ভারতে জনপ্রিয়।



**শ্রী বৈদ্যনাথ**

**আয়ুর্বেদ ভবন লিমিটেড-এর**

একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

১. ৩-ত লেন, কলিকাতা-৬

কলিকাতা • পাটনা • খাঁসী • নাগপুর • এলাহাবাদ



ছিলেন। আর মধ্যে কিছু গান  
উল্লেখ্য নির্বাচিত না হলেও  
ক'ত। এই সব গান আর ক'বিতা  
করে কিশোরের উপহার 'স্বি-  
রাগিনী'। মনেতেই হয়, অনুষ্ঠান  
সম্পন্ন হওয়ার আগে যদিও উপস্থিত  
উল্লেখ্যের কাছে গ্রহণযোগ্য না  
ও পারে। গ্রন্থকার ভাবা যেমন  
বাণী তেমন সরস কিন্তু বিকটিক  
ট সম্প্রদায়ের উপযোগী করে  
ত গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে এই সব  
স্বাধীনতার নিয়ে রচিত নর এমন  
কি গান সূচীভূত করতে হয়েছে তাতে  
ভাবা যতখানি আবেগপূর্ণ ততখানি  
নিষ্ঠ হয়ে ওঠে নি। উল্লেখ্যের  
সে অনুষ্ঠানটি তাই সৌন্দর্যহীন।

অপরূপে মূলত সংগীতই ছিল  
অনুষ্ঠানের প্রাণ। সেক্ষেত্রে  
শুদ্ধ শিশুশ্রীসম্প্রদায় তার পূর্ণ  
হার করে ছোটামুটিভাবে অনু-  
ষ্ঠানটিকে আনন্দময় করে তুলতে  
ক্ষম হয়েছিল। তবে সম্মেলক গান-  
সংগীতের মধ্যে একটি গানই ছিল  
যা শুধুই 'স্বপ্ন' হতে গিয়েছিল  
সেখানে অনুষ্ঠানটি আরো  
ভোগ্য হয়ে উঠত। যেমন মনো-  
মোহন কণ্ঠে চারটি গানের মধ্যে  
বল 'তুমি কি কেবল ছবি' গান-  
তেই তিনি ছিলেন স্বপ্নাকার। আর  
গর সেনের কণ্ঠে 'যদি তোমার দেখা না  
ই প্রভু' গানটিই কেবল উল্লেখ  
যোগ্য। যশী ঠাকুরের কণ্ঠে 'আমি  
এন তার দুয়োর পরিকল্পনা পরি-  
শন।' একটিমাত্র গান গেয়ে যান



সমবেত প্রাকৃতিক 'উল্লেখ্য' আনন্দ দানে  
সমর্থ হয়েছেন তিনি 'স্বপ্ন' হতে  
উঠাচার'। তার কণ্ঠে 'অলি বার  
বার ফিরে বার' মনে রাখার মতো।  
সেখানেই 'স্বপ্ন'ের সর্বোত্তম গানটি  
অবশ্য শোনা গিয়েছিল অর্থাৎ সেনের  
কণ্ঠে। 'তাই তোমার আলম আমার  
পক্ষ গানটির এমন ভাবসম্পূর্ণ পরি-  
বেশন করি' শোনার সৌভাগ্য হয়।  
জাম্বতী মনোমোহন্যের কণ্ঠস্বরে  
ভক্তিতার আভাস কিন্তু সুরেলা,  
তিনি গেয়েছিলেন 'আজু সখী মূহু-  
মূহু'। সংগীত পরজালনা বাণী  
ঠাকুর। 'পাখি' খোঁষ ও গৌরী ঘোষ  
লাবণ্যময় কণ্ঠে ভাবগাম্ভীর্য দারিত্ব  
নিষ্ঠাকারে পালন করেন।

১ জুন (১৭ মে-র পরিকল্পনা)  
অনুষ্ঠিত হল এই পর্বের সূচী  
অনুষ্ঠান—আমি যে গান গেয়ে-  
ছিলেন। প্রয়োজনা : কেবল।  
ক'ত বিচিত্রভাবে বিভিন্ন পরি-  
বেশে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে বারবার তার  
অসংখ্য প্রাকৃতিকভাবে নন্দিত হয়েছে,  
কতজনকে স্মৃতিতে চিরকালের জন্য  
বসে হয়েছে... বারী মনেছেন সেই  
কণ্ঠে তারা অমৃতের আশ্বাস পেয়ে-  
ছেন আর আজ সেই গান প্রবাসের  
কণ্ঠে হলেও আমাদের কাছে অমৃত  
গারক হিসাবেও জিন হতে পারে  
আছেন। এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে  
গারক রবীন্দ্রনাথের কিছু স্মৃতি  
সংগীতের উপযোগী করে  
একটি সুরে গেয়েছেন শ্রীঅমিতাভ  
চৌধুরী। ধারাজায়া রচনায় তিনি  
মহানত নিষ্ঠার করেছেন স্মৃতিকথনের  
ওপর আর সম্ভবত সে কারণেই  
বিষয়টিই একদিকে যেমন তথ্যনিষ্ঠ  
অপরদিকে তেমনই হৃদয়গ্রাহী হয়ে  
উঠেছে।

সকল অনুষ্ঠানটি কিছু  
সংগীতের দৃষ্টান্তের জন্য নির্দিষ্ট  
মানে উত্তীর্ণ হতে পারল না।  
সম্মেলক গানগুলি গ্রাহ্যহীন।  
একমাত্র কীটন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর  
রচিত 'তুমি বিনা কে প্রভু' গানটি। এই  
গানটিতে অন্যান্য সম্মেলক গানের  
মতো দলের সদস্যদের সুযোগ দেবার  
কারণে গানের অংশ বিশেষ এক কণ্ঠে  
গায়কানোর চেষ্টা হয় নি আর সে  
জনাই গানে প্রাণের ছোঁড়া জেদে-

ছিল। জোরজোরে একটি সম্মেলক  
গানের মধ্যে, হঠাৎ একটিমাত্র কণ্ঠ  
দুর্বল কম্পন এক কণ্ঠে গীত  
হলে তা কতখানি যেমননা লাগে এই  
অনুষ্ঠানে বার বার তার নিজের  
মিলেছে। এছাড়া সম্মেলক গানের  
'ধরা ছাড়ি'-র ক্ষেত্রে 'মনবন্ধনতা  
অত্যন্ত প্রতিকূল। মনে রাখা উচিত  
সম্মেলক গানে শব্দ কণ্ঠের সাথে  
কণ্ঠের মিলনেই প্রাথমিক সৌন্দর্য  
বিকাশিত হয় না। আর 'ভরা বাঁধ'  
বা 'তলক' গানটিতে এক অংশে  
আলো স্তিমিত হয়ে আসা এবং  
সম্প্রতিষ্ঠিত অংশে আলোর প্রাবন  
হালকা।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলতে  
হচ্ছে একক শিশুশ্রীও যেন সোনি  
কেমন ক'ত ব্যস্ততার সাথে হেরেছিলেন।  
অধিকাংশ গানই ছিল ফরাসী, প্রদেশ  
কোনো সম্প্রদায় ছিল না। কোনো কোনো  
গান প্রায় স্বরাগীর্ণ পঠি (আক্ষরিক  
অর্থ)। কোনোটি বা সুরহীন।  
তবু এই মধ্যে সুরসম্পূর্ণ কণ্ঠে গীতা  
বটকের 'স্বপ্ন' মনে রেখে, আরও  
কণ্ঠে অসংখ্যতম, কল্যাণামায়ের  
'আমার বোলো না গিয়েতে বোলো না  
এবং মূহু বালিশ কণ্ঠে স্বপ্ন গৃহের  
এই লজ্জা, সখী জব' গানগুলি  
স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ্য। সংগীত পরি-  
চালনা : শ্রীশ্রী 'উল্লেখ্য'। বলায়ালে  
কমল চন্দ্রের ন্যায় অবশ্যই উল্লেখ-  
যোগ্য।

পরিবেশে একটি বক্তব্য : একই  
অনুষ্ঠান বার বার প্রবেশকার

প্রকাশিত ১৭ এর বেষ্ট সেলার থ্রিলার  
হলে।

# জেমস হ্যাডলী চেজ

## স্বর্গে এক স্বৈরিণী

১৯৫৬

ক্যারাগেট কুংফু জগতের প্রবাদ পুরুষ বুস লীর  
একমাত্র প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থ  
বুস লী/লিঙা লী

### ব্রহ্ম আমার ব্রহ্ম

অনীশ দেব / রক্তে অমানুষ্য ৮৮

আপনার আগামী প্রতিটি রাত দুঃখে ভরিয়ে তোলার মত আতঙ্কজনক।  
বাংলা ভাষায় এই প্রথম হরার চিত্রারের দাবী রাখছেন।

বিষয়শ্রেণী লেখকদের প্রেষ্ঠ প্রেমের কাহিনী

## প্রেমের অমনিবাস ১৮৮

ডি এইচ লরেন্স / জিপসী ও কুমারী ৯৮

আলবার্তো মোরাভিয়া / স্বর্গ নরক ভালবাসা ৮৮

উইলিয়াম পিটার ব্যাটলি/বিদায় শরীর (EXORCIST) ৯৮

এ পি পি ১৬৬ কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রকাশিত হ'ল দ্বিতীয় মুদ্রণ একটি অসাধারণ বই

রবীন্দ্র-পুরস্কার, ইউনেস্কো-পুরস্কার এবং শিশু-  
সাহিত্যের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার-প্রাপ্ত গ্রন্থকার

অধ্যাপক ডঃ যতীন্দ্র প্রসাদ গুহ প্রণীত

# জীবের ক্রমবিকাশ

যশস্বী লেখকের সর্বাধুনিক গ্রন্থ

এতে আছে—বর্তমান জীব-জগতের সঙ্গে পরিচয়, জীবনমূলক  
প্রক্রিয়াসমূহ, ভিক্টোরিয়া, হারমোন, প্রজননবিদ্যা, অতিবিক্রমবাদ,  
জীব প্রজাতি কোথা থেকে, জীবের ক্রমবিকাশ, অভিযোজন, মানুষের  
উক্ত প্রভৃতি বিষয় সর্বাধুনিক তথ্য ও তত্ত্বসমূহ। এমন একটি  
বই অনবদ্বিত্য হতে তদগত হয়ে পড়বেনই, প্রাকৃতিক ইতিহাসের কাজে  
রাখবেন একটি রেফারেন্স বই হিসেবে। যে-সব কথা প্রতিটি জেনে-  
মেয়েই জানা উচিত, জীব-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে গবেষনার  
এই অতি-প্রস্তুত অগ্রসর যাপন যে-সব কথা না জানলে যুগ থেকে  
পিড়িয়ে পড়তে হয়, যে-সব কথা জানতে হলে প্রচুর পরিশ্রম করতে  
হয়, অনেক পুথিখণ্ড ঘাটতে হয়, সে-সবই পাওয়া যাবে এই একটি-  
মাত্র গ্রন্থে। এমন বই বাংলা ভাষায় তো বটেই, ইংরেজী ভাষাতেও  
দুলভ। জীব-বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর কাছেই এ একটি অমূল্য  
সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। কারণ, প্রতিটি বিষয় অত্যন্ত সহজ,  
সরল ও সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ৪০

মূল্যবান যাপন-লিখে কাগজে ছাপা। পাতায় পাতায় ছবি—  
ফোটো ও রেখা-চিত্র আছে প্রায় চারশ' এবং তাই প্রাইজ ছাপা  
রঙীন চিত্র নয়টি।

শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী কোং ৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড,  
কলিকাতা-৯

Four bottles of Shamoo hair oil are shown, each with a different number on the label: 14, 5, 23, and 9. Each bottle has a portrait of a woman on the label. The text on the labels includes 'SHAMOO', 'HAIR OIL', and 'For Beauty, Hair'.

**ইয়াযো ফরমুলা ১৪**  
বিশিষ্ট শাম্পু  
কাজানিক টুলের জন্য

**ইয়াযো ফরমুলা ৫**  
লোমশ শাম্পু  
কোলা টুলের জন্য

**ইয়াযো ফরমুলা ২৩**  
ঠিক শাম্পু  
ওক টুলের জন্য

**ইয়াযো ফরমুলা ৯**  
এক্স প্রোটিন শাম্পু  
কপুটী টুলের জন্য

adlink/dps/kc-3/80

না, না। কয়েকই। ক্রমশঃ এক হার। নাটকে  
যখন ঘটনাট ইক্সট্রারারি চল গেল  
তখন কিবরুশা মহান উপন্যাসের  
নাট্যরূপে দিতে শুরুর কামেনে  
সুবর্ণলতা সেই রূপ বদলের সাম্র  
তিত্তম সংকল্পণ। বাসায়াক মো  
অনেক জেজুতালি সেকুও একা  
জানিস সবলকে কখনকারে জনা হলে  
নাড়া দেয়—সেটি হল অভিনয়  
রাসবিহারী সরকার নিবেদিত  
নাটকে পদ্মপাত্রীকে কেউ আধুনিক  
মনস্ক নন, অভিনয়ের দরকার  
গভীরতা দেখানে দৃষ্টপ্রাপ্য। এ  
নাটকের নামক বসন্ত চৌধুরী হাস্যাক  
অভিনয় করেন। লোকের হায়ে বকে  
হাস্যাক নয়—তিনি ঘটনা সময়সীমার  
মধ্যে চরিত্রটি কোন সময় দান  
বর্ধিত পায়ে না। তবে বিবাহ  
অভিনেতার প্রভাব তার মঞ্চাভিনয়ে  
আছে—সে পোশাক তার পক্ষে খার  
অস্বাভিকর। কোন সময় মনে হয়  
আটি হয়ে দমবন্ধ করেন আনছে। অথ  
বসন্ত চৌধুরী শক্তিত, মাজি  
বোধের অভিনেতা—কিন্তু নাট্যরূ  
তাকে দৃড়িতে ঘেঁষে না। আরও  
ভট্টাচার সম্পর্কেও সেই একই কথা—  
তিনি যখন রবীন্দ্রসম্মান আর্জিত করেন  
তখন তা লক্ষ্যীর প্যালায়ী সমগোত্র  
হয়ে দাঁড়ায়। যবনিকার আগে তিনি  
যখন প্যাগলের নত হাসতে থাকেন—  
সেটি যথা সময়ের হাসি—কারণ আর  
বিশীকরণ চললে দমকর প্যাগল  
হওয়ায় উপক্রম হত। অসম্ভব ভাল  
অভিনয় প্রোঞ্চয় বসন্ত। উপন্যাসের

## অপারেশন ককটেল

ঘরাবা নিয়ে এই একটি লাভ  
 মেয়ে-রিলিফ হিসেবে কোন চরিত্র  
 লাগতবদ্ধ হয়ে অথবা ভাষ্কর্য করে  
 যায় নি। কলকাতার অবস্থিতিতে  
 যন কালেন দ্বীন মজুমদার। অনেক  
 তরুণ শিল্পী যখন প্রাথমিকভাবে  
 বাসে বাঁধা পড়েন তখন এই প্রবীণ  
 শিল্পী অশুভ ক্যাঙ্করাল অভিনয়  
 করে যান। এই নাটকে কিরল লাহিড়ি  
 ধরে সুন্দরভাবে চরিত্র বিশ্লেষণ করে  
 যান। প্রধান চরিত্রের মধ্যে  
 সৌরাণ চক্রবর্তী অশুভভাবে সংলাপ  
 বলেন। কমা, সেমিকোলন, বসাবধ  
 ব্রাকগার না বসিয়ে এক ধরনের কঠিন  
 সংলাপবর্তী তিনি আয়ত্ত করেছেন।  
 অথবা এইটাই নাটকের মূল সুর,  
 বৈশিষ্ট্যের অনিরমের রাজত্ব। মিঠে  
 গাল ও গীতা নাগ দাপটে অভিনয়  
 করে বাংলা নাটকের চিরন্তন দম্ভাল  
 শাস্ত্রীকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গীতা  
 নাগ অথবা একবার 'গজি' খেয়ে  
 বাড়ির সব ইট খসিয়ে দেবে' বলার  
 জায়গায় ইট খেয়ে বাড়ির সব গজা  
 খসিয়ে দেবে' বলে ফেলেন। মিঠে  
 গাল দু'বার দশকের দিকে  
 মারাত্মকভাবে পা ছড়িয়ে যান।  
 আর একবার আর একজনের সংলাপ  
 আটকে যেতে আরও ভ্রাতৃত্ব সামাল  
 দেন। অনুশাসনা রায়ের কণ্ঠ পূর্ব  
 এবং হাইলারি বর্ডারের অবস্থান করে।  
 বকুল ধর দুটি-একটি কথা বলে  
 চািলে যাচ্ছিলেন, সেই তিনি দ.  
 লাইন কবিতা আবৃত্তি করেন তখনই

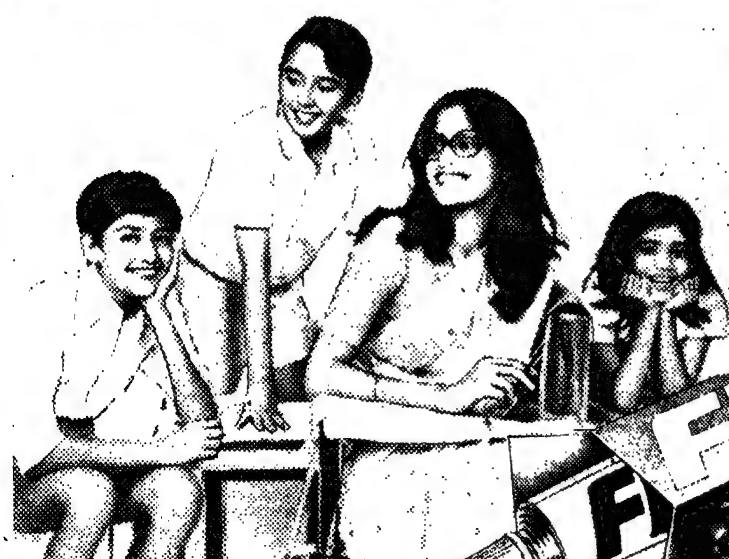
বোকা বার বারনাটি যাত্রার। যাত্রা মহান  
 শিল্প কিস্তি হঠাৎ কেউ এ বছরের  
 রমণপতন ব্যাপারেই ঘটিয়ে থাকেন।  
 আশ্চর্যকর বর্ডারের ভূমিকায় তিনি  
 অভিনয় করেন তিনি প্রথমেই খুব  
 স্বাভাবিক, স্থিতীয়কে, সেইটিশ বহু  
 পরে তিনি যে কেন নিজের চলাফেরা,  
 কঠক বাট বহুর পেরিয়ে আনেন  
 বাঁধতে তার কাখা চলে না।  
 আমাইয়ের ভূমিকার অভিনেতাও খুব  
 স্বাভাবিক। (এখানে নাট্যরপে  
 চুটি-চরিত্রগুলির নাম প্রচার-  
 পুস্তিকায় সেখা বার, কিন্তু নাটকে  
 শোনা যায় না)।  
 নাটকের প্রথমে সুবর্ণলতা ঘুর  
 থেকে উঠেই হাত নেড়ে (যার প্রমাণে  
 সবে মাত্র পাটখুঁফা মনে হয়)  
 রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে  
 থাকে 'নিব্বেরে' স্বন্দভল। নারক  
 রবীন্দ্রনাথের কবিতা শোনে ন।  
 কবাবোধও তার নেই—কিন্তু একবার  
 'দ্যা আশা কুহকিনী' বলে ফেলেন।  
 একই ফেরওয়ালার কণ্ঠ পরপর তরল  
 আলতা, চুড়ি এবং ল্যাঙড়া আর  
 ফের করে যায়, পরবর্তী দু'শা  
 সমরোপযোগী 'বেলকুল' হাঁক দেয়  
 রমণাবদারকভাবে। এই সর্বাধিকার  
 বটিকা ব্যবসায়িক রূপমণ্ডই সেবা।  
 শ্বিভেন মনোপাধ্যায়, অমর পাল  
 দ্বীনেন্দ্র চৌধুরীর গাওরা গানগলি  
 ভাল হলও আবহ যথাবিহিত।  
 শৈলেশ রায় দুটি টাইটেলে রেকর্ড  
 করেছেন। এক একটি পাঁচ দশ

মিনিটের টাইটেলে রাসজালার মত  
 গানের পর পর সুর বাজিয়ে যাওয়া  
 হয়। খালি গলার অরুণ চৌধুরী  
 বেশ গিয়েছেন। কটকের অনুসন্ধে  
 ব্যাপাঙ্গাঙ্গলা বাড়ি করেছে নারক—পরে  
 বোকা গোল বটকের অনুসন্ধে হলো  
 একটু, একটু, মমতা থাকত—আসলে ঐ  
 ব্যাপাঙ্গা পরিচালকের আদেশে তৈরী।  
 সুধাংশু শেলেই ওখানে প্রোজেকশনে  
 পুতুলনাচে ননারকম মন্তাজ দটের  
 মধ্যে নারক-নারিকার আলিঙ্গন  
 দেখান যায়। সুরেশ দত্তের সেট বেশ  
 ভাল—পুরোন বাড়ির, মেজাজ রেখে  
 মাঝেমাঝেই দেয়াল নড়বড়ে হয়ে  
 যায়। তাপস সেনের অস্তিত্ব লুপ্ত  
 পুতুলনাচের অংশ। কমল চৌধুরীর  
 ধনি বেশ ভাল—কিন্তু মেক-আপ  
 খুব খারাপ। একটি দুশো নারক  
 দু'বার দু'রকম আলোয়ান গায়ে দিয়ে  
 ঢোকে। অন্য সকলের গায়ে কিছু  
 নেই। বোকা গোল না ওটা শীতকাল  
 কি-না। অথবা হতে পারে পঞ্চাশ  
 বছরের ঘটনাকে তিন ঘটায় সামাল  
 দিতে গিয়ে সমগ্র প্রযোজনাটিই  
 জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে—নারক তার  
 প্রতীক।  
 সেন্সিটল দামদত্ত

কালচক্রের সোলহীটের শিল্পীশকা  
 শাস্ত্রীকে প্রাথমিক অনুষ্ঠান নির্বাহিত  
 হল অবনমনে। ২৭ এপ্রিল সম্ভার।  
 নিজস্ব প্রযোজনা ছিল 'পারিবারিক'  
 মতানো। এই সম্ভার সম্পীত-  
 শিকারতন সুরবর্তনকে বহিষ্কৃত  
 অকলপন গান ও নৃত্য সহযোগে  
 মে-আলোখ্যটি রচনা করেছেন তার  
 দু'পায়ের ছিলেন সম্ভারই শিল্পক-  
 শিল্পিকা ও হাটছাত্রীস্ব। চৌ-  
 ম, চতাবে সখ্য এই অলোখ্যটি। কথিত  
 কহো লহো তুলে লহো গানটি সুর  
 মনে হয়নি, ঐক্যসম্পীতে কিংবদন্তি।  
 জারতবর্ষ-এর নৌবা গায়ক বটী  
 সারলীল সাগরিকার নেপথ্যশিল্পী  
 তেমন নন। আবহসম্পীত সুরের  
 বিশেষভাবে কানে গেলে আরে সেতারের  
 ব্যবহার।  
 অনুষ্ঠানের আয়ত্তে ছিল পূর্ণা  
 দামের কণ্ঠের সাতটি অনকা রবীন্দ্র-  
 সম্পীত এবং বৈশিষ্ট্য দত্তের অসামান্য  
 চারটি মুকাদিমের কীচায়। নবীল  
 শিল্পী নক্সা চক্রবর্তী'র কণ্ঠ নরর-  
 গীতি ভাল লেগেছে, ভাল লেগেছে  
 হোট শিল্পীদের জিপসী নচও।  
 এক ঘন্টার লোডশেডিং অনু-  
 ষ্ঠানের গতি ধামিরে ঘিরেছিল, মইলে  
 শুর, থেকে শেষ পর্যন্ত মোটামুটি একটা  
 পরিচ্ছন্ন ও তরতর ভাব ছিল সার্বিক  
 নিবেদনে।  
 প্রব মনোপাধ্যায়

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **বিবিধ**  
 নৃত্যনাট্য সাগরিকা  
 ইন্ট গাড়ীরা এডুকেশন অ্যাঙ্ক

# ফ্র্যাশে দাঁত উজ্জ্বল-ঝলমলে নির্মল!



## তরতাজা হাসির খাস কারণঃ

- ফ্র্যাশের তরতাজা গুণ :  
 এতে এমন এক বিশেষ  
 নীল উপাদান রয়েছে, যা  
 খাল-প্রদাহকে দুর্গন্ধমুক্ত,  
 মিহল করে ও দাঁতের  
 পোকা ইতড়া রোধ করে।  
 ফ্র্যাশের দক্ষতা  
 আত্ম বিশ্বাস :  
 কারণ আপনি জানেন যে,  
 জ্ঞান আপনাকে শাস,
- মাড়ি-বলতে কি, শাস  
 মুখের ভেতরটাই  
 চমৎকার ভাল রাখে।  
 ফ্র্যাশের সুস্বাদু :  
 উম-ম-ম-মজাদার...  
 চমৎকর তাজা স্বাদ  
 চমৎকার-স্নিগ্ধ মাকতে  
 চাইবেন বার বার।



**ফ্র্যাশ**  
 টুথপেস্ট

ঘাতে সেলাতো আছে তরতাজা স্বাদের আকাশ-তীল উপাদান।



# শরৎ রচনাবলী

## (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ)

- শরৎ রচনাবলীর (পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ) নতুন করে গ্রাহক নেওয়া হচ্ছে। দাম আগের মতই একশত দশ টাকা থাকছে।
- ১লা জুলাই, ১৯৮০ থেকে সম্পূর্ণ মূল্য অথবা প্রথম কিস্তি বাবদ বাট টাকা নগদ জমা দিয়ে শনি, রবি ও ছুটির দিন বাদে বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬-৩টা পর্যন্ত নীচের কেন্দ্রগুলিতে গ্রাহক হতে পারা যাবে।
- ক) শরৎ স্মৃতি মন্দির- ২৪, অশ্বিনী দত্ত রোড, কলি-২৯।
- খ) প্রজ্ঞানন্দ ভবন- ১৪২/৪, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, (মৌলানী) কলি-১৪।
- গ) এম. ধর অ্যান্ড কোম্পানী- ১৫৬/১সি, রাধাবাজার স্ট্রীট, (লালবাজারের পাশে) কলি-১।

শরৎ সমিতি, ৩১, অশ্বিনী দত্ত রোড, কলিকাতা-৭০০ ০২৯ এই ঠিকানায় মনিঅর্ডার মারফৎ ও গ্রাহকমূল্য পাঠানো যাবে। ডাকবোণে গ্রাহক পত্র অথবা বই নিতে গেলে উপযুক্ত ডাকমাশুল অগ্রিম পাঠাতে হবে।

- প্রথম খণ্ডটি গ্রাহক হবার সময়ই দেওয়া হবে।

- শরৎ সমিতি প্রকাশিত বিজুতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আত্মজীবনী 'জীবন-তীর্থ' (মূল্য তিরিশ টাকা) বইটিতে শরৎ রচনাবলীর গ্রাহকেরা ২০% ছাড় পাবেন। পুস্তক বিক্রেতার বইটি এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড-এর দোকান থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।

শরৎ সমিতি

৫১, অশ্বিনী দত্ত রোড,  
কলিকাতা-৭০০ ০২৯



শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়  
সাধারণ সম্পাদক

PX/G/SS-1/80

## প্রমুদ শিল্পী পরিচিতি

লতিকা কাঠ (১৯৪৮—)

লতিকা কাঠের জন্ম স্বর্ধীনতার পরে। তখনটা ফেব্রু-বি এ (ফাইন আর্টস ক্লাস) হিন্দু কলেজ, ১ম শ্রেণী, স্বর্ণ পদকপ্রাপ্ত ১৯৭১। এম এ (রোজ টালাই, প্রথম শ্রেণী, বঙ্গোপা- ১৯৭৫)। পরকালে ছিল আর্ট স্কুল। '৫০-এর পর হলো আর্ট কলেজ। এখন থেকে বি এ, এম এ, পি এইচ ডি। ভারতীয় রত্ন ডিগ্রীপ্রাপ্ত। এসব জ্ঞানেতে গেলে লিখতে হয়। সুতরাং ইরোজী- নারিস হতে হয়। এই শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রকৃত শিল্পীর স্থান নেই।

রচিতকার স্বামী বলবীরা সিং কাঠ। এর সপ্তে লতিকা ইংল্যান্ড থেকে কাজ করেন (১৯৭১-৭৩)। একক প্রদর্শনী দেয়ায় (১৯৬৮)। জাহাপুরি আর্ট গ্যালারী, বেস্কাই, ডাম্ফার্স এবং রেখা- চিত্র (১৯৭৫) ডেকর সার্ভিস (১৯৭৭) মাক্স মুলার ভবন (১৯৭৮) কলকাতা। এম ডি প্যাডেলার কাছে ন্যাশনাল কালচারাল স্কলার হিসাবে কাজ করেন (১৯৭৫-৭৮)। বর্তমানে বলবীর এক লতিকা দর্জনেই কাশী হিন্দু কলেজের ডাক্তারের অধ্যাপক করেন চাকরি স্বাভাৱে।

পুরস্কার পেয়েছেন — গুরুরাট ললিতকলা আকাদেমী (১৯৭০) আইফেক্স, নয়াদিল্লি (১৯৭৪, ৭৫, ৭৬), অল ইন্ডিয়া ললিতকলা (১৯৭৫)। আকাদেমী অব ফাইন আর্টস (১৯৭৮)। আন্তর্জাতিক মহিলাদের প্রদর্শনীতে পুরস্কার (১৯৭৫)।

কাজ আছে, ন্যাশনাল গ্যালারী অব মডার্ন আর্ট, নয়াদিল্লি; ললিতকলা আকাদেমী, নয়াদিল্লি; উত্তর প্রাদেশিক ললিতকলা; এয়ার ইন্ডিয়া, দাউন এবং বাটা স্ সম্পন্ন। এছাড়া নানা কল্যাণত সংগ্রহে। বিদেশে বহু প্রতিকৃতি করেছেন।

আমি মনে করি সমকালে ভারতীয় নারী ভাস্কর্য পুস্তকের সমকক। অনেক সময় জীবন যৌবন ভাস্কর্যের বেদী তলে সম্পূর্ণ করে পুস্তকে ছাড়িয়ে গেছেন। প্রকৃতিই মনে পড়ে মীরা মথুরা- পাখারো কথ। ভুলানি অবশ্য পিলে- পোচখানাওয়ারা কথ। হয়তো কাল- ক্রমে লতিকাও এই দলে যোগ দেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বারবার 'হেপওয়ার্থ'। লাইজা বেকডলান এবং লতিকার সম- স্বয়ী হেডে বিজলের কথ মনে পড়ে। জন্মের সত্যতনের জননী হওয়ার মতো প্রমাণ এক সমকালে কাজ। সুতরাং চিত্রের চেয়ে মূর্তিতে নারীরা কৃতিত্ব দেখিয়েছে বেশি। অল্প বার্থা মরিস বা কেথ কোল্ডসের কথ আমি ভুলানি।

লতিকার প্রথম দিকের কাজের মধ্যে প্রতিকৃতিগুলো উল্লেখযোগ্য। বিশেষত তার পিতার প্রতিকৃতি। (প্রদর্শনিত দেবী- প্রদাস থেকে কলিকাতা ভাস্করদের যাদের দেখছি তাদের প্রায় সবাই মূর্তিতে রূপের মতো পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ করেছেন। সমাজ, মন- মতাত্ত্বিক এর মধ্যে কিছু খালি পেতে



প্রতিকৃতি-নির্ভর কাজ। যেমন লো- কেসে মেমসাহেবের মস্তকে আরো অভিব্যক্তি মূল্য করে। তার চোখটা যার দিয়ে, চককে বন্ধকে করেন। বা একটা মানুষের মস্তুর পেছনে দিকটা খোলা। তার বাইরে ভেতরে সিঁড়ির ধাপ উঠে নেমে গেছে।

আরেক ধরনের মূখ লতিকা করতে ভালবাসেন। এখন পড়া ধরা মখ। কিন্তু কাঁচা নয়, এদের চোখে মখে মখে আর নকশামিত ভঙ্গী আনেন। হয়তো হা- বা টোঁটের কুচকানো। বা কপালের চুলটা পড়ার মতোই এটা ধরেন। দেখ মনে হয় নরকের কল্যাণে গেল। এইসব নকশা নকশা নকশা যেন উঠে এসেছে। চোখগুলো ফোলাটে, মখ নিকারপ্রসূ। কখনো মথের স্বক মঙ্গ। কখনো একজনে খেঁজো। কেমন যেন ভল ভয় করে।

এছাড়া লতিকা যেমটা বা দেহমূল নিয়ে কাজ করেছেন। যেমন ধরন প্রকৃতির ভাস্কর্যটি। আল-মিনাম্মে কল এক নারী হাট্ট হাড়ে বসে আছে। মাথার পেছনে হাত। কিন্তু পেছনের (টরাসো) ওপরেই জোর দিয়েছেন। এটা তীরিক এক পাখি। বস্ত্রপন্ন কেটে করেছেন। লতিকা নারীদেহের শাঁজ, ভাঁজ, ঢাল গড়ান, চড়াই উৎসাহ চমৎকার ধরেন।

অবশ্য লতিকা এখনও রচনাময়ী কাজ খুব বেশি দেখাননি। কিন্তু এখনও তার যবার দ্যায় অনেকটাই। তার নিষ্ঠাই প্রমাণ করে যে মাক পথে তিনি যেম বাকেন না। মস্ত কথ হলো, কলবীরের প্রভাব তার ওপর পড়েনি। তার ভাস্কর্যের একটাই দোষ, ভারতীয় ভাস্কর্যের ঐতিহ্যের সামান্যতম ছায়া পড়েনি।

লতিকা নানা মাধ্যমে দক্ষ। আল- মিনাম্মে, পেতল, রোজ, কাঠ, পলিস্টাইল, ফাইবার গ্লাস। প্রত্যেকটি মাধ্যমের চরিত্র করার বেখে তিনি কাজ করেন। তার স্বা অধ্যকার প্রচণ্ড। তিনি তার কাজে অমায়ের প্রচুর প্রতিভাতি দিয়েছেন। এইভাবে চললে শেষ পর্যন্ত তিনি সিদ্ধ নারী হবেন সন্দেহ নেই। না হকার

# আপনিই দেখুন, দেনা ব্যাঙ্কে আপনার জমা টাকা কেমন ত্বরান্বিত বেড়ে ওঠে...



## সমৃদ্ধি

### জমা যোজনা

আপনার জমানো টাকা ত্বরান্বিত আশীর্ষ গতিতে বেড়ে উঠার মূল কারণ হল আপনার আসল মূলধনের সাথে সাথে অর্জিত সুদও সুদ আর করছে... সুদের ওপর সুদ, তত্ত্ব সুদ। ১২ থেকে ১২০ মাসের মেয়াদে ১০০ টাকার মূল্য সংখ্যার অর্থ লম্বী করুন।

### ক্রম-পঞ্জিত জমা যোজনা

আপনার আজকের মাসিক স্বল্প সঞ্চয়কে ভবিষ্যতের মোটামুটি খোক টাকায় পরিণত করুন। সঞ্চয়ের অর্থ আপনার পছন্দমত মূল্য সংখ্যা বেছে নিন: ৫ টাকা থেকে ৫০০ টাকা। মেয়াদকালও সুশীলমত বাছুন: ১২ থেকে ১২০ মাস।

### মেয়াদী জমা আমানত

সুখের সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার জগ্রে আপনি এই টাকা নিরাপদে সরিয়ে রাখতে পারেন। আপনার টাকা দীর্ঘ মেয়াদকালের জগ্রে জমা করে বেশী হারে সুদ আয় করতে থাকুন।

## ক্যাশ পার্টিকিফেট

এক নিরাপদ জমারূপি যা আপনি-আপনি বেড়ে উঠে। এই পার্টিকিফেট এইসব মূল্য সংখ্যার পাওয়া যায়: ২৫ টাকা, ১০০ টাকা, ১০০০ টাকা, ১০,০০০ টাকা, ৫০,০০০ টাকা ও ১,০০,০০০ টাকা।



## দেনা ব্যাঙ্ক

(একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাঙ্ক)

সেন্ট্রাল অফিস: মেকার টাওয়ার্স ই,  
কাফ পার্ক, বম্বে ৪০০ ০০৫

আরও বিশদ বিবরণের জগ্রে আপনার  
নিকটতম দেনা ব্যাঙ্কের শাখার চলে আসুন।

জনগণের উন্নতি ও সমৃদ্ধির সেবায় সম্মিলিত

# সোনালীর ফুটফুটে রূপের বাহার লাক্সেরই প্রসাধনে



সোনালীর দীঘল চোখে রূপের ঝিলিক খেলে। গোলাপের মত গুঁর এই ফুটফুটে রূপের বাহার লাক্সেরই প্রসাধনে।  
 গুঁর নিজের কথায় শুধু—“আমার রূপ-লাবণ্য কোমল আর সুন্দর রাখার জন্যে আমার প্রসাধন সাবান—লাক্স!”

শুদ্ধ, স্নিগ্ধ লাক্স—

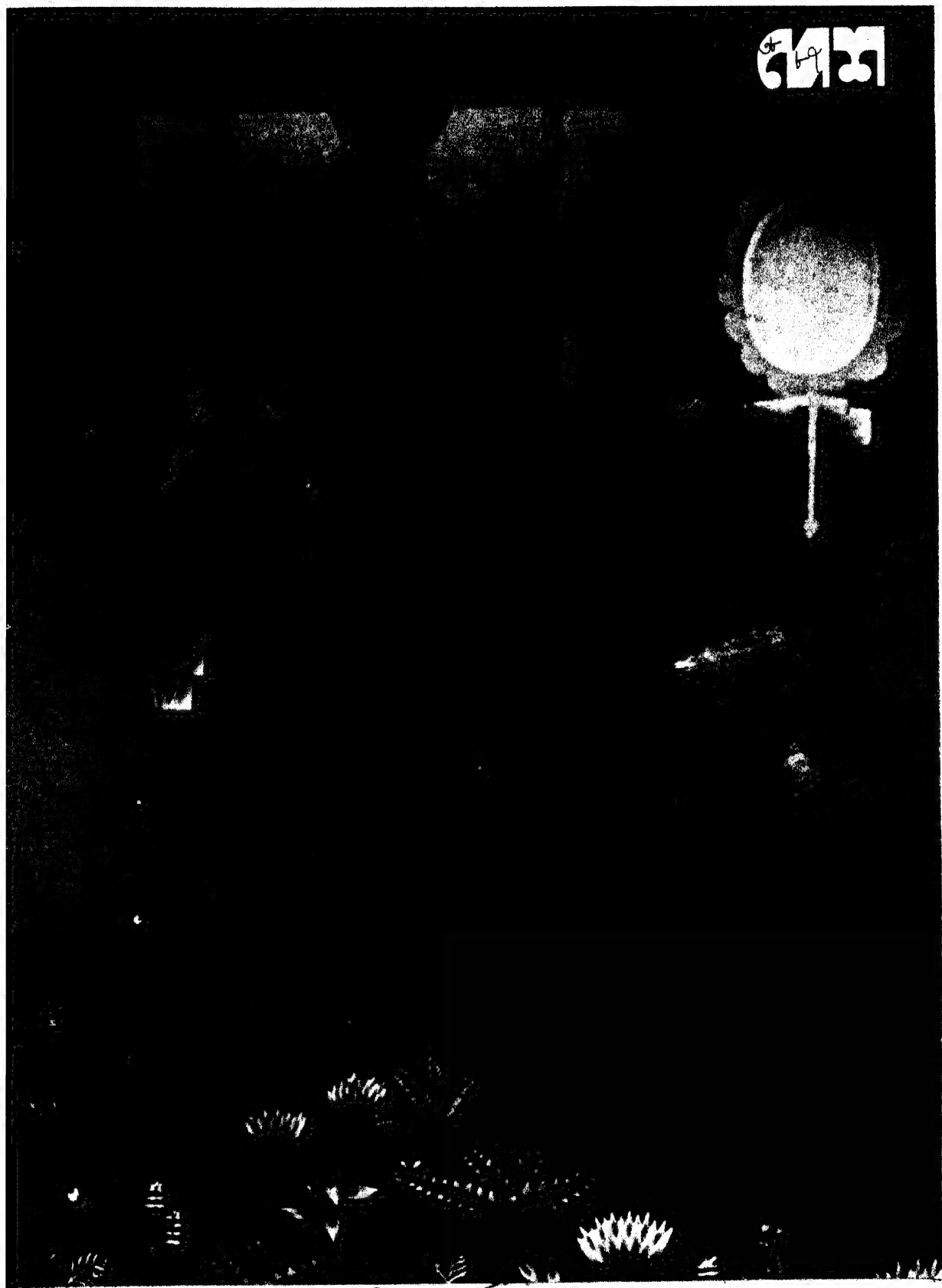
চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান।

*Sonali Gupta*



হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেডের উৎকৃষ্ট উৎপাদ

CM



আপনার চুল স্বাভাবিক,  
তাহলে আপনার শ্যাম্পু সিন্থেটিক কেন?

# ব্যাচারেল

ভেষজ শ্যাম্পু

জরুরি আর কোন শ্যাম্পু নেই যা এর মত  
খাঁটি...মোলায়েম...পুষ্টিকর...আর যত্নবান



স্বাভাবিক চুলের  
জলা বন্য চিবি  
চুলের গোড়া বহুত  
করে, চুলের বাহা  
অক্ষর রাখে, আর চুলে  
আনে চাকচিক্য।

ডেলিট চুলের  
জলা আরও রসম  
চুলের স্বাভাবিক তেল  
সংরক্ষিত করার পাড়সা  
চামড়ার আবরণ বিনষ্ট  
না করে, চুল থেকে  
আঠাল তেল আর  
নোংরা দূর করে।

মুকামা চুলের জলা  
ক্যামোমাইল  
ডালুতে উত্তেজনা  
কষ্ট করে চুলে  
স্বাভাবিক তেলের  
পরিমাণ বাড়ায়...  
চুলে আনে কমলীয়তা  
আর নতুন বীজ।

মুখের জলা  
স্বাভাবিক  
ডালুতে মুখের কল  
থেকে অক্লিষ্টে বকা  
করে। চুল পড়া বন্ধ  
হয়। চুল কালো করে  
আর চুলের বৈধা  
বাড়াতে সাহায্য করে।

অস্বাভাবিক চুলের  
জলা এলো তেঁতা  
গোড়িনে কবুপু এ  
কেনা? বেশকিছর  
সহায়ক। নিজেই,  
নিশ্চয় চুলে কিছর  
আনে স্বাভাবিক  
উজ্জ্বলতা।

একজন **ব্যাচারেল** তারি হাত  
ব্যালব্যাক্সির গুণে-ভরা উৎপাদন







মায়েরা !

# এঙ্গেল শিশু-দুগ্ধাশ্রয় অসজেই সহজ এটি আপনাদের সমস্ত সমস্যা সমাধান করে

ভিটামিনে ভরপুর এঙ্গেল একটি সুস্থ অসজেই সহজ  
সহজ সমাধান জন্ম দেয় আপনার সমস্যা।

এঙ্গেল শিশু-দুগ্ধাশ্রয় কয়েক বছরের গবেষণার  
ফল। শিশুর বাড়-বাড়ন্তের জন্য যে সমস্ত পুষ্টি  
দরকার, তা সবই আছে এতে। এর ঘূষের  
গুড়ো খুব মিষ্টি আর মৃদু করে তৈরি করা  
হয়েছে যাতে শিশু এটি সহজেই হজম করতে  
পারে।

“শিশুর পাকস্থলীর জন্য মিষ্টি আর মৃদু  
ঘূষের গুড়ো দরকার”—

শিশুর পাকস্থলী নতুন নতুন কাজের সম্মুখীন  
হয়। তার নবীন পাকস্থলী যাতে বিপদগ্রস্ত  
না হয়, সেজন্য এঙ্গেল ঘূষের গুড়ো খুব মিষ্টি আর  
মৃদু করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এঙ্গেলের  
চর্বিগুলি ছোট ছোট মিষ্টি দানায় গুঁড়ো করা  
হয়। পাকস্থলীতে গিয়ে এঙ্গেল নরম আর সহজে  
গলে যাওয়া দইয়ের মত হয়। শিশু তা চুষি করে  
হজম করে নিতে পারে।

“শিশুর বাড় ও গঠনের জন্য সুস্থ  
আহারের প্রয়োজন”—

প্রথম কয়েকটি মাস শিশুর ভবিষ্যৎ গঠন আর  
তার বেড়ে ওঠার ভিত্তি। এই বিশেষ সময়ে তার  
দরকার সবরকমের ভিটামিন আর লোহ। এঙ্গেল  
একটি ভিটামিন-২রপূর্ণ ফর্মুলা যাতে আছে  
আটটি ভিটামিন আর লোহ। প্রকৃত-পক্ষে  
এঙ্গেলই একমাত্র শিশু-দুগ্ধাশ্রয় যাতে রয়েছে  
বেশী পরিমাণ ভিটামিন-ই, যা শিশুর কোমল  
চামড়া রক্ষা করে।

“মায়েরদের কাছে এই দুগ্ধাশ্রয় তৈরী  
করাও এত সহজ”—

আপনি কেবল আধ মিনিটে দুগ্ধাশ্রয় তৈরী  
করে আপনার শিশুকে খেতে দিতে পারেন।  
কোনো ঘূষের পাউডার। আপনি কেবল চামচ  
দিয়ে এই পাউডার ফীডিং বোতলে ঢালবেন।

তারপর গরম জল ঢেলে নাড়ুন। বাবা, আপনার  
শিশুর পুষ্টির আহার তৈরী। সে এটি ঘেঁষে  
সহজেই হজম করবে। এবার আপনার শিশু  
হলো—সত্যি এঙ্গেল শিশু।



ভিটামিন-ই সহ  
আটটি ভিটামিন  
দ্বারা সুরক্ষিত।

‘Progress of an Angel Baby’

বিশ্বায়নের এই পুষ্টিকার জন্ম এক টাকার

ডাক টিকিট সহ এই টিকিটের নিম্নলিখিত—

Consumer Services Division, Foremost  
Dairies Ltd. 72 Janpath, New Delhi-110001



লেখকের অন্যান্য বই  
স্বর্গাদপি গরীয়সী  
(১ম/২য়/৩য়) ১৯৫০  
আর এক সাবিগ্রী ৫  
দোল গোবিন্দের কড়চা ৮  
কথাচিত্র ৩

**রাণু** ১২-৫০  
(পেপার ব্যাক)

## বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে

কোন খণ্ডে কি কি বই আছে—

প্রথম খণ্ড :	নীলস্মরীয়, রাণুর প্রথম ভাগ, কুশী-প্রাঙ্গণের চিঠি	২০,
দ্বিতীয় খণ্ড :	স্বর্গাদপি গরীয়সী (১ম খণ্ড), রাণুর দ্বিতীয় ভাগ, দুয়ার হ'তে	২০,
	অদূরে	
তৃতীয় খণ্ড :	স্বর্গাদপি গরীয়সী (২য় খণ্ড), রাণুর তৃতীয় ভাগ, কথাচিত্র, পোনুর চিঠি	২০,
চতুর্থ খণ্ড :	স্বর্গাদপি গরীয়সী (৩য় খণ্ড), রাণুর কথামালা, কলিকাতা-নোয়াখালি-বিহার, দুপটু-লক্ষ্মীদের গল্প	২০,
পঞ্চম খণ্ড :	নব সম্মাস (১ম), বর্ষায়, অষ্টক	২০,
ষষ্ঠ খণ্ড :	নব সম্মাস (২য়), বসন্তে, বরষাগ্রী, লঘুপাক	২০,

— সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হল পঁচিশ টাকা —

সপ্তম খণ্ড : উত্তরায়ণ, বাসর, রূপান্তর, কৈলাসের পাটরাণী ।



যে কোন খণ্ডে যে কোন সময় কিনতে পারা যায় ।

প্রকাশিত হল দক্ষিণারঞ্জন  
মিত্র মজুমদারের

## ঠাকুরমার ঝুলি

উনত্রিংশতি সংস্করণ বারো টাকা



বিজিতকুমার দত্তের  
একটি সার্থক গবেষণামূলক গ্রন্থ

বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক  
উপন্যাস ২৫



নারায়ণ সান্যালের  
রহস্য উপন্যাস

**উলের কাঁটা** ১৯

শীঘ্রই  
প্রকাশিত হচ্ছে

আশাপূর্ণা দেবীর

**বালির নীচে ঢেউ** ১০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

## কিশোরসাহিত্য-সমগ্র

তৃতীয় খণ্ড



কিশোরদের জন্যে  
লিখিত লেখকের  
সমগ্র রচনাগুলি  
তিন বা চার  
খণ্ডে প্রকাশিত  
হচ্ছে । প্রতিখণ্ড  
আনুমানিক ৩০০-  
৩৫০ পৃষ্ঠা,  
প্লাস্টিক জ্যাকেটে  
মোড়া, ছোট্টদের  
উপহার দেবার মত ।  
এখনই সংগ্রহ  
করুন ।

১ম খণ্ড ১৫-০০  
২য় খণ্ড ১২-৫০  
৩য় খণ্ড ১৪-০০

যে সকল সহৃদয় ক্রেতা ৩টি খণ্ড একসঙ্গে  
সংগ্রহ করবেন তাঁরা ৪১-৫০ টাকার বই  
৩৫ টাকায় পাবেন ।

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ / ৩৪-৮৭৯১  
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ / ৩৪-৩৪৯২

## বিভূতিভূষণ ও সুপ্রভা

৩১ মের "দেশ" পত্রিকার প্রীতম মন্থনোপায়ার আমার "শিল্প, বিভূতিভূষণ ও সুপ্রভা" প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইল। লিখেছেন সে সম্পর্কে আমার কিছু কথা আছে।

আমার প্রবন্ধে সুপ্রভা সম্পর্কে বা কিছু লিখেছি তাদের উল্লেখ বিভূতিভূষণের দিনলিপি গ্রন্থে "উৎকর্ণ"। তাতে সুপ্রভা কে, কীভাবে তার সঙ্গে বিভূতিভূষণের পরিচয় হল এবং বিভূতিভূষণের সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু লেখা নেই। তা ছাড়া, প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিবেচনা করলে সুপ্রভা-বিভূতিভূষণ সম্পর্কিত বাস্তবিক প্রসঙ্গ অপ্রাসঙ্গিক, কাজেই এ সম্পর্কে তথ্য আরও কোন চেষ্টা করা নি।

তদুত্তর, যে সব তথ্যগত ত্রুটি (১) কথা লিখেছেন, তাদের উৎসও এই "উৎকর্ণ"। বিভূতিভূষণ ও সুপ্রভার Spread Eagle Falls-এ কোথায় যাওয়া সম্বন্ধে তদুত্তর, লিখেছেন:

ঈগল ফলস দেখতে যাবার সময় সুপ্রভার সঙ্গে তার ভাইপো ছিলেন না। ছিলেন শ্রী, বিভূতিভূষণ। এবং এটাই স্বাভাবিক। পাইনবনে পথ হারাবার পর ষণ্ডামার্ক লোক দুটিকে দেখে সুপ্রভা ভীত হয়ে ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে বন থেকে বেরিয়ে আসেন নি। কন্যাগল বিভূতিভূষণ কচারা এই দুটি ষণ্ডা লোককে কথায় বল করেছিলেন—আ তার পকেট সম্ভব ছিল। যাবার সময় তারা বিভূতিভূষণকে বাড়ি বিনাময় করে এক বৃক্ষবানবাব। বলে সম্মান দেখায়। অতঃপর ট্যাক্সি করে সুপ্রভাকে সনৎ কুঠিরে পৌঁছে দেন বিভূতিভূষণ।

কিন্তু এটি প্রসঙ্গে "উৎকর্ণ" প্রকাশিত বিভূতিভূষণের উক্তি:

"...চা খেয়ে ওর (সুপ্রভার) সঙ্গে বেড়াতে বেরুই। সঙ্গে ঈগল তার ভাইপো। প্রথমে হিন্দোলাইন ফলস দেখে ও বললে, চলুন Spread Eagle Falls দেখিয়ে আন। তাই দেখাতে গিয়ে ও পথ হারিয়ে ফেললে। কতদূর শহরের বাইরে নিকট পাইনবনের দিকে বিজন পথে চলে গেল। তখন সম্ভব হয়ে এসেছে। পথে খাসিয়া দস্যুর ভয়। ওর মুখ দেখি শূকরে গিয়েছে, যখন দেখা গেল, সত্যিই ষণ্ডামার্ক। গোছেছ দুজন লোক অশ্বকারে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ও বললে—আমার ভয় করছে। কী কিপদ! ছেলেমানুষের কাণ্ড। তাই বলছিলাম, কেন যে আমি জানি Spread Eagle Falls-এর পথ।

"যাই হোক, অবশেষে নিরাপদে শহরে পৌঁছে ট্যাক্সি করে ওকে লাবানে পৌঁছে দিয়ে আমি হোটেল হোটেলে ফিরি..."

সুপ্রভার সঙ্গে পরিচয়টি সিলেট ভ্রমণ প্রসঙ্গে তদুত্তর, লিখেছেন:

সিলেটে যাবার সময় সুপ্রভার সঙ্গে ছিলেন তার ছেন সেবা—বীণ

না। এবং কয়েকজন বাঙালী। প্রীতির লিখেছেন যে, সিলেটে যেতে না পেরে অন্য সের্বিসে কিছুকাল দিলা হয়েছিল বাম। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। বরং পরদিন সুপ্রভা এলে বিভূতিভূষণের মান ভাঙলে তাকে কোথায় স্পোর্টস হোটেল থেকে নিয়ে বান সনৎ কুঠিরে।

এ প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণের (উৎকর্ণ) প্রকাশিত) বক্তব্য:

"...সেখানে চা খেয়ে বীণ ও সুপ্রভার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলাম। ...কাল রাতের কথাবার্তা হোল, লাডে আটটার সময় গাড়ি আসবে আমার হোটেল। একখানা ট্যাক্সি পাওয়া গিয়েছে, তিনজনে যাব আমরা। ও বললে, কমলা নেব অনেক করে সঙ্গে, গাড়িতে ঝুঁ মাথা ঘোরে।"

পর দিন সুপ্রভার ট্যাক্সি অনসরণ করে তার নাগাল না পেয়ে বিভূতিভূষণ কী করলেন তা তার নিজের জবানীতে (উৎকর্ণ) থেকে উদ্ধৃত) লিখি:

"...কী আর করি, নিরাশ হয়ে ফিরলাম। শিল্প পোস্টারিসের কাছে দেখে, কান্ট বার্ডের আঁকে, তাকে গাড়িতে উঠিয়ে নিলাম। সে বললে—একটার সিলেটের ডাক-ড্যান ছাড়ে, তাতে লোকও নেই। আমার মন কেয়ার খারাপ, শিল্প-এ থাকতে একটুও ইচ্ছে নেই, কান্টকে সঙ্গে নিয়ে মেল-ডানে টিকিট বুক করে এলাম। ...একটার সময় বাস ছাড়ল। নতুনালুকি গেটে গিয়ে আমি টাইমকিপারের কাছে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ওবেলা সুপ্রভাদের ট্যাক্সিখানা ৮-৩২ মিনিটে গেট পার হয়ে গিয়েছে, আর আমি এসেছি ৮-৫২ মিনিটে..."

সম্পর্কণ রায় শিল্প-ও [এ সম্পর্কে আর কোনো পত্র প্রকাশ সম্ভব নয়]

## বার্লিন

বার্লিন : কলোনী ও কলঙ্ক লেখকটি পড়লাম। অনেকদিন থেকে আমার জানবার ওৎসুক ছিল যে, জার্মান জাতি কি রকমভাবে এই বিসদৃশ দেশভাগ মেনে নিয়েছে। প্রকৃতি থেকে মোটামুটি পরিষ্কার একটি ছবি পেয়েছি পূর্ব জার্মানী ও পশ্চিম জার্মানীবাসীদের। জার্মান জাতি কোনও দিন কমান্ডেন্ট মনোভাবাপন্ন ছিল না, বরং জাতি চিরদিনই কমান্ডিমেন্টের বিরোধী। এ কথা ঠিক যে, পূর্ব জার্মান ও পশ্চিম জার্মান মূলত সেই জার্মান। তাই যারা ভাগের ফেরে আজ পূর্ববাসিকের অধিবাসী, তারা অনেকেই - বা তি জী ব নের ওপর কমান্ডিমেন্টের নির্যাতন প্রভাব মেনে নিতে পারেন নি। তাই বার্লিন-প্রাকার ডিঙিয়ে বিশালবহুল পশ্চিম বার্লিনে আগমনে পূর্ব জার্মানদের এত উৎসাহ। কিন্তু আবার এটিও ঠিক যে, সমস্ত পূর্ব জার্মানী এই ব্যাপারে একগায়িত দেখা নি। বরং তারা যেমন আছেন তেমন থাকতে অনিচ্ছুক নন। এই ব্যাপারটি, অর্থাৎ জার্মান জাতির মধ্যে

## প্রকাশিত হলো

# জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ গল্প

এতকাল পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অমূল্য সব অনুবাদ গল্প। ভিক্টর উগো, লিয়ো লাপে, আলফ্রেস দোদের মতো ফরাসী লেখকের গল্প থেকে শুরু করে রুশীয় লেখক পুশকিন, মামিন সিবিরিয়াক, স্পেনীয় লেখক পিসোন্স সুইস লেখক এডুয়ার রদ এঁদের বিচিত্র স্বাদের গল্প অনুবাদ করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। এত বছর পর সেই হারানো গল্প সংগ্রহ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম অনুবাদ গল্পের বই প্রকাশিত হলো। সব-কালের সব সময়ের রুচিশীল পাঠকদের জন্য এই বই। ১০,

সম্পাদনা: সুব্রত রুদ্র

কয়েকটি ভিন্ন স্বাদের ছোট গল্পের বই

## সমরেশ বসুর গল্পসংগ্রহ

(১ম) ২৫'০০ (২য়) (৩য়) ২৫'০০

## সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পসংগ্রহ

(১ম) ২৫'০০ (২য়) ২৫'০০

(৩য়) ২৫'০০ (৪র্থ) (যন্ত্রস্থ)

## আজকের হিন্দী গল্প ১০'০০

## শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্পসংগ্রহ

(১ম) ২৫'০০ (২য়) (যন্ত্রস্থ)

## মতি নন্দীর গল্পসংগ্রহ ২৫'০০

## বিমল করের গল্পসংগ্রহ (যন্ত্রস্থ)

## জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

## গল্পসংগ্রহ (যন্ত্রস্থ)

## বিশ্বাবানী প্রকাশনী

৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড ৥ কলকাতা ৯

# বোধন

## পূজার আগেই উদ্বোধন

‘পছন্দ-সই’ লেখকদের নাম জানানোর আহ্বানে অজস্র পত্র আসছে প্রতিদিনই। নাম-করা সব নাম দেখে বিস্মিত। সবার লেখা পাবো তো—এই পূজার বাজারে! তা সব বড়ো লেখকই তো ছোটদের ভাল-বাসেন। তাই আশ্বস্ত। তবে শুভ খবর—ইতিমধ্যেই যাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে তাঁরা সবাই সম্মত। ‘খেলা নিয়ে’ নানা বিষয়ে যাঁরা বোধনে লিখছেন প্রথম কিস্তিতে তাঁদের নাম ঘোষিত হল:

খেলার পিকে—প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়  
লেখা নিয়ে বেতার-ডায়াকার—অজয় বসু  
লেখা বিষয়ক প্রবীণ সাংবাদিক—মুকুল দত্ত  
সংবাদ পত্রে নিয়মিত লেখার লেখক  
চিরঞ্জীব ও শান্তিপ্ৰিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্প-উপন্যাস ছড়া-ছবি কারটুন-কমিকস্ প্রভৃতি বিষয়ে  
‘পছন্দ-সই’ লেখকদের নাম পরের কিস্তিতে।  
এখন গ্রাহক হলে ‘বোধন’ নেওয়ার সময়সীমাকরা কুড়ি  
ছাড়। অর্থাৎ ১০ টাকা দাম হলে ৮ টাকায় মিলবে।  
শুধু নাম-তিকানা পাঠালেই গ্রাহক। অ্যাডভান্স নেই।  
এজেন্টগণ সব থেকে বেশী শতকরা ৩৩% কমিশন  
পাবেন। তবে এখনই তাঁদের বই পিছ ১ টাকা আগাম  
দিয়ে অর্ডার বুক করতে হবে।

ছোটদের কয়েকখানি বই

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেনতুর সাদাঘোড়া ৬.০০

সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ

মহেনজোদাড়োর ঘোড়া ভূত ৮.০০

মহাশ্বেতা দেবী

ভয় দেখানো ভয়ংকর (৭ম খণ্ড) ৫.০০

জাতক কাহিনী (২য় ৩.০০)

লীলা মজুমদার

ভারতের উপকথা (১ম ৪.০০) (২য় ৫.০০) (৩য় ৫.০০)

মহাশ্বেতা দেবী ও অসিত গুপ্ত

জাতক কাহিনী (১ম ৩.০০)

শিবরাম চক্রবর্তী

বিশ্বপতির অশ্বমেধ ৫.০০

শক্তিপদ রাজগুরু

দক্ষিণারজন বসু

বনে গেলেন গবুদা ৫.০০ ঈশ্বরের সেনাপতি ৫.০০



করুণা প্রকাশনী

১৮ এপ্রিল রোড, কলিকাতা ৯, ফোন: ৩৪-৬২৬৮

আজ যে ঘটবিরোধ, যা দেশভাঙ্গার  
একটি সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি, তা কতখানি  
জাতিগত মানসিকতাকে পরিবর্তিত  
করেছে, মৌটি খুব স্পষ্টভাবে প্রকটিত  
প্রকাশিত হয় নি। প্রকৃষ্টকার যে  
উপসংহারে পৌঁছেছেন তা হল সুদূর  
ভবিষ্যতেও বিধাবিকল জাতিগত  
মিলন একপ্রকার অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে  
একটি কথা জানাই যে, প্রবন্ধকার শব্দ  
এক পশ্চিম জার্মান পিটার কোহেনকে  
উল্লেখিত করেছেন, তাই তাঁরা বচনাটি  
অনেকক্ষেত্রে একপেশে হয়ে পড়েছে।  
একজন পূর্ব জার্মান নাগরিকের  
মানসিক প্রতিচ্ছবি এতে প্রতিফলিত না  
হওয়ার আমরা জানতে পারলাম না,  
তাঁরা কতখানি নিজেদেরকে এই  
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক  
কঠোরতায় সঙ্গ খাপ খাইয়ে নিতে  
শেষেছেন, বা তাঁরা কতখানি একজন  
পশ্চিম জার্মানের সঙ্গে স্বজাতিগত  
নৈকট্য অনুভব করেন।

একটি জার্মান প্রকৃষ্টকারের নিত্য  
ছেলেমানুষী বড় চোখে লাগে। তিনি  
লিখেছেন—এ দেশে আসার আগে তো  
খাম্বা ছিল, কালিন বৃষ্টি পূর্ব ও  
পশ্চিম জার্মানীর সীমানা। প্রশ্ন  
হচ্ছে, যুক্তোত্তর যুগের জার্মানীর  
রাজনৈতিক মানচিত্র কি তিনি আগে  
প্রত্যক্ষ করেন নি?

জার্মান জাতির শক্তির উৎস তাঁদের  
অর্থব্যয় ও তথাকথিত আর্থগরিমা।  
সেই উৎস যে আজও জলসিঁপুত হয়  
তা স্বেচ্ছা যায়, পিটারের চিকিত  
গর্বেষিত হার্মিতে, স্বর কথা প্রবন্ধকার  
উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে  
জার্মানি পরাজয়ের পর দুই চির-  
প্রতিদ্বন্দ্বী—তথাকথিত প্রতিজ্ঞাশীল  
পশ্চিমবাহী শক্তি ও সমাজবাদী শক্তি  
জার্মানিকে তাদের কিরণগ্রস্তি করে  
নিরোহ। হয়ত এর ফলে আর একটি  
হিটলারের উত্থান, পথ রুদ্ধ হয়েছে।  
তাই অজস্র শিষ্টাচার গবিত হার্মিতে  
আজ শব্দ তিস্ত রিভতা।  
শুভজিৎ রায়  
খাগড়া, কক্সবন্দর

৮০ ওলিম্পিকের আগে

রুশ দেশ

দেশ সাপ্তাহিকে চিরঞ্জীবের  
“৮০ ওলিম্পিকের আগে রুশ দেশ”  
লেখটি প্রথম কিস্তি থেকেই আমার  
মত অসম্মত পাঠক হয়ত অতি আগ্রহে  
পড়ে চলেছেন। কারণ লেখটি শব্দ  
খেলাধুয়ার বিষয়েই নয়, রুশ দেশকে  
নানান দিক থেকে জানবার পক্ষেও  
প্রয়োজনীয়।

১৪ জুন সংখ্যার ৩৮ পৃষ্ঠার  
দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে চিরঞ্জীব যে  
বাহ্যিক বছর বয়সের তালিকার একটি  
কিশি কো-অপারেটিভের পর টাইম  
চিটারের কথা উল্লেখ করেছেন। সেই  
তালিকার প্রশ্নগুলির উত্তর জবাব  
দিতে পারলেন না কেন বন্ধুতে  
পালায় না। চিরঞ্জীব লিখেছেন,  
তালিকার জুগাল পড়ান ভারতবর্ষ  
কিন্তু তার পর খটখটানি খবর

রাখেন, রবীন্দ্রনাথ পড়াশোনা করেছেন,  
রাজনীতির খবরও রাখেন, বিলোনিয়ার  
খোলাগলি নিয়ে প্রশ্ন করার সময়  
হলেন “ভাইয়ে ভাইয়ের বিবাহ কেন?”  
তোমরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য  
করছ কয়েক বছর আগে। আর আজ  
তাদের সঙ্গেই গণ্ডগোল? চিরঞ্জীব  
কেন জবাব দিলেন না, বাংলাদেশকে  
যিনি মৃত করেছিলেন সেই মুক্তিযুদ্ধকে  
সবশেষ গুলি মেরে যারা হত্যা করল,  
যারা জেলখানার চেতনে ঢুকে  
লাজবন্দীদের হত্যা করে বিনা বাধায়  
শব্দ বেরিয়ে এল না, প্রাইজ পোস্ট  
নিয়ে বিদেশে দূত হয়ে চলে গেল,  
জনরোষ থেকে যাদের রক্ষা করল  
এইভাবে, সে সরকার মুক্তিযুদ্ধে  
আমাদের সাহায্যের কথা কি মনে  
বাঁধতে চান ও পারেন?

বাহ্যিক বছরের রুশ পণ্ডিত  
মানবদিক চিরঞ্জীব কেন জবাব  
দিলেন না যে চীনদেশ তাঁদের আশ্চ-  
গত ভাই, (ক্লুশেভের বক্তা স্মরণীয়)  
অর্থাৎ কমরেড তাঁদের সঙ্গে রুশদের  
সীমান্ত সংঘর্ষ হয়েছিল কেন? কেন  
হালেই সরোজ মুখার্জির কাছে চীনের  
নেতারা বলেছেন, রুশ চীনের গাড়ি  
দেবার সব রকম চক্রান্তে লিপ্ত বলেই  
আমেরিকার সঙ্গে চীনের পৌহাদ  
বাড়তে হয়েছে? এখানে ভাইয়ে ভাইয়ে  
এরা কি করেছেন? চীন কি বিপ্লবের  
সময় রুশদেশের সাহায্য পায়নি?  
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রায় হিটলার  
যখন রুশদেশে আক্রমণ করল তখন  
চীনও কি সারা বিশ্বের শ্রমিক  
বিপ্লবীদের মত তাকে জনবন্দু? আত্ম  
দেয়নি? ভিয়েতনাম কি বিপ্লবের সময়  
চীনের কোনো সাহায্য পায়নি? তারা  
কি ভাই ভাই নয়? তবে অতবড় চীন-  
ভিয়েতনাম কাণ্ডটি ঘটে গেল কি  
করে? সেই ভিয়েতনাম কি  
কামপুচিয়ার ভাই নয়? তবে পল-  
পটের পটে চোকালো কেন ভিয়েত-  
নাম? দিয়োন-বিকেন-ফুয়ের সম্মতি  
কি বিশ্বের তাৎস ভাইয়েরা ফুল  
গেলেন এত শীঘ্র? কেউ মনে রাগি তো  
কাটলেন না? ক্রুশেভ বলেছিলেন,  
when comrades debate, they  
enjoy it, capitalist world has  
nothing to gain from it  
—এতো নিজলা deb বা pole-  
mics নয়—এ তো মৃত্যু-ট্যাংক বিমান  
কর নিয়ে একভাই আরেক ভাইয়ের  
সর্বস্ব gain of revolution-কে  
গাড়িয়া ছাড় করে দেবার ব্যর্থ।  
বাহ্যিক বছর বয়সের সুপণ্ডিত রুশ  
জুদলোকটিকে চিরঞ্জীব এসব কথা মনে  
করিয়ে দিলেন না কেন? তাঁর মত  
বিজ্ঞ পুরোন ব্যক্তি কি জানেন না, কি  
অবশ্যায় সদামুখ বাংলাদেশের রাজ-  
নৈতিক কাঠামোটি আমূল পরিবর্তিত  
হয়ে গেছে? ভারত কত সংঘত বাহ্যিক  
করে চলেছে, জল নিয়ে নিজের  
সর্বনাশ মনে নিয়ে এখন চুপ করে  
আছে, বড়ারের অশ্বিনীকুমারের হাতে  
গুলি লাগা সঙ্কট?

গৌরচন্দ্র চক্রবর্তী হাজারিবাগ

চন্দ্রদান ও ধর্ম

২৪শে মে ১৯৮০ দেশ পত্রিকায়

খ্রীষ্টান্ধ দাসের 'আই বাবক ও তার সমস্যা' প্রথমটি পড়লাম। অস্বাভাবিক ও ভয় প্রত্যকার সম্বন্ধে কিছু কিছু জরাজনন এদিকে এদিকে চোখে পড়ে কিন্তু এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের যে কিছু করার আছে তা খ্রীষ্টান্ধ আমাদের ঘরে পরিচয় দেন। এর প্রতিভার দরকার নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবেন, বেশরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহও এগিয়ে আসুক এটা আশংকিত। খ্রীষ্টান্ধ ধর্মীর সেতাসেরও অহরন জানিয়েছেন। আমাদের দুঃখ এই যে, এসেছে ধর্মীর সেতাসে অধিকাংশই কোন ভাল কাজই করেন না, কেবল বিভ্রান্ত দৃষ্টি বিস্তারিত আনা আর মানুষের দুঃখতাপ্যকে সমাজভাবে মানবিকতা অভিযুক্ত করার বদলে তাদের অনুশাসনের এমন একটা ছোট গাশ্বের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চান যেখানে মানবিকতা মাথা ফুটে মরে। আই বাবক সম্বন্ধে খ্যাতি ও বিস্ময় ময়ের নেতাজন কিছুটা ভালো মনের দুঃখের রেখে আমাদের প্রমোদভাজন হয়েছেন কিন্তু কলকাতার নাথোদা মসজিদের ইমাম সাহেবের কতোদা শূন্য দুঃখের বেলায় অভিযুক্ত হতে হয়। আমরা মানি আমাদের সকল জ্ঞান-মঙ্গের জিম্মাদার নিশ্চয়ই সেই মহান আল্লাহ। কিন্তু তার উপর নিজের বা মানব জাতির ভবিষ্যৎবাণী স'প দেওয়ার কথা ইসলাম কোথায় বলা হয়েছে? ইসলামে বলা হয়েছে কোন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হলে তার সমাধানের জন্য প্রথম চেষ্টা করে দেখতে হবে পাকি কোরান শরিফে তার কোন সমাধান আছে কিনা। না থাকলে হজরতের (রাঃ) জীবনে অথবা হাদিসে এর সমাধান খুঁজতে হবে। সেখানেও বাধা নিজে নিজে বিবেকের কাছে থেকে উত্তর খুঁজে নিতে হবে। চমক দান সম্বন্ধে কোরান শরিফে কোন নির্দেশ নেই, হজরতের জীবনকালেও এমন সমস্যা আসে নি। কিন্তু আমাদের বিবেক কি বলে? প্রাথমিক ইমাম সাহেবের কাছে আমাদের বিনীত জিজ্ঞাসা অসুখ করলে তিনি কি ডাক্তারের কাছে যান না? তার পরিজন অসুখ হলে তারা কি বিনা চিকিৎসায় থাকেন পরম করুণাময়ের করুণার উপর নির্ভর করে? সবই মহান আল্লাহতালার উপর ছেড়ে দিবে আমরা নিশ্চয়ই হরো বসে থাকলেই জে পারি! আমরা আমাদের ধর্ম ও বিবেককে বিসর্জন দিতে পারি না। কেশওয়ার জাহান কলকাতা-১৯

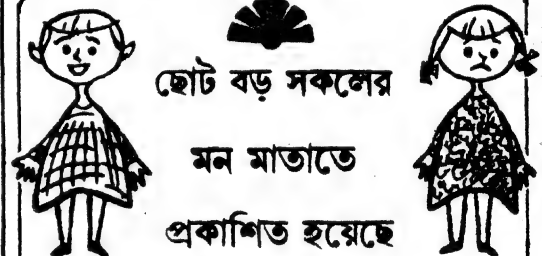
রবীন্দ্র মণ্ডল : লেখকের উত্তর  
১৪ জুন ১৯৮০ 'দেশ'-এ রবীন্দ্র মণ্ডলের বিষয়ে প্রচ্ছদপটে লেখার সম্বন্ধে পাবতী মতোপাধ্যায়ের প্রতিবাদ পড়লাম। মন সত্য কি ক বিলম্বিত না গিকেও বলাবে, সাধারণ কথা বাক্যের চুরিয়ে দেখার জন্য বিপণিত ঘটছে। আর পাবতী যদি 'ফ্রাণ্ডস'র এক অন্যান্য পত্রিকা থেকে আমার লেখা সংগ্রহ করে থাকেন, তা হলে তাঁকে আমার লেখার অনুরাগীই বলতে হয়। প্রশ্ন হলো, রবীন্দ্রের সঙ্গে যদি অতীতকাল থাকে, তা হলে ও'র কিসের ইংরেজী বাংলায় আমি এত লিখব কেন? এমন কি জয়া আত্মস্বামীক বলে রবীন্দ্রের বিষয়ে সচিৎ খড় প্রকথ

ললিতকুমার কট্টোপাধ্যায় পত্রিকার আমিই লিখছি।  
রবীন্দ্র মণ্ডল জরাজনন সন্তানের প্রতিভার লক্ষণ এ কথা পাবতী দাবি করলেও, রবীন্দ্র নিচুর করছেন না। প্রতিভাজন বহু লিখপী কাজ না করে মইরে গেছেন, এমন কি এই কলকাতারও এটা তো ঘটনা। প্রাথমিক পাল রবীন্দ্রের চেয়ে প্রতিভাজন ছিলেন না কি? রবীন্দ্র ইন্ডিয়ান অর্ডার করেছেন লৈল বিভাগের ছাত্র। মূলত ললিতকুমার পেরে কলেজী ছিল একটা থাকলে কাজে দেবে এটা চিন্তা করিয়ে তিনি স্নাতক হয়েছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রই আমার স্বপ্নের এক অধ্যক্ষের এক পরিচয়ই রবীন্দ্রের সাক্ষ্যের কারণ, এ কথা কলকাতা কোথায়? রবীন্দ্রকে আমি অশ্রুতকর (মিনিস্ট্রিও) বলি নি। খোলা গাইতে গেলে মনস্কম টুকরো স্ক্রম কাজ করতে হয়। ফুটাই হোক আর ছোটই হোক ছবিতেও ছোট ছোট নানা কাজের করণী করতে হয়। যদিও 'অশ্রুতকর' যে গলাগাল সেটা জানলাম। সত্যি সারা জীবন করে কত কি লিখতে হয়।  
ললিতকুমার অনুসারে 'পল্লী' শব্দের অর্থ খোঁড়া, 'যে নীচেতে চড়তে পারে না'। অবশ্যই আমি এ কথা বলি নি, রবীন্দ্রের পাকের হাড় কলকাতা বা পলিওমাইলাইটিস হয়েছিল। তাঁকে পাকের জন্য কিছুকাল শয্যাসারী হতে হয়েছিল। লোকের সাহায্য ছাড়া পড়তে চড়তে ডাক্তারের বারণ ছিল। ছেলে-বেলা সেই সময় তিনি ছবি আঁকা শুরু করেন, এ কথা বহুকাল আগে রবীন্দ্র আমাকে নিজেই বলেছেন। প্রসঙ্গক্রমে প্রথম পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন নি দুজন এমন প্রথম প্রোগ্রাম প্রমোড চিত্রকর কলকাতার দুটো আর্ট কলেজে অধ্যাপনা করছেন, এ কথা জানি। আবার লিখল কিংবদন্তি এক প্রকাশক কর্মকারের মতো প্রতিভার লক্ষণ আর্ট কলেজের চোখা ছাড়াই দারণে ছবি এঁকেছেন এমন উদাহরণও আছে। প্রতিভাট আর কেলার ছাত্র হিসাবে ম্যাট্রিক দেওয়া তো উপলব্ধ। কী ভাগ্যিস পাবতী বলেননি যে রবীন্দ্রের আসল নাম আমি ভুল করেছি, সেটা হবে রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল। ফ্রেন্ড-আডালার-ইংলিশ শিবা না হরো বলা যায়, 'পল্লী' শব্দটাই গোল ব্যথিয়েছে। একবার অভিধান খলে দেখলেই হত।  
সন্দীপ সরকার

ললিতকুমার  
হঠাৎ যে তারিখের দেশ পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে সাধীর চক্রবর্তী মহাশয় লিখেছেন যে ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয় যে ইশান স্কলারও ছিলেন, এ কথা 'অন্য কোনও সম্বন্ধ' তিনি বাকি পান নি। তাঁকে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কালেক্টরে ইশান স্কলারের নামেও ডাকিতা দেখতে বলি। তাতে আছে যে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ইশান স্কলারের পেরেছিলেন ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায়।  
অমলেন্দু সেন কলকাতা-২৫

## শ্রামল গদ্যোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস স্বর্গের আগের স্টেশন

কলকাতার এত কাছে এত সুন্দর সব জায়গা আছে তা না দেখলে—সেখানে না থাকলে বিশ্বাস হবে না। সব দেশেই সিমেন্ট বাঁধানো জায়গা কম। বেশির ভাগটা মাটি। তাতে গর্ত থাকে। গর্তে সাপ থাকে। গাছে আতা খোলে। বর্ষার কটু পাতা জব্বার ভেঙে। ট্রেন-ফেল মানুষ কলকাতা না গিয়ে জুতোর দোকানের বেঞ্চে বসে দই-চিড়ের কলার করে। জখত দু-পা হেঁটে গেলেই বাড়ি। পাতাল রেল, কমপিউটার, সত্যাব্দ অভিমান ইত্যাদির পনের মাইলের ভেতর এই আমাদের প্রাচীন মাটির ব্যাকরণ এবং ছন্দ।  
মাটির এই ছন্দই প্রাণান্তি হস্তেই শ্রামল গদ্যোপাধ্যায়ের সর্বাধিক আলোচিত অসাধারণ এই উপন্যাসে। অন্ধারের রাস্তা ধরে যতই এগোনো যায় ততই মন ভরে ওঠে একটি গল্প—সে গল্প মাটির, সে গল্প জীবনের ॥ ২০'০০ টাকা ॥



ছোট বড় সকলের

মন মাতাতে

প্রকাশিত হয়েছে

আশাপূর্ণা দেবীর  
কিশোর সাহিত্য-সম্ভার  
উপন্যাস আর গল্পে ভরা ॥ ১৫

গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়  
ভারতের নৃত্যকলা  
১১৩০০০

অরুণ মিত্র

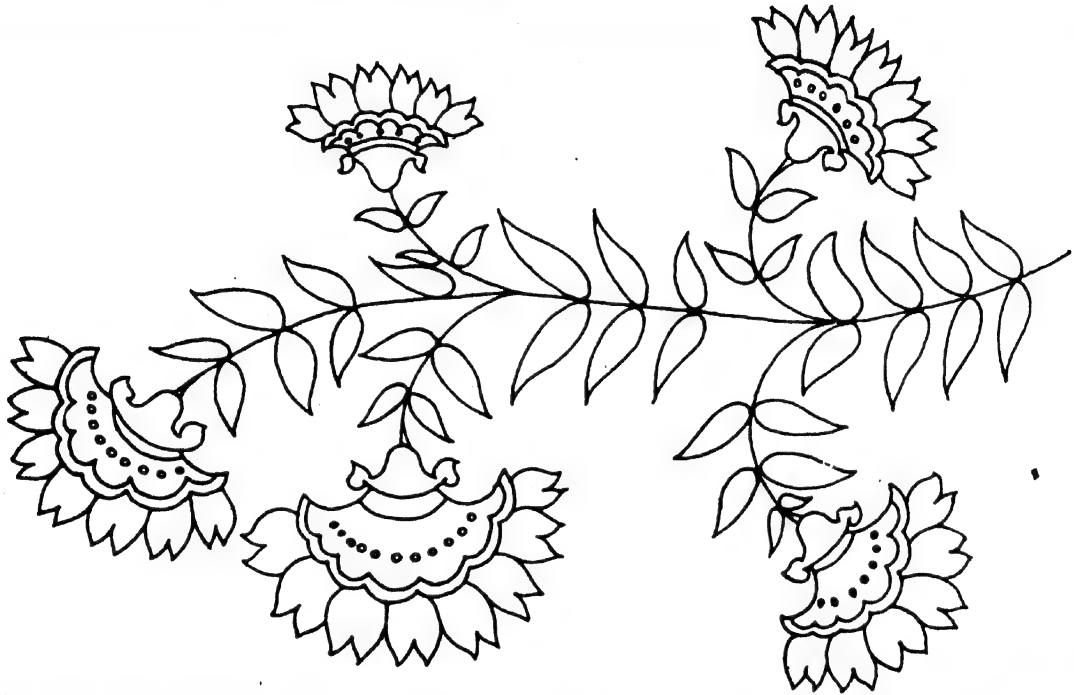
শুধু রাতের শব্দ নয় ॥ ৬



নবগত প্রকাশন  
৮ গুয়াটোলা মেন, কলি-৯



ঐ চমৎকার প্যাটার্নটা আপনার শাড়িতে  
বাড়িয়ে ফেলুন... দেখুন, কেমন জীবন্ত দেখাচ্ছে!



আপনার ওয়ারড্রোবের শোভা আরও বাড়ানোর এক চমৎকার উপায়ঃ

উপকরণঃ

একটা প্লেন শাড়ি, রোমাঞ্চকর  
কিছু কবিতা, উৎসাহ সামগ্রী  
কিছু সময়, ক্যামেল ক্রাইলিন  
কালার ও মিডিয়াম,  
ক্যামেলিন ত্রাণ

পদ্ধতিঃ

১. গরম জলে ভিজিয়ে শাড়ির  
সমস্ত মাড় তুলে ফেলুন।
২. এবার শাড়িতে পাতলমত  
প্যাটার্ন ট্রেসিং করে নিন।
৩. এরপর মেসেজ বী বিনা বা

বাকেটে শাড়ি টানটান করে  
আটকে নিন।

৪. যাতে সর্বত্র সমানভাবে রঙ  
ধরে তার জন্য কালারের সঙ্গে  
ক্রাইলিন মিশিয়ে নিন।
৫. এবারে শাড়ির ডিজাইনে তুলি  
দিয়ে সমান ভাবে রঙ করুন।
৬. ড্যাণ্টার জল শুকতে দিন।
৭. ৭২ ঘন্টা বাদে শাড়ির  
উল্টেপিঠটি ইস্ত্রি করে নিন।

পোশাক-আশাকের রঙ জীবন্ত  
করে তুলুন। ঘরদোর ঝলমলায়।  
বালিশ বাড়িয়ে নিজাববিলাস করুন।  
ক্যামেল ক্রাইলিন দিয়ে কত কি  
চমৎকার রঙানো যায়, এ হ'ল  
তার সামান্য কয়েকটি উদাহরণ।  
এই রঙ একদম পাকা আর  
কত শুণা। এটি দেয়া যায়, ইস্ত্রি  
করা যায়, যে কোনও ত্রাণ দিয়ে  
লাগানো যায়—যা আপনি নিজ  
হাতেই পারেন।



**ক্যামেল ক্রাইলিন**

১২

ক্যামেলিন প্রাইভেট লিমিটেড, আর্ট মেট্রিক্যাল ডিভিশন, বক্স-৪৫৬, ৩০০ (ভা.৩৫).

VISION/C/802/BEN

## গ্রাফিক আর্ট

গ্রাফিক আর্ট (জ্যোতিষ নন্দলাল সেনকে অনুসরণ করে বাংলায় ছাপের ছবি বালি না কেন? অথবা আরও একটু বদলে নিয়ে যদি বালি ছাপাই-বলি, 'তবে' তৎসম-তৎকালীন নন্দলাল সেনকে ভারতীয় ভাষাতেই এই বংশধর শিল্পটিকে গ্রাফিক আর্ট বা আর্ট অব প্রিন্ট-মেকিং-এর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে) বিষয়ে সম্পাদক সরকার-সনং কর কিত্তির (দেশ, ১৭ মে এক ২১ জুন) কিছুতেই নাসিক-অনুপ্রাণিত করা যায় না যদি না সম্পাদকবৃন্দ তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে আমার মতন নগণ্য লোককে সাক্ষী মানতেন।

সম্পাদকবৃন্দ সনং করের বক্তব্যের বিরোধী বক্তা হিসাবে আমার লেখা থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তার সঙ্গে সনং করের বক্তব্যের আদলে কোন বিরোধিতা নেই। সনং করবৃন্দ বলেছেন, "অন্যদিকে বস্তু দেখে ফেরার অনেক আছে... সোলাইটি অব কন্টেন্টের প্রেরণী আর্ট স্ট-এর ধর্মভার করে ইন্টার্লিং পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য স্টাডিও প্রতিষ্ঠিত হয়... এবং ইন্টার্লিং পদ্ধতিতে কাজ ও প্রাকল্প-নির্দেশনা চলতে থাকে।" সম্পাদকবৃন্দ আমার লেখার যে অংশ উদ্ধার করেছেন, সাদা বাংলায় তার অর্থ দাঁড়ায়, একটি মাত্র স্পোট বা ম্যাট্রিক্স থেকে বহুস্তর ছাপাই ছবি তৈরি করার রীতি, যা হেটার রীতি নামে পরিচিত, কলকাতার প্রচলন করেন অরুণ কন্দল। এর সঙ্গে সনং করের বক্তব্যের বিরোধিতা নেই।

ছাপাই-ছবি সম্পর্কে সম্পাদকবৃন্দ ধারণার অস্বচ্ছতার জন্যই তিনি মনে করছেন আমার আর সনং করের বক্তব্য পরস্পর-বিরোধী। তাঁর ধারণার অস্বচ্ছতার প্রমাণ পাই যখন তিনি বলেন, "এটি আর ইনটার্লিংও তফাত আছে।" আর এই ধারণাই আছে যত গুণগোলের মূলে।

ছাপাই ছবির জাতি-ভেদ করা হয় দু' ভাবে। এক, সাপোর্ট মেটেরিয়াল বা ম্যাট্রিক্স মেটেরিয়ালের নামানুসারে এবং অথবা ম্যাট্রিক্স মেটেরিয়ালে যে পদ্ধতিতে নকশা বা রূপকল্প ফুটিয়ে তোলা হয় সে পদ্ধতির নামানুসারে। ম্যাট্রিক্স মেটেরিয়ালের নামানুসারে নামকরণ হতে দেখা যায় লিথোগ্রাফি (মেটেরিয়াল এখনো লিথোগ্রাফিক স্টোন) ও সেরিগ্রাফি (সেরি=সিল্ক)। ম্যাট্রিক্স মেটেরিয়ালে যে পদ্ধতিতে নকশা বা রূপকল্প ফুটিয়ে তোলা হয় সে পদ্ধতির নামানুসারে নামকরণ হতে দেখা যায় এনোগ্রাফি-এ, ব্রাই-পয়েন্ট, এটিং-এ। উড-কাট এবং এনোগ্রাফি-এর ক্ষেত্রে এসে দেখা যায় যে তার মধ্যে সাপোর্ট মেটেরিয়াল এবং নকশা বা রূপকল্প ফুটিয়ে তোলার পদ্ধতি উভয়েরই পরিচয় আছে নমঃ। দুই, কালির সাহায্যে যে পদ্ধতিতে ম্যাট্রিক্স থেকে কাগজ বা কাগজের উপর ছাপ তোলা হয় সে পদ্ধতির নামানুসারে আরেকভাবে ছাপাই ছবির জাতি-ভেদ করা হয়ে

ইনটার্লিং ও প্রিন্টিং, স্কেনোগ্রাফিক বা স্কেনোগ্রাফিক প্রিন্টিং এবং স্টেনসিল প্রসেস। আমরা যখন বালি এটিং, তখন জামার বা দস্তার বা অন্য কোন ঘটিত পাতকে অ্যালিড দিয়ে ধাক্কা দিয়ে নকশা বা রূপকল্প তোলার পদ্ধতির কথা বলি। যখন বালি ইনটার্লিংও, তখন এমনিই একটি ছাপাই পদ্ধতির কথা বলি, যে পদ্ধতিতে কালি লাগানো হয় স্পোট বা ম্যাট্রিক্স-এর খোঁদাই-কৃত নিন্দ-তলে ছাপাইয়ের সময়ে যে নীচ-তল থেকে কালি উঠে এসে কাগজে লাগে। স্লেটের উপর-তলা থাকে পরিষ্কার। ধাতুর পাতের উপর করা এনোগ্রাফি, ব্রাই পয়েন্ট, এটিং মাধ্যমগত ইনটার্লিংও প্রথমে ছাপা হয়ে থাকে। এটিং-ই বালি আর ইনটার্লিংওই বালি, আমরা যখন ফিনিশড প্রজেক্ট-এর কথা বলি তখন তার সূচিতে নিম্নোক্ত একটা অপারেশন-এর কথা বলি, পুরোটা বলি না। এটিং কর্মটিতে ছবিতে রূপান্তরিত করতে হলে ইনটার্লিংও পদ্ধতির ছাপাই কর্মের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এর পরে কি করে সম্পাদকবৃন্দ বলেন ফিনিশড ছবি হিসাবে এটিং আর ইনটার্লিংওর মধ্যে তফাত আছে। বা ইনটার্লিংও পদ্ধতি স্ট্যানলি উইলিয়ম হেটার-এরই দান, যা অরুণ বসু, মারফত কলকাতায় এসে পৌঁছায়?

সনং করবৃন্দ বলেছেন, ইনটার্লিংও পদ্ধতিতে ছবি তৈরি করা শুরু হয় অরুণ বসু, এদেশে এসে ফিনিশার আগেই। আমি তো বলি, ১৮৯৬ সালে গঙ্গাধরশ্যামের ডক্টর কতক প্রকাশিত 'অরুণামঙ্গল'-এর জন্য যখন রামচন্দ্র রায় এটিং করেছিলেন, তখন তাও ইনটার্লিংও পদ্ধতিতে ছাপা হয়েছিল (তখনও প্রসেস বুক অ্যাকসিউট হয়নি বলে লেটারপ্রেস রিফ্রিক প্রিন্টিং প্রসেসে ছবি ছাপা হতো না)। অতএব, ১৯০৪-এ যার জন্ম সেই অরুণ বসু, কলকাতায় ইনটার্লিংও পদ্ধতিতে ছবি তৈরির জগীরদার কি করে? অরুণ বসু, পরীর আভেলিয়ারে সতের থেকে, একই ম্যাট্রিক্স থেকে বহু রঙ ছবি ছাপানোর রীতিনীতি, যা নাকি হেটার-পদ্ধতি বলে স্পর্শাচিত্র শিখে এসে কলকাতায় তার চর্চা শুরু করান। তাতে যে ছবি তৈরী হয় তা রঙিন এটিং, ইনটার্লিংও রীতিতে ছাপা।

এখানেই আমার চিঠি শেষ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু স্ট্যানলি উইলিয়ম হেটার নামক ব্যক্তি কি দূরের শিল্পী সে-নিম্নে সম্পাদক সরকার-সনং কর বিতর্কে একটা অংশ না-নিম্নে পারছি না।

স্ট্যানলি উইলিয়ম হেটার যে একজন কারিগরের চেয়ে বেশী সমান পাবার যোগ্য নন-তবু এই বক্তব্যের স্বপক্ষে সম্পাদকবৃন্দ এ্যালিস্টার গ্রান্ট নামে লন্ডনের রয়েল কলেজ অফ আর্টের একজন অধ্যাপকের মৌখিক মতামতের কথা উল্লেখ করেছেন। এ্যালিস্টার গ্রান্টের কথার কে, কবে, কোথায়, কাকে কি বলেছেন তা যদি যাচাই

সম্পন্ন-প্রমাণ হিসাবে গ্রাফা হতে পারে? সম্পাদকবৃন্দ আরও বলেছেন, নানা বিদেশী দপ্তরালয়ে এবং বিদেশী প্রচার সংস্থায় তাঁর সঙ্গে অনেক জ্ঞানী-গণী সাহেবদের সঙ্গে কথোপকথান কথাস্বার্থ্য হয়। তাঁরাও নাকি বলেছেন যে তাঁরা হেটার মশাইয়ের নাম কখনও শোনেন নি। এই নাম-ধাম-গোত্রহীন সাহেবরা কি ধরনের জ্ঞানী-গণী, তাঁরা ভাগ্য-পান সম্পাদকবৃন্দ কানে-কানে কি কথা বলেছেন তা জানবার এবং যাচাই করার সুযোগ যে-হেতু আমাদের মতন সম্ভাব্য দর্শকের নৈঃসম্বৃত্ত সেক্ষেত্র বা তাঁদের কথা সম্পাদকবৃন্দ মুখ থেকে শুনেন মানবার দায়ও আমাদের নেই। আমাদের নির্ভর করতে হয় নিজস্বের চোখে দেখা অভিজ্ঞতার উপরে ও ছাপা অক্ষরে প্রকাশিত মতামতের উপরে।

হেটারের ছবি দেখার অভিজ্ঞতা থেকে আমি আমার বান্ধি বিদেশী মতন তাঁকে কি দূরের শিল্পী বলে মনে করি তা আমি বলছি না, কারণ সাহেব না-হবার কারণে আমার মতামত হয় তো গ্রাহ্য হবে না। আমি সাহেবদেরই প্রকাশিত মতামতের কথা উল্লেখ করছি। হ্যাঁ, আন্তার্জাতিকের নতুন ইয়ক্স প্রকাশন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত সকল গ্রন্থ 'আর্ট সিনস ১৯৪৫'-এ দর্শক স্যার হার্বার্ট রীড উইলিয়ম হেটারকে যুগ্মশিল্পের কালের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সূত্রায়ালিত শিল্পী হিসাবে বর্ণনা করেন। সেখানে, তিনি ছাপাই-ছবি নির্মাতা না চিত্রকর সে-প্রশ্ন থাকে উঠে। না ইয়ক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পের ইতিহাস বিষয়ের অধ্যাপিকা ডোরে এ্যানাটন-এর ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ 'সুপ্রারিয়ালিজম অফ হেটার' সেকেন্ড ওয়ার ও স্ট্যানলি উইলিয়ম হেটারের পবিত্র পাই সূত্রায়ালিজমের কবিতা নবনী পালবদলের অন্যতম হোতা হিসাবে, কালির হিসাবে নয়। ফ্রিৎস আইখেনবার্গ এবং জুলে হেলারের ছাপাই-ছবি বিষয়ক দুই মহাশিল্পের কথা না হয় বাতল দিলাম, কারণ সেগুলির কথা উল্লেখ সম্পাদকবৃন্দ গ্রন্থেই বলেছেন, বইগুলি যেহেতু ছাপাই ছবি বিষয়ক সেহেতু কারিগরী গণের জন্যই হেটার উল্লেখিত হবেন। কিন্তু কারিগরী উদ্ভাবনী শক্তি ও দক্ষতার এত হয়ে জ্ঞান করা কেন? শিল্পে তো ধান-ধারণা, ভাবনা-চিন্তা, আবেগ-অনুভূতিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু করে তুলতে হয়, শিল্পবস্তু তো নির্মাণ করতে হয়। তার জন্য তো কারিগরী উদ্ভাবনী শক্তি ও দক্ষতার প্রয়োজন আছে।

হেটারের গুণাগুণের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সম্পাদকবৃন্দ লন্ডনের রয়েল কলেজ অফ আর্টের অধ্যাপক এ্যালিস্টার গ্রান্টের তথ্যকথিত (এবং স্বয়ং বিবর্তিত) বক্তব্যকে শানিত-নিকটতমের কলাভবনের অধ্যাপক সনং করের মতামতের চেয়ে অধিকতর গ্রাহ্য বলে মনে করেন। কিন্তু কেন, কোন

বলে (তাঁর নিজের কাজের নিদর্শন কলকাতার ব্রিটিশ কন্সটিটিউশন কলার ট্রান্সপারেন্সির মাধ্যমে বা দেখলাম, তাতে তাঁকে আমার সনং করের চেয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্পী এবং প্রিন্ট-ছাপাই বলে মনে হয়নি)? তিনি লন্ডন রয়েল কলেজের অধ্যাপক বলে? সনং কর ভারতীয় শিল্পী এবং অধ্যাপক বলেই কি তাঁর বক্তব্য তের? ছাপাই ছবিচর্চার ক্ষেত্রে রয়েল কলেজ কোন ছবি চর্চার ক্ষেত্রে রয়েল কলেজ কোন অর্থে কলা-ভবনের চেয়ে, হেটারের আভেলিয়ারে সতের বা ফ্রিৎস আইখেনবার্গের প্রাট ইন্সটিটিউট-এর চেয়ে বেশী কতিত্বের দাবীদার? প্রণবরঞ্জন রায় কলকাতা-২৯

## ত্রিপুরা

দেশ-এর সম্পাদকীয় 'ত্রিপুরার গণহত্যা' পড়ে ভালো লেগেছে। ত্রিপুরায় যে নরমেধ বজ্র অনুষ্ঠিত হয়েছে তার জন্য মূলত কমন্স সরকারই দায়ী। আজ বিভিন্ন প্রত্ন-পরিষদ ত্রিপুরার বিদেশী প্রয়োচনার অভিযোগ করা হচ্ছে। কী হচ্ছে যে, বিদেশী ক্ষম প্রচারকরাই উপজাতীয়দের উসকানি দিয়েছে। কিন্তু আজ থেকে প্রায় সাত-আট মাস আগে যখন নৃপেন্দ্রাবর সরকার উপজাতীয়দের সম্মুখে বাঙালীকে লাঠিপেটা করে দোষপ্রতিপন্ন করে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁরাও কম বান না, তখন তো কই কেউ বিদেশী প্রয়োচনার কথা বলেননি। আমি তখন হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড-এর সম্পাদককে লেখা একটি চিঠিতে নৃপেন্দ্রাবর জ্ঞাত কার্যকলাপের সমালোচনা করেছিলাম। আজকের রাজনৈতিক অন্ধ যদি কিংবাস করতে হয়, তবে ধরে নিতে হয় যে, ত্রিপুরার কমন্স সরকারও বিদেশীদের প্রয়োচনার বলি।

ত্রিপুরা, মণিপুর, উত্তরকর্ণা, উপ-জাতি-অধ্যুষিত বাঙ্গা-বিহারের অংশ বিশেষ-এ সব জায়গায় আজ যে অসহ্যমান চলছে তাকে সামাজিক-অত্যাচার হিসেবে চিহ্নিত করলেই ভাল হয়। প্রতিটি জায়গাতেই কী হচ্ছে যে, ১৯৬৯ সনে এ সব জায়গার রাজারা প্রাকের ভয়ে ভারতে যোগ দিয়েছিলেন, ভারত নাকি "Gunpoint"-এ এসব রাজা দখল করেছিল? তাই আজ, ১৯৮০ সনে, উপজাতীয়দের আদ্যকার অধিকার ফিরায়ে দিতে হবে। কী কী হাং লা, এ সব দাবির পেছনে অতীতের রাজ্যস্বামীদের নীল রক্ত কলঙ্ক রয়েছে। এ সব রাজ্যস্বামীদের নেহরুরী বদান্যতার অনেক পেয়েও বেশি নয়। জনতা সরকারও এদের মদত দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, আজকের কেন্দ্রীয় সরকারও এদের ক্রিকে শক্ত হাতেও পাকড়া দিতে পারেননি। রাজ-মহারাজাদের কথধরনের অর্থে পুট মারসবাদীরাও বিভিন্ন কারণে এদের সাথে লড়তে পারছেন না। মারখান থেকে মার খাচ্ছে হাজার হাজার গরীব বাঙালী।

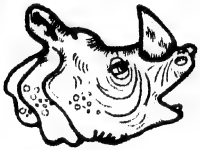
রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

## গৌরী ধর্মপাল-এর জন্মদার ছবি-ছড়ার বই ঘোড়া যায় দাম ৬.০০

“রক্তচোটে পাতা আর/ছবি  
ছড়া জন্মদার/হাসি খুশি  
ফর্তি/এই দিয়ে ভর্তি”  
—ঘোড়া যায়—এর প্রথম  
ছড়ার প্রথম চারটি পংক্তিতেই  
যেন তুলে ধরা হয়েছে বইটির  
বিষয় এবং বিন্যাস, স্বাদ  
এবং রস, মজা এবং আনন্দ।  
ছোটদের জন্য নতুন স্বাদের  
ছড়া আর সঙ্গে তাল-  
মেলানো মন-ভোলানো সব  
ছবি—এ-দুয়ের হরগারী  
মিলনে দু-রঙে ছাপা এ-বই  
এক অনন্য উপহার।



গৌরী ধর্মপাল-এর ছড়ার  
বৈশিষ্ট্য হল, অবিকল ছোট-  
দের চোখ দিয়েই পৃথিবীকে  
দেখতে জানেন তিনি।  
ছোটদের অনুভব-উপলব্ধি-  
বিস্ময়-আনন্দ-অভিলাষকে  
ধরতে পারেন জীবন্তভাবে।



ছোটদের চারপাশের প্রাণী-  
জগৎ এ-বইয়ের অধিকাংশ  
ছড়ার বিষয়। ভালুক-হরিণ-  
ময়ূর-প্রজাপতি-কাকাতুরা  
মাছরাঙা-পাচা-উট-বাঘ-হাতি-  
বেড়াল-কুকুর—কে নেই! এ  
বনে এক আঁজব চিড়িয়াখানায়  
ছোটদের ডেকে নিয়েছেন  
তিনি। আর সেই চিড়িয়াখানায়



প্রমণের ছবিগুলোকে জ্যান্ত  
করে তুলেছেন একালের  
দুর্ধর শিল্পী দেবাশিস দেব  
শিল্পচিত্রের জন্য এই কদিন



## রমাপদ চৌধুরীর বিস্ময়-জাগানো উপন্যাস বীজ দাম ৭.০০

হঠাৎই একদিন বাড়ি ছেড়ে  
চলে গেলেন শশাঙ্কশেখর।  
হাঁতহাসের গবেষক, স্ত্রী-  
পুত্রকন্যা সবাই রয়েছে। তবু  
চলে গেলেন। গেলেন যে,  
আর ফিরে এলেন না। কোনও  
চিঠি নেই, খবর নেই।  
নিরুদ্ভিষ্ট শশাঙ্কশেখরের  
বইয়ের ভাজ থেকে  
এক-টুকরো কাগজ আবিষ্কার  
করলেন স্ত্রী সুধাময়ী। এক  
প্রিয় ছাত্রীর নাম বারবার  
লিখেছেন শশাঙ্কশেখর সেই  
কাগজটায়। সংসারে যার কোন  
সম্পর্ক? বা কোন ভালবাসায়  
কোন খাদ ছিল না  
তিনি কেন লিখতে গেলেন  
এক ছাত্রীর নাম? কেন?  
কেন?

‘বীজ’ উপন্যাসের আরম্ভেই  
এক গড়-গহন জট। সেই গ্রন্থি  
ক্রমশঃ উন্মোচিত হয়েছে, আর  
কাহিনীর ভাজে-ভাজে  
লুকনো রহস্য ক্রমশঃ ছাড়িয়ে  
পড়েছে। আজকের স্মৃতি-  
ভ্রষ্ট সভ্যতার সর্বনাশের  
বীজটি কোথায়, শশাঙ্ক-  
শেখরের নিরুদ্ভিষ্টকে কেন্দ্র  
করে সেই কাহিনীই বিস্ময়-  
জাগানো শিল্পকৌশলভার তুলে  
ধরেছেন রমাপদ চৌধুরী।  
লেখকের অন্যান্য গ্রন্থঃ  
রূপ ১২.০০ হৃদয় ৬.০০  
লজ্জা ৭.০০ খারিজ ৭.০০  
অ্যালবামে কয়েকটি ছবি  
৭.০০ যে যেখানে দাঁড়িয়ে  
৫.০০ পিকনিক ৬.০০  
পরাজিত সম্রাট ৭.০০  
বনপলাশির পদাবলী ১৫.০০  
এবং গল্প-সমগ্র ৪০.০০

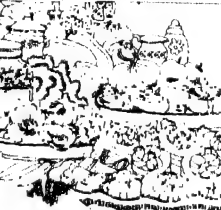
প্রকাশিত হয়েছে  
ইন্দ্রমিত্র-এর  
অসামান্য হাসির উপন্যাস  
মহারাজ

নতুন কিছু রান্না সংযোজিত,  
অনুপ রায়ের পুরো-পাতা  
তেরখানা ইলাস্ট্রেশন,  
অফসেটে ছাপা প্রচ্ছদ

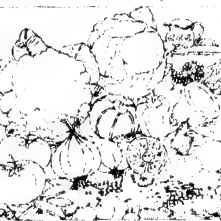
## লীলা মজুমদার ও কমলা চট্টোপাধ্যায়

রচিত রামা-শেখানোর বই  
রান্নার বই  
দাম ১৫.০০

অগ্রগণ্য কথাসাহিত্যিক লীলা  
মজুমদার ও তাঁর কন্যা কমলা  
চট্টোপাধ্যায় এ-বইকে বাছাই  
রান্নার বই করে তোলেননি।



তাঁরা দেশী-বিদেশী সব-  
রকম রান্না শেখাতে চেয়েছেন।  
জন্মদিনে-উৎসবে-অতিথি  
আপ্যায়নে-অসুখে-পিক-  
নিকে কীভাবে কী করলে



ভালো হয়, তা যেমন বলেছেন,  
তেমনই প্রতিদিনের  
আহার্যকেও কীভাবে স্বাদ-  
করে তোলা যায়, তাও  
শেখাতে ভোলেননি। কাটা-  
চটাই-শাকখণ্ড যেমন রয়েছে  
তেমনই রয়েছে চপ-কাটলেট  
আর পোলাও-বারিয়ান,  
দুপ-সুদুয়া যেমন রয়েছে,  
বাদ যামনি আইসক্রিম-কেক-  
ডাউন-ই-মিষ্ট বিস্কুট কিংবা  
প্যান্ট্রি। উপকরণ দু-মুঠো  
নয়, নয় দু-প্রাপ্য। মধ্যবিত্ত  
পরিবারের রান্নাঘরের দিকে  
তাকিয়ে, জিভের কথা ভেবে,  
সম্প্রতির কথা মনে রেখেই  
প্রতিটি রান্না শেখানো।

নতুন সংস্করণে আরও কিছু  
রান্না যোগ করা হল। উপহারে  
বা বাড়ির বাবুছায়ে অপরি-  
হার্য এই ‘রান্নার বই’ সবদিক  
থেকেই অমিষ্টতায়।

## শঙ্খমালায় মিষ্টি প্রেমের উপন্যাস দাম ৫.০০



শঙ্খমালাকে মানুষ জীবনে  
একবারই পায়। “এ পৃথিবী  
একবার পায় তারে,  
পায় নাকো আর”—  
জীবনানন্দের কবিতার এই  
আইডিয়াকে এই মিষ্টি  
প্রেমের উপন্যাসে এক  
অসামান্য রূপ দিয়েছেন  
বিশিষ্ট তরুণ লেখক মিহির  
মুখোপাধ্যায়। অসামান্য  
কয়েকটি ছোট গল্প লিখে  
তাঁর খ্যাতি, কিন্তু উপন্যাসেও  
তাঁর দক্ষতা যে কত তাঁর  
তা ‘শঙ্খমালা’য় প্রমাণিত।

## সুধাংশু ঘোষের

নিবিড় স্বাদের উপন্যাস  
কে বাজায় দাম ৬.০০



“তখন সেই ধর্মান, প্রথমে  
দূর-দূরান্তে অস্পষ্ট, ক্রমে  
এগিয়ে আসে, স্পষ্ট হয়।  
সু-রেলা নয়, ককশ নয়, তবে  
দুঃসহ ধার। বিরামহীন  
ধ্বনিভরঙ্গ। কে বাজায়!”  
উত্তরতিরিশ এক সুবার  
নিত্য-মরণের হস্তা এক দরদী  
গায়কের কণ্ঠে বিশুদ্ধ  
মার্গসঙ্গীতের বিষয়  
আলাপের মতো স্বরে পাড়ছে  
এই নিপুণ নিবিড় উপন্যাসে।

## সন্তোষকুমার ঘোষের বিস্ময়কর কিশোর-গ্রন্থ তুপুরের দিকে দাম ৮.০০

একজন মানুষ বারো  
বছর বয়সের মধ্যে বা শেষে  
বাকি জীবন তারই  
চর্চিত চর্চণ চলে। ফলে  
একজন কিশোরকে যেভাবে  
অজ্ঞ ভেবে নাবালক করে  
রাখি আমরা, বোধহয় ততটা  
কচি সে নয়।  
সন্তোষকুমার ঘোষই  
সম্ভবত সেই লেখক, যিনি  
বিশেষভাবে শিশুদের



চিত্র-শিল্পী থেকে মুক্তি  
দিয়েছেন। তাঁর লেখা একটু,  
গাড়, একটু, গভীর, একটু,  
জটিল। তিনি গা ভাসিয়েছেন  
চিত্রচিত্রিত শিশু-সাহিত্যের  
প্রতিকূল স্রোতে।  
তাঁর রচনা সেই সব  
ছেলে-মেয়েদের জন্যে, যারা,  
এই প্রথম জীবনের  
জটিলতার আশ্বাদ নিতে  
শুরু করেছে। যারা  
সকালবেলা থেকে পা  
বাড়িয়েছে দুপুরের দিকে।  
বয়ঃসন্ধির দু-দশ সময়ে  
হঠাৎ তারপু মনে হতে পারে,  
এই যে... সেই কথা,  
যা বস্তুতপক্ষে আমারও!  
বন্দীশাস্ত্রের যুগের  
বিশিষ্ট গদ্যকার সন্তোষকুমার  
এর আগে শিশুদের জন্যে  
সময় বার করেননি একটুও।  
আকাদেমী পুরস্কার-প্রাপ্ত  
এই লেখক বড়ো বেশি  
বাল্য ছিলেন বড়োদের নিয়ে।  
এই প্রথম তাঁর কিশোরদের  
মনস্তত্ত্ব পদচারণা এবং  
প্রথম বারেই ওই আচর্ষ  
সাম্রাজ্যের অনেকে অপেক্ষা  
বস্তুকে তুলে এনে হাজির  
করেছেন তাদের সামনে  
এবার যারা তাঁর রচনার বিষয়।  
ভেতরে চমকবার সব ছবি—  
এঁকেছেন দেবাশিস দেব।  
প্রচ্ছদ—এঁকেছেন বিশাল গুপ্ত



আনন্দ পাবলিশার্স ৩৫/৩৬ মিটিউ  
৪১ শেনিয়ার্টোনা রোড কলকাতা ২  
ফোন: ৫৮ ৪৫৩০

## সূচীপত্র

चिठियाँ : ७

অভ্যুপগম কিছার? । সম্পাদকীয় । ১  
 গ্রামীণ সংবাদ । মিহির মুখোপাধ্যায় । ১০  
 জ্যোতিষোক্তা ঠাকুরবাড়ি ও কলিক । অমিত্রদ্বন্দ্ব  
 ভট্টাচার্য । ১৭  
 জাল গোষ্ঠীনের আগে । প্রবোধ, দাশগুপ্ত । ২৫  
 অনুভবায় হওয়া । কুল কান্দ । ২৫  
 জল-ছবি । নিজম দে জেহুরী । ২৫  
 সেই সময় । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । ২৭  
 অরুণ্যদেব । ৩২  
 মানকম্মিন । শীবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় । ৩৩  
 স্মৃতি সততই স্মৃতির । প্রতিভা বসু । ৩৩  
 কড়কলিখ । অতুল ঘোষ । ৩৯  
 বিজ্ঞান । সমরজিৎ কর । ৪১  
 গ্রাম ইন্দ্রের স্মৃতি, সর্বজিৎ বিহার  
 মানুসের । কল্যাণকুমার দেব । ৪৩  
 ৮০-র উইলফ্রড বণ্ডার  
 অসাধারণত্ব । মুকুল । ৪৭  
 আলোচনা : শিক্ষণ সংস্কৃতি । ৪৯  
 প্রবন্ধ : ধর্মালোচনায় দাশগুপ্ত  
 প্রবন্ধাঙ্গণী পরিচিতি শেষ পাতায়

## পরবর্তী আকর্ষণ

শংকরা ঘোষের প্রবন্ধ  
বুদ্ধশক্তির রাজনীতি  
চিন্তারাজন দেবের প্রবন্ধ  
সহজপাঠের সুকণ জয়ন্তী  
রাজত চট্টোপাধ্যায়ের গল্প  
জয়নময়ীর ঠিকানা

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ

মানন্বৰাজ্যৰ পত্ৰিকা লিমিটেড-এৰ পক্ষে  
বাণেশ্বৰীয়া ৰায় কৰ্তৃক ৬ প্ৰফুল্ল সৰকাৰ স্ট্ৰীট  
কলকাতা ৭০০ ০০১ ঠেকে প্ৰকাশিত এবং  
আনক অফসেট প্ৰাইভেট লিমিটেড প ১৪৮  
সি ছাৰ্ভি (ৰোড কলকাতা ৭০০ ০১৪ এবং  
জীবনসত্য প্ৰিণ্ট: হাউস ১০ প্ৰফুল্ল সৰকাৰ  
স্ট্ৰীট কলকাতা ৭০০ ০৭২ ঠেকে মুদ্ৰিত।  
দায় এক টকা।  
বিমান মালুস: ১৫ পয়সা।  
পৰ্বাণ্ণলয় অধ্যাপক হাৰ্ভাৰ ২০ পয়সা।

## অতঃপর বিহার ?

উত্তর পূর্ব ভারতের সর্বত্রই সব উঠেছে 'বাঁচাও' আর 'তাড়াও'। বিহার যে এতদিন ঘুমিয়ে ছিল তা ঠিক নয়; হয়ত দেখছিল, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। দেখল, এই বেনো ঘোলা জল অনেক দূরই গড়িয়ে যেতে পারে। চারদিকে নজর রেখেই দৃষ্টি নতুন সংগঠন গড়ে উঠেছে বিহারে : একটি 'বাঁচাও'-আন্দোলনের, অন্যটি 'তাড়াও' জগিরের। সংগঠন দৃষ্টির নামকরণ করা হয়েছে, 'বিহার বাঁচাও মোরচা', আর 'অবসদ'-অর্থাৎ অল বিহার স্টুডেন্টস ইউনিয়ন। সদ্য প্রসূত এই দৃষ্টি সংগঠনের সম্মুখ সময় এখনো প্রত্যক্ষ করা যায়নি। তবে শোনা যাচ্ছে, প্রথমটি জ্যেষ্ঠ হিসেবে যে-চালটি চালবেন, কনিষ্ঠ দলটি তা পালনের ব্যবস্থাগুলী কার্য-কর করবেন। যেমন, জ্যেষ্ঠ বলবেন, বিহার থেকে গুচামালা বাইরে চালান যেতে দেবেন না; সংগে করলে অবসর রাজ্য-প্রেমিক ছাত্ররা রেল লাইন, কপলা খনি, কারখানা সব ঘেরাও করতে শুরুর করবেন যাকে বলা হবে 'পাকটিং'-আসলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটান সব রকম সম্ভাবনাই থেকে যাবে।

বাদ প্রদান ওঠে, কী উদ্দেশ্যে এই নতুন সংগঠন দৃষ্টি? উত্তর হবে, বিহারের অর্থনৈতিক মন্দির চাই! অর্থনৈতিক মন্দির কথাটা শুনেতে ভাল, ব্যঞ্জননা এবং অর্থব্যাপ্তি আছে। বাদি এমন ধরা যায় যে, সংগঠকরা ওই রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা বলেছেন তবে অন্য কথা। অর্থ-নৈতিক উন্নতি কোন রাজ্যের চাই না? আসামের চাই, পশ্চিমবঙ্গের চাই, বিহারের চাই, উড়িষ্যার চাই—গোটা দেশেরই চাই। সেই উন্নতির জন্যে কি প্রতিটি রাজ্য কীভাবে বাইরে যাওয়া বন্ধ করার হুমকি দিতে পারে? এই হুমকির কী ব্যঙ্গ থাকতে পারে? তেল বন্ধ করে আসাম কি তার অর্থনৈতিক মন্দির লাভ করেছে? নাকি তার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়েছে?

আসলে অর্থনৈতিক মন্দির কথাটা ম-মের বুলি। ভেতরের উদ্দেশ্য আলাদা। কিছু স্বার্থান্বেষী, হয় উচ্চভিলাষ সফল করার মতলব নিয়ে না হয় রাজনৈতিক মনোনাশ লোটার জন্যে বড় পরামের কিছু বিশৃঙ্খলা চান। এ-দেপের রাজনীতিতে এখন বিশৃঙ্খলাই বড় অঙ্গ। কথায় বলে, শয়তান এক লাফে সাত পা যায়। বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারলে কারও কারও লাভ হয় হয়ত, কিন্তু কতি হয় বহুর। একথা যে কতদূর সত্য তা প্রমাণ করার কোনো দরকার নেই না, চতুর্দিকেই সে-দণ্ডালিত দেখা যাবে আজ।

বিহারের এই আন্দোলনকে উপেক্ষা করলে ভুল হবে। যখন তার বিচার্য্যার বার্ডেন—অণ্ড বড়ার মুখে—তখনও তা অবজ্ঞার ব্যাপার নয়। এ-কথা মনে রাখা দরকার, বিহারের ছোট নাগপুরের নানা অংশে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের উগ্র সমর্থকরা রয়েছেন, রয়েছেন এমন অনেক অনুন্নত সম্প্রদায় যাঁদের ওপর বিহারের ভূমিমালিকদের অত্যাচার দীর্ঘস্থায়ী, রয়েছে জাত-পাতের কলহ এবং আকোশ। নানা ধরনের শিকোভ ও উম্মাফে কাজে লাগিয়ে একটি বড় বিক্ষুব্ধতা সৃষ্টি করা অসম্ভব নয়। তাতে বিহারের অর্থনৈতিক মূর্খতা অজান করা যাক বা না যাক—বিশৃঙ্খল বিহার কিছুকালের জন্যে অত্যন্ত দেশের লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠবে।

আন্দোলনকারীরা যে নির্বোধ তা নয়, তবে অনেক সময় অতি চালাকেরও হিসেবে গরমিল হয়। আজ বিহার যদি বিহারের অর্থনৈতিক মুক্তি দাবী করেন—কাল দক্ষিণ বিহার উত্তর বিহারের থেকে মুক্তি চাইবে, মোখলী-ভোজপুরীরা বিচ্ছিন্নতা দাবী করবে অন্য কোনও অছিলায়। এই ধরনের ছোটখাট দাবীদারের সংখ্যা বিহারে কম হবে না। এই রাজ্য একভাষী নয়, কৃষি সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক মুক্তি এক নয়। বিহারের আদিবাসী, উপজাতিদের অর্থনৈতিক মুক্তির সঙ্গে পাটনার মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির মিল থাকতে পারে না।

বিরহ যদি নিজ রাজ্যের বিশেষ এক শ্রেণীর জন্যে এই রণে মগ্ন হয়—তবে অনুমান করি তাকে রণে পর্য্যাপ্তদর্শন করভেই হবে, কেননা তার নিজের রাজ্যের অসংখ্য খেটে-খাওয়া মানুষ আজ অন্য রাজ্যের প্রীতি নিভরশীল। পটচমৎকাণ্ড তা থেকে বাদ যায় না। রাজ্যের সম্পদ এবং তার ভোক্তা একমাত্র সেই রাজ্যের লোক হতে পারে না যে—এও যেমন সত্য। সেই রকম অর্থনৈতিক মণ্ডলও বিচ্ছিন্নভাবে আসে না।

এটা খুবই আশ্চর্যের কথা, আঞ্চলিক দেববিশ্বি, সংস্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা আমাদের এত দিনেও ঘুচল না। বরং স্বাধীনতার পর এই ব্যাধি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে ব্যাপ্তে বাড়তে এনে অবস্থা হয়েছে যে তা ভীষণ ব্যাধির মতন সংক্রামক হয়ে উঠেছে। আমরা সহজেই তাতে সংক্রমিত হচ্ছি। প্রতিটি রাজ্য এবং সেই রাজ্যের স্বতন্ত্র অঞ্চলগুলি যদি নিজ নিজ মুন্সির নামে নামে লনে নেমে পড়ে তবে আমাদের ভবিষ্যৎ কী? এই প্রশ্নটা কি?



## গ্রামীন সংবাদ শিখির মুখোপাধ্যায়

১ এক ১

বিকেলবেলা ছোট কানাই এসে বললো, "স্বজন, মাছ ধরতে বাবে, তা" হলো চলো বিশ্বাসদের বড় পুকুরে বাস একদিন।"

এই বালিজগৎর রাজার দু'জন কানাই। বড় কানাই হলেন দত্ত জয়েলাচারি কানাইলাল দত্ত। যাঁর ঘরে কল। মোটাসোটা, রাশভারী মানব। সোনারপেঁয় মস্ত কারকারী। কাজের ব্যবসায়ী সমিতির প্রেসিডেন্ট। বিপত্তর জায়গাজমি, দেউলা দালান, পুকুর। আট-দশটা গাই-বাছুর, সাতটি ছেলেমেয়ের ঘরে একপাল নাতি-নাতনী আর জাদিরল গিঁম নিয়ে জমকালো সংসারের কত। ইদানীং দু'টি কানাই কম শুনতে শরম করছেন বলে যত্ন নিয়েছেন। এরকম যত্ন এ উল্লাটে আর কারো নেই। খাস বিলিভী জিনিস, বলকারের ডাক্তারখানা ঘুরে বালিজগৎ এসে বড় কানাইবাবু কান উঠেছে। রোজ-রোজ অনেকের আকর-উমেদারি কথ শুনতে হয়। পরসাগুয়ালা বড় মানবের যা হয় আর কি। সর্বাধিন নানাজনের নানা নালিশ-নিন্দা, অভাব-অভিযোগের ফিরিস্তি শোনে, অনেক গোলমালে কাণ্ড-কারবারের ফসলালা করেন। যখন আর শুনতে চান না, কিংবা কাউকে জগাতে চান, তখন বড় কানাইবাবু একটা মজার কাণ্ড করেন। প্রেফ কানের যত্নরটি খুলে রেখে অনাটিক তাকিয়ে থাকেন। অর্থাৎ আর শুনবে না, এবার কাটো। এ নিয়ে কাজের হাসাহাসি হয়। কিন্তু বড় কানাইবাবুকে নিয়ে এ গল্প নয়। তাঁর ছোট ছেলে বালিজগৎর মস্তান দালাল দত্তর কথা খাশময়ে আসবে।

এই ছোট কানাই হল পণ্ডান ভাণ্ডারের মালিক বিধু পালের মেজ ছেলে কানাই পাল। নাম-ডাকের দোকান পণ্ডান ভাণ্ডারের একপাশে চাল-ডাল-তেল-নুন-মশলাপাতির মুনী দোকান, আরেকপাশে মস্ত পাটের আড়ত। দেশ ভাগের পর নতুন জেসার বালিজগৎ এসে ছোট একটা মুনী দোকান দিয়ে শরু করেছিলেন বিধু পাল। তারপর পাটের কারবারে নামলেন।

সোনালী পাটের গুচ্ছ, কাগজী নেটের গোছা হয়ে ঘরে আসতে লাগল। তিরিশ বছর লাগ হয়ে গেলেন। টাকা হলে হাঁক-জক বাড়ে, পরসার সঙ্গে প্রভাব-প্রতিপত্ত।

ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি নিয়ে কানাই দত্তর সঙ্গে ঐকান্তিক লাল।

একদিকে বরিশালের বাঙালি কিছুকিছু পাল, আরেকদিকে এখানকার আদি-বাসিন্দা নতুন জেলার কানাইলাল দত্ত। সে সব অন্য গল্প। এখন ব্যস হয়েছে বিধু পালের। কোমরে কাঁচ, চোখে জল। তিন ছেলে। বড় ছেলে কানাই পাল ব্যবসা দেখে। বাপের সঙ্গে সঙ্গে থেকে কাজ-কারবার ডালই শিখেছে। ছোট ছেলে নিমাই নৈহাটি কলোজে পড়ে। আর মেজ ছেলে এই কানাই পাল খোশ-মেজাজের মানবে। পর্যাটপের মত ব্যস। বিরো-বা করেছে। দুটি ছেলে-মেয়ে আছে বটে, কিন্তু উড়, উড়, মন। ইই-চই, আমোদ-শুভ্রতির দিকেই ঝেঁকটা বেশী। দোকান দেখার দার-দারিও বিশেষ নিতে চায় না। স্বজাতি-স্বজাতির কলীপুলো কিংবা ব্যবসায়ী সমিতির প্রবোজনায় তিন রাশিবাণী জল-উলব ইত্যাদি কাজকমেই ছোট কানাই উৎসাহ প্রচুর। তার মতে, এসব না হলে পার্বালক ওয়ার্ক। আর এই পার্বালক ওয়ার্কের মাতব্বি নিয়েই দালাল দত্তর সঙ্গে রেযারিষ।

ছিকলবেল। যখন মাছ মারার কথা কাত এল ছোট কানাই, স্বজাবহারী তখন দর্জির দোকানের ঝাঁপ খুলে সরে বসেছে। দোকানখণ্ডটি পাকা দালান, তাকে উপরে দিনের ছাউনি, সামনে কাথানো রোয়াক। ছোট দোকান "কুড়ু টোলার"-এর ব্যস বেশী নয়, ছ' সাত বছর। বাংলাদেশের হাঙ্গামার সময় এ অঞ্চলে পালিয়ে এসেছিল স্বজাবহারী।

খলনার কাছে দৌলতপুরে কুড়ু টোলার-এর দোকান ছিল।

বালিজগৎর কাজের খলনা-খলনার লোক বেশী। জকা-বিসাল-ফরিশপের লোক অল্প। দেশ ভাগের পর দফার দফার লোক এসেছে। স্বজাবহারী সঙ্গে সংগেই যেমন বরিশাল থেকে বিধু পাল এসেছিলেন, তেমন খলনা থেকে এসেছেন জকাবহারীর কাকা ত্রীপতি কুড়ু। ধতি শাড়ির বিপুল জোজ্ঞনের দোকান "মনোমোহিনী স্টোর"-এর মালিক কুড়ুমশাই এ কাজের পরসাগুয়ালা পরনে ব্যবসায়ী। লক্ষ, রোগা গড়নের পরম বৈক্য কুড়ুমশাইর বাড়িতে রাখামাছের নিতা সেকা হয়। খলনখাটা, জমাটমী আর দৌলতপুরিয়ার মহোৎসব অটপ্রহর কীতনের সমারোহ। কিছদিন আগে কুড়ুমশাইর বা অর্থাৎ স্বজাবহারীর ঠাকুমা মনোমোহিনী বেশী জিনিসবই বছর ব্যসে একদাই ছেঁকলা করেছে।



(মাতৃ শ্রাঘ উপলক্ষে শ্রীপতি কৃষ্ণমশাই তিনদিনব্যাপী দ্বিদিনব্যায়ম সেবার যে ফিরতি বাসনা করেছিলেন, এ অঙ্গুলে অভূতপূর্ব সে খবর নদীয়া-কর্তৃক কাগজে ছাপা হয়েছিল।)

কাকার ভরসার একরকম একবন্দে এখানে পালিয়ে এসেছিল ব্রজবিহারী। সশো শ্রী আর ছোট ছোট দুটি ছেলে। পালিয়ে আসার কয়েক মাস আগে একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল। প্রথম সন্তান শান্তির স্বশ্রবণাভি নলাভা-বাসবেশুর। লোকের মধ্যে খবরম্বর শনেছিল, ভৈরবের কলে সেই গ্রামস্বয়ং জন্মালিয়ে দিয়েছে মিলিটারীরা। লাল সব নদীতে ফেলে দিয়েছিল। শান্তির শশুর-শাশুড়ী, স্বাধীন-জগদীশ-দেওর কাছে কোন খোঁজ পায়নি। এই আট বছরে কোন হাঙ্গির করতে পারেনি।

এখন পঞ্চাশের মত বয়স ব্রজবিহারীর। কাকার মত লম্বা হলেও রোগা নর। ছ' ফুটের কাছাকাছি যেমন লম্বা, তেমনই বলিষ্ঠ গড়ন। মাথা জোড়া মস্ত টাক। পাশে আর পেছনে সামান্য কাঁচাপাকা চুলের বলয়। ব্রজবিহারীকে দেখলে মনে হয় না, ছাত্রজীবনে সে কৃষ্ণিত লড়ত, দৌলতপুরে কলেজের মাঠে ব্যায়ামের কসরত দেখাত।

শান্ত স্বভাবের নিরীহ মানুষ। কম কথা বলে, নিজে না হেসে অন্যকে হাসাতে পারে। সম্বোধনো বাজায়গারী কালীতলয়ার আড্ডার ছেলে-ছোকরাদের কেউ তামাসা করে যদি বলে, "লাল চিরুণী আছে?"

"চিরুণী নেই, আয়না আছে, মুখ দেখতে পারো।" বলতে বলতে মাথা নিচু করে চকচকে টাকটি সামনে এগিয়ে দেবে। সবাই লক্ষ করে হেসে উঠবে, কিন্তু ব্রজবিহারীকে মুখে কোন লক্ষ দেই, সামান্য হাসির আভাস। বাজায়গার কোন দলদলীর মধ্যে থাকে না সে, কোন হুজুমে মাতে না। সত্যিই একদিন (বৃহস্পতি-কর) দোকান কল রাখবে। সেদিন সন্ধ্যায় ওই কালীতলয়ার আড্ডায় বসে পানপা খেলে। মধ্যে মধ্যে ছিপ ফেলে মাছ ধরার নেশা ছাড়া সব-আহ্লাদ বলতে তেমন কিছু নেই। মাছ-মারার সঙ্গী ওই কানাই পাল। কালে বছর পনেরোর ছোট হলেও সঙ্গী হিসেবে ছোট কানু ব্রজবিহারীর পছন্দের লোক। দাদা বলে ডাকে, অনাগণ্য করে। আগে আড়ালে বিড়ি টানতেন। এখন অনমিত দিয়েছে ব্রজবিহারী। দজমক কাছাকাছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফাতনার দিকে চোখ রেখে পুকুরপাড় বসে থাকতে হয়। মধ্যে মধ্যে কিছু গলায় দু'চারটি কথা হয়। তখন একসঙ্গে বিড়ি না টেনে উপায় কি?

সেদিন বিকলবেলা ছোট কানাই যখন মাছ মারার কথা বলতে এল, তখন অন্য কারো সঙ্গে কথা বলছিল ব্রজবিহারী। দোকানঘরের পেছনে বাসা। তিনের ঘর দুমার বেড়া, মোজেরা অংশ পাকা। সৌন্দর্য যাবার দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল কেউ। দোকানের সামনের রোয়াক থেকে সোজাসৃজি দেখা যায় না। শব্দ ছাপা শব্দের অটলতা চোখে পড়ছিল। ব্রজবিহারীর শেষের কথাগুলি কানে এল, "তোমার কাকীমা, তোকে প্রাণত চায় না, আমি কি করবো বল?" তারপর ছোট কানুর কথা শুন এদিকে মুখ ফেরল। এমন সময় পুরোপূর্ণি চোখের সামনে এল মেয়েটি। পেছনের দরজার দু' পাশে দুটি হাত রেখে কালো, "আমি তা হলে কোথায় যাবো, কাকাবাব?" বাইশ-বতইশের উজ্জ্বল কালো রঙ, বড় ঝড় চোখ, সামান্য চাপা নাকে বৃণের নকচাঁবা, রূপোর হার, কানপাশ। পুরস্কৃত গড়নের নিটোল শরীর, সজ্জা দুই হাতে মোটা মোটা বৃণের বাউটি। কালো রঙে রাপের গরানয় বেশ চেকনই দিয়েছে। কপালে সবুজ টিপ, সবজি ব্রাউজ, আর সাদার-সবুজ-হল-এর মেসারো ফুল-ফল ছাপা শাড়ি।

বড় বড় দুই চোখে রাজ্যের উৎসে নিয়ে ব্রজবিহারীর মুখের দিকে তাকল, পরকণ্ঠে ছোট কানুবাঁকে দেখতে পেয়ে জড়সড়ভাবে আবার দরজার পাশে সরে গেল। চিন্তিত পরল ছোট কানু, চেনা মুখ, বেশ ভালভাবেই চিনল। "রাখ" গলায় বউ, লবণলতা। ঘরামির কাজ করত রাখহরি। অল্প বয়সেই ভাল কাজ শিখাছিল। এ বাজারের অনেক দোকানদার রাখহরির তৈরী। পচ বছর আগে গোবরজাপা না মহলদপুর থেকে ওই মেয়েটিকে বিয়ে করে আবার পুরই অলঙ্কার লাগল। লবণলতার শাড়ি-গরানয় রায়না সামাল দেবার জন্য চুঁচি আরম্ভ করল। রাত দুপুরে নিজের হাতে তৈরী নতুন দোকান ঘরের ঝাঁপ ঝুলে মাল পাচার করার সময় হাতে-নাতে ধরা পড়ল রাখহরি। তারপর চোরের মার। তারপর থানা-শুলিস, জেল-হাজত ঘরে এক বছর পরে বালিভাঙ্গার ফিরে এল, তখন মাথাটা কেমন খারাপ হয়ে গেছে। আপন মনে বিড়িবিড়ি করে বসে, ফিক ফিক করে হাসে, কখনো বা রাগঘাটের যতীন মোজারের নকল করে লোকচায় দেয়, কিংবা সাক্ষী জেরা করে।

রাখ পাগলের কামক দেখার জন্য বাজারের রাস্তায় এক-একদিন ভিড় জমে যেত।

মধ্যে মধ্যে নিরুদ্দেশ হত। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াত কে জানে। এক মাস দেড় মাস পর ফিরত। ইদানীং প্রায় বছরখানেক হল রাখহরির পস্তা নেই। কাঁজতে কাঁজি মা আর স্ববতী বউ।

ওরা আর কোথায় খুঁজতে যাবে। উড়া খবর আসে। কে নাকি শেয়ারদার কাছে ভিক্ষে করতে দেখেছে। আরেকজন এসে বললো, বাজাসতে চাপাডালির মোড়ে এক মরার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে শালপাতার করে জিলিপি খেতে দেখেছে।

বালিভাঙ্গার বাজারে রাখহরির শেষ খবর এসেছে, হাস চারেক আগে। কিন্তু পালের পাটের জড়তে যে খাতা লেখে সেই বৃদ্ধ লম্বা পরিবার নিয়ে

কোথাকার মেসার গিরীছল দোলপূর্ণিমাও পরের দিন। সেখানে নিজের চোখে দেখে এসেছে বৃদ্ধ, মেসার একপাশে আমতলার বসে চার-পাঁচটা সাহেব-সাহাব সঙ্গে গজা টানছে রাখহরি।

তখন লম্বা হরা হর। গলায় মোটা মোটা রুম্মকের মলা, লম্বা লম্বা চুল আর সোঁকাড়িওজলা হাঁপ। সবেমগলো রাখহরির হাত-পা নাড়া লেখে স্বব হাসিছিল।

রাখহরও অর্মন লম্বা লম্বা উসকোখসকো চুল, একগাল গোঁফ দাঁড়। অম-ময়লা একটা লুপা, নীলরঙের টালকুলি হামশাট। কক-পকেটে দুটি পদ্ম খা জবা ফল পোঁজা, কপালে ডগডগে সিঁদুরের ফেট। গলায় মালার বদলে কালো সুতো বাঁধা মাদলী। ওর মা এনে দিয়েছিল, পাগলামী সারস্বত স্বন্দালদা মাদলী। ওই দলে একটি মেমসারেরও ছিল। আটো প্যাট, গেরো পাঞ্জাবি, লাল ফিতে দিয়ে পিঠের দিকে সোনালী চুলের গোছা বাঁধা। গলায় আবার একছড়া গাদা ফুলের ময়লা। কি রঙ, কি স্বাস্থ্য! ফুসফুস করে সিগারেট টানছে। বৃদ্ধের বউ আর কিংবা সিঁদু অরক চোখে দেখাছিল।

কিন্তু ওদের কাছাকাছি কেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখার ভরসা পায়নি বৃদ্ধ, রাখহরিকে জেক দুটো কথা বলারও সাহস হয়নি।

রাখহরির মা-বউ দিনমানে গোবর কুড়িয়ে ঘণ্টে দিত, ঘণ্টে বেচত। কিন্তু ওভাবে আর কদিন চলে। লবণার বাপের বাড়িতে তেমন কেউ আছে বলে মনে হয় না, থাকলেও এ উল্লাটে কেউ কখনো দেখেনি তাদের। তার বোধ হয় বেড়াল পার করার মত মেয়ে বিদেয় করে দায়মন্ত হয়েছে। তারপর যা হয় আর কি! লবণলতার পেছনে লোক লাগল।

বৃদ্ধেরও সায় আছে। পেটের জন্মলা, বড় জন্মলা। পেছনের দরজার দিকে লক্ষপকে লক্ষ করে বললো ব্রজবিহারী, "এখন যা, এ বেতার মত ঘরের কাজ কর, আমি ভেবে দেখি, আর তোমার কাকীমাকে বল, দু' কাপ চা পাঠিয়ে দিতে।" তারপর এদিকে মুখ ফিরিয়ে, "আর, ভেতরের আর, মাছের খবর কি বলছিল?" গটিগটি রোয়াক পেরিয়ে মোকানবরের ভেতর এল ছোট কানু, একটা টুল টেনে তক্তাপোশের পাশে কল। চোখ রয়েছে পেছনের দরজায়। স্পষ্ট দেখতে পেল হেলদলে রান্না ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে লবণলতা। সৌন্দর্য চোখ রেখে বিড়িবিড়ি করে কালো, "এ আবার এখানে কেন, ব্রজমা?"

তক্তাপোশে পা ছড়িয়ে বসেছিল ব্রজবিহারী। দেয়ালে পিঠ রেখে দেশলাই-এর কাঠি দিয়ে দুটি খুঁটছিল। তক্তাপোশের উপর মাদুর পাড়া, কিছু ছিট কাপড়ের রঙীন টুকরো, মাপ নেবার ময়লা ফিতে, লম্বা খাতার মধ্যে সুতো-বাঁধা পেন্সিল গোঁজা। খাটের পাশে সেলাই-এর কল।

## ॥ গ্রাহক কর। হইতেছে ॥

কথা-সাহিত্যিক রাজশেখর বসুর

সমগ্র রচনার সংকলন

## রাজশেখর গ্রন্থাবলী

(তিন খণ্ডে সমাপ্ত)

সম্পূর্ণ মূল্য : ১১০ টাকা ॥ গ্রাহক মূল্য : ৭০ টাকা

## পরশুরাম গ্রন্থাবলী

(তিন খণ্ডে সমাপ্ত)

সম্পূর্ণ মূল্য : ১০৫ টাকা ॥ গ্রাহক মূল্য : ৭০ টাকা

প্রতিটি গ্রন্থাবলীর জন্য পৃথক ভাবে ১০ টাকা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে। বাকী টাকা তিনটি করে মোট ৬টি কিস্তিতে বই নেবার সময় ২০ টাকা করে দিতে হবে। ডাকে বই নিয়ে প্রতিটি বইয়ের জন্য ৪ টাকা করে বেশী দিতে হবে।

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

১৪, বক্সিম চাইল্ডে স্ট্রীট কলি-৭৩ ফোন-৩৪-২৭৮২

কানে শুনে স্থির করুন আপনার কোনটি চাই!

**এইচ এম ভি  
স্টিরিও পপুলার II**



নামেই যে স্টিরিওকে চেনা যায়।

এই পপুলার II-এর গম্বুজের ভিতরে রয়েছে ক্যাভিনেট, নয়নাভিরাম রূপালী ট্রিমযুক্ত হালকা রঙের ঢাকনা এবং একেবারে হালফুল নব কন্ট্রোল আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। দুটি স্পীকার দিচ্ছে ও ওয়াট স্টিরিও পাওয়ার। টেপ-আউট ডিন সকেট সহ। ব্যালেন্স টোন ও ভলুমের জন্য পৃথক পৃথক কন্ট্রোল।

\*দাম ১১২৫ টাকা

\*উৎপাদন কর সহ অনুমোদিত খুচরা মূল্য। কর অন্তর্ভুক্ত।

এইচ এম ভি ইলেকট্রনিক্স-এব ৭৫০,০০০ গ্রাহকের সমৃদ্ধিই আপনার গ্যারান্টি।

**এইচ এম ভি  
স্টিরিও 1010-IC**



আই সি স্টিরিওর সপক্ষে এই স্টিরিও মডেলটি আলোড়ন তুলেছে। এতে প্রাচ্য নিখুঁত সমতাসূক্ত স্পীকার ও আমপ্লিফায়ার। ১২ ওয়াট স্টিরিও পাওয়ার। ব্যালেন্স, ট্রেবল, বেস ভলুম এবং টেপ-ইন/আউট-এর সুবিধা ছাড়াও বিশেষ ধরনের অটো-স্টপ ব্যবস্থা। আসল টিকিউড ক্যাবিনেট।

\*দাম ১৫৩০ টাকা

EMI

HMV

আমরা জানি কি করে সঙ্গীতের শাণ্ডি সজীব করে তুলতে হয়

**এইচ এম ভি স্টিরিও সিস্টেমস**

এইচ. এম. ভি হলি-ডে প্রতিযোগিতায় যোগ দিন। হংকং, সিঙ্গাপুর, ব্যাংককে উত্তেজনাময় সফর।  
পীমিত। বিবরণাদির জন্য এইচ. এম. ভি. ডীলারের সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

ACIL/HMV-29/80 BEN

9

# আগাথা ক্রিষ্টির

আখি তারায় রক্ত ১৬

মৃত্যুর চোখ হিম ১৮

নিহত ভ্রমর ১৮

একটি আশ্চর্য প্রিলজী

## ক্রাইম অ্যান্ড প্যাসন আই

চিরঞ্জীব সেন-এর একটি নতুন ধরনের থ্রিলার

নাইটহুক ১০

ইজরেলের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে চলেছে, সারা ইজরেল ভেঙে লাক্ষণ কর্তৃত্বপরতা আর উত্তেজনা, কি হয়, কি হয়, তামাম আতঙ্ক দুনিয়া এবার মুখি হুঁটি তিপে ধরবে, সিন বেত আর সি আই এ দুজনেই সক্রিয় কিন্তু দুকে বসে কে কলকাটি নাড়ছে? নাইটহুক? কোনো বিদেশী রাষ্ট্র নাকি সেই নয়নভোলানো সুন্দরী?

## বিদেশী ভৌতিক অমনিবাস ২০

সম্পাদনা ও ভাষান্তর—পৃথীরাজ সেন

এতে আছে—শার্লক হোমসের প্রচণ্ড স্যার আর্থার কনান ডয়েলের একমাত্র ভৌতিক উপন্যাস, বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী হরর ফিল্ম 'দি ওয়েন' অবলম্বনে ডেভিড সেলজারের ভয়াল কাহিনী, শিহরিত রহস্যের জনপ্রিয় লেখক ফ্রিজ লিবারের আদিম প্রতিনিধিসার উপন্যাস ও ভৌতিক সাহিত্যের বরণীয় লেখক এডগার অ্যালান পোর চারটি মন রহস্যের নিখাদ কাহিনী। অবিকৃত অনুবাদে মূল কাহিনীর রস আবাদ করা যাবে।

## জেমস হেডলী চেড

এ কফিন ফ্রম হংকং ১৮

সোনালী মাছেরা নিরুদ্দেশ ১০

সঞ্জিনী স্মেরিনী ১৮

প্রাতিষ্ঠান সাহিত্য মন্দির ৥ ৫৭-সি, কলেজ স্ট্রীট, কলি-৭৩

জ্যোতি প্রকাশন \* ২২ নবীন কুণ্ডলেন \* কলি-৯

শুনক, আমি মিছে কথা বলছি নাকি, কাশী-রাস্তা সেনের মত অত বড় কাঁবরাজ সারা যশোর জেলার ছিল না, বড়ো হয়ে বেচেছে, বেশ তামাকাগির কেশেপাকারী আর দেখে যেতে হয়নি।

মাছ মারার যুগ ছিলেন হারান সমান্যার। শেষ পর্যন্ত মারাও গেলেন ওই মাছ মারার সর্বশেষ নেলায়। যোর বহার দিনে একা-একা মাছ ধরতে গিরেছিলেন সীংগারী বলে।

হারান কাকার পিসী-ঝাড় ছিল সিল্পিয়ার। সেদিন সকাল থেকে তুমুল বাত।

মেঘে মেঘে অন্ধকার আকাশ, ঝোড়ো হাওয়ার সপো ককে বলে থাকিবে বাকি।

কাছে-পাঠে জন্মানব নেই। বিলের ধারে পাটেকতের পাশে সাপে কাটল।

ওই অবস্থায় বেড় মাইল মঠের বেশতা জেতে যখন পিসীর বাড়ি পৌঁছলেন, তখন প্রায় শেষ। ফেলাটে চোখ, মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠে, সমস্ত শরীর কপিছিল। কাপতে কাপতে দাওয়ার শুরে পড়ে সুখ বলাতে পেরেছিলেন, "কালে কেটেছে।"

মাছ মারার মশলা পাকবার সময় হারান কাকার কথা মনে পড়ে, শান্তির কথা মনে পড়ে, দৌলতপুরের কথা মনে পড়ে। দৌলতপুরের পাশে নদীর নাম উজব। উজব নদী নয়, নদ। সেই নদের ধারে শান্তির শব্দেবুঝি নলতা-বাসদেবপুর।

পাউন্ট, পিপড়ের ডিম, ফ্রাঙ্ক চা নিয়ে এল ছোট কানাই। তখন গাইঘাটার দিকে যাবার রাস্তার মোড়ে বিশাল কটাঘাটার পেছনে সুখ উঠেছে। এদিকে ব্রজবিহারীর মশলা তৈরি শেষ। তাড়া দিল কানাই, "মাদা, বড়ো দেরি হয়ে গেল।"

"কোথায় দেরি, সাড়ে ছটা কাকে, মশলাখানা যা হয়েছে না, যদি মাছ থাকে, মিনিট পনেরোর মধ্যে চারে কিলবিল করবে।"

"যদি মাছ থাকে মানে, তুমি চলেই না, নিজের চোখে দেখবে, আমার কাছে পাক খবর আছে, চার-পাঁচ কোঁজ ওজনের কম করে পানরো-বোলাটা রুই, তা ছাড়া ভাল সাইজের কয়েকটা কাউল। আর মগেল।"

"কি-বাস-কতা? যদি আগে-ভাগে মাছ ধরিয়ে থাকেন, তুই জানাছিস কি করে?"

"তা" করেননি, তা হলে গাত পেতে চাকিলাটি টাকা নিতেন না, গেল পট ওহরে ওই পুকুরে মাছ ধরেন। কেউ, সরকার মশাইর মুখে শুনছি, বড়ো-কতার নাকি ইচ্ছে ছিল, বড় নাতনীির বিয়ের সময় জাল টানবেন, কিন্তু কতার ইচ্ছেমত সে কিয় হয়নি।"

"কেন কি হয়েছে?" ব্রজবিহারীর জিজ্ঞাসার জবাবে বললো, "কলকাতার কলজে পড়া মেয়ে, আমি দেখেছি কয়েকবার, চেহারায় বেশ চট আছে।" বা-চোখ টিপল ছোট কান, "গেল বোশেখ মাসে নাকি প্রাইভেট মাস্টারের সপো পালায় গিয়ে রেজেন্টারী করছে।" প্রথমে জিত কাটল, তারপর ডান হাত নাকে ঠেকিয়ে খেকশিয়ালের কাশির মত খাঁকখাঁক করে হাসল কানাই পাল।

আবার বললো, "এ সব খবর বার করার জন্য সরকারমশাইকে তামাক খেতে দুটি টাকা দিতে হয়েছে, ও বাড়ির সবাই টাকা চেনে, মাছ ধরতে দেবার জন্য শিবসিংগি যে পান-দোস্তার পরমা চেয়ে বসেন, এ আমার চোদ পুরষের জাগি।" আবার খেকশিয়ালের কাশি। সব গাছিয়ে নিয়ে আঘাটার মধ্যে রক্তন হল দুজনে।

॥ তিন ॥

কালিডাসের রাজার এলাকা থেকে মাইলখানেক দূরে বিশ্বাসদের পুরনো দুই মহলের দোতলা বাড়ি। এককালে এই অঞ্চলের জমিদার ছিলেন বিশ্বাসরা। এখন তেমন কিছু নেই কটে, তবে চণ্ডীমন্ডপ আছে, দেলমণ্ড আছে, ক'ন নাটমন্দির আছে, ঠাকুরদালান আছে, কিছ, খান-কিছ আছে, রাজার কপোতা দোকানখরো জাড়া আছে। গোমস্তা নীলাম্বর সরকার আদায়-উল ল'কে টিমটিম করে পঞ্জোপবনের নিয়মরকা হয়, টিপে টিপে সংসার চলে।

দুই ছেলে চাকরি করে কলকাতায়। তারা কিছ, কিছু পঠায়। তাদেরও সংসার বাড়ছে। ছেলেমেয়েরা কলকাতার স্কুল-কলেজে পড়ে। সেখানে খরচ কম নয়। এখনে এত বড় বাড়িতে থাকে বড়োবড়ী আর এক ডান্টী। বাইরের দিক ঠেকখানা ঘরে থাকেন সরকারমশাই। পশের একটা কুঠিরিতে থাকে নিতাই পাইক। সর্বঘণ্টে কট্টালি কলা এই নিতাইচরণ। গরুর বিচালি কাটা থেকে শব্দ করে ধান তোলা, ধান বাড়, হাটবাজার ইস্তক সব কাজ এক হাতে করে। আবার লাঠি কাঁধে সরকারমশাইর পেছন পেছন যায় খান কাটার সময়। মাসকাবরে বাজারে গিয়ে দোকানখরের ভাড়ার তাগাদা দেয়।

বড়ো বিশ্বাস-কতার কাল পাচার হলও বেশ শক্ত-সমর্থ। পর, কালের চশমা সামলে বাত নেই কটে, তবে এখনো লাঠি ঠেকক করে ঘরে বেড়ান। পাকুর, কানান, পুরনো বাড়ির তদারক করেন। মোটামোটা খলখলে দেহ, কিবাস-গিমার দোতলায় উঠতে হাঁপ ধরে, ছাদে উঠতে কষ্ট হয়, কিন্তু এখনো দাঁটি বেলা দু'এক পদ রান্না করেন। ভালের বাড়ি, আমসবু, আমের আচার, কুলুর আচার দেন। ডান্টী অবশ্য হাতে হাতে সব গাছিয়ে দেয়। সেই আচার, আমসবু, ভালের বাড়ি মাটির তিলেলে করে সরকার মশাইর হাতে কলকাতার বাসার কিংবা শয়নগরে মেয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন।

কিবাসদের কড় পুকুরটা আসলে বাড়ির পেছন দিকে, আম-আলুনেক মধ্যে। জমির সামনের দিকে চন্দ্রিয়ার বাটারে দাপালে দশটি মাঝারী আকারের পুকুর





**বিষয়কর টেনিদার অবিস্মরণীয় টি.বজি**

নবাবের পুত্র সাদার মনোমতী সাদারের চাকরটি  
টেনিদার টেনিদার... (text continues with story details)

কিন্তু সাদার কি কেউ জানে চাকরটির আত্মপ্রকাশ করে  
করে... (text continues with story details)

প্রথম দুঃখ নিঃশ্বাসিত। সাম দল টাকা মাত্র  
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

**টেনিদার  
অভিযান**



লেখকের আরও দুটি কিশোর উপন্যাস

**চার মূর্তি**  
**বাউবাংলোর রহস্য**

চা মূ



প্রকাশন বিভাগ  
৮/১১ শ্যামাচরণ দে ফ্রন্ট

**ছোটদের  
আরোও নতুন বই**

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

**হাতিচোর** ৬

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

**ঘনাদার**

**জুড়ি নেই** ৫

**মঙ্গলগ্রহে**

**ঘনাদা** ৫

বিভূতিভূষণ বন্দ্যো

**কিশোর ভূপু**

**অপূর**

**ছেলেবেলা** ৬

**ছোটদের**

**অপরাজিত** ৬

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

**ছোটদের**

**কাজল** ৬

যোগোপ্তনাথ সরকার

**বনে জঙ্গলে**

অমলাশঙ্কর রায়ের

**হট্টমালার**

**দেশে** ৫

অবন ঠাকুরের

**তেপান্তর** ১৩

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

**ছোটদের**

**কাশীনাথ** ৬

সমরজিৎ করের

**ভয়ঙ্কর সেই**

**অভিযান** ১০

যোগোপ্তনাথ গুপ্তের

**বাঙলার**

**ডাকাত**

১-৪১ প্রতিখণ্ড ৬

**মহিম**

**ডাকাত** ১০

ইন্ডরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের

**কথামালা** ৬

কেটেছে। ছোটরা পুকুরের জলে হুড়ে দিল রক্তবিহারী। তারপর কচলা হাতের  
মত আকস্মিক উপায় এগিয়ে হুটে গেল। লবণাক্ত মাটিতে চিত করে ফেলে  
পেটের উপর চেপে বসেছে দলুদ। দস্ত। ডান হাতে মাথ চেপে শীতল ওর  
ডান-হাতটা মচড়ে ধরেছে। গায়ে কাপড় নেই, কোমরের কাঁধ আলগা। পা দাঁটি  
চাপাচ্ছে লবণ, একেবারেই পাখরের মর্টিভর ৩৬ ডারী দল। দস্তকে ফেলে দেবার  
চেষ্টা করছে। প্রথমেই নরকেল-৩৬। কলের ওজনে বাঁধের কাছে এক রস  
মাল, হাড়ি খেয়ে লবণের বকের উপর পড়ার আগেই বাঁ পৃষ্ঠের এক লাখি।  
ছটকে মাটিতে পড়তে না পড়তেই লবণ চুলের মেছা ধরে মেনে তুলে টান-টান  
গুপে-গুপে তিনটি চড়। তারপর চুলের মর্টি ধরে টানতে টানতে কোমর এগাশে  
পুকুরের ধারে নিয়ে এল রক্তবিহারী। আবার দাঁটি চড়। দুই কানে 'খিখি'  
লাগল, মাথার মধ্যে যোমা ফাটার শব্দ দই চেখে তারাবাজির ফুলকি দেখল  
দলানচাঁদ। ফাঁদা চোখে চারপাশে তাকাল। বিশ: নেই। অস্তা নেই। পরাবার  
রাশতা হুড়ে দাঁড়িয়ে আসে কানাই পাল। এক হাতে সাইকেলের চেন, আরেকহাতে  
আলুনা ইট। চুলের মর্টি ছেড়ে কোমর একটা ধাক্কা দিল রক্তবিহারী। কোন কলম  
টাল সামলে দিশেহারার মত পুকুরের জলে লাফিয়ে পড়ল দল। দস্ত। কেনাকাটিন  
সাঁতার কেটে পশ্চিম কিনারায় উঠে কোমর জলে দাঁড়িয়ে এদিকে আঙুল তুলে  
শাল, 'খতাকে দেখে নেব বজ্ঞাত বড়ো, আমার নাম দল, দস্ত, তোকে  
আলিভাপমা খেতে তাড়াবা।' 'কানাই! খেতো কাটাকে, বাটা-কমাশা।' কানাই  
বলতে তাড়া দেবার ভাঁপে রক্তবিহারী কয়েক পা এগিয়ে যেতেই হাক-পাক  
করে পাড়ে উঠে জলদা মাথা জামা-প্যান্টে, খালি পায়ের বাল কাড়ের ভেতর দিয়ে  
হুটে পালল দলান দস্ত। এক পাটি সায়েল এগিয়ে, আরেকপাটি জলে ডায়েছে।  
ওর পালাবার ভাঁপা দেখে হেসে ফেলল ছোট কানাই। রক্তবিহারী হাসল না।  
হাঁপাচ্ছিল সে। এই মহাভেদ মনে হল, সেই বরস নেই, সে শক্তি নেই। নরতো  
এই লম্বা খাকর পর বেখানে অজ্ঞান হয়ে বাবার কথা, সেখানে দলু, মনতান  
সাঁতার কেটে পাললো কি করে। পেছনে ফৌপানিক শব্দ শব্দে ফিরে তাকাল।  
শাড়ি-গম্বা সামলে ফৌপাতে ফৌপাতে শাপলার গোছা তুলে নিচ্ছিল লবণ।  
"আবার শাপলা তোলা হচ্ছে!" দল দিল রক্তবিহারী, পাল, পাল শিগগির  
এখান থেকে। তাড়াতাড়া গোছা করাট বকের কাছে জঁকড়ে ধরে খিড়িকির ফরসা  
দিয়ে কিসবাবাড়ির ভেতরে ঢুকে দলজাটি বধ করে দিল লবণপলতা। আফলা  
ইটখানা, সাইকেলের চেনটা পুকুরের জলে হুড়ে দিল ছোট কান, তারপর এগিয়ে  
এসে রক্তবিহারীর পায়ের দলো নিয়ে একপাল হেসে কলো, "দলো, তুমি  
অরুণাদেব; খালি হাতে তিনটে জোয়ান ছেলেকে আয়েল করে দিলে, ডাবা যায়  
না, তুমি যে এককালে কুশিত লড়তে, আজ প্রমাণ পেলাম, বড়ো হুড়ে ভেলকি  
দেখালে কটে।"

"হাঃ হাঃ, ইয়াকি! মরিস না, তোরা সবাই সমান।" এক দল খাৎ, ফেল  
কলো রক্তবিহারী, "আমি বাড়ি যাচ্ছি, আমার ছিপ তিনটে বাড়ি দিয়ে  
আসিস।"

"সে কি! মাছ ধরবে না?"

"কিছু, ভাল লাগছে না, মনে হচ্ছে সারা গায়ে কোঁড়া জ্বালেনয়ারগলোর গম্ব  
লেগে রয়েছে, গা ঘিন্‌ঘিন করছে, বাড়ি ফিরে ভাল করে চান করবো, তুই বসে  
বসে ধর না, চারে অনেক মাছ আসছে, আমি চললাম।" বসে গেল বটে, কিন্তু  
এখানে বসে একা এবর মাছ ধরতে ডরলা পেপ না ছোট কান। কি জানি, 'বাঁদ  
দল, দস্ত আবার দলবল নিয়ে ফিরে আসে। মেরে তজ্জা কানিয়ে বেবে। এই  
বাগানের ভিতর খুন করে রেখে সেলেও কেউ দেখতে আসবে না। কিসবাবাড়ির  
রেককরের আচরণও অশুভ! এত বড় একটা কাড় বটে গেল, অথচ জামলা  
খলে উকি দিয়ে দেখল না কেউ। এমন কি, লবণের মধ্যে শোনার পরেও দেখতে  
এল না। লবণা নিশ্চয়ই বলেছে, আশ্চর্য ব্যাপার! এমন গেললো জামলার  
একা-একা বসে মাছবসা কোন হতেই নির্যাস নয়। মাছ তো হলই! মাছখান  
থেকে মাচা বাঁধার বাঁধের দাম সমেত গোটা পত্তাশেব টাকা গচ্চা গেল। আশ্চর্য  
টাকা অবশ্য রক্তদার দেবার কথা। তা হলেও পশ্চিমে টাকা চোট খেতে হল। গা  
চড়কা করে। এই কাজেরে পশ্চিমে গরুা দেয় না কেউ। হাত সব বাজে ব্যাপার!  
একটা ছেলান ছাড়ির জন্য এই কিশি। আপন মনে গা গজ করতে ফলো  
খিঁচটিপ সব গুঁছিয়ে নিয়ে সরে পড়ল কানই পাল। কিসবাবাড়ির সাত ঘিয়ার  
বাগানটা আবার চুপচাপ হয়ে গেল। আবারো মেছা আকাশ। এক একবার হঠাৎ  
হাতেরায় লকনে বাল পাতা, একটা-দুটো লাল বাদাম পাতা উড়ে উড়ে পড়ছিল  
পুকুরের জলে। কোথাও জনমান ফের সাড়া নেই। শব্দ বাঁধবাননের ভেতর থেকে  
কোম একটা 'খু-খু' ডাকছিল, আর বাঁধের মাচা পাঁটির আশেপাশে কয়েকটি বড়  
জাতের মাছ চারের গম্ব আশ্বর্য হয়ে ঘুরঘুর করছিল।

৥ জা ৥

মহা রাতের ঘরের দরজার কাঠের খুঁটি তৈস দিয়ে বসেছিল রক্তবিহারী। হাঃ  
আসছে না। কপালের ডান পাশে ওষুধে ভেজা তুলার উপর গণে চিহ্নের মত  
লিউকোসান্ট লানিয়ে। কালীতলার পাশে বিশাল হাতার তুলা শিরায় গরুটার  
মথার কল-পপুড়ার চাঁদ। চান ঘোরা জল রঙের খোলাটে জোয়ান। মলতা-  
বাসদেবপরের আকাশও এগনি চাঁদ, এই আবেশ। হলল শব্দে ভেতর ঘরে  
চলেছে। আট বছর আগে ওই জলজ্বাতে ভেসে যাবার সময় কেউ কি চোঁচিয়েছিল,  
"খাঃ শেঃ, বাঁসে।"

হাবি : মনন সরকার

# জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ও বঙ্কিম

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

“বঙ্কিমবাবুর অসাধারণ নাক। এই নাকে, সুদৃঢ়ি, অভিনিবেশ, মানব-চরিত-জ্ঞান ও অসাধারণ উদ্যম প্রকাশ পায়। তাহার এজলাসি কাজ সত্ত্বেও, উপহৃদ-পরি এত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ যে তিনি লিখিতে পারিয়াছেন সে কেবল তাঁর নাকের জোরে।”

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মনুষ্যগণের মধ্যে সার্বভৌমিক বঙ্কিমের আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠতা বহুদূর বিস্তারিত ও বিস্তারিত ইতিহাস যেমন কোত-হোলোদীপিক ভেদনই চিত্তাকর্ষক। আমরা কিছু পরিমাণে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গী রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের ইতিহাস জানি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও ঠাকুরবাড়ির অনেকের সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ প্রতিষ্ঠা অনুভূত। প্রাচ্য ভাষাবাসী ও মৈত্রী ছিল। যখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমের আলাপ হয়নি তখন আগেই বঙ্কিমচন্দ্র এসেছিলেন তখন নব্বয় স্বাক্ষরকানাথ ঠাকুরের গালিতে। সুখ গালি পথত লয়, উঠেছিলেন ঠাকুরবাড়ির তেতলার ছাদেও। হৃদয় দেবদেবনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা পড়তেন। স্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বহুদূর ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বঙ্কিমকে সামনে বসিয়ে এত-ই ছিলেন বঙ্কিমের অসামান্য পোষক। রবীন্দ্রনাথের নতুন বউঠান কামন্দরী দেবী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের একান্ত অনুগামী পাঠিকা, জ্ঞানদানীন্দ্রনাথ তাঁর পরিচয় বঙ্কিমকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছিলেন—বাংলা সাময়িকপত্রে তিনিই প্রথম ছাপিয়েছিলেন বঙ্কিমের প্রতিষ্ঠা, সুখীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের উপর লিখেছিলেন একাধিক আটকিলে লিখেছিলেন বঙ্গদেবনাথও, স্বর্ণকুমারী প্রাইই যেতেন বঙ্কিম-চন্দ্রের বাড়ি, স্ত্রী দেবী বঙ্কিমচন্দ্রের অর্থ ভর ছিলেন স্বিজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ থেকে সরলা দেবী পর্যন্ত সকলের সঙ্গেই বঙ্কিমের চিঠিপত্র চলত বঙ্কিম সরলা দেবীকে নিজের এক সেট বউ উপহার দিয়েছিলেন আর সরলা দেবীরা দিয়েছিলেন বঙ্কিমের প্রিয় এক প্রেতি দামী মার্জিলিং চা—সঙ্গে সুগন্ধি একগাছ গোলাপ। বঙ্কিমের বৌদীন অকস্মাৎ মৃত্যুবাদ এল বিশেষতঃ স্বর্ণকুমারী বৌদীন মনে হয়েছিল—তাঁর নিজের জীবনেরই একাংশ যেন খসে গেল।

ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের যোগ বঙ্গদর্শন পত্রিকার সূত্রেই। জোড়াসাঁকোর বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন নিয়মিত আসত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন “বঙ্গদর্শন এলে পাড়ায় দুপুরবেলার কাছাকাছি থাকত না। আমার সুবিধে ছিল, কাড়াকড়ি করবার দরকার হত না—কেননা আমার একটা গুণ ছিল—আমি ভুলে পড়ে শোনাতে পারতুম। আপন মনে পড়ার চেয়ে আমার পড়া শুনতে বউঠাকুর ভাষাবাসতেন। তখন বিজলি-পাখা ছিল না পড়তে পড়তে বউঠাকুরের হাতপাখার হাওয়ায় একটা ভাগ আমি আদায় করে নিতুম।” বউঠানের সাম্নে এবং তাঁর হাতপাখার মল্লর বাতাস গারে লাগিয়ে কেনন করে তাঁর মাসিক বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমের বিবন্ধ চন্দ্রশঙ্কর প্রভৃতি ধারাবাহিক উপন্যাস “মাসেব পর মাস কামনা করিয়া অপেক্ষা করিয়া অল্পকালের পড়কে সুদীর্ঘকালের অবকাশের স্বারা মনের মধ্যে অনুরাগিত করিয়া ভূপ্তির মধ্যে অতীত ভাগের সঙ্গে কোত-হলকে অনেক দিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া” পড়তেন—তাঁর বিবরণ রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে পাই।

অথচ এই বঙ্গদর্শনে ঠিক সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের জ্যোতির্দশা—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম নাট্যগ্রন্থ ক্রিষ্ণ জলযোগ কিংবা দ্বিতীয় নাট্যগ্রন্থ পুত্রবিক্রম নাটক কিভাবে সমালোচিত হয়েছিল

বঙ্কিম ভালো বলেছিলেন না মন্দ বলেছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে সেই সমালোচনা কিরকম প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করেছিল, কবি-বউঠান কামন্দরী দেবী তাঁর স্বামীর প্রথম বা দ্বিতীয় পুত্রত্বের সমালোচনা দেখে কতখানি পুনর্জন্মিত বা উজ্জ্বলিত হয়েছিলেন—ইতিহাস কোনো সংবাদ রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে আমরা পাই না।

মনে রাখা প্রয়োজন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থ ক্রিষ্ণ জলযোগ (২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭২) বা দ্বিতীয় গ্রন্থ পুত্রবিক্রম নাটক (১ জানুয়ারি ১৮৭৪) যখন প্রকাশিত হয় তখন স্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্ন-প্রয়াণ (১৮ অক্টোবর ১৮৭৬) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গদর্শনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গ্রন্থের বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত সমালোচনা ঠাকুর পরিবারের সাহিত্যের ইতিহাসে খুব একটা পুত্রবিক্রম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অথচ রবীন্দ্রনাথের মনে এই রকম একটি ঘটনা সোঁদন বিশেষ কোনো লাগ কটোন দেখতে পাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দুটি বই-ই সোঁদন নাট্যকারের নাম ছাড়াই ছাপা হয়েছিল। তাই বঙ্গদর্শনের সমালোচনাতেও দেখি গ্রন্থের নামের সঙ্গে গ্রন্থকারের নামটি নেই। সমালোচনাতে নাট্যকারের নামোল্লেখ না থাকলেও ক্রিষ্ণ জলযোগ বা পুত্রবিক্রম নাটক যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা—তা নিশ্চয় কামন্দরী দেবী বা রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাত ছিল না।

বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষেই (১২৭৯ চৈত্র ১৮৭৩ খ্রী) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম পুত্রত্বের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় (১২৮০ শ্রাবণ ১৮৭৩ খ্রী) প্রকাশিত হয় স্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের প্রথম সর্গ। পরে সমগ্র কাব্যটি পুত্রত্বকারের প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সালের ১৮ অক্টোবর।

স্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর সমালোচনার (পুত্রত্ব প্রসঙ্গ) বঙ্গদর্শনে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য প্রকাশের উল্লেখ করেন। স্বিজেন্দ্রনাথের উক্তি, “আমি যখন প্রথম স্বপ্নপ্রয়াণ ঘটনা করিতে আরম্ভ করি, তাহার কোনও কোনও স্থানে বঙ্কিমবাবুকে পাঠাইয়াছিলাম, তাহার বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করিবার জন্য। তখনকার স্বপ্নপ্রয়াণ আর এখনকার স্বপ্নপ্রয়াণ অনেক ভিন্ন। প্রায় পুত্রত্বের কতকগুলো কাহিনীক ছবিই সমাধা হইল। বঙ্কিমবাবু বোধ হয় সেগুলো ছাপান নাই। এক আশা ছাপাইয়াছিলেন; কি না আমার স্মরণ নাই। কিন্তু তাহার বিবন্ধের মধ্যে ঠিক সেই বঙ্গদর্শন ছবিই অবতারণা করিয়া বসিলেন। তখনকের মধ্যে পড়াইল এই যে, হায়া স্বপ্নে অশোভন হয় না, তাহা বাস্তব জগতে, গৃহস্থচিত্রে, বিশেষতঃ হিন্দু, গৃহস্থচিত্রে অজ্ঞাত অশোভন হইয়া দাড়াইল। স্বিজেন্দ্রনাথের মনের মধ্যে সেই রকম ছবি থাকিতে পারে। কিন্তু বাড়ার মধ্যে বঙ্গদর্শন গাড়ি গাড়িই হইলেন, এ তিহা এক-অন্যেই সুসোজদ হইল না। কিন্তু এই রকম চিত্র সমাধার আইডিয়াটা যে তিনি আমার ঘটনা হইতে পাইতেছিলেন, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।” সাহিত্য সাধক চরিত্রাণা গ্রন্থে স্বিজেন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনকার বিনা মন্তব্যে স্বপ্নপ্রয়াণ প্রসঙ্গে স্বিজেন্দ্রনাথের এই উক্তি পুরাতন প্রসঙ্গ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, ফলে বাংলা সাহিত্যের পটভূমিতে স্বিজেন্দ্রনাথের কথন-সারে এই দৃষ্ট এই ধারণাটি গঠিত করে এসেছেন যে বিবন্ধকে সিন্ধু প্রদীপে শীর্ষক দুয়াল্লিঙ্গ সংখ্যক পত্রিকাটি স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের আইডিয়া অবলম্বন করিয়া লিখেছেন না বলেছেন। তাই মনে হয় যে বঙ্কিমের ওই পরিচ্ছেদের ছবি বঙ্কিম স্বপ্নপ্রয়াণ থেকে হরণ করেছেন। কথাটার সত্যতা যাচাই করা দরকার।

স্বিজেন্দ্রনাথের কথা অনুসরণে রাখলে এর মনে নিলাম যে বিবন্ধ ও স্বপ্নপ্রয়াণের মধ্যে চিত্রার্থতার কিছু মিল আছে। নয় হলে বিবন্ধ একজনকে ব্যাধি আর একজন প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু কার স্বাভাবিক প্রভাবিত হয়েছিলেন? স্বিজেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক বঙ্কিম না স্বিজেন্দ্রনাথ? দেখা যাক—সাময়িকপত্রের রচনা কবে প্রকাশিত হয়েছে।

পূর্বে বলেছি স্বপ্নপ্রয়াণ প্রকাশিত হয় ১২৮০ শ্রাবণে। অপর দিকে দেখি বঙ্গদর্শনে



বঙ্কিমচন্দ্র একাধিকবার ৬ নং স্নানকল্যাণ ঠাকুরের গলিতে এসেছিলেন। সুখ গালি পথত লয়—উঠেছিলেন ঠাকুরবাড়ির তেতলার ছাদেও

**গৃহলক্ষ্মীগণ!**  
আপনাদের 'পরিষ্কার করার সব সমস্যার এই একটাই সমাধান



## টীপল বহুবিধ উপযোগী লিকুইড ডিটারজেন্ট

**টীপল**—কণ্ডের সেরাজাতের সামগ্রী বা সারা  
জগতের ঘরে ঘরে গৃহিণীরা ব্যবহার করেন  
টীপল অগাধবায়ু 'শেল'-এর ফরমুলেশনে বানানো  
এক উৎকৃষ্ট ডিটারজেন্ট যা ভারতের  
ঘরে ঘরে গৃহিণীদের ব্যবহারের  
জন্য হাকির করছেন 'নৈসর্গিক'  
(মেকটাল-শেল কোম্পানী)।

**টীপল**—স্নোংরা ময়লা চটপট সাফ করে  
টীপল হল এক লিকুইড অর্থাৎ তরল ডিটারজেন্ট,  
যা জলেতে নিমেষে গুলে যায়।  
সুতরাং এটি জলেতে মিশিয়েই  
আপনি পরিষ্কারের কাজে চটপট  
লেগে যেতে পারেন।

টীপল দিয়ে ক্রীজের ভেলচিটে  
ময়লা দাগ সঙ্গে সঙ্গে সাফ  
টীপল ডিটারজেন্টের  
কোয়ালো কার্শাভি থাকার  
দুইন গ্রীজের ভেলাচিটে ময়লা  
দাগ চটপট পরিষ্কার হয়ে যায়।  
এটি আপনার অর্থে মেহনতে ডবল পরিষ্কার করে



**টীপল**—আপনার পরসার বাঁচায়

টীপল হল ঘনীভূত তরল পদার্থ। সুতরাং, সামান্য  
একটু টীপল দিয়েই আপনি অনেক বেশী জিনিস  
চমৎকার পরিষ্কার করতে পারেন।

**টীপল**—বহুবিধ জিনিস পরিষ্কারে পারদর্শী  
এই একটাই লিকুইড ডিটারজেন্ট দিয়ে আপনি অনেক  
বিভিন্ন ধরনের জিনিস পরিষ্কার করতে পারেন।  
এটি দিয়ে আপনি টাইল, শিশি-বোতল, জার, জানলা,  
আমনা, কাঠের কাঠ, কাপেট, আসবাবপত্র ও গৃহসজ্জা  
ডিশ, চুরি-কাটা-চামচ, আকেন, স্যানিটারী-ওয়ার এবং  
ঘরের মেঝে, সবই স্বচ্ছক পরিষ্কার করতে পারেন।

বিক্রী-বাবদ্বারঃ  
জাতীয় অর্গানিক কেমিক্যাল  
ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিমিটেড  
মকটলাল সেন্টার, নবীমাম পয়েন্ট বম্বে ৪০০-০২১।



বহুবিধ জিনিস চমৎকার পরিষ্কারের উপায় একটুখানি টীপল।



জ্যোতির্ভঙ্গনাথ বস্কমকে সামনে বসিয়ে একঁকেছিলেন এই জ্ঞানমানা পোড়োটা।

বিববন্ধের প্রকাশ হয় ১২৭১ বৈশাখ (১৮৭২ খ্রী) আর শেষ হয় ওই বছর ফাল্গুনে (১৮৭৩ খ্রী)। অর্থাৎ বঙ্গদর্শনে স্বপ্নপ্রয়াণ প্রকাশের পর মাস আশেই বিববন্ধ উপন্যাস সমাপ্ত হয়। আর বিববন্ধের চর্যাংশ পরিচ্ছেদটি (স্মৃতিমত প্রদীপে বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত হয় ১২৭১ মাঘ—১৮৭৩ খ্রী) সংখ্যায়। অর্থাৎ স্বপ্নপ্রয়াণ প্রকাশের ছয় মাস পূর্বে। স্মৃতিমত প্রদীপে পরিচ্ছেদটি মাঘ মাসে মুদ্রিত হয়েছিল—এর অর্থ, বস্কম এই অংশটি লিখে ফেলেছিলেন অন্তত কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে, কিংবা ধরা যাক পৌষ মাসেই। তা হলেও দাঁড়ায়—স্বপ্নপ্রয়াণ প্রকাশের দীর্ঘ সাত মাস পূর্বে। এই অবস্থায় কখনই কেউ স্বীকার করতে পারেন না যে স্বপ্নপ্রয়াণের পুরা বিববন্ধ প্রভাবিত হয়েছিল।

স্বিজেন্দ্রনাথের উক্তি সমর্থন করে কেউ হয় তো বলতে পারেন—বঙ্গদর্শনে স্বপ্নপ্রয়াণ যবই ছাপা হোক না কেন কবি তার কবিতা সম্পাদকের কাছে পাঠিয়েছিলেন তার অনেক পূর্বে, বঙ্গদর্শনে স্মৃতিমত প্রদীপে পরিচ্ছেদটি প্রকাশেরও পূর্বে। অর্থাৎ স্বপ্নপ্রয়াণ মুদ্রিত হবার সাত-আট মাস পূর্বে। স্বিজেন্দ্র-পক্ষবলস্রীরা বলতে পারেন—বস্কম স্বিজেন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি থেকেই চিত্রগুলি সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন। এই কথাই উত্তরে বস্কম পক্ষের সমর্থক বলবেন—বস্কম যদি কোনো পাণ্ডুলিপি থেকে কিছু “অপহরণ” করেই থাকেন তবে তিনি নিজ কখনো তার নিজের পত্রিকার পাতায় সেই পাণ্ডুলিপি পুনরায় ছাপতে পারেন না। নিজের অপরাধের সূত্রে নিজে থেকে কি কেউ কখনো চোখের সামনে দেখিয়ে দেন? বিববন্ধ কথা ধরে নেওয়া গেল যে স্বিজেন্দ্রনাথ ১২৭১ মাঘের আগেই পাণ্ডুলিপি বস্কমকে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, স্বিজেন্দ্রনাথ যখন দেখলেন বঙ্গদর্শনের মাঘ সংখ্যায় বস্কম বিববন্ধের মাধ্যমে তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণের কাগজপত্র চিত্রগুলির মত “ছবি”র অবতারণা করিয়া বসিলেন? তখন স্বিজেন্দ্রনাথ বস্কমের সেই অমাজনীয় অপরাধ নীরবে মেনে নিলেন কেমন করে? তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকাতেও তো একটা প্রতিবাদ-পত্র প্রকাশিত হতে পারত। কিন্তু তেমন কোনো প্রতিবাদ সৌগন্ধের কোনো কাগজে প্রকাশিত হয়নি। সব চেয়ে বড় কথা হল—বস্কম যদি স্বপ্নপ্রয়াণের চিত্র-সমাবেশের আইডিয়াটা বিববন্ধে মনে সত্যিই গািলিয়ে থাকেন, তা হলে এই ঘটনার পরেও স্বিজেন্দ্রনাথ কি করে তার স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য বঙ্গদর্শনে পত্রিকার ছাপার অন্-

যতি ছিলেন? কিন্তু দেখা থাকে, স্বিজেন্দ্রনাথ তার স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য বঙ্গদর্শনে থেকে তুলে নেননি। ১২৮০ শ্রাবণের বঙ্গদর্শনে স্বপ্নপ্রয়াণ ছাপা হল।

স্বিজেন্দ্রনাথ যে বলেছেন, “এই রকম চিত্র-সমাবেশের আইডিয়াটা যে তিনি আমার রচনা হইতে পাইতেছিলেন সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।”—একথা কোনো দিক থেকেই প্রমাণ করা যায় না। বরং ইতিহাস ও তথ্য-প্রমাণ একথাই বলবে যে উভয় রচনার মধ্যে সত্যিই যদি কোনো ভাবগত মিল থাকে থাকে তবে স্বিজেন্দ্রনাথই চিত্রসমাবেশের আইডিয়াটা বস্কমের কাছে থেকে পেয়েছিলেন। কারণ বিববন্ধের অনেক পরে স্বপ্নপ্রয়াণ প্রকাশিত হয়।

বঙ্গদর্শনের যে সংখ্যায় স্বপ্নপ্রয়াণ ছাপা হয় তার ঠিক এক বছর পর, ১২৮১ ভাদ্র (১৮৭৪ খ্রী) সংখ্যায় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হল জ্যোতির্ভঙ্গনাথের দ্বিতীয় গ্রন্থ পৃথিবীময় নাটকের সমালোচনা। কতিপয় জলযোগের মত এটিও যে বস্কমচন্দ্র-কৃত সমালোচনা—তা জ্যোতির্ভঙ্গনাথের নিজের উক্তি থেকেই জানা যায়।

কতিপয় জলযোগের সমালোচনার বস্কম গ্রন্থকারকে বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। পৃথিবীময় নাটকের সমালোচনায় বস্কম নাট্যকার সম্পর্কে বলেছেন, “এইরূপ কৃত্যবিধা এবং মাজিডরুটি মহাসুযোগ নাটক প্রণয়নের ভার গ্রহণ করেন, ইহা নিতান্ত বাহনীয়। তাহা হইলে নিতান্ত পক্ষে বাঙালী নাটকের বর্তমান অশ্লীলতা এবং কদর্যতা ধ্বংস হবে না।”

রবীন্দ্রনাথ বস্কমকে প্রথম দেখেন ১২৮২ বঙ্গাব্দে—১৮৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের এমারেল্ড বাগারের দ্বিতীয় কলেজ রিইউনিয়ন নামক মিলনে সভায়। তখন বঙ্গদর্শনের চতুর্থ বছর শেষ সংখ্যা, সব বেরিয়েছে। শেষ হয়েছে রজনী, শব্দ হয়েছে নতুন উপন্যাস কুকাকাতের উইল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “সেই সন্মিলন সভার ভিড়ের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে নানা লোকের মধ্যে ইতঃ এমন একজনকে দেখিলাম যিনি সকলের হইতে স্বতন্ত্র—কিহাৎক অন্য পাঁচ জনের সঙ্গের দিশাইয়া ফেলিবার জো নাই। সেই গৌরবান্বিত দীর্ঘাকার পুরুষের মূখের মধ্যে এমন একটি দৃষ্ট তেজ দেখিলাম যে তাহার পরিচয় জানিবার কৌতুহল সর্বত্র করিতে পারিলাম না। সেদিনকার শুভ লোকের মধ্যে, কেবলমাত্র, তিনি কে ইহাই জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলাম। যখন শুনিলাম তিনিই বস্কমমহাশয়, তখন ঝড়ো বিস্ময়ের জ্বলিল। লেখা পড়িয়া এতদিন যাহাকে মহৎ

বলিয়া জানিতাম চেহারাতেও তাহার বিশিষ্টতার যে এমন একটি নিশ্চিত পরিচয় আছে সেখান সৈদ্য আমার মনে খুব লাগিয়াছিল। বস্কমবাবুর খজানাসায়, তাহার চাপা চোটে, তাহার ভাঁজ, দৃষ্টিতে ভারি একটা প্রবলতার লক্ষণ ছিল। বস্কমের উপর দুই হাত বন্ধ করিয়া তিনি যেন সকলের নিকট হইতে পৃথক হইয়া চলিতেছিলেন, কামারও সঙ্গ যেন তাঁর কিছুমাত্র গা-বেঁধাঘেঁষি ছিল না, এইটাই সর্বাপেক্ষা বেশি করিয়া আমার চোখে চোঁকিয়াছিল। তাহার যে কেবলমাত্র বুদ্ধিমানী মননশীল লেখকের ভাব তাহা নহে, তাহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল।”

এই ১২৮২র শেষে চৈত্র সংখ্যায় (১৮৭৬ মার্চ) পর বঙ্গদর্শনের প্রকাশ অবস্ফাৎ বন্ধ হয়ে গেলে।

বঙ্গদর্শনের জন্ম এবং মৃত্যুই ঠাকুরবাড়ির ভারতী পত্রিকার আবির্ভাবের মুখ্য কারণ। ১২৮০-তে (১৮৭৬ খ্রী) বঙ্গদর্শন বেরলো না। সেই সময় ঠাকুরবাড়ির সাহিত্যিকরা বঙ্গদেশের জন্য একটি সাহিত্য পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করলেন। প্রকাশিত হল নতুন কাগজ ভারতী। প্রথম সংখ্যা বেরলো ১২৮৪ শ্রাবণ (১৮৭৭ খ্রী) মাসে। জ্যোতির্ভঙ্গনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে এই মাসিক পত্রিকাটির প্রবর্তন হল। সম্পাদক হলেন স্বপ্নপ্রয়াণের কবি স্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বিজেন্দ্রনাথ তার স্বাক্ষর দিয়ে লিখেছেন, “জ্যোতির কৌক হইল, একখানা নতুন-পত্র বাহির করিতে হইবে। আমার কিন্তু ততটা ইচ্ছা ছিল না। আমার ইচ্ছা ছিল, তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকাকে ভাল করিয়া জাকিইয়া তোলা যাক। কিন্তু জ্যোতির চেতন্য ভারতী প্রকাশিত হইল। বস্কমের বঙ্গদর্শনের মত একখানা কাগজ করিতে হইবে, এই ছিল জ্যোতির ইচ্ছা। আমাকে সম্পাদক হইতে বলিল। আমি আপত্তি করিলাম না। আমি কিন্তু এ নামটুকু ঝিরাই রাখাল। কাগজের সমস্ত ভার জ্যোতির উপর পড়িল।”

বস্কম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে জ্যোতির্ভঙ্গনাথের বইয়ের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল; এবার ঠাকুরবাড়ির পত্রিকায় বস্কমচন্দ্রের বইয়ের সমালোচনা প্রকাশিত হল। ভারতীতে বস্কমের কবিতাপুস্তক নামক গ্রন্থের অতি দীর্ঘ সমালোচনা বেরলো ১২৮৫ ভাদ্র (১৮৭৮ খ্রী) সংখ্যায়। রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই খবরটি সমালোচনাটি রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে মনে করেছেন (রবীন্দ্রনাথের বালা রচনা : কালানুক্রমিক সূচী) রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা প্রথম খণ্ড)। কিন্তু সত্যিই



“তৎকালের ছবির উপর পাল খাটাইয়া কেঁজ বাঁধিয়া বাৎসরিক প্রতিভার অভিনয় হইল। আমি সাজিয়াছিলাম বাৎসরিক! ...বস্কমের মধ্যে বস্কমচন্দ্র ছিলেন।”—রবীন্দ্রনাথ।

বাংলা সাহিত্যের কয়েকখানি

শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ কাহিনী

০০০০০০০০০০০০০০

ভারতীয় ভ্রমণ সাহিত্যের

প্রধান পথিকৃৎ পরিব্রাজক

প্রবোধকুমার সাথাল

সর্বাধুনিক ভ্রমণকথা

পর্যটকের পত্র

১৫

০০০০০০০০০০০০০০

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

কেরানার উপকূলে

কাম্বোজী বাহার ৬

সুনীল চৌধুরী

হিমালয়ের গহনে নির্জনে

পাহাড় পাহাড় খেলা ১০

সুন্দর দুর্গমের পথে ৬

বাসুদেব বসু

রহস্য নিজেই যখন দিশেহারা

নেফা সুন্দরী নেফা ৭

০০০০০০০০০০০০০০

শঙ্কু মহারাজ

গঙ্গা-যমুনার দেশে

(যমুনোত্তর, গঙ্গোত্রী ও গোমুখী) ১২

পুণ্যার্থ প্রভাস ১০

লীলাভূমি-লাহল ১০

হিমতীর্থ হিমাচল ১০

রাজভূমি-রাজস্থান

১৫.০০

দে'জ পাবলিশিং/দে বুক স্টোর

১৩ বক্সিং চ্যাটাজি স্ট্রীট,

কলিকাতা-৩৩ ফোন : ৩৪-৫০৩৫

এটি রবীন্দ্রনাথের লেখা কি না—তা জোর করে আমরা বলতে পারি না। কারণ, আমাদের হাতে, এটি রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে প্রমাণ করার মত কোনো প্রত্যক্ষ তথ্য নেই। আমাদের স্বপ্নে, এটি রবীন্দ্রনাথের লেখা হতেও পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু এটি যে রবীন্দ্রনাথেরই লেখা—এমন কথা নিশ্চয় করে বলার মত কোনো অবকাশ নেই।

ভারতীয় পত্রিকার সমালোচনার উপসংহার জংশনটি উদ্ঘাটন করি—

“উপসংহারকালে আমরা একটি মাত্র কথা বলি—বিশ্ববাস্য উপন্যাস লিখিয়া বড়দের প্রতিদ্বন্দ্বান হইয়াছেন, এই নিশ্চয় কবিতাধারীর প্রভাবে তাঁহার সে যশ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না। আমরা বিলক্ষণ জানি যে ভাল একজন উপন্যাস লেখক ভাল কবি হইতে পারেন না। স্যার ওয়ালটর স্কটের কবিতাগুলি পর্যন্ত প্রধান প্রধান সমালোচকের মতে হুমুসিগ্রাথিত উপন্যাসমাত্র। কিন্তু তাহা না হইলেও সকল বাস্তবতা স্যার ওয়ালটর স্কটের প্রতিভা সম্ভাবিত নহে। কবি ও উপন্যাস লেখক জিম উপন্যাসে নির্মিত, তাহাদের অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি ভিন্নভাবে বিকশিত হয়, একজন কেবল ঘটনাগুলি এমন করিয়া সাজাইতে চাহেন যে তাহাতে উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে—অপরজন ঘটনার প্রতি ঈশ্বরোদ্যম দৃষ্টি রাখিয়া কেবল ভাবের বিকাশের দিকেই লক্ষ্য স্থির রাখেন। স্কটের লেডি অফ দি লেকের সহিত বাইরনের জুয়ালের তুলনা করিয়া দেখিলে আমাদের কথার সার্থকতা সপ্রমাণ হইবে।”

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বিষ্ণুকের প্রথম আবির্ভাবের সংবাদ পাই “বিশ্বজনসমাগম” সভা উপলক্ষে। বছরে একবার দেশের সমস্ত সাহিত্যিককে একত্র করবার অভিপ্রায়ে ঠাকুরবাড়িতে বিশ্বজন-সমাগম নামে এক সভা স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সম্মেলন উপলক্ষে গান-বাঁজনা আকৃতি ও আহারাদি হইত।

এই সম্মেলনের দ্বিতীয়বারের সভায় বিষ্ণু-চন্দ্র উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্মেলনের প্রথম বৎসরের আয়বলে হয় ১২৮১ বৎসর (১৮৭৪ খ্রী:)। সেবারের সভায় বিষ্ণুচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন না। দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন আহুত হয় ১৬ ফাল্গুন শনিবার ১২৮৭ (১৮৮১ খ্রী:)। এই সভায় রবীন্দ্রনাথের বার্ষিক-প্রতিভা অভিনীত হয়। বার্ষিক-প্রতিভা বই প্রকাশিত হয় ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১ (২ মাঘ ১২৮৭)। রবীন্দ্রনাথ নিজে বার্ষিকের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই সভার বিবরণ হাণ্ডা হয় ১৭ ফাল্গুন ১২৮৭-র (২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১) সাধারণী পরে। পত্রিকা লিখেছে—

“কল্যাণ শনিবার সন্ধ্যার পর কলিকাতার জোড়াসাঁকো গ্রীষ্ম শ্রবণে বিশ্বজননাথ ঠাকুরের ভবনে ‘বিশ্বজনসমাগম’ হইয়াছিল। ডাক্তার কুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু, প্যারীমোহন মিত্র, বাবু, বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, বাবু, শীতলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মিস্টার বি এল গুপ্ত, মিস্টার টি এন পালিত, আচার্য শ্রীকৃষ্ণমোহন গোস্বামী, রাজা শ্রীশৈলীশ্রীমোহন ঠাকুর, ডাক্তার কানাইলাল দে, পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ নায়র, বাবু, কৃষ্ণবাহিনী সেন প্রভৃতি কতর আহুত ভ্রমলোক উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুরবাড়ির ছোট ছোট গটিকত বালক বালিকা সঙ্গীত-শব্দের সুরের সঙ্গে বেশ সুন্দরে গান করিয়াছিলেন। ডাক্তার পর বার্ষিক প্রতিভা নামে একখানি অভিনব গীতিকাব্য অভিনীত হয়। বার্ষিক সর্বস্বতী-কুসুম দর্শন-ভাগ করিয়া কিরূপে অমর কবি লাভ করেন তাহা প্রদর্শন করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। গ্রীষ্ম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং বার্ষিক হন আর ‘প্রতিভা’ নাম্নী প্রতিভাসম্পন্ন তাহার স্বাধীনবর্ষা ঠাকুরকন্যা বাগদেবী রূপে অভিনয় করেন।”

রবীন্দ্রনাথ এই অভিনয় প্রসঙ্গে লিখেছেন,



মহাশি শিবোত্তরনাথ শ্রবণেন্দ্রনাথকে বসেছিলেন—প্রচারে বিশ্বনাথ লিখছেন তার একটা প্রতিবাদ হওয়া উচিত।

বার্ষিক প্রতিভার অভিনয় হইল। আমি সত্যজা-ভিলামে বার্ষিক। আমার ভ্রাতৃস্পৃহা প্রতিভা সর্বস্বতী সাজিয়াছিল। বার্ষিক প্রতিভার নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয়াছে। দর্শকের মধ্যে বিষ্ণুচন্দ্র ছিলেন—অভিনয়মুগ্ধ হইতে আমি তাহাকে চক্ষে দেখিতে পাইলাম না কিন্তু শ্রুতিতে পাইলাম তিনি খুঁসি হইয়া গিয়াছিলেন।”

বিশ্বজনসমাগম অনুষ্ঠানের পরেই রবীন্দ্রনাথ কোনো সময়ে (১৮৮১ ফেব্রুয়ারি-সেপ্টেম্বর, ১২৮৭ মাঘ—১২৮৮ ভাদ্র) ‘সাহস’ সপ্তয় করে বিষ্ণুচন্দ্রের বাসায় তাঁর সঙ্গে আলাপ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু নরীন্দ্র রবির সঙ্গে প্রবীণ চন্দ্রের প্রথমবারের সেই আলাপ তেমন জর্মান বলে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন। কবি লিখছেন, “তাহার পরে অনেকবার তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে কিন্তু উপলক্ষ ঘটে নাই। অবশেষে একবার যখন হাওড়ার তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন সেখানে তাহার বাসায় সাহস করিয়া দেখা করিতে গিয়াছিল। দেখা হইল, যথাসাধ্য আলাপ করিবারও ক্ষেত্র করিলাম, কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় মনের মধ্যে যেন একটা লক্ষ্মী লইয়া ফিরিলাম। অর্থাৎ, আমি যে নিতান্তই অবাচীন, সেইটে অনুভব করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন করিয়া বিনা পত্রেরে বিনা আহ্বানে তাহার কাছে আসিয়া ভালো করি নাই।”

বিষ্ণুকের গুরুগোষ্ঠীর চাল দেখে তখন বরষক রবীন্দ্রনাথ হয়তো প্রথম আলাপে তেমন সহজ হতে পারেননি। কিন্তু বিষ্ণু “রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা উপলক্ষ করেছিলেন তা জানা যায়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত ‘বার্ষিকের জয়’ গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বিষ্ণুচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বার্ষিক প্রতিভার উল্লেখ করেন বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ১২৮৮ আশ্বিনে (১৮৮১ অক্টোবর)। বিষ্ণু লিখেছেন, “যাহারা বাবু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বার্ষিক প্রতিভা পড়িয়াছেন বা তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাহারা কবিতার জন্মভূমিতে কখনো ভুলিতে পারিবেন না।”

পরের বছর (১৮৮২ খ্রী:) রবীন্দ্রনাথ পনেরার বিষ্ণুকের বাসায় হাওড়ায় পুর করেন। তখন বিষ্ণু ভবানীচরণ দত্ত স্ট্রীটের বাসিন্দা। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, “বার্ষিকবাসীর কাছে যাইতাম বটে কিন্তু বেশি কিছু কথাবার্তা হইত না। আমার তখন শ্রীবাণীর বয়স, কথা বলিবার বয়স নহে। ইচ্ছা করিত, আলাপ জমিয়া উঠুক, কিন্তু সেক্ষেত্রে কথা সরিত না।” রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সত্যজা-সাহস-চরিত্রালাপ গ্রন্থে লিখেছেন,



কালিকাতার বালি হস্তশিল্পের পর, কালিকাতার নবীন পর্বত  
শিল্পের মালা কালিকাতার বটবাজার পাড়ায় ছিল ;  
স্বদেশ প্রায় প্রত্যহই সাহিত্যিক ইন্টেক বিসিত :...  
স্বদেশপ্রিয় ঠাকুর এবং কথো কথো রবীন্দ্রনাথ এই  
দুজনের বিচ্ছেদ নিকট স্বাভাবিক করতেন।... ১৮৮২  
বৌদ্ধাব্দে ২০-এ জানুয়ারি...সম্মান রবীন্দ্রনাথ  
আগিয়া ভাইদের জ্যেষ্ঠসিকার বাড়িতে বিকমকে  
দেখা যান। সেই দিন ১৯ই মার্চ [১২৮৮] ছিল।”  
“স্বদেশ কন্যা সরলা দেবী তাঁর জীবনের করা-  
পাতা বইতে লিখেছেন, “একবার একটা ১৯ই মার্চের  
রাত্রে বাড়ির ছেলেরা-পারনামগুলি আমার গান  
দুইতে গাইতে হঠাৎ অনুভব করলাম আমার  
শিশুরা একটা নাড়াচাড়া সাদৃশ্য পড়ে গেছে। কে  
রসেছেন? পিছন ফিরে-ভিড়ের ভিতর হঠাৎ একটি  
ছোরা চোখে পড়ল—দীর্ঘ নাসা, তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল  
চাঁদ, মুখের একটা সহসা জ্যোতির্ময়তা, জানলাম  
তিনি বিকম। যে বিকম এতদিন তাঁর বইতে  
মনোমুগ্ধতা আমাকে পেয়ে বসেছিলেন আর  
পেন্সনে তাকে প্রকৃতির তুলিতে হাড়মাংসে রঞ্জনা  
হুত্বিত।”

জ্যোতির্বিদ্যনাথ ঠাকুরের উপোগে সারস্বত  
রম্যাক নামে একটি পরিব্রাজ্য স্থাপিত হল। “বাংলার  
পরিভ্রাজ্য বারিমা দেওয়া ও সাধারণতঃ সব প্রকার  
উপারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিমান এই  
সভার উপেক্ষা ছিল।” এই সভার প্রথম অধিবেশন  
হয় স্বাক্ষরকাল ঠাকুরের গাল ৬ নম্বর ভবনে  
রাবির ২. শ্রাবণ ১২৮৯ (১৭ জুলাই ১৮৮২)।  
এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন  
রাজেন্দ্রলাল মিত্র। অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের  
সম্মতিভবে প্রথম বর্ষের জন্য সভাপতি, সহযোগী  
সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন। সভাপতি হন  
রাজেন্দ্রলাল মিত্র। সহযোগী সভাপতি তিনজন—  
বিকমচন্দ্র, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও বিজ্ঞেন্দ্রনাথ  
ঠাকুর। সম্পাদক মনোনীত হন কৃষ্ণবাহরী সেন ও  
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই অধিবেশনে স্থির হয় “বাঁহারা  
বপলাহিতা স্বাভাবিক করিবার এবং বাঁহারা  
বাংলাভাষার উন্নতিসাধনে বিশেষ অনুগ্রহণী, তাহারাই  
এই সমাজের সভা হইতে পরিব্রাজ্য।” সভ্যদের  
বার্ষিক চাঁদ ৫ টাকা বছরের গোড়ায় দিতে হবে।  
রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন—এই সভা  
একটুখানি অক্ষুরিত হয়েই শূন্য হইল।

অতঃপর বিকমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের  
সাক্ষাৎ হয় রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যার বিবাহসভায়।  
এই রমেশ দত্তকেই বিকম একদিন বাংলা ভাষায়  
সাহিত্যসৃষ্টি করতে উৎসাহিত করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সম্মানসংগীত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত  
হয় ৫ জুলাই ১৮৮২ (২২ অশ্বিন ১২৮৯)। রমেশ  
দত্তের মেয়ের বিবাহ হয় ১২৮৯ শ্রাবণ (১৮৮২  
খ্রীঃ)। এই নিমন্ত্রণসভায় ছিল রবীন্দ্রনাথের পক্ষে  
একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। এই দিনটি ছিল  
রবীন্দ্রনাথের জীবনে সাহিত্যচর্চার প্রথম গৌরবের  
দিন। এই নিমন্ত্রণসভার বিকমচন্দ্র নিজস্বত্ব থেকে  
পুষ্পমালা পরিবেশ দিয়েছিলেন সম্মানসংগীতের কবির  
গলায়।

“রমেশ দত্ত মহাশয়ের গোষ্ঠী কন্যার বিবাহ-  
সভার স্মারকের কাছে বিকমবাবু দড়িহীন ছিলেন ;  
রমেশবাবু বিকমবাবুর গলায় মালা পরাইতে উদাত্ত  
হইয়াছেন এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত  
হইলাম। বিকমবাবু তড়াতাড়ি সে-মালা আমার  
গলায় দিয়া বলিলেন, “এ-মালা ইহারই প্রাপ্য।  
রমেশ, তুমি সম্মানসংগীত পড়িয়াছ? তিনি বলিলেন,  
না।” তখন বিকমবাবু সম্মানসংগীতের কোনো কবিতা  
সম্মুখে যে-মত বাস্তব করিলেন তাহাতে আমি  
পূরস্কৃত হইলাম।”

লক্ষ করবার বিষয় সম্মানসংগীত এক মাস  
কালও প্রকাশিত হয়নি, এর মধ্যেই ওই কবি-খানি  
বিকমচন্দ্রের পড়া হয়ে গিয়েছে। হয়তো রবীন্দ্রনাথ  
তাঁর নতুন কাব্যগ্রন্থের একখানি কপি বিকমচন্দ্রের  
সঙ্গে উপস্থিত দিরাইছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস বৌদ্ধাব্দে  
হাট ভারতী পত্রিকার বার্ষিক্যিক হুত্বিত হয় ১২৮৮  
বার্ষিক্য থেকে ১২৮৯ আশ্বিন পর্বন্ত। হাট ভাষা  
হয় ১১ জানুয়ারি ১৮৮৩ (২৮ শ্রাবণ ১২৮৯)।  
বৌদ্ধাব্দে হাট উপন্যাসটি পড়ে বিকমচন্দ্র  
নিজের থেকে একটি প্রশংসাপত্র পাঠিয়েছিলেন  
লেখককে। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, “এই গল্প  
বোঝার পরে বিকমের কাছ থেকে একটি অব্যক্তি  
প্রশংসাপত্র পেরেছিলুম, সেটি ইংরেজ ভাষায় লেখা।  
সে পত্রটি হারিয়েছে কোনো কথুর অব্য করলেন।  
বিকম এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, বইটি যদিও  
কচিবয়সের প্রথম লেখা তবু এর মধ্যে কমতার  
প্রভাব দেখা দিয়েছে—এই বইকে তিনি নিশ্চয়  
করেননি। ছেলেরা-মের ভিতর থেকে আনন্দ পাবার  
এমন কিছু দেখেছিলেন যাতে অপরিচিত বালককে  
হঠাৎ একটা চিঠি লিখতে তাকে প্রবৃত্ত করলে।  
দূরের যে পরিণতি অজানা ছিল সেইটি তাঁর কাছে  
কিছু আশার আশ্বাস এনেছিল। তাঁর কাছ থেকে  
এই উপহাসবাণী আমার পক্ষে ছিল বহু-মূল্য।”

রবীন্দ্রনাথ এখানে নিজেকে বিকমের  
“অপরিচিত” বলে উল্লেখ করেছেন। এ কথা ঠিক  
নয়। উপন্যাস সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ হয়তো  
“অপরিচিত” ছিলেন সেদিন, কিন্তু বিকমের তিনি  
পূর্ণপরিচিত ছিলেন বৌদ্ধাব্দে হাট প্রকাশের  
পূর্ববর্তী।

শ্রীশ মজুমদার বিকমপ্রসঙ্গে লিখেছেন,  
“রবীন্দ্রবাবুর কথা উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম  
—তাঁর উপন্যাস কি আপনি পড়িয়াছেন? উত্তর—  
‘পড়েছি।’ স্থানে স্থানে অতি সুন্দর স্থানের উল্লেখের  
লেখা আছে কিন্তু উপন্যাসের হিসাবে সেটা নিশ্চয়  
করেন। রবিকে সে-কথা আমি বলেছি। উদীয়মান  
লেখকদের মধ্যে হরপ্রসাদ, তুমি ও রবির মধ্যে আমার  
বোধ হয় রবি বেশ গিফটেড কিন্তু পুঙ্কোসিস,  
এখনি তার বয়স ২২-২৩, সে-কথা সেদিন রবিকে  
বলেছি।”

১২৯১ শ্রাবণে (১৮৮৪ খ্রীঃ) বিকমের নতুন  
মাসিকপত্র প্রচার প্রকাশিত হল। প্রচারের প্রথম  
সংখ্যার বিকমের করকটি রচনা প্রকাশিত হয়। তার  
মধ্যে ছিল ‘হিম্মত’ শীর্ষক প্রবন্ধ। ওই প্রবন্ধে  
নবজীবন পত্রিকার ‘বিকম’ লিখেছিলেন ‘ধর্ম-  
জিজ্ঞাসা’।

বিকমের ধর্মজিজ্ঞাসা পাঠ করে উদ্ভাবনীয়  
পত্রিকায় ১২৯১ ভাদ্র সংখ্যায় বিজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুর



জীবন সাক্ষাৎকালে পঠিত রবীন্দ্রনাথের ‘বিকম-  
জিজ্ঞাসা’ রচনা সম্পাদক বিজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে  
পত্রিকার ছাপতে চাননি?

বিকমের সমালোচনা করে লিখলেন ‘নব্য হিন্দু,  
সম্প্রদায়’।

বিজ্ঞেন্দ্রনাথ পরে ‘পুণ্ড্রান প্রসঙ্গে’ বলেছেন  
—তিনি বিকমের লেখা সমালোচনা করার বিকম  
কম্ব হইয়াছিলেন ও পরে প্রচারে বিকম প্রত্যাহার  
দিয়াছিলেন। “পত্রিকার সমালোচনা বাহির হইবার  
পর তিনি প্রচারে এমনভাবে লিখিলেন যেন  
সমালোচনা আমার লেখা নহে—কর্তা স্বয়ং লিখিয়া  
লিখাছেন। কিন্তু বাবা তখন অজান্তে পড়িত।  
তাঁহার লেখা তখন আমি চোঁড়ার ছিলাম বটে,  
কিন্তু তিনি মোতালার খ্যাতিমত ছিলেন। তিনি  
আমাকে এইটুকু হার বলিয়াছিলেন—দেখ, বিকম  
যে রকম করে কলিকাতার [ধর্মজিজ্ঞাসা হইবে] আলোচনা  
করবে, তার একটা প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যিক। তাই  
আমি প্রতিবাদ করিয়া পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম। সে  
সমালোচনার কতটা কোনও হাত ছিল না; আগ-  
গোড়া আমার নিজের।”

বিজ্ঞেন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা  
যাচ্ছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বিকমচন্দ্রের প্রবন্ধাধি-  
গতীয় মনোবোধ্য সহকারে পাঠ করতেন এবং কোন-  
লেখার প্রতিবাদ হওয়া উচিত-অসম্ভবতার মধ্যেও  
তিনি পত্রের সে-বিকম নির্দেশ দিতেন এবং  
পত্রেরাও সে-নির্দেশ সর্বদা পালন করে গিয়েছেন।  
বস্তুত পক্ষে বিকম বিজ্ঞেন্দ্রনাথের সমালোচনার  
কোনো প্রতিবাদ করেননি সে-সময়। বিজ্ঞেন্দ্রনাথের  
রচনাকে সমালোচনা বলেই বিকম গ্রহণ করেছিলেন,  
আক্রমণ বলে নয়। পরে রবীন্দ্রনাথ যখন ১২৯১  
অগ্রহায়ণের ভারতীতে ‘একটি পুণ্ড্রান কথা’ নাম  
রির পুণ্ড্রান কথাকে আবার টেনে এনে বিকমকে  
নতুন করে ‘আক্রমণ’ করেন, তখনই বিকমচন্দ্র তাঁর  
প্রতিবাদ প্রবন্ধ লেখেন ‘আদি রাজসমাজ ও নব্য  
হিন্দু সম্প্রদায়’ শিরোনামে, প্রচারে ১২৯১  
অগ্রহায়ণে (১৮৮৪ খ্রীঃ)।

এই প্রবন্ধে বিকম রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের উত্তরে  
নিজের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বলেন, “রবীন্দ্রবাবুর  
সুপ্তা এতদূর বিচারে আমার প্রবৃত্তি নাই। আমার  
বাক্য মনে থাকিত—সে, আমি রবীন্দ্রবাবুর প্রতিবাদ  
করিতোঁছি, তাহা হইলে এতটুকুও বলিতাম না।  
এই রবির শিষ্টেন যে ঘায়া আছে, আমি তাহারই  
প্রতিবাদ করিতোঁছি—বলিয়া এত কথা বলিলাম।”

বিজ্ঞেন্দ্রনাথ উদ্ভাবনীয়ত লেখেন, “নব্য-  
জীবনের প্রথম সংখ্যার একপ্রকার নতুন হিন্দুধর্মের  
প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে—এবং তাহা প্রস্ফুট



জ্যোতির্বিদ্যনাথের পর পর দুখানি নাট্যগ্রন্থের ‘বিকম-  
চন্দ্র-কৃত সমালোচনা বঙ্গবন্ধু’ প্রকাশিত হয়।

## সদ্য প্রকাশিত

বুদ্ধদেব গুহ

জলছবি,  
অনুমতির  
জন্মে ১৭

প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী  
অনেক রক্ত  
অনেক নাম ১১

বিক্রমাদিত্য

কমরেড  
স্পাই ১৪

তারা প্রণব ব্রহ্মচারী

কে তুমি ২১

নটরাজন

বাঁশরিয়া ১০

শঙ্কু মহারাজ

কুন্তুমেলায় ১২

দে'জ পাবলিশিং C/o দে বুক স্টোর

১০ বঙ্গিম চ্যাট জি স্ট্রিট, কলিকতা-৭০০০৭১

আকারে ব্যাখ্যাত হইতেছে। গ্রীষ্মক বীক্ষমচন্দ্র চর্যাপাধ্যায় তাহার লেখক—সুতরাং তাহা উপেক্ষণীয় নহে—আবার তাহা ধর্মের মর্ম আঘাত করিতে উদাত—সুতরাং আমাদের নীরব থাকি অকর্তব্য। গ্রীষ্মক বীক্ষমবাবু আমাদের দেশের একজন প্রধান লেখক এবং তিনি স্বয়ং আমাদের গ্রন্থের পাত্র; তবে যে, আমরা তাহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছি—সে কেবল কর্তব্যের অনুরোধে।”

প্রচার পত্রিকায় বীক্ষম শ্বিজেন্দ্রনাথের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখলেন, “তত্ত্ববোধিনীতে নবা হিন্দু সম্প্রদায় শিরোনামে একটি প্রবন্ধে আমার লিখিত ধর্মবীক্ষমবাবু সমালোচিত হয়। সমালোচনা আশ্চর্য্য নহে। এই লেখক বিজ্ঞ, গম্ভীর এবং ভাব্যক। আমার বাহ্য বলিবার আছে, তাহা সব শুনিয়া, যদি প্রথম সংখ্যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া তিনি সমালোচনার প্রবৃত্ত হইতেন, তবে তাহার কোনো দোষই দিতে পারিতাম না। তিনি যদি অকারণে আমার উপর নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি দোষ আরোপিত না করিতেন তবে আজ তাহার প্রবন্ধ এই গণনার ভিতর ধরিতে পারিতাম না। তিনি যে দয়ার সহিত সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আমার ধন্যবাদের পাত্র। বোধ হয় বলার দোষ নাই যে, এই লেখক স্বয়ং তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক বাবু শ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।”

তত্ত্ববোধিনীতে যে সংখ্যায় শ্বিজেন্দ্রনাথের সমালোচনা প্রকাশিত হয় সেই সংখ্যায় বীক্ষমকে ‘বিতর্ককার’ করে ‘নূতন ধর্মমত’ নামে আরও একটা সমালোচনা মুদ্রিত হয়। বীক্ষম জানিয়েছেন, এই প্রবন্ধের লেখক দেবেন্দ্রনাথের অন্তঃস্বামী সহস্র রাজসমাজের বসু। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের রচনা ভারতীয় পত্রিকায় বারোশ একানন্দই অগ্রহায়ণে প্রকাশিত হয়। বীক্ষমের প্রবন্ধ প্রকাশের (বারোশ একানন্দই) প্রাণণ দীর্ঘ চার মাস পরে রবীন্দ্রনাথ বীক্ষমের বিরুদ্ধে কলম ধরেন পুরাতন প্রসঙ্গ টেনে ‘একটি পুরাতন কথা’ শীর্ষক প্রবন্ধে। পত্রিকায় প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে রবীন্দ্রনাথ লেখাটি আদি রাজসমাজ হলে সর্বসমক্ষে পাঠ করাইছিলেন।

কেন এই দীর্ঘ চার মাস রবীন্দ্রনাথ বীক্ষমচন্দ্রের প্রবন্ধের কোনো প্রতিবাদে আগ্রহ বোধ করেন নি? বারোশ একানন্দই আশ্বিনে (আঠারশো চর্যাপাধ্যায়) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্বিজেন্দ্রনাথকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক এবং রবীন্দ্রনাথকে আদি রাজসমাজের সম্পাদক পদে নিযুক্ত করেন। সমাজের সম্পাদক হয়েই রবীন্দ্রনাথ আদি রাজসমাজের পক্ষ সমর্থন করে বীক্ষমের বিরুদ্ধে কলম ধরেন। বীক্ষমচন্দ্রও মনে করেন—এতদিন পরে রবীন্দ্রনাথের এ প্রবন্ধ নিশ্চয় কারও প্ররোচনার রচিত।

বীক্ষম তাঁর প্রবন্ধে লিখছেন, “যে কথা সাধারণ পাঠ্য-প্রবন্ধে বলা দুর্ভাবগর্হিত, বাহ্য Personal, তাহা বলিতে বাধ্য হইলাম। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি রবীন্দ্রবাবুর নিকট বিলক্ষণ পরিচিত। শ্রদ্ধাসম্বরণ মনে করি,—এবং ভরসা করি, ভবিষ্যতেও মনে করিতে পারিব যে, আমি তাহার সুহৃৎজন মধ্যে গণ্য হই। চারি মাস হইল প্রচারের সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই চারি মাস মধ্যে রবীন্দ্রবাবু অনুগ্রহপূর্বক অনেকবার আমাকে দর্শন দিয়াছেন। সাহিত্য বিষয়ে অনেক আলাপ করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গ কখনও উত্থাপিত করেন নাই। অথচ বোধ হয়, যদি এ প্রবন্ধ পড়িয়া রবীন্দ্রবাবুর এমন বিশ্বাসই হইয়াছিল যে দেশের অবনতি, এবং ধর্মের উচ্ছেদ, এই দুইটি আমি জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছি, তবে যিনি ধর্ম প্রচারে নিযুক্ত আদি রাজসমাজের সম্পাদক, এবং স্বয়ং সত্যানুরাগ প্রচারে যত্নশীল, তিনি এমন ঘোর আপত্তির উত্থারের জন্য যে সে প্রসঙ্গ যোগ্যকর ও উত্থাপিত করিবেন না, তার পর চারি মাস বাদে সহসা পরোক্ষ বাহ্যিকতার উপর খুলিয়া দিচ্ছে, ইহা আমার অসম্ভব বোধ হয়।”



বাংলা পত্র-পত্রিকার মধ্যে আনন্দানন্দিনী দেবী তাঁর মালিক পত্রিকায় বীক্ষমের প্রতিকৃতি প্রথম মুদ্রিত করাইলেন।

ধর্মবিষয়ে তর্ক-বিতর্ক ঘাই ঘটুক না কেন, শেষ পর্যন্ত শ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতির্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ তথা সমগ্র ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে বীক্ষমচন্দ্রের সম্পর্ক খুবই ভাল ছিল। আর বীক্ষমচন্দ্রের ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রতি আন্তরিক অকৃত্রিম গভীর অনুরাগ। দীর্ঘ ছয় মাস ধরে বাদ-প্রতিবাদের যে ঝগড়া হইবে, তার সমাপ্তি ঘটলো পরমু পূর্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, “এই বিরোধের অবসানে বীক্ষমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে—যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন, বীক্ষমবাবু কেমন সম্পূর্ণ কন্মার সহিত এই বিরোধের কাটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।”

রবীন্দ্রনাথ ‘একটি পুরাতন কথা’ প্রবন্ধটি আদি রাজসমাজ হলের যে সভায় ‘পাঠ করেছিলেন সেই সভায় একটি বিবরণী পাই সব্য দেবীর লেখা থেকে। জীবনের অগাধতা বহিতে সরলা দেবী লিখছেন, “রবিমামার সঙ্গে ছেলেবেলায় একটি সভায় মাওমা আমার মনে পড়ে। জীবনে এই প্রথম সভা-গমন। কি excitement কি উদ্দীপনা আমাদের—সুতরাং বিবি সুধীদাদা বলবদাদারাও আসে। সভাটি আদি রাজসমাজ হলে আহুত। উৎসাহে সভায় বীক্ষমের একটি মতের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের তাঁর প্রতিবাদ পাঠ। বীক্ষমের যশ ও কীর্তি তখন মহাশয় গগনে সমুদিত আর রবি সম্মুখে উদ্দীপমান। লোক-দের মধ্যে একটা হলচল পড়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের নাম তখন তাঁর গানের ভিতরে পরিচরিত হইতে প্রায় নিবন্ধ। এই বহুভাষ্য যে ওজনবী গদ্যে, যে ব্যক্তি-তর্ক তঁর প্রোতাদের মন আকৃষ্ট করলেন তা ইতিপূর্বে তাঁর সম্বন্ধে অভাবনীয়। সংক্ষেপে ব্যাখ্যাটি এই—রবীন্দ্রনাথের প্রতিপাদ্য এই যে, যিথায় কোনো অবস্থাতেই কোনো সময়েই কখনই নয়। এ বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রকারক ও পণ্ডিতমণি বিধিগণি তিনি সমর্থন করেন না, বীক্ষম করেন—এই প্রভেদ। রবীন্দ্রনাথের দুই অগ্রজ শ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতির্দ্রনাথ এ বিষয়ে শাস্ত্রকারদের ও বীক্ষমের পক্ষাবলম্বী হলেন, তাঁরা বহুভাষ্য-সভায় যোগদান করলেন না। কিন্তু ছোটরা তাঁর hero-shipper হল।” সরলা দেবীর এই উক্তি থেকে মনে হয় শ্বিজেন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত বীক্ষমের সঙ্গে প্রকাশ্যে মতবিরোধে রাজি হননি। রবীন্দ্রনাথের

লেখা আদি রাক্ষসমায়ে পঠিত হল, সে লেখা তবু-  
বোধনীতে ছাপা হওয়াই তো স্বভাবিক ছিল।  
কিন্তু তা তবু বোধনীতে ছাপা না হয়ে ভারতী  
পত্রিকায় মুদ্রিত হল। তবু বোধনীর সম্পাদক কি  
এই লেখা তাঁর পত্রিকায় ছাপতে চাননি?

বারোশ একানন্দই অগ্রহারণে (অঠারশ  
চুরাশ খটী) বিরোধের অবসান ঘটি আর ওই বছর  
অর্থাৎ বারোশ একানন্দই মাঘে (অঠার শ পঁচাশি  
খটী) বঙ্গবন্ধুর প্রচার পত্রিকায় দেখা যায় রবীন্দ্র-  
নাথের নতুন কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে বঙ্গিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা যে  
কত গভীর ছিল—তা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী কর্তৃক  
সম্পাদিত বালক পত্রিকার দিকে তাকালেই বুঝতে  
পারা যায়। ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকার  
প্রথম বছর প্রথম সংখ্যার অর্থাৎ বারোশ বিবানন্দই  
বঙ্গবন্ধুর বৈশাখ (অঠার শ পঁচাশি খটী) সংখ্যার  
বঙ্গিমচন্দ্রের একটি বৃহৎ চিত্র মুদ্রিত হল। চিত্রের  
জ্যোতির্বিদ্যনাথ ঠাকুর। জ্যোতির্বিদ্যনাথ বালক  
পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে ‘মুখচেনা’ বলে যে  
ধারাবাহিক নিবন্ধের সূত্রপাত করেন, তারই প্রথম  
কিস্তিতে বঙ্গিমচন্দ্রের ছবি মুদ্রিত হয়।  
জ্যোতির্বিদ্যনাথ নিজে বঙ্গিমচন্দ্রকে কাছে বসিয়ে  
এই পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন। বঙ্গিমের জীবিকাকলের  
মধ্যে মুদ্রিত আর কোনো ছবি এখনো পর্যন্ত  
আমাদের চোখে পড়েনি। সেইজন্য বালক পত্রিকার  
মুদ্রিত জ্যোতির্বিদ্যনাথের আঁকা ওই চিত্রটির একটি  
অসাধারণ মূল্য রয়েছে স্বীকার করতে হয়। বড়  
আকারের বালক পত্রিকার এক পাতের বঙ্গিমচন্দ্র ও  
রাজনারায়ণ বসুর ছবি ছাপা হয়।

জ্যোতির্বিদ্যনাথ ‘মুখচেনা’ প্রবন্ধে বঙ্গিমচন্দ্র  
সম্পর্কে বা লিখেছেন উদ্ভূত কর—

“বঙ্গিমবাবুর উপরিভাগের কপাল উচ্চ ও  
প্রশস্ত। ইহাতে বিশ্লেষণ শক্তি সমালোচন শক্তি ও  
হাস্যরস প্রকাশ পায়। আবার ইহার নীচের দিকের  
কপাল খণ্ডে উচ্চ—ইহাতে ছোটখাট জিনিস খুব  
ইহার নজরে পড়ে। তবুজ্ঞান অপেক্ষা বিজ্ঞানের দিকে  
ইহার বেশ কৌক প্রকাশ পায়। তবুজ্ঞানের বিষয়  
লিখিতে গেলেও ইনি বিজ্ঞানের প্রণালী অবলম্বন  
করিয়া লিখিতে ইচ্ছা করিবেন। বিশ্লেষণ শক্তি,  
পর্ববন্ধন শক্তি অধিক পরিমাণে থাকায় তাহার  
উপন্যাসে মানব চরিত্রের ও বাহ্য প্রকৃতির বর্ণনায়  
একটি অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে। ....  
বঙ্গিমবাবুর অসাধারণ নাক। এই নাকে সুরচি,  
অভিনিবেশ, মানব-চরিত্র-জ্ঞান ও অসাধারণ উদ্যম  
প্রকাশ পায়। তাহার এজলাস কান সজ্জাও  
উপযুক্ত। তাহার এত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ যে তিনি লিখিতে  
পারিয়াছেন সে কেবল তাঁর নাকের জোরে.....  
বঙ্গিমবাবুর ঠোঁট খুব সরু—ইহাতে কর্মকরা  
বুদ্ধি—সূক্ষ্ম রচি ও অসাধারণ দৃঢ়তা প্রকাশ  
পায়। বঙ্গিমবাবুর চোখে বিহ্বলিত ও ভীকৃত্য  
প্রকাশ পায়।.... বঙ্গিমবাবুর চেহারায় নেপোলিয়নের  
মুখের কিছু আভাস পাওয়া যায়। নেতার লক্ষণ  
ইহার মধ্যে জাম্বুজলমান। ইহার ঋণ-নাসা, চাপা  
ঠোঁট, ডীক্ষা চোখ লইয়া ইনি যদি কাহারও উপরে  
গিয়া পড়েন তবে সে হতভাগ্য বজ্রধাতের মর্ম  
ব্যথিতে পারে। বঙ্গিমবাবুর নাকের নিম্নদেশ  
যেরূপ ঝুঁকিয়া আসিয়াছে, এবং তাহার চিবুকের  
নীচে যেরূপ ফুল দেখা বাইতছে ইহাতে তাহার  
অর্থোপাক্ষিকসঙ্গহা ও মিতব্যয়িতা প্রকাশ  
পাইতেছে।”

এই বালক পত্রিকাতেই জ্যোতি (১২৯২)  
সংখ্যায় মুদ্রিত হল বঙ্গিমচন্দ্রের বঙ্গমাতরম্  
সংগীতের স্বরলিপি। স্বরলিপিপত্রী প্রতিভাসুন্দরী  
সচিত্র বঙ্গমাতরম্ নামক বিখ্যাত গানটির সমস্তটুক  
দেওয়া গেল না, কারণ উক্ত গানের সুর অত্যন্ত  
কঠিন, সমস্তটা দিলে পাঠকের সহজে অরুণ হইবে  
না।” বালকের এই সংখ্যায় বঙ্গমাতরম্ গানের



ভারতী পত্রিকার জন্য লেখা চাইতে স্বর্ণকুমারী দেবী  
প্রায়ই বঙ্গিমের কাছে যেতেন।

ভাব অবলম্বনে পূর্ণ পৃষ্ঠার একখানি মনোরম চিত্র  
মুদ্রিত হয়। ছবির নীচে ছাপা—‘বঙ্গ মাতরম’।

এই সব নানা ঘটনা থেকে বোঝা যায় ঠাকুর-  
বাড়ির লোকজন সকলেই বঙ্গিমচন্দ্রের প্রতি গভীর-  
ভাবে প্রাণাশীল ছিলেন। যে বাড়ির ছেলেরা  
সকলেই প্রায় কবি ও গীতিকার সেই বাড়ির  
পত্রিকায় বঙ্গিমের গানের স্বরলিপি প্রথম প্রকাশিত  
হল—এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ পরে  
নিজকৃত সুরে বঙ্গমাতরম্ গানের প্রথমংশ  
বঙ্গিমচন্দ্রের কাছে গেয়ে শোনান। রবীন্দ্রনাথের  
অনুরোধে সরলা দেবী সমগ্র বঙ্গমাতরম্ গানে সুর  
দেন।

সরলা দেবী লিখেছেন, “বঙ্গিমের স্মৃতি  
প্রসঙ্গে বঙ্গমাতরম্ গান ও মন্ত্রের স্মৃতি ভেসে  
না উঠে যায় না। সে গান বঙ্গিম-ভর্তিতে ডোবা  
আমার প্রাণে প্রথম ফুটেছিল। অর ফোটাতে ছিল  
রবীন্দ্রের হাত। জীবনের প্রথম দিকে কাবা বা  
সংগীতের রসগ্রাহিতায় রবীন্দ্রের আশ্রয় বিচার  
ছিল না। যে কবির যেটি ভালো লাগতো সেটিতে  
নিজের সুর বসিয়ে গেয়ে ও গাইয়ে তার প্রচার  
করতেন। রবীন্দ্রনাথই বঙ্গমাতরম্-এর প্রথম  
সুর বসিয়েছিলেন। তাঁর দেওয়া সুরে ঐ দুটি পদে  
গানটি সবটাই চলত হল। একদিন মাতুল আমায়  
ডেকে বললেন—‘তুই বাঁকটু-কুতে সুর দিয়ে ফেল  
না।’ ওরকম ভার-মাঝে মাঝে আমার দিতেন। তাঁর  
আদেশে ‘সম্ভবকটিকণ্ট কলকলিনানাকরালে’ থেকে  
শেষ পর্যন্ত ভাবের সঙ্গে ও গোড়ার সুরের সঙ্গে  
সংগতি রেখে সুর দিয়ে ফুটিয়ে নিলুম। দুই  
একটা জাতীয় উৎসবে সমস্তের বহু-কণ্ঠে বহুজনকে  
গাইতেও শেখালুম। সেই থেকে সভ্যসমিতিতে  
সমস্তটাই গাওয়া হতে থাকলো।”

বঙ্গিমের ‘কুচাঁরিত’ প্রকাশিত হল ১৮৮৬-র  
আগস্টের গোড়ায় (১২৯০ শ্রাবণ)। বঙ্গিম তাঁর  
নতুন বইখানি শিবজেন্দ্রনাথ জ্যোতির্বিদ্যনাথ ও  
রবীন্দ্রনাথকে পাঠালেন। শিবজেন্দ্রনাথকে চিঠি  
লিখলেন—

“শ্রদ্ধাশ্রদ্ধে তিনখানি কুচাঁরিত পাঠাইলাম।  
অনুগ্রহপূর্বক আপনি একখানি গ্রহণ করিবেন।  
জ্যোতি ও রবিবাবু এখন কোথায় তাহা জানি না।  
এ কারণ তাহাদের জন্য দুইখানি পুস্তক আপনার  
নিকটেই পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগের  
কাছে পাঠাইয়া দিবেন। ভরসা করি আপনারা ভাল

আছেন। ইতি তার ১০ই অগস্ত/ত্রিবাংকমচন্দ্র  
চৌপাধ্যায়।”

১২৯১ থেকে এদিকে ভারতী পত্রিকার  
সম্পাদন তার গ্রহণ করেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী।  
পত্রিকায় তিনি ১২৯১ থেকে ১৩০০ পর্যন্ত  
পত্রিকা সম্পাদন করেন। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রায়ই  
বঙ্গিমচন্দ্রের কাছে যেতেন। ভারতীর লেখকপ্রণীর  
মধ্যে বঙ্গিমচন্দ্রের নাম বিজ্ঞাপিত হয়েছিল।  
স্বর্ণকুমারীকে বঙ্গিম লেখা দেবেন কথা দিয়ে-  
ছিলেন। কিন্তু কাজের চাপে ও নানা বাস্তবতার  
কারণে বঙ্গিম শেষ পর্যন্ত ভারতীতে কোনো  
লেখা দিতে পারেন নি। ইচ্ছে থাকে সত্ত্বেও পারেন  
নি।

দেখতে দেখতে দিন গড়িয়ে যায়। নতুন নতুন  
পত্রিকা জন্ম নিতে থাকে মধ্যে মধ্যে। সুরেশ  
সমাজপত্রের সাহিত্য বেরলো ১২৯৭ বৈশাখ  
(১৮৯০ খ্রীঃ)। এই পত্রিকার সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
১২৯৮ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় লিখলেন দুটি  
সমালোচনা প্রবন্ধ—স্বর্ণকুমারী ও কৃষ্ণদান্দিনী, আর  
কপালকুন্ডলা ও মিরাজ। সাপ্তাহিক হিতবাদী  
পত্রিকা বেরলো ১২৯৮ জ্যৈষ্ঠে (১৮৯১ খ্রীঃ)।  
পত্রিকার প্রধান সম্পাদক কৃষ্ণকল উট্টাচার্য। পত্রিকার  
সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক হলেন রবীন্দ্রনাথ।  
পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গিম-  
চন্দ্রকে লেখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। রবীন্দ্র-  
নাথের অনুরোধে বঙ্গিম যে সম্মতি জানিয়েছিলেন  
তা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি থেকে জানা যায়।  
শ্রীশ মজুমদারকে রবীন্দ্রনাথ এই হিতবাদীর জন্য  
লেখা চেয়ে যে চিঠি দেন তাতেই পরেলক্ষ্য  
লিখেছেন, “বঙ্গিম, রমেশ বড় প্রভৃতি অনেক ভাল  
ভাল লোক লেখায় যোগ্য দিতে রাজি হয়েছেন।’  
তবে এই পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্ভব বৈ-  
দিন ছিল না মূল বঙ্গিমের এখনো লেখার প্রস  
ওঠে না।

১২৯৮ অগ্রহারণে (১৮৯১ খ্রীঃ) রবীন্দ্র-  
নাথের উদ্যোগে ঠাকুরবাড়ির নতুন মাসিকপত্র  
বেরলো—সান্দনা। এই পত্রিকায় নাম সম্পাদক হলেন  
সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর; কিন্তু কার্যত সম্পাদনার সফল  
দায়িত্ব হাতে নিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে। সান্দনা  
পত্রিকার জন্য বঙ্গিমচন্দ্রের লেখা চাইলেন রবীন্দ্র  
নাথ। ঠাকুরবাড়ির দুটি কাগজ চলেছে একই  
সঙ্গে—পুরাতন ভারতী ও নতুন সান্দনা। সুরেশ  
সমাজপত্রের সাহিত্য বেরিয়েছে সাধনার আদে  
বছর। বঙ্গিমের কাছে লেখার জন্য হাতে পেতেছে  
স্বর্ণকুমারী দেবী রবীন্দ্রনাথ ও সুরেশ  
সমাজপত্র। স্বর্ণকুমারী প্রায়ই আসেন বঙ্গিমে  
বাঁসিতে। চাটজো পরিবারের সংগেই স্বর্ণকুমারী  
ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও সান্দনা



সরলা দেবীকে বঙ্গিম নিজের এক সেট বই উপহার  
দিয়েছিলেন—বঙ্গিম পেতেছিলেন এক গল্প দেখল  
কতক।

## উজ্জ্বল নীলমণি

ডঃ হীরেন্দ্রনাথ মুখোঃ

## মুক্তিযুদ্ধে

## ভারতীয় কৃষক

সুপ্রকাশ রায়

## মাইকেল

## মধুসূদন দত্তের

## জীবন-চরিত

যোগীন্দ্রনাথ বসু

## রবীন্দ্রনাথ

(কবি ও দার্শনিক) ২৫.০০

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

## সাহিত্য ও সমাজ

ডঃ মানোজ্ঞন জানা

## দেশ-বিদেশ

(ভ্রমণ) ১২.০০

সুরেশচন্দ্র সাহা

## পশ্চিমের পাঁচালী

ডঃ শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য (ভ্রমণ) ৫.০০

## কাশ্মীর-

## অমরনাথ

১২.০০

মহম্মদনাথ রায় (ভ্রমণ)

## অজন্তা অপরাধ

২০.০০

নারায়ণ সান্যাল

## আদিম পিপাসা

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য (নৃত্য)

## সত্যজিত রায় :

## ভিন্ন চোখে

১৫.০০

শীতল ঘোষ : অরুণ রায়

## বিদ্যাপতি-

## সমীক্ষা

১০.০০

ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী

## ভারতী বুক স্টল

৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলিকাতা-৯, ফোন-৩৪-৫১৭৮

খুলি দিবে বন্ধিমের কাছে উপস্থিত হন। সুপের সমাজপতি সাহিত্যের জন্য লেখা চাইলে বন্ধিম বলেন, "আমি-বে তোমার কাগজ কিছু দিতে পারিবে না, তাহার কারণ আছে; অশ্রুত চারিটি প্রবন্ধ না লিখিলে হবে না। তা পারিয়া উঠিতেছি না।" সুপেরচন্দ্র বলেন, "একটাই দিন না।" বন্ধিম বলেন, "শুধু তোমাকে একটা দিনে তো চলিবে না। স্বর্ণকুমারী আসেন; আমার নাইদের কত খেলনা দিয়া গিয়াছেন। আমি ও সব বন্ধি। তাহার ভারতী আছে। রবি আসেন; জানো ত, প্রচারের সময় এক পালা হইয়া গিয়াছে। তাহার সাধনা আছে। তুমি আই, তোমার সাহিত্য আছে।" সাধনা পরিকাতেও বন্ধিম শেষ পর্যন্ত কিছু লিখে উঠতে পারেন নি।

স্বর্ণকুমারী দেবীর মধ্যে সঙ্গে তার কন্যা সরলা দেবীর মধ্যেও বন্ধিমের আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। সরলা দেবীর তখন অঠরো উনিশ বছর বয়স। ভারতীতে লেখালেখি শুরুর করছেন। সরলা দেবী লিখছেন, "তুমি সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্ক" অনলে আমার লেখা পড়ে তার চিঠি। সে চিঠি ত যে সে চিঠি নয়। তার দু-চারটি মাত্র সেটেলস বন্ধিমেরই সেটেলস বটে। ভারতীতে আমার আঠার উনিশ বছরের লেখা 'বর্তিবলাপ' ও 'মালবিকাগ্নিমিত্র' পড়ে তার লেখা চিঠি। সে চিঠি সাহিত্য দ্বারা দ্বারা দ্বারা একজন নবীর উপর তার রায়-বা তাকে দুই বা দুই বাড়ির আদর করে নেওয়া। যদিও রবিমায়ার চিঠিতে তারও appreciation বাক্য হইয়াছিল, কিন্তু তার চেয়েও সৌন্দর্য সাহিত্যসম্রাট ও সাহিত্যের ন্যায়াধীশ বন্ধিমের দ্বারা নিজেকে বেশি চরিতার্থ মনে করলুম।...বন্ধিমের চিঠির সাধী হয়ে এসেছিল সৌন্দর্য তার নিজের এক সেট বই উপহার-অপ্রত্যাশিত স্নেহ-নিদর্শন। তার হস্তলিপিবদ্ধ সে বইগুলিও রাখতে পারিনি শেষ পর্যন্ত।...চিঠি ও বই উপহারের পর তিনি আমায় লিখে লিখে একদিন আমাদের বাড়িতে। মানুষ বন্ধিমের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরম্ভ হল। মনে পড়ে তিনি চা-ভাঙ ছিলেন, আর আমার পিতা ছিলেন চায়ের একজন মমত্ব। আমাদের কাছের চা বন্ধিমের সুস্বাদু বোধ হত। তার পরদিন সেই চায়ের এক প্যাকেট এক গোলাপ ফুলের সঙ্গে তার কাছে উপঢৌকন গেল। কোথায় বন্ধিমের এক সেট বই-আর কোথায় দার্জিলিংয়ের এক প্যাকেট চা। কিন্তু দুইয়েরই পক্ষাতে প্রবেশ ছিল যে দুটি ভাব-স্নেহ ও ভক্তি-ভাষা যথেষ্ট হয়ে সমানই অমূল্য। তিনি সৌন্দর্য আমার ফরমাস করে গিয়ে-ছিলেন তাই সাধের ওগুণী গানটিতে সুর বসাতে। গিয়েটারে দেওয়া সুর তার পছন্দ হয়নি বললেন। সেটা শুনতে এলেন আর একদিন-শুনেন খুশি হয়ে গেলেন। বন্ধিমের ফরমাস এই গানের স্বরলিপি 'লজ্জানা' গ্রন্থে দেওয়া আছে। তারপরে আমাদের-আমার মাকে ও আমাকে-দাঁদি তখন ছিল হয়ে নিজের বাড়িতে থাকেন-নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন তার বাড়ি একদিন। তার স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হল। বন্ধিমের স্ত্রীর সন্তিত বা তার সম্পর্কীয় কথাবার্তার একটি সুন্দর শীতময় হাসিকৌতুকের ডেউ খেলিয়া যেত। আমরা বেন তার নজরেই একটা দৃশ্যের মধ্যে পড়ে যেতুম।"

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ বোটারের সঙ্গে নির্জন দুপুরে বগদাশন পড়েছিলেন-পড়েছিলেন নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনীর প্রেমের কাহিনী বিষয়ক; অপর দিকে জীবনসম্রাট মাসে মাসে বন্ধিমের হাতে এসে পৌঁছায় রবীন্দ্রনাথের পরিকা সাধনা। এই সাধনার ১৯১১ পৌষ (১৮১১-১০ খ্রীঃ) সংখ্যার প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের'। বন্ধিম সাধনায় প্রবন্ধটি পড়ে অত্যন্ত ব্যগ্নি হয়ে প্রবন্ধকে লিখলেন "পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষা সংবর্ধীর প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছয়ে আপনায়



বন্ধিমের জিরোখানের পর স্ত্রীর খিয়েটার হলে শোক-প্রস্তাব পাঠ করেন রবীন্দ্রনাথ।

সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উপাধিত করিয়াছিলাম এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।" বন্ধিমের পত্রে এই অংশ সাধনার পৌষ সংখ্যার প্রসঙ্গ-কথা বিভাগে উল্লেখ হয়।

সাধনায় ১০০০ বঙ্গাব্দের (১৮৯০ খ্রীঃ) আধ্বিন-কর্তৃক যন্ত্র-সংখ্যার রবীন্দ্রনাথের 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধ বেরলো। সাধনায় প্রকাশের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটি চৈতন্য লাইব্রেরিতে পাঠ করেন। সৌন্দর্য সভামঞ্চে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন বন্ধিমচন্দ্র। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের অনুরোধেই বন্ধিমচন্দ্র এই পাবিত্র সভায় সভাপতি হতে সম্মত হইয়াছিলেন। একই মঞ্চে চন্দ্র সুব-বন্ধিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। সভার পত্রে পূর্বে একদিন রবীন্দ্রনাথ বন্ধিমচন্দ্রকে এই প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ শুনিয়ে এসেছিলেন। বন্ধিম প্রবন্ধটি শুনেন সপ্রশংসে অভিমত প্রকাশ করেন ও সভামঞ্চে সভাপতির আসনে বসতে সম্মত হন।

চৈতন্য লাইব্রেরিতে প্রবন্ধ পাঠের কয়েক দিন পর ১৮৯০ সেপ্টেম্বরে রবীন্দ্রনাথ প্রথম চৌধুরীকে লিখলেন, "কতবার খবরটা পেয়েছি দেখছি। চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদকের অকৃত্রিম উত্তেজনার এই অসম্ভবসাহিত্যিক কর্ণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, নইলে পাবিত্রের কাছে যেতে আমার আর বড় ইচ্ছা করে না। আমার খুব ইচ্ছা ছিল কতটা তোমাদের একবার শুনিয়ে নিয়ে রণস্থলে প্রবেশ করতে। কিন্তু সে সময় কলকাতায় তোমরা কেউ উপস্থিত ছিলে না।...একবার কেবল বন্ধিমবাবুকে লেখাও হইয়াছিল তার প্রশংসাবাক্যে অনেকটা নিরুদ্ভিক হইয়াছিলুম।"

সাধনায় ১০০০ চৈত (১৮৯৬ খ্রীঃ) সংখ্যার রবীন্দ্রনাথ বন্ধিমের রাজসিংহ উপন্যাসের দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। পত্রিকা বেরলো কিন্তু বন্ধিম এ সংখ্যা আর দেখে যাবার অবকাশ পেলেন না। প্রায় এক মাস রোগযন্ত্রণা ভোগ করার পর সাহিত্য-সম্রাটের জিরোখান বহলো ১০০০ বঙ্গাব্দের ২৬ চৈত, ১৮৯৬-এর ৮ এপ্রিল।

তার মৃত্যুর পর স্ত্রীর খিয়েটার হলে চৈতন্য লাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ 'বন্ধিমচন্দ্র' শীর্ষক মহামূল্য প্রবন্ধখানি পাঠ করে সাহিত্য-সম্রাটের প্রতি তার অশ্রুতের অকৃত্রিম দ্বন্দ্বা নিবেদন করেন। ১০০১ বৈশাখের সাধনার রচনাটি ছাপা হয়। যে-সাধনায় বন্ধিমের নিজের লেখার কথা ছিল সেই সাধনার তার উদ্দেশ্যে শোকপ্রস্তাব প্রকাশ করতে হল রবীন্দ্রনাথকে।

বন্ধিমের জিরোখান প্রসঙ্গে সরলা দেবীর মন্তব্য, "যেদিন বন্ধিমের মৃত্যু সংবাদ হঠাৎ কানে এল-মনে হল আমারই জীবনের একাংশ হুসে গেল।"

## অনান্যীয় হাওয়া

কৃষ্ণা বসু

হু, হু করে মুখে এসে ঝাপটা মারছে অনান্যীয় হাওয়া  
'তুই কে?' 'তুই কে?'—বলে চিৎকার করে নোখে দাঁতে  
ফলা ফলা করে দিচ্ছে মুখ, সুবাসা-চিবুক  
আর কপালের আলো,—  
চাবকাছে, ঠা ঠা হাসছে, লম্পটের মতো এই উল্লা বাতাস।  
একটা দূটো তিনটে করে কিছ, ফল ফলোছিল  
বাস্তিগত বেদনার নীলবস্ত স্থলে। 'অবান্তর' 'কিসের দরকার'—বলে  
ছিঁড়ে ফেলেছে এই উল্লা বাতাস তাদের—

অলৌকিক সম্মোহন ছিল পূর্বগামী জ্যোৎস্নার ভিতর,  
লোকাল ট্রেনের থেকে দূর মাঠে কুচ্ছাড়ার ছিল সাংকেতিক ডাক,  
লাল হয়ে হাওয়া পুরোনো চিঠির মতো  
সেই সব স্বপ্নবীজ ছেঁড়া খোঁড়া ডাস্টবীনে গেছে,  
সাদা নীরস্ত হাওয়া এসে জেনে গেছে এইসব ;  
চুপি চুপি দরোজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শূনে গেছে  
বাস্তিগত চাপা কামা গোঙানীর স্বর, চতুর সে আড়ালে রয়েছে ;  
দরজা খুলে বেরোলেই  
'কেন এলি?' 'কেন এলি?'—এ ফোড় ও ফোড় করে বিখছে আমার,

হু, হু করে মুখে এসে ঝাপটা মারছে অনান্যীয় হাওয়া।

## জাল গোটানোর আগে

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

জাল গোটানোর আগে, সমুদ্রের দিকে আমি  
একবার চাঁকতে তাকাই।  
চাঁদ গুঁড়ো হ'য়ে আছে, চেউ তাই আত'নাদ করে।  
আর কিছুক্ষণ পরে বাড়ি যাবো, আর কিছুক্ষণ  
আমি এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবো সমুদ্রের ঠিক ম'খোমুখি।

এখন বাড়িতে ঢের কাজ আছে ; জাল তুলে  
আমি ঘরে যাবো।  
তবু, যেখানে পেতেছি জাল, সেই অনন্ত জলের কাছে  
জ্যোৎস্নার দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে মারা আছে।  
বলো, মারা নেই?  
কস্মির ওজনে আমি টের পাই, জাল আজ  
পূর্ণ হ'য়ে আছে।

রাত পাখি উড়ে যায় ; চাঁদ ডোবে, চাঁদ জেনে ওঠে।

## জলছবি

নিজন দে চৌধুরী

কিছুই থাকে না, শব্দ শব্দই থাকে—অনস ও আনন্দ  
এয়োতী বাল্য, দাম্পত্যের কলঙ্ক শব্দ  
বৃকের হৃদয় শব্দে সিঁদুর-মোছানো জলদ্বারা  
তরঙ্গে তরঙ্গে শব্দ, জলে রাখে তুল সন্তপদী।

কিছুই থাকে না, এই অন্ধকার প্রান্ত পাদমলে  
মণ্ডল-সুদের গ্রাসি ছিঁড়ে যায় হাওয়ার হাওয়ার ;  
প'ড়ে থাকে শব্দ, দাম্পত্যের অদৃষ্ট শব্দে,  
সিঁদুরের দিন যায়, জল-ছবি করে রক্তে ঘাট।





এক ৭০:৩০ পলিয়েস্টার-উল উরসেটেড স্যুটিং সম্বন্ধে  
নতুন করে কিছুই বলার নেই!  
কিন্তু আমাদের সৃষ্ট স্যুটিং অনেক নতুন কথাই জানান দিচ্ছে।



**বিমল নিবেদন করছেন**

**পলিউল**

**সাধারণ প্রচলিত স্নেপে বানানো  
এক অসাধারণ  
উরস্টেড স্যুটিং**

**সুতো তৈরী।**

**ভারতের আধুনিকতম স্পিনিং কারখানায়।**

রিলামেন টেক্সটাইলস-এর ১৮.৫ কোটি টাকার অত্যাধুনিক স্পিনিং কারখানায় আধুনিকতম টেকনিকে বানানো

এই সুতো অনেক দিক দিয়েই ভারতের 'সর্ব-প্রথম'।

একটি কারণ, এর অষ্টকাল ইলেকট্রনিক ক্রয়িং ডিভাইস। এই ধরনের যন্ত্র-সরঞ্জামের মধ্যে ভারতে, এই প্রথম প্রবর্তিত, যার ফলে উৎকৃষ্ট জাতের নিখুঁত সুতো পাওয়া একেবারে সুনিশ্চিত।

অপর কারণ, যথাসাধ্য টাকা খরচ করে বানানো সবচেয়ে আধুনিক টেস্টিং ল্যাবোরেটরি। এখানে বিশ্বের উচ্চমানের সুতোর সঙ্গে সমতুল্য সুতো বানানোর জন্যে পৃথানুপৃথকভাবে সুতোর কোয়ালিটি টেস্ট করা হয়।

**এবার স্যুটিং তৈরী।**

**ভারতের আধুনিকতম কাপড়ের কারখানায়।**

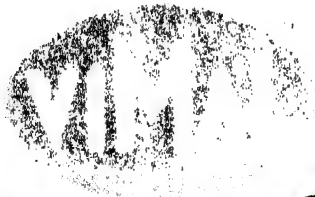
পলিউল স্যুটিং তৈরী হয়

ভারতের আধুনিকতম কাপড়ের কারখানায়-- রিলামেন টেক্সটাইলস।

**কি কি গুণের জন্য পলিউল 'অসাধারণ'  
খেতাব অর্জন করেছে?**

১. এর সুতো বিশ্ব-শ্রেণীর:

২. এই অসাধারণ সুতো দিয়ে এরপর অত্যাধুনিক উইভিং ও প্রসেসিং টেকনিকের সাহায্যে অসাধারণ পলিউল স্যুটিং তৈরী হচ্ছে ভারতের আধুনিকতম কাপড়ের কারখানা-- রিলামেন টেক্সটাইলস-এ।



**একমাত্র বিমল**

**বিশ্ব-শ্রেণীর খেতাব প্রাপ্ত**

না। প্রমাণ-বিহীন কোনো প্রসঙ্গ ওঠালেই, ওমা, যে কি দিবে কাজ নরর।



খাওয়া শেষ করে হাত-মুখ প্রক্ষালন করে এসে গঙ্গানারায়ণ কুসুমকুমারীর বইটি খুলে বসলো। কুসুমকুমারী আহার সেরে এসে ফিরে এসে সে বললো, তুমি জে অনেকখানি পড়ে ফেলচো! কেমন লাগতে?

কুসুমকুমারী উৎসাহে বসে, জারি ভালো, এতবার ধরে আন ছাড়তে হচ্ছে করে না।

—তুমি সব বুঝতে পারো? তোমার কোনো-খানে খটখটো লাগে না?

—একটুও না। বাকি যথো একটা ঘূটা কটার মনে জানি না বটে তবু সব বুঝতে পারি। আমি আগে কালীবাসী পড়িলাম, কিন্তু তার সঙ্গে কত তফাৎ।

—সত্যি আমাদের ছোটকু এই একটা মস্ত বড় কাজ করছে। কতই বা করস ওর। আমার ছেরে অস্তত ডের-চোপ বছরের ছোট, এই বরষেই গোটা মহাভারত অনুবাদের কাজ হাতে নেওয়া.....কেমন সুন্দর ভাষা.....আমাদের এই বংশে ছোটকু একটা প্রতিভা। ওর সঙ্গে তোমার ভালো করে আলাপ পরিচয় হলে?

নীল চক্, দুটি শ্মিরতাবে মেলে, ওঁঠাধরে সামান্য হাসি মেখে, আশেত আশেত মাথা দু'দিকেরে কুসুমকুমারী বলে, না। তবে আগে দৈর্ঘ্যিচ আমার মিতনীর বর হিসেবে—

গঙ্গানারায়ণ বললো, ও খুব বাস্তব, তবে আলাপ-পরিচয় তো হবেই তখন দেখো, ও কেমন

পালল। সব সময় বড় কোনো কাজের চিন্তা ওর হাতের মধ্যে টগবগ করে ফোটে।

মহাভারতের মোট তিনটি বন্ড প্রকাশিত হয়েছে এ পর্যন্ত তা করেকাননের মধ্যেই কুসুমকুমারীর পড়া হয়ে যায়। আরও পড়বার জন্য সে হটকট করে। এ ব্যক্তিভে এসে অফুরন্ত অবসরের মধ্যে তার বই পড়ার নেশা অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু অত বাংলা বই সে পাবেই বা কোথায়!

এক রাতে গঙ্গানারায়ণ ফিরলে কুসুমকুমারী জিজ্ঞেস করে, আপনাকে একটা কথা বলবো? আপনি রাগ করবেন না?

গঙ্গানারায়ণ অবাক হয়ে বলে, কী কথা? তোমার ওপর রাগ করবো কেন, কুসুম? তোমার ওপর রাগ কতে পারে এমন পাবিও কেউ আছে?

আপনি সরাসরি খেটেখুটে আসেন, তাই বলতে সহস পাই না। এক একদিন একটু ভাড়-ভাড়ি এসে আমার একটু পড়বেন? আমি তো সংস্কৃত পড়তে পারি না, বাকি আমার পড়ে পড়ে বুঝিয়ে দেন।

গঙ্গানারায়ণের দরীরে অকস্মাৎ রোমাঞ্চ হয়। মনে দেখা বিন্দুবাসিনীর কথা মনে পড়ে। বিন্দুবাসিনী অভিমান করে বলে ছিল, তুমি আমার মেঘদূত পড়াবে বলিচি, পড়ালি না তো, গম্ভা! এ যেন অবিকল সেই কথবার!

গঙ্গানারায়ণ একটুক্ষণ খেমে থেকে তারপর আপন মনে বলতে শুরু করে: কান্ডং কান্ডংবরহ-গুরুদা / ম্বাবিকারপ্রমত্তঃ / শাপনন্দস্মিতমহিলা বর্ষভোগ্যোন ভক্তং.....তারপর বড় স্নেহের সাথে যখন মোহা বরষাধিশে নামের লম্বাকামা.....এই পর্যন্ত বলে সে ধামে। স্নেহক বসতে বসতে

গঙ্গানারায়ণ যেন অন্য কোথাও চলে গিয়েছিল, সেখান থেকে আবার ফিরে আসে। উত্তরপর বললো, আমার অনেক ভাল থেকেই হচ্ছে, ভারি কমে মেঘদূত পড়ে শোনাই.....তুমি আন বললো, এসো, কুসুম, আমার পক্ষে এসে বসো, তোমার আমি মেঘদূত পড়বো।

কুসুমকুমারী বললো, মেঘদূত কী? এ বইয়ের নাম তো শুনিনি কখনো। আমার খুব হচ্ছে করে লকুতলা বইটা পড়বার—

গঙ্গানারায়ণ একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, লকুতলা? হঠাৎ লকুতলা পড়বার জন্য হচ্ছে হলো না কেন? মেঘদূত পড়ল নর?

কুসুমকুমারী মেলে বললো, আমি কি ছাই কোনোটাই জানি। ছেলেবেলার আমার দাদাদের পোনে বম্বাইয়ের হুকে লকুতলার গম্পোটা শুনিনিচলুম, তাও পুরোটা নর.....সেই গম্পোটা জানতে হচ্ছে করে। মেঘদূতের জে আমি নাই জানি না!

একটু খেমে থেকে গঙ্গানারায়ণ বললো, তবু প্রথমে মেঘদূতটাই শোনো। লকুতলার কথা পরে একদিন বলা হবে।

মেঘদূত গঙ্গানারায়ণের আগাগোড়া কঠম্ব। তার বই লাগে না। কু দিবে সে সেরবারতটা নির্বিঘে দিলে তৎকাল্য এক কলক জ্যোৎস্না এসে পড়ে করের মধ্যে। কুসুমকুমারীর হাত ধরে সে নিরে আসে গনাকের ঘরে। পরক্ষাত, এর সময় অতাসে কালকল বর্ণের লম্ব মেঘ জেনে বেড়ায়। সেই রকম একখন্ড মেঘ ঘেঁষে গঙ্গানারায়ণ বললো, এ দ্যাকো মেঘদূত থাকে.....তুমি মহাভারতে নল দয়সতীর গল্প পড়েছো? একটি হলে হয়েছিল ওদের দূত.....ভেমান রামাংগির সাহায্যে এক নির্বাসিত কক সূর্য অলকার তার প্রিয়াকে একটি বচা।

## এখন পাচ্ছেন এমন এক শ্যাম্পুযুক্ত হেয়ার ডাই যা প্রতিবারেই চুল ধোয়ার সাথে ফিকে হয়ে যায় না।

নতুন নেচুরী। শ্যাম্পুযুক্ত এক অসাধারণ হেয়ার ডাই যা চুলের ভেতরে আপনা থেকেই ছড়িয়ে পড়ে; আর সেইসঙ্গে আরও গুণ: চুল যোয়ার সাথে নেচুরীনের রঙ ফিকে হয়ে যায় না। আমার দেখুন, এটি লালানও কত সহজ—চুল সামান্য ঝললেই এর ফেনা খুব তাড়াতাড়ি সারা চুলে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে—যার ফলে আপনার চুলে দেখা দেয় তারুণ্যের দীপ্তি—আর আপনার হার্মিসেবতা দুনাঙ্করে এটি জ্ঞানভেও পারেন না।

নেচুরীনে কোনো কর্কশ জাতের কেমিক্যাল না থাকার নতুন আপনার চুল মোলায়েম আর সোচ্ছালো থাকে। আর এর মিত সৌরভ আপনার হালুস ভালও লাগবে।

সাতাধিক ধরনের র্যাক ও ডার্ক রাউন রঙে মাইলা ও পুরা, উভয়ের জন্যই পানেন।

**নতুন**  
**নেচুরীত**  
শ্যাম্পুযুক্ত হেয়ার ডাই

নতুন নেচুরীত অত্যন্ত শ্যাম্পুযুক্ত পুরাতো হেয়ার ডাইকে ফল মাতাম।



মে. ডে. হেলেন কল্লিস-এক এক উৎকর্ষ উপাধান।

পরিষ্কার জন্য একশত বৈদ্যক হুত দিয়েছে নিজেই  
করিয়েছিল।

কুসুমকুমারী জিজ্ঞাস করলো, রানীকীর  
কেন্দ্র?

গঙ্গানারায়ণ বললো, জেয়ার মতন লক্ষ্যেরই এ  
প্রশ্ন মনে আসলে বলে কবি কলিলাস প্রথম স্তোত্রকেই  
কে কবি রানীকীর দিয়েছেন.....জনকভদ্রনারায়ণ-  
পুণ্যোদকে/ শিখরচারণাভব, কবিজ্ঞ .....জনক-  
ভদ্রা মনে সীতা কন্যাসের সময় রাম আর  
সীতা এই রানীগীর্জিত ছিলেন কিংবদন্তি, এখনকার  
জলে সীতা স্থান করেছিলেন বলে তাঁর অঙ্গ-  
স্পর্শে জল পরিষ্কার .....এইকেন্দ্রেই সেই বক।

—এই বকের নাম কী?

—এটাই আর একটা কথা। কলিলাস তাঁর এই  
কবোর নামকরণ কেনো নাম রাখেন। অর্থাৎ এ যেন  
মগতের সনাত্ত বিরহী যাদুকেই মনের কথা। বরো,  
আমি যদি কোনোদিন হুত দিয়ে চলে যাই, আমার  
যদি কেউ নির্বাসন দেয়, তখন আমিও জেয়ার কথা  
জেনে এমনভবকেই বিলাপ করব।

—তল্লপের বলুন।

—আমাদের প্রথম মিসেস মেঘমাণ্ডিক সান্দ্র

সেই অভিনয় বক আট মাস নির্বাসনে কাটিয়েছে,  
হুত-বিরহে রোগা হরে গ্যাচে সে, হাত থেকে  
বলর খসে পড়ে বার.... এরই মধ্যে এলো আমায়  
সানের প্রথম দিন, বক দেখলে পবিত্রের সান্দ্রেশ  
আলিঙ্গন করে আচে একশত মেঘ, তার মনে মনে  
হলো এক পরিণত গর বস্ত্রীড়া কচ্ছ, অর্থাৎ এক  
খাপা হাতি যেতে উঠেছে ভূমিখননের খেলার.....  
কী অপূর্ব সেই দৃশ্য! তখন সে মেঘকে ডেকে  
বললো.....

—মেঘ কি মানুষের কথা শুনতে পার?

—ঠিক মতো আকর্ষিত দিয়ে ডাকলে নিশ্চরই  
শুনতে পারবে, যেমন এই বকের ডাক শুনিয়েছে....  
তা ছাড়া কবিও বলে দিয়েছেন, যারা কামার্ত,  
চেতন-অচেতনের প্রভেদ বোঝা তাদের কাছে অসা  
করা যায় না...

বল করকটি শ্লোক শোনবার পর কুসুমকুমারী  
বললো, ছাড়ে যাবেন?

গঙ্গানারায়ণ আবিষ্ট হরে পড়েছিল। যেমে  
গিয়ে জিজ্ঞাস করলো, ছাড়ে? কেন! তোমার ভালো  
লাগছে না?

কুসুমকুমারী গঙ্গানারায়ণের বাহুতে গম্ব  
ছুঁয়ে বললো, ভীষণ ভালো লাগছে, এমন আমি  
কখনো শুনিনি, আলসি যদি এখন যেমে যান আমি  
মলে যাবো.....চলুন ছাড়ে যাই, সেখানে খোলা  
আকাশ, মজার ওপর দিয়ে মেঘ উড়ে যাবে সেখানে  
বস শুনতে অল্পও বেশী ভালো লাগবে।



রাতি নিশ্চুতি, সারা ব্যক্তি নিশ্চুত, সকলেরই  
ঘুমুতা। হুত সন্তপণে শরনকক থেকে বোঁয়ে  
এলো কুসুমকুমারী আর গঙ্গানারায়ণ। পা টিপে  
টিপে উঠে এলো ওপরের সিঁড়ি দিয়ে। যাতে  
কোনো শব্দ না হয় এমন সাবধানে চললো দরজা।  
শরৎকালীন আকাশ থেকে অল্প অল্প লিলিরপাত  
হেছে, হল ঝং ঝং ভেঙে ছেঁকে, কিন্তু তা ওয়া গ্রাহ্য  
করলো না। হায়ে কতকগুলি বৃহৎ মাটির  
জালার জল ভরা থাকে, সেরকম একটা জালার  
পিঠের ভর দিয়ে গাঙ্গাপাশি বললো ওয়া দুজনে।  
আজকের রাতিও বড় উপশ্রুত, কোমল, মিহন  
সুগন্ধ বইছে। চোখ আকাশের দিকে ফুলে  
তগগতভাবে গঙ্গানারায়ণ বললো, কোথাও নদীর  
তীরে তীরে চাঁপা ফুল ফটে উঠেছে...কোথাও  
দামাশ্রিত বন পড়ে পিরিঙা, যে মেঘ, তোমার  
বধে সেখানকার রাতি থেকে বধুর গম্ব উঠে। আর

সেই গম্ব হুতের হুতের হুতের হয়ে যাবে জিল  
হাতি....

সম্পূর্ণ পূর্বসেব সমাপ্ত করে গঙ্গানারায়ণ  
হুত করলো।

কুসুমকুমারী বললো, থাকলেন কেন?

গঙ্গানারায়ণ বললো, আর এই পূর্বসেব কক।  
উত্তরবহ তোরার কল খোলাবে। হুত ভালো  
জিনিস একদিনে বেশী গ্রহণ করে নেই...যেমন ধরো  
হুত, এক সঙ্গে যদি বেশী গ্রহণ করো, কষ্ট হবে।  
—আমার কিন্তু এখন হাত থেকে যেতে ইচ্ছে  
করে না।

—এসো, এখানেই বস থাক।

—যদি সারা রাত থাকতে চাই, থাকবেন?

—পাগল মেরে, হুত যদি থাকতে পারো, আমি  
পারবো না?

—আমার ভীষণ ভালো লাগছে, এত ভালো,  
যেন কষ্ট হচ্ছে বকের মধ্যে, এমন সুন্দর দিন  
আমার মাঝনে কখনো আসেনি। যেতুন আকাশের  
দিকে, মনে হচ্ছে না চাঁদ যেন ঠিক আমারই  
দৃকনকেই দেখতে?

—আমাদের দৃকনকে নয়, শব্দ তোমাকে।

চাঁদ তোমার হিঁসে কছে!

—তা তো হিঁসে হতেই পারে। চাঁদ বড় একা।  
বেশ কিছুক্ষণ ওয়া চাপ করে বসে রইলো  
এরপর। জাগ্রত মানুষের মন কখনো ঘেমে থাকে না,  
ওদের চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হতে লাগলো  
দৃককে।

এক সময় গঙ্গানারায়ণ পাশ ফিরে জিজ্ঞাস  
করলো, কুসুম, তুমি একটা প্রশ্নের জবাব দিতে  
পারো? এই যে মানুষের জীবন এর উদ্দেশ্য কী?

কুসুমকুমারী বললো, জানি না তো, কখনো  
জানিও নি।

গঙ্গানারায়ণ বললো, এই কতটা আমার এখন  
প্রাইই মনে হয়। এই জগৎ সসারের একজন পরম  
শিতা আসেন, একদিন তাঁর পারের কাছে বখন  
যাবো, তিনি শূন্যে, মানুষের জীবন পেরিয়েছিলে,  
সে জীবন চিরতারা করে এসেছে তো? তখন কি  
উত্তর দেবো?

—আমি সামান্য করে আপনি আমাকে এ কথা  
জিজ্ঞাস করেন?

—তুমি সামান্য হবে কেন, কুসুম। তোমারও  
মন আছে—

—জীবনের উদ্দেশ্য কী তা আমি জানি না।  
আসুন আর থেকে আমরা দুজনে মিলে খুঁজি....  
এর উত্তর খোঁজার জন্য আমি একলা একলা  
আমার ছেড়ে কোতোও চলে যাবেন না কতা দিন!  
প্রশ্নটা শুন প্রশমটার কেনন কেন ভয় করে উঠলো।  
কিন্তু আর ভয় পাবো না, আমিও খুঁজবো আমার  
সাহায্য করব, বলুন।

—কতা দিলুম, কুসুম।

কুসুমকুমারী গঙ্গানারায়ণের পায়ে হাত  
রাখলো। সেই হুত, জ্যোত্স্নালোকে গঙ্গানারায়ণ  
দেখলো এই নীলনরনা, নিশ্চ, কোমল, কুসুমদীর  
মতন হুতের মেয়েটি কিংবদন্তি নর, এ অন্য  
নারী, এর নিজস্ব চরিত্রপ্রভার আর অন্য কারুর  
কথা মনে পড়ার না।

গঙ্গানারায়ণ উঠে দাঁড়াতেই কুসুমকুমারী  
বললো, আর্কন চলে যাবেন? এই যে বললেন—

গঙ্গানারায়ণ হুত হাত বাড়িয়ে বললো, এসো—

কুসুমকুমারীও উঠে দাঁড়ালো এবং

গঙ্গানারায়ণের আহবানে বকলানো হলো।  
গঙ্গানারায়ণ তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে সিঁড়ির  
দিকে এগোতে এগোতে বললো, জীবনের উদ্দেশ্য  
যাই হোক, মানুষের একাক্ষ বড় সাংঘাতিক। আমি  
অনেকদিন বড় একা ছিলাম গো, কুসুম, এখন থেকে  
তুমি আমার সেই শূন্যতা সম্পূর্ণ ভরিয়ে দাও।

(জয়শ)

# সংগ্রহ করে রাখার মত পত্রিকা

## অসাধারণ গ্রন্থ

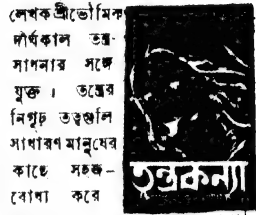
কম্পানির, আশ্চর্য্যসা ও  
প্রত্যেক মিসে  
দুইহাতে এক চাকলাকার মহান  
উপন্যাস

জিতেন্দ্র বোহন (ভৌমিকের)

**তত্ত্বকন্যা**  
(১ম ভাগ ৭৩)

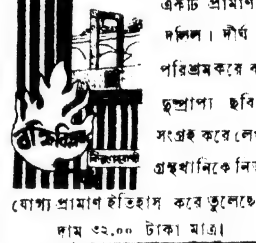
প্রতি ভাগ ১৮.০০ টাকা মাত্র

বেদ, বেদান্ত, পুৰাণ, তন্ত্র, কম্পানির  
রহস্য, আশ্চর্য্যরহস্য, প্রত্যেক ৩  
সামাজিক উপন্যাসের এক পরমার্শ  
অলৌকিক সমগ্র।



লেখক ভৌমিক  
দীর্ঘকাল তন্ত্র-  
সাধনার সঙ্গে  
যুক্ত। তন্ত্রের  
নিগূঢ় তত্ত্বগুলি  
সাধারণ মানুষের  
কাণ্ডে সহজ-  
বোধ্য করে  
তুলেছেন চমকপ্রদ এক সুগঠিত।  
কাহিনীর মাধ্যমে। দুই খণ্ড একত্রে  
মিলে ২০% ছাড়।  
এই সুযোগ মাত্র কয়েক দিনের জন্য।

কিরলক্ষ বাণীর বক্রিবিষ্ণু  
আমাদের আর একটি সঙ্গ প্রকাশিত  
গ্রন্থ। ভারতের সনাত্ত আন্দোলনের



একটি প্রামাণ্য  
দলিল। দীর্ঘ  
পরিভ্রমণের বহু  
দৃশ্যপা ছবি  
সংগ্রহ করে লেখক  
গ্রন্থখানিকে নির্ভর-  
যোগ্য প্রামাণ্য ইতিহাস করে তুলেছেন।  
মাত্র ৩২.০০ টাকা মাত্র।

পুস্তক বিক্রেতা ও লাইব্রেরীগুলির  
বিশেষ সূচ্যোগ। প্রাস্টিক জ্যাকেট,  
সুন্দর বাঁধাই, স্বকথকে ছাপা আমাদের  
তিনখানি বই একত্রে মিলে ডি. পি.  
খরচ নেই।

আমাদের আগামী প্রকাশনা  
ডঃ কুঞ্জ গোবিন্দ গোস্বামী  
প্রতীভা পরিচয়

সবাসির আমাদের সাথে যোগাযোগ  
করুন:

**দেবকর্ত পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ**

২২, লাউডন স্ট্রিট, মার্কেট বিল্ডিং,  
কলকাতা-৭০০০১৭

ফোন: ২৪২০৩০০  
অথবা কলকাতা পিউ পাইড

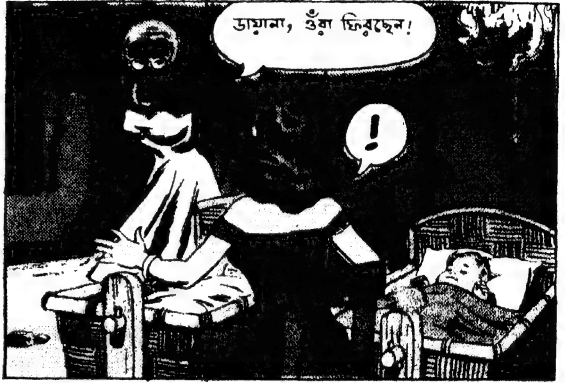
ডি.পির জন্য অগ্রিম ১০.০০ টাকা  
পাঠান। CALCUTTA FILMIST  
ADVERTISING-৪৩/৭

# অরণ্যদেব

গভীর অরণ্যের বাসন-প্রবর্তী...



গভীর অরণ্যের গোপন প্রবেশ-পথ।







(উপন্যাস)

ফেরারি মাসে ক্রাকারদের সঙ্গে হাতাহাতি করে, লাইন ম্যানের করে এবং বকিং ক্রাকারদের সঙ্গে বিস্তারিত অর্থহীন কথা বলে সরিং এলাহাবাদের তিনটে সেকেন্ড ক্লাস স্লিপারের টিকিট কেনে ফেলল। কাড়া বন্টা চারেকের চেম্টায়।

বোরিং এন্ডে টিকিটগুলোর দিকে চেয়ে চুপ-চুপ করে একটা আশ্বাসের শব্দ করল। একেবারে ফাল্গু গন্ধ। এলাহাবাদ পর্যন্ত অনন্তরাসে বিনা-টিকিটে বাওলা বেড, খরচ লাগত অর্ধেকের কম। কিন্তু সেজমিক সেকথা বলাই যায় না।

শেষ বেলার বাড়িতে ফিরে বিজয়ীর মতো হেসে সেজমির হাতে টিকিট দিয়ে বলল, ব্রাকে কাটতে হয়নি। লাইনেই শেষে গেলাম।

তব্বা কোনো জবাব দিল না। প্রথমতঃ গম্ভীর-মুখে টিকিটগুলো নিয়ে ঘরের আলমারিতে রেখে এল। বলল সজলকে একটা ডেকে দিয়ে যাস তো। বোধ হয় পুরোনো মোরালখরটার আছে।

সরিং গিয়ে দেখে, মস্ত বািলর বস্তায় হাতে নামকাড়া ছাড়ির ঘরে ঘরে ছবি চাপাচ্ছে সজল।

হুঁ রতন? সর্বাপেক্ষা প্রবলবে ঘাম। অবাক সরিং বলে, কি করছিস? বকাস?

সজল গম্ভীর মুখে বলে, হ্যাঁ। কে দেখায় তাকে?

কউ না। নিজে শিখছি। সরিং নিজের কাজকর্ম এবং ভবিষ্যৎ ভাব করে

করতে ইমানিং এতই ব্যস্ত ছিল যে, সজলকে ভাল করে লক্ষ্যই করেনি। আবার করল। এবং একটা অবাক হল।

তুই কত ফুট লম্বা রে? পঠি নয়।

সজলের উচ্চতা ও রকমই হবে। বেশী ছাড়া কম নয়। তবে আরও লম্বা হবে। অনেক লম্বা। সরিংয়ের নিজের হাইট মাত্র পাঁচ আট। কিন্তু সে জল্প বাড়বে না। শূন্য লম্বাই নয়, সজলের কাঠামোটা আশ্চর্য রকমের মজবুত। কীছ দৃশ্যনা চওড়া, হাত দৃশ্যনা যেমন লম্বা তেমন প্রুতগাতি-সম্পন্ন। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এবং সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, সজলের দৃশ্যনা চোখ।

অসুস্থ থাকে বটে। একটা অজানা করে বুকেটা সামান্য কেপে উঠল সরিংয়ের। এ ছেলেকে সামলানো যত্নশীল হবে। এর ওপর আশিপতা করা বাবে না কখনো। এ সব সরিং এক নজরেই বোঝে। সে তবু মুখে হাসি টেনে এনে বলে, খুব তিনকাটা লম্বা হয়েছিল তো।

সজল হুঁব ধীরে ঘরের বেড়ায় গোঁজা একটা কীকশ তোললে দিয়ে ঘাব মেরে।

সরিং মস্ত বস্তার হালকা দু-একটি ঘূষি মেয়েই বুকেতে পারে, এই ভারী ককশ বািলতে ধার হয়ে ওঠা বস্তার এক নাগাড়ে ঘূষি যাত্রা অভ্যস্ত কর্তন করে। কীছ ডেকে বাওয়ার সম্ভাবনা আছে, লিগামেন্ট ছিঁড়তে পারে।

সরিং জান হাতটা বাড়িয়ে বলল, তোর পাঞ্জার কেমন জোয়ার হয়েছে।

বলল একটা হাসল, তারপর হাত বাড়িয়ে সরিংয়ের চোরে অস্তিত দেড়গুণ বড় খাবার চোপে ধরল হাতখানা।

সরিং বিস্তারিত মারপিট করে হান্ডি পাকিয়ে ফেলল। তার হাতে বাধা লাগে না, তবু হাত-খানা ধরে সে বুকেতে পারল, সজলের গায়ে জোরে যে তার চেয়ে বেশী তাই নয়। বহু বহুগুণ বেশী। সরিং না হয়ে অন্য কেউ হলে সজলের আঙুলের চাপ কীয়ে উঠত। সরিং কীয়ে উঠল না, কিন্তু খাবার এক অজানা ভয়ে খানিকটা বিবণ হয়ে পেল।

সজলের পিঠ চাপড়ে সরিং বলে, ভাল ভৈরি হয়েছিল। খুব ভাল। তাকে কয়েকটা শক্ত কারদা শিখিয়ে দেবো। কালিমশং-এর একজন রাউন বেটের কাছ থেকে দেখা।

সজল খুব উল্লাহ দেখাল না। উমাম মুখে বলল, দিও।

এখন যা। তাকে সেজমি ডাকছে। গায়ে গেঞ্জী ছিলই। বেড়ার গা থেকে জামাটা টেনে গায়ে চড়াল সজল। বলল, তুমি এগোও। যাচ্ছি।

চিন্তিত মুখে সরিং গিয়ে তার মেপেত চালিয়ে বাজারে গেল। প্রবীণে নতুন মাল এসেছে। ময় ফেলতে হবে।

জামার ওপর হাতকাটা সোয়েটার চাপিয়ে সজল এসে মায়ের ঘরের সামনে গাড়ায়।

তব্বা বোরিং আসে।

শেষ বেলার শীতের মলান গোধ পড়েছে সজলের মুখে। মুখের ঘাম সবটা মরোনি এখনো।

লম্বা, সরবান চোখরা। চোখের দৃষ্টি এই বয়সেই যথেষ্ট স্থির এবং গভীর। নিতুল একজনের ছাপ পড়েছে সজলের চোখারায়। কিন্তু সেই লোকটিকেও দিনেকালে এ ছেলে ছাড়িয়ে যাবে। তব্বা কীছতেই শ্রাকাল ছেলের সামনে সহজ বোধ করে না। কেমন অবশ্যস্ত হয়।

ডেকেছে?

তব্বা গম্ভীর মুখে বলে, সামনের সপ্তাহে আমরা এলাহাবাদ যাচ্ছি।

জামরা মানে আমি, তুই আর সরিং।

আমি গিয়ে কি করব? ইস্কুল কামাই হবে না?

মামী তাকে দেখতে চেয়েছে। আমরা বেশী দিন থাকব না।

সামনেই আনন্ডাল পরীক্ষা। সজল ঘাড় শক্ত রেখেই জবাব দেয়।

দু-তিন দিনে কীছ হবে না।

বড়দির বিয়ের ব্যাপার, সেখানে আমাকে দিয়ে কি হবে?

কীছ হবে না। কিন্তু আমি তোমাকে একা বাড়িতে রেখে যেতে চাই না।

সজল অন্ধ হয়ে বলে, একা কেন? মেজমি, ছোড়মি আছে, বাবা আছে।

তাদের থাকা না-থাকা সমান। তুই কবে থেকে মুখে জবাব দিতে শিখলি?

তুমি বোকার মতো কথা বলছ বলছি জবাব দিচ্ছি।

বোকার মতো বলে স্তম্ভিত হয়ে তব্বা চোরে থেকে ছেলের দিকে। এত সাহস! এত সাহস এরা কোথেকে পায়?

কীছ লম্বা তব্বা কখনই বলতে পারল না। সজল উজ্জ্বল শে একটা ভয় পেল। যা

সম্পর্কে এখনো তার ভয় পুরোপুরি বাক্যনি। শক্ত কঠিনের গম্ভীর ও আদর্শীন তার এই যা ভো গানের জোরে সবাইকে টিট করে রাখেন। আর একটা কীছ আছে। সেই রহস্যময় অজানা একটা কীছকেই পেরোনো যায় না।

সজল চোখ নামিয়ে বলে, এখন আমি মেতে পাব না। তুমি মেজমি বা ছোড়মিকে নিয়ে যাও।

তব্বা কীছ বলল না। নিশেজে ঘরে চলে গেল। ঘরের ঠিক মাঝখানে আবহাওয়ায় কীছ কশ কাঠ হয়ে বাড়িয়ে থাকে সে। রাগ হয় না, পরাজয়ের শ্লানিও বোধ করে না। শূন্য এক শুনাতা এসে তার ভিতরটাকে ফাঁকা বোধবোধহীন করে দেয় কীছ লগের জন্য।

সজল নিজের ঘরে গিয়ে জামা-প্যান্ট পাল্টায়। একটা চিন্তিত, উদ্ভিষ্ট।

আগে সে মায়ের কাছে থাকত। তারপর জামগা হল দুই দিদির ঘরে। সম্প্রতি তার একটা আলাদা ঘর হয়েছে। এ-ঘরে সে একা থাকে। ভুতের ভয় পেত আগে। এখন পায় না। আত্মকাল খুব কম জিনিসকেই তার পায় সজল।

চুপচাপ কীছ লগে এসে সে এলাহাবাদ হাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল। বেড়াতে যাওয়ার খরাম নয়, কিন্তু এখন তার কোথাও মেতে ইচ্ছে করছে না। মনে হয় সে চলে গেলে বাবার বিপদ হবে।

পারে চিট গিলিয়ে সজল ঘর থেকে বেরিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ভাবনায় এসে ঢোকে।

বাবা।

প্রীনাথ বগানের ধারের রাস্তায় বেড়াতে বলে গলার কম্বলটার জড়িয়ে ভৈরি হাঁকল। বলল, কি রে?

মা এলাহাবাদ যাচ্ছে।

জানি। চিটার বিয়ের সম্পর্ক এসেছে।

আমাকেও নিয়ে যেতে চাইছে।

প্রীনাথ ভালমানুষের মতো বলে, যা না। ঘরে

আয়।

আমি বলছি বাবো না। সামনে পরীক্ষা।

ও। তাও তো বটে। তবে তাকে নিয়ে যেতে

চায় কেন?

কি জানি। মারি ধারণা, এ-বাড়িতে একা থাকলে আমি বমাইশী করব।

প্রীনাথ মুখ বিকৃত করে বলে, বাজে কথা।

মা খুব রাগ করেছে। তুমি মাকে একটা বুঝিয়ে বলবে?

কি বলব বল তো?

বোলো, আমি চলে গেলে তোমার অসুবিধে হবে।

তাতেও তো তোর মা রেগে যাবে।

সে আমি জানি না। তুমি যেমন করবেই হোক

যাওয়ার ব্যাপারটা কাটিয়ে দাও।

প্রীনাথ চিন্তিত মুখে চেয়ে থেকে বলে, আমার

কথার কি কোনো দাম আছে ওর কাছে? তবু বলে দেখব।

তুমি বললেই হবে।



দুইই গম্ভীর মুখে সরিংকে নিয়ে পরের সপ্তাহে এলাহাবাদ রওনা হয়ে গেল তব্বা। তিন দিনের নাম করে গেল, সাত দিনেও এল না বা চিঠি দিল না।

তারার খবরের জন্য এ-বাড়ির কেউই উদ্ভিষ্ট নয়। শূন্য বুড়ো দীপনাথ মাঝে মাঝে ডাক-খোজ

করেন, ওরে বউমার পৌছন সংবাদ এল? ডাকঘরে, একটু পৌছ নে না তোরা। ওরা তো কত চিঠি হারিয়ে ফেলে, বলি করে না।

প্রায় রোজই মজা আর স্বপ্নার সংগে সজলের ঝগড়া হয় আজকাল। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। বাগদন প্রায়ই গরু ঢেঁকে। বাড়ির গরু দুই দুই অনেক কম হয়। গ্রাহকরা রাগারাগি করে। হাঁস মুরগিদের ডিমও কম পড়েছে আজকাল। উঠানে শুকনো পাভা পড়ে থাকে। রাতিবেলা তুষার ঘরের দাওয়ার নীচে বসে ইস্পাত রাতঝরতে কেনে ওঠে প্রায়ই।

এই ভাবে একদিন মলাবদল সেরে নিশুতরতে চুপিচুপি বিনিকে এনে ঝোপড়ায় তুলে ফেলল ক্যাপা নিড়াই।

পরদিন তাকে নিয়ে হইচই পড়ে গেল বাজারে। জটা নেই, টেরিকটা মাথা। দাড়ি কামানো। প্রথমটার লোকে চিনতেই পারেনি। গম্ভীর মুখে সাজার করছিল। একজন দুজন করে চিনে ফেলাতেই ভীড়ে ভীড়াকার।

নিতাই ভীড় ভালবাসে। তাকে নিয়ে লোকে হইচই করুক তা ও চায়।

সে ভীড়ের দিকে হাত তুলে বরাভয় দেখিয়ে টিউবওয়েলের মাথায় উঠে দাঁড়াল। গলা কেড়ে বলল, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের পরিচিত নিত্যানন্দ মহারাজ এখনো নিত্যানন্দ মহারাজই আছেন। তলসাধনা অতি গুহা সাধনা। এর স্বরূপ কেউ জানে না। গতকাল গুরুদেব স্বপ্নে আদেশ করলেন, ওরে নিতাই, অনেককাল ব্রহ্মচর্য হল। এখার একটু গেরস্থ হ। গহস্থ না হলে সংসারটিকে টের পাবি কি করে?

তোরা তো পনেরো আনাই হয়ে আছে, এইটে হলেই খেলে আনা হয়....

শূনে লোকে হাততালি দিল।

পনেরো দিনের মাথায় এলাহাবাদ থেকে কাশী আর লখনউ ঘুরে ত্যা ফিরে এল। নিড়াই ঝোপড়ার দরজা আর দিনমানে খুললই না পৌছন।

ত্যা ফিরে আসার পরই গরুর দুই বেড়ে যায়, হাঁস-মুরগিরা উঁচি মতো ডিম পাড়ে, উঠোন ককক করে, মজা স্বপ্না আর সজলের ঝগড়া মিটে যায়।

তবে তুষার মুখ একটা কাঠের যুথের মতো গম্ভীর থাকে। সহজ হয় না, স্বাভাবিক হয় না।

পরদিন সকালে গ্রীনাথের ঘরে এসে ত্যা বলল, ছেলে আমার পছন্দ হয়েছে। মত দেবো? পছন্দ হলে মত দেবে না কেন?

তোমার মতও আছে। আমার মত বল কিছ, নেই। কিন্তু তুমি যেকের বাবা, চিঠিটাও তো তোমাকেই লিখতে হবে।

আমি আজকাল লিখতে পারি না। হাত কাঁপে। তুমি লিখে দাও বরানটা, আমি সই করে দিচ্ছি।

ছেলেটা কেনম তা জানতে চাইলে না? তোমার কখন পছন্দ হয়েছে তখন ভালই হবে। সংসারের এ সব ব্যাপার তুমি আমার চেয়ে অনেক ভাল বোঝো।

ত্যা চলে আসে। ঝোপড়ার বেড়ার ফাঁক দিয়ে দুই জোড়া ভীড় চোখ লক্ষ করছিল ত্যাকে। এখনো টের পায়নি।

কিনে যে এ-করে আছে তা কারো জানা খবর নয়। ধরা পড়লে কী হবে তাও ভেবে ঠিক করতে পারছে না দুজনে।

ত্যাকে কেউ কিছু বলেনি। তবু আনমনে ভিতরকাঁড় দিকে কিমতে কিমতে ত্যা একবার আলতো দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ঝোপড়ার দিকে। তাকিয়েই হুঁ কোঁচকাল। ঝোপড়ার উঠোনটা নিকোনো, ভাল চট্টা। একটা নতুন গামছা খুলছে দাঁড়তে।

ঘরে এসে সে মলুকে ডেকে বলল, ক্যাপা নিতাইকে ঘরে আন তো। আর দেখে আসবি ওর ঘরে কেউ আছে কিনা। বললই পল্লমুহুর্তে আবার কী একটু ভেবে বলল, থাক এখন। বিকেলের দিকে ডেকে আনলেই হবে।

মলু হালিমুখে বলল, আজো নিতাই জটা ছেঁতে কলেছে। দাড়িও চেঁচেছে।

ত্যা কাঠমুখেই বলল, ও। আচ্ছা যা। সজলকে বলিস, বেন ইস্কুলে বাওয়ার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যাব।

প্রাস পাওয়ারের চশমা চোখে পাতপাককে দেওয়ার চিঠিটা মুসাবিদা করতে বলল ত্যা। খুব বেশীকিছু লেখার নেই। তা হলেও অনেকটা সময় নিয়ে সে নিছুল করল চিঠিটাকে।

মা!

ত্যা তাকাল। দরজার সেই মানুন্টার দ্বারা। সারা মাইনে যে একটি মাত্র মানুন্কে ভালবাসতে পেরেছিল ত্যা। কিন্তু তার এই ছাত্রকে সে কেন ভালবাসার চেয়েও ভর পায় বেশী?

মা আর ছেলে মুখোমুখি তাকিয়ে থাকে। দুজনেই আজ বেন স্পট মুহুর্তে পারে, আমদা পরস্পরের লড়া।

# “আমিই টিয়ারা সুকন্যা, রূপসী অনন্যা”



- সবরকম হুনের ঘরের মতো টিয়ারা, দখল করে।
- টিয়ারা গ্রন শ্যাম্পু
  - টিয়ারা লিমোন শ্যাম্পু
  - টিয়ারা বিটটি শ্যাম্পু
  - টিয়ারা ফিলকাই শ্যাম্পু
  - টিয়ারা লম্বোনিন শ্যাম্পু
  - এখা টিয়ারা হেয়ার কন্ডিশনার'ও পছন্দ যাক।



**টিয়ারা**  
শ্যাম্পু

হুনের ঘর ঘর মতো টিয়ারা, দখল করে।

# স্মৃতি সততই সুখের

প্রতিভা বসু

২১

রাতিবেলা হোটেলের নিয়ম অনুযায়ী যেমন তাড়াতাড়ি খাওয়া হয়ে গিয়েছিলো, তেমনই শোয়াও হয়েছিলো তাড়াতাড়ি। আর ঘুমিয়ে পড়তেও দেরি হয়নি। সারা দিন ধরে যা যোরাখাড়া চলছে সর্বত্র, বিছানায় গা দিলে নিম্ন-দেবীকে আর আরাধনা করতে হয় না। পা বাড়িয়েই থাকেন, লাগিত হলেই চোখের পাতায় এসে আসন পেতে বসেন।

এরিনতে দৌরতে ঘুমোলেই আমাদের চিরকালি জন্মভূমি। অল্প কয়েক বছরের রাত ভোগে লিখতেন, আমি সেলাইয়ের কল নিয়ে বসতাম। শতশ শতশ সেলাই জমা হয়ে থাকতো। সকালের দিকে সমস্তই পেজাম না, আর খেয়ে উঠে ঘুমিয়ে ঘুম শেয়ে যেত। শিশুকন্যাটি কড় ঘুমের বাঘাত করত রাতিবেলা, ফলত ষিপ্রাধিক নিদ্রা থেকে চেপে খুলে রাখা হয় হত। কিন্তু এই সময়টা খুব ভালো। খুব নিজস্ব। কাজ করা যায় মন দিয়ে। তবে রাতের ওপরি আমি দেখতাম না কখনো, বুজদের শূভেন ডরও অনেক পরে। তারিও লেখার কাজটা জমা থাকত রাতিরের জন্য। সকালে বেলায় ওঠার অভ্যাস, উঠেই তো ছুটফুটিয়ে নিয়ে খেয়ে, কলেজে ছোটো, কলেজ থেকে যদি তাড়াতাড়ি আসতে পারতেন তা হলে তখনই বসে যেতেন টেবিলে। যেদিন দেরি হত সেদিন আর সময় কই? কৈফালি চারের পর্ব সাপা হতেই চান-টান সেরে সাধা আভার জন্য প্রস্তুত। আর্জি জন্মেতে দশটা সাড়ে দশটা, এর পর আহার। কিন্তু আহারের পরে নিদ্রা নয়। তখন ঘটা তিনেক কাজ। এই নিদ্রা ছিল।

বয়স হতে হতে অবশ্য রাত জাগার ব্যাপারটা অনেকখানি বর্জন করতেই হয়েছে শারীরিক কারণে, তবুও রাত জাগার প্রতি খুব আকর্ষণ বৃদ্ধকরে। সুযোগ পেলেই হল। আমিও ঘুম-কাহুরে না হওয়া দরুন কোনো প্রতিবন্ধকও ছিল না। লন্ডন পারিয়ে যাবেন পরিমাণে পাওয়া গেছে সে সুখ। কিন্তু এখানে তার প্রশ্ন নেই। এখানে আটটার খেয়ে নটা সাড়ে নটাতেই ঘুম। সত্যি, ছুটতেই ঘুম ভেঙে গেল আমার। তাকিয়েই সমুদ্র থেকে উঠে আসা সূর্যের লাল লাল রোদের গোখালি আভা দেখে মনটা পিঁচ হয়ে গেল। সারা বয়স যেন ঈশ্বরের প্রতিরূপ। উঠে পড়লাম বিছানা ছেড়ে।

এরিনতেও চোখ খুললে আমি আর বিছানায় থাকতে পারি না। থাকা যাকও না। কত কাজ থাকে কাজে। এখানে একেবারেই নিষ্কর নিরুৎসাহ। হাটাইট নেই, খাটাইট নেই, ঘড়িও নিকমে সব পৌঁছে যাবে হাতের কাছে, শূন্য কণ্ট করে কোমিট টোপা। ইচ্ছে করছিল খুঁজে খুঁজে ওদের বিচরনে গিয়ে হাজির হই। অবশ্য তা কেলান না, জানিলায় গিয়ে দাঁড়িলাম। দেখলাম দিশতাবাপী আকাশ আসতে আসতে লাল থেকে সাদার রূপান্তরিত হচ্ছে, দাঁড়িতে ভেজার বিকিরণ শূন্য হচ্ছে, সুশীতল বাতাসে তার চেঁচা নেমেছে, আর জল—

জলে তাকিয়েই আমি চমকে গেলাম। মোহনার উপরে পালটি কোথায় গেল? এই পাল এটি অতি সম্প্রতি বসে। সারা দিন গাড়ি মোটর স্কটর মানব কত কী কত আর আসতে। সাঁকিয়েই শূন্য। সারা রাত হাসা-খাওয়া বিরাম নেই। কিন্তু এখন দেখলাম সেই পল্লি স্মৃতিটি। এতটাই চমকে উঠিলাম যে, আমার গলা দিয়ে আনন্দাক বেরিয়ে এল।

ভাড়া ভাড়া ঘরে বৃদ্ধদের কলমে 'কী ব্যাপার'।

দেখে যাও—

উঠে এলেন। নদীর মতো প্রস্রাব মোহনা অসংখ্য বক্রে কুলকুল শব্দে বয়ে যাচ্ছে এপার ওপার মথিত করে। উপরে পাল নেই। এ কি ভোজকাজ নাকি? কাল এসে থেকে যতক্ষণ ঘরে ছিলাম স্কট তাকিয়ে দেখেছি এ সেতুর রাজপথ, রাজপথের লোকজন যানবাহন—সব কি তাই চলছে প্রাণিত? এখান জলে ভেঙ্গে গেছে কত কড় বড় সব পাল-তোলা নৌকো যাচ্ছে, মাস্তুল-তোলা নৌকো যাচ্ছে, সবই মূলবাহী সওদাগরের নৌকো, জিনিসপত্র ঠাসা।

এই ধরনের সওদাগরী নৌকো আমি দেখেছি আমার ছেলেবেলায়। এরকমই খাল হয়ে আসত, আমাদের ঘাটেই ভিড়ত। আসত বরিশালের গ্রাম দাসপাড়া থেকে, যেখানে আমার পিতৃপুরুষের জন্মভূমি। সংবৎসরের খাদ্যপ্রব নিয়ে যোঝাই হয়ে আসত। তাতে যে কতরকমের তৈজসপত্র থাকত তার ঠিক নেই। সবারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস। চাল ভাল তেল নুন শুকনো লবঙ্গা এলাচলান আলু-কুমড়া কিসমিস মনাকা গড়—আর নাককলা যা আসত সে তো পাহাড়। কালের কতও অবশ্য পাহাড় প্রতিমই। চালগুলো গিয়ে গোলাল ঢালত, মাটি থেকে টাই পরশত ভরতি হয়ে যেত। তৈজসপত্র রাখত টানা লম্বা তিন হাজার ভাঁড়ের পরাম্বার, নারকেলগলো জড়ো হয়ে থাকত চক-মিলাতো বাড়ির মত চৌকো উঠানে। আর কর্দি কর্দি কলার ছড়া।

এখন জেলা-পাড়া করে জায়গামতো সাজিয়ে রাখত হিম্মিসম খেয়ে যেতেন

মা-কাঁচা-ঠাকুরা। সাহাবকারী ছিল আমাদের সব বাড়ির কোলে-পটে করে মানব কর কোন কালক-কলে মজফরপুর জেলা থেকে আসা ছোটো। নৌকার আট-সাতজন মাঝি তো হেইও হেইও বলে ঘাট থেকে উঠেন এনে ফেলেই খালাস। উঠান থেকে কলারায় তোলা আবার বরালায় থেকে ঘরে তোলা সোজা কথা নয়।

আমাদের সবচেয়ে বেশী লোভ থাকত টিন টিন তেঁতুলছড় আর ধামা-ভরতি কিসমিসের উপর। একনো সবার আগে তাড়াতাড়ি সে দুটো জিনিস চলে যেত ঘরে। তারই মধ্যে ছুরি করে করে সেই তেঁতুল খেয়ে এক-একজনের অঙ্গুষ্ঠ করে কেত। মটো মটো কিসমিস খেয়ে পেট ফাটত হত।

তেঁতুলটা অল্প ঘরে তুললেই যে ঘরেই আটকে থাকবে না তা আমরা জানতাম। সব গৃহ্যনে হলে সেগুলোর আবার বেরিয়ে আসবে উঠানে, চাটাই পেতে রোদ্দুরে সেওয়া হবে, শুকিয়ে বৌজা হলে আবার কেটে কেটে তার বিচি করা হবে, যে বিচি দিয়ে আমরা ছোড় না বিজোড় খেলব। পাহারায় বসে থাকবে আমাদের উঠান বাড়ু, ক্ষেত্রা বড়ী, হাতে লাঠি থাকবে একজন। কাক তো তাড়ালে হবে না, কেন্দ্র পাতলা একজন পক্ষ্মে। কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকবে সে তেঁতুল। তাড়ানো হবে আমাদের। একজনই লাঠি নিয়ে বসে থাক। বড়ী বড় কড়া। জাগও খুব বেশী। আশেপাশে হাটতে দেখলেই কে রাস বলে এমন হাঁক দেবে, এক দৌড়ে সে পালিয়ে বাঁচবে। শূন্যই কি তেঁতুল? কুলও তো এসেছে, তাও তো রোদ্দুরে পড়েছে। শূন্য অনেক। অনেককমেই।

সকালবেলাকার ঘুম-জাড়া চেপে এসব নৌকার ডিড় দেখে কত কাল কদে মনে পড়ে গেল সেসব কথা।

বৃদ্ধদের কলে, সীতা তে, পুলাটা গেল কোথায়?

তারপরেই লক্ষ পড়ল দুই তীরে দুটি উদ্ভটমুখী লোহার স্ক্রেনের দিকে। আসলে পুলাটি স্বর্গিক নয়। প্রয়োজনমতো এইসব বড় বড় সওদাগরী নৌকো বা মালবাহী জাহাজকে কদমের দিকে অথবা সমুদ্রের দিকে যেতে ক্ষেত্র জন দাপ্তরিক কৌশল দু' দিকে ভাগ হয়ে উঠে থাকে, আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে নেমে আসে নিচে। জড়ো বার মূখে মূখে। ঠিক ট্রেনের লেভেল ট্রান্সয়ের মতো।

সময় নিত্যই নির্দিষ্ট করা আছে। যেমন রাস্তার থাকে ট্রাফিক পুলিশ। আলো জ্বালিয়ে কিংবা হাত দেখিয়ে কখনো পথিক পথ করে, কখনো গাড়ি পারা করে। ঠিক তেমনি।

কীভাবে এসে দুটো লোহা আবার বিশাল সড়কে পরিণত হয় সেটা দেখবার জন্য আমি ঠাণ্ডা দাঁড়িয়ে থাকলাম। এক সময়ে নেমে এলো, জড়ো গেল মূখ, আর সঙ্গে সঙ্গে দু'পাশে জমে-থাকা মানবজন গাড়ি মোটর স্কটর সব চলতে লাগল হুসহাস করে। একদম অন্য চেহারা হয়ে গেল জায়গাটার।

প্রাচুর্য নিয়ে এল পরিচারিকা। হাসিমুখে অভিবাদন জানাল। জিজ্ঞেস করল রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল কিনা। ওদের পরিচরার কোনো দৃষ্টি হয়েছিল কিনা। আমি টাটকা করে বললাম, এত খাবার এনেছে কেন? দরুন তো মানব। নাকি ভারতীয় দেখে বাঘ ভেবেছে? হাসতে হাসতে মরে গেল মেয়ে, গাল দুটো আশেপাশ হয়ে উঠল।

কথা ছিল সন্ধ্যাটা আর বেলাই না। দুপুরে লাভের পরে সন্ধ্যা তিনেক লাগত ভুল্লোকে আসবেন, পার্বলিক হলে কতটা আছে বৃদ্ধদের, সেখান থেকে নিয়ে থাকেন তাঁদের প্রমোদকানন টিভাল পার্কে। তাই হল। বেশ বিশ্রাম হল খানিকটা। ভুল্লোকে তাঁদের জাতীয় স্কটার অনুযায়ী ঠিক ভিনটার সময়েই এলেন। খুব হাওয়া ছিল, যেন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আকাশ গভীর নীল। ভীষণ ভালো লাগল চারিদিকে তাকিয়ে। স্কটার সময় ছিল সাড়ে তিনটে থেকে পাঁচটা। অর্থাৎ শহরের কেন্দ্রস্থলে, মিটিংয়ের জায়গাটা মাঠে করেক মিনিটের পথ। সেই একবারে বৃদ্ধদের আর একবার চিত্রশলাটা দেখে নিলেন। এও তারকাক্ষের ছাঁই তাঁর প্রধান আকর্ষণ।

সভা শেষ করে টিভাল পার্কে এসে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, শহরের সব আলো জ্বলি গিয়েছিল ততক্ষণে। কিন্তু টিভাল পার্কে ঢুকে যে কিন্দুগুড়ার সম্মুখীন হলাম তা অচিন্তনীয়। বেশ দীর্ঘনিশ্বাস। সারা পুরটা আলোয় আলোময়। তার যে কত রু, কত ধনু, কত ছোরা তার ঠিক নেই। শূন্যই কি আলো? ফুঁটার আলোজনই বা কত! কেউ মদ্যমেদার উঠে থাকে, কেউ দোলনায় দুলে, কৃত্রিম শব্দে উঠে কেউ কেউ, গাড়ির পড়ছে ইচ্ছে করে, কিছুও আছে কোণে কোণে, লতাপাতার আঁকড়ালে আলোর উজ্জ্বল্য আপসা দেখানে। সেটা প্রেমের জায়গা। কোথাও মজলিক হচ্ছে, কোথাও দি বাজিয়ে মালিক পড়ুল খেলা দেখতে আকর্ষণ করছে কাচাদের, কোনো ভাঁহুতে নাচ হচ্ছে, গান হচ্ছে, বাক্সা হচ্ছে—সব এক উপবের আলোয়।

আমি কলাম, খুব ভালো সময়ে এসেছি তো, খানিকটাল হচ্ছে স্বর্গিক? ভুল্লোকে কলে, না না, কান ভাল কেন। যেকোনো সময়ে থেকে রাত পশত এই পার্কে এসব হয়, দিনে থাকে না। সন্ধ্যা পরে একেবারে লগে জে? সেরানই এই কলোবন্ত।

# রাবেক্স ঊষতা দেয়



সর্দি লেগেছে? তো খোকায় নাকে রাবেক্স  
মাশিশ করুন না! ওর বক নাক খুলে যাবে  
আর সহজে নিশ্বাস নিতে পারবে।  
রাবেক্স ওর বুকেও মাশিশ করুন, দেখুন এর  
উষ্ণতা কেমন চমৎকার কাজ করে! রাবেক্স  
বুকে মাশিশ করতে শুরু করলেই সর্দি-শ্লেষ্মা  
গলতে শুরু করবে। মনে রাখবেন, সর্দি-  
শ্লেষ্মার ভোগান্তি থেকে চটপট আরাম  
পাবার নির্ভরযোগ্য ওষুধ—রাবেক্স!

## সর্দিতে আরাম আনে



## রাবেক্স



গ্রাইকোডিন-এর নির্মাতা  
অ্যালোথিক-এর উৎপাদন।

ঊষতা ছড়ায়,  
সর্দি-শ্লেষ্মায় আরাম আনে।

এই মেলা কোথায় চলে এখানে?  
দেখ। কত খাবার দোকান রয়েছে দেখেছেন?  
অনেকে খায়। আজ আমি আপনাদের খাওয়াব। আসুন না, নগরবাজারে  
কেন।

আগরকোলা? না, না। দেখেই মাথা ঘোরে।

গহাড়ে উঠবেন?

না, না।

অনেকগুলো তাঁর আছে, চলুন ঢুক পড়ি কোথাও।

বৃদ্ধদের তো প্রশ্নই ওঠে না, আমিও ইচ্ছা না থাকার উনি কিয়ল  
লেন। অরপরেই উপস্থিত হয়ে বলে উঠলেন, ঠিক আছে। নৌকোবাহারে  
দেন।

কেনখায়?

এই দেখছেন না কত দূর পরন্ত চল গেছে কিরাট তাঁর, আর ভিতরে এক  
শুভ্র জগৎ?

জল আছে?

নিশ্চয়ই। তাতেই নটীরঘোটে চেপে বেড়ায় লোকেরা। চমৎকার ঝিগ। খুব  
শুভ্র, খুব ভালো। চলুন।

এখানেও বৃদ্ধদের গল্পরাঙ্গী। এসব ছেলেমানুষিতে তারা আগ্রহ নেই। মৃদু  
হাসে সিকিয়ে অসম্মতি জানিয়ে বললেন, আপনি বরং একে নিয়ে যান, আমাকে  
নাফ করুন। আমি বৃদ্ধ স্তলগুলো দেখি ততক্ষণ।

তাই চলুন। অমনি টিকিট কাটলেন ভদ্রলোক।

তারিকের দেখানো টিকিটের আদাম নিল তার অন্ধ অরহলার যোগা নর।  
লসলাম, গীর্জিমিহি কী দরকার ছিল, এই তো কেমন সুন্দর ঘরে ঘরে মেলা  
দখাছিলাম, আলোগলো কী চমৎকারভাবে সাজানো, কী সুন্দর ফোয়ারা,  
সহাড়।

আমাকে প্রায় বগলদ্বারা করে নিয়ে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, এই  
গীমলাড়ে আপনাকে আমি নিয়ে যাবই যাব। প্রফসর বোস এলেন না, এলে  
নশ্চয়ই খারাপ লাগত না।

ভিতরে ঢুকে দেখি সত্যিই একটা রাজহা। সেখানেও পার্ক আছে, দোকান  
বাছ, গাছ আছে, অনেকে বসে আছে বৌদ্ধত, কোকোকলা আছে। তার এদিক  
দয়েই বসে যাচ্ছে খাল। সেখানে গিয়েও আপিল-জেরে টিকিট নিতে হল। অবশ্য  
সই টিকিটের দাম নেই। টিকিট নিয়ে খালের ধারে নির্দোষ জায়গায় এসে  
ড়িডাতেই ভেসে এল বোট। আলদা প্রবেশপথে ছোট ছোট সিঁড়ি নেমে উঠে  
ইলাম বোট। বাইরের জগতের সঙ্গে আর এর পরে কোনো সম্পর্কই হল বলে  
নে হল না।

নৌকোটাতে কোনো চালক নেই; নিজেই নসিছিল, নিজেই চলতে লাগল।  
ছোট বোট মাঠে দখলো আসন পাশাপাশি। একথানাতে আমি কসলাম, একথানাতে  
টান কললেন। আর কদা মাঠে তরতরিয়ে চলতে শুরু করল। কী আকাবাকা খাল  
বলা যায় না। দু'দিক ভরী। তীরের কোনো জায়গায় গভীর জঙ্গল, কোনো  
জায়গায় সাজানো বাগান, আবার কোথাও খাড়ো পাহাড় উঠে গেছে উপরে।  
পাহাড়ী পথ বেয়ে গাড়ি নামছে, মানুষ নামছে, ষীপের জপাল থেকে ডাকিয়ে  
আছে হরিণ। এক জঙ্গলে একটা সিংহের নিন্দাও শোনা গেল। ঐতু জায়গায়  
কী করে যে এত সব করেছে কে জানে। জলাশয়টি অশ্রহীন। মনে হয় না সম্রাট  
পর্যন্ত না গিয়ে শেষ হবে। এই কাণ্ডকারখানা দেখে আমি স্তম্ভিত।

হাসি-হাসি মুখে ভদ্রলোক বললেন, এসব জঙ্গল কিন্তু একটুও নিরঙ্গল  
নয়। রমটল শেকর ভরাতি।

ও ব্যাপ।

হ্যাঁ। একটু সাবধানেই কান, টুপ করে কখন লাফিয়ে পড়ে ঠিক আছে?  
না, না। সাপ আবার লাকার নাকি? কলই গুটিসিটি ইলাম।

এমনতে ভদ্রলোক খুব শান্ত, গম্ভীর। হাসি সব সময়েই মৃদু এক নিম্নল।  
লাজুকও বেশ। উত্তরোত্তর কিন্তু বিবাহিত নয়। অনেক সময়েই দেখা যায় বরষক  
অবিবাহিতরা মহিলা সম্পর্কে একটু বেশী সচেতন। জোখে জোখে তাকান না,  
কথাও বলন দেওয়ালকে সম্বোধন করে। ইনি অনেকটা সেই জাতীয়। এই  
কর্ণিকের পার্কের আমার সেইসকলই ধারণা হয়েছে। রাখা পাটি পাটি করে  
আঁড়ে, নিকলের চশমা সেখে দিয়ে আবার দূরে সরে গেছেন জীবনের উজ্জলতা  
থেকে। কিন্তু নৌকা চড়ে দেখা গেল বেশ হুঁত-ফুঁত জ্বর।

বিশদ অবশ্য শব্দ র্যাটল শেকই নয়, আরো আছে। গৌফের ফিকে সেই-  
রকম মৃদু হাসি।

কীরকম? আমি ঈর্ষ ভীত।

ক্সয়গিলত নৌকা তো, চলে ইচ্ছেতো, ফেরে ইচ্ছেতো, আবার যদি হঠাৎ  
কপালদোবে কোনো যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে যায় তবে তো উপায়ই নেই।

হে কি।

## উৎকৃষ্টতর ক্যালামাইন আবিষ্কার করার সময় হয়েছে



## ততুত ল্যাক্সে ক্যালামাইন

- আরো ভাল শেড!
- আরো ভালো সুরভি!
- আরো ভালো ঢাকবার ক্ষমতা!



একমাত্র ল্যাক্সে  
ক্যালামাইন-ই পাওয়া  
যায় তিন রকমের  
গায়ের রঙে!  
ল্যাক্সে ক্যালামাইন মাখা  
যায় কত মোলায়েমভাবে...  
কত সহজে!  
ল্যাক্সে ক্যালামাইনের  
সুরভিও কত হালকা, কত  
মনোরম! সেরা তিনটিই  
তো আপনার প্রাণ্য!  
আপনার প্রাণ্য  
ল্যাক্সে ক্যালামাইন!

সারা দিনের জন্য ঔষধিযুক্ত আবরণ।

# Lakmé



(संस्कृत)

# কণ্টকলিত অতুল্য ঘোষ

(নব পর্বায়)

৯ ৩৮ ৯

বাম ফুট সরকারের তৃতীয় বর্ষ প্রতিপলকে নানা উৎসবের ঘোষণা হয়েছে। সংবাদটা যখন প্রথম পাড়ি, তখন বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয়নি। তারপর দেখলুম সত্যি সত্যিই ঘোষণা হয়েছে। তাজব ব্যাপার। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বহু সরকারই তো অনেক বছর থেকেছেন, উৎসব করার কথা তো কখনো শোনা যায়নি; তা হলে এ'রাই বা উৎসবের ঘোষণা করলেন কেন? সংবিধান অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবেই তো এঁদের পাঁচ বছর থাকার কথা! আর এ'রা যেরকম সংখ্যাধিক্য নিয়ে এসেছেন, তাতে তো মন্থিত ছেড়ে চলে যাবার কথাই ওঠে না! তবে হ্যাঁ, যদি ঘরোয়া কৌদলে ভেঙ্গে যাবার কোন আশঙ্কা থাকে, সেটা স্বতন্ত্র কথা। এবং তা হবে খুবই দুঃখজনক। আর সংবিধানের বাইরে যদি এ'রা না মান এবং তা সবুজও যদি ওপর থেকে বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়, তা হলে জনসাধারণ তো পুনরায় নির্বাচনে তাঁদের আরও অধিক সমর্থন জানাবেন। এর নজিরও আছে। অবশ্য এ'রা মাঝে-মাঝেই 'ষড়মন্ত্র' প্রভৃতি যেসব কথা বলতেন, তার থেকে মনে হয় স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে এ'রা নিজেরাই সন্দিহান। আর উৎসবের ঘোষণা করতেও মনে হচ্ছে যেন সত্যিই এ'রা সন্দিহান—যেন যে ক'দিন থেকে গেলাম, সেইটাই লাভ, এই মনোভাব আর কি!

মন্ত্রিসভায় যারা আছেন তাঁদের মধ্যে অনেকে এবং দলের মধ্যেও অনেক কর্মী সত্যিই কঠোর পরিশ্রমী এবং নিজদের আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন। তা হলে বার্ষিক উৎসব কেন? পাঁচ বছর কাটুক, আগামী নির্বাচনের সময় তো হিসেব নিকেশ হবে। তখনই তো উৎসবের দিন। কোন মন্ত্রিসভাই তো এক মাস, দু' মাস, পাঁচ মাস বা এক বছর, দু' বছর তিন বছরে কার্যক্রম শেষ করতে পারে না! সকলকেই তো দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। অবশ্য রাস্তা মেরামত, মজা খাল উদ্ধার—এসবের কথা স্বতন্ত্র। এসব করার জন্য তো আর উৎসব করা চলে না! তা হলে কিসের জন্য উৎসব? উৎসবটা কি ও'রা আছেন বলে? মন্ত্রিসভা বা দলের বাইরে থেকে কেউ যদি উৎসব করেন, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু এখানে মন্ত্রিসভা নিজেরাই তো উদ্যোগী! এ একটা কিসদুঃখ ব্যাপার! সব দেখে-শুনে মনে হচ্ছে যে, এ'রা যেন মনে করছেন এ'রা বিরোধী দলে আছেন। যে-কোনরকমে একবার বড়ী ছুয়ে গেলেন অর্থাৎ মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। বাস! তা তো নয়! এ'রা তো স্থায়ী সরকার গঠন করেছেন এবং ভবিষ্যতেও গঠন করতে চান। নির্বাচনে জনসাধারণের ভোট পেয়ে ও'রা এসেছেন। ওদের অহেতুক আশঙ্কার তো কোনো কারণ নেই। আর জনতা দলের



দল নন! তা হলে অর্ধপথেই উৎসবের ঘোষণা কেন? ও'রা কি মনে করছেন যে, তিন বছর থেকেই দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে? কোন কোন মন্ত্রী আবার বলেছেন যে, তাঁরা নির্বাচনের সময়ে যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন, তার অর্ধেকের উপর সমাধা হয়ে গেছে। এও একটা অশ্রুত কথা। তাঁরা নিজেরা নিজেরদের বাহবা দিলে তো হবে না। তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা কতটা ঘোচাতে পেরেছেন, সেটাই আসল কথা। তিন বছরে সেদিকে বেশী দূর এগোনো কি সম্ভব হয়েছে? ও'রা হয়তো বলবেন যে, পূর্বতন সরকারের দায়িত্বহীনতার জন্য অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। বেশ তো, যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে, ও'রা সত্যি কথাই বলছেন, তা হলে ও'রা জেনে-শুনেই তো ক্ষমতায় এসেছিলেন! এবং দায়িত্ব নেবার সঙ্গে সঙ্গে সেইসব অসুবিধা অপসারণেরও তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। গোটা রাজ্যের কথা ছেড়ে দিয়ে কলকাতা শহরেরই কতগুলি দুরবস্থার কথা ধরা যাক। কলকাতার রাস্তাঘাট কি জঙ্গলমূর্ত্ত? ফুটপাথ-গুলিতে কি এখন আর বাজার বসে না? মানিকতলা বাজার আর বড়বাজারের বাইরে রাস্তার উপর যে বাজার বসে, তা বোধ হয় আসল বাজারের থেকেও বড়। শ্যামবাজারের পশ্চিম দিকের ফুটপাথ দিয়ে কি হাটা যায়? বহু রাস্তার মানহোলের উপরে কোনো ঢাকা নেই। রাস্তায় গর্তের কথা তো আলাদা! রাস্তায় মানহোল ঢাকা না দেওয়া যে কি অপরাধ, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এ অবস্থায় কি উৎসব করা সাজে? আগে আগেও মাঝে মাঝে পানীয় জল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটত। আজকাল তো এটা নিতানৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাগজে একটা নোটিস আর রেজিওতে একটা ঘোষণা; বাস, তাতেই দায়িত্ব শেষ।

দুটি স্কুলের কথা আগেই বলেছি। মুরারিপুকুরে একটি স্কুল আর বি আর এল (৩)এ একটি স্কুল। আশেপাশে রাজাজানি, ছিনতাই-এর কথা ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু সে অশুভ শব্দে দু'গমই নয়, অগম্যও। কলকাতা

শহরেই যখন এই অবস্থা, তখন পানী অশুভ কি হচ্ছে বলা নিশ্চয়প্রয়োজন। অশ্রুত অবস্থায়! প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার দণ্ড পেলে কলকাতার ছাত্ররা। একই সঙ্গে : : অন্যান্য ওয়ালয়ও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে; কিন্তু সেসব জায়গা সম্বন্ধে কোন উচ্চ-বাচ্য নেই। আর প্রশ্নপত্র থাকে দোষে ফাঁস হল, তাদের কি সাজা হল? সিলে-বাসে যেসব বইয়ের নাম দেওয়া আছে, পরীক্ষার আগের দিন অবধি সে বইয়ের খোঁজ পাওয়া যায় না। যে রাজ্যে সামান্য স্কুলের লেখা লেখবার জন্য খাতা কিনতে লাইন দিতে হয়, সে রাজ্যে কি উৎসব মানায়? তারপর বিদ্যুতের কথা। স্বীকার কর অনেক অসুবিধা আছে। যে রাজ্যে বিদ্যুতের জন্য লেখাপড়ার ক্ষতি হচ্ছে, কেরা-সিনের জন্য কিউ দিতে গিয়ে 'ছেলেমেয়েদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে, সে রাজ্যে উৎসব কি মানায়? আর এই যে উল্টোডাঙ্গা থেকে কাকুড়াগাছি, মুরারিপুকুর প্রভৃতি জায়গায় কয়েক হাজার 'বসন্ত রিহাবিলিটেশন স্কিম'-এর যে চারতলা ফ্লাট আছে, তার সব কটিতেই চারতলায় জল ওঠে ইলেকট্রিক পাম্পে। ইলেকট্রিক পাম্প এখন কার্যকরী নয়—সকলেই জানেন। তা হলে থাকে দোতলা, তেতলা, চারতলায় জল তুলতে হয়, তারা কি এই উৎসবে সাথী হতে পারবে? এইসব উৎসব দেখেই তো এসব ফ্লাটের অধিবাসীরা উৎসবের প্রতি বিমুখ হয়ে উঠবে। তা হলে কাদের জন্য উৎসব? প্রতিবছরিতার তালিকা করার জন্য লেখা হচ্ছে না, খালি কতগুলি দৃষ্টান্তই দেওয়া হল। কোন মন্ত্রী বা দলপতি এসব কথার সাদৃশ্য দিতে পারবেন না। তবে হ্যাঁ, ক্লোথ প্রকাশ করতে পারবেন। কিন্তু ক্লোথ প্রকাশে তো মানুষের দুঃখকষ্ট লাঘব হবে না বা দায়িত্ব পালন করা হবে না!

কেবলমাত্র কল্যাণ করা বা শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকার নয়। বিশেষত বাম ফুট সরকার—যারা বলেন যে, আমরা আদর্শ অনুযায়ী কাজ করতে চাই, তাঁদের পক্ষে এ কথা আরও বেশী করে প্রযোজ্য। এ কথা বলা সহজ যে, বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী নিজেরের আদর্শমত সব ব্যবস্থা করা যাবে না। কথটা

কুস্বাস্থ্যে গড়ার মতো বই

জেমস্ হেডলী চেজ

আগাথা ক্রিস্টি

অ্যালস্টেয়ার ম্যাকলীন

অ্যালফ্রেড হিচ্‌কক্

আর্থার কোবাব ডয়েল

অপারেশন

ককটেল

প্রকাশিত হল ৥ কুড়ি টাকা

জেমস্ হেডলী চেজ

অর্কিড ভিলা

দশটাকা

জিরঞ্জীর সেনের

মিস্টেস

লাভার

বেডরুম

অপারেশন সিঙ্গাপুর ৯০০

ডেড ড্রপ ১০ বো হট ইনিমুন ১৫

মৌসুমী প্রকাশনী

১এ কলেজ রো \* কলকাতা-৯

যদি সত্যিই হয় তা হলে সরকারে যাবার প্রয়োজন কি? কিন্তু ক্ষমতা হাতই সীমায়িত হোক, কতগুলো কাজ তো অনায়াসেই করা যায়! যেমন—মানুষের মনোভাব পরিবর্তন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে যেসব মন্ত্রী ও অফিসাররা আছেন, তাঁদের আহার, বিহার ও আচরণের সঙ্গে কি বাম ফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী ও তাঁদের পরিচালনাধীন অফিসারদের বিশেষ পার্থক্য আছে? যদি না থাকে, তবে কেন নেই? কুচ্ছসাধনের কথা বলা হচ্ছে না, কিন্তু আচরণবিধি এই তিন বছরে কতটা পরিবর্তিত হয়েছে? অফিসাররা কি মনে করেন যে, জনসাধারণের সেবা করার জন্য তাঁরা আছেন এবং জনসাধারণের অর্থ থেকেই তাঁদের মাইনে এবং স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করা হয়? রাইটার্স' বিশিষ্ট-এ চাপরাসী, পিওন বা কনস্টেবল আছে তারা কি উপলব্ধি করতে পারছে যে, আগে যেসব মন্ত্রীরা ছিলেন তাঁদের সঙ্গে বর্তমান বাম ফ্রন্ট মন্ত্রীদের আচরণের কোন পার্থক্য আছে? দু-একজনের কথা বলা হচ্ছে না, সমষ্টিগতভাবে বিচার করতে হবে। মেডিকেল কলেজে ঢুকতে গেলে পরীক্ষা দিতে হবে কি হবে না এই নিয়ে দলপতি মুখ্যমন্ত্রী সমেত অন্যান্য মন্ত্রীদের ভৎসনা করেছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত আচরণের দৃষ্টি-বিচ্যুতির জন্য ভৎসনা করা হয়েছে, এমন কথা কোন দিন তো শোনা যায়নি! সংবিধানের জন্যে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের জন্যে সর্বাঙ্গিক বিপ্লব করা সম্ভব হচ্ছে না। ঠিক কথা। কিন্তু জনসাধারণ কি বুঝতে পেরেছে যে, এঁদের ইচ্ছা থাকলেও করতে পারছেন না? সে বোঝাতে গেলে তো ব্যক্তিগত আচরণ একবারেই বদলাতে হবে! কেবলমাত্র বুর্জুয়া, প্রতিজ্ঞাপন্থী এইসব বলে এর আগে ঘরী ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে তো পার্থক্য বোঝানো যাবে না! এঁরা যে প্রগতি-শীল, ব্যক্তিগত আচরণে তার কি নিজের স্থাপিত হয়েছে? তিন বছরের সালতামামি করতে গেলে এইটিই তো প্রধান বিচার্য বিষয়। যে ক্ষমতা হাতে পেয়েছেন, তার মধ্য দিয়ে নিজেদের আচরণের স্বারাও তো বোঝানো যায় যে, অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের মন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁদের কি পার্থক্য। দল বেঁধে ওলিম্পিক দেখতে গেলে এ রাজ্যের শতকরা ক'জন লোকের সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হবে? ওলিম্পিকের কথা পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ক'জন লোক জানে? এবং জনসাধারণের মধ্যে খেলাধুলার প্রসারের জন্য কি সরকার, কি স্পোর্টস কাউন্সিল কত টাকা খরচ করেন? গ্রামে গ্রামে যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, তাঁদের কতগুলি স্কুলের খেলার জায়গা আছে? ক'জন এ বিষয়ে খোঁজ করেছেন এবং এই তিন বছরে কতগুলি স্কুলের খেলার জায়গা হয়েছে? কলকাতা বা বড় বড় শহরে খেলার মাঠের কথা উঠলেই এ কথা বলা হয় যে, জায়গার অভাব। কিন্তু পল্লী অঞ্চলে তো এখনও জায়গা পাওয়া যায়। ভূমিহীনকে ভূমি সংগ্রহ করে দেওয়া অবশ্যপালনীয় কর্তব্য—এ বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। তেমনই ছে লম্বেরেদের

খেলার মাঠ এবং খেলাধুলার ব্যবস্থা করা কি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য নয়? ক'জন মন্ত্রী টাঙ্গিয়ে এসব খবর নেন বা অফিসারদের এসব খবর নিতে বলেন? এগুলো করার জন্য তো সংবিধানে আটকায় না বা কেন্দ্রীয় সরকার বাধাও দিতে পারেন না। বহু গ্রামে তো ধান শূকো-বার জায়গা অবধি নেই। এ কাজ অতি সামান্য। কিন্তু সেই সামান্য কাজেও তো দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন! মানবিক দিক দিয়ে বিচার করলে এরকম বহু কাজ করা যায়। এবং সেই পথেও তো বিপ্লবের বীজ বপন করা যায়। কিন্তু তা করতে গেলে তো দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের প্রয়োজন। সে চেষ্টা কতটুকু হয়েছে এই তিন বছরে? ক'জন আজ দাঁড়িয়ে বলবে যে, এই সরকারের ক্ষমতা সীমায়িত, তাই এঁরা আমাদের আপন? অন্যান্য রাজ্যের মন্ত্রীরা যখন টাঙ্গিয়ে যান, তাঁদের জন্য যে খরচ, যে ব্যবস্থা হয়, তার সঙ্গে বাম ফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীদের কোন পার্থক্য আছে কি? তিন বছরে এই পথে এই সরকার কতটা এগিয়েছে? বহু গ্রামে এখনও চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। মোবাইল হেলথ ইউনিট করে তো গ্রামে গ্রামে ঘোরানো যায়, তাতে তো সংবিধানে বাধা না! অনেক টিউবওয়েল ও পাম্প ওয়াশারের অভাবে অব্যবহার্য হয়ে পড়ে রয়েছে। সামান্য যন্ত্র-পাতি হলে গ্রামের লোকেই সেগুলো মেরামত করতে পারে। মোবাইল টেকনিক্যাল ইউনিট তো গ্রামে গ্রামে যেতে পারে এ কাজের জন্য! কংগ্রেসী এক মুখ্যমন্ত্রী এ কাজ করেছিলেন। তারপর কেউ আর সেদিকে নজর দেননি। আরও বহু ছোটখাট কাজ আছে, যেগুলো করলে জনসাধারণ বুঝতে পারবে যে, এখন ঘরী মন্ত্রী আছেন, তাঁরা তাদের নিজেদের লোক অতি কাছের লোক। আপন থেকেই তারা একটা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করবে। এই তিন বছরে সেদিকে কতটা কাজ হয়েছে? জলকন্ঠের কথা শুনতে পাওয়া যায়। লার করে খরার সময় জল সরবরাহ করাটা সংসদপথে বেশ চমকপ্রদ খবর বটে। কিন্তু বাস্তবে তো সেটা সম্ভব নয়। হাজার হাজার লোকের হৃৎকণ্ঠ এভাবে দূর করা সম্ভব নয়। অফিস পদের কথা বাদ দিচ্ছি। মন্ত্রীরা যদি ঐসব অঞ্চলে গিয়ে দু দিন করে বাস করেন, তা হলে বুঝতে পারবেন ঐসব অঞ্চলের লোকের সহযোগিতায় ছোট ছোট পুকুর উদ্ধার করা যায়, ছোট ছোট কুয়ো খোঁড়া যায়। গ্রামে বাস করার জন্য বলা হচ্ছে না যে, যে-কোন অবস্থায় বাস করতেই হবে। টেন্ট খাটিয়ে বাস করা যায়, বাসযোগ্য গৃহ খুঁজে বার করা যায়। আসল কথা—মন, দৃষ্টিভঙ্গী। এই সীমায়িত শক্তি নিয়ে রিক্ত, সর্বহার মানুষের কতটা আপন হতে পারা যায়, সেই দিকে চিন্তা করলেই এ কাজ করা সম্ভব। তিন বছরে এই বিষয়ে এই সরকার কতটা অগ্রসর হয়েছেন, সেটা তাঁরা নিজেরাই আলোচনা করে স্থির করুন। '৭৭ এবং '৮০ লোকসভা নির্বাচনে জনসাধারণ দোঁখিয়ে দিয়েছেন যে, শৃঙ্খল শেল্যনে তাদের ভোলানো যায় না।

বিভাগ

নরাময়ে নতুন পদক্ষেপ

বিজ্ঞানীরা এই বিকলগা ডাইরাসের নাম রেখেছেন 'ডিফেক্টিভ ইনটারফারেন্স ডাইরাস' বা সংক্ষেপে 'ডি আই' ডাইরাস। যার বাংলা পরিভাষা কম্বলে দাঁড়ায় প্রতিবন্ধক ডাইরাস।

এর প্রধান কারণ ব্যাকটেরিয়া হ'লে স্বাধীন জীব তাদের নিজেদের এক একটি শব্দেও জীব-ব্যবস্থানিক চরিত্র আছে। যেমন আছে তেমনি প্রাণী বা উদ্ভিদকেও। তাদের চরিত্রের সব কিছুই মোটামুটি ভাবে প্রাণীদের জন্য। জীবদেহের ক্ষাত্যচরিত্র অথবা যেখানেই বাস করুক, ওই সব কারণায় তাদের শরীরসংস্থার জায়গা ক'ভাবে ঘড়িতে পারে, ক'ই বলনের ওষাধের সাহায্যে তাদের প্রতিরোধ কা, যায়, শরীরের নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা বা 'ইন্টিগ্রেটেড' তাদের নিজস্ব করার ব্যাপারে বা ঘরনের ভূমিকা গ্রহণ করে সে সব ব্যাপারে অনেক তথ্যই বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন। তুলনায় জীবদেহের চরিত্র সম্পর্কে বহু কথা এখনও পর্যন্ত অজ্ঞাত।

বৌগ। এদের সাহায্যেই বণ্ণবৃদ্ধি করে তারা।  
কখন যখন ভাইরাস নিয়ম করার মত কিছু কিছু  
ওষধ যে তৈরি হয়নি, তা নয়। কিন্তু এসব ওষধ  
প্রচুড় বিষাক্ত। রোগে নিরাসের ব্যাধির ধ্বন সমস্যা  
রক্ষা ওষধ ব্যর্থ হয়, যখন ধরে নেওয়া হয় মৃত্যুই  
একমাত্র পরিণতি, শূন্যে সে ক্ষেত্রেই চিকিৎসকরা এ  
ধরনের ওষধ রোগীর ওপর প্রয়োগ করে থাকেন।  
ইতিমধ্যে ভাইরাসখচিত রোগের চিকিৎসার আর  
এক শ্রেণীর রাসায়নিক বৌগের কথাও ভাবা হচ্ছে।  
এদের বলা হয় 'ইনটারফেরনস'। এরা এক ধরনের  
প্রাচীন প্রাণীর বৌগ। ভাইরাস শ্বারা আক্রান্ত হলে  
জীবকোষে অণুর খেঁচেই এদের প্রস্তুত করে। তারপর  
এদের সাহায্য নিয়ে খেঁচে করার চেষ্টা করে আক্রমণ-  
কারী ভাইরাসদের। কিন্তু মশকিল এই, গত কুড়ি  
বছর ধরে চেষ্টা করা সত্ত্বেও যথেষ্ট পরিমল  
'ইনটারফেরন' তৈরি করার মত কোন পদার্থ এখনও  
অবিকৃষ্ট হয়নি। এছাড়া প্রাণীদেহে প্রয়োগ করে  
ভাইরাসখচিত রোগে সাহায্য তুলতে গিয়ে ক্ষতির  
কেনে আশংকা আছে কী না, সে সম্পর্কেও এখনও  
কোন সিদ্ধেহ নেই। এক্ষেত্রে প্রতিক্রমক ভাইরাস  
জামাদের কাছে আশার আলো বলেই মনে হয়।"

The diagram shows a sequence of four stages of cell lysis. In stage 1, a cell with a nucleus is surrounded by small particles. In stage 2, some particles have entered the cell. In stage 3, the cell membrane is shown with small gaps, and more particles are entering. In stage 4, the cell has ruptured, and its contents, including the nucleus and many particles, are released into the surrounding environment.

প্রতিবন্ধক ভাইরাস সৃষ্টির মূলেও কাজ করে প্রাকৃতিক ঘটনা। শারীরিক কোন দুর্বলতার কারণেই ভাইরাস গিরে সহযোগী আক্রমণ করলে। এই দুর্বলতার দরুন বংশোদ্ভবের তার জিনের কোন একটি অংশ হয়স্ব থেকে। যখন যা তৈরি হলো, তাকে বলা চলে 'ডিফেক্টিভ' ভাইরাস। দেহের কোষের বাইরে যদি কোন স্বাধিক ভাইরাস এসে প্রবেশ করে সে ক্ষেত্রে কোষের মধ্যে 'ডি আই' ভাইরাসের স্বাধিক বাইরে থাকে। তাদের পরিমাণ মাপাও এখন সম্ভব হয়। কিন্তু কম স্বাধিক ভাইরাস প্রবেশ করলেও অঙ্গের বংশবৃদ্ধি হারও কম থাকে। সে ক্ষেত্রে ঠিক তী পর্যাপ্ত 'ডি আই' ভাইরাস সৃষ্টি হলো সেটা জানা সম্ভব হয় না। কোষের মধ্যে এখন ম্যুটা রোগ সন্তানমাকার ভাইরাসেরই আধিপত্য চলেছে থাকে।

১৯৭০ সালে ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ ইনস্টিটিউট অফ  
টেকনোলজির দুইজন বিজ্ঞানী ডঃ আলান হুয়ার  
হয় ডঃ ডেভিড বালটমোর একটি তত্ত্বও নীতি  
স্বাক্ষরেন। তাঁরা বলেন ভাইরাস আক্রান্ত কোষে  
কতটা প্রতিবন্ধক ভাইরাস সৃষ্ট হবে সেটা ওই কোষের  
উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ ইনফ্লুয়েন্সার  
কণাও ধরুন। ইনফ্লুয়েন্সার কখনও কখনও মহামারীর  
রূপে দেখা দেয়। ওই সময় বত সখ্যাক রোগীরা  
শয্যাশায়ী হয় তার চেয়ে আক্রান্ত হয় আরও অনেক।  
যদি আক্রান্ত হয় শয্যাশায়ী হয় না তাদের কোষে  
ইনফ্লুয়েন্সার ভাইরাসের 'প্রতিবন্ধক ভাইরাসের' পরিমাণ  
তুলনামূলকভাবে বেশ থাকে। আর থাকে বলেই  
রোগ আক্রমণকারী ভাইরাসের বংশবিস্তি কমে যায়।  
কিন্তু কোষে প্রতিবন্ধক ভাইরাসের উৎপাদন হার কম  
থাকলে, কোষে আক্রমণকারী ভাইরাসের সংখ্যা বড়ে  
আক্রান্ত ব্যক্তি সহজেই শয্যাশায়ী হয়। বলা বাহুল্য,  
পুরা তার নিজস্ব প্রাতিরোধ কমই বহুদূর না  
করে যায়, কোষে প্রতিবন্ধক ভাইরাসের বংশবিস্তি  
তৎক্ষণ সমানে চলতে থাকে।

গতি কয়েক বছর ধরে প্রতিবন্ধক ভাইরাস নিয়ে

# হেমেন্দ্রকুমার বায় বচনাবলী

৪র্থ খণ্ড বের হল

দাম ২৫/-

৪র্থ খণ্ডের সূচী

ডাগমের হুঃস্বপ্ন। অমৃত-দ্বীপ। ভারতের  
দ্বিতীয় প্রভাতে। সব সেরা গল্প।  
এখন হাঁদের দেখছি। সর্বনাশা নীলা।  
১ম খণ্ড ২৫/-

সূচী : যকের ধন। সজ্জার পরে  
সাবধান। হিমাচলের স্বপ্ন। এখন  
হাঁদের দেখছি। মেঘদূতের মর্মে  
আগমন। ছড়া। চিঠি।

২য় খণ্ড ২৫/-

সূচী : অমাবস্তার রাত। মানুষ  
শিশাচ। এখন হাঁদের দেখছি। শনি-  
মঙ্গলের রহস্য। ছড়া ও কবিতা।  
অদৃশ্য মানুষ। চিঠি।

৩য় খণ্ড ২০/-

সূচী : জেরিগার কর্তৃত্ব। সাহিত্যিক  
শরৎচন্দ্র। সোনার আনারস। ত্বতের  
রাজা।

লেখকের অন্যান্য বই :

অমাবস্তার রাত ৫/-

ভূতের রাজা ৫/-

সব সেরা গল্প ৫/-

অমৃত-দ্বীপ ৪/-

অবন ঠাকুরের  
হোটেলের মস্তুরা - ২৬/-

আর

উপেন্দ্রকিশোর গুপ্তায়  
বায়-হেমেন্দ্রকুমারবায়  
নীলাগ্রহায়দায়  
এডওয়ার্ড লিয়ায়-সুইস  
প্রায়ল-হ্যান্স স্যাক্স-  
সন-গ্রিগ ডাইন্ডের  
বচনাবলী ও পাণ্ডুয়া  
যাঙ্কে মুখিই থাকে।

এসিয়া পাবলিশিং  
কোম্পানি

বহুলজ স্ট্রীট গ্রান্ড  
মোনকোয়া ৭০০০০৭

দেখে সাধারণভাবে ভিনটি সিদ্ধান্তও করেছেন  
বিজ্ঞানীরা। এক, সব রকম ভাইরাসই প্রতিবন্ধক  
ভাইরাস তৈরি করে। দুই, প্রতিবন্ধক ভাইরাস  
একমাত্র কেইসব ভাইরাসের সঙ্গেই প্রতিদ্বন্দ্বা করে  
যাদের থেকে তারা সৃষ্টি হয়। আর অর্থাৎ ইনকুবেঞ্জা  
ভাইরাসকে যদি প্রতিরোধ করতে হয়, তা হলে এমন  
ধরনের প্রতিবন্ধক ভাইরাস দরকার যাদের সৃষ্টি ওই  
ইনকুবেঞ্জা ভাইরাস থেকেই। অর্থাৎ বিভিন্ন রোগের  
ভাইরাসের প্রতিবন্ধক ভাইরাস হবে স্বভাবতঃ। তিন  
একমাত্র জিন হজ্জা ভাইরাস এবং তার প্রতিবন্ধক  
ভাইরাসের অন্যান্য গঠন-বৈশিষ্ট্য কোন তারতম্য  
নেই।

প্রতিবন্ধক ভাইরাসের সাহায্যে চিকিৎসা করার  
আপারে ইতিমধ্যে কিছু কিছু গবেষণাশাল ফলা-  
ফলের কথাও জানা গেছে। যেমন ধরুন, ক্যালিফোর্নিয়া  
বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জন হল্যান্ড এবং তার  
সভ্যর্থকের কথা। তারা ভোঁসকুটলার স্টোমাইটিস  
ভাইরাস (ভি এস ভি) নামে এক ধরনের ভাইরাস  
নিরে পরীক্ষা করেছেন। বিশেষ এই ভাইরাস গরুর  
শরীর এক ধরনের মৃদু রোগ সৃষ্টি করে। কিন্তু  
ইন্দুরের মস্তিস্কের ক্ষেত্রে এই ভাইরাস খুবই  
বিপজ্জনক। হল্যান্ড দেখিয়েছেন, ইন্দুর যদি প্রাণ-  
ঘাতী এনকেফেলাইটিস রোগে আক্রান্ত হয় এবং ওই  
অবস্থায় তার মস্তিস্ককে অধিক মাত্রায় প্রতিবন্ধক ভি  
এস ভি ইনজেকশন করা হয়, তাহলে আশাতীত  
সুফল পাওয়া যায়। বেশির ভাগ ইন্দুরই রোগমুক্ত  
হয়। তবে কখনও কখনও এক্ষেত্রে এনকেফেলাইটিস  
রোগের উপসর্গের বাপাসরে কিছু কিছু পরিবর্তনও  
দেখা গেছে। ইনজেকশন দেওয়ার পর কিছু কিছু  
ইন্দুরের স্বভাব-শল্য হয়। পেছনের পায়ে পক্ষাঘাত  
হতেও দেখা যায়।

‘ভি আই ভাইরাস নিয়ে আমরাও কিছু গবেষণা  
করেছি।’ বলেছেন ডঃ নিগেল ডিমক। ‘এর জন্যে  
আমরা কাজে লাগিয়েছিলাম ‘সেমলিক ফরস্ট  
ভাইরাস’ (এস এফ ভি) নামে এক ধরনের ভাইরাস।  
এই ভাইরাসটি প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯৪৪  
সালে, উগান্ডায়। এরা মানুষের শরীরে কোন রোগ  
সৃষ্টি করে না। যদিও এক ধরনের স্নায়বিক রোগ  
সৃষ্টিকারী ভাইরাসের সঙ্গে এর যথেষ্ট মিল রয়েছে।  
পৃথিবীর ক্রান্তীয় অঞ্চলে ঘোর পাওয়া যায়। এক  
ধরনের মশা এই ভাইরাসটি ছড়িয়ে থাকে।’

‘পরীক্ষার জন্যে আমরা নিয়েছিলাম কয়েকটি  
ইন্দুর। ইন্দুরের দুটি দলে ভাগ করা হলো।  
প্রথমে প্রথম দলের ইন্দুরের নাকে ইনজেকশন করা  
হলো বেশি মাত্রায় ‘এস এফ ভি’। দেখা গেল, খুব  
কম সময়ের মধ্যেই তারা এনকেফেলাইটিস রোগে  
আক্রান্ত হয়েছে। তাদের পান্ডুলি পক্ষাঘাতে জীর্ণ।  
তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে সবাই তারা মারা গেল।  
এরপর দ্বিতীয় দলের ইন্দুরের শরীরে ইনজেকশন  
করা হলো ‘এস এফ ভি’ এবং প্রতিবন্ধক এস এফ  
ভি। সমান সমান মাত্রায়। অর্থাৎ কণ্ড। এবার  
দেখা গেল প্রায় সব কটি ইন্দুর ইনজেকশন নেওয়ার  
পরও সুস্থ রয়েছে। তাদের মধ্যে রোগের কোন  
লক্ষণই পাওয়া যায়নি। লজ্জাকার নতুনই ভাগ ইন্দুরই  
বোঁচে গেল শেষ পর্যন্ত।’

কিন্তু প্রশ্ন এই, প্রতিবন্ধক ভাইরাসের ভূমিকাই  
যে এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছে তারই বা  
গ্রাম্য কী? এমনও তো হতে পারে, প্রতিবন্ধক  
ভাইরাস ইন্দুরের সহজাত রোগপ্রতিরোধকারী  
ব্যবস্থাগুলি সক্রিয় করে তুলেছিল বলেই দ্বিতীয়  
দলের কোন ক্ষতি হয়নি? এর ধনু ইন্দুরগুলির  
শরীরে হরত অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে থাকবে?  
কোষকলা সচরাচর যেভাবে জীবাণু ধ্বংস করে  
তেনমণিও ফটা সম্ভব? এমন কি ইনটারফেরনও  
কল্যাণকিত হতে পারে? বা ‘এস এফ ভি’র ক্ষতিকর  
প্রতিভার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ইন্দুরদের প্রাণ  
রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে?

এ সব সমস্যাই দূর করার জন্য ডঃ ডিমক নতুন

ইন্দুরদের দেহে এবার ইনজেকশনের সাহায্যে ট্যাক্সি  
দিলেন সমপরিমাণ ‘এস এফ ভি’ এবং প্রতিবন্ধক  
এস এফ ভি। তবে এবার যে প্রতিবন্ধক এস এফ  
ভি দিলেন শরীরে প্রয়োগ করার আগে তাদের  
অতি বেগুনি রশ্মির মধ্যে মধ্যে দেওয়া হয়েছিল  
কিছুক্ষণ। এর ফলে কোষের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে  
প্রতিক্রিয়া করার মত ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেললো।  
এক্ষেত্রে ইন্দুরগুলি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ‘প্রতি-  
বন্ধক এস এফ ভি’-ও বশিষ্টতার করতে পারে  
নি। ডঃ ডিমক দেখিয়েছেন, প্রতিবন্ধক ভাইরাস মিশ্রিত  
‘এস এফ ভি’ মস্তিস্ক কোষে গিয়ে হারিয়ে যায়।  
কিন্তু খুব কম সময়ের মধ্যেই সেখানে ‘এস এফ ভি’  
বশিষ্টতার হার প্রায় এক লক্ষ গুলের মত কম  
আসে। তুলনায় প্রথম এবং তৃতীয় দলের ইন্দুরের  
ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে যায়।

সমস্যা এই, এক এক ধরনের ভাইরাস শরীরের  
এক-একটি অংশে গিয়ে আশ্রয় নেয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে  
তারা যে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে তা নয়। শরীরের  
বিশেষ বিশেষ অংশে বাসা বাঁধার পর সেখানকার  
কোষে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া তারা করে, বিজ্ঞানীদের  
কাজে এখনও তা পরিষ্কার নয়। হরত সবাই তারা  
প্রতিবন্ধক ভাইরাস সৃষ্টি করে। কোন ভাইরাসের  
প্রতিবন্ধক ভাইরাস কোনটি তা সনাক্ত করাও একটা  
বড় রকম সমস্যা। সনাক্ত করার পর আছে সংগ্রহ  
করার সমস্যা। গবেষণাগারে কোর কালচার করে ওই  
সব প্রতিবন্ধককারী ভাইরাসদের পৃথক করতে হবে।

কৃত্রিম রক্ত

ওসকার গ্রীন রক্ত কো-অপারেটিভের বিজ্ঞানী  
ডঃ জো লাতিও এক ধরনের কৃত্রিম রক্ত তৈরি করে-  
ছেন। তিনি এই রক্তের নাম দিয়েছেন ‘এফ ডি এ’।  
পারমুরোডেকলিন এবং পারমুরোপ্রল্যামাইন  
নামে দুটি রাসায়নিক যৌগের সাহায্যে এই রক্ত তৈরি  
করা হয়েছে। এই রক্ত শরীরের শ্বাসত্বিক রক্তের মতই  
অক্সিজেন বহন করতে পারে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ,  
গ্লোমেরুলস প্রভৃতির সময় শরীরে রক্ত দেওয়ার  
প্রয়োজন হলে এই রক্ত ব্যবহার করা যাবে।  
একনাগাড়ে তিন দিনের মত ব্যবহার করেও শরীরে  
এখনও পর্যন্ত এর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া ধরা  
পড়েনি। এই রক্ত দেখতে দুধের মত। দুধের মতই  
তরল। এই রক্ত যুক্তের কোন ক্ষতি করে না।

অসুবিধে এই, সাধারণ রক্ত অক্সিজেন ছাড়াও  
যেমন শরীরের বিভিন্ন অঙ্গল পুষ্তিকর সামগ্রী  
পৌঁছে দেয়, কৃত্রিম এই রক্তের সে রকম কোন  
ক্ষমতা নেই।

সম্প্রতি মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত শলা চিকিৎসা-  
সকলের এক সম্মেলনে জাপানের বিশিষ্ট শলা-  
চিকিৎসক ডঃ কেনজি হোনিম্বা মন্তব্য করেছেন  
‘এ পর্যন্ত মেড শ জন রোগীর সমস্ত অস্ত্রোপচার  
করার সময় এই কৃত্রিম রক্ত আমি ব্যবহার করেছি।  
কোন জটিলতা আমার চোখে পড়েনি।’

সাধারণ ক্ষেত্রে কারোর শরীরে রক্ত দিতে  
গেলে দেখতে হয়, কার শরীরে কোন রক্তের রক্ত  
প্রয়োজন। যে কোন গ্রুপের রক্ত হলেই চলে না।  
কিন্তু নতুন এই রক্তে তেমন কোন বাধা-বিচার নেই।  
কৃত্রিম এই রক্ত যে কোন মানুষকেই দেওয়া যেতে  
পারে। অক্সিজেন ছাড়াও এই রক্ত যাতে ভিটামিন,  
মিউক এবং অন্যান্য পুষ্টিসামগ্রী বহন করতে পারে  
বিজ্ঞানীরা সে নিয়ে এখন গবেষণা করছেন। ডঃ  
হোনিম্বা বলেছেন, যদি আমরা সফল হই, ভবিষ্যতে  
লিউকেমিয়া রোগীদের আর বেঘোর প্রাণ দিতে  
হবে না। করুণী অস্ত্রোপচারের সময় রক্তের দরকার  
হলে আপাতত পঞ্চাশ শতাংশ আসল রক্ত এবং পঞ্চাশ  
শতাংশ ‘এফ ডি এ’-র মিশ্রণ রোগীর দেহে ঢুকিয়ে  
দিয়ে থাকেন ডঃ হোনিম্বা। তিনি আশা করেন,  
ভবিষ্যতে শ্বেদ কৃত্রিম রক্ত হলেই কার্জ চলবে।

সমরাজিৎ বর



# গ্রাম ঈশ্বরের সৃষ্টি, সবুজ বিপ্লব মানুষের কল্যাণকর দেব

দুটি শীর্ষভোয়া নদীর কাছিনী। ভূগোল বইতে তাদের নাম খেজে পাওয়া যাবে না। একটি জলপাইনদী জেলায়, অপরটি রাঢ় দেশে। দুটিরই তীরে দাঁড় কৃষিজীবীদের বাস। উত্তর বংশের নদীতীরের গ্রামটিতে প্রাণ মাংস খান রোমা হয়। কোনো বছর বৃষ্টি না হলে খান জ্বলে যায়—আসন্ন অনাহারের দ্বারা দেখে কৃষিজীবীরা কপাল চাপড়ায়।

দক্ষিণের নদীতীরে তিথি বিচার করে ডোঙা বাঁধা হয়। খান বসানোর সময়ে প্রায় বছরই বর্ষাক জলে যথেষ্ট কাঁচা হয় না। ডোঙা দিয়ে নদীর থেকে জল তুলে জমি কাঁচা করা হয়। এরপর তিন মাস বন্দাই ক্ষেতে জল নেমে—যদি ডোঙা দিয়ে জল তুলে দেওয়া হয়।

একটি গ্রামে একদিন আতঙ্কের বন্যা বয়ে গেল। যত্নমূল্যে ধর থেকে খবর এসেছে সরকার থেকে নদীতে রিভার পাম্প বসাবে আর সবাইকে তার জন্য বছর বছর জলকর দিতে হবে। অবশেষে ঠিক হল গ্রামের লোকেরা শহরে গিয়ে জমি জানায়ে খজনা দিতে পারবে না বলে। বলা বাহুল্য তাদের আঁর্জি গৃহীত হল, বাতিল হয়ে গেল রিভার পাম্প।

জনা গ্রামটিতেও একদিন পরিবর্তন হল এল রিভার পাম্পের জায়গা নির্বাচন করতে। গ্রামে একটা অসামান্য সূর্যের কপনায় চাপা শিহরন বয়ে গেল। সারা দুপুর কাঠফাটা রোদে সরকারী অফিসার, কর্মাক, বার্তাবহের মাথার ছাড়া ধরে ধরে বেড়াল গ্রামের মাথারা। গ্রামের বট-কিরা ঘোমটা ফাঁক করে দূর থেকে নজর করতে লাগল পরিদর্শক-দলের লোকজনকে। এখন সেখানে বছরে তিনটে চাষ হয়। জমির মানে পরিদর্শক ফসল ওঠে, আউশের মরসুমে সংস্কর জাতের ধানের। গোল আটারের বানে মাটির ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ার পর পাকা দেওয়ালের বাড়ি উঠেছে গ্রামে পঁচিশটা।

পশু শিকারের যুগ থেকে বহনই মানুষে পশুপালনের যুগে প্রবেশ করল। তখনই মানুষকে এমন অনেক কাজ শুরুর করতে হল—ক্ষয়বৃষ্টি অথবা পরিধারের প্রয়োজন সরাসরি মেটানোর জন্য পশু হাজার সঙ্গে যে কাজগুলির সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত অপ্রত্যক্ষ। এইভাবে সে নিজের তাক্ষণিক প্রয়োজনে স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়তার চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে অপেক্ষাকৃত ভবিষ্যতে ফলস্রবের জন্য বর্তমানে সক্রিয় হতে শিখল। এবং অনিবার্যভাবেই তখন তার ওপর অতিরিক্ত দায়িত্ব এসে গেল নিজের কাজকর্ম নিয়ে নিজের পরিকল্পনা করার। অতএব উৎপাদনের তারতম্য লক্ষ করে উৎপাদন ক্রিয়া থেকে জানাহরণ শুরুর হল। অথচ এত সব করে তার জীবন হল শিকারী জীবনের থেকে স্বাভাবিক। এর পর ক্রান্তিত প্রবেশ করে মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম কাজের সময় আরো কমল। অন্যদিকে উৎপাদনের প্রয়োজনগুলি লক্ষ করবার ও শেখবার সময় সে গেল বেশী।

এর ফলে হাজার বছর পরে অনাহারহীনতা মানুষের কোষের রক্তা বিপ্লবে পরিণতির বিকল্প হিসেবে দেখা দিয়েছে সবুজ বিপ্লব। সেচ ও সারের ঠিক ঠিক প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন লক্ষের জাতের বীজের ব্যবহার প্রথাগত জলস্রবের চেয়ে উৎপাদনকে এতখানি বাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে যে তাকে বিপ্লব নাম দিতেই হয়।

জাতীয় আয়ের ভাগাভাগিতে কৃষির অংশ সামান্য কম হলেও ন্যূনতম বেঁচে থাকার জন্য লক্ষ্যবাহী খাদ্য ফসল উৎপাদন করে কৃষি এবং অধিক সংখ্যক মানুষের লাভজনক কর্মসংস্থানের নীতি কৃষিতেই বেশী সম্ভব ও কার্যকর। কৃষি-সংস্কার রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয় এবং পরিস্থিতি আলাদা রকমের হওয়ার এই ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে গত তিরিশ বছরে ভিন্ন ভিন্ন দাঁড়পণী

অবলম্বন করা হয়েছে। যেটা সকলেই জানেন পাজিবা চারিয়ানায় কৃষি জমির ব্যবসায়িকরণকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। চকবন্দী অর্থাৎ জমি একত্রীকরণ হয়েছে সমবায় হয়েছে, নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষিজীবীদের সমবায় নয়—ভূমি মালিকদের সিলিং। এজন্যের জন্য তাঁর বাবা পিসী ছেলের সমবায়। এইভাবে পঁচিশ থেকে পঁচিশ শ একর জমি এক একটা সমবায় খামারের অধীনে আনতে পারলে সেচ চাষ আর বজারীকরণের খরচা অনেক কমে যায়। যেমন ধরা যাক একটা আটঘোড়া (অশ্বশক্তি প্রচলিত বাংলা নাম ঘোড়া) মোশনের (মোটর পাম্পের) দাম আটটা একঘোড়ার মোশনের অনেক কম—উপরন্তু তাকে চালাবার জ্বরের এবং পিচ্ছিলকারী ঘর্ষনের খরচও অনেক কমে যায়। প্রতি একর জমির পেছনে ব্যাক অগ, বীজ সার বোমাড করার যে সব অপ্রত্যক্ষ শ্রম আছে সেটাও অনেক কমে যায়। জমি বড় হওয়ার জমির একটা না একটা অংশ জলের উৎসের লাগোয়া থাকে এবং অন্যান্য জমির ওপর দিয়ে নিয়ে আসবার ছোটখাটো ভোগ করতে হয় না। অবশ্য একটা বড় খরচা—সারের খরচাটা একই থেকে যায়।

ফসল ফলাবার কাজে বৈজ্ঞানিক গবেষণা-গুলির উন্নততম ফসলগুলির প্রয়োগে এইসব কারণে সব বড় বড় খামারগুলিই নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। সে খামার কখনো পাজিবা চারিয়ানার তুলে ভূমিমালিকদের সমবায়ের অথবা পাশ্চাত্যের দেশগুলির মত একক ভূমিমালিক মালিকানাধীন আবার কখনো বা কমিউনিস্ট দেশগুলির মতন কমিউনের মালিকানাধীন (রাশিয়া) অথবা পরিচালনাধীন (চীন)।

পশ্চিম বাংলার একক বৈশিষ্ট্য হল এই বড় খামারের নেতৃত্ব ছাড়াই এখন সবুজ বিপ্লব শুরুর হয়েছে। কৃষির তথা গ্রামের সমগ্রিক উন্নয়নের মডেল স্থাপনের উদ্দেশ্যে সমবায়িক ভিত্তিতে কৃষি খামার গড়ে তোলার যে মহান প্রকল্পগুলি এই শতাব্দীতে কাণ্ড হয়েছে এবং হতে চলেছে সি এ ডি পি বোখ

হয় তার সবশেষ দৃষ্টান্ত। দু-একটি অতি বিজ্ঞান সম্মেলনের নিদর্শনও নিশ্চয়ই আছে কিন্তু সেগুলিও সংখ্যা, মোট জমির পরিমাণ এবং প্রচার এত কম যে সেগুলিকে কেনোভাবেই পশ্চিম বাংলায় সবুজ বিপ্লবের অগ্রদূত বলা যায় না।

অন্যদিকে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেন দক্ষিণ ও পূর্ব বর্তমান সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা-গুলির সেচযুক্ত উর্বর জমির সেইসব বিঘাট বিঘাট মোতাও যোগলো এক এক প্রাক্তন জমিদার পরিবারের সদস্যদের মালিকানা হলেও মালিকদের অধিকাংশ অনুপস্থিত থাকার ফলে বার মালিকানা স্বত্ব একই ব্যক্তির দ্বারা প্রযুক্ত হয়। এই সব অনুপস্থিত মালিকদের সাধারণত উচ্চ বর্ণভূত এবং বৌদ্ধ ভাগ ক্ষেত্রেই কলকাতার অথবা বড় শহরগুলির স্থায়ী বাসিন্দা ব্যবসায়ী অথবা চাকুরীজীবীদের মধ্যে হয়ত একজন বা দুই প্রমে থাকেন এবং বাকীর কিংবা চাকুরদার সমস্ত উত্তরাধিকারী জমি একাই দেখা-শুনো করেন।

তা সত্ত্বেও পশ্চিম বাংলার সবুজ বিপ্লব যেটুকু হয়েছে, তার পরিমাণটা হেলাফেলার মতন নয় এবং আশ্চর্যের ব্যাপার এটা সম্ভব করেছে নিম্ন মধ্য চাষীরা, যারা নিজস্বের ভ্রমে নিজস্বের জমিতে ফসল ফলার তারাই ১৯৬৬-৬৭-র সেই তাঁর খাদ্যাভাবের বগেই ভেতর ভেতর গড়ে তুলছিল অনাহারকে প্রতিরোধের দুর্গ। নিবিড় এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচী ছিল সত্যিই একটা অত্যন্ত সুসং-রচিত পদ্ধতি। এক একটি অঙ্গলকে বেছে নিয়ে সেখানে একই সঙ্গে সেচ সার, বীজ এবং লাভজনক চাষের পদ্ধতি প্রচার জোগান হয়। যা হয়নি তাকে সমালোচনা করতে গিয়ে যা হয়েছে তা তুলে বাওয়া তুল হক। সবুজ বিপ্লব বহু কাণ্ডে পশ্চিম বাংলায় সেই প্রথম। সৌজন্যে মলেছিল, এমনিতে হুড়ি বছরে জনগণের বা শিক্ষা হয়, বিপ্লবের সময়ে একদিনে হয় সেই শিক্ষা। সেটা অবশ্য রাজনৈতিক বিপ্লব সম্পর্কে। কিন্তু সবুজ বিপ্লব যে সত্যিই বিপ্লব তার প্রমাণ পাওয়া গেল এই কর্মসূচীর ফলাফল দেখে। নিরক্ষর, বৃগ বৃগ ধরে কু-মন্ডকতা আর গোষ্ঠী কলহে নির্মলজাত প্রান্তিক চাষীরা উত্তাল হয়ে উঠল সৃষ্টির উল্লাসে। সারের



নিত্য এক অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে কোনো জড়তা দেখা গেল না তাদের।

খাঁ খাঁ দুপুরের রোদে একদিন একটি একা ছেলেকে রাস্তা দিয়ে হাঁকিত দেখেছিলাম আমি। তাকে জিজ্ঞাস্য করলাম কোথায় যাচ্ছে? সে মাইল দুই দূরের একটা জায়গায় নাম বলল। আমি জরজর বললাম, বাসে চড়িস নি কেন? সে বলল, বাসে পোকা লেগেছে, এখন ধান বঁচাতে হবে খাই না খাই। আমি তাকে রাস্তাবার জন্যে বললাম, না খেয়ে থাকলে ধান বাঁচবে? সে ঠান্ডা মাথায় আমাকে বোঝাল এখন পরসী নীচাতে হবে। তবে ওষুধ কেনা হবে তবে ধান বাঁচবে।

কম্বাটা নিশ্চয়ই তবুর নিজের নয়, বাবা-মার কাছ থেকে শোনা। তবু বাবা-মার মধ্যেও কী প্রচণ্ড দৃঢ়তা দেখেছিলাম সে বা তার শিল্প মনকে উদ্দীপ্ত করেছিল। মনে হল যেন কোনো পরাধীন দেশের মুক্তিযোদ্ধার যোদ্ধা শূন্যই আমি। এও নিশ্চয়ই স্বাধীনতা-অন্যায় থেকে মুক্তি। আগামী কালের সোনালী দিনের জন্যে আজকের কষ্টকে বরণ করে নেওয়া।

ছোট খামার এইসব অগ্রণী অঙ্কলগুলিতে কিছু কিছু অসুবিধাকে জয় করতে সমর্থ হয়েছে। সার, বীজ, কীটনাশক খুঁচুরো দোকানে পাওয়া যায়। ছোটখাটো বস্ত্রপাতি যেমন কীটনাশক স্প্রে করার যন্ত্র, জ্বালান, ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার ভাড়া পাওয়া যায়। অন্যের জমির ওপর দিয়ে নালা কেটে ব্রহ্ম নিয়ে বাওয়ার অধিকারও মোটামুটি স্বাভাবিক।



সবগুলি অসুবিধা জয় করা অবশ্যই সম্ভব হয়নি। তার একটি হল বিশেষজ্ঞতার প্রবন্ধ। ছোট খামারের একজন মালিককে বিভিন্ন বিষয় জানতে হয়, এখানে কোনো দায়িত্ব বিভাজনের সুবিধা নেই। অবশ্যই সরকারী কৃষি প্রশাশন অধিকারিকরা এবং গ্রামসেবকরা এর জন্যে রয়েছেন কিন্তু এই জাতীয় ব্যাপার সরকারী ক্ষেত্রের স্ফাটিক হয় না। কিছু শিল্পকার বিনিময়ে গাছের রোগ, পোকা দমন মর্টি পরীক্ষা এবং সার ইত্যাদি বিষয়ক প্রশ্নসমূহ উপদেশের পেছা প্রচলিত হলে সে ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয় হয়ে পড়বে। বিশেষ বিশেষ গাছের বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। যেমন বড় বড় আমবাগানে প্রতি বছর ফলতলালে হরমোন স্প্রে করা হয় যাতে বকুলগাছ গুলে না পড়ে যায়। আশা করা যেতে পারে যে কিছুদিন পরে এমন লোক পাওয়া যাবে যারা গাছ প্রতি নির্দিষ্ট সময়ের নির্দিষ্ট উপর্যুপের একটি কুটো গাছও দেখা দিতে পারবে।

জাতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থা এবং কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি উৎপাদন বাড়ানোর ব্যাপারে তে গবেষণা করেছেন তা তবু কৃষকদের ব্যবহারের জন্যে

প্রকাশিত করেছেন কিন্তু এই গবেষণাগুলি করা হয় সর্বোত্তম অবস্থায়। গোষাধারের চাষের জন্যেও তারা নিবেদন করেন ভাল দুগ্ধের না এমন দো-আঁশলা জমি চাই। তবে নিশ্চয় জমিতে কি হবে? এ ছাড়া জমির সর্বাধিক উৎপাদনের শর্ত লেখেন কিন্তু রাস্তা জানতে চায় প্রতি একক বিনিয়োগে সর্বাধিক উৎপাদনের শর্ত (আলোর মতন যে সব চাষে খরচ হবে বেশী, চাষী নিজের সর্বোত্তম জমি সাধারণত সেই চাষ করে না এবং জমির বার্ষিক মূল্য সেখানে ধরতে হয় না কিন্তু সরষে বা কলাই-এর মতন অল্প খরচের চাষে বিনিয়োগের মধ্যে জমির বার্ষিক মূল্যও অন্তর্ভুক্ত থাকে) অথবা ধরা যাক এক হাজার টাকা বিনিয়োগ করে নির্দিষ্ট জমির থেকে দু'হাজার টাকার ফসল পাওয়া গেল কিন্তু পাঁচশো টাকা বিনিয়োগ করলে পাওয়া যেতে পারে বারোশো টাকার ফসল। এখানে চাষী নিশ্চয়ই পাঁচশো টাকা বিনিয়োগ করতে চাইতেন, যদি না জমির পরিমাণ খুব কম হয়। এইসব খুঁটিনাটি বড় খামারগুলি ছোট এক-একটি জমিতে পরীক্ষামূলক চাষ করে ও হিসেব-নিকেশ করে দেখে নিতে পারেন। ছোটদের পক্ষে এই তথ্যগুলি তৈরী পেলে ভাল হয়। কৃষি গবেষণার ফলাফল যদি সরকারি ছোট চাষীদের ব্যবহারে-পযোগী পুস্তিকায় খুব সম্ভব তাদের জোগানো হয় তা হলে বিরাট উপকার হয়। আর একটা কথা এইখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না—ছাত্রের অভাবে গ্রামাঞ্চলের বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি যে কার্যে নিষ্ফল হয়ে রয়েছে, এই ধরনের পঠ্য পেলে নিরক্ষরের পড়তে শেখার আগ্রহও জন্মাবে।

পরিমার্জনের আগে সম্ভব নয়। কৃষির উৎকৃষ্ট মাংসে বিশুদ্ধ পরিমার্জন অবশ্যপূর্ণ চাষী ও বাসার দের মারফত শহরে চলে এসেছে, সেটা সম্ভবত উন্নতর এড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে যে পরিমাণ ক বা বৃহৎ শিল্পে নিয়োজিত হয়েছে, সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতির তা উপকারই করেছে কি পরিমাণে তা নগণ্য। এই উৎকৃষ্ট মালের অভাবও গেছে ভোগ সামগ্রীর পেছনে অথবা অনুৎপাদনশীল ক্ষেত্রে। গ্রাম থেকে শহরে চলে আসার কারণ খুঁজলে অনেক সময়েই শহরের অধিকতর সুযোগ সুবিধার কথা বলা হয় কিন্তু আমার বিশ্বাস এ ধারণা সমাজবিজ্ঞানের ধোঁপে টেকে না। অবস্থাপা গ্রামবাসীদের শহরে চলে আসার থেকে কৃষির বলেছিলল দেহের সমস্ত রক্ত মুখে জমা হওয়ার কারণ খুঁজতে হলে শহরের আকর্ষণের মধ্যে বিতরণিত এবং প্রথমত গ্রামের বিকর্ষণের মধ্যে কিছু বেশী টাকা-পয়সা জমা করার পরও একটা গ্রামবাসী গ্রামেরই মানুষ—গ্রামের অসুবিধায় অভ্যস্ত অসুবিধার অনভূত। টাকা তিনি বিনিয়োগ করতে চান গ্রামের কৃষি বা ক্ষুদ্রশিল্পে এক ভোক্তা করতেন চান গ্রামেরই মানবিক অনায়াস। কিন্তু বিনিয়োগ করতে গিয়ে গ্রামের অনড় অর্থনীতির সঙ্গে তার টোকটাক লাগে। কখনো কখনো পথে বর্জ্য আর ভোগ করতে বসবাসের পক্ষে যে মাথা উপস্থিত হয় তা হল চুঁচি ও ডাকাত। বিশুদ্ধ নবমানের কৃষি সমগ্র দক্ষিণ ও পূর্ব অংশে একে কলপাইনুড়ি কেল্লা দ-এককর ডাকাত হয়ে যাওয়ার পর গ্রাম ছাড় হয়েছেন বহু পরিবার। প্রথমে হয়ত তবু পাঠিয়ে দেন পরিবারের মহিলা ও শিশুদের। তারপর শহরের ওপর নির্ভরতা বাড়তে বাড়তে আর গ্রামের ওপর নির্ভরতা কমে কমে একসময় তাদের গ্রাম করে ফেলে শহর।

পরেই অর্থনীতির অনড়তাকে আরো সাহায্য করেছে কাকের পর দশক ধরে ক্রমশঃ সেটেলমেন্ট জমিত বিভাজিত, মামলা, দুর্নীতি গ্রাহস্পর্শ। রাজ্য সরকার আগামী দু-এক বছরের মধ্যে সেটেলমেন্টটা শেষ করুন তো দেখি। কলকাতায় ও মেসার্স লাইব্রারীতে তো রাজ্য সরকারের অনেক উৎকৃষ্ট কমচারী আছেন, ডেপুটেশন বৃত্তি দিয়ে তাদের নিয়ে আসুন না গ্রামে।

পাঞ্জাবের ভূমিহীনরা ব্যাপকভাবে সেনাবাহিনীতে চাকরী করার ফলে অথবা অন্যান্য রাজ্যে নানান পেশায় ছাড়িয়ে পড়বার ফলে পাঞ্জাবে জমির ওপর দারিদ্রের চাপ কম ছিল এবং অন্যতম উপার্জিত অর্থ বিনিয়োগিত হয়েছিল কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পে। আর অন্যতম শিল্প প্রধান রাজ্য হলেনও শিল্প এখানে কলকাতা ওপর দারিদ্রের চাপ কমাতে সামান্যই পেরেছে এর প্রথমে অর্থনৈতিক ও পরে রাজনৈতিক ফলাফল আলোচনা শুরুর আগে এইট। বলে নেওয়া প্রয়োজন যে জমির ওপর স্বাধীন দারিদ্রের চাপ ন থাকবার ফলে পাঞ্জাব হরিজনের যে অতি বাস্তবিক হয়েছে তাকে আমি আদর্শ হিসেবে স্বাপন করে চাইছি না। জনসম্পদের প্রাচুর্যের এই দেশে দরিদ্রের কর্মসংস্থানের দায়িত্ব আশু লাভের আশা আশঙ্কিত করা পুরনো ভিত্তিতে চলিত ট্রাক্টর হারভেস্টরের অতি ব্যবহার একদিকে যেমন কৃষি একটি পরম ব্যাপেক্ষতার ওপর স্থাপন করেছে অন্যদিকে এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানে প্রায়শত একটা সামাজিক ন্যায়বিচার সম্বন্ধিত সমা গড়ে তোলার দায়িত্ব থেকেও করেছে আত্মশাশন আবার এটোও ঠিক পশ্চিম বাংলার দারিদ্রের চাপ কৃষির উন্নতিতে অধা দিচ্ছে।

অধিক ফলনশীল ক্ষেত্রে চাষে পৌনঃপুন মূল্যবান বেশী লাগে বলে চুঁচিটাকে চাষী সবচে বেশী ভয় পান। কৃষিজাত ফসলের উৎকৃষ্ট মতে কৃষির উন্নতিতে বিনিয়োগের বিলম্বে পুরে ধরনের কৃষি অর্থনীতির অনড়তার এককভাবে ও সময়ে বড় কাল। কোন এখানে একটা ম গ্রামিকালীন উচ্চ ফলনশীল ক্ষেত্রে থাকার চাষ হ

কলা হয়ে থাকে, গুরু নানক বর্ণপ্রভম লোশ করে খালসা সাম্যের ধারণা ছাড়িয়ে দেওয়ার পাঞ্জাবের কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের সামাজিক চর্চিত স্থাপিত হয়েছিল।

এখানে অবশ্যপূর্ণ ভূস্বামীরা প্রধানত উচ্চ-বর্ণের। তাদের আর্থিক ও সাম্প্রতিক সমর্থ্য কৃষির উন্নয়নে লাগাবার বদলে কৃষকে ঘৃণা করে তারা শহরবাসী হয়ে পড়ায় তাদের মালিকানা যে সকল কৃষি জমি আছে সেগুলি অভিজাতবর্গহীন হয়ে, ধারিত আছে ক্রমশঃ বৈধ এমন একদল ব্যাবসায়ের পরিচালনাধীন হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার বদলে এগুলিকে তাৎক্ষণিক কিছু অর্থপ্রদানকারী সম্পত্তি হিসেবে ভাষা হয়েছে।

নতুন প্রবন্ধে অর্থনীতিবিদদের মতে অন্যান্য দেশের ইতিহাসে কৃষির উৎকৃষ্ট মূল্য দিয়েই শিল্প খড়ে ওঠে কিন্তু আমাদের দেশে কেবল উল্টো গতি হয়েছে—স্বাধীনতার পর থেকে শিল্পের লভ্যাংশ সরকার কর্তৃক বিনিয়োগিত হয়েছে কৃষিতে। তীব্র অবস্থা এর নিদান হিসেবে সবায়ের কথা বলেছেন যেটা আমরা দেখেছি ও দেখব সামাজিক

এই মাসে অকশ্যপন পড়ার সময় জমির  
বিষয় জমি আছে। এই পটভূমি কিম্বা জমির মধ্যে  
পট ভূমি মট-কুড়ে আছে কেখানে একেজন জন চাষী  
পালা করে করে রাত পাহারা দেন। এখানকার  
চাষীরা চুরি কাকে বলে ভুলে গেছেন পাহারা ছাড়াও  
দটো কারণে। এ গ্রামে বেশী ফসল ওঠে বলে  
এ গ্রামের মানবের অর্থনৈতিক অবস্থা সাধারণভাবে  
ভাল। এই গ্রামের ভূমিহীনরা সবসময় মাঠে কাজ  
পান এবং কাজ যখন থাকে না তখনো অকশ্যপন  
চাষীদের ঘরে হাত পাড়লে সামান্য শ্রুতিভার  
মতন খানটা কাজ পেতে অসুবিধা হয় না। শ্রিত্যগত  
কৃষিজাত ফসল তা আর খড়ি বা রেডিও নয়,  
চোখেই ফসল বেশী দূরে বসে নিয়ে যাওয়া পোষার  
না বলে দূরের থেকে চোর আসে না।

এবার এরা থেকে মাঠ দূর। মাইল দূরের আর  
একটা মাঠের কথা ধরুন। মাটির উর্বরতা জলের  
প্রাপ্তিভযোগ্যতা এখানে একই রকম। এই মাঠে পাঁচ  
বা পনেরো বিঘা জমি আছে এমন একজন কৃষক  
যদি এখানে গ্রীষ্মকালীন উচ্চ ফলনশীল খালির বা  
শীতকালীন ফ্রোজিট বা চন্দ্রমণী আলুর চাষ করতে  
চান তাঁকে একটা উল্ল্যোগে রাত পাহারার ব্যাকসা  
করতে হবে—স্থানীয় চোরদের কিংবা ফল খেটা  
খুব সহজ হবে না। এ ছাড়া তাঁকে জমিতে বিশাল  
খরচ করে কেড়া দিতে হবে কারণ চাষ হয় না বলে  
আমনি চাষের সময়টুকু ছাড়া এ মাঠে সারা বছরই  
গরু ছাড়া থাকে। এত কিছ, বাড়তি খরচা পণ্যের  
সম্প্রদায় খুব সামান্যই থাকে বলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই  
যা হয়—অনেক কিছ, বিবেচনা করে অবশেষে তিনি  
নতুন ধরনের চাষ করার পরিকল্পনাটাই পরিত্যাগ  
করেন। হয় হতে পারে যদি গ্রাম পঞ্চায়তগুলি  
চুম্বি ব্যবস্থার ব্যবস্থা নিতে পারত—এবং নেতৃত্বাধীন খুবই  
উচিত ছিল কারণ গ্রামের সামগ্রিক উন্নতি এটির  
ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু পঞ্চায়তের একজন কোনো  
কর্মসূচীর কথা শুনিলেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে এ একজনও তো উল্ল্যোগ নিতে  
পারেন অধিকাংশকে নিয়ে উন্নত চাষ করা যায়।  
কিন্তু এ যে প্রথম গ্রামটির কথা বলছিলাম সেখানেও  
নিশ্চয়ই একজনই প্রথম উল্ল্যোগ নিয়েছিলেন—যার  
কথায় এক এক করে সম্মত হয়েছিলেন গ্রামের  
সকলে। কিন্তু এটা খুব সহজ কাজ নয়। হয়ত  
আগের গ্রামের লোকজনের সব একই ধরনের ছিলেন—  
সকলে মায়ায, যেখানে শ্রিত্যগত গ্রামে রয়েছে দুটি বা  
তিনটি ঘৃণ্যজন বর্ণ। একই অবস্থান ও যোগ্য  
অবস্থায় সবাই পাক খেতেই থাকবে, আরো ভাল-  
ভাবে যে বাঁচা যায় এই লোক তাদের মধ্যে জাগিয়ে  
তুলো সহজ নয়। একবার যদি কোনো গঠনমূলক  
কাজে সবাইকে সহযোগিতার সম্পর্ক আনা যায়—  
তখন দেখা যাবে দূর-এক মরুমের মধ্যে পুরোনো  
কলহ কোথায় উধাও হয়ে গেছে। কিন্তু নোহা  
সম্ভাবনার ওপর ছেড়ে দিল এই শ্রেণীটাই হয়ত  
আমাদের একলা করেই হতে উঠবে না।

ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে খাস জমি বিলির সঙ্গে  
সঙ্গে তাদের বীজ ও মালের মিনি কিট দিয়ে সরকার  
ভাল কাজ করছেন কিন্তু এ নিয়ে লুকাচাপা করে  
কি লাভ যে অনেক ক্ষেত্রেই বীজটা তারা চেড়ে ফেলে  
ফেল আর সারটা বেচে দেওয়া হয় নামমাত্র দামে।  
তারা বলে প্রতি ব্লক গরুর চাষীদের নিয়ে অনেক-  
গুলি করে কর্মসূচিহীনী তৈরী করা হোক বীজ  
জমি চাষা হওয়ার পর সার ও বীজভোগ্য বীজ  
ওজন দেখিয়ে ছাড়িয়ে দিয়ে আসবেন, এমন কি সরকার  
হলে রেওয়াজও করে আসবেন। এতে করে এ  
ভূমিহীন চাষীরা দূর-এক বছরের মধ্যেই দক্ষিণশীল  
চাষিতে রপালভিত্তিক হবেন। খরচ বাড়বে সামান্যই  
কিন্তু কাজ হবে অনেক নিশ্চিত।

সরকার চাপের রাজনৈতিক কিছটা দেখা যাক  
এবার। আমাদের দেশের মিশ্র অর্থনীতির ঐক্যশ্রুতি  
হল নিম্নোক্তভাবে কৃষিগত মনোমত কৃষিগত মূলধন  
সম্প্রদায় অধিকার অক্ষর থেকে মূল ভাষী কম্প-  
নীর রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং কৃষি জোটে মতদল



সবচে কৃষি শ্রমিকদের মালিকানা কার্যে করা।  
কর্মসূচীর মত মনে করুক ও মনে আশায্যে ভাষা-  
ভাগীর ক্ষেত্রে এক ভিন-এক ভগ্নভাগীর ক্ষেত্রে বীজ  
এবং সারও মনে। ১৯৭৭-এর সংশোধিত ভূমি  
সম্প্রদায় আইন এবং অপারেশন করা কর্মসূচী  
মত সার কার্যসম্পন্ন নথিভুক্ত করার ব্যাপারে রাজা  
সরকার এখন খুব সোজা দিচ্ছেন। সরকারের মতে  
এর ফলে কার্যসম্পন্ন খরচা অধিকার পেলে জমির  
দায়িত্বের দায়িত্ব চাড়া করতে পারবেন এক  
করা নিশ্চয়ই হওয়ায় পরটা দেখিয়ে কার্যের থেকে  
কৃষি লাভ পাবেন। বিপরীতে বলা হচ্ছে শ্রমী  
অধিকার পাওয়ার মত চাষ উন্নত করার প্রবৃত্তি  
বৃদ্ধি করে যাকে এক লক্ষ্যটাই এখন শ্রমী ভূম্যমীর  
প্রাণা জীবিত দেওয়ার দিকে।

গ্রামের বড় ভূম্যমীর এখন ঠান্ডার গাশীল দিকে  
তাকিয়ে বস আসেন কিন্তু হিন্দী কংগ্রেস রাজা  
কর্মসূচীর এলেও তাঁদের উপায় করবে না। ভেতর  
ভেতর প্রায় সব দলের উপর মতলের কাছেই তাঁরা  
একটা অপ্রয়োজনীয় শ্রেণী বলে পরিত্যক্ত হয়ে  
গেছেন। তাঁদের বঁচবার পথ নিজেদের হাতে করে  
নিতে হবে এবং সে পথ ঘূর্ণা ও লড়াই-এর নয়,  
সাধারণ ও সামগ্রিক উন্নয়নের। ১৯৬৮-এর মাস থেকে  
৭০-এর মাস পর্যন্ত যখন গ্রামাঞ্চলে নকশালদের  
খতম অভিযান চলছিল কী বাক্সা নিয়েছিল  
কেন্দ্রীয় সরকার? ব্যাপক নকশাল-কিছুখী অভিযান  
শুরু হলে যখন শত্রুগণ্য পলিস মিলিটারী  
ব্যবসায়ীদের গারি হাত পড়ল তাগপল থেকে। কেউ  
কোঁ কাম্পনশীল কৃষক কর্মসূচীর দায়িত্বের সংযোগ  
নিয়ে বাস দিয়ে জমি বঁচাবার চেষ্টা করতেন। এটা  
একটা উপায়। কিন্তু এ উপায়ও দীর্ঘদিন মূলপ্রস  
হবে না। মিনমজ রাসের জন অর্থনৈতিক মজদুরী  
দাবি করা হচ্ছে যা নিতে গেলে চাষ ছেড়ে দিতে হয়।  
আকার চাষ কর্ম গেলে কাজ না পেয়ে দিনমজুর  
এলে দূর টাকার বিনিময়ে কাজ করতে চাইছে।  
লোকসানের রাষ্ট্রীয়ত্ব কারখানা সরকার মজদুরী  
বাড়িয়ে যেতে পারে কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে তা কি করে  
হবে? মজদুরী খুব বেড়ে গেলে জমিতে ট্রাক্টরের  
ব্যবহার বাড়ছে—দিনমজুরেরা আরো কেকার হচ্ছে।  
অনাহারে থাকবে। ট্রাক্টর আমদানীতে অগুপ্ত নৈই  
বাম নেতাদের। কারণ তার কারিকারী আমদানী হচ্ছে  
শুধু ইউরোপ থেকে। কোথাও কোথাও বামপন্থী  
বলার কর্মীদের নেতৃত্বে বহিরাগত অতি দরিদ্র

বলা হচ্ছে কক্স শ্রমীদের দাও? অসল কারখানার  
হস্তিগে মিলে অশ্রের নাম রেকর্ড হচ্ছে বাহে। মেনা  
কথা হল, গ্রামে অশ্রুত অশ্রুত লড়াই লাগিয়ে দিলে  
মজা দেখছেন শত্রুগণী নেতারা। ভূম্যমীর ঘাড়ের  
ওপর অনেক দায়ের এসে পড়েছে। সারা দেশের  
দায়িত্বের সমস্তে স্বাধীন মতন ভারী শিল্প আর  
শহর যদি বা বেঁচে থাকতে পারে (যদি একে বেঁচে  
থাকা বলে) গ্রামের দরিদ্রের মধ্যে স্বাধীন মতন  
থাকতে পারবেন না। ভূম্যমীর। সঠিকতাল পরগণার  
শালগাছের ওপর নির্ভর করে আশ্রয়শীল। বেশী  
জাতের জনা শল কেটে সেগুন বালনের কিংখে  
সেখানে আরোজ উঠেছে সেগুন জেপই বন্ধ কর।  
আমাদের দেশে কি পরিকল্পনা করার সময়ে অর্থ-  
নৈতিক জরীপের প্রতিবেদনগুলো পড়ে দেখা হয়?  
উন্নততর উপাদানের ব্যপকভাবে কেন বীজ বেঁচে  
হবে প্রথাগত উপাদানের ওপর বেঁচে থাকা মনুষ্য-  
গলোক? উন্নততর উপাদানের অতিষ্ঠ মনুষ্যের  
একটা অংশ কেন আগে থেকেই সরিয়ে রাখা হয় না  
সেই মানবগণ্যের বিকল্প জীবিকার জন্য? সব  
কিন্তু মনেই যে ভ্রমকর্ম মান যেমন নয় তা তো আজ  
পশ্চিম বাংলায় প্রমাণিত।

এই আলোচনার ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক কারণ-  
গুলির ভিতর মূলত ব্যক্তিগত অংশটাই আলোচিত  
হয়েছে। যে কোনো ক্ষেত্রে মত কৃষির ক্ষেত্রেও  
উন্নতির হার হল ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক কারণে মূল-  
ফলের সামান্যতা। পশ্চিমের দেশগুলিতে সামগ্রিক  
ব্যবস্থাপনামূলক ব্যাপারে ব্যক্তি ভূম্যমীর  
পারম্পরিক সহযোগিতা একটা বড় ভূমিকা পালন  
করছে, আমাদের দেশে ঐতিহাসিকভাবে যা  
অনুপস্থিত, সামগ্রিক ব্যবস্থাপনামূলক জন রসে  
কেন্দ্রীয়গণের শক্তির বিশেষ প্রয়োজন। ব্যাকসা কি  
কি নিতে হবে, কিভাবে তা হতে পারে এবং বিভিন্ন  
কারিকারী সমস্যার সমাধান পরিকল্পনা-কার্যসম্পন্ন  
কাজ। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রসঙ্গকে কেন ক্ষেত্রে  
নিতে যেতে হবে, সেচ, নদী শাসন, কলভি তৈরী,  
কৃষিপণ্যের বিপণন নিয়ে বিশেষ অর্থনৈতিক ও  
বৈজ্ঞানিকদের বক্তব্য প্রায়ই উচ্চারিত এক জনস্বৈর  
এর প্রভাবও ব্যপক। কে কেন বলেছিলেন ভারতীয়  
কৃষি হল দৃষ্টির ওপরে একটি জ্বল ক্ষেপ। আমরা  
তো মনে হয় ভারতীয় কৃষি শ্রমী ব্যতির ওপর কেন,  
চুরি, সম্পূর্ণ অশ্রির ব্যাকসা—অনেক কিছ,র  
ওপরই একটা জ্বলখেল। এই গরু বছরই দেখেন ন,  
অন্তেরের কার্য আমনি ছেড়ে বাক্সা পর রাজা  
সরকার জোরে চাপ দিলেন আলু চাষের ওপর।  
চাষীরাও বানের লোকসান সামলাতে ঘিট-বাটি বেঁচে  
আলু চাষ করলেন। কি ফল হল? না, আলুর  
দর গত বছর এমনভাবে পড়ে গেল যে শেষ পর মত  
ফসল মাঠ থেকে তুলে বজারে করে নিয়ে যাওয়ার  
খরচ পেরায় না। চাষীর আর কাছাকাছি লোকসান  
সইকেন? পরের মরসুমে খুব কয়ে সেল আলুর  
চাষ যার জন এ বছরই আলুর দাম আগুন হয়ে  
গেল। রাজা সরকার, যার মনিসভায় আছেন নিম-  
করা একজন অর্থনীতিবিদ, কি এগুলো জানতেন  
না? যখন জলের দর বাড়িল, সরকার তখন কিম্ব  
কলেও আলু কিনলেন না কেন? এমন অনেকগুলো  
সহজ কর্মসূচী আছে যার উপকারিতা নিয়ে গরু  
পঞ্চাশ বছর ধরে যানবের মনে কোনো সন্দেহ নেই  
অথচ কেনো অদৃশ্য হাতের কাণার যেন তা হচ্ছে না।  
এর অন্তত একটা উদাহরণ কায়েই রয়েছে তা হল  
পড়ে থাকা অনস্বীত জমিতে কলভি সজ্ঞন করে  
ভূমি সম্প্রদায়। অর্থনীতিবিদ এমন কিছ, কিছ, ব্যপার  
আছে যা নিয়ে জনচিত্তে ব্যপ্ত সন্দেহ আছে কিন্তু  
কোনো অগ্রত মতলের বলে তা হার যাচ্ছে। যেমন  
আলিপন কলকাতা কির্কিবালগয়ের স্থানান্তর।  
আমাদের এখন যখনো গারবগার প্রকল্পন এই  
সরকার সম্পর্কিত। এই সরকার—সে যে মতসভায়  
পলিগণনাতই থাকুক না কেন, চল কিসের জোরে  
এবং যখন চল না সেই বা কিসের ব্যথার?



## এই বিশেষ দরে ইউনিট পাবেন সারা জুলাই ধরে

জুলাই মাসে ইউনিটের দাম বিশেষ ক'রে কমানো হয়। এ সময় টাকা খাটালে আপনি বেশী লাভবান হচ্ছেন।

ইউনিট হচ্ছে লাভ ও সুবিধার অপূর্ব সমন্বয়।

- ১) আপনার পুঁজি সুরক্ষিত থাকছে—ট্রাস্ট আপনার হয়ে ৬০০রও বেশী নামী কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে টাকা লগ্নী করে।
- ২) আপনার পুঁজি কখনই আটকে থাকছে না—ইউনিট যে কোন সময় বিক্রী কিংবা ট্রান্সফার করতে পারেন।
- ৩) আপনি বিশেষ কর-ছাড়ের সুবিধা পাচ্ছেন—ইউনিটের ডিভিডেন্ড, ব্যাংক অথবা পোস্ট অফিসের সুদ, শেয়ার ইত্যাদি থেকে আপনার অর্জিত আয় ৩০০০ টাকা পর্যন্ত সাধারণ কর-ছাড়ের আওতায় পড়ছে। এছাড়াও ইউনিটে টাকা রাখলে আপনি বাড়তি ২০০০ টাকা বিশেষ কর-ছাড় পাবেন।

বেশী মুনাফার জন্য ইউনিটে টাকা খাটান। ট্রাস্টের কাছে সকলের উপযোগী নানারকম প্রকল্প রয়েছে।

ক) ইউনিট স্কীম '৬৪ : যা দেয় লোভনীয় ডিভিডেন্ড।

খ) রি-ইন্ভেস্টমেন্ট প্লান : চক্রবর্তী হারে টাকা বাড়িয়ে তোলায় অপূর্ব সুযোগ।

গ) চিলড্রেন্স গিফট প্লান : একটি বিশেষ বিনিয়োগ যা শিশুর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে ওঠে—প্রতি বছর অনেকগুলি নগদ পুরস্কার দেওয়া হয়।

ঘ) ইউনিট লিংকড ইন্স্যুরেন্স প্লান : জীবনরীমাসহ ১০ বছরের সঞ্চয় প্রকল্প—বেশী লাভ এবং কর-ছাড়ের সুযোগ।

বিশদ বিবরণের জন্য যে কোন ব্যাংক/পোস্ট অফিস/এজেন্টের সঙ্গে অথবা নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :



### ইউনিট ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া

(একটি সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত আর্থিক সংস্থা)  
৪ ফেয়ারলি প্রেস, কলকাতা ৭০০ ০০৬  
ফোন : ২৩-১৩২১, ২৩-১৬৩৮

সঞ্চয় গড়ে তুলুন—ইউনিটে ইউনিটে

## গের অসাধারণত্ব

টানা চার বছরের উইল্ডন চ্যাম্পিয়ন সুইডেনের প্রার স্টার বিল্ড ক' আবার চ্যাম্পিয়ন হবেন এটা প্রত্যাশিত ছিল। অপ্রত্যাশিত ছিল ইফ গ্লাগারের ডাব জয়।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী মেয়ে গ্লাগার প্রথম উইল্ডন চ্যাম্পিয়ন হন ১৯৭১ সালে। তারপর চারবার ফাইনালে উঠে দু'বার (৭২ ও ৭৫ সাল) দু'বার বৃত্তাকারে বিল্ড জিন কিংয়ের কাছে, একবার (৭৬ সাল) জিস এডার্টের কাছে। এবার নিয়ে পচিশটি ফাইনালে খেলে দ্বিতীয় খেতাব পেলে জিস এডার্টকেই ফাইনালে সেট সেটে হারিয়ে। ৭৪ ও ৭৬-এর খেতাব জর্জিনী জিন এডার্ট ছয় বার ফাইনালে খেলে হারলেন তার বার। তার মধ্যে শেষ তিন বছর ফাইনালে পঞ্চাশটির পরাজয়। গ্লাগার ছিলেন চার নম্বর বাছাই, এডার্ট ৩ নম্বর। দু'জন দু'দেশের মেয়ে কিন্তু এক দেশের ধরনী। দু'জনেই ব্রিটিশ স্বামী। টেনিস খেলোয়াড় এডওয়ার্ড কালিকে বিয়ে করার পর গ্লাগার হয়ে বান গ্লাগার কলি। জিস এডার্ট এডার্ট-লয়েডে শিকার হন টেনিস খেলোয়াড় জন লয়েডের সঙ্গে বিয়ের পর।

তিন বছর আগে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করার পর গ্লাগার কলি ফলিছিলেন, "আমি চাই আর একটি সন্তান এবং উইল্ডনজনের আর একটি খেতাব।"

একটি সর্ব পূর্ণ হল এক আবার টেনিসের শীর্ষ তারকার সম্মান পেলে সেমিফাইনালে দুই নম্বর বাছাই বৃত্তাকারে টেনিস অস্ট্রেলিয়ান এবং ফাইনালে তিন নম্বর বাছাই জিস এডার্টকে হারিয়ে। গত দু বছরে চ্যাম্পিয়ন চেকোস্লোভাকিয়ার মেয়ে এবং বৃত্তাকারে বসবাসকারিণী মাউনি নাজাতিলোভা ছিলেন শীর্ষ বাছাই। কিন্তু তিনি নিজের ফর্ম অনুযায়ী এ বছর খেলতে পারেননি। ২০ বছর বয়সী নাজাতিলোভা অতি কঠোর ৩৬ কলর ক্লাসী বিল্ড জিন কিংকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠেন, কিন্তু সেমিফাইনালে হেরে বান জিস এডার্টের কাছে, গত দু বছর বাকি ফাইনালে হারিয়ে খেতাব জিতেছিলেন।

সবাই জানে খেলোয়াড়দের সাম্প্রতিক যোগ্যতা এবং অ্যাসোসিয়েশন টেনিস প্রোফেশনাল সংস্থার পনেরটির হিসাব অনুযায়ী বাছাই তালিকা তৈরি করা হয়। এই তালিকা হচ্ছে প্রতিযোগিতার মানের মাপকাঠি। অর্থাৎ খেতাব জয়ে ক' কতখানি সম্ভাব্য খেলোয়াড় তারই হিসাব।

মেয়েদের সিংগলসে বাছাই তালিকা অনুযায়ী ফল না ফলেও পনের বছরের সিংগলসে কিন্তু ফল হচ্ছে মিলে গেছে। শীর্ষ বাছাই বিরন বগই ফাইনালে দ্বিতীয় স্থানে। এ ম্যাচের আগে হারিয়ে উপসর্গের পাঁচ বছর চ্যাম্পিয়ন হবার অনন্য সম্মান পেয়েছেন এবং ২৪ বছর বয়সে এমন এক কীর্তি সৌধ গড়েছেন যা জীড়া বিশ্ব তাকে কিংবদন্তীতে পরিণত করেছে। কে জানে পৃথিবীর সবচেয়ে মর্যাদাময় এক ঐতিহাসিক টেনিস প্রতিযোগিতায় উপসর্গের ছয় বছর তিনি জয়ী সম্মান পূর্বন কিম্বা।

টানা ছয় বছর উইল্ডন চ্যাম্পিয়ন হবার অবশ্যই নজর আছে। কিন্তু সেটা টেনিসের শৈশব অবস্থার। উইল্ডনজনের শুরুর ১৮৭৭ সালে। ৮১ থেকে ৮৬ পর্যন্ত টানা ছয় বছর চ্যাম্পিয়ন হন ইংল্যান্ডের উইলিয়াম রেনশ। ইংল্যান্ডের আর ডোহাটি (১৮৭৭-১৯০০ সাল) টানা চার বছর, তারি ডাই হাণ ডোহাটি (১৯০২-১৯০৬ সাল) টানা পাঁচ বছর এক অস্ট্রেলিয়ার জার্টনী উইল্ডন (১৯১০-১৯১৩ সাল) টানা চার বছর বিজয়ী হয়েছেন। কিন্তু তখন ছিল ফুল প্যাট পরে শব্দের টেনিস খেলার ধারা এবং ক্রিমি ডাইগের বারের বিজয়ীক অন্য কোন খাত খেলতে হবে না। তিনি চ্যাম্পিয়ন হয়ে বসে থাকবেন।



উইল্ডন প্রাক্ষরিত করছেন বিরন বগ

প্রতিযোগিতার বিজয়ীকে তার সঙ্গে খেলতে হবে ট্রফি লাভের জন্য। ১৯২২ থেকে চ্যালেঞ্জ প্রথম উঠে যায় এক খেতাব জয় কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকে।

১৯০৪ থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের ফ্রেড পেরী এখন উপসর্গের তিনবার বিজয়ী হন তখনো ছিল ফুলপ্যাট পরে খেলার রেওয়াজ। দ্বিতীয় মহাবিশ্বের কিছ্র আগে এবং যুদ্ধের পরে টেনিসে বয়স্কতরী পুরুতন আসে এবং টোটাল ওয়ার ও পরওয়ার টেনিসের শুরুর আয়োজার ও প্রোফেশনালদের মিশ্র প্রতিযোগিতা শুরু চমু থেকে। এই অক্সফোর্ড মধ্যে কিম্বা বগের টানা পাঁচ বছর চ্যাম্পিয়নের সম্মানলাভ অসাধারণ এক কীর্তি।

ক' কিন্তু এখনো পর পর চারটি বড় প্রতিযোগিতা জিতে গ্র্যান্ড সলাম পাননি। অস্ট্রেলিয়ার অসাধারণ খেলোয়াড় রড লেভার পেয়েছেন দু'বার—১৯৬২ ও ১৯৬৯ সালে। অনেকের ধারণা, ৬১ ও ৬২তে চ্যাম্পিয়ন হবার পর লেভার যদি প্রোফেশনাল না হতেন এবং উইল্ডনজনে খেলার সুযোগ পেতেন তা হলে তার পক্ষে হয়তো একাধিকবার পাঁচ-সাত বছর খেতাব ধরে রাখা সম্ভব হত। কারণ পাঁচ বছর তিনি উইল্ডনজনে খেলতেই পারেননি। প্রোফেশনালদের জন উইল্ডনজনের মরজা মৃত হবার পর তিনি আবার খেলতে শুরুর করেন এবং ৬৮ ও ৬৯ সালে পর পর চ্যাম্পিয়ন হন।

তাই নিশ্চয় করে বলা শব্দ, কে সবকালের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়? রড লেভার? না, বিরন বগ?

গড় বছর ফ্রেড পেরীর রেকর্ড স্মরণ করে চার বছর চ্যাম্পিয়ন হবার পর বগ নিজই বলেছিলেন, "আমি স্বীকার করি না আমি সবকালের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। আমাকে সেটা প্রমাণ করতে হবে। আমার প্রথম লক্ষ্য ছিল যেভাবে বৃত্তাকারী চ্যাম্পিয়নশিপ

জয়, তারপর গ্র্যান্ড সলাম লাভ। কিন্তু জাসিৎ মেডেভেট হেরে পেলেন রসকো টানবেরো কাছে। উইল্ডনজনের ফাইনালে বাঁকে হারিয়েছিলেন। তার পরে একটি প্রতিযোগিতায় হারেন অস্ট্রেলিয়ার গ্লোরিয়া ভিলাসের কাছে। টানবের এবং ভিলাস দু'জনই বাঁহাতি খেলোয়াড়। একবারে উইল্ডনজনে ফাইনালিস্ট ২১ বছর বয়সী মার্কিন খেলোয়াড় ম্যাকেনরোও খেলেন বাঁহাতে। এই ম্যাচের আগে বগ আগে ৭ বার খেলেছেন নানা প্রতিযোগিতায়। ৪ বার জিতেছেন ক', ৩ বার ম্যাকেনরো। সুতরাং বাঁহাতি খেলোয়াড়ের কাছে বগের পরাজয়ের অনেক নজির আছে। কিন্তু উইল্ডনজনে বগের উপর বোগ হার ডর করে অলৌকিক শক্তি। না হলে কি হারের মুখ থেকেও জয় করার করতে পারেন? ৭৮এ আমেরিকার ভিক্টর আমায়ার কাছে প্রথম রাউন্ডে হারতে হারতে বোঁটে গিয়েছিলেন। গত বছর দ্বিতীয় রাউন্ডে হারতে বসেছিলেন কিম্বা অমর্তরাজের কাছে। ৭৭-এর ফাইনালে জিবি কেনসকে হারিয়েছিলেন হান্ডাহাতি লড়াইয়ে। গত বছর রসকো টানবেরের সঙ্গেও ফাইনালে দেখা গিয়েছিল টেনিসের ত্রিসংক্রিয়া। পাঁচ সেটের মরণশয় সন্ধ্যায় জিতেছিলেন বগ। এবার তো ম্যাকেনরোর সঙ্গে ফাইনালে খেলাটি উইল্ডনজনের ১০৪ বছরের ঐতিহাসিক সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসরোহকারী সংগ্রাম। দীর্ঘ ৩ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট ধরে সূর্যমুখিত সার্ভিস, সার্ভিস রিটান, ড্রপশট, ভলি, পাসিং শট এবং টেনিস কেভাবে বত রকম মার আছে তার সব কিছ্র অধীনে আছে দেখছেন সেটীর রেকর্ডের ১৬ হাজার দর্শক। আশা নিরাশার দোলায় এবং উত্তেজনার আবেগে টেনিস ডীর্ঘ সময় হয়ে উঠছে। যন্ত্রাঙ্ক খেতাব জয়ী ম্যাকেনরো তার জীবনের প্রথম উইল্ডনজনে ফাইনালে বিজয়ী হতে না পারলেও হেরেছেন বীরের মত তার লাপায়ে টেনিস খেলে। ক' এখন ২-১ সেট



পরেই দেখা থেকে বিদায় করে সেই সেট জিতে  
খেলোয়াড়ের আদর্শ ইতিহাসের বিবরণ।  
নতুন ঘটনা পাঁচ বছরে ৩৫টি ম্যাচে বঙ্গের টানা জয়  
আধারস্থ কিংস জটিল আধার আলাকিকতার  
হোয়া লাগতে চেষ্টা করি। কিন্তু টেনিস তো খেলা।  
ট্যালেট, স্কিল, শরীরিক শক্তি ও পটতা। পরবর্তন  
পরিচালনা, টাইমিং, স্ট্রোক এবং কোর্টক্রাফট—সব  
কিছুর সমাহারই অসাধারণের পরিচয় মেলে। সেই  
দিক দিয়ে কিয়ান বর্গ অসাধারণ খেলোয়াড়।

এই লেখার শেষে ফাইনাল খেলোয়াড়ের ফল দেওয়া  
আছে। এখন একবারে উইম্বলডনে ভারতীয়দের  
চূড়াকর কথা বলা যাক।

## ভারতীয়দের ভূমিকা

যাকে নিয়ে আমাদের প্রত্যাশা জড়িয়ে ছিল সেই  
বিজয় অমৃতরাজ প্রথম রাউন্ডেই ১৬ নম্বর বাছাই  
অর্জুনিয়ার জেস লাইস ক্রাকের কাছে হেরে  
যাওয়ায় এ বছরের উইম্বলডনে ভারতীয়দের ভূমিকা বড়  
হয়ে ফটে ওঠেনি। কিন্তু সামগ্রিক ফল খতিয়ে  
দেখলে ভারতীয়দের সংগ্রামের পরিচয় অবশ্যই পাওয়া  
যাবে।

উইম্বলডনে বঙ্গের টানা চার বছর খেতাব জয়ের  
সম্মতান গত বছর বিজয় অমৃতরাজ শেষ করে দিতে  
পারতেন যদি দ্বিতীয় রাউন্ডে আর একটু দৃঢ়তার  
পরিচয় দিতে পারতেন এক ভাগ্য তার সম্ভব হত।  
ওই ম্যাচে বর্গ জেতেন ২-৬, ৬-৪, ৪-৬, ৪-৬  
ও ৬-২ গেমে। বিজয় ২-১ সেটে এগিয়ে যাবার পর  
চতুর্থ সেটে ০-১ গেমে এগিয়ে যান বঙ্গের সার্ভিস  
ডেভিস। বিজয় সার্ভিস ধরে রাখতে পারেন, ০-১-এ  
এগিয়ে যেতে পারতেন। আবার ৪-২-এ ৪ গেম খাফা  
সময়ে বঙ্গের সার্ভিস প্রায় ডেড দিয়েছিলেন ৪০-০  
পয়েন্টে এগিয়ে। ডিউস করায় পর অসাধারণ দৃঢ়তার  
বর্গ সেমিট পানি এবং ওখান থেকেই খেলার মোড়  
ভাঙে। বর্গ অকপটে স্বীকার করেছেন “ওই সময়  
বিজয় যদি আর একটি পয়েন্ট নিয়ে আমার সার্ভিস  
জালিয়ে নিষাতি আমি হেরে যেতাম।” সত্যিই তাই,  
বর্গ ও বিজয়ের জয়-পরাজয়ের মধ্যে কাফান ছিল অতি  
সূক্ষ্ম। বলাতে গেলে গতবার ফাইনালে বসকা চ্যাম্পিয়ন  
কতখানি বেগ দিয়েছিলেন কার্কে তার চেয়েও বেশি  
বেগ দিয়েছিলেন বিজয় অমৃতরাজ দ্বিতীয় রাউন্ডের  
খেলার।

এবার বিজয় হেরেছেন কীভাবে? প্রায় একইভাবে,  
তাইই কাছে যাকে তিনি মাস দুই আগে ফ্রান্সফোর্টে  
হারিয়েছিলেন সেট সেটে। নাম আগের বর্গাই,  
অর্জুনিয়ার জেস ক্রাক। অবশ্যই ক্রাক বঙ্গের দুই  
নম্বর খেলোয়াড়। ভিলাসেব পায়েই তার স্থান। এবং  
মুম্বাই তাইই ক্রীড়াকে অর্জুনিয়া ডেভিস কাপে  
আমেরিকাকে হারায় এবং ডুসেলডার্মে জেতে নেদারল্যান্ডস  
কাপ।

বিজয় ৬-১ ও ৬-০ গেমে অতি সহজে ক্রাকের  
কাছ থেকে প্রথম দুটি সেট নিয়েও পরের তিনটি সেট  
হেরে যান ৫-৭, ৫-৭ ও ৪-৬ গেমে। অবশ্যই  
বিজয়ের খেলার সংগ্রামের পরিচয় আছে। কিন্তু মরীচা  
রূপের পরিচয় নেই। প্রথম দিন ২-২ সেটে এবং  
দ্বিতীয় দিন ২-২ সেটে ২-২ গেমে খেলা সমান  
ধাককা অকুণ্ঠায় ম্যাচ আলোর জন্য খেলা বন্ধ থাকে।  
পরের দিন ম্যাচ জিতে ক্রাক বলেন, “কাল সারা রাত  
আমি একটুও ঘুমোতে পারিনি, সারারাত ভেবোঁছ  
কীভাবে বিজয়কে হারাব। আজ বিজয়েরই প্রথম  
সার্ভিস ছিল তাই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, হালস্ব হবার  
আগেই তার উপর আঘাত হানব। কাল প্রথম দুটি  
সেট হারার পর আমি খেলার ট্যাকটিকস বদল করে  
প্রতিটি পয়েন্টের জন্য মরীচা হয়ে লড়াই করি। তার  
ফলেই বিজয়ের আকুণ্ঠায়ে চিড় ধরে।”

শেষ মধ্যে এই মরীচা লড়াই করতে পারেননি  
বলেই বিজয় ম্যাচ প্রায় হারের মতোয় মধ্যে এনেও  
গতবার হারতে পারেননি কার্কে, এবার হারতে  
পারলেন না ক্রাককে।



ইন্ডিয়ান ইডন গুলাগ:

বিজয়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর আনন্দ অমৃতরাজ প্রাথমিক  
প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়ায় উইম্বলডনে মূল প্রতি-  
যোগিতায় সিংহাসন খেলার সুযোগ পাননি। প্রাথমিক  
থেকে মূল আসে গতবারের জনিয়র চ্যাম্পিয়ন রমেশ  
কুমার। আর মূলে খেল লক্ষী মেনন।

লক্ষী প্রথম রাউন্ডে স্ট্রটের রবিন ড্রিসডেলকে  
হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে ৪ নম্বর বাছাই যন্ত্রাশ্রয়ের  
ভিটাস গেরলাইটের মুখে পড়ে। প্রায় বামবে মখে  
পড়ার মত। তার লক্ষী বিরুদ্ধে মার্কিন টেনিস  
তারকার জয় সহজে কাণ্ড হারানি। টাই বেকের  
৭-৬-এ লক্ষী প্রথম সেটটি নিয়ে পরের তিনটি সেটে  
হারে দারুণ খেলে, ৪-৬, ৫-৭ ও ২-৬ গেমে।

টেনিসের ঘরানা এবং জীবিতের কিছটা প্রমাণ  
দিয়েও রামনাথন কুমারের পুর রমেশ কুমার। রমেশ  
গত বছরই জনিয়র খেতাব জিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতাবন  
খেলোয়াড় হিসাবে টেনিসবিশারদের নজর কাড়ে।  
এবার পর পর দুটি রাউন্ডে যন্ত্রাশ্রয়ের বিল স্ক্যানলন  
এক স্ট্রটের মারক ক্রাক হারিয়ে বেশ সাড়া জাগায়।  
প্রতিদ্বন্দ্বী দুজনই নামী খেলোয়াড়। স্ক্যানলন গত  
বছর কোয়ার্টার ফাইনালে হেরেছিলেন জিম কনসের  
কাছে, মারক ক্রাকও এসেছিলেন শেষ ১৬ জনের মধ্যে।  
কিন্তু রমেশবীরে স্ক্যানলনের স্থানও উচুতে, ২-৭  
নম্বরে। রমেশ স্ক্যানলনকে হারায় ০-৬, ৬-৪, ৬-৪,  
৬-৪ গেমে এক ক্রাকে ৬-৭, ৭-৫, ৭-৫ ও  
৬-১ গেমে। তৃতীয় রাউন্ডে কিছটা অপ্রত্যাশিত-  
ভাবেই ০-৬, ৬-৭ ও ২-৬ গেমে হেরে যাক  
হাঙ্গেরীর বালাজ তারকাঙ্কর কাছে। তৃতীয় রাউন্ডে  
জিতলে রমেশকে প্রিকোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে হত  
বঙ্গের সঙ্গে।

সিগলসে ভারতের কেউ বাছাই আলিকার না এলেও  
ডাবলসে আনন্দ ও বিজয় ১২ নম্বরে স্থান পেয়ে-  
ছিলেন। মিস্ত্র ডাবলসে ৫ নম্বর জুড়ি ছিলেন বিজয়  
অমৃতরাজ এবং মার্কিন যোয় আনি মিস্ত্র। আনন্দ  
অমৃতরাজ এবং যন্ত্রাশ্রয়ের রেজমের ক্যাসালস ছিলেন  
৮ নম্বর বাছাই।

অবশ্যই জুড়ি যন্ত্রাশ্রয়ের ডাই-বোন জন অস্টিন  
এবং ট্রেস অস্টিন মিস্ত্র ডাবলস খেতাব জিতলেও  
পাঁচ নম্বর বাছাই বিজয় ও মিস্ত্র দ্বিতীয় রাউন্ডে  
হেরে যান এক অন্যরা অস্ট্রেলীয়কে জুড়ির কাছে।  
আনন্দ ও রেজি ক্যাসালস কোয়ার্টার ফাইনালে হারেন  
৪ নম্বর জুড়ি অস্ট্রেলিয়ার রস কেস ও ওয়েড  
টান বেলের কাছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের কবিব্রমা নীতির ফলে  
দক্ষিণ আফ্রিকা সপে আমাদের ব্রীডলস্পক নেই।

ডেভিস কাপের ফাইনালে উঠে একই কারণে ভারত  
দক্ষিণ আফ্রিকা সপে ফাইনাল খেলেনি। এখানে  
উইম্বলডনে কীভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা খেলোয়াড় রকট  
ট্রাগোলাকে জুড়ি করে লক্ষী মেনন ডাবলস খেলার  
বোকা গেল। লক্ষী ও ট্রাগোলা অকণা প্রথম রাউন্ডে  
হারে যন্ত্রাশ্রয়ের রিভেন-স্ট্রাট জুড়ির কাছে।  
ট্রাগোলা যদি ক্রুচমের খেলোয়াড় হয় এবং কবিব্রমা  
সমর্থন না করে পৃথক কথা। তার তার সঙ্গে লক্ষী  
খেলার যৌক্তিকতা থাকে পাছ না।

আমরা জানি, দুই সহোদর বলে এবং একসঙ্গে  
খেলার সুবাদে বিজয় ও আনন্দ ডাবলসে শক্তিশালী  
কম্বিনেশন। এক নম্বর কোর্টে এবার তার প্রমাণও  
দিয়েছেন। তৃতীয় রাউন্ডে তিন নম্বর জুড়ি রায়ন  
গটফ্রড (যন্ত্রাশ্রয়) ও রাউল রায়মেরজ (মোস্তাক)  
সঙ্গে অসাধারণ সংগ্রাম করে। ৮০-৪ উইম্বলডনে  
জুড়িগত খেলার সবচেয়ে দ্রুতগতির ৮-০ এবার এই  
একটি খেলাই ছিলে দীর্ঘ ৪ ঘণ্টা ধরে। মোট খেলা ২-৬  
৬-১টি গেমে। গটফ্রড-রায়মেরজ জুড়ি জেতেন ০-৬,  
৬-০, ৬-২, ১-৬ ও ১৯-১৭ গেমে। দুই জুড়ি  
দুটি করে সেট জেতার পর ১৯-১৭ গেমে শেষ সেটের  
মার্মাংগে জেতাই বোকা যাক কী প্রচণ্ড চাপের মধ্যে  
চারজনকে প্রত্যর্থা করতে হয়েছে। সব মিলিয়ে  
বিজয়-আনন্দ পান ৩৬টি গেম, গটফ্রড-রায়মেরজ  
৩৫টি। সূক্ষ্ম সূত্রে দেখান জয়-পরাজয়। ৪ ঘণ্টা  
খেলার পর সেটের কোর্টের সমস্ত দশক উঠে দাঁড়িয়ে  
৪ জন খেলোয়াড়ের হাওয়ায় টেনিসের তারিফ  
অভিনন্দন জানান। এ সময় খেলোয়াড় ছিল দারুণ  
জুড়িরই মধ্যে। শেষ সেটে ৬-০ গেমে বিজয়  
আনন্দ সার্ভিস শুরু করেন কিন্তু পরে বামবে পারেন  
না। আনন্দের সার্ভিস ভেঙে খেলার সমতা আনেন  
মার্কিন-মার্কো জুড়ি একই গেমকেই টেনে নিয়ে  
যান ১৯-১৭য়। সত্যিই অসাধারণ সময় চাপের খেলা।

দুই বছরের ফাইনাল—সাইডেনের বিবর্ন বর্গ ১-৬,  
৭-৫, ৬-০, ৬-৭ ও ৬-৬ গেম পাবাতিত কখন  
যন্ত্রাশ্রয়ের জন মাকেনরাকে। (সেমিফাইনাল) কার্কে  
৬-২, ৪-৬, ৬-২ ও ৬-০ গেমে হারান অবশ্যই  
খেলোয়াড় যন্ত্রাশ্রয়ের রায়ন গটফ্রডকে এবং মাকেনরাকে  
৬-০, ৩-৬, ৬-০ ও ৬-৪ গেমে তিন নম্বর  
বাছাই যন্ত্রাশ্রয়ের জিম কনসকে।

মেয়েদের ফাইনাল—অস্ট্রেলিয়ার ইডন গুলাগ (৪নং  
বাছাই) ৬-১ ও ৭-৬ গেম পান ৩ নম্বর বাছাই  
যন্ত্রাশ্রয়ের ট্রেস অস্টিনকে। (সেমিফাইনাল)  
গুলাগ ৬-০, ০-৬ ও ৬-৪ গেম দ্বিতীয় বাছাই  
যন্ত্রাশ্রয়ের ট্রেস অস্টিনকে এক ট্রেস অস্টিন ৪-৬,  
৬-৪ ও ৬-২ গেমে এক নম্বর বাছাই চেকোস্লো-  
ভাকিয়ার মার্টিনা নাজ্জাতিলাভকে হারিয়ে ফাইনালে  
ওঠেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইনাল—৪ নম্বর বাছাই জুড়ি  
অস্ট্রেলিয়ার পিটার ম্যাকনামার ও পল স্ট্রোমি  
৭-৬, ৬-০, ৬-৭ ও ৬-৪ গেমে হারান ৪ নম্বর  
বাছাই জুড়ি যন্ত্রাশ্রয়ের স্টান স্মিথ ও বব লাজকে।

মেয়েদের ডাবলস ফাইনাল—৪ নম্বর বাছাই জুড়ি  
যন্ত্রাশ্রয়ের কাথি জর্ডন ও আনি স্মিথ ৪-৬, ৭-৫ ও  
৬-০ গেমে হারান দ্বিতীয় বাছাই জুড়ি যন্ত্রাশ্রয়ের  
রেজি ক্যাসালস ও অস্ট্রেলিয়ার ওয়েড টানব্লকে।

মিস্ত্র ডাবলস ফাইনাল—অবশ্যই জুড়ি যন্ত্রাশ্রয়ের  
জাইবোন জন অস্টিন ও ট্রেস অস্টিন ৪-৬, ৭-৬ ও  
৬-০ গেমে হারান ৬ নম্বর বাছাই জুড়ি অস্ট্রেলিয়ার  
মার্ক এডমন্ডসন ও ডারান ক্রুমহোল্টকে।

জনিয়র যন্ত্রাশ্রয় ফাইনাল—ফ্রান্সের টি ডুলানি  
৬-৪, ০-৬ ও ৬-৪ গেমে পশ্চিম জার্মানির এইচ  
ডি কিউটলকে হারিয়ে জনিয়র খেতাব পায়।

জনিয়র গার্লস ফাইনাল—অস্ট্রেলিয়ার ডেস  
ফ্রিমান ৭-৬ ও ৭-৫ গেমে স্বদেশের সূয়ে লিয়নকে  
হারিয়ে পায় জনিয়র খেতাব।

মুফুদ

## আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **বই**

**জিলাবাহার।** পরিচোষ সেন।  
প্যাপিরাল, ২ গণেশ মিট লেন, কলিকাতা-৭০০০০৪। মূল্য বোল টাকা।

রূপের রেখা—তা সে তুলির হোক বা কলমের হোক—রসের ধারায় মধোই আপন সীমাকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করে। ধর্মগত এই মিলের সঙ্গে কর্ম-প্রকরণগত মিল যন্ত্র হওয়ার ফলে চিত্র-শিল্প ও সাহিত্য-শিল্প পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সহচর। উভয়েরই মৌল উপকরণ বর্ণ। তা সত্ত্বেও সেখানে পাই খুব কম মিলপাই। কলম দিয়েছেন, কলম সিঁহিঁড়াই সমান্তরালভাবে তুলি চালিয়েছেন। ছবি লেখা এবং গল্প আঁকার দৃষ্টান্ত প্রতিভা নিচুই আরও বিরল ঘটনা।

পরস্পরের প্রতিরূপ রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে আঁত সৃষ্টিকালে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'চিত্রকর' পরিচোষ সেনের 'জিলাবাহার' গ্রন্থের বিস্ময়কর পূর্বকর্ম। যদিও এই দুটি গ্রন্থের মধ্যে নানা কারণেই তুলনা চল না, তবু উভয়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মিলও খুব কম নয়। একটি যুগ-কাল এবং পরিবার-পরিবেশ নির্মুক্ত তরুণ মানের অন্ধুরিত ও কিশিভ হয়ে ওঠার ইতিহাস, ভাল-মান-হুগেন্ড তালিম এক সুরসংকেত ছাড়িয়ে আছে দুটি গ্রন্থেই। একইনৈর দৃষ্টির ক্ষণিতা, অন্যজনের পারিবারিক সংস্কারতা পরোক্ষ শিল্প-চর্চার চ্যালেঞ্জ হিসেবে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। ন-টি নকশা-নিবন্ধ ঢাকা

খয়ের একটি পথকেগিত পঞ্জীর চালচিত্র একেছেন পরিচোষ সেন। চিত্র-গুলি চালচিত্রের মতই কেটে কেটে বসানো কিন্তু সব মিলিয়ে একটি অর্থ-ব্যতাকার মাত্রা যন্ত্র হয়ে সম্পূর্ণ ব্যক্ত-প্রতিভা তৈরি হয়ে গেছে। ঠিক কাহিনী ধরে ধরে জিলাবাহার এগিয়েনি। কতক-গুলি চিত্রই এবং দৃশ্যোচ্ছল ঘটনার অনুব্রহ্মে জীবন রহস্যের অধ্যায়গুলো বাঁধা হয়েছে। নামকরণের কৃত্তিক ভাঁজ যদিও উক্ত নামের একটি উপসর্গ যাঁর অভিধানিক অর্থ জীবনবসন্ত। কিন্তু এর তাৎপর্যঘটিত আঁটার আর একটি অর্থও অলক্ষ্যগোচর নয়।

জীবন্ত সৌন্দর্য বা জীবনের দুর্মর বেঁচে থাকার রূপকালী তার শিল্পী মনের শৈশব সরাণি হয়ে দেখা দিয়েছিল। মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হবার মতই তো সৌন্দর্য এবং এই মনের সৌন্দর্যই শিল্প। প্রায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী পরিচোষ সেনের প্রতিভায় জীবন এই মৃত্যুকেই পদে পদে অতিক্রম করে গেছে সমস্ত প্রতিকূল উপাদান এবং উপেক্ষা ভেদ করে। ঢাকা শহর থেকে তিনি ছুটে চলে গিয়েছেন মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে, পরে সেখান থেকে প্যারিসে। তার অপ্রকাশিত প্রতিভাকে প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, পরে স্বীকৃতি জানিয়েছেন শিকাসো। পিকাসো পরিচোষকে মডেল করে ছবিও এঁকেছিলেন এই মজার খবর অনেকেরই জানেন না। বাঁধ বান এক

অনুপেক্ষ লক্ষ্যভেদী রেখার সঙ্গে হর-বোলা রেঙের কিস্তির গুচ্ছ, পরিচোষ সেনের চিত্রকলায়। জীবন পর্ববৈক্যে তিনি আশ্বাশানী। চিত্রকর হিসেবে তিনি স্পষ্টতরূপী, ভাবতাহীন এবং নিভীত। তার লেখার মধ্যো সেই গুরু থাকার তার প্রথম পর্যায়ের এই লেখাদুলির ভেতরে-বাইরে একটা নিবন্ধ এবং আধুনিক স্টাইল গড়ে উঠেছে। নিজের সম্বন্ধে প্রায় কিছুই না বলে শুধু, জীবনরম্ভের পশ্চাদ্দর্শটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ একে গিয়েছেন। একটি বিশেষ স্থান এবং কালের নড়ির স্পন্দন ধরা পড়েছে তার কলমের ডগায়। যে কলম নিরপেক্ষ নিলিঙ্গ এবং সন্তোষমুগ্ধ। হারিয়ে যাওয়া জীবনরম্ভের ডকুমেন্টারি আলোবাম হয়ে থাকল তার এই ন-টি রচনা। অ-শিল্পী পঠকের কাছেও পরিচোষবাবুর বিচিত্র চিত্র-ছটা



এবং দৃশ্যগুলি স্মরণীয় এবং উপভোগ্য হয়ে উঠবে তাকে সম্ভব নাই। বিশেষ করে 'দাঁজ' হাফিজ মিল্লা, সিনপেপের জিতনে গোসাই, ডেনটিস্ট আখতার মিল্লা, প্রসন্নকুমার, আগুন, নবাব, সেজোবাব এবং এই অল্পই অত্যন্ত প্রচ্ছন্নসীল রচনা।

সেই অসামান্য আনার্টাম-জ্ঞানসম্পন্ন হাফিজ মিল্লার পায়রা ওড়ানে; নাটকে সিনপেপের, ক্রিপ্রভাত তুলিবহন জিতনে গোসাইয়ের বিচিত্র চিত্রকর্মের পাশাপাশি মোতাহী প্রহরে জড়িতকণ্ঠের স্ফূর্ত সঙ্গীত—ফাগুনের কু-বাসনে/বুকের কাপড়-বায় লো খসে/পোড়ার মতো কোঁকল এসে/কুহ-হু, করে সে—তোলা যায় না। দাঁত কসারী লাগানে জগণী ডেনটিস্ট আখতার মিল্লার 'খানদা' স্ফূর্ত সত্যনিষ্ঠ বিকার কাহিনী এবং তার অন্তিম কিসা-যাত্রা; পিতা বৈবাহিক প্রসন্নকুমারের অন্দর মহল-বহিমহলের হাল-চাল পাঠকের বহুদিন মনে থাকবে। তার আর একটি অসাধারণ রচনা আগুন মৃত্যুদুর্ভাগ্য জীবনের বর্ণনায় যেন শোকার্তকম্পের মন্ত এবং উপলব্ধি একই সঙ্গে। একটি গাছকে চারদিক দিয়ে করে আর এক জীবনের প্রচ্ছন্ন গল্প হে অজান মনকে নড়া দেয়। ন-বাব, সেজোবাব, এবং এ গ্রন্থের কেন্দ্রীয় রচনা 'আমি' ঘণাবিত একাধিকবার পরিবারের মনোস্থানি অবলম্বন নিয়ে নব্বই তথ্যচিত্রের মত মনের মধ্যে দাগ রেখে যায়। সব মিলে

'সাহিত্য সমবায়' প্রকাশিত :  
'রাজন-সংস্ক'—এফ ৭, জয়ন্তী পার্ক, কলকাতা-৩৪  
'একজোটে'—৭৫/৩/১, সন্তোম রায় রোড, কলকাতা-৩৪  
'নিজনে'—৮/১, বেচরাম চ্যাটার্জী রোড, কলকাতা-৩৪  
'বিরুদ্ধ'—১৩, গোপাল ঘোষ লেন, কলকাতা-২৩  
শারদীয়া সংখ্যার জন্য রিপ্লাইকার্ড সহ ছোট কবিতা পাঠান।

'কলির ঠাকুর রামকৃষ্ণ' রেকর্ড খ্যাত ভক্তমণ্ডলী কণ্ঠক উচ্চ প্রশংসিত  
**নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের**  
ভক্তিমূলক গান ও গীতি আলোচনা  
● কলির ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ  
● পরমাপ্রকৃতি সারানামণি  
● স্বামী নিবেকানন্দ  
● মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য  
যোগাযোগের ঠিকানা—এম চ্যাটার্জী  
জি-২/১, ১৩৬৭ আনন্দ রোড, হাওড়া-৩

প্রকাশিত হয়েছে  
**উত্তরকালের গল্প/৩**  
গল্প : অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়, দেবকুমার মৈত্র, পল্লব রায়চৌধুরী, গৌতম বসু, নিতাই চক্রবর্তী ও প্রেম-চন্দ্র II এছাড়া গ্রন্থ পর্যালোচনা ও শিবনারায়ণ রায়ের চিঠি। যেকোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক করা হয়—  
বাসিক : সড়াক চট্টালা II যোগাযোগ :  
প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : সম্পাদক  
১২/১, সামন্তল হদা রোড, কলি-১৭

বিনয়ভূষণ ঘোষের  
**দ্বিজাতিতত্ত্ব ও বাঙালী** ১০৮  
আসাম ও বাংলাদেশে বাঙালী সংখ্যা গন্য নিগাতন দেশবিভাগ প্রস্তুত আন্তর্জাতিক সমস্যা। এই ঘটনার পূর্নাজ ইতিহাস ও সমাধান সমৃদ্ধ এই পুস্তক।  
সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে  
এবং বিশেষ ভাঙে প্রাপ্তব্য  
৬/১/৮, পি, ডবলিউ, ডি, রোড কলি-৩০

এবারে দুই পর্বে  
প্রকাশিত হচ্ছে  
নীলরতন সেনের  
**আধুনিক বাংলা ছন্দ**  
প্রতিপর্ব আঠারো টাকা  
দে বুক স্টোর  
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট  
কলিকাতা-৭০০ ০৭৬

প্রকাশিত হলো  
**অর্গানন অব মেডিসিন**  
স্যামুয়েল হ্যানিম্যান এম.ডি.  
বল্লানুদ/সম্পাদনা :  
উত্তর এস এন সেনগুপ্ত  
পরিবেশক—উচ্চারণ  
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট  
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রভাত কুমার দত্তর  
**সমকালীন বাংলা মঞ্চ ও নাট্য আন্দোলন**  
মূল্য চার টাকা  
নবায় থেকে আটাত্তর সাল পর্যন্ত বাংলা গ্রন্থ থিয়েটারের মনোজ আলোচনা  
মণ্ডল বুক হাউস  
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৩

পল্লবরামের নাটক  
**ভূশুণীর মাঠে**  
তিন টাকা  
নাট্যরূপ : জমিতাভ চৌধুরী  
**চিকিৎসা সংকট**  
তিন টাকা  
নাট্যরূপ : স্বতীজকুমার সেন  
এম. সি. সরকার  
অ্যাড সল্য প্রাইভেট লিমিটেড  
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট : কলি-৭৩

কবিতা-আন্দোলনের যুগপত্র  
**উত্তরসূরি ১০৫**  
প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি ভূমূল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে শুক্ল তরুণতম কবিমহলে। অক্লপ মিল পরমানন্দ সরস্বতী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আলোক সরকার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত থেকে প্রতিনিধি স্থানীয় সকল কবিদের রচনা। প্রাচীন পুঁথি, সাম্প্রতিক ইংরেজী কবিতা, শেকস্পিয়ার চিন্তা মলয়শংকরের অসাধারণ প্রচ্ছদ।

**মালিনী**  
মেয়েদের কাগজ কিন্তু মেয়েলি নয়  
১লা জুলাই থেকে তার নতুন তিকান সবাই আসুন সবাই মিলুন  
লিখে বিন :  
১৪/ডি রোড স্ট্রীট, কলি-৭০০ ০১৬  
(আসোচ্ছলি অব গুপ্ত চারু-এর পাশে)  
সম্পাদক : মায়ী সিদ্ধান্ত  
প্রতি সংখ্যা : এক টাকা পঞ্চাশ

# জীবনে ছোট-খাটো মুখের মূল্যও অনেক...



শিশুর চোখে আনন্দের ঝিলিক দেখা কিংবা বাড়ির সবাইকে নিয়ে কোথাও রেডাতে যাওয়ার আনন্দ বড় কম নয়, ছোট হলেও জীবনে এই মুহূর্তগুলির মূল্য অপরিমিত। আজ আপনার বয়স অল্প, সঞ্চয় করার মতো কিছু পয়সাও আপনার হাতে আছে—আজই কানাডা ব্যাঙ্ক একটি নিরন্তর ডিপোজিট খুলে ফেলুন। অল্প কিছু টাকা—তা সে যত কমই হোক না কেন—নিয়মিত ভাবে প্রতিমাসে কিংবা কিছু টাকা একসঙ্গে জমা রাখলে এ থেকে সারা জীবন আপনার বেশ কিছু বাড়তি আয় হতে পারে। কানাডা ব্যাঙ্ক প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে টাকা দিতে শুরু করবে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—সারা জীবন ধরেই এই টাকা আপনি পেয়ে যাবেন। বিলাসিতা, সুখ—এমন কি অবসর জীবনের শান্তি, সব কিছুই হবে আপনার করায়ত্ত। এই কুবেরের ডাঙার শেষ হবে না কোনদিনও। অথচ আপনার মূলধন অক্ষয়ই থেকে যাবে, প্রয়োজনে তাও কাজে লাগাতে পারবেন।

যেসব অল্পবয়সী মানুষ জীবনের পুরো আনন্দ উত্তল করে নিতে চান, কানাডা ব্যাঙ্কের দূরদর্শী নিরন্তর ডিপোজিট তাঁদেরই জন্যে।

বিশদ বিবরণের জন্যে কানাডা ব্যাঙ্কের নিকটবর্তী শাখায় চলে আসুন। আমাদের অন্যান্য আরও বিশেষ পরিকল্পনার মধ্যে আছে : ক্যাম্পেন, বিদ্যাবিনিধি এবং বালকেম।

## নিরন্তর ডিপোজিট

## কানাডা ব্যাঙ্ক

(একটি বাস্তবায়ন ব্যাঙ্ক)

সারা দেশে এই  
ব্যাঙ্কের ১২০০-রও  
বেশি শাখা আছে।



স্বাভাবিক এক কথাই, একটি জিন্দা-  
বিশ্বত বলা যায়।  
হৃদয় শৈলিতে তবু একটা চুটি  
স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। শিশু এবং বালক  
সের পরিত্রাণের চোখ দিয়ে প্রথম  
বার আদলে এই গ্রন্থের  
নকশা লিখিত অনুপ্রাণিত হলেও  
মন কোন রচনার অংশ বিশেষে  
মন আগমনে রচনা। পরিত্রাণ  
কণী পরিত্রাণ সেনের মনস্তত্ত্ব যুক্ত  
যে গেছে। এই দ্বিতীয় মাত্রা চিত্রের  
চুক্তা যেন যা দিয়েছে। আর একটি  
যেয়ে রচনার কিছু করার আছে। তার  
লিপিত নিরপেক্ষ সবেম একটি রচনার  
আমি। ব্যাহত না হলেই ভাল হত।  
রূপকে গোপন করাই যেমন প্রকৃত লিপিত  
মনি ক্রোধকেও। তার মত লিপিত  
গছে এই সামান্যতম বিচলিত অবস্থাও  
করা আশা করি না।

রিতোষাব্যবস্থার ব্যৱেটি রেখাচিত্র  
ই গ্রন্থের মূল্যমান বাড়িয়ে দিয়েছে।  
মানব বাসচী

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি চিত্রকলা

## বাগ্যত বিষাদ

আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ  
হলো বিপন্নতা এক বিপন্নতা। এই  
বিশ্বভূমির মায়ার সম্বন্ধে আসক্তি-  
ক্ষতির চান। কিন্তু তবু হৃদয়ের ফকি  
দিয়ে যেন অজিলা-ভয় জল যায়।  
মৃত্যুর সাত দিন আগে জী পল সার  
শেষ সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, মানব  
প্রথম যে জিনিসটা বোঝে সেটা হলো :  
আমি আছি। তারপর দ্বিতীয় উপলক্ষ  
হয় তার—নৈতিক হিসাবে আমি থাকব।  
কিন্তু সে থাকে না থাকায় পৃথিবীর  
কাজে যায় আসে না। যা কিছুই করা  
যাক না কেন তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে (সেই  
শমিস ফায়ারল শব্দটা ব্যবহার করে-  
ছেন)। তবু কাজ করে যেতে হবে বাধ্য  
হবে জেনেও। অস্তিত্ব মানে এক নিবিড়  
লাভার কিস।

তরুণতম শিল্পীদের অনেকের  
কাজেই এই বিশ্বাসের ছায়া। শূভাশ্রম,  
অলোক ভট্টাচার্য, কাওন দাশগুপ্ত,  
বিশ্ববর্ষিত মাইতী বা বৈশ্বত পোশাবমী  
প্রশান্ত নিয়োগীর ছকির বিষয়কত্ব,  
চিত্রপ্রতিমা (আইকনোগ্রাফি), অঙ্কন-  
কলার যতই অমিল থাকুক,  
মানসিকতার কোথায় একটা সাক্ষ্য  
ধরা পড়ে।

হরেন চাকুরের মিশ্র মাধ্যমে আকা  
ছবিগুলো শৈলীর ভিন্নতা সত্ত্বেও এই  
নব্য দীর্ঘায় সঙ্গো মিল কম নয় এক  
তাই স্বাভাবিক। হাতে তৈরী কাগজে  
প্রধানত জলরঙে আঁকা হলেও অন্য  
মাধ্যমও ব্যবহার করেছেন।

জন্ম ১৯৫০। কলাভবনের স্নাতক  
১৯৭৫। শাসিতনিকেন্তন থেকে যান  
কলার মনেকান স্কুলের শিল্পকলার  
শিক্ষক হয়ে। সম্প্রতি হরেন  
আবাসনীতে একক প্রদর্শনী করে  
গেলেন।

দীর্ঘায়িত তার মানবজনের সঙ্গো  
বিনোদবিহারীর রূপারোপণের অনেক  
অংশে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু তার  
বিশ্ব, ভূমিব্যবস্থান-রচিত নিজস্ব।  
সমগ পটভূমি পট পট অসংখ্যক অসংখ্য

রেশম দিয়ে জগৎ করে তার মতো  
দীর্ঘায়িত এই সব মানবজনের জিন  
বল-ছড়াবে সাজান। ফকিগুলো সমস্ত  
রঙ দিয়ে ভরেন। সামান্যতম মৃত্যু,  
মৃত্যুকাল, মৃত্যুকাল, মৃত্যুকাল, মৃত্যুকাল,  
শব্দকাল, সংকার সমাধি অস্তিত্ব  
অনুষ্ঠান নিয়ে তার ইলানিকালের  
ছবি। সামনে পেছনে কয়লাই ছোট  
ছোট পাছা, রক্ত পাহাড়ী প্রান্তর,  
বেন প্রকৃতিও মৃত্যু। হরেনের কোন  
বক্তিতও পুরোজগতের ল্পশ। বর্ণপট  
তার খুবই সীমায়িত। মৃত্যুর, হালকা  
বাদামী, ফিকে নীল। ছবি মানে রঙ।  
পেনটিং মানে পেন (কেননা) তার  
ছবিতে বার অভাব নেই। পেনটিং মানে  
আবার স্পট (কফ)। সুতরাং, কফ  
ব্যাপারে কুপনতা চলেবে না। ঘন এক  
ফিকে উজ্জ্বল স্ক্রু অসচ্ছ বর্ণের  
কেন্দ্রী করা ফলবগান তৈরি করতে  
হবে। সেখানে শীতল বাগীর বাক্যের  
তিনি আমাদের জমিরে দিয়েছেন।  
যেখানে রচনা এবং চিত্রনির্মিতের  
কঠোরো বহুলবেশ কঠিন সেখানে  
ঠান্ডা রঙ যেন যায় না। তা ছাড়া, তার  
অঙ্কনও একটু দুর্বল। তবুও তার  
কাজের মধ্যে প্রতিপ্রতি আছে। যদিও  
ছাত্রজীবনের কিছু কাজ ছিল যা নিক  
হাত মকসো করার পর্যায় পড়ে।  
এগুলি বাদ দিতে পারতেন। এত দূর  
থেকে এসে ঘন বর্ষায় প্রদর্শনী করার  
জন আশানুরূপ দর্শক পাননি।  
আকাশমীর কর্তৃপক্ষ এ সব বিষয়ের  
তীক সাবধান করবেন না অন্তত সেই  
অভিজ্ঞতাটুকু তার হলো।  
দর্শনীয় সরকার

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি চলচ্চিত্র

## দর্পচূর্ণ

ছবির টাইটেল আরম্ভের আগেই  
আনিয়ে দেওয়া হয় যে মূল গল্পটি  
আকারে ছোট বলে চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে  
কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে কল্পনা  
প্রয়োগ করে। চলচ্চিত্রের ভাষায় কোন  
কাহিনী রূপান্তরিত করতে পরিচালনা  
ও পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রেই অনিবার্য।  
তাই বলে মূল কাহিনীর অন্তর্গত  
মতো চরিত্রগুলির নাম এবং কাহিনীভূত  
ঘটনাবলীর এক-চতুর্থাংশ (ও সম্ভাব্য  
কিছু সংলাপ) মাত্র রেখে বাকি সবটাই  
কল্পনা থেকে গঠিত করার উদ্যম  
স্বাভাবিক বা প্রত্যাক করা গেল জাত  
কাহিনীটি শরৎচন্দ্রের বলে ছবিতে  
উল্লেখ না করলেই শোভন হতো।

শরৎচন্দ্র রচিত কাহিনীতে মূল  
চরিত্র ইন্দুমতী ও নরেন্দ্র। নরেন্দ্র লেখন  
বলে সংসারের বায় নির্বাহে অক্ষম।  
এই নিয়েই ধনী কন্যা ইন্দুর সঙ্গে  
তার বিয়ে। শান্ত প্রকৃতির ভাগ্যো-  
মানুষ নরেন্দ্র দুঃখটা নিজের ভোগ করে  
—ইন্দুকে তার ভাগিদার করা চান  
না। ছবিতে কিন্তু ইন্দুর চেয়ে নরেন্দ্রের  
জীবন প্রায় অতিক্রম করে ভোগে পাওনা  
দায় শব্দ পাল। মূল কাহিনীতে তার  
আভাস মাত্র দেওয়া আছে। ওই পাওনা-  
দায়ের ঋণ মেটাতে বাধ্য হয়ে নরেন্দ্র  
জেলের যায়। ইন্দু তখন বাপের বাড়ি  
তাই সে খবর জানত না। কলকাতার

আকাশবাণীখ্যাত বেলা দে'র

রূপ সাধনা ১২

দেশ বিদেশের রান্না ১২

গী দ্য মপার্স

পার্স এস বাক

কৃষ্ণা স্বপ্ন আদিম ১২

শয়তানের চোখে ঘুম নেই ১২

নিক কাটার

আর্থার কোনান ডয়েল

অপারেশন কায়রো ১২

গ্লোরিয়াস্ট শার্লক হোমস ১২

রবার্ট ম্যাককান

স্পাই ইন বস্ফোরাস ১২

নীহারজন গুপ্ত

দোলনচাঁপা

তারা ওঠার আগে

ক্লাউবিহজ

১০

৬

৫

চিরঞ্জীব সেন

নীহারজন গুপ্ত

নিশাচর

মক্কাভাড়া ১০

প্রজাপতি রঙ ৬

ডেডবডি ১০

বনফুলের

শক্তিপদ রাজগুরু

আশাপূর্ণা দেবী

মানদণ্ড ১০

আমি শুধু একা ১০

বংশধর ৭

বনফুলের শ্রেষ্ঠগুণ ২২

শক্তিপদ রাজগুরু

নিশাচর

হরিনারায়ণ চট্টো

প্রতি ঘরে ঘরে ১৫

স্বর্গগড় ৮

বসন্তবাহার ৮

সন্ধ্যা প্রকাশনী ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-২

ডঃ সুবোধ সেনগুপ্তের

৯ খানি অসাধারণ সমালোচনা গ্রন্থ

হাস্যরসিক পরশুরাম

জীবন সন্ধ্যাকে লেখক পরশুরামের রচনাকে সজীবনী শক্তি রূপে  
আবিষ্কার করেছেন। ১৫.০০

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য

শরৎ রচনাবলীর নিপুণ বিশ্লেষণ ছাড়া এই গ্রন্থে লেখক অকাতী  
যুক্তির সাহায্যে শরৎ জীবনী সম্বন্ধে প্রচলিত অনেক জল্পনা  
কল্পনার অবসান ঘটিয়েছেন। ১২.০০

শরৎচন্দ্র

ধ্বন্যালোক

(দ্বাদশ সংস্করণ) ১৫.০০

৮.০০

বাংলা সমালোচনা পরিচয় যত্ন

মধুসূদন কবি ও নাট্যকার ৮.০০

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল ৮.০০

THE ART OF BERNARD SHAW

15.00

AN INTRODUCTION TO

ARISTOTLE'S POETICS 8.00

এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ

২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি ৭৩

# পরিপূর্ণ জীবনের জন্যে শক্তি



ওকাসা যোগায় প্রাণশক্তি। ৬টি বায়োকেমিক্যাল, ৬টি খনিজপদার্থ, ১০টি একান্ত প্রয়োজনীয় ভিটামিন, অম্লগন্ধা ও ইয়োহিম্বাইনের মত ভেষজ নিগাসের এক জোড়ালো সমন্বয় ওকাসা—আপনার হারানো শক্তি ফিরিয়ে দেয়। ওকাসা খান, জীবনকে অসাধারণ আনন্দময় করে তুলুন।

এখন সহজে নাড়াচাড়া করা যায় এমন প্যাকে

## ওকাসা

সব প্রধান কেমিস্টের দোকানে পাবেন  
ওকাসার বিনামূল্যের পুস্তিকার জন্তে লিখুন:  
OKASA CO. PVT. LTD.  
P.O. Box No. 396, BOMBAY-400 001.

022

প্রকাশের পথে একটি অনবদ্য ব্যঙ্গ রচনা।  
\* সজীব চট্টোপাধ্যায়-এর \*

## মনুষ্য ক্রেশ নিবারণী সমিতি

কসমস কয়েকটি অভিনব বই

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	সজীব চট্টোপাধ্যায়
দরজার আড়ালে ৯৯	বহু দূরের ওপার হতে ৯৯
চিরজীব সেন	সমরেশ বসু
দুরন্ত দুবাই ১২৯	সোনালী পাড়ের রহস্য ৫৯
ফ্যানটম ৫৯	বিচিত্র শিকার কাহিনী ৯৯

কসমস আসন্ন ফ্রাইম প্রকাশ

কলকাতা সেনগুপ্ত-র

## কুমুমে গরল একফোঁটা

এই লেখকের অন্যান্য ফ্রাইম থ্রিয়ার  
রক্তা খুন হল ১২.০০ ডায় ১০.০০  
দহনে বিষ দহনে বড় ছালা ৯.০০

কসমস

প্রকাশক : মৌসুমী ব্রহ্মচারী  
১৪ কলকাতা ১০

হিচ  
হাইকার  
১০৯



ফিরে ইন্দু আরও জানল যে নরেন্দ্রের মামাতো ভাগিনী বিমলা তার সমস্ত গহনা বিক্রি করে নরেন্দ্রের ঋণ শোধ করে তাকে কারামুক্ত করেছে। তখনই ইন্দু তার মিথ্যা দপ ফুলে বার।

চিন্তাচাকার-পরিচালক দিলীপ এম যেভাবে ঘটনা সাজিয়েছেন তাও নরেন্দ্রের জীবনে পাওনাধার শব্দ পালই অভিশাপ রূপে দেখা দিয়েছে। ছবি এক-ভুতায়ীশে শব্দ পরাগ (নিশ্চয়ই চরিত্রটি ডত্তমকুমারকে দিয়ে অভিনয় করানোর উদ্দেশ্যেই) অবস্থিত। এবং এক মাত্র পুরুষে হারানোর শোকে সে এমন নির্মম যে পাওনা টাকার জন্য নরেন্দ্রকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ব্যর্থপ্রস্ত করে তোলে। পরিশেষে কিভাবে তার পুত্র বিপদে গিয়ে আত্মবাসীদের হাতে নিহত হয় সে-কাহিনী সর্বিস্তার ব্যস্ত করার পরই নরেন্দ্রকে ঋণের দায় থেকে মুক্ত করে। পর্যায়-যে-কাহিনী প্রাতি-ফলিত ভাবে দেখা গেল মনুষ্য-ক-যন্ত্রণা দিয়ে আমোদ উপভোগ করার দপ ছিল শব্দ পালের এবং নরেন্দ্র অসহ্য অবস্থায় ছেন তার সেই দপকে চণ করে দেয়। আর এই শব্দ পাল চরিত্রটিকে প্রাণ্য দেবার জন্যই ইন্দু সঙ্গো বিবাহের পূর্বেই নরেন্দ্রকে দিয়ে কিলের নেওয়া হয়েছে যে পিতৃধন্য সে শোধ করে দিয়েছে। যা মূল কাহিনীর ঠিক উলটো ব্যাপার। মূল কাহিনীতে ইন্দু ও নরেন্দ্রের মানসিক সংঘাতকে হৃদয়ভর্যায় সন্দেহ তারের অনুরণে স্বকৃত করে তোলা হয়েছে। দিলীপ রায় তার ধার দিয়েও যেতে চাননি। বরং মূল কাহিনীর আবেদন জোড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন সব চরিত্র ও ঘটনা তিনি উদ্ভাবনা করেছেন যা শরৎচন্দ্রের রচনার সঙ্গো মিশে পুরু-চন্দ্রালী দোষ ঘটিয়েছে। শরৎ রচনার 'মেজাজ' সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। আর এই পুরুচন্দ্রালী মেজাজ ব্যাপারটা পরিজ্ঞাত সর্ববিশেষে। যেমন, পাচ-পাচীর সাজ-পোশাক দেখে বোঝা যায় ঘটনা-কাল বাড়বাতিড় আমলের। অথচ সুইচ টিপে বিজলীবাতি জ্বালানো হয়।

হীকর্জনি দেখতে শেষ পর্যন্ত যে কসে ধাকা যায় সে আকর্ষণ হলেন অভিনয় শিল্পীরা। উত্তমকুমার (শব্দ) সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (নরেন্দ্র), সন্দ্যা রায় (ইন্দুমতী), সুরভা (কিমলা), দীপঙ্কর দে (গগন), ডানু কন্যা-পাধ্যায়, নির্মলকুমার, লিলি চক্রবর্তী, সজল পাঠক প্রমুখ কৃতি শিল্পীর অভাব নেই। কিন্তু নরেন্দ্র ও শব্দই ছেড়ে থাকে প্রায় অর্ধেক চেষ্টা। ব্যাক চরিত্রগুলির ভিত্তি কেমন যেন

জানগা। বিবাহ বলির ছাড়া গা-  
কোন প্রয়োজনই ছিল না। কালী  
সেনের সুরে মাল্লা দে, হেমন্ত ম-  
পাধ্যায় ও অরুণভট্টা চোম চৌধুরী  
কর্তে শুনতেও ভাল, কিন্তু  
প্রসিদ্ধ মনে হয়।  
পঙ্কজ দত্ত

জালোচনা: শির সংক্টিত সংগীত

## রবীন্দ্রসদনে গানের আসর পূজা পর্যায়

রবীন্দ্রসদনের উদ্যোগে রবী  
জন্মোৎসবের অন্যতম অংশ পর্যায়  
জিতিক গানের আসর। সামগ্রিকভাবে  
এবার অনুষ্ঠানের দিন কমানো হয়েছে  
কিন্তু গানের আসরের সংখ্যা কমে  
গত বছর বাংলাদেশের শিল্পীদের জ  
নির্ধারিত ছিল একটি সম্মান। এর  
নেই। কিন্তু আসর বসেছে দশ দিনের  
বহু শিল্পী গভীর দুদিন করে গায়  
ছিলেন, এছাড়াও অনুষ্ঠানে সেই প্র  
বজিত। নতুন শিল্পীদের মধ্যে গি  
জন অন্তর্ভুক্ত। অভিশানে পাল ক  
চুক্তিতে হয়েছে এদের। কিন্তু অভিশ  
বে যোগ্যতাকেই একমাত্র মাপকাঠি  
হয়েছিল তার প্রমুখ সকলের ক্ষে  
পাওয়া যায়নি। আবার, আগে যে  
সুযোগ পেয়ে আসছেন যারা, সে  
ভাগ্যবানদের সকলেই যে যথার্থ অর্জ  
শনে টিকে যাবেন, এমন কথাও  
যায় না। দৃ-একজন আগে গান  
অভিশানেও পাল করেন নি, তবে  
সুযোগ পেয়েছেন। এমন নয় যে তাঁ  
নামী কিংবা যোগ্য শিল্পী—অভিশ  
কসতে কলা দৃষ্টতা, তবে কী করে মা  
জায়গা পেলেন এবং প্রোডাক্টলি  
উদ্ভাব করে তুললেন কে জানে। অর্জ  
নামী এবং যোগ্য কিছু শিল্পী  
রবীন্দ্রসদনের আমন্ত্রণ পান নর, এ-ক  
আমরা আগেও বলছি, এবারেও বল  
বাধ্য। সদন মধ্যেই অন্য বহু অনুষ্ঠান  
গান গেয়ে প্রোডাক্টলি আসল  
করেছেন, অথচ কোনরকম আসর  
আমন্ত্রণ পান না এমন একজন শিল্পী  
কথা একদম মনে পড়ছে। তাঁর নাম  
কুমার হাজরা। দেবদত্ত বিশ্বাস না  
আসেন না, শান্তিনিকে ঘোষও কি তাই  
অন্যবার থাকেন, এবারে অনুপস্থিত—



দীপাল সেন





শ্রীমতী ভট্টাচার্য

শ্রীমতী ভট্টাচার্য নাম হেমন্ত মথো-  
ধার, ঋতু গৃহ, বনানী ঘোষ এবং  
প্রায় মথোপাধ্যায়। আরেকটি  
সংখ্যায়ো অন-পস্থিতি হল—অধিকাংশ  
নৈ প্রাক-মধ্যমী উপচেপড়া ভিড়।  
এই সত্যি কমে আসছে, ন্যাক আগ্রহ  
দায় রাখতে সদন-কর্তৃপক্ষ বাধ? দুটি  
র গানের জলসা করে তেলো, পরি-  
শনানী অনসম্মত শিল্পী-সমাবেশ  
মগ্রিক ভাবে নিচু মানের নিবেদন  
জ্ঞাপনের কাপশা-বহু-কিছাই দায়ী  
র জনা। অন-পস্থিতি শিল্পীদের  
পক্ষে সদন-কর্তৃপক্ষ কখনোই কিছ-  
লেন না। কেন? টিকিট কেটে দর্শকরা  
গিনে, শিল্পী তালিকায় হেরফের  
টলে তাদের জানানো নীতিগত দিক  
থকে কর্তব্য। তাছাড়া সরকারী পৃষ্ঠ-  
পাশকতায় পুষ্ট এই প্রতিষ্ঠানে সহ  
গল্পী কেন আমন্ত্রণ পান না, আমন্ত্রণ  
দেও কারা এলেন না এসব তথ্য  
মানবীর দায়িত্ব থাকে। সে-দায়িত্ব সদন  
কর্তৃপক্ষ নেন না। এটা কি ঠিক? এক  
ধরনের আত্মসম্মতি যেন কোথাকার কাজ  
হচ্ছে, যেন শিল্পীরাই ধন্য এই  
সম্মতিতে গান করতে পেরে, দর্শকরা  
না টিকিট কেটে হলে চক্রে পেয়ে—  
এমন যদি কারো মনে হয়, দোষ দেওয়া  
গয় না। ফলে ভিড় তমছে, কমেই  
প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা তমশ উদাসীন হয়ে  
পড়ছেন, পড়বেন। কারো মনে কিছ-  
করার নেই। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা  
প্রয়োজন। সদন-কর্তৃপক্ষ কি ভাববেন?

এবারের অনুষ্ঠানের তিনটি দিন  
নির্ধারিত ছিল 'পূজার গানের জনা'।  
৯ মে শতাব্দীর দক্ষিণীয় সম্মেলক  
সম্প্রতি দিয়ে শুরুর। সূচনা শব্দ। কিন্তু  
একক আসরের প্রথম শিল্পী রিনি চিঠি  
প্রথম গানেই লয় হারিয়ে ফেললেন।  
সর্বোচ্চ বসু বাছলেন যোগাড়ার অনু-  
প্রাণে ভাঙ্গি গান। 'জাগো নাথ জোছনা  
প্রাণে' গানটাই হারানো গলার কণ্ঠসবে,  
কে বাসলে আজতে কণ্ঠ হল  
কিপাশপ্ত। সন্ধ্যায় গানত 'হৃদয় কল্লন  
বন' গানটিতে সতেজ সম্মত আবহাওয়া  
তৈরি করলেন। আসরের পরের গান, 'এ  
কি লাগবে পুণ্য প্রাণ'—এ তাকে ঈষৎ  
প্রান্ত মনে হল। কিশোরী শিল্পী  
অনিরুদ্ধ সিংহ ফলের মতো সহজ  
সুখেই গাইলেন, 'যে ধ্রুপদ', 'তুমি যে  
সুখের আগুন'—এ সেই আগুনের গুণে

কেন্দ্রদেশে অকল এক শব্দ কল্লন।  
অবলম্বিত শ্রীমতী ভট্টাচার্য গান জগতে  
শোনালেন 'কল্লন বলে ধন্য আর্য'। অকল-  
গুণ গুহ্যত্বের তার মধুর উল্লাস কণ্ঠে  
শুনক প্রাণ কানে সবার কল্লন জ্বলিত  
সুন্দরভাবে গ্রাস করল আসরের পরি-  
বেশকে। সেই বিবর্ততা ছিল রণো গুহ-  
ঠাকুরতার শব্দ কল্লনো যে সলোয়ারিতে,  
ছিল গীতা ঘটকের তারে বাধা রেশমী  
মসৃণ কণ্ঠে শোনানো 'এখনো সেল না  
আঁখি' এবং 'শুধু রতে হে নাথ' গানে  
ছিল কল্লন গুহ্যত্বের তার শব্দ  
রে-তে, এমন কি ঈষৎ কল্লনবিহীন কণ্ঠে  
শোনানো শ্রীলা সেনেরা ঘাটে বসে আছি,  
আনন্দনাভেও। এর মধ্যে এলাকা মথো-  
পাধ্যায় দায়িত্ব সুরেলা কণ্ঠে শুনিয়ে  
গেছেন 'হৃদি মন্দির ঘরে' এবং  
'অনিমেব আঁখি'। তার গান পরিবেশকে  
যত নিম্নিত, আবেদনে তত উজ্জ্বল নয়।  
কণ্ঠের অতিরিক্ত তাকাতার কিছুটা  
শাস্তিক অনুভূতি, ভাব কম ফুটতেই যেন।  
অমল নাগ গত বছর ছিলেন না। এবারের  
চারটি গানে কণ্ঠপূর্ণ করলেন। সৌন্দর্য  
তার কণ্ঠের সজীবিত্য নিবেদন 'চ্যামিন  
আপন আমার ঘাবে কেটে'। কল্লন গুহ-  
ঠাকুরতার প্রান্ত কেন ওহে পাশ্ব এই  
সম্মার বিশেষ উল্লেখযোগ্য নিবেদন।

মাধ্যমিক সংস্থার সমবেত সংগীত  
দিয়ে সূচিত হল ২ওমে তারিখে শ্রীমতী  
'পূজা' পূর্বায়ের আসর। মধ্য বাল্য-  
পাধ্যায় অন-পস্থিতি ছিলেন এইদিন।  
মাইকের সোলমাল সত্ত্বেও ভাষ্যত  
মথোপাধ্যায়ের সবল সত্ত্বেও কণ্ঠটি  
চিনে নেওয়া গেছে। স্বাস্থ্যতা মথো-  
পাধ্যায়ের সুরেলা পরিবেশনে ভাব যত  
ছিল, দম তত ছিল না। আশিস ভট্টা-  
চার্যের ভরাট শাল্যামর কণ্ঠে 'ধন্য জাণে  
আঁখি' অসামান্য নিবেদন। আশিস  
ভট্টাচার্য তমশই দিল্লির একটি জাগিয়া  
করে নিচ্ছেন এতে সন্দেহ নেই। মিতা  
দণ্ডিতদার 'ঘা হবার তা হলে' গানে  
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।  
শ্রীমতী মথোপাধ্যায় নিবেদনে উজ্জ্বল,  
নির্বাচনে অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী। প্রসন্ন  
দমশব্দে 'ওই পোহাইল তিমির  
রাততে দাপট ছিল, দাপট ছিল কুমকুম  
চটোপাধ্যায়ের গান মৃতিতেও। বিশেষত  
তার 'এ মোহ আকল' মনে থেকে যায়।  
প্রিমতা মাল্লিক সহজ গানে স্মৃতিময়,  
এরোও দেখা গেল। পোপাল মহাপাত্র  
মেঘকারভাবে তৈরি হুজুনে। আদর্শিত  
সেনগপ্তের 'ঘোর দুখে জাগিল'  
নিশ্চয় পরিবেশন, 'ঘনি সলক কাজের  
কাজ'তে তাকে বেশি করে পাওয়া  
গেছে। সুপের্য চৌধুরীর 'সকল জনম  
ভরে' এই আসরের বিশেষ স্মরণীয়  
পরিবেশন রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।  
তার উল্লাস, স্পষ্ট পরিবেশনে সহজেই  
স্বাভাব্য ফটে ওঠে। গোরো সর্বাধি-  
কারী কিছুটা নিম্নপ্রাণ পরিবেশ তৈরি  
করলেন। বর্ণী ঠাকুর 'তুমি এবার  
আমায়'—এ নিজস্বতায় সজীব সূচনী  
চটোপাধ্যায়ের পরিবেশন শোনা তমশই  
অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছে। কণিকা বন্দ্যো-  
পাধ্যায় স্বমহিম ছিলেন। 'লক্ষ্মী যখন  
আসবে' গানে। কিন্তু 'বরষা ধরা-  
মধ্যে'তে ধরা ও মাকের মধ্যবর্তী  
কল্লনজনিত খণ্ডন কথার বাক্যনাকে  
কল্লন করেছে, তার মতো পরিণত

বিশ্বকবি বনয়ানে বন নিয়ে দাপিয়ে নেড়াছেন অনেক রথী-  
সহায়ী। এদের মধ্যে সেরা কে বা কাদের নিয়ে বিশ্বদল গড়া  
যেতে পারে, সেই বিতর্কিত প্রশ্নের মধ্যস্থ উত্তর নিয়ে প্রকাশিত হলো:

জয়ন্ত দত্তের

## ফুটবলে বিশ্ব একাদশ ১৫

লেখকের অন্য বই:

ফুটবলের মাদুর স্ট্যানলী ম্যাথিউস ৮

ইংলিশ ফুটবলের সর্বকালের সেরা উইংগার, বিশ্বের প্রথম সবার  
উপাধিতে ভূষিত ফুটবলারকে নিয়ে এক অনবদ্য জীবন উপন্যাস।

ফুটবলের সেরা ইয়াসিন ৫

ডিক্টোরিয়াস মোহনবাগান ১০

প্রকাশিত হলো:— পরেশ ভট্টাচার্যের

## শুধার গাত্রে বিষ ৬০০

একদিকে প্রেমের ছলনা, অন্যদিকে রহস্যের ছায়াপাত—রাজগীরের  
গটভূমিকায় রচিত এক রোমাঞ্চ-মধুর উপন্যাস।

লেখকের অন্য বই:

তবুও রমণী ৭৫০ ওস্তাদ ৪০০

ডি. পি-তে বই নিতে হলে অবশ্যই অগ্রিম পাঠাতে হবে।

সাহিত্য প্রকাশ ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯



প্রকাশিত হলো  
সেই কালজয়ী বিতর্কিত উপন্যাস  
ভাদিমির নভোকভ'এর

## লোলিটা ৫

অনুবাদ: প্রবীর ঘোষ

'লোলিটা' বিশ্ববরণ্য লেখক নভোকভ'এর অনবদ্য সৃষ্টি। বইটি  
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের অল্পনো বয়ে গিয়েছিল অড়। বহু  
দেশে 'অসীল' চিহ্নিত করে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। তবুও শ্রীল-  
অসীলের বেড়া ভিঙিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বিতর্কিত 'লোলিটা'  
সমাদৃত হয় সব দেশে, সব কালে। নায়ক হামবার্ট সাহিত্যের  
অধ্যাপক। আশ্চর্য ভালবাসার কাঙাল। পান্ননি মাতৃয়েহ, পিতার  
ভালবাসা। হারিয়েছে কৈশোরের প্রেমিকাকে। যৌবনে স্ত্রীকে ভাল-  
বেসে পূর্ণতা পেতে চেয়েছে। ছৈরিনী জী সে আশা চূর্ণ করে  
দিয়েছে। এমনি এক চরম দুঃসময়ে ওর সামনে এসে দাঁড়ালো  
লোলিটা, ছাদশী কিশোরী। তারপর, সে এক অসাধারণ ঘটনার  
সংঘোজন। প্রেম, ঘৃণা, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের এক অসাধারণ  
বিশ্ববরণ্য উপন্যাস। ..... অনবদ্য অনুবাদ, অনুবাদ সাহিত্যে এক  
অসাধারণ সংযোজন।

আগাথা ক্রিস্টিয়ান-আয়না জানে

অনুবাদ: অরুণ বাগচী ১৪

আগাথা ক্রিস্টিয়ান-শেষ দৃশ্যে

অনুবাদ: নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১৬

৮০-র বই মেলায়  
বিশেষাঙ্গণ ঘটিয়েছে

অ্যাডভেনচার

সম্পাদনা: প্রবীর ঘোষ ১৬

প্রান্তিক প্রকাশনী ৥ ৫৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-৭

## নৃত্যের তালে তালে

সম্প্রতি রবীন্দ্রসম্মানে দক্ষিণ বঙ্গ কাতার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নৃত্যের তালে তালে তাদের চতুর্দশ বাঁহা উৎসব পালন করলেন। সমবেত যুগ্ম সংগীত-বাদন ছাড়া দুটি নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠানসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল যা সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষ আনন্দ দানে সমর্থ হয়েছে।

প্রথম নৃত্যনাট্য শিশুস্বর্গকে সমর করে রচিত 'বিশ্বব্রাহ্মণ'। এই নৃত্যনাট্যের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন মিস্ট দাশগুপ্ত। নৃত্যনাট্যটিতে শতাধিক শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন। সাধারণ গল্প—বলবল নামের একটি বালিকা স্বপ্নের মধ্যে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছে এবং সেখানকার সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। সবশেষে তারা একই সঙ্গে জ্বরতরঙ্গ এসে এখানকার সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয় এবং ভারতের বালক বালিকারা বিশ্বব্রাহ্মণের চিহ্নস্বরূপ তাদের হাতে রাখী পরিয়ে দেয়। মামুলি এই গল্পকে নৃত্যনাট্যের রূপ দেওয়ায় তাদের সযত্ন নিষ্ঠার ছাপ ছিল সর্বত্র। কাহিনী ও সংগীত রচনা করেছেন—আনন্দ মুখার্জি। সংগীত পরিচালনা—শশী দাশগুপ্ত। নাটকের মূল চরিত্রে মধুমিতা ঘোষ দমিতদারের নৃত্যকুশলত্ব বিশেষ প্রশংসনীয়।



### সম্মতিগত গুরুত্ব

জয়ন্তী দাশগুপ্তের 'আহ অস্তরে' তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছে পূর্ণ মাত্রায়। দীপালী রায় নিতান্তই অপরিণত অযোগ্য। নীলমঞ্জনা সেনের শ্লেষাভারাতুর বিপর্যস্ত কণ্ঠ বারবার ক্লান্ত করেছে তার সন্তকের কথাকে। রূপিতকান্ত রায় চৌধুরী বয়সে প্রবীণ, অথচ প্রথম দেখা গেল এই আসরে। পরিচ্ছন্ন, মজলিশী পরিণত গায়নভঙ্গি তাঁর। কণ্ঠটিও সুস্বন্দ। রমা রায়চৌধুরীর কণ্ঠ সুন্দর, 'মাঝে মাঝে তব' গানটি গেরেছেও ভাল, কিন্তু 'সাধক' করো সাধন—এ তাঁর গোটাগোটা উচ্চারণ কানে লেগেছে। নীলিমা সেনকে বহুকাল বাদে পাওয়া

সেল আসরে। বম্বের কণ্ঠ সবুও 'আমায় জ্বালব না'র বিরল লতা পরিণত নিবেদনের পূর্ণতা ফুটে উঠল। জয়ন্তী রায় এর কণ্ঠ বেশ ভাল। কিন্তু পরিবেশ নিখুঁত। চিরলেখা দত্তের সকল জনম জগৎ গানে প্রাণিত দরম ছিল। এ-দিকের আসরের সঙ্গীত এবং সঙ্গ্ৰহাগানো কাঁচিৎ সূচিচা মিত্র এক সুবিনয় রায়ের। সূচিচা মিত্র খুবই প্রাক-বলত ছিলেন এই আসরে। 'আমায় বধন' কিংবা 'এই মলিন বস' অথবা 'ঘাটে এসে আছি' নিঃসন্দেহে অসামান্য, কিন্তু 'না রে না রে হবে না তোয় স্বর্গসাধন'—এ তিনি যেন আরও অতিরিক্ত কিছু উপহার দেন যা কথায় বা স্মরণলিপিতে নেই, নেই অন্য শিল্পীদের নিবেদনেও। তেমনই অমোঘ আকর্ষণ সুবিনয় রায়। তিনি ছিলেন শেষ শিল্পী। চারটি গানই রেখে গেলেন অশেষের দান। 'সে নিখিলভার যারণ' বা 'সুখের তিমির মাঝেতে' যিনি শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়স্পর্শে অনন্য হয়ে বিরাজ করেন, তাঁকেই রাজ আসনে বসাতে হয় 'আছি রাজ আসনেতে'। এ-কথার পূর্ণ প্রমাণ দিলেন তিনি। আর শেষ গান? 'পতীর ক্ষণী নামিল হৃদয়ে' গানটিতে সুবিনয় রায়ও ছাপিয়ে যান কথা এবং স্বরলিপির প্রত্যক্ষ বাস্তবতা, অতিরিক্ত একটি মাত্রা বৃদ্ধ করে শ্রোতৃমণ্ডলীর অন্তরে হতে গঠন অরূপকান্ত এক ব্যক্তিত্ব।

ফটো : সুবীর চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি রবীন্দ্রসম্মানে দক্ষিণ বঙ্গ কাতার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নৃত্যের তালে তালে তাদের চতুর্দশ বাঁহা উৎসব পালন করলেন। সমবেত যুগ্ম সংগীত-বাদন ছাড়া দুটি নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠানসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল যা সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষ আনন্দ দানে সমর্থ হয়েছে।

প্রথম নৃত্যনাট্য শিশুস্বর্গকে সমর করে রচিত 'বিশ্বব্রাহ্মণ'। এই নৃত্যনাট্যের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন মিস্ট দাশগুপ্ত। নৃত্যনাট্যটিতে শতাধিক শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন। সাধারণ গল্প—বলবল নামের একটি বালিকা স্বপ্নের মধ্যে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছে এবং সেখানকার সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। সবশেষে তারা একই সঙ্গে জ্বরতরঙ্গ এসে এখানকার সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয় এবং ভারতের বালক বালিকারা বিশ্বব্রাহ্মণের চিহ্নস্বরূপ তাদের হাতে রাখী পরিয়ে দেয়। মামুলি এই গল্পকে নৃত্যনাট্যের রূপ দেওয়ায় তাদের সযত্ন নিষ্ঠার ছাপ ছিল সর্বত্র। কাহিনী ও সংগীত রচনা করেছেন—আনন্দ মুখার্জি। সংগীত পরিচালনা—শশী দাশগুপ্ত। নাটকের মূল চরিত্রে মধুমিতা ঘোষ দমিতদারের নৃত্যকুশলত্ব বিশেষ প্রশংসনীয়।



**"আমায় যত কিছু দুর্ভাগ্যতা ছিল, শাস্ত্রায়  
বিয়ের একমাত্র আশেই তা দূর হয়ে গেল"**

বলেন মিঃ শুভ্র কুলের শিল্পক,  
আমিনতকারী, কানপুর শাখা।

**ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কের ক্যাশ সার্টিফিকেট পরিকল্পনার  
মাধ্যমে আপনিও যে মিঃ শুভ্র মত প্রচুর টাকা**

"কথার বলে লোক কথা না বলে বিয়ে হয়  
তা। আমি বলি লোক কথা নয়, 'লোক টাকা'  
হয়। আমার একমাত্র ভয়ে শাস্ত্রায়  
বিয়ের আগে আমায় অন্তত ১০ টাকা মনে  
প্রাচুর্য, যদিও আমি বর্তমানে সন্তান  
হয়েছিলাম। ১০ বছর আগে আমি  
৪০০০ টাকার একটি কাল সার্টিফিকেট  
লিখেছিলাম। আমি নিশ্চিত ছিলাম,  
একদিন না একদিন এটি কাজ আসবে।  
ঘটনাত্মক শাস্ত্রায় বিয়েটা হওয়া বিস্তর হয়ে  
যাওয়ায় সন্তানটাই টাকার কাজ  
লগে গেল। এটা আমার হস্ত কিত্তি  
চলানো ছিল, শাস্ত্রায় বিয়ের একমাত্র  
আশেই তা দূর হয়ে গেল।"

মিঃ শুভ্র-র অভিজ্ঞতা থেকে  
আপনিও লাভের হিসেব করতে  
পারবেন।

মিঃ কপূর মত আপনিও বলতে পারুন।  
আপনার কাতারটি ইতিহাস ব্যাঙ্কের  
এক মাঝেকারের সঙ্গে দেখা করুন—  
তিনি কুটিলতার আপনাকে সেবা  
পরামর্শ দিবেন।

ইতিহাস ব্যাঙ্কের ১০টি পরিকল্পনা—  
যাতে টাকার অর্থ বেড়েই চলে  
১. ক্যাশ সার্টিফিকেট ২. অফিসিয়াল প্রকল্প  
৩. ক্রেডিট ডিপোজিট ৪. টাইম ডিপোজিট  
৫. ক্রিজ ডিপোজিট ৬. অফিস ডিপোজিট  
৭. আপনাকে বৈধ মালিক হোন প্রকল্প  
৮. বিদেশী মুদ্রার আনুমানিকের একাউন্ট  
৯. রিটেনেড-ইয়েন্ট প্রকল্প ১০. সেকিউরিটি  
পলিপলি প্রকল্প ইত্যাদি ব্যক্তিগত আপনাকে  
কি লাভের প্রদান করা হয়।



**ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

(একটি ব্যক্তিগত উদ্যোগ)

**আপনার  
ক্যাশ-সার্টিফিকেট  
ক্রেডিট ডিপোজিট**

শিল্পীরা নৃত্যনাট্য লিপ্যঙ্গীরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কাহিনী ও গল্পের আশ্রয় থেকে বিতাড়িত হয়ে নায়িকা সূতকণা নটরাজের মন্দিরে আশ্রয় নেন। মন্দির-দ্বারে নবরসের মূর্তি দেখার কালে আবেশে কিম্বদীপিত সূতকণা নিগ্রায় বিভোর হয়। সেই স্বপ্নের মধ্যে এক-একটি রসের মূর্তির নৃত্যকণ্ঠস্বর তার শিকার হুটি সংশোধিত হয়। নট-রাজের আশীর্বাদে সূতকণার সূত প্রাতিভার তখন বিকাশ ঘটল। নৃত্যনাট্যের কাহিনী রচনা খীরা লালসাপ্ত এবং নৃত্যনাট্য রূপ বাসন্তী বাচাণী। শিল্পীরা এই নৃত্যনাট্যটিকে তাঁদের নৃত্যকণ্ঠস্বর প্রাণবন্ত করে তোলেন। বিশেষ করে নায়িকা সূতকণার ভূমিকায় চম্পা মুখার্জি। অন্যান্য চরিত্রে অঞ্জলি বানার্জি, সূর্যকণা সরকার, ইন্দ্রাণী দাশগুপ্ত, কণা মুখার্জি, শমিতা সরকার, নৃপের মজুমদার, ডলি মুখার্জি, রূপা দাসগুপ্ত এবং পিয়ালী গুপ্ত তাঁদের ভূমিকা যথার্থ পালন করেন।

নৃত্যনাট্যের সংগীত রচনা : নীল-বরণ। সংগীত পরিচালনা : রজন মজুমদার। সব মিলিয়ে দুটি নৃত্যনাট্যই সৈদন অত্যন্ত উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

নৃত্য চৌধুরী



গায়ক। জাতীয় নাট্যশালার জন্য তরুণ রাজক লেখা শব্দ মিতের চিঠিটিও প্রয়োজনীয় তথ্য। পশ্চিম বছরের অনেক শব্দ লগ্ন এসেছে প্রদর্শনীতে। সর্ব-ভারতীয় রাষ্ট্রীয় নেতা, আন্তর্জাতিক সংগীত শিল্পী, বিখ্যাত অভিনেতা অনেকেরই সংযোগ হয়েছে থিয়েটার সেন্টারের সঙ্গে। থিয়েটার সেন্টার মণ্ড যখন গুড়ো গেল সেই দুঃখরাতির ছাঁও দেখা গেল। শব্দ দেখা গেল না সেই ঘটে যাওয়া অগণিত দর্শক যারা বিমুগ্ধ থিয়েটার সেন্টারের অভিনয় দেখছে। অসম্ভব থিয়েটার সর্বজনন্য না হলে সন ছাঁইই নগরিক বিলাস বলে মনে হয়।

অনামিকা রজত জয়ন্তী উপলক্ষে ক্রিকেট অনুষ্ঠানসূচীর দ্বিতীয় পর্ব ভারতীয় ভাষা পরিষদে ভারতের নাট্য-শাস্ত্রের উপর দীর্ঘ আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করেন। নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনাচক্র অজকের দিনেও প্রাচীন নাটকের যে মূল্যবোধ কাজ করে যার এবং নাট্যশাস্ত্রের আধুনিক ব্যবস্থায় প্রয়োগ বর্ধিত প্রসঙ্গও আলোচনা হয়। এই আলোচনাচক্র অনেক আলোচনাই গবেষণামূলক, থিয়েটারের ছাত্রদের কাজে লাগার মত দর্শক অথবা আধুনিক নাট্য প্রয়োগের কাজে আসেন। পশ্চিম বছর পার করে উচিত পঞ্চাশ বছরের জন্য আরও গঠনমূলক প্রকল্প। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা যেটুকু কাজে আসে সেটা বেছে নেওয়াই যথোচিত হুসবাস।

সেবিশাল দাসগুপ্ত

## চেনা মূখ অচেনা গল্পো

চেনা মূখ অচেনা গল্পো'র রচয়িতা প্রবণ বন্দু এমন একটি নাটক লিখেছেন যা বাংলা মৌলিক নাট্য-প্রিয় সম্প্রদায়ের কাছে হিট হওয়া হওয়া বৃষ্টির উত্তম সহায়ক। নাটকটিতে প্রায়শঃ ছড়াছড়ি। নাটকও তাই ছড়িয়েছে নাট্যকারের স্থূল খেলায় বণত। শেষ পর্যন্ত গোটাতে গিয়ে কটোয়াকারবেণী জনৈক কম্যুনিষ্টের যোগদানটি কথি ব্যাগ খোলানো বক্তৃতাশিল্পীর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আরে কার নাট্যকারের আর কোনো ভাষা ছিল না। গত ১০ই মে সন্ধ্যার অহীন্দ্র-মঞ্চে বসে 'রূপা' এর বর্তমান প্রযোজনা সম্পর্কে এই আয়োজক নীতি অভিজ্ঞতা। স্বয়ং নাট্যকারই এক্ষেত্রে নির্দেশক। প্রযোজনা নয়, স্বরচিত নাটকটির 'বাহাদুরী' বোঝাতে বিজ্ঞ চরিত্রে অংশগ্রহণকারীদের বা কেউ এই ভাষে ব্যঙ্গ্যর করেছেন তিনি। একজন গল্পকার তো দেখলাম অক্ষাঞ্চল এই প্রসঙ্গের তে নাটকে দর্শক মনো-রঞ্জন (??) কথা জেবেই আগামোড়া 'কলকাতা' করে গেলেন। নাটকে এমন

অনেক ঘটনাক্রম আছে, মূল বক্তব্যের সঙ্গে যোগাযোগ সন্তোষজনক। সমাজের এক প্রকার শূন্যবাহোজীরা নিজেরদের স্বাধীনতা নিয়ে অপর প্রকার দীনতা কিভাবে কাজে লাগায় এই বোধ করি নাটকটির বক্তব্য বিষয়। রচনা, নির্দেশনা বা অভিনয় কোনদিক থেকেই যা শিল্পিত থিয়েটারের মান স্পষ্ট করে না। বরং অভিনয়ের প্রস্তুতি, মঞ্চায়নের ব্যাকপা ইত্যাদি থেকে শুরুর করে মার ভাষণকল্পে প্রেসের প্রতিনিধিদের ঠাণ্ডা পানীয় সেবনে শুরুরই কিছু উল্লেখ নাটককারী টাকার প্রাশ্ন করে। ইদা দাস

## আলোচনা: শব্দ সংকীর্ণ বিবিধ

### প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কবিতা

আনুমানিক মাসে শিশিরমণ্ডে একটি আবৃত্তির আসর বসেছিল, নাম—সংগ্রামের কবিতা। বোধকরি সেই অনুষ্ঠানটিতে প্রেরণা জুগিয়ে থাকবে রবীন্দ্রসদন কতৃৎপক্ষে। গত ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখ প্রযোজনা করলেন একটি পাঠ ও আবৃত্তির আসর—নাম, প্রতিবাদ, প্রতিরোধের কবিতা। প্রতি-রূপ অনুষ্ঠান, তাই পূর্ববর্তী আসরের বহু কবিতাই এবং কবিতার নামে ছেলো-দেওয়া বহু রচনাই পুনরাবৃত্তি হল এই আসরে। নতুন কিছু ভেজালও নমনাও মিলল। মিলল কিছু কবির দেখাও, যারা অনুপস্থিত ছিলেন সংগ্রামের কবিতায়।

আসলে বিষয়টাই অনিশ্চিত। কার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিসের প্রতিরোধ? উদ্যোক্তারা বলেননি, শিল্পীরাও সকলে ধরতে পেরেছেন বলে মনে হল না। ধরা সন্তোষও ছিল না। তাই পড়া হল কিছু মের ঘোড় সওয়ার, যেখানে কামান তানে সংহত শোঁসিয়ায়; পড়া হল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মহারাজ, আমি তোমাকে', যেখানে রোমান্টিকতার জয়-গাথা; পড়া হল রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্যের কবিতা, যেখানে মঙ্গলময়ের কাছে প্রার্থনা রয়েছে, রয়েছে দীকার তিকা। এমন অনেক অনেক, যা প্রতিবাদে মুখ্যতঃ নয়, নয় প্রতিরোধে উদ্দীপিত। তা বলে কবিতা নয়, একথা ভাবলে ভাল হবে। আসলে বিষয় কাছাকাছি সিমা-বন্ধতা আরোপিত হয়েছে। কবির রচনায় সমর্থন না পেয়ে অনেককেই হাত বাড়তে হয়েছে অ-কবিতার দিক। অকারণে চিৎকার করতে হয়েছে, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের আর্থ কবিতার তোলাব অঁছায়া।

গোষ্ঠীগতভাবে চারটি সংস্থা পরি-বেশন করলেন সমবেত আবৃত্তি। বহু ধরনের পরীক্ষার চেষ্টা ছিল। ছিল জির ফেলের কণ্ঠ মিলিয়ে একতান সুবিত্ত প্রকাশ, ছিল সুরকে আবৃত্তিতে ধরার চেষ্টা, ছিল একক-বৈচিত্র্য-সম্মেলন আবৃত্তির পরস্পরায় নিবেদন। সব থেকে দারুণ 'আবৃত্তি আকরিকা'। সম্মেলনকার মহলার চিহ্ন ছিল তাঁদের নিবেদনে। চাচামেচিও সব থেকে কম। একক আসরে নতুনদের মধ্যে ছাপ ফেলেছেন রজা ঘিট। তাঁর আবৃত্তির কণ্ঠ সুন্দর, ভাষা নিজস্ব। শব্দ, শীর্ষক চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে শেষ

কবিতার অংশ-ভাষা বর্ণা-মুখা-নয়-নয় বিরতি থাকলে ভাল হত। অশোক পালিত এদিন খুবই নির্ভরত ও নির্ভর্য ভাষাতে পাঠ করেছেন। অথচ আবেগ ছিল, ছিল নাটকীয়তাও। কিন্তু সংহত সংগম ছিল। ছিল কবিতার মূল রসটিকে পুরোপুরি অক্ষুণ্ণ রেখে পরবেশনের সব প্রয়াস। অমল গহ খুব জোরালো জাঁপাতে পড়লেন। তাঁর নির্বাচিত রচনার ক্ষেত্রে অবশ্য এই জোর-দেওয়া মানিয়ে গেছে। প্রিয়লাল রায়চৌধুরী রেখটের কবিতার 'হে ভাগ্যহত' যেভাবে আলাদা করে ডাঙলেন, তাতে হ-মায়ার ধূনি-প্রধান ছিল হঠাৎ কেটে গেছে। একই রকম ভুল শব্দে বন্দু ঘোড় সওয়ার কবিতাতেও কানে লাগে। দীপ্ত বিশ্ব-কিন্নরী বর্মা তালো পুষ্টিতর দীপ্ত কবিকিন্নরী বর্মা তালো। এই পূর্ব-ভাগ মূল ছন্দে সুরের পরিপন্থী হয় গিরেছিল, বিশেষত দুটি পর্বের মধ্যে বিরতি ঠিক বেড়ে যাওয়ায় ছন্দের মধ্যাঞ্চলের মজাট একবারেই পাওয়া গেল না। তুষ্টি মিত সোহিন আচার্য নির্যবেগ একটি ভাষা বেছে নিয়ে-ছিলেন। ফলে পাঠমাত্র হয়ে পড়ল তাঁর নিবেদন। আবার দেবদাসের কল্যাণ-পাখার এমনই উচ্চৈশ্বর্যে অসম্ভব দৃষ্টি করলেন শেষ কবিতায়, যা কান-মনকে পীড়িত করে। কাজল চৌধুরী এবংও পাকলা নেরদার কবিতাটি পড়লেন। তবে শিশিরমণ্ডের থেকে অনেক তুষ্টি-কর ভাষণেই বিজয়লক্ষ্মী অমণ শিশির মণ্ডে 'সংগ্রামী' অ ভদ্রলক্ষ্মী জানিয়ে-ছিলেন, এবারে জানলেন সপ্তজ্ঞ নমস্কার (সংগ্রামের কবিজ ও প্রতিরোধের কবিতার এতখান তফাত নাকি?) তাঁর দৃষ্টান্তগত পরিবেশন মনে দাগ বাটে। অমর চট্টোপাধ্যায় কলকাতা ০৭ সংখ্যক কবিতার সন্ধান বেছে নিলেন। এটুকুর মধ্যেই তিনি হরতো প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সুর খুবই পেয়েছিলেন। কৃষ্ণ কবিতা কবিতা কবিতার সর্বত্র শোনাগেল। বোধ করি, দুটিভাষার তফাত। তরুণ চন্দ্রবীর নির্ভর্য ও নির্যবেগ উল্লেখযোগ্য। রজত বন্দোপাধ্যায়ের নির্ভর্য ভাষাট নির্ভর্য একটি—অ ভি বো গ রাষ্ট্রের হতা—শিশিরমণ্ডে গোঁরাী ঘোষের কণ্ঠে শুনোছে। গোঁরাী ঘোষ পি বে শ তে রচনাটি আরও ভাল লেগেছে। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ল, এই আসরে গোঁরাী ঘোষ ও শব্দ ঘোষ দুই উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতি। তাঁরা বা পড়লেন কেন? নীলারি-দেখার বন্দু বৈষ্ণবের অভিনয়-জানিয়ে নতুন-কছ-করা মনে হয়েছে, তবে তাঁর এদিনের আবৃত্তি খুবই উত্তীর্ণ। নির্ভর্য দে-র নির্ভর্য এলোমেলো, আবৃত্তি অসম্ভব ধারণা নয়। শীলী মিট এই আসরেও অব-সংবাদী জনপ্রিয়তার জলন্ত প্রমাণ রাখলেন। নির্ভর্য সময় বাড়াতে হল তাঁর ক্ষেত্রে। এবং একবার তাঁর ক্ষেত্রেই। দেখা গেল, প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত প্রান্ত থেকে উদ্বেল অনুরোধ, উচ্ছ্বাসিত অভিনয়ন বাধা করল শেষের পরও নতুন করে পরিকল্পনা। প্রবণ মুখোপাধ্যায়



# পুষ্প-স্নী® কিনুন

বাচ্চাকে তার একান্ত প্রয়োজনীয়  
সহজ স্বচ্ছন্দ আরাম এনে দেবে।

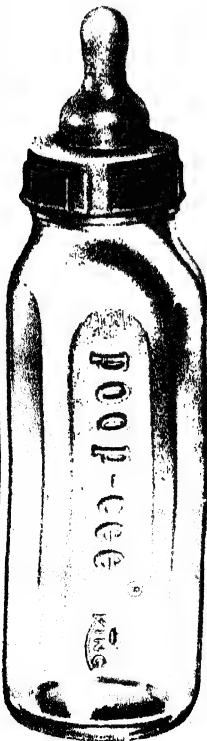
আপনি হয়তো বাচ্চাকে বুকের দুধ  
খাওয়াতে চান কিন্তু শারীরিক কারণে  
তা খাওয়ানো হয়তো সম্ভব হচ্ছে না।

উৎকর্ষ কখনও কখনও নেই। পুষ্প স্নী ফীডারের  
বিশেষ ভরসা করুন। দেখবেন সেটি ঠিক আপনার মত  
বাচ্চার পুরোপুরি ঘর করবে। এর নিশ্চলটি মাথার

গুরুত্ব মতই কমাল যা বাচ্চা খুব সহজে চুষতে  
পারে। আর এই পুষ্প স্নী ফীডিং বোতলটি এমন  
বিশেষ ডিজাইনে গড়া যে বাচ্চা শুধুই সমানভাবে  
দুধ টানতে পারে এবং যার দপন বাচ্চাকে কোনও  
কষ্টই করতে হয়না। এই বোতলে দুধ খেতে খেতে  
বাচ্চা কখনো এঁপিয়ে ওঠে না, যাব ফলে তার  
অজান্তেই বিগড়ানো না।

বাচ্চাকে পুষ্প স্নী ফীডারের সাহায্যে দুধ খাওয়ান।  
দেখবেন বাচ্চা সত্যিই সুস্থই। কারণ তার পুরোপুরি  
ঘর নেওয়া হচ্ছে।

এর সাহায্যে বাচ্চা বাচ্চা দেখে আপনার  
আনন্দও শান্তি পূর্ণ বেড়ে যাবে, কারণ আপনি ভরসা  
করেছিলেন পুষ্প-স্নী এর উপর।



# পুষ্প-স্নী®

ভারতের সবচেয়ে বেশী  
বিক্রীর ফীডার ও বিপ্ল

INNOVATION BUD B&B

## প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

### ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত

(১৯৩৯-)

দেশ পূর্বে জগন্নাথ। জন্ম  
ত্রিপুরায়। তিনি যখন শিল্পী হতে  
চাইলেন তখন আপত্তির ঝড় উঠল।  
আই এ পড়তে হলো গুরুজনের  
আদেশে। উত্তীর্ণ হবার পর সোজা  
এসে শাস্তিনিকেতনের কলাভবনে  
যোগ দিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ত্রিপুরা  
সরকারের জলপানি পেয়ে গেলেন।  
শাস্তিনিকেতন থেকে চারুকলায়  
ডিপ্লোমা নিলেন (১৯৬১)। কলা-  
জীবনের বেশিরভাগ কাটিয়েছেন সেল্ট  
টিমাল চাচা স্কুলে, হাওড়ায় (১৯৭৮  
পর্যন্ত)। কিন্তু স্কুলে কর্তৃপক্ষের সংগে  
মতান্তর, ফলো ছেড়ে দিলেন। ওঁরা  
করেকজন সহকর্মী মিলে হাওড়ার  
দাসনগরে সেল্ট টিমাল হাই ইন্সকুল  
প্রতিষ্ঠা করলেন (১৯৭৯)। এর ফলে  
অল্পসময় রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ  
প্রিন্টিং টেকনোলজিতে অধ্যাপনা  
করলেন। কিছুদিন রবীন্দ্রভারতী  
বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপক ছিলেন।  
এক বছর রবীন্দ্রভারতী সংসদের সদস্য  
ছিলেন (১৯৬৯-৭০)।

প্রদর্শনী স্থানীয় শিল্পীদের সংগে  
বৌদ্ধভাবের অপরতলার (১৯৬১)।  
এক প্রদর্শনী, কলকাতা (১৯৬৩)।  
ত্রিপুরা প্রদর্শনী, নতুন দিল্লি  
(১৯৬৪)। ছজনের প্রদর্শনী, কলকাতা  
(১৯৬৬)। কৈত প্রদর্শনী, কলকাতা  
(১৯৬৭)। শাস্তিনিকেতন অঞ্চলিক  
সংঘের প্রদর্শনী, কলকাতা (১৯৬৯)।  
যৌথ প্রদর্শনী কলকাতা এবং নতুন  
দিল্লি (১৯৭০)। ১৯৬১-৭০ আকা-  
দমী অব ফাইন আর্টসের বার্ষিকী,  
কলকাতা। ওয়েস্ট বেঙ্গল অকাদমী  
অব ফাইন আর্টস, কলকাতা  
(১৯৬১)। বিড়ল অকাদমীর  
বার্ষিকী (১৯৭৫-৭৯)। ১৯৭১-৮০  
জাতীয় প্রদর্শনী, লালিতকলা অকাদমী,  
নয়া দিল্লি। ১৯৭১-এ সোসাইটি অব  
কনটেম্পোরারী আর্টিস্টস সংস্থার  
যোগদান। দলীয় প্রদর্শনী হয় নয়া-  
দিল্লি, বোম্বাই, কলকাতা। এছাড়া ঢাকা  
এবং চাটগাঁও কলাযাত্রার প্রদর্শনী, নয়া-  
দিল্লি, মাদ্রাস এবং কুয়াললাম শহর,  
(মালেশিয়া), ১৯৭৯। ছবি আছে  
লালিতকলা অকাদমী, নয়াদিল্লি,  
বিড়লা অকাদমী, কলকাতা এবং  
সংগ্রহকারীর কাছে।

প্রচ্ছদচিত্র “শাসক” (কানভাস  
সেপেরা, ২৪" x ২২") সবজাত  
রঙের মধ্যে কদমী এবং নীলগ  
বাবরার সূঁচের ঐকতান গড়ে উঠছে।  
শাসকের হাড় নেই। হাতে এবং পায়ের  
কাছে ফল। তিনি কি এর গম্ব শব্দবল,  
পায়ের না মাড়িয়ে দেখেন? মাঝ করবার  
মূল চিত্রটির বিষয় অবসর গলি বণের  
মধ্যস্থ দিয়ে জরেছেন। গোটা ছবি  
মনোমগ্ন আকৃতি রচনা করেছে।

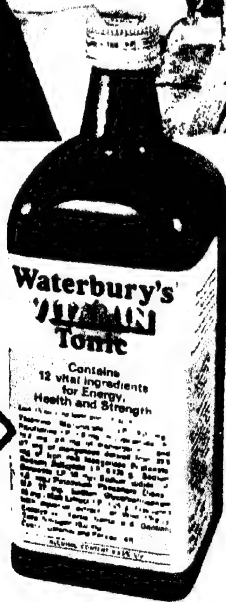
ধর্মনারায়ণ গোড়াতে ঠেতলচিত্র  
আঁকতেন। বসন্তর মনে পড়ে তাঁর  
ছবির প্রথম দিকের বিষয় ছিল তন্তু।



জোয়ার। এর মূল প্রবক্তা নীরদ  
মজুমদার। তাঁর দেখাদেখি দিল্লিতে  
বোম্বাইতে হুদো হুদো তাস্তিক শিল্পী  
উঠল। নীরদবাবুর যে অনুধ্যান  
জ এঁদের কারো থাকার কথা নয়।  
বিশেষতঃ তখন ভারতীয় কিশু  
চাইছেন। সুতরাং অশ্লের বজ্জার তখন  
তেজী। এই গডলিকা স্রোতে যারা  
গা ভাসলেন ধর্মনারায়ণ তাঁদের অন্য-  
তম। অশ্লের প্রতীক প্রতিমা বাক্য  
করে তিনি ভাল ছবি না এঁকেছেন তা  
নয়। আসলে এই সম্মতি পথ হাতি-  
ডুচ্ছেন তিনি। কিন্তু নিষ্ঠা ছিল বলেই  
তিনি পথ্য বদল্যাতে পারলেন।

শাস্তিনিকেতনে নন্দলাল বসু  
কাছে শেখা টেম্পরার দিকে নজর  
পড়ল এবার। কিন্তু নন্দলালী ঘরাণায়  
থাকার কোন ইচ্ছা ছিল না তাঁর। তাঁর  
মোক্ষ তাঁর নিজের হাতে। গুরুত্বপূর্ণ  
শিগেপে ঢলে না। মোটামুটি তিনি  
ভারতীয় অণুচিত্রের (মিনিচার) কাছে  
গেছেন। তাঁর মিনিচারের মধ্যে নান্দ  
মাত্রিক তান তোড়র সূক্ষ্ম কাজের  
দিকে দৃষ্টি পড়ল। তাঁর সঙ্গে কল্প-  
পায়ার অন্য একটা মাত্রা যোগ করলেন।  
আমাদের গৃহস্থায়ত অবচেতনলোকে  
কাছে ছবির আবেদন করতে হবে।  
পবনসম্মত একটা জগতের স্পর্শ  
রাখতে হবে ছবিতে। দুনিয়ায় রুশের  
আরপাক জীবজন্তুর সংগে মেশালেন  
তিনি ভারতীয় অণুচিত্রের গান চিত্র-  
ভাগ্য। কলকাতা নিজেস্ব তাঁর সহজে  
হুদু তুললেন। এর সঙ্গে পল ক্রীর  
অনুসন্ধান। তাঁর ছবিতে বিধবা মহিষ।  
পাহাড়ের সামনে, লাল, সবজ সাপ  
জড়ানো গাছতলার দাঁড়িয়ে থাকে। ধান  
ক্ষেতে হলুদ সাপুড়ে বাণী হাতে  
নাগিনী কন্যাদের ধরতে ছেটে। পাখি  
উলটোভাবে ডালে বসে থাকে। পরবর্তী  
পর্বে পুরাতন মোটর গাড়ি বনপথে  
চলে। ওড়ে আকাশে। চালা চ্যাপলিনের  
মরদেব ফুল ঢাক পড়ে থাকে। ইদনিং  
ফোটোগ্রাফ চেঁচে এক ধরনের ছবি  
আঁকছেন—মেয়েদের কটা মুখ ভেসে  
উঠছে। হালের এই ব্যাপারটা পুরের  
পুঁথি পরীক্ষার স্তরে। নাস্তানিক উত্তর  
ঠিক এখনও ঘটেনি। পূর্বে পূর্বে পালা  
কল তাঁর সহজাত। হাউ এক পর্ব  
থেকে অন্য পূর্বে মাত্রার সেতুবন্ধ খুঁজে  
পাওয়া দুরূহ। তবুও তাঁর কিশু  
ছবিতে রয়েছে প্রগাঢ় গীতিকবিতার

সদা প্রাণোচ্ছল...



হলচে  
লেবেল  
দেখে  
নিম।

## এর জন্যে চাই ওয়াটারবেরীজ<sup>®</sup> ভিটামিন টনিক

কথায় বলে স্বাস্থ্যই সম্পদ! আর যাঁদের তা আছে—

তাঁদেরই দিনগুলি হাসিখুশিতে ভরে থাকে! আপনিও আপনার পরিবারের সবাইকে সদা সুস্থসবল রাখুন—এক সহজ উপায়ে! নিয়মিত তাঁদের ওয়াটারবেরীজ ভিটামিন টনিক খেতে দিন। কারণ, এ এক সম্পূর্ণ টনিক, আপনার আহায়ে যে পুষ্টির অভাব থাকে, তা পূরণ করে। স্বাস্থ্য আর শক্তির জগে একান্ত প্রয়োজনীয় সমস্ত ভিটামিন আর খনিজপদার্থই এতে আছে। সুস্থ রক্তের জগে আয়রণ, ক্ষিদে বাড়ানোর জগে বিশেষ উপাদান আর নিমেষে শক্তি যোগানোর জগে মল্ট! খেতেও দারুণ ভালো! ওয়াটারবেরীজ ভিটামিন টনিক—আপনার একান্ত প্রয়োজনীয় যাবতীয় পুষ্টিগুণে ভরপুর!

**সার্বা পক্ষিয়ারের জন্যে সম্পূর্ণ টনিক  
ভিটামিন, মল্ট, মদ্যমার্য ও আয়রণযুক্ত**

লিনটাস-WVT.1-2415 BG



পাণ্ডিত্য গান



আদিকার

এলপার কাপড়

পারাগন টেক্সটাইল মিলস কোঃ লিমিটেড, বক্স ৪০০১০

এই টিভি স্পট পাবেন: ● পারাগন এলপার কাপড়ের বিক্রেতা স্থান:

evares/80/PTM/34-b

65-5679 ✓

65-5679



ক্ষুরে হাত দেবেন না!



**অবাহিত লোম দূর করত  
বাহিত ক্রীম অ্যান ফ্রেঞ্চ  
হেয়ার রিমুভার দিয়ে!**

মেয়ে হয়ে আপনি ক্ষুর দিয়ে কি করছেন ?  
কামাচ্ছেন ? কিন্তু সে তো পুরুষদেরই সাজে !

ক্ষুর দিয়ে শুধু চামড়ার ঠিক ওপরের স্তরের লোমটুকুই কামানো যায় — তাই  
লোমের গোড়াগুলো খরখরে খোঁচা হয়ে থাকে ... এমনকি কেটে ছড়েও যায় !  
আপনার দরকার মেয়েদের বা মানায় তাই — কোমল অ্যান ফ্রেঞ্চ — হেয়ার রিমুভার ।  
এটি চামড়ার গভীরে গিয়ে কাজ করে, যেখানে ক্ষুর পৌঁছতেই পারে না ।  
তাছাড়া, ব্যবহার করাও খুব সহজ ।

শুধু ক্রীম লাগান ... একটু অপেক্ষা করুন ... তারপর মুছে ফেলুন — অবাহিত  
লোমও উঠে আসবে !  
এবার দেখুন—আপনার রূপের বাহার—হাতপা থাকবে রেশমের মত মোলায়েম —  
সপ্তাহের পর সপ্তাহ ।



**অ্যান ফ্রেঞ্চ হেয়ার রিমুভার**  
**এখন ২ টি সুগঞ্জে।**

আপনিও অধাক হবেন

একটা  
ছোট ডাই সেল  
কি ক'রে এত শক্তি  
থাকাত পারে ?

## জীপ হাই-লাইফ্

শক্তির এক 'অফুরন্ত উৎস'  
আপনার ট্রানজিস্টরের  
জন্মাই যেন অবিকল তৈরি

এই হল আপনার জন্য জীপ  
হাই-লাইফের পরিচয়।

সর্বোত্তম লীক প্রুফ ডাই সেলের  
ওপর পোল্যেস্তার ফিল্ম সেলিং  
(জাপান হইতে আমদানী)

দেওয়া থাকে বলে নিরাপদ এবং  
মরচে পড়ে না। অনেক বছরের  
গবেষণার পর উন্নত জীপ প্রযুক্তি  
বিচার দ্বারা আরো নিখুঁত করা।

জীপ হাই-লাইফ সেল কিস্তন, যা  
অগ্ন্যস্ত্র সবার চেয়ে বেশী দিন চলে।



(এ মোরায়ানী এন্টারপ্রাইজ)

আগামী ১৬ই আগস্ট, শনিবার, আমাদের দ্বিতীয় কাউন্টারের প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উপলক্ষে ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোডের উক্ত কাউন্টার হইতে আমাদের প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তক সাধারণ ক্রেতাদের শতকরা ১৫ টাকা এবং পুস্তক বিক্রেতা বন্ধুগণকে তাঁহাদের প্রাপ্য কমিশনের উপর অতিরিক্ত ৫% কমিশন দেওয়া হইবে।

॥ এ সুবিধা কেবল মাত্র ঐদিনের জগুই ॥

প্রকাশিত হল

পেপার ব্যাক ক্লাসিক্স  
তারাকঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুমথনাথ ঘোষের

পঞ্চগ্রাম ১০, বাঁকাজ্যোত ১০

বাংলা পকেটবই

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

নীললোহিতের চেনা-অচেনা ৩

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

সুখে থাকার কাল ৩

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

মৃত্যুর ঠিকানা ৩

জরাসন্ধের

তিলোত্তমা ৩

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

কিশোরসাহিত্য-সমগ্র

১ম খণ্ড ১৫.০০ ২য় খণ্ড ১২.৫০ ৩য় খণ্ড ৮৪.০০

\* যে সকল সহৃদয় ক্রেতা ৩টি খণ্ড একসঙ্গে  
সংগ্রহ করবেন তাঁরা ৪১.৫০ টাকার বই  
৩৫. টাকায় পাবেন।

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ



১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট-৭৩  
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড-৯

প্রকাশিত হল

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের

ঠাকুরমার ঝুলি

উনত্রিংশতি সংস্করণ

বারো টাকা



বিমল মিত্রের

আর এক যুধিষ্ঠির ১৫

আশাপূর্ণা দেবীর

বালির নীচে চেউ ১০

সমরেশ মজুমদারের

বন্দী নিবাস ১০

সুমথনাথ ঘোষের

এক নাটক অনেক দৃশ্য ১২.৫০

নারায়ণ সান্যালের রহস্য উপন্যাস

উলের কাঁটা ১০

অবধূত-এর ভ্রমণ-কাহিনী-সমগ্র ১০



## ইসরায়েল

০১ মে তারিখের 'দেশ'-এ গ্রীষ্মকালী যোষ মহাশয় কন্ট-কাল্পিত প্রবন্ধে ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, "আমরা ইসরায়েলকে কখনও সমর্থন করিনি। আর ইসরায়েলের জন্মও তো অস্বাভাবিক। কবে দু'হাজার বছর আগে ইহুদীরা ওখান থেকে আসে। ইজিপ্টের আমেরিকার কুটনীতিতে ইসরায়েলের সৃষ্টি হল।"

এই অবসরে ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম এবং ইহুদী জাতির ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। জনৈক আরাবিয়ান দুই পত্র ইসরাইল এবং আইজাক হতে আরব এবং ইহুদী দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। সেই থেকেই আরব ইহুদীর ইতিহাস হল নিরবচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক ইতিহাস। আদি বাসভূমি প্যালেস্টাইন হতে ইহুদীরা তিনবার—প্রথমে রোমান বিজয়ীদের দ্বারা, দ্বিতীয়বার খ্রিস্টীয় (crusader) দ্বারা, তৃতীয়বার আরবদের দ্বারা—বিভাজিত হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। একবার ভারতবর্ষে তারা কোন প্রকার সামাজিক বা রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার আচরণের সম্মুখীন হয়নি। তাছাড়া মিশর, ইউরোপের সকল রাষ্ট্রের তাদের উপর চলে সমানে নির্যাতন। সেক্সপীয়ারের "ম্যাচেন্ট অ্যান্ড ভেনিস" নাটক থেকে বেশ বোঝা যায় সেকালে ইউরোপে ইহুদীদের প্রতি সামাজিক ঘৃণা কিরূপ প্রবল ছিল। মাত্র কয়েক বৎসরে হিটলারের জার্মানী মেয়েছে ঘাট লক্ষ ইহুদী। সৈয়দ মুজিব আলী লিখেছেন, ইউরোপের সব দেশেই ইহুদীদের উপর অকথা অত্যাচার করা হত কিন্তু হিটলারের অত্যাচারের জয়যুক্তি দেখে তারা অকৃতজ্ঞ হতে হাত গুটিয়ে নিল। সোভিয়েট ইউনিয়নে এখনও তারা সখে নেই।

পৃথিবীর যে দেশেই ওরা থাকুক, প্রথম থেকেই স্থান দেখে এসেছে এবং বিকাশ করে এসেছে যে, ওরা স্বদেশ ফিরবেই। এ ধরনের একটি অত্যাচারিত জাতি, নির্যাতন থেকে মুক্তির অভি-নায়ে যদি একটি নিজস্ব বাসভূমি (হোমল্যান্ড) নিজেদেরই আদিভূমিতে প্রতিষ্ঠার দাবী করে, তা কি অযৌক্তিক? প্যালেস্টাইন ইহুদীরা পুরোপুরি ছেড়ে আসেনি। একটি বিরাট সংখ্যক ইহুদী সেখানে রয়ে গিয়েছিল। প্যালেস্টাইন এদের তীর্থক্ষেত্র। বিদেশে এরা 'নিজেদের ধর্ম' এবং সংস্কৃতি এত বৎসর ধরে বজায় রেখে এসেছে।

এই শতাব্দীর প্রথম থেকে সারা পৃথিবী জুড়ে তাদের হোমল্যান্ডের আন্দোলন জেরদার ধরে হয়। ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রী 'ল্যান্ডন ইহুদী রাষ্ট্র' গঠন করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর প্যালেস্টাইনের ইহুদীরা বার বার আরব অক্রমণের সম্মুখীন হয়। সেখানে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত অনেকগুলি দাঙ্গা হয়। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রসংঘ সোভিয়েট ইউনিয়নের সমর্থন সহ প্যালেস্টাইন

রাষ্ট্রের সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪৮ সালের ১৫ই মে তারিখে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মহাভেদী আরব আক্রমণে পতি হাজার ইহুদীর জীবন অহত দিতে হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নও ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেয়। ভারতেও ইসরায়েলের কনসুলেট অফিস আছে কোম্বইতে। আরবদের অস্বাভাবিক আক্রমণের কারণে তো সুবিধিত। আরব দেশগুলোতেই নানা রকমে পৃথিবীর জ্ঞাত তৈল সম্পদের ৫২%।

"ইসরায়েলের জন্ম" পর্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। (পরবর্তী ঘটনার কথা এখানে নিশ্চয়প্রায়ন)। এটা কি খুবই "অস্বাভাবিক"? তার চেয়ে "অস্বাভাবিক" কি নয় পূর্ব জার্মানী, বাল্টিক, ডাইওক্সন, পাকিস্তানের জন্ম! গ্রীষ্মকালী যোষ মহাশয় আরব লিখেছেন, "ভারতবর্ষের কিছু লোক আর্থবংশসম্পন্ন তারা যদি বলেন যে, আমরা যথা এশিয়া চলে যাই, সেখানে আমাদের একটা রাজ্য দেওয়া হোক। কারণ সেখানে থেকেই তো আমাদের পূর্ব পুরুষেরা এসেছিলেন।.....তিন এই যুক্তিতেই ইসরায়েলের জন্ম হয়েছিল।" এটা বস্তুত একটি কাল্পনিক যুক্তির সংগে মিল খোঁজার চেষ্টা। ভারতের আর্থবংশসম্পন্নরা কি কোন দিন জানতেন বা মনের দিক থেকে বিশ্বাস করতেন যে, তাঁরা যথা এশিয়া, স্ক্যান্ডিনেভিয়া বা বাইরের কোন দেশ থেকে ভারতে এসেছেন? বা বাইরের কোন অঞ্চলের সংগে কি ভারতীয় আর্থবংশের সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক কোন যোগসূত্র আছে? তাদের পৌরাণিক বা ধর্মীয় গ্রন্থ কি বিহীন থেকে এদেশে আসার কথা উল্লেখ আছে? একমাত্র প্রত্যাশিত্বের একথা বলছেন এবং এরাও এই ইজিপ্ট-এরিয়ান খিয়ারী নিয়ে সন্তোষিত। এরা বিজ্ঞান মত পোষণ করেন। সত্যি খিয়ারীরা যোষ অনাতম "সত্যসম্মত খিয়ারী" যা কিন্ন বসে সিন্ধু নদের অংশপাশের বটি নদী বিধৌত অঞ্চল আর্থবংশের আদি বাসভূমি। দাক্ষিণাত্য একসময় সমুদ্র দ্বারা এই অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল।

সুন্নীতি ভৌমিক  
রূপে

খরায় সাহায্য

অতুল্য যোষের "কন্ট-কাল্পিত" পঞ্চায়ের লেখাগুলি আগ্রহের সঙ্গে পড়ে আসছি। গত ১৫ই জুন সংখ্যায় তিনি লিখেছেন যে "চোত-বোশেখ দু মাসে পাকিস্তানের কয়েকটি জেলা দুই দুই করে জ্বলছে। দাবদাহও এত কষ্ট হয় না। ইসরায়েল জল নেই, কুয়ায় জল নেই, পুকুরে জল নেই, গরুখাল জল খেতে পায় না ইত্যাদি। ভালভাবে কাসজে বেরায় না। সেইজন্য আমাদের জনহিতকর সব সংস্থা নিশ্চুপ, নিম্নক ও নিম্পন্দ। রোটারী নামও শোনা যাচ্ছে না। তিনি আর এক জায়গায় লিখেছেন যে "সরকারী দল ও বিরোধী দল কেউই এ সম্বন্ধে অবহিত নন হল রোটারী, লায়ন্স, স্কেয়ার অফ কমার্স ও অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠান

## সুসংবাদ

প্রকাশিত হলো

# নীললোহিত সমগ্র

নীললোহিত কে? সকলের মধ্যে মিশে থাকা একজন লাজুক মানুষ, যার বয়স কখনই সাতাশ বছরের বেশী হয় না। সকলে যা দ্যাখে, নীললোহিতও তাই দ্যাখে কিন্তু কিছু কিছু দৃশ্য সে আলাদা করে জমিয়ে রাখে। নীললোহিতের কলমে লেখা সেই দৃশ্যগুলি পড়ে প্রত্যেক পাঠকেরই মনে হয়, এ তো আমারও দেখা, আমারই জীবনের ঘটনা, ভুলে গিয়েছিলাম কেন? প্রত্যেক মানব-মানবীর পাশে দ্বিতীয় সত্তার মতন নীললোহিত যেন একটি ছায়া।

নীললোহিতের ছোট ছোট লেখাগুলি ঠিক গল্পও নয়, রম্যরচনাও নয়, এগুলির নান নীললোহিতের রচনা। সেইজন্যই, নীললোহিতের লেখা ঠিক নীললোহিতের মতন, এর আর অন্য কোনো তুলনা নেই।

নানান বইতে এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা নীললোহিতের সমস্ত লেখা এবার খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রতি খণ্ডে একটি বা দুটি করে উপন্যাস থাকবে।

# নীললোহিত সমগ্র

৩ম খণ্ড ২৫-০০

বিশ্ববাণী প্রকাশনী

৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড II কলকাতা ৯

নিগূড়ানন্দের

## সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে

এক আশ্চর্য অলৌকিক রহস্যকে কেন্দ্র করে এই গ্রন্থ। ছোটবেলায় গ্রামের শ্মশানের বট গাছের নিচে এক বিষাক্ত কালভুজঙ্গ দেখে ভয় পেয়েছিলেন লেখক। কয়েকদিন ধরেই এক অজ্ঞাত তান্ত্রিক এসেছিলেন সেই বটগাছের নিচে। তিনি লেখককে বলেছিলেন- 'সাপকে ভয় নেই। সাপই সব।' ছোটবেলার সেই স্মৃতি জাগ্রত কৌতূহল হয়ে বেঁচে ছিল লেখকের মাথা। বয়োরদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি আশ্রিত সেই কৌতূহলের তাড়নায় 'সাপই সব' এই রহস্যময় বস্তুর ব্যর্থ অর্থ খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেছেন। লেখক পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অংশে সর্প পূজার প্রচলন দেখতে চেয়েছেন। দেখেছেন বড় বড় অনেক ধর্মের সঙ্গেই সাপের এক নিবিড় যোগাযোগ। বিষাক্ত সাপকে এত ভক্তি ও পূজা করার কারণ কি? এ পূজা কি ভীতি থেকে? না কোন গভীর এক সত্য নিহিত ছিল এর মধ্যে? ইতিহাসে ও শাস্ত্র গ্রন্থে যখন তাঁর কৌতূহল মোটেই তখন আশে পাশে খুঁজে বেড়িয়েছেন তিনি সর্পসামকদের। অখ্যাত অজ্ঞাত বহু অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন সামক দেখেছেন নিজের চোখে; তাঁরা সবাই সর্প সম্পর্কে তাঁর কৌতূহলই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এ রহস্য কেউ ভেদ করে দেননি। অবশেষে অতিলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন এক সন্ন্যাসীর দেখা পান তিনি হিমালয়ের আড়িনায়, দুধচটির পথের ধারে। তিনিই তাঁকে প্রথম সর্প রহস্যের গোপন কথা খুলে বলেন। তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ এ এক অলৌকিক রহস্যের কাহিনী, যা পাঠ করলে এক শিহরণ জাগে। নিগূড়ানন্দের এটি আর একটি সাড়া জাগানো রচনা।

## বোধন

### পূজার আগেই উদ্বোধন

তোমাদের আজি-মাফিক গল্প বা উপন্যাস  
লিখিয়েদের আরো কিছু নাম

আশাপূর্ণা দেবী লীলা মজুমদার নীহাররঞ্জন গুপ্ত  
গজেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশ্বেতা দেবী কবিতা সিংহ  
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় অতীন  
বন্দ্যোপাধ্যায় সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় সৈয়দ  
মুস্তাফা সিরাজ হিমালীশ গোস্বামী শেখার বসু  
শক্তিপদ রাজগুরু আনন্দ বাগ্চী

পরে আরো নাম জানতে পারবে

গ্রাহকদের জন্য ২০% ছাড়। এজেন্টরা যোগাযোগ করুন।



করণী প্রকাশনী

১৮ এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯, ফোন : ৩৪-৬২৬৮

কি এটা ধরে নিতে হবে যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে খুশী করার জন্য এরা জনহিতকর কার্যে উদ্যোগী হয়?"

জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ করে রোটারী সম্বন্ধে অতুল্যব্যবহার এ মন্তব্য সমীচীন হয়নি। রোটারী প্রচারে কিংবাস করে না। রোটারী একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এবং কোন রোটারী ক্লাবই নিশ্চয় হয়ে থাকে না। তিনি বীরভূমের উল্লেখ করেছেন এবং সেজন্য তাঁর অবগতির জন্য কয়েকটি উদাহরণ দিই। বীরভূমের খরগ বাল্যশ্রমিকদের রক্ষার জন্য শান্তিনিকেতন রোটারী ক্লাব বোলপুরের সমীকটে আমন্ত্রণের মাধ্যমে একটি ৫ ফুট ব্যাসের ইন্দ্রাধন করে গ্রামবাসীদের জলের ব্যবস্থা করেছেন। নিকুটের আর একটি গ্রাম কাপাসটিকুরীতে একটি নলকণ খনন করেছে। গত বোশেখ মাসে শান্তিনিকেতন রোটারী ক্লাব চন্দ্র শিখির স্থাপন করে দুস্থদের চন্দ্র মূল্যে চন্দ্র অস্ত্রোপচার করেছে ও চন্দ্রও দিয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ৭৪ সালের ডিসেম্বর বন্যায় যখন বোলপুরে এক বিজয়ী স্বীপের মত হয়েছিল, তখন সরকার কোন প্রচেষ্টা নেয়ার আগে সর্বপ্রথম রোটারী ও লায়নস স্থানীয় ছেলদের নিয়ে দ্রাণ ও উদ্ধারকার্যে নেমে পড়েছিল।

রোটারী মানেই সেবা (service) এবং রোটারী সচেষ্টভাবে রাজনীতি থেকে দূরে থাকে এবং "রাজনৈতিক দলকে খুশী করার" কোন স্পষ্ট আদেব নেই।

### পরিব্রজ্যের দাস শান্তিনিকেতন

### কলকাতার জল সমস্যা

কলকাতার জল সমস্যা নিয়ে যে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে, ও সি এম ডি এ থেকে প্রতিবাদ পত্র বেরিয়েছে এ দুটোর কোনটা পড়েই কলকাতার সাধারণ মানুষ প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে পারছেন না। কলকাতার জল যেমন বেড়েছে, মানুষও বেড়েছে, বেড়েছে পাইপের ছাঁদও, কলে জল নষ্ট হচ্ছে বেশী—ফুটপাথে বাসিন্দার সংখ্যা হিসাবের বাইরে চলে যাচ্ছে। আর যে সব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে সেগুলো কব শেষ হবে সেটা ভাবনা ছাড়া কেউ বলতে পারছেন না। কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মালপত্র পাওয়া যাচ্ছে না। ওজরগানের অভাব, ট্রাকের অভাব—কারখানাগুলোর অকথা পার্শ্বমবস্তু থেকে অন্য রাজ্যে (যেমন ফিরোজ) আরও শোচনীয়। অন্যদিকে 'সেক্টর' হল জল সরবরাহ। "প্রাথমিক কোর" (Priority/Core) সেক্টরে না আনতে পারলে জলের অভাব কোনও দিন মিটেবে না। ভারত সরকার মাথায় হাত দিয়ে কি ভাবছেন এতকাল বসে?

শিশিরকুমার নিয়োগী

মহাসচিব, আই পি এচ ই

স্বাধীনতা পুরস্কার প্রাপ্ত

### পুরস্কারপ্রাপ্ত

২৮ জুন তারিখে প্রকাশিত শ্রীমতী প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। বিনয়ের সঙ্গে জানাই, বিতর্কে অংশ নেওয়া ভাল কিন্তু যে কোনো মতে একমত সত্য বলে ধরে নেওয়া ভাল নয়।

সুইডিশ অকাজেমীর কাছ রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার জন্য ইংল্যান্ডের রাজ্যের সোসাইটি অব লিটারেচার-এর ফেলো স্টার্ক মুর প্রস্তাব দিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু এই সোসাইটির কাছে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর রচনাকর্মকে কে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন? ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ নভেম্বর ইয়েটস-ই এডমন্ড গাসের কাছে রবীন্দ্রনাথকে ইংল্যান্ডের আকডেমিক কমিটির সদস্য করার প্রস্তাব জানিয়ে পত্র দিয়েছিলেন। স্টার্ক মুর নোবেল কমিটিকে জানান তাঁর পরেই।

প্রসঙ্গত ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির অন্তরালে কিভাবে কাজ করেছিলেন তাঁর কিছুটা প্রকাশ করলে চলিতার একদেশাচারিতা কিছুটা সংঘত হবে আশা রাখি।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জুন রবীন্দ্রনাথ গীতাজিলার পাণ্ডুলিপি-র কপি নিয়ে ইংল্যান্ডে উপস্থিত হলেন। রোটেনস্টাইনকে কপি দেখালেন। রোটেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী গীতাজিলার তিনটি টাইপ কপি করিয়ে একটিকে তৎসদস্য বিশ্বকজ্ঞানমণ্ডলীর স্রীতি পরিচয় করে ইয়েটস-এর নিকট পাঠালেন। ইয়েটস তখন দক্ষিণ ফ্রান্সের নর্ম্যান্ডিতে ছিলেন। সেখানে তিনি মড গ্রানের জ্যাকথো ব্রিগাম নিকটলেন। তিনি মড-গনকে কপিটি পড়ে শোনালেন ও মতামত চাইলেন। মালাম গান একা নন, জেমস এইচ কাজিনস সম্প্রদায় সে সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করেন। ২৭ জুন ১৯১২ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইয়েটস-এর সাক্ষাৎ হল। ৩০ জুন সম্মান্য রোটেনস্টাইন গল্পে এজরা প্যাউন্ড আর্নেস্ট রীজ যে দিনক্রেয়র, এন্ড্রু প্রমথের সামনে গীতাজিলার পাঠ করে শোনালেন ইয়েটস। ১০ জুলাই ট্রেকডোম হোটেলে ইংল্যান্ড সোসাইটি আর...এর রবীন্দ্র সংবর্ধনা সভাতে ইয়েটস সভাপতির বক্তব্য রাখলেন ও ইংল্যান্ডের বহু বিদ্বৎ সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের নিকট তাঁর আতিথ্য অগ্রহের সঙ্গে ক্রিও করলেন ও তুলে ধরলেন। ১৭ জুলাই ইয়েটস ও রবীন্দ্রনাথ হোটেলে একসাথে ডিনার খান এবং ইয়েটসের গৃহে বসে পাণ্ডুলিপি খুঁটিয়ে দেখলেন—এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একসময় বলেন, ত্রুটির পর এল সেই আনন্দময় দিনগুলো যখন আমি ইয়েটসের সঙ্গে কাজ করছি এবং আমি নিশ্চয়ই বলবো যে তাঁর লেখনীর জাদুপূর্ণ আমর ইংরেজী কিছুটা চিরন্তনতার গুণে অর্জন করতে পেরেছি। গীতাজিলার রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদগুলিকে তিনি মর্মান্বিত করে তোলেন। গীতাজিলার

কোম্পানীকে পর লেখক উল্লেখ  
করেছেন। লোকজ্ঞান জানা নেই, এ-কাজ  
গোপনে হয়নি। প্রকাশক ১৯১৭  
খ্রীষ্টাব্দে ইয়েস্টে ম্যাকমিলান  
কোম্পানীর অধিকৃত করে রাষ্ট্রপতিদের  
ইংরেজ কালোচরন/অনুবাদ পন্থার  
ভুল ইত্যাদি বিষয়ে পর দিয়েছিলেন।  
১৯০৫-এ রোটেনষ্টাইনকে তিন সের  
জুন জারিয়েছিলেন, ১৯০৭, ১লা  
জুন অবিশ্যচন্দ্র বসুকে সাক্ষ্যকরে  
জারিয়েছিলেন। এজরা পাউন্ড  
ইংরেজীর বিষয় ছাড়া হাবিয়েট  
মনরো-কে পঠে জারিয়েছিলেন—  
এম'ম প্রচারক হিসাবে টেগোর  
অপরিহার্য, যন্ত্রণাদেবী পাশ্চাত্য  
মানবের তিন তেমন কাজে  
লাগবেন না। রাষ্ট্রপতি বেছে ছেছে  
কতকগুলি ভাবসম্পন্ন পূজা-পর্বের  
কবিতা নিয়ে তো গাঁপজলি বেধে  
ছিলেন এবং অনুবাদ বাস্তব তাই  
নিজের পক্ষে, এড. ওয়ার্ড টমসনকে  
লেখা, তার উল্লেখ আছে—আমার অনু-  
বাদে আমি ভাইর মত সব সমস্যা  
এড়িয়ে গিয়েছিলাম, কলত সেগোলে,

স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কবিতা দুইখণ্ডেই, শাণি হয়ে গেছে। (কবিতা রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬৬ : পৃষ্ঠা ১০৫)। ইয়েটস্‌ ইয়াতরু ভেঁা ছিলেন না ছিলেন আজীবন। গণগ্রাহ্যী-সংত নিকাল সিং-এর বিরোধ। (ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট-টোপার জেনারেল সান্সনমন্ট ১৯১১) থেকও জানা যায়। আর বিষয়টির দিক দিয়ে ইয়েটস্‌ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে বিষয়ে মূলতঃ কারণে বিপরীত মত প্রকাশ করতেন তা হল—অপদ্যায় ভাষাতত্ত্ব। অমতও পেতে চান; অমি চাই মতও। (নরেশ চন্দ্র/বালা রূপ নট্যর উত্তরে আইরিশ প্রেসন/চতুর্থ বৈশাখ ১৩৭০)। লেখিকা একমত হবেন নানা জানি না, ফাঁকি দিয়ে বা ঈর্ষাকাতর মন নিয়ে

বা অনোর গৌরব আত্মসাৎ করে  
বিশ্বসাহিত্যে স্থান নেওয়া যায় না।  
ইয়েটস্, রবীন্দ্রনাথ, এজরা পাউন্ড—  
সবই মননামে ও মন মন কর্মে মনস্তত্ত্ব।  
মিহিরকান্তি ন্যায়বান

প্রাথমিক আর্ট

দেশে ২১শে জুন ১৯৮০ সংখ্যার  
নটিশপত্র বিভাগে 'প্রাথমিক আর্ট'  
লেখকবর্গ প্রস্তুতবর্গ পড়ে পুনরায়  
কিছু আলোচনা করতে বাধ্য হলো।

১। 'প্রিণ্ট' (চাপাই ছবি  
ওর মতে) সম্বন্ধে সম্দাপিবাবুর বাস্ত-  
গত মতান্তর নিয়ে উীন প্রবন্ধ—এর  
পৃথিবী ভাবে অনারকম। মোটামুটি  
ভাবে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ থেকে চার-  
শিল্পের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড প্রিণ্ট-  
ম্যান একটি আধুনিক শিল্পমাধ্যম  
হিসাবে সর্বা পৃথিবীতে প্রসারিত। এই  
মাধ্যমের গুরুত্বও বৈচিত্র্যের দিক  
আকৃষ্ট হয়ে অনেক বিখ্যাত শিল্পী  
এসোবর্ধ কাজ করেছেন। সম্দাপি-  
বাবুর মত অনুযায়ী অবসর বিদ্যা-  
বনের জন্য এটাও কখনো নি।

২। আগের পর্বে লিখেছিলাম—  
ধড়ুর পাতে কোনো অঘটন ঘটে না—  
প্রয়োজনক্রমে নিয়ন্ত্রিতভাবে ঘটনা  
হয়। আমি এখনও তাই বলছি।

প্রকাশিত হলো

র সঙ্গে দেখা  
ন গল্পোপাধায়

মতে পিতৃবন্ধু অসুস্থ মধুসূদন  
 চত্বে ফুল্লরার কাছে আশ্রয়  
 নারাটা রাত সে এক দুর্দান্ত  
 রে তখন পৃথিবী ছিল টাল-  
 শা ঝড় আর বর্ষণের তাণ্ডব,  
 থেকে বেরিয়ে আসা উড়াল  
 শিবু অস্থির হচ্ছিল প্রিয়জনের  
 বহা জী পুস্পর কথা জেবে ।  
 বহা ফেরার জন্য আশ্রয় ছেড়ে  
 চল্লিশ মাইল পথের বাধা  
 সব মানুষের আদিম চেহারা  
 কাছে ছুটে গিয়েছিল উগ্রশ্রান্ত  
 তার নদীর সঙ্গে দেখা । কাম  
 সা হিংসা আর হিংস্রতার সঙ্গে  
 মেরে এমন আদিম জীবনচিহ্ন  
 । পনেরো টাকা ॥



# গের স্টেশন

আন্দোলন

ত সন্দূর সব জায়গা আছে তা  
থাকিলে বিশ্বাস হবে না । সব  
জায়গা কম । বেশির ভাগটা  
। গর্তে সাপ থাকে । পাছে  
। পাতা অঝোরে ভেজে । ট্রেন-  
গিয়ে জুতোর দোকানের বেঞ্চে  
রে । অখচ দু-পা হেঁটে গেলেনই  
মপিউটর, সত্যবন্ধ অভিনয়  
ভেতর এই আমাদের প্রাচীন  
দম ।  
গায়িত হয়েছে শ্যামল গঙ্গো-  
আলোচিত অসাধারণ এই  
স্বা ধরে যতই এগোনো যায়  
ককটি গন্ধে—সে গন্ধ ঘটির,  
০০ টাকা ॥

---

পত্র প্রকাশন  
টোলা লেন, কলি-৯

1

**সুখীত শ্রুতিদ্বারা সত্য প্রমাণিত!**

# **এই হল এক সম্পূর্ণ ক্রিচ্চন মেশিন। এখন তো এটি আরও বেশী ক'রে সত্য লাগাচ্ছে, কারণ এখন এ হল আরও নতুন নতুন সত্য কাজ ক'রে দেখাচ্ছে!**

সুখীত হল ভারতে প্রথম নিজস্ব ধরণের এক মেশিন। এতে, সহজে খোয়া যায় এমন এক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বৈনলেস স্টীলের জার থাকে আর তাতে থাকে এক আকর্ষনিক ঢাকনা— আর তার ফলে সুখীত যে কত সহজে আর কত সুশীলতার সঙ্গে কাজ করছে তা দেখা যায়।

মানুষ ধরণের কাজ গুব চটপট আর অনেক বেশী সহজে করতে পারার ক্ষেত্রে এতে এখনও প্রচুর আশ্চর্য্যবশী লাগানো হয়েছে, যার ফলে ভিজিয়ে বা জুকানো ভাতের পেসা, ফেটানো, একসঙ্গে মেলানো বা ঘোলায় জন্মে অবধা মাস বেকে কিম্বা তৈরী করা বা শাক সবজী কাটাও অনেক সহজ হয়ে গেছে। একটি বিশেষ ধরণের আটা মাথার অংশও এতে আছে, যেটি কটি, লুচি বা দাঁড়ির ইত্যাদির জন্যে অতি চমৎকার আটা মেগে দেয়—আর আঙুর কেক মিশ্রণ মেশানোর এক বিশেষ হীক!

সুখীত-এ এক ছোট ছোট মোটরও থাকে, যেটি এক নাগায়েই একটুকু না বেয়ে ৩০ মিনিট পর্যন্ত চলতে পারে। তাই বলছি, আশুন! এসে সুখীত-এর কাজ কারখানা একবার নিজে চোখে দেখুন!

সুখীত এক কম দামের পাাকে, আটা মাথার অংশটি ছাড়াও পাওয়া যায়, যার নাম সুখীত হোমোজাইজার বলা হয়। আটা মাথার অংশটি আলাদাভাবেও কিনতে পাওয়া যায়।



**নতুন! মাংসের কিম্বা তৈরী করা,  
শাকসবজী কাটা, কোয়া ইত্যাদি  
উপযোগী নিজস্ব ধরণের অভিনব  
এই মেশিন, ভারত এই প্রথম!**

বৈনলেস স্টীলের জারের সঙ্গে একটি দেখতে সুন্দার সঙ্গে অর্ধচক্রে নিশুণ ব্রেড দেওয়া হয়। সুখীত নিম্নোক্তদের দ্বারা বিশেষভাবে উদ্ভাবিত এই ব্রেডটি মাংসের কিম্বা ৩ মিনিটের মধ্যে আর গাজর, পেঁয়াজ, নাংকোল, কাঙ্ক্ষ ইত্যাদি নিম্নোক্তের মধ্যে কুঁড়ে দেয় আর এমন কি বরফদ টুকরা ক'রে দেয় একবারে পলক ফেলতে না ফেলতে। সত্যি, কি অস্বাভাবীয় জিনিস বলুন তো? নীচের লেখাগুলি পড়ে ভেবে দেখুন, এটি আপনার রান্নাঘরের কোন কাজে লাগবে।

**কাঁচা মাংস:**

মশলা মাথা মাংসের কিম্বা তৈরী করে দেয়— তাই আর একবার চালালেই আর তার মুখোচক, স্বাদানিক আর অস্ত্র মূল্যবান রস একটুকু নষ্ট হয় না। শিক-কাঁচা, ছায়ামাংস, কিম্বা ইত্যাদি তৈরী করতে তো এ একেবারে সম্ভব!



**পেঁয়াজের গ্রেডিং ও সস:**

এটি ঘন ঘন মুখোচক গ্রেডিং আর মোগলটি রান্নার জন্যে সলস তৈরী ক'রে দেয়।

**নারিকোল বরফ:**







আপনার প্রিয় সব খাবার তৈরী করার নারিকোল কুঁড়ে দেয় কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই। গাজরের হালুয়াই তৈরী করুন বা কাঙ্ক্ষ বা আখ্যাটো ২-৩ মিনিট খাবার—এ কাজ করে যাবে একই ভাবে।



**সুগন্ধযুক্ত বরফ:**

পলকের মধ্যে বরফ টুকরো টুকরো করে দেয়—যা দেখে জিভে জল গলে যায়। যে কোনো রকম স্বাদের সঙ্গে মেশান, এমন কি ককটেলের জন্যেও এ বরফ যথেষ্ট দেবে।

**এবার দেখুন! সুখীত দিয়ে আপনি আর কি কি করতে পারবেন।**

		
জুকানো মশলা পিষে দেয় ৩-৫ মিনিটে	ভেজানো ডাল পিষে দেয় ৩-৫ মিনিটে	সেকেন্ডের মধ্যে গাজর কেটে দেয়
		
লুসী/কলের রস ফেটিয়ে দেয় ১ মিনিটে	চাটনী পিষে দেয় ১ মিনিটে	আটা মেগে দেয় ২ মিনিটে আর কেক মিশ্রণ মেশায় ৩-৫ মিনিটে

**সুখীত**  
পুষ্টিপূর্ণ ক্রিচ্চন মেশিন



বিশ্বমূল্যে প্রদর্শন : আমায়ের অকারতুল্য পথ চেয়ে থাকুন আর দেখুন সুখীত-এর অশুর সপ কাজের নয়না!

সার্ভিস সেন্টার : কে, দণ্ডপানী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা। ফোন : ২৬৬৭২৮, ২৬৬৭২৯

OBM-223-BEN.

জিক্স বা কপার শ্লেটে যদি দু'খণ্টনা যত্নে তাহলে ব্রুক-মেকার্সদের কি অবস্থা হত? আলিয়াস হিসে বা ত্রিটিশ কাউন্সিলে কোনো জ্ঞানী শিল্পরসিক হস্ত সঙ্গীপবাবুকে এই ভুল ধারণা দিয়েছেন—যা ঠিক কাছ বোঝাবার। কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলাম—জ্ঞান না কেনে শ্লেটে যাহোক কিছু একে আয়িশে খাইয়ে দিলেই এঁচং হয় না—এখানে নান্দনিক গুণের কথাই বলাইলো। আর আমার ১৯৬৪-তে প্রকাশিত প্রিণ্টগুলি সঙ্গীপবাবু দয়া করে এসে দেখলে বৃকতে পরবেন।

৩। আমরা যারা 'পেণ্টার-প্রিণ্টার-মেকার'—ভারা প্রিন্টের আলাদা সত্যকে তার বিশেষ গুণগুলিকে তেমনভাবে দেখি না। জ্ঞান-পেনটিং-এর গুণ-গুলিকেও প্রিণ্ট-এর ঘাড় চাপাই। তাই শিল্পনিকেরদের রতনকুঠিতে অধ্যাপক আলিস্টার গ্রাণ্টের সংগে প্রথম পরিচয় ও আলাপের ফাঁকে যখন কল—আমি বিশ্বাস করি ভাল পেণ্টার না হলে ভাল প্রিণ্ট-মেকার হওয়া যায় না—তাই আমাদের বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের আমরা প্রিণ্ট-মেকিং-এর সাথে জ্ঞান-পেণটিং এমনকি ডাক্ষর্যও করাই—তখন উনি বলেছিলেন—'সুঁধের বিশ্ব প্রথম পরিচয়েই এক জায়গার আমরা একমত হলাম।' এরপর দু'দিন উনি আমাদের বিভাগে কাটিয়ে যা বলেছিলেন তা আমার আগেই পড়ে লিখেছি। পৃথিবী এগোচ্ছে—নতুনরা প্রিণ্ট-মেকিং-কে তার নিজের পারে দাঁড় করাতে চাচ্ছে—করছেও। অন্যের গায়ে তার বেধে দাঁড়াতে চায় না তারা।—অতএব আলিস্টার গ্রাণ্ট বনাম সনৎ কর বা কলাভবন বনাম রয়েল কলেজ নয়। 'বিশ্ববিদ্যালয় গুরু' সুতরাং কলেজের এই ঐতিহ্যে আমাদের সঙ্গীত-বাবু যা বলতে চেয়েছেন—ভারতীয় হিসাবে সেজন্য তার লাজিত হওয়া উচিত। উইলিয়াম হেটোর সম্বন্ধে গ্রাণ্ট সাহেবের নিজস্ব মতামতে আমাদের কিছু বলার নেই। আর তাতে কিছু যায় আসে না। আধুনিক নান্দনিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে গ্রীহেটোর একজন দিশারী।

৪। সব এঁচং-ই ইন্ডালিও (কথাটা 'ইন্ডালিও' নয়) কিন্তু সব ইন্ডালিওই এঁচং নয়। এর আগের চিঠিতে পরিষ্কার ভাষায় বলেছি—হেটোর প্রদর্শিত ইন্ডালিও প্রথমে এদেশে কাজ হয় না—কোনোদিন হয়নি। উপকরণের অভাবে এদেশের ইন্ডালিও প্রিণ্ট-মেকার্স-রা নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী ইন্ডালিও প্রিণ্ট-মেকিং-র কয়েকটি পদ্ধতি করে নিয়েছেন। তাঁদের প্রিণ্ট কোনো অংশে অন্যান্য জায়গার প্রিণ্ট-এর থেকে নিষ্কণ্ট নয় বরং কয়েকটি বিশেষ উৎকর্ষের দাবী রাখে। সেই ঐতিহাসিক সূত্রে ধরে আমি আগের পত্রে প্রমাণ করেছি কেন। শ্রীসোমনাথ হেডিকে প্রিণ্ট-মেকিং-এর ভগ্নীয় বলব, অরুণ কন্দে কন্দ—আর ডাকেরেই রমেশনাথ চক্রবর্তীর দিকে, অরুণ দেখছি

তখন আমরা ভগ্নীয় নিয়ে মাথা নাই ঘামালাম। যে প্রথম এখানে কোনোদিন কাজ হয়নি—আজও হয় না, সে প্রমাণ সম্বন্ধে তর্ক করতে যাব কেন? তা একমাত্র করতে পারেন সঙ্গীপবাবু ও প্রণবরজন রায় (করণ প্রণবরজনের বোমা পড়েই সঙ্গীপবাবু তর্ক নেমেছেন)। প্রণবরজন আবার চট করে ক্ষান্ত হন না—লিখেছেন, আকোয়া-টিণ্ট ইত্যাদিও অরুণ বসু আমার শিখিয়েছেন—অথচ উনি হস্ত আজও জানেন না কলকাতা আর্ট কলেজে আকোয়া-টিণ্ট ইত্যাদি, বহু আগে থেকেই শিক্ষা দেওয়া হয়ে আসছে—এবং আমি উক্ত কলেজে গ্রাফিক আর্ট বিভাগে গ্রীহেরেননাথ দাস মহাশয়ের ছাত্র ছিলাম। অসলে সঙ্গীপবাবু এবং প্রণবরজন উভয়েরই প্রিণ্ট-মেকিং পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা কিছু সীমায়িত। না হলে কেউ বলতে পারে "ছাপাই ছবিকে আমি চির এবং ডাক্ষর্যের সমান মর্যাদা দিই না।"—চান্না, জাপানী প্রিণ্টস্-এর ঐতিহ্যের কথা একেবারে ভুলে গেলেন। লিখেছেন—

—“মহান শিল্পী ডুয়েররের...”  
—ডুয়েরর তো বিশেষভাবে একজন প্রিণ্ট-মেকার-ই ছিলেন। (যদিও পেণটিং-ও তার আছে) সঙ্গীপবাবু বলেছেন কয়েক বছর আগে নাইরক মডার্ন আর্ট গ্যালারীর প্রেরিত প্রদর্শনীতে পিকাসো, মাতিস, রাবি, শাগালের সাথে হেটোরের ছবিও প্রদর্শিত হয়েছে—তাহলে বৃকতেই পারা যাচ্ছে হেটোর কোন শ্রেণীর শিল্পী। অসলে ঠিকার বার বার ভুল করছেন দেখে এর আগেই চিঠিটি আমি লিখেছিলাম। আমি ও প্রণবরজন যুগ্ম সম্পাদক ছিলাম—সোসাইটি অব কন্টেম্পোরারী আর্টিস্টের। ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে এই সম্প্রদায় সভার ইন্ডালিও প্রিণ্টমেকিং স্টুডিও স্থাপন করে ধর্মতলার ঘরে ও প্রিণ্ট-মেকিং-এর কাজ করতে থাকে। এই সময়ে অরুণ বসু বিদেশে। ফেরেন ১৯৬৬-র কোনো সময়ে। এবং প্রণবরজনের প্রতিষ্ঠিত স্টুডিওতেই এদেশে থাকাকালীন কয়েকটি কাজ করেছিলেন—তবে হেটোরপ্রথমে কোনো কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি—উপকরণের অভাবে। স্টুডিও'র দেখাশোনা আমরা সকলেই করতাম—প্রণবরজনের মত অনুযায়ী কোনো ম্যানেজার আমায়ের ছিল না। আর অমৃতবাজার পত্রিকার পুরো 'ব্যাক-পেজে' আমাদের সকলের স্টুডিওকে যে অরুণ বসুর একমাত্র স্টুডিও বলে লেখা হয়েছিল—তাতেও সত্যের অবসান হয়নি।

৫। আধুনিক শিল্পবোধ ও শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে অপরিণত ধারণার জন্য 'ধরনা' ইত্যাদি লেখা হয়েছে অথচ ব্যক্তিগতমত ও মৌলিকতাই বেধানে গোড়ার কথা।

সনৎ কর  
কলাভবন বিশ্বভারতী

[এ বিষয়ে আর কোন চিঠি ছাপা

## অমর সাহিত্য প্রকাশন-এর বই সাহিত্য-অধিরাজী আশা-পূর্ণা দেবীর



কখনো দিন কখনো রাত ৩২.০০

চার দেয়ালের বাইরে ৮.০০

ঝিনুকে সেই তারা ৯.০০

ওরা বড় হয়ে গেল ৭.০০

অবিনশ্বর ১০. নীলপর্দা ৫.০০



যাঁর খ্যাতি শুধু বাংলায় নয় সারাদেশে পরিব্যপ্ত  
সেই অদ্বিতীয় উপন্যাসিক

বিমল মিত্রের

বিষয় বিষয় নয় ৭.০০ আমি ১৬.০০

ওহেনরীর শ্রেষ্ঠ গল্প ১৪.০০

তিন ছয় নয় ৮.০০ পরজ্ঞী



বাংলাসাহিত্যে যে ক'জন স্বনামধন্য সাহিত্যিক  
আছেন বিমল কর তাদের মধ্যে অন্যতম।

বিমল কর-এর

যাতুকর ৫.৫০ তিন চরিত্র ৭.০০



নীহাররজন গুপ্তের

গোয়েন্দা কাহিনীর গ্রন্থাবলী

কিরীটি অমনিবাস

১৩দশ খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হলো

উর্বশী সন্ধ্যা ৯.০০ সূর্য তপস্যা ১০.০০

পদাবলী কীর্তন ১২.০০



অমর সাহিত্য প্রকাশন

৭ টেমার লেন, কলিকাতা-৬ (কলেজ স্ট্রীট জংশন)



প্রকাশিত হল

ইন্দ্রমিত্র-এর

রস সজীব কৌতুক উপন্যাস

মহারাজ দাম ১০.০০

হাসির গল্পের একনিষ্ঠ  
লেখকরা খুব কম ক্ষেত্রেই  
হাসির উপন্যাস লিখেছেন।  
শরৎচন্দ্র লেখেননি।  
শরৎচন্দ্র চক্ৰবর্তীও না।  
অথচ কে না জানে,  
কৌতুকগল্পের ক্ষেত্রে এই  
দুটি নাম কী অবধারিত,  
কী উজ্জল এবং অবিসংবাদী।  
হাসির গল্পকার ইন্দ্রমিত্র  
এদেরই উত্তরসূরী এবং  
বিশিষ্ট সফল একটি  
বাস্তব। তাঁর গল্পগল্প  
'শুভদিন' খারা পড়েছেন  
তাঁরা জানেন, জীবন থেকে  
কত সহজে তিনি তুলে  
নেন অনাবিল কৌতুকে  
উজ্জল সিঁচাশেন। বুদ্ধিদীপ্ত  
ধারালো তাঁর ভাষা, সরস,  
সজীব তাঁর বর্ণনা, বিস্ময়কর  
তাঁর পরিমতিবোধ।



হাসির গল্পকাররূপে তাঁর  
সার্থক অতিজ্ঞতাকে  
বিস্তৃতরূপে ক্ষেত্রে প্রয়োগ  
করেছেন ইন্দ্রমিত্র 'মহারাজ'  
উপন্যাসে। আদ্যন্ত কৌতুক  
ময় এই উপন্যাস বাংলা  
সাহিত্যে এক দর্শন  
ও দুর্মূল্য সংযোজন হয়ে  
থাকবে। নেপথ্য-জগৎ বা  
আন্তরিক্য-এর যেসব  
কার্তিকান্ড আমাদের  
যাবতীয় ঘটনাপ্রবাহকে করছে  
নির্যাসিত, এই উপন্যাসে  
তারই পরিচয় তুলে ধরেছেন  
তিনি। ঘটনাবলী আমরা  
জানি, ঘটতে দেখি। কিন্তু  
নেপথ্যকাহিনী জানা ছিল  
না। দম-ফাটা হাসির  
রাগভর মুণ্ডে অনাস্বাদিত  
সেই কাহিনীই অনন্য  
ভঙ্গিতে শোনালেন ইন্দ্রমিত্র।

এই লেখকের গণপ্রিয়ঃ  
শুভদিন ৬-০০

দীপালি দত্ত রায়ের

চাণ্ডাল্যকর উপন্যাস

লাল হলুদ সবুজ

আলো নেই

দাম ৬.০০



সাহিত্যবান্যায় মোড়া শহুরে  
উচ্চ মহাবীত যে-মানুষদের  
ককককে বাইরের চেহারাটা  
দেখে আমরা সম্ভ্রম বোধ  
করি অথবা হীনম্মন্যতায় হই  
অপমান তাদের ভেতরের  
জীবনের নীতিহীন  
নিয়ন্ত্রণহীন যান্ত্রিক  
সম্পর্কময় ছবিটি অত্যন্ত  
দক্ষতায় ও আন্তরিকতায়  
কৃষ্টিয়ে তুলেছেন দীপালি  
দত্ত রায় তাঁর শক্তিশালী  
কলপের অধীনে।

সুধীরঞ্জন

মুখোপাধ্যায়ের

সাক্ষ্যের পটভূমিকায়

উপন্যাস

দিনরাতের খেলা

দাম ১০.০০

সাক্ষ্যের আলো যখন নিবে  
যায়, তখন যায় বাজনা,  
পূর্বীর মতো সুন্দরীরা,  
সুখের শব্দ, যেরা আর অলীক  
জোয়ারবরা যখন মগ্নের  
আড়ালে ফিরে যায় তাদের  
নিজস্ব ছাউনিতে, কিংবা  
টোকার-ব্যাডমাচটার প্রমথ  
নেপথ্য শিল্পীরা হয়  
নিজেদের মাথোমোখি, সেই

আলোহীন সুরহীন  
অপরিচিত জগতের সঙ্গে  
আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন  
সমীপবর্তন মতোপাধ্যায়

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

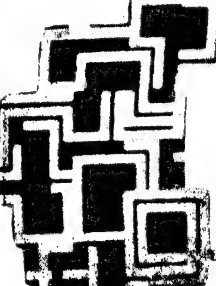
আশাপূর্ণা দেবীর

চমকপ্রদ উপন্যাস

লোহার গরাদের

ছায়া দাম ৭.০০

এক নির্মলচিত্রের মানুষ  
হঠাৎই দগ্ধিত হলেন  
কারাবাসে। আড়াই বছর ধরে  
স্বামীীর মুক্তি দিদিটির  
প্রতীক্ষা করেছে শুধি চন্দা।  
অবশেষে এল সেই ঈশ্বরিত  
মুহূর্ত। কিন্তু কোন্  
রূপ ধরে? কী চেহারায়?



লোহার গরাদের অদৃশ্য এক  
ছায়া গ্রাস করেছে যেন  
সমস্ত সত্যকে। দাব্য  
চমকপ্রদ কাহিনী লোহার  
গরাদের ছায়া।

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

সুনীল

গঙ্গোপাধ্যায়ের

আকর্ষণীয় উপন্যাস

কবি ও নর্তকী

দাম ১০.০০



এক যুবক ও দুই যুবতীকে  
নিয়ে এই উপন্যাস।  
যুবকটি কবি। মেয়ে দুটির  
একজন কলেজের ছাত্রী,  
অন্য জন সিনেমার নায়িকা।  
কুড়ি থেকে ছাব্বিশ বছরের  
এই তিনটি ছেলেমেয়ের  
আন্তর সভা ও বাইরের  
জীবনের সংঘর্ষ ও  
সমন্বয়ের, আকাঙ্ক্ষার ও  
উত্তেজনার এক অসামান্য  
কাহিনী রচনা করেছেন  
এ-যুগের যৌবরাজ্যের



শৈলেন ঘোষ-এর

আজব বাঘের

আজগুবি দাম ৭.০০

বাঘ কি কখনো গল্প বলে  
মানুষের মতো?  
একটা বাঘকে জানি যে  
আমাদের শূন্যেছে তার  
আশ্রয় জীবনের গল্প।  
বাঘটা আজব বই কি! গল্প  
বলে, বেহালা



বাজায় আরও  
কতসব অশ্রুত  
অশ্রুত কাণ্ড করে। কিন্তু তা  
বলে আজগুবি বলে উড়িয়ে  
দেওয়া যায় না তার গল্পকে।  
আসলে বাঘও তো একটা  
জীব, যার বাবা আছে, মা  
আছে, ঠাকমা আছে। আমরা  
কি তার সব খবর জানি?  
কিন্তু আজব এই বাঘটা যখন  
নিজেই গল্প শোনালো তার  
নিজের জীবনের, তখন  
আমরা আজব বনে গেলাম।  
সে কি সুন্দর গল্প কী  
বলব। আরো বাঘের সঙ্গে  
দেখা হল এক ছোট ছেলের,  
যে ওই বাঘের মতোই  
দুঃখী। ছেলেরটার বাবাকে  
আটকে রেখেছে এক  
দস্যু-সর্দার, রাজস্ব নিয়েছে  
কেড়ে। সেই ছেলেরটা আর এই  
আজব বাঘটা হঠাৎ বন্ধ  
হয়ে গেল। তারপর তারা  
দুজনে মিলে কী করে মেরে  
ফেলল সেই দস্যু-সর্দারকে,  
আর কী করেই বা ফিরে  
গেল হারানো রাজস্ব সেই  
কাহিনীই লিখেছেন রূপকথার  
জাদুকর শৈলেন ঘোষ তাঁর

প্রকাশিত হয়েছে

গৌরী ধর্মপাল-এর

মজাদার ছবি-ছড়ার বই

ঘোড়া যায় দাম ৬.০০



“রঙ-চঙে পাতা আর/ছবি  
ছড়া মজাদার/হাসি খুঁশি  
ফুঁটি/এই দিয়ে ভর্তি”  
—‘ঘোড়া যায়’-এর প্রথম  
ছড়ার প্রথম চারটি পংক্তিতেই  
যেন তুলে ধরা হয়েছে বইটির  
বিষয় এবং বিন্যাস, স্বাদ  
এবং রস, মজা এবং আনন্দ।  
ছোটদের জন্য নতুন স্বাদের  
ছড়া আর সঙ্গে তাল-  
মেলানো মন-ভোলানো সব  
ছবি—এ-সবের হরগৌরী  
মিলনে দু-দুগে ছাপা এই  
এক অনন্য উপহার।  
গৌরী ধর্মপাল-এর ছড়ার  
বৈশিষ্ট্য হল, অদিকল ছোট-  
দের চোখ দিয়েই পৃথিবীকে  
দেখতে জানেন তিনি।  
ছোটদের অনুভব-উপলব্ধি-  
প্ৰিয়ায় প্রাণদ্রবীভূতভাবে  
ধরতে পারেন জীবন্তভাবে।  
ছোটদের চারপাশের প্রাণী-  
জগৎ এ-বইয়ের আধিকাংশ  
ছড়ার বিষয়। ভালুক-হরিণ-  
ময়ূর প্রভৃতি, কাক-হুসা  
মাছরাঙা পাখি-উট-বাঘ-হাতী-  
বেড়াল-কুকুর—কে নেই! এ  
যেন এক আজব চিড়িয়াখানা!  
ছোটদের ডেকে নিয়েছেন  
তিনি। আর সেই চিড়িয়াখানায়  
প্রমত্তের ছবিগল্পকে জ্ঞানত  
করে তুলেছেন, একালের  
দুঃখ শিল্পী দেবীশাস দেব  
—শিশুচিত্রের জন্য এই কদিন  
অগে যিনি হলেন প্রস্তুত।

প্রকাশিত হয়েছে

১০জন বাঙালী বৈজ্ঞানিকের  
ফ্যোটিসহ জীবনী ও কীর্তির  
পরিচয়

সমরজিৎ কব-এর

অগ্রজ বিজ্ঞানী

আমল পাবলিশার প্রাইভেট লিমিটেড  
১৫ বেনিগনটোল্লা রোড কলকাতা ৯

## সূচীপত্র

চিঠিপত্র । ৩	চুবামূল্য । সম্পাদকীয় । ১
বাংগাল । ১০	মুকুন্দের রাজনীতি । শংকর ঘোষ । ১১
বিজ্ঞান । সমরজিৎ কর । ১৫	স্বর্ণময়ীর ঠিকানা । রাজিত চট্টোপাধ্যায় । ১৭
মিরিক না-বাওয়া । মজুভাষ মিঠ । ২৫	পূরোনো দিনের গান । জয়ন্তী মিঠ । ২৫
কম্পনিত । অতুল ঘোষ । ২৬	সেই সময় । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । ৩০
অরণ্যদেব । ৩২	মানকর্জন । শীবেন্দ্র মথোপাধ্যায় । ৩৩
স্মৃতি সততই সূতের । প্রতিভা বসু । ৩৫	সহজপাঠের সুবর্ণ জয়ন্তী । চিত্তরঞ্জন দেব । ৩৭
সাহিত্য । ৪১	শতাব্দীর সেরা খেলোয়াড় নির্বাচন অসাধ্য কাজ । মৃকুল । ৪৩
আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি । ৪৫	প্রচ্ছদ : বৈশেষ
প্রচ্ছদশিল্পী পরিচিতি শেষ পৃষ্ঠায়	

## পরবর্তী আকর্ষণ

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের প্রকথ  
সুখও নয়, দুঃখও নয়, শুধু শান্তি  
পূর্ণেশ্বর পট্টার রচনা  
আরোগের কবিতা, রোগশয্যায়  
শিশুর লাইভের গল্প  
হিমালয়ের দিনরাতি

## সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ

অনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে  
বঙ্গোদিতা প্রেস লিমিটেড প্রকাশক  
কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং  
অনন্দ অফসেট প্রাইন্টিং লিমিটেড পি ২৮৮  
সি আই টি বাড়ি কলকাতা ৭০০ ০৭৪ এবং  
জীবনসত্য প্রিন্টিং হাউস ১০ প্রকল্প সরকার  
স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।  
দাম এক টাকা।  
বিমান মাসুল : ১০ পয়সা  
পৃথাকের অগ্রাধিকার ২০ পয়সা

## দ্রব্যমূল্য

কিছুদিন আগে এ-রকম একটা আশা হয়েছিল যে, জিনিসপত্রের দাম যে-হায়ে চড়ে গিয়েছে তার চেয়ে খানিকটা কমবে। জনতা সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি আটকাতে পারেননি। বরং তা উধামুখী হয়েছিল। ইন্দিরা কংগ্রেস নির্বাচনের নামার আগে জনতার বিরুদ্ধে যেসব অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন, মূল্যবৃদ্ধি তার অন্যতম। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, জনতার আমলে দেশের অধিকাংশ মানুষ—যাঁদের রোজগার কম এবং বাঁধাধরা, গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণ, অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধিতে হতাশ ও নিত্য-পীড়িত হয়ে উঠেছিলেন। ইন্দিরা কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার ছিল, তাঁরা ক্ষমতায় এলে এটা রোধ করবেন। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছেন মোটামুটি ছ' মাস। এই ছ' মাসে কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি রোধ হয়নি। বরং একেবারে গোড়ার দিকে কোনো কোনো জিনিসের দাম যাও বা কমেছিল তাও আবার বেড়ে যাচ্ছে। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, রাতারাতি কিছু হবার নয়। ঠিক কথা, কিন্তু ছ' মাসও কি কিছু কম!

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই বিষয়টির সম্পর্কে অনবহিত নন। তিনি যা বলেন তার অর্থ এই দাঁড়ায়, দেশের অর্থনীতির চেহারা গত তিন বছরে এমন দুর্বল করে ফেলা হয়েছে যে, তাকে সুস্থ না করা পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা যাবে না। অবশ্য তিনি মনে করেন, মূল্য আর বাড়ছে না, স্থিতিশীল রয়েছে। এটা অবশ্য তর্কের বিষয়। সাধারণ তা স্বীকার করবেন না।

কেন্দ্রীয় সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমাবার জন্যে যে সচেষ্ট নন সে-কথা বললে ভুল হবে। চাল, গম, বনস্পতি, বাদাম তেল, সরষের তেল, কেরোসিন, কয়লা প্রভৃতি দ্রব্যের দাম যাতে সরকারের নখদর্পণে থাকে তার জন্যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, নজর দেওয়া হচ্ছে সরবরাহের ওপর, মজুতদার এবং কালোবাজারীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তিবিধানেরও পথ প্রশস্ত করা হয়েছে। তবু এখন পর্যন্ত এমন কিছু ঘটেনি যাতে জনসাধারণ আশা করতে পারেন, দ্রুত কোনো সফল পাওয়া যাবে। সম্ভবত দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির এই প্রবণতা রোধ করার পক্ষে এই ব্যবস্থাগুলিই যথেষ্ট নয়। আরো কিছু করার আছে।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অন্য রাজ্যের তুলনায় ভাল নয়। তেল, ডাল, চিনি, কয়লা, কেরোসিন প্রভৃতি সামগ্রী সকল গৃহস্থের পক্ষেই নিত্য প্রয়োজনীয়। অথচ প্রতিটি জিনিসই আজ অগ্নিমূল্য; সব সময় সংগ্রহ করাও সম্ভব হয় না। রাজ্য সরকারের এ-ব্যাপারে তেমন কোনো মাথা ব্যথা নেই। সমগ্র ব্যাপারটিকে তাঁরা রাজনৈতিক চাল হিসাবেই যেন ব্যবহার করতে বেশী আগ্রহী। কেন্দ্রীয় সরকারের ওপরই সব দোষ চাপিয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে চান। কখনো বলেন, সরবরাহ আসছে না নিয়মিত, কখনো বলেন কেন্দ্র অসহযোগিতা করছে বা ষড়যন্ত্র করছে রাজ্যের বিরুদ্ধে। কেন্দ্র আবার দোষারোপ করেন রাজ্য সরকারকে। সরবরাহ ব্যবস্থায় অপ্রয়োজীয়া ব্যাঘা, অবাধ্যতা, দুর্নীতির জন্যে কেন্দ্র দায়ী করেন রাজ্যকে। পরস্পরের প্রতি দোষারোপ সমস্যাকে বিন্দুমাত্র লাঘব করছে না। বলা বাহুল্য কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর সমস্ত দায় চাপিয়ে দিয়ে রাজ্য সরকার লোক ভোলাতে চাইছেন। মজুতদার, কালোবাজারীরা এর ফলে নিশ্চিন্ত। এমন কি অত্যাবশ্যক পণ্য আইন—যা আরও কড়াকড়ি ভাবে প্রয়োগের সুপারিশ কেন্দ্র করেছেন—রাজ্য সরকার সেখানেও হাত গুটিয়ে বসে আছেন। অসাধু ব্যবসায়ীদের এই আইনের বলে অবশ্যই কিছুটা আয়ত্তে আনা যেত।

জিনিসপত্রের দাম কোনো কোনো সময়ে হয়ত বাড়বে, একাধিক কারণে, কিন্তু ইদানীং যে-হায়ে বাড়ছে তার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। আর এটা বোঝাই যায়, ব্যবসায়ী-সম্প্রদায়ের হাতেই সমস্ত কিছু নির্ভর করছে। চিনির দাম বাড়ার সঙ্গত কারণ কী? বোকানো যাবে না। চিনি-ব্যবসায়ীরা অবশ্য বলছেন, উৎপাদন কম বলে দাম বাড়ছে। কিন্তু এই বাড়ার কি কোনো সীমা নেই? সরষের তেলের দামই বা লাফিয়ে লাফিয়ে কেন চড়েছে? সরষের উৎপাদন নেই বলে নাকি?

এটা বিশেষভাবে লক্ষ করার কথা, নির্ধারিত, এমন কি মুদ্রিত দামের সঙ্গে বিক্রীত দামের কোনো সামঞ্জস্য থাকে না। যে কোনো দোকান তার খুশিমতন দাম নেয়, সে সাবানই হোক আর সিগারেটই হোক। অর্থাৎ ব্যবসায়ী এবং দোকানদার খুশিমতন দামে জিনিস বিক্রী করবে—এ অধিকার তার আছে, সরকার তা স্বীকার করে নিয়েছেন। যিনি কিনবেন—সেই খরিশদারের কিন্তু সম্মত ও ন্যায্য মূল্যে কিছু পাবার অধিকার নেই। দাম কমা-বাড়ায় যে ব্যবসায়ীদের হাতেই প্রধান—সরকার সেটা যদি জেনেও মূখ ফিঁড়িয়ে বসে থাকেন—সাধারণ মানুষের কিছু বলার থাকে না।

ত্যাগা ফরি ওয়া  
তোমার মলজ খোলাই  
ফরোনি !



[illegible][illegible]

मन्त्राणां गुणः

মানে ন্যায়ের বা সুসূত্রিকতার জোরে অসেন্সন এবং  
প্রধানমন্ত্রীর বোকাখোনের বিশেষত্ব গণতান্ত্রিক  
সমাজেরই একটা অসামান্য বিরুদ্ধতাপ্রদায়ক  
সামর্থ্যবাহক চিহ্ন। কারণ, বাহ্যিকভাবেই প্রাথমিক  
প্রভাবতন প্রচারে অভিজ্ঞতার, ধর্ম, অসংযোজ কবাজন,  
ভাষা, অবস্থা এই বিশাল ভাড়াপট্টা গল্পবাহ্যু একটি  
বহুধা রূপধারণের একটি কোর্ট ট্রায়াল হয়ে প্রাচীন  
একটা মায়ার পটভাবের দু'থো কদম্বের সাথে হাসাভাল  
গল্পগরিবার-সপ্তি ও মনোভঙ্গপটীতি সন্ধান সমাধান।

এ ব্যাপারে আর্মোরকার কাগজগুলিও কম  
যারিনি। নিউ ইয়র্ক টাইমস, এয়াইজটন পোস্ট  
এতাই আর্মোরকার প্রায় সবকটি বড় কাগসে  
স্বাধীনতার বার্ষিক প্রকাশিত ইনডিপেন্ডেন্স  
দেখতে ইন্ডিউ-এর এক সংবাদ সমীক্ষার বলা  
হয়েছে। সঙ্গর গাধার জুড়ি মায়ের ঝল্লাড়াভাষ  
এখানে জন: এবং তার দাদামশায় যে শাসকবংশে  
অগ্রভক্ত করেছিলেন তাকে আর এক পৃথ্বে উঠাই  
করার জন্য তেদী হাঙ্কলন এই প্রকট সত্যটি  
বলুতে ভূঁয়াসহ হল। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে  
একটি পরিবারের, ঘরের ও জাতির ভাণ্ডার  
গড়ে, সন্ধানের মন্ডুতে এই তির্যক ভাণ্ডার  
অনিচ্ছাত: দেখা দিল।

ইন্দিরা ও সঞ্জয়ের প্রতি বিশেষে আমেরিকান  
ও ব্রিটিশ সংবাদপত্র-পত্রিকা একজোট। বিশেষে বিব  
অন্যের পরিবারের বিরুদ্ধে নয়, তা! বিজয়লক্ষ্মী  
পণ্ডিত বা নরনাথের সেগালকে 'স্পা' করে না, বরং  
ইন্দিরা-সঞ্জয় বিরোধিতার জন্য তাঁরা নারনাথকে  
'হিসাবেই' পরিচিত। আমেরিকান কাগজে কিছু  
ব্রিটিশ রাজপরিবার সম্পর্কে কোন কঠোর মতবাদ  
হয় না, বরং রাজপরিবারের সকলকে সম্মুখই করা  
হয়। সঞ্জয়ের মৃত্যু সম্পর্কিত সংবাদ সমীক্ষার দিন  
নাচই ইন্টারন্যাশনাল হোয়াল্ড ব্রিটেন ছেপেরে  
ইংলণ্ডের রানার মৃত্যুতেও তাঁই সম্মুখ আশ্রয়  
শৌচোছেন সেই বয়স। তেমনই ব্রিটেনের কাগজে  
মার্কিন রাজনীতিতে কেনেডী পরিবারের প্রতিপত্তি  
অথবা টিগারল্যান্ডের পার্লামেন্টের রক্তচোরা পরিবারের  
নাশট নিয়ে কোন উল্লেখ করা হয় না। জন-এক পর  
ববার, রবার্টের পর এডওয়ার্ড কেনেডী আমের  
রিকার প্রেসিডেন্ট হবেন বা দলের মনোনিবেশ পাবেন  
এ-ভাবেই আমেরিকা-ইংলণ্ডে হেউ কো  
অস্বাভাবিকতা দেখেন না, এসব যেন বংশগত কো  
ব্যাপারই নয়। হয়ত অস্বাভাবিকও নয়, কেননা সো  
আরবে এখনও বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পর তাঁই পরের  
ভাই রাজ্য হন, স্মিক শতাব্দী আগে দেশপাল  
প্রধানমন্ত্রীও এইভাবে নিমন্ত হতেন। এই দুটি  
একটি সুবিধা, ভাইয়ে ভাইয়ে বংশোদ্ভূত  
থাকে কোনো সব ভাই-ই দ্রাবন, বেঁচে থাকে

একাদশ তার পাল। আসবে, 'কমতা' তার করারও হবে। কাজেই সহজে কেউ আগুরুগজেব হতে চান না।।

জাভেদ পারভেন, কোন আর্মিলিকান কণ্ঠে  
লিখছে, ইলন্ডের বানী এলিডাবেরথের। তবু  
যুবরাজ চার্লস একটি নিমন্ত্রণ সভায় একে বসিয়ে  
নয় ভব ছুঁবার চড় মেরেছেন এর। সেই  
ইলন্ডে ও তার মিত্র দেশগুলোর সবদপরে ফলা  
কর ছাপছে জারতের লো তাই হুয়েলিন। সব  
নাকি কোন পাঠিটে ইমিরাকে চড় মেরেছিলেন।

নব্যাদর্শের ককটেল-চক্র থেকে এটি গম্ভীর সংস্কার করে ওয়াশিংটন পোস্টে পাঠ্যযোগ্যত্বের সীমাটো সাইমন। ওয়াশিংটন পোস্টের খবরটি ইংরেজি ছেপেইল ভারতবর্ষে গাড়া দান করায়। মারের উপসর্গের কেন এত বাগ চা নিয়েও বেশ কিছু গবেষণা সে সময় চলেছিল। সেইম রাতারাণি বিখ্যাত হয়ে পড়েন এই খবরটি ও এই ধরনের আরও কিছু খবর পাঠিয়ে। কল তিনি যখন এদেশে বিতাড়িত হলেন তখন ভারতীয় গণতন্ত্রের অপমৃত্যুতে ফিল্ড-আমেরিকার কাগজে কাগজে বেশ কড়া ভাষায় শোক প্রকাশ করা হয়েছিল। সেইম খবরঃ সত্যতা সম্বন্ধে ওয়াশিংটন পোস্ট এতটা সন্দেহ ছিল যে কয়েক মাস পরে ওয়াশিংটন পোস্টে ঐ কাগজের একজন কৰ্মচারীর সঙ্গে আলোচনাটি সেইমের সংবাদে সত্যতা সম্পর্কে এই লেখা সন্দেহ প্রকাশ করায় সাহেব তৎক্ষণাৎ আলোচনাটি দাঁড়ি তেন দিয়ে বললেন, 'আপনি দেখাতি ইন্দিরা সমর্থক'।

দেশেবিশেষে সমাজের যে-সব সমালোচনা হয়েছে তাকে দু'টি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বের সমালোচনার প্রধান বস্তু মাদ্রাস। যদি আজগাণ করা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর পুত্র হিমালী তিন তাঁর বাবাসর জন্য অনেক রকম অবৈধ সুযোগ পাচ্ছেন ও নিচ্ছেন তবু এই পর্বে তাঁর খ্যান ছিল গোপন। এখানে আন্তর্গণ্য ছিল মৃত্যুতে হিন্দুর উপর। সংসদে ভিতরে ও বাইরে সমাজের মাদ্রাস নিয়ে তেলপাড় গুরু হর পাগোবান বোকাগোবান অববাহিত পরে যখন হিন্দুরা গান্ধীর উদ্দেশ্যে নাপাক পারমাণবিক দেশদ্রাব্য শক্তিও হয়ে উঠেছে এতদেব তাদের কেউ কেউ এই উপমহাদেশে বিলম্ব করাতে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন সৃষ্টির জ উঠে পড়ে লাগার সিংধাঙ নিয়ে ফেলেছে। এ ঐক্যবান সি পি আই সরে যেবার কিছু পেরে সারাজ পাটকার সমাজের দুই বিঘাত সাফাকারার যোগেদানোর পর। তখন সমাজ ও মাদ্রাসের সমাধোদ মধ্য দিয়ে বলবার চেষ্টা করা হাছিল হিন্দুরা গান্ধী মধ্য অসাম্প্রদায়িক কিছু নেই। তিনি মোহাম্মদ জামান তিনি দু'পাক পর্ব স্বজনপাষণ ইত্যাদি কোন কিছুই উল্লেখ নন।

সমগ্র সমালোচনায় দ্বিতীয় পর্ব শব্দে হাজার জব্বারী অবস্থার সম্মুখীন। যখন সঙ্গর রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নিতে শুরুর করেছেন। তখন বলা হচ্ছিল ইন্দ্রিয়া সঙ্গরকে তত্ত্ব রাজনৈতিক উদ্ভাবনাধিকার মনোনয়ন করেছেন, তিনি চেষ্টা করছেন যাতে তাকে পুরে যোগে দিয়ে প্রচানমন্ত্রী হন। সঙ্গর রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার ইন্দ্রিয়ার নিচয়ই সার ছিল, না হলে ১৯৭৭ সালে আরোহিত তিনি কংগ্রেসপ্রার্থক মনোনীত হতেন না, কিন্তু জব্বারী অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার ঠিক করে ফেলছিলেন সঙ্গরই তাঁর পক্ষে ভারতের প্রচানমন্ত্রী হবেন, তা মনে করার কোন সম্ভাব্য কারণ নেই। জগজীবন গ্রাম, চাবরের কথা হয় বাদ লিখুন, তাঁরা ইন্দ্রিয়ার চায়ে বসেন করে কয়েক বছরের বড়, কাজেই তাঁরা কোন মূখে বলে ইন্দ্রিয়া অবসর নিলে প্রচানমন্ত্রী হইবেরি পাড় উচিত? কিন্তু সেসময় যে তিনজন কংগ্রেসনে ইন্দ্রিয়ার ইচ্ছিতম সংযোগী ছিলেন তাঁরা তখন তাঁদের ভিতরে সঙ্গরকে বসানোর চেষ্টার মাপকাঠি জানতে পারতেন। কখন ও কখনই সঙ্গর এক

সেবকান্ত বড়ুয়া, রজনী গ্যাটেল, সিদ্ধার্থ বার, এদের সবাইকে ইন্দিরা জেলে পাঠাতেন মনে হয় না। কাজেই এরা ভয়ে চুপ করেছিলেন তা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। এরা প্রতিবাদ করেননি, যেহেতু প্রতিবাদের কোন কারণ ঘটেনি।

হতে পারে, ১৯৭৫ সালেই ইন্দিরা বন্ধু- ছিলেন হার পর এদেশের প্রধানমন্ত্রীদের গুরুভার বহন করবার মতো কেউ দলে নেই। হতে পারে তখনই তিনি স্থির করেছিলেন, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য সঞ্জয়ই যোগ্যতম ব্যক্তি। কিন্তু তিনি মনে করা এক জিনিস আর দল ও দেশের কষ্টে গ্রহণযোগ্য হওয়া আর এক জিনিস। সঞ্জয় যে দেশ ও দলের আত্মভাজন তা প্রমাণের জন্যই তার ১৯৭৭-এর নির্বাচনে অংশ গ্রহণ। ১৯৭৭-এ সে প্রমাণ মেলেনি, এবারে মিলেছিল এবং ইন্দিরাও এবার সঞ্জয়কে কার্যত তাঁর উত্তরাধিকারী ঘোষণার চেষ্টায় রতী হয়েছিলেন।

এই সিদ্ধান্ত ও চেষ্টার পিছনে কেবল অন্ধ মাতৃস্নেহ ছিল একথা মনে করার কোন কারণ নেই। হ'রা বিশ্বাস করেন, জওহরলালই ইন্দিরাকে প্রধান-মন্ত্রীদের আসনে বসিয়ে গেছেন এবং এই উচ্চ পদ অধিকারের জন্য আবশ্যকীয় কোন যোগ্যতা ইন্দিরার নেই তাঁরই অবশ্য মাতৃস্নেহের কথা তোলেন। না হলে তাঁদের স্বীকার করতে হয়, ইন্দিরার রাজ-নৈতিক বিচার, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন ক্ষমতা অসাধারণ। সঞ্জয়ের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সঠিক ধারণায় তিনি যেমন সক্ষম হয়েছিলেন তেমনই সহকর্মীদের অপদার্থতা সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসও অস্বাভাবিক প্রমাণিত হয়েছে।

নির্বাচনের পর প্রচারের ধরনটি রাতারাতি উল্টে গেল। এতদিন বলা হচ্ছিল ইন্দিরা সঞ্জয়কে গড়ছেন। এখন বলা আরম্ভ হল, ইন্দিরার নিজস্ব



চারু মজুমদার

ভাবনা বা নীতির কোন বালাই নেই, তিনি সঞ্জয়ের কথায় ওঠেন বসেন। আমাদের সংসদীয় পদ্ধতির মূলে একক সব চেয়ে বড় অঘাত যিনি করেছেন, সংসদীয় আচরণবিধি লঙ্ঘন করাকে যিনি বিরোধী-পক্ষের নিজাকর্ম বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন সেই ডঃ রামমোহর লোহিয়া ইন্দিরাকে বিদ্রোপ কর বলতেন, 'ডাম ডল'—বোবা বা বোকা পুতুল। এতদিন পরে আবার নতুন করে সেই কথাটিই বলবার চেষ্টা হল—ইন্দিরার নিজের কোন বুদ্ধিমত্তা নেই, তিনি কখনও দীনেশ সিং, কখনও হাকসার, কখনও সিদ্ধার্থ

সঞ্জয়ের কথামতো। কেউ কেউ আরও কানিকটা এগিয়ে বলছিলেন, সঞ্জয় বোধিদীন তাঁর মাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বরদাশ্ত করবেন না, তাঁকে হঠিয়ে অর্থাৎ অবসর নিতে বাধ্য করে বর্তমান লোকসভার আয়ু্যকালের মধ্যেই সঞ্জয় প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসবেন। হ'রা তোতাপাখীর মতো এই বুলি আওড়াচ্ছিলেন তাঁরা ধবঁবোর মধ্যে নন, কিন্তু হ'রা এই সব তোতাপাখীদের বুলি পড়তেন তাঁরা অসাধারণ। তাঁদের উদ্দেশ্য একটাই—যে-কোনভাবে ইন্দিরার চিরত্বনন, যাতে ইন্দিরা সাধারণের আস্থা হারান। তাঁরা ভালোভাবেই জানেন, লোকে ইন্দিরাকেই ভোট দেয়, জগজীবনবাবুকে নয়, হেমবতীনন্দন বহাগুণাকেও নয়, সঞ্জয় গান্ধীকেও নয়, সুতরাং যে-কোনভাবে ইন্দিরার ভোট যোগাড়ের ক্ষমতাকে খর্ব করতে পারলেই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা অস্থিরতা সৃষ্টির পথ সুগম হবে।

এই সব অভিসন্ধিমূলক তত্ত্ব যে প্রাপ্ত তা আগেও বারবার প্রমাণিত হয়েছে, এবারও হবে। ভারতীয় জনতার সঙ্গে যোগ ইন্দিরারই। আমাদের এই মাতৃপুজার দেশে নিরঙ্কর, অনশনক্লিপ্ত সাধারণ নাগরিক তাঁকে যে আসনে বসিয়েছে, সে আসন সঞ্জয় বেঁচে থাকলে তাঁরও অধিগত হত না। এ-জনপ্রিয়তা, এ-নেতৃত্ব ইন্দিরার একান্ত নিজস্ব, এ-নেতৃত্বের অবসান তাঁর সংগেই ঘটবে, তিনি চাইলেও আশ্রয় চেষ্টা করলেও এ-নেতৃত্ব কাটকে দিয়ে যেতে পারবেন না। তা সত্ত্বেও তিনি সঞ্জয়কে গড়ে তুলেছিলেন কেননা তিনি বুঝেছিলেন, জাতীয় স্বার্থে দেশের নেতৃত্ব এক নতুন পুরুষে বর্তানো প্রয়োজন। এবং এই হস্তান্তর যদি তিনি নিজের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন না করেন তা হলে বুকেরা আবার ক্ষমতা দখল করবে, যেমন করেছিল ১৯৭৭ সালে।

বাম রাজনীতিকদের আত্মসব্বস্ব রাজনীতির

শক্তিশালী। নিরাপদ। শুধু একটাই যথেষ্ট।





অবসান ঘটানোর জন্য তান যুবশক্তির সহায়তা চেয়েছিলেন। যুবশক্তিকে যাতে তাঁর মনোমত ধরে চালনা করতে পারেন তার জন্য তিনি সজ্জয়ের রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার সানন্দ সমর্থন জানিয়েছিলেন। সজ্জয়ের রাজনীতিতে অবিভাব যুবনেতা হিসাবে এবং বর্তমান পর্যন্ত না তিনি নিজেকে অপ্রতিবন্ধী যুবনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন ততদিন সরাসরি রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার অনুমতি তাঁর মেলেনি। প্রাচীন নেতৃত্বকে পরাজিত করার জন্য যুবশক্তির সাহায্য নেওয়া এই প্রথম নয়। নেহরু-আমল শেষ হওয়ার পর আরও দু'বার এই চেষ্টা হয়েছে, এবং দু'বারই সে-চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যাপারে আমাদের ধারণা অনান্য নয়। ষাট ও সত্তরের দশকে পৃথিবীর অনেক দেশেই সংগঠিত, অসংগঠিত যুবশক্তির হঠাৎ-বিস্ফোরণ দেখা গেছে, কিন্তু কোথাও তা সফল হয়নি। যে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ, সে ব্যবস্থা অটুট থেকে গেছে, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব বদল হয়েছে। চীনের সাম্যবাদিক বিপ্লবেও যুবশক্তিকে নিয়োগ করা হয়েছিল, এবং আজকের চীনা নেতৃত্বের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে স্বয়ং মাও সে-তুং-এর প্রেরণা সত্ত্বেও মহান সর্বহারা সাম্যবাদিক বিপ্লব তার উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হয়নি।

আমাদের দেশে গত দশ-দশের বছরে যুবশক্তিকে সামাজিক রূপান্তরের কাজে লাগানোর যে কতিপয় সচেষ্ট প্রচেষ্টা হয়েছে নকশাল আন্দোলন তাদের অন্যতম। যে-কোন কারণেই হোক স্বাধীনতা-উত্তরকালে এদেশের যুবশক্তি যার একটি বড় অংশ ছাত্রশক্তিও বটে, রাজনীতিবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেস দল ও নেতৃত্বের যে চেহারা সাধারণের কাছে প্রকাশ পেল তাতে বৈশ্বিক লাভের আশায় হিসাবী তরুণ কেউ কেউ যোগ দিলেও আদর্শের জন্য কারও পক্ষে যোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না। বৈহীনরাপিনা তারুণ্যের লক্ষণ, কাজেই যত না তরুণ কংগ্রেস যোগ দিয়েছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যকের যোগ দেওয়া উচিত ছিল বিরোধী দলগুলিতে, বিশেষত কমিউনিস্ট পার্টিতে। কেননা প্রথম সাধারণ নির্বাচনেই প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল, কংগ্রেসের পুরেই—যদিও অনেক পুরে—কমিউনিস্ট পার্টির স্থান। কিন্তু তা হয়নি। হয়নি যে তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ ১৯৪৭ সালে এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের যারা নেতা ছিলেন আজও তাঁরাই নেতা আছেন, যদিও ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি দু'ভাগ হয়েছে, তিন দশক গত হয়েছে। কালের অমোঘ নিয়মে যে সামান্য পরিবর্তন অপরিহার্য হয়েছে সেখানেও নতুনের স্থান হয়নি, পুরাতন পরিচিত মুখই শূন্য স্থান পূরণ করেছে। নৌদিক থেকে দুই কমিউনিস্ট পার্টিও প্রাক-সজ্জয় কংগ্রেসের মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

নকশাল আন্দোলনই সর্বপ্রথম যুব ও ছাত্র-শক্তির সক্রিয় সমর্থন লাভে সক্ষম হয়। নকশাল আন্দোলন যখন শুরুর হয় তখন সম্ভবত সুশীতল রায়চৌধুরী ও সরোজ দত্ত ছাড়া আর কোন নকশাল নেতাই পৃথক অতিক্রম করেননি। এই অপেক্ষাকৃত অসংগঠিত নেতৃত্বের অনুগামীরা অধিকাংশই ছিলেন সত্যি তরুণ। চার, মজুমদারের নজর প্রধানত ছিল ছাত্র ও তরুণদের উপর। কিন্তুই ছাত্র ও যুবকদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছিলেন, আচার থেকে চাক্ষুষ বছর হল মানুষের জীবনের সব চেয়ে ভাল সময়, আর আমাদের দেশের তরুণরা ঠিক এই সময়টিই ওর্নিবরোধী শিক্ষালাভের ও পরীক্ষা পাশের জন্য ব্যয় করতে বাধ্য হয়। কাজেই পরীক্ষা পাশের জন্য শক্তি ক্ষয় না করে তরুণদের উচিত এখনই বিপ্লবের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া।

তারুণ্যের সক্রিয় সমর্থন লাভের চেষ্টা চার, মজুমদার একা করেননি, প্রথমেও করেননি। তাঁর কৃতিত্ব, অনুরাগ যেখানে বর্ধিত হয়েছিলেন, তিনি সেখানে সফল হন। সেই সাফল্যের পরিমাণ কী তা

খোঁজা যোগ্য, যখন তান যুবশক্তি, অর্থাৎ আন্দোলনের যুব। তাঁর কথামতো তাঁর অনুগামীরা যেমন বিনা বিধায় প্রাণ নিয়েছিলেন তেমনি অকাতরে অনেক বেশী প্রাণ দিয়েছিল। শোনা যায়, কোন একজন বিখ্যাত যুব নকশাল নেতা নকশাল আন্দোলনের ভুলে দর্পভরে ঘোষণা করেছিলেন, আমি চার, মজুমদারের আদেশের দাস। একটা সময় ছিল যখন সব নকশাল যুবক ও তরুণই এই কথা বলতে পারতেন, দরকার হলে প্রমাণ দিতে পারতেন।

এত আত্মোৎসর্গ সত্ত্বেও চার, মজুমদারের আন্দোলন সফল হয়নি, তিনি যেসব ফলপ্রসূ জেলেছিলেন তা দাবানলে পরিণত হয়নি। কিন্তু তরুণদের রাজনীতিতে অকুণ্ট করা তাঁর সাফল্য সম্পর্কে কোন দ্বিমত কখনও দেখা যায় নি। রাজনীতির কারাবারীরা তা নিয়ে অনেক জল্পনাও করেছেন, কীভাবে যুবশক্তিকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষাও হয়েছে। চার, মজুমদারের পর যুব-ছাত্রশক্তিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে সার্থক ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। সর্বোদীয় জয়প্রকাশের নকশাল বিরোধিতায় সংশয় প্রকাশ করার কোন কারণ নেই। বরং তাঁর নকশাল-বিরোধিতা ছিল অন্য অনেকের চেয়ে খাঁটি। বিহারের মুশাহারী অঞ্চলে নকশাল আন্দোলনের অগ্রগতি বন্ধ করার জন্য তিনি দীর্ঘ ছয়মাস শিবির স্থাপন করে বাস করেছিলেন। তাঁর তখনকার অভিজ্ঞতার ফল ফেস টু ফেস পুস্তিকা। এই বইটিতে জয়প্রকাশ নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন যে-আন্দোলন মূলত জাতীয়তাবাদী নয়, যে-আন্দোলন অন্য দেশের নেতাকে এদেশের নেতা ঘোষণা করে শাসনা বোধ করে সে-আন্দোলন কখনও জয়ী হতে পারে না। জয়প্রকাশ তখনও বিনোবাজীর সর্বোদয়ে বিশ্বাসী, এবং সর্বোদয় আন্দোলনকে কীভাবে পরিচালিত করলে তা ওই এলাকায় নকশাল আন্দোলনের স্থান নিতে পারে সে বিষয়ে গবেষণাও ছিল তাঁর মুশাহারী বাসের অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু নকশাল আন্দোলনের মতোমুখি হয়ে তিনি বুঝেছিলেন ওই এলাকায়—না অন্যত্র—হিসেব প্রসারের জন্য তথাকথিত নকশালবিরোধী দায়ী নয়। প্রকৃত দায়ী যদিও এতদিন ধরে আইনকে জাঁক দিয়ে বাধ্য আইন লঙ্ঘন করে এসেছেন তাঁর—তা তাঁরা রাজনীতিকই হন, প্রশাসকই হন, জমিদারই হন, বা মজদুরই হন। রাজনীতিকদের তাঁর সমালোচনা করে তিনি করেছিলেন, তাঁরাও দায়ী, কেননা তাঁদের স্বাধীনতাশ্রবণের ফল গণতন্ত্র, দলীয় শাসনব্যবস্থা ও আদর্শবাদ সবকিছুই প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

১৯৭০ সালে মুশাহারিতে জয়প্রকাশের যে-উপলব্ধি হয়েছিল ১৭৭৪-৭৫ সালে তাই প্রকাশ পেল তাঁর সর্বস্বাক্ষর বিপ্লব ও দলহীন গণতন্ত্রের স্লোগানে। জয়প্রকাশ তখন কী চাইছিলেন স্পষ্ট বোঝা না গেলেও তিনি কী চাইছিলেন না সে বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ ছিল না। জয়প্রকাশ ধরে নিয়েছিলেন, সংসদীয় গণতন্ত্রের দ্বারা কিছু হবে না, সচল, অদল বাজনাটিক দলগুলি ও তাদের নেতাদের দ্বারাও কিছু হবে না। নিঃস্বার্থ ও আদর্শবাদী কম্যুনিষ্ট সম্মানে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন যুব ও ছাত্র সমাজের কাছে। তাঁর সংঘর্ষ সমিতিগুলি গঠিত হয়েছিল রাজনীতিতে আন-কোরা যুবক ও ছাত্রদের নিয়ে, পাওয়া ও পাইয়ে দেওয়া রাজনীতির মালিন্য যদিও স্পষ্ট করেনি, তাঁদের নিয়ে। ছাত্র ও যুবশক্তির সাহায্যে বিপ্লব সংঘটনের ভাবনা জয়প্রকাশ কেহা থেকে পেলেন তা নিয়ে কম জল্পনা হয়নি। কেউ কেউ বলেন, ১৯৬৮ সালে পার্টিসব ৬৪ অনুযায়ী থেকে তাঁর পরিচালনার জন্ম, অন্য অনেক বলেন, এ বিষয়ে তাঁর গুরু মারকুম। নকশাল আন্দোলনের মতোমুখি অভিজ্ঞতা থেকেও যে তিনি কিছু গ্রহণ করেছিলেন

# 

দায়-২৫৮

অনুবাদের পর থেকে শুরু করে  
ঐতিহাসিক, নৈতিক, বিজ্ঞান-নৈতিক  
কিনা নিয়েছেন কোন-কোনও। সে  
সময়কার দেশে বইটি কালের বদল  
দিয়েছে অর্থাৎ তার আদর্শ  
অক্ষয় হয়েছে কালের ধারা ধরে।  
সেই তেমন-কোনও বই নিয়ে  
সাধারণ লোকের মধ্যে  
প্রথম খণ্ড ১৫, দ্বিতীয় খণ্ড ১৫,  
তৃতীয় খণ্ড ১৫

## 

অনুবাদের জয়ন্ত চৌধুরী ও  
লীলা মজুমদার।  
ছবি-স্মারক টেনিয়েল ও  
অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়।  
প্রথম খণ্ড ১৫, দ্বিতীয় খণ্ড ১৫,  
তৃতীয় খণ্ড ১৫  
লীলা মজুমদার  
প্রকাশনা-স্বতন্ত্র।  
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।  
প্রথম খণ্ড ১৫, দ্বিতীয় খণ্ড ১৫,  
তৃতীয় খণ্ড ১৫

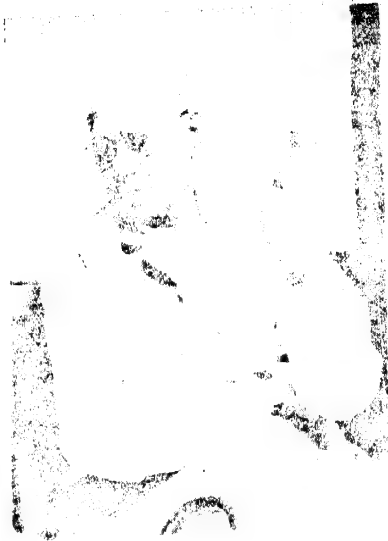
লেখকের আরও বই  
আজাদ দেশে অ্যালিসের  
অ্যাডভেঞ্চার ৩-৫০  
আগুনীর ওপারে অ্যালিস ৩-৫০

## 

অনুবাদের কামাকী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়  
ছবি-গণেশ পাইন  
যদিও মন জামিন তার অন্ধ বিশ্ব-  
জনন রূপে পোষকতা করে।  
উপকরণ-মনে ভাবা-ভাবা-পাওয়া  
তার যে-সব-সব-অনুভব-ভাবনা  
যদিও মন জামিন তার অন্ধ বিশ্ব-  
জনন রূপে পোষকতা করে।  
উপকরণ-মনে ভাবা-ভাবা-পাওয়া  
তার যে-সব-সব-অনুভব-ভাবনা

একথা কেউ বলেন না, অথচ এই সম্ভাবনাকে  
উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

নকশাল আন্দোলন ও জয়প্রকাশের সর্বাঙ্গিক  
বিপ্লব আন্দোলনের মধ্যে একটি মৌল মিল আছে।  
দুই আন্দোলনের উদ্দেশ্যই ছিল বর্তমান ব্যবস্থাকে  
নাশক হতে মৃত্যু ব্যবস্থার প্রবর্তন। দুই আন্দোলন  
লনের যেভাবে মনে করতেন, বেপ্লবিক পার্লামেন্ট  
চমৎকার। তৎকালিক বিপ্লব প্রাচুর্য্য অনেকটা  
সাক্ষ্য লাভ করলেও তাঁরা শেষ মুহুর্তে পারেন  
নি। নকশাল আন্দোলন মনে করতেন জনা ইন্দিরা  
নাগরীজকে নিয়োগ করেছিলেন, নকশাল আন্দোলন  
লনের অন্তর্দৃষ্টি তাঁর সহায়তা করেছিল। জায়া  
অবস্থা দেখবার অনেক আগেই ইন্দির জয়প্রকাশের  
আন্দোলনকে বাধা করে দিয়েছিলেন ইন্দির ফোর্স  
নির্বাহনে দুই পলাতক রক্তাক্ত জনা জয়প্রকাশের  
চালাকি করতেন আর জয়প্রকাশ সেই চালাকি গ্রহণ  
করতেন ফোর্সটি মারাত্মক প্রহারের অধ্যক্ষতা  
বাড়ীল। যে ফলীভীওক গণহত্যার অধ্যক্ষতা  
গ্রহণ করে জায়া করেছিলেন যে কঠোর  
জব্বার জনা জনি বিপ্লব সেই গণহত্যার ও সেই  
কঠোর জনা জনাই কাজ করত তিনি রাষ্ট্র হতে  
পালন। যিশ্বর পৃথক ঘরে পড়ে রয়েছেন তিনি  
চলছেন নিরপরাধদের পক্ষে। বিরাগী বলেন  
সম্ভাবক। বিপ্লবের পথপ্রদীপ জয়প্রকাশকে ফোর্স  
শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে দিয়েছিলেন তাই  
ওষাধিত জনগণীয়ের সামনে। বরফা খনন  
মতো তিনিও হয়েছিলেন প্রোন টি মি উল্লসিত।  
তবিলি জয়প্রকাশের বিপ্লবী সাধনার শেষকৃত্য।  
করতেন সর্বাঙ্গিক বিপ্লব শেষ হল সর্বাঙ্গিক  
বাধিত। জনগণ আন্দোলন অন্তত একটি  
নিষ্ঠার মতো বিপ্লব বাধিত স্বরণীয়। জয়প্রকাশের  
সাহসিক বিপ্লব জনগণের কথা বলে যায় কি



জয়প্রকাশের স্মরণ

যুগযুগান্তরকে দেশের কাজে নিত্য করে  
সামগ্রিকভাবে চেতনা ইন্দিরা গান্ধীর নকশাল  
আন্দোলনে যুবক ও ছাত্রা কেন অগ্রসর হন  
এ-প্রশ্ন ইন্দিরায় মনে অনেক প্রশ্নই জাগেছিল।  
১৯৭৩ সালের তখনকার সনাতন সাম্রাজ্যের পতন  
এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, অন্যভাবে  
পরায়ণ ছাত্রদের মধ্যে দারিদ্র সম্পর্কে তীব্র প্রতিক্রিয়া  
স্বাভাবিক, নকশালদের মধ্যে সম্পর্কে সেই প্রতিক্রিয়া  
কিছু হয়েছিল। রক্ত বাস্তব ও প্রেম সংগঠিত

ব্যবস্থার মনে তীব্র দীর্ঘত তখন তারা উদ্ভ্রান্ত  
হয়ে পড়ল জয়প্রকাশের আন্দোলনেও তিনি যুব-  
ছাত্রসমিতি পবিত্র দেখতেন। হঠাৎ তখনই তিনি  
ক্যাম্পের ঘরে জাগ্রিত হয়ে লাগানের সিঁধদে  
নির্গত হলেন। সেই মলমলের বা জয়প্রকাশের মতো  
যুব ও ছাত্র সাক্ষ্যে বহুদল শাসনব্যবস্থার  
সমুদয় গণহত্যার কঠোরমূলক চালিকাশক্তি রূপে  
কয়েক জগতের ইতিহাসে রক্তে সম্ভার ভিজে না  
কেননা তিনি নিজে এই পথটির ধারক ও চালক।  
এখানেই ইন্দিরায় যুব ও ছাত্রসমিতির মারাত্মক  
স্বাভাবিক ও স্বাভাবিক আন্দোলন মনে  
করতেন। তিনিই সেই যুব ও ছাত্রা যারা  
শক্তির সামাজিক ও জনৈক কঠোরমূলক  
কর্ম সম্পন্ন করে তবিলিছেন। এই কঠোর  
স্বাভাবিক কাজে তিনি এই পথের নিয়ন্ত্রক করেন।  
এই যুগান্তর যারা হিসাবে সর্বশেষ ১৯৭৭ সালে  
তিনি জয়প্রকাশের মতো আসার চেতনা করেছিলেন  
কয়েক তিনি সফল হননি, এবং হয়েছিলেন  
এবং সফলতা সাধন আসার শেষ ব্যবস্থার মতো  
নতুন সোভিয়েত বিপ্লবের ইতিহাসে। নতুন  
সাম্রাজ্য বিপ্লবের নাকাল অগ্রসর হলে ইন্দির  
আন্দোলনকে মারাত্মক পথের বিপ্লবিত্র প্রকাশ  
না এ জনগণের জাগ্রিত না সর্বশেষ মৃত্যুর এই  
পথে বিপ্লবিত্র হঠাৎ সাহসের দেখা দিয়েছে।  
চলিত বিপ্লবের যুগ যুগান্তর তিমিরেরে গমত  
হঠাৎ হঠাৎ হঠাৎ করে উঠল তাকে বলা  
সাম্রাজ্যের মতো মতো মতো মতো। আর কেজন  
করতেন না তিনি আসার সামনে আগন্তুক সোভিয়েত  
কেননা নতুন নতুন সর্বশেষ মৃত্যুরে হঠাৎকার  
একমাত্র উদ্ভ্রান্ত যুগান্তর জাগ্রিত সাপক্ষে  
সাম্রাজ্য বিপ্লবের কবর ছিল।

সমাজিক বিপ্লব

বিপ্লব

## বিপ্লবী সংস্কৃতি ও সমাজ

বিপ্লবী সংস্কৃতি ও সমাজ

লেখক: ব্রজেন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলাদেশের প্রথম বিপ্লবী

বাংলাদেশের প্রথম বিপ্লবী

সমাজিক বিপ্লব

প্রকাশক: বাংলাদেশের প্রথম বিপ্লবী

প্রকাশক: বাংলাদেশের প্রথম বিপ্লবী

ব্রজেন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

### সেন্ট হেলেনস আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ

কিছু একটা যে ঘটবে, আশ্চর্যগিরি বিশেষ-  
বজ্রের সেকথা আগে থেকেই বৃষ্টিতে পেরেছিলেন।  
মাকিন বজ্রবাহনই আছে দাঁট ওয়াগিংটন। একটির  
নাম ওয়াগিংটন ডি. সি. মাকিন বজ্ররশ্মির রাজ-  
ধানী যেখানে। অপারটির নাম ওয়াগিংটন স্টেট।  
রাজধানী থেকে যার অক্ষান বহু দূরে। এই  
ওয়াগিংটন স্টেটেই অবস্থান করছে সেন্ট হেলেনস  
আশ্চর্যগিরি।

দীর্ঘ ১২০ বছর নীরব থাকার পর সেবত হেলেনস এ বছর মার্চ মাসের গোড়ায় হঠাৎ সন্ধ্যা হয়ে উঠলো। তার ছয় মাইল গভীর ভূতরনের নিচে ধরা পড়লো মৃদু ভূকম্পন। সেই ভূকম্পনের মাত্রা বাড়তে লাগলো দিন দিন। অবশেষে ১৮ মে সেন্ট হেলেনস এ ঘটলো প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের সংগে সংগে তার জ্বালানী থেকে প্রচণ্ড বেগে বেরোতে শুরুর কারণে ভূমি এবং গ্যাস। সেই সংগে কাদা। নদীর স্রোতের মত সেই কাদা পাাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে এসে গ্রাস করলো বিপত্নীত অঞ্চল। পরদিন অর্থাৎ ১৯ মে আন্টন্যাগিরির ভ্রম্মে এয়ারোপ্লেন, অহিচাহ্নে ওই মনটানার আকাশ গেলে উঠলো। ভ্রম্মের মেঘে ওই সব অঞ্চল দিন হয়ে উঠলো রাতের মতই অন্ধকার।

সেন্ট হেলেনস-এর জ্বালামুখের ন্যাস প্রায়  
অশ্বমাইল। সেই জ্বালামুখের ভেতর দিয়ে নিত্য  
পার্থীয়ে জেরেতে শুরু করলে বাগ্ন এবং ভক্ষ।  
বর্ষায় ভেতরে সপ্ত উঠে গেলে ১০০০ ফুট  
উপদ্রাক্ষে। ১৮৫৭ সালের পর থেকে ১৯৭৭ ফুট  
উচ্চ এই পর্বতে চড়া সব সময়ই থাকত। বরফে  
লাকা। বিশেষরূপে পর তার মাথায় প্রায় ১০০০  
ফুট উচ্চ অংশ পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেল।  
অসুচ্যে বর্ষণ এই বিশেষরূপে লাভা বেরোয়নি।

জটিল প্রত্যাশদর্শী বক্স : আশেপাশগরি  
থেকে বোঝায় যাস, কান্না ধেরতে কতগটা সিমেন্টের  
লেই-এর মত, মনে ছিল, কোটি কোটি টন  
সিমেন্ট গুলো কাজে লাগে সৃষ্টি করে কে মনে  
ছড়িয়ে দিতে, সেই কান্নার স্রোত ধারায় প্রায় ৫০  
মাইল বেগে নদী, পুষ্কর এবং রাপতার উপর ছড়িয়ে  
পড়ে। কান্নার ভেতড়ে বহু গাড়ি এবং ঘরবাড়ি ভেসে  
যায়।

মার্কিন ভুক্ত সম্মান বিভাগের জনৈক পর্য-  
বেক্ষক বলেছেন সেস্ট হেলেনসের উত্তরে যে বন-  
ভূমি ছিল, সেই বনভূমির বিস্তৃত অঙ্গুল বিস্ফো-  
রণে নিশ্চয় হয়ে গেছে। সেখানে একটি গাছের  
গুড়িও আর অবশিষ্ট নেই। সেস্ট হেলেনসের সানু-  
দেয়ে 'স্পিরিট লেক'। অর্থাৎ এই প্রবাদ হুদটি  
কোষ এবং কাদার ব্যঞ্জে গেছে।

বিস্ময়বোধের পর আশ্চর্যগিরির উদ্ভাটনাকালে  
জন্মে ওঠে ভৈরবের মেঘ। হসই মেঘে শব্দ হ্রস্ব  
বিদ্যাতের চমকানি। এর ফলে অশপাশের বনশরমে  
আগুন ধরে যায়। হাজার হাজার একর বনসম্পদ  
পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

অদূরে মিসৌলা শহর। গরম গ্যাস এবং ডুম্ব  
ছড়িয়ে যাওয়ায়, সেখানে দিনের দিকেই পথ চিনে  
চলা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

১০০ মাইল দূরে ইয়াকিমা শহর। শহর না বলে গ্রামও বলা যায়। এই গ্রামের শোরফ বলেছেন, দুপুরের পরই হাইওয়ের আলোগলি আলোদের জেলে দিতে হয়েছে—এতই অন্ধকার। গাশা এবং কুম্ভার বেঁচে। কিছুই দেখা যায় না। মারি উপর কম করেও প্রায় চার হাঁফ পূর্ণ শ্বহ ছাই আর ছাই। ছাই-এর চোটে মানুষের প্রাণাত-কর অবস্থা। ২০ মের খবরে বলা হয়, “ওয়াশিংটন স্টেটের দৃষ্টি শহরের প্রায় ৫০০০ মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আশেপাশি থেকে এমনও

[illegible]

জঙ্গল বেঁচেয়ে আসছে। তবে তার বেগ কিছুটা কমেছে। প্রায় ৬৩০০০ ফুট উঁচু কাশে জমেছে গ্যাস এবং ডাম্পার মেঘ। কুশ্মন-কৈটু সমুদ্রগর্ভে প্রায় ৯২ মাইল দূরে সরে গেছে। উঁচু কাশে স্ম্যাটো-সিমাল পর্যন্ত ধূলিকণা ছড়িয়ে পড়েছে। এই ধূলিকণা, ইতিমধ্যে আরবন, আইভারের উত্তরাঞ্চলের আকাশ গ্রাস করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমুদ্র এবং আবহাওয়া বিষয়ক দপ্তরের বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই ধূলিকণা আগামী দশ বছর বাতাসে ভাসমান অবস্থায় থাকতে পারে। এর ফলে পৃথিবীর আবহাওয়ায় সাময়িক কিছু পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব নয়।

কিন্তু ক্ষয়ক্ষতির প্রথম শঙ্কা সামলে উঠতে না উঠতেই আবার বিস্ফোরণ। ২৫ মে সেন্ট হেলেনস অবার গর্জে উঠলো। এবার জঙ্গলের পরিমাণ কম। পরিবর্তে আশ্বেশগিরি গহ্বর থেকে উদ্গিরণ হলে লাগলো বাষ্প। সেই বাষ্পের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো উদ্‌ধীকাশে। প্রায় সাড়ে তিন মাইল পর্যন্ত। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের (সাইটালে অবস্থিত) ভূপদ্যবিজ্ঞানীরা বললেন, এই বিস্ফোরণের আগে সেন্ট হেলেনস-এর ভূত্বকের উল্লম্ব কয়ার মত ভূকম্পন ধরা পড়েনি। আশ্বেশগিরির বিস্ফোরণের আগে অশপাশের ভূত্বক আর এক ধরনের কম্পন ঘটে থাকে। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'হার'-মৌলিক 'ফোরস'। বাংলা ভাষায় যার অর্থ 'ধড়ায়' সমলয় কম্পন। এবার এ ধরনের কোন কম্পন ধরা পড়েনি। কাদা এবং লাভা—কঁচুই এবার বেয়ে যায়। তবু এবার নতুন একটা ঘটনা ঘটলো। আগের বারে ভূপদ্যপত্রের উৎস ধরা পড়ছিল প্রায় ১২-৩ মাইল গভীর অঞ্চলে। এবার তা ৪৫ পড়লো ৫০-৩ মাইল গভীরে। এ থেকে বিশেষজ্ঞরা ধরে নিলেন, সম্ভবত ভূত্বকের নিচে যে গলিত পদার্থ রয়েছে, যাকে বলা হয় 'ম্যাগমা'—সেই 'ম্যাগমা'ই এবার হঠাৎ উপরের দিকে উঠে এসেছে।

যনে হলো ওরা কিছু একটা স্নান পাঁচ করতে  
পেরেছে। সম্ভ্রান্ত বিস্ফোরণের দরুন সেখানকার  
জলে আগ্নেয়গিরির ভূম্ম এবং রাসায়নিক সামগ্রী  
মিশে থাকার ওরা বুঝতে পেরেছিল যার এগোনটা  
নিরাপদ হবে না।

এই ঘটনার ১৮ দিন পর ঘটনো চরমতম  
কিন্মদায়ণ। ১২ জুন রাত ৮টা বেজে ৪৫ মিনিট।  
তই সময় হাউসে হেলেনস-এর কাছাকাছি অশ্লল  
দায়ো উড়ু বার্ষিলো ইন্টন এয়ার লাইনসের একটি  
ফায়াকাই ব়মান। ওই বিমানের পাইলটের কাছ  
থেকেই মায়িক জুতাকি গুলু প্রাণ খবর পান।  
জানানো হয়, ওয়াশিংটনের দক্ষিণ-পশ্চিমের একটি  
পবিত্রের চড়া থেকে পাখির পালকের নত শুল্ল  
মেঘের উদ্বিগ্নির দেখা যাচ্ছে। পবিত্র চড়া থেকে ওই  
মেঘ প্রায় ৫২০০০ ফুট উর্ধ্বাকাশ পর্যন্ত উঠে  
এসেছে।

একটা সাংবাদিক বলেন "বিবেকবান।"  
 খবরটি শুনেই মন্তব্য করেন ভূতত্ব অনুসন্ধান  
 বিভাগের ভূতাত্ত্বিক পেট রাওলে।

[illegible]

রওশন শব্দ ১৩৫ মাইল দূর থেকেও শোনা  
গিয়েছিল।

ওয়ার্মিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিক প্রিঙ্ক  
ক্রেটন বলেছেন, মাউন্ট হেলেনস-এর এই বিস্ফা-

এখানে কলকাতার নদীগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। নদীগুলি হল :  
 ১. হুগলী নদী : হুগলী নদী কলকাতার পূর্ব দিকে গঙ্গা নদীর মুখে এসে পড়ে।  
 ২. হুগলী নদী : হুগলী নদী কলকাতার পূর্ব দিকে গঙ্গা নদীর মুখে এসে পড়ে।  
 ৩. হুগলী নদী : হুগলী নদী কলকাতার পূর্ব দিকে গঙ্গা নদীর মুখে এসে পড়ে।  
 ৪. হুগলী নদী : হুগলী নদী কলকাতার পূর্ব দিকে গঙ্গা নদীর মুখে এসে পড়ে।  
 ৫. হুগলী নদী : হুগলী নদী কলকাতার পূর্ব দিকে গঙ্গা নদীর মুখে এসে পড়ে।  
 ৬. হুগলী নদী : হুগলী নদী কলকাতার পূর্ব দিকে গঙ্গা নদীর মুখে এসে পড়ে।  
 ৭. হুগলী নদী : হুগলী নদী কলকাতার পূর্ব দিকে গঙ্গা নদীর মুখে এসে পড়ে।  
 ৮. হুগলী নদী : হুগলী নদী কলকাতার পূর্ব দিকে গঙ্গা নদীর মুখে এসে পড়ে।  
 ৯. হুগলী নদী : হুগলী নদী কলকাতার পূর্ব দিকে গঙ্গা নদীর মুখে এসে পড়ে।  
 ১০. হুগলী নদী : হুগলী নদী কলকাতার পূর্ব দিকে গঙ্গা নদীর মুখে এসে পড়ে।



সেই হেলেনস আনেন্সগিরির বিস্ফোরণ পর, হওয়ার লক্ষ্যের মহত্বগুলি ধরে রাখা হয়েছে। উপরের ডান কোণ থেকে বোঝা যায় যে, আগ্নেয়-গিরি থেকে আগ্নেয়-গিরির বিস্ফোরণের পর পর্বতের এক অংশ উড়ে গেছে।

সামনের বনাঞ্চল নির্মূল হয়ে গেছে। নীচে, ডান দিক থেকে—উপরে) পর পর্বতের এক অংশ উড়ে গেছে।

রণ বেশ কিছু অঞ্চল এখন উদ্ভাব্য। এতে করে বহু পতঙ্গ মারা গেছে। পতঙ্গ পাখির খাবার। ফলে এই সব অঞ্চল থেকে পাখির চলে যাচ্ছে। কোন কোন জীববিজ্ঞানী মন্তব্য করেছেন, পরাগ বিস্তারের জন্যে চাই পতঙ্গ। পতঙ্গ মারা যাওয়ায় ফল দাঁড়ালে এই, বেশ কিছু অঞ্চল এখন ফসল-হীন হয়ে পড়বে। উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৪০ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত মেক্সিকোর পারাকুতিন আনেন্সগিরিতে একনাগাড়ে ভূমির উদ্ভাবন হওয়ায় ওই অঞ্চলের পরিবেশ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আখের ক্ষতি হয়েছিল প্রচুর। এক ধরনের পোকা আখ গাছের ক্ষতি করে। ক্ষতিকর এই পোকাদের সাবায় করে আর এক ধরনের পতঙ্গ। আনেন্সগিরির ভূমি ওই পতঙ্গ ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় আখের পক্ষে ক্ষতিকর ওই পোকাদের হাত থেকে আখ গাছ রক্ষা করা খুবই শক্ত হয়েছিল তখন।

কামপানিয়ান সমভূমিকে আগ্নেয় চাখের পক্ষে অত্যন্ত উর্বর করে তুলতে সমর্থ হয়েছে। মাউন্ট এটনার ঢাল, জমিতে যে বিস্তার আগ্নেয় হয়, তার পেছনেও কাজ করে এটনা আনেন্সগিরিরই ভূমি। কলোরোডো বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিদ পেনসন শিটস-ও এ ধরনের মতবাদ সমর্থন করেন। তিনিও মনে করেন শত শত বছর ধরে এল-সালভাদোরের বিস্তৃত অঞ্চল যে উর্বর হয়ে রয়েছে, তারও মূলে কাজ করেছে এল-সালভাদোরেরই কুড়িটি প্রধান আগ্নেয়-গিরি। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিভাগ কক্ষ প্রকাশিত 'ভলক্যানিক আকটিভিটি আশে-পাশে হিউমান ইকোলজি' গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। বইটি যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেছেন পেনসন শিটস এবং ডেনাল্ড গ্রেসন।

আনেন্সগিরির থেকে নিষ্কাশিত ভূমি অনাভাবেও ফসলের ক্ষতি করে যথেষ্ট। বিশেষ করে আনার বা এমন ধরনের গাছপালা ফরা লম্বায় হয় খাটো। যেমন ধরন, ১৯১২ সালে আলাসকার কাতমাই আনেন্সগিরির প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সেখান থেকে প্রায় ৬০০ মাইল দূরের শহর কোডিয়াক দশ ইঞ্চির মত পুরু ভস্ম জমে ওঠে। এর ফলে প্রচুর আনাছের ক্ষয়ক্ষতি হয়।

‘না, মাউন্ট হেলেনস-এর তৃতীয়বারের বিস্ফোরণ এমন কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। ১২ জুন প্যাসিফিক ডেলাইট টাইম রাত ৯টা বেজে ১১ মিনিটে (১৩ জুন, গ্রীষ্মকাল সময় ভোর চারটে বেজে) এগার মিনিট। বেশ কিছুক্ষণ ঘটলো, আমরা বৃষ্টিলাল, আমাদের গণনা নির্ভুল।’ সিরিটল-এ অবস্থিত ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের বিজ্ঞানীদের মতবাদ।

ক্রেটন বলেছেন, আইডাহো'র কেলোগ শহর থেকে এবারকার আনেন্সগিরির বিস্ফোরণজনিত ভূমির যৎসামান্য নমুনা সংগ্রহ করে আমরা পরীক্ষাও করছি। তাতে দেখা গেছে, ওই নমুনার মধ্যে এমন কিছু কিছু অক্সাইড আছে যারা গাছপালায় বাসন আখের যথেষ্ট সাহায্য করে। যেমন ধরন, তার মধ্যে আমরা পেয়েছি ০.০৩ শতাংশ গন্ধকীয় অক্সাইড, ০.০৯ শতাংশ ফসফরাসের অক্সাইড, ইত্যাদি। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় ওই নমুনার ৬১.৭ শতাংশই সিলিকন ডাইঅক্সাইড (বালি)। এত বেশি সিলিকন ডাইঅক্সাইড ফসলের উৎপাদনকে বাহ্যেই করবে।

ওই দিন রাত ৮টার তারা ভবিষ্যাবণী করেন, আর ১০ মিনিটের মধ্যেই মাউন্ট হেলেনসে আবার বিস্ফোরণ ঘটবে। এই ভবিষ্যাবণীর পেছনে কাজ করেছে একটি তত্ত্ব এবং ওই সময় সেখানকার ভূকম্পনজনিত অবস্থা। এই তত্ত্ব বলা হয়, চাঁদ, সূর্য এবং পৃথিবী এখন একই রেখা বরাবর এসে অবস্থান করবে এবং মাউন্ট হেলেনসের নিচেকার ভূত্বক যেভাবে কাঁচছে সেটা যদি ওইভাবেই চলে, তাহলে ওই সময় হেলেনসে বিস্ফোরণ ঘটা উচিত।

প্রাচীনকালে অনেক মনে করতেন, আনেন্সগিরির ভূমি সাময়িকভাবে ক্ষতিকর হলেও পরে তা চাষবাসের পক্ষে উপকরী করে। বিশিষ্ট ভৌগোলিক স্ট্রাথো মনে করেন, ভিস্কাডোয়াস রাস্তার পথে মাউন্ট হেলেনস তার ভূমিই

১২ জুন প্রতিপদ। অথবা আকাশে নতুন চাঁদের আবির্ভাব। গণনা অনুযায়ী চাঁদ, পৃথিবী এবং সূর্যের ওই দিন সমরেখায় আসার কথা।

এই ভয়ের উপর নির্ভর করে ১৮ এবং ২৫ মে'র বিস্ফোরণেরও পূর্বাভাস যোগান হয়েছিল। কিন্তু দুটি বিস্ফোরণই তত্ত্বটিকে ন্যাং করে। কারণ ১৮ মে'র বিস্ফোরণ ঘটে সমরেখায় আসার চারদিন আগে। আর ২৫ মে'র বিস্ফোরণ ঘটে সমরেখায় আসার চারদিন পরে। কিন্তু তৃতীয় বিস্ফোরণ ভবিষ্যাবণী অনুযায়ী প্রায় ঠিক সময়েই ঘটেছে। কেউই ভয়ঙ্কর হয়েছে, তা করেক মিনিট মাত্র।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মাউন্ট হেলেনসের পর পর তিনটি বিস্ফোরণ সম্পর্কে গণনা করতে গিয়ে অনেক কিছুই শিখতে পেরেছেন তারা। তাদের ধারণা, এই জ্ঞান পরবর্তীকালে অন্যান্য আগ্নেয়-গিরির বিস্ফোরণেরও আগাম দিনকণ্ড জানার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করবে। এদের মধ্যে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (আলাসকা সহ), ইন্দোনেশিয়া, সোভিয়েত দেশ, জাপান, ইটালি, তুরস্ক কেনিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং দক্ষিণ আমেরিকার মহাদেশীয় আনেন্সগিরির সমূহ। উল্লেখ্য, নিম্নলিখিত স্থানের মত অথবা সমস্তের আগ্নেয়গিরি থেকে ওইসব আগ্নেয়-গিরির বৈশিষ্ট্য অনেকটা স্বতন্ত্র।

১৯৭৫ সালে মার্কিন ভূ-অনুসন্ধান দপ্তরের বিজ্ঞানী ডঃ ডিউইট, আর জ্যানডেল, ডঃ ডেনো'জ আর মূলিনো এবং ডঃ মেয়ার রবিন 'সামান্য মাগাজিন'-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ভবিষ্যাবণী করেন, মাউন্ট সেন্ট হেলেনস সম্পর্কে সাবধান। এর অন্ততল এখন প্রচণ্ড সক্রিয়। গত কয়েক হাজার বছরে এই আগ্নেয়গিরি ভয়ঙ্কর রকমের বিস্ফোরণ হয়ে উঠেছে। এই অবস্থা চলছে কম করেও ৩৭০০০ বছর ধরে। সম্প্রতি এর গহবরের মধ্যে চলছে উত্তপ্ত এবং গলিত ভূ-সামগ্রীর প্রবাহ। ১৯৭৮ সালে জ্যানডেল এবং মূলিনো আর একটি প্রবন্ধে সেন্ট হেলেনসের কোণ কোন অংশ বিপজ্জনক সে সম্পর্কে একটি মানচিত্রও তৈরি করেন।

বিজ্ঞানীরা সাবধান-বার্তা পাঠালেন এ বছর ২০ মার্চ, যখন তারা আশঙ্কায় করলেন ওই সময় সেন্ট হেলেনসের নিচে গভীর ভূত্বকে ভূকম্পন ঘটবে। আর সেই কম্পনের মাথা ৪-১ রিকটার।

২৭ মার্চ দেখা গেল ১৬৭৭ ফুট উচ্চ, আগ্নেয়গিরির গলার কাছের অংশ বাষ্প এবং ভূমির চাপে বৈশিষ্ট্য হয়েছে। সংগে সংগে ভূতত্ত্ব অনু-সন্ধানীরা সবাইকে সতর্ক করে দিলেন আবার।

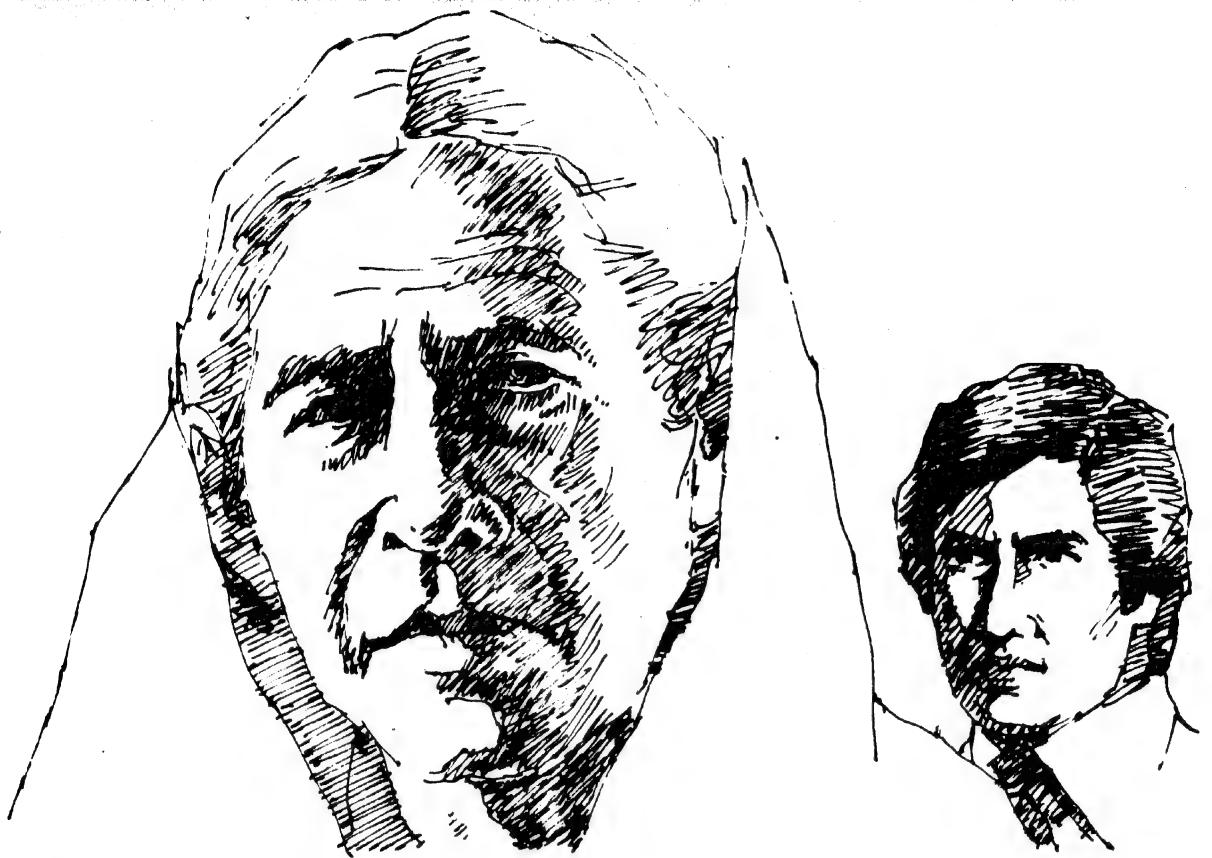
এপ্রিল নাগাদ বিমান থেকে আনেন্সগিরির গভীর ভাব তোলা হয়। ব্যবহার করা হয় 'লেজার রশ্মি'। এতে দেখা গেল, ভেতরে বেশ কিছুটা ভূতত্ত্ব সামগ্রী ফুলে ফেঁপে উপরের দিকে উঠে আসছে দিনে ১-৫ মিটারের মত।

১২ মে, ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ডঃ ডেভিড এ জনস্টন জানালেন, ১৪ মে পৃথিবীর উপর চাঁদের আকর্ষণ কিছুটা বাড়তে থাকবে। এর ফলে ১৭ মে সেন্ট হেলেনস-এ বিস্ফোরণ ঘটর সম্ভাবনা রয়েছে। ১৮ মে দেখা গেল, সেখানকার ভূত্বকের গভীরে ভূকম্পনের মাথা ৫.২ রিকটারে। ওইসব মহত্বেরই বিস্ফোরণ। এরপর কী ঘটলো, তার কিছু কিছু বিবরণ আগেই দিয়েছি।

মাউন্ট সেন্ট হেলেনস-এর ভূগর্ভস্থিক এই বিস্ফোরণ সম্পর্কে মন্তব্য করে গিয়ে হাজারি আগ্নেয়গিরির বিষয়ক মানমসিরের পরিচালক এবং বিশিষ্ট আনেন্সগিরির বিশেষজ্ঞ ডঃ বরট ডেকার বলেছেন: দুটি বিষয়ে আমি খুবই অবাক হয়েছি। সাধারণত দেখা যায়, প্রথমে ছোটখাটো বিস্ফোরণ। তারপর তা বাড়তে বাড়তে ছোট বিরাট বিস্ফোরণ। সেন্ট হেলেনস-এ কিন্তু তা ঘটেইনি। এছাড়া ১৮ মে যে ধরনের বিস্ফোরণ ঘটেছে, তার নিজস্ব খুবই বিরল।

ঘটনা ঘাই হোক, একটা ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা খুবই আশাবাদী। সেন্ট হেলেনস-এ নির্দিষ্ট পর্ব-বেশকালের পর কিছু কিছু পদ্ধতি আশঙ্কায় করেছেন তারা। তাদের বিশ্বাস, ওই সব পদ্ধতির সাহায্যে কোন আগ্নেয়গিরিতে কখন বিস্ফোরণ ঘটবে তা আগে থেকে জানা সম্ভব হবে। হয়ত নির্দিষ্ট ভাবে দিনকণ্ড বলা এখনই সম্ভব হবে না। তবে আনুমানিক একটি সময় বলে দেওয়া খুব অসম্ভবও হবে না।

সমরাজ্য কর হুই : জন হজসন।



## স্বর্ণময়ীর ঠিকানা রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়

এবার আর কোনরকম অজ্ঞানত ছিল না, সুতরাং ছোট ছেলে অমলের সঙ্গে আসতেই হল স্বর্ণময়ীকে তার কলকাতার বাড়িতে।

সকালে কি একটা কাজে চুচুড়ের গেছল অমল, ফেয়ার পথে চন্দননগরে মায়ের সঙ্গে দেখা করে সে বল বলল, চল না, দিনকতক কলকাতার গিরে আমার বাড়িতে থাকবে, মা?

একই? কথাটা বলেই স্বর্ণময়ী তাকালেন বড়বউ শ্রুতদার দিকে।

দেওরের কথা সম্বন্ধ জানিয়ে অন্যতর শ্রুতদা বলল, 'তা যান না, কখনো তো যান নি। ঠাকুরপোর নতুন বাড়ি কোমরান রেখেই দেখলেন না—'

এ অভিযোগ অমলের নিজস্বই আছে। ভিত পুজো থেকে গৃহপ্রবেশ—সবচেয়ে সে নিয়ে যেতে চেয়েছে মাকে; কিন্তু কোমরানই যাওয়া ভাব হয়ে ওঠে নি। ভিত পুজোর সময়টাতে কিলেরা মেয়ে মৃত্ত একজুড়ীতে ভুগছে, আয় গৃহপ্রবেশের দিন বড়বউ নিজেই কিছানা পড়ে। বসাবাসা, ছেলেমেয়ে দুটোর ক্ষেপালনের ভার কার খাড়ে চাপানেন তিনি! কিল তো বোঁরয়ে যায় কোন সাতসকালে, ফের সেই দু' প্রহর রাত!

কিন্তু এবার আর কোনরকম না করতে পারলেন না স্বর্ণময়ী। গোলপাফ, ফল মার্কা চটা-ওটা টিনের স্টেকেশনারি একখানা বান, শেমিজ একটা, গামছা আর টিকিটাকি দু-চারটে জিনিস ভরে নিয়ে তিনি বোঁরয়ে পড়লেন অমলের সঙ্গে। কলকাতার বাড়িতে যখন পৌঁছলেন তখন সম্বোধন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ট্যাঙ্ক থেকে নেমে কোমর-উচ্চ লোহার ফটকটা খুলে ধরে অমল বলল, 'এসো, মা!'

অসকেন কি, স্বর্ণময়ীর চোখ দুটো তখন দৃষ্টির প্রদীপ জ্বলে বাড়িখানাকে ঘন আরতি করছে। এই ভরি অমর বাড়ি! নিজের উপায়ের পয়সায় তৈরী! চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারেন না স্বর্ণময়ী। শ্রুত, কিংবা দৃষ্টিতে ফটকের গায়ে গাথ 'সুরমা ভবন' ট্যাঙ্কটোর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

অমল তর্গিল দিল, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন, মা?' কেন, তা সে ভালোই বোঝে, এক বোঝে কলিই কণ্ঠস্বরে তার প্রচ্ছন্ন গব্বর সুরটা সে গোপন করতে পারেন না।

পালিশ-করা দরজার গায়ে লাগানো বোতামটা টিপে ধরতেই ভেতর থেকে জলতরঙ্গের মিসি সুর একটা তেসে এল এক পরক্ষণেই দরজা খুলে সামান এসে দাঁড়ালো সুরমা। বিয়ের সময় মাত্র একবারই সে শাশুড়ীকে দেখেছিল,

তবে চিনতে তার অসম্ভব হল না, প্রণামও করল সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু ঠিক প্রশ্ন হল বলে মনে হল না। মখে মখে জবাব দেবার অপরাধে মাত্র দু'দিন আগে সে তাড়িয়েছে তার স্নাতকদের লোক গৌরীকে; বাসাবাসা, মেরেকে শুলে দেওয়া-নেওয়া, নিজের শুলের চাকরি করার রাখা—সংসারের হাজার কামেলা নিয়ে এমনিতেই সে হিমসিম খাচ্ছে, তার ওপর স্বামীর হঠাৎ এই মাতৃপ্রীতি কেন একটা উটকে কামেল রাই মনে হল তার কাছে।

অমলের দিকে ফিরে সংকল্পিত পলার সুরমা বলল, 'তুমি আর এখন ঢুকে না, একেবারে দোকানটা সেজে এসো।'

দোকান? অকস্মে হয়ে নয় অমল।

হ্যাঁ, দোকান। আমি তো জানি না, হোটেল থেকে নিজেকে মতন প্রায়ের রাইস আর চিলি চিকেন এনে রেখেছি। কিন্তু—

সমস্যাটা এবার অমলের কাছে পরিষ্কৃত হয়ে উঠল। স্টেকেশটা সুরমার দিকে এগিয়ে দিকে বললে, 'আজ্ঞা, এটা তুমি নিয়ে যাও, আমি দেখি কিছু, ফলমূল কি দইমিষ্টি—'

এগিয়ে বাজছে সে, কথা দিলেন স্বর্ণময়ী, 'এত রাত্রে আর যেতে হবে না, অমল, একটা রাত না খেলে মানুষ মরে না—'

অমল বলল, 'মা, আমমা সবাই খাব, আর তুমি উপাস করে থাকবে নাকি?'

'আমার অভ্যাস আছে, বাবা। কিন্তু তোরা যদি আমার সঙ্গে এককম কুটুম্বিতা করিস, তা হলে জে এখানে একটি দিনও টিকতে পারব না।'

স্বর্ণময়ীর কথায় এমন একটা সহজ সরল আন্তরিকতা ছিল যে, সুরমা কি অমল, একটি কথাও বলতে পারত না।

স্টেকেশটা হাতে নিয়ে শাশুড়ীকে নিয়ে সুরমা ভেতরে ঢকে গেল। একতলার উত্তরদিকের কোণের ঘরটাে থাকার ব্যবস্থা হল স্বর্ণময়ীর। একটু অকস্মে হয়ে অমল সুরমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখ মেলেতেই সে বল উঠল, 'কিন্তু হয়েছে, ওপর-নিচ করলে কষ্ট হবে না? ঠিক পক্ষে এই ঘরটাই তো ভালো। আলো-হাওয়া একটা কম—তাকেই হয়েছে কি? গৌরী তো এই ঘরটাই কাটরে গেছে কয়েকো পর বছর।'

স্বর্ণময়ীকে দেখে সবচেয়ে অকস্মে হল রাগা। এই প্রথম সে দেখছে তাঁকে।



প্রকাশিত হয়েছে



ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আগত  
চেনাঅচেনা, শ্রুত-বিশ্রুত বিভিন্ন ব্যক্তিদের  
পরিচয়সহ বাংলায় সর্ব প্রথম গ্রন্থ।

তৎকালীন সমাজের যে সকল নর-নারীর  
সমাবেশ ঘটেছিল তাঁকুরের কাছে সেইসব রাজা,

জমিদার, মনীষী, মহাত্মা, চিন্তাশীল, কবি,

দার্শনিক, গায়ক, নাদক থেকে শুরু করে লমপট, দস্যু, ওড়া,

পতিতা, মেথর, আশ্রিত জীবসকল প্রত্যেকের সম্বন্ধেই বহু তথ্য।

তাঁকুরের মহালীলার অপূর্ণ পরিচয় স্বাভাবিকভাবেই এই গ্রন্থে স্থান  
পেয়েছে। এছাড়াও তাঁকুরের গুণাগুণের স্থানও বহুতই আছে।

নির্মলকুমার রায়-এর

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

সংস্পর্শে ২০

শ্রীফকিরনারায়ণ কর্মকার-এর

বিযুপূরের

অমরকাহিনী ১৫

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু'র

রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থ

বাংলার লৌকিক

দেবতা ১২

৪র্থ  
সংস্করণ প্রকাশিত হলো একটি  
অস্বাধারণ গ্রন্থ

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী  
মা কথামৃত



দীর্ঘদিনের বিদেশি সাহসিক আনন্দময়ী মায়ের এই কথামৃত সংগ্রহ  
করছেন শ্রীশ্রী আনন্দময়ী। দাম ১০ টাকা ভিপি ১২ টাকা

দে'জ পাবলিশিং, C/O দে বুক স্টোর

১০ বক্সিম চারুজো স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩ ফোন : ৩৯-৫০৩৫৩

অধিবাস আর বিস্ময় যেন পাশাপাশি আশ্চর্য এক ছায়া ফেলে তার মধ্যে।  
এ কেমন ঠাকুরমা? তার দাঁদমাও তো বড়ো, চুল পাক ধরেছে, অথচ কেমন  
ধবধবে সব পাড় শাড়ি পরে, সায়্য পরে, রাউজ গায়ে ক্ষেপে। হালুকা করে আবার  
পাউডারও মাখে। কিন্তু স্বর্ণময়ী যখন চিত্রের সটকশ থেকে কাগজে মোড়া  
আমসত্ত্বের প্যাকেটটা তার হাতে চুলে দিয়ে বলেছেন, 'নে, নিজের হাতে করা—',  
তখন যেন তার স্বর্ণময়ীকে মনে হল অপমানজনক যেটা হলেও হতে পারে।  
এক টুকরো আমসত্ত্ব মধ্যে পুরে রসাবাদন করতে করতে কলর, 'মা এসব একদম  
খেতে দেয় না, জানো?' প্রগ করে।

কুণ্ঠিত হয়ে স্বর্ণময়ী বলে উঠলেন, 'তা হলে—'  
জিনিসটা যেন রসাল তেমনি সম্বাদু। আরও খানিকটা মধ্যে ফেলে  
বিজ্ঞের মত রীণা বলল, 'ঠাকুরমা দিলে ক্ষেপে নেই, না? দাঁদমাও তো যখন  
আসে, কেক নিয়ে আসে, প্যাসট্রিজ নিয়ে আসে, আবার কাডবেরীর চকোলেটও।  
চলো ঠাকুরমা, ওপরের ঘরে চলো—'

আবার কিছুটা সহজ হয়ে উঠলেন স্বর্ণময়ী। রীণার পেছন পেছন দোতলায়  
উঠে এসেন তিনি। অথচ বিস্ময়ে এধার-ওধার তাকাতে তাকাতে। অকস্মিক  
করছে চারখানা। যেন মোঝে তেমনি দেওয়াল, তেমনি জালসা-দরজা কাড়ি-বরণা।  
গিয়ে দাঁড়ালেন জানলার গোড়ায়। 'সিকের পদাটো সরাতাই চোখে পড়ল আশ-  
পাশের আকিঞ্চ-ছোঁয়া নতুন নতুন কাঁড়িলে। ঘরে ঘরে আলো, কোথাও রেডিও  
বাজছে, কোথাও বা শিঁকিও-এ গান। হাওয়ায় হাসনুহানার মিষ্টি গন্ধ। চন্দন-  
নায়ের ঘরের কখাটা মনে পড়ল স্বর্ণময়ীর। একপাশা ছোট জানলাটা খুলেই  
পাশের সরু গলি থেকে কচি জ্বেনের পচা গন্ধ নিয়ে ছুটে আসে হাওয়া, নাক  
যেন জ্বলে যায়।

পাশে দুঁড়িয়ে গরিত কণ্ঠে রীণা বল ওঠে, 'আমাদেরও শিঁকিও আছে  
ঠাকুরমা, জানো? দাঁদমাও দিচ্ছে, এসো, দেখবে এসো।'

ঠাকুরমা কে সে টেনে নিয়ে যায় আর এক করে পরিকা দেয়, 'এই যে  
শিঁকিও, ওঠে ফ্রিজ-গত বছর সাড়ে চার হাজার টাকা দিয়ে কিনেছে বাবা।  
আর পাশের ঘরে আছে একটা আকোঁরামা—দেখবে চলো—'

দেখেন স্বর্ণময়ী, দেখেন আর মন তার ভরে ওঠে পুরাতন। দূর-অতীতের  
দিনগুলো যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দৃষ্টির বর্ধন হয়ে উঠে যখন  
হঠাৎ একদিন চলে গেলেন, 'বিম্ব' তখন কলেজে পড়ছে, আর অম্ব বহর ঘরেবের  
শিল্প। চোখে অন্ধকার দেখলেন স্বর্ণময়ী, দিন গুজরান হয় এমন সম্বল নেই।  
লেখাপড়া ছেড়ে অল্প মাইনের কিছু দিয়ে চুকলে একটা কাপড়ের দোকানে,  
অমানুষিক ধার্টনি। তবু সেই ধার্টনির পরও রাতে ঘিরে এসে 'বিম্ব' পড়তে  
বসতো অম্বকে নিয়ে। স্বর্ণময়ীও বসে থাকতেন নি। পাড়ার লোকের কথা  
সেলাই করে, শীতের আগে উল বনে, পাপড় বলে, ঠোঙ গড়ে তিনি হোজগার  
করতেন বা হয় কিছ। অম্বকে মানুষ হতেই হবে।

বর্তি-পরিকার ব্যক্তি পেলো অম্ব, মাধ্যমিক প্রথম দশজনের একজন। মনে  
পড়ে, আজ সবকিছ মনে পড়ে স্বর্ণময়ীর। বহুর কাপড়ের প্রথম পাতায়  
ছবি সমেত যখন সর্বাঙ্গত একটা জীবনী বেরোল অম্বর, চন্দনালয়ের বাইশ  
টাকা ভাড়ার এঁসে ঘরের কথারও উল্লেখ ছিল তাতে। সেটা পাড় শাখ তার  
নয়, আনন্দ বিম্বও চোখ জলে ভরে উঠেছিল সেদিন। অম্বর সাফল্য পেছনে  
যে তার অনেক বস জল হয়েছে।

কলকাতায় এসে আবাসিক এক কলেজে ভর্তি হলো অম্ব। গোটা দুই  
তিন টিউশনি জুটিয়ে নিয়ে নিজের খরচ নিজেই চালাতে লাগল সে। মাঝে-মাঝে  
বিম্ব কিছু দিতে গেল, নিত না। বরং প্রগ করতো, বলতো, 'আমার জন্যে  
তোমাদের চিন্তা করতে হবে না। আমি আমারটা চালিয়ে নিছি, তুমি সংসারটা  
দেখো।'

বাড়ি ঘিরে খেতে বসে কিছু শাখ অম্বর গল্পই করতো। পড়তো, 'অম্ব,  
ভীষণ হিসেবী আর আত্মবিশ্বাসী, মা। তুমি দেখো, ও অনেক না হবে, অনেক  
উচুতে উঠবে।'

পূরের দিনের কথা ভাবেন আর নতুন বাড়ির নতুন নতুন আসবাব দেখতে  
দেখতে আনন্দে চোখের কোল জলে ভরে ওঠে স্বর্ণময়ীর। রাতে বিধানায় শবেও  
বিম্বর দূরদর্শিতার কথা চিন্তা করেন তিনি। অম্বর সম্বন্ধে সে যা বলেছিল,  
মলে গেছে তা অম্বকে অম্বের। শাখ, নিজের ভবিষ্যতাই সে দেখতে গেলো না।  
সাহসিক সেই অভাব আর অনটন। সেই ভাঙা তক্তাপোল, আল-দেওয়া ছোঁড়া  
মশারি, সারারাত মলার কামড়ে এপেশ-ওপাশ করা।

অনেক রাত পর্যন্ত সেদিন জেগে কাটলো চিত্রদলের যা অভাস সেই ভাবে  
ওঠার কিন্তু এতটুকুও ব্যতিক্রম হল না স্বর্ণময়ীর। কাক ডাকনি, উঠে পড়লেন  
স্বর্ণময়ী। স্নান করলেন, কাপড়-পায়ের ফেলে দিলেন তারে। কিন্তু ঠাকুরমাটা  
জপ করেন কোথায় বসে? পূজোর ঘর বসতে কিছ, সেই অথচ বাড়িতে জায়গা  
আছে পূজুর। অম্বর না হয় খোজাল না থাকতে পারে, বউমাও তো ছোটখাটো  
একখান কিরির নিতে পারত।

কাজেই খুঁজতে সংসারের আকাঙ্ক্ষা জিনিসগুলো যে ঘরে রাখা হয়,  
তারই এক কোণে ঠাই করে নিলেন তিনি। সবমোট বসতে থাকেন, সারার  
পরজার বেলাটা বেজে উঠল। বসি অম্ব হল না, উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে  
দিলেন তিনি।

ঠিক-নি কুণ্ঠী। পিচ বাড়িতে কাজ করে, নমা-নমা করে ফল-কোপাতা  
ফেলাতেও তো কত সময় লাগে। তাই জেব-জেব না এলে চলে না। অম্ব  
করেন, একটু বা রোগাটে, ডব্ব, সাধলতা নেহাত ফেলনা নয়। তেতরে পা দিয়ে



# ক্রাইম এ্যান্ড সন আই

১৪

## সম্পাদনা ও ভাষান্তর : পৃথ্বীরাজ সেন

এতে আছে : শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রহস্য লেখক-ডেভিস  
হেডলী হেডের আকর্ষণীয় প্যাকড ক্রাইম থ্রিলার  
রঙ্গনটীর মৃত্যু, রহস্য, বরনায় সাহিত্যিক সমরসেট  
মমের একমাত্র স্পাই কাহিনী অপারেশন সিক্রেট সার্ভিস  
ও মন রহস্যের সমরনায় রূপকার আলবার্তো মোরা-  
ভিয়ার দূরত্ব প্রেমের উপন্যাস শব্দন সূত্র। মনোরম  
প্রচ্ছদ শোভিত। দাম : ১৪৫ টাকা।

আত্মত্যাগ মুখোপাধ্যায়	১	মডেল	৭৮
নরেন্দ্রনাথ মিত্র	২	পালঙ্ক	৮৮
কৃষ্ণানু বন্দ্যোপাধ্যায়	৩	ডালিং ডেন	১০৮
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৪	চোখের বাহিরে	৫৮
নীহাররঞ্জন গুপ্ত	৫	সুভদ্রা হরণ	৬৮
প্রেমেন্দ্র মিত্র	৬	দ্বিতীয় জীবন	৭৮
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	৭	নবীন যৌবন	৬৮
আশা দেবী	৮	নির্জন দুপুর	৫৮
রমেন দাশ	৯	নজরুলের প্রেম	৮৮
তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী	১০	সেকি এলো ফিরে	৮৮
বাসুদেব বসু	১১	ভয়াল অরণ্যটা	
		হতবাক	১২৮
চিরঞ্জীব ও শ্রীপাথ	১২	ফুটবলের অ্যালবাম	৮৮
দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩	জ্যোৎস্নায় অরণ্যে একা	
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	১৪	নীলশূন্য	১০৮
জহর মুখোপাধ্যায়	১৫	মেঘের কোলে রোদ	৫৮
বেদুইন	১৬	বাংলায় এখান জল	
		ওখায় পানি	১৫৮
টোডরমল	১৭	ভূমিরাজস্ব ও জরীপ	১৫৮
জরাসন্ধ	১৮	নদীর প্রার কহে	৮৮
নিশাচর	১৯	সেই চোখ	৬৮
অবনী সাহা	২০	ফ্রেজজ	৬৮
চিরঞ্জীব সেন	২১	নাইটহুক	১০৮

ফ্রিজ লিবারের ভৌতিক এডগারএ্যালান পোর

আদিম অভিশাপ ৪ ছায়া প্রতিমা ৪

আর্থীর কোনান ডয়েলের ডেভিড সেলজ্যারের

প্রেত পিশাচ ৪ শেষের সেদিন ৪

প্রতিস্থান : সাহিত্য মন্দির, ৩৮/১ কলেজ স্ট্রাট, কলিকাতা-৭০

জ্যোতি প্রকাশন ২২ প্রবীণ-৫৫ সেনা কলি ৮

বাগের। তাই কি পারেন? সংসার যে তার নিজের। তার সবটাই ছাড়িয়ে আছেন তিনি। তার ধর্মীতে ধর্মীতে কইছে তাইই বৃক্কের রক্ত।

দেওয়ান ঘড়িতে চং চং করে বাগেটা বাজতে তিনি উঠে পাড় বারান্দায় গিয়ে দৌড়োটা জললেন। হাঁড়ি করে জল বসাতে গিয়ে মনে হল কে জানে আজ একাশ্রী কিনা! বাড়িতে পরিষ্কার বাসাই নেই। ছবিওলা একখানা ইংরাজ কালেক্টর আছে বাট, কিন্তু তার থেকে একাদশীর কোন হিটস ফেল না। শেক কি এই বড়ো বয়স একাদশীর দিন ভাঙে ফেলবেন! বড় বউ শভাখা থাকলে স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করতে পারতেন। কোথায় তার কাছে যাবেন খবর নিতে, তার চেয়ে দোঁড়া নিকিয়ে দিয়েই নিঃশব্দ হলেন স্বর্ণময়ী।

দিনে ঘুমোয় তাঁর কোনকিই অভ্যাস নেই। একজন লোক থাকলে দুটো কথা কলও সময় কাটবে। হাত গুটিয়ে কাঁহাতক আর ঠাট্টা জগল্লাথ সেজে কস থাকে যায়! কলমের ঢুকে এক বালতি জল আর শব্দেতে দেওয়া ন্যাকড়াটা নিয়ে তিনি ঘরে ঘরে মেঝে মূছেতে লাগলেন। ঠিকের সন্ধান করে গেছে বাট, কিন্তু ওদের তো দায়সারা কাজ, দরদ কোথায়!

মেয়ের রূপ যেন খুলতে লাগল। খুশি হলেন স্বর্ণময়ী। তবু সংসারের একটা কাজে লাগলেন তিনি। নিছক কাড়ি পাহারা দেওয়াই নয়।

কিন্তু সে আর কতক্ষণেরই বা কাজ! আবার সেই অনর্থক 'ঘারাঘরি' পেছনেনেব ছোট ঘরখানায় একগুদা পলেন খবরের কাগজ থাকে সাজিয়ে রাখা। স্বর্ণময়ী একবার ভাবলেন, একটু আটা তৈরি করে নিয়ে ঠোঙা গড়তে বসেন। ইংরাজী কাগজ। ঠোঙাগুলো দোকানদারেরা বোঁশ দরই কিনে নেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'ভরসা পেলেন না'। তা ছাড়া, না জিজ্ঞেস করেই বা করেন কি করে? অগত্যা ইচ্ছাটা তাকে দমন করতেই হল।

পরের রবিবারই কিন্তু সূরমা এক পুরোন কাগজের ফিরিওলা ডেকে সব জুজুগ বেড়ে দিল। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল স্বর্ণময়ীর। কটাঁই বা টাকা! ঠোঙা বাক্ত হত আরও অনেক বোঁশ পরায়া। বিমলের সংসারের দশ দিনের কাজের খরচ হয়ে যেত।

সদর দরজার কেলটা বেজে উঠতেই ঘাড়ের দিকে তাকালেন স্বর্ণময়ী। দুটো বাজছে প্রায়। কি এলো, তার মনেই আবার ব্যস্ততা শরৎ। সামনে দাঁড়িয়ে থেতে না করলে সব কাজই নোংরা করে রেখে যাবে।

কিন্তু দরজা খুলতেই স্বর্ণময়ী অবাক। কি ন্যা, সূরমা! জাগ্র গলার কল উঠলেন, 'কি ব্যপার, আজ এত সকাল-সকাল যে! শরীর ভালো আছে তো, মা?'

গলদঘর্ম সূরমা ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'আপনার ছেলের সঙ্গে আজ একটা বোঝাব। চাপড়ের ফিরে তার মধ্যে উঠরী হয়ে থাকতে বলেছে। পরক্ষণেই রাসাখরের দিকে চোখ পড়তেই স্বর্ কলে গেল তারা। বলল, 'লক্ষ্মী আসে নি এখনও?'

না মা, এখনও আসিনি।

অরোহে! ও আবার কামাই করে কসবে না তো?

ঘাড়ের দিকে আর একবার তাকালেন স্বর্ণময়ী, 'এখনও সময় চলে যায়নি, এসে পড়বেনা। তুমি একটু জিরোও মা, বড় মেয়ে গেছো। রোদে পড়ে মূছটা ভালো হয়ে গেছে।'

বাথরুম থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে বেরিয়ে আসার পরও লক্ষ্মী এলো না দেখে সূরমা গজগজ শব্দে করল, 'ঠিক কিয়ের কাউই এই। সময় বাক জলদ ফেলে।'

এতে আর জব্দে ফেলার কি আছে মা? স্বর্ণময়ী বলে উঠলেন, 'তুমি কিছ মাগ ব্যস্ত হয়ে না। তাড়াতাড়ি করার কিছু নেই, আমি তো ব্যস্ত ছি। অম্ম মনো আসবে, তুমি দাঁড়িয়ে থেও উঠরী হতে থাকো। আমি রাসাখরটা দিয়ে, বারান্দা মূছে বাসন কাখানা মেজে তুলে রাখবখন। রীণাও মা, নাকি ভেতরের দপেই?'

'ওরই জেনা ভো বেরান আজ! সূরমা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'আজ ওদের গেট টুগেদার হবে ভালোলায় নীতাদের কাউ!'

সেটা আবার কি, মা? স্বর্ণময়ীর গলার বিশ্বয়।

প্রতি মাসে রীণাও কখদের কায়েন-কায়ে কাড়িতে একবার করে সব অভিভাবকরা জড়ো হন, পড়শনো নিয়ে আলোচনা-আলোচনা হয়। গান-বাজন, কওয়া-দাওয়া-এই আর কি!'

জন্মদিন, বিয়ের ভিথি, অফিসের পার্টি, মাসে এক-আধবার সিনেমা থিয়েটার কি জলসায় যাওয়া-শহুরে মানুষদের আনন্দ আহরণের এমন অনেক উপকরণের কথা শুনিয়ে স্বর্ণময়ী, কিন্তু আজকের ব্যাপারটা যেন সম্পর্কে নতুন ঠেকলো তার কাছে।

স সন্ধ্যা হইছে ঠিক সাড়ে চারটায় ওরা বেরিয়ে গেল। বাসন ধোয়া শেষ করে স্বর্ণময়ী ওবন পোড়া তাওয়াখানা নিয়ে পড়লেন।

সংজায় সাক্ষা দেওয়ার দুমদাম শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল স্বর্ণময়ীর। মড়মড়িয়ে উঠে পড়ি তিনি বেরিয়ে এলেন বাইরে। অম্ম, সূরমা আর রীণা সমস্তর চিকার শব্দে একরকম ছোট গিয়েই তিনি সদর দরজাটা খুলে দিলেন।

এক ভিতর-নাভিতই রীণা বলে উঠল, 'ঠাকুরমার কি ঘুম রে কাহ! যেন কুড়কুড়!'

অমল বলল, 'তুমি কি ঘুমিয়ে পড়ছিলে মা?'

অমলের কথা শেষ হতে-না-হতেই সুসমা বলে উঠল, 'আমরা সেই কখন থেকে দরজায় থাকা দাঁড়ি—'

কলা স্বহস্তে, গলা কারতই মিহি নয়, ভাঁপেও মিষ্টির ধারে-কাছ যার না। তবু তার লক্ষ্য পেলেন স্বর্ণময়ী। বললেন, 'হিঁ ছি, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে আমার। এই আসবে এই আসবে করে অনেককণ জেগে ছিলাম, তারপর কখন তে দাঁ চোখের পাতা এক হয়ে গেছে—'

কোন জবাব না দিয়ে ওরা ভেতরে ঢুকে এল। কঁধের খিঁং কাগড়া ডিভানের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে সুসমা অমলের উপশেষ বলল, 'গেয়ে যদি দরজা ভাঙতো, মা তো জানতেও পারতেন না। দরজায় একটা অটোমেটিক ল্যাচ লাগাবার কবস্থা করে তুমি।'

হাজে রাইরে স্বরাঙ্গার এককোণে কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্বর্ণময়ী। সেদিকে হঠাৎ চোখ পড়তেই সুসমা গলা কঁপিয়ে খাদে নেমে এল। মায়ের তো বরষ হয়েছ, সব সময় কি সব দিক হ'ল দেখে কাজ করতে পারেন? কোল্ট্রিন হাম্রাটা দরজা খেলা রেখেই ঘুমিয়ে পড়বেন।

ব্যরাঙ্গার ঘাড়তে ঢং ঢং করে আওয়াজ হতেই বনামাঘর থেকে একটা বেড়াল বেঁধিয়ে এসে এই সময়, একছুটে লক্ষ দিয়ে জালা গলে বোঁরয়ে গেল কাইরে। সেটার দিকে লক্ষ পড়তেই সুসমা বলে উঠল, 'রান্নাঘরে আশনার ছুটি-তরকারি দেখে গিয়েছিলাম, খেয়েছেন মা?'

'আজ যে আমার নীলবর্ষির উপোস বটুমা, আজ তো পোড়া জিনিস, কিছ খাব না! স্বর্ণময়ীর গলা তেমনি ঠাণ্ডা আর সঙ্কুচিত।

'ওহা, তাও তো বটে। আমার একদম খোলাই ছিল না। হিঁ ছি, আপুর্স ঘর ফেরাবার সময় একটু মনে করিয়ে দিতেন, মিটি কিংসে আনতাম ফেরাবার পথে। অলি ভিজের খাবার। তো অপনার চলবে না—নইলে ফল মিটি সই তো আছে।'

'তোত কি হয়েছে, একটা দিন না খেলে কি আর আমি মরে যাব। ও তো আমার বন্ধুস্বালের অভ্যাস, মা। ও নিজে তোমায় অত ভাবতে হবে না। নাও, এবার সব মুরে পড়ে গে যাও। অনেক রাত হয়েছে, উঠেছো সেই কোন্ সাতসকালে—' ছড়ির দিকে তাকালেন স্বর্ণময়ী। ব্যরাটো বেজে সাত।

লক্ষ্মীর কাজ সারা হলে সদরে তালি লাগিয়ে স্বর্ণময়ী বেঁধিয়ে পড়লেন। রীশার ছুটি তিনটেই। এখনও ঘের আছে কিছুক্ষণ। রান্নার লোককে জিজ্ঞাসা করতে করতে তিনি গিয়ে হাজির হলেন আর মাইলটাক দরেক এক পোস্তাপিস। একথানা খাম কিনে শোষকের ফাঁক থেকে বার করলেন একখানা চিঠি, তারপর সেটা খামের ভেতর ভরে ঠিকানা লিখে ডাকবাক্সে ফেল দিলেন।

আজ কণিক ধরেই মনটা তার খুব আশ্বস্ত হয়ে পড়েছে। কতদিন হলো, তিনি এখানে এসেছেন, ঘুমের কোন খবর পান নি। বড় কউমার শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না, ফিরও অফিস কথ আছে আজ তিন মাস, কি করে যে চালাচ্ছে ওরা তা ভাবানই জানেন। আলতা-সিদুরের একটা কারখানার ঠিক যে কাজটা পেয়েছে কিম্বা, তাকে কেনেদর দামটাও ওঠে কিম্বা সন্তুষ্ট। সংসারের কাজ সেরে মামলাকউয়ে ঠোঁট গড়তেন অবসর সময়ে। পেতেন বড়ামানাই, তিনি চলে আসার পর এখন তাও কমেছে। মাইনের অভাবে ছেলেমেয়ে দুটোর স্কুলে যাওয়া বন্ধ। হাত-খরচ বলে মাসে মাসে ভাত কিছ টাকা দেয় অম, তাই; নইলে কবে ঘর ছাড়তে হত তাদের, মামলার অভাবে বাস করতে হত অশ্বকুর। এখানে আসার আগের দিন হুলি দ, গাছা বিকি করতে চেয়েছিল কিম্বা, বাধা দিয়েছিলেন স্বর্ণময়ী। ও দুটো ওর মামার বাড়ি থেকে দেওয়া। নিজের গলার হাঙ্গাছটা খুলে তার হাতে দিতে যেতে কিম্বা হাত সাজিয়ে দিয়ে বসেছিল, তেয়ার ওই শেষ সম্বলটুকু আর নাইবা ঘোচালুম মা।'

হন-হন করে হাঁটছিলেন যত, গলগল করে ঘামাছিলেনও তত স্বর্ণময়ী। ফিরতে ঘেরি হলে কোরা রীশাকে সেরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। বাজলো কটা? তিনটে বেজে গেল নাকি? রান্নার এক ছোকরার কাছে সময় জানলেন, পোঁৎ চারটে।

পোঁৎ চারটে! স্বর্ণময়ী যেন একটা ধাক্কা খেলেন। আরও দ্রুত পা চালালেন তিনি। বাড়ির কাছাকাছি হতেই দেখলেন বা ভেবেছেন তিনি ঠিক তাই। গেষ্টের মধ্যে বক্সের দুইকোণে ঘামিয়ে রেখে আশ্বস্তভাবে পারচারি করছে রীশ আর একিক-ওদিক তাকাচ্ছে। তাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে যেন ব্যাপিয়ে পড়ল তার ওপর। বলল, 'আজ্ঞা, তুমি কী বল তো ঠাকমা। ঠাকমা থেকে নেমেই দেখি ঘোরে তাল দেওয়া। সেই কখন থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। পা বাধা করে না আমার? খিদে পায় না বা? সোরে তালি লাগিয়ে তুমি কোথায় গেছলে শুনি?'

তালি খলে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে স্বর্ণময়ী বললেন, 'বলছি, বলছি, ভেতরে চল, সব বলছি। আগে ঝুঁপুড় রাখ, হাত-পা ধো, খাওয়া-দাওয়া কর—'

'আমি বইপুস্তকও রাখব না, হাত-পাও ধোব না—তুমি আগে বল কোথায় গেছলে? কেন তুমি আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখল? রীশার গলায় বাগের চেয়ে অভিমানের সরটাই যেন এবার বেশি করে বাজে।

লোডজিও দেখে, হাত-পাখাখানা ঢেঁনে নিয়ে বাতাস করতে করতে স্বর্ণময়ী কৌতুহলভরা গলায় বললেন, 'কোথায় গেছলম জানি? গেছলম তোরাই তাকে ভালো চকোলেটের সখান করতে। কিন্তু পেলাম না—কোথাও পেলাম না, ভাই।

সবাই বললে কাল পাওয়া যাবে। এই দেখ না, তাড়াহুড়া করতে গিয়ে হেঁচ খেয়ে পায়ের কি অবস্থা!'

ঠাকুরমার পায়ের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল রীশা। বলল, 'ও মা, এ যে ক পড়ছে ঠাকমা! দাঁড়াও, দাঁড়াও, ওহুহ লাগিয়ে দিচ্ছি। তুমি বসো, একদম উঠ না কিন্তু—'

এক দৌড়ে দোতলার চলে গেল রীশা, ফিরে এল পলকের মতাই—ডেটল শিশি আর তুলো নিয়ে। ঠাকুরমার পাটা মূছে পরিষ্কার করে দিতে দিতে কাল 'তুমি এমন তাড়াহুড়া করে কাজ করে না, ঠাকমা! পড়ে গেলে কি হতো না তো?'

'কি আর হতো, মরে যেতুম! স্বর্ণময়ীর গলায় তেমনি কৌতুক।

ইস, মরে যেতুম বললেই হলো! মরতে যাবে কেন শনি? ও কথা কখন কখনে না—' রীশার গলায় যেন ভরসনা : 'ও-কথা বলতে নেই।'

দরজায় কলিং বেলের আওয়াজ পেয়ে রীশা বল উঠল, 'তুমি বসো ঠাকমা আমি যাচ্ছি। দেখ হয় মা এসেছে—'

স্বর্ণময়ী আদেশের ভাঁপতে বললেন, 'যাক যেন কলসনি, আমার আন্ত হ কেটে গেছে।'

রীশাও সঙ্গে সঙ্গে বল উঠল, 'তুমিও বল ফেলো না যেন আমার জন্য চকোলেট খ'জতে বেরিয়েচাল।'

কিকলে পায়ে বেড়াতে বেড়াতে রীশা বলল, 'আজ আর বেশি হটবো না ঠাকমা, কোথাও একটা কিস চলে। তোমার পায়ের কথা, হাঁটল আরও বাড়বে।

ওরা একটা ফাঁকা জায়গা দেখে বসলো। রীশা বলল, 'জানো ঠাকমা, আসছে মাসে আমার জন্মদিন। সেরিনে সঙ্গেহবেলা আমাদের বাড়িতে এবটা পাঁচি আঁজ আমার সব বন্ধুবান্ধবের আসবে। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো, আ! তুমি কিন্তু সেদিন ঝয়ের মত এরকম মহলা কাপড় পরে থাকতে পারবে না—এই বলে রাখলুম। একথানা ভালো কাপড় পরবে—পরবে তো : যদি না পরে, তোমার সঙ্গে আমায় ঝগড়া হয়ে যাবে কীকত।'

স্বর্ণময়ী চুপ। অশ্লিষ্ট মন তখন তার স্থির হয়ে ছিল চন্দনগরের সেই ঘরে যেখানে মূর্তি আর কেউ হয়তো খনসটি করছে, আর সামনের লাগ রোজবে ডোলা উনে কয়লা সাজাতে সাজাতে লুভদা বলছে, 'ঘরে এমন এক চিমটি আটা নৈই যে, তোদের দুখান ছুটি করে দিই। তোর বাকি কখন আসবে যা তো, কেউ?'

'কী, কথা কলো না কেন? স্বর্ণময়ীর হাঁটতে নাড়া দিয়ে রীশা বলল, 'পায়ের যতগা হচ্ছে : চল, তা হলে বাড়ি ফিরে যাই।'

সবিত্ত ফিরে পেলেন মনে স্বর্ণময়ী। রীশার হাত ধরে উঠে পড়লেন তিনি। বললেন, 'সন্ধ্যা হয়ে গেছে, চল। দাঁড়মাণ হয়তো এতক্ষণ এসে গেছেন।'

কোলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৌতুহলটা যখন চরমে গিয়ে পৌঁছলো, তখনই জিজ্ঞাসা করলেন কথাটি স্বর্ণময়ী : 'হা মা, আজ কি বাড়িতে কিছ আছে নাকি : কেউ আসবে?'

শো-কিস থেকে তোলা-কাঠের রূপ-শ্লেটগুলো বার করতে করতে সুসমা জবাব দিল, 'হ্যাঁ, ক-বেলা আমার বোন ভাঁপপোতে আসবে।'

আসবে যে কেউ, সে অন্যমন স্বর্ণময়ী অনেক আগেই করেছিলেন। সকাল-বেলা লক্ষ্মী আসতে-না-আসতেই সুসমা যখন হুকুম করল, গোরীর ঘর থেকে বাঁশের খুলে-ঝাড়টা বার কর তো লক্ষ্মী, আর বেলায় কাজ সেরে এ-বাড়িতে চলে আসিস, এখানেই খাওয়া-দাওয়া কর। আজ আমার কিছ করে দিতাম।

স্টিলের আলমারি থেকে কোরাল নতুন একসেট গু-মেলালেন। বাঁশের ওয়ড়-ঢাকা চাদর, জানলা-দরজার পর্দা, বেড়-কাবা, দুলা জেছ : আসবাব আরো স্বকককে করা হল, ব্যবসায় মূছে সিঁড়ি-গারাদা-ঘর যেন আয়নার মত চকচকে করে তুললো লক্ষ্মী। নতুন বাড়ি যেন আরো নতুন হয়ে উঠল।

ভাড়ার ঘর থেকে যখন আনাজ বার করা হল, ফ্রিজ থেকে ন্যামো হল ছাল-ছাড়ানো গোটা তিনেক চিকেন আর মাছের পান, স্বর্ণময়ী এগিয়ে যাচ্ছিলেন কথারীতে, সুসমা বাধা দিয়ে বলল, 'আজ আর আপনি হাত লাগাবেন না মা, রান্নার ফাঁরিত অনেক, আমার স্খিখমত আমি করে নেবো।'

স্কুল থেকে ফেরার পর পোশাক ছাড়ারও যেন তার সই ছিল না রীশার। ঠাকুরমাকে দেখতে পেয়েই কল উঠল, 'জানো ঠাকমা, বিকলে আমার এলাহাবাদের মাসীমা আসবে, মোসামাক আসবে, তপ দাদা তন দাদা আসবে। তপ দাদা তন দাদা আবার বাংলা কথা বলতে পারে না একদম। ওরা সবাই কখনোজা থাকে তো—ওরা কথা বলে ইংরিজিতে। তুমি তো ওদের কথা বুঝতেই পারবে না—আলাপ করবে কি করে কল তো?'

'কি করে করব, তুই কসিয়ে দিবি।'

স্টেট উল্ল রীশা বলল, 'আমি কি ছাই সব বকবো! ওদের কথার চান একবারে সাহেবদের মত, পাচ্ছবেই সুস কলে, কোরার কাছে জেনে নিয়ে তোমার কসিয়ে দেবো, কি বলে?'

অমল সেদিন একটা সকাল-সকালই অফিস থেকে ফির এল। সুসমার গলায় কাজ এখন প্রায় শেষ : মিউসেটের ভেতর ঘরে যাবে সাজানো ও-কককে শিলের পথে নানান রকম ভোজ। মনে মনে স্বর্ণময়ী তারই কথলেন সত্যের। সত্যিই বউটা কাজের। কত কম সময়ের মধ্যে গাছিয়ে কত রকমের রান্না সে একা-ভাঙে সেরে ফেলছে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়  
পরবর্তী আকর্ষণ ১০.০০

সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়  
দাগী ১০.০০ গুরু ৮.০০

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়  
শংকর নর্মদা ১৬.০০  
হেলেন ট্রয়ের হেলেন ১০.০০

আভ্যুতাম মুখোপাধ্যায় বনফুল  
অংকার ১০.০০ নবীন দত্ত ৮.০০

চন্দ্রভক্ত মৌর্য  
বেঞ্চ অ্যাণ্ড বার ১২.০০

পূর্বাভাস ১২.০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

সুর নৃত্যের উর্বশী ১০.০০

বাসুদেব বসু

নদীর নাম মহানদী ১০.০০

শক্তিপদ রাজগুরু

নিঃসঙ্গ যৌবন ১০.০০

ইন্দ্রজিৎ সেন

ফেড ইন ফেড আউট ১২.০০

তোমার দেশ আমার দেশ ১০.০০

নারায়ণ চক্রবর্তীর রহস্য উপন্যাস

সোনার হরিণ ১০.০০

রবার্ট লুই স্টিভেনসন

সুইসাইড ক্লাব ৮.০০

নিশাচর

প্রীপারাবত

প্রেমপ্রতিহিংসা সেফ ল্যাণ্ডিং

৩.০০

১০.০০

তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

শতাব্দীর মৃত্যু (তিন খণ্ড)

প্রথম ২০.০০ দ্বিতীয় ২৫.০০ তৃতীয় ২০.০০

শান্তিপ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাস ১০.০০

ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাস ১০.০০

রিংয়েন রজা আলী ১০.০০

মণ্ডল বসু কবি

৭৮ নম্বর ১৯৮১ সালের ১০ নং সংখ্যা ১০.০০

ইয়াসিনারী কাওয়াবাতা

ইজুনর্তকী ৮.০০

নারায়ণ সানাল

চীন ভারত লঙ্কা ২০.০০

সুজা

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ২০.০০

নিজের ঘরে গল্প লেখেন মূল আর চার টানের মত কল্পনা তত্ত্বপাশের ওলা থেকে নেন তার গল্পের সঙ্গম। তার কল্পনায় কাচনো থান ধাঁড়টা, সেই সপ্তে এরাই ফসল। এই মজার কল্পনা ওলা থেকে আসল, সাতবার তরুর একটি ফোঁফাট থাকবে হলে এইকি। হাজার হলেও আমার মা ফিরে আসবে, মনে হয় এখানে।

কিন্তু পরে যখন লেখলেন, সেতলার বসার ঘরে তীর ডাক পড়ল না, বাওয়ার টোকাও কোনরকম তদারকি করতে হল না তবু। যখন যখন রাজন একটা সর্বস্বত্ব পেলে যেন তিনি বরজার ফাঁক দিয়ে ফেট কুতর মতো পরতেছিল। তিনি বসে ছিলেন যেন সামনে দাঁড়িয়ে খাবি বিহীন হতে হতো তখন। বসে কল্পনাতী মোকে হার বউমা, বিশপক টেলিতে চায় না বাজাই তবু ডাক নি সে। রাণী একবার তুলেছিল খোঁচা জন কথা পেড়ে তাকে চুনিয়ে দিতে আর মোটেই দেরি হয় নি।

পতঙ্গের আরেক দলঃ স্বপ্নময়ী হলে ফলে উঠল। শিশু অর্থ সাচ্ছল্যে নয়, কিবাহিত জীবনকে জগাবান সে। জগাবান ওদের মাথায় কান্না।

সরমা কোরেতে গিয়ে এমন সময় লোক এসে। টেলিফোন অফিস থেকে। জরুরি লাইন পাওয়ার বিশেষ টোকা কান্না আগাই জমা দিয়ে এসেছিল অমল। লাইন অকাল আরও কটা দিন হয়ে গেলে তবু ওরা এসেছে ইন্সপেকশন করতে—কোথা দিয়ে 'ভাড়া' যাবে, রিসভাল বসার কোন ঘরে দেখতে। সরমা দেখিয়ে দিল, দেখিয়ে দিল, তারপর হাতখোঁজ দিলে হাবিয়ে গেলেন ডিপোতে বলল, আপনাকে আশীর্বাদ জানাব যা দেখবার আছে কিং কিছ মনে করবেন না, আমার কিছু দেখে হয়ে থাকে—

সেইদিনকার মত আরও মোটা চাল গেল। শেমিজ আর থানটা হাতে নিয়ে সবমোট বাগানে চকতে যাবেন সবময়ী। এমন সময় বরজার কেনটা অকাল বেজে উঠল। হাতে হাতে জিনিসপত্র তাড়াতাড়ি জমায়েত ওপর নামিয়ে রেখে এগিয়ে গেলেন বরজাটা খলোই বগান। বেশ বেশি হয়ে উঠল। হাবি বলে উঠলেন—ও, কুই! অথ আর—এমনও উঠি পেল কার ব্যাডুৎ সব বক। কুই! বউমা কেমন আছে? মজি, কেউ এরা সব ভালো আছে তো? তোরা শরীর কেমন?

ঘমস্ত বিমল ভেতরে ঢেকে যোগে বসতে বসতে বলল, আগে হাফ ফরমেট দাও, তারপর সব কলিছ। তুমি তো একটা পর একটা প্রশ্ন করে যাচ্ছ। আমি অত তাড়াতাড়ি জবাব দই কি করব?

শ্রুতিটা বলে দিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন স্বপ্নময়ী কটাটা ট্রেন বোঝাইছস?

বমল দিয়ে ঘাড় মুছেতে মজতে বিমল বলল, পর্বরয়'ছ থাডু ট্রেন, বাসেব জনে এত দেরি?

শ্রুতি কান মুখখানা লক্ষ করে স্বপ্নময়ী বললেন, সকাল থেকে খাস নি তো বিছা?

বিমল মাথা নাড়তে স্বপ্নময়ী ফেরে ফেরলেন, তা বলে নান করে নে, দটো ভাত বা। হোলেস গ্রিস ফেলো কি হল, খাবিছস কিছু?

কিছুই চকতে পারছি না, এখনও ঘাস দই লগাবো মনে হয়। ভাত কড়াই বাড়তে পছন্দে নেই—স্বপ্নময়ী জিজ্ঞাসা করলেন, বড় বউমার শরীর ভালো যাচ্ছিল না, দেখে এসেছিলম। এখন কেমন আছে?

প্রথমটায় বেশি বলতে চায় নি। কি হার কল? দার বস বড়ো মান যটা শবে উঠবে আর দশিনতায় ভুগবে? কিন্তু শেষ পর্যন্ত জগত রাখতে পারল না। বলল, যেমন ভালো যাচ্ছিল না—দিন কয়েক ওঠাইনি। বাগল কান দিয়েছ ডাক্তার। ওর জনে একটা ওরপে সবকিছু বগতই তো বলবাতায় আসা। স্বপ্নময়ীর হাত যেন খেঁচে গেল মনে হল—ওঠা হাটা গরল! ডাক্তার কি কলছে?

ডাক্তাররা যেমন বলে, আনিমিয়া—ভালো ভালো খাওয়াও চেয়ে নিয়ে যাও—

ওষধপত্র কি দিয়েছ?

একপাশ। দিলে কি হবে কিনতে পারছি কটা?

ভাতের থালটা ধরে দিলেন স্বপ্নময়ী, রান্নার কি আছে?

কি আর হবে একবেলা যেদিন পারছি দটো ফটুয়ে দিচ্ছি, নইলে মজি-চিড়ে ভরসা।

স্বপ্নময়ী সেন ক্রাইই অস্থির হয়ে উঠতে থাকেন—তা হলে চল, আমিও যাই তোরা সঙ্গে—

তাকে থামিয়ে দিয়ে বিমল বাল উঠল, তুমি এখন গিয়ে কি করবে? চিরাগদই তো হাড়ি-কুড়ি সংসার নিয়ে কটালে, এবার না য়ে কিছু কিন একটা, বিদ্রামই নিলে। এসেছ যখন থেকে যাও আরও কিছুদিন। পরবার পড়ল হোমসক নিষ্ক বসবাস। তা ছাড়া তোমার সউমার তো এমন বহুজলদি হয়—

বিমলের কথাটা ঠিক মনপড়ে হলো বলে মনে হলো না স্বপ্নময়ী। চুপ করে বইলেন তিনি।

সন্ধ্যার পর পাটের কাপড়খানা পরে পুজোর কসতে যাবেন স্বপ্নময়ী, রামায়ণ থেকে সরমা জিজ্ঞাসা করল, আজ কাপিস মাছ কুটাইলেন, মা?

কেন, হা পিস—প্রাচীন যা কুটাই

ওবেলা আপনায় ফেলে মাছ খায় নি। খেয়েছিলম আমি আর রাণী দার্শন্য। থাকবে নয় দিল—তো দেখছি দার্শন্য আছে।

ও হো, ওবেলা তেমনই ভাসল এসে হল, তেমনই খেয়েছে যখন



পরই। বেলা হয়ে গেছল, তাই দুটো ভাত খাইয়ে দিলাম। দু'পিস মাছ তাকেই দিলাম।" স্বপ্নময়ী গলা কেমন নয়ম শোনালো।

দিকের দিক জলোই করেছেন। তবে কিনা 'ও' মন্ডের মাছ—কললে রাখে থাকে—

গলা নামিয়ে সুখ্যা আরও দু'একটা কথা কি বলল, শুনতে পেলেন না স্বপ্নময়ী। গরম কড়ার মাহের ডরকারি ছাড়ার শব্দে তা চাপা পড়ে গেল।

ঢং ঢং করে বেজে ওঠার নেশা সঙ্গে একবার ঘড়ির দিকে মা' তুলে তাকালেন স্বপ্নময়ী। তারপর গিয়ে ঢুকলেন নিজের ঘরে। স্বপ্নময়ীর সমর পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোতে পারলেন না স্বপ্নময়ী। আরবার কেবলই মনে পড়ে বড় বড়মার শাঁশ পান্ডুর মা'খানা, উনের ধারে কিসের অক্ষম অগুট, হাতের রামার জোপাড়, আর অথচ অবহেলায় ঘুরে-বেড়ানো ছেলেরা দূরের শব্দে মা' দখল।

স্বপ্নময়ী বসলে, কীভাবে দাঁড়িয়ে এসে ফিরে গেলেন, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন।

একদিন, মারকটিং সেরে আমরা অনেক আগেই ফিরতাম, কিন্তু গাড়ির কতকগুলো নিয়েই বত রকমটা। বাবা যে গাড়িখানা চাচ্ছে, সুজিৎ সিং সেখানা বেছে না। তাকে অনেক কলঙ্কাটি করে বেশি টাকা বল করে বাবা ওই গাড়িখানা। বাবাকে অনেক দূর যেতে হবে, ভালো গাড়ি না হলে কি চলে?

একটু যেন অস্বস্তি হলেন স্বপ্নময়ী। প্রকৃতিত করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গাড়ি কিসের গাড়ি? অনেক দূর—কোথায় যেতে হবে?'

ও, তুমি শোনো নি বাকি টাকা মা' চারজন ভাই পড়তে পর পর, সেই ছটিতে দু' রায়ের জন্যে আমরা হলিও পারকায়নে দাঁকা বেড়তে যাব মোটের করে।

'তাই নাকি? কবে?'

'আমরা কেম্পতিবার—গুড ফ্রাইডে আগের দিন রাতে। কি মজা হবে চল তো টাকা মা'। সারা রাত গাড়িতে চড়ে—'

তোরা একা ছা'বে, না আর কেউ যাবে?'

'আমরা তিনজন, আর বাবার কলঙ্ক ট্রাপকা'কুরা তিনজন। সেই জন্যেই তো মারকটিং সেরে গাড়ির ব্যবস্থা করতে গিয়ে এক দৌঁড়া।

দেতলা থেকে ডাক পড়তেই রীনা বলল, 'চল টাকা মা, ওপরে চল।' কি কি জিনিস কেনা হল দেখবে চল।

মজার জিনিসগুলো নিয়ে তত আগ্রহী নয় রীনা, বড়টা নিজেরগলো নিয়ে। একটা একটা করে 'সাস্টিকের মোড়ক' বলতে লাগল রীনা আর বলতে লাগল, 'কলঙ্ক দিয়েছে এই দুটো—পোলিয়েস্টারের সাধারণ কামিজ আর লেস কলানো' সিলেক্স মালি। আর মা দিয়েছে—' অন্য একটা প্যাকেট খুলে রীনা বলল, 'এটা হল মিড স্কাট আর চীজ কটনের কাজ করা টপ।' কেমন দেখতে বল তো টাকা মা, আমাকে মানাবে না?'

'খুব সুন্দর মানাবে। তা আমাকে একবার পরতে দিবি তো?'

খোদা, তুমি কি এ জিনিস পরবে! তোমার কি এই পেশাক?'

রাতে থাকার বেড়ে দিয়ে কতকটা আবদারের ভাপিত সুখ্যা কলল, 'দিন দু'দিনের জন্যে আপনার ওপর একটা দায়িত্ব চাপাব, মা'।

দায়িত্ব? কিসের দায়িত্ব, মা? সবকিছুই হলে মা' তুললেন স্বপ্নময়ী।

'আমরা একটু বাইরে বেরোব। আপনার ছেলেরা বন্ধু দাঁপকা'বর মা'জেন, আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু মা'শকিল হচ্ছে কি, বাড়িতে কে থাকবে! লক্ষ্মীকে অবশ্য বলেছি, রাতে ওরা ভাইকে পাঠাবার জন্যে। আপনি যদি—'

'তা এতে এত 'শকতি' হবার কি আছে, মা? যাও না, ঘরেও এসে না দু' দিন—কোন চিন্তা নেই।' লক্ষ্মীর ভাই যদি রাতে আসে, তা হলে আর ডাকনা কিসের? বাও, যাও, নিশ্চিন্ত মনে ঘরে এসো।' বারো মাস তিকি দিনা সংস্কারের জোয়ালে আটকা পড়ে আছে, হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছে দিনরাত—ঘরে আবার কাইরে—সুযোগ স্বপ্ন পাচ্ছে, চল যাত্রা।

দু'কোণে বাটিটা পাড়ের কাছে এগিয়ে দিয়ে সুখ্যা কি একটা বলতে যাচ্ছিল, বাবা দিয়ে স্বপ্নময়ী কললেন, 'তুমি তো জানো মা, দু'খ আমি খাই না। আমাকে খবর একটু চিনি দাও, জল দিয়ে ভিজিয়ে নিই রটিখানা—'

পরদিন থেকে সেরে তোড়জোড় আরো বেড়ে গেল। স্বপ্নময়ীর রাতে ওরা যাত্রা করবে। তারা মনে মনে আর তিনটি দিন। সবচেয়ে আশঙ্ক যেন রীনা। জীবনে প্রথম এই সে কাইরে যাবে, আনন্দ যেন উপচে পড়ছে। থেকে-থেকে হঠাৎ এসে জড়িয়ে ধরেছে ঠাকুরমাকে, আর বলছে, 'তুমি খুব পলমত টাকা মা, তুমি এসেছো বলেই যাওয়া হচ্ছে। জানো টাকা মা, কি বলেছে জানো তো? বলাচ্ছে, আমরা ফিরে আসার পরই তোমাকে নিয়ে অনেক জায়গায় ঘুরিয়ে আনবে। কল্যাণটো দাঁকশেবর, চিড়িয়াখানা—তুমি তো কিছুই দেখে নি এসবের।'

কেনাকাটার যেন আর অলং নেই ওদের। শাড়ি-জুজ থেকে শুরুর করে থামো 'লক্ষ্য', ওঠার বাটারী পর্যন্ত হাজিরো জিনিস। গাড়িতে থাওয়ার জন্যে শব্দে না ধরারই কতরকম। সারাদিন ধরে ঘুরেছে আর ঢুকছে, রাখছে আর আনছে। এটা পাটায়, ওটা বদলায়, কেনটা গিয়ে ছোট, কোনটার রং পছন্দ নয়।

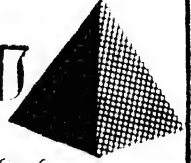
স্বপ্নময়ীর একবার মনে হল বলল, 'যাকে তো দু'টো দিনের জন্যে, তার জন্যে এত কি অহান! কিন্তু বললেন না কিছুই। বাইরে যাওয়ায় আনন্দে ওরা যা

চমক লাগানো আর একখানি বই

এবার পড়ুন - 'চিরঞ্জীব সেনের  
আর এক রহস্য

## পিরামিড রহস্য

দাম : দশ টাকা।



পিরামিড নিয়ে অনেক রহস্য, যেমন পিরামিড কে বা কারা তৈরি করল? কি করে তৈরি করল? ফারাওরা তৈরি করে নি এমন কি গ্রন্থাত্মের জীবও নয়। পিরামিডে রক্ষিত মমির নাকি অভিশাপ আছে। আছে নাকি? মমি যারা ছুঁয়েছে তারা অকালে মরছে। তাই কি?

নেপোলিয়ন একা পিরামিডের ভেতরে ঢুকেছিলেন কিন্তু ফিরে এলেন যেন ভূত দেখে ভয় পেয়ে। কি দেখলেন তিনি? কি শুনলেন? ভয় পেলেন কেন?

এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন রহস্য। পিরামিডের মাপ অনুসারে ছোট মডেল পিরামিড তৈরি করে তার নিচে কাঁচা মাংস সবজি বা ফুল রাখলে সেগুলি নষ্ট হয় না। দাড়ি কাটাবার পুঁজ রাখলে ভৌতা হয় না। আরও কত কি হয়।

তিনকোণে, চারনামা বিরাট পিরামিড আছে, আছে আমেরিকায় এবং আরও কয়েকটি দেশে। পিরামিডের নতুন রহস্য পৃথিবীকে ভাবিয়ে তুলছে। গবেষকরা নতুন রহস্য নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন। এ এক আশ্চর্য বই। দশ টাকা।

চিরঞ্জীব সেনের আরও কয়েকটি আশ্চর্য বই  
বারমুডা ট্রাঙ্গল ১০/- আবার বারমুডা ট্রাঙ্গল ১০/-  
প্ল্যানেট মিষ্টি ১০/-

অজয় বসু-র

ময়দানের নায়ক ৮-০০

আশাপূর্ণা দেবী

প্রতীক্ষার বাগান ১২-০০ বাছাই গল্প ১০-০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সাধুসঙ্গ ১০-০০ জলে দেখি জোনাকি ৬-০০

প্রেয়সী ও শ্রেয়সী ১০-০০ তৃতীয় রিপু ৮-০০

বিমল কর

সংশয় ১০-০০ পাশাপাশি ৮-০০

শক্তিপদ রাজগুরু

তিল থেকে তাল ১২-০০

মডল বুক হাউস II ৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-২

## পঞ্চ পরমেশ্বর

প্রেমচন্দ্রের আরণ্যিক রচনা

## পঞ্চ পরমেশ্বর ১৪

গুরু বিশ্বাসের উপন্যাস

মতিন মিয়ার মরিফত ১২

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

## আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্প ১০

অভীশ বর্ধন সম্পাদিত

## বিশ্ববিখ্যাত সায়েন্স ফিকশন ২০

ফেঙ্ক, আমেরিকা, ইংলিশ এবং রাশিয়ান সাহিত্য থেকে  
বিশ্ববিখ্যাত চারটি উপন্যাস ও তিনটি কাহিনীর অনুবাদ

## ভৌতিক অমনিবাস ১৪

দিল্লীর বিখ্যাত শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ শান্তি ঘোষের



## শিশু পালনের অভিধান ১৫

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

## চারটি উপন্যাস ১৫

মরানোনা জীবন/চিন্তামণি/আদ্যায়ের ইতিহাস/প্রতিবন্ধ  
তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি উপন্যাস

## তিন কাহিনী ১৫

মনোজ বসুর তিন মহৎ উপন্যাস একত্রে

## তিন কাহিনী ১৫

প্রমী দিব্যানন্দ

সাধুসন্তের জীবনে পরলোক ও  
অলৌকিক রহস্য ১ম ১৪ ২য় ১২ প্রেততত্ত্ব ১০

অভীশ বর্ধন সম্পাদিত

জুল ভের্ন রচনাবলী ৬ খণ্ড  
বেরিয়েছে।

## শার্লক হোমস্ অমনিবাস

চারখণ্ড সম্পূর্ণ ॥ তিন খণ্ড বেরুচ্ছে।

সর্বসাধারণকে ২০% ডিসকাউন্ট।

১৫ বসন্ত মাটাজি স্ট্রিট, কলি-১২

করছে কবুকে। কে জানে হয়তো, নিজ হলেও তিনি ওই রকমই করতেন।

বাকুর আগের দিনও সুরমা মেয়েকে নিয়ে বেয়েল বিকলে। টুকটাকি এক-আমটা জিনিস এখনও থাকি। কিন্তু নিজে সোজা থাকে ওয়া কেয়াডলা, অথবা মাপকদের কাড়ি। বেরোবার সময় সুরমা বলে গেল, 'আপনার ছেলে অফিস থেকে ফিরলে বলে দেবেন, আমাদের যদি ফিরতে স্নাত হয়, যেন চিন্তা না করে।' মনে করে বলবেন, মা—

চিন্তায়ই বলবেন, মা? সে চিন্তা করবে, আর আমি বলব না, তাই কি হয়?

মিকলের ফ্রেমের চশমাটা নাকের ডগায় লাগিয়ে বাকুর চিঠিখানা পড়লেন স্বপ্নময়ী। গুম হয়ে বসে রইলেন কতক্ষণ। তারপর মুখ তুলে বললেন, বউমাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে—এমনই অকথা।

সামনেই বেতের চেয়ারটায় বসেছিল অঠোরো-উনিশ বছরের যে ছেলেটি, বয়স অল্প হলেও, স্বপ্নময়ীর মুখ-চোখের অকথা দেখে মনের চেহারাটা বোধ হয় পড়ে ফেলল চট করে। তাই স্নাননা দেওয়ার সুরে বলে উঠল, 'আপনি অত ডাকবন না ঠাকুমা। ডাকার বলেছে, হাসপাতালে থাকলে বিশ্রাম হবে, নিয়ম করে ওষুধ-পানি পড়বে—তাই দেওয়া নইলে—'

স্বপ্নময়ী সে-কথার কোন জবাব দিলেন না। চশমাটা খুলে চিঠিখানায় চাপা দিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন বোসনের ঘরে। চোখে-মুখে জল ছিটোলেন কতবার, পাখার স্পীডটা বাড়ালেন, কমালেন, আবার বাড়ালেন; তারপর সদর দরজায় দাঁড়ালেন একটু। ফিরে এসে অস্থির গলায় বললেন, 'কিন্তু কাড়তে এখন যে আমি একা, ভাই।' অম না এলে তো বেরোতে পারছি না। তুমি একটু বাসা, অফিস থেকে ও ফিরলেই আমরা বেরিয়ে পড়ব। আমি বকে ততক্ষণ তৈরি হয়ে নিই।'

পলককো জনো একবার বারান্দার ঘড়ির ওপর চোখ ঝুলিয়ে নিয়ে স্বপ্নময়ী ঢুকে গেলেন তার নিজের ঘরে। পা দুটো তখন তার খরখর করে কাঁপছে, হাত দুটোও। জলে বাপসা চোখের সামনে ভেসে উঠছে পায়ে পায়ে জড়িয়ে থাকা মেয়ের কাড়া সেই বড় বউয়ের অভাববিস্মৃত করণ মন্থন। যতদিন পেয়েছে, সংসার টেনেছে, তারপর নেহাত যখন অপাকা হয়েছে, বিছানা নিয়েছে। ছেলে-মেয়েগেলার খেয়ালের শেষ নেই। চিন্তায় চিন্তায় বিমুর আহার-নিদ্রা লুপ্ত। নিজেকে কেমন কেন অপরাধী মনে হল স্বপ্নময়ী। এখানে না এলেই বোধ হয় ভালো করতেন। অম, আবার করল আর বড় বউমাও একরকম জোর করে ঠেলে পাঠালো তাকে, তাই তো তিনি এলেন। নইলে হাজার অভাব হলেও বিমুর সংসারে কোন অসুবিধাই তার ছিল না।

অমল এসে পড়ল, কিন্তু তার আগেই স্বপ্নময়ীর গেইগাছ সব শেষ। গোলাপফুল মার্কা চটা-ওটা টিনের সটকেটা চোখে পড়তেই অবাক হয়ে সে কিছ্র একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই গভীর উচ্চস্বাস নিয়ে স্বপ্নময়ী বলে উঠলেন, 'আমাকে এখন চন্দননগরে ফিরে যেতে হবে বাবা, বড় বউমাও খুব অসুখ—হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে—বোধ হয় বাঁচবে না।'

কথা শেষে খরখর করে কেঁদে ফেললেন তিনি।

ফিরেের পাঠানো ছেলেটির কাছে ঘটনাটা সব শুনেন মিল অমল। তারপর হালকা গলায় বলল, 'কিন্তু না-কাঁচার তো কোন কারণ দেখছি না—তুমি মিছেই অত উত্তলা হচ্ছে, মা। অর্নিময়—তাতে হয়েছে কি! সামান্য কিছ্র ওষুধ আর খাওয়া-দাওয়ার জাম্বল করলেই তো সেরে উঠবে।'

তা হয়েতো উঠবে—কিন্তু তুই তো ওদের অকথাটা জাম্বল তেমনি কাগো-জড়ানো জরী গলায় স্বপ্নময়ী বললেন, 'না বাবা, আমাকে আর আটকাস নি—প্রাণের মন ভালো গাইছে না। আজ আমি আমার—'

অমলকে আর কোন কথা কলার অবকাশ না দিয়ে, ভেজা-চোখে হনু হনু করে এগিয়ে গেলেন স্বপ্নময়ী। পেছনে সটকে হাতে 'ছেলেটি। দরজার গাড়ায় দাঁড়িয়ে হাতব্যাগের চেনটা একবার ঝুলেও কি ভেবে আবার বন্ধ করল অমল, তারপর শুন্য দৃষ্টিতে তারিয়ে রইল ঝাঁরের দিকে।

কথাটা শুনেন প্রচন্ড একটা ধাক্কা খেলো সুরমা। স্বপ্নময়ীর মুখের দিকে ফাল ফাল করে কতক্ষণ থাকিয়ে থেকে একসময় ঘোমার মতই ফেটে পড়ল যেন সে, 'ভাইয়ের সংসারে অভাব-দেখে মায়ের বোঝা তো কাঁধে চাপালে, এখন দেখলে তো তার আকুলখানা! অসুখ কি কারো করে না, না হাসপাতালে ভর্তি হলেই সবাই মরে যায়।'

টৌকাল বিছানো একরাশ কাগজের ওপর থেকে থেকে চোখ তুলে অমল বলল, 'তুমি অত উত্তেজিত হচ্ছে কেন? বোঝাই তো—মায়ের প্রাণ—'

'প্রাণে তোমার মায়ের প্রাণ! সুরমায় মধো থেকে শিক্ষার খোলস যেন সম্পূর্ণ খসে পড়েছে তখন, মায়ের প্রাণ—সে বুঝি শূন্য বড়র জনেই!'

তেমনি ঠান্ডা গলাতেই অমল জোকাবার চেষ্টা করল, 'সমস্যাটা তো তোমার কাড়ি পাহারা নিয়ে। যা হয় একটা বান্ধা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। কাল সকালেই আমি যাব সেন সাহেবকে কাছে।'

'তাই যেও। কিন্তু সেই সপো একটা কথা যেন সেন সাহেবকে বলতে ভুলো না। যত ডাড়াডাড়ি পড়েন, আমাদের জন্যে যেন একটা ভালো জাঁজো কুকুর তিন জোড়া করে সেন। কুকুর—আর বাই হোক, খেঁমানী অন্তত করবে না—'

অমল চুপ। মাঝে নিচু করে থাকিয়ে রইল টৌকালের ওপর বিছানো একখানা কালো শটের ওপর। যেন কিছ্রই শুনতে পায় না।

## মিরিক—না-যাওয়া

মঞ্জুভাষ মিত্র

না-যাওয়া মিরিক, সুন্দরী ধ্যানাঙ্কিকা তুমি মহাজ্ঞান  
চিন্তার ভিতর তুমি সঙ্গীতকারী দেবী, স্বরবতী বৃক্ষের মত—  
বাদলের রিমঝিম ঝংকারে ঝংকারে বাজে তোমার মধুর  
নামের পদ্যাবলী ; জলের বাগিণী মাথা রেখে শূন্যে থাকো  
অথবা অনপরাধ হৃদের সুন্দর তটে নৃত্য করো নানা ছন্দ-তালে  
ফুলের ধনুক হাতে সহসা উধাও হও সু-ময়ূরী স্বচ্ছ-সকালে  
কুমারী দেবীর মত বিবসনা গৌরাঙ্গী পার্শ্বদেশে ঘাস, ফুল, ঘাস  
মেঘপশুদের বিন্দু করো, স্বপ্ন দিয়ে স্নিগ্ধ করো ভিস্মিত হৃদয়  
বিচ্ছিন্নের গাউদে সমুচ্চ চুপন আলো দান করো গাঢ় সহবাস  
শূন্যে এ-সব কথা গ্রন্থে তপ্ত পথিকের উজ্জ্বল সংলাপে  
সকল সংবাদ রাশি লেকশহরের মত অনিবেদন যৌবন-স্ববতী  
সবেগে অপেক্ষা করে আছে যৌদিন সমাপ্ত হবে সমস্ত ভ্রমণ  
হয়ত সেদিন তুমি চিন্তার ভিতর এক অনবদ্য সঙ্গীতকারী  
শশা-লতাটির মত হবে স্বকে রুঢ় পদ্যাবলী বাদলের স্নিগ্ধ অম্বকারে

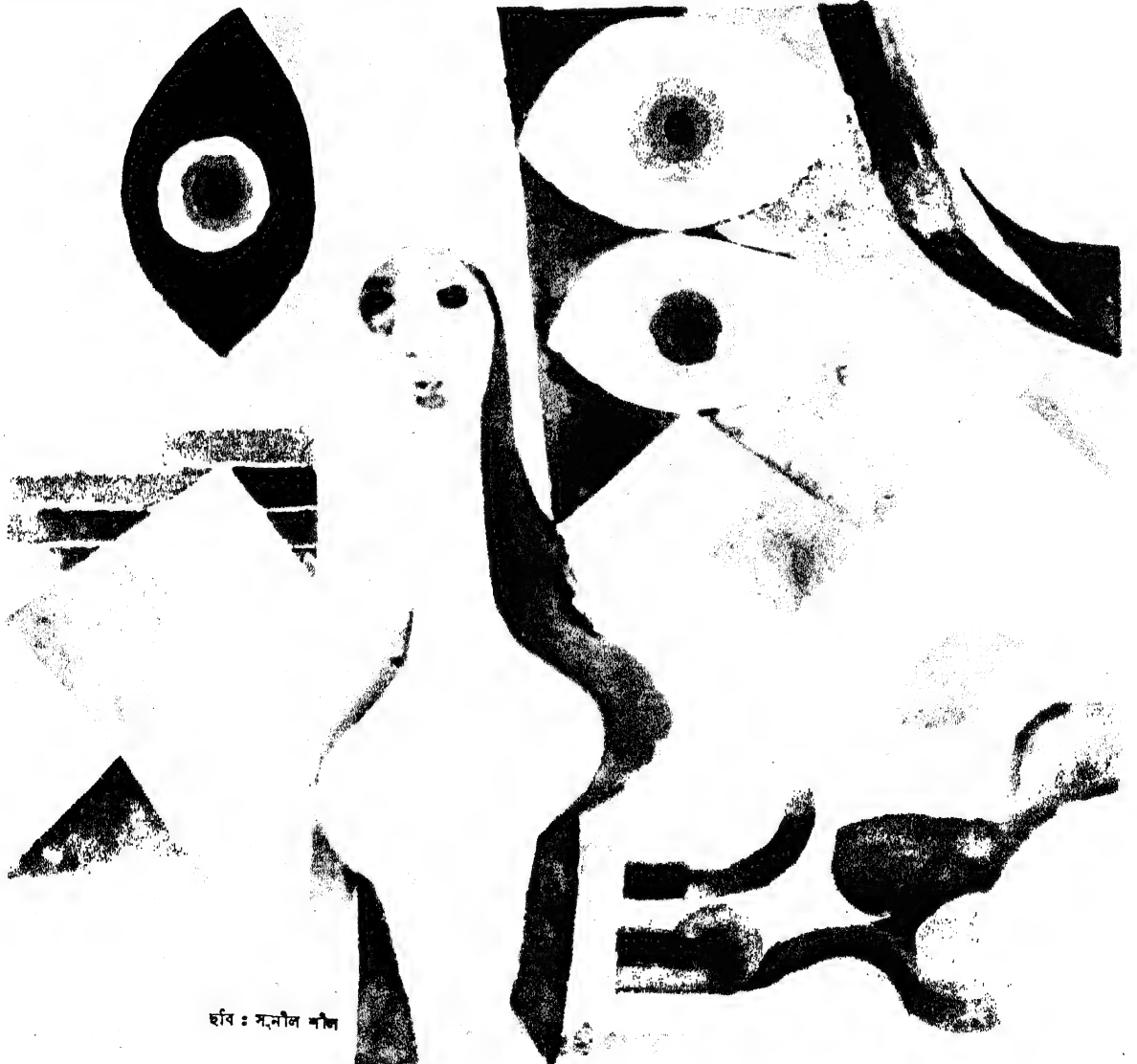
## পুরোনো দিনের গান

জয়ন্তী মিত্র

অনুরাগী কেউ বোধিছিল, 'ভালোবাসি'  
দুপুরিয়া সুখে শব্দিত কথকতা  
পাতার নুপুরে ছলকিয়ে ওঠে হাসি  
ধূ ধূ মাঠ জুড়ে স্বপ্ন অলোকলতা।

যারা এসেছিল পেরিয়ে দিনের সিঁড়ি  
উজল খুশীর আকাশ মুঠিতে পুরে  
অন্যলোকে আজ শূন্য তাদের সিঁড়ি  
মনকেমনের হাওয়া বয় রোদ্দরে

দুরলীন পথ গহন দু-চোখে আঁকা  
বিস্ময়ে আগে সীমান্তিনীর শাখা ॥



# কণ্টকলিত অতুলা ঘোষ

(নব পর্বায়)

১৩১

বিদেশী গাণমূলক সেবা-প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান বা মিশনারী প্রতিষ্ঠান, যাদের সকলেরই উদ্দেশ্য—তা সে হাসপাতালের মাধ্যমেই হোক, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই হোক বা ব্যক্তিগত কিছুর মাধ্যমেই হোক—লক্ষ্য একটাই : যারা অবহেলিত ও সমাজে অনাদৃত, তাদের সেবা করা। এই সেবাকার্য্য যেসব মিশনারী প্রতিষ্ঠান করে, হঠাৎ পশ্চিমবঙ্গের চিফ সেক্রেটারী খবরের কাগজে ঘোষণা করলেন যে, এইসব বিদেশী মিশনারী প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হবে। কারণ যাই থাক, এই ঘোষণায় অনেকেই একটু চমকে উঠেছিলেন। আরও বিস্ময়ের সৃষ্টি হল তার পরদিন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায়। মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে, এরকম কোন ব্যবস্থার কথা সরকার থেকে হয়নি। তা হলে জিনিসটা একটু ঘোরাল হয়ে দাঁড়াল। মুখ্যসচিবের নিজের বলার তো কোন ক্ষমতা বা অধিকার নেই। তিনি তো সরকারের মুখপাত্র! সরকার তাঁকে দায়িত্ব না দিলে তাঁর বলার অধিকার কোথায়? স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী যখন বলছেন, জানি না, তা হলে—। তাতে ব্যাপারটা শুধু যে বিস্ময়জনক হয়ে উঠছে তা নয়, একটু ঘোরালও হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংবিধান অনুযায়ী এইসব মিশনারী বন্ধ করারও কোন অধিকার নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ছাড়া এইসব মিশন চালু হতে পারে না। অনুমোদন প্রত্যাহার করার অধিকারও কেন্দ্রীয় সরকারের। সেখানে চিফ সেক্রেটারী হঠাৎ সংবাদপত্রে এরকম ঘোষণা করলেন কেন? সরকারের পদস্থ কর্মচারীদের শিক্ষিত হতে হয়। আবার সর্বোচ্চ পদে যারা যান, তাদের শিক্ষার সঙ্গে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান দুইই বাড়ে। এ ক্ষেত্রে এরকম অশুভ ও বিসদৃশ ঘটনা ঘটল কি করে?

কোন নিম্নপদস্থ কর্মচারী যদি এইরকম দায়িত্বহীন, অসঙ্গত উক্তি করতেন, তা হলে সঙ্গে সঙ্গেই তাকে সাজা পেতে হত। আমাদের দেশে সংবিধানসম্মত উপায়ে যে সব আইন আছে, তাতে উচ্চপদস্থ-নিম্নপদস্থ, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের অপরাধের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখা হয়নি। অপরাধের গুরুত্ব বিচার করে অপরাধীর দণ্ড বিধান করা হয়। এই অবস্থায় কি করে চিফ সেক্রেটারীর মত লোক এইরকম দায়িত্বহীন উক্তি করলেন যা মুখ্যমন্ত্রীর জানা ছিল না এবং মন্ত্রিসভাও এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেননি? এই প্রশ্নের সদুত্তর আজ অবধি পাওয়া যায়নি এবং যত দীর্ঘদিন যাবে, জনসাধারণ এই মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তত সমালোচনায় মূখর হয়ে উঠবে। কারণ, জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক মন্ত্রিসভার বা মন্ত্রীদের। সরকারী কর্মচারী যারা আছেন, তাঁরা তো মন্ত্রিসভার কার্যক্রম ও নীতি রূপায়িত করার জন্যই আছেন। আপন আপন

মন্ত্রীর কাছে প্রয়োজনমত তাঁরা নিজস্ব মতামত দিতে পারেন। কিন্তু সে মতামতের ভিত্তিতে তো প্রশাসন চলে না বা সেই মতামত বাইরে ঘোষণা করারও সরকারী কর্মচারীদের অধিকার নেই। সরকারের আদেশে ও নির্দেশে সেগুলা ঘোষণা করা হয়। গেজেট খুললেই দেখা যাবে সামান্য বদলির অর্ডারের নীচেও লেখা থাকে 'By order of the Governor' গণতান্ত্রিক দেশে রাজাপালকেও মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হয়। যেখানে পরিষ্কারভাবে সংবিধানে এই কথা লেখা আছে, সেখানে চিফ সেক্রেটারীর এরকম অসঙ্গত ঘোষণা যে খালি তাঁর যশ হানি করেছে তা নয়, সমগ্র মন্ত্রিসভার উপরও কালিমা লেপে দিয়েছে।

অথবা এ কথা কি মনে করবার কারণ উপস্থিত হয়েছে যে, মন্ত্রিসভায় এত মত-বিরোধ যে, সরকারী কর্মচারীরা যদুচ্চ আচরণ করবার সাহস পাচ্ছে? আর যদি সত্যিই মন্ত্রীদের মধ্যে ব্যক্তিগত মতবিরোধ থাকে, তার সঙ্গে সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্ক কি? তাঁদের কাছে তো মন্ত্রিসভার সম্মানতাই একমাত্র পালনীয় কর্তব্য। এ কথা লেখবার কারণ তো পুঁবেই ঘটেছে। অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে প্রায় বর্ষ-দ্বন্দ্ব প্রবৃত্তি হয়েছিলেন অন্য এক বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মচারী। আর সেইজন্যই সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা এই যে, এইসব মতপার্থক্য ও অসঙ্গত কাজের খুঁটিনাটি বিবরণ ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রের যারা প্রতিনিধি, তাঁদের ক্ষমতা অসাধারণ—এ কথা স্বীকার করলেও এটা তো সত্য যে, তাঁরা কোথাও থেকে সংবাদ সংগ্রহ করেন। এই সংবাদ পাবার সূত্রটি (Source) কোথায়? সূত্রটি নিশ্চয়ই মন্ত্রীদের এবং সরকারী কর্মচারীদের কাছে আছে। সংবাদ-দাতারা তো আর অশরীরী নন যে, যেখানে সংবাদ সৃষ্টি হচ্ছে, যেখানে কারো প্রবেশাধিকার নেই, সেখানে তাঁরা অলক্ষ্যে প্রবেশ করে সেই সংবাদ সংগ্রহ করছেন। আর 'ওয়াটার গেট'-এর মত অবস্থা এখানে এখনও হয়নি। অবশ্য বিদেশী মিশনারী সংক্রান্ত ব্যাপারটি চক্কানিনাদ সহকারে সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকেই প্রকাশ করা হয়েছে।

বিদেশী মিশনারী প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে, এই মিশনারী



ও মিশনারী প্রতিষ্ঠান আদিবাসীদের মধ্যে অনেক মানুষকে ধর্মান্তরিত করেছে, সেবাকার্যের সঙ্গে ধর্মান্তর গ্রহণের কোন যোগ নেই। নিছক সেবাকার্য্য যারা করেন তাঁদের জাতি, ধর্ম বর্ণ কিছুই মানতে নেই। এর ব্যতিক্রম যারা করেন, তাঁরা অন্য কিছু স্বার্থ নিয়ে আসেন, সেবাকার্য্য তার খোলস মাত্র। এমন অনেক 'অরফ্যানেজ' আছে, যেখানে খৃষ্টিয়ান ছাড়া কাউকে নেওয়া হত না। রাঁচী, হাজারিবাগ, পালামো, সিংভূম প্রভৃতি জেলায় এবং মধ্যপ্রদেশের বহু জেলায় ভাল ভাল মিশনারী প্রতিষ্ঠান আছে, সেবাকার্য্য যাদের একমাত্র লক্ষ্য। আবার অনেক জায়গায় দেখা গেছে যে, ভালভাবে সেবাকার্য্য করলেও ধর্মান্তর গ্রহণেও প্রভাবিত করা হয়েছে। এইসব প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলি আবার গোপন সুড়ঙ্গ-পথে রাজনীতিও করেন। যখন দেশ পরাধীন ছিল, তখন এরা বিভিন্ন সেবাকার্যের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় লোকদের চেয়ে বিদেশীরা কত ভাল, তা দেখাতেন এবং ইংরাজ রাজত্বের অবসান হলে এইসব সমাজে অনাদৃত ও অবহেলিত মানুষদের দেশীয় লোকদের শাসনে কি দুর্দশা হবে, তাও বোঝাতেন। আমার ব্যক্তিগত জীবনে উত্তরবঙ্গে দু-এক জায়গায় এবং বিহার ও ছোটনাগপুরে কয়েকটি জায়গায় এইসব মিশনারী কার্যকলাপের জন্য তাঁদের সঙ্গে কয়েকটি সংঘর্ষও হয়েছে। সেইজন্য অনেক বিদেশী মিশনারী প্রতিষ্ঠান যে বিচ্ছিন্নতাকামী কাজ করেন, এ কথা সত্য। কিন্তু সত্য বলেই সব প্রতিষ্ঠানকে তো একভাবে বিচার করা চলে না! এই প্রসঙ্গে একটা মর্মান্তিক সত্যও আমাদের উপলক্ষ্য করা প্রয়োজন। যেসব অঞ্চলে মিশনারী প্রতিষ্ঠান আছে, সেইসব অঞ্চলের কতগুলি অসহায়, অশিক্ষিত ও আমাদের সমাজে অবহেলিত মানুষের কিছুটা দুঃখ-দুর্দশা লাঘব হয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারও বেড়েছে। সাধারণভাবে যে সব একটু ভাল কাপড়-চোপড় পরা এবং শিক্ষিত লোকদের এইসব অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়, তারা অধিকাংশই খৃষ্টিয়ান হয়েছে। এবং তারা আহারে ও সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্যে কিছুটা মনুষ্যত্বের মর্যাদা লাভ করেছে। তত্ত্বাবধানের হয়তো তাতেও নাসিকা কুণ্ঠিত করে। কিন্তু এতে একটা দুঃসহ লজ্জা, গ্লানি ও কলঙ্ক যে, এইসব মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে না পেয়েছে সমাজে স্বীকৃতি, না পেয়েছে রাজা ও জমিদারদের অনুগ্রহ। কঠিন কঠিন কাজ এদের করতে হয়েছে—সবই অর্ধাসনে ও অনশনে। বনে-জঙ্গলে যেসব কন্দ বা মূল পাওয়া যায় এবং যে চাল সবচেয়ে নিকৃষ্ট, তাই এদের সংগ্রহ করে ক্ষমিবৃত্তি করতে হয়েছে। কঠোর পরিশ্রমের পরিবর্তে পেয়েছে হতাদর এবং দুঃমুষ্টি অন্ন; কোথাও কোথাও আবার গরুকে যে খুদ দেওয়া হয়, তার অবশিষ্টাংশ। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কঠোর পরিশ্রম করে যারা সমাজে শিক্ষিত অবস্থাপন্ন মানুষদের অন্ন, আহাৰ্য্য যদিও এসেছে, দিনান্তে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে এসেও মালিকের বাড়ি বসবার জায়গা পায়নি। আর যিনি একবার ছাতা মাথায় দিয়ে

## AN APPROACH TO LITERARY CRITICISM 15.00

Sri A. K. Roy, M. A. (Double)

কঠিন কথা যায় কি বলা সহজে? বলা যে যায় এ বইটি পড়লে তা সহজেই বোঝা যাবে। Aristotle, Dryden, Wordsworth, Col-ridge, Matthew Arnold, T.S. Eliot প্রভৃতি বিশ্বের সাহিত্য-তাত্ত্বিক যেসব কঠিন সাহিত্যতত্ত্ব পরিবেশন ক'রে গেছেন, তারই সহজতম অবতারণা করা হ'য়েছে এ গ্রন্থে।

পরিশিষ্টাংশে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ইংরেজী এম্.-এর VIIIth Paper-এর জন্য যে সমস্ত প্রশ্নো-ত্তরের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে, তা অতুলনীয়। কি নিয়মিত ছাত্র, কি প্রাইভেট পরীক্ষার্থী সকলের পক্ষেই এটি অপরিহার্য। বিশেষ ক'রে প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের পক্ষে, এটি একটি দিকদর্শন বিশেষ।

## বঙ্গের রত্নমালা

কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ১০.০০

## বঙ্কিম অভিধান (১)

অশোক কুণ্ড ২০.০০

## চৈতন্যোত্তর সহজিয়া

## চারিটি পুঁথি

পরিতোষ দাস ১৫.০০

## মোপাশাঁ পঞ্চবিংশতি

অনুবাদক : বিমল দত্ত ১০.০০

## Astrology for the Millions

Shakuntala Devi 8.00

## Bharati Book Stall


Book-sellers and Publishers,  
6 Ramanath Mazumder Street,  
Calcutta-9 Phone : 34-5178

মাঠে কাজ তদারক করে এসেছেন, তঁর শারীরিক কষ্ট দূর করার জন্য অয়োজনে প্রাচুর্যের কোথাও অভাব হয়নি। তাও নিভুতে নয়—এইসব ক্রিস্ট, খেটে-খাওয়া মানুষদের সামনে। সংখ্যাতত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে এইসব না খেটে খাওয়া, অপরের পরিশ্রমের উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। কিন্তু অর্থ ও সামর্থ্যে তাঁরা গণ্যমান্য। সেইজন্যই এদের এই অসহায়তার সুযোগ নিয়ে যদি কেউ অধিকারের অপব্যবহার করে, তা হলে তাদের দণ্ড দেবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ও প্রশাসনে যথারীতি মাথা, তাঁদের কি দণ্ড পাওয়া উচিত, সেটা বিচার্য বিষয়। স্বাধীনতার পর তপশীলভূক্ত ও আদিবাসীদের জন্য অনেক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু সেইসব ব্যবস্থার কতটুকু যারা এখনও অবহেলিত অনাদৃত, অস্বীকৃত—তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে, সেটাও বিশ্লেষণ করার বিষয়। আর 'সিডিউল্ড কাস্ট' বা তপশীল-ভূক্ত—এই কথাটার মানে কি? ইংরাজের আমলে যে ব্যবস্থা হয়েছিল, তাই এখনও চলে আসছে। ফলে দেখা যায় 'সিডিউল্ড কাস্ট'দের মধ্যে যারা লোকসভার বা রাজ্য আইনসভায় যান, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই বিত্তশালী বা প্রভাবশালী। অধিকাংশ মানে শতকরা ৮০ জন। কেন্দ্রীয় সরকারের যে 'সিডিউল্ড কাস্ট' বা ট্রাইব-এর কমিশন আছে, তঁরা এ সম্বন্ধে কতটা খোঁজখবর রাখেন? যদি না রাখেন তবে কেন রাখেন না? একটা মামলারী কমিশন করাই কি সরকারের দায়িত্ব শেষ হয়? সিডিউল্ড কাস্ট বা ট্রাইব-এর লোকদের মধ্যে থেকে কেন্দ্র এবং রাজ্যে মন্ত্রী হন। এইসব লোকেরা যেসব সমাজ থেকে এসেছেন, আজ মন্ত্রীদের মধ্যে অধিকাংশেরই সেইসব সমাজের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। ক্রমাগতই দেখা যাচ্ছে থাক সৃষ্টি হচ্ছে। যেখানে সমাজ থেকে থাক তুলে দেওয়া স্বাধীন দেশের পক্ষে একটি অবশ্যপালনীয় কতবা, সেখানে নতুন করে থাক সৃষ্টি হচ্ছে।

এই 'তপশীলভূক্ত' ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যায় না, কেমন গোলমালে। অনেকে কপশীলভুক্তির কথাটা জানেনও না। তপশীল-ভুক্তির আসল উদ্দেশ্য ছিল, যেসব সম্প্রদায় সুযোগ-সুবিধা পায় না, সেইসব সম্প্রদায়ের একটি তালিকা তৈরি করা, যাতে সরকারের পক্ষে বৃকতে সুবিধা হয় যে, কি করে সেইসব সম্প্রদায়কে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যায়। কিরকম গোলমালে ব্যাপার, একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। পশ্চিমবঙ্গে রাজবংশীরা তপশীলভুক্ত, কিন্তু বিহারে ও আসামে রাজবংশীরা তপশীলভুক্ত নন। ধুবড়ীতে যে রাজবংশী আছে এবং কুচবিহারে যে রাজবংশী আছে, তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক পুরোপুরি বজায় আছে, বিয়ে-থা-ও হয়। কিন্তু সরকারী দলিলে পশ্চিমবঙ্গের রাজবংশীদের অনগ্রসর বলা হয়েছিল, কিন্তু আসামের বা বিহারের রাজ-বংশীদের অনগ্রসর বলা হয়নি। সিডিউল্ড কাস্ট ও সিডিউল্ড ট্রাইব কমিশন এই বৈষম্যের

ব্যাপারে কেন্দ্রের কতখানি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বা কেন্দ্র এই ব্যাপারে কতখানি দি- করেছেন? এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে যে সিডিউল্ড ট্রাইব-এর ছেলেরা মেথারী হলেও সাধারণ হস্টেলে জায়গা পায়নি। ১৯৪৭-এর আগে কেউ কেউ এই পার্থক্য দূর করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। যেমন, পূর্ববঙ্গীয় প্রদেশ্যে নিবারণ দাশগুপ্ত, বকুড়ায় প্রদেশ্যে গোবিন্দ-প্রসাদ সিংহ। কিন্তু সীমায়িত শক্তি নিয়ে তঁরা সব অবহেলিত মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেননি। রাঁচীতে বহু বছর আগে—বোধ হয় পঞ্চাশ বছর—বিড়লাদের অর্থানুকূলে আদিবাসীদের জন্য একটি হস্টেল হয়েছিল। কিন্তু সেই হস্টেলে শিক্ষায়তনের অন্য ছেলেরা কেউ যেত না। গান্ধীজী এ নিয়ে অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কংগ্রেসের কার্যক্রমেও এই সমস্যা একটা বড় স্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে এই কাজে সাধারণ কর্মীরা কখনই বেশী যোগ দেননি, মুষ্টিমেয় কর্মী এই কাজ করেছেন। কারণ, আমাদের রাজনৈতিক শিক্ষা ছিল আংশিক। দেশবাসীদের একটা বড় অংশকে বাদ দিলে দেশ স্বাধীন হলেও তাকে সমৃদ্ধ করা যায় না, এই বোধ অনেকেরই ছিল না। আর স্বাধীনতার পরে এ বিষয়ে যদিও অনেক নিয়মকানুন হয়েছে, সর্বের পেছনেই আছে কলাগকর্ম এবং কতবাকর্মের প্রেরণা—প্রায় কাঙালীভোজনের মত। নিজেরা উত্তম আহাৰ্য খেয়ে সামান্যতম আহাৰ্য দিয়ে কাঙালী-ভোজন করানো হয়। নাম হয়েছে 'নরনারায়ণের সেবা'। হাজার হাজার বছরের অন্যায়ের প্রতি-বিধান করছি, এ কথা কেউ ভাবে না। যারা প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করে তারাও ভাবে না যে, এত বছর ধরে যে মানুষকে হত্যার, অনাদর, অবজ্ঞা করে এসেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন। ভূমিহীনদের ভূমি দিয়ে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের কিছু চেষ্টা হচ্ছে, তার পেছনেও আছে নানাবিধ যুক্তিতর্কের অবতারণা। কোন পার্থক্য যে থাকে উচিত নয়, এটাই যে সবচেয়ে বড় যুক্তি, যতদিন বৈষম্য-পার্থক্য থাকে, ততদিন স্বাধীনতার অমর্যাদা করা হয়, এই বোধ যঁরা 'ক্লাস-লেস সোসাইটি' চাইছেন, তঁদের মধ্যেও বিশেষ দেখা যায় না। তত্ত্বকথায় তঁরা এ কথা স্বীকার করেন, কিন্তু বাস্তবে এই কাজ রূপায়িত করার কোন চেষ্টা বা ইচ্ছা আছে, তা মনে হয় না। ক্লাস-লেস সোসাইটি-টার স্বীকার প্রবক্তা, তঁাদের মধ্যে স্বীকার কুতরী, তঁাদেরও চারদিকে আহাৰ্য, বিহার, শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সামাজিক মর্যাদার বেশ একটা সীমাবদ্ধতা গড়ে ওঠে। অবহেলিতরা হয়তো মুষ্টিভিকার পরিবর্তে ঠোঙায় বা খলিতে আহাৰ্য পায়। কিন্তু পার্থক্যের কোন পরিবর্তন এখনও দেখা যায়নি এবং মনে হচ্ছে দেখা যাবেও না। বিদেশী মিশনারীদের কার্যকলাপ লেখার সঙ্গে এই বিষয় আনা অনেকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে : কিন্তু এই বিষয়টি অত্যন্ত প্রয়ো-জনীয় এবং যতদিন এই ব্যবধান লুপ্ত না হবে, ততদিন স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিকদের মধ্যে অধিকাংশই মনুষ্যত্বের মর্যাদায় বঞ্চিত থাকবে।





রূপসী সাজের  
কাপড়ে  
রূপের মাদুর্য  
ঝরে!

১০০% গবিয়েস্টার ঘার জর্জেট শাড়ী

নতুন অবদান

টিশলন

গবিয়েস্টার টিস্যু শাড়ী

বোম্বে

আলোড়ন জাগানো নতুন



# ডাইং



নতুন ফ্যাশনের ১৩-বর্ষ।



# সেই সময়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৫৫ ॥

ঠিক সাহাগবালার মতন থাকোমণির শরীরও এমন জামতে শূন্য করেছিল। এটা বুঝি এই ছোট জলচৌকিখানিই গণ্য; নিচের ওলার এই দরদ লানের জলচৌকিতে যে নসবে ভূতা মহলের কঠোর যোমেন তপ হাতে আসবে তেমন তার চেহারাতেও পুঁতি লাগবে। কয়েক বছর আগেও থাকোমণির দেহ ছিল যেন পাথরে কেদা, সাধারণ রমণীদের তুলনায় একটু বেশী লম্বা বলে তার মেদাবহীন শরীরটি ছিল দাঁতমতন অকণ্ঠশীল। এখন তার চিবুক দুটি ভাজ পড়েছে, হাত-পা গোল গোল হয়ে এসেছে এবং আঙুলের ডগগুলো যেন সব সময় টিস্টিস্টিস্টি করে।

মাঝখানে দু'মাস থাকোমণি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায় এই জলচৌকিটি প্রায় বেদখল হবার উপক্রম হয়েছিল। মানদা দাসী এখানে বাসছিল জীকিয়ে। মানদা এবং অনন্যাদার খাবার হয়েছিল যে থাকোমণি আর বাঁচবে না। প্রায় সেই একই দশা হয়েছিল তার হাত-পা নাড়ার ক্ষমতাও চলে গিয়েছিল। একলা ঘরে পড়ে থেকে চি'চি' করতে, তবু, ভাগ্যক্রমে সে আরও বেঁচে উঠলো।

তারপর এই জলচৌকি থেকে মানদা দাসীকে সরানোর জন্য প্রায় দশদ্বিগুণ করত হয়েছিল থাকোমণিকে।

সেই অসুস্থের পর থেকেই থাকোমণি এ রকম ক্ষীণ হতে শুরু করেছিল। শেষ পর্যন্ত সাহাগবালার মতনই পরিণতি তার হবে কি না এই কথা ভেবে প্রায়ই থাকোমণির বন্ধ কাঁপে। তা ছাড়া, এই জলচৌকিটা যে এখানে অঁকড়ে ধরে আছে বটে, কিন্তু সে টের পেয়ে গেছে, যে-কোনো মহাবর্তে তার পায়ের তলা থেকে মাটি ধসে যাবে। মানদা দাসী এবং অন্যান্য কয়েকজন সব সময় তার দিকে লুকন-চুকন তাকায়। থাকোমণির আর ভালো লাগে না, কিছু ভালো লাগে না।

নকড় অর দুয়োখন মাছ কুটছে চাটালে বসে। থাকোমণি অলসভাবে চেয়ে আছে সেদিকে। বড়বাবুর কুটমবাড়ির কীয়েকজন আজ নেমন্তন্ন খাবেন এ-বাড়িতে, এই হাতে বেশী মাছ এসেছে। কুটতে কুটতে দু'একটা টুংগো বাঁ দিকে ছুঁড়ে ফেললে

দুয়োখন, আর নকড় তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। এভাবে প্রায় সেরখানেক মাছ সরিয়ে ফেলে ওরা বাইরে বিকি করে আসবে। থাকোমণি ইচ্ছে করে দেখছে না। ওরা কি ভাবছে, ওরা থাকোমণির চেয়ে ধুলো দিতে পারবে? থাকোমণি সবই জানে। তবু, নির্ভীক ভাষায় দিন আর ওদের সঙ্গে খাট খাট করতে থাকোমণির ইচ্ছে করে না। মাছের দরদে যা হিসেব দিলে নকড়, তা শুনেনও তাড়াতাড়ি হবার কথা। বলে কি না, রাইমাছের মন বায়ো টাকা, এ কী গণের মূল্যকে পেয়েছে? ন টাকা সাড়ে ন টাকা মন দরে পাকা রাই বাড়িতে এসে বয়ে দিয়ে যায়। থাকোমণি তবু ওদের কাছ থেকে চুরির টাকার কথা চায়নি।

টাকাপরসার প্রতিও লোভ কমে গেছে থাকোমণির। কী হবে টাকা দিয়ে? এক সময় ভাবতো বটে, 'বন্দু নাই কড়ি বই' কিন্তু বয়েস অসুচালের দিকে চল পড়ায় সে উপলব্ধি করেছে সে কড়ি থাকলেও মেয়েমানুষের জীবনে নিরপত্তা নেই। বলতে গেলে থাকোমণি তো টাকার ওপরেই শূন্য আছে। তার শখ্যার নিচে গোড়ায় বঁধা বঁধা টাকা আর খুচরো পরসার। বিশ বৎসর ধরে সে যা উপার্জন করেছে, তার থেকে পাই:পরসার খরচ হয়নি, সবই জমা আছে, তবু থাকোমণির অন্তরে অশান্তি ব আগুন ধিকি করে চলে কেন?

এই যে ইদানীং সে নকড় বা দুয়োখনের কাছ থেকে চুরির খবরা নেয় না সেইজন্যই বরং সে কিছু খাতির পায়। থাকোমণির এবং বিধ পরিবর্তনে নকড় আর দুয়োখন খুব অত্যন্তের সঙ্গে গেছে, বাপারিধি আগা-পাশ-তলা কিছুই তারা বুঝতে পারছে না। সেই সোহাগবালার আমল থেকেই এই দরদালানের জলচৌকির অধিকারিণী প্রত্যেকটি চুরির আখলারও ভাগ না নিয়ে ছাড়কি। থাকোমণি যে এখন আর ভাগ চায় না, তার মনে কি তার গভীর কোনো মতলব আছে? 'দিবাকরের বলে থাকোমণি যে-কোনো দাসী বা ভৃত্যের চাকরি যখন খুশী থেকে দিতে পারে। থাকোমণির ক্ষমতা সাহাগবালার চেয়েও বেশী, কারণ সে দুলালের মা।

রাতিরবেলা সব কাজ মিটে গেলে নকড় থাকোমণির ঘরের দোরের সামনে এসে জিজ্ঞেস করে, ও থাকোমণি, ঘুমলে নাকি, আসবো? পিছনে গোলপাতার ঘর অনেক দিন হলো ছেড়ে এসেছে থাকোমণি। দিবাকরের অনুগ্রহে সে নিচের মহলেই একটা পাকা ঘর পেয়েছে। ঘর থেকে যখনই বেরোয়, তখনই থাকোমণি সে ঘরের দরজায় তাল লাগায়। হুটহাট কেবে এ-ঘরে করসুর প্রবেশ করার হুকুম নেই। নকড় বয়েসে থাকোমণির চেয়ে যথেষ্ট বড় তো বটেই, এক সময় সে ছিল থাকোমণির উপরিষ্ঠ, তবু এখন সে থাকোমণিকে দাঁচি বলে সম্বোধন করে। প্রথম দিন যে আচমকা থাকোমণির ঘরে ঢুকে তার ওপর বলাৎকার করতে এসেছিল, সেই নকড় এখন থাকোমণির ঘরে ঢোকার আগে বিনীত কণ্ঠে অনু-মতি নেয়।

থাকোমণি বলে, না। ঘুমুইনি, আর ভিতরে আয়।

এই ভূতা মহলে নকড়ের মতন শয়তান আর ছুটি নেই। চুরির শোণায় সে এমনই পাগল যে পিঁপড়ের পেট টিপে মধু বার করতেও সে ছাড়ে না। কয়েক বছর অন্তর অন্তর নকড়ের গড় মরা। আবার সে গায়ে গিয়ে একটি করে বিয়ে করে আসে। এবং অন্যান্য ভৃত্যদের মতনই, দেশের বাড়িতে একটি বড় থাকলেও এখানেও সে একজন সিঁগলী রাখে। গ্রামের বাড়িতে কাবার জন্য তো বছরে ছুটি মতো একবার, তাও বেশী দিন থাকা চলে না, পরসার টানে নিজেরই তড়াতাড়ি ফিরে আসে।

নকড় আবার ঘন ঘন সিঁগলী বদলায়। যথেষ্ট খরস হলোও তার শরীরটি এখনো অপরের মতন এবং সারা দিন ধরে সে এত রকম কাজ করতে পারে যে তার স্বভাবের বতই দোষ থাকুক, প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো কাজে নকড়কে প্রয়োজন হয়।

নকড়ের সঙ্গে থাকোমণির শারীরিক সম্পর্ক নেই অনেকদিনই। নকড় এখন মগলা নান্দী এত দাসীকে নিয়ে খুব মেতে উঠেছে। তা থাক, সেজনা থাকোমণির কোনো খেদ নেই। নকড় এখন তার সেবা-দাস।

ঘরে ঢুকে নকড় দেয়ালের এক কুলুঙ্গি থেকে একটা বটুয়া বার করে মেঝের ওপর আসনিপতি হয়ে বসে। থাকোমণি বসে থাকে তত্পরতার ওপরে। বটুয়াটা খুলে কল্লেক বার করে গাছা সাজে। শূন্য করে নকড়। সারা দিনের পর এই শয়তান জনা উন্মত্ত হয়ে থাকে থাকোমণি। এই নকড় তাকে এক সময় গাঁজার নেশা ধিরিয়েছে। এখন কয়েক ছিলিম গাঁজা না টানলে থাকোমণির ঘুমই আস না রাতে। থাকোমণি নিজে যে গাঁজা সাজতে জানে না তা নয়, তবু অনা কেউ সেজে দিলে ভালো লাগে। কিছুদিন হলো নকড় আবার নিজেই গায়ে পড়ে এসে এটি তার নিয়েছে।

নকড় ছিলিম সেজে ফুঁ দিতে দিতে ডান হাতের কনুই বাঁ হাত দিয়ে চোখে মেরি এগিয়ে দেয় থাকোমণির দিকে। তার একদা-শিখা থাকোমণিকেই সে প্রথম টানটি লাগাবার সম্মান দেয়। থাকোমণি দু'হাতে কল্লেকটি ধরে প্রথমে কপালে টেঁকায়, তারপর শিবন্তে হয়ে টানতে শুরু করে। পট পট করে বীজ ফাটার শব্দ শু্য, অনেকখানি ধোঁয়া বৃক টেনে দম বন্ধ করে থেকে কল্লেকটা সে ফিরিয়ে দেয় নকড়কে। তারপর এইভাবে কল্লেকটি হাতবদলাবদলি হতে থাকে। ছিলিম শেষ হলে নকড় আবার সাজতে বসে।

নকড়ের চেয়ে থাকোমণিই আগে বৃন্দ হয়। চোখ বজ্র থেকে সে একটু, একটু মাথা দোলতে থাকে। নকড়ের এর পরও অন্যত বহু কাজ আছে। সে একটু পরেই উঠে যাবে, তার আগে থাকোমণিকে খুশী করার জন্য বদলো, থাকোমণি, থোমার হাটুতে আত্র বেদুন আড়ে। তারপরই সে হাত বাড়িয়ে থাকোমণির পদসেবা শুরুর করে। থাকোমণি চোখ মেলে ঘের-লাগা দৃষ্টিতে নকড়ের দিকে চেয়ে থাকে, কোনো কথা বলে না।

ঠিক সেই সময়টিতে কোনো ছাত্র-বাজেন্দ্রাণীর সঙ্গে থাকোমণির কিছু তফাত থাকে। বস্তুত উপরতলা ও নিচতলায় অনেক কিংবা একই ভাবে মলে। অনেক কাহিনী-কিসাস পড়া যায় যে কোনো সোচ্চারিণী রানী প্রতি রাতে এক একজন প্রেমিক পত্রমুখে অন্তরমহলে নিয়ে আসতেন। এই ভূতা-তম্বে থাকোমণি এখনো সন্মাজী, সেও কি তা পারে না? এই তো নকড়ের মতন একজন সা-জোয়ান তার পা টিপছে। এই নকড় এক সময় তাকে অসহায় অবলা পেয়ে মাটির পুতুলের মতন ভাজ করে চেয়েছিল।

একটু পরেই এক পা তুলে নকড়ের বৃক একটা ঠোকার মেরে থাকোমণি বলে, যা, এবার তুই যা। নিতান্ত বধ্যের মতন নকড় উঠে পড়ে এবং যাবার সময় দরজাটি টোন দিয়ে যায়। দিনের পর দিন থাকোমণি চুরির পরসার বখরা চায় না, তার বদলে একটা করে পায়ের ঠোকার তো সে দিতেই পারে।

নকড় চল গেলে থাকোমণি জ্বন্দ শূন্য করে, ক্রমশ তার কল্পা বাড়তে থাকে। গাঁজার ধোয়ার মতন

এই কান্নাও তার শ্রমের ঐক্য, চোখের জলে বার্লিশ ভিজিয়ে থাকোমার্গ শ্রমের থাকে।

দিবাকর এখনো সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেনি থাকোমার্গকে। শরীরে আর জোর নেই দিবাকরের, তবু এখনো সে নিজের মহলের প্রভু। বাড়ির কতাদের কোনো নজর নেই বলে দিবাকরের ক্ষমতা এখন অনেক বেশী। একা আর বেশীদিন সামাল দিতে পারবে না বলে সে গ্রাম থেকে তার স্নাতকপত্রকে আনিয়েছে। ছেলোটির নাম পণ্ডানন, অগপ্তক দিবাকরের এই পণ্ডাননই উত্তরাধিকারী। ছেলোটি মাথায় টোঁর কাটে, সম্মেহ হলেই উড়ুনি গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। গ্রামে দিবাকরের বখশত বিবয় সম্পর্কিত, সেইজন্য ছেলোটির স্বভাব হয়েছে বাবু ধরনের। একদিন নবীনকুমার বাড়ি থেকে নিগত হচ্ছে, সেই সময় পণ্ডানন তার সামনে পড়ে গিয়েও কোমর বাঁকিয়ে নিচু হয়ে হাত জোড় করে থাকেন। ছোটবাবু অবশ্য লক্ষ্যই করেনি কিন্তু দূর থেকে দিবাকর দেখতে পেয়ে পণ্ডাননকে কান ধরে হিড় হিড় করে ভেতরে টেনে এনে খড়ম পেটা করে কপাল ফাটিয়ে দিল। যেকোনো উপায়েই হোক, দিবাকর তাব এই স্নাতকপত্রটিকে মানুষ করবেই।



দিবাকর থাকোমার্গকে হাতে রাখতে চায় বিশেষ উদ্দেশ্যে। এক একদিন সম্ভাবনা! দিবাকর ডেকে পাঠায় থাকোমার্গকে। ওরা স্বামী স্ত্রী নয়। তবু যেন ওদের অনেককালের দাম্পত্য সম্পর্ক। এমনভাবে কথা হয়ে সুখ দুঃখের। বাইরের চোখের একটু আঘাত, সংবাদ দিবাকরের কাছ থেকেই শুনতে পায় থাকোমার্গ। গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে তিন চারবার মাত্র থাকোমার্গ এ বাড়ির বাইরে গেছে।

দিবাকরের কাছ থেকেই থাকোমার্গ এই প্রত্যাহতা খরবটি শুনলেন যে বড়বাবুর নতুন বউমা গান গায়।

শুনে থাকোমার্গ চক্ষু কপালে তুলেছিল, বলে কি, একে বিধবা, তার ওপর গান করে নতুন বউ। এ কেমন বংশের মেয়ে।

থাকোমার্গের অধিবাস দেখে দিবাকর বলেছিল, হ্যাঁ বো, থাকো, আমি নিজের কান শুনানি। আদালতে ফৌজদারী এমিলো, আমি সে কাগজ নিয়ে ওপরে গিচি বড়বাবুকে সহী করতে, হঠাৎ শুনিনি কতামার ঘরে কে গুনগুনোচ্ছে। কী অন্যচ্ছিত ভেতে দাক, কতামা আমাদের সতী সর্বাঙ্গের, তেনার ঘরে এ অজ্ঞ-কুজতের মেয়েকে ঢোকালেন বড়বাবু! গগনানারায়ণ বিধবা বিবাহ করায় এ বাড়ির দুজন রসই ঠাকুর চাকরি ছেড়ে চলে গেছে পাপের জগে।

বড়বাবুর সময় কুসুমকুমারীকে দেখেছে থাকোমার্গ। নতুন বধুর রূপ দেখেই কী, বিধবার কপালে সিঁদুর, এটা ভেবে সেদিকে তাকাতেই ভয় করছিল তার। সবাই যখন উল্ধাশুনি দিচ্ছিল, থাকোমার্গের জিহ্বা নড়ল।

—এবার কোন্‌দিন দেখাবি হিজড়ে মাগীদের মতন বাবুদের কউ খেই খেই করে নেতা কচ্ছে। —অমন কতা বলানি গো, অমন কতা বলানি! বড়বাবুর অমণাল হলে যে আমাদেরও অমণাল।

—তোকে আমি বলে রাখছি, থাকো, মিলিয়ে নিস, এ বাড়ি থেকে মা লক্ষ্মী বিদায় নিয়েছেন। এত বড় বংশ এবার ছাগলে মড়াবে। ছোটবাবু যেমন দুহাতে টাকা খাচ্ছিলেন তেহে কোন্‌দিন না দেখলে হতে হয়। আমরা যে তো কেউ বেশী জানে না। মাতার ওপর তো মাকার কেউ নেই—

—ও বাড়ির বড়বাবু আর আসেন না। —তেনার ভীমরতি হয়েছে, তিনি খার কী করবেন!

কথার কথার দিবাকর আসল কথাটা পাড়ে। পণ্ডাননকে থাকোমার্গ নিজের ছেলের মতন দেখে, জুকে শিখিয়ে পড়ে মানুষ করে নেয়। দিবাকর চোখ বুজলে তো পণ্ডাননকেই গোমস্তাগিরি করতে হবে। সুতরাং থাকোমার্গের সঙ্গে পণ্ডাননের মিল না হলে নিজের মহলের রাজ্যশাট ঠিক ঠাক চলেবে না।

থাকোমার্গ পোড় থেকে অনেক কিছু শিখেছে, সে দিবাকরের আসল মতলবটিকে ঠিকই বোঝে। দিবাকর চিরকালই স্ত্রীলোকদের সঙ্গে রক্ত ব্যবহার করে, শয্যালীর্ণানীদেরও সে একটিও নরম কথা বলে না। অথচ ইদানীং থাকোমার্গের সঙ্গে তার ব্যবহার একেবারে মধ্যমাখা। এমনকি নিজের পানের ডিবে থাকোমার্গের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে বলে, নে থাকো, একটিল পান যা।

দিবাকর থাকোমার্গকে তার ছেলের বিপক্ষে দাঁড় করতে চায়। দিবাকর জেনে গেছে যে দুলাল তার মাকে একটুও ভক্তিশ্রদ্ধা করে না। ছোটবাবুর পেয়ারের লোক দুলাল এখন সময় সময় দিবাকরের ওপরেও চোখ রাঙায়। সেই জন্যই দুলালের বিরুদ্ধে একটা জোচ বঁধা দরকার, তাতে থাকোমার্গকেও দলে টানতে হবে। থাকোমার্গের যে এতবড় অসুখ গেল, দুলাল একদিনের জনও তার মায়ের চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করেনি। সুতরাং অমন ছেলেকে আর থাকোমার্গের দরকার কী?

থাকোমার্গের সত্যিকারের দুঃখের জায়গায় ঘা দেয় দিবাকর। সে ভেতরে ভেতরে পড়তে থেকেও বলে হ্যাঁ, পাঁচু তো আমার ছেলেরই মতন। একটু ভাবিসবার জ্ঞান কম, তা বয়সকলে শৃঙ্খলে যাবে। আমি বলি কি, পাঁচুর বে দাঁও, তার বউ এসে এখানে থাকুক।

একটা নয়, ইতিমধ্যে দু-দবার বিবাহ হয়ে গেছে পণ্ডাননের। কোনো স্ত্রী-ই বর্তিন। আবার বিয়ে তো দিতে হবেই দেখে শনে, তার আগে ছেলোটা খুঁটে খেতে শিখুক।

—পাঁচুর বউ এলে তখন তাকে আমি জলচৌকি ছেড়ে দেবো। এ মানদা হারামজাদীকে কোনদিন দোকা না!

দিবাকর এমন মুখ করে থাকে যেন মানদকে সে চেনেই না। অথচ থাকোমার্গের অসুখের সময় মানদা যে জলচৌকিতে গাটি হায়ে বসেছিল সে কি দিবাকরের অনুমতি ছাড়াই? দিবাকরের শযায় হয়তো এখনো মানদার শরীরের গন্ধ লেগে আছে। থাকোমার্গ সব জানে। দিবাকর যতই চরুর হোক, সে এটুকু বোঝে না যে মা কখনো তার সন্তানের বিরুদ্ধে যায় না।

থাকোমার্গের খুব বাসনা ছিল যে দুলালের পত্নী সুবালাকে ক্রমে ক্রমে সব হিসেবপত্র বুঝিয়ে দিয়ে একদিন তাকেই নিজের জায়গায় বসবে। কিন্তু তা হলো না। সুবাল নিজের যেমন দেমাকী, দুলালও হয়েছে সেরকম। দুলাল তার মাকে ধমকে বলেছিল, তার বউ ভন্দরলোকের বাড়ির মেয়ে, সে কখনো দলী-বাদীগিরি করতে যাবে না। ছুতোয় মিস্তিরির মেয়ে হলো ভন্দরলোক আর দুলালের নিজের মা দাসী!

দুলাল এখন প্রাণপণে ভুললোক হবার চেষ্টা করছে। বাগানের মধ্যে একখানি এঙেরের ঘরে সে তার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকে। সে বা সুবালার ভুলেও কখনো দাসদাসী হতে পা দেখে না। তাদের জন্য খাবার পাঠাতে হয় দুলাল ঘরের মধ্যেও জামা পরে থাকে, জুতো পরে দেয় এবং হুকোয় তামাক খায়। নিজের সে বই পড়ে এবং বই ছেলেকে পড়তে দেখায়। এমনকি দুলাল নিজের জন্য একটি চাকর পর্যন্ত রেখেছে।

থাকোমার্গ দেখা করতে গেলে দুলাল বা সুবালার বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলে, একবারও ভেতরে গিয়ে বসতে বলে না। নাতিকে নিয়ে সোহাগ করা আর থাকোমার্গের এ ক্রমে হলো না। নাতি তাকে চিন্দালি না ভালো করে। কেন যে মায়ের ওপর

দুলালের এত রাগ তা থাকোমার্গ বুঝেও বুঝতে চান না। সেটাও বুঝলে তার জীকনের আর বাকি রইলো কী!

একদিন দুলাল তা অতি নিদ্রাভাবে বুঝিয়ে দিল।

থাকোমার্গের একটাই শৃঙ্খল স্বপ্ন স্থান আছে। কোনো ভাঁমি কিনে ঘর তুলবে, পুকুর কাটাবে, ধান চাষ করবে। দাসীবৃত্তি ছেড়ে সে আবার চষার বাড়ি গৃহিণী হবে। সেরকম পরয়া তো তার রয়েছেই, কিন্তু একা তো যাওয়া যায় না, ছেলে-বউকে সঙ্গে নিয়ে না যেতে পারল সুখ কোথায়? কিন্তু দুলাল এ প্রস্তাব কিছুতেই কানে তোলে না। তবু সে যতই বকুনি বকুনি দিক থাকোমার্গ প্রায়ই এই কথাটা বলে।



একরত্তে থাকোমার্গের মাথার এই স্বপ্নটা আবার বেশী চাণিয়ে উঠলো। গাঞ্জার একটু দম দিলেই তার না-কেনা জামি, না-কাটা পুকুর, না-তোরি বাড়ির চমৎকার ছবি ফুটে ওঠে মানস নেত্রে। সেই জন্যই সে জ্বদে। সে রাতে থাকোমার্গ আর ছেলে পারলো না একলা ঘরে। নকড় ছুটি নিয়ে দেশে গেছে, দিবাকরের ঘরের দ্বার বন্ধ, শুনশান করছে নিজের মহল। একা একা গজা টেনে থাকে মর্গের বেশী ঘোর এসে গেল, সে বাইরে এসে বাগানের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে বাজা মাতে ল গলো। দুলালদের দরজায়। ঘুম ভেঙে উঠ দুলাল দরজা খুলতেই থাকোমার্গ তার হাত ধরে নেশাজড়িত কণ্ঠে আতঙ্কিতম কাহুতি মিনতি করে বললো, অ দুলে, চ না, আমরা গিয়ে যাই সেখানে মারে পুতে সূপে থাকবো, তোর বউকে আমি মাড়ায় করে রাখবো, অ দুলে, চ না যাই। একুনি চলে যাই—

দাঁতে দাঁত চেপে হিংস্র কণ্ঠে দুলাল বললো, বেবুশে মাগী, এত রাত্রে এফাঁস চলানী কন্তে, এতটুকু হায়া নেই কো, তোর মুখ দেখলে পাপ হয়! ফের যদি কোনদিন—

বলতে বলতেই মস্তবুদ্ধি সঙ্গে পদাঘাত করলো দুলালচন্দ্র। বিফলিত যন্ত্রে থাকোমার্গ, ধরাশায়ী হতেই সমাজে দোহ বন্ধ করে দিল তার শত্রু।



পরদিন ভোর থেকে থাকোমার্গকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। তাড়া খাওয়া বনা শব্দ মতন ছুটেছে ছুটেছে থাকোমার্গ একসময় গম্ভা পেয়ে গেল। ভেতরে প্রথম খেয়াল গণ্ডা পার হয়ে ওপরের মানুসদের জানে জনে ভিজ্ঞাস করত লাগলো, ওগো, তিনকুড়ি গাঁ কোড়ায় বলতে পারো? আমি সেখানে বসবো, ওগো তোমরা আমার পথ বলে দাও—। দু, চাওজন তাকে সহায়্য করার চেষ্টা জানতে চয় কোন জেলা, কোন পর্বগন, কোন মৌজা। কিন্তু থাকোমার্গ মনে সে সব কিছুই জানে না। দানকুড়ি আর তিনকুড়ি পাশাপাশি এই দুটি গ্রামের নাম ছাড়া তার আর কিছুই মনে নেই। কিন্তু শৃঙ্খল গ্রামের নাম শনে পথ বা দিকের সন্ধান দিতে পারে না কেউই তবু থাকোমার্গ আশ্বের মতন ছুটেই থাকে। সে তার স্বামী শব্দরের জিটের ফিরে যাতে চায়। সেখানে পৌঁছাতে পারুক বা না পারুক, সে আর পিছন পানে চাইবে না। (কমশ)

# অরণ্যদেব







# মানবজমিন

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

(মোট)

সাতসকলে কে যেন 'শ্রীনাথবাবু! শ্রীনাথবাবু!' বলে ডাকডাকি লাগিয়েছে। এ সময়টায় শ্রীনাথের ভারী একটা আমেজের ঘুম হয়। আধোঘুম আর আধো-জাগরণের মধ্যে সে ভারী একটা আয়েসী ব্যাপার। বিরক্ত হয়ে উঠে দরজা খুলে দেখে, প্রেসের আর এক প্রফারিডার মানিক গম্ভীর। বহুকাল দেখা নেই।

কিরে? কী ব্যাপার? আয়, ভিতরে এসে বোস।

জিব কেটে মানিক বলে, বসব কি? স্বয়ং বদ্বাবু বাইরে গাড়িতে বসে আছেন। ঘরদেয় একটু সামলে নিন: আপনার খবর করতে এসেছেন।

বলিস কি? বদ্বাবু! বলে শ্রীনাথ ভারী ব্যস্ত হয়ে লোকজন ডাকডাকি করতে লাগল।

হাঁকডাকে বৃন্দা আর নতুন ধার একটা কাজের লোক দৌড়ে এসে ঘরদেয় সারতে লাগে। শ্রীনাথ কোনোক্রমে মুখ ধুয়ে কাপড় পাশ্টে নেয়। তারপর ফটকের বাইরে দাঁড় করানো পুরোনো প্রকাশড হাউস গাড়িটার কাছে এগিয়ে যায়।

আজ্ঞে, আর্পান আসবেন ভাবতেই পারিনি।

বদ্বাবুর বয়স শ্রীনাথের মতোই হবে। ফসি, গোলগাল বনেদী চেহারা। বাবা কষ্ট করে কারবার তৈরি করেছিল। এবাও বাবসা জানে। প্রেস ছাড়াও অন্যান্য কারবার আছে। প্রচুর পরস।

বদ্বাবুর পরনে পাজারি আর ধুতি। কঁধে শাল। মুখটা কাঁচিফর, গম্ভীর। একটু হেসে বলে, আর্পান সেই যে অসুখের খবর দিলেন তারপর আর দেখা নেই। খাবার আমলের লোক, কী হল কী হল ভাবতে ভাবতে চলে এলাম।

আসুন, আসুন, বড় ডাগ।

বদ্বাবুর সঙ্গে মানিক আর ব্রাইডার ছাড়াও বাড়ির চাকর এসেছে। সে একটা মাথারি বাড়ি নামাল সামনের সীট থেকে। ফলটল আছে, অনুমান করে শ্রীনাথ।

ভাবনখর অল্প সময়ের মধ্যেই ফিটফট হয়ে গেছে। এমন কি, টোঁবলে ঝাওয়ার ভাসে টাটকা ফলও হাজির।

বদ্বাবু চেয়ারে বসে বললেন, কী হয়েছিল বলুন তো!

শ্রীক মজা।

এখন কেমন আছেন?

এখন ভালই।

চেহারা কিছু খারাপ দেখাচ্ছে না।

শ্রীনাথ একটু হেঁ হেঁ করল।

বদ্বাবুর হাতে হীরের আংটি। মজোর আংটি, পজারি আংটি। গলায় সোনার চেনে গহ্বিকারের লকেট। মসু একটু সুকস ছড়াচ্ছে গা থেকে। শ্রীনাথ বিগলিত কদয়ে অবাক চোখে কেবল দেখল আর দেখল। স্বয়ং বদ্বাবু তার বাড়িতে! কিবাস হওয়ার কথা?

বদ্বাবু বলে, শরীর খখন তেমন কিছু খারাপ নয় তখন কাল থেকে প্রেসে আসতে থাকুন না কেন। কাজ টাঙ্গ তেমন কিছু করতে হবে না। সুপারভাইজ করবেন একটু।

ঘাড় চুলকে শ্রীনাথ বলে, শরীরের জন্য নয়। মনটাই কেমন হয়ে গেছে। দূরে যেতে ভয় ভয় করে। বদ্বাবু, উদাস মুখে বলে, ভয় তো আমারও। বাবা মরে যাওয়ার পর থেকেই কেমন একটা মরনের দয় এসে ধরেছে। কেবল ভয় পাই, এই বৃষ্টি কে কোথায় মরে গেল, আর বৃষ্টি তার সঙ্গে ইহলন্ডম পরজন্মে আর দেখা হল না। মনটা খুব দুর্বল হয়ে আছে সেই থেকে। গত দুদিন কেবল আপনার কথাই মনে হচ্ছে, শ্রীনাথবাবু! বেশি আছেন তো! তাই আজ ছুটে এসেছি।

দেখি একটু ভেবে।

ভাববার কিছু নেই। আপনার এখনো পঞ্চাশ পোরেনি, বড়োও হননি। এই বকসে অত ছাবড়বার কী আছে? চলে আসুন, বাদবাকি যে কদিন বাকি সবাই মিলেমিশে থাকি।

শ্রীনাথ একথায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ত্যা খবর পেয়ে ভিতর বাড়ি থেকে প্রচুর খাবার আর চা পাঠিয়েছে। বদ্বাবু বসে বসে খসেখসে খেল। চায় চুমুক দিয়ে বলল, এ মায়গাটা বেশ ভাল।

বদ্বাবু উঠল। শ্রীনাথ গাড়িতে তুলে দিয়ে এল তাকে। তারপর ঘরে এসে ভাবতে বসল। এখন থেকে কলকাতা আগে হাতের নাগালে মনে হত। আজকাল মনে হয়, কলকাতা বৃষ্টি সাত সমুদ্রের পর। কি করে অতদূর রোজ হবে শ্রীনাথ?

\*

বউদিমনি নোটিশ দিয়েছে, এ বাড়িতে আর থাকা চলবে না। নিতাই বাজারের দিকে বসিততে সন্তান একখানা ঘর পেয়ে গেছে। তার নিজের এলেমে নয়। বউ পাঁচ বাড়ি দিকে কিরের কাজ করবে। তার স্নোজগারেই এই ঘর নেওয়া।

আজ নিতাই সকালে উঠেই ঝোপড়াটা ভাঙেছিল। একটু আগে তার তলিপতলপা মাথার কর বউ বসিততে রওনা হয়ে গেছে। ফাঁকা নড়বড়ে ঘরখানা ভাঙতে তেমন কষ্ট নেই। তবে চালের ওপর একটা সডেজ লাউডগা। সেটার জন্যই যা কষ্ট। কুঁসি কুঁসি লাউ ফলেছে মেলা।

বঁশের ঝুঁটিগুলোর গোড়া নড়বড়ে, বেড়ার বঁধন পড়ে গেছে কবে। চালে খড় পড়ে গোবর। পোকামাকড় কিস্তর বাসা করেছিল। নিতাইয়ের সঙ্গে গেমেলোরও অপ্রিয় গেল।

লাউডগা সমেত চালের ঝড়গুলো নামিয়ে নিতাই খাম মোছে। গাছটা বদি বটে এই আশার বঁশ বাখারি দিয়ে চটপট একটা মচান খাড়া করতে লেগে যায় সে। মলে, এসে তাকো দেয়, হল তোর? একটু, বাদেই ভুইমালী এসে এ জায়গা চৌরস করবে। হাত ঢালা।

কী তো। মচানটা বেশি দই আগে।

তোর ঐ লাউগাছ থাকবে ভেবেছিস? মালী

এসে একটানে উপড়ে ফেলে দেবে। খামোখ গাটীছিস।

কখাটা সঁতা। নিতাই দয় ধরতে একটু জিরেয়। বলে, বিড়িটাড়ি কিছু আছে? সে না।

তা দেয় মলে। লোকটা চলে যাচ্ছে। বিড়ি ধরিয়ে দিয়ে বলে, বিয়ে করল বলে জায়গাটা গের তোর। দিবা ছিল।

ভৈরবী ছাড়া সাধনভজন হয়, শুনোছিস?

মলে সঠিক বিশ্বাস করে না নিতাইকে। আখের পুরোপুরি অবিশ্বাস করতেও ভয় পায়। ব্যাটার বগে কাজ হয় না ঠিকই। আবার যদি এব খাটা লেগে যায়! তাই সে নিতাইয়ের মূখের ওপর তেমন ঠাটাইয়াকি করে না। তারও ভালবাসা আছে। মলে বলে, সামস্তর বেটি আবার ভৈরবী হল কবে থেকে?

ভৈরবী কি পেট থেকে পড়ে রে ব্যাটা? বানিয়ে নিতে হয়।

কবে আর বানাবি বাপ? নিজেই জটা কেটে দাড়ি কামিরে জল্লোক বনে গেল।

নিতাই বিড়িতে লম্বা টান মারে। নিম্নলিত চোখে লাউগাছটার দিকে চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ। বলে, পটালপুরে এক মহান্ত এসেছে। কপাল থেকে জ্যোতি বেরোয়। সেই জ্যোতিতে হোমের আগুনে জ্বালে। বিকেটা দিখে আসতে হবে।

তোরও তো অনেক বিদ্যা শুন।

দূর! এখনো কত শেখার আছে। বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, বউদিমনি তাহলে এখানে ক্রোত করবে!

তাই তো বলল ভুইমালীকে।

ক্রেত জ্বলে যাবে।

মলে অবাক হয়ে বলে, কি করে জার্নাল?

এখানে পঞ্চমুণ্ডির আসন ছিল রে ব্যাটা। কুঁত ইলেক্ট্রাসিটি জমে আছে এখানে। গাছ কি বঁচে?

তবে লাউগাছটা বঁচল কি করে?

সে আমি ছিলাম বলে। আমি না থাকলে ভুতেরা ডিনখা নাচনে নাচতে লাগবে। দেখিস, বলে দিলাম।

মলে একটু হাসে। অনিশ্চয়তার হাসি।

নিতাই বিড়িটা শেষ করে অন্যদিকে চেরে বলে, খাবু জানে?

তা কে বলবে?

খবু জানতে পারলে রাগ করবে। আমাকে খাবু বড় ভাল চোখে দেখে।

মলে, উদাস মুখে বলে, খাবু রাগ করলেই যা কি? মা খখন বলেছে তখন সেইটেই হাকিমের আইন।

বউদিমনি বিয়েটা পব্বন্ত থাকতে পারলে কে হত। বউদিমনি বলেছিল আমাকে ফাইফরমান খাটতে এলাহাবাদ নিয়ে যাবে। ভেবেছিলাম, এলাহাবাদ থেকে হিমালয়টা কাছে হয়, একবার ঘুরে আসবো। অঘোরাবাঘর চরণ দ্বান্যো দর্শন হয়ে যাবে।

অঘোরাবাঘা কে রে?

নাম শুনিসনি? তিন হাজার বছর এক ঠাই বসে সাধনা কর যাচ্ছে। গায় পট পট করছে পোকা। জটা মাইলখানেক লম্বা।

বলিস কি?

শুধু কি তাই! সাপের মতো খোলস একশো বছর পর পর। হিমালয়ে অর্ধে ঠিকানাটা আমাকে এক সাধু লিখে দিয়ে।

মলে, সান্ধনা দিয়ে বলে, তা বা তাকে কি?

বুঝানো বেজার করে নিতাই বলে, আর তো  
মতে বলছে না।

বলবে, বিয়ের দেরী আছে। সেই ফালগুনে।

ফালগুনের আরে দেরী কি?

এলাহাবাদটা কেন্দ্রিক বধ তো!

হিমালয়ের গোড়ায়। সেখানকার জল হাওয়া

থবে ভাল শুনছি। মেলা সাধু আসে।

মল্লু ওঠে। বলে, ঘর ভাঙা হয়ে গেলে

গাফিস। বাশবাখারিগুলো বাগানের উত্তর দিকে

গলার নিচে জমা করে যাস।

তোকে ভাবতে হবে না। যা।

লাউগাটা ভুইমালী এসে উপড়ে ফেলবে।

কম্বু নিতাই সেটাকে কেন্দ্রিক বেতে পারছে না। আবার

টুটে মাচানটা বঁধতে লেগে যায়। মালীটা মহা

খাঁচড় লোক। কিছু বলতে গেলেই খেঁচকিয়ে ওঠে।

লাউগাটার কথা তাকে সাহস করে বলবে কিনা

ভবে পার না নিতাই। বিড়ির একটু তামাক জ্বিব

দয়ে খুঁ করে ফেলে নিতাই আপনমনে বলে, দুই

কাপা। দুনিয়াটাই তো তোর নিজের। এ জায়গা

এ জায়গা বাঁচিস কেন? সব সমান। বাজারের বিস্তৃত

টা, চাউজেরবাড়ির কাগানও তা।

ঝোপড়া ভেঙে জিনিসপত্র চালার নিচে সরিয়ে

রখে নিতাই মস্ত বকুল গাছটার তলায় বসে

জরোচ্ছল। হঠাৎ মনে হল, যাওয়ার কথাটা বাবকে

হানানো দরকার।

সেই ভাবা সেই গিয়ে ভাবনঘরে টীকি মারে

নতাই।

টীকিচেয়ারে বসে ইংরাজি একটা খবরের কাগজ

কালে নিয়ে পেনসিল দিয়ে কী যেন কাটাকুটি

দেছে বাবু। খবরের কাগজের পিছনে একটা সুন্দর

তো মেয়েছেলের ছবি।

বাবু!

উ! শ্রীনাথ কাগজ নামিরে বলে, নিতাই নাকি?

আজ্ঞে, একটা কথা বলতে এলাম।

আমিও তোর কথাই ভাবছি। ভিতরে আর।

নিতাই ভিতরে ঢুকে মেঝের ওপর বসে।

আমার তো ঝাটিপাটি ওঠাতে হল এখন

দেকে।

কথাটা না বুঝে শ্রীনাথ বলে, কি বলছিস?

আজ্ঞে চলে যেতে হচ্ছে।

কোথায়?

বিস্তৃত ঘর নিয়েছি।

সে কি! আমার যে তোকে ভীষণ দরকার।

কাল থেকে প্রেসের চাকারতে যাবো। তুই রোজ

আমার সঙ্গে গিয়ে সারাদিন থাকবি, আবার আমার

সঙ্গেই ফিরে আসবি।

ঠিক এই সমস্ত লাউগাছটার কথা মনে পড়ল

বড় হু-হু করে উঠল বুক। নিতাই ডাক করে

কেদে ফেলে।

কান্নাধিস কেন?

বউদিমণি তাড়িয়ে দিলেন যে।

তাড়ায় কেন?

বিয়ে করছি বলে।

বিয়ে করছিস? কই, বলসনি তো!

আজ্ঞে লুকিয়ে চুরিয়ে করছি। বউদিমণির

ভয়ে।

শ্রীনাথ বহুকাল বাদে একটু সত্যিকারের হাসি

হাসল, বিয়ে করে বেশ করেছি। আর একবারও

তো করেছি। এবারকার বউটা কেমন?

খুব ভাল। অমন মেয়ে হয় না।

ভাল হলই ভাল। কিন্তু বিয়ে করলি বলেই

বউদিম তাড়িয়ে দিলে, এ কেমন কথা?

আজ্ঞে সবাই বলছে বড়ো বয়সে কচি মেয়ের

সর্বনাশ করছি।

বউটা খুব বাক্য নাকি?

বাক্য নয়, ভাটা মেয়ে।

তোর বয়স কত?

কত আর হবে! ঠিক বাক্যে পারছি না।

সে বাই হোক, কাল থেকে আমার সঙ্গে রোজ  
কলকাতার টানা মারতে হবে, কথাটা মনে রাখিস।  
বরং আজই গিয়ে স্টেশন থেকে একটা মানখল করে  
আয়। টোকা দিচ্ছি।

সে যাব। কিন্তু বউদিকে কথাটা একটু বলে  
বাথবেন বাবু। নইলে যা চটে আছে আমার ওপর।

তোকে বিস্তৃত ঘরে হবে না। ঝোপড়াতেই  
থাক। আমি তোর বউদিকে বলে দিচ্ছি।

ঝোপড়া ভাঙা হয়ে গেছে। মালী সেখানে  
চাষ দেবে।

শ্রীনাথ অবাক হল। বলল, তুই না দাদার  
আমলের লোক।

আজ্ঞে। এই বাড়ি ঘর সব আমার চোখের ওপর  
হয়েছে।

শ্রীনাথ একটু চিন্তিত হয়। একটু ভেবে বলে,  
ঝোপড়া ভেঙেছিল তো কি আছে। ভাবনঘরের  
পিছনদিকে ছাড়া জমি আছে। চালাঘরে বিস্তৃত টিন  
আর খুঁটি আছে। একটা ঘর বেঁধে নিগে যা।

কিন্তু বউদি?

বউদিকে আমি বলছি।

\*

ত্বার কথা কোনোদিন ওলটা না। যা বলে  
তাই হয়। কিন্তু আজ যখন গিয়ে শ্রীনাথ তাকে  
বলল, ক্যাপা নিতাইটাকে আমার বড় দরকার। কাল  
থেকে রোজ আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবে। এখন  
ত্যা না করল না।

বহু সাবধান বসেছিল ত্বার ঘরে। তাকে  
বিয়ের পছন্দ বরাক দিচ্ছিল ত্বা। শ্রীনাথের কথা  
মন দিবার শব্দে বলল ঠিক আছে, একে নতুন করে  
ঘর ত্বা নিতে পারো ত্বা।

কুমার



হাসিতে দেয় মুক্তির আলক

দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য উপাদানে তৈরী **বৈদ্যনাথ**  
আম্বুবেদীয় দাঁতের মাজন।

দাঁতকে সুদৃঢ় ও উজ্জ্বল করে। মাড়ির স্বাস্থ্য বজায় রাখে ও মুখকে  
সুগন্ধ করে।

কন্জিউমার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া সমীক্ষায় দেখা গেছে—  
কেবলমাত্র আম্বুবেদীয় গাছগাছড়াই দাঁতকে বিভিন্ন দস্তরোগ থেকে  
রক্ষা করে।

সুনির্বাচিত ভেষজ থেকে ঐতিহ্য ও আধুনিক পদ্ধতির সমন্বয়ে  
তৈরী **বৈদ্যনাথ** ঔষধ সারা ভারতে জনপ্রিয়।



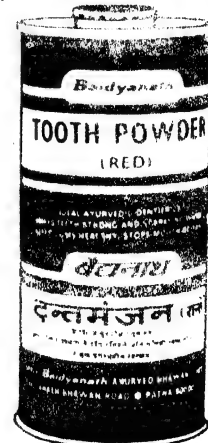
**ব্রী বৈদ্যনাথ**

**আম্বুবেদ ভবন লিমিটেড-এর**

একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

১.৩৩ত লেন, কলিকাতা-৬

কলিকাতা • পাটনা • বাসী • নাগপুর • এলাহাবাদ





হঠাৎ, সেই সপ্নে কিছু সাময়িক জিনিসপত্রও আছে। আরো চক্কর কাঁ সব।  
বেহেত সজ্জেনীর, ঘাম তুলে।

সেই সব ছাড়িয়ে ভিতরের চরম। শেকসপিয়রের নামে উৎসর্গীকৃত। চারিদিক  
কম্বারপ্রাচীরে কেঁতনীর, মাথার উপর নীল আকাশের একটি চৌকো খণ্ড ছাড়া আর  
কিছুই চোখে পড়ে না। মনে হয় না জগৎসংসার ঘাস মাটি বায়ু প্রাণী আর  
কিছুই কোনো অস্তিত্ব আছে। খানিকটা হেটে গেলে ডাইনে দেউতাক সমান  
খাড়া-খাড়া সব পাথরের সিঁড়ি, শেষ সিঁড়ির মধ্যে আবার লেহাফা প্রবলম্বার।  
সেই দরজা দিয়ে ঢকে গেলে প্রাসাদের অন্তরমহলের আড়িন। আড়িনকে যেদিক  
দেখলে সেদিকে রৌলিং বেগা, যতো দূর দৃষ্টি চলে ততো দূরই খোলা; অন্য দিকে  
প্রাসাদের অলিঙ্গ গম্বক প্রকাণ্ড ইত্যাদি।

সমুদ্র থেকে উঠিত উত্তল হাওয়া বয়ে যাচ্ছে বেগে। মাথার চুল উড়ে যাচ্ছে,  
শাড়ি ফুলে উঠছে পালেল মতো। এই উঠানে দাঁড়িয়ে একদিন সেই রাজপুত্রের চুল  
এবং পোশাকও নিচের চিরন্তন সমুদ্রের এই চিরন্তন হাওয়ার বিপর্যসিত হলেই,  
হয়তো এই উঠানে দাঁড়িয়েই সে তার শিটার আখ্যার সম্মুখীন হয়েছিলো। এই  
প্রসাদেরই কোন কক্ষ থেকে হামলেটের মৃত্যুর চিকিৎসা ভেসে গিয়েছিলো সমুদ্রের  
গর্ভে।

অজি সারা উঠোনটা প্রদক্ষিণ করলাম। আমায় তিনজন ব্যতীত আর অন্য  
কোনো দর্শনার্থী ছিলো না সেখানে। তিনজনের অতিক্রম আর একজন মাত্র যে  
ছিলো তার পরনে সান্দীর পোশাক, মাথার লোহাধা শিকল। হাতে দুর্বলী।  
খুব গম্ভীর ভাবে সেই দুর্বলী ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে যথার্থই সাবকান্ডা এবং  
সতর্কতার সঙ্গে এদিক-সেদিক দেখাচ্ছিলো সে। মনে যে কোন মূহুর্তই শব্দ  
এসে ব্যাপিয়ে পড়তে পারে, এইরকম তার ভঙ্গি। এও আর এক খেলা। মেকী।  
সান্দী ভালো করেই জানে এই দুগো আর কোনো দিন কোনো শব্দ প্রবেশ  
ঘটবে না। ঘরঘর প্রবেশ ঘটে তারা এই আমায়। আর বছরে একবার করে  
ইন্সপেক্টরের নানা কেস থেকে সব শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ অভিযোজনা আসে। যথায়ের  
ভূমিকাটি পাঠ করেন প্রাপণের মধ্যে দাঁড়িয়ে। তারপর নিশ্চয় অভিনয়ের দক্ষতার সেই  
রাজপুত্রই আবার ফিরে আসে এই মত ভূমিতে।

সমুদ্র থেকে গোঁথে তোলা প্রাসাদের প্রায় অসংলগ্নতায় সমান আজিনার  
রৌলিংয়ে তৈরি দিয়ে পায়েক তলায় সমুদ্র দেখাও একটি সমুদ্র। দুর্গে দেখার  
চেয়ে এ-ও কম আকর্ষণীয় নয়। যথেষ্ট কিসক উপভোগ্য করে। এই প্রাদিকৃত  
কিন্ময় আরো ঘন হয় যখন দূরের তীরে সুইডেনের বাগান, গম্বকসমূহ আর বাড়ি-

ঘরের আভাস চোখে পড়ে। রৌলিংয়ে উঠে একটা ঝাপ দিলেই বেন পৌঁছে  
যাচ্ছে সেখানে। আমাদের প্রথমপঞ্জীতে সুইডেন নেই, কিন্তু তখন খুব সুইডেনে  
যেতে হচ্ছে করছিলো। এদিকে নরওয়ে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ আর সমুদ্র দেখতে দেখতে বেলা পড়ে এলো। সূর্যের  
লাল ছায়া ঘন হলো অগাধ জলে। আমায় নেমে এলাম।

আবার সেই চরম, ফটক, দোকান, পূল। দোকান থেকে কিছু পিকচার  
পোস্টকার্ড কেনা হলো, একটি ছোট্ট জলকন্যাও কেনা হলো। ভ্রমলোক গাড়ি  
পারল এসেও হঠাৎ ছুটে গিয়ে অতি দুমুলা এক দুপ্রাপ্য একখানা ছবির বই  
কিনে এনে উপহার দিলেন।

এখানে এসে একটা খুব লক্ষণীয় বিষয় হল মনে হচ্ছিলো, ডেনমার্কের সবই  
যেন দেশটির সঙ্গে মিলিয়ে ঠৈরী। কোথাও কোনো উগ্রতা নেই, বশততা নেই,  
মাপে মাপে খপে খপে। দু' দিক বৃষ্টি সংকীর্ণত চওড়া চওড়া রাজপথ থেকে  
শুরু করে এখন এই বন্দরটি পল্লভ-এইমাত্র যেখানে এখন দাঁড়িয়ে আমরা  
সুখান্ত দেখছি, যে সুখান্তের কবিতা আজ ছোট্ট জলকন্যার সারা শরীরকে  
আকর্ষিত করে রেখেছে, সবই একই পল্লভিত্যে সুসংকেত। সমুদ্রও তা থেকে  
বিচ্যুত নয়। সমুদ্রও এখানে সংবৃত। তার গজন রাগী নয়, তার চেটে দুজর  
নয়, তার চেহারা ছোটোখাটো শান্ত-শান্ত।

ভ্রমলোক আমাদের এখানে পৌঁছে দিয়েই চলে গেলেন। বললেন, 'খব  
হচ্ছে ছিলো যতোটা সময় সম্ভব থাকবে আপনারদের সঙ্গে, কিন্তু অন্য কোনো  
জরুরী কাজে বাধ্য হয়েই যেতে হচ্ছে।'

কলকটি ঠিক কদরের মতো নয়, বাঁধানো তীরের এদিকে ফেলের বাগান  
ছড়ানো বসবার জন্য বৃষ্টিতে আরামদায়ক লোহার আসন বা হোলান দেওয়া  
সিমেন্টের বেঞ্চি। অনেকেই বেড়াচ্ছে, অনেকেই বসেছে। বাজারা খেলাধুলো  
করছে। আমরাও কললাম। দু' দিকান্ত তাকিয়ে মন উড়া হয়ে যায়। সমুদ্রের  
কিতার দেখে সম্ভবত অতি বড়ো পার্শ্বের মনও নিরম হয়, অতি বড়ো ন্যাসকও  
ঈশবরের মহিমা অবলোকন করে অস্তিত্ব সেই মূহুর্তেই জন্য আদর্শিত হয়।

তীর থেকে কিছুটা দূরের জলে মস্ত এক উন্নত শিলাখণ্ডের উপর হাস  
আন্ডারসনের লিটল মারমেইড উপকিট। বসেছে হাটি, ভেঙে, এই মরুদেশের  
উপরের দিকটা মানয়ের মতো, মানের দিকটা মাছের পৃষ্ঠ। বসবার ভাঁপটি  
অতি নম্র, অতি কুণ্ঠিত, কতিদেন মতোয় ধরা যায়, নিগাপ, অনিদমসুন্দর মুখের  
বিস্ময়ে ভরা। এই কনাই তীরে এক রাজপুত্রের কাঁচ দেখে প্রেমে পড়ছিলেন।  
উঠে এসেছিলো সমুদ্রের তলদেশ থেকে, মৃত্যুর মূলে; প্রার্থনা করেছিলেন তার  
প্রেমকটিকে।

হাস নিজে বায় প্রেমিক। কার্যতর মধ্যে তিনি মনে মনে জানেন। এই  
গল্প সেই বর্ণনাতেই প্রতিচ্ছবি। মৃত্যুটি মেরু পাথরের ঠৈরী। চেউ এসে  
আছে আছড়ে পড়ছে সেখানে, জল ছিটকে ঝরনা হয়ে স্নাত বহুই জলকন্যাকে।  
একটু একটু শ্যাওলা ধরেছে, মনে হয় সবজি অকণ্ঠ, পিঠে নরম কেনী।  
কয়েকটি দশ-বারো বছরের ছেলে কেম গেছে নিচ, পাথরের বড়ো বড়ো চাঁই  
ডিকের চলে গেছে জলকন্যার কাছে। গিয়ে প্রাণপণে দৃষ্টিম করছে। এ ওকে  
জল ছিটোচ্ছে, সে তাকে জল ছিটোচ্ছে। একটা ছেলে বড়ো পাখপটা বেয়ে বোয়ে  
উঠে গেছে উপরে, আরেকজন উঠছে। হাসছে খিলাখিলা করে, ফুঁতর কন্নায়  
ভেসে যাচ্ছে, সমুদ্রের শব্দ আর হাসির শব্দ মিলে-মিশে তলদেশের পটভূতা তার।  
বহু দূরে ফেল-আসা শৈশবের উত্তাল প্রতিরূপ।

একসময়ে বৃষ্টিদের হাস আন্ডারসনের প্রায় সব কটি কথা গল্পই অনুবাদ  
করেছিলেন, সম্ভবত তিন খণ্ডে বর্ণিয়েছিলেন। কারা প্রশংসা ছিলেন ঠিক  
মনে করতে পারছি না। বইয়ের নাম অপূর্ণ-রূপকল্প। আম গল্পগুলো বাংলা  
অনুবাদেই পড়েছিলাম। এইখানে বাস এই জলকন্যার দিকে তাকিয়ে সেইসব  
গল্পের কথা খণ্ড খণ্ড অংশ আমার মনে পড়ো যাচ্ছিল। এখন আর সে বই পাওয়া  
যায় না, ছাপা নেই। যে-কোনো গল্পগ্রাহী কল্পিত বাস্তবী নিচের স্থায়ীকরণ করেন  
বৃষ্টিদের সহিতানিষ্ঠা তার অনুবাদ-কর্মও অকিঞ্চি ছিলো। অনুবাদে ভাষার  
মূল সৌন্দর্য্য এনে দেবার জন্য কাজ যে পরিচয় করতে দেখেছি তার ঠিক নেই।  
বতোক্ষণ সে কাজ করতে আছে সারাক্ষণ সেই চিন্তাতেই নিমগ্ন। এক বিদ্য,  
সুখের নিরাসনা জন্য হয়তো এক লো এই এসে গেছে করে। একটি শব্দের  
একটি সঠিক প্রতিশব্দের অনুসন্ধান হয়তো ঘম নেই রাতে। কোথাও এক  
ফোটা সঠিক নেই, এক ফোটা ঠিকিলা নেই। একজন সুশীল লেখক হতে  
গল্পগ্রাহিতার আবেশ নিজের কাজ দিয়ে দিনের পর দিন নিজের প্রিয় লেখকটিকে  
সকলের কাছে যোগ্যভাবে উপস্থিত করার জন্য প্রাণপণে পরিচয় করছেন। তা  
জন কালের মাধ্যমেই হোক বা স্বলিখিত প্রবেশের আকৃতিতেই হোক। আমার  
দীর্ঘ জীবনে বৃষ্টিদের মতো এরকম নিবন্ধিক, নিবাদ, বৈয়াক্ষণ্যহীন গল্প-  
গ্রাহী কাঁচ আর একজনকেই মাত্র দেখেছি, বাদ নাম দিলীপকুমার রায়, সন্ন্যাসী  
দিলীপকুমার। যার মহানুভবতা, সত্যতা, গল্পগ্রাহিতা প্রায় গল্পকথার মতোই  
সত্য এবং সহজাত। যার পল্লভিত্য ছিলো সমুদ্রের মতো অগাধ। বাকি আজ  
সবাই ফুল ফেছে।

(কলম)

**প্রকাশিত হচ্ছে নাটক**

**জীবন ধর্মী নাট্য প্রযোজনার**

**রূপ ও রেখা: সুনীল দত্ত**

(কিছু অভিনয়ের সূচি যা মনে পড়েছে তার  
সারা না, যা কোনো দিনও হারানো না, যা  
আমোদ পাচ্ছে ২০)

শুদ্ধ সম্পাদিত

গণ প্রাঙ্গণের নাটক ১৬

সনির চৌধুরী: অক্ষয়দত্তের পক্ষে সূত্রের  
চিকিৎসা: কলকাতা প্রেসটি। অনুবাদ: সুনীল  
সুখাতী প্রকাশ: নবোক্ত প্রেসটি, কলকাতা।  
ভট্টাচার্য্যগোষ্ঠী: আলোচনা প্রকল্পটি কলকাতা  
রজাবত কলী চান, আমায়ের প্রযোজনা কলকাতা  
কুমার কলকাতা প্রকাশ: আলোচনা প্রকল্পটি কলকাতা  
ভট্টাচার্য্য। আলোচনা প্রকল্পটি: শতাব্দীর পাথর  
সুনীল দত্ত: মৃত্যুর সান্নিধ্য স্বপ্নের সান্নিধ্য  
ভেলকীর খোঁজ। ভুলের চক্কর।

**শিশির কুমারের নাট্য চর্চা**

সম্পাদনায়: সুনীল দত্ত দীক্ষিতমাস শিল্প

১। বিতরণকার: প্রাঙ্গণনা ১।

# সহজপাঠের সুবর্ণ জয়ন্তী চিত্তরঞ্জন দেব

১৯৩৭ সাল সহজপাঠের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন-কাল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর তিন শতাধিক গ্রন্থ রচনার মধ্যে এক উজ্জ্বল শিশুপাঠ্য বইও লিখেছেন। এই বইগুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় বোধ করি সহজপাঠ। শাস্ত্রানুগতন প্রেস থেকে প্রকাশিত জগদানন্দ রায় লক্ষ্মী সহজপাঠ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৭ সালের বৈশাখ মাসে (২৭শে)। পাতায় পাতায় নন্দলাল বসুর অঁকা ছবি আর বড় বড় অক্ষরে ছাপা তিস্পার পুস্তার সুন্দর বই সহজপাঠ প্রথম ভাগের দাম পাঁচ আনা এবং একটু ছোটো আকারে ছাপা একত্র পুস্তার দ্বিতীয় ভাগের দাম সাত্টি আনা। বইটির সমালোচনা প্রকাশ করেন মাসিক প্রকাশী ১৯০৭ সালেরই গ্রাবণ সংখ্যায়। সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লেখেন,

“সেইসব শিশুর সন্মুখে হৃদয়বাক্য হইয়াছে। তাহাদের জন্য কবি এই বই দুখনি লিখিয়াছেন। ইহা তাহারা আনন্দের সহিত দেখিব এবং দেখিতে দেখিতে পড়িতে শিখিব, পড়িয়া আনন্দ পাইবে।”

“বই দুখনির কাব্যভাষালিতে কবির আছে। রবীন্দ্রনাথ বই হইলেন ও বলা দরকার এইজন্য। যে অনেক বশিষ্ঠান লোকও ছোট ছেলেমেয়েদের বশিষ্ঠ উপযোগী করিয়া কিছু লিখিত গিয়া এমন কিছু জিনিষ লেখেন যাহা সচিত্র নহে। রবীন্দ্রনাথ শিশুদের জন্য যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাহাদের ভাল লাগিবে, বুঝোদেরও ভাল লাগিবে।”

“গদ্য গল্পগুলিতেও অল্প দৃষ্টিয়া এবং যথান শিখাইবার জন্য লিখিত হইলও উপভোগ্য।”

ভূম্যশাস্ত্রী সম্পাদকের কথা যথা হইয়াছে। ছেলেবড়ো সকলের কাছে সমাদরে গৃহীত সহজপাঠ সর্বোত্তম তার পঞ্চাশ বছর উত্তীর্ণ করিয়া সমাজের প্রকাশিত অন্যান্য শিশুপাঠ্যগুলির তুলনায় সহজপাঠ সকলের কাছেই বেশি আকর্ষণীয়। এত মনে আসে সহজপাঠ রচনার রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীলতার দীর্ঘ প্রসঙ্গ। শিশুপাঠ রচনার বৈশিষ্ট্যের পথ দিয়া সহজ পাঠ আদর্শ। সহজপাঠের আদ্যমূল কাঁছাই ভগীরথের গণ্ডা অরণ্যেরে এসে মনে করিয়ে দেয়।

বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় প্রকাশের (১৮৫৫) পঁচাত্তর বছর পর রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠের প্রকাশ (১৯০০) বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বর্ণপরিচয় বয়স যখন চার বছরও পূর্ণ হয়নি, তখন তিনি বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’ প্রকাশিত পান। আশ্চর্য আনন্দিত হয়েছিলেন পঞ্চাশ বছর বয়সে জীবন-স্মৃতির পাতায় তার বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নের ভাষায়,

“সেদিন পড়িতেছি জল পড়ো পাতা নড়ো। এইটাই আমার জীবনের আনন্দিত প্রথম কীর্ত্য। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ি তখন দৃষ্টিতে পায়, কবিতার মধ্যে মিলে জীবনসত্যের এত প্রয়োজন হয়। মিল আছে বলিয়াই কথাটি শেষ হইয়াও শেষ হয় না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার স্বকোরে ফুরায় না, মিলাটকে লইয়াই কবির সঙ্গে মনের সংগে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।”

বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’ কবিতায় বই নয়। আগাগোড়া গদ্য লেখা এই বইয়ের ও সংখ্যক পাঠে মনোহর আছে ‘জল পড়ো’ কথাটি এবং ৪ সংখ্যক পাঠে মনোহর আছে ‘জল পড়িতেছে’, ‘পাতা নড়িতেছে’—এই দুটি বাক্য। রবীন্দ্রনাথ উক্ত ‘পড়িতেছে’ ও ‘নড়িতেছে’ শব্দগুলির মধ্যে মিল লক্ষ করে ‘জল পড়ো’ ও ‘পাতা নড়ার ঘটনার আনন্দিকির প্রথম কবিতার ছন্দ আবিষ্কার করে আনিদিত হয়েছিলেন। তাঁর স্মৃতির ভাঙাটো অক্ষয় এই আনন্দের অমৃত থেকেই নিপাতি হয়েছে তাঁর অমর কাব্যের ধারা। মিলের খেলাতেই তিনি বিশ্বজয়ী হয়েছেন। এই

মিলের খেলার সঙ্গে ‘সঙ্গেই এসেছে তাঁর জীবনের নানা পর্যায়, নানা বাসনাকামনা, তার রূপায়ণে নানা সমস্যা। সংসারী হয়েছেন। পৃথিবীতে গিয়েছেন যুগলিনী দেবীকে। পাঠটি পঠনকায় জনকরূপে একদিন যখন সর্পিবারে শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে এসে সংসার পেতেছেন এসেছে আপন সন্তানদের শিক্ষাদানের পাতা। শিশুদের বর্ণপরিচয়ের কথা চিন্তা করে মনে পড়েছে তাঁর শৈশব পড়া ‘বর্ণপরিচয়’ বইখানির কথা। বইখানির নাম জুলে গেলেও ভুলতে পারেননি সেই বইয়ের ‘জল পড়ো’ ও ‘পাতা নড়া’র ছন্দটি। ঠিক তেমনিই হচ্ছে লিখতে চাইলেন তিনি তার পরিকল্পিত প্রথম শিশুপাঠ্য। ঠিক করলেন, তাঁর বইয়ে তিনি বাংলা বর্ণমালায় প্রতিটি বর্ণকেই করে তুলবেন মিলের খেলা। শিশুরা যাতে সহজেই চিনতে পারে প্রতিটি বর্ণ খেলাই হল। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা হল বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের চেয়েও সহজ করে লিখবেন একখানি বই। ‘সহজ পাঠ’ নামটি তখন তাঁর মনে এসেছিল কিনা, সে কথা অবশ্য জানা যায় না।

সহজপাঠের আদ্যোচ্যোদয় রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য শিশুপাঠ্যগুলির কথাও এসে পড়ো। নিম্নের তালিকায় তাদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করা গেল :

- ১। সংস্কৃত শিক্ষা প্রথম দ্বিতীয় ভাগ। প্রথম ভাগে প্রকাশিত (১৯০০)
- ২। ইংরাজি সেপান, প্রথম দ্বিতীয় ভাগ (১৯১১-১৯১৩)
- ৩। ইংরাজি পাঠ, প্রথম ভাগ (১৯১৬)
- ৪। ছুটির পড়া (১৯১৬)
- ৫। ইংরাজি প্রতিশিক্ষা, প্রথম দ্বিতীয় ভাগ (১৯১৬)
- ৬। পাঠ সঙ্গ্রহ (১৯১১)
- ৭। বিচিত্র পাঠ (১৯২১)
- ৮। অনুবাদ চর্চা (১৯২৪)
- ৯। সিলেটের প্যাসেজের ছাত্র ইংরাজি ট্রান্সলেশন (১৯২৪)
- ১০। ইংরাজি সহজ শিক্ষা, প্রথম দ্বিতীয় ভাগ (১৯০৬)
- ১১। পাঠপ্রচার, দ্বিতীয়, চতুর্থ ভাগ (১৯০৬)
- ১২। সহজ পাঠ, প্রথম, দ্বিতীয় ভাগ (১৯০৭)

## সহজপাঠের পাণ্ডুলিপি

মানুষের শিশুক যথার্থ মানুষ করে গড়ে তোলা, এবং মানুষকে ভালো করার চিন্তাও চেষ্টা যেমন ছিল বিদ্যাসাগরের, তেমনি ছিল রবীন্দ্রনাথের। শিশু শিশুপাঠ্য। রচনার ক্ষেত্রেই নয়, সমাজে সংসারে যেখানেই মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও সমস্যা, সেখানেই বিদ্যাসাগরের মতো রবীন্দ্রনাথও এসেছেন এগিয়ে। এই উভয় মনীষীর মধ্যে রয়েছে পার্থক্য অনেক ছিল বলে বাহ্যিকভাবে তাঁদের পরস্পরের যোগাযোগ হয়েছে সামান্য, কিন্তু মানসিকভাবে পরস্পরের যোগ ছিল অসামান্য। বলা যায়, বিদ্যাসাগরের জীবন-সাধনার অনেকাংশের যোগ্য উত্তরাধিকারী হতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

যদিও উৎকর্ষের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সহজ-

পাঠ বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’ পাঠ্যের চেয়ে এসেছে, তবুও সহজপাঠ রচনার উদ্দেশ্যে অন্য গভীর রয়েছে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের অদৃশ্য অগাধসংকেত—একথা অবশ্যকার করা যায় না। আবার, বর্ণপরিচয়কে স্বীকার করেও বলা যায় সহজপাঠের অভ্যুদয় শিশু শিশুপাঠ্য বইয়ের স্ফূর্তি নয়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এর উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কারণ, সহজপাঠের আবিষ্কারের পূর্বে বা পরে প্রকাশিত কোনো শিশুপাঠ্যেই এই সহজ ছন্দ ও ভাষা ভাব ও বিন্যাসে এমন মৌলিকতা সংযত রচনা লক্ষ করা যায় না। সোনার তরী নৈবেদ্য-গীতাঞ্জলির গভীর উৎস রবীন্দ্রপ্রতিভা উদ্ভূত। হিমালয় থেকে সহজপাঠে অবতরণ বা সাধারণ ঘটনা নয়। তা ছাড়াও, যে সহজপাঠের প্রকাশ ১৯০৭ সালে হয়েছে, তার সূচনা হয়েছে প্রকাশ কালের পরগিরি বছর আগে ১৯০২ সালে। সহজ পাঠ কতটি এমন অন্য কোনো রবীন্দ্রপ্রতিভার নাচ আমাদের জানা নেই। যাব সূচনা ও প্রকাশকালের মধ্যে এমন দীর্ঘকালের ব্যবধান আছে।

সহজপাঠের আদ্যোচ্যোদয় রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য শিশুপাঠ্যগুলির কথাও এসে পড়ো। নিম্নের তালিকায় তাদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করা গেল :

- ১। সংস্কৃত শিক্ষা প্রথম দ্বিতীয় ভাগ। প্রথম ভাগে প্রকাশিত (১৯০০)
- ২। ইংরাজি সেপান, প্রথম দ্বিতীয় ভাগ (১৯১১-১৯১৩)
- ৩। ইংরাজি পাঠ, প্রথম ভাগ (১৯১৬)
- ৪। ছুটির পড়া (১৯১৬)
- ৫। ইংরাজি প্রতিশিক্ষা, প্রথম দ্বিতীয় ভাগ (১৯১৬)
- ৬। পাঠ সঙ্গ্রহ (১৯১১)
- ৭। বিচিত্র পাঠ (১৯২১)
- ৮। অনুবাদ চর্চা (১৯২৪)
- ৯। সিলেটের প্যাসেজের ছাত্র ইংরাজি ট্রান্সলেশন (১৯২৪)
- ১০। ইংরাজি সহজ শিক্ষা, প্রথম দ্বিতীয় ভাগ (১৯০৬)
- ১১। পাঠপ্রচার, দ্বিতীয়, চতুর্থ ভাগ (১৯০৬)
- ১২। সহজ পাঠ, প্রথম, দ্বিতীয় ভাগ (১৯০৭)

উদ্ভূত তালিকায় সর্বশেষ আছে যে সহজপাঠ সেটি রচনার কাজ রবীন্দ্রনাথ সর্বোচ্চ হাতে নিয়ে ছিলেন, কিন্তু সর্বোচ্চ হাতে নেওয়া বইটির রচনা অসম্পূর্ণ রেখে তিনি কেন পরেই সংস্কৃত পাঠ প্রকাশ করলেন এবং তাব পর ইংরাজি পাঠ ইত্যাদি আরও এগারোখানি বই সংকলনে মনোনিবেশ করলেন, সে-বিষয়ে তিনি নিজে কিছু বলেছেন বলে আমাদের জানা নেই। সংগৃহীত তথ্য ভিত্তি করে সে বিষয়ে আমরা অনুমান করতে পারি বলে :

যদিও আপন শিশুসন্তানদের জন্য বাংলা সহজপাঠ-সংকলনে রবীন্দ্রনাথ হাত দিয়েছিলেন এবং স্বর ও বাজনবর্ণ পরিচয় অংশ চমকে লিখেছিলেন, মূল পাণ্ডুলিপি থেকে এর দৃষ্টান্ত যথাস্থানে নেওয়া হবে। তবুও লেখা আরম্ভ করে সভ্যত তাঁর মনে হয়েছিল, বাংলা পাঠ্য শিশুদের আকর্ষণীয় করতে হলে, এ নিয়ে আরও কিছুকাল ধ্যানধারণ প্রয়োজন। হয়ত, তিনি সংস্কৃত পাঠ্য-সংকলনে কাজও ঐ সময়েই শুরু করে বাংলা-পাঠ্যের আগেই সংস্কৃত পাঠ্য প্রকাশ করা তাঁর কাছে জরুরি হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া, সংস্কৃত রবীন্দ্রনাথের আবাস অনুর্বণ। একবার শিশুর সংগ্রহ থেকে ফোটা উইলসনের ছাপা বাংলা অক্ষরের সংস্কৃত গীতি কোম্পানি পড়ে তিনি এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে বাংলার পড়বার লোভে বইখানি তিনি নিজের হাতে আগাগোড়া নকল করে নিয়েছিলেন। জরুরির ভাব ও জায়া তিনি তখন কিছুই বোঝেননি, সে কথা অকপটে স্বীকার করেছেন, তবু যে বার বার গীতি কোম্পানি পড়তেন, তার কারণ, উক্ত বইয়ের চন্দ-





"কানে কানে অ আ/করে বলা করো।  
কোণে বসে ই ই/শীতে করে হী হী।  
শূরে শূরে উ উ/করে শব্দ হু হু।  
খেতে বসে এ এ/হেকে বলে সে সে।  
খেলা করে ও ও/কিনে এনে বেনে কউ।"  
স্বরবর্ণ পরিচয়ের তৃতীয় খসড়া এবং বাজন-  
গণ পরিচয়ের দ্বিতীয় খসড়াটি পাওয়া যায়  
১৩৩৫-৩৬ সালের অন্যান্য লেখার সঙ্গে  
নিম্নোক্ত রূপে:-

"অ আ/ছোটো খোকা বলে অ আ/  
শেখনি সে কথা করো।  
ই ই/হুস্ব ই দীর্ঘ ই/বসে খাফ করি খই।  
উ উ/হুস্ব উ দীর্ঘ উ/জকি ছাড়ে কেউ কেউ।  
ঋ/ঘন মেঘ বলে ঋ/দিন বড় বিদ্রী।" ইত্যাদি

"ক খ গ ঘ/ক খ গ গান গেয়ে/  
জেলে ডিঙি চলে বেয়ে।  
ঙ/চরে বসে রাখে ঙ/চোখে তার লাগে খেঁখা।  
চ ছ জ ঝ/চ ছ জ ঝ দলে দলে/  
বোকা নিয়ে হাটে চলে।

এক্ষিপে পায় খকী এ/  
শূরে কামে কিরী কয়ো।" ইত্যাদি  
উৎকৃষ্ট স্বরবর্ণের তৃতীয় খসড়া এবং বাজন-  
বর্ণের দ্বিতীয় খসড়ার প্রায় অনুরূপ পাঠই স্থানে  
স্থানে বর্জিতব্য পরিবর্তিত হয়ে সহজপাঠে  
প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়  
স্বরবর্ণের প্রথম খসড়াটির সঙ্গে দ্বিতীয় এবং  
তৃতীয় খসড়া ও প্রকাশিত পাঠের। যেখানে দীর্ঘ  
ঋ ও দীর্ঘ ঋ-র উল্লেখ ছিল প্রথম খসড়ায়,  
সেখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খসড়ায় উক্ত দ্বি-ত্রি বর্ণকে  
বাদ দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক খসড়ায় সহজপাঠের গদ্যপাঠ ছিল  
নিম্নোক্তরূপে:

"ঘর কই। ঐ যে। দূরে। আয় না, ঐখানে।  
না, ওখানে কাদা। এইখানে আয়। ঐ যে খাল।  
খালে জল। আয় ধারে বাস। ধারে গাছ আছে।  
আম গাছ। ডালে কত ফল। এখানে ঘাস আছে, আর  
ছায়া। গাছে কাক ডাকে। পাতা নড়ে। রাম গাছে  
চড়ে। আম খায়। ডাল নাড়ে। ফল পাড়ে। পাকা  
ফল নীচে পড়ে। হরি মালী রাগ করে। রাম নীচে  
নামে। ঘরে ছুটে যায়। মালী পিছে পিছে ছোটে।  
রাম ছোটো ছেলে তাই ভয় পায়। আমি আম খাই,  
তার দাম দিই। মালী খুশি হয়। যতো চাই ততো  
পাই। ওটা কি পাখী। ওটা কাক। ডালে বাসা আছে।  
বাসায় তার ছানা। ছানা ডাকে। খিদে পায়। খেতে  
চায়। কাক তাকে খেতে দেয়। কি খেতে দেয়।  
পোকা দেয়। আরো কত কি দেয়। এই বার ঘরে  
গাই। না গেলে রাগ করে। দোর হলে মা ডাবে  
বাবা বকে।"

"মামার বাড়ি চৌবেড়। মা নৌকো করে যায়,  
বাবাও যায়, আমিও যাই, দাদাও যায়। নৌকো করে  
যায় না। সে গাড়ি করে যায়। মামার বাড়ি আজ  
পূজা। তাই মা কোটো করে গয়না আনে। গয়না  
মাথায় পরে, হাতে পরে, গয়না গলায় পরে।  
সৌন্দর্যদর্শনও গয়না পরে। বৌদিও গয়না পরে।  
নৌকে যাতে এল। নৌকো থেকে নেমে দৌড়ে চলে।  
গোর দাদাও দৌড়ে চলে। ঐ যে দেউড়ি। ঐখানে  
জাক বাজে ঢোল বাজে সনাই বাজে। রাম নাচে, হরি  
নাচে, কানাও নাচে। যদু গান গায়, মধু গান গায়,  
সিধু গান গায়। বুরু ঘটা ঐ যে গয়লা দখে আনে,  
ছানি আনে। কতো কই মাছ, রই মাছ। গোরুর  
গাড়ি করে আনে কলা মূলে শাক আলু কচু তেল  
ঘি চিনি। ঐ যে মূটে আনে বুরি সরা কলাপাতা।

"এক বনে এক বাঘ থাকে। সেই বাঘ হরিণ  
যায়। হরিণ বাঘ দেখে ভয় পায়। হরিণ বন থেকে

কই? ঐ যে। দূরে। আয় না, ঐখানে।  
না, ওখানে কাদা। এইখানে আয়। ঐ যে খাল।  
খালে জল। আয় ধারে বাস। ধারে গাছ আছে।  
আম গাছ। ডালে কত ফল। এখানে ঘাস আছে, আর  
ছায়া। গাছে কাক ডাকে। পাতা নড়ে। রাম গাছে  
চড়ে। আম খায়। ডাল নাড়ে। ফল পাড়ে। পাকা  
ফল নীচে পড়ে। হরি মালী রাগ করে। রাম নীচে  
নামে। ঘরে ছুটে যায়। মালী পিছে পিছে ছোটে।  
রাম ছোটো ছেলে তাই ভয় পায়। আমি আম খাই,  
তার দাম দিই। মালী খুশি হয়। যতো চাই ততো  
পাই। ওটা কি পাখী। ওটা কাক। ডালে বাসা আছে।  
বাসায় তার ছানা। ছানা ডাকে। খিদে পায়। খেতে  
চায়। কাক তাকে খেতে দেয়। কি খেতে দেয়।  
পোকা দেয়। আরো কত কি দেয়। এই বার ঘরে  
গাই। না গেলে রাগ করে। দোর হলে মা ডাবে  
বাবা বকে।"

সহজপাঠের পাণ্ডুলিপি  
পালায়। হরিণ সেই বনে থাকে না। হরিণ বাঘ আর  
এক বনে। বাঘ যায় সেই বনে। হরিণ তাই ভয়  
পায়। বাঘ দেখে সবাই ভয় পায়। সবাই বন থেকে  
পালায়। তাই ঢাকা থেকে রাম আসে। বনে গিয়ে  
রাম বাঘ মারে। হরিণ তাই আরাম পায়। সবাই  
আরাম পায়। হরিণ বনে ফিরে যায়। হরিণ আর  
ভয় পায় না। তাই হরিণ বনে আরামে থাকে। রাম  
ঢাকায় ফিরে যায়। সবাই বনে ফিরে আসে।"

সহজপাঠের কবিতাগুলি রচনার ক্ষেত্রে  
ববীন্দ্রনাথ যতটা ভেবেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি  
ভেবেছেন গদ্যপাঠগুলি রচনার বেলায়। উপরে  
উদ্ধৃত গদ্যপাঠের তিনটি খসড়া দেখলেই বোকা  
বার কি পশ্চিমে তিনি সহজপাঠ সংকলনের জন্য  
অসীম ধৈর্য নিয়ে একটি একটি করে শব্দ চয়ন  
করেছেন, একাধিক শব্দ নিয়ে বাক্য রচনা করেছেন,  
এবং বাক্যগুলি পর পর সাজিয়ে একটি দৃশ্য  
এনেছেন চোখের সামনে। উদ্ধৃত খসড়াগুলি থেকে  
শব্দ ও বাক্য চয়ন করে বহু পরিবর্তন ও সংযোজন  
সহকারে ক্রমশঃ সহজপাঠে গ্রহণ করেছেন  
নিম্নোক্ত প্রকাশিত পাঠগুলি দেখলেই সে কথা  
জানা যায়:

"বনে থাকে বাঘ। / গাছে থাকে পাখী। / জল  
থাকে মাছ। / ডালে আছে ফল। / পাখী ফল  
খায়। / পাখা মেলে ওড়ে। / বাঘ আছে  
আম বনে। / গায়ে ঢাকা ঢাকা দাগ। / পাখী বলে  
গান গায়। / মাছ জলে খেলা করে। / ডালে ডালে  
কাক ডাকে। / খালে বক মাছ ধরে। / বনে কত হাতি  
ওড়ে। / ওরা সব মোহামাছ। / ঐখানে ঘোঁচাক। /

তাতে আছে মধু ভরা।..."

"রাম বনে ফল পাড়ে। গায়ে তার লাল শাল।  
হাতে তার মালি। জবা ফুল তোলে। বেল ফুল  
তোলে। বেল ফুল সাদা। জবা ফুল লাল। মূলে  
আছে নাল ফুল। ফুল তুলে রাম বাড়ি চলে। তার  
বাড়ি আছে পূজা। পূজা হবে রাতে। তাই রাম  
ফুল আনে। তাই তার ঘরে বুরু ঘটা। ঢাক বাজে  
ঢোল বাজে। ঘরে ঘরে ধূপ ধনা।

"পথে কত লোক চলে। গোরু কত গড়ি টানে।  
ঐ যায় ভোলা মালী। মাল নিয়ে ছোটো। ছোটো  
খোকা দেঙ্গা চড়ে দোলে।

"খালা ভগ্ন কৈ মাছ, বাটা মাছ। সরা ভরা  
চিনি ছানা। গাড়ি গাড়ি আসে শাক লাউ আলু  
কলা। ভারী আনে খটা ঘড়া জল। মূটে আনে সরা  
বুরি কলাপাতা।..."

পাণ্ডুলিপি খসড়ার সঙ্গে যুক্ত সহজপাঠের  
প্রতিটি পাঠ মিলিয়ে দেখার সুযোগ এত স্বল্প  
পরিসর প্রবন্ধে নেই। সহজপাঠের পাণ্ডুলিপিতে  
প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ চিহ্নিত করা হয়নি।  
ববীন্দ্রনাথ আগে অবিক্রমে লিখে নিয়ে ছাপবার  
সময় দুই ভাগে ভেঙেছেন। সহজ পাঠ সহজ পাঠই।  
প্রথম ভাগ থেকে দ্বিতীয় ভাগে বাবার সময়ও সহজ  
থেকে কঠিনের দিকে যায়। কিছই বোকা যায় না।  
তাই, সহজপাঠ সংকলনের ভয়েই সহজ এক অন্যান্য।"

"প্রথম কল্পিত পাণ্ডুলিপি-তথ্য ও কটাক্ষ  
কিন্তু তবুও দ্বিতীয় উপায়ে রচনার সময়ও সহজ  
থেকে কঠিনের দিকে যায়। কিছই বোকা যায় না।  
তাই, সহজপাঠ সংকলনের ভয়েই সহজ এক অন্যান্য।"

# ইন্ডানা হোল মিল্ক পাউডার

হাতের কাছে এমন খাঁটি দুধ যা দিয়ে মনোমত  
অনেক খাবার তৈরী করা যায়।



পান করুন, শীতল  
পানীয় তৈরী করুন, চুই  
ভুয়ান, অন্য জিনিষের সঙ্গে  
মিশিয়ে খান, মিষ্টি তৈরী করুন

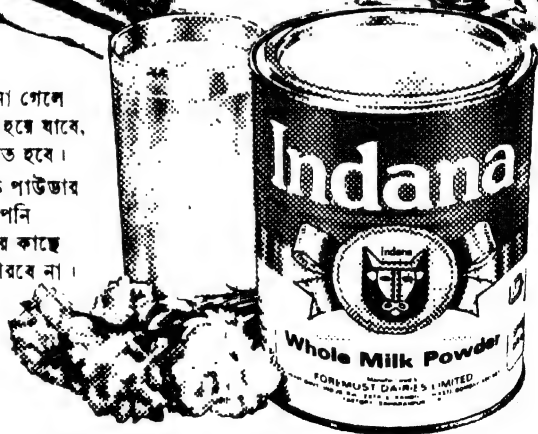
আপনার এলাকায় বিতরক পুষ্টিকর দুধ সহজে পাওয়া না গেলে  
আপনি কি করবেন? আপনার রান্নাঘরের কাজই তো বন্ধ হয়ে যাবে,  
আর বাচ্চারা দুধের তৈরী তাদের প্রিয় খাবার থেকে বঞ্চিত হবে।

এইসব সমস্যার সমাধান—এক টিন ইন্ডানা হোল মিল্ক পাউডার  
সহজে গুলে যায়, পুষ্টিকর আর স্বাস্থ্য—এই দুধ দিয়ে আপনি  
হরেক রকম মজাদার খাবার তৈরী করতে পারেন। হাতের কাছে  
ইন্ডানা রাখুন—আপনার পরিবারের সবাই সুখী না হয়ে পারবে না।

## ইন্ডানা

হোল মিল্ক পাউডার

—এমন প্রাচুর্য্য যাত সবাই ধুশী



শরৎকুমারী চৌধুরানী : 'শুভ বিবাহ'

আমাদের বাড়িতে ছোটরা স্কুলের গাফি পেরোবার আগে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের লেখা ছাড়া অন্য কারুর লেখা বড়দের বই পড়ার অনুমতি পেত না। আমিও পাইনি। কিন্তু নিষিদ্ধ জিনিসের আকর্ষণ খড় বোঁশ। কম বয়সে তো কথাই নেই। এ রকম কোনো একটা সময়েই দু'দিনের জন্যে আমার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে হাতে পেরেছিলুম একটা জীর্ণ মলাটের শীর্ষ বই নাম 'শুভ বিবাহ'। কোনোদিকে না তাকিয়ে গোয়াসে গলাধঃকরণ করার মতো করে বইটা পড়ে ফেলেছিলুম। কার লেখা, কী নাম কিছুই স্পষ্ট মনে ছিল না, ছিল শুধু পুরনো বইয়ের গন্ধমাখা একটা আত্মা স্মৃতি।

ভেবেছিলুম কোনদিনই হয়ত আর ভালোলাগা সেই উপন্যাসটি আমার হাতে ফিরে আসবে না। সেই ভূবন, ভুবনোবরী বা ভুবনমোহিনী যা হোক কিছু, আর তার ছেলে গণেশের কলকাতা আসার গল্পটাও নতুন করে পড়া হবে না কোনদিন। কৈশোরের দুটো-একটা ভালো লাগা কিংবা মন-কেনন-করা স্মৃতির মতোই 'শুভ বিবাহ' উপন্যাস মনের কোণে বাসা বেঁধে থাকবে। কিন্তু বছর তিনেক আগে সম্পূর্ণ অজ্ঞ কারণে শরৎকুমারী চৌধুরানীর লেখার ওপর চোখ বোলাতে গিয়ে হঠাৎ নতুন করে খুঁজে পেয়ে গেলুম সেই পুরনো উপন্যাসটিকে।

আমি সর্বোচ্চ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা মোটেই সুখের হয় না। প্রথম পাঠের রোমাঞ্চ দ্বিতীয় বারের খুঁজতে গিয়ে অনেকেরই হতাশ হন। আমারও সে আশংকা ছিল না তা নয় তবু দ্বিতীয়-অর্থ পরতে গিয়ে 'শুভ বিবাহ'কে ভালো লাগল, আবারও বেশ বরফের পরিচ্ছন্ন গল্প। নায়ক-নায়িকার প্রেম-পরিণয়, মান-অভিমান কিংবা সুখ-শব্দ চমক কোথাও কিছু নেই। তবু উপন্যাস তরতরিয়ে এগিয়ে চলেছে। গল্প শুরুর হয়েছে ভূবন ও গণেশের কলকাতা আসার পর থেকে। প্রায় পঁচিশ বছর পরে কলকাতায় এসেছে ভূবন, এসে দেখে অনেক বদলে গেছে দেশটা। তার কলকাতাবাসিনী দিদি ফিসফিসিয়ে তাকে হালফিল গল্প শোনায় : "তোকে চুপিচুপি বালি, কাউকে বলিসনি। শুনলেই বোয়েরা পশ্চিমে নিক পহাড়ে যখন হাওয়া-উত্তা খেতে যায়, তখন কাকি জুতো মোজা পরে দেয়।"

ভূবন কলকাতায় এসেছিল মনের মতো টুকটুকে মেয়ে খুঁজতে ছেলের বিয়ে দেবে বলে কিন্তু দিদির জায়ের নাতনীর বিয়েতে নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে দেখে সেখানে বিষম কান্ড। পণ নিয়ে গন্ডগোল হওয়ার মেয়ের বিয়ে ভেঙে যায় আর কি। মেয়ের বাবা নীরদ শিক্ষিত জল্পলোক, সম্মানবোধ আছে কিন্তু প্রচলিত প্রথাকে এড়াবার মতো মনোবল খুব দৃঢ় নয়। তাই মেয়ের বিয়ে ভেঙে দিয়েই অবসর হয়ে শূন্য পড়ে। সব দেখে এগিয়ে আসে ভূবন, নিজেই গণেশের সঙ্গে এই মেয়ের বিয়ে দিয়ে সব সমসার সমাধান করে দেয়। একেবারে শেষটা পড়তে পঞ্চমবার খসে ভালো লেগেছিল :

"...একজন দাসী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, 'ওগো, বর আসছে।'—চুপ করিয়াও ইতিমধ্যে দাসী মহলে জানাজানি হইয়াছে যে, বিবাহ ভাঙিয়া গিয়াছে, বর আসিবে না।"

রাণী : কাদের বর ?  
দাসী : ওগো আমাদের বর। ঐ দেখ বরের বাড়ির ঝি আসছে।—

বরের বাড়ির ঝি : (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) বাবু কোথা যা ?  
নীরদ : কেন ?  
বরের বাড়ির ঝি : বর আসছে গো—তোমরা



সব উদ্বেগ কম। মাঠাকরুণ সব শুনছেন, তিনি কতাবাবুর উপর তাঁর রাগ করেছেন, তিনি বলেন 'আঁ, কথা দিয়ে এমন কাজ করা।' তিনি বলেছেন যে, আমি যদি ঐ মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে না দিই, তবে আমি কারোতের মেয়ে নই।'—ঐ শোন, বাজনা শোনা যাচ্ছে—খবর দিতে আমি ছুটে এসেছি গো ছুটে এসেছি।

নীরদ : (হৃদভাবে গণেশের হাত ধরিয়া) বাছ, যেমন ছুটে এসেছ, তেমনি ছুটে যাও—বরকে ফিরে নিয়ে যেতে বল। আমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে—এই দেখ আমার জামাই। এস বাবু—

দ্বিতীয়বার পড়বার সময় শূন্য গল্পের আকর্ষণে 'শুভ বিবাহ' পড়েছি, তা নয়। শরৎকুমারীর সঙ্গে পরিচয়ই তখন প্রধান উদ্দেশ্য। যে বইটি পড়েছি সেটিও সেই আগের বারে পড়া ১৩১২ সালের প্রথম সংস্করণের বই নয়। সেবার উপন্যাসে শরৎকুমারীর নাম ছিল না কোথাও। শোনা গেছে, রবীন্দ্রনাথ 'নবপঞ্চায়-বঙ্গবর্ধন' প্রকাশ করবার জন্যে পেনসিলে লেখা পাশ্চাত্যিপিট ধরেই টানাটানি করেছিলেন কিন্তু শরৎকুমারীকে বাজী করতে পারেননি। পরে শরৎকুমারী উপন্যাসটি প্রকাশের অনুমতি দিলেও কিছুতেই নিজের নাম প্রকাশ করতে দেননি। একেবারে নাম-গোষ্ঠান অবস্থায় 'শুভ বিবাহ' ১৩১২ সালের চৈত্র মাসে (২৬ মার্চ ১৯০৬) প্রকাশিত হয়। তবু যে উপন্যাসটি একেবারে হারিয়ে যাননি সে শূন্য শরৎকুমারীর লেখার গুণে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে শরৎকুমারী ও তার স্বামী অক্ষরচন্দ্র চৌধুরীর যোগ অনেক দিনের। 'ভারতীর সাম্মা মজলিসে তাঁরা ছিলেন উপদেষ্টা এবং নিয়মিত সভা। 'ভারতী'তেই লেখিকা রূপে শরৎকুমারী আত্মপ্রকাশ করেন, যদিও এ ব্যাপারে তাঁরা ছিল প্রবল অনীহা। মেয়েদের নিয়ে, কলকাতায় স্ত্রী-সম্মান নিয়ে কিছু কিছু রচনা লেখার পরই তিনি 'শুভ বিবাহ' লিখেছিলেন। সেই তাঁর প্রথম উপন্যাস লেখা। বিষয়বস্তু খুবই সামান্য। সামান্য বিষয় নিয়েই উপন্যাস লিখতেন তিনি। এর পরে লেখা বৌদ্ধিক আর সোনার কিছুকিও এতদিন সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে লেখা।

এই একই কাহিনী নিয়ে বাংলায় বোধ হয় কম করেও গোটা দুটি পঁচিশ গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে। কিছু কিছু পড়েছি। কিন্তু তার মধ্যে 'শুভ বিবাহ'কে বিশেষ করে মনে রাখার কারণটা আবিষ্কার করলুম এতদিন পরে নতুন করে পড়বার সময়। তাঁর নিজস্ব অনাড়রন্দ্র স্বচ্ছ প্রকাশই উপন্যাসটিকে এত সুন্দর করে তুলেছে। নিতান্ত ঘরের কথা ঘরোয়া ভাষায় বলতে পারাও আট। সহজ কথা এত সহজে বলার দুল্লভ ক্ষমতা দেখেই রবীন্দ্রনাথ শরৎকুমারীর এত প্রশংসা করেছিলেন। তিনি 'শুভ বিবাহ' প্রকাশের পরেই ১৩১৩ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'বঙ্গবর্ধন' নব-পঞ্চায়ী পুস্তক সমালোচনা করবার সময় প্রশংসা করে

এবার পুজোয়  
ছোটদের  
একমাত্র উপহার !

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও  
কল্প-বিজ্ঞানের  
রচনায় ভাসা কিশোর  
রচনার এক আশ্রয়  
সম্পন্ন !!

বাংলা ভাষায় এই প্রচেষ্টা

এর আগে হয়নি কি ?

সস্তবত না !

নিখোছেন সেবা সব

বিজ্ঞান-জাতিগোরা !

উৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের

গল্পই নয়, থাকবে

সংখ্যা নিয়ে খেলা, বিজ্ঞানের

যতসব ধাড়া ও ম্যাজিকের

ইংগিত এবং রোমাঞ্চকর

ও বিস্ময়কর অভিমানের

কাহিনী !!



এছাড়া আরও থাকছে

বিশ্ববিজ্ঞান-এর পরিপ্রেক্ষিতে

বিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতম

আবিষ্কার ও গবেষণার খবর

যা আমাদের প্রচলিত

ধ্যান ধারণাকে

অনেক বদলে দেবে।

প্রস্তুতি সম্পাদনা করছেন,

বাংলায় সাহায্য ফিকসন

রচনার অন্যতম পাঠ্যক্রম

সমরাজ্য কর।

শেখা প্রকাশন বিভাগ

# প্রকাশিত হল আশাপূর্ণা দেবীর সর্বাধুনিক উপন্যাস সুখের নিলয় বারো টাকা

বাজারে ঘুরতে ঘুরতে একদিন  
নিরানন্দকে কুড়িয়ে পেলেন শম্ভবর।  
বাড়ি নিয়ে গেলেন। কিংবদন্তি-বাসী  
নিরানন্দ ওরফে নিকর মতো শম্ভবর গুঁজে  
পেলেন তাঁর অতীত জীবন। যে জীবন  
কেবলি লাঞ্ছনার অত্যাচারের অপমানের—  
মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতার আনন্দ  
বাকুল। কিন্তু নিকর উৎসাহ আর  
শম্ভবরের মানবিকতা সহজভাবে মেনে নিতে  
পারে না কেউ। না ভারতী, না অমিতাভ,  
নীথিকা, সবুজা, সবুজার ভেলে, চন্দা, না নবীন।  
এরা সবাই 'সুখের নিলয়'-এর বাসিন্দা।  
এদের চম্বা অভিমানে চন্দা ভালোবাসা কুৎসা  
মতবু নিয়েই 'সুখের নিলয়'-এর কাহিনী।

**জন  
নন্দ**

লেখক পাঠক  
প্রকাশক  
এই তিন নিয়ে  
তিন সঙ্গী

শুধু বইয়ের দোকান নয়—আরও কিছু  
ওয়েস কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৫

ভারতবর্ষের সঙ্গে দেখা হয়েছে  
নানা ভাবে। কখনো ধানক্ষেতে, আলপথে,  
গোহাটায়, খালপাড়, বৈকুণ্ঠপুরে  
হস্তশিল্পের হাবির আঙনের আলোয়।  
আবার কখনো সদা পুত্রহীন শরৎ চাষী  
কেরাচিন কিনতে বেরিয়ে ছেলে-পড়া  
ধানের শীষ যখন দেখাছিল তখন।  
এই সব নিয়ে গঠিত দুই দশক আশি যেসব  
গল্প লিখেছি তার বাছাই  
সুন্দর, সুসংগত আয়োজন

শ্যামল  
গঙ্গোপাধ্যায়ের  
গল্প সংগ্রহ-১  
পঁচিশ টাকা  
নতুন উপন্যাস  
চন্দ্রনৈখর  
জংশন  
বারো  
টাকা

প্রথম সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষের পথে

সে সহজে লেখা যায়, এ কথা ঠিক নহে। নিত্যা-  
পরিচয়ের আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির জড়তা আনে—মনকে  
বাধা নতুন করিয়া বিশেষ করিয়া আঘাত না করে,  
যদি তাহাকে জানিবার ও জানে না। বাধা স্পর্শচিত্ত,  
তাহার প্রতিও মনের নবীন ঔৎসুক্য থাকে একটি  
দুলভ ক্ষমতা। 'শুভ বিবাহ' লেখিকা সেই ক্ষমতা  
প্রচুর পরিমাণে প্রকাশ করিয়াছেন। এমন সম্ভব  
সত্য চিত্র বাংলা কোন গল্প বইয়ে আমার দেখি নাই।  
গ্রন্থে বর্ণিত অন্তঃপুর ও অন্তঃপুরিকাগণ 'যে  
লেখিকার বানানো, একথা আমরা কোন ভাষাগোষ্ঠেই  
মনে করিতে পারি নাই।"

পরবর্তীকালেও শরৎকুমারীর রচনার প্রতি  
রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ও কৌতুহল ছিল তাই দেখি  
তিনি স্বল্পপত্রের সম্পাদককে লিখছেনঃ লাহোরিনী  
একটা কি গল্প লিখেছেন, এমন গুরুত্ব শুনাই।  
আমার বোধ হয় তাঁর লেখা ভূমি নির্ভরে স্বল্প  
পত্রের জন্য দাবী করতে পার।

'শুভ বিবাহ'র ঘটনাস্থল কলকাতাবাসী  
কায়স্থ সমাজের দুটি অন্তঃপুর। সমস্ত উপন্যাসটা  
নাটকের মতো সংলাপ দিয়ে লেখা। বর্ণনার বাহুল্য  
নেই, খুঁটিনাটি আছে। দুটি পরিবারের চালচলন,  
ভাবধারাও লক্ষ করাবার মতো। ভুবনের দ্বিধার পরি-  
বার সবেকীর্ষাচীরে। সেখানে মেয়েদের স্কুলে পাঠানো  
হয় না তবে একটি পড়াশুনা জানা না থাকলে বিয়ে  
হবার জো নেই বলে পলিডত রেখে মেয়েদের লেখা-  
পড়া শেখানো হয়। আর নীরদচন্দ্রের শিক্ষিত  
পরিবারে আপাত সবেক চালচলন বজায় থাকলেও  
সেখানে মেয়ে-বউরা সবাই ইংরেজীতে কথা কইতে  
পারে, গান-বাজনা করতে জানে। "হস্তায় তিনদিন  
করে মেম এসে তাদের সেলাই, ইংরেজী আর হার-  
মানিয়াম শেখায়।" "মেয়েলি কথাবার্তার মধ্য দিয়ে  
সমস্ত ঘটনা যেন হাবির মতো চোখের সামনে ভেসে  
ওঠে।

দ্বিধা পাক চুল তুলাইতে তুলাইতে বালিলেন  
—দেখিছিস রাণী, বোয়ের শিকলি চাড়ির গড়ন  
দেখিছিস, চ্যাপা, চ্যাপা—  
রাণী। কিন্তু মা, বেলওয়ারি ক-গাছির  
চমৎকার গড়ন।  
আমি। দ্বিধা বাড়ির বৌ কেন নিমন্ত্রণ করিতে  
আসিল।

দ্বিধা। আজকাল এ রকমই নিয়ম হয়েছে।  
রাণী, আমার মতো জায়ের আকলে দেখিছিস, একটা  
পুটে বৌ দিয়ে কিনা আমাকে নিমন্ত্রণ করা  
হয়েছে। আমি ত যাব না, তুই কাল সেজবোমাকে  
নিয়ে যাস। কালই চলে আসিস।  
রাণী। মেজোকাঠীর যে জ্বর হয়েছে মা,  
তাইজন্য আসতে পারেন নাই—দেখলে না কত করে  
বলে দিয়েছেন।

দ্বিধা। বড়বউকে তো পাঠাতে পারতো, বৌটার  
বড় চাকরি হয়েছে কি না, তাই বড় গুমর হয়েছে।  
সমস্ত উপন্যাসটাই সংলাপ নির্ভর। পড়তে  
পড়তে মনে হয় শরৎকুমারীর পর চলতি বাংলায়  
এমন উপন্যাস আর লেখা হইল না। নাটকের মতো  
সংলাপের মাধ্যমেই তিনি 'শুভ বিবাহ'র ছাঁচশক্তি  
চিরকাল জীবন্ত করে তুলেছেন। শরৎকুমারী নিজেও  
ছিলেন সুঅভিনেত্রী 'অলীকাবাব' নাটকের নায়িকা  
হেমোংগিনীর ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি সবাইকে  
মুগ্ধ করেছিলেন। তাই ভুবন, ভুবনের দ্বিধা,  
নন্দ, শ্যামল, নন্দীরা রাণী, নীরদ, গণেশ,  
নীরব মা, নিস্তারিণী, বিলি, আহলাদী কেউই  
প্রতিদিনের শত ভুজের আড়ালে হারিয়ে যান।  
নিজের নিজের ঐশ্বর্য্য নিয়ে হারিয়ে যান।

শরৎকুমারী ভুবনের চোখ দিয়েই আমাদের সব  
কিছু দেখাবার চেষ্টা করেছেন। ভুবনের সংগে তাঁর  
সাদৃশ্যও প্রচুর তিনিও ভুবনের মতোই দীর্ঘদিন  
কলকাতার বাইরে, সুন্দর লাহোরে কাটিয়েছিলেন।  
ঠাকুরাণ্ডিতে সেজবো শরৎকুমারীকে 'লাহোরিনী'

পাশেই তখন থাকা। 'শুভ বিবাহ'র লেখক ভুবন বাইরে  
থেকে এসেছে কলকাতার নারীসমাজে  
খুঁটের দেখেছে একটু, দুই থেকে, এটুই দুই ন  
থাকলে অনেক কিছুই ঠিক ঠিক চোখেরাটা চো  
পড়ে না। দেখেছেন শরৎকুমারীও। দেখেছেন বাংলা  
দেশে মেয়েদের চোখে মেয়েদের কী দাম!

দ্বিধা। ওলো সুহাসিনী, তুই যেন দই খানি  
কোলে কাঁচি ছেলে।  
সুহাসিনী। কেন মা, এ দেখ নবদুর্গা খাচ্ছে  
ওরও তো কোলে কাঁচি।  
দ্বিধা। ওর যে মেয়েটা—মেয়েনোড়াইত স  
সম, তোর যে খোকারটা—বোটাছেলে, সুখী শরীর  
সদি হবে যো।

কিংবা,  
মেয়েমানুষ, পাতের হাতের কুড়িয়ে খে  
মানুষ হবে—তাতে আবার খুগা কি, আশীর্বাদ  
হাতের নোরাগাছটা বজায় থাক, পাঁচ পাত কুড়িয়ে  
খায়।"

এ সব ছবি মেয়েদের পক্ষেই অসাধারণ।  
এমন সংলাপ মেয়েরাই রচনা করতে পারেন।  
রবীন্দ্রনাথও হাল ছেড়ে দিয়ে বলেছেন "মেয়ের কথা  
মেয়েতে যেমন করিয়া লিখিবাঁ, এমন কোন  
পুরুষ-গ্রন্থাকার লিখিতে পারিত না।" অবশ্য  
ভুবনের সব অভিজ্ঞতাই যে এ যুগে অচল তা নয়।  
তাঁর অভিজ্ঞতার শরিক হতে আজকের পাঠক বাধা  
পাবেন বলে মনে হয় না কারণ সমাজের বাইরের  
দিকটা যতই বদলাক না কেন ভেতরটা আগের মতই  
আছে। ভালোমানুষ ভুবন ডেবেছিল শিক্ষিত  
ছেলেরা লেখপড়া জানা মেয়ে পছন্দ করে কাজেই  
মেয়েদের লেখপড়া শেখালে নিশ্চয় পণ্ডিত  
হবে। কিন্তু তার কলকাতাবাসিনী দ্বিধা তাঁকে  
অবাক করে দিয়ে যখন বলে, 'সে-গুড়ে বালি' নে  
জাই। ভূমিও যেমন, পয়সার কাছে কেউ নয়।  
আজকালের বাজারে মেয়ে রূপসাই হোন আর  
গুণেতাই হোন, বাপ একছালা টাকা চালাতে না  
পারলে তার আর পারাপার নেই।' তখন পচাত্তর  
বছরের কখনো ঘটে যায় এক পলক।

এ যুগের পক্ষে 'শুভবিবাহ' বড়ো বৌলি  
মটিলতাবোধিত, সমসাহীন সাদামাটি উপন্যাস।  
কলকোশল বা ভাষার ছটা একেবারেই নেই। সামান্য  
একটুখানি গল্প, নীরদচন্দ্রের মেয়ের বিয়ে ভেঙে  
যাবার মতো ঘটনাটিও ঘনঘটাহীন তবু গল্পের  
বিন্দুনিতে চেনা পরিবেশ এমনভাবে বাঁধা পড়ে গেছে  
যে মনে হয় সমস্ত কিছুই জীবন্ত।

'শুভ বিবাহ' হয়াত টুটিহীন উপন্যাস  
নয়। কল্পনার সংগে সত্যের সূচনা,  
মিশ্রণই গল্প উপন্যাস সার্থক হয়। কিন্তু  
শরৎকুমারী তাঁর কল্পনামৃতিকে দূরতর দিগন্তে  
প্রসারিত করার কোন চেষ্টাই করেননি। নিজের  
পরিবেশটিকে নিবিড়ভাবে ফুটিয়ে লেই তিনি কাজ  
শেষ করেছেন। লেখক শর্তবিহীন পরিবেশ  
সচেতন হলে এবং তাঁর বা অধর্মী ছবি আঁকার  
প্রবণতা থাকলে অনেক সময় একটা বিশেষ  
যুগ পার হয়ে এলে আর সেই গল্প বা  
উপন্যাস পড়তে ভালো লাগে না। 'শুভ বিবাহ'ও  
হরত সাময়িক রচনা তবু 'হু' বছর আগে লেখা  
'শুভ বিবাহ' গভীরগতিক ভগ্নাতিতে পাঠকদের  
সামনে আত্মপ্রকাশ করেন, এখনও তার সত্যত্ব  
কিছুমাত্র কম হয়েছে বলে আমার মনে হল না।

এখনকার পাঠকদের সবার সংগৃহে হরত  
'শুভ বিবাহ' নেই। পুরানো বই খুঁজা থেকে পেতে  
পড়েন তাঁরাও শরৎকুমারীর উপন্যাসটি পড়েন কি না  
জানতে পারিনি, অনেকে নামও শোনেনি হয়ত। কেউ  
কেউ আবার সেকলে মহিলার লেখা বলে অবজ্ঞাও  
করেন কিন্তু 'শুভ বিবাহ' সত্যিই অন্যদর পারার  
মতো উপন্যাস নয়। পড়তে বসলে আপনিই মনকে  
টানে, পরে আবার পড়তে ইচ্ছে করে।

চিত্রা দেব





# সাদা ডেট'ব সাদা

নতুন ফর্মুলা

## ডেট

ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার  
পাউডার



অতুলনীয় ধোয়ার শক্তি, অকুরন্ত ফেনা,  
সতেজ স্বগন্ধ আর ধবধবে সাদা।



কিশোর সাহিত্যে জালোড়ন স্থিতিকারি গ্রন্থ

## বিশ্ব-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প সংগ্রহ

সম্পাদক-অনুবাদক-অধ্যাপক ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী  
প্রথম খণ্ড ২০, (কিশোরদের জন্য ২০% বিশেষ ছাড়)

লেখক ভূপতিরঞ্জন দাস-ভ্রমণ সাহিত্যে; এবং তথ্য  
সংগ্রহের ক্ষেত্রে যুগান্তর সূচনা করলেন।

## পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণ ও দর্শন

১ম ও ২য় খণ্ড—মূল্য ৪০

## ভারতের তীর্থ পথ নির্দেশ ২০

## দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন ১২

সত্যীশচন্দ্র চক্রবর্তী

## সন্তানের চরিত্র গঠন ৫

৪৭৪ পাবলিশিং হাউস

১৮৮ টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

'শ্রীসত্যকাম'কে

নাট্যকার্য শ্রী মম্মথ রায়-এর

## আশীর্বাদী

"তোমারা 'এই নারী এই তরবারি' পেয়ে এই বয়সে একটি ভরই  
পেয়েচিলাম, কিন্তু পড়তে শুরু করে আর চাড়াতে পারি নি।  
শেষ না হওয়া পর্যন্ত কলঙ্কাসে পড়ে পড়ে, শেষ হতেই মনে হল-  
কেন শেষ হল! তোমার লেখনীর যাদুতে ইতিহাস আর  
রোমান্টিক সাহিত্যের মালি কাকদ্বন্দ্ব সংযোগ হয়েছে। তোমার গ্রন্থে  
গল্প কাহিনীটি পাই নি, যুগটিও পেয়েছি। এটা এক অপরিসীম  
কৃতিত্ব।"

[বইখানি তৈমুর লঙ্গের বিভিন্ন জীবন কাহিনী প্রায় ৪০০  
পৃষ্ঠার; দাম পনের টাকা]

★

রাষ্ট্র সংস্কৃতির নবতম আকর্ষণ—

রুশা পৈতৃষ্ঠী বিরচিত 'মঙ্গলপীঠ-সিদ্ধপীঠ-মহাপীঠ-  
বক্রেশ্বর' মূল্য ১৩-৫০ টাকা মাত্র।

জ্ঞানদা সাহিত্য সংসদ

পি ৬৪৮ লেক টাউন, কলিকাতা-৩৫

কিছুতেই গাড়ি জেগাড় হল না। অতএব  
জোড়াসকো থেকে দিনেন্দ্রনাথ গান  
করতে লাগলেন টোলফোনে। জবান-  
পেরে ব্যারিস্টার সি আর দাশের এই  
বাস্তব চেষ্টায় ফোন ধরে দাঁড়িয়ে তারা  
দুপুরে গান শিখতে লাগলেন সাহানা  
দেবী। সেইভাবে সোঁদন টোলফোনেই  
শেখা হলো চৌদ্দটি গান! (পৃঃ ১২৭)  
হায় রে, আমরা যদি ফোন রকমে সেই  
সময়ে একটা ক্রসকানেকশন পেয়ে  
যেতাম!

সাহানা দেবীর মাসিমা অমলা দেবীর  
কণ্ঠসম্পদের জন্য তাঁর হিন্দী গানে  
বালা কথা বলিয়ে টপ্পা গান বেখে  
দিতেন। এইভাবেই তাঁর 'বির  
মখা হে', 'এ পরকাসে রাবে কে', 'কে  
বসিলে আজ হৃদয়সনে', 'দিনফারকো  
হে সংসারী' ইত্যাদি অসামান্য গান  
আর সাহানা দেবীর জন্যও একইভাবে  
বেখে দেন মহারাজা কেওয়াড়িয়া  
খোশোর সুরে কথা বাসুরা খেলার সখী  
বিমলাজি খোশো। 'নবমা কান্ধাইয়ার  
সুরে তাঁর হলো 'বর্ষা ওই সপ্তরে  
ভালো মোরে। শেষে গ্যাটি গাঁপ-  
বিতান নেই; কোনো রচনাবলিতেও  
এটির অন্তর্ভুক্তি ছিল ভ্রমবশত। গানটি  
এখানে তাই পুরোই তুলে দিয়েছেন—  
আর সুর তো চেনা। ওই হিন্দী  
গানটিতেই বালা কথা বাসুরে অতল  
প্রসাদ রচনা করেছেন শ্রীকান্ত ওলা তা  
(পৃঃ ১৩৩) এই খবরগুলি মহাশয়  
মূল বর্ণনা করেছে।

১৯২৩-এ গিনজান অভিনয় হচ্ছে  
এম্পাররে সাহানা দেবী জুর নিয়ে  
দশটি গান গাইলেন। রবীন্দ্রনাথ আছেন  
গোবিন্দনাথকা ও জবাসংহের বৈষ্ণ-  
ভূমকায়। রঘুপতি দিন ঠাকুর। বায়ট  
বছর বয়স্ক কবি যখন জয়সিংহের বঙ্গ-  
লঙ্কার মধ্যে প্রবেশ করেন তখন সাহানা  
দেবীর চোখ দিয়ে আমরাও মুগ্ধ নরনে  
এবাক বিস্ময়ে সাক্ষী হই সেই অসামান্য  
নৃসংসারের—তার সেই রূপসংহার  
মধ্যে রয়েছে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ,  
নন্দকল্ল কুমুদ শিল্পীশ্রেষ্ঠদের প্রা-  
চুর স্পষ্ট ছাপ। (পৃঃ ১৬৪)।

ছোটো ছোটো উল্লেখের মধ্যে স্বাভা-  
বিকর গাই স্বাঃ রূপটিও দিবি ফাঁড়ের  
ছেন সাহানা দেবী। কবিবে যখন বল-  
লেন : 'বেলা যখন শিশু, আমি রাত্র  
উঠে দুঃগম করে তাকে কত খাইয়েছি',  
তখন সাহানা দেবীর কলমে আমাদেরও  
মনের কথা প্রকাশ পায় : 'সত্যিই  
এসব দুখা আমাদের কল্পনারও বাইরে  
স্বপ্নেরও অগোচর' (পৃঃ ১৯২) কবি  
যখন তার পূর্ববধূকে বলেন—'এখন  
ওঁমা, তোমার শাড়ীডেকে আমি আনব  
রামা শিখিয়েছি।' তখন কবিকল্যা  
মীরা দেবীর স্মৃতিকথা মনে পড়ে বাখ  
তিনিও পিতার রঞ্জন-উৎসাহের কথা  
বলেছেন। মতিরা দেবী, সরলা দেবী,  
মৈত্রী দেবী এদের মূল্যবান স্মৃতি-  
কথার সঙ্গা সাহানা দেবীর বইয়ের  
সামগ্রিক মেজাজের কিছটা কিছু  
পাথক আছে। এতটা বিপুল আয় চেষ্টার  
শ্রম তদের লেখায় পাওয়া যায় না।  
কলি কোথাও ঘটনার চেয়ে বড় হয়ে  
ওঠেন, কথক কোথাও কথার  
জন্মে প্রাধান্য পান নি। অতঃ  
মীরা দেবীর স্মৃতিকথা মতো নিজেকে  
মুখে ফেলার প্রয়াসও এখানে নেই।

নিজের প্রসঙ্গ সামনেই আছে, কিন্তু  
বহুতর কেনো ব্যক্তিগত উল্লেখের দৃশ্য  
অনুবিবর্তিত হয়ে। যেমন অথ নেই  
তেননি সেই অতি ক্লিন্নের ক্রন্দন।  
এমনকি নিজের প্রসঙ্গে অন্যের প্রশংসা  
উদ্ধৃত করার সময়ও লেখকের মধ্যে  
আত্মীয় এক জড়তাইবী, নৈবাঁদিক  
দুঃখ দেখা যায়। এটা বোধহয় জাপনী  
যোগসাদিকারই যোগা সংঘে।

ঠাকুরবাড়ি ছেড়ে এক সময় স্মৃতির  
খেয়া ভেসে আসে গোমতী নদীর তীরে  
লখনৌ শহরে, উচ্চাপ সঙ্গীতের জ্বর-  
বস্ত আসরে। সেখানে আমাদের দেখা  
হয় অতুলপ্রসাদ, হুজুটিপ্রসাদ, দিল্লীপ  
কুমারের সঙ্গ। পাশত ভাতখণ্ডের  
দেখতে পাই—সুন্দর ধানী মাত।  
বসন্তে সঙ্গীত সভা আলো করে।  
(পৃঃ ১৭৭) সাহানা দেবীর গগন  
তিনিও মুগ্ধ হয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ  
চৌধুর গান, মোরাদ খানের বীণা,  
এনায়ে খানের সেতার, আলাউদ্দিনের  
মইহার বাজ, বীরু মিশ্রের তবলা,  
হাফিজ আলির সাদেদ...অতুলমণি এক  
জ্যোতির্ময়মণ্ডলী উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন  
সাহানা দেবীর প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে। সুখ-  
মাধনা সাহানা দেবীর প্রাণরস সঙ্গীত  
তার গাইশবের জুস। এই সঙ্গীতের  
মাধ্যমেই দিল্লীপকুমার রায়ের শব্দ  
ঘনিষ্ঠতা। এই কথ্যে তাঁর ভাবনাক  
এক নতুন পথে পটভূমিক তুলে তখন  
দিল্লীপকুমার বলতে বাংলাদল দাপল  
সঙ্গীতজগতের সেই কল্ল প্রাণের  
সাহানা দেবীকে দিলেন এবং মূলতঃ  
কগরের স্থান, যার মত এতমাত্র  
এমন কি সঙ্গীতও হয়ে থাকে।  
কাড়ি কতি দিল্লীপকুমার সাহানা দেবীর  
যখন গানের প্রসঙ্গের ঐক্যমত  
গলিককেও কল্ল করে দিল সেই অত  
গতি মনোহর জ্যোতি—দিল্লীপ  
কুমারের কথাবাতা শুনেই আমি  
যোগজ্ঞানের সম্বন্ধে আসা পাই ও  
ধীরে ধীরে সেই দিকে আকৃষ্ট হই।  
(পৃঃ ২১০)

অবশ্য সঙ্গীতের কথা কোনো  
দিনই ঢুকে যায়নি, তাঁর লজ্জাই সে  
গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তার সুর এবং  
কাজের মজলার ছড়িয়ে। আগ্রহ  
বাগিনী, যোগিনী, তপস্বিনী সাহানা  
দেবী যখন রবীন্দ্রসঙ্গীত বিবরণী কথা  
বলেন, তার অন্তরের সেই উত্তাপ কুণ্ডে  
বেরোয়। 'এখনও রবীন্দ্রসঙ্গীত  
শুনেন...মনে হ... তাকে কী সেন  
পাই না...দুঃখ বোধ করি এইজন্যে  
যে যা তাঁর দিয়ে গিয়েছিলেন তা গ্রা  
সেই...আমরা তাকে রক্ষা করতে  
পারিনি।...আজকালে রবীন্দ্রসঙ্গীত  
সকলেই গেয়ে থাকেন...সঙ্গীতচর্চা  
এখন ঘরে ঘরে...তবু, রবীন্দ্রসঙ্গীত  
অন্যের যত্নে তেনন মোটে না...কি  
অতঃ সুর হয়ত ঠিকই থাকে।...কি  
তবে গাইলেই যে তা সব সময় রবীন্দ্র  
সঙ্গীত হয়, তা বলা যায় না।' (পৃঃ  
১০৪-৯) পাঠকেরা অনেকেই হয়তো  
সাহানা দেবীর অন্তর্দৃষ্টি অনুভব করেও  
পারেন।—কীতনের বহুল প্রচলন ছিল  
দেশবন্ধুর পিকারে। কীর্তন ছিল  
রবীন্দ্রনাথের কিছ মন্তব্য কুলে  
দিয়েছেন সাহানা দেবী, যা খুবই  
জরুরি। কীর্তনের বৈশিষ্ট্য চাংকার-  
ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, কেন

জা বাঙালীর একান্ত গনজন্ম অমূল্য সম্পদ।

সম্পত্তি বিষয়ে সাহান দেবীও চিন্তাগণি গভীর অভিজ্ঞতাপ্রসূত, গ্রন্থা। কিন্তু সম্পত্তিকে ছাড়িয়ে তার জীবন ভ্রমশ মিথে যায় এক মহত্ত্ব প্রোত, গীতালীর সম্প্রদায় এসে আম জীবনকে দেখতে শিখি অন্য দৃষ্টি নিয়ে। জীবনের গভীরতর দিক দৃষ্টি পড়ে। (পৃঃ ২১১) এর পরে শর, হয়েছ সেই গভীরতর জীবনে থেয়ে বাইবার কাহিনী। শ্রীঅরবিন্দ এবং শ্রীমায়ের করুণাময় ছায়ার আশ্রয়ে এসে পৌছোনের মন্থবোধ কথা। আঘাতের পরে আঘাত হেনে ইন্দুর নাচিয়ে-গাইয়ে হাসিমুখি স্বপ্নের উজ্জল স্বনটকে জোর করে জেতার দিকে ঘুরিয়ে নিলেন। শ্রীমায় সংস্পর্শে এসে তার পুনর্জন্ম ঘটল। অতীত সংগ্রহ, সঞ্চল, স্পর্শে ভায়র সেই বহুসময় যৌগিক অধ্যাক্ষিক্যের বর্ণনা দিয়েছেন বীতিন, তার ভ্রমশ জেগে-ওঠে তখনার খবর দিয়েছেন আমাদের পড়তে পড়তে অতি বড় কাহা। পাহাড়েরও গোমাণ হয়। অসম সাগর ভারতে যে, সে-সময়টির বৃক্ক শৈশবের পিতৃবীণা থেকে শর, কাল বাবুটি প্রবল স্নাতত এসেছে ঘর জীবনসিন্দুর মতোই অজ্ঞাতাভিত, তরঙ্গশস্য, তা। সমীপের পথটি কী করে এসে পাহাড়-ফলগাছের গির-ধ্বনি সাগরতীর উপর ডেসে বেড়াচ্ছ। বইটি সম্পূর্ণ অস্-ব্যক্ত। জীবনের শাস্ত, শৃঙ্খল, ক্যান সন্দের দিকগুলিই শৃঙ্খল, এখানে ধরা পড়েছে। সেই মঙ্গলশক্তির মধ্যে বিকশিত হয়েছে একটি সমাধিত হৃদয়ের মাধুর্য। পাঠকের মন প্রাণত নম্র হয়ে আসে।

তবে বইটির একটি, সম্পদনার প্রয়োজন ছিল। আলদা প্রথমে শিরোনামগুলি বর্জন করে অধ্যায় কাল ক দেওয়া যেত। অন্যথায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির স্বাধ ও কালের নিদেখ দেওয়া উচিত ছিল।

মুহুর্তির প্রাণ গতিতরায় সম্পদ-সম্পত্তির উল্লেখ অমূল্য শ্রীঅরবিন্দের অনুবাদও সম্পদ। কিন্তু এই বইটি সে অংশটি প্রস্তুততা ছাড়া কলকাতা-গাল চতুর্দশম মাসের বঙ্গদেশে সহস্রা করে না-প্রাণ অতিক্রম পাঠ্যের কান/শৃঙ্খল ও গোমাণ নানা বা-স ম যথেষ্ট তরঙ্গিত। অতঃপর ইত্যাদি অমোঘভাষ্য রবীন্দ্রনাথ বসুপ্রসাদ, মনে পড়িয়ে দেয়। এগুলি এ বই-য বাদ দিলেই সর্বদিক থেকে ভালোই য়ে। তবে অরবিন্দের অসামান্য ইংরাজি অনুবাদগুলি পড়ে বড়তে পারি সত্যি 'গোমস্তকেশন' কাকে বলে। দেখে চমকি অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথ অনুবাদে যা করলেন না বলে।

সত্যতা এবং সারলা উদারতা এবং আনন্দ স্মৃতির খোঁজা হল এবং দৃষ্টি, মাতুল এং পাল। এমন বই লিখতে পারা ভাগ্যের কথা। পড়তে পাওয়া পে। সৌভাগ্য বটেই। নবনীতা দেব সেন



নির্বোধতা ঘোষ

চারিদিকে শিশু চিত্রপ্রদর্শনীর ধুম পড়ে গেল। শিশু-মাত্রই সম্প্রদায়ের আধার এবং শিল্পকলার মাধ্যম শিক্ষা দিলে তারা বড়তে পারে তোড়াটাড়ি। এমন কী তাদের কবিতার শান (আই কিউ) বেড়ে যায় মূল্যবোধকে দেখেছেন। শিশুর সজ্ঞানী-শক্তির উলস খুলে দেওয়ার এক তোড়ের বাধ দিয়ে নিম্নশ্রমণ করার দিক দিয়ে শিল্পকলার মতো কিছু নেই। সে নিজেকে এক বাইরের জগতটিকে আবিষ্কার করে রঙেরেখা কাসমাটি ঘটিতে বসে। সবাই যে শিল্পী হয় তা নয়। কিন্তু শিল্পকলা তাকে দেয় নন্দনবোধ এক সরটি। ইংরাজী মাধ্যম মূল্যবোধ একথা বড়তে পেয়েছে। কিন্তু তথাকথিত ইংরাজীনিবাস মাধ্যমিক পরবর্তে বড় কতরের ঘটে এটা ঢোকেনি, লুপ্তের চারুকলাকে নিবাসন দিয়েছেন তারা। কল্পনা নাকের কলস হাতের কাজের নরম পেরোচ্ছ শিশুরা।

ইদানীং কস আঁকা প্রতিযোগিতা থেকে পায়াল পায়াল শিশু চিত্রশিল্পের কেন্দ্রে বেড়েছে কল আমি বশি। এরা হঠাৎ বড় হয়ে বাকি জগতের চেয়ে শিল্পকলাকে ভালবাসতে বেশি। শিল্পীদের ক্যানা সম্মান দেবে। কিন্তু এইসব ফ্রেণ্ড-বিশিষ্ট বার্ষিক প্রদর্শনীকে যথার্থ শিল্পীদের প্রদর্শনীর চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে দেখে, আমার ভাল লাগছে না। শিল্পিত বাঙালী মধ্যবর্তি চলচ্চিত্র, মঞ্চ, শিশুচিত্র, ফেটোগ্রাফ এক কল্পনায়ের পুতুল ছাড়া বেশি কোকেন না।

গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত সারলা দেবী শিশু চারুকালকে কেন্দ্রের প্রদর্শনী বিবেচনামূলক হলে অনুষ্ঠিত হল। এটা দেখাশোনা কল কবিতার রামানন্দ বঙ্গোপাধ্যায়। তিনি অবশ্য শিশুদের আঁত স্কুল খুলেছেন। মেসোলাইট বোর্ডের শিরিষের আঁতা আর মেটে রঙ দিয়ে বড় ছেলেমেয়েরা মা-সারলা-ঘরী কাজ করেছে। রামানন্দ ভারতীয় পরগনা মহাকাব্যের জগতের সংগে সাংগা ভারতীয় ছবি পরম্পরা সম্বন্ধে অবহিত করেছেন চিত্রছাত্রীদর। সৌমেন্দ্রনাথ সর্ গ্রীকক বর্ষি হাতে এককোছ মন দিয়ে। মেমিন ভাল লেগেছে প্রতীপ সুরের সমদ্রুতধন দশা।

রামানন্দ মাটিতে জল রঙ আঁতা পিন্সারিন দিয়ে রেখা তাকরণ ছবি একে

হাতের জোরে ছবির ছাপ তোলাতে লেখাচ্ছে। বস্তুর অন্য কোন কেন্দ্রে ছাপাই ছবি হয় না। এছাড়া আমার ভাল লেগেছে কিছু পঞ্চ পল্লবকেশর ছবি। বিশেষত আশীষ মধ্যাজীর কাজ। পাহুন হচ্ছে আচায রমেশনাথ চক্রবর্তীর নাতনী পিমালীর একটি ফলের কাজ। আর অভীক সেনগুপ্তের কোলজ। ইন্দু-দীপের ঢাকুরিয়া রঞ্জির কাজটি বড় ভাল।

আকাদমী অব ফাইন আর্টসে 'বাণী-চক্রের শিশুচিত্র বিভাগের' কিম্বদন্তি প্রদর্শনী হলো। অজিত গুপ্ত শিল্পীদের হয়ে যে কাণ্ড কারখানা করেছেন তা ভাবা যায় না। তিন শ ছবি কিম্বদন্তি প্রদর্শনী। অজিত সোমনাথ হোড় এক বিজন চেহেরীর সহপাঠী। শিল্পের কল্পনার খার খলে দেবার বরণের তারি জড়ি নেই। তিনি কলন ছাত্রদের এক-জনকেও তিনি শিল্পী হিসাবে দেখতে চান না। বরং তাদের সমাজদার হিসাবে হেঁচকী করতে চান। তিনশ শিল্প কি ভাণ্য কল্পনার দৌড় লাগাতে পারে এই প্রদর্শনী তার প্রমাণ।

মেমিন কলিগঞ্জ ইনস্টিটিউটের ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির সভাপতি স্বাক্ষরকার ছাত্রছাত্রীর কাজ। কিন্তু আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে হাওড়ার তপন মজলার 'বাণালী'র কাজ। জন-কেন্দ্র শিল্পের তোড়কে বধি দেবার ক্ষেত্রী হওয়ায়। তপন সোমকান্ত কল্পনাকে অগাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন। বিদেশী শিল্পচিত্রের কীতে যে ধরনের মস্তপক শিল্পদের কল্পনাকে উড় যেত দেখা যায়, তপনের ছাত্রছাত্রীদর গ্রন্থা সেটীটা দেখলাম। এটি অব্যাহত স্বাধীনতা আমার ভাল লেগেছে।

## নবীন যুবক রূপে শিল্পীর প্রতিকৃতি

নাম এলিস্টার গ্রান্ট। শৈশব চিত্র-শিল্পী। লন্ডনের রয়েল আর্ট কলেজের ছাপাই ছবির বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। পড়াশুনো করেন ব্যামিংহাম আর্ট স্কুল এবং রয়েল আর্ট কলেজ। পশ্চিম ইউরোপের নানা দেশে প্রদর্শনী করেছেন। বয়স বছর চুয়ান্নশ। আগামী হেমন্তে কলকাতায় ব্রিটিশ ছাপাই ছবির গত পঞ্চাশ বছর (১৯২৮-৮০) বলে বিরাট

প্রদর্শনী আদ্যে। আগন্তকার তার নতুন এসেছিলেন। এদেশের নানা আর্ট কলেজ ঘুরে তিনি কাজ দেখিয়েছেন। শীতকাল নিরান্ধিত হোটেলে রেস্টোরার আমার সঙ্গে শিল্পকলা প্রসঙ্গে নানা আলোচনা করলেন।

বললাম : কি দেখলে এলিস্টার ? এলিস্টার : বড় বড় দেশ আর প্রাচীন। এক মাসে এর তলা খুঁজে পাব : আ : তবু ?

আ : তোমাদের দেশের দেওয়ালচিত্র ভালকর্ম, অশ্লিষ্ট এবং লোকচিত্রের বৈচিত্র্য আমি বসু হয়ে গেছি।

আ : আধুনিক কাজ ?

আ : দেখেছি বড় কম। ব্রিটিশ কাল-সিল আমাকে ঘুরিয়েছে নাকে বড় দিয়ে। স্পেন, এয়ারপোর্ট, হোটেল এবং আর্ট কলেজ। অধ্যাপকদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাইনি। ছাত্রদের সঙ্গে কেটেছে। এই দেখ গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের ছাত্রদের উপরোক্ত লিথোগ্রাফ করলাম—নখে এখনও কালির দাগ। ছাত্রদের সঙ্গে কাজ করতে হয় লন্ডনে। তার চেয়ে খুশি হতাম শিল্পীদের সঙ্গে আভা মেয়ে। তাদের কাজ দেখে।

আ : আর এখনকার ছাপাই ছবি ?

আ : টেকনিক টেকনিক করে এখানে ছাপাইকাররা বড় বাড়াবাড়ি করে ছেঁতে

আ : এখানে কেউ কেউ হেটেরের কাছে পারী গিয়ে কাজ শিখেছিলেন—সেইজন এই বিপত্তি।

আ : হেটের ইজ এ ডিসেন্টার। এক কুক রেডী বসু মিলে ওর কাছে ছবি কাজ শিখেছেন তাঁরা হেটের-মাকী কাজ করেন। এটিও রেখার অকিবদ্বিক কাটা নতুন নয়। তবে তোমাদের এখানে 'সফট গ্রাউন্ড', 'ডিপ বাইট', 'এক্সা টিট' এত শুনোই যে মনে হয় যে চিত্রভাষা আর নন্দনতত্ত্ব এরা ভুলে গেছেন।

আ : তা হলে ছাপাই ছবি.....

আ : শেন একটা কথা বলি। ইতি-হাস দেখলে দেখবে বড় শিল্পীরটি ভাল ছাপাইকার। ডুরেরার, রেমব্রা, গৌয়া, পিকাসো, হোয়াথ' সমকালীন ছবনী পর্যন্ত সবাই প্রমাণ যাদের ফেন বড় শিল্পী। ছাপাই ছবি বারি শৃঙ্খল, করেন তাঁরা খাটো মাপের একাত্তমীর ছাপাই বিভাগে আমরা বড় বড় শিল্পী-দের ডাকি। হেনরী মুর চানসিস কেকন, আর সব নামী-দামী শিল্পীরা আছেন। তাঁরা অবলীলার দারুণ কাজ করেন। যে



এলিস্টার গ্রান্টের ছবি

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি চিত্রকলা

হাজার খোকার কাণ্ড

ফেল্ডারগীর শেষ তিনটে সপ্তাহে



# নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাস... সুস্থ সবল দাঁত



## কোলাগেট ডেন্টাল ক্রীমের গুণ

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলাগেট দিয়ে দাঁত মাজুন।  
আপনার দাঁতকে হরক্ষিত রাখার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের  
ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর  
সৃষ্টি হয়। ফলে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে, পরে দাঁতে যক্ষ্মাদায়ক  
ক্ষয়রোগের শুরু হয়ে যায়।

সুতরাং প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলাগেট দিয়ে দাঁত  
মাজুন। দাঁতকে সাদা রকরকে করে তুলে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ  
দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলাগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার  
প্রমাণিত হয়ে গেছে।

কোলাগেটে এমন এক চমৎকার তাজা মিল্টি স্বাদ রয়েছে  
যে অনেকজন ধরে দাঁত ত্রাণ করতে ইচ্ছা করবেই।

কোলাগেটের নির্ভরযোগ্য করণ্য হলো কি ভাবে কাজ করে!



নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়রোগের জীবাণু জন্ম নেয়  
দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে।



কোলাগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে অবশিষ্ট  
খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দুইই দূর করে।



ফলাফলঃ সাদা রকরকে দাঁত, নির্মল তাজা শ্বাস-প্রশ্বাস  
ও দস্তক্স রোগ প্রতিরোধের দৃঢ় মনোবল।

**কোলাগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে  
নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন...  
দাঁতের ক্ষয় রোধ  
করুন!**



- 1 দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো বের করে।
- 2 দাঁত সাদা করে তুলে।
- 3 দাঁতের ক্ষয় রোধ করে।



# প্রখ্যাত লেখিকা শিপ্রা দত্তের চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত

প্রথম পর্ব প্রকাশিত হইল মূল্য ১৮ টাকা।

প্রখ্যাত দার্শনিক, গাণিতিক, বৈজ্ঞানিক শ্রী প্রিয়দারভন রায়  
লিখেছেন—

“চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত” এই দুই কাব্যের নায়ক নায়িকাদের  
চরিত্রের বিশ্লেষণে ও তুলনামূলক ব্যাখ্যানে তুমি যে নৈপুণ্য ও  
দক্ষতার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছো তাহা বিরল বললে অত্যুক্তি হবে  
না। তোমার ভাষা প্রাক্তন মনোভা ও হৃদয়গ্রাহী। সাহিত্য ও  
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বই দুখানি মূল্যবান অবদান হিসাবে সমাদৃত  
হবে। মানব জীবনের অদৃষ্টবাদ বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বা পুরুষাঙ্কার  
সম্বন্ধে যে দার্শনিক আলোচনা করেছো ইহা একটি চিরন্তন  
দার্শনিক সমস্যা.....।” এই পর্বে বহিষ্ঠ কর্ণ চরিত্র সমান বহিষ্ঠ  
ভাবে অঙ্কন করা হয়েছে। মহাভারতের কর্ণ চরিত্রের পূর্ণ মর্যাদা  
অক্ষুণ্ণ রেখে তাঁর অনন্য সাধারণ গুণগাণির সঙ্গে তাঁর দীনতা  
ও দীনতা সমানভাবে প্রদর্শন হয়েছে। পূর্বকার পর্বগুলির মতই  
এই পর্বটিও সুখপাঠ্য ও মনোরঞ্জন করবে পাঠকদের।

১ম—২০৮, ২য়—১৬৮, ৩য়—২৫৮, ৪র্থ—১৮৮

চট্টগ্রামের লোক সঙ্গীত

ডি. এম. লাইব্রেরী

৪২ বিধান সরলি কমিকাতা-৬

## হীরেন্দ্রনাথ দত্ত রচনাবলী

বাসবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্লিক গণিত ‘হীরেন্দ্রনাথ দত্ত  
কাউন্সেল’ দার্শনিকপ্রবর হীরেন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষা-  
কল্পে তাঁর সমগ্র রচনাবলী সংকলন ও সম্পাদন করে  
কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন।

● ‘প্রথমধর্ম’ ও ‘রাসলীলা’ এই দুটি গ্রন্থ নিয়ে রচনাবলীর  
প্রথম খণ্ডটি ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

ম্যাপলিথো কালজে ছাপা, ৪৬৮ পৃষ্ঠা, মূল্য বহিষ্ঠ টাকা।

‘বেদান্ত ও বিজ্ঞান’ এবং ‘জগদগুরু আবির্ভাব’  
দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট। শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

পরিবেশক  
সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

কলিকাতা-৯

জিজ্ঞাসা

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং

১এ কলকাতা-৯

৫৪/৩ কলকাতা-৯

এসং ১৬৩এ রাসবিহারি এডেন্স

কলিকাতা-৭৩

কলিকাতা-২৯

স্বর রসে না, গলার কাশে। ইন্দ্রনাথ  
চক্রবর্তীর ‘স্বপ্নে হল বেন’ সঙ্গীত  
নিবেদনের গম্ব-ঢালা, কোথা যে উষাও  
হলতে বরং প্রতিপ্রতির অভাব  
মিলল। নির্যাত বসুর গানে দখল  
হাওরা প্রাণ জগদ্বাসী, পূর্ণ চাঁদের  
মর্যাদা অক্ষুণ্ণ নিবেদন। ধীরেন চট্ট-  
পথ্যার ‘স্বপ্নে হল বেন’ চিত্রিত  
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ‘অনুভূতি’  
মের ছাপ ফেলতে পারেননি। তমালিকা  
গহ্বর ‘আমার দিন ফুলের’ প্রার্থিত  
অভিব্যক্তি ছিল। ইলায় মূল্যের সবল,  
সুরেলা, স্বকল্প ভাষার দৃষ্টি গানই  
রমণীয় নিবেদন। চিত্র বসু মূল্যের  
দৃষ্টি-চাঁপা ভাষা ভাষা লাগেনি।  
জলো লাগনি মূল্যের মূল্যের  
শুদ্ধ কণ্ঠের গানও। গৌতম মিত্র  
কণ্ঠে ‘আকাশ আমার’ যেমন সজীব,  
গান ‘বন ছাইল’ তেমনই অর্থনৈতিক  
এক উচ্চ। ‘কী হবে কে জানে-তে  
আকুলতা রয়েছে, রয়েছে ভাববহুলতা,  
একথা সত্য কিন্তু গৌতম মিত্র এমন  
ভাষাতে উচ্চারণ করেন যে, মনে হয়  
ভুলে গেলেন সালপেনস লোকের  
রয়েছে ওই শব্দ কণ্ঠিত। রত্না  
গোপালমায়র মাইক-নিরুপণ অনুশীলন  
করা প্রয়োজন, বোশ কানে লাগে।  
দীপ্ত চট্টোপাধ্যায়ও সবল, কিন্তু  
প্রয়োজনীয় কোমলতা প্রয়োগ  
করেননি। সুদীপ্ত মাইক-এর গায়ন-  
ভাষাতে নিজস্বতা নেই, কিন্তু  
হেমন্তের গান নির্বাচন করেছেন,  
একটা সদন কর্তৃপক্ষের তথা শ্রোতা-  
মণ্ডলীরও কৃতজ্ঞতাভাজন। শ্রীতির  
গান গাওয়াই হয় না, হেমন্তও অক্ষুণ্ণ  
হয়ে থাকে প্রায় প্রতি বছর। বুলবুল  
ভট্টাচার্য ‘স্বপ্নে হল বেন’ এসেছেন  
স্বপ্নে হল বেন। ‘গোয়েছেনও স্বপ্নে হল বেন’  
গানেরই বেশ-এ ‘ভর কণ্ঠে’ কিছুটা  
চাপা লেগেছে। স্বপ্নে হল বেন মূল্যের  
প্রতিষ্ঠার মহিমার চারখানি গান  
গোয়েছেন, গানে প্রতিষ্ঠিত করতে  
পারেননি। ‘এসো শ্যামলসুন্দর’-এ  
খোল ব্যবহার করলেন, নতুন না  
পরীক্ষা বোঝা গেল না। সুমিত্রা বসু  
নিঃসন্দেহে এদিনের স্মরণীয় শিল্পী।  
একটি গভীর বাণীর প্রতিটি এ কী-তে  
বিস্ময়কে আশ্চর্য কল্পনার শরীর করে  
তুলেছিলেন সুমিত্রা বসু। মনে গেছে  
যায়। আর বিস্মিত করেছেন নবীন  
শিল্পী স্বপ্নে হল বেন ‘স্বপ্নে হল বেন’



স্বপ্নে হল বেন

রহো’ গানটিতে। সঙ্গীতময় স্বপ্ন  
অন্যভাবে ‘স্বপ্নে হল বেন’ তার কণ্ঠে,  
গানটির অন্তর্ভুক্তি ঐশ্বর্যকে তুলে  
ধরল পূর্ণমাত্রায়। কিন্তু স্বপ্নে হল বেন  
—আজি স্বপ্নে হল বেন তেমন স্বকল্প  
মনে হয়নি তাকে। ‘আকাশ কণ্ঠে  
হতাশ-সম’ প্রথমবার তুলে করে  
বললেন, ‘আকাশ কণ্ঠে’। পরে অবশ্য  
স্বপ্নে হল বেন নিবেদন।

‘স্বপ্নে হল বেন’ স্বপ্নে হল বেন  
ছিল ১ মনে সকলে। স্বপ্নে হল বেন  
উদ্বেগধনী সঙ্গীতের মধ্যে ‘আজি এই  
গম্ববিশ্বের’-এ হারমোনির প্রয়োগ  
সংযত। প্রথম শিল্পী তপস্বী রায়ের  
সিন্ধুতা কম, কিন্তু সবলতা রয়েছে।  
সুদীপ্ত মূল্যের মূল্যের  
মূল্যের মূল্যের মূল্যের  
গোয়েছেন ‘এ কী আকুলতা’। গভীর,  
সুরেলা তার কণ্ঠে। জয়ন্তী ঘোষ প্রথম  
গানেই স্বপ্নে হল বেন, ভাবে-রসে  
আগ্রহ করে গান শোনাতে এসেছেন  
তিনি। ‘চিত্র আমার হারালো’ শব্দে,  
অনুরণনের নিবেদন। বিবর্তন গানে—  
‘আজি স্বপ্নে হল বেন’-তিনি আরও  
মোহাজী, অর্থ-অনুসরণকারী, অপ্রতি-  
রোধ হয়ে উঠলেন। গান থেকে রসটুকু  
নিঃসৃত পরিবেশন করলেন বেন।  
সুদীপ্ত চক্রবর্তী ‘এই প্রাণবন্ততার  
নিজেকে তুলে ধরতে পেরেছেন।  
অবাক করলেন শ্রুতিজ্ঞ চৌধুরী,  
সিঁড়ি নীরস তাঁর এই রস নাট।  
প্রথম কণ্ঠটি মনে ল মূল্যের।  
সুতপা দেব-এর গানও কোলাহলময়।  
উষা কল্যাণমায়র বসন্তে কি স্বপ্নে  
খারাপ গাননি, কিন্তু প্রথম গানটি  
বড়োই নিঃপ্রাণ নিবেদন। দীপ্তির  
মূল্যের অচল। শ্রীপর্ণা ভট্টাচার্য  
স্বপ্নে হল বেন ভাষাতে শোনাগেলেন  
এবার। দৃষ্টি গানই স্বপ্নে হল বেন।  
কিশোর, স্বপ্নে হল বেন তেমন নিজে  
ছাপিয়ে উঠেছিলেন। বেশ রেখে  
গোয়েছেন এই গানে। স্বপ্নে হল বেন  
পাখারও বেশ স্বপ্নে হল বেন।  
‘মহাবিশ্বের’ এবং ‘প্রথম ভূপন তামে’  
দৃষ্টি গানই স্বপ্নে হল বেন।  
রূপা মিত্রাল-এর ‘বসন্ত এসে’  
প্রণবলত পরিবেশ তৈরি করেছিল।  
বিভাস ঘোষের কণ্ঠটি পরিচ্ছন্ন,  
গায়কীও স্বপ্নে হল বেন। দৃষ্টি গানই  
রসোত্তীর্ণ, বিশেষভাবে উদ্বেগধন্য



জয়ন্তী ঘোষ

ভিত্তির অবগুণ্ঠনে। প্রতীমা মতো-  
পাখ্যার-এর নিবেদনে জীবিতার ছাপ  
প্রকট। প্রসাদ সেন-এর ধরণী ঘুরে  
চেষ্টা এবং কোথা যে উড়াও হল  
নিপুণ। নিপুণা ছিল সঙ্গীতায় রায়-  
চৌধুরীর প্রথম গানটিতেও। শ্বিত্তীর  
গানে মনঃসম্পর্ক কণ্ঠ অস্তিত্ব পেয়েছে।  
সুবী মতোপাখ্যার দ্রুত চম্পের  
গানে আসের মাজিরে ভোলেন।  
এবারেও তাই। 'বসন্তে আজ ধরার চিত্র'  
সপ্রাণ, শেষ বীণা উঠে জমজমাট।  
আসরের শেষ শিল্পী ছিলেন কমলা  
সেন। 'এসো শরতের অমল মহিমায়'  
জানিয়ে দিলেন তার কণ্ঠের অমল  
মহিমা এখনো কী অস্বাভাবিক। তৃতীয়  
গানের জন্য অনুবোধ ছিল। কিন্তু  
বাবীন্দ্রসদন সে-অনুরোধ কান দেননি,  
পরদা নেমে এসেছে আকস্মিকভাবে।

## গীতালির গান

রবীন্দ্রসদনের রবীন্দ্রজন্মোৎসবের  
আসরের শেষ সপাতিয়া প্রতি বছর  
ইন্দ্রিয় শিল্পীগোষ্ঠী কোনোনো  
কোনো তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে ভিরিয়ে  
তোলেন। আটগুণের তারার উপহার  
দিচ্ছেন গীতালির গান, উন  
আশিতে গীতালির গান, এবং  
তাদের নিকট পীতালির গান।  
গীতালি গ্রন্থের আলোচনাসহ গানের  
মধ্য দিয়ে তাদের একটি পরিচয়  
অবসান ঘটল। সে-পরিচয় শব্দ গান  
শোনানোই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না,  
ছিল কিছু জিজ্ঞাসা এবং কিছু উত্তর  
অনুসন্ধান।

সম্প্রদে সেই যে, ইন্দ্রিয়র কাছে  
শব্দ নয় ভাব-ব্যক্তিগতরূপে শব্দ  
যোয়ের কাছেও প্রোতপল্লীর  
কণ এই তিনি বছরের জন্ম হয়েছে।  
গীতালি এই গ্রন্থমালা সামগ্রিক নিষ্কল  
গড়ানটিকে তিনি যেমন ব্যক্ত করেছেন  
তেনেই অনুপ্রবেশের বিচারে খুঁজছেন  
এদের সাদৃশ্য ও ভিন্নতা, কবিমানের  
পরিণতির তিন মন্তব্য, এই কাব্যরূপে  
সমকালীন রচনার সঙ্গে আখ্যে  
সাদৃশ্য, এই পর্বের উপাধানের সঙ্গে  
সঙ্গীতালির সম্পর্ক।

'ইন্দ্রিয় গোষ্ঠী' এবার পাঠের  
অংশ একটু কমই রেখেছিলেন। শব্দ,  
ধরিয়ে দেওয়ার কজটুকুর জন্য ভাষা।  
মোট চারটি পর্ব। প্রতি পর্বের শুরুর  
পট, তারপর একের পর-এক গান।  
গানের মধ্যেও যদি থাকত কিছু ভাষা,  
হয়তো স্পষ্টতর হয়ে হরা পড়ত বাজনা।



ইন্দ্রিয় শিল্পীগোষ্ঠী

স্বাক্ষরিত অনুবোধের পথ হত স্ফূর্ত।  
তবু, যেটুকু ছিল, তার মূল্যও কম  
নয়।

গানের অর্ধাৎ 'ইন্দ্রিয় গোষ্ঠী'  
সচেতন থাকেন আমন্ত্রিত শিল্পী-নির্বা-  
চনে, প্রস্তুতি থাকে সম্মেলক নিবেদনে।  
একথা যদি কারো মনে হয়, আমন্ত্রিত  
শিল্পীদের ওপর এতটা নির্ভর না  
করে, নিজস্ব গোষ্ঠীর শিল্পীদেরও  
আরও সুযোগ করে দিতেন তাহলে  
বেশি ভালো হত, তাকে উড়িয়ে দেওয়া  
হয় না। সপাতিয়া-শিল্পীরও নিষ্কল  
শিল্পীর কতটা তৈরি হচ্ছেন, কেমন  
তৈরি হচ্ছেন—এটা জানানোরও একটা  
ক্ষেত্রে এই ধরনের অনুষ্ঠান। সেই  
ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় গোষ্ঠী কিছুটা হালসই  
করেন। তাদের নিজস্ব শিল্পীর  
অভাব একক সংগীতের ক্ষেত্রে প্রকট।

আমন্ত্রিত শিল্পীদের মধ্যে স্বত  
গুরু অনুপ্রবেশ ছিলেন। অশোককর,  
বলোপাখ্যার এসেন কিসে। তখন  
তালিকায় চিহ্নিত প্রথম গানটি অন্য  
শিল্পীর কণ্ঠে পরিবেশিত হল।  
আমন্ত্রিত শিল্পীদের মধ্যে অর্ধাৎ সেনের  
দুটি গানই অস্বাভাবিক। বিশেষত তার  
'কল থেকে ঘোর গানের তরী' দীর্ঘ-  
কাল মনে থাকবে। কলা হাজারের নই  
বা ভাব' এবং নীলিমা সেনের 'শব্দ  
তোমার বাসী' অবশেষে উজ্জল  
নিবেদন। দাপট ছিল অশোককর,  
বলোপাখ্যারের 'কল থেকে কল' একলা  
পথে' গানটিতে। সূচীতা মিত্রের কণ্ঠে  
পট ছিল, ছিল সম্মেলক সপাতিয়া  
লিখ, এবং কলা বহুলা, একক গান।  
'পথের সাধিতে একক ও সম্মেলকের  
প্রাণাগ অবসান। এককসংগীত তোমার  
দুয়ার খোলার ধনি'তে স্পষ্টপ্রভ  
ছিলেন সূচীতা মিত্র।

ইন্দ্রিয় শিল্পী-গোষ্ঠীর মধ্যে  
পরিণত উপহার গ্রীষ্মা চৌধুরীও  
দ্রুত যদি না পাবে তো। সম্মেলক  
গানসঙ্গীত প্রতিটিই ভাল। তবু বেশি  
কর মনে থাকে 'ওরে ডার' এবং 'আমার  
সকল রসের ধারা'। অমিত্রাংশ মতো-  
পাখ্যারের 'ওগো আমার প্রাণের ঠকুর'ও  
সমকালীন নিবেদন।

প্রথম মতোপাখ্যার

ফটো : সুবীর চট্টোপাধ্যায়

## সংগীতম-এর অনুষ্ঠান

তেইশ জুন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে  
সংগীতম আয়োজিত সপাতিয়া গ্রন্থের  
প্রধান দুই শিল্পী ছিলেন প্রসাদ সেন  
ও নীলিমা সেন। শিল্পীদের একক  
সপাতিয়া-গানের পূর্বে 'বহু যুগের  
ওপার হতে আশ্রিত এসো' শিল্পোদ্যে  
একটি বর্ষার গান পরিবেশন করলেন  
সংগীতম-এর শিল্পীগোষ্ঠী। দুখানি  
একক জিন্ন সব গানগুলিই ছিল  
সম্মেলক। অনুষ্ঠানের এই অংশের  
প্রয়োজনার যৌথিকতা মেলা ভার।  
প্রবর্তনগত বিস্তার করে প্রোতপল্লীর  
আহ্বান করে শোনানোর জন্য যে  
প্রস্তুতির প্রয়োজন তা এখা এখনো  
অজ্ঞান করেন নি একটা নিঃসন্দেহেই  
বলা যায়। আর গানগুলির সঙ্গে  
'ভাবলা-লহরী' তো অসহনীয়।  
অনুষ্ঠানের পরবর্তী শিল্পী



## প্রসাদ সেন ও নীলিমা সেন

ছিলেন প্রসাদ সেন। ইনিও তার  
গানের জালি সাজিয়েছিলেন রবীন্দ্র-  
নাথের বর্ষার গানে। পরিণীলিত কণ্ঠে  
একাদশমে বরাট গান তিনি গেয়ে  
শোনালেন। অভিজ্ঞ এই শিল্পী তার  
শিল্পার ধারা অনুসারে গানগুলি সুরে  
জালে সঠিক পরিবেশনে যতখানি  
স্বরবান ছিলেন ঠিক ততখানি  
অমনোযোগী ছিলেন গান নির্বাচন,  
গানের ক্রম নির্বাচন এবং লয় নির্বাচনে।  
সেই কারণেই তিনি প্রোতপল্লীর  
সম্পর্কভাবে আকৃষ্ট করতে সক্ষম  
ছিলেন না। সেই সঙ্গে গানের ছত্রগুলি  
অতিষ্ঠ পুনরাবৃত্তিত অনুষ্ঠানটি  
অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে সৌন্দর্যের মাধুরী  
হারা।

প্রসাদ সেন যখন অনুষ্ঠান শেষ  
করলেন প্রেক্ষাগৃহ তখন প্রায় শূন্য।  
তারই মধ্যে পরবর্তী শিল্পীর দীর্ঘ  
অনুষ্ঠানের ভারে রুদ্ধ নীলিমা সেন  
আসরে বসেই অত্যন্ত দ্রুত ভ্রমে তার  
গানগুলি গেয়ে গেলেন। তিনি পূজা-  
পথের গান নির্বাচন করেছিলেন।  
তার কণ্ঠে যা শোনা ইদানীং বিরল  
অভিজ্ঞতা। বলা বাহুল্য, এই দ্রুত-  
তার জন্য তিনি সমস্ত গানগুলির  
প্রতি সূচীতার করে উঠে পারেননি,  
এমনকি 'আজি নাহি নাহি নিদ্দা'  
গানটিতে তাকে অনানন্দকও হতে  
সেখা গেল। তবু, মনেতেই হয় তিনি  
গান শুরুর করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত  
পরিমলক বদল করে একটি পরিবর্তন  
নির্মল পরিবেশের সৃষ্টি করলেন।  
যখন তার স্মিত মধুর কণ্ঠে তিনি  
'তুমি বহু তুমি নাথ' অথবা 'আমি  
তোমায় বহু' গেয়ে উঠলেন তখন তা  
বিশ্বব্যবস্থা হয়ে রচিত হতে থাকল।  
বাণীর মহিমা সুরের ছেঁওয়ার প্রাণ  
পেল তার কণ্ঠে। আর যখন গাইলেন  
'আমার ভাঙা পথের রাগা হুলাস' এবং  
সব শেষে 'হৃদয়সদনা পূর্ণ হল'  
তখন সহজেই উপলব্ধি করা গেল এই  
গান তার জীবন, জীবিকা নয়।  
যথানুযায়ী সার্থক সহযোগিতা করেন  
সলিল মিত্র, সুকেশ জানা এবং  
সত্যকাম সেন।  
সুজি চৌধুরী

ফটো : সুবীর চট্টোপাধ্যায়

## আয়োজনা-বিশ্ব সংস্কৃতি নাটক

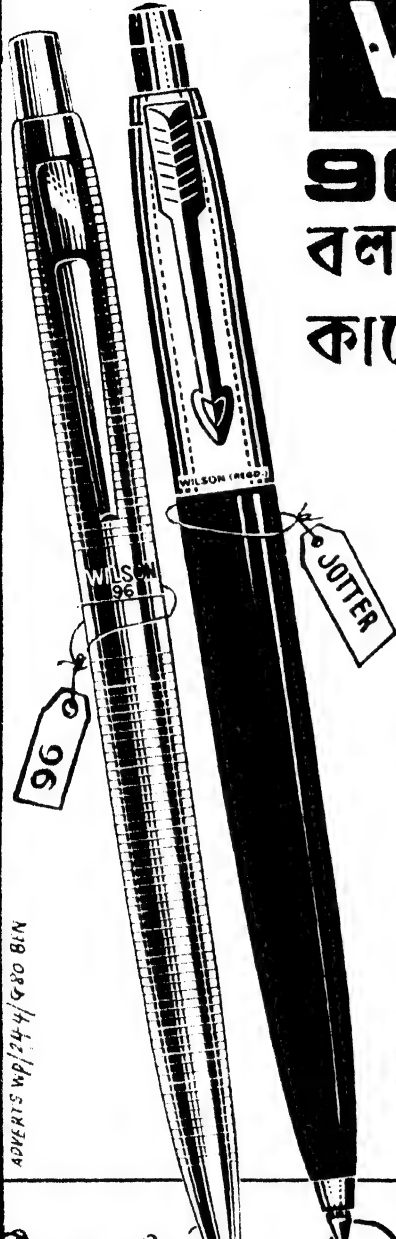
সংকেত  
পরেতে নাটকের উপজীব্য  
হিটলারের স্বেচ্ছাচারিতা, উদ্দেশ্য  
স্বেচ্ছাচার শাসনের স্বরূপ সম্পর্কে

স্থানীয় জনসাধারণকে সচেতন করা।  
কিন্তু সেটা কিভাবে করা হবে ও  
বহুপারো দেখা গেল নাটকের স্রষ্টা  
শিবদাসপ্রসাদ। তাই তিনি বিভিন্ন দশো-  
'ভাব-সংস্রাণ' করেছেন অধ্যাপক  
রূপী একজন সূত্রধরের সংযোগে।  
যা অনেকাংশেই আশংকগত ভৌগ-  
হিসেবে স্বীকৃতি না পেয়ে বাতলাতার  
পর্যবসিত হয়। এই বাতলাতার উৎস  
দর্শকদের বোধবোধের প্রতি হাস্যকর  
আলোচনাত্মক।

অন্যদিকে সর্বশিল্পী নাট্যগোষ্ঠার  
'রূপান্তর'র ঐতিহ্য উল্লেখযোগ্য  
প্রয়োজনার গৌরব থাকলেও আলোচ-  
ক্ষেত্রে তা কিছু মাত্র প্রতিফলিত নয়।  
অর্থবাহী করে লাভ নেই, 'রূপান্তর'  
রূপান্তরকে অনেকটা দুর্বল করে  
ফেলেছে। অতীত, অতীত টিকির  
রাখার দায় সর্বক্ষেত্রে যে দায়িত্ব প্রকাশ  
কর না আলোচ্য প্রকাজনাই তার  
প্রমাণ। আগেই বলেছি নাটকটি পাকা-  
পোস্ত নয়, সলাপও অনেক জায়গায়  
বেশ ঢিলেঢালা। এই অকথ্যার মিলে-শনা  
বা অভিনয়ে এমন কোনো উৎকর্ষ লক্ষ  
করা যায়নি ব্যতীত প্রয়োজনটি গ্রহণ-  
যোগ্য হয়ে উঠতে পারে। চরিত্রগুলি  
এবং চরিত্রেরাশয় দৃষ্টান্তেই অভিজ্ঞতার  
স্বপ্নে অভাব। গোপাল দেবের মধ্য  
পরিচয়নার অভিনয়শিল্পীরা সকলেই  
কমবেশি বিশদকে পড়েছেন।  
দেবাশিস দশগুপ্তের 'আজ  
পরিচয়নারও ধামলী। নাটকটিতে  
নির্দেশনা দিয়েছেন পাণ্ডা মিত্র। হিটলার  
চরিত্রটিও তাঁর। এছাড়া উল্লেখযোগ্য  
চরিত্রগুলোয় অংশগ্রহণ করেছেন কমল-  
নাথ চক্রবর্তী, কমল রায়, তপন  
কানাজী, কাজল মল্লাজী, স্বতা সেন,  
বিল্লী চৌধুরী প্রমুখ। আমাদের যে  
ভূমিকালিপি দেওয়া হয়েছে তাতে  
অন্যান্য সকলের উল্লেখ থাকলেও নাট-  
কতের নাম নেই। সম্ভবত নাটকটি  
শাখাভুক্ত হাঙ্গের রচনা।  
রায় রায়

## ছায়াপথ

নাটক যেহেতু প্রত্যক শিল্প— তাই  
তার সমকালীন রচিত শরিক হওয়া  
দরকার। বিজ্ঞান ভূতাত্ত্বিকের 'ছায়াপথ'  
নাটকটির রচনাকাল ও প্রথম অভিনয়কাল  
১৯৬১। এর আগের রচনা নবজ  
(১৯৫৪), জুগুপ্স (১৯৫৬),  
গোরাপুত্র (১৯৫৬-৫৭), পূর্ণাঙ্গ মধু-  
চাঁদ (১৯৬০) প্রভৃতিতে একটি নির্দেশ  
কাহিনী আছে, যার উত্থানপতনের সঙ্গে  
দশক সহমর্মী হয়ে ওঠেন। কিন্তু ছায়া-  
পথ নাটকে সেই অর্থ কাহিনী নেই।  
অনেকটাই খণ্ডচিত্র, ডকুমেন্টেশন, অথ  
সঙ্গে প্রত্যক অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি।  
যে অনুভূতিতে চাষী-কট সব হারিয়েও  
সংগে বলতে পারে, 'আমার জায়গার  
খালি। রাস্তার তো কোন দরজা জাননা  
নেই। আড়াল আড়াল নেই—তাই ভর-  
লোকের মত দাপ করছে ভর পাই।'  
রাস্তার ভিখারীদের নিয়ে এই নাটক।  
তার মধ্যে জন্মসূত্রে ভিখারী এবং অর্থ-  
নির্ভর সূত্রে ভিখারী—দু'রকমই আছে।  
১৯৬১ সালে যখন নাটক ঘোষণা  
তখন স্বাভাবিক সম্পর্কভাবে মজাতে



# WILSON

(REGD.)

## 96 & JOTTER

### বলপেন

কাদের কাছে এত কদর ?

ছাত্র, কেরানী, টেকনিসিয়ান,  
ঘরের গৃহিণী ও অন্যান্য  
অসংখ্য জন

ন্যায্য দাম ও সর্বাধিক উপযোগিতার জন্যেই  
এগুলি সবারই এত প্রিয়। জীবনে সব শ্রেণীর মানুষই চান  
উইলসন জট্টার বা উইলসন ৯৬।  
যে কোনো স্টাইলের লেখার জন্যে সুন্দরভাবে ডিজাইন  
করা। যে কোনো জামগার ওপরেই ঝরঝরে  
সুন্দর লেখা পড়ে।



বালকক পেন প্রাইভেট লিমিটেড,  
নাগরদাস রোড, আফেরী, বম্বে ৪০০ ০৬২  
টেলিফোন: ৪৭৪৩২১, কেকল: WILSONPEN  
টেলিগ্রাম: ০১১.৪১৪১ BPPL IN  
পরিবেশক: কিরণ অ্যান্ড কোম্পানী  
৭৩/৭৫, লামসেট স্ট্রীট, বম্বে ৪০০ ০০২, টেলিফোন: ৩২৪৬৩২

ADVERTS WP/244/980 BIN







পবিত্র লানাল, অসিত মথোপাধ্যায় ও অশোক চক্রবর্তী

পায়োন—কারণ তখনও এ জাতীয় নাটক দেখার অভ্যাস আমাদের গড়ে ওঠেনি। পাশাপাশি আমাদের আভ্যন্তরীণ নিয়মে নাটক ছিল—কাহিনীর তথ্য মোড়া সেগুলিই আকর্ষণ করত বেশি।

১৯৮০ সালে ককতুল হল এই নাটকটি মঞ্চ অঙ্গনে মঞ্চস্থ করলেন। ইতিমধ্যে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি তাই নাটকটি নতুনভাবে আবিষ্কার করা গেল। বিজ্ঞান ভূট্টাচার্য চিরকাল প্রথা-ভাঙ্গার সাধনা করে এসেছেন—সব সময়ে সিম্ফিলিভ হইত হয়নি। ভারতে অবাধ লাগে পরবর্তী কালে অনেক বিখ্যাত প্রযোজনা যার অবলম্বন প্রায়শই বিদেশী। আমাদের অবাধ করলেও সূত্রপাত দেশজ পটভূমিতে, বিজ্ঞান ভূট্টাচার্যই করেছিলেন। ককতুলহলের সাম্প্রতিক প্রযোজনায় নাটকটি অনেকখানি গৃহীয়ে ওটা চলেও স্মৃতি সত্যত সঞ্চার হয় না। এই নাটকে মহানরম বিজ্ঞান ভূট্টাচার্য শিল্পীদেব দেখতে বসেছিলেন রাস্তার মানবদল এমনি ককতুলদেরও / বাহুবলক ধূম খাওয়ানোর সময় জননী গাভীর চোখের স্নেহ/পোষা কুকুর জিপসী কিছুরে প্রাপ্তপক্ষ সৃষ্টি করে বাওয়ার সঙ্গে লড়াই করে নিজের খাবার খায়—সব কিছুই লোক রেখেছিলেন। ফলে তখনকার জীবনবৈচিত্র্যগণের সঙ্গে এখনকার সার্বস্বত্বভেদে ভিত্তিকরণের (পেটল সান্যাল) অনেক ফারাক থেকেই যায়। বাস্তব কালের বদলে আমি 'জালত' শব্দ ব্যবহার করেছি। তৎকালীন ভিত্তিকরণের একটা কুসংকেত-আগ দেওয়া হয়েছিল—যার জন্য থেকেই ৬৯ কোঁঠুল জগাত। তবুও অনেক কিছুই অস্পষ্ট হয়ে এলো সেই ভূমিকা কিম্বদন্তি হইনি। চাষী বা চাষী-নউ সম্পর্কও এই কথা। তখন সেটা ছিল যথার্থ ভক্ত্যমেন্টশন, এখন যেন ভক্ত্যমেন্ট-এর উপর গবেষকদের লেখা গাইয়াক। তবুও ককতুলহলের প্রযোজনা যে ভাল লাগে হার কারণ মূল চরিত্রে অসিত মথোপাধ্যায় ও অশোক চক্রবর্তীর অভিনয় (নিদেশকও এরা দুজন)। কয়েকটি মূহুর্ত যেখানে কানা কথা বলে যায়, খোঁড়ার সঙ্গে ভিত্তিকরণের দৃষ্টি বিনিময় চলে বা শেষ দৃশ্যে এবং খাওয়ার সময় ভাল লাগে তাঁদের অভিনয়ের জন্য। বিজ্ঞান ভূট্টাচার্যের অনেক সৃষ্টিতেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের সঙ্গে যেখানে ছাড়াপথে মেল পাখা সেটা সঠিকভাবে নিদেশকরা বাস্তু পোষেছেন—খন্ডচিত্রের মধ্যে মাতঙ্গ পাগল বা কাগজ কুড়ান ছেলে আরও

কিন্তু সোনার দরজা, তখন লিখা পোষ কলিক পনেরো বলে। আচ্ছ রচনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব থাকলেও কাসেট রেকর্ডিং এর জন্য কিছু শাস্ত্রিক ট্রুটি আছে। আর আপত্তি, হঠাৎ একবার প্রথমত কব্জ সুরে কাশিতে মেঠো সুর বাজার, যেখানে চোংকাতাবে দুলকের লাড়াইয়ের সময় কুকুরের কণ্ঠা দেওয়া হয়েছে—সেইখানে প্রধানমন্ত্রী সুরেলায় হারায়। রবি চট্টোপাধ্যায় নতুনভাবে মঞ্চ পরি-কল্পন করেছেন—পুলকো মঞ্চ বোধ হয় অন্য রকম ছিল। আর যতদূর মনে আছে, বিভাজিত আগে গোপাল যখন একা দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে বাবা মাকে ডাকছে তখন আর একদিকে প্রচণ্ড জ্বাল মিউজিক—এর সঙ্গে একটা ব্যালটিক মৃত-শেষ হত—নরার সভাভার দিকে আগলার উঁচিয়ে শুনাতাকে বাগ করত। অনেকের অভিনয়ের মত এ জায়গাটোও এখন কেমন ফাঁকা লাগে—মরমে বেঁধে না।

সেবাসিন দাসগুপ্ত

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি নৃত্য

বসন্ত সন্ধ্যা

আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে, তার এক পিঠে নৃত্য, এক পিঠে পরাতন। যখন উলটে পরেন তখন দোঁধি শুকনো পাতা, ঝরা ফুল, আবার যখন পালটে নেন তখন সকালেকার মালিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী—তখন ফাল্গুনের আলমঞ্জরী, চৈত্রে কনকটীপা। উনি একই মানুষ, নৃত্যে-পূর্তাদের মধ্যে লোকচারের হবে বেজাজন। —১৩২৯-এ বিচিত্র বসন্ত ঋতুতোটা কবি চরিত্রের আড়ালে সবার বসন্তদলের এই কথা-গলো অনুমান করলে কোনো কিছুকের ব্যাধ্যই শেক্ষবসন্ত আমাদের ঠকত হয় না।

১৩৮৬-র শেষ দিনটিতে উপস্থিত ছিলাম গীতি ও ছন্দের বসন্ত সমায়া। বলা বাহুল্য, খুবই তাৎক্ষণিক সন্ধ্যা, যথেষ্ট বিদায়ের মধ্যেই আগমনের প্রাতি-শ্রুতি। ললিত বাগের বিদায় ব্যাঘা অমন সূত্বের রাশি আর কোনদিন ফুলে ওঠে? দুয়াব আঁটকে যখন পরাতনকে ধরে রাখতে চাই তখনই ত্রো নতুনর ডাক শুনি—খোলা খোলা শবার/রাখিয়ে না আর/ বাহিরে আমাের দাঁড়িয়ে।

যে কথাটা এই প্রাতিবসন্ত বলতে চান, অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের দিনটি নিবাচনের মধ্যেই গীতি ও ছন্দ তাঁদের কাল্পনিক সার্থকতার অনেকটা সোপান পেরিয়ে আসেন। সঙ্গে সঙ্গেই প্রশংসা কবির তাঁদের অনুসন্ধান চেতনার, গান ও রচনার উপযুক্ত নিবাচনে যা কবির বসন্তদর্শনের সমস্তবাদান ঘটায়।

আলোচ্য নৃত্যনট্যের নৃত্যশিল্পের পরিচালনা ও ব্যাখ্যা কিছু আমাকে সবদা সূচনা করান। এই ধরনের অনুষ্ঠানে গানক প্রকাশ করার যে অনিবার্য দায় তা অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের দেহ অমনকালেই বহন করান, সম্ভবত বহন করার মতো শিক্ষা গ্রহণের সুযোগও তাঁদের ঘটে নি। পরিচালন তাঁদের উপস্থিতিতে যে অনুরাজন

মমানসারী হয়ে ওঠে না। ভাষা ও সংগীতের সঙ্গে তুলনায় অনেকটা দাম্ভিকবাহী, রচনা নিবাচন সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের সাহায্য করছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সাহায্য গ্রহণে শিল্পীরা প্রত্যেকেই ছিলেন কর্মবীর যোগা এবং আন্তরিক। বসন্ত সন্ধ্যার নৃত্য ও সংগীতের পরিচালনা দায়িত্ব ছিলেন যথার্থভাবে তন্ময় করা ও পলাশ মুখো-পাধ্যায়।

আলোচ্য নৃত্য নাট্যের পর সাম্প্রতিক সন্ধ্যাটি কিছটা শিল্পী-ভারজাত বোধ হয় মিতীয় পর্বে। ক্রান্ত বোধ করে অনেকেই তখন অবন মহলেসে আসন ছাড়েন। যথেষ্ট পরিশ্রম বাধা শেষাবধি উত্তীর্ণ তারা অবশ্যই লাভবান হালেন বাণী ঠাকুর ও অর্থা সেনের সঙ্গীত নিবদনে।

রানা দাস

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি বিবিধ

পারিজাত ইনস্টিটিউট অব কালচার

পারিজাত ইনস্টিটিউট অব কালচারের প্রধান উদ্দেশ্য পাচাত্তা মুখী ভারতীয়দের ভারতবর্ষের ধর্মীয় ঐতিহ্য ও প্রাচীন সংস্কৃতি স্মরণ করিয়ে দেওয়া। আধুনিক টেকনোলজি এরা গ্রহণ করেছেন বটে কিন্তু মূল বস্তু ভিত্তিবাদ। এই জন্য এরা বেছে নিলেন তাঁদের প্রথম অনুষ্ঠানে তুলসী দাসের 'বিনয়পটিকা', যেখানে তিনি সমস্ত দেবতাদের প্রতি তার ব্যাকুল প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণ করেছেন।

২৫ মের কলাম্বিরের সাধ্য অনুষ্ঠানে প্রায় সকলেই হয়ত সেই ভাবে ভাবিত হতে পেরেছিলেন। প্রধান অতিথি ও সভাপতি একবাক্যে বললেন রাম নাম শোনার পূজা অজই চড়াইত কথা। কেবল শিষ্য অতিথি রইচাই বড়ল সঙ্গীত ও সমাজের যোগাযোগের কথা মনে করিয়ে দিলেন।

'বিনবাসে মিলায় কুক, তাকে কহু'। তাই সমালোচকের পক্ষে ভাস্তস্বাপানই শেষ কথা নয়। নানা জিজ্ঞাসার কটা মাঝ উঁচিয়ে ওঠে। প্রথমে মনে হয় কারিকুর এত বেশি কেন? ছায়া নাটক (শ্যাডো প্লে) থাকুক না, কিন্তু সেটাকে ম্যাজিকের পর্বেই ওঠালে অপরিণত, বালকোচিত মনে হয়। প্রতি দেবতার আরাধনায় তাঁদের যে মূর্তি ব্যাকগ্রাউন্ড দেখান হল সেগুলি সস্তা ক্যালেন্ডারের আটের জুখ উঠল না। অচ্চ এরা যে প্রচণ্ড অর্থ ব্যয় করেছেন তার পরিচর পদে পদে, মঞ্চসজ্জা থেকে প্রতিটি শিল্পকে সুবহং শৃঙ্গারুছ উপহার দেওয়ার মধ্যে স্পষ্ট।

এখানে নাটক আনা হয়েছে, নাচও বিভিন্ন জাতের। উচ্চ মানের ক্লাসিকল থেকে লোক নৃত্য পর্যন্ত। গানেও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। ভজন, রূপদ, বেদগান সবই আছে। বিশেষ করে পূর্ববর্তে গীত গানগুলি আত প্রকা সুন্দর। বালক্ক মেননের দক্ষ পরিচালনায় শেষের দৃষ্টি ক্লাসিকাল নাচ চমককার। সঙ্গীত পরিচালনায়

সঙ্গীত পরিচালনার শ্রীমতী জলজ ভাসুটি এতটা কৃতিত্বের অধিকারীণী না হলেও তাঁর অবদান অগ্রাহ্য করা নয়। কিন্তু সব ছাপিয়ে উঠেছে স্টেড জাফটু দেখাবার মোহ। শব্দ যে কং কর্ণপাড়াবারক হতে পারে তার একটি অভিজ্ঞতা সৈনিকের দর্পকরা সঞ্চার করে গেছেন। গভীরতা ও ঐশ্বর্যবর্ধক ঐশ্বর্য প্রকাশে আলোর খেলাও সুদৃশ্য শব্দপ্রয়োগ ভিত্তিবাদকে বিমূর্তন করায়।

প্রতিটি সাহা রচনার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ নাচ ও গান এবং কারণ অকারণে নানাজাতীয় নাচ রসহানি ঘটিয়েছে। যদি এরা শব্দ বিনয়প্রকাশকে অবলম্বন করতেন তাহলে এতটা খাপছাড়া হত না। তুলসী দাসের জীবনের কিছু কিছু ঘটনা দেখান যেতে পারত, এই সঙ্গে 'বিনয়প্রকাশ' রচনার প্রসঙ্গ আনা যেত এবং সেই সূত্রে একটির পর একটি নাচ গান সংযোজিত করা যেত। কিন্তু এরা প্রথমেই আরাধ্য দেবতাদের ছায়ামূর্তি দেখিয়ে স্তব্ধতা সৃষ্টি করলেন ও পরে তুলসীদাসকে দেখিয়ে রামনামের ধীমা গাইলেন। অচ্চ 'বিনয়প্রকাশ'র মূল কথা সর্বদেবতার আরাধনা।

অলে নিরুচ্চন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান কয়েকজন কিছু শিক্ষক ও ছাত্ররাই। এছাড়া বাকি অছেন তরীও সন্মানন্য। তবু ভক্তির সঙ্গে চাবিশ্বাসের উচ্চ সংযোগিতা দৃষ্টিতে মলে তুলসীদাসের প্রধান যে অবদান সহজবস, তাকে দূরে সরিয়ে রাখ হল।

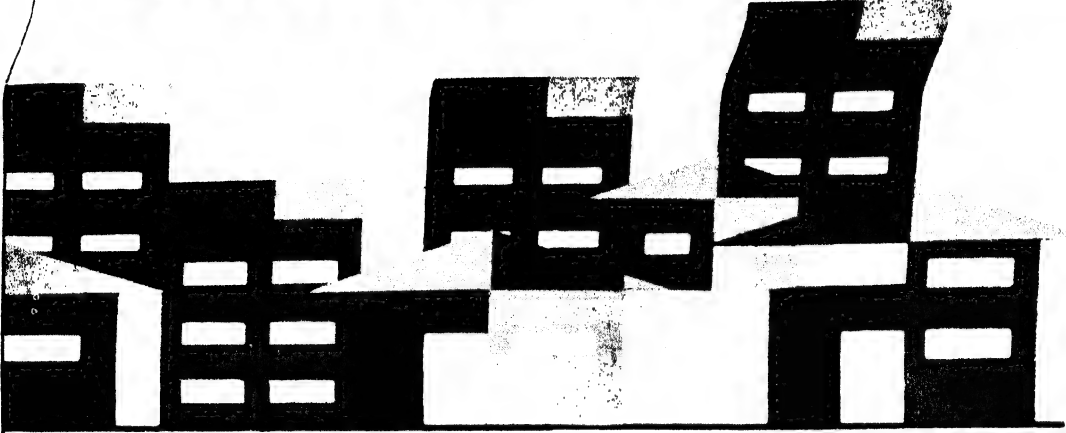
বাসন্তী জোয়ারদার।

টরন্টোতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান

বিশেষে এমন কেন বড় শহর নেই যেখানে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ নৃত্যের মূল, বিশেষ করে ভরতনাট্যের কোন মূল নেই। সেটার শেখার সুযোগও রয়েছে অনেক শহরে। কিন্তু উচ্চাঙ্গ গানের মূল প্রায় নেই বললেই হয়। পশ্চিম ওকরাবর্ষের সুযোগে ছোট্ট প্রামাণ্য শ্রাবিত চক্রবর্তী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মূল অন্তত তরফাতে এই অভাবটি মিটিয়েছে। এই মূল প্রায় চরণ জন ভারতীয় ও কানাডিয়ান ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রায় দুই জনকে নিয়ে গত ১৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় এই মূল প্রায় বাসের অনুষ্ঠান। বিভিন্ন রকমের একটি সূত্রে গেয়ে এই উচ্চাঙ্গ গীতলেখাটি রচনা করেছিলেন শ্রীমতী



# একক ব্যক্তি বা সমবায় সমিতি!



একক ব্যক্তি বা সমবায় সমিতি !  
এইচ ডি এফ সি থেকে গৃহঋণ পেতে  
পারেন-এখানে, কোলকাতায় বসেই !

এইচ ডি এফ সি হল এমন এক আর্থিক সংস্থা যা একক ব্যক্তি,  
সমবায় সমিতি আর কোম্পানীকে দীর্ঘ মেয়াদা গৃহনিমাণ  
ঋণ দিয়ে থাকে।

গৃহঋণ আবেদন-পত্র খুব তাড়াতাড়ি যাচাই করা হবে—  
কোলকাতাতেই !

খবরাখবর, আলোচনা, তথ্য পুস্তিকা এবং আবেদন পত্রের  
জগো যোগাযোগ করুন, এইখানে :—

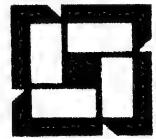
## আঞ্চলিক দপ্তর

কুক এণ্ড কেলভি বিল্ডিং,  
২০, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রাট,  
কোলকাতা-৭০০০০১।  
ফোন : ২৩-১৯৮১

## রেজিস্ট্রীকৃত দপ্তর

রেমল হাউস,  
১৬৯, ব্যাকবে রিক্রিমেশন,  
বঙ্গ-৪০০০২০।  
ফোন : ২২০২৮২/২২০২৬৫  
টেলেক্স : এইচ ডি এফ সি ৬৭৬২  
গ্রাম : হাউসকর্প

**HK** হাউসিং ডেভেলপমেন্ট  
ফাইন্যান্স করপোরেশন লিমিটেড



অনুষ্ঠানটির শেষে টেরেটো কিল-  
কিলের অধ্যাপক ও বাংলাভাষা  
কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ্যকৃত  
কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ্যকৃত  
কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ্যকৃত

আমরা সকলে'র আবেশিত  
পুস্তকটির বিতরণী যে কত  
শ্রমসাধ্য হতে পারে, দেখা গেল আমরা  
সকলের অনুষ্ঠানে, গত ২৬ মার্চ  
সন্ধ্যায়, পাঁচশঃ মণ্ডে। বই পুস্তক  
তার একদশমংশও বিলি হল না,  
অনুপস্থিত প্রতিযোগীর নম্র শব্দে  
হল বারবার। মূল অনুষ্ঠানেও সেই  
কৃতিত্বের রেশ কটল না সোঁদিন। এত  
শিল্পী, এবং এত বেশী অযোগ্য  
নিবেদন, বড়-একটা দেখা যায় না।  
অজ্ঞত বসু তার স্বরচিত কাব্যসংগ্রহ  
'মূল কবিতা' শোনালেন। মূল কবিতা  
ব্যাপারটা কি বোধগম্য হল না।  
নাম-কবিতা? তার ভাগ্য কোলহুল্লমর,  
কবিতা গলায়। অরুণাংশ, বিশ্বাস  
হুঙ্কর, অমির চট্টোপাধ্যায়, জতন  
সেনগুপ্ত, নীলদ্রিষ্টেশ্বর বসু। শ্যামল  
ঝারিক-এর কণ্ঠ ভরাট, কবিতা-  
নিবন্ধিতও সুন্দর, শব্দ, উচ্চারণ  
কখনো-সম্বন্ধে পিচ্ছিল। সত্যচন্দ্র  
শোনালো 'সত্যদর্শী'। মল্লিকম দত্ত,  
অরুণ চৌধুরী, কুমকুম দে, প্রণীত  
মিত্র, মুস্তাফা, দিলীপ ঘোষ ও  
আইভি রহমান অনুষ্ঠান সোঁদিন  
অসম্বাদ্য। বর্ণনাত্মক শেষ দুই শিল্পীর  
যশস্বিনিবন্ধন আইভি রহমান সম্পূর্ণ  
বর্ণনা, দিলীপ ঘোষের কিছুই করণীয়  
ছিল না। রাজেশ্বরী রায়চৌধুরী  
উচ্চারণ কিছুটা মার্জিত হলে ছাপ  
রাখতে পারতেন। কণ্ঠ সুন্দর,  
কবিতাটিও সুন্দরবর্ণিত। কবিতার  
সঙ্গে অলোক পালিত 'অমিতাক্ষর'—  
নাটকের অংশও শোনালেন কেন? এ  
প্রশ্ন না তুললে বলতে হয়, তার  
অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্য ছিল। নতুনদের মধ্যে  
তুলসী রায় কণ্ঠকে যে প্রয়োজনে কোমল  
করণকণ্ঠের করে তুলতে পেরেন,  
অসামান্য দক্ষতার তার প্রমাণ রাখলেন।  
অমির চট্টোপাধ্যায় মনস্তাত্ত্বিক ছাপ  
রাখলেন রবীন্দ্র ক্রস্টের জন্মদিনের কথা  
স্মরণ করে তার অনুদিত কবিতা  
পড়ে। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা  
ভাষা মা আমার-এ পুস্তকের দ্বন্দ্বের সংবাদ  
পারম্পর্য স্মৃতিক উল্লেখ করেন।  
কাজল চৌধুরী ভালো কেছেন তারাপদ  
রায়ের 'কুসুমের পরিহাস', ভালো  
শুনিয়েছেন রাম বসু, পরান মাঝ  
হাক দিয়েছেন। রজত বন্দ্যোপাধ্যায়  
তার রোমান্টিক কণ্ঠের উপযোগী  
কবিতা শোনালেন সোঁদিন। একই কথা  
জগন্নাথ বসুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পাঠ  
যোগ্যকে সোঁদিন পুরো মেজাজে পাওয়া  
যায়নি। নীলদ্রিষ্টেশ্বর বসুর কণ্ঠে  
নীলবর্ণনাথ চক্রবর্তীর 'খোড়া' বেশ  
ভালো লেগেছে। কবিতা সিংহ এবং  
ছোট শিল্পী অরুণাভা বসু সোঁদিন  
নিখুঁত নিশ্চল। 'আবেশিত পরিবর্তন'

অনুষ্ঠানটির শেষে টেরেটো কিল-  
কিলের অধ্যাপক ও বাংলাভাষা  
কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ্যকৃত  
কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ্যকৃত  
কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ্যকৃত

পরলোকে পিয়রীমোহন দাস  
আমাদের দেশ' পত্রিকার অন্যতম  
প্রবীণ ও প্রাক্তন সহকর্মী শ্রীপদ্মা-  
মোহন দাস গত ১২ জুলাই, শনিবার  
কলকাতার পরলোকগমন করেছেন।  
তার বয়স হয়েছিল ষাটবছর।  
পিয়রীমোহন একদা রাজনীতিক কর্মী  
হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। বাংলাদেশের  
কিলব আন্দোলনের সঙ্গে তার যোগ-  
যোগ এককক্ষম। কিশোর বয়স থেকে।  
পিয়রীমোহন বঙ্গালেল মানুষ। বহু  
কিলবীর কম স্থল তখন পৃথক।  
কোবনের শব্দেই বাঙ্গালে থাকার  
সময় তিনি এই আন্দোলনের সঙ্গে  
প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন। ফলে



কিলবী পিয়রীমোহন রাষ্ট্রের রাজ-  
কোষের শিকার হন সেই তখন বয়সে।  
প্রথম মহাস্থব্রের আগে তাকে  
করাইয়া করা হয়। পাঁচ বছর  
করাইয়াসের পর ফাঁদে তিনি মৃত পান  
—তবু রাজনীতির সংশ্লিষ্ট ত্যাগ  
করেননি। ১৯৩০ সালে আবার তাকে  
গ্রেফতার করা হয়। পরে অট বহর  
তার বিচারে জেলে এক বন্দির কণ্ঠ  
শিখরে কেটে যায়। রাজনীতির জীবনে  
ছেড়ে যখন তিনি সংবাদপত্রের জগতে  
এলেন তখন তিনি প্রবীণ, ক্রাস পণ্ডিত  
উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে কবে! ১৯৪৬  
সালে পিয়রীমোহন দেশ' পত্রিকার  
যোগদান করেন। তারপর দীর্ঘ তিরিশ  
বছর তিনি এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত  
থেকে বিদ্যায় গ্রহণ করেছিলেন।  
স্বকামখ্যাত প্রেলোক মহারাজ ছিলেন  
পিয়রীমোহনের কর্মসঙ্গী। পিয়রী-  
মোহন তার রাজনীতিক জীবনে  
কদু বিলবীর বিশেষ প্রিয়পাত্র  
ছিলেন। সাংবাদিক জীবনেও এই  
প্রতিভার ও দেশ' পত্রিকার সকল  
কর্মীরা প্রাণের ও অনুরোধের পাথ  
ছিলেন তিনি। জেটা কদর্য পরিহিত,  
শব্দ কেশ, লালত এই মানবটির কথা  
আমরাই শব্দ জানি। একদিকে যেমন  
পরিপ্রসঙ্গ—তেমনিই নিষ্ঠাবান ও অকপট  
মানুষ ছিলেন তিনি। ছিলেন সুরসিক।  
তিনি ইহজগতে আর নাই ভাবতে  
আমরা বৈদ্য বোধ করছি। আমাদের  
প্রাণ নিবেদন করি তার উদ্দেশে।

অমরদাশঙ্কর রায়ের  
নতুন ছড়ার বই  
যেমন বড়দের তেমন  
ছোটদেরও সাহিত্যের ক্ষেত্রে  
যারা অনায়াসে আকর্ষণ  
করতে পারেন—তাদের মধ্যে  
অমরদাশঙ্কর রায় অগ্রগণ্য।  
তার গম্প, উপন্যাস প্রবন্ধে  
ভাষার উজ্জলতায়, বলিষ্ঠ  
মননশীলতায় তিনি প্রতিটি  
বাঙালী পাঠকের যেমন  
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন  
তেমনি ছোটদের  
হাতেও তুলে দিয়েছেন।  
অসামান্য ছড়ার ডালি।  
ছোটদের জন্য তাঁর লেখা  
ছড়ার বইয়ের সংখ্যা—  
চার। 'রাঙাধানের' থৈ 'আলিম  
গাছে মো' 'আতা গাছে  
তোতা' ও 'হেরে বাবুই হৈ'।  
আর একটি বই যন্ত্র—  
'রাঙামাথার চিরুনি'। প্রত্যেকটি  
বই থেকে দশটি করে ছড়া  
বাছাই করে শিশুবর্ষে গৃহীত  
পরিচয়পনার ৪২তম গ্রন্থ  
'হট্টমানার দেশে' প্রকাশিত  
হল। 'তেলের শিশি'  
'পার্বতীর ছড়া' 'কাদুনি'  
ইত্যাদি সব বিখ্যাত  
ছড়ার সংগে যুক্ত হয়েছে  
পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত  
সেই সব অসামান্য ছড়া—  
'চক্রবর্তীর তীর্থযাত্রা', লিচু  
ফল টক, ও 'আমার ঘরে  
আমি রাজ্য' প্রভৃতি।  
এবং এই সব ছড়ার সংগে যুক্ত  
হয়েছে অসংখ্য মনভোলানো  
ছবি। ছবিগুলি একেছেন  
দুর্ধর্ষ ছবি আঁকিয়ে দেবারিস  
দেব। দাম ও  
এসদাশঙ্কর রায়



ছোটদের  
আরোও নতুন বই  
অবন থাকুরের  
তেপান্তর ১৫  
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের  
ছোটদের  
কাশীনাথ ৬  
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়  
কিশোর অপু ১২  
অপুর  
ছেলেবেলা ৬  
ছোটদের  
অপরাজিত ৬  
তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়  
ছোটদের  
কাজল ৬  
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়  
হাতিচোর ৬  
প্রমোদ মিত্রের  
ঘনাদার  
জুড়ি নেই ৫  
মঙ্গলগ্রহে  
ঘনাদা ৫  
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়  
টেনিদার  
অভিযান ১০  
ঝাউ বাংলোর  
রহস্য ৫  
চারমূর্তি ৫  
সমরজিৎ করের  
ভয়ঙ্কর সেই  
অভিযান ১০  
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের  
বাঙলার  
ডাকাত  
১—৪। প্রতিখণ্ড ৬

শেষ্য ৥ প্রকাশন বিভাগ  
৮/১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

# বিনাকার বাচ্চাদের টুথব্রাশ

বিনাকার  
বোনী টুথব্রাশ

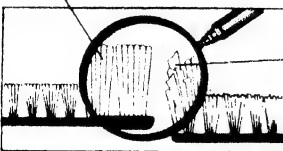


বিনাকার  
জুনিয়র টুথব্রাশ

## আপনার কোমল স্নেহের মতই আপনার বাচ্চাদের দাঁতেরও কোমলভাবে দেখাশোনা।

মোলায়েম, গোল কুচির ডগা বাচ্চাদের কোমল মাড়ির  
দেখাশোনা করে। ছোট ছোট হাত আর মুখের উপযোগী  
করে তৈরী হ্যাণ্ডল ও হেড-এর বিশেষ ডিজাইন।

মনে রাখবেন, সমস্ত বিনাকার টুথব্রাশেরই  
নিরাপদ “গোল কুচির ডগা” মাড়ি ছুঁতে যেতে  
দেয় না। সাধারণ ব্রাশের কুচি মাড়ির  
ক্ষতি করে।



আপনার বাচ্চাদেরও দরকার, বিনাকার-মস্ক

## প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

বেঙ্গুর (১৯১০-)

পুণ্ডে নামে নামাঙ্কণ গ্রীষ্মের বেঙ্গুর।  
বহুবাহু চিঠি লিখে উত্তর আসেন।  
এইবার চিঠি যখন ঠর হাতে পড়ল  
তখন সেখানে সেখানকার সগরকর  
ভাই সিলে ঘোষ ছিলেন। স তরাং  
স্লাইড জীবনব্যাপ্ত এসে পড়ল।  
বেঙ্গুর সেই কস যখন খ্যাতি আর  
তাইক স্পর্শ করে না। অথচ সমকালীন  
ভারতীয় শিল্পকলায় তাঁর প্রভাব  
প্রতিপত্তি কম ছিল না। ১৯৫২-৬৬  
ছিলেন বরোদার মাহারাজা সন্ন্যাসী  
বিশ্ববদ্যালয়ের শিল্পকলা বিভাগের  
প্রধান এবং চিত্রকলা অধ্যাপক।  
সেই সময় শিল্পকলা-চর্চায় কেন্দ্র  
হিসাবে বরোদার নাম ভারতের মানচিত্রে  
স্থান পায়। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় ললিত-  
কলা আকাদেমীর সহ-সভাপতি ছিলেন।  
তার চেয়েও বড় কথা হলো শিল্পী  
হিসাবেও তিনি বড়।

জন্ম মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে। বি এ  
(আগ্রা)। হোলকারের কলেজে  
চিত্র শিল্প। বোম্বাই থেকে চিত্রকলার  
স্নাতক। ছাপাই ছবির প্রশিক্ষণ আর্ট  
স্টডেন্টস লীগ, নতুন ইয়ক। চান্নামাটির  
কাজ (সেরামিকস) ওয়াশি এম সি এ,  
নতুন ইয়ক (১৯৪৭)। শিল্পী এবং  
সাংবাদিক হিসাবে কাজ করেন  
কাশ্মীরের ভিসিটরস বোর্ডে  
(১৯৩৬-৩৯)। সর্বশেষের চিত্রকর  
ছিলেন বোম্বাইতে (১৯৩৯-৫০)।  
ফকি ফকি ভ্রমণ চলেছে—হোল্ড  
আমেরিকা এবং যথ ইউরোপ (১৯৪৭-  
৪৮)। পশ্চিম এশিয়া (১৯৫৪)।  
চেকোস্লোভাকিয়া, ইউগোস্লাভিয়া  
এক পোল্যান্ড (১৯৬৯)। ভারতীয়  
সাংস্কৃতিক দলের সব প্রথম চীনদেশে  
ভ্রমণ করার সময় তিনিও ছিলেন  
(১৯৫২)। জাপানও যান (১৯৬০)।  
বম্ব বরাসে ঘরতে যান মার্কিন মূলক,  
ক্যান্সাস এক ইউরোপ (১৯৭৭-৭৮)।

ভাগতবয়সে বিভিন্ন শিল্পকলাকেন্দ্র  
থেকে অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন।

একক প্রদর্শনী মার্কিন মূলকের  
স্থানে (১৯৪৭, ৪৮)।  
চেকোস্লোভাকিয়া, ইউগোস্লাভিয়া এক  
পোল্যান্ড (১৯৬৯)। বোম্বাই ১৯৪০,  
৫০, ৫৭, ৬০, ৬৮৭০, ৭২, ৭৪, ৭৬,  
৭৭, ৭৯। পূর্বপূর্ব কাজের সর্বস্ব  
প্রদর্শনী (১৯৭৪)। দলীয় প্রদর্শনী নতুন  
ইয়ক এবং টোরন্টো (১৯৭৮)।

নয়াদিল্লি দ্বিতীয় ত্রিবার্ষিক  
প্রদর্শনীর বিচারকের সভাপতি ছিলেন  
(প্রায়শঃ ১৯৭১)।

তাঁর ছবি আছে কাশী হিন্দু বিশ্ব-  
বিদ্যালয়ের বাদঘর। আকাদেমী অফ  
ফাইন আর্টস এবং বিড়লা আকাদেমী,  
কলকাতা। বরোদা: বাদঘর। মাদ্রাজ  
বাদঘর। মহাশূর প্রাদেশিক ললিতকলা  
আকাদেমী। সালার জং বাদঘর,  
হায়দ্রাবাদ। ন্যাশনাল গ্যালারী অব  
মডার্ন আর্ট সংগ্রহশালায়। তা ছাড়া  
দেশ বিদেশের নানা সংগ্রহশালায়।  
দেওগালাচিট একেছেন এয়ার ইন্ডিয়ায়  
জুঁজুখ, রুসেলস এক লন্ডন আপিসে।



সম্প্রতি বোম্বাই-এর এক ব্যাংক নতুন  
মজুমদারকে একটি দেওয়াল চিত্র আঁক  
জনা সাধাসার্থি করে। তিনি রাজী হন,  
বলে শেষ পর্যন্ত বেঙ্গুরকে সেই কাজ  
দিয়েছেন।

বেঙ্গুর কাজ খুবই রোমান্টিক। এ  
রূপসগন্ধম্পর্শময় জগতের চিত্র  
দেখেন গীতিকবির দৃষ্টিতে। এ  
মজারকার শিল্পী এক জেদ ইতীন সযত্নে  
বাদ দিয়ে যান। পংক নাম, পংকজ তার  
সকল আসক্তি। ছবির মজার ভূমিকা  
অহলা অংশটুকু তিনি ছবির প্রয়োজনে  
সুন্দর অথচ অমোঘভাবে ব্যবহার করার  
পক্ষপাতী। অথচ তিনি মূলত অব্যবহার  
(ফিগারেসে) চিত্রকর। মানস, ভক্ত,  
গাছপালা তাঁর মেজাজ এক দৃষ্টিভঙ্গি  
থেকে পটে রাখেন। পরে তারই সূত্রে  
সুর মিলিয়ে গড়ে তোলেন বর্ষমা এক  
অভিনব একজন। এখানে কাঠামো এক  
রচনাসৌক্য সম্বন্ধে তিনি ভাবিত।  
অথচ অব্যবহার্য রূপবোধের প্রয়োজনে  
উপস্থাপন করে আকোকে উপেক্ষা করার  
পক্ষপাতী নন। তাঁর ছবি গল্প বলে না।  
আবার অবিচ্ছিন্ন মেলক ভূমকপও তার  
কাজে নেই। একটা স্নিগ্ধ উল্লসে  
এসেছে তাঁর ছবিতে ব্যঙ্গব্যঙ্গ। তার  
বিদেশ পরিভ্রম, চিত্রভাস্কর্যের ইতিহাস  
সম্বন্ধে কৈবল্য তাকে ভারতীয় ছবি-  
বিশেষত অর্থাচরণের—সাঁতুকতা থেকে  
অনন্ত নিয়ে যেতে পারেন। অথচ ছবি-  
সৌন্দর্য তত্ত্ব বাদে, গঠন, দীর্ঘায়ণ, ইত্য  
বিকৃতকরণের ধরমে গঠন একটা কিছু  
আছে যা তাকে আনন্দিক স্থল চিত্রিত  
করে।

প্রচ্ছদের ছবি বেঙ্গুর মানসিকতার  
ভাস্কর। মাথায় বুলি নিয়ে একটি লীল  
মেয়ে চলেছে হৃদয়ত ভঙ্গীতে। পেছনে  
আরও কতজন। আর ফলে সময়ে  
যেন। এই ছবিতে লাল অরু কমলা  
প্রাধান্য সমস্ত পট সুন্দরভাবে সাজান  
বর্ণের মাধ্যমেই অধরা রূপ যেন ধর  
পড়েছে। তেলবস্তুর যাদু আছে। বেঙ্গুর  
পর থেকে বহু ভারতীয় শিল্পী হ্রদে  
গেলেন। এই যাত্রাঘরের ফল শিল্পীর  
নিজেকে সমকালীন চিত্রের শব্দক মনে  
করতে শুরুর করেন। দেশজ ঐতিহ্য এবং  
প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধেও বেঙ্গুর ভাব  
চিন্তা এবং সমস্যা পন্থতী শিল্পীদের  
পথনির্দেশ দিল অকশাই।

ফটো: দেবরত্ন রায়

# দাড়ি কাম্বাতোর পরে ত্বককে তির্ম্মল, তাজা ও তরম্ব করতে...



আপনার ত্বক  
স্বাভাবিক, শুকনো বা  
তৈলাক্ত যে অবস্থাতেই  
থাকুক না কেন,  
ইরাসমিক এখন  
এনেছে এমন এক  
শোভিৎ ক্রীম যা ঠিক আপনার  
ত্বকেরই অনুকূল... এর বিশেষ ফর্মূলা।  
আপনার ত্বককে তির্ম্মল, তাজা ও  
নরম করে দেয়। আজই পরীক্ষা করুন--  
ইরাসমিক।

- এন্টিসেপটিক --- স্বাভাবিক ত্বকের জন্যে।
- ক্রীম রীচ --- শুকনো ত্বকের জন্যে।
- লাইম ফ্রেশ --- তৈলাক্ত ত্বকের জন্যে।

## ইরাসমিক হাজির করেছে-- এমন এক ক্রীম-যা সব প্রকার ত্বকের অনুকূল

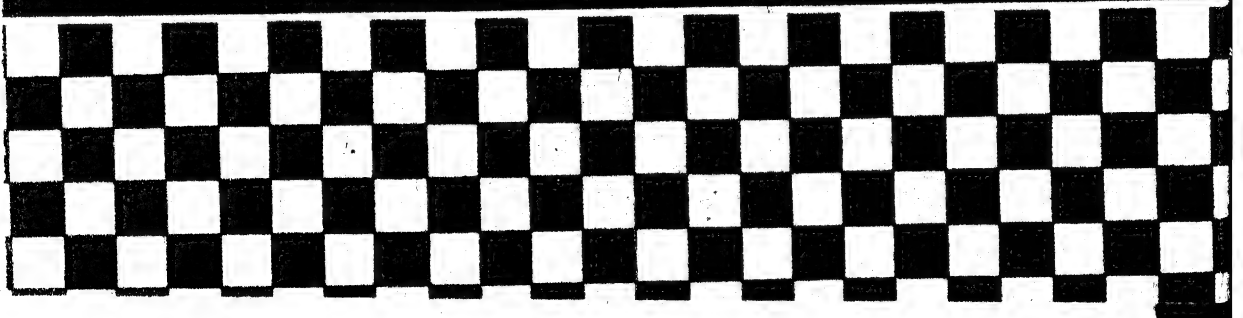


গলা ব্যথা  
কাশি থেকে রেহাই দেয়...



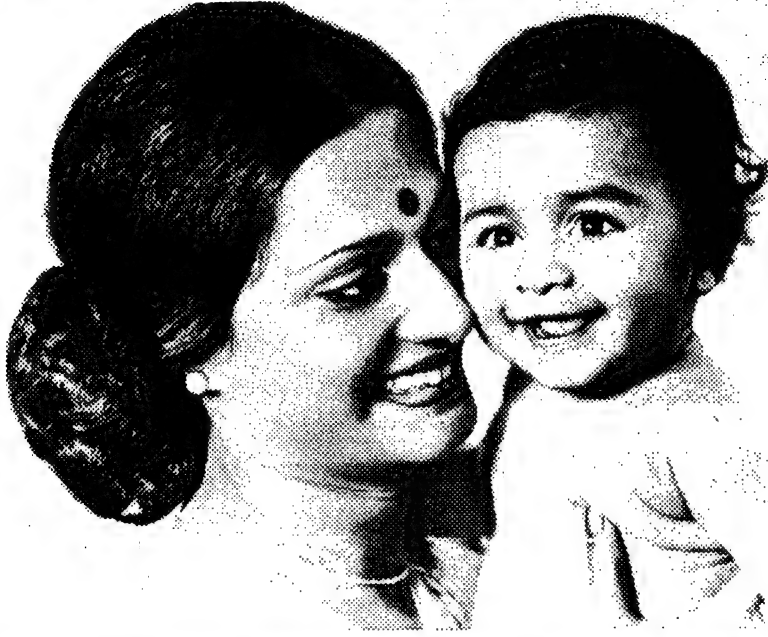
মুখরোচক স্বাদ, গলার আরাম ।

ভো কা সি ল





আপনার শিশু ৩ মাসের মত যথেষ্ট আয়রণ উপদান নিয়ে জন্মেছে



কিন্তু ৩ মাস বয়েস হলে, শুধু দুধ ওর  
আয়রণের চাহিদা মেটাতে পারবে না

ওকে আয়রণে ভরপুর

**ফ্যারেস্তা**

দিন

“মায়ের শরীর থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে  
আয়রণ নিয়ে শিশু জন্মায়, কিন্তু জন্মের পর  
এই জন্মা করা আয়রণ ক্রমশঃ কমে যেতে  
থাকে। যদিও দুধ আহাৰ হিসেবে ভালো,  
তবে তা সম্পূর্ণ আহাৰ নয়— কারণ  
তাতে আয়রণ থাকে না। এইজন্যে শিশুর  
এমন শক্ত আহাৰের প্রয়োজন যাতে  
আয়রণ আছে।”

—ডাঃ সুভাষ চ. আৰ্য্য : “ইনফ্যান্ট অ্যান্ড  
চাইল্ডকেয়ার ফর দ্য ইণ্ডিয়ান মাদার।”

অতএব, তিন মাস বয়েসে আপনার  
শিশুকে এমন এক শক্ত আহাৰ ধরান যা তার  
রক্তের জন্যে, রোগ প্রতিরোধ শক্তির জন্যে,  
সাধারণ স্বাস্থ্যের জন্যে, এবং বৃদ্ধি  
ও বিকাশের জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয়  
আয়রণ যোগায়।

ডাক্তাররা ফ্যারেস্তা খাওয়াতে  
বলেন কেন?

ফ্যারেস্তা হল শক্ত আহাৰ ধরানোর জন্যে  
বিশেষভাবে তৈরী আহাৰ—যা শিশুর  
কোমল হজমশক্তির উপযোগী করার জন্যে  
আগে থেকে রান্না করা থাকে।  
এতে আছে—দুত বেড়ে ওঠার জন্যে প্রোটিন;  
শক্তির জন্যে কার্বোহাইড্রেট আর ফ্যাট;



মজবুত হাড় আর দাঁতের জন্যে ক্যালসিয়াম,  
ফসফরাস ও ভিটামিন। ফ্যারেস্তা খেলে  
আপনার শিশু অনেক ঘনীভূত আকারে  
ক্যালোরি পায়, ফলে তরল আহাৰ খাওয়া  
কমে যায়, আর সে চিবিয়ে খেতে শেখে।  
আর সবচেয়ে বড় কথা হল, ফ্যারেস্তা  
আয়রণে ভরপুর—যা শিশুর সাধারণ স্বাস্থ্য  
আর বৃদ্ধির জন্যে একান্ত প্রয়োজন।

বিনামূল্যে! চিঠি লিখে চেয়ে পাঠান  
শিশুর প্রথম বছরের খাতা : নতুন মাসেদের  
জন্যে শিশুপালন সম্বন্ধে সহজ পরামর্শ।  
সঙ্গে ডাকখরচ বাবদ ৫০ পয়সার  
স্ট্যাম্প পাঠাবেন।

পোঃ অঃ বঃ নং 19119  
(FAR 77 I) বক্সে 400 025.

ডাক্তাররা খাওয়াতে বলেন ফ্যারেস্তা—

সব দিক থেকে দ্রুত বেড়ে ওঠার জন্যে শিশুর আদর্শ শক্ত আহাৰ



প্রাণচাম্পল্যে ডেরপুর  
নেসকাফে®



বিশ্বের সর্বাধিক  
বিক্রীত কফি

শতকরা ১০০ ভাগ খাঁটি কফি থেকে তৈরী  
একমাত্র ইন্সট্যান্ট কফি

॥ প্রকাশিত হল ॥



সমরেশ মজুমদারের

নতুন উপন্যাস

## বন্দী নিবাস

বন্দী নিবাস বাংলা ভাষায়

লেখা প্রথম মৌলিক খিলার  
যা পাঠকদের নিঃস্বাস ফেলার  
সুযোগ দেবে না।

উত্তরাধিকারের লেখক  
সমরেশ মজুমদার নিজেকে  
ভাঙতে জানেন, ভেঙ্গে গড়তে  
পারেন, বন্দী নিবাস সেই  
আশ্চর্য আবিষ্কার।

দশ টাকা



বিজিতকুমার দত্তের

একটি সাধক গবেষণামূলক গ্রন্থ

## বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস

বন্ধিমচন্দ্র থেকে রাখানদাস  
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক  
উপন্যাসের ধারাবাহিক,  
বিশ্লেষণপূর্ণ আলোচনা। ডঃ  
দত্তের আলোচনায় ঐতিহাসিক  
বোধ ও তাঁৎস সমালোচনা  
জিজ্ঞাসার নিপুণ সমন্বয় ঘটেছে  
এই গ্রন্থে। সমবেদনা এবং  
আন্তরিকতার সঙ্গে তথ্যানিষ্ঠা  
যুক্ত হয়ে গ্রন্থটি বাংলা  
সাহিত্যে এক অনন্যসাধারণ  
মহাদা পেয়েছে পঁচিশ টাকা।



নারায়ণ সান্যালের

রহস্য উপন্যাস

## উলের কাঁটা

১৯

॥ প্রকাশিত হল ॥

মিত্র-ঘোষের

আবার এক অবদান

উপহার দেবার মতো স্বল্প মূল্যের বই

কাগজ ছাপার দুর্মূল্যতার মধ্যে — মিত্র ঘোষের  
সুলভ সৎ-সাহিত্য প্রকাশের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা



বরণীয় লেখক-লেখিকার নবতম ও শ্রেষ্ঠতম  
রচনা উপহারযোগ্য সুদৃশ্য সংস্করণে অথচ  
সুলভ মূল্যে পরিবেশনের উচ্চাশা-মূলক অভিযান:

—এ পর্যায়ের প্রথম উপন্যাস—

সাহিত্য-অধিরাজ্ঞী আশাপূর্ণা দেবীর  
অন্তর্দর্শনা উপন্যাস

## বালির নীচে ঢেউ

১০

[মোহন মুদ্রণ, সুন্দর প্রচ্ছদ, প্রাস্টিক জ্যাকেটে  
মোড়া, ডিমাই ২২৫ পৃষ্ঠার স্বাভাবিক নিয়মে যার  
মূল্য হওয়া উচিত ১৬০ সেই বই মাত্র ১০০  
টাকায় দেওয়া হচ্ছে]

॥ প্রকাশিত হল ॥



যাঁর খ্যাতি শুধু বাংলায় নয়

সারাভারতে পরিব্যাপ্ত

সেই অদ্বিতীয় উপন্যাসিক

বিমল মিত্রের

নবতম উপন্যাস



আর এক যুধিষ্ঠির

১৫

আর এক নতুন ইতিহাস রচনা করল ॥  
॥ সাহিত্যক্ষেত্রে আবার এক নতুন ইতিহাস রচনা করল ॥

॥ প্রকাশিত হল ॥



মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট-৭০/৮৬/১, মহাশ্বে গান্ধী রোড-৯

॥ প্রকাশিত হল ॥



সুমথনাথ ঘোষের

## এক নাটক অনেক দৃশ্য

লেখকের এই গ্রন্থে আসল  
মানুষ আর আর নকল,  
পুতুলকে অসাধারণ নৈবাস্তি  
কতায় পাশাপাশি রেখে  
দেখানো হয়েছে নকলের  
চাপে আসল আচ্ছন্ন। গ্রন্থটি  
আগাগোড়া পড়তে পড়তে  
কেবলই মনে হবে যে এর  
বক্তব্য কত স্পষ্ট, কত স্বচ্ছ।

সাত্বে বারো টাকা



জরাসন্ধের

আত্মস্মৃতিমূলক উপন্যাস

## নিঃসঙ্গ পথিক

'নিঃসঙ্গ পথিক' এর পটভূমিও  
বাংলাদেশ — থেয়ালী নদী  
আড়িয়াল গাঁর তীরে গড়ে  
ওঠা কতগুলো গ্রাম ও গঞ্জ  
একদিন তারই গর্ভে বিলান  
হয়ে গেল। সর্বস্বতারা শ্যামা  
চরণ শিরোমণি একটা যুগের  
মিনি প্রতিনিধি—নদীতান  
দেশে গিয়ে ঘর বাঁধলেন—  
শুরু হল এক নতুন জীবন  
ধারা। তাঁর পুত্রের মধ্যে  
জন্ম নিল আ একটা যুগ।  
'নিঃসঙ্গ পথিক' এটাই ঘরের  
মিলন এবং সেই সঙ্গে কিছুটা  
বিরোধের কাহিনী।  
প্রথম খণ্ড-১৯২২, দ্বিতীয় খণ্ড-১৮৯



তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অমর উপন্যাস

## পঞ্চগ্রাম

১৯

(পেপার ব্যাক)

॥ প্রকাশিত হল ॥



## চিঠিপত্র

### স্বীন্দ্রসংগীত

শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্যের লেখা রবীন্দ্র-সংগীত বিষয়ক একটি চিঠি ১২ই প্রল "দেবদ" পত্রিকার প্রকাশিত হবার তার উত্তরে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম। শ্রীকমলাকান্ত বরাট হাউস আমার চিঠির ওপরে এমন কিছু লিখেছেন, যেগুলো সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য রাখার অবকাশ আছে।

শ্রীকমলা তাঁর চিঠিতে সাহানা দেবীকে কথা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি থেকে উদ্ধৃত দিয়েছেন, তা বিশ্লেষণ করে শ্রীবরাটের মতো কিছুতেই এটি লক্ষ্যে নেওয়া যায় না যে, ঐচ্ছিকভাবে সবরকম বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যে প্রত্যয় প্রদান নাহলে এবং নিরন্তর আত্মসমর্পণ করতে না পারলে নি গাওয়া অথবা গান শোনা কোনটাই ঠিক হয় না—এ হেন ভক্তিগদ্যগদ্য দুই-বাক্য মাকী শিল্পদর্শনে রবীন্দ্র-নাথের আস্থা ছিলো বলে আমার তো মনে নেই। উদ্ধৃত পটভূমিতে রবীন্দ্র-নাথ সাহানা দেবীকে যা বলছেন, তা থেকে কোনো প্রমাণিত হয় না যে (১) হানু দেবী স্বেচ্ছাকৃত সর্বস্বত্ব বিক্রয়-কার-বিক্রয়-কার উদ্দেশ্যে রাখতেন রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়ার সময়ে বা

(২) রবীন্দ্রনাথ অমনাচার কাজের পক্ষ-পাতী ছিলেন। আমি যতদূর জানি, গত একশো বছর ধরে রবীন্দ্রনাথের

স্থানে (আমাদের দেশে ও ব্যক্তিগত নয়) সমালোচনা, বিশ্লেষণ, বাস্তব ইত্যাদি কাপড়কাটা মানবের স্বাভাবিক সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় দারুণভাবে অনুপ্রাণিত হতে হতে এক "বিক্রয়" নামে একটা ব্যাপার অধুনাক মানলে তার আসন পাকা করে নেবার পর মানবের স্বাভাবিক সৃষ্টি পরিভ্রমার সুহৃদের (সাম্প্রদায়িক প্রমাণ করলে ওয়ালারা নন) ক্রিয়াক্ষেত্রের না করে মানবের কোনো সৃষ্টিকে গ্রহণ করা তো ধরে থাক, আমল দেবার কথাও ভাবতে পারেন না। নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ "ডুব দে হন কালী বঙ্গো" শ্লোকে মোহময়, মধ্যযুগীয় ভাস্কর্য, তুরীক বরাপার যা এই অভক্তি, বিভ্রম গোড়ায় এবং মধ্যযুগীয় কল্পিত-সংগীতের মধ্যে এক প্রণয়ী মানবের তা যতই পছন্দ হোক না কেন—আমলে স্বীকার, নিঃপ্রাণ, অস্বপ্নের। তা ছাড়া সংগীত, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি ব্যাপারগুলো তো আর হিটলারের তৃতীয় রইখ নয় যে "নিঃশর্ত" ও নিরন্তর আত্মসমর্পণ না করলে সাজা পেতে হবে। মস্তিস্ক নামে পদার্থটি মানবের যখন আছেই, তখন বিচার-বিশ্লেষণ করতে কী? সংগীত-চিন্তার "সংগীত ও ভাব" প্রবন্ধটিতে আমরা পড়িঃ "আমাদের বঙ্গ সমাজে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে...। এই নতুন আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে সংগীতের নব অভ্যাস হইয়াছে। সংগীত সবে জাগিয়া উঠিতেছে মাত্র, কাজ ভালো করিয়া আরম্ভ হয় নাই। এখনো সংগীত লইয়া নানা প্রকার

## প্রকাশিত হলো

### হাবু পাল-এর

গ্রামভিত্তিক উপন্যাস

## আত্রেয়ীর উপকথা

আত্রেয়ী তার শাড়ির নীল আঁচলটাকে উড়িয়ে দিয়ে, নাচের ভঙ্গিতে দেহটাকে বঁকিয়ে উত্তর পশ্চিমের ছকুল ছাপিয়ে কুল কুল করে গান শুনোতে শুনোতে চলেছে আপন থেয়ালে। তারই পক্ষমীর চাদের মত বাঁকটার পাড়ে একটি ছোট গ্রাম।

সেই গ্রামের কথা, দুঃখী মানুষের স্তন্য-দুঃখের কথা, গাজনের মেলার কথা এই উপন্যাসে উপজীব্য।

শরতের শিউলি ফোটার জন্য সারা বছরের পতিক্ষে। দেবী দশভুজার পূজার আনন্দ চারটে দিন রাতের আনন্দ। চণ্ডীমণ্ডপের জটলা, যাত্রা, খেমটা, কবিরালদের লড়াই—এ সব আজ-কালকার উপন্যাসে যেন হারিয়ে যাচ্ছে। সেই সাহিত্য জগতের চিরকালীন পুরোন কথা নতুন করে শোনোতে এসেছেন নতুন লেখক হাবু পাল।

## প্রকাশিত হলো

### শ্রীবাসব-এর

বহু প্রশংসিত উপন্যাস

## বাঁধন ছেঁড়া দাগ

সেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস

### নাজমা বেগম

এক মুঠো মাটি ৬, গুলবানু ১২, গোমতী গঙ্গা ১৪, দেওয়ানবাড়ি ১৫, আনন্দীকল্যাণ ৫, ছুয়ে পক্ষ ৬

## বিশ্ববাণী প্রকাশনী

৭২/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড II কলকাতা ৯

### সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

আপনার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানের নীল আলোতে আমাদের অমায়িক অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। আমরা আত্মগোপনের জায়গা পাচ্ছি না। আমরা স্বীকার করছি আমরাই অনুসন্ধানে খুঁজি। প্রতিদিন খুঁজি করছি অথবা খুঁজি হচ্ছি। কিন্তু আপনি তো জানেন.....

### সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের অনুসন্ধান

প্রথম অস্তিত্ববাদী উপন্যাস  
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের  
সব মিলিয়ে ১৬.০০ মানস ভ্রমণ ১০.০০

প্রথম অস্তিত্ববাদী উপন্যাস  
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের  
সব মিলিয়ে ১৬.০০ মানস ভ্রমণ ১০.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের  
বাংলার  
শেষ ডিটেকটিভ  
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের  
প্রণয় চিহ্ন  
পূর্ণেন্দু পণ্ডিত  
টপ্পাঠুংরী  
শীর্ষেন্দু মাধোপাধ্যায়ের  
তিন হাজার দুই পয়সা দিয়ে কেনা  
ছবার ঘোষের  
গ্রীস রোমের উপকথা

স্বরালিপি : ২৩এ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রাট কলিকাতা-৯

পৃষ্ঠক: বিপণি/২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯

যখন প্রকাশিত হতে চাইলে তখন কখনও  
সঙ্গে গলাগলি করে সে দেখা দিল।  
হলেকো থেকে গানের প্রতি আমার  
নিবিড় ভালোবাসা যখন আপনাকে  
বাত করতে গেল, তখন অবিচ্ছিন্ন  
সংগীতের রূপ সে রচনা করল না।  
সংগীতকে কাকের সঙ্গে মিলিয়ে  
দিলে, কোন্টা বড়ো কোন্টা ছোটো  
বাঁকা গেল না।" (সংগীতচিন্তা/পৃঃ  
৩০) "আধুনিক বাংলা গানও একটি  
আত্মিক বিশেষ্য নিয়েছে। এই সংগীতে  
আত্মশক্তি ও সুরশক্তির মিলনে  
কবিতা অপরূপ সৃষ্টিশক্তি রূপ নিতে  
চলেছে।" (সংগীতচিন্তা/পৃঃ ৬৭)।  
রবীন্দ্রনাথের গান আধুনিক গানের  
উৎসে আছে বলে আমার যে বক্তব্য  
ছিলো, রবীন্দ্রনাথের এই উদ্ভাবিত  
শ্রীকৃষ্ণের তার বিচার করলে শ্রীকৃষ্ণের  
স্বয়ং হই সুবিধে হবে।

"রবীন্দ্রনাথের গান কি আধুনিক  
গান নয়? গত একশো বছর ধরে  
আধুনিক গানের যে ধারা চলে আসছে  
রবীন্দ্রনাথ কি তার উৎসে নেই?"—  
আমার এই প্রশ্নকে শ্রীকৃষ্ণের "অশ্রুত"  
হলে হয়েছে। অশ্রুত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ  
শ্রীকৃষ্ণই হইলেন দৈবীক একটি চিত্রিত  
লিখছেন: "আমার আধুনিক গানে  
জগৎ-তালের উল্লেখ না থাকতে  
অসম্পূর্ণ করছি।" (সংগীতচিন্তা/  
পৃঃ ২৪৫)। গানে কথার পাশে পাশে  
কবিতার সামগ্রিক কাঠামো, সুর  
ইতিমধ্যে, ছন্দ, মাত্রা, স্বরবিন্যাস-  
কবরসংগতির সম্ভাবনা ইত্যাদি বিভিন্ন

ব্যাপার আছে। রবীন্দ্রনাথ, ইন্ডিয়ান-  
লাল এইসব ব্যাপারগুলো যেভাবে  
ব্যবহার করেছিলেন এটাই সব ব্যাপার  
নিরে যেভাবে ভাবনাচিন্তা করেছিলেন  
এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন,  
সেই ধরনের সাংগীতিক কাব্য কলাপ  
বাংলা গানের ক্ষেত্রে তাঁদের আগে এ  
হারে, এ মাত্রায় আর কেউ করেছিলেন  
বলে আমার জানা নেই। বাংলা গানের  
গঠন-বিন্যাস, গীতপ্রকৃতি, ভাব, চরিত্র  
উপাদান ইত্যাদির ক্ষেত্রে আধুনিক  
মনের প্রথম ধাক্কা ও প্রভাব রবীন্দ্র-  
নাথেরই পড়েছিলো। ঐভাবেই আধুনিক  
গানের জন্ম। তাঁরই দশকের প্রথম  
দিকে "আধুনিক গান" নামে কোনো  
কথা শোনা যেতো না বলে শ্রীকৃষ্ণ কি  
প্রমাণ করতে চাইছেন? পুরোনো  
পুরোনো রেকর্ড-এর লেবেল পড়লে  
খরট মশাই দেখতে পাবেন যে,  
সেকালে রবীন্দ্রনাথের গানের রেকর্ডেও  
"রবীন্দ্রসংগীত" নামটা লেখা থাকতো  
না। তাই বলে কি "রবীন্দ্রসংগীত"  
সেকালে ছিলো না? শ্রীকৃষ্ণের  
যুক্তিতে তো বলতে হয় যে "রবীন্দ্র-  
সংগীত"ও সেদিনের থেকে। "বাংলা  
গানের বিশিষ্ট ধারার অবলম্বনেই এই  
আধুনিক গানের প্রকৃত উৎস" ইত্যাদি  
কথা ঐতিহাসিক ও সাংগীতিক যুক্তির  
ধোপে ঢেকে না। রবীন্দ্রনাথ নিজের  
নিজের গানকে "আধুনিক" বলেছেন,  
তার প্রমাণ আমি দিয়েছি।

সুমন চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশিত হলো



## নদীর সঙ্গে দেখা বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

ভয়ঙ্কর এক দুর্যোগের রাতে পিতৃবন্ধু অসুস্থ মধুসূদন  
গিরি আর যুবতী রক্ষিতা ফুল্লরার কাছে আশ্রয়  
পেয়েছিল শিবনাথ। সারাটা রাত সে এক দর্দান্ত  
অভিজ্ঞতা। ঘরের বাইরে তখন পৃথিবী ছিল ঢাল-  
মাটাল। একদিকে সর্বনাশা ঝড় আর বর্ষণের তাণ্ডব,  
অন্যদিকে ভয়াল নদীগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসা উত্তাল  
জলরাশির ধ্বংস-খেলা। শিবু অস্থির হচ্ছিল প্রিয়জনের  
কথা ডেবে। সন্তান-সন্তবা স্ত্রী পুণ্ডর কথ্য ডেবে।  
মাইল চল্লিশেক দূরে স্বগৃহে ফেরার জন্য আশ্রয় ছেড়ে  
বেরিয়ে পড়েছিল শিবু। চল্লিশ মাইল পথের বাধা  
পায় পায় মাড়িয়ে বিচিত্র সব মানুষের আদিম চেহারা  
দেখতে দেখতে পুণ্ডর কাছে ছুটে গিয়েছিল উদ্ভ্রান্ত  
শিবনাথ। যেতে যেতেই তার নদীর সঙ্গে দেখা। কাম  
জ্যোৎস্না প্রেম ভালবাসা হিংসা আর হিংস্রতার সঙ্গে  
দেখা। প্রকৃতি আর মানুষের এমন আদিম জীবনচিত্র  
বাংলা সাহিত্যেরই সম্পদ। পনেরো টাকা ॥



একাত্তরের শেষ বাহাদুরের গুরু। এই রক্তক্ষয়ী  
অস্থির কাজকে চিহ্নিত করার একটি নিরপেক্ষ অভি-  
জ্ঞতার দর্পণ 'অজাতবাস'। উপন্যাসের নায়ক তপু  
বিশ্বাস করত সেই বিশ্বাসে, যা এই পঙ্কিল সমাজ  
কাঠামোকে ভেঙে তখনই করে দিয়ে শ্রেণীহীন এক  
নতুন ব্যবস্থার প্রকাশ ঘটাবে। সেই বিশ্বাসই তপু  
আশ্রয় নিয়েছিল অজাতবাসে। স্বৈচ্ছায় গ্রহণ করেছিল  
অপরিসীম নির্যাতন আর লাঞ্ছনা। শৈবাল মিত্রের এই  
চমকে দেওয়া প্রথম উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের বর্তমান  
চিরাচরিত ধারা থেকে যে স্বতন্ত্র তাতে সন্দেহ নেই।

বারো টাকা

নবপত্র প্রকাশন

৮ পটুয়াটোলা লেন, কলি-৯



র চ ন া ব লী গ্র ন্থ ম া ল া

### গিরিশ রচনাবলী

সমগ্র রচনা ৫ খণ্ডে সঙ্কলিত। ১ম খণ্ড ডঃ রথীন রায় ও  
ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য ও অন্য খণ্ডগুলি ডঃ ভট্টাচার্য কর্তৃক  
সম্পাদিত। জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত, কয়েকটি বিশেষ  
প্রবন্ধ। প্রতি খণ্ডে কয়েকটি আর্ট প্রেট। [প্রতি খণ্ড টা. ২৫.০০]

### তারাকান্তের গল্পগুচ্ছ

সমগ্র ছোটগল্প (প্রায় ২০০) তিন খণ্ডে সঙ্কলিত। অধ্যক্ষ জগদীশ  
ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত।  
[প্রতি খণ্ড টা. ৪০.০০]

### বঙ্কিম রচনাবলী

সমগ্র বাংলা রচনা দুই খণ্ডে সঙ্কলিত। যোগেশচন্দ্র বাগল  
কর্তৃক সম্পাদিত। ১ম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস (১৪টি) [টা. ২৫.০০]  
২য় খণ্ডে সমগ্র সাহিত্য-অংশ। [যজ্ঞস্থ]

সা হি তা সং সদ

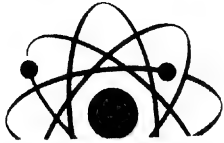
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৭০০ ০০৯

প্রকাশিত হল

সমরজিৎ কর-এর  
গল্পের মতো স্বাদ, জীবনী

অগ্রজ বিজ্ঞানী

দাম ১৫.০০



১৯১৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। পরের বছর সদ্য এম সি সি পাশ একদল তরুণ এলেন তাঁর কাছে। তাদের আজি, রসায়নের মতো আধুনিক গণিত এবং পদার্থ বিদ্যাতেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এস সি কোর্স চালু করা হোক। 'কে পড়াবে?' জিজ্ঞাসা করলেন স্যার আশুতোষ। 'কেন? আমরা!'

জবাবে বললেন সেই তরুণ ছাত্রদল। সৌদীন বাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে মিশ্রগণিত ও পদার্থ বিদ্যায় এম এস সি কোর্স চালু করেছিলেন স্যার আশুতোষ তাঁদের মধ্যে ছিলেন মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। এরা নিবৃত্ত হলেন নতুন কোর্সের লেকচারার। মাইনে কম, কিন্তু উৎসাহ কম নয়। বিজ্ঞান চর্চাকে সৌদীন জীবনের ব্রত হিসেবে যারা গ্রহণ করেছিলেন, দেখা গেল, স্বল্প ক্ষেত্রে নিজেরাই তারা হয়ে উঠলেন এক একটি ইনস্টিটিউশন। ভারতকে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করলেন পৃথিবীর বিজ্ঞান-মানচিত্রে। এমনই কয়েকজন অগ্রজ বিজ্ঞানীর জীবন ও কর্মের সন্ধান এই বইতে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন সমরজিৎ কর-বিজ্ঞানকে সাহিত্যের মতো স্বাদ ও সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলায় যার জড়ি মেলা ভার। প্রতিটি বিজ্ঞানীর ফোটো এই বইয়ে আলাদা আকর্ষণ।



দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

সুনীল  
গঙ্গোপাধ্যায়ের

নতুন স্বাদের কিশোর উপন্যাস

ডুংগা দাম ৭.০০

সুজ্ঞকে মনে আছে? সেই সুজ্ঞ, যাকে নিয়ে দুর্ধর্ষ উপন্যাস 'তিন নম্বর চোখ', যে চোখ বুজলে হঠাৎ দেখতে পায় বহু দূরে কোনো দৃশ্য অথবা ঘটনা, বার সপ্তা দেখা হয়েছিল গ্রহান্তরের অধিবাসীদের।



সেই সুজ্ঞ আর তার আদরের কুকুর ডুংগা আর অন্য গ্রহের লোকদের নিয়েই নতুন স্বাদের অসামান্য উপন্যাস 'ডুংগা'।

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

সুনীল  
গঙ্গোপাধ্যায়ের

এক মলাটে দুটি উপন্যাস

হলদে বাড়ির

রহস্য ও দিনে

ডাকাতি দাম ৬.০০



দুটি দারুণ জমজমাট আড্ডেভোগার কাহিনীর একত-সংকলন এই বই। শিমুলতলার লাটু, পাহাড়ের কাছে দুর্গের মতো এক রহস্যময় বাড়ি নিয়ে 'হলদে বাড়ির রহস্য'। আর, ব্যাকের এক মৃত দারোয়ানের অশরীরী আখ্যার সাহায্যে কীভাবে ধরা পড়ল ব্যাক-ডাকাতির নায়ক ডাকাতিদল তাই নিয়েই লেখা 'দিনে ডাকাতি' দুটি



কালকূট-এর

উচ্চ স্বাদের উপন্যাস

অমৃত বিষের

পাত্রে দাম ৮.০০

বিষবাহী প্রাণের অমৃত-সম্মানের কথা লিখতেই কালকূট একদা কলম ধরে-ছিলেন। তাঁর প্রথম যাত্রা 'অমৃতকুণ্ডের সম্মানে'। অমৃত-সম্মানের শেষ যদি এখানেই হত, তাহলে যে-অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছিলেন তুলোত্তমা নগরী রাজধানী দিল্লীতে গিয়ে, সেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা কোনোদিনই জানা যেত না। এ-ও এক দুর্লভ অমৃতেরই সম্মান। যমুনার ওপরে টলমলে আকাশে ভেসে-বেঙেনা একটি মুখ-সেই মুখই অমৃতের মুখ, বিষের পাত্রে টলটলানো কার সেই মুখ? সে-মুখ রঞ্জিতার। অগ্রীম্বরী রূপ তার, দূরন্ত যৌবন। কিন্তু রূপই অভিশাপ। আগুনের মতো সেই রূপে পতঙ্গেরা পুড়ে মরে, কিন্তু মানুষ এই আগুন নিয়ে সুখের ঘর বাঁতে ভয় পায়। রাজতাকে চেয়েছে অনেকে, কিন্তু ও পায় নি-তার নাম ভালবাসা। প্রবল ভ্রুশ নিয়ে, তাঁর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, আকর্ষিত বিষের পাত্রে মুখ রেখেছে যে-রাজতা রিজতি, কালকূটের-এর নির্বাসন-যাত্রায় তার সেই বিষই কীভাবে অমৃত হয়ে দেখা দিল, তারই এক উচ্চ উল্লেস অসামান্য কাহিনী 'অমৃত বিষের পাত্রে'।

কালকূট-এর অন্যান্য উপন্যাস:

শব্দ ৭.০০ তুষার সিংহের পদতলে ৬.০০ অমাবস্যায় চাঁদের উদয় ৮.০০



আনন্দ শাহবাগ রাস্তা গ্রাইডেড লিমেণ্ড ৪৫ বেনিফিটো ফোন করকাতা ৯

সুরজিৎ দাশগুপ্তের

চমকপ্রদ উপন্যাস

বিদ্বদ্ব করে।

দাম ১০.০০

একটি ছেলের বড়ো-হরে-ওটার এক চমকপ্রদ কাহিনী 'বিদ্বদ্ব করে।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালীন এক যক্ষ্মল শহর, রাস্তাসমাজ, সংস্কার, আচার, একটি পরিবারের ডেউরের লুকনো কাহিনী, চারপাশের মানুষজন, নিসর্গ দৃশ্য, স্মৃতি, অপমান, দুঃখ, যৌনতাবোধ, পাপ-এমন বহু-কিছকে একটি কিশোরের চক্ষুর জানালা



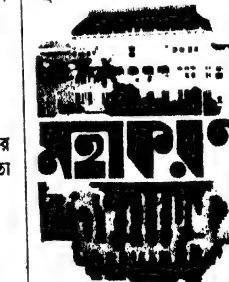
দিয়ে পরিণত দক্ষতায় দেখিয়েছেন সুরজিৎ দাশগুপ্ত।

শুভ্রাংশু গুপ্তের

বিশিষ্ট উপন্যাস

মহাকরণ দাম ৮.০০

রাইটার্স' বিন্ডিংস-এর পটভূমিকায় রচিত এই চামুল্যাকর উপন্যাসে এক অজ্ঞাত পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক লেখক শূভ্রাংশু গুপ্ত। আমলা-কোবানী



কর্মচারীদের জীবন থেকে তুলে-আনা এই কাহিনী একাধারে ঐতিহাসিক দলিল এবং বিচিত্র স্বাদের উপাখ্যান।

প্রকাশিত হয়েছে  
সমরেশ বসু  
নতুন উপন্যাস  
বিপর্যস্ত

প্রকাশিত হয়েছে

ইন্দ্রমিত্র-এর

সরস সজীব কৌতুক উপন্যাস

মহারাজ দাম ১০.০০



হাসির গল্পের একমাত্র লেখকরা খুব কম পেয়েই হাসির উপন্যাস লিখেছেন। পরশুরাম লেখেননি। শিবরাম চক্রবর্তীও না। অথচ কে না জানে, কৌতুকগল্পের ক্ষেত্রেই দুটি নাম কী অবধাতিত, কী উজ্জ্বল এবং অবিচল। হাসির গল্পকার ইন্দ্রমিত্র এঁদেরই উত্তরসূরী এবং বিশিষ্ট সফল একটি ব্যক্তিত্ব। তাঁর গল্পগ্রন্থ 'শুভদিন' যারা পড়েছেন তাঁরা জানেন, জীবন থেকে কত সহজে তিনি তুলে নেন অনাবিল কৌতুক উজ্জল সিঁচুয়েশন। বুদ্ধিদীপ্ত ধারালো তাঁর ভাষা, সরস সজীব তাঁর বর্ণনা, বিশুদ্ধ তাঁর পরিমিতবোধ। হাসির গল্পকাররূপে তাঁর সার্থক অভিজ্ঞতাকে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন ইন্দ্রমিত্র 'মহারাজ' উপন্যাসে। আদ্যন্ত কৌতুকময় এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে এক দুর্লভ ও দুর্লভ, সংযোজন হয়ে থাকবে 'নেপথ্য-জগৎ' বা 'আপডার ওয়াল্ড'-এর যেসব কীর্তিকান্ড আমাদের যাবতীয় ঘটনাপ্রবাহকে বণ্ডে নিয়াস্তিত, এই উপন্যাসে তারই পরিচয় তুলে ধরেছেন তিনি। ঘটনাগুলো আমরা জানি, ঘটতে দেখি। কিন্তু নেপথ্যকাহিনী জানা ছিল না। দম-ফাটা হাসিও, রাগতায় মূড়ে অনাস্বাদিত সেই কাহিনীই অনন্য ভাসিতে শোনালেন ইন্দ্রমিত্র। এই লেখকের গল্পগ্রন্থ: শুভদিন ৬.০০

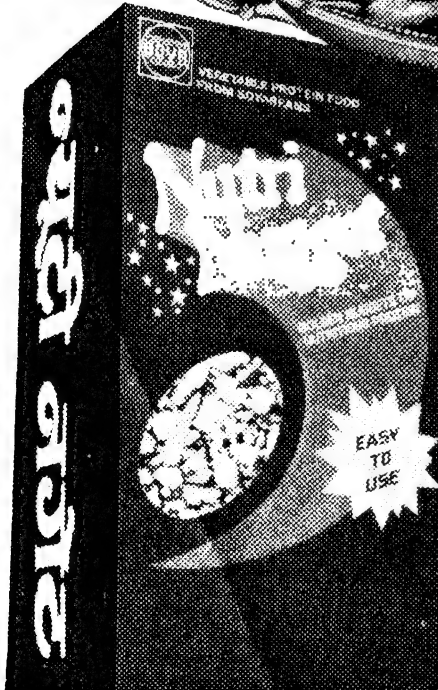




ଜେ3 ଏକଦିନ ছিল  
মায়ের হাতের রান্না ছিল কণ্ড  
পুষ্টিকর...



জেনিত আবার  
ফিরে এনেছে **ন্যুট্রি নাগেট**®.



ହାଟ୍ରି ନାଗେଟ୍—ପ୍ରୋଟିନ-ସମୃଦ୍ଧ ଉଦ୍ଭିଦ ଆହାର। ଧାରର ରାନ୍ଧାୟ ଏକ ନୂତନ  
ପ୍ରମାଣୀ।

ହାଟ୍ରି ନାଗେଟ୍—ବେଶୀ ପୁଷ୍ଟିକର, କାରବ ଏତେ ଆଛେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ  
ପ୍ରୋଟିନ। ଡିମ୍, ଢୁପ ବା ଭାଲେଣ୍ଡ ଏତେ ପ୍ରୋଟିନ ନେଇଁ ।

ହାଟ୍ରି ନାଗେଟ୍—କମ୍ ଦାୟେ ଲାଭଜନକ, କାରବ ୨୨ଟା ଡିମ୍, ୧୧୦ ଗ୍ରାମ୍  
ପନୀର, ବା ୪ ଲିଟାର ଢୁପେ ଯତେ ପ୍ରୋଟିନ ଆଛେ, ତା ପାଠୟା ଯାୟ  
ହାଟ୍ରି ନାଗେଟ୍‌ର ୨୫୦ ଗ୍ରାମ୍‌ର ପ୍ୟାକେଟେ ।

ହାଟ୍ରି ନାଗେଟ୍—ସର୍ବଶ୍ରେୟ ସମ୍ପନ୍ନ, ରାନ୍ଧାୟ ଏନେ ଦେୟ ଅପୂର୍ବ ସ୍ବାଦ ।  
ଆପନାର ଦୈନିକ ରାନ୍ଧାବ ଉପକରଣେ ଆଜିହି ହାଟ୍ରି ନାଗେଟ୍ ସାମିଲ କରନ୍ ।

**ନ୍ୟୁଟ୍ରି ନାଗେଟ୍**

ଶୁଦ୍ଧ, ଯୋଗ୍ୟାଳୀ ସୟାବୀତେ ତେରି ତିରାମିଷ ଆହାର  
ଦାନା ବା ହୋଟି ହୋଟି ଟୁକରୋୟ ପାଠୟା ଯାୟ ।



ସୟା ପ୍ରୋଡାକ୍‌ଶନ ଏଣୁ ରିସାର୍ଚ୍ଚ ଏସେସିୟେସନ  
ପୋଷ୍ଟ-ବକ୍ସ ନଂ ୨୫, ବେରିଲୀ, ୨୫୦୦୦୧, ଇଣ୍ଡିଆ ପି.  
ନେବ ଟେକନିକାଲ ଇନ୍‌ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଏବଂ ଜି. ବି. ପବ୍ଲିକ୍‌ସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନିଆସିଟି  
ଏବଂ ଏଗ୍ରିକାଲ୍‌ଚାର ଏଣୁ ଟେକନୋଲୋଜିର ଏକଟି ସଂସ୍ଥାନ ।

# সুখও নয়, দুঃখও নয়, শুধু শান্তি

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

প্রস্তাবনা

কয়েক দিন আগে প্রশান্তচন্দ্রের অসুস্থতায় সব গেলুমতে গিয়ে এই লেখাটা হাতে ঠেকলো। ৮ই মার্চ, ১৯৮২ সালে শান্তিনিকেতনে কস লেখা একখান চিঠি তাঁর কোনো স্নেহের পর্যায়ে লেখা। এটা এমন একটা চিঠি যেটাতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রশান্তচন্দ্রের প্রথম পরিচয়ের একটা অধ্যায় যেন ছবির মতো ফুটে উঠেছে। কবি সে সময়কার সহজ নিয়াদেশ্বর জীবনযাত্রার কথা এখনকার দিনে অনেকই জানেন না। তাঁদের কাছে তাই এই লেখাটা অতি মূল্যবান মনে হবে বলে আমি প্রশান্তচন্দ্রের চিঠিখানা ছাপতে ক্লিলাম। কবির সঙ্গে প্রশান্তচন্দ্রের জীবনের গ্রন্থবন্ধন দিনে দিনে ভিলে ভিলে কেমন করে গড়ে উঠেছিল তার ইতিহাসটা ফেলে দিয়ার মতো জিনিস নয় বলেই আমার বিশ্বাস। আজকের দিনে রবীন্দ্রগবেষণা নিয়ে যারা রত আছেন তাঁদের কাছে নিশ্চয়ই এর মূল্য আছে। রবীন্দ্রনাথের স্নেহখানা একজন মানুষ, যদি সমগ্র জীবনটাই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব দিয়ে তৈরী যিনি রবীন্দ্রনাথের আদর্শকেই নিজের জীবনের আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন, যাক রবীন্দ্রনাথের মনোভাষ্য বললেও অত্যন্ত হয় না, কবির মৃত্যুর কোনো তারিখ নির্ধারণ এই লেখার ভিতর দিয়ে কি রকম করে ফুটে উঠেছে তা সবাই দেখতে পারে। প্রশান্তচন্দ্রের মনের অনুভূতি কখনো বাইরে প্রকাশ পেত না। অস্তরঙ্গ গভীর ফণা, নদীর মতো সব স্নেহ ভালোবাসা প্রস্রাব প্রবাহ নিত্য বয়ে যেত, কিন্তু বাইরে তার কোনো উচ্ছ্বাস কখনও দেখান। তাই যদি কখনও সামান্য প্রকাশের আভাস কোনো দিন দেখা দিত তাহেই অস্বস্তিতে পেরে যে সেটা কতখানি। যেদিন এই লেখাটা লিখেছিলেন সেদিনকার কথা মনে পড়ছে। সেদিনও আমার স্বামীর কবির মতো দেখে কেউ বসতে পারতেন যে, তাঁর অন্তর রক্ত-মৃত্যুর তরঙ্গ কি রকম উবেল হয়ে রয়েছে সারাক্ষণ। এ বিষয়েও তাঁর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আশ্চর্য মিল।

শ্রীনিমলকুমারী মহলানবিশ

"Uttarayan"  
Santiniketan  
Bengal

৮ই মার্চ ১৯৮২

ল্যাণ্গারাসু,

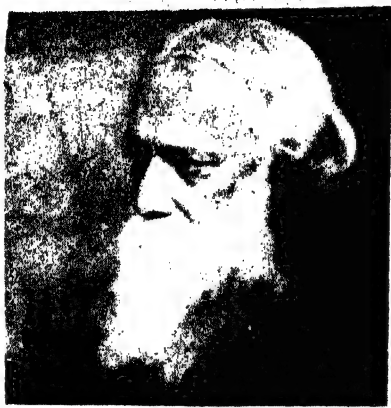
আট মাস পরে শান্তিনিকেতনে সেছি। কবি যাওয়ার পরে এই প্রথম। কাল নে আসতে আসতে মনে পড়লো ১৯১০ লে, প্রায় বত্রিশ বছর আগে এইরকম একটা কালের গাড়িতেই শান্তিনিকেতনে প্রথম আসি। এসেই কবির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। আর মনে পড়ছে ঠিক এক বছর আগে মার্চ মাসে দিল্লী থেকে ফিরতি পথে খানে এসেছিলুম। পেঁছেই কবির সঙ্গে খা হোলো। কাল থেকে বারবারে মনে ভুছে যে এবার আর দেখা হবে না। থেকে থেকে ভুলে যাই। মনে হয় এখন দেখতে পাবো পাশে কোথাও রয়েছেন। বকে মৌচড় যে ওঠে। কাল রাতে শুতে গেলুম। কবির সঙ্গে দেখা হয়নি। রাতে বারোটা, একটা জলো। মাঝে এই বত্রিশ বছরের কত কথা ন পড়াছিলো। আজ সকালে উঠে কোনো ডা নেই। ভোর না হতে রানী উঠে চলে য়—সূর্য্য ওঠার আগে উনি অপেক্ষা রে থাকবেন। সকালে চায়ের টেবিল থেকে ঠ বড়ো ঘরটার পাশ দিয়ে গেলুম—ই সময়টা আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে ই। ঘরটা এখন museum করা হয়েছে। কবার উর্কি মেরে চলে এলুম। উপরে এসে নলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি ফাল্গুন মাসে ঠানোর বাগান ফুলে ফুলে উজ্জ্বল। রশু কালবৈশাখী রুড় হয়ে গিয়েছে—ফাল্গুনীর বাতাস আজও স্নিগ্ধ। দুরে পাই নদীর পারে ঘন সবুজ রঙ লেগেছে। মনে কবির হাতে লাগানো গাছের পাতা লোয় বাতাসে ঝলমল করছে। চূপ করে বসে ছি। এইরকম কতো সকাল বেলায় কবি গুন

গুন করে গান ধরেছেন। পুরানো সব স্মৃতি যেন ভেসে আসছে।

বত্রিশ বছর আগের দিনগুলি মনে পড়ছে। অতো বড়ো একটা মানুষকে দেখেছি কতো কাছে থেকে। আজ ছোটোখাটো কতো টুকরো দিনের কথা মনে পড়ছে। বড়ো বড়ো কতো কাণ্ড ঘটেছে, কতো কবিতা, গান, অভিনয়। আজ মনে পড়ছে এ সমস্ত ছাপিয়ে ওর কাছে কতো স্নেহ পেয়েছি। ১৯১১ সালে গ্রীষ্মের ছুটির আগে দুমাস শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে ছিলুম—তখন কলেজে পড়ি সতেরো আঠারো বছর বয়স। তখন সারাদিন প্রায় ওর কাছে কাছাকাছি থাকতুম। শান্তিনিকেতনে পুরানো guest house-এর দোতলায় পূর্বদিকের সেই ছোট ঘরখানায় উনি থাকেন। এই ঘরে বাসই গতিজ্ঞানি, রাজা, ডাকঘর লিখেছেন। মাঝে একটা বসবার ঘর। আমি থাকি পশ্চিমের ঘরে। গ্রীষ্মকাল—আমি একটা মাদুর নিয়ে উপরের বড়ো ছাদে শুতাম। কবির চাকর ছিল উমাচরণ—সেই আমাকে খাওয়াতো। সন্ধ্যাবেলা আশ্রমের লোকজন দেখা করে যাওয়ার পরে দক্ষিণে গাড়ি-বারান্দার ছাদটায় উনি বসে থাকতেন একটা লম্বা চেয়ারে। সন্ধ্যার আগেই আমাদের খাওয়া হয়ে যেতো। খুব সাদাসিধা। হয়তো একটু ফল, বা মিষ্টি, আর এক গেলাস ঘোলের সরবৎ। রাতে সে সময় রাঁধা হতো না। সকাল-বেলা চায়ের সময় পিউরি, আঁচ ফল। দুপুরে একটু ভাত আর দু একটা নিরামিষ তরকারি—বোধহয় Icmic চলছে। আর কেউ নেই। রথীবাবু, বোঠান, মীরা সকলে শিলাইদায়। উমাচরণই সব ব্যবস্থা করতো। ঐ একজনই চাকর, রাঁধিয়ে সব কিছু। সমস্ত কিছু ছিল সাদাসিধা। ছোটো ঘরখানায় খুব নীচু করে পাতা ওর বাঁহানা। এককোণে একটা ছোটো নীচু লেখবার ডেস্ক। এছাড়া আর আসবাবপত্র কিছু নেই। কয়েকখানা বই ডেস্কের একপাশে

আর লেখবার সরঞ্জাম। ঘরে একসঙ্গে দু তিন জনের বেশি মাটিতেও বসবার জায়গা নেই। পাশেই ছোটো স্নানের ঘর। কাপড় চোপড়, পাজামা, পাজিাব, আর একটা শোশাবাগানের জিনিস সেই ঘরেই আলিনায় টাঙানো। সিঁড়ির পাশে একটা বাসের বোধহয় আর কিছু কাপড় থাকতো। বারান্দায় একটা গোল টেবিলে বসে খাওয়া। এই ছিল তখনকার ব্যবস্থা। রাতে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলতে বলতে দেখতুম উনি চূপ করে আসছেন। আমি ছাদে চলে যেতুম। কোনো কোনো দিন আমিও অনেকবার ছাদে বেড়াতে বেড়াতে দেখতুম কবি তখনো স্তম্ভ হয়ে বসে আছেন। তারপরে গভীর রাতে কখন শুতে যেতেন। সূর্য্য ওঠবার আগে নীচে এসে দেখতুম যে কবি তার অনেক আগে উঠেছেন। কোনোদিন বারান্দায় বসে আছেন। কোনোদিন বা মন্দিরের সামনে পূর্বদিকের চত্বরে গিয়ে বসেছেন। সকালবেলা চায়ের টেবিলে নানা রকম আলোচনা। কখনো কখনো বিদ্যালয় থেকে কেউ আসতেন কাজ কমের কথা নিয়ে। কখনো অজিত চক্রবর্তী আসতেন কিছু আলোচনা করার জন্য। সকালে অনেকক্ষণ কবি নিজের লেখাও লিখতেন। চিঠির জবাব দিতেন। বেশ একটু বেলায় যেতেন স্নানের ঘরে। এই ছিল ওর অবসর। কখনো এক ঘণ্টা কখনো দেড় ঘণ্টাও স্নানের ঘরে থেকেছেন। কখনো শুনেছি গান করছেন। দুপুরে খাওয়ার পরে আবার কাজ। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা। লেখা। অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনা। এছাড়া মাঝে মাঝে সকালে বা দুপুরে ক্রাশ পড়াতেন। কোনো নতুন গান লেখা হলেই অজিত বা দীনবাবুকে ডেকে পাঠাতেন। বিকালে এক একদিন গান শোখানোর পালা। সন্ধ্যাবেলায় আবার দুচার জনের সঙ্গে কথাবার্তা। মাঝে মাঝে খানিকটা বৌড়িয়ে আসতেন। কখনো বা বিদ্যালয়ে যেতেন। দু একদিন নীচু বাংলা থেকে বড়োবাবু (কবির বড়োদাদা) এসে হাজির। খানিকটা দর্শন, বা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা। এইরকম করে দিনের পরে দিন ওকে দেখেছি—ওর সঙ্গে সত্যিকার পবিচয় এইরকম করে ঘটেছে। শেষের দিকে নিজের কাজ, নানা লোক, নানা ব্যবস্থা নিয়ে ওর কাছ থেকে খানিকটা দূরে সরে গিয়েছিলুম। কিন্তু আগে শান্তিনিকেতনে এসে ওর কাছেই থাকতুম। বেশির ভাগ সময় কাটতো ওর কাছে। বাঙালী একটা স্বভাব আছে মাথামাখ করা। কবির ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ওর নিজের সব ইচ্ছায় চিরদিন একটা দ্রব ছিল। তাই এক একদিন যখন তার পতিতক্রম ঘটতো তখন ওর ভালোবাসার নতুন ব্যতিক্রম পেতুম। স্নানের ঘর উনি বরাবর আলাদা ব্যবহার করতে ভালোবাসতেন। তাই ওপর স্নানের ঘর কখনো কেউ ব্যবহার করতো না। কিন্তু একদিন মনে আছে গ্রীষ্মকালে দুপুরের গাড়িতে এসে পেঁছেছি তখন বেলা সাড়ে বারোটা একটা হবে। জানতেন আমি আসবো: না খেয়ে অপেক্ষা করছেন। আমি যেতেই বলছেন, যাও তোমার জন্যে জল রেখে দিয়েছি স্নান করে এসো। তখন থাকতেন "দেহলি"র দোতলায়।

সেখানে শব্দ একটা ঘর। আমি থাকবো guest house-এ আরো খানিকটা হেঁটে যেতে হবে। বৃষ্টিপাত যেন তা ইচ্ছা নয়। অন্য সময় হলে হয়তো না বলতুম। তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে গিয়ে দেখি একটা পরিষ্কার তোয়ালে, জল সব ঠিক করিয়ে রেখেছেন। এই রকম ছোটো ছোটো কতো কথা মনে পড়ছে। সে-ও এক গ্রীষ্মের দিনের কথা। পঁচিশে বৈশাখের কাছাকাছি। সারাদিন অসম্ভব গুমুট গরমের পরে একান্ত একটা কালবৈশাখীর ঝড়ে বৃষ্টিতে ধুইয়ে দিলে। তখন ঝড়ের সময় মাঠে ঘুরতে বেরনো ছিল একটা মস্তো বড়ো আনন্দ। শিলা বৃষ্টির মধ্যে সম্ভে বেলায় খুব দৌড়াদৌড়ি করে কাপড় ছেড়ে ও'র কাছে গিয়ে বসেছি। হঠাৎ খুব ঠান্ডা পড়েছে। একটু পরে উনি উঠে পাশের ঘরে গেলেন। একটা গরম কাপড় কোথা থেকে বের করে এনে গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বললেন, বেশ ঠান্ডা আছে। আর বাহাদুরি করতে হবে না। অনেকদিন পর্যাণ্ত—আমার বিয়ে হবার আগে—ও'র কিরকম একটা ধারণা ছিল যে আমার খাওয়া দাওয়া, বা শোয়া সম্বন্ধে কিছু খেয়াল থাকে না। তাই সর্বদা ও'র সঙ্গেই আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। আর শূদ্রামও প্রায়ই ও'র পাশে বা কাছাকাছি কোনো ঘরে। ও'র বরাবর ছোটো ছোটো ঘরে থাকা অভ্যাস। নতুন নতুন বাড়ি যখন করতেন তখন গোড়ায় অনেক সময় একখানা বই দুখানা শোবার ঘর থাকতো না। তাই ও'র বসবার ঘরে খাট ফেলে যে কতো শূয়েছি তার ঠিক নেই। একদিনের কথা মনে আছে। বোধহয় ১৯২২ সাল—৭ই পৌষের ঊষবের আগের দিন বিকালের গাড়িতে এসে পৌঁছেছি। উনি তখন থাকেন “প্রান্তিক” বলে বোধহয় বাড়টার নাম। একখানা ছোটো শোবার ঘর, আর প্রায় সেরকমই ছোটো একটা বসবার ঘর, এককোনে সেই মাগের একটি স্নানের ঘর, আর চারদিকে শব্দ বারান্দা। শোবার ঘরে একটা ছোটো খাটীয়া ফেলা হোলো। ঘরটা এতো ছোটো যে সেখান থেকে ও'র তক্তপোষ তিন চার হাত দূরে। মাঝের দরজায় পদ্ম ফেলা। তার ঠিক আগে আলিপূরে হাওয়া-আপিসে প্রথম গিয়েছি—উনি কয়েকদিন সেখানে আমার কাছে ছিলেন—তখনো আমার বিয়ে হয়নি। জানতুম মীরার জন্য ও'র মন খুব ব্যথিত আছে। রাতে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলবার পরে গিয়ে বারান্দায় বসলেন। আমি শূয়ে পড়লুম। তখন বেশ গভীর রাত। খানিকক্ষণ ঘুমবার পরে হঠাৎ শূনি উনি শোবার ঘরে, বোধহয় বিছানায় শূয়ে শূয়ে, গান আরম্ভ করেছেন। “অশ্বজনে দেহ আলো মৃত-জনে দেহ প্রাণ। তুমি করুণা-মৃত-সিদ্ধ করো করুণা-কণা দান॥ শূক হৃদয় মম কঠিন পাষাণ সম, প্রেম-সলিল নীরে সিগুহ শূক বয়ান।” তখন বোধহয় রাত তিনটা হবে। দৃষ্টি ধরে বারবার করে গাইতে লাগলেন। আশ্চর্য আস্তে, যাতে আমি জেগে না যাই। ভোরবেলা পর্যাণ্ত শূয়ে শূয়ে শূনি লুম বৃষ্টিপাত যেন গানের ভিতর দিয়ে মনকে শান্ত করছেন। এক একটা কথা কতোবার করে ফিরে ফিরে আওড়াতে লাগলেন।



বাইরে থেকে, গানের স্বর শুনতে বোঝা যায় না, যে কতোখানি ভিতরের তাগিদে উনি গান লিখেছেন। শব্দ গান কেন ও'কে কাছে থেকে না দেখলে ও'র সাহিত্য, ও'র কবিতা, ও'র লেখা যে কতোখানি সত্য ছিল ও'র কাছে তা কেউ বুঝতে পারবে না। ফাগুন চৈত্র মাসে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে যখন গান গাইতেন তখন ও'র সমস্ত শরীর মন যেন সাড়া দিয়ে উঠতো। কালবৈশাখের ঝড়ে, বর্ষার দিনেও আবার দেখেছি ও'র মন কেমন মেতে উঠেছে। যারা শব্দ ও'র লেখা পড়বে তারা কিছুতেই বুঝতে পারবে না যে কতোখানি বাদ পড়লো। এবার শান্তিনিকেতনে এসে থেকে থেকে খালি মনে হচ্ছে যে সমস্ত যেন বদলিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ধরে তো রাখা যায় না। আমরাও তো চলছি। আমাদের দিনগুলিও একে একে নিবে আসছে। কালকের যে দিন সেটা ফুরিয়েছে বলেই তো আজকের দিনটিকে পেয়েছি। আবার আজকের দিনকে না চুকিয়ে দিলে কাল আবার নতুন দিন আসবে কি করে? এ সবই জানি কিন্তু তবুও মনের মধ্যে ফাঁক থেকে যায়। শব্দ কবি সম্বন্ধে নয়। সব জানাশূনা, পরিচয় ভেঙে ভেঙে নতুন করে গড়ছে। যেখানে স্মৃতি সেইখানেই তাই এত ব্যথা। কিন্তু মানুষ তবু ধরে রাখতে চায়, আঁকিড়িয়ে রাখতে চায়। কিন্তু সে হোলো মোহ, নিতান্তই মিথ্যা। মহর্ষি শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরে বলে দিয়েছিলেন যে ও'র কোনো ছবি, কোনো প্রতিকৃতি যেন এখানে না রাখা হয়। ও'র মনে ভয় ছিল, যে এই মিথ্যাটাকে মালা চন্দন, ধূপধূনা দিয়ে পূজা করে আশ্রমের আসল সত্যরূপটি চাপা পড়বে। কবি অনেকবার আমাকে এই কথা বলেছেন। “সদর স্ট্রিট থাকতে বাবামশায় আমাকে ডেকে বললেন, রবি তোমাকে আমি এই কথাটা বলে যাচ্ছি—এ দায়ীত্ব তোমার। শান্তিনিকেতন আশ্রমে আমার কোনো প্রতিকৃতি যেন না থাকে।” তাই এখানে আজ পর্যাণ্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠাতার কোনো ছবি কোথাও নেই। কবির নিজের মনের ধারাও ছিল ঠিক তাঁর পিতার মতো। আমাকে একদিন বলেছিলেন—“রামমোহন রায় যে ব্রিস্টলে মারা যান খুব ভালো হয়েছিল। এদেশ এমন দুর্ভাগা—এখানে মরলে হয়তো ঠুঁক পূজা করবার একটা

জায়গা তৈরি হতো।” আজ রথীবাঘুর সঙ্গে এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। গোড়ার দিকে “শ্যামলী” বাড়টার কবির খাট, বিছানা, চেয়ার, টেবিল, কাপড়চোপড় সব উনি যেমন ব্যবহার করতেন সেইরকম করে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। লোকে দেখতে আসতো। ফুল দিয়ে যেতো। তারপরে ধূপধূনাও দেওয়া হয়। রথীবাঘু সম্প্রতি জিনিষপত্র সরিয়ে সেখানে অন্য লোকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমি অবশ্য তাতে সায় দিলাম। রথীবাঘু বললেন, যে, “অথচ বাইরে থেকে যখন লোকজন আসে একটা কিছু ব্যবস্থা থাকলে ভালো হয়। ভাবছি যে যে ঘরটা উনি সব শেষে করিয়েছিলেন সেটা খালি করে, খুব পরিষ্কার করে রেখে দেবো। সেখানে ও'র ব্যবহার করা কোনো আসবাব থাকবে না। কিন্তু ও'র আঁকা এক একখানা ছবি, ও'র কোনো বই বদলিয়ে বদলিয়ে রাখা হবে।” আমি বললুম, যে, তা হতে পারে কিন্তু এর চেয়েও আরো ভালো হয় অন্য একটা ব্যবস্থায়। শান্তিনিকেতন আশ্রমে বারবার করে কবি বলেছেন এখানকার এই উন্মুক্ত উদার প্রান্তরের কথা—দূরে যেখানে আকাশ আর মাটিতে মিশে গিয়েছে সেইখানে পূর্ব দিক সূর্য ওঠা আর পশ্চিমে আবার সেইরকম করেই ডুবে যাওয়া। এখানকার এই খোলা মাঠের মধ্যে একটা জায়গায় একটু উঁচু করে আশেপাশে ফুলের গাছ দিয়ে সাজিয়ে দিন। তার উপরে হয়তো পাথরের একটি বেদী—কবি ব্যবহার করেছেন এমন কিছু নয়, কিন্তু শব্দ দাঁড়বার বা বসবার একটু জায়গা। কবি নিজের হাতে কাটা আর বুনো গাছের বাগান করেছিলেন—সেইরকম ছোটো ছোটো গাছ হয়তো এক এক পাশে। কিন্তু প্রান্তর-চারদিক থেকে প্রশস্ত রাস্তা এসে মিশেছে। এই হোলো কবির যথার্থ স্মরণ চিহ্ন। ও'র মাটির দেহের কোনো চিহ্ন তাতে নেই—আছে শব্দ ও'র ভিতরকার যে কথা তার একটা ইংগিত। এইখানে লোকে এসে দাঁড়াবে। এইখানে খোলা আকাশের নীচে কবির কথা স্মরণ করবে। ঊষবের দিনে এই হবে আশ্রমের সকলের মেলবার জায়গা। কবির কবিতা যখন ভাবি এ ছাড়া আর কিছু তো তাঁর যোগ্য বলে মনে হয় না।

মানুষের সঙ্গে তা দের যে পরিচয় তাকেও আমরা বারবার নানারকম গম্ভীর মধ্যে আবদ্ধ করতে চেষ্টা করি। কিন্তু তাতে শব্দ নিজেকেই ছোটো করি। তাই যেখানে আমাদের সত্য সেইখানেই বারবারে বন্ধন কাটবার প্রয়োজন আছে। তাতে মন ব্যথিত হয় ফিরে ফিরে আঁকিড়িয়ে ধরতে চায়। তবু মনে রাখতে হবে, যে, সব চেয়ে বড়ো কথা মৃত্যু রূপে জানা। কিন্তু মুখে যতো সহজে বলি মন তো অত সহজে বোঝে না। থেকে থেকে সমস্ত যে খালি হয়ে যায়। বারবারে মনকে সামলাতে হয়। আজ সকালবেলা বসে বসে চেষ্টা করছি সেই অনুভূতিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য যা সুখ নয়, দুঃখও নয়, শব্দ শান্তি।

ইতি  
ফুলদা

# আরোগ্যের কাবতা, রোগশয্যা

পূর্ণেন্দু পত্রী

পদ্মশ্য পৌরষে যখন একাঙ্গ্য পা, যখন যথার্থ  
মর্থে তিনি সুখী এবং সার্থক, যখন উপাঙ্গনে এবং  
মর্থে তিনি সমৃদ্ধ, সাংসারিক জীবনে যখন নেই কোনো  
মচিরতা তখন জের, ঠিক তখনই, অচমক, অনেকটা  
যন তাঁর অজ্ঞা এসেই, এক প্রবল ভূমিকম্প এসে  
মাছড়ে পড়ল মর্ম্মলে। আর এক অসহ্য কাপানিত  
তোহ ধসে যেতে লাগলেন টেলম্যর। এমন কি  
প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন নিজের মর্মান্তিক অস্তিত্ব।  
যখন তিনি কথা বলতেন এমন এক অন্ধকার গহ্বর  
থেকে, অন্ধকার লিখতেন এমন এক ভয়াবহ শূন্যতার  
ভেগে বাস, যা তাঁর মতো বলিষ্ঠ শরীর এবং  
দৃষ্টিভঙ্গি মনের মানবের পক্ষে শব্দে অপ্রত্যাশিত নয়,  
বিস্ময়জনক। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক গেছে ছিড়ে।  
সত্যেরা তাঁর স্মৃতি-সীমানার বাইরে। রাতে নিজের  
ঘড়ানায় তিনি বিনম্র। দিনে, লেখার টেবিলে বসে  
গতকাল কেবল কলম ছুঁয়ে। কাগজ অক্ষর ফোটে না।  
শব্দ এক দিশেহারা পাখ। সেখানে যদি লিখে ফেলেন  
কছ, একটু পরেই সেগুলো ছিড়েও ফেলেন কুচি  
চিহ্ন। থেকে থেকে ডুকরে কেঁদে ওঠেন এমন শব্দে,  
নে হয় কোনো এক সবনাশা দুঃখের ভার বাকি তাঁর  
হিবার পক্ষে অসহ্য। অন্ধকারে, ঘরের আলো নিবিয়ে  
সে থাকলে কিছুটা আরাম পান যেন। খাম খলে  
গঠি পড়তে তিনি অক্ষম। বন্ধুদের জকে সাড়া দিতে  
নিচ্ছক।

সেই দঃসময়ের দিনগুলোয় তিনি কাতেন বা  
লখতেন এই সব কথা—

১। কি করে একজন মানবের পক্ষে বাঁচা সম্ভব  
যন জীবন আর তাকে মাতাল করে না।

২। মানসিক দিক দিয়ে আমি এখন ঘুমন্ত, সে  
মে আর জাগর না।

৩। আর কিছুতেই আমি পাচ্ছি না জীবনের  
ধার। জীবনের কাছে আর কিছুই চাইবার নেই  
আমার। এবার টলে পড়ছে মৃত্যুতে। আমার সমস্ত  
গণশক্তি দিয়ে, আমি এখন জীবনের উল্টোদিকে।

৪। মৃত্যুর জন্যে ভয়।

৫। Il faudra mourir sevel (মানুষটি  
গ্নে গেছে একাকী)

আর ঐ সময়েই, ১৮৭৯-এ একদিন এক টুকরো  
গণ্ডে লিখে বসলেন এইসব অজানা প্রশ্নমালা—

১। কেন বাঁচবে?

২। আমার এই আশ্চর্যের কারণ কি এবং  
নিরদেরও?

৩। আমার আশ্চর্যের উদ্দেশ্য কি এক  
নাদেরও?

৪। ভাল এবং মন্দ সম্পর্কে এই যে দঃ-  
কর্মের ধারণা রয়েছে আমার কাছে, এর অর্থ কি এবং  
নই বা এর ঠিক রয়েছে?

৫। কেমন করে বাঁচবে?

৬। মৃত্যু কি? কেমন করে বাঁচবে নিজেকে।  
ঐ সময়ে, কী এমন ভয়াবহ দুঃখটো ঘটেছিল  
নস্টারের জীবনে? তাঁর আশ্বাস ভিতরে কেন এই  
সহ্য ক্রন্দন?

স্টেফান জাইগ এর উত্তর দিয়ে গিয়ে বলেছেন—  
Terrible was the answer: nothing had  
appened to him. Or, to be precise (and  
his answer was more terrible still, and  
ruer), Nothing had happened. Tolstoy  
ad glimpsed the Nothing that lies behind  
ings".

পর জানতে পারা গেলে ঐ দঃসময়টা ছিল তাঁর  
জীবনে 'আধ্যাত্মিক নবজন্মলাভের সূচনা-পর্ব'।

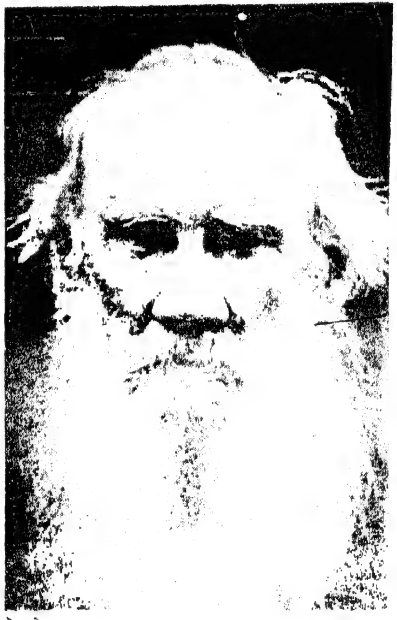
২ ৥  
কী এমন দুর্বিষহ ঘটনা ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের

জীবনে, নোবেল প্রাইজ পাওয়ার মাত্র ৬ মাস পরে?  
কেন লিখেছিলেন এশ্বজকে যে, অরুণাপথে সংগ্রাম  
করে চলেছেন তিনি, তাঁর পা দুটো রক্তাক্ত। কেন  
লিখেছিলেন—

"মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমার যেতে হবে সে আমি  
জানি। যে বেদনা আমার হৃদয় বিদীর্ণ করছে, ভগবান  
জানেন, তা মৃত্যুযন্ত্রণাই।"

চিঠির তারিখ ২১ মে। সাল, ১৯১৪।

একটু সরে বাই পিছন দিকে। নোবেল প্রাইজ  
পাওয়ার পর কাকার অনটনের সংসারে শরৎ হয়েছিল  
মুখ্য অধ্যাপক, বিলেতে কী বিজ্ঞান বাবদ। থকোর



টেলম্যর

কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে নৈনিতালের কাছে রামগড়ে  
মধ্যম্ননাথ, কাকামশায়-এর গ্রাম্য-মাপনের স্ব-সুবিধের  
কথা মনে রেখে, কিসে কালেন ফলের বাগনসহ এক  
সাহেববাড়ি। ১৯১৪-র মে মাসে রবীন্দ্রনাথ চল  
এলেন রামগড়ে। নোবেল-প্রাইজ সত্তারত জন্ম-প্রতিবাদের  
তেতো ঘণ্টা মিলিয়ে গেছে বাতাসে। কবির মন এখন  
প্রসঙ্গ এবং পরবর্ত্ত। লিখে চলেছেন গানের পব  
গান। তার এশ্বজকে লিখছেন নিম্নমত চিঠি। এশ্বজ  
তখন দেহান্তে, মজ্জাকে প্রস্তুত করছেন শান্তি-  
নিবেদন। যোগদানের জন্যে। রামগড়ে পৌঁছে  
এশ্বজকে প্রথম যে চিঠি, তার তারিখ ১৬ মে।  
লিখতেন—

"এখানে এসে আমার মনে হচ্ছে, পৃথিবীর ঠিক  
যে জায়গাটিতে আমার প্রয়োজন ছিল, সেখানেই এসে  
পড়ছি।।।

আমায় ঘিরে এই যে শ্যামশৈলপ্রবাহ—এ শব্দ  
বা গায়ার গড়া। তারই ভরা পাত্রটি হতে চিরশান্তি ও  
দুর্ভিত উপরে পড়ছে। এই সৃষ্ণস্তরী নিঃশব্দতাটি যেন  
ফলের মতো তার সোন্দরের পাপড়ি দিকে দিকে  
মেলো দিয়ে জানের মধ্য অন্তরে সঞ্চিত করে রেখেছে।  
আমার সমগ্র চৈতন্য এখন পূর্ণসত্তায় নিমজ্জিত। আর  
এতে কোনো খণ্ডতা বা অপূর্ণতা নেই।"

একই পরের দিন চিঠিতে—  
"এতদিনে আমি পরিপূর্ণতার স্ব-আনন্দ

পৌরষে ছাড়া আরোপের বৈশিষ্ট্য। যে শব্দ আমার স্ব-  
ক্রান্ত জীবনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে দিচ্ছে  
তাই নয়, এ আমার মনের স্বাভাবিক খোঁজকণ্ড  
জোয়ারে। একমুহুরে এলে বাক্যে পানি এতকাল  
কি অতঃপূর্ণ জগতায় কেনোমতে পৌঁছেছিলো।

এই পরিবর্তে পেলম আমার অজানা পরিচয়।  
একটু ঘাসের শীষের মধ্যে যে অনন্ত শক্তি ও আনন্দ  
রয়েছে, আমার সত্তারও সেই একই ধারা এই বোধে  
আমি বিশ্বাসে অভিভূত।।।"

এরপর থেকেই এলোতে লাগল চিঠির রং, ধূসর  
থেকে ঘন কালার দিকে। অথবা লাল ফিনিক থেকে  
প্রবল রক্তের দিকে। ১৬ মে-র কোন চিঠি নেই।  
১৭ মে-র চিঠি—

"আজ আমার পিতৃদেবের বার্ষিক-জন্মবার্ষিক।  
আমাদের ভোরের উপাসনা শেষ হয়ে গেছে, এখন  
আমার অন্তরে পূর্ণের চৈতন্য ভরপুর।।।"

কিন্তু সেদিন সকাল থেকে কইতে শুর, করেছিল  
ঝোড়া হাওয়া, ঘোর অন্ধকার মূছে গিরেছিল চারু-  
পাশ। তারই মধ্যে থেকে বিচ্ছিন্নিত হাঙ্কল আলোর  
একটা স্তান রশ্মি। তাঁর মনে হয়েছিল—ঐ আলোর  
মধ্যে রয়েছে তাঁর 'আধ্যাত্মিক নব জন্মলাভের সূচনা'।

তিনদিন পরের চিঠির ভাষা ও স্বর একেবারেই  
জিয়া।

"জন্ম অরুণাপথে সংগ্রাম করে চলেছি। পর্বত-  
শিখর থেকে যে আলো আসছে তা সম্পূর্ণ, কিন্তু  
অপকব চাল। উপত্যকা—পথে বাঁকা ছায়া ভাঙি ঘন  
ও ঘোরালো। আমার পা দুটি রক্তাক্ত, তবু আমি  
বৃক্ষমূলে চলেছি।

মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমার যেতে হবে, সে আমি  
জানি। যে বেদনা আমার হৃদয় বিদীর্ণ করছে, ভগবান  
জানেন, তা মৃত্যুযন্ত্রণাই। নিজের পরনে সত্তার  
সাথে কথা খবর কঠিন। সময় না এলে কেউ বকতেই  
পারে না, কবদ্বব পথত তার শিকড় ছড়িয়ে গেছে,  
আর কোন অভাবিত অজ্ঞাত গভীরে তার সূক্ষ্ম  
তত্ত্বাল পৌঁছে অমৃতময় জীবনের আকর্ষণ করে  
শবে নিচ্ছক।।।"

এ পর্বত পড়ে মনে হতে পারে, এই বেদনাযন্ত্রের  
অনেকখানিই বৃত্তি নৈর্বাতিক। ব্যক্তিগত সংকট-সংঘর্ষ-  
এসে চোয় এই জগতায় অন্তরের পিছনে রয়েছে  
বাকি কিসকালিক কোন ভাবনা, যা কবির পক্ষে  
একান্তভাবেই সম্ভাব্য। কিন্তু পরের দিনের চিঠির  
আকরগলো যেন ব্যক্তিগত আত্মদৈব মাকর।

"আমার অবগানে জলে নম্র, আগনে...তাই  
মাক মাকে আমারে অশ্রুস্রবন নবজন্ম...আগন  
পাপকেই দম্ব করে, আফকে নয়। আমারে আফকে  
আমার সকল আনার সাথে গাই...দুঃখের রয়েছে  
যে প্রথর আলো জ্বললে, তাতেই সে পূর্ণাঙ্গ  
আমাদের মধ্যে পড়। কখনো কখনো মৃত্যুই সেই  
আলো জ্বলকর মশাল হতে নিয়ে আসে। আশ্বর,  
কখনো বা জগৎজগৎ যে দুঃখ নিঃসবে আসেন তাঁকে  
চোখে দেখা যায় না। এই আগন্তুকটি এবার আমার  
মাক এলে উপস্থিত হয়েছেন। তাকে আমি কত প্রদ্র  
করি কিন্তু তিনি নিবৃত্তর। আমার হৃদয়ে তাঁরভাবে  
আগন জ্বলছে—আমার সমস্ত নিভৃত গোপন কর্মের  
উদ্ঘাটিত করে, মিথর ও বক্তার সঞ্চিত স্তব্ধ দম্ব  
করে সে চলেছে। জ্বলক সেই আগন, যতক্ষণ তার  
ক্ষমের ইচ্ছন পায়। যা ধ্বংসের যোগ, তার একটুও  
যেন অব্যাহতি না থাকে।"

পড়তে পড়তে যখন সত্যিই এক লক্ষ্যকে  
আগনের শিখর মূখোমুখি হয়ে আমাদের ভাবনা-  
গলে আত্মসংকট হয়ে ওঠে, আরো ভয়াবহ কোনে  
ধ্বংস দগের আশংকার, তখনই মেঘ জেগে জেগে  
কঠে বৈদ্যকরোজ্বল দিন। পর্বতমস্তর কঠে শোনা  
যায় ধ্বংস-জয়ের আর্শবক উল্লাস। পরের দিন, ২২  
মে চিঠিতে জানাচ্ছেন—

"এই যে আমার আমি আলো হাওয়াতে বোরছে  
এসে সহজে নিঃস্বাস ফেলতে পারছি।।"

পার স্বাস্থ্যের ধ্বংস ফেলাতে পারি না, তার কারণ, তখনও সাদা জুইয়ের আড়ালে ঐকিঞ্চিক জ্বলে চলেছে মরা আগুনের লাল আভা।

“মৃত কানীন আমি এমন একটি জগতে সংগ্রাম করছি, যেখানে ছারখার আধিপত্য। অর অন্তর্ভুক্তদের যেন মাতা নেই!...তবে এই অধিকারের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে একটি মহৎ শিক্ষা বহন করে এনেছে।...আমি যেমনি তার অনাবৃত বীভৎস রূপটা দেখে নিরোঁছ, আমি তার সঙ্গে প্রতিদিন সংগ্রামের অঙ্গীকার মেনেছি।”

অগ্নে-জ্বালানো কী এমন দুর্বিবহ ঘটনা ঘটছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনে যে মাসের এই অঙ্গ কয়েকটি যিনে? “It is the death-pang that is tearing my heart!”-এর মতো মর্মান্তিক উচ্চারণের দিকে তার ভাবকে ঠেলে পিঠেছিল কোন ধরনের বিপদ?—এর সঠিক উত্তর জানার উপায় নেই। এগুলা লিখেছেন—

“গ্রীষ্মের দুটি পাহাড় কাটবেন বলে তিনি বেশ সুস্থ পরাইয়ে সেখানে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরে আমাকে বলছিলেন যে, সেখানে পৌঁছবার পর থেকেই যে মানসিক কষ্ট ভোগ করেছেন সে প্রায় মৃত্যু-যন্ত্রণারই সমতুল্য। তার হাত থেকে যে কোনোদিন নিকৃত পাবেন তাও তখন আশা করতে পারেননি। আরো আশ্চর্যের বিষয় এই, ঠিক যখন তিনি এখানেকার জটিল গল্প থেকে গিয়ে হিমালয়ের অপূর্ণ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে শরীর মনে অশেষ তৃপ্তি অনুভব করছেন তখনই এই আঘাতটা হঠাৎ এল। মনে পড়ে, তিনি বলছিলেন মেঘমত্ নির্মল আকাশ থেকে হঠাৎ বজ্রপাতের মতোই এই ব্যাপারটি তাকে আঁতড়াত করে।”

যে মাসের এই মৃত্যু-যন্ত্রণায় দিনগুলোর স্মৃতি জ্বল মাসে আর ছিল না? তিনি হয়ে উঠেছিলেন শরীরে মনে বৃক্ষের মতো প্রাণকৃত। জ্বল মাসটা কটল আনন্দ-উদ্বেগে। জ্বলারের আশ্রিত আবার নেমে এল সেই পুরনো কিতাবিকা, সেই পুরনো অধিকার, যার আঘাতে মোহামান হয়ে পড়ত হলের তটিক। কারণ? না, প্রশ্ন করলেই দ্বিধা কয় যাবে হিসেব, এমন কোনো কারণ জানা ছিল না কবির নিজেরও।

এগুলা লিখেছেন—

“তিনি কতবার আমাকে বলতেন যে, কি রকম একটা অস্বাভাবিক অবর্ণনীয় ক্রম তার মনকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে...তার এই অবসাদের ভার কাটাতে প্রায় তিন মাস লেগেছিল। এ সময়ে বলতে গেলে প্রায় চিঠিপত্র লেখেনই নি। তবু অঁসহ ব্যাখ্যা কি যে কাভব তাকে দেখেছি সেই বেদনাদায়ক স্মৃতি এখনো আমার মনে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে।”

কলাকার প্রসঙ্গ কবি নিজের জানিয়েছিলেন একবার—

“তখন আমার প্রাপের মধ্যে একটা ব্যাধা চলছিল এবং সে সময়ে পৃথিবীতে একটা জগৎচোড়ার আরোহণ হচ্ছিল।”

গামগড়ের এই আশ্বক-দুঃখের যখন কেউ গেল, কি লাভ করলেন তিনি? অথবা সেই ভয়ঙ্কর সংকটকে রোধ করলেন কোন শক্তির জোরে? এর উত্তরও পেয়ে যাই এ সময়ের পরবর্তী চিঠিগুলো থেকে। আরোগ্যের অভিজ্ঞতা সেখানে এইরকম—

১. “আমি যেমনি তার বীভৎস রূপটি দেখে নিরোঁছ, আমি তার সঙ্গে প্রতিদিন সংগ্রামের অঙ্গীকার নিরোঁছ।”

২. “এখানেকার পার্বত্য ওক গরুর মতো আদ্য-ওকে দিনে দিনে আলোর সম্পদ সমুদ্র করে নিজেকে গ্রহীত শক্তিমান করে তুলেছি। বড় বাক আসে তবে এর সঙ্গে সানন্দে শক্তি-পরাণীকর আমি প্রস্তুত।”

৩. “রাতের চেয়ে অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ হলেও দিন সহজবোধ্য, কারণ তা উজ্জ্বল প্রত্যক।

একাধিপত্য কিতার করতে চায়? অস্বস্তিক সত্যের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখিত করে দেখায়। বা কিছু অপরিণত অধিক সংগ্রামের, বা কিছু মর্মান্তিক অধিক মৃত, সর্ব প্রকাশিত করে দেয়, ত্রী ও শক্তি নিয়ে ঊর্ধ্বত যে অন্ধুর তার বিস্তারে শব্দ সাহায্য করে না, তার মূল্যও রক্ষা আলোক।”

৪. “সব অসম্পাদিত দেখেও সম্প্রতিত সুখের আমার অনুভব করি। স্বস্তি-সংঘর্ষ সবটাই আছে, তবু সুস্থের চিরজরী।”

৫. “দিন যখন অনাড়ম্বর শব্দ পরিষ্কৃত আকর্ষিত হয়, রাতি তখন মিথার রূপাকাল নিয়ে লজ্জায় আত্মগোপন করে।”

৬. “এ সবই ভালো। প্রশস্ত এই পথ, দিগন্ত বিস্তৃত এর গতি, তার চারিদিকে বিরাজ করছে বাক্য আলো।”

একটু স্থির হয়ে আকাশে এই সব উড়ন্ত মধ্যে চোখে পড়ে যায় যেন দুই প্রতাপক, যার একদিকে আলো এক সুন্দর অনাদিকে অন্ধকার এবং অসত্য। আরো সংক্ষেপ করতে চাইলে, দিন এক রাত্রি। দিন এবং রাত্রির মধ্যে এই সংঘাতকেই আরো প্রবল-প্রচণ্ড-রূপে আমরা দেখতে পাবো আরো একবার, যখন তিনি পৌঁছে যাবেন জীবনের সূচ্যস্ত লম্ফে। যে কবিতার কই থেকে এই সংকট-সংঘর্ষের ভয়ঙ্কর অভিযান, তার নাম ‘রোগগম্ভীর’। সেখানে আলোর জন্যে কী ধরনের ব্যাকুলতা, আর অধিকারের ক্রোধের কী জ্বলন্ত ব্যাধা, বিকোচ এবং বিচার তার আনিকটা প্রমাণ মিলবে নীচের সংঘাতের, যা ‘রোগগম্ভীর’-র পাতা থেকেই খুঁজে তোলা। সেখানে—

নানানভাবে আলোর উল্লেখ—২৭ বার  
নানানভাবে সুখের বা সুখালোকের উল্লেখ—৬ বার  
নানানভাবে জ্যোতির উল্লেখ—৮ বার  
নানানভাবে অন্ধকারের উল্লেখ—১০ বার  
নানানভাবে সুখ রাত্রির উল্লেখ—১ বার  
যার ‘রোগগম্ভীর’ থেকেই আমরা সন্ধান পেয়ে যাবো এমন এক তুমুল রনকরের, যেখানে হতাশাস পরাভূত, মুহামান, ধসার, নিঃতথ, অথ অস্বস্তিক দুর্বল, পাণ্ডুবর্ণ, লুপ্ত, স্নিকণ ইত্যাদি বিশেষণ-গুণে কখনো আলোর কখনো অন্ধকারের পক্ষ নিয়ে রচনা করে চলেছে এক মৃত্যুদণী পরিকল্পনা।

৩।

এবার আমরা চল আসি তার জীবনের একবারের স্মৃতিস্তর লম্ফে, যখন তিনি নিরপায় রোগগম্ভীর, যখন বারংবার চেতনা হয়ে চেতনাসীতার মতো বিন্দুস্ত তার শরীর, যখন সন্ধ্যার ডাকে সাড়া দিতে ‘অক্ষম’ তাঁর একদা-অনুগত ইন্দ্রিয়হীন, যখন আলোর কবি হয়েও অধিকার খায় তাঁর বন্দী জীবন্যাপন, প্রকৃতির সঙ্গে দৈনন্দিন যোগাযোগের অভ্যস্ত তটিক যখন মাঝে মাঝে গভীর সংজ্ঞাহীনতার ভিতর থেকে জেগে উঠে প্রশ্ন করতে হচ্ছে—এখন দিন না রাত?

তার এই রোগগম্ভীরের সময়ের বহু তথ্য-চিত্র ছড়িয়ে আছে তার কলিতকবিতার স্মৃতি-কথায়। আর তার সাহিত্য-চিত্র পাই এক পন্থারগীত কবির হৃদয়ভেদী রচনায়।

পঁতান কসাইছিলে দাঁকনের ঢাকা বাগানদায়, মুখ তার শাঁণ, আগনের মতো গায়ের রং কিংক হয়েছিল, কিন্তু হাতে মূর্তি কি কবিতার দিকে তাকালে কিসাট কলিত দেখের অভাস এখনো পায়। কেশরের মতো যে-কেশপাশ তার খাড় খেয়ে নামতো তা ছেটে ফেলা হয়েছিল...তার চোখের সেই মর্মভেদী ভাবটা আর নেই, তিনি যখন কারো দিকে তাকান সে-চাইনি স্নিককোমল। এই জন্যে তাকে রোগগ-বানশাহের মতো আর লাগে না, বরং অশীতিপর উলস্করের হাবি সঙ্গে কোথায় যেন সন্ধ্যা বরা পড়ে। এই অপমুগ্ন রূপের পরের দিকে এখন সন্ধ্য হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়, যেমন করে আমরা

রবীন্দ্রনাথ আরে কখনো ছিলেন না। এর জন্যে এই ধরনের জর আর রোগ দুঃখভোগের প্রয়োজন ছিলো।...যেটা লেখার হাত দেবার গায়ে নেই, ছোটদের জন্যে ছড়া বইয়ে, গল্প গাথনে, কখনো কবিতা, কখনো সাহিত্য-বিরক প্রবন্ধ লেখেন—হঠাৎ হয় তো একটি ছোটগল্প বেয়ীর যার কি রুহ তেলে জ্বলে ওঠে রনপাণী সত্যতার প্রতি অভিশাপ—এইভাবে যেটুকু পাবেন তুমি রাখেন হৃদয় আকাঙ্ক্ষকে। রোগগম্ভীর চাইতে চেয়ে বেশী নিষ্ঠুর এই রনপাণী, শরীর-মনের স্বস্তি এদিকে থেকে তাঁর জীবন এখন উপার্জিত, কপনকার সঙ্গে কবির, চিত্রার সঙ্গে প্রকাশের বিরোধে জন্মহীন।”

(দুঃখের বন্দু) ইংরেজ অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ একদিন শারীরিকতেন ছেড়ে চলে এলেন কালিঙ্গপট—এ, বউমা প্রতিমা দেবার কাছে। কেন এমন হঠাৎ আগমন, তার কৈফিয়ত দিতে গিয়ে বললেন—

“ভাতারেরা বলছে কখন কখন হয়, তাই তোমাদের কাছাকাছি থাকা ভালো। আমাকে এবার বড়ো ক্লান্ত করেছে, ভিতরে ভিতরে দুর্বল বোধ করছি মনে হচ্ছে যেন সামনে একটা বিপদ অপেক্ষা করে আছে।”

কালিঙ্গপট-এ পৌঁছবার তারিখটা ছিল ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪০। এরই সাতদিন পরে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন তিনি। ২৯ সেপ্টেম্বর তাকে নিয়ে আসা হল কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। তিনটো সুস্থ হয়ে উঠতে সময় লাগল দুই মাস। আবার ফিরে এলেন নিজের ভবনে, শারীরিকতেনে। এখানেই সুস্থ বিন্দুস্ত শরীরে গ্রহণ করলেন আশ্রমবাসীদের শেষ প্রণাম, শেষ জন্মদিনের উৎসব। তারপর বৈশাখ পেরিয়ে এল জ্যৈষ্ঠ। অসুস্থতার এখন তিনি আরো বিন্দীর্ণ। রোগমুক্তির জন্যে অবিবাহ হয়ে উঠল অস্ত্রোপচার। অতএব কবিকে আবার নিয়ে আসা হল কলকাতায়। এবার মাত্র ষোল দিন। তারপরই সুস্থ গেল অস্ত্রচলে।

তার শেষ পর্যায়ের অসুস্থকালের হিসেবটা দাঁড়ায় ১৯৪০-এর ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪১-এ আগস্ট, এই এগুলা মাস। এই এগুলা মাস ধরে কবিকে রোগমুক্ত করার জন্যে আত্মীয়স্বজন, অনুপরিবেশ আর কলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তারদের মধ্যে চলেছে প্রাণপাত প্রচেষ্টা। কবি নিজের জানেন, কারো এখন তার চারপাশে সঙ্গতপন্থ, ছায়ার মতো নীরবে, সর্বান্তঃকরণ শব্দস্বর নিবৃত্ত। জানতেন বলেই এ রোগের বিজ্ঞানতোই ক্রিষ্ট শরীরে, অদ্ভুত হাতে কখনো সরস ছড়ায় কখনো গভীর পায়ের জাঁকিয়ে দিয়েছেন আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকের সম্বন্ধে তার আন্তরিক এবং উন্মোচিত কৃতজ্ঞতা। এমনকি তার জীবন যখন মৃত্যুর দুয়ার থেকে আর “সন্ধ্যা দুঃখ, তখনও রাগী চন্দকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন—

“শিবতীরা, জ্যোতি নাকি একটি কবিতার জন্যে দংশন করছিল।”

অতএব ডাক্তার জ্যোতি সরকারও ক্রিষ্ট হলেন না প্রীতি-উপহার থেকে। বাইরে যখন কবিকে বঁচানোর এই প্রাণপাত সংগ্রাম, রোগগম্ভীরকে আরোগ্যের আলোয় পৌঁছে দেওয়ার নিরলস যুদ্ধ, তখন কি কবির আত্মর চেতনের ভিতরের চলাচল অমনি আর এক প্রবল সংগ্রাম, জিজ্ঞাসার আর এক প্রাণপাত যুদ্ধ, রোগগম্ভীর রচিত কবিতাগুলোর অসুস্থ, দুর্বল, পাণ্ডুর, মৃত্যু-ছায়াজঙ্ঘ অনুভূতিগুলোকে আরোগ্যের আলোয় পৌঁছে দিতে? জীবনের একবারের শেষ পর্বের কবিতাগুলোকে অধিকারের গ্রাস থেকে উদ্ধারের জন্যে জীবনের শেষ রচনায় আলোর জন্মদান জাগিয়ে দেওয়ার জন্যে, তিনি কি নিজের ভিতরে



যখন হঠাৎছিলেন এক ধর্মশালায় লড়ার? তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতিমালা যখন রোগশয্যায়, তখন কি তিনি প্রতিজ্ঞা পালনের মতো হ্রাস নিষ্কৃত রাস্তে চেরছিলেন নিজেকে, আরোগ্যময় কবিতা রচনার দৃশ্যোৎসাহ প্রকাশে।

মনে হয়, যেন ডাই-ই। মনে হয় তিনি যেন একই সঙ্গে স্বতন্ত্র দুটি সংগ্রামে ব্যাপ্ত, বাস্তব এবং বিশাল ছিলেন তাঁর জীবন-শেষের এ এগার মাস। একটা মৃত্যু, শারীরিক। আর একটা আত্মিক। একজন কবি, যাকে আমরা জেনে এসেছি আলোক-সম্পন্ন যিনি নিজেকে এতদিন জেনে এসেছেন সূর্য-সজ্জাত, কী করেই বা তিনি সেইসব সেই মর্যাদাপূর্ণ কবিতার ভার, যখন তাঁর আত্মজীবন-লালিত আলোর বলয় চূর্ণ-খণ্ডিত হয়ে যেতে চাইছে বিকট অন্ধকারের আক্রমণে। বৃষ্টিতে পারছেন যে, তিনি প্রায় পরাস্ত হওয়ার মধ্যে। আর পরাস্ত হওয়ার লক্ষিত অসম্মানই সেই মূহুর্তে তাঁকে অগ্নিতে চলেছে শেষ লড়াইয়ের প্রেরণা—আলোর অমর্যাদার দ্বারা সোঁপ।

মৃত্যুশয্যায় আলোর জন্যে প্রার্থনা বোঝেছে অনেক কবি-কন্ঠই। গোটেকে তো এখনো আলোকিত রেখেছে তাঁর মৃত্যুকালীন সেই স্মরণীয় উক্তি—আলো, আরো আলো। গোড়ের দেশেরই আর এক কবি হাইনে যখন মৃত্যুশয্যায়, সমস্ত শরীর অবশ, একটা চোখ অন্ধ, পিঠে দগদগে ঘা, মরফিয়া আর কবিতা ছাড়া আর কোন কিছুই যখন তাঁকে দিতে পারছেন না স্বপ্নের স্বাদ, কারাগার-সদৃশ কোঠারের ঝিমঝিম যখন অন্ধকার দিয়ে মোড়া তাঁর জীবন-বাপন, তখন কবিতায় ফুটে উঠেছে এক মর্মভেদী আত্মবাদ—

"No sunbeam, not a ray of hope reaches my cell to pierce the gloom."

কিন্তু এ আত্মবাদ নির্বলবেদনার অন্তর্গত নয়। বহুং কোন অন্তঃসংকট থেকে আরোগ্যের চেয়ে, সাময়িক শাস্ত্রাই এই ক্রন্দনের উপলক্ষ্য।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমস্যা স্বতন্ত্র। যেন প্রচণ্ড খানিকটা অট্টালিকা হেসে নিয়ে মহাকাশের মতো কোনো এক অ-সেহ আন্তর্য তটিক প্রশ্ন করছে—

সারা জীবন তো আলোর গান গাইলে, এখন হওয়ার বেলায় যখন তোমার চারপাশে রাহুর মত মৃত্যু বিচ্ছিন্নে চলেছে ছায়া, যখন দৃষ্ট তোমার আবিলা, ক্রিষ্ট তোমার রচনা, অঙ্গুলি অচেতন, ভাষা অবরুদ্ধ, গভবল শরীরের সমস্ত অঙ্গল যখন শিথিল, যখন তোমার শ্বাসে প্রতিদিন হানা দিয়ে চলেছে দুঃস্বপ্নের অধিশ্রুতি রাগিণীগুলো জয়ের মতোশ এটে, যে-পৃথিবীর ধূলিকণাকে বলেছিলে মধুময় সেই পৃথিবীর ভিতরে এখন যখন ছড়িয়ে পড়েছে 'মানব পাঁড়নের মহামারী', যে রোগাক্রান্ত বিশ্বাস করেছিলে সভ্যতার ভাগ্যবিধাতা রূপে, সেই রোগেশ যখন বর্ষা নবদন্তের বিভীষিকায় সভ্যতার মজ্জার ভিতরে ঘালিয়ে তুলেছে মানবাত্মার অপমান, তখনও, সামস্ত বিশ্বাস দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার পরও, তুমি কি বলে যেতে পারবে যে, আলোকের মৃত্যু নেই। আলো অপরাজেব?

রবীন্দ্রনাথকে উত্তর দিতে হবে এই চ্যালেঞ্জের। কই রোগশয্যায় শুরুর হয়ে গেল সেই ঐতিহাসিক সংগ্রাম, যার কথা আমরা অন্যাকবে শুনোঁছি সাম্যবাদের রচনায়—

"...the tragic history of human thought is simply the history of a struggle between reason and life, reason bent on rationalizing life and forcing it to submit to the inevitable, to mortality, life bent on vitalizing reason and forcing it to serve as a support for its own vital desires."

রোগশয্যায় দীর্ঘ সংজ্ঞাহীনতার ভিতর থেকে রাগা উঠে তিনি যখন প্রশ্ন করেন—এখন দিন না রাত? তখন এই সহজ, আপাত-সমাধার জিজ্ঞাসার

দিকে মৃত্যু ঘেরেলেই আমাদের বৃক্কত পারি, তাঁর সংগ্রাম চলেছে ঠিক কোনখানে, আর তাঁর প্রবলতম প্রতিবন্ধী এখন কে?

১৪৪

রবীন্দ্রনাথের শেষ চারটে কবিতার বই যথাক্রমে—রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মান্বিত আর শেষলেখা। এর মধ্যে 'শেষলেখা' বেরিয়েছে কবির অবর্তমানে। জোড়াসাঁকোর শৈথিল্য ভ্রমণে চেতনালারভর পর কবির প্রথম রচনা 'রোগশয্যায়'—এর তৃতীয় কবিতা। অর্থাৎ রোগশয্যা-পর্বের কবিতার সূচনা এ তৃতীয় কবিতা থেকেই। যদিও কালিম্পাঙেই তাঁর রোগ-যন্ত্রণাময় শেষ জীবনের শুরু, বলেই এখানে লেখা একটি কবিতাও এ বইয়ে জায়গা পেয়ে গেছে শ্বিতীয় কবিতা হিসেবে।

'রোগশয্যায়' থেকে তাঁর কবিতার বইয়ে একটা নতুন লক্ষণ খুঁজে পাই আমরা। কবিতার নীচে রচনার স্থান ও তারিখ-এর উল্লেখ তাঁর কবিতাব



রবীন্দ্রনাথ

বইয়ের একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। 'সানাই' পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত। 'রোগশয্যায়' থেকে শুরু হল এক নতুন সংযোজন—সময়। সকাল, বিকেল অথবা রাতের ঠিক কোন সময়ে কবিতাগুলো লেখা, সেই আভিষ্কার সংবাদটুকুও তিনি জুড়ে দিলেন কবিতার নীচে। কিন্তু কেন দিলেন? কেন মনে করলেন তাঁর কবিতা-পঠকের কাছে এই অকিঞ্চিৎকর তথ্যটুকু জানাও একান্ত জরুরী? নাকি এটা করলেন তাঁর পাঠকদের মনে করিয়ে দিতে যে, এই পর্বের কবিতাগুলো শূন্যমুখ কবিতা নয়, তারও সেরে কিছু বেশী, তাঁর আন্তর্যের ভিতরকার তুমুল আলোড়ন-অভিঘাতের দিনগঞ্জী অথবা ক্ষণগঞ্জী এগুলো। এক মণ্ডিত যন্ত্রণার জনাল যেন। অনেকটা সেই ভঙ্গীতেই বলতেন তখন। রাণী চন্দ্র লিখছেন—

"গুরুদেব বললেন, সকাল বেলার অরুণ আলোর মতো মনে পড়ে কয়েক লাইন—লিখে রাখ, নরতো হারিয়ে ফেলো।"

ঠিক তেজাবে অরবীন্দ্রনাথের মূর্ষের বচন, অর্থাৎ তাঁর জীবন-স্মৃতিকে লিখে রাখার নির্দেশ নিজেছিলেন একদিন রাণী চন্দ্রকে, সেইভাবেই কবিতার ক্ষেত্রে, নিজের নিয়ত আলোকিত হৃদয়-স্পন্দনকে ধরে রাখার অনুরোধ যেন।

১৩

ইতিহাস উপন্যাসের প্রিন্স মিসকিনের মারফত চন্দ্রভাটিক একবার আমাদের কাছে পেঁপেছে দিয়েছিলেন একটি অলোক-সম্মানী চরিত্রের এইরকম সংলোপ—

অমায়ক যদি মরতে না হয়, আঃ কী অনন্ত সময়। পৃথিবী তখন আমার। প্রত্যেক মূহুর্তকে আমি যানিয়ে নেবো এক-একটা যুগ। প্রত্যেকটা মূহুর্তকে গুণে গুণে নেব আলো আলো করে, করে পড়তে, হারিয়ে যেতে দেব না কোনোটাকেই।"

মৃত্যু থেকে উদ্ধার হওয়ার জন্যে অনন্তের সঙ্গে যখন বোঝাপড়া, রবীন্দ্রনাথের সংলোপও যেন সেইভাবেই ফুটে উঠেছে এইসব কবিতায়। মানসিক সংগ্রামের সমস্ত মূহুর্তকেই ধরে রাখবেন তিনি, দেবেন না করে যেতে। মূহুর্তগুলিকে নিয়ে তিনি রচনা করবেন যুগ। যুগোত্তর হতে পারে যে-সব সত্য, তারই তাঁর অনুসন্ধান চলেবে এইসব খণ্ড খণ্ড মূহুর্তের অন্তরাল ভেদ করে করে।

অথবা আমরা ভেবে নিতে পারি আরো বেশী কিছু। রোগশয্যা-পর্বের এই কবিতাগুলো যেন রবীন্দ্রনাথের শিরস থেকে, রবীন্দ্রনাথের আন্তর্যের ভিতরে আলো বনাম অন্ধকারের যে আবিষ্কার সংগ্রাম, সে সম্পর্কে, কবির স্মরণিত এবং ফেছা-প্রচারিত এক ধরনের মৌজকেল বলেটনি। রিলেকের ভাষায় যাকে মনে হয়, কঠিন জন-কখনো নকর, কখনো পাথর। তাঁর শেষ জীবনের শেষ দশ দিনের স্বেচ্ছা-সম্পর্কিত বিবরণ ছাপার অন্ধরে আমরা পড়েছি। সেখান থেকে একটি সাত দিনের চেহারার দিকে তাকানো যাক।

১৫ প্রাণণ। সোঁদন অপারেশন।

গায়ের তাপ সকাল ৯টা ৯৮.৫। বেলা ১টা ৫০ মিনিটে ৯৮.২। ৫টে ১০ মিনিটে ৯৮.৮। রাত ৮টা ৯৯.০। ভোর ৫টে ৫০ মিনিটে ৯৯। আর নাড়ির গতি সকালে ৯২, দুপুরে ৯৬, বিকেলে ১০০, রাতে ১০০, ভোরে ১০৮।

অনেকটা যেন একই সমানপাতে চলেছে নিজের আন্তর্যের ভিতরে আলো-অন্ধকারের সংগ্রামের ধারা-বিকণী, তাঁর এই সব কবিতায়। কোর্নিডন সকালে সবেমাত্র প্রবল, বিকেলে বিকসের আরাম। কোর্নিডন বিকেলে আলোর জয়, আবার রাত অন্ধকারের উল্লাস। এইভাবে এগিয়ে চলেছে তাঁর দিনগঞ্জী। আর ধীরে ধীরে তিনি এগিয়ে চলেছেন চূড়ান্ত আরোগ্যের দিকে, যদিও রোগশয্যায়।

এবার সেই ক্রমব্রয় অভিযানের ইতিহাস।

২৯ অক্টোবর।

সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে আনা হয়েছে কলকাতার ৩০ অক্টোবর।

আলো-অন্ধকার সম্পর্কে যেন অনেকটা উদাসীন। বৃষ্টি গেছেন যেন যে, কিনে-বেলায় প্রাণের ঘাটে হার করে এনেছিল গানের খেলা, তবু এখন ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে সাঁঝের কোয়ার ছায়ায়। সূর হারিয়ে সে-সব গান এখন যেন মিথোই ব'জে কেঁড়াচ্ছে তাদের একতারা। এখন আগের চেয়ে অন্ধকারই বেশী।

"প্রহর পর প্রহর যে যায়,

কস বসে কেবল গনি

নাঁর ক্রপের মালার ধানি

অন্ধকারের শিরে শিরে।"

৩ নভেম্বর।

ঈশ্বর অভ্যমান আলোহীনতার জন্যে। আগের দিনের কবিতায় যে অন্ধকার ছিল অনেকটা প্রকৃতিক, আজ সেটাকে মনে হচ্ছে অনেক বেশী ভয়ংকর। এ যেন চোখ থেকে অজস্র দিনের আলোকে উপড়ে নেওয়ার অন্ধকার, প্রাণ নার ভঙ্গীতে একটা আলোর জন্যে তিনি আবেদন-মুখ। এমনকি পুণ্ড্র নর, বঙ্গমামান একটা আলো, যা কির শেষবাক্যের মতো রচনা করে নিতে পরকে নিজের জগৎ।

৪ নভেম্বর।

শরীরে প্রবল জ্বর-যন্ত্রণা যেমন, আন্তর্যে এখন

সেব্যক্যে 'মহারাজ' সম্বোধন করে প্রায় করবোড়ে ভিক্ষা  
 মেগোছিলেন অল্প কিছু অলো, এখন তিনি বিশ্বের  
 ভৈরবীকরে বিদ্যাতার প্রচণ্ড মত্ততায় বিক্ষুব্ধ। এমনকি  
 'পাড়নের' বনশালে, চেতনার উদ্ভীষ্ট প্রাপ্তগণে' শেল  
 শুলের গরকার এগা ক্ষত্রবীর অভিজ্ঞতার, 'মানবের  
 ক্ষত্র দেহ, বস্ত্রের শক্তি তার কী দুঃসীমা' জেনে গিয়েও,  
 মানবের বনশা অভিজ্ঞতায় দুঃসীম চেতনা সম্পর্কে  
 স্তব্ধ থাকা।

"মানবের দুঃসীম চেতনা,  
 দেহ-বস্ত্র-হোমানলে

যে অর্থের দিল সে আহুতি—

জ্যোতিষকের তপস্যায়

তার কি তুলনা কোথা আছে।

এমন অপরাধিত বীরের সম্পদ,

এমন নিষ্ঠার সঙ্কলিতা,

এমন উপেক্ষা মরণের,

হেন জয়যাত্রা—

বিশ্বশ্রী: মাড়িয়া দলে দলে

দুঃসীম সীমান্ত শূন্যকরে—

নামহীন জলাশয় কী তাঁর লাগি—"

আমরা স্বাধে গেলাম, এই ম হুতে' তিনি আলো-  
 অন্ধকারের সমস্যাকে দেখতে পেয়েছেন ভিন্নরূপে,  
 নিজের ক্রাণিত দেহ-দুঃখ-হোমানলকে অতিক্রম করে।  
 নিষ্ঠার সঙ্কলিত আর মৃত্যুকে উপেক্ষা করার শক্তি  
 ছাড়া জ্যোতিষকের তপস্যা যে অসম্ভব, তাও আর তার  
 বোধের বাইরে নয়। সমস্ত দুঃখের সীমান্ত যে নামহীন  
 জলাশয় তাই, বিশ্বশ্রী: মাড়িয়েই যে সেখানে  
 পেঁছানোর পথ, রোগশয্যা তাকে জানিয়ে দিয়েছে  
 এতক্ষণে।

১১ নভেম্বর। প্রাতঃকাল।

তার চেতনা আগের দিনের মতো ভারসাম্য নয়।  
 পাড়নের ভার অনেক হালকা। কথা কইছেন ভোলের  
 চড়াই পার্থক্য সংগে। জ্যোতিষকের তপস্যায় নিম্ন-নীতি  
 জেনে গেছেন বলেই ক্রিয়াস হয়ে উঠেছে এমন সহজ  
 যে একটা চড়াই পার্থক্য কাছের 'সকল জীবের' দিনের  
 আলো' চেয়ে বসতেও স্মিতা নেই তার।

১২ নভেম্বর। রাত্রি দুটো।

থানোটাঘরের পাশা হটাৎ দেখা গেল অনেক  
 উজ্জ্বল। তার চেতনার স্তরে সংক্রামিত হয়েছে অসংখ্য-  
 তার এক নতুন বীজ। থেকে থেকে, হৃদয়গ গরীতে যেমন  
 জাগে কাঁপনি, রংগে চেতনায় তেমনি জেগেছে আতঙ্ক।  
 রোগের আঁকল দাঁড়িয়ে আলো একবার মাত্র জাগে  
 অকণ্ঠের জাগিয়ে যদি চলে যায়, আর তার পরেই যদি  
 নেমে আসে উদাসীন জগতের সেই ভীষণ স্তব্ধতা যা  
 প্রধানত অন্ধকারেরই সৃষ্টি, যেখানে অস্তহীনকালের  
 অগাধ গ্রহতারা অনুপস্থিত, আতঙ্কের উত্থান এই  
 দৃষ্টান্তেরা থেকেই।

১৩ নভেম্বর।

এই একদিনে চারটি রচনা। চারটি রচনায়, জুড়কে  
 ওঠা-নামার মত চার রকম বোধ। প্রাতে লেখা একটা  
 রচনা ভাবছেন, নিজের দিনের শেষ ছায়াটুকু যখন  
 মূল তানে মিশে যাবে—কি থাকবে তখন? এ একই  
 সময়ে লেখা আর এক কবিতায় পাঠ করছেন বিখ্যাত  
 অন্তর্গত সংকল্পের ধারা।

তার অন্তর্ভুক্ত কথোপকথন এখন প্রাচীন  
 তমস্করীর সংগে কালের প্রথম কপে নিরন্তর  
 অন্ধকারে যাক তিনি দেখতে পাচ্ছেন সৃষ্টির ধানে।  
 আর সেই মহাহুত হুত, মিলে যাচ্ছে নিজের অসংখ্য  
 স্বেচ্ছা মাকে ক্রিষ্ট রচনা যে প্রজ্ঞা, তার সংগে তখন-  
 কার অনাদি আকাশের ছাঁ। সেখানে নীরব অন্ধকারের  
 ভিতরে বিকলাল, অসম্পূর্ণ, প্রকাত সব স্বল্পের পিণ্ড,  
 নখ নব স্বেচ্ছাকে, কালের দক্ষিণ হেসে, একদিন  
 পূর্ণ দেহ, সুসংগত কলবর পাবার জন্য অপেক্ষাকৃত।  
 সৃষ্টি-রহস্যের শব্দ আদি লেনে নয়, সৃষ্টির আদিভূম  
 সত্যে নেমে পৌঁছে যায় তার প্রজ্ঞা। রোগের বিমিশ্র  
 ভীমভবেও তিনি অনুভব করছেন আত্মপ্রকাশের শিখর  
 শিখায় জ্বলে ওঠা ক্ষুধা, যা আপাতত বিরূপ ক্ষয়  
 হলেও, সম্পট শিশুর সম্ভাবনায় আকর্ষণ। এই তো

জন ভাবে শূন্যকালেন রিলকে। পৃথিবীর দিক  
 মূপ দেখে তার প্রদন ছিল—

"What is your urgent command, if not  
 transformation?"

অথচ, এমন সুসংহত অভিজ্ঞতার পরও, সেই  
 বিশ্ব-কোষের ভয়-ভাবনার হাত থেকে মুক্তি জোটে  
 না তার। আতঙ্ক আবার ফিরে আসে এ একই  
 দিনের অন রচনায়।

"মনে হয়, হেমন্তের দর্ভাবার কুজ-কটিকা-পানে  
 আলোকের কী যেন ভংগনা  
 দিগন্তের মৃত্যুর তুলিছে তর্জনী।  
 পান্ডুরণ হয় আসে সূর্য্যোদয়  
 আকাশের ভাল,  
 লক্ষ্য ঘনীভূত হয়, হিমসিত অরণ্যছায়ায়  
 স্তব্ধ হয় পাখির গান।"

আবার এই দিনের আরো এক কবিতায়, আলো-  
 অন্ধকারের সংকট থেকে সরে এসে, তার অভিজ্ঞতা যেন  
 ঠাল খায় গোপন এক ভূমিকম্পে।

"ভিত্তি যার ধ্বংস হয়েছিল মনে  
 তলে তার ভূমিকম্প টলে ওঠে প্রলয় নতুন।"

দারুণ এক 'অক্ষমা'কে প্রত্যাক করনি তিনি,  
 বিশ্বের ভিতরে যা জমা হয়ে চলেছে প্রতিদিন, আর যার  
 হাতে সামান্য রেখার ভুলও নিম্নলে হয়ে যায় একদিন,  
 অপরাধিত শক্তির গা থেকেও যে ছিনিয়ে নেয় মহাভাব।  
 হৃদয়, এমন দারুণ ভাঙনও, শেষ পর্যন্ত সাংসারহীন  
 থাকে না আর। তিনি পাড় নিতে পারেন, এই অক্ষমার  
 পিছনেও রয়ে গেছে পণেই আদেশ, —অবশ্য মাত্রিক  
 গাড়ির নতুন প্রাণের অন্ধুর এক ভিন্ন সৃষ্টিক  
 ছাটিয়ে তুলতে।

আজ্ঞাত চেতনার জ্বর যেন গড়িয়ে আসে নীরব  
 দিকে।

১৪ নভেম্বর। দুপুর।

এই দিনের কবিতায় না-আলো, না-অন্ধকার, না  
 রোগের দাহ, না-কোনো দর্ভাবার জিজ্ঞাসা। যেন সব  
 অথক কিছ: কিছ: প্রশ্নের উত্তর পাওয়া হয়ে গেছে।  
 অতএব সংগঠের কবিত। অথবা আপাত শব্দ সংগে  
 সন্ধি। তাই ফিরে এসেছে সহজ, সাবলীল কবিতার  
 কবিতার বীজ। এমন কি ফিরে এসেছে হালকা ছন্দটি  
 বোল।

১৫ নভেম্বর। প্রাতঃকাল।

এখন মনে হচ্ছে তিনি যেন যক্ষ শাষণ এক জয়  
 যোগা দুটোতেই আনন্দক। কোনো ক্রিয়াকর্মী শক্তির  
 কাছ ঠিকিফত দিতে নাগা। কেননা বিশ্বজগতের  
 শিশুলোকে নতুন প্রভাতে জেগে ওঠে যে-সব নতুন  
 জিজ্ঞাসা আর যে-সব পরাজন প্রশ্ন উত্তর না পেয়ে  
 অবাক বস্মিকে জাগ করে যায়—

"সহজ উত্তর তার পাই যেন মনে  
 সহজ ক্রিয়াস  
 যে-ক্রিয়াস আপনার মাত্ম তুষ্ট থাকে,  
 করে না বিরোধ,  
 আনন্দের স্পর্শ দিয়ে সত্যের প্রত্যয় দয় এমন।"

রোগশয্যাশায়ী রবীন্দ্রনাথের একটা জীৱন-পদ  
 শেষ হল এইখানে। আগের চেয়ে সঙ্গ। এখন তিনি  
 চিকিৎসকদের অনগ্রসিত পেয়েছেন শান্তিনিকেতনে ফিরে  
 যাওয়ার।

॥ ৫ ॥

১৮ নভেম্বর ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনে, তার  
 নিজস্ব ভূখণ্ডে, সেই সঙ্গো নিজের সহজ ক্রিয়াসে,  
 আনন্দের স্পর্শ লাগানো সত্যের প্রত্যয়ে। এখানে  
 থাকবেন তিনি প্রায় আট মাসের মত সময়। তাকে ফিরে  
 থাকবে অজ্ঞান শূন্যতার হাত। তিনি মাঝে মাঝেই  
 আন্তরিক প্রশান্তির মালা পরিবেশে যেন সেই সব  
 সেক্সতারদের গলায়। আগ্রহ চেষ্টা করবেন নিজের

স্বাধীন শাশ্বতের 'যক্ষ' ও 'অন্ধ' ফলে সৃষ্টিক  
 সেইসকল সেধারতাদের কারো কারো মনে হয়ে—

রোগশয্যাশায়ী রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আনন্দের যা  
 কবিতা, তা সাধারণ নিরামের কবিতা বা  
 যন্ত্রণাকে ছাড়িয়ে উঠবে সহ্য করার অসম  
 কৌশলেই রবীন্দ্রনাথ। যারা তার সঙ্গের  
 নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁদের চিন্তাধারনা করেন তিনি  
 রকম হাস্য-পরিহাস দিয়ে, নিজের বস্তুবাদে  
 কবিতার উপায়ও হতে পারে। 'সমস্ত তার চা  
 রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবোধ'—সংস্কৃত বোধের

বিশ্ব অসংখ্যতার তিনি যে পদ-বোধকে  
 জন্য তার অন্যতম বার বার ফটে উঠেছে এবং  
 এতে রচনায়। ১৯ নভেম্বর, শান্তিনিকেতনে ফিরে  
 পরের দিনের কবিতাতেই লিখে ফেলবেন এ  
 পদার্থের তার এই বোধ প্রোত জীৱনকে যক্ষ  
 ব্রহ্মের সংবাদকে ধরা হতে বিভিন্ন সূত্রের  
 কবিতা পরে লিখবেন।

"সজীব খেলনা যদি  
 গড়া হয় ক্রিয়ায় কমশালে  
 কী তাহার দশা হয়  
 তাই কীর অন্যতর  
 আজি আর শায়ে।"

অথবা মথেন কথায় জানাবেন—

"আমি ছ-মাসের 'লালকাসা'র বৈ হয়ে গৌ  
 ক্রিয়া—"

"আমরা জীবন প্রথম পাল্য কলার বাগে, য  
 সমস্ত শব্দকে ওলাফেরা চলতে, বিবর্তন পাল্য  
 হেদেরী সঁপকসিত তুলে হাটো বীজ।"

আর অনেকটা যেন নিজের কৃষ্ণের গাফর, নি  
 ভেতরের হৃদয়-ক ক্রিয়ায় ছাটী দেওয়ার জন্য  
 আগ্রহ চেষ্টা করবেন তিনি সমস্ত খবর-বতীর  
 হাস্য-পরিহাসময় জ্ঞান বা হালকা কবিতায়  
 থাকতে। যেন কোনোভাবেই আর সংকোচনা নন তিনি  
 এমনিভাবে লিখে যাবেন মিলনের কাব্য। ছোটদের  
 অজ্ঞান ছড়া দিয়ে মোড়া হৃদয়-বীজ ওলাফ-সঙ্গ।

"এদের 'ল্যান শারি'র বইট পাকত কিছ: য  
 কেউ দেখা করতে এলে চোখের এবং হাস্যময়  
 বাঘাত হত না। তার অন্যতমের সাঙ্গা হাস্য কেউ  
 করে গড়বে উজ্জ্বল পদ্য এখানে, দুঃসীম দর  
 একটুও মনে হতো না। এইরকম কবিতার মনে  
 কিশোর বকাতুক-প্রভা তিনি শেষ পর্যন্ত রক্ষা।  
 এসেছিলেন: কবিতার অন্ধকার দিনেও প্রাণ থ  
 হাসতে পারতেন।"—প্রতিভা দেবী।

এমন কি বসন্তের বসন্তও মনে হয়েছিল, কো  
 আর অস্বা নেই তার।

"কে কলবে ঠিক যে হুত অস্বা...কণ্ট  
 স্বয়ং কবি, মাঝে মাঝে একটু থামে, কিস্তি কলার ও  
 কক্ষনে হাতড়তে হয় না। এক জায়গায় ঠিক ক  
 আপনাই মুখে এসে কুসে। সেদিন এক ঘণ্টার উ  
 প্রায় অনবল কথ্য বললেন, সাহিত্য সম্পর্কে চিত্র  
 জীৱন-শব্দ হাস্য পরিহাস মেধাশালা এক জা  
 যক্ষমার নেরে উঠল ম। এর অস্বা? ভাবা যায় না।

বাইরে তিনি যখন এই কেম, ভিতরেও কি  
 তাই? তাই যদি হবে, তা হলে যখন তিনি মুখে  
 বলছেন, 'হুত', তার শেষের দিককার গদ্য বইগে  
 মতো, অতি সাধারণ কথাকেও অসাধারণ করে ক  
 ক্ষমতায় তার গল্পের সকল পর-পাঠকে তিনি  
 মানান, উপমা রূপক থেকে থেকে ফটে উঠে, এ  
 অত্যন্ত অপ্রতীত মহাহুত কিলিক দিচ্ছে কৌতু  
 ঠিক তখনই, নিজের কবিতার কাছে এসে কেন  
 করছেন যে, বাক্যের শক্তি হারিয়ে ফেলছেন তিনি  
 কেন যেন হচ্ছে তার যে, যে-গান্ধীর পরাভূত করে  
 এতদিন অন্যকে, সেই 'অন্যত-গান্ধীর' কাছই  
 যেন পরাভূত তিনি।

১৮ নভেম্বর।

এই মত দিন দুইকে বিভ্রাম। পূরের দিনের অর্থাৎ ভ্রমের কবিতায় নৈই কোনো আত-অলাড়ন। যৎ প্রকাশিত যেন তিনি। ইংরেজি কবিতা। নীতি ই শ কনো মরা ভালের মতো যদি বা মনে হারছে ক, তবও তৃত। কেননা সচিৎসি ভসমান না দিহা প্রকাশ করে চলেছে আর কনাচাতুরী, লেছে শৈবালের স্বীপ। অর্থাৎ রোগীর ঘরস আকাশে আছেন ব্যট, কিন্তু চারিদিক ঘোঁক আসা বিন্দু সেবার হাত সেখানও সচিৎ করে সুধা-ভরা দিন। এমন নিচিন্ত-নিরাপত্তার থেকেও ইংরেজি কবিতা যেন ন, তা নয়। একদিন লে শৈবালের স্বীপখানা কে ভেসে ফরে, মনে যায় তার। কিন্তু তাব চেয়েও আরো অশ্রুতর জিহায়া আপনাব কেন্দ্র আর্বাতি জীবনের এই স্রোত, যা

মুহুরের সবাকের

ফি হতে বিচ্ছিন্ন সদর।"

২১ নভেম্বর। কবিতাতেই ফটে ভিন্ন ক্ষণ। সে-সংগ্রাম নিত যাবে আশা করা লে, আবার তা থেকে ফটে পড়ল জন্মকথা। উল কবির ভিতরের সেই মানস, যে অসংখ্য এক-ই পৃথিবীর কাছে যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আলোর গ রনয়ন অথচ অধিকার যার কদীজীক। ঐ র শুরেই ভাষা বা বাণীর সংকট।

"অসংখ্য শরীরখানা

কোন অধর্ম ভাষা করিছে বহন

বাণীর ক্ষীণতা

মুহুরান আলোকেতে রচিতছে অস্পষ্টের কারা।"

ই চারটে পঙ্ক্তি পাড়েই থমকে যেতে হয় কা। বিশ্রুত হয়ে থাই, ফিল্ডলও। নৈশিন্দন বার এত কথা, কথার অসম্মান দ্যতি আর পরিহাসের কিলক এখনও অনর্গল ফোটে যার তার বলমেও ভাষা অবশ্যই তাইও আশা-ক-হয়ে আসছে বাণীর দাড়া, ভাষা হারিয়ে ফেলেছে ন, খড় খড় কুণ্ড মাঝে ক্রান্ত হয়ে থাকছে স্রোত। এইখানে পৌছে এক নতুন প্রাশ্নের িখ হই যেন। নৈশিন্দনতার বাণী দিয়ে কবিতার সমস্যা মোটামোটা যায় না বৃষ্টি তা হলে? কবিতা। তার আশ্বাসন কিয়ৎ জীকানন্দ একবার হলেন

মান্যদক কথাবাত। ও যুক্তি তকের চেয়ে এ ক্ষদ্র ক্রমের; জীবনের যে কোনো মুহুরে যুক্তিতর্ক পার, কথা কলতে পারি, কিন্তু আরো সুস্থির ত না হলে সাধুমাঠা কবিতা পাড়েও স্বাদ গ্রহণ িন।"

খন মনে হচ্ছে, কবিতা কন্যার বেলায়, এই কবিতা। জীবনের যে কোনো মুহুরে যে কবিতা কথায় বা আলো অল্পস বৃষ্টি করতো একজন কবি। কিন্তু লেখার সময় চাই অন্য এক রোগ, পৃথিবীর সংগা মিলমিলে এক গহন র স্পন্দন। জীকানন্দ বলেছিলেন—

মদি দিকপাতর মত গভীরতা ও আকাশের আকাশ, পৃথিবীর ভিতরে পৃথিবীকে কোণী ম" করার কথা। এই হারণার বীজ হয়তো তিনি যেন শেকসপীয়রের কাছ থেকে।  
poet's eye, in a fine frenzy rolling,  
glance from heaven to earth, from  
h to heaven;  
as imagination bodies forth  
form of things unknown, the poet's

them to shapes, and gives to airy  
g  
al habitation and a name."

২১ নভেম্বর। কবিতার প্রধানতম কেন্দ্র এই নয়

বে, জীবনের সচিৎসি কালিতে থিকার ফের স্পর্শ হারিয়ে ফেলেছে তার কদা। বৈদ্য এই জন্য আরো

বড় যে, তার বাণী হারিয়ে ফেলেছে কিকৃষ্টি।

"আত্মগত স্রিষ্ট জীবনের কুহেলিকা

জাহার বিষের দৃষ্টি করিছে হস্ত।"

এই বিস্কর্পিতকে ফিরে পাওয়ার জন্যে এখন কি করুক তিনি? 'ক করা স্বাভাবিক তাঁক পক্ষে? এই প্রশ্নের উত্তরের দিকে য়, তার তাকবার আগেই আমাদের মনে পড়ে যায় ইয়েটস-এর একটা কবিতা। "অন একার অব গ্রাস"। সে কবিতায় আমরা দেখতে পাই এমন এক বৃদ্ধ, অসুস্থ, আর অক্ষম লেখককে, যিনি নিজেকে তুলনা করেন ভাঙ্গা বাড়ির মধ্যকার সঙ্গে, ইন্টার হটপাট ছাড়া আর কিছই সাড়া তেলে না যেখানে। জীবনের এই অসুস্থশায়ী তিনি জানতে পেরে গেছেন—

"Neither loose imagination

Nor the mill of the mind

Consuming its rags and bone

Can make the truth known".

এই বিপুল কাণ্ড তার লগ্নে তিনি প্রার্থনা করছেন টিমেন বা লায়র অথবা উইলিয়াম ব্রেকের সেই frenzy বা মত্ততা—অথবা আকাশ-কপন—

"Who can beat the wall

Till truth obeyed his call".

অথবা চাইছেন মাইকল এন্ডার্সনের সেই মেধা

"That can pierce the clouds"

নিঃশব্দ

"Shake the dead in their shrouds".

ইয়েটস যখন এই কবিতা লিখছেন, তখন তাঁরও কাস পেরিয়া গেছে সম্ভব। কারা করে জনমান রেকের একটা চিঠিই সম্ভবত এই কবিতার শিহনের প্রেক্ষা, যে-চিঠিই অন্যতম তিনি উল্লেখ করেছেন পা মোট কিউটিফল অফ অল দা লেটারস বুল। ব্রেকের চিঠির বয়ান—

বয়স পেরিয়ে গেছে সম্ভব। কারা করে জনমান, "মতাব দরজার খব কচাকাছিই পেরিয়ে

গির্দেছলাম তবে ফিরে এসেছি দুর্বল আর বৃদ্ধ হয়ে, নিস্তেজ আর বদশাদীণ হয়ে। কিন্তু এসব স্পর্শ করতে পারিনি আমার আত্মকে, জীককে, আমার ভিতরের আসল মানসকে, কপনকে, যা চিরজীবী। সে হিসেবে আমি বরং হয়ে উঠেছি ক্রমশ অনেক বেশি দুঃ, পরিণত, যত ভেঙ্গে পড়ছে এই নির্বোধ শরীর।"

ইয়েটস-এর 'মিডনাইট' আর এক মধ্যারতির অনুষঙ্গ মনে পড়িয়ে দেয় আমাদের। নীটশের দি ড্রাকেন স-এও বাক্যের বেজে উঠেছে 'মিডনাইট সেলা-এর প্রশাসিত। সেখানে মধ্যারতির নিকট অবস্থানের কিল ডিপ আর্ড প্রোফাউন্ড ইটারনিটি। এই সময়কার রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়েও মনে হয় যেন মধ্যারতির অশকার রোগশয্যাই হয়ে উঠেছে তার জপের আসন। তিনি নিজেই হয়ে উঠেছেন মধ্যারতির সেই আত্মা, যাকে পাঠ করতে হবে অশকার লুপ্ত সেই ভাষা—নীটশে যাকে বলেছেন—ডিপার দ্যান দা দে কুড াই। আর এই দুঃ অধ্যয়নের জন্যে দুর্বল শরীরে না শরীরে নয়, অবশ্য চেনায়, যা অশকারের আক-স্মিক আক্রমণে বিপর্যস্ত, চাই প্রেক্ষা, চাই অজের শক্তি।

২১ নভেম্বর। ঐ কবিতার শেষ স্তবকের কাছে এসে দেখতে পাই, ইয়েটসের মতো তিনিও প্রার্থনারত। সে প্রধান করে কোনো বাস্তবশয়ের নাম নয়। প্রার্থনা তাঁর নীচজীবনের সখা, সুস্থ, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, পিতা, পরামর্শদাতা এবং পথপ্রদর্শক সূর্যের কাছে।

"যে প্রভাত সূর্য,

আসন্নার সূক্ষ্মতম রূপ

ভোমার জ্যোতিষ কেন্দ্রে হেরিষ উজ্জ্বল

প্রভাত ধানের মোর সেই শক্তি দিয়ে

করে আলোকিত।"

পরের দিনেই কবিতার দিকে তাকতেই কোথা সেলা সূর্য তার প্রতি প্রসন্ন। হতাশাস বজনীর মস্তক প্রহরলো বার জাগরণ পথে আসে অধারের গহ্বা দিয়ে, সেই অবসর সায়হের শব্দ ও কণ্ঠে মৃদু বক মধ্যে এখন তিনি দেখতে পেলেন কল্যাণরূপ, প্রভাতের অরুণ-করণ। আর তাই ২৪ নভেম্বরের কবিতায় জানিয়ে দিলেন যে রোগদুঃখময় বজনীর নীরব অধারেও এখন তিনি পড়তে পারছেন আলোকিতের নির্দেশ। অশকারের এই ঘন আকর্ষণ সার্বিক। যা চে পেলেই দেখ দেবে দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি। ঐদিনেই আরেক কবিতায় ফুলদলিতে যাক একটা গোলাপের দিকে তাকিয়েই তার দোহরটিকেও দেখতে পেলেন আকাশে, সতরে সতরে পাণ্ডি-য়েলা এক জ্যোতিষের বিরট গোলাপ। এরপর থেকে রোগশয্যার-এর সব কবিতাই কলসে ওঠে 'সম্ভ্রান্তিম সুবলকসম'। কিকৃষ্টির সত্যদর্শনে, চিরনৈরাস্যের দূত সেজে, ভাঙা বস্ত্রে বেসুরো কাকেরে কোনো কবি যদি পৃথিবীর শাস্বত সত্যকে কাণ্ড করে, তিনি জানিয়ে দিলেন পৃথিবীর কাছে সে অনাবশ্যক, তার পক্ষে আশ্বহতাই প্রের। কাককে মশালের দূত হতেই হবে।

২৮ নভেম্বর। প্রাতঃকাল।

একদিনে লিখলেন তিনটে কবিতা। প্রথম কবিতাতেই জানিয়ে দিতে পারলেন এখন "জীবনের দূর্বে শোকে তাপে স্বর্জিত একটি বাণী-চিহ্নে দিনে দিনে হরছে উজ্জ্বল—আনন্দ-অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ। ক্ষুদ্র যত বিরুদ্ধ প্রমাণে মহান্নের শব্দ করা সহজ পটুতা।"

শ্রুতিয়া কবিতার কিবাস আরও দৃষ্ট এবং দ্বল।

"আমার কিবাস আপনারে।"

আর তার পরেই—

"এ কিসের জলবাসিরাহ

এ জলবাসিই সত্য, এ জন্মের দান

বিদায় নেয়ার কালে

এ সত্য অশ্বান হয়ে মৃত্যুকে করিবে অস্বীকার।"

কৃতীয় কবিতার ঘোষিত হল এমন এক আদেশ, যা একই সঙ্গে মনে হয় পাশ্চাত্যের আবার পৃথিবীর। তিনি উল্লেখ করলেন এমন এক কাবের, যা ধারণও হতে পারে, আবার হতে পারে তাঁরই অস্পষ্ট কোনো প্রতিবন্ধী শক্তি।

"থলে দাও দ্বার

নীলাকাশ করে আবার;

কৌতুহলী পুংগাব কক্ষ মোর করক প্রবেশ;

প্রথম রোদের আলো

সর্বদেহে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায়

আমি বেঁচে আছি তার অভিনন্দন করণী

মমরিত পল্লবে পল্লবে আমারে শনিতো দাও।"

দীর্ঘ সংগ্রামের পর যেন বিজয়-উৎসর্গে শোভা-যাত্রা এই কবিতার পৃথিত পৃথিত। অশকারে সমস্ত হলনা-জাল ছিড়ে এতদিনে স্থিরতর কিবাসের আলো পৌঁছে গেছে তার জীবনে। আর অস্পষ্ট নৈ। সেই মৃত্যুও।

ডেথ অব ইডান ইলিচ-এর নায়ককে অসংখ্য করেছিলেন টলস্টয় উপন্যাসের চরু অধ্যায়ে। তারপর চটা অধ্যায় ছিড়ে তার যশস্বতোষণের তমস্ব অসহনীয়তা। সক্ষম, সার্থক পরিপূর্ণ একটা মানসকে ক্রমাগত দুঃখ-মুচড়ে, ছিড়ে-নিড়ে, কীটপতঙ্গের মত ক্ষুদ্রতার দিকে তেনে নিয়ে চলেছে মৃত্যু। স্বাধন অধ্যায়ে ইডান ইলিচ হঠাৎ দম্বত পেল একটা আলোকবিন্দু। আর তারপরেই তার সবদেহে, শিরায়-শিরায় বর্নিত হয়ে উঠল—  
"Death is over. There is no more death".

ম্যাজক মাইটেন-এ জীবনে দশদিকাতক সাক্ষারিত ছাঁচের চিরে চিরে দেখার এক দেখানোর জন্যেই টমাস হান উপন্যাসের কোর্টকদ্দুতে বেধে-ছিলেন একটা সরনটোরিয়াম। আসলে মৃত্যুকেই করত

করোছিলেন পটভূমি। মৃত্যুর নিকট কালো কণ্ঠস্বরে চেয়ে-  
ছিলেন যেন। মৃত্যুচেতনার চেয়ে আর এমন কী আছে  
যা একজন লেখকের কাছে সর্বচেয়ে ঘণা, সবচেয়ে  
অপরিহার্য? দান হেনরিক মানেক এই কথাটাই  
লিখেছিলেন একবার।

"Ah, Literature is death! I shall never  
understand how anyone can be dominated  
by it without bitterly hating it. It's  
ultimate and best lesson is this: to see  
death as a way of achieving its antithesis,  
life".

মানেক অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন যে  
জীককে দেখতে হয় মৃত্যুর জানলা দিয়ে। কিন্তু এখন  
জীক আর মৃত্যুর মাঝখানে জানলাটাও হচ্ছে গের  
তার জীবনে। দুয়ো একাকার। এই কী তাকে সেই  
সুখ-সময় যখন মৃত্যুর আয়নার সবচেয়ে পক্ষিকার  
দেখা যায় মৃত্যুর প্রকৃত প্রতীকস্বরূপ জীককে?  
হয়তো তাই। নইলে রবীন্দ্রনাথই বা কোথায় পাবেন  
এত আলো, এমন প্রশান্ত সন্তোষ?

১৬৬

রোশনাবার-এর শেষ ১২টা কবিতা থেকে, এর  
পর, হচ্ছে যায় শব্দ-সংঘাতক সমস্ত আত্মক। তার  
উচ্চারণ হয়ে ওঠে কল্প, প্রতীতি এবং চৈতন্যজ্যোতিতে  
প্রদীপ্ত। হঠাৎ যদি বা প্রিয় পাম্বচর অথবা প্রিয়  
আলোককে দেখতে না পেয়ে তার মনে হয়  
"পৃথিবী পরের নীচে চুপি চুপি কবিছে মস্তগা  
সঙ্গে বাবে বলে"

কিন্তু পাশ ফিরেই দেখতে পেরে যান, যাকে তার  
এক কাকুল খোঁজাখোঁজ, সে নতশিরে বনে চলেছে  
পশম, সৃষ্টির অমোঘ শান্তি সমর্থন করি। আমরা  
বুঝতে পারি, এরপর কেন তিনি স্বেচ্ছা নেবেন তার  
পরবর্তী বইয়ের নাম—আরোণা।

রোশনাবার-এর শেষ কবিতার রচনাকাল ও  
জিসম্বর, ১৯৪০। এন্টই সাতদিন পরে তার জীবনের  
শেষ এই পৌষ। তিনি শান্তিনিকেতনে, তবু মন্দিরের  
উপাসনায় সেই প্রথম যোগদান অক্ষম। সকালে  
বসলেন অমিয় চক্রবর্তীকে নিয়ে। কবি মঞ্চে কল্‌ডন,  
লিফটনে অমিয়বাবু, বা পঠ করছেন আচার্য ক্রিতি-  
মোহন সেন। আশ্বিন, সে-ভাষণের নামও 'আরোণা'।

এইখানে পৌঁছেই আমরা যেন বুঝে যাই, জীবনের  
বাকি দিনগুলোয় তিনি কী বলবেন কোন সুরে।  
অথবা এরপর, জীবনের শেষ নববর্ষের ভাষণ দিতে  
গিয়ে সভাতার প্রবল সংকটের ছবি একেও তিনি  
আমাদের কানে বাজিয়ে দেবেন কোন বিশ্বাসের  
বাণী। অথবা চূড়ান্ত মৃত্যুর মতোমুখি হবেন  
যখন আর কসের মাস পরেই, 'তার দেওয়া দেহ  
অক্ষতভাবেই তাকে ফিরিয়ে দেওয়া ভালো।' এমন  
অনিচ্ছা সত্ত্বেও যখন তাকে মেনে নিতে হবে  
অনিবার্য অপারেশন, যখন রাহুর মত মৃত্যু গ্রাস  
করতে আসবে তার জীবনের স্বর্ণাঙ্গী অমৃত,  
হানা দেবে দুঃখের অধার রাতি, কন্ঠের বিকৃত  
ভান আর টাসের যত বিকট ভঙ্গীর আশ্রয় নিয়ে,  
তখনও তিনি কোন চিরমুগ্ধ, চিরসমুজ্জ্বল,  
আলোক-খোঁজ অন্তরের দীপ্তিকণা রেখে যাবেন  
আমাদের দুঃখ-দুঃসময়ের পথ হিসেবে, তাও যেন  
জানা হয়ে যায় আমাদের।

এইখানে পৌঁছেই আমাদের মনে পড়ে যায়  
১৯১৪-র এন্ড্রুজকে লেখা তার সেই প্রতিশ্রুতি—

"যদি আসে তবে তার সঙ্গে সানন্দে  
শক্তি পরীক্ষায় আমি প্রস্তুত।" বাক্যে পরি, এই  
প্রতিশ্রুতি রক্ষার দায়িত্বেই, যতক্ষণ শরীরে নিশ্বাস-  
প্রশ্বাসের ওঠা-নামা, যতক্ষণ রক্তের বঙ লাল,

যতক্ষণ হৃদয়ের কক্ষ অরুণ হৃদয়ঙ্গম সচল, তিনি  
বিরত হবেন না বা বিরতি নেবেন না পৃথিবীর  
সঙ্গে তাঁর ব্রহ্মময় বোঝাপড়ায়।

বেঙ্কা নিবর্গসিদ্ধ জীবনে তখন শেষ আশ্রয়  
জুটছে আসতোপেজো নামের এক অখ্যাত স্টেশনের  
এক দুঃভরী ঘরের একতায়। নীচু ছাদ, আসবাব-  
হীন, অধকার, কাঠের ঘর। লোহার খাটে শয্যা।  
তারই কাছে একটা টেবিল; টেবিলে তার নিয়ত-  
সঙ্গী ডায়েরী, স্টেফান জাইথ যাকে বলেছেন 'দি  
স্পির্কিং-টিউব প্রু হুইচ হি কনভার্স উইথ গড'।  
হারিয়ে ফেলেছেন নিজের হাতে পেনসিল নিয়ে  
লেখার ক্ষমতা; মেয়ে অলেকজান্দ্রা শিরে সব  
সময়েই জাগর। টলস্টর বলে যান মৃত্যুমুখী  
জীবনের সর্বশেষ সভা-উপলক্ষের ছোট ছোট  
বচন। অলেকজান্দ্রা যান লিখে।

রবীন্দ্রনাথেরও তখন সেই অবস্থা। নিজের  
হাত অবশ। তবুও তাকে লিখতে হয়। লেখেন  
পরের হাতে। আবার সেই মৌখিক ভাষ্যকেও,  
অজান্ত না ভেবে শূন্যের দেন কেটে-ছেটে।  
জীবনের একবারে শেষ কবিতার শেষ স্তবক  
হিসেবে তিনি উচ্চারণ করলেন যে তিনটি লাইন—

"অন্যায়সে যে-পেরেছে হলনা সহিতে

সে পায় তোমর হাতে  
শান্তির অক্ষয় অধিকার।"

পড়ার সময় আমরা যদি 'শান্তি'-র বদলে পড়ি  
'শক্তি', তা হলেই যেন তার আজীবনের রক্তকতম  
সংগ্রামের উৎসকে ছুঁয়ে ফেলি। আর সত্যিই তো,  
সভাতার অথবা মানবের অথবা চৈতন্যের স্তরে  
স্তরে ফুলে-ফোঁপে ওঠা 'আমরাতির দুঃখতোরণ'-  
গুলো ভাঙতে জানেন সে-সব শক্তিমান, তাদের  
ছাড়া আর কার কাছে নত করব আমাদের মাথা?

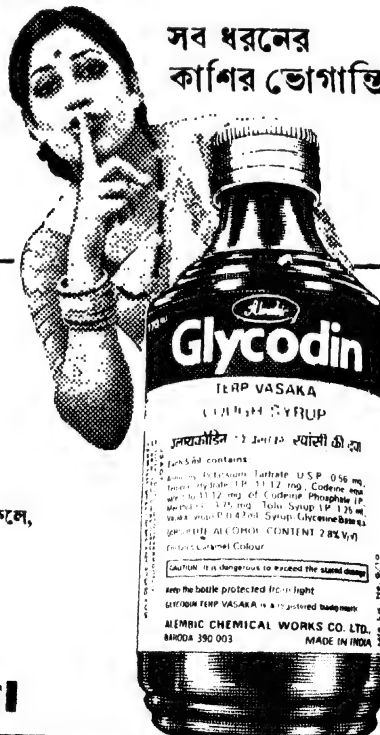
# কাশি সুত্র

শরীরে কাশি হওয়ার চারটি ঘাঁটি আক্রমণ  
করে কাশি সম্পূর্ণ দূর করে গ্রাইকোডিন:

- ১। মস্তক থেকে কাশবার ইচ্ছাকে দূর করে।
- ২। গলা খুশখুশ বন্ধ করে।
- ৩। বুকের আড়ষ্টতা দূর করে, ফলে শ্বাস  
নেওয়া খুব সহজ হয়।
- ৪। বুকের জমা স্লেমা গুলিয়ে বার করে দেয়।

গ্রাইকোডিন আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস সহজ করে, ফলে,  
আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন।

**গ্রাইকোডিন**  
**কাশি সুত্র করতে**  
**ভারতের সেরা ওষুধ।**



সব ধরনের  
কাশির ভোগান্তিতে

**Almbic**

আলম্বিক—বিশেষ  
গুণের ওপর ডাক্তাররা  
সম্পূর্ণ ভরসা করেন।

# স্মৃতি সততই সুখের

## প্রতিভা বসু

॥ ২০ ॥

সমুদ্রের ঐ কোণে আস্তে আস্তে লাল গোল সোনার থালায় মতো সূর্য নিচে নেমে আসছিলো, থালাটা বড়ো হতে হতে টুশ করে ডুবে গেল জলে। একটু বাসেই বিকলের আলো ঘোর-ঘোর হয়ে সখ্যার অশ্বকারে মিশে গেল। এখন বন্দরের অন্য রকম চেহারা। এখন আলো জ্বলে উঠেছে, এখন সমুদ্রে অনন্ত জলরাশি সহস্র অনন্তনগের মতো কালো কালো ফণা জ্বলে পিছল শরীরে ভরের মতো। মাঝে মাঝে আলোর কিদু হরো জাহাজ ভাসছে; লগ্ন কোট ভটভট করে চলে যাচ্ছে; আমাদের গাছের তলাবার বেগুতে সুশ্রুটি অশ্বকার।

এখন ফেরা। কিন্তু কীভাবে? ভুল্লোকের নিদ্রা শমতো; জলপথে অথবা স্থলপথে।

জলপথেই বাই। নতুন অভিজ্ঞতা। সমুদ্রের হাওয়া খেতে খেতে ঘরে ফেরা কি কম কথা?

আমো অনেকই উঠাছিলেন। দেখাশোনা আমরাও উঠলাম নিচে নেমে গিয়ে বোট নিলাম একটা। গন্তব্য বলতেই ইঞ্জিনচালক এক মুখ হেসে বললো, 'অলরাইট। খাম-অন-—' বলে নিজের টপাত করে নেমে এলো, হাত ধরে উঠতে সাহায্য করলো আমাকে। আবার স্বস্থানে এসে বসে কালো, 'ফ্রম হোয়গর, খ্যালখাটা?'

বৃন্দেব কলেন, 'তুমি দেখাও বেশ ইংরাজী বলছো, কলকাতা গিয়েছিলে নাকি?'

'অব কোর্স। কতবার। ঐ যে ব্রিস্টল হোটেল সেখানে কড়াবার খেয়েছি। ঐ জন্যই তো দেখা মাত্রই বড়ো পারলাম কলকাতার লোক। কলকাতার সব মেয়েরাই তোমার স্ত্রীর মতো দেখতে। ছোটো, নরম, লম্বা পোশাক, তাদের বলে বাঙালী মেয়ে ঠিক না?'

'একবারে ঠিক। কেন গিয়েছিলে কলকাতা?'

জাহাজের নাবিক ছিলাম যে। কোম্বাই, মাদ্রাস, কলকাতা—সব বন্দরে গিয়েছি আমি। সব শহরে ঘুরেছি। দারুন। দারুন। ইন্ডিয়া আমার খুব ভালো লেগেছে।'

'এখন বৃদ্ধি অবসর হয়ে গেছে সে কাজে?'

'না, অবসর ঠিক হয়নি, অবসর আমিই নিয়েছি।'

'কেন? ভালো লাগে না?'

'না। এই বেশ আছি নিজের দেশে। এই বোটই আমাকে বাইরে পরিচয় রেখেছে। বকলে না, ছোটো থেকে জলে কস, জল ছাড়া থাকতেই পারি না, তাই এই পেশাই নিলাম আমার।'

বোট সমুদ্রে থেকে মোহনায় ঢুকলো, বললো, 'ঐ দেখ আমাদের পার্লামেন্ট হাউস। আমাদের দেশ তোমাদের কেমন লাগছে?'

'খুব ভালো। খুব সুন্দর।'

মোহনের ঢেউ ছাড়িয়ে নৌকা খালে ঢুক পড়লো। জল থেকেই সারা শহরটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আমরা তার দেশ ভালো বলতে উৎসাহিত হয়ে জুরো সব চেনতে লাগলো। পার্লামেন্ট হাউসের পরে টিডাল পার্ক, টাউন হল, কোর্ট, ইয়নিকর্ভারিসিটি—সব চেনালো। তারপর রেস্টোরাঁ। তারপর তখন তারাই প্রধান। 'এটা সবচেয়ে বিখ্যাত', 'এটা সবচেয়ে পুরোনো', 'এটা অমূল্য সময়ের', 'এটা তমূল্য সময়ের'—কেবা গেল ভীষণ আলাপী। কথা বলতে খুব ভালোবাসে। আমাদেরও কিছু খাওয়া লাগছিলো না এই দরুনর হাউসখানি ফর্তিবাজ আলাপী জাহাজের এবং পাইলটদের।

তার পরের হাওয়া সে আমাদের প্রাণের ঐক্যে মিলে গেল। সে বৃষ্টি, কী গল। এখানেও বৃষ্টিপাতের পানি ছাড়াই কীভাবেই বাতাসে মিলে গেল। এখানেও বৃষ্টিপাতের পানি ছাড়াই কীভাবেই বাতাসে মিলে গেল। এখানেও বৃষ্টিপাতের পানি ছাড়াই কীভাবেই বাতাসে মিলে গেল।

'পারো কোথাও?'

'আমার পয়ামর্শ যদি নাও, ঐ যে সিনেগরটা দেখছো, ওখানেই যাও। কীক-জমক কিছু নেই, বড়ো হটাৎ ঢুকলে নাকালই মনে হবে, ওয়ে লাক, কী মাছের রাসা, বকলে। আ—'

'খুব ভালো বৃষ্টি?'

'ভালো বলে ভালো। দারুন। সারা শহরে এদের রাইনীদের টেককা দেবে এমন কে আছে, কলো?'

'তুমি খেয়েছো কোনেদীন?'

লাজুকভাবে হাসলো, 'কম দাম। এখন আর কোথায় অত টাকা পাবো। ঐ অল্প কাসে সারা বছর নাবিকগণিক করে ঘরে ফিরলে অনেক কটা পরসা থরচ

করোই, কেজাকুকের মতো। খেতে আমি বড়ো ভালোবাসি।'

সে ভেবেই যাচ্ছে। আমরা বললাম, 'তা হলে চলো আজ তোমাকে খাওয়াই।'

'কেপেছো? তোমরা হলে গিয়ে অতিথি, আমারই উচিত তোমাদের খাওয়ানো।' হাসলো, 'আমি খুব খেতেই ভালোবাসি না, খাওয়াতেও ভালোবাসি।'

'সে তো নিশ্চয়ই! কিন্তু আজ আমরা তোমাকে খাওয়াবো।'

'কোনো রেষা কোথায় যাবো? তোমাদের পোঁদে দিয়ে আগে করকটা ট্রীপ না লিলে তো রোজগারই হবে না কিছ! তবে বাই বলো, তোমাদের দেশের সেই স্পাইসিস দিয়ে রান্না, সে বড়ো ভালো।'

'খেয়েছো?'

'খাইনি? কলজে কী? ঐ ব্রিস্টলের রান্নাঘরে গিয়ে খেয়েছি। যারা রান্নাভো, কাজ করতে, তারা খসেরদের জন্য যা রান্না করতে ওসব ছুঁতেও দেখতো না। নিজেকে রান্না আলাদা করে বা রাখতো না—'

'খুব ভাল খায় তারা, তুমি খেতে পারতে?'

'খালে খালে আমার মতো যেতে হচ্ছে করতে—এতো চমৎকার। বকলে, ঐ হচ্ছে জিবের চাবুক, বজো মার ততোই সবচেয়ে আর ততোই জলো লাগবে। নোয়ার মতো। আমি কি একাই খেয়েছি? তাদের সঙ্গে ভাব করে নিয়ে দল বেধে খেয়েছি।'

'আবার যেতে হচ্ছে করে?'

'আ করে। তবে আর কি হবে?'

'হেলই হয়।'

'পাগল! আমার মতো মানুষ কি শখ করে ইন্ডিয়াতে যেতে পারে? অত পরসা কি আছে?'

তা অকস্মিক ঠিক। বললাম, 'নাবিকের কাজ ছাড়লে কেন? কতো ঘরে ঘরে কেজাছিল। কতো দেশ দেখার কতো মজা—'

মজা ঐ প্রথম প্রথম। শেষে জিরে করার পরে কুট ফেলো—তোমরাই ভেবে দেখ, কোথায় পড়ে রইলো সব আগুনজম, আর আমি ভারিচ তো ভাসছি। একটা তীরে যখন পেতাম পরগলের মতো ছুঁতাম শহরের দিকে। আলো দেখতাম, দোকান দেখতাম, ছুঁয়ে ছুঁয়ে গাছ দেখতাম, আর দেখতাম মেয়ে। আসলে কাজটা ছাড়তাম না হয়তো, একবার কঠিন অসুখে পড়ে গেলাম। বউ আর যেতে দিল না। অসুখ বয়েস তো ছিলো তখনো। কউর কথা কি ফেলতে পারি? কন দেখা হতো হ্যাঁ, খুব ভাব ছিলো।'

বেশী দেখা হলে বৃদ্ধি ভাব থাকে না?'

'থাকলো কই। কাজ ছেড়ে দিয়ে ঘরে থাক। মাত্রই কয়েক দিনের মধ্যে কেজল কগড়া আর কগড়া। নিজের কাজ ছাড়লো কল্লাকাটি করে, আবার নিজের পোঁদে দিত। যাকে একদিন না দেখলে অস্থির হতাম, তখন তাকে দেখা মাত্রই আমার রোগ উঠে যেতো। কেন এমন হয় বলা তো?'

'কী জানি।'

'জারি মজার, না?'

'সেই রকমই তো মনে হচ্ছে।'

'আর মধ্যে আর একটা লোক ঢকে পড়লো। কস, হয়ে গেল—'

'কী হয়ে গেল?'

'আরে, ঐ আর কি! ঐ লোকটার সঙ্গেই চলে গেল কউ। থাক গে, আমার কষ্টও হলো না। তবে ঐ মেয়েটার জন্যই বা একটু—'

'দেয়ে আছে বৃদ্ধি তোমার একটা?'

'সেই মেয়ে তো এখন কতো বড়ো! এখন সে তার অহস্তর বছরো বাবাছে খুব দেখতে আসে।'

'বিকর হয়েছে?'

'নিশ্চয়ই। তার মেয়েরও বিকর হয়েছে।'

'তখন কেন আবার নাবিকের কাজে ফিরে গেলো না?'

হা হা করে হাসলো, 'যায়েই তো ভেবেছিলাম। প্রথমে পড়লাম না। বিকর করে ফেললাম। বকলে, যে পুরুষ একবার বিকর করে খুব সেই জানে বউ না থাকটা কী অসুখের। নতুন কউ ছেড়ে মানুষ যেতে পারে, কলো? বউও, হুড়ে না। আমি অকলা মনে মনে হাসছিলাম আর ভাবছিলাম, এই ভালোবাসার মেয়ের কর্পন তা তো আমি জানি। যাক না এক-ন, বছর, তারপর তো লাগলো বাল।'

'তা তোমার অন্যান্য কি সত্য হয়েছিলো?'

'আসলে কি জানো! আমরা দুজনই ছিলাম অভিজ্ঞ। আমিও যেমন এটা স্ত্রী ছেড়েছি, ওও তেমন এক স্বামী ছেড়েছে। সুতরাং, আমরা বয়ে মিলেই ব্যাপারটা। ভেবেই নিয়েছি দুজনেরই দুজনের কিছুটা মানিয়ে নিতে হবে। একটা শব্দেও ঐটুকু, কিন্তু তার জোর বড় কম ন্না। সেই স্ত্রী নিয়েই তো বয়স হয়ে লোলাম। তবে হ্যাঁ, এ কথা বলতেই হয় মাঝি ন্যাসির মতো দুজাল না। বৃষ্টি হয়, কিন্তু মাঝিরা জনাই সেটা মায়াফক হতে পারে না। বৃষ্টিও আছে। আমি তো জল ছাড়া থাকতে পারি না, তাই অন্য কাজ পেয়েও বেশী দিন কোর্ট পড়ি না। পরের বোট ভাড়া নিয়ে জলেই ফিরে এলাম। মাঝি পাইয়ে সংসার ধরতে ডিউটে ছেলেরা নিয়ে অল্প আয়ের মধ্যেও যেমন করে জমিয়ে জমিয়ে



# ১৫০০০ কপি

## নিঃশেষ!

শঙ্করীপ্রসাদ বসু-র

### বিবেকানন্দ ও

### সমকালীন ভারতবর্ষ



প্রথম খণ্ড ২০, দ্বিতীয় খণ্ড ২৫, তৃতীয় খণ্ড ৩০, চতুর্থ খণ্ড ২৫

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়-এর

### সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ

২০.০০

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

### শ্রীরামকৃষ্ণ ও

### বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ

২০.০০

আশাপূর্ণা দেবী

### যতীন্দ্রকার বাগান ১২.০০ বাছাই গল্প

২০.০০

স্বপ্না কর

১০.০০

### পাশাপাশি

৮.০০

রূপদ রাজগুরু

### ভাল থেকে ভাল ১২.০০

জগদীশ্বর মিত্র

### শ্রীমদ্ভগবত প্রেরণী ও প্রেরণী ১০.০০

### তীয় রিপু ৮.০০ জলে দেখি জোনাকি

৬.০০

মণ্ডল বক হাউস

৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী

লকাতা-৯। ফোন: ৩৪-৮৭৪৭

কেউটা কিনে দিল আমাকে। নিজের বোট, বুঝতেই তো পার—

বেশ ভালো জায়গা হয় তা থেকে, না?

বেশ ভালো। ট্যুরিস্ট এলে তো কথাই নেই। আমেরিকানরা খুব আসে, খুব বেড়ায়, খুব পরাম দেয়। দিনে-রাত্রে খাতি তখন।

তোমাকে দেখে কিন্তু বোকাই যায় না যে, তোমার বাহাসের বছর বয়েস।

খুব খুশী হলো, সেখানায় যাব না, না?

একটুও না।

সবাই তাই বলে বটে। এখনে আমি যা খাই, আমার ডেইরিশ বছরের ছেলেও তা খেতে পারে না। ভালো রান্না, হলে তো কথাই নেই। আচ্ছা, তোমাদের আমি এই ঘাটটাতেই নামাই। সামনেই খুব ভালো মাছের রান্নার রেস্টোরাঁ পাবে। সোজা চলে যাও। দামও রাজিহীন।

নৌকো থামলো সে। বাঁধানো সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। অনেক ধনবান দিয়ে নেমে পড়লাম। সেও নামলো। বললো, কী সম্পদা কটলো সময়টা কলো দেখি। তোমরা হয়তো ভাবছো ঝড়ো হয়ে এরকমই বকরবকর করা আমার অভ্যাস। তা কিন্তু নয়। তোমাদের দেখে খুব ভালো লাগলো। ভালো লাগলে আমি আপন পর ভুলে যাই। সব কথা বলে ফেলি। গাড়িই কালকটা—

ফটফট করতে করতে আবার সে নৌকোর মুখ ঘোরালো। আমার সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড়ে এলাম। সামনেই যে রেস্টোরাঁ পেলাম ঢুকলাম সেখানে। খাওয়ানোয় সেরে হোটেল। কালকেই ফিরে যাবার তারিখ।

যাকো হামবুগে। শ্বেদন স্নাতক। তার মানে কালকের দিনটাও পাওয়া যাচ্ছে। কাল কোনো নির্দিষ্ট থাকার জায়গা স্থির করা নেই, স্বাধীনভাবেই ঘোরাঘুরি। যে ডল্লোকটি আমাদের নিয়ে ঘুরেছেন, তিনি বলেছেন সকালই চলে আসবেন। বন্ধসেব তাঁকে আমাদের সঙ্গে ব্লেকফাস্টে নিমন্ত্রণ করেছেন।

যেদিন এখানে এসেছিলাম, এয়ার পোর্টে প্রায় আনারই কয়সী আমায় ঠাকুর-দাদার মতো পাকা পাকা চেহারার এই মানুষটির সযত্নলিখিত এক জোড়া লাল গোল, চোখের রিমলেস চশমা, আর পরিধানে শার্টের উপর তিনকোণা জ্যাকেট দেখে আমার প্রায় হাসি পেয়ে গিয়েছিলো। একদিনে দেখলাম সেই পোশাকের সেই চেহারার মানুষটির জন্যই বেশ টান অনুভব করছি। অবিদ্রাণিত একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে করতে কখন যে কেমন একটা একান্তব্যব জন্মে গেছে টেরই পাইনি। আসলে সব দেশের সব জাতির সব মানুষের একই নান্দ্রিয় টান।

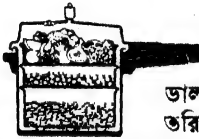
আমেরিকায় থাকতে সহসা একদিন এক অচেনা ডল্লোক নিমন্ত্রণ করেছিলেন আমাদের। ফোনে কথা হয়েছিলো, নিমন্ত্রণ আমরা গ্রহণ করেছিলাম। যথাসময়ে তিনি গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। মানুষটোকে বিশাল এক উজ্জল কাঁড়ের মালিক। বিশেষ ধনী সম্প্রদায়ের একজন। গিয়ে আলাপ হলো। কয়েক নবীন কথা না হলেও খুব ক্রান্ত নন্দ। হয়তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। টিপটপ ফিটফট মানুষ। দেখতে অত্যন্ত সুন্দর, বেতের মতো ছিপিছেপে চেহারা। নিজের দরজা খুলে দিলেন, বিনীতভাবে অভ্যর্থনা করে এনে বসালেন কবর ঘরে। বন্ধসেবকে কলোন, আমাদের ইয়ুনিভার্সিটিতে আপনি অর্মান্বিত হয়ে পড়াতে এসেছেন আমি জানি। আপনি যে শব্দই একজন বিদগ্ধ অধ্যাপক তাই নয়, একজন বিখ্যাত সৃষ্টিশীল লেখক, তাও আমি ক'ব গলপ নিয়ে কিনেলের কাছে শুনেছি। আমার দিকে ফিরলেন, গলপ নিয়ে আপনায় কথাও অনেক বলেছে। আপনিও যে একজন লেখক! হেসেবে আপনাদের দেশে বিখ্যাত, সে কথাও সে বলেছে। আমি বাবসারী মানুষ, লোহালকড় নিয়ে আমার কারকর, তার ফাঁক সাহিত্যের নেশা আমাকে অনেকখানিই ভরাত করে রাখে। বাবসা আমার নয়, পর্বপূরসের। আসতে পারেন ইজিনটে নিজেই চলে, আমি শব্দ, হাল ধরা বসে থাকি। ট্যুরিস্টের ধরে থাকি তাইতেই সোম থেকে শব্দ পর্যন্ত আমার আহার-নিদ্রার সারা থাকে না। নইলে এর অনেক আগেই আপনায় সঙ্গে আমার দেখা হতো। নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমারও নানা ধরনের সংস্পর্ক আছে। এমন অনেক মিটিং থাকে যেখানে ফাঁকি চলে না, যেতেই হয়। যাইও। কিন্তু সেসব মিটিংয়ে অধ্যাপকরা আসেন না, সেসব মিটিং একান্তই বাবসারিক। সেজন্যই আপনাদের সঙ্গে আমার কানোবকম যোগাযোগ ঘটেনি। আজকের এই যোগাযোগের একটা বিশেষ কারণ আছে। আমি আরো কয়েকজনকেও আসতে বলছি। তারা সকলেই অনেকের কাছে পরিচিত কবি। সাহিত্যিক নন কেউ, সমাজসেবক হিসেবেই চিহ্নিত। তাঁরা আসবেন ছটা চার্লিশ। আমি ইচ্ছে করেই চাঁদ মিনিট হাতে রেখে আপনাদের ছটার সময়ে আসতে বলছি। বাবসা—এই চার্লিশ মিনিটে আপনাদের সঙ্গে পরিচিতও হয়ে নেবো, আমার উদ্দেশ্যটাও বাস্তব করবো।

কিন্তু উদ্দেশ্যটা বাস্তব করবার আগেই দরজার বেল সঙ্গীতের পরে বেয়ে উঠলো। ডল্লোকের ইঙ্গিতে তাঁর পরিচয়ক গিয়ে দরজা খুলে অভ্যর্থনের নিয়ে এসে ঘরে বসলো। সন্তোষভরে গৃহস্থ্যমী তাঁদের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিলেন। এসেছেন পরিজন স্ত্রী-পুত্র-ব। এই পরিজনের মধ্যে তিনজনের নামই আমরা শুনিয়েছি এ-দেশে এসে থেকে। এঁরা মহাপ্রাণ মানুষ, কিন্তুমিত্রাণে বিশ্বাসী শব্দে বিশ্বাসীই নন, সক্রিয়ভাবেই সেই কাজে তাঁরা মন-প্রাণ নিয়োজিত করেছেন



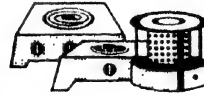
আরও বেশী জ্বালানী বাঁচান!

**কয়েক মিনিটের মধ্যেই  
পুরো খাবার রান্না  
করুন কিংবা**



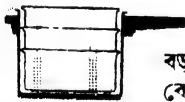
**ডাল, ভাত ও  
তরিতরকারী এক সাথে!**

প্রেস্টিজের ভিতরের বাটী ব্যবহার করে আপনি ডাল, ভাত ও তরিতরকারী এক সাথে রান্না করে নিতে পারেন। সাধারণতঃ প্রেস্টিজ কুকারে রান্না করতে ১৫-২০ মিনিটের বেশী সময় লাগে না। আর মশলাপাতি দিয়ে সামান্য কয়েকটা মিনিট—আপনার পুরো রান্না তৈরী।



**বিজলী, গ্যাস,  
কেরোসিন বা  
কয়লা বাঁচান!**

কেরোসিন বা কয়লা, কিংবা বিজলী বা গ্যাস যাতেই জ্বালানী ব্যবহার করুন না কেন সবচেয়েই প্রেস্টিজে সমান ভাল রান্না হয়। রান্নার সময় কম লাগার দরুন জ্বালানীও কম লাগে এবং আপনার পয়সা ও সময় দুইই বাঁচায়।



**বড় বাটী,  
বেশী রান্নার জল!**

কিন্তু এই বাটী থাকার দরুন কুকারের ভিতরে রান্নার জায়গাটি কি কমে যায় না? না, প্রেস্টিজে তা হয় না। প্রেস্টিজ এমনভাবে তৈরী যে প্রায় কুকারের আয়তনের সমান বাটী বসানো যেতে পারে। সেইজন্য প্রেস্টিজে সম-আয়তন অন্যান্য নম্বার কুকারের চেয়ে বেশী বাটী রাখবার জায়গা পাওয়া যায়। এটা আপনি স্বচক্ষে যাচাই করে নিতে পারেন।

**বিদ্যামঞ্জলীঃ “কয়েক মিনিটেই  
পুরো রান্না সারুন” পুস্তিকা**

এই পুস্তিকা পেতে হলে লিখুন—দি কনজিউমার সার্ভিস ম্যানেজার,  
প্রেস্টিজ ন্যাশনাল সার্ভিস সেন্টার, টি.টি. (প্রাইভেট) লিমিটেড,  
দূরবাণী নগর, বাঙ্গালোর-৫৬০ ০১৬,

**বাটীতে কত  
বেশী জায়গা?**

প্রেস্টিজ কুকারটি আপনি স্বচক্ষে দেখুন! এবং সম-আয়তন অন্যান্য নম্বার প্রেসার কুকারের সঙ্গে তুলনা করুন। প্রেস্টিজ “প্রীতি ৬.৫” মডেলের কুকার আপনাকে ৫১% বেশী বাটী রাখবার জায়গা দিচ্ছে। প্রেস্টিজ “এলিগেন্ট”—এ ১০১% বেশী বাটী রাখবার জায়গা আছে। একই সাথে পুরো রান্না করতে প্রেস্টিজের চেয়ে ভালো অন্য কোনও কুকার নেই।

**Prestige**

MCA-TT-55-Ben



## ১ এককথা

কোনো মহিলা যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা চায় তবে তাতে বাধা দেওয়ার কী আছে? বোস সাহেব খুব ক্রান্ত চোখে চেয়ে জিজ্ঞেস করে।

দীপনাথ মাথা নেড়ে বলে, মিসেস বোসকে আপনিও চেনেন, আমিও খানিকটা চিনি। প্রপার হাইডেনস না থাকলে উনি সব টাকা পরমা নষ্ট করে ফেলবেন। বাবসা বা দোকান চালাবার জন্য যে মন বরকার তা ঠিক নেই।

গাইডেনস ও নেবে না। আমাকে উনি পাটনার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখন ও আপনার নামটাও সহ্য করতে পারছে না।

কেন বলুন তো।  
ও জানে ওর চারশো টাকা আলাউনস আপনিই ঠিক করে দিয়েছেন এবং যাতে সব টাকা ওড়তে না পারে তার জন্য আপনিই নানারকম প্রকাশন নেওয়ার আড্ডাইস আমাকে দিয়েছেন।

কথাগুলো শুঁকে বলে ভাল করেননি। বোস ক্রান্ত মনে বলে, আই আম টায়ার্ড অফ হার। আর কত অভিনয় করা যায় বলুন তো।

অভিনয় না করতে চাইলে কোর্টে যেতে হয়। সেটাও কি ভাল?

আমি এখন কোর্টে যেতে রাজি। গেলে আপনি সহজেই ডিভার্স পেয়ে যাবেন। তারপর মিসেস বোস 'মামলা' লড়বেন না। কিন্তু তারপরে ওর অবস্থাটা কী দাঁড়াবে ভেবেছেন? ওর বাপের বাড়ির অবস্থাটা ভাল নয়, আত্ম-সম্মানবোধ বেশী বলে উনি নিজের সেখানে যাবেন না। যতদূর খোঁজ রাখি শুঁকে আশ্রয় দেওয়ার কথা কেউ নেই। চাকরি যে চট করে পাবেন তারও সন্দেহ নেই।

সেইজনাই ওর দোকানের স্কীমটা আমি প্রসার্ট করছি।

দীপনাথ শ্রান হেসে বলে, উনি তিন মাসও দোকান চালাতে পারবেন না।

আচমকি বোস সাহেব বলে, লেট হার ম্যামি গুন। আবার বিয়ে করুক। সেই স্কাউন্ট্রলটাকেই করুক, কী নাম যেন, সিন্দেবের না কি।

দীপনাথ ধমধমে মুখে বলে, সিন্দেবের মারবেড যেন। তাহাড়া একটা বেশ বড়লড় ফলারশীপ নিশ্চয় ন এখন আহারিকার।

আমি তো এতসব জানিও না।

আমি জানি। সিন্দেবের কোমর এসব সমস্যার জড়তে চাইতো না। বিয়ের কথা বলছেন। এদেশে এখনো ডিভার্স খেয়েদের অভ সহজে বিয়ে হয় না।

ফাইন্ড এ ওয়ে চ্যাটার্জি। আই ভোট ওয়াস্ট টু ডিচ হার। কিন্তু ওকে আরেক রাখা মানে আমার নিজেরও আটকে থাকা। ইউ নো মাই প্রবলেমস।

দীপনাথ শ্বির চোখে বোস সাহেবকে দেখছিলেন। উত্তর বাংলা থেকে ফিরে আসার কিছু পর থেকেই সে বোস সাহেবকে অত্যন্ত ক্রান্ত ও অধৈর্য দেখেছে।

দীপনাথ মসৃণস্বরে বলে, আজ্ঞা, আমি ভেবে দেখছি। দু একদিন সময় দিন।

বোস সাহেব জবাব দিল না।

দীপনাথ বোসের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের টেবিলে ফিরে এল। অন্য ভিনজন আসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের জন্য আলাদা তিনটে মাইউডের খপের তৈরি হয়েছে। শেষে দীপনাথই খপেরিতে যেতে বাজি হয়নি। তাই সে এখনো মস্ত হলখরটার একপাশে খোলামেলা জায়গায় বসে।

টেবিলের কোণটির দিকে জুটুটি করে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে দীপনাথ। উত্তর বাংলা থেকে ফিরে এসে বার দুই মণিদীপার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার চেষ্টা করেছে। মণিদীপা কথা বলেইনি। ক্রমশ অপ-মানকর গলায় বলেছে 'আই হেট টু, টু উইথ ইউ।' অথচ মণিদীপার সঙ্গে এখন কথা বলার দরকার। বোকা মেয়েটা জানেও না, বা জানলেও বোঝে না যে, তার বিপদ ঘনিয়ে আসছে। দীপনাথ বাইরে থেকে কতদিন বালির বাঁধ দিয়ে রাখবে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দীপনাথ কাছে মন দেয়। কিন্তু আবার আনমনা হয়ে যায়। নিজের ভেতরকার এক পাপবোধ তাকে বড় অস্থির করছে, কান্ডে দিচ্ছে, কাজে মন দিতে দিচ্ছে না। মণিদীপাকে কি সেই নষ্ট, করুণি? সিন্দেবের হয় তো মণিদীপার নেতা ছিল, প্রেমিক ছিল না কিছুতেই। কিন্তু দীপনাথ জানে, মণিদীপাকে যদি সত্যিকারের কিন্নরত কেউ করে থাকে তবে সেই ব্যক্তি সে নিজেই। এখন সে মণিদীপার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও লাভ নেই। তাতে ভাঙা সংসার জোড়া লাগবে না। দীপনাথ নিজের দুর্বল। বড় দুর্বল। মণিদীপার কথা সে খুব কম সময়েই না ভাবে। এখনো এক তীর অশ্রুত আনন্দ রয়েছে মণিদীপাকে মনে করার মধ্যে।

থাকতে না পেরে দীপনাথ বোস সাহেবের বাড়িতে রিং করল। বাবচি ফোন ধরে জানাল, মেমসাহেব বাড়ি নেই। লানচেও ফিরবে না বলে গেছে।

একা বৌবিয়েছে?  
না, একজন দালাল এসেছিল।  
দালাল কিসের?  
মনে হয় বাড়ির দালাল। মেমসাহেব একটা দোকানঘর খুঁজেছে।

দীপনাথ ফোন বেছে দেয়।  
বিকেল পর্যন্ত অনেক ফোন এল। অনেক কাজ করল দীপনাথ। কিন্তু মন কান সবই উৎকণ্ঠ, রয়েছে অন্য দিকে।

বেলা চারটে নাগাদ ফোন বাজতেই তুলে মেয়েলী গলায় 'হেলো' শুনলে সে প্রায় চোঁচিয়ে বলল, মণিদীপা?

মণিদীপা? মণিদীপা আবার কে বলো তো সেজনা!

ওঃ, তুই বিল? কব ফিরল?  
আজ্ঞা।  
প্রথম কেমন আছে?  
ভালই তো। নিজের আপনজনদের কাছে ভাল থাকারই তো কথা।

## পুজোয় ছোটদের অনন্য উপহার

### কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান-এ

প্রোফেসর শঙ্কর লেখা

থাকছে



কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে থাকবে :  
বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ও কল্প-বিজ্ঞান  
বিজ্ঞানীদের ছেলেবেলার গল্প  
সংখ্যা নিয়ে মজার খেলা  
বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার  
এবং গত একশ বছরে প্রকাশিত  
সেরা লেখকদের নির্বাচিত  
বিজ্ঞানের নিবন্ধ ও গল্প।  
সমরজিৎ করের সম্পাদনায়  
বাংলায় ছোটদের জন্য  
প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে  
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কল্প-বিজ্ঞান  
বিষয়ক রচনার আশ্চর্য সঙ্কলন!

প্রকাশিত হচ্ছে  
পুজোর অনেক আগেই।  
বই বের করার পর কাড়াকাড়ি  
যে পড়বেই একথা  
জোর দিয়েই বলা যায়।



## অবন ঠাকুরের ছোটদের সম্ভার

২৫

## উপেন্দ্রকিশোর রচনাবলী

১ম খণ্ড ৬৫, ২য় ৬০

## হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

১ম খণ্ড ২৫, ২য় ২০, ৩য় ২০  
৪র্থ ২৫

## সুকুমার রায় রচনাবলী

১ম খণ্ড ২৫, ২য় ৬৫  
একত্রে বাঁধাই ৪০

## লীলা মজুমদার রচনাবলী

১ম খণ্ড ২৫, ২য় ২৫

লীলা মজুমদার অনূদিত

## হান্স অ্যাণ্ডারসন রচনাবলী

১ম খণ্ড ২৫, ২য় ২০  
একত্রে বাঁধাই ৪০

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত

## গ্রিমভাইদের সমগ্র রচনাবলী

১ম খণ্ড ২৫, ২য় ২০, ৩য় ২০

অশোককুমার মিত্র ও  
শৈলশেখর মিত্র অনূদিত

## এডওয়ার্ড লিয়ারের রচনাবলী

১২

জয়ন্ত চৌধুরী অনূদিত

## লুইসকারলরচনাবলী

১ম খণ্ড ২৫, ২য় ২০, একত্রে ৪০

## মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের ছোটদের সম্ভার

প্রকাশিত হচ্ছে

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী  
কম্পোজ স্ট্রিট মার্কেট ৭ কলিকাতা-৭

ওভাবে বলছি কেন? কিছ' হয়েছে?

এসো, সব বলব।

আজ আমার সময় হবে না রে।

না হয় কাল অফিসের পর এসো। আসবে?

চেষ্টা করব।

মণিদীপাটা কে বলে তো।

ওং, বসের বউ। টেলিফোন করার কথা ছিল,

তাই হঠাৎ মেয়েলী গলা শুনে ভাবলাম সে-ই।

তোমাকে আর তোমার বসের বউকে নিয়ে  
কিন্তু অনেক কথা রটেছে। জানো?

দীপনাথ ভীষণ চমকে গিয়ে বলে, সে কি?

এমন কি আমি শিলিগুড়িতেও শুনে এসেছি।

কে বলল?

এলে বলব। ফোনে কি সব কথা উঠিত?

কোথা থেকে কথা বলছি?

মাদ্রাজীদের ফ্ল্যাট থেকে। ছাড়ছি। কাল  
এসো।

বাকি সময়টা দীপনাথ গাড়লের মতো হত-  
বুন্ধি মুখে বসে রইল চোরে। কিছুই করতে  
পারল না।

এক সময়ে উঠে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল  
রাস্তায়। চারদিকে রথযাত্রার ভীড়। গায়ে গায়ে  
লোকে। বাস ট্রাম ট্যাক্সিতে বাদুড়াকোলা মানুষ।  
দীপনাথ পথে পথে অনেকক্ষণ হটল। হঠাৎ  
হঠাৎ 'রেসকোর্স' পেয়ে এল। জাইনে, কখনো  
বাঁয়ে মোড় নিয়ে এ-রাস্তা ও-রাস্তা ধরে অবিরাম  
হেপ্টে সে গরন নিউ আলিপুরে বাস সাহেবের  
ফ্ল্যাটের সামনে পৌঁছালো। তখন তার ভীষণ ক্লান্ত  
হয়ে পড়ার কথা। কিন্তু মানসিক বিকলতায় সে  
দেহের ক্লান্তি টের পাচ্ছিল না।

সম্পূর্ণ গাট অন্ধকার নেমে গেছে। শীত-  
শেষের ঠান্ডার অন্তিম কামড় এবার বেশ তীব্র।  
দীপনাথ অবশ্য মাইল মাইল হেপ্টে ঘেঁষে গেছে।  
আকস্মিক জলতেজটা পেয়েছে তার। তবে ক্ষুব্ধবোধ  
নেই। লোকে তার আর মণিদীপার কথা বলাবলি  
করে। সত্যিই করে। নইলে বিলু জানল কি  
করে? লজ্জা। লজ্জা।

কালং বেল টিপতে হল না। দরজা খোলা  
ছিল। আর খোলা দরজা দিয়ে ঢুকতেই দেখা গেল,  
বইয়ের সাজ পরা মণিদীপা বসার পার কিছ',  
কাগজপত্র আর একটা ডটপেন নিয়ে কিছ' করছে।  
টেবিলে এককাপ কফি।

এবার বেশ কিছুদিন পর মণিদীপার সঙ্গে  
দেখা হল দীপনাথের। অনেক রোগা হয়ে গেছে  
মেয়েটা। চোখে-মুখে কিছু রক্ততা। সাজগোজে বেশ  
একটু অমনোযোগ।

দীপনাথকে দেখে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল  
একটুক্ষণ। তারপর বলল, এত ঘেমেছেন কেন?

আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

কথা? বলে ঠেট ওলটয় মণিদীপা, কথা তো  
অনেক হল। কথায় কিছ' হয় না।

দীপনাথ একটা ক্লান্ত শ্বাস ফেলে বলে,  
জরুরী কথা আছে। এটা ইয়াক' নয়।

মণিদীপা এই ধমকটা আশা করেনি। তার  
শব্দভাবক সতেজ অহংকারী ভাবটা সম্প্রতি নানা  
ঘটনায় বড় বেশী মার খেয়েছে। এসেছে ভয়,  
জীবনের অনিশ্চয়তা, ভাঙা জমির অভাব বোধ।

মণিদীপা দীপনাথের সামনে একটু বিবর্ণ  
হল, একটু কঁকড় গেল। এতই চেঁখে পড়ার  
মতো ব্যাপার যে, উদ্ভ্রান্ত দীপনাথেরও চোখ  
এড়াল না।

মণিদীপা হঠাৎ উঠে সিলিং পাখটা আলো

চালিয়ে দিয়ে এসে বলল, বসুন। কফি বলে  
আসি।

তার আগে কথাটা।

কথাটা তার পরে। আপনি বসুন।

দীপনাথ বসে চোখ বুজল। সিলিং পাখার  
হাওয়াটা এত মিষ্টি লাগল যে বলার নয়।  
মণিদীপার গায়ের সুগন্ধ ব্যাভাসটাকে ভারী ঘন  
করে রেখেছে।

চোখ বুজে বেশ কিছুক্ষণ শূন্য মাথায় বসে  
গাফার পর মণিদীপা ফিরে এল। বাবা' নয়,  
নিজেই ট্রেতে কফি আর গোটা দুই চকোলেট  
কেক-এর টুকরো নিয়ে এসেছে।

দীপনাথ তাকিয়ে দেখল। তারপর হাস বাড়িয়ে  
কফির কাপটা তুলে নিয়ে বলল, টেলিফোনে  
আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাননি কেন  
বলুন তো!

মণিদীপা জবাব দিল না। চাপ করে ফুলদনি  
থেকে ফুল তুলে তুলে আবার সাজাতে লাগল,  
দীপনাথের দিকে পিছন ফিরে।

কথা বলবেন না

মুদ্র শান্ত স্বরে মণিদীপা বলে, কথা ডের  
হয়েছে। আর আমার কথা ভাল লাগে না।

কথা ছাড়া কমিউনিজ'ট করার আর কী  
উপায় বলুন!

মণিদীপা মরালীর মতো শরীর বাকিয়ে  
একবার কাকয়। তারপর বলে, লাভ হাজ ইটস  
ওন ল্যাংগুয়েজ।

দীপনাথ মুক হয়ে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে  
বলে, আপনি কী চান একটু খুলে বলবেন?

একটা দোকান। খুব সুন্দর জায়গায়, ভ্রম  
পরিবেশে গুলু, একটা দোকান। আপাতত আর কিছ'  
নয়।

আপনার মাথায় দোকানটা কে ঢোকাল বলুন  
তো।

দ্যাট ইজ নান অফ ইওর বিজনেস।

দীপনাথ নীরবে শব্দাতটা সহ্য করে শান্ত  
স্বরেই বলে, দোকান যদি একান্তই দিতে হয়  
তবে আমার আপত্তি তোলা ছাড়া তা হওয়ার নয়।  
আপনি তো তা জানেন।

জানি। তাই আমি বাস সাহেবের কাছ থেকে  
কিছ'ই আর প্রত্যাশা করি না। আই আম  
আরেনট্রিং এ কার্পিটাল ফ্রম এলসোয়ার।

আপনি ভুল করছেন মণিদীপা। ব্যবসা  
আপনার থাকে নেই।

দ্যাট ইজ অলসো নান অব ইওর বডিক। বাস  
সাহেব যে ছু'কারিটির মধ্যে ঘোঁরসা করছেন  
এখন থেকে আপনি তাকেই আডভাইজ দিতে শব্দ  
করুন না।

দীপনাথের সংশয়টা ছিলই। খুব অবাক হল  
না। বলল, ছু'কারিটি আবার কে?

ন্যাকামি করবেন না দীপনাথবাবু, ইউ নো।

বাস সাহেব কোথায়?

এ সময়ে বাড়ি থাকেন না। এই আসে  
টিন এজারকে হাত করতে হলে একটু বেশী লেবার  
দিতে হয়। হি ইজ ডায়িং একজ্যাকটল দ্যাট।  
আপনি তো সবই জানেন। উনি হয় তো এটাও  
আপনার পরামর্শই করছেন।

দিগ্ভাবিকজ্ঞানশূন্য দীপনাথ হঠাৎ উঠে  
মণিদীপার কাছে এসে এক ঝটকায় তার কাঁধ  
ফিরিয়ে মুখোমুখি দাঁড় করাল। বলল, আমি কিছ'  
জানি না। এখন আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব  
দিন।  
(ক্রমশ)



## বিজ্ঞান

### কৃত্রিম রক্ত

জাপানের জনৈক শল্যচিকিৎসক জরুরীকালীন প্রয়োজন্যের সময় এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ কাজে লাগিয়েছেন। এই যৌগ স্বাভাবিক রক্তের মতই নতুন রক্তস্রোতের স্রবণকারী করার ক্ষমতা রাখে।

ভরলোলের নাম উই কেমিক্যাল হোন্ডা। কমপ্লেক্স কৃত্রিম মৌলিকাল কলেজ, জাপান।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের একজন সাংবাদিক ডঃ হেনডাকে প্রশ্ন করেছিলেন, অস্ত্রোপচারের সময় মৌলিক রক্তের দেহে এই কৃত্রিম রক্ত আর্পন চুকিয়েছেন?

মোট ১৫০ জন। সবই জরুরী কেস। এক প্রত্যেককে ক্ষেত্রেই আমরা সফল পেয়েছি—ডঃ হেনডার উত্তর।

দারুণভাবে যৌগটিকে বলা হচ্ছে কৃত্রিম রক্ত। রাসায়নিক নাম 'এফ ডি এ'। 'এফ ডি এ' তৈরি করার জন্য বিজ্ঞানীরা দুটি রাসায়নিক যৌগের সাহায্য নিয়েছেন। যৌগ দুটির নাম পারক্লোরোডেকাভিন এবং পারক্লোরোট্রাইপ্রলমাইন। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, 'ঠিক ওয়েশ করতে যা বোকার, 'এফ ডি এ' কিন্তু তা নয়। অন্য একে বলা চলে অক্সিজেন পরিবাহী।' বলেছেন ডঃ হেনডা।

'এফ ডি এ'র উদ্ভাবক ওসাকার গ্রীন রুস কর্পোরেশনের বিজ্ঞানী ডি জে নটিও।

ডঃ হেনডার মত : 'এফ ডি এ'ই প্রথম কৃত্রিম রক্ত। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীর দেহে কৃত্রিম এট এক এক নাগাল। দুই থেকে তিন দিনও আমাদের চোখেতে হয়েছে। এতে করে তাদের কারোর দেহেই কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া ঘটে নি। কেউ মারাও যান নি। আমরা ভেবেছিলাম, শরীর হ্রাস কৃত্রিম এই রক্ত সহ্য করতে পারবে না, পরিতাপ করক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যেমন কিছুও ঘটে নি। এবং আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই, কোনো শরীরে রক্ত দিতে গেলে চিকিৎসকরাই ধরেকটি বিকল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। যেমন ধরন, স্বাভাবিক রক্তের ব্যাপারে প্রথমেই তাদের দেখতে হয় সেই রক্ত কোন গ্রুপের। অনেকই হয়ত জানেন, এক-এক জনের রক্ত এক-এক গ্রুপের হয়ে থাকে। এভাবে যে কোন মানবের রক্ত ঠিক মত থেকেনা রোগীর দেহে ঢোকানো সম্ভব নয়। কারোর দেহে রক্ত দিতে গেলে প্রথমেই দেখে নিতে হয়, তার দেহে ঠিক কোন গ্রুপের মধ্যে পড়ে। তারপর দেখতে হয়, তার শরীর থেকে রক্ত সংগ্রহ করা হবে তার রক্তের গ্রুপ তার দেহের গ্রুপ হলে তার রক্তের গ্রুপের অনুদ্বন্দ্ব কী না। যদি অন্য গ্রুপ হয়, তবেই এর জনের রক্ত আর এক জনের শরীরে দেওয়া সম্ভব না। নতুন দিতে বিপরীত হওয়ারই সম্ভাবনা। সম্ভাবনা কোন, রক্ত তা ক্ষতিকারকই হয়। অনেক সময় রোগীর জন্য ঠিক যে গ্রুপটির রক্ত দরকার, সেই গ্রুপের রক্ত দেওয়ার মত দাতা হাতের কাছে পাওয়া যায় না। রাত বাক্তও না থাকতে পারে। 'এফ ডি এ' এটি অস্বীকার্য দূর করবে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, কারোর দেহে যে কোন গ্রুপের রক্তই থাক না কেন, রক্তের প্রয়োজন হলে তাদের সবাইকেই 'এফ ডি এ' দেওয়া যেতে পারে। এতে করে কোন বিপন্ন প্রতিক্রিয়া ঘটে না।

'এফ ডি এ' দেখতে কতকটা দূপের মত। 'স্টট ইজ আন ইমালসন', ডঃ হেনডার মতবাব। 'শুক্ল-কোষ একে গ্রহণ করে, সংরক্ষণও করে। কিন্তু কোন রক্ত শারীরিকভাবে দিক দিয়ে এর তাৎপর্যই বা কী, সে সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কিছু জানা যায় নি।'

স্বাভাবিক রক্তের সঙ্গে 'এফ ডি এ'র তা হলে পার্থক্য কোথায়?

ডঃ হেনডার উত্তর, হ্যাঁ, পার্থক্য রয়েছে। 'এফ ডি এ' সাধারণ রক্তের মত শব্দ অক্সিজেনই পরিবহন করে। আর কিছু নয়। স্বাভাবিক রক্ত অক্সিজেন ছাড়াও শরীরের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দেয় নানান রক্ত ঘনিষ্ঠ পদার্থ। ফিউমিন এক পণ্ডিত সামগ্রী। দেহ-

কোষের বৃদ্ধি, বিজ্ঞান এবং শারীরিক ক্রিয়াকর্মের জন্যে এসব দরকার। 'এফ ডি এ'র পক্ষে একমাত্র অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করা সম্ভব নয়। এই সব কাজও 'এফ ডি এ'র পক্ষে করা যাবে। সম্ভব হয় অল্প দিনের মধ্যেই তার জন্যে আমরা গবেষণা শুরু করছি। যদি আমরা সফল হই, তা হলে অল্প ভবিষ্যতে লিউকেমিয়া এক বিজ্ঞান রক্ত-দোকানিত চিকিৎসার কাজ সহজতর হবে।

কৃত্রিম রক্তের এই শল্যচিকিৎসক আরও বলেছেন, যে ১৫০ জনের দেহে 'এফ ডি এ'র অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল, তাদের সবাইলই জরুরী কেস। হাসপাতালে নিজে আসার সঙ্গে সঙ্গে এভাবেই সময় নষ্ট না করে তাদের দেহে অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল। অস্ত্রোপচারের আগে তাদের জন্যে প্রথমেই আমরা স্বাভাবিক রক্ত জোগাড় করার চেষ্টা করেছি। সেই রক্ত সংগ্রহ করা সম্ভব না হওয়ায় আমাদের কৃত্রিম রক্তের সাহায্য নিতে হয়েছিল। তবে রুটিন মার্ক চিকিৎসার জন্যে যাতে 'এফ ডি এ' ব্যবহার করা যায় তার জন্যে জাপান সরকারের অনুমোদন দরকার। সে অনুমোদন এখনও আমরা পাই নি। সরকার থেকে বলা হয়েছে, আগে প্রমাণ করন, কম করেও ৩০০ জন রোগী এ ধরনের রক্ত নিয়ে আোগ্য লাভ করেছে, তবেই সরকারী অনুমোদন দেওয়া হবে।

চিকিৎসার সময় প্রতিটি রোগীর দেহে 'এফ ডি এ' দেওয়া হয় ২০০০ থেকে ৩০০০ মিলিলিটার। আর তার জন্যে সময় লাগে প্রায় দুই ঘণ্টা। শরীর প্রবেশ করার পর 'এফ ডি এ'র প্রতিক্রিয়া থেকে তিন ঘণ্টার মত। চিকিৎসার জন্যে ডঃ হেনডা আপাতত পণ্ডাশ শতাংশ স্বাভাবিক রক্তের সঙ্গে পণ্ডাশ শতাংশ 'এফ ডি এ' ব্যবহার করেছেন। কাজ করার পর এই যৌগ ফুসফুসের ভেতর দিয়ে এসে নিঃস্বাসের সঙ্গে শরীরের বাইরে পরিভ্রম হয়। এবং শরীর থেকে পরোপরি মজুত হতে সময় নেয়। তিন থেকে ছয় মাসের মত।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, অদ্ভুতভাবেই চিকিৎসার ব্যাপারে ব্যাপক রক্ত সঞ্চালনের ক্ষেত্রে 'এফ ডি এ'র ভূমিকা যদি নিষ্ঠুরযোগ্য হিসেবে প্রমাণিত হয়, অস্ত্রোপচারের কাজ তখন সহজতর হবে সন্দেহ নেই। পৃথিবীর সব দেশে হাসপাতালে যেতেই প্রচুর রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। অস্ত্রোপচারের জন্যে চাই প্রচুর রক্ত। জনসাধারণের পক্ষে অত রক্তের যোগাযোগ দেওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। এ ছাড়া আছে গ্রুপের প্রশ্ন। ঠিক যে গ্রুপের রক্ত দরকার, সেই গ্রুপের রক্ত অথবা রক্তমতাই হতে পাওয়া গেল না সময় মত। হয়ত রক্তদাতা পাওয়া গেল, কিন্তু রক্ত দেওয়ার মত তার ক্ষমতাই নেই। এর পর দেখতে হয়, যিনি রক্ত দিচ্ছেন, তিনি আবার রোগগ্রস্ত কী না। কারোর সংক্রামক রোগ অথবা রক্ত অনাকর্ষক বস্তু থাকলে তার রক্ত অপরের শরীরে ঢোকান বিপজ্জনক। কৃত্রিম রক্তের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন ঝুঁকি থাকবে না। এ ছাড়া, কৃত্রিম রক্ত দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করাও যাবে।

### মানবকল্যাণে তেজস্ক্রিয়তা

তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে বাস্তব সমস্যা সমাধানের প্রথম ঘটনাটি সত্যিই মজার ব্যাপার।

১৯১১ সাল। 'লর্ড' না হেভিস নামে একজন ভরূণ ম্যাগনেটারে এলেন গবেষকদের সাহায্য করার কাজ নিয়ে। খুবই সাধারণ চাকরি। খনিজ পদার্থ থেকে প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় সামগ্রী পৃথক করা, এই ছিল তার কাজ।

অনেকই জানেন, কতুমতাই পরমাণু দিয়ে তৈরি। অনেক সময় দেখা যায় একই মৌলিক পদার্থ, কিন্তু তাদের বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করে তাদের পরমাণুর ভর মাপলে দেখা যায় তাদের ভর পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র। একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন ভর বিশিষ্ট এই পরমাণুদেহই বলা হয় আইসোটোপ। এই সব আইসোটোপেরা অনেককে স্থায়ীভাবে অবস্থা। তাদের নিউক্লিয়াস বিকিরণ ত্যাগ করে ভিন্নতর নিউক্লিয়াস পরিণত হয়। যে সব কতুর পরমাণুর নিউক্লিয়াস



জে জে পোল আভিকার মানবের কাছে এক জীবিত বিজ্ঞানী। এই পোল গ্ন-রোগের জীবাণু ছড়ায়। বিজ্ঞানের সাহায্যে এই পোলক বংশবৃদ্ধি প্রতিরোধের চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা।

যেহেতু 'স্বভাবগতভাবে' বিকিরণ বের হয়, তাদের বলা হয় রেডিও আইসোটোপ বা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। আবার এমনও কিছু কিছু আইসোটোপ আছে, যাদের কোন বিকিরণ নেই। এদের বলা হয় স্থায়ী আইসোটোপ। উল্লেখ করা যেতে পারে, কিছু কিছু রেডিও আইসোটোপ প্রকৃতিতেই পাওয়া যায়। যেমন, রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম-২৩৫ প্রভৃতি। তবে বেশির ভাগ রেডিও আইসোটোপ তৈরি করা হয়ে থাকে ফারও যন্ত্র বা অরকসেলোরে এক পারমাণবিক চূর্ণে। এই সব যন্ত্রে পরমাণুর উপর নিউট্রন, প্রোটন, প্রভৃতি পারমাণবিক কণার সাহায্যে প্রচণ্ডভাবে আঘাত হলে বিভিন্ন আইসোটোপ তৈরি করা হয়ে থাকে। হেভিস বখন ম্যাগনেটারে এসে কাজে যোগ দেন তখন আকসেলেরা অথবা পারমাণবিক চূর্ণ কিছু কিছু আইসোটোপ তৈরি করেন। খনিজ পদার্থের ভেতর থেকে একমাত্র প্রকৃতিজাত তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পৃথক করাই ছিল তার কাজ।

হেভিসের আর্থিক অকথ্য তখন খুবই ধারাপ। ফলে আগ্রহের জন্যে তাঁকে বোহেমিতে হয়েছিল খুব কম ভাতার একটি ছোট ঘর। আর খাওয়াদাওয়ার চালাতেন ওই ঘরেরই জমিকা মহিলা-মালিকের কাছে। অন্য এক জনেরও তাঁকে আতিথ্য পরমাণু গণিতে হত।

এইভাবেই চললো বেশ কিছুদিন। কিন্তু একদিন খেতে গিয়ে কেমন যেন সন্দেহ হলো তাঁর। তিনি দেখলেন, যে খাবারটি কয়েকদিন আগে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল, সেই একই খাবার গৃহকর্তা আবার তাঁকে খেতে দিয়েছেন। খাওয়ার শেষে কোন কোন খাবারের কিছু অংশ তিনি ফেল রাখতেন। দেখতে, কয়েক দিন পর সেই একই রকম খাবার আবার তাঁকে খেতে দেওয়া হয়েছিল। একবার ভাবলেন, খাদ্যতালিকার এক-খোঁরমিতা দূর করার জন্যেই হয়ত এই ভাবে কয়েকদিন পর পর আগের খাবারের পুনরাবৃত্তি করছেন গৃহকর্তা। আবার এমন সন্দেহও হলো, আগের দিনে ফেলে যাওয়া খাবারই আবার তাঁকে খেতে দেওয়া হচ্ছে না তো?



পশ্চিম জার্মানির জলিখে অবস্থিত এক পারমাণবিক গবেষণাগারে অধিক ফলনশীল বালির চারা তৈরি করছেন বিজ্ঞানীরা। এর জন্যে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সাহায্য নেওয়া হয়েছে

৫ম খণ্ড প্রকাশিত হল  
পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদে ২৫ খণ্ডে

## বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও ছোটগল্প

(প্রথম পর্যায় ভারতীয় উপমহাদেশ বাদে)

সম্পাদক : ড. জে. ও. রবীন্দ্র ও. ধীরেন্দ্র

ড. জে. ও. রবীন্দ্র ও. ধীরেন্দ্র  
দেবনাথ, ড. বিষ্ণু বসু,  
অধ্যাপক সুনীল সাহা, প্রাচীন  
মহাস্থান।

এশিয়া (ভারতীয় উপমহাদেশ বাদে),  
আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা ও  
অস্ট্রেলিয়া - বিশ্বের এই পাঁচটি মহা-  
দেশের বহুলাংশ কথাসাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ  
রচনার সংকলন।

আমরা গ্রাহক নিষ্ঠা। গ্রাহকদের  
১০.০০ টাকা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে।  
প্রতি খণ্ডের গ্রাহক-মূল্য ২২.০০। এক-  
কালীন গ্রাহক-মূল্য ৪৫০.০০ টাকা।  
প্রতি খণ্ডের সাধারণ মূল্য ৪৫.০০।

১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে

## বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কিশোর কাহিনী ১২ খণ্ডে

সম্পাদক : ড. জে. ও. রবীন্দ্র ও. ধীরেন্দ্র  
দেবনাথ, ভারত ভাস্করী, চিত্রময় মহাস্থান।

● বিশ্বের বিখ্যাত কিশোর উপন্যাস।  
● ছোটদের সব রকমের সব স্বাদদের  
সেরা গল্প—ভূতের, হাসির, গোয়েন্দা,  
আতঙ্কিতকার, সত্য শিকার-কাহিনী,  
ভৌগোলিক অভিযান, ডাকাতির কথা,  
যুদ্ধক্ষেত্রের গল্প, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক  
আবিষ্কারের কাহিনী। দেশবিদেশের  
পৌরাণিক কাহিনী, লোকগল্প ও  
রূপকথা। ঈশপ-ক্রিয়াক-পুস্তক প্রভৃতি  
নিষ্ঠগল্প, মহাকাব্য ও প্রাচীন কাব্যের  
গল্প।

গ্রাহক নেওয়া হচ্ছে। গ্রাহক-চাঁদা  
১০.০০। প্রতিখণ্ডের গ্রাহক-মূল্য :  
২০.০০। এককালীন গ্রাহক-মূল্য :  
২০০.০০।

১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে

## বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বহুস্তর উপন্যাস ও গল্প

উপদেষ্টা : ড. জে. ও. সম্পাদক : অসিত  
সরকার, সুনীল সাহা, চিত্রময় মহাস্থান।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রহস্য উপন্যাস ও গল্পের  
সকল (অনুবাদ ও মৌলিক রচনা)।  
গ্রাহক নেওয়া হচ্ছে। গ্রাহক-চাঁদা  
১০.০০। প্রতিখণ্ডের গ্রাহক-মূল্য :  
২০.০০। এককালীন গ্রাহক-মূল্য :  
২০০.০০।

প্রতিখণ্ডের সাধারণ মূল্য : ৩২.০০।

ডাকে বই নিলে আলো ডাকমাওল।  
একমাত্র এককালীন গ্রাহকের প্রতি  
খণ্ডের জন্য ৩.০০ করে ডাকমাওল।  
টাকা নিজে এসে, মালি অর্ডার বা  
ব্যাংক ড্রাফট (চেক নয়) দিতে হবে।  
ডালো কাগজ, ডালো ঝাঁক।

গ্রন্থনিলয়

৫২/১বি পটুয়াটোলা লেন, কলি-৯

সংস্কৃত দূর করার জন্যে অভিনব একটি পদ্ধতির  
কথা ভাবলেন হেভিস। একদিন খেঁজার পরে যে  
খাবারটি অবশিষ্ট হিসেবে পড়ে রইলো গৃহকর্তার  
অলসতা তার মধ্যে বংশসামান্য তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ  
মিশিয়ে দিলেন তিনি।

এর পর কয়েকদিন অপেক্ষা করলেন হেভিস।  
জরুর, হ্যাঁ, একদিন সেই ভুত্বাক্ষেপ খাবারের মতই  
একটি খাবার টোপলার উপর রেখে গেলেন গৃহকর্তা।  
তার মনে হলো, এই খাবারই তো কিছুদিন আগে  
তাকে দেওয়া হয়েছে। তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে-  
ছিলেন একটি 'গোল্ড লিফ' ইলেকট্রোস্কোপ।  
ইলেকট্রোস্কোপটি খাবারের প্লেটের সামনে আনতেই  
তার সোনার পাত ল্যাফিয়ে উঠলো। তার মানে, তার  
খাবার থেকে বোঝে আসছে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ।  
পরীক্ষার বোঝা গেল গৃহকর্তা। তাকে পুরনো খাবারটি  
দিয়েছেন। তাঁর ভুত্বাক্ষেপ খাবার, যার মধ্যে তেজ-  
স্ক্রিয় আইসোটোপ মিশিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ওই  
বিকিরণ আসছে সেই আইসোটোপ থেকে।

হেভিস বাগারটা দেখালেন গৃহকর্তাকে। বললেন,  
বাসি খাবার দিয়েছেন আপনি আমাকে। দিন কয়েক  
আগে যা আমাকে খেতে দিয়েছিলেন তারই ভুত্বাক্ষেপ।  
ভরমাইলো কিন্তু হেভিসের অভিযোগ উড়িয়ে  
দিলেন। বরং ফল হলো বিপরীত। 'গোল্ড' লিফ  
ইলেকট্রোস্কোপটি দেখিয়ে বললেন, ওসব মাজি-  
ক-ট্যাঙ্ক আমার বাড়িতে চলবে না। তুমি এক্ষণি  
আমার ঘর ছেড়ে দাও।

হেভিস কাশতাহারী হলেন।  
উল্লেখ্য, পঞ্চতী কালে জীক-বিজ্ঞানে তেজস্ক্রিয়  
আইসোটোপের ব্যবহার ঘটিয়ে গবেষণার জগতে নতুন  
এক দিগন্ত খুলে দিয়েছিলেন হেভিস। এই অসামান্য  
কৃতিত্বের জন্যে ১৯৪০ সালে তাকে নোবেল পুরস্কার  
দিয়ে সম্মানিত করা হয়। পরে মাননিকল্যাণে তার এই  
অসামান্য সদরপ্রসারী হিসেবে বিবর্তিত হয়। এক তার  
স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ১৯৫৯ সালের 'আটম ফর  
পিস' পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৫৭ সালে জন্ম নিলো ইনটারন্যাশনাল  
ম্যাট্রিক্স এনার্জি এজেন্সি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে  
পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের ব্যাপারে পারমাণবিক  
যোগাযোগ স্থাপন, বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রযুক্তিগত  
সাহায্য যোগানার ব্যাপারে সাহায্য করা ডাড়া ও গোড়া  
থেকেই তাঁরা আরও একটি ক্ষেত্র নিয়ে উঠে পড়ে  
লাগেন। সেটা হলো মানব কল্যাণে তেজস্ক্রিয়  
আইসোটোপের প্রয়োগ। কিংবা তিন দশকে পৃথিবীর  
বিভিন্ন দেশে অনেকগুলি পারমাণবিক চুল্লি কমানো  
হয়েছে। কমানো হয়েছে শক্তিশালী পারমাণবিক-  
খরচ বৃদ্ধি। ওই চুল্লি এবং খরচ বৃদ্ধি তাঁর হচ্ছে  
নানা রকম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। সেই আইসোটোপের  
সাহায্যে কী না করা হচ্ছে এখন।

আইসোটোপের তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সাহায্যে  
তৈরি করা হয়েছে নতুন জাতের বাঁজ। ওই সব বাঁজ  
থেকে পাওয়া গেছে অধিক ফলনশীল ফসল। ধান  
গম, ডাল, আখ—অনেক কিছু। রোগের হাত থেকে  
ফসল বাঁচানোর জন্যেও কাজে লাগানো হচ্ছে তেজস্ক্রিয়  
বিকিরণ। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সাহায্যে নিরাস্ত্র  
অথবা প্রতিরোধ করা হচ্ছে ক্যানসারের মত দুর্যোগিক  
রোগ। কোন ওষুধ শরীরে কোন অংশে গিয়ে সঞ্চিত  
হয়, ইহানীং সে বস্তু জানার ব্যাপারেও নির্ভর করতে  
হয় তেজস্ক্রিয় পদ্ধতির উপর।

পরিবেশের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে নানা রকম  
দুর্ভিত্ত কণ্ট। ওই সব কণ্ট কী ভাবে ছড়ায়, কত  
তাড়াতাড়ি ছড়ায়, সে সব তথ্য জানার ব্যাপারেও  
পরিবেশ বিজ্ঞানীরা এখন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের  
সাহায্য নিয়ে থাকেন। বড় বড় শহরের পরঃপ্রণালীর  
জল এখন বড় রকমের সমস্যা। ওই জলে জীবাণু  
আবদ্ধ। ছাড়াও কাকে নানা রকম রোগের জীবাণু,  
মত পরিবেশে ছেড়ে দেওয়ার আগে ওই সব জীবাণু  
বদলে করার ব্যবস্থা নিয়েছেন অনেক। এর জন্যে  
পরঃপ্রণালীর জন্যে রিচিও প্যাউজার থেকে কত রকম  
জীবাণুনাশক রাসায়নিক যৌগই না মিশিয়ে দেওয়া হয়ে

থাকে। হুমকিত এই রাসায়নিক যৌগ জীবাণু বদলে  
করে ঠিকই। কিন্তু নানান দুর্যোগের মধ্যে মিশে  
যখন তার উদ্ভূত প্রাপ্তের অথবা নতুন নানার মধ্যে  
গিয়ে পড়ে তখন তার ফল কাঁড়ার সদরপ্রসারী।  
জলের মত অথবা ডালার প্রণী এক গহগহালা ওই  
সব রাসায়নিক সামগ্রীর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটি  
ক্ষতিগ্রস্ত হাত থেকে পরিবেশ রক্ষা করার জন্যেও এখন  
কাজে লাগানো হচ্ছে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ। নানা  
নান্যায় জল তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সাহায্যে শোধন করে  
জকেই উদ্ভূত পরিবেশে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে  
নিরুদ্ভূত তাল। বিকিরণের স্পর্শে জীবাণুরা মূলে  
হয়। অতএব রোগ ছড়ানোর কোন আশংকা থাকে  
না। ক্ষতিকর রাসায়নিক যৌগ না থাকায় নানান দুর্যোগ  
পরিবর্তিত জল পরিবেশেরও কোন ক্ষতি করতে পারে  
না।

নতুন জল এবং ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ এক  
প্রকার নির্ধারিতরূপে কোনো কাজে লাগানো হচ্ছে তেজস্ক্রিয়  
আইসোটোপ। এর জন্যে ভূস্তরে গর্ত খুঁড়ে ভূগর্ভস্থ  
জলের প্রবাহে মিশিয়ে দেওয়া হয় বংশসামান্য তেজস্ক্রিয়  
আইসোটোপ। মটির নিচে দিয়ে বত দূর জল যায়,  
আইসোটোপও চলে তত দূরে। আর যেখানেই  
আইসোটোপ, সেখানেই বিকিরণ। বিকিরণমাপক  
যন্ত্রের সাহায্যে ওই বিকিরণ ধরা পড়ে। তখন  
কিছেরজ্ঞা বলে দিতে পারেন, ভূগর্ভস্থ জলের প্রবাহ  
কোন দিক বরাবর চলছে।

ইহানীং খাজ সংরক্ষণের ব্যাপারেও কাজে লাগানো  
হচ্ছে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। কলা, পিঁপড়া, আলু,  
এক বিভিন্ন ফসলে ও মাছ মাংস। নিশ্চিত মাত্রার  
তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মধ্যে উপস্থিত সময় মত এই সব  
সামগ্রী রেখে দেওয়া হয়। পরে স্বাভাবিক পরিবেশে  
রেখে দিলে ওরা পচে না, তাদের খাদ্যগুণও নষ্ট হয়  
না। রাসায়নিক পদ্ধতিতেও খাদ্য সংরক্ষণ করা যায়।  
তবে দেখা গেছে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ পদ্ধতিতে  
রাসায়নিক পদ্ধতির চেয়ে খাজ পড়ে কম, খাদ্যে বিকিরণ  
ঘটা সংভাব্যও কম থাকে।

উল্লেখ্য ভাষা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র বিকিরণ  
সাহায্যে খাদ্য সংরক্ষণের ব্যাপারে গবেষণা হয়েছে  
বিস্তার। তাতে আশানুরূপ ফলও পেয়েছেন  
গবেষকরা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ওই পদ্ধতি  
অন্যভাবেই কাজে লাগানো যায়।

যেমন হেভিস, সুন্দরকন্যা অশ্লের মাছ। সুন্দরকন্যা  
নদী নালা এবং সমগ্র অধ্যুষিত অঞ্চলে ধরা পড়ে  
প্রচুর মাছ। কাকের অভাবে সেই মাছ সংরক্ষণ করা  
অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। যারা বরফের  
ব্যবস্থা করতে পারেন, তারা বড় বড় কারবারী। ছোট  
কারবারীদের সন্তা দরে ওঁদেই মাছ বেচে দিতে হয়।  
পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্যোগী হয়ে যদি সুন্দরকন্যা  
এলাকায় একটি বিকিরণের প্ল্যাট কমান বসে, গরীব  
মাছ ব্যবসায়ী তাতে লাভবান হতে পারেন। নিজেদের  
ধরা মাছ ওই বিকিরণ প্ল্যাটে সংরক্ষণ করে নিয়ে  
কলকাতা বা দূরবর্তী অঞ্চলে নিজে আসতে পারবেন  
তাঁরা। এতে করে মাছের অপচয় কমবে, মাছের মত  
মূল্যবান খাবার ব্যাপারে অনেকটাই বর্ধিত হবেন না  
এবং সেই সঙ্গে ক্ষত্র মাছ-ব্যবসায়ীও অর্থনৈতিক  
দিক দিয়ে লাভবান হবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের  
বিজ্ঞান এবং কারিগরি কমিটি বিকিরণ বিবেচনা করতে  
পারেন।

আইসোটোপের চল এখন সবট। শল্যাচিকৎসকদের  
সাসরঞ্জাম নিজস্বাণ করণ—তাও এখন করা হচ্ছে  
তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ নিসৃত বিকিরণের সাহায্যে।  
স্বতন্ত্রের গতি, অভিমুখ—সে সব জানার ব্যাপারেও  
আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা এখন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের  
সাহায্য নিয়েছেন।

হেভিস একদিন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে  
নির্যাস্ত্রন নিয়ে প্রয়োজন। উদাস্তর কবর পর  
সেই আইসোটোপই মাননিকল্যাণে এখন এক বিশিষ্ট  
ভূমিকার অবতরণ।

সমরাজ্যের কর

## আবুজাদ আলি খান অনন্য পরোক্ষা

এক মহান ঐতিহ্যের উজ্জ্বল উত্তরসূরি ;  
শুদ্ধ রাগগুলির অনবদ্য ব্যাখ্যা  
একে এনে দিয়েছে যোগা সন্মান  
ও স্বাতি ।

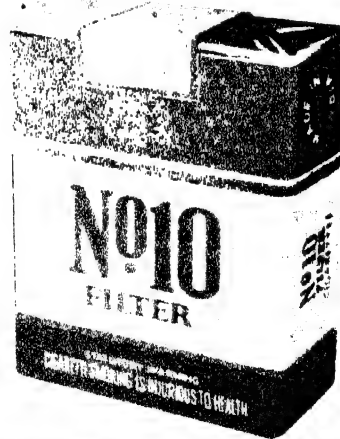
“আমার সুরের মধ্য দিয়ে আমি পৌছতে চাই  
সবার কাছে, আমার সুর জানে না আমার  
বাঁধন । মানে না ধনী গরীবের ভেদাভেদ ।”

এ’র সিগারেট : নান্নার টেন ফিল্টার ।

আপোসহীন মান • অসীম তৃপ্তি

**নান্নার টেন**  
ফিল্টার

**যে স্বাদ দিন রাত  
মন ভরায়**



পূর্ব অরতে  
ফিল্টার সিগারেটের  
মধ্যে এর বিকি  
সবচেয়ে বেশি

# বত্বন!

## প্রত্যাপিত আজীবন বীমার পলিসি

### 50%

পলিসির মেয়াদ  
অন্তের পূর্বেই  
কয়েকটি কিস্তিতে  
বীমাকৃত টাকার  
৫০% পাবেন।



### 100%

আপনার  
পরিবার  
যে কোন সময়ে  
বীমাকৃত টাকার  
১০০% পাবেন।



## দু'ভাবে লাভবান হবার একটি আকর্ষক প্রকল্প

- পলিসির মেয়াদ অন্তের পূর্বেই নিশ্চিতভাবে বীমাকৃত টাকার ৫০% প্রাপ্তির সুযোগ
- যে কোন সময়ে, এমনকি মেয়াদপূর্তির পরেও বীমাকৃত টাকার ১০০% প্রাপ্তির ব্যবস্থা

আপনি এই পলিসি ২০ বছর, বা ২৫ বছরের মেয়াদের জন্য নিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনার ২৫ বছর বয়সে আপনি যদি ২০ বছরের মেয়াদের জন্য একটি প্রত্যাপিত আজীবন বীমার পলিসি নেন, তাহলে আপনি দুটি বিশেষ ধরনের সুযোগ পাবেন। ২০ বছর ধরে নির্দিষ্ট সময় অন্তর আপনি পলিসির শর্তসাপেক্ষে যে টাকা পাবেন, তাতে আপনার ছোটখাটো চাহিদা মেটাতে পারবেন। অধিকন্তু, যে কোন সময়ে, এমনকি মেয়াদপূর্তির পরে যখন প্রিমিয়াম দেবার তাগিদ থাকে না তখনও, আপনার পরিবারকে বীমাকৃত টাকা দেওয়া হবে।

একজন ব্যক্তি ৩৫ বছর বয়সে যদি

২০ বছরের মেয়াদে একটি ২৫০০০ টাকার পলিসি নেন, তাহলে তিনি এইসব সুযোগ পাবেন।

৪০ বছর বয়স অবধি জীবিত থাকলে তিনি পাবেন ৩১২৫.০০ টাকা।

৪৫ বছর বয়স অবধি জীবিত থাকলে তিনি পাবেন ৩১২৫.০০ টাকা।

৫০ বছর বয়স অবধি জীবিত থাকলে তিনি পাবেন ৩১২৫.০০ টাকা।

৫৫ বছর বয়স অবধি জীবিত থাকলে তিনি পাবেন ৩১২৫.০০ টাকা।

এমনকি মেয়াদ অন্তের পরেও যদি তাঁর মৃত্যু হয়, তাহলেও তাঁর পরিবারকে বীমাকৃত টাকা দেওয়া হবে।

২০ বছরের মেয়াদের অন্তর্বর্তী কালে অথবা তার পরে যে কোন সময়ে মৃত্যুজনিত দাবীর ক্ষেত্রে তাঁর পরিবারকে লভ্যাংশসম্মত সম্পূর্ণ বীমাকৃত টাকা দেওয়া হবে, বীমাকারীকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর কোন কিস্তির টাকা দেওয়া হয়ে থাকলে, তাসত্ত্বেও।

এই অনন্য পলিসি থেকে আপনার পরিবার দু'ভাবে লাভবান হবার সুযোগ পাবেন। বিশেষ করে প্রত্যাপিত আজীবন বীমার পলিসির উল্লেখ করে এ সম্পর্কে জেনে নিন। অনুগ্রহ করে আপনার জীবন বীমার এজেন্ট অথবা নিকটস্থ আমাদের কোন শাখা অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।



## ভারতীয় জীবন বীমা নিগম

RADEUS/LIC/SP-37

## পাখিটা

বঙ্গলকুমার গদ্য

পরে দিকে দৌড়ছে নদী      কিছু বলার আগেই  
উড়ে গেল পাখিটা

আকাশ পারল না ধরতে  
বাতাস চেঁচা করল শব্দ শব্দ  
অথচ ওদেরই হাতের মতোয় ছিল

। শব্দ না-থাকার ছিল      এ শব্দ না-থাকার বেদনা  
লেগে থাকে গাছে গাছে আর ছায়ার  
বেশনে এখনো এলোথোঁপা

খুলে ফেলে পুরষ হাওয়া  
একজনের নামে গান গায় দোরেল  
পার      ফুলের ঘোমটা খুলে যে দেখেছিল মৃদু দৃষ্টি চোখ  
সেই বিহ্বল ভ্রমর  
তার স্মৃতিও গালে-হাত বসে থাকে চূপচাপ

পাখিটা      কোনোদিকে না তাকিয়ে  
সোজা উড়ে চলে যায়  
কেউ ধরতে পারে না

## শৈলাবাস স্মৃতি ও ছবি

রাণা সরকার

তুমি যাবে, এ তোমার দূরন্ত পারাপার—  
অরণ্য নির্জন ছায়ার ভরাণের লক্ষ্যহীন ফুল করে।  
এই সব দৃশ্য নিয়ে কিছু ছবি হবে জানি ;  
প্রতিধ্বনি শব্দ হয়ে ছুঁয়ে যার বুকের গভীর।

কাল সারারাত শৈলাবাস নিঃপ্রদীপ ছিল  
প্রাদেশিক মেঘ জ্যোৎস্নায় সারাঞ্চল খেলছিল  
সুকোচুরি খেলা।  
ঘরছুটে বেরাড়া পর্বতের মত তুমি নির্বিধায় ভুলেছিলে  
উকতার নিজস্ব আমেজ।

এখন কুয়াশা সকাল, সেগুল লেকের জলে কাগুজে নৌকোর মত—  
মৃত মেঘ ক্রমশই সরে যাচ্ছে দূরে।  
মেল ব্যাগ শূভেচ্ছার শব্দ প্রতীক নিয়ে এইমাত্র ছুটে গেল -  
দূর সমতলে।

তুমি ফিরে যাচ্ছে, শব্দের বর্ণমালায় বিদায় সংগীত  
মসৃণ জলের স্রোতে নিরুদ্দেশ স্মৃতি।

## আমি দাহ চাই

নীলাঞ্জন মৃত্যোপাধ্যায়

এ বর্ষা থাক নীল পর্বতে একা  
কেন বুঝা তাকে আনো দীন সংসারে?  
মল্লারগানে বিষাদ যে বিজড়িত  
আমি দাহ চাই দীর্ঘ রত্ন দিনে।

সন্ধ্যাসী রোদে ধু-ধু হাওয়া বহে বাক  
মরুদেশ হোক এই শ্যাম প্রান্তর  
বসন্ত আসে, যেমন শরৎ মৃদু  
বড় ভয় আনে উক কলিক সূর্য !

অম্বতা বুঝি মৃত্যুভয়েরও বেশী  
সংসারী দিন মিশেছে বিভ্রমণে  
কোন দিকে যাওয়া? দুই চোখে নিয়ে কর  
প্রবাসী প্রশ্নে শব্দ মৃত্যুর মোহ !

বর্ষা থাকুক শরৎ তুফা ছুঁয়ে  
আমি দাহ চাই দহন দীপ্ত শীতে।

## অপাবৃত

অশোক চট্টোপাধ্যায়

দ্রুত বাস্তব সকালের সংসার ছাড়িয়ে  
তুমি চলে যাও রোজ একা,  
আমার দৃশ্য—  
লঘুপায়ে নেমে আসে বুকের ভিতরে প্রতিদিন।

তুমি দূরে গিয়ে কাছ আসো  
চিরটা দৃশ্য  
সহস্র স্মৃতির অঙ্গে প্রান্তরে আমার।

তুমি স্বপ্ন ভাঙে গড়বে বলে।  
যে বলে বলুক শূন্য  
আমি দেখি নীলিমায় ঢেকেছ  
আকাশ।





**Luxol  
Silk**

**British Paints**

# মেঝেতে কার্পেট-পার্সিয়ান কাজ দেয়ালে লাকসল সিল্ক-অপূর্ব সাজ

লাকসল সিল্ক সাজা আমাদের এক নতুন আফ্রিকান ইমালশন যা গত দু বছর ধরে পাশ্চাত্য জগতে স্থিতি করেছে এক বিপুল আয়োজন। অস্ট্রেলিয়ার উদ্ভাবিত ও নিখুঁত করে তোলা এই ইমালশন বিশ্বজোড়া বাজারের প্রাপ্য অন্যতম সদস্য ব্রিটিশ পেটেন্টস্ আপনাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

স্পর্শে মোলায়ম, নয়নাভিরাম, রুচিসম্পন্ন লাকসল সিল্ক আপনাকে দেয় এমন এক নিখুঁত ফিনিশ যা আজ পর্যন্ত সহস্রাব্দের কোন রঙ অর্জন করতে পারে নি।

## আপনার দেয়াল হয় সমুদ্রতর

লাকসল সিল্ক “সমগ্র পৃথিবীতে সমুদ্রতর ইমালশন” বলে আত্মজাতিক প্রবণতা অর্জন করেছে। এই প্রবণতার কারণ ব্রিটিশ পেটেন্টস্ কর্তৃক ব্যবহৃত আফ্রিকান পলিমার, পিগমেন্ট, সারফ্যাকট্যান্ট ও একত্রীভবনকারক উপাদানের সার্থক সংমিশ্রণ।

দ্রুতি পরীক্ষামূলক প্যানেল পাশাপাশি রেখে দেখুন। এ দেশের অন্য যে কোন ইমালশনের তুলনায় লাকসল সিল্ক সমুদ্রতর বলে প্রতিষ্ঠাত হবে।

## ধোয়া-মোছা চমৎকার জন্মত কোন দাগ পড়বে না

দেওয়াল যতো মসৃণ হবে, ধোয়া-মোছা করতে ততই সুবিধে। লাকসল সিল্ক দেওয়ালকে সিল্কের মতোই মসৃণ করে তোলে, ফলে এই ইমালশন ধোয়া-মোছা করা সবচেয়ে সহজ।

সমস্ত ইমালশনই পরিষ্কার করা যায় বলে দাবি করে কিন্তু প্রত্যেকের গায়েই থেকে যায় ‘শেষ করার পর দাগ’। এটা হয়ে থাকে তার কারণ ঐ সব ইমালশনের বেলায় আপনাকে খুব কমে দেয়াল যত্নে হয় আর তার ফলে দেয়ালে থেকে যায় পালিশের এক অস্বাভাবিক দাগ।

লাকসল সিল্কের বেলায় কিন্তু তা ঘটে না। কারণ এর পিছনে লাসে যৎসামান্য প্রয়াস এবং আরো কারণ হলো এর নিখুঁত রেশমী মসৃণতার ওপর আর কোনরকম পালিশ চলে না। সেইজন্য কেবলমাত্র লাকসল সিল্ক ব্যবহৃত দেয়ালই বছরের পর বছর নতুন থাকে।

## ধুলো ঝেড়ে ফেলে দেয়

খাড়াই দেয়ালে জমার জন্য অশুভম স্থলিকণারও প্রয়োজন পা রাখার আয়গা। তাই দেয়ালের ফিনিশ যত মসৃণ হবে ততই ধুলো জমার সুযোগ হবে কম।

সুতরাং, এখন আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে কেমনভাবে লাকসল সিল্ক সহ্যাই ধুলোময়লা ঝেড়ে ফেলে দেয়। আর তাই আপনি সব সময়ই দেখতে পান পরিচ্ছন্ন, অকম্বল দেয়াল।

## রেশমী পরশ

লাকসল সিল্ক হলো একমাত্র আফ্রিকান ইমালশন যা আপনি চোখ বুজে বলে দিতে পারেন। দেয়ালের ওপর দিয়ে আপনার আঙুল একবার বুজিয়ে নিন। আপনি আর কোনদিনও অন্য কোন সাধারণ ইমালশন ছুঁয়ে দেখার আদর্শ বোধ করবেন না।

এর রেশমী মসৃণতার আরো অর্থ হলো লাকসল সিল্ক অতি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে এবং আপনার দেয়ালকে আবৃত করে আরো সার্থকভাবে।

## চল্লিশটি রঙের বৈচিত্র্য

লাকসল সিল্ক-এর বেলায় আপনি পাচ্ছেন পছন্দ করার অভূতনীয় সুযোগ। আমাদের কলার কার্ডে আপনি পাবেন চল্লিশটি রেশমী রঙের বৈচিত্র্য। আপনার কল্পনাশক্তি ও আমাদের রঙের সার্থক সমন্বয় ছাট্টিয়ে আপনি পাবেন আরো একশোটি মৌজিক রঙ।

**বাড়ির দেওয়াল ছনিয়ার সেরা ইমালশন  
লাকসল সিল্ক হিসেবে সাজে নিন**

“একজনের নাম রেখা ওরফে মেনি। অন্যজনের নাম মনে নেই। দুজন-কেই পরী হতে দেখেছিলাম মধ্যরাত্রি, একেবারে অন্য পরিবেশে। মেনি ছিল আমার বালাসখী। তার সঙ্গে প্রেম হয়েছিল। সে ছিল আমার ব্যবসায় র মেট্রিয়াল। দ্বিতীয়-জনকে আমরা তিনজন দরাদরি করে কোথায় নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম তার কোনো ঠিক ছিল না।”

## শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের দিগন্তকে নিঃসন্দেহে আরও বিস্তৃত করেছে।

## পরীর সঙ্গে প্রেম

দাম : দশ টাকা

## সমরেশ বসুর

## গঙ্গা

নতুন মুদ্রণ ৥ দাম : ১৫.০০

## সুবীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

## যুবক যুবতীরা

দাম : ১৪.০০

কৃষ্ণস্বাসে পড়ার মতো বই

## জেমস হেডলী চেজ

## অর্কিড ভিলা

দাম : দশ টাকা

স্বৈচ্ছিক প্রকাশনী  
১এ কলেজ রো \* কলকাতা-১

## কণ্টকলিত অতুলা ঘোষ

(নবপর্ষদ)

৥ ৪০ ৥

—“আমাকে রাজ্যপাল চিঠি লিখেছেন এই যে, তুমি কুটির বানিয়েছ, ব্যাপারটা কি।”

—“আপনি দেখলেই টের পাবেন।”

—“আরে দেখব তো বুট্টেই। গভর্নমেন্ট যে পত্রিকার স্বত্বাধিকারী, সেই কাগজে বেরিয়েছে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ‘কুটির’ তৈরী হয়েছে, আর সব বাতানুকূল ব্যবস্থাও আছে। আবার ‘আনন্দবাজার’ ছোট্ট টিনের কুটিরের ছবি দিয়ে বলেছে যে, সর্বসম্মত লাখ খানেক টাকা খরচ হয়েছে। তা কোনটা সত্যি?”

—“আপনি একবার এলেই তো টের পাবেন।”

“আমি অবশ্য—রাজ্যপালকে লিখে দিয়েছি, এসব লাট-কেলাটের ব্যাপার আমাদের বৃদ্ধির অগম্য।”

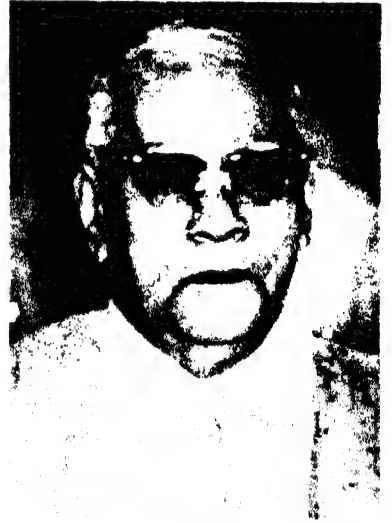
—“আহা, দেখে লিখলেই তো পারতেন।”

—“দেখ বাবু, তোমাদের এইসব এত বড় বাড়ি—ধাকা যায় না, এসব বুঝতে পারি না। মাঝে মাঝে অবশ্য এসব কথা শোনা যায়। কাউকে করতে তো দেখি না। বর্তমান রাষ্ট্র-পতিও তা বলেছিলেন, কিন্তু—”

কথা হচ্ছিল আমার সঙ্গে ত্রিভুবনের (শ্রীত্রিভুবন নারায়ণ সিং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল)।

মাঝে মাঝেই শোনা যায় যে, ছোট বাড়িতে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল থাকবেন। কিন্তু কাজে তা হয়ে ওঠে না। অবশ্য গান্ধীজী বলেছিলেন রাষ্ট্রপতিভবনে হাসপাতাল হওয়ার কথা। গান্ধীজীর অধিকাংশ কথাই তো আমরা শুনিনি; এটোও না-হয় শুনিনি। তাতে বিস্মিত হওয়ার কি আছে! একটা কমিশনও বোধ হয় হয়েছিল বা হয়েছে, যে কমিশনের সুপারিশ হচ্ছে মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং কল-কাতার রাজ্যপালদের জন্য ছোট বাড়ি। তারও তো কোন উচ্চবাচ্য শোনা যায় না। আর তা ছাড়া ছোট বাড়ি বড় বাড়ি—এসব কথার মানেও তো বোঝা যায় না। রাষ্ট্রপতিভবনে তিন শ-খানা ঘর আছে। সেখানে রাষ্ট্রপতি থাকেন মাত্র তিনখানি ঘর নিয়ে। কাজে-কাজেই সেখানে ছোট বড় এসব কথা কেন ওঠে, তা বোঝাই শক্ত। আর বাকী ঘর তো সব দেশী ও বিদেশী মহামান্য অতিথিদের জন্য সংরক্ষিত। তা ছাড়া আরও কতকসময়ের লোক বিবিধ ঘরে থাকে—এইসব নিয়েই রাষ্ট্রপতিভবন। দেখতে বাইরে থেকে বিরট বড়, কিন্তু রাষ্ট্রপতির এলাকা মাত্র তিনটি ঘর। অবশ্য ঘর তিনটি বেশ বড় বড়। কলকাতার রাজভবনের হিসেব নিলে দেখা যাবে যে, সর্বসম্মত ১৬০টা ঘর আছে, অবশ্য ছোট বড় মিলিয়ে। তার মধ্যে রাজ্য-পালের ভাগে দুটি শোবার ঘর, আর একটি বসবার ঘর। সেই বসবার ঘরেই লোকজনের সঙ্গে দেখা করা এবং খাওয়া। অবশ্য হচ্ছে

করলে খাওয়া-দাওয়াটা অতিথিদের আপ্যায়ন করার জন্য যে বড় খাবার ঘর আছে, সেখানেও হতে পারে। কিন্তু সাধারণত রাজ্যপালরা কেউ সেখানে যেতে যান না। এ ছাড়া দেশ-বিদেশের অতিথি-অভাগতদের জন্য পঁচিটি স্নুইট আছে। আরও আছে কিছু সরকারী অফিস—যেমন, কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট বিভাগের দপ্তর, প্ল্যানিং বোর্ডের অফিস ইত্যাদি। বাড়িটা দেখতে বিরট। তৈরী হয়েছিল তো তখনকার দিনের বড়লাট—তাদের জন্য। লর্ড ওয়েলেসলির আমলে ১৮০০ সালে প্রথম এখানে বসবাস আরম্ভ হয়। তখন কলকাতা ছিল ভারতবর্ষের রাজধানী। ১৯১১ সালে রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। তখন থেকে এটি এই প্রদেশের লাট-সাহেবের বাসস্থান। আবার স্বাধীনতার পর নাম হয়েছে রাজভবন, এবং গভর্নরের নাম হয়েছে রাজপাল। বাস্তবিকপক্ষে এটি সরকারী অতিথিশালা। যেমন রাষ্ট্রপতি, প্রধান-



ডঃ হরেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক

মন্ত্রী, এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য মন্ত্রীর এলে এখানেই থাকেন, আবার অন্যান্য মাননীয় অতিথিরাও এখানে থাকেন। বিদেশ থেকে অতিথি স্বীরা আসেন, তাঁরাও এখানেই থাকেন। সব ব্যবস্থা আলাদা। আমাদের রাজভবনের এলাকার মধ্যে আবার উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব কোণে মন্ত্রীদের আবাস হয়েছে। তবুও মাঝে মাঝে শোনা যায় রাজ্যপাল এত বড় বাড়িতে কেন? এবং এসব কথা বেশী শোনা যায়, সরকারপক্ষের লোকদেরই মুখ থেকে।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্যপাল শ্রীত্রিভুবন নারায়ণ সিং এইসব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে দিয়েছেন। তিনি একটি ছোট্ট টিনে ছাওয়া বাড়ি বানিয়ে নিয়েছেন। খুব কম খরচেই এ বাড়ি তৈরী হয়েছে। খুব ব্যক্তি করে তৈরী করেছেন বলেই খুব কম খরচ হয়েছে। দু'খানি শোবার ঘর এবং সংলগ্ন স্নানের ঘর। একটি ছোট ঘর—যেটি গুরু নিম্নস্ব অফিস এবং এখানেই লোকজনের সঙ্গে

লক্ষ্য করেন। আর পশ্চিম দিকে একখানি মারাম্মা, তিন দিকে চিক ফেলে সেখানে খানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতি কষ্টে তিন-চার-খানি চেয়ার ও টেবিল ধরতে পারে। কোন ঘরই বাতানু-কূল নয়। সাধারণ সিমেন্টের মধ্যে। এর চেয়ে অনেক পথিপাশ্বাৰ্থ ডাক-বাংলো তৈরি করতে ঢের বেশী খরচ পড়েছে। এমন মৌসুমীপুত্রের পশুকুড়ার একটি ডাক-বাংলোর দেখেছিলুম সবটা মোজাইক করা, একটি ঘরে গড়োছিলুম সতেরটা ইলেকট্রিক পয়েন্ট। অবশ্য পশুকুড়ার বাংলোর ছাদ টিনের নয়, রাজ্যপালের বাড়িটি টিনে ছাওয়া এবং আরও অনেক ছোট। আমি তো ঘরে ঘরে সবটা দেখলুম, কিন্তু কোথাও এয়ার কন্ডিশন মেশিন খুঁজে পেলাম না। রাজ্যপাল এখন এই বাড়িতেই বাস করছেন। যে বাড়িতে এয়ার কন্ডিশন মেশিন নেই, সে বাড়িতে সরকারের নিজস্ব সংবাদপত্র এয়ারকন্ডিশন মেশিন দেখলেন কোথা থেকে—অবাক কাণ্ড! শুনছি তো এই সরকারের সঙ্গে রাজ্যপালের সম্পর্ক তিস্ত নয়, বরং প্রীতিকর। তবু তঁদেরই কাগজে এই বাড়ির জন্য সাত-আট লাখ টাকা খরচ হয়েছে এসব খবর বেরায় কি করে?

এই বাড়ি করতে যে নাশা খরচ হওয়া উচিত, রাজ্যপাল তার চেয়ে অনেক কমে করেছেন। দরজা-জানালা সবই এসেছে পরি-তাক্ত ও অববাহ্য জিনিসপত্র রাখবার গদাম-ঘর থেকে। সেগুলো খালি রং কাঁসিয়ে নিতে হয়েছে। করোগেট টিন দিয়ে ঘর ছাইবার জন্য যে লোহার ফ্রেম দরকার হয়, তাও এসেছে ওইরকম পরিতাক্ত জিনিসের এক গদামঘর থেকে। আর করোগেটের নীচে যে সিলিং দেওয়া হচ্ছে, তার কাঠও এসেছে ব্যারাকপুর রাজভবন থেকে। তা হলে খরচ হয়েছে খালি ইন্ট, চূণ, সূর্য্যাসার করোগেট টিনের। অবশ্য যারা তৈরি করেছে, তাদের মজুরি দিতে হয়েছে, আর হাঁ, দরজা-জানালা রঙও আছে। সবসুখ এখনও লক্ষ টাকাও খরচ হয়নি। এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ না করে পারছি না। আমাদের দুই রাজ্যপাল ভারতবর্ষের মধ্যে দুটি নিজের স্থাপন করলেন, যা হয়তো অন্য অনেক রাজ্যের রাজ্যপালের মনোমত নয়। প্রথমে ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় রাজ্যপাল থাকাকালে মাত্র পাঁচ শ' টাকা করে মাইনে নিতেন। এতে অন্য অনেক রাজ্যপাল অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। হরেন্দ্রনাথ হোসে হসে বলতেন, “বাড়ি ভাড়া নেই, লোকজনের মাইনে দিতে হয় না, পাঁচ শ' টাকাতেই আমার বেশ তো চলে যায়।” আর তিনি এমন অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন যে, অনেক অফিসারের পক্ষেও তিনি অসহ্য হয়ে উঠেছিলেন। কি করা যায়, ওঁকে তো তাড়ানো সম্ভব ছিল না! সেইজন্য অনেক ঘরে-করে জওহরলালকে দিয়ে রাষ্ট্র-পতির কাছে সুপারিশ করান যে, ওঁকে বন্দের রাজ্যপাল করা হোক। যুক্তি ছিল যে, কল-কাতায় অনেক বিদেশী সম্ভ্রান্ত অতিথি আসেন, সেখানে উনি যেমান। কিন্তু রূপেতে হোক করে চলে যাবে। ভেতরে ভেতরে এইসব



শ্রীমন্তন নারায়ণ সিং

ব্যবস্থা যে হয়েছে তা ডাঃ রায় ঘণাক্ষুরেও জানতেন না। আমি যদিও ওঁর পরিবারভূক্ত ছিলাম, আমিও জানতুম না। হঠাৎ একদিন টেলিফোনে ডাক এল; গিয়ে দেখি রাজ্যপালের জিনিসপত্র বাঁধাছাদি হচ্ছে। আমি তো অবাক! জিজ্ঞেস করলাম, “এত বাঁধাছাদা কিসের জন্য?” সহাস্য হরেন্দ্রা উত্তর দিলেন, “দেখ, আমাকে বোম্বাই যেতে বলেছে। তা বোম্বাই-এর চেয়ে তো ডিহি-শ্রীরামপুর কাছে, আমি সেখানেই যাচ্ছি।” মধ্য কালিকাতার ডিহি শ্রীরামপুরে এক বিস্তর মধ্যে ওঁর একভলা একটা বাড়ি ছিল। সেখানেই উনি থাকতেন। “কনস্টিটিউয়েন্ট আসেমবল” যখন ছিল, তখন রাজেন্দ্রবাবু চেয়ারম্যান, হরেন্দ্রা ভাইস-চেয়ারম্যান। ঐ পদ আজকের দিনে উপরাষ্ট্র-পতির পদের মর্যাদার সমান। তখনও ঐ এক-ভলা বাড়িতেই থাকতেন। আমি সভরে জিজ্ঞেস করলাম, “আপনি তা হলে পদত্যাগ করছেন?” উনি সহাস্যে জবাব দিলেন, “আমার তো পদ-বৃদ্ধি হয়নি, তাই পদত্যাগ করার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এই রাজ্যপালগিরি আর বাপু পোষাচ্ছে না। আমি ত্যাগপত্র লিখে ফেলেছি। তুই দেখবি?” আমি আর ওখানে না বসে “কয়েক মিনিটের জন্য ঘুরে আসছি” বলে সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ রায়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলুম। একটা শুনাই ডাঃ রায় বললেন, “চলো, যাচ্ছি।” অবশ্য রাইচাঁস বিল্ডিং থেকে ফোনে রাজভবনে খবর পেঁচে গেলে যে, ডাঃ রায় সেখানে যাচ্ছেন। ডাঃ রায় গিয়েই সরাসরি প্রশ্ন করলেন, “আপনি নাকি ছেড়ে দিচ্ছেন?” হরেন্দ্রা সহাস্য মুখে আমার দেখিয়ে বললেন, “ঐ দুর্বৃত্তা বলেছে ব্যক্তি? আপনাকে টেনে নিয়ে এল?” ডাঃ রায়ের উত্তর, “ও কেন টেনে আনবে—আপনিই তো আসতে বাধ্য করলেন।



রাজ্যপালের নবনির্মিত স্থান

আমি জানি না, আমার মস্তিষ্ক জানে না। কি করে আপনি ছেড়ে যাবেন, তা হয় নাকি?” হরেন্দ্রা হেসে বললেন, “দেখুন, এই কলকাতা শহরের আমি লোক, একে আমি ভালবাসি। এই কলকাতা শহরেই আমার শেষ সময় কাটাতে চাই। অত দূর বোম্বাই, সেখানে অনর্থক কেন বাব?” অবশ্য শেষ অবধি তাঁর বাওয়া হয়নি এবং তিনি কলকাতা শহরেই এই রাজভবনে তাঁর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

আগেকার কথায় ফিরে যাই। হরেন্দ্রা যেমন পাঁচ শ' টাকা মাইনে নিয়ে নিজের স্থাপন করেছিলেন, এই রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণও ঐ বিরাট রাজভবন সংলগ্ন বাগানে কুটির স্থাপন করে নিজের সৃষ্টি করলেন। ‘সিকিউ-রিটি’র জন্য খরচ বাড়ল না। আলাদা জম-কালো ব্যবস্থার জন্য খরচ বাড়ল না। কারো অনুমতি নিতে হল না। নিজের তহবিল থেকেই সব হয়ে গেল। কোন ঘোষণা নেই, আড়ম্বর নেই, প্রচার নেই। নিঃশব্দে কলকাতা শহরের বুকে এত বড় একটা পরিবর্তন হয়ে গেল। এ কাজ ত্রিভুবন নারায়ণের পক্ষেই সম্ভব। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজভবনে কি হবে জানি না। কিন্তু অন্তত কলকাতার রাজ-ভবন নিয়ে আর কিছুর বলায় অবকাশ রইল না। ত্রিভুবন নারায়ণ শ্রীমন্তন কামিশনের সদস্য ছিলেন, কেম্বেস্টার মন্ত্রী ছিলেন, ভারতবর্ষের বৃহত্তম রাজ্য উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন—কিন্তু আজ অবধি তাঁর আচার-ব্যবহারে কোন পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি। রাজভবন ও রাষ্ট্রপতিভবন নিয়ে তো অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে; কিন্তু দিল্লীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বাসভবন নিয়ে আজ অবধি কোন কথা শোনা যায়নি। দিল্লীর মত জায়গার, যেখানে জমির দর আকাশ-ছেঁয়া, সেখানে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের বাসভবন সংলগ্ন যেসব জমি আছে, তার মূল্য নির্ধারণ করলে দেখা যাবে যে, কয়েক কোটি টাকা। সে সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য শোনা যায় না। যে আদর্শ সামনে রেখে রাষ্ট্রপতিভবন ও রাজভবন সম্বন্ধে আলোচনা হয়, মন্ত্রীদের সম্পর্কে কি সেই আদর্শের কথা আসে না? আমি বাস্ত-গতভাবে রাজভবন ও রাষ্ট্রপতিভবন নিয়ে যে এইসব কথা ওঠে, তার কোন মানে বুঝতে পারি না। রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালরা তো থাকেন সীমায়িত জায়গায়। এই ভবনগুলিতে তো অন্য অনেক কাজ হয়। তবু কেন এইসব কথা ওঠে? অনেক দিন আমরা স্বাধীন হয়েছি। এখনও কি আমরা সাবালক হইনি? এখনও কি ভাবপ্রবণতা আমাদের বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখবে? আর যদি আড়ম্বর কমাতেই হয়, তা হলে মনে রাখতে হবে সেটা সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালের দৃষ্টান্ত দিলেই চলবে না, সর-কারী দল এবং বিভিন্ন দলের দলপতিদেরও এই আদর্শ অনুসরণ করতে হবে। আর কেবলমাত্র বাসস্থানের উপরই আদর্শ রক্ষা নির্ভর করে না—বাস্তিগত আচরণ ও জীবন-ধারায় এই আদর্শ অনুসরণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

তমসা মা জ্যোতগময়

যজ্ঞে  
গলে হোম  
জয়

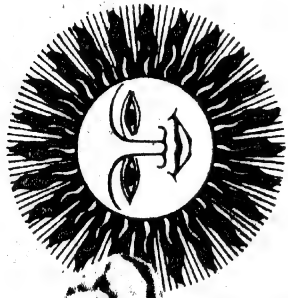
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বদেশে চন্দ্র

৩

SHRIGRACE  
ARTS

সম্পদ  
প্রকাশিত হল  
অভিব্যক্তিতে-  
সান গ্রাস







# সেই সময়

## সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

১১ ও ৬ ১১

দেবেন্দ্রনাথের কৈশোর পর সত্যেন্দ্রর একদা-সহপাঠী কেশব ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পর থেকেই ব্রাহ্মদের মধ্যে যেন আবার নতুন রঙ সঞ্চারিত হলো।

কিছদিন ধরে ব্রাহ্মদের মধ্যে নিজীব বা ভাব এসে গিয়েছিল, ভিতরে ভিতরে নানা স্কন্ধ মনোমালিন্য ও মডতেন। কেউ কেউ বিশ্ব ও জ্ঞানচ্যায় যতটা আগ্রহী ততটা ঈশ্বর বা ধর্মচর্চায় নয়। তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কিন্তু তার মধ্যে ঈশ্বরের কথা কখনো শোনা যায় না। অক্ষয়কুমার দত্তও যেন দিন দিন সংশয়বাদী হয়ে পড়ছেন। দেবেন্দ্রনাথ মনে মনে এদের প্রতি বিরক্ত। রাগ করে তিনি পাছাড়ে চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু এসেও ব্রাহ্মদলের ঠিক মতন হাল ধরতে পারছিলেন না।

দেবেন্দ্রনাথ এখন প্রৌঢ়। এক কালের তরুণ বিশালবী এখন রক্ষণশীল। কিছু ব্রাহ্মের চাপে পড়ে তিনি স্বীকার করেছেন যে বেদ কোনো অদ্রাঘত, পবিত্র গ্রন্থ নয়। কিন্তু ব্রাহ্মসভার কোঠে কোনো ব্রাহ্মের বদলে অস্বাভাব্য বাস শাস্ত পঠ করে শোনাও, এতটা তিনি মেনে নিতে পারছেন না। পৈতা-বিসম্মান, জাতিভেদ প্রথার অবসান কিংবা কিংবা কিংবা—এর কোনোটারই ঠিক বিরোধী না হলেও মৃত কোনো পরিবর্তনের পক্ষপাতি নন। তিনি ব্রাহ্ম হলেও তার বাড়িতে দর্শা পূজা হয়, তিনি বাঘা দেন না, আবার পূজার সময় নিজে উপনিষতও থাকেন না।

কেশবচন্দ্রের মধ্যে তিনি দেখলেন নব যৌবনের এক মৃত প্রতীক। এ ছোট্ট কিমান তেজস্বী তেমনই এর মধ্যে ধর্মের প্রতি উদ্যাদনা রয়েছে। প্রবল পাপ বোধ আছে বলে সে পূজার অভিলাষী। ছোলা বাক্সানোর বেশী ব্যাসস্ত হয়ে যাচ্ছিল বলে নিজের হাতেই সেই ছোলা ভেঙে ফেলেছে কেশব।

কিছটা রামকাল সেনের পোঠ কেশবকে দেকেন্দ্রনাথ বালকাল থেকেই দেখছেন। প্রায়ই সে এ বাড়িতে উল্ল ছেলেদের কাছে আসে। কেশব বংশের সন্তানকে এক সময় কুল গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হয়, কিন্তু

কেশব সেই দীক্ষা কোল, পিরকারের সকলের মতের বিরুদ্ধে গিয়েই সে ব্রাহ্ম হয়েছে। এতেই বোকা যায় তার সাহস।

কৈশোর ছাড়াকার পর থেকেই কেশব আদর্শ ও নীতিচর্চা নিয়ে মেতে আছে। তার একটা বড় গুণ, সে কোনো কাজই একা করে না, অনেককে এক-সঙ্গে নেয়। নেতৃত্বের সহজাত গুণ আছে তার মধ্যে, যেকের দল বিনা বিশ্বাস্য তাকে জেলে হিসেবে মেনে নেয়। ইয়ং ফেলান, দিল ইজ ফর ইউ? নামে সে একটা ইংরেজী পুস্তিকা লিখেছে, তাতে যেন আগুন ঝরছে একেবারে।

ছেলেদের নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ একবার বোটে করে ছোড়াতে গেলেন রাজমহলে, সঙ্গে আছে রাজনারায়ণ কাস্তুরী, আর এসেছে পূর্ববন্দু, কেশব। বোটের এক কোণে কস উপনিষদ পড়েন দেবেন্দ্রনাথ, অন্য কোণে কস কেশব পড়ে বাইবেল। আবার হঠাৎ হঠাৎ কেশব আর সত্যেন্দ্র এক সঙ্গে গান ধরে। কেশব কাড়ির ছেলে কেশব, বালকাল থেকেই গানের চর্চা আছে তার। কেশবের অনুপ্রেরণায় সত্যেন্দ্রও গান লিখতে ও গাইতে শুরু করেছেন। দৃ জনের গান শনে প্রাণ জড়িয়ে যার দেবেন্দ্রনাথের। শব্দ, শব্দ তত্ত্ব নয়, ভক্তি রসের সঞ্চার করে এই দুই যুগ।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ব্যাপারে কেশবের খবর উৎসাহ। প্রায়ই সে বলে মাত্র এক হাজার দু হাজার লোক ব্রাহ্ম হলে কী হবে? এই নব ধর্ম ছড়িয়ে দিতে হবে সারা দেশে, এমন কি সারা পৃথিবীতে। যেমন তেমন করে হোক আমরা সকলকেই এই ধর্ম দীক্ষা দিচ্ছি। আমাদের ধর্মেতে পাগল হতে হবে। উদ্ভাসনা হলে কোনো কাজ হবে না।

ব্রাহ্মধর্মের মূল কথাটাও বড় সবল করে বলে কেশব। সে বলে, আমাদের এই ব্রাহ্মধর্মের ঈশ্বর তর্কালঙ্ঘ বা পূর্ণাঙ্গ কর্তব্য ঈশ্বর নন। এই ঈশ্বর জীবন্ত ঈশ্বর। কিংবা এই ধর্মের মন্দির প্রকৃতি এর পরোহিত। সকল অবস্থার মানব ঈশ্বরের নিকটবর্তী হয়ে পূজা করার অধিকারী।

তরুণ কেশবের মধ্যে এসব কথা শনে মুগ্ধ হয়ে যান দেবেন্দ্রনাথ। যত শোনে আরও শনে ইচ্ছে হয়। বিক্ষয়-সম্পত্তি কিংবা পারিবারিক সংঘ সম্ভোগের জন্য বিশ্বেদ্য অগ্রহ নেই এর, কেশব চায় তার সর্ব সময় ব্রাহ্মধর্মের জন্য দের, সে সারা দেশে প্রচারে বেরিয়ে পড়বে।

যেন এই রকম একজনের জন্যই এতদিন অপেক্ষা করছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। শুধু একটা বিষয়ে তাঁর খটকা লাগে। কেশব যেমন মতন বলে কেন? সে যেমন তেমন ভাবে সকলকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দিতে চায়, তা হলে কি সে কোনো কৌশল বা চাতুর্যের আশ্রয় নেবে? কেশব জাতিভেদ বৈদ্য, লোকের বলে বৈদ্যেরা ফিচল হয়, কিন্তু পবিত্র ধর্মের প্রচারের মধ্যে তা ফিচলমি থাকল চলে না। রাজনারায়ণ বসুকে দেবেন্দ্রনাথ চুপ চুপ জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা, তুমি কি জানো, কৈজাজিতি ফিচল বলে অপবাদ আছে না?

রাজনারায়ণ হাসতে হাসতে উত্তর দেন, হ্যাঁ, তা আছে!

দেবেন্দ্রনাথের এ সংশয়ও কেটে যায়। তার মনে হয় কেশব ছেলটি একেবারে খটি সোনা। সে ভাবাবেগে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, পৃথিবীর সকল জাতি সম্মুখের এই গান করুক, ঈশ্বর আমাদের পিতা, সকল মানব ভাই-ভাই। তা শনে দেবেন্দ্রনাথের মনে হয় ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য এই তো আদর্শবাহী।

পূর্বের বন্ধ দেবেন্দ্রনাথ সবল বলে গেলেন সিংহলে। জাহাজে চড়ে কালাপানি পার। এবারও সঙ্গী হলেন কেশব এবং কালাকিমল গঙ্গোপাধ্যায় নামে দুই যুগ। কাড়ির যোক্তের ঘোর মাঝে কেশব চুপ চুপ জাহাজে ওঠে এক কুঠির মধ্যে লুকিয়ে রইলেন। জানা দিলে বাইরে কোনো বাসালীকে দেখা মাত্র চমকে চমকে ওঠেন, এই যুগ ভক্তি কোনো আত্মিক তাকে ধরে নিতে এসেছে।

সিংহল বাতায়নের দ্বীপ সময়ে দেবেন্দ্রনাথ তাকে আরও ভালো করে চিনলেন।

কেশব যে কতখানি উৎসাহী প্রচারক তার প্রমাণ পাওয়া গেলে সিংহল থেকে ফেরার পরের বৎসর। শারীরিক অসুস্থতার জন্য কেশব ব্যায় পবিত্রকর্মের জন্য কিছু দিনের জন্য গোল কুলকণার। কলকাতার চৈত্রের কুলকণার প্রাচীন এক বড় শিক্ষিত লোকের বাস সেখানে। পাদ্রীরা সেখানে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করার জন্য বড় ব্যটি বানিয়েছে। কেশব সেখানে সভা ডেকে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করতে গিয়ে কগড়া লাগিয়ে দিল পাদ্রীদের সঙ্গে। পাদ্রী ডাইসন কেশবকে তর্কবিশ্লেষ আহ্বান করলে কেশব সিংহ গজনে মাঝের মতন জবাব দিলেন তার। বহু লোক ভিড় করে এলো কেশবকে দেখতে ও তার মতের কথা শুনতে। একটার পর একটা সভা, স্থানীয় ছাত্র, শিক্ষকের দল, এমন কি স্কপলীল হিন্দুরাও এলো কেশবকে সম্মান জানাতে। এতদিন পর একজন এসে পাদ্রীদের প্রচার অভিযান রোধ করার জন্য নিখুঁত বক্তৃতা দিয়ে পাদ্রীদের চুপ করিয়ে দিয়েছে। কেশব খ্রীষ্টধর্মের নিম্না করে না, সে বাইবেল থেকেই অজস্র উক্তি উদ্ধৃত করে, দেশের অক্ষা এবং সমাজের অক্ষাও আলোচনা করে সে ব্যক্তির দেক যে ধর্ম সমাজ-ছাড়া নয়, আবার সমাজও ধর্ম-ছাড়া নয়।

কেশবের এই বিজয়-অভিযানের বিরল শরনে চমকুত হন দেবেন্দ্রনাথ।



কেন অক্ষা এমন হলো কেন কেশবকে না সঙ্গে তিনি থাকতেই পারেন না। পূর্বসম এই কাকটি হয়ে উঠলো তার পতনের চৈত্রের প্রভাত। কেশব বাড়িতে এলে তিনি লশবাস্ত হয়ে উঠে বসলেন। কেশব ওনা আর পঠি জনের সঙ্গে বসতে গেল তিনি তাকে জোর করে টেনে এনে বসিয়ে কেন নিজের কোঠের এক পাশ। তাঁর জন্য মিছনি বা অনানি কোনো বাস এল তিনি এক চামচ কেশবের মধ্যে জুল দিয়ে তারপর নিজ এক চামচ খেয়ে বলেন, একবার তুমি খাও, একবার আমি খাই। ...ততমাকে দেখলই আমার আত্মার আরম্ভ হয়, তুমি যে স্বচ্ছানন্দ!

ঘটীর পর ঘটা কেশবের সঙ্গে আলাপচারি করে কাটান দেবেন্দ্রনাথ। কেশব বেশল ব্যাক কেরানিগিরি করে, আপিস ছটি হলেই সে চলে আসে। সঙ্গে আসে তার কথা ও সমর্থক। হল ঘরে লম্বা মাদুর পেতে তার ওপরে বসে সকলে। ছোড়া ও মল্লা পোশাক পরা যুগে কেরানি হল ধর্ম আলোচনায় গলা ফাটার, কখন গেরে ওঠে গান। ঘন ঘন চা আসে। অধিক কটি হলে গেল কেউ কেউ ওঠবার জন্য বড় দেখলে দেবেন্দ্রনাথ তার হাত চেপ ধরে বলেন, রাখে তোমার ব্যটি, ব্যটির সময় কি ঠিক থাকে?

কেশবের প্রভাবে দেবেন্দ্রনাথের মধ্যেও কিছু কিছু পরিবর্তন হলো। কেশব তার যুগে কেশবের সঙ্গে এই সংকল্প নিয়েছে যে তাদের মধ্যে ব্যায় ব্রাহ্ম তার আর কেউ উপবীত ধাক্কা করবে না। এই কথা শনে দেবেন্দ্রনাথ নিজের পেতের দিকে তাকিয়ে বললেন, তা হলে আর এটা ব্রাহ্ম কেন? এতদিন পর তিনিও পেতে ব্যায় করলেন।

দেবেন্দ্রনাথ জানতেন, পিরলী সংসর্গ থাকার ডাকের কেউ খটি ব্রাহ্ম মনে করে না। ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনার সময় উপাচার্য হিসেবে খটি ব্রাহ্মেরাই কোঠে বসে শাস্ত পঠ করে। দেবেন্দ্রনাথ উপদেশ দেবার সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলেন, সেই কোঠে কখনো বসো না। কেশব একদিন তাঁকে কালো, আপনি আমাদের চক্ষে সকল ব্রাহ্ম অপেক্ষা প্রোষ্ট, আপনি মহাবী, আপনি কেন কোঠে বসবেন না? ব্রাহ্ম পবিত্র এই ধর্মের সার কি বোঝে? এই জন্মদোষ

মায়েরা !

# এঙ্গেল শিশু-দুগ্ধাশায় মশজেরই স্বাস্থ্য এটি আপনাদের সমস্তার মতই মিত্র

ভিটামিন ভরপুর এঙ্গেল একটি মূষম আশায় এবং মশজে স্বাস্থ্য  
সুস্থতার জন্য খুব মিলি আর মজুৎ করে তৈরী।

এঙ্গেল শিশু-দুগ্ধাশায় কয়েক বছরের পবেষণার  
ফল। শিশুর বাড়-বাড়ন্তের জন্য যে সমস্ত পুষ্টি  
প্রকার, তা সবই আছে এতে। এর দ্বারা  
খুব মিহি আর মসৃণ করে তৈরী করা  
হয়েছে যাতে শিশু এটি সহজেই হজম করতে  
পারে।

শিশুর পাকস্থলীর জন্য মিহি আর মসৃণ  
যে শুড়ো দরকার—

শিশুর পাকস্থলী নতুন নতুন কাজের সম্মুখীন  
। তার নবীন পাকস্থলী যাতে বিপদগ্রস্ত  
হয়, সেজন্য এঙ্গেল দ্বারা শুড়ো খুব মিহি আর  
মসৃণ করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এঙ্গেলের  
মুগ্ধলি ছোট ছোট মিহি দানায় শুড়ো করা  
। পাকস্থলীতে গিয়ে এঙ্গেল নরম আর সহজে  
পাওয়া দেহের মত হয়। শিশু তা চট করে  
হজম করে নিতে পারে।

“শিশুর বাড় ও গঠনের জন্য মূষম  
আহারের প্রয়োজন”—

প্রথম কয়েকটি মাস শিশুর ভবিষ্যৎ গঠন আর  
তার বেড়ে ওঠার ভিত্তি। এই বিশেষ সময়ে তার  
দরকার সবরকমের ভিটামিন আর লৌহ। এঙ্গেল  
একটি ভিটামিন-ভরপুর ফর্মুলা যাতে আছে  
আটটি ভিটামিন আর লৌহ। প্রকৃত-পক্ষে  
এঙ্গেলই একমাত্র শিশু-দুগ্ধাশায় যাতে রয়েছে  
বেশী পরিমাণ ভিটামিন-ই, যা শিশুর কোমল  
চামড়া রক্ষা করে।

“মায়েরদের কাছে এই দুগ্ধাশায় তৈরী  
করাও এত সহজ”—

আপনি কেবল আশ মিনিটে দুগ্ধাশায় তৈরী  
করে আপনার শিশুকে খেতে দিতে পারেন।  
কোনো দ্বন্দ্বের পাউডার। আপনি কেবল চামচ  
দিয়ে এই পাউডার ফাউন্ড বোতলে ঢালবেন।

তারপর গরম জল ঢেলে নাকুন। বাস, আপনার  
শিশুর পুষ্টির আহার তৈরী। সে-এটি খেয়ে  
সহজেই হজম করবে। এবার আপনার শিশু  
হলো—সত্যি এঙ্গেল শিশু।



ভিটামিন-“ই” সহ  
আটটি ভিটামিন  
দ্বারা সুরক্ষিত।

‘Progress of an Angel Baby’

বিনামূল্যে এই পুষ্টির জন্য এক টাকার  
ডাক টিকিট সহ এই ঠিকানায় লিখুন :—

Consumer Services Division, Foremost  
Dairies Ltd. 72 Janpath, New Delhi-110001

পানী ফেরার দুগ্ধজাত দ্রব্যের প্রস্তুতকারকদের তরফ থেকে।

আপনার এঙ্গেল শিশুর জন্য

উপেক্ষা করতে পারলেন না দৈবেন্দ্রনাথ, বৃদ্ধ একাধিক শিখা কয়লায় পুঁজি বেঁধে বসলেন। গ্রাম সমাজের এ-টুকরো এক প্রথা পরিবর্তন হলো।

এর পর একটা বেশী সাহসের কাজ করে ফেললেন দৈবেন্দ্রনাথ।



কেশব নাগালের স্বাধীনতার পক্ষপাতী, তার কথ্য সত্যোক্ত অঙ্গ করেসেই স্বাধীনতা নামে একটি বই লিখেছে। দই বন্ধু স্ত্রীলোকদের শিক্ষা দান এবং বাড়ির খেঁচোটোপ থেকে মুক্তি দান বিষয়ে আলোচনা করে। এসব দৈবেন্দ্রনাথের কানে আসে, তিনি আশ্চর্যিত হয়ে ন। তিনি বুঝতে পারেন, শৃঙ্খল পরিবর্তন হচ্ছে।

কেশব কুমারের থেকে ফেরত আসার পরে দৈবেন্দ্রনাথের স্মৃতিস্মারক কন্যা সুকুমারীর বিবাহ। কেশব এক অন্যান্য বাক্যের হবে একটা উচ্চ কণ্ঠে দাঁকি না তুললেও গল্পগানিয়ে বলারবল করতে লাগলো। গ্রাম সমাজের প্রধান পরব লেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে কিয় কেল হিন্দু মতে হবে। সেই নারায়ণ শিলা আর অশ্বিন-স্বামী? রাক্ষস এই সব পৌত্তলিকতা মানে না, অথচ সামাজিক অনর্থকোনে এগুলো মেনে চলতে হবে?

দৈবেন্দ্রনাথ রাজি হয়ে গেলেন বৃদ্ধদের কথায়। তিনি ঘোষণা করলেন, গ্রামমতেই কন্যার বিবাহ দৈবেন্দ্রনাথের সব কি, অশ্বিনীকায় না করে একটা মাঝামাঝি রকমের নিলেন তিনি। হিন্দু, ধর্মিত প্রায় সব কিছুই হিসেবে রাখলো, উল্লেখ্য হলো, কন্যার আসরে রাক্ষসে রাইলো দান সন্ধ্যা। অথ, অগ্ন্যুৎসব, মধুপক? বস্ত্রাদি নিয়ে বরকে বরণ করলেন দৈবেন্দ্রনাথ, স্ত্রী-নাচারও হলো, শূভদ্রুতি, মালা বদল, গ্রন্থি বন্ধন সব কিছুই বাদ গেল না। শ্রদ্ধা রাইলো না কোনো রোহিত আর নারায়ণ শিলা, আগুনের সামনে বজ্রও লাগে না। তার কলো কর ও বধুকে নিয়ে হলো ব্রহ্ম-সংসার আর পুরোহিতের বদলে প্রবীণ রাক্ষস দিলেন বদল।

উগ্র রাক্ষস এতখানি হিন্দুমানী মেনে চলার পুরো-চরিত্র খুশী না হলোও এটাই হলো প্রথম রাক্ষসমতে বিবাহ। হিন্দু সমাজের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ কাহিনী ছড়িয়ে পড়লো নানা দিকে। পুনরায় চার্লস ডিকেন্স সম্পাদিত বিলাতি সংবাদ-পত্র 'অলা দা ইয়ার রাউন্ড-এ' এই বিবাহের বর্ণনা ছাপা দিলো ফলোও ভাবে।

আর এরই ফলে বিরাট কোলাহল পড়ে গেল হিন্দু-মাজে। নতুন ভাবে স্বল্প শত্রু হলো। রাক্ষস চলেতার পর প্রথমে প্রবল আলোড়ন হলোও আস্তে আস্তে তা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। দেশের মানুষ কে নিরোঁছল যে এটা কিছু, আলোড়নো কড় মান-ধর কিছু, কলঙ্কীয় ছোকরাদের ব্যাপার। হিন্দু ধর্মের সংখ্যা লক্ষা আছে, রাক্ষসও না হয় আর একটা শাখা যে কলো থাকবে।

কিন্তু রাক্ষস কেবল অশ্বিনীকায় কয়লা হিন্দু-রাবার নড়ে চড়ে ওঠে। স্বাধীনতার আছে বইবেল, সেলমানের কোরান, আর হিন্দুদের বেদ থাকবে না?

এই সব দৈব গ্রন্থের কেউ ভুল ধরতে পারে? আর রাক্ষস বলে কিনা বেদ অস্ত্রান্ত নয়। এমন কি কেউ কেউ কলতে শত্রু, করুহ, বেদ একখানি কাব্যগ্রন্থ মাত্র। একটা কথা যারা বলে, তারা হিন্দু ধর্মের স্ত্রী।

এর পর ঠাকুরবাড়িতে শালগ্রাম শিলা বাদ দিয়ে বিবাহের কথা প্রচারিত হওয়ায় রোহের ফলটি ছড়তে লাগলো। ইন্দ্র ও অশ্বিনীকায়ী না রেখে বিবাহ হয়? সে তো ব্যভিচার? জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির উদ্দেশ্যে নিকশিত হতে লাগলো সারা দেশের যারা। শত্রু উপহাস ও বিদ্রোপ নয়। রাক্ষসের ওপরে যখন তখন আক্রমণের আশংকা দেখা দিল। রাক্ষসও বৃদ্ধের জন্য কোমর বাঁধলো নববোধে।

এই সময়ে রাক্ষসের একজন সেনাপতি দয়াকর। আর কে হবে সেই সেনাপতি, কেশব ছাড়া?

শহরে দৈবেন্দ্রনাথের মন টেকে না। সুকুমারীর বিবাহের সময় আত্মীয় পশ্চিমবঙ্গের কাছ থেকেও অনেক লোকের ও কটকটি সহজেই হয়েছিল। দৈবেন্দ্রনাথের ইচ্ছা শহর থেকে বেশ দূরে কোনো নিরালা জায়গায় একটা আগ্রাম তৈরি করবেন। সেই উদ্দেশ্যে বরিয়ে পড়ে, স্থান নির্বাচনের জন্য ঘরতে ঘরতে বর্ষমানের গুলকরায় এক অল্পবুজু তব খাটিয়ে রয়েছেন তিনি, হঠাৎ যেন এক রাতে প্রত্যাদেশ পেলেন। যেন স্বয়ং ইন্দ্রের তালিক থেকে কলঙ্ক, কেশবচন্দ্রক সমাজের আচার্য্য করে, তাতেই সমাজের কল্যাণ হবে।

কলকাতায় ফিরে গিয়েই তিনি ঘোষণা করলেন যে কেশবচন্দ্রকে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আচার্য্যর পদে বরণ করবেন। তাঁর কায়স হয়েছিল। সব কাজের ভার তিনি একার হাতে আর কাথতে পালেন না, তা ছাড়া এখন তিনি বেশী ভাগ সময়েই কাইরে বাইরে থাকেন। তিনি নামে মাত্র প্রধান আচার্য্য থাকলেও সব কাজের দায়িত্ব এখন থেকে নেবে কেশবচন্দ্র।

কেশবচন্দ্র কায়স সব মাত্র তেইশ বৎসর পার হয়েছিল, তাকে কায়সে দেওয়া হবে সমস্ত প্রবীণ রাক্ষসের মাথার ওপরে। এবং আক্রমণ হয়ও সে আচার্য্য হবে। এ কি সকলে মেনে নিতে পারে? কয়েকজন বৃদ্ধ শতানুশায়ী দৈবেন্দ্রনাথকে আড়ালে কালেন। এখনই এতটা ব্যক্তিগত কল কি ঠিক হতে আপনার? আর কিছলিন অপেক্ষা করল হয় না? এ কথা গল্প ছোকরাকে আপন এতখানি সম্মান ও দায়িত্ব দিয়ে একবারে সমাজের আচার্য্য করে দিচ্ছে? এ বোধ হয় আর চমকো কথিবাক দিয়ে কতটা কাজ হবে।

বোধহয় আর চমকো করুক নিয়। কেশবচন্দ্রের আড়ালে অনেকই কৌতুক করে। কেশবচন্দ্র সন্তানরাণ এখন এমনই শত্রুতে গেছে যে যাতে ভুল করেও একটা মিথ্যা কল ফেলতে না হয়, সেই জন্য কেশবচন্দ্র সব, কথার মধ্যে কোপ হয় বা চমকো করিব জড় দেয়। বাস্তব অক্ষের হিসাব লেখবার পর সাহেবের কাছ নিয়ে গেল সাহেব জিজ্ঞাস করছিলেন, হিসেব মিলেছে। কেশবচন্দ্র উত্তর দিয়েছিল বোধহয় মিলেছে। সাহেব ধমক দিয়ে কালেন, হিসাব মিলেছে কিংবা মেলেনি, এর মধ্যে আবার বোধহয় কী? কেউ কেউ রসিকতা বানিয়েছে যে, কেশবচন্দ্র ভাত খেতে বসে কল, এবার আমি ভাত খাবার চমকো করব। খাওয়ার পর হাত ধয়ে এসে বলে, এবার বোধহয় আমি অজিহিয়াছি।

প্রবীণদের আপত্তিতে কান দিলেন না দৈবেন্দ্রনাথ। কেশবের মতো এমন সত্যনিষ্ঠ, কায়স আর কে আছে। সবচেয়ে কড় কথা, তার অন্তরে জলছে আগুন। মাগামী ১লা জ্যৈষ্ঠে মহা ধুমধামের সঙ্গে তাকে বরণ করা হবে আচার্য্য পদে।



বেংগাল বাস্কের কোবানির চাকার ছেড় দিয়েছে কেশব। প্রায় সর্বকণ্ঠই সে ঠাকুরবাড়িতে থাকে। উৎসবের দু দিন আগে সত্যোক্ত তার বধুকে কললেন, ভাই এত বড় এতটা ব্যাপার হবে সেদিন। তোমার স্ত্রীকে আনবে না? তিনি দেখকেন না?

কেশব বললো, এ তো অতি উত্তম কথা। অকণ্ঠই বোধহয় তাকে আনা উচিত।

এবারে কিন্তু কেশবের পরিবারের সকলে একবারে বকে বসলেন। বাড়ির বড় বাবে এ ঠাকুরদের মতন স্নেহ ও পতিভাৱা বাড়তে? তা একবারেই অসম্ভব। কেশব যদি তার স্ত্রীকে নিয়ে যায় তা হলে একবারেই চলে যেতে হবে, এ বাড়িতে আর তার ফিরে আসা চলবে না। এমন কি সম্পত্তি অংশ থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হবে।

কেশবচন্দ্র তাতেও নিরস্ত হলো না। সম্পত্তি চিন্তা না হয় পরে করা যাবে, এখন যেমন ভাবেই হোক সে তার স্ত্রীকে নিয়ে যাবে। সারা বাড়ি ওষুতম কর বৃজেও কেশব তার স্ত্রীকে কোথাও বৃজে পেল না। এর মধ্যেই তাকে কোথাও লকিয়ে ফেলা হয়েছে।

সেই রাতেই একটা শিখিকা সঙ্গে নিয়ে কেশব চলে এলো বালিতে। এখানে তার শল্লভালয়। ভূতদের কাছে প্রথমে সন্ধান নিল তার পত্নী জগন্মোহিনী সেখানে আছে কি না। আছেন জেনেও কেশবচন্দ্র বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলো না, এক ভূতকে দিয়ে সংবাদ পাঠালো যে সে বাইরে অপেক্ষা করছে, জগন্মোহিনী ইচ্ছে হলে এসে সাক্ষাৎ করতে পারে।

জগন্মোহিনী তৎক্ষণাৎ নেমে আসতেই কেশবচন্দ্র তাকে সমস্ত ঘটনাদি প্রথমে বোঝালো। তারপর বললো, শোনো, তুমি খুব ভালো করে ভেবে নাও। তুমি যদি আমার সঙ্গে আসো, তবে তোমাকে জাত, ধর্ম, টাকা-পয়সা, সোনা-গহনা সব ত্যাগ করতে হবে। তোমার পিতা-মাতা ও অন্যান্য বৃদ্ধের সঙ্গে তুমি স্নেহ-ভালোবাসার বন্ধনে বন্ধ, তাঁদের সঙ্গে নষ্ট হবে তোমার সম্পর্ক। ক্ধার অল্প কখন কী জুটেবে ঠিক নেই। আমাকে ছাড়া আর সব কিছুই হারাবে তুমি। এতখানি ভাণের বিনিময়ে শত্রু, আমি কি তোমার যোগ?

কোনো উত্তর না দিয়ে কেশবের দিকে এগিয়ে এলো জগন্মোহিনী।

ভোরকো সন্ধ্যা কেশব এসে পৌঁছেলো জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দেউড়ির সামনে। দৈবেন্দ্রনাথ অপেক্ষা করছিলেন তার জন্য। কেশবকে আশ্বিনগন করার জন্য দু হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যেতে যেতে তিনি বললেন, এসো ব্রহ্মানন্দ, আমার এ গৃহ, তোমার গৃহ তুমি সাথে এখানে বাস করো। (ক্রমশঃ)



**সুখীত সুস্থিতিক্ষয় গুরু লাগাচ্ছে!**

# **এই হল এক সম্পূর্ণ কিচেন মেশিন। এখন তো এটি আরও বেশী ক'রে গুরু লাগাচ্ছে, কারণ এখন এ যে আরও নতুন নতুন সব কাজ ক'রে দেখাচ্ছে!**

সুখীত হ'ল ভারতে প্রথম নিজস্ব ধরণের এক মেশিন। এতে, সহজে খোঁচা যায় এমন এক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বৈদ্যুতিক মিলারের কার বাকের আর তাকে থাকে এক আকস্মিক ঢাকনা— আর তার ফলে সুখীত যে কত সহজে আরও কত সুপলতার সঙ্গে কাজ করছে তা দেখা যায়।

মানুষ ধরণের কাজ খুব চটপট আর অনেক বেশী সহজে করতে পারার জন্যে এতে এখনও ব্রেড আলোড়নী লাগানো হয়েছে, যা'র ফলে ভিজেন বা ভুকনো করে পেশা, ফেটানো, একদিকে মেলানো বা গোলার কাজে অথবা মাংস থেকে কিম্বা তৈরী করা বা শাক সবজী কাটাও অনেক সহজ হয়ে গেছে। একটি বিশেষ ধরণের খাটা মাথার অংশও এতে আছে, যেটি কটি, লুটি বা পীপার ইত্যাদির জন্যেও অতি চমৎকার। এটি মেখে দেয়—আর আরেক কেক মিশ্রণ মেশানোর এক বিশেষ স্বক!

সুখীত—এ এক হেভী ডিউটি মোটরও থাকে, যেটি এক নাগাড়ে একটুও না থেমে ৩০ মিনিট পর্যন্ত চলতে পারে। তাই বলছি, আছেন! এসে সুখীত-এর কাণ্ড কাণ্ডখানা একবার নিজের চোখে দেখুন!

সুখীত এক কম ঘামের পাচ্ছে, খাটা মাথার অংশটি ছাড়াও পাওয়া যায়, যার নাম সুখীত ভোমেরিক। স্বককার হলে খাটা মাথার অংশটি আলাদাভাবে কিনতে পাওয়া যায়।



**নতুন! মাংসের কিম্বা তৈরী করা, শাকসবজী কাটা, (ফোরা) ইত্যাদির উপযোগী নিজস্ব ধরণের অভিনব এই মেশিন, ভারতে এই প্রথম!**

বৈদ্যুতিক মিলারের কারের সঙ্গে একটি দেখতে, সাধারণিধে অথচ কাজে নিপুণ ব্রেড সেটরা হয়। সুখীত নির্মাতাদের দ্বারা বিশেষভাবে উদ্ভাবিত এই ব্রেডটি মাংসের কিম্বা ১ মিনিটের মধ্যে আর গাজর, পেঁয়াজ, নারিকেল, কাঙ্ক্ষ ইত্যাদি নিম্নেবের মধ্যে কুরে দেয় আর এমন কি বরফও টুকরো করে দেয় একেবারে পলক ফেলতে না ফেলতে! শক্তি, কি অভাবনীয় জিনিষ বলুন তো? নীচের লেখাগুলি পড়ে ভেবে দেখুন, এটি আপনার রান্নাঘরের কোন কাজে লাগবে।

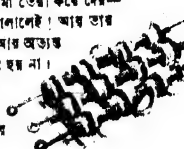
**কাঁচা মাংস :**

মশলা মাখা মাংসের কিম্বা তৈরী করে দেয়— ৩/৪ আবার একবার ঢালালেই! আর তার মুখরোচক, আভ্যন্তরিক আর অভ্যন্তর মূল্যবান রস একটুও নষ্ট হয় না।

শিক-কাঁচা, কামবাগ,

কিম্বা ইত্যাদি তৈরী করতে তো এ একেবারে

সিদ্ধান্ত!



**পেঁয়াজের গ্রেডিং ও সস :**

এটি ঘন ঘন বৃক্ষরোচক গ্রেডিং আর মোপলাই হারার জন্যে সসও তৈরী করে দেয়।

**নারিকেল বরফ :**

আপনার প্রিয় সব খাবার তৈরী করুন।

নারিকেল কুরে দেয় কয়েক

সেকেন্ডেও মশোট!

গাজরের হালুয়াই

তৈরী করুন বা কাঙ্ক্ষ না

আমহোট ইত্যাদির

খাবার—এ কাজ দ্রুত যাবে

একটু ভাবে!



**সুগন্ধযুক্ত বরফ :**

পলকের মধ্যে বরফ টুকরো টুকরো

করে দেয়—যা দেখে জিতে মল

এসে যায়। যে কোনো স্বকম স্বাদের

সুগন্ধ মেশান, এমন কি ককটেলের

জেনোও এ বরফ ঘষে দেবে।

**এবার দেখুন! সুখীত কিয়ং আপনাকে কি কি করতে পারবে।**



ভুকনো মশলা শিখে  
দেয় ৩-৫ মিনিটে



ফেটানো ডাল শিখে  
দেয় ৩-৫ মিনিটে



সেকেন্ডের মধ্যে গাজর  
কেটে দেয়



লক্ষী/ফলের রস কেটে  
দেয় ১ মিনিটে



চাটনী শিখে দেয়  
১ মিনিটে



খাটা মেখে দেয় ২ মিনিটে আর  
কেক মিশ্রণ মেশায় ৩-৫ মিনিটে

**সুখীত**

পূরণোপরি কিচেন মেশিন



OBM-2223-BEN

বিদ্যামূল্যে প্রাকর্ষণ : আমাদের অফিসগুলির পথ চেয়ে আছেন সুখীত-এর অসুখ সন কাজের মনুষ্য :

সার্ভিস সেন্টার : কে, দণ্ডপানী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা। ফোন : ২৬৬৭২৮, ২৬৬৭২৯

# হিমাংশুর দিনরাত্রি

## শিশির লাহিড়ী

ঘুম ভাঙতে বেশ দেরী হল হিমাংশুর। এমন বড় একটা হয় না। আল্লাহর গোল। নড়কড়ে উঠতে উঠতে হিমাংশু দেখল রোদ্দুরে ঘর ভরে গিরেছে। গরম লাগছিল। কাল প্রায় সন্ধ্যা রাত ঘুমোতে পেরেনি হিমাংশু। শতে শতে লোডশেডিং। ঘুমটা চোখের পাতার এসেও কেটে গেল। ভোরের দিকে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ছিল। সে ঘুম ভাঙতে যদি বেলা হয়, কলবার কিছু নেই। অথচ আজ সকাল সকাল ঘুম ভাঙার দরকার ছিল। ছোট সাহেব ভরমার কি একটা জরুরি কন্ফারেন্স আছে। ফরগুসন অ্যান্ড মেহেতার ফাইলটাইল সব বোঁড় রাখতে বলেছিল ভরমা। দাঁত পাইপ চিবোতে চিবোতে বলছিল, লাক্ হিয়ার মিস্টার রয়, আই ওয়াট নাট ফাইল রেডি। দ্যাটস্ জের ইমপোর্টেন্ট। শিলস অফার কো এক্সিকিউস। শালা মহা টেণ্টি। খল শিল খেতে এসেছে। এখানকার জল-হাওয়ে এখনও চামড়ার রঙ ধরে বারানি। তাই শিনরাত কাজ কাজ করে পাগল করে মারে।

বাড়ির দিকে তাকিয়ে হিমাংশু চমকে উঠল। সাতটা সাত। নটা পর্যন্ত টেনটা আল্লাহর ধরতে হচ্ছে না। ওটা ধরতে না পারলে নির্বাচন লেট। এ নির্বাচনে ইতিমধ্যে দুদিন লেট হয়েছে, তার সঙ্গে আর একদিন যোগ হবে। কিন্তু লেটের জন্য ভাবছে না হিমাংশু, ভাবছে কাজটার কথা। সোনালী মিস্তির আঁককাল



খবর নাগা কড়ছে। আজ যদি আবার কট মারে তা হলে হয়ে গেল। টাইপ করতে ছোটো বিপুল কানাকড়ন কাছে। শালা মহা হারামম। পানের বোটার চুল জিবে লাগাতে লাগাতে তারিয়ার তারিয়ার কলবে, কেন, তোমার সেই পেয়ারের মাগী আসেন কি। —ওসব হকটেবে না, ফেট। আমার কাজ আছে। শালাকে পটাতে এক প্যাকেট সিগারেট আর দুটো জর্দা পান নগদ থরকা। অফিস দেবে সে পরলা? তা না হলেই জবাবদিহি।

আসলে জবাবদিহি করতে চায় না হিমাংশু। সব অফিসে তো আর ব্যস্ত-ব্যস্তের মতন কড়া ইন্ট্রাকশন নেই, যে ফস কলেই লাগাতার। তার মতন এস্টাবলিশমেন্টে ওপরঅলাদের চটিয়ে কোন ফল হয় না। কনফিডেন্সিয়ার ফাইলে কে কোথায় কি ঢুকাল করে দিল, তা হলেই আঁখের গেল। যে চেয়ারে প্রথম দিন এসে বসেছিল, সে চেয়ারেই পেছন দিকে জম্ম কাবার। নহ, এক চেয়ারে জীবন কাটার জন্য হিমাংশুর জন্ম হয়নি। তাকে উঠতে হবে। সামনে সমুদ্র ভবিষ্যৎ। অদূরেই নীতি, মনমুখ আর বাক্য।

‘নীতি!’ হিমাংশু এবার চিবকার জড়ল। নীতি চা। জলদি।  
‘এই তো উঠলে। দাঁড়াও, জলটা ফটুক।’  
হিমাংশুর তর সহছে না। চমত গলার বলল, ‘তোমারকে কে আবার জল ঢাপতে কল? সকালের চাটা গরম করে দিলেই পারতে।’  
‘ও চা খেয়েছ কোনদিন? না, ও চা তোমার মুখে রেক্টে।’

হিমাংশু, চুপ করে গেল। নীতির গলার সরে থমক হয়ে যাচ্ছে। বেলা করে ঘুম থেকে ওঠার জন্য নিজের ওপর রান্ন হচ্ছিল হিমাংশু। —জানো হয়। হিমাংশু মনে মনে বলল। ঘুমের মধ্যে রক্তাক্ত অস্তিত্বের যে ব্যবসায় পাইয়ে দিয়েছে হিমাংশু, তা ভগাট করতে হিমাসম খেতে হচ্ছে, অথ—

হিমাংশু, কাসি মখে সিগারেট ধরল। গলা খকখক করছে। গমকা একটা কাশিও এল। কাশি সামাল দিতে দিতে হিমাংশুর স্বপ্ন নীতির ওপর পড়ল। নীতি

কড় একগুয়ে। নিজে বা কেঁকে, তাই করবে। অথচ এটা বোকা দরকার, যে সময় কারও হাতধরা নয়। এই পালিয়ে বাওয়া সময়ের পিছা পিছা ছুটে সময় ধরা, সোনার হরিল ধরার চেয়েও কঠিন ব্যাপার।

নীতি চা এনে রাখল। নিজে দেখী করে উঠবে, আবার কথা। কেন, সকাল সকাল উঠতে পারনি?’

হিমাংশু গলা তিরিয়ে নিল। ইচ্ছে করে উঠেছি। হয়ে গেল, কি করবে। সাজ রাত একতারা ঘুঁঘুরেছি।

কে ঘুমিয়েছে? তুমি তো বেশ কাত ফিরে একা একা শূরে পড়লে। তোমার ছেলেমেয়ে দুটোকে রাতভোর যে হাওয়া করতে করতে হাতের নোড়া ছিঁড়ে গেল, সে কথা জানো?’

হিমাংশু চোখ জুলল। নীতির স্মরণ সারা। ‘ভিজ়ে চুল গিট দিরে পিঠের ওপর এলানো। এখনও চুলে চিমুনি দেবার সময় পারিনি নীতি। মূখ প্রলাথল্হী। ককর লাভবার প্রলেপে কোথাও একটা রাতজাগা রাস্তির রুকুতা। সে রুকুতাট কজাবতার এখন ফটে উঠছে নীতির।

সব জানি। হিমাংশু কলল, কিন্তু কি করব কল। আমি তো আর বিকল-মলী নই যে, তোমার কোন সুন্দর হবে।

‘অবত, শব্দ শব্দ আলোবারে করছ কেন? তুমি যেমন ঘুমোওনি, যাও পিঠজনও তেমন ঘুমোওনি। তবু জোর না হতেই তাসের উঠতে হয়। হয়েছে। যদি তো আর তাসের জন বসে থাকবে না।’

‘আমার অন্য থাকবে?’





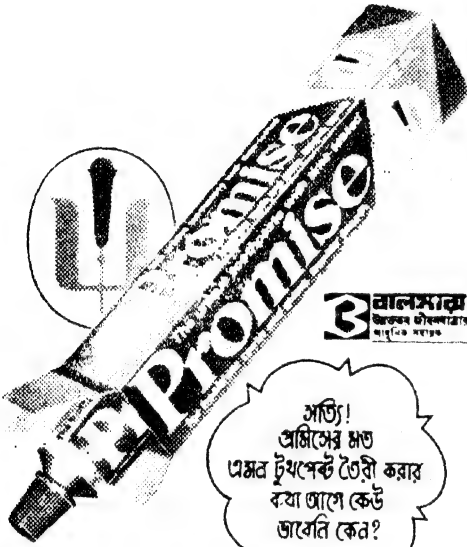
মনে আছে কি, ছোটবেলায় যখন দাঁতের যন্ত্রণা হ'ত, তখন ঠাকুমা লবঙ্গের তেল লাগিয়ে কেমন তা সাহিয়ে তুলতেন? আপনার দাঁতের ডাক্তার আজও তা ব্যবহার করেন!

# প্রমিস

## এক অদ্বিতীয় টুথপেস্ট

### যাতে আছে চিরকালের ব্যবহার

### লবঙ্গের তেল!



গতি! অগ্নিসের দাত প্রমিত টুথপেস্ট তৈরী করার কথা আগে কেউ ভাবেনি কে?



**লবঙ্গের তেল মিশ্রিত নতুন প্রমিস টুথপেস্ট**

১

দাঁতের ক্ষয় নিবারণ করতে সাহায্য করে।

২

মুখের ভেতর তাজা রাখার মতন নিঃস্বাসে দুর্গন্ধ হতে দেয় না।

**সুস্থ সবল দাঁত ও মাড়ি**  
**আর তাজা শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য... প্রমিস!**  
 বিশেষ প্রমিস অফারের জন্য আপনার  
 ডীলারের কাছে খোঁজ নিন।

CHAITRA-BLS 369 R BEN

‘কি জানি!’ নীতি তাঁটারে কোণ বেঁকা হাসিতে ভিজিয়ে নিল। ‘পতঙ্গ - পুরুষমানুষ, থাকলেও থাকতে পারে!’

এ কথাই কোন উত্তর নেই। উত্তর শোনবার জন্য নীতিও দাঁড়িয়ে রইল না, রাস্তাঘাটে অনেক কাজ। ভাত ফটছে। ছেলেমেয়েরা জলখাবারের জন্য চানচান করছে। এক মিনিট এদিক-ওদিক হালাই আলমটি চাল করে ফেলবে। নীতি যেতে যেতে বলল, ‘বকসেফের মাথার টোকা রেখেছি, বাজার যেতে হবে।’ ‘বাজার?’ হিমাংশু আকাশ থেকে পড়ল।

এক পা সামনে, মাথা ফেরানো। নীতি ছবিরা মতন হজ্ঞে দাঁড়াল। ‘কথাটা নতুন শুনই নাকি? সংসার করলে কাজটা যেতে হয় জানো না?’

‘কালই তো গিয়েছিলাম।’

‘কাল নয় পরশু?’ এই গল্পে দু’দিনের বাসি কিছু থাকে।

হিমাংশু উঠতে যাচ্ছিল। আবার বসে পড়ল। এখন বাজার! ঘাড়তে সাতটা সতরো! এ সময়ে বাজারে প্রচণ্ড ভিড়। কোন জিনিসই আর দেখেশুনে কেনবার জো থাকবে না। একটু যে দরদাম করবে তাও উপায় নেই। হারামজাদা বাপার! গুলো ঠিক এই ভিড়ের মধ্যে ওজন মাপবে, দামও কোপাবে।

বাকরম থেকে ফিরে তাঁর চাত হতে আরও কয়েক মিনিট গেল। পারে চিট গুলিয়ে ভিড়খিড় বের হবার সময় হিমাংশুর হঠাৎ মনে হল প্রয়োজনের সময়ে হাতের টাকার মতন সময়ও বড় ত্যাগত্যাগি ফুরিয়ে যায়।

চিটটা পায়ে দেবার সময় হিমাংশুর খটকা লেগেছিল। এখন চলতে চলতে ব্যাল, গুলি বেসের বলছে। ডান পায়ের বড়ো আঙুলের শূদ্রাপটী কদিন ধক্কেই চিলে চিলে লাগছিল। এ সব আধা জোড়া জুতো, মেয়ামত ককবার কথাও ভেবেছিল হিমাংশু। কিছটা কুড়ুমি, কিছটা করছি করব, কিছটা পাঁচ কাজে হয়ে ওঠেনি। এখন নোড়াই আলগা লাগছে। দাঁত তোলা হ’লে ককবার মতন কেমন যেন ফস ফস করে। হিমাংশু অথচ বাকি নেবার চেষ্টা না করে, পাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাটতে লাগল।

‘কি হল? পায়ে আবার কি হল তোমার?’

হিমাংশু মুখ ঘোরাল। তেলের ভিড় হাতে নারদর মতন অবস্থা-হিমাংশুর। পণ্ডবকে মুখ তুলে দেখেনি। এখন আচমকা কথার জ্বাকে মুখ তুলতেই পদ্মদার বয়সা মুখ দেখে বলল, ‘চিটটা কিদ্রা ঘোষণা করবার তালে আচ্ছ দাদা। একটু কক্সা করে হাটছি।’

‘কক্সা! তুমিই তো কক্সায় পড়ে গেছ দেখছি।’ তোমার এখন টিন্দিরা গাখীরা অবস্থা, শ্যাম রাখি না কল জাখি! হতে আমার মতন, শ্রীচরণগল! চরসা, ভাহলে কি আর নেকে নেকে চলতে হত?’

‘পদ্মকই না হয় পরিত্যাগ করেছেন, এর পর যখন কক্সপণ্ড বিদ্রাঘ করবে, তখন কি করবেন দাদা?’

‘একটা জব্বার প্রশ্ন বকছে ভায়া! গহীরা বস্ত বিমোচন করতে পারে না। সম্যাসীরা পারে। সে সময় হলে, না হয় সম্যাসই নেওয়া যাবে।’

সময়! আবার সময়! শকুটা কানের ওপর ঢং করে বাজল। হিমাংশু প্রায় লাফিয়ে উঠল। ‘মহাতের জন চটর কথা সম্পূর্ণ তুলে গিয়েছিল হিমাংশু। মাটিতে পা রাখতেই বিপদ। আলগা শূদ্রাপটী পড়ে খলে গিয়ে দাঁত কক করে হাসছে। ভাগস হেচি খায়নি। খেলে বড়ো আঙুলের নখ কেটে ঝগাঝগি হয়ে যেত।

পদ্মদা আঙুলে ধরা নীসর টিপ নাকে সশব্দ টেনে নিলেন। ‘নাও, হোল তো! আমাদের কি ভিড়খিড় সাজে? আমাদের সব গলাই-লক্ষ্মী চাল; করছি কব, যাচ্ছি যাব, তা নক্সা—তুমিও যেমন! নাও, ওটাকে এখন কালে পুরে শরৎকব, সাজো, কেউ জিজ্ঞাস করলে কব পাদুকা-পূরণ।’

এত দুঃখেও হিমাংশু হেসে ফেলল। পণ্ড দা ওইরকমই। ‘ক’র হাঁস, গ্যয়ে আঁচ লাগে না। কিন্তু হিমাংশু হিমাংশু, পণ্ড দা নয়। হিমাংশু সময়ে টান পড়েছে। সে টান ক্রমশ গলার ফাস হয়ে যাচ্ছে। হিমাংশু যতই চেষ্টা করুক এই পালানো সময়ের ফাস থেকে তার মতি নেই। নিদারুণ এক উপদ্রবের মতন এই সময় আজ সকাল থেকে হিমাংশুকে কড় মলিন করে তুলেছে।

বাজার সেয়ে ফিরতে বেশ দেরী হল হিমাংশুর। নীতি আড়চোখে দেবে বলল, ‘বাজারে বাজার নিয়ে বসে গিয়েছিলে নাকি! দেবী দেখে আমি আবার লোক পড়বার কথা ভাবছিলাম।’

মুখে অশ্রুত একটা শব্দ করল হিমাংশু। খেঁড়ার পা খানায় পড়ে। দিল বকে চিটটাও আজ ছিঁড়ে গেল।

যাক গিয়েছে! এবার নিশ্চিন্দ! নীতি হাসল। ‘অনেক দিনই ওটার ব্যবহার সময় হয়েছিল। তুমি প্রাণে ধরে কিছতেই ফেলতে পারছিলে না।’

হিমাংশু লেগে উঠল। আচমকা বেগে উঠল। কেন যে এই রাস, হিমাংশু, নিজেই বকতে পারছিল না। নীতির কথাগুলো খেঁচার মতন শোনছে। পুরানো কোন ক্ষত বেন আঘাত পাচ্ছিল হিমাংশু। এই মহাতে ক্ষতের স্থানটা চোখের আড়ালে থাকলেও, মনের মধ্যে একটা জ্বালা অনুভব করছিল হিমাংশু। সেই জ্বালাই হবার বিশেষরূপে সহসা চিকচিকে যেতে পড়ল। ‘সব কিছই একটা সময় আছে, বাজে বকক করে না। পারের ওপর পা নিয়ে গদিয়ান চালে বস আছে, কুটে যেতে হলে বকতে পারতে!’

জ্ঞান কি?   
 কিসের জ্ঞান?

ফোন। হিমাংশু শব্দ ছুঁতে কোঁচকাল। এই অসময়ে, এই শেষ দৃশ্যের কে ফোন করতে পারে। খুব প্রয়োজন না হলে কেউ কড় একটা ফোন করে না হিমাংশুকে। জামতে সন্তান কবীর ভবন এত বেশি আত্মীয়-পরিজন নেই। নীতা ইদানীংকাল



প্রবন্ধিত হ'ল

বাংলা সাহিত্যের  
ব্যঙ্গ-বিদগ-রসরসের  
প্রতিষ্ঠিত লেখক

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের

মনুষ্য ক্রেশ

নিবারণী সম্মিতি

চটুলতা নয়, গন্নিমিত এবং  
পরিশীলিত রসস্থিতির মাধ্যমে  
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এক  
মনোজ্ঞ হাস্যরসের অবতারগণা  
করেছেন।

চণ্ডা লাভিড়ার মজদুর কার্টুন  
বইখানির অন্যতম আকর্ষণ।



লেখকের ভিন্ন স্বাদের কাহিনীবহু দূরের ওপার হতে

প্রকাশিত হল  
ক্রাইম উপন্যাসের জগতে নিপুণ  
বহুশ্রুভেদী  
কালো সেনগুপ্ত

তীরনতুন নিবেদন



কুমুমে গরল  
একফোঁটা

বারো টাকা

কালো সেনগুপ্ত-র অন্যান্য ক্রাইম থ্রিলার  
রক্তা খুন হল ১২.০০ হিচ হাইকার ১০.০০  
দহনে বিষ দহনে বড় ছালা ৯ ডামি ১০.০০

কুমুমে গরল

প্রকাশক: মোহনী প্রকাশনী  
১৪ কলকাতা ১০

মদস দুই আগে একবার করেছিল। একদিন ছোট্ট শালা। কিন্তু সে সব ফোন  
কালেছত্র আসে। হিমাংশু, চেয়ারে ছেড়ে না উঠেই বলল, 'দে, বল দে, আমি নেই।  
আউট!'

না, না মহিলার গলা শুনছে। কোথায় বউদি হবেন।  
নীতা! নীতার ফোন করবার মতন কি এখন জরুরী ব্যাপার হল? খুব  
জাগ্রদের কিছু, না হলে অজ্ঞ তো নীতা মচকাবে না। অফিস আসার সময় ডলটল,  
টাকাপয়সা টেবিলের ওপর রেখে নীতা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। অনাদিন দাঁড়িয়ে  
থাকে। রুমালটো মাল এগিয়ে দেয়। নীতার কোলে বাবুকে চুমু খাবার সময়  
নীতাকেও একটু খুচরো আদর করে নেয় হিমাংশু। নীতা এতকালেক বেস,  
দিককে দিন কি অসভ্য হচ্ছে না, মানুযজন জ্ঞান নেই! 'কাক' আবার মানব!  
হিমাংশু হাসে।

ফোন ধরে হিমাংশু উদ্বেগের মলায় বলল, 'হ্যালো!'  
কে অংশুনা! আমি তুপ্তি বলছি।  
'তুপ্তি! হিমাংশু একটু ঠেক খেল। পরক্ষণেই সোফারের বলল, 'আঁ হ্যাঁ, বল  
বল? কি ব্যাপার?'

'উফ! আশ্চর্য একটা লাইন ব্যার! তুপ্তি উত্তর দেয়। 'বাড়ি পার্জোয়িন  
মিনট ধরে ডায়াল করতে করতে এতক্ষণে পেলাম।  
'কলকাতার আর কোনটা ঠিক আছে বল। ইলেকট্রিক, টেলিফোন, কনভেয়ান্স,  
স্কুল-কলেজ, পরীক্ষা সবই বৈঠক।'

'তা বা বলেছ। শোন, তোমাকে আজ একবার আমাদের বাড়ি আসতে হবে।  
'আজ! আজ তো আমার সময় হবে না। হাতে ভাষণ কাজ।'  
'ও কাজটাছ কললে চলবে না। আসতেই হবে। বাবা তোমাকে পরগলার মতন  
খুজছে।'

'কি ব্যাপার বলবি তো?'  
'ব্যাপার কি ছাই আমিই জানি। বাবা তো আজ সতেরো দিন শয্যাশায়ী হয়ে  
পড়ে আছে।'

'শয্যাশায়ী! কই খবর পাইনি তো?'  
'নিলে তো পাবে।' তুপ্তি টেলিফোনেই হাসল। 'তোমাকে সব সময় খবর দিত  
হয়, নিতে জানো?'

ফোনা কটকট করছে। হ্যালো! হ্যালো! হিমাংশুর হালের হ্যালো চিৎকারের  
মধ্যেই ফোন কেটে গেল। লাইন ডেড। হিমাংশু ফিরে তাকাল। কিং বলল,  
'কেটে গেল?'

'না লাইন ডেড। নো সাউন্ড, নট কিছ।'  
কিং চেয়ারে এলিয়ে বলল। 'খাক বাবা! বাটা গেল। আজকের মতন হুটি।  
শালা ইনটরকম থেকে খালি একটা করে ঝড়বে আর বলে লাইন করে। হট  
লাইন ছাড় আজ সব ফাঁকা।'

হিমাংশু ফিরে এল। মানে হয়! মিছিমিছি কিছু সময় নষ্ট, অথচ খবরটাও  
পুরো পাওয়া গেল না। অথবা একদম উদ্বেগের মধ্যে এখন হুটি না হওয়া পর্যন্ত  
কটাতে হবে। অন্য দিন হলে চলে যেতে পারত হিমাংশু। কিন্তু আজ দিন  
বকেই ফোনাটা এল। মেসোশাই যে সতেরো দিন শয্যাশায়ী আছেন, এ কথা কেমন  
করে জানবে হিমাংশু। আজকাল আর তেমন যোগাযোগ নেই। মা মারা যাবার পর  
থেকেই কিছুটা আড়োআড়ো ছাড়াছাড়া ভাব। একহাতে তালি বাজে না।  
হিমাংশু দিন কতক ব্যাটারি করেছিল, কিন্তু মাসামারি ফিরাও আসা যাওয়া করেন  
না। শুনের ক্রস হয়েছে, ঠাণ্ডা না আসতে পারেন, কিন্তু তুপ্তিটারিও তো আসতে  
পারে। মেরোয়ি ব্যাপারম্যাপার ঠিক বুঝতে পারে না হিমাংশু। কোথায় কি যে  
হল, একআধদিন এসে ওর আসা-যাওয়া বন্ধ করল। নীতিও আর যাবার নাম  
করল না। অথচ খোঁচাটা হিমাংশুকেই হজম করতে হল। এখন না গেলেও নিঃ  
গেলেও বিপদ। একটা মানুয শয্যাশায়ী এ কথা শুনে কেমন করে? গিয়ে থাকতে  
পারা যায়। গেলে মেসোশাই কি যে বলবেন, তারও কি-কলগা জানে না  
হিমাংশু। ভাল বিপদ।

হরকেও এসে বলল, 'বড়বাবু, কলাতা হার।'  
হিমাংশু বলল, 'খাচ্ছি মা।'

মনের তারিফ কেটা বিজ্ঞানবিদ এই ক্ষেত্রে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে  
চাইছে না হিমাংশু। মনোবিদদের মতন বড়বাবু, নিজেকে একটু খাতল করে নিক  
হিমাংশু তারপরেও মনোবিদদের মতন এক একটা খবর আসে যে,  
পারের মাট নড়ে উঠেছে। মনোবিদদের মতন মেসোশায়েরে খবর হয়েছে, কোন  
দিন আছেন, কোন দিন চাই। হিমাংশু, গল্প যায় না, ভালমন্দ যদি কিছু একটা হয়ে  
যায়, তাহলে মনোবিদদের ক্ষমতা বরাতে পারবে না হিমাংশু। অথচ তুপ্তির গলায়  
তেমন কিছু, উদ্বেগের চিহ্ন দেখল না হিমাংশু। ব্যাপারটা কেমন যেন হোসোময়-  
ফিল।

আরও কিছুক্ষণ পরে হিমাংশু, উঠল।  
বড়কে কঠিন দিয়ে দাঁতের ফাঁক আটকানো সুপারিশটি বার করতে করতে  
বড়বাবু, কললেন, 'হয়েছে?'

হিমাংশু, ঘাড় নাড়ল। 'টাইপ হয় নি।'  
হুর্দান। 'তা বেশ। বাও, ভেতরে বাও।'

হিমাংশু, বড়বাবুর মনের দিকে তাকাল। একবারে পাকাল মাহের মতন মন্থ।  
মুখ দেখে মনের কথা যদি কিস, শুধা যায়। সুই-ভেজর টেলে ভেতরে ঢুকল  
হিমাংশু। পারের ওপর পা জড়িয়ে সিলিডিয়া ডিকটেশন নিচ্ছে। ফস! লম্বা পা,

কক্ষ বসে না লেগেছে। স্বাক্ষর সামান্য উঠে গিয়েছে, ডান পারের হাঁটুর কাছে বেশ কিছু জায়গা অনাবৃত। সেখানে আর্থাল সাইজের একটা মেন্স কন্ডর ছিল। এক বলক আঁকিয়ে হিমাংশু চোখ ফিরিয়ে নিল। এরকম একটা গোল জড়ুলের চিহ্ন নীতিতর বা পারের উপরে আছে। জড়ুল নাকি কড় শুলেছিল।

সিলাভিয়া উঠে পড়ল।

ভরমা হিমাংশুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'রোড? এন্ডারিং? ও কে?'

হিমাংশু, অমত্যা আমতা করল। 'রোড। আর নট টাইপস্ট স্যার।'

'আই ওয়াণ্টেড ইট টু বি রোড?'

'ফ্রায়েন্ট কান আই ডু স্যার। মিস মিসে ইজ আবসেন্ট।'

'কেন গেট ইট ডান ফ্রম এনহোয়ার এলস। আই ওয়াণ্ট ইট নাই।'

কথার ধরনে হিমাংশুর অহমিকা আঘাত খেল। হিমাংশু জোরের গলায় কলল, 'দ্যাটস্ নট মাই জব। প্লিস আসক বড়াবাব, টু ডু ইট।'

ভরমার মুখটা লাল হয়ে আসছিল। হিমাংশু ঘর ছেড়ে বের হয়ে এল। আগে কান! মাথা ভেঁ ভেঁ করছে। বড়াবাবের টেবিলে এসে বলল, 'একটিন টাইপ করিয়ে দিন, পেটের ছেলে পড়ে যাচ্ছে।'

মথের সুপারিশকৃত থু থু করে ফেল দিয়ে বড়াবাব বললেন, 'রাখো তো! কাল কা যোগা।'

হিমাংশুর মুখ সামান্য বিষম দেখাচ্ছিল। ওপরঅলাদের সঙ্গে ধরি মাছ না ছুই পানি গোছের ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু আজ হিমাংশু তাকে জড়িয়ে পড়ল। ভরমা মনে মনে খেতে থাকবে, কোথায় যে কি চুকালি করবে কে জানে।

বোয়াল চা রেখে গিয়েছে।

হিমাংশু চায়ের টেট ডুবিয়ে গলা ভিজিয়ে নিল। বাপস! আজ খাট্টের খাটিয়ে জান মেরে দিয়েছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিজেকে সামান্য এলিয়ে দিল চোয়ারে। নপেনে পাশ থেকে বসে উঠল, গুঁকল, তোর সেই সময়টাকে ধরতে পারলি।'

'খরোঁছলাম। কিন্তু শেখরকা হল না।'

'তাই হক চাঁদ! তাই হয়। সময়, স্ট্রীলোক এবং জীবন এ কেউ ধরে রাখতে পারে না। যত দিন থাকে, থাকে।'

স্টেশনে নেমে হিমাংশু উবসুক চোখে বাইরের দিকে তাকাল।

না, 'নিছক অশ্রুকার। দোকানে দোকানে কুঁপ জ্বলছে। অম্পূর্ণা বন্দ্যার হাজাকা জ্বালিয়েছে। এই অশ্রুকার কি জীবন স্বার্থী হয়ে গেল, আলোর পোশনাই কি আর জ্বলবে না? হিমাংশু ভাবল। হিমাংশু, ক্রমশ ক্রমশ হতাশ হচ্ছিল।

'প্ল্যাটফর্ম' থেকে নামার সিঁড়িটা গড়ানে। সিঁড়ির ইট ক্ষরে গিয়েছে। দেখবার কেউ নেই। পাশেই ফেরালার বোপাডু। আর একটু হলেই হোটেল খেতে হিমাংশু, খুব সময়ে সামলে নিয়েছে। পিছন থেকে কে যেন বলল, 'রেল আমদের জাতীয় সম্পত্তি। লুট লো।'

হিমাংশু, নেমে এল। সিগারেটের দোকানে দাঁড়াল। এক প্যাকেট সিগারেট দরকার, টুকটাকি আরও কিছু... আটটা পয়তাজির গাড়ীটা পেয়েছিল তাই সব রকম, তা না হলে দশটার আগে ফেরা হত না। দশটার ফিরলে কেনাকাটা কিছই সারা হত না। এই অশ্রুকারের মধ্যে কে অত রাত অবধি দোকান খুলে কসে থাকবে।

'কটাগ গিয়েছে?'

'আড়াইটে।'

'এখনও এল না।'

'ভ্রাসে কি না দেখুন। কেবল ফলটু। সারান্নে না হলে আজ সারা রাত হারিমটর।'

'সে কি! তা হলে তো মরে যাব।'

'আপনি মরে যাবেন তাতে সরকারের কি! কং পোড়তে গেলে ঘাট খরচ দিতে হবে।'

হিমাংশু আর কথা বাড়াল না। কার্দিন ধরেই মনমুন একটা ফিটের ককা বলাছিল। নীতা এক প্যাকেট সেফটপিন। সেফটপিন আবার রাতে পাওয়া যায় কি না কে জানে। সুচু বিন্ধ করে না। এসক জিনিসকে বিন্ধবারটা একটা বিশেষ সময় আছে। সব বিষয়েই সময়ের বাধ্যবাধি, অথচ নিজের ব্যাপারে আজ কিছতেই সময়টাকে হাতের মটোয় আনতে পারছে না হিমাংশু। কোথা দিয়ে কারবার পিন্ধলে পড়িয়ে থাকে সময়।

অফিস ঘাবার সময় ভেবেছিল, আজ কাজটাজ সেজেই ফিরে চলে আসবে হিমাংশু। অন্য দিকের মতন অফিস-ক্লকের তাসের আছাড় টু মারবে না। সকাল-জো নীতিতর সঙ্গে খচকাবর হয়ে গেল। একটু, সকাল সকাল ফিরে পালিস দিয়ে ওটুকু সরল করে দেবে। মেয়েদের ইগোয় আঘাত লাগলে মেয়েরা কেশধুরিয়াস হয়ে যায়। তা যেতে পারে, বলার কিছ নেই। এ সংসারে পুণ্ডের তুলনায় মেয়েরা অনেক বেশি স্বার্থভাগ্য করে। সে তাগ অকল নিজের স্বার্থেই। স্বার্থেই হোক আর নাই হোক, পুণ্ডের কাজ হাসিল করতে হলে, ওদের চাট্টে লাভ হয় না। বজ একটু তোয়াজ দরকার। কিন্তু না, সেই তোয়াজের সময়টুকু পাওয়া গেল না। কোথা থেকে কুঁপ্ত দুম করে একটা ফোন করে বলল, 'আজ হিমাংশুকে ছুটিত হল উল্টোজাপা। বাপস! সে কি এখানে। অফিসের এই রাশ-পিরিয়ডে বেরিয়ে যাওয়া কি চাট্টখানি ব্যাপার।

হিমাংশু, দরজায় নক করল। গলা নমিয়ে জবল, 'নীতি!'

ডাকটা কুঁড়িয়ে বাস্তব আবেশ দুম করে আলো জ্বলে উঠল। চতুর্দিক থেকে একটা একটা উজ্জ্বলের গলন, 'আলো এসেছে! আলো এসেছে!' মনমুন যেন হাততালি দিয়ে নেচে উঠল। নীতিতর আলসোয় হাই তোলা গলার শব্দের সঙ্গে ডোর-বোন্ট খেলার শব্দব আওয়াজ মিলেমিশে একাকার।

হিমাংশু ভেতরে ঢুকল। নীতিতর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভালো বিপদ! কি ভাগি এল। তান্না হলে অজ্ঞও অশ্রুকারে পচ মরতে হত।'

নীতিতর ঠিক উত্তর মিল না। কথাতার সায় দেওয়া গোচের গলার মধ্যে একটা শব্দ করল। আরপর মনমুনের দিকে ফিরে বলল, 'মুনি, যাও এবার পাখা খুলে শূরে পড়। রাত হল।'

হিমাংশু এল। আলোও এল। ঠিক এই মহতের ঘুমোতে যাবার ইচ্ছে মনমুনের নেই। মনমুন আদুরি আদুরি গলায় কলল, 'আর একটুখানি মা। একটু, পর শূরে পড়ব।'

নীতিতর চোখ পাকিয়ে বলল, 'না! যাও, শূরে পড়। ভোরবেলা শুলে যেতে হবে জামো না।'

হিমাংশু একবার নীতিতর দিকে তাকাল। একবার মনমুনের দিকে। এখন প্রত্যয়ের চোখে তাকালে বিশ্লেষণ ঘটতে পারে। হিমাংশু, লাল ফিটের গলিটা পকেট থেকে বার করে মনমুনের হাতে দিয়ে বলল, 'নাও, তোমার ফিটটা নিয়ে শূরে পড়। কাল শুলে পরে যাবে। আমার মা-মণি। দাঁটস্ এ গুড়ে গারল।'

বড় অস্পে খুশি মনমুন। লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

'চা খাবে?'

প্রশ্নের মতন ভাসা ভাসা উত্তর মিল হিমাংশু, 'থলে হয়।'

গলায় সামান্য জোরের সঙ্গে নীতিতর কলল, 'খাবে কি না বল।'

'খাবো।'

নীতিতর রামাঘরের দিকে চলে গেল। হিমাংশু পেশাচট্টোশাক ছাড়তে ছাড়তে বাকল, নীতিতর মেজাজ এখনও নরম হয়নি। বরং লোডশেডিং-এর তন্ত কটায়ে পড়ে আরও গম্ব হয়েছে। এই গরমের মোকাবিলা গরম দোখের করা যায়। কিন্তু সেটা অশান্তির পথ। সারা দিন তেতেপড়ে এসে এই রাস্তার আর চেচামেচি জ্বল লাগছে না। তা ছাড়া, আজকের ঘটনায় হিমাংশুই সবতোভাবে দোষী। খাওয়ার খেটা ভয়ানক খেটা, এমন খেটা দিলে যে কোন মানুষই শোশান্তরী হতে পারে।

দোকান বদলে সহজ হল হিমাংশু। শুকনো ডোয়ালে দিয়ে গা-পিঠ বগড়াল। পিঠ কুঁকছে। আজ মোয়ের শিং-এর হাতটাই ভরসা। নীতিতর নিজের থেকে এগিয়ে এসে পিঠ খুঁটে দেবে না নিশ্চয়ই।

হিমাংশু, পাখার তলায় বসল। যাক, মদের ভাল, আলো-পাখা আছে। এই হাওয়ায় খানিক সুস্থির হয়ে বসলেই, সময়সর মোকাবিলা করবার মতন বুদ্ধি নিচটাই মাথায় এসে যাবে। আর কিছ, না হোক নিজের বুদ্ধির ওপর ভরসা রাখে হিমাংশু।

নীতিতর চা নমিয়ে রাখল।

হিমাংশু, বলল, 'ও বাড়ির পাখি খবর দেয়নি, আমি টেলিফোন করছিলাম।'

নীতিতর কাটা কাজে জবাব দিল। 'দিয়েছে।'

নীতিতর চোয়ারে গিয়ে বসল। রোঁড়ের চাঁদ ঘোরাল। চায়ে চুমুক দিয়ে হিমাংশু, বলল, 'শুধু, শুধু ছুটিয়ে মাল। মেসোমশায়ের এমন কিছ হয়নি।'

প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ করতে চাইছে হিমাংশু। নীতিতর সেরকমভাবে সাড়া দেয় কিনা। নীতিতর উৎকর্ণ হল ঠিকই, চোখের কোলে একটু, ভাজিও পড়ল যেন। কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। নীতিতর কথা কইল না।

'কুঁপ ফোন করে বলল, বাবা সতেরো দিন শয্যাশায়ী, তোমাকে আজই একবার আসতে হবে। এরকম খবর পেলে কি করা যায়। গিরে দোঁধ, বাঙের বাখা! শুধু, শুধু দৌড়কাপ করিয়ে মায়।'

'যাক, তবু বাঙের দৌলতে মেসোমশায়ের বাড়ি যাওয়া হল। তা না হলে তো হয়ে ওঠে না।'

ককর মাঝপাটটা ঠিক ধরতে পারল না হিমাংশু। একটু বোঁকানো ভাব আছে, একবারের সরল নয় বলার চা। তবু ওই মজা হিমাংশু, যেন নিজের স্বীকৃতি খুঁজে পেল। হিমাংশু, বলল, 'তুমি মাই বল, মা মারা যাবার পর ওরা যে ব্যবহার করেছেন, তাতে আর ওখানে যাওয়া যায় না। মতু, যেতে হল।'

'আরে বইক! তোমার মেসোমশাই, তুমি তো আর ফেলে দিতে পার না। আমি পুরের বাড়ির মেয়ে নট দশু, আমার কথায় নিজের আত্মীয়বন্ধন ছাড়বে না কি!'

একফণে সকালের সেই প্রসঙ্গ মনে পড়ল হিমাংশুর। সপ্তে সপ্তে সেই ক্ষতের আঘাতটা। 'প্রাণে ধরে তুমি কিছ, ফেলতে পার না', শুনই হিমাংশু, চটে উঠেছিল। আশ্চর্য! মেয়ে কিছই ভোলে না। কবে, কোন সময়, কখন, কি হয়েছে সব যেন মেয়েদের স্মৃতিতে সতের সতের সাজানো থাকে। সময় সেখানে স্তব্ধ, মৃক হয়ে যায়।

বাগমা-বাগুর সেরেসের পান-সিগারেট খেতে খেতে সাড়ে দশটা বাজল। রাত

# প্রকাশিত হল

ভারতের লুপ্ত ইতিহাসে নভশ্চর দেবতাদের যুদ্ধময়ত্রী  
রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের সর্বাধুনিক বিশ্লেষণ

বীরেন্দ্র মিত্র-র

কুরুক্ষেত্রে

দেবশিবির



মহাভারতের প্রথাবদ্ধ আলোচনার আসরে বীরেন্দ্র মিত্রের 'দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা' প্রবেশ করেছিল নৌলিক চিন্তা ও বিশ্লেষণের ঘোষণা নিয়ে। 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির'—এ সেই প্রাক্ত বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তি ও প্রমাণ, তথ্য ও তত্ত্ব মহাভারতের প্রতিটি পর্ব থেকে উদ্ধার করল এবার সকল রোমহর্ষক হারানো ইতিহাস, অলৌকিক কল্পগল্লের কুরাশায় যা ছিল এককাল সমগ্র সমাচ্ছন্ন। বেদ, বাইবেল, উপনিষদ, পৃথিবীর পুরাণকথা, ভারত-তাত্ত্বিকদের বক্তব্য, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব সমাজবিজ্ঞান, ধর্মাদর্ম ও দার্শনিক ভাবনা এবং অত্যাধুনিক বিজ্ঞান একাকারে মিশিয়ে বীরেন্দ্র মিত্র আবিষ্কার করেছেন এক মহিমময় পুরাইতিরত্ত্ব যা আগে কখনো লিখিত হয় নি এবং এমন অকুতোভয়ে সংস্কারবজিত মন নিয়ে ইতিপূর্বে যা কেউ ভাবতে বা বলতে সাহস করেন নি। দানিকেনতত্ত্বের আলোকে মহাভারতের দেবস্বরূপ উদ্ঘাটন করে স্বর্গনরক পাপপুণ্যের প্রচলিত ধারণার মূলে বীরেন্দ্র মিত্র যে চমকিত আঘাত হেনেছেন, ইতিমধ্যেই তা পাঠকমনকে সপ্রম ও বিচলিত করেছে। 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' মহাভারতের পর্বানুক্রমিক ঘটনা বিশ্লেষণ করে প্রতিটি আপাত-অলৌকিক ঘটনার যুক্তিগ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক বিচার উপস্থাপিত করল। 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' সমকালীন আর্ষ্যাবর্তের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি যেমন আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরে তেমনিই তা আমাদের হাত ধরে নিয়ে যায় আর্ষ্যাবর্তের পথে প্রান্তরে এবং রূপবতী গাড়োয়াল হিমালয়ের রহস্যময় গিরি উপত্যকায়। সে এক বিচিত্র ভ্রমণ। ডঃ বিজয়বিহারী ভট্টাচার্য তাই যথার্থই লিখেছেন, বাঙলা সাহিত্য-মন্দিরের একটি নতুন দ্বার উন্মোচিত করেছেন বীরেন্দ্র মিত্র। সাহিত্য সংস্কৃতি, ধর্ম ইতিহাস, অর্থনীতি সমাজনীতির চর্চা ও চিন্তার সঙ্গে যুক্ত কৌতূহলী পাঠকের কাছে 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' যে একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ, একথা আজ আমরা বলছি, ভবিষ্যতে আরও অনেকাই তা বলবেন এ বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।

মূল্য পঁচিশ টাকা

নাথ পাবলিশিং হাউস C/O নাথ ব্রাদার্স

৯ গান্ধী চরণ দে স্ট্রীট ৥ কলকাতা-৭০০০৭৩

এমন কিছু গভীর নয়, আবার গভীরও। পাথর হাওয়া পেয়ে ফেলোমেয়ে দুটো প্রশংসা দিয়েছে। এই গরমে ঘণ্টা বৈধি বজতে গেলে। মশারি না ফেললেও চলে। তবে ছোটদের মশারি টানানো আছে। বড় খাট উদ্যোগ। নীতি হাতের কাজ। টাক সেজে এসে ফেলবে। একবারে না ফেলতে ভয়ঙ্কর হয় না। মাঝরাতে লোড-শেডিং হলে দু-চারটে যা আছে তাই ছেঁকে ধরবে। তখন ঘরের দম্বা গলা।

কাজ সারতে এখনও বেশ বেরী নীতিয়। গাটা ধুরো ফ্রেশ হয়ে আসতে আসতে আরও মিনিট কুড়ি। সকালের চান দুটোপটি করে সররা, তখন স্কুল-অফিসের তাক্স থাকে। রাতের এই পা খোঁগর অনেকটা যেন আলম-কিলাসের। তারপর আলম-সামনে দাঁড়িয়ে চুল অঁচড়াবে নীতি, মুখের কারুকার্য করবে। সেনা-ক্যাম-সচন্দন গল্পগল্প কি সব মাখবে। অন্তবাসিনী পাতলা চিকণ শাড়ি, টাইট রোসের পর নীতির হাত-পা-মুখ তখন সচল ছবির মতন চমকায়। হিমাংশু, অপলকে দেখে। টেকসার ভোগ নিজেকে নিজেই সাজায় এ এক আশ্চর্য অন ভূত। প্রিয় কামনার পরম পরিচায়ক তখন হিমাংশুকে ক্রমশ যেন আচ্ছন্ন করতে থাকে।

দুটো বালিশ জোড়া দিয়ে হিমাংশু শুল। ঘরে ফলসা শব্দের মত, একটা আলো। ফর ফর করে হাওয়া লাগছে। সারা শরীর জড়িয়ে যাচ্ছে। হিমাংশু চোখ বুজল। চোখ বুজতেই কেনে একটা আচ্ছন্ন ভাব হিমাংশুকে জড়িয়ে ধরছে। হিমাংশু, তাকতে চোটা করল, তাকতে পারছে না। অথচ কি আশ্চর্য, হিমাংশু দেখতে পাচ্ছে। এ যেন আলমার প্রতিবন্ধ দেখা। হিমাংশু হিমাংশুর মুখ দেখছে। দুটি মুখ এক, ভাব বিভ্রম। একমুখে উজ্জ্বলতা, চোখে কৌতুক, ঠোঁটে হাসি। অন্য মুখে বিষম, দৃষ্টিতে অবিবাস, ওঠে জিজ্ঞাসা।

কি রে! তুই আজকাল খুব মাতব্বর হয়েছিস নীতি!

কই? না তো! কিসেব মাতব্বর?

কুর্মি আজকাল সময়কে ধরতে চাইছে চাঁদ! ভাঙ্ক সময় তোমার বাপের চাকর।

যা! তাই কখনও হয়। সময়কে কি ধরা যায়?

তবে সকালকো নীতির সঙ্গে ঝগড়া করল কেন? অফিসে গিয়ে রান্না নিল। ভাবলি তুই শালা মহাকালের নাক, তোর ইচ্ছে অনিচ্ছয় চন্দ-স্ব-গ্রহ-তারা ঘুরবে।

না, মাইরি। আমি এসব কিস্‌সু ভাবিনি। হয়ে গেল। ওই শালা ঘম ভাণ্ডাতে দেবী হল,—আর মেজাজটা খটে গেল। তারপর 'কি হল, আমি নিজেই জ্বিনি না।'

জ্বিনি না কাল চলবে কেন? জানতে শেখ। নিজের ওজন না বুঝে বাপার কবির, লজ্জায় মুখ দেখাতে পারি না।'

হিমাংশুর চটকাটা ভেঙেপ আসছে। মুখের সামনে একটা হাত দেখতে পাচ্ছে হিমাংশু। সে হাতের চাঁড়ির টুংটা মত জলতরঙ্গের শব্দ হচ্ছে যেন।

এ বালিশটাও টেনে নিয়ে শয়েছে। লোক দেখ।

হিমাংশু চোখ খুলল। মাথা তুলল। নীতি বালিশ নিয়ে সরে গেল। মশারি আজ ফেলা নেই। শাড়ির অঁচল মুখের ওপর ঢাকা দিয়ে শয়ে পড়ল নীতি।

কিছুক্ষণ সময় যেতে দিল হিমাংশু। তারপর ধীরে ধীরে কাছে সরে এসে নীতির গায়ে হাত রাখল। নীতি প্রথমে কিছু বলল না, মূর্ডের মতন শয়ে বইল। অল্পক্ষণ পরে হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'হাত নামাও। গরম লাগছে।'

হিমাংশু, কথা বলল না। আবার গায়ে হাত রাখল নীতি।

নীতি চাপা গলার বলল, 'বিস্তার কোর না। ঘুম পাচ্ছে।'

হিমাংশু পা তুলে পায়ের ওপর রাখল। বড়ো আঙল দিয়ে পায়ের পাতা ঘষল। নীতি কটকা মেরে পা সরিয়ে নিল। এরকম করলে আমি ওঠে যাব বলছি।'

গলার স্বরে চাপা অভিমান। কিছু আচ্ছন্নও। হিমাংশু শুনল বুলল। তবে হাতের বাঁধন শব্দ করে নীতিকে কাছ জড়িয়ে আনতে চাইছিল হিমাংশু।

কেন, এখন বর্ষিক সেবাদাসী চাই? ঘুম আসছে না।

লক্ষণালো কুরে কুরে কান্না মাঝে ঢুকিয়ে দিল নীতি। নিজেকে এক কটকার ছাড়িয়ে নিয়ে মোক্ষের ওপর বালিশ পাতল। মটিত শব্দ শব্দে বলল, আমি ভড়া কল মেয়েমানুষ নই! আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছয় সুখ দুঃখ বলে একটা জিনিস আছে।

হিমাংশু চপ করে শয়ে রইল। কথা বাজল না। গালের ওপর প্রচণ্ড একটা লড়ের মতন নীতির কথাগুলো কেটে কেটে বসছে। ঘড়ির টিক-টিক শব্দ শোনা যাচ্ছে। হুমহুম বাববুর নিশ্বাস। হিমাংশু নিশ্বাস চোখে তাকিয়ে উঠল। সময় ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র হচ্ছে। সাত গভীর থেকে গভীরতর। সেই ছেলবেলার পড়া পড়ানো এক কবিতার চলে হিমাংশুর শ্মাতিতে চট্টা ভেসে উঠল।—সময় বহিরা যায়, নদী প্রান্তের প্রর। যে জন না বাস তারে, দিক তারে দিক! হিমাংশু হাসি চাপতে পারল না। আচমকা হেসে উঠল।

নীতি অবাক চোখে তাকাল। অজান ঘরে শাল।

সকালে যে ঘম ভাণ্ডাতে দেবী হারছিল হিমাংশুর, এখন সেই ঘম চোখের পাতা থেকে উধাও। প্রত্যক্ষ মানবের নিশ্বাস কিছু দৃশ্য থাকে। হিমাংশু সেই দৃশ্য মানবের মতন স্নানাহার্য চোখে একা একা জেগে উঠল।

ছবি : সুধীর মৈত্র



## বিনয় ঘোষ

বিনয় ঘোষ-ছিলেন ঘোষণা আনাই কলকাতার মানুষ। কলকাতাতেই তাঁর জন্ম। কলকাতাতেই তাঁর শিক্ষাদীক্ষা। কলকাতাই ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র। আবার কলকাতাকেই তিনি করে নিয়েছিলেন তাঁর গবেষণা ও অনুশীলনের বিষয়বস্তু। তাঁর মত একজন কলকাতা-কেন্দ্রিক মানুষকে হারিয়ে, কলকাতা আজ নিজেকে খুব নিম্নবোধ করছে।

কলকাতাকে বিনয় ঘোষ মনে-প্রাণে ভাল-বাসতেন। কলকাতাতেই সারা জীবন কাটিয়েছেন। এটাই ছিল তাঁর জ্ঞানতপস্যার পীঠস্থান। মগধে কলকাতার বাইরে গিয়েছিলেন এক দূর্গত-হাসিক অভয়ানে। সেটা কবাব্বাচলেন কলকাতাকে ভালভাবে বুঝবার জন্য। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, কলকাতা পশ্চিম বাঙালার নব-সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র হলেও, এর বিকাশ পরিমার্জিতভাবে বুঝবার জন্য পরিচিত হতে হবে বাংলার বিশাল গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে। সেজন্য অসাধারণ ধৈর্য, অধাবসায় ও দৃষ্টিবিস্তার প্রত্যেক স্বীকার করে তিনি পশ্চিমবঙ্গ করেছিলেন পশ্চিম বাঙালার প্রতি জেলার প্রতি গ্রামে। পৃথক-পৃথক পরিদর্শন করেছিলেন প্রতি গ্রামের আনন্দ-উৎসব, অচার-বাহার, দেবদেবী ও মন্দির, ও সাংগঠনিক কর্তৃক তাদের কলজী-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের কাহিনী। কানে শুনছিলেন মূল বাঙালার সাংস্কৃতিক জীবনকালের অন্তর্গত। তাই প্রতিদর্শন অবরূপ করেছিলেন তাঁর "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি" গ্রন্থে। এটা একটি ভ্রমণ-কাহিনী নয়। ভ্রমণ-কাহিনী তো তার আগে লেখা হয়েছিল, পরেও লেখা হয়েছে। কিন্তু এটা জাতীয় সাংস্কৃতিক জীবনের প্রাণের স্পন্দন ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের ভিতর দিয়ে তার চরমায় গতি সেরে পৌঁছানো হয়েছিল। তাই তিনি সেভাবে আনন্দ করেছিলেন তাঁর প্রবেশ, সেরুপটি আর কেউই করেনি। প্রাচীন ইতিহাস ও নৃত্যের ছত্র হিসাবে সাংস্কৃতিক জীবনের ধারা প্রধারা বিশ্লেষণ ও সংকলন করার দায় অসাধারণ দীর্ঘাঙ্গ ছিল। সেজন্যই তিনি পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির অং সূত্রের চাষ দিতে পেরেছিলেন।

ইংরেজিতে একটি বচন আছে—Writers are born and not made—বিনয় ঘোষও লেখকের সত্তা নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইচ্ছে করলে হতে পারতেন একজন বিখ্যাত অধ্যাপক। তা কিন্তু তিনি করেনি। সাহিত্য-সাধনাতোই নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। যে বছর এম এ পাশ করেন, সে বছরেই বরিয়েছিলেন তাঁর "শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ"। তাঁর পরের বছর লেখেন "নতুন সাহিত্য ও সমালোচনা"।

পরে তিনি হয়েছিলেন কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাসকার। কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস রচনাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও সাধনা। এ সম্বন্ধে পড়াশোনা করেছিলেন হাজার হাজার গ্রন্থ, পত্রিকা ও অন্যান্য বস্তু। কলকাতার লোকসমাজকে তিনি একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি নিজেই বলে গিয়েছেন—"যে কলকাতা শহরে আমি জন্মেছি, সে কলকাতা সমাজে আমি মানুষ হয়েছি এবং যে কলকাতা-কালচারের আমি একজন নিম্নমধ্যবিত্ত উত্তরাধিকারী, তাকেই আমি বুঝবার চেষ্টা করছি।" কলকাতা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন একজন বিরাট পাণ্ডিত্য। কিন্তু একবারে নিরাভিমানী পাণ্ডিত্য। নিজের ভুল সব সময়ই মেনে নিতেন। এটা তখন লক্ষ্য করাচ্ছি যখন তিনি এবং আমি পুরোনো কলকাতা সম্বন্ধে আলোচনার প্রসঙ্গ হতো। কলকাতার দৌলভিগমে।

অথাও বিনয়রা ভ্রমভ্রমে রচনা করে গেছেন ৪০ খানা মৌলিক ও আক্ষর গ্রন্থ। কলকাতা সম্বন্ধে তাঁর রচিত যতগুলো বই আমরা পড়া আছে, তার মধ্যে আছে—"কলকাতা কালচার", "জনসভার সাহিত্য", "বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ", "বাংলায় নবজাগৃতি", "কলকাতার ভ্রমবিবাক্ষা", "কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত", "মেট্রোপলিটান মন বিদ্রোহ", "বিদ্রোহী জিওরাজিও", "নবাবের চরিত্র", "বঙালার কিংসমাজ", "সাময়িকপত্র বাঙালার সমাজচিত্র" ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি লিখেছিলেন, "কলগেটার বঙ্গদর্শন", "বাঙালার লৌকিক সংস্কৃতির সমাজ-উদ্ভূত", "বাদশাহী আমল", তার ইংরেজী রচনা ও সংকলনের মধ্যে আছে—বিদ্যাসাগরের জীবনী, Statesman Anthology, ও স্যারথেন্ডে পরি-কল্পিত Selections from English Periodicals of 19th Century Bengal। এগুলি রচনা ও সংকলনের জন্য পরিশ্রম করেছিলেন অমানুষিক। সেই অমানুষিক পরিশ্রমের প্রকাশেই অকালে তাঁর বিলম্ব ঘটল। জীবনে অনেক কিছু করার তাঁর ইচ্ছা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাঁর জ্ঞানের পরিধি এত বিস্তৃত ছিল যে, কোন বই লিখেই তিনি সন্তুষ্ট হতেন না। চাইতেন তার চেয়ে বড় ও



বিস্তৃত আরও কিছু লিখতে। "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি" প্রথমে একবারে তৈরি হতে পারেনি। পরে তিনি ওটা চারখণ্ডে প্রকাশ করেছিলেন। সত্যি! পাতার বই "কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত" তিনি প্রথম বার করেছিলেন একখণ্ডে। পরে এটাকে দু'খণ্ডে বের করেছিলেন। তিনি আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু সব সমাই সেতেন ছিলেন জীবনের অনিত্যতা সম্পর্কে। তিনি একবার লিখেছিলেন—"ইচ্ছা আছে যদি ভবিষ্যতে জৈন বা 'ভবিষ্যৎ' বলে কিছু আছে কিনা। সুযোগ পাই তা হলে আর একটি পৃথক গ্রন্থে কলকাতা শহর সম্বন্ধে আরও অনেক নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।" কিন্তু তাঁর সে সাধ সে-আশার পূরণ হল না।

কলকাতা বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের প্রসিদ্ধি কেবল মাত্র একদশের লোকের কাছেই জ্ঞাত ছিল না, বিদেশের মানুষও তা জানতেন। এ বিষয়ে বৈদেশিক মহলে তিনি সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। বিদেশে যাবার জন্য ভূরি ভূরি আমন্ত্রণ পেয়েছেন, কিন্তু সবই সেজিনের সপক্ষে প্রত্যাশন করেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তব্য তাঁর নিজের কথাতেই বলি—"মহা মহা বিদেশী প্রকাশকদের কাছ থেকে ইংরেজী ভাষায় কলকাতার ইতিহাস লেখবার প্রস্তাব এসেছে, কিন্তু নিশ্চিতে কাজ করার সুযোগ না

থাকায় এ রকম প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারিনি। বিদেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে আমন্ত্রণ এসেছে, সেখানে গিয়ে, ইচ্ছা হলে সপরিবারে নিশ্চিতে বর্তমান খালি থেকে, এই ধরনের কাজ করার জন্য। কিন্তু নিজের দেশ থেকে কাজ করার কথা এড়িয়ে বিদেশে গিয়ে নিশ্চিতে কাজ করতে মন যায় দেয়নি।" এই ভাঙি থেকেই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য পরিষ্কৃত হয়ে ওঠে।

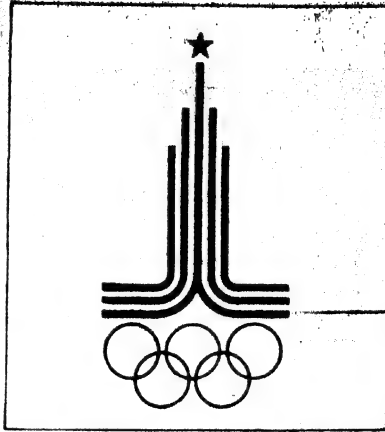
তরুণ বয়সে বিনয় ঘোষ রচনীতি নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। তখন বামপন্থী মতবাদের তাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর কাছে, তাঁর তরুণ বয়সের যুগটা ছিল এক আশ্চর্য যুগ। তাঁর কথাতেই বলি—কিনলব সমাজতন্ত্র সাম্যবাদ এসব তখন হাতের মুঠের এবং মতোগুলো সম্ভাব্য হলো নবীন তরুণদের। নবীন তরুণরা তখন বিশেষভাবে প্রজাবান্ধিত হয়েছিল কঙওয়েল, অডেন, ইশারউল্লাহ, পামে দত্ত ও মার্কসবাদের আরও নানারকম বিচিত্র চিন্তাধারার ভাষাকারদের দ্বারা। তাঁদের মতবাদ স্বারা বিনয় ঘোষও প্রজাবান্ধিত হয়েছিলেন। এ মতবাদ ছিল শহরকেন্দ্রিক বামপন্থী মতবাদ। সেজন্য তিনি তাঁর বাংলার নবজাগৃতি গ্রন্থে লিখেছিলেন—"বাংলার নবজাগৃতি আন্দোলনের পরোয়া হিন্দু-প্রধান উদীয়মান বুদ্ধিজীবীশ্রেণী, নবজাগৃতি মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণী।" নবজাগৃতির এই ভাবকে লক্ষ্য করেই তিনি পরবর্তীকালে বলেছিলেন—"সুদূর বাংলা দেশের কলকাতা শহরে আমাদের মতো বুদ্ধবাদের মনে যে রামধনু-বর্ণের স্বপ্নের সৃষ্টি করেছিল, তা আজ রূপকথার মতো শোনিয়।" পরবর্তীকালে রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়ে ওই নবজাগৃতির মধ্যে যে অলংকা ছিল, তা উপলব্ধি করেছিলেন। তখন তিনি বলেছেন—"আজ থেকে তিরিশ বছর আগে (তখন আমার নিজের কালও তিরিশ) বাংলার নবজাগৃতি লেখা আরম্ভ করেছিলাম। অনেক বড় পরিকল্পনা ছিল, এখন খণ্ড ওই নবজাগৃতির ইতিহাস রচনা করব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা করা হয়নি। তারপর আরও তিরিশ বছর কাটল, ইতিহাস চর্চার আধিক্য দিলে, অনেক ঘোলা জল বয়ে গেল। অনেক প্রশ্ন জাগল, অনেক প্রশ্ন। শহর থেকে গ্রামের দিকে তাকাবার ইচ্ছা হল প্রবল। অম্মা ইচ্ছা। শহরে জন্ম, শহরে মানুষ হলেও গ্রামের পথে পা-বাঁজিয়ে চলতে আরম্ভ করে রূপিত বোধ করিনি কখনও, গ্রামের সমাজ না; কখন হলেও বাংলার গ্রামের মানুষ, গ্রামের সমাজ, গ্রামের জীবনযাত্রা, গ্রামের সংস্কৃতি স্পষ্ট দেখতে দেখতে বাস্তবের মতো হতে লাগল, পশ্চিমবঙ্গের উল্লস শতাব্দী বাংলায় যে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের কথা বলেন সেটা কি পালন? কোথায় এবং কখন জাগরণ হল? জাগল কারা? কলকাতা শহর যদি নবজাগৃতির কেন্দ্র হয়, যদি রেনেসাঁসের সূর্য জোড়ির কনক পদ্মের মতো কলকাতার অকাল উদিত হয়ে থাকে, তাহলে কলকাতার খুব কাছাকাছি গ্রামেও দেখেছি বছর পূর্বে, কেন অমাক্সার রাস্তার মতো অন্ধকার? কেন অতীতে? ছেঁড়াকাঁথায় শূন্য গ্রামের মানুষ আজও গভীর ঘুম অঁকতেন? কেন শেরাফিক যুগের স্বপ্নের ঘোরের আজও তাদের স্বপ্নকারিতা?" Urban leftism-এর এই অবসরকালে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিল বিনয় ঘোষ মশায়কে। তাঁর কাছে শহরভিত্তিক বামপন্থী একটি tragedy ছাড়া আর কিছু ছিল না।

তাঁর মতুতে, বাঙালার বিন্বেসমাজ একজন প্রকৃত ও নিষ্ঠাবান স্কলারকে হারালেন। আমার কাছে তাঁর মৃত্যু বিশেষভাবে পীড়নায়ক এই কারণে যে মাত্র দু'মাস পূর্বে (২৬ মে ১৯৮০), তিনি আমাকে যে শেষ চিঠি লিখেছেন, তার শেষ লাইন ছিল—"আপনাকে সুস্বাস্থ্য প্রার্থনা করি।" অপরের সুস্বাস্থ্যে কামনা করেছেন, কিন্তু নিজের সুস্বাস্থ্যকে ব্যর্থ করেই রেখেছেন। আমার চেয়ে ১৪ বছরের ছোট হলেও, তিনি আগেই চলে গেলেন। অতুল সূর

# অন্নগাদেব



# আধুনিককালের ১৮টি অলিম্পিকের কথা



আধুনিককালের অলিম্পিকের বাইশতম অনুষ্ঠান হয়ে গেল মস্কোয়। চার বছর অন্তর এক একটি অলিম্পিকের হিসাবে মস্কোর বাইশতম অনুষ্ঠানই হয়। কিন্তু প্রথম মহাব্যবস্থার জন্য একবার এক দ্বিতীয় মহাব্যবস্থার জন্য দুইবার অলিম্পিক খেলাধুলা হয়নি। সুতরাং, আগে গেমস হয়েছে ১৮টি। কোন দেশে, কখন গেমস হয়েছে, কীটি দেশ, কত প্রতিযোগী অংশ নিয়েছে, কে কোন অলিম্পিক নায়ক হয়ে উঠেছে চমকে তারই বিবরণ দেওয়া হল।

১৮৯৬—এথেন্স : (৬-১৫ এপ্রিল) আধুনিক-কালের প্রথম অলিম্পিক যোগ দেন ১৩টি দেশের ৩১১ জন পুরুষ প্রতিযোগী। প্রথমবারের মধ্যে প্রতিযোগী অংশ নেন। ক্রীড়া বিষয় ছিল ৮টি। যথা—জারথলেটিকস, কুস্তি, সাঁতার, টেনিস, শাটলি জিমন্যাস্টিকস, ফেন্সিং ও সাইক্লিং। হপ স্টেপ ও জাম্প জিতে অলিম্পিকের প্রথম চ্যাম্পিয়ন হন আমেরিকার জেমস কনালী। মোট ১১টি ইভেন্ট জিতে আমেরিকা শীর্ষস্থান পায়। ৮টি ইভেন্ট জিতে গ্রীস পায় দ্বিতীয় স্থান। ম্যারথন রেস জিতে প্রথম অলিম্পিকের নায়ক হয়ে ওঠেন গ্রীসের এক ডাকপয়ন স্পিরিডন লুইস। ম্যারথন রেস স্পিরিডনের সম্ভাব্য জয় ঘিরে এত উৎসাহ উল্লসিতার সৃষ্টি হয়েছিল যে, লোকপিকে গ্রীসের দুই রাজকুমার স্পিরিডনের পালকপালি দৌড়েছিলেন। তখন ম্যারথন রেসের দূরত্ব ছিল ২৪ মাইল ১৫০০ গজ। ১৯০৮ সালে লন্ডন অলিম্পিক থেকে ম্যারথন রেসের দূরত্ব পাকপাকি ঠিক হয় ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ।

১৯০০—প্যারী : (১১-১৯ ফেব্রুয়ারি) প্যারীতে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর সঙ্গে দ্বিতীয় অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হওয়ার খেলাধুলার আকর্ষণ অনেক কমে যায়, যদিও বেশ মনে ২২টি দেশের ১০৩০ জন প্রতিযোগী। মেয়ে প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১১। ফ্রান্স জয়ী হয় ২৮টি ইভেন্টে, আমেরিকা ২২টিতে, ১৪টিতে গ্রেট ব্রিটেন। প্রতিযোগিতার ফির ছিল ১৭টি। তার মধ্যে গলক, ক্রিকেট, বোলিং এবং পেলো মেলাও ছিল। আমেরিকার আর্মান্ডিন ক্রয়েজলিন ৬০ মিটার দৌড়, ১১০ মিটার হাডলস ও ৯০০ মিটার হাডলস ও লং জাম্প—মোট চারটি ইভেন্ট জিতে এই অলিম্পিকের নায়ক হয়ে ওঠেন। আমেরিকার আর এক আশ্চর্য্যই হল ইউজেন স্ট্যান্ডিং হাই জাম্প, স্ট্যান্ডিং লং জাম্প ও স্ট্যান্ডিং হপ স্টেপ ও জাম্প। এই তিনটি ইভেন্টে পরকর্ষী তিনটি অলিম্পিক ইউরি পান আরও ৭টি পদক—মোট ১০টি। কলকাতার আগস্টে ইন্ডিয়ান প্রতিযোগী নরিন প্রিচার্ড, বিনি আই এফ এন সম্পাদক ছিলেন এক কলকাতার ফুটবলে প্রথম হার্ট্রিক করেছিলেন তিনি বেসরকারীভাবে এই অলিম্পিকে যোগ দিলে ২০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান পান। মেয়েদের মধ্যে প্রথম অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হন ব্রিটেনের লুইজ ব্রুস্টার টেনিসে সিঙ্গলস জিতে। উল্লেখ্য, প্রথম ও দ্বিতীয় অলিম্পিকে দুই প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানধারীকে পুরস্কার দেওয়া হত। প্রথম বিনি হতেন পেভেল ব্রুস্টার পদক, দ্বিতীয় ব্রুস্টার পদক। সোনার পদক দেওয়া শুরু হয় চতুর্থ অলিম্পিক থেকে।

১৯০৪—সেন্ট লুই : (৪-১৫ ফেব্রুয়ারি) কিশ মেসার জগৎ হিসাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার দ্বিতীয় অলিম্পিকেও সঙ্গ বিবেচ্য তখন সড়ক ক্যারভে প্যারি না। ইউরোপে ৭টি এক অন্যান্য ৫টি—মোট ১২টি দেশের ৬২৫ জন অংশ নেন। এর মধ্যে মেয়ে প্রতিযোগী ছিলেন মাত্র ৮ জন। ক্রীড়া বিষয় ছিল ১৪। রুমের। আমেরিকার জেবন লাইবর্ড জিনিটি সেরান পদক পান সিঙ্গেল জেব, ৬০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার সাঁড়ে। আমেরিকার প্রতিযোগীরা সোনা পায় ৭টি।

আধুনিক অলিম্পিকে প্রথম দুইটি পরিসর মেলে সেন্ট লুইতে। আমেরিকার লরেন্স ম্যারথন দৌড়ে প্রথম হন। কিন্তু পরে জানা যায়, দাঁড় পথের ১০ মাইল ভিত্তি এসেছেন একটি ট্রাকে চড়ে। ফলে প্রতিযোগিতা থেকে তাঁকে বাতিল করে দেওয়া হয়।

১৯০৬—এথেন্স : (২২ এপ্রিল-২ মে) আধুনিক কালের অলিম্পিকের দ্বন্দ্ব আর্থিক পালনের জন্যই আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির অনুমোদন নিয়ে এথেন্সে আবার অলিম্পিকের আসর বসে। কিন্তু যেহেতু চতুর্বার্ষিক অনুষ্ঠান নয় সেহেতু সরকারী অলিম্পিকের খ্যাতি ছিল না। ১১ রকমের খেলাধুলায় ২০টি দেশের ৮৮৪ জন (মেয়ে ৭ জন) প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন। ফরাসীর প্রতিযোগীরা জিতেছিলেন ১৪টি ইভেন্টে, আমেরিকার প্রতিযোগীরা ১২টিতে।

১৯০৮—লন্ডন : (২৭ এপ্রিল-৩১ অক্টোবর) সুস্থবস্থা, সাংগঠনিক সুসুষ্ঠা এবং সুপ্রচারের ফলে এই চতুর্থ অলিম্পিকেই সঙ্গ বিবেচ্য অলোডন সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক প্রতিযোগিতা শুরু থেকে অলিম্পিক শেষ হতে সমগ্র লন্ডন ছাড়া মাস। অলিম্পিকের হলে কেন্দ্র ছিল এক লাখ দর্শক আসন বিমিষ্ট হোয়াইট সিটি স্টেডিয়াম। ২২টি দেশের ২০০৫ জন (মেয়ে ৩৬ জন) প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন ২১ রকমের খেলাধুলায়। এই অলিম্পিকেই প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয় হকি ও ফুটবল। এই অলিম্পিকেই প্রথম শোনা যায় : 'অলিম্পিকে জয়লাভ করুন'—অংশ গ্রহণই বড় কথা; পদক জয় মূল লক্ষ্য নয়—সত্যতার সঙ্গে সংগ্রাম করাই লক্ষ্য। কাণীটি পাঠিয়েছিলেন, পেন্সিলভানিয়ার কিশ।

নিজদেশের দেশে প্রথম আয়োজিত এই অলিম্পিকে গ্রেট ব্রিটেন পায় ৫৬টি স্বর্ণপদক, আমেরিকা পায় ২২টি। আগেই লির্কেই, এই অলিম্পিক থেকে স্বর্ণপদক দেবার রেওয়াজ চলি, হয়। চতুর্থ অলিম্পিকের দ্বিটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি—৪০০ মিটার দৌড়ের ফাইনালে আমেরিকার তিনজন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। রবীন্দ্র এক টেলার অনুরোধে দৌড়ের ফলে বাতিল হয়ে যাওয়ার আবার দৌড়ের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু অন্য কোনো প্রতিযোগীর অভাবে গ্রেট ব্রিটেনের হলসওয়েল একই ৪০০ মিটার দৌড়ে সোনার পদক পান। দ্বিতীয় ঘটনাটি—ম্যারথন দৌড়ের রাজকীয় মহাবীর জন দৌড় শুরু হয় উইন্ডসর রাজপ্রাসাদের সামনে থেকে। দৌড়টি দেখান প্রায় অর্ডাই লাখ মানুষ। কোনো স্পোর্টসে তখন পর্যন্ত রেকর্ড জনসমক্ষে। ইংলিশল খেলায় প্রতিযোগী ডোমেন্ডো প্রেরিত সর্বপ্রথম স্টেডিয়ামে পৌঁছে এবং প্রথম হস্তে স্বর্ণপদক না পেয়ে অমর হয়ে আছেন। কারণ, ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ দৌড়ে প্রান্ত রাস্তা অবসর পিরিটি জিতে ছিড়বার আগে মাঠে দূর্যাব লটিয়ে পড়েন। প্রথমবার নিজে উঠে আবার দৌড়তে থাকেন। দ্বিতীয়বার পড় পড় সহানুভূতিসহ স্পোর্টসের কয়েকজন কর্মকর্তা তাঁকে ধরে লাড়ু করিয়ে দেন। সেটা বেরাইনি

কথা। তাই ষষ্ঠের বাড়ি হয়ে যান। কিশ তার অসাধারণ দৌড়ের জন্য ইংল্যান্ডের রানী আলেকজান্ড্রা তাঁকে উপহার দেন একটি বিশেষ সোনার কাপ।

১৯১২—স্টকহোম : (৫ মে-২২ জুলাই) সুইডেনের সর্বাধিকসর স্বর্ণপদক পদক অলিম্পিক হয় আরও সাক্ষরমণ্ডিত। আরও বেশ দেশ এক আরও বেশ প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। ১৪ রকমের খেলাধুলায় ৫৭ জন মেয়ে প্রতিযোগী সহ ২৮টি দেশের মধ্যে প্রতিযোগী ছিলেন ২৪৪৭ জন। মেয়ে সত্যতার প্রথম অংশ নেন এই অলিম্পিকে এবং প্রথম ইলেকট্রিক টাইমিং এবং ফটোফিনিশের ব্যবস্থা হয়। ফিনল্যান্ডের হান্স কোলমিনেন পট হাজার, দশ হাজার ও আট হাজার মিটার রসকাপ্তি রেস জিতে তিনটি স্বর্ণপদক পান। তবে অসাধারণ আশ্চর্য্যই হল সন্ধান পান আমেরিকার নিয়োগী জিম্ম থর্প ডেকাথলন ও পেন্টাথলনে সোনা জিতে। ডেকাথলনে ইভেন্ট দশটি—১০০ মিটার, ৪০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার দৌড়, লং জাম্প, হাই জাম্প ও পেলডলট, লোহার বল ছোঁড়া, ডিসকাস ছোঁড়া ও বর্শা ছোঁড়া এবং ১১০ মিটার হাডলস রেস। আর পেন্টাথলনের পাঁচটি কিলা হস্তে—ঘোড়ার চড় ৪০০ মিটার রেস, ফেন্সিং (এশি), ২৫ মিটার দূর থেকে পিলেলে গুলি ছোঁড়া, তিনটি মিটার ফ্রিপাইল সত্যতার এক চার হাজার মিটার রসকাপ্তি দৌড়। সবচেয়ে খেলাধুলায় কত পরকর্ষী হলে পেন্টাথলন ও ডেকাথলনে স্বর্ণপদক জয়লাভ সম্ভব সহজেই অনুমের। কিন্তু জিম থর্পের ভাষা মন্দ। কখন নাকি আমেরিকার বাসকেটল খেলা পছন্দ করেছিলেন। তাই প্রয়োজনীয় কল পরিগণিত হন এবং এক বছর পরে দুটি স্বর্ণপদক তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে দ্বিতীয় স্থানধারীকে দেওয়া হয়। তার মতুর ২০ বছর পরে ১৯৭০ সালে আমেরিকার আথলেটিক ইন্ডিয়ান কিশ্ব তাঁকে আমেচারের স্ট্যান্ডাই দিয়েছেন। স্টকহোম অলিম্পিকে ২৪টি স্বর্ণপদক পায় সুইডেন, আমেরিকা ২০টি।

১৯১৬—বার্লিন : ১৯১৪ সালের আশুত মাসে জার্মানি হস্ত ঘোষণা করে জেজারাম ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। প্রথম মহাব্যবস্থার ডামাজেলে দ্বিতীয় অলিম্পিক কথ হয়ে যায়।

১৯২০—আন্তর্জাতিক : (২০ এপ্রিল-১২ সেপ্টেম্বর) প্রথম মহাব্যবস্থার পর অলিম্পিক, তাই পট মহাব্যবস্থার একসঙ্গে বোঁধে রখার পরিকল্পনার অলিম্পিকের শেষ পজার পজরকার একে দেওয়া হয় ওই অলিম্পিকে এবং উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ক্রীড়া ক্রীড়া পাররা উড়িয়ে দেওয়া হয় শান্তির দূত হিসাবে। দুটি পরিকল্পনাই আসে আধুনিক অলিম্পিকের সবচেয়ে ব্যাক পিরের দ্য কুয়ার্টেনের মধ্যে থেকে। এই অলিম্পিকেই প্রথম আশ্চর্য্যটিকের পদ থেকে একজন সত্যতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার লক্ষ্য বাকা পাঠ করেন। শপথ বাকা পাঠ করেন গেমসের আয়োজনকারী দেশ জোজিরামের ফেন্সার ভিক্টর ব্রুস্টার। এই—অলিম্পিক ও পরকর্ষী দুটি অলিম্পিক মিলিয়ে ফিনল্যান্ডের পরাডো নুরীম দুরপানার দৌড়ে পান ১টি সোনা ৩টি রূপোর পদক। আন্তর্জাতিক সর্বকনিষ্ঠ অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নের স্বপ্ন পান আমেরিকার ১০ বছরের মেয়ে জাইলিন রিগান, সিংহ বোড জাইলিংয়ে কিশ্বিনী হয়ে। আমেরিকা পায় ৪১টি সোনা, সুইডেন ১১টি। অংশ নিয়েছিলেন ২৯টি দেশের ২৫০৭ জন প্রতিযোগী (মেয়ে ৬৪ জন)। ক্রীড়া বিষয় ছিল ২২টি।

১৯২৪—প্যারী : (৪ মে-২৭ জুলাই) কোপলান-কারী দেশের সংখ্যা কমেই বাড়ত থাকে। অতীম অলিম্পিকে যোগ দেন ৪৪টি দেশের ৩০৯২ (মেয়ে ১৩৬ জন) প্রতিযোগী। ক্রীড়া বিষয় ছিল ১৮টি। পরাডো নুরীম জাইলিং ফিন নামে অভিহিত হন ৫টি সোনা জিতে। তিনি জেতেন পনকরাশো মিটার, পট হাজার মিটার, দশ হাজার মিটার রসকাপ্তি (টিম ও ব্যক্তিগত) এবং তিন হাজার মিটার টিম ইভেন্টে। পরকর্ষীকালে বিনি টেননের ডিসকাস হানসহাি অসচেতন বিবাহত হন সেই জন উইসমলার এই অলিম্পিক সত্যতার তিনটি সোনা পান ১০০ মিটার, ৪০০ মিটার

১২৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিসাল্ডে। আমেরিকার শীর্ষস্থান পায় ৩৬টি স্বর্ণপদক পেয়ে, ১৭টি সোনা পদক দ্বিতীয় স্থান দখল করে ফিলিপাইন।

**১১২৮-জার্মানি :** (১৭ মে-১২ আগস্ট) নবম অলিম্পিকেই প্রথম গেমসের ১৫ দিন ধরে পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনী থাকে। এই অলিম্পিকেই প্রথম ফল জানার জন্য স্টেনকোবোর্ডের ব্যবস্থা হয় এবং আর্থলটিকসে মেরের প্রথম প্রতিযোগিতার সংযোগ পান। ফল মেসে প্রতিযোগীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২১০। মোট প্রতিযোগী ছিলেন ৩০১৪ জন। ১৫ রকমের খেলাধুলায় অংশ নিয়েছিল ৪৬টি দেশ।

আমাদের ভারতের কাছে এই অলিম্পিক স্মরণীয়। ভারতের আর্থলটিক্স সরকারীভাবে আগের অলিম্পিকে অংশ নিলেও আমস্টারডামেই ভারত বিশ্বের ক্রীড়া দলবলের প্রথম বড় সম্মান পায় হক চ্যাম্পিয়ন হয়ে। এখানে জর্ন উইন্সলায়ার পান আরও দুটি স্বর্ণপদক। আমেরিকা আবার শীর্ষস্থান পায় ২৪টি সোনা জিতে।

**১১৩২-লন্স অ্যাংলেস :** (৩০ জুলাই-১৪ আগস্ট) প্রতিযোগীদের একস্থানে এবং একসঙ্গে নবকালের জন্য লন্স অ্যাংলেসেই প্রথম অলিম্পিক ভিলেজের ব্যবস্থা হয় এবং বিজয়ীদের উচ্চ স্থানে দাঁড়িয়ে পদক নেবার জন্য ব্যবস্থা হয় ভিক্টর স্ট্যাড-এর। ১৫ রকমের খেলাধুলায় অংশ নেয় ৪৭টি দেশের ১৩০৮ জন প্রতিযোগী (মেয়ে ১২৭ জন)। ৪৭টি পদককে আমেরিকা শীর্ষস্থান এবং ১২টি স্বর্ণপদকে ইতালি দ্বিতীয় স্থান পায়। এশিয়ার দেশ হিসাবে জাপান ক্রীড়া সত্তা জায়গা সাঁতারে ৫টি এবং মোট ৭টি স্বর্ণপদক জিতে। একমাত্র লং জাম্প বায়ে আর্থলটিকসের হক ও ফিল্ড ইভেন্টের সমস্ত রেকর্ড এখানে ভেঙে গিয়েছিল।

**১১৩৬-বার্লিন :** (১-১৬ আগস্ট) বার্লিনে প্রারম্ভ অলিম্পিকের মাধ্যমে হের হিটলার চরিত্রিতেন আর সভ্যতা আর অলিম্পিকের প্রমাণ দিতে। কিন্তু তাঁর দম্ভে অঘাট হয়েছিল ক্রমশঃ নিজে মশলাই জেসি ওয়েস সত্যসত্যি চারটি সোনা জিতে। পদকতালিকায় জেসি ওয়েস সত্যসত্যি প্রথম আর্থলটিক্সের সম্মান পেয়েছেন। বার্লিনে ওয়েস সোনা পায় ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়, লং জাম্প এবং ৪০১০০ মিটার রিলে দৌড়ে।

বার্লিনের একাদশ অলিম্পিক থেকে শুরু হয়েছিল অলিম্পিকার মাদ্রাস প্রাণের স্মরণীয় থেকে আতস হওয়ার সাহায্যে পূর্ণাঙ্গ জমালিয়ে সেই অংশ রিলে প্রথমে অলিম্পিক অঙ্গনে আনার রেকর্ড। বার্লিনেই প্রথম বেতারের এক টেলিভিশনে অলিম্পিকের খবর ও চিত্র প্রচারের ব্যবস্থা হয়। একাদশ অলিম্পিকে যোগ দিয়েছিল ৪৯টি দেশ। ২০ রকমের খেলাধুলায় অংশ নিয়েছিল ৪০৫৬ (মেয়ে ৩২৮) প্রতিযোগী। জার্মানি পেয়েছিল ৩৬টি স্বর্ণপদক, আমেরিকা ২৫টি। নতুন ইভেন্ট ছিল বাসকেটবল।

**১১৪০-টোকিও ; পরে হেলসিংকি**

**১১৪৪-লন্ডন :** দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য বাদশ ও দ্বাদশ অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়নি। বাদশ অলিম্পিক টোকিওয় হবার কথা থাকলেও চীন-জাপান যুদ্ধের জন্য হেলসিংকিতে করার ব্যবস্থা হয়। লন্ডনে ব্যবস্থা ছিল যৌগত অলিম্পিকের।

**১১৪৮-লন্ডন :** (২১ জুলাই-১০ আগস্ট) ৩২ বছর পরে যুদ্ধকালত পৃথিবীতে আবার অলিম্পিকের আয়োজনে সারা বিশ্ব মেতে ওঠে। মরণ অলিম্পিকের পর বন্দুকের অলিম্পিক যুদ্ধে জার্মানী, জাপান ও রাশিয়া অংশ নিতে পারে না। ১৮ রকমের খেলায় ৫১টি দেশের ৪০১১ জন (মেয়ে ৩৮৫) প্রতিযোগী অংশ নেন। চারটি সোনার পদক জিতে সবাইকে অবাক করে দেন দুই সন্তানের জর্নানী হলান্ডের যানি গ্র্যান্ডস প্রজেক্ট। তিনি সোনা পান ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে, ৮০ মিটার হাউলসে এবং ৪x১০০ মিটার রিলে বেগে। মাত্র ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি উচ্চ লম্বা উচ্চতার বেসেই পিয়েমো বাটিনোভোভ ৩০৭.৫ কিলোগ্রাম তুলে নতুন রেকর্ড

করেন। পিয়েমোভের চেয়ে খর্বকায় প্রতিযোগী বোয় হার অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হননি। আমেরিকান অবার পদক তালিকায় শীর্ষস্থান পায়। সোনা পায় ৪১টি।

**১১৫২-হেলসিংকি :** (১৯ জুলাই-৩ আগস্ট) ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকি জনসংখ্যা তখন মাত্র সাড়ে তিন লাখ। কিন্তু ক্রীড়াবিদগণ কিংবদন্তি আমন্ত্রণ জানিয়ে সমুদ্র কাব্যসমুদ্রায় তাক লাগিয়ে দিয়েছিল সবাইকে। ১৭ রকমের খেলায় প্রতিযোগী ছিলেন ৬৯১টি দেশের ৪১২৫ জন (মেয়ে ৫১৮ জন) প্রতিযোগী। হেলসিংকি অলিম্পিক চিহ্নিত হয়েছিল চেকোস্লোভাকিয়ার এমিল জেটোপেকের নামে। জিতে ছিলেন পাঁচ হাজার মিটার, দশ হাজার মিটার ও মারাগান দৌড়-ভিন্টনিটেই নতুন রেকর্ড। তাঁর সহধর্মিণী ডানা জেটোপেকাভা সোনা পেয়েছিলেন জার্ডালিন জোভে। শহিৎয়ে রাপিড ফায়ার পিস্তলে লন্ডনে সোনা জিতেছিলেন হাঙ্গারীয় ক্যাপালি টাকাকস। হেলসিংকিতেও জেতেন। উল্লেখ্য, ছোটবেলায় দুর্ঘটনায় ডান হাতখানি খোয়া যাওয়ার পর টাকাকস গুলি ছুড়তেন বাঁ হাতে।

হেলসিংকি গেমসের বড় ঘটনা আমেরিকার পিছনে ফেলে রাশিয়ার এগিয়া যাক্সা। জাম-এর আমলে রাশিয়া তিনটি অলিম্পিকে যোগ দিলে পের্ডিল মাত্র একটি সোনা, চারটি রূপা ও তিনটি ব্রোঞ্জ পদক। ৪০ বছর পরে রাশিয়া হেলসিংকি অলিম্পিকেই পায় ৪০টি সোনা, আমেরিকা পায় ৩৪টি। অবশ্য সোনার পো-ব্রোঞ্জ মালিকে আমেরিকা পায় ৬৬টি পদক, রাশিয়া পায় ৬১টি।

**১১৫৬-স্ননবোল :** (২২ নভেম্বর-৮ ডিসেম্বর) ইটালি ও যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রের প্রথম অলিম্পিক হয় অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে। যোগদানকারী দেশের সংখ্যা বাড়লেও প্রতিযোগীর সংখ্যা কম ছিল। ১৭ রকমের খেলায় যোগ দিয়েছিলেন ৭১টি দেশের ৩৩৪২ জন (মেয়ে ৩৮৪) প্রতিযোগী। পদকতালিকা এ শ্যা শীর্ষস্থান পায় (১৮টি), দ্বিতীয় স্থান পায় আমেরিকা (৭৪টি)।

রাশিয়ার মেয়ে জিমনার্স্ট লারিসা ল্যাটিনিনা পান ৪টি সোনা এবং ১টি রূপা। পরবর্তী অলিম্পিকে আরো পদক পেয়ে তার মোট পদকের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮টি-১টি সোনা, ৫টি রূপা এবং ৩টি ব্রোঞ্জ। অলিম্পিকে এত পদক আর কেউ পাননি।

অস্ট্রেলিয়ার মেয়ে বেটী নুভাকট মেলবোর্নে পান আর্থলটিকসের তিনটি সোনা। নুভাকটের নৌদে ডাবল পাল রাশিয়ার ভ্যাডিমির কুটস, পাঁচ হাজার ও দশ হাজার মিটার দৌড়ে জিতে।

**১১৬০-রোম :** (২৫ আগস্ট-১১ সেপ্টেম্বর) ৪০টি দেশের ৫০৪৮ জন (মেয়ে ৬১০) প্রতিযোগীর মধ্যে ১৭ রকমের খেলায় সব চেয়ে তাক লাগানি ইথিওপিয়ার ননপদ আথলটিক্স আবারে বিকলা এবং আমেরিকার কলো মেয়ে জেতেন মারাগান দৌড়ে। পরের অলিম্পিকে আবার জেতেন। তবে রানিং শূ পরে।

উইলমা রুডলফ সোনা পায় ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে ও ৪x১০০ মিটার রিলেতে। টেনেরর মেয়ে এই উইলমা রুডলফ কিন্তু পোলিও রোগে ৭ বছর ক্রাস পর্যন্ত হাঁটতে পারত না। পরবর্তীকালে দ্বি-টি-যুদ্ধের প্রবাদ মহাদাদ আলী এখানেই সোনা জেতেন মিডল হোভওয়েটে। তখন পর্যন্ত ছিল ক্যাসিয়াস ক্রে নামে।

রোম ভারতের কাছে রমণীয় হয়ে ওঠেন হকির সোনা পাঁকিস্তানের হাতে জমা দেওয়া। পর পর ছয়টি অলিম্পিক হকির সোনা জিতে ভারত গেমের রানার্স হয়।

পদক-তালিকায় রাশিয়া আবার শীর্ষস্থান দখল করে ১০৩টি সোনা-রূপা-ব্রোঞ্জ পেয়ে। আমেরিকা পায় ৭১টি।

**১১৬৪-টোকিও :** (১০-২৪ অক্টোবর) এশিয়া ভূখণ্ডে প্রথম অলিম্পিক হয় টোকিও। মোট ৫৬০ লক্ষ উচ্চর বারো অষ্টাদশ অলিম্পিকের আয়োজন, জাকজমক এবং বর্ণ-বৈচিত্র্য প্রচারে দেশগুলির তাক

লাগিয়ে দেন উত্তম সূচক। ১৯ রকমের খেলায় যোগ দেন ১০টি দেশের ৫১৪০ জন (মেয়ে ৬৮৫) প্রতিযোগী।

বাল্লিভাডাবে নজর কড়েন হাকিন মল্লক্রীড়া দ্বারা ডন স্কোলাস্টার সাঁতারে ৪টি সোনা জিতে কিন্তু এখানেই ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে উপাধি জিতে অলিম্পিকে সোনা জেতেন অস্ট্রেলিয়ার হের ডন স্কোলাস্টার এবং খেলায় প্রতিযোগী অলিম্পিকে সোনা জেতেন আমেরিকার অল টর্টর পরে মোজিকো অলিম্পিকেও সোনা জিতে ওটার ও নতুন কীর্তির অধিকারী হন। টোকিওয় রাশিয়ার ১৬টি পদক, আমেরিকা ১০টি। জেজে এবং ভিলার এর হয় টোকিও থেকে। টোকিওতে ভারত আবার পায় হকির সোনা। হিরোশিমায় প্রথম অলিম্পিক সোনা জিতেছিল দিন যে ছেলটিক জাম হয়েছিল মের ছেলটিক উপর অংশ করা হয়েছিল মেরিয়ার অলিম্পিকের পূর্ণাঙ্গ স্থাপনের দায়িত্ব।

**১১৬৮-মেক্সিকো :** (১২-২৭ অক্টোবর) সমগ্র পৃথিবী থেকে ৭৫০০ ফুট উপরে মেক্সিকো শহরে উদ্বোধন অলিম্পিক আমেরিকার নিজে জামার ক রামিন লং জাম্প এমন এক রেকর্ড করে রেখেছেন যা কে ভুলিয়ে ভাঙবে ভাবাংই জানে। লং জাম্পের নব রেকর্ড ছিল ২৬ ফুট সাড়ে ৭ ইঞ্চি। ক্রমশঃ লম্বা ২৯ ফুট জাইই ইঞ্চি। অবশ্য সব বাজঃ প টেটপ জাম্পে মেক্সিকোয় বিন বরুড ভাগে নরম। এই অলিম্পিক থেকে মেয়ে প্রতিযোগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মোজিকোর ১৮ রকমের খেলায় ১১২৫ দেশের ৫৫৩১ জন (মেয়ে ৭৪১) প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল। বক্তরাণ্ড পায় ১০৭টি পদক, রাশিয়া ১১টি। আমেরিকার নিজে আর্থলটিক্স ক্রীড়ার প্রতিবাদে মেক্সিকোয় ক্রীড়ার দাঁড়িয়ে দুর্ভিক্ষ হায়ে রূপা-ব্রোঞ্জ ডিমোফোস্তোন দেওয়া। চারটি সোনা ও দুটি রূপার পদক অ্য করে ডিমোফোস্তোন সন্মান পান চেকোস্লোভাকিয়ার ভোদা ব্যাললভাক।

**১১৭২-মিউনিখ :** (২৬ আগস্ট-১০ সেপ্টেম্বর) সবচেয়ে বেশি দেশ (১২২টি) এবং সবচেয়ে বেশি প্রতিযোগী (৭১৫৭ জন-মেয়ে ১০৭০) বিশিষ্ট অলিম্পিক অংশ গ্রহণ উল্লেখ করার মত ঘটনা। যেমন খেলাধুলায় ইতিহাসে ক্রীড়াকারী ও টপকার ঘটনা বড় মিউনিখ অলিম্পিকেই। আরও গেরিলাদের লক্ষ্যবস্তুর দিকে হেঁচকিয়ে ১১ জন ইজরাইলি ক্রীড়াদি। মোট ১৭টি প্রকার খেলায় ১১২৫ মিউনিখই বিজয়ীদের দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের কিছঃ হকির খেলোয়াড় ভারতের মধ্যে রূপার পদক ভালে সেই জায়গা উড় করে তুলে ধরেছিলেন অলিম্পিকের ইতিহাসে প্রতিবাদ জানাবার জন্য।

অলিম্পিক ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কীর্তি অধিকারী হন আমেরিকার মার্ক স্পিঞ্জ, সাঁতারে ৭টি সোনা জিতে। রাশিয়ার ভালেন্টিন বোরজভ পদ আর্থলটিকস স্পিট ডাবল। পায় পায় ১০৩টি পদক, আমেরিকা ১১টি।

**১১৭৬-মন্ট্রিয়াল :** (১৭ জুলাই-১ আগস্ট) বন ক্যামোরে প্রতিবাদে আফ্রিকার প্রায় ৩০টি দেশে মন্ট্রিয়াল অলিম্পিক বাকট করা সত্ত্বেও ২১ রকমের খেলায় ৮৮টি দেশের ৬১৫২ জন (মেয়ে ১২৬১) প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। মন্ট্রিয়ালকে মাত্র ৩ ভোলে ইউরোপের দুই চতুর্দশী, পূর্ব জার্মানি কনেলিয়া এডার এবং রোমানিয়ার নাক্সা কোমনেচো সাঁতারে এডার পায় ৪টি সোনা, জিমনার্স্টকস কোমনেচো ৩টি সোনা ও একটি রূপা।

মন্ট্রিয়াল অলিম্পিকে খরচ হয় সবচেয়ে বেশি অর্থ। আমাদের মন্ত্রীর হিসাবে তেরোশো কোটি টাকা। রাশিয়া পায় ৪৭টি সোনা, পূর্ব জার্মানি ৪০টি এবং আমেরিকা ৩৪টি। মন্ট্রিয়াল থেকে ভারতের গের্ট পলকে শনা হাতে ফিরতে হয়। মিউনিখ ও মেক্সিকো তবু হকির রোজ পদক জর্টোছিল। মন্ট্রিয়ালে হকির ভারত পায় সন্তোম স্থান।



# বাংলা চলচ্চিত্রেতিহাসের সর্বোত্তম নায়ক

সামান্য কেরানী থেকে চলচ্চিত্রাভিনয়ে যত্ন নিয়ে দীর্ঘ তিন দশক জনপ্রিয়তার ভূষণ অর্ধাতিত করার যে দৃষ্টিগত উত্তমকুমার রেখে গেলেন তার স্বত্তীয় নজির নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে তখন গণদাঙ্গা বন্দোপাধ্যায় নেই। অধিকাংশ বাংলা চলচ্চিত্রে রোমাণ্টিক নায়কের অভাব প্রকট। তদুপরি হিন্দী ছবি'র ভ্রমপ্রচার বাংলা ছবিকে জনচিত্র থেকে হিট্টে দিতে আরম্ভ করেছে। ঠিক এমনি মুহূর্তেই উত্তমকুমারের আবির্ভাব। সেই থেকে বাংলার চলচ্চিত্র বাজারে, হিন্দী ছবি'র প্রাধান্য অবশ্য অপ্রতিহত থাকলেও মুমূর্ষু বাংলা ছবি'র প্রাণের স্পন্দন ভিইয়ে রাখতে অতি মুষ্টিমেয় যে কয়েকজনের নাম ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে উত্তমকুমার নিঃসন্দেহে তাদের অন্যতম। নির্বাচন যুগ থেকে সূচনীয় নায়কের অভাব ছিল না, কিন্তু উত্তমকুমারের চেহারায় এমন একটি সম্মোহক আকর্ষণ ছিল যে চতুর্দশদশী তাকে 'গু' বা 'মহানায়ক'-এর পদে অভিষিক্ত করে উপাসনা করে এসেছে। উপরন্তু উত্তমকুমারের ছিল অসীম অভিনয় দক্ষতা। দুর্বল কাহিনী বা দুর্বলতার বিন্যাস তাঁর অভিনীত বহু ছবি'র জনপ্রিয়তা বিচ্যুত করেছে। কিন্তু এমন ছবি'রও উল্লেখ করা যায় যে ছবি'র নায়ক উত্তমকুমার একদমই আকর্ষণে দর্শককে মোহাবিষ্ট রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রথম ছবি, যতদূর মনে পড়ে 'কামনা'। এর আগে মাস্টার মুক্তিলাভ করে 'সহযাত্রী'। তৎপূর্বে অরুণকুমার নামে খান দুই ছবিতে অবতরণ করেন। এরপর আরও খান দুই ছবি'র পর রোমাণ্টিক নায়ক হিসেবে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন 'সাদে চুয়াত্তর'-এ। এ ছবি'র নায়িকা ছিলেন সুচিত্রা সেন। প্রতাপের অধিনায়িকা, সর্ব্বের প্রদীপ, সূর্য-চাঁদাব, শাপমোচন, হারানো সুর, সাগরিকা শিল্পী সুপদী, প্রভৃতি ছবিতে এই শিল্পী-জুড়ি অবতরণ করে বাংলা চলচ্চিত্রের কাজে 'মা গাঙ্গে' বেশ শিষ্ট, ভাল বাণ ডাকিয়েছিলেন। এর মাঝে এবং পরে জীবিত চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া দেবী সন্ধ্যা রায়, আদ্যবী চক্রবর্তী, শর্মিষ্ঠা ঠাকুর এবং সাম্প্রতিককালে সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় প্রমথের বিপরীতেও বেশ কিছু সংখ্যক ছবিকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। অভিনয়ে অসামান্য প্রতিভা প্রথম উন্মেষ সঞ্জীবনী-তে (সম্ভবত ১৯৫২)।

উত্তমকুমার বাংলা চিত্রের দর্শকচিত্রকে কি পরিমাণ আবিষ্ট করে রেখেছিলেন তার বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে একটির উল্লেখই যথেষ্ট হবে। সেটা সম্ভবত ১৯৬০ সাল। প্রেক্ষাগৃহের কর্মীদের মাস্কোলনে মাস ছয়েকেরও বেশী সময়ই চরমই বন্দ। আলদালন প্রতাহিরের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তিলাভ করল 'সূর্যোদয়', যার নায়িকা ছিলেন কঞ্চালা রায়। ছবিখানির কাহিনী বা পরিচালন রকতা এমন ছিল না যাতে ছবিখানি জনপ্রিয় হবে বলে আশা ছিল। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক মাস পর উত্তমকুমারকে দেখার দর্শকদের বৌক মুষ্টি-প্রাপ্ত চিরহংসুলিতে এমন জেতে পড়ে যে একটানা চার থেকে ছয় সপ্তাহ প্রত্যেকটি শ্রমণীর 'হাউস ফুল'-এর এক বেকডাই সৃষ্টি হয়। এমনি প্রবাদ পুঙ্খ হয়ে উঠেছিলেন উত্তমকুমার, যি প্রেক্ষাগৃহে দর্শক আকর্ষণে ভূমিকালিপিতে তাঁর নাম থাকাটাই ছিল যথেষ্ট।

অভিনয়ে বৈচিত্র্য আনার দক্ষতায়ও উত্তমকুমার ছিলেন বিশিষ্ট। যার স্বাক্ষর তিনি রেখে পিছেইর সাপেব বিবি গোলাব, ডা'গা ডাক্তার কট, লু, মজের বিয়ে, নেকলেস, বসু পরিবার, কমলাভা

রাজলক্ষ্মী ও প্রীতান্ত, শিউলিবাড়ি, মরুভূমি' হিলোয়, শ্যামলী, বড়দাঁব, খানা থেকে আসা'ই, যদুবেশ, হুম্মবেশী, নায়ক, চিড়িয়াখানা, থেকে হালফিলের দেবদাস এবং মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে মুষ্টিপ্রাপ্ত 'দুই পৃথিবী' ও 'দশচূর্ণ'। ছবিতে অভিনয় সৌকর্য্যের যে নিদর্শন রেখে গিয়েছেন তা তাঁর বিশিষ্টতা অমর করে রাখবে। তাঁর অভিনয়ে ছিল একটা স্বচ্ছন্দ সাবলীলতা। প্রায় শ'আড়াই ছবিতে উত্তমকুমার অভিনয় করেছেন। অর্থাৎ ঠিক তত সংখ্যকটি ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র। সেই শ'আড়াই ছবি'র প্রতিটি চরিত্রে উত্তমকুমারকে দেখা গিয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে। কোন একটির সঙ্গে অপরটির মিল নেই। শব্দ নিজের অভিনয়টুকু সারতেই তিনি তৃপ্ত থাকতেন না। অনুজপ্রতিম সহ-অভিনেতা ও অভিনেত্রীদেরও সাহায্য করতেন তাঁদের অভিনেতা ও চরিত্রের সঠিক রূপায়নে।



হালকা ধাঁচের চরিত্রাভিনয়েও অসাধারণ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। 'চিরকুমার সত্য', ভান্টি বিলাস' প্রভৃতি কতকগুলি ছবিতে।

শব্দ চিত্রাভিনয়েই নয়। মঞ্চাভিনয়েও তাঁর পারদর্শিতা কম ছিল না। উত্তমকুমার যে একদা অতীব জনপ্রিয় মঞ্চাভিনেতা ছিলেন সে কথা অনেকেই অজ্ঞ বিমতঃ। ঘুরে 'শ্যামলী'-র কথা এই স্মৃতে স্মর্তব্য। নাটকের নাম-ভূমিকায় অভিনয় সারিটী চট্টোপাধ্যায়। একটানা কয়েক শত রজনী চলার মতোও মুখা আকর্ষণ ছিলেন উত্তমকুমার। রম্ভুত পোট' কমিশনার অফিস পে-ডাক' রূপে কাজ করা'র সময়েও শব্দ করে অভিনয় করেছেন। একসময় সংগীতেও তাঁর কৃতিত্ব স্বীকৃতি পেয়েছিল। ছবি'র পরিচালনাতেও যে তিনি দক্ষ ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে 'বনপলাশীর পদাবলী'-তে। তাঁর শেষ পরিচালনা প্রচেষ্টা ছিল প্রয়াত পরিচালক পাইসে বসুর 'কলঙ্কিনী কংকবতী'। কিন্তু ছবিটি শেষ করে ছেড়ে পারলেন না।

বাংলা চলচ্চিত্র শিপের দৃশ্য মোচনের

খাপাহেও তিনি সক্রিয় ছবি'র গ্রহণ করতেন। সরকারের কাছে দক্ষতার করার মধ্যেই সে-চেষ্টা সীমায়িত ছিল না। হিন্দী ছবি তৈরি করে সর্ব-ভারতীয় বাজার থেকে অর্ধাজন শ্রাব্য বাংলা শিল্পকে পুষ্ট করার তিনি ত্রুটি হয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যেই প্রবোজিত করেন ছোটটি সি মোলাকা'। ছবিখানি উত্তমকুমারের উদ্দেশ্য সফল করতে পারেন 'বন অফিস'-এ ব্যর্থতার জন্য। তৎসত্ত্বেও হিন্দী চিত্র-জগতেও তাঁর খ্যাতি বড় কম ছিল না। 'অমানুষ' বা 'আনন্দ আশ্রম'-এর জনপ্রিয়তার মতো উত্তম-কুমারের কাঙ্ক্ষিত চরিত্রাভিনয়ের কৃতিত্ব অন-স্বীকার্য। দীর্ঘ তিন দশকের অভিনয়শিল্পী জীবনে যে আড়াই শতাধিক ছবিতে অবতরণ করেছেন তার অধিকাংশই ছবি হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকার মত নয়। গুণী পরিচালক তাঁর ভাগ্যে খুব কমই জুটেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অনুলোক চিত্রাঙ্কির মধ্যেও উত্তমকুমার ছবি'র বারান।

আসল নাম অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। চলচ্চিত্রে প্রথম অবতরণ অরুণকুমার নামে। উত্তমকুমার নাম গ্রহণ থেকেই তিনি রোমাণ্টিক নায়ক রূপে সাদা জাগিয়ে তোলেন। তাঁর প্রতিভার প্রথম স্বাক্ষর পাওয়া যায় সঞ্জীবনী-তে। এবং সেই থেকেই কেবল-মাত্র দর্শকমনের উপরই নয়, সমগ্র বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পকেই বোহাগ্ন করে রাখেন। অভিনয়ে অসাধারণ প্রতিভার যেমন অধিকারী ছিলেন তেমনি ছিলেন পরিমল। দর্শকসাধারণের মনে শিল্পী হিসেবে অনুরাগ ও প্রস্ধার আসন অর্জন করা থেকেই কোন একটি বছরও ঘাঘনি যে বছর তাঁকে একই সঙ্গে চার-পাঁচখানি ছবিতে কাজ করতে হয়নি। মৃত্যুর আগের দিনও তিনি 'ওগো বহু সুন্দরী'র শ্যুটিং করেছেন। আরো তালিকায় ছিল 'দুর্বলাক্ষী' 'কলঙ্কিত নায়ক' 'খনা' ও 'হার মার্নো'।

ছবিতে আরাম কাজ করে গেলেও চলচ্চিত্র নির্মাণে সফলকট বিশেষ করে দুঃস্থ শিল্পী ও কলাকুশলীদের সুখ-দুঃখ নিয়েও চিন্তা এবং কজ করতেন। কত দুঃস্থ কুশলী যে তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন সে-খবর কলাকাতার স্টুডিও মহলে কারো আবিদিত নেই। দুঃস্থ অভিনয়শিল্পীদের সহায়তার জন্য তাঁরই অগ্রহে গঠিত হয় শিল্পী সংসদ। গঠনই নয়, দুঃস্থদের সহায়তার জন্য অর্থের সঞ্চান ব্যবস্থায় নিজেই পরিচালনা করেন 'বনপলাশীর পদাবলী'। একই উদ্দেশ্যে নির্মিত হয় 'দুই পৃথিবী' যেটি প্রয়াত পরিচালক পাইসে বসুর শেষ ছবি। কলাকুশলীদের সহায়তার জন্যও একখানি ছবি প্রযোজনার কাজ অনেকটা এগিয়েছিল। তাঁর প্রয়াণে তা আর এগোতে পারল না।

অভিনয়ে অন্যা গুণের অধিকারী তো ছিলেনই, তাছাড়া ছিলেন সুগায়ক। চলচ্চিত্রে যোগদানের পূর্বেও গান শেখাতেন। ছবিতে স্বকণ্ঠে গেয়েছেন 'নবরাগ'-এ প্রয়াত নট্যকতা বোম্বের দেওরা সুরে। সংগীত-পারিচালক রূপেও তাঁকে দেখা গিয়েছে 'কাল তুমি আলোয়া'-তে। এমন বহু-মুখী প্রতিভা, জনপ্রিয়তা অপ্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু আত্মত্যাগের লেশ-মাত্র কোনদিন তাঁকে স্পর্শ করেনি।

শোকবার্তার সত্যিই রায় বলেছেন, কেবলমাত্র বাংলাদেশ বা ভারত নয়, তাঁর ধারণায় দীর্ঘ তিন দশক ধরে জনপ্রিয়তার ভূষণ অর্ধাতিত থাকতে পেরেছেন এমন অভিনয়শিল্পী সমগ্র বিশ্বেই বিরল। মৃণাল সেনের মতে, আমাদের দেশেই শব্দ নয়, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সমকক্ষ হবার মত প্রতিভাবান ছিলেন উত্তমকুমার।

উত্তমকুমারের তিরোধানে যে স্থান খোঁজা হল তা আর কারুর দ্বারা পূরণ হতে পারবে মনে হয় না।

পঞ্চজ দত্ত



## আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি বই

A Biographical Sketch of David Hare by Peary Chand Mittra. New reprint ed. by Gauranga Gopal Sen Gupta. Jijnasa, Calcutta-2 Price Rs. 30.00.

বাংলার নবজাগরণ য়ে-সব বিদেশীরা দান প্রদান সপে স্বরণীয় ভেঁজিত হেয়ার তাঁদের অন্যতম। তাঁর কর্মদোহা যেন কবিতা এমন আর কারও নেই। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ভারতীয়দের প্রথম প্রয়োজন আধুনিক শিক্ষার দৃঢ় বান্যাদ। একবার রামমোহন পৌত্তলিকতা দূরীকরণ সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি ঘরোয়া বৈঠক ডেকেছিলেন। অক্ষমপ্রিত না হয়েও হেয়ার সেই সভায় উপস্থিত হয়ে বললেন, একমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারই সংস্কার দূর করতে পারে, শুধু আলোচনায় ফল হবে না। হস্ত হেয়ারের এই প্রস্তাবই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সূচনা। কেউ কেউ বলেন, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোগী পুরুষ। এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও একথা প্রমাণিত যে তিনি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে হিন্দু কলেজের পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণাঙ্গল



প্রমুখ ৫৬৪ জন নব্য ভাবনার উদ্ভব বাঙালী যুবক হেয়ারকে সম্বর্ধনা জানান। উত্তরে হেয়ার যা বলেছিলেন তা থেকে বোঝা যায় শিক্ষাকে তিনি কেন প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি কলেজ, জরুরে সকল সম্পদের অক্ষুণ্ণ উৎস রয়েছেন। এখানকার লোকেরা বুদ্ধিমান পরিগ্রহী, তারা অন্যান্য সভ্যদেশের নাগরিকদের তুলনায় কোন অংশে নীচ নয়। শুধু বহু শতাব্দীর উৎপীড়ন ও কুশাসনে দেশের নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতি ভেঙ্গে পড়ায় জনগণের এই দুর্দশা। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার এর প্রতিকার করতে পারে। এই জন্যই তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার বীজ বপনে আগ্রহী। তার কৃতিত্ব ছাত্রদের মধ্যে সের

হাচের সাফল্য দেখে তিনি আর আশাবাদী।

কিন্তু অন্য শিক্ষার প্রতি তাঁর বিরূপতা ছিল না। রামমোহন সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধী ছিলেন; হেয়ার বিরোধিতা করেন নি। তাঁরই জমিতে এই বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মিত হয়েছিল। বাংলা শিক্ষিত ছাত্রদের তিনি উৎসাহিত করতেন। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান যে কেবল ইংরাজী বই থেকেই শিখতে হবে এর কোন অর্থ নেই। বাংলা ভাষায় উপযুক্ত বই প্রকাশ করে আধুনিক জ্ঞানের পাঠ দেওয়া যায়। প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক রচনার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হল স্কুল বুক সোসাইটি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে। পর বসের কলিকাতা স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা হল শিক্ষা ক্ষেত্রে ও স্কুলে পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য। হেয়ার এই দুটি সমিতির সঙ্গেই দীর্ঘকাল সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। স্কুল সোসাইটি আরপুলি পাঠশালাটির তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব দেয় হেয়ারকে। সে দায়িত্ব তিনি দুল্লভ আত্মিকতায় সহিত পালন করেছিলেন।

বালিকাদের মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিল নেটিভ সোসাইটি ফর নেটিভ স্কুলে এডুকেশন। হেয়ারের সহযোগিতা থেকে এই সমিতিও বর্ধিত হয়নি। তাছাড়া কালকাতা মেডিকেল কলেজের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন।

বর্ষ সম্বন্ধে হেয়ার ছিলেন অনেকটা উদাসীন। শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পালন করে চলাই ছিল তাঁর আদর্শ। এজন্য তিনি মিশনারিদের আশ্রয়ভাজন হতে পারেন নি।

সে সময়কার শিক্ষা ও সংস্কৃতি-মূলক সব প্রতিষ্ঠানের সপেই হেয়ার যুক্ত ছিলেন। অন্যান্য সামাজিক প্রদন সম্বন্ধেও তিনি ছিলেন সচেতন। ভারত থেকে মরিসাস এবং অন্যান্য দেশে মজুর পাঠানোর বিরোধী ছিলেন তিনি। একবার তিনি পুলিশের নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ করেন যে প্রাকৃতিক হালদারের বাড়িতে বিদেশে পাঠাবার জন্য "কুলীদের" এনে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

কৃষির সাহায্যে বিচার এবং মুদ্রায়ন্ত্র নিয়ন্ত্রণবিরোধী আলোচনের সমর্থক ছিলেন হেয়ার।

ডিরোজিও তাঁর বন্ধু ছিলেন, রামমোহনও ছিলেন অন্যতম সহৃদয়। লন্ডনে হেয়ার-পরিবারেরই আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন রামমোহন। ডিরোজিও এবং রামমোহন জ্ঞানের আলোকে বুদ্ধির দীপ্তিতে নিজেদের পথ সৃষ্টি করেছিলেন। অন্যদেরও পথ দেখিয়েছেন। হেয়ারের পাণ্ডিত্য ছিল না, ছিল প্রণভরা ভালোবাসা। তাঁর শিক্ষাসেবা ভালোবাসার সংযোগে মহিমান্বিত। ছাত্রদের জন্য হেয়ারের ভালোবাসা প্রবাসে পরিণত হয়েছে।

সাতব্বি বছর বয়সে কলেয়ার

## মাড়ির গোলমালের প্রথম লক্ষণ?



### প্লেক (Plaque)

হল জীবনের এক অদৃশ্য পর্দা যা আপনার দাঁত আর মাড়িতে সবসময়ই তড়িয়ে থাকে। অবহেলা করলে প্লেক দস্তমলে পরিণত হয়।

### দস্তমল

দাঁতের গোড়ায় জমে, ফলে মাড়ি জলা করে আর ফুলে ওঠে। পরে মাড়ি আর হাড় ক্ষয়ে গিয়ে দাঁত পড়ে যেতে পারে।

### মাড়ি থেকে রক্ত পড়া

গ্রাস দিয়ে দাঁত সাফ করার সময় দুই দাঁত আর খোলাখোলা মাড়ি থেকে রক্ত পড়তে পারে। এতে বাধা না পেলেও গুরুতর সমস্যা দেখা দিতে পারে।

## দাঁতের ডাক্তারের তৈরী করহ্যান্স টুথপেস্ট দিয়ে আগবার মাড়ির যত্ন নিন

ডাঃ করহ্যান্সের অধিভায় করমূল্য ডাঃ ফরহ্যান্সের শাণ্ডালী অ্যাসিট্রেটে ক্রিয়াকরমূল্য আপনার মাড়ির ওপরের ভাগ মজবুত করে তোলে, ফলে আপনি মাড়ির গোলমাল রোধ করতে পারেন।

### দাঁতের ডাক্তাররা বলেন

মাড়ির গোলমাল হলে এমনকি সুস্থ দাঁতও পড়ে যেতে পারে। রোগ রোগে আর সকালে দাঁত গ্রাস আর মাড়ি মালিশ করুন, ফরহ্যান্স টুথপেস্ট আর ফরহ্যান্স ডবল অ্যাকশন টুথব্রাশ দিয়ে।



মাড়ি  
খারাপ  
জো স্নান  
খারাপ



### কিন্তু! "আপনার দাঁত ও মাড়ির যত্ন"

রত্নান পুস্তিকা। অনগ্র করে ২৫ পয়সার ডাকটিকিট সমেত এই ঠিকানায় লিখুন: ফরহ্যান্স ডেন্টাল আডভান্সারী বুরো, পোস্ট বাক্স নং ১১৪৬৩, ডিপার্টমেন্ট P 128 215, বম্বে ৪০০ ০২০। যে ভাষায় চান জানাবেন।

## ফরহ্যান্স

দাঁতের ডাক্তারের  
তৈরী টুথপেস্ট

হেয়ারের মৃত্যু হয়। জয় শোকযাত্রার পূর্ণাঙ্গ হাজার লোক হোল দিরাইল। সে যুগের পক্ষে এটা ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। হেয়ারের প্রতি ছাত্র ও জনসাধারণের যে সত্যিকারের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল এটা তারই প্রমাণ। এই অকৃত্যকার, স্বেচ্ছাচরী শিক্ষার সেকক কলকাতা এসেছিলেন ঘড়ির কবসা করতে। খুব ভালো চলছিল বাবসা, বেশ উপার্জন হচ্ছিল। কিন্তু শহরের ঘরে ঘরে জ্ঞানের আলো জ্বললে দেবার কি এক বোঝা ভাঁকে পেয়ে কল, একটু একটু করে বাবসা থেকে সরে এলেন এবং শেষ পর্যন্ত একেবারে ছেড়েই দিলেন। পরিণামে শেষ জীবনে তাকে অর্থকষ্টে পড়তে হয়েছিল।

হেয়ারের শিশুরীতি বাঁধক স্মৃতি-সভার স্থির হয়েছিল যে তাঁর একটি পুত্রাঙ্গ জীবনী লেখা হবে। কিন্তু নানা কারণে তা হয়ে ওঠেনি। হেয়ারের মৃত্যুর ছাত্র বর্ষ পরে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্রের রচিত জীবনীটি প্রকাশিত হয়। পুত্রাঙ্গ জীবনী নয়, তাই প্যারীচাঁদ একে বলে-ছেন “স্কেচ”। উপকরণের অভাবের জন্যই পুত্রাঙ্গ জীবনী রচনা করা সম্ভব হয়নি। এই অভাবের জন্য অনেকগুলো দাবী হেয়ারের আশ্র-প্রচার বিঘ্নিত। ঘনিষ্ঠদের সঙ্গও তিনি নিজের কথা নিয়ে আলোচনা করতেন না। প্যারীচাঁদ যে স্কেচটি রেখে গেছেন তারই যথেষ্ট মূল্য আছে। সুতরাং বইটির পুনর্মুদ্রণ হওয়ায় আমরা আনন্দিত। মূল গ্রন্থ ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত : পান্ডিত্য শিক্ষা, প্রবর্তন ভৌত হেয়ারের দান, মাতৃ-ভাষায় শিক্ষা এবং স্বাধীন শিক্ষা, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে ভৌত হেয়ার, ভৌত হেয়ারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, বিশিষ্ট বাঙালি স্মৃতিচারণ ও নিঃস্বার্থ উপকারক ভৌত হেয়ার। দুটি পরিশিষ্টের একাটতে দেওয়া হয়েছে হেয়ার-রচিত হিন্দু, মুসলিম নিয়মাবলী, অন্যটি হিন্দু কলেজ ও তার প্রতিষ্ঠাতা।

নতুন সংস্করণটি সুত্বরূপে সম্পাদনা করেছেন গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত। পার্শ্বীয় তিনি বহু নতুন তথ্য সংযোজন করেছেন। তাছাড়া যোগ করেছেন ছয়টি নতুন পরিশিষ্ট। ভৌত হেয়ারের উইলটি এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। আর একাটতে বহুমানের প্রতাপচাঁদের মামলার হেয়ার যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সব চেয়ে দরকারী হল প্রায় পোঁদে দশ দেশী-বিদেশী হেয়ারের সমকালীন ব্যক্তিদের জীবনী-তালিকাটি। প্রত্যেকের জন্ম-মৃত্যুর বৎসর সব সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। অন্য সূত্র থেকে অনেকের সংক্ষেপে সহজে তথ্য পাওয়া যায় না। সম্পাদকের অনেক পরিশ্রম ও অনু-সন্ধানের ফল এই তালিকা। এটি রেফারেন্সের জন্য কাজে লাগবে।

একটি নির্মল্য হস্ত করা হলে বইটির কবছত্রোপযোগিতা বৃদ্ধি পেত। চিত্ররঞ্জন স্বল্পপাধ্যায়

## আলোচনা: শিশু সংস্কৃতি চিত্রকলা

### কোষ্ঠীর ফলাফল

এমন একটা সময় ছিল ১৭৭০ শিল্পীরা যখনই কাল করতেন। তাঁদের পুত্রপোষকের মত অনুসারে চলেতে হতো। তবু পুত্রপোষকের নির্দেশ এবং পরম্পরায় মেনে নিয়েই শিল্পী সাধ আত্মিক মেটাতে বসেই শিল্পকলা নতুন দিকে মোড় নিয়েছে। শিল্পী যেখানে ঘানির বলয়ের মধ্যে। ঐতিহ্যের চারপাশে ঠলি পরে য়েছেন সেইখানে সেটা হয়েছে মূল্যবোধ। সে সময় শিল্পী সামগ্রিকভাবে নিজেকে জীবন এবং সংস্কৃতির অঙ্গ বলে ধরতেন বলেই ক্রীতদাস বলে কখনো তাকে মনে হতো না। ক্রীতদাসকে কোন কমেয়ালী, নৃম্ম, অত্যাচারী পুত্র-পোষকের পাঞ্জায় কখনো কখনো তাকে পড়তে হয়েছে। অনান্য শিল্পী বল বেয়ে গৃহ্যার দেওয়াল-চিত্র বা শিল্পের ভাস্কর্য করার সময় নিজেকে কারিগর হিসাবেই ভেবেছেন। শিল্প-বিশ্ববের পর চিত্র-শিল্পীর পুত্রপোষকতা করার মত ধর্ম-মহামাঙ্গল্যের মোহন্ত বা রাজস্বয়ংয়ের



### বন্দনা রয়ের জীবা প্রতিকৃতি

অকথা রইল না। শিল্পীরা হলেন ক্রমশ স্বাধীন। অহেতুকী আনন্দের বিষয় হল শিল্পকলা কিন্তু যথা ইচ্ছা তথা বাবার অকথা সকলের থাকে না।

বন্দনা রায় প্রদর্শনী (অকামমী অব ফাইন আর্ট স, ফেক্সহারারি মাঝামাঝি) দেখতে গিয়ে মনে হল এসব। এমন পট-মিশালী প্রদর্শনী খুব কমই দেখা যায়। প্রতিকৃতিগুলো সাধারণ বাজারে যেমন তৈলচিত্রে সে তেমনি। কিন্তু প্রদর্শনীতে অজল। পেছনে হাওয়া-বাতাস কোথা মতো জারগা নেই। বসিও ফোটাওয়ারের মত প্রতিকৃতি একেই মিলেছে। জল এবং তেলের মিশ্রণ মন্দ নয়। এসব আর্ট কলেজের প্রদর্শনীতে মন্দ লাগতো না। বন্দনা আর্ট কলেজে মোটামুটি নির্ভর মন্দ কাজ শিখেছিলেন। কিন্তু প্রাণিকৃত ক্ষেত্রের বাইরে বিচরণের জন্য চাই আলো হাওয়ার খোলামেলা পরিবেশ। এইখানে শিল্পীর অঙ্গিন-পরীক্ষা।

বন্দনা একটা গোটা চিত্রকলা করেছেন রাশি মিরে। বস্তুত যে বাস

রাশি মিরে করে দেখে নিতে পারেন। কোন কৃত্ত রাশির জন্য তাঁনি একটা বট রেখে গোটা রচনাটা সাজিয়েছেন। ৪ অর্ধশতাব্দীর মহাভাগ্যতিক পরিবেশ বনক হাতে হল বন রাশি। প্রতীক একেই বহুলাংশে সূত্র-ওটা। ঠিক কাজ করে না। যদিও রাশিকে প্রতীক হিসাবে চিন্তা করার মধ্যে অভিনব আছে।

বন্দনার জলরঙ বোঁশ ভারী। তেল-রঙ হালকা। জৌলুস আছে কিন্তু তেলের ভাস কম। তার ওপরে অঙ্গন কাঁচা। আমার মনে হয় প্রথমে পুত্র-বেশমলক চিত্র তাকে আকৃষ্ট হার অনেক, বহু। অঙ্গনে জোর হলে তবে ভাঙ্গা, বা জোড়াতাড় দেওয়া কিংবা বিকৃতিকরণ, অথবা নিজস্ব উত্তে মূপা-রোপের প্রসন্ন আসে।

স্বাধী গৃহকালের বাইরে আসেন নি। জীবনীটা দেখেছেন, চিত্রের না হলো। মিরাপ দ্বয়ের আড়াল থেকে। কলে ভৌম আসক্তির পরিবর্তে ভাব্যতা-কোমোতিকতা পটে এসে হানা দিয়েছে। আকৃষ্টিকরণ লাল হলকু মাছ আকার বরকার পড়ত না।

### দলীয় দরকার

## আলোচনা: শিশু সংস্কৃতি চলচ্চিত্র

### শব্দবলু

পাচটি ইন্সট্রের মধ্যে কর্ণের ভূমিকা যে কত বড় সেটা নিরক্ষর মানবেরও অজানা নয়। অজানা যা তা হল কানের গঠন, তার কর্মধারা এবং প্রবণতা কত রকমজব্ব কতপ্রশস্ত হয় সে সম্পর্কিত তজ। বর্ধরয় শব্দ, প্রবণেই বিষয় ঘটায় না কোন কোন ক্ষেত্রে মস্তিষ্ককেও কাঁদল করে তোলে। এই বিষয়ের তথ্যপূর্ণ একটি ডকু-মেন্টারি ছবির নাম ‘শব্দবলু’।

এই তথ্যচিত্রখানি প্রযোজনা করেছেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ই এন টি বিভাগের প্রধান ডাঃ আবিরলাল মুনোপাধ্যায়। কান সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার চিত্র নাট্যকার ডাঃ দেবাশিস সান্যাল কানের গঠন থেকে প্রবণতা কতভাবে বাহ্য হতে পারে ধাপে ধাপ তা অভিভাষ করার সফল হয়েছে। এই সাফল্যের মূলে পরিচালক অভিভাষ সন্নকরের কৃতিত্বও সমর্থক। উপন গৃহস্থায়ের কামের কাজ, এস মোহন্তীর সম্পাদনা, দেবাশিস দাশগুপ্তের আবহ সুরযোজনা এক চন্দ্রী লাইডী ও তুলসী লাইডীর কাট-ন ছবিখানির বস্তু পরিষ্কৃত করে তোলার সহায়ক হয়েছে। খ্যাতিমান অভিনয়-শিল্পী সৌম্য চট্টোপাধ্যায়ের ধারাভাষা বিষয়টি সরল করে বুঝিয়ে দেয়। বিষয়-বস্তুর গৃহস্থের বিবেচনায় এবং ৮১ সাল কিংব বর্ধর কল্যাণ বৎসর মনে রেখে তথা চিত্রখানির কল প্রচার প্রচার আনুষ্ঠান।

### পঙ্কজ বসু

## মিশ্রণ

অজন্ত শিল্পকার ভিত্তি দুরন্ত স্মৃতিক্রম প্রথম সংখ্যা: সন্তোষকুমার ঘোষ, সুনীল গঙ্গোত্রী, শক্তি চট্টো, পুন্ডক পট্টা, মঙ্গলেশ্বর দাশগুপ্ত, দেবাশিস বসু, পদাশ নিগ, মঙ্গল সিংহ, সুভাষা সেন, দিনাল সেন, শ্যামাল মজুমদার, রাধানাথ মজুম, অসিত পাল, দিনাকী গুহ, তপন ঘোষ, রতীন্দ্র দেব রায়, ব্রজ সেন, আলপনা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

সম্পাদনা: আলপনা চট্টোপাধ্যায়  
৪ ৪ প্রোড মেন, কলিকাতা-২৬

### প্রকাশিত হল

### সংজ্ঞিতর বই

## বিষাদসঙ্গীত

(অনুবাদ কবিতা, কবিতা, গান, ইংরাজী কবিতা)

### বন্যা প্রকাশনী

৫৪, মাধব চ্যাট্টো লেন, কলকাতা-৭০০০২০

### শীতলী প্রকাশিত হচ্ছে

## চৈতন্যের ছাতি প্রকাশ

নানারঙের দিন। শরতের মেঘ ওজবিবাহ। প্রস্তাব এক ডেইলি প্যাসজের করুণ কাহিনী এবং তামাক সেবনের অপকারিতা অভিজ্ঞত বঙ্গোপাধ্যায় রূপান্তরিত নাম বারো টাকা।  
তুর্নলক্ষী প্রকাশনী  
৫/৩৪ কাশী বসু লেন, কলি-৬

## শুভাকাঙ্ক্ষী রবীন্দ্রনাথ

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রকাশিত অধ্যাপক শ্রী প্রমথনাথ মিশ্রকে দেখা রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী চিত্তির সংকলন। অধ্যাপক মিশ্র কৃত্তিকা ও পর গিরিচি সহ। মূল্য-পাঁচ টাকা।

### পুস্তক বিপণি

২৭, বেনিফিটাল লেন, কলিকাতা-২

বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণের একমাত্র পুস্তক

## চলচ্চিত্র নির্মাণ

## ও পরিচালনা ১০০

### খীন্দেশ শোষ

দে বুক স্টোর, কলি : ৭০০০৭৪

## প্রকাশিত হল SOUTHERN AFRICA STANDS UP

*The Revolutions in Angola,  
Mozambique, Rhodesia,  
Namibia and South Africa*  
by  
**Wilfred Burchett**

Wilfred Burchett has been covering revolutions and wars for more than thirty-five years—first in China and Korea, then in Laos, Cambodia and Vietnam and now in Southern Africa. Wherever Burchett goes he gives us the story and the inside information from “the other side”. He talks to the revolutionaries themselves, to the leaders, footsoldiers and peasants and allows them to explain how and why they do what they do. Wilfred Burchett's comprehensive account of the completed and still ongoing revolutionary struggles in all of Southern Africa—Angola, Mozambique, Namibia, Rhodesia, and South Africa itself—draws on close personal acquaintance with the revolutionary leaders in the various countries and on first-hand observation. Burchett knows the overall political and strategic components as well as the characteristics of the struggle in each of these countries. This is one of the first overall studies of the entire revolutionary developments in all of Southern Africa. 1980, Pp : 375 Rs. 40.00 (Post free)

Published in India by  
**K P BAGCHI & COMPANY**  
286, B. B. Ganguli Street Calcutta-700 012  
Branch : I-1698 Chittaranjan Park, New Delhi-110 019

আমোচনা : শির সংস্কৃতি নৃত্য

তাসের দেশ : অশ্রুত রস,  
মধুর অভিজ্ঞতা

১২ জুলাই ১৯৮০—তারিখটা লিখে রাখার মত। কারণ ওই দিন ববীন্দ্রসদনে একটা মিলনকূল ঘটিয়েছিলেন আচর্য শান্তিসেবক ঘোষ। একটা বাদ্যসংস্কৃত পূর্ণভাবে ববীন্দ্রসংখ্যায় পরিণত করে দিলেন। প্রগাঢ় হেমন্তের কন্ঠ থেকে কত অনায়াসে ডাক দিয়ে নিয়ে এলেন প্রমিত কলন্তকে। সন্তর জঙ্ঘের একটি মানবের নিম্নোক্ত জন্ম-মন্ডে উন্মোচিত করে স্ফুরিত হল তেইশটি পুষ্পিত কতর এক স্বা-পরেব। খোলা গলার অক্লিষ্ট বাতাসে গন্ধের ভেলা ভাসিয়ে, সাকলী প্রাণবন্ত অভিনয়ে, আর অসামান্য শিল্প-সুসমাস্থিত নৃত্যে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহকে একইসঙ্গে জীবন্ত আর সম্মোহিত করে রাখলেন শান্তিসেবক। অভিনয় শেষে কিছু, প্রান্ত আর অনেকখানি জবেগ ডগুর কম্পিতকণ্ঠে যখন তিনি বললেন, “আমার যতটুকু যা প্রাপ্ত, সব গুরু-দেবের কাছে, সব তাঁর চরণতলে বস শেখা”—তখন মনে হল যতদূর আমাদের মর্মে বিকলিত, ততদূর এই ববীন্দ্র-শির উল্লেখ্য অনভব, কিস্মী ঐশ্বর্য আর আকাশভরা আনন্দ আমাদেরও সঙ্গে সঙ্গে যাবে।

উপলব্ধ, ববীন্দ্রনাথের তাসের দেশ-এর সাম্প্রতিকতম অভিনয়, দেশপাণ

ববীন্দ্রনাথ ইন্দ্রচিহ্নিত সাহায্য-কল্যাণ। অনুষ্ঠান সঙ্গীত ছিলেন অম্বিকানন্দ সুরকার। সুনির্বাচিত করেকটি শব্দে তান বেজবো আচর্য শান্তিসেবকের প্রাতিভার প্রতি প্রখ্যা নিক্ষেপ করেন তা উল্লি অগাণ্ড শ্রোতারই মনের কথা। একদা ববীন্দ্রনাথ যার বার নানা অনুষ্ঠানে আয়োজন করেছিলেন বিশ্বভারতীয়া আর্থিক অজাবমোচনের জন্য। কাজেই এবার অন্য এক শিক্ষাপ্রাতিভানের সাহায্যার্থে তাঁর দেশে স্বগৃহ্য করা—সেও ওই মহৎ পথারই অনুসরণ করে। বক্তৃথাপকজা এজন্য অকৃত সাধবাদ পাবেন।

তাসের দেশ ববীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে পড়ে না। এর বহুত্ব একটু চড়া সুকেই উপস্থাপিত। সংলাপ সহস্য লঘু, হালো রুচিক ঝাঁকুনি দিয়ে যায়। ববীন্দ্রনাথের রঙ্গরঙ্গ সাধারণত সেটাও তাঁর অনান্য সব কিছুর মত অত্যন্ত উচ্চমানের। এই নাটকে সব দা তা রীকিত হয়নি। শব্দের মোচড়ে স্থিত-হাসের জন্ম দান যার স্বভাবজ, তিনি হঠাৎ প্রেক্ষাগৃহে সস্তা হর্ষধ্বনির লোতে কিছু করেছেন এটা অবশ্যই নয়। মহাত্মার প্রয়োজনে সংবাদপত্র যে জাযার প্রবর্তন করে, সেটার বিরুদ্ধেও বক্তৃথাপকাটা স্বাভাবিক। বিস্ময় শিক্ষাপ্রাতি অথবা উগ্র-আধুনিক সমাজের কাণ্ড-কারখানা বিদ্রূপের বিষয়বস্তু অকাই হতে পারে। কিন্তু মনত বড় মৈত্রো সঙ্গে যিনি লড়াই করতে নেমেছেন তিনি কেন ছোট ছোট ছাড়াডত এড-

আপনার চুল কি নিশ্চয় প্রাণহীন?

কেন প্রাণ ও উজ্জলতা ফিরিয়ে আনুন আপনার চুলে...

হেলো টটিক  
শ্যাম্পুর

বিশেষ টটিকের  
সাহায্য নিয়ে।

খাভাবিক নিয়াম, যত দিন যাবে  
আপনার চুলের তেলতালা ভার ওতট  
মতে থাকবে—এতে আপনার চুল  
যে যাবে নিশ্চয় ও প্রাণহীন।

হেলো টটিক শ্যাম্পুর বিশেষ টটিক  
খালাসটোন টটিকের মতো কাজ  
করে। আপনার চুলে ফিরিয়ে আন  
প্রথম পরিমানে স্বাভাবিক তেল।

চুলের গোড়ায় পুটি জোপায়।

এটভাবে হেলো টটিক শ্যাম্পু

আপনার চুলের সজীব সৌন্দর্য

ফিরিয়ে আনে, তলমাল করে

তোলে—চুলে নতুন প্রাণ আর

উজ্জলতা সঞ্চয় করে।

এর ঘন ফেনা আপনার চুলের ময়লা

পরিষ্কার করে একটী তলমালে দাঁপ্ত

আনে দেয়। আর এর মন্দর তাজা

গন্ধ আপনার আরো ভাল লাগবে।

আপনার নিশ্চয় প্রাণহীন চুলে

নতুন প্রাণ আর উজ্জলতা আনতে,

হেলো টটিক শ্যাম্পু ব্যবহার করুন।





ভাঙ্গেরদেশে রাজপুত্রের ছদ্মকায়  
সদাশিবের ঘোষ

যেই ভিতরে কেঁদে কঁদে পড়ল  
করকেন জে কেবল শব্দ।  
অবে একক স্বাক্ষর এই সব  
সমালোচনাও কলহিত নটকটির মোট-  
খাটো কিয় নিজে মাথা ঘামালে। হলে  
আসের বেশ শব্দ মৃত্যুর অন্তপ্রকট,  
ভাঙ্গারো সন্নিহিত। আলো হাওয়ার  
মত স্বদেশিভার তার মাথা মহীরুহের  
অগাধ পরিকল্পনা। অচলভ্রম প্রকৃত  
নটকে রবীন্দ্রনাথ যে জীব সংস্কার,  
অথ পুনরাবৃত্তি আর বিকল পথার  
অভ্যাস-সংস্কার কিংবা অনবকার  
ভুলেছেন, তাদের বেশ জন্মের পিছনেও  
সেই একই কিসকলী পরাক্রমতা ফল  
করেছে। দুটি বিষয়ে জয় চেনেও কিছ  
কেশী। প্রথম, এখানে প্রানের স্বাক্ষর  
ধারকে রূপবায় জল বড়লি বধ,  
সবক ভাঙতে তো কলা হচ্ছে।  
তদুপরি একমিকে কলিঙ্গী শাস্ত্র আর  
অকালিক সম্প্রতি অভ্যাস—এই দুয়েব  
অশ্রুত মিলনে একটা সমাজের চিত্রের  
ভিতরে কীভাবে মস্তব্যাজ মজ মজ  
আসে সেটাও শিপিপ্ত সত্যের আকারে  
কটিকে তোলা হয়েছে। দ্বিতীয় কথা  
এই, একটা দুমিকে পড় খাজক  
ভাগতে হলে চাই নারীসমাজের সার্বিক  
মতি। চিন্তার নতুন নম, নতুন হল  
রবীন্দ্রনাথ যে ভাঙতে সেই কিসকাকে  
ওঠ করেছে, নটককার হিসেবে তাকে  
তাকে লাগিয়েছেন। তাল স্বাক্ষরের স্রোত  
বন্দন স্বপ্নবাস্তবাত ধরনের সংহাসনে  
থল রাজকীয় অবজামিত্র প্রায়শ্চিন্দ  
দলপাতে জনক চাইলেন বিদেশের  
কোনও আকেন আছে কিনা, তখন

বিশ্বকুটবল ময়দানে বল নিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন অনেক রথী-  
মহারথী। এঁদের মধ্যে সেরা কে বা কাঁদের নিয়ে বিশ্বদল গড়া  
যেতে পারে, সেই দ্বিত্বিক্ত প্রেমের স্বার্থ উত্তর নিয়ে প্রকাশিত হলো :

## জয়ন্ত দত্তের ফুটবলে বিশ্ব একাদশ ১৫

প্রকাশিত হলো :— পরেশ ভট্টাচার্যের

## মুখার পাতে বিষ ৬.০০

একদিকে প্রেমের হলনা, অন্যদিকে রহস্যের ছায়াপাত—রাজগীরের  
পটভূমিকায় রচিত এক রোমাঞ্চ-মধুর উপন্যাস।

জয়ন্ত দত্ত-র

## ভিক্টোরিয়াস মোহনবাগান দশ টাকা

ভারতীয় ক্রীড়া ইতিহাস সমৃদ্ধ ঐতিহ্যবাহী মোহনবাগান আজো  
অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। ফুটবল-হকি-ক্রিকেট তিনটি  
খেলাতেই আজো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দলের জন্ম মুহূর্ত থেকে আজ  
পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ খেলার বর্ণনা সহ বহু অকথিত  
কাহিনী এবং মনোবান তথ্য ও ছবি সহ প্রকাশিত হলো ক্রীড়া-  
নাগীর বহু আকর্ষিত গ্রন্থ ভিক্টোরিয়াস মোহনবাগান।

ডি. পি-তে বই নিতে হলে অবশ্যই অগ্রিম পাঠাতে হবে।

সাহিত্য প্রকাশ ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রকাশিত হলো

## জেমস হেডলী চেজ খুনীর চোখে ঘুম নেই

(THE GUILTY ARE AFRAID)

লী ক্রোডি সেন্ট রায়ফেল সিটির সবচেয়ে ধনী লোক।  
তিনটে খবরের কাগজ, একটা ফ্যাক্টরী, একটা শিপিং-  
লাইনের মালিক—তাছাড়া শহরের সব বড় বড়  
নাইট ক্লাবে ওর শেয়ার আছে। সে কেন  
সান্ফ্রান্সিস্কোর এক ক্ষুদ্রে গোয়েন্দাকে কাজে  
লাগাতে যাবে? কিন্তু সেই গোয়েন্দা এসেছিল এবং  
কাজ হাতে নেবার অল্প সময়ের মধ্যে খুন হল, কেন?  
লিউ ব্রাউন সেই প্রশ্নের সমাধানের জন্য তৎপর—  
কিন্তু সেই স্বর্ণকেশী রহস্যময় মেয়েটি কে—যে ওর  
পার্টনারকে শেষ জীবন্ত অবস্থায় দেখেছিল? ১৮.০০

পরিবেশক : সাহিত্য মন্দির ৫৭-সি কলেজ স্ট্রীট কলি-৭৩

প্রকাশিত হল

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের

## ইরাণ ভ্রমণ ১৫.০০

প্রত্যক্ষদর্শীর চিত্রাকর্মক বিবরণে জানতে পারা যাবে শাহ-শাসিত  
ইরানের সাংস্কৃতিক জীবনের অস্থিম গ্রন্থাগার, পারস্য ভারত কথা,  
গাজা রাজ্য, তেহরান বিমান পন্থে, ইস্পাহান, উৎসব নগর সিরাজ  
জাহান নেমা বাগ, ইরানের রানী, আসেরনাগ আলকুম দোস্তার  
গান, পারস্যী মাত্রা, হাফেজী, শেখ সাদীর নাখবরা নাক্স-ই-  
কাস্তম, পারস্যের উপকথা, পুতুনানা, নীলনদের বাশীওয়াল,  
রাজধানী তেহরান।

রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তীর

## বিষ্ণু পুরাণ ১৪.০০

প্রাচীন পুরাণের গভীর রস অক্ষুণ্ণ রেখে লেখক বিষ্ণুপুরাণকে গদ্য  
সারানুবাদে উপস্থিত করেছেন মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে।

সুবোধবাবুর লেখা একখানি অনবদ্য গল্প সংকলন

## গল্প শুধু গল্প ১০.০০

এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ

২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলি : ৭৩

# THE ROLE AND POSITION OF WOMEN



## THE ECONOMIC TIMES

### The Thinking Person's Paper

focuses its attention on this important subject  
with a distinguished list  
of  
Contributors

Anees Jung

Asha Bhende

Dina Vakil

Geeta Rao Gupta

Hazel D'Lima

Indira Jaising

Indira Mahindra

Kamla Suri

Leela Dubey

Malavika H. Karlekar

Maitreyi Krishnaraj

Mira Savara

Mala Thapar

Meenakshi Apte

Purnima Mane

Rebecca Kostka

Suma Chitnis

vatsala Narain

Vinita Srivastava

## THE ECONOMIC TIMES

India's largest circulated economic daily.

Simultaneously published from Bombay Delhi Calcutta

Sunday magazine issues of  
August 17 and 24, 1980  
Order your copies now






**TEEPOL**  
B 300  
LIQUID DETERGENT

Manufactured by  
**NATIONAL ORGANIC CHEMICAL  
INDUSTRIES LTD. Bombay 400 021**

Bottles: 500 gms when packed.  
TEEPOL™ is a Shell Trade Mark.

**বহুবিধ উপযোগী লিকুইড ডিটারজেন্ট**

[illegible]

বিজ্ঞান-সাহিত্য :  
 জাতিসংঘ অর্থনৈতিক কমিশন  
 ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লিগেট

CHAITRA-NOC-108 A BEN

 **ইউনাইটেড নিউজিট**  
সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত  
বকসে ১০০০২১

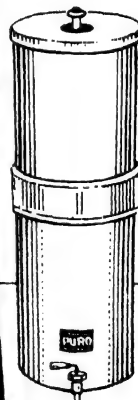
CHAITRA.NOC.108 A BEN

মাকের একটি বৃহৎ চরিত্র  
সংগঠনশক্তির চরিত্র। তিনি রাজ-  
পুত্রের সখা এবং হুম্মাসহচর। সর্বদা  
পাশপ্রদীপের আলোয়। কিছু রাজ-  
পুত্রের তথা শাসিতদের প্রবল  
ব্যক্তিদের আড়ালে পড়ে যাবার  
আশঙ্কা তার স্বাক্ষর। এই লক্ষ্য  
চারিটে উঠে সহজ ভাষায় আনিয়  
করে গেছেন আলোকময় ঘোষ।  
রুইউনের সাহেব (শমীক ঘোষ),  
ইস্কাফের সোলাম (সাগরবের ঘোষ),  
মহলা (বিশ্ববিজয় রায়)—এই বিচিত্র  
ডিনেটি চরিত্র নিয়ে রবীন্দ্রনাথ মজার  
খেলা খেলেছেন। এরাই বস্তুত রাজ-  
সভার প্রধান তিন রাজপুরুষ। সাহেব  
তার যৌবনদীপ্তি নিয়ে চলে গেল  
ভাসের দেশে নবীনের প্রতিষ্ঠাযজ্ঞে  
প্রেমের প্রথম পুরুষ হতে। ইস্কাফের  
সোলাম, যিনি তলসম্মীপদ্রদীপের  
কটর সম্পাদক এবং রক্তশলিতার  
প্রতীক মহলা গঞ্জিত প্রায় শেষ পর্যন্ত  
বিরোধিতা করে গেছেন কবীচরিত্র-  
গায়ার বিরুদ্ধে। রুইউনের সাহেবের  
চিহ্নময় শমীক আত্মপ হতে কিছু

সূচনাপ্তা বসুর হরতণী যেমন  
দুর্ভিক্ষনন্দন, তেমন তার নাচ আর  
আভিনয় ভিত্তিগ্রাহী। তার কথনভণী  
অজন্ত অপ্রতিভ। সারনী টেক নী  
ইক্ষাকপুত্র, সূচরতা ধারণ টেক নী  
শ্রেয়সী বসুর চিড়েতনী, আশ্রয়ী  
চৌধুরীর মহালানী সুন্দর চরিত্রাণক  
বালগেবর অংগ যে যেমন পেয়ে ছন  
সংলোভন। এ বধূপার আভিনয়ের

100

**প্ৰিউৰো**  
ফিলটাৰ ক্যাণ্ডল যুক্ত  
**প্ৰিউৰো ফিলটাৰ**



আপনাকে টাইফয়েড,  
কলেরা, ডাউন্স,  
প্রাণাশয় প্রভৃতি  
সকলপ্রকার জন্মবাহিত  
ব্যাধির হাত থেকে সর্বদা  
রক্ষা করবে।

ফোন : ২৬-৫৪১০ ও ২৬-০৯৪০



PHASA/DST-2:B:90



উৎকর্ষ দেখানো অনকটাই নিয়তি-  
নির্ভর। ততসের রাজকুমারীদের  
ভূমিকায় বিপাশা বসু, অননা রায়,  
সুহিতা ভট্টাচার্য ও মানানসই অভিনয়  
করেছেন।

নটকের মনোরম আবহ রচনার  
গান তার মান রেখেছে। সবাই ভালো  
গেয়েছেন। তবে তার মধ্যে দীপ্তি  
চট্টোপাধ্যায় তাঁর সতেজ সুরেলা কণ্ঠ

এ সম্পর্ক উভয়দিকে একটির পর একটি  
সুন্দর গান গেয়ে ফল ভরিয়ে  
দিয়েছেন। 'কেন নয়ন' গানটি সহজে  
ভোলার নয়। পূর্ববী চট্টোপাধ্যায়,  
উম্মনা দত্ত, প্রভাতকুমার পাণ্ডা, বিজয়  
কুমার সিংহ ও অশোক গণেশোপাধ্যায়  
একক ও মিলিতভাবে মনোগ্রাহী। মঞ্চ  
ও সাজসজ্জায় ইলা ঘোষ, সুধম্বর মিত্র,  
সুখেন গণেশোপাধ্যায় এবং বিবি রায়  
নজর দিয়েছেন প্রত্যাশিত উৎকর্ষের  
সঙ্গে সেই প্রথমদিককার সজ্জার একটা  
রাখী বন্ধন ঘটিয়ে দিতে। সংগতকার  
হিসাবে পূলক দত্ত ও শ্রীপাদভল।  
সহযোগিতায় পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়  
দর্পিত পালনেরও অতিরিক্ত কাজ  
করেছেন।

দুটি বক্তব্য পরিশেষে রাখতে চাই।  
মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা ও বালানসে  
ত্রুটি ছিল। ছাড়া-পাজার গান ভেসে  
এসেছে পিছন থেকে গানের দলের  
জোরালো মাইকে। আর রাজপুত্রের  
গান প্রথম করেকটি সারির খেঁড়া  
ভিঙিয়ে আর যেতে পারছিল না,  
মিলিয়ে যাচ্ছিল বলে সন্দেহ করি।  
কিছু খোলানো মাইক থাকলে এটা  
ঘটত না। দ্বিতীয়ত, প্রথম রাজসভার  
তাসবংশীয় মহারথারী যখন ঢুকছেন,  
তখন বাজনাটা আর একটু গুরুগম্ভীর  
হলে মানাত ভালো। রাজারানী সভা-  
সদস্যের নিয়ে যখন মঞ্চে আসছেন,  
তখন যেন প্রোত্যাদেরও আসন ছেড়ে  
উঠে দাঁড়িয়ে ইচ্ছে জাগে।  
অরুণ বাগচী ফটো : অলক মিত্র

সদ্য প্রকাশিত :-

সজীব চট্টোপাধ্যায়

## অ্যাকোয়ারিয়াম ১০১

অত্যন্ত সরস, নিপুণ আবেগে ডরপুর একগুচ্ছ গল্প।  
সঙ্গে অসাধারণ কিছু চুটকি। চণ্ডী লাহিড়ীর ব্যঙ্গচিত্রে  
সমৃদ্ধ। সজীব চট্টোপাধ্যায়ের কলমের সঙ্গে যাদের  
পরিচয় আছে তাঁরা এই রচনাসম্ভারে অবশ্যই খুশি  
হবেন। এই সংকলনে এমন সব রচনা স্থান পেয়েছে  
যার স্বাদ বিভিন্ন মশলায় রান্না সুস্বাদু ব্যঞ্জনের মত।

চুপতিরঞ্জন দাস

## দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন ১২১

সুজ্যোতি মল্লিক উপহার :-

চুপতিরঞ্জন দাস

## তীর্থপথিক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ১৫১

মহাপ্রভুর জীবনকে ব্যাখ্যা করতে হলে, জীবনী বা  
বাণীই যথেষ্ট নয়। যিনি জীবনের রূহৎ অংশ শুধু  
ভ্রমণ এবং পদযাত্রায় অতিবাহিত করেছেন, তার মূল  
তথ্য আজও অপ্রকাশিত। এই গ্রন্থ অত্যন্ত সঠিকভাবেই  
সে অভাব পূরণ করল।

শরৎ পাবলিশিং হাউস

১৮এ টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৬

## এখন পাচ্ছেন এমন এক শ্যাম্পুযুক্ত হেয়ার ডাই যা প্রতিবারেই চুল ধোয়ার সাথে ফিকে হয়ে যায় না।

নতুন নেচুরীল : শ্যাম্পুযুক্ত এক অসাধারণ হেয়ার ডাই যা চুলের ভেতরে আপনা  
থেকেই ছড়িয়ে পড়ে, আর সেইসঙ্গে আরও গুণ : চুল ধোয়ার সাথে  
নেচুরীনের রঙ ফিকে হয়ে যায় না। আবার দেখুন, এটি লাগানো কত সহজ—  
চুলে সামান্য ঘষলেই এর ফেনা খুব তাড়াতাড়ি সাঁরা চুলে সমানভাবে ছড়িয়ে  
পড়ে—যার ফলে আপনার চুলে দেখা দেয় তারুণ্যের দীপ্তি—আর আপনার  
সাম্প্রদেয়তা পুনাক্রমে এটি জ্বলতেও পারেন না।

নেচুরীনে কোনো কঠিন জাতের কেমিক্যাল না থাকার দরুন আপনার চুল মোলায়েম  
আর গোছালো থাকে। আর এর মিলে সৌরভ আপনার দাঁতুল ভালো লাগবে।  
সাত্ত্বিক ধরনের রসায়ন ও ডার্ক ব্রাউন রঙে মহিলা ও পুরুষ, উভয়ের জন্যই পাবেন।

**নতুন**  
**নেচুরীল**  
শ্যাম্পুযুক্ত হেয়ার ডাই

নতুন নেচুরীল অন্যান্য শ্যাম্পুযুক্ত  
পুরাতো হেয়ার ডাইকে হার মানায়।



সে. কে. হেলেন কার্টিস-এর এক উৎকর্ষ উপস্থাপন।





আবু সলীম আইয়ুব-এর

## পথের শেষ কোথায়

'দেশ' পত্রিকায় (১৩৮৩) প্রকাশিত রচনাগুলি হাড়া

আরও বেশ কিছু প্রবন্ধ এ-বইয়ের অন্তর্গত।

যা সংশোধিত ও পরিমার্জিত। দাম ১৪/-

আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ ১২/- পাছজনের সখা ১২/-

## গোপালচন্দ্র রায়ের

সদ্য প্রকাশিত আর একটি মূল্যবান গ্রন্থ

# রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথের অতি বিখ্যাত গ্রন্থ ছিন্নপত্রাবলীর বিবিধ তথ্য, ব্যক্তি ও ঘটনা ঐ গ্রন্থ-সম্পাদনায় সম্পাদকের তুল-ক্রটি প্রকৃতি নানা বিষয় নিয়ে মনোজ্ঞ ও পাতিতাপূর্ণ আলোচনা। এই বইয়ের আরও বড় আকর্ষণ সাজাদপুরের জমিদারি সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের এক অপ্রকাশিত অর্ডার বুক বা হুকুমনামা বইয়ের কৌতূহলোদ্দীপক অসংখ্য তথ্যাবলী।

দাম-৮/-

গোপালচন্দ্র রায়-এর আর এক গ্রন্থ

## অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র

সুসম্পাদিত বঙ্কিমচন্দ্রের এই পত্র-সংকলন গ্রন্থটি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে বহু অজানা তথ্য প্রদর্শন। দাম-২৫-০০

# অমিতাভ চৌধুরী'র সূর্যাস্তের আগে রবীন্দ্রনাথ

শম্ভু ঘোষ-এর

## ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ

নতুন এই সংস্করণে বেশ-কিছু বদল হয়েছে যা আগের সংস্করণে ছিল না। নতুন তথ্যও সংযোজন হয়েছে এ বইয়ে। দাম ১২ টাকা।

ড. সুশীলকুমার গুপ্তার

## নজরুল চরিতমানস ২৬/-



দেশ পাবলিশিং C/O দেবু শঙ্কর

১৩ বঙ্কিম চ্যাট্টো স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩, ফোন : ৩৪ ৫০৩৫

## প্রমুদ শিল্পী পরিচিতি

### বিকাশ ভট্টাচার্য (১৯৪০-)

কপালে কাটা দাদা কিন্তু কলার সঙ্গের বিকাশকে দেখলে সেটা চোখে পড়ে না। কিছুদিন আগে পড়ে গিয়ে হাড় ভেঙ্গে লাঠি নিয়ে চলতে হয়েছিল। সেই সময় লাঠি হাতে চলা-ফেরার সঙ্গে মানানসই একটা ফরাসী কালার বাড়ি রেখেছিলো। সব মিলিয়ে নারকের মতো লাগেজ।

বিকাশ সব ভারতীয় ক্ষেত্রে খুবই জনপ্রিয় শিল্পী। ছবি প্রচুর বঁচী হয়। ব্যাতির একটা কিছুনা হল, ছবির গুরুত্ব নিয়ে বিতর্কের ঝড় ওঠে। আমি সে প্রশ্নে যাব না। সাধারণভাবে তাকে 'সুপারিমালিস্ট' (সুপারাস্টক-বাদী) কলা হয়। প্রশ্ন হল : তিনি কি সত্যিই তাই? সুপারাস্টকবাদ একটি শিল্পকলা এবং সাহিত্যের আন্দোলন। ১ম মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালে ফরাসী দেশে এর উৎপত্তি। অভিজ্ঞতার অধোভিত্তিক উপস্থাপনা করে মানুষকে লক মিতে চাওয়াই এর প্রধান লক্ষ্য। এইসব লেখক শিল্পীদের গুপার জয়ের মননভ্রমের প্রভাব, বিশেষত অবচেতনের ব্যক্তিগত ভয়াল চিত্রকল্পের প্রতি আকর্ষণ খুবই স্পষ্ট। এক হিসাবে দাদাবাদের সম্প্রসারিত রূপ। স্বপ্ন, লালম-ছেড়ে দিয়ে বিকারগ্রস্ত অনুষ্ণ নিজে লেখা বা আঁকার ভাব স্পষ্ট। এছাড়া বজ্রা বিরোধী একটা ব্যাপার ছিল। বিকাশের ছবির মধ্যে সদ্যসত্যব বিষয় আছে অবশ্য। অবচেতনা এবং দৃশ্যবাদের জগতের প্রতিবিম্ব আছে। কিন্তু তা এই কলকাতার বাস্তব ফটোপাত-বাসী দৃশ্য, হতভাগ্য রোগজীর্ণ মানুষের ছবি। কখনো অবশ্য বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ নিম্নবিত্ত, বা বিকারগ্রস্ত ধনীও এসেছে। বিকাশ রেনে মাত্রটি ডাল, বা ডি চিরিকোর মতই কতকটা বাস্তববাদী প্রথাপ্রকরণে আঁকার সিম্বলিস্ট। বিকাশের ছবিতে ওলন্দাজ ইম্প্রেশন কলমের প্রধাসিদ্ধ রীতি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। এবং অবশ্য ট্রিমাস্ট্রিকতা। অধুনা মানুষের সমগ্র সর্বনাশ এবং উন্নয়ন দশার প্রতীক রূপকল্প খুঁজতে গেলে একজন প্রধাসিদ্ধ বাস্তব দিকপন পৌঁছবেন সদ্যসত্যবতার।

বিকাশের ছবির বহু অনুষ্ণ প্রতীচের। যেটা ঘরের জামাকাপড়, চুলছাটা, ডাণ্ডি, পড়ুল পর্বত। মানুষ এবং মেকেন্দ্রব' সর্বত্র ভারতীয় পোশাক আসবাবের সঙ্গে যেতাস্থ ঘরের কিছু এসেছে। ঔপনিবেশিকোত্তর সময় নগরিক মানুষের জীবন-যাপন, আবেগ, পোশাক সর্বত্র বেন নিষধারা। এই স্বাধীনপরাভার টানা-পেরডেন এসেছে ছবিতে। সংকটের চেহার আঁকতে গিয়ে আতঙ্কে ভয়ে প্রায় পাগল মানুষগুলোকে তিনি আঁকেছেন। হয়তো রচনা বা নির্মাণ এমন কী রঙ-সম্বন্ধ ভাবনার চেয়ে তাত্ক্ষণিক দাড়া মারায় প্রকট। প্রথম দিকে জগৎ কাল মতো তিনি শহরের বাড়ি ঘর ছাড়া আঁকতেন। আঁকতেন ফ্ল্যাটে দরজা জানালা। তারপর আকাশে ড.সমান ভরাত মান্দ্র এল। এলেন চৌবাচ্চা

জলে নিমজ্জন বৃষ্টি। মাল্লের পাঠ থেকে সুরস্বন্দরী। শেষে বিগাতী পড়ুল ঘন সজীব হয়ে উঠল। তারপর জমে সকলে কেমন লুইস্ট্রীন হল। বেনিবে আত্মগ করল জীবন। জরা। পেরে বসল। কেউ বেন নৃশ্ব নয়। তীক্ষ্ণভাবে ছবিতে বসেছেন একথা। প্রতীকরণ যে উচ্চম্যাবিস্তারের স্তোত্ররটকে কোঁপার করে দিচ্ছে এটা দেখেছেন বারবার। অ-সুখের জগৎ বেন।

ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের স্নাতক (১৯৬০) সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। কলকাতা, দিল্লি, বোম্বাই মিলিয়ে প্রদর্শনীর সংখ্যা দশ। ভারতের সর্বত্র এবং বিদেশে যাত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। সোসাইটি অব কন্টম্পোরারীর সদস্য। দ্যার লালিতকলার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন (৭১, ৭২)। আকাশী ফাইন আর্টস পুরস্কার (৬২); বিজলা আকাশী পুরস্কার (৭২)। ইন্টিস, শিপিং কংগ্রেসন, টি বোর্ডের



আইনানে আঁকেন। নরায়ান্সর গলিত কলার সাধারণ পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় কর্মসমিতির সদস্য।

প্রমুদচিত ("আকাশ্যার বেলন" তৈলচিত্র) নীচের দিকে কালো কালো নিষ্কল মতের ঝিলে নাকলে কোঁ উকছে। আকাশ্যার হাত সেটোক বরা জন্য বাড়ির দিচ্ছে কে বেন, হয়ে সবাই।

ছবিতে মূল বিষয়টি পড়ে মধ্যস্থলে থাকে। সাধারণভাবে বর্ণকণ করেন স্তরের স্তরে। তৈলঘোড় ক উপস্থাপন করেন। খুব বেশি কাল ব্যক্য পক্ষপাতী নন। আশোষায়ের খেলা এ কস্তৃপঞ্জের যথার্থ উপস্থাপনের দি ষ্টোক। রচনার জ্যামিতি অনেক সরল। চমক শূন্য ঘটনায়। মাইক হা নিয়ে যে টিভির স্ক্রীনে গাইছে অম্ম। বা টিউব থেকে রঙের ন্যাড় কলছে একটি শিল্পী। বা মৃদুহীন দে স্বীকৃতি আলর কলে অসংখ্য এ' পেনসিল, কালিকলম, প্যাংস্টেল-সং পরিষ্কার হাত। তার ছবির য আতঙ্কের ছায়াঙ্কন উপত্যকা।

যখন করা বা নিয়ন্ত্রণ জাগানো ব্যক্তি যদি চান...

# ম্যাক্স ফ্যাক্টর-এর বয়েছে মানবসমূহ ট্যাক আর সাবান

দ্বিমোতক  
মনমোহনো মনোমোহন  
সাধা অসে জাগায় আবেশ  
সমোহন করা সৌভ

ইলেকট্রিক  
কুলের সৌভ করা,  
দিল-ভর মন মোহনো  
নিয়ন্ত্রণ জাগানো সুভাস



ম্যাক্স ফ্যাক্টর-এর অনিন্দ্যসুন্দর সম্ভাবের তরঙ্গ থেকে - অত



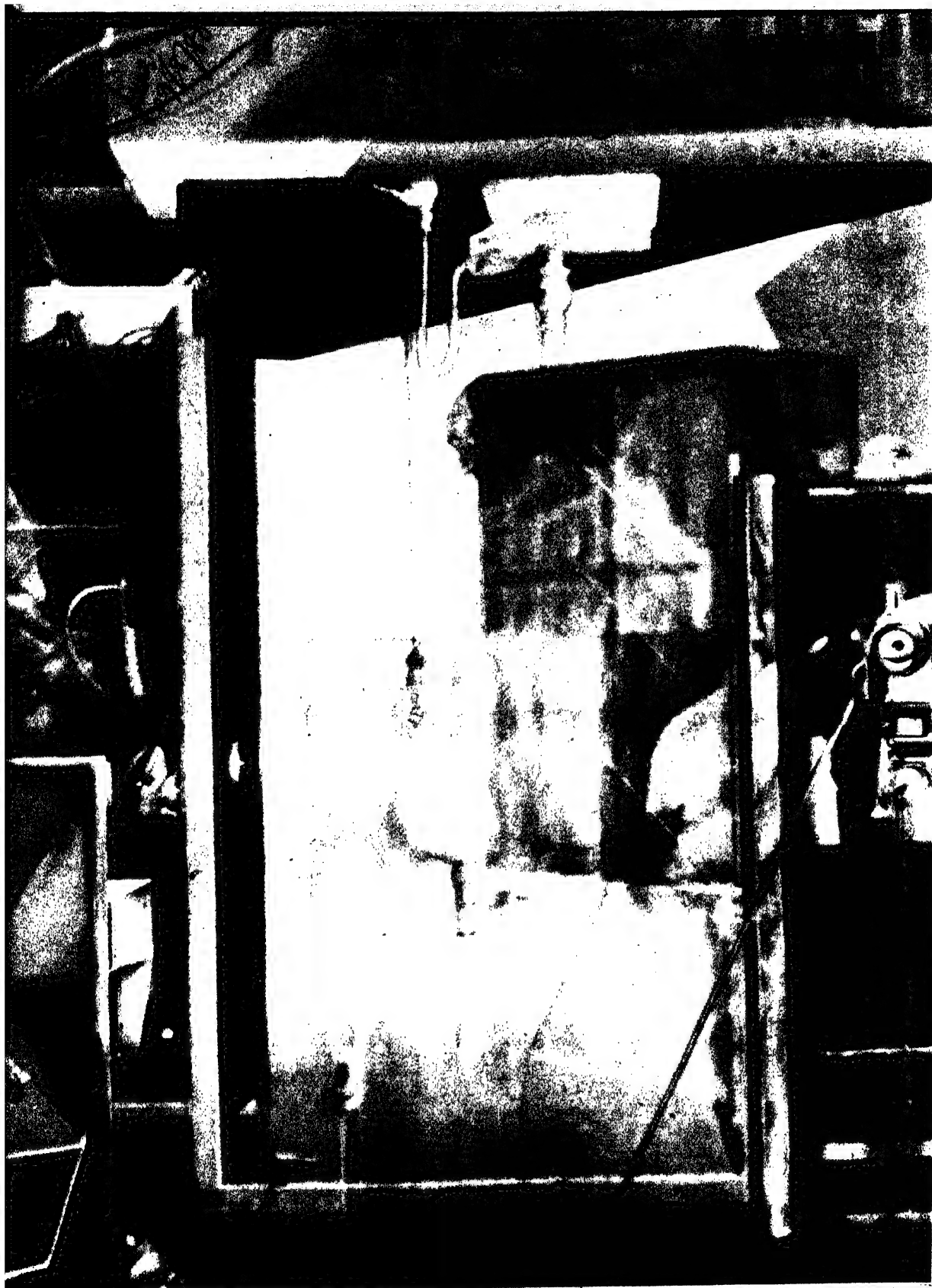


# ফ্যাশনে বিজয়ী ফ্যাব্রিক্স

নতুন দশকে  
ফ্যাশনের বিজয় বিদর্শন

ড্রেস ফ্যাব্রিক্স, স্ফাটিংস, শাটিংস ও শাড়ী।  
আসল পলিয়েস্টারে, কটন ও রেগুস।

ড মোরারজী গোকুলদাস স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং কোম্পানী লিমিটেড,  
বম্বে-৪০০০১২।



# অতুল

## লিটলস্-এর ফীডিং বটল, যা ডাঙেও না ফাটেও না!



### সবদিক দিয়ে এটি একেবারে অতুলনীয়!

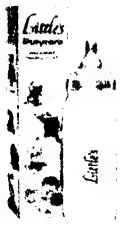
**অতুলনীয় কারণ এ থেকে  
একেবারেই চুইয়ে পড়ে না।**

দুনিয়ার সর্বোত্তম প্রযুক্তি দিয়ে  
তৈরী বোলেই এর সব দিকের চাপ  
একেবারে সঠিকভাবে বসে যায়।  
মামের মোড়গুলি গোলাকান আর  
সেজনো পরিষ্কার করা খুবই সহজ। এমন কি  
বোতলটির ঘল সহজে পরিষ্কার করা যায়।

আপনার শিশুর জন্য সেরা।

"লিটলস্-এর ফীডিং বটল" অতুলনীয় কারণেই  
লিটলস্-এর ফীডিং বটল অতুলনীয় একটি বটল।  
"অতুলনীয় ফীডিং বটল" নীচে দেওয়া আছে।

ওটিকে চাপসি হতে বা দুমড়ে যেতে দেয় না।  
উত্তম ববার দিয়ে তৈরী আর খুব টেকসই আর  
প্রায় ২০০ বার "স্টেরাইজ" করা যেতে পারে।



**অতুলনীয় কারণ এটি ভাঙে না।**

লিটলস্ হ'ল বিশেষভাবে অতুলনীয় করা পলিকার্বোনেট  
দিয়ে তৈরী—যা দিয়ে সারা দুনিয়ায় না ভাঙে এমন ফীডিং  
বটল তৈরী হয়। এটি একেবারেই জোড়বিহীন  
আর বেশ পাতলাপোক। ভাঙে না। চিড় খায় না—  
বাচ্চাদের জন্যে খুব সুবিধাজনক।

**অতুলনীয় কারণ এটি ফটিক-স্বচ্ছ।**

এর ভলমলে খুঁজ পুশ, শুষু দেখতেই অপবুপ  
সুন্দর নয়, এটি এমনিই সুন্দর।

**অতুলনীয় কারণ এতে একসঙ্গে**

**তিনটি খরিদ হয়।**

লিটলস্ এর "স্টীজার ক্যাপ" সাধারণ  
ফীডিং বটল থেকে অনেক ভাল।

এরপর বসে যাওয়ায় বোতল  
কোনদুপুরে "স্টীপার", যা  
চীৎকারে একেবারে ফিট করে।

শক্ত আহাৰ পাতলা করে  
খাওয়ানোর জন্যেও বটল-এ  
লাগানো যেতে পারে।



## লিটলস্ পলিকার্ব ফীডিং বটল

### সারা দুনিয়ায় সর্বোত্তমের মতই উত্তম।

দেখাচ্ছে ততুত... সজীবতার ততুত রূপ



বিনাকা **টপ**

সজীবতার জরপূর ততুত প্যাকে

সজীবতা অনুভব করুন। প্রমাণ দেখে নিন।

ছোট্ট পরীক্ষাটি করুনঃ



একটু কাঠ কয়লা গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন জলের মধ্যে। তারপর সামান্য একটু বিনাকা টপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে তার এক কোঁটা ফেনুন এর মাঝখানে। এবার দেখুন, বিনাকা টপ কেমন চট করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে ময়লা দূর করে দিয়ে জলের মাঝখানটী করে তুলল বিসুদ্ধে নিখুঁত!

বিনাকা টপ আপনার মুখের মধ্যেও ভবত এই ভাবে ক্রিয়া চালায়। এর ছড়িয়ে পড়া বিশেষ উপাদান - মুখের ভেতরের অতিটী কোনে নিমেখে ছড়িয়ে পড়ে দাঁতের ক্ষয়কারী বীজাণু নাশ করে এবং নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করে এনে দেয় এমনই সজীবতা যা আপনি অনুভব করতে পারেন।

বিনাকা **টপ**

টুথপেস্ট-মুখের ভেতরকে সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষা করে।

সিলা-গামগী

CBT-1-000-BN

দ্বিতীয় খণ্ড  
প্রকাশিত হল



শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

**হাওয়া  
গাড়ি**

এই গ্রন্থের  
প্রথম খণ্ডের  
প্রথম সংস্করণ  
নিঃশেষিত

প্রথম খণ্ড ২৫, দ্বিতীয় খণ্ড ২৫.

মহাবয়সে পৌঁছে দেখা হল—একদিন তাদের সঙ্গে  
মিশেছি—তার আমার কেউ নয়। আমিও তাঁদের কেউ  
নই। মানুষ বারবার ভেঙে পড়েও বারবার উঠে দাঁড়ায়  
কিছু বানাবে বলে। বানানোর আনন্দে মনস্তত্ত্ব মানুষ  
তাঁচি কখনো শয়তান, কখনো স্বর্গদেব—কখনো চন্দ্র

তাই তার সুদীর্ঘ রূপদী উপন্যাস হাওয়া গাড়ির  
দিলোপ বস্তু খাদ্য থেকে মোটর গাড়ি—কেটার পর  
একটা আত্মঘাতী অভিযানে অবগতন করে—দিলোপের  
বিশ্বাস : মানুষকে নিশ্চিত করলেও স্মৃতি মোটা যায়  
না। কিন্তু তার ছেলে রবি মানুষের ভালোর জন্যে মানুষ  
খতমেও পিছু পড়ে নয়।

এই লেখকের আরও দু'খানি উপন্যাস  
অজুনের অজাতবাস ১৫, ঈশ্বরীতলার রূপোকা ১৫.

—সম্রাট প্রকাশিত—

বিমল মিত্রের

**আর এক যুধিষ্ঠির** ১৫.

আশাপূর্ণা দেবীর

**বালির নীচে চেটে** ১০.

নারায়ণ সান্যালের

সমরেশ মজুমদারের

রহস্য উপন্যাস

বাংলা প্রথম মৌলিক খিলার

**উলের কাঁটা** ১০.

**বন্দী নিবাস** ১০.

সুমথনাথ ঘোষের

**এক নাটক অনেক দৃশ্য** ১২.৫০

দুটি গবেষণামূলক গ্রন্থ

শুভেন্দ্রকুমার মিত্র সম্পাদিত  
শিক্ষার্থী ও শিক্ষিত সকলের প্রয়োজন

**বৈজ্ঞানিক অভিধান**

পঁচিশ টাকা

অহিভূষণ ভট্টাচার্যের

**TRILINGUAL  
DICTIONARY**

ইংরাজী

বাংলা • হিন্দী

ত্রিশ টাকা

॥ আনন্দ সংবাদ ॥

তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

**কিশোরসাহিত্য-সমগ্র**



কিশোরদের জন্যে  
লিখিত লেখকের  
সমগ্র রচনাগুলি  
তিন বা চার  
খণ্ডে প্রকাশিত  
হচ্ছে। প্রতিখণ্ড  
আনুমানিক ৩০০-  
৩৫০ পৃষ্ঠা,  
প্রাস্টিক জ্যাকেটে  
মোড়া, ছোটদের  
উপহার দেবার মত  
এখনই সংগ্রহ  
করুন।

১ম খণ্ড ১৫.০০  
২য় খণ্ড ১২.৫০  
৩য় খণ্ড ১৪.০০

যে সকল সহৃদয় ক্রেতা ৩টি খণ্ড একসঙ্গে  
সংগ্রহ করবেন তাঁরা ৪১.৫০ টাকার বই  
৩৫. টাকায় পাবেন।



মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ  
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট-৭৩/৮৬/১, মহাশা গার্লি রোড-৯  
(ফার্মিসন রোড-কলেজ স্ট্রীট সংযোগস্থল)



## চিঠিপত্র

### স্বাধীনতা হীনতার

ভরুণ দত্তের প্রবন্ধটি (এই জুলাই, দেশ) মনকে নাড়া দেয়। নারী স্বাধীনতার নান্দিক নিয়ে আলোচনা করলেও নারীসত্তার প্রকাশের মধ্যেই যে তার স্বাধীনতা হারানোর খাঁজ লুকিয়ে থাকে সে কথা এভাবে বোধ হয় মেয়েরা নিজেরাও ভাবে না। তাই যে নারী ব্যাপক অর্থে স্বাধীনতা সেও তার emotional conflict-এর কাছে পরাস্ত পরাধীন। প্রতি-নিরত 'মুখ' আর 'মুখোশের' দ্বন্দ্ব তাকে ক্লান্ত করে তোলে। মনো-মোহিনী, মনতোষণী রূপ কি তার কামা না জগৎকে নিজের জোরে ঘাটাই করে নেওয়াতেই সত্যিকারের কৃষ্টি এ দোটারায় পড়ে অনেক সময় তার ভাবনার আর কাজের সঙ্গতিও থাকে না।

প্রকৃতি বধন তার বিপক্ষে তখন শব্দ পুরুষের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে তথাকথিত নারী স্বাধীনতার জিগির তোলার স্বার্থকতাই বা কোথায়। নিজেকে বঞ্চে নিয়ে তবেই তো বোঝাতে হবে যে পুরুষের পছন্দ বা অত্যাধিক মনোযোগ অনেক সময় মেয়েদের কাছে 'দম আটকানার' মতন কটকট। পুরুষ নারীর মনকে বঞ্চে তার ইমোসানের মর্যাদা সঠিকভাবে না দিতে পারলে নারীর এই অক্ষুণ্ণ

মিটেবে না। কিন্তু নিজেকে পুরোপুরি প্রকাশ করার সাহস, সংগতি বা মানসিক প্রস্তুতি কখন মেয়ের থাকে? সবিভা গদহ চ'চুড়া

২ ২ ২

ভরুণ দত্তের প্রবন্ধ "স্বাধীনতা হীনতার" পড়ে ভালো লাগল। কিন্তু দু-একটি ক্ষেত্রে বোধ হয় একটু বাড়িবাড়ি হয়ে গিয়েছে। যেমন তাঁর প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন: "পনের ষোলো বছরের কালিকা তার শ্বিগুন ক্সসী পরনের বন্ধু হিসেবে নির্ধারিত হলে সমাজ আলো জ্বালিয়ে শাখি বাজায়, শুনী, উৎসব করে এবং ওই নায়ক নায়িকার বয়স উলটিয়ে দেওয়া মত-উৎসব নিবে ভূমিকম্প হতে থাকে।" ভরুণ-বাবুকে সর্দিনয়ে বলি, এই অংশটি পড়তে বা শুনতে খুবই ভালো লাগে এবং কানিকণ্ড। কিন্তু পুরোপুরি সত্য কী? আমার নিজেরই চোখে দেখা এবং শোনা কয়েকটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি যে জল্প বয়স্ক কিশোরের (পনের বছরের ছেলে নিশ্চয়ই বালক নয়) সংগ তার শ্বিগুন বয়সের নারীর বন্ধুত্ব একেবারে অপ্রতুল নয়। এমন কী একটি কিশোর এবং একজন পূর্ণ বয়স্ক নারীর মধ্যে বিবাহও আমার চোখে দেখা। এবং হয়ত আমার মত আরো অনেকের। সেক্ষেত্রে কেউ কেউ অড়ালে মুখটিপে হাসলেও তাদের সামাজিক সহযোগিতা

## ১৮-শ খণ্ড প্রকাশিত হলো

এই দুল্লভ গ্রন্থের গ্রাহক হউন।

মহামহোপাধ্যায়-মহাকবি-ভারতচাঁদ্য

হরিন্দাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য-এর

## মহাভারতম্

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণায়ন বেনবাস-এর

মূল শ্লোক

দর্শনাচার্য্য শ্রীমন্তীলকণ্ঠের

টীকা।

টীকা, পাঠান্তর, প্রতি পর্বের ভূমিকা, ভারত-যুদ্ধের

কালনির্ণয়, বৃহৎ সূচীপত্র এবং গাথো বঙ্গানুবাদ

রয়াল সাইজের এই শোভন সংস্করণ রেকর্ডনে বাঁধাই ও প্রচ্ছদে সোনার জলে নাম লেখা।

ধার্ম্য অগ্রিম ২৫.০০ টাকায় জমা দিয়ে গ্রাহক হবেন, তাঁরা

প্রতি খণ্ড ২৭.০০ টাকায় পাবেন। কলকাতার বাইরের

গ্রাহকদের বই পাঠায়ার রেজিস্ট্রি ডাক খরচ আলাদা।

আনুমানিক ৪০ খণ্ডে প্রকাশিত হবে।

## ৫ম খণ্ড প্রকাশিত হলো

গঙ্গেশচন্দ্র চক্রবর্তী-র

## বাংলার সাধক

তান্ত্রিক, যোগী, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্নপন্থী সাধকদের জীবনী। বিভিন্ন ভঙ্গীর চরিত্রগুলি একত্র সম্মিলিত হওয়ায় পাঠকদের কাছে বৈচিত্র্যহীন মনে হবে না। ১০.০০

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও লক্ষপ্রতিষ্ঠা অধ্যাপক

ডঃ জয়গুরু গোস্বামী-র

গবেষণালব্ধ আকরগ্রন্থ

## চারণকবি মুকুন্দদাস

(রচনা সম্ভার সহ)

বিশ্ববাণী প্রকাশনী

৭২/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড ৥ কলকাতা ৯

## হীরেন্দ্রনাথ দত্ত রচনাবলী

হাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত 'হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ফাউন্ডেশন' দার্শনিকপ্রবর হীরেন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে তাঁর সমগ্র রচনাবলী সংকলন ও সম্পাদন করে কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন।

● 'প্রেমধর্ম' ও 'রাসলীলা' এই দুটি গ্রন্থ নিয়ে রচনাবলীর প্রথম খণ্ডটি ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা, ৪৬৮ পৃষ্ঠা, মূল্য বত্রিশ টাকা।

● 'বেদান্ত ও বিজ্ঞান' এবং 'জগদন্তরুর আবির্ভাব' দ্বিতীয় খণ্ডে সম্মিলিত। শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

পরিবেশক

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৯

জিজ্ঞাসা

১এ কলেজ রো কলকাতা-৯

এসং ১৩৩এ রাসবিহারি এডেন্স

কলকাতা-৯৯

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং

৫৪/৩ কলেজ স্ট্রীট

কলকাতা-৭৩

# আমি তেজীর উত্তরানে মঙ্গী ছিলাম জগদরাম তলোয়ার



এই গ্রন্থ কোনো মামুলী গ্রন্থ নয়, এর লেখক নেতাজীর ভারত ত্যাগের একমাত্র সঙ্গী—দেশভক্ত পাখ তুন পরিবারের সন্তান—জগদরাম তলোয়ার। গ্রন্থের প্রথম পর্বে তলোয়ার পরিবারের দেশপ্রেমমূলক কর্মধারার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্বে আছে মূল বিষয়বস্তু, অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের কথা। গ্রন্থটিতে এমন সব ঘটনার উপর আলোকপাত করা হয়েছে যা জনসাধারণের কাছে এতকাল ছিল একেবারেই অজাত। ২০'০০

বৃটিশ রাজরোষে অভিযুক্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস  
চলচ্চিত্র মেনে

## মহারাজ নন্দকুমার ৮০ বছর পরে প্রকাশিত হন

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট। ঐ তারিখেই একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রায় সত্তর বছর বয়সে আইনের ছলে মহারাজ নন্দকুমারকে ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। ঐতিহাসিক হেনরি বেডারিজ এই ঘটনাকে 'জুডিসিয়াল মার্ডার' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল বর্তমান রেস কোর্সের কাছে—কুলিবাজারের মোড়ে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ থেকে আশি বছর আগে চলচ্চিত্র সেন রচনা করেছিলেন এই বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস। তদানীন্তন বৃটিশ সরকার সহ্য করতে পারেন নি অসাধারণ এই গ্রন্থটিকে—তাই প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে রাজরোষে দগ্ধিত। অথচ বাঙালী পাঠকসমাজ উপেক্ষা করেছিলেন এই রাজরোষ—মুদ্রণের পর মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল 'মহারাজ নন্দকুমার'। ৩০'০০

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের  
উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ ২৫  
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের  
স্বর্গের আগের স্টেশন ২০

নবপত্র প্রকাশন

৮ পটুয়াটোলা লেন, কলি-৯

থেকে বাস্তব করেন। ছবি সম্পন্ন হলে  
একেবারেই মনো কল্পনা।  
শ্যামল কুমার বিশ্বাস  
শ্যামনগর

### পরীক্ষা প্রহসন

গত ২৮শে জুন-এর দেশ  
পত্রিকার গ্রীষ্মকালী শোণ মহাশয়ের উদ্ভা-  
সাময়িক পরীক্ষার প্রহসন নিয়ে লেখা  
গ্রন্থ পড়ে বিশেষ আনন্দ পেরেছি।  
সরকারী কর্মচারী হিসেবে নয়, অভিজ্ঞ-  
ভাবক হিসেবে আমি উচ্চসাময়িক  
ক্যাডিস্টের কাছ থেকে কয়েকটি  
প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই। আমরা  
সকলেই জানি যে, পশ্চিম কলকাতার  
বিভিন্ন অংশে ইরোজী বিশ্বাসী পর  
পুরুষের জেনে অনেক ছাত্র-ছাত্রী  
পরীক্ষা দিয়েছে। কেবল কলকাতা  
নয়, প্রদেশের বহু জায়গা থেকেই  
একই অভ্যাস এসেছে। বিভিন্ন পর-  
পরীক্ষা এ ব্যাপারে বহু অভিভাবক ও  
ছাত্রছাত্রীর চিঠিপত্র ছাপিয়েছে। অথচ  
মজার ব্যাপার হলো, সংসদ কক্ষপক্ষ  
এসব অভ্যাস সম্পর্কে সত্য জেনেও  
নানা অজুহাতে তা মিথ্যা প্রমাণিত  
করার জন্য ব্যস্ততা দেখাচ্ছেন।

এতদিন আমরা জেনে এসেছি  
যে, দিল্লীর একটি ছাপাখানাতেই হত  
গোলমাল হয়েছে। একথা বহু লোকই  
জানেন না যে, কীটিনগরের পার্ল  
অফিসট প্রেস-এ কেবলমাত্র পদার্থ-  
বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও অংক-র গণ-  
পত্র ছাপা হয়েছিল। তাই যদি হয়

তবে ইরোজীর প্রশ্নপত্র ফাঁস হলো  
কোথায়? কিন্তু সেই বা তা ফাঁস  
হলো? এসব প্রশ্নের জবাব অভিজ্ঞ-  
ভাবক হিসেবে আমরা অবশ্যই চাইতে  
পারি। আমরা যদি একথা জানি যে,  
একটিমাত্র ছাপাখানাকে দোষী করে  
আরও অনেক দোষীকে নির্দোষী  
করানো হচ্ছে তবে কি ভুল ভাববো?

আরেকটা প্রশ্নের জবাবও আমি  
বার করতে পারিনি। এত সরকারী  
ছাপাখানা থাকতে হঠাৎ বেসরকারী  
ছাপাখানায় 'সদর কত' পক্ষ কেন  
গেলেন? সরকারী নিয়মানুযায়ী  
সরকারী স্কুল-কলেজের পরীক্ষার প্রশ্ন  
সরকারী ছাপাখানাতেই ছাপানো হয়।  
সংসদ সরকারী প্রাধান্য অনস্বীকার্য।  
একদিকে তা সরকারী ছাপাখানার অস্তিত্ব  
নেওয়াই স্বাভাবিক ছিল। হঠাৎ সংসদ  
বেসরকারী ছাপাখানার সাথে চুক্তিবদ্ধ  
কেন হলেন? এতে কি কোনও বাস্তব-  
গত বা সমাজগত স্বার্থ ক্ষতি  
আছে?

রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়  
কলকাতা-৩১।

তাল : ধামার

দেশ পত্রিকার ২৮শে জুন  
সংখ্যায় গ্রীষ্মকালী চৌধুরী গত ২৫ ও  
২৬শে মার্চ রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ব-  
বিদ্যালয়ের অবনমনে অন্তর্নিহিত দু-  
ছিন ব্যাপী তাল সম্বন্ধীয় আলোচনা  
সভার সমালোচনা করতে গিয়ে  
ধামার তাল সম্বন্ধে আমার

প্রকাশিত হল

বাংলা কবিতার জগতে  
বুক ট্রাস্টের সাম্প্রতিক নিবেদন :

## বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বিতর্কিত  
কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের  
শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের



শ্রেষ্ঠ কবিতা

প্রচ্ছদ। মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত



বুক ট্রাস্ট

৩০/১বি কলেজ রো, কলকাতা-৯

ব্যাপার ৩/৪/০/৪ এই বিভাগ  
মেনে নিতে পারেননি। তার মতে  
৫/৪/০/৪-এর বাক্য গতিই ধামার  
বৈশিষ্ট্য। “না হলে রূপক বা তেওড়ার  
সংশোধন ধামার-এর পৃথকী কৈবর্ত?”  
এটাই ঠিক বক্তব্য। এই সম্বন্ধে আমার  
কিছু বক্তব্য জানতে চাই।

প্রথম কথা ধামার-এর তাল-ভাগ  
সম্বন্ধে দুটি মত প্রচলিত আছে।  
একদল বলেন ৫/৪/০/৪ আর  
একদলের মত ৩/৪/০/৪। কোন  
তালের গঠন-বিভাগ সেই তালের  
ঠেকার বাণীর ওজন দ্বারা সুনির্দিষ্ট  
করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ ঠেকার বর্ণ-  
গালি এমনভাবে সাজানো হয় যা শ্রবণে  
সমগ্র তালটির চিত্র পরিস্ফুট হয়।  
সেই হিসাবে ধামার-এর ৩/৪/০/৪  
ভাগটিই মন মানতে চায়। তালের  
কণ্ঠ মন্ত্রের যে ‘ধা’ আছে তাকে অথবা  
জোরে বর্ণজের হয় জে ৫/৪/০/৪  
মাত্রা বিভাগকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়  
কিন্তু তা স্বাভাবিক শোনাবে না।  
রূপক বা তেওড়ার সংশোধন “ধামার”  
তালের পার্থক্য নিশ্চয় আছে।

(এক) রূপক ও তেওড়া সাত  
মাত্রার তাল। ধামার চৌদ্দ মাত্রার তাল।

(দুই) রূপক তবলার তাল।  
“ধামার” পাখোরাজের। কোনও  
পাখোরাজবাবক যদি পাখোরাজের  
রূপকের ঠেকা বাজান, শ্রবণেই  
কেন্দ্রীয়া যাবে ও তাল পাখোরাজের নয়।  
সেই একই কথা বোল বাণীর ওজন।

(তিন) উত্তর ভারতীয় সংগীতে

একই সংখ্যক মাত্রাবিশিষ্ট বিভিন্ন  
তালের প্রচলন আছে। কেবল মাত্রা-  
বিভাগের তরতম্য তাই একটি তাল  
থেকে অপর একটি তালের পার্থক্য  
বোঝায় না। প্রত্যেক তালের একটি  
নিজস্ব গতি আছে। যেমন অতি  
বিলম্বিত বোল মাত্রার তাল বাজালে  
মিলাত-এর বঙ্গলে তিলুয়াড়া বাজানো  
সুবিধাজনক। যে কারণে স্বমাত্রা  
অতি বিলম্বিত লয়ের তাল কিন্তু  
আটাত্তাল চৌদ্দ মাত্রার মধ্য-  
বিলম্বিত, মধ্য, মধ্যদ্রুত ও দ্রুত লয়ের  
তাল। সেইভাবে তেওড়া বা রূপক  
মধ্য বা মধ্য-দ্রুত লয়ের তাল। কিন্তু  
“ধামার” বিলম্বিত বা মধ্য-বিলম্বিত  
লয়ের তাল।

সনৎ কল্প কলকাতা-২৬

### মণিপুরী নৃত্য

৭ জন তারিখের বেশ পরিচায়  
মণিপুরী নৃত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে  
এ নৃত্যরীতিতে ‘তালের কার্যকার্য’  
বাহাদুরী ও সৌন্দর্য্য ছাড়িয়ে  
‘সাপালাপ’ সম্পর্কে অলৌকিক কিছু  
মন্তব্য করেছেন। মণিপুরী নৃত্যে  
করা তালের গুরুত্ব বোঝেন তাঁরা  
কোন সময়েই উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণ  
পাওয়া মণিপুরী নৃত্য শিল্পীর তাল  
দক্ষতাকে বাহাদুরী বোলা বলে মনে  
করেন না।

মণিপুরী নৃত্যে লাস্য হবে সুসুন্দর  
এবং তান্ডব হবে সুসুন্দর ও শৌর্য্য



## লালবান্ধী

২৫ বছরে পদার্পণ করলো।

আজও সমান লোকপ্রিয়।

১৯৫৫ সালে ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু হওয়ার  
সঙ্গে সঙ্গে আলোড়ন তুলেছিল এই উপন্যাস।  
গ্রন্থাকারে প্রকাশের পনেরো দিনের মধ্যে  
নিঃশেষ হয়েছিল প্রথম সংস্করণ। তার পরেও  
মুদ্রণের পর মুদ্রণ চলছে। জনপ্রিয়তা  
আজও অব্যাহত। দাম কুড়ি টাকা।

## রমাপদ চৌধুরীর



### গল্প-সমগ্র

দ্বিতীয় মুদ্রণ : চল্লিশ টাকা

লেখকের অন্যান্য উপন্যাস

খারিজ • লজ্জা • হৃদয়

বীজ • রূপ

বনপলাশির পদাবলী

এখনই • পিকনিক

যে যেখানে দাঁড়িয়ে

দ্বীপের নাম টিয়ারও

এই পৃথিবী পান্থনিবাস

প্রথম প্রহর

ডি এম লাইব্রেরীতে লেখকের সব বই পাবেন

শৌনক গুপ্তের করুণ ঐতিহাসিক উপন্যাস

আমি মারী আতোয়ানেৎ ১৬.০০

ও অনন্য এক প্রেমের উপন্যাস

পাখি আমার একলা পাখি ১০.০০

কলিন ফোর্বস/নিশানা ভয়ঙ্কর

২য় বেস্ট-সেলার ডায়ালগ/বাবু মুখোপাধ্যায় ১৬.০০

১ম বেস্ট-সেলার পাথরের চিতা ২য় মুদ্রণ ২২.০০

জন গডি/পেলহ্যাম একটা তেইশ ২য় মুদ্রণ

পাতাল ট্রেন ছিন্নতাইয়ের দুঃসাহসিক কাহিনী ১৫.০০

ব্রাম স্টোকার-এর দুখানি ক্র্যাসিক হরর

ড্রাকুলা (পূর্ণাঙ্গ) ১৪.০০ সপ্তমির অভিলাষ ১৬.০০

মারে লেইনস্টার/মৃত্যু বিসপিল ১০.০০

ছোটবড় সকলের জন্যে বিখ্যাত হরর-সাসপেন্স রহস্য

আলেন লক/ব্রেনগানুর মানুষথেকো (শিকার) ৮.০০

দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়/ফরেনসিক ১ম ১২.০০

অনীশ দেব/নরকে আমিই রাজা (ক্রাইম থ্রিলার) ৬.০০



এই তালিকার জন্মে লিখুন

চিহ্নায়ত ৥ ১৩ বাক্স চাট্‌জো স্ট্রীট ৥ কলি-৭০

শৈলেশ দে'র

আগ্নি সুভাষ বলছি ( তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ )

প্রতি খণ্ড কুড়ি টাকা

গান্ধীজী ও নেতাজী ২০

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের

গোমুখীর পথ ১৬

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলীর

বিপ্লবীর জীবনদর্শন ২০

ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়ের

ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব ২৫

সুভাষ সমাজদারের

গঙ্গা থেকে কাম্পিয়ান ১৮

আবদুল জব্বারের

পল্লীর পদাবলী ১৬ জীবনপদ জীবন ৮

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের

ভালবেসেছিলাম ৮

কল্‌হনের

খবরে প্রকাশ ১০

ব্রজমাধব ভট্টাচার্যের

ত্রিভুবনের বাইরে ১৮ স্বর্ণজন্মর ১৪

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সুবনশিরি ২০

নিখিলচন্দ্র সরকারের

দুগ্ধে সুখে বাঁচা ১০ সজনে নির্জনে ১২

আণ্ডতোষ মুখোপাধ্যায়ের

চাঁদের কাছাকাছি ৭ আর এক সাজে ৬

চিরঞ্জীব সেনের

মিরানজিয়া রহস্য ১০

নটরাজন-এর উপন্যাস

খানার মাটি নোনা ১৬

লালবাজার ১৮

কাশীকান্ত মৈত্রের

গণতন্ত্র মুখোশ ও

মুখশ্রী ২৫.০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

পূর্ব পুরুষ ( ২য় খণ্ডে সম্পূর্ণ )

১ম খণ্ড ৮ ॥ ২য় খণ্ড ১২

একাল চিরকাল ১০ ॥ আকাশের আয়না ১০

রুশান বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

থৈ থৈ হাহাকার ১৮

রাই শোন আজ ৬ ॥ অনেক রক্ত মাড়িয়ে ৯

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস

শেষ বিচার ১৮

স্বাতী ও দীপ ১২ ॥ বিশ্বাসের বাইরে ৫

চিরঞ্জীব-এর

জয় থেকে জয় ক্রিকেটে ২০

বিশ্বকাপ ফুটবল ২৫ ॥ বিশ্ব টেবিল টেনিস ২০

শঙ্কু মহারাজ-এর

মধু-বৃন্দাবনে ( তিন পর্বে সম্পূর্ণ )

মূল্য প্রতি পর্ব বারো টাকা

মন-দ্বারকায় ১২

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

কুশী প্রান্তণের চিঠি ৭

নীলাঙ্গুরীয় ১২ ॥ অবগুষ্ঠন ৫

শক্তিপদ রাজগুরুর

গৌড় জন বধ ১২

নয়া বসন্ত ৭ ॥ অভয়াারণ ১৫

অনুসন্ধান ১৫ ॥ রূপবদন ৫

নিগূঢ়ানন্দের

হৃদয়ে নাবিক ৮.০০

চিরঞ্জীব  
১৯৫১

রবীন্দ্র লাইব্রেরী

১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ ॥ ফোন : ৩৪-৮৩৫৬

অমূল্য গোপাল মজুমদার  
কলকাতা-৬

১৮ এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯, ফোন : ৩৪-৬২৬৮

প্রকাশ ভবন ॥ ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রাট, কলকাতা-৭৩



প্রকাশিত হল

## সমরেশ বসুর

তাজা স্বাদের গভীর উপন্যাস

## বিপর্যস্ত

দাম ১৫.০০

সমরেশ বসুর সেই বিরল সাহিত্যিকদের অন্যতম, সমাজ এবং সময়েকে যিনি জীবন্তভাবে ধরতে পারেন। আমাদের বিপর্যস্ত মূল্যবোধ, ন্যায়নীতিবৈবেক, পাপপুণ্যের ধারণা, রাজনৈতিক পরিবেশ, নতুন প্রজন্মের সংগে পুরনো প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার-আচরণের ব্যবধান তিনি যেমন নিপুণ চিত্রণ মতো অগ্রসরে ফুটিয়ে তোলেন, তেমনই সব-কিছু ছাপিয়ে একটি চিরকালীন সত্যকেও তুলে ধরেন চোখের সামনে। 'বিপর্যস্ত' উপন্যাসও তার বাস্তব নয়। এই কাহিনীর নায়ক এমন এক যুবো, যাকে নিয়ে পারিপার্শ্বিক কেবলই বণ্টনার খেলা খেলেছে।



অথচ যুব বড়ো আশা তার ছিল না। সে চেয়েছিল এক সাধারণ জীবন, যে-জীবনে থাকবে দিনব্যাপনের উপযোগী একটা কাজ, কাজের পর থাকবে ব্যাড্-ফেরা, ব্যাড্‌তে ফিরে থাকবে সুখী, শান্ত একটি সংসার। অথচ এই সামান্য চাওয়াটুকু তার মিলল না। ছোটবেলা থেকে একের পর এক বিপর্যয় তাকে রিক্ত, নিঃস্ব, অসুখী করে তুলল। তবু, কি সত্যি সে বিপর্যস্ত? যে-বিশ্বাস, যে-বোধ, যে-অনুভূতি জীবনকে গড়তর তাৎপর্য করে অন্বিত—কী করে সব-হারানো এক মানুষ পেলে তার নিভুল সম্ভান, তাই নিয়েই এই গভীর, তাজা স্বাদের উপন্যাস রচনা করেছেন সমরেশ বসু।

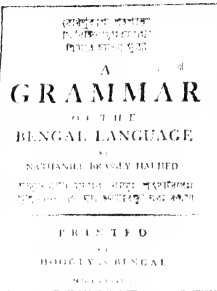
একটি সগৌরব প্রকাশনা

## A Grammar of the Bengali Language

By Nattaniel Brassey Halhed

দাম ১০০.০০ টাকা

অবিকল (ফ্যাক্সিমিলি) পুনর্মুদ্রণ



এই সেই বই, যে-বই দিয়ে শুরুর হয়েছিল আমাদের ছাপাখানা, পাণ্ডুলিপির ধ্বংস যুগ থেকে যে-মুদ্রিত পুস্তকের হাত ধরে আমরা পা বাঁড়িয়েছিলাম আধুনিক যুগে। হ্যালহেড-এর বাংলা ব্যাকরণ শুরুর যে এ-মূল্যকে প্রথম মুদ্রিত বই বলেই স্মরণীয় তা নয়, আরও-এক বড়ো গৌরব এ-বইয়ের প্রকাশনার সংগে জড়িত। সহজে অদলবদল করা যায় ধাতু-দিয়ে-তৈরী এমন বাংলা হরফ এই বইয়েই প্রথম ব্যবহার হয়েছিল। ১৭৭৮ সালে ছাপা বাংলা প্রকাশনার এই আদি পুস্তকের অবিকল (ফ্যাক্সিমিলি) পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হল দশো দুবছর বাদে। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে, এ এক অভিনন্দ্য ঘটনা। কোন পরিপ্রেক্ষিতে ছাপা হয়েছিল এই বই, কে এই হ্যালহেড সাহেব, কে তৈরী করেছিলেন বাংলা হরফের এমন রমণীয় ছাঁচ, ওয়ারেন হেস্টিংস-এর ভূমিকা কী ছিল, কোন পরিবর্তন সূচিত হল এই আদি প্রকাশনার ফলে—এমন বহু কৌতুহলকে মনে রেখে এ-বইয়ের আনন্দ সংস্করণে একটি অসামান্য ভূমিকা লিখেছেন নিখিল সরকার ওরফে গ্রীপাথ্য যা এই অমূল্য গ্রন্থের মূল্য আরও বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে।

১৯৮৫ সন

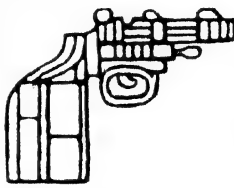
## বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের

আদ্যন্ত কৌতুহলকর উপন্যাস

## নিশীথ ফেরী

দাম ৫.০০

প্রকাশ বেকার। ওর বিশ্বাস পাটি'ই একদিন সুদিন ফিরিয়ে আনবে ওদের। একদিন পাটি' থেকে গোপন নির্দেশ আসে—একটা বে-আইনী রিভলবার তাকে পৌঁছে দিতে হবে এক আত্মগোপনকারীর হাতে।



শুরুর হয় ওর যাত্রা। পথে পুলিশের সম্মানী দৃষ্টি, বৃকে অজানা রোমাঞ্চ। কিন্তু কেন? কেন এই হত্যাকাণ্ড? কেন এই নিশীথ ফেরী? এক দূরন্ত কৌতুহল ও উৎকণ্ঠা এ-বইয়ের আদ্যন্ত ছড়ানো।

## শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অসাধারণ উপন্যাস

## সাক্ষী বালুচর

দাম ৪.০০

রূপনারায়ণের অদূরে এক পুরনো ভাঙা বাংলো।

বাংলো আর নদীর মাঝে দু'খুঁ বিশাল এক বালুচর।



দুটি যুবক যুবতী এক অপরাহ্নে পালিয়ে এসে উঠল সেখানে। বালুচরকে সাক্ষী রেখে এক শ্বাস-রুদ্ধকর মর্মাস্তিক নাটকের অভিনয় হল সেখানে—অতৃপ্ত বাসনার আকুল আঁতড়ে নিয়তিদম্ব একটি যন্ত্রণা-রক্তের স্রাবসহী আত্ম হার



## আশাপূর্ণা দেবীর

চিরন্তন উপন্যাস

## সেই রাত্রি

এই দিন দাম ৭.০০

একজন একুশ, অন্যজন ষোলো। একজন সমুদ্র, অন্য জন উর্মিলা। ভালবেসেছিল তারা। দুজনে দুজনের হাতে পেয়েছিল সমর্পণ ও নির্ভরতা, চোখে পেয়েছিল পিপাসা ও আমন্ত্রণ। পরস্পরকে পরস্পর আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু সমাজ সমর্থন করেনি এই প্রেম। পাথুরে প্রাচীর তুলে দিতে চেয়েছিল দু-জনের মাঝখানে। বিনষ্ট করে দিতে চেয়েছিল অর্ধস্বপ্ন কোরককে, বাঁধ দিতে চেয়েছিল প্রবল স্রোতস্বিনীর উৎসমুখে। কিন্তু যে-প্রেম মৃত্যুস্বপ্ন যা নিভৃততম উৎস থেকে উৎসারিত তাকে কি যায় এভাবে ফেরানো? এক পুরনো প্রশ্নের নতুন করে জবাব দিয়েছেন আশাপূর্ণা দেবী তাঁর এই চিরকালীন উপন্যাসে, 'সেই রাত্রি এই দিন'-এ।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :  
লোহার গরাদের ছায়া ৭.০০  
চাঁদের জানালা ৭.০০  
গাছের পাতা নীল ১০.০০  
সময়ের স্তর ৩.০০  
রাতে পান্থ ৪.০০  
কিশোর সাহিত্য : গজ উকিলের হত্যা রহস্য ৮.০০  
রাজকুমারের পোশাক ৪.০০



আনন্দ প্রকাশনা প্রাইভেট লিমিটেড  
১০০ মেদিনীপুর রোড, কলকাতা ২

প্রকাশিত হয়েছে

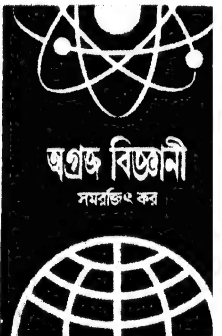
সমরাজিৎ কর-এর

গল্পের মতো স্বাদ, ভাবনা

## অগ্রজ বিজ্ঞানী

দাম ১৫.০০

১৯১৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান কলে প্রতিষ্ঠা করলেন স্যার আশুতোষ মথোপাধ্যায়। পরের বছর সদ্য এম এ সি পাশ একদল তরুণ এলেন তাঁর কাছে। তাদের আজি রসায়নের মতো আধুনিক গণিত এবং পদার্থ বিদ্যাতো বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এম সি কোর্স চালু করা হোক। 'কে পড়াবে?' জিজ্ঞাসা করলেন স্যার আশুতোষ। 'কেন? আমরা।' জবাবে বললেন সেই তরুণ ছাত্রদল। সেদিন যাদের আবেদনে সাড় দিয়ে মিশ্রগণিত ও পদার্থ বিদ্যা এম এম সি কোর্স চালু করেছিলেন স্যার আশুতোষ তাঁদের মধ্যে ছিলেন মেঘনাদ সাহা,



সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। এঁরা নিযুক্ত হলেন নতুন কোর্সের লেকচারার। নাইনে কম, কিন্তু াহ কম নয়। বিজ্ঞান চর্চাকে সৌন্দর্য জীবনের রত হিসেবে যারা গ্রহণ করেছিলেন, দেখা গেল, স্ব-স্ব ক্ষেত্রে নিজেরা তাঁরা হয়ে উঠলেন এক একটি ইনস্টিটিউশন। ভারতকে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করলেন পৃথিবীর বিজ্ঞান-মানচিত্রে। এমনই কয়েকজন অগ্রজ বিজ্ঞানীর জীবন ও কর্মের সংগে এই বইতে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন সমরাজিৎ কর—বিজ্ঞানকে সাহিত্যের মতো স্বাদ, ও সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলায় বার জুড়ি মেলা ভার। প্রতিটি বিজ্ঞানীর ফোটো এ-বইয়ের

## সূচীপত্র

চীঠপত্র	৩
আইন শৃঙ্খলা : সম্পাদকীয়	১
জগদীশ	১০
কুশলিকার অমর ও বাড়খন্ডী কীর্তন	১১
কাজে শব্দ মিষ্ট	১১
প্রতিবেদন : বলরাম বসাক	১৭
মানবজমিন : শীর্ষে স্বঃ মুখোপাধ্যায়	২০
জিজ্ঞাসা : সমরকিরণ কর	২৫
এক নিশ্বাসের গল্প : জনদ বাগচী	২৭
শ্রীচরণে : ভারতবর্ষ : তারাপদ বার	৩৭
লিখন : বিজয়কুমার দত্ত	২৭
কুল : মল্ল সিংহ	২৭
কলকল্পিত : অতুলা ঘোষ	৩০
সেই সময় : সুদীপ গুপ্তাপাধ্যায়	৩০
স্মৃতি সত্যই মুখের : প্রতিভা বসু	৩৫
অনুগদেব : ৩৫	
সহিত্য : ৩৯	
মেলভিন জগ : সুদেব রায়চৌধুরী	৪১
অলিম্পিক কার কীর্তি সবচেয়ে বড়	৪১
হুসুল : ৪৩	
সমকালীন ভারতীয় চিত্রকলায় প্রভাব—গোপাল ঘোষ	৪৩
অহিভূষণ মালিক	৪৫
আলাচনা : শিশুসংস্কৃতি	৪৭
প্রজ্ঞা : রণবীর সিং কলেক্ট	
প্রাচীন শব্দ পরিচিতি শেষ পত্র	

## পরবর্তী আকর্ষণ

প্রভাস সেন ও  
শুণে শব্দ শব্দীর প্রবেশ, প্রসঙ্গ  
সামাজিকের ক্ষেত্র  
চিরন্তন পালিতব্য প্রকল্প  
জগতের বঙ্গালীয় চরিত্রতা  
সুদূর চট্টোপাধ্যায়ের নিবন্ধ  
হুদাল রায় : এক অ-সাধারণ লেখক  
সমস্যা মুখোপাধ্যায়ের গল্প  
জিহাদিদের গান  
জিবানী চৌধুরী প্রমুখরাইনী  
আজকের মেসোপটেমিয়া

## সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে  
প্রাথমিকীয় রায় কড়ক ও প্রকল্প সরকারী স্ট্রীট  
কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং  
আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮  
সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০০৪ এবং  
কলকাতা প্রিন্টিং হাউস ১৩ প্রকল্প সরকারী  
স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।  
প্রথম এক টাকা  
প্রথম মাসিক : ১৫ পয়সা  
প্রথম প্রকাশ : ১৫ পয়সা

## আইন শৃঙ্খলা

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার অনেক ব্যাপারেই স্পর্শকাতর। বিশেষ করে কেউ যদি এই রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার কথা তোলেন, সরকার সঙ্গে সঙ্গে ধরে নেন এ-সব অভিযোগ উদ্দেশ্য-মূলক। বামফ্রন্ট সরকার বরং বলে থাকেন, এই রাজ্যে যতটা আইন শৃঙ্খলা, শাসন ও নাগরিক শান্তি বজায় আছে অন্য কোনো রাজ্যে তা নেই। আসলে যারা পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলার অবনতির কথা তোলেন তারা চান দিল্লি একটা ছুতো ধরে এখানকার রাজ্য সরকারকে বাতিল করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যা মনে করেন করুন কিন্তু এই রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার যে দুট অবনতি ঘটছে তাতে সন্দেহ করা চলে না। চলে না যে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ আশি সালের প্রথম চার মাসে হাঙ্গামার সংখ্যা দু'শো নয়টি। সরকারীভাবে এই সংখ্যা সমর্থিত, মনগড়া বা বানানো সংখ্যা এটি নয়। পরের তিন মাসে হাঙ্গামার সংখ্যা কত তা অবশ্য এখনও সরকারীভাবে জানা যায়নি। কিন্তু কংগ্রেসী তরফ থেকে এক হিসেবে—দু'শোর মতন বলা হয়েছে। এটি কি বেশী? খবরের কাগজের পাতা খুললে প্রতীতি কম করও তিন চারটি করে এই ধরনের খবর দেখা যায়, অর্থাৎ প্রতি মাসে মোটামুটি একশো-টি ঘটনা ঘটেছে। মনে রাখতে হবে, আমরা প্রধানত যে খবর পাই—তা শহর কলকাতার এবং আশেপাশের, ছোট শহর, গ্রামগঞ্জের খবর কদাচিত কাগজে প্রকাশ পায়। কেননা তা জানার সুযোগই হয় না।

কলকাতা কিংবা কলকাতার কাছাকাছি এলাকা গোটা পশ্চিমবঙ্গ নয়। তবু যদি আমরা কলকাতার দিকে তাকাই—দেখতে পাব, খুন, চুরি ডাকাতি, ছিনতাই, গাড়ি চুরি, পাড়ায় হাঙ্গামা বেড়েই যাচ্ছে। কিছুকাল আগে স্বয়ং মধ্যমশ্রী শ্রীজ্যোতি বসু স্বীকার করেছিলেন, সমাজ-বিরোধীদের দৌরাঙ্গ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। তিনি পুলিশকে কঠোর হতে নির্দেশও দিয়েছিলেন। এবং একথাও বলেছিলেন, এ-ব্যাপারে রাজনৈতিক দলের মুখের দিকে তাকালে চলবে না। যতদূর মনে পড়ে সেই বৈঠকে থানায় থানায় পুলিশ বাড়ানো, ফাঁড়ির সংখ্যা বাধি করা, ফৌজদার আইনের কোনো কোনো ধারা সংশোধনের কথাও উঠেছিল।

কাগজে কলমে যা যা করণীয় করা হলেও বাস্তবে কী হয়েছে আমরা জানি না। খুন কর্মনি। ডাবতি যে-হারে চলছিল সেইভাবেই চলছে। আর পুলিশের কাজকর্মের বহর দেখে এখন জনসাধারণ নিজেরাই ডাকাতি ধরতে মালকেঁচা মেরেছেন। কাজটি নিশ্চয় প্রশংসার, কিন্তু কে বলতে পারে এই উৎসাহ থেকে অন্য কিছুই উদ্ভব ঘটবে না! যার কাজ তারই সাজে অন্য লোকের লাঠি বাজে—এই গ্রাম্য প্রবচনটি একেবারে অর্থহীন হয়ত নয়।

বামফ্রন্ট সরকার যতই কেননা আত্মপ্রসাদ অনুভব করুন, কলকাতা ও শহরতলির দিকে তাকালে আমাদের নিশ্চিত হবার কোনো কারণ ঘটে না। একথা নিঃসংশয় বলা যায়, রাজনৈতিক বিরুদ্ধ দলের মধ্যে রেষারেষি বেড়েই চলেছে, হাঙ্গামাও। সমাজবিরোধীরা এই হাঙ্গামার বাইরে থাকে না, অধিকাংশ সময়ে তারাই হয়ে ওঠে প্রধান। কোনো রাজনৈতিক দলই এদের প্রতি কঠোর হন না। হলে হাঙ্গামার সংখ্যাও কমত। ডাকাতি, লুট—এমন কি ট্রেনে প্রতীতি যে ছিনতাই হয়—তার সংখ্যাও কমানো যেত যদি পুলিশ দায়িত্ববান ও কর্ম-তৎপর হতেন, যদি সমাজবিরোধীদের দিকে নজর দিতেন তীক্ষ্ণভাবে।

এ-প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার। শিল্পাঙ্গুলের পরিবেশ সম্প্রতি রীতিমত আতঙ্কজনক হয়ে উঠেছে। চা বাগানে, কয়লা খনিতে, কারখানায় ও অন্যান্য শিল্পাঙ্গুলে প্রায় প্রত্যহই হাঙ্গামা ও খুনোখুনি হচ্ছে। আই এন টি ইউ সি-র পশ্চিমবঙ্গ শাখা তো স্থিরই করেছেন তারা এইবার এক ব্যাপক আন্দোলন শুরু করবেন এই কারণে যে, সরকার দেখেশূন্যেও শিল্পাঙ্গুলের বিশৃঙ্খলা রোধ করার কোনো চেষ্টা করছেন না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার দাবী করেন, তারা সুদৃষ্টিমানক এবং শাসন পরিচালনায় আপন পর ভেদ করেন না। দুঃখের বিষয়, এই রাজ্যের নানা বিশৃঙ্খলার ঘটনা সম্পর্কে স্বয়ং মধ্যমশ্রীকে জানানো সত্ত্বেও তিনি অন্য দলের নেতাদের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে চান না। মধ্যমশ্রী নিজে যদি এ-বিষয়ে কর্ণপাত করতে না চান তবে অন্য কে করবে! আর একথা ঠিকই, সরকারী তরফের সমর্থকদের প্রশ্ন এতে বেড়ে যায়, বিশেষ করে যেখানে অভিযোগ মাত্রই মিথ্যা নয়।

গ্রামাঙ্গুলের কথাও আমরা বাদ দিতে পারি না। গ্রামের দিকে পুলিশ আরও বেশী নিষ্ক্রিয় এমন অভিযোগ অনেকেরই। বামফ্রন্ট সরকারের কাজকর্ম সাধারণ মান য়ে আশঙ্কিত হননি এমন নয়। তার একটি প্রমাণ পণ্ডায়েত নির্বাচন। সি পি এম ও তার সহযোগী দলের নেতারা মুখে যাই বলুন, মনে মনে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন—যে কয়েকটি মত্ব কারণে তাদের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা কমেছে তার অন্যতম দুটি কারণ হল, অরাজকতা ও দুর্নীতি।

বামফ্রন্ট সরকার যদি আত্মতুষ্ট থাকতে চান থাকুন—কিন্তু এই নির্বিকার মনোভাব তঁদের শাসন দক্ষতার প্রমাণ নয়।

ব্যস্ত যে সংরক্ষিত প্রাণী তাও  
জানি। কিন্তু স্মিথের ব্যাপারে  
ইন্দিরার তেমন সন্দেহ আছে মনে হয়না।



# পুরুলিয়ার ঝুমুর ও ঝাড়খণ্ডী কীর্তন

## স্বদেশের মিত্র

ঝুমুরগান সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই; শুধু বহু দ্রাষ্টা ধারণা বর্তমান। এর কতকগুলি রূপ আছে। প্রথমত ঝুমুর রাসের যে অঙ্গুলে চলিত সে অঙ্গুল সম্বন্ধে আমরা দীর্ঘদিন আগ্রহ রাখি। শ্বিতীয়ত, ঝুমুরের উৎস পুরুলিয়ার মানিক, এতাবৎকাল পশ্চিমবঙ্গের বাইরেই ছিল। তৃতীয়ত, একমাত্র চাকুরি বা ব্যবসা ছাড়া এই জগৎলাকীর্ণ কালের আদিবাসী বা বঙ্গভাষীদের মধ্যে আমাদের অনেকের গতিবিধি ছিল না। অপরপক্ষে এ অঙ্গুলের নৈহিত্যী মানসেবা স্বভাবতই খাঁটি অশিক্ষিত; এত দুঃস্বভাবী স্থান থেকে বহু অসুবিধা সহ্য করে দল্লীত-প্রচলিত জনা নিন্দাবর্তী অঙ্গুলে এরা আসতে গিয়েছিল এবং তার প্রয়ে জনীয়তাও বোধ করেন না।

তবে অনেক দীর্ঘ প্রণয়র লোক চাষের কাজে বা মল্লিকীকর্মে হুগলী, হাওড়া জেলা পর্যন্ত এসে অনেকদিন থাকেন। কেউ কেউ পাকাপাকিভাবে থেকেও যান, তবে অধিকাংশই ফিরে যান। এদের কষ্ট অনেক সময় পুরুলিয়ার খাঁটি ঝুমুর শোনা যায়। এরা যে অসুর সময় ঝুমুর গানের চর্চা করেন, তা এদের গান শুনলে বোঝা যায়। তৃতীয়ত, পুরুলিয়ার অঙ্গুলের সঙ্গে এতঙ্গুলের ভাষাগত ব্যবধানও বেশ কিছুটা আছে। উৎকৃষ্ট ঝুমুর বৈষ্ণব পদাবলীর ধারায় রচিত এবং রজবুলি বা ছোটনাগপুর অঙ্গুলের মিশ্রভাষায় রচিত হয়েছে। এই সব ভাষা বা ধরন অনেকের কাছে সুপরিচিত নয়। দ্রাষ্টা ধারণা হচ্ছে এই যে, ঝুমুর নামক গানের উল্লেখ হলেই, আমাদের এক-প্রকার চটুল গানের কথা মনে হয়—যা খেমটার সম-প্রাচীন। ঝুমুরকে আমরা সাধারণত এমন একটা প্রণয়র গান বলে মনে করি, যা ইতর সমাজের ব্যক্তি ও বৈষ্ণবাদের মধ্যে প্রচলিত। এই স্বীকৃতিই একাধিক জগৎব্যবসয়ে লিপিত থাকে, অপরদিকে এমন নৃত্য ও গীতে অত্যন্ত যার মধ্যে যৌন আবেদনই প্রধান।

কবিগানের ধরনে এদের মধ্যে দুই দলে প্রতিযোগিতা চলে থাকে এবং তা অসিদ্ধ অঙ্গুলি পর্যায় গিয়ে দাঁড়ায়। তথাপি, তার কবি উপন্যাসে এই সমাজেরই বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু এদেরও আজকাল আর প্রমাণ মেলে; যা উৎসবে দেখা যায় না; কবিদের মত, এদেরও কবিত্ব বলতে অস্বীকার হয় না। সম্ভবত পুরুলিয়ার অঙ্গুলের বিখ্যাত নাট্য-সম্প্রদায়ের এরা একটা অঙ্গুলিত প্রণয়ী; ক্রমে এই নৃত্যকারী ঘনো-বিপণ্যর বৈষ্ণবীও অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে এবং উচ্চাঙ্গ নৃত্যপট্টে থেকেও বিদূত হয়েছে। কিন্তু, যথার্থ নাট্য-নাচ আজও এ অঙ্গুলে বর্তমান।

কিন্তু, পুরুলিয়ার এদের গুরু 'রাসিক' নামে পরিচিত ছিল। ছিলেন, তারা উচ্চপ্রণয়র নৃত্য ও গীতে দক্ষ ছিলেন; নাট্যনদের মধ্যেও অনেক ছিলেন, যাঁরা এই সব আর্ট সমানভাবে কৃতী ছিলেন। যথার্থ নাট্য-নাচে দেখা যায়, নৃত্য যেন এককভাবে অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে। ভাবে এবং রাসে এরা যেন আপাদমস্তক আগ্রহ হায়ে যান। দক্ষিণেরও একইভাবে মস্তক-মস্তক হয়ে নৃত্য এবং ঝুমুরগীত শব্দ উপভোগই নয়, উপলব্ধি করতে থাকেন। প্রত্যেককে, ছোটনাগপুর, মানিক এবং নারায়ণ তথাকথিত রাজারাজড়া, অর্থাৎ জমিদার প্রণয়রই বহুদিন পর্যন্ত এদের পট-পেশকতা করে এসেছিলেন, যার ফলে বৈঠকী ঝুমুরও এদের মাধ্যমে বিদ্যুত হয়েছিল। আজ, সেটা আর অনেকের পক্ষে সাধারণ নয় এবং সেই প্রণয়ীও আর জমিদারগোষ্ঠীতে বর্জিত নেই। তথাপি, এই শিল্পকে তার রাখবার একটা যথার্থ প্রয়াস এখনও লক্ষ্য করা যায় এবং অশীতিপর বংশ সচরাৎ মহাত্মা আজও জীবিত। গত এপ্রিল মাসে তার গান এবং ভণ্ডার গানে এসেছি পুরুলিয়াতে। নাট্য-নাচও অঙ্গুল-রসিক, বরং কোনও কোনও স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তি

এই নৃত্যের প্রেক্ষিতে ভুলে ধরবার জন্য যত্নবান হচ্ছেন, —এরকম শব্দেই।

অবশ্য, প্রকৃত ঝুমুর সম্বন্ধে অনেক অবহিত না হলেও এক্ষণে ঝুমুরের পারিধি কম বিস্তৃত হয়নি। অষ্টাদশ শতকেই ঝুমুর ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয় এবং বাকুল্লা, মেদিনীপুর, বীরভূম অঙ্গুলে ছাড়িয়ে পড়ে, এমনকি মর্শিমাবাদেও এর প্রসার এতটা দেখা যায় যে মনোহরসাই কীর্তনরীতিতেও এর অনুপ্রবেশ হতে। আজ যারা মনোহরসাই চিত্রের কীর্তন গান করেন, তাদের গান যদি বিশ্লেষণ করা যায় তা হলে ঝুমুরের গায়কী অনেকটাই ধরা পড়বে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, গোবিন্দদাসের ভগ্নতায়ু পদ, —

নাগিনীতানী বেষে রাধিকার কাছে শ্রীকৃষ্ণের আগমন বা বদনাখ্যাসের পদ,—সখি সখি বিনোদিনী কুক আলাপনে, হেনকালে শ্যামের বাঁশ বাজিল বিপিনে, অথবা বাণেশ্বর রায়ের একাধিক পদ সম্ভবত বৈঠকী ঝুমুর থেকেই মনোহরসাই কীর্তনে প্রবর্তিত হয়েছে।

দুঃখের বিষয়, বহু কীর্তনরীতিই ক্রাসিকাল ঝুমুরের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত নন। বোধ করি, এখনও অনেকের কাছে এখন না যে বিদ্যাপতি থেকে বৈষ্ণব পদাবলীর যে ধারা মিথিলায় সংরক্ষিত ছিল, তা



ছোটনাগপুরের একটি দল।

দ্বারভাড়া, তিরহত অঙ্গুল থেকে সঞ্চারিত ঝাড়খণ্ডে প্রবেশলাভ করে এবং ক্রমে এই পদাবলী গান এই অঙ্গুলের চর্চা ও পরিচালনে এমন একটি বংশ পরিগ্রহ করে, যে সেই ধারাটিই 'ঝাড়খণ্ডী রীতি' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। তবে প্রাচীনকালে প্রচলিত ঝুমুরের অস্তিত্ব আর আছে কিনা সন্দেহ, তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে উদ্বোধন শতাব্দীর প্রথম ভাগে বহু উৎকৃষ্ট ঝুমুর পদাবলী রচিত হয়েছে। এদের মধ্যে একজন প্রধান ছিলেন বাঁচি জেলার সিম্রার রাজপরিবারের বিনন্দ সিংহ। ইনি এই অঙ্গুলের ভাষাতে ঝুমুর রচনা করেন। গায়কীভর গৌরাঙ্গ সিং (গৌরাঙ্গিয়া দাস) নাকি এরাই সম-সাময়িক ঝুমুর-কবিগণ। বিনন্দ সিং আনুমানিক ১৭৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন বলে ধারণা করা হয় (ছোটনাগপুরের মহাকবি শ্রীধরনাথ সিং—সিম্রা—জ্যোতিলাল মহাদানীর হিন্দী রচনা থেকে অনুবাদ করেছেন শ্রীনরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়;—ছাত্র ক, শারদীয়া সংখ্যা ১০৪০)। তার একটি পদ, অধ্যাপক অশ্বত্থার উদ্বোধন সম্পর্কিত 'বংশীয় লোকসংগীত-রসাকর', শ্বিতীয় খন্ড থেকে উদ্ধৃত করছি :

কানাই (কানাকুল) ছুটে আসা লাগেই সজনী  
এবারে আওত ভরা (ভায়া) মোর।  
কানাই উড়ত আসা ছুটে রে সজনী,  
নোহের আওত ভরা মরি।  
বিনন্দ সিং বলে ঝুমুরি বানাইবো বলে  
কানাই উড়ত ছুটে সজনী  
এবে রে আওত ভরা মোর।

এইটি বোধ করি পট্ট পরগনার ভাষা, যাতে বিনন্দ সিং সাধারণত গান রচনা করতেন। 'কানাকুল' যে পুণ্ড্রজগতের কোন বস্তু, তা অবশ্য এই লেখকের জানা নেই।

একেবারে এ-মুগের একজন প্রবীণ পদকর্তা ছিলেন বৈষ্ণাবধর্মের ভবপ্রতীপদ ওঝা। এঁর পুণ্ড্রপুণ্ড্রের বাসভূমি ছিল মিথিলায়, ইনি বাংলা নান্দেতন এবং বাংলা, রজবুলি ও হিন্দীতে প্রচুর পদ রচনা করে গেলেন। এঁর রচনার বিদ্যাপতির প্রভাব অসামান্য। বোধ করি, তাঁর আদি নিবাস মিথিলাকে স্মরণ করেই তিনি বিদ্যাপতির ধারায় উৎকৃষ্ট ঝুমুর রচনা করেন। তাঁর একটি গান (গানটি অবশ্যই ঝুমুর)—

বয়সা আগত ভেল 'মেঘেতে বিজুরি খেল  
মাতি গেল যত শিখিকুল গো  
হরিশ্চন্দ্র হইল গোবুল।  
বরষিছে জলধারা নিশিগলী তারাহারা  
শ্যামহারা-গোপিনী গোবুল গো,  
গিরাল তরুশাভিত শীতবরু প্রবাহিত  
বিকশিত মালতী বকুল গো।  
অশনি বনঝনি মদন দল্লীভ ধনি  
বিরাহিনী হুদে বিধে শুল গো  
রাধা ফহে সখী সনে ভবপ্রীতি ভাবে মনে  
রাধা সনে জগতের মূল গো।

(সংগ্রহ—অধ্যাপক শ্রীসুবোধ কল্লার। সামান্য পরি-বর্তিত আকারে বংশীয় লোকসংগীত রসাকর—শ্বিতীয় খন্ড)।

ভবপ্রতীপদেবের ঝুমুর বিশেষ প্রাচুর্যের সঙ্গে মনভূম, বাকুল্লা, মেদিনীপুর সর্বত্রই গীত হয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত সম্প্রতিকালের পররচিতভাষের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছেন—পাতকুরের রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, গঙ্গাধর ঘোষ, দিবাকর সিংহপাণ্ড, দুর্ঘোষন দাস; বাণেশ্বরের জগৎ কবিবাজ, উদয় কবি, দগা দাঁতি, রজবাম দাস, আড়বার চৈতন সিং আলনার নরেন্দ্র সিং, জয়পুরের ফণীকৃষ্ণ হাজরা, পুরুলিয়ার টমা ঠাকুর—ইত্যাদি। এই নামগুলি এবং অনুষাঙ্গিক বহু তথা পুরুলিয়ার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শ্রীসুবোধ কল্লা আমাদের গোচর করেছেন, যা কেবল সংগ্রহ গ্রন্থ থেকেই পাওয়া সম্ভব নয়। এদের মধ্যে উদয়কবির ভগ্নতায়ু পদ একটি পদ উদ্ধৃত করছি। এই পদটিও বিদ্যাপতিক মায়র করিয়ে দেয় :

কি কহব জোরে দুতী, কি কহব জোরে  
আজ স্বপনে হাম ভেটিল নাগরে;  
জুই ও চামোলিফল গাখিল সকাল  
ধীরে ধীরে তুলি দিল চাড়ার উপরে।  
মেঘ প্রহর রাত আসল অবসরে  
হাসিয়া উঠিল শ্যাম পালক উপরে।  
হেন উদয় সাড়া রইল দুয়ারে  
নিদ্র ভাগল হায় পড়ল ফাঁপরে।

(বংশীয় লোকসংগীত রসাকর, শ্বিতীয় খন্ড)।  
উপরে উল্লিখিত কবিরের অনেকেই হবে বেশি-দিনের নয়; ঝুমুর পর্যায়ের পদাবলী এখনও রচিত হতেছে। যদিও মনোহরসাই চিত্রের গান প্রাচীনদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে—নতুন পদকর্তার উদ্ভব হচ্ছে না। এর কারণ ঝুমুর জীবিত; মনোহরসাই ক্রাসিক উত্তীর্ণ হয়ে খেয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে, নানান পরিস্থিতির দরুন। ঝুমুর পর্যায়ের বহু কবিও ভগ্নতায়ু পদই লোকসংগীত রসাকর' নামক কোষসম্মত করিয়ে দেবে; যাঁরা এইসব পদ সংগ-স্থানে গিয়ে সংগ্রহ করেছেন, তাঁরা যথার্থই সাধবাবদে

অবশ্য, কেন্দ্রনা তার এমন একটি অটোর উদ্ভাবনকে  
কাজ করেছেন, যার ইতিহাস আজও পূর্ণভাবে রচিত  
হবার অপেক্ষায় আছে। অবশ্য এই ধারণাটা অর্থোডক্স  
নয়, যে কলকাতার কবিগণও একপ্রকার পদাবলী  
সম্পর্কিতের পরিচয়ই পড়ে। উৎকৃষ্ট কবিগানের বহু  
পদই উৎকৃষ্ট বৈকল্য কাব্যের নিদর্শন। অটোর  
শব্দাবলীতে এর বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করবার পূর্বে  
এর সঙ্গে কুমুরের কোনও যোগ ছিল কিনা বলা যায়  
না, তবুও এর সঙ্গীতের কুমুরের প্রভাব লক্ষ করা  
যায়। সেটিও প্রভৃতি গান যদি শ্রুতিগত অংশ  
থেকে খসড়ে দাখ্য তবে তার বহু পূর্ববর্তী কুমুর  
বা কীট। মৌলিনীপুর এবং মানভূম অঞ্চলটি থেকে  
গায়কগণের না, এমন নয়। এ বিষয়ে প্রবন্ধের শেষে  
সময়টা অলোচনা করা হয়েছে। বিষয়টি ঠিক এই  
প্রস্তাবের প্রাসঙ্গিক নয় বলেই অধিক অগ্রসর হবার  
সমযোগ নেই।

উদ্ভাষ্য কুমুরের এই দিকটির কথা বোঝার  
প্রথমতম প্রণয় যখন কবিগণের মন বিবর্তিত কামত-  
বন্ধন তার তাঁর প্রকৃতিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আবিষ্কারের  
পক্ষে অনুমান দৃষ্টি বঙ্গবঙ্গকাল জামি তার সাহচর্য  
কাজ করেছিলুম। সারাক্ষণে, গত মহামুখের প্রথম  
কিছু। তখন তাঁর বয়স সত্তরের কিছু ওপরেই হবে,  
কিন্তু তাঁর সর্বশক্তি ও ইন্দ্রিয়লোকের তখনও খুবই  
প্রবল ছিল। সেইসময় আমার বয়স অল্প বলে তিনি  
আমাকে প্রভুত্ব করে নিন, বঙ্গ বহু চমকপ্রদ বিষয়  
কল্পনা করেছেন তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে। তাঁর দৃঢ়  
গাফিলি ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গানগুলি কুমুর  
গায়কগণের মন, বহু কাগ, তালের উত্তর পদগুলিতে  
নিরীক্ষণ করে তাঁর মতে 'সমগলি কুমুর পুষ্পায়ই  
না, এটা বহু কলকাতায় সেগুলির ভাষা ও গায়কীতে  
অভিযোজন ঘটে। কিন্তু সেগুলিও যা কুমুর গানের  
রূপে নিশ্চয়ই বঙ্গবঙ্গকাল স্বীকৃতি, পদগুলির বহুখালে  
প্রকাশিত। অতঃপর তিনি বলছেন। এই উক্তি

সত্যতা বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রসাকর-শ্রবণীয় বস্তু  
থেকে পূর্ণাঙ্গিত হয় এবং অধাপক শ্রীআশুতোষ  
ভট্টাচার্য্যও এরকম ইঙ্গিত স্বরন বিশেষে করেছেন।  
অবশ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সংগীতগত নিয়ে কিছু কিশিৎ  
অলোচনা যে হয়নি তা নয়, তার মধ্যে এই লেখকও  
আছেন; কিন্তু পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে প্রধানত  
প্রথমসঙ্গীতের দিক থেকে। সমীক্ষণের অপর একটা  
দিকও আছে, যা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। এই  
হ্রসবে সেটিও পরিষ্কার করে নিতে চাই। বলা  
বাহুল্য সেটি কুমুরের অন্তর্গত।

কুমুরের গায়নরীতি প্রধানত অববাহণধর্মী।  
ছড়ার দিকে এঁরা অবশ্য অনেকটাই যান, কিন্তু ক্রমে  
নেমে আসতে থাকেন বঙ্গগীতিতে এবং অবশেষে খালে  
এসে একটি পদে স্থিতিলাভ করেন। এই যে বঙ্গগীতি  
এটি আশ্চর্য সুন্দর এবং এর মধ্যে এমন একটি আর্ট  
আছে যা আধাবঙ্গের সঙ্গে অভাস না করলে আয়ত্ত  
করা সম্ভব নয়। এই অববাহণরীতি অত্যন্ত সুললিত  
এবং মনোরম। আরও একটা চিত্তকর্ষক বিষয় হল যে,  
অববাহণক্রমে অনুষ্ঠিত হলেও গানের চড়া এবং  
খাদের ভারসাম্যটি কিন্তু খণ্ডাখণ্ডভাবে রক্ষা করা হয়,  
যাতে সমস্ত গানটিতে একটি নিটোল ভাব থাকে।  
মাকে মাকে কিছুটা একঘোরে লাগলেও সর্বাঙ্গাঙ্গ-  
ভাবে সমগ্র গানটি খুব ভাল লাগে। তখন এটা  
বোঝা যায় যে, এই গায়কীটি লোকবীতির অন্তর্ভুক্ত।  
পূর্বে যে পদগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি  
পড়তে গেলে হয়ত লোকসঙ্গীতের পর্ষায়ে ফেলতে  
স্বিচার্য্য হবে, কিন্তু যখন কুমুরের ধারার  
রূপায়িত হয়, তখন যে আবেদনটি ফটে ওঠে, সেটি  
লোকসঙ্গীতের আবেদন। এক্ষেত্রে পদাবলী সাহিত্য  
অবশ্য খুব উচ্চ পর্যায়ের নয়। অপরদিকে কুমুরের  
আবেদন লোকসঙ্গীতের যে ছায়াপাত ঘটে, সেটি  
বাস্তবিকই এটা একটি ক্ষেত্র ছাড়া বোধ কান আর  
কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। এই গায়নরীতিকেই বলা

হয় বৈঠকী কুমুর।

অবশ্য বৈঠকী কুমুর ব্যতীত আরও নানা  
প্রকার কুমুর বর্তমান। আমরা সাধারণত রেডিওতে  
কেউ বা তথাকথিত লোকসঙ্গীতে কুমুরের নাম  
বা শুনি, তা একেবারে চটুল গানের নিদর্শন।  
অনেক সময় এতে সঁওতালি চত্তুর নকল দেখা  
যায়। এসব গান থেকে বৈঠকী কুমুরের কোনও  
পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ যে অববাহণধর্মী  
গীতের বৈশিষ্ট্য, তা এতে অর্পণ নেই, যা আছে, তা  
হালকা ছন্দের লঘুগতি। মাঝামাঝি এক স্তরের  
কুমুর আছে বা যথেষ্ট জনপ্রিয়। এইগুলির মধ্যে  
কিন্তু যথেষ্ট আর্ট রয়েছে। একটা উদাহরণ দেওয়া  
যাক :

মেঘ অঁধার রাতি বিজলি চমকে  
এমন সঙ্কট পড়ে এলে কার সাথে  
বঁধু, এত রাত কিসে।

এলে বঁধু ভাল করলে, তুমি বস পালঙ্কে  
তোমার পা ধুয়ে নমনকলে, মুছাইব কেশ  
যার সঙ্গে যার ভাব থাকে মরিলে না টটে  
লাল শালুক ফুল কটে অঁধারেতে।

বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রসাকর শ্রবণীয় বস্তু  
এই গানটির অবশ্য কয়েকটি ভাষান্তর বর্তমান।  
ভাষান্তর আছে বলে শুনছি; কিন্তু এই গানটির  
সঙ্গে পরিচিত নয়, এমন কুমুর-গায়ক পুরুল্লিয়ার  
বিরল। এতে অববাহণধর্মের মধুর গতিটি সুন্দরভাবে  
প্রকাশ করা যায় এবং এটি যে প্রচলিত কুমুরের  
একটি উত্তম নিদর্শন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই  
ধরনের দু-চারটি গান শুনলে প্রকৃত কুমুরের মাধুর্য  
সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়।

পুরুল্লিয়ার কুমুর সম্বন্ধে পূর্বে থেকে কিছু  
পরিচয় ছিল। এবারে বায়মন্ডি ব্লক যুব-অফিসের  
প্রয়োজনায় কুমুর এবং 'দুছা-নচ'-এর যে বাপক  
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, এপ্রিল মাসের

## র্যানব্যাখির গ্যালিক পার্লস্

কিছু তথ্য যা আপনার জ্ঞাতা উচিত

গ্যালিক পার্লস্ হল একটি রসুন  
হাল মিষ্টি ভেজত গুণের জন্য  
স্বাস্থ্যকর।  
স্বাস্থ্যকর গ্যালিক পার্লস্  
জানো রসুনের বাবজান প্রকার  
কার্যকর। রসুন রান্না করা,  
কাঁচা অবস্থা কাঁচা পুষ্টি আকারে ও  
গাফিলি মাংস - কিছু সর্বাঙ্গিক  
গ্যালিক পার্লস্ হল রসুন এমন  
প্রকার যা উচিত যা  
স্বাস্থ্যকর বেশী কার্যকর হয়।

কাঁচা রসুন নয় কেন ?



রসুনের কে বাস্তু  
চিবলে তাই তর  
চট শরীরের  
ভেতরে কাজ করে।  
কিন্তু চিবাবার  
সহজ আরও দ্রিষ্টা একটা গন্ধ লাগে।  
আর গিলে খেলে রক্তন করা নষ্ট করে।  
এক চমকিত পুষ্টিগত ক বার হয় না।



রাঁধা  
রসুন  
নয়  
কেন ?

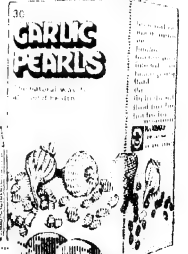
রসুন রান্না করলে তার  
ভেতর গুণগুলি চলে যায়।

## কেন র্যানব্যাখির গ্যালিক পার্লস্ ?

রানব্যাখি লাবারবিরত, যার অপর চিপসকমের আস্তা আছে - এমন  
তারা আপনাকে দিচ্ছেন গন্ধ ছাড়া কাঁচা রসুনের সমস্ত গুণগুলো।  
রানব্যাখির গ্যালিক পার্লস্ আছে সহজে হজম করার মত শুধু  
কাঁচা রসুনের রস, মরম মুকাদানার আকারে যার থেকে  
রসুনের সর্বাঙ্গিক ভেজত গুণগুলি পাওয়া যায়।

### র্যানব্যাখির গ্যালিক পার্লস্

- গ্যাস ও বদহজম দূরকার, ব্রুকের  
জ্বালায় আরাম দেয়।
  - গ্রন্থিক কোলাইফেল মাত্রা কমিয়ে আনে।
  - গাঁড়ির বাধা কমাতে সাহায্য করে।
  - অনবরত সর্দি কাশির হাত থেকে বাঁচায়।
- প্রাচীন রানব্যাখির গ্যালিক পার্লস্ খান।  
একটা স্বাস্থ্যকর অভ্যাস



সর্বাঙ্গিক স্বাস্থ্য লাভের প্রাকৃতিক উপায়



শেষের দিকে সেটি পর্ববৈষ্ণবের সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত উপকৃত হয়েছিল। ব্রহ্মের তরুণ ধ্বংস-আঁশসারি জি এম আবদুসসার সাহেব এই অয়োজনে এটি অঞ্চলের সমস্ত স্বাম্ভব-গয়ককেই একত্র করাইলেন। এদের মধ্যে ছিলেন অশীতিপূর বংশ সচাঁদ মহোদয়, বিশিষ্ট চোন্দ্রো শিল্পী গান্ধী সিং এবং অভিজ্ঞ ও রসজ্ঞ গোলাম মেহম্মদ সাহেব। এরা বিশেষভাবে সম্মানিত হন। কলকাতার বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত শিল্পী শ্রীদিনেন্দ্র চৌধুরীকে দেখলুম ছাত্রের ভূমিকা নিয়ে এইসব গানকে আকাজেডমিক অনুসন্ধানসা সহকারে অনুধাবন করছেন। এবারে অবিশ্রান্তভাবে বহু উৎকৃষ্ট বৈঠকী স্বাম্ভব শৈল্যবাসী সুযোগ হয়েছিল এবং আমার মনে এ সম্বন্ধে যে প্রধান সমস্যাটির উদয় হয়েছিল, সেটির যেন সমুদ্রের এই গানগুলির থেকে পাওয়া সম্ভব বলে ধারণা হল। এর পূর্বে, পুরুলিয়ায় এসে আকাশে মতো যখন টেকসই স্বাম্ভব শৈল্যে তখন এই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে এইটিই তথাকথিত কাড়খন্ডী কীর্তনের মূল ধারা; কিন্তু এবারে বহু নিদর্শন থেকে এই উপলব্ধি হল যে এই কাড়খন্ডী রীতিই পদাবলী কীর্তনের প্রাচীনতম রূপ, যাতে বাহুল্য বা অঙ্কুর নেই, কিন্তু প্রকৃত একটি আট এবং রস বর্তমান। পরায় ছন্দে রচিত বহু স্বাম্ভবের পদে সাধারণ্যে প্রচলিত পদাবলী কীর্তনের আলাপের ধারাটিও কিছুটা লক্ষ করা গেল; কিন্তু আধুরের প্রয়োগ নেই বললেই চলে, তার বদলে গুরুত্ব অধিকার করেছে “ধ্রুবা”, যাকে “রঙ্গ” বলা হয়। অধিকাংশ গায়ক তবলার সঙ্গত বর্জন করলেন, এমনকি হারমোনিয়মের সহযোগিতাও গ্রহণ করতে দেখলুম না। খালি গলায়, প্রাণীক পরিশীলন-ভুক্ত অবলম্বন করে তাঁরা যাদের পদ গাইলেন, তাঁদের নাম পূর্বেই উল্লেখ করছি। আমার মনে হল, খোলের সঙ্গত হলে তাঁদের এই লিম্ব, সুরেলা অকরাহণটি ঠিক ধরা যেত না এবং গানের নৈশল্যও ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হত। বরুণ একতারা বা দোতারার সহযোগিতা বোধ করি এই একক গান-গুলির পক্ষে উপযোগী হত। স্বয়ং বিনন্দ সিং একতারা বাজালেন।

এখন প্রশ্ন উঠছে, কাড়খন্ডী রীতির পদাবলী গায়ন কত প্রাচীন এবং এর ঐতিহ্য কোথায় নিহিত? আবও একটি প্রশ্ন, কেমন আন্দোলনের প্রভাব অথবা ময়াজের ধীর হান্সব্রের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের ফলেই কী এই রীতির উদ্ভব হয়েছে? যা সাধারণত আমাদের সর্বাঙ্গ প্রচারিত হয়ে আসছে।

এই দুটি বিষয়ে প্রবেশ করবার পূর্বে একটু বক্তব্য গোচর করা প্রয়োজন মনে করি। পদাবলী কীর্তন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ সম্প্রতি প্রয়াত পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সপ্তা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্প্রদায় আমার বহুবার আলোচনা হয়েছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় জানতে চেয়েছিলেন স্বাম্ভব সম্প্রদায় ধ্বংস প্রাচীন কোনও উল্লেখ্য চলন-চরিত্রসম্প্রদায়ে পাওয়া যায় কিনা। তদন্তের অমি তার কাছে সঙ্গীতরসায়নের বর্ণিত শব্দ সূত্র পর্যায়ের ‘কোম্বাড়া’ নামক একটি বহু সংগীত গোষ্ঠীর উল্লেখ করি। এর প্রকারভেদ ও লক্ষ্যাদি শব্দে তাঁর কাছে সেটি প্রাচীন স্বাম্ভবের আদি উৎস বলে মনে হয়েছিল এবং তদীয় ‘বাগমলার কীর্তন ও কীর্তনীরা’ গ্রন্থে তিনি এ বিষয়ে মত প্রকাশ করে গেছেন (পৃষ্ঠা ১৫)। বহু পরবর্তীকালে শতাব্দীর রচিত ‘সঙ্গীত দামোদর’ নামক সঙ্কলন গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে—কালক্রমে এই গীতধারাটি ‘শালগা সূত্র’ (অর্থাৎ, মিস্র এবং সহজতর সূত্র পর্যায়ের গীত) পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন এটি আর ‘কোম্বাড়া’ নামে পরিচিত ছিল না, তাকে বলা হত ‘স্বাম্ভব’। শব্দসংকলন বলছেন—একিঞ্চ স্বাম্ভবশোভিত শালগাঃ কথিতা ইমে (কলকাতা সংস্কৃত কলেজ প্রকাশিত সঙ্গীত দামোদর, পৃষ্ঠা ১১)। অর্থাৎ অপরূপ শালগা সূত্র পর্যায়ের গীতে যেমন একাধিক প্রকৃ-ভেদ বর্তমান, স্বাম্ভবের ক্ষেত্রে সেসব প্রকৃ-ভেদ ঘটে।

অতঃপর, আর একটু বিস্তৃত বর্ণনা প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে লেখা যচ্ছে—

প্রায়ঃ শৃংগারবহুলা মাধুনীকমধুরা মৃদুঃ একিঞ্চ স্বাম্ভব লোকে বর্ণাদিমিয়োজ্যকিতা, অতো লক্ষ্যমতোলা লোভহারি লিখিতঃ। অর্থঃ প্রায়শ্চিত্ত শৃংগারবহুল মৃদু এবং মাধুনী নামক সুরার মত মধুর স্বাম্ভবের একপ্রকারই দৃষ্ট হয়। এতে বর্ণাদি সম্পর্কে অর্থঃ লঘু, গুরু, মৃদু প্রভৃতি বর্ণের নিয়ম অনুযায়ী সন্নিবেশ, অথবা আরোহী, অবরোহী, সঙ্গারী প্রভৃতি বর্ণের সন্নিবেশটি নিয়মের অনুসরণ। নিয়ম পরিভাষ্য হতে থাকে। এইটুকুই এর লক্ষণঃ আর বিশেষ কোনও উল্লেখ্য দেওয়া হয়নি।

এইসব তথ্যানুসন্ধানে পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাৰ কট, কিন্তু কার্যত কিছুই হয় না। একটা উদাহরণও যদি না পাওয়া যায়, তাহলে বর্ণনার কোনও তাৎপর্য নেই। কেবল এইটুকু বোধগম্য হতে পারে যে, ‘স্বাম্ভব’ নামক গীতধারারটির ঐতিহ্য ধ্বংস প্রাচীন। দুঃখের বিষয়, পরবর্তীকালের লেখকগণ একটু খোঁজ নিয়ে এটুকু পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেননি যে, ‘স্বাম্ভব’ কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।

যাই হোক, এবার উক্ত দুটি প্রশ্নের মূল বিষয়ে আসা যাক। আমরা সঙ্গীতশাস্ত্রাদি থেকে এই গানের প্রাচীনত্ব ছাড়াও এতে যে গায়কের প্রচুর স্বাধীনতা ছিল, সেটাও জানতে পারি। মনোহরমহী পদাবলী কীর্তনে এখনও বড় বড় তালের ব্যবহার আছে; কিন্তু স্বাম্ভবে সেইরকম বাধাবাধি নেই। তথাপি রজবলিতে নিবন্ধ এমন বৈঠকী স্বাম্ভব অনেক আছে, যাতে নানান ধরনের তালের প্রয়োগ বর্তমান। কিন্তু সেগুলি কাড়খন্ডী কীর্তনের পর্যায়ে পড়ে না। স্বাম্ভবে যে কেবল শুরাশিলা, বাকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ এমন নয়, বিহারের বহু অঞ্চলেও নানা উপভাষায় এর বিবিধ প্রকারভেদ বর্তমান। এমনকি কলকাতাতেও লক্ষ করা যায়, দশভাঙ্গা, ভাগলপুর, মির্জাপুর অঞ্চলের বহু দরিদ্র অধিবাসী তাঁদের ভাষার একপ্রকার গান গেয়ে থাকেন যা পুরুলিয়ার স্বাম্ভবের মতই অস্বাভাবিক। এই-গুলিও স্বাম্ভবে পর্যায়েই গান। অতএব, এই সঙ্গীতের প্রভাবও বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আছে।

বৈঠকী স্বাম্ভবের যে ধারাটি পদাবলী সাহিত্যকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে, সেটি প্রধানত মিথিলার কবি বিদ্যাপতিজীর আদর্শরূপে গ্রহণ করেছে, তারপরেই চন্দ্রাবাসীর স্থান। উৎকৃষ্ট ও উচ্চাঙ্গের স্বাম্ভব, যা আজও শুনতে পাওয়া যায়, তা এই দুই কবির উদ্ভাবিত ধারা থেকেই প্রস্ফুট হয়েছে। খেতীর মহোৎসবে গানান্বীতি ধারার প্রবর্তনের বহু আগেই কাড়খন্ডী বিদ্যাপতিজীর সত্তার স্বাম্ভব সঙ্গীতে গ্রহণ করেছে, কেননা এগুলি সবই সন্নিবিষ্ট অঞ্চল।

বিদ্যাপতির গানকে, অথবা বিদ্যাপতির গাইবার শাইলকে গ্রহণ করবার পক্ষে কাড়খন্ডী নামক বহু জনপদের বেশ কিছু সুবিধা ছিল, কারণ বিদ্যাপতি যে ধারার প্রবর্তন করেন, তা চিত্রাচারিত পদ্যটি থেকে অন্য প্রকার এবং বাহুল্যবর্জিত। এ সম্বন্ধে বলতে গেলে মৈথিলী বিন্দস কবি লোচন ঋ প্রণীত ‘দ্ব্যন্তরগণনা’ নামক গল্পটির সহায়তা গ্রহণ করতে হয়। গ্রন্থটি পণ্ডিত বলদেব মিশ্র কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে, দশভাঙ্গা থেকে ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপরে এর আর কোনও সম্প্রদায় হয়েছে বলে জানি না। এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ হওয়া একান্ত উচিত ছিল, কিন্তু তাও হয়েছে বলে শুনিনি। লোচন ঋ সম্ভ্রদ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। রাগতরিশিগণী বইটি সঙ্গীতবিষয়ক হলেও তার দিক থেকেও অত্যন্ত চিত্রকর। এতে তিনপ্রকার ভাষার সমাবেশ হয়েছে, সংস্কৃত, হিন্দী (রাজভাষা), মৈথিলী দেশভাষা তথা অথর্ষ অর্থাৎ অপভ্রংশ বা

অপভ্রংশ। এমনকি, এই গ্রন্থে উপস্থিত জনদেবের কোনও কেনও সংস্কৃত পদও মৈথিলী মিশ্রণ দেখা যায়। বিদ্যাপতির পদেবহুই নাকি এই প্রকার প্রণীত পদে কিঞ্চিৎ মৈথিলী যোজন্য করা হয়েছিল। এটি তরিশিগণীর গ্রন্থভাগ বা টেকসই হাছে প্রধানত সম্প্রদায় কিন্তু উদাহরণগুলি বা দোহাগুলি সবই মৈথিলী ভাষায় দেওয়া হয়েছে। এই অপভ্রংশ কিন্তু অসম্মত কাছে দুর্দৃষ্টি নয়, কারণ তা প্রায় বাহুল্যই শাফিল।

এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক দেশের গানের এক একটি বিশেষ গতি আছে এবং সেই অনুসারে দেশে দেশে গানের গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হয়। মিথিলার এইরকম একটি গতির প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন স্বয়ং বিদ্যাপতি, তদন্তের অপভ্রংশকে অবলম্বন করে। এই নত উদ্ভাবিত গতিতে ‘মিথিলাগীতি’ অর্থাৎ দেওয়া হয়েছিল। প্রচলিত কাহিনী, যা লোচন বর্ণনা করেছেন, তা থেকে জানা যায় যে, একদা ভবভূতির কোনও একটি উপাখ্যান পূরণ-কাব্যের রূপ দিয়ে সুমতি নামক একজন কাম্যস্থ কুলোদ্ভব কথক রাজার কাছে সেটি গান করে ও কথকতার মাধ্যমে প্রচার করেছিলেন। এটি অতীত মনোগ্রাহী হয়েছিল। অতঃপর রাজা শিবসিংহ উক্ত কথকের পর জরতকে কবিশেখর বিদ্যাপতির হস্তে সমর্পণ করলেন। বিদ্যাপতি এবং জয়ন্ত—এরা দুজনে যে গীতরীতির উদ্ভাবন করলেন, সেইটিই মিথিলার রীতি বলে পরিচিত হয়েছে। বিদ্যাপতি স্মিহ করলেন, একটি গান যে রাগে গাওয়া হবে, সেই রাগটিকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করার জন্য তার ছন্দ এবং গতি নির্দিষ্ট করতে হবে এবং তার সঙ্গে উপযুক্ত স্থানে ধ্রুবারও পরিকল্পনা করতে হবে। অর্থাৎ, তিনি রাগ বা সুরটিকে মাত্র গ্রহণ করলেন, কিন্তু তালের দাসত্ব স্বীকার করলেন না। তিনি এক একটি রাগের আবেদন অনুসারে গানের বাণীকে এমনভাবে সাজলেন যে লঘু, গুরু, বর্ণের সমাবেশে, মাতানসারে (সংস্কৃত ছন্দের গণ-নিয়মও তিনি মানতেন) উক্ত রাগটি সমস্ত সৌন্দর্য্য নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠল। জয়ন্ত রাজসভায় বিদ্যাপতি পরিবর্তিত গানশৈলী সর্ধকতার সঙ্গে সম্পাদন করলেন। ওপর যিনি বিদ্যাপতির প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হলেন তিনি অন্ততঃশায়ী কথক হারহর মন্ত্রকের মধ্যম পদে বনব্যাঘ। তিনি তার তিন পত্রের সহায়তায় বিদ্যাপতির বহু কাব্যবর্ণে নিবন্ধ এইরকম গান রাজসভায় গেয়ে শোনালেন। রাজা নরপতি সেইসব গীত সংগ্রহ স্মিহতারে লক্ষণ অনুসারে লিপিবদ্ধ করবার জন্য তৎকালীন মিথিলার কবি লোচন ঋকে অনুরোধ করলেন। লোচন, তদীয় গ্রন্থে তাঁর নিজের রচিত বহু গানও সন্নিবেশিত করেছেন এবং রাজা নরপতি ও তৎপূর্ববর্তী রাজা মনিষা ঠাকুরের নাম প্রাধার সঙ্গে উল্লেখ করতেন। তাঁর গ্রন্থে আরও বহুজনের উৎকৃষ্ট পদসমূহ উদ্ধৃত হয়েছে।

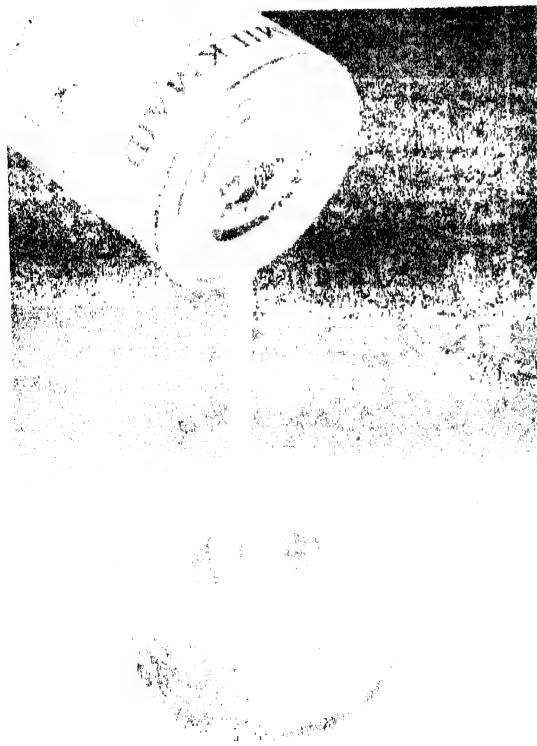
বিদ্যাপতি যে রীতি নির্দেশ করেছিলেন তার দুটি ভাগ, একটি ছন্দ এবং অপরটি গতি। লঘু, গুরু, বর্ণের সমাবেশ এবং মাতানসারে প্রত্যেকটি মাতাশ্রয়ী গানের ছন্দ নির্ধারিত হত; সেইসাথে সেই গানের সংখ্যা এবং ধ্রুবার স্থানও নির্ধারিত হত। এই ছন্দ অনুসারে গান করা হলেও, সাধারণত ওয়াতে তিনটি গতি অবলম্বন করা হত; যথা সত্ত্ব, মধ্যম এবং বিলাসিত। কখনও কখনও এই তিনটির মাঝখানে আরও একটি মধ্যম বিলম্বিত গতি অবলম্বন করে, চারটি গতিতেও গান করা হত। এইভাবে, মিথিলার রাগসঙ্গীতে মাতাশ্রয়ী তার প্রধানা থেকে বিকসিত হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপে লোচন ঋেরই রাগে জয়ন্তের ‘বরুণী’ গীত ‘রাজাগার’ গানটির উল্লেখ করা বলাচ্ছেন—এক্ষেত্রে ‘চক্রপট্ট’ প্রভৃতি মাতাশ্রয়ী পরিভাষ্য করে বিদ্যাপতি প্রণীত মৈথিলী রীতি অনুযায়ী সত্ত্ব, মধ্যম এবং বিলাসিত লয়ে গানটি রূপায়িত হয়েছে। এইভাবে তাঁর ভূক্ত (বিতরিত) প্রদর্শন ছবিটি



মিল্কমাইড  
চিলেন...



রুটিতে  
মাখিয়ে নিন..



টিন খুললেই  
খাসা  
গন্ধে-স্বাদে  
ঠাসা

সুস্বাদু  
সুস্বাদু



স্বাদেই  
তফাৎ বুঝবেন

প্রধান রাগ, রাগিণীসহ গাওয়া হত। এই বিশেষ প্রথাটি “মিথিলাগীতি” আখ্যায় স্বীকৃতিলাভ করেছিল। এই রীতি কেবল উক্ত দেশেই নয় অন্যান্য সন্নিকট অঞ্চলেও প্রচলিত হয়েছিল। এতদ্ভাষীতা, আরও রাগিণীসহ নবমি রাগ বিশেষভাবে মিথিলাতেই প্রচলিত ছিল। এই কারণে এদের সংকীর্ণ বাগ বলা হত। মনসম্মত রাগিণীসহ সাতানন্দইটি রাগকে তির্যক্ভিত্তি সেশীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি রাগ বা রাগিণীর আবেশন অনুসারেই গানের ভাবা, ভঙ্গ এবং গতি নির্ধারিত হত।

মিথিলার এই রীতি সর্বাপেক্ষে বিহারের কয়েকটি সন্নিকট অঞ্চলে প্রচলিত হয়েছিল এবং ঝাড়খণ্ডে আছে থেকে প্রচলিত ঝুমুরের পাশাপাশি এই রীতিও চলতে লাগল। কিন্তু, ঝুমুরের রীতিটা ছিল আরও উদার; অর্থাৎ বিদ্যাপতি বর্ষাধির নিয়ম মেনে চললেও উক্ত গানে তাও ছিল না; কারণ ঝুমুর ছিল বর্ষাধির নিয়মকানুনের বাইরে। অতএব, ধীরে ধীরে মিথিলা, রজবলী রীতিতে নানাপ্রকার পদাবলী রচিত হতে লাগল এবং সেগুলিও ঝাড়খণ্ডী রীতির অন্তর্ভুক্ত হতে লাগল। অবশ্য, ধ্রুবা এবং গতিতে বৈশিষ্ট্য বৈঠকী ঝুমুরেরও রীতিতে হয়ে এসেছিল। কিছুকাল পরেই চণ্ডীদাসের আবিষ্কার ঘটল। তাতে আরও একটি সুবিধা হল, কেননা বাংলা ভাষা অনেকটা প্রেরণা পেল। কথিত আছে, শ্রীচৈতন্য পুরাতন বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের পদ আরহের সাপেক্ষে শুনতেন। তিনি যে মিথিলায় ধারাত্তেই বিদ্যাপতি গান শুনতেন এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। চণ্ডীদাস অবশ্য শ্রীচৈতন্যের অবাবৃত্তি পুর্বেই ছিলেন এবং তাঁর ধারাও সম্ভবত মিথিলা ধারাকেই অনুসরণ করেছিল। অতএবের গান তিনি শুনতেন বরং মামোদারের কণ্ঠে এবং তাঁর পর্ষ্যতি ছিলো দক্ষিণ ভরতীয়, কেননা জয়দেব বড় পুর্বেই উড়িষ্যার মাধ্যমে সারা দক্ষিণ ভারতে পরিচিত হয়েছিলেন।

কিন্তু পরবর্তীকালে, নরোত্তম, শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ প্রভৃতি সকলেই বিস্তৃতভাবে ঝাড়খণ্ড পরিভ্রমণ অবকাশ পেয়েছিলেন এবং ঝাড়খণ্ডী ও মিথিলা রীতির সংগে তাঁরাও সর্বশেষ পরিচিত ছিলেন। কিন্তু উক্ত ট্রান্সিশন ভারী গ্রহণ করেননি। শ্রীচৈতন্যের বেশ কিছুকাল পরে, খেতরির মহোৎসবে নবোত্তম পদাবলী কীর্তনে একটি নতুন আঁট করে গড়ে তুলতে চাইলেন। বিদ্যাপতি, কবীর আবেদনকে বক্ষা করবার উদ্দেশ্যে যে তাঁলের বঁধাধরা নিয়মকে পরিহার করেছিলেন, নরোত্তম সেইটাই এরোগ কর, বৈষ্ণব পদমায়েনে সর্বাঙ্গিকভাবে আনতে চাইলেন। তাঁর ধারণা ছিল পদাবলী কীর্তনে অনেকটা ধ্রুপদের মত একটি প্রবন্ধসংগীতের আঁটসাঁট রূপ দেওয়া। তিনি করেও ছিলেন তাই; কিন্তু তাতে কীর্তনের তাল, মান এবং জটিলতা এত বেড়ে গেল যে আসল বস্তুই অনেকখানি চাপা পড়ে গেল। ফলে, গরগহাটি ও ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয়তা হারাতে লাগল। নরোত্তম যদি মিথিলায় রীতিটা অয়ত্ত করে দেখতেন এবং বিদ্যাপতির রসভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে সফলতর করতে সচেষ্ট হতেন, তাহলে হয়ত পদাবলী কীর্তনে মনের দিক থেকে একটা নতুন প্রেরণা পেতেন। কিন্তু তা না করে নরোত্তম ওস্তাদী রীতির প্রবর্তন করতে চেষ্টাছিলেন, যা পদাবলী কীর্তনের পেলবতার সহায়ক হতে পারত। বিদ্যাপতি স্বীয় অভিজ্ঞতা-স্বারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, একটা রাগ যে লালিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম, একটা তাল যে সেই অনুপাতেই তার পরিণত হবে, এমন কথা নেই। বরং, তার বিপরীতও হতে পারে, কারণ সেখানে একটা রাগ বিস্তৃতভাবে রসসৃষ্টি করে, সেখানে তাল তার সীমায়িত গাণিতিক নিয়মে গায়ককে তার পথ ধরে সংকীর্ণভাবে চলতেই বাধ্য করে। অতএব, যে সঙ্গীত, রাগ এবং মার্গভাষ্যকে অবশ্যম্ভাব্য করে, বিদ্যাপতি, মনে করতেন, তার বহুনি, রীতিনিষ্ঠ ও প্রকাশভঙ্গী স্বভঙ্গ হওয়া উচিত।

তাই, পদাবলীর অকৃতি-প্রকৃতির সংগে মার্গ-ভাষ্যের সংযোগ সন্তুষ্টি হতে না পারে, রাগের সূক্ষ্ম প্রকাশকে তাঁর সূক্ষ্ম পদে অব্যাহত রাখবার জন্যই তিনি রাগের পরিমপে ছন্দের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু, লয়ের দিক থেকেও তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, তাই ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রতিটি কালিকে লঘু, গুরু, বর্ণস্বারা নিরূপিত করেছিলেন এবং দীর্ঘ পদসমূহ যাতে একত্রে না হয় সেজন্য বিলম্বিত, মধ্য এবং দ্রুত—এই তিনটি লয়কেই যথযথভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। লোচন তাঁর গ্রন্থে এই রকম রচনার বহু দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন। এটা বিদ্যাপতির স্বেচ্ছাচারিতা নয়, এটা তাঁর অভিজ্ঞতালাভ কল্পেপাতিশ্রম। অ ছাড়া, যতদূর একটা ধ্রুবা ভোগ করবার পক্ষপাতীও তিনি ছিলেন না; সেটাও তিনি শোভনভাবে পদের বিন্যাস অনুযায়ী যথাযথভাবে স্থাপন করেছিলেন। এখানে কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, বাংলার মত বিদ্যাপতির অপভ্রংশও সংস্কৃত লঘু-গুরু নিয়মে চলেনি। চলন অনুসারে লঘু-গুরু নিরূপিত হয়েছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। শ্রী-মালব রাগে একটি গানের ছন্দ-লক্ষ্য সন্মত বলা হয়েছে:—

চতুর্ভিঃ সমমের সাং পদাধঃপুতুলৈঃ।  
গণৈঃ কলিঙ্গান কলসপদঃ শ্রীতস্ত্রৈব গায়তে।  
অর্থাৎ,—প্রতিটি পদাধঃ চারটি করে সমন মাপের চতুষ্কল (চতুর্মাত্রিক) বর্ণ সমাবেশে রচিত হবে।



অথোধ্যাপাধ্যাক্ষে আধিমাশী পদ্বীতে মারিটর দেহালে  
অলংকরণ  
কোনও কোনও ক্ষেত্রে কলারিবাধ বা গণনিয়ম অনুসারে (লঘু-গুরু, বর্ণের সংযোজন অনুসারে) নির্ধারিত এই বিভাগগুলি অবশ্য ন্যূন হতেও দেখা যায়। এই ভাবে ছন্দ পরিকল্পনা করে, শ্রী (শ্রী-মালব) গান করা হয়ে থাকে।

উদাহরণের খানিকটা উদ্ধৃত করি:—  
প্রথম পদর রাতি রজসে বহলা  
দোসর পদর পরিজন নিদ গেল।  
নিদ নিরুপইতে ভৌল অধরাতি  
তখন জাগল চণ্ডা পরম কুজাতি।  
তনই বিদ্যাপতি তখন কুজাব  
জেহে শুনমত সেহে জনপএ পাব।

এখানে কিন্তু ছবি ছয় মালয়ে তিনটি পদ ধরা হয়েছে এবং এক-একটি ছয়কে পদাধঃ বলে ধরতে হবে। উক্ত ছন্দ-নিয়ম অনুসারে এই অংশটি কিভাবে গীত হতে পারে, তার একটি নিদর্শন দেওয়া গেল।

প্রথম প। হরপতি। রজসে। হংলা।  
দোসর প। হরপতি। জননিদ। গোলা।  
নির্নিদ। পইতে। ভৌলঅধ। রা। তি।  
তখন জ। গলচণা। পরমকু। জাতি।  
তনইবি। ম। দ্যাপতি। তখনকু। জা। ব।  
জেহেশুন। মতসেহে। জনপএ। পা। ব।

এর ইতিবিশেষ হতে পারে, কিন্তু ভগাটি এইরূপ চতুর্মাত্রিক হবে।

এই রকম উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, বিদ্যাপতি তাঁর নিজের পদের উচ্চকৃত রূপায়ণ,

অর্থাৎ সেটা যাতে একটা উন্নত আঁট সংগীতের পরিণত হয়, সে সংকল্প কতখানি চিন্তা পোষণ করতেন। অপরপক্ষে, নরোত্তমের ধারণা ছিল প্রাচীন চিরাক্রান্ত উচ্চাঙ্গ নিম্ন সংগীতের রূপ প্রদান করলে পদাবলী উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত হবে। এই পরিকল্পনা সাধক না হওয়াতে মনে হরসাই রীতিতে কীর্তন আর একটা স বলাই হয়ে উঠল:— কীর্ত্ত তাতও অন্যান্য মিশ্রণ বহুল পরিমাণে আনতে হয়েছে। তা ছাড়া, বড় বড় তালকে মনোমসই করবার জন্যও চেষ্টা কম করতে হয়নি। আসলে পদাবলী কীর্তনের জন্য তে বড় বড় তালের সৃষ্টি হয়নি, হয়েছিল মার্গ সংগীতের জন্য। যেহেতু পদাবলীর গায়ন-পর্ষ্যতি ভিন্ন রকমের, সেহেতু এই তালবিন্যাসেও যথেষ্ট সংস্কার-সাধনের প্রয়োজন হয়েছিল। ক্রমে, প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিন্তা, গবেষণার পর মনোহরসাই-রীতি একটি আর্টে পরিণত হয়।

ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন বিষ্ণুপুরের আধিনায়ক হারিবার মল্ল নারীক নরোত্তম ঠাকুরকে আমন্ত্রণ করে, তৎপ্রবর্তিত কীর্তনের অনুষ্ঠান বিষ্ণুপুরে করেছিলেন—এ রকম জনসম্মতি ছিল, সেখানেও ঝাড়খণ্ডে যদি তার প্রভাব পড়ত তা হলে ঝাড়খণ্ডী রীতিতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হত। কিন্তু, তার কোনটাই হয়নি। এমনকি, সরকর মন্দারণ বা মল্লদের অধীন ছিল, সেখানেও স্বকীয় রীতিতে সংগঠিত মল্লারিণী নামক কীর্তন ধারার সংবাদ পাওয়া যায়। সম্ভবত—এটিতেও বৈঠকী ঝুমুরেরই প্রধান বংশী ছিল। “ঝাড়খণ্ডী কীর্তন” বলে একটি প্রেরণা নির্ণয় করেছিলেন পদাবলী কীর্তনের পূর্বেপেখকগণ, যারা গরগহাটি ধারা প্রতিষ্ঠিত হবার পর, তার প্রভাবে কীর্তনের অন্যান্য শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়েছিল, এই রূপ প্রমাণ করতে চেষ্টাছিলেন। এটা সত্য নয়; আসলে ঝাড়খণ্ডের পদগীতি তাদের স্বকীয় কবসঙ্গীত এবং সেই সংগে ঝুমুরও সম্পূর্ণভাবে মানভূম, পরোয়ীরা অঞ্চলের লোকায়িত সংগীতভাষ্য।

ঝাড়খণ্ডী রীতি এবং গরগহাটি তথা মনোহরসাই রীতির মধ্যে তফাতগুলি হচ্ছে এই:—

গরগহাটি এবং মনোহরসাই ধারায় একটি কনসার্টের বপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল, যাতে পদাবলী কীর্তন একাধারে একটি শাস্ত্রীয় রীতিতে এবং তা জলযন্ত্র গীতবাদের সমন্বয়ে একটি একতাক্ষকে গ্রহণ করা ত পারে।

ঝাড়খণ্ডী রীতি বা বৈঠকী ঝুমুরে গোর-চন্দ্রিকার ভূমিকা নেই। উক্ত নামে যে দু-চরটে গানকে চিহ্নিত করা হয় সেগুলি বাউল সম্প্রদায়ই প্রধানত গেয়ে থাকেন। বউল চৈত্রী ঝুমুর বলেও একটা কথা আছে। কোনও বৈঠকী ঝুমুরের আসল মৌরচন্দ্রিকা দিয়ে আরম্ভ হয় না, বরং গণেশ বন্দনা করতে দেখা যায় দু-একটি ক্ষেত্র—যা ছেঁ-নাচে প্রচলিত আছে। খোল, করতাল ইত্যাদি এই ধরনের আসরের বাজানো অবশ্যাবশ্যিক।

মনোহরসাই রীতি থেকেই যোধ কবি অখবের প্রবেশ বিস্তৃত হয়েছে; কিন্তু ঝাড়খণ্ডী রীতিতে অখবের পরিবর্তে ধ্রুবার (যাকে রঙ বলা হয়) প্রতি সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়। বৈঠকী ঝুমুর এবং নাচান-নাচেও এটি অতি মনোরমভাবে রূপায়িত হয়।

মনোহরসাই কীর্তনে একজন প্রধান গায়ক থাকলেও অপরায়ণ সহযোগিতার উপর তাঁকে প্রচুর পরিমাণে নির্ভরশীল হতে হয়। এটা পর্ষ্যতি যতটা পরিমাণে একক ততাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সমকর্তী। অতএব, মেলাটি এখানে যেমন একটি প্রধান অঙ্কন করেনি; কিন্তু বৈঠকী ঝুমুর বা ঝাড়খণ্ডী সাধারণত একক কণ্ঠের গীত হওয়াতে, মেলাভিত্তি প্রতি অভ্যাস্ত অধিক মনোযোগ দেওয়া হয়। গায়ক যদি সূক্ষ্ম হন, তা হলে পদাবলী অবলম্বনে যে বৈঠকী

ঝুমুর গাওয়া হয়, তার লীলায়িত সুরে মন্থ হতে হয়।

গরাণহাটি বা মনোহরসাই—এই দুটির কোনটিই বিদ্যাপতি-প্রবর্তিত মৈথিলী ধারাকে অবলম্বন করেন; কিন্তু ঝাড়খণ্ডী উচ্চ ধারাকে ওভলম্বার অবলম্বনই করেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রচার করে গেছে। ঝুমুর এই ধারাকে গ্রহণ করে একটা স্বকীয় কবামাধ্যমিক চিত্তাকর্ষক-ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

মনোহরসাই রীতিতে যাকে ঘটকালি বা কথকতার চকু বলা হয়, সেটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা পেয়েছে। এর প্রয়োগে পদাবলী কীতনে একটা অভিনয়ের ধারা আনা হয় এবং আসরকেও দীর্ঘায়িত করা হয়। ঝাড়খণ্ডী রীতিতে গানের মাঝখানে কথকতার অবকাশ রাখা হয়নি। পরন্তু এই ধারার গান অভ্যন্তর সংবেদনশীল হওয়াতে মেলটিতেই বা কিছু প্রজ্ঞা সব প্রকাশ হয়ে যাবার সুযোগ থাকে।

আসলে, হয়তো বড় চণ্ডীদাসের আমলে ঝুমুর এক-একটা পলা হিসাবে আচারিত হত; কিন্তু ক্রমে সেটা কমে আসতে থাকে এবং বর্তমানে বৈঠকী ঝুমুর একক সঙ্গীত হিসাবেই প্রধান লাভ করেছে। তবে, যদি কোনও উদ্যোগ, শৃঙ্খল ঝুমুরের পদাবলী দিয়ে একটি পাল্লা গাওয়াতে চান, তবে তার উপযুক্ত রচনা প্রচুর পাওয়া যাবে। ঝুমুর এখনও রচিত হয়ে চলেছে; কিন্তু মনোহরসাই পরোনো ধারাকে অবলম্বন করাই চলেছে কেননা নতুন পদ রচনার সম্ভাবনা বাংলার এ-প্রান্তে নানা পরি-স্থিতিতেই আর সম্ভব নয়। মহাকব্যের যুগ যেমন চলে গেছে তেমন পদাবলীর যুগও আর ফিরে আসবার নয়। পরুল্লিয়ার দিকের অবস্থাটা এখনও অন্য রকম। সেখানকার বৃহৎ জনসমাজ ঝুমুরকে তাদের জনপদের জাতীয় সঙ্গীত বলে মনে করেন। ছাল বৈঠকী ঝুমুরের আসরে যে কী পরিমাণ ইলেক্ট্রনিক হয তা না দেখলে কল্পনা করা যায় না এবং সেখানে আসর অরম্ভ হবার পর কোন রকম বিশালত্ব বা মেলমাখক ধ্যান শোনা যায় না। পরুল্লিয়ার বিশিষ্ট শিক্ষিত জনগণের অনেকে ঝুমুর সম্বন্ধে অভ্যন্তর সংবেদনশীল এবং এখানে বেশ উচ্চ সরের কাজও অরম্ভ হয়েছে নানা পারিপ্ৰেক্ষিকত।

ফলকথা এই যে, ঝাড়খণ্ডী, গরাণহাটি বা মনোহরসাই—এই সব রীতিই এক একটি বিশিষ্ট কম্পোজিশন। প্রত্যেকটিরই রূপরংগ সম্বন্ধে এক একটি উদ্দেশ্য এবং পরিচালনা ছিল। এদের মধ্যে কোনও প্রতিযোগিতার ভূমিকা আনা আমার উদ্দেশ্য নয়; শৃঙ্খল আমার বস্তু এই যে, পদাবলী গায়নে, ঝাড়খণ্ডী রীতিই প্রাচীনতম। বিদ্যাপতির গান থেকেই এর সূচনা। গরাণহাটি এবং মনোহরসাই অনেক পরবর্তীকালের কম্পোজিশন, সেটা ধারা-বাহিকতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। নয়তোম দত্ত—যিনি গরাণহাটি ধারার প্রবর্তক, তিনি ঝাড়খণ্ডী রীতির সর্বশেষ জ্ঞেও, বিদ্যাপতির রীতিকে তথা প্রাচীন উচ্চাঙ্গ ঝুমুরের পন্থাটিকে পরিহার করে, একটি স্বকীয় রীতির প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পদাবলী গায়নকে উত্তর ভারতের সর্বত্র প্রচলিত উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের দামিল করা। কিন্তু হয় তাঁর প্রবর্তিত রীতি কঠিন ছিল অথবা দেশ এই রকম একটি সৃষ্টিকে গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। অপর পক্ষে, মনোহরসাই শেষ পর্যন্ত বৈঠকী ঝুমুরের বহু আঁককক, এমন কি কীতপয় পদকেও কাজে লাগাতে সক্ষম করেননি। আমি এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ ইতিহাসকেই সর্বাঙ্গতর তুলে ধরোচ্ছি এবং ইতিহাস যা বলে, তাই বলতে চেষ্টা করছি—এব বোধী কিছু নয়।

তবে সব ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে, বৈঠকী ঝুমুরের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এতেও হয়ত অস্টো-ল্যা এবং উর্দুবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত কবি,

পাচালি প্রভৃতি ধারার প্রভাব কিছু কিছু পড়েছে, অথবা কবি ও পাচালিতে ঝুমুর থেকে বেশ কিছু আমদানি ঘটেছে। একটি চিত্তাকর্ষক উদাহরণ দেওয়া যাক :

বালি চন্দ্রমুখী      জি করিব সাঁখ  
কেন লক্ষণ্ট কুঞ্জ এল ন  
বিষাদের বাতি      জেলেছে শ্রীমতী  
ভাষাতে আত্মিত দিও না।  
ফিরে যাও হে মরম বঁধু  
এখানে দাঁড়িয়ে থেকে না  
নিবেদন করি, গাও ফিরে হরি।  
কত নারীর সঙ্গ      করিয়ছ রঙ্গ  
বঁধু, শ্রীমতীর অঙ্গ ছুঁয়েনা  
গোবিন্দদাস ভণে      আশা করি ঐ চরণে  
রাখে, মান করিলে শ্যামকে পাবি না।  
শূল ওগো পারায়ী      কহিতে বিচারি  
ফিরে গেলে শ্যাম আর আসিবে না।

(বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রসাকর, দ্বিতীয় খণ্ড)  
এই গোবিন্দদাস যে কে, তা এই লেখকের জানা নেই, তবে এটি বৈঠকী ঝুমুর হিসাবে গাওয়া হয়। এই ভাষাটিই, অষ্টদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কবিবন্দর রাসু ও নাসিহের কবিগানে (সাঁখসম্বাদ)



বৈঠকী ঝুমুরে হারমোনিয়াম সহযোগে গাইছেন তরুণ শৃঙ্খল

পাওয়া যাচ্ছে। তাঁদের পদটি সুদীর্ঘ, শৃঙ্খল প্রথম দিকের প্রায়জনীয় অংশটুকুই উদ্ভূত করি :

শ্রীমতীর মন      মানেতে মগন  
ওখানে এখন যেও না  
মনে করি কলহ আর বাড়ও না।  
বিষাদের বাতি      জেলেছেন শ্রীমতী  
ভাষাতে অহুতি দিও না।  
নিবেদন করি      ফিরে যাও হরি  
দুঃসারে দাঁড়িয়ে থেকে না  
কত নারীর সঙ্গ      করবছ কি রঙ্গ  
শ্রীমতীর শ্রীমঙ্গ ছুঁয়েনা। ইত্যাদি।  
(বেঙালীর গান)

এই পদটি মূলত গোবিন্দদাস নামক কবির রচনা বলেই মনে হয়। যেভাবে গানটি গাওয়া হয়ে থাকে, সেইভাবে এটি লিখিত হয়েছে। বঙ্গীয় সঙ্গীত রসাকর গ্রন্থে গানটি তিনবার উদ্ধৃত হয়েছে, বোধ করি তিনজনের সঙ্গর থেকে। মনে হয়, এক সময় গানটির জনপ্রিয়তা এত অধিক ছিল যে রাসু ও নাসিহ এটিকে তাদের দীর্ঘ সাঁখ-সম্বাদ পদের শীর্ষদেশে কিছু এদিক ওদিক করে, যুক্ত করেছেন। কিন্তু এ ছাড়াও আর একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী এই গীতঃশ্রুতিকে স্মরণীয় করে রেখেছে—সেটি নিধুবাবুর নামের সঙ্গে জড়িত।

রাসু-নাসিহের পদ থেকে যে অংশটি উদ্ধৃত হয়েছে, সেটি উৎকৃষ্ট কাব্যসম্মুখে গেয়ে আসা হচ্ছে টপ্পার আধিক্যে। গায়কগুরুপরা কবিরা আছে যে নিধুবাবু তাঁর প্রতি প্রয়াসভা শ্রীমতী নামনী শ্যালিকাকে উদ্দেশ্য করে, নিজেই নাকি এই গানটি রচনা করে গেয়েছিলেন। গানটি টপ্পা হিসাবে একটি উচ্চকার সৃষ্টি হলেও নিধুবাবু এটি কখনও করেছিলেন বলে মনে হয় না, কারণ নিধুবাবু এর রকম পয়্যার লিখতেন না এবং রাখকুণ্ডলযুক্ত পদ রচনার তাকে উৎসাহিত হতে দেখা যায়নি। তবে তিনি যদি শখ করে সুর দিয়ে থাকেন, সেটি অন্য কথা। কারুর অনুরোধে সুর দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। বহুদিনকার জনপ্রিয়তার মূলে কি ঘটনা নিহিত আছে, তা বলা খুব কঠিন ব্যাপার। গানটি এখনও কেউ কেউ বেতাবরে গেয়ে থাকেন—এই গানটি কিন্তু নিধুবাবুর কোন গীত-সম্মলনে বা অপর কোনও সম্মলনে গ্রন্থে নিধুবাবুর নামে দেখা যায় না।

এই রকম আর একটি পদ :—  
আসবে বলেছিলে ঠিক সময় কৈ এলে হে,  
বিফলেতে গেল আমার যামিনী,  
গত নিশি কোথা ছিলে কর প্রেমোত্তে

মজোঁছিলে

প্রভাতে কি কাজে এলে বল হে শূনি।  
ফিরে যাও হে প্রাণের বঁধু  
বাসি ফলে নাই হে মধু  
বিপদ হবে হলে তোদের লোকে জানাজানি।  
হেন যামিনী ভণে, প্রেম রাখিবী ফোপনে  
গলে বস্তু দিয়ে তোদের প্রেমকে প্রণামি,  
আমি জানি হে জানি বঁধুর মূখের ফুটানি।  
(বঙ্গীয় সঙ্গীত রসাকর, দ্বিতীয় খণ্ড)

প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়াল নীলকন্ঠ মূখোপাধ্যায় রচনা করেছেন।

তোমার হেরে অঙ্গ জলে  
ভূমি কি আশার এখানে এলে  
ফিরে যাও হে চিকন কালা  
বাসি ফলে কি মধু মেলে।  
গত নিশিতে কার কুঞ্জে  
কোন ফলেতে মজোঁছিলে  
সখ্যাবে মন রাখিতে  
প্রভাতে আসি দেখা দিলে  
ফিরে যাও হে রসময়, হয়েচে যে অসময়  
করে গেলে ক্ষুধার সময়, ভাল লাগে কি সুখ  
পেলে।

কন্ঠ কব এ প্রভাতকালে, কেন এলে  
চিকনকালা

কুজ বনে মৌনস্বরে গাইছে যত কুলবালা  
ফিরে যাও হে ভ্রমর বঁধু, শৃঙ্খল

কমল মধু  
চন্দ্রাবলীর কত মধু বস

এই দুটির মধ্যেও মনে হয় 'যামিনী' ভগিনীভুক্ত ঝুমুর পদটিই প্রাচীনতম। নীলকন্ঠের বিভাদে রচিত এই গানটিও ঝুমুরের পন্থায় পড়ে, কেননা গায়নরীতিতে ঝুমুরের বিশেষত্ব যথেষ্ট স্ফোটার।

এই রকম আরও বেশ কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রবন্ধক দীর্ঘ করবার প্রয়োজন নেই। এই দুটির উল্লেখ করা হল এটুকু মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য যে একদা ঝুমুর এবং অনার প্রচলিত সঙ্গীতে বেশ খনিরকটা আদানপ্রদান ঘটেছে। কবিগানে এমন অনেক গায়নরীতি ছিল বা রচনা রীতি ছিল, যাতে প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে একেরও ঝুমুরের প্রভাব অস্বীকার করবার মত নয় এবং এটাও অনুমান করা যেতে পারে যে, অনেক রচয়িতা ভাল ঝুমুরে গানের খোঁজ খবর রাখতেন। অর্থাৎ, ঝুমুরের ব্যাপকতা কলকাতাতেও যে না পৌঁছেছিল, এমন নয়।

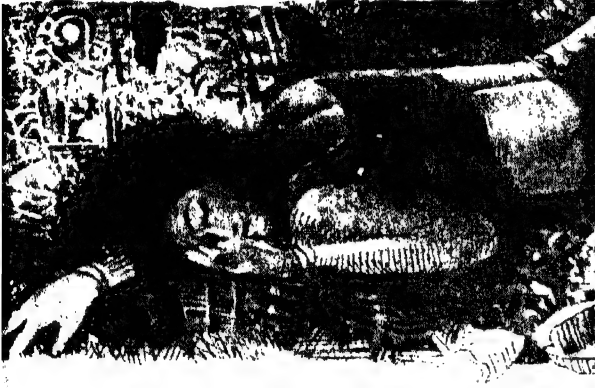
ছবিগদ্যি বাঘমন্ডি ব্রজ যুব দস্তুরের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

## প্রতিবেদন বলরাম বসাক

মানুষের দেখা পাওয়ার সৌভাগ্য তো কখনো হয় না, তাই আপনার সাত নম্বর পি এ সুন্দর জট-এর কাছে আমার এই লিখিত বক্তব্যটি রেখে যাচ্ছি। আজ, আমি আমাদের ব্রাণ অফিস থেকে পনেরো মিনিট আগেই বেরিয়েছিলাম। কাঁড়ি ধাব বলে। নতুন বিয়ে করছি বলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার জন্যে মনটা ছটকি করছিল। কিন্তু বাড়ি ফিরে ক'লে বেলটা টিপতেই বুঝলাম ওটা বাজছে না। দরজায় ধাক্কা মারতেই দেখি, ঠান্ডা করে তা খুলে গেল। ভেতরটা অন্ধকার। ঢুকতেই পায়ে কী যেন ঠেকল। উম্ম হয়ে জিনিসটা তুলতেই ফুলদানির টুকরো মনে হল। চিনেমাটির ফুলদানি। খুব সুন্দর দেখতে ছিল জিনিসটা। বউভাতে পেয়েছিলাম। টুকরোটা হাতের মটোর নিয়ে চুপ করে একটায় দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। চোখ দুটো আস্তে আস্তে খাপসা হয়ে গেল। ফুলদানির শোকে নয় ওটা গেছে তো কী হয়েছে? আসলে, মানে, এই যে ভাঙচুর।

উম্ম হয়ে আরো কয়েকটা টুকরো কুড়োলাম। টুকরোগুলো এদিক ওদিক ছিটকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার মানে ফুলদানিটা খাউব জোরে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল।

খাপসা চোখে একটা খুব জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। অন্ধকার বলে কিছু ঠাইর কসতে পারছিলাম না। পরে আরো ক'কি যেন ঠেকল। উম্ম হয়ে হাত বাঁলয়ে বাঁলয়ে দেখলাম—যা যা হাত ঠেকল, তার মধ্যে কতগুলো কাচের টুকরো। একটা টোপাল ল্যাম্প উল্টে আছে। একটা



পালিশের মগ যেন মনে হল, হাতের যা খেয়ে অনাবিলে গলত পড়তে চলে গেল। ভাঙা গেলাস ছিল হয়তো একটা—জুতার টোকাও খোঁজ কনকন শব্দে আমার খানিকটা ভেঙে গেল। কতগুলো বড় বড় আয়নার টুকরো হাতে উঠে আসতেই আমি অধিক উল্টলাম—এ-একি, ভ্রুসং চোখদুটোও ভেঙে ফেলছে না কি। তাড়াতাড়ি সইচবোডের দিক দূর পা এগিয়ে গিয়ে, হাত বাড়িয়ে সইচবোডে আঙুল রাখলাম, রাখবার সাথে সাথে, হাত কনই বাক মের দড় একগল্লাে কিংকম ঝিকম্ করে উঠল। শক্ খাচ্ছি মনে করে তাড়াতাড়ি হাতটা আঁকুনি দিয়ে নাকির ফেললাম। মনে হল, সইচবোডটা ঝলছে। চারদিকে তার ছিঁড়ে একটা এতো বড় মাকড়সার মনে করে ঠাংগলো বের করে রেখেছে। অন্ধকার অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল বলে, মনে হচ্ছিল সত্যি সত্যি একটা বিশাল মাকড়স। আমার ঘরে ঢুক পড়েছে। ভাবলি ক'বুকাটা চিব চিব করে উঠবে না? অবশ্য ফাটটা পাকর সমসই দেখাচ্ছিল। সইচবোডটা অলপাকতর ভাঙা। এখন ওটা হাত দিয়ে যেন মতো ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছি। দেখে দাঁত দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সইচবোডে ভাঙার উপেক্ষা ঘরে যাতে আলো না জ্বলে। সবেবেলা ঘরে আলো জ্বলবে না—ভাঙলে মাথাটা কিছুতেই ঠান্ডা রাখা যায় না, সার।

ক্রমে ক্রমে দেখলাম টোপাল চেয়ার সব উল্টেপাল্টে রয়েছে। অনেকক্ষণ অন্ধকার থাকার জন্যে একট, একট, করে ভেতরের ভাঙুর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। শোবার ঘরে ঢুকতেই দেখি, আরো কাচের টুকরো, গেলাস-জিনের টুকরো। দেয়ালের প্লাস্টার অনেক জায়গাতেই চট উঠেছে। গেলাস, ডিশ, সসপ্যান, কপ, আস্তে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভাঙা হয়েছে। আলমারির কাচ ভাঙা। পতলগুলোর কোনকি ম'কু নই। কোনটার হাত-পা নেই। কোনটার বিগের নেই। সব গড়াগড়ি খাচ্ছিল। গড়াগড়ি খাচ্ছিল রাইসকুকার। হিটাবের সিগা ছিটকে বোঁয়ে পড়েছে। দেখতে দেখতে চোখ দুটোতে জল ধরে রাখতে পারছিলাম না, খাটের ছত্রগুলো আঁক ওঁক ছিঁড়িয়ে পড়েছিল। খাটের ওপর বিছানার চাদর এলোমেলো। কোলবাঁলিশ ছিঁড়ে তুলো বোরিয়ে পড়েছিল। ঠিক তাইই পাশে বুক দিয়ে পড়েছিল। ফু'সে ফু'সে কানিচ্ছিল। কাপড়গোড় একেবারে এলোমেলো। কতগুলো এমন খোলা অবস্থায় ছিল যে, মনে হচ্ছিল যেন খাপসা করে পড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।



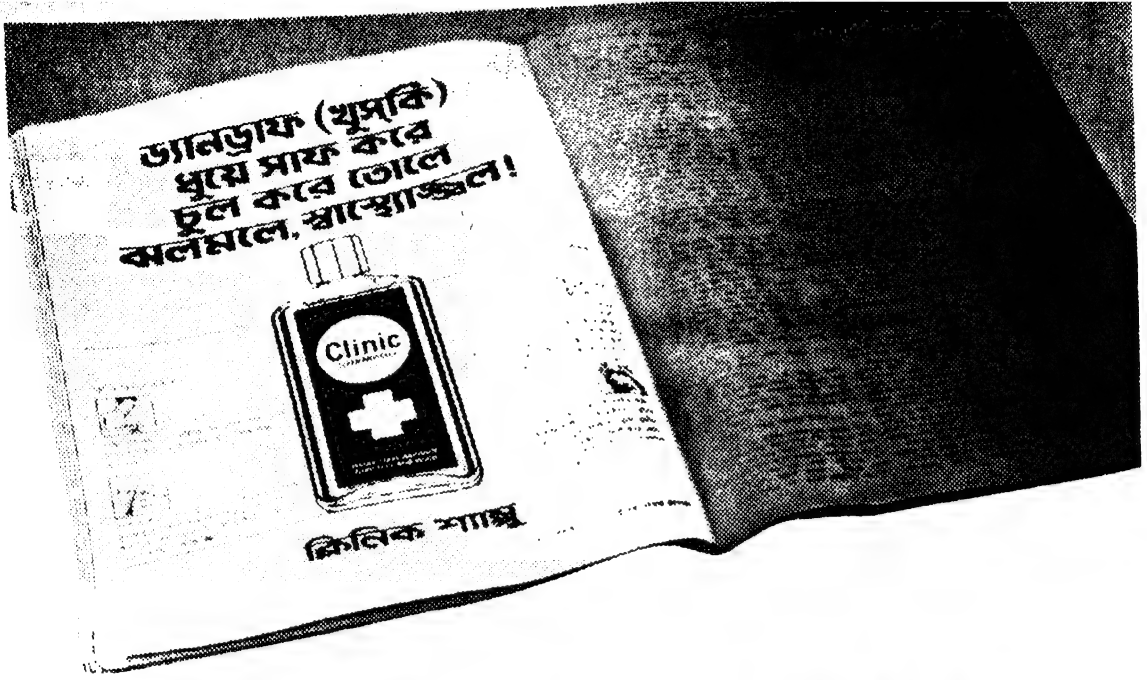
উপর অপরং থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত নন্দ উজ্জ্বল ধবধবে পা দুটো থরথর করে কাঁপছিল।

ইচ্ছে হয়েছিল, অতীত ক'শ গলার রক্তাক্তে ডাকি শাস্প, কিন্তু ত'না করে শ'খ, একবার গলা খাঁকারি দিলাম। তাই শূন্যে আরো জোর জোর ফেস ফেস শব্দ কানে এল। পা দুটো আরো থরথর করে কাঁপল। পিঠখান ওপরে। হাতের একটা বকর তুলায়। আরেকটার ওপর ম'খ গুঁজে শয়ে ছিল। কী যে হয় ওর মাকে মাঝে। একটা দীর্ঘ নিব্বাশ ফেলতেই হল, সর।

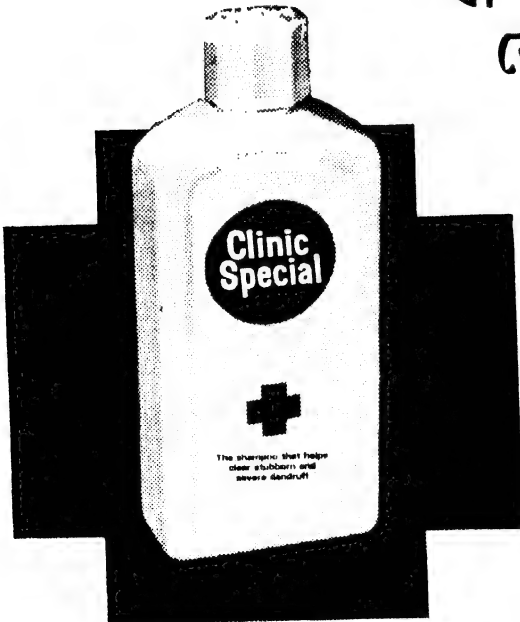
আপনি তো সবই ন্যনেন। আর কয়েক মাস হল বিয় হয়েছ। এখনও আমার ওপর তেমন টান আসেনি। মাঝে মাঝে অকারণে আচমকা বেগেমেগে কাপ ডিল গেলাস ভেঙে ফেল। অলমারি খুলে লাড়ি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেল। বাসহকাসন ছিঁড়ে দেয় আঁক ওঁক। তারপর বিছানার পড়ে পড়ে কাঁদে। কিন্তু আজ ও বন্ধ বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।

পছন্দ হয়নি আমাকে। হয়তো অন্য কোথাও ওর মন পড়ে আছে। এইভাবে জোর করে কি ওকে বাধ্য করানো যায় আমার ঘর-সংসার করতে? সেপ্টাল অফিসের ওপরতলা থেকে আপনার নোট এল। বিশেষ অনুরোধ। শাস্পকে যেন আমি বিয়ে করি। আপন, শ'নোঁছ, শ'তিনেক কোম্পানীর জোড়ের মালিক। সবচে বড় ক' আপন। আপনার পি এ-বদরই শ'খ দেখা পাওয়া যায়। আপনার দেখা পাওয়ার সৌভাগ্য কারুর হয় না। এমন বসের বিশেষ অনুরোধ মানেই বিশেষ আবেশ। আর সে আবেশ অমান্য করার অত শ'ছি আমার নেই। তাই শাস্পকে বিয়ে করছি। তাই নীরব থাকে আর আমলই দিই নি। বলতে পারেন, মনের মধ্যে তাকে একট





কিন্তু... আপনার খুস্কি যদি  
নাছোড়বান্দা ও জোরদার  
ধরনের হয়, তাহলে আপনার  
দরকার এমন এক শ্যাম্পুর  
যা ক্লিনিক-এর চেয়েও  
বেশী শক্তিশালী !



নতুন

## ক্লিনিক স্পেশাল

ক্লিনিক-এর ওপর আপনি যে যথেষ্ট সজ্জা তা আমরা জানি, কারণ এটি আপনার খুস্কিতে অনেক কাজ দিয়েছে। কিন্তু এমন লোকও আছে যাদের খুস্কি একেবারে নাছোড়বান্দা ও জোরদার ধরনের। সেজন্তেই আমরা এক নতুন ফর্মুলার শ্যাম্পু তৈরি করেছি যা, এই ধরনের নাছোড়বান্দা ও জোরদার খুস্কিও ধুয়ে সাফ করে দেবে— এমন কি, ক্লিনিক-এর চেয়েও অনেক বেশী কার্যকরীভাবে। এ ত'ল ক্লিনিক স্পেশাল তার মানে এখন পাবেন দু'ধরনের ক্লিনিক। ক্লিনিক—সাধারণ খুস্কির জন্য। ক্লিনিক স্পেশাল—নাছোড়বান্দা ও জোরদার খুস্কির জন্যে। এবারে খুস্কির সব সমস্যার সমাধান।

স্ট্রুভান লিমিটেড-এর এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

স্বপ্নে দিয়ে রেখেছি। কিন্তু সেও তো মন থেকে তাকে ধরে রেখে ফেলার জন্যে খুঁজে চেষ্টা করে যাচ্ছি। আর সাথে তো আর কোন রকম যোগাযোগ রাখিনি।

গলার ভেতরটা আর জল জমেছে, সার। কিংবা কফ। প্রবলত এই সময় কিশল হয়ে যায়। দুটো চোখ আপনায় হয়ে যায়। আমার চ্যাপ্টা কত সুন্দর। ঐ চ্যাপ্টার কালকনি থেকে অবশ্যাকারে কলকাতার বাড়িঘর, গাছপালা, রাস্তা মনোভেদে ভিত্তোরিয়া মেমোরিয়াল, হাওড়ার পুল, আর ঘন নীল আকাশের ছায়ে থাকে—সব দেখা যায়। চ্যাপ্টার ভেতরে কত সুন্দর সুন্দর ফ্যানিচার কিনিবে, কত পুতুল, কাপড়চোপড়, কী কত কি। সবই কোম্পানীর টাকায়। সবই আপনি কব দিয়েছেন। অথচ কি বলব, ঠিক এরকম ফ্রাণ্টেই স্বপ্ন দেখেছিল নীরঞ্জন। এর সাথে দুটো কত সুন্দর নরম আর শান্ত ছিল। মেজাজী একদম ছিল না। দেখতে তেমন ভাল ছিল না, আর ওর বাবা খুবই গরীব ছিল। সে জনেই ওকে বিয়ে করা উচিত ছিল আমার। দাঁতে দাঁত চেপে ভাবছি এ সব। চোখে কেন যে জল আসছে। এইভাবেই কেবল হয় অপরাধীরা দাঁতে দাঁত চেপে বিবেকহীন সহ্য করে। তাই না, সার?

মনে পড়ে যায় আপনার তের নম্বর পি এ শান্তনু, যাজ্ঞিক আমার হোস্টেলে কী রকম উদ্ভৃকাসে ছটে এসেছিল। ওর হাতে ছিল আপনার নোট। আর সেই নোটের সংস্পর্শে একটা আলাদা কাগজ এনক্লজড করা ছিল। তাকে ছিল শম্পির বোয়োভাটা। আপনি লিখেছিলেন, শম্পি খুব ভাল মেয়ে। ওকে বিয়ে করলে আমি সুখী হব। আর আপনিও খুশী হবেন। কোন অসুবিধে হবে না। অসুবিধেয় পড়লে আমি যেন তাকনি সমস্ত অসুবিধার কথা পুণ্ডানপুণ্ডভাবে আপনার পি এ-সেভেন সুন্দর ভাটকে জানাই। তাই তো আজ ছটে এসেছি। সুন্দর ভাটের কাছে এই বস্ত্র রাখছি। আজ শম্পি অনেক বেশী বাড়িবাড়ি করে ফেলেছে। আজ ও টিউব লাইটও ভেঙেছে। রৌণ্ডটাও আছাড় দেবে ভেঙেছে। স্টোভখানা ছুড়ে ফেলে দিয়েছে টান মেয়ে। কেরোসিন তেলে মেঝের অধ কটা ভিজ়ে গেছে। জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো কিংবা দেশলাই কাঠি পড়লে, দাড়ি দাউ করে আমার ঘরে আগুন জ্বলে উঠতে পারত। ইলেকট্রিকের তারে আগুন ধরে যারনি, তাই আমার ভাগি। আমার ভাষণ রাগ হয়েছিল। কী ভয়ঙ্কর রাগ হয়েছিল বলে বোঝাতে পারব না। অফিস থেকে ফিরে কোন মানুষই স্বেচ্ছায় হোস্টেলে থাকতে চায় না। ঘরে থাকতে চায় না। ফুটপাথে ফুটপাথে হেঁটে বেড়াতে চায় না। বাড়ি যেতে চায়। বাড়ি মানে খুঁউব সুন্দর একটা নিষ্কল আশ্রয়—যাকে লোকে বলে ঘর, কেউ বলে সংসার—আমি যে সেটা এখনো পাই নি, সার। —এখনো কপালে জুটল না।

২ ২

অফিস থেকে ফিরে এই ভাঙুর দেখলে মেজাজ কি ঠিক রাখা যায়? বিছানায় লক দিয়ে শূন্যে মূখ গুঁজে কাঁদছিলাম। একবারও আমার দিকে ফিরে তাকায় নি। ইচ্ছে করছিল, চুলের মাটি ধরে একটা চড় কষাই। কিন্তু তাকনি আপনার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। আপনার দয়ার কথা। আপনি আমাকে চাকরি করে দিয়েছেন। চ্যাপ্টা দিয়েছেন। কউ দিয়েছেন। অফিসে সব উচ্চ পদ দিয়েছেন। তাই আপনার কাছেই ছটে এসেছি। বলে দিন, এখন কী করি:

আপনি নোট য়া যা লিখে পাঠিয়েছেন তাই করে গেছি। সেদিন বাড়ি ফিরে খবার আগে আমাদের পড়ার দৈর্ঘ্যনার দোকান থেকে একটা মোমবাতি কিনে নিয়ে গেছি। মোমবাতি জ্বালিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে, ওটা ছোট একটা টি-স্টেবল রেখে বিছানায় বসেছি। তাকপর যা যা বলেছেন তাই করেছি। প্রথম ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছি। দেখলাম, আরো জোরে জোরে কাদতে লাগল। ওখন চুলের ভেতর আঙুল ডুবিয়ে চিরে চিরে দিলাম। খুব নরম গলায় আস্তে আস্তে ডাকলাম, 'শম্পি'। এইভাবে ডাকতেই দারুন ফল দিল সার। গাটা আর শক্ত করে রাখল না। কেনম তুকতুক নরম হয়ে গেল। ওখন ওকে আস্তে আস্তে টেনে বকে তুলে নিলাম। পিঠে হাত বুলিয়ে দিলাম। দিতেই ও কী রকম হাউ হাউ করে অঝোরে কাদতে লাগল। তাই ঠেঁট ঠেঁট রেখে অনেকক্ষণ চুম খেয়ে খেয়ে ওর সজোরে কান্না বন্ধ করলাম। আমার জামা দিয়ে ওর চোখ মছিঁয়ে দিলাম। দেখলাম, ঘরের জিনিসপত্র ভেঙেছে বলে ও খুঁউব আফসোস করতে লাগল। আমি ওকে সাহসনা জানালাম। বললাম, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আবার সব হয়ে যাবে। বলতে বলতে আপনার কথা মনে পড়ল। আপনার দয়ার কথা—। আপনার কথা, আপনার দয়াতেই আমার কী রকম উজ্জীত হয়েছি ওকে বললাম। বলতেই, সার, দেখলাম ওর মূকতা কী রকম হয়ে গেল। কপাল গৌজ করল। কেন, করল বৃকতে পারলাম না। তাকপর আস্তে আস্তে আমাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরল। অনেকক্ষণ আমিও নানা-জবে আদর করলাম। সারারাত ওকে বকে নিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে শূন্যে থাকলাম।

ঘরের ফ্যানিচার যা যা ভেঙেছে, সে সব খুব সকালবেলা উঠে এক জয়গায় একর কললাম। পুণ্ডানো ডাঙাচোরা জিনিস যারা কেনে, তাদের কাছে বিক্রি করত বলে রেখে দিলাম। নিজের হাতেই ইলেকট্রিকের লাইনটা ঠিক করলাম। ইলেকট্রিকের কাজটা জানা ছিল, তাই করলাম। সেই বোঝা অবশ্য ছাত্র-মিস্ত্রী ভেবে মজবুত করে বানিয়ে নিয়েছি। এখন তো আর কোম্পানীর কাছ থেকে নতুন করে সব ফ্যানিচার প্রার্থনা করা যাবে না। তাই শম্পিকে নিয়ে ব্যাপেক গেলাম। আমার সেভিংসে যৎসামান্য যা জমে ছিল সব তুলে ফেললাম। এবারে শম্পির পছন্দ অবশ্যেই পিঠিও, রৌণ্ড, একটা টি ভি (ইনসুলেমেট), কানের সরকট সেট, টি সেট, কফ সেট, ডিনার সেট, কুকার, হাটর, স্টোভ, পুতুল, ফুলদানি বসুড়াক

প্রেমচন্দ্রের অরণীয় রচনা

পঞ্চ পরমেশ্বর ১৪

চিত্ররঞ্জন মাইতির উপন্যাস

আর্থ অনার্থ ২২

কালের কল্লোল ১০ মোহিনী ১১

দিল্লীর বিখ্যাত শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ শান্তি ঘোষের



শিশু পালনের

অভিধান ২৫

তাপস গঙ্গোপাধ্যায়/পিনাকী চট্টোপাধ্যায়

বনে বনে ১২

তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত যুগ্ম উপন্যাস

গণদেবতা

মাত্র ৩০ টাকায়।

৩০

গণগ্রাম

সর্বসাধারণকে ২০% ছাড়

ঈশপ রচনা সমগ্র ১৫

শার্লক হোমস অমনিবাস

চার খণ্ড বেরুল।

জুল ভের্ন রচনাবলী

৬ খণ্ড বেরিয়েছে।



অগ্রীম বর্ধন সম্পাদিত

বিশ্ববিখ্যাত সায়েন্স ফিকশন ২০

ফ্রেন্স, আমেরিকা, ইংলিশ এবং রাশিয়ান সাহিত্য থেকে বিশ্ব-বিখ্যাত চারটি উপন্যাস ও তিনটি কাহিনীর অনুবাদ

বীর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

দেশ বিদেশের ভৌতিক কাহিনী ১২

দেশ বিদেশের অলৌকিক কাহিনী ১২

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১৪, বঙ্কিম চার্জার্সি স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

# আপনিই দেখুন, দেনা ব্যাঙ্কে আপনার জমা টাকা কেমন তরতরিয়ে বেড়ে ওঠে...



## সমৃদ্ধি

### জমা যোজনা

আপনার জমানো টাকা  
তরতরিয়ে আশ্চর্য গতিতে  
বেড়ে উঠার মূল কারণ হল  
আপনার আসল মূলধনের  
সাথে সাথে অজিত সুদও  
সুদ আয় করছে... সুদের  
ওপর সুদ, তথা সুদ।  
১২ থেকে ১২০ মাসের  
মেয়াদে ১০০ টাকার মূল্য  
সংখ্যায় অর্থ লব্ধী করুন।

### ক্রম-পঞ্জিত জমা যোজনা

আপনার আজকের মাসিক  
সঞ্চয়কে ভবিষ্যতের  
মোটরকম খোক টাকায়  
পরিণত করুন। সঞ্চয়ের জমা  
আপনার পছন্দমত মূল্য  
সংখ্যা বেছে নিনঃ  
৫ টাকা থেকে ৫০০ টাকা।  
মেয়াদকালও যুগ্মিত বাছুনঃ  
১২ থেকে ১২০ মাস।

### মেয়াদী জমা আমানত

সুখের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার  
জগো আপনি এই টাকা  
নিরাপদে সরিয়ে রাখতে  
পারেন। আপনার টাকা  
দীর্ঘ মেয়াদকালের জগো  
জমা করে বেশী হারে সুদ  
আয় করতে থাকুন।

## ক্যাশ

### পার্টিসিকেট

এক নিরাপদ জমার শি যা  
আপনার আপনি বেড়ে উঠে।  
এই পার্টিসিকেট প্রতিমূল্য  
সংখ্যায় পাওয়া যায়ঃ  
২৫ টাকা, ১০০ টাকা,  
১০০০ টাকা, ১০,০০০ টাকা,  
৫০,০০০ টাকা ও  
১,০০,০০০ টাকা।



## দেনা ব্যাঙ্ক

(একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্বাবধায়িত ব্যাঙ্ক।)

সেণ্ট্রাল অফিসঃ মেকার টাওয়ার ই,  
কাফ প্যারেড, বম্বে ৪০০ ০০৫

আরও বিশদ বিবরণের জগো আপনার  
নিকটতম দেনা ব্যাঙ্কের শাখায় চলে আসুন।

জনগণের উন্নতি ও সমৃদ্ধির সেবায় সম্মিলিত

ঘোড়া, পেন্টিং, দু-তিন রকমের ১০ন সেট কসমোউজ, চাররকম শার্ড, খুব সুন্দর ডিজাইনের তিন জোড়া বেড সীট, টেক্স ক্রপ, আলবার্ন ব্লক, রুপোর জড়িত সেট—সব সব কিনে ফেললাম। শপিংকে নিয়ে মাঝে মাঝে অভিজাত হোটেল গিয়ে রাজকীয় ডিনার খেলাম। সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা সবই দেখিয়েছি। আর লগ্নে লগ্নে লক্ষ করছি ওর মধ্যে কটা উৎকর্ষ ধরনের মেজাজ ফিরে আসছে। কয়েক মাসেই হই-হু-হু-হু হাসি ঠাট্টা শুনতে পাই। কিন্তু সারি, কতদিন তার আশ্রয় কখনো গেলো, আবার কেমন যেন চুপচাপ বসে থাকে। কথা বলে কম। মাঝে মাঝে পড়ে পড়ে ঘুমায়। মাঝে মাঝে রাসাতোমা একদম ভুলে যায়।

আজ অফিস থেকে ফিরে দেখি আবার সেই অশ্রুকার। আবার সেই ভাঙচুর। স্ট্রিটও, রেডিও, টি ভি, ফানিচার, গেলান ডিশ কাপ, ফোনে জেং সং টেক্সের কাচ, পেন্টিং, টিউবলাইট, টেবিলল্যাম্প, কিছু কিছু রাখা আছে। সব টেক্সের টেক্সের করে ফেললে। আমার যৎসামান্য সেভিংসের টাকায় এই সব কিনেছিলাম। কী রাগ যে আমার হচ্ছে, আমি আপনাকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না। আমার পা দুটো ধর ধর করে কপিছিল। দাঁত ঠক ঠক করে কপিছিল। নিজের শেষ রাজকীয় দিয়ে সারা, আপনার কথামত সংসারটা আবার ঠিকমত গড়বার চেষ্টা করেছিলাম—এই হল তার হাল। আমি নিঃশেষ হয়ে গেলাম। কয়লাঘর ঘরে একটা পুনোনা তারকটির টেক্সের পড়েছিল, সেটা একটানে বার করে আনলাম। আমাকে আর্পন মাপ করতেন, সার। আমি তখন রাগে অশ্রু, আমার মাথায় চড়াও করে বসে উঠে গেছিলাম। গাড়ি অশ্রুকার শোবার ঘরে ঢুকে, কোর্নদিকে খাট ত্যা একবার শখ, হাটর করে, তারপরে খাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে, প্রিন্সিনায় পড়ে থাকা এক হাটুতা ফোঁস ফোঁস করতে থাকা আবছা-আবছা শপিংকে একবার যেন লক্ষ করলাম। পরক্ষণেই তার পিঠ লক্ষ করে তারকটি দিয়ে চাবকের মত মারতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পর খোঁয়া হল কোন যন্ত্রণার কাতর শব্দ শুনতে পারছি না তো। শপিংকে কি মেরে ফেললাম?

তখন একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে, দেখলাম শপিং বিছানাকেই নেই। শখ, বিছানার ওপর তোশক ছিটকি হয়ে আছে। তারকটির চা খেয়ে খেয়ে, পাশ-কালিশটাও বাঁধস মতন দেখতে হয়েছে। চারদিকে তুলো ছড়িয়ে পড়েছে। শপিং বিছানায় নেই। সারা ঘর, বাইরের ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম, কয়লাঘর। পালের ছাউনীতে, ওপরে, বাড়ির কাছাকাছি সর্বত্র খুঁজলাম। শপিং সব ভেঙেচুরে কোথায় যে চলে গেছে... এখন বলুন, কী করি?

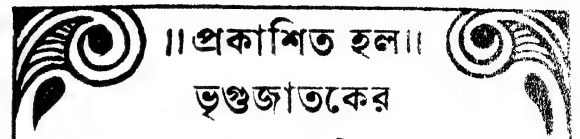
২ ৩

আপনার মোট অনুসারে পুলিশে থাকা দিয়েছি। তাৎক্ষণ আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি গেছি। কোথাও না পেয়ে শুন্য বাসায় ফিরে এসেছি। ঘরের ভেতর খুঁসে-খুঁসে। বেশিক্ষণ চোখে দেখা যায় না।

ছাটো তলা কাটাগিয়ে, অফিস থেকে একদিনের ছুটি নিয়ে এসেছি। শপিংপুর আমার বাড়ি। সেখানেও খোঁজ করলাম। নেই। ফিরে এলাম। হাওড়া স্টেশন থেকে কোঁরয়ে তফরিন বাসে না উঠে, ট্রামে না উঠে হাওড়ার ব্রিজ দিয়ে চলে আসলাম। হাওড়া নদী এখন চারদিকে বিশালতর ব্যাপ্ত করে আপনমনে ভেসে চলেছে। দূরে দূরে জাহাজ দাঁড়িয়ে ছিল। রেডিও জোঁট নৌকা চলছিল। আকাশে কত যে রঙের ফেরিয়া মেঘ থাকে মেঘে ছড়িয়ে পড়েছিল। দূরে দূরে কত দাপান কোটা, কান্ডাজ, মিনারী...কতভাবে ঘুরপাক খাচ্ছিল দলবদ্ধ পরিবার—সবই দেখেছিলাম। কিন্তু মনটা আমার কিছুতেই সেসব নিতে পারছিল না। এই যে, সবজি খাওয়া কর্তিত গাছটা যেন অনেক দিন আমি দেখিনি। গাছ থেকে গাছের যন্ত্রণা হওয়ার ফল লগছে। আমি যেন অনেক দিন ভুলে গেয়েছিলাম গাছের গাছের একদম কলসর কথা। লম্বা কতগুলো ছোট ঘাট থেকে কলসে কলসে ফোঁসে পড়েছে। পাহা-গালো গেল হয়ে ঘাটের আরেক ধারে ঘাট ছিড়েছে। একটা লাল মেঘ কলসর করে উঠেছিল, আমি মনমরা হয়ে দেখলাম। কত দিন সে জেলজিভি দেখিনি, জাহাজের মাংসুল দেখিনি, নদীর স্রব্দে প্রান্তে যেখানে তালগাছগাছের কবিতা রাখা আকাশের রঙে চোখ ভরিয়ে রেখেছে—আমি অনেকদিন এসব দেখিনি। কী দেখেছি তা হলে এতদিন?

ভাবতে গিয়ে মাথাটা ঝাঁকতে লাগলাম। সুন্দর ছাটো, সুন্দরী স্ট্রিট। সব কিছু মনেই এখন কেমন একটা যেন ভাঙচুর। আমি যে কিছুই সমালোচনা পারছি না, সার। প্রচণ্ড বেগে পাশ দিয়ে ট্রাম-বাস লরি-ট্রাক-ট্রেনপা প্রবেশনা হচ্ছে। কাতার কাতারে লোক হাটছে অফিস ছুটিং আনন্দে। হঠাৎ দেখি নীলবর্ণের একদম ভেড়ার ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কী শান্ত নিম্নল দৃষ্টি চোখ ওর হাওড়ার উপরে। চুলগুলো যেন ফ্রাইড অনভব করছে। ও হাটছে কেমন দুঃখভরা। কথা বলছিল বোধ হয় পাশের কোন ছেলের সাথে। তফরিন আমার মনে হল, শপিং তো আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, তাই আপনার অফিসে ঢাকঢাকি দেবেই না। ক হের। ছাটোখানো ছেড়ে দেব। সুতরাং, নীলবর্ণের আবার আমি ফিরে পেতে পারি—আমি না হয় ওর পিছ পিছ ধাওয়া করি, ছাটো ছুটে চলে যাই ওর পিছ দিয়ে—চিৎকার করে না হয় ডাকি শীতেরেখা শোন শোন...।

কিন্তু ছাটোতে গিয়ে পায় পা জড়িয়ে গেল। চিৎকার করতে গিয়ে জিভ আমাকে গেল। তফরিন আপনার কথা মনে পড়ে গেল। আপনার দয়ার কথা। আর্পন যা করেছেন সবই তো আমার ভাল চেয়েই করে এসেছেন। মন তো কিছ, করেনি না। তা হলে কেন আপনাকে বিব্রত করব। তাই আবার ছাটো এসেছি এই



## কার ভাগ্যে কি আছে

জীবনে ভবিষ্যতের আভাস পেতে কে না চায়? কিন্তু জ্যোতিষ কি সত্যি অদৃষ্টবাদ? সন্দেহই জাগে। অজানাকে জানার আগ্রহ আদিম যুগ থেকে মানুষ এগিয়ে চলেছে। বেদের ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ কিংবা সবিতার স্তবস্তুতি থেকে শুরু করে তারা পেয়েছে এক অব্যক্ত দূর্জয়ের শক্তির সন্ধান। সেখানেই করেছে তারা মাথা নত।

জ্যোতিষের কাজ সেই অনুযায়ী পথ নির্দেশ করা। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিচার করা। শুধু যোগ্যতাই নয়, জাতক জাতিকার স্বভাব-চরিত্র, হিংসা, অহিংসা, প্রেম, ভালবাসা, উদারতা স্পৃহা, অস্পৃহা এমন কি দেবভাব কিংবা অসুরিক হিংস্র প্রকৃতি কাম-ক্রোধের মাপকাঠিও জন্মকালীন গ্রহ সন্নিবেশ অনুযায়ী ধরা আছে। অদৃষ্টবাদের বিরুদ্ধে জ্যোতিষের লড়াই চিরকাল। ভাগ্যে যা আছে তাই হবে, এই সাত্ত্বনায় রোগীকে ফেলে রাখা চলে না। আবিষ্কার হচ্ছে যুগে যুগে রোগ-প্রতিরোধক কিংবা রোগ নিরাময়ের জন্য নানা উপকরণ। ২২-০০

আপনার কিংবা আপনার পরিবারের সকলের ভাগ্য দেখা কিংবা জানা যাবে এই গ্রন্থে।

লেখকের অগাধ বইঃ—

হাত দেখতে শিখুন

(হস্তরেখা বিচার ভূমিসহ)

ভাগ্যালিপি

— উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ কাহিনী —

পরিব্রাজক শ্রেষ্ঠ

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

বৈষ্ণোদেবীও অন্যান্য কাহিনী

কুয়ারী গিরিপথে

ত্রিলোকনাথের পথে



অমর সাহিত্য প্রকাশন

৭ টেমার লেন, কলিকাতা-৯ (কলেজ স্ট্রীট জংশন)

সেখা কোলা আপনার অফিস, আপনার পি এসসিডেন সুন্দর ভাটের কাছে। এখন বলুন, কী করি?

॥ ৪ ॥

সেদিন নোট পাঠিয়ে যে সাফল্যদান করেছিলেন, তাইতে মনটা খুব শান্ত হয়ে গেল। সেদিন রাত বাড়ি ফিরে এসে বেশি একটা ঘোরা ঘুরে আছে আমার ফ্রাটের কাছাকাছি, সিঁড়িতে। মাথা নীচু করে কস আছে। কাছে গিয়ে দেখলাম। এবং চিনতে পারলাম যে খোঁচের শিম্প। মনের বস্তু বালা হয়ে গেছে। চুল খুবই উকখাশ। শাড়ীতে বসে আর কালিমালা এমন করে মোহে গেছিল যে, ওকে খি-খি-এর মত লাগছিল। ঘরে হাঙ্গা লাগানো ছিল কালিমালা কটা পড়ে নি। আমাকে দেখে তর্কান কথা নাকচা নিল। আমি ভাবলাম, একটা প্রচণ্ড জ্বরে চড় কই। কিন্তু সার, আপনার কথা মনে পড় গেল। আপনি সবার আগেচর থেকে, সব সময়ই কেবল কমা করেই বলেন যে রাগই থাকে, যত অপরাধই হোক। আপনি নিজের সবার আড়ালে থেকে বেরিয়ে বলেন, শ্যে, কমা কর, আর আদর কর।

তাই ওকে দু' হাতে কাছে টানলাম। দেখলাম সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখ ফেটে গেল। জল পড়তে লাগল।

হামাল দিল্ল প্রথমে গালের ওপকাল জ্বলের ফ্রাটো মনে দিল। চোখের পলাকের প্রতিটি লোম বিন্দু, বিন্দু জল ধরে রেখেছিল মস্তুর মতো। তারপর সেগুলো হামাল দিয়ে শুষে নিলাম। যখন ফ্রাটের দৃষ্টি বজা দ্বিধা ও নিজে থেকেই কল, ও একটা ছেলের সাথে পালিয়ে গেছিল। পালিয়ে কসবার সর্কি কলের কাছে একটা বাড়িতে উঠেছিল। তারপর ছেলটাই নাকি সেই বাড়িতে তাকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

শুনে একটা চমকে উঠেছিল। না, কোন একটা ছেলের সাথে ও পালিয়ে গেছিল—তা শুন আমি চমকই নি। ছেলটাই যে ওকে এরা ফেলে পালিয়ে গেছে তাই শুন চমকে উঠেছি। কেন ছেলটো শিম্পকে আমাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেল। কেন কসবার সর্কি কলের কাছে একটা বাড়িতে তুলল? আমার কেনই বা ওকে ওখানে একা ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। শুন আমিও কাছে ফেরন যেন বহুসাজনক ঠেকছে। ছেলটো শেষে একে ফেলে পালিয়ে গেল। কিন্তু কেন হঠাৎ এত ভয় পেয়ে গেল? এ আশঙ্কা কি ছেলপেয়ে গোপন আপনার হাত কাজ করেছে? একটা সিগারেট ধরিয়ে আপনার কথা ভাবতে লাগলাম। আপনারকে কখনো দেখিনি। আপনি সব সময় সবার আড়ালে থাকেন। সবার অলক্ষ্যে নীরবে কাজ করে যান। আমরা কিছই টের পাই না, সার। আপনার অসীম দয়। তাই শিম্পকে আবার ফিরে পেরোছি। এবারে আমার কাছে নিজে থেকেই ফিরে এসেছে। একেবারে অসম্মান অনুভব হয়ে, কমা মোহের মত ফিরে এসেছে। আমার না কী আনন্দ হল

সার, আমি কেনে ফেললাম। দু' হাতে ওকে বকে তেন আমার চোখের ভাটা গলে ভেতলাম। কমা আর আদর যে এমন একটা মোজাজ এনে দেয় যে কী দৃষ্টিতে আপনাকে স্মরণ করে রাখা নইয়ে দিলাম। শিম্পকেও কললাম। ও কৃতজ্ঞ ভাবে আপনাকে স্মরণ করে রাখা নইয়ে দিলাম। শিম্পকেও কললাম। ও এই সবার জন্যে হল—সবার কাছে আমাকে দৃষ্টিভঙ্গি রাখা উচিত। কিন্তু সার, শিম্প তর্কান কেন যে কপাল গোঁজ করল। দাঁত উঠে চোয়াল শক্ত করে। ও আপনারকে কেন যেন সরা করতে পারে না। একটা কমা চোয়াল থেকে কেনে ফেলল। অবশ্য কমাটা যেন কারাগার হতে পারে। হঠাৎ করে থেকে কেনে ফেলল। অত্যাচারে হতে পারে। হঠাৎ মনেযোগে সময় আমার কপ শব্দে পাচ্ছিল না। অন্যমনস্ক ছিল। অত্যাচারে হতে পারে। হঠাৎ মনেযোগে আমার ঘরের ভেতরে ভাঙচুরটা লক্ষ্য করছিল। এতকি ওর চোখ চোখের দিকে ফেলল। দেখতে দেখতে ওরকম একটা ফেলল। এই যে ভাঙচুর—এ মো নিজেই হাতেই ঘটেছে বলে এখন হঠাৎ ওই খবর আমসেস হতে। পালিয়ে কটাটা বিজনার ছিন্নভিন্ন অকথা দেখে একটা শিউরে উঠল। আমার দিল্লি জালা চোখ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল।

একটা পর আশঙ্কা খিলখিল করে হোস উঠল। আমাকে অপরাধ মনে মনে ভাবিয়ে ঘরতে লাগল। হঠাৎ এই খিলখিল হাসি, হঠাৎ এই হাসি কখনো মনে হল বহুসাজনক, কখনো মনে হল সর্টি, কখনো মনে হল বহুসাজনক কখনো মনে হল অকিবাস। কোন কোন সময় মনটা আনন্দে মতো উঠে। কোন সময় মনটা ভয় ভর কমে উঠল। তাই তো আপনার সেখান থেকে ফিরে আসা পি এসসি কাছে ছাটে এলাম। আপনার আড ভাইস চাইতে। এখন বল না, কী করি?

॥ ৫ ॥

আপনার মনে শব্দে আশঙ্কা ফ্রাটো ছেড়ে দিয়ে, রবীন্দ্র সর্বোদর লেনে নতুন ফ্রাটো নিয়েছি। অপর সর্বদ এই ফ্রাটো—যথান কসে দেখা যায় ফ্রাটো, নির্বিড় শান্তি, সবজ প্রকৃতি, আর পানারিমক আকাশ। আপনার শিম্পকে অফিস থেকে লেন করেছি। আপনার দয়ার সেই লেন দীর্ঘমোদার আর সমস্ত পেরোছি। তার ওপর লেন যাতে শোধ করতে পারি তার জন্যে মাইনোই অস উপায়ভাণ্ডার বাড়িয়ে দিয়েছেন।

আজ নতুন করে ফানিগল কিনেছি। লাসনকাসন কিনেছি। রেডিও কিনেছি। ফ্রিজ সব—সব কিনেছি। বাগরম, কিনেছি, ড্রাইংরম, বেডরম আর দুটা যা যা দিয়ে সাজাতে হয়, সাজিয়েছি। আবার হাসি-খুশি গান নাচ কণ্ঠস্বর খাওয়াদাওর হইহুয়া সব ফিরে এসেছিল। কিন্তু...

কিন্তু সার, কী বলব, আবার একদম অফিস থেকে ফিরে ফ্রাটে ঢুকে কী অশঙ্কার। না, কোন ভাঙচুর নয়, সবই ঠিক আছে। ঘরটা শুধু অশঙ্কার। আরে চোলেতেই, আলো জ্বলল। খাটে শিম্প—। না, শ্যে ক দিছিল না, কিছই করিছ না। শ্যে জ্বাখছে, হয়ে বসেছিল বিজনার ওপর। একটা কথা বলছিলাম একটা পরে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে দেখি, হুকে একটা দড়ি বসা রয়েছে, অ তাকে কাস লাগানো। দড়িটা খুলেছে। শিম্প বোহ হয় কাসিতে লটকে মরা চোরেছিল। ভাবতে ভাবতে সময় পার করে ফেলেছে। আমি, সার, তর্কান দড়ি সিলিং-এর হুকে থেকে খুলে আপনার পি এসসি কাছে ছাটে গেল এসেছি। এব বলুন...

॥ ৬ ॥

আপনার নির্দেশ মত বাড়ি ফেরার পথে কতগুলো স্লিপিং ট্যাবলেট কিনেছি আসলে যে সুইসাইড করার কথা ভাবে, তার যে কী প্রচণ্ড দাম্পত্যতা—সে কত আপনি আপনার নোটে উল্লেখ না করলে জানতেই পারতাম না। তাই আপন নির্দেশ মত স্লিপিং ট্যাবলেটগুলো শিম্পকে দিয়েছি। কটা দিয়েছি ঠিকমত খোয়া করিনি। হঠাৎ তিনটে দিয়েছি কিংবা পাঁচটা। আমার নিজেরই মনে মনে কেমন কেমন হয়ে গেছে, ঠিক মেরকমটি বেরোছিল নীরবেবার সঙ্গে যখন আমি প্রথম সোফাখোয়া ছিন্ন করি। সেদিনও আমি ঘরের ট্যাবলেট খেয়েছিলেন—কটা খেয়ে ছিলাম? একটান টো-তিনটে—। আমার মনে নেই। সার রাত ঘুম আসছিল না আমি কি নীরবেখোকে বিয়ে না করে, তার সাথে সম্পর্ক কি করে কোন ভুল করেছি? ভুল আপনি কেন আমাকে করতে দেবেন? আমি সার সব সময়ই আপনার নির্দেশ মত কাজ করে যাচ্ছি, তাহলে কেন ভুল হবে?

তবু, আমার পলগ নীচতে ভুল হয়ে গেছে, সার। শিম্পকে কটা স্লিপিং ট্যাবলেট খেতে দিয়েছিলাম আমার মনে পড়ছে না। আপনি খুব স্বাভাবিক কারণে সন্দেহ করতে পারেন আমাকে। সর্টি কলিছ, কটা স্লিপিং ট্যাবলেট—তার হিসেব করতে কস মনে পড়ছে, আমলেও ঘুম আসছিল না বলে আমিও একটা কি দুটা খেয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি টেবিলের ড্রয়ারে একটাও ট্যাবলেট নেই। আমিই কি শিম্পকে মেরে ফেলেছি? সকাল কখন হয়ে গেল, ও এখনও ঘা থেকে উঠল না, কথা কলল না, ওর বুক উঠে না, নামছে না, হাত-পা কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা...আমিই ওকে বেশি করে ট্যাবলেট খাইয়ে মেরে ফেললাম।—এখন আমি কী করি?

॥ ৭ ॥

আপনি যা যা বলেছেন তাই করেছি। ডাক্তারকে খবর দিয়েছি। ডাক্তারের কথা অনুযায়ী আমলেস ডেকে হাসপাতালে নিয়ে গেছি। হাসপাতালে পূর্ণপ কটা ওর পেট পরিকার করা হয়েছে। ও বেঁচে উঠেছে। কয়েক দিন পর সুস্থ হয়ে বাড়ি এসেছে। এখন একটা ভাল। কিন্তু, বেঁচে উঠলেও মজার মতই পাড় খাওয়া মরা মান খের মতই তাকায়। মরা মানখের মতই কথা বলে, আমার ভাল লাগে না। কেমন ভয় ভর করে। আর যে আমার ভাল লাগছে না, সার। বহুসে, কী করি? খবি? সমসীর মের

Read

SAMVIT

A Semi-Annual in English  
of  
Sri Sarada Math  
Dakshineswar,  
Calcutta 700076

on

Religion, Philosophy,  
History & Culture

Editorial & Publication Office

C-8A, Hauz Khas,  
New Delhi 110016

Annual Subscription  
Rs. 5.00 only





(বার্ষিক)

মণিলাপা অনেক পুরুষকে পার হয়ে এসেছে জীবনে। সে জানে, পুরুষমানুষের এই হঠাৎ আগ থেকেই আসে আশ্বেষ। দীপনাথ তাকে এই ধরো ধরো জগের চাড়ায়ে যে হঠাৎ জড়িয়ে ধরে ভেঙে পড়তে পারে অন্যজগে, চুম্ব থেকে পরে, এমনতরো ঘটনার জন্য সে প্রস্তুত ছিল।

কিন্তু দীপনাথ পিছিয়ে গেল। ক্রান্ত স্বরে বলল, চার্লসকে কন্যার রটে গেছে মিসেস রবার্স।

কিসের কন্যার?

আপনাকে আর আমাকে নিয়ে। আমার ছোটো বোন পর্যন্ত জানে।

অবাক হয়ে মণিলাপা বলে, এই জন্য আপনি এত ডিসটার্বড আছেন?

ভীষণ ডিসটার্বড।

বদনাম রটলে কী তো মেয়েদের। আপনারা পুরুষমানুষ, আপনারদের কন্যামটাই ফেমস।

দীপনাথ মাথা নাড়ে, না। আপনি ককে বরবনে, নিজের জন্য আমি ততটা চিন্তিত নই, যতটা আপনার জন্য।

মণিলাপা আবার একটু অকক হয়। তাকে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, কন্যাকে আমি তো ভয় পাই না। আমার নামে এ পর্যন্ত বহু কন্যার রটেছে। আপনি আমার জন্য অনধিক ভাবছেন।

অনধিক? তাই হবে। বলে দীপনাথ সোফায় বসে অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে নিজের আঙুলগুলো দেখে। তারপর এক সময়ে বিবর্ণ বিভ্রান্ত মুখখানা তুলে বলে, আমার মাথার ঠিক ছিল না। আপনার সঙ্গে একটু, রাফ ব্যবহার করে ফেলেছি।

মণিলাপা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকেই একদৃষ্টে দেখছিল দীপনাথকে। চোখের দৃষ্টি কোমল, ক্ষমাজ্ঞ। কথাটা শুনে মৃদু, একটু হাসল। বলল, রাফ ব্যবহার? একটুও নয়। আমি পুরুষদের সত্যিকারের রায়ফেন্স দেখেছি। আপনি রাফ নন। তবে টাফ। ডেরী স্টাফ আর হেডস্টাফ।

কিফ ঠান্ডা হচ্ছিল। কয়েকটি বাগ চুমকে কাপ শেষ করে দীপনাথ উঠল, আজ চাঁল।

হঠাৎ কেন উদয় হয়েছিলেন, কলেন না তো। আপনার সঙ্গে একটা শো-ভাউজেনে জ্ঞান। অনেক দূর ধরে আপনি আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে যাচ্ছেন।

শো-ভাউজেন কি হয়ে গেল?

কলেন হেসে দীপনাথ বলে, হল আর কই? আপনার সামনে এলি আমার সব গুলিয়ে যায়।

আমার কন্যার নিয়ে আপনি খুব চিন্তিত, কিন্তু একবারও হেসে সাহেবের বদনাম নিয়ে ভাবছেন না তো।

দীপনাথ হেসে বলে, এই যে কলেন পুরুষ-মানুষের কন্যার মতোই ফেম।

তা ঠিক। তবে, আর এ ওরেল-উইলস আপনারা আর একটু ইন্টারেস্টেড হওয়া উচিত। আজকাল শুনি বেশ সাহেব আপনারকে জিজ্ঞেস না করে কোনো ডিসিশন নেন না।

অতটা সত্যি নয়। তবে কোনো কোনো ব্যাপারে উনি আমার আড্ডাইস নেন।

শুনছি আমার মাসোহারা কত হওয়া উচিত তাও আপনিই ঠিক করে দিয়েছেন।

দীপনাথ অস্বস্তিত বোধ করে বলে, আমাকে হোস সাহেব জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি যা ভাল বলেছিলাম তাই বলেছি। আপনি কি তার জন্য রেগে আছেন?

আমি মাঝে মাঝে খামোখাই রোসে বাই। সে আমার শ্বশুর। কিন্তু চারশো টাকা যে অনেক টাকা তাও আমি জানি।

আপনি রাগা করছেন।

আমার রাগে আপনার কি আসে যায়? আপনি আমার কে? আমি শূন্য ভাবছি হোস সাহেব কি করে এ কথাটা মেনে নিল। চারশো টাকার প্রশ্ন নয়, আমার হাত থেকে সব অর্থনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার ডিসিশনটা ও মেনে নিল কি করে?

দীপনাথ মুখ তুলল না। কিন্তু শান্ত গলায় বলল, এই ডিসিশন না নিলে হোস সাহেব এতদিনে পুত্র দাঁড়াতেন। অফিসে ঠার লোন কত ছিল জানেন?

ঠেট উল্টে মণিলাপা বলে, জানতে চাই না। আমি জানতে চাই, হোস সাহেব যে মেয়েটাকে নিয়ে মাথা-মাথা করছে সেও আপনার রিভাইট কিনা।

দীপনাথ এবার মুখ তোলল। মুখ সামান্য লাল। শ্বাস গাড়। চাপা গলায় সে বলে, আমাকে আপনি কি ডাকেন বলুন তো।

এ মান উইলসটি বাকবোন আশু ভয়েড অব পারসোনালিটি। আপনার মতো মানুষ কসক সন্তুষ্ট করতে সব পারে।

দীপনাথ উঠে দাঁড়াল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ঠিক আছে। হোসেন্দিন আমার সম্পর্কে আপনার ধারণা যদি পালটার তবে আবার দেখা হবে।

মণিলাপা তাকিয়েই ছিল। স্থির গভীর দৃষ্টি। একটু হাসল। বলল, আপনি আমার অনেক কীতি করেছেন। আমার এত কীতি আর কেউ কখনো করেনি। কিন্তু মশকিল হল, সেটা আপনি টের পরছেন না।

দীপনাথ মণিলাপার দিকে চেয়ে বলে, সত্যিই জানি না। চারশো টাকা মাসোহারা যা অর্থনৈতিক অধিকারে হস্তক্ষেপকে যদি কীতি করা বলেন তবে কীতি করেছি। কিন্তু তাতে লাভ হ্যাঁ কীতি হয়নি। গত কয়েক মাস হোস সাহেবের কিছ' টাকা জমে গেছে। গলফ ক্লাবে একটা জমি বারনা করেছেন। এ সব কি কীতি?

মণিলাপা চোয়ই ছিল। দীর্ঘ শ্বাস বলল, না, এসব হোস সাহেবের দিক থেকে খুবই ভাল খবর। নিজের বাড়িতে নতুন ছ কঁরি বউ নিয়ে থাকবে। কিন্তু তাতে মণিলাপার কি আসে যায়?

দীপনাথ গভীর শ্বাস ফেলে বলে, কিসস কহুন, আমি হোস সাহেবের প্ররজ্জ্বিত কোনো ক্যাপার আছে বলে জানি না।

মণিলাপা শান্ত স্বরে বলে, বিশ্বাস করছি। আপনি হয়তো এখনো অত নীচে নামেননি। তবে কেনে রাখুন, হোস সাহেব গলপাউল খোয়া তুলসী-পাতা নন।

আমি খোঁজ ক'ব? ইফ ইট ইজ টু তা হলে আমি ওয়া সঙ্গে কথাও বলব।

তাতেও মণিলাপা কিছু যায় আসে না। মণিলাপা তেমনি অকপটে চেয়ে থেকে বলে, তাতেও আমার কীতিপুত্র হওয়ার নয়।

আমি আপনার আর কি কীতি করার ক্ষমতা রাখি? কি কীতি তা জানেন না?

২৫

## চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ

(১ম) — অনন্ত সিংহ ২০.০০

## চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ

(২য়) — অনন্ত সিংহ ২০.০০

পাপা গ্রিন্স-সুত্র সেন ২০.০০

অস্থির পঞ্চক-দরবেশ ১৫.০০

কেন ভালবাসা—

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ১৩.০০

অজানা তারার সজ্ঞানে—

নারায়ণ চক্রবর্তী ৮.০০

পুরুষ-সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৮.০০

ডেভিল-শেখর সেনগুপ্ত ১০.০০

সুন্দরবনের মানুষকে—

অগাধটাস সমারভিল ৮.০০

খুনি বাঘের ডেরায় ডেরায়—

অগাধটাস সমারভিল ৮.০০

চেনা মুখ-সৌরীন সেন ১৫.০০

মহারাগী-দেওয়ান জারমানি দাস

ও রাতেশভান দাস ৮.০০

সৈনিকের ডায়েরী—

শেখর সেনগুপ্ত ১০.০০

সেদিন শৈলশিখরে—

কুশান বন্দ্যোপাধ্যায় ৮.০০

হিমতীর্থ হিমাদ্রি-অমৃতা সেনগুপ্ত

১০.০০

ডেটলাইন তাকা-পার্থ চট্টোপাধ্যায়

১২.০০

গোপনতার গভীরে-জাঁ ব্রশ

১২.০০

অভিনয়-জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ১৫.০০

সমুদ্র মানুষ-অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

১২.০০

প্রেমে অপ্রমে—

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ৮.০০

মানসী মানা-প্রাণেশ চক্রবর্তী

১০.০০

কি করে আপনি আপনার শ্রেষ্ঠ

বন্ধু হতে পারেন

পরীক্ষিত অন্তিত ৫.০০

নাথ পাবলিশিং হাউস

C/O. নাথ ব্রাদার্স

৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট \* কলকাতা-৭৩

# হেমেন্দ্রকুমার বায় রচনাবলী

৪র্থ খণ্ড বের হল

দাম ১৫০

১র্থ খণ্ডের সূচী

ডুগনের চতুষ্পদ। অমৃত-দীপ। ভারতের দ্বিতীয় প্রভাতে। সব সেরা গল্প। এখন যাদের দেখছি। সর্বনাশা নীলা।

১ম খণ্ড ২৫

সূচী : যাকের ধন। সন্ধ্যার পরে সাবধান। হিম্মাচলের স্বপ্ন। এখন যাদের দেখছি। মেঘদূতের মতে আগমন। ছড়া। চিঠি।

১ম খণ্ড ২৫

সূচী : অমাবস্ত্যার রাত। মানুষ পিশাচ। এখন যাদের দেখছি। শনি মঙ্গলের রহস্য। ছড়া ও কবিতা। অদৃশ্য মানুষ। চিঠি।

৩য় খণ্ড ২৫

সূচী : জেরিগার কণ্ঠহার। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র। সোনার আনারস। ভূতের রাজা।

লেখকের অন্যান্য বই :

অমাবস্ত্যার রাত ৫০

ভূতের রাজা ৫০

সব সেরা গল্প ৫০

অমৃত-দীপ ৪০

## উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ৩৫০ দ্বিতীয় খণ্ড ৩০০

উপেন্দ্রকিশোরের অন্যান্য বই :

ছেলেদের রামায়ণ ৪০

টুনটুনির বই ৫০ ছেলেদের

মহাভারত ১০০ গুপী গাইন

বাঘা বাউন ৫০ গল্পমালা ৫০

এমিয়ারাবলিনিক্স কোং

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা-৭০০ ০০৭

এতক্ষণ মণিদীপার এই অস্বাভাবিক শান্ত স্বর, স্বপ্নাক্ষর দাঁটি আর একভাবে দাঁড়িয়ে থাকার একটা অর্থ খুঁজে পেয়ে কেপে উঠল দীপনারথ। কল, না জানি না।

সোকে কি মিথ্যা কলমন করে?

দীপনারথ চুপ করে রইল থাকে।

বলুন, লোক কি মিথ্যা মিথ্যেই কিছ, রটার?

মণিদীপা জিজ্ঞেস করে।

দীপনারথ মুখ নামিয়ে স্বাভাবিক স্বরে বলে,

আমি জানত আপনাদের কোন কতি করিনি।

মণিদীপা যে সূত্রে নেই তা কি জানেন?

মাথা নাড়ে দীপা। জানে।

কেন, তা জানেন না?

মুদ্র স্বরে দীপনারথ জিজ্ঞেস করে, আমি কি তার

কারণ?

হিসেব অস্বস্তি চাপা স্বরে ক্রোধ হত্যা অপমর্মনকে

মুষ্টি দিয়ে মণিদীপা বলে ওঠে, আপনি। শব্দ

আপনি। আর কেউ নয়। আর কিছ, ন্যা। দয়া করে

আমার আর ভাল করতে হবে না আপনাকে। এবার

যান। যান।

এককমভাবে ভেঙে পড়ার মেয়ে মণিদীপা নয়।

দীপনারথ একটু অবাক হয়ে তাকাল। মণিদীপা পেছনে

ফিরে আবার ফলদানীতে ফুল সাজাচ্ছে। কদম্বে কিনা

তা পিছন থেকে বোঝা গেল না।

প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে নিয়েছে দীপনারথ। গাড় এক

ভালবাসা বহুকাল যাবৎ তার বুক থেকে ঐ কিশোরী-

প্রতিম মেয়েটির দিকে বসে থাকে। এত লোভনীয়

বহুকাল যাবৎ তার কাছে আর কেউ নয়। এই তো

সময়। উঠে গিয়ে শব্দ একবার স্পর্শ করে কলতে

পারে যে, তেমনাকে ভালবাসি মণিদীপা। তা হলেই ও

বকেল মধ্যে ভেঙে পড়বে, আর কোনদিকে চাইবে না,

তার হয়ে যাবে চিরকালের মতো। বড় অসুখী

মণিদীপা, বহুকাল এই পরের ঘরে বসে রয়েছে।

লোভ হল, বড় লোভ হল আজ। সমস্ত শরীর

পিপাসায় উদ্ভব। পলকা ডিমস তোর মতো একটু

নীতিবোধের বাধা আছে বাট, সেটু কিছুড়তে কট

নেই।

ঘর ভাঙবে দীপনারথ। ভিতরে ভিতরে সেই সিলিং-ও-

কমিক নকশা আবার বহুকাল বাদে শনতে পেল সে।

ঘরই কি সব? ভালবাসা কিছ, নয়?

ভালবাসার মানে হল ভালতে বাস করা। বাস

করতে ঘর চাই, দীপনারথ। পাকা ঘর। নইলে আবার

কোন ভালবাসা ঘর? এসে তোমার ভিতরে ও চরবে।

ওকে বরং এই ঘরে স্থিতি হতে দাও। নিজের সখ-

অসুখ বসতে দাও। সওয়া নেই, বওয়া নেই, বিয়ে

কি চাটুখনি কথা। কত সখ-দঃখ সয়, কত কড়-

খাপটা পেরিয়ে তবে স্নানমী আর স্নান ভালবাসা হয়।

ওদের সময় দাও আর একটু।

ফিলাম।

দীপনারথ ওঠে।

মিসেস বোস।

মণিদীপা খব আসতে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। বড়

চেষ্টা, অবাক দাঁটি।

আমি আজ আসি।

একটু হাসল মণিদীপা, অনেকক্ষণ ধরেই যাই-যাই

করছেন। এত তাড়া কিসের?

আমিও সখে নেই। বড় জ্বালা, এক জায়গায়

বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারি না।

তাই বসি? আজ আমি কেবল ঝগড়া করলাম।

না। তা নয়। আপনার দঃখ আমি কখি।

ধন্যবাদ। কিন্তু বেশী বসতে যাকেন না। তাতে

বিপদ বাড়বে।

তার মানে?

বোস সাহেবকে ঘাটনার দরকার নেই। ও আমাকে

চার না। আমি বরং চলই যাবো। আপনি শব্দ কিছ,

টাকার ঝগড়া করে দিন ওকে বলে। আমার তো

একটা ফুটিং চাই।

সেই দোকানের কথা এখন মাথা থেকে যায়নি?

অন্য কোনো আইডিয়া আসছে না সে।  
দোকান কল্যাণী আরও পছন্দ নয় মিসেস বোস।  
আজ্ঞা দাঁটিতে চেয়ে মণিদীপা মুদ্র, হেসে বা-  
ডকে কি পছন্দ?

ভেবে দেখি। কল। কিন্তু বা বলাব শব্দকম হে

মণিদীপা মাথা নাড়ে, শানক। আমাকে কেউ

গাইডেনস দেখনি এতকাল। আমি ভারী একা

গেছি। এত একা সহ্য হয় না।

আমি আপনার ভাল চাই। ভীষণভাব চাই।

মণিদীপা সত্যিকারের লজ্জার মাথা নাড়

বলে, জানি। খব জানি।

আজ যাই।

আসেন। বলে একটু থেমে মণিদীপা আবেগ মু

স্বরে বলে, এবার ফোন করলে কথা কাক।

দীপনারথ বোস সবেশক এতটাই জানে যে, খ

বেশী খেঁজ থবর না করেই সে মেয়েটির পাত্তা লাগি

ফেলতে পেরল পর দিন।

বোস সাহেব বোকা নয়। সবেশক মখে দীপনার

হঠাৎ বিনা এজেলার তার খর্শা ডাতে ঢাকল দীপনার

মুখের দিকে চেয়েই বোস সাহেব বাকতে পারে, সামখি

য়।

বলন চাটুখি।

দীপনারথ বসে এক বিনা ভূমিকায় বলে, মহ

আপনার কাজিনি?

বোস স্তম্ভ ও স্থির হয়ে বসে থাকে। তার

টোকে। বোস সাহেবের শরীরের যন্ত্রপাতি খুব ভাল

নয়, দীপনারথ জানে। তাই ঐ সতখতায় একটু ভ

পেল সে। কিন্তু তব, নীরবতা ভাঙল না। বাক্সের

লড়াইতে প্রথম রাউন্ডটা খই গরব্বপণ।

বোস সাহেব ঠিক এক মিনিট স্প সেকেন্ড বাদ

কি হাতের তক্তনীর দার দিয়ে খাতনিটা ঘষে নিয়ে

নড়ে বসল। তারপর বসখসে ভাঙা গধার বলে,

দরজাট লক করে দিলে আসুন।

দরজাট নেই। অফিস ফাঁকা।

বোস মাথা নাড়ল। মখে ফাকাস, অসহায় ভাব

কেমন এক ধরনের হাস্য গেছে। হাতে একটা কাগজচাপ

নিয়ে নাড়তে নাড়তে তেমন অস্বস্ত গলায় বলে, দীপ

কতখী জানে?

সামানাই। অন্তত মহারর কথা জানে না। শ

জানে সামখি ইজ কুিং।

মহুয়া আমার ডিসট্যান্ট কাজিনি।

তা হোক বোস সাহেব। ইট ইজ এ ব চয়েস।

উই হাড অল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফ্রম অলমোস্ট

চাইলডহুড। কিন্তু পারিবারিক কাণ্ডার বিষ হতে

পারনি। ও বাক ছিল ভীষণ কনজারভেটিভ।

বাট ইট ইজ নাই এ ডেড কেস।

বোস মাথা নাড়ে, না। রিলেশন না থাক উই

অলওয়ার্ড হাড দ্যাট ফিলিং ফর ইচ অদার।

বোস সাহেব। দীপনারথের গলায় 'মাকের মতো

শোনার, কাপাকটা ইন্ডিভিটবল নয়' ম জানি।

আমি তা ব জানি।

তবে? আপনি অতীতকে খড়ে বেস করছেন।

দীপার সঙ্গে আমার রিলেশন তে-অপন জানেন।

অথচ আই নীড সামওয়ান। বাক বিশ্বাস করা যায়,

যার ওপর নির্ভর করা যায়।

বোস সাহেব, আপনার এক ভাই এই অফিস কাজ

করে।

বোস অবাক হয়ে বলে, ও কিছ, বলেছে?

না। তবে ও শব্দে। ও বখে ঘোমার ডাব

দেখলেই তা বোঝা যায়।

বোস সাহেব পিছনে মাথা হেলিয়ে বলে, দীপা

অলমোস্ট উইল হুট মি। চাটুখি, আই আম সর্কি।

কিছ, করার নেই।

দীপনারথ কিস নেওয়ার একটা নাটকীয় এক

বংসই কলের জন্য অপেক্ষা করছিল। একটা

সাইকোলজিক্যাল মোমেন্ট। এই কথার পরই তা পেয়ে

গেল সে। আচমকা উঠে দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল।

(কম্বাশ)

## পশুপাখির চোরাকারবারে কে বেশি লাভবান?

মাথার ওপর ময়নার ঝাঁক। একপ, দু'প, কখনও বা হাজার। প্রাচুর্যের পরিচয় দল কখনও উড়ছে। কখনও গিরে বসছে গভীর বন-জঙ্গলে শুষ্ক গাছের মাথায়। উদ্ভূত উপত্যকার দল বেঁধে কটিপরেও পড়ে কখনও কখনও। মধ্যশস্যকুল পরিবেশ। কন্যাসাগরের মধ্যে নদী রকম কীট পতঙ্গের মনোহর। কিন্তু অত সব দেখলে তো আর বেঁচে থাকা যায় না?

ওরা দরিদ্র। ময়নার কাঁকের উপর চোখ রেখে সেই বিবস্ত্র কন্যাসাগরের আড়ালে ওরা বাপটি মেরে বসে থাকে। কখনও স্বপ্নটিমুটি এগিয়ে চলে আলতো হাতে দাঁড়িয়ে বন সারিয়ে। নিঃশব্দে। মধ্যশস্যকুলে প্রতিটি মহুর্ভের জন্য অপেক্ষা। কখনও কয়েক মিনিট। কখনও স্বপ্নের কবিতা। পেটে দানপানি পড়নি হয়ত সকাল থেকেই। তা না পড়ুক। ওই ময়না। ওই ময়নাই তো তাদের দানপানি।

জাক। নিশ্চয়ই হয়নি আজকের মিনিট। আগেরই ওরা কিছুতেই রেখাছিল জালের ফাঁদ। ময়নার ঝাঁক গিরে বসলো সেই ফাঁদে। ফাঁদে পড়ে কী তাদের ছুটতানি। ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অপেক্ষমান শিকারীকে মধ্যে তখন উল্লাস। মানবদলি মহুর্ভে ফুলে ফুলে তারা দাঁড়ায়। দানপানির আশার ওদের মাথ উপরুল হয়ে উঠেছে।

এবার সহজ কাজ। গুটিয়ে নাও জাল। জালত ময়নাদলি খপ খপ করে ধরে এবার খাচার পোয়া।



ভারতীয় কোবরা। সাপ-খেলা বারা দেখার তাদের কাছে এবার দাম অনেক বেশী। গবেষণা, পশু শাস্ত্রের সংরক্ষণ, সাপ খেলা থেকে শ্রদ্ধা করে বিধি সন্ত্রাসের জন্যে এ দেশ থেকে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ কোবরা মেরাপথে বিদেশে রপ্তানি হয়ে বহুক।

তারপর ঢালা স্থানীয় মহাজনের কাছে।

তা মহাজন তো আর জঙ্গলে থাকে না। তার আশ্রয় লোকালয়ে। সে লোকালয় হয়ত গ্রামে, অথবা শহরে। দু'গম পথ ধরে কখনও পারে হেঁটে অথবা গাড়ি চড়ে তার কাছে পৌঁছতে কখনও দুই দিন, কখনও তিন দিনও বেগে যায়। পাখিরা প্রথম দিকে জানা খাপটায়। পরে নিজস্ব হয়ে বসে থাকে। এই দুই বা তিন দিন তাদের পেটে দানপানি পড়নি। দানপানি দেওয়ার কথাও কেউ জামে না। জামের হাতে তারা বন্দী দানপানি যোগানোর মত সামর্থ্যও তাদের নেই। তাদের এখন একমাত্র লক্ষ্য, যেকোনো হোক, পাখিগুলি এখন



সেখলা চিতা বা 'ক্রাউডেড লিওপার্ড' এখন বিলম্ব প্রাপী। এ ধরনের একটি প্রাপী বিক্রি করে প্রচুর লাভ করে চোরাকারবারীরা। ঢালান পরে কখনও কখনও এদের সন্ত্রাসের পর সন্ত্রাস প্রচুর কল্যাণের করতে হয়



গিফট সহজে পোষা মনে না। কিন্তু ইউরোপের বাজারে এদের প্রচুর কল্যাণ। এদের সন্ত্রাস করতে হয় বিশেষ অবস্থায়। আর একটি শিশু শিশুকে তার জন্মের কয়েক থেকে ছিনিয়ে আনতে শিকারীর তার মনকে ধূলি করে হত্যা করে

জ্যান্ড অবস্থার মহাজনের কাছে পৌঁছে লাও। তারপর হাত উপড় করে সেই মহাজন বা দেবে, মাথা নিচু করে তা গ্রহণ করে নিজের এক পরিবারের পাঁচ জনের পেটে দানপানি যোগাও।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন পশুপাখি নিয়ে ধারা ফলাও কারবার ফেঁদে বসেছে তাদের ববসা সংগঠিত কিছু কিছু চাষীরা। তথ্য পরিবেশন করেছেন জিন-ইভেস ডোমালিয়ান নামে জনৈক প্রাপী বিশেষজ্ঞ (নোভারাল হিস্টোরিক : মে, ১৯৭৭ সংখ্যা পৃষ্ঠা ১১)। ডোমালিয়ান লিখেছেন : প্রচুর পরিভ্রম করে ময়ন সংগ্রহ করে দরিদ্র চাষীরা। এক-একটি ময়নার জন্যে মহাজনরা তাদের দিবে থাকে ০-৬০ থেকে ১ ডলার। মহাজনরা কিছুটা লাভ রেখে সেই পাখি বিক্রি করে হোল-সেলারদের কাছে। হোল-সেলাররা সেই পাখি বিদেশের বাজারে রপ্তানি করার সময় চড়া দাম দায় করে। এক-একটি ময়নার দাম দাঁড়ায় তখন ৩০ ডলারের মত। যদি কথা বলিয়ে ময়না হয়, ওই দাম আরও বাড়তে পারে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় আমদানি-কারকদের হাতে পৌঁছনের পর দাম হাতে আর এক দাপ। অবশেষে প্রকৃত খদ্দেরের হাতে গিয়ে যখন পৌঁছায়, তখন এক-একটি ময়নার দাম দাঁড়ায় ৩০০ ডলার। কখনও বা তাব চেয়েও বেশী। অর্থাৎ যে বেচারী পরিভ্রম করে ময়না ধরলো, সে পেলো এক-একটি ময়নার জন্যে ১ ডলার। আর লাভের গড় খেলো মাঝ পথেই কারবারীরা।

শেখ ময়নাই নয়, অন্যান্য প্রাপীর ক্ষেত্রেও ওই একই ব্যাপার। বন-জঙ্গলে ছোটখাট করে গিফট ধরলো দরিদ্র চাষী। ধরার পর গিফটের দৌঁধক মধ্যমা যদি ঠিক ঠাক থাকে তা হলে এক-একটি গিফটের জন্যে মহাজনরা তাদের দেবে ১০ থেকে ১৪ ডলার। মহাজনরা রপ্তানিকারকদের কাছ থেকে নেমে ৩০ ডলারের মত। তার হাতে পড়ে মধ্যমা মধ্যমা একটি গিফটের দাম এক লাফে গিয়ে দাঁড়ায় ২০০ ডলার। প্রকৃত খদ্দের থাকে কেনে ৪০০ ডলারে। অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই : আমদানি এক রপ্তানিকারকরাই পেলো অগাধ অর্থ। কোজা আসল সংগ্রাহক! সেই ক্রীলো গরীব। মধ্য প্রকৃত খদ্দেরের পকেট ফাঁক।

রপ্তানিকারকদের জব্বা, আমদারের খরচ কম। ওই সব জ্ঞানোকারদের খাওয়ানো, বহাব্যবহাবে ম্যামদান-কারকদের হাতে তুলে দেওয়া, এ সব করতে খরচ কত? কিন্তু বড়ই ভাড়া বলা, পশুপাখি নিয়েই হোজাতে কতকণ থাকে, ততকণ যে ধরনের খাবার তাদের দেওয়া হয়, তার দাম খুবই কম। মধ্যপ্রদেশের জনৈক বহুত বহু নেওয়া উচিত। সে বাপেরও তাদের অকপে থাকে না।

পাক করার খরচ, স্টেন, জাহাজ অথবা গাড়ির ভাড়া। আরও কত কী আছে।

এই এত কী-র মধ্যে থাকে নানা ঘোর পট। পরিবেশ বন্ধনকার কন্স। শুল্ক বিভাগের কমচারী। কোন দেশের সরকার হস্ত বিশেষ কোন প্রাণীর রপ্তানি যে-আইনী ঘোষণা করেছে। সেই সব প্রাণী চোরগণকে চালান দিতে পাঠলে পছন্দ লাভ। এ সব ক্ষেত্রে তিচ্ছ কায় পল্লস হুড়োনে বরকার। এই খরচের বোঝাও সামলার প্রকৃত বন্দন।

\*

যারা দরিদ্র শিকারী তাদের একমাত্র লক্ষ্য, শিকার করতে হবে। এ ব্যাপারে তারা কোন বিশিষ্ট নিষেধের ধার ধারে না। শিকার ধরার পর দেখা গেলে কোন প্রাণী অস্ত্রসেদ্ধ। দেখা গেল, ফাঁদে ধরা পড়ছে খুই কম কলক কিছ, সংখক শিকার। মস্তের খুইক দুখ হাড়া তাদের কিছু খাওয়াবেনই নহে। অথবা তারা এমন কোন প্রাণী ধরলো যারা বিকল এক বিলুপ্ত হতে চলেছে। এ বয়সের কোন বাচ্চিকার তারা করে না। কং বিলল প্রাণীর দিকই তাদের বেশি ঝোক। কারণ ওই ধরনের প্রাণীর খন্দের পাওয়া সোজা। ভালো দামও পড়বে।

খন্দের, মনে স্থানীয় মহাজন। সে জানে সব কিছুরই বাল্যর আছে। তা সে ব্যাঙই হোক অথবা বাঘ। বুনো বেড়াল, সাপ, পাখি, হাতি, ডলফিন তিমি নান্ন জাতের মাছ, প্রবাল কীট, কাকড়া, নেউল, ইখুর বান্দ্র প্রভৃতি। অথক অকড়সা, কাকড়া বিছ, জোনাক, ফড়িং থেকে শরু করে নানা রকম কটিপতঙ্গ। যা কিছু জাপত, তার কলার আছে। মহাজনের কাছে কলার বলে কিছু নেই।

আর দরিদ্র ওই সংগ্রাহকরা? অসাধারণ তাদের শিকার ক্ষমতা। কোথায় কী ধরনের প্রাণী এবং কটিপতঙ্গ পাওয়া যায় তার খবর তাদের নখরপদে। কোন প্রাণী অথবা কটিপতঙ্গের স্বভাব চিহ্ন কী রকম তারও খুঁটিনাটি খবর তাদের জানা। তারা জানে, কে হিলে, কে লাগত প্রকৃতির। কে বিবাহ, কে কিল্লত নহে। স্থানীয় ওই সংগ্রাহকদের সহজাত কল-কৌশল এবং লক্ষ্যতার মনে তুলনা হয় না। যা কিছু হোক না কেন, তাদের কাছে ধরা পড়বেই। প্রচণ্ড সতর্পণে অসাধারণ ক্ষিপ্ততার সঙ্গে তারা শিকারের ক্ষেত্রে ধাবনা করে। এর জন্য যেমন কলসামান করতে হয় প্রচুর, সেই সঙ্গে থাকে জীবনের কষ্ট।

তা ছাড়া কত শিকার চাই। কারণ শিকার মানাই তাদের কাছে পেটের জাত। তাই শিকার লাভে হাত ছাড়া না হয়, জর জনো সব রকম কষ্ট নিতে তার প্রস্তুত। ফলে তাদের পশ্চিমসালিও হয় এমন, শিকারের পক্ষে বাস্তব এড়িয়ে থাকার খুই নহে। যেমন ধরুন ধাই শিকারীদের কথা। এক-একটি পাইথন। লক্ষ্যর হয়ত লম্বা বাজে কুট। মোটা দড়ির ফাঁদই হয়ত তাকে ধরা যায়। তাতে সাপের কণ্ঠও হয় কম। সেটা না করে তার বাঘার করে মোটো তারের ফাঁদ। ফাঁদে ধরা পড়ার পর তাকে জড়িয়েই সাপটিকে নিয়ে বারো মহাজনের কাছে। এর ফলে অনেক সময় সাপের দেহ কত সৃষ্টি হয়। মারাও যায় অনেকে।

পনকড়ে কলার জন্যে এক ধরনের ফাঁদ তৈরি করে তারা। বলছেন ডোমঃ লয়ান। "মরণ ফাঁদই বলতে পারেন। এর জন্যে ওরা তৈরি করে গভীর গর্ত। কিন্তু সেই গর্ত অতটা গভীর না হলেও তো চলে : না, কোন কাজ নিতে তারা বাজি নয়। এই মরণ ফাঁদে গড়ে অনেক সময় নেকড়ে ভীষণভাবে আহত হয়। একবার লেং অকড়সু একটা বাঘ ধরা পড়লো। ধর পড়ার পর তেমন কষ্ট অকল তার হয়নি। কিন্তু পাছে সেই হিলে প্রলীকিত কলার কটি করে কিলে পালিয়ে যায়,

এবং ওই অকল্যাতেই পাতানো হয় আবার কাছে। দশ দিন পর বাঘটি আবার কাছে এসে পেঁচলে দেখলাম, তার পা তারে কেটে গিয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। গ্যাংগ্রিন হয়ে কয়েক দিন পর বাঘটি মারা গেল।

কন্সী শিকারের উপর নৃশস অত্যন্তরও হয় অনেক সময়। কোন ধরুন, প্যাংগোলিন। গালের ওপরে পুরু অশিওয়ালো এই প্রাণীর বাঘার পিপিড়ে এক উইপোকা। এদের নখ হয় ভীষণ তীক্ষ্ণ এক লম্বা। তাই কঠোর খাচার পুরে যে এদের চালান দেওয়া হবে তার জো নেই। নখের ধারে ওরা খঁচর ফেলে ফেলে। এর জন্যে স্থানীয় সংগ্রাহকরা এই প্রাণীদের খাচার পুরে তাদের লেজ মোটা গজাল কাঁচিরে খঁচর কাঠের সঙ্গে আটকে রাখে। কী নৃশস ব্যাপার একবার ভেবে দেখুন। কন্সী করার পর বাঘ, ভালুক প্রভৃতি হিংস্র পশুকে ঠাণ্ডা রাখার জন্যে কখনও কখনও তাদের মাথায় মৃদুর দিয়ে আঘাত করা হয়। বাচ্চা সংগ্রহ করতে গিয়ে তাদের মাঝে খুন করা হয় কখনও কখনও। সত্যকাতার অভাবে বাচ্চাদের দেহে আঘাত লাগে; অথবা ধরুন, মা আহত হলো, কিন্তু তাকে ধরা গেল না। গভীর বনে পালিয়ে গেল সে। তারপর মারা গেল। এর ফলে তার বাচ্চারা অনাহারে মারা পড়লো। এইভাবে বনা প্রাণীরা কতিপ্লত হয়। বনে আগুন লাগিয়ে প্রাণীদের বন থেকে বের করে এনেও শিকার করার চল আছে নান্ন দেশে। অনেক সময় গ্রামবাসীরা মিলে কড় কড় জাল দিয়ে কল-কলার দিয়ে শিকার করে। এ সব ক্ষেত্রে বহু, পশু প্রাণী মারাও পড়ে।

স্থানবাসী ছাড়াও বিভিন্ন পশু পাখি সংগ্রহের জন্যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানও কাজ করে কোন কোন দেশে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান একমাত্র পূর্ব-আফ্রিকাতেই তপস্র। এদের ফলে থাকে বিজ্ঞানী, পশু, চিকিৎসক, শিক্ষণ প্রাপ্ত প্রমিক। কন্সী পশুর উপর যে ধরনের সেবা বহু নেওরা বরকার এরা তা নিয়ে থাকেন। শিকারের সময় এরা সতর্ক থাকে। কতে বিকল প্রাণীর না কটি হয়, অবশিষ্ট প্রাণীও না কটিপ্লত হয়।

কিন্তু সমস্যা ওই দরিদ্র সংগ্রাহকদের নিয়ে। তারা জর পরস। সে বহু কষ্ট হোক। অতএব যে ভাবে হোক জাপত পশুদের ধরে মহাজনের হাতে পেঁচছে দিলেই তাদের কাজ শেষ। দারিদ্র্য।

সম্প্রতি হুগলী জেলার বেগমপুর অঞ্চলের কয়েক জন সাপুড়ের সঙ্গে কথা হয়েছিল বর্তমান লেখকের। আলপাশের গ্রাম থেকে নান্ন রকম সাপ সংগ্রহ করে ওরা নির্মিত চালান দিয়ে থাকে। ওরা কালো, কী আর পাখা, বাঘ। বন বলাড়ু হবে সাপ ধরা। এই তো দেখছেন। কলই গোটা দেশক বাঁশের তৈরি আধারের দিকে সৃষ্টি আকর্ষণ করলো আমার। বললো, দশটি সাপ ধরেই চার জনে। গোখরা, লাউডগা, চন্দ্রবেড়া এক লক্ষ্যমুটি। কলকাতার মহাজন আছে। কত আর পাবো? ধরুন না, একটি গোখরার জন্যে পাবো তিরিশ টাকা। ওরা ভিন দেশী। সাপ ধরতে এসে থর বেঁধেছে কোমপুরে। গরমের সময় সাপ ধরে। তারা সময় জন-মজুরী অথবা সাপের মাংসে মাঁখুরে জোয়াগার। তাতে পেট চালাকেই দৃষ্টিকর।

\*

জীকৃত প্রাণীই শব্দে নহে। দরিদ্র সংগ্রাহকদের আকর্ষণ অনেক কিছুর উপরও নির্ভর করতে হয়। বিভিন্ন প্রাণীর চামড়া, হাড়ের দাঁত, পখির পালক, পশুর দাঁত, শিং, পায়ের খুই, নখ, লেজ—এ সবক সংগ্রহ করে তারা বিক্রি করে। সম্প্রতি এক লক্ষ সাপের চামড়া ফ্রান্সে চালান হিলেবে পশ্চিমবঙ্গের পেট্রোপেল সীমান্ত পথে কীভাবে পাচার হিচ্ছিল তার খবর অনেকেই জে পড়ছেন জাপনরা।

আকর্ষণ করতে গেলে পশুও তো মহলহারী করা দরকার। বন-জগল থেকে পশু পাখি ধরার পর হাত চালাচালি করতে গিয়ে তাদের অনেকেই চোখা আকর্ষণ হারায়। অতএব বরকার ঘন্সামা। ধরা থাক, একটা ভৌকপ। আমদানি রপ্তানীর টানা পোড়েনে তার মসং লোম হয়ত ফাকাশে হয়ে গেছে। দাও তার লোম খানিকটা হাইড্রোজেন পারঅকসাইড দিয়ে ধোয়। কলার বার জোয়ার পর তার লোমের রঙ হয়ে পড়লো মেও শব্দে। আর চড় চড় করে তার দাম ৩০ ডলার থেকে বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো ১০০০ ডলারে। এই ভাবে সাপের গা চেটে ধরে চককে করে বাড়ানো হয় দাম। কোন কোন চিত্রা কামকে রঙ লাগিয়ে কালো করে, পখির ঠোঁটে বা গালের রঙের বাটার ঘট্টিয়ে খন্দের ঠকানোর ব্যবসাও ফাঁদ বসে অনেকে। রঙ এবং বিভিন্ন রাসায়নিক সামগ্রী জন অনেক পশু পাখির রঙ বাড়ি, কটিপ্লতও হয় তারা।

রপ্তানিকারকদের চালাকিও কম নহে। আইন অনুযায়ী কোন কোন প্রাণী রপ্তানি করা নিষে। সে খবর তারা ভালোভাবেই রাখে। এমন ধরনের বনা প্রাণী বন্দরনের সময় নান্ন রকম ফাঁদ ফাঁকিরে অস্ত্রয় নেন্ন তারা। যেমন ধরুন, কোন দেশের আইনে বলা হয়েছ, সমতল-মৃদু বেড়াল (লাতিন নাম : ফেলিস পলিনেসি়াস) রপ্তানি করা চলবে না। রপ্তানিকারক কিছুটা বিশেষ চালান দেওয়ার জন্যে ওই বেড়ালই খচায় পুরে বিমান বন্দরে হাজির হলো। শব্দ, খচার উপর লেখা : মেছো বেড়াল (লাতিন নাম : ফেলিস ভাইবের্নার)। কিমান কন্সের কন্সীর অস্ত্রতার তারা সন্যোগ নের। কারণ, বেশির ভাগ কন্সীই জানে না মেছো বেড়াল এক সমতল মৃদু বেড়ালের মতো পাখ কা কী। অনেক সময় নির্দিষ্ট প্রাণীর গারে খানিকটা রঙের প্রচলপ মাখিয়ে তাকে অন্য প্রাণী বলে চালিয়ে আইনের ফাঁকা পথেও অস্ত্রয় নেন্ন তারা। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় বিশক্ষস্বের একটি ঘটনার কথা বলি। তখন এক সময় হঠাৎ চিনির আকাল পড়ে। সরকার থেকে আইন করে দেওয়া হয় বিনা পারমিটে চিনি চালান চলবে না। অসাধ, কলসারীরা তখন জলে গলে চিনির গাড় রস তৈরি করে চিনি চালান দিতে শার, কললো। তাদের বাস্তি চিনি চালান ব্যবসা। কিন্তু যা তারা চালান করছে সেটা কান্ডি। মিছরিও কটিপ কল চালিয়ে ছিল তারা।

পশু পাখি এক অন্যান্য প্রাণী অথবা চোখাকার-বার আকর্ষণ একটি বড় বিপদ আছে। যথার্থ আইন মেনে ওদের চালাচালি করা হয় না। ওদের সবকই লরীর থেকে কোন না কোন রোগের জীবাণু এবং কীটপতঙ্গ। উপযুক্ত পরীক্ষা না করে ভিন দেশে এসে থর নিয়ে গেলে সে সব রোগে নান্ন রকম রোগ হুড়ানোর সম্ভাবনা থাকে। এতে করে বিশপই ভেঙে আনা হয়।

বনা পশু পাখি ধরার বাপারে কী সব কলশই আছে। কিন্তু সেই আইন রক্ষা করার উপযুক্ত ব্যবস্থা অনেক দেশেই নেই। আমদানি ভারতেও নেই। এর জন্যে বরকার বিশেষ প্রচিন্ধ প্রাণ পলকি উল্লাস। বরকার সং কমপ্লি। বিকল প্রাণী যাতে কেউ না ধরে সে ব্যাপারে জনসাধারণেরও চোখ লম্বা বরকার। নির্দিষ্ট পশু পাখি হত্যা, অথবা যে সময়ে যে সব প্রাণী শিকার করা নিষে—তা না কল, এ সব কিল নল্লর রাখা দরকার। চোখ পথে ভাঙতার বনা কিল প্রাণী প্রতি বছর হিলেলে বাজে। তাতে সত্যিকারক ইন্দন যারা কোগার, সেই দরিদ্র সংগ্রাহকরা, তাদের দারিদ্র্য ঘাড়ে নে। পরিকল্পিত আমদানি প্রাণীক পরিবহন ভারসাম্য হারাজ। সমস্যাটি জাতীয় পর্যায়ে খাঁতার দেখা দরকার।

সমরজিৎ কল

## এক নিঃশ্বাসের গল্প

আনন্দ বাগচী

শুকোয় ডালের বড়ি, ভিজ়ে কাঁথা—গেরস্থ রোস্দুরে ভাঙা ছাতা  
খোলার ঢালের খাঁজে ঠেঁট ঘষে স্মৃতিভ্রষ্ট কাক  
আচমকা মূঠোর ফাঁকে শহরের জলছবি দেওয়ালে  
অনন্ত মূলের মত বটচারা যেন বিধে আছে—  
সন্ধ্যায় শাঁখের ফঁদ ফেরাতে ফেরাতে অন্ধকার-  
চোখের পলকে সব রাস্তা শেষ, গল্পের গলায়  
দাড়ি। দমবন্দ্য দরোজায় শেষ টোকা...এমনি করে  
সুগন্ধি জর্দার কৌটো ফেলে যায় ভক্তকী স্মৃতির  
রোজ ঝাড়ফঁদু খাওয়া তুক-তাকে মোচড়ানো জীবন,  
মুড়োয় ফুরোয় কটা-নটে গাছ রোমন্থনে রক্তমুখী উট।

ঘর-ভাঙা কানুন এসে পায়ের তলার মাটি কাড়ে  
যে ভাবে শরীর যায় নষ্ট চোখ ভ্রষ্ট দাঁত ফেলে  
আপাদমস্তক ছুঁয়ে চিতার চোঁকাঠ—আমি সেভাবে যাব না

নারী শিশু প্রেম স্মৃতি কবচকুন্ডল বর্ম সব  
ছুঁড়ে ফেলে পদতলে ফেঁচনা খেলনা যাবো—  
রাজ-সমারোহে যাব লুপ্ত ভিখারীর সামনে দিয়ে।

## ফুল

মলয় সিংহ

আমি কোনদিন ফুল কিনতে পারিনি—এ স্বভাব  
আমার শৈশব থেকে বড়ো হয়েছিলো : গোপন  
হৃদয় থেকে তুলেছি ফুল, ভুল করে, সোহাগে  
আপন করে ছিঁড়েছি ওই বসন্ত বকুল : এ  
পাপ ? এ এতো কাছে টেনে কেন ? কে পরালো  
ঋতুরঙা বেহাগশৃংখল ? বড়ো মানিয়েছে তো।

কতোদিন ভেবেছি গাছকে ; শেকড় ও ডাল  
কি বুঝে সভতা টানে, টেনে আনে বিক্ষোভ—  
সে শূদ্ধ পান্থদের—ফলের, বাঁচা নিয়ে কথা !

এখন কী তরুণের অসুখ ? পৃথিবীর ছোট গলি  
তার শেষে পরাণের বাড়ি। সেখানে অন্ধকার।  
তবু জানলার দিকে মাথা—পরাণের বাথটবে  
দৌখ, সাজিয়ে রেখেছে বহুদিন হলুদ আর  
শাদা কিছু চন্দনের ফুল ; বড়ো মানিয়েছে তো।

## শ্রীচরণেষু, ভারতবর্ষ

তারাপদ রায়

আমার মাঝে মাঝেই জ্বর হয় ;  
জ্বর হওয়া ভালো না খারাপ ?  
নিশ্চয়ই খারাপ।

কিন্তু তার চেয়েও খারাপ,  
তিরিশ বছর পরেও বার বার মনে সংশয় হয়,  
আমার কি মাঝে মাঝেই জ্বর হয়,  
নাকি মধ্যে মধ্যে জ্বর হয়।

মধ্যে মধ্যে নাকি মাঝে মাঝে,  
সঙ্গে সঙ্গে নাকি সাথে সাথে ?  
এতো উত্তাপ, এতো ঘাম, হাতে-পায়ে ব্যথা, মাথা ধরা,  
শুকনো জিবে, তেতো মুখে সারা দুপূর বিছানায় শুয়ে শুয়ে  
শ্রীচরণেষু,

ভারতবর্ষ,

এতদিন পরে আমার আবার ভয় হয়,  
আমি স্বদেশী না আমি বিদেশী ?

## নিখন

বিজয়কুমার দত্ত

খররোদ্রে অন্ধকারে, পড়ে আসা বিকেলবেলায়  
যখন বুকের মধ্যে জ্বালা ধরে (কেমন তা জানি না)—  
হাসপাতালের করিডরে যখন অজস্র মানুষের  
দিগন্তান্ত আনাগোনা, যখন কোথাও  
আলোকিত ঘর নেই, খোলা জানালায়  
অতর্কিত হাওয়া নেই, কে যেন তখন  
চোখের সামনেই এসে সপ্রতিভ হয়ে উঠতে চায়,  
তাকে কোন্ সাজানো স্কেমের  
ঘেরাটোপে বেঁধে রাখবো সকাল সন্ধ্যায়।

ঘরোয়া সংসার কিংবা মনের মানুষ  
কিছুই সাজাতে আমি শিখিনি কখনো  
আমার চারদিকে শূদ্ধ অকীর্তির ইতিবৃত্ত জমে  
প্রতিরোধে ঘুমহারা ঘরের দেওয়ালে  
যেমন নিঃশব্দে ঝোলে গতবছরের  
উদাসীন ক্যালেন্ডার দরজার মাথায়  
বিবর্ণ হরফে লেখা অসম্পূর্ণতার  
অতি স্বচ্ছ দায়ভাগ মেলে—

এমন মূর্খতা নিয়ে, এমন বিন্মৃতি নিয়ে, তবে  
অমোঘ প্রতিভা তার লিখে রাখবো কিভাবে এখন  
বহুবাবহারে জীর্ণ শব্দ সমাহারে ?



একমাত্র বিমল'ই তাদের বিশিষ্ট ধরনের অনন্য সৃষ্টিঃ  
বানানোর শিল্প-কলায় বছরের পর বছর অতুলনীয় রয়েছে।  
এই প্রতিভা ধারা আরও অগ্ৰান।



একমাত্র বিমল



এখন পেশ করা হচ্ছে  
 ট্রিকুল • অল্টাইমস  
 গলিউল • গলিকুল  
 লর্ড ওয়েস্ট •  
 উল ডেজ • গোলেডজ  
 সারা বছরই পরিবার সর্ব-প্রথম  
 ইনস্ট্যান্ট স্মার্টিং শেণী ।



**স্মার্টিংস**

স্মার্টিংস স্মার্টিং স্মার্টিং স্মার্টিং স্মার্টিং স্মার্টিং স্মার্টিং স্মার্টিং স্মার্টিং স্মার্টিং

রুদ্ধস্বাসে পড়ার মতো বই

জেমস হেডলী চেজ  
আগাথা ক্রিস্টি  
অ্যালস্টেয়ার ম্যাকলীন  
অ্যালফ্রেড হিচকক  
আর্থার কোনান ডয়েল



অপারেশন ককটেল

২০'০০

জেমস হেডলী চেজ

অর্কিড ভিলা



জেমস হেডলী চেজ

অর্কিড ভিলা

দাম : দশ টাকা

ভুসার বায়ের জেট পতির খিলার

এক্সপেরিমেন্ট

সাত টাকা

মৌসুমী প্রকাশনী

১৭ কলেজ রো/কলকাতা-৯

## কণ্টকলিত অতুল্য ঘোষ

নব পর্বস

১৪১১

অনেকে যা আশঙ্কা করেছিলেন, তাই ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গের সুযোগ্য (১) অর্থমন্ত্রী এবারে রামকৃষ্ণ মিশনের উপর হানা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। গোল পার্কে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের 'ইনস্টিটিউট অব কালচার' নামে যে প্রতিষ্ঠান আছে, তার খ্যাতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে। কত দেশ-বিদেশের কত পণ্ডিত এবং সজ্জন ব্যক্তি প্রায়ই এখানে আসেন এবং এখানে যেসব আলোচনা হয় তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতীয় সংস্কৃতির উপর এঁদের প্রকাশিত বই একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। বর্তমানে সংস্কৃতির নামে যেসব ঘটনা ঘটে, তাতে অনেক সময় নিজেদের কাছে নিজেকে লজ্জিত হতে হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে যেসব গান হয় তার অধিকাংশই যে-কোন সভা জগতের পক্ষে লজ্জাকর। কয়েক বছর আগে পুঞ্জের সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে একটি গান মাইকে প্রায়ই শোনা যেত। তাতে এই কথাগুলি ছিল : 'ভাবাচাকা, ভাবাচাকা, ভাবাচাকা'। কোন সংস্কৃতি থেকে এইসব অনুষ্ঠানের নাম 'সাংস্কৃতিক' হয়েছে জানা নেই, কিন্তু এটা এখন নিতানৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংস্কৃতির নামে এখন এইসব নর্ভন-কুর্ভন চলছে, সেই সময়ে গোল পার্কের এই প্রতিষ্ঠানটি মরুভূমির মাঝে মরুদান। এখানে যেসব আলোচনা হয়, তা শুনলে নিজের দেশের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে, দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে, আর দেশের জন্য গৌরববোধও হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে হস্তক্ষেপের ঘটনা পূর্বেও ঘটেছে। যেমন মিশন পরিচালিত কোন কোন বিদ্যালয়ে তাণ্ডবকোণার চেষ্টা হচ্ছে, তেমন 'ইনস্টিটিউট অব কালচার' সম্পর্কেও অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। ভারতবর্ষের সৌভাগ্য যে, সে অপচেষ্টা বাধে হয়েছে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মহাপ্রতাপশালী অর্থমন্ত্রী এখানকার জন্য রাজা সরকারের যে অর্থসাহায্য অনুদানের ববস্থা আছে, তা বন্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন। যুক্তিটা অশুদ্ধ—যে এদের অর্থসাহায্য আছে। রামকৃষ্ণ মিশন তো কোন দলভুক্ত নন, বা এঁদের কোন জমিদারিও নেই। এঁরা লোকের কাছে ভিক্ষাও করেন না। এঁরা পরিশ্রম করেন; সাধারণ মানুষ ভাল কাজ বলতে বা বোঝায়, এঁরা সেই সব কাজ করেন। সেই জন্য লোকের মনের উপর এঁদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। 'শ্রদ্ধা দেয়'—এঁদের সম্পর্কে এই কথাটাই খাটে। সেইজন্যই এমন অনেক লোক আছেন, যারা শ্রদ্ধাহীনতার লেশকে ঢেকে দিতে চান, তারা এঁদের পছন্দ করেন না। মিশনের অর্থসাহায্য মানে? এঁদের কৃতকর্মের জন্যই সাহায্য। নিরন্তর, নিরলস সব কাজের কর্মসাহায্য এঁরা হেমাঙ্গিন

জাতিদের নিজেদের পুত্র পাখি করেছেন। তারা রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু-সন্ন্যাসী, তারা এই হেমাঙ্গিনদের নিজেদের আদর্শ দিয়েছেন এবং সে বন্ধ এখনও চলেছে। পার্থিব কাজের মধ্যে এঁদের আকর্ষণ একটাই। এঁরা ডাক শুনছেন—আরামের শয্যাতল ভাগ্য করে বোরিয়ে এসেছেন। পুত্র-পরিবার-পরিজনের কথা এঁরা ভাবেননি। তথাকথিত পার্থিব সম্পদ এঁদের আকর্ষণ করতে পারেনি। জনসাধারণের উপর আধিপত্য, নেতৃত্বের মোহ এঁদের মনকে বিভীর্ণ করতে পারেনি। পূজা-পাঠ, সাধন-ভজন নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে আত্মসমাহিত হয়ে আছেন, দুর্ভিক্ষে, প্লাবনে, মহামারীতে তাঁদের দেখা বাবে আতের কুটিরে কুটিরে। হিমালয়ের অন্দর-কন্দরে যেসব সাধু বাস করেন, পার্থিব জগতের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু মিশনের এইসব সাধু-সন্তরা, হাঁদের তপস্যা হিমালয়ের এসব সাধু-সন্তদের চেয়ে একটুও কম নয়, দুর্দিনে আত্ম মানুষদের পাশে এসে দাঁড়ান সব ছেড়ে দিয়ে এমন অপূর্ব সমন্বয় খুব কম দেখতে পাওয়া যায়। পার্থিব সম্পদের মারা তুচ্ছ করে তারা দিব্যজ্ঞানের জন্য ধ্যান-ধারণায় মগ্ন, পার্থিব মানুষদের দুর্দিনে তারা আর আত্মসমাহিত থাকেন না, প্রভাত-সূর্যের মত জ্যোতির্মান হয়ে তারা সকলের কাছে দেখা দেন। এইভাবেই তারা মানুষের মনের মধ্যে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছেন। তার ভিত্তি এত মজবুত যে তাকে টলানো যায় না। জমিদারি, ব্যবসাদারি, পেশাদারি—সবেরই ভিত টলানো যায়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে যে প্রতিষ্ঠা, শ্রদ্ধার যে প্রতিষ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে, তার শিকড় তো মানুষের সমাজের অন্দর-কন্দরে প্রবেশ করে স্থায়ী স্থান করে নিয়েছে। গভর্নমেন্টের সামান্য অনুদানের উপর এঁদের স্থায়ী নির্ভর করে না। এই অনুদান দিয়ে গভর্নমেন্ট ধনা হয়। দুর্ভাগ্য অর্থমন্ত্রীর, তাঁর এ বিষয় অনুদান করবার শক্তি নেই। তিনি মনে করেছিলেন অন্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানের অর্থসাহায্য বন্ধ করলে তাদের যেমন কষ্ট হবে, তেমন অনুদান, বন্ধ করে মিশনকেও অসুবিধায় ফেলবে হবে। তিনি দুর্ভাগ্য, তাই তিনি বোঝেননি যে, মিশনের তারা সাধু-সন্ন্যাসী তারা সাধারণ সুবিধা-অসুবিধার গণ্ডির মধ্যে বাস করেন না। তাঁদের আদর্শ এবং লক্ষ্য স্থির, করণীয় যেটা সেটা তারা করবেনই এবং তারা জানেন যে, সেই কাজের জন্য অর্থের অভাব হবে না। তারা স্বার্থপর, ক্ষুদ্রমনা, তা বা অর্থের অভাবের জন্য বৃহৎ কাজ থেকে বিরত হন। তারা সে অবস্থা অতিক্রান্ত হয়েছেন, তাঁদের মনে সে সংশয়, সন্দেহের কোন দিন উদ্ভব হয় না।

অশুদ্ধ যুক্তি যে, মিশনের অর্থসাহায্য আছে—তাই তাঁদের আর দেবার প্রয়োজন নেই। মিশন যদি এমন কাজ করে থাকেন যে, যাতে তারা অর্থ অনুদান পাবার যোগ্য, তা হলে অর্থসাহায্য বাধার সৃষ্টি করবে কি করে? আর অর্থসাহায্য তো কাজের জন্যই হয়। অনুদান যেটা পান, সেটা তো তাঁদের কাজের স্বীকৃতি। জনসাধারণের শ্রদ্ধা; আর

স্বীকৃতিতত্ত্বরূপ দেন। বিচার তো একটাই—  
অর্থের সম্ভাব্যহার। যে কাজের জন্য অর্থ  
দেওয়া হয়, সেটা যদি ঠিকমত হয়, তাকেই তে  
সম্ভাব্যহার বলে। তা হলে অর্থসাম্রাজ্যের কথ  
আসে কি করে? তবু ভাল যে, অর্থমন্ত্রী  
এটাকে অধিগ্রহণ করতে চাননি। যেখানে  
কাজের পেছনে যুক্তির কোন বলাই নেই,  
সেখানে যে-কোন অর্থ হতে পারে। মুখ্য-  
মন্ত্রীর সমঝোচিত হস্তক্ষেপে অর্থমন্ত্রীর এই  
যুক্তিহীন, অর্থহীন, বিচারহীন কাজ যে বন্ধ  
হয়েছে, তাতে জনসাধারণ একটা স্বস্তির  
নিশ্বাস ফেলেছে। রামকৃষ্ণ মিশন ও তদের  
কবি-কলাপ নিয়ে কিছু যে বলার প্রয়োজন  
আছে, তা অনেকেই মনে করেন না। দুঃখ এই  
যে, তা শুধুও মাঝে মাঝে এসব বিষয়ের  
অবতারণা করতে হয়। যদের কাজ নিজেদের  
অস্তিত্বকে স্থায়ীকরণে দিয়েছে এবং যে কাজ  
এখনও অব্যাহত গতিতে চলছে, তদের সাধু-  
বাদ দেবার প্রয়োজন হয় না। দায়িত্বশীল পদে  
কার্যনিষ্ঠ জনসৈন্য কোন মানুষের অবিমণ্য-  
ধারণার জন্য সাধুবাদ মাঝে মাঝে প্রয়োজন  
হয়, এটাই দুঃখের।

সরকারের কোন দাক্ষিণ্যও নয়, সেবাকারও নয়। এটা দায়িত্বপালনের কাজ এবং এই দায়িত্বপালনের জন্যই তো তারা সরকারকে এসেছেন! দায়িত্বপালনে যদি তাদের হ্রাট হয়, তা হলে সে হ্রাট তো কেন্দ্রের নিন্দাবাদ করে বা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিবোম্ভার করে সংশোধন হবে না! কেন্দ্র যদি সত্যিই পশ্চিমবঙ্গের ন্যায্য দাবিকে উপেক্ষা করে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে করণীয় কাজ যদি না করে, তা হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিশ্চয়ই জনসাধারণের সমর্থন সমর্থন পাবে না। কিন্তু অর্থমন্ত্রী স্বভাবে বিবোম্ভার করেন, তাতে পুরো ছবিটা কারো চোখেই ভেসে ওঠে না। বেশ তো, রাজ্যের অর্থমন্ত্রী পরিষ্কার করে 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' প্রকল্পের যাবতীয় তথ্য ভাল করে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করলেই তো পারেন। কিন্তু তা তো হচ্ছে না—ক্রমাগত বাগাড়ম্বর আর আত্মফালন। সমীক্ষক-দলের মারফত অনেক অভিযোগই তো সংবাদ-পত্রে বেরিয়েছে এবং আপাতদৃষ্টিতে অনেকেরই ধারণা, এইসব অভিযোগ মোটামুটি সত্য। কারণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট অভিযোগের নির্দিষ্ট উত্তর আজ অবধি প্রকাশিত হয়নি। এ সম্বন্ধে জন-

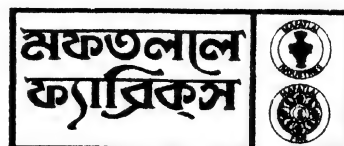
ਸਾਮਕਰ ਸਿਖਲਨ ਇੰਸਟੀਚਿਟ ਆਫ ਕਾਨਸਲਰ

পশ্চিমবঙ্গ খরা এবং বন্যা—দুইয়েতেইই  
গভীর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই অবস্থায় কেন্দ্র  
বদি অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে  
যথোচিত সাহায্য পাঠিয়ে থাকেন, তা হলে  
রাজ্য সরকারের তা অস্বীকার করা উচিত নয়  
শ্রুতিবাদ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু অহেতুক

“আমি অফিস অফিসারি,  
আমার চটপট কাজের দ্বারা মতই আমার ড্রেসও হবে স্মার্ট।”



আবার অফিস-মারফিক পোশাকের জুতো  
নানান গছন্দসহই মনোমোহা করবে!



মুর্শিদাবাদ, শাওর, শাজী, ড্রেস মেকিংসহাল ও ডেলিভারি।

**মফতলাল ইণ্ডাস্ট্রিজ্ লিমিটেড মফতলাল ফ্যাব্রিকস**





# সেই সময়

## সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

৯৭৭

পরিদর্শকের কাফালগের জন্য চিপেরে একটি বাড়ি ভাড়া করেছেন নবীনকুমার। নতুনভাবে সব কিছু সজ্জিত করা হচ্ছে। সম্পাদকের কথটি দিনতলে।

অগ্রহায়ণ মাসের এক দিবসেই নবীনকুমারের জন্মি গাড়ি সেই গরুর সামনে থামলো। অজ্ঞ থেকে সে এই দৈনিক পত্রিকাটির পরিচালনা ও সম্পাদনার ভার গ্রহণ করবে। জগদমোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামী নামে দুই ব্রাহ্মণ নবীন কুমারকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সমস্তকে নিয়ে গেলেন দ্বিতলে। এই দুই ব্রাহ্মণই পত্রিকাটি শব্দ করে দিলেন। ক্ষুদ্র আকারের এক পাণ্ডুর কপট এত চমকিত পারেন। নবীনকুমার কদের কাছ থেকে পরিদর্শকের সর্বস্ব গ্রহণ করেছে। হিন্দুদের মতের পর সাম্প্রতিক হিন্দু পৌরষের সেই মালিকের দূর্বিন নামে একটি উদ্-পত্রিকাও চলে তার অর্থানুকূলে। এবার সে অগ্রগ্রহণ করলো এই দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র।

সম্পাদকের কেরারায় এসময় হয়ে নবীনকুমার অন্যদের বললো, অনুগ্রহ করে আপনারাও সেসব প্রথমেই আমি প্রয়োজনীয় কটা কথা বলে নিতে চাই।

প্রাক্তন দুই সম্পাদক ছাড়াও আর দু জন মস্তাকর এই কাগজের কর্মী। এ ছাড়াও নানাভাবে সর্ফলস্ট সাত-আট জন বাড়ি সেখানে উপস্থিত। কয়েক জন আসন গ্রহণ করলো, কয়েক জন এলো দলভায়মান।

বাইশ বৎসর বয়স্ক সম্পাদক গভীর কন্ঠে বললো, প্রথমেই জানাই, ওকালৎকার মশাই ও গোস্বামী মশাই সমেত এই পত্রিকার যারা যারা কর্মী ছিলেন, সকলেই ভবিষ্যতে এ কাগজে বহাল থাকবেন।

সকলে একসঙ্গে সাধা! সাধা! বলে উঠলো। ছলছল করে উঠলো ওকালৎকার ও গোস্বামীর চক্ষু। তারা এতটা আশাই করেনি।

নবীনকুমার বললো, আপনারা আরও যোগ্য শ্রমক শ্রমজেন, আমার আরও কর্মী লাগবে। এক-

পাতা নয়, এই পত্রিকা হবে চার পৃষ্ঠা।

এবার সকলে আরও বিস্মিত। চার পৃষ্ঠার বাংলা কাগজ? প্রতিদিন? এমন কথা কেউ কখনো শুনেনে!

অন্যদের মুখে কিংময়ালখা পাঠ করেই নবীনকুমার আবার বললো, হ্যাঁ, প্রতিদিন চার পৃষ্ঠা। এ কাগজ হবে ইংরেজ পত্রিকাগুলির সমতুল্য। আপনারা সকলেই জানেন, এতকাল যে সব বাংলা সংবাদপত্র বেরিয়েছে, তা ইংরেজি কাগজগুলির উচ্ছ্রষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। ইংরেজি কাগজের বস্তুপাচা পুরোনো খবর বাংলা কাগজে বেরায়। আমি নাম কতে চাই না, এমন বাংলা কাগজ যাতে যার সংবাদ অংশ ইংরেজি কাগজের চেয়েও অনুবাদ, কী তাই না?

অন্যরা আর কী বলবে! এ তো জানো কথাই; বাংলা কাগজের নিজস্ব সংবাদ সংগ্রহের সুযোগ কোথায়?

আমরা পরিদর্শকের জন্য নিজস্ব বিপোর্টার নিয়োগ করব। তারা হাইকোর্টে যাবে। মফস্বলে যাবে, হাটে-বাজারে ঘুরবে, গবরমন্ডের হাই হাই ক্রিডের সঙ্গে কথা বলবে, তারপর নিরপেক্ষ সংবাদ দেবে। দেখুন, অনেক সংবাদ আছে, যা সাংবাদিকের কাজে লমবে কিন্তু আমাদের কেনো প্রয়োজন নেই। তবু, বাংলা কাগজে ইংরেজির অনু-করণ করে সেগুলি ছাপে। যেমন ধরুন, অমুক ব্রাহ্মজি অমুক স্থল থেকে এসেছে। অমুক জায়গায় অমুক দিনেতে কলকাতা ছেড়ে ইংলন্ডে যাবে। এই সংবাদ পাঠে বাঙালীর কী উপকার? আমাদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধেই ইংরেজ জাতি হতে ভিন্ন। সুতরাং বাঙালী কাগজে বাঙালীর নিজস্ব খবর, যাতে দেশের কল্যাণ হয়। মানুষের চেতনা জগুত হয়, এমন বিষয় পরিবেশণ কতে হবে। তা ছাড়া আপনারা সকলকে এক শপথ নিতে হবে, আপনারা রাজি।

সকলের মখপাত হয়ে মদনমোহন গোস্বামী বললেন, সিংহমশাই, আপনার বাকগালি শুন্যে আমাদের মনে এক নতুন ভাবের উত্তরক হতেছে। এ সব যে বড়ই সত্য কথা। তবু তাহা আমরা এতদিন উপলব্ধি করি নাই।

নবীনকুমার বললো, মেডিক্যাল কলেজ থেকে ছাত্রী পাশ করে যখন ডাক্তার হয়, তখন মানব-সেবার জন্য তাদের শপথ নিতে হয়। সংবাদপত্রও মানুষের মনের চিকিৎসা হলো কতখানি। সে কারণে আসুন আমরা শপথ গ্রহণ করি, জ্ঞানপূর্বক সত্য পথ থেকে বিচলিত হবো না। আর যাদের কোনো বিষয়ের জ্ঞান এখন না হয় সে বিষয়ে সর্বিশেষ যত্নবান হবে। আর ...পাঠার্থীর কোনো মানবই পক্ষপাতের হাত এড়াতে পারেন না যদিও তবু আমরা অস্বীকার কচ্চি যে, জানত কোনো পক্ষপাত দেয় লিপ্ত হবো না। কেমন, এ শপথ ঠিক?

—অবশ্যই, অবশ্যই।

—আপনারা জানেন, আমি মহাভারত অনুবাদ-কাজে বাস্তু আমি। অর্থেকের বেশী হয়ে গ্যাছে, এ সময় সে কাজে চিল দেওয়া চলে না। সেজন্য এখানে আমি খুব বেশী সময় দিতে পারবো না। দায়িত্ব নিতে হবে আপনাদেরই। আমি সকাল আট ঘটিকা থেকে দুপুর দুই ঘটিকা পর্যন্ত মহাভারত কাফালগে থাকব। সেখান থেকে আসতে আমার এক ঘন্টা লাগবে। অর্থাৎ তিন ঘটিকা থেকে রাত আট-নয় ঘটিকা পর্যন্ত আমি আপনারদের সঙ্গে এখানে কাজ করবো!

—সে কি মহাশয়, আপনি আহা-বিশ্রামেরও সময় রাখবেন না?

—আমার এ শরীরের পক্ষে খুব বেশী অহাযের প্রয়োজন হয় না, আর বিশ্রামের জন্যও

আমার লম্বার প্রয়োজন খুব না। সেজন্য না সেজন্য চিন্তা করার দরকার নেই। বাংলার ঘরে ঘরে এই কাগজ পৌঁছে দেওয়া চাই। যাতে লোকে ইংরেজি দৈনিক ফেলে সাগড়ে এই কাগজ পড়ে। আর একটা কথা! গোস্বামী মশাই, এ কাগজে লেখবার সময় আপনারদের উদ্ভাষি-বাংলা ছাড়াই হবে। সংস্কৃত আর নাসার গম্বল। বাংলা আমার চাই না। সাধারণের বোধগম্য সহজ সরল ভাষাতেই সংবাদপত্র প্রচারিত হওয়া উচিত। তাতে ব্যাকরণ একটু ক্ষয় হলে কিংবা ব্যোপদেব রাগ কলেন কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না।

শুরু হয়ে গেল দৈনিক পরিদর্শক। চার পৃষ্ঠার কাগজ, দাম চার পয়সা। সম্পূর্ণ নতুনভাবে সংবাদ পরিবেশন, স্বকণ্ঠে ছাপা, সবই অভিনব। লোকে প্রতিরাশ গ্রহণ করার আগেই যাতে এই কাগজ পেয়ে যায়, তেমন ব্যবস্থা করা হলো। শিক্ষিত ব্যক্তিরা সকলেই স্বীকার করলেন, বাংলায় এমনটি আর কেউ দেখেনি।

বিদ্যাসাগর প্রথম দিন পরিদর্শক পেয়ে বিস্মিত হলেন। নবীনকুমার কী কামড় শুরু করেছে! দৈনিক সংবাদপত্র বার করা কি সোজা কথা! ওদিকে মহাভারত অনুবাদের মতন অত বড় কাজ হতে রয়েছে.....হুজুগে যুবক, তবে কি মহাভারতের কাজ মূলত্বি রেখে এবার এটাতে ম্যেতছে?

একদিন তিনি চলে এলেন বরাহনগরে। সারস্বত-আশ্রমে মহাভারত অনুবাদের কাজ কিন্তু একটুও থেমে নেই। নবীনকুমার পশ্চিমতনের এক-দলও নিবর্তি দেয় না। পশ্চিমতন মহাভারতের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি থেকে মিলিয়ে একটি একটি মূল নির্বাচন করে তার আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ করে রেখে দেয়। নবীনকুমার প্রত্যেকদিনের প্রথমার্ধে এখানে কাটিয়ে ভাষার পরিমার্জন করে। তারপর সে চলে যায় পরিদর্শক কাফালগে।

বিদ্যাসাগর ভাবলেন, তা হলে এই বাংলা সংবাদপত্র বেশীদিন বেরবে না।

অথচ দিনের পর দিন ঠিক সময়ে পরিদর্শক প্রকাশিত হতে লাগলো।

এক সন্ধ্যাকালে পরিদর্শকের সম্পাদকের কক্ষ এসে প্রবেশ করলো। সম্পাদকেরই সমবয়সী এক যুবক। নবীনকুমার সম্পাদকের লিখাছিল আভ-নিবর্তভাবে, যুবকটি গলা ধাক্কির দিয়ে বললো, কী হে, নবীনবাবু, একটু বসতে পারি?

নবীনকুমার মুখ তুলে, ঈষৎ বিস্মিত হয়ে বললো, এ কি কৃষ্ণকমল নয়? আরে, আরে, বসো বসো! অ্যান্দিন বাদে হটাৎ কী মনে করে?

কৃষ্ণকমল উদ্ভাষি নবীনকুমারের সহপাঠী ছিল হিন্দু কলেজে, কিছুদিন সে বিদ্যোৎসাহিনী সভাতেও যোগ দিয়েছিল উৎসাহের সঙ্গে। তারপর বেশ কিছুদিন তার দেখা নেই। কৃষ্ণকমল যেমন মেধাবী, তেমনই খেলালী।

কৃষ্ণকমল বললো, কেমন দেশোদ্ধার কতে মেতেচো, তাই দেখতে এলাম।

নবীনকুমার বললো, একটু বসো, কৃষ্ণকমল। আমি হাটের এই কাগজটা সেয়ে নি আগে তারপর তোমার সঙ্গে কথা কইবো।

সম্পাদকীয় লেখা শেষ করে, কপি বয়বে ডেকে তার হাত দিয়ে সেটি ছাপাখানায় পাঠিয়ে দিয়ে নবীনকুমার বললো, কৃষ্ণকমল, তুমি এসেছে বড় ভালো হয়েছে, তোমার মতন একজনকে খুঁজিচলুম।

—ঘরে হুকো-গড়গড়া কিছুই রাখেনি?

—আমি তো ধূমপান করি না।

শ্রমপুণ্যের জন্য তো অত্যন্ত রাক্ষসে, সম্পাদকের  
রয়ে কত রকম মনুষ্য আসবে।

—এখনি আনিবে দেবার ব্যবস্থা করি।

—থাক, থাক, আপাতত নিসতেই কাজ চালাই।  
ভট্টাচার্য্য বাণেশ্বর ছেলে, সংগে সব সময় নবিসার  
ডিবেটা থাকি।

—তা ভট্টাচার্য্যর বাণেশ্বর সম্প্রদায় হয়েও তুমি  
তো পরোপন্থীর নাস্তিক শুনিনি! আরও কী কী  
মন কচ্ছো, যা ঠিক ভট্টাচার্য্য-স্বলভ নয়?

—আরে, নাস্তিক হয় বামনরাই। চাঁড়াল  
কখনো নাস্তিক হয় না। বামন ব্যাটরা তো জানে  
যে অন্য জাতের লোকদের ভগবানের নাম করে খুব  
ভয় দেখাচ্ছি বটে, আসলে ভগবান-টগবান কিছ-  
নই। মন্দিরদের পুজোরিরা দেকবে উপ করে ঠাকুরের  
প্রসাদ এটো করে খেয়ে নেয়।

—হা-হা-হা-হা-হা।

—তোমরা কায়তরা আর বেনেরা ধর্মধাম করে  
মা-বাপের ছোরাপদ যজ্ঞ করা, ব্রাহ্মণকে গোরা-  
গছুর দান করা। কত না যেন পবিত্র পুণ্যের কাজ।  
স্বার সে বামন বাছুরের গলায় দড়ি বেঁধে হিড়  
হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে কশায়ের কাছে বিক্রি  
করে দেয়।

—হ্যাঁ, ছেলেবেলায় এ রকম দাঁকচিলুম  
হটে, তখন রাগ করে সেই বামনের টিকি কেটে  
নইচিলুম। থাক সে কতা। তুমি এসে পড়েছো,  
তামাকে আমার দরকার।

কৃষ্ণকমল দাঁড়াল, কৃষ্ণকায়, গায়বর্ণ মাজা  
গজা, এই কয়েকটি একটু একটু টাক পড়তে শব্দ  
দরজে, কিন্তু গম্ভীর বোধ পুরস্কা। পয়সা  
দেখে, খোঁসান ও চারনা কোট, পায়ে জালতলার  
টি। ওশে একটু যেন বিদ্রূপ হাসা সব সময়  
দাঁকিয়ে থাকে।

এক টিপ নস্য নাকে ঠেস দিয়ে সে বললো,  
মামার মতন লোককে তোমার কী দরকার পড়লো  
লো তো?

—তুমি দুরাকাক্ষের বৃদ্ধা ভ্রমণ নামে একখনা  
বস সেরে গল্প রচাচ্ছিলে, পড়ে বড় মজা পেয়ে-  
চলুম। আর তো বাংলায় ভেমন লিখলে না!  
তোমার মতন বিদ্বান, তীক্ষ্ণধা লোককে আমাদের  
ই। তোমরা কলম ধরলে দেশের অনেক ওপকার  
হবে। তুমি আমাদের কাগজের জন্য লেগে পড়ো  
ই।

—হুঁ, তোমার কাগজে দেশসেবার বিষয়ে  
নেক বড় বড় কতা থাকে তো দেখছি। তা এ জন্য  
মামার কত খরচ হচ্ছে?

—খরচ কতা ভাবলে কি কোনো ভালো কাজ  
হ?

—সাহেব ব্যবসারীরা তোমার কাগজে বিজ্ঞাপন  
দেয় না। অর্থাৎ রোজনিউ নেই। সবটাই তোমার  
সব থেকে যাচ্ছে তাই না?

—কাগজ ঠিক মতন চললে ব্যবসারীরা  
জ্ঞাপন ঠিকই দেবে।

—বালা কাগজে? হেঃ।

ইংরেজের সংগে টিকুর দিতে পারে? ইংরেজিতে  
ভালো নাজ পেপার হয় আর বাংলায় আমরা তেমন  
পারি না?

—ইংবর গন্ত কিংবা গড়গড় ভট্টাচার্য্য  
মতন খিস্ত-খিউড় ছাড়া, কাগজ চলবে। তোমার  
এট বড় বড় আইডিয়ালিজম-এর কথা ক'জন  
বুঝবে? দেশব্যবোধ, হুঃ, ক'জন লোক জানে  
দেশ কাকে বলে?

—কৃষ্ণকমল, তুমি কি আমার নিরাশ করে দেবার  
জনাই আজ এখানে এসেছো? তোমার এ সব বিনি  
পয়সার উপদেশ আমি শুনতে চাই না। তুমি আমার  
কাগজে লিখবে কি না?

—পয়সা পেলে লিখতে পারি বটে।

—পয়সা পারে। প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজির  
অধ্যাপনা করছো শুনিনি, তোমার কি এমনই পয়সার  
অভাব যে লেকচার আগেই পয়সার কথা মনে এলো?

—পয়সার কতা কার নেই! শ্বয়ং লর্ড ক্যানিং  
পদবীত বলেন যে সরকারি ফাউন্ড টাকার অভাব।  
তোমাদের মতন দেশের উপকার করবার জন্য আমি  
মাতা ফাটাফাটি করতে রাজি নই। সমাজ পরি-  
বর্তনের জন্য যারা উজ্জীয়ে বেড়ছেন বেড়ান, আমি  
প্রফেশনাল মানব।

—বেশ ভালো কতা। প্রফেশনাল লেখক  
হিসেবেই তুমি আমাদের নতুন কী দিতে  
পারো? সাহেব-সুপার গল্প কিংবা বিলাতি  
চালের বাংলা আমার চলবে না।

—তুমি দেশীয় বিষয় চাও। এ দেশের কোতায়  
কী ক'জ ঘটেছে তুমি কতটুকু জানো? তুমি এমন  
কোনো স্থানের কতা জানো, যেখানে হাজার হাজার  
নারী-পুরুষ প্রকাশ্য স্থানে পাশাপাশি বসে  
খাওয়া-দাওয়া করে, নাচে, গায়?

—হাজার হাজার নারী-পুরুষ?

তার বেশী ছাড়া কম নয়। পুরুষের চেয়ে  
নারীর সংখ্যাই বেশী, এক পুরুষের পাশে তিন-  
চারজন যুবতী—

—এ সব কী গীজখনি চালাচ্ছো, কৃষ্ণকমল?  
নারী-পুরুষ প্রকাশ্য স্থানে বসে আহারাদি করবে?  
এ কি তোমার সাধের ইংলন্ড না সুদূর আমেরিকা?  
ইংলন্ডতানে এমন সম্ভব নয়।

—ইংলন্ডতান বাদ দেও কৃষ্ণকমল। থেকে মাত্র  
যোল ব্রোশ উত্তরেই এমন হয়, আমি নিজের চক্ষে  
দেখে এসিছি। রেলযোগে ক'চড়াপাড়া চলে যাও,  
তার কাছেই ঘোষপাড়া গ্রাম। সেখানে প্রতি দোল-  
পূর্ণিমায় আউলে সম্প্রদায়ের মেলা বসে। আউলে  
সম্প্রদায়ের নাম শুনো? শোনানো? অথচ দেশের  
অবস্থা বদলাতে চাও? সেইজন্যই বলচিলুম,  
ক'জন জানে দেশ মানে কী?

—বাংলায় হিন্দুদের কত সম্প্রদায় আছে। তার  
মধ্যে সব ক'টি সম্প্রদায়ের পরিচয় না জানলেই  
দেশকে জানা হলো না?

—নবীন, তোমার একটু ক্রিপাচিলুম। আমি  
নিজেই কি ছাই জানতুম? নেহাত গভবায় গিয়ে

মানুষের মেলা। তার মধ্যে চোদ্দ জনাই নারী-  
লোক। কুলকামিনীরা আর এমন খেই খেই করে  
মেলায় যাবে এমন বিশ্বাস হয় না, মনে হলো  
বেশ্যার সংখ্যাই বেশী। কেউ হতো দিয়ে আছে,  
কেউ পুজো দিচ্ছে, কেউ বা নাচা-গানা করে চলছে,  
আবার কেউ বা নিজের লোককে ঘোবা সাগিয়ে  
ঘোবার কথা হোক বলে রোগ আরামের ভৌতিক  
দেখাচ্ছে!

—এত লোক এক সংগে?

—হ্যাঁ। আউলে সম্প্রদায়ের ক'টা এখন  
ঈশ্বরচন্দ্র মহাশয়। তার সংগে দেকা করতে গিয়ে  
দেকলুম, ক'টা বাবু একটা শব্দায় শয়ন করে  
আছেন আর অনেকগুলি স্ত্রীলোক তাকে ঘিরে বসে  
কেউ পদসেবা কচ্ছে, কেউ গা টিপে দিচ্ছে, কেউ মখে  
সদেখ তুলে দিচ্ছে, কেউ আগে চন্দন লেপতে আর  
কেউ গুলায় মাল্য পরাচ্ছে। বেড়ে ব্যাপার।  
ক'টা বাবু আমার সংগে কতা বলার সময়ই পেলেন  
না। শুনলুম নাকি বন্দাবনের কেণ্টলীর মতন  
এখানেও স্ত্রীলোকদের বন্দবরণ হয়।

কৃষ্ণকমল, তোমার খেঁকটা কোন দিকে বলো  
তো? তুমি যেন আমি রসের ব্যাপারে বেশী  
পেরেছো? আমার কাগজে ওসব আমি প্রচার কতে  
চাই না।

—ওঃ হো, তোমার বুদ্ধি আদি রসের  
দিকে ঝোঁক নেই। ঐ যে হুতোম পাঁচার নক্সা বাজারে  
ছেড়েছো, তাতে তো আদিরসের টিপনী কম নেই!

—ওটা, ওটা—

—বুঝিচি, ওটাও সমাজসংস্কার! শোনো,  
আমি এই মেলায় কতা সাক্ষ্যতারে বললুম কেন  
জানো? ঐ মেলাটা দেকে আমি মূখ্য হইচি। এ  
আদিরসের জন্য নয়, এই প্রথম আমি একটা মেলা  
দেকলুম, কোনো জাতিভেদ নেই। এখানে হিন্দু-  
মোছলমান সব সমান। মোছলমান এখানে  
সানন্দে বামনের মখে অন্ন দেয়, বামন আহাদ  
করে খায়। সদগোপ, কল, হুচি, বৈকুণ্ঠ সব ওখানে  
এক। এমনকি নারী-পুরুষেরও প্রভেদ নেই। অবস্থা  
বৈশিষ্ট্যে যে-সব অবলা নারী বেশীা হয়েচে, তাদেরও  
কেউ ঘণা করে দূরে সরিয়ে রাখে না। এ যেন এক  
মহামিলন মেলা। এ কতা সারা দেশকে জানাবার  
দরকার নেই?

—বেশ তো তুমি লিখে দাও!

কৃষ্ণকমল প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে আসতে  
লাগলো পরিদর্শকের সম্পাদকীয় দফতরে। কিন্তু  
গাল-গল্পই করে, লেখার ব্যাপারে অলস। ঈশ্বর  
কিছলো কিছু মিশ্রিত গল্প বলায় তার জড়ি  
নেই, কাজ কম করে নবীনকুমারকে শুনতে হয়।

নবীনকুমার তাকে লেখার জন্য দিলেই সে  
বলে, আরে দাঁড়াও, তোমার কাগজ ভালো করে  
চলুক। আগে দিক, তোমার এলুম কতদূর। এর  
মধ্যে কত টাকা গলে গ্যাছে, ঠিক করে বলো তো  
জাই?

নবীনকুমার এই শেষের কথাটিতে অপ্রসন্ন হয়।  
সে হাত তুলে বাধা দিয়ে বলে, ও প্রশ্ন তুলো  
না। আমি টাকা-পয়সা নিয়ে চিন্তা করতে চাই না।  
(ক্রমশঃ)



# স্মৃতি সততই সুখের

প্রতিভা বসু

॥ ২৮ ॥

পৌষিণে গেল হামবর্ণে। জামান দেশ পা দিয়েই বোকা গেল, জামানরা জাত হিসেবে পৃথিবীর অনান্য বাসিন্দার চাইতে বেশ কিছুটা স্মৃতিশীল। জামানরা পৃথিবী জামান-ফরাহ অনেক ভাষায়ের মধ্যে শব্দেই পশ্চাত্তাত্ত জগতে অন্যান্য দেশের তুলনায় তাদের কাছে এই দেশটারই বেশী ভালো লাগে। যদিও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে এরা যে খুব কল্যাণ তা নয়। পৃথিবীর এই দেশটি সে কারণে এদের টেকা দিয়ে বেরিয়ে যেতে সমর্থ। চমক লাগাবার মতোও তেমন কিছু আছে তাও নয়। এদের নিউ ইয়র্কের মতো এক দেশে আসতে কাড়িও নেই, প্যারিসের মতো চমক, লন্ডার বা চতুর্দশ লাইসেস প্রাসাদও নেই। তবু যে সে দেশ সহজেই, বলা যায় প্রথম দর্শনেই, অমরকালীন্দর মনোযোগ আকর্ষণ করে তার প্রধান কারণই সম্ভবতঃ এদের যেটা ভালো লাগে। যোগ্য কিন্তু ঠিক দার্শনিক নয়, চপল নয়, সতেজও নয়। এরা জানে একা কী। এদের ভিগনিটি আছে, অহংকার নেই। রাস্তাঘাট, লোকজন, দোকানপাট—সবটাই যেন লেখা আছে সে কথা।

অবশ্য হামবর্ণের কণিক সম্প্রদানে সেটা ততো বেশী প্রকট হয়ে ওঠেনি, হয়েছিলো কাল্পনিক চক্রে।

হামবর্ণ পৌষিছলোম বাড়িতে। এয়ার পোর্ট থেকে আসতে আসতে যতটুকু দেখা সেটুকুই তৃপ্ত হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে হলো। সকালবেলা দুটি ছাত্র এসে বৃদ্ধদের কাছে। একান্ডই ওগ বৃদ্ধা অতি সুন্দর চেহারা, বটি নয় সুতরাং পোশাক সাবান্ড, বাঁকো নয়, ভাঁসে মিনীত। গাঢ় নীল চোখ, পাকা সোনার মতো রঙের ঘন চুল। তাদের বাসনা তাদেরই আয়োজিত একটি ছোট্ট আসরে মাস্টার্স করেকজন ইন্টেলেকচুয়াল যুবক এবং আধুনিক লেখকের সঙ্গে বৃদ্ধদের সম্মতি একবার মিলিত হোন। তারা লাগেৎ বস্কা করবে, শহর চেনাবে, মিডিজিয়ামে নিয়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

হামবর্ণ বৃদ্ধদের বিশেষ কোনো জরুরী কাজ নিয়ে আসেননি। নিম্নলিখিত হয়ে এলও নানা স্থানে বস্কা করে বেড়ানোর চুক্তি নেই কোনো। একমাত্র কিংবদন্তিলায় ছাড়া।

ছেলে দুটি কলসো, এটা কোনো সভাসমিতি নয়, শহর নিতে পারেন আপনাদের দুজনকে নিয়ে অমরদের একটা আস্তা মাঠ। আপনাদের আমার একটুও কণ্ট দেরো না।

বৃদ্ধদের সানন্দে রাজী হলেন। বেরিয়ে পড়লো তাদের সঙ্গে। যেখানে নিয়ে এলো বেশ হয় কারো বাড়ির প্রথম। জন্য পরোক্ষ যুবক সমবেত হয়েছে সেখানে। খুব খুশী হয়ে আদর-আত্মালাপ করলো তারা। কলসো গেল হয়ে, আলাপ-পরিচয়ের পর প্রশ্ন এবং উত্তর-প্রত্যুত্তর তার ক্রমবিকাশে আসার জমে উঠলো সহজেই। বৃদ্ধদেরও জামায় একসঙ্গে এতজন সমান শিক্ষিত আধুনিক যুবক সহজে দেখা যায় না। ভারতবর্ষ দিয়েই তারা কেউ অজ্ঞ নয়, কলিঙ্গনাথ বিষয়ে শব্দ, শ্রুণের দ্বারাই শ্রদ্ধাশীল বা কেউই হলী নয়, দম্ভমতো পত্নীশ্রী করছে, তাঁর জীবনব্রতান্ত তারা জানে। সংস্কৃত পড়তে এমন ছেলো আছে সেখানে।

বেলা তিনটে পর্যন্ত তাদের সঙ্গেই কাটলো। নদীতে নৌকা চড়ে বেড়াতে বেড়াতে স্থিপ্রাধিক ভোজ, তারপর মিডিজিয়ামে সন্ধ্যা হোটেল ফেরা।

কলেজের মিটিং সাড়ে পাঁচটায়। পাঁচটাই এসে গেলেন দুজন অধ্যাপক। আমি আর বেরলোম না, বৃদ্ধদেরকে তো যেতেই হবে।

আমি ভের্কেছলাম সারাটা সময় শায়েই থাকবো। বিদ্রাম। সেটা কিন্তু পারা গেল না। ঘণ্টাখানেক পরেই মনে হলো, ঘোরাবির গামিতর চেয়ে শয়ে থাকার পরিশ্রমও মোহাত কম নয়। তখন হোটেলের একা ঘরে অসম্ভব খারাপ লাগতে লাগলো। অধ্যাপক দুজন এতো অনুগোহ করলেন তবু কেন গেলোম না ভেবে অমরদেরই হলো। যানিকরণ একজনালায় ও-জনালায় দুটিয়ায়, আবার এসে কিছুনিয়া বসে, আবার দাঁড়িয়ে শেষে মনে হলো নিচে যায়, লিবিতে গিয়েই বসি। অন্তত লোকজন দেখে তো সময় কাটবে। পাতে যায় লিফটের কাছে এসে নিচে নেমে এলাম। সজানোগোছোনে পরিপাটি লিফট অশচর্যজনকভাবে জনমানবহীন। এরকম একটা অজানা অচেনা দূর বিশেষে এই নিজ নত। আমার একটুও মনোপাত হাঁছলো না। সাহস করে রাস্তায় এসে দাঁড়িলাম। সেখানে খুব লোক চলছিলো। পেরানুলোর গেলে মায়েরা যাচ্ছে কাজ নিয়ে, কামক স্বামী-স্ত্রী যাচ্ছে, যুবক-যুবতী যাচ্ছে, কিন্তু সব এক দিকে, ডাইনে।

আমি দাঁড়িয়ে আছি চুপচাপ। নিশ্চয় খুব বোকাম মতো দেখাচ্ছিলো। কেউ কেউ কী করছিলো, হাসাচ্ছিলো। তার মধ্যে একজন আমার মধ্যে নেড়ে নেড়ে কিছ, জিজ্ঞাসা করলো। এক কণ্ড আমি বাক্যে পারলাম না। আবার আমি যা বললাম সে কথাও সে এক বর্ণ বাক্যে পারলাম না। সে এক ফোটা ইংরাজী জানে না, আমি এক ফোটা জামান জানি না। তখন আমার সাথে পরিচয়টা বাংলায় বললাম, 'শোনো, তোমরা সবাই কলিকটায় যাচ্ছে কেন? ওদিকটায় কী আছে? মেঝা বসেছে নাকি? আমাকে নিয়ে যাবে? কলার সঙ্গে প্রচুর অগণ্ডাশিপও করেছিলোম। জবাবে

সে-ও প্রচুর অগণ্ডাশিপ সহযোগে দুটি লম্বা লাইন দিগন্ত বকলো। বৃদ্ধদের বোকাম তারপর যেমন চলছিল তেমনই চলে গেল। মনে হলো মাঝভাষার আবেগ দিয়ে জাকজাকগত তাকে আমি যা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে তা বোঝেই। আমার সে তরু মাঝভাষার আবেগ দিয়ে আমাকে যা বলেছে আমিও তা বোঝেছি। সুতরাং সেই বোঝাটুকু সম্বল করে আমিও ডাইনের দিকে হাঁটতে লাগলাম। যদি কোনো রকমে হারিয়ে যাই তা হলে যে দেশ সাংঘাতিক বঠিন হবে বাক্যে পারছিলাম এরা এখন ভাষার দিক থেকে আমার কাছে একান্তই অন্য প্রেতের লোক। পা জিজ্ঞেস করল কারো সাহায্যই পাব না। ভীর ভীর করে তবু হেঁটে হেঁটে ডাইনে একটা রক পার হলাম। আবার গেলোম। মারলশঙ্কর খাওয়ার টিকে নিলাম। এক; আর একটা রকে পা দিলাম—দুই; আরো একটা—তিন। তারপর চতুর্থ রকে শেষে এসে দাঁড়িয়েই দেখলাম, মস্ত হুদ নদী হয়ে যায় যাচ্ছে, তাঁদের কিস্তী সমস্তল মানুষের মেলা। একজনই ঐ কিস্তিলে অত মানব হাটছিলো ওদিকে।

এখন আর বিকেল নেই, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। একটি বিশেষী মেয়ে আমি কিছুই জানি না, কথি না, চিনি না, এ অবস্থায় একা একা এ সময়ে লোকের ধরে গিয়ে বেড়ানো উচিত হবে কিনা বন্ধে উঠতে পারছি না।

তবুও এক সময়ে দৌঁধ, ভাকত ভাকতে পার হয়ে এমিছ রাস্তাটা, একটু বসে এসে কখন ঢাক গেছি ভিতর। পিছনে ঘোরানো প্রবেশপথ পড়ি আছে দুরে। ঢকে মূগ্ধ হয়ে গেলোম। ভারি সুন্দর বেড়াবার জায়গাটি। কিন্তু এতোটা ছড়ানো এবং চারিদিক ঘিরে এতোগুলো প্রবেশপথ যে, নিজের নির্দিষ্ট প্রবেশপথটি হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। আমার সব প্রবেশপথই একরকম। ঠিকটি দিয়ে না বেহুতে পারলে ঠিক রাস্তা ধর যাওয়া থাকে না। সবচেয়ে বড়ো বিপদ নিজের রাস্তার নাম আমার জানা নেই। এরা তো কথা কোকে না, তবু হারিয়ে গেলে রাস্তার নামটা কলসে হয়তো এক দৌঁধিয়ে দেবে। কিন্তু পড়তে বিকেলেই সেই উন্মত্ত মাঠ জল কপাল মানব সবটা মিলিয়ে এমন একটা আনন্দপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে সেখানে, যা ফেল হোটেলের একা ঘরের বন্ধ দরজায় আর ফিলতে ইচ্ছে করলো না। বস্তুত হারানোরই বা প্রশ্ন কী? আমি তো ছেলেমানুষ নই।

তবু চারদিকে তাকিয়ে ভ্রমগাথীদের মধ্যে সেই ম'হলাটিকে খোঁজবার চেষ্টা করলাম, যার পিছনে পিছনে আমি এছিলাম। কেননা, উনি যে পথে এসেছেন আমিও সে পথেই পথিব। ঠিক চোখে চোখে রাখতে পারলে আর আমার ফেরাি কোনো অসম্ভব থাকে না। কিন্তু পথে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ পরে ঢাকবে কি ঢাকবে না চিন্তা করেছি ততক্ষণ উনি চোখের আড়াল হয়ে গেছেন।

সাধারণত আমরা প্রত্যেক দেশ এবং প্রত্যেক জাতি সম্বন্ধেই মনে মনে একটা ধারণা নিয়ে বসে থাকি। যেমন জাপান যাবার আগে জাপানীদের চেহারা বিষয় বেশ একটা ভুল ধারণা ছিলো, নিজের দেশে বাস করণাধী করিনি তারা দেখেও এক লোক। এখন বিকেলের এই পড়ন্ত আলোর জামানীর এই হামকর্ণ ম'হলেই এত লোকের দারের পাকটিতে এসে আমার সেই কথাই মনে পড়লো আমার জামানদের বিষয়েও আমার মনের মধ্যে এক ধরনের ধাককা ছিলো। এরা যোদ্ধা জাতি, নিশ্চয়ই এদের সমস্ত ভাষার মধ্যেই সৈনিকের ছাপ স্পষ্ট থাকবে। এর হবে বড়োমুড়া ভাষি দেহী, যাগ হটি, ভেঙে হাট না, বেশী কথা বলে মা অকারণে হাঙ্গে না, তখনই অসাদাশী এবং সন্দিহান।

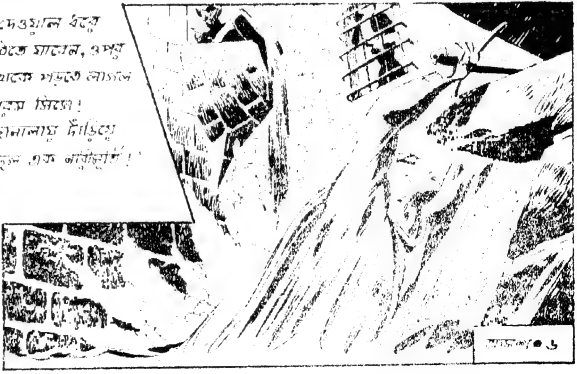
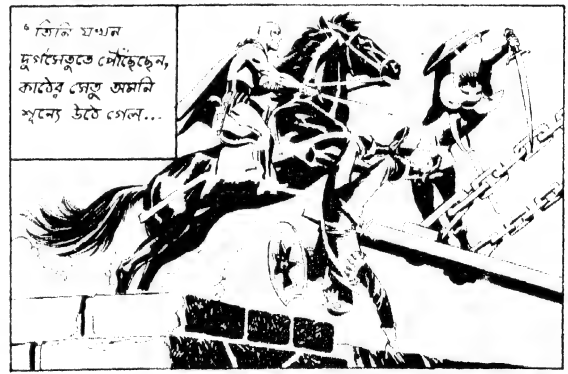
কিন্তু সেই ম'হলেই সেই পাক সেই দেশের এতোগুলো মানুষকে একসঙ্গে দেখতে পারার সাহায্যে প্রায় প্রত্যেকটি মানুষের চেহারাও মধ্যেই যে লাগিতা ধর পড়লো তাহে তারের সৈনিকের ছাপ এক ফোটা ছিলো না। এক কথায় বল যায়, তারা সন্দর। খুবই সুন্দর। হাসিখশিও থাকে। খুব উজ্জ্বল হাসি, কং কংছে, কথ তা করছে, আমাকে বিদেশীরা দেখে মাথা নামায় সম্ভাষণ করছে বেশ হলুতার আমেজ।

ধরে ধরে দোকানপাট বসেছে অনেক। দাবার দোকান, খেলার দোকান, রেলিং ফোলানো সস্তা জামা-কাপড়ের দোকান—সবই কলা যায় অসংখ্য। কলসে ছড়ি ছিটিয়ে, পাক নিজ নলেই উঠে যাবে। আমি খুব সাবধানেই ঘোরাবির করছি ছেলেগুলো পড়া মুখলতা রাওয়েত খাব অক গিরির গরমের মতো পথে পা নিশানা বেশ দেখেই এগুচ্ছে। খেলার দোকানটার একটা না দাঁড়িয়েই পরা এগে না। দেখে নাওনী আছে চো। কলসের আর কতো দরুনই যে খেলনা এনে একটা চাকাওলা গাড়িতে তার ঠিক নেই। সেইসবের ডিমবস্ত্রশ্রমও হচ্ছে, আকারে উড় গেল কিমান, লাইনের উপর চলে গেল টেন, জলে গায়েলায় ভেসে গে চাকার, হেঁটে বেড়াচ্ছে প'তুলার, কথা বলছে হাটতে হাটতে, উজ্জ্বল বায়িক অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে ট্রাক জিপ, মারগালিত মোটরগাড়ি চাল গেল এক বাজা নিয়ে, বাঁহমতো গোমাগুর বাগদার।

কিছ দূরেই লিপিপল। কলসের বিকেল, অনেকই কাপছে ছেড়া জাক একটু, নিগাল দেখে একটা গাছের তলায় বসে গিয়ে গেলোম। ভীষণ ভাং লাগছিলো। ভাকত অবাক লাগছিলো ইয়োকেপের অর্ধপড়ে অর্ধশ্রুত এমন এক দেশের অভ্যন্তরে এসে পৌঁছেছি, আমার একা একা বেড়াতেও এমিছ লেবে ধরে। আসল ঐ একা একা সংজ্ঞাটাই আমাকে বেশী উত্তেজিত করে তুলছিলো।

সুগঠিত দেহ নিয়ে যে পুরষেরা সঁটার কাটছিলো লেবে তাদের দেখে হাঁছলো। প্রত্যেকেই যেন মহাভারত থেকে উঠে এসেছে। সবলেই যেন এক-একক কণ্ড আর অজ্ঞান।

# অরণ্যদেব



## মহাস্থাবির জাতক

প্রকৃতির মস্ত এলাকা থেকে, দিগন্ত ছলকনো স্নায়ুশাসনের অতুল জীবন থেকে এসে পড়েছিলাম কঠোর অনুশাসনের চাপানপি ছোট খাঁচার মধ্যে। তখন বলতে গেলে বালক যুগ পার হয়েছি মাত্র। স্কুলটাস্ক আর হোমটাস্কের ঘানির মধ্যে ছুটির দিনসহ রেশন, তোলা জলে স্নান আর জানলা দিয়ে নিষিদ্ধ রাস্তার দিকে ক্ষুধিত চোখে তাকিয়ে থাকা। ঘড়ির কাঁটা আর রোদ সরছে, নগরের রাস্তা প্রহরে প্রহরে বন্ধ বদলাচ্ছে অতিকায় গিরগিটির মত—ফেরিঅলার হরকানা হাঁকে আর রাস্তা ঘেঁষা জলের শাশে। অফিস টাইমের জোয়ার ভাটার মুখাখানে তলানী জমা খেতানো দুপুর, আলসো বজ্ঞে অসা চোখের মত খড়খড়ি নামানো কানলা, বোয়ামখে উড়ুনী লীগ হাতে তালিবাগ-দের গগনভেনী শিস আর মাটিনী শোয়ের দশ আনা-ভ আনার উপোসী লাইন। এট পরিবেশের মধ্যে রীতিমত মুখে পড়ছিলাম, এমন সময় পেয়ে গেলাম আমার মৃত্যুর উপায়। অর্থাৎ বই, মানে গল্পের বই। ঘরের চার দেওয়ালকে বেহাশ ভুলিয়ে রক্তে ধরাশয়ি সেই গল্পের বইয়ের যুগে হাতে এসে গেল “মহাস্থাবির জাতক”। যেমন নাম, তেমনি মাংস পেপারে বাঁধানো দু-নব্বারী মলাট, সমান অক্ষরগহীন। লেখকের নামটিও বোধগ্রাম্য টিপের। জাতকের গল্প ভেবে টীকালের ওপর নিরাসক্ত মনে নামিয়ে রাখতে গিয়েছিলাম কিন্তু পারলাম না। আগন্তের পৃষ্ঠা থেকেই চোখ যেন কিসের অঠার আটকে গেল। তলপূর বেসিন এক-দমে কাহিনী শেষ করা যখন দুই মলাটের ফটক বন্ধ করলাম তখন অনেক রাত। বিচিত্র কলকাতা শহর আর তার বিচিত্রতার সব চরিত্র মাথার মধ্যে কেমন কিম কিম করছে।

এটা যে-নাটক কেতার কেতার ভাঙে আর সম্ভব থাকল না, মনে হল বাংলা গল্পের ছাঁদ বদলে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে রথের পটালী পড়ে যে রকম নাড়া খেয়েছিলাম, কয়েক দিন একটানা অভ্যস্ত হয়ে ছিলাম, সে রকম অতটা নয়। তবে এটা পথেরই উল্টো পটালী, মানে বিপরীত পিঠের রসনা তা বোকা শক না। শৈশব-বাল্যের এ আর এক দুপ, অন্য দ্বাদেশ। কাহিনীর মধ্যে লুকানো চরিত্র আছে, গল্পের চান থাকে বাল-শৈশব না পরে পাশা যায় না। এমন তুচ্ছ ঘটনা, হরগোজের চেনা দাশা নিঃড়ে যে নাট্যরস বের করা যায়, দুঃখ পরিয়া ক্ষয়কীর্তির মধ্যে নিবলক্ক হাস্যরস, এবং কাহিনীর ইনডোর ডেকোরেশনের মত কথা-চরিত্র উভয়কে জাঁকিয়ে তোলায় মত ইতিহাসের রস বইটি না-পড়া পর্যন্ত ভাবা যায়নি। উনিশশতকী ঘরানার শহর কলকাতা, তার প্লেগ, হেলেথেরা, মাপের ভীতি, সচেতন-ভীতি, ঘোড়ার টানা ট্রাম, রাফ শিক্ষা-সংস্কার-সম্মত, গুরুদেবঘটিত শিক্ষা-সমকট, গুরুবাবলস ইত্যাকার জীবনযাপনের বাংলাছাঁদ টাসা রয়েছে এই মধ্যে।

মহাস্থাবির জাতক পড়তে পড়তে আমি তার শ্বিতীয় পর্বের জন্য উগ্রাণ হয়ে উঠেছিলাম। গল্পের সূত্রধার শ্বাবির জীবনের পরবর্তী অধ্যায়, অলিখিত ইতিকহাস জানায় জনে মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। সেই বয়সেই বৃহত্তে পেরেছিলাম, এটি কোন ছদ্মনামী লেখকের আত্মজীবনী। কিন্তু কে এই লেখক, কোথায় তিনি থাকেন? আমার সব প্রশ্নের নিষ্পত্তি হয়ে গেল কয়েক দিনের মধ্যেই। শ্বিতীয় পর্ব তখনও হাতে আসেনি। আমার এক সঙ্গী পরিচিত দাদা একদিন মদন মিত্র নামের বোয়ালক জমাটি অজ্ঞায় বসা মহাস্থাবিরকে স্বচক্ষে

দেখতে দিলেন। পাকা বস্ত্রের মত সোরণ ১৮৭-ছিলে মানুষ্যটি মজলিশের মধ্যমণি হয়ে সবাইকে জমিয়ে রেখেছেন, মাথার সব চুল সাদা। যে শ্বাবিরের সমবাণী সোমত বনে গিয়েছিলান মনে মনে তার লেখক মৃত্যুর কাছে এগিয়ে যাবার সাহস হল না। তারি গলা শুনলাম, নাম শুনলাম, ডাক নাম শুনলাম এবং নিঃশব্দে পায়ে পায়ে সোঁদনের লাড়ুক আমি পালিয়েও এলাম। মহাস্থাবিরের প্রকৃত নাম প্রমোদকর জাতকী, অনেকেই তাকে বড়োদা বলে ডাকে। অনুমান করলাম, এই বড়ো নমটাই শ্বাবির নামের উৎস। যেমন তারি বাবার নাম মহেশচন্দ্র আত্মত্বীকেই চিরন্তে যথার্থ রেখে উপন্যাসে নামকরণ করেছিলেন মহাদেব শর্ম্মা। জানতে পারলাম মহাস্থাবির জাতকে অতিরঞ্জনর কোন ব্যাপারই নেই। স্কুল পালানো, বাড়ি পালানো, দুঃসাহসী, পথে পথে ভেসে বেড়ানো এই মনুষ্যটির জীবনে যে সব বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে তার বারো আনাও লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা সম্ভব। শুন্যে আমার প্রশ্না করেক ভিগ্নি বেড়েই গেল। আর এই ভক্তিমুগ্ধ অবস্থাতেই হাতে পেয়ে গেলাম গরম কেকের মত প্রতভঙ্কা শ্বিতীয় পর্ব।

সাহিত্য মূলো যাই হোক শ্বিতীয় পর্বের দীন প্রচণ্ড, অন্তত বরংসমিকালের কাছে। প্রথম পর্ব যদি হয় ইজ্জেল অটি শ্বির ছবি তবে শ্বিতীয় পর্ব প্রতভামী চলচ্চিত্র। তার পটভূমি অশ্বির, পরিবেশ রোমস্করণ, তার চরিত্রের মিছিলে নতুন নতুন মতের সমাবেশ। প্রবেশ এবং প্রধান নটকীয়, দুটি কর্পর্কশনে কিশোরের মর্ম্মান্তক অভিনয়ের কাহিনী। উত্তর প্রদেশের অপরিচিত শহর-গ্রামের রহস্যময় নরনারীর ঘরামুখ্যালির এবং বিচিত্র জীবনযাত্রা যে পুণ্যানুপুণ্য চমকপ্রদ বর্ণনা আছে তা বাংলা গল্পসাহিত্যে অভাবনীয় ছিল। অন্তত সে সময়ে আমার কাছে তাই মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল বিপ্লব প্রসারিত করে বাংলা সাহিত্যের ভূগোল বিস্তারিত হয়েছে, কাহিনী একটা আত্মদর্শক সেতুবন্ধন ঘটিয়েছে।

## \*

দীর্ঘ বহিঃ বছর পরে মহাস্থাবির জাতক উপন্যাসটি আবার হাতে অসায় ভীত এবং রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। বাংলাপ্রসারে অভিশাপ থাকে, শ্বিতীয়বার পড়তে গিয়ে এ রকম পেয়ে-হরানোর দুঃখে অনেকবার ঘেরেছি। প্রথম দেখার মতই প্রথম পড়ার মধ্যেও বিপজ্জনক উদ্ভ্রমদা মিশে থাকে। একে বলা যেতে পারে মনচক্ষু-মায়াকাজল বা শূড়দাশি। এই দেখ এই পড়ার স্বাদই আলাদা, শ্বিতীয় বারে তার কিছুই প্রায় অবশিষ্ট থাকে না। তাই ভয় হয়েছিল হয় তো ভাল লাগবে না, হয় তো কয়েক পাতা পড়ার পরেই অপাঠ্য মনে হবে। মনের মধ্যে এতদিনকার লালন করা সূর্যটা হয় তো বা কেটে যাবে। সেটা মর্ম্মান্তক হবে কারণ এই মর্ম্মতাকাহিনীটি তো আমার কাছে নিছক আর একটি গল্পকাহিনী মত নয়, এ আমার ফেলে আসা সেই ছেলেবেলা যেখানে ফিরে যাবার ইচ্ছা বার বার মনের মধ্যে ঠেলা দেয়। আমার কাছে এর বাড়তি মূল্য এই জন্যে যে, মহাস্থাবির জাতক এবং বর্তমান জাতক প্রায় একই মানসিকতার যুগলবন্দী, অনুভূতির একই অনুভূতির মাধ্যমে একই উভয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। আলোচ্য জাতকের সূত্রপাত ও সূত্র-বিস্তার সেই কলকাতায় যার মধ্যে তখন আমি সদ্য সদা এসে পড়েছি—সেই সময়ে যা অজাত হলেও তর্কান হাত এড়ালে যেন ছোঁয়া যায় এবং তার নায়কের তখন সেই বয়স সেই জীবন যার মধ্যে তৎকালে আমি হাবডুব খাচ্ছি। আসলে বয়সস্থির ব্যাপারটাই হয়ত এই রকম। এখন একটা পুরনো টাকা হাতে এলেও অনেক সময় মনে হয় টস-এ জিতে গেছি। টীকশানের সেই বিশেষ সজ



প্রমোদকর জাতকী, জন্ম : ১৮৭০ খ্রিঃ : ১৯৬৫

তারিখতার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠতে হয়, মনে হয় গোটা খেলার মাঠটাই বৃষ্টি আমন্ত্রণ হাতে মটোর এসে গেছে। পুরনো বইয়ের বেলয় সেটা তো অক্ষর অক্ষরে সঁজা, সে হয়ে ওঠে সেকালের স্বকালে ফিরিয়ে আনার সক্ষম ভূমি। অনেক কিম্মতির খড়ির গন্তী দিয়ে ঘেরা সেই দুলভ মর্ম্মতি—মহাস্থাবির জাতক আমাকে হাত ধরে আবার পৌঁছে দিল সেখানে।

খ্রীষ্টীয় উনিশ শতক প্রায় শেষ, ভিক্টোরিয়া রাজত্বের হারিক জর্জাল হয়ে গেছে। ৩১ ডিসেম্বরের শেষ রাতে কনওয়ালিশ স্ট্রীটের একটি বাড়িতে, তখন চলেছে গড়ের মাঠে নববয়সের কুচকাওয়াজ দেখতে যাওয়ার প্রায় জুগ্মী প্রস্তুতি। এক সাবালক পিতা আর তিন নাবালক পুত্রের বর্ষফল দিয়ে উপন্যাসের শব্দ। হিংস্রের হারিকেন লন্ডনের ওপর কামর জাতি রেখে মহাদেব শর্ম্মার দুঃখ গরম করা, পুত্রদের বোধোদয় ঘটতে ঘটতে লংমার্চ, পুলিশের সংগে গড়ের মাঠে বন্দুক্ষুশ শেষে আহত ছাপাবাসিকে নিজের ধূতি ছিঁড়ে বিপুল ব্যাঘ্রজ বোঁধে দেওয়াব পর প্রায় নগ্না মহাদেবের প্রত্যাবর্তন জোলা যায় না।

চৌবঙ্গীর রাস্তা দিয়ে মহাদেব চলেছেন। আবেগ কালো দাড়ি কাটা ও জলে প্রায় ডুটিয়াবা। গায়ে একখানা রক্ত কমলালেবু, রক্তের আলোয়ন, পরনে আধখানা ধূতি, হাতে কাদা মথানো একপাটি জুতো। পেছনে তিন ভেলে গটগট করে চলছে। দু'ধারী লোক এই অপূর্ব শোভাভাষা কিম্ময়-বিম্বায়িত নেত্রে দেখতে লাগল।

এই মহাদেব শর্ম্মার চরিত্র প্রথম পর্বের প্রায় আধখানা জুড়ে উন্মুল্ল হয়ে রয়েছে। এমন বিচিত্র আদর্শবাদী, নাটকীয়, বিপজ্জনক রকম গোঁয়ার মানুষ এখুগে দেখা যায় না, সেযুগেও বিলাই ছিল। তবে কিনা সে যুগটাই ছিল মেলেজামাটিক, কতব্য অকর্তব্য দুইই ছিল প্রমাণ সাইজের। মরলতা ছিল টীকা-টিপ্পনীহীন।

একবার এক নির্বোধ চিল বজার-ফেরত মহাদেবের হাত থেকে দেড়সেরা ওজনসে একটা শিলমাছের টুকরো খেয়ে মেরে নিয়ে পলাতে গিয়েছিল। চিলটির মনুষ্য চরিত্র জানা থাকলেও সম্ভবত মহাদেব শর্ম্মার বিষয় সমাক জ্ঞান ছিল না। যে



একবারে দুঃখালী। সেবার চট্রিশ দিন পরে জান ফিরেছিল, ছ মাস পরে বাকশক্তি। তলভবে সেরে উঠতে লেগেছিল দেড় বছর। আর একবার পাগলা জুড়িঘাড়ার সামনে থেকে একটি ছোট্ট ছেলেকে বঁচতে গিয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিলেন। এবং আর একবার স্টামার থেকে জলে পড়ে যাওয়া একজনকে উদ্ধার করতে গিয়ে প্রপল্লবের ধাক্কা খেয়ে ছটি মাস শয্যাশায়ী ছিলেন।

খামখেয়ালী পরিকল্পনায়-ও তাঁর জড়ি ছিল না—তা সে বাবসার ক্ষেত্রেই হোক কিংবা সমাজ-সেবার ব্যাপারেই হোক। স্বদেশী শ্বেলটের বাবসা করতে গিয়ে যেমন সবস্বান্ত হয়েছিলেন তেমনই একবার রাস্তা থেকে নিত্য নতুন পাগল ধরে এনে নিজে হাতে তাদের পরিচর্যা করতে গিয়ে গোটা বাড়িটাকেই তবলে পাগলাগারদ বানিয়ে তোলেন নি, তাঁর স্ত্রীর জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করে ফেলেছিলেন। এ রকম সব অশুভ ঘটনার মহাদেব চারি মরণীয় হয়ে আছে।

স্মরণীয় হয়ে থাকে উনিশ শতকের প্রথম দশকে ত্রিয়ারতর বছর বয়সী, সংস্কার মুক্ত ভল্লোক 'পাগলা' শ্রমোদীর চরিত্র। যিনি তাঁর বার ও চৌদ্দ বছরের দুই বালক বন্ধু অশ্বির আব স্ববিরকে শৈলী-বাগনের স্ব্যাই কেবল নিয়ে বর্নানি বিলিতি পানীয়ে আচমন করিয়ে চিত্তশান্তি ঘটিয়ে দিয় গিয়েছিলেন। মনে থাকবে লুপ্ত সঙ্গের স্ববিরের নাবালক গান্ধব বিবাহ, বিচার কুমারী বধু-গোষ্ঠীগিরি হঠাৎপ্রমী় উদ্দেশ্য পৈশাচী অপভ্রংশ লেখা স্ববির-অশ্বিরকৃত মোহমুগুর, রেজুবাগান্ধ জফ স্কুলের জ্বাই ত্রিনার মাস্টারবাবুদের জন্য আহিরীটোলাবাসীদের গরুদাঁককার আয়োজন। স্কুলের বিচার সব বন্ধু, প্রমথ, শচীন, প্রকাশ পরিভাষ। সাধনা করার জন্যে বনবাসী হবার পরিকল্পনা, বাড়ি থেকে পলায়নের উদ্যোগ বানচাল হয়ে যাওয়া। কলকাতার প্রেগ-দুঃখার পাশাপাশি রাস্তা-সহশিক্ষার বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষিকার দুঃশাসনের তথ্যচিত্র যেমন রয়েছে তেমনই সর্বল শিশুশিক্ষকের সামনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির মাঘেৎসবের আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের সচিচ ধারাদৃশ্য।

তাদের আগেও দু-চারটি বাকুল্লাছা এসে স্থান সংগ্রহ করেছেন। সর্বাঙ্গ রাস্তার মোড়া এক-একটি আর্থনিক ধানী মৃত্তির মত দেখাচ্ছে তাঁদের। কাপেটের আর এক কোণে কয়েকজন মিলে জীবন হুকুকারে কীতর্ন করছেন, তৌলী বিষবালী সম সতত মংশয় রে—

সংগীতান্তে শাস্ত্রী মশায় (শিবনাথ) চাঁৎকার করে কি সব বলতে আরম্ভ করলেন। সে সব ভাল ভাল কথা, গুঢ় তার অর্থ, নানা অলংকার পূর্ণ সে ভবা-শিশুর কাছে তা হলেহলিকা। স্ববিরের মনে উঠে লগল এ যেন একটা ইচ্ছা। বেদীর ওপরে বসে অছেন ওই মাশটার মশায়—চৌচিয় বৃত্তিয়ে দিচ্ছেন, হঠাৎ একটা কান্নার আওরাজে তার অমন মনোময় ঘুম ছুটে গেল। চোখ চেয়ে সে দেখতে পেলে, তার পাশেই একটি বৃদ্ধ ত্রৌচিক তুলে কঁদছে আর বিড়বিড় করে কি বলছে।

.....শাস্ত্রী মশায় চাঁৎকার করে উঠলেন, ওই যে বিহগ শুনাপথে মস্ত পক্ষ প্রণ করল—

স্ববিরের পাশের লোকটি, যিনি এতক্ষণ কান্নার সঙ্গের বিড়বিড় করে বকছিলেন, হঠাৎ ডাক ছেড়ে ডুকরে উঠলেন, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়—

স্ববির ভাবলে, এবার বোধ হয় শাস্ত্রী মশায় বেদী ছেড়ে নেমে এসে এদের প্রহার করবেন।



পনের বছর বয়সে প্রায় কপদকপন্য অবস্থায় বন্ধু পরিভেদ্যক সঙ্গী করে স্ববির দুঃপাল্লার পাড়ি জমিয়েছিল। শিবতীষ পবের পাতর পাতায়

সেই দুঃসাহসী পরিভজকের চমকপ্রদ কথা কাহিনীর বিচার বিবরণ ছড়িয়ে রয়েছে। যাতে অথচই মহামুখু আছড়ে পড়া সেই জীবন কাহিনীর তুলনা ছিল না আমাদের সেই বয়সে। এও একথানা বই আমাদের বয়স বাড়িয়ে দিয়েছিল রাতারাতি, কাব্যইড দিয়ে পাকানোর মত বন্ধ খবর মুখাই আমাদের বাজার-চালু হবার মত তৈরি করে দিয়েছিল। নিজে তখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের বাইরে কোথাও যাবার সুযোগ পাইনি কিন্তু ভেতরে ভেতরে মনটা বারমুখো হয়েই ছিল। বিশেষ করে পাড়ায় তিনকড়ি নামে একটি বন্ধু জুটেছিল যে ছিল শেলক্লেডা পাখির মত, থেকে থেকেই বাড়ির টকাকাড়ি মায়া গয়নাগাতি হাতিয়ে উধাও হয়ে যেত। কোথায় যেত কি কত কিছ সে খুলে বলত না। ব্যাপারটা আমাদের কাছে রহস্যময় এবং রোমান্টিক ছিল। তাই মহা-স্ববির জাতক শব্বের যখন ঘর ছাড়ল মনে মনে আমি তার সঙ্গ ছাড়িনি। কাশী শহরের অলিগলি এবং আশপাশের পুশ্খনপুশ্খ বিবরণ বিবরণ হয়ে গেছে। কাশীর পাশা গিরিধারী, বঙালীটোলার বাড়ি-কাম হোটেলওলা মহেশ চট্টোজ, নিত্য নতুন ছেলেধরা গরুমা লক্ষ্মীমণির বিচিত্র আঁকনোতহাস, জয়া-গম্ভী, বাঙালীমা, কাশীর গম্ভা বৈদনাথ, কাশাতে নিবাসিত অসহায় বিধবা সমাজের কবণ ইতিহাস মনকে কেমন ভারী করে রাখে। উত্তর প্রদেশী ভাষায় এবং ঘরানায় প্রায় জন্মভার পাওয়া প্রবাসী বাঙালী বন্দোপাধ্যায় পরিবারের নিশ্চিত মড়াপথঘাটী ছেগেটা সাহেব, বিরুনা, দ্বিমিধিগ এবং কথায় কথায় 'পিছিয়া' চালিয়ে বড়কুটার কাহিনী কাশীর গম্ভা পরিচয় এক নতুন অভি-জ্ঞাত। তারপর বিহারশাফের পথো নবাবী আশ্রয়ে প্রাপ্তবয়স্ক চারি পিয়গা সাহেব এক আচ্ছ চারি। যিনি ধর্মিক মুরগী দাল বহুর জন করে ততীয় বাব বিবাহ করতে চলে গেলেন, বনাপিনা ও রক্তন আনন্দানুষ্ঠানের পরও শেষ হয়ে গেল স্ববিরদের জীবনে। ঘরর ছেলেদের এনার ঘর ফেরার দিন এসে গেছে। কিন্তু কান্না বাক আরও কয়েক ধাপ পিছিয়ে এসে বন্দোনের এক মর্মস্পর্শী উপাখ্যান দিয়ে এই পবের পাথর ছেদ টনা হয়েছে।

বাঙালী বিষবাদের ডাফিং প্রউন্ড কোনো দিক থেকেই আকর্ষণশ্বল নয় তবু কায়গাটা স্ববিরকে একাধিক-বার টেনে নিয়ে গেছে। পরবর্তী জীবনে এই রকমে বন্দোনা পুনর্দর্শন করতে গিয়ে এক বন্দা জিয়ারগীর পাগলায় পড়ে। প্রথমটয় স্ববির চিনতে পারেনি কিন্তু পরে আবিষ্কার করতেন তার জীবনের সত্য মনে—আমদানে-ভালোমাসায় প্রায় আঁকনো বকমে জড়িয়ে যাওয়া ছোট্ট সাহেবের জিয়ার প্রায় রাজনবিন্দনী দ্বিমিধিক। জায়গাখো হু বড় বিচার, সেই মানচিত্র যে কার জায়গা 'প্রায়' নিয়ে বাক নিয়েছে, কোন অশ্ব বলিতে গিয়ে শেষ হয়েছে তা সব রকম অনুমানেরই বাইরে। সময় এবং বয়স মানুষের সব কিছু ক্রমে ক্রমে কেড়ে নেয় কিন্তু সেই সঙ্গে তাল রেখে কিছু দিয়েও যায়। নিবারণে সখিছুতাই এই প্রাপ্ত, যাকে বলা যেতে পারে বিশ্ময়বিহীন গ্রাহকশক্তি আকর্ষক অভূত-পবে কে পরিপাক করবার সহজীয়া ক্ষমতা। মহা-স্ববির জাতক আমাদের অকালে পাকিয়েছিল, পোড় খাইয়ে সাবালক করে দিয়েছিল। জীবনে পূর্ণ-অপূর্ণের ছোঁয়া লাগবার বহু আগেই আমাদের জগতিক নশ্বরতার ওয়ার্কবহাল এখ সপ্নভিত্ত করেছে, পেয়ে হারানোর সর্দাশঙ্কা দিয়েছে।

পরিণত বৃদ্ধি এবং শিল্পকরণের হাতে-কলমে অজ্ঞিত জ্ঞান নিয়ে মহাস্ববির জাতক বিচার করতে গিয়ে তার দৃষ্টি এবং স্বাদুতার কারণ দুইই স্পষ্ট চোখে পড়ে। তার ভাষা-প্রকাশ এবং মণ্ডনরীতি কোনটাই অজ্ঞ আর আর্থনিক নয়। সার্থীতাক মূলো হয়তো কিছু ঘাটতি আছে। শালীনতা থাকলেও সংহতির অভাব

মিতবাচনের অনুশাসন সর্বত্র কার্যকর হয়নি। কিন্তু সেইসঙ্গে প্রত্যেক অভিজ্ঞতা, ইতিহাসের একাধিকতা এবং হাস্যরস এমন নিবিড় প্রভাব সংগে মিশেছে যে তার লক্ষ্যভেদ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। যা ছাড়া এমন এক চিরন্তন বিষয়-নিঃসঙ্গা অব-হেলিত কিশোর মনের স্বপ্ন ও বেদনাকে লেখক তাঁর উপজীব্য করে তুলেছেন যে তার অবদান নিঃশেষিত হবার নয়। মহামুখের জাতক সঠিক

আত্মজীবনী নয়, উপন্যাসও আক্ষরিক অর্থে নয়। লক্ষ্য পড়ে বোনা, উত্তম পুরুষের বয়ান-অপ্রিত হলেও এবং ঘটনা ও চরিত্রের টানা-বনোয় এর কাহিনীর জমি জমে উঠলেও এক উপন্যাস বলতে কোথায় যেন আটকায়। অথচ কনফেশন জাতীয় রচনার বহিরঙ্গী আদল থাকলেও এর অন্তর্ভুক্ত মনো-ভাষ্যটাই কনফেশন-বিরোধী হয়ে উঠেছে। কৃত-কর্মের প্রত্যাপা বা অনুতাপ কোনটাই এর মধ্যে

নেই। কোন কিছুই না হোক এটা যে মহামুখের জাতক হয়ে উঠেছে তাতে আর সন্দেহ নেই। আমার বয়সী শহরবাসী অনেকেই হয়তো এর মধ্যে একটা দুর্য্যবসী নব্যনৈতিক বেদনা অনুভব করেছেন। বৃদ্ধ বয়সের এই বাতের কাণাটাই মনে হয় নগদ লড়া।

আনন্দ বাগচী

ফটো : পরিমল গোস্বামী

## মেলভিন ব্রাগ

না, কোন মারকেন্টাইল ফারম-এর একজি-কিউটিভ নন। লনডন দূরদর্শন দর্শকদের কাছে প্রিয় মেলভিন ব্রাগ একাধারে সাহিত্যিক, কবি, সম্পাদক, টিভির প্রোড্যুসার, রিটেনের আরট কন্ট্রোলিং লিটারের প্যানেল বা সাহিত্য শাখার চেয়ারম্যান হবার পর থেকে ইংলন্ড তো বটেই, সারা বিশ্বে সাহিত্যানুগামী মহলে সাজা জাগিয়ে-ছেন। অনেকটা আমাদের দেশের সাহিত্য আকাদেমির মতনই আরট কাউন্সিলের লিটারের প্যানেলের কঠামো। পুরস্কার না দিলেও সমসাময়িক ও ক্লাসিক সাহিত্য মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই প্যানেলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। মেলভিনের ঠিক আগে এই পদটির দায়িত্বে ছিলেন খ্যাতিমান সাহিত্যিক রয় ফুলার।

মেলভিনের সঙ্গে আলাপ হল সেক্সপিয়ার সর্বাংগে, ব্রিটিশ কাউন্সিল ভবনে। সেদিন ছিল সোমবার, নয় জুন। রাত আটটা হবে। একটু আগেই এক পশলা খাটি হয়ে গিয়েছে। কোন 'আপয়েন্ট-মেন্ট' ছিল না। নীচে মেন গेट থেকে ফোন করতেই মেলভিন দেখা করতে রাজি হয়ে গেলেন। ওইদিনই সকলে লনডন থেকে সোজা উড়ে এসেছেন কল-কাতায়। শেওপাথরের সিঁড়ির গোটা কতক ধাপ অতিক্রম করতেই ব্রিটিশ কন্ট্রোলিং লিটারের এডুকেশন অ্যাডভাইজার রবীন টোয়াইটের সঙ্গে দেখা। তিনি নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে। হাতের ঘড়ির দিকে চোখ রেখে বললেন : চটপট সেরে ফেলুন। হাতে সময় কম। দু'জন জটুমহিলা বাস আছেন। ডিনাবে যেতে হবে।

মঙ্গল টোঁকে। একপাশে আমি, আমার এক তরুণ সহকর্মী আশীষ ঘোষ ও রবীন্দ্র বিপরীত দিকে মেলভিন। দেওয়ালে টাঙানো চিত্রমালার উপর চোখ বোলাতে ব্যস্ত। দু'ম-সাদা প্যান্ট-শার্ট পরনে। দীর্ঘ দেহ। ঘন সোনালী চুল। বোকাই যায় না একটিলিশ বছর বয়স। এরই মধ্যে তার লগতে খ্যাতির শীর্ষে। বাবা, বেদনায় ভরা মেলভিনের জীবন। বাইশ বছরে বিয়ে করলেন মেরি এলিজাবেথ রোচিক। একটি কন্যা রেখে মেরি মারা গেলেন কয়েক বছরের মধ্যে। মেলভিন মায়ার টানে আবার সংসার পাটতলেন ১৯৭৩ সনে। এবার তাঁর স্ত্রী হয়ে এলেন কার্থারিন মেরি হেস্ট। স্বামীর মত না বলেও কার্থারিন মেরি হেস্টও লেখিকা হিসাবে পরিচিত।

প্রশ্ন করতেই মেলভিন বললেন : আমার আবার ইনটারভিউ। আমি নিজেই তো অসংখ্য মানবের ইনটারভিউ নিয়েছি। এই বলে লতীতে ডুব দিলেন।

একশ বছরে লনডন দূরদর্শনে আত্মপ্রকাশ। দূরদর্শন, গলাটো খরাপ নয়। তাই গেলাম, দেখলাম, জয় করলামের মত কিছুদিনের মধ্যেই লনডনের পাড়ায় পড়ায় মেলভিনের নাম ছড়িয়ে পড়ল। তখনও অকসফোর্ডের ওয়াডহাম কলেজের পঞ্চ থেকে যায়নি। কখনও সংবাদ পাঠক, কখনও চমকপ্রদ প্রবন্ধ শুনিয়েছেন। আবার কখনও দর্শকদের সমনে হাজির করেছেন বিশ্বব্যাপ্ত কোন

সাহিত্যিক, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ কিংবা কোন চিত্র-পরিচালককে। সেই থেকে ধাপে ধাপে বি বি সি রেডিও টি ভি-র প্রোড্যুসার, প্রোজেক্টর, এডিটর। সাথে, দুঃখে, আশঙ্কা-বেদনা, খ্যাতি-অখ্যাতি সব কিছুই যেখান থেকে পেয়েছেন সেই বি বি সি টি ভি-র সঙ্গে তার এখন আর কোন যোগ নেই। মেলভিন বর্তমানে ইনিভিপেনডেন্ট টি ভি-র সঙ্গে যুক্ত।

—আপনি তো এখন আরটস কাউন্সিলের লিটারের প্যানেলের চেয়ারম্যান। লনডনের টি ভি-তে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের উপন্যাস, নাটক দেখানোর ব্যাপারে আপনি কি কিছু ভাবছেন?

মেলভিন : ওঃ ইয়েস। টি ভি-র ছবি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সিনেমায় দেখানো বস্তুপাচা ছবি কখনই টি ভি-তে প্রচার করা উচিত নয়। তবে কলকাতা বা দিল্লির ক্ষেত্রে এক কথা। পুরোপুরি খটে না। কলকাতার টি ভি-র তো এখনও শৈক্ষাব্যবস্থা কার্টোনি। দিল্লির অবস্থাও তদনুরূপ। লেখকের সরাসরি টি ভি কত পক্ষের কাছে বই পাঠাতে হবে। পাণ্ডুলিপি লেখক অনুমোদন করলেই তা টি ভিতে দেখানোর যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। অনেক সময় দেখা গেছে ডিকেন্স, হারডি, লরেন্স, জয়েন্সের বই-ও রূপালী পর্দায় বিকৃত করে দেখানো হয়েছে। টি ভি-তে সাহিত্যের মূল ভাষা যতটা সন্তব রেখে নাটক সঠিক করা হয়ে থাকে। এখানে কি হয় বলতে পারব না, ইংলন্ডে কখনও কখনও সিনেমায় মূল বইয়ের বিষয়বস্তু এমনভাবে বিকৃত করা হয় যা দেখে স্বয়ং লেখক পর্যন্ত প্রেক্ষাগৃহ থেকে বৌয়ের এসে হাঁফ ছেড়ে ব'চেন। ইফসই এটা অনেকটা কম এসেছে।

পশ্ন : শূন্য টি ভি-তে ছবি দেখালে লেখকেরা কি ব্যথায়ুক্ত পারিশ্রমিক পাবেন?



প্রশ্নটা যেন মেলভিনকে খবক করে দিল। বললেন : শূন্য টি ভি-র জন্য ছবি করলে একটি বড় গল্প বা উপন্যাসের জন্য লেখক পাবেন দশ থেকে বর হাজার পাউন্ড যার অর্থ মজা লাগ টাকার কাছাকাছি। অর্থাৎ একখানি বই টি ভি-তে দেখানো হলেই অখ্যাত লেখকও লক্ষপাতি হয়ে যাবেন। তাই বলে সব লেখকের বই তো আর টি ভি কত পক্ষ কেনে না। বাজারে কোনটা চলবে সেটাও তাঁদের বিচার্য বিষয়।

বি বি সি কিংবা আই টি ভি-র বিভিন্ন চ্যানেল ব্রিটেন ছাড়া অন্যান্য দেশের খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের উপন্যাস, নাটক দেখানো হয়ে থাকে। ভারতের সাহিত্যিকের রচনা অবলম্বনে কি কিছু দেখানোর ব্যবস্থা আছে?

প্রশ্নটি শুন মেলভিন প্রথমে যেন একটা হেঁচট খেলেন। খানিকক্ষণ চুপচাপ। নিজেই নীরবতা ভঙলেন। টোঁকলে উপর আস্ত করে টোকা দিতে দিতে বললেন, রবীন্দ্রনাথ ঠেগোর কিংবা অন্য কোন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের লেখা উপন্যাস, নাটক টি ভি-তে দেখানোর আমাদের খুবই ইচ্ছে আছে। যথোপযুক্ত ইংরেজী অনুবাদ বা রূপান্তরের অভাব এর অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একমাত্র আর কে নারায়ণের ইংরেজী লেখকগুলির ভিতর দিয়ে ব্রিটেনের সাহিত্যানুগামী ভারতীয় সাহিত্যের কিছুটা স্বাদ পান। রুডইয়ার্ড কিপলিংয়ের রচনাবলী এখনও পর্যন্ত ভারত সম্পর্কে জানবার সবচেয়ে বড় দরজা। অন্ততপক্ষে ইংল্ডবাসীরা বাজে। নীচের সিঁচুরীর নামটিও এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। ব্রিটেনের টি ভি-র দর্শকদের একটা বড় অংশ নিজের দেশের তো বটেই, অন্যান্য দেশের ক্লাসিক্যাল সাহিত্যকে ভালবাসেন। লন্ডন টি ভি-তে জাপন, চীন, রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিকের নাটক-উপন্যাস দেখানো হয়ে থাকে। নীতিগতভাবে ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের উপন্যাস দেখানোর কোন কথা নেই।

কলকাতা, দিল্লির টি ভি সম্পর্কে কোন অভিযোগ না দিলেও মেলভিন ইংলন্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সের টি ভিও সাহিত্যেচ্ছা হবে বলে তাঁর ধারণা।

মেলভিন বললেন : London's T.V. is literary, American T.V. is light and sensational, French T.V. is too serious and boring.

মেলভিন বললেন, ইংলন্ডের মত কলকাতায় টি ভিও সাহিত্য ঘোষা হবে বলে তাঁর ধারণা। রবীন্দ্রনাথ বা অন্য যে-কোন শ্রেষ্ঠ ভারতীয় সাহিত্যিকের উপন্যাস ইংরেজীতে সাদা রূপান্তর করে তার কাছে পাঠালে তিনি নিশ্চয়ই দেখবেন যাতে সেই বইখানি টি ভি-তে প্রদর্শিত হয়। রূপান্তরের দায়িত্ব নিতে হবে ভারতের কোন বিশেষজ্ঞকে। তা হলে গীতাঞ্জলির প্রত্যেক রিটেনের মানুষ অরও কাছ থেকে দেখবার, অনুভব করার সুযোগ পাবেন। তার কারণ, যে-কোন দেশের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মধ্যে সর্বজনীন অবদান বর্তমান।

প্রশ্ন : টেলিভিশনে কোন উপন্যাস বা নাটক দেখানো হলে সঙ্গে সঙ্গে বাজবে সেই বই-এর কার্টাট কমে যায় এবং তাতে লেখকের আর্থিক ক্ষতি হয়। পাবলিশারদেরও তাতে সর্বাধা হয় না। তার চেয়ে বড় কথা সাধারণ পাঠকের মধ্যে সেই বইখানি

পড়ায় চাহিদা অনেকাংশে কমে যায়। এ সম্পর্কে আপনার মত কি?

মেলভিন : সিনেমার মত কখনও কখনও টেলিভিশনে প্রদর্শিত ছবিতেও মূল বইয়ের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কাটছাট করে দেওয়া হয়। তাতে কোল কোন ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুই হারিয়ে যায়। কিন্তু একথা বলা ঠিক হবে না টেলিভিশনে কোন বই দেখানো হলে বাজারে সেই বইয়ের ক্যাঁটও কমে যাবে। বরং প্রায়ই এর উল্টোটা হতে দেখা যায় : টেলিভিশনের 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' বইখানি টেলিভিশনে দেখানোর পর লনডনের বই পাড়ায় হু হু করে এই বইয়ের চাহিদা বাড়তে লাগল। উদাহরণস্বরূপ বল। যেতে পারে টেলিভিশনে 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' দেখানোর আগেও সম্ভ্রমে বিক্রি হয় তিনশ' কপি। টি ভি-তে দেখানোর পর থেকে ছমসের মধ্যে পাঁচ লাখ কপি 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' বিক্রি হয়েছে। এইবার ভেবে দেখুন, আপনার প্রশ্নের সত্যাসত্য কতটা?

শ্রদ্ধা কি তাই! লিটারেরি প্যানেলের চেয়ারম্যান হবার পর বহু সাহিত্যিক, কবি তাঁর কাছে আসছেন। অনেকেরই চান, তাঁর অন্তততমকে একখানি বই টি ভি-তে দেখানো হোক। টি ভি এখন সাহিত্যিক, কবির খ্যাতির মানদণ্ড বললে বোধহয় অতুষ্টি হবে না। থিওফোর, সিনেমার সম্মান এখন অতীতের বিষয়বস্তু।

মেলভিন উপন্যাস লিখেছেন উজনখানেক। ফর ওয়াশ অফ নেল, দি সেকেন্ড ইনহারিটেন্স, উইসাউট এ সিটি ওয়াল, দি হুয়ার্ড ম্যান, দি সিলেক্ট নেট প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

—এত উপন্যাস, নাটক লেখা সত্ত্বেও ইংলন্ডের বিশেষ করে লনডনের পর-পরিচায় কেউ কেউ আপনাকে 'minor writer' বা নাবালক সাহিত্যিক হিসাবে বর্ণনা করেছেন কেন?

শিশুর মত হো হো করে হেসে উঠলেন—তাহলে লনডন-কলকাতায় সিডাই আর কোন ফরাক নেই। নিম্নার গাঁত দ্রুত। কিন্তু এত দ্রুত আ জানতাম না। ইভলিন ওয়াফের মত সাহিত্যিক যদি বলতে পারেন তিনি ডিকেন্স-এর তুলনায় 'মাইনর রাইটার', তা হলে আমারই বা 'মাইনর' হবার বাধা কোথায়? অসলে কে 'মেজর' আর কে 'মাইনর' সময়ই তার একমাত্র নির্ণায়ক। তাই নয় কি? আর্ট কউনসিলের লিটারেরি প্যানেলের চেয়ারম্যান হবার পর থেকে আমার নিন্দা ও প্রশংসার ছড়াছড়ি হচ্ছে। সেটাই স্বাভাবিক।

—লনডন টি ভি-তে ক্র্যাসিক্যাল লিটারেচারের চাহিদা কেমন?

মেলভিন : খুব ভাল বলব না। তবে নেহাত খারাপও নয়। সীমায়িত হলেও ডিকেন্স হারডি, লরেন্স, হেমিংওয়ের ছবি দেখবার আগ্রহ কমেই না।

ভারতীয় টি ভি সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করলেও শ্যাম বেনগালের একটি ছবি সম্পর্কে মেলভিন বললেন, ছবির বিষয়বস্তু দুর্বল। তবে অভিনয় ভাল। বইখানির নাম সম্ভবত জেনেন। কথায় কথায় জানালেন সেক্সপিয়ারওয়ালার তাঁর এক নিকট আত্মীয় অভিনয় করেছেন। নাম টমাস জেমার। বইয়ের পরিচালকও তিনি কিন্তু ছবিখানি আজও দেখা হয়ে উঠল না।

কলকাতায় স্বল্প সময়ের মধ্যে মেলভিন সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে দেখা করেছেন।

প্রশ্ন : সত্যজিৎবাবুকে কি আশ্মি আগে থেকে চিনতেন?

মেলভিন : হ্যাঁ, শুঁকে নিয়ে আমি লনডনের টি ভি-তে ডকুমেন্টারি করেছি। ভারতে কি সত্যজিৎয়ের উপর কোন ডকুমেন্টারি হয়নি?

ববিন্দ্রনাথ শাস্ত্রীসহ সত্যজিৎয়ের সঙ্গী আলোচনা করেছেন। এক ঘণ্টা তিন সত্যজিৎবাবুর মৃত্যুর ছিলেন। আগামী বছর লনডনে 'ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যাল'-এর রূপরেখা নিয়েও মেলভিন সত্যজিৎবাবুর সঙ্গী কথাবার্তা বলেছেন। এজন্য লনডনে তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। ব্রিটিশ সরকার এই উৎসবানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। আরও এর ব্যাপারে সত্যজিৎবাবুর সন্তান সহযোগিতা চেয়েছেন মেলভিন। সত্যজিৎবাবু ওই গুরু দায়িত্ব নেবার ব্যাপারে তাঁর সিম্বান্ত পরে জানাবেন। ভারতীয় শিল্পকলা ওই উৎসবানুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ। মেলভিন এই উৎসবানুষ্ঠানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এজন্য তাঁকে এ বছরের মধ্যে হয়ত আরও কয়েকবার ভারতে আসতে হবে। শাস্ত্রীসহ সত্যজিৎবাবু ঠাকুরবাড়ি থেকে শ্রদ্ধা করে অজস্র-ইলোয়া সবুই যেতে হবে মেলভিনকে। সংগ্রহ করবেন মূল্যবান ভারতীয় শিল্পকলা।

কলকাতা কেমন লাগল?

—একদিনে কি আর কোন বড় শহর চেনা যায়। আর কটা দিন কাটিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না।

দুই মেয়ে, এক ছেলের বাবা মেলভিনের কথা। স্বর যেন হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে এল। বললেন, কাথারিন বা মেয়ে দুটির জন্য নয়, ১২, হ্যাংসফোর্ট হিলগারডেনস (লনডন)-য়ের বাড়িতে কাথারিনের কোলের চার মাসের শিশুটির মাংখানি না দেখে এক মূর্ত্তও থাকতে পারি না। বস্তু কষ্ট হয়। এই বলেই আবার সেই শিশুর মত হো হো করে হেসে উঠলেন।

সুদেব রায় চৌধুরী

দাঁতের ডাক্তাররা বলেন:

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করুন আর মাড়ি মালিশ করুন, তাহলে মাড়ির গোলমাল আর দাঁতের ক্ষয় রোধ করতে পারবেন।

**ফরহ্যাগ ডবল অ্যাকশন টুথব্রাশ ব্যবহার করুন**

যা আপনার দাঁত পরিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে মাড়ি মালিশ করার জন্যে বিশেষভাবে তৈরী

সাদা নরম  
দাঁড়াগুলি  
আপনার মাড়ি  
মালিশ করে

নীল শক্ত  
দাঁড়াগুলি  
আপনার দাঁত  
পরিষ্কার করে



**ফরহ্যাগ ডবল অ্যাকশন টুথব্রাশ**

পরিবারের প্রত্যেকের জন্তে

আন্ডার-১৫ (মিডিয়াম ও সফ্ট) • জুনিয়ার • বোবা

ফরহ্যাগ দিয়ে দাঁত ব্রাশ আর মাড়ি মালিশ করতে শিখুন। **বিনামূল্যে** "আপনার দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্য" সম্বন্ধে রঙিন পুস্তিকা পান। ডাকখরচ বাবদ ২৫ পয়সা রসায়ন সমেত লিখুন, এই ঠিকানায় : ফরহ্যাগ ডেন্টাল আন্ড ভাইসারী লিমিটেড, ডিপার্টমেন্ট নং B5-219, পোস্ট বাক্স ১১৪৩৩, বোম্বে ৪০০ ০২০ যে ভাষায় চান জানাবেন।

# অলিম্পিকে কার কীর্তি সবচেয়ে বড় ?

অলিম্পিক খেলাধুলার ইতিহাসে কার কীর্তি সবচেয়ে বড় এবং চোখ-খানো এ সম্পর্কে নানা মর্নির নানা মত।

ইতিহাস বলতে অবশ্য প্রাচীন অলিম্পিকের কথাও এসে পড়ে, যদিও সে ইতিহাস কতটা তথ্য-নিষ্ঠ এবং কতটা গম্প কথা বলে শক্ত। তবুও অনাদিকালের পথ বেয়ে যে সব বিবরণ আমাদের হাতে এসেছে তা যেমন বীরত্ববজ্রক, তেমনই রোমহর্ষক।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং খেলায় নিষ্পাক শৌখ প্রদর্শনের অঙ্গন গ্রীসের অলিম্পিক স্টেডিয়াম যখন আদিপার্থক্যের পরিণত হুল এবং স্লাভিয়েট-দের প্রশংসী হয়ে উঠল বড় আকর্ষণ তখন বনের হিপ্র পশুর সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের বলাক গল্প আছে। সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ের ঘটনার কথাও লেখা আছে। অলিম্পিকের প্যারোশন প্রতিযোগী পোলিডামাস নাক খালি হাতে এক সিংহকে বধ করেছিলেন। প্রাচীন অলিম্পিকে প্যারোশন ছিল একই সঙ্গে কৃষ্টি ও যুদ্ধবৃদ্ধির প্রতিযোগিতা। আরও এই পোলিডামাস ছিলেন মহাবলী মাইলার তুলনায় খুবই দুর্বল। ইতিহাস বলেছে, কৃষ্টিতে মাইলো অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ছয়বার। খাদ্য-তালিকার যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় তার প্রতিদিনের আহার ছিল সাত পাউন্ড মাংস, সাত পাউন্ড ব্রেড ও পাঁচ গ্যালন দুধ। প্রাচীন অলিম্পিকের ইতিহাসে আছে অলিম্পিয়ায় একদিন মাইলো একটি আশ্চর্য বড় খেয়ে ফেলেছিলেন। এসব খ্যাতিপূর্ণ ঘটনা শতকের কানো। তখন আর কোনো অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন মাইলার মত কীর্তি অর্জন করতে পারেননি। কিন্তু আগেই লিখেছি, প্রাচীন অলিম্পিকের ওই সব কাহিনীতে কতটা কল্পনার কালি আছে কেউ বলতে পারেন না। আধুনিককালের অলিম্পিকের সব ঘটনাই তথ্য-নিষ্ঠ এবং বৈধক্য বহীরা নথীভুক্ত। বেশি দিনের ঘটনায় নয়; শতাব্দীর বহুর আগে, ১৮৯৬ থেকে।

এই চারটি বছরে অনুষ্ঠিত অষ্টাট অলিম্পিক যেমন কতজনের কত কীর্তি। প্রথম অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেমন স্মরণীয় হয়ে আছেন আমেরিকার পিল জোনার জেমস কনালী, তেমন প্রথম মাদারন গেস জিতে বরণীয় হয়ে আছেন গ্রীসের ডাকোথান স্পিগিন লাইস। দিন দিন মানবীয় কীর্তিকল্পনা বেছেছে। অলিম্পিকের লক্ষ্য হয়েছে বৈশিষ্ট্য-স্বাভাবিক-স্বাভাবিক। অর্থাৎ আরও জেদে প্রযত্ন, আরও উপযুক্ত এবং আরও শক্তিশালী কীর্তি। সেই লক্ষ্য মানুষ অনুশীলন অধ্যবসায় এবং বিরামহীন সাহসায় অসাধ্য সাধনের প্রয়াস পেয়েছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে কৌতুকবিজ্ঞান এবং স্পোর্টস মেডিসিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তার ফলে এক অলিম্পিকের নবকর্ড ভেঙে গেছে পুরনো অলিম্পিকের। তারপর হয়েছে ভেঙে গিয়েছে আরো ফলে আথলেটিক, সাঁতার, জিমনাস্টিক বা অন্যান্য খেলায় প্রথম দিকে যারা স্মরণীয় কীর্তি অর্জন করেছিলেন পরবর্তী অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নরাও। ফলস্বরূপ দিয়েছেন। তবুও কালের গতির সঙ্গে অলিম্পিকের সব সময়ই অলিম্পিকের অমর নায়ক। আমরা মতিই মরলোক ভাগ করেছেন কিন্তু নামগুলি অমর হয়ে আছে। যখনই অলিম্পিকের আসর বসে বা নয়রবের কথা ওঠে তখনই তাদের কীর্তির কথা আমরা স্মরণ করি। গবেষণা করি কার কীর্তি বড়।

নায়কদের নামের অভাব নেই। অসাধারণ কীর্তি-দর্শনার পরিচয়ে কেউ একটি স্বর্ণপদক পেয়ে স্মরণীয়



জিম থর্প

হয়ে আছেন, কেউ একটি অলিম্পিকে পেয়েছেন তিনটি কি চারটি স্বর্ণপদক। কেউ বা উপযুক্তি তিনটি অলিম্পিকে বা চারটি অলিম্পিকে একই ইভেন্টে সোনা জিতেছেন। একটি অলিম্পিকের একটি স্বর্ণপদক লাভ যেখানে একজনকে কীড়া-বিশ্বের পরিচিত করে তোলে সেখানে একাধিক পদক লাভ এবং একাধিক রেকর্ড সৃষ্টি অসাধারণ কীর্তির নজির।

কত নাম মনে পড়ছে। আথলেটিকসে রে ইউরি, কোলেমেনে, রিটোলা, জিম থর্প, পাতো নুর্মি, বেব ডিক্কিন্সন, জেসি ওয়েস, ফ্যানি ব্র্যাংকাস কেয়েন, এমিল জেটপেক, বেটি কুথবট, আবেবে থিকলা, অল অটার, স্যালভাকোজ, বব বাইন প্রভৃতি। সাঁতারে জ্যান উইসমলার, ডন সোল্যান্ডের, ডন ফ্রয়ের, রোনাল্ড মাথেন, মার্ক স্পিজ। জিমনাস্টিকসে ভিক্টর চুকারিন, লারিশা ল্যাটিনিনা, ওলগা করবুট, ভেরা কাসলাভস্কা, নাদিয়া কোমনোচি। বাক্সিংয়ে লাক্সলো প্যাপ, টিওফিলো স্টিভেনসন।

মসকো অলিম্পিকের ফল জানাব আগেই লিখছি। লাস ভিরেন এবং বন্নার টিওফিলো স্টিভেনসন আগে থেকেই অলিম্পিক নায়ক। যদি পাঁচ হাজার ও দশ হাজার মিটার দৌড়ে ভিরেন আরও সোনা জেতেন তবে তিনটি অলিম্পিকে দুই পাঞ্চার ডাবর জয়ে অনন্য কীর্তির অধিকারী হবেন। স্টিভেনসন যদি আরও চ্যাম্পিয়ন হন কনবন হেভিওয়েট সোনা জয়ের হাটটিক মা আর কেউ করতে পারেননি।



এমিল জ্যাটোপেক

আগে যাদের নাম কবেছি তাদের কীর্তির খতিয়ান দিতে গেলে দেখা অনেক বড় হয়ে যাবে। অসাধারণ কীর্তি অর্জনকারী কয়েক জনকে আমি বেছে নিচ্ছি।

অলিম্পিকে সবচেয়ে বেশি পদক জয়ের নজির আছে রাশিয়ার জিমনাস্ট ল্যাটিনিনা। মোট অষ্টাট-নয়টি সোনার পঁচিটি রূপের ও চারটি ব্রোঞ্জের। একটি অলিম্পিকে সাতটি সোনার পদক পেয়েছেন ব্রুকলিন সাতার মার্ক স্পিজ। উপযুক্তি তিনটি অলিম্পিকে সোনা পেয়েছেন অনেকেই। চানা চারটি অলিম্পিকে সোনা জয়ের অনন্য কীর্তি একমাত্র আথলেটিক গুজরোয়েট ডিসকাস ছুঁড়িয়ে অল অটার। চারটি রেকর্ড সহ কার্লিন অলিম্পিকে জেসি ওয়েসের চারটি সোনা জয়ের কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে ১৮৯৬ লন্ডন অলিম্পিকে দুই সপ্তাহের জন্যই নেদার-ল্যান্ডের ফ্যানি ব্র্যাংকাস কোয়েন আথলেটিকসে চারটি সোনা জয়ের কথাও। কিন্তু কোনদিনই জোলা যাবে না একই অলিম্পিকে নিজের দুই পেশটখলন এবং ডেকাথলন জয়ে সোনা জয়ের আর ব্রডজাম্পার বব বাইনের অলিম্পিক লাফের ঘটনা।

চারটি অলিম্পিকে মধ্যবর্তী সময়ের ব্যাপ্তি বারো বছর। কেউ যদি বলে যে আথলেটিক এই বারো বছর ধরে একটি ইভেন্টে বিশ্বের এক নম্বর ছিলেন তার কীর্তি বড় তবে তার যুক্তি অস্বীকার করা শক্ত। আর কেউ যদি বলে, যে সাতার একটি অলিম্পিকে সাতটি সোনার পদক পেয়েছেন তার চেয়ে বড় কীর্তি আর কেউ অর্জন করতে পারেননি তবে তার কথাও উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

কিন্তু আমি বলব, একক কীর্তি হিসাবে জিম থর্পের ভূমিকাই বড়। ১৯১২-র স্টকহোম অলিম্পিকে ওট আমেরিকান নিগ্রো সব চেয়ে কষ্ট-সাধ্য দুটি ইভেন্ট-ডেকাথলন ও পেন্টাথলন জয় করেছিলেন। সবাই জানে ডেকাথলন সর্বাধিক বিশারদ আথলেটের ইভেন্ট, যার মধ্যে আছে তিন রকমের দৌড়, তিন রকমের লাফ, তিন রকমের নিক্ষেপ এবং হাউল রেস। আর পেন্টাথলন হচ্ছে নৌবাস কীর্তিবিদের ইভেন্ট। সাঁতার, গুলি ছোড়া, অদি চালনা, অস্বাচ্ছন্দ্য হয়ে ত্রিশটি লাফের মাধ্যমে পাঁচ হাজার মিটার স্টপল চেজ এবং রসকান্ট দৌড় হচ্ছে পেন্টাথলনের ইভেন্ট। সমস্ত রকমের খেলা-খেলায় কত দক্ষ হলে এই দুই ইভেন্ট জেতা সম্ভব সহজেই অনুমেয়। বিজয়ী জিম থর্প পরে পেশাদার প্রযাণত হওয়ার তাঁর কাছ থেকে দুটি স্বর্ণপদক ছিনিয়ে নিয়ে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নের সম্মান ভেঙে দিতে কব। হয়। কিন্তু তার মত সর্বাধিকারীশাধক আধুনিক অলিম্পিকে আর দেখা যাবেনি।

একটি মাত্র ইভেন্টে অধিন্যাস রেকর্ডের বীরিত্ব আর এক নিগ্রো লাং-জাম্পার বব বাইনের। মানুষ যখন দক্ষতা ও কীর্তিগম্যতার প্রায় তুলেণে পৌঁছায় তখন স্মরণের সামান্য উল্লিখ বা দূরত্ব এক স্মৃতিমটার বাড়ানোর জন্য বহু সাধনার প্রয়োজন হয়। তার প্রমাণ একশ মিটার দৌড়ে জেসি ওয়েসের ১০.৩ সেকেন্ড রেকর্ড। ১০.২ সেকেন্ডে ভেঙে ছিল দীর্ঘ পদক্ষেপ বড়ার পরে। ১৯৬৮ মালে মেক্সিকো অলিম্পিকে বব বাইন লাফের দূরত্ব কতটা বাড়িয়েছিলেন তা দু'হাতে কাছাকাছি। বিশ্ব রেকর্ড ছিল ২৬ ফুট ৬ ইঞ্চি। বাইন লাফের ২৯ ফুট ২ ইঞ্চি লাফ দেখে কীড়া-বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন—অবিস্বাস্য, অলিম্পিক। গবেষণা করে আরও বলেছিলেন—বিশেষত্ব। ফুট-বল খানিালে একজনকে তিনটি পদক্ষেপে লাফাও টেস্ট দিলেও একদিন একজনকে লাফানো কব অথবা নয় সেকেন্ডে একশ মিটার দৌড়ে মাত্র কীর্তি। অনেকেই অতিক্রম করে ও এত দূরত্ব লাফা পক্ষেই বাইনের রেকর্ড ফলস্বরূপ সত্য হয়ে যা়।

মুকুলা

সাদা

সাদা

ডেট'র

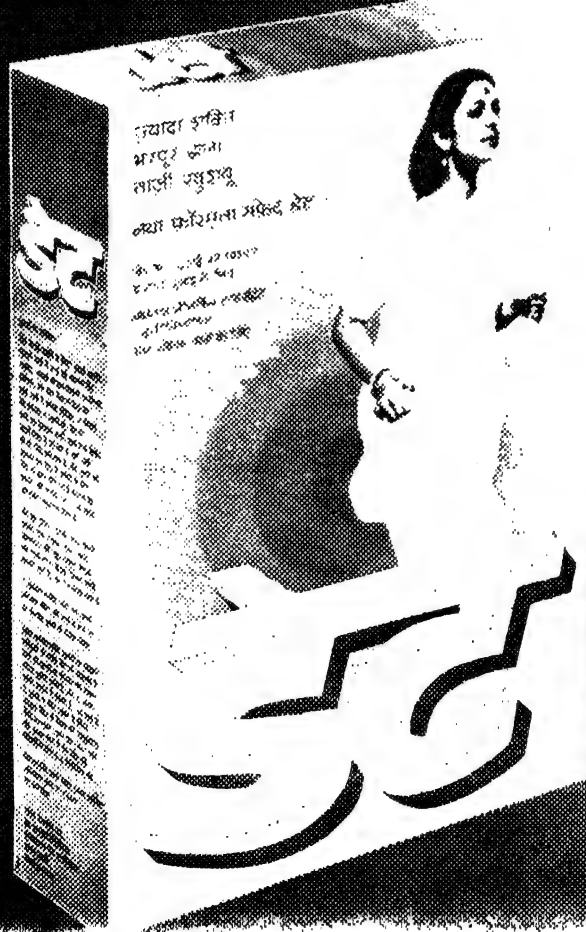
সাদা

নতুন ফর্মুলা

ডেট

ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার

পাউডার





সমকালীন ভারতীয় চিত্রকলার স্তম্ভ-গোপাল ঘোষ

শিল্পী গোপাল ঘোষ পরলো—  
কথাটা বিবাস হচ্ছে না। এই কিছু ন  
সঙ্গেও তার সঙ্গে কথা হল। “রা  
মদু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, “কোন  
লাগছে আমার অংশের কাজ?” তৈ  
মাথায় কাজ শব্দ করছিলেন কিছু  
দিন হল; যে মাথায় তাকে ভারত-  
বিখ্যাত করেছিল। কিন্তু তৈর নয়  
টেমপরা আর প্যাস্টেল।” স্বাচ্ছ  
রঙের কাজও কিছু দেখোচ্ছ ভাল  
কলনা হয় না।

অশুনালম্ভ কালকট। গ্রুপ  
শিল্পীগোষ্ঠীর গোপাল ঘোষ ছিলেন।  
সলেতে গেলে, মধ্যপা। কালকট।  
গ্রুপের সবাই ছিলেন বেশবের। কিছু  
গোপাল ঘোষের সাহস যেন সবার  
ওপরে। শ্রোতৃভাইক 'তুমি' বলে  
সম্বেদন করায় গোপাল ঘোষ বুঝে  
বিড়িয়েছিলেন ডাঃ বিধান রায়ের  
সাধন। বিধান রায় ডুল বন্ধুতে পেয়ে  
কম্য চান। কারোর কাছে মাথা খেঁচে  
কম্য তাঁর স্বভাব ছিল না। শিল্পী  
হিসেবেও সমকালীনদের মধ্যে  
ছিল তাঁর উচ্চাত।

প্রথাগত ধারায় গোপাল ঘোষ ছবি  
আঁকতেন না, কিন্তু ইউরোপের আর  
অভিগারদ-এর সমর্থন কোনও দি  
তাই মুখে বা কানে প্রকাশ পায় নি  
বং ভারতীয় শিল্পে পাশ্চাত্য  
বিকৃত প্রদান কিংবা বিমূর্ত কল্পনায়  
পুনরাবৃত্তির তিনি ছিলেন কঠোর

সমালোচক। তাঁর ছিল বিবাস  
পাঁচমের আটকে অনুকরণ করে  
ভারত শিল্পের কোনও উন্নতি সাধন  
হতে পারে না। একথা, সুবিধে  
পেলেই তিনি সেচ্ছায় জানতেন  
উঠতি শিল্পীদের, ছাত্রদের। মডার্ন  
বলে তিনি বুঝতেন সমকালীন  
জগৎ অর্থাৎ মডার্ন ব্যাক্তি, মডার্ন  
প্যাড, মডার্ন বৈহারিক জীবনপন্থা।  
ওসবের ছবি অঁকলেই তো মডার্ন  
আর্ট হল, প্রকাশভঙ্গিতে, ক্রিয়া-  
কৌশলে, মডার্ন হওয়া বাতুলতা  
ছাড়া আর কিছুই নয়। অবনীন্দ্রনাথ  
স্বাঃ নন্দলাল বসুর নাম উঠলে তিনি  
প্রশংসার নিম্নে কপালে হাত টেকাতেন।  
রজনীত তাঁকে কঙ্কায় আনতে  
পারে নি। কলকাতার প্রাসাদে যখন  
নানা দাবিতে আড়া উড়িয়ে রজনীতিক  
র্যালি চলেছে, গোপাল ঘোষকে তখন  
দেখে তো ক্যান্টাস কিংবা সজিনা-  
ফুলে কিংবা পল্লব ফুলের ছবি  
অঁকায় উৎসাহ। যথেষ্ট সময় আকালে  
বিমানপেড়ের গোপাঞ্জলি এবং দূর্ভিক্ষ-  
পীড়িত নবী-পুত্রের ক্ষুধায় কাণ্ডিত  
—কোনওটিই তাঁকে বিচলিত করতে  
পারে নি তার প্রকৃতি-সংখ্য থেকে।  
তিনি তখন একে চলেছেন রৌদ্রতপ্ত  
যুঁ-যুঁ মাঠ কিংবা শান্ত শীতল বাংলার  
পল্লী। যখনই কলকাতার বাইরে  
গেছেন, তা দল মাইলই হোক আর  
লগ শো মাইলই হোক, গোপাল ঘোষ

তুলে এনেছেন ছবি, কাগজেবোঝা নয়।  
হাতে একে, রঙ দিয়ে। গোপাল  
ঘোষের ছবির মত বড়ের বাহান। খালি  
কাজন শিল্পীর কাছে দেখা যায়।  
সারা জীবনে অজস্র ছবি এঁকেছেন  
গোপাল ঘোষ, সংখ্যায় তা কত হবে।



বলাতে পারবে না। কোনও দিন ছবি না অঁকাতে পারলে তাঁর জন্মস্থানের সীমা থাকতো না, প্রাকৃতিক স্রোত-কর্মাঙ্গের নত ছবি অঁকাটো ছিল তাঁর দৈনন্দিন কাজ।

গোপাল ঘোষের নামের সঙ্গে  
ওপরেই যার সবার ফলাফল। যা প্রায়  
ওনিসম-এর মত। মরার সময়ও  
তিনি চেয়েছিলেন মরার পরে  
সোচ্চের প্রতিষ্ঠিত করতে, যাঁর  
তার নিজ মর্যাদা ইন্দ্রপ্রাসাদ কবর  
জন্মে ফরাসি বিপ্লবের সময়  
করতে শিল্পীর নিজ মর্যাদা

ছিল না। কিন্তু যাবসযি বট আউট-  
এর দিক ঘাঁট আসে। নয়। গোপাল  
ঘোষের প্রজন্ম সমকালীন শিল্পীদের  
অনেকেরই পুণ্য বতসী। কিন্তু ঐ  
সবতসীসমূহ প্রকাশভঙ্গীতে কতখানি  
মন পেতে তখন ১নং চৌধুরী টেরায়-  
এ প্রদর্শনীতেই সমকালীন আর্ট-এর  
নির্মিততা। ঐখানেই গোপাল ঘোষের  
ছবি দেখতে দেখতে প্রশ্ন করছিলাম  
এক রকম স্বাধীন সাতার শিল্পীকে,  
কবে তাঁর প্রশংসা করলে। তাঁর  
জন্মের তারিখ নয়। গোপালের প্রদর্শন-  
নীর পর আমার পক্ষে জন্ম  
মহালিকা। সীতাই গোপাল ঘোষের  
বড় ছেলের পর আর কোনো সাথী ছিল  
না তাঁকে ভিগিয়ে যাবেন। শব্দ  
লাভকেই অর ফুলই নয়, তাঁর  
চিঠিভাষাখানা সম্মোহিত করে, তাকে  
গমক দশকক। তামা খঁচায় বন্দী  
নয়। সফলত্বের ডগমগ মুক্ত বিহঙ্গ।  
সেখানেও রঙের ঘাটতি নেই। স্বকীয়  
করণকশিলে যেপর্যায় শিল্পী প্রয়োগ  
করতেন বড় বাহির। প্যাস্টেল  
বড় ব্যবহারে তাঁর ছিল নিজস্ব  
শৈলীক। প্যাস্টেল দিয়ে অমন  
সৌন্দর্য করত একমাত্র গোপাল ঘোষই  
প্রচলিত।

ভারতীয় সমকালীন শিল্পের একটি সত্যত ভেঙে গেল, এ শূন্যস্থান কোনও দিনই আর পূরণ হবার নয়।  
অহিভূষণ মালিক



**“এখন আমাদের কাছে রয়েছে দুটি  
উপভোগ্য জিতিষ কিন্তু দ্বিতীয়টি  
তিয়ে যে কি করণ জাতি।”**

बलेन मिसस पाशा\* लाइब्रेरीयान,  
आमानउकारी, हायद्राबाद शाय

ইঞ্জিয়ান ব্যাকের রিইনভেস্টমেন্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে  
আপনিও যে মিসেস পাশার মত প্রচুর টাকা  
জমাতে পারেন, সে সম্পর্কে একটি নতুন

[illegible]

ଆନେକ ସାଧାରଣ ଆକ୍ତିକତା ଶେଷ  
କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ  
ପ୍ରାର୍ଥନା

১. ...  
 ২. ...  
 ৩. ...  
 ৪. ...  
 ৫. ...

১. ইন্ডিয়ান বোয়ার্‌স ১০টি পরিকল্পনা—  
 গাং-টাংকার আত্ম-নেতৃত্ব চলে  
 ২. ১৯৭১ সালের প্রাচীন ও কাল মসজিদকে

১. ১৯৭৬ সালে প্রকল্পের প্রথম  
 ২. ১৯৭৭ সালে প্রকল্পের প্রথম  
 ৩. ১৯৭৮ সালে প্রকল্পের প্রথম  
 ৪. ১৯৭৯ সালে প্রকল্পের প্রথম  
 ৫. ১৯৮০ সালে প্রকল্পের প্রথম  
 ৬. ১৯৮১ সালে প্রকল্পের প্রথম  
 ৭. ১৯৮২ সালে প্রকল্পের প্রথম  
 ৮. ১৯৮৩ সালে প্রকল্পের প্রথম  
 ৯. ১৯৮৪ সালে প্রকল্পের প্রথম  
 ১০. ১৯৮৫ সালে প্রকল্পের প্রথম



**ইতিহাস লিখক**  
(একটি গল্পের ইতিহাস)

## REFERENCES

# ইন্ডানা হোল মিল্ক পাউডার

## হাতের কাছে এমন খাঁটি দুধ যা দিয়ে মনোমত অনেক খাবার তৈরী করা যায়।



**পান করুন, শীতল  
পানীয় তৈরী করুন, দই  
ডিম্যান, অন্য ডিম্যানের সঙ্গে  
মিশিয়ে খান, মিষ্টি তৈরী করুন**

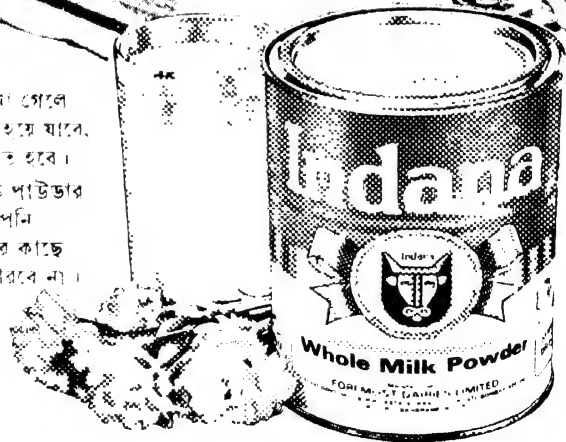
আপনার এলাকায় বিতরণ পুষ্টিক দুধ সহজে পান করা না গেলে  
আপনি কি করবেন? আপনার রান্নাবান্নের কাজটো বন্ধ হয়ে যাবে,  
আর বাচ্চারা ছুঁধের তৈরী তাদের প্রিয় খাবার থেকে বঞ্চিত হবে।

এইসব সমস্যার সমাধান—এক টিন ইন্ডানা হোল মিল্ক পাউডার  
সহজে গুলে যায়, পুষ্টিক আর স্বাস্থ্য—এই দুই দিয়ে আপনি  
হরেক রকম মজাদার খাবার তৈরী করতে পারেন। হাতের কাছে  
ইন্ডানা রাখুন—আপনার পরিবারের সবাই সুস্থী না হয়ে পারবে না।

### ইন্ডানা

**হোল মিল্ক পাউডার**

—এমন প্রাচুর্য যাতে সবাই খুশী



## আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি বই

TRADE & FINANCE IN THE  
BENGAL PRESIDENCY 1793-  
1833. By Amallesh Tripathi.  
Oxford University Press, Cal-  
cutta. Rs. 100.

ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী একজন লক্ষ-  
প্রতিষ্ঠ ও বাক্স ঐতিহাসিক। তিনি  
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস  
বিভাগের প্রধান ও আর্থিক অধ্যাপক।  
বইখানিতে তিনি বাংলা প্রেসিডেন্সির  
এক অতি গুরুত্বপূর্ণ যুগের ঐতিহ্য  
ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে  
আলোচনা করেছেন। ইস্ট ইন্ডিয়া  
কোম্পানীর এই চর্চাশীল ব্যবসায়ী  
যুগটিকে কোম্পানীর জীবনের এক  
জ্বলন্ত কাল বলা যেতে পারে।  
কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের  
বিরুদ্ধে এদেশে ও বিলাতে যে  
যে বিরোধিতা প্রকাশ পেয়েছিল,  
তার প্রতিঘাতে এই যুগেই কোম্পানি  
তার একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার  
হারিয়ে, বাণিজ্য সংস্থা থেকে  
শাসন সংস্থায় পরিণত হয়েছিল।  
বস্তুত এই যুগেই রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসাবে  
এদেশে ইংরেজের প্রাধান্য সংস্থাপিত  
হয়। আবার এই যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়  
কেন্দ্রকারী বাণিজ্য সংস্থাসমূহ, যেগুলি  
পরবর্তীকালে 'এজেন্সী হাউস'-এর রূপ  
পরিগ্রহ করে রাজশক্তির সহায়ক হয়ে  
দাঁড়ায়। এর প্রতিঘাতে বাঙালীরাও  
পরিণামের উদ্ভব হয়েছিল, সে সম্বন্ধে  
ডঃ ত্রিপাঠীর অনেক কথা বলবার  
আছে। তিনি এ সম্পর্কে আগেকার  
দিনের অর্থনৈতিক ইতিহাসকারদের  
(যথা রামেশচন্দ্র মজুমদার) একদেশী  
দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি আমাদের অবহিত  
করেছেন। আগেকার দিনের ঐতিহ্য  
হাসিকরা ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞান শিল্পের  
অবনতি ও তার কুফলের ওপরই বেশী  
জোর দিয়ে গিয়েছিলেন। এই যুগ  
বাঁচালার বাণিজ্যের যে অসাধারণ  
প্রসার ঘটেছিল, তার প্রতি দৃষ্টিপাত  
করতে ছুলা গিয়েছিলেন। আরও  
পাশ্চাত্য দেশে ওই যুগটা ছিল শিল্প-  
বিপ্লবের যুগ। সে যুগে কলকারখানার  
প্রস্তুত তত্ত্বজ্ঞান বস্তুর প্রান্তযোগ্যতার  
বিশেষের হাটে ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞান শিল্পের  
পক্ষে দাঁড়ানোও অসম্ভব ছিল। তা  
ছাড়া, অত্যধিক ভূমিরাজস্ব জমির  
উৎপাদনী শক্তির ওপর অভ্যাস হেঁদে-  
ইল, রমেশচন্দ্র মজুমদারের এ মতবাদও যে  
সম্পূর্ণ ঠিক নয়, তা-ও ডঃ ত্রিপাঠী  
স্বাক্ষর করেছেন। কীভাবে জমির উৎপাদন  
বেড়েছিল, তা তিনি বাণিজ্য সংস্থার  
পরিসংখ্যান দ্বারা প্রমাণ করেছেন।  
আলোচ্য চার্লস বক্সের মধ্য কালমালের  
রফতানি প্রসার সাড়ে চারগুণ বেড়ে গিয়ে-  
ছিল। এর ফলে কৃষক সম্প্রদায়েরই  
সম্প্রদায় বেড়েছিল—যে সম্ভলতা  
তাদের উৎসাহিত করেছিল ক্রমাগত  
উৎপাদন বাড়তে। কিন্তু এর এক সহ-  
জাত দুর্ভলতা ছিল, একে তার প্রতিও  
ডঃ ত্রিপাঠী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ  
করেছেন। তত্ত্বজ্ঞান শিল্পের অবনতির

ফলে কৃষক সম্প্রদায় ক্রমশ বৈদেশিক  
মূলধনী শিল্পসম্পর্ক আন্তর্জাতিক শক্তি-  
সমূহের (forces) দাস হয়ে পড়েছিল।  
এর ফলে এদেশের লোক উপলব্ধি করে-  
ছিল, এবং এই চেতনাই ভারতকে  
উদ্বুদ্ধ করেছিল দেশের শিল্প উন্নয়নের  
প্রতি অর্থাহিত হতে। এরই ফলে শিল্প-  
বিশ্ব শক্তিশালী শ্রেণীকে ভারতে উপল-  
ব্ধি প্রতিক্ষার নিমিত্ত এক বিরাট কর্মসূচি  
অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই কর্মসূচিই  
ভারতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এক নতুন  
সমাজবিন্যাস, যার মেরুদণ্ড ছিল মধ্য-  
বিত্ত সমাজ।

পরবর্তীকালের এই পারিস্থিতিতে  
সামনে রেখেই ডঃ ত্রিপাঠী 'রচনা  
করেন' তাঁর আলোচ্য চার্লস বক্সের  
ইতিহাস। বিভিন্ন অধ্যায়ে তিনি বিশদ-  
ভাবে ও বৈচারিক পদ্ধতি অনুযায়ী  
আলোচনা করেছেন জমির মালিকদের  
শব্দ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে  
কর্মওয়ালিশের আশা ও নৈরাশ্য,  
এজেন্সী হাউসসমূহের উত্থান ও  
পতন ইত্যাদি ওই যুগের নানা ঘটনা ও  
সমস্যা। সমস্ত পারিস্থিতি পুঙ্খানু-  
পুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে লেখক যে  
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, সেটা এখানে  
সংক্ষেপে বলি—উনিবিংশ শতাব্দীর  
প্রারম্ভে মঙ্গলকামী রাষ্ট্র (welfare  
state) আশা করা যেমন স্বাভাবিক,  
অপার দিকে ইংরেজ পূর্বকল্পিত কোন  
ছক নিয়ে ভারতকে শোষণ করতে এসে-  
ছিল, তা ভাবও তেমনই ভুল। ভারত  
হিন্দু অবস্থার পথে গিয়ে থাকে, তার  
সূচনা ইংরেজগণ কর্তৃক বাঙালী সার্ব-  
ভৌমত্ব গ্রহণের অনেক আগে থেকেই  
ঘটেছিল। রাষ্ট্রীয় আর্থিক ও সামাজিক  
—সকল ক্ষেত্রেই বাঙালী শক্তি হয়ে  
গিয়েছিল অবস্থার লক্ষ্য ইংরেজ সার্ব-  
ভৌমত্ব স্থাপনের আগে থেকেই। দেশের  
মধ্যে কোনরূপে ঐক্য ও সংহতি ছিল  
না। শাসিত-শাসকগণও ছিল না। লেখক  
বলেছেন—  
"Caste stood against initia-  
tive, chaos against enterprise,  
localized markets against  
nationalized market, and  
economic fragmentation ag-  
ainst formation of capital".  
কৈশিক শাসনের কুফল ছিলই। কিন্তু  
তা সত্ত্বেও দেশের মফল প্রতিক্রিয়া হয়ে-  
ছিল জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও শান্তি-  
শৃঙ্খলা।

এইখানার সবচেয়ে আকর্ষণীয় অঙ্গ  
হচ্ছে মজারান পাদটীকাসমূহ ও পরি-  
শীল প্রদত্ত পরিংখ্যানের প্রাচুর্য। বই-  
খানা যে বিদগ্ধ সমাজে সাংসার গৃহস্থ  
হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।  
অতুল নূর

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি চিত্রকলা

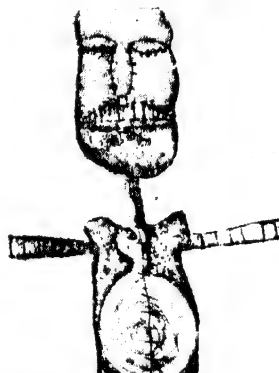
### বহিরাগত

সাধারণত কলকাতায় কেউ প্রদর্শনী  
করতে এসে আয় নিষ্ঠুর হতে পারি  
না। শিল্পীকে তার কাজ নিয়ে আমদের  
সঙ্গে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রের জন্য  
সাধাবাদ দিতে হয়। কিন্তু একেই  
নিঃসঙ্গ ব্যতিক্রম ঘটতে হল।

অমিত আম্বালাল (জন্ম ১৯৪৩)  
আমেদাবাদের মানব প্রদর্শনী অনেক

করেছেন। কিন্তু তিনি প্রদর্শিত শিল্পী  
নন। তাঁর কাজে বোধহয় সেটা স্বপ্রকাশ  
(আকস্মিক) অব ফাইন আর্টস—২১শে  
ফেব্রুয়ারি। প্রথমেই যেটা চোখে পড়ত  
সেটা হল উজ্জ্বল দৃষ্টিময় বৈশিষ্ট্য  
এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণ। বর্ণের ছায় (টোন)-  
এর চেয়ে বরং সমস্ত ভাবে চাপনোর  
দিকে ঝুঁকতি বেশি। একটু সামলানি  
বোকা বার, কাজেরে বিজ্ঞাপন-চেয়ে  
প্রভাব পড়েছে তার ওপর। অবশ্য শিল্প-  
চিন্তার রূপারোপ (স্টাইলাইজেশন)  
তিনি আগাগোড়া কাজে লাগাবার চেষ্টা  
করেছেন। কিন্তু ছবির কঠোরতা আর  
নির্মাণ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অসাধারণ।  
কিন্তু সহজাত বোধের জন্য কোন ছবি  
উপরে গেছে মোটামুটি।

আমার ভাল লেগেছে তাঁর মাথা  
কালো মজারান মুখগুলো। চেয়ারে  
'পাঞ্জ' দিয়ে বসা মেয়েকেও ছোট ছবির



হঠাৎ—অমিত আম্বালাল

মধ্যে গাছের তলায় বসে ছেলের মতো  
আঁকা পাখিগুলো ভারী মিষ্টি। আমার  
ছোট ছবিগুলো বেশ ভাল লেগেছে।  
বড় ছবি তেমনভাবে টানে না সব-  
সময়। এখানে তিনি পশুপাখি-মিষ্টি  
একটা কণ্ঠে প্রাধান্য দিয়েছেন—সব-  
ছবি বা নীলই হোক। মাঝে মাঝে  
একটা অননুভূমিক রেখা টেনে অন্য একটা  
বর্ণকে পশুপাখি-মিষ্টি এনেছেন। অথবা  
তার সংখ্যা কম। শিল্পচিন্তকের সাধারণ  
বাস্তবচিন্তার মিতব্যাক তিনি ব্যাঙ্গ্য  
করেছেন। হয়তো চারটে ছবির নাম  
কুর্স্তিগার বা অন্য চারটির ম্যানেজিং  
ডিরেক্টর—এঁদের ভঙ্গী নিয়ে একটা  
মশকরা করেছেন। দশকের মনের ভেতর  
এই কুর্স্তিগার, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বা  
'হঠাৎ' আছে। মানুষের আত্ম-  
স্বভাবতা নিয়ে তিনি হাসতে এবং  
হাসতে চেষ্টা করেন। সাট পরা ম্যানেজিং  
ডিরেক্টরের সখী আত্মসম্মত ভঙ্গী  
যখন তিনি কেদারায় বসেন বা উঠে  
দাঁড়ান সেটা তুলে ধরতে চেষ্টা করেন, যা  
যখন কুর্স্তিগার ক্রিয়া করেন গড়াগড়ি  
দিয়ে। মজার উপভোগ্য। হয়তো  
তখন নীর মুদ্রা যেখানে প্রাধান্য দিয়েছেন  
সেখানে ভ্রম দিয়ে লোকটির মাথা  
কপাল থেকে কেটে দিয়েছেন। মানুষের  
ফেলানো ব্যক্তিগত হাসকরা দিকটা  
দেখিয়ে, কতদূর খাপস মানবসমাজ, এটা  
বলতে চেষ্টা করেন। "এইসব ভয়ঙ্কর  
আরতি"—তিনি নিজের মানুষের  
স্বভাববৃত্তিতে ভর পাননি, ফলে ব্যাপারটা  
নিছক "কুর্স্তিগার" (গোল্ড বাঙালার

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওম্কারনাথ  
মহারাজের ওড ৮৮তম আবির্ভাব  
তিথি উপলক্ষে প্রকাশিত শ্রীশ্রীচাকুরের  
সামিধাপ্রস্তু তাঁহার গীতামূলক  
গ্রন্থ

## বীণাবিগ্রহায় ধামহি

প্রতিষ্ঠান

শ্রীঅমৃত চট্টোপাধ্যায়

৮৫/১, মসজিদ বাড়ী স্ট্রীট, কলি-৬  
মুদ্রা—১৫০ ৫৫-৬৬৪৭

একটি রূপালী সারিতা দ্বারা

। গোপাল-বন ।

- পুস্তক রচনা প্রকল্প
- স্বাক্ষর ছাপা
- সমকালীন গল্প/কবিতা/প্রবন্ধ
- সংকলিত-সংবাদ ও পুস্তক

সমীক্ষা

সম্পাদক : অশোক চট্টোপাধ্যায়  
নতুনপাড়া, চন্দ্রনগর, হুগলী

। টোয়ের রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বই ।  
রবীন্দ্রচন্দ্র অপরিসর্য দৃষ্টি গ্রন্থ

সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ  
প্রবাসী—সোমেন্দ্রনাথ বসু  
২০-০০

সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ  
শান্তিনিকেতন—সুপ্রী মিত্র  
২৪-০০

পুস্তক বিশদ

২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-১৬

## মালিনী

জ্ঞানসংখ্যায় অত্যন্ত নিষ্ঠা

কল্পকল্পন লেখক :

সংস্কৃতভাষার মোহ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়,  
ফিরোজ চৌধুরী এবং রামানুজ  
মণ্ডল। বাইশে শ্রাবণ উপলক্ষে তিনটি  
বিশেষ রচনা এবং অন্য অনেক  
লেখা। পুস্তকের প্রস্তুতি চলছে।  
দাম-দেড় টাকা।

সম্পাদিকা : মারা সিদ্ধান্ত

২৪ ডি রোড স্ট্রীট, কলকাতা-১৬

১৫ খণ্ডে ছবিভরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই

## জানবার কথা

সম্পাদক : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

১ম, ২য় ও ৪র্থ খণ্ড প্রকাশিত

২০, টোকা প্রাচক চৌধুরী ও প্রতিষ্ঠান ১২

নতুন প্রাচক (নতুন) হাং

প্রাচক কেন্দ্র : শরণ লুক হাউস

২৮ বি, শ্যামালেন্দ্র চৌধুরী

কলকাতা-১৬ ১৩০০৭৩

রিসার্চ ইন্ডিয়া পারিকেশনস

# পরিপূর্ণ জীবনের জন্মে শক্তি



ওকাসা যোগ্য প্রাণশক্তি। ৬টি বায়োকেমিক্যাল, ৬টি খনিজপদার্থ, ১০টি একান্ত প্রয়োজনীয় ভিটামিন, অম্লগন্ধা ও ট্রায়োহিমবাইনের মত ভেদক নির্যাসের এক জোরালো সমন্বয় ওকাসা—আপনার হারানো শক্তি ফিরিয়ে দেয়। ওকাসা খান, জীবনকে অসাধারণ আনন্দময় করে তুলুন।

এখন সহজে নাড়াচাড়া করা যায় এমন প্যাকে

## ওকাসা

সব প্রধান কেমিস্টের দোকানে পাবেন  
ওকাসার বিনামূল্যের পুস্তিকার জন্যে লিখুন:  
OKASA CO. PVT. LTD.  
P.O. Box No. 396, BOMBAY-400 001.

ভাড়াঝো কলমে একটু বেশি আঘাত দেওয়া হতো) হয়ে গেছে। আসলে অমিত আহমেদবাবের মিল মালিকদের কনাইয়ের গাভো মেরেছেন। কিন্তু কনাইরই কথাদের নিয়ে তেমন মশকরা করতে পারে। ফলে সমস্ত বাপাটা হয় দাঁড়িয়েছে একটা মস্ত প্রহসন। এমন মনে হবার একটা কারণ রচনাসৌক্য (কম্প-জিসানো) জোর নেই। যদিও হাত দিয়ে ফল ধরা, বা কসতে ফাওয়া, আসন করার মতো বা যন্ত্রদোষণগুলি কিন্তু ধরেছেন ভাল। কড় ছবির দুটো ছবি মিলিয়ে একটা পেটো ছবি হয়েছে একটি ক্ষেত্র। দেখানে ওপরের দিকে অনুভূমিক রেখা টেনে কাম্বিস সাদা রেখে ছবির ফ্রেমের বাইরে করে দেওয়া হয়েছে। তারপর ছবির চারদিকের হাতটিকে ছবি থেকে টেনে ফ্রেমের এই সাদা জায়গাটার এনে একটা মজা করেছেন। একটিকে একটি মেরে। অন্যটিকে দশাসই পুরে। মেরে টি অকোশী কামিজ পরেছে। সব জ ওড়না। কালো চুল। কিন্তু কাম্বিসের সাদা রঙের মুখ (এখানেও তিনি বহু বহাদুরী দেখিয়েছেন)। তার একটা হাত চলে গেছে ফ্রেমের বাইরে সাদা জায়গায়। আশুপে ধরা ফল। অন্যটিকে ললাটে কোনো ফোট পরা লোকটির মুখ সব জ রঙের। মেরেটিকে দেখে সেও একটা হাত তুলে দিয়েছে ফ্রেমের বাইরে সাদা জায়গায়। পাশ থেকে অঁকা ছবি। হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়াতে দৃষ্টান্তে উল্লসিত। ছবি দুটির নাটক উপভোগ্য। আর "লাল কুকুর" বলে ছবিটা আবার

মন্দ লাগেনি। সব জ বাহরী লোক পাতাল মতো কুকুরটিকে সামান্য রেখার দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।  
আবার মনে হয় পেটো রচনা সম্বন্ধে তার আধিক্য ভাবা উচিত। এক বা দুই রঙা পটভূমি মাঝ ক্রাক্স একটা লোককে ছেড়ে দিয়ে তিনি সহজে কিস্তিমা করে তৈরী করছেন।  
সন্দীপ সরকার

জালোচনা: শিল্প সংস্কৃতি চলচ্চিত্র

## শেষ বিচার

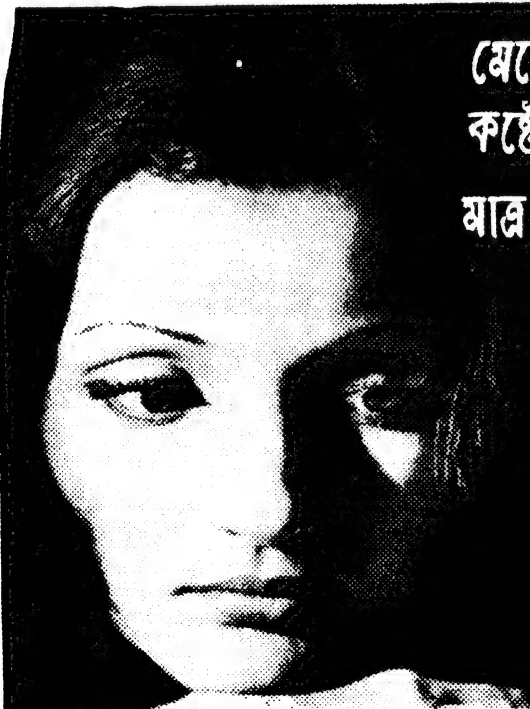
কাহিনী বিচারক শিবনাথ বানার্জীকে (উৎপল দত্ত) নিয়ে। খুনী নিজেরই পুত্র রাজা। বিচারক শিবনাথ রাজাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি আনুগত্যের পরাক্রান্ত দেখান। এই কাশারটা পরিস্ফুট করতে, অর্থাৎ রাজার খুনী হওয়ার পিছনে যে ধরনের ঘটনার সমাবেশ তার সবকিছুই যেন প্রসিদ্ধ। 'কমন সব এলোমেলো ঘটনা দেখতে দেখতে মনে হয় কাহিনীকার-পরিচালক বিমল রায় ঘটনাবলী যোভাবে উপস্থাপিত করেছেন তাতে দর্শক কাহিনীর সেই মেলাতেই পরিশ্রান্ত হয়ে ওঠেন। শ্রী শত্রোকে (সুমিত্রা মুখার্জি) খনের দায় নিজের ঘাড়ে নেয় অধ্যাপক স্বামী রাজীব (দীপংকর দে)। বিচারক শিবনাথের সন্দেহ হতে

মেয়েদের প্রতিমাসে কয়েকটা দিন  
কষ্টে ও অস্বস্তিতে কাটাতে হয়।  
মাত্র একটি সারিডন'ই যথেষ্ট।

## সারিডন

টিকানা

গোলা





#### সুখী ও দীপঙ্কর

রাজীবের সঙ্গে গোপনে দেখা করে প্রকৃত ঘটনা জানতে পারেন। রাজীবের এই জবান থেকেই ফ্রাশ-বাকে কাহিনীর অবতারণা। আর এই ফ্রাশ-বাকের ব্যাপারেই পরিচালক চলচ্চিত্রের সরল ব্যাকরণও উপেক্ষা করেছেন। ফলে রাজীবের জবান সূত্রে এমন ঘটনাও দেখানো হয় যা সে প্রত্যক্ষ করেনি। খলচরিত্র রাজা (সম্ভ্রু মুখার্জী) আসলে নারী শিকারী। রাজীবের বোন রোচনারও সে সবনাশ করে। রাজার সঙ্গে পরিচিত হবার পর শত্রু একসা এক ক্যাবারে নাচিয়ে রূপে রোচনাকে দেখে। পরে রাজীবের সঙ্গে বিবাহের পর শত্রু জনমত পারে রোচনা আসলে তার হারিয়ে যাওয়া নন্দ। কিন্তু শত্রু রাজীবকে সে-তথা আর জানিয়ে যেতে পারল না। রোচনা (মহুয়া রায়-চৌধুরী) কিভাবে রাজার ফঁদে পা দেয় এবং তার পরিণতি ঘটে সে ব্যাপারটির

জনা আবার ফ্রাশ-বাক। এবং সেটা ঘটে আদালতে রক্ত ঘের হবার অব্যাহতি পূর্বে। আর ফলে রাজীব মৃত্যু পায়, আর রাজার হয় হত্যাশাস্ত। বিন্যাসে সানসেপ্ত গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে বা অন্তত চেষ্টা। ঘটনার অবিন্যস্ত পরিচর্যা ছবিখানির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় অন্তরায় ঘটায়।

ছবি কতকটা জমে কিয়দ ঘটনা। বিচারক-পী উপপল সন্ত এবং দুই-পক্ষের উকীলের চরিত্রে বিকাশ রায় ও শেখর চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ই ওই জংশ জমিয়ে তোলার সহায়ক হয়েছে। কিন্তু সে-তত্ত্বিও দর্শকমনে স্থায়ী হতে পারে না আদালতে বিচারক পক্ষীর বক্তৃতাটা আত্মনাদ এবং রায়দান শেষে বিচারকের কমে ইস্তফা পড়ে সম্বন্ধের টেবলে রেখে চেয়ার ভাগ্যের মত অসম্পাত ও হাস্যকর ব্যাপারে। সম্ভ্রু মুখার্জী ছিলেন চরিত্রেও সচল প্রমাণ দিয়েছেন। দীপঙ্কর শেখর রাজীবও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পঙ্কজ দত্ত

#### আলোচনা: দিল্লী সংস্কৃতি সংগীত

নরেন্দ্রনাথ ধরের একক আসর তরুণ সরোদ বাদক নরেন্দ্রনাথ ধরের একটি আসরের আয়োজন করেছিল নবদীপা নামক এক সংস্থা শিশির মন্ডে গত ৮ জুন। তবলা সঙ্গিতে ছিলেন স্বপন চৌধুরী।

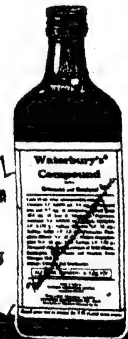
মাড়োয়া রাগে সংক্ষিপ্ত আলোচনা-

শরীর দ্বন্দ্ব  
থাকলে সর্দি-  
কাশি লেগেই  
থাকে।



নিয়মিত ব্যবহার করলে  
ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড রেড  
লেবেল রোগ প্রতিরোধ-শক্তি  
গড়ে তোলার সাথে সাথে  
আরামও দেয়।

- \* শরীর আরাম দেবার জন্য এতে ক্রিয়োসোট ও গায়কোল মেশানো আছে।
- \* তাছাড়া এতে এমন অনেক টনিক পদার্থ মেশানো আছে যা বছর দ্বিগুণ করে রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি বজায় রাখে।
- \* বারবার সর্দি-কাশির আক্রমণ থেকে আপনাকে রক্ষা করে।
- \* স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখে।



সর্দি-কাশির  
উপশমের  
সর্বোত্তম  
নির্ভরযোগ্য  
উপায়।

ওয়াটারবেরিজের উৎকৃষ্ট উপাদান

ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড  
রেড লেবেল

WH.5884

#### জেমস হ্যাডলী চেজ

স্বর্গে এক ফেরিগী

নাইট ক্লাবের নর্তকী

কারলা খুঁজি হঠাৎ নিরুদ্দেশ।

পরনে এক চিলতে ব্রা, চোদ্দ মাস

অমুসন্ধান করেও পুলিশ হদিস করতে

পারল না কারলা মৃত না জীবিত।

সাংবাদিক চেষ্টা শুরু করল তদন্ত।

দেখল-কেঁচো খুঁড়তে সাঁপ বেরুচ্ছে।



জেমস হ্যাডলী চেজ

পিঞ্জরে পাখি নেই ১২, শিশিরে রক্তের ফোঁটা ১২

আলবার্তো মোরাভিয়া / স্বর্গ নরক ভালবাসা

তত্ত্ব প্রেমের মধুর স্বাদে, কামনার বহিষ্কৃত জ্বালায়, নীড় রচনা রহস্যে নিজের  
অজান্তে কখন স্বর্গে মোপানে নিয়ে গেছে-এমন এক নারীর প্রেমকাহিনী



বুস লীর একমাত্র প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থ

বুস লী/মিগুা লী ১২

ব্রুস আমার ব্রুস

এ পি পি ৥ ১৬৬ কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯



# নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাস... সুস্থ সবল দাঁত



## কোলাগেট ডেন্টাল ক্রীমের গুণে

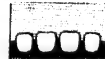
প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলাগেট দিয়ে দাঁত মাজুন।  
আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত রাখার জগ্গে সারা পৃথিবীতে দাঁতের  
ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর  
সৃষ্টি হয়। ফলে নিঃশ্বাসে ভগ্নক আসে, পরে দাঁতে যন্ত্রনাদায়ক  
ক্ষয়রোগের শুরু হয়ে যায়।

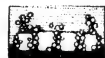
সুতরাং প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলাগেট দিয়ে দাঁত  
মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে নিঃশ্বাসের ভগ্নক  
দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলাগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার  
প্রমাণিত হয়ে গেছে।

কোলাগেটে এমন এক চমৎকার তাজা মিষ্টি স্বাদ রয়েছে  
যে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত ত্রাণ করতে ইচ্ছা করবেই।

কোলাগেটের নির্ভরযোগ্য করণ্যতা কিভাবে কাজ করে!



নিঃশ্বাসের ভগ্নক ও দাঁতের ক্ষয়রোগের জীবাণু জন্ম নেয়  
দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে।



কোলাগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে অবশিষ্ট  
খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু মুইট দূর করে।



ফলাফলঃ সাদা ঝকঝকে দাঁত, নির্মল তাজা শ্বাস-প্রশ্বাস  
ও দৃষ্টকর রোগ প্রতিরোধের দৃঢ় মনোবল।

**কোলাগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে  
নিঃশ্বাসের ভগ্নক দূর করুন...  
দাঁতের ক্ষয় রোধ  
করুন!**



দাঁতের পুরোপুরি স্বাস্থ্যের জন্যে  
কোলাগেট টাইমার্ট টুথপেস্ট ব্যবহার করুন...  
এটি দাঁতকে ভিত্তি ভাবে স্বাস্থ্য করে।

- 1 দাঁতের ক্রান্তনয় মুদ্রণ করে।
- 2 দাঁত সজলত রাখা  
করতে সহায়ক।
- 3 দাঁতের মুদ্রণ করে।



নরেন্দ্রনাথ রায়

জোড় দিয়ে আসারটি শূন্য হয়। ছোট করে বাছানো আলাপটিতে রাগের মৌলিক রূপ মোটামুটি ভালো ফুটেলেও জোড়টিই বেশি আনন্দ দিয়েছিল। এটি অতি সুন্দরো ও সুগঠিত হয়েছিল এবং এতে শিল্পী ভাল লেপেট ও গমকের কাজ করেছিলেন। মখলয় জন-জোয় সফিকশত লড়গুখাওয়ার কাজও বেশ ভাল লেগেছে তবে কালার কাজ বড় তাড়াহুড়া করে শেষ করা হয়েছিল।

শ্যামকল্যাণ রাগে বিলম্বিত তিনতাল গংকারি সরোদ ও তবলার ছন্দ ও তেহাই-এর আদান-প্রদানে রীতিমত জমে উঠেছিল। নরেন্দ্রনাথ ধাবল ছন্দের কাজ যেমন ছিল সুন্দর তেমন ছিল বৈচিত্র্য ও বোলের বিস্তার

—চৌগুণ, আটগুণ, কুয়ার্ড, বিজাউ ও বারগুণের বলিষ্ঠ স্বরসঙ্গতি তিনি বাজারে ছিলেন শিল্পবোধ ও নিপুণতার সঙ্গে। এর উৎকৃষ্ট জবাব উঠেছিল স্বপন চৌধুরীর তবলার। এই রাগে দ্রুত তিনতাল গংটিতে ভালো তাদের কাজ ছিল—সম্বা ও সুনির্মিত এক-হারা তানগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এর মধ্যে কয়েকটি সোতারের কারদার শব্দ একটি তারের উপরে বাজানো হয়েছিল—সরোদে এ তিনিস বাজানো শব্দ কঠিন। কালার কাজ, দ্রুত, পরিষ্কার ও সুন্দরো হয়েছিল এবং এতে ছিল অসাধারণ বোল-বৈচিত্র্য। এই বোলবৈচিত্র্য প্রতিধ্বনি শোনো ব্যক্তি স্বপন চৌধুরীর ঠেকা বৈচিত্র্য।

এরপর শিল্পী শোনালেন কিছুটাটি রাগে একটি মঙ্গল, আবেগ-পূর্ণ আওয়ার এবং একই মেজাজের দ্রুত তিনতাল গং। গংকারিতে সেই একই কোমল মনোভা দেখা গেল—তিন সপ্তক জোড়া সুগঠিত একহারা তানগুলিতেও। এই তানগুলিতে তাদের তাদের ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। স্বপন চৌধুরীর রেলার কাজও এই একই মনোভা দেখা গেল। উল্টো-কালার কাজে যেমন ছিল ধ্বনি-মাধুর্য তেমন ছিল বোলবৈচিত্র্য।

সম্পূর্ণ জিন্ন মেজাজের ছিল পরের বাগেত্রী রাগে বিলম্বিত গংটি। এটির অতি-বিলম্বিত লগ বাজানো প্রথম মিনিট দশক শিল্পী মাজির

সদ্য প্রকাশিত

বিনয় বোষ

## শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ

‘শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ’ একটি দুপ্পা ‘আধুনিক’ বই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে প্রগতিবাদী শিবির থেকে বাংলাদেশায় লেখা এ বই শুধু একজন নবীনলেখক ও সংস্কৃতিকর্মীর মার্কসবাদী প্রত্যয়ের প্রথম দ্বিধাহীন উচ্চারণই নয়, এটি সেদিনের তরুণ সমাজের কাছে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের সপক্ষে এক জোরালো হাতিয়ার হয়ে অ-রাজনৈতিক মহলেও তোলাপাড় তুলেছিল। এদেশে গত চারদশকে ইতিহাসের নানা ঘূর্ণাবর্ত পেরিয়ে আজকের তরুণদের সামনে বিনয় ঘোষের প্রথম প্রকাশিত এই বই পুনঃপ্রকাশিত হল। সংযোজন-সহ নতুন সংস্করণ। চোদ টাকা।

লেখকের আরো দৃষ্টি গ্রন্থ

বাদশাহী আমল ১৪০০

বাংলার লোকসংস্কৃতির

সমাজতত্ত্ব ১৪০০

প্রকাশক : অরুণা প্রকাশনী ৭ যুগলকিশোর দাস রোড, কল ৬  
পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ ১২ নকিম চাটুজো স্ট্রীট, কল ৭৩

# “আমিই টিয়ারা সুকন্যা, রূপসী অমন্যা”



সবকালের হৃদয়ের দ্বারে খোলে

টিয়ারা, নবায় সেহা।

- টিয়ারা এগ শ্যাম্পু
- টিয়ারা লিমোন শ্যাম্পু
- টিয়ারা বিউটি শ্যাম্পু
- টিয়ারা সিকাইই শ্যাম্পু

• টিয়ারা লেমন শ্যাম্পু

• টিয়ারা ল্যানোলিন শ্যাম্পু

• অথবা টিয়ারা হেয়ার কন্ডিশনার ও শিউরা বাত।



টিয়ারা  
শ্যাম্পু



হুগো বকুর ব্যাপারে তাঁরা অনেক সময় অনেক

everest/80/JKH/314-bn.

এইচ এম ভি'র  
অভূতপূর্ব  
উপহার!

# অসামান্য দশজন



যেকোনো ৩টি এল পি—মাত্র ১০৬\* টাকায়!!  
এইচ এম ভি'র অনবদ্য সংগ্রহ—একালের দশজন  
অসামান্য শিল্পীর নির্বাচিত ৮১টি এল পি রেকর্ড থেকে  
যেকোনো ৩টি বেছে নিন।

এইচ এম ভি'র অনন্য শিল্পী সমারোহ।  
লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে,  
কিশোর কুমার, মুকেশ, মান্না দে, মহঃ রফি,  
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, তালাত মামুদ, বাণী জয়রাম ও  
মহেন্দ্র কাপুরের সেরা সব গান। এইচ এম ভি'র  
৮১টি নির্বাচিত এল পি রেকর্ডের এ এক অনন্য  
সংকলন। এর মধ্যে তিনটি নতুন এল পি-তে  
পাবেন হিন্দী ছায়াছবির গান, গীত, গজল,  
উক্তিগীতি, লাইভ কনসার্ট রেকর্ডিং এবং পাবেন  
সকল শ্রোতাকে খুশী করার মত রবীন্দ্রসঙ্গীত  
ও আধুনিক গান।

এই সব দারুণ দারুণ এল পি  
রেকর্ড থেকে যেকোনো ৩টি বেছে  
নিন—মাত্র ১০৬\* টাকায়।  
আপনার বাঁচবে ২২ টাকা।

এই সুযোগ পাবেন  
এইচ এম ভি ডীলারের কাছে।

\*কর আলাদা।



**হিজ মাস্টার্স ভয়েস**  
অসামান্য শিল্পী। অনবদ্য সঙ্গীত।

রেশে ভরা গায়ক অপেরা বিন্দুর  
মাকিরেছিলেন। এতে রাসের গম্ভীর  
মেজাজ সুন্দরভাবে ফুটেছিল। লর  
একটু বাড়ার পর ভাঙ্গ স্বপ্নের কাজ,  
ভান-ভেড়া ও সাধ-সঙ্গত শোনা গেল।  
এই রাগে দ্রুত ও অতি দ্রুত তিনতাল  
গয় দুটিও ভাল হয়েছিল। প্রথমটিতে  
ছিল জমজমট বোল অপেরা তান-  
তোড়া এবং দ্বিতীয়টিতে উচ্চাঙ্গের  
বোলকার ও কালার কাজ। শেষের  
জিলা কাফি আওচর, ও দ্রুত তিনতাল  
গয়-এ ঠিকই অপেরা কথা-বলা  
মানকতা এক রংয়ের স্বপ্নে নকশা  
ছিল। জায়গার জায়গার আলী আক-  
বরের প্রভাব দেখা যাচ্ছিল, জায়গার  
জায়গার আমজাদ আলীর। দ্বিতীয়-  
তরের প্রভাব অবশ্য আসরের সব  
জায়গাতেই ছড়িয়ে ছিল—বিশেষ করে  
একদম তানের কাজে। কারণ একথা  
আর সবজন স্বীকৃত যে সরোদে  
একদম তানের বহুল প্রয়োগ  
আমজাদ আলীই প্রথম করেন।

নীলাল গুপ্ত

নানা স্বাদের গান

পরিচালনার অভিনব ছিল না,  
তবু 'খায অরিল্ল' স্মৃতি সংস্কার  
তরফে মহাকাশি সমনে লশাক দাস-এর  
আয়োজিত সাম্প্রতিক বিচিচান-তানিটি  
নানা স্বাদের গানের এক বর্ণনায় সমাহার  
হয়ে উঠেছিল। প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা  
বয়সান ছিলেন, নতুনরা ছিলেন সম্ভাবনা-  
ময়। শর্মিস্তা মথোপাধ্যায় 'অমার অঙ্গে

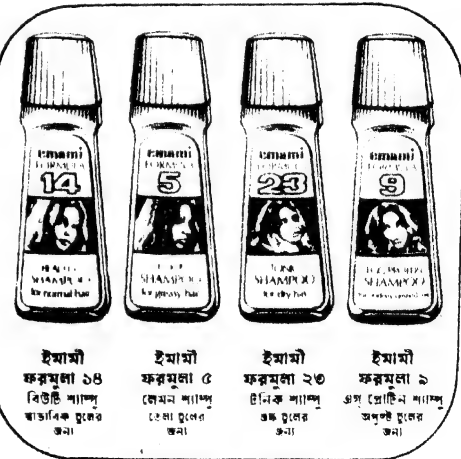
জরদে' গান প্রত্যাখার রমেশজি সতিই  
জেরেছিলেন, যদিও অন্য গানে জা হর  
উঠেছিল, কিন্তু নিপুণ। হু-পন  
হাজারিকা শান্ত ভাণ্ডে জনপ্রিয় গানের  
পরিধিতে ডেক নিয়োজিতেন প্রোডু-  
ম-জটিল। হুইচই বসাক-এর গানে  
বতটুকু গান, ততটুকুই হুইচই। কিংবা  
তার বেশীই। তবু ছদ্ম-গানটি ভালো  
লেগেছে। অভিজ্ঞ কিংবাস শোনা-লন  
ইরবোলা-ক-ঠর কিছ, নমুনা। ধূনির  
অনুসরণে এই নবীন শিল্পী বিশ্বজের  
সম্ভার পরিচয় রেখেছেন। বি.সবত  
দুই বিপরীত ধূনির দুইই মিশ্রণ,  
যেদের বিভিন্ন গতিপথের ভিন্ন ভিন্ন  
ধূনিবাজনা, ভিত্তি জর র্যালি—  
অনবদ্য। খেলার রিলের ধূনির অংশ  
বেশী ভালো, কণ্ঠ আরও মাজনার  
মুখোপেক্ষী।

মানবেন্দ্র মথোপাধ্যায়-এর নব্বুল-  
গীতির সবটুকুই ছিল রায়গারী।  
অত্যন্তই পরিচ্ছন্ন ছিল তাঁর কণ্ঠ  
সেদিন। ছিল দাপট এক মেজাজ।  
গানের সঙ্গে হাত তোলো নেহাতই লোক-  
দেখানো কারসাজি যে নয়, ভেতরের  
মেজাজ বহিঃপ্রকাশ—বৃত্তে অস্বিধে  
হয়নি। আর ছিলেন রবীন্দ্রসংগীতের  
আসরে সৃষ্টি মিত্র—আসরে জর-সেওয়া  
নাথান গান যাকে নতুন করে পুরো  
গেল সেদিন। জাগতে হবে রোর  
আরম্ভের 'জা' বল টান সৃষ্টির শিকড়  
থরে কীভাবে দেয় টান, 'তোমার কথা  
হেথার কাষায় লুকনো রয়েছে অনা-  
লোচনার দীপ্যবাস' গীতমর অবগুঠনের

## ইমামী র চারটি শ্যাম্পু ফরমুলার অপূর্ব উপহার খুলবে চুলের নতুন বাহার



আর... সম্পূর্ণ নতুন আগতি



ইমামী শ্যাম্পু  
-আপনার চুলের নতুন জীবনের  
গোপন কথা

প্রকাশিত হলো

# জেমস হেডলী চেজ খুনীর চোখে ঘুম নেই

(THE GUILTY ARE AFRAID)

লী ক্রীডি সেন্ট রাফেল সিটির সবচেয়ে ধনী লোক।  
তিনটে খবরের কাগজ, একটা ফ্যাক্টরী, একটা শিপিং-  
লাইমের মালিক—তাছাড়া শহরের সব কটা বড় বড়  
নাইট ক্লাবে ওর শেয়ার আছে। সে কেন  
সানফ্রান্সিস্কোর এক ক্ষুদ্রে গুগোয়েল্লাকে কাজে  
লাগাতে যাবে? কিন্তু সেই গুগোয়েল্লা এসেছিল এবং  
কাজ হাতে নেবার অল্প সময়ের মধ্যে খুন হল, কেন?  
লিউ ব্রাউন সেই প্রশ্নের সমাধানের জন্য তৎপর—  
কিন্তু সেই স্বর্ণকেশী রহস্যময় মেয়েটি কে—যে ওর  
পাটনারকে শেষ জীবন্ত অবস্থায় দেখেছিল? ১৮০০

পরিবেশক: সাহিত্য মন্দির-৫৭-সি কলেজ স্ট্রীট কলি ২৬

প্রকাশিত হল  
ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের  
**ইরাণ ভ্রমণ** ১৫-০০

প্রত্যক্ষদর্শীর চিত্তাকর্ষক বিবরণে জানতে পারা যাবে শাহ-শাসিত ইরানের সাংস্কৃতিক জীবনের অস্তিত্ব অশাস্য, পারস্য ভারত কথা, মাদ্রা মন্ডল, তেহরান বিমান বন্দরে, ইস্পাহান, উৎসব নগর সিরাজ জাহান নোমা বাগ, ইরানের রাণী, আস্‌সেজাস আলেকুম দোতারার গান, পারস্যী মাদ্রা, হাফেজী, শেখ সাদীর মশবরা নাকুস-ই-কম্বুম, পারস্যের উপকথা, পুতুলনাচ, নীলনদের বাঁশীওয়ান, রাউদানী তেহরান।

রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তীর

**বিষ্ণু পুরাণ** ১৪-০০

প্রাচীন পুরাণের গল্পের রস অক্ষয় রেখে লেখক বিষ্ণুপুরাণকে গদ্য সারানুবাদে উপস্থিত করেছেন মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে।

সুবোধবাবুর লেখা একখানি অনবদ্য গল্প সংকলন

**গল্প শুধু গল্প** ১০-০০

এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ

১ বক্সিস চাটাজী স্ট্রীট কলি : ৭৩

এনিশ নাই কাটেতে কীভাবে চাঁকতে  
শিল্পতার উত্তীর্ণ হয় ধর্মানময়তার  
বিহীন আবেশ, 'করো করো বীরবীর'  
মদ্য মেঘের গুরুগুরু, ধর্মান কীভাবে  
ছড়নো রয়েছে শূন্য থেকে শেষবর্ধা—  
নতুন করে জানিয়ে দিলেন সেদিন  
সুচিন্তা মিত্র।  
প্রথম প্রকাশ্য

অনোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

বেহুলা

এড়িয়ে যাবার মনোভাবটা প্রতি-  
রোধকে জমশ দুর্বল করে তোলে  
এবং এই দুর্বলতার সুযোগেই  
অত্যাচারের মাত্রা জমশ বর্ধিত পায়—  
বেহুলা গল্পের প্রধান চরিত্র শ্রীপদ  
মাল নিরক্ষর নিরসীকৃত একজন ওকা  
হয়েও এই কথাটা বুদ্ধিতে পেরেছে।  
সেই হেতু সংস্কারের মধ্যে বেড়ে  
উঠলেও বিজ্ঞানের প্রতি তার অধিক  
বিশ্বাস। যদিও এই দুইয়ের স্বস্থ  
তার মধ্যে রয়েছে। বলা বাহুল্য,  
গল্পটির বাস্তবিকতাও সেখানেই।  
“একদিনে যেখানে শত শত সাপ জন্ম  
নিচ্ছে সেখানে তিন-চারটে মানুষকে  
বাঁচিয়ে তুলে কি লাভ”—ছোট্ট এই  
সংলাপটির মধ্যেই বেহুলা নাটকের  
মূল বক্তব্যটি নিহিত। অতএব অজমশ  
হাসিকে হবে সেই উৎসে যেখানে  
সাপের বংশবর্ধিত হয়। একটু, মনস্ত  
হলেই টের পাওয়া যায়, হোসাবাবুর  
ইটের পাঁজা আসলে একটা রূপক, যা

একটি সমাজ-ব্যবস্থাকেই প্রতিফলিত  
করে। তথাকথিত শ্রেণীচেতনার নাটক  
দেখে দেখে দর্শকের নাট্যচেতনা যখন  
প্রায় নাজহাল অপরাধ (নর্থ) তখন  
কিঞ্চিৎ আশাপ্রদ একটি প্রযোজনা  
করলেন মহাশেখতা দেবীর বেহুলা।  
মূল কাহিনীর আনকুল্যে যথার্থ  
পলিটিট মেলে দিতে পেরেছেন নাট্য-  
রূপকার (মলয় সেনগুপ্ত), টেউ-ডুনির  
ভরটা সামলে দিয়েছে নির্দেশনার  
সত্যক হান (অসীম চক্রবর্তী),  
প্রযোজনার নৌকাটি তাই এগিয়ে গেছে  
তরতর করে।

চরিত্র রচনায় শ্রীপদর ভূমিকায়  
অসীম চক্রবর্তীর অভিনয়ে তথ্যই  
রচিত পূর্ববর্তী একটি চরিত্রের ছায়া  
লক্ষ করা গেলেও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে  
সেটা খাপ খেয়ে গেছে। নিরক্ষর ওকা  
শ্রীপদর বোধ ও বোধের প্রতিজ্ঞাগুলো  
ধারালো অভিব্যক্তিতে ধরে নিয়েছেন  
তিনি, যার প্রভাবে আলোচ্য প্রযোজনার  
অভিনয়শিল্পী অনেকখানি মর্যাদাসম্পন্ন  
হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি আর কিছু  
না-হোক সংলাপে সপ্রতিভ থেকে  
তাপস ঠাকুর ও সুদীপ দে যথাক্রমে  
বসন্ত ও ভাস্কর চরিত্র দুটিকে বিশ্বাস-  
যোগ্য করে তোলেন। অথচ প্রথার  
পিছটানে বারবারেই অজ্ঞানত হন  
হেঁদেই ভূমিকায় আদিত্য দাস। অন্যান্য  
সকলের অভিনয়েই পরিণতির যথেষ্ট  
অপেক্ষা। কিন্তু কুশলী নির্দেশনার  
যোগ্যতার এই তারতম্য মূল প্রযো-  
জনাকে কোথায় লক্ষ্যচ্যুত করেনি। শূন্য



**বৈদ্যনাথ**  
**দন্তমঞ্জর (লাল)**

হাসিতে দেয় মুক্তোর আলক

দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য উপাদানে তৈরী **বৈদ্যনাথ**  
আয়ুর্বেদীয় দাঁতের মাজন।

দাঁতকে সুদৃঢ় ও উজ্জ্বল করে। মাড়ির স্বাস্থ্য বজায় রাখে ও মুখকে  
সুগন্ধি করে।

কনজিউমার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ায় সমীক্ষায় দেখা গেছে—  
কেবলমাত্র আয়ুর্বেদীয় গাছগাছড়াই দাঁতকে বিভিন্ন দস্তরোগ থেকে  
রক্ষা করে।

সমিবাচিত ডেমজ থেকে ঐতিহ্য ও আধুনিক পদ্ধতির সমন্বয়ে  
তৈরী **বৈদ্যনাথ** ওষধ সারা ভারতে জনপ্রিয়।



**শ্রী বৈদ্যনাথ**

**আয়ুর্বেদ ভবন লিমিটেড-এর**

একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

১, ৩-ত লেন, কলিকাতা-৬

কলিকাতা ● পাটনা ● খাঁসী ● নাগপুর ● এলাহাবাদ





শেষের দিকে ইটের পাজি খাল্লমখাল্ল  
দৃশ্য পরিবর্তনটি একটু বেশি  
“নাট্যক” বলে মনে হয়, যা প্রয়োজনার  
পক্ষে কিছুটা ভালদ্রষ্ট লাগে। পঞ্চা  
ধরের অলো সংযমী কিন্তু অভিজ্ঞতার  
অভাবে সর্বক্ষেত্রে বাজনাযম নয়।  
সংগীতে প্রতি চৌধুরী প্রয়োজনার  
সঙ্গে সংগতি রাখেন।

### শেষ দৃশ্যে পৌঁছে

মেদিনীপুরে নন্দীগ্রাম থেকে  
উদয়ন নাট্যসংস্থা সম্প্রতি শিল্প-  
মঞ্চে দুটি একাধিক মণ্ডল্য করে গেলেন।  
পদবী ব্যবহারে সম্ভবত লাজুক জগৎ  
শঙ্করের নির্দেশনায় এদিন তারা যে  
দুটি নাটক অভিনয় করলেন তার মধ্যে  
বয়েছে সজল ভট্টাচার্যের ‘অথ ধনপতি  
কথা’ এবং রতন ঘোষের ‘শেষ দৃশ্যে  
পৌঁছে।’ আলোচ্য নাট্যানুষ্ঠানের  
সাক্ষী হতে গিয়ে যারা বাস্তবিকই  
শেষ দৃশ্য পর্যন্ত প্রেক্ষাগৃহে বসে-  
ছিলেন তাদের সৌজন্যবোধের প্রতি  
‘উদয়ন’ নিঃসন্দেহে কৃতজ্ঞ হবেন।  
অমার্জিত পরিচালনাই মূলত উদয়নের  
প্রয়োজনকে লঘু করে দিয়েছে।

রানা দাস

### আলোচনা: শিল্প সংগতি বিবিধ

### নৃত্যের তালে তালে

ইন্ডিয়ান ড্যান্স অ্যান্ড মিউজিক  
সেন্টারের দশম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে  
সভানেত্রী ছিলেন মেনকা ঠাকুর, বালকক

মেনন প্রধান অতিথি। মৃত্যু নাচের  
শুভ। তাই মহাজাতি সদনের এবারের  
সাংস্কৃতিক উৎসবে প্রধানত পরিবেশিত  
হল নৃত্যানুষ্ঠান। ভারতনাট্যমে ধ্রুপদ  
বেরা এবং কথকে হেনা ভট্টাচার্য  
নিঃসন্দেহে শুল্লের শৌর্য। আধুনিক  
নৃত্যে চন্দনা পাল সাবলীল। শিল্পী  
শিল্পী সুদীপ্তি মিতের আবর্তিত  
স্পন্দিত সন্ধানাপূর্ণ। রবীন্দ্র  
সংগীতের সঙ্গে নৃত্যের যে অন্তর্নিহিত  
নির্বোধিত হল তাতে চারটি গানে  
শুল্লের ছোট-বড়ো-মাকারি বহু  
ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়োজিলেন। এই  
নাচগুলি যত সফল ও সচেতন নিবেদন,  
ততটা সপ্রাণ নয়। অভিনববেশ ছিল,  
সুস্থিতি ছিল না। সজল চৌধুরীর  
গান নিয়ে তৈরী “শপথ” নৃত্য-  
নাট্যটিতে গানের কথা সর্বত্র শোনা  
সহজ ছিল না। পেশাচ পরিবর্তনটিও  
ছিল দুটি। “আজল মেঘ দে” বা “আয়  
বাণী” যেখানে অংশগ্রহণকারী  
শিল্পীরা সকলেই লুপ্ত পুরা না, বেশির  
ভাগ কোনো কোনো গ্রামে পরতে  
পারে। এই নৃত্যনাট্যে “হেই সামালো”  
গানটি একমাত্র স্মরণীয়। বিরতির পর  
ছিল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক-  
নৃত্য। এই নৃত্যানুষ্ঠানটি সুপারি-  
বেশিত, একেবারে ছোটদের  
“লোকনৃত্যটিও ছিল মধুর হৃদয়ইতে  
ভরা।  
প্রণব মৃৎশিল্প

### বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াতে চান না?

নিজেকে দোমী  
ভাববার কোন  
কারণ নেই।



পূপ-সী বাচ্চাকে  
তার একান্ত প্রয়োজনীয়  
সহজ স্বচ্ছ  
আরাম এনে দেবে।

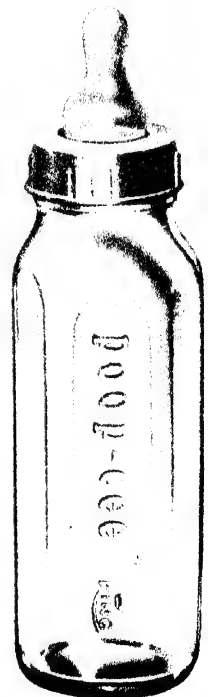
আপনি হয়তো বাচ্চার মা হাঁকে  
চাকরি-বাকরি করতে হয় অথবা আপনি  
হয়তো আপনার ফিগার ঠিক রাখা  
সম্পর্কে বিশেষ সচেতন। হয়তো  
এইসব কারণে বাচ্চাকে বুকের দুধ  
খাওয়ানোর ব্যাপারে আপনি মন  
থেকে ঠিকমত সাদা পান না।

এতে চিন্তার কোন কারণ নেই। এর একটি বড়ই  
সহজ সমস্যা উপায় আছে। তা হল পূপ-সী।  
এটি ঠিক আপনার মতই বাচ্চার পুরোপুরি যত  
করবে পূপ-সীতে লাগানো রয়েছে এমন নিম্পল  
মা মায়ের বুকের মত কোমল আর যেটি বাচ্চা  
গুব মতো চুষতে পারে। আর এই পূপ-সী  
ফাঁড়ি যেতলটি এমন বিশেষ ডিজাইনে গড়া  
যে বাচ্চা স্বচ্ছ সমানভাবে দুধ টানতে পারে  
এবং যার দপন বাচ্চাকে কোনও ব্যথাই করবে  
হয় না। এই যেতলে দুধ খেতে খেতে  
বাচ্চা কখনো হাঁপবে ওঠে না, যার ফলে তার  
মেজাজও বিগড়ায় না।

সুতরাং বাচ্চাকে পূপ-সী-ফিডারের সাহায্যে দুধ  
খাওয়ান। মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার মতই  
এটিতে দুধ খেয়ে বাচ্চা যে সুন্দরভাবে বেড়ে  
উঠবে, সে বিষয়ে আপনি সুনিশ্চিত থাকতে  
পারেন। আর এর চেয়ে জলজ্যান্ত সাক্ষা-প্রমাণ  
আপনার আর কিই বা থাকতে পারে।

**পূপ-সী®**

ভারতের সবচেয়ে বেশী  
বিক্রীর কীডার ও বিশ্ল



### সংগীত-এবং

শম্ভুনাথ ঘোষের

কলকাতা নৃত্যের একটু ভাবনা

- ১। মজলিসী তুংরী ৬
- ২। সহজ তানালপ  
১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে ১৫
- ৩। তবলার ইতিবৃত্ত ১৫
- ৪। সংগীতের ইতিবৃত্ত  
১ম ও ২য় প্রতিখণ্ড ১২
- ৫। প্রমোত্তরে নজরুলগীতি ১৫
- ৬। নজরুলগীতির নানাদিক ৭
- ৭। প্রমোত্তরে প্রভাকর ও বিশারদ ১২
- ৮। রবীন্দ্রসংগীত (প্রমোত্তরে)  
১ম খণ্ড ১০, ২য় খণ্ড ১২

পঞ্চকেন্দার, সম্ভবদরী, নন্দনকানন ও ছেমকুণ্ডের একটি  
মিষ্টিমধুর ভ্রমণকাহিনী : শম্ভুনাথ ঘোষের

হিমগিরির অঙ্গনে

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স !! ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট !! কলিকাতা-৭৩

## উৎকৃষ্টতর ক্যালামাইন আবিষ্কার করার সময় হয়েছে



## ততুত ল্যাক্সে ক্যালামাইন

- আরো ভাল শেড !
- আরো ভালো স্মরডি !
- আরো ভালো ঢাকবার ক্ষমতা !



একমাত্র ল্যাক্সে  
ক্যালামাইন-ই পাওয়া  
যায় তিন রকমের  
গায়ের রঙে !  
ল্যাক্সে ক্যালামাইন মাথা  
যায় কত মোলায়েমভাবে...  
কত সহজে !  
ল্যাক্সে ক্যালামাইনের  
স্মরডিও কত হালকা, কত  
মনোরম ! সেরা ত্রিনিময়  
তো আপনার প্রাপ্য !  
আপনার প্রাপ্য  
ল্যাক্সে ক্যালামাইন !

সারা দিনের জাগু ওষধিযুক্ত আবরণ ।

# Lakmé

daCunha/L.59 BN

## প্রচুদ শিল্পী পরিচিতি

রণবীর সিং কালেকা  
(১৯৫৩-)

ভরুণতম শিল্পীদের মধ্যে বর্ষা  
বিদগ্ধনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে  
পেরেছেন তাঁদের মধ্যে রণবীর  
প্রনাতম। বিকাশ ভট্টাচার্যের সাফল্য  
যে সদবাস্তব ছবির দিকে কিছু  
শিল্পীক আকর্ষণ করেছে সেদেহ  
নেই। কালেকা নিজে প্রথাগত বাস্তব  
ছবি ভাল আঁতে পারেন, সুতরাং  
ইদানীং এই গ্রহের বিকারগ্রস্ত  
চেহারা আঁতে গেলে তাঁকে সদ-  
বাস্তব ছবির দিকে যেতে হবেই।  
কালেকা অবশ্য বলেন না, কিন্তু  
তাঁর ধমনীতে পাতিয়ালার রাজবংশের  
নীল রক্ত। এই বংশের পুষ্ঠপোষকতা  
কিছুকাল হেমেন মজুমদার মহাশয়  
লাভ করে বিপুল ধনের অধিকারী  
হয়েছিলেন। শিল্প-বিপণির মালিকের  
বংশে তান গষের জন্ম, আর গণীর  
পুষ্ঠপোষকের বংশে চিত্রকরের জন্ম।  
অলঙ্কো সরস্বতী হয়তো ঈশ্বর হাসো  
এক একটি বংশের শিল্পকলানুরাগকে  
এইভাবে পুরস্কৃত করেন।

জন্ম পাতিয়ালায়। চণ্ডীগড় আর্ট  
কলেজের স্নাতক (১৯৭৫)। পেরে  
বছর থেকে ললিতকলার জাতীয়  
প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ। ললিতকলা  
আয়োজিত 'ছবির দেশ' (পিকটো-  
রিয়াল পেন্স) প্রদর্শনীতে অংশ  
গ্রহণ (১৯৭৭-৭৮)। প্রথম সর্ব-  
ভারতীয় সদবাস্তব চিত্রকলার প্রদর্শ-  
নীতে যোগদান (আইফেকস ১৯৭৬)।  
আইফেকসের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে  
আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী (৭৭-৭৮)।  
তা ছাড়া অমৃতসর ফাইন আর্টস  
আকাদেমীতে যোগদান করেন।  
পুরস্কার — ললিত কলা  
আকাদেমীর জাতীয় পুরস্কার  
(১৯৯১), সুবর্ণ ফলক, মহাকোশল  
কলা পরিষদ (৭৬)। পঞ্জাব ললিত-  
কলা আকাদেমী (১৯৭১, ৭৫, ৭৭)।

বিত্ত ভেদবের মধ্যে মানুষ  
হয়েছেন। তবুও কখনো তাঁর মূখে  
মহর্ভের জন্যও অহংকারের প্রকাশ  
দেখিনি। সবই শিল্পীচার সহব  
মেনে। একবার দিল্লিতে প্রকাশ কর্মকার  
এবং আমি পান্জাবী শিল্পী দেবের  
বাড়িতে ছিলাম। সেই সময় রণবীর  
সেই বাড়িতে আতিথ্য ছিলেন। তাঁর  
চালচলনে এমন একটা বিনীত থান-  
দানী ছাপ ছিল যে তাঁকে না ভালবেসে  
পায় যায় না। ঠর সলো ক্রাম্য প্রকলের  
আলকাজি শহের কাছে যাওয়ার  
ঘটনাটা মনে থাকবে। রণবীরের হাতে  
একটা ক্যানভাস। আমার হাতে একটা।  
অবসর গ্রহণ করে আলকাজি 'ব্র্যাক  
হোরিজেন্ট' গ্যালারী খুলেছেন।  
রণবীরের একটি ছবির বিষয় ছিল  
একটি কনট্রোল রুমের সুইচ বোর্ড,  
তার, পাইপের জগলে বন্দী বীশু,  
খুঁটি। আলকাজি শুমালেন, ভারত-  
বর্ষ টেকনোগিজ কোথায় মানুষকে  
এমনভাবে চেপে ধরেছে ? এই ছবিটার

ভারতীয় প্রাসঙ্গিকতা কি ? খাড়া  
স্টাশনকে লেকচার। রণবীরের হাস  
হাসি নিঃস্পাণ মুখে কিন্তু কোন  
ভাবান্তর দেখিনি। পরেও এ নিয়ে  
একবারও অভিযোগ শুনিনি। রণবীর  
যে পরিবেশে যেসব দামী দামী  
গ্যালেটের মধ্যে মানুষ, তাতে করে ঠর  
ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা অন্য রকম। দেবে  
বাড়িতে সেই শিল্পী-কিশোর পাশ-  
পাশ নেমারের খাটিরার শূন্য শিল্প-  
কলা সংবন্ধে প্রশ্ন করছেন। কখনো  
কখনো তর্ক। পান্জাবী ট্যান্সি ড্রাইভার-  
দের ধাবার বসে খাওয়া। পুরনো  
দিল্লিতে ঘরে কেড়ানো। অনেক দিন  
ঘরে শুঁকে দেখেছি। আমাদের হিন্দু-  
স্থানী স্কুটারচালক, এক পান্জাবী  
ড্রাইভারের টাকসীর সঙ্গে থাকা মারতে



মারতে ব্রেক কবে রণবীরের সামনেই  
বলল, পান্জাবীগুলো এসে দিল্লির  
বরোটা বাজাল। রণবীরের মুখে হাসি।

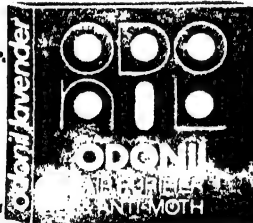
অথচ তাঁর ছবিতে কেমন এক  
বিকল্পগ্রস্ত, বিকৃত, ভাঙচোরা মানুষের  
মিছিল। যেকা অনেক সময় মন্তাজের  
মতো। পটভূমির ভিতরে উপস্থাপনের  
সময় শরীলীকে কিছুটা ইচ্ছা করে  
অযথাস্থানে রেখে তিনি অস্বস্তি রকম  
খেলা খেলেন। অপ্রত্যাশিত স্থানে  
অস্বস্ত-দৃশ্য দেখা। তার মধ্যেই পট-  
বিভাজনে কিছু, ওস্তাদি। শহরে  
য বকেরা নাস সাসের মতো অসংখ্য  
আয়না। নিজের মুখ দেখছে। বা নানা  
রকম উপাদিত বস্তুর মধ্যে যন্ত্রপাতির  
মতো ভাঙা তোবড়ানে মানুষের  
উপস্থিতি। মানুষ নিজেকে যন্ত্রের  
কারাগারে কব্দী করেছে। পান্জাব সংকট  
ঠিক নয়, ফুটে ওঠে। ছবিতে হলো  
মানুষের সামনে মানুষের অসহায়তা।  
ঠর ছবিতে 'ফাউন্টের' বা রক্তকরবীর  
সংকটের রূপটা বলা পড়েনি। বরং মেয়াদী  
শেলার 'গ্রন্থেকেন্সটাইনের' মানসিকতা  
প্রতিফলিত। মানুষ যন্ত্রপাতির বশ।  
চিত্রকল্পবৃত্ত দিয়ে এটা বিশ্বাসেছেন  
চমৎকার। রণবীরের ছবিতে বর্ণের স্থান  
গোঁপ। রং-এ কিছুটা কর্পণা করেন।  
মূল শরীলী অকৃতিটাই এখানে প্রধান।  
উপস্থাপনের অভিনবধে কিছুটা  
অত্যাশিত ঝোঁক। স্বল্পবয়সী তো !  
সামনে অনেক পথ।

“আমাদের অসংখ্যলো” (টেলিচার  
১৯৭৭) ছবিতে একটা প্রাস্টিকের স্মৃতি  
হ্যাণ্ডলের খঁচা স্বলছে মানুষটা। চর-  
পাশে তার, বালব, কামেরা, মাইক্রো-  
ফোন ইত্যাদি যন্ত্রপাতি তাকে ঘিরে  
রেখেছে। সে এখন বন্দী। ছবির  
অন্ধন সুন্দর এবং পট বিভাজন  
দারুণ।

মা, আমরা আমাদের  
আলমারিভেও ওডোনিল  
রাখি কেন?

অতর্কিত-

নকল হইতে  
সাবধান!



**বালসারা**  
উন্নততর জীবনযাত্রার  
আধুনিক সহায়ক  
**BALSARA**  
১০, ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০, ৭০, ৮০, ৯০, ১০০

ওডোনিল-এর  
গন্ধে পোকামাকড়, আরশোনা এবং  
দূরে পালিয়ে যায়, আর আমাদের  
জমাকসপড় নতুনতর  
মতো রাখে, রুমলে মিষ্টি আনা!

- ওডোনিল যে কোনও ক্যাপসুলিন গুলির চেয়ে  
৩০ গুণ বেশি শক্তিশালী ও কার্যকরী।
- ঘরের এবং বিশেষ করে বাথরুমের বাতাস  
সুস্বাদিত করে।

CHAITRA-BLS-186 BEN



প্যারাগন  
 EL PAR  
 এলপার কাপড়

everest/80/PTM

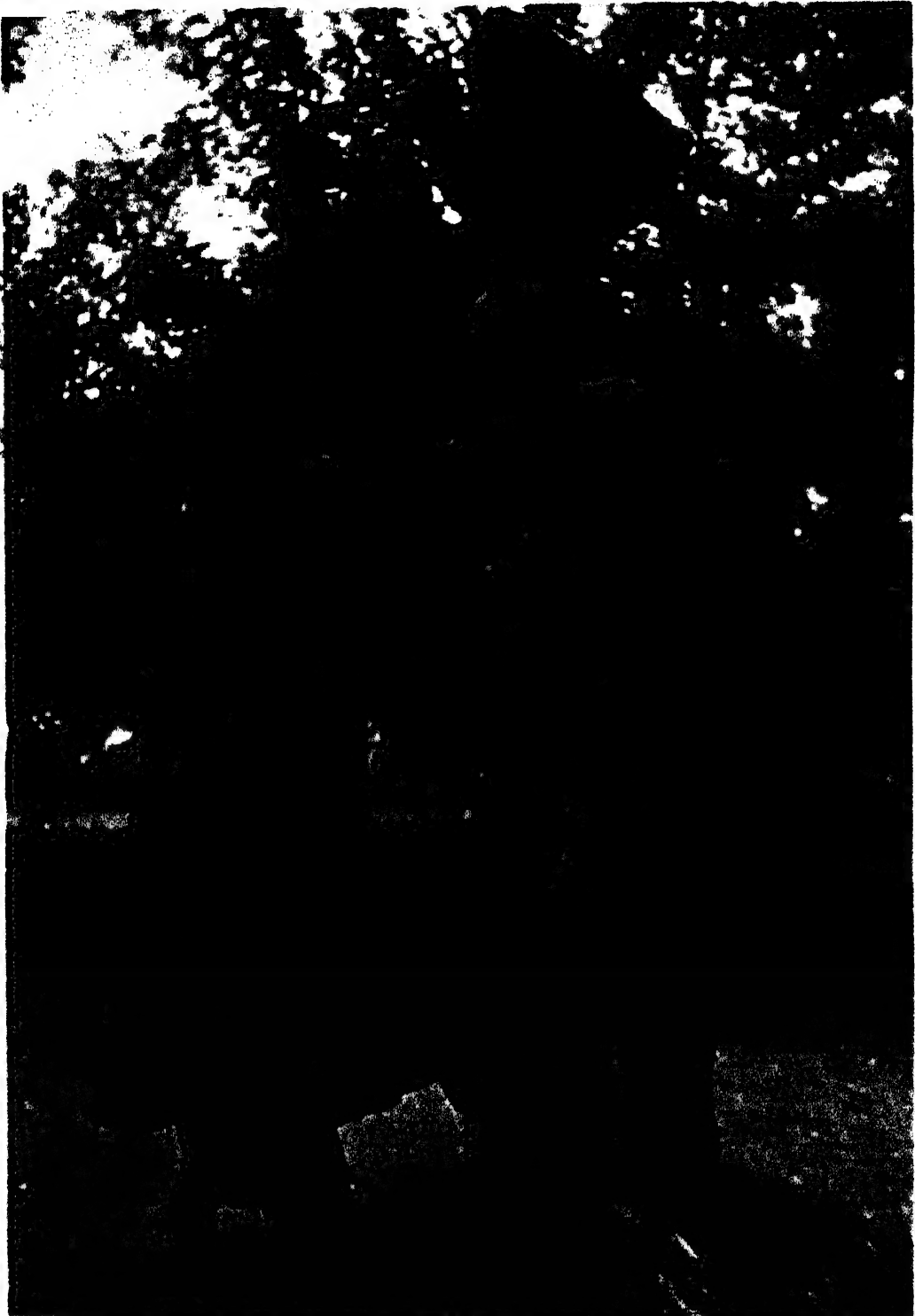
প্যারাগন টেক্সটাইল মিলস প্রাঃ লিমিটেড, বক্স ৪০০ ০১৩

এই ঠিকানায় পাবেন: ● মিলের রিটেল শপ:

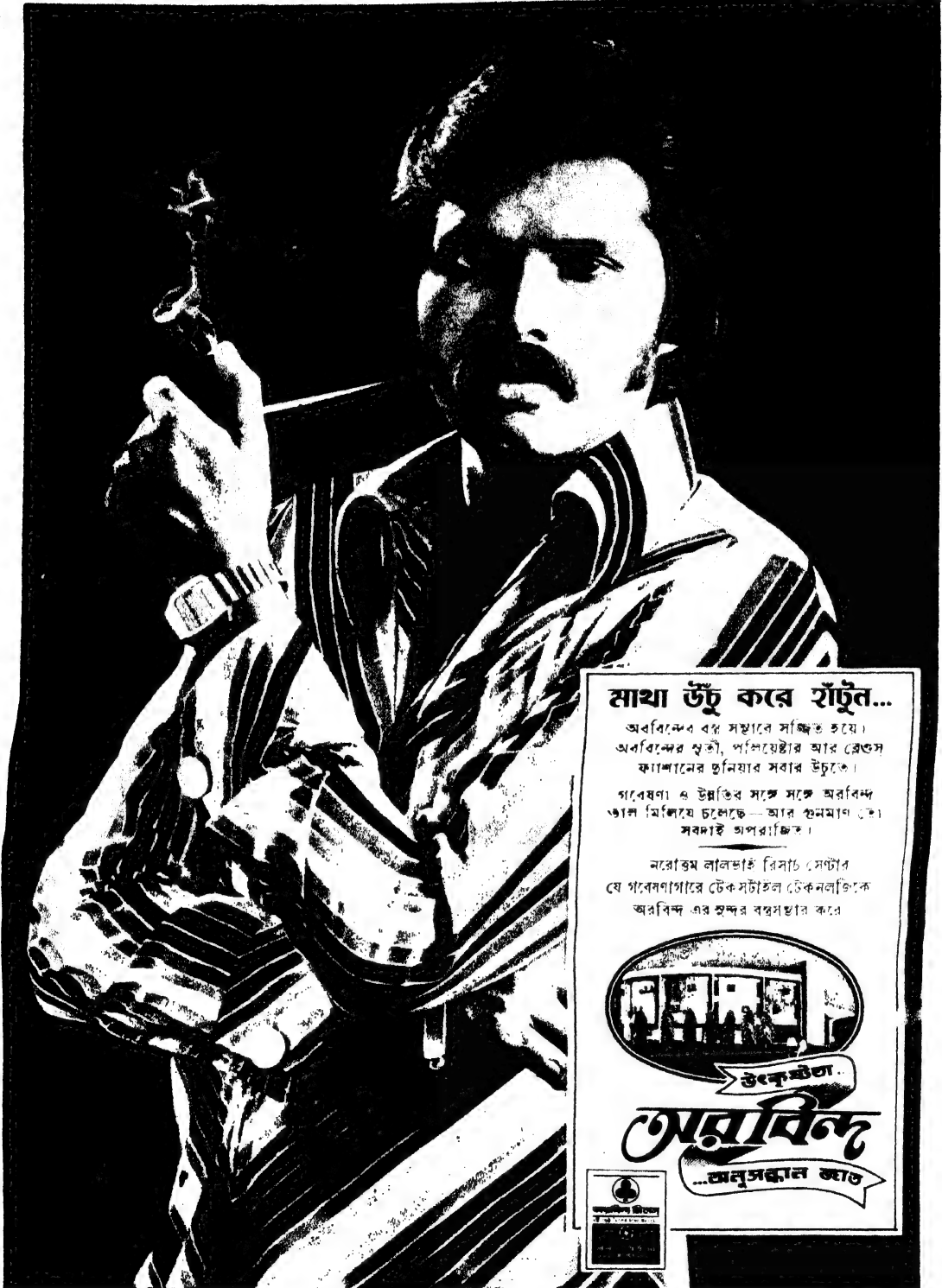
১৩৬ বঙ্গবন্ধু সড়ক, ঢাকা-১১০০ (১৩৬ বঙ্গবন্ধু সড়ক, ঢাকা-১১০০)

82-2664

6/1/81





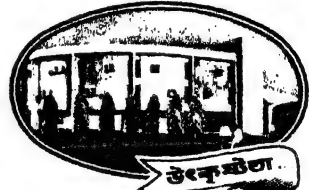


## মাথা উঠু করে শাঁটুত...

অবিনন্দন বহু সম্ভারে সম্বিষ্ট হয়ে।  
অবিনন্দন স্বামী, পলিয়েটার আর ব্রেণ্ডস  
ফ্যাশানের তুনিয়ার সবার উচ্চৈঃ।


গবেষণা ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অবিনন্দ  
ভাল মিলিয়ে চলেছে—আর গুনমাণে  
সবদাই অপরাধিত।

নরোত্তম লালভাই রিসার্চ সেন্টার  
যে গবেষণাগারে টেকস্টাইল টেকনলজিকে  
অবিনন্দ এর হৃদয় বহুসম্ভার করে



# অবিনন্দ

...অনুসন্ধান জাত



বিক্রেতা : কলিকাতা : গঙ্গাধর গুপ্তা, ৩২ নিউ মার্কেট • সুনিট, এফ-২২/৩৮ নিউ মার্কেট • রীচী : মধুবন, মেন বাজার, বেগুসরাই • পাটনা : চন্দ্রলাল  
দুর্গাপ্রসাদ, বাঁকীপুর • সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভস • অগ্রা : অরোয়া টেকস্টাইল রোডিং কর্পোরেশন, ৪২/১৬৪ বিলোচপুর, মোড়কুয় রোড • কানপুর : গনেশপ্রসাদ  
হীরালাল, ৪২/২৬ জেনারেল গঙ্গা • কলিকাতা : শিরধরীলাল রামনারায়ণ, পি/১০ নিউ হাওয়া রীজ, এ্যাপ্রোচ রোড । আসাম : অমলী টেকস্টাইলস, অশোক ভবন,  
এস আর সি বী রোড, শৌহাট • গুৱাহাটী : আদরুওয়াল টেকস্টাইল এজেন্ট, জোনালিয়াপাট, কটক ।

দাড়ি কামাতোর পরে  
ত্বককে নিখুঁত, তাজা ও নরম করতে...



আপনার ত্বক  
স্বাভাবিক, শুকনো বা  
তৈলাক্ত যে অবস্থাতেই  
থাকুক না কেন,  
ইরাসমিক এখন  
এনেছে এমন এক  
শেভিং ক্রীম যা ঠিক আপনার  
ত্বকেরই অনুকূল...এর বিশেষ ফর্মুলা  
আপনার ত্বককে নিখুঁত, তাজা ও  
নরম করে দেয়। আজই পরীক্ষা করুন—  
ইরাসমিক।

- এন্টিসেপটিক — স্বাভাবিক ত্বকের জন্যে
- ক্রীম রীচ — শুকনো ত্বকের জন্যে
- লাইম ফ্রেশ — তৈলাক্ত ত্বকের জন্যে

**ইরাসমিক হাজির করছে—  
এমন এক ক্রীম-যা সব প্রকার ত্বকের অনুকূল**

## বালির নীচে ঢেউ ১০১

রবীন্দ্র-পুরস্কার ও জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে সম্মানিত আশাপূর্ণা দেবীর সর্বাধুনিক উপন্যাস 'বালির নীচে ঢেউ'। মানুষের অন্তরের অন্দর-মহলে নিরন্তর যে মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের ঢেউ ওঠা-নামা করে, যা হয়তো সাধারণ চোখে পড়ে না; আশাপূর্ণা দেবীর এই উপন্যাস তারই এক নিখুঁত চিত্রায়ণ। বালির মত সহজ নিস্তরঙ্গ জীবনের মনোজগতে ক্ষণদীর্ঘ মত অবিশ্রান্ত বহমান চিরন্তন আবেগ-অনুভূতির এই সাবলীল কাহিনী পাঠক মাল্লকেই মুগ্ধ আবিষ্ট করে রাখবে গ্রন্থ পাঠের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

## বন্দী নিবাস ১০২

উত্তর বাংলার হিম-পাহাড় আর স্থাপদ জঙ্গলে একটি মানুষকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছিল কিছু স্বার্থ সন্ধানী যাদের বৃকে ঈশ্বর দয়া স্নেহ প্রীতি দেওয়ার জায়গা পাননি।

ষড়যন্ত্র করে যাকে কোর্ট মার্শালের মুখে তেলে দেওয়া হয়েছিল সেই ক্যাপ্টেন নীল মাসনকে প্রতিটি মুহূর্তের জীবন অর্জন করতে হয়েছিল দাঁতে দাঁত চেপে।

বন্দী নিবাস বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম মৌলিক থ্রিলার যা পাঠকদের নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ দেবে না।

উত্তরাধিকারের লেখক সমরেশ মজুমদার নিজেকে ভাঙতে জানেন, ভেঙ্গে গড়তে পারেন, বন্দী নিবাস সেই আশ্চর্য আবিষ্কার।

সদ্য প্রকাশিত

বিমল মিত্রের

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

আর এক যুধিষ্ঠির

হাওয়া গাড়ি

কথা কল্পনা কাহিনী

খোল টাকা

পঞ্চাশ টাকা

কুড়ি টাকা

পেপার ব্যাক ক্লাসিক্স এ ছটি বিখ্যাত উপন্যাসের সংযোজন।

ভারাসঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সুমথনাথ ঘোষের

পঞ্চগ্রাম ১০১ ★ বাঁকাস্রোত ১০২

নতুন গ্রন্থ

সুমথনাথ ঘোষের

মরণের পরে ৩

## এক নাটক অনেক দৃশ্য

বাংলা সাহিত্যে প্রথম সারির ঔপন্যাসিক হিসেবে সুমথনাথ ঘোষ ইতিমধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন কেবলমাত্র তাঁর সাহিত্য সাধনার গুণে। বর্তমানে সেই প্রমাণকে আরও বেশী পরিস্ফুট করে তুললেন তাঁর সদ্য প্রকাশিত "এক নাটক অনেক দৃশ্য" গ্রন্থে। লেখকের এই গ্রন্থে আসল আর নকল, মানুষ আর পুতুলকে অসাধারণ নৈব্যক্তিকতায় পাশাপাশি রেখে দেখানো হয়েছে নকলের চাপে আসল আচ্ছন্ন। গ্রন্থটি আগাগোড়া পড়তে পড়তে কেবলই মনে হবে যে এর বক্তব্য কত স্পষ্ট, ভাষা কত স্বচ্ছ। সাড়ে বারো টাকা

এ ভূতের গল্প নয়। তুমিত আত্মার অতৃপ্ত কাহিনী। বাস্তব ও প্রত্যাঙ্ক। একদিন যারা জন্মেছিল স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা নিয়ে কিন্তু মৃত্যুর অভিশাপ এনে দিল তাদের জীবনে বিচ্ছেদ। এ সেই বন্ধিত আত্মাদের গোপন কাহিনী। কেন তারা রাত্রের অন্ধকারে চুপি চুপি দেখা দেয়? কিসের লোভে? পড়ে শিউরে উঠবেন।

## রক্তগোলাপ ৩

এক বিচিত্ররাপিনী, সুন্দরী, তরুণী বাঙালী মেয়ের মনে এত রক্তের পিপাসা কোথা থেকে এলো? কে দিল? তার রোমহর্ষক কাহিনী।

লেখকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই  
সোহাগরাত ৪৮  
রোশনাই ৪৮  
নীলাঞ্জনা ৯৮  
সর্বসহা ৫৮  
শুদুরের পিয়াসী ৮৮

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

৩৪-৩৪৯২

৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি ৯

৩৪-৮৭৯১

## চিঠিপত্র

### স্বাধীনতা হীনতার

ও জ্বলাইয়ের 'দুখ-এ' শ্রীতরঙ্গ দত্তের 'স্বাধীনতাহীনতার' লেখাটি ভালো লাগিল। এই সম্পর্কে কয়েকটি কথা লিখছি।

শ্রীমন্ত ঠিকই বলেছেন যে, 'উই মেনস লিব-এর বাংলা অর্থ 'স্বাধীন নয়, যৌনতা থেকে মুক্তি।' অবশ্য এখানে মনে রাখা দরকার যে একজন সন্ন্যাসিনী যে অর্থে যৌনতা থেকে মুক্তি চান, কোন সাধারণ মহিলা ঠিক সেই অর্থে তা চান না—তিনি চান পুরুষের আগ্রাসন থেকে মুক্তি, স্ব-ইচ্ছার প্রতিষ্ঠা এবং বৈশিষ্ট্য ভাগ সময়েই নারী-পুরুষ দ্বিধা সমাজ কেবলমাত্র 'মানুষ' এই পরিচয়ের স্বীকৃতি অর্থাৎ এক কথার সহ-নিষ্ঠার নারীর শাশ্বত থেকে মুক্তি।

এই চাওয়া কিন্তু কখনোই খুব সোজার বা স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি অন্তত আমাদের দেশ। কারণ প্রায় সেই বৈধ উপনিষদের যুগের পর থেকেই সমাজ আমাদের শিখিয়েছে যে নারীর সমাজের তার অজ্ঞাত গুণে নয়, পুরুষ নির্মিত মাপকাঠি-নিষ্ঠার দৈহিক-ভিত্তিক রূপে। যে রূপ মেয়েদের আরো মেরেছিল করে—শ্রীমন্তের মতে 'কামিনী' করে। আর এই শিক্ষকে প্রায় অকস্মিক-এর পর্যায়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন সাহিত্যিকেরা।

আমাদের সাহিত্যে নায়িকার সব সময়েই সুন্দরী, প্রায়শ তাঁদের এক-মাত্র মূল্যই তাদের 'সৌন্দর্য' এবং সময়ের হিসেবে যত 'পিচ্ছ' যাবেন তত বেশি। এই 'সৌন্দর্য' বর্ণনা প্রাঙ্গণকভাবে না এসে বৈশিষ্ট্য ভাগ সময়েই অভ্যস্ত অপ্রাঙ্গণকভাবে নায়িকার প্রথম উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আমলে তো নায়িকাদের কেবল সুন্দরী নয়, পরমা সুন্দরী হতে হতো। তেলোবেলার প্রথম আমি বঙ্কিমচন্দ্রের সব নায়িকাদের নিয়ে কিছুটা কনটেন্ট আরোহন করার স্বপ্ন দেখতাম। মজার কথা হল, যেসব লেখার কদাচিত্ত অসুন্দর নায়িকা থাকত, সেখানে লেখার বিষয়ই হত অসুন্দর হওয়ার জন্য তাদের কত হেনস্তার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাই নিয়ে। আর আমাদের মেয়েরা এইসব লেখা পড়ে হলুদ-বাটা গায়ে মেখে, নারকালের ছিঁড়ে চুলে ঢুকিয়ে ও আরো অনেক কিছু করে লোভনীয় হওয়ার আগ্রহ চেষ্টা করত।

বিশেষভাবে নারীদের এই স্তুতি এবং মেয়েলিককে ভোলায় চেষ্টার প্রতি অনীহা কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্যেও বিরল নয়। রবীন্দ্রনাথ যে নায়িকাকে বরণীয় বলে মন করেছেন, সানাই-এর অন্তর্ভুক্ত 'অনন্দরা' কথিত্য তার পরিচয় সেই মেয়ে নছে বিশেষ শক্তিকরা...সে নর ইকনিমিত্ত-পরীক্ষা বাহিনী। পূর্বত অভিজ্ঞাটনি বা ক্রিকেট পারদর্শিনী মেয়েদের নিয়ে এখন যে ঠাট্টা, রবীন্দ্রনাথের সময়ে

ইকনিমিত্ত-পড়া মেয়েদের নিয়ে সেই ঠাট্টা করা হত। অপরাধিক বাহিনীর নিমন্ত্রণ-এ রবীন্দ্রনাথ তাঁর যুগের পরিচয় দিয়েছেন এই বলে গণ্যন হইতে দেখিলুম কোমল গ্রীবা লোকল হইতে রেশম চিকন চুলে। এই যুগ-তা ক্রমশঃ অপরোধে অপরাধী হতে হয় পাছে তাই চার অধ্যায়ের বিপ্লবী এলাও অপূর্ব সুন্দরী, বাঁশির নায়িকা বাঁশির বিলাতি-মুন্নিজানি টিতে পাস করা মেয়ে তাই রূপদী না হলেও তার চলে—এই সাফাই একেবারে গোড়াতাই গেয়ে রাখা হয়েছে। এর ফল সাধারণ ঘরের মেয়েরা যাত্রা অন্তর্গত পাস করতে পারে না তাদের সেই হলুদ-বাটা, নারকালের ছিঁড়ে প্রত্ন অননা আকর্ষণ।

মেয়েদের বোধকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা আমাদের দেশে প্রথম ভাবেন বিদ্যাসাগর। তাঁর শত বিপ্লবের মধ্যেও একের পর এক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তারই পরিচয়। বিদ্যাসাগরও কিন্তু মেয়েদের এই পরম নিষ্ঠারূপের কঠোর থেকে বাইরে আনতে সাহস পাননি, তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা ভাবেননি। তাই বিধবাদের বাবা-দাদার ঘর থেকে পটাবার চেষ্টা করেছেন বিবর্তীর স্বামীর ঘরে। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, বিদ্যাসাগরের মানসিকতার কাজ করেছে তাঁর অসাধারণ মনঃ ও হৃদয়শালিতা। তাই মেয়েরা চিরকাল তাঁকে আন্তরিক হৃদয় সংগে স্মরণ করবে।

আমার মনে হয় আমাদের দেশে মেয়েদের এই পরাধীন-যৌনতা থেকে মুক্ত করার দেখার কথা প্রথম বলেন ঠাকুর শ্রীধরকৃষ্ণ এবং তা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রয়েছে এই জন যে তিনি কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক কারণে একথা ভাবেননি, সমাজে মেয়েদের হাত সমান করার জন্যেই ভাবিয়েছিলেন। ঠিকই যে শ্রীধরকৃষ্ণ মেয়েদের মাফুরপে দেখতে বলেছিলেন কিন্তু তাঁর অর্থ এই নয় যে, স্বামীর স্ত্রীর মাফুরসংবাদন করে, পুত্রের মত আচরণ করে বিবর্তীকে প্রমত্ত দেখে। তিনি চেয়েছিলেন। কামিনীর পল্লিনহীন মানবশূণ্ডির প্রতিষ্ঠা। আর সাধারণ মানুষ বিশেষভাবে মাঝেই এভাবে দেখতে অভ্যস্ত। কাজেই প্রত্যেক নারীর মাফুরকে স্মরণ করানোর মানে তার যৌনতা বিজ্ঞত জীবনশূণ্ডির দিকে দৃষ্টি দেওয়া। এই প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে যে, শ্রীমা সারদাদেবীর সঙ্গে তাঁর দেহ-হীন আধ্যাত্মিক সংযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন 'আমি যদি ষোল আনা পারি, তোমরা অন্তত চার আনা করে দেখাও।' অর্থাৎ ঠাকুর তাঁর মাফুরের আগ্রহের মাধ্যমে কোন অস্বাভাবিকতা বা অরোপিত বিবর্তীর প্রমত্ত সাধারণ মানুষকে দিতে বলেননি।

ভাবতে অবাক লাগে যে, মেয়েদের প্রথম আত্মপ্রতিষ্ঠা, পুরুষ-শাসন মত্ত করার জন্য আগ্রহ চেষ্টা করেন আকস্মিক রক্ষাচরী সম্রাসী স্বামী

## প্রকাশিত হচ্ছে

### সমরেশ বসু-র

নতুন ধরনের রহস্য উপন্যাস

## দু মুখো সাপ

এসো ছোটবাবু, বাগানের সে মালটি খুঁজে পেলো? ...না সেটি বোধহয় এক শালা টিকটিকির হাতে পরেছে। তবে সাক্ষী...পুণিটাকে খতম করে দিয়েছি। ওটা নিয়ে আর ভাবছিনে কিন্তু আমি অস্বস্তিবোধ করছি। অশোক ঠাকুর নামে একটা বাস্তব যুগু পেছনে লেগেছে, শালা অন্ধকারের সাপের থেকেও নাকি ভীষণ।

.....এখন তুমি জল গেলাস নিয়ে এসো তো, আমার পাশে একটু বসো। আমার আর কিছু ভালো লাগছে না।

...আহা একেবারে জামাকাপড় খুলে দিচ্ছ যে গো—'

'ছোটবাবুকে এখন আমার ভয় করে, কোন্‌দিন আমাদেরও গলা টিপে শেষ করবে।'.....অচ্ছা মেয়ের স্বর।

অনেক চরিত্রের ভিড়ে, এই ছোট বাবুটিকে কে? কেমন করে লুকিয়ে রেখেছে নিজেকে?

অশোক ঠাকুর কী ভাবে এই ছোট বাবুটিকে ভিড়ের মাঝখানে থেকে ঠেকে তুললো? তারই কল্পনা কাহিনী 'দু মুখো সাপ'।

প্রকাশিত হলো নতুন গল্পের বই

ও আপনার কাছে গেচে

বারো বিলাসিনী

অন্ধকার গভীর গভীরতর

হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা

জগদল ২৫

অচিনপুর

নাটের গুরু ৬

অগ্নিবিন্দু

লগ্নপতি ৬

গল্পসংগ্রহ (১৯২২-৩৭)

প্রতি খণ্ড ২০০

বিশ্ববানী প্রকাশনী

৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড II কলকাতা ৯

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়  
পরবর্তী আকর্ষণ ১০০০

সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়  
দাগী ১০০ গুরু ৮০০

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়  
শংকর নর্মদা ১৬০০

হেলেন ট্রয়ের হেলেন ১০০০

আভতোম মুখোপাধ্যায় বনফুল  
ঝংকার ১০০০ নবীন দত্ত ৮০০

চন্দ্রশেখর মৌর্য

বেঞ্চ অ্যাণ্ড বার ১২০০

পূর্বাভাস ১২০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

সুর নৃত্যের উর্বশী ১০০০

বাসুদেব বসু

নদীর নাম মহানদী ১০০০

শক্তিপদ রাজগুরু

নিঃসঙ্গ যৌবন ৭০০

১৯০৬-০৭-০৮

সাপ্তসঙ্গ ২০০০

প্রেয়সী ও শ্রেয়সী ১০০০

নারায়ণ চক্রবর্তীর রহস্য উপন্যাস

সোনার হরিণ ১০০০

রবীন্দ্্র লুই ফিটজেনসন

সুইসাইড ক্লাব ৮০০

মিশাচর

শ্রীপারাবত

প্রেমপ্রতিহিংসা সেফল্যাণ্ডি

৬০০

১০০০

তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

শতাব্দীর মৃত্যু (তিন প্রঃ)

প্রথম ২০০০ দ্বিতীয় ২০০০ তৃতীয় ২০০০

শাবলি বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাস ১০০০

ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাস ১০০০

রিংয়ের রাজা আলী ১০০০

মণ্ডল বুক হাউস

১৯৬৮ সালের বই-মেলার হই এই করে বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেডের প্রকাশিত জগদীশ

ইয়াসনারী কাণ্ডমাবাতা  
ইজুনতকী ১০০০

নায়ায়গ সান্যাল  
চীন ভারত লঙ্কা ২০০০

১২০০

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

১২০০

বিবেকানন্দ। মেয়েরা নিজেদের সমস্যা সমাধান করবে, এই ছিল তাঁর বক্তব্য। তিনি লিখেছেন— "I am asked again and again, what I think of the widow problem and what I think of the woman question... am I a widow that you ask me that nonsense? Am I a woman that you ask me that question again and again?" (Swami Vivekananda, Complete Works, Volume III P 248)

কেবলমাত্র মেয়েলিষকে উপজীব্য করে বেঁচে থাকার বিরোধিতা করে- ছিলেন বলেই বিধবা বিবাহও তাঁর পছন্দ করেন নি। এই প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি— "Our reformers do not see where the wound is, they want to save the nation by marrying the widows; do you think that a nation is saved by the number of husbands its widows get?" (Complete Works, Volume VIII P 307)

বিবেকানন্দ সম্পূর্ণভাবে নারী পরিচালিত স্ট্রীমট স্থাপন করেন মেয়েদের স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য। এইসব মতের মেয়েদের নানা হাতের কাজ শিখিয়ে উপজীব্যতার উপায় করে দেওয়া, এবং ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়ার কথা তিনি বার বার বলেছিলেন। আধার্মিকতার খোলাসে মোড়া থাকলেও এই মত কিন্তু শ্রীদত্ত বর্ণিত সেই পুরষের তীর চার দেওয়াল বা চাপ-টির থেকে মেয়েদের বাইরে খোলা হাওয়ায় অসারই উপায়মাত্র। স্বাভাবী রায় কলকাতা-২০।

### জগদীশ গুপ্ত

দেশ' পত্রিকার সাহিত্য কলমে সূত্রবাদের আলোচনা: "জগদীশ গুপ্ত অনুপস্থিত" আমাদের মনেও কোন্ডের সম্ভার করে। সত্যি বলতে কী, অধিকাংশ বঙালী পঠকের কাছে জগদীশবাবু আজো অপরচিত। আমি নিজেও জগদীশবাবুর লেখার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি অনেক পরে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি আলোচনায় পড়েছিলাম, 'মানিকের সাহিত্যচিন্তার উপর যদি কারো প্রভাব পড়ে থাকে তিনি জগদীশ গুপ্ত'। কে এই জগদীশ গুপ্ত যিনি মানিকের সাহিত্যচিন্তাকে প্রভাবিত করতে পেরেছেন? তারপর হলো হয়ে বইপাড়ার সোকনো সোকানে জগদীশ গুপ্তের বইয়ের খোঁজ করছি। পাইনি। অধিকাংশ বই বিক্রেতারা জগদীশবাবুর নামও শোনেন নি। হঠাৎ একদিন কলকাতার ফুটপাথে পুরনো বইয়ের স্তপের মধ্যে একটা বই পেয়ে গেলাম—মেঘাবৃত অশ্বিন। লেখক—জগদীশ গুপ্ত। সেই প্রথম জগদীশ গুপ্তের লেখার সাথে আমার পরিচয়। তারপর ১৯৭৮ সালের বই-মেলার হই এই করে বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেডের প্রকাশিত জগদীশ

জগদীশবাবুর আরো একটি গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। তবুও কয়েক দশক আগে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত যে লিখেছিলেন, জগদীশবাবু সাহিত্যক্ষেত্রে বিচলনশীল অনেকের কাছে অনুপস্থিত—সেটা আজো সমান সত্য। আর সেটাই আমাদের ক্ষোভের কারণ। মানুষের মনের অতল অশ্বকরে জীবন দিয়ে আমাদের সর্পিণ্ড জঘন্যগলোকে জগদীশবাবু যে নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গীতে মনস্তত্ত্বের আলোকে সাহিত্যের আভিনায় হাজির করেছেন—তা শব্দ, দুর্লভ নয়, স্বতন্ত্র। কখনো কখনো তা এত নিষ্ঠুর অথচ বাস্তব যে আমাদের অস্বস্তির কারণ হতে পারে। কারণ তাতে আমাদের সভ্যতার আর, খসে পড়ে। আমরা প্রকৃতই যেমন ঠিক তেমনভাবে অন্যের কাছে ধরা পড়ে যাই। এ প্রসঙ্গে একটা গল্পের কথা মনে পড়ছে। গল্পটির নাম লোক-নাথের তামসিকতা। লোকনাথ পেশায় উকিল; ভাল পসার; কিন্তু স্ত্রী অসুস্থরী। ফলে বড় হয়েছে; তার বিয়ে দিতে হবে। চারদিকে পটী দেখে বেড়াচ্ছেন লোকনাথ। পটী কিন্তু সহজে পছন্দ হয় না। কোনোটা কালো; কোনোটা বেটে আবার কোনোটা মূখর। দিনরাতপরের মেয়েটা তাঁর ভাষণ পছন্দ হয়ে গেল, 'সুন্দরী তুমি সঠিক লড়াইয়ে বর্ণগৌরবে আর পরিমাণ সুখময় আর শ্রীলাবণ্যের এমন একটি মঙ্গল পারিপাট্য আর সুনির্মল সমগ্রতা লাভ করিচ্ছে যে, লোকনাথের মনে হইল, পুরষের এ প্রণয়ন তপস্যার সামগ্রী।' লোকনাথ এখানেই ছেলের বিয়ে দেবেন। এমন কী কোন্ডীগত কোনো বিষয় থাকলেও তিনি পিছপা হবেন না। পার্যাপক্ষকে লোকনাথ কথা দিলেন।

কিন্তু ভাবান্তর হলো বাড়ি ফেরার পথে। "লোকনাথের হঠাৎ জন্মিল জ্বালাময় টুফা—জীবন অতি-বাহিত হইয়া গেল; দুর্ভাগ্য এমনি প্রবল যে, রূপ তহার সপ্নে অভিজ্ঞ একাকার হইয়া তহার চক্ষুগোচর হইল না। কিন্তু পুত্র অসীম ভাগ্যবানের মত ঐ রূপ তার পুত্রের তারায় আর প্রাণের হিঞ্জো বহন করিয়া অহিনী' সম্মুখে বিচরণ করিবে, আর তাহাই তিনি চিরবৃত্তকার শব্দ অন্তর লইয়া তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিবেন কেবল। ইহা হইতে পারে না..."

বাড়ি পেরাচ্ছে স্ত্রী ভবানীর শব্দের উত্তরে জানলেন, মেয়ে পছন্দ হয়নি। বললেন, "বিক্রমপুত্রের সেই মেয়েটিকেই ঠিক করে ফেল—।" ভবানী চমকিয়া উঠিলেন; ভীত-ভাবে বললেন, সে যে কালো! লোকনাথ হাসিয়া মুখ তুলিলেন; বললেন, সে ত তুমিও।

এই পরিবেশনা বড়ই রূঢ়, নির্মম। কারণ মেঝে সভ্যতার খোলাস হইতে ফেলে দিয়ে আমাদের কুটিল ভাবনা-গলোকে নাগটো করে সবার সামনে তুলে ধরলে আমরা বড় নির্মম হয়ে যাই; হীন হয়ে পড়ি। মনস্তত্ত্বের



পশ্চিম নিজেদের প্রতিষ্ঠিত অবিকৃত-  
নয় দেখতে পেয়ে নিঃস্বরাই লক্ষ্য  
রে হয়ে। তাই বোধ হয় কালচারাল  
নয় ইনটেলেকচুয়াল বহু পরিচিত  
জাতি পার্শ্ববর্তী কালে মনস্তাত্ত্বিক  
পেশীশ গুণে অসুস্থ অনুশ্লিষ্ট এবং  
চরিত্রিক হয়ে গেলেন।

পল্লীসংস্কৃতি

কলকাতা-৬৪

### কলকাতাপত

দেশ পরিচর ১২ জুলাই, ১৯৮০  
তারিখের সংখ্যায় 'কলকাতাপত'  
এই নামের গ্রীষ্মকাল ঘোষের নিবন্ধটির  
কতিংক রকম সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট  
হয়েছে।

পত ৬ জুলাই, '৮০ কলকাতার  
বিভিন্ন সংবাদপত্রে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী  
ডঃ অশোক মিশ্রের যে বক্তব্য প্রকাশিত  
হয়েছে, তা গ্রীষ্মকাল ঘোষের নজর  
আকৃষ্ট হয়েছে বলে মনে হয়। কেন্দ্রীয়  
কৃষিমন্ত্রী বাও বীরেন্দ্র সিং-এর  
বক্তব্যের প্রতিবাদে ডঃ মিশ্র যে চিঠি  
বিস্তারিতভাবে তাও সংবাদপত্রে  
প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছিল। ডঃ  
মিশ্র মৌসুম জারিনের দিয়ারছিলেন  
যে ১৯৭৯-৮০ সালে কেন্দ্রের  
কর থেকে বছরে পাওয়া  
২,৬৪,০৬৪ মেরিক টন গমের ৯১-২  
কোটিশ সম্ভাব্যহারের জেলাওয়ারী  
হিসাব কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়েছে।  
যদি কোন রাজ্য সরকার চণ-অনুদান  
সম্পর্কে কেন্দ্রের কাছে যথাসময়ে এতো  
বৈধিমাণি হিসাবকপ দিচ্ছেন কিনা  
অন্যদের জানা নেই।

তা ছাড়া, ১৯৭৮-৭৯ সালে  
ন্যায়ালয়ে কেন্দ্র ৮৮.৯০ কোটি টাকা  
প্রায় সহস্রককে দিয়ারছিলেন। সমস্ত  
স্বল্প পরীক্ষা করে ভারতের  
কলকাতার ও অভ্যন্তর জেনারেল  
জারিনের রাজ্য সরকার ও-বছর  
কলকাতার খরচ করছেন ১০০.৫০  
কোটি টাকা, অর্থাৎ কেন্দ্রের দৈন  
ন্যায়ালয়ে প্রায় বাসে কোটি  
টাকা বেশি।

মাসের চক্রবর্তী

কলকাতা-৬৪

### নগরায় লোকসমিতি

৬ জুলাই তারিখের দেশ পরিচর  
গ্রীষ্মকাল ঘোষ 'কলকাতাপত'তে  
বিস্তারিত 'অনেক লোকের খরগ  
শায়ীস্বকার আসামে পূর্ববঙ্গের  
জেল থেকে লোক এনে আসামে  
নিষ্পত্তিছেন। এ সম্বন্ধে দু-একটি  
কথা লিখতে চাই।

১৯ শতাব্দীর শেষে আসামের  
নগর জেলায় বিধে করে বন্দোবস্ত  
এলাকার কলারের মহামারীর আকার  
ধারণ করে। এ রোগে বহু লোক  
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন এ  
রোগের কোনো কারণ আবিষ্কৃত হয়  
নি এবং এ রোগের কোনো চিকিৎসা  
ছিল না। তাই ইংরেজ সরকার রোগ-  
প্রসূত ব্যক্তিদের আলাদা জারগার ক্যান্স

করে রাখে এবং রোগীদের ঘরবাড়ি  
জ্বালিয়ে দেয়। এর ফলে নগরী  
জেলার বহু এলাকা পরিত্যক্ত হয়।  
ওই এলাকা বহু বছর জনবহুল ছিল।  
বহু বছর এভাবে থাকতে জমির  
উর্বরতাও বৃদ্ধি পায়। ঐ সময়  
পূর্ববঙ্গের কিছু কিছু লোক যাদের  
হয়ত পুলিশ নরহতা, ডাকাতি  
প্রভৃতি অপরাধের জন্য খেঁজ করত  
তারা পুলিশের হাত এড়াবার জন্য ওই  
সব এলাকায় পালিয়ে এসে বসবাস  
শুরু করে। জমির উর্বরতার খবর  
পেয়ে ভ্রমণ আরও লোক বিশেষ করে  
ময়মনসিংহ জেলা থেকে বহু লোক  
চায়াবাদ করতে নগরী জেলায় আসতে  
থাকে। ওই জেলার অধিকাংশ লোক  
ছিল মুসলমান যাঁরা চায়াবাদে ছিল  
বিশেষ পারদর্শী। এদের নগরী জেলার  
যাতায়াতের সুবিধার জন্য যাতে বিভিন্ন  
জমানে গাড়ি বদল না করতে হয়,  
তদানীন্তন A B Ry ময়মনসিংহ  
থেকে নগরী (ময়রাকান্দি) জংশন  
পর্যন্ত 'থ্রু' (through) গাড়ির  
প্রচলন করে। এই মুসলমান কৃষক  
সম্প্রদায় আশ্চর্যজনক পরিশ্রমী ছিল।  
তারা এসব এলাকায় ধানের ফলন এত  
কড়ায়, যার জন্য নগরী জেলাকে  
Granary of Assam এই আখ্যা  
দেওয়া হয়। আসাম গবর্নমেন্ট তখন  
এদের এক বছরের মেয়াদে জমির পাট  
বিতনে এবং আলাদা নির্দিষ্ট জায়গায়  
বসবাসের অনুমতি দিতেন। একে  
সরকারীভাবে বলা হতো Line  
system. স্বখন আসামে শায়ীস্বকার  
সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সময়  
পরলোকগত আবদুল মতিন শায়ীর  
নেতৃত্বে মুসলীম লিগ এই Line  
system ও এক বছরের মেয়াদী  
পাটের তীর বিরোধিতা করে, কারণ  
এতে বিশেষ করে মুসলীম সম্প্রদায়ের  
স্বার্থ জড়িত ছিল। এই আন্দোলনের  
পরিপ্রেক্ষিতে শায়ীস্বকার গবর্নমেন্ট  
Line system উঠিয়ে দেন এবং  
এদের স্থায়ী পাট দেওয়ার জন্য আইন  
করেন। এর ফলে এরা স্থানীয়  
অধিবাসী বলে পরিগণিত হন।  
সুখেন্দ্রভূষণ দাশগুপ্ত  
কলকাতা-৬৪

### গিরিতীর্থ হিংলাজ

১২ জুলাই '৮০ সংখ্যা 'দেশ'  
বর্তীপদ চট্টোপাধ্যায়কে 'পলিটানার  
সিমাচার ও গিরিতীর্থ হিংলাজ'  
প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ। লোকের  
ভ্রমণ-অন্যায়গ দিন দিন বাড়ছে সন্দেহ  
নেই। সেই জন্য ভ্রমণ ক্ষিতির  
বর্তমানে খুবই দরকার, সেই সঙ্গে  
দরকার তথ্য সরবরাহে যথেষ্ট সক্ষম  
হওয়া। আমরা একাধিকবার গুরুত্বপূর্ণ  
ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় পলিটানাকে  
দেখছি বিশ্বস্তের চোখে। কতকগুলো  
তথ্য দিচ্ছি, পাঠকরা সংযোজন হিসাবে  
তা গ্রহণ করলে আশা করি উপকৃত  
হবেন।

প্রথমে জানাই গুরুত্বপূর্ণ একমাত্র  
হিংলাজ মার মন্দির পলিটানারই  
আছে এমন নয়, আমোদবাস থেকে ৭১  
কিলোমিটার দূরে নলসরোবরের একটি

প্রকাশিত হ'ল

অজয় বসুর

## ফুটবলে দিকপাল ময়দানের নায়ক

এক কালের খেলোয়াড়, একালের সাপ্তাহিক ভাষা-  
কারের লেখনীতে কলকাতার ফুটবল মাঠের নায়কদের  
চিত্র চিত্রণ। হিরোরা হাজির সেন আশ্চর্যের  
বাগানে। কাকে ফেলে কাকে রাখবেন? সেকালের  
চুণী গোয়ামী, প্রদীপ নানাজি, সনৎ শেঠ প্রমুখকে না  
একালের সুরজিত, হাবিব, প্রসূন প্রভৃতির? ময়দানের  
নায়কদের সঙ্গে সঙ্গে পুরো ফুটবল জগতটাই এসে যাবে  
পাঠকদের মূর্তির মতো। 'আকস্মিক' তথ্যে লেখা  
বইটি পড়তে শুরু করলে শেষ না করে ওঠা যাবে না।  
সেই সঙ্গে আছে আট পেপার ছাপা নকশাও সব  
ছবি।

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হলো • ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল-এর

## পুলিশ কাহিনী

ইউ.আর.অনন্তমূর্তি সংস্কার ১৫-০০  
অনুবাদ : রবিশঙ্কর সেনগুপ্ত

এবার পড়ুন অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিরঞ্জীব সেনের  
আর এক রহস্য

## পিরামিড রহস্য

দাম : দশ টাকা  
পিরামিড নিয়ে এমনক রহস্য, যেমন পিরামিড কে বা  
কারা তৈরি করল? কি করে তৈরি করল? ফারাওরা  
তৈরি করে নি এমন কি গ্রহাচরণের জীবিত নয়।  
পিরামিডে রক্ষিত মানব নাক অতিশয় আড়াল আছে  
নাকি? আগে যারা চলেছে তারা অতীতে মারা গেছে।  
নিঃ

চিরঞ্জীব সেনের আরও কয়েকটি আশ্চর্য্য নই  
বারমুডা ট্রাঙ্গল ১০, আবার বারমুডা ট্রাঙ্গল ২০,  
প্লানেট মিস্ট্রি ১০,

মণ্ডল বুক হাউস II ৭৮/১ মহাশয় গান্ধী রোড II কলিকাতা-৯



ছ'টি সূরহৎ

সম্পূর্ণ উপহাস

সত্যজিৎ রায়

(ফেলুদার রহস্য-রোমাঞ্চ অ্যাডভেঞ্চার)

কালকূট

রমাপদ চৌধুরী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়



নিশ্চেষ্ট আকর্ষণ

রবীন্দ্রনাথের

অপ্রকাশিত নাটক

এবার শারদীয়া দেশ পত্রিকার অন্যতম প্রধান উপহার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি সূরহৎ পূর্ণাঙ্গ অপ্রকাশিত নাটক। কবির স্বহস্ত লিখিত ভূমিকা সংবলিত এই রহৎ নাটকখানি সংকলন করেছেন অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। কবির জীবৎকালে ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগে অভিনীত এই নাটকটি রচনার দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পরে পাণ্ডুলিপির অনেকগুলি পৃষ্ঠার প্রতিলিপিসহ প্রকাশিত হবে।

এছাড়া ছোট গল্প, কবিতা, রম্যরচনা, প্রবন্ধ ও রঙীন আর্টপ্লেট

দাম ১২.০০ টাকা

রেজিস্ট্রী ডাকে ১৪.৯০ টাকা



আপনার কপির জন্যে

এখনই এজেন্টকে বলে রাখুন বা আমাদের লিখুন।

সাকুলেশন কন্ট্রোলার,

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

দেবীপেও দেবী হিংলাজের মন্দির দেখে এসেছি।

ভারতে যে সব জায়গায় জৈন মন্দির আছে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের মতে পলিটানই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। আমার ভারত দর্শনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি ভারতে পাঁচটি জৈন তীর্থ সমান প্রসিদ্ধ। তিনটি আছে গুজরাট যথা গিরনার, পলিটানা (শত্ৰুজ পাহাড়) ও তারাগা পাহাড়, অপর দুটি রাজস্থানের আবু পাহাড় ও বিহারের নামেত শিখর।

শত্ৰুজ পাহাড়ের উচ্চতা উনি যা দিয়েছেন (২৮৭৭ ফুট) তা ঠিক নয়। প্রকৃত উচ্চতা ১৯৭৭ ফুট। পাহাড় পর্বতের প্রায় ১০০০ ফুট উচ্চতার পার্থক্য সাধারণ যাত্রীদের বেশ ভীতির কারণ হয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তির আমার সঙ্গে এক মত হবেন ভরসা রাখি। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের মন্দির সংখ্যার পরি-সংখ্যানেও কিছু প্রমাদ থেকে গেছে। মন্দিরের সংখ্যা ৮৬০, এক হাজারের ওপর নয়। এ তথ্য সংগ্রহ করতে আমরা সাহায্য করেছিলেন মাদারেলের মিঃ ধীরুভাই।

তীর্থস্থান হিসাবেই যখন পলিটানকে শ্রীচট্টোপাধ্যায় হাজির করেছেন, তখন দেবদর্শনের কিছু তথ্য লেখা উচিত ছিল। (১) সকল ১০টায় আশা অর্থাৎ শ্রীআদিনাথকে অলংকার সাজান হয়। (২) ১টা ৪৫ মিঃ-এ স্নান করানো হয়। দর্শনাধীরা এক ঘণ্টা ধরে তা দেখার সুযোগ পায়। (৩) ১০টা ৪৫ মিঃ-এ পূজা শুরু হয়। (৪) বেলা ৩টার ফের রত্নরাজ্য ভূষিত করা হয়।

মন্দিরের অলংকার ও রত্নাদি দেখার সুযোগও আলোচ্য প্রবন্ধে বলা নেই। এ ক্ষেত্রে জানাই, অলংকারাদি দেখা যাবে বিশেষ অনুমতি নিয়ে। অনুমতি দেবেন হিল ইনসপেক্টর অথবা আনন্দজী কল্যাণজী ট্রাস্টের ম্যানেজার।

মন্দিরের উৎসব উল্লেখযোগ্য। কার্তিক পূর্ণিমা, ১৩ই ফাল্গুন, ওরা বৈশাখ এবং চৈত্র পূর্ণিমায় বড় উৎসব হয়। মন্দির খোলা থাকে সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

যে মুসলমান পীরের কথা উল্লিখিত হয়েছে সেই অগ্নারনোরের ধানে কথ্য নারীরা সাতান কামনার ছোট ছোট দোলনা দিয়ে যায়। এমন একটি ঘটনার উল্লেখ শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে থাকলে পাঠকরা খুশী হত কারণ, এমনটি সারা ভারত তীর্থে একেবারেই অসম্ভব।

যারা পুরাতত্ত্বে আগ্রহী শ্রীচট্টোপাধ্যায় তাঁদের একটি মূল্যবান তথ্য থেকে বঞ্চিত করেছেন। সেটি হল, 'রত্নস্থানের দিলওয়ারা ও জামনগর জেলার খাম্বালিয়ার কারিগর বংশই পলিটানা মন্দিরের প্রমুখ।

পরিশেষে জানাই, শত্ৰুজ পাহাড় থেকে নির্গত শত্ৰুজ নদী প্রোজেক্ট গুজরাটের ঐ অঞ্চলকে বর্ষাচরে। ঐ প্রোজেক্ট ১৯৬১ সালে শেষ হওয়ার ফলেই আজ পলিটানার সমৃদ্ধি ও জয়জয়কার।

## ধূমকেতু

২৮ জুন তারিখের 'দেশ'-এ প্রকাশিত 'সেই রাজকীর ধূমকেতু আবার আসছে' প্রবন্ধটিতে অনেক তথ্য আছে।

কিন্তু প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে হ্যালির ধূমকেতু সম্পর্কে একটি উক্তি আছে যা ইতিহাস-সম্মত নয়। লেখক লিখেছেন, "বর্তমানে শতাব্দীর গোড়ার ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডমান্ড হ্যালি সব প্রথম এর সঞ্চার পথটি আবিষ্কার করেন।" আসলে কিন্তু হ্যালির জন্ম ১৬৫৬ সালে; তিনি ছিলেন নিউটনের স্নেহহুনা সহযোগী ও বন্ধু। তার আগে ধূমকেতুদের গতিবিধি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। ১৬৮২ সালে যখন আকাশে অতি বৃহৎ উজ্জ্বল এক ধূমকেতু আত্মপ্রকাশ করল, তখন হ্যালি (তিনি স্বনামধন্য বন্ধু নিউটনের সাহায্যে) পর্ববৈকল্য ও গণনার মাধ্যমে ধূমকেতুটির কক্ষ, পরিভ্রমণকাল ইত্যাদি নির্ণয় করেন। আর তার ফলেই অতীতে প্রাপ্ত প্রায় ৭৬ বছরের ব্যবধানে ঐ ধূমকেতুটিই যে বরাবর দেবা দিয়ে ছিল এবং ইতিহাসে বা সমকালীন সাহিত্যে সর্বশেষ উল্লেখ পেয়েছিল তা প্রতিপন্ন হয়। ধূমকেতুদের আচার-আচরণ সম্পর্কে গাণিতিক পর্বালোচনার সেই সূত্রপাত।

হ্যালির ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, ১৭৫৮ সালে ধূমকেতুটির পুনরাবির্ভাব ঘটবে। হ্যালি নিজে তার হিসাবে নির্ভুল প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাননি, তার ষোল বছর আগেই (অর্থাৎ ১৭৪২ সালে) তার মৃত্যু হয়, কিন্তু ধূমকেতুটি বাস্তবিকই নির্ধারিত সময় আবির্ভূত হয়ে হ্যালিকে অমরত্ব দান করে।

ঐ ধূমকেতুটিকে শেষ দেখে গেছে ১৯১০ সালে। আবার দেখা যাবার কথা ১৯৮৬ সালে। এ তথ্য-গুলোর উল্লেখ অবশ্য সমরাজবাবু করেছেন। রমাতোষ সরকার মহাকীর অধ্যক্ষ, বিড়লা প্লানেটোরিয়াম

## প্রজ্জদিশক্তি পরিচয়

গত ওরা শ্রাবণ ১৩৮৭ সখেয়া দেশ'-এর প্রজ্জদিশক্তি পরিচিতিতে কয়েকটি ভুল তথ্য আছে। সেগুলো সংশোধনের প্রয়োজন।

প্রথমত, আপনারা লিখেছেন—'একবছর রবীন্দ্রভারতী সংসদের সভ্য ছিলেন।' 'রবীন্দ্রভারতী' নয়, বিশ্বভারতী হবে।

দ্বিতীয়ত, নন্দলাল বসু কাছে শেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমি যখন কলা-জীবনে লিপ্সি তখন তিনি অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন এবং অসুস্থ। ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত।

## ভ্রমসংশোধন

২৬ জুলাই '৮০ সংখ্যা দেশ' প্রকাশিত 'পুরনো দিনের গদ্য' কবিতার রচয়িতার নাম জরিতা মিত্র হবে। এই ভ্রম প্রস্তুত জনা আমরা

প্রকাশিত হলো। জ্যোতিষাচার্য ★ ভণ্ডজাতকের

## কার ভাগ্যে কি আছে ১২:০০

আপনার কিংবা আপনার পরিবারের সকলের ভাগ্য দেখা কিংবা জানা যাবে এই গ্রন্থে।

লেখকের অত্যন্ত বই :-

হাত দেখতে শিখুন ৭, ভাগ্যালিপি ৯

আপনার মনের মত বইটি আগে সংগ্রহ করুন।

জ্ঞানপীঠ পুরস্কার ভূষিতা

বিমল করের

আশাপূর্ণা দেবীর

এক অভিনব গ্রন্থ

অবিনশ্বর ১০

তিন চরিত্র ৭

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

নতুন এক অনবদ্য সৃষ্টি

পদাবলী কীর্তন ১২

নারায়ণ সান্যালের

'আনন্দ'-স্বরূপিনী ৭:৫০

বাংলায় প্রথম খাজুরাহো ভ্রমণ কাহিনী

শঙ্কু মহারাজের

রূপতীর্থ খাজুরাহো ১২

কাজী নজরুল ইসলামের ওপর ২৩ জন লেখকের

বিশিষ্ট রচনা ও আলোচনার

নজরুল সঙ্গ ও প্রসঙ্গ ১০:০০

মণি দত্তের রঙিন পাতার লিখন ৩:৫০

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের এবার ফেরাও ৫:০০

প্রমথনাথ বিনী ও ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কাব্যবিতান ১২:৩০

কাব্য সঙ্কলন প্রবীণ থেকে নবীন পর্যন্ত সমগ্র কবির লেখা

মোট ১৬০ জন

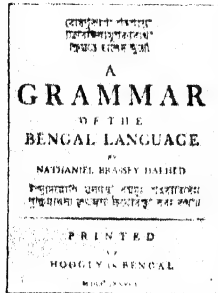


অমর সাহিত্য প্রকাশন

৭ টেমার লেন, কলিকাতা-৯ (কলেজ স্ট্রীট জংশন)

একটি সঙ্গীতের প্রকাশনা  
**A Grammar  
of the  
Bengal Language**  
By  
Nattaniel Brassey Halhed  
দাম ১০০.০০ টাকা

অবিকল (ফ্যাকসিমিলি)  
পুনর্মুদ্রণ  
এই সেই বই,  
যে-বই দিয়ে শব্দ হুয়েছিল  
আমাদের ছাপাখানা,  
পাণ্ডুলিপি রচনার যুগ  
থেকে যে-মুদ্রিত পুস্তকের  
হাত ধরে আমরা  
পা বাড়িয়েছিলাম আধুনিক  
যুগে। হ্যালহেড-এর  
বাংলা ব্যাকরণ শব্দ যে  
এ-মূল্যকে প্রথম মুদ্রিত  
বই বলেই স্মরণীয় তা নয়,  
আরও-এক বড়ো গৌরব  
এ-বইয়ের প্রকাশনার সঙ্গে  
জড়িত। সহজে অদলবদল  
করা যায় খাতা-দিয়ে-ঠেতরী  
এমন বাংলা হরফ  
এই বইয়েই প্রথম ব্যবহার  
হয়েছিল। ১৭৭৮ সালে  
ছাপা বাংলা প্রকাশনার এই  
আদি পুস্তকের  
অবিকল (ফ্যাকসিমিলি)  
পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হল  
দুশো দুসহর বাদে।



আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে  
এ এক অভিনন্দ্য ঘটনা।  
কোন পরিপ্রেক্ষিতে ছাপা  
হয়েছিল এই বই,  
কে এই হ্যালহেড সাহেব,  
কে তৈরী করেছিলেন বাংলা  
হরফের এমন রমণীয় ছাঁচ,  
ওয়ারেন হেস্টিংস-এর ভূমিকা  
কী ছিল, কোন পরিবর্তন  
সূচিত হল এই আদি  
প্রকাশনার ফলে—  
এমন বহু কৌতুহলকে মনে  
রেখে এ-বইয়ের আনন্দ  
সংস্করণে একটি অসামান্য  
ভূমিকা লিখেছেন  
নিখিল সরকার ওরফে  
শ্রীপাথক যা এই অমূল্য  
গ্রন্থের মূল্য আরও বহুগুণ  
বৃদ্ধি করেছে।



**শীর্ষেন্দু  
মুখোপাধ্যায়ের**

অবিস্মরণীয় উপন্যাস

**শ্যাওলা** দাম ৮.০০

তখন দিনগুলো ভরা থাকত  
বারুদের গন্ধে। পথে পথে  
ছাড়িয়ে থাকত রক্তের ছোপ।  
তখন ছিল তাড়া খেয়ে ফেরা,  
তাড়া করে যাওয়া। ছিল  
রোজ মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি  
খেলা। ভুল হোক,  
সাজা হোক, একটা বিপ্লব  
হয়েছিল। সেই বিপ্লবের এক  
নায়ক হিরন্ময়। পেট-কোচড়ে  
রিভলভার, টানটেন স্মায়,  
সজাগ পেশী। আর ছিল  
গুপালি—হিরন্ময়ের দিকে যে  
বাড়িয়ে দিয়েছিল ভালবাসার  
মোহময় হাত। হিরন্ময়ের এক  
চোখে ভালবাসা, অন্য চোখে  
ঘৃণা। তারপর এল 'গঠন-  
মূলক' দিন।  
সেই নতুন সমাজে ফিরে এল  
বার্ণা বিপ্লবী হিরন্ময়। নিঃস্ব,  
নিঃসহায়, নিঃসম্পর্ক। অচল  
টেলিফোনের মতো যোগা-  
যোগহীন। নতুন সমাজে  
সকলেই কিছু বলতে চায়  
তাকে। কিন্তু রিং বেজে  
গায় বার্ণা পৌঁছয় না।  
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর  
এই নতুন উপন্যাসে এক  
দিকে আশ্চর্য মমতায় ফুটিয়ে  
তুলেছেন অভিমাত্রী আত্ম-  
ঘাতী যুবসমাজের নিষ্ঠুর  
মোলালিপির মতো অমোঘ  
নিয়তি, অন্য দিকে দুলভ  
ক্ষমতায় চিত্রিত করেছেন  
দুঃসময়ের এক জীবন্ত  
চলচিত্র।

প্রকাশিত হয়েছে  
**ননীগোপাল  
চক্রবর্তীর  
কিশোর-উপন্যাস  
পীর ফকিরের**

**সৈয়দ মুজতবা**

**আলীর**

অবৈধ প্রেমের অসামান্য  
উপন্যাস

প্রেম দাম ৫.০০

এক পুণ্যবতী বিবাহিতা  
মেয়ে। স্বামীর কাছে সে  
কিছুই পায়নি—  
না সম্মান, না ভালোবাসা।  
এমন সময় তার জীবনে এল  
প্রেম, উদ্ভাস, অবৈধ,  
কুলস্খারী। সেই প্রেম  
ভাসিয়ে দিল মেয়েটির  
যাবতীয় নীতিবোধ, সংস্কা-  
ভয়। অবদমিতকাম বৃদ্ধ-  
নারীর বধিন-ভাঙা প্রেমের



এই অসামান্য কাহিনী  
লিখেছেন রাশিয়ান লেখক  
নিকোলাই সেমেনোভিচ  
লেস্কেফ। স্বকথকে বাংলায়  
অনুবাদ করেছেন  
সৈয়দ মুজতবা আলী।

**প্রবোধকুমার**

**সান্যাল-এর**

অনন্য উপন্যাস

**পিয়ামুখচন্দ্র**

দাম ৮.০০  
অসাধারণ এই প্রেমের  
উপন্যাসের নায়ক আধুনিক  
কাবি, নায়িকা এক  
বিজ্ঞানসাধিকা। নায়কটি  
ছন্দছাড়া, নায়িকা ধনী, তবু  
জন্মপরিচয়হীন। নায়িকা  
চেয়েছিল প্রেমিক কবির  
কাবিতায় যেন থাকে  
বৈশ্বানরের সর্বশাসা আশ্রয়।



জিসমন্তার রক্তপিপাসা,  
পরশুরামের ঘৃণা, দুর্বাশার  
আজন্ম আক্রোশ। আর  
নায়িকার নিরাবরণ তনুতর  
আশ্চর্য যৌবনী নায়ককে

**চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হল**

**সত্যজিৎ রায়ের**

ফেলুদার  
রহস্য-অ্যাডভেনচারের  
যুগল কাহিনী

**ফেলুদা এও কোং**

দাম ১০.০০



'বোস্কাইয়ের বোস্কাই' আর  
'গোসাইপূর সরগরম'—এই  
দুটি দুর্দান্ত রহস্যকাহিনীর  
এক-সংকলন 'ফেলুদা এও  
কোং'। স্বনামধন্য রহস্য-  
রোমাঞ্চ উপন্যাসিক জটায়ুর  
বর্ষা নম্বর উপন্যাসের  
হিন্দী চিত্রপের শব্দটিং  
হাফিল বোস্কাইতে। সেই শব্দটিং  
দেখতে গিয়েছিল তিন-  
মুঠি—ফেলুদা, তোপসে  
আর জটায়ু। আর তাইতেই  
পাকাল জট। সে-জট শেষ  
পর্যন্ত গড়াল খুন অবাধ।  
বোস্কাই চলাচল জগতের  
একবারে ভিতরমহলের  
চোখ-ধাধানো পরিবেশ  
এ-বইয়ের যেমন অন্যতম  
আকর্ষণ, তেমনই গায়ে-কাটা-  
তোলা উত্তেজনাময় খুনো-  
খুনির পালায় ফেলুদা কী  
করে জিতে গেলেন তার  
বর্ণনাও কৌতুহলকর।



'গোসাইপূর সরগরম'-এর  
রহস্য অবশ্য খুন নয়, খুনের  
আশংকা নিয়ে গড়ে উঠেছে।  
এর পরিবেশ একবারে  
উল্টো-ধরনের। কাটোয়ার  
কাছে এক অজ পাড়াগাঁ  
গোসাইপূর। সেখানেও এক  
দুর্ঘটনা রহস্যের সঙ্গে জড়িয়ে  
পড়েছে সেই অবিচ্ছেদ্য  
ঠোঁ-ফেলুদা, তোপসে এবং  
জটায়ু। এবং এই অ্যাড-  
ভেনচারেও বলা বাহুল্য  
ফেলুদাই বিজয়ী।



আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

**প্রকাশিত হয়েছে**

**সমরেশ বসুর**

তাজা স্বাদের গভীর উপন্যাস

**বিপর্যস্ত** দাম ১৫.০০

সমরেশ বসুর সেই বিরল  
সাহিত্যিকদের অন্যতম,  
সমাজ এবং সময়ে যিনি  
জীবন্তভাবে ধরতে পারেন।  
আমাদের বিপর্যস্ত মূল্যবোধ,  
ন্যায়নীতিবিবেক,  
পাপপুণ্যের ধারণা,  
রাজনৈতিক পরিবেশ, নতুন  
প্রজন্মের সঙ্গো-পুসো  
প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গি ও  
আচার-আচরণের ব্যবধান  
তিনি যেমন নিপুণ চিত্রার  
মতো অক্লেশে ফুটিয়ে তোলেন,  
তেমনই সব-কিছু, ছাপিয়ে  
একটি চিরকালীন সত্যকেও  
তুলে ধরেন চোখের সামনে।



'বিপর্যস্ত' উপন্যাসও তার  
ব্যতিক্রম নয়। এই কাহিনীর  
নায়ক এমন এক যুব, যাকে  
নিয়ে পারিপার্শ্বিক কেবলই  
বক্তার খেলা খেলেছে।  
অথচ খুব বড়ো আশা তার  
ছিল না। সে চেয়েছিল এক  
সাধারণ জীবন, যে-জীবনে  
থাকবে দিনযাপনের  
উপযোগী একটা কাজ,  
কাজের পর খাবো বাড়ি-  
ফেরা, বাড়িতে ফিরে থাকবে  
দুখী, শান্ত একটা সংসার।  
অথচ এই সামান্য চাওয়াটুকু  
তার মিটল না। ছোটবেলা  
থেকে একের-পর-এক  
বিপর্যয় তাকে রক্ত, নিঃশ্ব,  
অসুখী করে তুলল। তবু  
কি সত্যি সে বিপর্যস্ত?  
যে-বিশ্বাস, যে-বোধ, যে-  
অনুভূতি জীবনকে গড়তর  
তাৎপর্য করে আশ্বিত—  
কী করে সহ্যরানো এক  
মানুষ পেল তার  
নিভুল সম্মান, তাই নিয়েই  
এই গভীর, তাজা স্বাদের  
উপন্যাস রচনা করেছেন  
সমরেশ বসু।

## দোঁপ

চিঠিপত্র । ৩

লকাতা ও জনসংখ্যা । সম্পাদকীয় । ১

চিঠিপত্র । ১০

কলকাতা । প্রভাস সেন । ১১

মের ও একটু বোকামি । সুধেন্দ্র মল্লিক । ১৪

লালবন্দু । সুনীল বসু । ১৪

মনবের অপেক্ষা এখন । নীরদ রায় । ১৪

মঞ্চ । মানল রায়চৌধুরী । ১৪

মাকিকের কুমড়ল । পূর্ণেশ্বর পট্টা । ১৫

মাকুর বাঙালীর চরিত্র । চিত্রিত পালিত । ২১

চরিত্রের গান । সমীর মল্লিকপাধ্যায় । ২৫

মল্লিকপিত । অতুল ঘোষ । ৩১

মল্লিক কবিতা । ৩৫

সুই সময় । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । ৪১

মৃত সত্যই সত্য । প্রতিভা কল । ৪৫

কল । সমীর কল । ৪৯

মানবমিত । শ্রীযুক্ত ম. মল্লিকপাধ্যায় । ৫১

মারতবধীক বর্ণনামূলক সমালোচনা । ৫৩

মারত । মিত্র সিংহ । ৫৩

মার্মাপক হিন্দু-সেনার খবর

মতামিত । ম. মল্লিক । ৫৭

মরমসেব । ৬০

মল্লিকচনা । মল্লিকসংস্কৃতি । ৬১

মল্লিক । মল্লিকসংস্কৃতি । ৬১

## পরবর্তী আকর্ষণ

হাইকেননাথ মল্লিকের প্রবন্ধ

মুমি মের পাও নাই পল্লিক

শিবগী চৌধুরীর প্রথম কাহিনী

আজকের মল্লিকপট্টম

ভুলসী সেনাপতির গল্প

শরদাধার

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ

আমন্ত্রণকার পত্রিকা : লিমিটেড-এর পক্ষে

বাংলাদেশ রায় কর্তৃক ৬ প্রকল্প সরকারী স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং

আমন্ত্রণ কর্তৃক প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮

সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৪৪ এবং

জীবনসত্য প্রিন্টিং হাউস ১০ প্রকল্প সরকার

স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।

দাম এক টাকা

বিমান মাসুল : ১০ পয়সা

পূর্বাঞ্চলের অন্তর্গত স্থানে ২০ পয়সা

## কলকাতা ও জনসংখ্যা

ডেনিয়েল পি মরিনহান, একদা যিনি আমেরিকার রাষ্ট্রদূত হিসেবে ভারতে ছিলেন, তাঁর একটি গ্রন্থে কলকাতাকে কবরখানা বলে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, কলকাতা হল মৃত ও মৃত্যুর নগরী; বিশাল, পচনশীল, বিষাক্ত। পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ কলকাতার পথের পাশে শূন্যে জীবন কাটায়।

মরিনহান-সাহেবের এই রুঢ় মন্তব্য আমাদের কানে নিশ্চয় মধু-বর্ষণ করবে না, বিশেষ করে যখন কথাটা বলেছেন সেই আমেরিকান সাহেব থাকে নিয়ে কিছু বিতর্ক তো হয়েছে সৈদিনও। কিন্তু কথাটা কি পুরোপুরি মিথ্যে? এই নগরীর সেহে কি পচনশীলতা প্রত্যক্ষ নয়?

কলকাতার লোকসংখ্যা কত? কলকাতা কর্পোরেশনের '৭৭-৭৮ সালের হিসেব খাতায় লেখা আছে, প্রায় সাড়ে একটিশ লক্ষ। হিসেবটা অবশ্য '৭৯ সালের। ওই হিসেবমত বৃহত্তর কলকাতার লোকসংখ্যা সওয়া সত্তর লক্ষের কিছু বেশি। অনেকের মতে আশি লক্ষ। গত ন বছরে এই সংখ্যা আরও কয়েক লক্ষ নিশ্চয় বেড়েছে। মোটামুটি তিন লক্ষ ধরা বেতে পারে, কেননা তিন দশকের হিসেব ধরলে দেখা যায়, দশ বছর অন্তত তিন লক্ষের মতন জনসংখ্যা এখানে বাড়ছে। আশি লক্ষ মানুষের এই শহর, বলা হাক বৃহত্তর শহর কলকাতা, যা পৃথিবীর কয়েকটি বৃহৎ শহরের অন্যতম।

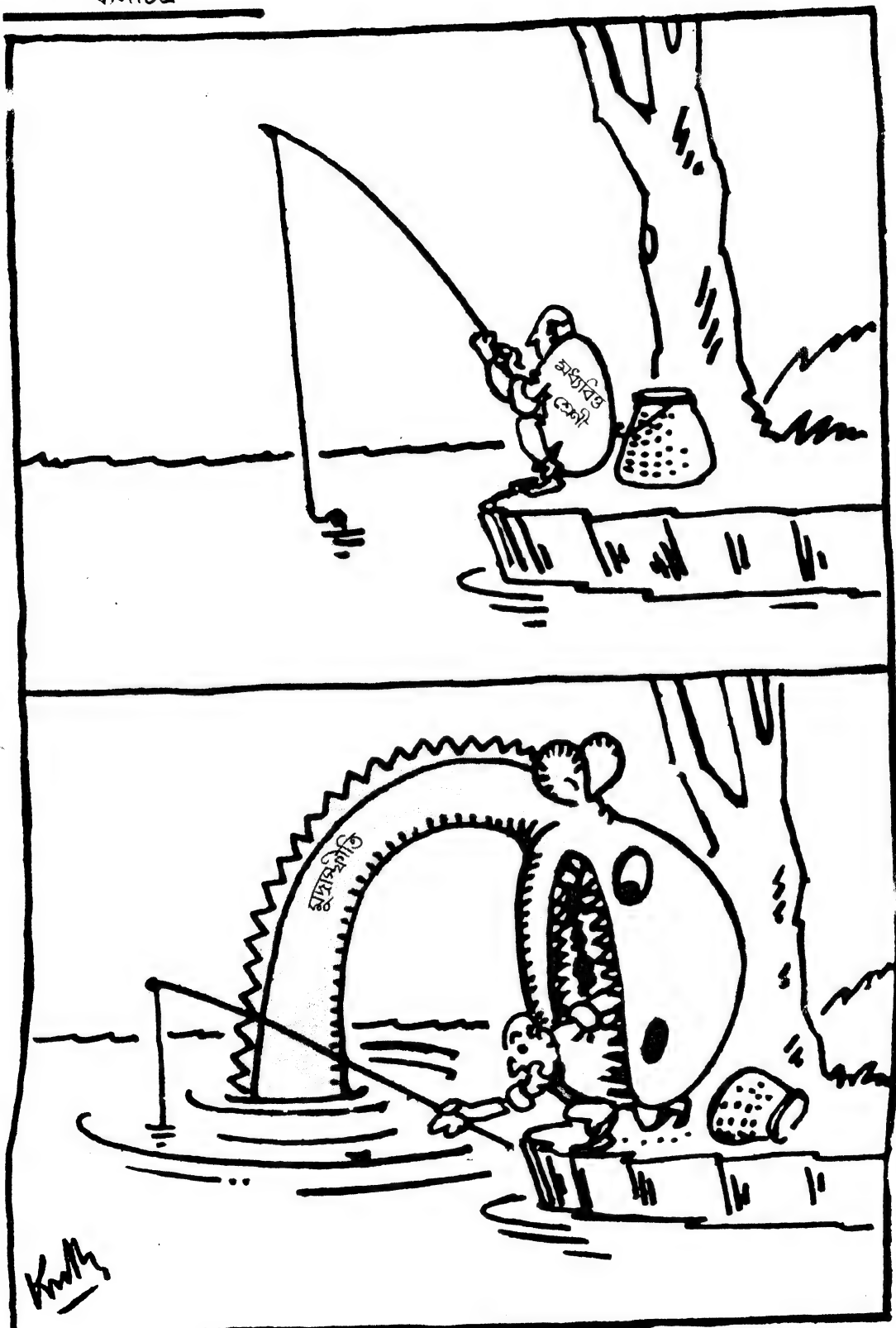
প্রশ্ন হল, জনসংখ্যার এই অস্বাভাবিক চাপের জন্মেই কি কলকাতা শহরের এই মৃত্যুর অবস্থা? জনসংখ্যার চাপ অনেক শহরেই আছে, যেমন বৃহত্তর টোকিওতে এক কোটিরও অনেক বেশি মানুষের বসবাস; যেমন নিউইয়র্কে, মস্কোতে ও অন্যান্য কিছু শহরে। কিন্তু এমন কথা শোনা যায় না যে, এই বৃহৎ শহরগুলি মৃত অথবা মৃত্যুর। কলকাতার বেলায় শোনা যায় কেন? এ-দেশ গরীব বলে? কলকাতা শহরের পঞ্চাশ লক্ষ গৃহহীন, রাষ্ট্রের শূন্যে ঘুমোয়—একথা শুনলে আমাদের অভিমান লাগতে পারে নিশ্চয় তবে কথাটা উড়িয়ে দেওয়া বোধ হয় যায় না। বড় জোর বলা যায়, ওটা অতিশয়োক্তি। সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে নিতে হবে, এই শহরে ফুটপাথে-ঘুমোনা মানুষের অভাব নেই, অভাব নেই সেই মানুষের যারা রাষ্ট্রের গণ্যজনের কৃপায় স্নান বাসনমাজা, শৌচকর্ম ইত্যাদি নিত্যক্রিয়া সম্পন্ন করে দিনের পর দিন।

নগর পরিকল্পনায় কলকাতার আদি চুটি কোথায় কী ছিল সে-প্রসঙ্গ আজ আর নতুন করে তুলে লাভ নেই। যা বাস্তব তার সমস্যা কেমন করে ছোঁচানো যায় সেটাই বিবেচ্য। এই সমস্যাকে কি আমাদের নগর-পরিকল্পনাকারীরা সমাধান করার চেষ্টা করছেন? করছেন না—একথা বলা যাবে না, কেননা কলকাতার উন্নয়ন নিয়ে অনেক মাথাঅলা মাথা ঘামছেন। তবে কলকাতার অবনতি এত প্রত্যক্ষ কেন? কেন কলকাতার রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দু-পাশ জুড়ে আবজ্ঞার স্তূপ, কেন গাড়িঘোড়া চলতে পথ পায় না, কেন প্রত্যেকটি পার্ক আজ বৃক্ষহীন, খালিময়, কেন হাওড়া-শিয়ালদহ সড়ক থেকে রাত পর্যন্ত জনারণ্য হয়ে থাকে, আর কেনই বা এই শহরের আবহাওয়া নিত্য দুর্ভিত?

কলকাতাকে বর্ণিত্যে রাখার একটি মাত্র পথ খোলা ছিল বলে শোনা যায়। বলা হত, কলকাতার কাছাকাছি উপনগরী গড়ে তুলে জনসংখ্যার এই চাপ কমানো সম্ভব। কল্যাণী উপনগরী এই মনোভাব নিয়ে গড়ে তোলা। কিন্তু কল্যাণী কি সফল হতে পেরেছে? তাহাড়া একটি মাত্র উপনগরীর সাধাই বা কতটুকু? উপনগরী গড়ে তোলা মানে ঘরবাড়ি তৈরী করা নয়। জন-জীবনের একটি স্বাভাবিক প্রবাহ আছে—সেটিকে বজায় রাখাই প্রয়োজন। তার জন্যে চাই অফিস কাছারি, বাসস্থান, স্কুল কলেজ, হাসপাতাল, এবং সর্বোপরি রুজি রোজগারের ব্যবস্থা। কলকাতাকে সমস্ত কিছুর কেন্দ্র করে রেখে বাইরে উপনগরী গড়ে তুললে লাভের লাভ কিছুই হবে না। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। এ-রকম শোনা যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতা শহরে একাধিক অফিস রাখার জন্যে প্রতি মাসে কয়েক লক্ষ টাকা বাড়ি ভাড়া গোনে। কেন গোনে? এই দস্তরগুলি অনাথ সরিয়ে ফেলতে অনাগ্রহ কেন? কর্মচারীরা কলকাতা ছেড়ে যেতে চান না বলেই কি? কলকাতায় কি তবে এত মধু রয়েছে? মরিনহান-সাহেব জানতে পারেনি অনেক রহস্য। কলকাতায় শূন্য বৃজি নেই, কলকাতা-বিকার বলে একটি ব্যাধিও বাঙালীর রয়েছে। অবশ্য কলকাতা শূন্য বণিকবাসীর বৃজি রোজগারের জয়গা নয়, ভিন্ন প্রদেশের মানুষেরও উপার্জনের জায়গা। মনে রাখতে হবে, এদের সংখ্যা কম নয়, এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি কারণ অবশ্যই এই ভাগ্যান্বেষীরা।

সম্ভবত একটা কথা এখানে বলা যায়। কলকাতায় যেমন-তেনম কিছু উপার্জন গতর খাটলে করা সম্ভব, তাতে দিন গজরান চলে। যেমন রিকশাওয়ালা, ফেরিওয়ালা, মট্টে মজুরে করছে। কলকাতার বাইরে সে-সুযোগ নেই। এই শহরের বাইরে যেসব শিল্পাঞ্চল রয়েছে সেখানকার সীমায়িত সুযোগের সম্ভাবহার বোধ হয় নিঃশেষ হয়েছে। কিন্তু কলকাতাও কি নিঃশেষিত নয়? কলকাতা সম্পদ আহরণ করে না। আজ কলকাতা সর্বস্বাক্ত হলেও তার কাটামোটুকু সে বজায় রেখেছে এই মাত্র। তবে কতদিন পারবে তা বলা মুশকিল।





# কক্করদা প্রভাস সেন

কি এক আশ্চর্য যোগাযোগের ফলে আমাদের শর শিল্প-জগতের তিনিটি উজ্জ্বল জ্যোতিষিক দীপ্তনাথের শান্তিনিকেতনের আকাশে একই সপ্তে টে উঠেছিলেন। আচার্য নন্দলাল আর তাঁর দুই ছাত্র বিনোদবিহারী ও রামাকঙ্কর। এদের ত্র্যেকই বংশ শতাব্দীর ভারতের শিল্প-জগতে ঐতিহাসিক স্বকীয়তার অতুল্য পূর্ব পরিচয় রাখতে না হয়েছেন। গুরু নন্দলাল চৌদ্দ বছর পূর্বে প্রয়াণ করেন। আজ রামাকঙ্কর গুরুকে অনু-শ্রবণ করলেন।

বিশ্ব শতাব্দীর ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর এবং জ্ঞাত কমতামালী ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল রক্ত রামাকঙ্কর তাঁর যুবা বয়সে ছিলেন যেন 'শশ' নতুন যৌবনের দ্যুত। স্কোপামীর নেয়ার নিজে তে তাঁর কর্মস্থান শান্তিনিকেতনে আশোপাশের ঠিকেক ও মাতিয়ে রাখতেন তিনি—গানে, নাচে, ফিনের, মূর্তি গড়ার, ছবি আঁকার। কোন শিল্পের দ্বিষ্ট বৈধাধরা নিয়ম কানুনের ধার ধারতেন না। চোখ খোলা, মন উদার, অনুভূতি প্রখর। শান্তি-কেতন আশ্রমগুরুর মনের মতো ছাত্র—নিজস্ব দ্বা নিয়ে বিকশিত। শিল্পগুরু নন্দলালের দামোদর—শিল্পের নানা আশিগক, নানা বক্তব্য নিয়ে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মত।

১৯০৬ সালে বকুড়া শহরে যুগোপাড়ার রামাকঙ্কর বেইজের জন্ম হয় ২৫শে মে তারিখে—টিটি সাধারণ প্রমজীবী পরিবারে। তাঁর বাবার নাম ল চণ্ডীচরণ বেইজ, মায়ের নাম সম্পর্শী। বেইজ বৌটি খুবই বিরল। স্বর্গাত ফিতমোহন সেনের তে পদবীটি সংস্কৃত বৈদ্য শব্দের অপভ্রংশ। বৈদ্যকে প্রাকৃত বৈজ্ঞ এবং তা থেকে এসেছে বর্তমান পদবী বেইজ। হিন্দু বর্ণবিভাগ অনুসারে হিজরা জাতিতে ন্যাপিত। পুরাকালে ন্যাপিতদের হস্ত থেকেই শলা চিকিৎসক হতেন। বৈদ্য পদবীটি ১৮শ হয় এইভাবেই তাঁদের হস্তে এসেছিল।

ছাত্রের, কামার ও অন্যান্য নানা কারিগরদের সঙ্গে বসবাসের আবহাওয়ায় পুষ্ট রামাকঙ্করের বকুড়া স্কুলে পড়াশুনার সঙ্গে চলে কুমোরদের সাথে মূর্তিগড়া আর পোড়োদের সঙ্গে ছবি আঁকা। সেকালের বিখ্যাত সম্পাদক ও রবীন্দ্রনাথের বন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নজরে পড়ে এলেন শান্তিনিকেতনে ১৯২৫ সালে। সেই থেকে সেখানেই তাঁর স্থিতি।

শিমের মূর্তি গড়বার ছোট্ট দেখে নন্দলাল কলাভবনে ভাস্কর্যের ক্লাস খুললেন। ছবি আর মূর্তির কাজ সমানে চলল। আর চল লাইব্রেরিতে দেশবিশেষের ছবির বই ছাড়া—আর এক নতুন জগৎ। নন্দলালের প্রেরণায় দেশের নানা শিল্প-ঐতিহ্য-ছবির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় হল তাঁর। আর ডঃ স্টেলা ক্রামারিশের সঙ্গে আলোচনার আর শিল্পীবন্ধু অগ্রজপ্রতিম বিনোদবিহারী মুখো-পাধ্যায়ের সাহচর্যে ইউরোপের শিল্প-আন্দোলন সম্বন্ধে জাগল প্রবল অনুসন্ধিৎসা।

রামাকঙ্কর শান্তিনিকেতনে আসবার পূর্বেই ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে স্টেলা ক্রামারিশ আধুনিক ইউরোপীয় শিল্প-আন্দোলন সম্বন্ধে কলাভবনে বৈশ কয়েকটি বক্তৃতা দেন, বেগুনির মাধ্যমে দাদাইজম, কিউবিজম, স্যুরিয়ালিজম প্রভৃতি ইউরোপীয় শিল্প আন্দোলনের ধারা-গুলির সঙ্গে কলাভবনের ছাত্র ও শিক্ষকদের পরিচয় ঘটে। এরপরও বহু বছর ধরে স্টেলা-ক্রামারিশ শান্তিনিকেতনে আসতেন এবং শিল্পীদের সঙ্গে নানা শিল্পতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন। রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় এবং কলাভবনের ছাত্র ও শিক্ষকদের বিশেষ করে বিনোদবিহারীর উৎসাহে শিল্প বিদ্যালয়ের প্রথম যুগ থেকেই পূর্ব ও পশ্চিমের সমস্ত শিল্প-ঐতিহ্য ও আন্দোলন সম্পর্কীয় গ্রন্থে কলাভবনের গ্রন্থাগারটি ভরে উঠে থাকে। বার কোনও নজির সে যুগে স্মৃতিচিহ্নভাবে আমাদের দেশে ছিল না।

পাশ্চাত্যের আধুনিক শিল্প-আন্দোলনের সঙ্গে এইভাবে নিবিড় পরিচয় সত্ত্বেও কিন্তু সে সময় শান্তিনিকেতনে কোনও অনুকরণ প্রবণতা দেখা দেয় নি। তার কারণ সে যুগের শান্তিনিকেতনে শিল্পী ও ছাত্রদের তাঁর স্বাধীনতা বোধ, শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক বুনোয়াদ, শিল্পকর্মের পরিপোষক বীরভূমির অপূর্ব পারিপার্শ্বিক পরিবেশ—যে পরিবেশের সঙ্গে সে যুগে আশ্রম-জীবনের কোন সংঘাত ছিল না এবং সবচেয়ে বড় কথা তিন মহা-শক্তিধর সৃষ্টিশীল শিল্পীর সমাবেশ য'রা একে অন্যকে সাহায্য করেছেন সমস্তরকম প্রভাবের উদ্দেশ্যে নিজস্ব শিল্প-বক্তব্য বার বার নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ করতে।

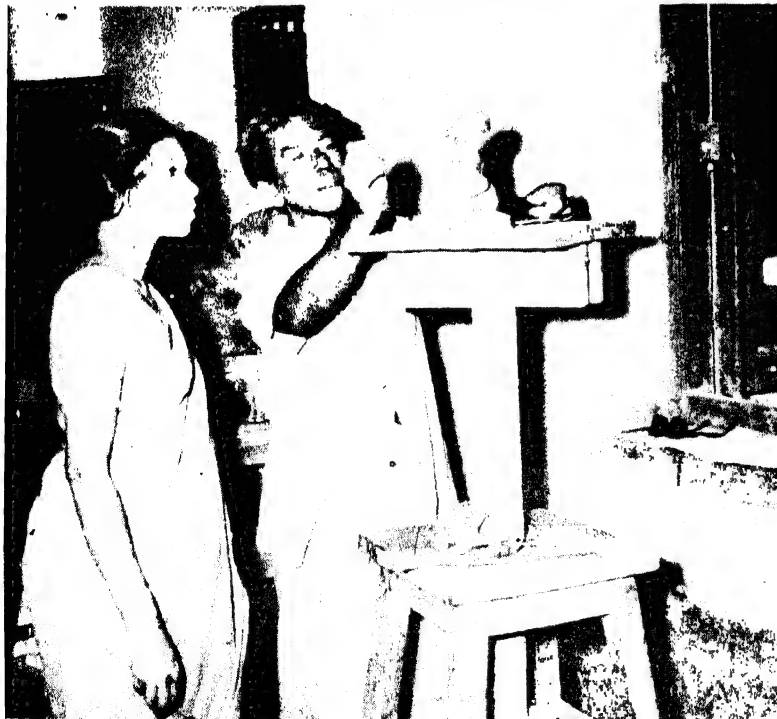
কলাভবনে শিল্পশিক্ষার সময় রামাকঙ্কর মূর্তি গড়বার প্রাথমিক পাঠ পেরিয়েছিলেন আরো নন্দলাল ছাড়া অস্ত্রায়ার শিল্পী লিঙ্কল্ডনপট আর প্রখ্যাত ফরাসী ভাস্কর বুরদেলের শিক্ষা মার্কিন মহিলা মিসেস মিলওয়ার্ডের কাছে। দুজনই রবীন্দ্র-নাথের আশ্রমগণে স্বল্প সময়ের জন্য কলাভবনে শিক্ষা দেন। রামাকঙ্করের দু-এক বছর পর মডেলিং ক্লাসে যোগ দেন শিল্পী সূর্য্যর খাস্তগীর। সূর্য্যর খাস্তগীরকে সঙ্গী করে আচার্য নন্দলালের উৎসাহ ও সহায়তায় ভাস্কর্য হাত পাকবার কাজ চলল, সঙ্গে চলে ছবি আঁকা—ওয়াশ, টেম্পারা আর জল রং-এ। এ ছাড়া এঁচি, জুই পল্ট্রি আর তুলি দিয়ে সাদা কালোর কাজ। বিনোদবিহারী আর নন্দলালের সঙ্গে নন্দন-তত্ত্বের আলোচনা চলল শিল্প কাজের কঠোর কঠোর—আর চলল বীরভূমির রক্ত প্রান্তর, শাল, তাল, শিমুল, পলাশের এবং সেই পরিবেশের লক্ষণ মিলে থাকা মানুষ সাঁওতালদের সঙ্গে বিভ্রাটের সাধনা।

যতদূর বীরভূমির বিভ্রাটরূপ রামাকঙ্করকে চিরকাল মুগ্ধ করেছে এবং তার ছাপ তিনি রেখে গেলেন তাঁর ছবিতে, জুই-এ, স্ক্লেচে এবং ভাস্কর্যেও।

ছাত্রাবস্থায় সমসাময়িক বা দু-চার বছর আগেপিছে তাঁর সঙ্গী ছিলেন বিনোদবিহারী, ধীরেন দেববর্মণ, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেন চক্রবর্তী, মশী গুপ্ত, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তি এস বসোজী প্রভৃতি। বতসর জানা বার ভাস্কর্য শেখবার সঙ্গী ছিলেন শ্যুই সূর্য্যর খাস্তগীর।

শান্তিনিকেতনে কয়েক বছর কাটাবার পর রামাকঙ্কর দিল্লির মডার্ন স্কুলে শিল্পশিক্ষকতার কাজ নিয়ে যান। কিন্তু ভাল না লাগায় মাস ছয়েকের মধ্যে সে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন এবং নন্দলালের অনুরোধে কলাভবনে তাঁর সহকারী হিসাবে যোগ দেন। এর পর তাঁর সমস্ত জীবন তিনি শান্তিনিকেতনেই কাটিয়েছেন এবং শিল্প অধ্যাপনার সঙ্গে নানা মাধ্যমে অনবদ্য শিল্পসৃষ্টির যে পরিচয় রেখেছেন তা যে কোন যুগের পক্ষে গোপনের বস্তু।

রামাকঙ্করের শিল্পকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসে প্রথমেই যে কথা মনে হয় তা হল একটি বলিষ্ঠ সৃষ্টিশীল মানুষের বিশ্ব প্রকৃতির প্রতি অগাধ ভালবাসা এবং কিরাস ও সেই ভালবাসা আর বিশ্বাসের রূপকল্প সৃষ্টিতে তাঁর আনন্দ বেদনার অপূর্ব প্রকাশ। নানা মাধ্যমে তাঁর শিল্পকর্মের ভিতর দিয়ে তিনি জীবনের জয়গান গেয়ে গেছেন। সমস্ত বৈষয়িক বিষয়ে বা শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। সমস্ত কর্মজীবন কেটেছে যেন সৃষ্টির নেশায় সৃষ্টির আনন্দে। যে সৃষ্টি থেকে আর কোনও প্রাপ্তি তাঁর মনে স্থান পায়নি। তাঁর স্বভাবে বা কর্মে কোনও কৃত্রিমত্বের স্থান ছিল না। অনেক বলে থাকেন সে যুগের শান্তিনিকেতনে তিনি ছিলেন 'রেবেল'। এবং এজন্য তিনি তাঁর কাজকর্মে অনেক বাধা পেয়েছেন। কিন্তু এ কথাগুলি একেবারেই ঠিক নয়। নন্দলাল বা রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে সৃষ্টিশীল মৌলিক-কতাকে সবদাই উৎসাহ দিয়েছে। না হলে রামাকঙ্কর



ভাস্কর্যের গুরু রামাকঙ্কর

ফটো : নীরোদ রায়

[illegible]

মোট কঠিন শাস আর ভাঙা পেয়লা পরিচ।  
সকালের স্বাধিকারী, পাচক, বা সবই  
কসমবিশ্বীকৃত ডাঙচোরা যোগীন। সেকালের  
শান্তিনিকেতনে যোগীনের দোকানে চা খানি এরকম  
কোন লোক পাওয়া যাবে না। কফি অবশ্য সে  
যানতো না।

আমি তখন কলকাতার আর্ট স্কুলের ছাত্র।  
তিন মাস ধরে শব্দ মেলোর ভেনাস কপি করে  
প্রস্তুত। পূজার ছুটিতে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়ে  
দাঁদর খালি বাড়িতে উঠেছি। সকালবেলায় তেল-  
গ-এ খোয়াইয়ের এক স্কেচ করে ইজেল কঁধে  
লুটো নাগাদ উপস্থিত হয়েছিলাম যোগীনের  
দোকানে। কিংকরদার আর বিনোদমা সেখানে চা  
খাচ্ছিলেন—আমি তাঁদের তিমাম না। লটবহর দেখে  
কিংকরদা ছবি দেখতে চাইলেন, বেশ সুন্দর  
টপনেশও মিলেন। তারপর আমি কোথায় আছি জেনে  
নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—খাওয়া দাওয়া কোথায়  
হচ্ছে? তারপরই কলেন—চলে এসো এখানে,  
যোগীন তোফা রাঁধে। আমরাও ছুটিতে এখানেই  
ঘাই। তারপর তিন সপ্তাহ ধরে বিউলীর ডাল আর  
সকলপোস্ত দিয়ে ভাত খেতে খেতে তাঁদের সঙ্গে  
পরিচয় দৃঢ় হল। সঙ্গে গিয়ে তাঁদের কাজ  
দেখলাম। আমার ১৮ বছর বয়সে সে এক আশ্চর্য  
অভিজ্ঞতা। তার পূর্বে ২১০ বছর ধরে কলকাতায়  
প্রদর্শনী দেখেছি; বিদেশী শিল্পীদের কাজের বই-  
পত্র সেখানে দু'চারখানা দেখেছি কিন্তু কিংকরদার  
কাজের খলিষ্ঠ উজ্জলতা, রং রেখার অপূর্ব বিন্যাস  
আর বিনোদমা কাজের সরল খজু, কমপোজিশনের  
রক্ষা গভীরতা, রং ও রেখার পরিমিত ব্যবহার সেই  
অল্প বয়সে আমার মনকে অতৃপ্ত করে নাড়া  
দিয়েছিল। ছুটি শেষে তাই যখন বিনোদমা  
বললেন কি হবে আর্ট স্কুলে পড়ে, এখানে চলে  
এসো, আমি সঙ্গে সঙ্গে আর্ট স্কুল থেকে নাম  
কাটিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে গেলাম।

শান্তিনিকেতনে এসেই কলাভবনের হস্টেল  
কালো বাড়িতে বইয়ের দেয়ালে রলিফ-মর্টি  
সজার কাজে কিংকরদার চেনা হয়ে লগে পড়লাম।  
কিংকরদার স্টাডিও তখন ছিল সিংহসদনের পাশের  
দোতলা দুটি বাড়ির একটির উপর তলায়। লম্বা  
চৌহদ্দী তখন কলেজে পড়তে পড়তে কিংকরদার  
স্টাডিওতে রাইফেলা কাজ দেখেন।

যে সময়টা কলাভবনের ছাত্র হিসাবে আমরা  
শান্তিনিকেতনে ছিলাম সেটাই বোধ হয় কিংকরদার  
জীবনের সবচেয়ে সৃষ্টিশীল যুগ। ৩০ থেকে ৩৫-  
এর মধ্যে বয়স, অসাধারণ স্বাস্থ্য, প্রাণোজ্ঞ এক  
মানুষ, সমস্ত জটিলতার উদ্বেগ। জীবনব্যাপী-  
প্রণালী সহজ ও সরল।

চারপাশের পৃথিবীকে প্রাণভরে দেখছেন ডাল  
কাসছেন এবং প্রথম আনন্দের নানা শিল্প মাধ্যমে সেই  
আনন্দের প্রকাশ করে চলেছেন। দিবা রাত্রি প্রায়  
বিগ্রাহমহীন আনন্দের জোয়ার-ভাটা কখনও দেখিনি।  
সারাদিন আনন্দের কাজ চলেছে, সন্ধ্যা আর ভোর  
রাস্তা চলেছে তেল রং নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-  
নিরীক্ষা। তার সংগে ছেলেমেয়েদের নিয়ে নটকের  
মহড়া। গান তো মতো সব সময় লেগেই আছে—  
মাঝে মাঝে ছাত্র বা বন্ধুদের প্রবন্ধের জবাব দিতেন  
বাউলদের মতো গানে। বেশির ভাগই রবীন্দ্রনাথের  
গান—গাইতেন রবীন্দ্রনাথের সুরের তার নিজস্ব  
উদ্ভারিত প্রবন্ধে।

তখন শান্তিনিকেতনে এতো গাছপালা ছিল  
না। গ্রীষ্মকালে তাপ ১০৭/১০৮ পর্যন্ত উঠতো।  
সেই নিদারুণ গ্রীষ্মে শান্তিনিকেতনের রক্ষ প্রকৃতি  
কিংকরদাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করত। বেলা দুটোর  
সময় মাঠে, ঘাটে, শালবনে ঘুরে বেড়েন তাঁর একটা  
নেশা ছিল। শান্তিনিকেতনে ছাড়িয়ে থাকা বড়  
বড় মর্তিগুলি সবই গ্রীষ্মকালে শুষ্ক। গ্রীষ্মের  
ঠাট্টা জোড় খোঁচা আকাশের নীচ কাজ করতে তাঁর  
ভাল বাসন্তেন। আখ্যাত সাঁতড়ান পরিবারের বড়  
মর্তিটি গড়বার সময় মনে পড়ে গ্রীষ্মের নিঃশব্দে

দুপুরের কঁকর, বাঁল, নিমেষের মশলা ছুঁড়ে  
মর্তির নানা অঙ্গ ফুটিয়ে তুলছেন বা প্রয়োজনে  
ছেনী হাড়টি দিয়ে সেগুলো কাটছেন। মাথায়  
টোকা, ডানহাতে রবারের প্লাস্টাস পরা আর মুখে  
যতদূর সম্ভব উঁচু স্বেদে গা—দারুণ বহনজ্বালা—  
—রস নাই রস নাই বা ধরা দিয়েছি গো আমি—  
আকাশের পাখী তাঁর নিজস্ব সুরে। একপাশে  
সরকোপের ধারে একটি সুইস তাঁবু খাটান। প্রায়ই  
তার ভেতর বসে কাজ দেখছেন আমাদের সবাই-এর  
মাস্টারমশাই নন্দলাল বসু। মাথায় ভেজা গামছা  
জড়ান আর হাতে বাড়ির বাড়িল পাশে চায়ের  
ট্রাকস। মাঝে মাঝে ডাকছেন—এসো হে কিংকর,  
একটা বাড়ি খেয়ে নাও। তেমনটাও একটু চা খাও।

তখন রবীন্দ্রনাথ বেঁচে। বড় কিখাত লোক  
তার সংগে দেখা করতে আসতেন। অনেকেই কলা-  
ভবন ও তার শিল্পীদের খোঁজখবর করতেন।  
কিংকরদা এই সময় সর্বদা পলায়ন করতেন—অগ্রায়  
প্রায়ই যোগীনের চায়ের দোকান। মাঝে মাঝে  
সেরকম না-মোড়-বান্দা লোকের পূজায় পড়লে  
আমরা তাঁকে ধরে আনতাম।

মৃত্যুর বছরখানেক আগে বোধ হয় গুরুদেব  
বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর দিন ফুরিয়ে  
আলছে। সে সময় তিনি কদিন ধরে গাড়িতে বসে  
সমস্ত শান্তিনিকেতন ঘুরে দেখাছিলেন। একদিন  
কলাভবনে এসে কিংকরদার খোঁজ করলেন—  
কিংকরদা প্রথমেতো পলায়িত। ধরে নিয়ে আসবার  
পর গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন তোকে দেখি না কেন  
দেখ? কিংকরদার জবাব—আপনি কাজ নিয়ে বাস্ত  
থাকেন, আমিও তাই থাকি, আপনার কাছেই তো  
আছি। তুই তো এতো মর্তিটপটি করছিস,  
বড়োটার তো কিছু করলি না—এরপর মরে গেলে  
আপসোস করবি—গুরুদেব হেসে বললেন। এর  
কিছদিন পরই কিংকরদা গুরুদেবের আশঙ্ক  
মর্তিটি তৈরি করেন যা নিয়ে কামাস পূর্বে এডো  
হইচই হল।

গুরুদেবের মৃত্যুর পর অবনীন্দ্রনাথ কিব-  
ভারতীর আচার্য হয়ে কিছুকাল শান্তিনিকেতনে  
ছিলেন। রোজ সকালে এসে কলাভবনের বাগানদার  
বসন্তেন আর ছাত্র শঙ্কর সবার সঙ্গে নানা আলোচনা  
করতেন। শুনছেন তাঁর নিজের প্রিয় 'ওয়াশ'  
পদ্ধতিতে ছবি আঁকার রেওয়াজ তখনকার কলা-  
ভবনে উঠে গেছে। হঠাৎ সৌন্দর্য কিংকরদা সামনে  
পড়ে গিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ  
হাস্তে আমরা তাঁকে ধরে নিয়ে এলাম। পালাচ্ছিল  
যে বড়ো? ওয়াশ শেখাতে পারিস না তাই বকবো  
বল পালাচ্ছিস, না? কিংকরদা হেসে কললেন,  
অনেক কিছু তো শিখছে, এখন ওয়াশ না শিখলেও  
চলবে। 'নিজে পারিস না তা শেখাবি কি করে তাই  
বল?' কিংকরদা আবার হেসে বললেন—পারি।  
পাশে জানালার নিচে ছিল নতুন ফোটা দোলনচ'পার  
গাছ। অবনীন্দ্রনাথ জুলন্ত সিংহার স্মৃষ্টি হাত দু'লগে  
বললেন—বেশ আজ তাতে আমাকে কম্পিউশন—  
ওয়াশ এ দোলনচ'পার ছবি হবে—তিনিদিনি সময়।  
ওরে আমাদের দু'টো গোল্ড, কাগজ টাগজ দে তো রে।  
নন্দলাল তুমি হবে জজ। দুদিন পরই কিংকরদাকে  
বিকলে ডেকে পাঠালেন 'কম্পদে হল? শুরুর  
করেছো তো?' শেষ করে ফেলেছি। সেদিক গো,  
নিয়ে এসো, নিয়ে এসো। ছবি এলো, দেখতে দেখতে  
উঠে ডালেন—কিংকরদাকে জড়িয়ে ধরলেন তারপর  
উঠেস্বরে ডাক নন্দলাল আর আজ করবে কি?  
তোমার ছাত্রের আমায় হারিয়ে দিলো। তারপর কি  
তার আনন্দ। আমরাও হতবাক হলাম সেই ছবির  
অতি সুক্ষ্ম ও কোমল রেখা ও রং-এর বিন্যাস দেখে।  
কিংকরদা তখন বড় বড় মর্তি গড়ছেন আর নয়তো  
বিরাট ক্যানভাসে জাতীর বরশের পেঁচড় মেরে  
তেল রংএ বড় বড় ছবি করতেন।

১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত কিংকরদা দাপটে  
কাজ করে গেছেন। শান্তিনিকেতনের বাইরে বড় কাজ  
করেছেন ৪০-এর দশকে নেপালে ওয়ার মেমোরিয়াল

—অজানা শহিদ সৈনিকের মর্তি। আর ৬০-এর  
দশকে ২৪ ফুট উঁচু দুই থক থকপা মর্তি  
দিল্লির রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সামনে। গান্ধীজীর বড়  
ব্রোঞ্জের মর্তি একটি আঁহে আসাম গোষ্ঠীতে। তার  
অসুস্থ অবস্থার একটি। এর মূল মর্তিটি শান্তি-  
নিকেতনে আছে নিমেষে গড়া। ছাত্রের সাহায্য করে-  
ছিলেন এটি গড়তে।

আমাদের পূর্বে কিংকরদার প্রথম কামসফের  
ছাত্র ছিলেন রত্ন হানুজী। বছর দুই পূর্বে ইনি  
পরলোকগমন করেন। তারপরই আমরা কজন গণ্য  
চৌহদ্দী, রবী চট্টোপাধ্যায় আর আমি। এরপর যাদের  
নাম মনে পড়ছে তাঁদের মধ্যে আছেন কৃষ্ণ সেনে, ডা.  
ধর্মণী, জিতেন্দ্রকুমার, সুব্রেন ঘোষ, সুব্রেন দে,  
বিপুল সাহা, বলরীর সিং কাট, প্রণব দেববর্মান ও  
অন্যেরা যিনি পারমার ইত্যাদি।

গত ১লা আগস্ট শ্রুত্বের ক্রটি সাজে বারডায়  
আমরা দেশের এই উজ্জল জ্যোতিষ্মত, মহান শিল্পী  
রাজকিংকরকে হারিয়েছি। বেশ কয়েক বছর ধরে  
অসুস্থ শিল্পীকে গতে এপ্রিলের প্রথমে পাঁচমহাঙ্গ  
সরকার চিকিৎসার জন্য শান্তিনিকেতনে থেকে  
কলকাতার সুবলাল কাননানী মেমোরিয়াল হাস-  
পাতালে আনবার ব্যবস্থা করেন। এই কামাস ধরে  
বিশ্বকর্মে চিকিৎসকদের নিয়ে গঠিত একটি মেডিক্যাল  
টিম তাঁর চিকিৎসা করছিলেন। এতদিন বহু যত্ন  
নিয়ে তাঁর দেখাশুনা করতেন কলাভবনের প্রাচীন ছাত্র  
শ্রুতিতে ঘোষ।

শ্রীরীর কিছু অংশ প্রত্যাহার স্বাভাবিক  
কাজকর্ম বাহ্যে হওয়ায় গত ২৬শে জুলাই তাঁর  
মস্তিষ্কে একটি সাধারণ অস্ত্রোপচার করে 'শাট'  
নামের একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র বসান হয় মস্তিষ্কের  
একটি আশের রক্ত চলাচল ব্যবস্থার সুরাধা করার  
জন্য। ধীরে ধীরে তিনি সুস্থ হয়ে উঠছিলেন।  
৩০শে জুলাই ভোরে দিকে হঠাৎ গুরুতর সেরোব্রাল  
গ্রন্থবিসর্গ রোগে আক্রান্ত হয়ে অজ্ঞান হয়ে যান এবং  
ডাক্তারদের সমস্ত চেষ্টা বিফল করে দুদিন পর শেষ  
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কিংকরদার কোনও দিনই নামের মোহ ছিল  
না। প্রচার বা প্রদর্শনীর দিকে তখনও নিজে কোন  
উৎসাহ দেখাননি। তাঁর কাজের অসাধারণ কিছু  
গণজনকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছে আর শান্তি-  
নিকেতনের বড় বড় মর্তিগুলি টেনেছে কিছু সাধারণ  
মানুষকে।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তাঁর কাজ সম্বন্ধে  
কোনও উপযুক্ত পুস্তকাদি না থাকায় দেশে বা  
বিশেষে এতো বড় একজন শিল্পীর ব্যাপক পরিচিতি  
নেই। ১৯৫০ সালের কাছাকাছি ২০ বছর ফরাসী  
দেশের রিয়ালিতে ন্যূতেন গ্রুপ তাঁর কিছু কামসফ  
প্যারিসে প্রদর্শন করেছিলেন। বিশেষ পঠাবার  
হাঙ্গামা, খরচা ইত্যাদি তাঁকে এ বিষয়ে নিম্বৃত্ত  
করেছিল। এ ছাড়া বিশেষে দু'একটি জায়গায় ভারত  
সরকার প্রেরিত প্রদর্শনীর সংগে তাঁর দু'চারটি কাজ  
প্রদর্শিত হয়েছে। দশেও ৮ বছর পূর্বে বিউলা  
আকাজমার প্রদর্শনী ও প্রায় ১৫-২০ বছর পূর্বে  
কলকাতা আর দিল্লিতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণের অপরিসীম  
দুইটি প্রদর্শনী ছাড়া শান্তিনিকেতনের বাইরে তাঁর  
কাজের একক প্রদর্শনী আর হয়েছে বলে মনে পড়ে  
না।

আমি ১৯৫৪ সালে রোমে বড় বড় শিল্পী  
কামসফের এক জমায়েতে তাঁর মর্তিগুলি বিচার কোর্ট-  
গাফ দেখিয়েছিলাম। তাঁরা উজ্জ্বলিত প্রশংসা করে  
তাঁর কাজ সম্বন্ধে প্রকাশিত সমস্ত পুস্তকগুলি  
পাঠাতে অনুরোধ করেছিলেন এবং কোনও বইই নাই  
শুনিয়ে হতবাক হয়েছিলেন। আমি বিশেষ কিছু  
দিল্লির ললিতকলা আকাজেমির উদ্যোগিতা  
সম্পাদক একথা জানিয়েছিলাম। সেখানে শিল্পীরা  
রাজনীতি ভেদ করে একটা চটি বই ছাড়া আর কিছু  
করা সম্ভব হয়নি এখনও পর্যন্ত। তাঁরা ছবি  
ও মর্তিগুলি জাতীয় সম্পদ সেগালি স্টেট রক্ষণ-  
বেশের তার অজ দেশের উপর নসত হল।

## মানুষের অপেক্ষা এখন

সুধেন্দু মল্লিক

সব তো হচ্ছিলো ভালো সব চলছিলো বেশ ভালো  
সামনের করতালি পিছনের মমিষ্ঠ গুঞ্জন  
সহসা ছাঁপিয়ে গিয়ে বেজে উঠলো

সাহেবের অকর্ণের মতো।  
মুখপদ্মে বারংবার আলোর আঘাত আহা ক্লিক ক্লিক  
ক্লিক ক্লিক ক্লিক।

ফুলের মালাও যেন বলবো কি—ভেসে এলো,  
গলায় জড়িয়ে গেলো বাহুর আদরে।

তখন আচমকা খুব ভয় হলো, কোনদিন ওবোস তো নেই!  
বল্লম মথের দল ছেড়ে দে আমাকে থিক্ থিক্—  
অমরত্ব পাওয়া যায় এতো সহজেই?  
ছেড়ে দে ছেড়ে দে বলছি। বলতে বলতে ছুটছি ছুট ছুট ছুট।  
ধপাস পড়ছি যেই ওই সব ধৈর্য আসছে এবার তো মালা নেই হাতে।  
এ যে লাঠিসেঁটা! এই ধরে। ধরলো রে। কারো কি করে কি বলে  
হঠাৎ জাগ্রত, সিনেমার বিরতি যেমন।

দুয়ারে রৌদ্রের বাঙ্গ। মুখ ঠুকছে অতি ক্রুদ্ধ কাক।  
বাজে স্বপ্ন! একটুকু বৃষ্টি করে না চোঁচিয়ে চেপে গেলে হতো।

## অমরত্ব ও একটু বোকামি

নীরদ রায়

মানুষের অপেক্ষা এখন একা—  
তার নিকটে কোনো রোদ্দুর নেই,  
শুধু প্রকৃত সুন্দরের নষ্ট হয়ে যাওয়া ঘরবাড়ি মাথার মুকুট।  
সমস্ত দেখা তাই কী ভীষণ দুঃখের পাশে উবু হয়ে বসা—  
কুসুমের শীর্ণ সময় বোঝেনি বৃক্ষের অক্ষম কোলাহল  
দুঃশোর সংসার তাই প্রায়শই ভুল পথ, ভুল নারী,  
ভুল নদীর দিকে—;

মানুষের অপেক্ষা এখন একা—  
তার নিকটে কোনো রোদ্দুর নেই,  
উজ্জ্বল প্রজন্ম নিয়ে সমস্ত অধারের যৌবন তাই সহসা  
ঢুকে যায় প্রত্যেকটি মানুষের নিজস্ব ভূমণ্ডলে—  
এলোমেলো খেয়ে ফেলে—যা কিছু দুঃপ্রাণ সোনালী প্রতীক,  
মতিচ্ছন্ন ফসলের মাঠ!  
আসলে, মানুষের অপেক্ষা এখন বড় একা।

## জলবিন্দু

সুনীল বসু

তোমাকে চিনেছি আজ আমি ক্ষেমক্ষর  
ক্রমে ক্রমে ধোঁয়া হ'য়ে আসে পরমায়ু  
আমাকে আঘাত দিল নিয়ত বর্ষের  
কোন অভিগাণ?

আজ নৈরাশে উদ্বায়!

বিষে বিষে নীল হ'য়ে এলো সব শিরা  
কিছুতে কিছুই নেই ভাল আর নেই  
নিষ্ফল আমার দেখা জলবিন্দু ভেঙে ভেঙে হীরা  
যতবার বাঁধি গান ততবার ছিঁড়ে যায় খেই।

নিয়তির কুলিশ-কঠোর এই অদৃশ্য কুঠার  
নেমে এসে ছোঁবে ক্রান্ত ঘাড়  
মৃত্যুর হিমালী গর্ভে প্রবল শীতলে  
মরে র'ব, অনর্থক স্মৃতির পিতলে!

চিনেছি তোমাকে শোণিতস্রাবী হে চাঁদ  
তুমি সেই মান্দাতা জল্লাদ,  
দুই চক্ষুতে সিন্দুর লবণাক্ত বারি  
উথলিয়ে, চেনাতে কি চাও  
যথদ্রষ্ট নারী?

## অপ্রম

মানস রায়চৌধুরী

ধর্মান্তরিতের কাছে ধর্ম ও অধর্ম বলে হয়তো কিছু আছে  
দৃশ্য থাকে মন্দির, গাথিক চূড়া অথবা গম্বুজ  
ঘুমোতে যাবার আগে ইচ্ছা বীজমন্ড খণ্ডির্নাটি  
প্রাণায়াম, জপমালা অধারে আলোয়—  
যাদের সে সব নেই তাদের পথের আড়াআড়ি  
চলে গেছে অবিশ্বাসী নদীটির স্রোত  
জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো দিনান্তের রোদ  
ধর্ম আর অধর্মের মাঝামাঝি অদৃশ্য দেওয়াল গড়ে তোলে।

সে দেওয়ালে পা ঝুলিয়ে বসে আছে দুজন প্রেমিক  
'দুজনেই দুজনের জন্যে জন্মেছিল'  
ওদের পৃথিবী ঝুড়ে ফাল্গুন বাতাস বইছে, আর  
গীর্জার বণ্টার চেয়ে গাঢ়তর অন্তর-স্পন্দন।  
দূর থেকে যদি দেখতে পাওয়া যায়, তবে কাছে যাওয়া কেন  
দূরত্বের চেয়ে এই অসহিষ্ণু পাগল সময়  
চারপাশে ঘূর্ণি তুলে বলে : ভেবে দেখো  
গম্বুজে আজান শোনা যায়, দূরে মন্দির আর্য্য  
ধর্ম তো গিয়েছে কবে কর্তাদিন আগে  
অধর্মের অর্থ বুঝতে বাকিটা জীবন  
দেওয়ালে কি বসতে হবে পা ঝুলিয়ে  
কাকে সঙ্গে নেবে?

ধর্মহীন মধ্য রজনীর খেদ হাতে তুলে নিলো  
ঠান্ডা জল, সপ'গন্ধা গাঢ় নীল ঘূমের মশাবি।



# রামকিংকরের ভ্রমণল

পূর্ণেন্দু পত্নী

“সহিত্য নিয়ে প্রকাশ করে কিত্তর ভিতর দিকের, আর পেনালিটি রেখা  
রঙের সমন্বয়ের আমাদের প্যারাম্প্রদান এমনকি সেন্সেশনকেও গরুড় ভেলে  
শিখর অক্ষরে। কোরের কাছে ক্যারের গঙ্গাঘাট হওয়ার কিংবা ভীষণ অনুগত  
ওয়ার অথবা আত্মসমর্পণ করার দরকার নেই। যেটা দরকার, সেটা হল নিজের  
ডল আর সবার উপরে নিজের প্রকাশ-মাধ্যমের উপর দখল। তোমার সামনে  
রয়েছে তার ভিতরে ঢেকে পড়ার আর যতটা সম্ভব ব্যক্তিগতভাবে সেটা প্রকাশ  
হতে চেষ্টা করে।” সেজান

“কোনো বস্তু লাইন আছে সব আয়ত্ত করা উচিত। কোর হচ্ছে সের্বিশপ্লী।  
ত লুপ্তর সূক্ষ্মর লাইন সূচি করে লেখেন। সে সব শিখে নির মনে রেখে  
রে প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে হবে।” রামকিংকর

“ইনস্টিটিউশন, পেনালি, অনারস, এগুলো স্থল-স্ট্রিচ, প্রত্যেক আর  
সকলকে জানে।” সেজান

“পল্লীস্বামী আকস্মিক ফল্ট প্রাইজ, অন্য কিছু করলে মার খেতে হবে, তা  
র চলতে পারে না। শিল্পী সব সময় পথে রয়েছে। সে চলছে। কোথাও  
টকে নেই।” রামকিংকর

“লুপ্তর হল এমন একটা বই, যা দেখে আমরা পড়তে শিখি। তাই বল  
মরা কখনোই আত্মতুষ্টি হয়ে আটকে থাকবে না আমাদের প্রবেশ পূর্বসূরীদের  
কমল ধরমালয়।” সেজান

“আমাদের ক্লাসিক্যাল গান একভাবে ইনফিনিটিকে ধরেছে, শব্দ, স্বর দিয়ে,  
নড়ব দিয়ে। কথা দিয়ে নয়। গুরুদেবের গান আবার আরেকভাবে সেই  
ফিনিটিকে ধরেছে। সেখানে সুকের সঙ্গে কথাও আছে, অর্থও আছে। ছবিতেও  
ই—কখনও কখনও বা অর্থ দিয়ে ধরা হয়, কখনও হয় আকস্মিক অর্থে  
র বা দিতে শব্দ রাগিনীর মত রূপ দিয়ে। আমরা তো শিল্পের শিক্ষার  
কটা ওড়াছি না। শিল্পের মূল মন্তব্য হল শিল্পে হবে। কিন্তু আমের  
নে এই ট্রাটের প্রতিও প্রবণতা রয়েছে, লোক আনন্দ পাচ্ছে—সেটা কেন স্বীকার  
রা হবে না?” রামকিংকর

২।

সালটা সম্ভবত ৫১। তখন আট স্কুলের ছাত্র। তখন গরুরে আবেগের  
রস। কবীর উপর রাগ করে চলে গিরিহিল্লাম শাস্তিনিকেতনের পৌষমেলায়।  
য়ে কবল। পকেটে ফাউন্টেন পেন। হাতে কিছু কাগজ, স্কেচ করার। গুলন  
নৌছ, মেলা দেখছি, আড্ডাও চলেছে, তারই ফাঁকে ফাঁকে চলেছে স্কেচিং।  
গড়েন্দুপনের নিজের টানে রেখা। আর নিবের পিঠে বড়ো আঙুল ঘষে সেই  
গিলতে দরকার মত শেড। সেবারে সদা আলাপ হয়েছে তিন জলজলে  
বকের সঙ্গে। অমিতাভ চৌধুরী, এখন যিনি ডাকসাইট সাংবাদিক। অমর্ত্য  
দন, এখন যিনি দীক্ষারী অর্থনীতিবিদ। আর বৃষ্টিপাত প্রশান্ত শ্রুতময়  
ঘা। স্কেচগুলো দেখে অনেকেরই ভালো লাগেছিল। অমিতাভ দেখেই বললেন—

—চলো।

—কোথায়?

—কিংকরদাকে দেখাযো। আসল লোক, যার সার্টিফিকেট পেলে বুঝবে,  
কিছু হয়েছে।

ভরে আশ্চর্য। কিংকরদা মানে রামকিংকর? শাস্তিনিকেতনের বাগানে যার  
সব পূর্বসূরী মূর্তি? সর্বনাশ! অত বড় শিল্পীর কাছে আমকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে  
কেন? অমিতাভর আশ্বাস—

—মানুষটাকে আগে দেখ, তারপর বুঝতে পারবে কেন নিয়ে যাচ্ছি।

মানুষটাকে দেখলাম। কালো পাখরের একটি জীর্ণ ডাক্ষর। খালি গা।  
গরনে আত্মমল্লা লুটি কিংবা খাটো-খুলের পজামা, বে-রকম পাজামা পরে টোকা  
পাখার নন্দলাল হেঁটে যান গুলবাবীর ছায়ায়। লজ চোয়াল। সামনে এগিয়ে  
রাস টেট। পেশাবিহীন অটসাঁট শরীর। চোখ দুটো যেন বৃদ্ধ হয়ে আছে  
কসের কোমর। বে-রকম রোজ দেখা যার সে-রকম কোনো মানস নয় যেন।  
গদের চেয়ে আদম, তাদের চেয়ে অনেক বেশি অকৃত্রিম, স্বাভাবিক।

চোখটা পঁচিশেক স্কেচ। প্রত্যেকটা মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন। আর  
নিম্ন দেখতে লাগলাম তার ঘর বাড়ি, তার জীবনযাপনের পরিবেশ। গৃহসম্মান  
লতে যা বাকি তার চিন্তায় নেই কোনমানে। কুড়েরের মতো একটা ঘর।  
ভতরে একটা চৌকি। চৌকির উপর অতি সাধারণ বিছানা। দেয়ালে দেয়ালে  
সোন-মেরো-গাখা দরজা-সমান অয়েল পেন্টিং। এমিক সেরিক ডাক্ষরের  
কল্লো-টাকার। বাস্ট একটা। জিন্সা স্বাধীনতা বৃত্তীর মূখ্য। এইভাবে  
হতে ধরে চোখটা চলে গেল চৌকির নীচে। সেখানে মেঝের উপর ভাঁই  
য়ে পড়ে রয়েছে হাজার খানেক কিংবা তারও বেশী চিঠিপত্র, খাম-পোস্টকার্ড-  
পেন্সেল-প্যাকেট সব মিলিয়ে। মনে হল অনেক চিঠির গায়ের প্রাপ্তকের হাতের  
ফিঙ্গারপ্রিন্টও পড়ানি এখনো।

চাপা গলার অমিতাভকে জিজ্ঞেস করলাম—

—চৌকির নীচে এত চিঠি জমা হয়ে আছে কেন?

—এখানেই তো থাকবে। কিংকরদার চিঠি আসার থাকবে কোথায়?

—দেখে তো মনে হচ্ছে অনেক চিঠি খোলাই হয়নি এখনো।

—কিংকরদা কি ওসব খুলে পড়বে নাকি? ওর মধ্যে সেন্সিটিভেন্সের নিয়ন্ত্রণ  
পর আছে, আত্মমারাত্মকের কত প্রশস্ত আছে, বুঝলে দু'চারটা চেক-টেকও  
পড়বে। বাবে হয়েছে।

অমিতাভর এইসব কথার গয়ে মিশে ছিল এক ধরনের তরল হাসি। কিন্তু  
আবার কয়েক সর্বস্বী ধাঁধার মতো। কিংবা আশ্বিনাস কোনো বৃশকথা। আমাদের  
এইসব চাপা-গলার চিঠির-মিঠিরের মধ্যেই কেলে উঠল রামকিংকরের ভীষ। ভয়ট  
কণ্ঠস্বর।

—এই যে এটা একেছো...

এগিয়ে গেলাম কাছে। কেন আঁখিটর দিকে মাছ।

—এই যে এটা একেছো, এটা ঠিক হলনি।

রামকিংকরের হাতে তখন কেসেচ, সেটা একটা মালকোঁচা-মারা বাদা  
সিওতালোর। তার হাতে-মুখে একটা বাঁশী। সেটা বজাচ্ছে। আরও একটা বাঁশী  
আর দুই জন্মের ফাঁকে গেছো। রামকিংকর সেই জন্মের ফাঁকে গুলে রাখা বাঁশীটার  
দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—

—এটা স্বপ্ন দেখা উচিত ছিল। ঠিক হলনি।

কিটগড়ার দমিনে সাক্ষীর গলার আমি বললাম—

—হেলোটর এখানে একটা বাঁশী ছিল।

—সেটা তো বন্ধতে পেরেছি। তুমি মন থেকে আঁকনি। কিন্তু রিস্টারিটর  
সক্টাই কপি করতে নেই। কিছু ছাড়তে হয়, বাদ দিতে হয়, জড়তে হয়।  
কেউ কেউ তো মনে করতে পারে ওটা বাঁশী নয়, হেলোটর নুঁদ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।  
কনিফিউশন হতে পারে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।

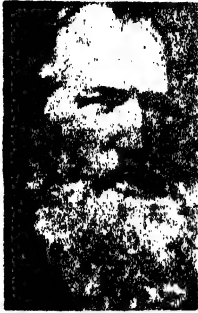
পাখর ফাঁকির বে-করার নামে, করন-করালোর মতো সেই হাসির সঙ্গে এ  
আমার প্রথম সাক্ষরকার। কলকাতার তখনো পশ্চিম বে-সব হাসি দেখেছি, সেগুলো  
চাম্পিয়নের মর্সিরে ভেসে মতো চাপা এবং মর্চিক। তাই চমকে উঠেছিলাম  
প্রথমে। অজ্ঞান আর হাতি নরতো এটা? পরে, কেল কিছু পরে, বুকে গেলাম এই  
হাসি হল সভতার সেই প্রথম যুগের সমবেত বিজয়-উৎসবের লামা-দৃষ্টান্ত  
বোল।

এরপর অমিতাভর অনুরোধে তিনি খুললেন তার কিছুকাল আগের শিলাং-  
সিঁদুরের ছবিগুলো। সবই ওরারকালার। প্রথমে মোটা রাশে রঙ চাপির পরে



প্রতিকৃত (স্কেচ)—পূর্ণেন্দু পত্নী

১৯২ বছর পরে দুপ্পাপা গ্রন্থ



রেভারেন্ড জেমস লওর

## প্রবাদমালা

১ম খণ্ড (প্রথম প্রকাশ ১৮৬৮)

২য় খণ্ড (প্রথম প্রকাশ ১৮৬৯)

৩য় খণ্ড (প্রথম প্রকাশ ১৮৭২)

রেভারেন্ড জেমস লও বাঙালির নিকট প্রধানতঃ 'নীলদর্পন'র ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের জন্য দত্তিত 'পাদ্রী লও' নামেই সুপরিচিত। এ পরিচয় নিশ্চয় সম্মরণীয়। কিন্তু জেমস লওর পরিচয় আরও অনেক দিকে। এ দেশের মানুষের শিক্ষা-সভ্যতা প্রভৃতি নানা গবেষণায় ছিল তাঁর অক্ষুণ্ণ জিজ্ঞাসা। দেশী-বিদেশী প্রবাদ-সংগ্রহ তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ। প্রবাদ-বিষয়ে প্রবন্ধ-ভালিকা প্রণয়নে যে আধুনিক বিদ্যা গঠিত হয়ে উঠেছে তার মধ্যে জেমস লও পৃথিবীরই অন্যতম পথিকৃত। শতাধিক বছর আগে লও সংকলিত 'প্রবাদ-মাল্লা'র তিনটি খণ্ডই আজ আমরা বাঙালী পাঠকদের কাছে নিবেদন করলাম প্রথম খণ্ড : বারো টাকা, দ্বিতীয় খণ্ড : দশ টাকা, তৃতীয় খণ্ড : পনেরো টাকা।

## আশাপূর্ণা দেবীর

সাদা জাগানো উপন্যাস

## সাপের ছোবল

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল ॥ ১০.০০

ভক্তিমূলক রচনা

গোবিন্দী ভূজসীদাস : রামচরিতমানস ও দোহাবলী  
সম্পাদনা ও ভাষান্তর-জ্যোতিভূষণ চাকী  
৩ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ৩০.০০  
সনৎকুমার গুপ্ত সম্পাদিত দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ ১২.০০

## মহাশক্তি দেবীর

## মূর্তি

নতুন মূল্য উপন্যাস

মূল্য : নয় টাকা

নবপত্র প্রকাশন

৮ পটুয়াটোলা মেন, কলি-৯

কনট্রের বা স্বইন্দ্রিয়ের রেখা টেনেছেন এই কটা রেখের বা খেঁবেই চাইনিজ কালিতে তুলির বাটের পিছন দিয়ে। ফলে কোথাও কোথাও রেখের ছল পেয়ে চাইনিজ কালি ছাড়িয়ে গেছে ফানের মতো, শিখরগুলো শিকড়ের মতো। যা হতে পারতো মানবমুগ্ধকর দৃশ্য শৃঙ্খল। এই নিয়ম ভাঙলে ফলে তা হয়ে উঠেছে অনেক বেশী প্রাকৃতিক, আরো অরণ্যগম্ভীর, এক এলিমেন্টাল। শিল্প যেন নড়ছে, চড়ছে, দলছে গাছ, হঠাৎই মেঘ, রক্ত বদলাচ্ছে রোদ, গাছ শিকড় নামাচ্ছ মটতে, খসে পড়ছে কিছুর, কেউ যেন জড়িয়ে যাচ্ছে কারো সঙ্গে আলিঙ্গনে-মগ্ধনে।

এ এক দিনের আলোপে আমার অভিজ্ঞতার সংখ্যা হল চার।

১। চিত্রকলা কাস্তুরের হুকুম অনুকরণ নয়।

২। কটা রেখের উপর চাইনিজ কালির রেখা টানলে সেটা জড়িয়ে ভিটিয়ে ভেঙেই হয় এক আকর্ষক আদিমতা।

৩। তুলির বাটের পিছন দিয়ে রেখা টানলে তা হয়ে ওঠে অনেক গতিশীল, স্প্রিং, সরল, সবল এক বৈদ্যুতিক বলকের মতো রূপবান।

৪। পৃথিবীতে কিছু কিছু মানুষ জীবনব্যাপন করেন না, জীবন সৃষ্টি করেন শুধু।

॥ ৩ ॥

সেমান প্রসঙ্গে রামকিংকর—

১। "সেমানের হাবির ভিতরে ঢোক যার, কেননা সেমানের হাবি রাস্ট নয়, ওত ভালুম আছে।"

২। "পাশ্চাত্য হাবি অনেক দেখেছি, সেমানকেও ভালো লাগে, কিন্তু সম্প্রতি একটি পট্টকতে দেখলাম যে আমি নাকি হল'ছ—সেমানকেই ভালো লাগে। তা কিন্তু না, নট সেমানারিল, তবে সেমান কিউকিমটাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন।"

রামকিংকরের প্রসঙ্গে সেমান :

১। "ভরা কিছু নিসর্গচিত সেমান প্রতিভাবান। বাংলাদেশের মাঠে নদীতে যে আলো, তাকে প্রতীচা প্রিয়মে ভাগ করায়, ভাঙার এই নিদর্শনগুলি আমাদের উপকারী সম্পদ।"—গণেশ পাইন।

২। "রামকিংকরের কোনো কোনো ছবিতে—যেমন ১৯৪৪-এ অঙ্কি হলসের ছোপ-মাখানো নীল-সবুজ-লাল-ককেশ—সেমানের প্রভাব চোখে পড়ে..." —প্রবন্ধ, দালগ স্তঃ

৩। "In most of his paintings there is a happy and unself-conscious co-mingling of impressionist light, Cezanian space, cubist plains and transparency and the verve of oriental calligraphy"—Ratan Parimoo.

৪। "Some of these (watercolour studies) have a slightly Cezannesque feel because of the treatment!"—Jaya Appasamy.

॥ ৪ ॥

খরার দেশ বাকুজ আমাদের দেশের শিল্পকলাকে উপহার দিয়েছে দুই প্রথম প্রতিভা, ঘামিনী রায় আর রামকিংকর। দু'জনেই আজন্ম শিল্পী। দু'জনেই শিল্পী হয়ে ওঠার প্রাথমিক প্রেক্ষা স্থানীয় লোকশিল্প। ঘামিনী রায় গোড়ার পাশ্চাত্য বা রুশোপীয় করণ-কৌশলে যুরোপীয় হাত পাঁকিয়েও একদিন কপিলাবস্তুর রাজ-কুমারের ভঙ্গিতে সুখী-স্বামিনের সমস্ত সংস্কারকে পিছনে ফেলে চলে এলেন বাংলার লোকশিল্পের কাছে, মাথো অনুকরণের জ্বালা বদলা থেকে নিজের স্বাধীন মস্তিষ্ক প্রাণবন্ত। তার দীর্ঘ জৈবনিক তপস্যায় যুগ্ম হয়ে বাংলার লৌকিক পট একদিন তার হাতে তুলে দিল চূড়ান্ত শিল্পাভিত সোনার কাঠিটি। দীর্ঘ-বৈবীপ ঘামিনী রায়, সেই চারিটি পাওয়ার পর হয়ে গেলেন শান্ত, সমাহিত, স্থিত। রামকিংকর সে-রকম কোনো ছবি খেলেন না তাঁর জীবনে। সেলেনা তার কারণ তিনি কোথাও স্থিত হতে চাননি, আর শান্ত-সমাহিত জীবন দি। তাঁর পক্ষে অকল্পনীয়। যেমন তাঁর প্রবল প্রণামতম্ব হাসি, সেই রকমই প্রব। এলিপান ছাড়িয়ে তিনি ধরতে, ছুঁতে, ঘটিতে, নিড়েতে চেয়েছেন শিল্পকলার সবখানের সব কিছুকেই। নিজের এক অপ্রকাশিত আকর্ষণে তিনি নিঃশ্বাস বহলে গেছেন—

"জীবন অনেক মেয়ে এসেছে, কেউ স্বে 'নয়, কেউ মানসিক ভীরু আকষণ নিয়ে। কিন্তু ছাড়িনি কাজকে। ধরছি, আবেগপূর্ণে ধরছি। হজম করে ছিবড়ে করে ছেড়েছি। হজম করার মানে জানো? ও মনটা আমার গুরুদেবের কাছে লেখা। তাঁর থেকে জন্ম নিয়েছে আমার অনেক ছবি, মূর্তি, অনেক কল্পনা, আর অনুভব।"

ঠিক এইভাবেই শিল্পকলার ক্ষেত্রে পৃথিবীর যেখানে যা কিছু জীবিত, যা স্পন্দিত করে চলছে সৃষ্টির জগৎ, তার সব কিছুই দিকেই কখন যেন আড়চোখে তাকিয়ে নিয়েছেন তিনি। গোপনে কখন যেন শব্দে নিয়েছেন তার গম্ব, চিবিয়ে নিয়েছেন শব্দ, শব্দে নিয়েছেন একবারে ছিবড়ে করে তার অশ্লিষ-মঞ্চ। রবীন্দ্রনাথের বাংলা কবিতার জীবনানন্দ বা, আর ঠিক যেভাবে তিনি দেশান্তরের সাহিত্য থেকে শব্দে নিয়েছেন অন্তরপ্রেরণা, বাংলা কবিতার আকাশকে টেনে ছাড়িয়ে নিয়েছেন পৃথিবীর অনেক দূরের আকাশে; অকীর্ণ-নন্দলালকে যুগে যুগে কিংকরের যেন ছিল সেই রকমই আত্মনন্দমান। জীবনানন্দের কবিতার দিকে তাকিয়ে আমরা কেউ হরতো কখনো দেখছি ইয়েটস কিংবা পোর-এর ঠিকের দারিত, কখনো বা কীটস-হাইম্যানের এক কলাক আলো; ঠিক তেমনি ভাবেই আমরা রামকিংকরের ছবিতেও শব্দ পাই সেমানের, শিকারের, গানের হঠাৎ আলোর কলকানি কখনো কখনো। আমাদের মনে গরম দুইয়ের ফেনার মতো উথলে ওঠে তখন এই সব অসংখ্য জিজ্ঞাসা—তিনি কি কিছুই? শেষ পর্যন্ত কি শব্দ-

গলিফের দিকে ঝুঁকতে চেষ্টাছিলেন তিনি? আব্বাসজাদী আটের দিকে কি ছিল র' মাড়র টান? অকবীন্দ্র-কলশালের অনিবার্য প্রভাবকে এড়িয়ে বাওয়ার জন্যই তিনি কোণী করে ঝুঁকতে ছিলেন ওয়েস্টার্ন ধারার দিকে? শেষ পর্যন্ত কোনো উত্তরই কাজে লাগে না আমাদের। কেননা তার আগেই, ৬ নম্বরে হয়ে তার সমগ্র শিল্পকলার দিকে তাকাই যখন, ঠিক জীবনানন্দের হৃদয় মতোই আমাদের চোখে ধরা পড়ে বার, পৃথিবীর নানা কিছ' আলাব' রও তিনি সগোঁসে শব্দীর এক সন্দেহাতীতরূপে বেলজ।

৫।

শিল্পচাত্তা শিল্পকলা প্রসঙ্গে রামকিংকর—

১। “অনেকেই ওয়েস্টার্ন ইনফ্লুয়েন্সের কথা বলেন, কিন্তু ওয়েস্টার্ন ইনফ্লু-  
ন' বলতে একটা ভরানক গোলামাল হয়ে যাবে, আমাদের এটা তুল' কিন্তু এক  
ক দিয়ে। যেমন ধরুন, আমাদের শিল্পকলা। এটা কি ওয়েস্টার্ন?”

২। পিকাসো আমার চিরদিনই ভালো লাগে। শিল্পতাত্ত্বিকভাবে এই সব  
রস্টার্ন মাস্টারদের ছবি দেখার কোনো অস্বিকি ছিল না, খুব ভালো প্রিণ্ট  
ল এইখানে, বইও ছিল কতো। এই যে পিকাসোর কল' কলছেন, ওরও তো  
ককোই অ্যাকাডেমিক্যাল, স্টুডেন্ট হিসেবে নাম করছিলাম, ভালো হাত ছিল।  
র থেকেই ডারী (Vase) করেছি।”

৩। পিকাসোর যেমন ভান্ডা ভান্ডা গড়ন সব, দেখেছ তো? ওই সবার মধ্যে  
রয়েটাল ছাপ আছে অনেক। মজার, মজার, অর্থনিক।”

৪। ডাইমেনশন মানেই হচ্ছে, সামনে যেটা দেখছি, তার পিছনটাও যে আছে,  
ই পিছনটিকে ফাঁলিগো ফোটাও। কিউবিজম' বাপ্তরররও ছিল এইখানেই।

কি? কিউবিজ ছবিতে দেখবেন দু'রকম ভাবে মন্থ আঁকা। এটা অবশ্য  
ধুনিককালের সর্টি এই কিউবিজম-এ শব্দ নয়, চিরকালের কথা।  
প্রত্যতে দেখবেন, আরম্ভে তুল' অচিরেই মেরে। তিনটে ফিগার। তার  
টা উল্টে দিয়েছে, তলার প' দেখা যাচ্ছে। তা এটা তে সেকালের জিনিস,  
জকাল করলে কলা হতো খুব মজার হয়েছিল, কিউবিজ হয়েছে—কিন্তু তাতে  
। এখানে সব দিকের ডাইমেনশন একসঙ্গে ধরতে চেষ্টাছে। কিউবিজম-এও  
টা করা হয়। পিকাসোর ছবিতে দেখুন, তিনটে চোখ, ক্লোথও নাকটা সোজা  
নে পাশে চালিয়ে দিয়েছে। চোখ যা নাকের ঠিকখুলেনেসটা আছে কিন্তু।  
৬ দিকের দেখাটাকে একসঙ্গে ধরে রাখাটাই কঠিন। এতে প্রোটাল এফেক্ট কিন্তু  
বাস্তবটুকু হয়ে যায়।”

৫। “কিউবিজ আবার অন্যভাবেও বোঝানো যায়, কোনো জিনিসের, যেমন  
মন এই বইটার, তিনটে সাইড দেখা যাচ্ছে, তার এধারটা এরকম, ওধারটা অন্য  
ম, আরেক ধার আরেক রকম, বইটা অক্ষিতে গেলে তিনটে ধারেরা শেপ' কি রকম  
ব' অ' হলে ভাবুন। এই রকম দৃষ্টিভঙ্গীতেও কিউবিজম এসে যাচ্ছে।”

৬।

এখন আমাদের জানা হয়ে গেছে যে রামকিংকর দুটো মানুষ। তার দুটো  
ভার একটা দিন আর একটা রাত। দিন ফুটেছে তার ছবিতে। রাত ডান্ধক'।  
না হয়ে গেছে, কারণ তিনি নিজের জীবনের গেছেন ঐ রকম কথা—

“জীবনের উদ্যানে যেটা দেখি চোখের সামনে দ্বিনের আলোর তা ছবিতে আঁকি,  
র যা টাট' করি অশঙ্করে তা শব্দপটের করি।”

ছবি আর ডান্ধকের কথা বাদ দিলেও দিন রাতের দুই রামকিংকরক' অন-  
বেও দেখেছি আমরা, দেখেছে শিল্পতাত্ত্বিকেরা। দ্বিনের রামকিংকর গ্রীষ্মের  
রূপ দ্বিনে দিনে, আগুন-ঝরনা রাসের মধ্যে গড়ে চলছেন ডান্ধক'। আর  
রতের রামকিংকর মধ্যরাতে তাঁরা দরজা গলার সমস্ত জানলা-দরজা খুলে দিয়া  
বিস্তরপাতি গাইতে গাইতে হেঁটে চলছেন ঘোরাই-এর দিকে। দ্বিনের রাম-  
কিংকর তাঁরা ছায়েদের ধমকাজেন তারা বৈসিক স্ট্রাকচার লেখেন বলে। রাতের  
রামকিংকর ছায়েদের পরামর্শ দিচ্ছেন—কাল রাত্তে যে যা স্বপন দেখেছো তাই নিয়ে  
কটা কিছু তৈরি করে।

দিন এবং রাতের এই দুই শিল্পী মিলেমিশে এক। যেন এক ডালে  
পানিকলার দুই পাখি, স্বয়' স্পর্শ, একটা বৃষ্টির অনাদি জাগরণ। আবার এই  
য ও জাপক' ভর করে আমরা যদি চলে আসি চেতন এক অবচেতনের প্রসঙ্গে,  
রামকিংকরকে কোয়ার সেটাও পেয়ে যাব' তাৎপর্ষের মহিমা। চেতনেও তিনি,  
ব্যবচনেও তিনি। যখন সময় বা ইতিহাস-চেতনাকে শিল্পী তিনি গড়ছেন  
ভিত্তিগল্লা, কালের বাক্যে সংসার এবং শিল্পাধনে বকু' নিয়ে চলা সাঁওতাল দলপাতি,  
রলের ভেঁ শনে ছটে চলা সাঁওতাল রমণী, ধান ঝাড়ের বশত কুক্ক, অঁকছেন  
মুখ-মালা, বন্যার বিপন্ন মানবের ছবি, তার লিনেকাটে ফেটে পড়ছে দৃশ্-  
মণ্ডিত মনকর্মিতর বাঁধনস-বিকৃত মন-ছবিদের আভ' হাছাকার, তার স্কেচে ধরা  
রুখে সাধারণ মানবের মৈনিক জীবনবাপনের ধাম-রঙ, হাসি-ক্লম, শোক-সত্যাপ,  
মালম-কেনা, ফুঁত-উজাস। সেই সব মানবের হাড়-শেড়, অস্থিমজ্জা, চোয়াল-  
স্বক, বাহ-পতনের দিকেই তাঁরা যেন অধিকতর ভালবাসা, ধারা হিম হয়ে আছে  
সদেও, বাদের নিরাম জীবনের প্রত্যেকটি মহত্বই সংগোষে জীববিজ্ঞান। এই  
জীববিজ্ঞানতার চেহারে অথবা ধারণা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখি তিনি  
নির' জীবকে কোথাও অশব্দ করে না জড়ো, জড়র নান' করা জড়ো, নানা কোণে  
যিক ডাগ করে, ডান্ড কাচের টুকরোর মতো ছড়িয়ে-সরিয়ে দিতে চাইছেন  
ব' সময়।

তাঁরা বাস্তব-বোঝা ছবিতে ঘুরে ফিরে আসে আরও একটা মোটিভ। সেটা



কলসী কাঁখে বলিষ (জল রং)—রামকিংকর

শিল্পের। তাঁরা সাঁওতাল রমণীর স্কালপচারে আমরা দেখেছি একটি নায়ট্রে  
শিল্প ছটে চলেছে মারেকের পিছন-পিছন। আবার সেই রকমই এক শিশু বকের  
মধ্যে জব্ব্ব, গুড়িসিঁড়ি মেরে বসে রয়েছে সাঁওতাল দলপতির ডান্ধক'। তাঁরা  
নানা অয়েল পেণ্টিংয়েও দেখা যায় এক অদ্যুত অবহেলিত রুশ শিশু কখনো  
আঁকড়ে আছে জননার শূকনের স্তন, কখনো পড়ে আছে ধান ঝাড়ের দৃশ্যের  
এক কোণে ভিত্তি মটিতে, পড়তে থাকে গ্রীষ্মের গনসনে দুপুরে কোনো কোনো  
শিশু জড়িয়ে থাকে মায়ের পা, মা যখন ধন জাটেছে মাটে। মা এবং শিশু এই  
নামে একটা ডান্ধক'ও রয়েছে তাঁরা। হাট, মূড়ে কলা মা আর সেই মায়ের  
দিকে, মায়ের সর্বশা পেরে সাপের মতো, গরুর শিকড়ের মতো উঠে যেতে  
রাইছে একটি শিশু। এরকম ভরানক ডান্ধক' খুব কমই দেখেছি আমরা। যেন  
মা নয়, শিশু নয়, পৃথিবীর আদিমতম কোনো জীবজন্তুর কংকাল অথবা ফসিল।  
মৃত-শতাব্দীর মাটির তলা থেকে উপড়ে তোলা কোনো গাছের গুড়ি হয়তো যা,  
পড়ে-গলে-মট হয়ে গেছে যা অনন্তকাল আগে। আবার এমন ডান্ধক'ও রয়েছে  
বেখানে শিশু নেই, ল'ই মা, ল'ই একটি রমণীর আঁক, কুরা হাড়-কঙ্কালসার  
রাক, কুল, কদম, মূর্তির মন্ত্র সবচেয়ে পশ্চ, পাকা ফলের মতো রসালো ফুঁ  
কলে রয়েছে দুটি স্তন। কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসা দুটো চোখ আর  
দুই ভান্ডা চোয়ালের মজাধানে বিস্তীর্ণ করাল হাসিটির দিকে তাকিয়ে আমরা  
বকতে পারি না একি অদ্বৈতবর্তী শিল্পর জন্যে আহ্বান, না পৃথিবীর শিল্পদের  
মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে মৃত্যুর লক্ষ্যহীন বিলাপ? কতবের অথবা চেতনার  
রামকিংকর তাঁরা অনেক ছবিতেই আমাদের আধুনিক দেশকাল সম্বন্ধে তাঁরা চোরা  
হাসিটিকে এইভাবেই লুকিয়ে রাখেন তাঁরা ছবিতে, ছোরা যেমন করে লুকনের  
থাকে খোদাই-করা খোপে।

অবচেতনের রামকিংকরও আরও জটিল এবং ভয়ঙ্কর।

তাঁরা সপো বছর চারেক আগেও এক সাক্ষাৎকারের কিংবা থেকে উদ্ধৃত করছি  
একটু। সাক্ষাৎকারের সময়ে রামকিংকর মাঝে মাঝে এসেছে তখনকার  
একমাত্র নিভরশীল বন্ধ' এক ছাত্র কক্সারও সঙ্গাতোষি।

শ্রোণী এক মনিষেরী মেয়ে এসেছিল। রাজসর্গবাদের মেয়ে। রাম-  
কিংকররা ওই মেয়েটার একটা শ্রেণীট' করেন। যদি মাঝে মাঝে, ব'কতে পরবে,  
কী সাংঘর্ষিক কল' ওটা। মেয়েটা ক্যানভাসটা যেন জ্বলছে। জীবিত। আগনের



#### কম্পোজিশন (জলরং)—রামকিংকর

মতো। চোখ দুটো ঠিকরে আসতে চাইছে যেন। এই রকম লাইভলি কাজ আমি দেখি নি।...মানে প্রচণ্ড একটা জ্ঞান ছিল। রামকিংকরের মন অই প্রজেক্টেটা দেখলেই বোঝা যায়—ভেতরের, সম্পূর্ণ সাক্ষরশাসনের মান খটকে টেনে বের করে আনা একেবারে। মোরট চলে যায়।—সিদ্ধার্থ রায়, রামকিংকর

আর এই প্রসঙ্গেই আমাদের স্বাভাবিকভাবে মনে পড়ে যায় তাঁর প্রিয়তম ছাত্র এক ভারতীয় শিল্পের ক্রমতে প্রতিষ্ঠান ডাক্তর শংখ চৌধুরী কিছ্ কিছ্, উচ্চ উত্তম অভিজ্ঞ। এই অভিজ্ঞতার সূত্রেই আমরা ব্যক্তি পেতে থাকি, যে এলিমেন্টাল প্যাশন রামকিংকরের ডাম্পক এবং ছবিতে অগিরেছে এক প্রাণময় গতি, অস্থিরতা, সেই প্যাশনেই তাঁকে, শান্তিনিকেতনের সেই অরুণ্ডের হাওয়া কিছ্ পরিবেশে, কী ভাবে উন্মোচিত করেছিল জীবনের অবচেতন-সত্যকেও নিজের সৃষ্টির বিজ্ঞ হিসেবে বেছে নিতে।

‘স্বচ্ছন্দ্যপ্রাণ কটিকাসহীন মূর্তি বা যৌন্যগল কখন ডাম্পক’ পরিণত করার অসীম সাহস দেখানোর স্পর্শ সহজে মনে নেওয়া সহজ নয়, এক তা স্বভাবতই হয়নি। নন্দলাল প্রায়ই যে কমার আদর্শ প্রদর্শন করেছিলেন, সেটা ঠাই গুরু। যদিও দু-একটা কাজ আত্মকাসী ও ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টির অঙ্গচর সরানোও হয়েছিল। রামকিংকর এই ধরনের শিল্প করার সময়, কাল ও স্থানের গণ্ডী পার হয়েছিলেন কোনো উৎসাহ বা পরিতোষকের প্রত্যাশা ব্যতিরেকে। ঠিক শিল্পপ্রয়াস অদ্বিপ্রাণিত হয়েছিল তখনকার কণ্ঠস্বরে, লোকসম্মতি ছাড়া মজাঘা বাধাধরা প্রাণহীন সন্দরতার বন্ধনমুক্ত হওয়ার। সেখানে তিনি বিরোধী হলেও, সেই বিরোধের ইশ্বর রবীন্দ্রনাথের স্বতস্বয় ছাড়া নতুনত্ব ও অকাল্পিত-নাথের কৃত্রিম কাটামের অভিনব প্রণালীতে সমাহিত ছিল।...নন্দলাল ছিলেন রামকিংকর-অভিষেকের ভর সাধক, বিনোদবিহারী কই পড়েছেন প্রচুর, জানা পণ্ডিত, সব কাজ আধুনিক রীতিতে মাগজাক করে করতেন। রামকিংকর সেখানে সাধক কাগজিকের মতো মাংসপেশী নিড়ে ছবির রস বর করেছেন, নয়, শুধু, অস্থির কংকাল দিয়ে স্ফালচার করেছেন।—শংখ চৌধুরী।

অভিজ্ঞান যেটে পড়েছে আরও এক শিল্পীর রচনায়। সে রচনায় চোখ পড়লেও আমরা দেখতে পাই এক বিরোধী রামকিংকরের ছবি, যিনি ধর্ম-বান্দা বিষয়ের সীমাকে অতিক্রম করে চুকে পড়তে চান জীবনের মর্মমূলে, প্রশংসা করতে চান জীবনের আদিমতম সমস্ত পিপাসাকে মরাল রোম্বিকশনের যাকতীয় কীটাতারের জেঁজালি ছিঁড়ে ফেলে।



‘রামকিংকরের একটি অস্বাভাবিক ডাম্পক’—হারভের্ট টে। একটি মার্জিনাল নন্দ নারীমূর্তি ধন বাড়ছে—সেটা এখন দেখা যায় না। ঠিক আরও কিছ্ কাজের মতো এটিও গোপনে সরিয়ে ফেলা হয়েছে? কারণ—অশ্লীল? কি অশ্লুত মানসিকতা? মোট কথা রামকিংকরের সব কাজেই একটা অগাধ শ্রেণি লুক করা যায়। তা ছাড়া আমার নিজের ধারণা রামকিংকরের কাজের মধ্যে ‘সেক্স’ প্রাধান্য পড়েছে। কাজেতে ভুল স্বপ্নে নো, আমি রামকিংকরকে নিছক ‘এরোটিক আর্টিস্ট’ বলতে চাইছি না, বরং বলা যায়, তাঁর কাজ একেবারেই অহতুক ‘সেক্স’-এর প্রসঙ্গ নেই। রামকিংকরকে যা আকৃষ্ট করতো তা হচ্ছে গাভীর শ্বাভাবিক অপ্রতিপত্তা সেক্স-এর ক্ষমতা। কারণ, সেক্স হচ্ছে, আর কিছ্ না হোক, এক ধরনের এনার্জি। শান্তিনিকেতনের আকাশেওরতে না থেকে রামকিংকর যদি আরও একটু মুহূর্ত পরিবেশ অরুণ্ডে, তবে ‘সেক্স এজাজ’—এই অফ এনার্জি-র প্রকাশ ঠিক কাজে আরও বেশি ধর পড়তো।—হারভের্ট টে।

এইখানে এসে আরও একটা নতুন প্রশ্ন কড়া নাড়ে আমাদের ডাকের দরজায়। তাই সমস্র, নানা সাক্ষরকারে রামকিংকর শিল্প সম্পর্কে কত কথা বলেছেন তার ভিতরে অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলালের সঙ্গে তার কঠিনত সম্পর্কের কথা রয়েছে ছবিতে ছবিতে বেশ কিছু, কিন্তু তাঁদের শিল্পসৃষ্টি সম্পর্কে রামকিংকর কীভাবে গেলে এরকম নীরবই। অথচ রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রসঙ্গে তাঁর আধা উচ্চাস কেন অফুয়ান। এটা কেন ঘটে? রবীন্দ্রনাথের ছবির যাবতীয় নিয়ম-ভাঙা অনাসৃষ্টি-অকণ্ঠে, তাই আন্দোল-বিস্ফোরণই ঠিক তাহলে ছিল তাঁর সৃষ্টি-উদ্ভাসের প্রধানতম প্রেরণ এবং সাহসী দাপটের উৎস?

একবার দিল্লী যাওয়ার পথে এক আদিবাসী রমণীর যৌবনের টানে রামকিংকর হঠাৎ তার সঙ্গে নেমে গিরিহিল্লোল এক অজানা টেঁশনে। দীর্ঘ দিন তিনি বোকা। হঠাৎ একদিন শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছল এক ঠিকানাবিহীন টেলিগ্রাম—“I lost myself, search myself.” এমনিভাবে বারবারই নিজেকে হারিয়েছেন রামকিংকর কখনো প্রেম, কখনো গানে, কখনো নটকে, কখনো মগ্নসম্মার, কখনো মোহমে-কল্লোটে, কখনো পাখো-হুইটে-হাড্ডীতে, কখনো কানডানে-অয়েলে, কখনো কাগজ-রঙ, কখনো সিনের রোসে, কখনো রাতের জ্যোৎস্নায়, নিশ্চয় চেতনে কখনো, কখনো উল্লস অবচেতনে।

#### ১১ ৭

রামকিংকরের রচনা রবীন্দ্রনাথের ছবি প্রসঙ্গে—

১। ‘রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে বিশেষ কোনো রিআকশন’ হয়নি এখানে। এখানকার লোকে আর ভাল মন্দ কি কলবে? শুনেছে পারিসে ভালো বলেছে আর খারাপ বলে কি করে? ঠিক ছবিগো বোঝে মজার; নানা রকমের, হাইমাসক্যাল তো...নানা ধরনের ফিগার একেছেন, বস্তুও বিচিত্র। তবে দু-একটা জিনিস একটু স্টিরিও-টাইপ হয়ে গিয়েছে, যেমন—নাক, সেটা কখনো কলারায়নি, একই রকম রঙে গিয়েছে সব ছবিতে। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে রঙের বহুর দায়, নাচারাল কালার আনবার চেষ্টা করেছেন, যথেষ্ট কভারেজ ছাড়া বস্তু দেখবেন—ঠিক যেন মৌ ফলের রঙ। খুব কড়া অকজারভেশন ছিল কিন্তু। রিআলিস্টিক ছবিও কোথাও কোথাও আছে, টার্নট লঞ্জে একটা ছবি দেখলাম, নাচের ছবি, বেশ রিআলিস্টিক। নিজের ছবি অথবা সেলফ পোর্ট্রেটও সন্দর্ভ। সব মিলিয়ে বেশ আশ্চর্য বস। কুমারস্বামী রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্পর্কে দু-লাইন লিখেছিলেন, ‘ওর ছিকালো ন্ট চাইন্ডিস ব্যট চাইন্ড লাইক’। তাছাড়া, রস না থাকলে এতদিন ধরে যে ছবি অর্কসেন—প্রায় দশ বছর—, তা কি সম্ভব হতো।’

২। ‘তখন তো ঠিক শেষ দিকের অবস্থা। ঠিকে দেখতাম নানা অন্তর্দানে, মাল্টি-পার্সপেক্টিভ। আমরা কাজ করতাম। উৎসাহ, উৎসাহ, আসত তাঁর কাছ থেকে, উৎসাহ, করে যাও, করে যাও।’

৩। ‘রবীন্দ্রনাথের ব্যস্ট কর্তেই যে বছর সেই বছরই উনি...বান। সংস্কার আছে যে কাজে ছবি অর্কলে বা মূর্তি করলে সে নাকি বাঁচি না, এখন মনে হয় কেন করলাম তখন। রবি ঠাকুরের ব্যস্ট সিটিং নিয়ে করা। মূর্তিটা খুব কাছ থেকে বোঝা যাবে না, একটু দূর থেকে ভালো বোঝা যাবে। উনি বললেন—‘আপজোক নিও না কিন্তু। এপস্টাইন কি রকম জুলাতন করেছ আমার, সমস্ত সময় কার্লিপাস নাকের কাছে ধরা আছে, ওসক কি পোষায়?’ তখন আমি পোর্টেট করছি খুব, সাহস ছিল, অল্প বয়সে। আমি বললাম—‘আচ্ছা বেশ, অর্পান বসে বসে কাজ করে বান, আমি কোনো ডিসটাব করবো না।’ উনি খুঁজে বসে লিখতেন, আমার কাজটাও সেই রকম। হুল দিই অল্প, সে বছরই কাটা হয়েছিল তো। প্রথমে ভেরেইলাম পুরেটাই করবো। ঠিকে পেশদাক ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করতে বললেন—‘পেশদাক দিয়ে কেন মানসটাকে ফেটাবে, তার চাই, তারা কিশ্টা ফুটিয়ে তোলা, তাই বস্তুকে তুমি কেমন আর্টিস্ট?’

আমিও আর চেষ্টা করিনি।

রবীন্দ্রনাথের একটা আ্যবস্টাক্ট মূর্তিও করেছিলাম। এটা সিটিং নিয়ে নয়, মন থেকে গড়া। উনি শুনেছিলেন এটার কথা। কেউ ঠিকে গিয়ে বলছিল—‘ওটা যে কি করেছে, চোখ বলা দেওয়া, চেনা যায় না।’ রাসিক লোক তো, বলছিলেন—‘এটাই ঠিক করেছে।’

৪। ‘প্রথম দিকে আমি শব্দ মার্জলাং শেখাতাম। কারো স্বাধীন স্বতস্বয় কাজকে স্বাধ দিতাম না। রবি ঠাকুরের এ ব্যাপারে উদার মত ছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন—‘সবাইকে নিজের নিজের ইচ্ছামত করতে দাও, কখনো কাছ দিও না।’



#### ১৫ বছর বয়সে যোগেশ্ব্যার রামকিংকর

জ বা অয়েল পেনসিল নন্দাবাবু পছন্দ না হলেও আমাকে কাশা দেননি মিন্দমাটা। ভালো কাজ করছিলাম অয়েলে যতদূর মনে হচ্ছে গাল' রাগত দা ডগ। নন্দাবাবু লজ্জা অসহ্য হয়েছিলেন অয়েলে করছিলাম বলে। তাকে বাধাও দেননি। আর শিশুনাথের আইডিয়া ছিল দারুণ মজার। উনি আমাদের কাজ দেখতেও অস্বস্তি না—খালি করে যাও, নতুন কাজ কর। ওদেশে কত ভালো ভালো কাজ ছা. তোমরা কর।”

এ। আমাদের প্রচলিত শিল্পকার্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রথম অনু পাথে গেলেন। না অনেক বড় বড় কবি ছবি একেতন—কিন্তু তাদের ছবি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। রিশ গুরুত্বপূর্ণ মত দৃষ্টান্ত, অনুভূতির গাঢ়তা তাদের ছিল না। এই দৃষ্টি গ না থাকলে গুরুত্বপূর্ণ আবাসটাকট আর্ট ফেল করতেন। অন্য কবি হলে কবিতার ছবি আকতেন। এদেশের অনেক আঁকিয়ে তা করেছেন, আমার গুরুত্বপূর্ণ কবিতার লাইন ছবির তলে বসিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তা বলেন না। তাকে ছবিতে রয়েছে বলিষ্ঠতা, ভাইটাল অবজারভেশন, ঘনভাব, স্নায়ুশক্তি...”

৪।

শাস্তিনিকেতনে প্রথম অয়েল পেনসিল-এ হাত লাগিয়েছেন তিনি। তখনকার শাস্তিনিকেতনে সেটা এক ধরনের বিদ্রোহ। তার আর এক বিদ্রোহ স্কালপচার। শাস্তিনিকেতনের প্রথম ভাস্কর তিনিই। আবার আধুনিক ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্যবাহীও তিনিই প্রথম আধুনিক ভাস্কর। আধুনিক ভাস্কর্যের আকর্ষণীয় নিও তার বিদ্রোহী মানসিকতার প্রথম দান। কেবলমাত্র মর্তি আর মজা-ধসে ি, দুটোই তার স্বভাবের অইয়ের জিনিস, সেই ছেলেবেলা থেকে। বকুড়ার লাক্ষ্মীসেপ, গোড়া মাটির কাজে, নিয়ম-ভঙ্গার নৈপুণ্য বহুকালের। বকুড়ার কাজে তার খ্যাতির দৌড় আজ বিশ্বভূমিকায়, ঘোড়ার প্রতিমর্তি নয়া। ঘোড়ার জেম্মীতার প্রতিমর্তি। কোনো রকম প্রাথমিক প্রস্তুতি ছাড়াই তিনি যে আর্ট স্কুলে রবে ভাস্কর্যের দিকে ঝুঁকেন এর পিছনে সম্ভবত দুটো কারণই বড়। এক সময় ছেতোর পরিস্রুত তাঁর জন্ম-পরিবেশ। দুই, শাস্তিনিকেতন-পর্ব শ্রমজীবীর জীবন-এর ভাস্কর্য গুণ। অবশ্য ততীয় একটা কারণও অভ্যাস।ই আমরা। সেটা হল রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে-উদ্যমে গড়ে ওঠা আধুনিক শিল্প-কার্য লাইব্রেরী। সেই সংগে আধুনিক শিল্পকলার উপর আলোচনার বাস্কখা। রামকিংকর শাস্তিনিকেতনে যোগ দেবার চার বছর আগে, ১৯২১-এ, স্টোলা মেরশকে দিয়ে এক ক্ষুদ্রমাত্রার আয়োজন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আর দলদলে থেকে কল দিয়েছিলেন—এটা কিন্তু বাধ্যতামূলক নমস্কাল, এটা

ঘটো : বরুণকান্ত চট্টোপাধ্যায়

কিউবিকম, স্যুরিয়ালিজম—আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পের সব ধারাকে ধরেই। সেদিনের সেই আলোচনার এক নির্বিশেষ ছাত্র-প্রোগ্রাম আজকের প্রসিদ্ধ শিল্পী বিনোদীন্দ্রের। রামকিংকর বিষয়ে তাঁর এক রচনা থেকে আমরা জানতে পারি তাঁর সেদিনের অভিজ্ঞতা :

“তখন আমরা পারি না পারি মধ্যে তো কপচাতে পারি। অথবা আবহাওয়া তৈরী ছিল। আর্টের উপরে বইও পাঞ্জিলাম লাইব্রেরীতে। ছবির কাঁপ, স্কেটও ছিল যা এখনো হয়তো কল্যাণবনে আছে।”

আবহাওয়া তৈরী ছিল। রামকিংকর এসে সেই আবহাওয়ার গায়ে জড়ে দিলেন গতি অথবা কলা। খেমে-খামে আবহাওয়াকে বকুনি দিয়ে করে তুললেন খোড়ো। জুতোর বরষ দিয়ে ছেলেবেলার সেই চওড়া আর দুরন্ত টানে ধীরেতারে ড্রপাসন আঁকার টেন, শাস্তিনিকেতনে পৌঁছে মোটামুটিভাবে ভারতীয় চিত্রকলার সম্পর্ক স্থান-ধাওয়া, পাশ্চাত্য শিল্পকার্যের যাবতীয় উদ্ভাস ভক্তচরিত্রের সম্বন্ধে সদা-পাওয়া অভিজ্ঞতা, এই সব কিছুকে মিলিয়ে—আর তারই সপো নিজের রক্তের আদিম উদ্ভাসনার বনবকার মিলিয়ে গড়ে তুললেন নিজের এক অমূল্য ভূমণ্ডল, ছবি বা মর্তি সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত পূর্ব-সংস্কারের দেয়াল ধ্বংসের।

১৯৭০। অনুদবাজার পত্রিকা আমরণ জানালা রামকিংকরকে, কলকাতার ভাস্কর্যের চেহারা-চরিত্র সম্বন্ধে আপনার মূখ থেকে আমরা কিছু শুনতে চাই। ঘর-কুনা রামকিংকর, আমাদের চমকে দিয়ে, আশ্চর্য্যবাসে জ্বালিয়ে দিলেন তাঁর সম্মতি। আর নির্বিশেষ দিনে, ভাস্কর-ছাত্র সন্ধ্যা দেক সংগে নিয়ে চলে এলেন কলকাতায়। প্রোগ্রাম হল এইরকম, রামকিংকরকে নিয়ে আমরা কয়েকজন কল-কাতার সমস্ত স্টাফ ঘরে ঘরে দেখাযো। তিনি যা মন্তব্য করবেন তা টেকে নেবে টেপেরেকর্ডার। পরে সেটা ছাপা হবে তৈরিক আনন্দবাজারে।

এখন মনে হচ্ছে কি সৌভাগ্যবান আমি। কাশা তাঁকে ঘোষানার-স্বপ্নের প্রশ্ন করে-করে জানার এবং সবশেষে তা নিয়ে প্রশ্নাভিত্তিক রচনাটিরও ভার পড়েছিল আমার উপর। আমরা আড়াই দিন ছুটিছলাম তাঁকে নিয়ে, সকল সাড়ে দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা। পরে ‘মর্তিমান কলকাতা’ নাম দিয়ে কল-কাতার স্থাপত্যের সম্বন্ধে তাঁর মতামত ছাপা হয়ে ছল দুর্ভাগ্যভাগ্যে।

কিন্তু এই ৭ ঘণ্টার অন্তরঙ্গা সঙ্গলাভের বাইরেও আমাদের কপালে জড়োঁছিল আরো কিছু উপরি পাওয়া। যে কাল কলকাতায় ছিলেন, তাঁকে এতটুকুও প্রশ্রয় না দিরা আমাদের টেপ রেকর্ডারের মাউথপিসের সব সময়ে সাপের ফন্সর খেতে উঠিয়ে থাকতো তাঁর মূখের ঝিলিক। অ বরল প্রশ্ন আমাদের। বৈঠকী মেজাজে, অর্থাৎ একেবারে খোল মনে আমাদের শত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতেন তিনি সহস্রো, স্ফুটস্ফুট ভঙ্গিতে।

একবার প্রশ্ন করেছিলাম—



—শান্তিনিকেতনের পরিবেশ ছেড়ে অনেকদিন পরে তো কলকাতায় এসেই?  
কেমন লাগছে কলকাতাকে?

তার উত্তর—

—এর উত্তর দেওয়া সহজই বটে। শান্তিনিকেতন অন্ধকে আছে বটে, সেটাই যে কাল কলকাতা না হয়ে যাবে, তা কি করে জানিলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এখন যা অন্ধরা হয়েছি, কোথায় সবুজ আর কোথায় কি? ইটের বাড়ি উঠে চলেছে। এটাও না কলকাতা হয়ে যায়। আমরাই তো কলি অন্ধের বাড়ি দু' মাইল যেতে হয়। এখন কবে হয়তো গ্রাম চলে, হয়ে যাবে। মোটর গাড়ি তো আছেই। চলেছে। গতি।

—কলকাতার ধরন ঐ চৌরঙ্গীর বিশাল বিশাল শকাব্দাগুলির উল্লেখিকর মাঠে আজ যদি কোনো শিল্পীকে একটা ভাস্কর্য তৈরি করতে দেওয়া হয়, আপনার মতে তার গড়ন-গঠন কেমন হওয়া উচিত হবে?

—তাঁর নির্ভর করছে শিল্পী কি করতে চায়, তার উপরেই তো।

—শিল্পীর অত স্বাধীনতা কি আছে আমাদের দেশে। এসব অভাব আসে সরকারী মহল থেকে। তারাই যাপনকার দর সাম ঠিক করে দেন আগে ভাগে।

—দাঁটস রাইট। গ্রামে সরকারী পঙ্কোর মূর্তি হয়। হেলো! এসে কল যায় অন্ধক আর্টিস্টের মত মুখ চাই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ময়ের মুখ হোক বা না হোক, ঐ রকম মুখ চাই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আর্টিস্টের ফ্রাইডম কই? ফ্রাইডম দিলে আর্টিস্টের কি করবে তা আপনিও জানেন না, আমিও জানি না। কিন্তু ফ্রাইডম দিক তো আগে। শান্তিনিকেতনে আমি তো কাজ করেছি, নিজের মতো করে কাজ করেছি। কেউ অভাব দেখেনি। রিয়ারসিটিকও করেছি। অ্যাকসিটিকও করেছি। কেউ বাধা দেখেনি। ফ্রাইডম ছিল।

—আজ্ঞা, আপনাকে যদি অনুরোধ জানানো হয় কলকাতার জন্যে একটা মূর্তি করে দিতে, কি করবেন আপনি?

—সে কলা হবে কঠিন। কত কিছই জো করা যায়। গাছ, একটা গাছ, গাছ যেমন হয়ে যায়, ঐ রকম একটা গাছই করতে পারি। আমারও তো ইচ্ছে করে এসব বাড়ির মতই একটা মূর্তি করি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু দিচ্ছে কে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। কে দিচ্ছে করতে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। দেবে না।

—এখনে আপনার বিসর্গ মূর্তি গড়তে ইচ্ছে করে?

—ইচ্ছে করে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ধরুন না, মিশরের পিরামিড, মিশরের পিরামিডের মতো মূর্তি করতে ইচ্ছে করে। এত বড় পৃথিবী। চন্দ্র সূর্য জ্বলছে। কি বিশাল জোড়ি। জগতাই তো কী বিরাট। তার মধ্যে আমি কী একটা পাতুল গড়তে চাই, আমি তো পাতুল গড়ি, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো দিক একটা পাতুলই গড়তে দিক আমাকে।

আমরা আশা করেছিলাম, অনাধারায় রামাংকরের এই প্রত্যবন্ধ অ ট্রেনসাই অকাল প্রকাশিত হওয়ার পর শুধনকার সকারী কলপক সত্যি সত্যি অনুরোধ এবং আমলাগ জানাবেন তাকে। তিনি বলেছিলেন টাক-পাসা চাই না চাই না এক টকরো জমি, সমস্তই সিমেন্ট বালি মোড়াম আর মশের মতো কি একটা করার স্বাধীনতা। কিন্তু এমন উন্মত্ত প্রাণভর্তেও কর্পোরাটর মতো স ও সজ্জা জোট নি সরকারী অমোদের দর্বি, সেই তাগিদে অনাধারায় হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ বাস্তব এবং বলকন হয়ে ওঠে আমাদের দর্বি, সেই তাগিদে অনাধারায় হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ কিছুদিন পরে দেশ পরিহার রামাংকর নাম দিয়েই কবিতা লিখেছিলেন এক সে কবিতা রামাংকরেরই কথা বেন। মুখে কথা বলতে বলতে তাঁর মনে হয় আঙলে অট্রহাসিতে যে আবেগ এবং অকর শব্দ বেননা অন্তর করেছিল। সে কবিতা হঠাৎ ভিতরভাবে সাজানো। তার প্রথম চারটে লাইন—

“খানিকটা পাথর দাও আর একটা বক-খোলা মাঠ

হে কলকাতা, হে আমার রূপ জীর্ণ মহামান শিল্পের সম্রাট

রয়ে নাচ ছেননী

কাতাসে উড়িয়ে দিত ইচ্ছে করে যতটাই বেগুয়া কৌ।”

১১

নিজের চেনা প্রসঙ্গে রামাংকর।

১। “এক ফটোগ্রাফার এসেছেন ফিল্ম করতে। তখন অবনীন্দ্রনাথ জ্বর ফটোগ্রাফারটি কলেন—‘হ্যাঁ মশাই, ও একটা কি দেখছি, আমি ওদিকে দি দেখলাম, এসে এসে দেখলাম—কিন্তু কিছই বসতে পারলাম না।’ অবন চু হেসে বললেন—‘ও তো গো, ও যে জোয়ারে ফোঁবে দেখাবে—এ হচ্ছে রামাংকর।’ একটা দেখকেন নারায়ণ, চন্দ্রনাথ, তার পরে দেখকেন পাখি আছে—‘কী বড়স। নরায়ণ মূর্তি এক পাশে দেখা যাবে এক সেই নারায়ণ মূর্তির সবটা নেই।’ কী সত্য না থাকলেও বোঝা যায়। এইভাবে আবসট্রাক্ট কল কতকগুলো উঠে আসছে, বেগ দো সাধারণ কাজে নেই। এই ফ্রাইডম ঠিক ঠিকভাবে প্রয়োগ করে একটা অন্য ফর্ম আসছে, যেন চেনা যাচ্ছে না, অথচ চেনাকনা লাগছে। নু জইমনশন এস যায়, মিস্টিক ভাব আসে, অতেরুত ভাক্তি বাড়ছে।”

২। “একটা ঘটনা মনে পড়ল। তখন পনেরো গেস্ট হাউসের সামনে মূর্তি ট করা। একদিন আমি কাজ করছি, নন্দাব ও এসেছেন। আমাদের এখান একজন পণ্ডিত মশাই ছিলেন, তা তিনি এসে জল্পনা করতেন—আমি মশায় এটা দি: নন্দাব, একটা আলগাছের দিক দেখিয়ে বললেন—এটা কি বলুন তো? নন্দাব গম্ভীর হয়ে পণ্ডিত মশাইকেই চেন করলেন—তা হলে ওটা কি? অশী। এটা যদি আবসট্রাক্ট হয়, তা হলে তাল গাছটা কি? তা হলে কোনটা অবসট্রাক্ট? আবস ট্রাক্ট মাইন কি? পণ্ডিতমশাই পালিয়ে গেলেন।”

৩। “শিল্পের সামনে ঐ কাজটা আছে না? কেউ বলে লাইট স্ট্যান্ড, কেউ কল নির্বাণ, কেউ কল অনির্বাণ, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কেউ বসতেই পারবে না। আমি অনেক আধুনিক করে ফেলছি, হেঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।—হ্যাঁ হ্যাঁ, ফিল্ম ফিগার হেনে ওটার। আর এক দিক থেকে দেখলে পাখি মনে হবে। পাখি।”

৪। “সে যা কাড়। সচিত্রা একটা পোট্রেট করে ছলাম। ও এস ধরল, দাঁড়ই হবে সেইট। আমি যত বলি, আরে ওটা নিয়ে কী করবে—বাজে জিনিস, কিছই হবে না। দিয়ে দিলাম। তার পর কী হয়ে—কী কারণ সেই পোট্রেটটা একজন ভেঙেই ফেলছে। তারপর আমার কাছে এস বলছে—কমা করান। শাস্তি দি। আমায় কী শাস্তি দেব। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো বলই দিলাম—তোরা শাস্তি হলে, বস বসে গান কর, গান কর, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ ভেঙেই ফেলছিল পোট্রেটটা।”

৫। “পঁচিলতে রিকার্ড ব্যাংকস সামনে করছি যক্ষ-যক্ষ। এটা পাথরের। ঐ মূর্তির মোটামুটি আইডিয়া জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে এটা ক’ক-এর ব্যাপার। সিমেন্টটা তাই অর্ধের এবং ক’হর। এগ্রিকালচারাল যক্ষের নক, তাকে আর ক’গরার, এগ্রিকালচার ও ডান হাতে কর। যক্ষের হাত, বা আছে তা আমার স্বকপালকম্পিত। যক্ষের এক হাতে রায়হ পেন্সিল—ইন্ডাস্ট্রিয় প্রতীক, আর এক হাতে অর্নি কাগ। যক্ষের ব্যাপারটা ভেবে নেইই হয়েছে, নইল যক্ষের হা মারি পাওয়া যায় তাদের কারোই হাত নেই। কলকাতার মিউজিয়ামে যে যক্ষ-মূর্তি আছে এটা তারই ধাঁচে তৈরী। কলকাতার মূর্তি মথরা যক্ষ পাখি ফ্রাইডম সম্রাট সঙ্গহীত। আমার কাজটার নাম যক্ষ-যক্ষ। অতেরুত ভুল করেন যক্ষী ভেবে তা কিন্তু নয়, আসলে পৌরাণিক কাহিন্যে এস ভাই-বোন, কখনই স্বামী-স্ত্রী নেই তই যক্ষীও নই। ক’ বলছিলাম—ওটা ছিল কাল কাজ, অন্য মশ কিলের ব্যাপার ছিল ওটতে। সিলকট করেছিল কুল ডালী ব কাছ বৈদ্যনাথ কল এক জগতায়। কিন্তু ওখানকার বস যে মটর শক্ত তা খেয়াল ছিল না। ১৪ ফটের এক একটা স্প্যান সেল আন গেল না। তাই পাথর টকরো করা হয় চার ডাঙ্গা। সিল্পিত এনে জোড়া হল। আসল স্প্যান ছিল একটা মাত্র পথের কো মনেলিথ কাজ করায়।”

১১

একবার এক পত্রিকা, খবর মনে, তাঁর দীর্ঘ সাংবাদিক লেখার পর অনয়ে জানিয়েছিল একটা আশ্চর্যপ্রতিফলিত জেনে। রামাংকর তাব কলে এসে কী দিচ্ছে বলে একটা সর্বমুখী ফল। তাঁর পক্ষ এটাই স্বাভাবিক। তিনি যা, তাই-ই এককর্ তিনি। ভাবন গগ স্বকথ এক বিখ্যাত সমালোচক একবার মন্তক করছিলেন—ডান গগ অর্কিন “not trees but growth, not blossoms but bloom” সেই পথত সেই রম সেই সর্বমুখী রামাংকর।

# রসময় শ্রীরামকৃষ্ণ

অজয় দাশগুপ্ত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ রসমন আলোপ। গ্রাহকদের বিশেষ সুবিধে আছে। পোস্টকার্ড নিখেই গ্রাহক হওয়া যায়। অগ্রিম লাগে না। এখনই গ্রাহক হোন। সীমিত সংখ্যক ডাণা। সদ্য প্রকাশিত। ১৬.০০

## লোকমাতা সারদামণি

পুরজন্মপ্রসাদ চক্রবর্তী

সহজ অনাড়ম্বর সারদামণির অগুহময় জীবন কাহিনী (গল্পস্ব)

## যুগমানব লোকনাথ

নরেশচন্দ্র রায় মূল্য ১০.০০

যুগমানব লোকনাথের অলৌকিক জীবন কাহিনী। বহুদিন পর নবকলনের পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে।

মনুসংহিতা ১ম। গোপাল বটব্যাল অনুদিত ২০। মনুসংহিতার একমাত্র বাংলা অনুবাদ। প্রকাশিত।

## রক্তললি পলাশ সত্যেন সেন

১২।

নিপীড়িত গণ-অভ্যুত্থানের রোমাঞ্চকর কাহিনী। সেই সঙ্গে গোপন প্রেমের প্রতিহিংসা। ইতিহাসের অনাবিস্কৃত অধ্যায়।

## অনন্ড আইনস্টাইন : অমূল্য গুণ (যন্ত্রস্থ)

বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের সমগ্র জীবনের তথ্য ও তত্ত্ব। পদার্থবিজ্ঞানের যুগান্তর।

বুক হোম ৩১ কলেজ রো ৥ কলকাতা ১

# গাকুরে বাঙালীর চরিত্রকথা

## চতুর্থত পালিত

উনিশ শতকে বাঙালী ইংরেজীচর্চার মধ্যে ন্যাবৎনের চেয়েও বড় প্রেরণা ছিল উপায়-পাঠন। ইংরেজী-শিক্ষণই চাকুরে বাঙালীর চতুর্থ শব্দ। রাজস্বদায়কের ভাষা জানলেই না চাকরি পাকুর লা।

ব্রিটিশ আমলে জমি-জিরদে পরিবারের সকলের ধাপেধাপের তরফা দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছিল। বড় জমিদারী ভেঙে টুকরো টুকরো। ব্যবসায়ী ব্রিটিশের হাতে লাঞ্ছিত সম্প্রদায় দিয়ে গুণের দ্রো বা কাজের পরিশ্রমিক দেবার রেওয়াজ আর ইং। টাকা দিয়ে অর্থনীতির ঢাকা ঘোরে। মাস-ইনেতে চলে সাংসার। এককম পরিকল্পনাই নিষ্কর কলসবস্থা বাঙালীর জন্ম। ইংরেজী শিখে পদে পদা চাকরিতে এলেন, সমতান-সমতান্ত্রের ইংরেজীতে দুগড় করতে কষ্ট হয়ে পড়লেন তারা। ১৮৩০ সনের মচার দশক জানাচ্ছেন, কোম্পানীর সেওয়ারের ছেলে, রমানীর জই, তালিকাভাগের ডাইগো, গোমস্তার তিরাই হিন্দু, কলেজে ভিড় করছেন ইংরেজীর সোলাতে কার ধরনের বস। ১৮৭০ সালের এক প্রতিবেদনে দ্রুত অধিকার এই উত্তরই প্রতিধ্বনি করছেন। শ্রীরাজ কলেজের ছাত্ররাই এগিয়ে আইনজীবী ক সরকারী চাকুরে ঘর থেকে। যতই ইংরেজী দ্রুত প্রসার ঘটছে, ততই চাকুরে বাঙালীর সংখ্যা অজোয়া মস্তকলে আড়ালে পড়ার দরুন নকচি বড়ছে। তারা পৌঁছে গেছে এক প্রজন্ম থেকে অন্য জন্মে।

মূলত আমলাতান্ত্রিক খরচ বঁচানোর প্রয়োজনে ১৮৩০ সনে লর্ড কেলিকি কিছু লোকী দেপটি হেল্টর নিয়োগ করেন। এ সালের চার্টার আইনেও পিট-থর্ম-অর্থনীতিবিশেষে যোগ্য প্রার্থীর চাকরিতে অধিকার স্বীকার করা হয়। ১৮৩০-এ আরো বাঙালী চুক্তি ম্যাজিস্ট্রেট হলেন। ১৮৩০ থেকে ১৮৪০-এর শব্দে মুখ্য নব্যবস্থার অনেকই এ পদ লাভ করেন। সিন্ডিকট মাসিক, চন্দ্রশেখর দেব, হরশ্রুত ঘোষ, কলকাতার মি, সোমকি বসাক প্রভৃতির মম এ সঙ্গের সহজেই মনে আসে। মহাশ্বতর দরুন বেগলার প্রিন্সডেসপটি ব্রিটিশ কর্মচারীর সংখ্যা ১৮৩৫ সনে ১৬ এক ১৮৫৫তে ৫১১-এর বেশী ছিল না। সেই ১৮৪৫ সনে লর্ড হাউজের প্রস্তাবক্রমে পশ্চাত্য দ্রুত পদে পদে মেধাবী ছাত্রদের এক তালিকা প্রস্তুত হলেন শিক্ষা-অধিকারী। সেই তালিকা থেকে অত্রপত্র রকারী চাকরি দেবার সুপারিশ করা হতে থাকল। রকারী কলেজগণের থেকে নাম পঠান হতে নির্মমিত। মতার মত ধারাপাত থেকে ভাগবান কিছু ধর্মানের রকারী চাকরির ছিটেফোটা জটতে লাগল।

১৮৪৪-এর হিন্দু কলেজের তালিকা থেকে চাকরি পাতের দু'একটা নামের দিই। অবতারচন্দ্র গাঙ্গুলী প্রেমি কোর্টে কোনো বিন্যস্ত হয়েছেন, নন্দলাল শ্রীরপ বিভাগের গদক, শ্রীকৃষ্ণ দত্ত খারাজিখানার বাক্ষক। ১৮৪৫-এ পিট গোরজাপার নানকী অকির গোরাল্লা ধরণীর রায় কমিশনার ডেলেরী মিসরের সহকারী। হরশ্রুত রায় সরকারী চাকরি না পয়ে চুড়চুর নিজের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের শিক্ষক। হিন্দু কলেজের ছেলেদেরই এই হাল। অ হলে হুগলী লেলজের ছেলেরা হালে পানি পেল কি? ১৮৪৯-এ কলেজের মধ্যস্থতায় ব্যানার্জি শালিকরার আবগারী রেগম, কালীনাথ মধ্যস্থতি রাজকীর সেনাবাহিনীর ১৩ম ফেলিক্সের চিকিৎসা বিভাগের করানী, গহতারক রায় হুগলী কলেজেরই মাদ্রাসার আইন মিসর মৌলভী। দেলওয়ার আলি সেওয়ারী দিলাতে অম্মদুলমান ল অকিসার। মমতাজ আলি হুগলী কলেজেরই হুগলী, তালীল উর্দীন মিসার সরকারী স্কুলে আইন শিক্ষক। চাকরির মধ্য জিরে এই বা মন্ড কি। টাকা কলেজের দিকে চোখ

কেনেনো থাক। ১৮৫৫-৫৬ সনে এই কলেজের বিশ্বস্তর দাস আবগারী কমিশনারের দস্তুর করানী। শ্রীনাথ বসু, তথ্যে। চন্দ্রকিশোর গুহ মরমনসিংহের অবগারী দস্তুরের অধাকের সেরিস্তাদার আর মগমোহন দাস চাকরই ইঞ্জিনারের অফিসে কলমনাবিল।

এরাই পবিত্র চাকুরে বাঙালী। স্পষ্টতই মেধাবী ছাত্রদের এক নল্যা অংশ চাকরি পেতেন। অধিকাংশই ছাত্র শিক্ষক। নিয়ম আবার পুঙ্খনে দ্রুতগত ফিরে যেতেন, নর কোন না কোন দস্তুরে সেখানেই করানী হিসেবে। ১৮৪৯-৫০ সনের প্রতিবেদনে শিক্ষা অধিকার অকপটে স্বীকার করতেন যে, এই সব প্রতিভাবান ছাত্রদের আরো ভাল মাইনেতে আরো মধ্যমাশীল পদে বৃত হওয়া উচিত ছিল। ১৮৫৫-৫৬ সনের প্রতিবেদনে থেকে এদের বেতনেরের একটা ধারণা দেওয়া যেতে পারে। গুরুচরণ চ্যাটার্জি (হুগলী কলেজ) দিনাজপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক। মাইনে পেতেন মাসিক ১৫০ টাকা। ইন্দ্রচন্দ্র মিত্র (হিন্দু কলেজ) ছিলেন দিনাজপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মাস-মাইনে ২০০ টাকা। জগদীশনাথ রায় (হিন্দু কলেজ) মৌলভীপুর নূনের চৌকির অধ্যক্ষ, মাসিক বেতন ৩০০ টাকা। কেমারনাথ সেন (হিন্দু কলেজ) জমীপ দস্তুরের করানী, সাক্ষ্যে ৪০ টাকা পেতেন। প্রসন্ন সর্বাধিকারী (হিন্দু কলেজ) সাক্ষ্যে কলেজে ইংরেজী সর্ভিহের অধ্যাপক, পারিশ্রমিক ১০০ টাকা। গোপালচন্দ্র ভট্ট (হিন্দু কলেজ) হাওড়ার নূনের চৌকির দারগা, মাসিক দারগা ৩০ টাকা মহেশলাল সোম (হিন্দু কলেজ) হিন্দু স্কুলের খাড়া মাস্টার। মাস পরলায় হতে পেতেন ১৫০ টাকা। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। এদেশীরা যতই কৃতবিন্দা হোন না কেন, ৪০০ টাকার উপরে যেতেন কদাচং। মোট মাইনে ধরা ছিল ইংরেজদের জন্য, যোগাতার খাটো হলেও।

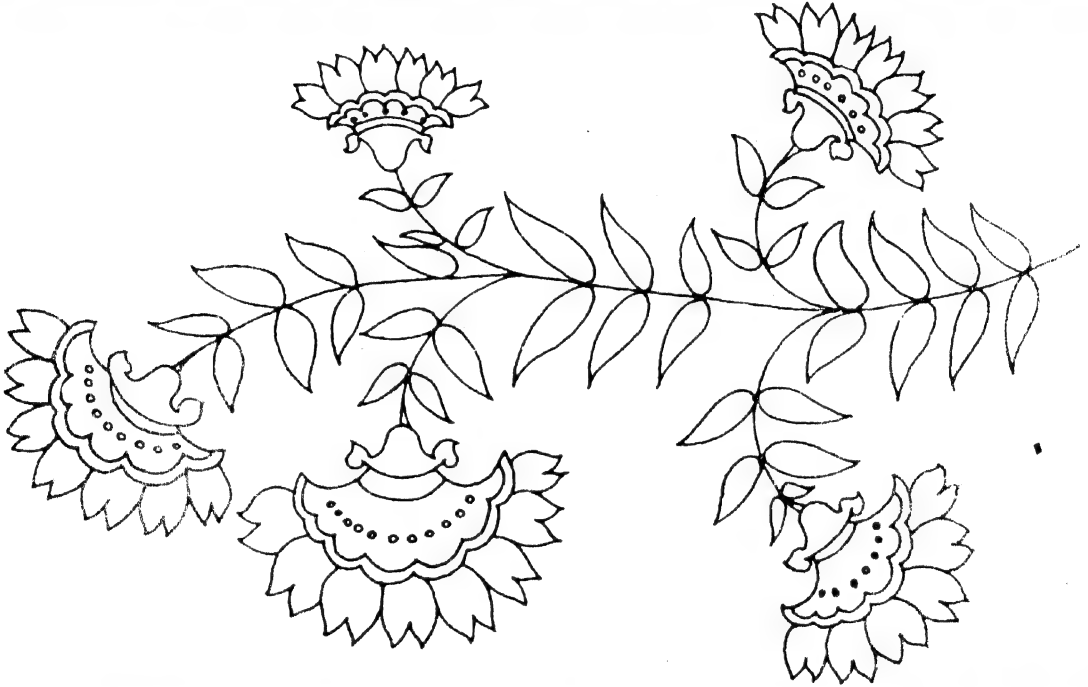
১৮৫৮-১৮৬১র মধ্যে কলকাতার মোট স্নাতকের সংখ্যা ১৭১২ বলে হিসেব করা যায়। এর মধ্যে ৩৫৫ জনের খবর নেই, ৩০ জন মৃত। বাকী ১৩৫৬ জনের মধ্যে ৫২৫ জন সরকারী চাকুরে, ৬১০ জন আইনের আভিনায়। উকীল ৬৬৬ জন, এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এদের পরেই শিক্ষক ৩২৬ জন। এই সময়ের মধ্যে মধ্যমাশীল পদে তুলনায় অগের চেয়ে অনেক বেশী ভারতীয়কে দেখা যায়। ৩৪ জন স্নাতক এবং ১৬০ জন মাসিক এবং ডেপুটি কালেকটরের হুদিশ মেলে।

এ প্রাপ্তো সমতর্পা, সবাই যথার্থ বাংলাদেশ চাকরী পান নি। মর ৪০৪ জন পেয়েছেন, তার মধ্যে খোদ কলকাতায় ৩২৬ জন। আর সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলেন। বিহারে ১০৪, উড়িষ্যা ১৮, আসামে ২১, উত্তরপ্রদেশ-অযোধ্যায় ১০৭, পাঞ্জাবে ২২, মধ্যপ্রদেশ ২৭ জন। পানি, মসুগের, মজফফরপুর থেকে শব্দ করে সদর, পশ্চিম বেয়ারস, লাক্ষী পোরের শ্রীণগর, লাহোর, পেশোয়ারে বাঙালীকে নানা পেশার দেখা গেছে। বগের বাহিরে বাঙালীকে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এদের তাঁর বিশ্বাসের এবং বিভাজনের শিকার হতে হয়েছে। যেটুকু পারিসংখ্যান উদ্ভূত করা গেল, ততদে সহজেই বোঝা যায় যে এরা ছিলেন সংখ্যা-লব্ধ কিছু কিছু মাত্র অথবা উকীল-জাজের। নিজ বাসভূমে ঠাই হয়নি বলেই বর্জিত-রোজগারের তড়নায় প্রবাসী হয়েছিলেন। এদের প্রভাবেই প্রদেশগত জনতন্ত্র হয়ে পড়েছিল, এখন হুঁজি টেকে না।

চক্রেতে দেবের বেশে নয়, জৈবিক হিসের হলাহলে যদি এদের জীবিতারা খসে পড়ে, তাহলে পাব-ভাপের অবশিষ্ট থাকে না।

প্রাদেশিকতার কুস্তক না গিয়ে চাকুরে বাঙালীর দৃষ্টি বিশেষ পেশার প্রতি বরণতার উৎস সম্বন্ধে কার থাক। ডাক্তার আর মোজারি। কল-কাতার মেডিকেল কলেজ ১৮৫৫ সনে স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল, সরকারী সামরিক, বেসামরিক হাস-পাতালে সাহেব ডাক্তারের বদলে এদেশীয় চিকিৎসক গড়ে তোলা। শুরুরে সাহেবের সহকারী, প্রস্তুতি সত্তা হলে সমকক্ষ। এই প্রতিষ্ঠাত শিক্তিত বাঙালীর মনে সোঁদন সাড়া জাগিয়েছিল। কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ রায়ালি লিখেছেন, শব-ব্যবচ্ছেদ শিক্ষানবিশদের কাছে ঘুরেপেও আতঙ্ক ও ঘৃণার ব্যাপার ছিল। তাঁর মনে আশঙ্কা ছিল, এদেশী ভাবপ্রকল তরুণদের মধ্যে এর প্রচলন সহজ হবে না। জাতপাতের কথা চিন্তা করে প্রথম পরীক্ষাটি লোকচক্রের আড়ালে গোপনে সমধা করায় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। রায়ালি মশ্ব বিস্ময়ে জানাচ্ছেন, ১৮৫৫ সনের ২৮ অক্টোবরের সেই অবিস্মরণীয় দিবসে তাঁর সব ধর্মের অবসান হল। কলেজের চারজন কৃতী ছাত্র স্বেচ্ছায় এই কাজে ছুটি-কটি নিয়ে এগিয়ে গেলেন। এই নীরব বিস্ময়ের প্রথম নায়ক মধুসূদন গুপ্ত। এই অসামান্য সূক্তিতর জনা ডাঃ গুপ্তিত এবং বেথুনের স্বাক্ষর সম্বলিত এক স্ব-প্রতিষ্ঠিত তাকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। ছবির তলায় লেখা ছিল 'ভারতের প্রথম দেহবিজ্ঞানী'। মেডিকেল কলেজের বিপরীতে আরপুলি লেনের ফিতের প্রান্তে যে গিলির সূত্রপাত, সেই মধু গুপ্ত লেন তাঁর স্মৃতির সলতে হয়ে আজো তাঁর কথা আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে। ১৮৫৫-এ ৬৭ জন কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। এরা প্রায় সবাই হিন্দু, মধ্যবিত্ত ঘরের জরসন্তান। ডেভিড হেমার কলেজের সম্পাদক হলেন। কলেজের সঙ্গে যুক্ত হল হাসপাতাল। ১৮৫২এ মধুসূদন গুপ্ত, নবীচন্দ্র মিত্র, শিবচন্দ্র কর্মকার এবং প্রমথকুমার মিত্র, এই চারজনই সরকারী স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রথম পদাধিকারী বাঙালী। ১৮৪০ সালে প্রথম যে পরীক্ষা হল, তাতে সফল হয়ে কাজে যোগ দিতে আরো এলেন মাদবল্লভ ধাড়া, বাসকুমার চ্যাটর্জী, গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত এবং নবকুম গুপ্ত। সাব-আসিস্ট্যান্ট সার্জন পদে একে একে নিযুক্ত হলেন এরা। আর একটি যোগ্যতাকারী ঘটনা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতই হবে। প্রিন্স শ্বারকানাথ ঠাকুরের চোড়ায় এবং অধ্যাপক, হস্তা তিনজন এবং কলেজের অধ্যাপক ডাঃ গুপ্তিত এবং মুদ্রাস্বাস্থ্যের নবায়ের যুগ্ম প্রচেষ্টায় চতুর্থ জন—এই চারজন বাঙালী গোপালচন্দ্র শীল, চরণনাথ বসু, শ্বারকানাথ বসু এবং স্বর্গকুমার চক্রবর্তী বিলেতে পাড়ি দিলেন উচ্চতর শিক্ষার জন্য। এরাই আমাদের প্রথম এস আর সি পি এবং এফ আর সি এস ধরা যতে পারে। তাঁরা ফিরে এসে নিজের কলেজে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হলেন। ১৮৪৮ সালের এক প্রতিবেদনে কলেজের ৫০ জন প্রাক্তন ছাত্রকে সাব-আসিস্ট্যান্ট সার্জনের পদে ভারতের নানা প্রদেশে কর্মরত পাওয়া যায়। মেডিকেল কলেজে ছাত্র রাস পথর এতটা প্রাথম কারণ ছিল স্বাস্থ্য দপ্তরের চাকরিতে এদেশীদের সম্প বেতন। ১৮৪৮-এ বেতনভর বাড়িয়েও সাত বছরের কম অতিজ্ঞানের মাসিক অর্থ দুইয় ১০০ টাকা সাং থেকে চোদ্দ শব্বের পূর্বসূরদের ১৫০ টাকা আর তাঁর উপর ২০০ টাকা। স্বয়ং মধুসূদন গুপ্ত তের বছরের বেশী সর্ভিহেয় কর্মনিপুণ্য দেখিয়েও অবশেষে মাত্র ২০০ টাকা বেতনে উন্নীত হন। ঐশিক বাঙালীর এত মেহতপ্প, হস্তা এবং রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। উকীলপাড়ায় প্রবাস কর। ফেট উইলিয়াম কলেজে ১৮৪০-৪৪ সালে প্রথম আইন পড়বার

ঐ চমৎকার প্যাটার্নটা আপনার শাড়িতে  
রাঙিয়ে ফেলুন... দেখুন, কেমন জীবন্ত দেখাচ্ছে!



আপনার ওয়ারড্রোবের শোভা আরও বাড়ানোর এক চমৎকার উপায়ঃ

উপকরণ :

একটা সেরা শাড়ি, রোমাঞ্চকর  
কিছু করার-উৎসাহ সামান্য  
কিছু সময়-ক্যামেল ফ্রাইলিন  
কালার ও মিসিয়ান  
ক্যামেলিন ত্রাশ

পদ্ধতি :

১. গরম জলে কিছুটা শাড়ির  
সমস্ত মাড় তুলে ফেলুন।
২. এবার শাড়িতে পছন্দমত  
প্যাটার্ন ট্রেসিং করে নিন।
৩. এরপর এমব্রয়ডারী থিং বা

বাকটে শাড়ি টানটান করে  
আটকে নিন।

৪. যাতে সর্বত্র সমানভাবে রঙ  
থরে তার জন্য কালারের সঙ্গে  
ফ্রাইলিন মিশিয়ে নিন।
৫. এবারে শাড়ির ডিকাইনে ডুলি  
দিয়ে সমান ভাবে রঙ করুন।
৬. দু'ঘণ্টার জন্য শুকুতে দিন।
৭. ৭২ ঘণ্টা বাক শাড়ির  
উন্টোপিটটি ইত্থি করে নিন।

পোশাক-আশাকের রঙ জীবন্ত  
করে তুলুন। ঘরদোর ঝলমলান।  
বালিশ রাঙিয়ে মিষ্টিবিলাস করুন।  
ক্যামেল ফ্রাইলিন দিয়ে কত কি  
চমৎকার রাঙানো যায়, এ হ'ল  
তার সামান্য কয়েকটি উদাহরণ...  
এই রঙ একদম পাকা আর  
কত গুণ... এটি খোয়া যায়, ইত্থি  
করা যায়, যে কোনও ত্রাশ দিয়ে  
লাগানো যায়—যা আপনি নিজ  
হাতেই পারেন।



**ক্যামেল ফ্রাইলিন®**



ক্যামেলিন প্রাঃ লিমিটেড, আর্ট মেট্রিয়াল ডিভিশন, বক্স-৪০০ ০৭৯ (ভারত)।

রা হয়। শিক্ষা-অধিকার স্পষ্টই লিখেছেন, শিক্ষার এবং আইন ব্যবসায়ের বিপুল বনা বাক্সালী দেখে ধরা পড়ে। ব্রিটিশ রাজের নর শাসনে আইনচর্চার মূল্য বৃদ্ধিতে পেরে কেই এগিয়ে আসেন। ১৮৪০ সনে হিন্দু রে আইনের অধ্যাপকের পদ চালাই করা হলেও ৭ সালের আগে কেউ সেই পর্যায়ে পৌঁছাননি। ৬ সনে হিন্দু কলেজে আইন পরীক্ষার বিবরণ গণ্য হয় এবং ১৮৫৭তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে প্রথম যে ছাত্র প্রেসি-দী কলেজ (প্রাক্তন হিন্দু কলেজ) থেকে আইন করার স্নাতক হন, তারি হলেন অমতলাল জাঈ, আগুতাবাধ ধর, স্মারকনাথ চক্রবর্তী, ফরাস, গিরিজাশঙ্কর দাস, হরিহর মুখার্জী, রনাত চ্যাটার্জী, নীলমাধব বসু, প্রভৃ চন্দ্র, রতনলাল ঘোষ ও শ্রীনাথ মিত্র। ১৮৬৪-৭০-মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৭০৪ জন ন পাশ করে বেরোন। কলকাতার স্নাতকদের কর্মতালিকা থেকে জানা যায় ১৮৬৮-৮২র আইনজীবী ৬১০ জন। এর মধ্যে ব্যারিস্টার উকীল ৪৬৬, আট্টানী ১৪, এদের কর্মচারী এবং পাঠক ১০০ জন। পেশা হিসেবে আইন রেই সবচেয়ে সোভনীয় হয়ে পড়ে। বাংলা-র গণকর্মচার মত ভূমিবাণেশ্বর ফলে-৬৬-৮৮র মধ্যে সারা ভারতের প্রায় একের পচ-দেওয়ানী মামলা (৬ লাখের মত) শব্দে নকার আদালত ছেড়ে থাকে। শহর হিসেবে কলকাতাতে এবং সালগন ২৪ পরগণায় ১৮৭৫ ন ২৬ জন ব্যারিস্টার, ১২৭ জন আট্টানী, ৫৩১ উকীল এবং ৭৮৪ জন অন্যান্য আইন ব্যবসায়ী লন। কলকাতা অতএব উকীল-মোক্তারের মন্ডা। পরেই ঢাকার স্থান। এখানে ৩৭২ জন উকীল ২ ৪৭০ জন আইন ব্যবসায়ী। অন্য চাকরীর

তুলনায় এদের আর ভালই ছিল। ১৮৮৮-৮৯-এর এক হিসেবে জানা যায়, উকীল-ব্যারিস্টারের বাৎসরিক আয় ৫০০-২০০০ টাকার মধ্যে ছিল ১৪০৪ জনের। ২০০০ টাকার উপরে আয় ৫৫১ জনের। অন্যান্য আইন-ব্যবসায়ীদের সেই অনুপাতে আয়ের নীচু এবং উচু সীমায় ছিলেন যথাক্রমে ১৮০১ এবং ২২১ জন। তাই বিনিয়োগ পাল তঁর স্মৃতিকথায় সর্বোত্তম লিখেছেন, বাংলাদেশ ব্রিটিশ রাজের পরেই ছিল ডকলিঙ্গ। ব্রিটিশ রাজের জীবিকার সম্মানে কৃতী ছাত্ররা পথে পথে পাথর ছড়ান দেখে অবশেষে আইনের কাননে খরনা করিয়েছিল।

উপসংহারে নিবেদন, চাকুরে বাঙালীরা উদ্ভব এবং পদসম্মার মাত্র এই প্রবন্ধে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। তার পতন-অভ্যুদয়-বন্দ্র-পন্থার সব কটি হাইলস্টোন ধরে দেবার দুঃসাহস করিনি। লক্ষণীয় এই যে প্রধানত চাকুরেরাই নিজেদের সম্মান-সম্মতিদের মধ্যে থেকে পরবর্তী প্রজন্ম গড়ে তুললেও, তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন অভাবী ভূস্বামী পরিবার। জমিতে পরিবারের ভরণ-পোষণ না হওয়াতে কিছু সদস্য কাম-কারবারে বেরিয়ে পড়ে-ছিলেন। মর্টিটে এদের নাড়ীর যোগ ছিল টন-টনে। নিছক চাকুরে মধ্যবিত্ত হিসেবে চিন্তা বা কর্মের জগতে কোন সমাজ-বিশ্বব এঁদের স্বারা সম্ভব ছিল না। এঁদের অনেকেই চাকুরীর জমানো পরসায় আবার জমি-জোত কিনে ভদ্রলোক-জোতদার হয়েছিলেন এবং প্রজন্মের আইন নিয়ে মাতামাতি করেছিলেন।

কিন্তু, মানতেই হয়, এঁদের অনেকেই বাংলার নব জাগরণের পুরোধা-পুরুষ। তথাকথিত জা-বার বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের চেয়ে এঁদের অবদান হয়ত কিছু বেশী। এঁরা পাশ্চাত্য-বিদ্যা আয়ত্ত করে হাতে-কলমে অনেক বেশী প্রয়োগ করেছেন। দেশীর

অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে এক সেতুসম্মন সভ্যতার জনক হয়েছেন।

আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের নান্দীকর এঁরাই। ১৮৫১ সালের ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সভা থেকে শুরু করে ভারতসভা এবং জাতীয় কংগ্রেসের এঁরাই ছিলেন মেরুদণ্ড। ১৮৫২ সনে প্রথমোক্ত সভার ভরফে দিগম্বর মিত্র সরকারী চাকরী ভারতীয়-করণের দাবী করেছেন। ১৮৬৭তে মনোমোহন ঘোষ অনার্যভাবে বিলেতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অমনোনীত হলে এবং ১৮৭৭-এ সুরেন্দ্রনাথ বান্যাজী মনোনীত হয়েও উপহাস পদ না পেয়ে যে অশোভনের সূচনা করেন, তাকে ব্রিটিশ সরকার সে যুগে সিভিল সার্ভিস আন্দোলন এবং কিছু সামাজ্যবাদী চিন্তাভাবনা ঐতিহাসিক ইদানীং স্বাধীন আন্দোলন বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু গভীরভবে ভেবে দেখলে বোঝা যাবে কেন রুটির লড়াই শিক্ষিত ভারতীয় জনমানসকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রতিবন্ধকতার স্বরূপ সম্বোধে সর্ব-প্রথম প্রবলভাবে সচেতন করে দিয়েছিল। জাতীয়তাবাদের দর্শন বাস্তবতার এই কটিপাথরে শানি পড়ে জাতীয়তাবাদী কর্মপন্থার পরিণত হয়েছিল। যে বোধে আক্রান্ত হয়ে ১৮৫৬ সলে কৃষ্ণদাস পাল ব্রিটিশ দপ্তরে কেরানী হওয়ারকে পোষা কুকুরের খোঁয়াড়ে প্রবেশের মত হীন কর্ম বলে মনে করেছিলেন এবং নবাবগঞ্জে ধিকার নিয়ে স্বাধীন ব্রিটিশ নিয়ে স্বাধীনতার আশ্বাস নিতে উদ্গীর্ণ করতে চেয়েছিলেন, যার ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি স্বদেশী যুগে ব্রিটিশপন্থী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়কে গোলামখানা বলে গণনা করা, সেই জাতীয় চেতনাকে স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা বলে মনে নিলে সভ্যতার অপলগ হয়।

চাকরীজীবী মধ্যবিত্ত ইতিহাসে উপেক্ষিত পুরুষ। চরিত্রকার এই স্মৃতিভরণ তাঁদের প্রাপ্য।

এখন পাচ্ছেন এমন এক  
শ্যাম্পুযুক্ত হেয়ার ডাই যা  
প্রতিবারেই চুল ধোয়ার  
সাথে ফিকে হয়ে যায় না।

নতুন নেচুরীল। শ্যাম্পুযুক্ত এক অসাধারণ হেয়ার ডাই যা চুলের ভেতরে আপন।  
নেচুরীল ছড়িয়ে পড়ে, আর সেইসঙ্গে আরও গুলি চুল যোয়ার সাথে  
নেচুরীলের বন্ধ ফিকে হয়ে যায় না। আবার দেখুন, এটি লাগানও কত সহজ—  
চুলে সামান্য ঘষলেই এর ফেনা খুব তাড়াতাড়ি সারা চুলে সমানভাবে ছড়িয়ে  
পড়ে—যার ফলে আপনার চুলে দেখা দেয় তারুণ্যের দীপ্তি—আর আপনার  
স্বামীদেবতা বুঝাকরে এটি জানতেও পারেন না।  
নেচুরীল কোনো কর্তন ছাড়াও কেমিক্যাল না থাকার দরুন আপনার চুল মোলায়েম  
আর গোছালো থাকে। আর এর মিশ্র সৌরভ আপনার মনুষ্য ভালও লাগবে।  
স্বাভাবিক ধরনের রসিক ও ডাক গ্রাউন্ড রঙে মহিলা ও পুরুষ উভয়ের জন্যই পারেন।

নতুন  
**নেচুরীল**  
শ্যাম্পুযুক্ত হেয়ার ডাই

নতুন নেচুরীল অত্যন্ত শ্যাম্পুযুক্ত  
পুরানো হেয়ার ডাইকে হার মানায়।



সে. কে. হেলেন কার্টিস-এর এক উৎকৃষ্ট উপাদান।

সম্প্রদায় করা বা শিহরণ জাগানো ব্যক্তি যদি চান...

## ম্যাক্স ফ্যাক্টর-এর রয়েছে মানানসই ট্যাল্ক আর সাবান

হিম্মতীক  
মনমোহনো মনোরম বেশ,  
সারা অঙ্গে জাগায় আবেশ  
সম্প্রদায় করা সৌরভ

ইলেকট্রিক  
কলের সৌরভ ভরা,  
দিন-ভর মন মোহনো  
শিহরণ জাগানো সুবাস



ম্যাক্স ফ্যাক্টর-এর অলিম্পিকসুন্দর সম্ভারের তরল কোকো-অলিভ



# চরদিনের গান

## মীর মুখোপাধ্যায়

আমার এই চলতে চলতে দেখা, আর দেখতে দেখতে চলা। চলতে চলতে তো কি দেখি। দেখতে দেখতে কতো পথই না চালা। এ যেন পিরীতি-কূলটি ধৈ নিয়ে পিরীতি-নগরে ফেরা। এই রসেই মন মজেছে। এই রসেই আছি। হ রসেই কলম ভিজিয়ে বড় অনুরাগ একটি দটি করুণ-রাঙন গল্প সাজাই।

বাঁগার কাজল দিয়ে উজ্জ্বল-করা চোখ আজ কোন বেনারস টলটল করে চলে, আমার কাছে এ খবরটি সবচেয়ে জরুরী। স্চরিতার আঘাতের মত দুঃ কপালে কেন চন্দনের টিপ নষ্ট হয়ে গেছে অনেকদিন, এ শহরে একমাত্র আমিই তা জানি। সেই সরু গলির তৃণা এতোদিন যে সোজা সিঁথি কাটবে, রক্ত কেন সে বাকী সিঁথিতে চলে এলো, এ সংকটে আমি ছাড়া আর কে গরু হবে? কোন কিনাদিনীর নয়ন কোণে অশ্রুজল কলসে উঠেছে, করা চোখের গণে চকলতা, করা ঠোঁটে গোপন প্রেমিক সেদিন চিহ্ন রেখে গেছে, কে কার কৈ আড় নয়নে চেয়ে একেবারে বিবশ, বিকল করে দিয়েছে, নবীন কার লোবাসা সোনালী মদের মত ফেনায় ফেনায় উজ্জ্বলিত—জীবনের কাটকটি লোয় কতো হার-জিত, কতো জয়-পরাজয়, কতো শোধ-প্রতিশোধ, এই বিচ্ছিন্ন জীবনের শাড়ির গারে এইগুলোই শূন্য সাদা জারির কাজ। আমি এদের মোহিনীরা দি আটকে পড়েছি।

...সেদিন অমাবস্যের এক পড়ন্ত দুপুরে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, একটা আগে ল এক পল্লা বাঁধি হয়ে গেছে, জলের টাংকের শীর্ষবিন্দুতে একটা এককাক বড় চুপচাপ এখন, জল পড়ছে না আর, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি একটা বাড়ীর নেকশাল পাইপের মধ্যে একটা ফাটা পাইপ থেকে তখনো ফেঁটার ফেঁটার করে ল, আকাশে এখনো ছিন্ন মেঘ তবু রোদ উঠলো বেশ জমকালো ভাঁগতে, জেলার বাড়ির ছাদে ছাদে উঠে পড়েছে হই হই করতে করতে, তারা ভিজ়ে শাড়ি ধাক টান টান করে মেলে দিচ্ছে এই আচ্ছন্ন বসন্ত-খোওয়া তরুণ রোশনুরে—ব মিলিয়ে রক্ত আর রূপের এক মধুর অকেশ্য। এই মধুরে আরো মধুর ঢেলে আরেক দৃশ্য হঠাৎ জেগে উঠলো আমার মস্তক-দ্বিতর সামনে।

শুলবাড়ির ঠিক বৃদ্ধ-বৃদ্ধ, একটা বাড়ির গরাদ দেওয়া জানলা, সেই জানলায় গাল ফিরে বসে সদা যুবতী কাসে প্রমোদন পাওয়া এক তরুণী, আর তার গান, সলজ্জ হাসির সোনালী বিভ্রমের ঠিক নীচে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে রক্তবাণী এক বৃদ্ধ, উড়ো পাখির জনার মত যার ডুর, মখটা এমন মিষ্ট যে আদর লাতে ইচ্ছে করে, কণ্ঠে একটি সজ-করা শব্দানিকতনীর কোলা, যুবক, আমি নিশ্চিত জানি, তোমার ওই কোলাটি নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। ওতে তেমন রোদী কোন কাগজপত্র কিছ নেই। ওটা প্রেমিকার কাছে নিজেকে মহাদর্প করার (কটা স প্রচলিত আর্ট)। বৃদ্ধটি যেন যুবতীটির খুব নিজনে এসে দাঁড়িয়েছে এমন ভাঙ্গাতে মৃগ, আকর্ষণ চোখে, তন্ময় হয়ে ওর সব দামী আবেল ভাবলেনে যাচ্ছে। যে রাস্তার ওপর, জানলায় বসে, নারী তার একপাশ পৃথিবের গ্যারে হমবর্ণ শরীরের আলো ফেলছে সেই রাস্তাটি এই শহরের হৃদয়পদ, সেখান দিয়ে এখন হাজার মানবের কল চলফেরা, কিন্তু এখ প্রক্ষেপহীন, ওদের চার চোখে এখন সোনালী হানাহানি। দৃষ্টি ফেরানো উচিত। কিন্তু তর গাটি ওর সুন্দর, উজ্জ্বল চুলে যে একেবারে কলমলে হয়ে উঠেছে। দৃষ্টি কি ফেরে? কেনই বা ফিরবে। এই সব দৃশ্যের জন্যেই বেঁচে থাকা, তাই নর। কি। ওরা দুজনে দু জনক নিয়ে খবই হস্ত, তবু অতো কলতত্তর ভেতরেও কোনকমে সময় চুরি করে নিয়ে আমার নাকে নিস্তান্ত অবহেলায় একবার তাকালো। বাস, ওই পর্যন্তই। তারপর দুজনে শায়র কলনে মত্ত হয়ে গেল। কিন্তু আবার শেখ এই গদ্য দুপুরের উত্তমত নায়িকাটি দেখেছি এককটি সরে। হঠাৎ উজ্জল ভাঙ্গতে তার কাহ: দটি মাথার ওপর তুলে ও অর ঠাসবনেট, উজ্জ্বল চুলের রাশি ঠিক করে নিলো। বৃদ্ধ চোখ নীচু করলো। কলকই তো। তারই তো জানিস। আর দু চারদিন পর তারই তো একার সম্পত্তি হবে। তখন অনেকবার অনেকভাবে ওই আশ্রম শরীরটি অলীক মাধুরী নেড়েচেড়ে নানাভাবে বৃদ্ধ আবিষ্কার করবে। আজ, এখন এজে তাড়া কিসের? কিন্তু আমার তো সে উপায় নেই। আমার যে বেলা যায়। কিমে আঁচ। এই চেনশোনার সখকলয় যেটুকু যা রোজগারপাতি হয় সেটুকু থেকে একটুও যাতে অন্যরে হাতছাড়া না হয়ে যায় সেটুকু তো আমায় দেখতে হবে। অতএব আমি ওই অক্ষাংশ শরীরের সলো গভীর নিম্নার মত জড়ানো তরলত শাড়িটল দিক অপলাকে তারি করে গইলম। প্রতিবাদ-স্বরণ রমণী তার নিপুণ কীতে নীচকার লাল ঠোঁটে আস্তে করে দংশন করলো। অকথ্য এই, কি অসভ্য লোক একখান।

বৃষি, বৃষি। সুন্দরী তরুণী, তোমাদের এ খেলাটাও বৃষি। যাকে তোমরা একদম পছন্দ করো না, যে তোমাদের চোখের বালি, তাকে তোমরা তো সভা কেশতে চাইবেই। আর যাকে তোমরা পছন্দ করে তাহ কাছে যোজ যোজ, প্রতি মহাত্ম লাবী কর নতুন নতুন অসভ্যতা। তাই নয় কি?

জবে তাই হোক, তোমার জানলার ময়ূরপালকে তুমি রাজরাজেশ্বরী হয়ে বসে থাকো, আমি রূপকন বৃদ্ধটিকে তোমার ঠিক নীচে, রাস্তায় রেখে এখন লে বাই। কিন্তু চলে বাই বলই কি চলে কওয়া সহজ।

বে মেরটিকে ভালো লাগে তার বাড়ীর চকরটিকেও তো না ভালো লেগে



১৯১৩ সাল। সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পেলে  
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই তখন থেকে দেশ-বিদেশের  
সমগ্র জেনে আসছেন—এই গ্রাইজের পরিমাণ ১ লক্ষ  
২০ হাজার টাকা। এ তথ্য কি সত্য? সত্যই কি তিনি  
ওই অর্থ পেয়েছিলেন?

না, একেবারেই সত্য নয়। এই জনশ্রুতি তথ্য-নির্ভর  
নয়। কত টাকা পেয়েছিলেন কবি? জানতে হলে পড়ুন

# রবীন্দ্রনাথ ও নোবেল গ্রাইজের অজানা তথ্য

বোধন-এর জন্য লিখেছেন

চিত্তরঞ্জন দেব

কেউ কি এই তথ্য অস্বীকার করতে চান?  
'বোধন'-এর রইল চ্যালেঞ্জ। লেখা পড়ে পক্ষে, বিপক্ষে  
যাঁর যা মত লিখে পাঠাবেন। প্রমাণের দায় বোধনের।  
গ্রাইজের টাকা কবির হাতে এল কীভাবে? নিজই কি  
তিনি সুইডেন গিয়েছিলেন? কোন ব্যাঙ্ক টাকা জমা  
পড়ে? গ্রাম-বাংলার কোন ব্যাঙ্ক কি? তারপর কীভাবে  
ব্যয় হয়! রবীন্দ্র-পুত্র রথীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-  
সম্পত্তি বিশ্বভারতীকে দিলেন কেন?  
এসব জিজ্ঞাসার জবাব মিলবে বোধন-এ।

'বোধন'-এ এরকম আরো পাবে

অপ্রকাশিত

নন্দলাল বসুর ছবি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প

সব মিলিয়ে বোধন হবে অনন্য

ছোট-বড়ো সবাই এখুনিই গ্রাহক হয়ে নিশ্চিত হন।  
দেবী করলে অসুবিধা হতে পারে। আগাম টাকা  
পাঠাবেন না। শুধু নাম-ঠিকানা পাঠালেই গ্রাহক।  
বোধন-এর আরো আরো বৈচিত্র্য জানানো হবে পরের  
বারে। মনোজ দত্ত, সম্পাদক।



করণা প্রকাশনী

১৮ এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯, ফোন: ৩৪-৬২৬৮

উপায় নেই। এ বাড়ীতে কি চাকর আছে? থাকলেও তাকে এখন পাচ্ছি কই  
অতএব বাড়িটির দিকেই তাকাতে হল।

তাকাবার মত বাড়িই বটে। এমন সিম্ধকের মত বাড়ি এর আগে কখন  
দেখিনি। নুড়িটের গাধা। একদিন যেন খলে পড়ে যাবে। পাল্লার  
টানটানের বলাই নেই কোন। জায়গায় জায়গায় প্রকাণ্ড আশ্রয় উঠে গেলে যে  
খালকা খালকা দেখায় তেমনি এখানে এখানে গর্ত হাঁ করে আছে। দাঁড়িয়ে  
দাঁড়িয়ে এককালে বরোকার মত জানকা ভেঙে প্রায় পড়ে আর কি। বাড়িটি  
শেষদিকে বাড়িটিকে প্রায় শিকারীভূত করে একটা দল্লোল অশব্দ গাছের দাঁড়ি  
সব জ পাতায় বলমল করতে করতে শরতাকের হাসি হাসছে, না, সবনাশা আ  
কাক নেই। হঠাৎ একটা চামচিক কারো শিখায় জেগে উঠে কানের পশ দি  
উড়ে গিয়ে আকাশের নীলিমায় চলে গেল।

একদিকে এই সুন্দরী নারী আর তার কটকট-গর্ত চোখ, রূপকান ফলক  
উজ্জ্বল পাখির ডালির মত কুঁড় আর তার প্রয়োচনাময়, নরম মৃৎ-অনিন্দিত এ  
রঙটো, নেনার দাগ লাগা, এসো, বিক', প্রায়-বিধবৃত, পলেন্দুরা-বস। এই পড়ে  
কাড়-জীবনের এ এক বিচিত্র কনস্ট্রাক্ট, একথা ভাবতে ভাবতে সেদিন নিদ্রা  
অনিদ্রায় সরে এসেছিলাম বোধনের সেই জানলার ধারের বিহীনতা থেকে।  
আসতে আসতে, কে জানে কেন সেই গানখানিই বেজে উঠেছিলো, 'অপাধি অধিগো  
নব নীলমা'। কার অঁচল? সে কি তুমি? সে কি তুমি? তেজস  
সুন্দরী? না অন্য কোন হাওয়া-ঝরা ফল? অন্য কোন মাধুরী? সে হাঁ  
হোক আর যেই হোক সেদিন আমার সমস্তদিন কোন এক অদৃশ মৌচাক ধের  
ঘন নিশ্বাসে করে করে পড়েছিলো। আমি একথা ভাবতে বাধ্য হয়েছিলাম, অত  
কার মৃৎ দেখে আমি উঠেছি। যারা মৃৎ দেখে উঠেছি তার মৃৎ যেন বেজে  
রোজ দেখি।

...প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুনকালের ঐক্য মিশে আমাদের এ শহরটির  
চেহারা অনেকটা দাঁড়িয়েছে বয়স্কা, পৃথল এক বারিবল্যসিনী মত। যেনবদ  
সে ডেউ আর নেই। চামড়া অনেক শিথিল হয়ে গেছে। শরীরের বেথোপলি  
আর তেমন টানটান নেই। তবে যে একদিন ছিল রূপের দপট, রঙের অধিকার  
তার জেরা আজো হীরার ধুলোর মত গড়ো গড়ো হয়ে এ শহরের এখানে এখানে  
চিহ্ন রেখে গেছে।

এই শহরের গঙ্গার কিস্তীর্ণ পাড়ে, বটের ছায়ায়, দুমুখ খোলা কি টি  
মোড়ের ছায়াছন্ন বসবার জায়গাগুলিতে, রাস্তার দু'ধারের কাঁড়ির চোয়াকে অথবা  
ঘাটতে, লাইব্রেরীর বারান্দায়, বানার্জি কৈবনের চালের ধারে, সদা নিমিত্ত  
পার্ক, বৃন্দের গাঁতর আড়ায়, রিজ খেলার আসরে, স্টার্স সেটে যাওয়া  
চাতালে, অপরিচ্ছন্ন অসংখ্য ছোটখাটো চা-খানায় এখন এই একুটিমাত্র আলোচন,  
এই সল্ল উত্তীর্ণ যবতী আর ওই রূপকান যুকটিকে নিয়ে।

হ্যাঁ, সবাই ওদের দেখেছে, ওরা কোথাও যায় না। পরা আড়াল, আবডল  
খোঁজে না। রেস্টোরাঁর পদা-খাজানো সংকিশ্ণত আসনে ওদের কখনই পাওয়া  
যায় না। ওদের যুগলে ম্যাটিন অথবা নাইট শো এ কখনো কেউ দেখেনি।  
ওদের সবই প্রকাশ্য, কোন ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই, সকলের চোখের সামনে  
গিলতে এককাল ব তিনবারই, সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, ওদের দৃজনকে দেখা যায়।  
একই জায়গায়, একই ভূপাতে। জানলার একপাশে ফিরে বাস আছে তরুণী  
যুবক নাচতে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে, আর ওয়া কথা বল যাচ্ছে অনর্গল, অনবরত,  
আকাশের ধারার মত, কে দেখলো না দেখলো তাতে তাদের বড় করেই গেল, যে  
কেউ এ পথে যাবে, তার একবার দাঁটি পড়বেই। তার মনে হাট্টে যুবকী  
মেয়েটির সঙ্গে আছে অথবা মেয়েটিও আছে যুবকটির সঙ্গে আর তারা কথা  
বলছে না আ যেন চাণ্ডীক আলো করে শিউল ফল করে বলে পড়ছে।

এরপর যখনই ওপথ দিয়ে গিয়াছি, যখনই যারেক ওদের সঙ্গে চোখাচোখি  
হয়েছে, আমি দাঁড়িয়ে গেছি, বলেছি না, তরুণীটি এক কঠি স স্মৃ! সে হয়  
সঙ্গেপনে আমার দিকে আড়চোখে তাকায় হুড়পিং করে। অথবা অকারণে  
উচ্চকিত হয়ে উঠেছে ওর অমলিন, বিজয়নী হাসি, অথবা তার অজানা দাঁট,  
অঁচলটি অশাসনে কাধ থেকে খসে পড়েছে, আমি কি কর? আমকে নিতান্ত  
বাধ্য হয়েই সেই 'গ্যাংডেন মাউন্ড'এর দিকে তাকান্নেই হয়েছে, অবশ্য সঙ্গে  
সঙ্গে চোখও ফিরিয়েছি, কিন্তু তা হলে কি হয়, তাতেই অস্বাভাবিক চোখের দাঁটি  
হয়েছে প্রথর ঠোঁটের রক্ত শেখার ফটে উঠছে তাকিলা, গ্রীবার অনবদ্য ভূপাতে  
এসেছে নারীর মত অসংকার—যা' কেবলমাত্র তাকেই মানায়।

আমার এই সবই দেখতে দেখতে চলা অল চলেতে চলেতে দেখা। এই দেখে  
যেমন ফরোয় না, এ চলারও তেমনি শেষ নেই।

...এক মগোই হঠাৎ বমকা বাড়াস একদিন আমাদের চিরকালের শ্মশন শহরটি  
ওপা দিয়ে বহে গেল। এই প্রাচীন শহর যেন বড় বেশি জীকিত, বৃহৎ হাট  
উঠলো। কি যে হল কাণ্ডখানা! অবাক হয়ে দেখলাম, এতদিনের সজান  
ছক উল্টে গেছে। পুরনো স্তম্ভগুলি যেন মৃৎ-থবড় পড়ে গেল। এলা  
এক বিদঘুটে, আজব, রান। এই বান, বেশ মনে হ'ল, ডাঙ্গা জহর সব ভাসি  
নেকে। একটা দিক-হারানো, ভয়ঙ্কর স্রোত আমাদের শ্বকির গাহশ্বাকের  
ফর্দাফ'ই করে, ছিঁড়েফা'ড়ে একাকাক করে দিলো।

আমি একদিন সন্ধ্যার ষোলক কাছের স্টেশন দিগ্ন গরিফা যাকো, স্টেশনের  
নীচেরা যে চার নম্বর এসটা এসে দাঁড়ায়, সেইখানে দাঁড়িয়েছ, অশঙ্করে কোথায়  
গা-ঢাকা দিয়েছিলো, হঠাৎ যেন মাটি ফা'ড় একটি ছোলে উঠে এলা আস



বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে সেই আমল—  
লালবিহারী দে, দক্ষিণারঞ্জন, যোগীন্দ্রনাথ  
প্রমুখের আমল থেকে শিশুরা যে আরব্য রজনীর  
গল্প লোক-পরম্পরায় শুনে আসছে, যা আজ  
অবধি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি, সেই  
বিশ্ববিখ্যাত রূপকথা আমাদের শিশুদের জন্য  
বিশেষভাবে রচনা করেছেন—

শিশুসাহিত্য সান্নাধ্য

লীলা মজুমদার

## ছোটদের আরব্য রজনী

রেস্কিনে বাঁধাই, সোনার জলে লেখা, অসংখ্য  
ছবিসহ বিরাট বইটির দাম মাত্র ১৫.০০ টাকা।

ছোটদের জন্য এ্যুপের একটি সেরা সংকলন  
প্রীতিভূষণ চাকী সম্পাদিত

## ছোটদের সেই বইটি

বিদ্যাসাগর থেকে উপেন্দ্রকিশোর, রবীন্দ্রনাথ থেকে  
লীলা মজুমদার, অবন ঠাকুর থেকে হেমেন্দ্রকুমার  
—কেউ এতে বাদ নেই। প্রবীণ ও নবীনদের এক  
কথায় বাছাই করা সেরা সেরা গল্প দিয়ে গাঁথা এই  
বইখানি আট থেকে আশি—সবাইই উপভোগ্য  
হবে। ছোটরা হাঁ করে গিলবে আর বড়োরাও  
স্মৃতির ঝলমলে আলোয় নিজেদের শৈশবকে আর  
একবার আবিষ্কার করবেন।

অসংখ্য রঙিন ছবিসহ ঝকঝকে ছাপা, রেস্কিনে  
বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা ও প্রাস্টিক জ্যাকেট-  
সহ বিরাট বইটির দাম মাত্র পনের টাকা। পূজা  
পর্যন্ত সর্বসাধারণ বইটি পাবেন মাত্র বারো টাকায়।

মৌসুমী প্রকাশনী/১এ কলেজ রো/কলকাতা-৯

আমার কাছে পড়ছে। শনৈঃ ওর কণা নেই কিংবা যা আছে। বাই, ওর কাছে  
বাই। সান্দ্রনা আর কি দেব। কে কাকে সান্দ্রনা দেয়। ওমনি একটা যাওয়া। দল  
বারো দিন পর ওরো পড়ায় ঢুকতে যাবে, পাশ দিয়ে সাঁ করে অন্ধকারে কে এগিয়ে  
গেল। তার পরেই মখে জোরালো টেচর আলো, হুট। দাঁড়িয়ে পড়লো  
কাছে এসে আমার আপদসম্পর্ক ডালো করে নিরীক্ষণ করে কে যেন বলল, 'ও  
আপনি।' তা সম্ভেবেলা এ গলিত কেন?'

কারটা বললাম। বলতেই ওয়া পথ ছেড়ে দিলো। খানিকটা গিয়ে আর  
একটা বড়, দোতলা, ডাঙা বাড়ির কড়া নাড়তে লাগলাম। মিনিট খানেক পর ঘন  
কাপড় মোড়া এক বড়ী মতন, মাজা-ডাঙা মেয়েমানুষ বোঁয়ালে এলো।

বললে, 'কি বাবা।'

বললাম, 'আমাকে পড়াতাম।' তাই একবার—

বাঁকাটা আর শেষ হতে দিলাম না। এসব বাঁকা কেমন করে শেষ করতে হয়  
আমি তার বছর জানি না।

উনি হারিকেনটা মখের সামনে তুলে, কি আচর্ষ্য, হেসেও ফেললেন।

বড়োমার বাড়িতে পড়তে যেতো, বাবা।

হ্যাঁ।

'আমলোয় মাস্টারমশাই আপনি? আমি ভেবেছিলাম পুলিশের লোক। আসুন  
বাবা, ভেতরে আসুন।' আমি নিশ্চয়ই সেই বিশাল পোড়ো, প্রায়শ্চকর বাড়ির  
জঠরে প্রবেশ করে, সাজা-পড়া ভিত্তি ভিত্তি কাঠের সিঁড়ি পার হলে, একটা  
অনাড়প্রশস্ত ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম।

উনি বললেন, 'ওই আমার আট ছেলের পরা শেষ হলো। বোমা বধতো। অনেক  
বলোছি, কেদেছি, শোনেনি।' কেমার কতা মাথার শিরে নিয়ে শতো। কালে  
বলতো, কখনা পুলিশ আসে ঠিক নেই। ঠিক সময় কেন কতা নির সত্তে যেতে  
পারি তাই মাথার শিরে রেখেছি। আমি শুনতাম না। আমি কতাম, বোমার কতা  
যদি রাখতেই হয় সে আমার মাথার শিরেই থাক। আমি বড়ী মানুষ। পুলিশ  
বলজা দেখে মনে করবে খুঁটের কতা। ছেলে রাজী হল। এতো করেও একে বাঁচাতে  
পারলাম না। বোমা তৈরি করতে করতে হঠাৎ ফেটে গিয়ে—

বড়ী হু হু করে কেদে ফেললে। মাথা নীচু করে আঁচ। টেঁবলে রাখা  
হারিকেনের রক্তাক্ত আলো আমার পিঠের দেয়ালে আমার একটা ভৌতিক ছায়া  
তৈরি করেছিল। আমি সেই দিকে মখ ঘুরিয়ে কতক্ষণ ছিলাম জানি না, কে একজন  
ঘরে ঢুকলো, একটা মধ্যকলী মাসী পিলা গোছের মানুষ, আমার সামনে টেঁবলের  
ওপর ঠক করে কি একটা নীচুর দ্বিলা, কালে, এটুকু খনি।

আমি চমকে চেয়ে দেখলাম, সন্দেহ।

আমল জোমা বাস্ট করে মারা গেল। ওর চোখ দুটো উড় গিয়ে দেখানে কালো  
কালো দুটো গর্ত হয়েছিল, ঘটনাটি নৃশংস কিন্তু তার চেয়েও নৃশংস এই নিরীত  
দেখতে সন্দেহাট। অপঘাতে মৃত এই বড়ী বাড়িতে মাস্টারমশাই হিসেবে প্রথম  
ঢুকোঁছ বলে এটি আমাকে খেতে হবে। জামনে এর আগে অনেক পরীক্ষা দিয়েছি,  
কিন্তু এমন পরীক্ষা বোধ করি এই প্রথম। কোনকমে সন্দেহটি গলমাংসকরণ করে,  
জলের প্লাসের শেষ বিস্ফোটক পান করে, সটান উঠে দাঁড়িয়ে, 'চল' বলে সৈদন  
ফেলে একটা অশোভনভাবেই অলসের মার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম।

...পর পর এই রকম চাপলাকার ঘটনা ঘটে যাবার পর, এই সব জোমাঝাজী,  
রক্তাক্ত অনেকটা নিশ্চয় চোখে দেখতে লাগলাম। এই রকম মারামারি, কাটাকাটি  
নোতুন কিছু নয়, মৃত ইতিহাসের পর্বে পর্বে মানুষের আদিম রক্ত এক এক সময়  
উত্থত হয়ে উঠেছে, এক একবার, এক এক নামে, এক এক পতাকার নীচে শর.  
হয়েছে ডাঙকা, গভীর নিশাথে ছেঁকে উঠেছে কাড়া-নাকাড়া, রক্ত মশালের ধবকা  
ফুরকা আলোয়, অন্ধকার আলো করাল, আরো ভয়াল হয়ে উঠেছে, মানুষের কাটা-  
মুণ্ড জামিরে মানুষ নিতান্ত ফাঁপা, অথহীন জরজরত তুলেছে, অন্ধকার  
ফলোয় ধলোয়, কদম্বের শব্দে, বারদের ধোঁয়ায় সৈদন যে এসেছিলো আত  
লাল তিলকে ললাট রাঙিয়ে সেই আবার এসেছে, এ নোতুন কিছু, না, চমকপ্রথও  
কিছু নয়, সৈদন যদি মানুষ সব সহ্য করতে পারে, আজকেও মানুষ জা পারবে—  
এই সব ভেবে, সমর, জীবন আর ইতিহাসের এই বাখ্যার বেশ . . . আখ্যপ্রসাদও  
লাভ করলাম। কিন্তু একদিন আমার নিজের আবাসেই এমন এক কণ্ড ঘটলো  
যে আমার এই বড় বড় আইড়ির দিয়ে তৈরী এই অঁত-সোঁধিন, স্মৃতিবান, বিস্ময়  
আখ্যপ্রসাদটি, (আহা বেচারী!) কেলনের মত ফুটো হয়ে গেল। ঘটনাটি সামান্য  
কিন্তু আমার কাছে কিচিৎখার মত লাগলো।

...আমি বাড়িতে ঢুকোঁছ, সিঁড়িতে একটা পর রেখোঁছ, কি রাঁধনি, সেঁধি যে  
ঘরটি আমার ব্যাকার করি না সেই ঘরটি এতদিন তলা ঝোলানো ছিলো, হঠাৎ দেখি  
সে ঘর থেকে গাড়াচক্রে পাড়ার ছেলে বের হচ্ছে।

খাপারটা কি জানতে যাবে আমার দ্যী প্রজা এসে আমার হাত ধরে টানতে  
টানতে ওপরে নিয়ে গেল। আমি প্রজার বাপারে হকচকিয়ে গেলাম। বললাম,  
'কি ব্যাপার? এসব কি? এরা করায়?'

বলতেই তো পারছো। চুপ করে থাকো।

কি চুপ করবে। আমার ঘরে আমার বিন পারিমাননে—

'আহ, কেলেকারী কোরো না। মনবে বলে মতিচ্ছন্ন হয়েছো।'

'দুশর' কথাটি শুনল আমি একটা হাডম্ব হলম। তবু, বললাম, 'আমার

বাড়িতে আমার পাড়ার ছেলে ঢুকে জোশ দখল করবে, তবু আমি কিছু বলতে  
পারবো না।'

'ওয়ে, না। ওরা আর পাড়ার ছেলে আছে নাহি। ওদের দিকে কখনো তাকিয়ে  
দেখোনি?'

যা কি আর ওয়া আছে? ওরা অন্য রকম হয়ে গেছে। ওদের সঙ্গে পাইগগান

কর আমার কিশোরের পালা।

মি পাইগগান জানো, দেখেছো?

নিম্ন বলতে গিরিহিলাম, ওরা পান্ডারিণি গলাটা একটু ফাঁক করে পাইগগান

না। তাই তো আমি অমাকে বাস্তব করছি।

লা দেওয়া ছিলো কে ধরতায়?

রা তালো ভেঙে ঘরে ঢকেছে।

কন চুকেছে জিগেস করলে?

ক মেনা বলল, কিশোর করবে অট।

কলব। তা বটে। ওই অবস্থাতেও কথাটা শব্দে হাসি পেল। কিন্তু এ তো

শব্দ। তবোবন বা হিচ্ছলো সবই পুরের ওপর দিয়ে। তাতও ভরা ছিলো না

না, তবে রোমাণ্ট ছিলো অনেক। কিন্তু এখন যখন নিজের ঘরেই বসে

না, তখন দেখছি রোমাণ্টের ছিটেও নেই। শব্দ ভয়ই আছে, ভয় আর অসম

ক, বরিত আর কিছু করতে না পারার জন্যে একটা অস্বাভাবিক, যে

শব্দ মানব নিজের আত্মা নিয়ে কামড়ায়। আচ্ছা জ্বলা হল দেখছি। উঠতে

এ বেশ ভালো দৃষ্টিভঙ্গি হল। কিন্তু দিগে যখনই উঠবে নামকে তখনই

কারণ না কারুর সঙ্গে চোখাচোখি হবেই আর সমস্ত রাত আমি ঘুমোতে

না। এ আবার কি অপেক্ষা জটিল দেখ। টেবিলে ওপর একটা ওঠরণ গা

বিশ্বলব হচ্ছে। যতো সব—

যেমন জোরজোরের জলের মত সঙ্গর্ভনে আজ এই সব মারামারি, কাটা

কোমাই একদিন এসবই কবিতাতে কবিতাতে চলে যাবে। আশ্বাস দেওয়া হ

ক সুন্দর হয়েই, শেষ পর্যন্ত দেখা যায় কোন কিছুই সন্দেহ হয় না, বরং

আগের চোখে অনেক খারাপ হল, মাঝখান থেকে রেখে যায় কিছু তি

সেনার মত ছেলের জটিল ও উচ্চ গল্প, রাস্তার এ মোড়ে ও মোড়ে ছড়ানো

কিছুর মত কিছু, শহীদদের, আলকাতরা নিয়ে অঁকা দেয়ালে দেয়ালে

লাগায় কিছু হিংসা ও প্রতিহিংসার বাণী। ওই তো বিপ্লব। ক্রম একদিন

তিষ্ঠা স্থাপিত থাকবে ক্রমে কালের ধূলা, সেনার ছেলের রূপকথাও তার

হারায়, শহীদদের ইন্ট কারা মেনা পালা করে করে খলে নিয়ে যায়, জলে

রোদ্দে ভেঙে আর পড়ে গিয়ে বিধব পতাকার মত আলকাতরার লেখা

র কবির জৌলুম হারায়, দেয়ালে দেয়ালে লটকানো বাণীগুলো আজ যতো

তত মনে হোক, সেগলোর কৈ লোকে একদিন ভুলেও থাকার না, কেননা

শো ততোদিনে সব অর্থহীন, দারিত্র্যই হয়ে পড়বে। শোভার আর ইস্তাহার

বাড়ির গা থেকে পড়ানো যাকার খোসার মত পড়ে যায়—এই তো বিপ্লবের

।

ঘরে ঢুকেছে গিরিহিলাম, ভালো লাগলো না, রাস্তার বৈয়াক পড়লো। মাথাটা

ধরে গেছে। আজ একটা ঘর দখল করেছে পাড়া ছেলেরা, বাল গোট বাউট

করে নেবে। তা হলেই হয়েছে আর কি। ঠিক আছে, এ রকম ফাঁদ করে,

যে আমিও সতীন ওদের দলে ভাঁড়ি করব। পরের ঘর আর পরের বাড়ি দখল

র জন্যে ওসকাকে। তখন হয়তো ছেঁড়াগলো বকুর লোকটাকে ওপর থেকে

সাদা, সাদা দেখাক আসল একটা, তখন আর আমার খাতিরে না, হঠাৎ

দেখি আমার ঘর বাড়ি রক্ষা পাবে। চাই কী এমন নিয়ম হতে পারে, এবার যে

নিজের ঘর নিজের বাড়ি দখল করে।

মনে মনে খুব একদমই হাসলাম।

ইউরেকা, পেয়ে গেছি। রাত্তা ওয়েল ডান।

অজ সাহায্য খুব বুঝি গেছে। সকাল থেকে শেষ বিকেল পর্যন্ত একটু

ছিলো না। এই এখন একটু, থেমেছে। রাস্তার নিম্ন লাইটে জলে ভেজা,

যে থকথকে রাস্তাফাট, ভিকে সপসপ ঘাসঘাসের ক্রম অশ্রুত দেখাচ্ছে।

আকাশে এখনো জমট কাপো মেঘ, মাঝখানে একটু খানি ফাটল, সেই ফাটল

কি জোৎস্নার মতো আলো সন্ধ্যা উঠি দিয়েছে। লোকজন পাট গুটিয়ে জলে

না শহরের ওপর থপ থপ শব্দ করতে করতে ভূতের মত হেঁট চলেছে। আমিও

ছি তারপাশে মনে, হু হু জোলা হাওয়া দিচ্ছে, কেমন একটু শীত শীত

হচ্ছে, মরা আলোর শহরটাকে ভারি অশ্রুত লাগছে, মনে হচ্ছে, "আনিরয়ল",

অনা কোন দলের হা, এ পথিবীর হা।

এমন সময় হঠাৎ কান ফাটলে সেই ভয়ংকর আওয়াজ, সেই বম্ব বম্ব শব্দ,

। ঝিক্‌র ভেতর প্রথম শব্দই ছিলো, সেই ভয়ংকর শব্দ, তার পরেই একটা তীক্ষ্ণ

গ—আর সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশট ওরালাস ডানি...তার সাত লাইটের তীব্র

লা যে যেখানে ছিলো দৃশ্য ছুট...আমি ছুটলাম...

ঘণ্টা দ্বয়ের পর থক থক নিয়ে যা জানলাম ভাত মন দিব্যে একবারে ভরে

। হ্যাঁ সেই রূপবান যুবক, উড়া পাখির ডানার মত বাক ভূত, কাঁধে কাজ করা

শতিনকেতনী কোলা নিয়ে জানলার বসে থাকা প্রেমিকার কাছে বার ছিলো

কক মহাশয় করণের প্রয়াস, সব সময় যাকে দেখা যেতো রাস্তায়, সকাল-দুপুর

ওরা যখনই লোকে এ পথে হেঁটে যেতো তখন কোন না কোন সময়ে তাকে দেখা

হা এই এক কোন ফাঁক ছিলো না, আজ, এই কিছুক্ষণ আগে, খতমওয়ালদের

ও সে খতম হয়ে গেল।

তাকে প্রথম তার প্রিয় জানলার দার থেকেই নাকি ডাকা হয়েছে, সে অকপট

পাইগগান, বুঝি আর অন্ধকার মেধা দিন...কিরিঝিরে বুঝি আর পাতলা, তলে  
অন্ধকার, মাঝে মাঝে আকাশে বিদ্যুতের টান, দমকা বাতাস এলোমেলো...এক কার  
খোজ রাখে...খোজ রাখেই বা বাধা দিচ্ছে কে...তাকে একটা গিলির মধ্যে নিশ্চয়  
নিজে বাওয়া হয়েছে, প্রথমে ঘাড়ো মারা হয়েছে মৃগশ, ও মুখ খুঁজতে পড়েছে  
মটিতে, ও তখনো মরেনি, ও তখনো চেয়েছে জল, ওর মুখে চাঁকিয়ে দেওয়া হয়েছে  
বিস্তৃত, সবচেয়ে বা নিয়ম, বোমা ফাটিল চলে যাওয়া—সেইভাবেই ওরা চলে  
গেছে।

ওক মারা হল, কেননা ওকে ওদের অনেক দিন থেকেই সন্দেহ, ও নাকি  
স্পাই ও নাকি সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা জানলার নীচে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওদের গতি-  
কিম্বদন্তি লক্ষ করতো, একদিন কি একটা নাকি খুব গোপন জিনিস ও দেখে ফেলে,  
সেটা এমনই এর পর যুবকটিকে ব্যাচরে রাখার অর্থই হচ্ছে নিজের সন্ধান  
সাধ করে ডেকে আনা। হ্যাঁ, বুঝি আর অন্ধকার মেধা দিন...কিরিঝিরে বুঝি...  
আর পাতলা, তার অন্ধকার...দমকা বাতাস এলোমেলো...মাঝে মাঝে আকাশে  
বিদ্যুতের টান...হ্যাঁ, ভালোই হল, কল হল।

এর পর থেকে জানলার দারে সেই মেয়েটি আর বসবে না, কেন না ছেলেটি  
তো আর নেই, সে খতম হয়ে গেছে, আর কেউ ওদের কথা বলতে দেখবে না, ওদের  
নিরে আলোচনাও আজ থেকে খতম হয়ে গেল।

হে মারা গেল—সে গেলই তার জন্যে কোন চিন্তা নেই, কিন্তু যেতে যে  
রইলো সেই মেয়েটি? তার কি হবে? সে এই ভয়ংকর শোক কিভাবে গ্রহণ করবে?  
এর কি কোন উত্তর আছে? না, একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে আমাকে মাথা নীচু  
কর কেনে নিতেই হল—এর কোন উত্তর নেই।

উঃ! আজকের গোটা দিনটাই কেমন অবসাদ, কেমন অভিশপ্ত। একটু  
আগেই মনে হচ্ছিলো শহরটা কি "আনিরয়ল"। আর এখন? এখন মনে হচ্ছে বড়  
বোঁশ "রিয়েল"। অন্য কোন দুরূহ গ্রহ একি নয়।

আমি কপিতে পারি না, এই এক অস্বাভাবিক আমার, ন...একটু কান্ডাম,  
নিজের মনে। হায় কিশব! হায় আর বলি।

...যা স্বাভাবিক। জানলা আর খুলে না তার পরের দিন। তার পরের দিনও  
না। তার পরেরও না। শুনলাম, মেয়েটিকে নিয়ে ওর বাবা অন্য কোন জায়গায়  
পাঠিয়ে দিয়েছে। আহা, দেখেই তো। ও আর এখানে থেকে কি করবে? কি করবেই  
বা থাকবে? এখানে যে ওর অনেক দিনের অনেক স্মৃতি।

এখনো চোখ বজলে জমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাই, স্থূলবাড়ির সামান্যামনি  
একটা বাড়ির জানলা, সেই জানলার পাশ ঘিরে কা এক তরুণী, তার গ্রেপন,  
সলজ, মোহিনী হাসির বিভ্রমের নীচে রাস্তার ওপর দাঁড়ানো সেই রূপবান যুবক,  
উড়া পাখির ডানার মত ভূত, কাঁধে শান্তিনিকেতনী কোলা, মুগ্ধ হয়ে সে যেন  
মেয়েটির অনেক বেশী নিজ নে এসে তার সবরের দামী আলো তাকল ভ্রময়  
হয়ে শব্দে যাচ্ছে। এ সংসারের সমস্ত কলরোল ছাপিয়েও আমি যেন তাদের  
কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি।

...মাসখানেক পর, এই পথ দিয়েই ফিরছি, হঠাৎ, এমনই জানলাম চোখ পড়ে  
গেল। কি আশ্চর্য! এ কি ভোজবাজী নাকি। মজিক! যাদু! চোখে ঠিক দেখছি  
তো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে সৌন্দর্যের সেই যুবকটির মত একজন যুবক, কাঁধে  
অজান্তভাবে কল-করা শান্তিনিকেতনী কোলা। আর সৌন্দর্যের সেই মেয়েটির মতই  
আর একজন, সে জানলার বসে আছে। আহা, সুখখানি কি সুখখানি। তাদের মন  
মসৃণ কপাল। পিঠে একটাল কুণ্ডিত চুলের রাশ। ওই রকমই দীর্ঘল চেহে বড় বড়  
পালক দিয়ে ঘেরা। হাসিতে, লজ্জায় অপরূপ হয়ে কথা বল যাচ্ছে। ওরাও  
কোনরকম তাকাচ্ছে না—রাস্তার এখন কতো লোক, তাদের কতো রকমের অর্থ-  
পথ চাহনি, কেউ কেউ টিম্পনী কাটছে, ওরা কিন্তু নির্বিকার, ওরা কোনরকম,  
গ্রাফা না করে পরস্পর কথা বলে যাচ্ছে। বাস্তবিক, জীবন কি বিচিত্র, কি বিচিত্র  
জীবনের গাথ।

প্রথমতায় একটু, খতমত খেলেও ব্যাপারটা না বোঝার কিছু নেই। মেয়েটির  
দিকে একটু নিরীক্ষণ করলেই টের পাওয়া যায়, এ মেয়েটি কিছুতেই সে মেয়েটি  
নয়, কিন্তু সম্ভবত মেয়েটি সে মেয়েটিরই বোন, মখের গড়নে, হাসির ধরনে,  
কসবর আলস্যায় ভর্তিপতে, কেশবোশ অনেকটা তারই মত, তব সে নয়। আর  
যুবকটি যে অন্য যুবক তব কানার অপেক্ষা রাখে না, মুখ চোখের গড়নও  
আলাদা, উড়া পাখির ডানার মত ভূতও নেই, কিন্তু চোখে মুখে অবিকল সেই  
একই মন্থতা, যা চিনে নিতে ভুল হয় না।

হঠাৎ কিংবদন্তির মত একটা কথা আমার মনে হল। যদি এই তরুণী বা  
ওই তরুণকেও পুলিশের স্পাই বলে সন্দেহ করা হয় বা ভয়ংকর কোন অপরাধের  
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—এরকম দেখানো হয় তবু আমি যেন কেমন করে জেনে গেলাম, এ  
জানলা কখনো বন্ধ হবে না।

এ আর কি সামান্য দৃষ্টি চারটে বোম্ব আর পাইগগান বা স্টেনগান। এ আর  
এমন এক সাপ্তাহিক দুর্যোগের দিন! শত শত আশ্রয়োচ্ছ্বাস, বা ভূমিকম্প বা  
পরাক্রান্ত মহামারী বা কানার ওপরেও এ জানলা খোলা থাকবে, সৌন্দর্যে যুবক  
দাঁড়িয়ে থাকবে রাস্তায়, আর জানলার বসে নারী তার একমাত্র পরষের গায়  
তার হেমকর্প শরীরের আলো ফেলেবে, আর তার কথা কল যাবে অনাগত যমের  
করে করে শিউলি, শিউলি করে বনভূমি আলো করে।

জীব : সুখীর মেষ





মায়েরা !

# এঙ্গেল শিশু-দুগ্ধাশ্রয় সহজেই সহজ করা এটি আপনাদের সমস্ত সমস্যা সমাধান করে দেবে।

জিটামিন ডবলপুর্ন এঙ্গেল একটি মূল্যবান আহার্য এবং সহজেই সহজ  
হওয়ায় জন্ম শিশুকে আর মনুষ্য করে তোলে।

এঙ্গেল শিশু-দুগ্ধাশ্রয় করবে আপনার সব সমস্যা  
ফল। শিশুর বাড়-বাড়ন্তের জন্য যে সমস্ত পুষ্টি  
দরকার, তা সবই আছে এতে। এর দুধের  
গুঁড়ো খুব মিষ্টি আর মনুষ্য করে তৈরী করা  
হয়েছে যাতে শিশু এটি সহজেই হজম করতে  
পারে।

“শিশুর পাকস্থলীর জন্য মিষ্টি আর মনুষ্য  
দুধের গুঁড়ো দরকার”—

শিশুর পাকস্থলী নতুন নতুন কাজের সম্মুখীন  
হয়। তার নবীন পাকস্থলী যাতে বিপদগ্রস্ত  
না হয়, সেজন্য এঙ্গেল দুধের গুঁড়ো খুব মিষ্টি আর  
মনুষ্য করে দেবে। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এঙ্গেলের  
চর্বিগুলি ছোট ছোট মিষ্টি দানায় গুঁড়ো করা  
হয়। পাকস্থলীতে গিয়ে এঙ্গেল নরম আর সহজে  
গলে যাওয়া দুধের মত হয়। শিশু তা চট করে  
হজম করে নিতে পারে।

“শিশুর বাড় ও গঠনের জন্য অল্প  
আহারের প্রয়োজন”—

প্রথম কয়েকটি মাস শিশুর ভবিষ্যৎ গঠন আর  
তার বেড়ে ওঠার ভিত্তি। এই বিশেষ সময়ে তার  
দরকার সবরকমের ভিটামিন আর লৌহ। এঙ্গেল  
একটি ভিটামিন-ভরপুর ফর্মুলা যাতে আছে  
আটটি ভিটামিন আর লৌহ। প্রকৃত পক্ষে  
এঙ্গেলই একমাত্র শিশু-দুগ্ধাশ্রয় যাতে রয়েছে  
বেশী পরিমাণ ভিটামিন-ই, যা শিশুর কোমল  
চামড়া রক্ষা করে।

“মায়েদের কাছে এই দুগ্ধাশ্রয় তৈরী  
করাও এত সহজ”—

আপনি কেবল আধ মিনিটে দুগ্ধাশ্রয়টি তৈরী  
করে আপনার শিশুকে খেতে দিতে পারেন।  
কোনো দুধের পাউডার। আপনি কেবল চামচ  
দিয়ে এই পাউডার ফোঁড়ি বোতলে ঢালবেন।

তারপর গরম জল ঢেলে নাবুন। বাস, আপনার  
শিশুর পুষ্টির আহার তৈরী। সে খেতে খেয়ে  
সহজেই হজম করবে। এবার আপনার শিশু  
হলো—সত্যি এঙ্গেল শিশু।



ভিটামিন-‘ই’ সহ  
আটটি ভিটামিন  
দ্বারা সুরক্ষিত।

‘Progress of an Angel Baby’

বিনামূল্যের এই পুস্তিকার জন্য এক টাকার  
ডাক টিকিট সহ এই ঠিকানায় লিখুন :—

Consumer Services Division, Foremost  
Dairies Ltd. 72 Janpath, New Delhi-110001

ইণ্ডিয়া ডেইরীর দুগ্ধজাত দ্রব্যের প্রস্তুতকারকদের তরফ থেকে।

আপনার এঙ্গেল শিশুর জন্য



৫ম খণ্ড প্রকাশিত হল  
পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ ২৫ খণ্ডে

## বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও ছোটগল্প

(প্রথম পর্বারে ভারতীয় উপমহাদেশ বাদে)  
সম্পাদক: জস্টিস

ড. ক্ষেত্র গুপ্ত, ড. রবীন্দ্র গুপ্ত, ড.  
ধীরেন্দ্র দেবনাথ, ড. বিষ্ণু বসু,  
অধ্যাপক সুনীল সাহা, শ্রীচৈন্যময়  
মজুমদার।

এশিয়া (ভারতীয় উপমহাদেশ বাদে),  
আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা ও  
অস্ট্রেলিয়া—বিশ্বের এই পাঁচটি মহা-  
দেশের বহুলাংশ কথাসাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ  
রচনার সংকলন।

আমরা গ্রাহক নিছি। গ্রাহকদের  
১০.০০ টাকা দিলে গ্রাহক হতে হবে।  
প্রতি খণ্ডের গ্রাহক-মূল্য ২২.০০। এক-  
কালীন গ্রাহক-মূল্য ৪৫০.০০ টাকা।  
প্রতি খণ্ডের সাধারণ মূল্য ৪৫.০০।

১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে

## বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কিশোর কাহিনী ১২ খণ্ডে

সম্পাদক: ড. ক্ষেত্র গুপ্ত, রবীন্দ্র গুপ্ত, ধীরেন্দ্র  
দেবনাথ, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, চৈন্যময় মজুমদার

● বিশ্বের বিখ্যাত কিশোর উপন্যাস।  
● ছোটদের সব বুকোলের সব বাদে  
সেরা গল্প—ভূতের, হাসির, গোয়েন্দা,  
অ্যাডভেঞ্চার ● সত্য শিকার-কাহিনী,  
জৌলুকার অন্বেষণ, ডাকাতির কথা,  
মুক্তাঙ্কুরের গল্প, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক  
আবিষ্কারের কাহিনী ● দেশবিশেষের  
পৌরাণিক কাহিনী, লোকগল্প ও  
রূপকথা ● ঈশপ-ক্লিড-পঙ্কজের প্রকৃতি  
নীতিগল্প, ● মহাকাব্য ও প্রাচীন কাব্যের  
গল্প ●

গ্রাহক নেওয়া হচ্ছে। গ্রাহক-চাঁদা  
১০.০০। প্রতিখণ্ডের গ্রাহক-মূল্য:  
২০.০০। এককালীন গ্রাহক-মূল্য:  
২০০.০০।

১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে

## বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বহুসংখ্যক উপন্যাস ও গল্প

উপদেষ্টা: ড. ক্ষেত্র গুপ্ত, সম্পাদক: জস্টিস  
সরকার, সুনীল সাহা, চৈন্যময় মজুমদার।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রহস্য উপন্যাস ও গল্পের  
সংকলন (অনুবাদ ও মৌলিক রচনা)।  
গ্রাহক নেওয়া হচ্ছে। গ্রাহক-চাঁদা  
১০.০০। প্রতিখণ্ডের গ্রাহক-মূল্য:  
২০.০০। এককালীন গ্রাহক-মূল্য:  
২০০.০০।

প্রতিখণ্ডের সাধারণ মূল্য: ৩২.০০।

ডাকে বই নিলে আলোনা ডাকমাওল।  
একমাত্র এককালীন গ্রাহকের প্রতি  
খণ্ডের জন্য ৩.০০ করে ডাকমাওল।  
টাকা নিজে এসে, মাগি ডাকের বা  
ব্যাঙ্ক ড্রাকটে (চেক নয়) দিতে হবে।  
ডালো কাগজ, ডালো বীথাই।

গ্রন্থনিলয়

৫২/১৮ পটুয়াটোলা লেন, কলি-২

তখন বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ আনাতে  
হয়েছিল। এখন আমাদের দেশের সম্পদ নিয়ে  
আমাদের দেশের বিশারদরাই তৈরি করতে  
পারেন। এরই নাম স্বাধীনতা। আমাদের দেশে  
প্রথম যখন ঘড়ি তৈরী হয়, তখন বেশির ভাগ  
সরঞ্জাম বিদেশ থেকে আনতে হত; এখন আর  
হয় না। আমাদের দেশের জগলে, পর্বতে,  
নদীতে—সর্বত্র কত সম্পদ ছড়িয়ে রয়েছে।  
পরাদীন অবস্থায় এই সম্পদের সম্ভাবহার  
আমরা ঠিকভাবে করতে পারতাম না; এখন  
পারি, আমরা স্বাধীন বলেই তো তা পারি।  
জাপান একটি স্বাধীন দেশ। সে দেশে কোথাও  
এক মটো লোহা পাওয়া যায় না। বিদেশ থেকে  
লোহা আনিয়া জাপান এখন ইম্পারিশিপে  
পৃথিবীর প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। এতে  
কলঙ্ক কোথায়? আমাদের দেশে তো প্রচুর  
লোহা আছে! কিন্তু পরাদীন অবস্থায় অতি  
সামান্য সামান্য লোহার জিনিসও বিদেশ থেকে  
আসত। তার কারণ নিজের দেশের সম্পদের  
সম্ভাবহার করার ক্ষমতাও আমাদের ছিল না।  
বিদেশী রাজ তার দেশকে সমৃদ্ধ করার জন্য  
আমাদের দেশের সব সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে  
যেত। তার নামই ছিল শোষণ। ক'জন বিদেশী  
কর্মচারী বেশী টাকা ঘাইনে নিয়ে আমাদের  
দেশকে শোষণ করত, এটা তো ঠিক কথা নয়।  
আমার দেশের সম্পদ আমরাই দেশে সম্ভাবহার  
হত না। এরই নাম শোষণ। এখন শোষণ  
করবার কেউ নেই। আমরাই আমাদের দেশের  
সব সম্পদ ক'টা। এখন আমরা আমাদের দেশের  
সম্পদ যদি ঠিকমত ব্যবহার করতে না পারি,  
তাতে আমাদের অকর্মণ্যতাই প্রমাণিত হয়।  
নিজেদের অকর্মণ্যতাকে ঢাকা দেবার জন্য  
'অর্থনৈতিক পরাদীনতা' এই কথা ব্যবহার  
করা অসামর্থ্যই নামান্তর।

মাঝে মাঝে আরও একটা কথাও শুনতে  
পাওয়া যায়—যখন আমাদের দেশের সঙ্গে  
অন্যান্য কতগুলি দেশের তুলনা করে বলা হয়  
যে, আমরা সেইসব দেশের চেয়ে অনেক  
পিছিয়ে আছি। পৃথিবীর ক'টা দেশ আমাদের  
মত পরাদীন ছিল? ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের  
কথা শোনা যায়। ফরাসীরা তো আমাদের  
দেশের মত পরাদীন হয়নি! তাদের দেশেরই  
দুটো দলের মধ্যে মারামারি-কাটাকাটি হয়  
শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের জন্য। অবশেষে দেশে  
স্থিতিশীলতা আসে। দু'শো বছর ধরে তো  
বিদেশীরা তাদের দেশ শোষণ করেনি! বহু  
ইংরাজ ঐতিহাসিকের লেখার ভারতবর্ষ থেকে  
ইংরাজ ধনরত্ন কিভাবে শোষণ ও লুণ্ঠন করে  
নিয়ে গিয়েছিল, তার বিবদ বিবরণ দেওয়া  
আছে। ইংরাজ এ দেশে আসবার পর  
মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠন করে যে ধনরত্ন নিয়ে যায়,  
তার নিখুঁত বিবরণ কেউ দিতে পারেনি। যে  
বিবরণ পওয়া যায়, তাতে লেখা আছে যে,  
লন্ডন শহরে যে ধনরত্ন ছিল এরকম ২৯টা  
শহরের ধনরত্ন একত্রিত করলে বা হয়, তার  
চেয়ে ঢের বেশী ধনরত্ন মুর্শিদাবাদ থেকে  
লুণ্ঠিত হয়েছিল। এসব কথা সকলেরই  
জানা। তবু বারবার বলা প্রয়োজন হয়ে পড়ে  
এইজন্য যে এ কথা যাদের বলার দায়িত্ব, তারা

নির্বাক হয়ে থাকেন বলে। রাশিয়ার সঙ্গে তুলনা  
করা হয়। রাশিয়া তো পরাদীন ছিল। রা  
রাশিয়ার ঘটেছিল অর্থবিপ্লব! তা হয়ে  
কী করে সেইসব দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের  
তুলনা হতে পারে? সমালোচনা নিশ্চয়ই কর  
উচিত। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত কথা  
প্রকাশিত হওয়া দরকার। একদা ভারতবর্ষ  
জাহাজশিল্প ছিল মহা সমৃদ্ধ। বিদেশ  
শাসনের সময়ে সে শিল্প একেবারে নিষ্পত্তি  
হয়েছিল, এখন নতুন করে আরম্ভ করতে  
হয়েছে। আর কোন দেশে কি এরকম ঘটেছে?  
আমাদের দেশের সিংক ও সত্যী তাঁতের কাপড়  
সারা পৃথিবীতে চালান যেত। আমরা জ্ঞান  
হয়ে অবধি দেখেছি, হয় ইংল্যান্ডে তৈরী  
কাপড়, অথবা ইংল্যান্ডের তৈরী সত্যী  
এধানকার মিলে তৈরী কাপড়। মিলের যন্ত্র,  
পাতিও আসত বিলেত থেকে। এরই নাম  
শোষণ! আমাদের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে  
বিদেশী রাজের অর্থনীতির সমৃদ্ধি। এইভাবে  
যেখানে শোষণ চলেছিল—সর্বোপাধি, সাম্যের  
ও সর্বজনীন, সেই দেশের সঙ্গে অন্য কোন  
দেশের তুলনা করা কি উচিত? এ কথা তো  
অনেকের জানা আছে যে, ভারতবর্ষে জাহাজ  
ভরতি নুন বাহির থেকে আসতো। অথচ  
আমাদের দেশের তিন দিকে সমুদ্র এবং  
মাঝখানে নুনের পাহাড়। অনেকের হয়তে  
এ কথা জানা নেই যে, ভারতবর্ষে কয়লা  
আসতো বিদেশ থেকে। আজকে এটা আজগুর্বা  
মনে হলেও এটা সত্য। এবং এসব তথ্য ইংরেজ  
লেখকদের বই থেকেই পাওয়া যাবে। ক্রমাগত  
ভারতবর্ষ থেকে কাঁচা মাল চালান গেছে  
সেইসব সম্পদ নিয়ে সে দেশে কল-কারখানা  
হয়েছে, সে দেশের লোক অর্থোপার্জন করেছে  
সে দেশ সমৃদ্ধ হয়েছে। এই শোষণের সঙ্গে  
পৃথিবীর ক'টা বড় দেশের তুলনা হয়:  
আমাদের দেশে হিন্দু রাজত্ব ছিল, মুসলমান  
রাজত্ব ছিল, মাঝে মাঝে লুটেরা হানা দিয়ে  
ধনরত্ন লুট করে নিয়ে গেছে; কিন্তু অব্যাহত  
গতিতে এরকম শোষণ ও লুণ্ঠন কখনও  
হয়নি।

যাঁদের হাতে শাসনক্ষমতা আছে, তাঁর  
যদি ঠিকমত কাজ না করেন, তা হ'ল বিরোধী  
পক্ষের সমালোচনা করার পূর্ণ অধিকার আছে  
কিন্তু 'অর্থনৈতিক স্বাধীনতা' এইসব বড়  
জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা কি উচিত? আর  
সরকারী দলে যারা এইসব কথা বলেন, তাঁর  
নিজেদের অকর্মণ্যতা ঢাকা দেবার জন্য বলেন  
এতে সরকারী দলের কোন উপকার হয় না  
এতে খালি সৃষ্টি হয় জনসাধারণের মত  
শোষণে ধারণা। স্বাধীনতার বিকৃত ব্যাখ্যা  
দেবার অধিকার কারো নেই। স্বাধীনতা যেমন  
আনে নিজেদের দেশে সম্পদ সৃষ্টি করা;  
অথবা অধিকার, সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন দেশের  
নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথাও মনে  
করিয়ে দেয়। যারা সরকার চালাচ্ছেন, তাঁদের  
নিশ্চয়ই দায়িত্ব আছে এবং সমালোচনার পথ  
রোধ করা তাঁদের উচিত নয়। ঠিক সেইভাবে  
সমালোচনা করার অধিকার যাদের আছে  
তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকের দায়িত্বও পালন  
করতে হয়।

সবচেয়ে সেরা - সর্বশ্রেষ্ঠ - সর্বোত্তম



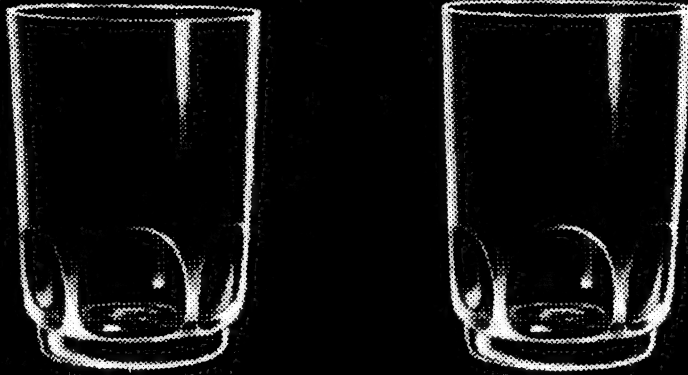
চমকুলাগা আলো-  
হাস্য সেতে শ্যামল-  
মুচিন প্রিটের  
মুচিন রুমালী  
শোষকে !

নীল রঙের বিচিত্র মেলা...  
টেরিফ্রেনেলের শোষকে  
নম-চপলতার খেলা !

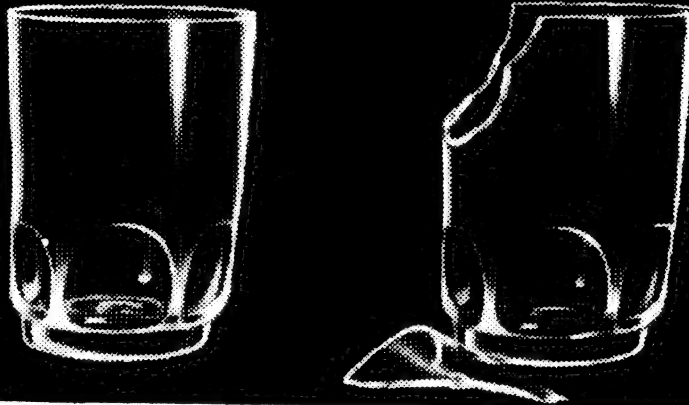
পলিফ্রেটার শাফারি-  
ডেয়ারার কুর্টজে তোলে  
নিভীক দাঁড়ি ! থাকে  
বালান বিশিষ্ট রঙ !

**সীমাবদ্ধ** **কমপড - উৎকৃষ্ট ডায়াল মালিকের মতো!**

এখন ৬ সে. মি. দূর থেকেও পার্থক্য বুঝাবেন না।



কিন্তু পার্থক্য বুঝাবেন এখন থেকে ৬ মাস পরে!



ইয়েরার পার্থক্য খালি চোখে দেখা যায় না।

আপনি দেখছেন হুবহু এক রকমের দুটি গ্রাস। আর যা গিয়ে ফেটে যেতে পারে এমন সব অদৃশ্য খুঁত ধরে নেবে। দেখতে পাচ্ছেন না তা হল—এদের একটির অতি সূক্ষ্ম খুঁত। থার্মাল শক্ টেস্ট—আপনাকে এমন গ্রাস দেয় যা নিশ্চিতভাবে ইয়েরা কিন্তু দেখতে পায়! ইয়েরা দেখেও! ইয়েরা হলে এমন বিভিন্ন তাপমাত্রার ধকল সহ্য করতে পারে। ওহারা নকল গ্রাস বিক্রীই করতো না! তবে গুণমান নকল করা মোটেই সহজ নয়—প্রতিটি ইয়েরা গ্রাসকে দু'রকমের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে তাও আবার ইয়েরার গুণমান! এর পেছনে আছে—হয়। কালার ভেরিয়েশন পোলারিস্কোপ টেস্ট—পরে বেড়ে গ্রাস তৈরীতে ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা!



ছ'মাস গেলেই আপনি বুঝে আনন্দিত  
হবেন যে ইয়েরা কितে আপনি  
কি লাভ করছেন।

লগ্নত করছেন: অ্যালেক্সিক গ্রাস  
ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, বরোদা



নীচের দিকে ইয়েরার  
মাক দেখে নিন—  
যা হল সেরা গুণমানের গ্যারান্টি



# বদেশে রবীন্দ্রচর্চা

## নাতে রবীন্দ্রজয়ন্তী

উদগ্রাস্ত আক্ষিপ্ত যুগে রবীন্দ্রসমগ্র যে আত্মিকাকে নিয়ে নিয়ে গিয়েছিল প্রচীত পৃথিবীর বুক থেকে চোর কবি রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গে দেহবন্ধন ঘটিয়ে লেন আত্মিকা কবিতায়। তারপর প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে ঘানার প্রথম রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে গত ২০ মে গিরিখে যেন তারই পুনঃচারণ ঘটল। আমাদের বীর কবির আত্মকল্পা সংস্কৃতির মেলবন্ধনের পদাী সূত্রটি এখনও রবীন্দ্রনাথ।

ঘানা লেখক সবে ভারতীয় দূতাবাসের সহ-গণতায় স্থানীয় ব্রিটিশ কাউন্সিল হলে এ বছর যে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব পালন করলেন তার পরিচয়না। প্রায়শ্চক ভাবেই গড়ে উঠেছিল অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগে একটি ঘরোয়া আলোচনার অঙ্গরে রবীন্দ্রতস্পর্গে পড়ায় এক ভর কবিতা পরঠের ফলে। দূতাবাসের সাংস্কৃতিক সচিবের বাড়িতে সাহিত্য বিষয়ে কথা ছিল ঘান লেখক সবে সভাপতির সঙ্গে। অনিবার্য-ভাবেই রবীন্দ্রনাথের কথা উঠল, তার দৃষ্টি একটি বিষয়ও পড়া হল। সবাই অভিভূত। আশ্চর্যের সময় কিছুক্ষণের মধ্যেই উপস্থিত কবি-লেখকরা করে ফেললেন ঘানার টেমোর সোসাইটি স্থাপন করা দরকার কেবলো সম্প্রদায়ের রবীন্দ্রতস্পর্গে আলোচনা করা যাবে। এরা ঠিক করলেন কবির স্মৃতি পালন করতে হবে। যাওয়া হল ঘানার গনকম্প্রী ভবন কোয়ার্টার ওকরান মশাইয়ের কাছে।

মন তো হবে উপসহী। ঘানাতে অনেকদিন পর স্পী শাসনের অবসান হয়ে আরম্ভ গণতান্ত্রিক সরকার হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয়। নতুন সরকার টালমাটাল নৌকো সামলাতে হিম্মত খাচ্ছে। গনকম্প্রী ইচ্ছা ঘানার ছাত্ররা আরও বেশী করে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করুক। এ সম্বন্ধে উনি প্রাথমিক ও রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কলা পুস্তক এবং গুণে। ২০ মে তারিখে প্রত্যাগত অনুষ্ঠানে উনি প্রান আতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে স্বীকৃত হলেন।

বস, উৎসবের আয়োজন শুরু হল। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী উৎসাহী ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী প এ নাজারেখ। পত্র-পত্রিকায়, রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচার শুরু হয়ে গেল। স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ওপর লিখলেন ঘানা লেখক সংঘ।

অনুষ্ঠান সূচী তৈরী হয়ে গেল। ঠিক হল ঘানা লেখক সংঘের সভাপতি রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করবেন আর ভারতীয়রা করবেন রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং নৃত্যপরিচয়। ছেলেমেয়েরা যারা বিদেশে মানব তাদের বাংলা গান-নাচ ফাঁসি দেখাবেন তাদের নিজেদেরই এ স্থাপারে জ্ঞানের সাম্যব্যবস্থার পরমা বা দীর্ঘকাল চার অভাবের জন্য কাজটা খুবই মটিন হয়ে দাঁড়াল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কয়েকজন বাঙালী ও দক্ষিণ ভারতীয় মহিলাদের নিয়ে গাঁপম দেওয়ার কাজ শুরু হল। পুরুষকর্তেও বেশ বাঙালীকে পাওয়া গেল। একটা হারমোনিয়াম কাজ চলে যায় গোছের। আর বঁধা তুলনা ছাড়া আর কিছু নেই। একটি বাঙালী মেয়ে পিঙ্গলো বাজায়। তাকেও দু'খান গানের সুর শেখানো হল।

নির্ধারিত দিনে সন্ধ্য সাড়ে ছটার সভাসহ দর্শক-প্রাণ্ডার ভরে গেল। এদের মধ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ছাড়াও বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতও উপস্থিত ছিলেন।

শকামপ্রী ওকরান তাঁরা ভাষণে কলেন—

"In our country today as in many other developing countries, we appear still to be in slumber as to the relationship of language to culture. Let us learn from Tagore and others before him who recognised language as a tool of culture. He was born in Bengal and all his life wrote in Bengali. However, he was not blinded therefore to write and think in narrow terms. While he loved his



ঘানা লেখক সংঘের সভাপতি রবীন্দ্রনাথের আত্মিকা কবিতা আবৃত্তি করছেন

monther-tongue, he used it as a vehicle for his learning and wisdom which transcended all barriers of language, caste, race and creed. I am sure that the parochial linguism and atavistic nationalism that often rear their ugly heads in some parts of Africa must now be torturing the spirit of Tagore."

ঘানার লেখক-লেখিকারা উদাত্ত কণ্ঠে কবিতা দিয়ে তাদের আবেগ প্রকাশ করলেন। সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়েছিল একসঙ্গে চারজনে মিলে ঐদের 'আত্মিকা' কবিতার ইংরেজী অনুবাদ পাঠ। ভারতীয় মেয়েদের নাচও খুব প্রশংসা কুড়িয়েছিল দর্শকদের।

বিশ্বপতি ঘোষ

## আমেরিকান কলেজে রবীন্দ্রচর্চা

এবছর কাস্টকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব-

উপকূলে অর্ধস্থিত ব্রিন ম্যর (Bryn mawr) কলেজে তৃতীয় রবীন্দ্র-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। গত কয়েক বছরে এই অনুষ্ঠানটি কলেজের সাংস্কৃতিক জীবনের একটি অঙ্গ হয়ে গেছে। ব্রিন ম্যর কলেজ তার আন্তর্জাতিক ছাত্রী-সম্প্রদায়ের জন্য খ্যাত। প্রতি বছর কাস্টকালে এখানে মহা ধর্মধামের সঙ্গে 'আন্তর্জাতিক সপ্তাহ' পালিত হয়। উৎসবের উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। কলেজে এত বিদেশী ছাত্রী থাকায় ঘানা দেশের গানবাঁজনা, লোকনৃত্য, ছারছাঁষ, এমনকি রামায়ণমার নিম্নলিখিত সারা কলেজ সরগরম হয়ে ওঠে। ১৯৭৭ সাল থেকে এই উৎসবে বড় রকমের দাম্য বসিয়ে আসছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান।

উদ্বোধন শতাব্দীর শেখাটিকে, মেয়েদের পুরুষদের সমান উচ্চাশ্রয় সন্ধান দেওয়ার জন্য ব্রিন ম্যর



রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে ভারতীয় মেয়েদের নৃত্য

কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতারা সকলেই ছিলেন 'সোসাইটি অফ ফ্রেন্ডস' বা 'ফ্রেন্ডস' সম্প্রদায়ের সভা। ব্রিন্ মার আমেরিকার পূর্ব উপকূলের 'সেন্টেন সিট্যার' কলেজগুলির অন্যতম, কিন্তু ১৮৮৫ সালে যখন এটি খোলা হয়, তখন বি-এ, এম-এ, পিএইচডি ডিগ্রীর শিক্ষাক্রম সমেত এটিই ছিল প্রথম মহিলাদের কলেজ। সেই থেকেই কলেজটি ফেমিনিজম ও মেয়েদের উচ্চশিক্ষার একটি ঘণ্টা ক্লাস চলে।

কলেজে আমরা কয়েকজন মাত্র ভারতীয়। কিন্তু আমাদের সঙ্গে আমেরিকান ও অন্যান্য ছাত্রীরা দলবেধে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। তারা গলা মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান গায়, শাড়ী পরে সমবেত নৃত্য পরিবেশনা করে। গানের দলের সকলেই পাশ্চাত্য ক্লাসিকাল সঙ্গীত অথবা নিজদেশীয় সঙ্গীতে পারদর্শিনী। ঠিক তেমনি, নাচের দলের সকলেরই কোন না কোন নৃত্যধারার সঙ্গে বহুদিনের পরিচয় হয় বলে, নয় মডার্ন ড্যান্স, কিংবা হাফ আমেরিকান বা ফিলিপিনো নৃত্য।

এবছর অনুষ্ঠানের 'theme' ছিল 'তারুণ্য'। এছাড়া অক্যা আন্তর্জাতিক সাতাহের 'লেকচার সিরিজের' আমন্ত্রণে প্রীতিময় চতুর্থী রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর ধর্মচিন্তা ও রাজনৈতিক চিন্তার উপর দু'ঘণ্টা কথোপকথন। সঙ্গীতানুষ্ঠানের আগে বিদেশী দল কর্মজলীর কথা মনে রেখে অল্পস্বল্প একটি ভূমিকা থাকে। প্রতিটি গানের আগে সেটির কবিতায় ইংরেজ অনুবাদ পাঠ করা হয়। কোন কোন অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী নাচের আগে একটি 'ডেমন্স্ট্রেশন' করা হয়, যাতে দর্শকেরা সেটি পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারেন। শাড়ীপরিহিতা গাইয়েরা কখন মঞ্চে পিছন দিকে। তাদের মঞ্চেই কেউ তানপুরা যেন। পেশাদার ভারতীয় তবলাবাদক অক্যা আসেন। নিউ ইয়র্ক থেকে।

একই ছকে ১৯৭৮ সালে রবীন্দ্রনাথের ক্ষত-পূর্ণায়ের বিভিন্ন গান নিয়ে একটি ছোটখাট 'স্মৃতিগান' মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠানের



প্রজ্ঞা ঘোষের ক্ষেত্রে 'রৌদ্রধারম্য'—আমেরিকার গান্ধীজী স্মৃতি



‘নৃত্যের তালে তালে’



সমবেত নৃত্যে আমেরিকা, ফিলিপিনস, তাইওয়ান, ইয়েমেন, পাকিস্তান ও ভারতবর্ষের মেয়েদ

বিজ্ঞানসভা ছিল ক্যা। তারা ইংরেজী নামকরণ হয়েছিল 'হোয়েন' বা 'হোয়েন কাম'। সেবার সীতাই অনুষ্ঠানের সময় পর পর কয়েকদিন কমকম করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। তাই বাংলাদেশের ক্যার আমেজও তৈরী হয়ে গিয়েছিল। সেবার ফিল্মডেল ফিল্ম অঞ্চলের ভারতীয় সম্প্রদায়ের আমন্ত্রণে আমরা ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভেনিয়ায় অনুষ্ঠানটির পুনরাবৃত্তি করি।

বিদেশীদের গান বা নাচ শেখাতে গিয়ে আমাদের যা চমকিত করেছে তা হল তাদের উৎসাহ এবং শিখার অদম্য ইচ্ছা। আমেরিকান ছাত্রছাত্রীদের বোঝানো হয়েছে, যে বিদেশী সংস্কৃতিও সঙ্গে পরিচয় হওয়াটা তাদের শিক্ষার এক বিশেষ অঙ্গ। এত পড়া-শোনার মধ্যেও নিম্নমিত রিহাসাল হয়। কোনকিন্তু নতুন আসতে পারলে বা শেখানো হয়েছে তা শিখে নেওয়ার দায়িত্ব ছাত্রীদের নিজের।

গান শেখাতে গিয়ে আমি দেখেছি তাদের কি অধ্যবসায়। কলেজ choral সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে তারা অভ্যস্ত। পাশ্চাত্য ক্লাসিকাল

সঙ্গীত আবার প্রায়ই ল্যাটিন অথবা অন্য বিদেশী ভাষায় গাইতে হয়—যেমন ফরাসী বা জার্মান। এসবের সঙ্গে বাংলা যুক্ত হয়েছে মার। পরিশ্রম করতে হয় সঠিক উচ্চারণের জন্য, আর বিদেশী ভাষায় লেখা গানের ভাবটি শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। কোন অংশ মনোহর না হলে সেটি হাজারবার পুনরাবৃত্তি করতে বললে তারা কিনা প্রতিবাদে তাই-ই করে। সেসময়ে অমৃতপ্রহর আমাদের তৈরী থাকতে হয়—যেকোন সময়ে কেউ এসে জিজ্ঞাসা করতে পারে গানের কোন অংশ বা নাচের কোন ভঙ্গী নিখুঁত হচ্ছে কিনা।

আমেরিকান ছাত্রীদের এই রবীন্দ্রতা! কিন্তু কেবলমাত্র একটি সাম্প্রদায়িকতাই সীমায়িত নয়। ওদেশী যে ডে উৎসবে খোলা আকাশের নীচে নানা নৃত্যগীত—অভিনয়ের সঙ্গে আজকাল শব্দে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের বসন্তের গান। কিংবা কোন সুন্দর দিনে হয়ত ব্রিনমরের বড় বড় গাছগুলির ছায়ায় অধ্যাপকেরা ক্লাস নিয়ে, পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ কানে ভেসে আসে পরিচিত গানের কল। স্বদেশী জন্য ভ্রম হয়, তবে কি শান্তি-স্বস্তিতে গায়?

ব্রিন ম'র অক্যা দাঁবা করত পারে যে রবীন্দ্র-  
দেখের সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় কেউ দেন।  
নিশ্চয়ই কুড়ি সালে নভেম্বর মাসে আমেরিকা ভ্রমণ  
করার সময় রবীন্দ্রনাথ এই কলেজে এসেছিলেন।  
এই নভেম্বর শ্রবণের তিনি এখানে ভিলেজ  
মিস্টার্স অফ কেম্পেল—এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন।  
সারগের কাসল এর মত টমাস হু-এর ভিতরের  
স্বয়ং 'কুয়েন্টাস'-এ তোলা তার ছবি ায়ছে।

কলেজ 'আরকাইভস'-এ রক্ষিত ওখনকার কাগজ-  
পত্র পড়ে দেখলাম, তিনি আসার তিন সপ্তাহ আগে  
একে কলেজের সাম্প্রতিক পত্রিকায় তাঁর আগমনবাত।  
যাষণ করা হয়েছিল ও তাঁর জীবন সম্পর্কে নানা  
এখা পাঠকদের জানানো হয়েছিল। সেখানে 'কলা'  
য়েছিল যে কলেজের প্রিয় কিছু, বিশেষজ্ঞক বিষয়-  
এর উপর রবীন্দ্রনাথের সম্প্রতি মতাদি রয়েছে—যেমন  
অধীনত্ব, শিক্ষা, বা আমেরিকানদের ঘোষণা।

এইসব লেখায় রবীন্দ্রনাথের বৃহৎমুখী প্রতিভা  
বর্ণনা করার সময় স্বভাবতই তিনি যে শিক্ষাবিদ, এই  
বিষয়টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।  
রাষ্ট্রতনিকেরা তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলের বর্ণনা দিয়ে

কলা হয়েছে, যে এখানে প্রথম ছাত্রদের মধ্যে প্রায়ও-  
শাসন চালু করা হয়। ক্ষুভার পর তাঁর জন্য দেওয়া  
ডিনার এক সম্প্রদানসভার রবীন্দ্রনাথ নাকি  
শান্তিনিকেতনের স্কুলের কথা কিশরভাবে আলোচনা  
করেছিলেন। এমনকি বক্তৃতায় 'রিজার্ভ' আসনের জন্য  
এক ডলার ও তা নরও দেড় ডলার মূল্য ধার্য  
হয়েছিল। পত্রিকায় কলা হয়েছে যে এই অর্থ শান্তি-  
নিকেতনের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হবে।

কলেজ পত্রিকার বিকল্পী পড়ে মনে হয় যে  
রবীন্দ্রনাথের চেহারা, জীর্ণবস্ত্রাভূষিত, ভাষাভাষী,  
ক্ষুভার বিষয়বস্তু, সবচেয়েই আমেরিকান শ্রোতার  
মনোহর হয়ে গিয়েছিলেন। সভার ভিত্তি তিনি সকলের  
থেকে আলাদা—

"He stood apart, not only by virtue of  
his appearance, his eastern dress, his  
calm face with the deep, quiet eyes and  
long gray hair and beard, but by the  
mysticism expounded in his lecture."

কিন্তু সবথেকে মনে গরোঁছিল 'বুদ্ধমান'-এর কান্না, যা  
অনুসরণ করে কলা হয়েছে, যে তাঁকে দেখে মনে  
গেছিল যেন দা ভিগোর চিত্রের যীশুখ্রীষ্ট।



‘কেন শাস্ত্র’ ও ‘চণ্ডলতা’—নাচে ফিলিপিনসের  
জোসেফিন ফেলিচিয়ানো

প্রতি বছরই আমরা রবীন্দ্রনাথের ব্রিন ম'র আগমনের  
কথা স্বাগত করি। অতীতের এই স্মরণযোগ্যের কথা  
চাটাইলে বিশেষ কৌতুহল ও অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে।  
কে জানে, হয়ত সেই ঋণীক সন্নিবেশে ছেঁদার  
রবীন্দ্রনাথের জবাবের গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সহজতর  
হয়েছে।

শামিলা বসু

#### লন্ডনে রবীন্দ্রনাটক

স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে যে প্রবাসী বাঙালীরা  
দীর্ঘকাল বিলেতে রয়েছেন তাঁদের পায়ের তলা  
থেকে কেবল দেশের মাটিই সরে যায়নি ভাষা ও  
সংস্কৃতির মণ্ডিকাতও কমে ক্ষয়মান হয়ে আসছে।  
এখন দেশের সাংস্কৃতিক জলবায়ু সঞ্চে তাঁদের  
একমাত্র যোগসূত্র বজায় আছে গ্রিমোফোন রেকর্ড। দেশ  
পত্রিকার সাধারণ বিশেষ সংযোগগুলির আর মাঝেমাঝে  
দেশে বেড়াতে যাওয়ায় মাঝেমাঝে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে  
একে সংস্কৃতিচর্চা বলে না কারণ এতে অংশ গ্রহণ  
করে মন ভরাবার, নিজেদের সক্রিয়ভাবে কিছু গড়ে  
তুলবার কোন সুযোগ বা আনন্দ নেই।

অথচ এই প্রবাসী বাঙালীদের অনেকের মধ্যেই  
কমবেশী প্রতিভা ছিল। তাঁরা কেউ লিখতেন, কেউ  
ছবি আঁকতেন, কেউ কেউ গান গাইতে এবং কাবিতা  
অনুষ্ঠিত করতে পরতেন অথচ কুশলতার সঙ্গেই।  
কিন্তু সুযোগ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার অভাবে  
এদের এই গুণগুলি ক্রমশ বিবর্তিত হয়ে চলেছে।  
পারবর্তী প্রজন্মের ইতিহাস আরও এতশাশ্বতক।

এদের ছেলেমেয়েরা যাবা হয় এদেশেই জন্মেছে  
নামতো এদেশের মাটিতেই জীবনের প্রথম পর্ব শুরু  
করেছে, তারা তো বাংলা ঘরানা থেকে পুরোপুরিই  
নির্বাসিত। স্কুলে সবভাষার ইংরেজী শিক্ষা,  
বোর্ডিং স্কুলেই সর্বস্বপ্ন ইংরেজী গান নাটক



বিদেশিনী গায়কদের রিহাসাল চলছে



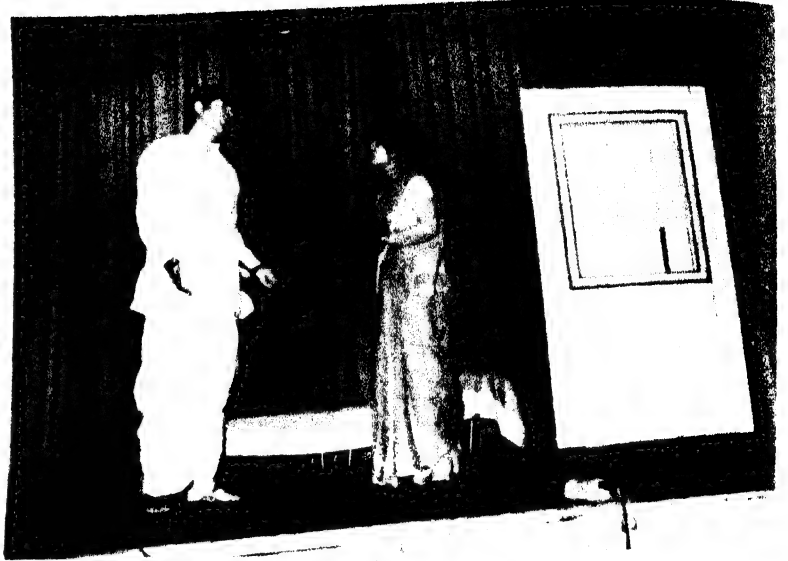
নগের একপাশে বিদেশিনী গায়িকার দল

আলোচনা এবং তদুপরি অনেকেরই মা-বাবা তাদের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষয় পাওয়া দূরের কথা বাংলা অক্ষরের সঙ্গেও এদের অনেক পরিচয় ঘটেছে না। নিজের মনোবল ও জ্ঞাতের ঐতিহ্য ইতিহাস ও সাহিত্য এদের কাছে অজ্ঞাতই থেকে গেল। তার ফলে বাঙালির মধ্যে তাদের রক্তের সম্বন্ধ এবং অন্তরের টান পড়ে উঠল না। উপরন্তু ইংরেজ সমাজের সঙ্গেও ভেদন গভীর যোগাযোগ ঘটল না।

একটি জাতির পক্ষে এই চ্যুতি পতীর উল্লেখের বিষয়, এর অব্যাহিত পরিণাম অত্যন্ত আশঙ্কাজনক এই কারণে যে, আঞ্চলিক উৎসের সম্মান এবং ঐতিহ্যের বাতী না জানলে এই আপন তরুণ সমাজ অচিরেই দাবুশ হীনম্মন্যাতার ভূগবে যেমনটি ভুগছে নিয়োগ দাসদের উত্তরাধিকারী এসেদের ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান তরুণেরা।

এই অভাববোধ এবং জাতীয় নৈরাশ্যের কথা চিন্তা করেই আমরা কয়েকজন বাঙালী একত্র হয়ে লন্ডনের নিকটবর্তী 'নিউ মলডেন-এ প্রান্তিক' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পত্তন করি। আমাদের এই উদ্দেশ্যবোধের বয়স যদিও বছর-খানেকের বেশী নয় তবু, আশাতীত সজা পাওয়া গেছে। ইমানী সৌভাগ্যবশত অনেক বাঙালীই এ বিকল্প সচেতন হয়েছেন, ফলে এখানে শুরুর করা গেছে বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্লাস, বাংলা গানের ক্লাস, প্রান্তিকের এই আরম্ভ যে শ্রুতমস্ত ভাঙে সন্দেহ নেই। কয়েকটি বাঙালী পরিবারের বাবা-মা-ছেলে-মেয়ে সকলেই যোগ দিচ্ছেলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্লাসে। এরকম সপরিবারে যোগদানের উদ্দেশ্য ফলে-মেয়েদের আরও বেশী করে অনুপ্রাণিত করা। বর্তমানে দুটি গানের ক্লাস (প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ) এবং একটি শিশুবিভাগ খোলা হয়েছে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, গান ও ইতিহাসের কথা শোনার আসর নিয়ে।

বর্ষশ্রুতি উপলক্ষে গত ১১ এপ্রিল রবীন্দ্র-



‘নিউ মলডেন-এ প্রান্তিক’ জাতীয় ও জাতীয় আচরণ

নামের উদ্দেশ্য সঙ্গীতের একটি অনুষ্ঠান ও পরে তার চরম অধ্যায় নাটক অভিনয় করা হয়েছিল। এই উদ্দেশ্য সঙ্গীতের অঙ্গের প্রান্তিকের শিল্পীরা ছাড়াও অংশ গ্রহণ করেছিলেন শ্রীমতী সুবিনার রায়ের স্যজন হাতী শ্রীমতী অরতি জ্যোত্স্না। শ্রীমতী জ্যোত্স্নার ‘এ পরকালে জীব কে’ গানটি অনুবাদন প্রদর্শিত। চার অধ্যায় নাটকটিও দশ-কন্দের দ্বারা অভিনয়িত হয়েছিল। এলায় জুমিকার নীমতা আচার্য, ইন্দ্রনাথের জুমিকার কলীপ যথোপাধ্যায়

এবং অভিনয়ের জুমিকার অমিতাভ আচার্য বেশ ভাল অভিনয় করেছিলেন। প্রায় নাটকের খিটে লেখা ‘চার অধ্যায়’-এর চারটি অধ্যায়ের চারটি দৃশ্য সামান্য মাত্র অঙ্গবদল করা হয়েছিল নাটকের খাতিরে। দ্বিটিও-কোনক দৃশ্যের একেকটি, সেটের ডিজাইন, আলোক-সম্পাত-সব মিলে নাটকটি ভালই উত্তরে গিয়েছিল। যতদূর জানা যায় লন্ডনে কোন অপেশাদার দল-কর্তৃক চাণ অধ্যায়-এর অভিনয় এই প্রথম। জয়ন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

## সর্দি ও ফ্লু'র আক্রমণ এবং রোগ দুটির মোকাবিলা। জরুরী কয়েকটি কথা জেনে রাখুন।

নার্স নাটালিয়া ডিস্জা বলেন :  
“সর্দি ও ফ্লু-জরের রোগভোগের  
বেদনা থেকে চটপট আরাম  
এনে দিতে আনাসিন খুবই  
সাহায্য করে।”



সর্দি আর ফ্লু হয় কিভাবে?

আনাসিন কোনো ব্যক্তি-কিছু থেকে বাতাসে সংক্রমক  
বীজাণু ছড়ালেই এটি রোগ গুলিকে সংক্রমণ করে।  
সাধারণতঃ শরীর গরম বীজাণু প্রতিরোধ করে। তবে  
অতিরিক্ত পরিশ্রম বা পুষ্টির অভাবে শরীর দুর্বল  
হলে পড়লে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায়।

রোগের লক্ষণ কি কি?

গা ব্যথা, মাথা ভার ভার, নাক দিয়ে জল করা এবং  
ইটি, এসব উপসর্গ দেখা দেয়। এর সঙ্গে অধিকাংশ  
সময়েই কাপুনি, অস্বস্তি আর অতিরিক্ত গাম হ'তে  
পাকে। এছাড়া কাশি, গলাব্যথা, শ্বাসাশ্বাস, আর  
অবসাদও দেখা দিতে পারে।

এরোগ জটিল হ'য়ে উঠতে পারে?

অবতলা করলে এ থেকে নিউমোনিয়া এবং হাস-  
প্রশ্বাস যন্ত্রের ওপরের অংশ সংক্রমণ ঘটতে পারে।

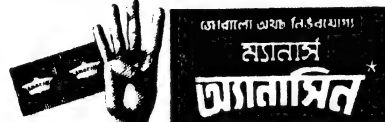
আনাসিন কিভাবে সাহায্য করে?

আনাসিন সর্দি আর ফ্লু'র সময় চটপট আরাম

এনে দেয়। আনাসিন বেশ জোরালো ওষুধ-সারি  
বিশেষজ্ঞদেরা বাতাস-বেদনার উপশমে সাহায্য  
বৈদ্যপ্রাণিক করেন, তাই এতে বেশী করে প্রেরণা  
আছে। লক্ষ লক্ষ লোক আনাসিনের দ্বারা নিভার  
করেন। ডাক্তারের দেওয়া ওষুধের মতই এটি নানান  
ওষুধের এক মিশ্রণ। সর্দি আর ফ্লু'র পাপমর্ক  
লক্ষণগুলো দেখা দিলেই দিলে ৪ বার আনাসিন খান।

এছাড়া আপনার আর কি কি করা  
উচিত?

- গড়র পরিমাণে জলীয় তরলীয় যেমন, ফসিটানো  
জল, কমলা, মুসাবী বা পাতিলেবুর রস পান।
- পুষ্টিকর খাবার খান।
- যথেষ্ট বিশ্রাম নিন।
- এন্টিসেপটিক কোনো ওষুধ বা হুন্ড জলে মিশিয়ে  
গার্গল করুন।
- ঘরে বাহিরে যথেষ্ট আলো-বাতাস আসে, রাখা করুন।



ভারত বাতাস-বেদনার উপশমকারী ওষুধগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়

\* Regd. TM

জেনিফার ম্যানার্স-এর আনাসিন বিভাগ থেকে

## জাপানে প্রকাশিতব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী

—কবিতার প্রধান দৃষ্টি—

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যেমন নতুন করে রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ রয়েছে, তেমনি বি-অনুরাগী সূর্যের দেশ সুন্দর জাপানেও বৃহৎ প্রয়োজন চলছে জাপানী ভাষায় বারো খণ্ডে রবীন্দ্র-রচনাবলী মুদ্রণের। প্রথম খণ্ডটি ছাপা হয়ে বারবে ১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে, আর শেষ বা দ্বাদশ খণ্ডটি প্রকাশিত হবে ১৯৮২-র নভেম্বরে। এখন আমাদের কৌতূহল থাকবে—জাপানের আগে আমরা রবীন্দ্র-রচনাবলী ছাপার কাজ শেষ করতে পারি কি না।

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীর সময় জাপানে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী একবার প্রকাশ করা হয়েছিল। তার দুই দশক কাল পর আধুনিক জাপানে আজ আবার নতুন করে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী প্রকাশ ও প্রচারের প্রয়োজন অনুভব করেছেন গভীরভাবে। মূল বাংলা থেকে বা ইংরেজী থেকে জাপানী ভাষায় তজ্জমার কাজ চলছে অনেক দিন ধরে—একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অতিশয় যত্ন সহকারে। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পূর্বেই জাপানে রবীন্দ্রনাথের কবিতার তজ্জমা প্রকাশিত হয়েছিল সেখানকার সাময়িকপত্রের পাতায়। ১৯২০ সালেই জাপানী ভাষায় গোরা প্রকাশিত হয় মূল থেকে। অনুবাদক ছিলেন ইনোসুকে সানো। ইনি ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ শাস্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন। ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন শ্বিতীয় বার জাপানে যান তখন তাঁর হাতে উপহার দেওয়া হয় জাপানী গোরা।

এ বছর বৈশাখে, ১০ মে তারিখে জাপানে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পালিত হয়। এই উপলক্ষে একটি সুন্দর স্মারক-পুস্তক বেরোয় জাপানে। টোকিওর একটি বড় পার্বলিক হলে সম্ভা ছটা থেকে আনন্দ-অনুষ্ঠান শুরুর হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা একজন মহিলা। ইনি শাস্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী জাপানের বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী মীনা কান্। অনুষ্ঠানে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয়। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে এই নৃত্যনাট্য অভিনীত হয়। চিত্রাঙ্গদা ও অজ্ঞানের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মীনা কান্ ও তমাকি মাশুওকা।

১ম রকপত্রের শেষ পাতায় প্রকাশিতব্য রচনাবলীর বিজ্ঞাপন বেরোয়। এই বিজ্ঞাপন থেকে জাপানে এখন রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের কি রকম আয়োজন চলছে তার একটা স্পষ্ট ছবি পাই। বিজ্ঞাপনটি তজ্জমায় আমাকে সাহায্য করেছেন শাস্তিনিকেতনের জাপানী বিভাগের অধ্যাপক শীসাইজি মাকিনো।

\*

মনুষ্য হৃদয়ের উৎসবাক ভারতীয় কবি-কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলীর প্রকাশ সমাপ্ত।

### রবীন্দ্র-রচনাবলী

১২ খণ্ড

সম্পাদকমণ্ডলী : সিজুকা ইয়ামামুরো, হিরোসি নোমা, তাতসুও মরিমতো এবং কাজুও আজুমা।

কবিতা উপন্যাস, নাটক, নিবন্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার রচনার দ্বারা মানবচিত্তজগৎগণের কবি-কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সমৃদ্ধ ব্যক্তিগত ও গভীর চিন্তাচর্চা দ্বারা ভবিষ্যৎ মানবজাতির জন্য যে বাণী প্রচার করে গেছেন—তার আধুনিক অর্থ নতুন ধর সম্প্রদান করা প্রয়োজন। বর্তমানের এই অস্থির সমাজে মানবমনে পুনরায় সুস্থ চিন্তাশক্তি জাগিয়ে তুলতে আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট রচনাবলী প্রকাশের আয়োজন করছি।

### প্রথম খণ্ড

কবিতা সংগ্রহ—১

প্রকাশিত হবে ১৯৮১ জানুয়ারি।  
কাব্য-আলোচনা : সুনী ওয়াকো  
গ্রন্থ-পরিচয় : তাতসুও মরিমতো  
রচনা : গীতাঞ্জলি দি গার্ডেনার শিশু, চতুর্থাঙ্গদা, রস যোড ইত্যাদি।

### দ্বিতীয় খণ্ড

কবিতা সংগ্রহ—২

প্রকাশিত হবে ১৯৮২ জানুয়ারি।  
কাব্য-আলোচনা : সিজুকা ইয়ামামুরো  
গ্রন্থ-পরিচয় : কাজুও আজুমা  
রচনা : সোনার তরী, লিপিকা, প্রবী, লেখন, মহায়া ইত্যাদি।

### তৃতীয় খণ্ড

বৃহৎ উপন্যাস

প্রকাশিত হবে ১৯৮১ নভেম্বর।  
উপন্যাস-আলোচনা : হিরোসি নোমা  
গ্রন্থ-পরিচয় : কাজুও আজুমা  
রচনা : গোরা

### চতুর্থ খণ্ড

ছোট উপন্যাস ও গল্প—১

প্রকাশিত হবে ১৯৮১ মে।  
উপন্যাস ও গল্প-আলোচনা : মিনোরু ওদা  
গ্রন্থ-পরিচয় : তাতসুও মরিমতো  
রচনা : চতুর্থাঙ্গদা, মণিহারী, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি।

### পঞ্চম খণ্ড

ছোট উপন্যাস ও গল্প—২

প্রকাশিত হবে ১৯৮২ মে।  
উপন্যাস ও গল্প-আলোচনা : মিতসুহা, ইনোমু  
গ্রন্থ-পরিচয় : স্তুওসি নারা  
রচনা : দুই বোন, চার অধ্যায়, দুর্ভাগ্য, কমফল, শূন্যদৃষ্টি, চোরাই ধন ইত্যাদি।

### ষষ্ঠ খণ্ড

নাট্যসংগ্রহ

প্রকাশিত হবে ১৯৮১ সেপ্টেম্বর।  
নাট্য-আলোচনা : জুর্নাজি কিনোসিতা  
গ্রন্থ-পরিচয় : তাতসুও মরিমতো  
রচনা : প্রকৃতির প্রতিশোধ, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা, ঢাকঘর, রাজা ইত্যাদি।



জাপানে রবীন্দ্র রচনাবলীর বিজ্ঞাপন

৩৯

### সপ্তম খণ্ড

দার্শনিক প্রবন্ধ সংগ্রহ

প্রকাশিত হবে ১৯৮২ মার্চ।  
প্রবন্ধ-আলোচনা : সুনী ওয়াকো  
গ্রন্থ-পরিচয় : তাতসুও মরিমতো  
রচনা : দি বিলিঞ্জিঅন অব মান, থটস্ ফ্রম টেগোর ইত্যাদি।

### অষ্টম খণ্ড

সামাজিক প্রবন্ধ সংগ্রহ

প্রকাশিত হবে ১৯৮১ মার্চ।  
প্রবন্ধ-আলোচনা : সাবুরো ইচি  
গ্রন্থ-পরিচয় : তোফু ও ইহার  
রচনা : সাধনা, নাশানালিজম্ ইত্যাদি।

### নবম খণ্ড

সাহিত্য কলা শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ সংগ্রহ

প্রকাশিত হবে ১৯৮১ জুলাই।  
প্রবন্ধ-আলোচনা : মাসাকিও মিয়ানোতো  
গ্রন্থ-পরিচয় : স্তুওসি নারা  
রচনা : ক্লিমেটিভ হুনিটি, পাসেপনালিটি ইত্যাদি।

### দশম খণ্ড

স্বাধীনতা আন্দোলন ও প্রগতিবাদ

প্রকাশিত হবে ১৯৮২ জুলাই।  
আলোচনা : সুনী ওয়াকো  
গ্রন্থ-পরিচয় : সিজুকা ইয়ামামুরো  
রচনা : জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা, আত্মপরিচয়, জাপানযাত্রী ইত্যাদি।

### একাদশ খণ্ড

ভাষার ও পত্রসংগ্রহ

প্রকাশিত হবে ১৯৮২ সেপ্টেম্বর।  
আলোচনা : আকিহি সাজিউরা  
গ্রন্থ-পরিচয় : কাজুও আজুমা  
রচনা : চিত্রাঙ্গদাবলী ও অন্যান্য।

### দ্বাদশ খণ্ড

(বিশেষ খণ্ড)

প্রকাশিত হবে ১৯৮২ নভেম্বর।  
রবীন্দ্র-চর্চা (ব্যক্তিগত ও সাহিত্য) :  
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত গ্রন্থের তালিকা, রবীন্দ্র-রচনার কালানুক্রমিক সূচী, রবীন্দ্রজীবনের কালানুক্রমিক সূচী।

এখন রবীন্দ্র-রচনাবলীর স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপনপত্রী প্রস্তুত হচ্ছে। আগ্রহী ব্যক্তি এই ঠিকানার লিখুন। প্রস্তুত হলে প্রেরিত হবে।

জাতীয় সভাভাষা কেন্দ্র

১০১ ২-৫-৪ সারাগাকু-ছো, ছিওদা-কু  
টোকিও টোল : ০০ (২১৪) ৮৭০১  
এম ও নং টোকিও ৫-১১৭৮২০

কেন্দ্রলুস্, পেপার বুকস্

প্রশাসনিক বই-বিক্রয় চলছে

নোবেল সাহিত্য পুরস্কার জয়ী

কবি-কবির জীবনচরিত

রবীন্দ্র জীবনী

(১ম ও ২য় খণ্ড)

লেখক : কে কৃপালনী

অনুবাদক : তাতসুও মরিমতো

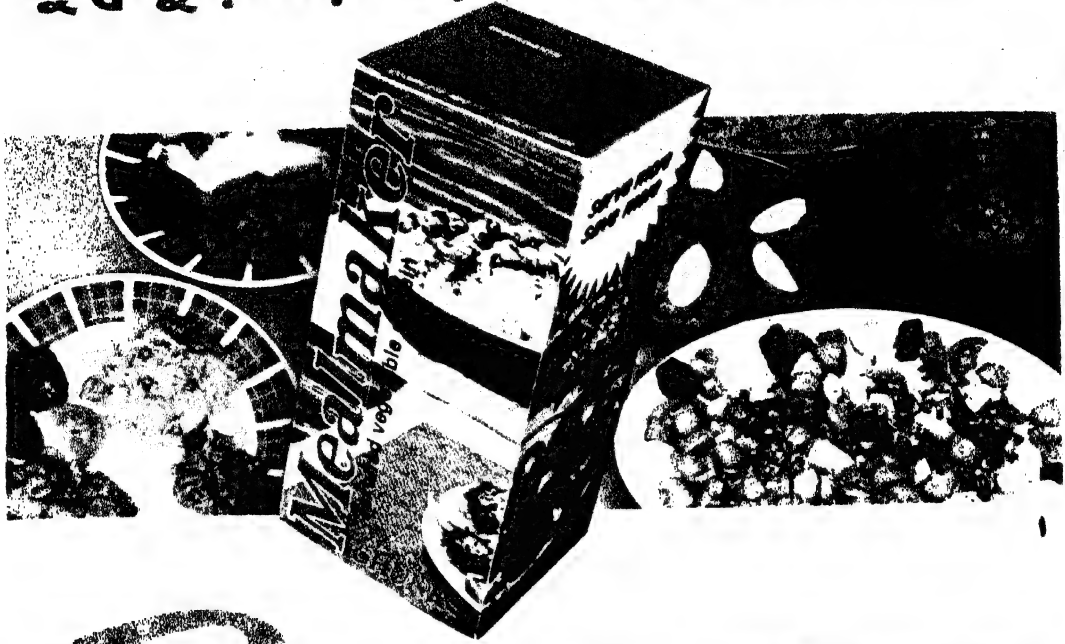
প্রতি খণ্ড ৪৮০ ইয়েন।

সমগ্র জীবন মানব-সত্তার পূজারী রবীন্দ্রনাথ, ইনি ১৯১০ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সেই রবীন্দ্রনাথের বিস্তারিত সমগ্র জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

অমিত্রসুন্দর ভট্টাচার্য



এক নতুন বাস্তু শিখে—  
সুস্বাদু বাস্তুর পরিচয় বাড়িয়ে ফেলুন!



**মিলমেকার**

এইসব সুস্বাদু খাবার পরিচয়ও বাড়িয়ে  
আর পোস্টাইও করে।

মিলমেকার মিশিয়ে রোধে মার্টন ও তরিতরকারির পরিমাণ  
যথেষ্ট বাড়িয়ে ফেলুন ও পাত্রে পাত্রে পরিবেশন করুন—  
আর দেখুন, আপনার পরিবারের সকলে তো বটেই,  
সেইসঙ্গে নিমন্ত্রিতরাও কেমন মহানন্দে সেটি খান।

আপনার খাবারের স্বাদে চমৎকার মিলে যায়  
মিলমেকার আপনার পছন্দসই সুস্বাদু খাবারের  
সাথে চমৎকার মিলেমিশে যায়।

**প্রোটিনের পুষ্টিগুণে ভরপুর**

এটি পুষ্টিগুণে ভরপুর... ২৫০ গ্রাম  
মিলমেকারে ০.৯ লিটার দুধ বা  
১ কিলো মার্টন কিংবা ২৪টি ডিমের  
প্রোটিন পুষ্টিগুণ রয়েছে।

**১০০% নিরামিষ**

মিলমেকার সয়া প্রোটিনের পুষ্টিগুণে  
ভরপুর। এটি পাওয়া যায়  
মোটা টুকরোয় ও দানাদার ধরনে।



**নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য**

৪ টাকা ৫০ পয়সা—২৫০ গ্রাম—মোটা টুকরোর প্যাকে (স্থানীয়  
কর অতিরিক্ত) রান্নার পর পরিমাণ ১ কিলোরও বেশী হয়।

৩ টাকা ৭৫ পয়সা—২০০ গ্রাম—

দানাদারের প্যাকে (স্থানীয় কর অতিরিক্ত)  
রান্নার পর পরিমাণ প্রায় ১ কিলো হয়।



অল্প পরন ঘনভালে... জল ঢেঁকে ফেলুন... এবার সুস্বাদু রান্নার  
সঙ্গে মিশিয়ে রাখুন।  
দিন...

উৎপাদক:

মাইসোর স্ন্যাক ফুডস লিমিটেড,  
১৯, স্ট্যাটফর্ম রোড, ব্যাঙ্গালোর ৫৬০ ০২০



## সেই সময় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৫৮ ॥

হরিশের মতন কুকুমলও বেশ খানিকটা প্রভাব বিস্তার করলো নবীনকুমারের মানস-জগতে, যদিও হরিশের সঙ্গে কুকুমলের অনেক প্রভেদ। হরিশ যথেষ্ট কৃত্তিকা হয়েও তারি মতো সব সমস্ত জলন্ত ছিল দুবার দেশপ্রেম এক তীর প্রাণশক্তি। হরিশের কম চাঞ্চল্য অন্যদেরও আঁগিয়ে দিত। সেই তুলনার কুকুমল শব্দই বৃষ্টিজীবী, তার মধ্যে কমেয় উদ্যম নেই, বরং অন্য সকলের সশেষ সমালোচনা করতে সে খুব পারদর্শী।

কিছুদিন আগে কুকুমলের দাদা রামকমল আত্ম-হত্যা করেছেন। সংস্কৃত কলেজের বিখ্যাত মেধাবী ছাত্র এবং রূপবান, গগনবান রামকমল স্বকোষে নিজের জীবনের অকসান ঘটনায় দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণই বিস্মিত হয়েছিলেন। ইদানীংকালের মধ্যে এককম ঘটনা আর শোনা যায়নি। কুকুমলের প্রেত দান এই মানব-জীবন, তা কেউ নিজের হাতে নষ্ট করে? দাদার মৃত্যুর পর থেকে কুকুমল যেন আরও তির হয়ে উঠেছে, সব কিছুতে প্রতিই তার বিমূঢ় হাস। একমাত্র রমণীদের প্রসঙ্গ উল্লেখই সে সরস হয়ে ওঠে।

‘পরিদর্শক’ কাৰ্যালয়ে সে নিম্নমিত আসতে লাগলো কিন্তু তার লেখার নমুনা নেই। একদিন সে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটি যক্ষককে সঙ্গে করে এনে নবীনকুমারকে বললো, এ বেশ কবিতা-টবিতা লিখছে, মাথো না, একে কোনো কাছ লাগাতে পারো কি না। আর একদিন সে বললো দেবেশবাবু, কড় ছেলে বিজ্ঞানদ্রক কিছু লিখতে কল না। শ্বজ্ঞান তোমার-আমার সম্বন্ধেই হবে বোধ কায়, মগজে বিদ্যা-বাস্তব আছে।

একদিন সম্মার পর ক্রিয়াসাগর ‘পরিদর্শক’ কাৰ্যালয় দেখতে আসবেন শনে কুকুমল তড়পাড় পায়ে চিট গিলিয়ে বললো, তা হলে আম উঠি।

নবীনকুমার অবাক হলো। সে জানতো, কুকুমল বিদ্যাসাগরের বিশেষ প্রিয় পাত্র, শিশু, কুকুমল ক বিদ্যাসাগর নিজে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। নবীনকুমার জ্ঞান করলো, কেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে যাযে না?

কুকুমল উঠে বসেই বললো, না হে, উনি আমার দেখলে ব্যস্ত হবেন। কেন আর মহামাছ ঠর বতুনি শনি।

—কেন, উনি জেয়ার বককেন কেন?

—কাল আছে। ভূমি জানো না, উনি চেয়ে-ছিলেন আমি মোড়কাল কলেজে ভর্তি হয়ে ডাক্তার হই। তাতে আমার হুঁচি হয়নি। ঠর আদেশ আমি মানি নি।

—সে তো অনেকদিন আগের কথা। উনি ডে পরেবো রক্ত পথে জ্বলেন না!

—ইদানীং অন্য একটি কারণেও উনি খুব কুণিপ হতে আছেন আমার ওপরে। বীরাংসংহারা ঐ রাক্ষসটির একটা ঘোষ কি জানো, হার সঙ্গে নিজের মত না মিলবে, তাকেই আর উনি সহ্য করতে পারেন না।

—কিন্তু উনি তো অন্যথা কিংবদন্তি রাখ করেন না। তোমার ওপর কেন্দ্র করছেন রাখ করেন?

—সেই এখন কলা হচ্ছে না। আমি বাই।

বেশ বস্তাসম্পত্ত হয়েই চলে গেল কুকুমল।

একটা পরেই এলেন বিদ্যাসাগর। বিশেষ যত্ন নিয়ে তিনি দেখতে লাগলেন সংবাদপত্র-পরিচালনার কাজকর্ম। তারপর বললেন, সেমপ্রকাশে স্বাক্ষরকানন ক্রিয়াতুল্য তোমার এই উদ্যোগের খবরই প্রকাশ্যে করেছেন। এখন দেখাছ, তিনি অভিরঞ্জন করেন নি মোটেই। তবে এটিকে টিকিয়ে রাখাটী বক্তব্য।

নবীনকুমারের মাথার কুকুমলের কথাটিই ঘুরছিল। সে ফস্ করে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কুকুমলকে পছন্দ করেন না?

কিরটি এড়িয়ে গেলেন বিদ্যাসাগর। উদাসীনভাবে বললেন, লোক ভাবে আমি বা কবে কুকুমল বসি তা সবই শুনবে। আসলে সে আমাকে মোটেই মানে না।

পরদিন কুকুমল আর আসতেই নবীনকুমার আঁকে চেষ্টা ধরলো। সে বললো, বিদ্যাসাগর মশয়িকের সঙ্গে জেয়ার কী নিয়ে মনোমালিন্য হয়েছে, তা বলতেই হবে। ঐ চিন্তাটা কিছুতেই মাতা থেকে তড়িতে পড়তে না।

কুকুমল হেসে বললো, আমার কণ্ঠগত ব্যাপার নিয়ে তোমার এত কেন্দ্রহল কেন, নবীন?

নবীনকুমার বললো, আমার কৌতুহল তোমার ব্যাপারে নয়, আমার গুরু কোন কারণে তোমার মতন প্রিয়জনের ওপরে রাগ করেন সেটাই শব্দ আমি জানতে চাই।

কুকুমল বললো, সেটি জানতে হলে তোমাকে এক স্থানে যেতে হবে আমার সঙ্গে। ভূমি যেতে পারবে?

নবীনকুমার কালো, কোথায়?

কুকুমল কালো, সে যে-স্থানেই হোক না কেন, ভূমি যেতে পারবে কি না বলো?

নবীনকুমার বললো, কেন পারবে না? আমি পুরুষমানুষ হয়ে এমন কোন স্থান আছে, যেখানে যেতে পারি না?

—তা হলে আগে কাজ সেরে নাও।

আর নটর পক্ষিক কাল্যায় থেকে কেহলো হুজেনে। জড়ি গাড়িতে উঠেই দার্শনিক অলোচন শুরু করে দিল কুকুমল। ফরাসী দার্শনিক কোঁ-এর সে খুব ভক্ত, প্রায়ই সে কোঁ প্রচলিত পদ্ধতিভঙ্গ্য তত্ত্ব বোঝাতে চায় নবীনকুমারকে। নবীনকুমারের অক্সা কলনের জটিল ব্যাপার নিয়ে মস্তক ঘমতা করার ভেদন আগ্রহ নেই।

কুকুমল বললো, মাথো, ইংরেজি মাসের নামগুলি যে জটিল কেবলমাসের নামে, এটা আমার মোটেই পছন্দ হয় না। এ বিষয়ে কোঁ একটা চমৎকারি কল্পনা দিয়েছেন। তিনি কবনের ভাগ করেছেন তের মাসে, প্রত্যেক মাসের নাম হবে মোজেন, হোমস, আরিস্টটল, আর্কিমিডিস, শেক্সপীর, এদের নামে।

নবীনকুমার বললো, তা বেশ জে। কিন্তু আমাঙ্গেন কোঁজাল, দার্শনিক এরা কি কোষ করেন? বাস-কাল্পনিক কি হোমস-শেক্সপীরের চেয়ে কিছু খাটো?

—কোঁ সারা মাসটা ভাগ করেছেন অত্যাশ মিন। প্রত্যেক দিনের নামও হবে এক একজন মহাপুরুষের নামে। মনু, মহোদ, বৃদ্ধ, নিউটন, কলম্বাস এরা।

—তা আগে থেকে এই সব মহাপুরুষের নামে মাস আর দিনের নাম ঠিক করে ফেলো, ভবিষ্যতেও যে এদের চেয়ে আরও বড় মহাপুরুষ জন্মকেন না, তার কোঁনে ঠিক আছে? তখন আবার নাম বদলাবে? তা হলে এই মাস নিয়ে পৃথিবীর সব দেশের লোক একমত হবে কেন?

—আমি কোঁ-এর মতটিই প্রেত মনে করি।

—আমি কিন্তু রোজারিক দি প্রেতের চেয়ে স্মার্ট অলোককে বড় বলবো। আমার এখন কোঁতার হাচ কলো জে?

—আমি কোঁচারানকে বলে দিয়েছি। শোনে, জন নটরটি মিল এই পদ্ধতিভক্ত কালোভার সম্পর্কে কী বলেছেন জানো? এতে পক্ষপাত-বিরোধী, বিজ্ঞ মতামতদাতা এমন সব ব্যক্তিরের নাম পক্ষপাতাল রাখা হয়েছে যারা জীবিত অবস্থায় দেখা হলে পক্ষপাতের কলা কাটকাটি করতেই নিশ্চয়ই। কোঁ-এর এই যে কিংবদন্তি মানবক উদার মনোভাব, এটি পৃথিবীর আর কোন দার্শনিকের মধ্যে দেখেছো? ডিস্টিক্যান অফ ফাংশান, অর্থাকর্মে অধিকার তেন কোঁ-এর একটা প্রধান কথা।

গাড়ি এসে থামলো এক জায়গায়। পিছন থেকে দুলাল এসে জিজ্ঞেস করলো, এবার কোন দিকে যাবে?

কুকুমল কালো, সামনের গলিতে লাল কাড়িটির সামনে।

গাড়ি ছেঁকে নেমে নবীনকুমার এদিক-ওদিক তাকিয়ে লালিয়ে হলো। এ যে রামবাগানের হু-পল্লী। কোঁ-শব্দের এখানে কী জন্য আগমন? বিশেষতঃ মমত সত্য রমণীদের সম্মানার্থে কোঁ চার কবের অন্তর বিশেষ একটি দিনে সারা পৃথিবীতে একসঙ্গে একটি উপবোধ প্রস্তাব দিয়েছেন, সেই কোঁ-এর শিবা হয়ে কুকুমল অসতী নারীদের কাছে এলো কেন এত রাতে?

লাল রঙের বাড়িটির দ্বারের সামনে গাড়িরে কুকুমল কালো, এসো, তিনতলার যেতে হবে।

কেনের আপত্তি না জানিয়ে নবীনকুমার তাকে অনুসরণ করলো।

আলো কলমল কক এবং রমণীকণ্ঠের নিলজ্ব হাসানুদ্বি শনে বাড়িটির চারি সম্পর্কে সশেষের কোন অবকাশ থাকে না।

ওপরে উঠে এসে একটি বৃদ্ধ দ্বারের সামনে গাড়িরে কুকুমল ডাকলো, প্রমদা, প্রমদা।

চক্কর লালাপড়ে ঘনোখালি শাড়ী পরা এক বক্তৃতা দ্বার বলে ওদের দেখে একট, সরে দাঁড়ালো।

দ্বারের মধ্যে একটি মোটা জামিন পাতা, আর দেয়ালের সঙ্গে টেসান দেওয়া কয়েকটি চোয়। জেতো না বলে হাতের কোঁটিটি বা হাতে ধরে নবীনকুমার গিয়ে কালো একটি চোয়ের। এখনো যেন সে ঠিক কিংবদন্তি করতে পারছে না। পূজারী রাক্ষসের সন্তান, পক্ষপাতাল লক্ষনে বিভক্ত কুকুমল এককম কাড়িত কল্পনাত করে। অতচ ননা প্রসঙ্গে সে কুকুমলার হুঁচি পক্ষেই যে সে মদ্যপানের ঘোর বিরোধী।

হুঁচিটিই হু হু এক কলক দেখেই নবীন-

সুসংবাদ !

সুসংবাদ !!

সুসংবাদ !!!

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ১৭ই জুলাই, ১৯৮০ তারিখে আমাদের নতুন শোরুম এবং ধারে বই বিক্রী কার্যক্রম দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করেছে।

এ ছাড়া আরও আনন্দ সংবাদ হচ্ছে, ২রা আগস্ট আমাদের কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এর ১১৯ তম জন্মদিন। এই উপলক্ষে আগামী ২ থেকে ৬০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমাদের শোরুম ও কাউন্টার থেকে যাবতীয় ক্রয়ের উপর বিশেষ কমিশন দেওয়া হবে।

ঃ আমাদের প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য পুস্তকাবলী :

১৯৮০ সালের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর জয় লাভের পূর্বে লিখিত সঠিক ভবিষ্যৎবাণী সংক্রান্ত বিখ্যাত বই।

খুশবন্ত সিং-এর Indira Gandhi Returns এর বঙ্গানুবাদ

**আবার ইন্দিরা ১০৷**

শ্রীশ্রী ব্যাসাবতার মহাকবি

শ্রীল রুদ্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত

**শ্রী চৈতন্য ভাগবত**

গদ্য-রূপান্তর-কুমারেশ ঘোষ

আদি, মধ্য, অন্ত-এই তিন খণ্ডে সমাপ্য

আদি খণ্ড ১২ টাকা। আদি খণ্ড বেরিয়েছে।

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

এ কালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভ্রমণ কাহিনী

**শঙ্খদ্বীপের নর্তকী ১০৷**

খগেন্দ্র নাথ মিত্র ও রামেন্দ্র দেশমুখ্যের

স্মরণীয় লেখকের বরণীয় লেখনী

**রূপময় ভারত ১০৷**

মনোরঞ্জন হাজারার

সাম্প্রতিক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস

**অভিশপ্ত জগৎ ১০৷**

ছোটদের শ্রেষ্ঠ উপহার

**বালমল**

প্রতি সংখ্যা ১-৮০ টাকা

অধ্যক্ষ সুধাংশু শেখর ভট্টাচার্য  
ও ননী গোপাল আইচ্ সম্পাদিত  
সর্বশ্রেষ্ঠ শব্দাবিধান ও এন্সাইক্লোপিডিয়া

**আধুনিক বিশ্বকোষ**

২৫ খণ্ডে সমাপ্য। ২ খণ্ড বেরিয়েছে। প্রতি খণ্ড ৬০৷ টাকা। গ্রাহকদের জন্য ৫০ টাকা। গ্রাহকদের ৫০ টাকা জমা রাখতে হবে। ধারে কিস্তিতে নিলে প্রতি খণ্ড মাসিক ১০৷ টাকায় পাওয়া যাবে।

অশ্বিনীকুমার দত্তের

**ভক্তিরোগ ১২৷**

মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ খানের  
আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজীর উপর সর্বশ্রেষ্ঠ, নির্ভর-  
যোগ্য ও তথ্যসমৃদ্ধ

**আজাদ হিন্দ ফৌজ**

**ও নেতাজী ১২৷**

অতুলকৃষ্ণের দত্তের

রোগভিত্তিক শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা শাস্ত্র

**আয়ুর্বেদ শিক্ষা ৫০৷**

(আয়ুর্বেদ মতে লাক্ষনিক চিকিৎসা গ্রন্থ)

শান্তিলাল ভট্টাচার্যের

**সর্বৌষধী শিবাম্বু ৫৷**

স্বমুগ্ধ প্রকল্প বিধি

ননীগোপাল আইচ

**ছোটদের রামায়ণ ৫৷**

**ছোটদের মহাভারত ৫৷**

**চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী এ্যাণ্ড কোং লিঃ**

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রতিষ্ঠিত : ১৯১০ সাল : ফোন-৩৪-১৯৩৪

প্রতিষ্ঠাতা—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

(শো-রুম-দেওতাল্লা)

কুমার। এখন সে লজ্জার সম্মুখীন হয়ে পাড়িয়ে  
আছে দূরের এক কোণে।

কৃষ্ণকমল বললো, একটু চা পান করবে নাকি,  
নবীন?

নবীনকুমার সংগে দু'দিকে মাথা আন্দোলিত  
করলো। পাড়ির বাঁধের কোণেও সে পারতলক কোনো  
খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে না।

কৃষ্ণকমল বললো, আমি একটু চা পান করবো।  
প্রমদা, একটু চায়ের জোগাড় দেবেগে পাড়ী তো।

যুবতীটি একটি মজার পদ্য সুরে চল গেল  
পাশেব কক্ষে।

কৃষ্ণকমল বললো, আমি ওকে চা প্রস্তুত করা  
শিখিয়েছি। এ বাড়ির অন্য কোনো স্ত্রীলোক চা কী  
দ্রব্য তাই আগে জানতো না।

পায় সপো সপোই সে সংসাধনের ভিণ্ডিতে আবার  
কলসো, অবশ্য প্রমদাকে তুমি এ বাড়ির অন্য স্ত্রীলোক-  
দের মতন মনে করো না। সে কোনো এক মধ্যাস-  
সম্পন্ন ভদ্রবাড়ির কন্যা। বাল্যবিধবা। পরিবারের  
কয়েকটি অমানুষের অভ্যাসেরে সে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য  
হয়। আমরা এক পরিচিত লোকের সাহায্যে এখানে  
এসে উঠেছি। প্রমদা বিশেষ গৃহবতী। আমি তাকে  
কিছা করছে ঠিক করছি।

—বিবাহ করবে?

—কেন, তোমারও আপত্তি আছে নাকি?

—তোমার তো একটি পত্নী বর্তমান।

—তা থাক না। আমার একটি পত্নী আছেন বটে  
কিন্তু তিনি আমার সহধর্মিণী নন। তাই আমি  
প্রমদাকে সহধর্মিণী করতে চাই। তাতেই তোমার  
গৃহের ঘোর আপত্তি।

নবীনকুমার হাসলো।

কৃষ্ণকমল আবার কলসো, তিনি বিধবা বিবাহের  
প্রতিষ্ঠাতা অথচ এই বিধবা রমণীটিকে আমি গ্রহণ  
করতে চাই শুনেন একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বল  
উঠলেন।

নবীনকুমার বললো, আমার গুরু যে আপত্তি  
করেন তা জানি। তিনি বিধবা বিবাহের নামে  
পুরোষের একাধিক বিবাহের ঘোর বিরোধী। কিন্তু  
তোমার মতন ঘোর নাস্তিক এবং পজিটিভিস্ট যে  
হঠাৎ বামন পণ্ডিতদের খারা অনুসরণ করে একাধিক  
বিবাহ করতে চাইবে, তাতে আশ্চর্য হচ্ছি। তোমার  
গুরু, ফরাসী কোঁচ সাহেব বেচেন থাকলে কী বলতেন?  
তিনি একাধিক বিবাহ সমর্থন করেন?

—কোঁচ-এর জীবনেও একজন ক্রোটিল্ড নাম্নী  
কমণী ছিলেন, তা জানো না বন্ধু?

—মাদাম ক্রোটিল্ড-কে দার্শনিক কোঁচ কোনোদিন  
সামাজিকভাবে বিবাহ করছিলেন, এমনও তো  
শুনেন নি।

—শোনো, তাঁর মতে বিবাহ তিন প্রকার। প্রথম  
তো হলো সিভিল ম্যারেজ, যাতে বিবাহ একটা চুক্তি  
মাত্র, সম্পত্তির মনোর অমূল্য হলে সে বিবাহ বিচ্ছিন্ন  
হতে পারে। দ্বিতীয় হলো তোমার রিলিজিয়াস  
ম্যারেজ, ধর্মের নামে বিবাহ, যা চিরদিনের জন্য  
অবিচ্ছিন্ন। এই বিবাহের পর শব্দে বিধবা নয়  
কিপত্রী। পুরুষও আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে  
পারবে না। আর এক রকম বিবাহকে তিনি আখ্যা  
দিয়েছেন চেস্ট-ম্যারেজ। এ বিবাহে স্ত্রী পুরুষের  
মনাসিক মিল হলে তবেই তারা একত্ব রূপে  
করবে

কিন্তু সহবাস করবে না। আমি প্রমদা-সঙ্গরকে  
চেস্ট-ম্যারেজ বিবাহ করতে চাই। পারম্পরিক সন্তুষ্টি  
বড় কথা।

—সাতো বাছ কোয়ার?

—মুশকিল কি জালা, এ দেশের লোককে তো  
চেনো তুমি, তারা এর মর্ম বুঝবে না। মনে করবে,  
আমি বন্ধি অনা ভড়ং করে একটি উপপত্নী রেখেছি।  
তাই একে একটা সামাজিক বিবাহের আবরণ দিতে  
চাই।

নবীনকুমার উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তোমার চেস্ট-  
বিবাহ মাথায় থাক আমিও ওতে কিংবদন্তি করি না।  
আমিও ক্রিয়াসাগর মহাইয়ের সংগে একমত। কৃষ্ণকমল,  
আমি আর তোমার সংসর্গ থাকতে চাই না। জম্মু!

—আরে, আরে, দাঁড়াও, অত চটলে কেন?

কিন্তু নবীনকুমার আর অপেক্ষা করলো না।  
সিঁড়ি দিয়ে জুতা মশমশায়, কোনো দিকে প্রবেশ  
না করে সে নেমে এলো নিচে। তার পরীক্ষা কিস্কিস  
করছে বিরক্তিতে। চেস্ট-ম্যারেজ না ঘোড়ার ডিম!



পরিদর্শক নিরীক কয়েক মাস উঠে পড়ে লেগে  
থাকলেও নবীনকুমার কাগজটিকে ঠিক দাঁড় করাতে  
পারলো না। কেজ্ঞা-খিউড় পড়ায় যার অভ্যাস্ত তারা  
পরিচ্ছন্ন সংবাদ সম্পর্কে আগ্রহী নয়। বঙালী  
শিক্ষিত সমাজ কিছতেই বাংলা কাগজ পড়তে চায়  
না। ইংরেজি সংবাদপত্র বাড়িতে না রাখলে তাদের  
মান যায়। বাসের একাধিক পত্রিকা রাখার সমর্থ্য  
আছে তারাও মনে করে বাংলা সংবাদপত্র পাঠ করলে  
অন্য লোকেরা বাকি তাদের কম শিক্ষিত মনে করবে।

কিন্তু নবীনকুমারের জেন, পরিদর্শক সে  
চালাবেই। কাগজের চাহিদা হতে কমতে লাগলো ততই  
সে পুরো সংখ্যা বাড়িয়ে নাম কমিয়ে দিতে লাগলো।  
কমতে কমতে নাম হলো এক পয়সা। এর পর কোথ-  
হয় সে বিনা পরামর্শে বিল করবে। অর্থ ব্যয় হতে  
লাগলো জলের মতন।

এক সময় গগনানারায়ণ পর্যন্ত সচকিত হলো।  
বেঙ্গাল প্রাব নামে সাহেবদের বিখ্যাত একটি প্রাব  
আছে। সেই প্রাবব্যাধীতি এবং জমির মালিক নবীন-  
কুমার। খুব মূল্যবান সম্পত্তি। নবীনকুমার সেই  
বেঙ্গাল প্রাবের বাড়ি-জমি বিক্রয় করে দিতে চায়।

গগনানারায়ণ একদিন নবীনকুমারকে ডেকে বললো,  
তুই এ কি ঠিক করিস, ছোট্টু? ওঁদকে জমির  
দাম যে হু-হু করে বাড়তে। এসলানিউ ছাড়িয়ে  
সাহেবরা পাক শিল্পের দিকে কিতর বসতি কচ্ছে  
ওঁদকে যে দু' চারদিন বাদে জমি হবে সোনা!

নবীনকুমার বললো, উপায় কী, দাদামণি। তোমার  
তবিল যে শুল্ক দের্চি। আমার এখন অনেক টাকার  
দরকার।

গগনানারায়ণ বললো, তুই যে-ভাবে টাকা ব্যয়  
করিস, তত টাকা আসবে কোথা থেকে। গত পাঁচ  
মাস তুই এক লাখ টাকার ওপরে নিয়চিস!

—আমার আরও টাকা লাগবে। তুমি দেখলে তো  
দাদামণি, হারশ যেই মলো, অমন কোলমে সন্ধ্যাই  
তাকে ভুল গেল। তার কাজ তো কারকে না কারকে  
চালিয়ে যেতে হবে? এখন টাকার জন্য চিন্তা কর  
চলে? তুমি হার একবার জমিদারি দেকতে বেরোও

দাদামণি, তুমি কি আমার হার মানতে বেলো?

অনেকদিন পরে গগনানারায়ণ গেল বিশ্বশেখরের  
সঙ্গে দেখা করতে। বিশ্বশেখর ইদানীং প্রায়ই কাঁধে-  
প্রস্ত হয়ে শয্যালয়ী থাকেন। কেউ সাক্ষাৎ কছতে  
গেলো হু-হু ছাড়া কিছু বলেন না। কয়েকদিন হলো  
তাঁর পিঁড়ী খুব বন্ধি পেয়েছে। সহানুভূতি সেই  
সংবাদ দিয়ে সকালবেলা লোক পাঠিয়েছিল।

কিন্তু গগনানারায়ণ অনা কারকে দিয়ে চিকিৎসা  
করেন না বিশ্বশেখর। গগনানারায়ণ তাঁকে কোথায়  
চেঁচা করলো যে বহুমুখ রোগের খবর ভালো চিকিৎসা  
আছে অলোপ্যাথিতে, সেই একজন চিকিৎসক ডাকলে  
বিশ্বশেখরের কলপের উপশম হবে।

বিশ্বশেখর উদাসীনভাবে বললেন, আর কী হবে,  
আমি তো এখন দিন গর্গচ, আর এই শেষ সময়  
কোছা ওধু গলার দিয়ে কী হবে।

জ্ঞানও কিংকর্ণ অনান্য কথা পর গগনানারায়ণ  
খানিকটা ইতস্তত করে বললো, জ্ঞাতিবান, আপনাকে  
আর একটা কথাও জানানো দরকার বোধহয়। আমাদের  
ছোট্টু এক সপো অনেক কড় কড় কাজ হাতে নিয়ে  
নিচ্ছে, এমন দ' হাতে টাকা খরচ কচ্চে যে আর বাকি  
সম্পত্তি রাখা দায়। আমি তো কোনো দিকে তাল  
সামালোতে পাচ্চি না।

জীর্ণ পরীক্ষাানা একটা কাত করে বিশ্বশেখর মঞ্চ  
উঠু করলেন। তাঁর বিবর্ণ ওঠে একটা যেন হাসার  
ছায়া দেখা গেল। চোখে জ্বল উঠলো অগ্রহ।  
এতদিন পরে সিংহ বাড়ির এই উদ্দেশ্যে যাবক তাঁর কাছে  
এসেছে কিয়-সম্পত্তির জন্য পশমশ নিতে। তিনি  
জানতেন, আসতেই হবে একদিন না একদিন।

সমস্ত বিবরণ খ্যাতিয়ে খ্যাতিয়ে শুনলেন তিনি।  
জরপের মতন করেছেন, ওর ঐ নৈনক পত্রিকা বন্ধ  
করে দেবার জন্য কৌশল করে। আর নবীনকে  
একবার পাঠিয়ে দিতে পারো আমরা কাকে। তাকে  
অনেকদিনে দেখান, একবার দেখতে সাধ হয়।

কিন্তু বিশ্বশেখরের কাছে যাওয়ার সম্মা পেল না  
এবং সঘর বেঙ্গাল প্রাবের সম্পত্তি বিক্রয় করে দিল।

গগনানারায়ণকে কোনো কৌশল করতে হলো না  
অবশ্য, তার আগেই শেষ দশা ঘনিয়ে এলো পরিদর্শক  
সংবাদপত্রের। শব্দ, অং গায় করুই তো পাঠকদের মন  
কল করা যায় না। শেষ পর্যন্ত এই অবস্থা দাঁড়ালো  
যে ঐ পত্রিকা বিনামূল্যে পঠানো হয় দেড়শত বাক্যিক  
আর নগদ মূল্যের ক্ষেত্রে মাত্র চারশ পয়তাল্লিশ জন।  
বাণ্ডল বাণ্ডল আর্কিত কাগজ স্তূপাকার হয়ে  
থাকে। এমনকি কর্মচারীরাও আড়ালে হাসাহাসি করে  
মালিককে নিয়ে। যে কাগজ পাঠকরা কিনে পাড় না,  
সে কাগজের জন্য মন দিয়ে লিখতেই বা ইচ্ছে করে  
কাজ? পত্রিকার মানও কমতে লাগলো দু'ত।

কৃষ্ণকমলের সংসদ পরিত্যাগ করতে চেয়েছিল, তবু  
একদিন এসে বিদ্রোপ করে গেল সে। পরতাল্লিশ জন,  
আঁ? এদের নিয়ে তুমি দেশোৎসার করবে আর সমাজ  
বলাবে? তোমাদের এই এক মত্রে সমাজ নিয়েই  
যত নচানোচি। আসল দেশটাকে তোমরা কেউ এখনো  
চিনলে না!

পরিদর্শক যেদিন বন্ধ হয়ে গেল সেদিন নবীন-  
কুমার বাড়ি ফিরলো মধ্যাহ্ন। নিজের পায়ে ভর  
দিয়েও ফিরতে পারলো না সে। দলো এবং আরও  
দু' একজন তাকে ধরধর করে নিয়ে এলো। অসদ  
মহলে। জেশার ঘোর সে সংজ্ঞাহীন। (ক্লান্ত)





আপনার স্বিস্থত স্যটিচারীওয়্যারের সাজ-সরঞ্জামকে দিত দীর্ঘ জীবন

# সুরক্ষা করত সোমার জোরে

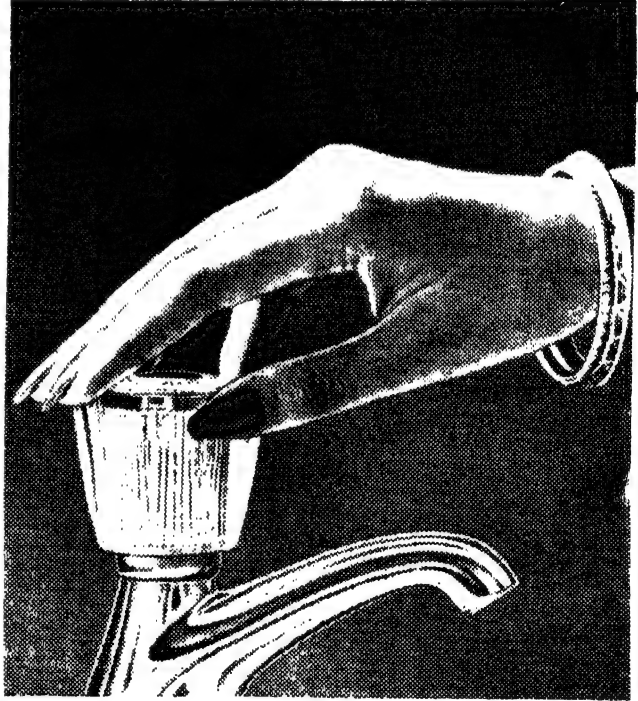
-সোমা মেটাল ফিটিংস,টিংস্যাডে যার বারোতা জল

একটি সোমা মেটাল ফিটিংস খুলে ফেলুন।  
দেখতে পাবেন, জলধারাকে মসৃণ ও সুসম রাখতে  
ভেতরের প্রতিটি ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতিও সর্বোচ্চ  
আন্তর্জাতিক মানের কারিগরীতে কি নিপুনভাবে  
তৈরী।

এবার বন্ধ করুন (জোর দেবেন না, মাত্র  
দেড়পাক ঘোরালেই ট্যাপটি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে  
যাবে)। জল চুয়োনের বা বারার কোন লক্ষণ  
কখনও খুঁজে পাবেন না।

## সোমার অনন্য বৈশিষ্ট্য :

- ভেতরের ছোটখাট যন্ত্রপাতিগুলো একটার  
থেকে অন্যটার লাগিয়ে নেওয়া যায়। এতে  
বদল করার সুবিধে হয়, পয়সারও সাশ্রয়।
- ক্রোমিয়াম আর অ্যাক্রিলিকে তৈরী আকর্ষণীয়  
হাতলগুলো সহজেই হাতে ধরা যায়।  
এগুলোও একটার থেকে অন্যটার বদলে নেওয়া  
যায় আপনার বাথরুমের সাথে খাপ খাইয়ে।
- স্টার্ক আর হেঠা-ডিউটি মডেলদের মধ্যে  
থেকে বেছে নেওয়ার সুযোগ আছে।



আপনার ঘামেলা আর পয়সা বাঁচাতে একমাত্র সোমাই তিখুঁত কারিগরীতে তৈরী



**সোমা ইঞ্জিনিয়ারিং  
ফিটিংস লিমিটেড**

ফিল্ডার সারিটারিওয়ার ৩৩ টাওয়ার সিলিয়ার  
সম্পূর্ণ মালিকানাধীন একটি পাবলিক সন্যাসক সন্যাস



# স্মৃতি সততহ সুখের

প্রতিভা বসু

শ্রিতীয় পর্ব

১৫ ও ১৬

হামবর্ণ থেকে জালিন খুঁজি কাছে। সেলেন মাত্র পঞ্চাশ মিনিটের রান্ডা।  
বলা সাড়ে পঞ্চাশ টুই সাড়ে এগারোটার আগেই পেঁপেছে গেলো। এখানেও  
দুখেরে নির্দিষ্ট কোনো কাজের জন্য আমন্ত্রিত নন, শুধুই দেখ দেখার  
নয়না। আসল বস্তুতঃশাল মিউনিখ। এও পথের স্টেশন।

জালিনকে অকস্মিক পথের স্টেশন না বলাই ভালো। এখানে কয়েকদিন  
হাতে নিয়েই এসেছি।

এই প্রথম বদর যেখানে কাস্টম আমাদের ডীবাগ হয়জন করলো। কিছুতেই  
এরা সন্তুষ্ট নন। জিজ্ঞাসা আর ফরোয় না। পিছনে লাইন করে আবে সবাই  
দাঁড়িয়ে আছে, তারা অধৈর্য হচ্ছে, ভাবু।

আমাদের খিনি নিতে এসেছিলেন, ভদ্রমহিলার পদবী কেলনার। কিংবাহিত।  
মজবুত, জরি সুন্দর দেখতে। সবচেয়ে সুন্দর তাঁর চুল। একেবারে পাকা ধান।  
যেমন ফন, তেমন পিঠ-ছাপানো। খলে রেখেছেন, নক্ষম হাসানুতোরা মতো।  
বললেন, আমার চুল কাটতে ইচ্ছে করে না, তবু মাঝে মাঝে কাটি, জবাব  
বেড়ে যায়। আমার মশাধপের ফ্যাননা খুব ভালো লাগে। তবে চাকরি-কাজ  
করলে ওরকম বড়ো বড়ো পোশাকে জারি অসুবিধে। তারপরই আমার পোশাক  
দেখিয়ে, আপনাদের লম্বা ড্রেস আমার খুব পছন্দ। কিন্তু এই ড্রেস  
পরে তো কাজকর্ম করা যায় না।

জালি বললাম, আমাদের তো এ পোশাক ছাড়া অন্য পোশাক নেই, সবই  
করি।

কাপড় কাচতে পারেন?

হ্যাঁ।

আপিসেও মেয়েরা এই পোশাকে যায়?

কী করবে, এই তো পোশাক।

আজব।

এখন অকস্মিক পোশাক বদলাচ্ছে। সত্য কথাই, বাসে ট্রামে উঠতে হলে  
খুব অসুবিধে।

আমাকে এ পোশাক পরতে শিখিয়ে দেননা?

নিশ্চয়ই।

জালি নাইলনের ইয়র্ড মেট্রিফেল কিনে নেবো। কিন্তু সেলাই করে  
দেব কে?

এতে তো কোনো সেলাই নেই।

এতো বড়ো লম্বা একটা সেলাই ছাড়া কাপড়?

হ্যাঁ।

ক' গজ লাগে?

সাড়ে পাঁচ গজ আমাদের লাগে, আপনি কিনলে ছ' গজই কেনা ভালো।

ছ' গজ সেলাই না করা কাপড়! মাই গড! এই পোশাকের নাম কী?

শাড়ি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, শাড়ি। জালি শাড়ির কথা শুনছে। বৃন্দেবের মিকে ফিরে  
কালেন, আপনাদের জাতীয় পোশাক কি এটাই?

মাথা নাড়লেন বৃন্দেব, না, না। এ আমাদের আপনাদের কাছ থেকেই গ্রহণ  
করা। বলতে পারেন এটাই এখন ছেলের ইকোরিনাশনাল পোশাক। সর্বাঙ্গ  
তো।

এর পরে নানা জাতের নানা দেশের নানা কালের গাত্রাবরণ বিষয় কিছুটা  
আলোচনা চললো। সেটা সমাপ্ত করে অন্য প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হতে না-হতেই  
পেঁপেছে গেলো নির্দিষ্ট কসস্থানে।

যে হোটেলটার নিয়ে এলেন, চারদিক খোলা বড়ো বড়ো ঘরোয়া একটি  
নতুন বাড়ি, নাম শাভার হোটেল। Berlin Charlottenburg-এর উপক  
অবস্থিত। শাভার হোটেলটি অংশ নতুন নক, কোলিক মর্যাদা আছে, বাড়িও  
নতুন নয়, নতুন করে সারিয়ে নেওয়া। মিসেস কেলনার কালেন, বৃন্দেবের দরজা  
শহরটার মধ্যে চেহারার বলতে তো কিছুই আর বাকি ছিলো না, এ বাড়িও  
নিজের পার্থক্য; তবে সারাই-সুদাই করিয়ে নেওয়া মতো অকস্মিক ছিলো। তাই  
নতুন দেখাচ্ছে। কস্মিক বড়ো বড়ো রাস্তার উপরই বেশী হয়েছিল। উঁচু উঁচু  
বাড়িগুলো তো নৈই-ই কালতে পারা যায়, জনালার দাঁড়ালেই অনেক রইনস্  
দেখতে পারেন। আমরা রোজ দেখি, তবু রোজ কষ্ট হয়। এখন অকস্মিক কিছুটা  
সামলে ওঠা গেছে, নতুন গাছে পাতা গজাচ্ছে।

আমাদের ঘর দোতলায়। ঘরে এসে কসতেই পট ভরতি কাঁচ এলো।  
আলোপালা টুকটাক কিছু, খাদ্যদ্রব্যও এলো। মহিলাটি বেশ আকর্ষণ, কথার  
অজব হলো না। প্রসঙ্গ কিয়র থেকে বিষয়ান্তরে যেখানেই যাক না কেন, সব  
ক্ষেত্রেই তাঁর কলবার ভাষা আছে, মতান্তরে স্পষ্টতা এবং দৃঢ়তা আছে।  
আমাদেরও অভাব নেই। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, রাজনীতি—সবতেই সঙ্গান

জনায়ে। একতরফা শেখার অকালত পাবে, তবু সেখানে বসে বসে  
উপসই বেশী আগ্রহ। ভক্তি প্রসঙ্গ। বন-এ ছিলেন, সেখানে অধ্যাপনা করতেন।  
এখন বালিনে স্থায়ী কর্মস্থলে এসে এই সরকারী কালচারাল সংস্থার কাজে  
নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর মতে জার্মানীতে মেরদের অকস্মিক একটুও ভালো নয়।  
পূর্ববঙ্গের সঙ্গে বিবাহ, বৃন্দেব, পরমার্থিতার দৃষ্টি পা এগিয়ে থাকলেও কর্ম-  
ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টি পা পিছিয়ে রাখা হয়। সমান যোগ্যতা থাকলেও সমান সমান  
চাকরি পাবার কোনো প্রবন্ধই থাকে না।

এ বিষয়ে জারতবর্ষের মহিলায় যে আসে দুর্গত তাও তিনি জানেন।  
ভারতবর্ষে কিয়র আসে জানেন, বৃন্দেব, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরাক্ষ, রবীন্দ্রনাথ  
এসক কিয়র তো বটেই, জার্মানী রাষ্ট্রের নামও তাঁর অজানা নয়। বৃন্দেব  
কমর দুটি গল্প এক দু-একটি কবিতাও তিনি অনুবাদে পড়েছেন। ভারতীয়  
লেখকদের নিয়ে যে একটি সংগ্রহ কেবলই প্রস্তাব হয়েছে, সে কইয়ের নাম যে  
বৃন্দেবের কমর গল্পের নামেই কেবলই সে বিষয়েও তিনি ওয়াকিবহাল। গল্পের  
নাম 'একান অর টু ফ্রেন্ডস'। বালার 'একটি কি দুটি গোলাপ'।

জামার নাম জানেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন। সঙ্গে সংগেই বললেন,  
কেবললেখক হয়ে কেমন সমাজ পাচ্ছেন?

বৃন্দেব হাসতে হাসতে বললেন, 'এক আর তাত্তিরে দেখেন না, ডীবাগ  
জার্মানী, একজন বৃন্দেব অবতীর্ণ হয়ে আপনার সহযোগিতায় পরবর্তীকালে  
নয়ান করে দেননা। একা আমি, আমার কথা চিন্তা করুন—'

হাসতে হাসতে উঠলেন মহিলা, বললেন, 'এবার বিদ্রাম করুন, অনেক সময়  
নষ্ট করে দিয়ে গেলো। কোথাও বেরুন কি? তা হলে আবার আবেগ গাড়ি  
নিয়'।

আমরা শহর দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করলাম। সেই সঙ্গে আরো একটি ইচ্ছে,  
এ কয়দিনের মধ্যে পূর্ব জার্মানীতে যাকর কোনো বেসকলত করা যায় কিনা।  
এতো বেশ ঘুরছি, কোনো ক্রিমডীলট দেশ এখনো দর্শন। বৃন্দেবের দৃষ্টি  
রাশিয়ার যাবার আমন্ত্রণ এসেছিলো। একবার আমাদের ভারত সরকার পরিগতে  
চেরাছিলেন, যেমন মাঝে মাঝেই পাঠান। দলগত সফরে বৃন্দেবের কোনো  
কৌতুহল বা ইচ্ছে না থাকার সৌ সন্ধিরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আর  
একবার সরাসরি মস্কো কিংবদন্তির গিরে তিন বছরের জন্য অধঃপন্যর  
আমন্ত্রণ এসেছিলো। সেটা ঠিক প্রত্যাখ্যান না করলেও এই কারণই হলো না,  
ওরা তিন বছরের জন্য চান, বৃন্দেব এক বছরের বেশী থাকতে পারেন না।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'জালি নিশ্চয়ই চেষ্টা করবে, আশা করি পারবেন  
পাওয়া হবে, তবে রাষ্ট্রকস করতে পারবেন না।'

রাষ্ট্রবাস আমরা করতেও চাই না।

নিজের কালেন, 'অবশ্য তার দরকারও হবে না। এই তো এখন থেকে  
এখানে। একটা কোলা জেরাও করলেই যথেষ্ট।'

চলে গেলেন। বেশ একটা সৌরভ রেখে গেলেন। সত্যি সত্যিই নীলনয়না  
স্বর্ণকেশী মহিলাটিকে আমরাওর খুব ভালো লেগে গেল। কথা থাকলে, আবার  
সাড়ে চারটার সময় আসবেন।

আমরা যখন গিরোহিলাম রাজনৈতিক আবহাওয়া তখন বেশ উত্তপ্ত ছিলো।  
আমাদের যে এতো হরয়ানি করেছ কাস্টম, তারও একটা কারণ যোঝা গেল।  
কয়েকদিন আগেই একজন বিদেশী এসে নাকি অনেক কামেলা করে গেছে। যাবে  
পূর্ব জার্মানীতে, সেই দলেরই লোক, এখানে এসেছে একটা বিশেষ কুট উদ্দেশ্য  
নিয়। সেটা জানজার্মান হয়ে যাবার পর থেকেই বিশেষ সতর্কতা হয়ে গেছে।

তা ছাড়া দিন সাতক আরো পর পর দুটি ছেলেকে পূর্ব জার্মানী গুলি  
করেছে। দুটি ছেলের মধ্যে একটির মা-বাবাকে নিয়ে সমস্ত পরিবার পড়ে গেছে  
পশ্চিম জার্মানীতে, অবশ্য ছিলো বলে সে আসতে পারেনি, তার বয়স  
সতেরো। আর একটি ছেলের প্রেমিকা থেকে গেছে এপারে, সে পড়ে গেছে  
ওপারে। সদৃশ্যে আসার কোনো উপায় নেই, সুতরাং দুজনেই দেয়ল টপকাতে  
চেরাছিলেন, সত্যক প্রহরীরা সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে। দজনেই অবশ্য আলাদা-  
আলাদাভাবে আলাদা আলাদা দিনে চেষ্টা করেছিলেন, পারিগত একে। কয়েকদিন  
আগে আর একটি মেয়েও চেষ্টা করেছিলেন পালাতে। তাকেও ধরে ফেলেছে।  
তারা সন্দেহ করছে, এই মেয়ের মতামত তাদের মতের পরিপন্থী, সুতরাং নিগ্রহ  
শুরু হয়েছে। কীভাবে লুকিয়ে পালিয়ে চলে এসেছে কে জানে, ফটকের পাশের  
ফক দিয়ে প্রায় বোরের পড়ছিলেন, তারপরের অত্যাচার কলনাল। বিবাহ মা  
এপারে অন্যত অভূত অবস্থার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেঁদে সালা হচ্ছেন।

অত সাবধানতা সত্ত্বেও কী করে যে এসব ঘটে, কে জানে। আবার তার  
মধ্যে চিঠি চাচালিও হয়। সকলেই ওপটি থেকে পালিয়ে আসতে চায়।  
কেন?

এই কেন প্রশ্নটি এখনকার সকলের চোখে-মুখে। তাদের কল্পনা, অবিপ্রসঙ্গত  
পালাতে চাইবার মধ্যে যে মনস্তত্ত্ব কাজ করে সেটা হচ্ছে : ইতিহাসবিদ না হয়েও  
সাধারণ জ্ঞান অনুযায়ী মানুষ যতো পিছনেই থাকিয়ে দেখতে গেছে। যখন কিংব  
নিয়মে এটাই দেখা গেছে শাস্তি বা বৃন্দেব কিছই নিরবজিয় নয়। সর্বকালেই এ  
প্রভাব মানুষকে কষ্টও দিয়েছে, লজ্জাও করেছে। কিন্তু এই মতবাদে মধ্যে  
কোথাও কোনো দৃষ্টি নেই, বৃন্দেবই সব। অথচ অশান্ত থাকার আর অশান্ত



প্রকাশিত হলো

## কুম্ভমেলায় ১২

অমৃতময় কুম্ভমেলা বিশ্বের প্রাচীনতম মিলনমেলা আর এই মিলন ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মবাণী।

১৯৭৭ সালে প্রয়াগে অনুষ্ঠিত কুম্ভমেলা সর্বকালের সর্বদেশের বৃহত্তম মহামেলা। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে শুধু

একদিনে প্রায় দেড়কোটি মানুষ গঙ্গা-

যমুনার সঙ্গমে পূণ্যমান করে অমৃতলাভ করেছেন।

## শঙ্কু মহারাজ

দীর্ঘদিনের নিরলস সাধনায় সেই মেলা ও মেলার মানুষদের নিয়ে রচনা করেছেন এক অনবদ্য ভ্রমণ কাহিনী।

লেখকের কয়েকখানি সাম্প্রতিক ভ্রমণকাহিনী

গঙ্গা-যমুনার দেশে ১২

(যমুনোদী, গঙ্গোদী ও গোমুখী)

রাজভূমি-রাজস্থান ১৫

(জয়পুর, আজমীড়, চিতোরগড়, নাথদ্বার, হলদিঘাট, একলিজজি, উদয়পুর ও মাউন্ট আবু)

লীলাভূমি-লাহুল ১০

(রোতাং গিরিঘাট ও লাহুল-স্পিতি)

ভাণ্ডাউলের দেবতা ১২০০

অমরতীর্থ-অমরনাথ ১২০০

আমাদের আরও কয়েকটি ভ্রমণ কাহিনী

প্রবোধকুমার সাংঘাল-এর

পর্যটকের পত্র ১৫

সুনীল চৌধুরী

নীলকণ্ঠের ডাকে ৬

পাহাড় পাহাড় খেলা ১০ সুন্দর দুর্গমের পথে ৬

হিমালয়ের গহনে নির্জনে ৮

দে'জ পাবলিশিং ১৩ বক্সিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

কলিকাতা ৭০০০৭৩ ফোন : ৩৪-৫০৩৫

কিসকিন দিয়ে, হ্রদয়ের সমস্ত কোমলবর্তি বাধা রেখে তাই এই নীতিতে চলতে হবে।

কমিউনিস্টদের মতে, সোভিয়েত বিপ্লবের রাষ্ট্রশাসনকে ধ্বংস না করে শান্তি আসবে না, নিরাপত্তা আসবে না। যদি তাই হয়, তা হলে তাদের শান্তি কোথায়? কোথায় তাদের নিরাপত্তা? যদি হাতে তাদের এই অস্ত্র মর্দক চাবিটি সক্রিয় ছিলো এতোকাল, সেই স্টালিনকে নিয়ে আজ তারা কী করে কোথায় গেল সেইসব ভাঙা-ভালোবাসার ঢাক-ঢোল? মর্ত্যভূমির সেই ইশ্বর মালাচন্দন?

এ-সব নিয়ে যে পশ্চিম বালিনবাসীরা সবদাই খুব একটা আলোচনা না বা উল্লেখ করে বা ডক করে তা না, কিন্তু এই-ই তাদের সর্বক্ষেত্রে অনুভূতি কথাপ্রসঙ্গে উঠে পড়ে এবং রাজনীতির সঙ্গে এক কৌটোও বার সংশ্লিষ্ট নেই, সেভাবে কিংবদন্তির পক্ষে এই মতবাদ অতি বিশৃঙ্খলক। ভারতবর্ষে এর প্রভ কীরকম তাও ভিজ্জেন করে।

স্টালিন বিষয়ে মিসেস কেলনার হলছিলেন, দেখুন, মৃত্যু মানুষের অবস্থা মৃত্যুর বাড়ি গাল নেই। জীবনের অনেক উদ্দেশ্য মৃত্যুর আসন। সেই মৃত্যু নিয়ে এরা কী নৃশংস ব্যবহারই না করলো! কবর খুঁড়ে বার করলো সেই প্রাণহীন গরীব শব, পক্ষাঘাত করলো, খুঁড়ু ছিটোলো—হুঁহী ছুঁহী, ভাবা যায় না। এখন ফল তীর প্রতি এতদিনের ভাঙা প্রাণা ভালোবাসা সবই নাকি ছিলো ভয়ের ফসল কিন্তু জারতন্ত্রের অকলান ঘটিয়ে এই যে তারা একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করলো সেটা তো দেশের জনসাধারণকে আবার একটা ভয়ের শৃঙ্খলেই আবদ্ধ করে রাখা। খেতরি সমস্ত পৃথিবীটাকেই এরা কৃত্তবিকৃত না করে ছাড়ব না? এরা এক আত্মহীন যান্ত্রিক সমাজ গঠনে ব্যর্থপরিকর। দেশদ্রোহিতা নরহত্যা, যুদ্ধাচরণ এই হচ্ছে এদের প্রধান হাতিয়ার। এর জোরেই প্রায় অর্ধেক ইয়োয়োগে মানুষ বন্দি হয়েছে। দেশকে যদি আমরা মা বর্ষা আর কারণ তার জলবার, মটি। সেই এক কার, মাটি আমাদের প্রাণবাহিকা শক্তি। অচেতনভাবেই সেজন্য দেশকে আমরা ভালোবাসতে শিখি। তাই যদি হয়, আমি বলবো, যার বার দেশের কমিউনিস্ট সন্তানরাই তার তার মায়ের গলায় ফাঁসের দড়ি পরিয়েছে। এ বিষয়ে আরও অপরিসীম কৃতিত্ব।

এই কথা পরিপ্রেক্ষিতেই আর একজন পণ্ডিতমান্য বক্তি বললেন, আর পরন্তু যেতামো দেশ তাদের স্বাধীনতা হারিয়ে কমিউনিস্টদের কবরে মগন, তার জন্য তাদের দেশের কমিউনিস্টরাই কিন্তু দায়ী। তাদের দেশদ্রোহিতাই এর সর্বশেষ মূল।

চেকোস্লোভাকিয়ার জর্জিপ্র উদার্ননিক নেতা শেষ রাজপতি বেনেসের তার প্রাণতুল্য গণতান্ত্রিক চেকোস্লোভাকিয়াকে কমিউনিস্ট চক্রান্তের কবলে হতে দেখলেন, তখন তিনি চিৎকার করে এ কথা বলেই জগৎবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে গেলেন যে, নায়ক এবং নীতিবিরূপকর্তা হয়ে কেউ যেন কমিউনিস্টদের প্রায় না দেয়। তা হলে তার সর্বশাস্ত্র অনিবার্য। শেষ পরশ্বত তিনি এ ভুল করেই না বলেই নিজের দেশকে পরের হাতে বিক্রি দিয়ে তার খেপারত দিতে হলো। কিন্তু কখনো বিশ্বাস করেননি, কমিউনিস্ট হোক বা যাই হোক, নিজের দেশের স্বাধীনতা আর বিক্রি কেউ বড়ো করে দেখবে। তাই কমিউনিস্টরা তাঁর দেশে তাঁর পক্ষ পুষ্ট হয়েই তলার তলার এমন কেউ উঠতে পারেনি।

কতিপিল্লের ধণপ্রাণ সম্পত্তি স্বাধীনতা কিছুই যদি না থাকলো, এমন কি নাগরিক অধিকার পরশ্বত স্বীকৃত, না হলো, তা হলে কোন্ পারকর অধি রইতো? একনায়কতন্ত্রের নিরাকুল আনুগত্য স্বীকার না করলেই যেখানে মৃত্যুশাস্ত্র নিয়ম সেখানে একটা গৃহপালিত জীবের সঙ্গে একজন মানুষের পার্থক্য হোকতো গরীবের দঃখমোচনের ন্যায় যদি এই হয় তা হলে শয়তানের কাছ থেকে শাস্তি কতো বড়ো বা, এও তাই। এমনই কমিউনিস্ট বন্দন থেকে মস্তি পাবার জন্য এমন লোকগুলো লুকিয়ে পাঁচিয়ে বঁচতে চায়? শত দাবিদার ও মানুষ করে না তাই তারা করেছে। আর দেশভাগী হতে চেয়ে সমস্তে কাঁদ দি বড়, পরে মৃত্যুবরণ করেছে অব, ক্রিড হয়নি।

কথাটা অসত্য নয়। সাহায্যের হুমকিবেশে অন্যের দেশের আপন দখলে অন্যের জেটায় কমিউনিস্টরা যেটা বিশ্বাসঘাতকতা করে, অন্য কোন দেশ করলে উপস্থিত কখনো সেই চাতুরি খেলতে বাল জানা যায় না। কলুত সাম্রাজ্যবাদ মর্দকরা যে-কোনো গণতান্ত্রিক দেশের কাছেই একটি আভিধানিক শব্দমাথ। তার প্রয়োগ এখন একমাত্র কমিউনিস্ট দেশগুলোই টেনিটা। আর তাদের সেই সাম্রাজ্যবাদ শব্দ দেশ কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত হয় না, দেশের ধনরাজ আত্মসার করেই তৃপ্ত হয় না, এর কথা ভয়ানক। এই কথা কোনো জাতিতে না, গোষ্ঠীর নয়, এই ক্ষুদ্র আহাতি মানবের হৃৎপিণ্ড। মানবের হৃদয় মন অন্তঃকরণ। অসাম্য এবং দারিদ্র্যই যদি মার্কসবাদীদের বিশ্বাসের কাশন হয় তা হলে সে কারণ চেকোস্লোভাকিয়াকে কখনো হলো না। ১৯৪৪ সালে এই দেশস্বাধীনতা বড়বস্তুর ফলেই প্রায় খঁচকলো ইন্দুরের মতো আটকে গিয়ে মার দঃ মাসে স্ট্রীট-পুরুষ নির্বিশেষে পুনরো হাজার পোলা-ডবাসীরা মৃত্যু ঘটে, নরহত্যা বিবাহে সাহায্যের অছিলায় বন্দ সেজে রুশ মক্তি ফৌজ তখন ঘরের দরজায় উপস্থিত। আশ্রাস উৎসাহে তাতিয়ে তাতিয়ে নাংসী বিভাউনকে হেথই উপস্থ কর চারপাশে এই আগনের কেঁজাফল তারাি ঘিরে দিরাছিলো। কিন্তু সত্যিই বন্দন সাহায্যের অভাব মরত লাগলো সব, আত্মলটিও নাড়লো না। শব্দ অপেক্ষায় রইলো কোন সন্ধ্যাে ঘরে ঢুকবে।

পোল্যান্ডের একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক জেনারেল বোর কোমহরোভস্কিও সৈনিক মের্মে উপলব্ধি করেছিলেন ক্ষমতা দখলের জন্য কমিউনিস্ট শৈল্যাচকতা বড়ো দূর যেতে পারে। বাকো ছিলেন এমন কোনো পাপ নেই যা এদের হৃদয়ে তির্যাক্ত হারের সঞ্চার করতে পারে।

এমন কি, পোল্যান্ডের বিপদের খবর পেয়ে রাজড্রুৎকি যখন সাহায্য পঠাবার বন্দোবস্ত করলেন, স্টালিন তাঁর বিমানঘাটিগুলো পর্যন্ত ব্যবহার করতে দিতে অসম্মত হলেন।

লিখে পাঠালেন, জেনারেল বোর কোমহরোভস্কি এখন দেশদ্রোহী, নারসী দলভূষ। তাকে সাহায্য করা মানেই স্বাধীন পোল্যান্ডের সার্বভৌমিকতার হস্তক্ষেপ করা। এটা কমিউনিস্টদের নীতিবিকল্প।

জারপরা সেই নীতির ধন্য ধরেই মৃত্যুর স্তম্ভে পা রেখে রেখে তারা নগর প্রবেশ করলো।

কমিউনিস্ট বিচার খুব সংক্ষিপ্ত। বিশেষ আইন-আদালতের দরকার হয় না। যে বাঁধ তাদের মতবাদে কিস্যি না করে অথবা না করার সম্ভাবনা এক ফোঁটাও আছে বলে মনে হয়, সকলেই তাদের কাছে সমান কথা।

সুতরাং ১৯৪৪ সনের অক্টোবর থেকে ১৯৪৫ সনের জুন পর্যন্ত এই নয় মাসে পোল্যান্ডের দেড় লক্ষ থেকে দুই লক্ষ অধিবাসিকে তারা মধ্যপ্রাচ্যের কিয়দ দূর নিয়ে গিয়ে হত্যা করে নিশ্চিত হলো। হাঙ্গেরিতে এই নৃশংসতা আরো চরমে উঠেছিলো। অর্ধেকিত আক্রমণে চার্লস থেকে ছুটে এসেছিলো সব রুশ সাক্সোয়াকাইনী। ট্যাঙ্কগুলো ঘিরে ফেলেছিলো সমস্ত ঘাঁটি। তারপরে সমস্ত দিন ধরে যা চললো দেশটার উপরে সেই বীভৎসতা ইতিহাসের চরমও উন্মত্ত হিসেবেও লক্ষ্য দিয়েছে। বৃডপোন্সের রাস্তাঘাট অগ্নিগলি সৈনিক রাইর স্রোতে ভেসে গিয়েছিলো।

এগুলো তথা। ঐতিহাসিক সত্য। আমি নিজেকে কোনো ইজমেরই পক্ষপাতী নই। সোজাসজি গণতন্ত্র এক পাল্টেমেরটার শাসনব্যবস্থার কিস্যাসী। আমার ধারণা, মানুষের সব যুগ্মই স্বাধীনতার জন্য। কিন্তু সেই স্বাধীনতা এরা সত্যি সত্যি বিপন্ন করেছে।

কিন্তু এর ভীষণতা যে আরো কতটা দূর যেতে পারে তার উৎকট উদাহরণ হলো চীন। চীনের কমিউন। এই নীতি প্রবর্তন করতে যে কেবলমাত্র দুই লক্ষ জাতিসংঘকে সর্বসম্মত হত্যা করে জমির দখল নিতে হয়েছিলো তাই নয়, তার জন্য আরো অনেক দূর যেতে হয়েছিলো। মানুষ ধাতু নয় যে, পিটানো মাইই সিধ হবে; জন্তু নয় যে, মন নামক একটা পদার্থকে যেটা একান্তই মানুষের গণ্য) বাদ দিয়েও বেঁচে থাকবার কোনো অর্থ খুঁজে পাবে। কাজেই পুরুষের প্রথা ভেঙে দিয়ে তাদের কমিউনের খোঁজাড়ে ঢুকাতে পরে। চার বছর ধন্যজাতি করতে হয়েছিলো। অবশেষে দু' কোটি নরহত্যার পরে দখল হলো সব। তখন আর তারা কতটা মা বাপ ভাই বোন স্বামী আর স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে রইলো না। তারা রাষ্ট্রের হলো। একটা খাটলে যেমন গয়লার ইচ্ছাধীন কতো-গুলো গরু মোষ জাক কাটে, দু' দেয়, আর নির্দিষ্ট জায়গায় রাত কাটার, তেমনি কমিউনের মান যেরো কমিউনের দখল এলো। স্ত্রী-পুরুষ নিবি শেষে সমস্ত চীনবাসীর এক পোশাক। প্রত্যেকটি মানুষকে এক ছাচি টুটির করবার এটাই হলো কাইয়ের আবরণ। এবং যেহেতু স্ত্রীলোকের বাড়ির নিচে চুল নামাতে পারে না (হুকুম নেই), সুতরাং চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই কে পুরুষ, কে স্ত্রীলোক। দরকারই বা কী! কে কেমন মানুষ, কার কীরকম চেহারা, কে কী ধরনের মন বহন করে, এর তো আর কোনো অর্থ নেই সেখানে। সেখানে তাদের একমাত্র পরিচয় তারা সব কমিউনের সৈনিক। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এখন যুদ্ধক্ষেত্রে আঁছ। এই সেলাগান অনুযায়ী কেবল মূখ্য কাজে খেতে যাওয়া। এরই নাম শ্রমিক-দল।

প্রায় সমস্ত আশীটা গ্রাম নিয়ে এক-একটা কমিউন তৈরী হয়। আর সেই কমিউন বায়ো-চোন্দো হাজার পরিবারের পুষ্কাল-খট হাজার মানুষ একসঙ্গে বাস করে। জমি, বাড়ি, চাষের সরঞ্জাম, কুটিরশিল্প, বস্ত্রাঘরের জিনিস এবং গৃহ-পালিত জীবাণুসমূহের সংগে শিশু এবং বৃদ্ধরাও কমিউনের সম্পত্তি। এক সত্যই ব্যস খেবেই বাচ্চারা মায়ের বুকে ছেড়ে কমিউনের ক্রেশ ঢকে যায়। সেখানেই লালনপালন করা হয় তাদের। প্রাকৃতিক আবহবিশেষ শিশুরা মায়ের জন্য অথবা মায়েরা শিশুর জন্য যদি অতিরিক্ত বেদনা বোধ করে, তবুও কোনো উপায় নেই কাছে পাবার। একমাত্র অসুখ করলে দেখতে যেতে অনুমতি দেওয়া হয়। তার বেশী আর কোনো ইচ্ছের কোনো প্রেরণ সম্ভব নয়।

তেমনি যাদের বয়স হয়েছ, যাদের পশ্চিমের যোগ্য বলে বিবেচিত নয়, তাদের জন্যও পিঁজরাপোল আছে। সেগুলো হচ্ছে তাদের মতো বড়াদের স্মৃতির ঘর। ঐ স্মৃতির ঘরে তোমাকে যেতেই হবে, জাতি তোমার মতোই আপত্তি থাক বা কষ্ট হোক। স্ত্রী ছেড়ে, সন্তান ছেড়ে, সংসার ছেড়ে নিতেই হবে সেই নিবাসন; কেননা সরকারী মতে এখন পেনসন হয়েছ তোমার। ঘর-ভরা সন্তান-সন্ততি নাতি-নাতনি নিয়ে কোরার বাস থাকা চলবে না। সেই নির্বাসনে দু' কোটা দু' মতো খাদ্য মেলে, শীতে কম্বল।

মেয়েদের কেন গুরুতর ভূমিকা বাদ দিতে বাধ্য করা হলো, তার হিসেবটা অবিশ্যি খুব জটিল নয়। একজন মেয়ে যদি তার নিজের সমসারটুকু নির্যই

বাস্তব থাকে তা হলে তার প্রেমের অপচয় ঘটে। কেননা, তার আরো খাটবার ক্ষমতা বাকী থেকে যায়।

চীনের কমিউন জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মেয়ে। সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তাদের অংশই কাজে লাগানো দরকার। অতএব তার সব অবসরটুকু নিঃশেষ নিজে নিতে হবে। আর সেজন্যই একজন স্ত্রীলোক দিয়ে যদি এক শো জন লোকের রাস্তা করানো যায় তা হলে বাকী নিপানবই জন স্ত্রীলোকের শ্রম অন্যায়সেই রাষ্ট্রের কাজে লাগানো যেতে পারে।

যেহেতু জনসাধারণ সম্পূর্ণভাবে সরকারী নির্দেশ চলতে বাধ্য, তাদের হৃদয়ের বাইরে এক পাও বাড়ানোর কাজে সাধা নেই, সুতরাং প্রত্যেকটি লোকই জরুরী-মূলকভাবে তাদের আনুগত্য। আনুগত্য খারাবি দরুনই মানুষগুলোকে জন্তুর মতো চরিত্রের ঘণ্টা কাজের চাকর শিল্প করতে এক বিদ্‌ম্বিষ্ণু নেই।

অবশ্য জন্তুর মতো ক্লাসিও ঠিক হলো না। কেননা, জন্তুর জন্যও আমাদের গণতান্ত্রিক সরকারী মতে এরকম নিষিদ্ধক নৃশংস-আনুগত্যের নিষেধ নেই। তাদের বেহমেনের জন্যও আমরা যথেষ্ট চিন্তা করি।

এমন কি, চীনে জন্তু-জানোয়ারের বসলে লাঙলও মানব দিয়েই টানানো হয়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যে শৃঙ্খল এরা দেহটাকেই খাটার তাই নয়, প্রতিটি চাষীকেই যে সারা বছর ধরে একইরকম মানসিক সংঘাতপূর্ণ জীবনযাপন করতে হয় তাই নয়, তাদের প্রবণের উপরও যথেষ্ট পরিচয় চলে সারা দিন ধরে।

হাটে মাঠে কটে কাজে বাসে গাড়িতে সবাইই লোকডম্পীকারের চিংকার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। অক্লান্ত সন্তর কোটি লোককে ঐ লাউডম্পীকারের মাধ্যমে শুনতে হয়, জানতে হয়, মেনে নিতে হয় তারা কতটা সখে আছে। বেড়া ভাই মাও তাদের জন্য কতটা কষ্ট করছেন। মের্মে মের্মে গোঁধে নিতে হয় আলস্য কমিউনিস্ট হতে হলে কী করতে হবে, কীভাবে চলতে হবে।

সকালবেলা ঐ আতনাদ শুনতে শুনতেই যুগ্ম ভাঙবে। আধ ঘণ্টা ব্যায়াম। তারপরে প্রাতঃস্মরণের জন্য ক্যান্টিনে গিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়ান, তারপর মার্চ করে ঐ শুনতে শুনতেই ভাগে ভাগে কাজে যাওয়া।

দুপুরেও সেই শব্দ কানে নিয়ে যিরে এসে মস্ত ক্যান্টিনের মস্ত 'মেন হল' জমরেতে হয় সবাই। বাট হাজার লোকের জন্য এক লপারখানায় যে খাদ্য প্রত হ সোধ করে এনে পরিবেশন করা হয়, তার মধ্যে আর হাই থাক, বসন্তের কোনো পরিভূতি নিশ্চয়ই থাকে না। হয়তো পেট ভরে। নাও ভরতে পারে। ঐ অথাক গলাধঃকরণ করে আবার তাদের ছুঁতে হয় কাজে।

সন্ধ্যার সময় ক্লাস্ট মেহে ফিরে এসেও নিস্তার নেই। কেননা তখন ক্লাস। সেখানেও সেই খেঁড়ের চিংকার। রেডওর সাহায্যে সরকার কী চায় শোনানো

প্রাথমিক অবস্থায়

# আর্শের

জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে

আরাম পেতে

বিশ্বস্ত

## হ্যাডেনস্যা

ফলদ্র

ব্যবহার করুন-

অপ্রোপচার না

কবলেও চলে!

# আগাথা ক্রিষ্টির

আঁখি তারায় রক্ত ১৬

মৃত্যুর চোখ হিম ১৪

নিহত ভ্রমর ১৪

একটি আশ্চর্য ডিলজী

## ক্রাইম গ্যাসন আই

চিরঞ্জীব সেন-এর একটি মতন ধর্মের খিলার

নাইটহক ১০

ইজরেলের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় ঝরে চলেতে, সারা। ইজরেল ছুঁতে  
লাঞ্ছন কর্মতৎপরতা আর উত্তেকনা, কি হয়, কি হয়, ডামাম  
আরম্ভ দুনিয়া এবার বুঝি ছুঁটি টিপে ধরবে, সিন বেত আর সি  
আই এ দুজনেই সক্রিয় কিন্তু দুয়ে বসে কে কলকাঠি নাড়ছে ?  
নাইটহক ? কোনো বিদেশী রাষ্ট্র নাকি সেই নয়নভোলা নো সুলারী ?

## বিদেশী ভৌতিক

## অমনিবাস ২০

সম্পাদনা ও ভাষান্তর—পৃথীরাজ সেন

এতে আছে—শার্লক হোমসের প্রচণ্ড স্যার আর্থার  
কোনান ডয়েলের একমাত্র ভৌতিক উপন্যাস, বিখ্যে  
আলোড়ন সৃষ্টিকারী হরর ফিল্ম 'দি ওমেন' অবলম্বনে  
ডেভিড সেলজারের ডয়াল কাহিনী, শিহরিত রহস্যের  
জনপ্রিয় লেখক ফ্রিজ লিবারের আদিম প্রতিহিংসার  
উপন্যাস ও ভৌতিক সাহিত্যের বরণীয় লেখক এডগার  
অ্যালান পোর চারটি মন রহস্যের নিখাদ কাহিনী।  
অবিকৃত অনুবাদে মূল কাহিনীর রস আবাদ করা  
হাবে।

## জেমস হেডলী চেড

এ কফিন ভ্রম হংকং ১৮

সোনালী মাছেরা নিরুদ্দেশ ১৫

সঞ্জিনী স্নৈরিনী ১৪

প্রাতিস্থান সাহিত্য মন্দির ॥ ৫৭-সি, কলেজ স্ট্রীট, কলি-৭৩  
জ্যোতি প্রকাশন \* ২এ নবীন কুণ্ডলেন \* কলি-৯

হয় সে কথা। জানানো হয়। সেটা শেষ করে ধ'কতে ধ'কতে আবার দল'র  
সভা। এখানে প্রত্যেকটি লোককে উঠে দাঁড়িয়ে তাদের সার দিনের কর্মতালিকা  
পেশ করতে হয়। তারপর বড়ো ভাই মাওয়ের নামে শপথ করে বলতে হয়  
আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ আর জনগণের শত্রুকে তারা ধ্বংস করবেই করবে। এই  
প্রতিজ্ঞার পরে ছুটি। ছুটির বিশ্রামও নিম্নমহীন বা ইচ্ছানির্ভর নয়। সেখানে  
যার যার খোপে গিয়ে কথামতলকভাবে আট ঘণ্টা ঘুমোনো।

শব্দ জীকই নয়, মৃত্যুর পরে শেষকৃত্যের বস্তুধা করে কমিউন। শব্দ  
কে কার জন্য ক' ফেটা চোখের জল ফেলবে সে। এটা গণে দিতে শেখেন।  
বাকের মধ্যে কে কতোটা কেন্দ্রবোধে দৃশ্য হচ্ছে, এ। পরিয়ে সেটা দেখে নিতে  
দীক্ষিত করতে শেখেন।

মনে হতে পারে যান্ত্রিক যন্ত্রকে ঠাট্টা করে চাঁলি চ্যাপলিনের 'মডার্ন টাইমস'  
ছবির মতো এটিও বাকি একটা বাড়াবাড়ির কল্পনা নিয়ে প্রহসন। তা নয়।  
মানুষের জীবন নিয়ে এই খেলাই খেলছে এই একনায়কতবাদ।

সেই চীনই যখন তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টায় ভারতবর্ষের বাপক অঞ্চল  
দখল করে আরো কিয়ট অংশ দাবি করছিলো, সেই সময় কোনো কাগজে সেই  
বিষয়ে কিছু লিখতে অনুমতি হয়নি। সত্যিকার তথ্যের প্রয়োজন। এক  
বন্ধু তঁরা সংগৃহীত কিছু কাটিং দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেন।

১৯৫৮ সালে বিখ্যাত পরিসংখ্যানিক চন্দ্রশেখর বিশ্বভারতীয় চীনে গিয়ে  
ছিলেন। ফিরে এসে তিনি নানা কাগজে—যেমন দিল্লীর স্টেটসম্যান, বম্বে  
'ইন্ডাস্ট্রি'র উইকলি অব ইন্ডিয়া' ইত্যাদি—ধারাবাহিকভাবে কিছু প্রবন্ধ লিখ  
ছিলেন। স্টেটসম্যানের যোগেগুলো আমেরিকার অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস মাধ্যমে  
ভারতের বাইরে কয়েক শো দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কইয়ের কিছু  
অংশ 'দি নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার রুবরাসপীয়েটেও ছাপা হয়েছিল। সেইসব  
কাটিংই বন্ধু দিরাছিলেন আমাকে। আমি তা থেকেই এসব তথ্য পাই।

সেই সময়ে আমাদের দেশের কমিউনিস্টরাও তাদের চিন্তা অনুযায়ী স্বাধোগ-  
সুবিধামতে পশ্চিম এক প্রত্যেক এর সম্ভাবণে সম্মতক ছিলেন। ভারতবর্ষ  
নিরপেক্ষ দেশ, এই অঁছিলার ধরা তুলে যাতে অন্যান্য শক্তিশালী দেশের সাহায্য  
ও নিজের ক্ষমতার আমার প্রতিরক্ষায় পারপাম হয়ে না উঠতে পারি তার অবিহান  
চৈন্য ক্রান্তিনিভাবে নিয়োজিতও করেছিলেন নিজেদের। মানে তারা চাইছিলেন  
ভারতবর্ষ চীনের হাতে বিজিত হোক। কেননা, ভারতবর্ষ এক চীন—এ দৃষ্টান্ত  
নাম তাদের কাছে ঘুটো গুল মাত্র। যা অর্থহীন তা হচ্ছে গণতন্ত্র এক কমিউনিজম।  
গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে স্বদেশী বিপ্লবী যেই হোক না কেন এসে প্রভু কর ক  
কোনো আপত্তি নেই। দেশকে বিক্রেত দেওয়ার তো বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা  
ইজম, মতবাদ। একনায়কতন্ত্রের জোয়াল।

যদি তাই তারা মনে করে থাকেন তবে আর নিরপেক্ষ থাকার প্রস্তুতি কোথায়  
প্রয়োজ। যেসব দেশ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তারা নিশ্চয়ই তার সর্বনাশ চেকাত  
একপক্ষ হয়ে দাঁড়াবে। এক সেটাই হবে তাদের ধর্মবিশ্বাস। বিশ্বাসের উপর  
মনষাত্মের উপর, বাস্তবতার উপর এতো বড়ো জলম নিশ্চয়ই তারা অফলান  
বদনে মেনে নেবে না।

কিন্তু এই দাবানল কোনো গণতান্ত্রিক দেশই জ্বালাতে উৎসুক নয়।  
গণতান্ত্রিক দেশগুলো মোটামুটি শান্তিপূর্ণ বলেই ধরে নেওয়া যায়। বিশেষ  
করি ভারতবর্ষ জো বটেই। তার প্রমাণও ভারতবর্ষ খুব ভালোভাবেই দিচ্ছে।  
১৯৪৯ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত কমিউনিস্ট চীন আমাদের নানাভাবে ঘাটা উপায়ে  
করেছে, সেই তেরো বছর ধর ভারত সরকার তার অক্লান্ত বধ্যতা নিয়ে বড়োই  
অধঃস্থান হয়ে সেইসব উপায়ে ক্ষমা অথবা উপেক্ষা করে এসেছে। কিন্তু  
কেন কমিউনিস্ট চীনকে প্রতিনিষেধ করতে দেওয়া হচ্ছে না তা। বছরের পর  
বছর আমাদের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে এসেছেন।

১৯৫১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ৪৯টি রাষ্ট্র একত্র হয়ে যখন জাপান'র সঙ্গে  
একটি শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর দিল, কমিউনিস্ট চীনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।  
জওহরলাল নেহরু সেখানে যোগ দিলেন না। এমন কি, তখন তা রক্ষার্থে ১৯৫৪  
সালের এপ্রিল মাসে তিব্বতের উপর ভারতবর্ষের সমস্ত অধিকার পর্যন্ত উপঢৌকন  
দেওয়া হলো তাদের।

কিন্তু স্বাধ, রোগ, আগুন আর কমিউনিস্ট কখনই বন্ধ হয় না। এদের  
বিষয়ে কিছু বলতে গেলে সেই চেকোস্লোভাকিয়ার শেষ রাষ্ট্রপতি ডক্টর বেনেশ  
মৃত্যুকালীন জবনবন্দীই স্মরণ করতে হয়। কেউ যেন নাযয়নীতিস কনবর্তী হয়  
এদের প্রশ্রয় না দেয়। তা হলে দেশের সর্বনাশ অনিবার্য। সত্যিকার স্বনির্ভরই  
কমিউনিস্ট চীন তিব্বতের খোলা দরজা দিয়ে ভারতমাতার চুলের মণ্ডি শত্রু হাতে  
অঁকড়ে ধরাল।

মোট কথা, প্রাণিকুলে যার স্বাধা মানুষ প্রেতি প্রাণী বলে পরিগণিত সেইসব  
বাস্তবজালা অপহরণ করাই এই মতবাদের একটা শর্ত। চলন বলন শব্দ  
ভোজনে মনেন সব মানষকে একাকার করে দেওয়াই এদের ধর্ম। চল্লীশ শাসনের  
অপাণ্ডিতল'নই এই কমিউনিস্ট সব কটি মানষ উঠছে, বসছে কলা কল্যাণ  
খাটছে, হটিছে, অস্তিত্ব লাভউৎপাদকের বিজ্ঞাপন করপাউল দিল্লীকর  
সাম্রাজ্যবাদ আশংকা ইচ্ছা ক্রিয়াকর্ম চর্চা স্রাণীন চিন্তা কিছুকিছু কোনো প্রদ  
আসছে না, তার নাম যদি বেঁচে থাকে হয় তা হলে মৃত্যুর বাখাটা কী জানা  
ইচ্ছ কর।

চন্দ্রশেখরের মতে গোটা নরকও মানষের জীবনে এমন ভয়ংকর নয়। (ক্রমশঃ)

## বিজ্ঞান

### ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যখন ইউরেনাসের বলয় আবিষ্কার করলেন

একমাত্র ইউরেনাসই ছিল আমাদের লক্ষ্য। প্রায় মার্চ, ১৯৭৭। ভারতীয় সময় তখন রাত দুটো বেজে তিরিশ মিনিট। ইউরেনাস তার পরিভ্রমণ পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বাঙ্গালোদের প্রায় দুশ কুআর্মিটার দূরে কাভালুর মানমন্দির। সেই মানমন্দিরের মাধ্যমে দূরবীণ। দূরবীণের উপর চোখ রেখে রুদ্ধশব্দে আমরা অপেক্ষা করছি। আমাদের চোখ ইউরেনাস এবং দূরবর্তী একটি ক্ষীণ নক্ষত্রের উপর নিবদ্ধ। ইউরেনাস ক্রমে নক্ষত্রটি বরাবর সরে আসছে। আমরা আশা করছিলাম, নক্ষত্রটি আর কিছুক্ষণ পর ইউরেনাসের একপ্রান্তে অদৃশ্য হয়ে যাবে। বার অর্ধ ওই গ্রহ সেই নক্ষত্রটিকে আড়াল করে তখন, এবং কিছুক্ষণ পর তার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে আবার দৃশ্যমান হবে। নক্ষত্রটি যে মুহুর্তে আড়াল হবে এবং যে মুহুর্তে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসবে, গ্রহটি সম্পর্কে অনেক অজ্ঞাত তথ্য জানার ব্যাপারে ওই দুই মুহুর্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে খুবই মূল্যবান সময়। সেই মূল্যবান সময়ের জন্যে যখন আমরা অপেক্ষা করছি, ঠিক তখনই ঘটেলা এক নাটকীয় ঘটনা। ইউরেনাস তখনও অনেক দূরে। হঠাৎ আমাদের ইলেকট্রনিক যন্ত্র জ্ঞানিয়ে দিল ক্ষীণ সেই নক্ষত্রটিকে আর দেখা যাচ্ছে না। কয়েক উটলান আর। কী করে তা সম্ভব? ইউরেনাসই যদি না সামনে পড়তো, ক্ষীণ সেই নক্ষত্রটি আড়াল হলো কী করে? এ প্রশ্ন-এর জন্যে অজ্ঞোজিত এক সাক্ষাৎকারে প্রসঙ্গটি এই ভাবেই উত্থাপন করলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ অগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনা এক তৈরি করে ডঃ ভট্টাচার্য ইতিমধ্যে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন। এশিয়ার বৃহত্তম এক সবচেয়ে বেশি সংবদনশীল সেলার ম্যাগনেটোগ্রাফ বা সৌর-চৌম্বকক্ষে পরিমাপক যন্ত্রটি কোনো হয়েছে কোডাই-কানাল মনমন্দিরে। যন্ত্রটি তৈরি করেছেন ডঃ ভট্টাচার্য। সম্প্রতি কিরাত একটি দূরবীণ তৈরি কাজ চলছে। কাভালুর মানমন্দিরে কোনো হবে এই দূরবীণ। বার অভিনেত্রি ব্যাস হবে ৯০ ইঞ্চি। ১৯৮২ সালে দূরবীণটির কাজ শুরু করার কথা। এই দূরবীণের ব্যবহার ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি তৈরির দায়িত্ব ডঃ ভট্টাচার্যের উপর ন্যস্ত।

কাভালুরে ৯০ ইঞ্চি ব্যাসের এই দূরবীণ জ্ঞানোর পর আলোক-জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক পর্বকেশের জন্যে আমাদের আর বিদেশী দূরবীণের

দৃশ্য চেয়ে বসে থাকতে হবে না।" কলেন ডঃ ভট্টাচার্য।

ইউরেনাসের প্রসঙ্গ তুললাম। বললাম, ডঃ ভট্টাচার্য, আমরা জানি, আমাদের সৌরমণ্ডলে যতগুলি গ্রহ রয়েছে তাদের মধ্যে একমাত্র শনিরই কক্ষ আছে। আপনার কি আগে থেকে বুঝতে পেরেছিলেন, ইউরেনাসেরও কক্ষ থাকা সম্ভব?

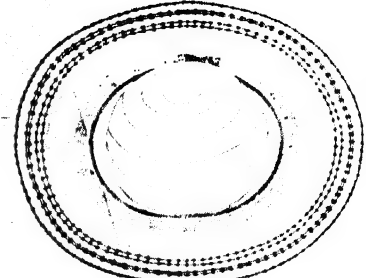
ডঃ ভট্টাচার্য কলেন, ম্যা কর, আপনি যে কলেন, একমাত্র শনিরই কক্ষ আছে—সে সম্পর্কে পরে বলছি। তবে হ্যাঁ, ওই দিন, অর্থাৎ ১১ মার্চ, ১৯৭৭ আমরা যে ইউরেনাসের কক্ষ আবিষ্কার করতে চলেছি, সে কথা স্বপ্নেও জন্ম নি।

“ব্যাপারটা একটু বিশদ করে কললেই বুঝতে পারবেন।” শুরু করলেন ডঃ ভট্টাচার্য। “আমাদের তো জানেন, পৃথিবীকে ঘিরে বেছেছে একটা পুরু কক্ষমণ্ডল। ব্যরমণ্ডলের আইরে রয়েছে সূর্য, তার বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহ, উল্কাঝ, আরও কত রকম কক্ষ। সৌরমণ্ডলের বাইরে বিশাল রুমানে রয়েছে অগণিত নক্ষত্র। গ্রহ উপগ্রহ এবং বিভিন্ন নক্ষত্র থেকে বিকীর্ণ হয় নানা রকম রশ্মি। পৃথিবীর বৃহৎ মানমন্দিরে বসে দূরবীণের চোখে ওই সব রশ্মি আমরা ধরার চেষ্টা করি। পরে তাদের বিশ্লেষণ করে আমরা জানতে পারি বিভিন্ন নক্ষত্র এবং নাক্ষত্রিক অঞ্চল এক তাদেক চিহ্ন। কিন্তু মূলতঃ এই, এ ধরনের পর্বকেশের ব্যাপারে পৃথিবীর ব্যরমণ্ডল একটি বড় রকমের বাধা। কক্ষ জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোকবাহী এই ব্যরমণ্ডলে শোভিত হয়। অল্প ব্যরমণ্ডলের ভেতর দিয়ে আসার সময় তাদের মৌলিক চিহ্নটি হারিয়ে ফেলে। এতে করে যখন বিকিরণেরই মূল উৎস সম্পর্কে ধারণা তথা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না।

“এ ধরনের অনেক বাধাই আছে। তবু তার মধ্যে এমন কিছু কিছু ঘটনাও ঘটে, যা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ। যেমন ধরুন, সূর্যগ্রহণ। এমনতে সূর্যকে দেখার একটি উজ্জ্বল আলোক-মণ্ডলের মত। তার উজ্জ্বলতম ফটোস্ফিয়ারের চারপাশে যে স্বল্প উজ্জ্বল পরিবেশ তাকে ফটোস্ফিয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথকভাবে পর্বকেশ করা যায়। এ কাজটি একমাত্র সূর্যগ্রহণের সময়ই সম্ভব। বিশেষ করে যখন পৃথোগ্রহ সূর্যগ্রহণ ঘটে, তখন ওই সময় চাঁদ সূর্যের ফটোস্ফিয়ারকে পুরোপুরি আড়াল করে রাখে। তখন আমরা সূর্যের কক্ষমণ্ডল বা ক্রোমোস্ফিয়ার এক কয়েনার মত স্বল্প উজ্জ্বল পরিবেশকে ভালভাবে দেখতে পারি। এই পর্বকেশ সূর্য সম্পর্কিত বহু চমকপ্রদ তথ্য জানার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করেছে।

“আরও এক ধরনের ঘটনার কথা বলি। দেখা গেছে, কখনও কখনও কোন একটি নক্ষত্র হঠাৎ অপর একটি নক্ষত্রকে আড়াল করলে। অথবা সৌরমণ্ডলের কোন গ্রহ অথবা উপগ্রহ নিজস্বের পরিভ্রমণ পথে চলতে চলতে আড়াল করে কলো দূরবর্তী কোন নক্ষত্রকে। এ ধরনের আড়াল করাকেই ইংরেজিতে বলা হয় ‘অকালটেশন’। গ্রহগুলির স্বল্প জ্ঞানার ব্যাপারে ‘অকালটেশন’ একটি বড় রকমের সাহায্য।

“যেমন ধরুন, বৃহস্পতির অন্যতম গ্রহ গ্যানিমিডের কথা। ৭ জুন, ১৯৭২ এই উপগ্রহটি সুদূর একটি নক্ষত্রকে কিছুক্ষণের জন্যে আড়াল করে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কলেন, কি, নক্ষত্রটি কে মুহুর্তে গ্যানিমিডের আড়াল চলে গেল সেই সময়টি জেনে নিলেন। তারপর অপেক্ষা কলেন কিছুক্ষণ। এর পর নক্ষত্রটিকে গ্যানিমিডের অপর প্রান্তে দেখা গেল। অর্থাৎ গ্যানিমিডের আড়াল থেকে বোঝার এলা মুই নক্ষত্র। নক্ষত্রটি কতক্ষণ গ্যানিমিডের আড়ালে ছিল সেই সময়টি হিসেব করে গ্যানিমিডের কাস কত জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সেটা জানতে সমর্থ হন। ওই সময় কাভালুর মনমন্দির থেকেও গ্যানিমিডের উপর পর্বকেশ চালিয়ে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম আমরা। সেই সব তথ্য থেকে জানা যায়



কাভালুর মানমন্দির থেকে সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করে বলার লক্ষ্য এই হার্কিট আঁকা হয়।

উপগ্রহটিরও ব্যরমণ্ডল রয়েছে। অন্যান্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সংগৃহীত তথ্যও ব্যাপারটা প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের চাঁদে কোন ব্যরমণ্ডল নেই। সৌর জগতে এ পর্যন্ত দুটি উপগ্রহই শব্দ করমণ্ডলের অস্তিত্ব করা পড়েছে। এই উপগ্রহ দুটির একটি বৃহস্পতির গ্যানিমিড এবং অপরটি শনির টাইটান।

“সাম্প্রতিক ধরে দেখা যায়, বৃহস্পতির আরও একটি উপগ্রহ আইও-র বৃহৎ আশেপাশের স্থান পেয়েছেন গ্রাকিন বিজ্ঞানীরা। সেই আশেপাশের ভেতর থেকে বৃহস্পতির মত বেগে বেরিয়ে আসছে নানা রকম গ্যাস। সেই গ্যাস আইও-র চারপাশেও কোন আকর্ষণমণ্ডল তৈরি করেছে কি না, সে ধর অল্পাধিক এখনও পর্যন্ত জানা যায় নি।”

প্রশ্ন : কোন গ্রহ বা উপগ্রহ আবহাওয়া মণ্ডল আছে কি না, অকালটেশনের সময় কীভাবে আপনিরা তা বুঝতে পেরেন?

উত্তর : খুবই সহজ ব্যাপার। আপনারা জরন, গ্যাসের মধ্যে দিয়ে চলার সময় আলোকবাহী বিচ্ছিন্নিত হয়। এখন মনে করুন, কোন উপগ্রহ ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে কোন নক্ষত্রকে আড়াল করতে। যে মুহুর্তে ওই নক্ষত্রটি উপগ্রহের প্রান্ত বরাবর এসে উপস্থিত হবে, তার আলো ওই প্রান্তীয় অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসবে। প্রান্তীয় অঞ্চলে যদি বাতাস না থাকে এ ক্ষেত্রে আলোর চিহ্নের কোন পরিবর্তন হবে না। কিন্তু বাতাস থাকলে, তার মধ্যে দিয়ে আসার সময় আলোকবাহী বিচ্ছিন্নিত হবে। এতদ্বারা আলোর বিচ্ছিন্ন কললেই বুঝতে হবে সেখানে বাতাস আছে। টেরি অলো বাতাসকে যেমন উপভাসিত করে, এ ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি দাঁড়ায় সেই রকম।

✱

প্রশ্ন : ইউরেনাস যে দূরবর্তী একটি নক্ষত্রকে আড়াল করতে চলেছে কখন জানতে পেরেছিলেন আপনারা?

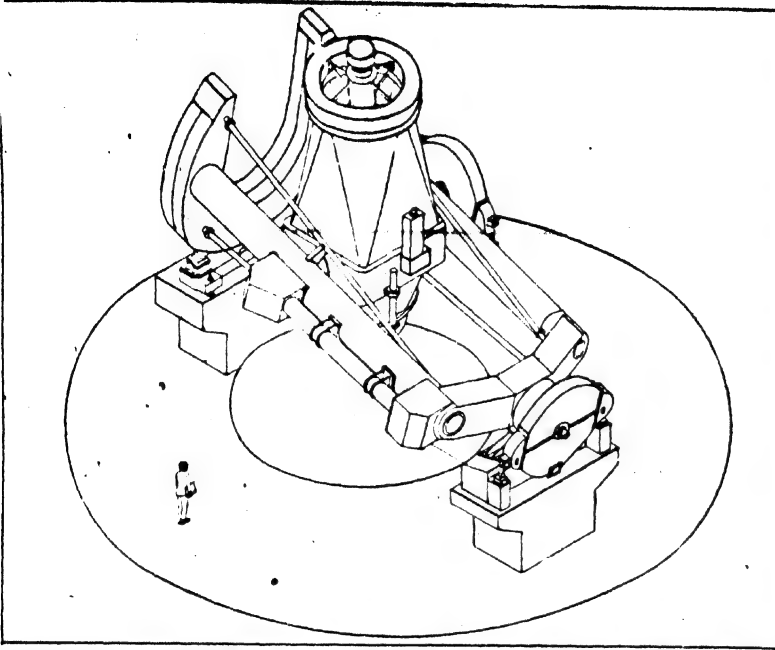
উত্তর : সেটা ১৯৭০ সাল। তখন থেকেই আমরা প্রস্তুত হতে থাকি। ঠিক হয় ওই সময় আমরা ইউরেনাসের উপর পর্বকেশ চালাবো।

যেখট জটিল কাজ সন্দেহ নেই। ইউরেনাস সূর্যের সুদূরতম গ্রহ। ফলে খুবই অন্ধকার। সূর্যকে একবার পরিভ্রমণ করতে ইউরেনাসের সময় লাগে ৮৫ বছর। পৃথিবীর অক্ষ পৃথিবীর পরিভ্রমণ তলের দিকে বৃহৎ ২৩ই ডিগ্রি কোণ করে অবস্থান করে। কিন্তু ইউরেনাসের অক্ষ ইউরেনাসের পরিভ্রমণ তলের দিকে হলে থাকে প্রায় ৮৫ ডিগ্রি বরাবর। এতে মনে হয় ওই গ্রহটি তার পরিভ্রমণ তলের উপর প্রায় শূন্য থেকে আকর্ষণ করে চলেছে। এমন অনেক কারণই ইউরেনাসের উপর পর্বকেশ চালানো করা হয়ে উঠেছে।

ডঃ ভট্টাচার্য কলেন, প্রাথমিক গলনার দেখা গেল, ১০ মার্চ, ১৯৭৭ নক্ষত্রকে পুরোপুরি আড়াল করার ঘটনাটি ভারত থেকে খুব ভালভাবে দেখা যাবে। মার্চ মাস। ওই সময় কাভালুর অঞ্চলের আকাশও







লিপ্সীক ভূলাতে কাজলার মানবিশ্বের ১০ ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীন। দূরবীণটি ১৯৮২ সাল থেকে ব্যবহার করা হবে।

থাকে খুবই পরিষ্কার। অতএব সোনার সোহাগা। এটাও জানা গেল, ঘটনাটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকেও প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া থেকেও দেখা যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে একটি অসুবিধেও রয়েছে। নক্ষত্রটি যখন ইউরেনাসের আড়ালে প্রবেশ করবে সেই ক্ষণটি পুরো ছবিটাই সেখানে থেকে ধরা পড়বে। কিন্তু আড়াল থেকে বোঁরয়ে আসার সময় থেকে নাও দেখা যেতে পারে। কারণ ওই সময় তখন সেখানে ঘটেবে সূর্যোদয়। সূর্যোদয়ের সময় অত ক্ষীণ গভা দৃষ্টিগোচর করা সম্ভব নয়। দক্ষিণ আফ্রিকাও পূর্ব বেক্ষণের পক্ষে আদর্শ জায়গা হিসেবে বিবেচিত হলো না।

কিন্তু ১৯৭৭-এর জানুয়ারি মাসে এল দুঃসংবাদ। গণনা করে জানা গেল, ইউরেনাস কতৃক সুদূরতম সেই নক্ষত্রের গ্রহণ ভারত থেকে মোটেই দেখা যাবে না। ভারত থেকে কম করেও ২০০০ কিলোমিটার দূরপাশে তারা ছায়া-কোণ বিচরন করবে। ইতিমধ্যে দেশ-বিশ্বের, কয় মানুষের কতৃক পক্ষ তিক করে-ছিলেন এই ঘটনা ভারত থেকে প্রত্যক্ষ করবেন তাঁরা। কিন্তু নতুন এই সংবাদে তাঁদের পরো পরিকল্পনাটাই পরিভাষা হলো। তারা ভবিষ্যৎ পর্যবেক্ষণের স্থান পরিবর্তন করলেন।

“হ্যাঁ, হাভাল হয়েছিলাম আমরাও। তবে কপাল ঠেকে নেমে পড়লাম। কে বলতে পারে, যদি আগের গণনাও এতটুকু ভুল হয়ে থাকে, ইউরেনাস কতৃক সেই নিকট নক্ষত্রকে আড়াল করার ঘটনা সে ক্ষেত্রে আমরাও তো প্রত্যক্ষ করতে পারি।

ঠিক হলো, কাজলার ৪০ ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীনের সাহায্যে আমরা পর্যবেক্ষণ চালাবো। কখন-সময়ে দূরবীনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিও প্রস্তুত করে নিলাম আমরা। গণনা মত ১১ মার্চ, ভারতীয় সময় রাত ২টো বেজে ৩০ মিনিটে ইউরেনাস এক সেই নক্ষত্রের পরস্পর নিকটতম দৃষ্টি-সীমার মধ্যে আসার কথা।

১০ মার্চ, ১৯৭৭। ডঃ ভট্টাচার্য এবং তাঁর সহ-মিত্রা কাজলার মানবিশ্বের পর বেক্ষণ কতৃক প্রস্তুত প্রতীক্ষা করতে লাগলেন অনেকক্ষণ আগে থেকে। ইউরেনাসের উদয় ঘটলো রাত ১১টার আগে। দূরবীনের মাধ্যমে তারা যথার্থ নিশ্চয় করলেন

ভেতর দিয়ে দেখা গেল এক পাশে ইউরেনাস। আর এক পাশে সেই নক্ষত্র। ইউরেনাস ধীরে ধীরে নক্ষত্রটি দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

রাত ১টা বেজে ৩০ মিনিটে শুরু হলো ক্রি-কিনীন পর্যবেক্ষণের কাজ। চালু হলো রেকর্ডিং যন্ত্র।

“এত আগে থেকে রেকর্ডিং-এর প্রয়োজন ছিল না। কারণ ইউরেনাস কতৃক নক্ষত্র-গ্রহণের তো তখনও অনেক দেরি। কিন্তু আগে থেকে রেকর্ড করার ব্যাপারটাই আমাদের কাছে শাপে বর হয়ে দাঁড়ালো।” মন্তব্য করলেন ডঃ ভট্টাচার্য।

“রেকর্ড চালু করার পর প্রায় কুড়ি মিনিট অতিক্রান্ত হয়েছে। আমার এক তরুণ সহকর্মী কুপ্প-স্বামী হস্তদলিত হয়ে ছুটে এল আমার কাছে।”

“কী ব্যাপার?” প্রশ্ন করলাম আমি। কুপ্প-স্বামী বললো, “রেকর্ডিং যন্ত্রে একটি অক্ষত ব্যাপার লক্ষ করছি।”

“তার কথা আমার কোন ঢুকলো কিই। কিন্তু ততক্ষণ আমিও অবাক। ৮ ইঞ্চি ব্যাসের গাইড টেলিস্কোপের ভেতর দিয়ে ইউরেনাসকে পর্যবেক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সেই ক্ষীণ রক্ত নক্ষত্র? সেই নক্ষত্রটিকে তো দেখতে পাচ্ছি না? আমরা মনে হলো, নীল আকাশের বুক থেকে নক্ষত্রটি যেন ভৌতিকবাক্সের মত আদৃশ্য হয়েছে। পরকথা পঠি সেকেন্ড আর আমি তাকে দেখতে পাই নি। অবশেষে আমার সে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। বলতে পারেন, মেঘের সাহায্যে এটাই ছিল আমার একমাত্র পর্যবেক্ষণ। এবং পৃথিবীতে একমাত্র আমিই এমনটি দেখলাম।”

পরে রেকর্ডিং যন্ত্রে ধরা পড়লো, পঠি সেকেন্ড নয়, মোট নয় সেকেন্ডের মত নক্ষত্রটি আদৃশ্য অবস্থায় ছিল।

না, কাজলার থেকে ইউরেনাস কতৃক সেই নক্ষত্রকে আড়াল করার ঘটনা শেষ পর্যন্ত দেখা যায় নি। কিন্তু ইউরেনাসের আড়ালে যাওয়ার আগে নক্ষত্র সেকেন্ড ধর কে আড়াল করলো তাকে? পূর ফটো ইলেকট্রিক রেকর্ড পরীক্ষা করে দেখা গেল, ওই নক্ষত্র সেকেন্ড নক্ষত্রটি আদৃশ্য হলেও মাঝে কয়েকবার তাকে ঈষৎ দৃশ্যমান বলে মনে হয়েছিল।

প্রশ্ন উঠলো : ওই সময় পর্যবেক্ষণ যন্ত্রে কোন

সমস্যা দূরবীনের দক্ষসীমার মধ্যে দিয়ে কোন উত্তর পিণ্ড অথবা মেঘ, কিংবা পাখি উড়ে গেছে। তাই আড়াল করার দরুন সাময়িক ভাবে নক্ষত্রটিকে অদৃশ্য দেখা যায় নি। কিন্তু এ সবই তো কল্পনা।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ডঃ ভট্টাচার্য এবং তাঁর দল তাদের রেকর্ডপত্র নিয়ে ছুটে এলেন কংগ্রেসের নির্দেশের অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল ইনস্টিটিউটে। সেখানে ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর এবং কিংখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ এম কে ভি বাপ্পা, তাঁদের সমস্ত তথ্যগত দৃষ্টিতে পরীক্ষা করলেন। তাঁর মনে চলো, সম্ভবত ইউরেনাসের কোন অজ্ঞাত উপগ্রহের আড়ালে চলে যাওয়ার দরুন নক্ষত্রটি সাময়িক ভাবে আদৃশ্য হয়েছিল।

যাই হোক, ঘটনাটি ওই দিনই নথিভুক্ত করার জন্যে সেগুনাল ব্যুরো অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল অস্ট্রোনোমিক্যাল ইউনিয়নকে জানানো হয়।

পরে জানা গেল আরও দুটি পর্যবেক্ষণ দলও অনুসরণ তথ্য সংগ্রহ করেছে। একটি দল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল কিংবিশ্ববিদ্যালয়ের। এটির পরিচালক ছিলেন ডঃ ইলিয়ট। ভারত মহাসাগরের দক্ষিণাংশে ৪০,০০০ ফুট উঁচু দিয়ে উড়ে আসার একটি প্লেন থেকে তিনি পর্যবেক্ষণ চালান। দ্বিতীয় দলটিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। এটি পরিচালনা করেন ল্যাউয়েল মানবিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ রবার্ট মিলিস। তাঁরা পর্যবেক্ষণ চালান অস্ট্রেলিয়ার পার্থ থেকে। উল্লেখ্য, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ল্যাউয়েল মানবিশ্ব থেকে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে প্লটো গ্রহটির সম্ভাবন জাগিয়েছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা।

কেউ কেউ মনে করলেন, ইউরেনাসের প্রসারিত আবহাওয়াগোলায়নের আড়ালে পড়ার দরুন নক্ষত্রটি সাময়িক ভাবে আদৃশ্য হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যে অঞ্চলে সে আদৃশ্য হয়েছিল তাই দূরত্ব কম করেও পঠি হাজার মাইল। কোন গ্রহের আবহাওয়াগোলায়ন এত দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া কি সম্ভব?

বাংলাদেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁদের সংগৃহীত তথ্যাদেশী যন্ত্রগণকের সাহায্যে বার বার পরীক্ষা করেছেন। নৈনিতাল মানবিশ্ব থেকে সংগৃহীত তথ্য নিয়েও পদ্যলোচনা করেছেন তাঁরা। ১৯৭৯ সালের আগস্টে মন্ট্রিলে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল অস্ট্রোনোমিক্যাল ইউনিয়নের এক সভায় তাঁদের ফলাফল বিচার করা হয়। পরে সিদ্ধান্ত করা হয়, ডঃ ভট্টাচার্য এবং তাঁর সহকর্মীরা সৌন্দর্যে যাদের আড়াল সেই নক্ষত্রটিকে আদৃশ্য হতে দেখেছেন, সেগুনাল ইউরেনাসের বলয় হওয়াই স্বাভাবিক।

শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছে, শনির মত ইউরেনাসেরও কলয় আছে। মোট চারটি বলয়। এই কলয়গুলির মাঝে কিছু ফাঁকা পরিসর। অথবা এমন ধরনের পরিসর যা বলয়গুলির মত অত ঘনো নয়। ১১ মার্চ সেই নক্ষত্রটি ইউরেনাসের তাল যাওয়ার আগে পর্যায়ক্রমে ওই বলয়গুলির আড়ালে গিয়ে পড়ে এক আদৃশ্য হয়। বলয়গুলির অন্তর্বর্তী জায়গায় এসে ঈষৎ আদৃশ্য হতে শুরু করে।

ডঃ ভট্টাচার্য কালেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা, শনি এক ইউরেনাসের মত অনন্য গ্রহ-ও বলয় আছে। কয়েক বছর আগে মার্কিন মহাকাশযান যে সব ছবি পাঠিয়েছিল, তা থেকে অনেকের মনে হয় বৃহস্পতিরও কলয় আছে। অনেক মনে করেন সূর্যেরও কলয় থাকে অসম্ভব নয়।

প্রশ্ন করেছিলাম, জ্যোতির্বিজ্ঞান ভারতের বিজ্ঞানীরা কতটা পারদর্শী?

আমার প্রশ্ন শনে কিছুটা যেন বিব্রত হলেন ডঃ ভট্টাচার্য। তাঁর ঠোঁটের কোণে ছাঁড়িয়ে পড়লো সলজ আনন্দ-কোমর মূক হাসি। বললেন, ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট প্রাধিকার সঙ্গে দেখেন কিংবা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। মেঘনাদ সাহা, চন্দ্রশম্বর শিশির মিত্র—ওঁষ তো আছেনই। আমাদের দেশে কারোজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডাকন চিন্তা যে বিদেশীদের চেয়ে অনেক আগে আগে চলে, তারও প্রমাণ পেয়েছি আমরা।

সত্যসিদ্ধি ১৯৯৯



# মানবজমিন

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়

(তৃত্বাংশ)

নিজের টেবিলে এসে অপেক্ষা করছিল দীপনাথ।  
কতক্ষণেই বোস তার লগ্না মেসবল চেয়ারটা নিয়ে  
মা পায়ে বৈঠকীয় এল। মুখ ভীষণ ভাবল,  
গভীর। চোখে আঁদম্বল দৃষ্টি।

বোস একটু ইতস্তত করে দীপনাথের টেবিলের  
পেছনে ঘাটতে ঘাওয়ার কথা।  
এই বাণী।

কিন্তু?

কোনকথা?

চলুন, কোথাও যাওয়া যাক।

দীপনাথ মাথা নেড়ে বলে, আজ আমার ছোটো  
গানের বাড়িতে যাওয়ার কথা।  
আজ ক্যান্সেল করুন।

দীপনাথ একটু দম ধরে থেকে বলে, মিস্টার  
বোস, আমি আপনাকে হেল্প করতে চাই, কিন্তু এখন  
কিন্তু সব আপাতত আপনাকে হেল্প করা সম্ভব  
না। তাই কান্ট হেল্প ইউ টু বি আনহাঙ্গী।

বোস একটু হাসে, ইঞ্জিনিয়ার আপনি মাঝে মাঝে  
চাইই বলেন। কিন্তু এখন আপনার সঙ্গে আমার  
কথা আছে। বাসার চলুন।

খুব জরুরী কথা কি?

খুব জরুরী।

দীপনাথ একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে ফোনটা তুলে  
সবুদের পাথর ফ্রাণ্টের নম্বর ডায়াল করল। বিল্ডিং  
নাকিয়ে বলে দিল, আজ নম্বা। কাল যাচ্ছি।

কত কথা ক্রমে আছে তোমার সঙ্গে।

আজ একটু কাজ পড়ে গেল রে।

প্রায়ে ঠিকই বলতে, ভীষণ কাজের। লোক

জোড়া তুমি শুদ্ধকাল। আমি যে তোমার জন্যই  
সবকম থেকে অভ্যর্থনা ফিরে থাকার উত্তর  
দেবত বসেছি।

একটু রাতের দিকে গেলে যেতে পারি। তবে  
ঠিক নেই।

দুঃখ। থাকলে আজ। কবে আসবে?

কাল।

ঠিক তো?

ঠিক। কাল অফিস থেকে একবার ফোন করিস।

বোস সাহেব নীচে গাড়ির কাছে অপেক্ষা করছে।  
সামনে ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বসে আছে। দুজনে  
উঠল। গাড়ি নিউ অর্লিয়ান্সের রক্তা হতেই বেশ  
সাহেব বলে, আপনি আমার ওপর স্পাইং করছিলেন?

ও কথা কেন?

আজকে আপনি আমার কথার কথা নকল।

খবর নেওয়াটা নোবেল, না খবর হওয়াটা?

বোস সাহেব মাস্ক হাসে। বুদ্ধদেবের মতো খুব  
সামান্য একটু মাথা নেড়ে বলে, আমি অবশ্য ব্যাপারটা  
গোপন রেখেছি, কিন্তু সেটা পাপসেধ থেকে নয়।  
ডিসেনসিয়ার জন্য। সমস্ত হলই মাপক জানাতাম।

আমি কিন্তু মিসেস বোসকে খবর দিইনি। উনি  
আগে থেকেই জানতেন।

কতটা জানে?

খুব বেশী নয়। জানে, একটা মেয়ের সঙ্গে  
মিশছেন।

মেয়েদের সঙ্গে আমার মেলামেশার তো বাধা নেই।

কিন্তু এবার একটা উদ্দেশ্য নিয়ে বিশেষ  
একজনের সঙ্গে মিশছেন।

সেটা দীপা জানতে পারে না। জানলে  
আমাকে বলত। ছেড়ে দিত না।

ডিকোর হবই ধরে নিয়ে উনি হয় তো  
ততটা কিছু করতে চাইতেন না।

তা হলে হেডেকটা কার? আপনার?

আমার একটা হেডেক তো আছেই।

বোস হাসল আবার। এবারকার হাসি দেখে  
থোকা গেল, বোস নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে  
পেয়েছে। বলল, ঠিকই। তবু, আমি আপনাকে  
কয়েকটা প্রশ্ন করব।

হাসি এবং গলার স্বরটা দীপনাথের খুব ভাল  
লাগল না।

বোস একটু চাপা গলায় বলল, দীপার ওপর  
আমার আর কোনো ইন্টারেস্ট নেই। তবু আমি  
ডিকোর করতে চাইছিলাম না। আপনাকে বলে-  
ছিলাম তো যে, আমি একটা লং-টের বাইরে চলে  
যাচ্ছি।

কলছেন।

হয় তো তাই যেতাম। তবে শেষ পর্যন্ত আদ  
একটা অ্যাক্সেসের খটে যাওয়ার মনে হল, জীবনটা  
আর একবার গড়ে তোলার ঝগ।

বোস বোধ হয় দীপনাথের সমর্থন পাওয়ার  
জন্যই এ সময়ে একটু চাপ করে রইল। কিন্তু  
দীপনাথ জবাব দিল না। সে খুব সন্তুর্ণণে ভাল  
দিলে। কথা বলার চেয়ে চাপ করে থাকাটাই এখন  
জরুরী। লেট ইম টক অ্যান্ড টক।

তাই এখন আমি ডিকোর চাই।

আবার চাপ করে থাকে বোস। দীপনাথ আবার  
দাঁড়ব।

বোস সাহেব একটু কাং হয়ে প্যান্টের পকেট  
থেকে জিয়ারি সিগারেটের একটা প্যাকেট বের করে।  
সিগারেট ধরিয়ে বলে, দীপার অন্য ইন্টারেস্ট  
থাকলে আমার আপত্তি নেই। অন্য কেউ ওর প্রতি  
ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকলেও বলার কিছু থাকবে না।  
ইন ফ্যাক্ট—

বোস সাহেব আবার অর্থপূর্ণভাবে দীপনাথের  
দিকে তাকায়। কিন্তু দীপনাথ নিজেকে সংযত  
রাখে। অনেক দিন বাদে এই লোকটার ওপর তার  
রাগ আর অল্প একটু ঘণা হচ্ছে।

টন ফ্যাক্ট, কেউ কেউ দীপা সম্পর্কে  
ইন্টারেস্টেড বলেও আমি জানি।

দীপনাথ সামান্য একটু নড়ে বলে, অসম্ভব  
বোধ করছে মনে মনে।

বোস সাহেব সিগারেটটা টানছে না। আঙুলে  
ধরে আছে মাত্র। বাইরের দিকে চেয়ে থেকে খুব  
আন্তে করে বলে, ইন ফ্যাক্ট, আপনি নিজের  
হাঁদ দীপা সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকেন তবে  
আমি আপনাকে সেব দিই না। দীপা ইজ  
মডারেলি গুড লুকিং, ইন্টেলিজেন্ট। তার ওপর  
গোনা।

দীপনাথের বুকটা কাং করে উঠল বটে।  
কিন্তু তেমন উত্তেজিত হল না। পাথরের মতো মুখ  
করে বলল, আর আমি?

বোস অবাধ হয়ে বলে, আপনি? আপনি  
কি?

আমি কেমন?

বোস হাসে, এলিজিবল। কোয়ালিটি এল-  
জিবল। হ্যান্ডসাম, ওয়েল প্রেসড, ইন্ট্রিগেটিভ।  
কোয়ালিটি এলিজিবল।

আপনি আপনার স্ত্রীর জন্য কি ঠিক এ রকম  
পারাই খুঁজছেন বোস সাহেব?

কথাটার ভিত্তিকার মার বোসকে একটু কাঁহল  
করে ফেলে। সিগারেটটা জানালা দিয়ে ময়দানের  
ফাঁকা রাস্তায় ছুড়ে ফেলে বলে, পাত্র-পাত্রীর  
পরপরকে খুঁজে পেয়ে থাকলে আমার আপত্তি  
নেই, আমি এই কথাটাই বলতে চাইছি।

দীপনাথ মাথা নেড়ে বলে, আমি এখনো  
পাত্রী খুঁজে পাইনি। তবে পাত্রীর গার্জিমানের কাছে  
আমার একটা প্রশ্ন আছে। তাঁর পবিত্র স্ত্রীকে  
আমি বিয়ে করলে অফিসে তাঁর পজিশনটা কী  
দাঁড়বে।

জিয়ারি প্যাকেটটা হাতেই ধরা ছিল, বোস  
সামনে আর একটা সিগারেট বের করে প্যাকেটের  
ওপর ঠকতে ঠকতে বলে, সেক্সান ইজ এ পয়েন্ট টু,  
পন্ডার অন। দীপাকে আপনি বিয়ে করলে আমাদের  
এক অফিসে থাকা বোধ হয় ভাল দেখাবে না।  
দেয়ার উইল বি এ লট অফ টক।

সেক্সের বোধ হয় আমাকেই সরে যেতে হবে।

বোস মাথা নেড়ে বলে, তার কোনো মানে নেই।  
বাংলালারের অফারটা এখনো আমার কাছে ওপেন  
আছে।

দীপনাথ বিজ্ঞের মতো হেসে বলে, আর এবার  
বোধ হয় আপনি আমাকে বাংলালারের সঙ্গী করতে  
চাইবেন না।

না। বোস শ্বাস ফেলে বলে, টন ফ্যাক্ট  
দীপাকে যদি আপনি নেন তা হলে আপনার এবং  
আমার এক শহরেও বসবাস করা উচিত হবে না।

আব মিসেস বোস যদি কাউকে বিয়ে না  
করতে চান, তা হলে কি হবে?

বোস কঁধ তুলে স্বক্টি দিয়ে বলে, ন্যাংং।

কিন্তু উনি কাউকে বিয়ে করলেই তো আপনার  
সুখ হবে।

বোস একবার তাকিয়েই দীপনাথের চোখ থেকে  
চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে, তা কেন?

দীপনাথ চাপা গলায় বলে, তা হলে  
আপনাকে মাসোহারা টাকটা গুণতে হবে না।

বোস এ কথাই চাপ করে থাকে। অনেককাল  
বাসে বলে, শুন্য তাই নয়।

তা হলে আর কি?

বোস উইন্ডশিল্ড দিয়ে সম্মনে চেয়ে থেকে বলে,  
দীপা চেলেমানুব, ইমম্যাচিওর, রেস্টলেস, একস্ট্রা-  
জ্যান্ড। একা থাকলে ও একদম শেষ হয়ে যাবে।  
আমি ওকে ট্যাকল করতে পারিনি বটে, কিন্তু  
আমার চেয়ে ইন্ট্রিগেটেড কোনো পুরুষ হয় তো  
পারবে।

পাত্রীর গার্জিমানের মতো কথা বলছেন না  
মিস্টার বোস। পাত্রপক্ষে মোহের কথা শোনাতে  
নেই। শুন্য গণের কথা জানাতে হয়।

জিয়ারি খোঁজ গলায় লেগে বোস কিহকপ  
কাশে। কড়া ফরাসী সিগারেট খোঁজা লাগতেই পারে

ফেনে একটু ধরা গলার বলে, আপনি বলেন খুব চমককার।

আপনি মিসেস বোসের জন্য এত চিন্তা করছেন কেন? ওর ভবিষ্যৎ ওকে ভাবতে দিন।

তা দিয়েই। আমি কোনো ব্যাপারে ইন্টার-ফিরার করি না। আপনাকে কথটা বলছি অন্য কক্ষের।

কি কারণ?  
আমি জানি, ইউ আর ইন লাভ উইথ হার, জার্নাল জাইন ভাসা।

এ কথার দীপনাথের পড়ের তলার ভিত্তি একটু নড়ে বার। কিন্তু ল্যাটোর নেই বাউপাড়ের জন্য। তাই সে সাবলে নের। তারপর একটা দীর্ঘ-শ্বাস ছেড়ে বলে, আপনি হয়তো সজি কথাই বলছেন, ইরেন্স, উই আর ইন লাভ।

বোস অথাক হয়ে বলে, ইউ আর্ডমিট। কংগ্যাচুলেশনস।

থ্যাকস। কিন্তু মশকিল হল—

বোস সাহায়ে একটু কুকে বলে, হ্যাঁ, মশকিল হল—?

মশকিল হল, আমি মিসেস বোসকে ভাল-বাসি বলেই তার ভাল চাই।

বটেই তো। তাতে মশকিল-কি?

মশকিল হল, কিস মিসেস বোসের ভাল হবে তা আমি এখনো ভেবে পাইনি।

ভালবাসার একটাই এইম থাকে চ্যাটার্জি, ভাল-বাসার লোকটাকে কক্ষা করা।

রিক। তবে যদি তাতে তার ভাল না হয়। ভাল হবে। তাতেই ওর ভাল হবে।

আপনাকে এ ব্যাপারে বড় বেশী উৎসাহী মনে হচ্ছে বোস সাহেব।

বোস একটু বিরক্ত হয়ে বলে, আমাকে সাহেব সাহেব করেন কেন বলুন তো।

আপনি যে ভীষণ সাহেব বোস সাহেব।

বোস আবার ক'খ ক'কার। তারপর বলে, আমিও ওর ভাল চাই। আমি জানি কিসে ওর ভাল হবে।

দীপনাথ মাথা সেড়ে বলে, পাণ্ডুর ভাল দেখলেই তো হবে না। পড়ের ভাল হবে কিনা সেটাও ভেবে দেখা দরকার।

আপনারও ভালই হবে। আপনাদের দুজনেই দুজনকে ভালবাসেন, সেবার উইল বি নো প্রবলেম।

ভালবাসি বলেই প্রবলেম। ভালবাসা মনে ভালতে থাকে কক্ষ।

মানছি। কিন্তু আপনার প্রবলেমটা ধরতে পারছি না।

কি করে বুঝবেন? আপনি তো কখনো কাউকে ভালবাসেননি বোস সাহেব। বুঝতে গেলে কাজবান্দে হয়। -

বোস একটু গম্ব হয়ে থাকে।

দীপনাথ সেখে, গাড়ি বাকি নিয়ে নিউ আলিপরে ঢুক যাবেন।

বোস সাহেব একটা শ্বাস ফেলে বলে, ইউ আল কিং এ বিট ডিসপেপটিভ। হঠাৎ দীপার

প্রতি আপনার আর্টারেক্টেট ফিজিকাল। যে বি ইউ ওয়াস্ট টি একসরগেট হার। যে বি ইউ হাভ অলরেডি একসরগেট হার।



দীপনাথের ঠেট শাকিয়ে গেছে, কান জ্বালা করছে। তবে শকুনো হাসি হেসে সে বলে, যদি তাই করে থাকি তবে আপনার কিছু করার নেই বোস সাহেব। ইউ আর এ ম্যান উইনাইট ব্যাক-বোন। আমার যদি শ্রী থাকত আর তার যদি পর-পর জুটত, তবে আমি শ্রীকে ভালবাসি ক না বাসি সেই পরপুরুষের ঠ্যা না ভেঙে ছাড়তাম না।

আপনি আমাকে আপনার ঠাং ডাঙর জন ইনভাইট করছেন।

করিছি। আর্ট লিস্ট ইউ শূড টাই। বোস হেসে ওঠে।

গাড়ি এসে থামে ড্রাটের সামনে। দীপনাথ দেখতে পান দোতলার বারান্দার স্লানমুখী মদি-দীপা উদাস চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুকটা কেঁপে ওঠে তার। গড়সে খড়স করতে থাকে।

(তমশ)

আপনার চুল কি পাতলা, যেভাবে পড়া?  
আপনার চুলকে ঘন ও  
মোলমোলাতো করে তুলুন।



প্রাচীন-সমৃদ্ধ  
হেলো এগ  
শ্যাম্পুর  
সাহায্যে

পুষ্টির অভাবে আপনার চুল পাতলা হয়ে যায়-  
বেচিয়ে পড়ে-মোলমোলাতো জাবটি  
আর থাকে না।

গাঢ় (সানালী) রঙ্গের হোলো  
এগ শ্যাম্পুর প্রাচীন-সমৃদ্ধ  
পুষ্টির ফরমুলা আপনার  
চুলে পুষ্টি জোগায় আপনার  
চুল আয়ত্ত্ব আনে। ফলে  
চুল দেখায় ঘন ও  
দোলদোলানো। হেলো  
এগ শ্যাম্পুর ঘন ফেনা  
আপনার চুলের মাধ্য  
সম্পূর্ণভাবে মিশে দিয়ে  
আপনার চুলকে সজীব  
ও বলমলে করে তোলে।

ঘন ও মোলমোলাতো চুলের জন্যে  
আজই হেলো এগ শ্যাম্পু কিনুন।

অবস্থা ও কর্তব্য মিহির সিংহ

ইন্টেলেক্ট বা ইন্টেলেকচুয়াল কথা দুটির  
সাধক বাংলা প্রতিশব্দ যোগ্য হয় নেই। তবে কথা  
দুটি খুবই পরিচিত, বহু, আলোচিত। কিন্তু  
ইন্টেলেক্ট মানে কী? এর অর্থব্যাপ্তি সর্বসম্মত ধারণা  
কোনটাই অনেকের থাকলেও ভাষায় তা ব্যাখ্য  
ও সর্বজনগ্রাহ্যভাবে ব্যক্তি করতে গেলে বিপদ খটো।  
বহুল প্রচলিত একটি অভিধানে যেমন ইন্টেলেক্ট  
ইন্টেলিজেন্স—এ দুটিকে প্রায় একই জ্ঞানস  
বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, উপরন্তু ইন্টেলিজেন্সকে  
বলা হয়েছে প্রগাঢ় ইন্টেলেক্ট। এই রকম অগাছালো  
ধারণা বহু নামজাদা ও প্রগতিশীল দেশেও সমাজে  
ব্যবহৃত। এর দৃষ্ট প্রতিবাদ প্রয়োজন। সাধারণভাবে,  
বিশেষত দৈনন্দিন জীবনে, ইন্টেলিজেন্স বা বুদ্ধি-  
মত্তার প্রয়োগান খুব। সামাজিক ডামাচালের মধ্যে  
কবে কটাই। কিন্তু ইন্টেলেক্ট বা ধীশক্তির স্থান  
মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে কি অনেক  
উপরে নয়?

একটি বিশেষ অর্থে বলা যায় যে কোনো ব্যবহারিক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে, মানুষ যেভাবে তার সমাধান খোঁজে, সেইটাই সাক্ষ্য দেয় তার ইণ্টেলিজেন্সের। ক্রিয়াকৃত বা মানবিক মনস্তত্ত্ব ও চুক্তি নিয়ে যারা চর্চা করেন তাঁরা বলছেন যে বিশেষ পরিস্থিতির মোকাবিলা করার বিশেষ দক্ষতা উদ্ভূত হয়ে অবশ্য জীব মনস্তত্ত্বের প্রায় কণ্ঠশটিরই খণ্ডে দেখে যেতে পারে, পুরুষানুক্রমিক সম্মতির (?) আধাে আলো-অথবা ছায়া ছােপে এক থাকতে পারে। তার দরুন উন্মুক্ত বস্তুপাতি বা ঘর বাড়ি গাছের জড় উপকরণগুলিও যুগ্ম হয়ে বৃণালতর ইহস্তান্তরিত হতে পারে। কিন্তু তবুও সেই অর্থে ইণ্টেলিজেন্স ঠিক কিছুইমানভিত্তিক সমস্যাংশল নয়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কোনো একটি সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা ক্রমশঃ বেশ ধর্ম্মমান নাও হতে পারেন, ধর্ম্মমানদের হাতে এমন কিছু উপায় থাকে না যার সাহায্যে সম্ভাবনের জন্যে উত্তরাধিকার সূত্রে ধর্ম্মমানের ভাঙার রেখে যেতে পারেন। সম্ভাবনা কিছু কিছু দূর নীনাভবে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেতেও ব্যক্তিগতভাবে অনুন্নত ধর্ম্মমান নাও হতে পারেন। উখান-পতনের ইতিহাসে বহু সমাজের ক্ষেত্রে এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

কিন্তু, ইন্সটেলেকচুয়ালদের সন্তানেরাও নিয়মিত  
মাফিক ইন্সটেলেকচুয়াল না হলেও, ইন্সটেলেক্ট নামক  
দৃষ্টির বস্তুটিকে বহুদূর অর্থাৎ মানুষের ট্র্যাডিশন  
শনের অন্তর্গত বলে মানবে—এক পুরনোই  
একটি ব্যক্তির জীবনেই ফাঁদিয়ে যাওয়ার জিনিস বলে  
মনে হয় না। ভাষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জ্ঞান, লিপিবদ্ধ  
জ্ঞান—এ সবই, দূর অতীত থেকে আর অব্যাহত  
মানুষের ইন্সটেলেকচুয়াল পদক্ষেপের ক্রমিক সাক্ষ্য  
ধারণ করা বাহক। ইন্সটেলেকচুয়াল বিকাশও অত্যন্ত  
বিশেষভাবেই কেনো বিশেষ ব্যক্তির মিলন ব্যাপার  
হলেও, এবং তার আগে ও পরে ইতিহাসের  
কাণ্ড সমাজে ঘটেলেও, সাধারণ পরম্পরা খুঁটি দেবে  
পাওয়া যায়। সে অর্থে ইন্সটেলেক্ট সমগ্র করা যায়  
বৃহৎধারণার সঙ্গে ইন্সটেলেক্টের প্রত্যাশনাই ও তা  
অপনার গতিতে বয়ে চলে। মানব সভ্যতার ইতিহাস  
বহুজাতীয় ইন্সটেলেক্টের পলিগেই ধীরে ধীরে গড়ে  
উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, সেনেকার বা স্ট্রোকটোর  
নব্যজাগরণ মানেই অনেকাংশে সেই প্রাচীন ইন্সটেলেক্ট  
চল সন্দেহক পুনরাবিষ্কার করা ও আরো বাড়িয়ে  
তোলা, যে মনসদ মধ্যবর্তী অধ্যবসায়ের যত্নে  
চলিয়ে গিয়াছিল।

আরও একদিক থেকে দেখতে গেলে, মনুষ্যের ঐতিহাস মূলত তার সমাজীকৃতিক অর্থনীতির ক্রমবিকাশের ঐতিহাস। আবার সমাজীকৃতিক অর্থনীতির একটি মূল কথা পেশালাইজেশন বা অর্থনীতিক ক্রিয়ার জগতে কোনো একটি সমাবধি ও অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ ক্ষেত্রে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছে। এই বিষয়ে জৈবের পারদর্শিতা প্রতিষ্ঠা করা। এর দ্বাৰা নানাভাবে ইন্সটেলেক্টের জগতেও পড়েছে। প্রথমত, ইন্সটেলেক্টের চর্চা অনান্য বস্তু জাতীয় মনস্কিক ক্রিয়াকলাপের মতন অসম্পর্কিত অর্থনীতিক তাৎপৰ্য লাভ করেছে। মূল বিচারে, ইন্সটেলেক্টের চর্চাও অজ বিবিশ উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতির মতন অথবা চিত্তাকর্ষক জি অভিনয়ের মতন, এক জাতীয় অর্থনীতিক বস্তু বিশেষ। বিবর্তিত। সেই অর্থে এ-যুগের ইন্সটেলেক্টমূল কাঙ্ক্ষম ক্রমবিকাশের প্রধানত একক বাস্তব নবীকতা ছেড়ে সংগঠন-আশ্রয়। এবং ভূতীয়, ক্রমশই ইন্সটেলেক্ট-মূল কাঙ্ক্ষম ও অর্থনীতিক সংগঠনের ধারা অনুসরণ পেশালাইজেশনের পথে এগোচ্ছে।

সমসাময়িক সমাজে এইরকম পেশাদার, সংগঠন-  
অপ্রায়ী, পেশালাইকড ইত্যৈনিক্যমলদের পর-গণের  
মধ্যে সম্পর্কগুলি বেশ একতাই হোলাদীপদ। কে-  
ক্ষেত্রেই তঁরা একে অণরের পেশালাইজেশন করে  
অজ্ঞা করেন, অনের বিম্বা বা বিষয় সবশেষ অজ্ঞও  
থাকেন। এবং অত সশস্ত্র অবজ্ঞা করা মানেই হয়ত  
বহু ক্ষেত্রে মনে মনে লুকিয়ে লুকিয়ে সমাহা করা  
বা নিজের পেশালাইজেশন সম্পর্কে হীনম্মন্যতা। এ  
ছাটিল অতবাবস্থের পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে  
সমসাময়িক সমাজের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ  
প্রবণতা।

বহুকাল যাবৎ ইন্টেলেক্টের সূক্ষ্ম লেখাভাষ্য  
একটা মোটামুটি রকমের সম্পর্ক আছে, যদি  
সম্পর্ক নীলকর মানুষ্য যে ইন্টেলেক্টুয়াল হয়ে  
পারেন না তা নয়। আগেকার দিনে বিখ্যাত  
পণ্ডিত সমাজের বেশির ভাগ লোকই পারতেন না  
সাধারণভাবে পুরোহিত বা শিক্ষকস্থানীয়  
লেখাপড়ার চর্চা করতে, ইন্টেলেক্টুয়াল ধারার  
ব্যাপক ছিলেন তাঁরাই। লিটারেচর বা লেখাপড়ার  
প্রসারের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম এই অসম্ভাব্য আমূল পরিবর্তন  
ঘটেছে। আজকের দিনে ইন্টেলেক্টুয়ালরা আ  
সামান্যকার মতন বহুস্তর সমাজের থেকে তত  
পৃথকও নন, দূরবর্তীও নন। এবং আগেই লখ  
করাছি যে তাঁরা আগেকার মতন গোষ্ঠীবদ্ধ না হো  
কর প্রচুর স্বতন্ত্রতাও লিখিত। বস্তুগত প্রতিযোগিতা  
করন প্রতিযোগিতার ভাষ্য ভাই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিত যে এই যুগের  
বিবর্তনের ধারায়, সঙ্গীত-শিল্প-সাহিত্যে  
কলা তথা সৃষ্টিমূলক প্রয়াস স্বতঃস্ফূর্তভাবে  
অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা আনুপাতিক হিসেবে  
কমছেই,—প্রায় যে কোনো আদিবাসী বা অনগ্রসর  
সামাজিক সংঘে তুলনা করলেই তা দেখা যাচ্ছে  
সুজনশীলদের মধ্যে এ একই ধরতে চেশলাই। জৈশ  
প্রকৃতিও বড়ছে, এবং যেতার কি চলচ্চিত্র  
দূরদর্শন ইত্যাদি যান্ত্রিক উপকরণের প্রাদুর্ভাব  
তাদের সুজনশীলতা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক  
সমাজের বিশৃঙ্খল থেকে বিশৃঙ্খলতার অংশের কা  
শেঁহীওঁই যাচ্ছে। সঙ্গীত-শিল্প-সাহিত্যে নিজে  
সুজনমূলক অংশগ্রহণ করছেন না অথচ তাঁর প্রতি  
অত্যন্ত অনুরক্ত—এমন মানিঁয়ে সংখ্যা ও অনুপ্রা  
দুত বাড়ছে। অথচ ভালমান উভয় অর্থ  
এক লিকে মনোরঞ্জন শিল্পের ভূমিকাতেই থকে দে

যাচ্ছে। এবং বহু ক্ষেত্রে সেই ভূমিকার দায়িত্ব  
ইন্টেলেকচুয়ালদের উপরেও খুব স্পষ্ট।

বস্তুত, জনাচরের দখলদারি নিয়ে প্রতি-  
যোগিতা কেবল শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা বা  
বিভিন্ন ব্যক্তিগত চর্চাকারীর মধ্যেই নয়, এই প্রতি-  
যোগিতা সার্বিকভাবে শিল্প-সাহিত্য চর্চাকারী-  
দের মধ্যে বিধিবাহারী ইংটেলকচ্যুরাল হয়েই দুই  
পক্ষই চাইছেন জনচিত্র আকর্ষণ করিতে। এবং সেই  
উদ্দেশ্যে ক্ষেত্র বিশেষে মোহ বিস্তার করিতেও তার  
পিছপাও নন। কিছুটা তার ফল, সম্প্রতি-শিল্প-  
সাহিত্য ইত্যাদি সমস্ত সৃষ্টিমূলক তথা মনোরমতার  
মূলক প্রয়াসের প্রতি সমস্ত মানুষের আকর্ষণ যেনো  
ক্রমশই বাড়তির পথে। বিজ্ঞান ও ধর্মিক গবেষণার  
প্রতিও প্রাধা বা ভক্তি বা নিছক মোহ, উচ্চাশ্রিত  
ও ইংটেলকচ্যুরাল মনো অতীতক্রম কথো মূল্যপ-  
শিক্ষিত ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাৱে  
ছড়িয়ে পড়ছে। এবং সব মিলিয়ে, ইংটেলকচ্যুরাল  
কাজকর্ম ও শিল্প বা বিজ্ঞান-সাধনা অপেক্ষাভাৱে  
প্রাধান্যই হইবে যার সাধারণ ধারণায়। এমন ধারণা  
যাৎ প্রাদুর্ভাব আছে যে ইংটেলকচ্যুরাল কাজকর্ম  
মানেই হয় শিল্প নতুবা বিজ্ঞানের সন্ধান।

এক স্বাধীকার ঘটেছে নানা কারণে নানানভাবে জনজীবনের সমগ্র সরকারী অথবা অনানি বস্তুদ্বারা প্রতীকিত দোষিত প্রত্যগ বর্নিত। সরকার মানে জনসেবা ক্ষেত্রের সার্বজনীন স্বাধীকার-বৈজ্ঞানিক এবং তাৎক্ষণিক দাখল বহুতররূপ উদ্ভবপদ্য আলাদা। আমলাতন সাধারণত অনেক সময়ে নিয়ম মারফক শিক্তিত হলেও তবিতো রাষ্ট্রনীতি মত মালিকরা আধিকৃত-অস্বাধীকারিত উদ্ভিশিক্ত সর্বপ্রকার। কিন্তু তাদের কোন পাত থাকে সামাজিক বৃহৎ অংশের আপাত পছন্দের উদ্দেশ্যে। অন্য প্রতীকিতের যারা মালিকরা তারা খোলাখুলিভাবে ব্যবসারী-শিক্ষণ বা সংস্কৃততর কোনো যোগ্যতা তাদের মারফকত নাই। এক সরকারী কোমসকারী সব প্রজ্ঞিতরই উচ্চতম আমলাতন মূলত চাকরী বজায় রাখিত সূত্রেই কালিতাভিতর শিক্তিত কি সংস্কৃততরন শিক্ষণ এ প্রশ্ন প্রায়শ অবান্তর। এদের সকলের তদারকিত ইন্টেলেকুয়াল জগতও বড় বড় রাষ্ট্রো কি মত মত বোধ বাবানার খাটে প্রচুর কাজ চলেছে। এটা এখানে এক বিশেষ বৈজ্ঞানিক।

কর্তাদের যুক্তি অত্যন্ত সরল। কারণ শিল্পা-  
চিন্তার অভাবে মানুষকে স্বভাব-জটিল ব্যাপ্তরূপালি-  
কৃত-সমস্ত করবার একধরকার প্রকলাভ নৈশেই পাও-  
য়ায়। ইটোলেকচুয়াল কাজ মনে সন্ধানমূলক কাজ  
অর্থাৎ শিল্প বা বিজ্ঞান এই দুটি পথে আছে এই  
সম্ভাবনা। তবেই, ঢালো অর্থাৎ বর্ন, বর্ন বা বাঁড়, আনান  
উপকরণ, গাড়ে তোলা কড় কড় গাংকশা হ্রদীর, কিম্ব  
নাও মোটা মোটা বর্নিত আর জাতি ভাতি উপবিহ  
উপকরণ, গাড়ে তোলা কড় কড় গাংকশা-মদীর, কিম্ব  
জগৎকে ব্যকিয়ে নাও আমরা ইনটোলেকচুয়াল তথ্য শিল্প  
সাধককে কী বস্তু আমর করলে জানি। এই হাওয়া  
সুযোগ নিয়ে ইটোলেকচুয়াল যজ্ঞ করবার জন্যে  
বীজগত প্রায়শঃ দেখা ফেল, পুরিস্কলপত আর্থনীতিত  
জোড়োয় সুযোগ-সম্পাদনী বাসনাসিক প্রয়াসের মননে  
কিন্তু এত হই হই হই হই হই হই হই হই হই হই হই হই  
ইটোলেকচুয়াল অগ্রগতি ভেদেই হল?

১৯৪৭ সালের পর থেকে ভারতবর্ষ গবেষণা  
মন্ডির বহু স্থাপিত হয়েছে। জাতীয় গবেষণা  
গণ্ডি থেকে শাখা অর্থনীতি, জাতীয়তা  
হোটেলে পরিচালনা কি মানবের জ্ঞানভাণ্ডার  
জ্ঞানসম্পন্ন এমন কোনো শাখা প্রায় নেই যে বিষয়  
অন্তত একটি না একটি গবেষণা-মন্ডির তৈরি হইল না।  
ভাল-খারাপ উভয় অর্থেই পক্ষপাত প্রত্যাগার  
একাক্ষিক গবেষণাচার্য ও ক'রেই আছে। কি  
গবেষণাচার্য আবার স্থাপিত হয়েছে চলছে পরীক্ষা  
গত কোনো না কোনো প্রমাণভাজন মানবের  
কবীর উদ্দেশ্য তাঁকে বা তাঁর চিন্তা ভাবনা কে  
করে গবেষণা কবীর জানে। বিবর্তনশাস্ত্র  
মানব। শিক্ষারতপালিতে সংলগ্ন গবেষণা-মন্ডির

শ্রমিকদেরই বেড়ে চলেছে। সমাজবিজ্ঞানে উপসর্গনিগলপ বা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত গবেষণা তো প্রসারিত হয়েছে। প্রাক-স্বাধীনতা যুগের গবেষণা-প্রতিষ্ঠানগুলিও এখানে বহুলা পরিমাণে ক্রোড়ে উঠেছে। এই ক্ষেত্রে দেশে বাইরে সংখ্যায় সামাজিক স্বাধীনতাতে উপর্যুপরে ও আড়ম্বরে নিয়োজিত মানুষের সংখ্যাও বেড়েছে, ইত্যাদি সর্বভাবে।

কিন্তু বহুলা, এর মূল উৎস হচ্ছে অর্থ, এক জাতি আসছে দুই দিক থেকে। প্রথমত সরকারী হস্তবিল থেকে, এক স্বাধীনতা বিজ্ঞান ব্যবসায়ী বা পরিহিত-রত্নীসকল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অর্থভান্ডার থেকে। একদিন বারী কলিকাতা ত্যাগস্বীকার ও উদ্ভবিত্তির সাহায্যে প্রাক-স্বাধীনতায় গবেষণা-প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তুলেছিলেন, তাই স্বাধীনতার পরে নিশ্চয়ই অতীত যুগের মতো এই আর্থিক সম্ভলতাকে গ্রহণ করেছিলেন। তারা হয়ত ভেবেছিলেন, এতে যে শ্রেণীই তাদের গবেষণার পথ সহজ হবে তাই নীতি, সমাজের কাজ থেকে এতদিন এই স্বাধীনতাও স্পেন্সর যে, আপাতভাবেও অন্যত্র যা জীবিকা নির্বাহের জন্যে কোনো একটি প্রচলিত বা গণতান্ত্রিক বস্তি গ্রহণ না করে, গবেষণার পাল্লায় মতো আর্থিক নিয়ন্ত্রণেরও নিশ্চয়ই কিছুটা সামাজিক সাধকতা আছে।

কিন্তু তাদের মধ্যে বারী প্রকৃষ্ণী তাদের এ আনন্দ অবশ্যই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। একদিন বারী বিজ্ঞানের নিচের তত্ত্ব আর্থিকায়ন আশ্রয় অস্বকার ঘরে লেবরটরী সাজিয়ে দ্বিতীয় দিন জন্মের পর বহুর মতো গিরোদ্বার গবেষণার কাজে, আজকে তারা কচি-কল্লীটের সৌধে মলাবান আসবাবপত্র ও যন্ত্র-সামগ্রীকে জাইনেক্সের পদ অলংকৃত করেছেন। তাদের আর্থিক কর্মদিনের নিশ্চয়ই অবসান হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের অবদান কি স্বাধীনতার পথে না কর্মতার পথে? অন্যরূপে তুলনামূলক চিত্র বস্তিভাগ্য ইন্টেলেকচুয়ালদের প্রায় যে কোনো কিরণ ক্ষেত্রেই আঁকা যায়। ক্ষমতা মূল্যে তারা যদি

নিজেকে প্রথম জীবনের প্রতি অথবা তাদের পূর্ব-গতাদের জীবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তো ব্যতীতই পারবেন যে আরোজনই বেড়েছে, ফলস্বরূপ আদৌ সে জনগণে হয়নি। কেউ যেন ভুল না বোঝেন; তাঁরা সমাজের অতি মূল্যবান অংশ, কে মলাবান কাজ তাঁরা করছেন তার উপর আরোজন ঘোর করে হলেও খবরই কামা। কিন্তু প্রথম এই যে যখন আরোজনের সেই মারাত্মক দৃষ্টিক ছিল, তখনো যে অন্যপাতে যে দলের কাজ হত তা কেন এখন হচ্ছে না? —না, কেউ কলকেন যে হচ্ছে?

করং স্পেন্সর রিসার্চের মতন একেবারে নতুন নতুন বিষয়ে, আনকোরা নতুন নতুন গবেষণা ক্ষেত্রে, হয়ত আশানুরূপ কাজকর্ম হচ্ছে। তাও, যেসব নতুন বিষয় স্বাধীনতার পরেই গবেষণার কাজ শুরু হয়েছিল সেসব ক্ষেত্রেও, পারমোজিক বিজ্ঞানের মতন, এর মধ্যেই যেন অকাল বার্ষিকের মতন নিখিলতা ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। নয় কি? কিন্তু কেন এমন হচ্ছে? এমন কি, কৃষ্ণবিজ্ঞানের মতন যেসব ক্ষেত্রে বরাবরই ভারতবর্ষের কো নাম-ডাক সেসব ক্ষেত্রেও বহু তিজতা, এমন কি পেশাদার গবেষকদের মধ্যে গবেষণার পদ্ধতি ও পরিবেশ নিয়ে গভীর অর্জুপ্তর থেকে আত্মহত্যা পর্যন্ত বারে বারে ঘটল। কেন? এই এক জাতীয় অর্জুপ্তর থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠিত-সম্পন্ন গবেষকরাও কেন এদেশের নাগরিক পদ্ধতি ত্যাগ করলেন? অন্য দেশে, উৎপাদন এড়াতে বা কখনো কখনো জীবিকার তাগিদে তা ঘটেছে। এদেশে তেমন উৎপাদনের পরিচয়ও নেই, নিছক জীবিকার তাগিদকেও অত গুরুত্ব দেবার অভাবও তো ভারত-বর্ষীয় ইন্টেলেকচুয়ালদের ছিল না?

বরং স্বাধীনতার কয়েকটি হয় যে, গবেষণা মহলের উপরের দিক বারী আছেন তারা কেবল উপাঙ্গনই নয়, সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার দিক থেকেও তো বেশ ভালই আছেন—অন্তত আপত্তিভুক্ত। বিভিন্ন সরকারী কাজে কর্মে তাঁরা মন্তশাসিতা হিসেবে জড়িত

তো থাকেনই, দেশের বিভিন্ন বিষয়ে নীতিনির্ধারণ ও কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রেও তারা খুবই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে থাকেন। আরেকবার স্মরণ করুন শাসকবর্গ পরিচালনা করতেন বিদেশী রাজপুত্রবর্গের, রাজনীতিক নেতারাও পেশাদার দেশী শাসকগোষ্ঠী। আরেকের দিনে বিদেশী বিজ্ঞান-সাক্ষর বা গবেষক-অধ্যাপকের বা এমন কি কলকাতার পক্ষেও রাজনীতির আসরে অংশগ্রহণ করা যেমন নতুন কিছু নয়, তাদের পক্ষে তেমনই নতুন নয় শাসকগোষ্ঠীরা মধ্যে ভিত্তি ধাওয়া।

এ তো গেল নেহাতই উপস্থলার কথা। আপেক্ষিক নিচের দিকও এই একই পরিবর্তনের হাওয়া। কোনো উচ্চশিক্ষিত তরুণ বা তরুণী তার সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে আজকে অনেক বেশী নিশ্চিত হতে পারবে যদি সে বলতে পারে যে সে বাস্তব আছে কোনো গবেষণার কাজে। যে শিক্ষক সে কেবল ছাত্র ঠেকায়, যে চিকিৎসক সে শাখা রোগের চিকিৎসা করে, সব চাইতে উচ্চ দরের চার্করও যে করে সেও নেহাত চার্করজীবীই। কিন্তু যে রিসার্চ ওয়াকর তার হাতে যখন ইন্টেলেকচুয়াল যন্ত্রপাতির দোহের চার্করীতি। এ সম্বন্ধে উপনীত হওয়া কিছু শক্ত নয় যে মানুষের মনে অতি গভীরভাবে লুকিয়ে আছে ইন্টেলেক্টের প্রতি ভীতির ভাব। খবর ভাল কথা। ইন্টেলেক্ট ছাড়া তো মানুষেরা সভ্যতার বা সংস্কৃতির সম্ভাবনাই থাকত না। কিন্তু বেশী ভীতির মতোই প্রকাশ পায় সেখানেই সামান্যতম সমস্ত শব্দ উপশ্লোকে বর্ধ করে প্রতিষ্ঠিত হয় মারাত্মক কোনো ভুল। আমাদের দৃষ্টান্ত যে একেবারে তার বর্তমান হয়নি।

আসলে অধ্যাপক সম্প্রদায়ই হোক বা সরকারী মহলেই হোক, সবাই ভাবছেন যে গবেষণা হল মানুষের সজ্জনী প্রতিষ্ঠার বিকাশক্ষেত্র। তাঁরা খবে সম্প্রদায়ে বাধ্য করতে পারবেন না, তবে তাঁরা এটাও বলবেন যে, গবেষণা মানুষের ইন্টেলেকচুয়াল বস্তিরই নামান্তর মাত্র। এদের মধ্যে বারী বেশ



বিশ্বের অদ্বিতীয়  
বৈজ্ঞানিক প্রফেসর  
ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কর  
আশ্চর্য অভিজ্ঞতার  
কাহিনী  
সত্যজিৎ রায়ের  
???

# ছোটদের শ্রেষ্ঠ পূজা বার্ষিকী

৩টি বিজ্ঞান গীতিক  
কিনোয় উল্লেখ্য নিম্নে

লীলা মজুমদার / অদ্রীশ বর্দন /  
সমরজিৎ কর



পৃথিবীর তাবৎ  
মুসকিল-আসান  
ঘনাদাকে নিয়ে  
প্রোমেন্ড মিটের  
বড় মাপের সায়াস  
ফ্যান্টাসী  
???



নির্বাচিত প্রবন্ধ  
অল্পপরিমিত ভট্টাচার্য  
দিলীপকুমার  
বন্দোপাধ্যায়  
পরিতোষ পাল  
কমল চক্রবর্তী  
সাধন দাশগুপ্ত  
পবিত্রানন্দ  
পদ্মোপাধ্যায়  
প্রমীলা বসু  
মণি বাগচি  
বিশ্বপ্রিয় মথোপাধ্যায় রথীন সরকার

বিশ্বায়কর  
অভিযান লিখেছেন  
পৃথী রাজ সেন  
আবিষ্কার ও  
গবেষণার প্রসঙ্গে  
লিখেছেন  
অমরনাথ রায়  
রবীন্দ্র বন্দোপাধ্যায়  
অরুণকুমার চক্রবর্তী  
জয়ন্ত বসু

লুই  
ক্যারোলের  
ধাঁধা  
রূপকথার যাদুকর লুই  
অসংখ্য ধাঁধা ও সংখ্যার  
মজা খুঁটি করেছেন।  
তারাই দশটি নির্বাচিত ধাঁধা  
বিবেক রায়  
সংখ্যা নিয়ে  
অমরনাথ রায়  
বিজ্ঞানের  
শব্দকূট

তিনটি বিখ্যাত  
রচনার অনুবাদ  
আইজ্যাক অ্যাসিমভ  
এইচ. জি. ওয়েলস  
রে ব্রাডবেরী  
বিজ্ঞাননির্ভর গল্প  
অদ্রীশ দেব  
কিত্তিলুনারায়ণ  
ভট্টাচার্য  
নিরঞ্জন সিংহ  
সিদ্ধার্থ বোষ  
এনাকী চট্টোপাধ্যায়



প্রাথমিক ভাষা আশা করেন যে গবেষণা মানেই নতুন নতুন আবিষ্কার, আশ্চর্যজনক পরিকল্পনা, নতুন নতুন কঠোরতা, ইত্যাদি। অর্থাৎ গবেষণার ক্ষেত্রে তুমি চালালেই তার পরিবর্তে ভাষা আশা করবেন যে কিছু পেতে, আর সাহায্যে বাগিচা করা যায়, বনের উন্নতি করা যায়, যম্বে নামলে শট, নিশা করা যায়, কিছু না হোক বিজ্ঞানসম্মত মনোভাৱে যাবে। ব'রো আরো শিক্ষণ বা দুরদর্শী এরা অনেক সময়ে আপাতলাভটিকে উপেক্ষা করতেও রাজি আছেন মৌলিক গবেষণার খাতিরে, যদিও শেষ পর্যন্ত ভাষাও কিছু পেতে চান যাতে।

গবেষণার মন্ডলের উদ্যোক্তা ও কর্তারা সাধারণভাবে এই অস্পষ্ট ধারণার সুযোগ নিয়েছেন নিজস্বের ক্ষয় স্বার্থের থেকে ভাবিয়ে। অগেগার যিনে পশ্চিম বলে এক ধরনের মানুষ ছিলেন। তাঁদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান-আবরণ। গুরু শরঙ্গার অথবা পুঁথি পুস্তকের সাহায্যে প্রভু জ্ঞান তাঁরা সংগ্রহ করতেন। নিরীক্ষণের জীবনে নিরস্বগ ছিলে তাঁরা অধীত জ্ঞানকে বাড়িয়ে তুলতেন সাধনার ভিতর দিয়ে। তাঁদের জীবনে নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা বিতরণ। রাজ অনুগ্রহ বা তাঁরা পেতেন না তা নয়, তবে স্বাভাবিক সময়ে রাজস্ব পরিচালনার কাজে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ সাধারণত তাঁদের কামা ছিল না। তাঁদের জীবনের যে সমান সেরি প্রধানত আসত শিক্ষা ও ছাত্রদের কাছ থেকে। সব চাইতে লক্ষণীয় বিষয় এই যে পশ্চিম-প্রাচীণ প্রমাণভাজন ছিলেন নিতান্তই তাঁদের জীবন-যাত্রা পশ্চিম ও পশ্চিমভাৱে জনো, কোনো বিশেষ বৃত্তিতে পারম্পরিকতা জনো নয়। যুগের পরিবর্তনের মধ্যে সশেষে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থারও আমূল পরি-বর্তন ঘটল এবং পশ্চিমপ্রাচীণ ও নব্যোচিত বৃত্তি-ভোগী শিক্ষক সমাজ অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পর থেকে তফাতে সরে গেলেন। কিন্তু তবুও সৈদন পর্যন্ত অনেক শিক্ষকের সব চাইতে বড় আশঙ্কা হতেন সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের বহক পশ্চিমত।

উনিবিংশ শতাব্দীতে ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শিক্ষক মনে করতেন তিনি সমাজের কাছ থেকে ভরণপোষণ পাওয়ার পরিবর্তে শিশু ও কিশোরদের সাধারণ শিক্ষার জন্যে দায়ী। শিক্ষকেরা শূন্য দরিদ্র থাকতেন না, দরিদ্র থাকাতিক তাঁদের আদর্শের একটি অংশ হিসাবে গ্রহণ করতেন। নিজস্বই প্রথম উঠবে এটি ভাল কি না, এবং সেই প্রশ্নের বিচারও আমাদের করতে হবে। তবে এটুকু বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই আদর্শের পরিবর্তন ঘটেছে। কোচিং ক্লাস, প্রাইভেট টাইশন, অর্থ-পুস্তক প্রণয়ন, ইত্যাদি প্ল্যানের কথা আজকে বোধ হয় পরানো হয়ে গিয়েছে। এই সব উল্লেখের মূল কথা হচ্ছে সময় চুরি করে একটু বেশি পরিমাণ ছেলেকে গড়পড়তা একটু কম জ্ঞান বিতরণ করে বরুটা সম্ভব বেশি অর্থ উপার্জনের চেষ্টা। এটি বোধ হয় বিদ্যার ক্ষেত্রে এক রকমের ব্রাক মার্কেট। কিন্তু কালোজারি আমলে তবু কিছু আদান-প্রদানের বাণীর ছিল, হোক তা জল মেশানো বা অন্যায়ের সুড়ঙ্গ পথে। আজকে এসেছে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্রাকমেলের বৃদ্ধি। প্রাক্তন শিক্ষকেরা বলছেন

তাঁরা ছেলে ঠিকানোর কমেলা আর পেছাতে রাশি নর। তাঁরা বহু পরিভ্রম করে ডেলিকট ইন্টেলেক্টেরটিকে রিসার্চের বারি বহন পেয়ে মারিচি ব'চিরে রাখতে চান। তাঁরা জনোই তাঁরা দাবী কর-ছেন সমাজ যেন পশ্চিমোপকতার বেড়াটি ভাল করে বেঁধে দেয় যাতে দৈনন্দিন প্রয়োজনের ভালগার গরু, মাঁষ এসে (নিষ্ফল) তরুটিকে মারিচিরে না যায়। অর্থাৎ রিসার্চের মোহাই দিয়ে শিক্ষকেরা বৈমূল্য অস্বীকার করছেন শিক্ষার সাগর।

খুবই আনন্দের কথা যে সরকারী চাকরি, সওদাগরী আঁপস, চিলেচালা, কলেজী আবহাওয়া ত্যাগ করে যে সব মানুষ এসেছেন গবেষণার মণি আহরণে, তাঁরা আজক প্রধানত সরকারী আনুকুল্যে ভাল খেতে ভাল পরতে পারছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা তো করা যেতে পারে যে তার পরিবর্তে সমাজকে তাঁরা কি দিচ্ছেন? ধরা যাক গবেষণার ক্ষেত্রে একটি চলিত মাপকাঠি হল এই অথবা প্রকল্পের আকারে গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা। উত্তর সাধকদের প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি বাদে এইটিকেই প্রধানতম মাপকাঠি বলা বোধ হয় সমীচীন হবে। রিসার্চ পেপার ছাপানোর এই ব্যয়টাকে অথবা কোনো এক সময়ে একটু বিচার করে দেখা যায় কতটা বৃত্তিসংগত। তবু এই সব গবেষণার ও ইন্টেলেক্ট পূজারীদের নিজেদেরই কাছে যে এটি একটি খুব আকর্ষণীয় জিনিস তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই মাপকাঠিতেও দেখা যাবে যে আমাদের গবেষণার মন্ডর-গলি কী রকম নৈরাশ্রয়। সামান্য দু-চারজন আছেন যারা ধীরে ধীরে ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন এবং সময় মতন তা প্রকাশও করে যাচ্ছেন। আরো কিছু আছেন যারা সাংবাদিকসুলভ প্রবন্ধ জািপয়ে থাকেন। ভা ছাড়া ডক্টরাল থিসিস বা ছাত্রদের হাত পাকানো প্রোগ্রাম লিখা মামলি ক্যানার পঠা রচনা অবশ্য যথেষ্ট বেগেছে। খিচুড়ি জাতীয় ওয়াকিং পেপারের সিরিজও কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করেন, যা প্রধানত নিজেরাই দেখে-দেখে (বা না দেখেই) নিজেদেরই গুদামজাত করে রেখে দেন। কিন্তু এই আনুষ্ঠানিক লেনদেনের যুগে, আনুষ্ঠানিক মানে পৌঁছায় বছরে কয়টি কাজ কোন বিষয়ে?

তবু এই গবেষণার ও ইন্টেলেকচুয়লরা, এবং তাঁদের দেখাদেখি উপরতলার শিক্ষকেরাও, শিক্ষকতা করতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক। শিক্ষকতা করতে হলেও যতদূর সম্ভব কম সংখ্যক ক্লাস যেন নিতে হয়, ছাত্রদের সম্বন্ধে তাঁদের দায়ব্ধ যেন ন্যূনতম হয়। 'প্রফেসর' ইত্যাদি নামে পরিচিত হতে ভাল বাসেন। আবাব অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ ক্যামেলা সঠিতে পারেন বা না পারেন, চাপরাশি, বড় টেবিল, টেলিফোন ইত্যাদির প্রতি প্রীতি আছে অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ কর্তাদের মতনই। এঁরা সপ্তম স্বর্ণ পেয়ে যান যদি মাঝে মধ্যে দু-চারজন স্বেচ্ছা অধ্যাপকের সঙ্গে কিছুটা আদ্যাপ আলোচনা করতে পারেন। এবং বছরে দু-একবার সেমিনার কি কনফারেন্স কি খোদা সায়ান্স কংগ্রেস জাতীয় মেলাতে যোগ দিতে পারেন। দেশ হলে, মনোরম কোন পরিবেশই কম। বিদ্যাহলে তো কথাই নেই। পশ্চিমোপক দফতর থেকে ফিনান-শিয়াল অতিত করে, কিন্তু পারফরম্যান্স অডিও করে

কেউ কখনো দেখতে পারে না যে কত টাকা খরচ করে বৃত্তি মনে সতিই কী গাজল গেল। এমন কি এক কয়েক বা এক সংস্কার কমলি অন কোম-বয়সের কর্মীদের সম্বন্ধে বা অন্য কোনো সংস্কার সম্বন্ধে এমন কোনো অস্বস্তিকর মূলগত প্রশ্ন তুলকেই না, নিজস্বের মধ্যে যতই রেবারোঁষ থাকুক। এমন সুখের রাজ্যে কে আগুন লাগাতে চায়?

সরকারী দফতরগুলি বা বাবসারী প্রতিষ্ঠান-গুলি প্রথম প্রথম পশ্চিমোপকতা করেই ক্ষান্ত হত। কিন্তু মজার ব্যাপার যে ক্রমে ক্রমে এদেরও রিসার্চ-ভুক্তে পেয়ে বসেছে। পশ্চিম রাজপুরুষ একতর বাস আজকে নীতিনির্ধারণের বা কাজ চালানোর বৈধক করার চাইতে পছন্দ করেন পল্লী জনের সেমিনার। সেখানেও ওয়াকিং পেপার। সম্ভব হলে জায়গাটি ভাল দেখেই বাছা হয়। বাবসারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গীত অনেক সময়ই বেশি। তাঁদের আমলারাও রিসার্চ বা সেমিনার বা ওয়াকিং পেপারে পেছিয়ে নেই, তাঁদের মক্জমক বরণ আরো বেশি। সম্প্রতিকালে সরকারী সৌজন্যে পাওয়া এ মাতারী একটি বহুতম পল্লীময় হল সায়ান্স ও টেকনোলজি সঙ্কাত পরিদর্শনটি। তবে, কোনো বাবসারী প্রতিষ্ঠান যদি কত পরিমাণ দাঁতের মানন বিত্তি হবে আদ্যাক করতে চেষ্টা করেন তো তাও এক মূল্যবান রিসার্চ বলেই পরি-গণিত হয়। এবং এই রিসার্চের বানে কলা-শিল্পীরাও ভেসে গিয়েছেন বহু ক্ষেত্রেই। সুকুমার কলার ক্ষেত্রেও সূত্রনশালী সাধনার পরিবর্তে 'চতুর্দিকে' ছাড়িয়ে পাড়ছে প্রধানত সরকারী পশ্চিমোপকতাপট সংস্থা অফিসারী মেকী গবেষণার রেওয়াজ। তাঁর একটি ফলস্বরূপ, কে ইন্টেলেকচুয়ল আর কেই বা কলাকার—এই বহুল প্রচলিত বিভ্রম আরো ঘনিরে এসেছে।

ফলে, যদিও বা ধরে নেওয়া যায় যে এই অত্যাধা দেশে শেষ পর্যন্ত এমন একদল সমাজ ন্যায়কব অভ্যাস হল যারা এদেশের প্রাচীন ইন্টে-লেকচুয়ল ষ্টাডিশনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করত, অথবা সমসাময়িক অগ্রসর সমাজের সঙ্গে তুলনীয় একটি ইন্টেলেকচুয়ল ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সতিই মনস্কির করলেন, তো তখন তাঁরা কেন পথে এগাবেন? লিখতে খারাপ লাগলেও লিখতেই হয় যে এই সব বিবিধ প্রতিষ্ঠান ও তাদের অবলম্বন করে গড়িয়ে ওঠা এই দেশব্যাপী সঙ্কাত ব্যাপারকে সৈদন প্রচুর ছাঁটতে হবে, পালাতে হবে। এবং তাঁর চাইতেও বড় কথা, দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবকেই আমূল পরিবর্তিত করতে হবে। তবে হয়ত শব্দে হতে পারবে সেই বহু প্রতীক্ষিত ইন্টেলেকচুয়ল নবজাগরণ। কিন্তু সে কি সরকারী উদ্যোগ, সরকারী উত্থাধানে হওয়ার ব্যাপার? সন্তোষাত যেনা 'কই' হোক না কেন—বস্তুত, এমন একটা বিশাল ও গভীর ওলট-পলট হওয়া সাধারণত খুব প্রকাণ্ড বিপ্লবের মধ্যে ছাড়া শব্দে হয়ই না—শেষ পর্যন্ত তার দায়িত্ব ইন্টেলেকচুয়লদেরই। এবং তাই যদি হয় তো তেমন বিপর্যয়ের জন্যে অপেক্ষা করা কেন? আত্মজিজ্ঞাসা ও সামাজিক মূল্যায়নের কাজটা শরু হয়ে যাক না? অন্তত কিছু শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানে এবং নেতৃস্থানীয় ইন্টেলেকচুয়লদের মনে?



A black and white photograph of a group of people, including a woman in a dark dress and a man in a light suit, standing together outdoors. The woman is holding a small object, possibly a camera or a book, and the man is holding a large, framed object, possibly a painting or a large photograph.

[illegible]

ਸੰਦੂਰ ੧੪੧੭ ਆਲ ਥੇਕੇ ਆਮੂਖ ਦ  
ਸਿਲਖ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ

# হিন্দুস্তান স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস্‌ লিমিটেড

第百一十卷

# লিম্পিক হকি-সোনা দ কতখানি

জুলাইয়ের ২৯ তারিখের সম্মান্য সমুদ্র মস্কো মনামো স্টেডিয়াম থেকে অলিম্পিক হকি ফাইনালে খেলার ধারা-বর্ণনা ইখার ভরগে ভেঙ্গে আসছে। কিছুক্ষণ পরে পরে ভাষাকারদের ভাষা বদল হচ্ছে। কোনো ইংরাজিতে, কোনো হিন্দিতে। সেই সময়েই দল হচ্ছে খেলার অবস্থা। ভারত বিরতির সময়ে পনের বিরামে ২-০ গোলে এগিয়ে। শ্বিভীয়াধের র মিনিটের মধ্যে এগিয়ে ৩-০ গোলে। রেডিও এবং ট্রান্সমিটারের সামনে ভিড করা ভারতীয় মর্থকদের মধ্যে তখন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। খেলোয়াড়ের ভারত আবার পাচ্ছে অলিম্পিক হকির সনার পদক। কিন্তু হঠাৎই উজ্জ্বল কিছুটা স্তমিত হয়ে গেল, যখন স্পেন পর পর দুটি গোল শাখ করে দিল। খেলার ফল ভারতের অনুকূলে এখন ৩-২। চিত্তার রেখা ফুটে উঠল অনেকের চোখে। সাত বছর আগে আমস্টারডামে বিশ্বকাপ হকির ফাইনালে তো এমনিভাবেই ভারত ২-০ গোলে এগিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত হেরে গিয়েছিল হল্যান্ডের কাছে টাইব্রেকারে। চিত্তাতা অবস্থা নামিয়ে। আরও একটি গোল করে ভারত ৫-১ গোলে এগিয়ে খাবার পর সোনা জয় সম্পর্কে অনেকেরই নিশ্চিত। কিন্তু আবার খেলার রঙ বদলে গেল, স্পেন আর একটি গোল শাখ করায়। ফল এখন ৫-৩ এবং স্পেন মরণ কামড় দিলে। আক্রমণের চেষ্টা তুলে ভারতীয় ডিফেন্স করছে হালের সপ্তম। কী হয় কী হয় অবস্থা। আর কিছু, অবস্থা হয়নি। ৫-৩ গোলে স্পেনকে হারিয়ে খেলোয়াড় বর পর ভারত আবার হয়েছে অলিম্পিক হকি চ্যাম্পিয়ন।

কিন্তু রমেশ্বরস উত্তেজনার মধ্যে আলা-আশঙ্কার দোলার দোলানো এমন হকি ফাইনাল কি বেশি হচ্ছে? অবশ্য মেলবোর্নেও টোড়িক অলিম্পিকের ফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের জয় ছিল খুবই কটাক্ষিত। রোম অলিম্পিকের ফাইনালেও পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে জিতেছিল মরণগণ সংগ্রাম করে। কিন্তু কোনো ফাইনাল খেলায় এমন নাটকীয়তা এবং গোলের চমক ছিল না। তাই ত ভারতের প্রাক্তন অলিম্পিক অধিনায়ক বলবীর সিং মস্কায় বলেছেন, "অলিম্পিকের অনেক হকি খেলা দেখেছি। খেলোড় ও অনেক আন্তর্জাতিক হকি। কিন্তু এমন শ্বাসরোধকারী খেলা আর দেখিনি।" উল্লেখ্য, মেলবোর্নে বলবীর সিংই ছিলেন সোনাজয়ী ভারত দলের অধিনায়ক।



অলিম্পিক

ফাইনালে পরাজিত স্পেন দলের কোচ হুস্ট ভেনহুইল বলেছেন, হকি খেলার দেশের সম্মান টিভির সঙ্গে সম্মতি পেয়ে ভারত অসাধারণ মাচা খেলেছে। এই দলের কাছে পরাজয়ে আমাদের কোনো আপসোস নেই।

অলিম্পিকের অপর প্রতিদ্বন্দ্বী হোল্যান্ডের কোচের মতে ভারত-স্পেন ফাইনাল খেলার পুরো সত্তর মিনিটের টেকনিক-টাকটিকস এবং কলা-কৌশল হকির টেক্সট বইয়ে স্থান পাবার যোগ্য।

এর পরও যদি কেউ মন্তব্য করেন, মস্কো অলিম্পিকের হকি-সোনা ভারতের ফোকটে পাওয়া তবে কলব, সাম্প্রতিক বিশ্ব হকির আবর্তনের সঙ্গে তালি ওঠাকিহাল নন।

সত্যি কথা, হকি খেলায় শক্তিশালী করেকটি দেশ মস্কো অলিম্পিকসে যোগ দেয়নি। যারা যোগ দিয়েছে তারাও আবার হকি দল পাঠায়নি। যেমন অস্ট্রেলিয়া, হল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড এবং গ্রেট ব্রিটেন। বরকটকারী দেশের মধ্যে হকিতে সমৃদ্ধ পাকিস্তান এবং পশ্চিম জার্মানি। এও স্বীকার করব, এই দেশগুলি খেললে ভারত সোনা নও পেতে পারত। কিন্তু পেত না এ কথাই বা জোর দিয়ে বলি কীভাবে? মেক্সিকো এবং মিউনিখ অলিম্পিকে তৃতীয় স্থান পাওয়া সত্ত্বেও ভারত কি পরম শক্তিশালী পাকিস্তানকে হারিয়ে ১৯৬৫ কুয়ালালামপুরে বিশ্বকাপ জয় করেনি? মিউনিখ অলিম্পিকের বানাস অস্ট্রেলিয়াকে কি আটম-এ অক্টোবর বিশ্বকাপে ২-০ গোলে হারায়নি? মিউনিখের চ্যাম্পিয়ন নিউজিল্যান্ডকেও তো গত বছর পার্থ আন্তর্জাতিক হকিতে হারিয়েছে ৫-০ গোলে, ৭৮৫



হকি

পাচ-ভারত হকি টেস্টে লাহোরেও ভারত ২-১ গোলে পাকিস্তানকে হারিয়েছিল।

অকপটে স্বীকার করব, সাম্প্রতিক কালের হকিতে ভারতের জর-গোরবের তুলনায় পরাজয়ের পলি অনেক বেশি। এক অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম জার্মানি এবং পাকিস্তানের কাছে করেকটি খেলার শেচনীয়ভাবে পরাজয়ও স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু হকি দলিয়ার এখন যে ওটা-পড়া ভাতে যে-কোনো দেশই যে-কোনো দেশের কাছে হার স্বীকার করতে পারে। না হলে নিউজিল্যান্ড কীভাবে মিউনিখ অলিম্পিকে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পাকিস্তান তৃতীয়, হল্যান্ডকে চতুর্থ ও পশ্চিম জার্মানিকে পঞ্চম স্থানে ঠেলে দিয়ে? নিউজিল্যান্ড আটমটিতে মেক্সিকো অলিম্পিকে দখল করেছিল সপ্তম স্থান, বাহামোর-এ মিউনিখে নবম স্থান, ছিয়াত্তর-এ চ্যাম্পিয়ন আবার গত বছর পার্থ আন্তর্জাতিক হকিতে পেল ষষ্ঠ স্থান। মেক্সিকো ও মিউনিখ অলিম্পিকে রূপেকরী অস্ট্রেলিয়র বানিলোনা বিশ্বকাপে হল অষ্টম, কুয়ালালামপুরে বিশ্বকাপে পঞ্চম। হল্যান্ড কুয়ালালামপুরে পেয়েছিল নবম স্থান।

চার বছর আগে অনুষ্ঠিত মিউনিখ অলিম্পিকের ফল যদি খতিয়ে দেখি তবে দেখতে পাব যে অস্ট্রেলিয়া ভারতকে হারিয়েছিল ৬-১ গোলে সেই অস্ট্রেলিয়াই হেরেছিল অক্টোবর কছে। অক্টোবর বিরুদ্ধে ভারত জিতেছিল কিন্তু ৪-০ গোলে। মিউনিখ অলিম্পিকের চ্যাম্পিয়ন পশ্চিম জার্মানি ১-৫ গোলে হেরেছিল স্পেনের কাছে, যে স্পেন মিউনিখে পেয়েছিল ষষ্ঠ স্থান। আবার



বলবীর সিং



বলবীর সিং



সোমায়



ভবিষ্যতে কোন  
খরচের পরিকল্পনা  
আছে? তার জন্যে  
ভাবনা কিসের?

**ভবিষ্যতে যতই খরচের পরিকল্পনা  
থাকুক না কেন, কথা দিচ্ছি, কানাডা  
ব্যাঙ্ক সেই খরচের অর্ধেক টাকা যোগান দেবে**

সময় থাকতে টাকা জমানো শুরু করলে সবকিছুই  
আপনার সামর্থ্যের মধ্যেই এসে যাবে। ভবিষ্যতের এই সব  
পরিকল্পনা রূপ দেওয়ার জন্যে আপনাকে সাহায্য করতে  
কানাডা ব্যাঙ্কের একটি বিশেষ জমা প্রকল্প রয়েছে।  
কি চাই বলুন না—গাড়ি? ছুটির? নিজের বাড়ি?  
না কি ছেলেমেয়ের উচ্চশিক্ষা কিংবা বিয়ের খরচ? কামধেনু  
জমা প্রকল্পের সাহায্যে আপনি খুব সহজেই আপনার  
টাকা নিতুল করে নিয়ে সবচেয়ে বেশি লাভ মারে তুলতে  
পারেন।

এই প্রকল্পের সবচেয়ে উল্লেখজনক দিক হল যে এতে  
আপনার প্রয়োজনীয় অর্থের একটা সামান্য অংশ জমা দিতে  
হবে। আপনি শুধু জমা টাকার অর্ধেক এবং মাসের  
সংখ্যাটা ঠিক করে ফেলুন। বাস, এরপর সূদের উপর  
সুদ জমতে জমতে মাসের পর মাস বেশ মোটা টাকাই  
আসবে। ফলে আপনার জমা টাকা হয়ে দাঁড়াবে  
দ্বিগুণেরও বেশি।

বিশদ বিবরণের জন্য কানাডা ব্যাঙ্কের নিকটবর্তী শাখায়  
চলে আসুন। আমাদের অন্যান্য আরও বিশেষ প্রকল্পের মধ্যে  
আছে বিদ্যালয়, নিরন্তর এবং বালক্কম।

**কামধেনু  
ডিপোজিট**

**কানাডা  
ব্যাঙ্ক**

(একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক)  
সারা দেশে এই ব্যাঙ্কের  
১২০০-রও বেশি শাখা আছে





রীশাদ সিং



কৌশিক



ফারহান অখতার



রীশাদ সিং

পন-পার্কিস্তান খেলা হয়েছিল ২-২ গোলে।  
ক খেলায় এখন এমন অপ্রত্যাশিত ফল আকর্ষণ  
ট যাবে। মেক্সিকোয় স্পেন-ভারত খেলা ছিল  
-১ গোলে স্পেন কর্তৃত্ব চ্যাম্পিয়নল ট্রফি  
-২ গোলে এবং আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপের  
সিগরের খেলায় ভারতকে ০-২ গোলে হার স্বীকার  
হতে হয়েছিল স্পেনেরই কাছে। মস্কো অলিম্পিকে  
ই স্পেনের সঙ্গে রাউন্ড রাবিন লীগে ২-২  
গোলে খেলা স্পেন এবং স্নে-অফ ফাইনালে ৪-০  
গোলে হারিয়ে সোনা জয় নিশ্চয়ই ফোকটে পাওয়া  
মান নয়। ছয় দেশের প্রতিযোগিতায় অপজিত  
কেই ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। কিছু দেশ গেমস  
রকট করলে জয়-গৌরব বোঝা কল্যাণ পূর্ণ না  
হে পারে কিন্তু খেতাবের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে।  
লিম্পিক রেকর্ডেও থেকে যাবে ভারত বইশতম  
অঙ্গের হক চ্যাম্পিয়ন। এই যে আফ্রিকার আটটি  
শ মন্ট্রিয়ল অলিম্পিক বরকট করেছিল। তার ফল  
খিওপিয়ায় দুরপাল্লার দৌড়বীর সিরাস ইফতার  
শিট্রয়েলে যোগ দিতে পারেননি। এবার যোগ দিয়ে  
শ হাজার মিটার দৌড়ে সোনা জিতেছেন। কিন্তু  
ফতার মন্ট্রিয়লে যোগ দেননি বলে কি ল্যাস  
ভারনের দশ হাজার মিটারে সোনা জয়ের গৌরব  
হটা হয়ে গিয়েছিল?

তার চেয়েও বড় কথা, হক খেলায় সম্মুখ  
দায়কটি দেশ মেক্সিকো না খেলায় ভারতের জয়-  
গৌরবকে যঁরা ছোঁট করে দেখছেন তারা একটু  
পাছন ফিরে ভাবাচ্ছেন না কেন?

১৯০২-এ লস আঞ্জেলেস অলিম্পিকে ভারত  
দের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল? মাত্র দুটি  
পক্ষে। তাও এমন দুটি দেশ হক-স্টিক নিয়ে



সদিক

যারা হাটি-হাটি পা-পা শব্দ করেছিল। অলিম্পিক  
থেকে হক উঠে যাবার দাখিল হয়েছিল বলেই  
আয়োজনকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র হককে নাম দিয়েছিল।  
আর নাম দিয়েছিল জাপান। জাপানকে এগার-এক  
গোলে এবং যুক্তরাষ্ট্রকে চম্বিশ-এক গোলে হারিয়ে  
ভারত সোনা জিতেছিল। কই সে সোনার তো কেউ  
খাদ খুঁজে পাননি। এবারই বা আমরা খাদ খুঁজব কেন?

বিশ্ববহির্ভূত ভারতের যখন একচ্ছত্র আধিপত্য  
ছিল তখন অনেক দেশ হক নিয়ে খুব বেশী মাথা  
ঘামাত না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে বহু  
দেশ আন্তর্জাতিক সঙ্গ হককে আকড়ে ধরে এবং  
ভারত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন পাকিস্তান হয়ে ওঠে  
সব চেয়ে শক্তিশালী। অপরাধকে ভারত ব্রীডারকৃত  
যতখানি না পিছিয়ে পড়ে তার চেয়ে বেশি  
পরিমাণে জড়িয়ে পড়ে প্রশাসনিক টালমাটালে।  
প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গোষ্ঠী-কোদিল অবশ্য আগেও  
ছিল। কিন্তু তখন, আগেই বলছি, অন্যনা দেশ  
হক খেলায় তেমন শক্তিশালী ছিল না বলে ভারতের  
প্যাক টানা ছয়টি অলিম্পিকে স্বর্ণ পদক জয় করতে  
বড় বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। ছয়টি কেন, বহি  
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য দুটি অলিম্পিক গেমস বন্ধ  
হয়ে না যেতে ভারত উপযুক্তির অর্টটি  
অলিম্পিকসেই হক চ্যাম্পিয়ন হত। পরবর্তীকালে  
বহু খেলায় পরাজয়ের মূলে আছে মুখ চেয়ে মন  
রেখে দল গড়া, হক ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের  
মধ্যে কলহ, প্রাদেশিকতার প্রশ্ন, অলিম্পিক চলাকালে  
খেলোয়াড়দের মধ্যে বিরোধ প্রভৃতি নানা ঘটনা।  
তা ছাড়া অ্যামো-টাফ বা পলিগ্রাস-যে সব কৃত্রিম  
পিচে এখন আন্তর্জাতিক হক খেলা হচ্ছে তারও  
ব্যবস্থা হয়নি। পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশের



জাফর ইকবাল

খেলোয়াড়রা কিন্তু এই কৃত্রিম পিচে অনুশীলন করে  
পট হয়ে উঠেছে।

মস্কোয় সোনা জয়ের পর একটি তাৎপর্ষপূর্ণ  
কথা বলেছেন খানচিদ ও রূপ সিংয়ের সমসাময়িক  
খেলোয়াড় মথুরাপ্রসাদ চৌবে। তিনি বলেছেন,  
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সুস্থ পরিবেশ এবং কঠিন নিয়ম-  
শৃঙ্খলার জন্যই মস্কোয় ভারতের সাফল্য।

সফল্য হয় তো নাও হতে পারত কিন্তু  
নিয়মশৃঙ্খলার মূলা কে অস্বীকার করতে পারে।  
অতীতে ক্যাম্প থেকে যাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে,  
যাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা  
হয়েছে তাদেরই আবার আদর করে দলে স্থান দেওয়া  
হয়েছে। এবার সুরাজ সিংয়ের মত খেলোয়াড়কেও  
ক্যাম্প থেকে ফেরত পাঠানো হয় নিয়মশৃঙ্খলা ভাঙার  
জন্য। এবং যত দূর জানা গেছে ক্যাম্প খেলোয়াড়কে  
অনুশীলন করেছে এক মন এক প্রাণ হয়ে।  
মস্কোতেও মরীয়া হয়ে লড়েছে দেশের সম্মান এবং  
হকের নষ্ট সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য। সাফল্যের  
এটোও আংশিক কারণ।

মস্কোর হক খেলেছে ছয়টি দেশ-ভারত,  
স্পেন, পোল্যান্ড, রাশিয়া, ভার্জিনিয়া ও কিউবা।  
এদের মধ্যে ভার্জিনিয়া এবং কিউবা হক খেলায়  
খুবই অপটু। ভারত রউন্ড রাবিন লীগে ভার্জিনিয়াকে  
১৮-০ গোলে, কিউবাকে ১০-০ গোলে এবং  
রাশিয়াকে ৪-২ গোলে পরাজিত করে। ২-২  
গোলে খেলা-স্পেন করে পোল্যান্ড ও স্পেনের সঙ্গে।  
স্নে-অফ ফাইনালে স্পেনের বিরুদ্ধে ৪-০ গোলে  
জয়ের কথা তো আগেই বলছি। পরে অলিম্পিক  
সমীক্ষার বিষয় আলোচনা করা যাবে।  
মুকুল







পাঁচটি অঙ্গাঙ্গী শ্রীঅরবিন্দের আর  
পরেই তিনটি নির্বোধতার ইংরেজী  
রচনার উল্লেখ। বাকি তেরটি নীলনি-  
কান্তের রচনা। এই রকম পরলৌকিক  
জ্ঞানাপন্থের প্রবর্তক হলেন লুইসিয়ান।  
ফরাসী বোড়শীর কয়েকটি ছোট গল্প  
ফরাসী থেকে অনুবাদ, আর অধিকাংশকে  
অনুবাদের বলা যেতে পারে। আরিষ্টো-  
ফানিস্টাঙ্কালের মতো নাটক দুটি  
ফরাসী থেকে অনূদিত।

জননকাল রত্নর খণ্ড আছে  
শ্রীঅরবিন্দের পাঁচটি ইংরেজী কবিতার  
অনুবাদ এক কোনও কোনও কবিজগৎ  
খ্যাত। তা ছাড়া আছে শেকসপিয়ার,  
স্যাণ্ডার্স, ম্যাকলান, লরেন্স, ডাইলান  
টমাস, মালমে, ফেল্ডলিংকে, রিলকে  
এবং আরও কয়েকটি বিদেশী কবির  
কবিতার অনুবাদ। জনাবলীর পঞ্চম  
খণ্ডে সার্বিক রয়েছে "আদিলেখা",  
"স্বপ্নের কথা", "নটশের, বাবা",  
"স্বপ্নের পাতা" (প্রথম ও দ্বিতীয়  
সর্গ)। "প্রাসার অঙ্গন" প্রসঙ্গে  
সোফোক্লিস-এর "আন্তিগোনী" নাটকের  
প্রথম লাইনটির মূত্র ধরে নাট্য রচনা।  
উল্লেখ্য করার পর প্রাচীন গ্রীসের তিন  
প্রখ্যাত নাট্যরচয়ী এসকিলস, সোফোক্লিস  
এবং ইউরীপিডিস-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে  
লেখক বা লেখকেন তা দিল্লিশনের  
সহায়ক। নারীর কথা "পঞ্চকলা"  
স্বপ্নের মত প্রকৃতির মধ্যে লেখকের  
মনসীলতার স্বাক্ষর আছে। তিনি  
লেখকেন, পঞ্চ কন্যার অর্থাৎ অহল্যা,  
কুন্তী, দ্রৌপদী, তারা ও মন্দোদরী

পাঁচভাগের দিক থেকে বাই হোন না,  
তাইর মধ্যে মানবী দৃষ্টি উদ্ভাস  
হয়েছিল দৈবিক সঙ্গ। তার স্মৃতি  
পড়ার আছে কৌতুকের সিন্ধু দাঁড়,  
কিম্বদন্তির রসমত্তা আর রক্তধার  
আলো।  
অনিরুদ্ধার মঙ্গলময়।

## আলোচনা: শ্রী অরবিন্দ চিত্রকলা

### পদতুল ও প্রতিমা এবং কলাপাহাড়

স্বাধীনতার পর থেকে চিত্রকলা  
নানারকম ক্যাসন কাজ করেছে। কিন্তু  
বিমূর্ত ছবির শাসনের চোড়সত  
পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ জেগে বার্ন।  
কোন কোন শিল্পীর সঙ্গে বিমূর্ততার  
ব্যবসায় সমস্তর জন্যে একটি ভাব-  
ভালবাসা হয়েছিল, তিন দেশী নাবিক  
বেমন নতুন দেশে একটি ফর্স্টনস্ট  
করেন।

পশ্চিম বাঙালার বিমূর্ত চিত্রকলা  
কখনোই শিল্পীকে আকর্ষণ করেন।  
সুতরাং লিটল ম্যাগাজিনে কেউ যদি  
লেখেন যে, শিল্পকলার প্রতিমা প্রজা-  
বর্তন করছে, তিনি নেহাত অজ্ঞ।

বাঙালী শিল্পীরা রূপারোপিত  
প্রতিমা চিত্রণ করেছেন। পাশাপাশি  
প্রথাগত বাস্তব ছবির চর্চা চলছে—  
শশী হেস, অতুল গুপ্ত, ছেয়েন  
মজুমদার থেকে প্রহ্লাদ কর্মকার।  
এরা অবশেষে থেকে যামিনী রায়  
পর্যন্ত আলো স্বদেশীয়তার চোপ

পাশাপাশি। 'কালকায় গ্রুপ' থেকেই  
কিন্তু শিল্পীরা শব্দ ভারতীয়  
নর, সর্বযুগের মানব-শিল্পকলার  
ব্যবহার ঐতিহ্যকে নিজের কলে ভাবতে  
শিখলেন। ফলে সমস্যাটি যে কঠিন হল  
এটা নিশ্চিত। শিল্পকলাকে সমকালীন  
এবং প্রাসঙ্গিক করার কাজটা লম্বা।

কত কঠিন, কলারাইজলস দলের  
বোধ প্রদর্শনই তার প্রমাণ। কারণ  
চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে করণকৌশল এবং  
অঙ্কন শেখানো হয়। কিন্তু শৈলী  
শিল্পীর মুখশ্রী। নিজস্ব শৈলী  
অন্যকারের উচ্চাল-পাখাল যেন গায়নো-  
কোলারজের গর্ভ বস্তু দেখার মতো  
অভিজ্ঞতা। অনেক সময় মূর্তবৎ  
প্রসব হয়। যেমন গোপীনাথ রায়ের  
উদ্ভব যেন রূপে অবসরভার ভাব।  
তবে তরুণ যোষের রাইটার্স কিভাবে  
এর সামনে কুস্তুরের পাল দেখানোর  
টেস্টাবিকা বস্তুটি, ময়লা রক্ত স্রোত  
উপভোগ্য। তেমনি আধা বিমূর্ত  
সমীর মন্ডলের জলরঙের কাছ-  
গাঁপির অন্য মজা আছে। বিকাশ  
মণ্ডোপাধ্যায় এবং দীপক ঘোষ যেন স্তম্ভ  
আশ্চর্যসিঁড়ির মতো অসুস্থপাতের  
আয়োজন চালাচ্ছেন। অন্য সবাইয়ের  
ব্যাপারে তেমন আশঙ্কিত হতে পারলে  
ভাল হতো। প্রতিমা প্রতীক কেমন যেন  
নীরস ফ্যাক্টলে। ঠিক যেন জমলো ন'  
(আকামী অব ফাইন আর্টস  
স্টো)।

পঞ্চল রায়ের একাধার প্রদর্শনী  
ফেব্রুয়ারি ১৫-২১ মে) ছাপাই  
ছবির। বছর পনেরো প্রদর্শনী করছেন  
তৈলচিত্রে। এবারে পাখরছাপ, কাঠ-  
খোদাই, লিনো-কাট, ধাতুরপাত খোদাই  
প্রকৃতি নানা রকম কাজ ছিল। তার  
অঙ্কনের রূপবোধ (ফর্ম)-এর 'র'  
বিকৃতিভঙ্গ করে রূপারোপের পদ্ধতি,  
তা নিয়ে নানা মাধ্যমে খেলা করছেন।  
অ্যাসিডে ধাতুর ওপরটা খাইয়ে বা বুলি  
দিয়ে কেটে তিনি যে কাজ করেছেন,  
তার মধ্যে রেখার স্নায়বিক কম্পন কম।  
মানুষের জীবনের বস্তুগা, একাক্ষ  
অপমানের উপস্থিতি প্রত্যেক ও প্রতিমা  
খুঁজছেন। একটা বিকল্পই ভগ্না  
আছে। হাছাকার। আর আশাবাদ। যেমন  
তার 'ফুল হাতে কলক'। তারে  
রচনা (কমপোজিশন) সন্দেহে আরেকটু  
ভাঙতে হবে। পটভূমির অবসরগুলির  
সঙ্গে মূল প্রতিমার সমান কখনো  
কখনো গড় ওঠেন। প্রতীক ও প্রতিমা  
যেন বাস্তব বাস্তব। তবে কিছু  
কাজ ছিল ভাল।

অনিত বন্দু শিল্পীকেতনের  
স্নাতক। তার বড় বড় তৈলচিত্রগুলিতে  
আশার কারণ আছে অনেক। তিনি  
মানব এবং নিসর্গ স্নায়বিক করেন  
পরিষ্কার। কথা না ইবং বিকৃত করে বেশ  
কড় করে পটের ওপর ছাড়িয়ে যেন।  
কখনো শিল্পচিত্রের রূপারোপ কাগজ  
করে ব্যবহার করেন। তার ছবি কিছুটা  
স্বাধী এবং তাতে আন্তরিকের 'কত'  
প্রাণ নীরব মজুমদার) কোনরকমে পপ  
নয়। তারতা, ভিজুয়া, তীক্ষ্ণতা—  
জ্ঞানলা-বস্তুগা এবং নৈরাশ্য, আনন্দিকতার  
প্রধান না হোক, অন্যতম লক্ষ্য। বরং  
তার ছবি অনেকগুলো মজুমদার এবং

আলো (ইউন লুইসিয়ানের) বা পট-  
ভূমির সমান টান (ইউনিকার্ড আরফেস  
টেনসানের) অভাব। তাই পটে কোন  
এক জায়গায় চোখ পড়ে গেলে, বা  
খাওয়ার ব্যস্ত হেড়ার মতো চাবকালে  
নড়তে চড়তে চায় না। যেমন তার  
'সাঁতারের তালমান' বা 'নানিক ৪০'  
ছবি দৃষ্টিতে নানাভঙ্গা দেখানো পটে  
ভালমান। কিন্তু ছবির কোন কেন্দ্র নেই।  
যদিও শেষের ছবির পটভূমিতে  
হলুদাভ সাধারণ ব্যবহার ভাল। 'লোড'  
শেডিং এবং বিজ্ঞান এবং প্রকৃতি  
ছবি দৃষ্টিতে জামাখিত হয়েছেন। তৈল  
ব্যবহার করা আর একটা মক্কা করছে  
হবে। মানব আকার পর্যবেক্ষণ এবং  
অনুশীলনের দরকার আছে আরো।  
এর হাতে কিন্তু কাঁ দৃষ্টিভয়।  
নন্দনিক কিছু অভিনব ভাঙাও আছে।  
বড় বড় পট নিয়ে যুগেছেন বীরের  
মত।

### অনুচিত্র আকারে

ললিতকলা আকাদেমীকে ধন্যবাদ  
ইদানীং তাদের অরোহিত নার  
প্রদর্শনী কলকাতায় আনা শব্দ  
করেছেন। এ বৎসর ললিতকলার রোপ  
জয়ন্তী। সুতরাং লক্ষ্য যে খুবই শক্ত  
কাঠি বহুল। শব্দ বসব এইসব  
সংকলন পাশ্চম বাঙালার শিল্পীদের মধ্যে  
শ্রেষ্ঠ অনেকেই কোন এক অজ্ঞাত কারণ  
বাস পড়ে যান। এবার ললিতকলা  
হয়েছেন, বিকাশ ভট্টাচার্য, সুশীল রায়,  
রবীন্দ্র মন্ডল, চিত্তামণি কল্ল এবং শূভা-  
প্রসন্ন। বাঙালী শিল্পী আরও আছেন  
কিন্তু তাঁরা পশ্চিমবঙ্গবাসী নন।  
তাছাড়া প্রথম তিনজন আবার ললিত-  
কলার নিবাসিত শিল্পী সদস্য। অর্থাৎ  
পশ্চিমবঙ্গে অনুচিত্রের আছেন—যেমন  
রামানন্দ বন্দোপাধ্যায়, মৃণাল রায়,  
গণেশ পাইন এবং ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত  
স্বনামধনা শিল্পীদের মধ্যে নীরব  
মজুমদার, পরিভোষ সেন, বিজয়  
চৌধুরী, গোপাল সান্যাল প্রমুখ  
অনেকে বাদ গেছেন। তারপরে মধ্যে  
যথার্থ অনুচিত্রের ছিলেন বিশ্বপতি  
মাইতি, আসিত মন্ডল, পৃথ্বীল সেন,  
সমীর মন্ডল। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীদের  
কাজ যাঁরা জানেন ভাল করে তাদের



সত্যপতি—এ রামচন্দ্র

## দুটি মূল্যবান গ্রন্থ পুনঃ প্রকাশিত হল



### বৈষ্ণব পদাবলী

- সাহিত্যরত্ন ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত।
- সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। দশ পদকর্তার প্রায়
- চার হাজার পদের সংকলন, বহু পদের টীকা, প্রস্থশেষে বাজনা-
- যুক্ত শব্দাবলীর অভিধান সংযোজিত। বর্তমানে একমাত্র
- আকর-গ্রন্থ। [টী. ৭৫.০০]



### ভারতের শক্তিসাধনা ও শান্ত সাহিত্য

- ডঃ শশিশ্রুষণ দাশগুপ্তের এই বইটি সাহিত্য একাদমী পুরস্কার
- ভূষিত। বহুদিনের ব্যবধানে তৃতীয় মুদ্রণ। সারগর্ভ অথচ
- প্রাঞ্জল সুখপাঠ্য। [টী. ৩০.০০]

### সাহিত্য সংসদ

১২২ অক্ষয় প্রহরচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৭০০ ০০২

কটা পরামর্শ নেওয়া সরকার ছিল নে হলে।

অনুষ্ঠান (মিনিগেটার) বলতে যাকার এমন ছবি বা চোখ বারান্নে ফেলতে দেখে আঁকা নর (নট পেইন্টিং) নাট আই লেভেল অন দ্য ইজল। কস কোলো নিয়ে দেখার জিনিস। ই প্রদর্শনীর অধিকাংশ ছবি চোখ রাবর আঁকা ছবির ক্ষয় সংস্করণ। তরার কাচের ফ্রেমে নাক না ঠেকিয়েই টিবা দেখা যায়।

সমকালীন ভারতীয় চিত্রকরের বাস্তবিকমূলক একটা রূপ পাওয়া যায়। দিও ভাল ছবি ছিল। কিন্তু সেখানে চিত্রিত শিল্পীরা তাদের ধরনের কাজ পরেছেন। যেমন গুলাম রসুল সন্তোষ চর সুপরিচিত কালোমাত্রার শিবকোণে পেরাতি বিহরের চিত্র একেছেন। তাঁর দশ রঙের মধ্যে একটা উজ্জ্বল রান্ধকে আরোপ করেছেন। রবীন শঙ্কর একেছেন যথারীতি একটা বকারগ্রস্ত মানুষের মুখ। একমাত্র চিত্রকর্ম, রামচন্দন। মেঘমলার ছাওয়া কাশের তলায় প্রহাড়ী শহরের সামনে কাট মৃত পাহাড়ির গারে পিপড়ে পাগা দাঁখিয়েছেন।

বড় শিল্পীর ছোট কাজের প্রদর্শনী যে খারাপ আর ভাল ছবি আছে সম-রিমানে। কিন্তু মন ভরে না।

শিল্পী সরকার



উৎপল দত্ত

উদ্ভাবক করেছেন যা দশকমণ্ডলকে হাসিতে মাতিয়ে রাখে। এ প্রচেষ্টায় অভ্যন্তর সত্য সহযোগিতা তিনি লাভ করেছেন অনিয়মিত শিল্পীদের কাছ থেকে। তাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য উৎপল দত্তের নাম। এ ছাড়া রবি ঘোষ, তরুণ কুমার, সন্তোষ দত্ত, উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, রাজকুমার, কৌশিক বানার্জী, গোতম চক্রবর্তী, শৈলেন মুখার্জী, দুর্গাদাস বানার্জী, বীরেন চ্যাটার্জী, এন কিব-নথন, বনানী চৌধুরী প্রমুখ অনেকেই আছেন যাদের অভিনীত চিত্রগুলি এক-একটি বিশেষ টাইপ। সামনে উপস্থিত করে ছবিখানি উপভোগ্য হতে সংস্কার হয়েছে। ঘটনা ও পরিস্থিতির অনুগামী, যাকে বলে এফেক্ট মিউজিক' রচনা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্বও উল্লেখ্য। হাসির তথ্য হালকা রসের মজার গড় তুলতে টাইটলে চাউনী লাহিড়ী ও তুলসী লাহিড়ীর কার্টুন ব্যবহার প্রশংসনীয়।

পঞ্চক দত্ত

আলোচনা শিল্প সংক্রান্ত সংগীত

### বিলায়েৎ খাঁর দুটি বৈঠক

গত মে মাসে প্রখ্যাত সেতারী ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ প্রায় এক বছর বন্দি কলকাতায় বাজান। এই মাসে তিনি বসিছিলেন দুটি আসরে। প্রথমটির আয়োজন করেছিল অঙ্কুর নামক এক সংস্থা কলামাস্ট্রের পরলা তারিখে এবং শ্বিতীয়টির আয়োজন করেছিল সম্প্রতি কলামাস্ট্র চার তারিখে একই প্রেক্ষাগৃহে। এই শিল্পী এর আগে শেষ বাজিয়েছিলেন গত বছরের সদারপা সম্প্রতি সম্মেলনে।

প্রথম আসরটি মোটেই ভাল হয়নি এবং সৌন্দর্য বাজনার চেয়ে গানই যেন বেশি হয়েছিল। আমি আগে কয়েকবার বিলায়েৎ খাঁর সেতারের আসরে গান গাওয়া নিয়ে আপত্তি করছি এবং বলেছি গংকার করতে করতে গান বরল। গংকারের সাপোর্টিং কাঠামো নষ্ট হয়ে যায়, জম্মট আবেহওয়া বিচ্ছিন্ন হয় এবং বোম্বা প্রোডা ও শিল্পী দুইরই যান ভগ্ন হয়। এবার দেখা গেল এই ওস্তাদের গান গাওয়ার পন্থা এত বেশি হয়ে পড়েছে যে গংকার অবধি মুখ বন্ধ বাজানো

সম্ভব হলে না—আলোচনারই গান আরম্ভ হল। সখি সরাফিল নামে ঘোষিত একটি রাগের স্বরগুলি (বা ইমন কলাপের ঠাট্টে) নিয়ে অসংলগ্নভাবে আধবর্তী নাড়াচাড়া করে বিলায়েৎ খাঁ গান ও গান-বাজনা শুরুর করলেন।

এই স্বর নিয়ে নাড়া-চাড়াতে সু-সৌন্দর্য এবং হস্ত কৌশলের উৎকর্ষতা ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু রাগও ছিল না—প্রখ্যাত আলাপে রাগের মর্তি জম্মট হয়ে উঠে যে গভীর অনুভূতির জন্ম দেয় তার নাম গম্ভও ছিল না। শিল্পীর বোম্বা অনুযায়ী রাগটি কলাপ, ইমন, ইম্মান, বোম্বা ও কলাবলের মিশ্রণে নির্মিত। এর থেকে বোঝা যায় ইমন কলাপের সঙ্গে রাগটির পার্থক্য এই যে এতে বোম্বা অঙ্গের কাজ হয় এবং ইম্মান চোটে দুই মধ্যমের ক্রমিক বাহার হয়—কারণ কলাপ, ইমন ও বিলাবল অঙ্গ ইমন কলাপেও আছে। রাগ বা অঙ্গ মিশ্রণে রাগ যখন নির্মিত হয় তখন মিশ্রণটি হয় রাসারানি—অর্থাৎ স্বরক রাগের অঙ্গ মিশ্রণ এমনই একটি বস্তু তৈরী হয় যা অন্য রাগের বিচ্ছিন্ন অঙ্গের সম্মুখি নয়, অন্য কিছু। পর পর বিভিন্ন রাগের বিশেষ স্বরসম্মতি বাজিয়ে গেলে রাগের যান্ত্রিক মিশ্রণ অথবা রাসামালা ধরনের কিছু হয়। বিলায়েৎ খাঁর আলাপে শ্বিতীয়টিই হয় : জারগার জারগার শোনা যাচ্ছিল ইমন, জারগার জারগার বোম্বা বা ইমন কলাপ বা ইম্মান বা বিলাবল। আলাপচারী এমনই অসংলগ্ন হয়েছিল যে আরো কয়েকটি রাগও পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছিল—যেমন খেম কলাপ ও গোড় সারহ। সখি সরাফিল রাগ নয় ধন, আলাপে যেই বাজাক না কেন এই রকমই শোনাযে—এই ধরনের কথা বলে শিল্পীর দেখ রাগের ঘাড়ে প্রাণনা যায় না : কারণ ১৯৭৭-এর ২০শে অক্টোবরে রবীন্দ্রসদনে আয়োজিত এক আসরে বিলায়েৎ খাঁ এই সখি সরাফিলই এক মোটামুটি গ্রহণযোগ্য রূপ পরিবেশন করেছিলেন।

যা হোক এই প্রথম আধবর্তীত আলাপেও যেটুকু ছিল তা গান এবং গান-বাজনা শুরুর হতেই নষ্ট হয়ে গেল। অনিবন্ধন অংশের বাজনা একটি ভৌতিক দিয়ে শেষ হল—সবাই ভো এখন গায়িক অঙ্গে বাজছে তারা এইভাবে গেয়ে আর বাজিয়ে দেখাক গায়িক অঙ্গ কি—এইরকম একটা কিছু বলে বিলায়েৎ খাঁ একই সঙ্গে গম্ভকতন গাইতে ও বাজাতে শুরুর করলেন এবং প্রেক্ষাগৃহ বিবেচনাইনি হাততালিতে ফেটে পড়ল। আলাপের শেষ তের মিনিট জোড় এক ক্রান্তিত তিনতাল গং একটি কথা খোয়ালের গীত অম্বারী, সেতারে গীত সরসল্যটির জবাব এবং সেতার-বদনের অনিয়মিত অরগার রূপ নিয়েছিল। এতে ঠকল শ্রোতা, বিশেষ করে বোম্বা প্রোডা—সে না শুনতে গেল ইম্মানদখানি ঘরানার প্রসিদ্ধ বালা ও গংকার না শুনতে গেল বিলায়েৎ খাঁ কিংবদন্ত্যকারী তানকার।

বিরতির পরে ঠুরী অঙ্গের বাজনাতেও এই গান গাওয়ার ব্যাপারটা বড় বেশি ছিল। তবে এই অংশ গান-টান হলেও তেমন খারাপ লাগে না যদি প্রথম থেকে শেষ ঠুরী অঙ্গের বাজনা বা গানই শোনা যায়। তার বদলে যা পাওয়া গেল তা হল একটি খাবাজ ঠুরীর মুখ দিয়ে শেষ হওয়া গোড়ম্বার খোয়ালে অম্বারীর অংশ, বাহার মিয়াম্বর, হাম্বারী, জয়জয়ন্তী দরবারী কানড়া, দেশ এবং একটি বাংলা গান। এরপর শিল্পী একটি ত্রিক কামাদের দ্রুত গং ধরেই হার আসরের অনিবন্ধন 'বিরহা'র গতে চলে গেলেন এবং খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে ছেড়ে দিলেন। শেষের তৈরবী আওচার ও কাহারবা গংটিতেও বেশ গান শোনা গেল। তবলা সঙ্গতে ছিলেন শঙ্কর ঘোষ।

শ্বিতীয় আসরটিতে বিলায়েৎ খাঁ নিজ মানেই বাজিয়েছিলেন এবং ভীম-



পল্লী রাগে আলাপ, জোড় যা গং কেনটিতেই গানের আকর্ষ্য হারি। বিরতির পর পিল্লুতে আওচার করতে করতে শিল্পী খালি একবার একটি পন্ডি গেরেছিলেন বল মনে পড়ে। গভীর মেজাজে বাজানো আলাপটিতে স্বরবিস্তার দুইই পাওয়া গেল এক আদর্শ মিশ্রণে এবং বোম্বা গেল বড় করে আলাপ করতে গলে এই দুই পম্বতির এমন একটা মিশ্রণের খুব দরকার। স্বর পরিবেশন ও ধনি-মধ্যমের দিক থেকেও আলাপটি অতি উচ্চা গর হয়েছিল—এক টোকায় বাজানো প ন স ম-জ ঘটিতে তাঁর কোমল গম্বারের রূপ এবং স ম স্র ঘটিতে মধ্যমের রেশ আস্তে আস্তে, গম্বারের মিলিয়ে যাওয়ার সৌন্দর্য বিশেষ করে মনে পড়ে।

জোড়টিও একই প্রণয়ী হয়েছিল। এতে ছিল উচ্চাঙ্গের বস্তন, গম্ভ, লপেট বোল ও মীড়কৃত স্বরসম্প্রতি এবং ঠিক যখন দরকার তখনই ছুটিছিল হরকং ও মড়কীর ফোয়ারা। তান-খালি ও মড়-খালার কাজও ভাল হয়েছিল এবং উচ্চা গর গর্যাক অঙ্গের তান ও পদার উপর বাজানো

আলোচনা শিল্প সংক্রান্ত চলচ্চিত্র

### পাকাদেখা

গণেশ রাক্ত (উৎপল দত্ত) এমন দুই ওসি বার দাপটে বায়ে-গর-তে এক ঘাটে জল খায়। তা-ই নয়, তোর-টোপাক্স তাদের পেট ছেড়ে কাঁতন গড়ে বেড়ায়। সুতরাং খানায় খেন কাজ নেই। গণেশ রাক্ত সম্মাসিকে উজ্জ্বল সন্যাস্ত) দিয়ে হাত দেখায় মেয়ে দপণর (মহুয়া রায়চৌধুরী) কিবাহের কাগ সম্পর্কে। সহকারী আফসার ইক্সম কাবচর্চা করে। আর খানার নস্টেব্রার নারগান নিজে মত থাকে। কিন্তু কথার বলে বায়ের ঘরে যোগের রাস। গণেশ রাক্তের ক্ষেতেই তাই ঘটে গেল। মেয়ের বিয়ের পাকাদেখার দিন-ক্ষয় ঠিক হয়েছ, বরপক্ষকে আপাদ্যনের হুকুখাও সম্পূর্ণ—কিন্তু অপরা হল নিখোজ। সেই ব্যাপারকে কেন্দ্র করে অমন দাপটভলা ও-সি এবং তার সাঙ্গপাওগকে নিয়ে পরিহাসময় যে পরিমার্জিত খণ্ডমার্জিত হয়েছে তা দেখতে দেখতে সারা প্রেক্ষাগৃহে হাসির বাণ ডাকে। ইহানীং কালের মধ্যে নির্মল হাসির প্রবণ ছোটোনা এমন বাংলা ছবি বড় একটা দেখা যায়নি। যদিও ও-সিকে নিয়ে আগাগোড়া ঠাট্টাই একমাত্র উপজীব্য।

কম্পনের ছোট গল্প দ্বি সংস্করণ অবলম্বনে পাকালক অরাক্ষ মধ্য-পাখ্য ঘটনাবলী কিসে নিছক হাসির হয়েছ দুটিতে কুঁতরের পরিচয় দিয়েছেন। চমক ধরবার মত শিল্পসৃষ্টি নয়। কিন্তু অস্বাভাবিক ধোলাউপভোগের ব্যবস্থার পরিচালক রণজাল এমন কতকগুলি মুহূর্ত

# আপনার বাচ্চাকে দেখুন



সেতে



বাড়কে



খেলতে

## সেরেলাক -এর সাহায্যে

বাচ্চাদের জন্য পুষ্টিগুণে  
ভরপুর সিরিয়েল ফুড।  
দুধ, চিনি... আর  
আদর ভালবাসায় ভরপুর।



এটি বানানো কত সহজ—  
শুধু এটি জলের সাথে মিশিয়ে নিন।



সেরেলাক—  
কেটান জলে ঢালুন



মিশিয়ে গুলে নিন



এবার খেতে দিন

আপনার বাচ্চার বয়স কি ৪  
৪ মাস হয়েছে? তাহলে  
এখন ওর সর্বাঙ্গীন বিকাশের  
জরুরী সঠিক মাত্রায় সুস্থ  
দান্য শস্যের শক্ত আহার।

সেরেলাক—শিশুদের জন্য  
পুষ্টিগুণে ভরপুর শস্য আহার—  
দানা শস্য, মাল্টাইডার তুখ আর  
চিনির এক সুস্বাদু মিশ্রণ, যা  
আপনার বাচ্চার বাচ্চের জন্য  
প্রয়োজনীয় সবরকম  
পুষ্টিগুণ যোগায়।

- সঠিক সুস্থমাত্রায় ফ্যাট আর  
কার্বোহাইড্রেট থাকার দরুন  
আপনার বাচ্চা চলতে পারে।
- যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন  
থাকার দরুন আপনার বাচ্চা  
বাড়তে পারে।
- অতিরিক্ত পরিমাণে  
ভিটামিন ও আয়রন থাকার  
দরুন আপনার বাচ্চা  
খেলতে পারে।

**NESTLE**



নকরী দিয়ে অনিচ্ছা অংশ শেষ

মধ্যরাত্রে ও মধ্যরাত্রে গংকারির রসে  
ধর করে রাখিল এক মনোহরা  
রিক মেজাজ এবং এই মেজাজ  
গায়ে তে এক আশ্রয় প্রাপ্ত এনে  
রোঁছল। বলিষ্ঠ উপজা অংশের কাজ  
য়ে শেষ হওয়া চোগাশী তানকারি  
বোলকারির কাঠামো ও স্বরপ্রগতি  
ল যেমন উৎকৃষ্ট ধনিমাধুর্য ও  
ল তেমন চমৎকার। এত ভাল  
ন-তোড়া হালে বিলায়েৎ খরি কাছে  
শোনা গেছে।

তবলায় ছিলেন মহাপুরুষ মিস্ত্রী  
তাল্লী সঙ্গীত, ও নিম্নে অংশগুলি  
ত উৎকৃষ্ট হয়েছিল সেদিন। একবার  
তিন একটি ধের-ধের-কেটু বোলের  
তার বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে  
গায়ের খাঁ সেতারে এই বোল এবং  
তারের জবাব তুললেন— কেবল  
কারি-জাড়ির খন খন শব্দ দিয়েই  
উৎকৃষ্ট সুর সযোজন করে।

কিরতির পর শিল্পী সুরের বাদু  
রা পিলু-রাগমালা আওচার ও  
দলি তিনতালে নিবন্ধ পিলু গ  
জিয়ে শোনান—দলি দ্রুত এবং  
কটি অতি দ্রুত। এগুলিতে ছিল  
ফাশের দলি তান-তোড়া এবং  
য়েলা দ্রুত কালার কাজ।

## রবীন্দ্রসদনে ঠংরী

দরজাটা আয়োজিত এক ঘরোয়া  
গারে (১২ এপ্রিল) রেখা মৃদু  
বোর্ক উত্তর ঠংরী, দাদরা ও চোত  
রিবেশন করেন। আজকালকার ঠংরী  
নে বাজা অভ্যন্ত তজ্জি রেখা মৃদু  
ঠংরী মনে বাদ একটু, হকচকিয়ে যান  
গ হলে তাদের দোষ সেওয়া যায় না।  
গরশ, পুরোন্মে ঠংরী প্রায় খোলের  
চলই গম্ভীর এক যে উত্তর ঠংরী  
রবা মৃদুগী গান—অর্থাৎ গগণপং রাও  
গইয়া সাহেব ও মৈজাদিন খাঁ প্রচারিত  
দনারসী ঠংরী—তা অপেক্ষাকৃত ধীর-  
তিস্পন্দ এক স্বরপ্রধান। স্বরপ্রধান  
রনে এতে স্বরের এক প্রাধান্য থাকে—  
আলংকারিক স্বরশব্দের প্রাধান্য দেখা  
গায় না। কাজেই এতে জমজমা, মুড়িক  
ও গিটাকির স্বরবাহারও কম।

বড় মোতি কাঁই-এর যে ঠংরীটি  
দিয়ে রেখা মৃদুগী তার আসর শুর  
করেন—পিলু তোরি তিরিছ নজর  
লাগে মোরে—তাতে সার্বিক বানারসী  
ঠংরী সব লক্ষণই পরিষ্কারভাবে  
পাওয়া গেল। এটির বোল-আনাও ছিল  
ধীর, শিথল এবং খোলের বড়তর মতই  
চলত। স্বরের বাহক ছিল প্রধানত  
মুড়িক বা জমজমা প্রায় ছিল না।  
গানের মজা আসছিল মুড়িক ও কথার  
দল শব্দ বাণীর অংশ বিশেষের বিভিন্ন  
স্বরের নকশার ভিতর দিয়ে ঘোরাফেরা  
কয়েকটি মধ্যস্বরের কোলাতানও শোনা  
গেল এক অংশে—খোলা থেকে সত্য  
প্রকৃতিতে সার্বিক বানারসী ঠংরীতে  
খোলাজগত কতখানি ভিন্ন তার লক্ষণ  
হিসেবে এগুলিকে ধরা যেতে পারে।

আসরের শেষে জোয়ালা-কালোড়া  
আশ্রিত 'জোকারি সবারিস' গানটিতেও

সঙ্গে সঙ্গে কিছু আলংকারিক  
আলংকারিত কাজের বাহারও ছিল।  
একটি কাহারো বাঁধা লখনেই হোরি  
ঠংরীও ছিল আসরে এবং এই  
অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতির ও ছন্দপূর্ণ  
গানটিতে চমৎকার পাচিনো খেল-বানও  
শোনা গেল। দ্রুত তিনতালে নিবন্ধ  
একটি খাঁটি ঠংরী উত্তর গরনও শোনা  
গেল। 'কাহেকো ডরে আজ তু'। বৈচিত্র্য  
পূর্ণ সুরের কাজের এক জায়গায়  
স্বন্দরভাবে পুরীয়া-ধানেত্রী রাগের  
বাহার হয়েছিল। এর লিঙ্গ অংশ  
দাদরায় গাওয়ার কেস একটা দোলন  
সৃষ্টি হয়েছিল এবং শেষাংশে সাহানা  
ও বাহারের বাহার হয়েছিল নিপুণ-  
ভাবে।

এগুলি ছাড়া আসরে ছিল  
একটি বং তালে বীধা চৈতি, একটি  
পঞ্চমসে গারা আশ্রিত ধারা—কাহে  
মারে নজরীয়া ও বলদেভ রচিত এক  
কাজের। চৈতিতে পুরানো উত্তর প্রদেশ  
লোকগীতির কিছু জিনিস ও পুরুর  
কৌশল নানা রঙের নকশার এক অতি  
আনন্দদায়ক মিশ্রণ লক্ষ্য করলাম।  
রয়ের আনগোনা ছিল অতি  
সুপারকাল্পিত। এক একটা রাসের  
থেকে চকিত এক একটা স্বরসমষ্টি  
আমদানি করা হয়েছিল—কিন্তু কখনও  
একটা পুরো রাগ এসে পড়ছিল না।  
দরজাটিতে উচ্চাশের কথার ছন্দ-  
ভিত্তিক পুরুর, পঙ্কজ বিস্তার ও  
আলংকারিক বোলতানের কাজ ছিল।  
কাজের বোল বানওয়ের রাসের  
শিল্পবোধপূর্ণ মিশ্রণ অতি আনন্দ-  
দায়ক হয়েছিল। পিলুর পটভূমির  
উপর শিল্পী কখনও আশ্চর্যভাবে  
মূলতানি ও ভৈরবী মিশিয়ে গাইলেন  
অবার কখনও একটু পরজ বসন্ত  
জুড়ে ছিলেন সুন্দরভাবে।

## নীলম গুপ্ত

## রবীন্দ্রসদনে গানের আসর— 'প্রেম' পর্যায়

অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে কবে  
কখন একটুখানি পাওয়া সেইটুকুতেই  
জাগরণ দখিন হাওয়া—তিন দিনের  
এগার মে, তিরিশ মে এবং আট  
জুন) প্রেম পর্যায়ের গানের আসরের  
প্রায় প্রতিদিনের সামগ্রিক অভি-  
জ্ঞাতকেই যেন সজ্জিত করা হয়েছে এই  
কাল দলি। রবীন্দ্রসদনের রবীন্দ্র  
রসমাধবের শ্রোতৃমণ্ডলীর এ কথা  
নিশ্চিত মনে হয়েছে এবার। প্রচুর  
শিল্পী প্রচুর গান। কিন্তু আবহনের  
দিক থেকে অধিকাংশই যেন গাঢ়  
পাণাঘমুরিত সুন্দরী, কচিৎ দৃ-চার  
জন দখিন হাওয়া পেরেছেন জাগতে।  
কচিৎ দৃ-একজনের গান শুন মনে  
হয়েছে—প্রেম এসেছিল, নিঃশব্দ  
চরণে।

বস্তুত 'প্রেম' পর্যায়ের প্রথম  
আসরের সূচনার প্রথম গানই  
লক্ষ্যমূলক কণ্ঠে 'গীতিবিতান' গোষ্ঠী  
'অনেক পাওয়ার' নির্বাচিত করে  
দৃষ্টিগতির পরিচয় রেখেছেন। শ্রবতীর  
গানেও ছিল এই অবস্থা কাটিয়ে  
দেখানোর চেষ্টা—গানের ডালি ভরে

যে গো'। কিন্তু নতুন পাড়ার গান  
সেভাবে আর শোনা হল কই। রবীন্দ্র  
কলুর অমন সুন্দর নৈপুণ্য, কিন্তু  
'তোমারেই করিয়াছি জীবনের দুঃখতার'  
যখন গাইলেন, তখন মনে হল, গায়ক  
দিক থেকে সুমিমা সেনের উপদেশেই  
যেন কালিটি নিবেদন করলেন তিনি।  
কী অবিকল অনুকরণ। কিন্তু করজাই  
যত্নে ধামেন, 'ওরে যায় না কি জানিমা'  
মনে হল—নরন নর, কণ্ঠই তার খেঁজে  
বেড়ছে যথার্থ গমকী, কিন্তু ঠিকানা  
পায়নি এখনো। সুমিমা সেনের মনের  
মাঝে কী গান বেঁচেছিল জানি না,  
কিন্তু তার নিবেদনে এ-দিন স্ফুল্ভ  
ছিল কম। প্রভাত ভক্তির ভাণ্ডা  
আধুনিক। গায়কী চৌধুরীর কণ্ঠিত  
কণ্ঠের মনে বাঁধ ফুটল কুসুম।  
অসিরক প্রায় বাসরে রূপান্তরিত  
করেছিল। গীতা মাইতি এসে প্রথম  
জানালেন—'পুরোনো জানিয়া' তাকে  
অঙ্গ অনা মনে গ্রহণ করা উচিত  
হবে না। এবং সত্যিই এই উত্তর  
প্রমাণ রাখলেন তিনি। জীবিতকে  
জয় করে, পুরাতনকে ভাগ করে।  
চির-নৃতনের সুদ বড়ো অনায়াসে  
সঞ্চারিত করলেন এবার গীতা মাইতি।



## গীতা মাইতি

আসর ঘন হয়ে এল তার শ্রবতীর  
আসর—কেহ কারো মন বন্ধ না'—তে।  
প্রার্থনা ও বিবাহ, প্রাক্তি ও সব  
হারানোর লক্ষা ধরা পড়ল অথ-  
জালিয়া। সঙ্গে অমল দেবের তর-  
লানাইও যেন গলা মিলিয়েছে এই  
গানে। জরন্তী পুরকায়স্থ ছিলেন  
পুরুর শিল্পী। পরিচ্ছন্ন, কোমল করে  
গাইতে পারেন। মুগাঙ্ক সরকারের  
বলিষ্ঠ কণ্ঠ ও শিখিত গায়কী  
প্রশংসনীয়। কিন্তু 'প্রেম' পর্যায়ের  
গানের বিষয়ভারময় অতি তার প্রথম  
নিবেদনে ফুটল না। মোর স্বপন-  
তরায় বরং বোঁশ মানসই  
লেগেছে। গীতা সেন পরিগত  
ভাণ্ডাতে শোনালেন 'প্রেম এসেছিল'  
ও মনে যে আশা লয়ে। শ্রবতীর  
গানটি তার কণ্ঠে অতিরিক্ত  
মত্তা ও বজ্রনা পায় যেন। রুমা  
বাশপুত্তর গানে দমের ক্ষুধি ছিল  
না এবার। শিখা বসুও নিজের ডাব-  
মুঠির কাজে এবার স্ফাণ। পরিচ্ছন্ন,  
কিন্তু নীরব। সুদ সেনপুত্তর পরি-



## শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

বেশনে শ্রবজেন মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব  
প্রকট। সুমিমা রায় 'অনেক কথা বলে-  
ছিলেম' এ-বে অভিব্যক্তি তুলে ধরলেন  
জ্যেষ্ঠ মতো পরিগত শিল্পীর  
কাছেই প্রত্যাশিত কিন্তু বড়ো  
বেদনার মতো-র বড়ো উচ্চারণটি  
কড়াই সফিস্টিকেটেড। হেনা সেন-এর  
বিরহ মধুর হল খোলামেলা, 'না  
চাইলে যাবে-তে কণ্ঠবিপর্যয় ঘটেছে।  
তুবার ভক্তির যে কণ্ঠস্বর সুন্দর,  
গমকী পরিগত, বোকা যায়। এও  
যোঝা যায় যে, এদিন তিনি কণ্ঠ নিয়ে  
বেশ বিবর্ত ছিলেন। তবু আমর  
পরান লয়ের মুড়িকে ঠিকমতো  
ধরতে পেরেছিলেন তিনি। মেখলা  
দলগণ্ডে এবার নিজের সুনামের প্রতি  
উত্তর দিয়েছেন। আসরে শেষ  
কাজও ছিল জড়নো। আসরের শেষ  
শিল্পী চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় 'নিশি না  
পোহাতে' গানে প্রমাণ রাখলেন, কাব্য  
গীতিতে তার দাপট এখনো কত  
উজ্জ্বল। 'কাছে ছিলে, দূরে গেলে'তে  
অভিব্যক্তি করলেন চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়।  
গানের অস্তলানি মুড়িকি খোসা  
ছাড়িয়ে শব্দের মতো তুলে ধরলেন  
তিনি। অনবদ্য ভাব ও মেজাজ ছিল  
এই গানে। কিন্তু অনুবোধ তাঁকে  
বিহ্বল করল, করল বিপর্যয়ময়ী,  
'তোমার শেষের গানের' গাইলেন,  
গাইলেন প্রেমের আসরে 'পূজা' পর্যায়ের  
'এখন আমার সময় হল'। কথার দিক  
থেকে মোহ তাঁকে পেয়ে বসেছিল  
সন্দেহ নেই। এও সন্দেহ নেই যে,  
গলা নামিয়ে, চড়িয়ে, ফিসফিস করে  
জনপ্রিয়তার চটুল অঙ্গগুলিকে মোহ  
গানে বাহার করলেন তিনি। নিজের  
পুরনো ভাবমূর্তির হাতে সাম্প্রতিক  
পরিগত দক্ষতাকে কলেন বিপর্যস্ত।  
'প্রেম' পর্যায়ের শ্রবতীর  
আসরটি ছিল ৩০ মে সম্পন্ন। আগের  
দিনের মতো এ-দিনও পছন্দ ময়র  
ময়রী। রবীন্দ্রটি আবার সপজ্জ।  
সপজ্জ ময়রী কোন শেখ পাওয়া  
যায় রবীন্দ্রসদনের মণ্ড সঙ্কটকাই  
জানেন। এদিন উপোধন সঙ্গীত  
গাইবার কথা ছিল গগত্যন্তিক লেখক-  
শিল্পী-কলাকুশলী সম্মিলনীয়। তাঁরা  
আসেন নি। কেন যে এই অপ্রেম,  
রবীন্দ্রসদনও জানাননি। এক আসর  
শুরু করলেন দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলসঙ্গকে অশ্রুত থেকেছে তাঁর কণ্ঠ। পরবর্তী শিল্পী মঞ্জুরী ভৌমিক। হারমোনিয়াম কিণ্ঠে উচ্চকিত, দুটি গানের মধ্যে 'না বলে যায়' মোটামুটি। চিত্রা রায় 'একদা তুমি প্রিয়ে'তে মনো-গ্রাহী, 'কী সুর বাজে'র স্কেলটি চড়া লেগেছে। শক্তিরত দাশের কণ্ঠ ভালো, কিন্তু অভিব্যক্তি নয়। 'চলজ তব'র শুরুরূপে হেঁচট খেলেন। অনুরোধা মঙ্গলতাম্রের 'আজি গোখলি-লগনে' চলনসই, দ্বিতীয় গানের, 'শেষ বেলাকার' নির্বাচন ভালো, নিবেদন জমজম। উম্মা'লা বসু প্রথম গাইলেন, দুটি গানেই ছিল সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি। কৌশিকী মজুমদার ও উম্মা চট্টোপাধ্যায় ছাপ রাখতে বাধ্য। ছন্দা দাশগুপ্তের নির্বাচন এবং নিবেদন দুইই প্রশংসনীয়। জয়তী ঘোষ-এর 'বড়ো বিস্ময় লাগে' কৃতিত্বপূর্ণ পরিবেশন। অর্ঘা সেন খুবই সংযত মাত্রার পরিবেশন করলেন 'তুমি সখ্যার মেঘমালা' এবং 'পূরনো জানিয়া'। অসামান্য 'অর্বোর অজা' হয়ে উঠল দুটি নিবেদনই। সম্ভাব্য সেনগুপ্তকে বহুকাল বাদে পাওয়া গেল রবীন্দ্র সঙ্গীতের আসরে। নিজস্ব ঐক্যে উজ্জ্বল তাঁর কণ্ঠের 'তুমি কোন ভাস্করের' এবং 'ফিরে এসো বন্ধু হে'। বুলবুল সেনগুপ্তর শান্ত লাবণ্যময় কণ্ঠ 'আকাশে আজ' এবং 'ও চাঁদ' কৃষ্ণিকর পরিবেশন। সিন্ধা ঘোষ সবল প্রেমের গানের পক্ষে হয়তো বা অতিরিক্ত, সবলতা তাঁর কণ্ঠে,



#### স্বপ্না ঘোষাল

কিন্তু নিখুঁত তাঁর নিবেদন। সুশীল মল্লিক 'আমি কেবলই স্বপ্ন'তে স্পষ্টতই লক্ষ্যভ্রষ্ট, কথা এবং সুর দুয়েরই গোলমাল ছিল, কিন্তু চমকে দিলেন 'কে মেতেছিঁস আয়ের হেথায়'। দারুণ জমজমাট নিবেদন দ্বিতীয় গানটি। বিভা সেনগুপ্তের 'আজি দক্ষিণ পবনে' দূরই নির্বাচন, কৃতিত্বপূর্ণ পরিবেশন। স্বপন গুপ্তের 'হার অতিথিতে যে প্রত্যাশা সত্তারিত, 'আমায় কী বেদনা'য় তা অপূর্ণ থেকেছে। মায়্যা সেন-এর 'অবগ রে' এবং 'অনন্ত সাগরমাকে' পরিণত গায়নভঙ্গির দুলভ নিদর্শন। বিশেষত প্রথম গানের উচ্চারণ শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত।

প্রেম পর্ষদের তৃতীয় ও শেষ আসরটি ছিল ৪ জুন সকালে। উত্তর-সারথি গোষ্ঠীর সম্মেলক সঙ্গীত আরম্ভকে রঙীন করে তুলেছিল। নবনীতা চক্রবর্তী একক আসরের সূচনায় যেটুকু রেশ রেখে গেলেন, তা পুরোপুরি বিপর্যস্ত হল অগ্নিমা মল্লিকের নিবেদনে। 'শিশু মহলে'ও এমন গান অচল। মাধব মিত্রর চিন্ময়ীচরিত গায়নভঙ্গিতে 'সোনার মগ' ধরার আশা যে দুরাশা। বোকা গেল। মধুমধবী ভট্টাচার্যের 'কী রাগিনী' এবং 'আমার প্রাণের পরে' গান দুটিতে শিক্ষিত গায়কীর চিহ্ন ছিল। পূর্বা দাম এসে আসরের মেজাজ প্রতিষ্ঠা করলেন। 'নাই বাঁধ বা' এবং 'কেহ কারো মন বুকে না' বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ ও অভিব্যক্তিপূর্ণ নিবেদন তাঁর। বীরেন ঘোষ নতুন, কিন্তু মর্যাদা আদায় করে নিলেন 'মনে যে আশা লয়ের সতাল পরিবেশনে। কণ্ঠ এবং গায়কী দুইই সুন্দর তাঁর। দ্বিতীয় গানেও নিতুল প্রমাণ ছিল। 'জ্ঞা বিস্ময় ভালো গেয়েছেন 'কোন সে ঝড়ের ডুল'। উত্তরা চট্টোপাধ্যায়-এর শিক্ষার ছাপ এবং নাভাসেন-এর ছাপ একই সঙ্গে ফুটে উঠল তাঁর নিবেদনে। অমরেশ দাশ-এর দুটি গানই মোটামুটি। শ্যামপ্রী দাশগুপ্তর নিবেদনও উদ্ভীর্ণ। মহাবেতা গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আমি রূপে তোমার' এ একপ্রশ্রুতির পরীক্ষা ছিল,

সাজাব না ফুলের হারে—'সাজাব না' অংশে যেন সাসপেন্স ফোটেলে তিঁনি। স্বর্ধনযোগ্য মনে হয়নি। 'ওহে সুন্দর মম' ভালো লেগেছে। কানাই ঘুগোপাধ্যায়-এর গান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, ভুলে যাওয়া বসন্ত থেকে অনেক দিনের মনের মানুষ পঞ্চজ মল্লিকের বিশিষ্ট ধরনটির সঙ্গে নতুন করে পরিচয় ঘটলেন তিনি তাঁর ঐতিহাসিক গায়ন-ভঙ্গিতে। স্মৃতিরামাণ্ডে উল্বেল করে দিচ্ছিল তাঁর কণ্ঠের 'আলা যাওয়ার' এবং 'সেই ভালো'। মঞ্জুলিকা ভাদুড়ীর রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসরের জন্য আলাদা শিক্ষা রয়েছে মনে হল না। মণিকা গঙ্গোপাধ্যায় 'ভয় করব না'তে মোটামুটি, 'তুমি একটু কেবল'—এ ছাপ রাখতে পারেননি। অরবিন্দ বিশ্বাস দুটি গানই—'হে নিরুপমা' এবং 'এমন দিনে তারে'—বেছেছিলেন জম্জটি, জম্জয়ে সোয়ে-ছেনও এবার। বিশেষত, এমন দিনে তারে।' স্বপ্না ঘোষাল কোনোদিনই ধারাপ গান না। নিজস্ব একটি মান বজায় রাখেন। কিন্তু ভ্রম যে তিনি পরিণতি পাননি, ইদানীং সে প্রমাণও স্পষ্টতর হয়ে ধরা পড়ছে। এবারের নিবেদনের মধ্যে কেবল তুমি আসবেতে তিনি যেমন সজীব, আজ যে বঙ্গনী যাত্রতে তেমনই হাহাকারময়। নিখুঁত কাজ, নিপুণ অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল দুটি গানেই। আর অবাক করেছেন এদিনের শেষ শিল্পী শ্রীহরম চট্টো-

**মুন্সীবান গ্রন্থ**  
রম্যা রলার

দুই বোন ৭.৫০      ভারতবর্ষ ৩৫.০০  
সুদুরের গিয়াসী ১১.৫০      জবারণ্য ৮.৫০  
ইড কুরুর      হাইনৎস লাইপমান-এর  
**মাদাম কুরী**      অগ্নিগর্ভ ৮.৫০  
ডঃ মূলকরাজ আনন্দের  
কুলি ৮.৫০      দুটি গাটা একটি কুঁড়ি ১.৫০  
অক্ষুণ্ণ ৫.০০      দরাজ দিল ১.৫০ (যন্ত্রস্ত)  
ম্যাকগিম গকীর      প. লাকনিৎস্কীর  
ক্রিম সামধিন ১৫.০০      পামীরের মেয়ে বিশো ১.৫০  
এডগার সোঁর  
**চীনের আকাশে লাল তারা** ৩৬.০০  
চীনের দীর্ঘায়ত সাংস্কৃতিক বিপ্লব ১৫.০০  
প্রমোদ সেনগুপ্তর  
**কালান্তরের পথিক রম্যা রলার** ১১.০০  
**নীলবিজ্রোহ ও বাঙালী সমাজ**  
র্যাডিক্যাল বুক ক্লাব (প্রকাশক)  
৩ বারিস চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

**স্কটিশ চার্চ কলেজের দেড়শো বছর পূর্তি স্মারক**  
আলোক রায়ের

**আলেকজান্ডার ডাফ ও অনুগামী কয়েকজন**  
একশো বছরে ছয়জন ধর্মপ্রচারক জ্ঞানতপস্বীর আত্মিক কর্মকৃতিত্ব কীভাবে একটি প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক আসন পেলে বাঙালীর জীবনে, তারই অবিভাঙ্গ্য ইতিহাস। এদেশের মনন-ইতিহাসের এক নতুন ও অনালোকিত অধ্যায়। ১৮

**ABU SAYEED AYYUB'S TAGORE'S QUE**  
With Ayyub's contributions Tagoreana has entered the truly modern phase. While relieving him from the crucifix of so-called modernism, Ayyub has discovered the roots in Tagore that still retain his relevance even to-day. Rs. 30.00

**কুমার রায়ের 'তিলোত্তমশিল্প' ১৫**  
অর্থাৎ নাট্যাভিনয়। তারই প্রাসঙ্গিক সমস্যা

**বদরুদ্দীন উমরের**  
**সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা ১২**  
একটা সময়ে সাম্প্রদায়িকতার মূল রূপটি ছিল ধর্মীয়। রাজনীতির খেলায় ক্রমে অর্থনৈতিক ও শ্রেণীগত বৈষম্যকে ব্যবহার করে কীভাবে গড়ে তোলা হয় এক কৃত্রিম সাংস্কৃতিক ব্যবধান তারই অনুপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

**প্যাগিবাস ১। ২ গণেশ মিত্র লেন। কলিকাতা ৪**

পাখায়। 'প্রকৃতির আসরে অনুপস্থিত ছিলেন তিনি, প্রেমের আসরে জন্মের তুললেন শব্দ' থেকেই। 'হেলারফলা সারাবেলায় উদাস মেজাজ অপরূপ লাবণ্য ধরা পড়ল তার কণ্ঠের রোমান্টিক উদ্ভাসে। আমার মনের কোণের বাইরেতেও ছিল একই উদ্ভাস সূরের চঞ্চলতাময় আভাস। রূপের ঘোষের সঙ্গতও ছিল দারুণ প্রাণময়। নিরেক্ষে ছাপিয়ে তোলা নিবেদনের জন্যই সেদিন একের পর এক অনুরোধ আসতে লাগল প্রোডাক্টম্যান কাছ থেকে। শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় কৃত্যের গনটি ধরলেন কেন বাজাও।' ফের-র প্রশ্নটিকে চমৎকার স্টেস দিয়ে প্রাথিত রসের উন্মোচন ঘটালেন। চতুর্থ গানেরও প্রবল অনুরোধ ছিল। কিন্তু তার আগেই নেমে এল পর্ব। বিস্মৃত প্রোতা এবং শিল্পী একই সঙ্গে যদি ছেঁবে থাকেন, 'হায় একী সমাপন'—দেখ দেওয়া যায় না।

**প্রথম মূখোপাখ্যায়**

ফোটা : সুরী চট্টোপাধ্যায়

### শূভেন্দ্রম

কালো পর্দার উপর লাল লেখাটি তত স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রসদনে দিলীপ রায় পারচয় করিয়ে দেবার পর যখন সম্মেলক গান আরম্ভ হল, তখন গানের মধ্য দিয়েই বাংলা গানের একটি শব্দ সূচনা ঘটল। প্রচলিত এবং প্রথাসম্ম অধুনিক গানের বন্ধাভূমিতে একটি নতুন আন্দোলনের সূচনা অক্ষরিক অর্থে। তাই 'শূভেন্দ্রম' শব্দ ইংগিতের আর এক নাম।

সম্মেলক গানগুলির কথা ও সুর জটিলেশ্বর মূখোপাধ্যায়ের। কথা ও সুরের মধ্যে সেই পৌরুষ যা সাম্প্রতিক বাংলা গানে অনাবিষ্কৃত অথবা অপ্রস্তুত। 'ছড়িয়ে রয়েছে কেন/কোটি কোটি তারা ছড়িয়ে রয়েছে কেন/এক-বার হলে জড়ো/আলোর প্রতি-যোগিতার/তোমরা সূরের চেয়ে বড়।' এই গানের আত্মদান বা 'কখন যদি আস/কিছু চেষ্টা নিয়ে এসো/মিথো ফাগুন করাতে হবে' গানের বাঁধন সঙ্গীতকার অনেক দিন শোনা যায়নি। গানগুলির কথা ও সুর বিবাহিত (ভিজডারের সম্ভাবনাই নেই)। কণ্ঠ সমাবেশে দুটি আছে—বাসু, ব্যারিটোন বা টেনর অর্থেই। এত সুন্দর গানে হার্মনিজেশন নেই বললেই চলে। সবচেয়ে বড় কথা গানগুলির জন্য কোরাস অপরিহার্য নয়—একক গাইলেও চলে। যথার্থ কোরাস গান ওখনই হয়ে ওঠে যখন কোরাস না থাকলে ফাঁকা লাগে। তবু আমাদের শাসক দেশকো বোশ, হয়তো এই ব্যবসায়ী যুগে তাঁদের প্রত্যাশা কম।

এই দিনের সূর্যর, অনুষ্ঠানে কোন সাড়া জাগানো শিল্পী ছিলেন না কিন্তু গান ছিল। অর্থাৎ মল্লরের উপাসনা ছাপিয়ে নববংধানার রাজকীয় দণ্ড প্রকট হয়ে ওঠেন—একটি বিরল ঘটনা। অনুষ্ঠানের আবৃত্তিকার ছিলেন পাথ ঘোষ, গৌরী ঘোষ এবং



জটিলেশ্বর মূখোপাধ্যায়

শিল্পী পরিচিত মেজাজের অনুষ্ঠান করলেন। কিন্তু অন্য কয়েকজন শিল্পী যারা তত পরিচিত নন অথবা প্রচার দাক্ষিণ্য যাদের প্রতি কৃপণ ভারী প্রোতাদের সংখ্যাকে সুরশীল করে তুললেন। গোপা কাজলালের কণ্ঠ অসম্ভব তৈরী। রাগাভিত্তিক গানে তার পারদর্শিতা অনস্বীকার্য। যদিও এই আসরে তাঁর গানের থেকে জনকর্তব্য প্রধান হয়েছিল বেশী। তাঁর গানের থেকে অলংকার চমক লাগায় বেশী। ঘোষ দিলীপ ঘোষ ঠিকই বলেছেন, বাংলা চলচ্চিত্রে এমন গায়ক অভিনেতার খুব অভাব। সমস্ত মূখোপাধ্যায় সেই জগতে একটি উজ্জ্বল বাস্তবত্ব। তাঁর ভরাট কণ্ঠস্বরে একটি অকৃত্রিম মেজাজ আছে যা শব্দ রূপালী মধ্যদার ভাঙে কাটে না—গায়ন ভাগ্যেই স্বমহিম। এইদিন সংগীতানুশংগের জন্য তাঁর কিছু অস্বস্তি ছিল, কিন্তু ভ্রমশ তিনি নিজের দাবিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলেন। জানা গেল পরিবেশিত গানের অনেকগুলিই বিভিন্ন সূত্রে তাঁর নিজের গাওয়া। অর্থাৎ গানের জগতে তাঁর পদক্ষেপ আরম্ভ হয়েছে। এই যাত্রারম্ভে তাঁকে সুরর গায়কের দেওয়া ভাল—আশ্চর্য কণ্ঠের অধিকারী সমস্ত মূখোপাধ্যায়কে আরও নিভর হতে হবে। নিভর, কিন্তু অকুতোভয় নয়।

মাধুরী চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি রেকর্ড আছে। সবকটি গানই মধ্যদা-বাহী। অথচ অজানা কারণে তিনি ততটা প্রসারিত নন। এই দিনের আসরেও যে কবিতার গীতিরূপ বা গানগুলি তিনি শোনালেন তাতে বোঝা যায় সঙ্গীতের সেই শিক্ষা তাঁর কাছে—যাতে শিল্পীকে কোন এক জায়গায় স্থগণ করে রাখে না। সব ধরনের গানই তাঁর অনায়াস নৈপুণ্য। বাংলা গানের দৃষ্টান্ত সূর্যমার মিত্র—তাঁর যথোচিত মধ্যদা পেরুনা। এই আসরে রাধাকান্ত নন্দীর তবলার দাপটের সহযোগিতা (?) সত্ত্বেও যে গজল বা নজরুল-গীতি তিনি গাইলেন তাঁর পাশাপাশি অনেকেরই নিপুণতা। তবু সূর্যমার মিত্রের রেকর্ডের সংখ্যা অল্প বলে গণ্যে লক্ষ্য হয়। এই প্রসঙ্গে অসুরের আর এক শিল্পীর কথা মনে আসে—জটিলেশ্বর মূখোপাধ্যায়। জটিলেশ্বর মূখোপাধ্যায়ের কথা ও সুর

অবাক তারায় মত। সুরারোপিত কয়েকটি জনপ্রিয় গানই তখন উদাহরণ। কিম্বদন্তি! তাঁর নিজের গানও অনেকদিন রেকর্ড হয় না। অথচ রেকর্ড পরিত্যক্তগালি নাকি নানা ধরনের পরীক্ষার উৎসাহী এবং নানা চরনের চাপলাই নাকি সম্মিলিত সেতু। একোন সকাল? যা রাতের চেয়েও অন্ধকার? মল্লিশব মূখোপাধ্যায় সেদিনের আসরে সবাইকে নড়া দিয়েছেন গভীরে। তিনি গাইলেন 'আমার স্বপন কিনতে পারে, এমন আমার কই?/আমার জলছাঁবতে রঙ মেলাবে এমন আবার কই?' সত্যিই তাঁর স্বপন কেনার সাহস কোন আবার কিদেশী কোম্পানী বা জলছাঁবতে আবার মেলাবার শিল্পবোধ কোন দেশী রেকর্ড কোম্পানীর নেই।

দেখাশিস লস্কর

ফোটা : সুরী চট্টোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃত

নৃত্য

### দুটি গীতিনাট্য

রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা : 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'কালমগ্না' যে উৎসাহে লিখাছিল, সে উৎসাহে আর কিছু রচনা করি নাই। ওই দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটি উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে।' এই দুটি গীতিনাট্য সম্পর্কে বলেছেন, 'গানের সূত্রে নাটকের মতো।' আরো বলেছেন, 'একটা দম্পত্যভাঙা গীতি-বিষয়ের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা।' নাট্যের অভিনয়ে আমিই প্রধান পদ গ্রহণ করিয়াছিলাম।' সব দিক থেকে এই গীতিনাট্যভিনয় তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রসদন-আয়োজিত রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানে এই দুখানি গীতিনাট্যের অভিনয় সূচীভূত হয়েছিল।

কালমগ্না প্রযোজনা করলেন : সুরতাল ২২ মে সম্পাদ্য। প্রথমেই গীতিনাট্যটিকে নৃত্যনাট্যরূপে পরিবেশন করে এঁদের ক্ষমতার সীমাকে যেমন প্রকট করে তুললেন তেমন রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সম্পর্কে অকারণ তুল ধারণার সহায়তায় স্বতী হলেন। সমস্ত গীতিনাট্যটিকে নৃত্যনাট্যের আশ্রয়ে অর্থাৎ নেপথ্যে সঙ্গীতের মাধ্যমে কাহিনী বর্ণনা এবং মঞ্চে নৃত্যের ছন্দে চরিত্রগুলিকে উপস্থাপিত করার নিম্নসঙ্গেই গীতিনাট্যের মূল স্মার থেকে বাস্তব করা হল। স্পষ্ট উপলক্ষ্য করা গেল এখানে প্রযোজনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষারতনের ছাত্রছাত্রীদের যত সন্দেহ সুরোগ্যমান এবং সেই সূত্রে ত্রোতার আসন পূর্ণ করা। হয় তো সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে কিন্তু তাতে প্রযোজনার মান কিছুমাত্রও উন্নত হয় নি। এমন কি নান্দীদামী কিছু শিল্পীর নাম যুক্ত করেও তা করা যায় নি। প্রায় শিশু থেকে শব্দ করে বিভিন্ন বয়সের অসংখ্য বনদেবীদের সৃষ্টি করা। সিন্ডিকেটের অধিনায়ক



বাল্মীকি প্রতিভা

উদ্বোধন অনবদ্য রাজা দশরথের ভূমিকায় সাধন গৃহের অভিব্যক্তিহীন নৃত্যভিনয় নিশ্চয়। কিছুকালের ভূমিকায় বামগোপাল ভট্টাচার্যের অভিনয় আত্মশয্যা দেবে দৃষ্টি; আর অন্ধমূর্খের ভূমিকটি তো শব্দ ভট্টাচার্যের অভিনয়ে কবু রসের পরিকল্পিত হাস্যরসের সৃষ্টি করেছিল। মঙ্গলজা, আলোকসম্পাত, সাজ-সজ্জা সবই ছিল অত্যন্ত সাধারণ মানের।

বাঁচিক্রম ছিল সংগীতশিল্প। গানে সর্বক্ষেত্রে প্রাথিত নাটকীয়তা বজায় না থাকলেও অধিকাংশ গান সুশ্রাব্য হয়েছিল। এ কথা অবশ্যস্বীকার্য। গান গেয়েছিলেন শ্বিজেন মূখোপাধ্যায়, তুষার ভল্ল, কমল গুপ্ত, ধ্রুব বিবাস, কন্যা মল্লমদার ও নিখাদা ঘোষ। সংগীত পরিচালনা : সিন্ধ্যা ঘোষ। নৃত্য পরিচালনা : সাধন গৃহ। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ছিলেন ডঃ নীহারকণা মূখোপাধ্যায়।

বাল্মীকি প্রতিভা প্রযোজনা করলেন : সুরী। সাত জন সংখ্যায়। গীতিনাট্যের যথার্থ রূপবিকাশে যে দীর্ঘ অনাশ্রয় ও প্রস্তুতির একান্ত প্রয়োজন, নির্দিষ্টাধার সঙ্গীতের করণে হয় এই প্রয়োজনের তার বাঁচিক্রম লক্ষিত হয়নি। এবং একেই সংগীত ও অভিনয় উভয় বিষয়ে যে সমান গুরুত্বপূর্ণ তা পরিচালক উপলব্ধি করেছেন বলে বার বারেই প্রতীয়মান হয়।

দম্পত্যদলের সম্মিলিত গান ও অভিনয় সমস্ত প্রয়োজনটিকে প্রশংসিত ও আকর্ষণীয় করে তৈরী। এর সঙ্গে যুক্ত হয় বাল্মীকির ভূমিকায় অশোকতরু কোম্পাধ্যায়ের দীর্ঘ অভিনয়। তাঁকে এই ভূমিকায় যেমন মানিয়ে যায় তেমনই বাল্মীকি ও গানের মাধ্যমে চরিত্রটিকে যথার্থ মণ্ডনা অরোপ করতে তিনি সক্ষম হন। কেবল দু-একটি কথা বলতেই হয় : প্রথমার্ধে অভিনয়ে বাল্মীকি তার নিজের অভাব পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয়ার্ধে তাই ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। অর্থাৎ 'শ্যামা একা ছেড়ে চলেছি' মা' গানটির সঙ্গে অভিনয় সূচনোদন নম। কুলিবার, ভূমিকার প্রীতির চোখের পিঠিতে কণ্ঠের গানই নাগ-রাসের উজ্জলতা, গানের অভিনয়ে

তিনিটি ক্ষেত্রে নৃত্যভাণ্ডার অঙ্গ সন্ধ্যালন আভির্ভাব মনে হয়। প্রথম দম্পত্য ভূমিকায় দীপেন মনোপাধ্যায়ের জড়ত্বের অতিপ্রাণিত আনন্দময়। একটি কথা তাকে কেবল মরণ করিয়ে দিতে চাই—বাস্তবিক প্রাণের প্রথম দম্পত্য কায়মগরন বিদ্যাক নয়, শিল্পীর দম্পত্য ভূমিকায় রবীন্দ্র বসু সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। লক্ষ্মীর কণ্ঠের গান আরো উজ্জ্বল মানের হওয়া একান্তই প্রয়োজনীয়। গৌরী ঘোষের লগ্নময় কণ্ঠ সরস্বতীর অবাঞ্ছিত দৃষ্টি সংবরণে। দেবতার মনোপাধ্যায়ের বসু সঙ্গী, তাপস সেনের আনন্দময়তাও এক ভি বাজসরায় ফটোগ্রাফির পরিচালনা এই প্রচেষ্টায় বিশেষ মত আনন্দ করে।

প্রসঙ্গতঃ কয়েকটি লক্ষ্য : বন-দেবীর সংখ্যা এবং নৃত্যের সময়সীমা সংক্ষেপ করা যায় কি? বনদেবী, লক্ষ্মী, সরস্বতীক বহুগুণে আলো-আধারের মতো বসায় যায় না? সরস্বতীর প্রথম আভিভাবের সময় সংক্ষেপ করা একান্তই প্রয়োজন—তেমনি লক্ষ্মী সরস্বতীর পরসঙ্গতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া। আর ক্রৌঞ্চ বধের প্রেক্ষাগেই বাস্তবিকভাবে নিষেধ প্রতিষ্ঠা করা উচিত। উজ্জ্বল হওয়া একান্তই আবশ্যিক। বিলম্বিত দৃশ্যটি নাটকীয় মহাভারতের সৌন্দর্য্য হারায়ে। প্রসঙ্গক্রমে যে কয়েকটি কথা বলা তা সবই প্রয়োজনের উত্তর মনে

পরিপ্রসিক্তে। এই সব ছোটোখাটো চুটি সন্তু ও গাঁড়িনাট্য বাস্তবিক প্রতিভা রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের অন্যতম স্রষ্টা প্রযোজনা। নৃত্য পরিচালনা : পিয়ালী রায় মহাশয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অশোকভট্ট, কল্যাণাধ্যায়।

### দুটি নৃত্যনাট্য

#### চণ্ডালিকা ও শ্যামা

রবীন্দ্রসদন আয়োজিত রবীন্দ্র জন্মোৎসবে 'চণ্ডালিকা' ও 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হল যথাক্রমে এগারো ও একত্রিশ মে সন্ধ্যায়। সারা বৎসর-ব্যাপী রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য-গুলির প্রযোজনায় যে রীতি এই দুটি প্রযোজনাতেও তার বিশেষ কোনো ব্যতিক্রম ছিল না—অর্থাৎ কিছু নাট্যী দম্পত্য গায়ক ও নৃত্যাশিল্পীকে একত্রিত করে একটি অথবা দুটি মহড়ার পরই অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই প্রযোজনার কোনো নির্দিষ্ট মান রক্ষিত হয় না। সৌভাগ্যবশত এই দুটি প্রযোজনায় অত্যন্ত মহড়ার সংখ্যা নিম্নতর কম ছিল বলে মনে হয় না।

চণ্ডালিকা প্রযোজনা : দ্বিবর্ণী। সমগ্র প্রযোজনা বিশেষ করে নৃত্যভাণ্ডার ছিল অত্যন্ত উচ্চমানের। প্রকৃতির ভূমিকায় রোমাঞ্চের অসামান্য দক্ষতার স্মৃতি করে তেলেন। তার নৃত্য-কুশলতায় এবং অভিব্যক্তিতে। চরিত্রটির



শান্তি বসু ও রেখা মৈত্র

মর্ম উপলব্ধির স্বাক্ষর রেখেছেন প্রায় প্রতিটি নাট্যমহড়ায়। সব শেষে 'দুটি' হতে তুলি লও অমায়িক পূর্ণা-লোকের নৃত্যাভিনয় যেমন দর্শকনন্দন তেমনই হৃদয়স্পর্শী। সমান যোগ তার নৃত্যের মাধ্যমে মায়ের চরিত্রটি ফটিকের তুলেছিলেন আরতি মল্লমদার—চরিত্রটিতে তিনি তার ব্যক্তিগত আবেগ করতে পেরেছিলেন বলেই চরিত্রটির সার্থক হয়ে উঠেছিল। আনন্দের ভূমিকায় শান্তি বসু যথার্থ সংযত ও সংবেদনশীল। সম্মেলক মতো িল সযত প্রস্তুতি। নৃত্য পরিচালনায়

জাগ্রত ছিল সৌন্দর্যবোধ সেজন্য নৃত্য পরিচালক শান্তি বসু অবশ্যই ধন্যবাদার্থ।

মণীতাম নৃত্যভাণ্ডার তুলনায় ছিল নৃত্যের প্রকৃতির গানগুলি কেবলমাত্র ইন্দ্রাবতী সেনের কণ্ঠে সুরময়্য হলেও প্রকৃতির গান টা নাটকীয়তা, যে গভীরতা, যে অনুরূপ তা তার কণ্ঠে ছিল অনুপাশিত। অসুখের সেন তবু লগ্নময়মান কণ্ঠে মায়ের গানগুলি গেয়েছেন—তার গম্ভীর কণ্ঠের সহায়তা অত্যন্ত প্রকট। অর্থাৎ সেন তার মধুর গম্ভীর কণ্ঠে আনন্দের গানে সহজেই মনোবোধ্য করেছেন। অন্যান্য গানগুলি অনুরূপ। সম্মেলক গানে প্রাণের পূর্ণতা অর্জন করেছেন। মণীতাম পরিচালনা ও সঙ্গীতা সেন। মঞ্চসজ্জা আলোকসম্পাত সবদিক মিলিয়ে সমগ্র অনুষ্ঠান সূক্ষ্ম পরিচালনায় অমিল সেনের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

শ্যামা প্রযোজনা : দ্বিবর্ণী। শেওড়ালিকা এই প্রকৃতির প্রযোজিত নৃত্যনাট্যের প্রযোজনার রীতি সম্পর্কে বলকালের মতো প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিচালনার মতো—প্রাথমিক সময় প্রকৃতির প্রসঙ্গ। দলপত্নী উপলব্ধিতে প্রকৃতির নিম্নতর হৃদয় প্রকাশ করেছেন। কেবল প্রযোজনা বিদ্যাক চমক সৃষ্টির পরিকল্পনা প্রকৃতির নিবন্ধিত, একটি উদাহরণ শ্যামা সহচরীর কণ্ঠে গৌরবের আধিক্য সার্থক ও বসু দীপেন শান্তি গানের মতো

কিশোরদের জন্য বিশেষ সংযোগ। ২০% বিশেষ ছাড় উইদ অমিলক চক্রান্তী বর্তক অনুবাদিত ও সম্পাদিত

## বিশ্ব-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ

কিশোর গল্প-সংগ্রহ ১মঃ অংশ ২০%

ডঃ প্রবরজন হোস

নিবেদিতা প্রজ্ঞাপারমিতা ১২

সমগ্র প্রকাশিত গ্রন্থ

শক্তি চট্টোপাধ্যায় চলে। বেড়িয়ে আসি ১২

১মঃ অংশ প্রকাশিত হল।

সজীব চট্টোপাধ্যায় অ্যাকোয়ারিয়াম ১০

পিকেশোর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত হল

অজলি চৌধুরী

শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১৬

ডঃ জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

মানব-সভ্যতার ধ্বংস কি আসন্ন?

এক বিতর্কমূলক প্রশ্নের বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা ১৫

১মঃ অংশ প্রকাশিত হল। ২মঃ অংশ প্রকাশিত হল।

## প্রকাশিত হইল ফবিফাব্যোপোধ্যাবিগ্ন প্রজ্ঞাপারমিতা বড়ুয়া

রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্র নিবন্ধে প্রকাশিত হইল। ১মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ২মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৩মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৪মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৫মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৬মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৭মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৮মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৯মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ১০মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ১১মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ১২মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ১৩মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ১৪মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ১৫মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ১৬মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ১৭মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ১৮মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ১৯মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ২০মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ২১মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ২২মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ২৩মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ২৪মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ২৫মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ২৬মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ২৭মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ২৮মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ২৯মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৩০মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৩১মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৩২মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৩৩মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৩৪মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৩৫মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৩৬মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৩৭মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৩৮মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৩৯মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৪০মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৪১মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৪২মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৪৩মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৪৪মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৪৫মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৪৬মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৪৭মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৪৮মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৪৯মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৫০মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৫১মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৫২মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৫৩মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৫৪মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৫৫মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৫৬মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৫৭মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৫৮মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৫৯মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৬০মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৬১মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৬২মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৬৩মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৬৪মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৬৫মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৬৬মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৬৭মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৬৮মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৬৯মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৭০মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৭১মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৭২মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৭৩মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৭৪মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৭৫মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৭৬মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৭৭মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৭৮মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৭৯মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৮০মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৮১মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৮২মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৮৩মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৮৪মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৮৫মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৮৬মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৮৭মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৮৮মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৮৯মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৯০মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৯১মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৯২মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৯৩মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৯৪মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৯৫মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৯৬মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৯৭মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৯৮মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ৯৯মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ১০০মঃ অংশ প্রকাশিত হইল।

এখন রবীন্দ্রনাথের আর একটি নতুন জীবনচরিত, যা আগে লেখা হয়নি।

সমগ্র বোর্ডে বাক্যই মুদ্রণ করেছেন মোড়া ক্রিষ্টাইন মাইজে ডেভসারও বেশী প্রকাশিত হইল।

পুস্তক  
বিশ্ব

১মঃ অংশ প্রকাশিত হইল। ২মঃ অংশ প্রকাশিত হইল।

এল দম্পতির নৃত্য পরিচালনা—  
যেমন অবিশ্বাস্য তেমনই অমার্জিত।  
তার ভূমিকায় সুমিত্রা মিত্রের নৃত্য  
মন ছন্দাময় তেমন সমগ্র নৃত্য-  
টা তিন একটা গতি সঞ্চারিত করে  
ন অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে। বলক  
হুসেন-এর ভূমিকায় নরেশকুমার  
মিখাংশ সময়ে কেন যে শব্দটির  
ধাগা উন্মুক্ত করে মধ্যে আন্তরক  
বজিলেন তা বোঝা দুঃসাধ্য। তবে  
তো সুমিত্রা মিত্রের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে  
মতা রক্ষা করতে না পাবলেও একটি  
নৃত্যের মান বজায় রাখতে শিল্পী  
বিন্দু সচেতন ছিলেন এবং অনেকাংশে  
ফলও। নৃত্যের যোগাটা সন্তো  
ভূমির ভূমিকায় অমল নিয়োগী  
মানান। এই বিস্ময়টি—অর্থাৎ নৃত্য-  
পরিচালকের দৃষ্টিতে যে একান্ত  
বস্তুপ্ৰিয়োগ্য হওয়া প্রয়োজনীয়—এই  
প্রথম শর্তটি আমবা অবহেলা করি।  
বহুরের রবীন্দ্রসদনে প্রসারিত নৃত্য-  
টাগলিতে এই বক্তাবের সৌন্দর্যভার  
দাশন প্রভূত পরিমাণে পাওয়া  
গেছে।

নৃত্যনট্যের প্রাণ ছিল শামার  
নে—আর সেই গান গেরেছিলেন  
বিশা। আর সত্য তালের শৃঙ্খলা  
জায় রেখেও গানে কথখানি নাট্যের  
সঞ্চারিত করা যায় আর সেইসঙ্গে  
নের সৌকর্য্যও ফুটিয়ে তোলা  
যা তা তিনি ব্যতিক্রম দিয়েছেন যা  
গণ্যে আনন্দদায়ক ও চমৎকৃতজনক।  
বয়েন মনোপাধ্যায় তাঁর স্বতন্ত্রতাব  
সিঙতে বক্তৃতাগানের গানগুলি পরিবর্তন  
কেন। সর্বভারত ভবের কণ্ঠে  
মুন্ডালের গান দৃষ্ট প্রাণবান। উভয়ের  
নিগলির প্রতি ধীরেন বসুর পক্ষে  
তথানি সৃষ্টি করার সত্যব তিনি  
করেছেন। সম্মেলক গানগুলি  
গীত। সংগীত পরিচালনাঃ সলিল  
গায়। নৃত্য পরিচালনাঃ নরেশকুমার।  
জ্যোতীন্দ্র

বিঃ স্বর্গীর চ্যাপ্টার

## সামান্য শিল্প সঙ্ঘঃ নাটক

### বিন্দুনটোয়াসব '৮০

অভ্যুপার রবীন্দ্রসদন কণ্ঠপক্ষে  
কেউ প্রস্তাব দেওয়া যেতে পারে।  
বিন্দু জন্মোৎসবের দীর্ঘ অনুষ্ঠান  
চীতে এবার নাটকের সংখ্যা মাত্র সাত  
নের হলেও, অন্যবাদের মত এবারেও  
পাঠ থেকে যায়। আগের মত  
বারেও হাস্যকর নাট্যপ্রযোজনা দেখা  
য়। সঙ্গীতের আসরে কিছু দূর্বণ  
বিশেষণ শোনা যায়, কিন্তু নৃত্যনটো  
এক প্রযোজনাও নিয়মবদ্ধ  
নের ক্ষেত্রে শুনছি এ বছর অভিনয়ের  
লক্ষ্য ছিল, বাছাই করে নির্বাচন করা  
গেছে। নাটকের ক্ষেত্রে এই রকম অভিনয়  
বাবস্থা করা অসম্ভব। কিন্তু  
রকম নিয়ম করা যেতে পারে, অবশ্য  
কনটি অভিনয় আগে হয়ে থাকলে  
যেই রবীন্দ্র জন্মোৎসবে অংশ গ্রহণ  
করা যেতে পারে। (সেই তিনটি  
নট্যান সম্পর্কেও খোঁজ নিতে হবে)  
প্রাপ্ত সকল উপরি পাওনা মনে



কর্তব্য ভূত

নাটক নিয়ে স্টেজ রিহাসাল দেন। এই  
নিয়মে হয়ত রবীন্দ্র নাটকের চর্চা বেড়ে  
যাবে—হয়তো নতুন পথ খুলে যাবে।  
নির্বাচনের ব্যাপারে খুব খারাপ ভাবে  
বলতে গেলে পেড়িগ বিচার করতে  
হবে—অর্থাৎ প্রযোজক বা প্রযোজক  
সংস্থার রবীন্দ্র ভাবনা এবং প্রযোজনা  
চিন্তা। একজন রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ মাঠে  
নিপুণ প্রযোজক নাও হতে পারেন।  
আবার একজন নামী প্রযোজক বা  
সংস্থা রবীন্দ্র ভাবনার মর্মনিসারী হয়ে  
প্রযোজনাকে বিপণ্যমাকী করতে পারেন।  
আমার যেমন ভাবনা যদি কেউ আপাত  
ভালেন, তবে এই ভাবনা, স্বপক্ষে  
প্রচুর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—  
এমনকি এ বছরের অনুষ্ঠান থেকেই।

সাম্প্রতিক কালে যে শিল্পটি সব  
চেয়ে নতুন ভাবে পরীক্ষিত এবং আবি-  
ষ্কৃত হয়েছে, সেটি আবৃত্তি। আবৃত্তি  
শিল্পীরা নতুন নতুন পরীক্ষায় তৎপর  
এবং নির্ভাবান। বিভিন্ন কাবের নাটকীয়  
পাঠের পর দেখা যাচ্ছে গদ্য রচনা পাঠেও  
তাদের কৃতিত্ব কম নয়। শব্দ, মাত্র ব্যঞ্জন-  
গত সুনামটাই মূলধন নয়। যে পরিপ্রাণ  
এবং অনুভূতিতে রবীন্দ্র জীবনকে  
শিল্প করে তুলতে অংশ গ্রহণকারী  
নট্যকর্মীরা বাধ্য হয়েছেন—সকলকে  
অবাক করে দিয়ে সেই অভিজ্ঞত নিষ্ঠাব  
ফল আবৃত্তিকারক অর্জন করেছেন।  
সমকাল প্রযোজনা করলেন চার  
অধ্যায়। অনেক নাটক থেকে এই নাটকীয়  
পাঠে অসুবিধা ছিল। গতবার 'শেষের  
কবিতা' যেমন নজির স্থান—সমকালের  
চার অধ্যায় পাঠের সময় স্বভাবতই এ-

কালের স্মরণীয় নাট্য প্রযোজনা চার  
অধ্যায়ের স্মৃতি তুলনায় প্রসঙ্গ  
করবেই। কিন্তু সমকাল সময়ে প্রভাব-  
মূল হতে পেরেছেন। হয়ত এই সচেতন-  
তার জন্য বিচ্যুতিও ঘটে যায়। মৃত্যুধার-  
এর অংশ প্রদীপ ঘোষ যেমন নির্দিষ্ট  
ভাবে দায়িত্ব পালন করে যথার্থ সূত্রধার-  
ধর্ম পালন করেন—দেবদত্তাল বন্দো-  
পাধ্যায় মাতারমণী-এর ভূমিকায় মাঝে  
মাঝে তাঁর নিজস্ব পরিচিত ভীষণ  
মধ্যে ঘরপাক বান। আবার অনেক সময়  
তিনি যথোচিত ব্যক্তি আরোপ করেন।  
এই বিষয়ে পার্থ ঘোষ নিজেকে সম্পূর্ণ  
ভাবে ভেঙ্গে নতুন ভাবে প্রতিষ্ঠিত  
করেন। মৃত্যুধার চক্রবর্তীর নাটকের প্রতি  
অনুগতা বেশি, যেটা এখানে একটু  
বেসুরো লাগে। বিপরীত ভাবে অতীত-  
এর ভূমিকায় অশোক পাঠিত  
নাটকীয়তাকে বর্জন করতে গিয়ে পৌরী  
ঘোষের এলায়া পাশে নিঃপ্রাণ হয়ে  
গঠন। এই রচনা পাঠে অত্যন্ত  
কৌতুহলী করে রাখেন পৌরী  
ঘোষ। তবে এই প্রসঙ্গে  
একটি কথা। পৌরী ঘোষ প্রতিটি বাক্য  
কবিতার সময়ও একটু ঢোক গিলে  
বলেন—যেটা সম্পূর্ণ সময়ের আবৃত্তিতে  
বিশেষ মাধ্যম আনে। কিন্তু এই দীর্ঘ  
রচনা পাঠে এ ভাষা মানসিকজম-এর  
দায়ভাগী হতে পারে। সম্পাদনার আর  
একটু লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল। কণ্ঠ-  
গুলি পরিচিত হয়ে যাবার পর সত্র-  
ধারের 'অতীত বলল বা এলা হাসল'  
বাহুল্য বোধ হয়। এই নাটকের সঙ্গীত  
সম্পাদনা করেছেন সৌমিত্র চট্টো-  
পাধ্যায়—এই নতুন ভূমিকায়ও তিনি

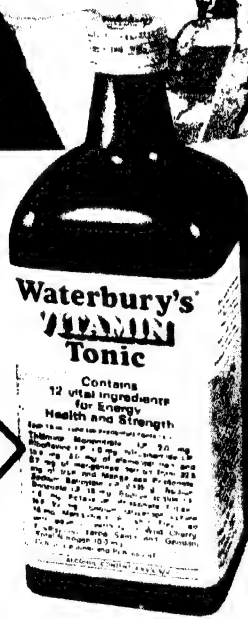


নাথকোচিত স্মার্টনেস দেখিয়েছেন।  
অপরিচয়ের চমক আনতে অনেক ক্ষেত্রে  
যেমন মাত্র-এর সঙ্গে মিলে যায়, বহু  
ক্ষেত্রে জবজবিত বোলেও বোধ হয়। তা  
বতের পাঠের সঙ্গে মিলে যায়  
পদ্যায়ের স্মার্টনেসের মত, কিন্তু, খুব  
শোভন, সংযত সঙ্গীতী আলোচ-  
সম্পাত। দীক্ষা প্রাণী অভিনয় করলে  
নট্যের পূজা গানে তাঁদের উত্তরায়  
করা। সূত্রধার গান গাইলেই তাঁরা  
স্বচ্ছন্দ কিন্তু অভিনয়ে কখনই বদা  
যাবে না, তাঁরা পাঠাংশ শেষ করে প্রজ্ঞন  
হয়েছেন। অথচ দীক্ষা এক সময় নাট্য  
প্রযোজনায় সচেতন ছিল। লোকেশ্বরবীর  
ভূমিকায় এলাক্ষী রায় গলায় সাত্ত্বজীর  
দাপট আনেন কিন্তু হাত দুটো নিচে  
খুঁই মূর্খাঙ্গল পড়েন। প্রত্যেক কথা  
বলেন একই গাইনে দাঁড়িয়ে কোরান  
গাইবার ভঙ্গিতে। প্রকাশ প্রস্থানের  
কোন যথানির্দিষ্ট বিধি নেই। রচনা  
গঠাকুরতা সঙ্গীত পরিচালনার  
নট্যের পূজা নারিকের বাইরেও অনেক  
গান জড়ো করেও নাটকের বিশৃঙ্খল  
সহায্য হয় না। দুইশের সময় এসরাজ  
যেমন ঘরানার স্মৃতিতে কিতার করে—  
রাষ্ট্রবিলকের সময় পাচকালন কিস্তি  
কোলাহল শব্দই জোড়াতালি। উপল-  
লগীর ভূমিকায় বসুধা গণোপাধ্যায়।  
তাঁর আড়ম্বর্তার জন্য করুণাই পেতে  
পারেন—সহানুভূতি নয়। বিশেষত হত্য  
কাণ্ডটি যখন ছেলমানুষীর জন্য হাসি  
খোঁক হয়। এই নাটকে ব্যক্তিগত নন্দার  
ভূমিকায় পূর্ণাঙ্গের। অস্বত স্বচ্ছন্দ  
সংলাপ উচ্চারণ। শ্রীমতীর ভূমিকায়  
শিপ্রা সারা গানকেই তুরঙ্গের তাল  
করেন। আমার ক্ষমতা হে ক্ষমতা গানটি  
সম্পূর্ণ না গেয়ে একই স্তবক বাক্যের  
গাওয়ায় চরমকণ্ঠটি কখনই আরম্ভক  
গেটে না। নাট্যানুষ্ঠানের আর একটি  
আসরে দীক্ষা প্রাণী সভাসভায় গান  
করেন। প্রত্যেকের একখানা দুখানা একক  
ও সম্মেলক গানে অংশ গ্রহণ করেন—  
খাতা বা কাগজ দেখে। কাল্যাতনে  
হারমোনিয়াম বাজান না হলেও প্রজ্ঞনীর  
হারমোনিয়াম ব্যবহার করেন। দু-একটি  
একক এবং কয়েকটি সম্মেলক এতদ-  
সত্ত্বেও বাহবা দেওয়ার মতো।

খুব ভাল লেগেছে শান্তিনিকেতন  
অন্য গোষ্ঠীর ডাকঘর। এই নটকে  
কোন চরিত্রকে সরেলা আবৃত্তি যেটা  
প্রাইই রাষ্ট্রবিলক বলে মরাদ্দ পাওয়ার  
চেষ্টা করা হয়। প্রসঙ্গ করিনি, আবার  
কেউ প্রথমে নাটকীয়তার আলোচনা  
করিনি। এই জন্যই অশোক ঘোষ, বিষ্ণু-  
কিঙ্গ রায়, মণীশ দেব, মঙ্গল চক্রবর্তী  
আটপোরে হয়ে দক্ষকে অমল ভাবনার  
শরিক করে তুলতে পারেন। আরও এবং  
কনট সঙ্গীত গানসমূহ করে। স্বর্গীর  
ভূমিকায় সারস্বতী গদ্যে চমকে  
দেওয়ার মতো আর অমলের ভূমিকায়  
সুনীলজিৎ সিংহ সূত্রের অভিনয় করলেও  
মাইকের জন্য তাঁর অনেক কথাই দূর-  
শ্রাব্য হয় না। শান্তিনিকেতন অয়ন  
প্রাণভরে শিল্প সৃষ্টি করেছেন কিন্তু  
যান্ত্রিক অনভিজ্ঞতাই তাঁদের আলা ও  
বাকের ক্ষেত্রে বহু গুরু নীতিম। যেমন  
নাটকের আগে ছোট নৃত্যানুষ্ঠান  
শ্রীমতীরবক্তব্য-এর গানবন ৯৮ ৭২৫



সদা প্রাণোচ্ছল...



হলফে  
লেবেল  
দেখে  
জান।

## এর জন্যে চাই ওয়াটারবেরীজ<sup>®</sup> ভিটামিন টনিক

কথায় বলে স্বাস্থ্যই সম্পদ। আর যাদের তা আছে—  
তাদেরই দিনগুলি হাসিখুশিতে ভরে থাকে। আপনিও আপনার  
পরিবারের সবাইকে সদা সুস্থসবল রাখুন—এক সহজ উপায়ে!  
নিয়মিত ওঁদের ওয়াটারবেরীজ ভিটামিন টনিক খেতে দিন।  
কারণ, এ এক সম্পূর্ণ টনিক, আপনার আহারে যে পুষ্টির অভাব  
থাকে, তা পূরণ করে। স্বাস্থ্য আর শক্তির জগে একান্ত প্রয়োজনীয়  
সমস্ত ভিটামিন আর খনিজপদার্থই এতে আছে। সুস্থ রক্তের  
জগে আয়রণ, ক্ষিদে বাড়ানোর জগে বিশেষ উপাদান আর  
নিমেষে শক্তি যোগানোর জগে মল্ট! খেতেও দারুণ ভালো!  
ওয়াটারবেরীজ ভিটামিন টনিক—আপনার একান্ত প্রয়োজনীয়  
যাবতীয় পুষ্টিগুণে ভরপুর!

সারা পরিবারের জন্যে সম্পূর্ণ টনিক  
ভিটামিন, যমিউপদার্থ ও আয়রণময়

লিনটাস-WVT.1-2415 BG

দর আকর্ষণের নির্দেশক প্রদর্শনী।  
এর সুরেলা আবৃত্তি। কোল  
ধাক্কায় ল্যাবরেটরি একমাত্র নিষিদ্ধ  
কৃত্রিম নাটক। এই দুঃস্থ হোতা  
পর নাট্যরূপ নিয়ে নিরমিত প্রযো-  
জার সাহস একটি ক্রান্তিময় প্রচেষ্টা।  
মল গম্ভীর এর আসেও রবীন্দ্র নাটক  
প্রকাশ করেছেন নিরমিত ভাবে।  
দবে ল্যাবরেটরি বিশদ ভাবে দেখা  
। ওঠেন—এই নাটকের বিস্তারিত  
প্রাচীনা পরে করা হবে। রামধন  
হাজির ডায়েকর বালি একটি সুন্দর  
সব নাটক। প্রায় আড়াই তিন ঘণ্টা  
র উপর গম্ভীর ভাবে যে কথাকাণ্ড  
কে দর্শক তাকে সরবে সহজে উপ-  
গ করছেন। শিল্পীদের অভিনয়  
ধরেছেন। মস্তুর ব্যবহার দেখে  
স্বাভাবিক। ঘর বাহির সব একাকার।



কলীর পুরা

নি পী ডি ত, নিষ্পবিত জনতার  
পরিচিত ভূমি দিয়েই কাজ সহজ করে  
তোলা যায়। জোহন দাস্তিদার অভিনয়  
প্রযোজক—তাই প্রথম থেকে কম্পা-  
জিশন বা সংলাপে বৈচিত্র্য আনতে  
পারেন—তাই প্রথম চমকটা যে মুগ্ধ  
করে সে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাব  
মানসিকতা। সেই নিজের একাকার  
নাটক নিয়ে আসা হয় তখন সুখ্যা  
পথ হারায়। কবিতার অংশগুলি  
নেওয়া হয়েছে গীতবিতানের কিছু গান  
থেকে এবং সম্ভারিত বহুপাঠ্য কবিতা  
থেকে। আবৃত্তিও খুব কাঁচা। অর্থাৎ  
হাতের কাছে যা পাওয়া গেছে তাই  
দিয়েই দায় মেটানো। মগ্ন পরিকল্পনা  
খুব সুন্দর। অবশ্য (পার্থ সেন) এমন  
উপদ্রব এবং শব্দ প্রকল্পণ আতঙ্ক  
বিস্তার করে।

রপ্পা মগ্ধ কয়েকজন গুগারা।  
এই উপন্যাসের নাট্যরূপ নিশ্চিতভাবেই  
কম্পনা এবং অভিনয়যোগ্য। কিন্তু  
নাটক তো অভিনয় রচনা নয়  
যেখানে পরিচালকই মধ্যস্থ। গোরা  
উপন্যাসের নাট্যীয় সমাপ্তি অনেকটাই  
বিময়—নাটকে সেই বিস্ময়কে আরও  
ঘনীভূত করা দরকার। সম্পাদনায় নিম্ন  
না হলে সেই বিরাট ঘটনাপ্রবাহ স্পষ্ট  
হতে বাধ্য এবং শিল্পীরা অভিনয় না  
হলে প্রযোজনা পাপ হতে বাধ্য।  
নির্দেশক সুরত মথোপাধ্যায় অনেক  
বিস্তারিত পরিশ্রমও মূল শর্ত



কলীর পুরা

চার্শক সম্প্রদায় প্রযোজনা করলেন  
তারা ভূত। নাট্যরূপ ও পরিচালনা  
জন দাস্তিদারের। এ নাটক ভূত এক  
ক্যাত দুইই। রবীন্দ্রনাথ যে ভাবনা  
জ আকারে রেখেছিলেন—কোনদিন  
ভাবা ছিল ভবিষ্যতে রীতিসম্মত  
চলবে তার বাঁজট, কুই থাকবে?  
ফলত হয়ে উঠবে না? রবীন্দ্র-  
নাথ যে হোয়ালাই নাটক আছে  
গলে কোনক্রমেই নাটক নয়,  
করে ইশারা। কিন্তু সংলাপের যে  
দ্রুতচমক, সম্প্রসারণ সেই চমক  
হতে গেলে যে মনোমীমান দরকার,  
ই রচনাশক্তি অনেকটাই অনাবস্থ।  
নিপুণ প্রযোজকও শেষ পর্যন্ত  
যে ব্যাধি হন—রবীন্দ্রনাথের নাটক  
গলের বাইরে। অনেক জোটগল্প বা  
থকার সম্প্রসারণ লিপিকা কারো  
জনাত্যরূপ এই বিভ্রান্তির দিকার  
। কতটা ভূত-এর প্রযোজক ততক্ষণ  
সেই পান না—বতক্ষণ না কবিতাকে  
। কবে তোলা যায়। এতে সুবিধা  
হ—স্যাটারায়ের অংশ শেষ হলে,  
তৌয়ার্থে নাব্যে সমকালীন জোত-

থেকে কিছুত হয়েছেন। সুরত  
মথোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গির  
আধুনিকত্ব অনেক জায়গায় প্রযোজনার  
বিরোধচারণ করেছে। সেটের বদলে  
স্লাইড ব্যবহার কোন মাত্রায় যোগ  
করেন। করণ ডাক আউটের পর  
সামনের আলো জ্বলে ওঠার পর ওই  
স্লাইডগুলি যখন নিঃপ্রভ হয় তখন  
ডায়েকর পক্ষে বিরক্তিকর। যতট  
ফিল্মের ব্যবহার। নাটকের ঘটনা তুলে  
উঠলে কোন কোন সময় ফিল্ম নাটকের  
গতি আনে, কিন্তু গোরা নাটকের  
বিভিন্ন অভিব্যক্তির ফিল্ম চর্চাচারে  
কাজে লাগলেও নাটকে বিপরীত ফল  
দেয়। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও  
নির্দেশক সম্পাদনায় নিম্ন হতে  
পারেননি। উপন্যাসে বিরাট অজগর  
পরিমাণ, ব্যাপ্তি অবাক করে—নাটক বা  
ছোট গল্পে বন-হরিণীর চর্কিত  
চমকেই অভীষ্ট সিঁধ। গোরা উপ-  
ন্যাসের প্রায় সব ঘটনাই এখানে  
সংকীর্ণতর অভিনীত, অভিনয়েও  
সকলে শক্তমান নন। প্রত্যেকে কথা  
কলে একই লাইনে দাঁড়িয়ে। একজন  
আধুনিক প্রযোজকের কম্পোজিশন  
সম্পর্কে এত নিষ্কলতা অভাবকীয়,  
অভিনয়ে কোন ব্যালান্স নেই—অনেকে  
ভাল অভিনয় করলেও সহশিল্পীদের  
জনা ক্রমশ মিথিয়ে আসেন। উৎসবে  
“ডাকঘর” নাটকে শিল্পীশিল্পী থেকে  
সকলেই মগ্ধ গান করেন—অনেক সময়  
খালি গলায় নাটককে ভারিয়ে  
তোলেন। আর “গোরা” নাটকে  
শিল্পীরা মাইক নিয়ে অভিনয় করলেও  
গানগুলি প্রত্যেক—অনেক যন্ত্র নিয়ে।  
পরের অভিনয়ের মত (এবং এখানকার  
ব্যায়োশ্কেপ জাতীয় চর্চাচারেও)  
শিল্পীরা একা থাকলেও গানের সময়  
কল-দলগল বেজে ওঠে। একজন  
আধুনিক প্রযোজক এই পুরোন  
ব্যাকথাকের সময় বিশেষে স্বাভাবিক  
জানান।

অনন্ত কলকর  
ছবি : পি এন কানারাজি

### নকশাল আন্দোলন :

চারগদলের সমীক্ষণ  
রাজনৈতিক নাটকের সংজ্ঞা কি  
হওয়া উচিত—এমন একটি প্রশ্নের

এ পর্যন্ত আমরা পাইনি। ফলত,  
এর ব্যাধি চলছে পশ্চিমগতবোধ এবং  
ব্যক্তিগত রাজনীতিক অগ্রহ ও  
অনীহার ভিত্তিতে। বত বড় রসবেস্তাই  
হোন শিল্পীজ্ঞান বা বিচারে এর  
প্রভাব এড়ানো দৃশ্যকর। এমন অবস্থায়  
রাজনীতিতে নিমোহ শিল্পের শূন্য-  
ব্যায়োশ্কেপ পজারীও এটা নিশ্চয়ই  
স্বীকার করবেন যে, শিল্প নিয়ে রাজ-  
নীতির তুলনায়, রাজনীতি নিয়ে  
শিল্প করটা অধিকতর কামা। কারণ,  
নিশ্চিতভাবে ডা কল্যাণমূলী।

‘নকশাল আন্দোলন তার  
সমীচতা ব্যর্থতা আশ্চর্য্যকর এবং  
‘আজ্ঞাজ্ঞান’ এই শিরোনামায়  
‘চারগদল’ তাদের বর্তমান প্রযোজনায়  
সে চেটেই করেছেন। এখানে  
একটি কথা উল্লেখ করতে হচ্ছে,  
প্রাগুক্ত শিরোনামটিকে প্রচলিত  
আজ্ঞাজ্ঞান কেউ যেন নাটকের নাম  
বলে ভুল না করেন। আসলে বিষয়-  
বস্তুকে সামনে রেখে প্রযোজনাটিকে  
চিহ্নিত করা হয়েছে মাত্র, নাটকটির  
‘ব্যায়োশ্কেপ নামকরণের’ দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট  
নাট্যকার এক্ষেত্রে দর্শকদের হাতে  
অর্পণ করেছেন। এর পেছনে যদি



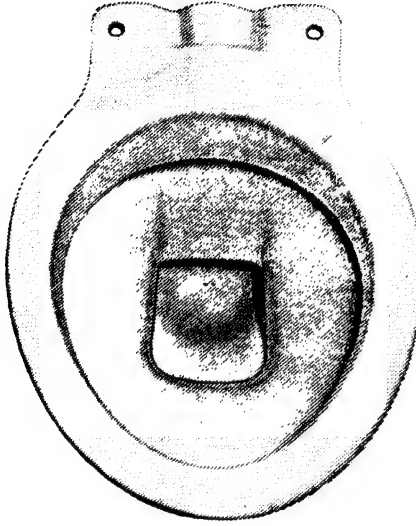
কোনো মতলবও থাকে তবে তাতে আর  
যাই হোক, নাটকটির সঙ্গে দর্শকের  
সম্পর্ক ক্ষয় হয় না, বরং কিছু বেশি  
আশ্বিত করে। এবং এই আশ্বিত হবার  
সূচকই টের পাওয়া যায়, নাট্যকার  
অলক রায়চৌধুরী নাটকটি গম্ভীরে  
লিখতে পারেননি।

এই না-পারার কারণ, বাহ্যত,  
নাটকের সময়সীমার তুলনায় বিষয়-  
বস্তুর বাহুল্য। এছাড়া, বিশেষ একটি  
রাজনৈতিক চেতনার সপক্ষে মানস-  
বিবর্তনের আঁজ সমস্যাগুলো নাট্য-  
কার উপলব্ধি করেও, তার সূচক  
ব্যাখ্যা করতে পারেন না, কিংবা  
(হয়তো) পরিসরের কথা ভেবেই  
এড়িয়ে যান। ফলত, প্রোগ্রামিংয়ের  
জটিলতাগুলোকে যে সকল বহুভা-  
ষমী সংলাপ তথা আঙ্গিক সূত্রে  
স্বচ্ছ করতে চান তিনি, তাতে  
প্রকরণভরে অনেক ব্যস্তবিকটাই  
সম্ভব হতে পারে। বিভিন্ন চরিত্রের  
অস্থির বিকলরূপে ব্যক্তির তুলনায়  
আবেগগতি প্রাধান্য পায়।

প্রসঙ্গত সম্মীশ চরিত্রটিই ময়রগ  
করা যাক। পুলিশের হাতে চরম  
নিগহীত হয়ে সে এখন বলে খেতে :  
‘আমি এই মূহুর্তে আমার নিজের  
শক্তি সম্পর্কে বলতে পেরেছি’ তখন

अथ महाभाष्यम्

# আপনি কি আপনার পায়খানা সম্বন্ধে সামান্য লজ্জিত?



আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই  
নিজেদের পায়খানার হাল সম্বন্ধে  
বিত্রত বোধ করেন। বিত্রত বোধ  
করাই সবটা নয়। তার চেয়েও  
সামাজিক ব্যাপার হল :

নোংরা পায়খানায় রোগের  
জীবাণু জন্মায় আর সেখান  
থেকে রোগ সংক্রামিত হয়।  
ময়লা পায়খানা আপনার  
ও আপনার পরিবারের  
সকলের স্বাস্থ্যের পক্ষে  
বিপজ্জনক।

সেই জন্তে অবহেলা করবেন না।  
আপনি কি একেবারে নিশ্চিত  
জানেন যে, আপনার পায়খানা  
পরীক্ষার? রোজ সকালে মগর  
এলেও সে কি তার কাজ পুরোপুরি  
করছে? কিংবা তাড়াতাড়ি কাজ  
সেরে পালাচ্ছে? এসব ব্যাপারে  
আপনি আপনার বিন্দুমাত্র সন্দেহ  
থাকলে ব্যবহার করুন—  
স্যানিফ্রেশ।

স্যানিফ্রেশ—  
পায়খানা পরিষ্কার  
করার শক্তিশালী পদার্থ।  
স্যানিফ্রেশ ৩ ভাবে  
কাজ করে :

১. স্যানিফ্রেশ সব দাগ  
উঠিয়ে দেয়

স্যানিফ্রেশ আপনার পায়খানা পুরো-  
পুরি পরিষ্কার করে। এতে রয়েছে  
এমন জোরালাই পরিষ্কার করার  
পদার্থ যা খুব শক্ত দাগও নিশ্চিহ্ন  
করে দেয়। এমনকি মরচের দাগও  
উঠে যায়। ফলে আপনার পায়খানা  
পরিষ্কার হয়ে ঝকঝক করে।

২. স্যানিফ্রেশ রোগজীবাণু  
দূর করে

নোংরা পায়খানা সামাজিক  
বিপজ্জনক, কারণ সেখানে রোগের  
জীবাণু জন্মায়। সাধারণ 'ফ্লাইল'  
বা রক্ষা করতে পারে না স্যানি-  
ফ্রেশ তা রক্ষা করে—আপনার ও  
আপনার পরিবারের সকলের  
স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।

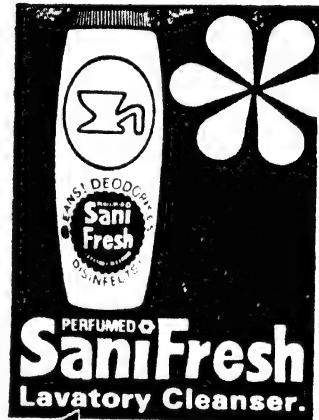
৩. স্যানিফ্রেশ দুর্গন্ধ  
দূর করে।

বিশেষ ক'রে যে পায়খানায় হাওয়া-  
বাতাস খেলে না সেখানকার দুর্গন্ধ

তো যেতেই চায় না। সেই জন্যে  
স্যানিফ্রেশ রয়েছে এমন অত্যন্ত  
কার্যকর দুর্গন্ধনাশক পদার্থ যা  
হাওয়া নির্মল ক'রে তোলে আর  
বদ গন্ধ দূর করে।

স্যানিফ্রেশ ব্যবহার করা  
খুবই সহজ

বিশেষ কিছু করতে হয় না বললেই  
চলে। প্রথমে পায়খানায় জল ঢেলে  
দিন। তারপর পায়খানার গামলার  
মধ্যে প্রচুর স্যানিফ্রেশ ছিটিয়ে দিন।  
৩-৪ ঘণ্টা ওই ভাবে রেখে দিন।  
আরও ভাল হয় একরাত রেখে দিলে।  
তারপর জল ঢেলে দিন। তাতে যদি  
তখন পরিষ্কার না হয় তাহলে  
এবারলি জল জোরে ঢেলে দিন।  
তারপর দেখুন আপনার পায়খানা  
কেমন ঝকঝক পরিষ্কার দেখাচ্ছে।  
স্যানিফ্রেশ কতবার ব্যবহার  
করা দরকার?  
নিয়মিত—প্রত্যেক দিন  
ব্যবহার করুন।



নকল হইতে সাক্ষান!  
প্যাকের ওপর

স্যানিফ্রেশ

নাম দেখে নিন।

এ হলো—বালসারার  
সেরা কোয়ালিটির গ্যারান্টি

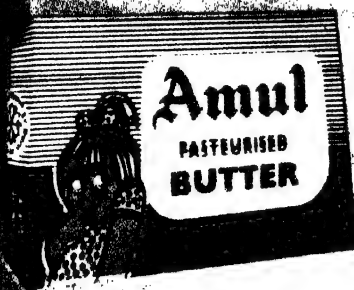
স্যানিফ্রেশ সব ময়লা দূর  
ক'রে আপনার পায়খানা  
পরিষ্কার রাখে।

**বালসারা**  
উন্নততর জীবনযাত্রার  
আধুনিক সহায়ক

BALBARA বালসারা ভারত কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড  
৩৩ এলিফান্ট রাস্তা, রাঁচি, গোয়া ৪০০ ০০১

CHAITRA-BLS-85 BEN REV

one for myself, one is for me  
and one is for none - one is for

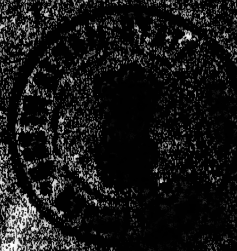


utterly butterly delicious  
**Amul**





643



# দেখ এল, মাগো ভোলটা!



নতুন স্বাদের  
এনেছে উপহার,  
জেলী আর  
কাস্টার্ড মজাদার!

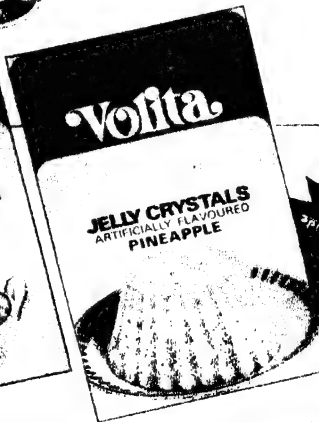


ভোলটা জেলী হ'ল যেমন স্বাদেভরা,  
ভোলটা কাস্টার্ড আবার তেমন মজাদার!  
এর স্বাদের মজা আলাদা আলাদা ভাবেই  
চাখুন বা দুটি একসঙ্গে, আর অথবা ফল,  
শুকনো মেওয়া, কেক আর আইসক্রীমের  
সঙ্গেই খান... করা যায় ১০১টি বেশী  
মুখরোচক স্বাদের জোড়ামল!

কাস্টার্ড  
ভিটারিন ভরা  
৬টি  
মনমোহনোপাদ

**ভোলটা**

জেলী আর ক্রিস্টালস  
ও কাস্টার্ড পাউডার

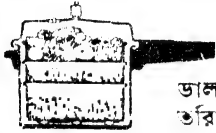


জেলী স্বাদের  
মনের মত মনমোহন  
মুনে ভরিয়ে  
আরও স্বাদ

ULTRA-VOLITA

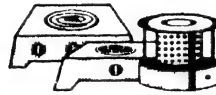
আরও বেশী জ্বালানী বাঁচান!

**কয়েক মিনিটের মধ্যেই  
পুরো খাবার রান্না  
করুন মিনি**



**ডাল, ভাত ও  
অতিরিক্তকারী এক সাথে!**

প্রেস্টিজের মিনি প্রেসার বাটি ব্যবহার করে আপনি ডাল, ভাত ও অতিরিক্তকারী এক সাথে রান্না করে নিতে পারেন। সাধারণতঃ প্রেস্টিজ প্রকারের রান্না করতে ১৫-২০ মিনিটের বেশী সময় লাগে না। আর মশলাপাতি দিয়ে সামান্য কয়েকটা মিনিট—আপনার পুরো রান্না তৈরী।



**বিজলী, গ্যাস,  
কেরোসিন বা  
কয়লা বাঁচান!**

কেরোসিন বা কয়লা, কিংবা বিজলী বা গ্যাস যাতেই জ্বালানী ব্যবহার করুন না কেন সবচেয়েই প্রেস্টিজে সমান ভাল রান্না হয়। রান্নার সময় কম লাগার দক্কন জ্বালানীও কম লাগে—এবং আপনার পয়সা ও সময় দুইই বাঁচায়।



**বড় বাটি,  
বেশী রান্নার জুজ!**

কিন্তু এই বাটি থাকার দক্কন প্রকারের ভিতরে রান্নার জায়গাটি কি কমে যায় না? না, প্রেস্টিজে তা হয় না। প্রেস্টিজ এমনভাবে তৈরী যে প্রায় প্রকারের আয়তনের সমান বাটি বসানো যেতে পারে। সেইজন্য প্রেস্টিজে সম-আয়তন অন্যান্য নমুনার প্রকারের চেয়ে বেশী বাটি রাখবার জায়গা পাওয়া যায়। এটা আপনি স্বচক্ষে যাচাই করে নিতে পারেন।

**বাটীতে কত  
বেশী জায়গা?**

প্রেস্টিজ প্রকারটি আপনি স্বচক্ষে দেখুন! এবং সম-আয়তন অন্যান্য নমুনার প্রকারের প্রকারের সঙ্গে তুলনা করুন। প্রেস্টিজ "প্রীতি ৬.৫" মডেলের প্রকার আপনাকে ৫১% বেশী বাটি রাখবার জায়গা দিচ্ছে। প্রেস্টিজ "এলিগেন্ট"—এ ১০১% বেশী বাটি রাখবার জায়গা আছে। একই সাথে পুরো রান্না করতে প্রেস্টিজের চেয়ে ভালো অন্য কোনও প্রকার নেই।

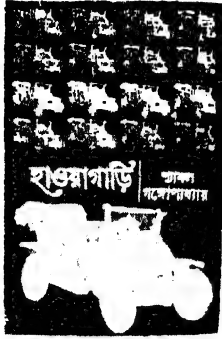
**বিনামূল্যে:** "কয়েক মিনিটেই  
পুরো রান্না সাক্ষর" পুস্তিকা।

এই পুস্তিকা পেতে হলে লিখুন—  
প্রেস্টিজ ন্যাশনাল সার্ভিস সেন্টার, টি টি. (প্রাইভেট) লিমিটেড,  
দুববাণী নগর, ব্যান্সালোর-৫৬০ ০১৬.

**Prestige**

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

## হাওয়া গাড়ি



দ্বিতীয় খণ্ড

প্রকাশিত হল

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের  
যে শিল্প-বিপ্লব ঘটিছে,  
তার ফলে অনেক মঙ্গল  
দিয়ে সাংসারে এসেছে  
অর্থস্বাচ্ছন্দ্য, আবার  
তাই ফলে দেখা-  
দিচ্ছে সামাজিক ও  
অর্থনৈতিক ভারসাম্যের  
অভাব, তাই জন-  
গণ্যদের অনেক সামা-  
জিক মায়ামোদ ও নীতি  
লোম পেড়ে পারছে।

এমনই এক যুগ সক্রি-  
করণের পটভূমিকায় রচিত  
“হাওয়া গাড়ি” উপন্যাস।  
অপ্রাপনীয় অমাবিশ্যম  
চলিতাপ কবীর নেশায়  
এক দুরন্ত অস্থিরতা নিয়ে  
আজ ছুটিচে মানুষ দিন-  
বিদিক স্থান হারিয়ে,  
তার সময়ের সংসার ভেঙে  
পড়ছে। শাসন ব্যবস্থার মত  
সেই মত।  
একজন “হাওয়া গাড়ি”  
উপন্যাসে সন্দেহ নিবাসক  
নেই। অনেক মন নিয়ে  
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। এই  
উপন্যাস আজকের বাস্তব-  
তার আঁখন অনিশ্চয়  
আবন ও সমাজের  
এক আঁখন দলিল।

প্রথম খণ্ড ২৫  
দ্বিতীয় খণ্ড ২৫

লেখকের অন্যান্য বই  
উপরোক্ত

রূপোকথা ১৪.০০  
অজ্ঞানের অজ্ঞাতবাস ১৫



## বাংলা পেপার ব্যাক

পেপার-ব্যা ক ক্লাসিক-এ  
বাংলা সাহিত্যে র দুটি  
বিখ্যাত উপন্যাসের সংযোজন।

তারাক্ষর বন্দোপাধ্যায়ের সুমথনাথ ঘোষের

পঞ্চগ্রাম ★ বাঁকাস্রোত

এইজিরিজিৎ যে বইগুলি পাওয়া যাচ্ছে

বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় শঙ্কু মহারাজ

পথের পাঁচালী ১০০ বিগলিত-করণ

অপরাজিত ১২.৫০ জাহ্নবী যমুনা ৮.০০

ইহামতী ১.০০ বনফুল

আরণ্যক ১.০০ স্থাবর ১০.০০

পথে-প্রবাসে অমদাশঙ্কর রায় ৫.০০

মহাপ্রস্থানের পথে প্রবোধকুমার সান্যাল ৫.০০

মরুতীর্থ হিংলাজ অবধূত ৬.০০

গণদেবতা তারাক্ষর বন্দোপাধ্যায় ১.০০

রাণু বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ১২.৫০

কেরী সাহেবের মুন্সী প্রমথনাথ বিন্দী ১০.০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

কলকাতার কাছেই ১.০০

পৌষ-ফাগুনের পাল ১৪.০০

আমি কান পেতে রই ১২.৫০

পুনর্মুদ্রণ

প্রকাশিত হয়েছে

বিজিতকুমার দত্তের

## বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস

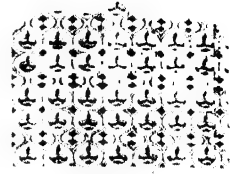
বঙ্গিমচন্দ্র থেকে রাধাকান্তদাস বন্দোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক  
উপন্যাসের শারাবাহিক, বিশ্লেষণপূর্ণ আলোচনা ও  
দত্তের আলোচনায় ঐতিহাসিকবোধ ও শিল্প সমালোচনা  
জিজ্ঞাসার নিদুর্লব সমন্বয় ঘটিছে। এই পুস্তকটি সমবেদনা  
এবং আস্থারিকতার সঙ্গে তথ্যনিষ্ঠতা সহ- হয়ে প্রস্তুতি  
বাংলা সাহিত্যে এক প্রত্যক্ষসাক্ষ্য মনোদ্যোতক পোষক।

বাংলাসাহিত্যের সকল ছাত্রছাত্রীদের অবশ্য পাঠ্য

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড  
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

## কথা কল্পনা কাহিনী



যারা ছোট গল্পের রস ও  
পাঠক তাদের কাছে  
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের নাম  
প্রিয় ও সুপরিচিত।  
পানকদের আগ্রহেই তার  
প্রধান গল্পগুলির সংকলন  
‘কথা কল্পনা কাহিনী’  
নামে খণ্ড খণ্ড প্রকাশের  
ব্যবস্থা। প্রতি খণ্ডে বিভিন্ন  
বসন্তের গল্প দিয়ে খণ্ড  
গুলিকে সমান আকর্ষণক  
করা হয়েছে। প্রতি খণ্ডে  
পঁয়তাল্লিশটি করে  
গল্প লেখক নিজে নিজে  
করে দিয়েছেন। খণ্ডগুলি  
প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠার মত।  
সুন্দর ডাস্ট জাকেটে  
মোড়া উপহার উপযোগী  
সংস্করণ।

তৃতীয় খণ্ড

প্রকাশিত হল

প্রথম খণ্ড ২৫

দ্বিতীয় খণ্ড ২৫

তৃতীয় খণ্ড ২৫

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের  
অত্যাশ্চর্য উপন্যাস।

আদি আছে

অন্ত নেই

মোল টীকা

প্রকাশিত হল

## চিঠিপত্র

### কিংকরদা

১৮-৮-৫০-র 'দেশ'এ প্রকাশিত 'কিংকরদা' (গ্রীষ্মকাল সেনের) প্রবন্ধে একটি তথ্যগত ভুলের কথা পড়ল। গ্রীষ্মকাল লিখেছেন, "রামকিংকর শাস্ত্র-নিকেতনে আসবার পূর্বেই ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সোঁলা হামরিশ...সুরেরিয়ালিজম প্রভৃতি ইউরোপীয় শিল্প আন্দোলনের ধারা-গুলির সংশ্লিষ্ট কল ভবনের ছাত্র ও শিক্ষকদের পরিচিতি ঘটে।"

অস্মৃত কথা।

সুরেরিয়ালিজম-এর জন্ম ১৯২৪-এ। অথবা ক্যারিশ ১৯২২-এ এই আন্দোলনের ওপর বক্তৃতা দিলেন? এ যে রামের আগেই রামায়ণ গান।

আমার বক্তব্যের সঙ্গীত বাবুটি রীড-এর কটা লাইন উদ্ধৃত করছি—  
The Surrealists were preceded by a group known as the Dadaistes, ... It was bourned at Zurich in 1916 and died at Paris in 1924. In 1924 Surrealism rose from the ashes — and took definite shape in a manifesto issued by the poet Andre Breton.

— Art Now, Faber, 1968, p. 95  
পরেই মন্ডল বারইপার

### রামকিংকর সম্পর্কে

'দেশ' (৪৪ সংখ্যা ১৬ আগস্ট, ১৯৮০)-এ প্রকাশিত রামকিংকর সম্পর্কে প্রভাসনা (সেন) এবং পরশেন্দ্র পট্টা মহাশয়ের লেখা দুটি অমূল্য ভীষণ ভাল লেগেছে। তাঁদের বলিষ্ঠ লেখনী রামকিংকরের চিত্র ও ভাস্কর্য কলর উপর বিশেষ আলোকপাত করেছে বা সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে।

কিন্তু, পরশেন্দ্র পট্টা মহাশয়ের লেখায় (রামকিংকর ভূমণ্ডল) উনি লিখেছেন "যখন সময় বা ইচ্ছাসূচক তখন র শিল্পী তিনি গড়েছেন ভিত্তিওয়ালা, কাঁধের বঁকে সংসার এক শিল্পকে বয়ে নিয়ে যওয়া সওয়া-তাল মস্পতি..." ইত্যাদি। পরশেন্দ্র বব, হয়ত বা ভুলক্রমে ভিত্তিওয়ালা মণ্ডিতটি কিংকরদা গড়েছেন বলে লিখেছেন। অসলে ভিত্তিওয়ালা মণ্ডিতটি কিংকরদার গড়া নয়। ভিত্তিওয়ালা গড়েছেন তাঁরই একজন ছাত্র সারেন দে, বর্তমানে কল্যাণবনে ভাস্কর্যকলর শিক্ষক।

বিপুলকান্তি সাহা  
অগরতলা

### রবীন্দ্র পত্রাবলী

'দেশ'-এর (৬ সেপ্টেম্বর) সাহিত্য পৃষ্ঠায় বিশ্বভারতীয়া অধ্যাপক আম্রসুন্দর ভট্টাচার্যকে ভাব রবীন্দ্র পত্রাবলী : একটি তথ্যপঞ্জী' শেখার জন্য ধন্যবাদ। আম্রসুন্দরবাবুর লেখা থেকেই জানতে পারলাম গ্রীষ্মকাল সাহা একক প্রয়াসে রবীন্দ্রনাথের মণ্ডিত সমগ্র চিঠিপত্রের একটি মূল্যবান কালানুক্রমিক সূচী ও তথ্যসহ

এক বিশুদ্ধ তথ্যপঞ্জী প্রস্তুত করেন। ৪১৬ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ বাংলায় টাইপ করা এই তথ্যপঞ্জীর একটি কপি শোরবাহু বিশ্বভারতীয়া হাতে ভুলে দিয়েছেন। পঞ্জীর চিঠির সংখ্যা ৪০৮৮। তাছাড়া সংবোধন-এ আরও কিছু চিঠির সংবাদ সংকলিত হয়েছে। শিল্প সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথ কণা অগ্রাঙ্গ পরিগ্রহে সংগৃহীত রবীন্দ্র পঞ্জীর এই মহৎ অর্থ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার জন্য এখনও পর্যন্ত কোন প্রকাশক এগিয়ে আসেননি।

অথচ রবীন্দ্রনাথের একটি বড় পরিচয় রয়েছে তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে। সমগ্র জীবনে কবি সহস্রাধিক মানুষকে যে বিপুল সংখ্যক চিঠি লিখেছেন—তার সঠিক পরিমাণ নিরূপণ করা সহস্রাধা নয়। বিশ্বভারতীয়া গ্রন্থন বিভাগ বা পাণ্ডিত্যবলা সরকার যে রবীন্দ্র পত্রাবলী প্রকাশ করেছেন, তাতে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী মণ্ডিত হয়নি। হিসেব নিয়ে দেখা গেছে, বিভিন্ন স্থানে বাক্যগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথের যে চিঠিপত্র ছাপা হয়েছে, তারই পরিমাণ পাঁচ সহস্রের অধিক। এ ছাড়া আছে তাঁর অপ্রকাশিত চিঠিপত্রের বিপুল সম্ভার। বছর দুয়েক আগে আম্রসুন্দরবাবু আম্রসর তিনবৃদ্ধিকারী নিকল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে বলেছিলেন, শাস্ত্রনিকেতনে রবীন্দ্র-ভবনের ঠান্ডা ঘরে রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠিগুলির পাণ্ডুলিপি সযত্ন রক্ষা করা হচ্ছে। সম্মেলনে তাঁর প্রশ্ন ছিল, রবীন্দ্রনাথ আজও পর্যন্ত অপ্রকাশিত থাকবেন কোন কারণে?

আমরা মনে হয়, বিশ্বভারতীয়া গ্রন্থন বিভাগ একটু সচেতন হলেই শোরবাহুর সংগৃহীত রবীন্দ্র পত্রাবলী অবিলম্বেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হতে পারে। এজন্য আর তাকে বাইরের কোন প্রকাশকের কাছে ধনী দেবার সরকার হবে না।

রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিগুলিও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিভার আর এক আশ্চর্য পরিচয়। কী অসাধারণ পরিগ্রহমী লেখক ছিলেন তিনি। কোন লেখাই একবার লিখে সন্তুষ্ট হতে পারতেন না। সংশোধন করতেন, পরিমোদন করতেন, আরও সুন্দর করে তৈয়ারি চেষ্টা করতেন। লেখার খাতার তিনি নিজেই নিজের মস্ত সমালোচক ছিলেন। পাণ্ডুলিপি দৃষ্ট-একটি কপিও চোখ বোলালেই এর সত্যতা ধরা পড়বে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে কঠিন সমালোচক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই। অমায়-সুন্দর সৌন্দর্যের বক্তৃতা থেকে জেনোই রক্তকরবী নাটকের কবিত্ব দর্শনটি সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি আছে শাস্ত্র-নিকেতনেই রবীন্দ্র-সংগ্রহালয়ে। একটি খাতার সঙ্গে আর একটি খাতার অনেক প্রভেদ। নিজের লেখা যতক্ষণ নিজের কাছে পছন্দ না হচ্ছে, ততক্ষণ তাঁর ভক্তি নেই, শাস্তি নেই। উপন্যাস, নাটক, কবিতা, গান—সব রচনাতেই তাঁর সংশোধন কর্মের পরিমাণ প্রচুর। কৌতুহলী পাঠক মনেই আগ্রহ হয় রবীন্দ্র জীবন আদিপাঠ কি রকম ছিল। রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপি ফটোকাট কপিও একটা নিবন্ধিত সংগ্রহও বিশ্বভারতীয়া

## সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

### গরমভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প

এই বইটিতে দুটি দীর্ঘ গল্প আছে। দুটি গ্রাম নিয়ে। একটি হিন্দুপ্রধান গ্রাম, অন্যটি মুসলমান-গ্রাম। শুধু গ্রামের জীবন নয়, গল্প দুটিতে ফুটে উঠেছে জীবনের প্রকৃত সত্য। বইটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে উৎসর্গকৃত। প্রথম গল্প, গরমভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প অবলম্বনে হিন্দী ভাষায় 'শোশ' নামে একটি চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে এবং সেটি এ বছর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চলচ্চিত্র হিসেবে পুরস্কৃত হয়ে স্বর্ণ কমল পেয়েছে। এ রকম একটি বই প্রকাশ করতে পেরে আমরা গবিত। ৬.০০

### লেখকের অন্যান্য বই

প্রতিশোধের একদিক ৮.০০

এক জীবনে ১০, অচেনা মানুষ ৫,

রাতপাখি ৮, মায়াবাননের ফুল ৬,

গল্পসংগ্রহ ২৫, গল্পসংগ্রহ (২য়) ২৫,

কোথায় আলো? ৬, হীরকদীপ্তি ৬,

আগামীকাল ৭, বৃত্তের বাইরে ৬,

ভোরবেলা পার্কে ৭, রক্ত ৮,

বুকের মধ্যে আশুন ৬,

মহাপৃথিবী ৫.৫০, রূপালী মানবী ৬,

আমি কি রকম ভাবে

বৈঁচে আছি (কবিতা) ৫,

গল্পসংগ্রহ ২৫.০০

কাব্যসংগ্রহ ১৫,

অন্য দেশের কবিতা ৮,

দাঁড়াও সুন্দর (কবিতা) ৫,

মন ভালো নেই (কবিতা) ৫,

এসেছি দৈব পিকনিকে (কবিতা) ৫,

## বিশ্ববাণী প্রকাশনী

৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড II কলকাতা ৯



শিশুর খাবারে বোচরা আনুন তাকে দিন  
সেরা চাল থেকে তৈরি দ্রমত খাবার যা সহজে হজম হয়



**নেস্টাম**  
বেবী সিরিয়াল  
রাইস

সহজেই তৈরি করা যায়



খাদ্য ও পানীয়  
কমপক্ষে ১০ মিনিট



খাদ্য ও পানীয়  
কমপক্ষে ১০ মিনিট



খাদ্য ও পানীয়  
কমপক্ষে ১০ মিনিট

১১টি ভিটামিন  
ও আয়রনে  
সমৃদ্ধ



**NESTLE**

SAAT/PSL N 1954 BEV

প্রকাশ করা উচিত। রবীন্দ্রনাথের পাক-  
লিপির মতো বিবরণ। এক, তার  
সাহিত্যিক মূল্য, অন্য দিকটায় তার  
শিল্পমূল্য। শিল্প অর্থে ছবি।  
লেখার খাতামূল্যের প্রতিটি পৃষ্ঠা  
গভীর মনোবেগের সঙ্গে লক্ষ্য করে  
হয়। কাটাকুটি বিবরণ নেই। কিন্তু  
সেই কাটাকুটিই কখন যে অলঙ্কার-  
একটি সন্দের সম্পর্ক ছাড়া হয়ে উঠে  
তা দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। এসব  
ছবি তো তিনি কখনও প্রকাশের জন্য  
আকর্ষিত—তাই এ ছবির মূল্য  
অন্যদের কাছে আরও তাৎপর্যপূর্ণ  
দেখা দরকার, যে পৃষ্ঠার কয়েকটি ছবি  
কেটে একটি ছবি অঙ্কন করলেন, সেই  
পৃষ্ঠার বক্তব্য বিবরণের সঙ্গে অঙ্কিত  
চিত্রটির কোন সম্পর্ক বা যোগসঙ্গ  
আছে কিনা। কোথাও কোথাও যে আছে  
তা সাধারণভাবে দেখলেই বোঝা যায়।  
রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণ শিল্পবর্ম  
স্বাভাব্য অপ্রকাশিত। রবীন্দ্র রচনা-  
বলীতে এই সব ছবি কি ইলাস্ট্রেশন  
হিসাবে ব্যবহার করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ ছবির জন্য ছবি  
একেছেন পেনসিল এবং কয়লা দিয়ে  
হাজার তিনেক। এগুলি ছবির মধ্যে  
কটি ছবি পাঁচবার মানুষ দেখতে,  
আমরাই বা কটি দেখতে পেরেছি? তাঁর  
জাতি যে কয়টি রঙীন ছবি ছাপানো  
হয়েছে, তা হাতে গুনে বলা যায়। বাকি  
সব আঙ্গুঠ সাধারণের চোখে  
অস্তরালে। কিন্তু কেন?

বাঞ্চমন্ড বসেছেন, গানি সূত্রাব।

তিনিই সূত্রাব, ইহা আঁত বিল।—  
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই বিল  
মৃত্যুস্তের অধিকারী। তিনি একাধারে  
সূত্রাব এবং সূত্রাবক। সূত্রাব রবীন্দ্র-  
নাথকে আমরা সর্বোচ্চ চিনি জানি।  
কিন্তু সূত্রাবক রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কণ  
জানবার উপায় আজ আর আমাদের  
কাছে নেই। তাঁর গাওয়া বঙ্গমাহাত্ম্য কণ  
আমরা ধরে রাখতে পেরেছি। তাও  
রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে সূত্রাব নয়। অর্থাৎ  
রবীন্দ্রনাথের গলা যে কি মধুর ছিল—  
তা কবি নিজেও স্বীকার করে গেছেন।  
রবীন্দ্রনাথের গীতিকতানও তো আমার  
জীবনের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু তিনি যে  
গানও গিয়েছিলেন—সেই কথটি মনে  
রাখবার মত কেন ভাল রেকর্ড বা টেপ  
আজ আর আমাদের কাছে নেই। কেবল  
মানুষ জন্মে মৃত্যুবরণ করে পর্যন্ত  
রবীন্দ্রনাথ সূত্রাবক ছিলেন। সভা-  
সমিতিতে বক্তৃতা পর এখন যেমন  
হেমন্তকুমার মাহা দেব নত  
শিল্পীর ক্ষেত্রে হতো তাকে রবীন্দ্রনাথের  
ক্ষেত্রেও তার প্রতিভা ও কর্মের বক্তৃতা  
পর প্রেমমন্ডলী দাবি জানাতেন। তাঁর  
বার একটি গান, কবিবাবুর একটা  
গান বলা। অমরসুন্দরার এই  
বক্তৃতার সঙ্গে আমি সম্পর্কিত একমাত্র যে  
অপ্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ্য কবিতা  
দ্বারা সম্পর্কিত। রাজ্য সরকারের  
উপর দায়িত্ব। রাজ্য সরকারের  
ভারতীয় অধিদপ্তর এই নতুন  
বক্তৃতা বঙ্গ-মহান থেকে কাজে লাগে  
পারবে হবে।

সুদেব রায়চৌধুরী

## পপ সাহিত্য

৩০ আগস্ট সংখ্যার প্রকাশিত  
অরবিষ্ট ঘোষের লেখা আমেরিকার 'পপ'  
সাহিত্য। বেশ আকর্ষণীয় ও উপাদেয়  
হয়েছে। এই লেখার একটি বইয়ের নাম  
দেখলাম না। লেখিকা গ্যারিয়েল  
ব্রাউন। সংক্ষেপে বইয়ের নাম দি নিউ  
সেলিবেসি। নাম খুব লম্বা। অনুবাদ  
করলে দাঁড়ায় অনেকটা এইরকম :  
নতুন রক্ষণ—কেন নারী-পুরুষ সেক্স  
থেকে দূরে সরে থাকে। যে আমেরিকার  
পপ সাহিত্যে, সিনেমায়, নাটকে সেক্স  
নিয়ন্ত্রণ হইচই, সেখানে এই ধরনের বই  
হঠাৎ চমক সৃষ্টি করে বসবে এতে  
আশ্চর্য কি। বইটির বিস্তারিত বহর দেখে  
কিছু প্রকাশক চিন্তিত হয়ে পড়লেন।  
এই আশঙ্কা আরও অনেকের। এক  
বৎসর প্রচলিত পত্রিকার সম্পাদিকা  
তার ১ লক্ষ ৬ হাজার পাঠকের মধ্যে  
একটা সমীক্ষা করে বলেন যে, উক্ত  
বইয়ের কোন প্রতিফলনই নেই পাঠক  
মহলে। অন্য দিকে লেখিকা দাবি  
করেছেন যে তাঁর এই প্রেসক্রিপশনে  
বহু নরনারী কাম-সংযম শূন্য করে  
দিয়ে আরও বেশী জীবনকে উপভোগ  
করতে পারছেন। সেইসব মানুষের একটা  
জালিয়াও দিয়েছেন তিনি। তার মধ্যে  
অর্ধেক বিবাহিত চিত্রের আঁচিৎ বার-  
ফেলার নাম। এই হচ্ছে আমেরিকা।  
এইসব লেখার সবচেয়ে বড় গুণ হলো  
গল্প। পপ লেখকের গল্প বলার ক্ষমতা  
মিসেসদের স্বর্ণমণি। তাছাড়া নতুন  
নতুন বিষয় নিয়ে লেখার সময় তা

দিয়ে পরিচয় করায়ও একটা প্রবণতা  
এঁদের মধ্যে থাকে। বার জনা গল্পের  
বিবরণকে কখনও বাংলা ও অর্ধ-স্বদেশ  
মানে হয় না। অনেকের ভাষাই বেশ  
আকর্ষণীয়। এই লেখকরা 'হিপো-  
ক্রেসি' করে না। সোজাই বলেন—  
পরসার জন্য লিখি। এইসব নিশ্চই  
আমেরিকার পপ সাহিত্য।

মেটামর্ফিভাবে পু. বি. বীর  
সব সাহিত্যেই একদল লেখক  
থাকেন যারা 'পপ' লেখার  
স্বাভাব্য সাহিত্যিক হিসেবে  
চিহ্নিত। বাংলাতেই কি তারা অন-প-  
স্থিত। 'পপ' সাহিত্য এখানেও চলছে।  
কেউ আঙ্গ পর্যন্ত কোন সন্ধ্যা  
নির্ধারিত করেননি। আসলে এ বিষয়ে  
পাঠকরা এগিয়ে না এলে কিছই হবে  
না। কিন্তু তা কোনদিনই ষোড় করি  
সম্ভব হবে নয়। জীবনযাত্রার ভ্রমশ  
যে জটিলতা, অস্বস্ততা ও অনিশ্চয়তা  
বর্ণনা পাচ্ছে, তার থেকে মৃত্যু পাবার  
জনা মানুষ এই ধরনের লেখা, সিনেমা,  
নাটক খুঁজবেই।  
জীবনময় দস্ত  
পাটনা-২০

## চিত্রকলা

৬ সেপ্টেম্বর দিনাঙ্কিত দেশ  
পত্রিকার চিত্রকলা বিষয়ক অলোচনা  
বেশবানে সুন্দরী নারীরা আসে  
যায় মুখে তাদের যামিনী  
রাস' এ পত্রের প্রসঙ্গ। অপ্রাসঙ্গিক-  
ভাবে বাড়তি কথা বললে কাজে

## প্রকাশিত হলো

বাংলা সাহিত্যে যে উপন্যাসের জুড়ি নেই

বোধিসত্ত্ব মৈত্রের

বিনুকের পেটে মুক্তো

যিনি আজকের যুগের উপন্যাস পড়ে তৃপ্ত নন,

সেই অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেন

“অনেকদিন পরে আমি বাংলা উপন্যাস পড়ে  
তৃপ্তি পেলাম। বিনুকের পেটে মুক্তোর গল্পরস  
ও পরিমণ্ডলদীপ্তি আমার মনে একটুও ক্রান্তি  
আনেনি। এই উপন্যাসের একটি বড় গুণ এর  
অভিনবত্ব।”

প্রাণিস্থান

দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,  
কলিকাতা ৭০০০৭৩।

কাছে পিঠে যে-কোনো বড়  
বইয়ের দোকানে খোঁজ করুন।

প্রতিটি গৃহে ও লাইব্রেরীতে রাখার মত  
কয়েকটি বই

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

কল্লোল যুগ কুড়ি টাকা

যা চলে যায় তাই আমাদের বড় প্রিয়—সময়, ঘটনা,  
চরিত্র ও জীবনের হারানো স্মৃতির এ এক অপূর্ণ  
আঙ্গাদন, এ যেন অতীতের বহুদূর থেকে ভেসে আসা  
মন পুলকিত করা সানাইয়ের সুর ভেসে উঠেছে  
অচিন্ত্যকুমারের অমর লেখনীতে।

নতুন প্রকাশিত হলো

চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক নবতম অবদান

ডাঃ নির্মল সরকারের

‘চিকিৎসা অভিধান’ কুড়ি টাকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক

হরপ্রসাদ মিত্রের

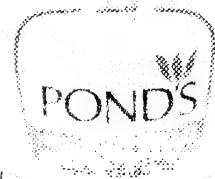
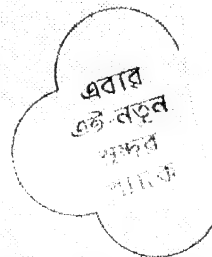
ইদানিং আমি (কবিতা) দশ টাকা

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট ১ কলিকাতা-৭৩



আমার ঘরের মানুষটি বলে আমি সুন্দর। মুখে বলে না,  
চোখে বলে। ভাল লাগার এই রেশটুকু সারাদিন আমাকে ভরিয়ে  
রাখে। ভরিয়ে রাখে রোজকার হাজারো কাজকর্মের মধ্যেও।  
বখনই আগমন্য নিজেকে দেখি, মুগ্ধ হয়ে যাই। সত্যিই তো,  
আমি কি সুন্দর। এক বলনে দল বড়র হয়ে গেল আমার বিয়ে  
হয়েছে? জানে শুধু আমার ভ্যানিশিং ক্রীম পণ্ডস!  
আমার সারাক্ষণের সঙ্গী—পণ্ডস।



**Pond's**

মন যা চায়, সে-ভাবে সাজায়  
পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম

09/08/2014 13:01 hr

**ঠাকুমার বিশ্বসতীয়া সেই ব্যথা-উপশমকারী  
বামটি আবার ফিরে এসেছে!**



**বিশেষ  
প্রভাবশালী  
তরঙ্গ।**

**লিটল'স**

**ওরিয়েণ্টাল বাম**  
মাথা ব্যথা ও গায়ের ব্যথা দূর করে।

মনে আছে, ঠাকুমার কালের সেই  
১ম নম্বর বামটির কথা—লিটল'স ওরিয়েণ্টাল  
বাম—গত ৭৫ বছর ধরে যেটি জনপ্রিয়! এটি  
কয়েক বছরের ব্যবধানে আবার ফিরে  
এসেছে। আর সঙ্গে নিয়ে এসেছে এমন  
কিছু, যা আরও বেশী শক্তিশালী আর আরও  
বেশী প্রভাবশালী!

**প্রভাবশালী তরঙ্গ!**

লিটল'স ওরিয়েণ্টাল বাম লাগালে

আপনি অনুভব করবেন এমন এক আরাম,  
মনে হবে যেন স্বাচ্ছন্দ্য ও শীতলতার তরঙ্গে  
ভাসছেন। বামটি যে সঠিকভাবে কাজ  
করছে ওটি তারই লক্ষণ। প্রভাবশালী  
তরঙ্গ—এটি ব্যথা-বেদনা দূর করে মাথা  
ব্যথা ও গায়ে ব্যথা থেকে দেয় দীর্ঘস্থায়ী  
আরাম। লিটল'স ওরিয়েণ্টাল বাম হাতের  
কাছেই রাখুন।



**স্থাপনা—১৮৮৫**

HTB-3 6217 A



ঝুমের গানের শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু বলা-  
মনি চুরি করে খায়, গোরু চরা-  
ইগ্নে বনে হারিয়ে যায়। তুলনামূলক-  
ভাবে শ্রীরাধা পরিপূর্ণ। যুবতী,  
সুরাসিকা এবং রতিনিপুণা। অবশ্য  
চৈতন্যোত্তর যুগের কৈবল্য পদকর্তাদের  
প্রভাবে ঝুমের গান প্রভাবান্বিত  
হওয়া অসম্ভব নয়। আবার, ঝুমের  
গানের প্রভাব বিভিন্ন ধারার কীতন  
গান কবিগান বা পটালীতে লক্ষ  
করা যায়। এ প্রসঙ্গে মিত্র মহাশয়  
অবশ্য বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

আমরা আশা করব, এই প্রবন্ধ  
প্রকাশের পর যদি কোন গবেষক ঝুমের  
গান ও ঝুমের গানের পদকর্তাদের  
বিষয়ে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য প্রকাশিত  
করেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের  
এক বিশ্লেষণ অঙ্গুরের এক বিশিষ্ট  
লোকসঙ্গীত সম্পর্কে সাধারণ মানবের  
তথ্য অনুসন্ধান, পাঠক ও শ্রোতাদের  
অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হবে।  
আশোক দাস  
দুর্গাপুর-৫

আরোগ্যের কবিতা,

রোগশয্যা

২রা 'আগস্ট তারিখের 'দেশ'  
পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীপূর্ণেন্দ্র পত্রার  
'আরোগ্যের কবিতা, রোগশয্যা'  
শিরোনামের প্রবন্ধটি সম্পর্কে ব-  
একটা কথা লিখছি। প্রথমেই ব-  
খ' টিনটি একটি ভিন্নতর উল্লেখ করে

নিই। প্রবন্ধটির প্রথমাংশে যে একটি  
ফরাসী বাক্য উদ্ধৃত হয়েছিল  
(It faudra mourir sevel)  
তার শেষ শব্দটি হুপা হয়েছে sevel  
ছাপার ভুল seul (এস ই ইউ এস)  
শব্দের পরিবর্তে। ঐ ফরাসী বাক্যটির  
অর্থও কিছু বিব্রিত আছে মনে  
হয়। বাক্যটির অর্থ দেওয়া হয়েছে—  
'মানুষটি যারা গেছে একাকী—কিন্তু  
বেধ হয় অর্থ' হওয়া উচিত—'মরণে  
হবে একই' (faudra শব্দটি  
falloir-এর ভবিষ্যৎ কালের রূপ,  
অতীত কালের নয়)। দ্বিতীয়ত,  
পূর্ণেন্দ্রবাবু লিখেছেন—'কবিতার  
নীচে রচনার স্থান ও তারিখ-এর  
উল্লেখ তার কবিতার বইয়ের একটা  
স্বতন্ত্র শৈলী'। 'সনেই' পদটি  
এই ধারা অব্যাহত। 'রোগশয্যা' থেকে  
শব্দ হল এক নতুন সংযোজন—সময়।  
সকল, বিকেল অথবা রাত্রির ঠিক  
কোন সময়ে কবিতাগুলো লেখা সেই  
অতিরিক্ত সংবাদটুকুও তিনি এতটুকু  
দিলেন কবিতার নীচে। (পৃষ্ঠা ১৩)  
এবং পূর্ণেন্দ্রবাবু অনুমান করেছেন  
যে কবি হয়ত তার পঠকদের মনে  
করিয়ে দিতে চেয়েছেন যে এই পর্বের  
কবিতাগুলো শুধুমাত্র কবিতা নয়,  
ভারও চেয়ে কিছু বেশী তার  
অস্তিত্বের ভিতরকার তুমুল আলো-  
ডুন-অভিযাতের দিনপঞ্জী অথবা  
ক্ষণপঞ্জী এগুলো। এক মণ্ডিত  
কল্পনার জননী যেন। (পৃঃ ১৩)

রোগশয্যা' থেকে শব্দ করে শেষ  
পর্বের কোন কোন কবিতার শেষে  
(সব কবিতার নয়) ঠিক কোন ক্ষণে  
লেখা লেখা তার উল্লেখ আছে,  
অন্যদিকে শব্দ 'সকাল, বিকাল'  
ইত্যাদি দিনের বিভিন্ন বিভাগের  
উল্লেখই আছে। রচনার স্থান ও  
তারিখ ছাড়াও এই ধরনের দিন  
রাত্রির বিভিন্ন সময়ের উল্লেখ কিছু  
'রোগশয্যা' কবীর অনেক পূর্বে  
রচিত কবিতাও পাওয়া যায় একেবারে,  
'মনসী' কাব্য থেকেই যদিও সেসব  
জরগরি এরকম উল্লেখযুক্ত কবিতার  
সংখ্যা বেশী নয় এক 'গীতাঞ্জলি' কাল-  
গ্রন্থ ছাড়া। 'গীতাঞ্জলি' বেলের কবিতা  
বা গানের শেষে 'সকাল বা প্রজ্ঞাত',  
'বিকাল' বা 'অপরাহ্ন', 'সন্ধ্যা' 'রাত্রি'  
এই রকম উল্লেখ আছে তার সংখ্যা  
চলিশের ওপরে। অন্যান্য বেশকিছু  
গ্রন্থের কোন কোন কবিতার (বা  
গানের) শেষে এরকম উল্লেখ আছে  
সেগুলো হল—মনসী, সোনার তরী,  
চৈত্র, খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতমালা,  
বলক ও প্রহাসিনী। সংখ্যার কম  
হলেও কোন কোন কবিতার শেষে দিন  
রাত্রির উল্লেখ ছাড়াও উপরন্তু কিছু  
উপভোগ্য তথ্য আছে যেমন 'মনসী'র  
'মেঘনাদ' কবিতার শেষে আছে  
'অপরাহ্ন', 'মনবদন' 'সোনার তরী'র  
'নদাপথে' কবিতার শেষে আছে  
'খলপথে' 'কড়বাড়' 'অপরাহ্ন'। কোন  
কোন কবিতার সরাসরি 'রাত্রি' না  
লিখে কাব্য লিখেছেন 'মেঘনাদ',

অমাবস্যা' বা 'অশীপূর্ণিমা' বা 'দোল-  
পূর্ণিমা' বা 'রাসপূর্ণিমা' অর্থাৎ  
কব শেষ ধরনের অর্থাৎ স্বপ্ন, সন্ধ্যা,  
প্রমত্তত ছিলেন তখনও অনেক  
কবিতার শেষেই দিন রাত্রি বা দিনরাত্রির  
কি পার্থক্য (কড়বাড়', 'মনবদন')  
কাব্য রচনা করেছেন তার উল্লেখ  
করেছেন। সুতরাং 'রোগশয্যা' থেকে  
শব্দ করে অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের রচনা  
সময়ের উল্লেখ থেকে ঐ কাব্যগ্রন্থ-  
গুলি 'মণ্ডিত কল্পনার জননী' বলা  
যদি কিনা আরও ভেবে দেখা দরকার  
মনে হয়। সাধারণ অবস্থায়ও কবির  
স্বাক্ষর অনুভূতিশীল মনের ওপর  
দিন রাত্রির আলো অথবা রাত্রে  
সুতরার বৈচিত্র্যের রেকর্ড হওয়া  
শুধুই স্বাভাবিক এবং যে কবির মনে  
ঐক্যবোধের 'অর্থ' থেকে 'পার্থক্য' রক্ত'  
মস্ত গভীর রেকর্ড করতেছিল তার  
কবিতার প্রকৃ-অন্তিম পর্বের  
এবং অন্তিম পর্বের রচনার শেষে যে  
ঐক্যবোধের 'অর্থ' থেকে 'পার্থক্য' রক্ত'  
মস্ত গভীর রেকর্ড করতেছিল তার  
কবিতার প্রকৃ-অন্তিম পর্বের  
এবং অন্তিম পর্বের রচনার শেষে যে  
ঐক্যবোধের 'অর্থ' থেকে 'পার্থক্য' রক্ত'  
মস্ত গভীর রেকর্ড করতেছিল তার

কল্যাণকুমার দত্ত  
কল্যাণী

## সদগ্রন্থ প্রসার

বর্তমান অবস্থায় যুগে সংস্কৃতিকে রক্ষা করুন, সদগ্রন্থ  
ক্রয় করুন, পাঠ করুন ও লাইব্রেরীতে রাখুন।

বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত নানা ধর্মগ্রন্থ, শ্রেষ্ঠ জীবনী ও  
বাণী, তত্ত্বের গ্রন্থ (ভারত-তত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব, জ্যোতিষ-তত্ত্ব  
ইত্যাদি), কালজয়ী উপন্যাস, কবিতা, কিশোর ও  
শিশু-সাহিত্য প্রভৃতির প্রাপ্তিস্থানের সন্ধান সকলে রাখেন  
না। ধ্রুব লাইব্রেরীর বিক্রয়-কেন্দ্রে (কলেজ স্ট্রীটের  
পুস্তক-বিপণির মতো) পদার্পণ করুন এবং পছন্দমত  
পুস্তক ক্রয় করুন। অর্ডার দিলে পুস্তক সংগ্রহ করিয়াও  
দেওয়া হয়। অগ্রিম পাঠাইলে কলিকাতার বাইরের  
অর্ডারের পুস্তক ভি. পি. তে পাঠানো হয়।

গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিঃ

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, ফোন-৬৪-৬৬৬০

বিঃ দ্রঃ-অনেক সদগ্রন্থের ভাল পরিবেশনার সুযোগ নাই।  
প্রকাশকেরা যোগাযোগ করুন।



সংশোধিত পরিবর্ধিত  
ও পরিমার্জিত

পঞ্চম  
সংস্করণ

প্রকাশিত হল

**SAMSAD  
ENGLISH-BENGALI  
DICTIONARY**

এই নূতন শব্দ সন্নিবিষ্ট। ৭টি পরিশিষ্ট।  
মিডিয়াম অক্টোভো আকার।  
মজবুত বাঁধাই। মূল্য: পঁয়ত্রিশ টাকা।

সাহিত্য সংসদ

৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড  
কলিকাতা ৭০০০২

## অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

হাওয়া-বদলানো রচনা সংগ্রহ

## হাওয়াবদল ও অগ্ন্যাগ্নি রচনা

দাম ৮.০০

সেবার তিনি যাচ্ছিলেন কাসি'য়ং। সেই তাঁর শেষ বারের মতো পাহাড়ী অঞ্চলে হাওয়া বদলাতে যাওয়া। সঙ্গে ছিল সর্ব, লম্বাটে একটি খাতা। টেনে উঠেই খুলে বসলেন সেই খাতাখানা, চারপাশের দৃশ্যাবলী আর অন্তর্ভব-অভিজ্ঞতাকে টুকরো ছবির মতো ধরে রাখতে শুরু করলেন জাদুময় শব্দের আঁচড়ে।



এ-ভাবেই রচিত 'হাওয়া বদল'—নির্দলীপের ধরনে অনান্য শব্দচিত্রাবলী। পরবর্তীকালে এই শব্দচিত্রই বহু সত্যি ছবির উপকরণ হয়ে দেখা গিয়েছে। তেমনই নতুন স্বাদের রচনা 'পাহাড়ী'—গদ্য-ছন্দের কবিতার ঐতিহাসিক প্রয়াস। 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই উল্লেখ করেছেন সেই তথ্য। হাওয়া-বদল, পাহাড়ী এবং অন্যান্য কিছু টুকরো রচনা নিয়ে প্রকাশিত হল অবনীন্দ্রনাথের নতুন এই গ্রন্থ। ছবি লিখতেন যে অবন ঠাকুর, তাঁর 'হাওয়া-বদল ও অন্যান্য রচনা' বাংলা সাহিত্যেও আনবে নতুন হাওয়ার স্বাস্থ্যকর দীপ্তি। আশ্চর্য স্বাদের এই টুকরো রচনাবলী ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল নানা সাময়িকীর ধূলোমালিন পৃষ্ঠায়, এই সংগ্রহে একত্র করে তুলে দেওয়া হল চিরকালের পাঠকদের হাতে। সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ও রত্নাঙ্গনা ঠাকুরের ছবি।

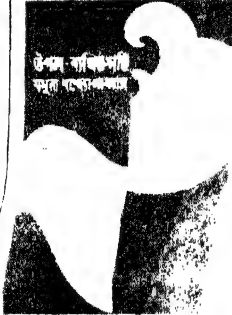
বিশ্বনাথ

## বন্দোপাধ্যায়ের

অন্তরঙ্গ স্মৃতিচারণা

## উপল-বাখিত গতি

দাম ৫.০০



বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের আপন ভ্রাতৃবৎ যমুনা বন্দোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণকে তিনি দেখেছেন অত্যন্ত কাছ থেকে, ঘরোয়াভাবে, অন্তরঙ্গ চেহারায়, পরিবারের গৃহকর্তা হিসেবে। সেই মানুষ্য পরিচয়টুকুকেই অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও প্রামাণ্যরূপে তুলে ধরেছেন তিনি 'উপল-বাখিত গতি'তে।

## শ্যামলকুমার

## চক্রবর্তীর

উৎকলজাতির ইতিহাস

## ছাত্র-যুব কংগ্রেসঃ

## কীর্তি ও

## কেলেঙ্কারি ১৫.০০



অতুল ঘোষ লিখেছেন : "পাতাভরের লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে কংগ্রেস, কংগ্রেস নেতৃত্ব, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এবং প্রশাসন সম্পর্কে অনেক বই বের হয়েছে—অনেকগুলি বই এমনভাবে লেখা হয়েছে যা পড়ে লোকে উত্তোজিত হয় এবং বিভ্রান্ত হয়—ছাত্র-যুব কংগ্রেসঃ কীর্তি ও কেলেঙ্কারি" সে-মালিন্য থেকে মুক্ত।" সঙ্গে কুটির

## নানা স্বাদের বহ

ভোল। চট্টোপাধ্যায়ের

## জয়প্রকাশ ও

## সম্পূর্ণ বিপ্লব

দাম ৬.০০

অমিয়কুমার বন্দোপাধ্যায়ের

## দেখা হয় নাই

দাম ২০.০০

## বঙ্গলক্ষ্মীর ঝাঁপি

দাম ১৫.০০

বিধান সিংহের

## শাহী কেচ্ছা

দাম ১০.০০

জনার্দন ঠাকুরের

## ইন্দিরা এণ্ড কোং

দাম ৮.০০

## জনতা এণ্ড কোং

দাম ১৫.০০

জয়প্রকাশ নারায়ণের

## কারাবাসের কাহিনী

দাম ৫.০০

ডাঃ শিশিরকুমার বসুর

## মহানিষ্ক্রমণ

দাম ৮.০০

শান্তিকুমার মিত্রের

## দর্পণে বাংলা

দাম ৫.০০

সাধনা মুখোপাধ্যায়ের

## রাগ্না করে দেখুন

দাম ৬.০০

অংশুমান বন্দোপাধ্যায়ের

## সূর্যপথিক শ্রীঅরবিন্দ

দাম ৮.০০

প্রকাশিত হয়েছে

মতি নন্দীর নতুন উপন্যাস



## অপরাজিত আনন্দ



আনন্দ পাঠ্যলিঙ্গ প্রাইভেট লিমিটেড



## বুদ্ধদেব গুর

বর্ণময় প্রেমের উপন্যাস

## সুখের কাছে ৭.০০

হঠাৎ গাড়ি খারাপ হওয়ায় এক মোটর মেকানিকের আশ্তানায় রাত কাটাতে হয়েছিল মহুয়াকে, সঙ্গে বাবা আর মহুয়ার পাণিপ্রার্থী কুমার। আর সেখানেই ঘটল মহুয়ার জীবনের স্মরণীয়তম ঘটনা। সুখ এল সুখন মিশ্রের বেশে। এক তাঁর 'কৌতুহলকর কাহিনীতে' শহুরে সভ্যতার নিলম্বিত মুখোশটিকে সম্পূর্ণ উন্মোচিত করে দেখিয়েছেন বুদ্ধদেব গুর।



## সমরেশ মজুমদারের

সমাদৃত উপন্যাস

## দৌড়

দাম ৭.০০

মোড়দৌড়ের মাঠ, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান গণিকার ফ্লাট, উচ্চ মহলের স্থানিক জীবনযাত্রা, আর্থনিক ছেলেমেয়েদের প্রেম-প্রেম খেলা আর এর পাশাপাশি মধ্যবিত্ত জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আশা-আকাঙ্ক্ষা-হতাশা-যন্ত্রণাভরা দৌড়ের এক অনুপম ছবি এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন সমরেশ মজুমদার। চলচ্চিত্রে রূপায়িত।

লেখকের আরেকটি গ্রন্থ : বড় পাশ হে ১২.০০

প্রকাশিত হয়েছে

## সাধনা

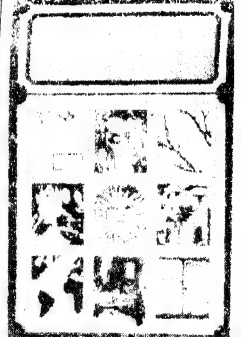
## মুখোপাধ্যায়ের

কৌতুহল মেটানো প্রথ

## জানা অজানা

দাম ৮.০০

এ-বইয়ে 'ভূমিকায় 'আমার মেলার' সম্পাদক নীলমণি চক্রবর্তী লিখেছেন, "বিজ্ঞানের বিষয়ে বাংলায় কিছু লিখতে হলে দুটো জিনিস জানা দরকার। বিজ্ঞান জানা দরকার এবং বাংলাটাও জানা দরকার। শ্রীমতী সাধনা দুটোই অত্যন্ত ভাল জানেন। সত্যি বলতে কী, পৃথিবী ও আকাশের বিচিত্র



সব রহস্যের কথা এমন সহজ ও সুন্দর বাংলায় এত প্রাঞ্জল করে এ-কালে আর কেউ ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন বলে তো আমার মনে হয় না। ছোটরা এ-বই পড়লে একদিকে যেমন তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশকে আরও ভালরূপেই শিখবে, তেমনি অন্যদিকে সেই পঠিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ আরও পরিচয় হবে তাদের ধারণা। মা-বাবারা একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে এ-বই তাঁদের ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দিতে পারেন প্রতিটি বিদ্যালয়ে। গ্রন্থাগারেও এ-বই থাকাই থাকা উচিত।" সত্যিই আশ্চর্য একটি বই লিখেছেন সাধনা মুখোপাধ্যায়। বাংলায় এমন স্বাচ্ছন্দ্য ও কৌতুহল-মেটানো প্রকৃতিবিজ্ঞানের বই নেই বললেই চলে। এ-বই পড়ে জানা যাবে, বাংলা বারটি মাসের বৈশিষ্ট্য ও পরিচয়, জানা যাবে ভৌগোলিক বহু বিচিত্র তথ্য। সেই সঙ্গে প্রচুর ফোটা এবং ছবি বইটির আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

## সূচীপত্র

চিঠিপত্র । ৩  
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও রাজনীতি । সম্পাদকীয় । ১১  
দুশার বিরুদ্ধে । অনিরুদ্ধ কর । ১৩  
প্রতিশ্রুতি । শিবির রায়নাথ । ১৩  
আমার বাড়ি । অশোক চট্টোপাধ্যায় । ১৩  
কর্তৃকাল্পিত । অতুল্য ঘোষ । ১৫  
বিজ্ঞান । সমরজিৎ কর । ১৯  
ঘোড়া থেকে নেমে । রবি সেন । ২৩  
সেই সময় । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । ২৬  
স্মৃতি সত্যই সুখের । প্রতিভা বসু । ৩৫  
মানবকর্ম । শীঘ্রেন্দু মুখোপাধ্যায় । ৪১  
লক্ষ্মী-সরস্বতীর মিলন । দীপক ভট্টাচার্য । ৪৫  
অরণ্যদেব । ৫২  
সাহিত্য । ৫৫  
রিংয়ে আঁলি হেরেছেন জিতেছেন টাকার ব্যক্তিগত ।  
মুকুল । ৫৭  
আলোচনা : শিল্পসংস্কৃতি । ৫৯  
প্রচ্ছদ : অমিতাভ দাস  
প্রচ্ছদশিল্পী-পারিচিতি ৬৮ পৃষ্ঠায়

## পরবর্তী আকর্ষণ

জ্যোতির্বিদ্যার নন্দীর গল্প  
দামমুখিক  
সাবিত্রী দাশগুপ্তের প্রবন্ধ  
সিঁদুরের সন্ধ্যা

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ

যানস্বত্বাধার পরিচয় : ইলিমেন্টে ৬৭৩  
প্রজাতিভাষ্য : রাণ কটক ৬৭৩  
বলকাতা : ৭০০ ০০১ থেকে পরামর্শিত : ৭০০  
অনিন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি. ৬৮৮  
শিখার টি বোর্ড কলকাতা : ৭০০ ০০৮ এবং  
জাতিসত্তা প্রিন্টিং হাউস : ১০ লক্ষের সরকার  
ফ্রিট কলকাতা : ৭০০ ০৭৭ থেকে মুদ্রিত ।  
দাম : ৬৬ টাকা  
বিমান মাসিক : ১৫ পয়সা  
প্রতি সংখ্যার অগ্রাধিকার : ২০ পয়সা

## শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও রাজনীতি

শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকই বেশ কিছুকাল যাবৎ এমন এক সন্দেহ জানিয়ে আসছিলেন যে, এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতাকে হরণ করবার জন্যে ব্যাঘ্র হয়ে পড়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে যেভাবে সরকারী কৃত্ত্বের আওতায় আনা হল তা এই ব্যাঘ্রতার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তো সব নয়, রয়েছে কলেজ স্কুল। সরকার তাদের পরিকল্পনা মারফত 'শিক্ষা দখল' অভিযানে যে ক্রমশই এগিয়ে যাবেন তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না। সন্দেহদের বোধ করি এখন বলার সময় এসেছে যে, তারা যেমনটি ভেবেছিলেন—সেইভাবে উচ্চ থেকে নিন্ম সকল শিক্ষাই এখন সরকারী মতোয় এসে পড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে তার আভ্যন্তরিক খবর সকলের জানার কথা নয়, এমন কি কয়েক শ' কলেজে কী ঘটে যাচ্ছে তাও প্রকাশ্য নয়। তবে এটা হয়ত বোঝা যায়, গত তিন বছরে আভ্যন্তরিক রদবদল ও প্রশাসনের পরিবর্তন হয়েছে। এটা ভালোর জন্যে এমন কথা কি জোর করে বলা যাবে?

পশ্চিমবঙ্গের অধ্যক্ষ সমিতির সাম্প্রতিক অভিযোগগুলি যদি আমরা অবজ্ঞা করতে না চাই—তা হলে বুঝতে পারব, কলেজগুলিতে কেমন নৈরাজ্য চলছে। অধ্যক্ষরা কেমন করে রাজনীতির শিকার হচ্ছেন, সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে তাগদের কীভাবে তৎফাতে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সরকার মনোনীত প্রশাসকদের সঙ্গে কী ধরনের সম্পর্ক নিয়ে কাজ চালাতে হয়—ইত্যাদি তাদের বিবরণে পাওয়া যায়। সে-প্রসঙ্গ এখানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করে লাভ নেই। তবে দোষা যায়, এক অস্বস্তিকর এবং অস্বাভাবিক রাজনৈতিক আবহাওয়া কলেজের শিক্ষক, কর্মচারী এবং ছাত্রদের মধ্যকার সকল ভাল সম্পর্ক নষ্ট করে দিচ্ছে। শিক্ষার সঙ্গে কিছুমাত্র সম্পর্ক না রেখে দলীয় রাজনীতির উদ্দেশ্য সাধন যদি মুখ্য হয়ে ওঠে তবে এর বেশি কী হতে পারে?

কলেজে যেমন, মাধ্যমিক স্কুল এবং প্রাথমিক স্কুলগুলিতেও সেই রকম রাজনীতির প্রতাপ। পশ্চিমবঙ্গে মোটামুটি মাধ্যমিক স্কুল ন' হাজারের মতন। এর অন্তত শতকরা পনেরো ভাগ নুরুলর তদারকির ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সরকার পক্ষ অবশ্য এই কাজটির এক কৈফিয়ত দেন। কিন্তু সেই কৈফিয়ত যে যথার্থ তা যে সকলে স্বীকার করে নেবেন এমন না হতেও পারে।

বামফ্রন্ট সরকারের কোনো মন্ত্রী কখনো স্বীকার করবেন না, করা সম্ভবও নয় যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে তারা কিছু করেন! দুঃখের বিষয়, স্বীকার না করলেই যে তাদের কৈফিয়তগুলি সত্য হয়ে যাবে তাও তো নয়। একথা আজ অনেকেই জানেন, কলেজে এবং স্কুলে যেখানোটা চালানো হচ্ছে তাকে রাজনৈতিক দখল নেবার প্রচেষ্টাই বলা সঙ্গত।

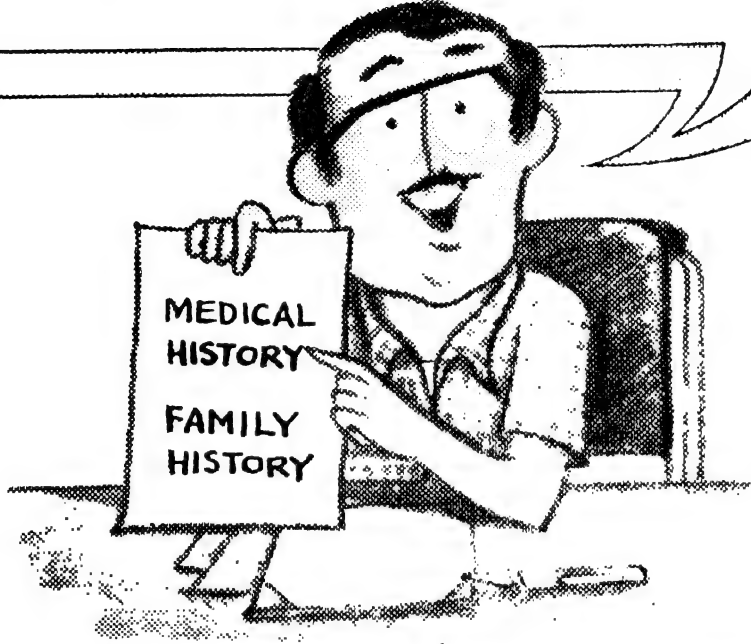
রাজনীতি যে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং শিক্ষাকে জটিল করে তুলছে তাতে সন্দেহ নেই। সারা ভারত বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান হিসেবে যিনি প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সেই শিক্ষাবিদ কমরান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেছেন, রাজনৈতিক ব্যক্তিরাই শিক্ষাক্ষেত্রে জট পাকিয়ে তুলেছেন। তিনি যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলেছেন—কিন্তু এটি শিক্ষার সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা বৃদ্ধ হয়েছে বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দাবি করেন। এ-বিষয়ে সরকার যাই বলুন ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং সাধারণ মানুষ কী মনে করেন? সংবাদপত্রের পাতায় এমন সংবাদও প্রকাশ পায় যাতে দেখা যায় অসংখ্য কলেজে মাসের পর মাস একাধিক বিষয়ে পড়ানোর মতন শিক্ষক নেই। সার্ভিস কমিশন কি এখনও আধো ঘুরে?

যারা শিক্ষা দেন তাদের সম্পর্কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মচারীদের মনোভাব থেকে বোঝা যায় আবহাওয়াটা যথার্থ কেমন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ কলেজ কর্মচারীদের সমিতি একটি ছড়া ছাপিয়ে বিলি করেছেন। তাতে লেখা আছে : 'যাই বা না যাই, পুরো মাইনে পাই/পড়াই বা না পড়াই বলার কেউ নাই।'

মাননীয় শিক্ষকদের প্রতি এমন অশোভন উক্তি অবশ্যই গর্হিত। সম্ভবত আক্কেশবশেই করা হয়েছে। কিন্তু অনুমান করা অসম্ভব হবে না যদি বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে এখন এই ধরনের আবহাওয়াই গড়ে উঠেছে। গত তিন বছরে এই রাজ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে রাতারা আনা উন্নতি ঘটিয়েছেন বলে যারা দাবী করেন তারা হয়ত এই আবহাওয়ায় তৃপ্ত হতে পারেন—কিন্তু সাধারণে নিশ্চয় হবেন না।

# বীমার পলিসি গ্রহণের সময় সঠিক তথ্য জানান



## এতে আমাদের পক্ষে দাবী দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে।

আপনি যখন বীমার পলিসি গ্রহণ করতে যাচ্ছেন, তখন আমাদের এজেন্ট আপনাকে সাহায্য করতে এবং যথাযথ পরামর্শ দিতে সবদাই প্রস্তুত থাকেন; শুভাবতঃই তিনি আপনার কাজ থেকেও পূর্ণ সহযোগিতা আশা করেন।

### সম্পূর্ণ সরল বিশ্বাস

বীমা হ'ল সম্পূর্ণ সরল বিশ্বাসের ভিত্তিতে একটি চুক্তি (যে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক)—সুতরাং প্রস্তাবপত্র পূর্ণ করার সময় আপনার পক্ষে আপনার বয়স, ডাক্তারী চিকিৎসার ইতিহাস, পারিবারিক ইতিহাস এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সব তথ্য, সত্য ও সঠিকভাবে প্রকাশ করাটাই ন্যায়সংগত হবে। কেন না, এইসব প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতেই আপনার প্রস্তাবপত্রের মূল্য-নির্ধারণ হয়ে থাকে এবং তা স্বীকৃত হয়।

### সুযোগ্য সুবিধা

একথা সত্য নয় যে যদি কেউ বীমাদান বা আগেকার কোন অস্থির কথা প্রকাশ করে ফেলেন, সে ক্ষেত্রে বীমার দায় গ্রহণ করা হয় না। হাজার হাজার বীমালব্ধী তাদের ডাক্তারী চিকিৎসার সম্পূর্ণ ও সত্য ইতিহাস প্রকাশ করেছেন এবং তা সফল ও তাদের জীবন বীমার প্রস্তাবপত্র বোশর ভাঙ্গা ক্ষেত্রে প্রচলিত হয় এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে উপযুক্ত অতিরিক্ত প্রিমিয়ামসহ স্বীকৃত হয়েছে।

যদি কোনো ক্ষেত্রে দাবী প্রত্যাখ্যান করা হয়ে থাকে, তবে সেটি প্রতারণার এবং বিশেষ তত্ত্বাগোপন করার দরুন; সেটি অবশ্যই পরে ধরা পড়েছে। মনে রাখবেন, বীমার দাবীর টাকার দ্রুত নিষ্পত্তির সবচেয়ে সহজ পন্থা হ'ল বীমা গ্রহণের সময় আপনার সম্পূর্ণ তথ্য জানানো।



ভারতীয় জীবন বীমা নিগম

## আমার বাড়ি

### অশোক চট্টোপাধ্যায়

আমার বাড়ি একটা পাহাড়ের চূড়ায়  
মানে ২৮ নং কে এল বি রোড  
এখানে আসতে কলকাতা মাদ্রাজ বা দিল্লী থেকে  
বিমানে প্রায় একই সময় লাগে

আমার বাড়িতে কোন বাগান নেই  
কিন্তু দুটো বারান্দা ও একটা ছাদ আছে  
আমার বাড়িতে টেলিফোন বা কোন কুকুর নেই  
কিন্তু একটা কলিং-বেল আর একটা সিংহ আছে  
সিংহটা বহুদিন ধরে খাবা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে দরজার  
মাথায়

আমি ইজিচেয়ারে বসে পাহাড়ের চূড়া থেকে  
উপত্যকার দিকে চেয়ে থাকি  
সামনের রাস্তাটা পূর্বদিকে একশো গজ গিয়ে একটা নদীতে  
ঠেকেছে

দুশো গজ পশ্চিমে গেলে আর একটা বড় রাস্তা পড়ে  
সামনের রাস্তা চণ্ডা তিরিশ ফুট গাছপালা বিশেষ নেই  
আমার বাড়ির অবস্থান বেশ আকর্ষণীয়  
স্কুল, বাজার, হাসপাতাল, সিনেমা হল ও শ্মশান সন্নিবিষ্ট

একদিন আকাশে একটা পাখি উড়ে যাচ্ছিল  
তাকে ডেকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে আমি অনেক উঁচুতে উড়ে  
গেলাম

একদিন রাস্তায় একটা বাচ্চা ছেলে স্নান করতে যাচ্ছিল  
তাকে বসিয়ে দিয়ে আমি নদীতে অনেকক্ষণ সাঁতার কাটলাম  
একদিন একটা শববাহী গাড়িতে একজন বৃদ্ধলোক যাচ্ছিলেন  
তাকে আমার চেয়ারে বসিয়ে দিলাম

আমার বাড়ি এখন মসৃণ রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে  
এখন আমার চারপাশে বাগান, ফুল আর ধূপের গন্ধ  
পাহাড়ের চূড়া থেকে বাড়ির লোকেরা চোখ মুছছে  
আর ইজিচেয়ারে বসে শাদা চুলের বৃদ্ধা লোকটা  
হাত নাড়ছে—‘আমি বেঁচে গেলুম!’

## দৃশ্যের বিরুদ্ধে

### অনিরুদ্ধ কর

উচ্চারণেও জুড়ায় না জ্বালা  
দিনযাপনেও যায় না,  
পেরেকে ঝুলছে বাসী ফুলমালা,  
ঝোলে তিনভাঙা আয়না।

আয়না! আয়না! তুমি কার আজ?  
কাঁচে প্রতিভা কে হে?  
চারদিক ঘিরে ছবির সমাজ  
যৎকিঞ্চিৎই দেহে।

ছবি! ছবি! আমি ছবির দৃশ্য?  
তুমি নবাগত রশ্মি!  
কাঁচে ঝলসায় অসীম গ্রীষ্ম—  
সীতা নয় অবশি!

এই ভাবে...তবে এই ভাবে দেখি  
রৌদ্র জ্যোৎস্না ঝড়কে—  
না থেকেও যা তা থেকেও সে এক-ই  
দেখা-অদেখার তর্কে।

## প্রতিশ্রুতি

### শিশির রায় নাথ

তোমার বিষাদ-শঙ্খসমুদ্র-হাওয়ায় বেজেছিলো  
একদিন বনান্তের পথে। একদিন বিদিশার হাতে  
জলপাই শাখা রেখে কথা দিয়েছিলো—  
গভীরে তোমার কোন বাথা নেই, নিয়োজিত  
বিষন্নতা নেই

কথা রাখো। জেগে ওঠো চন্দনের বনে

ভ্রূমধা শিকারী লাল সিঁদুরের টিপ  
রক্ত দ্রোণের মত উজ্জ্বল। বিদিশার নয়নে শ্বেত  
কারু রীতি জানে। তোমার বাণিজ্য তাকে  
যাত্রা করে। স্বামিও তোমার

নিসর্গ-নিয়মে এক পল্লবিত জলপাই শাখা  
রেখেছিলো। কথা রাখো, অপ্রতিম হাওয়া—  
বিদিশাকে ডেকে বল সুখে আছ, সান্ত্বনায় আছ





**২৫ বছর আগে  
সবচেয়ে কাছের ব্যাঙ্কেও  
মনে হত কত দূরে...**

**আজ তো  
চলে এসেছে  
অনেক কাছে,  
নাটানভাবে!**



পরোক্ষ — দূর !  
কিলোমিটার হিসেবে ।  
উদাসীন ! নাগালের বাইরে ।  
যন্ত্রের অভাব ।  
লাভ ছাড়া আর কিছুই  
বোঝে না । ব্যাঙ্কের  
এই ছিল বর্ণনা —  
২৫ বছর আগে ।  
আজ ব্যাঙ্কিং-এর ধারাই  
পালটে গেছে । আর  
স্টেট ব্যাঙ্কই প্রথম সেই  
প্রাচীন ধারাকে চুরমার করে  
দিয়ে গুরুত্ব দিয়েছে —  
অর্থের বদলে মানুষকে ...  
লাভের বদলে জনগণকে !

৪৬৬-টি দপ্তর দিয়ে  
শুরু করে আজ আশ্চর্যভাবে  
গড়ে উঠেছে আমাদের  
৫২০০'রও অধিক দপ্তর —  
সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে  
বেশী । জালের মত ছড়িয়ে  
আছে এক প্রান্ত থেকে  
আরেক প্রান্ত পর্যন্ত  
সারা দেশ জুড়ে ।  
সত্যি সত্যিই আমাদের  
ব্যাঙ্কিং সেবা পৌঁছে গেছে  
পাহাড়, উপত্যকা —  
সব জায়গায় ।  
ধনী সম্প্রদায় থেকে  
জনসাধারণের মাঝে !

আজ গ্রামবাসীরা অনায়াসে  
আমাদের দপ্তরে চলে  
আসে — ঠিক যেমন তাদের  
পণ্ডায়েত বা পোস্ট অফিসে  
যায় । প্রধানতঃ আমাদের  
ব্যাঙ্কই এনেছে মনোভাবের  
এই পরিবর্তন — যা মেপে  
বা গুণে বোঝা যায় না ...  
বোঝা যায় শুধু গ্রামাঞ্চলের  
উন্নতি দেখে !



**২৫ বর্ষ-ব্যাপী জনগণের উন্নতির সাধনা, আমাদের বিকাশের প্রেরণা**

**স্টেট ব্যাঙ্ক**

# কষ্টকল্পিত অতুল্য ঘোষ

(নবমর্ধ্যায়)

৯০

২৮শে সেপ্টেম্বর, রবিবার সন্ধ্যাবেলায় ১৯৮০-র উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হল। পরীক্ষার ফল বৈদিন বের হয়, সেদিনকার পরিস্থিতি বর্ণনাতীত। সে অবস্থা মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বৈদিন প্রকাশিত হয়, সেদিনই বোঝা গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের এমন সুব্যবস্থা (?) যে পরীক্ষার ফল কবে বেরোবে, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা যত রকমে করা যায়, তার সুযোগ কতৃপক্ষ করে দেন। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বৈদিন বেরোয়, পরীক্ষার ফল লেখা কাগজগুলি, যাকে 'গেজেট' বলে, তার পাঁচ টাকা থেকে আট টাকা অর্ধ দর উঠেছিল। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ব্যাপারেও তিন-চারদিন ধরে ছাত্র-ছাত্রীদের ও তাদের অভিভাবকদের উৎসাহের মধ্যে ঝুলিয়ে রেখে রবিবার সন্ধ্যায় ঝুপ করে পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেল। পরীক্ষার ফল যারা বার করে-ছেন, তাদের হয় বোধ নামক কোন বস্তু মস্তিষ্কে নেই, অথবা তারা অত্যন্ত কঠিন হৃদয়—পাষাণের মত। কলকাতার লোড-শেডিং হয়, সকলেরই জানা। এই লোড-শেডিং-এর সময় সন্ধ্যার পর ফল বেরুলে কি অবস্থা হয় তা কতৃপক্ষ একবারও ভেবে দেখেন না। অন্ধকারে লম্বা লম্বা কিউ, তার মধ্যে চোঁচামিচি, হটগোল এবং পরীক্ষার ফল ছাপা দ্রুপা কাগজগুলি পাবার জন্য কি প্রচণ্ড চেষ্টা। অন্ধকারের মধ্যে ছেলে মেয়ে এবং তাদের অভিভাবক-অভিভাবিকাদের ইচ্ছে করে বিব্রত করা, এ কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। কেন—জিজ্ঞাসা করার উপায় নেই। যে জিজ্ঞাসা করবে, সে হয় প্রতিক্রিয়াপন্থী, নয় বামফ্রন্ট সরকারের বিরোধী। অনেক ছেলেমেয়ে অন্ধকার রাত্রে এগারোটা/বারোটার সময় বাড়ি ফিরেছে। তাদের দুঃশার কথা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তারা একবারও ভাবেননি। স্যাডাবিক-ভাবেই কলকাতার রাস্তায় ছিনতাই, রাহাজানি ও বোমারাজি লেগেই আছে। সেই অবস্থায় সন্ধ্যার অন্ধকারে বহু প্রতীক্ষিত পরীক্ষার ফল বার করে যে অমানুষিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তা অমার্জনীয় অপরাধ। স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে যে কেন এমনটি হচ্ছে? আর যারা পরীক্ষার্থী, যে অবস্থার সম্মুখীন তাদের হতে হয়, তা ঠিক ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যে জায়গায় সিট পড়েছে বলে লেখা থাকে, দেখা যায় সেখানে সিট নেই। আরও নানারকর ঘটনা ঘটে। স্কটিশ চার্চ কলেজের একটি ছাত্রী পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখে তার রোল নম্বর কোন জায়গায় নেই। সে তো হতভম্ব হয়ে কি কববে ভেবেই পড়ছিল না। অনেক খুঁজে সে এক চেনা অধ্যাপককে পায়। এই যে পরীক্ষা দিতে গিয়ে রোল নম্বর খুঁজে পাওয়া যায় না, এতে যে মানসিক বিপর্যয় হয়, তারপর কি সুস্থ ও শান্তভাবে পরীক্ষা দেওয়া যায়?

এরপর যদি কোন বিশেষ হয়, তা হলে দোষ দেওয়া হয় পরীক্ষার্থীকে। আরও আছে। এই মেয়েটির খাতা স্কটিশ চার্চ কলেজের অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের খাতার সঙ্গে পরীক্ষকের কাছে যায়নি। কি করে যে রোল নম্বর খুঁজে পাওয়া গেল না, তা সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা খুব শক্ত। আবার এমনও সংবাদ পাওয়া যায়, খাতা হারিয়ে গেছে, খাতা পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। শুরুরতই এমন আঘাত পেতে হয় যে শিক্ষা সম্বন্ধে সব উৎসাহ তাদের চলে যায়। এই সেপ্টেম্বর মাসেই পার্ট টু পরীক্ষার Chemistry Practical-এর দিন পিছিয়ে গেল। কারও কিছু বলার নেই। সব কিছুই খেয়াল খুশী মত।

শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ে যারা সবকিছু দেখাশোনা করেন, তারাই এই সব বিশৃঙ্খলা করেন, তারা বা তাদের উদ্ভট ন কতৃপক্ষ আবার যখন Saha Institute বা প্রেসিডেন্সী কলেজের গবেষণা কেন্দ্র বা রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন, তখন লজ্জাও লজ্জিত হয়ে পড়ে।

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল বরাবরই ভাল হয়। এটি একটি সুগঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত, সুপরিচালিত সংস্থা। সেজন্যই বোধ হয় কতৃপক্ষের এই প্রতিষ্ঠানের উপর বিরাগ। পশ্চিমবঙ্গে সুনিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয় কেন থাকবে? থাকলে বোধ হয় বিপ্লবী বামফ্রন্ট সরকারের অসম্মান হবে। সেই জন্য সুপরিচালিত কোন বিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গে থাকা উচিত নয়—এটাই নিশ্চয় কতৃপক্ষের ইচ্ছা। এই ধারণার ফলেই বোধ হয় রামকৃষ্ণ মিশনের নামের সঙ্গে যুক্ত বিদ্যালয়ের ক্ষতি করার জন্য কতৃপক্ষ আগ্রহান হয়েছেন। মাঝে মাঝে ভেবে পাই না এই দুঃসাহস এদের কেন। যে বিদ্যা-

লয় বছরের পর বছর পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাচ্ছে তা কতৃপক্ষের চক্ষুশলে হয়ে উঠছে কেন? যে সরকার বিদ্যালয়ের আশেপাশ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারেন না, ল্যাবরেটোরি কাজের জন্য বিদ্যুৎ বা গ্যাস দিতে পারেন না, তারা রহড়া বিদ্যালয়ের ক্ষতি করতে চান কেন? কতৃপক্ষের শিক্ষাব্যবস্থার অপারদর্শিতার কথা নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তবে আর কেন? এবার ক্ষান্ত দিন না।

বামফ্রন্ট দলের দলপতি বিভিন্ন মস্তিষ্কের মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই—একথা বলে কলেজের। তিনি একথা আমাদের চেয়ে ভাল বোঝেন, কারণ তাঁর দলই বর্তমান সরকার চালাচ্ছে। মস্তিষ্কের মধ্যে যেখানে কোন যোগাযোগ নেই, সেখানে কোন কাজ সার্থক ও সম্ভব হতে পারে না। এই যাদের অবস্থা তারা রামকৃষ্ণ মিশনের মত সুপরিচালিত একটি সংস্থার বিদ্যালয়ের কাজে অনাবশ্যক, অহেতুক ও অসঙ্গত হস্তক্ষেপ করে নিজেদেরই হেয় করেছেন। মিশনের সেবাকার্য যেমন নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালিত হয়, বিদ্যাদেশিক কাজও ঠিক সেইভাবেই পরিচালিত হয়। এদের কাজের মূলমন্ত্র হল কর্তব্যনিষ্ঠা, কর্মে পারদর্শিতা ও চারিত্রিক সততা। রামকৃষ্ণ মিশন ইতো গিজিয়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান নয়। বহু কর্মীর বহু দিনের ত্যাগ, পরিশ্রম ও সেবার ফলে এই প্রতিষ্ঠান আজ মহা মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এদের প্রতি এই সরকারের অনীহা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এরা বোধ হয় শ্রমস্বাধীনতার দেশকে ভরিয়ে দিতে চান। সেইজন্য রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়ের প্রতি এদের আকোশ। যে মানুষটিকে সরাসরি জন্য এদের এত আগ্রহ, তিনি ভারতবর্ষের যে কোন শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষের চেয়ে কোন বিষয়েই ছোট নন। পাণ্ডিত্য, বহুদর্শিতা ও জ্ঞানের জন্য তাঁর খ্যাতি আছে। কি ঘটেছে, তা ভালভাবে অনু-সন্ধান না করেই একজন সুযোগ্য মানুষকে সরাসরি চেষ্টা করা হীনম্মন্যতারই পরিচায়ক। এবং যারা সরাসরি চেষ্টা করছেন, তাদের কার্যবলী বার বার প্রমাণ করেছে, তারা যে জায়গায় বসে আছেন, সে জায়গায় বসবার যোগ্যতা তাঁদের নেই। দলের দৌলতে তারা সেই জায়গায় বসে আছেন, নিজেদের কৃতিত্বে নয়। দুঃখ তা নয় যে শিক্ষা অধিকর্তারা এইসব অপকর্ম করছেন, দুঃখ এই যে রামকৃষ্ণ মিশনের হাজার-লক্ষ অনুরাগী আছেন, তারা এসব ব্যবস্থার প্রতিবাদ করা প্রয়োজন মনে করছেন না। ঘরে ছবি রেখে, তাকে ফুল দিয়ে সাজিয়েই কি মিশনের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব শেষ হচ্ছে? সর্বত্যাগী, সংশয়মুক্ত, দৃঢ়চেতা একদল মানুষ মিশনে ও মঠ থেকে তাঁদের কাজ অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যাচ্ছেন। সে কর্মসাধনায় কোন কলুষ নেই, কোন মলিনতা নেই, কোন মিথ্যা নেই। আর যারা গৃহী শিষ্য, তারা তো সবই ভোগ করছেন, তারা একবার বজ্রমস্তক কঠে হুকোর দিন যে মিশনের কাজে অনাবশ্যক ও অনধিকার হস্তক্ষেপ অমার্জনীয় অপরাধ। স্বামী বিবেকানন্দ পৃথিবীর মধ্যে হিন্দু ধর্মের বাণী প্রচার করে তাকে আরও মহাত্মামহীয়ান



করেছেন। তিনি কিরে এসেছিলেন তাঁর বৈরাগ্য, তাঁর সাধনা, তাঁর তপসার মধ্যে আত্মনিয়োগ করবার জন্য। এল কলকাতার বৃক্কে মহামারী। “তপ, জপ, আর পূজা-আরাধনা” সব শিকের তুলে রেখে সেবকের মূর্তি গ্রহণ করেছিলেন। মানুষ পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। সেই মানুষের বিপদে বিবেকানন্দ এগিয়ে গিয়েছিলেন। এর মধ্যে কোন সংশয় বা সন্দেহ ছিল না। সেইরকমই রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এতে যারা বাধা দিচ্ছেন, মনুষ্যোচিত সাহস নিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো প্রয়োজন। শিক্ষাজগতে যে বিশৃঙ্খলা হয়েছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ছাত্রছাত্রীদের জীবন যাতে দুর্বিষহ হয়, তার সব উপায় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছেন। লিস্ট অনুযায়ী বই পাওয়া যায় না। পাওয়ার সম্ভাবনা হলেও কবে পাওয়া যাবে, কেউ বলতে পারে না। ফলে বিদ্যায়তনে কোর্স শেষ হয় না, অথচ কোর্স শেষ হয়নি এমন প্রশ্নেরও পরীক্ষার উত্তর দিতে হয়। লে-বার কাগজ ও খাতা এখন আর দুর্মূল্য নয়, দুষ্ট্রাপ্য। প্রাকটিক্যাল করবার একমাত্র জায়গা হল বিদ্যায়তন। বিদ্যায়তনের কর্তৃপক্ষ সেখানে নিরুপায়। ইলেকট্রিক বা গ্যাস কোনটাই পাওয়া যায় না। বাড়ীতে পাড়ার জন্য কেরোসিন। সেই কেরোসিন তেল পেতে গেলে যে কিউ দিতে হয়, সেই সময়টা একে-বারেই নষ্ট হয়। যেটা নষ্ট হয়, সেটা পড়ার সময়

থেকেই নষ্ট হয়। কবে কোন পরীক্ষা হবে এবং ফল বেরোবে তা কেউই জানতে পারে না। ফলে পরীক্ষার্থীদের মনে যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়, তার ফলে সবসময়ই প্রশ্নের উত্তর দিতে অনেক গোলমাল এসে যায়। আবার মাঝে মাঝে পরীক্ষার খাতা হারিয়ে যায়। এবং পরীক্ষার হলে গিয়ে admit card এর রোল অনুযায়ী বসবার জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় না। শিক্ষা জগতে এই কৃতিত্ব (?) ধারা দেখাচ্ছেন, তাঁরা কোন অধিকারে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যায়তনের দিকে হাত বাড়িয়েছেন! নিজেরা যেটুকু দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালন করতে ধারা অক্ষম, তাঁরা কোন সাহসে ধারা দায়িত্ব পালন করছেন, তাঁদের কাজে বাধা সৃষ্টি করছেন। পারিপার্শ্বিকের কথা যদি বলা হয়, তা হলে উত্তর মধ্য কলকাতার বহু শিক্ষায়তনের আশেপাশে দিনে এবং রাতে যে বোমাবাজী হয়, তাতেও যে ছেলে-মেয়েরা এখনও পড়তে পারে, এটাই পরমাস্চর্য। যেসব বিদ্যায়তনে পাথার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ক্লাসে ছাত্রের আধিকার জনা, সেইসব বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা কি কণ্ঠের মধ্যেই যে ক্লাসের বন্ধ ঘরের মধ্যে কাটায়, তা বর্ণনা করা শক্ত। পাথার ব্যবস্থার জন্য বহু শুল্কের ঘর এমনভাবে তৈরী যে বাইরে থেকে হাওয়া ঢোকার ব্যবস্থা নেই। সেইসব শুল্কের ছেলেমেয়েদের দূরবস্থার সীমা থাকে না। লিখবে না ঘাম মুছবে। শুল্ক

যাতায়াতের যে রাস্তা, তা গ্রীষ্ম, বর্ষা সবসময়ই অগম্য। রোড রোড, ডি আই পি রোড মেরামতে অর্থের অভাব হয় না। কিন্তু ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেসব রাস্তা দিয়ে শুল্ক যাবে, সে রাস্তা মেরামতের কথা কারো মনেই হয় না। শিক্ষা ব্যাপারে কোন বিষয়ে কর্তৃপক্ষ যোগেতা সহকারে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন, তা জানা নেই। গরিব হাত কাজ যেসব করেছেন, তার তালিকা দিলে প্রকাশ্যে মহাভারত হয়ে যাবে। সেপ্টেম্বর '৮০-র সবচেয়ে বড় দায়িত্বহীনতার বিষয়টি বহুদিন সকলের স্মরণে থাকবে। রবিবার সম্মান্য লোডশেডিং-এর মধ্যে ঠিক মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ। এ যে কি অমানুষিক দায়িত্বহীনতা, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কলকাতার রাস্তাঘাটের যে অবস্থা তা সকলেরই জানা। তার উপর সম্মান্য পর লোডশেডিং-এর অধিকারের সুযোগ নিয়ে দুশ্কৃতকারীদের অপকারের কথা কারও অজানা নয়। সম্মান্য পর ফল প্রকাশ করে এই দুশ্কৃতকারীদের সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে আর অভিভাবকদের গভীর দৃষ্টিচলিতার মধ্যে সময় কাটাতে হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ধারা এই অরাজকতার সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন তাঁদের অন্তত দু' একটা ভুলত্রুটি শোধরাবার চেষ্টা করেন। এবং যতদিন না নিজস্বের ঘর ঠিক করতে পারেন, ততদিন যেন স্ফুটিলিত বিদ্যালয়গুলির দিকে হাত বাড়ান থেকে বিরত থাকেন।

মর্মরে  
পুরাণকথা...



...বস্তু-কথা  
চীনাগাটিতে

খোড়িয়ার স্যানিটারি-জিনিশপত্র

প্রখ্যাত ইন্দোনেশীয় ভাস্কর্য বারনিন লোককায়িনীকে  
কালবধ কীরে তুলেছিলেন। সেই পাথরের ভাস্কর্য  
জীবনের নিখুঁত চিত্র পাঁচ তুলে বিশ্বাসের গজলটির  
যে পরিচয় তিনি বেশ গভীর, তার সেই মনস্ত  
কায়িনী তার আত্মকায়িনী।  
খোড়িয়ার স্যানিটারি জিনিশপত্রের জগৎ উৎস  
বিশ্বকর্ষ। সেই জগৎ সেসববার পোষক পুষ্কর  
বিজয় মাল্য। কালবধ পোষকের সহযোগিতায় তৈরী  
এই সব জিনিশ তার উৎসাহের জগৎ দেশ বিদেশে  
সমাদৃত। অল্প সব চমকপ্রদ ডিজাইন, তারক র  
আর গৌরব নিয়ে খোড়িয়ার তার তার জিনিশ।  
নিউজ, মনস্ত, ইচ্ছা, আর আছে তার এসে আসি চিত্র।



খোড়িয়ার  
Khodiyar



খোড়িয়ার পটরি ওয়ার্কস্ লিমিটেড, সিলেট (গুজরাত) ৩৬৪২৪০  
সেনিটেরীওয়ার প্রথম এবং একমাত্র বিশেষ এক্সপোর্ট পুরস্কার বিজেতা

আনার এসে গেল হাসিখুশির দিনে...

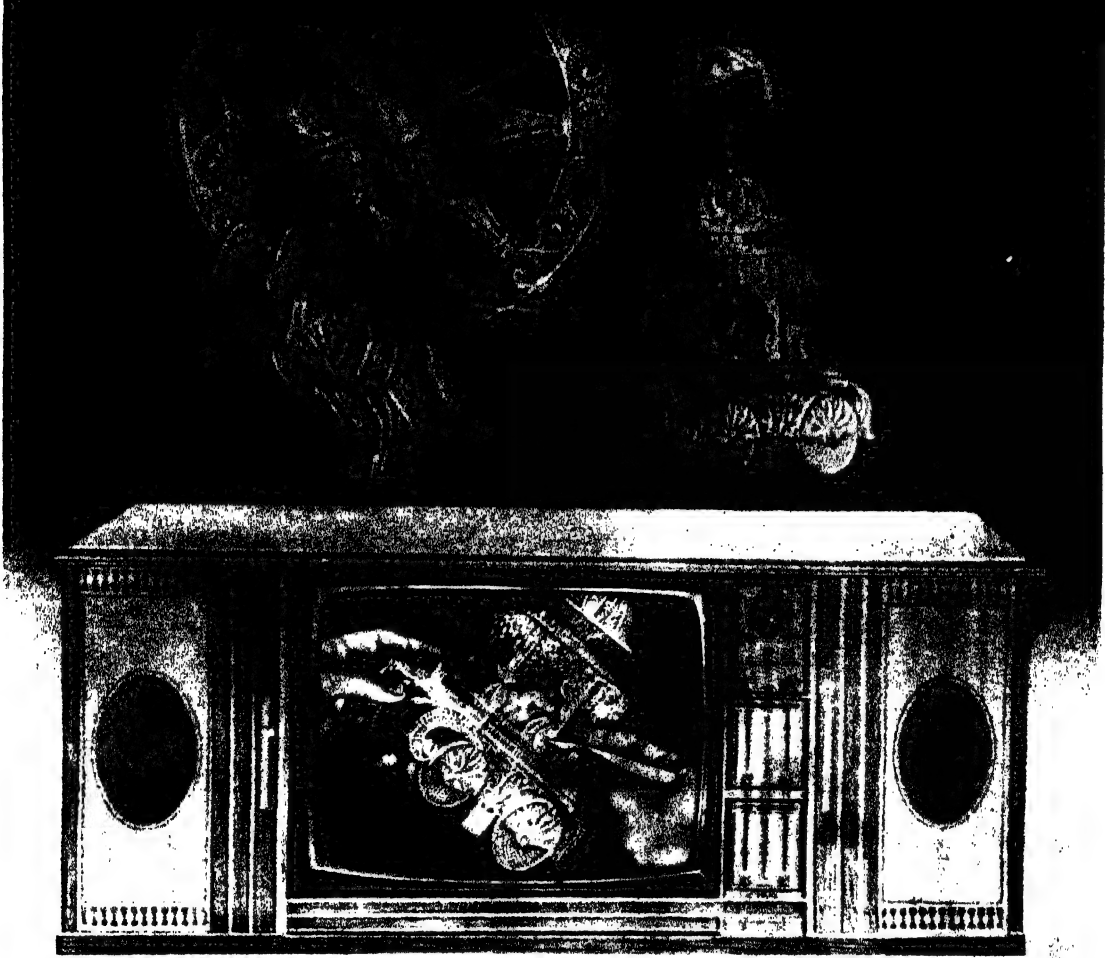


মিলেমিলে  
আনন্দের দিনে...



কোলার মজায় ভর  
দারুণ চাঙ্গা করা

দক্ষ হাতের সূক্ষ্ম কাজেতে, শিল্পী মনের আশা,  
রূপালী তারের হাল্কা! বুনে, পেল তার মুখে ভাষা।



## নিখুঁত

যে ঐতিহ্যের ধারা এখনও বয়ে চলেছে

নিখুঁত। সঠিক নজর এবং দক্ষ হাতের কাজ ছড়িয়ে আছে সৃষ্টির প্রতিটি পর্যায়ে। উচ্চশ্রেণীর কারিগরী বিদ্যা মূর্ত হয়ে আছে কোনার্ক টিভি-তে। উদ্ভিষার উদ্ভাবনী দক্ষতা এবং HAL-এর মহাকাশ যুগের প্রযুক্তিবিদ্যার সঠিক সমন্বয়।

টিভি চালু করুন। হৃদয়লি পাবেন উজ্জল এবং পরিষ্কার। প্রতিটি খুঁটিনাটি সহ এত স্বাভাবিক যেন জীবন্ত ছবি। টিভি চালানোর সঙ্গে সঙ্গে অটোম্যাক ব্যবস্থায় ছবি অকম্পিত থাকে। টিভি-র আওরাজ গুনুন। কোনার্ক

টিভি-তে আছে স্বতন্ত্র স্বর ও ধ্বনি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা—যা বেশীর ভাগ টিভি-তে নেই। অবাঞ্ছিত গোলমালের লক্ষ বাদ দেবার জন্য আছে স্বয়ংক্রিয় গোলমাল প্রতিরোধক সার্কিট। তাই, জোরে এবং স্পষ্টভাবে স্বাভাবিক ধ্বনি শুনেতে পারবেন।

হাইব্রিড এবং সলিড স্টেট, পোর্টেবল এবং স্ট্যান্ড—সাতটি বিভিন্ন মডেল থেকে বেছে নিন। যেটিই আপনি নিন না কেন, বছরের পর বছর ধরে টিভি দেখার

আনন্দ উপভোগ করার ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন।



দৃশ্য এবং ধ্বনি  
প্রযুক্তিবিদ্যায় শ্রেষ্ঠ।

দি উদ্ভিষা সমল ইন্ডাস্ট্রিজ  
কর্পোরেশন লিমিটেড—এর উৎপাদন।  
(উদ্ভিষা সরকার পরিগৃহীত)  
—এর সহযোগিতায়।



## যে প্রতিষ্ঠান এখন জাতীয় গর্ব

ভারী কৈদাতিক সজসজ্জার ব্যাপারে দেশকে স্বনির্ভর করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ১৯৬৬ সালে জুগোলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারত হেভী ইলেকট্রিকালস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড। পরে এই প্রতিষ্ঠানটিরই উদ্যোগে তিস্তা, হায়দ্রাবাদ এবং হারিন্দারে গড়ে উঠল অরও তিনটি কারখানা। ১৯৬৪ সালে এদের নিয়ে তৈরী হয় ভারত হেভী ইলেকট্রিকালস লিমিটেড কমপ্লেক্স বা সংক্ষেপে ভেল। ব্যাপারের মাত্র পনের বছরের মধ্যে সারা পৃথিবীতে এখন এটি একটি শিরোনাম। পৃথিবীর প্রথম দশটি ভারী বৈদ্যুতিক সজসজ্জায় এবং যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি।

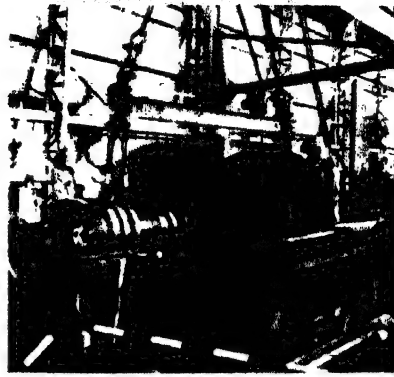
সম্প্রতি বাণ্যালেয়ে ভেল-এর ইনডাস্ট্রিয়াল সিস্টেম গ্রুপের ডেপুটি মেনেজার ম্যানেজার শ্রী এস কে বসু এবং শ্রী সুলেয় সপো মেনের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নানা রকম সমস্যা নিয়ে কথা বলে-ছিলাম। প্রশ্ন করছি, দেশের কোন কোন তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র আপনাদের তৈরী বরলাইন এক টারবাইনের যোগ্যতা সম্পর্কে ইদানীং অভিমোদন করছেন। এ ব্যাপারে আপনাদের কী বলতে চান?

শ্রীবসু বললেন, চট করে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত, মিছা কর। ব্যাপারটা আমরাও খতিয়ে দেখছি। তবে একটি কথা আপনাকে স্মারক করবেন, কোন যন্ত্রে এতটুকু ত্রুটি ঘটেছে না, এ কথা পৃথিবীর কোন দেশের উৎপাদনকারীই হলেও বলেতে পারেন না। এই ত্রুটি প্রযুক্তিগত অথবা উৎপাদনগতও হতে পারে। আবার পরিচালনা এবং বক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারেও সতর্কতার অভাবও হওয়া সম্ভব। আমরা এদিকটো খতিয়ে দেখছি।

তিনক' থাক। ঘটনা এই গত পনের বছরে বরলাইন, টারবাইন থেকে শুরুর করে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি এবং সাজসজ্জায় তৈরীর ব্যাপারে ভেল ইতিমধ্যে যে অসামান্য সাফল্যের নজির সৃষ্টি করেছে, সে ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই।

১৯৬১ সালে ভেলের তৈরী প্রথম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু হয় তামিলনাড়ুর বেল্লিন রিজ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রটি মাদ্রাস শহরের উপ-কণ্ঠে অবস্থিত। বিশেষ কোন রকম গোলাযোগ ছড়িই এই কেন্দ্রটি গত এগার বছর নির্মিত বিদ্যুৎ উৎপাদন করে চলেছে। মাদ্রাসের পর মাত্র দশ বছরের মধ্যে গুঁদের তৈরী তাপবিদ্যুৎ উৎপাদক বসেছে পশ্চিমবঙ্গের সওতালডিহিতে। এটি গুঁদের শতম বিদ্যুৎ উৎপাদক প্রয়াস। শুরুর তাই নয়, ১৯৭৮-৭৯ সালে ভারতের যাবতীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ১৭ শতাংশ যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছে ভেল। ওই একই সময়ের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান অষ্টার হাজার মেগাওয়াটেরও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে যত রকম যন্ত্রপাতি এবং সাজসজ্জায় দরকার তারও বড় রকমের একটি অংশ সরবরাহ করেছে। ১৯৮০-৮৪ সালের মধ্যে যাতে আরও অষ্টার হাজার মেগাওয়াটের মত বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সজসজ্জায় তৈরী করা যায় সে কাজেও এখন হাত দিয়েছেন ওরা।

শুরু ভারতেই নয়। ভেলের কৃতিত্ব এখন বিশেষণে সম্মত। পৃথিবীর কম করেও তিরিশটি দেশ এই প্রতিষ্ঠানটির এখন খরিদদার। বরলাইন, টারবাইন এবং লানিবাগিক যন্ত্রপাতি ছাড়াও কোন কোন দেশে পরোপরি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরী করে দেওয়ারও বরাত পেয়েছেন তারা। এদের মধ্যে উজ্বাতিশীল এবং উন্নত দেশগুলিও পড়ে। এই সব দেশের মধ্যে রয়েছে আফগানিস্তান, ভুটান, থানি, ইরাক, মালেশিয়া, মরিসাস, সৌদি আরব, তান-জানিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জর্জিয়া, আরব প্রজাতন্ত্র, পার্সি, জর্ডান, কৌনিয়া, মাল্যাউই, নেপাল, সিগাপুর, থাইল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, কাসোভাডিয়া,

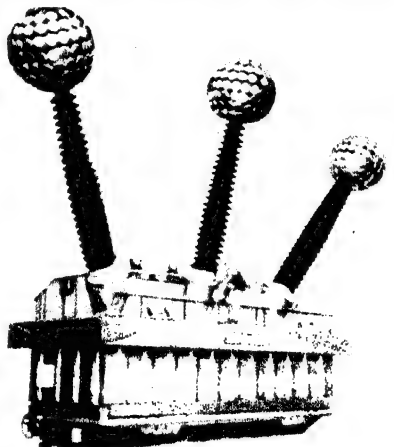


বরলাইন তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ভেলের টারবাইন বসান হচ্ছে

ইন্দোনেশিয়া, কুরাই, নির্ডাঞ্জাল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, উগান্ডা, ইয়েমেন, বালারেশ, ফ্রান্স, ইরান এবং লিবিয়া।

ভেল বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং পরিবহণের জন্যে যে সব সামগ্রী তৈরী করতে তাদের মধ্যে অন্যতমঃ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপযোগী টারবাইন জেনারেটর, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপযোগী টারবাইন জেনারেটর, বাষ্পচালিত জেনারেটর এবং তার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন ক্ষমতার মোটর, সুইচগিয়ার, ট্রান্সফরমার, ক্যাপাসিটর, নিয়ন্ত্রকগিয়ার, পাম্প, ভাল্ব প্রভৃতি।

শ্রীবসু বললেন, শুরুর প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতাই নয়, এই সব সামগ্রী তৈরী করতে গেলে অনেক জটিল কলাকৌশলের উপর নির্ভর করতে হয়। যেমন ধরুন টারবাইন। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের টারবাইন এবং জলবিদ্যুৎ-এর টারবাইনের মধ্যে বেশ কিছুটা পার্থক্য আছে। তাপবিদ্যুৎের টারবাইন চলে বাষ্পের চাপে। উক্ত তাপমাত্রার বাষ্পের সংস্পর্শে টারবাইনের ধাতু সম্প্রসারিত হয়। মনে পড়বেও সম্ভাবনা থাকে। এ সব যাতে না ঘটে, উৎপাদনের সময় সৌদিক আমাদের লক্ষ রাখতে হয়। জলবিদ্যুৎের ক্ষেত্রে আছে আর এক রকম সমস্যা। এক্ষেত্রে জলধার সঞ্চিত প্রাকৃতিক জলের তৌড়ে টারবাইন ঘোরান হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক জলের মধ্যে থাকে নানা রকম রাসায়নিক যৌগ। থাকে ধূলিকণা এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উদ্ভিদ। এদের সংস্পর্শে জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের টারবাইন যাতে মরচে পড়ে অথবা অনাভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সৌকর্য্যও দেখতে হয় আমাদের। ইদানীং পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন



ভেলের তৈরী ২,৪০,০০০ কিলোওয়াট জ্যামপেয়ার ট্রান্সফরমার এখন বিশেষণে সম্মত। কালের মত ইনসুলেটর তৈরী হয়েছে 'এস পি এল-এ'

কেন্দ্রের তাপবাহন ভোগ্য কাছেরও বড় সমস্যা নয়। শেষে এই টারবাইন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যাতে না ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেদিকেও আমাদের নজর থাকে।

মাদ্রাস পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের জন্যে দশ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতার টারবাইন তৈরী করেছে ভেল। নয়োরার যে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রটি বঙ্গের তারও টারবাইন তৈরী করতে চলেছে। রানি প্রতাপ সাগরের দ্বিতীয় ইউনিটটির টারবাইনও তাদের তৈরী।

প্রশ্ন : অঙ্গুর ভবিষ্যতে আমরা তো তারও বড় রকমের বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরীর পরিকল্পনা নিচ্ছি। তার জন্যে দরকার আরও শক্তিশালী টারবাইন। এ ব্যাপারে কতটা এগিয়েছেন আপনাদের?

উত্তর : আপাতত দু'শ দশ মেগাওয়াটের মত ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদক ইউনিটের টারবাইন তৈরীর কাজ চলেছে। এই সঙ্গে পঁচিশ মেগাওয়াট ইউনিটের টারবাইন তৈরীর কাজেও হাত দেওয়া হয়েছে। শূন্যে খাশি করেন, এক হাজার মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষম ইউনিটের উপযোগী টারবাইন তৈরীর মত প্রযুক্তি ক্ষমতাও আমরা অর্জন করছি।

ভেলের চিচীনগরীর কারখানার তৈরী হচ্ছে আধুনিকতম বরলাইন। মধ্যমেটো হাইড্রোভারান-মিস বা এম এইচ ডি নিয়েও উদ্ভাবনার কাজ চলেছে এখানে।

\*

শুরুর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ভারী যন্ত্রপাতিই নয়, দেশের বড় বড় শিল্পে কারখানার হাজারো যন্ত্রপাতির এখন চাহিদা মোটেও ভেল। এদের মধ্যে রয়েছে ইম্পাট, কগজ, সিমেন্ট এবং বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মের প্রয়োজনীয় সজসজ্জায়। এই সব সার-সরঞ্জামের মধ্যে পড়ে অতিবাক মোটর। শিয়ারলুম্ব, হাওড়া, মাদ্রাস এবং বোম্বাই অঞ্চলে যে সব বৈদ্যুতিক ট্রেন চলেছে, তাদের বেশির ভাগ মোটরই তৈরী করেছে ভেল। উৎপাদিত বিদ্যুৎ-শক্তি যাতে সন্তোষাবে বিভিন্ন মন্ত্রীর পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে নির্মিত প্রবাহিত হয়, তার জন্যে দরকার নানা রকম ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা। কোথাও বিদ্যুৎ-প্রবাহের মাত্রা বাড়তে পারে। কোথাও কমতে হবে। উক্ত মাত্রার বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দিতে গেলে যন্ত্রেও সতর্কতার প্রয়োজন। এই সতর্কতা শুরুর কীবনের নিরপত্তার জন্যেই দরকার তা নয়। বিদ্যুৎ পরিবহণ করতে গিয়ে জেনারেটরের যাতে না ক্ষতি হয়, বিভিন্ন যন্ত্রপাতির না অনিষ্ট ঘটে, কিংবা বিদ্যুৎশক্তির ন অপচয় হয়, এ সবার জন্যেও সতর্কতার প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, ভেল নির্মিত যন্ত্রপাতির ভূমিকা এক্ষেত্রেও এখন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

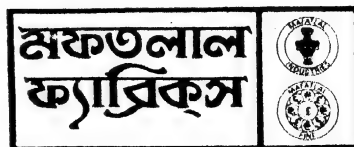
বাণ্যালেয়ে বসেছে ভেলের 'ইনডাস্ট্রিয়াল সিস্টেমস গ্রুপ'। এই গ্রুপটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৭ সালে বিপণন থেকে শুরুর করে বড় বড় ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে সহায়তা করা বক্ষণাবেক্ষণ, বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রপাতি বসান এবং নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সাহায্য করা, এমন অনেক কিছুই তারা করেন। এছাড়া স্বনির্ভরিত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং ইলেকট্রনিক সজসজ্জায় নিয়ে অঙ্গুরনকতম গবেষণা এবং উদ্ভাবনার কাজেও এরা হাত দিয়েছেন।

শ্রীসুলেয় সপো ঘরে ফিরে গুঁদের গবেষণাগারেরও কিছু কাজকর্ম দেখলাম। সম্প্রতি শ্রীসুলেয় তত্ত্বাবধানে সেখানে একটি বিশেষ ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্র গড়ে তোলায় কাজ চলেছে। ছোট্ট একটি যন্ত্র। এই যন্ত্রে আছে একটি টেলিভিশন পর্দা। অঙ্গুর ক্যালকুলেটর যন্ত্রের মত একটি ব্যবস্থা। আর আছে যন্ত্রগণক। ইম্পাট কারখানার কর্মী-সংখ্যা, প্রতি ঘণ্টা দিন অথবা সপ্তাহে কতটা উৎপাদন হল, চালিলের তপমাত্রা, প্রভৃতি নানা রকম তথ্য পৃথক অথবা সামগ্রিকভাবে বোতাম টিপলেই ওই পৃথক অথবা ভেদে ওঠে। পর্যালোচনার বাবে এ ধরনের যন্ত্রের চাহিদা এখন অপরিহার্য।

"আমি পরিবারের গৃহলক্ষ্মী,  
আমার আয়ামদায়ক পোশাকের 'সী'তে ঘরের 'লক্ষ্মী'সি ফুটে উঠবে।"



আবার রুচি-স্বাদিক পোশাকের জন্যে  
নানান পছন্দসই মূল্যসুবিধা আছে।



মুচাট্টা, শাটটুং, শাড়ী, ড্রেস কোর্টসিফাল ও ডেনিম।

মফতলাল ইণ্ডাস্ট্রীজ্ লিটে শরত মিলস মফতলাল ফাইন

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে দেখা যায়, এক-দিকে যেমন বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে পাশাপাশি গড়ে উঠেছে হাজারো ছোট ছোট শিল্প-উদ্যোগ। বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিই ওই সব ছোট ছোট শিল্প-উদ্যোগগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে। এ ব্যাপারে ভেল-এর ভূমিকা কতটুকু? বাংলালোরে তাঁর নিজস্ব অফিসে বসেই প্রশ্ন করেছিলেন শ্রী এস কে বসুকে।

আমর প্রশ্ন প্রায় লক্ষ্যে নিয়েই উত্তর দিলেন তিনি, দেশের বহু ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে আমরা সাহায্য দিয়ে আসছি। প্রয়োজনে নিজস্বের সঙ্গে সরাসরি জড়িয়েও নিয়োজি অনেককে। এতে করে ওই সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্মীরাই যে শুল্ক লাভবান হয়েছেন তা নয়, আমরাও লাভবান হয়েছি। বাংলালোরেই দুটি উদাহরণ রয়েছে। একটি 'রেকোফ' অপরটি 'এম সি এল'।

পাশে ছিলেন 'ভেল'-এর ইনডাস্ট্রিয়াল সিসটেম গ্রুপের ম্যানেজার শ্রী এ এম বৈশা। তিনি বলেন, চলুন না, দুটি মতপ্রিয় ক্ষুদ্র শিল্প ভেল-এর সহ-যোগিতায় কেমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে, নিজের চোখেই দেখবেন।

শ্রীবৈশ্যের সঙ্গে দুটি প্রতিষ্ঠানই দেখতে গিয়েছিলাম।

প্রথমে 'রেকোফ'। যার পুরো নাম এক সময় ছিল রেডিও অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড।

কর্নাটক সরকার পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলালোরের ইনডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের প্রায় দোরগোড়ায় অবস্থিত। এক সময় এখানে তাঁর হত নানা রকম সামগ্রী। যেমন, ইলেকট্রিক মিটার, কেবল, জল-বাহ্যরামিক বস্তু, আকাশের বিদ্যুৎ-গ্রাহী ব্যবস্থা। ইলেকট্রনিক বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি। বিভিন্ন রাজ্য সরকার পরিচালিত শিল্প সংস্থাগুলিতে সচরাচর যা হয়ে থাকে, গোড়া থেকে রেমকো'র ভাগ্যেও তাই ঘটল। এক-একজন পরিচালক আসেন আর ধুরূষা ভোলেন : এই কর, ওই কর। নতুন নতুন পরিকল্পনা হয়। তাঁর হয় নানা রকম সামগ্রী। যার অনেকই বাজারে অচল। আবার কাজের জিনিস যা তাঁর হয়, অব্যবহার্য ধরনে সেগুলি কারখানাইতেই জমতে থাকে। ফলে লোকসান আর লোকসান। ১৯৭৬ সালে এই লোকসানের মেট পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ৪.৫ কোটি টাকায়।

১৯৭৬ সালে কর্ণাটক সরকারের অনুরোধে ভারত সরকারের 'সাম্মা' ভেল মতপ্রিয় ওই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। গ্রহণ করার পর নতুন ভাবে সাম্প্রতিক সাঁজিয়ে নেওয়া হয়। যে সব সামগ্রীর বাজার নেই তাদের উৎপাদন বন্ধ করা হল। সেই সঙ্গে ভেলের তত্ত্বাবধানে এখনে বসান হল নতুন গবেষণা এবং উদ্ভাবনা কেন্দ্র। ঠিক হল এখানে বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্রপাতি তৈরির ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এর ফলে ১৯৭৮-৭৯ সালে এখানকার লোকসানের মাত্রা কমে গিয়ে লাভের পরিমাণ বাড়তে থাকে। অতঃপর ১৯৮০ সালের এক্ষেপে এই প্রতিষ্ঠানটি ভেলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়েছিল। এখন এর নাম দেওয়া হয়েছে ভেল-এর নিয়ন্ত্রক যন্ত্রপাতি বিভাগ বা 'কনট্রোল ইন্সট্রুমেন্ট ডিভিশন'।

প্রতিষ্ঠানটি ঘুরে দেখাছি। কথা বলছি এখানকার কর্মীদের সঙ্গে। দেখলাম, সবাই সন্তুষ্ট। সন্তুষ্টের প্রধান কারণ : এক, এতদিনে ওরা চাকরির ব্যাপারে নিরাপত্তাবোধ উপলব্ধি করছেন। দুই, এ ছাড়া এই প্রথম তঁরা এমন ধরনের কাজে রতী হয়েছেন, যা করতে তাঁদের ভাল লাগছে। যা তাঁদের নিজস্বের দক্ষতা এবং সৃজনশীলতাকে উজ্জীবিত করতে সাহায্য করছে।

দেখলাম, একদিকে তাঁর হচ্ছে নানা রকম মিটার। বিদ্যুৎশক্তি মাপার জন্য যে সব মিটার আমরা বাড়িতে ব্যবহার করি সে সব ছাড়াও কল-কারখানার বসান হয় এমন ধরনের মিটারও এখানে তৈরি হচ্ছে। দেশের প্রাথমিক বিদ্যুৎ পথগুলি এই সব মিটারের ক্রেতা।



২৫০ মেগাওয়াট মাত্রা পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রের জন্য এই হিট এক্সেনজারটি তৈরি করেছেন ভেলের কৃশলীয়া

'থাইরিস্টার কনভার্টার' নামে এক ধরনের বস্তু তাঁদের কাজে হাত দিয়েছেন এখানকার কর্মীরা। বিদ্যুৎ-প্রবাহকে সঠিক মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করতে এই যন্ত্রটি কাজে লাগান হয়। ইস্পাত কারখানা, কগল, তামা প্রভৃতি কারখানার বড় বড় মোটর থেকে শুল্ক করে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ-প্রবাহে আশ্বস্ততা বন্ধ করার ব্যাপারে এই যন্ত্রের ভূমিকা এখন অপরিসীম। এতকাল থাইরিস্টার পাইলট জেনারেটরে সহায়তা এ কাজটি করা হত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সচল এই যন্ত্রটি মাঝে মাঝে বিপদে ঘাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তুলনায় থাইরিস্টার কনভার্টার-এ কোন সচল অংশ না থাকার বিশেষণের ভয় কম। এ ছাড়া কর্মক্ষমতাও দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। এই যন্ত্রটি অনেক বেশি নিচরযোগ্য। এই থাইরিস্টারের প্রধানতম অংশ সিলিকনের অ্যনো-ক্যাথোড। এ বস্তুটি এতসাল বিশেষ খেতে আমদানি করা হত। এখন এই প্রতিষ্ঠানেই তা উৎপাদন করার ব্যবস্থা চলছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, তাঁদের বৃহত্তম কনভার্টারটি এখানেই তৈরি হয়েছে। এই কনভার্টার ছয় হাজার অ্যাম্পের বিদ্যুৎ-প্রবাহ আটক ভোল্টে তড়িৎ-বিভব মাত্রায় রাখতে সক্ষম করে। কনভার্টারটি রাউন্ডকেলা ইস্পাত কাঠখানায় কাঁচ করছে।

প্রতিষ্ঠানটির সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ডি বি ডি শর্মা বলেন, সিলিকনের মানসিষ্টান্ডার তৈরি হয়ে গেলে 'পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স'-এর বিদ্যুৎ সরবরাহ সফলভাবে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি খেটে এ আমদের দেশ স্বনির্ভর হতে পারবে।

ভেলের সাহায্যশ্রী আরও একটি প্রতিষ্ঠানও দেখলাম। নাম 'মাইসোর পোরাসিলেন লিমিটেড' বা সংক্ষেপে এম সি এল। ১৯৩২ সালে মহালীপুরের মহারাজার আমলে তৈরি হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠান। তাঁর পর প্রতিষ্ঠানটি মূলত যে সব সামগ্রী উৎপাদন করতে থাকে তাদের মধ্যে ছিল কম শক্তি-সম্পন্ন বিদ্যুৎ-প্রবাহের উপযোগী চৌম্বকীয় তৈরী ইনসুলেটর, বাসন-কোসন এবং দেখ-দেখার মর্তি।

স্বাধীনতার পর এই প্রতিষ্ঠানটিকেও কর্ণাটক সরকার অধিগ্রহণ করেন। এবং বলাই কল্যাণ শেখ



'এম সি এল'-এর কর্মীরা পোরাসিলেনের ইনসুলেটর তৈরি করছেন

পরিচালিত বড় রকমের একটি লোকসানের বোকা বহন করতে বাধ্য হন। কর্ণাটক সরকারের অনুরোধে ১৯৭৬ সালের অক্টোবর মাসে প্রতিষ্ঠানটির পর্যালোচনা গ্রহণ করল ভেল। সেই সঙ্গে ভেল থেকে অনুদান দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হল। পরবর্তী চার বছরে কয়েকটি পরিবর্তন এসেছে এখানেও।

এখানকার প্রধান শ্রী রাই-এর সঙ্গে কথা হল। শ্রী রাই বলেন, গোড়ার আমদের সমস্যা ছিল প্রচুর। এখানকার বেশির ভাগ কর্মীই অশিক্ষিত। একেবারে প্রাথমিকভাবেই কাজ করতে তারা। কিন্তু ঠাট চার বছরের মধ্যে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। ভেলের বৈদ্যুতিক এবং অন্যান্য সুযোগ চলাই হওয়ার কর্মীরাও হল। প্রতিষ্ঠানটির এখন নাম দেওয়া হয়েছে 'ভেলের ইলেকট্রো-পোরাসিলেন ডিভিশন'।

নেন এক আধুনিক কুমারবাড়ুর বাসনা। অতিথার দুটি বাড়ি। বাড়ি দুটির একপাশে কয়েক একর পোতা জলিয়া। সেখানে পাশাপাশি স্তূপ করে রেখে দেওয়া হয়েছে কঁচামাল। কোয়ালিটি, কেলড-স্পার, টেট্রোকাইট, পাইরোকলাইট এবং ফেজ-সাইট। সবই পাথর। নিয়ে আসা হয়েছে বাংলালোরের অনুরবর্তী গাহাড় জঙ্গল থেকে। হারপ্পান, চিত্তামণি (কোম্পালোর থেকে সত্তর কিলোমিটার দূরে), খাঁস এক মহালীপুর থেকে। এ ছাড়া আছে নানা রকম কয়লাও মাটি। যেমন, বনেশপুরের চৌনেমাটি, বিকারিয়ার বল ক্রে। একদুরে বল ক্রে, বাপারের বল ক্রে এক জাপানী বল ক্রে। সেখান এই মাটি জাপান থেকে আনতে হয়।

দেখলাম পাথরগুলিকে প্রথমে টুকটুক করে নেওয়া হচ্ছে কলচে সাহায্যে। টুকটুক করে পরে বল-মিলে পড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে। মাটি এক পাথরের উপর উপস্থাপ্ত মাপ মত মিশিয়ে আর এক জায়গায় রস মিশিয়ে জ্বলান হচ্ছে। তাও কলচে সাহায্যে। এই কলচে আছে চৌম্বক কল্যাণ। চৌম্বকশক্তির সাহায্যে মিশ্রণের মধ্যকার লোহার কথা সরিয়ে নেওয়া হয়। তারপর জল মিশ্রিত বস্তু থেকে জলাকে নিষ্কাশিত করে, কুমারীয়া যেমন মাটির লেই তৈরি করে, সেইভাবে ওই মধ্যকে লেই-এ পরিণত করা হচ্ছে। অবশেষে কিছুটা কলচে এবং বেশির ভাগই কর্মীরা তাঁদের নিজস্বের দক্ষতার সাহায্যে তৈরি করছেন নানা রকম ইনসুলেটর। এই ইনসুলেটরদের কোনটি গামলার মত, কোনটি চাকার মত। আবার কোনটি উচ্চ স্তরের মত। যেন অনেকগুলি চাকার পর পর বাঁধে ওই স্তম্ভ-গুলি তৈরি করা হয়েছে।

কচা ইনসুলেটরগুলি পোড়ান হয় ভেলের অন্তরে। তারপর আছে নানা রকম পরীক্ষা। সেখানিত হয়, প্রচণ্ড চাপে তাঁর বাতে নীত। উচ্চতর বিদ্যুৎশক্তি প্রবাহের সময় তাদের ভেতর দিয়ে কিল্লুতর এজেন্ট ক্রয় কেন না হয়। বৈদ্যুতিক ট্রে, ইঞ্জিন, পরিবহন-কেন্দ্র, উৎপাদন কেন্দ্র এবং ক্রেনের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা বিদ্যুৎবাহী তাঁদের সঙ্গে জড়ান অনেক ইনসুলেটরই এখন সরবরাহ করছে এই প্রতিষ্ঠানটি।

গ্রীরাই বলেন, এখন আর লোকসান নয়। বরং পাশা এখন লাভের দিকে ঝুঁকছে। চৌনেমাটির কারখানাটি দেখে কুমারের সময় খুসি ভাল লাগছিল। সম্পূর্ণ অশিক্ষিত এবং প্রাথমিক মানসিক আধুনিকতম শিল্প উদ্যোগে কাজ করে মত লক্ষ্য করে তোলা যায়-ভেলের এই প্রতিষ্ঠানটি উচ্চ দক্ষত। উপস্থিত সাহায্য পেলে অশিক্ষিত প্রবৃত্তি যে সরল এবং সাধারণ অশিক্ষিত লোকের মাঝে আত্মবিশ্বাস বোধগোস্ত পারে সেখান-কার কর্মীদের মত দেখলেই তা অনুমান করা যায়। বরং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে এইভাবে রক্ষা করে একটি বড় রকমের জাতীয় কতবা পালনে কাজে লাগবে। অনেক কর্মীই এটা অনুকরণীয় করে উঠল।

সমরজিৎ কর

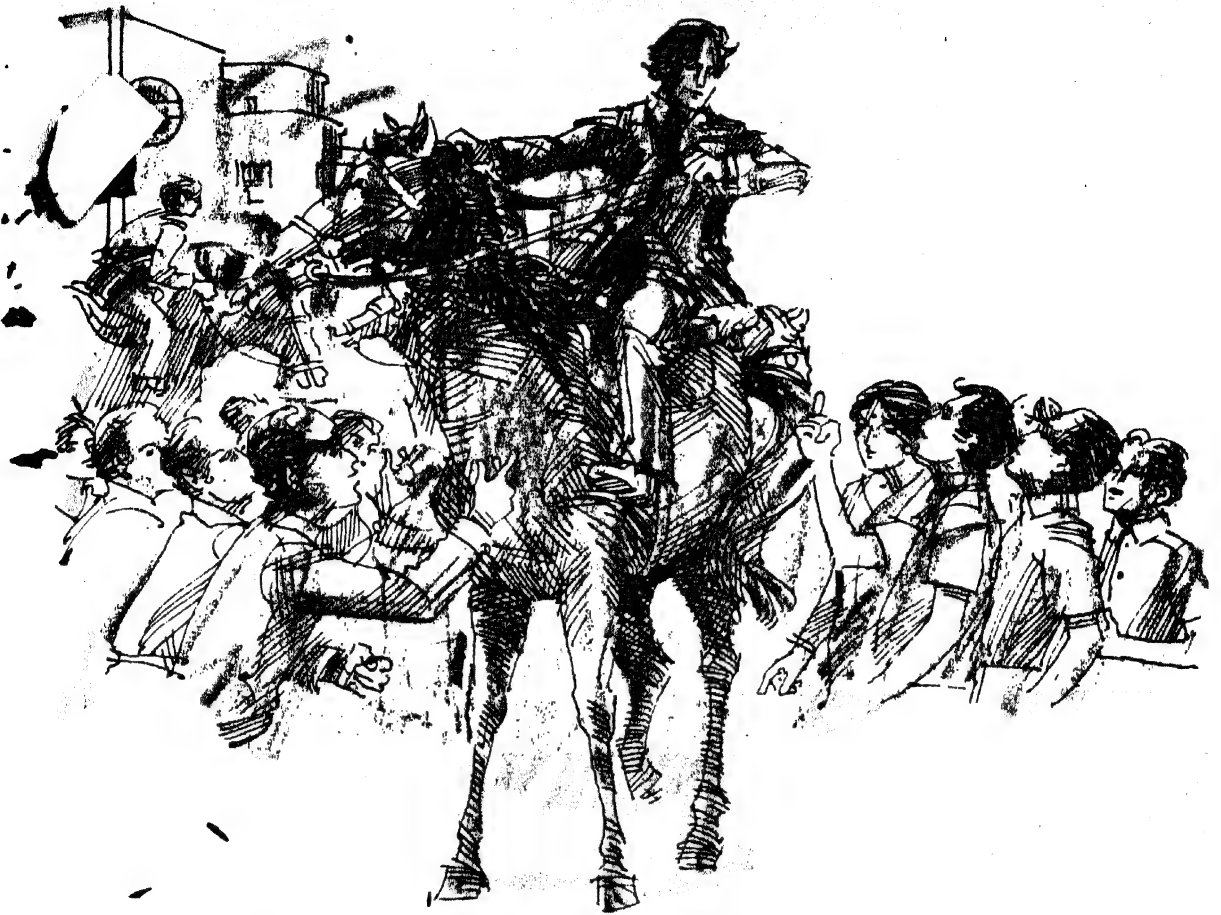
সতেজ ত্বকের গোপন রহস্য উন্মোচন করুন  
 হিমালী গ্লিসারিন সাবান  
 ২০ বছর ধরে একই রকম সতেজ আর স্বচ্ছ

আপনার ত্বক সতেজ রাখতে ও  
 তৈলাক্ত ডাব বজায় রাখতে খাটি গ্লিসারিন  
 সাবানের জুড়ি আর কিছু নেই। এছাড়া খুস খুসে  
 এবং কোচকান ডাবও দূর করে। হিমালী  
 মত মিন্ধ ও খাটি গ্লিসারিন সাবান  
 আর নেই-ই।



হিমালী ফেনা অনেক বেশী সমান ডাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে

হিমালী স্বচ্ছ ত্বকের মতই স্বচ্ছ



## ঘোড়া থেকে নেমে রবি সেন

এক গ্রীষ্মের ভোরে বা সেটা বসন্তকাল, পৃথ্বী জেলে উঠে দেখে তার পরি-  
কল্পনা মতো শহরের বানবাহন ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটেছে। তা হলে পৌর  
কর্তৃপক্ষের লাল ফিতোর ফান থেকে তার পরিকল্পনা মস্তি পেয়ে, এখন অবশ্যে,  
শহরের চলাচলে একটা স্বাভাবিক ও ছন্দ ফিরিয়ে আনলো। একটা সিগারেট ধরালে  
বেশ হয়।

সব জানালা খুলে দিল পৃথ্বী, দরজাও। গতি এখন ছন্দোবদ্ধ হয়ে সারা শহরে  
উপেবের হাওয়া বইয়ে দিয়েছে—চোখ বুজে উদ্মনা ভাবল সে। এবং চোখ খুলে  
তার পাশে সুমিকে একটুবার আঙুল দেখে নিল। সিগারেট ধরালে বেশ হয়। যদিও  
সুমি এখনও জানে নি, কিন্তু যে কোন সময় জেগে উঠে ভোরের কাকলীর মতো  
প্রথমে বলবে, “বেড়-টিতে চুমুক না দিতেই সিগারেট।” তা ছাড়া দরজা-জানালা  
খুলে কাকডোরে পৃথিবীকে ঘনের মধ্যে ডাকার বিলাস, বিশেষত স্ট্রীট লাইট ঘুমিয়ে  
এবং পোশাকে-আশাকে কিছটা অপ্রস্তুত, তখন। কাজেই অপরাধের সংখ্যা বাড়তে  
পারে না পৃথ্বী। তবু সে ভাবল সুমিকে জাগিয়ে দেওয়া জরুরী এবং একটা  
সিগারেট। এই ভোরে শহর জুড়েই সুন্দর হয়ে উঠছে। সুমি জেগে উঠে দেখুক  
ভোরের শহর অন্য দিনের তুলনায়, অতীতের ধারাবাহিক তুলনায়, গতকালের  
তুলনায় কত সুন্দর হয়ে ওঠে, ক্রমেই। আর পথ-দৃশ্যটনা স্ট্রেফ অতীতের ব্যাপার  
হয়ে যাবে। মানুষের মাথা থেকে তেলতেলে ঘিলু আর পথের মেটলে টুইয়ে হড়াবে  
না। বা দূটো চোখই ফুটপাথে ছটিকে উঠে বলবে না, এই যে ‘আমি’ চাকর তলার  
পিট। না কি একটা চোখ তখনই সন্দের দিকে রওনা দেবে। একটু, কতক পড়ে  
স্ট্রীট চিবুকে স্পর্শ করবে সে বা তা করতে গিয়ে সুমির গালে আলতো চিমটি  
কাটবে ঠিক এই সময় সন্ধ্যায় এক ঘোড়সওয়ার উর্কি দিল আর ঘোড়া থেকে তার  
পরিচিত কাবুলীওয়াল নামতে যাবে। পৃথ্বী তাকে ইশারায় চলে যেতে বলে।  
কাবুলী মদু হেসে, “আগামী মাস পরলো?”

“হ্যাঁ, আগামী মাস শেষ হলো।”

তা হলে পরিকল্পনার প্রথম ভোরে ঘোড়ার চেপে দিনের প্রথম আলোতুক  
তারই পাওনার। বাস্তবিক যে শহরে পেট্রোল-ডিজেলের দিন-রাত খারিজ হয়ে  
সমস্ত শহর ঘোড়ার পিঠে উঠে বসেছে, সেই শহরের প্রথম ভোরে পাওনার

বিদেশী সাত-সকলেই পৌছে যার সেনাদার তারই কাছে, যে কি না এই মাস্টার  
প্ল্যানের প্রতীক। একটু বিখর হাসলো পৃথ্বী, স্বগত, আপন খেলালে। আনমনা  
হতে গিয়ে সে বরং মনস্ক হয়ে উঠলো। কাক-বক-জানো না সেই এই মাস্টার  
প্ল্যানের ভাবুক, এমন কি সুমিও নয়। শব্দ পেরসভার কতাবাতির তাকে  
বিলম্ব চেনে। কিন্তু একদিন যখন জানাজানি হয়ে যাবে যে সে ঘাতকের মতো  
ছুরি চালিয়ে শহরের বুক থেকে পেট্রলের দিন-রাত উপড়ে ফেলেছে, তখন.....

তখন নিশ্চই তার পাড়া-পড়শীদের একজন, সেই তরুণী সবার আগে এসে  
তার সামনে দাঁড়াবে, কোন কথা বলবে না সে। নীরবে অপেক্ষা করবে সেই জিজ্ঞাসা  
নিয়ে, “কটা দিন আগে হলো...” “ঠিকই, কটা দিন আগে হলো আপনার স্ববক্ত  
স্বামী বৃষ্টির সন্ধ্যায় ভিড়ের শহরে বাসের পেছনের চাকর জড়িয়ে যেত না। কিন্তু  
কটা দিন আগে-পিছের ব্যাপারে আমার কোন হাত ছিল না, বিশ্বাস করুন।”

“বিশ্বাস করুন, আমার কোন হাত ছিল না।”

“বিশ্বাস করুন, আমার কোন হাত...”

কত জনকেই যে বলতে হবে এসব কথা।

শহর ফাঁদ পেতে রয়েছে। সকাল সন্ধ্যা মাঝরাতে কাগা-বগার প্রাণ যায়। বাপ  
ছেলের লাশ বয়ে নিয়ে যায়। একে অনোর। লোককে বলে পথে-ঘাটে চোরা ফাঁদ।  
লোককে বলে রাক্ষসী শহর। কিন্তু গ্রীষ্মক-পশ্চিমের বলে, মেট্রোপলিস—অমুক-  
তমুক। পৃথ্বী এই যড়যন্ত্র বানচাল করে দিয়ে... আরও করে কটা চেনা-অচেনা মূখ  
উর্কি মারে। পৃথ্বী মনে মনে বলে, বিশ্বাস করুন।

সে দিন-মাস-বছর পৌর দপ্তরে হট্টোটি করেছে। বছর ঘুরে আসে। পরি-  
কল্পনার পাড়ালিপি হলুদ হয়ে আসছিল। এদিকে শহরে রাউটার দাম বেড়ে গেল।  
এদিকে শহরে ভিড় ও বানবাহনের খরচা বেড়ে গেল। একদিন দুপুরবেলা পৌর-  
কর্তৃপক্ষের সবাইকে একসঙ্গে পাওয়া গেল বা অধিকাংশকে। জরুরী মন্থনা ছিল।  
তাকে দেখে পৌরপিতা চোঁচিয়ে বললেন, “এই যে সেই লোকটা এসে গেছে।  
বসুন বসুন। আপনার প্রস্তাব সভার মেম্বারের চার নম্বরে আছে।” পরে সহকর্মী-  
দের উদ্দেশ্যে, “ম্যাডামানস প্রপোজাল। বাট স্কোয়ার আন অরডার। দেখা থাক।”  
তাকে একটা টুল দেওয়া হলো লম্বা হলুদের এক কোণে।



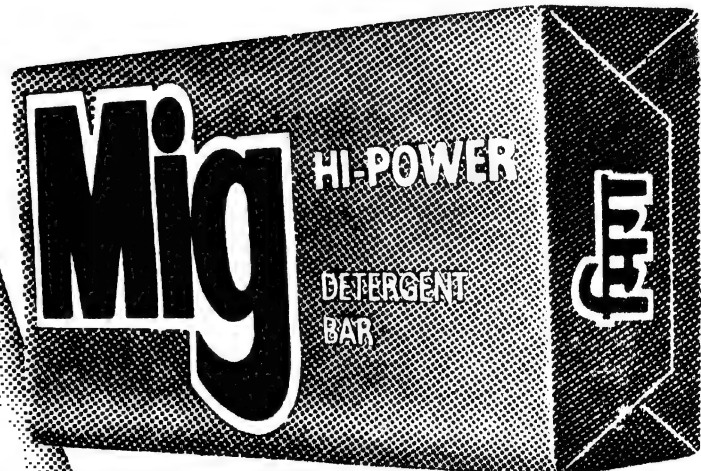
# ময়লা প্রতিস্কাতে সেবা হাতিয়ার



নতুন শক্তিশালী  
মিগ ব্লু ডিটারজেন্ট বার  
আরও সহজে  
লুকানো ময়লা পরিষ্কার করে।  
আর তার ফলে জামাকাপড় হয়  
স্বকস্মকে পরিষ্কার।  
আর কি সুবিধাজনক দামে!  
আজই মিগ ব্লু কিনুন।

# মিগ

## ব্লু ডিটারজেন্ট বার



201 KP-4 50g



A Kurum Product

কিন্তু প্রথম দফার আলোচনাই মধ্যরাতি অঁকি গড়াল। শহর অন্ধকার হয়ে গেল, শহর ঘুমিয়ে পড়ল। ভবঘুরে আর ভিখারী, কারবারী ও নট লোকজনদের দখলে শহর ফিলকুল চলে গেল। এক কোণে টেলের ওপর কিয়ানি খেতে খেতে সে গুনলো উদ্ভাস্ত আলোচনা বা তাকে বচনাই বলা চলে। শহরে ধোপারা আরকর ঢাকি দেয়, শহরে ধোপারা টেড লাইসেন্সের টাকা মায়ে, শহরের ধোপারা... অঁচ কিল পুকুর লেক ডোবা মাঠ রেল লাইনের ধার এরা দলল করে অঁচ। শহরের ধোপারা বড়ই ওঁশাদ, প্রায় সিনেমার অভিনেতাদের মতো। কাজেই কর ফাঁকি ক্ষো বন্ধ করতে ধোপাদের গাধাদের গণনার কাজ শূন্য করতে হবে। যার যত গাধা তাকে হিসেবের মধ্যে এনে আয়কর বিজয়কর নির্ধারণ করতে হবে। সুতরাং গাধাদের গণনার জন্য যাকে বলে বরীতিমত একটা আদমসুমারী। এই কাজে লোক দরকার। তাই নতুন নিয়োগ। শহরের বেকারীর খানিকটা হালকা হবে। হুররে! এবং ধোপারা জ্বল।

দুদমাম পা ফেলে যে যার মতো মন্তগাসভা ছেড়ে চলে গেল। এক কোণে টেলের ওপর তাকে কেউ দেখতেই পেল না। বাকি রইলো তিন দফা। তার সঙ্গে পরে আরও অনেক দফা যোগ হবে।

আরেক দিন।

এদিন সে ভেবেছিল মন্তগাসভার গোল টেকলের উপর ব্যাটের মতো লাফিয়ে উঠবে এবং মাননীয় সদস্যদের সামনে তার পরিকল্পনা সম্পর্কে একটা বাড়ি বজা রাখবে। কিন্তু মানাগণ্য সদস্যদের ভারিঙ্গী চেহারা ও তাদের সচিব-আমলা-বেয়দার কেতাদমস্ত হাঙ্গড়ের সে ঘাবড়ে যায়। সেই টেলের ওপর এক কোণে।

গ্যাণার গ্যাণ শূন্য হলো। বৃষ্টি তজ্জের ধুলোবাঁলি উঠলো। সংখ্যা-পরিসংখ্যান ঘরদাফাই হয়ে তপ্ত কড়াইয়ে খয়ের মতো ফুটে থাকে। তার চোখ বড় হয়ে এলো—তবে কি না এতো পাড়িতা? এতো ধী! তার চোখ ছোট হয়ে এলো। ঘুম এবং ক্লান্তিতে। তার চোখ আবার বড় হয়ে এল দুর্ভিক্ষ ও খাদ্য দাণ্ডার ওপর মনোরম আলোচনার। মাননীয় সকলারা অগ্রান্ত আলোচনার তুফান তুলেছেন। এবং সিংধ্যান্ত আসতে চাইছেন।

তার ঠোঁট ঝুলে পড়ল যখন সে এক দুই করে কতৃপক্ষের সিংধ্যান্ত নিজের কানে শুনল।

সিংধ্যান্ত এক : অপূর্ণিঘটিত মৃত্যুকে কখনই অনাহারে মৃত্যু বলে দেখে দেয়া চলে না। দু-চার জন লোক এদিক-সেদিক না খেতে পেয়ে মারা যেতে পারে, দু-চারজন অপূর্ণিঘটিত, চার-ছ জন এদের শোকে। বাকরা লোভে পড়ে ঘাস-পাতা খেয়ে। একে দুর্ভিক্ষ বলা চলে না।

সিংধ্যান্ত দুই : কতৃপক্ষ শূন্যই উদারভাবে লগরণানা খুলেছে। কিন্তু দেখতে হবে লগরণনার খিচুড়ী খেয়ে লোভী লোকজন বেন গগাঘাটা না করে। কতৃপক্ষ যে উদার তার আরও প্রমাণ শহরের রাজপথে বড় ও গোমাতা এখনও স্বাধীনভাবে মলমূত্র তাল করে। শহরের ফুটপাথে লোকে রইক-বাড়ে খার-দায় ও সন্তান পদদা করে। কেনো কর লাগে না।

সিংধ্যান্ত তিন : এখানে সেখানে দু-একখানা খাদ্যশস্য বোঝাই গাড়ি লাট হতে পারে, কিন্তু তাকে খাদ্য-দাণ্ডা বলা চলে না। এতে বরং প্রমাণ হয় দেশের লোক এখনও শংখলাপাররণ এবং হাসি মুখে মরতে জেনে।

সর্বশেষ সিংধ্যান্ত : এবারে খাদ্যশস্যের কলন ভাল হওয়া সত্ত্বেও যে আকালের কথা উঠেছে, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখা গেল যে খাদ্যশস্য সম্ভবত সীমান্ত পেরিয়ে চলে গেছে। কোন কোন মহল থেকে যে মজুতসার ও চেয়ারকারবারীদের শালিত্র দাবি উঠেছে, সে সম্পর্কে কতৃপক্ষও মনে করে প্রতিটি অপরাধকেই ল্যাপ পোস্টে কুলিয়ে ফাঁসী দেওয়া উচিত। কিন্তু সারা দেশে এত ল্যাপ পোস্ট কোথায়।

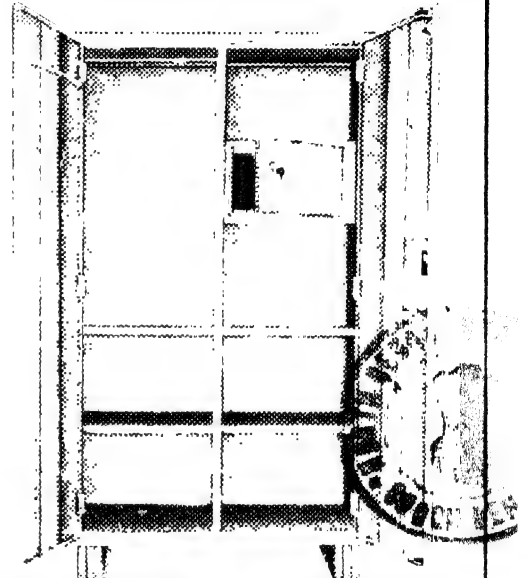
মানাগণ্য সদস্যদের সিংধ্যান্ত গ্রহণের সময় চলার এক কোণে একবার সে টেলের ওপর উঠে দাড়িয়েছিল এবং স্বপ্নে-পাওয়া মানুষের মতো সে বলে উঠেছিল, “হমের মধ্যে দুর্ভিক্ষও রপ্তান।” কিন্তু মাননীয় সদস্যরা নিজেদের আলোচনায় এতোই মাথা ডুবিয়েছিলেন যে সে-কথা তাদের কানে যায়নি।

এইভাবে পৃথ্বী ঘোরানুরি করছিল। হানা দিচ্ছিল কতৃপক্ষের আম-দরবারে। দিন-মাস-বছর ঘুরে যায়। কিন্তু সে হাল ছাড়েনি। বস্তুত দিনে দিনে অনেক টানা-হেঁচড়ার মধ্যে তার পরিকল্পনা গড়ে উঠেছিল।

বাড়ি থেকে বের হলেই যে জনতরঙ্গের ঘর্ষিতে তাকে পড়তে হতো তা ছিল ছাল-চামড়া ওঠানো বিভীষিকা। ভিড়ের বসে পা খেঁচলে বাওয়া বা মাথা ঠেকে গেলে রোজকার কলহের মধ্যে বিভীষিত হতে হতো তাকে। সে একসময় ভাবতে শিখেছিল যে শহরের প্রতিটি লোক পরস্পরের সঙ্গে কগড়া করে বড়ো হয়ে পড়েছে। একদিন সে পকেটমার হিসাবে সাবাস্ত হতে গিয়ে কোনক্রমে রেহাই পায়। আরেকদিন ক-ডাট্টর তাকে অকরণেই কলছিল, টিকিট-ফাঁকি দেওয়া বাবা। অপমান ও গ্লানি ছিল ক্রয়ের মতোই নিভা এবং ক্রয়ের স্বাক। বিধবৃত হয়ে খেতে ফোরার পথে সে নিজেই অঁডিসপাত করত, তখন বুকে একটা পুরানো বাখা ঝংকার দিয়ে উঠত। উজ্জ্বলশ্চাই তাকে এ শহরে এনেছিল, না কি রাজি-রোজগার—মনে করতে চাইত সে। বুকের বাখটা উঠলে সে কেমন ভয়ে ভয়ে বকের ওপর একটা হাত রাখতে চাইত। অন্য হাতে বাগ সমেত বাসের হাতল ধরে দেহের ভারসাম্য রাখত। এবং...

শহরকে লাগি মেরে ছেড়ে চলে যাবে। না কি কিছটা মাথা নিচু করেই। সে পারল না আর তখনই জমাট ভিড়ের মধ্যে বেপরোয়া কিম্বদন্তি সমেত একটা নদীর স্বপ্ন দেখতে। সে। বৃষ্টি বা নদীর সঙ্গে সেই জীবনের অনুশ্রল তাকে বড় বেশি ব্যাকুল করেছিল।

## গোদরেজ® স্টোরওয়েল® সামান্য বেশী দায়ের বদলে এত অতিরিক্ত লাভ।



অতিরিক্ত মজবুত। অতিরিক্ত স্বচ্ছ। পছন্দ করার  
অতিরিক্ত বিষয়। এবং অতিরিক্ত টেকসই।

### অতিরিক্ত মজবুত :

উন্নত স্টীল দিয়ে তৈরি। জরিরোজক। স্টীল আলমারীর মধ্যে  
সর্বোত্তম ডিজাইন।

### অতিরিক্ত স্বচ্ছ :

লকার এবং দরজার অঁট গোদরেজ ডাল। লুকানো বন্ধ। দরজা উপর এবং  
নীচে বন্ধ করার জন্য ডিক্রিমজারে শিশিলী ইকোলারিং ব্যবস্থা।

### পছন্দ করার অতিরিক্ত বিষয় :

উঁচু নীচু করা যায় এমন এক টাই বাল্যপোশাক ডোলাবার হুড। লকার।  
প্রমাণ সার্টিফিকার আয়না। আলমারি কুরোজন অনুযায়ী লুকানো হওয়া।

### অতিরিক্ত টেকসই :

ডিনা হালকাপ্পার ব্যবহার করা যায়। অনেক বেশী দিন চোর কনাই ইতরা

বিভিন্ন মডেল : স্টোরওয়েল ওয়ার্ডবোর (ডেবিত ডেবু),  
কমপ্যাক্ট, এবং মাইনর।

আর এখন পাওয়া যাচ্ছে — গোদরেজ সেকমায়রা।

ডিনা পৃথিবীতে কনাই এখানে লিখুন :

গোদরেজ অ্যাণ্ড বডেল ম্যানুঃ কোং প্রাই লিমিঃ  
মাকট্টে ডিক্রিমজারে লিগেরোজনা এবং গোমাই Soco ০৭৮৫

শ্রেষ্ঠ জীবনের বিদ্যতা — গোদরেজ® Godrej

# নতুন

## লিটলস্-এর ফীডিং বটল, যা ডাঙেও না ফাটেও না!

ULKA-LF-1-80 BEN



### সবদিক দিয়ে এটি একেবারে অতুলনীয়!

**অতুলনীয় কারণ এ থেকে**

একেবারেই চুইয়ে পড়ে না।

দুনিয়ার সর্বোত্তম প্রযুক্তিবিদ্যা দিয়ে

তৈরী বটলই এর সব বিকল্প ভাল

একেবারে সন্তোষজনক বলে যায়।

খাবার মোড়গুলি গোলাকায় আর

সেজন্যে পরিষ্কার করা খুবই সহজ, এমন কি

বাচ্চারাও খুব সহজে ধরে রাখতে পারে।

**অতুলনীয় কারণ এতে**

“ভালুভ-অ্যাকশন” নিশূল থাকে।

লিটলস্-এর স্টার্টার ও টড্ডলার দুটি নিশূল-এই

“ভালুভ-অ্যাকশন” থাকে সেজন্যে খাওয়ার সময়

ওটিকে চ্যাপটা হতে বা দুমড়ে যেতে দেয় না।

উত্তম রকমে দিয়ে তৈরী আর খুব টেকসই আর

প্রায় ২০০ বার “স্টেরিলাইজ” করা যেতে পারে।

**অতুলনীয় কারণ এটি**

লিটলস্ দুই বিশেষভাবে সাজানো কাজ-পরিচালনামূলক

সিস্টেম আছে—যা খাবার সারা দুনিয়ার না ভাঙে এমন সঠিক

কিন্তু তৈরী হয়। এটি একেবারেই সোজাবহীন

আর কোন পাক্যপোত। তারকা-চিহ্ন—জিক খার না—

খাবারের কোনো ধুব সূচীকৃত।

**অতুলনীয় কারণ এটি**

এর ফলস্বরূপে বাক্স খুশ, শুষু দেখতেই অপদৃশ

সুন্দর নয়, এটি এদানিই সুন্দর।

**অতুলনীয় কারণ এতে একসঙ্গে**

তিনটি বস্তু হয়।

লিটলস্-এর “ফীডার কম্প” সাধারণ

পেরালার মতও ব্যবহার করা যায়।

কলের রস খাওয়ানোর জন্যে

বিনামূল্যে “সীপার”, যা

টাঙ্কলারে একেবারে কষ্ট করে।

শত আহার পাতলা করে

খাওয়ানোর জন্যেও বটল-এ

লাগানো যেতে পারে।



## লিটলস্ পলিকার্ন ফীডিং বটল

সারা দুনিয়ায় সর্বোত্তমের মতই উত্তম।



একবার ভ্রমণে সে দেখে ছোট নদীর পাড়ে এক মাঝবয়সী লোক দাঁড়িয়ে ভাঁড়িঝড় মাথায়, নাকে, কানে ও নাভিতে তেল দিয়ে নদীতে দূটো ডুব মেরে উঠে এসে পাড়ে দাঁড়িয়েই হাঁক দিল, “বউ, ভাত দে।” স্পষ্টই সে শুনছিল লোকটার কটু অদ্ভুত দণ্ডায় থেকে বলছে, “দিয়েছি গো।” সেই থেকে একটা ছোট নদীর স্বপ্ন ময়কথো হানা দিত তার মনে। যখন শব্দ করে বাসের গাড়ীর পাটতে বা ক্লাচ না টিপেই হঠাৎ ব্রেক করার জন্য ভিড়ের সবার মাথা ঠোকরানিক হলে ছোট নদী তাকে ইশারা পাঠাত। কিন্তু এ পর্যন্তই। সে জানে এ শহর তাকে পেরেকে পূরতে লেগে রেখেছে। সে প্রাণিত। তা ছাড়া ছোট নদীর পাড়ের সেই জীবনের উল্টো পিঠটাও সে দেখেছিল এই শহরেই। সেই অভিজ্ঞতা—

বধুর শয্যার পাশ থেকে বিদায় নিয়ে ক্যানসার হাসপাতালের একতলার ভক্ষতে দাঁড়িয়ে দেখাছিল সে। দুই হুটুর মধ্যে মাথা রেখে লোকটা ঘুমিয়ে পড়েছিল, চুপচাপ ঘুমের অধিক কিছুর ছিল। তাই তাকে ভার্য মৃত্যুর দোসর হিসাবে এই ঘুম, না থাকে আমরা ঘুম বালি তার কাছে আশ্বিনবেদন, আবার জেগে উঠবে বলে। লোকটার কাছে তার মাঝবয়সী কটু মেঝেতে ঠাণ্ডা উঁচু করে শয়ে কাতরাছিল। মেয়েটার গলা থেকে চাপ চাপ গোপালান হাসপাতালের ইট-কাঠে বাড়ি থেকে কুটো কুটো হরে হাঁড়িয়ে পড়ছে। প্রসব বেদনার যন্ত্রণা এ নয়, যার অন্তিম এক কমলারঙের তোরকের কথা ভাবক কল্পনা করে। নেহাৎই ভ্রমায়তে ক্যানসার। রোগ ধরা পড়তে বছর অন্ত যায়। গ্রাম থেকে মহকুমায়, সেখান থেকে সদরে অনেক উল্টো-পাল্টার পর ডাক্তারবাড়ি, বিধান দিল, এবারে শহরে যেতে হবে যেখানে আছে এ রোগের হাসপাতাল। তারা রেল গাড়িতে উঠে বসল। আজ সাত দিন তারা এ শহরে। আজ সাত দিন তারা এ হাসপাতালের মেঝেতে মাথা কুঁজে। শয্যা মেলেনি। এ সব কথা জানা গেল বউটার ছেলেরসসী ভাইটার কাছে। আর হাসপাতালের ওয়ার্ড-মন্টার হাতে চারির গোছা দুলিয়ে বলছে, কিন্তু এভাবে রোজ রোজ এসে হাসপাতালের আউটডোরের মেঝেতে পড়ে থাকা চলবে না। এ হাসপাতালের একটা ইচ্ছত আছে। কিন্তু ছেলেরমানব ভাই এ কথা শুনবে না। সে বলে, “আমাদেরও একটা ইচ্ছত আছে গো। রোগী লিয়ে কি করে মিছিমিছি ঘরে যাই। যেতে হয় লাশ লিয়ে যাব।” এ সময় লোকটা জেগে উঠে ছেলে মানুহটার গালে চড় কাঁষের দেয়। সবাই হা হা করে ওঠে।

কে যেন পেছন থেকে পৃথিবীর পিঠে হাত রাখে।—কি হে পৃথিবী, ছোট নদীর পাড়ের জীবন যে এখন ইচ্ছত বাচাতে লাশ নিয়ে ঘরে ফিরতে চায়।

সে মাথা নাড়ে। তাই কি বলা চলে। তা হলে লোকটা তার শালার গালে চড় কয়লো কিসের তাড়নায়। না কি বউয়ের লাশ নিয়ে এ শহরেই তারা ঘরে বেড়াবে। আর কিস্যিটা তাই নিয়েই, কে জানে।

পৃথিবী নিঃশেষ হাসপাতাল থেকে বোঁয়ের ফুটপাথে পা রাখে। মাইল মাইল হেঁটে সে বাড়ি পৌঁছাবে। ট্রাফিক-আইল্যান্ডের সবুজ আলোর সংকেত তবু তাকে ঘাস-পাতার জীবনের ইশারা দেয়। পৃথিবীতে একদিন বাদি নামবে। তার আগে এ শহর ছেড়ে ছোট নদীর ঘরে ঠাই নিলেও কোন না কোন দুঃখের হাত ধরে এ শহরেই আবার ফিরে আসতে হবে তাকে। তাই এই শহরকে সুস্ব করার মরীয়া ইচ্ছায় অনেক ক্রান্তি ও বিশ্বাস-ব্রহ্ম, আতঙ্ক ও প্লাবিত মধ্যে পৃথিবীর যানবাহন সংকট মন্টার শ্যান অবরদ পেয়ে যায়। তারপর থেকেই কটুপক্ষের কাছে হাটো-হাটো। তা জিরে অভিজ্ঞতা বা একই অভিজ্ঞতার ভিন্ন দিক। মাঝরাতে সেই টুলের ওপর কস থেকে শহরের ওপ্তান ঘোপারের কর ফাঁকি দেবার গল্পনা বা দুর্ভিক্ষের রঞ্জন আলোচনার মান্যগণ্য সদস্যদের বাসিন্দা, এসব কিছুকে ছাপিয়ে গহরের ধূসর মন্দির তার চেতনায় গাড় কালো ছায়া ফেলে।

কিন্তু এই ভোরে সব কিছু তার বিপরীতে রূপান্তরিত হয়, যেমন রূপকথায়। কেননা তা বেচারী মানুহেরই স্বপ্ন-কল্পনার রঞ্জে জারিত। আর শহরের ভোর ক্রমেই স্বপ্নের হয়ে ওঠে যা দেখে পৃথিবীর শরীর-মনে নতুন এক পাশানের সোলা লাগে।

ভোরের ছবির মতো ভোর।  
বেবাক শহর ঘোড়ার পিঠে। পৃথিবীও চলেছে মন্থর, অথচ গদ্যছন্দে মতো।  
তার আগে আগে বোস সাহেবের গিম্মী ও তার পাশের বাড়ির যুবক। পাশাপাশি দাঁড়ি ঘোড়া গায়ে গা লাগিয়ে যেন কতকালের ঘনিষ্ঠ।

“খুব গ্লিমিং লাগছে, তাই না?” যুবক বলে।  
“কি আমাদের এই পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ ভ্রমণ?” মেমসাহেব অন্তরংগ জিজ্ঞাসা করে। বৃষ্ণতে চায় হোয়াট? হার্ব বয়-ফ্রেন্ড? রায়ালি মিনস।

“না, এই রাইডিং।” যুবক ঘোড়া ছাটছে দেয়।  
পৃথিবী শোনে, অবাক হয় না। সে একটা সিগারেট ধরিয়ে এক বুক ঘোঁরা ছেড়ে পারিপার্শ্বিক জরিপ করতে চায়।

চলকিয়ে যুবকের মতো রাস্তা জুড়ে ঘোড়সওয়ার। শিশুরাও চলেছে স্কুলে পানির পিঠে। সঙ্গে তাদের অভিভাবকদের দ্ব-একজন।

আজ শব্দর দিন। চৈত্রে বাতাসের মতো নতুন মেজাজ বয়ে আনে। মাথার আলক গুঁজে একদল যুব পৃথিবীর পাশ দিয়ে ছুটে গেল। তাদের মধ্যে একটা মেয়ে। রংগীন জামা গায়ে। তার হাতের লাগাম টালমটাল। তার ছোট্টা ঝগ বাধা পেয়ে পেয়ে শরীরে ঢেউ তুলেছে। তাই দৃষ্টি কেড়ে নেয়। আর তা দশ নের অধ্যাপক চলেছে ফুটপাথের গা ঘেঁষে সন্তপণে। এক হাতে তার বাজারের খলে পতাকার মতো উড়ছে। কথা বলছে রহস্যজনক অশ্বরতায়, মতো তার বাহনের সঙ্গে। বিপরীত দিক থেকে এক কবি আসে, মাথায়

প্রতিমিত হৃদয়ে

নরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর

শাহজাদপুরে

রবীন্দ্রনাথ

১৮৯০ থেকে ১৮৯৬ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁদের শাহজাদপুরের জমিদারি দেখাওনা করেছিলেন। এখানকার সুরম্য ও সুরহৎ কৃতিবাড়ি ছিল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য রচনায় সব চেয়ে প্রিয়স্থান। এইখানে বসেই তিনি বহু বিখ্যাত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, এমনকি একটি নাটকও রচনা করেছিলেন। সেই শাহজাদপুরে রবীন্দ্র-জীবনের ও সাহিত্যের বহু অজ্ঞাত কাহিনী নিয়ে এই সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থটি রচনা করেছেন শাহজাদপুরেরই প্রবীণ সাহিত্যিক নরেশবাণী। দাম ৭.০০ টাকা।

গোপালচন্দ্র রায়ের

রবীন্দ্রনাথের

ছিন্নপত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথের জমিদারি পরিচালনার অজ্ঞাত অর্ডার বুক বা হুকুমনামা বই প্রভৃতির সাহায্যে ছিন্নপত্রাবলীর বিস্তৃত তথ্যভিত্তিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা। বইটি রবীন্দ্র-জীবনের বহু অজানা সংবাদেও ভরপুর। দাম ৮.০০

গোপালচন্দ্র রায়-এর আর এক গ্রন্থ

অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র

সুসম্পাদিত বঙ্কিমচন্দ্রের এই পত্র-সংকলন গ্রন্থটি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে বহু অজানা তথ্যে ভরপুর। দাম—২৫.০০

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

বাংলা উপন্যাসের কালান্তর

অমিতাভ চৌধুরী'র

সূর্যাস্তের আগে

রবীন্দ্রনাথ

দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

বাক্সদের ধুলোবালি যাঁটা কি বন্ধ করা যায় ?



তাই, জে. সাগর এর  
উলমার্ক শ্রিক রেজিস্ট বোনার উলই নিয়ে আমুন -  
কারণ এ বাড়ীতেই ধোওয়া যায় আর তাও একেবারে নিশ্চিত।

জে. সাগর-এর শ্রিক রেজিস্ট  
বোনার উল, তার মান হোট  
হ'য় যাওয়া প্রতিরোধক উল।  
বাড়ীতে ধুলোও না এ ছোট হয়ে  
যায় বা আকার কোনোরকম  
থারাপ হয়। তাই তো,  
জে. সাগর-এর ওপর উলমার্ক  
শ্রিক রেজিস্ট লেবেল লাগানো হ'য়।  
বিক্রয়, নতুন উল যে স্বাভাবিক  
কোমলতা আর আরাম পাওয়া  
যায়, তা আর কি কোথাও মেলে ?  
এছাড়া, জে. সাগর-এর উল  
পাথর কত রকমের অপরূপ  
মানোহারিণী সব রঙের ছটা !  
বড়দের জন্য কোমল উলমার্ক  
শ্রিক রেজিস্ট আর বাচ্চাদের  
সব মনো কেয়ার।



উলমার্ক  
বিক্রয়,  
যাঁটা উল পাওয়ার  
আস্বাসন !



কাঁকে সে চেয়ে না, যেমন স্বপ্নের অধ্যাপককে চেয়ে। একই বাজারের কেনা-কাটার সুবাদে।

বাজার বলতে বাজার। রুমেই তা জমে উঠছে। কেনা-কাটা, দরদস্তুর আর পথের ভিড় আছড়ে পড়ছে। বেলা বাড়ছে। ভোর আর কতসময় থাকে। সকাল-বেলা সকাল সকাল চলে যায় কিণ্বা পাখির মতো লেজ নাচিয়ে। শহর কেনা-বোয়ার গমগম করতে থাকে। একসময় পৃথনী দেখে সেই বৃক আর মেমসাহেব আবার পাশাপাশি চলেছে।

“আপনার কতক আমার চাকরির কথা মনে করিয়ে দিবেন।”

“রীয়াসি লাক্-লাক্।” এই শহরের পিঠে ডানা লাগাবার মেককর্তা ছিল ও। এখন তো সব লক্-আউট।”

“তার মানে?”

“বৃক্কো না ডালি’ং, এখন গোটা প্রজেক্টই বাতিল হয়ে যাবে। তাই নতুন চাকরির কোন প্রশ্নই থাকছে না।”

“আপনি আমাকে ডালি’ং-ডালি’ং করবেন না।”

“ওক্। রাগ-টাগ আই মিন্। আগারও কতা সুন্নীট্ হর।”

“আপনি একটা হোর।” বৃক্ক নিশ্বাস ধরল।

“ইউ ইউ...”

“শাউ-আল্।”

“ইউ সান্। অক্ এ কি...”

একটা মিনি প্রলয় ক্ষতবে, পৃথনী দেখে, এমন সময় আলো কমে আসে। দাক্ষেণ্যের দিকে তাকালে মেঘের কালো দেখা যায়। সে ফের মনস্ক হয়ে ওঠে।

সাবর্জনীন আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়া বাছাই করে সে বেরিয়ে পড়ছিল। গরীর-মনে এক প্যাশান নিয়ে ভোরের শহরে রাস্তার একজন হতে। সুমি তখনও ঘুমে। তাকে জাগরানি যে এমন চিত্তার যে স্টী জেসো উঠে এই পরিবর্তনকে নিজের মধ্যে অনুভব করবে একা একা। এখন পথের মাঝে তার মনে হলো, যখন সুমি জানবে যে তার স্বামীই এই মাস্টার-প্ল্যানের দ্রষ্টা তখন তার দৃ’ চোখে বিশ্বাসের পরিবর্তে অনুবোধ খিনিয়ে উঠবে। সে কি সুমিকে বোঝাতে পারবে যে এই ক্রিসান্ত পরিবর্তনের জন্য তার দায়িত্ব কিছু মাত্র নেই।

“সু’মি, কিবাল কর...” সুমি ডাগর চোখে তারিফে থাকবে আর পৃথনী দেখবে স্টার চোখে অন্য এক ইশারার আলো। তার মনে পড়ে ডাগর বলেছিল, “এ হলো গিরে চাকর-করা মেয়েদের এক শহরে ট্রাজিডি।” আজকাল ট্রাজিডি গল্পের ব্যবহার নানা ভাবেই হয়। ডাগর আরও বলে, “ওদের সত্যক করে দিলেও ওরা সত্যক হর না। বা কলা চলে প্রাত্যহিকতার চাপে পেটে দ্রঃ নিয়েই বাস-ট্রামে বেশরোয়া বাতায়ত করে। ফলে বা হবার অনেক ক্ষেত্রে তাই ঘটে। গভ’পাতের অনুশোচনা।” তার বেশ মনে আছে সুমি এই ঘটনাকে কখনও শীতল অস্তুরকরণে মনে নিতে পারেন। শোক ছিল প্রথমেই অন্য। এবং বিরক্তি পরিপাক’ সব কিছুর ওপর। তখন সুমির চোখে চোখ রাখা যেত না। আর তখনই চেতন-অবচেতনে অবরব পাচ্ছে তার মাস্টার-প্ল্যান। নির্বিঘে’ মা হওয়ার জন্য কতক সামাজিক শর্তের প্রয়োজন। এই চিন্তাও তাকে ব্যাকুল করছিল।

হেঁচট খেল পৃথনী বা তার ঘোড়া। তার মনস্কতা চুরমার হয়ে সেলে সে দেখলে তাকে একদল বৃক-বৃবতী ঘিরে ধরেছে।

“তুমি, তুমি—”

“এই লোকটা—”

সবাই তাকে আঙুল তুলে দেখছে। দৃ’ কক্ষ এগিয়ে দৃ’ কদম পিছিয়ে এলো সে।

“তুমি, সেই লোকটা—”

“আমরা বলছি তুমি। আমরা জেনেছি তুমি।”

“কী আমি...” স্পষ্ট জানতে চাইল পৃথনী।

মাফা জবাব এলো, “তুমিই এই ঘোড়া-মাক’ মাস্টার-প্ল্যানের কারিগর।”

“আমরা জেনেছি তুমি।” তোমার নাম কাল করে দিলে পৌর কর্তৃপক্ষ লা ঢাকা দিয়েছে।”

“আরে, দেখছ না ইতিমধ্যেই এলাকার সাবর্জনীন আস্তাবলগুলো থেকে দৃ’বৃ’ উঠছে।”

“দৃ’একদিনের মধ্যেই হরতো শহরে একটা মহামারী দেখা দেবে।”

“মডার ওপর খজোর আঘাত।”

“পৌর পিতারা এখন কোথায়?” একজন চেঁচিয়ে জানতে চাইল।

“তারো গা ঢাকা দিয়েছে। সাত তাড়াতাড়ি শহরবাসীর উদ্দেশে একটা

ইস্তাহার প্রকাশ করবে বলে...”

“কেন তুমি এরকম একটা ঘোড়া-মাক’...”

“কেন কেন?” সরব প্রপেন বেলা উজ্জিকিত হয়।

“আমি শহরবাসীর ভাল চেরেছিলাম।”

পৃথনীর কথা শেষ হবার আগেই চারপাশে হাসির হুন্ডোড় শোনা যায়।

“আমাদের ভাল সবাই চায়। কিন্তু আমাদের ভাল হর না।”

সে শুনলো আরেকজন বলছে, “লোকটার ডাব-ডপাী অনেকটা বেন ডন্ কুইকস্টেটের মতো।” এ কথার সে হাবড়ে যায়। বলে, “না না। আমি নিতাপ্তই বৃক্ক সত্যর একজন কনিষ্ঠ কেরানি। বৃ’বৃ’ আমি চাইনি।” তাকে কেমন কাতর দেখায়; কিছ্ বা ভীত। তার বৃকের পুরনো বাখাটা মোচড় দিয়ে ওঠে।

“তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। আমরা তোমার বিচার করবো।”

“তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। আমরা ধূনি ভেটে তোমার মৃতদণ্ড দিচ্ছি। শহরবাসীকে নিয়ে কম্পনা-পরিরক্পনার ক্লাসের জন্য চরম দণ্ড।”

সমবেত বৃক-বৃবতী বৃ’বৃ’ আবেগে মৃত্যুদণ্ডে সম্মতি জানাল। পৃথনী, বৃক সত্যর কনিষ্ঠ কেরানী, যে শহরবাসীর ভাল চেরেছিল, তাকে ঘিরে মারমুখী বৃক-বৃবতীদের চোখে তার অনিবার্যতাকে দেখলো। অশ্রু’ কি বেন বলতে চাইল সে, পারলো না। বৃকলো সময় তার জীবনে শেষ কামড় বসিয়ে দেবে, আর কিছ্। অতুত এক কান্নার এই প্রথম সে ভেঙে পড়ছিল। এমন সময়—

“আপনারা ওর মৃতদণ্ড ঘোষণা করে, নিজেদেরকেই শাস্তি দিতে চাইছেন।”

এ কথার রাগী বৃক-বৃবতীর দল বিশ্বাসে নতুন আলোড়নকে লক্ষ্য করে।

“কে আপনি? এমন কথা কলছেন কেন?”

“এই গল্পের লেখক।”

“আপনি এই আধ-খোপা লোকটার পরিরক্পনা অনুমোদন করেন?”

“না।”

“তা হলে?”

“পাখীর রক্তা চোখের দিকে সকলেই তাকাত পড়েন না; অথচ পরিচাল চার। সঙ্কট মোচনের আসল চাবির হাঙ্গল যে জরেন না, সে কম্পনার চাবি দিয়ে তা হুলতে চার। এ হলো সেই ধরনের প্রতিজ্ঞা।”

“প্রতিজ্ঞার জীবন আমরা চাইছি না।”

“আমিও চেরেছিলাম, আমাদের আছড় বাওয়া বৃ’বৃ’ হোক। পথ বৃ’বৃ’না বৃ’বৃ’ হোক। আর বাড়ি ফেরার গ্যারান্টি,” পৃথনী বলে ওঠে।

“পথ বৃ’বৃ’না একদিন কমে আসলেও বার লিগা করা গেছে তার কী হবে?” ভিত্তের মধ্য থেকে এক বৃক তেতো গলার প্রাণ করে—ঠিক কাকে সেটা ধরা যায় না।

লেখক বলে “এর উত্তর পৃথনী জানে না। অ্যানা লুই স্ট্রপ জানতেন। তার দুরন্ত নদীতে একজনার লিগা কাটা গেছিল কিনা।”

এ কথার রাগী বৃক-বৃবতীর দল একে অন্যকে দেখে।

“তাহলে পথবৃ’বৃ’নার মতো ব্যাপার প্রেক্ হাওয়া দেবে একদিন। একজন বলে। অন্যজন, “সেই সাতবাসী ইউটোপিয়া।”

“এই খোপা লোকটা তাহলে ঘোষ করলো কী? আহা বেচারার সবার ভাল চেরেছিল,” জিজ্ঞাসার ব-ক্সেই ব্যাগ ও তাক্সি। এবং কোন কিছ্কেই বিশ্বাস না করার মরীচা ভগা।

তব্ লেখক বলে, “পথ বৃ’বৃ’নাও একটা সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে জুড়ে আছে।”

“আর অসাবধানী অসতর্কতার বারা চেপে যাবে তাদের উদ্ধার করবে কে, আপনি?”

“তাদের জন্য শোক করবে কে?” বৃ’বৃ’ দিয়ে চুক চুক শব্দ করে।

“জীবনানন্দ দাশও গ্রাম চাপা পড়েছিলেন। আপনি তাকে বাঁচরত পারতেন?” হাসি।

ঠিকই। আমাদের ভাবার সবচেয়ে ইতিহাস সচেতন কবি কিছ্টা অন্য-মনস্কও ছিলেন।”

“অর্থাৎ?” সকলে একবেলা এই অনামনস্কতার তাৎপর্য দাবী করে।

“অনামনস্কতাও একটা সামাজিক লক্ষণ।”

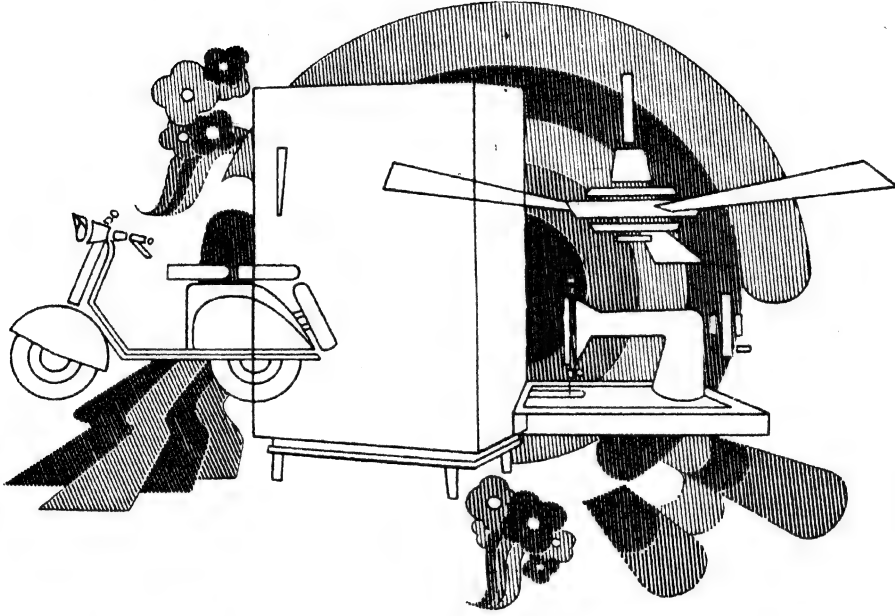
“অতঃপর?” আবার জিজ্ঞাসার কলরোল।

“কীবকেও সচেতন ভাবে পথ হারিয়ে হবে। অনামনস্কতা চলবে না।”

পৃথনী ঘোড়া থেকে নেমে চোখ-কান খোলা রেখে জরর পথে রওনা হয়। লেখক তাকে সতর্ক করে দিয়েছে।



নিয়মিত কিছু কিছু জন্মিয়ে যান—  
দেখবেন, আপনার যত সাধের জিনিস একদিন  
আপনার হাতের মুঠোয় এসে গেছে।



হ্যাঁ, এই আলাদীনের কাজই করে  
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের রেকর্ডিং ডিপোজিট স্কীম

সঞ্চয়ের এই পরিকল্পনাটির সবচেয়ে বড়ো সুবিধে হচ্ছে, মাসে মাসে কতো জমাবেন সেটা আপনার পছন্দমতো আপনিই ঠিক ক'রে নিতে পারেন। কমসে-কম ১০ টাকা থেকে সর্বাধিক ১,০০০ টাকা অবধি, আর তা-ও ১ বছর থেকে ১০ বছরের মেয়াদে—যা আপনার খুশি।

এতে সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে সহজেই একটা আয়ও দাঁড়িয়ে যায়। ফলে, মেয়াদ শেষ হলে মোট যা পাবেন তা আপনার জমা টাকা থেকে ৫০ শতাংশ বেশী তো হবেই....তার চেয়েও বেশী হতে পারে! এমনি করেই তখন

ইচ্ছেমতো কেনাকাটার সুযোগ আসে, বহুকালের সাধ ও স্বপ্ন সফল হয়। বিস্তারিত জানতে হলে আপনার কাছাকাছি এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের শাখায় আসুন।



**এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক**

আপনার নিজস্ব ব্যাঙ্ক

হেড অফিস : ১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,  
কলিকাতা-৭০০ ০০১



## সেই সময়

### সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

১৬৬৬

প্রলয়ঙ্কর খড়ে কলকাতা নগরীর অন্যান্য বহু অট্টালিকার মতন ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা ভবনটিরও প্রভুত ক্ষতি হয়েছে। \*সামমোহন প্রতিষ্ঠিত এই ভবনটির একাংশ কাত হয়ে পড়েছে। ছাদ ভেঙে কড়ি-বরগা এমন খুলে ছলছে যে উত্তমরূপে মেরামত করার আগে ওখানে প্রবেশ করাই বিপজ্জনক।

খড়ে শব্দ উপাসনা ভবনটিই ভাঙেনি। সেই

দ্বারায় ব্রাহ্ম সমাজও ভেঙে দাঁটুকরা হয়ে গেছে।

প্রবীণ দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে জড়ুলত তেজী যবো কেশবের মিলনে ব্রাহ্ম সমাজ নতুনভাবে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে। গঙ্গকরা গ্রামের এক অল্পকুলে তখির মধ্যে রাতিবাস কালে দেবেন্দ্রবাবুর গনে যে বিদ্রোহ চমক হয়েছিল তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। কেশব এই ধর্ম আন্দোলনটিকে স্থানীয় গণ্ডি থেকে মুক্তি দিয়ে সব ভারতে ছড়িয়ে দেবার উদ্যম নিয়েছেন। সুস্বরে বৌদ্ধবাহি শব্দে গিয়ে পর্যন্ত তিনি প্রচার করে এসেছেন এই নতুন ধর্ম মত। এখন সারা ভারতে ব্রাহ্ম সমাজের শাখার সংখ্যা পঞ্চাশ। দীক্ষিত ব্রাহ্মের সংখ্যা দশ হাজারের কিছু বেশী। যারা দীক্ষা নেননি এমনও অনেকে এই মন্ত্র-চিন্তা ও কালোপযোগী ধর্ম-সংস্কারের প্রতি আকৃষ্ট।

পারিবারিক বাধা অগ্রাহ্য করে নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে প্রকাশ্যে মাঘ উৎসবে বোলা দিয়েছেন কেশব। এই উৎসলকে চিরকালের মতন গৃহভাঙ্গ্য করতেও তিনি বিম্বা করেন নি। তখন দেবেন্দ্রবাবুর সনির্বন্ধ অনুরোধে সম্ভবত তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। সকলের এমন আন্তরিক, আগুন-করা ব্যাকার যে এ বৈ পনের বাড়িতে বাস, তা একদিনের তরুরও বোঝা যায় নি। কেশবের স্ত্রী জগন্মোহিনীর কী-ই বা করেন। এর আগে কখনো সে থাকে নি কোনো অন্যায়ের গায়ে। কিন্তু দেবেন্দ্রবাবুর কন্যা ও পুত্রবধূরা তাকে একবারে নিজের ঘরে মিশিয়ে নিয়েছিলেন। সকলে মিলে অশ্রমঘরে কত আনন্দ-হুড়ি। জগন্মোহিনীর তবু মন কেমন করে তার একেবারে ছোট ভাইটির জন্য। সে দুঃখও তিনি কুলে যান দেবেন্দ্রবাবুর কান্ডে পুত্র হারকে দেখে। রবির মধ্যে সন্ধ্যা আধো আধো বোল ফুটেছে। জগন্মোহিনী প্রায়ই তাকে কোলে নিয়ে ঘরে বেড়ায়। রবির বড় ভাই সোম

আর দেবেন্দ্রবাবুর এক নতি সত্যও তার পায়ে পায়ে ঘোরে, এই শিশুরা "মাচি" বলে ডাকে।

কিছুদিন ঠাকুর বাড়িতে থাকার পর কেশবের শরীরে একটি বিষম ফোড়া হলো। অস্বাভাবিক জাতীয়। দেবেন্দ্রবাবু খ্যাতনাম চিকিৎসকদের ডাকিয়ে চিকিৎসার কোনো ছাতি রাখলেন না। তবু বেশ কিছুকাল শয্যাশরী হয়ে রইলেন কেশব। তখন কেশবের আত্মীয়-স্বজন অনুভূত হয়ে কাঙ্ক্ষিত-মিনতি করে আবার কেশব ও জগন্মোহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল কলকাতার বাড়িতে।

সেইর ওঁটার পর কেশব আবার বিপুলে বিজ্ঞে লাগলেন ব্রাহ্ম সমাজের কাজে।

প্রথম বৈষম্য বিবর-কেশবের প্রতি দেবেন্দ্রবাবুর মনে একটা খুব বিরোধের ভাব ছিল। তাঁর মনে হতো, নিজে তিরিশ দিন অর্থ সম্পদের চিন্তা মানুষের নৈতিক উন্নতি ও ধর্ম সাধনার জন্তরায়। বিশেষত জাঁর পিতা, অত্যন্ত বৈষয়িক বিলাস-আড়ম্বর প্রিয় এবং ভোগী স্বারকানাথকে দেখেই দেবেন্দ্রবাবু, আরও বিপরীতমুখী হয়েছিলেন। প্রায়ই সব কিছু ছেড়ে দিয়ে সুস্বরে, নিজস্ব শৈলীশব্দে সূমহানি প্রকৃতির সান্নিধ্যে গিয়ে তিনি বেশী সম্প্রদায় পেতেন।

কিন্তু এখন তিনি মধ্যবয়স্ক এবং একটি সুবহু পরিবারের অধিপতি। সাধারণ ব্যার বিপুল তো খুটেই তা ছাড়া ব্রাহ্ম আন্দোলন পরিচালনার জন্যও তাকে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করতে হয়। উদ্ভাবনীয় পত্রিকা এবং ইন্ডিয়ান মিরার নামে ইংরেজি পাক্ষিকও চলে তাঁর অর্থানীকসে। সুতরাং দেবেন্দ্রবাবু, এই সময়ে মন দিয়েছেন জমিদারি বোঝানোর কাজে। পিতার ঋণ পরিশোধ করা হয়ে গেছে, জমিদারির অর্থও বৃদ্ধি পেয়েছে যথেষ্ট। এক সময় যিনি প্রায় দেউলিয়া হতে বসেছিলেন, সেই দেবেন্দ্রবাবু, এখন আবার দেশের ধনী সবারের শিরোমণি। এখন তিনি মনে করেন, পুরোপুরি সবার ধর্ম পালন করেও ধর্মনিরপীল এবং আত্মশুদ্ধির প্রয়াস অব্যাহত রাখা যায়। তাঁর পরিমন্ডলের সকল মানুষের প্রতি তাঁর ব্যবহার সর্বদা ও উদার। মৃত হলেও তিনি ধানশীল। কিন্তু তিনি গোষ্ঠীপতি। সকলকে যেনে চলতে হবে তাঁর বিধান, তাঁর মতের কথাই আদেশ। যে-কোনো বিষয়ে তাঁর মতই চরম, মত পাথরকর কোনো স্থান নেই। আসলে তো তাঁর ধর্মনিতে প্রবাহিত হচ্ছে পৈতৃক রক্ত।

কেশবকে খুঁই পছন্দ করেন দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু একটা ব্যাপারে তাঁর ষটকা লাগে। কেশব এত ষটবেল আর ষটখোঁড়ের জরগান করে কেন? এর মধ্যে যেন ষটীচনী গম্ব আছে। সাথে ষাতি এবং ষটীচনী ভাবকে যোর অশঙ্কল করেন দেবেন্দ্রনাথ ইংরেজ রাজ-পুরুষদের সংস্পর্শেও তিনি পারিতপকে যেতে চান না। ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর বিরাগ নেই। তিনি ফার্সি ভাষা শিকা করেছেন, সূফী তত্ত্বের প্রতি তাঁর ষেঁক আছে। তবে তাঁর ব্রাহ্ম ধর্মকে তিনি হিন্দু ধর্মেরই পরিশীলিত অঙ্গ মনে করেন, শৌভালিকতা যেমন হিন্দু সমাজ ছেড়ে ফেলেছে, সেই রকম একেশ্বরবাদও তেঁ হিন্দু ধর্মের প্রধান কথা, সুতরাং একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মরা হিন্দু ধর্মেরই সংস্কারক। সেই জন্যই পূর্ববাহুয়ে প্রচলিত হিন্দু সমাজের পারিবারিক অচার-ব্যবহারগুলি পরিভাগ করার প্রয়োজন নেই। তিনি বিষম পছন্দ করেন না। তিনি ধীরে ধীরে সব কিছু পরিবর্তনের পক্ষপাতী।

কিন্তু তরুণ কেশবের স্বপ্ন আরও অনেক বেশী উজ্জ্বল। দেবেন্দ্রবাবুর ব্রাহ্মধর্ম শব্দ বাঙালী উচ্চ কণ্ঠের হিন্দুর ধর্ম। কিন্তু কেশব মনে করতেন, তিনি সারা ভারতবর্ষ, এমন কি সারা পৃথিবীর জন্য এক নতুন ধর্মমতের প্রচারক। শব্দ বাইবেল নয়, কেবল আবেশপত্রও তিনি পাঠ করেন নিরন্তর। তাঁর মতে, পৃথিবীর প্রধান ধর্ম-গুলিতে যে সব পৃথক বিধান আছে, তা আদিক

সত্য, কোনোটাই পূর্ণ সত্য নয়। অতএব এই সব ধর্মের আংশিক সত্যগুলি মেলিতে পারলেই হবে পৃথিবীর সব মানুষের উপযোগী এক আদর্শ ধর্ম এবং ব্রাহ্মরা গ্রহণ করবে সেই দায়িত্ব।

কিন্তু দেবেন্দ্রবাবু আর কেশবের মধ্যে বিভ্রান্তি শব্দ আত্মিক নয়, ভেতরে ভেতরে বিজ্ঞে ধর্মনিতে হতে শুরু করেছে কিছুদিন ধরেই। তরুণ ধর্মনি ব্রাহ্মরা সকলেই প্রায় কেশবের চালা, তারা নিজে নতুন এক একটা ব্যাপার নিয়ে মোতে আছে। কেশব যেন মার্সিডেনিয়ার সেই তরুণ রাজকুমার, হৃদয়িমের একটি দল নিয়ে যে দুনিয়া জয়ের স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু যে-হেতু কেশব বহু শতাব্দী ধরে পৃথিবী, যুদ্ধবিষম, হিন্দুর সন্তান, তাঁই তলোয়ার নয় জিহবাই তাঁর অস্ত্র।

পৈতেধারী আচার্যদের ব্রাহ্মসমাজ থেকে

একেবারে বিদায় করে দেবার জন্য কেশবরা তৎপর। ব্রাহ্মধর্ম জাতিভেদ নেই, শব্দ বিজ্ঞের ঐ চিহ্ন থাকবে কেন? কেশবদের দৃষ্টান্তে দেবেন্দ্রবাবু, নিজে উপবীত ত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু যে-সব ব্রাহ্মণ আচার্যরা ব্রাহ্ম সমাজের একেবারে পঙ্কনের সময় থেকে আছেন, তাঁদের তিনি সমাজ থেকে সরিয়ে দিতে চান না। লোকচারের জন্য কিবা পারিবারিক গড়গোল এড়ানো জন্য যদি তাঁর পৈতেতা রাখতে চান তো রাখেন না। কেশবরা উদ্যোগ নিয়ে ব্রাহ্মণ আর শব্দের মধ্যে বিবাহ ঘটানো, এটাই দেবেন্দ্রবাবুর মোটেই পছন্দ নয়। এমন কি বিবাহ বিবাহ ব্যাপারটিকেও তিনি মনের খুব গভীরে সার দিতে পারেন না।

কেশবের উৎসাহদাতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নামে আর এক তরুণ। যেতিয়াল কলকাতার এই প্রাচীন ছাতি বাঘ আঁড়া নামে এক গ্রামে গিরে বারুণ বিজয়ের সঙ্গে প্রচারের কাজ করতেন। বিজয়কৃষ্ণের মতামত যেন কেশবের চেয়ে উগ্র। পৈতেধারী আচার্যদের ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার কৌশ থেকে না সরলে যেন তাঁর কিছুতেই স্বাস্থ্য নেই। শব্দ পর্বন্ত দেবেন্দ্রবাবু, রাজ হলেন ঔষের কথার।

তারপর এলো সেই ষড়।

ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব গৃহের ভগ্নদশা, কিন্তু সেজন্য তো প্রতি বৃহত্তরের উপাসনা কল্প রাখা যায় না। উদ্ভাবননিতে বিজ্ঞ পন দেখা হলো যে বর্তমান না সে গৃহের সংস্কার হয়, ততদিন সমাজের উপাসনা হবে জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রবাবুর বাড়িতে।

নির্দিষ্ট সময়ে কেশবের দলবল সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, উপাসনা এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, আর আচার্যের কৌশে বসে আছেন অযোধ্যানাথ পাকড়াশী। আর যায় কোথায়! এই পাকড়াশী বমাই শব্দ, যে পৈতে ধারী তই-ই নয়, একবার রটেছিল যে তিনি উপবীত ত্যাগ করেছেন, পরে আবার তিনি জানালেন যে না তিনি পৈতে ছাড়তে রাজি নন। সেই লোক আচার্য? অথচ কথা ছিল আজ বিজয়কৃষ্ণ এবং কমলাকান্ত আচার্য হবেন।

উপাসনার মাধ্যমানেই ছোকরারা উত্তোক্ত-ভাবে গোলাযোগ শুরু করে দিল। দেবেন্দ্রবাবু, এভাবে কথার খেলাপ করলেন কেন।

দেবেন্দ্রবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এটা তো ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান নয়, এটা তাঁর নিজের বাড়ি। এখানে তাঁর ষড় মতন অনুষ্ঠান পরিচালনার অধিকার তাঁর আছে।

নবীরা বললো, মোটেই না। সকলের সম্মতি নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার স্থান বদল হয়েছে। সে স্থানটি যার বাড়িতেই হোক, সেখানে ব্রাহ্ম-সমাজের বিধি মতই সব কিছু চলতে হবে।

দেবেন্দ্রবাবু, তখনও দুঃখের মধ্যে আপোষ

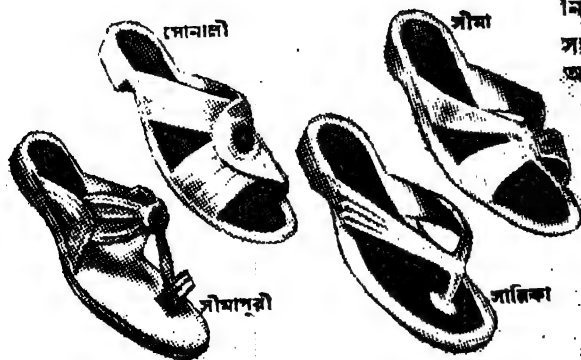


# কোমল পায়ে দিও পরায়ে— স্যাণ্ডাল

স্যাণ্ডাল সেবা মানের ক্ষয়ক্ষতি থেকে পাণ্ডি পিভিসি কন্সট্রাক্ট দিতে মোকদ্দম করা। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোটি কোটি একই মাথের বাচ্চু বৃদ্ধবলে তাঁসা। ফলে মধ্যমলের মতো কোমল—পরে আরাম কত।

কঠোর গুণমান নিয়ন্ত্রণের দরুনই স্যাণ্ডাল—এর মতো অসাধারণ জুতো তৈরি সম্ভব হয়েছে। উপরন্তু রকমারি ফ্যাশনদুস্তর ডিজাইন। ক্রিমিশ স্নায়ুজানা নির্মিত—দেখলেই চোখে পড়বে।

স্যাণ্ডাল পুরুন—চেহারাই বললে হবে। হাতে উঠবেন অপরাধী, মনমোহিনী।



**Bata/BSC**  
**স্যাণ্ডাল**

কাশনজরত! আরামদায়ক! টেকসই!

দেখা গুণমানের জুতো কিনতে হলে দরখাস্ত।  
হুড়োর লোকে খাটাই/বিজ্ঞানি স্থাপ দেখে যেবেন।

করবার জন্য বললেন, যে তা হলে এক কাজ করা যাক না। পাকড়াশী মশাই বসেছেন বসুন, তাঁর পাশে আর একজন পৈতে ডানার আঁচাষ আসল নিন। তা হলে আর কারুর কিছু বলার থাকে না। বিজয়রত্নই হতে পারেন শ্বিত্তীর আঁচাষ।

কিন্তু তরুণদল তা মানতে মোটেও রাজি নয়। উপাস কিসের? এখানে তো... একই সঙ্গে পৈতে পরে স্বাক্ষর লেজে থাকা, আবার জাতি ভেদ হান স্বাক্ষরমে' বিন্দুসী এ আবার কী রকম কথা।

বাইরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বিজয়রত্ন চিৎকার করে বলতে লাগলেন, দেবেন্দ্রবাবু, কি পোপ নাকি যে তাঁর ইচ্ছে জানিচ্ছে অনুযায়ী আমাদের চলতে হবে?

এবার কঠোর হলেন দেবেন্দ্রবাবু। হ্যাঁ, তাঁর নির্দেশই চূড়ান্ত। পাকড়াশী মশাইকে তিনি অচাৰ্যের বেশী থেকে নেমে আসতে বলতে পারবেন না। যার ইচ্ছে হয় এই উপাসনায় যোগ দিক, যার ইচ্ছে হয় চলে যাক।

সদলবলে কেশব-বিজয়রত্নরা চলে গেলেন সেই উপাসনা সভা ছেড়ে। অন্য এক স্বাক্ষর বন্ধুর বাড়ির ছাদে গিয়ে বসলেন তারা।



যে স্বপ্নাদেশ পেয়ে দেবেন্দ্রনাথ তরুণ কেশবকে আর সব প্রবীণ স্বাক্ষরের ডিঙ্গারে সমাজের আঁচাষ' পরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, বস্তুত কেশবের হাতেই তুলে দিয়েছিলেন সমাজের ভার, আজ দেখা গেল সেই স্বপ্ন প্রাপ্ত। স্বাক্ষরসমাজের ভবন এবং বাবতীর সম্পত্তির যে ট্রাস্টি বোর্ড ছিল

তা থেকে কেশব এবং অন্যদের তিন মীরের মিলন কলমের এক কোঁচায়। উভয়ের ভারকে তাঁর করকার নেই। তাঁর মোহনপুরে বিজয়রত্ন করলেন স্বাক্ষরসমাজের সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক সেই অস্বাভাবিক পাকড়াশী এবং নিজের হাতে রাখলেন সব মীর কলম।

দেবেন্দ্রনাথ বাবুহারা তরুণরা প্রথমে একেবারে হতবাক। স্বাক্ষরসমাজের সব সম্পত্তি কি দেবেন্দ্রবাবুর নিজের নাকি? তিনিই বেশী টাকা-পয়সা দিয়েছেন বলে, তাই এখন তো তা একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠানের অধীনে এবং স্বাক্ষরসমাজের কনসিটীউশনও আছে। সে সব অগ্রাহ্য করে দেবেন্দ্রবাবু নিজস্ব হুকুম আর করলেন। এ যে স্বৈরাচার! স্বাক্ষরসমাজের এই মত ছিল না যে স্বাক্ষরসমাজ ভবনে সব ধর্মের লোকেরই উপাসনার অধিকার থাকবে?

স্বাক্ষরসমাজ ভুল হয়ে যদি দুটি টুকরোই ভর, তা হলে ট্রাস্টের বিষয়ও ভাগ হওয়া উচিত। এমন মনে করলেন কেশব এবং তাঁর সমর্থকরা। কিন্তু সে সব কিছুই হলো না। ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকা সম্পাদনা করছিলেন কেশব, সে পত্রিকারও স্বাভাবিক অন্য সম্পাদক নিযুক্ত করা হলো। এতটা কেশব কিছুতেই মানতে রাজি নন। যিনি আর্থিক সাহায্য করেন, পত্রিকার ওপরে কি শব্দ, তাঁরই অধিকার? আর যে সম্পাদক পরিচয় করে সম্পাদক পত্রিকাটি বার করছেন, তিনি কেউ না? কেশবের লেখনী গাশেই মিরর-এর খ্যাতি।

কেশব তাক করলেন, যদি মিরর নামে দুটি পত্রিকা ঘেরায়, তাতেও ক্ষতি নেই। তবু তিনি মিররের সম্পাদক হ'তেন না। পক্ষপাতের মধ্যে তিনি স্বাধীনভাবে প্রকাশ করলেন মিরর-এর নতুন সংখ্যা।

নিজের নীতিতে অকিঞ্চল থাকলেও কেশবের সঙ্গে বিচ্ছেদ মনে বড় আঘাত পেলেন দেবেন্দ্রনাথ।

ভাবনের শক্তিকে তিনি ঠিক পরে চালিত করে তাঁর জাতি গির স্বাক্ষর আন্দোলনকে উজ্জীবিত করে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তরুণরা যখন ভুলে আসতে দেয়। আর তারপরে ধমকি এই। প্রবীণদের চিন্তাধারা থেকে অন্তত কয়েক পা এগিয়ে থাকা। মূল কার্যত ৮ ভাগ হবার পর উত্তোষিত যুবকরা... এমন কি কটু-কটব্য করতেও ছাড়লো না। অভিজাত দেবেন্দ্রনাথ একটি প্রতিবাদও না করে... হালকা হইলেন।

কিন্তু হঠাৎ যেন নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন তিনি। যদিও তাঁর অনুগত স্বাক্ষর সংখ্যাও কম নয়, বিদ্রোহী তরুণদের চেয়ে অনেক বেশীই হবে বোধ হয়, তবু দেবেন্দ্রনাথ আর আগেকার সেই উদ্দীপনা অথ করেন না। এমন কি, তিনি যেন অনুভব করছেন, তাঁর দৃষ্টিগত কর্ম আসছে, প্রবণ কমতাও ক্রীণ হয়ে আসছে, দরীয়ে আর সেই জ্বলন নেই। সাতভাষা বঙ্গের বয়স, এর মধ্যেই যেন তাঁর জীবন সারাহ এসে গেল।

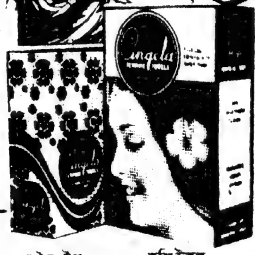


শ্বিত্তলের অভিলেপ আরাম কোমরার তিনি চূপ করে বসে থাকেন। মনকে সব কিছুর উর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারেন না। বারবার মনে পড়ে কেশবের প্রজন্মলভ মৃৎখানি। নিজের সমতানদের চেয়েও ওকে তিনি বেশী প্রীতি করেছিলেন। এখন কেশব হয়ে গেছে, তবু তিনি কেশবের ওপর রাগ করতে পারেন না। আপন মনে বলেন, কেশব নিঃস্রী হোক, ওর আশ্রয় প্রভায় আর সকলে আলোকিত হোক, সারা বিশ্ব কেশবকে চিনুক, জানুক।

(জয়দল)



ACI/A/379B



কটন-উল সিলিউইট

আপনার প্রয়োজনে  
কেমন করে ম্যাড্রে  
আপনাকে নিশ্চিত আত্মবিশ্বাসে  
পরিণত করে তুলতে হয়।  
আর কি সুবিধাজনক দামে।

**ম্যাডেলনা**

ম্যানিটারী টাওয়ার

ব্যবসায়িক অনুসন্ধানের  
জুগু লিখুন :  
জি. পি. ও. বক্স নং ২৫২৮,  
কলকাতা-৭০০০০১



ম্যুইচটি টিপুন আর...

আরো বেশী  
কাপড় বেচুন



কম্পটালাক্স-এর ঝলমলে আলো  
কাপড়ের সুন্দর ডিজাইনগুলিকে  
এমন দর্শনীয় করে তোলে যে  
খরিদাররা না কিনে পারেন না।

আরো বেশী  
গয়নাপত্র বেচুন



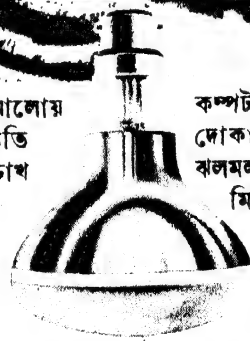
কম্পটালাক্স-এর উজ্জ্বল আলোয়  
সোনার এমন ঝলমলে দ্যুতি  
বেরায় যে খরিদাররা চোখ  
ফেরাতে পারেন না।

আরো বেশী  
জিনিসপত্র বেচুন



কম্পটালাক্স-এর উজ্জ্বল আলোয়  
দোকানের জিনিসপত্র এমন  
ঝলমল করে যে খরিদারের  
মিছিল লেগে যায়।

কম্পটালাক্স এক স্বয়ং-সম্পূর্ণ আলোর উৎস। এটি লাগাতে  
কোনো শেড বা বিশেষ ফিটিংস-এর দরকার হয় না। বাস,  
এটিকে লাগিয়ে ম্যুইচটি টিপুন আর যদিকে চান, সেইদিকেই  
উজ্জ্বল আলো ঝলমলান।



HTB-PFL-620



# কম্পটালাক্স

বহুপযোগী অ্যাকসেসরি লাইট।

ফিলিপ্স

ভারতে ৫০ তম বর্ষ

# স্মৃতি সতত সুখের প্রতিভা বসু

॥ ৩০ ॥

ইদনার্ঘসিও সিলোনির বাড়ির পাটিতে গিরে দেখলাম, অরো করেকজন গণমানব শেখাঙ্গা বাড়ির সমাবেশ হয়েছে। কিছু পরে একজন বাঙালী ভুল্লোকও এসেন। জারিনা সিলোনি বললেন, 'তোমাদের কথা ভেবেই এই ভুল্লোকটিতে নিমন্ত্রণ করেছি।' আমি খুব খুশী হয়ে উঠলাম। বাঙালী দেখলেই আমার ভালো লাগে। পরিচয়গোলা হলেন, এটা আমার বন্ধুত্ব। প্রাথমিকভাবে। কিন্তু প্রাথমিকতা নয়, সেসব কিছু আমার মনে হয় না, মনে থাকে না। আমার খুশির কারণ ভিন্ন। অবিজ্ঞানত অন্যের ভাবের কথা বলতে আমি রাস্তা হয়ে পড়ি। মাঝামাঝি কথা বলার জন্য আমার প্রশ্ন অশ্লির হয়ে ওঠে।

কলাই বাড়িয়া, এ আসরে সবাই সকলের সঙ্গে ইংরিজীতেই কথাবার্তা করি। দেখা হলেন কবি ইদনার্ঘসিও সিলোনি সব সময়েই হুপ। মাকে মাকে একটু হাসি, একটু ইয়েস নো, অথবা ছোটো ছোটো দু-একটি সেন্টেন্স—এর বেশী ব্যবহারই হচ্ছিলো না। জারিনা বললেন, 'তিনি ইংরিজী বলতে পারেন না ভালো। পড়লেননা করেন, কিন্তু বলার অভ্যাস নেই। বিদেশী কেউ এলে হয় তাঁরা তাঁর সঙ্গে ইংলিশে কথা বলেন, নয় তো আমিই সোভারীর কাজ করি।' জারিনা স্মৃত্যে। কিন্তু এখন স্বামীর ভাবাই তাঁর ভাষা। সেই দেখেই থাকেন, স্বামীর সঙ্গেও সেই ভাষাতেই কথা বলেন। বাধ্য না হলে ইংরিজী প্রায় বলতেন না। আর ইংলিশে বলে বাজ হবার প্রশ্নও ওঠে না। বললেন, প্রায় পনেরো বছর পিটার্সের বার্নি।

ইদনার্ঘসিওর জীবনবাসন খুব সাধারণ। ছোটো একটি মোটর বাড়ির মোটররুম ঘন তিনেক ঘর, সম্মুখে বারান্দা। বারান্দার নিচে গুলির রাস্তা। সম্মুখ সাড়ার মধ্যেই বাঙালী-সাদার পাট চলে গেলে সবাই কাঁচ নিয়ে বারান্দাতে এসেই বসলেন। এই সময়েই আমি বাঙালী ভুল্লোকটির কাছাকাছি হবার সুযোগ পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি বরাবরই রোমে থাকেন?'

ভুল্লোক ইংরিজীতে জবাব দিলেন, 'না, বেড়িয়ে এসেছি।'  
'ও এমনিতে কোথায় থাকেন?'

সংক্ষিপ্ত ভাষায় কোথায় যেন বললেন।  
এর পরে আমি আরো দু-একটি প্রশ্ন করে আলাপ জমাবার চেষ্টা করেছিলাম। এবং ভুল্লোক সব প্রশ্নেরই জবাব অতি সংক্ষেপে ইংরিজীতে দিয়েছিলেন। শেষে বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আপনি আমার সঙ্গে ইংরিজীতেই কথা বলুন।'  
অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, 'ক্ষমা করবেন। আমি বুঝতে পারিনি যে আপনি বাংলা জানেন না।'

এই সময়ে বৃষ্টিসেব এগিরে এসে বললেন, 'আপনি বরাবরই বিদেশে আছেন? দেশে কখনো বার্নি?'

ভুল্লোক বললেন, 'বরাবর না হলেও অনেক দিন আছে। প্রায় দশ বছর।'  
'দশ বছর? তার আগে?'  
'তার আগে কলকাতার ছিলাম।'  
'কলকাতার ছিলেন তবু বাংলা শেখেননি?'  
'তা কেন শিখবে না, এতোকাল বাইরে থেকে ভুলে গেছি।'  
এতোক্ষণ অতি সরলভাবেই ইংরিজীতে প্রশ্ন করছিলেন বৃষ্টিসেব, এবার হাসিতে ফেটে পড়ে বিলম্ব বাংলায় বললেন, 'কী কান্ড, মস্ত দশ বছর ভুলে গেলেন সব! আপনার বরল কতো? দশ বছর বাক দিলেও তো মনে হয় বছর তিরিশ না হোক পঁচিশ বছর তো বাকী থাকবেই। এই পঁচিশটা বছর আপনি মাত্র দশ বছরের ব্যবধানে হারিয়ে ফেললেন? ও জারিনা, শোনো শোনো, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি—'

জারিনা সিলোনির সঙ্গে বৃষ্টিসেবের জনিততা অতি নিকট আত্মীয়ের মতো।

জারিনা কার সঙ্গে কথা বলছিলেন, ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কী জিজ্ঞেস করবে?'

'ইংলিশে ক'বছর আছে?'  
'বছর পনেরো তো হবেই, ফুঁড়িও হতে পারবে।'

মাঝামাঝি ভুলে গেল।  
'জিজ্ঞেস করছো? ইংলিশ? না? হাসতে হাসতে জারিনা ভেসে ভেসে অন্যত্র চলে গেলেন। ভুল্লোকও হঠাৎ মূখ্য হয়ে আর করা সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এবং কিছুক্ষণ বয়েই বিদায় নিলেন। তারপর অনেক রাত পর্যন্ত চললো সেই পাটি।

আমাদের হোটেলটি একটি বাল্য রাস্তার ধরে। অনতিদূরেই পিরামিডমন্ড-চিত্রাভার ওয়ান, পাররা উড়ছে কাকি বেঁচে বেঁচে। ঐ কোণের দিকে 'ইলটোপো' কলজের আঁশস, পথে লোকদের অবিরল আনন্দোনা, জানালায় দাঁড়িয়ে দেখতে খুব ভালো লাগে। আজ জারিনা ভাটিকান দেখাতে নিয়ে যাবেন। আমি উত্তেজিত বোধ করছিলাম। হরতো সেনাই খুব ভোরে ছুঁম ভেঙে গেল। তখনো নগরী সম্পূর্ণ জাগ্রত নয়, সূর্যের লাল আলো আঁবীরের মতো ছড়ানো, বাড়ি ঘর সব রঙিন। পরশু রাতে এসে পৌঁছেছি, কাল সকালে 'সিমেটিয়ে' গিরোছি, রাস্তার ইদনার্ঘসিও সিলোনির বাড়িতে পৌঁছেছি, তারপর আজ এই ভোর। ভোরের রোম গহ্বর। যে রোম নিজেই একটা পৃথিবী। আমার সব স্বপ্নের মতো বোধ হচ্ছিলো। আর এ কথা তো সত্যই, আমার মতো বারা প্রথম এসেছে সেই সব দর্শনার্থীদের

মূল্যবোধ, কতো প্রসাদ, কতো দীর্ঘা, কতো বেশী, রাজারানী-পেরোহিতদের কতো ইতিবৃত্ত—আমার চোখের সঙ্গে আমার মন রাস্তা পেরিয়ে উভিত সূর্যের রক্তে বিন্দন বিন্দন বাড়ি পেরিয়ে আরো কতো ঘুরে চলে গেল। বিপুলনা পৃথিবী, কাল নিরবধি। এই রোমনগরের হাতেই একদিন জেরুজালেমের পতন হয়েছিলো, ধূসে-প্রান্ত প্রদীপ রাস্তা থেকে সরাসরি পৃথিবীতে ছাড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলো ইহুদিরা। রোমান সম্রাট জিরেরিরুসের রাজত্বকালে খ্রীষ্টাব্দ ৭০ থেকে ৩৬ সাল পর্যন্ত যিনি জেরুজালেম রোমান প্রশাসক ছিলেন, তাঁর নাম ছিলো পাণ্ডিত্য—পিসাস্‌স্‌। তাঁর হুকুমই খ্রীষ্ট প্রাথমিক দীক্ষিত হন, এবং সেই খ্রীষ্টদের নামেই খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের জন্ম। খ্রীষ্টানরা তখন রোমে ছিলেন একান্তভাবেই এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। জেরুজালেম থেকে বখন আসন লামে, সম্রাট নীরো বিরোধী ছিলেন বলে খবরটা করেই সেই লঘু সম্প্রদায়ের নামে দোষ চাপিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ যে কোন পথে খ্রীষ্টাব্দে প্রবাহিত হবে কেউ কি করেন সে কথা? যে রোমানরা একদিন খ্রীষ্টকে অপরাধী প্রমাণিত করে চোরদের সঙ্গে হুকুমকণ্ডে বিশ্ব করলেন ভবিষ্যৎ সেই রোমানরাই হলেন সবচেয়ে বড়ো খ্রীষ্ট-সেবক। আর তাদের মঙ্গলের জন্য খ্রীষ্ট প্রাণ দিলেন তাঁর সেই স্বদেশবাসী স্ফাতিভারাই হলেন খ্রীষ্টানদের ধর্মের পায়, কৃপার পায়। প্রকৃতির পরিহাস আর কয়েক বলে।

বেলা বাড়লে জারিনা এসে গেলেন। রাজেশ্বরীও এসেছে। চার জনেই বোরের পড়লাম ভাটিকান বার্নি। কখনোই সমুদ্র না দেখলে যেমন সমুদ্রকে কেনেছাওই কল্পনা করা যায় না, তেমনি ভাটিকান না এলে কোনো আত্মবানিক ভাবের ব্যাধি থাকে বর্ণনা করাও সম্ভব নয়। মানুষের ক্রমতা কতো দূর বেতে পারেন, প্রতিভার কী অসীম দীর্ঘ, সে কথা ভেবে কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত স্মৃতি স্তব্ধ হয়ে থাকে। সেন্ট পিটার স্কোয়ারে এসে ডোমটিক দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ সকলকেই ধমকে থাকতে হলো। আকাশকে পটভূমি করে এই বিশাল মহান গম্ভীর স্থাপনা নীল রঙের মিলনটি যেন স্বর্গের প্রহরী। মাইকেল এঞ্জেলোর অমর অলৌকিক প্রতিভাকে এই সৃষ্টি ইশ্বরের রূপেই প্রতিভাত করেছে।

প্রথম প্রবেশবারে একটি পোটি কো। তার পরেই নিউ থেকে উচ্চ পর্যন্ত চোখ চলে না। এমন এক প্রকাণ্ড রোজের কজা। ঢোকবার মুখে দুটি পক্ষ বিস্তার করে যেন আলিঙ্গনে উন্মত্ত এমনিভাবে দাঁড়িয়ে আছে একটি মূর্তি, অভাধন্যর স্মারিত দৃশ্য। ভিতরে ঢুকলে প্রথমটির দিশাহারা লাগে, তার পরে ধীরে ধীরে ভেঁজে ভেঁজে বখন বখনি উন্মোচিত হতে থাকে তখন সোন্দর্ভ তো কেটেই, গরিমার জ্বলের ক্রমতার ভীষণতা হৃদয়কে অন্তত মহাত্মের জন্য হলেও এক অতি-মানসে



## ‘বি’-কে ‘প্র’

প্রমথ চৌধুরী এক অসাধারণ পুরুষ ছিলেন।

বাঙালি, মননশীলতায়, শান্তিত বুদ্ধির দীপ্তিতে সাহিত্যে এক নতুন সুর সংযোজন করেছিলেন।

১৮৮৭-র দেশ, সাহিত্য সংখ্যায় প্রকাশিত

ইন্দ্রিা দেবী- প্রমথ চৌধুরীর পত্রগুচ্ছে তাঁর নম্র

প্রেমিক সত্যার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল।

যে পরিচয়ে তিনি আরও আকর্ষণীয়। সেই খণ্ডিত

পত্রগুচ্ছের সম্পূর্ণ অংশের সঙ্গে বিবাহোত্তর জীবনের

বেশ কিছু অপ্রকাশিত পত্রও উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই

পত্রগুচ্ছে সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন সুভাষ চৌধুরী।

৮ নভেম্বর থেকে প্রমথ চৌধুরীর এই পত্রগুচ্ছে

প্রেম

পত্রিকার ধারাবাহিক  
আকর্ষণ—‘বি’-কে ‘প্র’

**‘ঈগল প্রিফ্রেশন্স’ সম্বন্ধে আর কি বলা যায়?’**



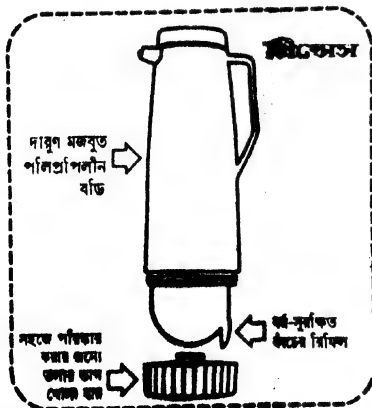
**“মনলোভা...”**

অতিথি সেবিকা !



**“অসামান্য...”**

ধুলো বাইরে বন্দী...উত্তাপ ভেতরে  
বন্দী ২৪ ঘণ্টা।



**“হুমমম...হুনেই তো,  
ঈগল ড্যাকুয়াম ফ্রাঙ্ক মে!”**



**ঈগলের পক্ষতলে...১২৩ টি মডেল নামমাত্রে**

। বার। জন্তরের জন্তরতম জন্তরে এক বিশুদ্ধ সন্তানের ডেউ নাকর হয়ে ওঠে।  
। সমস্ত শ্রানি কোথায় জেসে যায়।  
মানবিক ক্রমতার এই অভিব্যক্তি বস্তুতই যত্নর মতো মহান, মৃত্যুর মতোই  
গায় আখ্যায় আবৃত। যার চারটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত এই ডোম-এর উচ্চতা  
শো কষ্টে, প্রবেশদ্বার থেকে মেরুর মাথ সাত শো। লোকেরা সেই মনঃ পাখরের  
তে চিৎ হয়ে শূরে ডোম-এর কারুকার্য নিরীক্ষণ করছে। সঙ্গে বাইনোকুলার  
এসেছে। চেনা-অচেনা নেই, সাধ-কলো নেই, জাতিভেদ-মেলভেদ-প্রেরণাভেদ  
ই নেই কারো মনের মধ্যে, বা আছে তা শূন্য একনিষ্ঠতা, একাত্মতা, ঈশ্বর-  
নার মতো অলৌকিক প্রতিভার স্বাক্ষর দর্শন। অনেক উপরে উঠে বাজে  
নো সিঁড়ি বেয়ে। উদ্দেশ্য ঐ একটাই। এই প্রাঙ্গণ বা গির্জার সাক্ষরদেরও  
ক কাজ আছে। পৃথিবীর এই বৃহত্তম গির্জাটি সম্পূর্ণ হতে সময় লেগেছিলো  
শো দ্বিপ্রান্তর বছর। এখনো আশ পবন্তও ডাটিকান কার্খালিসজমের সশ্রমি  
তর। পৃথিবীর এক আশ্রয় সৃষ্টি।

অনেক হাত ঘুরে যখন এই কাজ মাইকেল এঞ্জেলোর কাছে এসে পৌঁছালে,  
নে তাঁর বরেন্দ্র সত্তর। বোঝা গেল প্রতিভার বৈদ্যনা করস নেই। জন্তর তাঁর  
তভার। বেন আঠেরো বছরের প্রবল বোঝন নিয়ে খাঁপিয়ে পড়লেন সে কথা  
না করতো। মস্তিস্কের কোণে কোণে শূন্য রং রং আর রং। ছবি, ছবি আর  
বা কোথা থেকে কে এতো শক্তি বোঝালো তা কি দিল্পী নিজেই জানেন? প্রশ্ন।  
নারি অনন্ত প্রেম ছবি হরে তাকে জড়িয়ে ধরলো। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর নকশা  
মুন্সাইই শেষে সম্পন্ন হলো সব কাজ।  
ডাটিকান প্যালেসে নাকি এগারো হাজার কক আছে। হল, মিউজিয়াম, গ্যালারি,  
ইয়েরী, চ্যাপেল, করাইডোর, আঙিনা, উদ্যান—সবই শোভার সমাধিতে  
কর্ষের এক আশ্রয় নমুনা। শূ শো বাট জন গোপ কস গেছেন এই সিংহাসনে।  
তা সব দেখা—এক দিন দু দিনের প্রশ্নই ঠে না। এক বছরেও মনঃ শেষে ওঠে  
না সম্ভব।

ডাটিকান বেথানে সন্ধ্যা নিরোকে ব্রাসিফাইড করা হরোঁছিলো, সেক্ষনেই  
ইষ্ট পিটারের সমাধিস্থল। এমন সুন্দর Basilica পৃথিবীতে আর কোথাও  
ই। সারিবদ্ধ স্তম্ভের গায়ে গায়ে কী সূক্ষ্ম সব কারুকার্য। ইষ্টার ডে-তে গোপ  
থার মুকুট পরে ঢিলা গোলাকে অট্টালিকার সম্মুখভাগে ব্যালকনিতে ভগবান  
র তাঁর নির্দিষ্ট সিংহাসনে আসন গ্রহণ করেন। প্রচুর দর্শনার্থীর ভিড় হয় সেই  
নটিতে। হাট, ভেঙে কস থাকে সব। যেটা ওদের Porta Santa, অর্থাৎ  
হালি ডোর। সেটা পণ্ডিত বছর অন্তর এক দিন খোলা হয়। এটা হয়  
Christmas Eve-এ, বিশেষ মর্যাদার এবং বিশেষ অধিকার প্রথমে পোপই প্রবেশ  
রেন তার অভ্যন্তরে। ধর্মসাক্ষর থেকে আর একটি আশ্রয় আকিষ্কার করেছে  
রা। Titus-এর স্মরণার্থ। এটা এখন ডাটিকান মিউজিয়ামের এক গর্বের বস্তু।  
কতো ভক্তরাপটা-গোলমালা, কতো উদ্যানপাত, কতো বংশানুক্রমে ডাটিকান  
তর্মানই ডাটিকান। ডাটিকান চিরন্তন। এখন ১৯২৯ সাল থেকে ডাটিকান লিট  
কটা আলানা স্টেট হয়েছে।

বেহুতে বেহুতে বেলা হলো অনেক। হাটতে হাটতে পা বাধা হয়ে গিয়েছিলো।  
গারনা সিলোনি তাঁর ছোটো পাখার ফুরফুর করে হাওয়া খেতে খেতে কলসে,  
আবার বর্ষি কখনো আসো, পরা করে ঘোড়ার জিন এটে এসো না। আসবার মতো  
হয়েই এসো। দেখবার মতো করেই দেখো।

বৃন্দেব বললেন, 'তা হলে তো এক বছর থাকতে হয়।'

ভারিনা বললেন, 'মহৎ জিনিসকে মান্য করতে হলে তাই তো উচিত।'

'একটা চাকরি জুটিয়ে দাও।'

'খদ্দি অমো ঠিক দেখো।'

রাজেশ্বরীও সঙ্গে ছিলো আমাদের। বাইরে এসে বললো, 'আবার কী?'

ভারিনা ঘড়ি দেখে ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আজকের মতো এই যথেষ্ট। বাড়ি যাই,  
সলোনার খাবার সময় পার হয়ে গেল। তা হলে বৃন্দেব, মিসেস বোস, মিসেস  
জি—'

আমরা রাজেশ্বরীকে নিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরলাম। কাল দুপুরে ওদের ওখানে  
বসেই আই সি এস সূচীল দে-র বাড়িতে খাবার কথা আছে। রাজেশ্বরীকে নামিয়ে  
সেই সুযোগে বাড়িটাও একটু চিনে বাবো। পথে অবশ্য একটু হেরফের হলো  
প্রোগ্রামটা। মনে হচ্ছিলো কোথাও নেমে আর না খেয়ে নিলে হচ্ছে না। তিন জনেরই  
এক অবস্থা। রাজেশ্বরী অবশ্য একটা বাড়িতে বাবে, তার খাবার সেখানেই প্রস্তুত  
আছে। কিন্তু আমাদের তো বাইরের খেতে হবে। অন্তঃপ্রাণ তিন জনে মিলে খেয়ে  
নওয়াই ডালো। রাজেশ্বরী একটু একটু এদের ভাবাও রসত করেছে।  
গোনে রেস্টোরাঁর গিয়ে সেটাও কম সুবিস্তার নয়।

এই করেই বেলা কেটে গেল। রাজেশ্বরীকে তার বাড়ি পেঁপে দিয়ে আমাদের  
হোটেল ফিরতে প্রায় তিনটে।

। বকেলে সামসুর রহমান এলেন। চায়ের পাট সাগ্ন করে তাঁর সঙ্গে যে শহরের  
কোথায় কোথায় ঘুরলাম তার কিছই আর মনে নেই। একসঙ্গে এক দিনে এতো  
দর্শন আমরাই উদ্ভাসিত করে দিয়েছিলাম।

পরের দিন সকালে আর ডাবলামই না বেরবার কথা। অনেক বেলা অবধি  
দুইয়ে ধীরে আস্তে স্নানটান করে সূচীল দে-র ওখানে গেলাম। রোমে বেশ গরম।  
দুইয়ে ধীরে আস্তে স্নানটান করে সূচীল দে-র ওখানে গেলাম। রোমে বেশ গরম।

## জেমস্ হেডলি চেজ্

কামনা নিঃশ্বাসে বিষ -	২০
নীল জোৎস্নায় একা -	২৬
হিম কুরাশায় মৃত্যু -	২৬
সমুদ্র সৈকতে খুন -	২৬
সবর্বনাশের নেশা -	২৫
সোনার হরিণ -	২০

সার হল কেউ-এর  
ইটারন্যাল সিটি ১৫/২য় ১৫

## ডেসমণ্ড ব্যাগলি

বাতাসে মরণ ফাঁদ - ২৬

## নিক্ কার্টার

সাগর সন্ধানীর ফাঁস ১০০০

স্বর্ণ শিহরণ - বাঘিনীর চোখে ঘুম নেই ৮০০

## আলিষ্টেয়ার ম্যাকলীন

রক্ত বার। দিনগুলি-৩০ ওয়ে টু ডাষ্টিডেথ ১২০০

এক হাট পাস ১০০০

## এরিথ মারিয়া রেমার্ক

অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্নফ্রন্ট ২০

## মারিওপুজো

অন্ধকারের দিন - ২০

চেজ, বণ্ড, নিক্ কার্টার ম্যাকলীন এর চারটি উপন্যাস একত্রে	পার্ল এন্স বাক রেনবো - ৩২ -
নিশীথ ভূষণ রবার্ট ম্যাককান-এর (সর্বশেষ বই)	লেটার ফ্রম পিকিং
ক্রাণ্ডাল-সি-আই এ	১০০০

পাত্রাজ পাবলিকেশান

২. শ্যামাচরন ৬৬ ট্রিট কলি-৭৩ ফোন : ৩৫-৬০৬২

দাড়ি কাছাতোর পরে  
ত্বকে তিস্মল, তাজা ও নরম করতে...



আপনার ত্বক  
স্বাভাবিক, শুকনো বা  
তৈলাক্ত যে অবস্থাতেই  
থাকুক না কেন,  
ইরাসমিক এখন  
এনেছে এমন এক  
শেভিং ক্রীম যা ঠিক আপনার  
ত্বকেরই অনুকূল...এর বিশেষ ফর্মুলা  
আপনার ত্বকে তিস্মল, তাজা ও  
নরম ক'রে দেয়। আজই পরীক্ষা করুন—  
ইরাসমিক।

- এন্টিসেপটিক — স্বাভাবিক ত্বকের জন্যে
- ক্রীম রীচ — শুকনো ত্বকের জন্যে
- লাইম ফ্রেশ — তৈলাক্ত ত্বকের জন্যে

**ইরাসমিক হাজির করছে—  
এমন এক ক্রীম-যা সব প্রকার ত্বকের অনুকূল**



দাঁল দে এবং তাঁর স্ত্রী করো সন্দেহই এর অংশ অন্তত আমার আলাপ  
না। কিন্তু দু'জনকেই নানানভাবে নানা সূত্রে জানতাম। বিশেষ করে সুশীল  
কে ব্যক্তিগতভাবে আমি প্রত্যক্ষ আলাপ না থাকা সত্ত্বেও খুব ভালোভাবে  
। ওর বাবা ডক্টর ডি এন মৈত্র আমার অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। ডক্টর  
ডক্টর মৈত্র আমাকে মা সন্মোহন করতেন এবং কন্যার মতোই স্নেহ করতেন।  
লোজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং গান সুরের মতো। সুরের মতো সুরের মতো  
লেখতেন। সেই সময়ের 'প্রবাসী' 'স্বারস্বত' এবং একাধিক গল্প-কাহিনী  
। আমার বিবাহের পরে পরবর্তী কালে 'কবিতা' পত্রিকাতেও এর কবিতা  
। রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন ছিলেন, অর্থাৎ বাজিয়ে গান করতেন। ওর  
আমি প্রথম আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বালক সৈক' গানটি শুনিনি। কথা  
র সন্মোহন আমার ঐ পনেরো-ষোলো বছর বয়সটাকে একেবারে সূক্ষ্মাঘাত  
হয়েছিলো।  
কি শহরে রবীন্দ্রনাথের গানের তেমন প্রচলন ছিলো না। রাষ্ট্রবাড়ি বা রাষ্ট্র-  
ছাড়া কে-কোনো লোকের মধ্যে এ গান শোনা রীতিমত বিশেষ ব্যাপার। আমি  
ক্রান্তিকাল শিখি, অতুলপ্রসাদ জানি, নজরুল ইসলাম জানি, ডি এল রায়  
। রায় জানি। রবীন্দ্রনাথ জানি না। আমার হৃদয়-মন উদ্বেল হয়ে ওঠে  
। সন্মোহন যার মুখেই রবীন্দ্রনাথের গান শুনিনি না কেন? সুরের মতো এবং  
মনা আমার সেই সময়কার প্রিয়তম বন্ধু নোটনি মৈত্রই আমাকে রবীন্দ্রনাথের  
প্রথম হাতেখড়ি দিয়েছিলেন।  
নোটনিদার মা বীকে আমি মাসীমা বলতাম, তিনি ছিলেন অতি সুশীলকৃত এবং  
মজিত ম'হিলা। খুব গান-গান্ধ মান্দ্য। আমাকে গানের জন্য প্রায়ই এসে  
। বাড়িতে নিয়ে যেতেন গাড়ি করে। আমার ওপাশদিক সোলমহম্মদ বীকে  
ত'র নিজের কন্যা নোটনের জন্যও রাখতেন। নোটনি প্রথমে আমার কাছেই  
। গান তুলে নিতেন। ঠুঁরি-জাতীয় সব গানই তাঁর আমার কাছে শেখা।  
কী নোটনদিকে খেয়ালে তালিম দিতেন।  
কী ডি এন মৈত্র একবার ঢাকা এলেন, বাই বাহুল্য, দাদা বউদির কাছেই  
ন, এবং তাঁরা আমাকে বেরকম ভালোবাসতেন তাতে এ কথাও বলা বাহুল্য।  
কী মৈত্রকেও সেই ভালোবাসায় অংশীদার হবার জন্য একদিন গান শোনতে  
এলেন আমাদের বাড়িতে। এর পরে ডক্টর মৈত্র নিজেই মাঝে মাঝে আসতেন,  
। আমাকেও নিয়ে যেতে লাগলেন তাঁদের সঙ্গে দিনব্যাপন করার জন্য। অতি  
সময়ের মধ্যেই নোটনিদার কাঁকা হিসেবে আমারও কাকাবাবু হলেন, আমি তাঁর  
লাম। শূদ্রমাত্র ডাক্তার হিসেবেই নয়, শিক্ষা-সংস্কৃতির বিবিধ ক্ষেত্রেই তিনি  
ন একজন দিকপাল। সোস্যাল সাভিস লীগের তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা।  
কি মৈত্র তাকে সকলে চিনতেন, জানতেন, শ্রদ্ধা করতেন।  
দুতরাং পরিচয়ের পটভূমিকা আগেই ছিলো। তা ছাড়া নোটনিদার বোন—  
। বা কম কথা কী? নোটনিদার কাছে আমি ত'র এই বোনের কথা অনেক  
ছি। ওদের কবে বিবাহ হলো তা-ও আমি জেনেছি। কিন্তু দেখা হলো এই  
। এই দূরে এসে, এতো কাল বাদে এতো বয়সে।  
একটি মাঝারি সাইজের পোতলার ফ্ল্যাটে তাদের বসবাস। কিন্তু এমন সুন্দর  
ছন্দ বাহুল্যহীন একথানা গুচ্ছোনা বাড়ি আমার খুব কম চোখে পড়েছে। হাতা  
মনে পড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বেশ বড়সড়ো একথানা বসবার ঘর। ঘরে ঢুকেই  
কুড়িয়ে গেল। বা দিকের দেয়াল নিচু এবং প্রশস্ত ঢালাও ফরাসে বিশদী  
ততে বসবার ব্যবস্থা। ফরাসের ভারতীয় ঢাকনাটি হতো সুন্দর ততো উজ্জ্বল,  
উপরে ছোটো ছোটো তারিকার বিজ্ঞপ্তি রঙে গুচ্ছাটো কাজের কাচবানো  
ক ওয়াজগুলোও রং মিলিয়ে তের্নাই মনোহারী। পিতলের উপর জয়পূরী-  
কাজের সেন্টার টেবিল আছে হাতের কাছে, কিছুটা বাবধনে ওপাশে  
বসে।  
দরজা-জানালার শাস্তিনিকেতনী অথবা কটকটী পর্দা। অনেক সময়েই অনেক  
। বর্ণনার খুব সাধারণ মনে হয়, কিন্তু রোমে সুশীল দে-র স্ত্রী বুলবুলের  
র ঘরে ঢুকেই যেটা প্রথম অভিব্যক্তি তা হলো, বাঃ, কী সুন্দর ঘরখানা।  
সুশীল দে বাড়ি ছিলেন না, খানিক বাদে এলেন। ত'র স্ত্রীই আমাকে আগ্র-  
হান করলো। তার বাবার প্রসঙ্গ স্মৃতিভাবিকভাবেই উঠে পড়লো, তার বোন  
নের কথাও উঠলো। নোটনি ছিলো বিখ্যাত সুন্দরী। গল্পগন্যও তার জুড়ী  
। ভার। হয়তো এতো রূপ আর এতো গুণই তার কাল হয়েছিলো। মাসীমা  
। তবুও ব'লুজ পাঠ পেলেন না মেয়ের যোগা। মেয়ে থাকে যোগা ভেবে মাল-  
। উৎসুক ছিলো, তাকেও তাঁরা প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য করলেন মেনেক।  
সিকভাবে সেই থেকেই হয়তো সে কিছুটা সরে গিয়েছিলো। স্মৃতিভাবিক জীবন-  
ন থেকে। আস্তে আস্তে বয়স বাড়লো, মধ্যবয়সও ছাড়লো, পিতৃহীন হলো,  
হীন হলো, তারপর অসাধারণ রূপগুণ আর নিঃসঙ্গ নির্বোধ জীবন নিয়ে  
ন মেন মনের ভারসাম্য হারিয়ে এক গভীর অন্ধকারে ডালিয়ে গেল।

## আমাদের প্রকাশিত প্রবন্ধ ও জীবনী সাহিত্য

গনেশ লাল গুয়ারী

### বর্ধমান মহাবীর ১৪

রাইমোহন সামন্ত

বিজয়ানন্দ (১৩২) শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনী ১৫

স্বামী নির্দোষানন্দ

স্বামীজীর স্মৃতি সঙ্কলন (২য় মুঃ) ১০

প্রতিভা চট্টোপাধ্যায়ের ॥ তাপসী বসুমতী মা ৭

ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষের

ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ (২য় মুঃ) ১২

সুজিতকুমার নাগ সম্পাদিত ॥ সুকান্ত স্মৃতি ৮

বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত ॥ অবনীন্দ্রনাথ স্মৃতি ৬

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাকথা ১২

স্বামীজীর জীবনকথা ১২, মানুষ রবীন্দ্রনাথ ১০

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ (১ম) ১০, (২য়) ৩৫

ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য ২০

বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য (৩য় সং) ৪০

ডঃ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস ২০

ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য

নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা (২য় মুদ্রণ) ৩৫

ডঃ সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-কাব্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথ ২৫

ডঃ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

নাট্যকার মধুসূদন ও কৃষ্ণকুমারী ১০

প্রমথনাথ বিশী ॥ মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ ১৬

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরাতন বাংলা নাটক সংকলন ৩০

ডঃ রামবহাল তেওয়ারী

আধুনিক বাংলাও হিন্দি ছন্দের তুলনাত্মক আলোচনা ১৮

সুভদ্রা অধিকারী ॥ ভারতের নৃত্যকলা ৮

ডঃ পারুল ঘোষ

বাংলার বৈষ্ণবধর্ম : সাহিত্যে ও দর্শনে ১৫

সুব্রতকুমার দিগা

গীতার শিক্ষা ও ভারতের আধ্যাত্মিকতা ১৮

নির্মল ঘোষ

চীনা সাহিত্যের ইতিহাস ১৬

নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য ২০



করুণা প্রকাশনী

১৮ এপ্রিলার লেন, কলিকাতা ৯, ফোন : ৩৪-৬২৬৮



ভবিষ্যতে কোন  
খরচের পরিকল্পনা  
আছে ? তার জন্যে  
ভাবনা কিসের ?

ভবিষ্যতে যতই খরচের পরিকল্পনা  
থাকুক না কেন, কথা দিচ্ছি, কানাড়া  
ব্যাংক সেই খরচের অর্ধেক টাকা যোগান দেবে

সময় থাকতে টাকা জমানো শুরু করলে সবকিছুই  
আপনার সামর্থ্যের মধ্যেই এসে যাবে। ভবিষ্যতের এই সব  
পরিকল্পনা রূপ দেওয়ার জন্য আপনাকে সাহায্য করতে  
কানাড়া ব্যাংকের একটি বিশেষ জমা প্রকল্প রয়েছে।  
কি চাই বলুন না—গাড়ি ? কুটার ? নিজের বাড়ি ?  
না কি ছেলেমেয়ের উচ্চশিক্ষা কিংবা বিয়ের খরচ ? কামধেনু  
জমা প্রকল্পের সাহায্যে আপনি খুব সচজেই আপনার  
টাকা নিত্তল করে নিয়ে সবচেয়ে বেশি লাভ ঘরে তুলতে  
পারেন।

এই প্রকল্পের সবচেয়ে উল্লেখজনক দিক হল যে এতে  
আপনার প্রয়োজনীয় অর্থের একটি সামান্য অংশ জমা দিতে  
হবে। আপনি শুধু জমা টাকার অর্ধেক এবং মাসের  
সংখ্যাটা ঠিক করে ফেলুন। বাস, এরপর সুদের উপর  
সদু জমতে জমতে মাসের পর মাস বেশ মোটা টাকাই  
আসবে। ফলে আপনার জমা টাকা হয়ে দাঁড়াবে  
ত্রিগুণেরও বেশি।

নিশদ বিশ্ববলের জন্য কানাড়া ব্যাংকের নিকটবর্তী শাখায়  
চলে আসুন। আমাদের অন্যান্য আরও বিশেষ প্রকল্পের মধ্যে  
আছে বিদ্যানিধি, নিরন্তর এবং বালক্কম।

কামধেনু  
ডিপোজিট

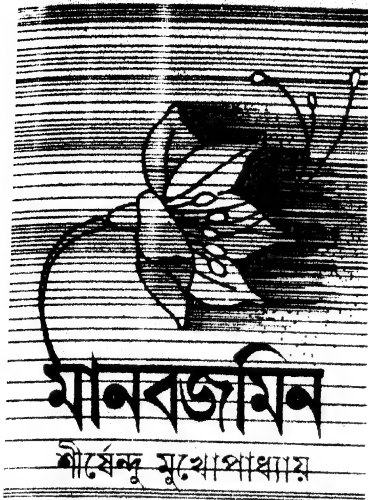
কানাড়া  
ব্যাংক

(একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক)

সারা দেশে এই ব্যাংকের

১২০০-রও বেশি শাখা আছে





(একাত্তর)

অশ্রুৎ এই টেলিফোনে সাইকেলটা পড়েও গেল না। চৌপাশী ছাড়িয়ে গড়গড়িয়ে চলতে লাগল। চলন্ত সাইকেলে প্যাডল করতে খুব শেখা কষ্ট নেই। কিন্তু কষ্ট হ্যাণ্ডেল সেজা রাখায়। এ পাড়ায় কীচিং কমাচিং এক আটো মোটরগাড়ি আসে। রিকশা অবশ্য অনেক। আর সাইকেল। প্রীতমের তরু করছিল, তরু কেনো সাইকেল বা রিকশার সঙ্গে থাকে খাবে, হয়তো রাস্তা ছেড়ে পাশের নদীমার গিয়ে পড়বে।

কিন্তু পড়ছিল না। চৌপাশী ছাড়িয়ে মাঠের ধার অবধি চলে এসে। পিছনে একটা হাইচই শোনা যাচ্ছে। আশপাশের লোক অবাক হয়ে দেখছে। আনন্দময়ীর বারান্দা থেকে পিনুর মা অথবা গলার চেঁচছেন, ওরে শম্ভু! ও তরক! শিগগির গিয়ে প্রীতমকে ধর। দেখ, কী সর্বনেশে কাণ্ড করছে ছেলেরা!

হ্যাঁ, এটা ঠিকই যে, সে একটা সর্বনেশে কাণ্ডই করছে আজ। কিন্তু এই অস্থানা বেঁচে থাকার নিরন্তর বন্দি থেকে মুক্তি আর খুব দূরে নয়। অনেকদিন তার জীবনে মৃত্যুর শাসন বড় গুরুভার হয়ে চেপে বসে আছে। সে তো জানে, মরবেই, তাই মৃত্যুর হাত থেকে এই ছুটি নেওয়া।

ওরা তাকে ধরে ফেলবে। পিছনে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ আসছে। করো চেঁচিয়ে ডেকে, প্রীতম! প্রীতম! থামো! আমরা আসছি।

প্রীতম তার সর্বশ্ব দিয়ে ভর দিল পাড়লে। তার দুর্বল পায়ের তেমন জোর নেই যে, সাইকেলকে এরোপ্লেনের মতো ছোঁটায়ে। তবু এই অবশ্যের মতখানি জোরে সম্ভব সাইকেল ছুটতে থাকে। হ্যাণ্ডেলের অকাঁবাঁকা হয়ে যাওয়াটা একটু কমে এল। শ্রীর হল। সরু রাস্তার মথাসাধা ধার ঘেঁষেই প্রীতম চালিয়ে নিতে পারছে। উল্টো-দিকের চারটি রিকশা অনেকটা তফত দিয়ে পেরিয়ে গেল তাকে। একটা মোটরগাড়িও। উত্তরাভিমুখী প্রীতমের সাইকেল রইল বহমান। কিন্তু এ পাড়ার শতকরা পঞ্চাশজনই তাকে চেনে। অনেকেরাও সাইকেলে যোগে চরবার শেখাটাকে দেখে অবাক হয়। সূর্য্যার যে প্রবলভায়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে, পিছন দিক থেকে একটা দুষ্টো মশাস্থান ছেলে বেগবান সাইকেলে এসে একদমি তাকে ধরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, তাও জানে প্রীতম। তাই সে যতদূর সম্ভব চেনা পাড়ায়ের গাড়ী পেরিয়ে যাওয়ার জন্য দুটো বাকি ফিরল। কিন্তু বকে হুক ধরে আসছে, গিয়ে ঘাম, হাত-পায়ের প্রতিটি সন্ধিতে খিল-ধরার বন্দগা। প্রচণ্ড বেগে তার চোখ কলসে মাছিল। চোখের দৃষ্টিও কিছুটা আবছা এখন।

তবু সব বাধাকে ছাড়িয়ে প্রীতম চলতে

থাকে। খানিকটা অশ্রের মতো, খানিকটা অশ্রের মতো। রাস্তা খুবই সরু। এত সরু যে একটা রিকশা উল্টোদিক থেকে এসেই সে বিন্দুসে পড়বে। সাইকেলের ওপর তার এত নিয়ন্ত্রণ নেই যে, অশ্র জারগা দিচ্ছে গলে যেতে পারবে। তবু বেগেরা প্রীতম প্রবল শ্বাস ফেলতে ফেলতে হেল প্যাডলে চাপ দিয়ে সাইকেলটাকে মথাসাধা বেগবান রাখছিল।

আর একটা মোড় করতে গিরে প্রীতম পড়ল। পড়বে, প্রীতম জানতও। কিন্তু তার জন্য কোনো প্রস্তুতি নেই। সে, লাগামান হয় নি। তাই জানা সম্ভবও পড়টা হল আচমকা।

বাঁ হাতে আর একটা পাখরুটির রাস্তার বাকি নিয়েই সে দেখতে পার সামনে ইট বোকাই এক টাটা মরসিডিস লরি থেকে মাল খালাস হচ্ছে। নীরব অবরোধ। প্রীতমের সাইকেলে রেক ছিল বটে, কিন্তু সেটাকে যথেষ্ট জোরে চেপে ধরার মতো শক্তি ছিল না তার হাতে। সূর্য্যার শকুনো একটা নদীমার খাতে সাইকেল পড়বে, ঘেরে খানিকটা পড়িয়ে গেল সে। জরুরি বাজা মারল ইটের পাজায়। বকে গেল সাইকেল। আরো একটু নিয়ে গেল তাকে। ফকা বাসমীর ওপর চলে পড়ে গেল, প্রীতমকে নিয়ে।

বাগা বেদনা টের পেল না প্রীতম। জমে চোখে অন্ধকার মেয়ে এল। গভীর শ্বাস ফেলে তীব্রতে চোখ বুজল সে। মথিত ঘাস আর ডেজা মাটির গন্ধ, হেলের সূর্য্যে ভরে গেল তার শ্বাস। ঘাসপোকাদের শব্দ শুনতে শুনতে সে চেতনা হারাল।

খুব বেশীক্ষণের জন্য অবশ্য নয়। চোখের মধ্য প্রথম জলের ঝাপটা পড়তেই চোখ মেলে সে। হাত তুলে ওদের বরণ করে আর জল দিতে। হান্সিমুখে ঘাসে শুরুর থেকে সে উল্লস অলোর মাথা অনেক-খানি আকাশকে চেয়ে দেখে। এতখানি স্বাধীনতার বহুকাল ভোগ করেনি সে।

পাড়ার হেলেরা তাকে ধরে তোলে, প্রীতম। এবার বাড়ি চলল।

ওরা তাকে একটা রিকশার তেলে। একজন তার পাশে বসে তাকে ধরে থাকে।

পাড়া ভীড়ে ভীড়াকার। ভারী লন্ডা করছিল প্রীতমের। আর তার মুখের ওই লাঞ্ছন হাসিটি দেখে অনেকেরই অবাক মানল, তাহলে কি প্রীতম ভাল হয়ে উঠছে।

মা প্রীতমকে শোওয়ার ঘরে নিয়ে যেতে চাইছিল, শতম বলল থাক মা। দাদা কা চাইছে তাই করে।

প্রীতম আবার বারান্দার বসে। কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে না, অভিযোগ করে না, শাসন করে না। বোধহয় শতম সবাইকে বারণ করেছে।

খুবই ক্রান্ত ছিল প্রীতম। দশের অনেককাল চামেলো। বিকেলে মনোরম আলোর বারান্দার এসে বসল আবার। ছবি চা দিতে এসে সহসা ফিরে গেল না। চরারের পাশটিতে বসে উদ্ভ্রমণে হয়ে একগাল হেসে বলল, তোমার আর কলকাতার জন্য হন খারাপ হয় না, না দাদা?

প্রীতম কথটা ভেবে দেখল। কলকাতার কথা তার খুব মনে পড়ে। কিন্তু না, প্রথম প্রথম যেমন হত, ফিরে যেতে ইচ্ছে করত, তেমনটা আর হয় না। সে মাথা কড়কল।

ভূমি কলকাতার লোক হয়ে যাওয়ার পর আমার বকেট নিয়েছিলাম ভূমি আমাদের পর হয়ে গেছে। এভাবে যে অনেকদিন আমাদের কাছে থাকতে পারবে তা কখনো ভাবতে পারতাম না।

প্রীতম হেসে গভীর শ্বাসও ফেলল সেইসঙ্গে। ছবি বলল, বউদির চিঠি আজও এসেছে। তোমার নামে। ভূমি বউদির চিঠিগুলো কেন পড়তে দেখ না বলতে তো! আগের চিঠিটাও অঁটা ঘরে তোমার টেবিলে পড়ে আছে। জবাব না দিলে, পড়তে দোষ কি?

প্রীতম উদসমুখে চুপ করে থাকে। কি জবাব দেবে? শিশুর চিঠি ভর পড়তে ইচ্ছে করে না। মনে হয়, বিলম্ব চিঠির মধ্যে অনেক মিথ্যা সাজানো কথা

থাকবে। ঠিক কথা তার এখন সত্য হয় না।

প্রীতম বলে, ভোমের কাছে রক্ত চিঠি দেবই। তা দেব। তবু, ভোমের কাছে তো আসানো করে

কিছু, বলার থাকতে পারে। থাকলে কি করব? আমার তো এখন আর ওই জন্য কিছু করার নেই।

ভূমি ভাবন অব্যবহৃত হয়ে গেছে।

জিরকম রে?

কেন বেল। ভোমাকে বাপু, আচ্ছা কাল তার

করে।

তর পাল?

তার পাই ভোমকে ঠিক বকেতে পায় না বলে।

লাবসোনার জন্যও ভূমি আচ্ছা কাল তাকে না দাদা।

প্রীতম চুপ করে একঘাট জবাব দিল না। সারা গয়ে একটা কাছার টীপটি সরেই এলো। তার অবশ্য প্রায় অনুভূতিহীন লরীতে এই কথটুকু খুব উপভোগ করছিল সে। হুয়ের দিকে খানিকদূর চলে থেকে বলল, লাথুকে দ্বিধে জবাব দিচ্ছ; তে নেই। যদি কোনো আকালভেট বা অকালমৃত্যু না ঘটে তাহলে ওর জীবন তো মিলালই। ওর মা ভাল চাকরি করে, আমরও কিছু টাকা করে সেজে। তার চেয়ে বরং স্বাধীনপরের মতো এখন আমার নিজেকে নিয়েই চিন্তা করতে বেশী ভাল লাগে।

কাল প্রীতম একটা হাসল।

কণাটার অর্থ ছবি খুব ভাল করতে পারল না, কিন্তু কিছু জিজ্ঞাস করল না। বলল, কিন্তু বউদি যে অমরের কথা কিংবদন্তি করে না, তার কি কবচে? প্রতি চিঠিতেই আমরা লিখি, দাদা ভাল আছে। কিন্তু বউদির সঙ্গে, ছুটি ভাল নেই। ভাল থাকলে নিজের হাতেই চিঠি লিখতে।

খুব চিন্তা করে ছিছ।

খব। লেগে তোমরা আমাকে সব কথা জানাচ্ছে না।

এবার লিখে দিস, দাদার জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। দাদার তো আর বেশী নয়, তাই বেচে থাকার প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি সেকেন্ড সে নিজেই নেয়। তার সময় কই যে তোমাকে চিঠি লিখবে?

ছবি হেলের কাছে এসে কথা লেখা যায়, বউদি। প্রীতমও হাসে, তাহলে কিছুই লিখিস না।

এটিকে নিজের হাতে তোমার একটা লেখা উচিত। একটবার লেখো। ওই বা বা সব বললে তাই না হয় লেখো। অত ভাবা তো আর আমাদের কলমে আসবে না।

তার কটীক বান আমকে নিয়ে ভাবনার পড়ে থাকে তবে একটা থাকতে দে না। জবলে ভালবাসা থাকে।

সম্মেলনা করে এসে টেবিলের ওপর বিলুর চিঠিটা পড়ে থাকতে দেখল প্রীতম। কিন্তু একবারও খলে পড়তে ইচ্ছে হল না তার।

আগের মতো প্রীতম এখন ঘরবন্দী থাকে না। সকলের সঙ্গে একসাথে বসে খায়। অনেক রাত অবধি পারিবারিক আড্ডার জেগে অংশ নেয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, সে সেই শৈশবের শিল্পিগুড়িকে পেয়ে গেছে বাকি। এখন আর তাই বিলকে মনে পড়ে না, লাথার জন্য চিন্তা নেই, হন কেমন করে না তেমন।

টেলিফোনটা এল বেশ রাতে। আরোইভং টেলিফোন অ্যাটেন্ড। বিলু।

টেলিফোনটা পিওনের হাত থেকে নিয়ে ঘরে এসেই মরম চোচার, বউদি কাল আসছে। হুয়ের। খবরটা মরমের খুব থেকে বেরতে না বেরোতেই বাকীতে একটা আনন্দের কোলাহল পড়ে যায়। মা খাঁশ, বাবা খাঁশ, ছবি খাঁশ। সূর্য্য প্রীতমই এই ধরে তেমন উত্তেজনা বোধ করে না। মরম তার একটা হু একটা উদ্ভ্রামণী হয়। বিলু, কে বিলু?

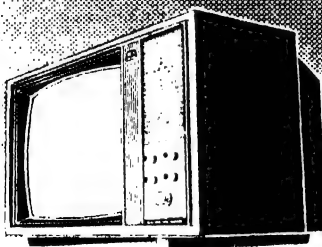
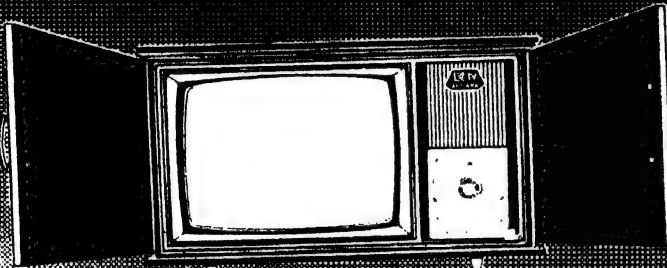
হতে হুয়েরে প্রীতমের মনে হয়, তার কোনো অভাব নেই। তার কিছু প্রয়োজন নেই। অল্প কড়কে ছাড়াও তার চাল যথেষ্ট। সকলে বক্তা নিয়ে যে মহিলাটি সামনে এসে দাঁড়বে সে এই পরিবার

# 1 সেরা টি ভি বেনার একটাই উপায়, ECTV টি ভি দেখুন আর ECTV কিনুন

আর পছন্দ করার উদ্দেশ্যে ECTV-র  
দুটো মডেলই অপ্রতিদ্বন্দ্বী:  
অপ্সারা ও এনকোর।

**APSTARA**

অল-সলিড স্টেট, মডুলার গডন,  
বরজা সমেত মাল্টি-চ্যানেল  
ডিলাক্স টি ভি।



**ENCORE**

অল-সলিড স্টেট,  
মাল্টি-চ্যানেল, সাশ্রয়কর  
দামের টি ভি।

ECTV-হ'ল

ECIL-এর অবদান।

যারা ভারতের ইলেক্ট্রনিক্সের শিল্প  
জগতে শুরু থেকেই সবার অগ্রণী।  
Ecil-এর অসাধারণ প্রযুক্তিবিদ্যার  
গুণে ECTV-কি কোয়ালিটিতে,  
কি কার্যক্ষমতায়, সবদিন থেকেই  
সেরা। আর সেই কারণেই আজ  
ঘরে ঘরে ECTV-র এত কদর।

অসাধারণ বৈশিষ্ট্য:

- পরিষ্কার তীব্রত্ব ছবি
- ডুম্পার কোন শব্দের সহ  
কাজ-কাজে সুসিদ্ধ সিস্টেম
- কম বিদ্যুত খরচ
- বিক্রির পর সেরার মুনিসিপালিটি
- ৫১ সেলেক্টমেন্টের বর্ড ড্রাম

ECTV অসাধারণ  
প্রযুক্তিবিদ্যার গুণে  
সবার অগ্রণী।



ইলেক্ট্রনিক্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড  
হায়দ্রাবাদ - ৫০০ ৭৬২

Branches at: Bombay, Calcutta, Delhi, Madras, Poona, Lucknow, Hyderabad, Chandigarh, Jaipur, Kanpur, Jullundur, Raipur.

APC/EC/8013

শ্রী কহিল, নয়। কিন্তু লাবণ্য! লাবণ্য তো তার  
রে। প্রীতম আধোহাস্যেই ভাবে, তই বা ভাবছি  
নয়? লাবণ্য আমারই বা কেন হবে? লাবণ্য এই  
ধিবীতে আমার একটি মাগাম খুঁজিছিল। প্রীতম  
ই মাগাম মাত্র। সে তো লাবণ্যের স্মৃতিভাষা নয়।  
লবণ্য প্রকৃত স্মৃতিভাষা যে, লাবণ্য তারই। প্রীতম  
যদি এক বিভ্রম, এক মায়ামণ্ডলে ভাবে, লাবণ্য আমার  
রে। কিন্তু সত্য ঘটনা তো তা নয়।

যদি সকলেই স্কুটার হাঁকিয়ে বউদিকে আনতে  
নউ জলপাইগুড়ি চলে গেল শতম। বাড়িতে  
গাছগাছ করতে লাগল ছবি আর মা।

গোছগোছের জন্যই সাতসকলে বিছানা ছাড়তে  
য়েছে প্রীতমকে। ছবি তাকে ঠেলে ভুলে সিঁদুর  
নটান করে ভুল বেড়কভর দিয়ে ঢেকে দিয়েছে।  
ঠিকলে পেতেছে নিজের হাতে কাজ করা সবুজ  
কল। আজ সব জলিলার পরজন্ম টানটান পড়ল।  
একটা বিরক্তমুখে কথা ধাঁতি পরতে হয়েছে  
প্রীতমকে। গায়ে সাদা কটকটে শোজ। চুল  
শট করে সজেকগেজে বসে আছে বারান্দার। ছবি তা  
দিতে এসে তেতো মূখে বলল, আজ কি পাঠ্যপুস্তক  
আমাকে দেখতে আসছে রে? জেরা বা শব্দ  
করছিল।

অসহ্যেই তো দেখতে। যা অগোছালো হয়ে  
থাকো, বউদি দেখে গিয়ে আমাদের নিন্দেদ করবে।

এমনিতে বৃষ্টি করে না?  
করলে করে। তবে বউদের পারি মন রাখার  
চেষ্টা করি।

তোমার বউদি হল কলকাতাই মা।  
কলকাতাইয়া অত সহজে খুঁশি হয় না।

কী যে সব হলো না শব্দ।  
প্রীতম প্রু কটকে চা খায়। তারপর হঠাৎ

উদাসী এক হাওয়া আসে। প্রীতম চরভরের দিকে  
সন্মোহিতের মতো চেয়ে অলো। আর ছায়া, সবুজ  
আর নীল, প্রাণ আর জীবনের খেলা দেখতে থাকে।  
সামনের মঠে শেঁটার বাঁধা গরুর পালে ছাগল  
চরছে। ঘাস পতঙ্গ পাখি তুচ্ছ সব ওড়াউড়ি,  
অস্তিত্ব, শব্দ তাকে এক গভীর প্রাণের রাজ্যে নিয়ে  
মেতে থাকে। সেখানে নামহীন অস্তিত্ব আর বৃষ্টির  
জগৎ। বিলুপ্ত, নেই, লাবণ্য, নেই, কেউ নেই।

এই গভীর ধ্যানের মধ্যে স্কুটারের লি' শব্দ  
হঠাৎ হানা দেয়। স্কুটারের পিছল পিছল গুড়গুড় করে  
আসে একটি অটোরিকশা। বাড়ির সামনে থামে।

লাবণ্য চোঁচিয়ে ডাকে, বাবা।  
ভোরের সূর্যের আলোয় ঘোমা মূখে একটি  
হাসে প্রীতম। হাত বাড়িয়ে স্পন্দিত করে বলে, আর।

লাবণ্যকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে প্রীতম টের  
পায়, আজ এরকমই সন্মোহে সে একটি ছাগলছানাটিকে  
কোলে নিতে পারে। তার স্নেহ অনেকটাই নৈবাভিক্ত  
হয়েছে এখন।

লাবণ্য অনেকটা লম্বা হয়েছে। অনেক বেশী  
সুন্দরও। তার মুখে এখন নিখুঁতভাবে প্রীতমের  
মুখের অঙ্গল চেপে বসেছে। যুব দামী আর সুন্দর  
একটা ছক তার পরনে। দুহাতে লাবণ্যের মুখখানা  
ভুলে নিবিষ্ট চোখে দেখাছিল প্রীতম।

লাবণ্যও মুখ চোখে চেয়ে আছে বাবার দিকে।  
বলল, তুমি ভাল আছ বাবা?

ভালই যা। তুমি?  
আমিও ভাল আছি বাবা।

বাড়িসমূহ লোক বেরিয়ে এসেছে বাইরে। মা  
বাবা ছবি মরম রূপম। ভাইয়া স্টুকেস, বাসকেট,  
বিছানা নামাচ্ছে অটোরিকশা থেকে। ছবি গিয়ে  
বউদির হাত ধরে টেনে আসছে।

ভারী সুন্দর এই দৃশ্য। কিন্তু প্রীতম নড়ল  
না। এক হাত মেয়ের হাতটা ধরে নির্বিকার বলে  
হইল। বিলুর দিকে চেয়ে সে স্পষ্টই বুঝতে পারে,  
বিলু সেই আগের মতো নেই। সামান্য মেঘবৃষ্টির  
ফলে তার চোয়ালটা পরিপূর্ণ, শ্রীমতী। মুখে  
স্মৃতির আশ্রয়ণের নীচে তৃপ্তির চিহ্ন। বিলু, আর  
তার নেই।

প্রীতমের দীর্ঘশ্বাস এল না। দুঃখ হল না।

আছে। সে দেখল। মনে মনে কমা করল। সবাইকে।

খাটখানেকেরও বেশী সময় কেটে যাওয়ার পর  
বিলু, লাড়ি পাল্টে, মুখ হাত ধুয়ে বারান্দার আসে।  
আর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বলে, আমার  
একটা চিঠিরও জবাব দাওনি।

আমি ভাল আছি বিলু।

সে কথাটাও তো জানতে পারতে।

তুমি কেন এত জানতে চাও?

চাইব না। বিলু, অবাক হয়, রোগা মানবটিকে  
এতদূরে ফেলে রেখে কলকাতার দাঁকি জানতে  
চাইব না?

প্রীতম বিরক্ত হয় না। কিন্তু গভীর বিবর্তায়  
গলায় কলে, বেশ তো আঁছি।

বেশ আছে জানি। মাঝে মাঝে আড্ডাফোয়ার  
করতে বেরিয়ে পড়ি, তাও শুনছি। কিন্তু আমি  
কেমন চটকট করি, তা জানো?

প্রীতম লেটহলভের বিলুর দিকে তাকায়।  
মুগ্ধ নেই। প্রীতমের জন্য বিলুর উদ্বেগ আছে,  
দারিদ্র্যবোধ আছে, দুঃখ আছে। কিন্তু এও জানে  
প্রীতম, বিলুর জীবনের ঠিক কোম্পক্ষে সে নেই।  
বিলুকে চাকরির খবরিত ঘোরছে কে? বিলুকে  
কলকাতার জলে আটকে রেখেছে কে? সে কি এক  
কোনো গভীর নিরাপত্তার বোধ? বিলু কি জানে না,  
কেউই কেখাও কখনোই নিরাপদ নয়?

প্রীতম বলল চিঠি লিখতে হচ্ছে করে না।  
পড়তেও নয়? শুনলাম আমার চিঠি এসে

তুমি নাকি তা খুলে পড়তেও চাও না।  
ছবি বলেছে বৃষ্টি। আসলে ভুলে যাই। মনে

রাখলে কষ্ট পাবো বলে জোর করে ভুলে যাই।  
নইলে তোমার চিঠি পড়তে লোভ হয় খুব। কিন্তু  
পড়লেই দুর্বল হয়ে যাবো যে।

এ কথা বিলু বোধহয় একটা ভিজ় যায়।  
তবু বলে, ও কথা মনে হয় না। চিঠিতে কষ্ট  
জরুরী কথাও থাকতে পারে তো।

জরুরী। কি আর এমন জরুরী থাকতে পারে  
হলো তো জীবনে। ঘর সন্দের সম্পর্ক সবই তো  
ফেলেখেলা বিলু।

মিষ্টি ঠাকুর, আমার মুখ চেয়ে না হয় একটা  
ফেলেখেলাই করলে। তোমার অসুখটা তো আমার  
কণ্ঠে ফেলেখেলা নয়। মেয়েটাও দিনের মধ্যে দশবার  
নাকের চিঠি এসেছে কিনা জানতে চার। ওকে কী  
বিলু হলো তো।

তুমি বেশ সুন্দরী হয়েছো বিলু।

অচমকা এই প্রশংসায় একটা কুঁকড় গিয়ে  
বিলু বলে, যাক বাবা অমাকে দেখেছো তাহলে।  
আমি তো ভালোম, সিমিটির বৃষ্টি বউয়ের মুখ  
দেখাও বাবল।

প্রীতম কান একটা হাসে। তারপর বলে, বেশ  
লাগে এখন তেমাকে দেখতে।

যাক, আর বলতে হয় না। নিজের দৈব ঢাকতে  
একন এরকম অনেক মিথ্যা কথা তোমাকে বলতে  
হবে।

প্রীতম গম্ভীর মুখে হঠাৎ বলে, একটা কথা  
কল বিলু?

কলো।  
তোমার এখনো সব শেষ হয়ে যায়নি। আমার

সেছে। কেন আমার স্মৃতি নিয়ে তোমার নিজের  
জীবনকে নষ্ট করছো?

বিলু, নড়ে বসল। তারপর বলল, ওরকম একটা  
কথা তুমি আগেও বলেছো। আর বোলো না।

লোনো, আমি অজিমন থেকে বলাছি না।  
আমার একটাও ঈর্ষা হবে না, অধিকারবেধেও লাগবে  
না। আমি তোমাকে সুখী দেখতে চাই।

যদি সুখী না হই? তুমি চাইলেই কি সুখের  
পাখি এসে আমার কলে বসবে?

তবু আমি চাইছি।  
বোলো না। আমি এখনো অত আত্মকোপিতক

নই। বিলু, তুমি যদি পাপস্বাধে কষ্ট পাছো। কিন্তু  
যাকে পাপ বলে ভাবি তা পাপ নাও হতে পারে।

(কমল)

## চিরদিনের বই—

মনীন্দ্রলাল বসু	
রমলা	৫-০০
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	
মাটি ঘোঁষা মানুষ	২-৫০
গুডাউড	৪-০০
মহাশ্বেতা দেবী	
বিপন্ন আয়না	৪-৫০
দিনের পারাবার	৬-৫০
রমাপদ চৌধুরী	
লালবাই	২০-০০
অনেক নামকের জন্মান্তর	৮-০০
শক্তিপদ রাজভুরু	
সোনা ফসলের পালা	১৪-০০
মাটির কাছাকাছি	১০-০০
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	
বউ বউ খেলা	৩-০০
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	
বাস স্টপে কেউ নেই	৭-০০
ফেরীঘাট	৭-০০
সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত)	
অষ্টাদশী	৬-০০
সুভাষ মুখোপাধ্যায়	
নারদের ডায়ারি	৩-৫০
সুবর্ণা বসু	
বিরহের অন্তরালে	১২-০০
সমরেশ বসু	
পুতুলের খেলা	১০-০০
শালঘেরীর সীমানায়	১২-০০
সুধীরজন মুখোপাধ্যায়	
অন্যান্যগর	৪-০০
সম্মল চিহ্ন	৫-০০
সন্তোষকুমার ঘোষ	
কিনুগোয়ালার গলি	৭-০০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	
সুখের দিন ছিল	৭-০০

ডি.এম.নারায়ণী  
৪২ মিলি সরিষা, কলকাতা-৭০০০১  
ফোন-৩৪-২০১১





ল্যাভেণ্ডারের সৌরভ। যেমনি সুন্দর, তেমনি  
স্বতন্ত্র। যে-সব সৌরভ সর্বকালের সেরা  
বলে গণ্য, তারই একটি।

ল্যাভেণ্ডারও আছে বিবিধ রকমের। তার  
মাঝে সূক্ষ্মতম যেটি, সেটি জন্মায় সৌরভের  
পীঠস্থান ফ্রান্সে। নাম তার লাইল্যাক  
ল্যাভেণ্ডার। স্পর্শে-গন্ধে ভ্রুমধাসাগরের সজল  
বাতাসের আমেজ। ফ্রান্স বলতেই যে অভিজাত রুচি  
আর প্রাগৈচ্ছাসের কথা মনে আসে, তারই সার যেন  
এই ল্যাভেণ্ডার।

ফরাসী ল্যাভেণ্ডারের নির্মাস দিয়েই তৈরী এদেশের  
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রসাধন সামগ্রী—ল্যাভেণ্ডার ডিউ।  
আজও এই ল্যাভেণ্ডার আসে ফ্রান্স থেকে, আর  
দরাজ হাতে সেই সুবুডি ডেসে তৈরী হয়  
ল্যাভেণ্ডার ডিউ সাবান আর ট্যালক।  
নিজেকে আনন্দ করুন ল্যাভেণ্ডার  
ডিউ-এর সৌরভে। বিশ্বের সেরা  
সৌরভের মারাজালে।

ফরাসী সুরভির  
অভিজাত স্পর্শ



ল্যাভেণ্ডার-ডিউ সাবান আর ট্যালক—ভারতের বিলাস প্রসাধন সামগ্রী

ক্যালকেমিকোর সামগ্রী, সেরা জিনিষের সমর্থদারদের জন্য

সন্ধ্যা-সরস্বতীর মিলন  
শীপক ভট্টাচার্য

কাকাবাবুর সুবিখ্যাত কাঁথাতা পুস্তককার—এর কথা প্রসঙ্গের শৃঙ্খলেতেই সবাই  
 যতো মনে পড়বে। স্তারতীরে ছাড়ি থরো এই বেলা লক্ষ্মীর উপাসনা—  
 ঐবর্ণপরা এই উপদেশে উৎসাহিত হয়ে কবি যে উদ্দেশ্য করছিলেন তার ফল-  
 বরুণ কিতাবের অবশেষে বাংলা পেলে এক মালাবাঁধে লক্ষ্মী-সরস্বতী! ডা-  
 ক্তকমন্ডাই অবগত আছেন। লক্ষ্মী-সরস্বতীর এই তথাকথিত মিলনের  
 স্মৃতিবিহিত বাজনা যাই হোক না কেন, আমাদের আত্ম সম্বন্ধারলক্ষ্য কিবাল  
 এই যে, মনোভৌতের আকাশিকা বা বাসনা থাকলে লক্ষ্মীর আরাধন সম্ভব হবে  
 এবং সেই মতে বিদ্যাভ্যাসে রত্বী হতে হলে সর্বসম্পদের আকর্ষণকে ভুলতে হইবে।  
 আমাদের আজন্ম ধারণা, বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সাক্ষাৎনের সম্ভাব্য হইবে। পাণ্ডিত্য  
 এবং ধনাঢ্যতা একাধারে হইবে বিরল। সুতরাং যে ধনী হলে চার সে জানী হবার  
 বুঝা চোটা করবে না—জ্ঞান অর্জন করতে হলে পাদ্র্যকে ভয় পেলে চলবে না।  
 ইহাও একটা সংস্কারগত মানসিক প্রস্তুতি থেকেই বোধ হয় সৃষ্ট হয়েছে।  
 আমাদের ধার্মা-বিশ্বাস অধঃগতী দেবী সরস্বতীকে ভক্তি করে হলে সম্পদের  
 দেবী লক্ষ্মীর কুপালাভ থেকে বঞ্চিত হতে হবে, এবং লক্ষ্মীর . ভক্তি সাংস্রবত  
 প্রসাদের অন্তরায়। একের আরাধনা অপরের অসন্তুষ্টির কারণ না হলেও  
 আমাদের ধারণায় এ কথা মোটামুটি ঠপস্টি যে, এই দুই দেবীর একত্র কুপালাভ প্রায়  
 অসম্ভব। হুব কমা লোকই আমাদের ধারণায়, সরস্বতীর বরণপূত্র হয়েও লক্ষ্মীবান্-  
 হতে পারেন।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিদ্যাকে আমরা শুধু যে এক বিশেষ রকম হিসেবেই শ্রীকৃত দ্বারাও দ্বিগুণে তাঁর, একে আমরা এমন এক মহাদান (বিদ্যাদান) মহাদানই বলে গণ্য করি যা পাননে ন ক্ষয় যাতঃ-অর্থাৎ দান করলেও কয়ে না (বেরং বেড়ে যায়।)। তবু এই মহাদান প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের আর্থিক অর্থে সম্পদ বলে পরিগণিত হলে পারেন তার কারণ হয়তো এই যে, টাকা পয়সা ফল-দৌলত মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে বা অন্য দ্বারা পেতে পারে বা যখন খুঁজে বাগধার পেতে পারে তবুও পারেন। কিন্তু বিদ্যাদান জ্ঞাতাভির্ভাষিত তৈরী হয়েপাশ



कराला पिठोकराव-आ नोजनो प्राप्त

নীরতে—অর্থীণ ইচ্ছা হলেই বিদ্যা জ্ঞানভেদের মধ্যে ভ্রাস করে দেওয়া চলে না; তেমনি এ সম্পদ চোরের হরণ করতে পারে না। বিদ্যাসম্পদ এবং অর্থ সম্পদের চিরগতক এই স্বাভাব্য বিস্মার দেবী এবং ধনদৌলতের দেবীর মিলনের অশুভরস কিনা কে জানে।

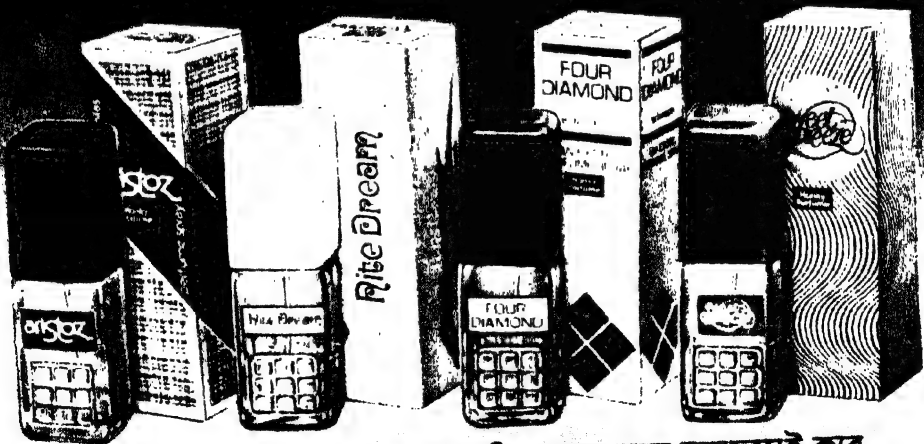
আমাদের প্রাচীন প্রবচনে এবং মৰ্যকথার বিদ্যা এবং ধনের পারদর্শনিক সম্পর্কের  
বে ছিঃ পাওয়া যায় তা খুব পাশ্চাত্যের নয়। বিদ্যাবান্ সৰ্বত্ৰ পুঙ্খভূতঃ—এ কথা  
যেহেতুলা থেকেই আমাদের দেখানো হয়। আর বঙ্গের 'বাগ্জিকা' বসতে লক্ষ্যকীঃ কথার  
সেহেও আমাদের প্রায় আলাদা পুরনো। এন বা সম্পদ লাভের উপায় হিসেবে বাগ্জিকা,  
কৃষিকর্ম এবং এমন কি রাজসেবার উল্লেখ আমরা পাই—বিদ্যাচর্চার কথা সেখানে  
স্থান পায়নি। অথচ বিদ্যা থেকে বিন্ন, বিন্ন থেকে পাঠ্য, পাঠ্য থেকে ধন, ধন  
থেকে ধর্ম এবং ধর্ম থেকে সুখ—এই সমীকরণের মধ্যে বিদ্যা এবং ধনের কী অকুত্  
আত্মীয়তার পরিসর রয়েছে। এর মধ্যে ধন এবং বিদ্যার পারস্পরিক মূল্যবোধের  
বিবর্তনের কোনও সূত্র লক্ষ্যে আছে কি না তার সঠিক খবর দিতে পারবেন ভগ্না,  
ভগ্না আমাদের সমাজিক ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য এবং তত্ত্বের সম্মান রাখেন।  
বিদ্যা এবং ধনের মূল্যবোধের বিবর্তনের সূচনা সাধা বিদ্যা এবং ধনের অধিষ্ঠাটী  
ক্লেবী বিষয়ক চিরন্তন এবং ভাব্যবসত্তাও বিবর্তন আসা খুব অসম্ভব হয়তো নয়।

এই দুই দেবীর—অর্থাৎ লক্ষ্মী-সরস্বতীর—পারস্পরিক সম্পর্কের খোঁজ নিতে গেলে দেখা যাবে বিভিন্ন গল্প-গাথার এবং লোকপ্রবাদে এদের স্বার্থ বা বিবাদের কাহিনীর সংখ্যাই হেন বেশী। এই স্বার্থ বা বিবাদের কল্পনা হবে এবং কিতাবে প্রথম শ্রেণী হইবে তার খোঁজ পাঁড়িত লোকেরা দিতে পারবেন। বর্তমান প্রসঙ্গে যে কথা জরুরী তা হল—এই দেবীর বিবাদের কল্পনা পুঙ্খানুপুঙ্খ হইতেই ভাঙা অথবা এক রূপ পরিগ্রহ করবে—লক্ষ্মী এবং সরস্বতী হইবেই বিবাদের দুই পক্ষী। সপক্ষী-কিরাণী হবে যেমানান মনে হয় না। তাই হয়তো লক্ষ্মী-সরস্বতীর স্বার্থ বিকলিতিকে আমরা হবে সামাজিক বলেই মনে করি। অথবা এ প্রসঙ্গে এটো কথা ভাবার আছে। এই দুই দেবীর স্বার্থ বিষয়টিই এদের বিবাদের দুই পক্ষী হিসেবে কল্পনা করতে সাহায্য করবে, নাকি বিবাদের দুই পক্ষী হওয়ার দশনাই পক্ষী হিসেবে কল্পনা করতে সাহায্য করবে, নাকি বিবাদের দুই পক্ষী হওয়ার দশনাই

ম্যানিলার সুরভিতে ভরা  
যেন ফুলের সৌরভে মন মাতোয়ারা!



অ্যারিসটোজ নাইট ড্রিম ফোর মুইট  
ডায়মণ্ড ব্রীজ



কোমল—সুরভিত রেশ—মনোহর! বিশ্বমানের সঙ্গে মানানসই করে  
বিশেষভাবে বেঙ করা স্প্রে পারফিউম।

MANILAS ম্যানিলাস পারফিউমের জগতে ৯৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।



প্রস্তুতকারক : ম্যানিলা ইনকর্পোরেশন,  
১৫৯/৩, ক্যাভাল ফ্রেশ লেন নম্বর ৬, কলবান্দেবী, বম্বে-৪০০ ০০২

আমাদের ছেড়ে দিতে হবে পশ্চিমবঙ্গের চিত্রের উপর।

বিক্রম দুই পত্রীর উল্লেখ কবি বাসুদেব—একা ভাষা প্রকৃতিমুখরা চণ্ডলা চন্দ্রিতা। অর্থাৎ সরস্বতী মুখরা, লক্ষ্মী চণ্ডলা। প্রকৃতপক্ষে, দুজনেরই এখানে নিদাম্পটিক উল্লেখ। দুই গৃহিণীর স্বভাবের জলাঞ্জলি বিষ্ণু দ্বারা তুলে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যাক বলে কবি বলে। রয়েছে—কবির এরকমই কল্পনা। আমরা বিষ্ণুর অঙ্গর-মহলের খবর জানি না। তবে অনুমান করতে পারি যে, বিষ্ণু নিজও তুলে দুই পত্রীকে সমীচরণে রাখতে পারেননি। পারলে তার গুণে অশ্রুত থাকতো না—তাকেও গর বাড়ি ছেড়ে জলশয্যা নিয়ে দিতে হত না। বিষ্ণু স্বয়ং পারেননি এই দুই দেবীকে তুলে একত্রে রাখতে, আমরা তো কোন ছার!

লক্ষ্মী-সরস্বতীকে বিষ্ণুর দুই পত্রী হিসেবে যেমন আমরা জানি, তেমনি এদের জানি দু' বোন হিসেবে, যদিও একের কল্পনার সঙ্গে অপরের বিরোধ তেমন নেই—দু' বোনের সম্পর্ক হতে বাধ্য নেই। এই দু' বোনের কল্পনার মধ্যে আমরা যে চিহ্নটি দেখি তা হল এই রকম: সরস্বতী বোকাপড়া এবং গানবাজনা নিয়ে থাকেন, লক্ষ্মী করেন গৃহকর্ম। লক্ষ্মীর মধ্যে যোগসূত্রটা পরোক্ষ হলেও বিবাদের নয়। বরং এর মধ্যে যেন আমরা কর্মভাষ্যজনিত বোকাপড়ার একটা ইঙ্গিত পাই। সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে এই দুই ভাগিনী বা দেবীর কর্মগুণে পরস্পরবিরোধী নয়—বরং একে অন্যের পরিপূরক। সীতা কথা বলতে গেলে সমস্ত দেবীই একে অন্যের পরিপূরক। কেননা, সবাই তো আসলে সেই আদ্যাশক্তিই কাব্য-একারণ জনিত বিভিন্ন প্রকাশ। মাক'ভেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য অংশে প্রকীর্ণিত (সরস্বতী), দৈবশক্তি (লক্ষ্মী) এবং শৈবশক্তি (দুর্গা) বা পাতালী-কে পরমা দেবীর বিভিন্ন প্রকাশ রূপে কল্পনা করা হয়েছে বার বার। কাজে কাজেই লক্ষ্মী-সরস্বতীর মধ্যে যে বিভিদ বা বিবাদের কল্পনা সেটা খুব সম্ভবত অপেক্ষাকৃত অবাচীনকালের সৃষ্টি।

আমাদের ইদানীন্তন ধারণায়, সরস্বতী বিদ্যা বা জ্ঞানের দেবী—লক্ষ্মী সম্পদের বা ঐশ্বর্যের। কিন্তু খেঁজ নিলে দেখা যাবে, লক্ষ্মীকে বিদ্যার দেবী এবং সরস্বতীকে সম্পদের দেবী হিসেবে কল্পনার নীতির খুব কম নেই। কিছুপুরাণে লক্ষ্মীকে জ্ঞানের দেবী হিসেবে সর্বশেষ উল্লেখ আছে। শিল্পরত্ন এবং তন্ত্রসারে লক্ষ্মী-প্রতিমার হাতে জ্ঞানের প্রতীক হিসেবে পুষ্পক ন্যস্ত করার নির্দেশ আছে। তন্ত্রসারে উল্লিখিত 'লক্ষ্মী-কব্জা' অংশে স্পষ্ট বলা আছে যে, এই কব্জা ধারণে জ্ঞানের বিভিন্দ শাখায় সমৃদ্ধি দেখা যাবে। বর্ণাশ্রম সাহিত্যে পরিষদে রাক্ষস একটি প্রাচীন লক্ষ্মী-প্রতিমার হাতে পুষ্পক দেখা যায়। নেপাল থেকে প্রাপ্ত বাসুদেব-লক্ষ্মীর 'অবতারী' মূর্তির একাধিক নীতির আমাদের জানা আছে, যার নারী অংশের (অর্থাৎ লক্ষ্মী অংশের) হস্তলঙ্ঘন হিসেবে পুষ্পক আছেই আছে। অনুগ্রহভাবে অগ্গবেদে নন্দীদেবতা সরস্বতীকে ব্রহ্মদেবী হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। শতপথব্রাহ্মণে সরস্বতী আরাক্ষিত হয়েছে সৌভাগ্য ও সম্পদের দেবী হিসেবে। এমন কি, বিষ্ণু সংবে ১৬১১ (অর্থাৎ ১৩৫৪ খ্রীষ্টাব্দ)তেও আমরা একটি লেখ—এ সরস্বতী সংবাদে এইরূপ উল্লেখ পাই—'সরস্বতী তোমাকে সব সম্পদ দান করুন।'

উপরের আলোচনা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সরস্বতী ও লক্ষ্মীর কল্পনা প্রাচীনকালে বেশ কিছু দিন হয়েছে। সমান্তরালভাবে চলেছিল। দুয়ের মধ্যে একটা সমতা বজায় ছিল। এই এক দেবীর কাছে যা পাওয়া যাবে তা অন্য জনের কাছেও পাওয়ার কথা লোকের অনায়াসে ভাবতে পারতো। এই ভাবনা লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর মধ্যে প্রকৃতি ও আকৃতিগত বৈসাদৃশ্য প্রায়শই ঘুচিয়ে দিত। দুয়ের বৈসাদৃশ্যের অবসানের সঠিক টেস্ট কোথায়? তা না জানা গেলেও উপরোক্তাধিত মাক'ভেয় পুরাণের 'দেবীমাহাত্ম্য' অংশে আমাদের এই প্রসঙ্গে পুনরায় স্মরণ করা প্রয়োজন। কেননা, ওখানে বিভিন্দ দেবদেবীর প্রকৃতি ও আকৃতিতে লক্ষ্মী-সরস্বতীর কাব্যকরুণ জনিত বিন্যাসরূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই রূপবিন্যাস যুগে যুগে কতভাবে যে প্রয়োজন হয়েছে এবং সে সবের সামাজিক পটভূমিকাই বা কি তা সঠিক জানার উপায় আজ আর খুব একটা নেই—সমগ্র চিহ্নটি আজ বহু যুগের বিবর্তনে হ্রস্ব এবং অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

এই বিবর্তনের মাকেই হয়তো কোনও সময়ে আমরা লক্ষ্মী-সরস্বতীকে দুই বোন হিসেবে এবং বিষ্ণুর দুই পত্রী হিসেবে কল্পনা করতে আরম্ভ করেছি। কোন কল্পনা আগে এসেছে এবং কোনটা পরে তার সঠিক বিচারও এখন আর সম্ভব নয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, সংবেগপ্রকীর্ণ নামক স্মৃতিগ্রন্থে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী এই উভয় দেবীর উপাসনাতাই বিদ্যার উপকরণ—মস্যাগার (মোহাট) এবং লেখনী (কলম)—পূজার আর্থিক প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে। এই গ্রন্থের আরও বলা হয়েছে যে, এই উপাসনা মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে করা উচিত। কেননা, ওই তিথি শ্রী না লক্ষ্মীর অতি প্রিয় তিথি—যা প্রিয়: প্রিয়া। আমরা জানি, এই তিথিতে—যাকে শ্রীপঞ্চমী বলে উল্লেখ করা হয়—ইদানীং আমাদের দেশে (বিশেষ করে বঙ্গদেশে) সরস্বতীর পূজা হয় ঘরে ঘরে। আচার্য বিদ্যাসিন্ধু মহাশয় তার 'পূজাপার্বণ' গ্রন্থে বলেছেন যে, হয়তো প্রাচীন কালে এই শ্রীপঞ্চমী তিথিতেই লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়েরই পূজা হত। কালক্রমে কোজাগার পূর্ণিমার দিনে—অর্থাৎ আশ্বিন-কাতিকের পূর্ণিমা—লক্ষ্মী পূজার প্রচলন শুরু হয়—সরস্বতী পূজা পূর্বপ্রথা অনুসারে শ্রীপঞ্চমীর দিনেই থেকে যায়। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ডঃ সূর্য্যকান্ত সেনের স্মৃতিস্তম্ভে মতামত বিশেষ প্রাধান্যযোগ্য—'সদা দেবতা হইতে সরস্বতী বৈদিক ভাবনার পুন্ডি, আরোপ্য, শ্রী ও ধনের দেবতার পরিণত হইয়াছিল। সেই অর্থে ইহা ইলার অর্থক্য'। পরে এই জলপাতা ও দেবতা দুইটি রূপ লইয়াছিল। এক রূপে বাগদেবতা, অপর রূপে শ্রীদেবতা। ঐদিক

রূপধারণে বাগদেবতা সূর্য্যদেবীর নারীরূপে অসুরদের মোহিত করিয়া দেবতাদের অমৃত আহরণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাি আমাদের পরিচিত দেবী সরস্বতীর পূর্ব রূপ।

'মেঘা ও বিদ্যার দেবতারূপে সরস্বতী স্বভাবতঃ আগে পূজা পাইতেন না। শব্দ দুর্গার সহচরী (বা কন্যারূপে দশভুজা প্রতিমার অঙ্গরূপে পূজা পাইতেন। এদেশে পড়ুয়ারা বসন্তপঞ্চমী দিনে যে বিদ্যাদেবীর পূজা করিতেন, তিনি শ্রীদেবীর সহিত অভিন্ন। শ্রীপঞ্চমী নামেই ইহার প্রকাশ। পূজার যবণিকা ইত্যাদির নৈবেদ্যও তাহা প্রমাণ করে।'

একই দিনে লক্ষ্মী-সরস্বতীর একসা উপাসনার বিষয়টি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, বঙ্গদেশের গৃহবধূরা প্রতি বৃহস্পতিবার ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপূজা করেন। এদিকে 'বিদ্যারূপে গুরুপ্রভে' কথাটাও আমাদের মধ্যে খুব প্রচলিত। অর্থাৎ বিদ্যার চর্চায় বা সারস্বত সাধনার জন্যও এই গুরুবার বা বৃহস্পতিবারকেই প্রশস্ত বলে চিহ্নিত হতে দেখি।

লক্ষ্মী এবং সরস্বতী শব্দ যে একই দিনে পাঁজিত হতেন তাই নয়, সম্ভবত এই দুই দেবীর একটা উপাসনাও প্রচলিত ছিল। ১৯৬১ বিষ্ণু সংবে (১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ) তারিখসূক্ত পরমার রাজাদের নাগপুর প্রশাসিত 'বাগদেবী' বলে যার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানানো হয়েছে তিনি যে এক দেবী নন তার ইঙ্গিত বাগদেবী শব্দটার শব্দবলে উল্লেখই হয়ে গেছে। এই দুই বাগদেবীর নাম কি কি তা আমরা জানি না। তবে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী এই উভয় দেবীকেই আমরা উপরে উল্লিখিত অংশে বিদ্যার (বা বাক-এর) দেবী হিসেবে পেয়েছি। তাই অনুমান করা সম্ভব যে, এই 'বাগদেবী' কথাটার মধ্যে লক্ষ্মী-সরস্বতীর একটা উপাসনার ইঙ্গিত রয়েছে। এই অনুমান যুক্তি-তর্কের চাপে কতটা ঠিকবে তা বলা না গেলেও খুব অনুমান হিসেবেও এর একটা বিশেষ মূল্য আছে। পরবর্তী কালে আমরা ভাবতে শিখি যে, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর একটা আরামনা সম্ভব নয়। প্রকৃতির শব্দভেদেই সে কথার উল্লেখ করেছি। কিন্তু এই ভাষাভাগির উৎস কোথায়, জানি না। দুয়ের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের কথাই বরং আমরা প্রাচীন গ্রন্থে বেশী পাই। মহাউষ্মণ্য জাতকে বহু বলেছেন, সম্পদ অর্জন এবং রক্ষণের জন্য মানুষকে জানাী এবং বৃদ্ধিমান হতে হবে। অর্থাৎ তিনি যেন বলতে চাইছেন, যেমন সরস্বতীর বরপত্রে না হলে লক্ষ্মীবান্ হওয়া যায় না, তেমনি লক্ষ্মীর কৃপালাভ ত্যরাই করেন য'রা সারস্বত-প্রসাদে দনা। লক্ষ্মী-সরস্বতীর পারস্পরিক পরিপূরকের এই যে স্মৃতিকা, এটা খুবই অর্থবহ। উল্লিখিত নাগপুর প্রশাসিত 'বাগদেবী' কথাটা অনুগ্রহে অধ্যাতনার কাব্যরূপ হওয়া তাই খুব অসম্ভব হয়তো নয়।

## অবাঞ্ছিত লোমের সমস্যাকে গোড়া থেকে দূর করুন

- এও শুধু নিবাপদ ভৈব উপাদান আছে। এমন কোনো ক্ষতিকর রসায়ন নেই যাতে 'দু' জালা জালা করে অথবা চুলকায়।
- দ্রুত কর্শ হবার বা কেটে যাবারও কোনো ভয় নেই।
- সাদে সাদে, এবং অতি সহজে লোমকে গোড়া থেকে দূর করে।



বিভিন্ন সলুনের নিভারবাগা

নতুন  
মাই ফেয়ার লেডী  
কোল্ড ওয়াক্স  
হেয়ার রিমুভার

বাজার ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড।  
বোম্বাই, কোলকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী

কসমেটিক্সএর ভৈবী।

# বাথরুমকে মলমলে বাহারে করুন প্যারীওয়্যার দিয়ে জাতিয়ে তুলুন!



ভেনেশিয়ান লাল, এমারেভেল  
সবুজ রঙ, আকাশী নীল,  
প্রমরোজ, প্রবালের গোলাপী  
বাতার কিংবা শুধু স্বকথকে  
সাদা, যাঁই হোক না কেন,  
প্যারীওয়্যারের কদর দেশে-  
বিদেশে সর্বত্রই লক্ষ-লক্ষ  
ঘরে-ঘরে। প্যারীওয়্যারের  
নাম সর্বত্রই প্যারীওয়্যার।

না। চমৎকার স্টাইল আর  
নিখুঁত ফিনিশ, অসাধারণ  
টেকসই আর দারুণ দেখতে।  
তাই অবাকের কিছুই নয়,  
যেখানেই তাকান সর্বত্রই  
স্যানিটারিওয়্যারের আর এক  
নাম প্যারীওয়্যার।

*Parryware*  
VITREOUS

আই. ডি. প্যারী

১০০, তেল্লার হাউস,  
মাদ্রাজ-৬০০ ০০১



লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে কখনও যে অভিন্ন বলে মনে করা হয়েছে তাই শব্দ নয়, দুই দেবীকে একাসনে আনার নজিরও আমাদের জানা আছে। বিষ্ণুর দুই পত্নী বা একেই আমরা বিষ্ণুমূর্তির দুই পাশে প্রায়শই দেখি—বিশেষ করে শ্রাবণ শতাব্দীতে রচিত পূর্ব ভারতীয় ভাস্কর্যশিল্পের একাধিক নমুনা নং ১)। এই সব ভাস্কর্যে সাধারণত বিষ্ণুর ডান পাশে লক্ষ্মীকে এবং বাম সরস্বতীকে দেখতে পাই—প্রথমজন পদ্ম বা চামর হাতে, দ্বিতীয় জন বীণা-গায়ত্রী। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, আমরা তো বীণাপাণি হিসেবে তাঁকেই জানি, অথচ স্কন্দপুরাণে একাধিকবার লক্ষ্মীকে বীণাবাদনরতা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানেও হয়তো এই দুই দেবী-কল্পনায় পারস্পরিক মনের স্বীকৃতিই আমরা পাই।

বিষ্ণুমূর্তির দুই পাশে লক্ষ্মী-সরস্বতীর অবস্থিতির ব্যাখ্যা হিসেবে বলা থাকে—এরা বিষ্ণুর দুই পত্নী। সমুদ্র মন্থনের পর বিষ্ণু লক্ষ্মীকে লাভ ন, আমরা পুরাণপাঠে অবগত আছি। সূত্রমতে লক্ষ্মীকে বিষ্ণুর পত্নী বা ভাৰ্য্যা বা ভাবার পটভূমিটা আমাদের বোধগম্য। বিষ্ণু সরস্বতীর অনুরূপ চিত্রিতনের রূপ ব্যাখ্যা খুব স্পষ্ট এবং জনপ্রিয় নয়। পুরাণপাঠে আমরা জানি, লক্ষ্মী, রত্নী এবং গঙ্গা—এই তিন জনই বিষ্ণুর পত্নী ছিলেন। কালক্রমে বিষ্ণু শব্দটিকে অপান ভাৰ্য্যা হিসেবে রেখে শুদ্ধা এবং শিবকে যথাক্রমে সরস্বতী ও হৃৎ দিয়ে দেন তাঁদের স্ত্রী করে নেবার জন্য (১)। এসব কাহিনীর ব্যাখ্যা বা তা খুঁজতে গেলে কোথায় হারিয়ে যেতে হবে কে জানে। তবে মনে আমাদের যথেষ্ট থাকে যার। কেননা, সরস্বতী বিষ্ণুপত্নী কেমন করে হলেন, এবং একই সঙ্গে র পত্নী হিসেবেও কি করে স্বীকৃতি পেলেন, তার সূচিটি আমাদের নাল্যের র থেকে গেল।

যাই হোক, বিষ্ণুমূর্তির দুই পাশে তাঁর দুই পত্নী লক্ষ্মী ও সরস্বতীর স্থিতির নিদর্শনের কথা আমরা উল্লেখ করছি। একাসনে এই দুই দেবীর স্থিতি আমরা পুনরায় দেখতে পাই বেশ কিছু পরবর্তী কালে দুর্গার দুই শ। বঙ্গদেশে এখনও শারদাশ্রমেবের সময়ে দুর্গার যে মূর্তি পূজিত হয় তাতে স্না শব্দ মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গাকেই যে দেখি তা নয়; তাঁর দুই পাশে দেখি স্না-সরস্বতী এবং কান্তি-কণেশকেও। দুর্গার দুই পাশে লক্ষ্মী-সরস্বতীর অবস্থিতি এখানে দুই ভাগিনী বা দুর্গার দুই কন্যা হিসেবে বঙ্গদেশের প্রচলিত কবিত্ববাস এইরূপ। দুর্গার বা বিষ্ণুর দুই পাশে লক্ষ্মী-সরস্বতীর এই স্থিতি—দুই ভাগিনী বা দুই সপত্নী হিসেবে—বঙ্গদেশের লৌকিক এবং ধার্মিক বাসে বেশ জনপ্রিয়ভাবে দেখা দিয়েছিল। পাল-সেন যুগের অসংখ্য বিষ্ণুমূর্তিতে পরবর্তী কালের দুর্গামূর্তিতে এর প্রতিফলন পাই। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যে, বিষ্ণুচন্দ্র তাঁর ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে এই দুই রূপেই লক্ষ্মী-সরস্বতীর স্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর অননুক্রমণীয় ভাষায়।

দেখা যাচ্ছে—বৈষ্ণবরা, এবং পরবর্তী কালে শাক্তরা, তাঁদের মূল উপাস্য হবার দুই পাশে লক্ষ্মী-সরস্বতীর একই অবস্থিতির স্বীকৃতি দিয়েছেন প্রতিমা-কল্পনের মাধ্যমে। এই স্বীকৃতির পেছনে একটি সুপরিচালিত উদ্দেশ্য থাকার ভাবিক মনে হয়। সে উদ্দেশ্য কি হতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা পরে করা য়। আপাতত যে কথাটা আমাদের কাছে মনে তা হল এই যে, লক্ষ্মী-সরস্বতীকে ল উপাস্য দেবতার দুই পাশে একাসনে যদিও আমরা এখনো পাচ্ছি, তবুও এই ই দেবীকে এক রূপে (অর্থাৎ এক দেহে) সমন্বিত করার কোনও প্রচেষ্টার শল্ল-দর্শন পাই না। এই সমন্বয়-প্রচেষ্টা একেবারে যে হয়নি তা-ও বলা যায় না। কারা ভাবে এ বিষয়ে এগিয়ে এসেছিল সে প্রসঙ্গে এবার আসছি।

কল্পযান-তত্ত্বদান বোধধরা অসংখ্য দেবদেবীর আরাধনায় রত্নী ছিলেন। এই দেবদেবীর অনেকেই হিন্দু দেবদেবীর সরাসরি বা সামান্য পরিবর্তিত রূপ, এ কথা ১৩ সনেকেই সর্বিশেষ অবগত আছেন। বোধধরের এক অতি লোকপ্রিয় দেবীর রূপ বসুধারা। বলাই বাহুল্য, ইনি পৃথিবী বা ধরতীদেবী ছাড়া আর কিছুই নয়। দেবীরাও বসুধারা দেবীর উপাসনা করেন। তবে বোধধরা এই বসুধারা দেবীর কাঙ্ক্ষিত রূপ কল্পনা করেছেন। এই রূপগুলো দেবীর বিভিন্ন কর্মানুসারে গঠিত। বসুধারা পৃথিবী-দেবী হিসেবে মারমধবের সময় গোতম বৃক্ষের পক্ষে ক্ষা দিয়েছেন। তাই তিনি পৃথিবী-দেবী রূপে পূজিতা। পৃথিবী-দেবী হিসেবে তিনি রক্ত এবং সম্পদদাতাও বটে। উপরন্তু তাকে কল্পনা করা হয়েছে জ্ঞান-দেবী হিসেবেও। কেননা, দশভূমির ধরতী হিসেবে তিনি শব্দ ভূমিপারমিতাই ন, তিনি প্রজ্ঞাপারমিতাবরণ। এই দেবী-কল্পনায় আমরা একাত্তর হিন্দুদের ক্ষ্মী এবং সরস্বতী—এই উভয় দেবীর সুস্পষ্ট ছায়া দেখতে পাচ্ছি। বসুধারা র এবং সম্পদদায়িনী অর্থাৎ লক্ষ্মী-সরস্বতী, আগার তিনি সরস্বতীর মত জ্ঞানদায়ী বা জ্ঞানদায়িনীও বটে। লক্ষ্মী-সরস্বতীর এই অর্থাৎ ভূমিকাই আমরা দেবী রূপে মগধার মধ্যে পাই। শব্দ তাই এই যৌগিক রূপের সমন্বিত রূপ। তাই দেখতে পাই এই দেবীরা এক প্রকার প্রতিমা-নিদর্শন।

বসুধারা দেবীর যে প্রতিমা রূপ সব চাইতে জনপ্রিয় ছিল বলে মনে হয় তা তাঁর ষড়ভুজ রূপ। এরূপ মূর্তি অনেক পাওয়া যায়—বিশেষত নেপালের বিশেষ স্থানে। দেবী সব মূর্তিতে ১) লম্বিত মনে উপকির্ত। তাঁর হস্তে ২) বেলুন বা বৃক্ষতক, ধানমঞ্জরী ও ভক্তগণের হস্তে রক্তবর্ণকল, ব্রহ্মদ্বা, রত্নমঞ্জরী এবং তথ্যগতবন্দনা-মন্ত্রা। এই রূপের বর্ণনা বসুধারারোহণের সময় কোষ সংগ্রহ জাতীয় ৩) হস্তলিখিত কিছু পুঁতে পাওয়া গেলেও মগধের সিংহ এই যে, বোধ প্রমিতা বিষয়ক প্রামাণ্য দুই গ্রন্থে—সানমাল্য ও নপম্যাসোপনিষদ—বসুধারা এই জনপ্রিয় ষড়ভুজ রূপের কোনও উল্লেখ নেই।

প্রবন্ধ ● সমালোচনা ও জীবনী

## দেশভাগ ও স্বাধীনতার বিস্ময়কর অধ্যায় !

দেশভাগ ও স্বাধীনতা একই সময়ে একইরূপে সম্ভব হয় যদিও এর প্রস্তুতি চলছিল দীর্ঘকাল জুড়েই। ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত আই. সি. এস. অন্নদাশঙ্কর রায় পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উভয় জেলাতেই প্রশাসনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এই দীর্ঘ আঠারো বছর তিনি ব্রিটিশ রাজপুরুষদের ঘনিষ্ঠ পরিবেশে কাজ করেছেন, পরিচিত হয়েছেন উভয়বঙ্গের রাজনৈতিক নেতা ও সমাজের বিশিষ্ট নাগরিকদের সংগে। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার কিছু কিছু অংশ সমুচিতারণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু প্রকাশিত হয়নি অনেক কথাই। সেও অপ্রকাশিত অজানা কাহিনী শুধু সত্য ও তথ্যনির্ভরই নয়, স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিস্ময়কর অধ্যায়। মূল্য ১৫/-

অন্নদাশঙ্কর রায়ের

## স্বাধীনতার পূর্বাভাসঃঃঃ !

অনন্ত সিংহ

কেউ বলে বিপ্লবী  
কেউ বলে ডাকাত

২০/-

মণি বাগচি

জীবনী শতক

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরাতন বাংলা

গদ্যগ্রন্থ

সঙ্কলন

শীতাংশু মৈত্র

যুগন্ধর মধুসূদন

অজিতকুমার ঘোষ

নাটকের কথা

অমিতাভ চৌধুরী

কবি ও সম্যাসী

অন্নদাশঙ্কর রায়

লালন ও

তাঁর গান

অমিতাভ চৌধুরী

রবিঠাকুরের

পাগলা ফাইল

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

চিৎপুর চরিত্র

## উপন্যাস ও গল্প গ্রন্থ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কখনো দিন

কখনো রাত্রি

শ্যামলা সিরাজ

নিখর বা জানি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

চ্যায়ী চান

বাহিনী

প্রথম ও শেষ অঙ্ক

মোহন কলিকাতা

প্রফুল্ল রায়

অন্ধকারে ফুন্দের

গন্ধ

অণ্ডতোষ মুখোপাধ্যায়

কোনে মনে বনে

শ্যামলা গঙ্গোপাধ্যায়

স্বর্গের গাশের বাড়ি

কৃষ্ণানু বসু

খমকে কেন দাঁড়িয়ে

৭০. ফোন ৩৪৮৫৪৩

# কেমন করে লাখ টাকা করা যায়

মাসে মাসে মাত্র ১৩৫ টাকা করে জমা রাখলেই হবে



## ব্যাপারটা সহজ—চুইটি পর্যায়ে বিশ বছরের প্ল্যান-এর মাধ্যমে

**প্রথম পর্যায়ঃ** প্রথম দশ বছর প্রতি মাসে ১৩৫ টাকা করে জমা রাখুন—সেন্ট্রাল ব্যাংক রেকারিং ডিপোজিট অ্যাক-এর মাধ্যমে। এই দশ বছরে আপনার গড়িত টাকা ফেঁপে ২৭, ৭৫১.৯৫ টাকায় পরিণত হবে। ঐ থেকে ২৭, ৭০০ টাকা আবার জমা রাখুন সেন্ট্রাল ব্যাংক মানি মান্টিপ্রান্সার ডিপোজিট অ্যাক-এর দশ বছরের মেয়াদে— যা আপনার জন্যে নিয়ে আসবে মোট ৭৪, ৩৮৮.৩৫ টাকা।

**দ্বিতীয় পর্যায়ঃ** একাদশ বছর থেকে আবার মাসিক ১৩৫ টাকা করে জমানো চালু করুন—রেকারিং ডিপোজিট অ্যাক-এর মাধ্যমে—যা আবার ২৭, ৭৫১.৯৫ টাকায় পরিণত হবে।

অতএব, আপনি বিশ বছরের শেষে পাচ্ছেন—  
৭৪, ৩৮৮.৩৫ টাকা + ২৭, ৭৫১.৯৫ টাকা = মোট ১,০২,১৪০.৩০ টাকা। মানে আপনি, একজন লাখপতি!

তাই, আজই সেন্ট্রাল ব্যাংক-এর কোনও একটি ল্যাখস পরাপণ করুন—আর বিশ বছর বাকি লাখপতি হয়ে বুক ফুলিয়ে ইটুনি।

সুন্দের হার ঠিক করা হয় রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া-র নির্দেশনায়।



**সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া**

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

যে ব্যাংক নানা দেশে নানা লোকের সেবায় আগ্রহী

এই রূপটির প্রতিচ্ছবি আমরা ১০১৫ খ্রীঃাব্দে (নেওয়ারী সংবৎ ১০৫) ত 'ক্যামব্রিজ প্রজাপারমিতা' নামক পুস্তিকে (Cambridge University Manuscript No. Add. 1643), পাই। এ থেকে বোঝা যে, বসুন্ধারার এই বড় ভূজ রূপের কল্পনা সম্ভবত একাদশ শতাব্দীর তেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল।

বসুন্ধারার এই বড় ভূজ রূপের মধ্যে আমরা হিন্দু দেবী লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মাস-রূপের একত্র সমাবেশ দেখি। দেবীর হাতের পুস্তক যেমন সরস্বতীর চিহ্নিত লাক্ষণ, তেমনি ভগ্নকট ও ধানমঞ্জরী আমাদের লক্ষ্মীপ্রতিমার অতি চিত্ত রূপটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সঙ্গেশ্বরের অবকাশ থাকে না যে, বসুন্ধারার ভূজ রূপটি লক্ষ্মী-সরস্বতীর সমন্বিত রূপ হিসেবেই কল্পিত হয়েছিল। ঐ প্রতিমাশাস্ত্রে তাই আমরা অসম্ভবকৈ সম্ভব হতে দেখি—লক্ষ্মী-সরস্বতী দেহে লীন হয়ে ভক্তের দৃষ্টিতে ভরে যেমন সর্ব সম্পদ দান করছেন, তেমনি ক' দিচ্ছেন জ্ঞান ও বিদ্যার অকুণ্ঠ অধিকার।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাবে, লক্ষ্মী-সরস্বতীকে একসঙ্গে বিকল্প দুই পু দেখানোর প্রচেষ্টা বৈষ্ণবরা সেই প্রাচীনকালেই করেছিলেন—একাদশ-শতাব্দীর শেষে বিশেষ ভাবে এর বহু নকল আছে, এমন কি ইতিপূর্বেকার নিদর্শনও পান। বৌদ্ধরাও এ বিষয়ে পিছিয়ে থাকেননি। অন্তত একাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে এই দুই দেবীর সমন্বিত রূপ প্রকাশ করেছেন বড় ভূজা বসুন্ধারার একাধিক শিল্প-নিদর্শনের মাধ্যমে।

আমরা সবাই অর্থ সম্পদ যেমন আকাঙ্ক্ষা করি, বিদ্যাসম্পদও তেমনি যাত্রা করি। দুটোই আমাদের চাই। অর্থ কিভাবে যেন আমাদের ধারণায় এসে গেছে যে, দুটো জিনিস, অর্থ ও বিদ্যা, একত্রে পাওয়া দুঃস্বপ্ন। বৈষ্ণবরা এই দুইয়ের কিছু সমাধা করতে উদ্যোগী হয়ে কল্পনা করলেন লক্ষ্মী-সরস্বতীকে করে দুই সহকর্মীরাপে। এদের বিকল্প দুই পদে সহাবস্থানের মাধ্যমে ভক্তমনে চীৎত কল্যাণের যে, লক্ষ্মী-সরস্বতীর কৃপালাভ একই সঙ্গে সম্ভব যদি তাঁদের ল দেবতা বিকল্পে আরাধনা করা যায়। বলাই বাহুল্য, এতে বৈষ্ণব পূজাপন্থীর তি জনমানুষের আকর্ষণ স্বভাবতই বেড়ে গিয়ে থাকবে। কিন্তু বৌদ্ধরা তাঁদের তথোপায়াত্মক সজ্ঞানী প্রতিভার পরিচয়স্বরূপ কল্পনা করলেন বড় ভূজরূপ। বসুন্ধারার বিনী প্রকৃতপক্ষে একাধারে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী দুই-ই! জন-রত্নার নিরীখে বোধ হয় এতে বৌদ্ধপূজাশাস্ত্রের আকর্ষণ কিছুটা বেড়ে গেল। ঐ প্রতিযোগিতার শাখার পিছিয়ে থাকা স্বীকৃতি মনে করলেন না। তাঁরা রত্নতী কলম দ্বারা দু'পাশে লক্ষ্মী-সরস্বতীকে এনে বসালেন। অবশ্য দু'পাশে পাশে লক্ষ্মী-সরস্বতীর সমীকরণ বহু আগেই যে তাঁরা করেছিলেন তার কথা তো আমরা মাক'ড়ের পুরস্কারে কৌমাহায়া অংশের প্রসঙ্গেই উল্লেখ করেছি।

লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিবাদ বা পরস্পরবিরোধিতার কল্পনা করে এবং কেমন করে নামদেয় প্রথম এসেছিল তা সঠিক বলা হয়তো সম্ভব নয়। কাঃ নাঃ সূত্রানুযায়ী দ্বন্দ্বের তদ্রূপ এক প্রবন্ধে বলেছেন—

"The popular belief is that Saraswati, the goddess of learning, would not co-exist with Lakshmi, the goddess of worldly wealth. It might have only a mere trick to keep the learned of the ancient lore poor, perpetuated by those who had the affairs of the state at heart".

অনুরূপ বা প্রতিরূপ বুদ্ধি বা মতামত হরতো আরও অনেক দিতে পারেন। তবে সেসবই মতামত-সর্বস্ব—ইতিহাসের প্রমাণ বা নিদর্শনের দ্বারা তাকে সমর্থন করা সম্ভব নয়। লক্ষ্মীর উপাসক বারা, তাঁরা সরস্বতীর কৃপা পান না, বা এর উল্টো ধারণার মূল উল্ল খুঁজে না পাওয়া গেলেও হয়তো এর কোনও-না-কোনও একটা ব্যাখ্যা দৃষ্টি করানো যায়, যদিও সেটাও অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের শাস্ত্রে ভক্তির সব চাইতে বড় লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে একনিষ্ঠতাকে। বারা জ্ঞাতিক অর্থ-সম্পদ চান তাঁরা একনিষ্ঠভাবে লক্ষ্মী দেবীর আরাধনার ত্রুতী থাকুন, আর বারা পারমাধিক জ্ঞান বা বিদ্যা-পিপাসু তাঁরা সারস্বত-সাধনাতাই শেখেন মন দিন—এমত অনুষ্ঠারিত লাক্ষ্য নিদর্শন থেকেই হয়তো কালক্রমে আমাদের মনে ধারণা এসেছে—বলাই বাহুল্য, প্রমাণ-সম্মে—যে, অর্থার্জন ও জ্ঞানার্জন পরস্পরবিরোধী কর্ম। তাই "ভারতীরে ছাড়ি ধরো এই বেলা লক্ষ্মীর উপাসনা"—দুজনের একত্র উপাসনা নৈব নৈব চ।

সূত্রীতি—

- ১ রত্নসিদ্ধান্ত মূখোপাধ্যায়, 'বসুন্ধারা', বসুন্ধারা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ১০৬৭ সাল।
- ২ P. Pal, Two Buddhist Paintings from Nepal, Amsterdam 1967.
- ৩ D. C. Bhattacharyya, Tantric Buddhist Iconographic Sources, Studies in Buddhist Iconography, Iconology of Composite Images, New Delhi, 1974, 1978, 1980.
- ৪ ভারতকোষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ৫ম খণ্ড, ১০৮০ সাল।
- ৫ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, পূজা-পার্বণ, কলিকাতার ১০৬৮ সাল।
- ৬ Ka Naa Subrahmanyan, 'Puja in South India', The Sunday Statesman (Delhi), Puja Supplement, October 8.

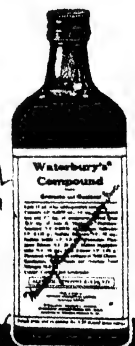
শরীর দুর্বল  
থাকলে সর্দি-  
কাশি নেগেই  
থাকে।



নিয়মিত ব্যবহার করলে  
ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড রেড  
লেবেল রোগ প্রতিরোধ-শক্তি  
গড়ে তোলার সাথে সাথে  
আরামও দেয়।

- স্বাস্থ্য আরাম দেবার জন্য এতে ক্রিয়োস্টেট ও গায়কোল মেশানো আছে।
- তাছাড়া এতে এমন অনেক টনিক পদার্থ মেশানো আছে যা বহু দিন ধরে রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি বজায় রাখে।
- বারবার সর্দি-কাশির আক্রমণ থেকে আপনাকে রক্ষা করে।
- স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখে।

সর্দি-কাশির  
উপশমের  
সর্বশ্রেণে  
নির্ভরযোগ্য  
উপায়।

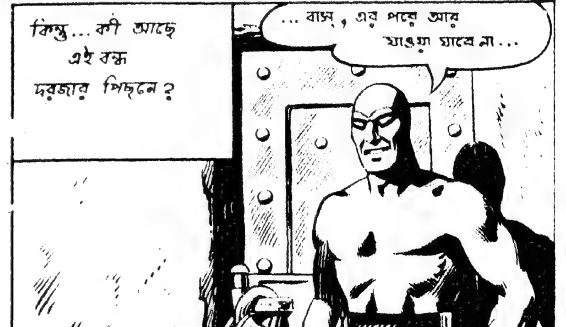
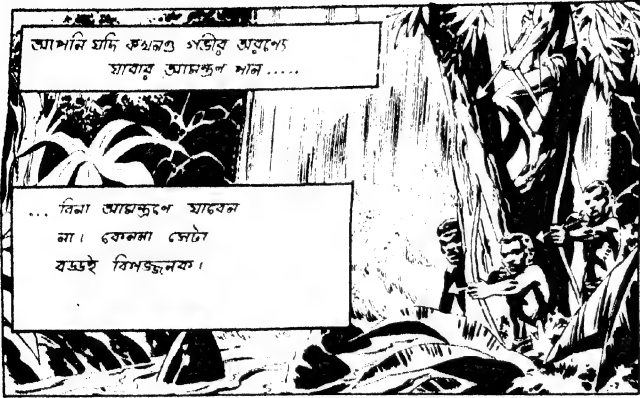


ওয়ার্ল্ড হিল্ডব্রানের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড  
রেড লেবেল

WH.5884

## অরণ্যদেব





পর্তুগীজ ভাষায় নিমের নাম মার্গোসা।  
 নানাতাবে আমাদের শরীর ও ত্বক সুস্থ রাখতে নিমের  
 জুড়ি নেই। তাই যুগ যুগ ধরে নিমের এত সমাদর।  
 মার্গো একমাত্র সাবান যাতে আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিম তেল।  
 খাঁটি ও প্রাকৃতিক উপাদানে ভরপুর মার্গো সাবান আপনার  
 সারা শরীর শুচিস্নিগ্ধ রাখে, ত্বকের সর্বাঙ্গীন যত্ন নেয়।  
 প্রকৃতির এই অবদানকে আপন করে নিন।  
 মার্গো সাবান মেখে স্নান করুন। প্রতিবার  
 স্নানের পর হয়ে উঠুন তাজা বারবারে।

**সারা শরীর পরিষ্কার  
 মায়ের মতন যত্ন তার**



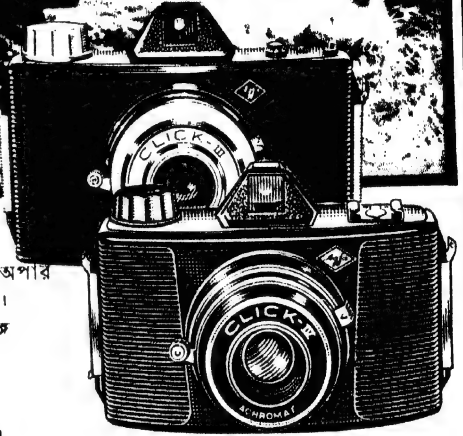
**মার্গো খাঁটি নিম তেলের তৈরি ত্বকের পরিচর্যা কারী সাবান**



প্রতিটি মুহূর্তই  
শুধী আনন্দে ভরা  
সঙ্গে যদি থাকে  
আগফা-ক্লিক  
ক্যামেরা!



পিকনিক, পাটি, জন্মদিন, ছুটিতে ভ্রমণ,  
সবেরই আনন্দঘন মুহূর্তগুলি আগফা-ক্লিক  
ক্যামেরায় ধরে রাখুন। এত কম দামে এত অপার  
আনন্দ, আপনি কল্পনা করতেও পারবেন না।  
এই আনন্দদায়ক সুবিধেজনক 'ক্লিক' সর্বদা সঙ্গে  
রাখুন। আপনার নিকটতম আগফা-গেভার্ট  
ডীলারের কাছে এখনই চলে আসুন।



দেখামাত্রই ছবি তোলা যায়

**ক্লিক III**  
**ক্লিক IV**

ফটোগ্রাফীর জগতে সবার সেবা



আগফা-সেন্টার ইন্ডিয়া লিমিটেড

হেজিয়ার্ড অফিস :  
মার্টেক কোয়ার্টার, ৪১ মিউনিসিপ্যাল লাইন, বোম্বাই ৪০০ ০৩০  
শাখা : মোম্বাই ও মিউনিসিপ্যাল লাইন ও মলকাভা ও মাদ্রাস  
(১) কোম্পানি সফটওয়্যার খাবারী ও উপহারের প্রস্তুতকর্তা  
আগফা-সেন্টার, আগফা-গেভার্ট, সিডায়ফুসেন - এর  
হেজিয়ার্ড ইন্ডিয়া লিমিটেড।

## জ্ঞানানন্দ পাঠগৃহ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়কাল একটা রাত সময় জুড়ে। বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে সারা রাত ভাঙত ঘোষে ১৮৫৭ সালে যে গণাল জ্বল উঠছিল তারও বহু পূর্বে থেকেই এই তৃণালয়ের হুপ্রকাশ বারবার খুঁজে। মুন্ডা বিদ্রোহ (১৮৫৭), ওড়াল বিদ্রোহ (১৮৫৫), বা তারও আগে অন্যান্য নজাতি-আদিবাসীদের বিক্ষোভ প্রকাশিত হচ্ছিল খোঁজ পিঁ (১৮৪৬), নানা জাতি (১৮০২), খুঁজ জাতি (১৮০৮) বা চুয়ার জাতিদের (১৭৭০ এবং ১৭৭২) প্রদোহের মধ্য দিয়ে। ১৮৫৭-পরবর্তী কালের আন্দোলনের গুরুত্ব ও ব্যাপ্তি আরও বিরতি।

এই সমস্ত বিক্ষোভ-বিদ্রোহ-বিশাল সংগ্রামে রচিত রেখে প্রচুর বই এবং এখনও হচ্ছে। এ ছাড়া, রয়েছে এই সম্পর্কীয় স্মৃতিস্তম্ভ জাতীয় বহু বই। আমাদের দেশের গবেষকদের কাজে অন্যতম অন্তরায় প্রয়োজনীয় সূত্রকের সাহায্য গ্রহণ করা—কারণ, বই যা আছে তা বিভিন্ন লাইব্রেরী বা প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে; এক জায়গায় তা একত্রে পাওয়া যায় না। কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞানন্দ পাঠগৃহ একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কিত বইয়ের একটি সবা গণীয় ব্যাপক সংগ্রহ গড়ে তোলা। কেবল গ্রন্থসমূহই নয়, তদানীন্তন যুগের বিভিন্ন স্বাবলিঙ্গ-সাময়িকপত্র থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য, গুরুত্বপূর্ণ সংবাদসমূহের মাইক্রোফিল্ম সংগ্রহও পাঠগৃহে কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য। বর্তমানে এই জাতীয় বইয়ের সংখ্যা প্রায় আট শত। খুবই উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ। গবেষকরা একই স্থানে মুষ্টি সংগ্রাম সম্পর্কিত এতগুলি গ্রন্থ প্রয়োজনে হাতের কাছে পাচ্ছেন, তার জন্য পাঠগৃহের কর্তৃপক্ষ সাধুবাদ নিচয়ই পাবেন। মাইক্রোফিল্মের সংগ্রহ সেরকম উল্লেখযোগ্য না হলেও, সংগ্রহের কাজ শুরুর হয়েছে।

প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এই সংগ্রহ প্রশংসনীয় মাধ্যমে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়। ১৯৭৭ সাল থেকে এই বাৎসরিক প্রদর্শনী নিয়মিত হয়ে আসছে। এবারের প্রদর্শনী (৪র্থ বর্ষ) অনুষ্ঠিত হলে প্রজ্ঞানন্দ ভবনের “কিরণচন্দ্র হল”—এই আদ্য থেকে ১৮ই আগস্ট পর্যন্ত। নানা প্রতিকূলতার জন্য কর্তৃপক্ষ এবারের প্রদর্শনীতে সমগ্র সংগ্রহ উপস্থাপিত করতে পারেননি—প্রদর্শিত হয়েছিল এর একটি অংশ মাত্র। এই প্রশংসনীয় একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল দেশের নিজেদের খুশিমত এই সব বই নাড়াচাড়া করে দেখতে পারাছিলেন—কোন বাধা-নিষেধ ছিল না। এরা দর্শকদের উপরিলাভ। কারণ এর বহু বইই বর্তমানে কিনতে পাওয়া যায় না। যুগান্তর দলের ডিক্টেটর ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়-এর সেই বিখ্যাত বইটি “ভারতের সময়সংকট” রয়েছে এঁদের সংগ্রহে। বইটি ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ১৯২৫ সালে মৌলিনীপুর জেলে থাকাকালীন রচনা করেন এবং তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৮ সালে। সেই সময়ে তিনি চীনের ভবিষ্যৎ মতগতি সম্পর্কে বসতে গিয়ে লিখছেন : “চীন একটা সুস্থির হতে পারলেই যে তিস্ত-সমস্যা জটিল হয়ে উঠবে, সে বিষয় আর সন্দেহ নাই। এখনও তিব্বত ও লাসার উপর চীনের চক্ষু আছে। চীন যদি একবার তিব্বতে কণ্ঠ করতে পারে, তা হলে টোয়ান প্রদেশ সহজে ও গোপনে ভারত প্রবেশের আভা বানিয়ে ফেলবে।” পড়তে পড়তে গা রিসার করে। সত্যিই কি অশ্রুত দরদ্রুটি! “হিন্দু, পৌরুষ”—এ প্রকাশিত হিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের র নার একটা সংকলনও রয়েছে। এরকম আরও অনেক উল্লেখযোগ্য ও বর্তমানে দুলভ গ্রন্থ পাঠগৃহের সংগ্রহ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি দুলভ সংগ্রহও উল্লেখ করতে হয়। নেতাজীর ছাত্রাবস্থার একটি পাঠ্যবই (মেকানিক)—নেতাজীর স্বাক্ষর সহ—এই

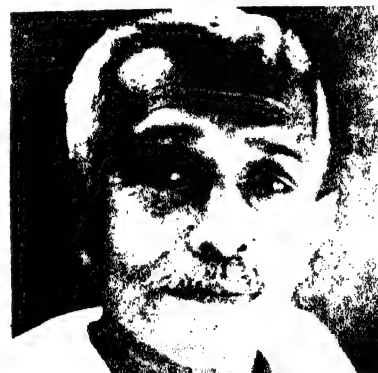


স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী

রয়েছে। সংবাদপত্রের কিছু ফটোস্তাটও প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল।

যদি স্মৃতি এই পাঠগৃহ বহন করছে সেই স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী (১৮৪৪-১৯২১)-র অন্যতম পরিচয় যে, তিনি বিলুপ্ত যুগান্তর দলের বিরশাল শাখার সংগঠক এবং নেতা। বারীন ঘোষ যখন তাঁদের গুরু বিলুপ্ত দলের কার্যকলাপ বন্ধির উদ্দেশ্যে ১৯০৬ সালে বিরশালে যান তখন তিনি এই বাণ্যার সাহায্যের জন্য অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অশ্বিনীকুমার দত্ত সে সময়ে বারীন ঘোষকে জানান যে, এই বিষয়ে যেটা ব্যক্তি হলেন স্বামী প্রজ্ঞানন্দ—তখন তিনি অবশ্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে পরিচিত। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্তের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং স্বদেশ বাণ্যের সমিতির (যার প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত স্বয়ং) সহ-সম্পাদক। সামাজিক সংস্কার ও আর্থিক উন্নয়ন করা এই সমিতির উদ্দেশ্য হলেও পুঁজি এই প্রতিষ্ঠানটিকে সূন্য করে দেখত না। তাই ১৯০৯ সালে কর্তৃপক্ষ এই প্রতিষ্ঠানটিকে বেআইনী ঘোষণা করে, ফলে সমিতির কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে কিন্তু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৯০৬ সাল থেকে, স্বদেশ বাণ্যের সমিতির সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন, গোপনে বিলুপ্ত সংগঠন গড়ার কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন। সমিতি বেআইনী ঘোষণা করার পর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিজেকে পুরোপুরি বিলুপ্ত সমিতি গড়ার কাজে নিয়োজিত করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শব্দক মঠই ছিল বিরশাল যুগান্তর দলের কেন্দ্র। কিন্তু পুঁজি ও নিষ্পত্তি থাকে। তাঁকে বারবার অন্তরীণে আবদ্ধ কর রেখেছে। শেষবার ১৯১৬ সালে তাঁকে মৌলিনীপুর জেলার মহিষাঙ্গলে অন্তরীণ অবস্থায় থাকতে হয়। প্রসঙ্গত স্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত এখানেই তাঁর সংস্পর্গ আসেন এবং তাঁরই



কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রেরণার স্বদেশী মতে দীক্ষিত হন। ইতিমধ্যে ১৯১০ সালে গয়ারে তিনি সম্মান নেন এবং তখন তাঁর নাম হয় স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী।

মহিষাঙ্গলে অন্তরীণ অবস্থায় থাকাকালীন স্বামী প্রজ্ঞানন্দ চারটি গ্রন্থ রচনা করেন; তার মধ্যে অন্যতম হল তিন খণ্ডে সমাপ্ত স্বদেশ “শেখারত দলের ইতিহাস” এবং “রাজনীতি”। প্রথম বইটি কোলকাতা দলের প্রথম পঞ্চাঙ্গ ধর্মাবলম্বী ইতিহাস এবং শেষেরটি ভারতীয় ও ইউরোপীয় রাজনীতির তুলনামূলক আলোচনা। তিনি কেবল সংগঠকই ছিলেন না, অগাধ পাণ্ডিত্যেরও বৈ অধিকারী ছিলেন পুস্তকগুলি তারই সাক্ষ্য দেয়। মহিষাঙ্গলে অবস্থানকালীন ম্যালেরিয়ার বার বার আক্রান্ত হওয়ার তাঁর শরীর সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। ১৯২০ সালে তিনি মুষ্টি পান এবং পরের বছর মাত্র সইটিশ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

প্রজ্ঞানন্দ পাঠগৃহ ছাড়াও তাঁর স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত করেকটি প্রতিষ্ঠান সমাজসেবামূলক কাজ করে চলেছে। স্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত স্থাপন করেছেন প্রজ্ঞানন্দ স্মৃতিস্তম্ভ সমিতি। এই সমিতির উদ্যোগে বেশ কয়েকটি বিদ্যালয় ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। হাওড়াতে তাঁর এক গৃহী শিষ্য (যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) প্রতিষ্ঠা করেছেন স্বামী প্রজ্ঞানন্দ বিদ্যালয়। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাচীন মন্ত্রী জীৱনচন্দ্র গুহের পরিচালনায় প্রজ্ঞানন্দ জনসেবা সঙ্ঘ বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে বেশ কয়েকটি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। এইসব সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ছাড়াও কলকাতার স্রীসরস্বতী প্রেসও তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত।

প্রজ্ঞানন্দ পাঠগৃহের প্রতিষ্ঠাতা কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৪০—১৯৫৪) দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। বছর কুড়ি বয়সে তিনি গৃহত্যাগ (ভূগলহাট, বনোয়ার) করে কলকাতার চলে আসেন। এখানে খেবরত বঙ্গের সংস্পর্গে এসে বিলুপ্ত দলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। বলাউল আদোলনের সময় থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত বিলুপ্ত আদোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। বিলুপ্ত জীবনের প্রায় অর্ধেক সময় তাঁকে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে থাকতে হয়েছে।

শেষবার জেল থেকে মুষ্টি পান ১৯৪৫ সালে। দেশের আত্মাওয়ার খেলন তখন অন্ধ—মুষ্টি আসন্ন, দেশ স্বাধীন হচ্ছে; হিন্দু স্বাধীনতার অন্তিম মলা হিসেবে দেশ বিভাগ তিনি অন্তর থেকে মনে নিতে পারেননি। সে যা হোক, জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর তিনি বাকলেন সংগ্রাম পর্ব শেষ হয়েছে কিন্তু কত বা শেষ হয় নি, সামনে রয়েছে আর এক বড় কাজ—পেশ গঠন। তাই যাট পেরিয়ে এনেও অবসর নিলেন না। স্বাধীন দেশের উপযুক্ত ন্যায়িক তাঁর করার উদ্দেশ্য নিয়ে কলকাতা স্কোয়ারে অল্পসে স্থাপন করলেন প্রজ্ঞানন্দ পাঠগৃহ।

সাধারণ মামুলী লাইব্রেরী নয়, ছাত্র ও যুবকরা নিজেকে যাতে প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত করে বতমান যুগের সঙ্গে পা খেল চলাতে পারে, সে জন্য তাঁর পুস্তক সংগ্রহে বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, রাজনীতি—এই জাতীয় গ্রন্থের একটি প্রামাণ্য সংগ্রহ গড়ে তুলতে গোড়া থেকেই তিনি সচেতন ছিলেন এবং আশানুরূপ সফলও হয়েছিলেন। “প্রজ্ঞানন্দ পাঠগৃহ সাধারণের শিক্ষার জন্য নয়। সাধারণকে যাহারা শিক্ষিত করিয়া সুপথে চালনা করিবেন তাহাদের শিক্ষারতনের নিমিত্তই প্রজ্ঞানন্দ পাঠগৃহ।” (যোগেশচন্দ্র বাসল—বরণীয়) কয়েক বছর হল মৌলারী মোড়ে প্রজ্ঞানন্দ ভবন—এই পাঠগৃহ স্থানান্তরিত হয়েছে।

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী এবং কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যে কেবল বড় মাগের মানুষ ছিলেন তাই নয়, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁদের উভয়েরই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। মুষ্টি সংগ্রামের উপর এই সংগ্রহের মাধ্যমে তাঁদের যেটা তপস্বীর ব্যক্তিত্বের পাঠগৃহের কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত কাজ করেছে।

অশোক দাস



## মুঘল যুগের চিত্রলেখার সাথে দেয়ালে শুধু লাক্সল সিল্কই মানায়।

লাক্সল সিল্ক। ভারতের একমাত্র ইমালেশন যা আপনি শ্রেষ্ঠ চোখ বুঁজেই চিনে নিতে পারবেন। শুধু দেয়ালে আঙ্গুল ছোঁয়ান, লাক্সল সিল্কের অপূর্ব রেশমী কোমল স্পর্শ আর অসাধারণ ফিনিশ আপনাকে মুগ্ধ করবে। এর পরে অন্য কোন ইমালেশন আর ছুঁয়ে দেখতেও ইচ্ছা করবে না।

লাক্সল সিল্কের রেশমী কোমল ফিনিশ বহুরের পর বছর ঝকঝক থাকবে। চট কার ধুলা ময়লা বসবে না, সামান্য ময়লা বা দাগ ধুয়ে নিলেই পরিষ্কার। ফলে আপনার বাড়ি-ঘর থাকবে সদাই নতুন—ঝকঝক আর ঝলঝলে। উপরন্তু এখন আপনি চল্লিশটি বিভিন্ন রঙ থেকে আপনার পছন্দসই রঙটি সহজেই বেছে নিতে পারবেন।

বাড়ির দেওয়াল ছবিয়ার সেরা ইমালেশন  
লাক্সল সিল্ক দিয়ে মুড়ে নিন



**Luxol  
Silk**

**British Paints**

A member of the worldwide BERGER group

# ংয়ে আলি হেরেছেন তেছেন কার বাজিতে

শ্রুতিমুখের দুই তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভোগাসে জগানো হেভিওয়েট বক্সিং লড়াইয়ে মুহম্মদ আলি পেছেন লারি হোমস-এর কাছে। হোমস জিতেছেন আটটি লড়াই।

মুষ্টিযুদ্ধ জগতের প্রবাদ, তিনবারের বিশ্ব পয়ন মুহম্মদ আলির পেশাদার জীবনের ৬০টি ইয়েক মধ্যে এই প্রথম বিষাদময় পরাজয় এবং নক-ট হয়ে প্রথম পরাজয়।

হা, ওয়ালড বক্সিং কার্ডিনালের কানুন অনুযায়ী ক্ষতি হওয়া নক-আউটেরই নামান্তর। চুক্তি ও রাউন্ডব্যাপী লড়াইয়ের ১০ রাউন্ড পর্যন্ত প্রতি

দেহে আলি হেরেছেন পরেরের হিসাবে। হোমসের সামান্যতম কাঁচিল হতে হতে একাদশ রাউন্ডে আর যে দুটিয়ে সংগ্রাম করতে পারেননি। তখন আলির দার আয়েজলো ডাউট হার মেনে নেন। রেফারী

এই গ্রীষ্ম লড়াই বন্ধ করে দিয়ে হোমসকে নক-আউটে জয় ঘোষণা করেন। বক্সিং বিশ্বের পরাজিত তে তখন রংয়ের কোণে তার টেলের উপর বসে মেমতকে ও নির্বাক বিস্ময়ে প্রহর গর্নাইছিলেন।

ক্লাপন রিংয়ের ২৭ হাজার দর্শক এবং দেশ-দেশে টেলিভিশন পর্দার সামনে বসা লক্ষ লক্ষ দর্শক ছিলেন শেষ হয়ে যাচ্ছে মুষ্টিযুদ্ধ ইয়েক: সবচেয়ে বর্ণময় মহাবলীর জীবনের শেষ

দেখ স্বপ্ন কথোটি কিন্তু আলির ক্ষেত্রে ফোকা নয়। বহুবাহী রিং থেকে অবসর নেবার ঘোষণা নিয়েছেন আলির রিংয়ের ফিরে এসে মহা-শিত্তির আধিকারী হয়েছেন। এই যে হোমসের

ছে অমর্যাদাকর পিরায়ন তবু বলেছেন—মামলুক খবরের খবর ফেলে দিও না। আমি আর ফিরে আসব। তবে কখন ফিরব সে সম্পর্কে খবরই মন স্থির করতে পারছি না।

সত্যিই অন্তিম অত্যাশ্চর্যভাবে আলি ফিরে সেছেন। বক্সিং ইতিহাসে এমন গৌরবজনক আচরণের নজির নেই। বক্সিং জগতে জ্যাক নসন, জ্যাক ডেমপসি, জো লুই, জো ওয়ালকট,

জর্জ চার্লস, রিক মার্সিয়ানো, ফ্রেড প্যাটার্সন, রীনি লিস্টন, মাক্স সের্ভেল, ইনগেমার জোহানসন, দি ফ্রোজয়ার প্রভৃতি কত স্মরণীয় নাম। এদের

সা একমাত্র কন্সার ফ্রেড প্যাটার্সন যিনি খেতাব দিয়ে আবার খেতাব ফিরে পেয়েছিলেন। সবচেয়ে ম বাকসে—মাত্র একুশ বছরে প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন

হয়েছিলেন। সবচেয়ে বেশি বয়সে (৩৭ বছরে) সব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন জো ওয়ালকট। জীবনে আট লড়াইতেও না হেরে—৪৯টি মধ্যে ৪৯টি

লড়াইয়ে জিতে খেতাব সহ অবসর নিয়েছিলেন মেমোর রিক মার্সিয়ানো। জো লুইও খেতাব সহ বসর নিয়েছিলেন। কিন্তু অর্থের প্রয়োজনে

পারার চ্যাম্পিয়নশিপ লড়াইয়ে ফিরে এসে হেরে গান একজর্জ চার্লস ও রিক মার্সিয়ানোর কাছে। কিন্তু এদের সকলের কীর্তি ম্লান করে

দখলেন মুহম্মদ আলি। একবার নয়—তিনবার হেরে নেবার বিশ্ব খেতাব পুনরুদ্ধার কল্পনাতীত কীর্তি। তিনবার কেন, চারবারও বলা যায়। প্রথম-ই খেতাবচ্যুত হবার কারণ কোনো মুষ্টিযোদ্ধার

সামান্যত নয়—স্বক্ৰিয় সেরকার খামখেয়ালীপনা। ১৯৬৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি মিয়ামি বিচে সোনি লন্সকেনে সপ্তম রাউন্ডে নক-আউট করে প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবার পর আলির মনোমুখ্য হবার

জড়িয়ে পড়েছিলেন রাষ্ট্রের সঙ্গে। মামলা জিতে আবার তিনি খেতাব ফিরে পান। আবার টাইটেল ফাইটে জো ফ্রোজয়ারের কাছে হেরে সেই ফ্রোজয়ার-কেই হারিয়ে খেতাব ফিরে পান। আর এক টাইটেল

ফাইটে হারান জর্জ ফোরমানকে। আবার খেতাব হারান কেন নটনের কাছে। ওই লড়াইয়ে আলির চোয়ালও ভেঙে দেন নটন। কিন্তু পরে দুবার

নটনকে হার স্বীকার করতে হয় আলিরই কাছে। '৭৬-এর ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে নিউ ইয়র্কের ইয়াংক স্টেডিয়ামে নটনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার জয়ের

পর আলি মুষ্টিযুদ্ধ থেকে অবসর নেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। কিন্তু অর্থের প্রলোভনে এবং বক্সিং প্রোমোটারদের বাস্তবায়নয় আলি-ফ্রোজয়ার আর এক

লড়াইয়ের ব্যবস্থা হয় ম্যানিলায়। বলা হয়েছিল—মাস্ট্র মিলিয়ন ডলারের লড়াই। দর্শনী থেকে সংগৃহীত হয়েছিল প্রায় দুই কোটি টাকা। জিতে আলি পেয়েছিলেন চার কোটি টাকা। পরাজিত

ফ্রোজয়ার পেয়েছিলেন দু কোটি। আবার আলির ঘোষণা: "আর মুষ্টিযুদ্ধ নয়। এবার আল্লার ইচ্ছায় কাজ করব। পরোপার্জ ধর্মযাজকের জীবন বেছে নেব।"

কিন্তু পেশাদার মুষ্টিযুদ্ধ এমন এক খেলা যার মধ্যে আছে সোনার খনির হাতছানি। ফল আলি আবার বক্সিংয়ের মধ্যে ফিরে এলেন এবং '৭৮-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে লাস ভোগাসে হেরে

গেলেন লিওন স্পিংকস-এর কাছে। কিন্তু যেভাবে নটন ও ফ্রোজয়ারকে হারিয়ে খেতাব পুনরুদ্ধার করেছিলেন ঠিক সেইভাবে মাত্র ৬ মাসের মধ্যে বদলা

নিলেন স্পিংকস-এর বিরুদ্ধে। '৭৮-এর ১৫ সেপ্টেম্বর নিউ অরলিয়ানে স্পিংকসকে হারিয়ে তৃতীয়বার পুনরুদ্ধার করলেন হেভিওয়েট বক্সিংয়ের বিশ্ব খেতাব।

সবাই ঘরে নিল ৩৬ বছর বয়সী আলির এটাই শেষ লড়াই এবং মহাগৌরবের সঙ্গে অবসর গ্রহণ। আলি নিজেও সেকথা ঘোষণা করলেন। কিন্তু আবার সেই সোনার খনির হাতছানি এবং

প্রোমোটারদের উস্কানি। তাই দীর্ঘ ২৫ মাস পরে লারি হোমসের সঙ্গে এই লড়াইয়ের ব্যবস্থা হয়, যে লারি হোমস ছিলেন আলিরই অনুশীলন সঙ্গী।

বক্সিং জগৎ বেশীদিন খেতাবশূন্য থাকতে পারে না। আলির অবর্তমানে লারি ছিলেন স্বীকৃত চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু লোকে বলত—ফলত চ্যাম্পিয়ন। কারণ আলিকে তো লারি কোনদিন

হারাতে পারেনি। সেই জন্যই কি লারি হোমস আলির সঙ্গে লড়াইয়ে রাজি হয়েছিলেন? কিংবা বড় মুখ করে আলি যে কথোটা বলেছিলেন—"আই অ্যাম দি

গ্রেটেস্ট সবাই জানে, এবার চারবার খেতাব জিতে এমন এক কীর্তি গড়ব যা কোনকালে কেউ ম্লান করতে পারবে না"—সেই কারণেই লড়াইতে রাজি হয়েছিলেন কি আলি?

অর্থই আসল কারণ। প্রেস কনফারেন্সে সে কথোটা খোলখুলি করল করেছেন লারি হোমস। হোমস যখন গর্বের প্রস্ফুটিতে পশুমুখ হয়ে

বলছিলেন—"এমন চ্যাম্পিয়ন হয় না, এমন মানুষ শিশুর বিরল।"—তখন সাংবাদিকতা প্রশ্ন করেন এ হলে এমন মানুষের সঙ্গে এবং হোমসের প্রাক্তন

গর্বের সঙ্গে লড়াইতে গেলে কেন? হোমস বলেন, আমি জনতাম আমি জিতবই এবং এ-ও জনতাম আলির লড়াইয়ে ফিরে আসা উচিত হয় নি। তার

ভাবমূর্তি ম্লান হয়ে যাবে। কিন্তু আমি না লড়ে পারি নি। একজন পেশাদার বক্সার কি ষাট লাখ ডলার ছেড়ে দিতে পারে?"

অলিও নিশ্চয়ই লড়াইয়ে নেমেছিলেন আশি লাখ বা এক কোটি ডলারের প্রলোভনে। হারাজং

প্রকাশিত হল  
শক্তিপদ রাজগুরুর

গ্রীন ভ্যালি ফার্ম

বিচিত্রতম উপন্যাস। বারো টাকা

পাঁচটি রুদ্ধশ্বাস ক্রাইম থ্রিলার

জেমস হেডলী চেজ  
আগাথা ক্রিস্টি  
অ্যালস্টেয়ার ম্যাকলীন  
অ্যালফ্রেড হিচকক  
আর্থার কোনান ডয়েল

অপারেশন ককটেল

কুড়ি টাকা

জেমস হেডলী চেজ

অর্কিড ডিলা

দাম : দশ টাকা

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

পরীর সঙ্গে প্রেম

দাম : দশ টাকা

সমরেশ বসুর

শ্রীমতী কাফে

১৬.০০

ভাবুসতীর ববরঙ্গ

১৪.০০

মিলন মুখোপাধ্যায় অমিতাভ রায়

চেনা অচেনা ১২ কমবোডিয়া ১২

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

যুবক যুবতীরা ১৪

মৌসুমী প্রকাশনী

১৭ কলকাতা রো/কলকাতা-৯

# বৈদ্যনাথ জীবনপ্রাশ



- প্রকৃতি-জাত ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ
- সর্দিকাশি হতে দেয় না
- ক্যালসিয়ামের অভাব এবং রক্তাক্ততায় কাজ দেয়
- অবসাদ ও ক্লান্তি দূর করে
- যৌবনসুলভ শক্তি যোগায়
- কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লরোগ ও বদহজমে কার্যকরী
- আমলকি ও গাছগাছড়ার দ্বারা তৈরী বলে এটি সুপরিপাত্য

বহু প্যাকের সঙ্গে বিলায়ুমে চামচ

**বৈদ্যনাথ** সর্বব্যবস্থা সমন্বিত ৫টি আধুনিক কারখানায় ৭০০টিরও বেশি আয়ুর্বেদীয় ঔষধ তৈরি করে ও দেশের বাইরে রপ্তানী করে।

**বৈদ্যনাথ** আয়ুর্বেদীয় ঔষধ ৮০০টি বিক্রয়কেন্দ্র ও ৬০,০০০ ডিলারের মাধ্যমে দেশের ও বিদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়।



শ্রী বৈদ্যনাথ

আয়ুর্বেদ ভবন লিমিটেড

কলকাতা • পটনা • বাঁসা • নাপপুর • এলাহাবাদ

## পরিবারের জন্য আয়ুর্বেদীয় টর্নিক



## আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **বই**

**জন হুসন মন্ডির নিবিড়।**  
সুন্দর সেন। সারস্বত লাইব্রেরী।  
৬ বিধান সরণি। কলকাতা-৭।  
টাকা।

**অনন্ত উদ্ভব রত্নে।** সুনীল  
এব নন্দী। অবেষা। ৮৯৩ এন কে  
মল রোড। কলকাতা-৪২। পিচ  
কা।

**সুখরঞ্জন কবিজা।** সুখরঞ্জন  
বসন্তী। দীপ প্রকাশন। ৩৭৩  
বঙ্গপুর্ন পাক। কলকাতা-৬৮। পিচ  
কা।

কোনো কিছুর স্পর্শ বা  
কবিতা সামিথে সাসিক মন যখন  
ভরে নমে, মনের আঁচন ভায়ে  
এরা লাগে তখন মনুষ্য অন্য সুরে  
হু হলে ওঠে। সেই বলা কখনো  
নিভা, গান, ছবি, শিল্প হয়ে দেখা  
না। গভীর অন্তঃভব, তীর উপলব্ধির  
কয়েও হয়ত কখনো কব-জীবনের  
প্রাকৃতিক ঠিকরে বেরায়। এখনও তিন-  
নো ক্ষণিকতরু কাব্যগ্রন্থে সেই ভাব-  
চ্ছুরণের কিছুর আভাস পাওয়া  
যায়।

সিন্ধেশ্বর সেন অনেককাল  
বিভিন্ন লেখেন নি। এককালে, বা  
কখনো বেশ লিখতেন। লোক সমক্ষে  
এই নাম ছিল। খ্যাতি-প্রতিপত্তি  
প্রদান করেছিলেন। কিন্তু বিগত  
কয়েক কেনো একসময় কেন যে তিনি  
একটানা ছেড়ে দিয়ে একটা ধর্মাবতার  
মতরাল চলে গিয়েছিলেন তার  
কর্তানীতিতে কোনো তত্ত্ব আমাদের  
কিনা নেই। অবশ্য কবিতার হাত যঁর  
এক-সংস্পর্শে তাঁকে মুক্তি দেন না।  
মিলে ফেলা নিয়ে রসের আসরে  
এক অবল অবতীর্ণ হতে  
যে। এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হয় নি।  
সিন্ধেশ্বর সেন দীর্ঘ মেয়াদের  
প্রাণে একগুচ্ছের অনন্ত সুন্দর  
কবিতা কবিতা কবিতা ভক্তের উপহার  
দিয়েছেন। কবিতাগুলি ভাষা,  
শব্দভাষা রোম্যান্সের মত অকর্ণণ  
করে কখনো তার মধ্যে ভেঙে আগুন  
লাগিয়ে লকলকিয়ে ওঠে কাক-চোখ  
খোঁজা জলের মধ্যে দোল খাওয়া  
চন্দন চন্দমালা বা চিরমালা হয়ে যায়।  
মদ ঘোড়ায় তিনি সংযমী। কিন্তু  
তবু বক্তব্য চিক্‌চিকানো তাঁর ফলার  
মত মনের মেলোয়েম মথমলে বিধে  
যে তিনি সংস্কৃত বিবাসী। কম  
এবার অনেক কিছুর বলা হয়ে যায়—  
এই স্বভাব-কৌশলে কুশলী। রম্ভ।  
খ্যাতি ছোট বই। কিন্তু কবিতাগুলির  
এক কটা টুকরো টুকরো উচ্চরসে  
তিনি চুষতে যে সুপা বাজিয়ে তোলেন  
এই সুপেলা পাখির পেঁজা ধানির মত  
অসমীমক একা কাল-স্বায়ী। তাঁর  
বিভিন্ন কাব্য গ্রন্থের জন্য উৎসুক  
বিশ্ববাসী।

সুনীলকুমার নন্দীও নিজস্ব  
বিশ্ববাসী এক স্বল্প-বাক সং কাঁটা।  
সুন্দর পত্র-পত্রিকায় খুব কমই  
লিখেন। কবিতা জিনিসটা খুঁ-  
নুসার মত ছড়ালে ছিটালে ককের

যত এই মতবাদে তাঁর আস্থা নেই।  
সুনীলও বিদ্যমান। তাঁর কাব্যগ্রন্থ  
বিশ্বায় কম। কিন্তু মাঝে মাঝেই তারা  
প্রকাশিত হয়েছে। যারা সে কবিতা-  
রাজ্যের মধ্যে ঢুকেছেন অমত একট,  
চোখে বুলোবার অবকাশ পেয়েছেন  
তারা জানেন যে তাঁর মেজাজের একটি  
নিজস্ব পরিমণ্ডল আছে, জলজ,  
জলা বনরাজিনী প্রকৃতির মধ্যে  
একটি মায়ারী মন চুরি করে নিয়ে  
যায় পথ দেখিয়ে দেখিয়ে অন্য একটি  
বিশ্ববাসী নিবিড় পাঠক-মনকে। তাঁর  
কাব্যচর্চার আদল ও আদর বিফল  
হয় নি। হঠাৎ তাঁর কণ্ঠ না শোনা  
গেলেও হাটের বইরে মেটো রাস্তায়  
তার মর্দির অহীন কনে পৌঁছয়,  
অচ্ছন্ন করে—দূরে দেখা যায় কালো  
অন্ধকারে এক প্রস্থ জৈনিক বালমলে  
ঝড়-লপন। ধূলা ধূলা গম্ব লগা  
ছন্দ দোলা। খোঁচা খোঁচা জল বিধে  
থকা অজস্র নজা-ডে বা-খাল-বিল-  
ব-ওড়-সুনীলকুমার নন্দীর কবিতার  
এই-ই দৃষ্টি-নিবিড়-বউল-উচ্ছন্ন  
স্বভাব। বাংলা কবিতার ইসানী-  
কালের আলোচনায় তাঁর স্মৃতি  
উল্লেখের দাবি রাখে।

এই অলোচনর শেষতম কবি  
সুখরঞ্জনের জীবনদীপ অকালে  
নিবর্তিত হয়েছে। মরণান্তর এই  
কাব্যগ্রন্থ পাঠে মন এক বিষয় বেদনার  
ভরে যায়। তাঁর কবিতার কঠোর  
এমন এক নিশ্চিত অভ্যাস কবিতার  
আভাস আছে—যা থেকে ভেবে নেওয়া  
যায় তিনি প্রতিপত্তি এবং খ্যাতি  
অজ্ঞান করতে পারতেন। অনেক  
কবিতায় আবেগের তেড়ে এতটাই যার  
মলে সুর বস্তুত্ব ফেনাটুকু বাস  
দিয়েই গ্রহণ করতে হয়। নিশ্চয়ই  
কোনো একসময় চর্চা ও অনুশীলনের  
মাধ্যমে প্রগতি নিশ্চয় বস্তুতে পারিতেন  
বেশীটুকু বদ দিয়ে কঁমটুকু রাখলে  
ছক। জিনিসটুকু পাওয়া যায়।  
সাহিত্য ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, দর্শন,  
রাজনীতি, অর্থনীতি, চলমান জীবন  
—এতগুলি বিষয়ের অধর হিসাবে  
তিনি কবিতার মধ্যমক ব্যবহার  
করেছেন—হয়ত এতে গুলি বিষয়ের  
প্রতিই তাঁর প্রবণতা ছিল, কিন্তু  
কবিতায় তাঁর কতখানি কণ্ঠের সে  
বিষয়ে ভাববার বা চিন্তা করার  
সুযোগ তিনি পান নি। একথা  
নিশ্চিত কবিতার প্রসঙ্গ পঠক অবশ্য  
যদি তিনি খুব সূক্ষ্ম হৃদযত্নে  
পাঠক না হন, চলচেরা বিচার নিয়ে  
তর্কবতর্ক না করেন, সুখরঞ্জনের  
কাব্য-প্রচেষ্টা তাঁকে কিছুক্ষণ এক  
অনাবিল আনন্দে ডুবিয়ে রাখবে।  
হয়ত বা কিছু কবিতার পাথরেও  
জুটিয়ে দেবে।

সুনীল বন্দ্য

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **চিত্রকলা**

**আত্মাল্পন বিচ্ছিন্নতা কিংবা  
মাঠ ভাগে কালপদ্রুয়**

ডেকর সাহিত্য স. গাঙ্গারী—সেপ্টেম্বর  
২০—এইমাত্র সপ্তাহখানেকের জন্য একটি  
প্রকাশনী শব্দ বরফ-ঠান্ডা লেমনেড  
দিয়ে। চারজন শিল্পীর যৌথ প্রদর্শনী।  
এদের তিনজনের কাজ “দেশ” প্রজ্জ

বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র  
নির্মাণের একমাত্র পুস্তক

## চলচ্চিত্র নির্মাণ ও পরিচালনা ১০১

শীর্ষশেষ বোশ

প্রাতিস্থান : দেবু বসু  
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট  
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

সদ্য প্রকাশিত  
সুপ্রসাদ সেন  
**সমাজ বিপ্লবে সংস্কৃতির প্রম  
ও ভারতীয় সমাজ 18.00**

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়  
**ভারতীয় দর্শন - আদিপর্ব  
25.00**

কে পি বাগচী গ্রাণ্ড কোম্পানী  
২৮৬ বি বি বাসুরী স্ট্রীট  
কলকাতা-৭০০ ০১২

সুশীল রায় অনন্দি  
The Sword of Tipu Sultan  
এর সম্পূর্ণ পুনর্নির্বাচন

**টিপু সুলতানের তরবারি**  
(উপনি্যাস) ২৫.০০

**মাইকেল মধুসূদন দত্তের  
পত্রাবলী** (পত্র সংকলন) ১৫.০০

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ  
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৭৩

**বুদ্ধিজীবীদের কাছে নতুন খবর**  
হিন্দুবিরাট আইনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে  
এবং হিন্দুদের দাম্পত্য তথা পরি-  
বারিক জীবনে বর্তমান সমস্যার কারণ  
নিয়ে লেখা তথ্যসমৃদ্ধ, বিজ্ঞানসম্মত,  
দর্শনভিত্তিক ও চাকলাকর বই

**পলিগামি হ্যাণ্ড বুক**  
প্রাতিস্থান : অক্ষাফোড বুক  
স্টেশনারী কোম্পানী, ১৭ পাক স্ট্রীট,  
কলকাতা-১৬ এবং অন্যান্য বুক স্টল  
গ্রন্থকার ও প্রকাশক : অতুলকৃষ্ণ কুণ্ডু,  
ফলপুত্র রোড, চুটুড়া, হুগলী

ডাঃ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত  
**চিকিৎসা বিদ  
রবীন্দ্রনাথ**

এলোপ্যাথী ও রবীন্দ্রনাথ/আয়ুর্বেদ ও  
রবীন্দ্রনাথ/হোমিওপ্যাথী ও রবীন্দ্রনাথ  
ন্যাচারপ্যাথী ও রবীন্দ্রনাথ চিকিৎসা  
রাসিক রবীন্দ্রনাথ/চিঠি পত্রে ডাক্তারী  
প্রকৃতি তথা সহজ অদ্বৈত গ্রন্থ। ১০১  
পরিবেশক : উষা পাবলিশিং  
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৭৩

হরেন ঘটক-এর

## ছড়া ও ছবিতে A B C D

সবকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছড়াকার  
হরেন ঘটক-এর অমর সৃষ্টি ভারত  
সরকার কর্তৃক প্রস্তুত এই বই-এর  
[আনন্দবাজারের মতে 'Self-taught']  
পরিমিত পঞ্চদশ শোভন সংস্করণ  
[৪ টা ২০ পয়সা] শিশুদের অসা-  
বনীয় আনন্দ ও জ্ঞানের খোরাক  
নিয়ে বেরুচ্ছে। S Banerjee & Co.  
6, Ramanath Majumdar St.  
Calcutta-9

প্রকাশিত হল  
বোল্টন স্ট্রাংলার, রামন রায় এবং  
জিগোমার এই তিনজনের মধ্যে সব  
চেয়ে নৃশংস এবং সাহসী খুনি কে  
জানতে হলে এখান পড়ুন।

**স্বনামধন্য চিরঞ্জীব সেনের  
জিগোমার কে?**

প্রাতিস্থান : নাথ ব্রাদার্স  
১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭০০ ০৭৩  
ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে

তাপসকুমার দে রচিত  
**ভারতের নাট্যসংস্কৃতির  
রূপরেখা**

সারা ভারতের পনোয়াটি ভাষার নাট্য-  
কমার উদ্ভব, প্রমবিকাশ, রূপান্তর  
রূপে জানতে তথা সমৃদ্ধ এই বইটি  
অপরিস্রব। ১ম প্রস্ত-১৫.০০

দেবু বসু, নাথ ব্রাদার্স  
কলকাতা-৭৩

১৫ খণ্ডে ছবিভরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই  
**জানবার কথা**

সম্পাদক : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়  
প্রকাশিত হয়েছে :  
১ম খণ্ড : মহাবিশ্ব রম্যভাষার সরকার  
২য় খণ্ড : বস্তুপরিচয় : অমিতাভ দত্ত  
৩য় খণ্ড : পৃথিবী : সুনীল মুন্সী  
প্রতিখণ্ডের দাম-১৮.০০  
প্রাতিস্থান : শরৎ বুক হাউস/দেবু বসু/  
নাথ/শৈল্যা/কে পি বাগচী/  
এন. বি. এ./বুক মার্কেট/ডি এম.

বিশেষ শারদীয় ১৯৮০  
**উত্তরসূরি ১০৮  
১০৮ উত্তরসূরি  
উত্তরসূরি ১০৮**

অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত  
নির্মিত কে. সি. মোহন মোহন  
কলকাতা-৭০০

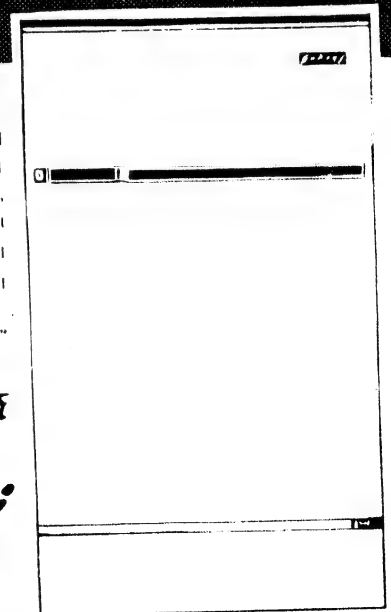


“আমি গোদরেজ  
পছন্দ করেছি কেন?  
—আমি নিজে  
ইঞ্জিনিয়ার-  
রেফ্রিজারেটরের  
খুঁটিনাটি সবকিছুই  
আমি জানি!”

“সবার মানান গুণ ও বেশিষ্টার ঢাক পেটানোতে সাধারণ লোক বিভ্রান্ত হয়ে  
যেতে পারেন। প্রত্যেক রেফ্রিজারেটর নির্মাতাই নিজ নিজ বেশিষ্টার দাবি  
করেন। সেইজনেই আমি নিজে এর সব কিছু যাচাই করে নেওয়া ঠিক করলাম।  
এর খুঁটিনাটি প্রতিটি অংশ পরীক্ষা করলাম, যেমন—কম্প্রেশরের স্পেসিফিকেশন,  
কায়বুলতা, ডিজাইন, মজবুত গড়ন, ফিনিশ ও নির্ভরযোগ্যতা।  
এর সবেতেই সন্তুষ্ট হয়েই আমি গোদরেজ কিনলাম।  
সাধারণ লোকের মত এর সনামের ওপর ভরসা করেও আমি এটি কিনতে পারতাম।  
উত্তমভাবেই বিচার-বিবেচনা করে একটি রেফ্রিজারেটরই আমার বাস পছন্দ—  
তা হ'ল গোদরেজ।”

সকলের আস্থাভাজন গোদরেজ

*Godrej*





মিঠাভাড়া বাজারে, শ্যামল দত্তরায়, কিশি ভট্টাচার্য। চতুর্থজন গণেশ লাই।

গণেশ হালুই অপেক্ষাকৃত পরিচিত 'দেশের' পাঠকের কাছে। জনতার দেওয়ালচিত্র নকল করার কাজ রেছেন বহুদিন। অজ্ঞতার ওপর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি বিশেষজ্ঞ। বর্তমানে সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। গণেশের প্রতি তার ভুলের ভয়। তৈলচিত্রের শিল্পকরণে নৈপুণ্য অর্জন করে গেলেও, সমরেশ্বরী ছবি 'কিন্তু' চলচ্চিত্র-স্বচ্ছ এবং অস্বচ্ছ উভয়ে—তার চিত্রাচার মত কাজ আছে। এবারের চলচ্চিত্র একেই তিনি। বর্ণচিত্র রঙের চোখ দখলিয়ে থেলে। শ্যামলার চিত্র গ্যালারি মতো মমল সমৃদ্ধ। কখনো কঠিনলাপাতার মত সূচিপটল লেগে। এসেছে নীচু জলাভূমির মধ্যে গাছের আভাস। ফেরীঘাট পেরিয়ে বোঝা পান অগুণে। কালো ছোপের মধ্যে বড় গাছ। পুকুরের পাশে নারিকেল গাছ আর কিছু বকের ডাল বেড়ানোর মতো। পাহাড় আর বড়-শুকনো জোপাশপ্রাপ্ত যেন। যদি রঙের সোপান এবং স্বেচ্ছা বিচার হয় তবে চিত্রগুলি প্রথম শ্রেণীর। তবে মন ভরে না। ছবির জোর তার নিম্নতম। বচনার ত্রুটি। এ সব যেন দোলপাতার অস্থায়ী ছবি। ফেরীঘাট ছবিতে খেয়া নৌকা মারা দিয়ে যেভাবে একেই মনে হয় যে মায়া সৃষ্টি করেছে তার মত কেউ হয়। অন্য কয়কটিতে কাটা কাজ সেটে সঠি ছবি (কোলাজ)-এর জীব এসেছে।

অমিতাভ মাতুরপাত খোদাইতে প্রেম উজ্জ্বল কারুকার্য দেখাচ্ছেন। বিশেষত 'বিক্রম' বুনোটির মধ্যে মায়া তৈরি হয়েছে। যেমন দেওয়ালের ফাঁদেটায় লোকের যেসব নকশা উঠে হয়। এতে 'প্রেমের' চিত্রনাট্য নারী এসেছে মিলিয়ে। কেউ ফুল, কেউ ফল। 'বিক্রম' পড় মিশরী। নতুনমতের থেলে। কিন্তু তিনি মূল প্রতিমাকে মাঝখানে থাকা চারপাশে মণ্ডনমণ্ডী 'বিশেষ' কখনো রচনা এবং অবসরের সময়সীমার মাপকাঠি না হয়ে পাশ কাটান। 'বিক্রম' বকসিংয়ের স্পারিং দ্বারা মন ভাঙলি দেখা হয় না শেষ পর্যন্ত।

শ্যামল দত্তরায়ের একটা 'বিক্রম'...

একটা চায়ের দোকান—দুই বড়ো বসে থাকে। ভাঙচোরা স্বেচ্ছা। ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়কাপড়। উনুনে সসপ্যান। ডিম কোলানো তারের বড়ি। খুঁটিনাটি মিলিয়ে সন্দের। রচনাসৌক্য এবং ভূমিবিদ্যাসে ভাল। অন্য ছবিগুলির মধ্যে পার্টিসানের ডাঁকে ডাঁকে বাড়ির আঁকাটা মন্দ লাগেনি। সামনে লোহার পাতের গোল ঘেরার মধ্যে একটা গাছের দিকে তাকিয়ে হাড্ডিসার গরুর আঁক-পাকুর ব্যাপারটা জমেছে। শ্যামলের গল্প বলা, রূপকথা বলা এবং সচিত্রকরণ করার একটা ঝোঁক আছে। রোমাণ্টিক-সিজমের তবক মোড়া। কিন্তু বস্তুত চায়ের দোকান দেখে মনে হল, তিনি নতুন রাস্তা পেয়েছেন।

বিকাশ ভট্টাচার্যের ছবি যেন নতুন দেশে আসার মতো। তৈলচিত্র। বড়। মেজাজে করা। ইদানীং বুঝেছি বিকাশ আসলে সাহিত্যিক। মানুষের দেহের মেঘ মাসে, জরা আর বার্ধক্য সম্বন্ধে তিনি ষাঁড়স্পর্শ। এই জীবনবসন, এই মোহ। দেহ এবং আত্মার মধ্যে স্বচ্ছ কাঁচের দেওয়াল। 'বিকাশের অধিবসন'—এ কয়েক জন মেয়ে সেজেগেজে মাসের দোকান সাজিয়ে বসে আছে। এদের পাশে শব্দ 'জলকে চল' মেয়ে আছে। সাধারণ মেয়েদের বিকাশের প্রসাধনে কি তার আপত্তি আছে? এই ছবির গঠন এবং বিন্যাস ফুলের মতো বৃত্তাকার। বড়ো রিকশাওয়ালা এক মহাবয়সী মহিলাকে টেনে নিয়ে চলে। তার রাউন্ডের ওপর দিয়ে বড়ের আভাস যেন নড়হুঁচি ফুটেছে। চরণ সিংয়ের জ্বর মুখের পেছনে এলিয়ে পড়া ধ্বংস মেয়ের ছবি আছে। হীন কি ভারতবর্ষ? আর এক বিধবা মহিলা। যার গলার কাছটা ফুলের চাক মটির মত পেঁচানো। হাতে একটা লোকের মুখ মুখাংশের মত কাটা। কেবল একটা ছবি আমার ভাল লাগেনি। হলদে দেওয়ালের ওপর রাস্তার বাঁধা মেয়েটি অকসফামের বিজ্ঞাপনচিত্রের মতো মনে হয়। বস্তুত বিকাশের ক্ষমতা সর্বদা সন্দেহ থাকতে পারে না। বিকাশ ক্ষমতায়, কল্পনায় সহজে চিহ্নিত হয়ে যায়। সকলে সমালোচনা করেন, কিন্তু সকলে সমালোচক নন। তৈলচিত্রশিল্পীদের মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য থাকবেই। বিকাশের রচনা হয়েছে চিলে ঢালা, বর্ণে আলো-ছায়ার বিভ্রম, এবং টাটকার চেয়ে মিশ্রিত রঙকে তৈলমোহিত করার দিকে ঝোঁক, এবং অন্ধকূলে প্রথাসিক বাস্তবের প্রতি আসক্তি, তবু মনে হয় মতলকের ঠাণ্ডা হাওয়া যেন গায়ে লাগছে। ছবি থাকা মারে। সহজে ভোলা যায় না।

সমালোচনা করা সত্ত্বেও বলব, কলকাতার আর দশটা প্রদর্শনীর চেয়ে এদের কাজের মান অনেক উন্নত। এদের কাজে সামগ্রিক অনেক বেশি সন্দীপ সরকার

আলোচনা-গণিত সংস্কৃতি

সবরঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন

বড়ো গুলাম আলী খাঁর স্মৃতি উদ্দেশ্যে আয়োজিত সবরঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন এ বছর রবীন্দ্রনগরে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রাথমিক অবস্থায়

# অর্শের

জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে আরাম  
পেতে বিশ্বস্ত

## হ্যাডেনস্যা

### ফলফল

ব্যবহার করুন—  
অস্ত্রোপচার না  
করলেও চলে!

3651 BEN

জরুরী প্রয়োজনের জন্য রাখুন

## জ্বালা

ব্যবহার

### স্ববিধাজনক লগন

২টি স্ট্যান্ডার্ড সাইজের সোল কাঁচ করে

- রঙের অনুমোদিত কল
- বিজ্ঞান—সরবরাহ বজায় কল
- প্রাকৃতিক স্ট্যান্ডার্ড কল
- অংশবিশেষ

- মজবুত ও রপনীয়
- নিরাপদ ও বহু কাল চলে
- উপকার দেওয়ার ক্ষমতা চমৎকার

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

গোবিন্দসল এক্সটার্মাইজ

১০০ নং বারীশ্বর রাস্তা হাট

মতলুক বাথ ১০০০০০০০

ফোন ১০০০০০০০

এত ভাল যে এটি ছাড়তে  
কখনো অঙ্গন মন চাইবে না!



শ্রীতিবাস  
করছেন  
অপকৃপ বস্ত্র-মেলা

শ্রীতিবাস  
করছেন  
মিলস  
লিমিটেড, কলকাতা

সংগ্রহ ১০০ টি নানান প্রকারের ডিজাইন, সুপার কটন ও ব্রাউড ড্রেস মেটেরিয়াল, শাটিন, স্যাটিন ও শাড়ী।

গুলামের সুপরিচিত শিষ্য মীরা গাথাখ্যায়ের গান দিয়ে প্রথম সংস্কার আরম্ভ হয়। ইনি প্রথমে গেরে-গন ইমন রাগে খেয়াল। বিলম্বিত পলের বিস্তারের কাজ সরেলা ও রিকাল্পিত হয়েছিল এবং এতে বড় সময় বিস্তারের মজাও বানকট। শেষের দিকের তানের কাজ পীর পুরনো মেজাজ অনুভব করা হয়। দ্রুত খেয়াল ও তারানাদিও না আকার তান ও বোল তান ছিল। পর শিল্পী সরস্বতী রাগে যে মধ্য খেয়ালটি সেরেছিলেন সেটি সুখ, তার, তান ও সরগম সব দিক দিকটি টি সার্থক শিল্পকীর্তি ছিল। তিনি টি ছোট ঠুরী গায়ের ঠিকঠাক শেক্স নি।

এদিনের দ্বিতীয় বৈঠকে শোনা গেল রুম চট্টোপাধ্যায় ও মঙ্গল কাপাধ্যায়ের তিনত লে গুলাম তবলা না। এদের বাজনার ঐতিহ্যের আকার মকটা থাকলেও হস্তমিপূরণে অভাব আও ছিল না। দুজনের মধ্যে বেশটা বোকা-পড়াও দেখা গেল।

সরোদবাদক বৃন্দদের দলগত জেন আসরের শেষ শিল্পী। এর মোহ রাগে আলাপটি প্রথম দিকে মধ্য জম্বো করেও কম্ভাচল না। না এও বড় অন্যান্য নয় কারণ বৃন্দদের রাগে আলাপ জম্বো প্রায় অসম্ভব। পরে জেদে থেকে—এখনো রুম ফোজনে পর থেকে—ইকর জম্বো জম্বো এবং বেশ কিছু বৃদ্ধদের মধ্য

ছন্দের প্রগতি শোনা গেল। লপেট, বাক ও বোল-মিশ্রিত মধ্য দ্রুত তান এড়া অতি উচ্চাঙ্গের হয়েছিল এবং বোল অংশের ব্যালার কাজও খুব ভালো হয়েছিল।

তবে গৎকারিতে শিল্পী সবচেয়ে সার্থক হয়েছিলেন। বিলম্বিত তিনতাল গানের প্রথম দিকের ছন্দ মোশানো বিস্তারের কাজ বৃন্দের মজা এবং পরিবেশন শৈলীর বিদগ্ধতা দুইই ছিল। ছয় থেকে বারো গুণের দ্বন্দ্বের সর-সঙ্গীতগুলি প্রথম প্রথম থেকে শেষ প্রথমই অর্থাৎ ছোটো কলিক এক অকৃত্রিম নিয়ম। মধ্য বিলম্বিত অংশের তানকারি দ্রুত তিনতাল গানের তানকারি দুইই ভালো হয়েছিল। কেরার ও দিলক কামান রাগে গবে দুটিই ভাবের বেগেই। শিল্পীর সঙ্গে শাকর যোগ উচ্চাঙ্গের তবলা সম্পর্ক করেন—তাই জবাব-গুলিকে একাধিক অকৃত্রিম শোনা ছিল না।

দ্বিতীয় দিনের আসর অনিবার্য কারণে শোনা সম্ভব হয়নি। এদিনের শিল্পীরা ছিলেন পার্শ্বসংগানের নম্রবদ্য গজব গজব গজাম আলী জুনিয়র মারা চট্টোপাধ্যায় ও বাকর ও বৃন্দদের মনোবাগাধারার সঙ্গতর।

শেষ দিনের আসর শোনা হয় বৃন্দ গুলামের গবে এবং সুপরিচিত খেয়াল গজব মুনওয়ার আলী বীর গান দিয়ে। এর প্রথম নিয়মক ছিল গুলাম আলী বীরের কতটি কলম রাগে খেয়াল। কলারির সংলগ্নতাই কলমিক জন-

সংবাদিন বা আমীর খাঁর কলারির মত —স র গ প ধ গ। তবে নিষদের বর প্রয়োগে বানকটা পার্থক্য সৃষ্টি হয়—অর্থাৎ এটি তোর সময় প ধ স অথবা ধ গ ধ স এবং নামার সময় স ধ গ ধ প এইভাবে যায়। সোজা ধ গ স কিংবা স গ ধ প হয় না। মুনওয়ার আলী বেশ একটি আয়েশী আমেজের সঙ্গে রাগ বিস্তার করে তার বিলম্বিত খেয়ালের প্রথম জাম জামিয়ে ফেলেন। পরের বাকি ও সুপরিচালিত তানকারি বালি শুনতে ভালো হয়নি রাগের চলন সব সময় ঠিক রেখে চলছিল। দ্রুত খেয়াল পরিবেশনে বৃন্দদের পঙ্খি ধরে দ্রব বিস্তার করা হয়েছিল এবং গমক তান সব কিছুই এই পঙ্খি বিস্তারের অংশ বলে মনে হয়েছিল। প্রথমে কিছু ছন্দ, তারপর সরগম তারপর দ্রুত তান এরকম কোনো প্রণালী এই গানে তিনি ব্যবহার করেননি। গুলাম আলীখান্ড অমল কমল দল লোচন কে কদারা দ্রুত খেয়ালটিও এই ধরনেরই ছিল এবং পরের কদারার তারানাদির (দ্রুত একতাল) মতই আনন্দ দিয়েছিল। তবে আরো চমৎকার লেগেছে বেশ রাগে মধ্য-দ্রুত তিনতাল খেয়ালটি—এতে বৃন্দদের বাণী ও কঠামোর দিকে নজর রেখে তান ও বিস্তার করার পঙ্খি খেয়াল গানে কতটা মজা এনে দিতে পারে তা বুঝিয়ে দিল। একটি ছোট দানরা গায়ের শিল্পী তার বৈঠক শেষ করেন।

আসরের শেষার্ধ্বে বড় গুলাম

আলীর কিছু টেপ রেকর্ডিং ব্যাঞ্জে শোনানো হয়—কয়েকটি এও বলা যায় যে গুলাম আলীই আসরের শেষ শিল্পী ছিলেন, তবে এরকমই এক শিল্পী বীর বিপর নতুন করে কিছু লেখার একমুদ্র দরকার নেই।

## সুরেশ সঙ্গীত সংসদের অনুষ্ঠান

সুরেশ সঙ্গীত সংসদের বার্ষিক অনুষ্ঠানের (মহাআতি সমন, বোল আগস্ট) প্রধান শিল্পী আমজাদ আলী খাঁ পিলদ, আওচার ও দ্রুত গত দিয়ে তার বৈঠক শুরু করে বেশির ভাগ প্রোডাকে অবাক করেছিলেন হয় তো, কিন্তু বৈঠক যখন শেষ হল তখন দ্বাখা গেল এভাবে আদম্ভ করলে আসলে কোনো কণ্ঠ হয় না। বরং এও বলা যায় যে অপেক্ষাকৃত হাল্কা চক্কের বাজনা (বা সাধারণত আলরের শেষের দিকে শোনা যায়) দিয়ে শুরু করে পরে তার জিনিস পরিবেশন করেও যিনি প্রোডাকে আনন্দ দিতে পারেন তিনি একজন ক্ষমতাবান শিল্পী। পিলদ, আওচারটিতে ঠুরী অপার গান-গাওয়া মজা ছিল এবং গৎকারিতে রঙমায় বিস্তারের কাজ এ তান-তোড়া ছিল। এরপর আমজাদ আলীর সরোদে শোনা গেল একটি মরীয়াবঙ্গীক মল্লার আশ্রিত শাওন চক্কের রচনা।

ইমন রাগে আলাপ, মোড় ও তিনটি গং বৈঠকের তৃতীয় নিবেদন

একমাত্র গাভগাছটার ভেবজগুণ মাত্রকে ক্ষয় থেকে বাঁচাতে পারে

একমাত্র **নিম**  
টুথপেস্টেই আছে নিমগাছের  
যাবতীয় প্রেষজ ও ঔষধীয় গুণ

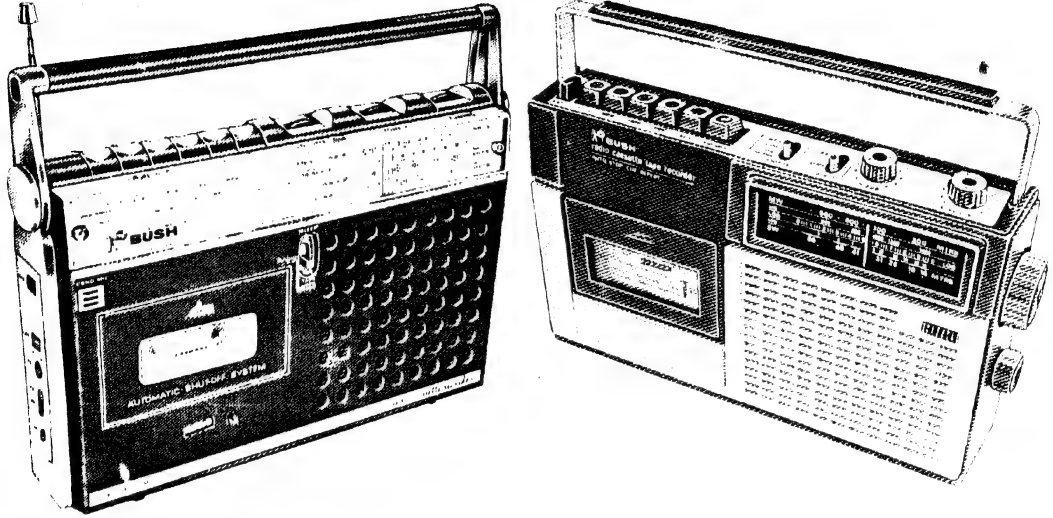


দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্যরক্ষায়  
অদ্বিতীয় টুথপেস্ট—নিম

কা'লকাটি কেমিক্যাল—এর তৈরী



## সবচেয়ে বেশী বিক্রীর দুই রেডিও ক্যাসেট রেকর্ডার



## এই দুই রেডিও ক্যাসেট রেকর্ডারের বিক্রী অত্যন্ত সব রেডিও ক্যাসেট রেকর্ডারের বিক্রীর চেয়েও বেশী।

দুটোর মধ্যে কোন রেডিও ক্যাসেট রেকর্ডারের  
মধ্যে কোনটি কিনবেন — এইটাই আপনার একমাত্র  
বিবেচ্য বিষয়।

সেরা জিনিসের মধ্যে বেছে নেওয়ার সুযোগ পাওয়াতে  
এক আনন্দ আছে, নয় কি?



সবার সেরা দুই রেডিও ক্যাসেট রেকর্ডার

সেবে এলো। মোটে করে বাজানো সাপটি সরেলা এবং মীড়-আসে। ছিল। এর চেয়ে খনিরটা লম্বা ডিটির মতই এতে পুরোনো ঢঙের ছন্দ স্বরসম্পত্তি ছিল বা আজকাল শব্দ শোনা যায় না। বৃথা-পক্ষ ধর্ষণ পক্ষ পক্ষ এবং গণ ধর্ম।

ডে গমক, লপেট, মীড়মুখ এবং সপ্তক মেশানো স্বরপ্রসঙ্গিত বাজানো গিছিল একটি সুপরিচালিত কাঠা-এ অংশ হিসেবে। কালার কামে এর সুরের মজা এবং তেজ সবই

বিলম্বিত তিনতাল গানের তারের কাজ বেশ জড়ো করে গঠনছিলেন শিল্পী এবং বোলের রঙ হরকণ দিয়ে অলংকরণ করে-লেন শিল্পবোধের সঙ্গে। শেষে উচ্চাঙ্গের চৌগঠন একরকম নও গমক তান ছিল। দুত গানের বকারিও উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। অতি দুত গংকারিতে বলিষ্ঠ ল অঙ্গের কাজ ও দুত খালা না। গিয়েছিল। অতিদুত গংটি পিতামহ ওস্তাদ নায়ে খার একটি নায় নিজস্ব কিছু সংযোজন করে মণি করেছেন বলে শিল্পী ঘোষণা রেন।

কিরওয়ারি রাসে আঁটার ও টি গং ছিল আমজাদ আলীর শেষ বেদন। রূপক তালে নিবন্ধ গংটি কোণপর্বে বিস্তারের কাজ দিয়ে রু হয় এবং তারপর রং-বেরঙের শে ভরপুর কড়-আশ্রিত নকশার গিবর্তন হয়। শেষের দিকে অতি

উচ্চাঙ্গের দুত তান শোনা যায়—এর মধ্য ছিল বেশ কয়েকটি আশ্চর্য খবদের একছারা তান। দুত একতাল গভের তান, তেহাই ও কালার কাজও খব জলো হয়েছিল।

শিল্পীর সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেছিলেন অনিন্দা চট্টোপাধ্যায়। হীন সাধ ও খালা অংশে ভাল বাজলেও ত্রিক-তন্ত্র দিতে পারেননি। একটি বৌশ জোরে বাজানোর প্রবণতা এবং বোল-বিস্তারে বৈচিত্র্যের অভাব তো ছিলই। আমজাদ আলীর সাজনার সঙ্গে গুপ খাইরে বোলে রচনার চেষ্টাও বিশেষ দেখা গেল না।

শান্তি মথোপাধ্যায়ের স্কোয়াল এ ঠিকের দিনে অলসটি শুরে হয়ে-ছিল। খেয়াল দুটি ছিল আনন্দি কলায়ে। বিস্তার বা তান বা সরগম কিছুতেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া গেল না। শিল্পী মোটামুটি সুরে গেময়েছিলেন এবং মোটামুটি গচ্ছিয়ে—এইটুকুই বলা যায়।

নীলকান্ত গুপ্ত

**‘প্রাক্ষণ’ এর চণ্ডালিকা**  
দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে ‘প্রাক্ষণ’-এর শিল্পীরা সম্প্রতি মহাজ্ঞানী সদনে ‘চণ্ডালিকা’ নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ করলেন। এই প্রযোজনার পেছনে যতটা আয়োজন ছিল তিক ততটাই নিষ্ঠা ছিল এমন বলা যাচ্ছে না। নৃত্যাংশে শিল্পী নিবচন থেকে শুরুর কয়েক অভিনয়-বিন্যাসের নানান দুটি সঙ্গত কারণেই

প্রযোজনার সাকল্যে বাধা হয়ে দাড়ায়। প্রস্তুতির অভাবে নৃত্যাভিনয়ে অধিকাংশ শিল্পীই মেহের ভারসাম্য হারান, ক্লাস্ত বোধ করেন, গানের ভাবানুভূতি প্রায় ক্ষেত্রই অভিব্যক্তির কোনো সঙ্গতি থাকে না। তদুপরি দু-একটি দৃশ্যে আকরিক অর্থে শিল্পশিল্পীদের সংবেদন সঞ্চার সঙ্গে জড়িত সকল শিক্ষার্থীকেই হরতো খালি করা দেছে, কিন্তু তরতে প্রযোজনার প্রতি দায়িত্ব প্রকাশ করা হয়নি। চণ্ডালিকার অঙ্কিত বোঝাতে দইওয়াল ও হুড়িওয়ালার অঙ্গ-বিক্ষেপ দৃষ্টিকটু। কুলা গাঙ্গুলীর পরিচালনার নৃত্যাংশে বিভিন্ন চরিত্রে গুণে গ্রহণ করেন জয়ন্তী চ্যাটার্জি, প্রবসী ঘোষ, সগুণী বসু, রূপা চক্রবর্তী, মধুমিতা দাশগুপ্ত প্রভৃতি। সুচিহ্না মিত্র সঙ্গীত পরিচালনার সঙ্গীতাংশে কিছু বেশ ভালো। গানের মধ্য দিয়ে চণ্ডালিকার প্রতিটি চরিত্রই প্রোতাসের মর্মে প্রতিষ্ঠা পায়। বিভিন্ন চরিত্রে গেম্মেছেন শান্তা মুন্ডাফী, সুবর্ণা মুখার্জি, সীমা চ্যাটার্জি, পবিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। চণ্ডালিকা ছাড়া এদিনের উৎসব সূচীতে ছিল ছোটদের ছড়ার নাচ ও সুচিহ্না মিত্রের একক সঙ্গীত।

সম্পন্ন করলেন। বেশ কয়েকজন কবিও তার ভাবে নাটকে অংশগ্রহণকারী বিশেষ করে নৃত্যাংশে বহন বেশ অধিকাংশ শিল্পীই বরস ও শিক্ষারত বোলাভার কথোপ-অপরিণত তখন এই ধরনের দুঃসাহসিক প্রয়াস প্রকাশ্যতরে একটি সংস্থার চিন্তা-ভাবনার দুরবস্থাকেই প্রকট করে। ভিন্নধর্মী নৃত্যের সূচন সহাক্ষর্যেই যে রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের বৈশিষ্ট্য, প্রতিটি নৃত্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই যে নিহিত এক একটি চরিত্রের অবদান মন্তব্যের প্রয়োজিত শিখার নৃত্যাংশে তা কেনো-ভাবেই লক্ষ করা যায়নি। নৃত্যের তুলনার সঙ্গীতাংশে বরং কিছুটা পরিণতির অভাব। অমর গাঙ্গুলীর বঙ্গসেন, রীনা বসুর শ্যামা কিংবা তপন চ্যাটার্জির উত্তীর সেখানে নাট্যরসের শতেই প্রস্তুতির প্রমাণ দিয়েছে।

শ্যামা নৃত্যনাট্যের আগে শিশুদের লোকনৃত্য একটি পারমারা অনুষ্ঠান। অরুণ বসুমারিক ও সুকুমার কোলের সহযোগিতায় লীনা করচীর কথক এই আরোজনের সকাইতে সিন্দূর নিবেদন। ঠট ও গং-ভাঙ-এ ইতিমধ্যেই শিল্পীর অধিকার সম্পত্তি।

রানা দাস

**আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি নাটক**  
বহু নায়িকা  
একটা পরাকা চর্চাছিল। একটি নামী কে জি স্কুলের অ্যাডমিশন টেস্ট। একটি শিশুকে কলা হল, এ’ দিয়ে একটি শব্দ লিখে ছবি একে দেখাও।

# সলু-রিসর্সিনল

খস্কি ও চুল-ওঠা বন্ধ করার কার্যকরী উপায়

- খস্কি দূর করে
- চুল ওঠা বন্ধ করে
- চুলের পুষ্টি যোগায় ও চুল বাড়তে সাহায্য করে
- চুল নরম ও পরিপাটি রাখে



**SOLU-RESORCINOL**  
A SOLUTION OF RESORCIN  
AN IDEAL HAIR LOTION

পাস্তুর ল্যাবরেটরীজ  
প্রাঃ লিঃ  
কলিকাতা ৭০০০০৬

PL 786 A BEN

## শম্ভুনাথ ঘোষ-এর একটি অনবদ্য ভ্রমণ কাহিনী

# হিমগিরির অঙ্কনে

নন্দনকানন, হেমকুণ্ড, পঞ্চকেদার এবং সন্তবদরী

“এটি কেবল ভ্রমণ কাহিনী নয়, টুরিস্ট গাইডও বটে।” যুগান্তর

কথক নৃত্যশৈলীর একটি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ

কথক নৃত্যের রূপরেখা—

অনিন্দিতা ঘোষ ও শম্ভুনাথ ঘোষ ১২:০০

### গ্রন্থকারের কয়েকটি সংগীত গ্রন্থ

১। সংগীতের ইতিবৃত্ত (১ম ও ২য় খণ্ড)	
[শাস্ত্রীয় ও ভাবসংগীত] প্রতিখণ্ড	১২:০০
২। তবলার ইতিবৃত্ত	১৫:০০
৩। প্রমোত্তরে নজরুলগীতি (১ম ও ২য়)	১৬:০০
৪। নজরুল গীতির নানাদিক	৭:০০
৫। প্রমোত্তরে প্রভাকর ও বিশারদ	১২:০০
৬। রবীন্দ্রসংগীত (প্রমোত্তরে) ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড	১০:০০ এবং ১২:০০
৭। সহজ তানালপ	৮:০০
৮। মজলিসী তুংরী	৬:০০

নাথ ব্রাদার্স

# “হারকিউলিস সাইকেলের বিশেষত্ব কি জানেন? এর ৭৭৮ টি পার্টসের প্রত্যেকটিই আমাদের নখদর্পণে।”

শ্রী এ সুব্রামনিয়ম, সিনিয়র এঞ্জিনিয়ার (প্রোডাক্ট ডিজাইন ও টেস্টিং)  
টি আই সাইকেলস্ অফ ইন্ডিয়া, মাদ্রাজ-৬০০ ০৫৬

শ্রী সুব্রামনিয়মের মতো লোক যারা সাইকেল সম্বন্ধে বেশি  
জানেন ও বোঝেন—যাদের ধ্যান-জ্ঞান, এমন কি জীবনই হচ্ছে  
সাইকেল, তাঁদের সাথে কথা বলে দেখুন।

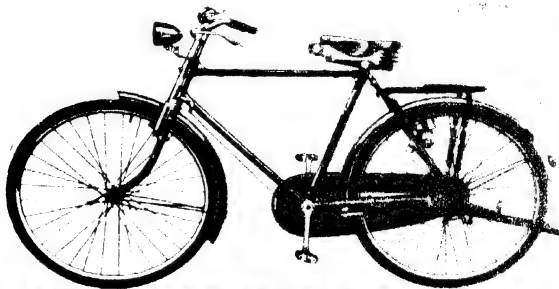
তাঁরা সকলেই আপনাকে হারকিউলিস সম্পর্কে বিশদ ভাবে  
বলবেন : এর নির্মাণ পদ্ধতি, এর ৭৭৮টি পার্টস (সত্যিই এতে  
৭৭৮টি পার্টসই আছে), নানা ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি ও গুণমানের  
পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে; বলবেন, কি ভাবে এটি ভারতীয় ইতিহাস  
সাইকেলগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে।

**হারকিউলিস :** বহন ক্ষমতা ও গুণমানের কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা  
কাঁচামাল থেকে শুরু করে প্রতিটি হারকিউলিসের উপরই ৬৭টি  
ভিন্ন ভিন্ন রকমের পরীক্ষা করা হয়।

প্রতিটি ব্যাচের একটি করে হারকিউলিস সাইকেল নিয়ে এক সপ্তাহ  
ধরে অবিরাম চালিয়ে পরীক্ষা করা হয় যাকে বলে ‘ট্রিচার’ টেস্ট।  
রিম্, টায়ার, টিউব শুধু ডানলপ থেকেই নেওয়া হয় (টি আই সাইকেলস্  
কেবলমাত্র সেরা জিনিসই কেনে)।

আপনার হারকিউলিসঃ সহজে চলার জন্য এতে আছে বিশেষ  
ধরনের বল ষ্ফোরিত

পুরো দুইসারি হাইক্রোম স্টীল-বল থাকায় চাকা সহজে ঘোরে ও  
আরামে চলে—এমন কি ভারী বোঝা থাকলেও। হারকিউলিসের  
বডি হাই-বেকড্ এনামেল আর পুরু ক্রোমিয়াম প্রেটিং-এর তৈরি  
ফলে বছরের পর বছর হারকিউলিস থাকে সুন্দর ও ঝকঝকে



**হারকিউলিস**

টি লিখলে 'আজন্স উলা' গ ছবি দিল রেজেকার কাগজে ছাপা পিছিচিট ছবি—যা কাগজে নাটকের রূপনের সঙ্গে বেরোয়। এ ধরনের পঞ্জিকা বা ছোট কাগজে ও দেয়ালে না থাকে—যৌনশক্তি বর্ধক মালসা' নামে। ছেলেটি নির্দেশ করণ তুলেই অজস্রই শিশুর ধর্ম।

চতুর্থ-এর অসীম চক্রবর্তীর নাম সময় 'জৈনেশ্বর মৃত্যু' প্রযোজনায়। এদেশের নাট্যচর্চায় প্রকার সঙ্গো সঙ্গিত হত। চতুর্থ-এর এক সময় হ, আসক্তির জন্য কামদেবের সৃষ্টি হন। চতুর্থ-এর অসীম চক্রবর্তী বর্তী সময়ের মানবের আদম নাকেই মূলধন করলেন। প্রতাপ গুপ্ত হত নাটক দীর্ঘদিন চলল।

আর থিয়েটারের ব্যবসা যদি করেন, দর মিলে এ 'এ' মার্কী নাটকের ভাসে লীলার অনুপ্রেরণা হিসাবে সীম চক্রবর্তীর নাম ঘোষিত হয়। প্রতাপ মণ্ডে চলতি নাটক বধ, যিক—এই ধরনের নাটকের প্রথা-গীত হয়েই এসেছে। অর্থাৎ সাজে জীবনের জন্য সমাজই নী, মৃত্যুর সেই কামনা-বাসনা পায়ের দেখিয়ে শাপমোচনের ভীণতা। ভিনমা, নাটক, থিয়েটারী কোন মাথায় দরকার নেই—মানুষকে কায়িত করতে পারলেই উদ্দেশ্য-ফিল।

আমি নায়িকা-তে প্রথম থেকেই কলে উচ্চতম অভিনয় করে চলেন। তে 'জাতিভার প্রীজ' বলে দশকদের ভিযোগ ওঠে—সেই জন্য চুক্তিগত ও



প্রচণ্ড শব্দে হয়—পিছনের সায়ের লোকের শ্রবণেও পরিষ্কার। আর একটি দৃশ্য সঙ্গায় বা ধর্মগণের কতকগুলি অক্ষুট সংলাপ 'মাইক' বাহিত হয়ে আসে। উদ্দেশ্য প্রস্নাতীত। অসীম চক্রবর্তী মাঝে মাঝে গেলান হাতে নিয়েছেন—কিন্তু কোন সময় যে তিনি মাতালের অভিনয় করছেন, কোন সময় স্বাভাবিক—অবশ্য দশক সেটা বুঝতে পারে না। গীতা কর্মকার-এর প্রতিটি ব্যক্তার পিছনে একটি সুর থাকে। কিছুক্ষণ পরেই সেই অভিনয়, নাটকের মতই একঘেয়ে হয়ে যায়। শ্বিতীয়ার্থে তিনি অবশ্য অনেকখানি গৃহিণী নিয়ে পেরেছেন—অর্থাৎ বধ হিসাবে তাঁর যে আড়ম্বর ছিল, নায়িকা হিসাবে সেই লজ্জা, ভয় কেটে গিয়ে অনেক শব্দত হয়। একটি নাচ, তিনি

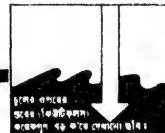
মোটামুটি আলো আধারির সাহায্য নিয়ে উতরে গেছেন। নাচটি অজ্ঞাত নৃত্য। এ নাম দিয়ে মর্দাদা পাওয়া যায়, কাব্যারেতে অনেক কামেলা। মণ্ড, বানার্জি আদ্যন্ত চিত্রকৃত অভিনয় করে গেছেন। প্রেম, আকা, ঘৃণা, ক্ষোভ সব কিছুই এক পর্দায় এবং এক চোখে বাঁধা। অসীম 'মুখার্জি' সেই চিত্রিত কমেডিয়ান, যিনি নাটকের কোন দায় বহন করেন না—ভূঁড়ামতেই তাঁর সিদ্ধি। অবশ্যই তিনি ভাল অভিনেতা—কিন্তু কি সব সংলাপ একবার তিনি চিঠকন প্ট' খাব বলান বদলে জিহ্বকন প্ট' খাব জ্বলন। নায়ক অন্তত দশবার মৃত্যু সহযোগে ব্যাখ্যা করে প্ট' এবং প্ট'লোর পাথর বৃষ্টিয়ে দেন। আশুতোষ দশক ও বীভৎস রসিকতায় বিরতি বোধ করেন

অন্যত উচ্চতম সুরে বলা হয়—  
লোকনাথ চন্দ্র। নাটকে বহু কবিতার অংশ ব্যবহার করা হয়েছে, সব কয়টি কবিতাই আধারির দোহে নী নিদ্রাপ্ত হতে পারে, তার উদাহরণ হয়ে বইল। জানকী শর্মার মণ্ডসম্ভার প্রথমবার ঘরের যে রং সেটা প্রথম চমক অন্তরে ও পূর্ণ যোগ্য যার মজহা নৃত্যের জন্য এ রংয়ের উপযোগিতা। শর্মার চক্রবর্তী এক সময় গ্রুপ থিয়েটার করেছেন, মাঝে মাঝেই তিনি শ্যাম এবং কুল দুইই বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। সিংহের মুখে হরিণের মূর্তি তুলে। তিনি একবার 'পুথানা সেই দিনেও কথা' মনে আনার চেষ্টা করেন। পর-মহাতেই ব্যাপ্যগতা আর সাজেশানে রাখতে পারেন না, সঙ্গত ব্যবসার কারণে। নাচের মিউজিকটি 'ক্যাসেট' বাজানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। খুবই যুক্তিসহ প্রয়োগ যদিও অমৌক্তিক নাট্যে তাকে রাখতেই হয়। গোপাল দাসের আলো মাঝে মাঝেই এককম ভাবনার সহযোগী হতে চেয়েছে। সঙ্গীত পরিচালক প্রবীর মজুমদার নানা রকম ব্যক্তিগে গেছেন প্রায়শই যা পুনরাবৃত্তি এবং অতিশয়োক্তি ভাবে আত্মসত্ত। এই নাটকে একটি বৈশাখ চরিত্র সবচেয়ে ভাল অভিনয় করেছেন চরম দাস। তাঁর কোন কথা নেই—এই অসাধারণ দায়ও নেই। হয়ত তিনি এই অর্থহীন প্রযোজনার নীরব সাক্ষী।

দেবাশিস দাসগুপ্ত

ফটো : অজয় দত্তগুপ্ত

## টু-টোন-এখনও ভারতের ১ তম্বর হেয়ার ডাই।



টু-টোন হৈল এককাল ভারত ডাই ন টু-টোন হারিয়ে ভারত করে... টু-টোন হারিয়ে ভারত করে...

টু-টোন ভারতের সবচেয়ে বেশী কাউটির হেয়ার ডাই - আর তা চলে আসছে বছরের পর বছর হয়ে... এর বিশেষ ফর্মুলা টুলের প্রতিটি ঘুরে ঘুরে দীর দীর প্রবেশ করে... সহজ ও নিখুঁতভাবে আপনার টুলের ডাই করে। আপনার টুলে এনে দেয় সত্যিকারের এক স্বাভাবিক রূপ। তবে টুলে মোলায়েম ও চক্চকে... রাখে নিজের বেশ।

একবার ব্যবহার করেই দেখুন না... আপনি অন্য কোনও হেয়ার ডাই আর পছন্দই করবেন না। কালো ও ব্রাউন রঙে পাওয়া যায়। পুরুষদের জন্যে স্পেশাল প্যাক।



**টু-টোন**  
হেয়ার ডাই



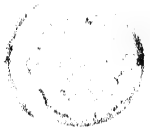
টুলের যত্নের ব্যাপারে যদিও জগতে সবার অগ্রণী।

www.tru-tone.com



## তলুত তো, মুচমুচে সিঁজাড়া, আগতি কোথায় গাভেত?

...তার তার মাগে ফুলো ফুলো ইডলি  
নরম নরম গোলাপ জাম  
পরত পরত পড়া প্যাটিস  
মেলো ফাঁপা পাকাডা  
আর ভালকা হালকা ওয়ালট।



### আগত্যে নিজেই রান্নাঘরেই!

সরকারি প্রথমিক এক চিমাট বেকিং পাউডারের।  
এবার লোক যখনই কিসেব মৃগ্যবাচক বারাক্তরারেন এটি মিশিয়ে নিন-  
দেখাবেন, আগত্যের বারাক্তরার একসব গাবার এমন ফোলা, ফাঁপা,  
মুচমুচে ভাং ডী নরম জামানি নিক ফেগেই অবাক হয়ে যাবেন।

বেকিং  
বেকিং  
পাউডার



আগত্যে রান্নাঘরেই গোপন সাহায্যকারী!

ORM-POST-BEN

## প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

### অমিতাভ দাস (১৯৪৭- )

সমকালীন ভারতীয় শিল্পকলার  
গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে পাঠকদের কিছু  
ধারণা নিশ্চয় প্রচ্ছদ দেখতে দেখতে  
হচ্ছে। অনেক কিছুই নতুন লাগছে।  
চিত্রভাস্কর্য সম্বন্ধে অনেক ধারণাই  
পালটাতে হচ্ছে। আধুনিক ভারতীয়  
শিল্পকলার ইতিহাসের রূপরেখাও বেশ  
খানিকটা স্পষ্ট হয়েছে।

মোটমোট আধুনিক ভারতীয়  
শিল্পকলার ইতিহাস যেভাবে দেখা  
যায় তা অনেকটা এইরকম।  
প্রথম যুগকে বলা যায়  
(১৯০০-১৯৩০) আত্মনুসংধানের  
যুগ। পশ্চিমী ধারায় টালমটাল  
অবস্থায় একটা অপ্রকৃতিস্থ আত্ম-  
বিশ্বস্তির অবস্থা ঘটেছিল। হাটা  
আমাদের সেবার করলেন সেই অবস্থায়।  
তাদের কাছে শুনলাম, আমরা আসলে  
রাজার ছেলে কিন্তু বড় দুর্দশায়  
পড়েছি। এইসব ভারতভক্তিবাদের  
গবেষণার ফলে আমাদের মনে জন্ম নিল  
জাতীয়তা। সেই নতুন চেতনার শেষ  
ফল শিল্পকলা। অবনীন্দ্রনাথ আসার  
আগেই ভারতীয় শিল্পকলা প্রায়  
অস্তিস্থ। জাতীয়তাবাদের জন্য  
শিশিষ্য অবনীন্দ্রনাথ সেই ফলকে খনন  
করতে চাইলেন। তাতে হয়তো সগর-  
বাজার সমস্ত পুত্রের কেউ কেউ বিচলে পড়ে  
বৈশিষ্ট্যবাহী ভাবে মরে ভুত হলে।  
কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের আধুনিক  
ভারতীয় চিত্রের ভিত্তি স্থাপন করে-  
ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। দ্বিতীয়  
যুগ (১৯৩০-৪০) বলা যায় লোকায়ন  
পর্ব যার নামক যামিনী রায়। তৃতীয়  
যুগ (১৯৪০-৪৭) বলা যায় সমন্বয়  
পর্ব — বিনোদবিহারী, রামকিংকর,  
অমৃত শেরগিল এবং “কালকান্ঠ  
গুপ্তের” পরীক্ষণ যে পূর্বে জীবন এবং  
শিল্পকলার মূল্যবোধ সম্বন্ধে নতুন  
প্রশ্ন তুলল।

স্বাধীনতা পরবর্তী শিল্পকলার  
ইতিহাস অনেকটাই জটিল। জট পাকানো  
ভারতীয় সমাজ মানস এবং অধ্যাক্ষ  
সংস্কৃতির ছায়া তাতে পুরোমাটায়। মিথ্যা  
খ্যাতির জন্য শোঁখিন মজদুরী চলছে।  
কিন্তু শিল্পকলার মৈরাজ্য ভারতীয়  
শিল্পীদের বিচলিত করছে। তাবিজ  
মাদুলী টোটকা তদ্রূপ এবং ভুতপ্রভেত  
অপমেরতার পূজা চলছে। কেউ কেউ  
সহেবা তন্তের নানাবলী গায়ে দিয়ে  
আড়ম্বুর চালাচ্ছেন — সাহেববন্দীর  
কিলাতী ওয়ার কীর্তি দেখে তার শিষ্য  
তৈরী হয়। ধর্নি উঠছে জয়গুরু, জয়  
ডালি, জয় ব্রোডো!

আমাদের আশা ভরসা এখন শূন্য-  
প্রসঙ্গ থেকে অমিতাভ দাস পর্যন্ত যারা  
জন্মেছেন স্বাধীনতার পরে। বড়  
হয়েছেন।

অমিতাভের জন্ম কর্ম দিল্লিতে।  
সেখানকার আর্ট কলেজের স্নাতক। এর  
বিষয় অনেকের মুখেই অবিচ্ছিন্ন  
প্রশংসা শুনছি। বিমল দাশগুপ্ত,  
ধীরাজ চৌধুরী, নীরেন সেনগুপ্তের  
মুখে ঠর ঠর বিষয় পঞ্চমুখে সুখ্যাতি।

দিকে লক্ষ রাখুন। তারপর যে বছর  
(১৯৭৬) অমিতাভ জাতীয় পুরস্কার  
পেলেন, সে-বছর ঠর শূন্যদুখ্যাদীদের  
খুশি ধরে না। অথচ এক প্রদর্শনীর  
সংখ্যা এক (১৯৭৮ ধর্মিমল)। তার  
আগের বছর নিজিং বাওয়ার নামে  
যুগলবন্দী প্রদর্শনী করেছিলেন প্রাক  
পার্টিজ।

এছাড়া তিনি যা করেছেন তা হল  
বড় বড় সব ভারতীয় প্রদর্শনীতে যোগ  
দান। আইফেকস বার্ষিকী ১৯৬৮।  
“তরুণ চিত্রকর”, ন্যাশনাল স্কুল অফ  
ড্রামা অয়েজিভ প্রদর্শনী, ১৯৬৯।  
“আজকের চিত্রকর”, কুনিকা কেমোলড  
১৯৬৯। “আজকের শিল্পকলা”, কুনিকা  
কেমোলড এবং রোটারী ক্লাব অয়েজিভ  
প্রদর্শনী ১৯৭০। “আজকের শিল্প-  
কলা—২” অশোকা গ্যালারী, ১৯৭০।  
“আজকের শিল্পকলা—৩” ১৯৭১।  
নিউ গ্রুপ, দিল্লি ১৯৭৪, ৭৬, বোম্বেই  
১৯৭৫, ৭৭। “বিশজন চিত্রকর”—  
গ্রীধরণী, দিল্লি, ১৯৭৬। গ্যালারী ২৬-  
এর বার্ষিকী। “আর্টিস্টস ফোরাম”—  
১৯৭৭। মুর্কবিরদের সাহায্যের  
১৯৭৭। “ছবির দেশ” গীতা কাপুরের  
প্রযোজনায়, দিল্লি ১৯৭৭। এছাড়া সব-



ভারতীয় ছাপাই ছবির প্রদর্শনী  
(পুরস্কৃত) চণ্ডীগড় ১৯৭৯। “অনুচিত্র  
ধরকো”, ললিতকলা অয়েজিভ প্রদর্শনী,  
দিল্লি, কলকাতা, মাদ্রাজ হায়দ্রাবাদ  
১৯৮০। ভারতীয় বাণিজ্য বোলা, দুবাই  
১৯৮০।

প্রচ্ছদচিত্রের নাম “নীল মেঘ”।  
যেন বা মেঘের স্তম্ভ। শাওলা ধরা  
প্রচাঁচীর বা হাতিসেতে দেওয়ালে কত  
অদ্ভুত ছবি ফুটে ওঠে। মেঘে মেঘে  
বেগা অবলম্বন নানা খেলা হয়। বজ্রধ্ব  
চলে আকাশের সড়কে। আগুন ঝিকরে  
ওঠে। আবার কখনো শান্ত মেঘ। ধান-  
ফসল সেই রূপ ধরেছেন অমিতাভ।

অমিতাভের কাজ আছে বৈদেশিক  
মুদ্রণালয়ে, দিল্লি, সোসাইটি অফ  
কন্টম্পোরারী আর্টস, লন্ডন, ললিত-  
কলা আকাদেমী, দিল্লি, পাজাব বিশ্ব  
বিদ্যালয়ের যাদুঘর, চণ্ডীগড় প্রভৃতি  
নানা সংগ্রহে।

অমিতাভ রূপবন্দের সরলীকরণে  
বিশ্বাসী। প্রকৃতি, মানবজন, জৈব এবং  
অজৈব জগৎ তাকে বিমূঢ় করে। কিন্তু  
পটকে তিনি মনে করেন স্বয়ংসম্পূর্ণ  
জগৎ। বাইরের রূপকে তিনি নিজে  
রূপ করে নেন মনে রাখুন।



**আপনার গাড়ীতে আরো বেশী দূর ভ্রমণের জন্য এবং  
আপনার স্টেড থেকে আরো বেশী রান্না পাওয়ার  
জন্য অর্থ-সাপ্রয়ের কয়েকটি পরীক্ষিত উপায়!**

আমরা জানি, জ্বালানী সমস্যার বর্তমান পরিস্থিতিতে সঠিকভাবে বাঁচার একটি উপযুক্ত রাস্তা আপনি খুঁজছেন। প্রত্যেকেই খুঁজছে। সেই কারণেই এই তথ্যগুলো আপনার অত্যন্ত কাজের বলে মনে হবেন। এর থেকে জ্বালানীর সবচেয়ে ভালো ব্যবহার শিখে আপনি আপনার সংসারের অনেক অর্থ সাশ্রয় করতে সক্ষম হবেন। আপনার গাড়ীতে কিংবা স্টেড লাগাবার মতো কোনো আলৌকিক যন্ত্র এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

বস্তুতঃ, এখানে যা লেখা তার অধিকাংশই হয়তো আপনার জন্য, একান্তই সহজ-স্বাভাবিক ব্যাপার বলে প্রথমে মনে হতে পারে। কিন্তু এই পরামর্শগুলো সত্যিসত্যিই কাজে লাগালে যে কতখানি সাশ্রয় হতে পারে তা আপনি ধারণাও করতে পারবেন না। নিন, এখন থেকেই শুরু করুন! যা আপনাকে করতে হবে তা হলো এরপর যখন আপনার গাড়ী, স্কুটার বা মোটর-সাইকেল চালাবেন, অথবা যখন আপনার পরবর্তী রান্না বাঁধাবেন—তখন থেকে আপনাকে কেবল আর একটু সাবধান থাকতে হবে—এরপর পাড় যান!

**পেট্রোল  
গ্যাস  
কেরোসিন  
ব্যবহারকারী  
প্রত্যেক  
পরিবারের  
জন্য...**

## বুদ্ধিমান চালকের “জ্বালানী-সামগ্র্যের” এগারোটি সহজ উপায় ৪

# পেট্রল গ্যাস

# কেরোসিন ব্যবহারকারী প্রত্যেক পরিবারের জন্য...

১ আপনার গাড়ীর আদর্শ গতি-ঘন্টায় ৪০-৫০ কি.মি.

বীর-স্বির যারা, তারা সত্যিই জেতেন— এই সং অভ্যাসে আপনার সবচেয়ে কম পেট্রল খরচ। যতো জোরে আপনি গাড়ী চালান, হাওয়ার প্রতিরোধ ততো বাড়বে। ফলে ততোই বেশী পেট্রল পড়বে। ভারতীয় যান-বাহনের ওপর পরীক্ষা প্রমাণ করেছে যে ঘন্টায় ৪০ কি.মি 'র বদলে ৪০ কি.মি. গতিতে গাড়ী চালালে একই পরিমাণ পেট্রলে আপনার গাড়ী ৪০% অতিরিক্ত দূরত্ব যেতে পারে।

২ আপনার গাড়ী কি পেট্রল হাওয়ার দানব ?

অল্প ইঞ্জিনই সমস্ত উপদ্রবের মূল। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে আপনার গাড়ীর ইঞ্জিন নিয়মিত টিউনিং করিয়ে নিলে

গড়পড়তা ৬% জ্বালানীর সাশ্রয় হয়। মনে রাখবেন— ইঞ্জিনের যত্নপাতির দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি হয় পূর্বোক্তাল থেকেই। স্বতরাং প্রত্যেক টিউনিং এর সময় যাবে গাড়ীর এয়ার-ফিল্টারটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার করা হয়

সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। স্কটার, মোটর- সাইকেলের সাইলেন্সর এবং এক্সহস্ট পোটের জলা-পোড়া কার্বনও মাঝে মাঝে পরিষ্কার করা প্রয়োজন। যাদ আপনার গাড়ী থেকে কালো ধোঁয়া বেরোয় অথবা তার বহনশক্তি দুর্বল মনে হয় তবে

সঙ্গে সঙ্গে কোনো ভালো গ্যারেজ/মিস্টার কাছে নিয়ে যান। পেট্রলের অপচয়ের চেয়ে এতে অনেক কম খরচ।

৩ চাকায় হাওয়া কম থাকলে পেট্রলের অপচয়।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে চাকায় হাওয়া কম থাকলে আপনার প্রতিরোধ বাড়বে, ফলে বাড়ায় পেট্রল খরচ। চাকায় হাওয়ার চাপ যদি ২৫% কম হয় তাহলে পেট্রল খরচ হয় ৫ থেকে ১০% বেশী এবং টায়ারের আয়ু ২৫% কমে যায়।

৪ গীয়ারের বিষয়ে এই তথ্যগুলো কি আপনার জন্য ?

ভুল গীয়ার বদলের ফলে এমনকি ২০% বেশী জ্বালানী ব্যয় হতে পারে। গাড়ী শুধুমাত্র প্রথম গীয়ারেই চালু করবেন। যদি কাদার মধ্যে পড়ে গিয়ে থাকে অথবা চালু পাহাড়ী রাস্তায় চালু করতে হয় তবেই কেবল গাড়ী ওপরের গীয়ারে ছাড়তে পারেন। শহরে চালাবার সময় যেই বুঝবেন ইঞ্জিনের সহ হাবে তৎক্ষণাৎ ওপরের গীয়ারে ঠেলে দিন। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব উচ্চতম গীয়ার দিয়ে দিন। চালু রাস্তায় নামবার সময় সেইটাই যথার্থ গীয়ার যা আপনি সেই রাস্তা ওঠবার সময় ব্যবহার করবেন।

৫ ভীড়ের সময় এবং ভীড়ের রাস্তা এড়িয়ে চলুন।

একটু ঝাঁক রাস্তায় সামান্য ঘুরে গেলেও আপনার জ্বালানী কম পড়তে পারে। বস্তুতঃ শহরের মধ্যে গাড়ী চালানোয় পেট্রলের ব্যবহার আপনার যাত্রার সময়ের সঙ্গেই সম্পর্কিত, দূরত্বের সঙ্গে ততোটা নয়। খুব বেশী ভীড়ের রাস্তায় আপনার গাড়ীর জ্বালানী- ব্যয় দ্বিগুন হয়ে যায়।

৬ বিচক্ষণ চালকেরা ধামবার অনেক আগেই ব্রুকে পারেন— আপনি ?

হঠাৎ ব্রেক কষলে অনেক উপযোগী শক্তি উদ্ধাপ হিসেবে নষ্ট হয়ে যায়। ব্রেক বেশী শক্ত থাকলে অথবা ব্রেকের ওপর পা রেখে গাড়ী চালালে আপনার ৫% বেশী জ্বালানী খরচ হতে পারে।

৭ ক্লাচকে মুক্তি দিন।

অপ্রয়োজনে ক্লাচের ব্যবহার শক্তি এবং পেট্রল অপচয় করে। ক্লাচ-লিফটার ক্ষয়ে গিয়ে থাকলে সঙ্গে সঙ্গে বদলে ফেলুন। চালু রাস্তায় স্থির হয়ে থাকার জন্য ক্লাচ বা অ্যাঙ্গেলারেরটি নিয়ে নাড়াচাড়া করা এক খারাপ অভ্যাস; এতে প্রচুর জ্বালানী নষ্ট হয়।

৮ গাড়ী ধামালেই ইঞ্জিন বন্ধ করে দিন।

গাড়ী ধামিয়ে ইঞ্জিন চালু রাখা অনেক পেট্রল অথবা পুড়ে নষ্ট হয়। যদি আপনার গাড়ীর ব্যাটারী, ডায়নামো, স্কেল স্টার্টার আর ফ্যানবেল্ট ঠিক থাকে তাহলে এক মিনিটের বেশী ধামতে হলে অনায়াসেই আপনি ইঞ্জিন বন্ধ করে আবার চালু করতে পারেন। এইভাবে আপনি প্রচুর জ্বালানী বাঁচাতে পারেন।

৯ অতিবিক্ত ওজন কমায়ে ফেলুন।

আপনার গাড়ীর মাপায় মালপত্র রাখার তাকটা বি সত্যিই সবসময় বয়ে বেড়ানো প্রয়োজন ? অথবা গাড়ীর পেছনে রাখা একশোটা ছোট-বড়ো জিনিসের ৭ ৭৫ কিলো ওজন কমালে শহরে চালাবার সময়ই ২% জ্বালানীর সাশ্রয় হয়।

১০ ইঞ্জিন গরম হওয়া পর্যন্ত আপক্ষা করবার প্রয়োজন নেই।

বরং নীচু গীয়ারে গাড়ী চালান ইঞ্জিন গরম না হওয়া পর্যন্ত। প্রয়োজনের বেশী চোক একদম ব্যবহার করবেন না। এবং কখনই এমন জায়গায় গাড়ী রাখবেন না যেখান থেকে শীতল ইঞ্জিনে গাড়ী পেছতে হতে পারে। এর ফলে এক অদ্ভুত পরিমাণ পেট্রল খরচ হতে পারে।

১১ পরিকল্পিত যাত্রা—সামগ্র্যের শ্রেষ্ঠ উপায়।

যাত্রা করার আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন : এমনি কি তাহত আবশ্যক ? অথবা এই পথে কি অন্য কোনো কাজও সেরে আসা সম্ভব ?

সামগ্র্যের আরেকটি দারুণ উপায়—“যাত্রাসঙ্গী দল” গঠন করুন। যাতে অন্তরাণ্ড আপনার গাড়ীতে যাত্রায় ভাগ নেবে। এবং স্বভাবতই, খরচেরও।

**ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଗୃହିଣୀର “ଜ୍ଞାନାଳୀ-ସାମ୍ରାଜ୍ୟ”**  
**ଆଜିଟି ଅରଜ ଓପାଏ :**

**পেট্রোল  
গ্যাস  
কেরোসিন  
ব্যবহারকারী  
প্রত্যেক  
পরিবারের  
জন্য...**

1 प्रदामे तामाद प्रवक्तिषु भूष्टिय तित...

বান্ধা অনেক কম খরচেই বঁধে সহজ হয় যদি স্টেড জালাবার আগে সুবিন্দিত কলিকটের তেলী কারে রাখা থাকে এবং যশলপাতিও অশ্বিনাবর্তের পূর্ব কালের পক্ষে। তিনবার শকভাবে কখনও স্টেড জালিয়ে রাখা হয় না।

୨ ଉଦ୍‌ଘାପନ ଅପଚୟ ବକ୍ତ କରନ୍ତ ।

১. বারান্দা পায়ে ঢাকা থাকলে ভেতরের  
 ফুল ফটা থাকে, ফলে তাড়াতাড়ি

ପ୍ରାୟ ୧୫% କମ

আলানী পোড়ে । বান্ধা

একবার ফুটে আঁরন্ত

করলে অল্প আঁচই সহজে তা

কমিটি সদস্যদের পূর্বের কাজের সঙ্গে সঙ্গে আট কমিয়ে দিন।

আপনার 35% জালানীক

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26

୨. ମୂଳିକ ପରିଚାଳନା ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ।

শ্রী বিষ্ণু ভক্তের ভক্তা, বিশেষতঃ চাল

৩ শ্রব-সকীতে, বেশী জালানী খরচ হয়

কোনো কালের পরিমাণ যতোটা সম্ভব কম

দান হইল আরো সুস্বাদুই নয়, আরো পুষ্টিকরও

সে দেখা গেছে, রান্না করার আগের রাতে ডাল

১৯৮২-৮৩ কয় জালানীর প্রয়োজন হয়।

4 छड़ों की छड़ों में बाँध कर रखें ।

[illegible]

**5** সকাল একসাত খালিও অর্থাল  
সাধ্য।

পরিবর্তনঃ মঙ্গলবার ১১/০৩/১৯৮০ খ্রিঃ  
কক্সনা—১০০০ ঘণ্টা ধরে বৃষ্টি হওয়ায় পানির  
উৎসর্গঃ ১০০০ জালমীন মালিক বড়ো আদার  
আবদুল করিম বড়ো মালিক

**6** প্রশার কুকারে জ্বালানীর সাংরক্ষ  
সবাত্মকে বেশী ।

প্রেমশীল ককটের রামায়ণ সম্বন্ধে বহু কথা  
স্মারকবাহকের রামায়ণ কবিতা দিয়ে বর্ণনা করে গেছেন  
গরচ হয়। কিন্তু আপনাকে জানতে হবে যে কবিতা  
দিলে, এমনটা ঘটে যেখানে কবিতা দিয়ে বর্ণনা করে  
বাস্তবের চাইতেও বেশি কবিতা দিয়ে বর্ণনা করে  
লেখক। আর যখনই মনে আসে কবিতা দিয়ে  
আর একটা দারুণ কবিতা ককটের মতো হয়  
বাড়িতে চাল, ডাল, সর্ষপের কাকার চাঁদে  
রামায়ণের নেত্রীয়া যায়। তবু সবে আপনাকে  
শাস্ত্রের কথাটা একবার কল্পনা করুন।

7 छोटो वार्तावर (वर्षी वावहार करत ।

১ বড়ো বার্নারের সময় কম লাগে ঠিকই কিন্তু ছোট  
 বার্নারের চেয়ে 10% বেশী জ্বালানী পোড়ে।

কোনোভাবেই পশু ককন, যে সময়টুকু বাঁচালেন তা  
আমার কালানী খরচের চেয়ে কি বেশী কামা ?

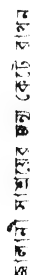
৩৬. ১৯৮০ সালের ব্যবহারে প্রত্যেকবার জ্ঞানানী বাচ।

୧ ପରିସ୍କାର ବାର୍ତ୍ତାବଂ ମାହାୟା କରେ ।

● আপনার বান্ধার কি রুদ্ধ হয়ে গেছে, অথবা

১০. কীভাবে নিয়মিত পরিষ্কার করুন।

© 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc.



## সর্বসাধারণের স্বার্থে পি সি আর এ কর্তৃক প্রচারিত।

এখানকার সমস্ত তথ্যই পি সি আর এ'র গবেষণা এবং পরীক্ষার ফলাফল। পি সি আর এ হ'লো ভারত সরকারের তৈল মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এক কমন্স্টি। বিশ্বব্যাপী যে তৈল-সঙ্কটের প্রভাব আজ আমাদের সকলকে স্পর্শ করেছে, সাড়ে চার বছর আগেই তার পরিণাম অনুমান করে এটি আরম্ভ হয়েছিলো জ্বালানীর আরো উপযোগী, আরো লাভজনক ব্যবহার শেখানোর জন্য— বাড়ীতে, ক্ষেত-খামারে, কলকারখানায়, রাস্তাঘাটে সর্বত্র। কারণ যতদিন না শক্তির কোনো বিকল্প উৎসের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে ততদিন পৃথিবীর এই ব্রহ্মহাসমান তৈল সম্পদের সবচেয়ে ভালো ব্যবহার আমাদের করতেই হবে।



পেট্রোলিয়াম কনজারভেশন  
রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন

709-711 সূর্য্য কিরন বিল্ডিং  
19 কঙ্করবা গান্ধী মার্গ, নিউ দিল্লী-110001

## কারন তেলের সঞ্চয় চিরদিন থাকবে না!

নিম্নলিখিত পুস্তিকার জন্য এ'টি কোটি পাঠিয়ে দিন।

হাতের কাছে রাখার মতো আরো তথ্য সংগৃহীত একটি পাঠিত পুস্তিকা পি সি আর এ আপনার প্রয়োজনে পাঠাতে পারলে স্তম্ভী হবে।

নিম্নলিখিতের জ্বালানী সাশ্রয়ের উপায় সম্পর্কে আরো বিশদ বিবরণ জানতে আমি আগ্রহী।

(আপনার প্রয়োজনের ঘরে দাগ দিয়ে দিন, ইংরাজীতে নাম-ঠিকানা লিখবেন)

\* গ্যাস/কেরোসিন স্টোভ ☐ \* মোটরগাড়ী ☐ \* স্কটার/মোটর সাইকেল/মোপেড ☐

আমার নাম \_\_\_\_\_

ঠিকানা \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন :

পেট্রোলিয়াম কনজারভেশন রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন, 709-711 সূর্য্য কিরন বিল্ডিং

19 কঙ্করবা গান্ধী মার্গ, নিউ দিল্লী-110 001

## তিন কোটিরও বেশী বাড়ীতে পৌঁছাতে হবে এই প্রচারের। আপনার পাশের বাড়ীতে পৌঁছানোর দায়িত্ব আপনারই।

অথ সায়েদায়ে যা খুঁজছিলত...



নতুন!

**সাই-ব্যান\***

লোশন

**তিব্বাশ্রদ, কার্যকরী উকুত তাশক।  
তেলাভাব-বহিত। মর্তোবস সুগন্ধ-যুক্ত।**

সাই-ব্যান বিশেষ কার্যকরী। রাতে ঘোরে  
ধীরে কেবল মাথার খুলিতে ঘষুন...  
আর সকালে চিবুকা দিয়ে আঁচড়ে মরা  
উকুন আর উকুনের ডিম বার করে ফেলুন।  
চুল শ্যাম্পু করুন। তারপর ভুলে যান  
কোনোদিন উকুনের সমস্যা ছিল।

**সাই-ব্যান তেলোভাব-বহিত**

সাই-ব্যানের মাথার তেল নয়; ফলে চটচট  
করে না। বালিশে দাগ ধরে না।  
ময়লাও হয় না। ভাড়াভাড়া ছিড়িয়ে  
পড়ে। ফলে চট করে সমস্যার গোড়ায়  
পৌছে যায়।

**সাই-ব্যান মনোরম সুগন্ধ-যুক্ত**

অন্যান্য উকুন নাশকের সঙ্গে এর তফাৎ  
হল--সাই-ব্যানের দুর্গন্ধ নেই। আছে  
ল্যাভেণ্ডারের মনোরম সুগন্ধ। এ সুগন্ধের  
রেশ থাকে সারারাত ধরে।

**সাই-ব্যান নিরাপদ**

সাই-ব্যান লোশনে চুল ও মাথার খুলির পক্ষে  
নিরাপদ। সাই-ব্যান লোশন ব্যবহার করলে  
চুলের রঙ বদলায় না বা চুল উঠে যায় না।  
হবেই তো, লেডারবলের তেরী যে!

এ হল বহুবছরের গবেষণা ও পরীক্ষার ফল।  
পরীক্ষা করে প্রমাণিত হয়েছে—

এটি নিঃসন্দেহে নিরাপদ ও কার্যকরী!

সমস্ত কেমিস্টের দোকানে পাওয়া যায়।



Obtained only  
in another  
only as it is not as  
popular movements  
ETHICAL  
Pro: (1) My  
habitually obtain  
large classes  
for the real  
Pressing my  
Right to  
to see for

**সাই-ব্যান\***

**বাতাবতি উকুত ও উকুতের ডিম দূর**

Sista's









